রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠিত

প্রবাসী

৬২শ ভাগ, দ্বিতীয় খণ্ড, ১৩৬৯

সূচীপত্র

কার্ত্তিক—চৈত্র

সম্পাদক—শ্রীকেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়

লেখকগণ ও তাঁহাদের রচনা

লেখকগণ তাঁহাদের রচনা

বিষয় সূচী

বিষয় সূচী

বিবিধ প্রসঙ্গ

চিত্রসূচী

ত্রিবর্ণ চিত্র

একবর্ণ চিত্র

প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা

কালী

শ্রীচৈতন্যদেব চট্টোপাধ্যায়

:: রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠিত ::

"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্"

"নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"

৬২শ ভাগ
২য় খণ্ড | কার্ত্তিক, ১৩৬৯ | ১ম সংখ্যা

বিবিধ প্রসঙ্গ

পঞ্জিকা বিভ্রাট

শারদীয়াই বাঙালীর জীবনের শ্রেষ্ঠতম উৎসব। নববর্ষ বা অন্য পূজা-পার্ব্বণ বাঙালীর জীবনস্রোতে যে আলোড়ন আনে, শারদীয়ার আনন্দ-উচ্ছ্বাস সে-সকলকে ছাপাইয়া সেই স্রোতপথে নূতন কল্লোল আনে। বাঙালী এই পূজার কয়দিন তাহার নৈরাশ্য ও ব্যর্থতায় পূর্ণ জীবনের সমস্ত তিক্ততা মুছিয়া আনন্দে মাতিয়া থাকে। এই কয়দিন তাহার মন-প্রাণে নূতন জীবন-ধারার স্পন্দন আনে। সেই জন্যই বাঙালী প্রতীক্ষা করিয়া থাকে এই উৎসবের জন্য।

এবারের পূজা কয়দিন থাকিবে সে বিষয়ে পঞ্জিকাকার-দিগের মধ্যে মতভেদ ঘটিয়াছে। পুরাতন পদ্ধতিতে গণনাকারীদের মতে ১৯শে, ২০শে ও ২১শে আশ্বিন (৬ই, ৭ই ও ৮ই অক্টোবর) এই তিনদিন মাত্র পূজা। কেননা, ২১শে আশ্বিন—৮ই অক্টোবর সোমবার নবমীর দিনেই দশমী কৃত্যের বিধান তাঁহারা দিয়াছেন। বিশুদ্ধ সিদ্ধান্তের পঞ্জিকাকারদিগের মত অন্তরূপ, এবং তাঁহারা পূজার সময়ও অনেক দিয়াছেন।

পাশ্চাত্ত্য মতের জ্যোতির্ব্বিদ্যা অনুযায়ী গ্রহ তারা ইত্যাদির গতিবিধি নির্ণয় ও নিরূপণের পন্থা নটিক্যাল এলম্যানাক নামক "বিলাতি" পঞ্জিকায় প্রদত্ত অঙ্কমালার মধ্যে দেওয়া আছে। বলাবাহুল্য গ্রহতারা ইত্যাদির অবস্থান ও তাহাদের সকল তথ্য বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে এবং অত্যাধুনিক যন্ত্রাদির সাহায্যে যাঁহারা অতি সূক্ষ্মভাবে গণনা করিয়া থাকেন সেই সকল জ্যোতির্ব্বিদেরাই প্রতি বৎসর এই নটিক্যাল এলম্যানাক প্রণয়ন করেন। সেই নটিক্যাল এলম্যানাকের বিচারেও নবমীর দিনে দশমী তিথি আরম্ভ হইলেও উহা ২২শে আশ্বিন, ৯ই অক্টোবর মঙ্গলবার দ্বিপ্রহর ১২-৩০ মিনিট পর্য্যন্ত থাকিবে। সুতরাং সেদিনেই বিসর্জ্জন চলিতে পারে।

আমাদের প্রাচীনপন্থী জ্যোতিষীবর্গের বিচার কিসের কারণে বিজয়া সম্পর্কে অন্য মত দিয়াছেন জানি না। তবে পরলোকগত যোগেশচন্দ্র রায়বিদ্যানিধি মহাশয় এক সময় বলিয়াছিলেন যে, আমাদের পঞ্জিকাকারদের মধ্যে অনেকেই জ্যোতিষ্কদিগের অবস্থান ও গতিবিধি নির্ণয়ের প্রত্যক্ষ পন্থা সম্পর্কে কোনও চর্চ্চা করেন না ও করিতে জানেনও না। এবারের পঞ্জিকা বিভ্রাটে সে কথাই মনে হয়।

পশ্চিমবঙ্গের সন্তানদিগের বেকার-সমস্যা

পশ্চিম বাংলার সন্তানদিগের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে এত দিনেও কোনও সুসংবদ্ধ পরিকল্পনার সৃষ্টি হয় নাই। ডাক্তার রায় এই বিষয়ে বিশেষ চিন্তিত ছিলেন এবং পশ্চিমবঙ্গে নানা প্রকার নূতন শিল্প উদ্যোগ গঠনে তিনি যেরূপ দৃঢ় সংকল্পের সহিত সকল কার্য্যক্রমকে অগ্রসর করিতে চেষ্টিত ছিলেন তাহাতে এ বিষয়ে তাঁহার চিন্তার গতিমুখও বুঝা সহজ ছিল। কিন্তু যে সকল শিল্পপতি ও

শিল্পসংস্থা পশ্চিম বাংলার অনুকূল পরিবেশের মধ্যে ও পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সহযোগিতায় গঠিত ও চালিত হইতেছে, সেগুলিতে পশ্চিম বাংলার সন্তানদিগের অন্ন সংস্থানের কোনও বিশেষ ব্যবস্থা নাই।

একটি ইংরেজী দৈনিকে এ বিষয়ে একটি পত্র অল্প কিছুদিন পূর্ব্বে প্রকাশিত হইয়াছিল। পত্র লেখক শ্রীকালোবরণ ঘোষ কংগ্রেস দলের মধ্যে সুপরিচিত এবং এই সকল বিষয়ে অভিজ্ঞ বলিয়া খ্যাত। ঐ চিঠিতে পশ্চিম বাংলার বেকার-সমস্যার বিশ্লেষণ এই ভাবে করা হইয়াছে:

স্বাধীনতার পরে পশ্চিম বাংলায় জনসংখ্যা বাড়িয়াছে শতকরা ৩০% কিন্তু কর্ম্ম নিয়োগের পরিমাণ বাড়িয়াছে মাত্র ৭½%, অর্থাৎ কর্ম্ম সংস্থান হইয়াছে মাত্র ৭½% বেশী সংখ্যায়। ভিন্ন প্রদেশের শিল্পসংস্থার সংখ্যা বৃদ্ধির তুলনায় পশ্চিম বাংলার বৃদ্ধির পরিমাণও বেশী নয় বরঞ্চ কোন কোন ক্ষেত্রে কম। যথা মহারাষ্ট্রে শিল্পসংস্থার সংখ্যা বৃদ্ধি হইয়াছে শতকরা ৪৫% ও গুজরাটে হইয়াছে ১৩%, কিন্তু পশ্চিম বাংলায় হইয়াছে ৫% মাত্র। তার পর রোজমজুরি ও মাহিয়ানায়ও পশ্চিম বাংলার কর্ম্মী-দিগের অবস্থা অন্য অনেক প্রদেশের কর্ম্মীদিগের তুলনায় খারাপ। তুলনামূলক সমীক্ষা দ্বারা দেখা যায় যে, যেখানে বোম্বাইয়ের কর্ম্মীদের রোজমজুরি হিসাবে বাৎসরিক উপার্জ্জন গড়ে ১,৪৫৮ টাকা, দিল্লীর কর্ম্মীর আয় ১৩৫৮'৭০, বিহারের কর্ম্মীর আয় ১২৮৩'২০, মধ্যপ্রদেশের ১২১৭'১০, উত্তর প্রদেশে ১২৩'৪০, এবং পাঞ্জাবে ১২১২'২০ টাকা সেখানে পশ্চিম বাংলার কর্ম্মীরা পায় ১১৯৮'৪০ টাকা মাত্র। অন্যদিকে নানাদিক হইতে পশ্চিম বাংলার সন্তানদিগের শারীরিক পরিশ্রমের বিষয়ে বিমুখতা সম্পর্কে যে সকল মন্তব্য করা হয় সে কথারও কোন ভিত্তি খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। এই রাজ্যের কর্ম্মনিয়োগ দপ্তরের বর্ত্তমান রেজিষ্টারে দেখা যায় যে, ৩,৬০,০০০ দরখাস্তকারীর মধ্যে শতকরা ২০% জন কেরাণীর বা লেখাপড়ার কাজ চায় যেখানে শতকরা ৭০% জনের উপর কায়িক পরিশ্রম করিতে প্রস্তুত এবং সেই মত কাজ চাহে।

তার পর শিল্পের ধরন অনুযায়ী সমীক্ষা করিলে দেখা যায় যে, সূতা ও কাপড়-কলের কর্ম্মীদের মধ্যে মাত্র শতকরা ৪২% বাঙালী, পাটশিল্পে শতকরা ২৪%, ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পে ৪৩%, লৌহ ও ইস্পাত শিল্পে ৩৬% এবং কাগজ শিল্পে ১৭% মাত্র। পশ্চিম বাংলায় রেজেষ্ট্রী-কৃত ৪,২৮৮টি কারখানার ৭,০০,০০০ সংখ্যক কর্ম্মীদের মধ্যে পশ্চিম বাংলার সন্তানদিগের অনুপাত মাত্র শতকরা ৩৭% এবং আপিস ও ঐ জাতীয় কর্ম্মসংস্থার কর্ম্মী ও কর্ম্মচারীদিগের মধ্যে শতকরা ৫০% মাত্র।

কলকারখানায় ধর্ম্মঘটে কামাইয়ের দরুন সারা ভারতে এই তৃতীয় পরিকল্পনার মেয়াদের মধ্যে এতাবৎ যে ২৪,০০,০০০ কর্ম্মী-দিন নষ্ট হইয়াছে তাহার মধ্যে পশ্চিম বাংলায় হইয়াছে উহার শতকরা ১০% মাত্র। সুতরাং এই প্রদেশে শিল্প প্রযোজনায় ঐ প্রকার গোলযোগও অন্য প্রদেশের তুলনায় বেশী নয়—বরঞ্চ কম। শ্রীঘোষের পত্রে আমরা পাই যে, এ প্রদেশের অপর্য্যাপ্ত কাঁচা মাল (কয়লা, লৌহ, ঘাস, তুলা, বাঁশ) আবহাওয়া, মাল পরিবহনের ব্যবস্থা, কর্ম্মী সংখ্যা ইত্যাদি শিল্পযোজনার হিসাবে অন্য যে কোনও প্রদেশের তুলনায় প্রতিকূল ত নহেই, বরঞ্চ অধিক অনুকূল। এবং একথা যে সকল শিল্পপতি এবং ব্যবসা-বাণিজ্যে অভিজ্ঞ লোক জানেন—অর্থাৎ এই প্রদেশের শিল্পযোজনা বিষয়ে অনুকূল পরি-বেশের কথা এতই সুপরিজ্ঞাত—যে এখানে ৮৯১১টি যৌথ কারবার কোম্পানী চালু আছে (যদিও তাহার অধিকাংশ স্বাধীনতাপ্রাপ্তির পূর্ব্বেই স্থাপিত) যেখানে মহারাষ্ট্রে আছে ৫২৯৮, মাদ্রাজে আছে ২৯৭১, দিল্লীতে ১৮৯২ (যদিও এখানে সংখ্যাবৃদ্ধির যথেষ্ট অনুকূল অবস্থা আছে) উত্তর প্রদেশে ১২৪, কেরলে ১০৬৩, গুজরাটে ১০০৬, পাঞ্জাবে ৮৮০ ও উড়িষ্যায় মাত্র ২২৪টি আছে।

সংবাদপত্রে পশ্চিমবঙ্গের সন্তানদিগের কর্ম্মনিয়োগ সম্পর্কে এইরূপ চিঠিপত্র লেখালেখি আরম্ভ হইয়াছে মুখ্য-মন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেনের এ বিষয়ে চর্চ্চা করার পর। বেকার-সমস্যা বিষয়ে সমীক্ষাও বিচার করার জন্য পশ্চিমবঙ্গে একটি উপদেষ্টা কমিটি সম্প্রতি পুনর্নির্ব্বাচিত ও প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। সেই কমিটির প্রথম অধিবেশনে শ্রীযুক্ত প্রফুল্ল সেন তাঁহার ভাষণে পশ্চিমবঙ্গের বেকার-সমস্যা ও উহা হইতে উদ্ভূত নানা জটিল ব্যাপারের উল্লেখ করিয়া এই প্রদেশের শিল্পপতি ও শিল্প প্রতিষ্ঠানের কর্ত্তৃপক্ষগণকে বিচার করিয়া দেখিতে বলেন যে, পারি-পার্শ্বিক সব কিছু বিবেচনা করিলে এদেশের সন্তানদের আরও অধিক সংখ্যায় নিয়োগ করা উচিত কিনা। তিনি বলেন যে, "আমি প্রাদেশিকতার পক্ষপাতী নহি এবং আমি এ কথাও বলিতেছি না যে, পশ্চিমবঙ্গের সকল কিছু শুধু উহার সন্তানদিগের 'একচেটিয়া' অধিকারে থাকিবে। তবে অবস্থা বিচার করিলে শিল্পপতি ও কর্ত্তৃপক্ষগণ নিশ্চয়ই একথা স্বীকার করিবেন যে, এদেশে

অবস্থিত যাবতীয় প্রতিষ্ঠানে পশ্চিমবঙ্গের সন্তানদিগের অধিক সংখ্যায় নিয়োগ করা উচিত।"

যে বিচারের কথা মুখ্যমন্ত্রী শ্রীসেন বলিয়াছেন, তাহার জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য সরবরাহ করিতেই শ্রীকালোবরণ ঘোষ উপরে উল্লিখিত পত্র লিখিয়াছিলেন।

আমাদের এ বিষয়ে আরও কিছু বলিবার আছে। আমাদের মনে হয় যে, এখন সময় আসিয়াছে যখন আরও স্পষ্ট ভাষায় বলা প্রয়োজন যে, বাংলা দেশে বসিয়া যাঁহারা কাজ-কারবার শিল্প-উদ্যোগ বা যন্ত্রশালা চালাইয়া বিলক্ষণ লাভ করিতেছেন তাঁহাদের এখন বুঝিবার সময় আসিয়াছে যে, তাঁহারা এদেশের সন্তানগণের সকল ন্যায়-সঙ্গত অধিকার নিজ স্বার্থে উপেক্ষা করিয়া আর চলিতে পারিবেন না। এ বিষয়ে বিচার-বিবেচনা বা দয়া-দাক্ষিণ্যের কোনও প্রশ্ন নাই এবং এই সম্পর্কে অন্য কোনও প্রশ্ন—যথা প্রাদেশিকতার কথা উত্থাপন করা অপ্রাসঙ্গিক ও অবাস্তব।

ধরিয়া লইলাম যে, পশ্চিমবঙ্গের সন্তানদিগের ন্যায্য অধিকার দাবী করা (যাহা তাহাদের ভবিষ্যৎ চিন্তার অত্যাবশ্যক অঙ্গ) প্রাদেশিকতার লক্ষ্য। সেখানে আমরা বলিব ভারতের কোন প্রদেশের কোন অংশে সেখানের সন্তানদিগের স্বার্থরক্ষায় এইরূপ প্রাদেশিকতার চূড়ান্ত করা হইতেছে না? এই প্রদেশ ছাড়া কোন্ প্রদেশে ডোমিসাইল, প্রাদেশিক ভাষা জ্ঞান ইত্যাদি নানা কল-কৌশলে ভিন্ন প্রদেশীয়দের বর্জ্জন ও বহিষ্কার চলিতেছে না?

বিহারের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীবাবু যখন আট-নয় বৎসর পূর্ব্বে বলিয়াছিলেন যে, বিহারের ভূমিতে স্থাপিত যাবতীয় শিল্প-বাণিজ্য বা খনি প্রতিষ্ঠানে কর্ম্মী নিয়োগে বিহারী-দিগকে সংখ্যা ও অনুপাতে গরিষ্ঠরূপে নিয়োগ করিতে হইবে (শুধু "অধিক সংখ্যায়" নয়, কেননা শতকরা ৫ হইতে শতকরা ৬ হইলেই "অধিক" হয়) তখন তিনি "প্রাদেশিকতা" ইত্যাদি ধর্ম্মনীতি বিগর্হিত আচার-ব্যবহারের প্রশ্ন তুলেন নাই। তিনি জানিতেন যে, তিনি মুখ্যমন্ত্রীরূপে নিযুক্ত ও প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। বিহারের অধিবাসিগণ কর্ত্তৃক এবং তাঁহার নিকট বিহারের সন্তান-গণের অন্নসংস্থান ও ন্যায্য অধিকার প্রাপ্তিই মুখ্য প্রশ্ন ও কর্ত্তব্য, অন্য সকল কথা অবান্তর।

পশ্চিমবঙ্গে বিশেষে কলিকাতায়, পশ্চিমবঙ্গের সন্তান-গণ বঞ্চিত, অবহেলিত ও প্রতারিত। এখানেও অর্থাৎ এই পশ্চিমবঙ্গেরই ক্রোড়ে—পশ্চিমবঙ্গের সন্তানগণের জন্মস্বত্ব ও জন্মগত অধিকার ক্রমেই সঙ্কুচিত ও ক্ষীণ হইয়া আসিতেছে। কলিকাতায় ত আর কিছুদিন পরে ভাল স্কুল-কলেজেও পশ্চিমবঙ্গের সন্তানগণ স্থান পাইবে না। বেকারসমস্যার কথা ত বলা নিষ্প্রয়োজন।

সেই জন্যই আমরা চাহিতেছি যে, এই "প্রাদেশিকতা" বর্জ্জনজাতীয় নীতিগত প্রশ্ন এখন অবান্তর। সারা ভারতে আমরা দেখিতেছি যে, এই নিজেদের স্বার্থ ও অধিকার চিন্তা প্রত্যেকটি প্রদেশে, প্রত্যেকটি জাতি-উপজাতির মধ্যে প্রবল হইতে প্রবলতর হইতেছে। শুধু আমরা বাংলামায়ের অভিশপ্ত সন্তানবর্গ দধীচির মানস-সন্তানসন্ততিরূপে অন্যের ভাঁওতায় পড়িয়া নিজেদের ও নিজের সন্তানসন্ততিদিগের বলিদান করিতে উদ্যত।

এ বিষয়ে আমাদের শ্রমিক নেতাদের কর্ত্তব্য কি ও মতামত কি আমাদের জানিতে ইচ্ছা করে। ধর্ম্মঘট ও কর্ম্মনাশের উদ্যোগই যাঁহাদের একমাত্র লক্ষ্য বা যাঁহাদের ন্যায়নীতি ইত্যাদি সবকিছুরই একটা অন্যরূপ ভিত্তি আছে, তাঁহাদের নিকট এই প্রশ্নের কোন উত্তর প্রত্যাশা করাই ভুল, একথা আমরা জানি। কিন্তু এখনকার শ্রমিকনীতিতে নূতন আবহাওয়ার সৃষ্টি করিয়াছেন যাঁহারা, অর্থাৎ শ্রমিকের স্বার্থই যাঁহাদের একমাত্র চিন্তা, রাষ্ট্রনীতি নহে এবং সেই স্বার্থ সম্পর্কে যাঁহাদের চিন্তার প্রসার এখন উপস্থিত ও ক্ষণস্থায়ী বর্ত্তমানকে ছাড়াইয়া দূর ভবিষ্যতের দিকে চলিতেছে, সেই প্রগতিবাদী শ্রম-নীতিজ্ঞানযুক্ত শ্রমিক-নেতৃবর্গ এ বিষয়ে কি ভাবিতেছেন আমরা জানিতে চাই, কেননা তাঁহাদের উপর বাংলা-মায়ের সন্তানদিগের বেকারসমস্যার সমাধান অনেকাংশে নির্ভর করে।

অর্থনীতির বিপাকে গ্রামোন্নয়ন পরিকল্পনা

গ্রামোন্নয়ন পরিকল্পনা কাগজে-কলমে অনেক হইয়া গিয়াছে। তবে এবারে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্ল সেন কাগজ-কলমের বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন। কারণ উন্নয়নের প্রধান বাধা গ্রামীণ অর্থনীতি। মুখ্যমন্ত্রী মহাশয় তাই পরিকল্পনা-মন্ত্রী শ্রীগুলজারীলাল নন্দের

শিক্ষকগণের সংশোধিত হারে বেতন পাইতে বিলম্ব কেন?

সংবাদপত্রে প্রকাশ, মাধ্যমিক শিক্ষকদের সংশোধিত হারে বেতনবাবদ পাওনা টাকা নাকি এখনও দেওয়া হয় নাই। ইহার কারণ, শিক্ষকগণের সংশোধিত হারে বেতনবাবদ পঞ্চাশ লক্ষ টাকা মঞ্জুর করার চিঠিখানা নাকি পাওয়া যাইতেছে না।

রহস্যজনক হইলেও, ইহাতে বিস্মিত হইবার কারণ দেখিতেছি না। ইহাই সরকারী দপ্তর! মাধ্যমিক শিক্ষকগণের বেতনবাবদ টাকাটা যে সময়মত বিলি হইতে পারিতেছে না অথবা নূতন সমস্যা সৃষ্টি হইতেছে, তাহাও একরকমের অব্যবস্থা এবং অবহেলার ফলে। অথচ কলিকাতা মহানগরীতেই রাজ্য-সরকারের সদর দপ্তর এবং অ্যাকাউণ্টেণ্ট জেনারেলের অফিস। দূরত্ব যৎসামান্য। জরুরী একখানি চিঠি, যাহার উপর কয়েক সহস্র মাধ্যমিক শিক্ষকের প্রাপ্য অর্থপ্রাপ্তি নির্ভর করিতেছে, তাহা হারাইয়া গেল? আর হারাইয়া গেলেও তাহার প্রতিকার হইতেছে না কেন? সামনেই পূজা। স্বল্প-সম্বল শিক্ষকগণ আশা করিয়া আছেন যে, পূজার পূর্ব্বেই তাঁহাদের পাওনা টাকাটা হাতে আসিবে, বৎসরের এই সময়টার বাড়তি খরচের ধাক্কা সামলাইবার কিছুটা সুবিধাও হয়।

কিন্তু আজ তাঁহাদের অবস্থা কি? বেচারা মাধ্যমিক শিক্ষকগণ পূজার পূর্ব্বে তাঁহাদের প্রাপ্য টাকা হাতে পাইবেন না—ইহা মোটেই কাজের কথা নয়। জরুরী চিঠি নিখোঁজ হওয়ায় কর্ত্তব্যচ্যুতির যে গুরুতর অপরাধ ঘটিয়াছে তাহার জন্য দায়ী-কর্ম্মচারীদের কৈফিয়ৎ অবশ্যই চাহিতে হইবে। নহিলে দপ্তরের অবহেলাজনিত দৌরাত্ম্য কমিবে না। কিন্তু সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজন, মাধ্যমিক শিক্ষকগণের পাওনা টাকাটা পূজার পূর্ব্বে বিলির ব্যবস্থা করা। চিঠিই না হয় নিখোঁজ হইয়াছে, মঞ্জুরি বাতিল হয় নাই এবং মঞ্জুরিকৃত টাকাও উবিয়া যায় নাই। দপ্তর-কর্ত্তারা একটু তৎপর হইলে জনসাধারণের ন্যায্য প্রাপ্য মিটাইয়া দেওয়া সম্ভব হইতে পারে। তাঁহারা এইদিক দিয়া বিবেচনা করিবেন বলিয়াই আমাদের বিশ্বাস।

হানাদারের বৈঠক-আব্দার

ভারতের সীমান্ত লইয়া যে সংঘর্ষ ইহার আর শেষ নাই। একদিকে নেফা অঞ্চলে ভারতীয় ঘাঁটিকে পরিবেষ্টিত করিয়াছে চৈনিক সেনাবাহিনী। ইহার উপর পাকিস্থানী হাঙ্গামা ত লাগিয়াই আছে। পূর্ব্বের মূর্ত্তির সহিত এবারের মূর্ত্তির তফাৎ দেখা যাইতেছে। অনধিকার প্রবেশ ত তাহারা বহুদিন পূর্ব্বেই করিয়াছে। এখন সেই অধিকার কায়েম করিবার জন্য তাহারা অস্ত্র প্রয়োগ করিতেছে। পাকিস্থানী ফৌজ পশ্চিমবঙ্গ সীমান্ত-পুলিসের উপর গুলীবৃষ্টি সুরু করিয়াছে। ভারতীয় রক্ষী-বাহিনী অবশ্য তাহার প্রতিরোধ করে। এখন তাহারা নাকি প্রস্তাব করিয়াছে, ঘটনাটি সম্বন্ধে আলোচনা করিবার জন্য একটা বৈঠক বসানো হউক। পশ্চিমবঙ্গ সরকার নাকি পাকিস্থানী কর্ত্তৃপক্ষের এই আব্দার মানিয়া লইয়াছেন। সেটা সম্ভবত তাঁহারা ভারত সরকারের নির্দ্দেশ মতই করিয়াছেন।

ইহার অর্থ বুঝিতে আমাদের বিলম্ব হইতেছে। হানাদারদের সহিত আবার বৈঠক কিসের? নিজেদের দোষ স্বীকার করিয়া তাহারা যদি সীমান্ত-সংঘর্ষ এড়াইবার জন্য ব্যগ্র হইত, তাহা হইলে না হয় কথা ছিল। কিন্তু তাহারা ভারতীয় এলাকা জোর করিয়া দখল করিবে, জবরদস্তি করিয়া এ দেশের মাঠের ফসল লুঠ করিতে প্রবৃত্ত হইবে এবং সে চেষ্টা ব্যর্থ হইলে, মিলিত বৈঠকের দাবি জানাইবে—চমৎকার!

জানি না, পশ্চিমবঙ্গ সরকার এই অযৌক্তিক সালিশে মত দিলেন কেন? বৈঠক তখনই ডাকা হয়, যখন দুই প্রতিবেশী রাষ্ট্রের মধ্যে কোনও একটা বিষয় লইয়া মতান্তর দেখা দেয়। অনেক সময় সেখানে দুই পক্ষেরই কিছু কিছু দোষ থাকে। সেইসব ক্ষেত্রে মীমাংসার জন্য দুইপক্ষ আলাপ-আলোচনার মধ্য দিয়া সঙ্কটের নিষ্পত্তি করে। এবং আপসের জন্য সাধারণতঃ দুই পক্ষকেই কিছু কিছু ছাড়িয়া দিতে হয়। কিন্তু যেখানে দৌরাত্ম্য এবং পররাজ্যলোলুপতা, সেখানে এ সবের প্রশ্নই উঠে না। পাকিস্থান অকারণে ভারতবর্ষের সীমানা লঙ্ঘন করিয়া ভারতীয় এলাকা জবরদখল করিয়াছে, সেখানে আলাপ-আলোচনার অবকাশ কোথায়? তর্কের খাতিরে যদি বা ধরিয়া লওয়া যায়, এ-অঞ্চলে ভারত-পাকিস্থান সীমান্তরেখার বিন্যাস লইয়া পাকিস্থানের মনে কিঞ্চিৎ সংশয় আছে, তাহা হইলে আলোচনা-বৈঠক বসাইবার কথাটা তাহার পক্ষ হইতে বহুদিন পূর্ব্বেই আসা উচিত ছিল। আর সেটা আসিলে ভারত সরকার অথবা পশ্চিমবঙ্গ সরকার তাহাতে রাজী হইলে, দেশের পক্ষে সেটা বোধ হয় অমর্য্যাদাকর হইত না। কিন্তু পাকিস্থানীরা তাহা করে নাই। অতর্কিতে হানা দিয়া ভারতীয়

এলাকায় জোর করিয়া চাপিয়া বসিয়াছে। এখন তাহাদের সহিত আলাপ-আলোচনার কথায় কেমন করিয়া রাজী হওয়া যায়? কেননা, এ ধরনের আলোচনা-বৈঠকে রাজী হওয়ার কদর্থ অনায়াসে করা যাইতে পারে। বলা যায়, দোষ একা পাকিস্থানের নয়, ভারতেরও আছে। নহিলে ভারত সরকারের তরফ হইতে আলোচনা-বৈঠক বসাইবার প্রস্তাবের সমর্থন আসিবে কেন? কাশ্মীরের ক্ষেত্রেও ভারত সরকার ঐ একই ভুল করিয়াছিলেন। সেজন্য আমাদের কঠিন মূল্য দিতে হইতেছে। এই আলোচনা চালাইবার সুযোগ দিয়া, ভারত সরকার তাহার হাতে অত্যন্ত মূল্যবান প্রচারের অস্ত্র যোগাইয়া দিয়াছেন। ফলে সারা বিশ্বে একটা বিভ্রান্তির সৃষ্টি হইয়াছে।

আর সেই ভুল যেন আমরা দ্বিতীয়বার না করি।

ভেজাল ঔষধ বিষয়ে কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রীর অদ্ভুত আব্দার

সম্প্রতি বোম্বাইয়ে অনুষ্ঠিত ভেজাল ঔষধের উচ্ছেদ ও বাজারে চালু ঔষধ সমূহের উপযুক্ত মান সংরক্ষণ উদ্দেশ্যে ভারতীয় ঔষধ-প্রস্তুতকারক সংস্থার (Indian Pharmaceutical Association) দ্বারা আহূত একটি আলোচনা সভায় (Seminar) কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী ডাঃ শ্রীমতী সুশীলা নায়ার একটি অদ্ভুত প্রস্তাব করিয়াছেন বলিয়া প্রকাশ। ভারতের আইনজীবীদের প্রতি তিনি আবেদন জানান যে, ভেজাল ঔষধ চালু করিবার অপরাধে যাঁহারা অভিযুক্ত হইবেন তাঁহাদের পক্ষ হইয়া যেন ইঁহারা মামলা গ্রহণ করিতে অস্বীকার করেন। ডাঃ সুশীলা নায়ারের মতে ভেজাল ঔষধের কারবারে যাঁহারা সংশ্লিষ্ট, তাঁহারা খুনী হইতেও হীন এবং আইনের দরবারে ইঁহাদের পক্ষাবলম্বন করিয়া ওকালতি করার অর্থ অত্যন্ত হীন অপরাধীকে সমর্থন করা।

ভেজাল ঔষধের কারবারীদের প্রতি আমাদের স্বভাবতঃই বিন্দুমাত্রও সহানুভূতি নাই এবং ভেজাল ঔষধের কারবারে লিপ্ত বা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের উপরে, তাঁহাদের অপরাধ সপ্রমাণ হইলে যে কঠিনতম দণ্ডের ব্যবস্থা হওয়া উচিত এ বিষয়েও আমাদের সম্পূর্ণই সমর্থন আছে, এ কথা বলাই বাহুল্য। কিন্তু অভিযোগ মাত্রই অপরাধের প্রমাণ নহে। অভিযুক্তের অপরাধ সন্দেহাতীত ভাবে সপ্রমাণ হইলেই তবে সে দণ্ডনীয় হইবে, ইহাই ন্যায় ও বিচার। বিলাতী আইনের মূল আদর্শের ভিত্তিতে রচিত এইরূপ আইনই আমাদের দেশে এতাবৎকাল প্রচলিত আছে এবং ভারতীয় বিধান বা Constitution-ও এই আদর্শ অনুসরণ করিয়াই রচিত হইয়াছে। ভেজাল ঔষধের কারবারে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ ও অন্যান্য সকল দেশবাসীরই মতন আইনের এবং বিচার পদ্ধতির এই মূল সংস্কার ফলভোগের অধিকারী। তাই এই হীন কারবারে সংশ্লিষ্ট বা লিপ্ত এই অভিযোগ মাত্রই তাঁহারা অপরাধী প্রমাণিত হন না। আইনের যথাবিধি অনুযায়ী বিচারে তাঁহাদিগের অপরাধ নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হইলেই তবে তাঁহারা দণ্ডযোগ্য হইবেন এই নিয়মের অন্যথা হইবার কোনই বিধি না বিধানসম্মত, না আইনসম্মত না বা ন্যায়সঙ্গত। অভিযোগের বিচারে অপরাধ প্রমাণিত হইলে এই সকল হীন অপরাধীদের প্রতি যেমন কঠিনতম দণ্ড বিধান করায় আমাদের সম্পূর্ণ সমর্থন আছে, তেমনি আইনানুমোদিত উপায়ে বিধিসম্মত ভাবে ইঁহাদের আত্মপক্ষ সমর্থন করিবার মৌলিক অধিকারে হস্তক্ষেপ করিবার কোনপ্রকার দুষ্প্রচেষ্টারও আমরা তীব্র প্রতিবাদ করি। উকীলের দ্বারা আদালতের বিচারকালে যে কোন অপরাধে অভিযুক্ত ব্যক্তির আত্মসমর্থনের অধিকার বিধানসম্মত একটি মৌলিক অধিকার। হত্যাপরাধের বা অন্য যে কোনও ঘৃণ্য অপরাধে অভিযুক্ত ব্যক্তিরও এই অধিকারটুকু আছে। থাকাও উচিত। কেননা এই অধিকারটুকুই সভ্য সমাজকে বর্ব্বরতার অবস্থা হইতে উন্নত করিয়াছে। ডাঃ সুশীলা নায়ারের এই অদ্ভুত আব্দার মানিয়া লইলে বর্ব্বর সমাজের দিকে প্রত্যাবর্ত্তনের পথ ধরিতে হইবে। সবচেয়ে আশঙ্কার কথা যে, ডাঃ নায়ারের এই অদ্ভুত উক্তির কোন প্রতিবাদ কোন দায়িত্বশীল লোক করিয়াছেন বলিয়া প্রচারিত হয় নাই। যে আলোচনা সভায় তিনি এই উক্তিটি করিয়াছেন বলিয়া প্রকাশ তাহাতে দেশের অনেক গণ্যমান্য চিকিৎসা-ব্যবসায়ী, ঔষধ-প্রস্তুতকারক সংস্থা ও আরও অনেকে উপস্থিত ছিলেন। সংবাদপত্র মারফৎ স্বাস্থ্যমন্ত্রীর এই অদ্ভুত উক্তিটি প্রচারিত হইয়াছে, কিন্তু কেহই ইহার বিরুদ্ধে উপযুক্ত দৃঢ়তার সহিত প্রতিবাদ জ্ঞাপন করেন নাই। তবে কি ইহা বুঝিতে হইবে যে ডাঃ সুশীলা নায়ারের এই সম্পূর্ণ বিধিবহির্ভূত প্রস্তাবে দেশের ও সমাজের দায়িত্বশীল স্তরের সরকারী ও বেসরকারী সকলের সমর্থন আছে? তাহা যদি হয় তবে ইহা নিতান্তই আশঙ্কার কথা, কেননা এই প্রস্তাবের মূল উদ্দেশ্যের প্রতি সকলের সহানুভূতি থাকিলে ব্যক্তি-স্বাধীনতার মৌলিক অধিকারের কাঠামোর মূলে কুঠারাঘাত করারই সামিল হইবে। এই বিষয়ে আমরা চিন্তাশীল দেশবাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

আসলে এই উক্তিটি কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রীর সম্পূর্ণ দায়িত্বজ্ঞানহীনতারই পরিচায়ক। একটি ভদ্রমহিলা সম্বন্ধে এরূপ কঠিন উক্তি ব্যবহার করিতে আমাদের ভদ্রতা ও রুচিতে বাধে, কিন্তু ভেজাল ঔষধ প্রচলনের বিষয়ে পূর্ব্ব হইতে স্বাস্থ্যমন্ত্রীর দৃষ্টিভঙ্গি ও ব্যবহার এমন অদ্ভুত খাত ধরিয়া চলিতেছে যে, আমরা নিরুপায় হইয়াই তাঁহার সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইতে বাধ্য হইতেছি। কিছুদিন পূর্ব্বে যখন এই বিষয়টি কেন্দ্রীয় বিধান সভায় আলোচিত হয়, তখন এই স্বাস্থ্যমন্ত্রীই কি কি কারণে এই বিষয়ে সরকারী হস্তক্ষেপ অসম্ভব, বা অবাঞ্ছনীয় তাহার লম্বা ফিরিস্তি দিয়া ব্যাপারটি চাপা দিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। অবশেষে নিতান্ত বাধ্য হইয়া এবং একান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও তিনি এ বিষয়ে প্রতিকারকল্পে কিছু কিছু নূতন সরকারী ব্যবস্থা অবলম্বন করিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুতি দেন। এই সকল ব্যবস্থা অবলম্বিত হইলেও যে ভেজাল ঔষধ প্রচলন বন্ধ হইবে বা কমিবে এমন ভরসা আমরা করি না। যাহা হউক তিনি তখন ইহার বেশী কিছুতেই অধিকতর অগ্রসর হইতে রাজী হন নাই। আজ আবার তিনিই এমনি উল্টা গাইতে সুরু করিলেন যে, ভেজাল কারবারে লিপ্ত বলিয়া সকলকেই তিনি বিনা বিচারেই দণ্ড দিতে উদ্যত হইয়া পড়িয়াছেন।

বস্তুতঃ আসল গলদের গোড়া হইতে সাধারণের দৃষ্টি অন্য দিকে বাহিত করিবার উদ্দেশেই এ সকল ঘটিতেছে বলিয়া আশঙ্কা হয়। ঔষধের ভেজাল কারবারের প্রশ্ন নূতনও নহে, ইহার গতি প্রকৃতির সঙ্গে জনসাধারণ সম্পূর্ণ অপরিচিতও নহেন। প্রথমতঃ ভেজাল ঔষধের ক্রেতা প্রধানতঃ বড় বড় হাসপাতাল,রেল-হাসপাতাল ইত্যাদি। এই সকল বড় বড় সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের জন্য ঔষধ ক্রয় করিবার পদ্ধতিগুলি ভাল করিয়া ও নিরপক্ষ দৃঢ়তার সঙ্গে পরীক্ষা করিয়া দেখিলেই যে কি খাত বাহিয়া প্রধানতঃ ভেজাল ঔষধের প্লাবন বহিয়া থাকে তাহার উৎসমুখের সন্ধান মিলিবেই, ইহাই আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস। এই প্রসঙ্গে একটা কথা বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। গত কয়েক বৎসরের মধ্যে যতবার ভেজাল ঔষধ সম্বন্ধে উত্তেজনার সৃষ্টি হইয়াছে, তাহার প্রায় সবকটিই সরকারী গুদাম হইতে আবিষ্কৃত হইয়াছে বলিয়া দেখিতে পাওয়া যাইবে। ইহার পুনঃ পুনঃ সংঘটন বন্ধ করা কি নিতান্তই কঠিন? সত্যই ইহা করিতে চাহিলে আমাদের মতে ইহা অসম্ভব ত নহেই, খুব কঠিনও নহে।

দ্বিতীয়তঃ ভেজালকারীর উপযুক্ত দণ্ডবিধানের প্রধান বাধা এই সম্পর্কীয় আইনের অসম্পূর্ণতা। ১৯৪০ সনে ভারতীয় ঔষধ-মান (Standardization of Drugs Act) সম্বন্ধীয় আইন পাশ করা হয়। সরকারী হিসাব মতই, আজ পর্য্যন্ত যতগুলি ক্ষেত্রে ভেজাল ঔষধ চালাইবার অভিযোগ লিপিবদ্ধ হইয়াছে, তাহার মধ্যে মাত্র শতকরা দশ ভাগেরও কম ক্ষেত্রে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে আদালতে বিচারের জন্য উপস্থিত করা সম্ভব হইয়াছে। আবার আদালতে অভিযুক্ত ব্যক্তিদের মধ্যেও মাত্র সামান্য কয়েকজনেরই অপরাধ সপ্রমাণ করা সম্ভব হইয়াছে। বস্তুতঃ কয়েকটি বিভিন্ন আদালতের মতে এই আইনে "ভেজাল ঔষধের" সজ্ঞাটি পর্য্যন্ত গভীর ত্রুটিপূর্ণ। কিন্তু এসকল প্রামাণ্য তথ্য সত্ত্বেও কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী এই আইনটির সংশোধন বা যে-সকল পরিচিত খাত বাহিয়া ভেজাল ঔষধ প্রধানতঃ চালু করা হইয়া থাকে তাহা নিরূপণ করিবার চেষ্টা বিন্দুমাত্র প্রয়োগ করেন নাই। ইহা কি কেবলমাত্র অজ্ঞনতাপ্রসূত, না ইহার মধ্যে অন্য কোনও রহস্য আছে?

ক. ন.

কেন্দ্রীয় মন্ত্রীমণ্ডলীতে অভূতপূর্ব্ব ঘটনা

সম্প্রতি সংঘটিত দুইটি যুগপৎ ঘটনা আমাদিগকে চমৎকৃত ও বিহ্বল করিয়াছে। ইহার প্রথমটি ঘটে নয়াদিল্লীর কেন্দ্রীয় মন্ত্রীমণ্ডলীকে কেন্দ্র করিয়া এবং এই ঘটনাটিরই পরিশিষ্ট হিসাবে অপরটি অব্যবহিত পরেই কেরল রাজ্যের রাজধানী ত্রিবান্দ্রম্ সহরে অনুষ্ঠিত হয়।

প্রথমটি ঘটে কেন্দ্রীয় সরকারের শিল্প-বাণিজ্য দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী শ্রী কে. সি. রেড্ডীকে কেন্দ্র করিয়া। সংবাদ প্রচারিত হয় যে, রাষ্ট্রপতি কেন্দ্রীয় শিল্প-বাণিজ্য মন্ত্রী শ্রী কে. সি. রেড্ডীকে পাঞ্জাব রাজ্যের রাজ্যপালের পদে নিয়োগ করিয়াছেন এবং পরদিনই শ্রী রেড্ডী এই নূতন নিয়োগ সম্পর্কিত শপথ গ্রহণ করিবেন। পরদিন কিন্তু পূর্ব্ব দিনের ঘোষণা প্রত্যাহৃত হইল। এই সম্পর্কে একটি বিবৃতিও প্রচারিত হইল। নূতন ঘোষণাটি এই যে, পূর্ব্ব মনোনীত শ্রী কে. সি. রেড্ডীর স্থলে কেরল রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শ্রী পাট্টম থানু পিল্লাইকে পাঞ্জাব রাজ্যের রাজ্যপাল নিয়োগ করা হইল। আনুষঙ্গিক বিবৃতিতে বলা হয় যে, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর অনুরোধক্রমে শ্রী রেড্ডী পঞ্জাবের রাজ্যপালের পদ গ্রহণ করিতে স্বীকৃত হওয়ায়, রাষ্ট্রপতি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর উপদেশক্রমে তাঁহাকে এই নূতন পদে নিয়োগ করেন। কিন্তু তাঁহার এই নূতন পদ নিয়োগ সরকারী ভাবে ঘোষণা করিবার অব্যবহিত পরেই এ বিষয়ে তিনি "দ্বিতীয় চিন্তার" দ্বারা আক্রান্ত হইয়া ইহা গ্রহণ করিতে

অস্বীকার করেন। ইহার ফলে এই পদটির জন্য অন্য ব্যক্তির বিনিয়োগ প্রয়োজন হয় এবং কেরল-রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীপাট্টম থানু পিল্লাই ইহা গ্রহণ করিতে রাজী হওয়াতে রাষ্ট্রপতি দ্বিতীয়বার তাঁহাকেই এই পদে নিয়োগ করেন।

এই দুইটি যুগপৎ ঘটনা বিভিন্ন দিকে বিভিন্ন ভাবে উত্তেজনার সৃষ্টি করিয়াছে দেখিতে পাই। কেন্দ্রীয় রাজ্য বিধান সভার বিরোধী পক্ষের অন্যতম নেতা শ্রীভূপেশ গুপ্ত শ্রী কে. সি. রেড্ডির প্রাথমিক নিয়োগের বৈধতার প্রশ্ন তুলিয়াছেন। প্রজা পার্টির নিখিল ভারত প্রধান, তাঁহাকে কিম্বা তাঁহার দলের অন্যান্য নেতৃবর্গের সহিত পরামর্শ না করিয়াই প্রজা-কংগ্রেস সম্মিলিত দলের দ্বারা গঠিত কেরল রাজ্য সরকারের প্রধানকে এ ভাবে অন্য পদে সরাইয়া দেওয়ায় নিতান্তই মর্ম্মাহত হইয়াছেন।

বস্তুতঃ শ্রীভূপেশ গুপ্ত যে প্রশ্ন করিয়াছেন সেটিই আমাদের নিকট এই প্রসঙ্গে মূল প্রশ্ন বলিয়া প্রতিভাত হইতেছে। ইহা সত্য যে, বিদেশ যাত্রার প্রাক্কালে তাঁহার ও অর্থমন্ত্রীর অনুপস্থিতিতে কেন্দ্রীয় সরকারের তরফে তাঁহার পক্ষ হইতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবার ক্ষমতা প্রধানমন্ত্রী স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী লালবাহাদুর শাস্ত্রীকেই দিয়া গিয়াছেন। কেবলমাত্র মন্ত্রীমণ্ডলীর সভায় সভাপতিত্ব করিবার ক্ষমতাটুকু দিয়া গিয়াছেন শ্রীজগজীবন রামকে। কিন্তু প্রধানমন্ত্রী স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বা অন্য কোনও মন্ত্রীকে সাময়িক ভাবে তাঁহার স্থলাভিষিক্ত করিয়া বিদেশ গেলেই কি প্রধানমন্ত্রীর সকল অধিকারই এই সাময়িকভাবে স্থলাভিষিক্ত মন্ত্রীতে বর্ত্তায়? মন্ত্রীমণ্ডলীর সঙ্গে সম্পর্কে প্রধানমন্ত্রীর সকল পার্লামেণ্টারী ডেমোক্রেসিতেই কতকগুলি ব্যক্তিগত অধিকার বা ক্ষমতা থাকে যাহা কখনও অন্য কোন মন্ত্রীতে বর্ত্তায় না বা তাঁহাতে হস্তান্তরিত করা যায় না। মন্ত্রীমণ্ডলীর সদস্য নিরূপণ, বা মন্ত্রীমণ্ডলীর রচনায় কোন পরিবর্ত্তন বা পরিবর্দ্ধন প্রধানমন্ত্রীর নিতান্ত 'ব্যক্তিগত' অধিকারের ক্ষমতা, ইহাতে অন্য কোন মন্ত্রীর হস্তক্ষেপ সাধারণতঃ চলে না এবং এই ক্ষমতা সাধারণতঃ (বস্তুতঃ ইহার অন্যথার কোনও উদাহরণই আমাদের জানা নাই) প্রধানমন্ত্রী নিজেও অন্য কোনও মন্ত্রীতে আরোপ (delegate) করিতে পারেন না। এ ক্ষেত্রে প্রধানমন্ত্রীর অনুপস্থিতিতে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীমণ্ডলীর ক্যাবিনেট সদস্য শ্রী কে. সি. রেড্ডীকে এই মণ্ডলী হইতে বাহির করিয়া লইয়া পাঞ্জাব রাজ্যের রাজ্যপালের পদে তাঁহাকে নিয়োগ করিবার এই যে সিদ্ধান্ত স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী গ্রহণ করিয়াছিলেন, ইহা কি সম্পূর্ণ অবিধেয় নহে? একই সঙ্গে শ্রী রেড্ডীর এই নূতন নিয়োগে সম্মতিও অবিধেয় হইয়াছিল সন্দেহ নাই।

ইহা অবশ্যস্বীকার্য্য, যে রাজ্যপালের পদে কোন ব্যক্তিকে নিয়োগ করিতে হইবে এই সিদ্ধান্ত গ্রহণে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সম্পূর্ণ অধিকার আছে। কিন্তু এই সিদ্ধান্তের দ্বারা যদি প্রধানমন্ত্রীর অনুপস্থিতিতে তাঁহার গঠিত মন্ত্রীমণ্ডলীর রচনায় কোন পরিবর্ত্তন ঘটিবার আশঙ্কা থাকে, তবে সে সিদ্ধান্ত স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর বিধিসঙ্গত ক্ষমতার অতীত। এবং মন্ত্রীমণ্ডলীর কোনও সভ্য এইরূপ সিদ্ধান্ত প্রধানমন্ত্রীর বিনানুমতিতে অংশ গ্রহণ করিলে তাঁহার কার্য্যও অবিধেয় বলিয়া বিবেচিত হইতে বাধ্য। বর্ত্তমান ক্ষেত্রে উভয়টিই ঘটিয়াছে দেখিতে পাওয়া যাইতেছে।

অবশ্য কেরল মুখ্যমন্ত্রী পাট্টম থানু পিল্লাইয়ের এই নূতন পদে নিয়োগে এরূপ কোন বৈধতার প্রশ্ন উঠে না। কিন্তু সে ক্ষেত্রে কেরলের রাজনীতিক্ষেত্রে নূতন আবহাওয়ার বা পরিস্থিতির আভাস ইহাতে যে পাওয়া যাইবে তাহাও নিশ্চয়। পাট্টম্ থানু পিল্লাই কেরল-রাজ্যের প্রজাসোস্যালিষ্ট দলের প্রধান। আইন ও শৃঙ্খলা রক্ষার কারণে রাষ্ট্রপতি তাঁহার সংবিধানসম্মত বিশেষ ক্ষমতার বলে কেরল-রাজ্যের কম্যুনিষ্ট দল-গঠিত রাজ্য সরকারকে বরখাস্ত করিয়া স্বয়ং এই রাজ্যের শাসনভার গ্রহণ করেন, তখন প্রধানতঃ পাট্টম থানু পিল্লাইয়ের এবং তাঁহার নেতৃত্বাধীন কেরলরাজ্য প্রজাসোস্যালিষ্ট দলের সাহায্য ও সহযোগিতায় এই অঞ্চলে কংগ্রেসের নষ্ট-প্রতিষ্ঠা ধীরে ধীরে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইতে থাকে। ইহা সত্য যে, কেরল-রাজ্যের বিচিত্র পরিস্থিতিতে উভয় দলেরই এই পারস্পরিক সহযোগিতার একান্ত প্রয়োজন ছিল। কেননা এই একদিকে কম্যুনিষ্ট অধ্যুষিত ও অন্যদিকে ক্যাথলিক ও মুস্লিম লীগের সাম্প্রদায়িক প্রভাবের অন্তর্বর্ত্তী এই দুই দলের কেহই যে একক স্বয়ংপ্রতিষ্ঠ হইতে পারিবেন, ইহার আশু সম্ভাবনা ছিল না। পারস্পরিক স্বার্থই একমাত্র এই দুইটি সাধারণতঃ পরস্পরবিরোধী দলকে একত্র করিয়াছিল এবং ইহাও অনস্বীকার্য্য যে, কেরল-রাজ্যে সাধারণ্যে পাট্টম থানু পিল্লাইয়ের অসাধারণ ব্যক্তিগত প্রভাবই একমাত্র এই মিলিত সহযোগকে সাফল্য দান করিয়াছিল। বস্তুতঃ-পক্ষে পরে যখন নির্ব্বাচনের ফলে কংগ্রেস-প্রজা মিলিত শক্তি সরকার গঠনের পক্ষে ন্যূন-সংখ্যা লাভ করিল। তখন প্রজাসোস্যালিষ্ট দলের প্রধান নেতৃত্ব স্বীকার করিয়া লইয়াই কংগ্রেস কেরল রাজ্য সরকারে অংশ গ্রহণ

করে! কিন্তু সম্ভবতঃ ইতিমধ্যে কংগ্রেস কেরলে বেশ খানিকটা শক্তি সংগ্রহ করিয়া থাকিবে, কেননা কিছুদিন হইতেই কেরল-কংগ্রেস প্রধান শ্রী শঙ্কর (কেরল রাজ্য সরকারে কংগ্রেসের প্রতিনিধি হিসাবে থানু পিল্লাইয়ের সহকারী মুখ্যমন্ত্রী) এই রাজ্যে কংগ্রেসের ক্রমবর্দ্ধমান শক্তি ও প্রভাবের বড়াই করিতেছিলেন। ইহা খুব প্রচ্ছন্ন ছিল না যে, শ্রী শঙ্কর কেরল রাজ্য সরকার তাঁহার ব্যক্তিগত নেতৃত্বের অধীনে কংগ্রেসের আধিপত্য প্রজাসোস্যালিষ্ট পার্টির ঊর্দ্ধে প্রতিষ্ঠা করিতে ব্যগ্র হইয়া পড়িতেছিলেন। পাট্টম থানু পিল্লাই বিচক্ষণ ও বহুদর্শী জননেতা, কিন্তু তিনি অশীতিবর্ষ বয়স অতিক্রান্ত বৃদ্ধ, তিনি হয়ত উপলব্ধি করিতে পারিতেছিলেন দেশে সার্ব্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী কংগ্রেসের প্রতিভূকে অতিক্রম করিয়া থাকিয়া এই রাজ্যেও বেশীদিন আর তাঁহার মুখ্যমন্ত্রিত্ব করা চলিবে না। অন্যদিকে কে. সি. রেড্ডীর "দ্বিতীয় চিন্তার" ফলে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর মহা অপদস্থ অবস্থা। রেড্ডী প্রত্যাখ্যাত পাঞ্জাব রাজ্যপালের শূন্য গদী অচিরে পূর্ণ করিতে না পারিলে তাঁহার মান থাকে না। অতএব পাট্টম থানু পিল্লাইকে এই পদটি লইতে রাজী করাইতে পারিলে সব দিক রক্ষা হয়। শূন্য স্থানও পূর্ণ হয় এবং কিছুদিন হইতে শঙ্কর বড়ই বিরক্ত করিতেছিল। তাহাকেও খুসী করিয়া দেওয়া যায়। বৃদ্ধ বয়সে গদীচ্যুত হইবার ভীতি বড়ই দুর্ব্বলকারক, অন্য গদীতে আরোহণ করিয়া থানু পিল্লাইও সে ভীতির আশঙ্কা হইতে মুক্তিলাভ করিলেন।

কিন্তু আপাতঃ রক্ষা হইলেও মূল প্রশ্ন থাকিয়াই গেল। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী কি অত্যন্ত গর্হিত অবৈধতার প্রয়াস করেন নাই? ইহা হইতেও মূল প্রশ্ন আরও একটি আছে। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী কি সম্পূর্ণ নিজের দায়িত্বে এরূপ একটি গুরুত্বপূর্ণ দুঃসাহসিক কাজে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন? কিংবা প্রধানমন্ত্রী বিদেশ যাত্রার প্রাক্কালে এ বিষয়ে কিছু গোপন ইঙ্গিত করিয়া গিয়াছিলেন? রেড্ডী মহাশয় মোরারজী দেশাইয়ের দলের লোক বলিয়া খ্যাত। মোরারজীর দল যে ভাবে কৃষ্ণমেননের উৎখাতকল্পে লাগিয়াছেন, এবং তাহাতে দেশের লোকের সায় যেমন বাড়িতেছে, ইহাদের শক্তি হ্রাস করিতে না পারিলে হয়ত মেননকে রক্ষা করা যাইবে না এবং কৃষ্ণ বিনা নেহরুর বৃন্দাবন অন্ধকার হইয়া যাইবে। এক এক করিয়া মোরারজী দলের পাণ্ডাগুলিকে সরাইতে পারিলে তবে নিশ্চিন্ত হওয়া যায়। তাঁহার পিতৃভবনের প্রাক্তন বাজার-সরকারটিকে দিয়া কি গোপনে নিজে প্রচ্ছন্ন থাকিয়া মোরারজীর অনুপস্থিতিতে এই 'দুরভিসন্ধিটিই সিদ্ধ করিতে চাহিয়াছিলেন? জবাব কে দিবে?

ক. ন.

বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়

খবরে প্রকাশ, বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে বাহির হইতে আসিয়া যাহারা পড়াশুনা করে, অর্থাৎ যাহারা অনাবাসিক ছাত্র তাহাদের অধ্যয়ন নিষিদ্ধ হইয়াছে। ইহাতে স্থানীয় ছাত্র-ছাত্রী যাহারা এতদিন এই বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশুনার সুযোগ ভোগ করিতেছিল, তাহারা নিরতিশয়-বিপন্নবোধ করিতেছে। আবাসিক ছাত্র হইয়া এখানে লেখাপড়া করিতে যে অর্থ প্রয়োজন, তাহা যোগানোর শক্তি ইহাদের নাই। অথচ রবীন্দ্র সংস্কৃতির এই পবিত্র পীঠের আশেপাশে যাহারা বাস করে, তাহারা এই শিক্ষায়তনে অধ্যয়নের আকাঙ্ক্ষাও আন্তরিকভাবে পোষণ করে। কর্তৃপক্ষ তাহাদের সেই পথে আইনের বেড়া তুলিয়া ধরিয়া বাস্তবিকই সমীচীন কাজ করেন নাই। সন্দেহ নাই যে, বিশ্বভারতী আবাসিক বিশ্ববিদ্যালয় এবং আবাসিক ছাত্র-ছাত্রীই এখানে অধিকতর সুযোগ পাইবে।

কিন্তু যে সুযোগ কবির আমল হইতেই স্থানীয় ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য অবারিত ছিল এবং ১৯৫১ সালে প্রবর্ত্তিত হইলেও, যে আইন মাত্র সেদিন পর্য্যন্ত কার্য্যকর হয় নাই, সহসা তাহাকে চালু করিয়া বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষ প্রকারান্তরে কবির আদর্শকেই কি আঘাত করিতেছেন না? কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী কিছুসংখ্যক অনাবাসিক ছাত্র-ছাত্রীর প্রবেশাধিকার সম্পর্কীয় প্রশ্নটি দরদের সঙ্গে বিবেচনা করিবেন বলিয়া সম্প্রতি যে আশ্বাস দিয়াছেন, তাহা প্রকৃতই সুবিবেচনার পরিচায়ক। আমরা আশা করি, বিষয়টি গোলযোগের চেহারা ধরার আগেই একটা শান্তিপূর্ণ সমাধানে পৌঁছান সম্ভব হইবে। রবীন্দ্রনাথের স্বহস্ত-স্থাপিত প্রতিষ্ঠান কাহাকেও শিক্ষামন্দিরের দরজা বন্ধ করিয়া বিমুখ করিবে, ইহাই কি শতবর্ষান্তে আমাদের রবীন্দ্রনাথের উত্তরাধিকার রূপে দেখিতে হইবে?

চোরা-কারবারে কাহারা লিপ্ত?

দেখিতে দেখিতে চোরা-কারবার সারা পৃথিবীতে ছড়াইয়া পড়িল! আগে ভারতবর্ষের মধ্যেই ইহা সীমাবদ্ধ ছিল। কিন্তু দেখিতেছি, সোনার চোরাই চালানের ফলাও কারবারে পৃথিবীর অন্য দেশও সিদ্ধহস্ত।

দুনিয়ার বাজারের তুলনায় ভারতবর্ষে সোনার দাম অনেক বেশী হওয়ায় পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ হইতে গোপনে এবং বে-আইনীভাবে ভারতবর্ষে সোনা আমদানী করা হয়। ভারতবর্ষে সেই চোরাচালানী সোনা বিক্রয় করিয়া যে মুনাফা হয়, সেই মুনাফার টাকা হইতে আফিম, কোকেন প্রভৃতি নেশার দ্রব্য, হীরা, জহরৎ ও ঘড়ির ব্যবসায়ের মূলধন আসে। সুতরাং দেখা যাইতেছে, আন্তর্জ্জাতিক বাণিজ্য-জগতের অন্তরালে যে আর একটি গুপ্ত বাণিজ্যের অন্ধকার জগৎ আছে, ভারতবর্ষ সেই জগতের একটি বৃহৎ ও লাভজনক বাজার।

কতকগুলি তথ্য হইতে জানা গিয়াছে, জল, স্থল ও বিমানপথে এই চোরাই চালান যাওয়া-আসা করিতেছে। সবচেয়ে বড় কথা, এই কারবারে দেশের ও বিদেশের একদল অর্থবান মানুষ ইহার পিছনে আছে। এই কিছুদিন আগেও, পশ্চিমবঙ্গ ও পাকিস্থানের সীমান্তে পেট্রাপোলের নিকট একটি অতি মূল্যবান বিদেশী মোটর গাড়ীতে ৫ মণ সোনা উদ্ধার করা হইয়াছে। এই গাড়ী যিনি চালাইতেছিলেন, সেই মার্কিন পর্য্যটককে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। এই ঘটনার পর শুল্ক-কর্তৃপক্ষ আরও একটি রহস্যজনক ক্যাডিলাক গাড়ী আটক করিয়াছেন। গত ২০শে সেপ্টেম্বর তারিখে দিল্লীর অশোক হোটেল হইতে একজন মার্কিন কোটিপতিকে গ্রেপ্তার করিয়া দশ হাজারের বেশী কার্ত্তুজ পাওয়া গিয়াছে। আরও সংবাদে দেখিতেছি, বে-আইনী ভাবে লক্ষ লক্ষ টাকার মোটর পার্টস আমদানীর অভিযোগে কলিকাতায় একজন ব্যবসায়ীকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। কিছুদিন পূর্ব্বে যুগান্তর পত্রিকায় ইহাও প্রকাশিত হইয়াছে, এই সোনার চোরা-চালানে লিপ্ত থাকার অভিযোগে নয়াদিল্লীস্থিত জর্ডানের রাষ্ট্রদূতকে দেশে ফিরিয়া যাইতে বাধ্য করা হইয়াছে।

অন্যান্য অনেক বৈদেশিক দূতাবাসের কার্য্যকলাপ সম্বন্ধেও নিশ্চয় আমাদের সরকারী কর্তৃপক্ষের নিকট এমন অনেক সংবাদ আছে যেগুলি প্রকাশ করা হয় না। কিন্তু সবচেয়ে উদ্বেগজনক সংবাদ হইল, এই ব্যাপক চোরা-চালানের ব্যবসায়ের সঙ্গে আমাদের দেশেরই একদল পুঁজিপতি জড়িত আছে। আমরা বলিব, এই বিবেকহীন ব্যবসায়ীর এই ধরনের কার্য্যকলাপ নিকৃষ্টতম দেশদ্রোহিতা ছাড়া আর কিছু নয়। সুতরাং এই দেশদ্রোহিতার স্বরূপ উদ্‌ঘাটন ও দণ্ডবিধান অবশ্যই করা উচিত। সরকারের চক্ষে ধুলা দিয়া ইহারা এত বড় ব্যবসায়ে লিপ্ত আছে, ইহা বিশ্বাস করা কঠিন।

হাসপাতালগুলির অব্যবস্থার কারণ নির্ণয়

হাসপাতালের অব্যবস্থা, দুর্নীতি, রোগীদের প্রতি ব্যবহার প্রভৃতি লইয়া বহু আলোচনা এ পর্য্যন্ত হইয়া গিয়াছে। সম্প্রতি এই সম্পর্কে পশ্চিমবঙ্গের স্বাস্থ্যমন্ত্রীর নিকট এক মেমোরেণ্ডাম বা স্মারকলিপি দাখিল করা হইয়াছে। কলিকাতার আটটি প্রধান হাসপাতাল যথা: কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজ, সংক্রামক ব্যাধি হাসপাতাল, এম. আর. বাঙ্গুর হাসপাতাল, নীলরতন সরকার মেডিক্যাল কলেজ, আর. জি. কর মেডিক্যাল কলেজ, শম্ভুনাথ পণ্ডিত হাসপাতাল, শেঠ সুখলাল করনানি মেমোরিয়াল হাসপাতাল এই কয়টি প্রতিষ্ঠানের ষ্টাইপেণ্ডারি হাউস-ষ্টাফ কো-অর্ডিনেশন কমিটির পক্ষ হইতে উপরোক্ত স্মারকলিপি স্বাস্থ্য-দপ্তরের নিকট পেশ করা হইয়াছে। জনসাধারণের এবং সংবাদপত্রের পক্ষ হইতে হাসপাতালের জঘন্য অবস্থার বিরুদ্ধে গত কয়েক বৎসর যাবৎ যে সমস্ত অভিযোগ করা হইতেছে, সেগুলি যে বর্ণে বর্ণে সত্য, তাহা এই স্মারকলিপি হইতে প্রমাণিত হইবে।

কিন্তু দুর্ভাগ্য এই যে, হাসপাতালগুলির এই নারকীয় অবস্থার জন্য জনসাধারণের সমস্ত আক্রোশ ও অভিসম্পাত গিয়া বর্ষিত হয় হাউস-ষ্টাফদের কিংবা তরুণ চিকিৎসকদের বিরুদ্ধে। ইহার জন্য অবশ্য তাহাদের দোষ দেওয়া যায় না। কারণ হাসপাতালের এই শোচনীয় আভ্যন্তরীণ অবস্থা তাহাদের জানিবার কথা নয়। তাঁহারা দেখেন, রোগীর চিকিৎসা বা পথ্যের কোন ব্যবস্থা হইতেছে না। তাঁহারা হাতের কাছে স্বাস্থ্যমন্ত্রী বা স্বাস্থ্য-দপ্তরের বড় বড় কর্ত্তাব্যক্তি এবং সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট প্রভৃতিকে পান না—পান ঐ হাউস-ষ্টাফদের। সুতরাং তাঁহারা ধরিয়া লন, হাসপাতালে যাহা কিছু ঘটিতেছে ইহার জন্য দায়ী উপস্থিত ব্যক্তিরাই। হাসপাতালের এই আভ্যন্তরীণ অবস্থা এবং প্রশাসনিব ব্যবস্থাই যে ইহার জন্য বহুলাংশে দায়ী, একথা অধিকাংশেরই জানা নাই।

এই ভয়ঙ্কর অব্যবস্থার কথা সম্পূর্ণ খোলাখুলিভাবেই কলিকাতার আটটি হাসপাতাল স্বীকার করিয়াছে। তাহারা বলিয়াছে, গত কয়েক বৎসরে হাসপাতালের ইনডোর এবং আউটডোর বিভাগে অসম্ভব রকম ভীড়, অথচ রোগীর ভীড় অনুসারে চিকিৎসার কোন উপযুক্ত ব্যবস্থা নাই। একদিকে যেমন অসম্ভব রকমের স্থানাভাব, অন্যদিকে তেমনি হাউস-ষ্টাফ ও অন্যান্য কর্মচারীদের

স্বল্পতা। নিতান্ত অপরিহার্য্য যে-সমস্ত উপকরণ, সেগুলির পর্য্যন্ত অভাব রহিয়াছে এবং ইহার সঙ্গে একশ্রেণীর কর্ম্মচারীর উচ্ছৃঙ্খলতা ও দুর্নীতিপরায়ণতা সমগ্র আবহাওয়াকে কলুষিত করিয়াছে। রোগীরা উপযুক্ত খাদ্য ও পথ্য পায় না, এমন কি নগদ কিছু হাতে গুঁজিয়া না দিলে একটি বেডপ্যান পর্য্যন্ত পাওয়া যায় না।

স্মারকলিপিতে আরও বলা হইয়াছে, "যাঁহারা ভর্ত্তি হন তাঁহাদেরও যথাযোগ্য যত্ন লওয়া অথবা চিকিৎসা করা সম্ভব হয় না। ফলে মৃত্যুর হার বৃদ্ধি পায়। ইহার মধ্যেও দুর্নীতিদুষ্ট প্রশাসন ব্যবস্থা অপ্রয়োজনীয় এবং বিরক্তিকর নিয়মকানুনের উপর অত্যধিক জোর দেন। হাসপাতালসমূহ পরিচ্ছন্নতার দৃষ্টান্ত স্বরূপ হইবে, ইহাই আশা করা যায়। কিন্তু কার্য্যতঃ ছোঁয়াচে অসুখে মারা যাওয়া রোগীর বেড পরিষ্কার না করিয়াই তাহাতে অন্য রোগীকে রাখা হয়, এমন কি অস্ত্রোপচারও করা হয়। একজনের রক্ত-লাগা বিছানার চাদর, বালিশ, কাপড় প্রভৃতি অন্যকে দেওয়া হয়—বীজাণু নাশের কথা উঠেই না। অজ্ঞান রোগীর পাশে বেড়াল-কুকুরকে প্রায়শঃই শুইয়া থাকিতে দেখা যায়। হাউস-ষ্টাফদের অবস্থা আরও খারাপ। ইহারা ছয় মাস ধরিয়া অস্থায়ীভাবে নিযুক্ত হন—মুষ্টিমেয় ভাগ্যবানেরাই কেবল মাত্র তৃতীয়বার এক্সটেনশন পাইয়া রেসিডেণ্ট সিনিয়র হাউস ষ্টাফ পদে উন্নীত হন। সকাল ৮টা হইতে ৩।৪টা এবং সন্ধ্যা ৬টা হইতে রাত ১১টা—অধিকাংশক্ষেত্রে সপ্তাহের পর সপ্তাহ সারাক্ষণই ইঁহাদের কাজ করিতে হয়। ইঁহাদের কাজের কোন ঠিক-ঠিকানা নাই, রবিবার অথবা ছুটি-ছাটা বলিয়া কিছু নাই, কাহারও অসুখ হইলে কি হইবে, তাহাও কেহ জানেন না। মাসে ৭০।৭৫ টাকা এবং ১০৫ হইতে ১৫০ টাকায় যাবতীয় ব্যয় নির্ব্বাহ করিতে হয়। নিজেদের থাকা-খাওয়ার যে ব্যবস্থা তাহাতে রোগীদের সে সম্পর্কে উপদেশ দিবার মত আর কিছু থাকে না। প্রত্যেককে আউটডোরে একশত হইতে দেড়শত এবং ইনডোরে কুড়ি হইতে পঁচিশজন রোগীকে দেখিতে হয়।"

জানি না, বাংলা সরকারের স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা বিভাগের কর্ত্তাব্যক্তিগণ এবং হাসপাতালের পরিচালকমণ্ডলী কি করিতে আছেন? একমাত্র বেতন গণনা এবং আমলাতান্ত্রিক ফাইল রচনার কায়দা ছাড়া, তাঁদের কি আর কিছুই করণীয় নাই? গত ১০।১২ বছর ধরিয়া এই নারকীয় অবস্থার সৃষ্টি সত্ত্বেও (যাহা কোন উন্নত সভ্যদেশ কল্পনাও করিতে পারে না)° কর্ত্তৃপক্ষ ইহার কোন পরিবর্ত্তন করিতেছেন না।

এবারে নূতন মুখ্যমন্ত্রীর দৃষ্টি এদিকে পড়িবে বলিয়াই আশা রাখিতেছি।

সংস্কৃত বর্জ্জন করিবার সিদ্ধান্তে কেন্দ্রীয় সরকার

১৯৬১ সনের মুখ্যমন্ত্রী সম্মেলনের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কেন্দ্রীয় সরকার মাধ্যমিক শিক্ষায় যে 'তিন ভাষা ফরমুলা' গ্রহণ করিয়াছেন, তাহাতে সংস্কৃতের গুরুত্ব অস্বীকৃত হইয়াছে। ভারতের বিভিন্ন মাতৃ-ভাষার প্রায় প্রত্যেকেরই সহিত সংস্কৃত ভাষার অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক রহিয়াছে। সংস্কৃতের শিক্ষা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে বর্জ্জিত হইলে, মাতৃ-ভাষারই শিক্ষার উৎকর্ষ ব্যাহত না হইয়া পারিবে না। মাধ্যমিক শিক্ষার স্তরে এমন নীতি প্রযুক্ত থাকিতে পারে না, যাহার ফলে ছাত্র তাহার মাতৃ-ভাষায় একটি লঘু ধরনের এবং নিম্নমানের যোগ্যতা লাভ করিবে। সংস্কৃত ভাষা মাতৃ-ভাষারই শিক্ষার একটি স্বাভাবিক প্রয়োজন। হিন্দী অথবা অন্য কোন ভাষা মাধ্যমিক ছাত্রের মাতৃ-ভাষার উৎকর্ষ অর্জ্জনের সহায়ক হইবে না।

তা ছাড়া, হিন্দী শিক্ষকের অভাবে পশ্চিমবঙ্গের মাধ্যমিক শিক্ষার পর্য্যায়ে হিন্দীর শিক্ষা দ্রুত সম্প্রসারিত করা সম্ভব নহে, ইহা তাঁহারাও যে না জানেন এমন নহে। আমরা মনে করি, যথেষ্ট সংখ্যক হিন্দী শিক্ষক সুলভ হইলেও, মাধ্যমিক শিক্ষার স্তরে সংস্কৃত বর্জ্জন করিবার প্রশ্ন উঠিতেই পারে না। মাতৃ-ভাষার সুশিক্ষার জন্যই সংস্কৃতের শিক্ষা প্রয়োজন।

সুখের বিষয়, পশ্চিমবঙ্গ সরকার এই ফরমুলা অনুমোদন করেন নাই।

পূজার ছুটি

শারদীয়া পূজা উপলক্ষ্যে প্রবাসী কার্য্যালয় আগামী ৬ই অক্টোবর (১৯শে আশ্বিন) শনিবার হইতে ১৯শে অক্টোবর (২রা কার্ত্তিক) শুক্রবার পর্য্যন্ত বন্ধ থাকিবে। এই সময়ে প্রাপ্ত চিঠিপত্র, টাকাকড়ি প্রভৃতি সম্বন্ধে ব্যবস্থা আপিস খুলিবার পর করা হইবে।

কর্ম্মাধ্যক্ষ, প্রবাসী

বৈষ্ণব কবিগোষ্ঠীর উত্তরসাধক রবীন্দ্রনাথ

শ্রীদুর্গেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

রবীন্দ্রনাথের প্রতিভা অনন্যসাধারণ। কবিতা, গান, গল্প, উপন্যাস, নাটক, প্রবন্ধ, নিবন্ধ, আলোচনা, সমালোচনা, চিঠিপত্রে তিনি অদ্বিতীয়। বৈষ্ণব সাহিত্যও তাঁর পুণ্যস্পর্শ পেয়ে উজ্জ্বলতর হয়েছে; এই কারণে তাঁকে বৈষ্ণব কবিগোষ্ঠীর উত্তরসাধক বলা যায়। প্রায় অর্ধ সহস্র বৎসর পূর্বে যে বৈষ্ণব পদাবলীর পূতধারা বাংলা দেশকে প্লাবিত করে দিয়েছিল, উনবিংশ-বিংশ শতকেও দেখা যায় যে তার ধারা অব্যাহত। মধুসূদনের ব্রজাঙ্গনাকাব্য এর অন্যতম দৃষ্টান্ত। রবীন্দ্রনাথের বৈষ্ণব রসানুরাগ জানা যায় কৈশোরে রচিত ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলীতে। তাঁর লেখনীতে যখন দেখি 'মরণ রে, তুহুঁ মম শ্যামসমান', তখনই বুঝা যায়, এই বৈষ্ণবতার বীজ অতি সুদূরপ্রসারী। 'মরণ রে, তুহুঁ মম শ্যামসমান' ও 'কো তুহুঁ বোলবি মোয়'—এই দুইটি পদ পদাবলীর পর্যায়ে যে পড়তে পারে তা জানা যায় ভানুসিংহের পদাবলী-সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের মন্তব্য থেকে; কিন্তু দেখা যায়, যে গীতবিতান ১৩৩৮ সালে সংকলিত হয়েছিল, তাতে ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলীর প্রায় সব পদই গ্রহণ করা হয়েছে। এতে নিশ্চিতরূপে মনে করা যেতে পারে যে, রবীন্দ্রনাথ তাঁর বার্ধক্য সময়ে ঐ পদগুলির মূল্যার্থ নির্ণয় সম্বন্ধে পূর্বের ধারণাকে পরিবর্তিত করেন। এইটুকু মনে রাখা প্রয়োজন, কবিগুরু একই সময়ে সব পদ লেখেন নি। শেষ পদ লেখা নিয়ে পদসংখ্যা যখন কুড়িটি দাঁড়ায় তখন কবির বয়স পঁচিশ বৎসর। 'কো তুহুঁ বোলবি মোয়' পদটি ঠিক এই সময় লেখা। রবীন্দ্রনাথ তরুণ হলেও তাঁর কবিখ্যাতি তখন সর্বত্র স্বীকৃত। সুতরাং ভানুসিংহের পদাবলীর মধ্যে অনেক পদ নিশ্চয়ই উচ্চাঙ্গের; নইলে ১৩৩৮ সালে সংকলিত গীতবিতানে অধিকাংশ পদই গৃহীত হ'ত না। রবীন্দ্রনাথ নিজে বলেছেন, 'এ কথা ব'লে রাখি, ভানুসিংহের পদাবলী ছোট বয়স থেকে অপেক্ষাকৃত বড় বয়স পর্যন্ত দীর্ঘকালের সূত্রে গাঁথা। তাদের মধ্যে ভাল মন্দ সমান দরের নয়।'

পদাবলী রচনার মূলে রয়েছে কিশোর রবীন্দ্রনাথের উপর বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস প্রভৃতি পদকর্তাদের প্রভাব। ব্রজবুলির উপর কবির যে কত কৌতূহল ছিল তা তাঁর রচিত পদ থেকেই জানা যায়। কবির বয়স যখন ১৬ বৎসর, তখন তিনি 'ভারতী'তে ৭টি পদ প্রকাশ করেন; পরে তিনি আরও ১৩টি পদ লেখেন কয়েক বছরের মধ্যে।

ভানুসিংহের পদাবলী প্রচলিত ধারায় রচিত নয়। পূর্বরাগ, অনুরাগ, অভিসার ইত্যাদি লেখক্রমের মধ্যে পদগুলিকে ফেলা যায় না। আরম্ভ ভাগে গীতগোবিন্দের অনুসরণই দেখা যায়। গীতগোবিন্দের যেমন আরম্ভ হয়েছে বসন্তকালে মদনাভিহতা চিন্তিতা রাধার কথা নিয়ে, ভানুসিংহের পদাবলীর আরম্ভাংশও তেমনই মধুমাসের আবির্ভাবে প্রকৃতির অফুরন্ত হর্ষ ও প্রিয়বিরহকাতরা রাধার দুঃখ বর্ণনা নিয়ে। তবে প্রত্যক্ষ প্রভাব পড়েছে পদকল্পতরু-ধৃত ১৭১৩ সংখ্যক পদটির উপর। পদটি বিদ্যাপতির। তিনি বলেছেন:

> ফুটল কুসুম নব কুঞ্জকুটীর বন
> কোকিল পঞ্চম গাওই রে।...
> সময় বসন্ত কান্ত রহু দূর দেশে
> জানহু বিহি প্রতিকূল॥

ভানুসিংহের পদে পাই—

> বসন্ত আওল রে।
> মধুকর গুন গুন, অমুয়া মঞ্জরী
> কানন ছাওল রে।...
> কঁহি রে সো প্রিয়, কঁহি সো প্রিয়তম,
> হৃদিবসন্ত সো মাধা?

উভয়তঃই বসন্তের আবির্ভাব ও কৃষ্ণবিরহকাতরা রাধার খেদোক্তি। এই অংশেই উভয়ের মধ্যে সাদৃশ্য; কিন্তু ভানুসিংহের কবিপ্রকৃতি একটু স্বতন্ত্র। তাঁর রাধিকা বলছেন—

> শুন শুন সজনী হৃদয় প্রাণ মন
> হরখে আকুল ভেল।

কেবল তাই নয়, প্রকৃতির শোভার সঙ্গে রাধার মনেও যে বসন্তের সঞ্চার হয়েছে সেদিকু থেকেও কবির দৃষ্টি এড়ায় নি। রাধিকা বলছেন—

> মরমে বহই বসন্ত সমীরণ,
> মরমে ফুটই ফুল,
> মরমকুঞ্জ'পর বোলই কুহু কুহু
> অহরহ কোকিলকুল।

সখি রে উছসত প্রেমভরে অব
ঢল ঢল বিহ্বল প্রাণ,
নিখিল জগত জনু হরখ-ভোর ভই
গায় রভসরসগান।

প্রকৃতির উপাসক রবীন্দ্রনাথ তাই তাঁর রাধাকে দিয়ে বলালেন, 'হরখে আকুল ভেল।' বসন্তাগমে হর্ষমুখরিত প্রকৃতির সঙ্গে বিদ্যাপতির রাধার সাযুজ্য দেখতে পাওয়া যায় না।

প্রথম পদে রাধা সখীকে প্রশ্ন করেছেন, ত্রিভুবন এখন বসন্তভূষণবিভূষিত; এমন সময় আমার 'হৃদিবসন্ত' মাধব কই? সখী খুঁজে এসেছে কুঞ্জে কুঞ্জে; কিন্তু কৃষ্ণের দেখা পায় নি। তাই রাধার কাছে এসে সে বলছে যে আর কুসুমমালিকা পরিধানের সার্থকতা কি? এখনও গাছে গাছে কুসুমমঞ্জরী দুলছে, ভ্রমর গুণ গুণ করে ফিরছে, যমুনা ললিতগীতিধ্বনিতে মুখরিত, আকাশেও পূর্ণচন্দ্র; কিন্তু রাধিকার ত এতে কোনও সুখ নেই! কুসুমহার তাঁর কাছে এখন ভারবোধক, হৃদয় সন্তপ্ত। বেদনায় অধরপল্লব কেঁপে কেঁপে উঠছে, এ সময় কুঞ্জে পিকধ্বনি অনলে ঘৃতাহুতির মত তাঁর মনে হচ্ছে। এমন সময় মৃদুসমীরে বনভূমি চঞ্চল হ'লে রাধা মনে করলেন, কৃষ্ণ আসছেন। মনে হওয়া মাত্রই কানন পথে রাধা বৃথাই চেয়ে রইলেন। শেষে শ্যামবিরহিত কুঞ্জের দিকে চেয়ে রাধিকা 'অশ্রুবারি' আর রোধ করতে পারলেন না। এইখানেই দ্বিতীয় পদের শেষ।

বৃন্দাবনে কৃষ্ণের বাঁশীর রবে যমুনার উজান বয়ে যাবার কথাই প্রচলিত; কিন্তু ভানুসিংহ তা বলেন নি; বরং ভ্রমরগুঞ্জনের সঙ্গে যমুনা নদীকে দিয়ে তিনি গানই গাইয়েছেন। বসন্তে প্রকৃতি উল্লসিত হ'লে নদীও তার সঙ্গে যোগদান করে! সুতরাং প্রকৃতির পূজারী রবীন্দ্রনাথ যদি যমুনাকে দিয়ে গান গাওয়ান, তবে বিস্ময়ের কিছুই নেই।

তৃতীয় ও চতুর্থ পদেও রাধিকার বিরহ বর্ণিত হয়েছে। রাধার মনের সাধ মনেই থেকে গেল; জীবন, যৌবন, প্রেম সবই বিফল হ'ল। কৃষ্ণের দর্শন-আশায় রাধা 'তৃষিত', এক দৃষ্টে যমুনার পানে তিনি চেয়ে আছেন, আর চোখের জলে বসন ভিজে যাচ্ছে; কথা বলার আর শক্তি নেই। হঠাৎ রাধা শূন্যের দিকে তাকিয়ে যেন শুনতে পেলেন, কৃষ্ণের বাঁশী বাজছে; পরক্ষণেই তাঁর ভুল যায় ভেঙ্গে। বড় দুঃখে রাধা বলেন—

নিঠুর শ্যাম রে, কৈসন অব তুহু
রহই দূর মথুরায়—
রয়ন নিদারুণ কৈসন যাপসি
কৈস দিবস তব যায়!
কৈস মিটাওসি প্রেম-পিপাসা
কঁহা বজাওসি বাঁশী?
পীতবাস তুহুঁ কথি রে ছোড়লি,
কথি সো বঙ্কিম হাসি?
কনকহার অব পহিরলি কণ্ঠে,
কথি ফেকলি বনমালা?
হৃদিকমলাসন শূন্য করলি রে,
কনকাসন কর আলা!

রাধার বড়ই দুঃখ, কৃষ্ণ মথুরায় গিয়ে কি ক'রে রাজা হয়ে বসলেন। কোথায় গেল তাঁর বাঁশী-বাজানো, কোথায় বা গেল তাঁর বাঁকা হাসি। কেনই বা তিনি পীতবাস ত্যাগ করলেন, বনমালা কোথায় ফেলে দিয়ে এখন কেনই বা কণ্ঠে স্বর্ণহার ধারণ করেছেন; হৃদয় থেকে 'কমলাসন' শূন্য ক'রে কেন স্বর্ণসিংহাসন আলো ক'রে ব'সে আছেন। তিনি কেমন ক'রে এত নিষ্ঠুর হলেন—এইরূপ বিলাপ করতে করতে রজনীর অবসান হ'ল।

উক্ত চতুর্থ পদটিতে কবির অন্তরের কথাই ব্যক্ত হয়েছে। রাধাকে হৃদয় থেকে দূর ক'রে মথুরার কনকাসনে ব'সে কৃষ্ণের কি তৃপ্তি হতে পারে? পীতবাস, বনমালা, ও মুরলী ত্যাগ ক'রে রাজপাটে ব'সে কৃষ্ণ সত্যই কি সুখে আছেন? যিনি প্রেমের রাজা, তাঁর কাছে কি সিংহাসন তুচ্ছ নয়?

রাধিকা বিলাপ করছেন, এমন সময় সখী ব'লে উঠল—ঐ যে কৃষ্ণকে দেখা যাচ্ছে! তিনি গান গাইতে গাইতে এদিকেই ত আসছেন। সখি, শীঘ্র সাজ কর,—

পিনহ ঝটিত কুসুম-হার
পিনহ নীল আঙিয়া।
সুন্দরি সিন্দুর দেকে
সীঁথি করহ রাঙিয়া।

সহচরীরা নাচুক, সর্বত্র মিলনের গীতিধ্বনি উঠুক, নূপুরের রবে কুঞ্জ ঝংকৃত হউক, মন্দিরে মন্দিরে স্বর্ণদীপ জ্ব'লে উঠুক, 'গন্ধসলিলে' কুঞ্জভবন সুরভিত হোক, ফুলের মালায় চারিদিক্ উজ্জ্বল হয়ে উঠুক। এইখানেই পঞ্চম পদ সমাপ্ত।

ভানুসিংহের এই পদটিও আন্তরিকতায় ভরা। কৃষ্ণ

আসছেন; পরম কাম্যজনকে দেখা যাচ্ছে। এ সময় সামান্য বেশে কি তাঁকে দেখা যায়? দেবতাকে দেখতে গেলে নিজেও যে দেবময় হতে হয়। তাঁকে আনন্দ দেবার জন্যই ত সব প্রচেষ্টা। অলঙ্কৃত হয়ে দীনবেশে গেলে তিনি ত আনন্দ পাবেন না।

ষষ্ঠ পদে দেখা যায়, রাধার সামনেই কৃষ্ণ; এতদিন পরে প্রিয় দয়িতকে দেখে রাধার দীর্ঘদিনের বিরহদুঃখ এক মুহূর্তে বিলীন হয়ে গেল। রাধিকা ব'লে উঠলেন,

বঁধুয়া, হিয়া 'পর আও রে,
মিঠি মিঠি হাসয়ি, মৃদু মধু ভাষয়ি,
হমার মুখ'পর চাও রে!

এর পর অভিমানের সুরে রাধা বলতে লাগলেন, 'যুগ যুগ সম' কত দিন চ'লে গেল, কিন্তু তোমার মুখারবিন্দের ত দর্শন পাই নি; কত পূর্ণিমা নিশি, কত মধুমাস অতীত হয়ে গেল, তুমি ত মুরলী বাজালে না? তোমার চ'লে যাবার সঙ্গে সঙ্গেই মুখের হাসি মিলিয়ে যায়, নয়নের আনন্দ চিরতরে হয় লুপ্ত। শূন্য কুঞ্জবনে, শূন্য হৃদয়ে তোমার মুখচন্দ্র কেবল খুঁজে বেড়িয়েছি। বৃন্দাবন যখন 'গোপনয়নজলে' নিমজ্জমান, তখন তোমার হাসিটি কোথায় ছিল, বল ত? এখানে যখন 'বংশীবটতট' নীরব ছিল, তখন তোমার বাঁশী কোথায় বাজত? কিন্তু কি আশ্চর্য, তোমার মুখারবিন্দ দর্শনমাত্রই শত শত যুগের দুঃখ এক নিমিষে তিরোহিত হয়ে গেল; কেবল তাই নয়, তোমার লেশমাত্র হাসিতেই আমার সকল মান-অভিমান দূর হয়ে গেল, তোমার উপর আমার বিন্দুমাত্র অভিমান আর নেই, আমার সকল দুঃখের অবসান হয়েছে।

পদটির মধ্যে যথেষ্ট আন্তরিকতা আছে। পদকর্তা রাধিকার যথার্থ মনের কথাই ব্যক্ত করেছেন। তাঁর পূর্বেও চণ্ডীদাস ব'লে গেছেন—

বহুদিন পরে বঁধুয়া এলে।
দেখা না হইত পরাণ গেলে॥…
দুখিনীর দিন দুখেতে গেল।
মথুরানগরে ছিলে ত ভাল॥…
সব দুখ আজি গেল হে দূরে।
হারান রতন পাইলাম কোরে॥

এতেও অভিমানের সুর প্রায় একই ভাবে ব্যক্ত হয়েছে।

সপ্তম পদে কৃষ্ণ বাঁশী বাজাচ্ছেন বৃন্দাবনে গভীর নিশীথে। চন্দ্রকিরণে সর্বত্র উদ্ভাসিত, কুঞ্জপথ সমুজ্জ্বল। দক্ষিণ বাতাসে তরুশ্রেণী চঞ্চল হয়ে উঠেছে, চারিদিক্ থেকে আসছে 'কুসুমসুবাস'। বেণুধ্বনি শুনে রাধিকার মন 'উদাস' আর হৃদয় হয়েছে বিহ্বল। তাঁর গতি স্খলিত, লাজ-লজ্জা আর নেই, চোখে জল, অন্তর আকুল আর হৃদয় পুলকাকুল। এ-হেন অবস্থায় রাধা সখীকে বলছেন, বল ত সখি, যিনি 'মধুর কাননে মধুর বাঁশরী'তে আমার নামগান করছেন, তিনি কি আমারই শ্যামচাঁদ? যুগ-যুগের পুণ্যসঞ্চয়ে, কত দেবতার ধ্যানের ফলে আজ আমার শ্যামরায়কে পেয়েছি। চল সখি, শীঘ্র শ্যামের কাছে যাই। ত্বরায় না গেলে হয়ত তাঁর দেখা পাব না, কারণ তিনি 'অতি-চকিত'। যদিও এখন সকলে নিদ্রামগ্ন এবং 'ভয় ডর' কিছু নাই, তবুও সবাই সবার হাত ধ'রে চল। তার পর শ্যামচাঁদকে স্মরণ ক'রে রাধিকা বলছেন—

শ্যাম রে,
শুনত শুনত তব মোহন বাঁশি
জপত জপত তব নামে,
সাধ ভইল ময় দেহ ডুবায়ব
চাঁদ-উজল যমুনামে!

পদটি রচনাকালে ভানুসিংহ পদকর্তাদের অনুসরণ করলেও শ্যামের বাঁশী শুনতে শুনতে ও তাঁর নাম জপ করতে করতে চন্দ্রকরোজ্জ্বল যমুনায় রাধার স্নান করার অভিলাষ ব্যক্ত হয়েছে কেবল ভানুসিংহের পদেই।

অষ্টম পদটি পূর্ববর্তী পদেরই অনুবর্তন। রাধিকা বলছেন, সখি, 'গহনকুসুমকুঞ্জে' কৃষ্ণের 'মৃদুল' বাঁশী বাজছে। অঙ্গে 'চারু নীলবাস' প'রে আর হৃদয়ে 'প্রণয় কুসুমের' রাশি ও 'হরিণনেত্রে বিমল' হাসি নিয়ে তাঁর কাছে চল। এখন কি আর লোকলাজের ভয় করলে চলে? দেখ সখি, কৃষ্ণের বেণুরবে প্রকৃতি কি সুন্দর রূপ ধারণ করেছে। কুসুম তার সৌরভ বিকিরণ করছে, বিহগকুল মধুর স্বরে তান ধরেছে, চন্দ্র অমৃতধারা বর্ষণ করছে, সর্বত্র রজতের আভায় ভ'রে উঠেছে, কুসুমকুঞ্জ ভ্রমরগুঞ্জনে মুখরিত, বকুল, যূথি, জাতি পুষ্পভারে অবনত। দেখ সখি, কৃষ্ণের নয়নে প্রেমধারা যেন উথলে পড়ছে, কৃষ্ণের মধুর অমৃতময় আননের কাছে চন্দ্র কত তুচ্ছ। চল সখি, আজ কৃষ্ণচন্দ্রদর্শনে চোখ সার্থক করি।

নবম পদের সঙ্গে পূর্ববর্তী পদের মিল নেই। রাধিকা কৃষ্ণদর্শন-আশে নিকুঞ্জে অবস্থান করছেন। রজনী তিমিরাচ্ছন্ন, সখীরা সব সচকিত, কৃষ্ণবিহনে নিকুঞ্জ অরণ্যসদৃশ; মলয়পবনের আন্দোলন, নীলাকাশের তারকারাশি, যমুনার কুলুকুলুধ্বনি, 'কুসুমিত বল্লীবিতান'

ঝরণার ঝর ঝর ধ্বনি সবই রাধিকার বিরহোদ্দীপক। রাধিকার বড়ই আশা, কৃষ্ণ আসবেন, তাই তিনি তৃষিত-নয়নে বনপথের দিকে ব্যাকুল ভাবে তাকিয়ে আছেন; কিন্তু কৃষ্ণের দেখা না পাওয়ায় চোখ ফিরিয়ে আবার বনফুল দিয়ে মালা গাঁথছেন, হঠাৎ রাধা সচকিত হয়ে ও মালা ফেলে দিয়ে সখীকে বলছেন, শোন সখি, ঐ যে তাঁর বাঁশী বাজছে, তিনি কুঞ্জে এসেছেন। তাঁর বাঁশীর সঙ্গে যমুনাও যে কল্লোলগানে কণ্ঠ মিলিয়েছে,

চকিত গহন নিশি, দূর দূর দিশি
বাজত বাঁশি সুতানে।
কণ্ঠ মিলাওল ঢল ঢল যমুনা
কল কল কল্লোলগানে॥

এখানেও উল্লেখযোগ্য, বংশীরবের সঙ্গে যমুনার তান ধরার কথা ভানুসিংহ একাধিকবার বলেছেন। এ কল্পনা অন্যত্র সুলভ নয়। বংশীধ্বনিতে যমুনার উজান ব'য়ে যাওয়ার কথাই সুবিদিত।

দশম পদটি পূর্ববর্তী পদের অনুবৃত্তি। কৃষ্ণ বাঁশী বাজিয়ে রাধিকার কাছে এসেছেন। বংশীরবের এমনই গুণ যে, শোনামাত্রই সারাদিনের বিরহদুঃখ ও মরমের 'তিয়াষ' এক নিমিষেই অন্তর্হিত হয়ে যায়। ও ত সামান্য রব নয়, হৃদয় ভেদ ক'রে অন্তরের অন্তঃস্থলে প্রবেশ করে। তাই রাধিকা বলছেন—

বাজাও রে মোহন বাঁশী!
সারা দিবসক বিরহ দহন দুখ
মরমক তিয়াষ নাশি।

পরে কৃষ্ণকে রাধিকা জিজ্ঞাসা করছেন যে তিনি এ রকম বাঁশী বাজাতে কোথায় শিখলেন। এ বাঁশীর স্বর শুনলে আর ত স্থির থাকতে পারা যায় না। কারণ—

হানে থিরথির, মরম-অবশকর
লহু লহু মধুময় বাণ।
ধসধস করতহ উরহ বিয়াকুলু
ঢুলু ঢুলু অবশ-নয়ান;
কত কত বরষক বাত সোঁয়ারয়
অধীর করয় পরাণ।

রাধিকা পুনরায় দুঃখ ক'রে বলছেন, আমার কত আশা ছিল, কিন্তু কিছুই পূর্ণ হ'ল না, কেবল জ্বালাই ভোগ করতে হ'ল। হৃদয় বাণবিদ্ধ হয়েই রইল। মনে হয়, এ-যন্ত্রণার অবসান হবে যদি যমুনায় দেহ বিসর্জন দেওয়া যায়। আমার সাধ যে তোমার চরণযুগল বক্ষে ধারণ ক'রে ও হৃদয়ের তাপাপহারক তোমার চন্দ্রানন দেখতে দেখতে যেন আমার জীবনাবসান হয়; আবার মনে হয়, চন্দ্রকরোজ্জ্বল 'কুসুমিত কুঞ্জ-বিতানে' তোমার সুমধুর বাঁশীর গানের সঙ্গে প্রাণ মিশিয়ে দিই; তা হ'লে—

প্রাণ ভৈবে মঝু বেণু-গীতময়,
রাধাময় তব বেণু।

এই পদে দেখা যায়, পদকর্তা আর আত্মসংবরণ করতে পারেন নি; কৃষ্ণের প্রতি রাধিকার সুগভীর প্রেমভক্তি দেখে ভক্তিতন্ময়তায় তিনি বলছেন:

জয় জয় মাধব, জয় জয় রাধা
চরণে প্রণমে ভানু।

একাদশ পদটি স্বতন্ত্র। পূর্ববর্তী পদের সঙ্গে এর কোন সমন্বয় নেই। বসন্তবর্ণনা ও কৃষ্ণবিরহকাতরা রাধার বিলাপোক্তি নিয়ে পদটি রচিত। রাধা বলছেন, দেখ সখি, বসন্তে আজ কুঞ্জবন কেমন শ্রীধারণ করেছে, পিক-যুগল গান করতে করতে পরস্পরের দিকে চেয়ে আছে; হৃদয় পুলকে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠছে; দেহ অবশ হয়ে আসছে। আজ এই 'মধু চাঁদনী' রাতে সব বন্ধন, লাজ-ভয় ছিন্ন হতে চায়; কথা জড়িয়ে আসছে, হৃদয় থরথর ক'রে কাঁপছে, দেহের মধ্যে অনুক্ষণ শিহরণ, নিজেকে আর সংবরণ করতে পারছি না, পা আর চলে না, কথায় জড়তা আসছে, আঁচল লুটিয়ে পড়ছে; আর সরোবরের—

আধফুট শতদল,
বায়ুভরে টলমল,
আঁখি জনু ঢলঢল
চাহিতে নাহি চায়।

কৃষ্ণের অদর্শনে এই মধুমাস রাধার কাছে দহনসদৃশ। অলকে বিন্যস্ত পুষ্পরাশি কেঁপে কেঁপে কপোলদেশ দিয়ে পায়ে প'ড়ে যাচ্ছে। এই সব দেখে পদকর্তাও শোক-সাগরে নিমজ্জিত।

দ্বাদশ পদটি পদাবলী সাহিত্যে অভিনব। রবীন্দ্র-নাথের পূর্বে এমন কথা কেউ বলেন নি। কৃষ্ণ আছেন ঘুমিয়ে; তাঁর মুখের হাসি দেখে রাধা বলছেন:

শ্যাম, মুখে তব মধুর অধরমে
হাস বিকশিত কায়,
কোন স্বপন অব দেখত মাধব,
কহবে কোন হমায়!

কৃষ্ণকে দেখে মনে হচ্ছে 'নীল-মেঘপর স্বপন বিজলি-সম'। রাধা মনে মনে কৃষ্ণকে জিজ্ঞাসা করছেন যে, এই প্রেম-ঋণ তিনি কি দিয়ে পরিশোধ করবেন; কৃষ্ণের

যাতে নিদ্রাসুখের ব্যাঘাত না হয় সে জন্য রাধা কত সচেতন! তিনি পাখীকে ভৎর্সনা ক'রে বলছেন—

বিহঙ্গ, কাহ তু বোলন লাগলি?
শ্যাম ঘুমায় হমারা।

আবার পরক্ষণেই চাঁদ ও তারকারাশিকে লক্ষ্য ক'রে বলছেন—

রহ রহ চন্দ্রম, ঢাল ঢাল তব
শীতল জোছন-ধারা।
তারক-মালিনী সুন্দর যামিনী
অবহুঁ ন যাওরে ভাগি।

বসন্তনিশির অবসান দেখে রাধিকা কাতর হয়ে বললেন—

নিরদয় রবি, অব কাহ তু আওলি
জ্বাললি বিরহক আগি।

পদকর্তাও রাধার এই দুঃখ সহ্য করতে না পেরে বললেন—

ভানু কহত অব—রবি অতি নিষ্ঠুর
নলিন-মিলন অভিলাষে
কত নরনারীক মিলন টুটাওত
ডারত বিরহ-হুতাশে।

সাধারণতঃ পদাবলীতে দেখা যায় যে, রাধাকৃষ্ণের সুখনিদ্রার যাতে ব্যাঘাত না হয় তার জন্য সখীরা নির্দয় অরুণের কাছে কাতরতা প্রকাশ করছে, কিন্তু ভানুসিংহের পদাবলীতে কৃষ্ণের সুখসুপ্তির বিঘ্নপ্রশমনের জন্য রাধার যে আকুলতা তা একদিকে অভিনব ও অন্যদিকে গভীর আন্তরিকতাময়।

রাধিকার অভিসার-ইচ্ছা বর্ণিত হয়েছে ত্রয়োদশ পদে। শ্রাবণ নিশি, তাতে ঘোর ঘনঘটা। 'উন্মাদ-পবনে' যমুনার তর্জন, ঘন ঘন মেঘের হুঙ্কার ও বিদ্যুৎ স্ফুরণে দেহ কেঁপে উঠছে; ঘোর বর্ষণে ঘন তাল-তমালের কুঞ্জ অতিতিমিরাচ্ছন্ন। এই ভীষণ দুর্যোগেও কৃষ্ণ বাঁশী বাজাচ্ছেন রাধা রাধা ব'লে। বাঁশীর রব পৌঁছেছে রাধিকার কানে। শ্রীমতী আর স্থির থাকতে না পেরে বলছেন—

বোল ত সজনী এ দুরুযোগে
কুঞ্জে নিরদয় কান
দারুণ বাঁশী কাহ বজায়ত
সকরুণ রাধা নাম।

বাঁশীর আহ্বানে উতলা রাধিকা ঘরে আর থাকতে না পেরে সখীকে ডেকে বলছেন, সখি, আমাকে সাজিয়ে দাও। মোতির হার ও সিঁথি আমাকে পরিয়ে দাও; বক্ষে বিস্রস্ত কেশরাশি মালতীর মালায় বেঁধে দাও। এখন লাজ-ভয় সব দূর হোক; শীঘ্র দ্বার খোল; আমার হৃদয় পিঞ্জরাবদ্ধ বিহগের মত 'ঝটপট' করছে। এই দারুণ দুর্যোগে রাধিকার অভিসারের ইচ্ছা জানতে পেরে পদকর্তা আশঙ্কিত হয়ে উঠেছেন। তিনি তাঁকে সাবধান ক'রে বলছেন—

গহন রয়নমে ন যাও বালা
নওল কিশোরক পাশ।
গরজে ঘন ঘন বহু ডর পাওব
কহে ভানু তব দাস।

এই পদে লক্ষণীয়, ভানুসিংহ নিজেকে শ্রীরাধার দাস-রূপে অভিহিত করেছেন, কেবল দাস নন, তিনি যে রাধার সমব্যথী তাও সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে পদটিতে।

চতুর্দশ পদটি উপরি-উক্ত পদের বিপরীত; অর্থাৎ ত্রয়োদশে রাধিকার অভিসার-ইচ্ছা এবং চতুর্দশে শ্রীকৃষ্ণের অভিসার বর্ণিত হয়েছে। ভাদ্র মাসের বর্ষণদুর্যোগ রাত্রিতে কৃষ্ণ নিয়তই রাধিকার কাছে আছেন। এই দুর্যোগের মধ্যে কৃষ্ণের নানা বিপদের আশঙ্কা ক'রে রাধিকার মন ব্যাকুল হয়। কৃষ্ণ এসে পৌঁছালেই রাধিকা ব'লে ওঠেন, প্রভু, তুমি দুর্যোগকে কি ক'রে উপেক্ষা কর। আমি সামান্যা বালিকা, আমার জন্য তোমার অমূল্য জীবন কেন বিপদাপন্ন কর—

ঘন ঘন চপলা চমকয় যব পহু
বজরপাত যব হোয়,
তুঁহুক বাত তব সমরয়ি প্রিয়তম
ডর অতি লাগত মোয়।
অঙ্গবসন তব, ভিঁখত মাধব
ঘন ঘন বরখত মেহ,
ক্ষুদ্র বালি হম, হমকো লাগয়
কাহ উপেখবি দেহ?

দয়িতের অভিসারক্লিষ্ট দেহ দেখে রাধিকা করুণায় আর্দ্র হয়ে বলেন, প্রভু, শীঘ্র এই কুসুমশয্যায় বোস, তোমার সিক্ত পদযুগল চুল দিয়ে মুছে দেই; আমার বক্ষে এসে শ্রান্ত অঙ্গ জুড়িয়ে নাও। রাধিকার কাতরতায় করুণার্দ্র পদকর্তাও রাধিকাকে লক্ষ্য ক'রে বললেন, 'প্রেমসিন্ধু মম কালা' তোমার প্রেমের জন্য সমস্ত বাধা-বিঘ্নকে তুচ্ছ জ্ঞান করেন।

পদটির ভনিতায় 'প্রেমসিন্ধু মম কালা'- এই উক্তির মধ্যে পদকর্তার দৃঢ় প্রেমভক্তির কথাই প্রকটিত হয়েছে।

পঞ্চদশ পদটি একটু স্বতন্ত্র। অন্য কোন পদকর্তার রচনায় এরূপ ভাববিন্যাস দেখা যায় না। একই পদের

মধ্যে কৃষ্ণের প্রতি রাধিকার অভিমান-উক্তি এবং পর-ক্ষণেই তজ্জন্য রাধিকার দারুণ অনুশোচনা। কৃষ্ণ কিছু ছলনা করেছেন; রাধিকা তা বুঝতে পেরে কৃষ্ণকে বলছেন, মাধব, তুমি আর আদর দেখিও না, প্রেমের কথাটি ব'লো না; তোমার কপটতা ও মিথ্যাচরণ সর্বত্রই বিদিত। ধীরে ধীরে আমি বুঝতে পেরেছি যে, তোমার প্রেম অবিশুদ্ধ; আর তোমাকে বিশ্বাস করব না; তুমি আমার সর্বনাশ করেছ—

ছিদল তরীসম কপট প্রেম'পর
ডারনু যব মনপ্রাণ,
ডুবনু ডুবনু রে ঘোর সায়রে
অব কুত নাহিক ত্রাণ।

এই কথা বলা মাত্রই রাধিকার ভাবান্তর উপস্থিত হ'ল; তিনি অনুশোচনায় ব্যথিত হয়ে উঠলেন। কৃষ্ণ যে দয়িত; তাঁকে কঠোর কথা বললে যে নিজের প্রাণেই বাজবে তা রাধিকা আগে বুঝতে পারেন নি। তাই নিষ্ঠুর কথায় কৃষ্ণের মুখের মালিন্য দেখামাত্র রাধিকা আর নিজেকে স্থির রাখতে না পেরে ব'লে উঠলেন—

মাধব, কঠোর বাত হমারা
মনে লাগল কি তোর?
মাধব, কাহ তু মলিন করলি মুখ
ক্ষমহ গো কুবচন মোর!
নিদয় বাত অব কবহুঁ ন বোলব
তুঁহু মম প্রাণক প্রাণ।
অতিশয় নির্মম, ব্যথিনু হিয়া তব
ছোড়য়ি কুবচন-বাণ।

রাধিকার এই 'পীরিত-লীলা' দেখে পদকর্তা ভানু-সিংহ হেসে বললেন, রাধিকা, এইবার অভিমান মিটল ত? তুমি 'পীরিতি-সাগর', কখনও 'অভিমানিনী' আবার কখনও 'আদরিণী'।

কৃষ্ণের মথুরা গমনের প্রাক্‌কালে রাধিকার অবস্থা, তাঁর নিকট কৃষ্ণের আগমন ও বিদায়-প্রার্থনা ইত্যাদি নিয়ে ষোড়শ পদটি রচিত। এ-বিষয়ে রাধা নিজের মনের কথা সখীকে বলছেন—,সখি, আমি পণ করেছিলাম যে, কৃষ্ণের মথুরা গমনকালে আমি রোদন করব না বা তাকে কোনও বাধা দেব না; বরং—

কঠিন-হিয়া সই, হাসয়ি হাসয়ি
শ্যামক করব বিদায়।

এমন সময় কৃষ্ণ মৃদুগতিতে আমার কাছে এলে তাঁর মুখের দিকে আমি চেয়ে রইলাম, সেও আমাকে দেখতে লাগল অনিমিষ নয়নে। ধীরে ধীরে আমার চোখে জল দেখা গেল; তখন কৃষ্ণ স্মিতবদনে আমার কাছে ব'সে কত মধুর কথা বলল। মুহূর্তের মধ্যে কোথায় গেল আমার পণ, কোথায় বা গেল আমার মান।

ফুকরয়ি উছসয়ি কাঁদল রাধা,
গদ গদ ভাষা নিকাশল আধা,
শ্যামক চরণে বাহু পসারি,
কহল—শ্যাম রে, শ্যাম হমারি।

আমি তাকে বললাম, মাধব, তুমি ছাড়া ত আমার আর কেউ নেই; তুমিই আমার বল্লভ, বান্ধব, আমার সব। আমার নয়নজলে তার চরণযুগল সিক্ত হয়ে গেল; এই ভাবে রজনীর হ'ল অবসান। মথুরাযাত্রার সময় এল। কৃষ্ণ আমার হাত ধ'রে মৃদু মৃদু হেসে মধুর কথায় আমাকে কত সান্ত্বনা, কত আশ্বাস দিল। এই ভাবে প্রবোধ দিয়ে কৃষ্ণ 'হাসয়ি হাসয়ি পলটয়ি চাহয়ি দূর দূর চলি গেল।' আচ্ছা, বল ত সখি, আমি যত দুঃখ পেয়েছি, তার অর্ধেকও কি কৃষ্ণ বোধ করেছে? সে ত এখন মথুরার পথে, আর আমি এখানে কেঁদে কেঁদে ফিরছি; তার কি মর্মে এক তিল ব্যথাও লাগে নি বা গমনে তিলেক বাধাও আসে নি? পদকর্তারও রাধিকার এই কথায় চোখে জল দেখা দিয়েছে। তিনি 'বরখি আঁখিজল' বললেন, জীবন অতি দুঃখের; কেবল তাই নয়—

হাসিবার তর সঙ্গ মিলে বহু
কাঁদিবার কো নাই।

এখানে বলাই বাহুল্য যে, ভানুসিংহের মনও এমন করুণ রসে অভিষিক্ত হয়েছে যে, তিনিও রাধার ব্যথায় না কেঁদে থাকতে পারেন নি।

সপ্তদশ পদটি পূর্ববর্তী পদেরই অনুবৃত্তি। কৃষ্ণ মথুরায় গিয়েছেন; রাধার বিরহদশা দেখে সখী মথুরায় কৃষ্ণের কাছে যেতে চাইছে; কিন্তু রাধিকা তাকে যেতে নিষেধ ক'রে বলেছেন যে, কৃষ্ণ এখন আমার নয়; সে এখন মথুরার অধিপতি। কেবল তাই নয়—

ধনকো শ্যাম সো, মথুরা পুরকো,
রাজ্য মানকো হোয়,
নহ পীরিতিকো, ব্রজ কামিনীকো,
নিচয় কহনু ময় তোয়।

সখি, তুমি যে মথুরায় যেতে চাচ্ছ, কিন্তু সেই 'নব নরপতি' যদি তোমায় অপমান করে তবে 'ছিন্ন কুসুমসম' এ প্রাণ ত্যাগ করব। এখন কৃষ্ণ বৃন্দাবনের সব 'সুখসঙ্গ' ভুলে 'নব নগরে নবীন নাগর' হয়েছে। এখন তার 'নব নব রঙ্গ'। পদকর্তা রাধিকাকে সান্ত্বনা দিয়ে বলছেন—

অয়ি বিয়োগকাতরা
মন মে বাঁধহ থেহ।
মুগুধা বালা, বুঝই বুঝলি না,
হমার শ্যামক লেহ।

অষ্টাদশ পদে পদকর্তার বিশেষ মৌলিকতা লক্ষণীয়।

রাধা বলছেন, আমি যখন এ পৃথিবীতে থাকব না, আর কৃষ্ণ 'বসন্তনিকুঞ্জ-বিতানে' এসে বাঁশীতে রাধা রাধা ব'লে ডাকবে এবং গোপীরা ছুটে তার কাছে যাবে, তখন তাদের মধ্যে আমাকে না দেখে কৃষ্ণ কি আকুল হয়ে আমার কুঞ্জপথের দিকে চেয়ে থাকবে? তার বাঁশীর শব্দে জাগ্রত গোপীগণের মধ্যে আমাকে না দেখে—

বন বন ফেরই সো কি ফুকারবে
রাধা রাধা নাম?

এই প্রশ্নের উত্তর রাধা নিজেই দিয়েছেন। তিনি বলছেন, এক শ্যামচাঁদকেই আমি জানি; কিন্তু তার ত আছে শত শত নারী; আমার মৃত্যু হ'লে শত শত রাধা তার চরণপ্রান্তে লুটিয়ে পড়বে। এই যদি হয়, তবে সখি যমুনা, কি জন্য জীবন বিসর্জন করব? চল নিকুঞ্জে যাই; আমার জন্য ত কেউ রোদন করবে না, তবে জীবন ত্যাগে আমার সার্থকতা কি? পদকর্তা রাধাকে সান্ত্বনা দিয়ে বলছেন যে, কৃষ্ণ রাধাকে ভোলেন নি; তিনিও চোখের জলে রাধার কাছে আসবেন, আর তার সঙ্গে 'মিলবে শ্যামক থরথর আদর'।

এখানে প্রাচীন পদকর্তাদের সঙ্গে ভানুসিংহের এই প্রভেদ যে, তাঁদের রাধা কৃষ্ণ-বিহনে জীবন ত্যাগই শ্রেয়ঃ ব'লে মনে করেছেন; কিন্তু ভানুসিংহের রাধা স্পষ্টই বলছেন—

তব সখি যমুনে, যাই নিকুঞ্জে,
কাহ তেয়াগব দে?
হমারই লাগি এ বৃন্দাবন মে
কহ সখি, রোয়ব কে?

ঊনবিংশ পদ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ সঞ্চয়িতার ভূমিকায় বলেন যে, ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলীর মধ্যে শুধু ঊনবিংশ ও বিংশ পদদ্বয় কবিতা হিসাবে গ্রহণীয়; কিন্তু এ-মত তাঁর পরে পরিবর্তিত হয়—এ-বিষয়ে পূর্বেই আলোচনা করা হয়েছে।

এই পদে রাধিকা মৃত্যুকে শ্যামের সমান বলেছেন, আর মৃত্যুর বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেছেন—

মেঘবরণ তুঝ, মেঘ জটাজুট,
রক্তকমল কর, রক্ত অধরপুট,
তাপ-বিমোচন করুণ কোর তব,
মৃত্যু অমৃত করে দান।
তুঁহু মম শ্যাম সমান।

রাধিকা মরণের নাম দিয়েছেন শ্যাম। কৃষ্ণ রাধিকাকে বিস্মৃত হয়েছেন ব'লে মৃত্যু যেন বাম না হয়, তার জন্য প্রার্থনা জানিয়েছেন রাধা। মৃত্যুকে ডেকে রাধা বলছেন, আমার হৃদয় আজ জর্জরিত; নয়নদ্বয় থেকে অনুক্ষণ ঝরঝর ক'রে জল পড়ছে; হে মরণ, তুমি আমার বন্ধু, তুমি আমার দোসর; তুমি এসে আমার এই মনোবেদনা দূর ক'রে দাও। তোমার বাহুপাশে আমায় আশ্রয় দাও; রোদন সম্বল ক'রে তোমার ক্রোড়ে আমি নিদ্রা যাব। রাধিকা মরণের কাছে আরও প্রার্থনা করছেন—

তুঁহু নহি বিসরবি, তুঁহু নাহি ছোড়বি,
রাধা-হৃদয় তু কবহি ন তোড়বি
হিয় হিয় রাখবি অনুদিন অনুখন
অতুলন তোঁহার লেহ।

দূরের থেকে রাধা রাধা ব'লে তুমি যে অনুক্ষণ বাঁশী বাজাচ্ছ, তাতে আমি বুঝেছি যে আমার দিন ফুরিয়ে এসেছে সমস্ত বন্ধন ছিন্ন ক'রে কুঞ্জপথে তোমার সঙ্গে মিলিত হব। এখন যদিও আকাশ মেঘাচ্ছন্ন, সর্বত্র ঘন অন্ধকারময়, বিদ্যুতের ঘন ঘন স্ফুরণ, মেঘের গম্ভীর গর্জন, শালতালতরুরাজির সভয় স্তব্ধতা এবং পথ অতিনির্জন ও ভয়ানক, তথাপি আমি—

একলি যাওব তুঝ অভিসারে,
যা'ক পিয়া তুঁহু কি ভয় তাহারে,
ভয় বাধা সব অভয় মুরতি ধরি,
পন্থ দেখাওব মোর।

পদকর্তা কিন্তু রাধার এই অজ্ঞানতা দেখে বলছেন, দেখ রাধা, তোমার মন অতি চঞ্চল হয়ে উঠেছে। তুমি বিশেষ বিচার ক'রে দেখ যে, আমার প্রভু মাধব মরণ অপেক্ষাও প্রিয় কি না।

এখানেও লক্ষণীয়, পদকর্তা ভানুসিংহ কৃষ্ণকে তাঁর প্রভুই বলেছেন। পদকর্তার প্রগাঢ় কৃষ্ণ-ভক্তিই প্রকটিত হয়েছে এই পদটিতে।

শেষ পদে রাধিকা কৃষ্ণকে প্রশ্ন করছেন, বল ত তুমি কে, তোমার স্বজনই বা কি, আর তোমার শক্তির পরিচয়ই বা কি? অনুক্ষণ আমার হৃদয়-মন্দিরে জাগ্রত হয়ে আছ, আমার নয়নে সদাই আসন বিছিয়ে আছ, তোমার 'অরুণ নয়ন' আমার মর্মস্থানে সতত বিরাজ করছে, নিমেষের জন্যও অন্তর্হিত হয় না, আমার হৃদ্‌পদ্ম তোমার চরণে

'টলমল' করে, তোমার জন্যই আমার নয়নযুগল অশ্রু-ভারাক্রান্ত হয়ে ওঠে, আমার 'প্রেমপূর্ণ তনু' পুলকাকুল হয়ে তোমার সঙ্গে মিলিত হতে চায়। কেবল তাই নয়—

বাঁশরিধ্বনি তুহ অমিয় গরল রে,
হৃদয় বিদারয়ি হৃদয় হরল রে,
আকুল কাকলী ভুবন ভরল রে,
উতল প্রাণ উতরোয়।

তোমার হাসিতে ঋতুরাজ বসন্তের হয় আবির্ভাব, তোমার বংশীধ্বনিতে পিককুল আনন্দে মুখর হয়, মুগ্ধ ভ্রমরের মত ত্রিভুবনের জীবকুল তোমার 'চরণকমলযুগ' স্পর্শ করার জন্য ছুটে আসে; বল ত তুমি কে? তোমার এমনই কী মাহাত্ম্য যে, বিকশিতযৌবনা গোপবধূজন পলকে তোমায় আত্মসমর্পণ করে, যমুনা পুলকিত ও উপবন মুকুলিত হয়ে ওঠে, তৃষিত আঁখি তোমার মুখ'পরে ভ্রমণ করতে চায়, তোমার মধুর পরশে রাধার শিহরণ জাগে। আর—

প্রেমরতন ভরি হৃদয় প্রাণ লই
পদতলে আপনা থোয়।

তোমার স্বরূপ নির্ণয়ে কত প্রশ্ন, কত জিজ্ঞাসায় দিনের পর দিন নয়নের ধারা বইতে থাকে। পদকর্তা বলেছেন যে, সব সংশয়ই ঘুচবে এবং সমস্ত প্রশ্নেরই অবসান হবে যদি সেই বংশীধারীর শ্রীচরণে স্থান পাওয়া যায়।

এখানে ভক্তিবিমিশ্রিত আত্মসমর্পণ ছাড়াও পদকর্তার কী গভীর conception-ই না সূচিত হয়েছে কৃষ্ণসম্বন্ধে।

কত কত পদকর্তা কত রূপে, কত ভাবে কৃষ্ণকে দেখেছেন; কিন্তু রবীন্দ্রনাথের কৃষ্ণদর্শন সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র, সম্পূর্ণ নূতন। কৃষ্ণের যে-রূপ তাঁর চিত্রপটে অঙ্কিত হয়েছে তা অভূতপূর্ব। বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, গোবিন্দদাস প্রভৃতি বিখ্যাত পদকর্তাদের পদরচনায় ভাবসাদৃশ্য দুর্লক্ষ্য নয়; কিন্তু রবীন্দ্রনাথ পূর্বসূরীগণের চিহ্নিত পথের অনুসরণ করতে গিয়ে কৃষ্ণকে অধিষ্ঠিত করেছেন সম্পূর্ণ এক নূতন লোকে, যেখানে তাঁকে দেখতে গেলে চাই নূতন মন, স্বতন্ত্র দৃষ্টি ও অভিনব অনুভাবনা। পদাবলী রচনায় রবীন্দ্রনাথের এই নূতন চিন্তার ফল সমুদ্র-মন্থনোত্থিত শ্রেষ্ঠ রত্নেরই সমতুল।
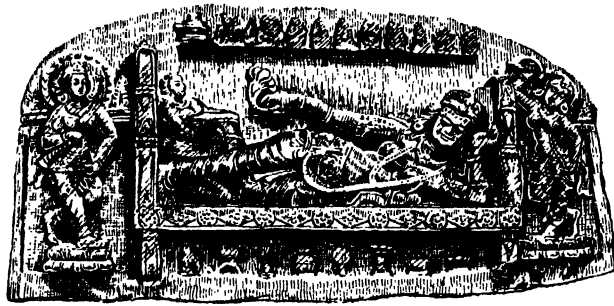
ঠাট্টাটুকু যা হ'ল তা নিরীহ হলেও দুষ্পাচ্য ত বটেই। তবে পাত্র স্ত্রীর ভাই প্রিয়নাথ, অর্থাৎ সম্বন্ধের দিক্ দিয়ে কোন খুঁৎ রইল না। এদিকে, সরোজের দিক্ থেকেও কোন দোষ রইল না; কেননা যেটুকু হ'ল সেটুকু নিতান্তই আকস্মিক, ওর কোন হাতই ছিল না তাতে।

কুকুরটা এসেছে পর্যন্ত স্ত্রী মনীষার গরগরানির অন্ত নেই। যেমন উৎফুল্লতার অন্ত ছিল না যখন থেকে শুনেছে, সরোজ অত দাম দিয়ে সাহেববাড়ী থেকে কিনে আনছে কুকুরটা। নূতন কলোনি গ'ড়ে উঠেছে, ওদের দিক্‌টা এখনও বেশ ফাঁকাই, প্রায় সব বাড়ীতেই কুকুর—ব্লাডহাউণ্ড, ল্যাব্রেডর, এ্যালসেশিয়ান, আরও সব গাল-ভরা কি কি নাম। দেখলেও, চোখ না জুড়িয়ে না-হয় আতঙ্কই হয় মনে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে সাহসও এসে পড়ে। ছিল না এক রকম বলতে গেলে একমাত্র মনীষাদেরই—অর্থাৎ যাদের থাকা উচিত তাদের মধ্যে। খেঁকেছেও স্বামীকে, লজ্জাও দিয়েছে—"একটা দ্যাখো বাপু, জজ-গিন্নীর বুলডগের গুণের ফিরিস্তি শুনতে শুনতে কান ঝালাপালা হয়ে গেল—ক্যাপ্টেন রায়ের মেয়ে শচীর তাদের এ্যালসেশিয়ান জোড়ার পেডিগ্রি আওড়ান আর সহ্য হয় না।"

সরোজ চেষ্টায়ই ছিল; নিজের শখও আছে, এসব পরিবেশে দরকারও।

একদিন এসে বলল—ঠিক ক'রে ফেলেছে। উড়ো-ফটকা নয়, একটা নামকরা সাহেববাড়ীতেই, এই ব্যবসা তাদের। কুকুরটা পাঁচ পুরুষ পর্যন্ত পেডিগ্রিড, অর্থাৎ কুলপঞ্জীদুরস্ত। এটা পুরুষ, জোড়া পাওয়া যাচ্ছে না, দার্জিলিং, ব্যাঙ্গালোর আরও কয়েকটা জায়গায় খোঁজ নিচ্ছে, পেলেই আনিয়ে সাপ্লাই দেবে। ইতিমধ্যে মূল্যের এক-চতুর্থাংশ জমা দিয়ে এসেছে সরোজ। দু'শ' টাকা। সরোজ বলে, কুকুর হবে একেবারে আলাদা ধরণের; জজ-গিন্নী, কি ক্যাপ্টেন রয়ের মেয়ে, কি ডাক্তার বাসুর পুত্রবধূকে আর রা কাড়তে হবে না।

উৎফুল্ল হয়ে চারিয়ে বেড়িয়েছে মনীষা কলোনিটাতে। গলা বড় ক'রে চারিয়ে বেড়াবার মতও ত—দার্জিলিং, ব্যাঙ্গালোর—মনীষা আগামটা দু'শ' থেকে সাড়ে তিনশ'য় তুলে দিয়েছে। পেডিগ্রিটাকে ঠেলে দিয়েছে সাতপুরুষ পর্যন্ত। কুকুরটা গ্রেহাউণ্ডের এক শাখা-জাতি। ও রাশিয়ান গ্রে ব'লে চালিয়েছে। শুধু বাকি রেখেছে প্রচার করতে যে এরই জ্ঞাতি-ভগ্নীদের কেউ মহাশূন্য সফর করতে গিয়েছিল।

—ও বেচারি একটু ওজনদার গল্প করতে ভালবাসে। স্বভাব। তা ভিন্ন না হ'লে নিউ কলোনিতে টেঁকতেই বা পারবে কেন? ফুঁয়ে উড়িয়ে দেবে না জজ-গিন্নী আর ক্যাপ্টেন রয়ের মেয়ের দল?

এদিক্ দিয়ে ওর কপালও ভালো। শুনছে, ভারতে ওর জোড়া পাওয়া যাচ্ছে না, বিলাতে লেখা হয়েছে। মনীষা বিলাতটাকে ছাড়ে নি, তবে রাশিয়াও জুড়ে

দিয়েছে তার সঙ্গে। আজকাল রাশিয়ারই ত জয়জয়কার।

এ হ'ল ওদিক্‌কার ইতিহাস; তারপর একদিন "স্পুনার" এল। সস্ত্রীক নয়, একাই। মনীষাই তাগাদা দিয়ে দিয়ে আনিয়ে নিল। তারও গল্পটা এঁচে রেখেছে, যদি কেউ জিজ্ঞেস করে ত বলবে—ওরা বলছে পাওয়া গেছে জুড়ি, নাকি নেক্‌স্‌ট্‌ মেলেই স্টার্ট করবে, তবে মনীষা আর এরকম ভয়ে ভয়ে কাটাতে পারল না, আনিয়েই নিল।

আসল কথা, নিজের একটা আগ্রহ ত আছেই, তার ওপর গল্পটা এতদিন চালাতে হ'ল যে প্রায় গাল-গল্পে দাঁড়িয়ে যাচ্ছে। সেদিন ডাক্তার বাসুর পুত্রবধূ ঠোঁটের কোণে একটু হাসিই ঝল্‌সে দিল।

"স্পুনার" এল।

ছুঁচালো মুখ থেকে ল্যাজের ডগা পর্যন্ত আড়াই হাত লম্বা, এক হাতের ওপর উঁচু একটা সারমেয়-কঙ্কালের ওপর পাঁশুটে রঙের চামড়া মোড়া। চুল—তা নেই বললেই চলে। লম্বা লম্বা চারটে পায়ের ওপর শরীরটা যেন টলছে, মনে হয় থাবাগুলা যদি ঐ রকম বড় বড় না হ'ত ত দাঁড়িয়ে থাকতেই পারত না।

চেহারাটা নিয়ে খানিকটা আশঙ্কা ছিলই সরোজের, ঠাট্টা ক'রে ব্যাপারটাকে হালকা ক'রে দেবার জন্য বলল—"তোমার মুখ দেখে মনে হচ্ছে মনু যে, আমায় লাভ করবার পর আর এত নিরাশ কিছুতে হও নি।"

ঠাট্টার উত্তর ঠাট্টাতেই দিল মনীষা, তবে ওরকম হাসি-ঠাট্টাতে নয়, নাক সিঁটকে আড়চোখে দেখছিল, মনীষা বলল—"যাদুঘর থেকে কেনা, তা নয় বুঝলাম, কিন্তু কোন্ যাদুকর প্রাণ দিল ঐ শুকনো কাঠামোটায়? তাকে একবার দেখতে ইচ্ছে করে।"

চেহারার দিকে এই। না হয় গোটাকতক ডাকই ছাড়ুক ওদিক্‌কার গলায়। লোকে টের পাক, একটা কুকুর এসেছে এদের বাড়ী। তাও নয়; এদিক্‌কার-ওদিক্‌কার কোন গলাতেই নয়। নিয়ে এসে ছেড়ে দিতে একবার বাড়ীর যে চারটি মানুষ জড়ো হয়েছে—এরা দুজনে, পাচক-ঠাকুর আর চাকর—তাদের ভালো ক'রে শুঁকে নিল। তার পর কারুর আদেশের অপেক্ষা না ক'রে সমস্ত বাড়ী-ঘরে চক্কর দিয়ে এল একটা, আসবাবপত্রগুলা শুঁকে শুঁকে। সরোজ "সিট ডাউন্" বলতে পায়ের কাছে কুণ্ডলী পাকিয়ে লম্বা গলাটা মাটিতে চেপে প'ড়ে রইল। সরোজ বলল—"এই এ জাতের বিশেষত্ব, চিনে নিলে—এই আমার ঘরদোর, আসবাবপত্র যা আগলাতে হবে, এই চার জন আমার এখন থেকে আপন জন্ হ'ল···"

"মাফ কর, আমায় বাদ দিতে বল।" মুখ গম্ভীর ক'রে মনীষা ব'সে ছিল বারান্দার সোফায়, আস্তে আস্তে উঠে ভেতরে চ'লে গেল।

সে-রাত্রে খেল না।

বেড়াতে যাওয়া একেবারেই ছেড়ে দিয়েছে। কেউ কচিৎ এসে পড়লে তাচ্ছিল্যের সহিত একটু হাসবার চেষ্টা ক'রে বলে—ভয় নেই কিছু, সে কুকুর নয়, জোড়া না মিলিয়ে পাঠাবে না বলেছে ওরা। চাকরটাকে, ঠাকুরটাকে ব'লে রেখেছিল মনীষা, কোথা থেকে একটা ধ'রে নিয়ে এনে রেখেছে। মনীষা বলে, থাক্ না হয় তদ্দিন, কি আর ক্ষতি করছে?···বিশ্বাস করতে বাধে না কারুর। এক কিলোগ্রাম ক'রে রোজ মাংসের ছাঁট আসছে বাজার থেকে, চাল আর হলুদের সঙ্গে সিদ্ধ ক'রে দেওয়া হচ্ছে; কিন্তু যেন কার পেটে যাচ্ছে!

নিজে কোথাও যাওয়ার পাটই তুলে দিয়েছে। শরীর ভালো থাকে না, মাথা ধরে। ও যা বলে আর কি।"

শেষ খবর, ধরেছে বাপের বাড়ী চ'লে যাবে। সমস্যায় প'ড়ে গেছে সরোজ।

ও কুকুর চেনে। এলাহাবাদে থাকতে কুকুর ওদের একটা পারিবারিক নেশার মধ্যেই ছিল। ভাল ভাল কুকুর—পাহারা দেওয়ার, আবার এমনি শখেরও নানারকম ঘাঁটা আছে ওর, কিছু কিছু কটু অভিজ্ঞতাও উগ্র জাতের কুকুর নিয়ে। সে আটশ' টাকা দিয়ে বাজে কুকুর কেনবার পাত্র নয়। তবে মুশকিল হয়েছে—যখনই স্পুনারের নানা বিশেষত্বের কথা তুলতে যায়, ভাল মুডে থাকলেও মনীষা মুখ ভার ক'রে উঠে যায়। প্রমাণ দেওয়া যায় চোর এলে, কিন্তু প্রমাণ দেওয়ার জন্য চোরকে ত ভাড়া ক'রে আনা যায় না?

বেচে দিতেই চায় এবং দিন দিন দাম্পত্য-জীবনে যেমন ফাটল ধরছে, তাতে দিতেই হবে বেচে শেষ পর্যন্ত। কিন্তু আটশ' টাকা দিয়ে কুকুর কেনবার খদ্দেরও ত পাওয়া সহজ নয়, বিশেষ ক'রে এইরকম এক কুকুর, যাকে দেশী নেড়ী কুত্তা বলে চালিয়ে দিলে কারুর বিশ্বাসে এতটুকু বাধে না।

অনেক ভেবে-চিন্তে কিন্তু ষ্টেট্‌স্‌ম্যানে দিলই পাঠিয়ে একটা বিজ্ঞাপন। যাতে কলোনিতে কেউ টের না পায় সেজন্য নাম-ঠিকানা না দিয়ে পোষ্টবক্সেই দিল। দাম্পত্য-স্বাস্থ্য বজায় রাখবার জন্য অবশ্য মনীষাকে জানিয়ে দিল কথাটা। এই সময় ব্যাপারটুকু হ'ল।

বিজ্ঞাপনটা বেরিয়ে গেছে। দেখেছে মনীষা। সিনেমা দেখা পর্যন্ত বন্ধ ছিল, রাজি হয়েছে। সরোজ অফিস থেকে ফিরে আসতে চা-জলখাবার খেয়ে দু'জনে বেরিয়ে গেল।

একটা কাজ মনীষাকে না জানিয়েই করল সরোজ। কুকুরটাকে দিতেই হচ্ছে বিদায় ক'রে, শুধু একবার যদি বুঝিয়ে দিতে পারত মনীষাকে যে, কী দুর্লভ জিনিসই পেয়েও হেলায় হারাচ্ছে ত মনের ক্ষোভ অনেকটা মিটত। এতদিন পর্যন্ত নিজেরাই দিনরাত বাড়ী আগ্‌লে এসেছে, সুযোগ পায় নি, আজকের এ-সুযোগটা হাত ছাড়া করল না। অবশ্য প্রমাণের যোগাযোগ যে হবেই তার কোনও নিশ্চয়তাই নেই, তবু একটা, যাকে বলা যায় চান্স নেওয়া।

সেটা ভালভাবেই নিল সরোজ।

পাচক-ঠাকুরটা তিন দিনের ছুটিতে রয়েছে, বাড়ী আগ্‌লাতে মাত্র চাকরটা। তাকে আড়ালে ডেকে ব'লে দিল, এরা দু'জনে চ'লে গেলে সেও বাড়ীর ফটক, দরজা সব খুলে রেখে কাছে-পিঠে কোথাও গিয়ে ব'সে থাকবে যেখান থেকে বাড়ীটার ওপর একটু নজর রাখা যায়। তাকে সোজাই জানিয়ে দিল, কুকুরটাকে পরীক্ষা করবার জন্যই তার এই ব্যবস্থা।

কিছুদিন যাবৎ এরকম ঢালা ছুটি পাওয়া যায় নি, গৃহকর্ত্রী পর্যন্ত অষ্ট প্রহর বাড়ী আগ্‌লে ব'সে, চাকরটা পূর্ণ সদ্ব্যবহার করল সুযোগটার। পশ্চিমা চাকর, কাছা-কাছি সবই বাঙালী বা উড়িয়া, কয়েকটা বাড়ী ছেড়ে এক দেশওয়ালির সঙ্গে ভাব হয়েছে, তার ওখানেই চ'লে গেল এবং চার্জ বুঝিয়ে অনেকদিন পরে একটু টহল দিতে বেরিয়ে গেল। পাকে-প্রকারে এমন দাঁড়াল, যে-টুকু

ঝুঁকি নিতে প্রস্তুত ছিল সরোজ, সেটা কয়েক গুণই গেল বেড়ে। বাড়ীটা অবাঞ্ছিত যে-কোন অতিথির অভ্যর্থনার জন্য হাত-পা মেলে রইল প্রতীক্ষা ক'রে।

এল বাঞ্ছিত অতিথিই; নিতান্তই বাঞ্ছিত। মনীষার বড় ভাই, প্রিয়নাথ।

প্রিয়নাথেরও বাড়ী পশ্চিমেই। কলকাতায় শ্বশুরালয়ে এসেছে। বাড়ীর গাড়ি, সোফার তাকে নামিয়ে দিয়ে, নিয়ে যাওয়ার সময়টা জেনে নিয়ে চ'লে গেল।

"সরোজ!" ব'লে লম্বা এক হাঁক দিয়ে খোলা গেটের মধ্যে দিয়ে প্রিয়নাথ গট্‌গট্‌ ক'রে বারান্দায় উঠতেই, সামনেই কুণ্ডলী পাকিয়ে শুয়ে ছিল "স্পুনার", উঠে দাঁড়াল। শ্বশুরবাড়ী এসেছে, বোনের বাড়ীতে এসেছে দেখা করতে অনেকদিন পরে, মনটা বেশ উৎফুল্ল, স্পুনার তার পুরো বহর তুলে ধরতে একটু থমকে গিয়েও সাহসের সঙ্গেই গায়ে হাত বুলাতে যাচ্ছিল, "গর-র্‌-র্‌-র্‌"—ক'রে একটা গম্ভীর আওয়াজ হ'তে সরিয়ে নিল। "তাই নাকি?"—ব'লে একটু রসিকতার হালকা ভাবই রক্ষা করবার চেষ্টা করল প্রিয়নাথ, প্রশ্ন করল—"তা মনিবরা কোথায়?"

ডাক দিল—"সরোজ!—কোথায় হে?···মনু! মনু! বাঃ, বেশ ত!...ঠাকুর! পাঁড়েজি!···এই, কোই হ্যায়?"

স্পুনার ইতিমধ্যে ওকে ধীরে ধীরে নানাভাবে শুঁকে যাচ্ছে, একটু অন্যমনস্ক ভাবে আবার, ডান হাতটা বাড়াতেই আবার সেই আপত্তির "গর-র্‌-র্‌-র্‌" কানে যেতে হাত টেনে নিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল প্রিয়নাথ।

অবাক্ হয়ে মাথা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখছে। সব ঘরের দোর খোলা, ঘরে ঘরে আলোও জ্বলছে, কিন্তু কারুর সাড়াশব্দ নেই। এগুল প্রিয়নাথ; হলঘর, দুটো শোওয়ার ঘর, ডাইনিং রুম, ভেতরের দিকে রান্নাঘর, ভাঁড়ার ঘর, সবগুদো ঘুরে দেখল, কেউ নেই। বাথরুম বাইরে থেকে শেকল দেওয়া, বিমূঢ় ভাবে তবুও হাঁক দিল দু'বার, সাড়া নেই। 'স্পুনার' আপত্তি করল না বিশেষ, শুধু মাত্র আধ হাতের একটা ব্যবধান রক্ষা ক'রে সঙ্গে সঙ্গে ঘুরল, ও চললে চলে, ও দাঁড়ালে দাঁড়িয়ে পড়ে। আপত্তিটা জানাল শুধু যখন নিতান্তই কৌতূহল বশে হলঘরের 'সেন্টার' ছোট টেবিলে নূতন ধরণের অ্যাশট্রেটা তুলে দেখতে গেল প্রিয়নাথ। সেই "গর-র্‌-র্‌-র্‌", শুধু এবার আরও গুরু-গম্ভীর। তাড়াতাড়ি রেখে দিল।

মহাসমস্যায় প'ড়ে হলঘরেই একটা সোফায় এলিয়ে পড়ল। সমস্যা কুকুরটা তত নয়। ওকে বোঝা গেল, কিছুতে হাত না দিলেই হ'ল, ওর গা থেকে আরম্ভ ক'রে। সমস্যা—যে কারণেই হোক্, বাড়ী খালি, এবং এই রকম খালি বাড়ী ছেড়ে ও যায়ই বা কি ক'রে? মনটাকে গুছিয়ে নেওয়ারই চেষ্টা করল প্রিয়নাথ। খানিকটা ব'সেই যাক তা হ'লে। কোথাও গেছে, এ ভাবে বাড়ী ছেড়ে নিশ্চয় বেশীক্ষণ থাকবে না বাইরে। হাত উলটে ঘড়ি দেখল—সাতটা বাজতে দশ মিনিট। হল-ঘড়িতেও তাই। পকেট থেকে সিগারেট-কেস্ বের ক'রে একটা ধরিয়ে সোফার পিঠে মাথা উলটে টানতে লাগল। ছাইটা অ্যাশট্রেতে ভয়ে ভয়ে ঝাড়ল, তবে দেখল স্পুনারের তাতে বিশেষ আপত্তি নেই। কুণ্ডলী পাকিয়ে পাশে শুয়ে ছিল। হাতটা ছাই ঝাড়বার জন্য বাড়াতে একবার ঘাড়টা তুলল মাত্র। সিগারেটে আঙুলের টোকা মেরে প্রিয়নাথ বলল, "There's a good dog" (খাসা কুকুর)! খোসামোদ ক'রেই হোক্, বা সখ্য-স্থাপনের আশাতেই হোক্। স্পুনার চুপ ক'রে থাকায় বোঝা গেল না, কি ভাবে নিল সে।

কেউ আসে না। একটা সিগারেট ফুরিয়ে যেতে আর একটা ধরাল। চোখ বুজেই নিজের এলোমেলো চিন্তা নিয়ে প'ড়ে আছে, একবার হলের ঘড়িটার ওপর নজর পড়তে দেখে সাড়ে সাতটা হয়ে গেছে। মনটা এতক্ষণ যেন অবসাদগ্রস্ত হয়ে ছিল, এবার হয়ে উঠল চঞ্চল। একটা অনুভূতি এতক্ষণ যে-কারণেই হোক্, ছিল না, হঠাৎ উপস্থিত হ'ল—গরম বোধ হচ্ছে। উঠে পাখাটা খুলে দিতে যাবে, স্পুনারও গা ঝাড়া দিয়ে উঠে পড়ল, এবং সুইচের জন্য হাত বাড়াতেই আবার তার নিজের ভাষায় আপত্তি জানাল। হাল্কা ভাবেই নেওয়ার চেষ্টা করল প্রিয়নাথ, বলল, "হারামজাদা মনিবের কারেণ্ট (current) খরচও সইবে না।"

গালাগালটা দিল, ঐতেই যতটুকু আক্রোশ মেটানো যায়। এবং নিশ্চয় এই সাহসেই যে, ভাষাটা নিশ্চয় বোঝে না কুকুরটা। একঘেয়েমিটা কাটাবার জন্য ঘরের অন্য প্রান্তে অন্য একটা কুশন চেয়ারে গিয়ে বসল। স্পুনার গিয়ে পাশটিতে যথাপূর্ব গুটিয়েসুটিয়ে শুয়ে পড়ল।

আবার একটা সিগারেটই ধরাতে যাচ্ছিল প্রিয়নাথ, মনটা এবার একটু সজাগ আর চঞ্চল হয়ে পড়ায় একটা কথা হঠাৎ খেয়াল হ'ল—প্রতিবেশীদের কাছে ত খবর নেওয়া যায়। কথাটা মনে হতেই, সঙ্গে সঙ্গে আরও একটা কথা মনে হ'ল—আশঙ্কার কথাও ত হতে পারে—আজকাল কত রকম ব্যাপার হচ্ছে বড় বড় শহরে।

প্রতিবেশীদের জানিয়ে একটা ইতিকর্তব্যও ত ঠিক ক'রে ফেলা উচিত?

ভাল ক'রে বসবার আগেই এবার একটু ত্রস্ত ভাবেই উঠে প'ড়ে দরজার দিকে একটু দ্রুতপদেই এগুল প্রিয়নাথ। সঙ্গে সঙ্গে ত্রস্তভাবে স্পুনারও পড়ল উঠে এবং এবার আরও স্পষ্টতর সারমেয় পদ্ধতিতে তার আপত্তিটা দিল জানিয়ে। লিক্‌লিকে শরীরটাতে একটা পাক দিয়েই নিমেষে ওর সামনে চ'লে গেল এবং সঙ্গে সঙ্গে দাঁড়িয়ে উঠে ওর দু' কাঁধে দুটো থাবা আল্‌গা ভাবে রেখে মুখের দিকে রইল চেয়ে।

এক ঝোঁকে ত মনে হ'ল সমস্ত দেহের রক্ত নেমে গিয়ে দেহটা যেন শক্ত হয়ে গেল। কিন্তু ডাক নেই, কামড়াবারও কোন লক্ষণ নেই, অল্পর মধ্যে সামলেও নিল প্রিয়নাথ। আস্তে আস্তে ফিরে গিয়ে এবার সোফাটাতেই গা ঢেলে দিল।

ওরা এল সওয়া নটায়। মোটরের শব্দটা একেবারে ফটকের সামনে থামতেই কানে গেল প্রিয়নাথের। হঠাৎ শোনা, নিজেরটা মনে ক'রেই আবার ভুলের মাথায় ত্রস্ত ভাবে এগিয়েছে, আবার সেই অবস্থা, নিঃশব্দে প্রতিরোধ। ওরা দু'জনে নেমেই ছুটেছে স্পুনারের নাম ধ'রে হাঁকতে হাঁকতে, তার পর প্রিয়নাথকে চিনতে পেরে একেবারে আতঙ্কের চীৎকার ক'রে ছুটে আসতে, সেই এদিক্ থেকে হাতটা তুলে হাল্‌কা ভাবে বলল, "মাভৈঃ"।

স্পুনারও তৎক্ষণে কাঁধ ছেড়ে নেমে প'ড়ে মনিবদের গায়ে লেপটে, ল্যাজ বুলিয়ে নিজের কৃতিত্ব সম্বন্ধে তাদের সচেতন করতে ব্যস্ত।

চায়ের টেবিলে ব'সে ওদের গল্প হচ্ছিল। সরোজ গলায় জোর পেয়েছে, বলল, "আমি এই জন্যেই এতদিন ধ'রে খোঁজাখুঁজি করছিলাম। এদের এই হচ্ছে বিশেষত্ব, কামড়াবে না, আটকে রাখবে শুধু। তুমি এ্যাশট্রেটা তুলে নিলেও দাঁত বসিয়ে কামড়াত না, তবে ধ'রে থাকত হাতটা, অবশ্য তার পরেও জোর করলে, সে আলাদা কথা; বোষ্টম ত নয়?"

মনীষা একটু আগ্রহের সহিতই ভাইয়ের মুখের দিকে চেয়ে ছিল—তার ওপর দিয়েই ত সবটা কেটেছে, প্রশ্ন করল—"দাদা কি বল?"

"কি বলব?"—একটু হেসেই উত্তর করল প্রিয়নাথ, বলল, "আমায় বলতে হ'লে ত বলব দিল্লীকা লাড্ডুই। লোভ নিশ্চয় হয়, তবে ..."

ঝুঁকে প'ড়ে ডান হাতটা জড়িয়ে ধরল মনীষা, বলল, "না দাদা, দোহাই, সরাতে ব'লো না। ও ত শুধু চোরের সঙ্গেই ওরকম ..."

"সরাতে বলব কেন?" তাড়াতাড়ি কথাটা চাপা দিল প্রিয়নাথ, উত্তেজনার মুখে ভাষার দিকে আর খেয়াল নেই বোনের, বলল, "বরং ব'লে রাখছি, বাচ্চা হ'লে প্রথম জোড়টা আমার ঠিক করা রইল। ...শুনলে ত সরোজ?"

একটা হাসি চেপে রাখবার চেষ্টা করছিল সরোজ, বলল, "সবটা আর কই শুনতে দিলে?"

এর পর দু'জনেই সজোরে উঠল হেসে।

কিছু না বুঝুক, হাসির ছোঁয়াচেই মনীষাও একটু হেসে উঠল। স্পুনারের পিঠে হাত বুলাচ্ছিল, বলল, "নে, তোর ফাঁড়া গেল কেটে।"

মনীষা এখন কলোনিতে তার পরিচয়ের বৃত্তটা আরও বাড়িয়ে দিয়েছে। মূল কাহিনীটা কল্পনায় বর্ণাঢ্য ক'রে নিয়ে চারিয়ে দিচ্ছে; বলে, "এই জন্যেই আমি পণ ক'রে বসেছিলাম কামড়ায় না অথচ কাজ হাঁসিল করে, এমন জাতের কুকুর থাকে ত ছাখো, অন্য কুকুর আমি ঢুকতে দেব না বাড়ীতে, তা দেখতে সে যতই বাঘা-ভাল্লুক হোক্।"

হরতন

শ্রীবিমল মিত্র

৭

অনেকক্ষণ ধ'রে তাঁর মুখ দিয়ে কোন কথাই বেরোল না। কর্ত্তামশাই যেন বিশ্বাসই করতে পারছিলেন না। তাঁর ব্যক্তিত্ব, তাঁর বয়েস, তাঁর পদমর্য্যাদা সব যেন ওই দুলাল সা'র পুত্রবধূর সামনে একমুহূর্ত্তে ধূলিসাৎ হয়ে গেল।

কিন্তু নতুন-বৌ-এর তখন সেদিকে চেয়ে দেখবার সময় নেই। সোজা নিবারণের তক্তপোশটার সামনে নিচু হয়ে বসল।

বললে—সরকার মশাই, কি হয়েছিল, আমাকে খুলে বলুন ত?

নিবারণ সরকারের মাথায় ব্যাণ্ডেজ বাঁধা। যন্ত্রণায় অন্ধকার দেখছিল চোখে। হঠাৎ এই অপ্রত্যাশিত ঘটনায় যেন তার যন্ত্রণাও অনেক কমে গেল। কিন্তু মুখ দিয়ে কিছু কথা বেরোল না। সেও যেন হতবাক্ হয়ে গেছে। হলধরের সঙ্গে যারা ঘরের ভেতরে দাঁড়িয়ে এতক্ষণ এর কথা বলছিল তারাও যেন সবাই এক নিমেষে বোবা হয়ে গিয়েছে।

—আপনি সব বলুন আমাকে, কি কি হয়েছিল? কে আপনার গায়ে হাত তুললে? বলুন, আপনার কোনও ভয় পাবার দরকার নেই, আমি আসল ঘটনা কি তাও জানতে চাই।

এতক্ষণে কর্ত্তামশাই-এর মুখে যেন কথা ফুটল।

তিনি বললেন—তার আগে বল, কে তোমায় পাঠিয়েছে এখানে? দুলাল সা? না নিতাই বসাক? তোমাকে ওকালতি করতে কে পাঠিয়েছে আমার কাছে সেইটে বল।

নতুন-বৌ মুখ ফেরাল। কর্ত্তামশাই-এর দিকে মুখ ফিরিয়ে বললে—আপনি আমাকে যে অপমান করবেন জ্যাঠামশাই, সব আমি মুখ বুজে সহ্য করব, কিন্তু নিরীহ ভালমানুষের ওপর অন্যায় অত্যাচার চলতে দেব না—

কর্ত্তামশাই বললেন—তা অত্যাচারটা যে দুলাল সা'র কথাতেই হয়েছে এটা ত শুনেছ?

—আমি কিছুই শুনি নি জ্যাঠামশাই, আপনি বিশ্বাস করুন, আর যেটুকু শুনেছি তাও পুরোপুরি বিশ্বাস করি নি। সেই জন্যেই ত সরকারমশাই-এর কাছে আসল ব্যাপারটা শোনবার জন্যে এসেছি।

কর্ত্তামশাই বললেন—তা এসেছ ভালই করেছ, কিন্তু অন্যায় যদি কেউ ক'রেই থাকে ত প্রতিকার করবার কি ক্ষমতা আছে তোমার?

নতুন-বৌ বললে—প্রতিকার যদি নিজে না করতে পারি ত দেশে পুলিস আছে, থানা আছে, তারাও প্রতিকার করতে পারে, কোর্ট-আদালত-হাইকোর্টও ত আছে!

কর্ত্তামশাই হাসলেন। একটা কর্কশ ব্যঙ্গের হাসি শুধু মুখখানাকে আরও কর্কশ ক'রে তুলল। বললেন—থানা পুলিস আদালতের কথা তুমি জান না ব'লেই বলছ, টাকা না থাকলে সেখানেও আজ পাত্তা পাওয়া যায় না! দুলাল সা ভাল করেই জানে আমার তা নেই, তাই এত সাহস—

নতুন-বৌ বললে—বাবা খেয়ে উঠে সবে একটু বিশ্রাম করছেন, তাই তাঁর কানে আর কথাটা তুলি নি, নইলে তাঁকেও সঙ্গে ক'রে নিয়ে আসতাম—

কর্ত্তামশাই বললেন—তুমি কথাটা না-তুললেও, দুলাল সা হুঁশিয়ার লোক, সে সব জানে—তলে-তলে সে-ই মতলব দিয়ে এই করিয়েছে—

নতুন-বৌ বললে—বাবার নামে আপনি অন্যায় দোষ দেবেন না জ্যাঠামশাই, বাবা এর মধ্যে নেই—

—তা হ'লে পেঁপুলবেড়ের বাঁওড়টা কি ভূতে কিনে নিলে?

যেন কর্ত্তামশাই এবার রেগে গিয়েছেন মনে হ'ল। একটু জোর গলাতেই বললেন কথাগুলো।

একটু থেমে আবার বললেন—আজ দু'বছর ধ'রে ওইটে নেবার জন্যে নিতাই বসাক আর দুলাল সা ঝুলোঝুলি করছে, নিবারণকেও কত ভাঙচি দেবার চেষ্টা ক'রে আসছে, এখন হঠাৎ আমার নতুন ক'রে কি এমন অবস্থা খারাপ হ'ল যে আমি বাঁওড়টা বেচতে গেলাম দুলাল সা'র কাছে? আমি জমি বেচলাম আর আমিই টের পেলাম না? এও আমাকে বিশ্বাস করতে বল? ওই বাঁওড়ের ওপর নির্ভর ক'রে আজ সাত-পুরুষ আমরা বেঁচে আছি, আমাদের বংশ, আমাদের প্রতিষ্ঠা একদিন ওর ওপরই নির্ভর করেছে! আজ না হয় বাঁওড় শুকিয়ে গিয়েছে, তা ব'লে আমি তাই বেচে দিতে যাব?

আর তা ছাড়া বেচবার আর লোক পেলাম না, বেচতে গেলাম ওই চোর বদমাইশ পাষণ্ডটার কাছে? ভেবেছ তুমি দুলাল সা'র বেটার বউ ব'লে যা বোঝাবে আমি তাই বুঝব? আমি আহাম্মক, গোমুখ্যু? আমি তোমাদের মতলব কিছু বুঝি নে মনে করেছ?

তারপর গলাটা নামিয়ে বললেন, যাও, অনেক বেলা হয়েছে, তুমি এখন যাও মা, প্রতিকার যা করবার তা আমি একলাই করতে পারব, তুমি যাও—

এতক্ষণ যেন স্বপ্ন দেখছিল নতুন-বৌ। কর্ত্তামশাই-এর কথা শেষ হতেই বললে, কিন্তু বাঁওড় আপনি বেচেন নি?

কর্ত্তামশাই আরও জোর গলায় বললেন, না, না, না, বেচি নি! আমার অমন ভীমরতি হয় নি যে, বাঁওড় বেচতে যাব পেটের দায়ে—

—কিন্তু আমি যে সে-দলিল দেখেছি জ্যাঠামশাই?

—যদি দেখে থাক ত ভুল দেখেছ, আর নয়ত জাল-দলিল দেখেছ!

—কিন্তু তাতেও ত আপনার সই আছে জ্যাঠামশাই, কেষ্টনগরের রেজিষ্ট্রারের সই আছে, রবার ষ্ট্যাম্প আছে, সমস্ত যে আমি নিজের চোখে দেখেছি!

কর্ত্তামশাই বললেন, তা হ'লে তুমি তোমার শ্বশুরকে এখনও চেন নি মা, দুলাল সা দিনকে রাত করতে পারে, রাতকে দিন করতে পারে। হেন পাপ-কার্য্য নেই যা দুলাল সা আর নিতাই বসাক দু'জনে না-করতে পারে। তোমার বয়েস কম, তুমি এখনও এ-সব বুঝবে না—

—কিন্তু জ্যাঠামশাই, পঁচিশ হাজার টাকা আপনি পান নি ওই জমি বেচার জন্যে?

—ওগো, না, না, না! পঁচিশ হাজার টাকা দেবার লোকই বটে, দুলাল সা! তুমি যাও ত দেখি, তোমারও খাওয়া-দাওয়া হয় নি, আমারও খাওয়া-দাওয়া হয় নি। মাথা গরম হয়ে উঠেছে এখন। এখন অনেক কাজ আমার, থানায় খবর দিতে হবে, দুলাল সা'কে জেলে না পাঠালে আমার স্বস্তি নেই—

নতুন-বৌ তবু যেন কী বলবে ভেবে পাচ্ছিল না।

হঠাৎ ঘরের ভেতরে দুলাল সা'র ড্রাইভার ঢুকল। বললে, বৌদিমণি, বাড়ী থেকে কান্তবাবু ডাকতে এসেছে—

কান্তও দাঁড়িয়ে ছিল। বললে, হ্যাঁ বৌদিমণি, সা' মশাই খবর পাঠিয়েছেন আপনাকে ডাকতে—

—কেন, বাবা কি ঘুম থেকে উঠেছেন নাকি?

—হ্যাঁ, ডাবের জল খাবার সময় হয়েছে—

হঠাৎ যেন মনে প'ড়ে গেল নতুন-বৌ-এর। খাওয়া-দাওয়ার পর একটু বিশ্রাম ক'রেই তার পর সা' মশাই ডাবের জল খান। ডাবের জলটুকু খেয়েই কাছারিতে এসে খাতা-পত্র নিয়ে বসেন। এইটেই চিরকালের নিয়ম। এতক্ষণ কোথা দিয়ে যে সময় কেটে গেছে, কোথা দিয়ে যে বেলা বয়ে গেছে কারোরই খেয়াল ছিল না।

নতুন-বৌ কর্ত্তামশাই-এর দিকে ফিরে বললে, আমি তা'হলে আসি জ্যাঠামশাই—

কর্ত্তামশাই বললেন, হ্যাঁ এস: আর তোমার শ্বশুর-মশাইকে ব'লে দিও এ-ব্যাপারের একটা হেস্ত-নেস্ত ক'রে তবে আমি ছাড়ব—

নতুন-বৌ সে কথার উত্তর দিলে না। মাথার ঘোমটাটা আরও একটু তুলে দিয়ে সদরের বাইরে বেরিয়ে ড্রাইভারকে বললে, চল দিগম্বর—

হলধর তার দল-বল নিয়ে এতক্ষণ কাঠের পুতুলের মত চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে ছিল। এবার তাদের মুখেও কথা ফুটল। হলধর বললে, কর্ত্তামশাই, তা'হলে আমরা আসি—

কর্ত্তামশাই সে কথায় কান না দিয়ে সোজা ভেতরে চ'লে গেলেন। তার পর জামাটা গায়ে দিয়ে আবার ভেতরে এলেন। চটি জোড়া পায়ে দিয়ে বললেন,—নিবারণ, এর একটা হেস্ত-নেস্ত না ক'রে আমি ছাড়চি নে—

ব'লে সদরের দিকে বেরুলেন।

হলধর এগিয়ে গিয়ে জিজ্ঞেস করলে, এই এত বেলায় কোথায় চললেন কর্ত্তামশাই?

কর্ত্তামশাই গম্ভীর গলায় বললেন, থানায়—

ব'লে আর দাঁড়ালেন না। সেই টা-টা রোদের মধ্যেই রাস্তায় পা বাড়ালেন।

কেষ্টগঞ্জের বাজারে কথাটা রটে গিয়েছিল সেই দিনই। কথাটা কানে কানে পল্লবিত হয়ে অন্য চেহারা নেওয়ায় অন্য মানে ক'রে নিয়েছিল সবাই। শেষ পর্য্যন্ত দাঁড়িয়েছিল যা তা এই: কীর্ত্তীশ্বর ভট্টাচার্য্যের সরকার নিবারণ লাঠিয়াল ভাড়া ক'রে নিয়ে পেঁপুলবেড়ের বাঁওড় দখল করতে গিয়েছিল ভোর বেলা। কিন্তু নিতাই বসাকের লোক সময়মত খবর পেয়ে বাধা দিতে যায়। তাতে নিতাই বসাকের ম্যানেজার সদানন্দ জখম হয়ে হাসপাতালে প'ড়ে আছে।

সদানন্দও যে জখম হয়েছে এটা প্রথমে কেউ জানত না।

মুকুন্দ বলেছিল, সা'মশাই, আপনি কর্ত্তামশাই-এর নামে পুলিস কেস্ করুন—এ অধর্ম্ম কখনও সহ্য করবেন না—

কান্ত দাঁড়িয়ে ছিল। সে বলল, পঁচিশ হাজার টাকাও নেবেন আবার জমিও দখল করতে দেবেন না, এ ত বড় আবদার —

যারা যারা দুলাল সা'র কাছারি-বাড়ীতে এসেছিল তারা সবাই ওই কথা বললে—কর্ত্তামশাই-এর ভীমরতি ধরেছে। বোধ হয় পেঁপুলবেড়ের বাঁওড়ের মায়া ছাড়তে পারছেন না এখনও। যখন জমিদারী ছিল, তখন ছিল। সে যুগ কবে চ'লে গেছে, এখনও আবার জমিদারীর মায়া! চিনির কল হ'লে কত লোক কাজ পাবে, কত লোক দু'বেলা খেয়ে প'রে বাঁচবে, সেটা কিছু নয়? নিজের বংশের গৌরবটুকুই বড় হ'ল কর্ত্তামশাই-এর কাছে!

মুকুন্দ বললে, গোয়ালাপাড়ায় গিয়ে আবার অন্য রকম কথা শুনে এলাম সা' মশাই—

কান্ত বললে, কি শুনে এলে?

—শুনলাম, সরকার মশাইকে নাকি ম্যানেজারবাবু মেরে হাড় ভেঙে দিয়েছে!

দুলাল সা মালা জপছিল, হঠাৎ যেন তার ঈশ্বর-ভক্তি উদ্বেল হয়ে উঠল নিজের মনেই ব'লে উঠল, হরি হরি, হরিই ভরসা—

মুকুন্দ বললে, আজ্ঞে তা ত বটেই, হরিই ত মানুষের একমাত্র ভরসা! কিন্তু থানা-পুলিসও ত রয়েছে সা' মশাই, কংগ্রেসী-রাজত্বে হাতের কাছে থানা-পুলিস থাকতে তার কাছেই ত প্রতিকার চাইতে যাব, হরির কাছে ত আর যাওয়া যাচ্ছে না—হরিকে ত আর চোখে দেখতে পাচ্ছি নে—

কথাগুলো দুলাল সা'র ভাল লাগল না। হরি-নিন্দা কোনও কালেই দুলাল সা'র ভাল লাগে না।

হাত তুলে বিরক্তির ভঙ্গিতে শুধু বললে, তুমি থাম মুকুন্দ—

মুকুন্দ তবু থামলে না। বললে, ওরা যে সবাই ভাবছে আপনিই লাঠিয়াল দিয়ে সরকার মশাইকে জখম করেছেন? গোয়ালাপাড়ার লোকরা ত তাই বলছিল সা' মশাই—

—বলুক গে! মাথার ওপর হরি সব দেখছেন!

—তা হরি কি তাদের মুখ বন্ধ করতে পারবেন?

দুলাল সা হাসল। বললে, দূর মূর্খ! হরির নামে বদ্‌নাম দিস নে, মুখ খ'সে যাবে তোর! বলি একটা কথার উত্তর দে দিকি নি আমাকে, এই ইহকালটা সব না পরকালটাই সব?

— আজ্ঞে পরকালটা!

দুলাল সা বললে, তা হ'লে? কোন্ আক্কেলে তুমি আমাকে থানা-পুলিস করতে বলছ মুকুন্দ! যদি থানা-পুলিস করতে হয় ত হরিই করবেন! যদি মামলা-মকদ্দমা করতেই হয় ত হরিই তা করবেন! আমি কে? আমি কে রে? এই ভব-সংসারে আমি কতটুকু? কতটুকু আমার ক্ষমতা? তোমরাই বল?

কথাটা যুক্তি-গ্রাহ্য। এর ওপরে আর কারও কোন যুক্তিই খাটে না।

—আ রে, আমি গাঁটের পয়সা খরচ ক'রে জমি কিনে আমিই হয়ে গেলাম চোর, আর কর্ত্তামশাই দাঙ্গা করতে এসেছিলেন, তিনি হয়ে গেলেন মহাপুরুষ, এর নামই কলিকাল! সাধ ক'রে কি দীক্ষা নিলাম মুকুন্দ! অনেক দুঃখে তবে দীক্ষা নিয়েছি। এই ত বেশ আছি বাবা, সারা দিন হরির নাম করি আর চুপচাপ প'ড়ে থাকি, এখন আর মনে কোন রাগ নেই কারোর ওপর, বেশ আছি—

তার পর আর একটু হরির নাম ক'রে নিয়ে বললেন, জীবনে অনেক দেখলাম, অনেক বুঝলাম, অনেক ভুগলাম, দুনিয়ার লোক দেখা হয়ে গেল আমার! আর দেখবার কিছু বাকি নেই হে! তাই যখন কর্ত্তামশাই-এর কথা ভাবি তখন হরিকে বলি—হরি হে, তুমি সকলকে ক্ষমা ক'রো, কর্ত্তামশাই বুঝছেন না তিনি কি ক্ষতি করছেন নিজের—

ক্রমে ক্রমে ঘটনাটা এমনি দাঁড়াল যে, আসল অপরাধী যেন কর্ত্তামশাই। সদানন্দ হাসপাতালে প'ড়ে ছিল। সেখানেও সবাই দেখতে গেল তাকে।

সবাই বললে, আহা, কি নিষ্ঠুর লোক কর্ত্তামশাই—

এদিকে কর্ত্তামশাই-এর কাছেও লোকের আনাগোনার শেষ নেই। নিবারণ সেই তক্তপোশের ওপরই শুয়ে প'ড়ে আছে। থানায় গিয়ে কর্ত্তামশাই ডায়েরী ক'রে এসেছেন। কিন্তু দুলাল সা'র লোক তার আগেই থানায় গিয়ে ডায়েরী ক'রে এসেছিল। সুতরাং তদন্তই হচ্ছে ক'দিন ধ'রে। খুন-খারাপির কেস্। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব তদন্ত করাই নিয়ম। তাতে আসল অপরাধীকে ধরবার সুবিধে হয়। কিন্তু কর্ত্তামশাইয়ের মনে হয়, সেই তদন্তও যেন তাড়াতাড়ি করছে না থানার লোকরা।

বলেন, দেখি কত ঘুষ দিতে পারে দুলাল সা'—এর কোথায় তল্ সেটা একবার দেখে নেব—

নিবারণ চিঁ চিঁ ক'রে বলে, আজ্ঞে, আমাকে আর

জড়াবেন না ওর মধ্যে! যা হয়েছে তার আর চারা নেই, মিছি মিছি টাকার ছেরাদ্দ—

কর্ত্তামশাই বলেন, হোক টাকার শ্রাদ্ধ, আমি এর একটা হেস্ত-নেস্ত করবই এবার, দরকার হলে বসত-বাড়ী বেচব, ওই দুলাল সা'র কাছেই বেচব—

যেন রোক্ চেপে গেছে কর্ত্তামশাই-এর। যেনই এ একটা প্রসঙ্গ নিয়েই তিনি দুলাল সা'কে চিরকালের মত নিশ্চিহ্ন ক'রে দেবার সুযোগ পেয়েছেন। শুধু নিশ্চিহ্ন নয়, দুলাল সা'র বংশ পর্য্যন্ত সমূলে উৎখাত ক'রে দিলেই হবে যেন তিনি মনে কিছুটা শান্তি পান।

সকাল থেকে কেবল একবার বার-বাড়ী আর একবার ভেতর-বাড়ী করছেন। ক'দিন পরেই এমনি করেছেন। সেই যেদিন নিবারণ সরকার মাথায় ফেটি বেঁধে এল। বুকের ব্যথাটাও সেইদিন থেকে বেড়েছে। দুলাল সা'র পুত্রবধূ নতুন-বৌ সেদিন এসেছিল। তার পর থেকেই।

বড়গিন্নী এমনিতে কথা বলে না। কিন্তু সেদিন আর চুপ ক'রে থাকতে পারলে না। বললে, ওদের বউ এসেছিল বুঝি তোমার কাছে?

কর্ত্তামশাই বললেন, হ্যাঁ, তোমার কানে দেখছি সব কথাই পৌঁছয়। কে বললে খবরটা তোমাকে শুনি?

—গৌরী!

—পাড়া-পড়শীরা সবাই বুঝি খুব মজা পেয়েছে?

বড়গিন্নী এ-কথার উত্তর দিলে না কিছু।

—পাক্, মজা পাক্, মজা পাওয়া এবার বার ক'রে দেব আমি! আরও অনেক কথাই শুনবে তুমি এবার থেকে। এবার দুলাল সা'রই একদিন কি আমারই একদিন! বলে কিনা আমি জমি বেচেছি! পঁচিশ হাজার টাকায় আমি পেঁপুলবেড়ের বাঁওড়টা বেচেছি দুলাল সা'কে! আমার আর খেয়ে-দেয়ে কাজ নেই, আমি জমি বেচতে যাব দুলাল সা'কে! আমি জমি দান করব, জমি বিলিয়ে দেব, তবু দুলাল সা'কে দিতে যাব কেন শুনি? সে আমার বাপের শালা?

এই রকম নিজের মনেই আবোল-তাবোল ব'কে যান কর্ত্তামশাই!

সেদিন ঘুম থেকে উঠেই যথারীতি নিচে এসেছিলেন কর্ত্তামশাই। এসেই দেখেন, নিবারণ তক্তপোশের ওপর উঠে বসেছে। সঙ্গে সঙ্গে রেগে গেলেন। রেগেই ছিলেন, আরো রেগে গেলেন।

বললেন, এ কি, তুমি উঠে বসেছ যে?

নিবারণ চিঁ চিঁ ক'রে বললে, এখন আজকে একটু ভাল বোধ করছি—

—ভাল বোধ করছি মানে? ভাল বোধ করলেই হ'ল ওমনি? এমন ভাল হয়ে ওঠা ত ভাল কথা নয়! জান, থানায় ডায়েরি করে দিয়েছি দুলাল সা আর নিতাই বসাকের নামে?

—আজ্ঞে, কেন ও-সব হুজ্জুত করতে গেলেন? ওতে কিছুই হবে না!

—হবে না মানে?

—আজ্ঞে, যাদের টাকার জোর তারাই জিতে যাবে। বড়লোকের সঙ্গে মামলা-মকদ্দমায় না-নামাই ভাল!

—তা আমার কি টাকা নেই ভেবেছ? আমার বসত-বাড়ী নেই? আমি বসত-বাড়ী বিক্রি ক'রে মামলা চালাব, আমি ধনে-পুত্রে সর্ব্বনাশ করব দুলাল সা'র, তবে আমার নাম। তুমি শুয়ে থাক! ওদিকে দুলাল সা সদানন্দকেও হাসপাতালে পাঠিয়েছে, সে মাথায় ব্যাণ্ডেজ বেঁধে সেখানে প'ড়ে আছে, তা জান?

নিবারণ বললে, কিন্তু আমি ত সদানন্দর গায়ে হাতও তুলি নি—

তুমি হাত তুলতে যাবে কেন? আমাকে জব্দ করবার জন্যে সে নিজেই নিজের মাথা ফাটিয়েছে। দুলাল সা জমিদারি চাল শেখাচ্ছে আমাকে! আমি কিছু বুঝিনে ভেবেছে! আমি নির্ব্বোধ আহাম্মক! তুমি শুয়ে পড়, আর কিছুদিন শুয়ে থাক, যদ্দিন তদন্ত শেষ না-হয় পুলিসের তদ্দিন শুয়ে প'ড়ে থাক, দেখি দুলাল সা কেমন ক'রে এবার পার পায়—

নিবারণ তক্তপোশটার ওপর অগত্যা শুয়ে পড়ল।

কেষ্টগঞ্জের সদর হাসপাতালে সদানন্দ শুয়ে ছিল খাটের উপর। দুলাল সা তার কোনও অভাবই রাখে নি। সা মশাইয়ের বাড়ী থেকে দু'বেলা সরু চালের ভাত আসে। হাসপাতালের ডাক্তার নার্স সবাই বিশেষ যত্ন নিয়ে দেখে যায়। দুলাল সা'ও এসে দেখে যায়।

দুলাল সা জিজ্ঞেস করে—কেমন আছ সদানন্দ?

—আজ্ঞে মাথায় বড় বেদনা—

—হরিকে ডাক সদানন্দ! হরির নাম কর! এ ভব-সাগরে হরি ছাড়া কারও কোনও ভরসা নেই সদানন্দ। আমাকে দেখেই বুঝতে পারছ ত? আমি হরি ছাড়া কারও কথা ভাবিনে, নইলে এই বয়সে দীক্ষা নিলাম সাধ ক'রে? কিসের দায় পড়েছিল আমার দীক্ষা নিতে বল ত?

সদানন্দ বলে, থানা থেকে পুলিসের দারোগা এসেছিল—

—হ্যাঁ, তা কি বললে তুমি?

—আজ্ঞে আমি যা জানি তাই-ই বললাম। বললাম, আমি বাঁওড়ে বেড়া-বাঁধার তদারকি করতে গিয়েছি জন-মজুর নিয়ে, হঠাৎ কীর্ত্তীশ্বর ভট্টাচার্য্যির ম্যানেজার নিবারণ সরকার এসে পেছন থেকে আমার মাথায় লাঠি মারলে।

ছুলাল সা বললে, সত্যি ছাড়া মিথ্যা বলবে না সদানন্দ, ওতে তোমার জিভ্ খ'সে যাবে—

—আজ্ঞে তা আমি জানি! আমার বাড়ীর ওরা সব ভাল আছে ত সা' মশাই—

ছুলাল সা বললে, আমার সব দিকে নজর আছে সদানন্দ! হরির নাম করি ব'লে কি সংসার ত্যাগ ক'রে বনে চ'লে গেছি? সব দিকে নজর না থাকলে চলবে কেন সদানন্দ! তোমার মাইনে তোমার বাড়ীতে ঠিক পাঠিয়ে দেব, তোমায় কিছু ভাবতে হবে না। তোমার ছেলেমেয়ে-বৌয়ের কাপড়-জামা খাওয়া-পরা কিছু তোমায় ভাবতে হবে না—

—আর জন-মজুরদের সাক্ষীও ত নেবে পুলিসের লোক?

—সে-সব তোমায় কিছু ভাবতে হবে না। নিতাই আছে, তুমি যেমনটি সাক্ষ্য দিয়েছ তারাও তেমনি সাক্ষ্য দেবে, সত্যি বই মিথ্যা কেউ বলবে না! মিথ্যা বললে নরকে পচতে হবে না? নরকের ভয় নেই কারও? তুমি চুপটি ক'রে হরির নাম কর, হরির ধ্যান কর শুধু, আমার মত হরির উপর সব ছেড়ে দিয়ে চুপ ক'রে শুয়ে প'ড়ে থাক, দেখবে ··

কথাটা আর শেষ হ'ল না। পাশেই তখন এসে দাঁড়িয়েছে নতুন-বৌ।

ছুলাল সা হাসল। বললে, এই দেখ, নতুন-বৌও এসে গেছে। এই আমার নতুন-বৌও প্রথমে ভুল করেছিল, জান সদানন্দ! ভেবেছিল, আমিই বুঝি কর্ত্তা-মশাইয়ের সঙ্গে গায়ে-প'ড়ে বিবাদ করতে গেছি! আ রে, আমি যদি অ-ই করতে যাব ত দীক্ষা নিলাম কেন শুনি? আমার কিসের আকর্ষণ? যে ক'টা দিন সংসারে আছি শান্তিতে কাটলেই ব্যাস্, আর কিছু যে চাই নে রে বাবা! ধন-দৌলত-টাকা-কড়ি গাড়ী-বাড়ী আমার যে কিছুতেই আর আকর্ষণ নেই মা?

নতুন-বৌ স্নান সেরে মাথার চুল এলো ক'রে দিয়ে এসেছিল। লাল পাড় গরদের একখানা শাড়ী প'রেছে। সেই দিকে চেয়ে ছুলাল সা মিটি-মিটি হাসতে লাগল।

বললে, না মা, তোমার কোনও দোষ নেই, সংসার এমনই জায়গা, এখানে খাঁটি সোনা দিলেও লোকে পেতল ব'লে ভুল করে! স্যাকরাকে দিয়ে ক'ষে নেয়—

নতুন-বৌ বললে, বাবা, নিতাই কাকা আসছে—

—নিতাই এসেছে? তা এখানে এল না কেন?

নতুন-বৌ বললে, কলকাতা থেকে খবর দিয়েছে, মিনিষ্টারকে নিয়ে বিকেল বেলাই এসে পৌঁছুবে—

—মিনিষ্টার? মিনিষ্টার কেন? কোন্ মিনিষ্টার?

—কালীপদ মুখুজ্জে মশাই, এই এখুনি লোক এসে আমাকে খবরটা দিয়ে গেল। আমাদের বাড়ীতেই উঠবেন সবাই, সভা হবে কেষ্টগঞ্জের বাজারে, তা তাঁদের সকলের ত খাওয়া-দাওয়া-থাকার বন্দোবস্ত করতে হয়! তাই আমি নিজেই বলতে এলাম।

ছুলাল সা বললে, ভালোই করেছ মা এসে—

—কিন্তু ক'দিন থাকবেন কিছুই ত ব'লে পাঠান নি!

—তা মন্ত্রী নিজেই যখন আসছেন, অন্তত ছ'শো লোকের বন্দোবস্ত করতে হবে, চল মা চল—

—কি কি খাওয়ার বন্দোবস্ত করব?

—সবই করতে হবে, মাছ মাংস পোলাও কালিয়া চপ কাটলেট লুচি ভাত—

—টেবিল-চেয়ার পেতে, না মাটিতে ব'সে কলাপাতা পেতে?

ছুলাল সা বললে, ও ছ'রকমই ব্যবস্থা করতে হবে মা, সেবার যেমন হয়েছিল—আমরা কলাপাতার ব্যবস্থা করেছিলাম, শেষ পর্য্যন্ত কাঁটা-চামচে-টেবিল-চেয়ারের ব্যবস্থা করতে হ'ল! এত ঝুঁকি নিয়ে দরকার কি? ছ'রকম ব্যবস্থাই ত আছে আমাদের মা—আর পুলিস-মন্ত্রী যখন, তখন গোরা সাহেব-টাহেব সঙ্গে থাকতে পারে। ও ছ'রকম ব্যবস্থাই করতে হবে—খরচের কথা ভেব না—সবই হরির ওপর ছেড়ে দাও—হরি যা করেন—

কর্ত্তামশাই প্রথমে চিনতে পারেন নি। কবেকার কথা। সেই পনের যোল বছর আগে দেখা কেষ্ট মালোকে না চিনতে পারারই কথা। শনের নুড়ির মত মাথার চুল হয়ে গেছে। বৈঠকখানা ঘরে ঢুকে এদিক্-ওদিক্ চাইছিল। চোখে হয়ত ঠিক ঠাহর করতে পারছিল না।

—কে?

কর্ত্তামশাই-এরও নজর ঠিক তেমন চলে না।

—আমি কেষ্ট মালো কর্ত্তামশাই—পেন্নাম হই—

ব'লে কেষ্ট মালো এগিয়ে এসে কর্ত্তামশাই-এর সামনে মাটিতে মাথা ঠেকাল।

—সঙ্গে এ কে?

কেষ্ট মালো বললে, এ আমার নাতি, জামাই-এর বাড়ী গিয়েছিলাম, তাই নাতিকেও সঙ্গে ক'রে নিয়ে এলাম। পেন্নাম কর কর্ত্তামশাইকে—

কেষ্ট মালোর নাতিও দাদামশাইয়ের মত মাটিতে মাথা ছুঁইয়ে প্রণাম করলে।

কর্ত্তামশাই বললেন, তোমাকেই ডেকেছিলাম কেষ্ট, আমার নাতনীর জন্যে! আমার নাতনীর কথা মনে আছে ত কেষ্ট? হরতন? তিন বছরের নাতনি, ফটিকের মেয়ে! সেই যে সে মারা গেল, তার পর ফটিকও পালিয়ে গেল, বৌমাও গেল—আমি ও-সব কথা ভুলেই গিয়েছিলাম। তা এক সাধু এসেছিল দুলাল সা'র বাড়ী, সে-ই সাধুই তার কুষ্ঠি দেখে বলল, সে নাকি বেঁচে আছে এখনও—

কেষ্ট বললে, আজ্ঞে সরকারমশাইয়ের কাছে আমি সব শুনিচি

—তা শুনেছ যখন, তখন আর নতুন ক'রে কী বলব! শোনা পর্য্যন্ত মনটা বড় ছটফট করছে আমার, বুঝলে কেষ্ট? আমার সোনার প্রতিমাকে আমি এমন ক'রে ভাসিয়ে দিলাম—আমার যে কী আফশোষ হচ্ছে কী বলব তোমাকে! আচ্ছা সত্যি ক'রে মনে ক'রে দেখ ত, আমার নাতনীর সৎকার হয়েছিল কি না? তোমার কিছু মনে পড়ে?

কেষ্ট মালো মেঝের ওপরই ব'সে পড়েছিল।

বললে, মনে ক'রে ত দেখেছি কর্ত্তামশাই, আমার যদ্দুর মনে পড়ে আমি সৎকার করতে দেখিনি—ঝড়-বিষ্টির রাত, আমি কাঠ-কুটো চেলা ক'রে দিয়ে বাড়ী চ'লে গিয়েছিলাম। সত্য ছিল, সত্যকে ব'লে গেলাম তুমি দেখ, আমি চললাম—আমার আবার শ্লেষ্মার ধাত কিনা।

—সত্য কে?

—আজ্ঞে বসন্ত মালোর ছেলে!

—তা সে কী বলে? তাকে একবার খবর দিতে পার না? তার যদি কিছু মনে থাকে?

—আজ্ঞে তা হলে ত ল্যাটা চুকেই যেত কর্ত্তামশাই! সে যে এখানে নেই, সে যে তার ছেলের কাছে থাকে এখন।

—ছেলে কোথায় থাকে?

—ছেলে চাকরি করে হাওড়ার পাট-কলে! কলকাতায়।

কর্ত্তামশাই যেন উত্তেজিত হয়ে উঠলেন। জিজ্ঞেস করলেন, তার ছেলের হাওড়ার ঠিকানাটা একবার দিতে পার তুমি কেষ্ট? তোমার এই নাতির হাত দিয়েই না-হয় পাঠিয়ে দিও আমার কাছে! তোমার নিজের আসবার দরকার নেই। তার ঠিকানাটা একখানা চিরকুটে কাউকে দিয়ে লিখিয়ে নিয়ে আমার কাছে পাঠিয়ে দিও—আমি না-হয় নিজেই একবার কলকাতায় গিয়ে দেখা ক'রে আসব সত্যর সঙ্গে।

কেষ্ট বললে, তা পারি, কিন্তু আপনি এই বুড়ো বয়েসে একলা কলকাতায় যাবেন কি ক'রে?

কর্ত্তামশাই বললেন, তা আর কি করব। যাব, যেতেই হবে।

তারপর একটু থেমে বললেন, আর তা ছাড়া আমার আর কে আছে বল না, যে যাবে? আমার ছেলে-মেয়ে, নাতি-নাতনী কেউই নেই, বুড়ো বয়েসে যাদের ওপর ভরসা ক'রে নিশ্চিন্তে চোখ বুজতে পারি, এমন কেউই নেই আমার কেষ্ট, কেউ নেই।

কেষ্ট বললে, আজ্ঞে সে ত ভগবানের মার, আপনি আর কি করবেন?

কর্ত্তামশাই বললেন, না কেষ্ট, ভগবানের নামে দোষ দিও না, ভগবান্ দোষ করলে তবু না-হয় বুঝতাম, কিন্তু মানুষেই যে আমার চরম সর্বনাশ করলে! সংসারে মানুষের মতন বড় শত্রু মানুষের আর কেউ নেই কেষ্ট, নইলে আমার একমাত্র ছেলে ঘর-বাড়ী-সংসার ত্যাগ ক'রে বুড়ো বাপকে ফেলে চ'লে যায়? আমার একমাত্র সোনার প্রতিমা হরতন, সে চ'লে যায়? ছিল এক বৌমা, তাকেও হারাই? এ কার শত্রুতা বল দিকিনি কেষ্ট? কার?

কেষ্ট মালো কথাটার মানে বুঝতে পারলে না। হাঁ ক'রে চেয়ে রইল কর্ত্তামশাই-এর মুখের দিকে।

—আবার কার? ওই দুলাল সা'র! ওই দুলাল সা'ই ত আমার সর্বনাশটা করলে! নইলে আমিই বা হরিসভার মধ্যে যাব কেন? আর দুলাল সা'ই বা এত জায়গা থাকতে এই কেষ্টগঞ্জে মরতে এল কেন? আর জায়গা পেল না? এই দেখ না, নিবারণটা ছিল, তার পর্য্যন্ত মাথা ফাটিয়ে দিলে?

তার পর একটু থেমে বললেন, তা যাক্ গে, সে-সব কথা তোমায় ব'লে মাথা-খারাপ করতে চাই না। ওই কথাই রইল তাহলে কেষ্ট, ঠিকানাটা আমায় পাঠিয়ে

দিও, আমি কলকাতায় গিয়ে একবার শেষ চেষ্টাটা ক'রে আসব! ডুবতেই যখন বসেছি তখন একবার তলায় তলিয়েই দেখি না—কোথায় তল্? তা তোমার কি মনে হয় বল ত কেষ্ট, হরতন বেঁচে আছে, না কি বল?

কেষ্ট মালো সান্ত্বনার সুরে বললে—আজ্ঞে সাধু-সন্নিসাদের কথা কখনও কি মিথ্যে হয়—ওনারা ত দিব্যচক্ষে দেখতে পান সব—

—আমিও ত তাই ভাবি কেষ্ট। সাধু কি বলেছে জান কেষ্ট? বলেছে, হরতনকে যদি একবার বাড়ীতে ফিরিয়ে আনতে পারি ত আবার রমরম্ ক'রে উঠবে ভট্‌চার্যি-বাড়া, আবার সেই আগেকার ভট্‌চার্যি-বাড়ীতে লোক-লস্কর পাইক-পেয়াদা আত্মীয়-স্বজনে ভ'রে উঠবে। ওই দুলাল সা'কে দেখছ ত তোমরা, আর আগে ভট্‌চার্যি-বাড়ীর অবস্থাটাও তুমি দেখেছ? তার কাছে এ? তুমিই বল? তার কাছে এ লাগে? ছোঃ—

কেষ্ট মালো চুপ ক'রে শুনছিল।

কর্তামশাই বলতে লাগলেন—তবে এও তোমরা দেখে নিও কেষ্ট, দুলাল সা'র গুমোর আমি ভাঙবই! দুলাল সা কত বড় হারামজাদ্ আমি দেখে নেব! ভেবেছে আমি ম'রে গেছি, ভেবেছে আমি বেঁচে নেই, ভেবেছে মাথার ওপর ভগবান্ ব'লে কেউ নেই! আর ভগবান্ যদি না থাকবে ত চন্দ্র-সূর্য্য ঘুরছে কি ক'রে, পৃথিবীটা চলছে কি ক'রে? এই যে এত বড় যুদ্ধটা গেল, তিরিশ লাখ লোক না খেয়ে মারা গেল, পৃথিবীটার কিছু ক্ষতি হ'ল? বল কেষ্ট, বল তুমি? আমি কিছু অন্যায় বলেছি? পৃথিবীটার এক কুচি ক্ষতি হয়েছে?

কেষ্ট মালো বললে—আজ্ঞে তা ত বটেই—

—তবে? তবে এত যে তার দেমাক, ছেলে বিলেত গেছে ব'লে মাটিতে পা দিস নে, পাটের আড়ত করেছিস ব'লে মানুষের মাথায় চ'ড়ে বসেছিস্, এ ক'দিন? একবার যদি হরতনকে এনে ঘরে তুলতে পারি তখন কোথায় থাকবি তুই, শুনি? তখন আমারও যদি মাটিতে পা না পড়ে, তখন আমিও যদি সকলের মাথায় চ'ড়ে বসি?

বলতে বলতে বোধ হয় খেয়াল ছিল না কর্তামশাই-এর যে কার কাছে কথাগুলো বলছেন। খেয়াল হতেই সামলে নিলেন।

বললেন—থাক্ গে, ভগবানের ইচ্ছেয় যদি দিন পাই ত সে সব তোমরাই দেখতে পাবে—এখন আগের থেকে ব'লে কোন লাভ নেই—তা হলে ওই কথাই রইল কেষ্ট. তোমার মনে থাকবে ত?

কেষ্ট মালো নাতির হাত ধ'রে দাঁড়িয়ে উঠল। বললে—আজ্ঞে, হ্যাঁ, খুব মনে থাকবে—

কর্তামশাই বললেন—আমি নিজেই কলকাতায় যাব কেষ্ট, পরকে দিয়ে কাজ হয় না, পরকে দিয়ে কাজ করালে কেবল কাজ পণ্ড হয়। আমি নিজেই ম'রে ম'রে যাব—

কেষ্ট মালো নাতির হাত ধ'রে সদর পেরিয়ে কাল-কাসুন্দির ঝোপের আড়ালে মিলিয়ে গেল। কর্তামশাই আর তাদের দেখতে পেলেন না। কিন্তু তাঁর চোখের সামনেই যেন আর একটা দৃশ্য ভেসে উঠল। মনে হ'ল, যেন সামনেই হঠাৎ একটা বাগান হয়ে উঠল দেখতে দেখতে। ফুলের বাগান। জাঁতিকাণি ফুলের ঝাড়টা আবার গজিয়ে উঠেছে কোণের দিকে। সাদা সাদা থোপা-থোপা ফুল ফুটেছে। লাল পথটার ওপর লাল সাদা ঘোড়াটা গাড়ীতে জোতা রয়েছে। সহিস-কোচোয়ান গাড়ীর মাথায় ব'সে। ওপাশে পুকুরটায় আবার তর তর করছে জল। তাতে পদ্ম ফুল ফুটে আছে সেই আগেকার মত। কর্তামশাই-এর বুকটা দুরু দুরু ক'রে কেঁপে উঠল। আনন্দে ভয়ে কর্তামশাই শিউরে উঠতে লাগলেন মনে মনে। একটা দুটো ক'রে পদ্মফুলগুলো গুণতে লাগলেন। আশ্চর্য্য, একেবারে কাঁটায় কাঁটায় একশো আটটা পদ্মফুল! একশো আটটা পদ্ম একসঙ্গে ফুটে রয়েছে!

ক্রমশঃ
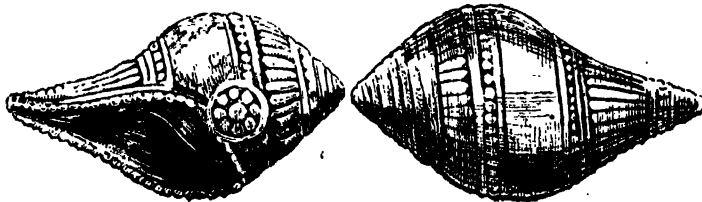
বঙ্গলিপির মৌলিকত্ব

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঘোষঠাকুর

বর্ত্তমান যুগে জনসাধারণের মধ্যে, এমন কি অনেক সংস্কৃত-শিক্ষাব্রতীদের ভিতরও, এই ধারণাই বদ্ধমূল দেখিতে পাওয়া যায় যে, সংস্কৃতভাষা স্বর্গ-নামক কোন শাশ্বত সুখস্থানের অধিবাসিগণের ভাষা এবং সেই দেবনগরে এই ভাষা লিখিবার অক্ষরসমষ্টিই দেবনাগরী লিপি। অতএব তাঁহাদের মতে সংস্কৃতভাষার সহিত দেবনাগরী লিপি-মালার সম্বন্ধ চির অবিচ্ছেদ্য। এই ধারণার বশবর্ত্তী হইয়াই তাঁহারা মনে করেন যে, বর্ত্তমান বঙ্গাক্ষরে সংস্কৃত-ভাষায় কোন কিছু লিখিত বা মুদ্রিত হইলে সংস্কৃতভাষার মর্য্যাদা বা আভিজাত্য নষ্ট হয়। হিন্দীভাষার স্বকীয় কোনও অক্ষর নাই। তথাপি এই ধারণার বশেই বর্ত্তমান ভারতে হিন্দীভাষা প্রচলনের বাহনরূপে মৌলিকত্বের দাবীতে দেবনাগর অক্ষরকেই গ্রহণ করা হইয়াছে। অথচ বঙ্গাক্ষর অপেক্ষা দেবনাগর সৌন্দর্য্যে অথবা লেখন-সৌকর্য্যে কোনরূপেই উৎকৃষ্ট বলা যায় না। বঙ্গীয় বর্ণমালার অধিকাংশ বর্ণই এক প্রযত্নে কিংবা কোন কোন বর্ণ দুই প্রযত্নে লিখিত হয়। কিন্তু দেবনাগরী-লিপির খুব কম বর্ণই এক প্রযত্নে লিখিতে পারা যায়। অধিকাংশ বর্ণই লিখিতে দুই, তিন অথবা চারিবার পর্য্যন্ত প্রযত্ন করিতে হয়। অতএব দেবনাগরীলিপির কেবল প্রাচীনত্বের দাবীতে উৎকৃষ্টতর বঙ্গলিপি সংস্কৃত, হিন্দী প্রভৃতি ভাষাপ্রকাশে অবজ্ঞাত হওয়ায় বঙ্গলিপির মৌলিকত্ব পর্য্যালোচনার প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে।

সংস্কৃত অথবা বৈদিকভাষা যতই পুরাতন হোক না কেন পাক্ভারতীয় কোনও লিপিমালার ইতিহাসই তেমন প্রাচীনত্বজ্ঞাপক নয়। অধ্যাপক বুহ্লার সাহেব ব্যাপক গবেষণার ফলে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, সেমীয় লিপির দুইটি ধারা আরামীয় ও ফেনিসীয় হইতে যথাক্রমে উদ্ভূত খরোষ্ঠী ও ব্রাহ্মী নামক লিপিমালা পাক্ভারতীয় সকল-প্রকার লিপিমালার আদি জননী। খ্রীষ্টপূর্ব্ব চতুর্থ শতাব্দী হইতে খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দী পর্য্যন্ত গান্ধার দেশে, অর্থাৎ বর্ত্তমান আফগানিস্থানের পূর্ব্বাংশে, এবং পাঞ্জাবের উত্তরাংশে খরোষ্ঠী লিপি ব্যবহৃত হইত। ইহার প্রধান বৈশিষ্ট্য এই যে, ইহা ডানদিক্ হইতে বামদিকে লিখিত হইত। ব্রাহ্মীলিপি প্রায় খ্রীষ্টপূর্ব্ব অষ্টম শতাব্দীতে মেসো-পোটেমিয়ার পথে যাতায়াতে বণিক্‌গণ কর্ত্তৃক আনীত হইয়া ভারতবর্ষে প্রচলিত হইয়াছিল। ইহা বাম হইতে ডানদিকে লিখিত হইত।* ইহাই তৎকালীন ভারতবর্ষের জাতীয় লিপিরূপে পরিগণিত হইয়াছিল। আজ পর্য্যন্ত পাক-ভারতে যে-সকল বর্ণমালা বামদিক্ হইতে ডানদিকে লিখিত হইয়া থাকে তাহারা সকলেই এই ব্রাহ্মীলিপিরই বংশধর।

সেমীয় আদি বর্ণমালা ছিল সংখ্যায় মাত্র ২২টি। এই অল্পসংখ্যক বর্ণ ধ্বনিতত্ত্বের চাহিদা মিটাইয়া সংখ্যায় বর্দ্ধিত হইতে হইতে ৪৬টি অক্ষরে পূর্ণসংখ্যক ব্রাহ্মী-লিপিতে পরিণত হইতে নিশ্চয়ই দীর্ঘকাল লাগিয়াছিল। মনে হয়, প্রাথমিক স্তরে বহু বৎসর যাবৎ বণিক্‌গণের ব্যবসায়ের সংক্ষিপ্ত হিসাব রাখার কাজেই কেবল ইহা ব্যবহৃত হইত। তার পর ক্রমশঃ অধিকতর লোকের এই অক্ষরের সহিত পরিচয় হইতে থাকিলে ইহার ব্যবহার ব্যাপক হইয়া চিঠিপত্র, হিসাবনিকাশ, সভা সালিশের সিদ্ধান্ত, বিচারালয়ের সেরেস্তা, রাজার ঘোষণা প্রভৃতি সমস্ত বিষয় এই অক্ষরে লিপিবদ্ধ হইতে লাগিল। অতএব স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, বিভিন্ন সময়ে নৃপতিগণ কর্ত্তৃক নিযুক্ত হইয়া শিক্ষিত ব্রাহ্মণ-বৈয়াকরণগণ সংস্কৃতভাষার ধ্বনিপ্রকাশক নানা বিদেশী বর্ণমালা হইতে বর্ণ আহরণ করিয়া ব্রাহ্মীলিপির এই ধ্বনিবিজ্ঞানসম্মত পরিপূর্ণ রূপদান ও প্রচলন করিয়াছিলেন, কিন্তু সঠিক কোন্ সময় হইতে প্রাচীন ভারতে এই অক্ষরদ্বারা পুস্তকাদি লেখার কাজ আরম্ভ হইয়াছিল তাহা আজ পর্য্যন্তও নির্দ্ধারিত হয় নাই। এখন আমরা বেদ প্রভৃতি যে-সকল অতি প্রাচীন সাহিত্য পুস্তকের আকারে পাইতেছি উহা বহু শতাব্দী যাবৎ গুরুপরম্পরাগত ছিল। নেপালের তরাই নামক স্থানের পিপ্রাবা হইতে প্রাপ্ত একটি প্রস্তর-কৌটার মধ্যে বুদ্ধদেবের অস্থি সংরক্ষিত ছিল। ঐ পাত্রের উপরে লিখিত লিপি ব্রাহ্মীলিপির প্রাচীনতম নিদর্শন। বুদ্ধের নির্ব্বাণকাল খ্রীষ্টপূর্ব্ব ৪৮৭ বৎসর। অতএব এই লিপি যে খ্রীষ্টপূর্ব্ব পঞ্চম শতাব্দীতে প্রচলিত ছিল সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নাই। অষ্টাধ্যায়ীনামক পাণিনির বিখ্যাত সংস্কৃত ব্যাকরণ খ্রীষ্টপূর্ব্ব প্রায় চতুর্থ শতাব্দীতে

সঙ্কলিত হইয়াছিল। ইহাতে এই পূর্ণাবয়ব লিপিমালার স্বীকৃতি রহিয়াছে। সেই সময় হইতে আজ পর্য্যন্ত ইহার ধ্বনিগত কোনও পরিবর্ত্তন বা সংস্কারের প্রয়োজন হয় নাই, কারণ বৈদিক কিংবা সংস্কৃতভাষায় যতপ্রকার ধ্বনি আছে তাহাদের সকলগুলিকেই প্রকাশ করিবার মত অক্ষর ইহাতে আছে। শিবসূত্র নামে প্রথম চতুর্দ্দশ সূত্রে উচ্চারণের স্থান ও প্রযত্ন হিসাবে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে এইগুলি সুসজ্জিত আছে।

ইহার পরে সম্রাট্ অশোকের শিলালিপিগুলিই ব্রাহ্মী-লিপি পরিচয়ের প্রধান উপকরণ। অশোক খ্রীষ্টপূর্ব্ব ২৮২ অব্দে মগধসিংহাসন আরোহণ করিয়াছিলেন, এবং খ্রীষ্ট-পূর্ব্ব ২৩১ অব্দে তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে। এই সময়ের ব্রাহ্মীলিপি প্রায় কয়েকটি সরলরেখা টানিয়া লিখিত হইত।

অশোকের পরে খ্রীষ্টীয় প্রথম শতাব্দী পর্য্যন্ত ব্রাহ্মীলিপি প্রায় এইরূপেই প্রচলিত ছিল। তাহার পর হইতেই বর্ণগুলির আকৃতি ক্রমশঃ পরিবর্ত্তিত হইতে থাকে। ইহাতে অনুমান হয়, এই সময় হইতেই লোকে লেখার প্রয়োজনীয়তা বেশী অনুভব করিতে থাকে। ইহার পূর্ব্বে ভারতবর্ষে লেখার আবশ্যকতা খুবই কম ছিল। অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা মুখে মুখেই শ্রবণ করিয়া সম্পাদিত হইত। এই জন্যই আজও লোকে বেদকে শ্রুতি বলিয়া থাকে। এইরূপে ক্রমশঃ বিদ্যাবিষয়ের বিস্তার, লোকের স্মৃতি-শক্তির হ্রাস এবং রাজকার্য্যের বাহুল্যবিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে উল্লেখযোগ্য সিদ্ধান্ত বা বিষয়গুলি সূত্রাকারে রচনা করা এবং ঐ সকল লিপিবদ্ধ করিয়া রাখার আবশ্যকতা বর্দ্ধিত হইতেছিল। কাগজের প্রচলন না থাকায় সে কালে শিলা, কাষ্ঠ ও তাম্রাদিফলকে লিখিত হইত। এই সকল কঠিন বস্তুতে অক্ষরগুলি ক্ষোদিত করিতে হইত বলিয়া অক্ষরগুলিকে সাধারণতঃ সরল রেখাদ্বারা চিহ্নিত করা হইত।

ইহার পর অত্যধিক প্রয়োজনবোধের সঙ্গে সঙ্গে দ্রুতলেখন ও সৌন্দর্য্যের অনুরোধে লেখকদিগের রুচি অনুযায়ী অক্ষরগুলির রূপ বা আকৃতি কিছু কিছু পরিবর্ত্তিত হইতে থাকে এবং লেখার আধার হিসাবে ভূর্জ্জপত্র, তালপত্র, বৃক্ষের বল্কল প্রভৃতির ব্যবহার হইতে থাকে। এইজন্য আজ পর্য্যন্ত লেখার কাগজকে পত্র বা পাতা বলা হইয়া থাকে। ভারত অধিকারের অব্যবহিত পরে মুসলমানগণ কর্ত্তৃক সর্ব্বপ্রথম কাগজের আবিষ্কার ও ব্যাপকভাবে প্রচলন হয়। আজও অনেক লিখিত দলিল-পত্রাদি পাওয়া যায়। যাহা হউক, এই ভাবে প্রতি শতাব্দীতে কিছু কিছু পরিবর্ত্তিত হইয়া খ্রীষ্টীয় তৃতীয় শতাব্দী হইতে দশম শতাব্দী পর্য্যন্ত অক্ষরগুলি বিভিন্ন পর্য্যায়ে যে সকল রূপ গ্রহণ করে তাহাই আধুনিক দেবনাগরী ও বঙ্গলিপির প্রাচীন রূপ। প্রকৃতপক্ষে খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীর শিলালিপি, পঞ্চম শতাব্দীর ভূর্জ্জ-পত্রে লিখিত পাণ্ডুলিপি, ষষ্ঠ শতাব্দীর তালপত্রে লিখিত পাণ্ডুলিপি এবং ত্রয়োদশ শতাব্দীর তুলট কাগজে লিখিত পাণ্ডুলিপিই দেবনাগর অক্ষরের প্রাচীনতম নিদর্শন।

এ পর্য্যন্ত দেবনাগরী ও বঙ্গলিপির উদ্ভব-বিষয়ে যে সংক্ষিপ্ত ইতিহাস সঙ্কলিত হইল তাহা অধ্যাপক বুহ্লার, মোক্ষমুলার, ম্যাকডোনেল প্রভৃতি পাশ্চাত্য গবেষকগণের এবং রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, নগেন্দ্রনাথ বসু, নলিনী-মোহন সান্যাল প্রভৃতি প্রাচ্য ভাষা ও লিপিতত্ত্ব বিশারদ-গণের সাধারণ সিদ্ধান্ত। কোন কোন স্থলে মতানৈক্য থাকিলেও তাহা বিশেষ উল্লেখযোগ্য নয়। এই সকল পুরাতত্ত্ববিদ্গণের সিদ্ধান্ত হইতেই দেখা যায়, দেবনাগর অক্ষর বাংলা অক্ষরের সহোদর। অতএব বঙ্গলিপি অপেক্ষা দেবনাগরী লিপির মৌলিকত্ব অধিকতর বলিয়া প্রতিপন্ন হয় না।

এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধের উদ্দেশ্য দেবনাগরীলিপি অপেক্ষা বঙ্গলিপি যে অনেক বেশী প্রাচীন তাহাই প্রতিপন্ন করা। এখন সেইদিকে যত্ন লই।

খ্রীষ্টপূর্ব্ব বঙ্গলিপি :—ললিতবিস্তর গ্রন্থের দশম অধ্যায়ে দেখা যায়, বুদ্ধদেব বিশ্বামিত্রের নিকট যে ৬৪ প্রকার লিপির উল্লেখ করিয়াছেন তাহার মধ্যে বঙ্গলিপির নামও আছে, যথা—

"অথ বোধিসত্ত্ব উরগসার চন্দনময়ং লিপিফলকমাদায় দিব্যর্ষি সুবর্ণ-তিরকং সমন্তাৎ মণিরত্নপ্রত্যুপ্তং বিশ্বামিত্রমাচার্য্যমেবমাহ। কতমাং ভো উপাধ্যায় লিপিং বঙ্গলিপিং মগধলিপিং……সর্ব্বসারসংগ্রহণীং সর্ব্ব-ভূতরুতগ্রহণীং। আসাং ভো উপাধ্যায় চতুঃষষ্ঠিলিপীনাং কতমাং ত্বং শিক্ষাপয়িষ্যসি। ইতি।"

ললিতবিস্তর গ্রন্থখানা বিশ্বকোষের মতে ('বর্ণলিপি' শব্দ দ্রষ্টব্য) বুদ্ধনির্ব্বাণের কিছুদিন পরেই অর্থাৎ খ্রীষ্টপূর্ব্ব দ্বিতীয় অথবা তৃতীয় শতাব্দীতে বৌদ্ধসঙ্ঘ কর্ত্তৃক রচিত হয়। তৎপর ৬৯ খ্রীষ্টাব্দে চু. ফ. লন্ কর্ত্তৃক তাহা চীনাভাষায় অনূদিত হইয়াছিল। অতএব এই গ্রন্থের প্রামাণ্য অস্বীকার করিবার উপায় নাই।

উদ্ধৃত সন্দর্ভে ব্রাহ্মীলিপির সহিত বঙ্গলিপির নাম

ব্রাহ্মীলিপির বিবর্ত্তন নয়? কারণ, লুপ্ত বা অপ্রচলিত লিপি শিক্ষা করিবার জন্য বোধিসত্ত্বের কোন প্রয়োজন হইল না। অন্ততঃ এ কথা দৃঢ়তার সহিত বলা যায়, যে সময়ে ব্রাহ্মীলিপি প্রচলিত ছিল বলিয়া পূর্ব্বসূরিগণ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন সেই সময়ে বঙ্গলিপিও প্রচলিত ছিল। অতএব ব্রাহ্মীলিপিকেও বঙ্গলিপির জননী বলা চলে না এবং পূর্ব্বসূরিগণের সিদ্ধান্তও প্রতিষ্ঠিত হয় না।

পঞ্চমশতাব্দীয় বঙ্গলিপি :

৪৫৩ খ্রীষ্টাব্দে বলভীরাজ ধ্রুবসেনের আদেশে কল্পসূত্র রচিত হয় (বিশ্বকোষে 'দেবনাগর' শব্দে দ্রষ্টব্য)। এই কল্পসূত্রের উপর জৈন পণ্ডিত লক্ষ্মীবল্লভগণি 'কল্পসূত্র-কল্পদ্রুমকলিকা' নামক ব্যাখ্যাগ্রন্থ প্রণয়ন করেন। সেই গ্রন্থে নন্দীসূত্রধৃত ৩৬ প্রকার লিপির উল্লেখ আছে, যথা—"অথ শ্রীঋষভদেবেন ব্রাহ্মী দক্ষিণহস্তেন অষ্টাদশলিপয়ো দর্শিতাঃ। নন্দীসূত্রে উক্তা যথা—হংসলিপি, ভূতলিপি, যক্ষলিপি, রাক্ষসীলিপি, যাবনীলিপি, তুরক্কীলিপি, কীরীলিপি, দ্রাবিড়ীলিপি, সৈন্ধবীলিপি, মালবীলিপি, নড়ীলিপি, নাগরীলিপি, লাটলিপি, অনিমিত্তলিপি, চানক্কীলিপি মৌলদেবী। দেশবিশেষাদন্যা অপি লিপয়ঃ। তদ্ যথা—লাটী চৌড়ী ডাহলী কানড়ী গুজরী সোরঠী মরহঠী কোঙ্কণী খুরাসানী মাগধী সৈংহলী হাড়ী কীরী হম্বীরী পরতীরী মসী মালবী মহাযোধী ইত্যাদয়ো লিপয়ঃ।"

কল্পসূত্র যে সময়ে রচিত হইয়াছিল এই নন্দসূত্রও সেই সময়ে অথবা তাহার পূর্ব্বে অবশ্যই সঙ্কলিত হইয়া থাকিবে। এ স্থলে এখন এই আপত্তি হইতে পারে যে, খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীতে নন্দীসূত্রে ধৃত এই লিপিগুলির মধ্যে বঙ্গলিপির নাম উল্লেখ করা হয় নাই কেন? ইহার সমাধানে বলা যায়, নন্দীসূত্রে বঙ্গলিপির যেমন উল্লেখ নাই তেমনই ব্রাহ্মী খরোষ্ঠী প্রভৃতি সুপ্রসিদ্ধ অনেকগুলি লিপিরও উল্লেখ নাই। অতএব মনে হয়, নন্দীসূত্রকারের নিকট এই লিপিগুলি অজ্ঞাত ছিল, অথবা নামান্তরের দ্বারা তাহাদিগকে অভিহিত করা হইয়াছে। অথবা আদি-শব্দের দ্বারা তাহাদিগকেও লক্ষ্য করা হইয়াছে। প্রকৃতপক্ষে এই শতাব্দীতে বঙ্গলিপি যে প্রচলিত ছিল তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ বিশ্বকোষে 'বঙ্গদেশ' শব্দের বিবরণের মধ্যেই সংগৃহীত আছে। ৫২৬ খ্রীষ্টাব্দে আচার্য্য বোধিধর্ম্ম ভারতবর্ষ হইতে "প্রজ্ঞাপারমিতা হৃদয়সূত্র" ও "উষ্ণীষ বিজয়ধারণী" নামক যে দুইটি তন্ত্রগ্রন্থ লইয়া সমুদ্রপথে যাত্রা করিয়াছিলেন বঙ্গাক্ষরে লিখিত সেই গ্রন্থ দুইটি এখন জাপানের প্রসিদ্ধ "হোরী উজী" মঠে আবিষ্কৃত হইয়াছে। অতএব পঞ্চম শতাব্দীতে বঙ্গলিপির অস্তিত্ব ও প্রচলন সম্বন্ধে বিন্দুমাত্রও সন্দেহের অবকাশ নাই। অতএব দশম শতাব্দীতে বঙ্গলিপির উৎপত্তির সিদ্ধান্ত মানিয়া লওয়া যায় কিরূপে?

বঙ্গলিপির উৎপত্তি :

নাগরীলিপির জন্মের বহু পূর্ব্বে ললিতবিস্তর গ্রন্থে বঙ্গলিপির অস্তিত্বের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে বলিয়া নাগরীলিপি হইতে বঙ্গলিপির উৎপত্তি স্বীকার করা যায় না। আবার ব্রাহ্মীলিপিকেও বঙ্গলিপির জননী মনে করা অতিশয় কষ্টকল্পনা। ইহার প্রথম কারণ, ললিতবিস্তর গ্রন্থ হইতেই প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে যে, ইহারা একই সময়ে প্রচলিত ছিল। দ্বিতীয় কারণ, অক্ষরের ক্রমপরিবর্ত্তনের ধারা বা রীতি এই প্রস্তাব সমর্থন করে না। নিম্নোদ্ধৃত কয়েকটি বর্ণের ক্রমপরিবর্ত্তন লক্ষ্য করলেই এই সত্যের উপলব্ধি হইবে।

এখন দেখা যাইতেছে যে, ব্রাহ্মী হইতে বঙ্গাক্ষরে এইরূপ ক্রমপরিবর্ত্তন স্বীকার করিলে যে কোন বর্ণ হইতে ক্রমপরিবর্ত্তনের এক অলীক চিত্র অঙ্কন করিয়া যে কোন বর্ণের উৎপত্তি দেখান যাইতে পারে। যেমন খরোষ্ঠী "অ" হইতে বঙ্গীয় অ-কার অথবা ইংরেজী "A" বর্ণ হইতে বঙ্গীয় অ-কার, যথা—

বরং ব্রাহ্মীলিপি অপেক্ষা খরোষ্ঠীলিপি হইতে অনেকগুলি অক্ষর অতি সহজে বঙ্গাক্ষরে পরিণত হইতে পারে, যথা—

অতএব ব্রাহ্মীলিপিকে বঙ্গলিপির জননী বলিতে হইলে খরোষ্ঠী প্রভৃতি লিপিকেও বাদ দেওয়ার কোন কারণ নাই, কাজেই ইহার অন্য কোনও উৎপত্তিস্থান আছে কিনা অনুসন্ধান করা আবশ্যক।

তন্ত্রে বঙ্গলিপি :

বর্ণের স্বরূপবর্ণনা বিষয়ে বর্ণোদ্ধারতন্ত্র ও কামধেনুতন্ত্র ভিন্ন অপর কোনও গ্রন্থ দেখিতে পাওয়া যায় না। উক্ত বর্ণোদ্ধারতন্ত্রে বর্ণের যে স্বরূপ বর্ণিত হইয়াছে তাহার প্রায় সবগুলিই বঙ্গাক্ষরগুলির সহিত মিলিয়া যায়। প্রবন্ধের কলেবর বৃদ্ধির ভয়ে মাত্র ৩।৪টি উদাহরণ দিতেছি। অনুসন্ধিৎসু পাঠকগণ প্রাণতোষিণীতন্ত্রে অথবা বিশ্বকোষ অভিধানে কিংবা শব্দকল্পদ্রুমে প্রায় প্রতি অক্ষরের প্রারম্ভেই বর্ণের স্বরূপবর্ণনা বর্ণোদ্ধারতন্ত্রানুসারে দেখিতে পাইবেন।

অকারের স্বরূপ, যথা—

দক্ষতঃ কুণ্ডলী ভূত্বা কুঞ্চিতা বামতো গতা।
ততোহর্দ্ধাসংগতা রেখা দক্ষোর্দ্ধা তাসু শঙ্কর॥

—বর্ণোদ্ধারতন্ত্র

	ব্রাহ্মী	ক্রমপরিবর্তন			নাগরী	বাংলা
(১) ই =	∴	⁚	ই	ই	इ	ই
(২) ও =	ㄱ	২	ও		ओ	ও
(৩) খ =	ʔ	8	খ		ख	খ
(৪) জ =	E	ε	জ		ज	জ
(৫) ত =	⅄	⅄	ণ		त	ত
(৬) থ =	⊙	θ	8		थ	থ
(৭) প =	b	4	प		प	প
(৮) য =	⅄	W	∀		य	য
(৯) র =	।	(	৫		र	র
(১০) ল =	ↄl	ↄl	ল		ल	ল
(১১) শ =	⋀	A	শ		श	শ (শা)
(১২) হ =	ʋ	ᑯ	৫		ह	হ

খরোষ্ঠী	ə	১	অ	
ইংরেজী	A	A	H	অ

	ব্রাহ্মী	খরোষ্ঠী	বাংলা
ই =	∴	३	ই
ও =	ㄱ	३	ও
ত =	⅄	৬	ত
দ =	ϸ	५	দ
ল =	ↄl	ল	ল
শ =	⋀	∩	শ (প্রাচীন বাংলা)
হ =	ʋ	2	হ

অর্থাৎ—দক্ষিণ দিক্ হইতে কুণ্ডলী করিয়া বামদিকে বক্র করিতে হইবে। অনন্তর তাহা হইতে অর্দ্ধরেখা টানিয়া দক্ষিণ দিকে উর্দ্ধগামী করিতে হইবে। যথা,—অ।

ঋকারের স্বরূপ—

উর্দ্ধাদ্দক্ষগতা বক্রা ত্রিকোণা বামতস্ততঃ।
পুনস্ত্বধো দক্ষগতা মাত্রা শক্তিঃ পরা স্মৃতা॥

—বর্ণোদ্ধারতন্ত্র

অর্থাৎ—উপর দিক্ হইতে দক্ষিণ দিকে বক্রভাবে রেখা টানিয়া বাম ভাগে ত্রিকোণাকার করিয়া তাহার নিম্ন ভাগ হইতে দক্ষিণ দিকে একটি মাত্রা দিবে। যথা—ঋ।

ওকারের স্বরূপ, যথা—

বামতঃ কুণ্ডলী ভূত্বা দক্ষাগ্রাধো তু কুঞ্চিতা।
কিঞ্চিদ্দক্ষগতা ধাতু কুঞ্চিতা বামতঃস্বরঃ॥

—বর্ণোদ্ধারতন্ত্র

অর্থাৎ—বাম দিকে বক্ররেখা টানিয়া দক্ষিণ দিকে মধ্য ভাগে আবার তাহাকে বক্র করিয়া কিঞ্চিৎ দক্ষিণ দিকে রেখাকে অগ্রসর করিয়া নিম্ন ভাগে বাম দিকে বক্রাকার করিতে হইবে। যথা,—ও।

এইরূপে প্রায় সমস্ত বর্ণই বর্ণনা অনুসারে বঙ্গাক্ষরের সহিত মিলিয়া যায়। যে দুই-একটি বর্ণের লক্ষণগত অসামঞ্জস্য দেখিতে পাওয়া যায় তাহাদের বিষয় পরে আলোচনা করা হইবে। অতএব বঙ্গলিপির উদ্ভব এই তন্ত্র হইতেই প্রমাণিত হইতেছে। অথবা তান্ত্রিক লিপিকেই বঙ্গলিপি বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। বোধ হয় এই জন্যই জাপানের শিঙ্গোন বা তান্ত্রিকগণ যে সকল স্তব কবচাদি লিখিয়া পাঠ বা ধারণ করেন সে সমুদয় পূর্ব্বোক্ত বঙ্গাক্ষরের আদর্শে লিখিত হইয়া থাকে (বিশ্বকোষ অভিধানে 'বঙ্গদেশ' শব্দ দ্রষ্টব্য)।

বঙ্গদেশ তন্ত্রের লীলাভূমি। এই দেশে এই তান্ত্রিকলিপি বেশী সমাদৃত হওয়ায় এবং তান্ত্রিক নিয়মের অধীন থাকায় বহু প্রাচীন কাল হইতে ইহা প্রায় একরূপেই চলিয়া আসিতেছে। বর্ণের স্বরূপজ্ঞাপক শ্লোকগুলির ব্যাখ্যার বিভিন্নতা হেতু অথবা লেখনসৌকর্য্যাদির অনুরোধ কিংবা পারিপার্শ্বিক অন্যলিপির প্রভাবে কোন অক্ষরের কিংবা তাহার কোন অংশের কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তন হইয়াছে। ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশে তন্ত্রের প্রভাব এইরূপ না থাকায় এবং বর্ণের স্বরূপনির্দ্দেশক নিয়মের অভাব হেতু পারিপার্শ্বিক বিভিন্ন লিপির আদর্শে মূললিপি ক্রমশঃ পরিবর্ত্তিত হইতে হইতে আধুনিক নাগরী প্রভৃতি লিপির উদ্ভব হইয়াছে। ললিতবিস্তরগ্রন্থে যে বঙ্গলিপির উল্লেখ আছে তাহা এই তান্ত্রিকলিপি ব্যতীত আর কিছুই নয়। নতুবা সেখানে তান্ত্রিকলিপির ও উল্লেখ পাওয়া যাইত।

বুদ্ধদেবের সময়েও যে তান্ত্রিকলিপির যথেষ্ট প্রভাব ছিল তাঁহার অক্ষর পরিচয়েই তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। বুদ্ধদেব অ-কার হইতে ক্ষ-কার পর্য্যন্ত বর্ণমালার মধ্যে ঋ, ঝৄ, ৯ ৯৯, এই চারটি অক্ষর বাদে ৪৬টি অক্ষর শিক্ষা করিয়াছিলেন। বিশ্বকোষের মতে তিনি ৪৫টি অক্ষর শিক্ষা করিয়াছিলেন। তিনি ল কারকেও বাদ দিয়াছিলেন। কিন্তু Dr. S. Lefmann সম্পাদিত ললিতবিস্তরগ্রন্থের দশম অধ্যায়ে তিনি ল-কারকেও শিক্ষা করিয়াছিলেন বলিয়া দেখিতে পাই। যথা,—

"ইতিহি ভিক্ষবো দশদারকসহস্রাণি বোধিসত্ত্বেন সার্দ্ধং লিপিং শিক্ষন্তে স্ম। তত্র বোধিসত্ত্বাধিষ্ঠানেন তেষাং দারকাণাং মাতৃকাং বাচয়তাম্। যদা অকারং পরিকীর্ত্তয়ন্তি স্ম তদা অনিত্যঃ সর্ব্বসংস্কারশব্দো নিশ্চরতি স্ম। আকারে পরিকীর্ত্ত্যমানে আত্মপরহিতশব্দো নিশ্চরতি স্ম। ইকারে ইন্দ্রিয়বৈকল্যশব্দঃ।····অংকারে অমোঘোৎপত্তিশব্দঃ। অঃকারে অস্তগমনশব্দঃ নিশ্চরতি স্ম।······লকারে লতাচ্ছেদনশব্দঃ। ক্ষকারে পরিকীর্ত্ত্যমানে ক্ষণপর্য্যন্তাভিলাপ্য সর্ব্বধর্ম্মশব্দো নিশ্চরতি স্ম।"

অর্থাৎ, এইরূপে দশহাজার ভিক্ষুশিশু বোধিসত্ত্বের (বুদ্ধদেবের) সহিত লিপিশিক্ষা করিয়াছিলেন। সেখানে বুদ্ধদেবের সমীপে ভিক্ষুশিশুগণের অক্ষর পাঠ করিবার সময় অকারের উচ্চারণ দ্বারা অনিত্য সর্ব্বসংস্কার শব্দ, আকারে আত্মপরহিত শব্দ, ইকারে ইন্দ্রিয়বৈকল্য শব্দ,··· অংকারে অমোঘোৎপত্তিশব্দ, অঃকারে অস্তগমন শব্দ,··· লকারে লতাচ্ছেদনশব্দ এবং ক্ষকারের উচ্চারণে ক্ষণপর্য্যন্ত শব্দ—এই ভাবে সর্ব্বধর্ম্মশব্দ উচ্চারিত হইয়াছিল।

বলা বাহুল্য, এখানে, 'অ'এ "অজগরটি আসছে তেড়ে, আমটি আমি খাব পেড়ে" ইত্যাদি আধুনিক অক্ষর-পরিচয়ের পদ্ধতি অবলম্বন করা হইয়াছে।

এস্থলে তান্ত্রিক বর্ণমালা অনুসারেই অংকার, অঃকার ও ক্ষকারকে পৃথক্ বর্ণরূপে গ্রহণ করা হইয়াছে। যথা গৌতমীয়তন্ত্রে—

"অকারাদি ক্ষকারান্তা বর্ণমালাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ।"

ন্যাসাদিকার্য্যে তান্ত্রিকগণ এই তিনটি অক্ষরকে সেইভাবে ব্যবহারও করিয়াছেন এবং "ক্ষকারঃ কণ্ঠঘাতজঃ" বলিয়া তাহার উচ্চারণেরও পার্থক্য নির্দ্দেশ করিয়াছেন। পাণিনি প্রভৃতি শাস্ত্রকারগণ এইগুলিকে পৃথক্ বর্ণ বলেন নাই কিংবা ইহাদের উচ্চারণের বিষয়ে কোন নির্দ্দেশও দেন

নাই। কেবল কামরূপীয় সাধক পুরুষোত্তমদেব তাঁহার প্রয়োগরত্নমালা ব্যাকরণে—

"অকারাদিক্ষকারান্তা বর্ণমালাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ।
উক্তঃ ক্ষো বর্ণমালায়াং মন্ত্রস্তোপচিকীর্ষয়া॥"—

এই নিয়মদ্বারা তন্ত্রের অনুসরণেই ক্ষ-কারকে বর্ণমালার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন, কিন্তু কেহই অংকার কিংবা অঃকারকে বর্ণমালার মধ্যে স্থান দেন নাই। পূর্ব্বোক্ত ললিতবিস্তরগ্রন্থে অক্ষরবাচী মাতৃকাশব্দেরও ব্যবহার করা হইয়াছে। অক্ষরার্থে মাতৃকাশব্দ শুধু তন্ত্রেই ব্যবহৃত হইয়া থাকে। অতএব বুদ্ধদেবের সময়ে এই তান্ত্রিক-লিপি যে বেশ প্রচলিত ছিল সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। অথচ তদুক্ত ৬৪ প্রকার লিপির মধ্যে তান্ত্রিক কোন লিপির উল্লেখ না থাকায় এবং বঙ্গলিপির সহিত তন্ত্রোক্তলিপির লক্ষণ মিলিয়া যাওয়ায় নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, বঙ্গলিপিকেই তান্ত্রিক লিপিরূপে ধরা হইয়াছে।

বিশ্বকোষ অভিধানে 'দেবনাগর' শব্দে পাওয়া যায়, জৈনদিগের চতুর্থ উপাঙ্গনাসূত্র শ্যামার্য্য (প্রথম কালকাচার্য্য) কর্তৃক বিরচিত। তিনি বীরনির্ব্বাণের ৩৭৬ বর্ষ পরে আবির্ভূত হন। জৈনমতে মহাবীরের সময়েই অঙ্গসমূহ প্রচলিত হইয়াছিল। মহাবীরের নির্ব্বাণের ১৬০ বৎসর পরে, অর্থাৎ খ্রীষ্টপূর্ব্ব ৩৬৩ অব্দে, পাটলীপুত্রের শ্রীসংঘে ইহা সংগৃহীত হইয়াছিল। এই প্রজ্ঞাপনাসূত্রে ও সমবায়সূত্রে যে মাহেশ্বরী লিপির উল্লেখ আছে তাহাও এই তান্ত্রিকলিপি ভিন্ন আর কিছুই নয়। প্রজ্ঞাপনাসূত্রে নিম্নলিখিত ১৮ প্রকার লিপির উল্লেখ আছে—

ব্রাহ্মী, যবনানী, দাশপুরী, খরোষ্ট্রী, পুষ্করশারিকা, পার্ব্বতীয়া, উচ্চতুরিকা, অক্ষরপুস্তিকা, ভোগবয়স্থা, বেয়নতিয়া, নিরাহইয়া, অঙ্কলিপি, গণিতলিপি, গন্ধর্ব্বলিপি, আদর্শলিপি, মাহেশ্বরী, দ্রাবিড়ী, পোলিন্দালিপি।

সমবায়সূত্রে লিখিত লিপিগুলির নাম, যথা—

ব্রাহ্মী, যবনানী, দাশপুরিকা, খরোষ্ট্রী, পুষ্করশারিকা, পার্ব্বতীয়া, উচ্চতুরিকা, অক্ষরপুস্তিকা, ভোগবয়স্থা, বেয়নতিয়া, নিরাহইয়া, অঙ্কলিপি, গণিতলিপি, গন্ধর্ব্বলিপি, আদর্শলিপি, মাহেশ্বরলিপি, দামলিপি, বোনিদিলিপি।

উক্ত সূত্রদ্বয়ের টীকাকার মলয়গিরি লিখিয়াছেন—
"ব্রাহ্মী যবনানীত্যাদয়ো লিপিভেদাস্তু সম্প্রদায়াদবশেয়াঃ।"

মাহেশ্বর সম্প্রদায়ের লিপি অথবা মহেশ্বর কথিত লিপিই মাহেশ্বরলিপি। সমস্ত তন্ত্রশাস্ত্রই শিবপ্রোক্ত বলিয়া তান্ত্রিকদিগকেই মাহেশ্বর সম্প্রদায় বলা হয়। তদ্ভিন্ন অন্য কোন মাহেশ্বর সম্প্রদায়ের প্রমাণ পাওয়া যায় না। অতএব মাহেশ্বরীলিপি শব্দের দ্বারা তান্ত্রিক লিপিকেই বুঝা যাইতেছে এবং এই তান্ত্রিকলিপিই বঙ্গলিপি। ইহাদ্বারা ললিতবিস্তরগ্রন্থের প্রায় সমসাময়িক উক্ত সূত্রগ্রন্থ দুইটির মধ্যে বঙ্গলিপির উল্লেখ না থাকিলেও ইহার প্রামাণ্য বিষয়ে সন্দেহ নিরাকৃত হইল।

বর্ণোদ্ধারতন্ত্রের প্রাচীনত্ব :

যাবতীয় তন্ত্রশাস্ত্রের প্রাচীনত্ব বিষয়ে কোন প্রশ্নই উঠিতে পারে না। অথর্ব্ববেদে এই তন্ত্রের প্রাধান্য খুব বেশী এবং প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য তত্ত্ববিশারদগণের মতে অথর্ব্ববেদের তান্ত্রিক অংশ ঋগ্‌বেদের সময় হইতেও প্রাচীনতর, কারণ মানুষের আদিম অবস্থা ও প্রবৃত্তির পরিচয় ইহাতে বেশী মাত্রায় পাওয়া যায়। তন্ত্রের এই প্রাচীনত্বের জন্যই বেদ, পুরাণ, স্মৃতি, মহাভারত প্রভৃতি গ্রন্থে তন্ত্রশাস্ত্রের প্রামাণ্য স্বীকৃত হইয়াছে, যথা—

সাংখ্যং যোগঃ পাঞ্চরাত্রং বেদাঃ পাশুপতং তথা।
... ...
... ...
সত্যং যজ্ঞস্তপো বেদাস্তন্ত্রা মন্ত্রাঃ সরস্বতী॥
মহাভারত (শান্তিপর্ব্ব)

এখন বর্ণোদ্ধারতন্ত্রের প্রাচীনতা বিষয়ে আলোচনা করা প্রয়োজন। মহাসিদ্ধসার তন্ত্রে দেখিতে পাই, প্রতি-ক্রান্তার জন্য চতুঃষষ্টি তন্ত্র কথিত হইয়াছে। শঙ্করাচার্য্যও তাঁহার আনন্দলহরীতে চতুঃষষ্টিতন্ত্রের উল্লেখ করিয়াছেন, যথা—"চতুঃষষ্ট্যা তন্ত্রৈঃ সকলমতিসন্ধায় ভুবনম্" .. ইত্যাদি। ইহাদ্বারা তন্ত্রগুলির তৎপূর্ব্ববর্ত্তিত্ব স্থাপিত হইতেছে। রথাক্রান্তাদেশীয় সেই চতুঃষষ্টিতন্ত্রের মধ্যে বর্ণোদ্ধৃতিতন্ত্রের নাম পাওয়া যায়, যথা—

তন্ত্রাখ্যং পরমেশানি রথক্রান্তা নিবাসিনাম্।
চিন্ময়ং মৎস্যসূক্তঞ্চ তন্ত্রং মহিষমর্দ্দিনীম্॥
... ...
বর্ণোদ্ধৃতিং ছায়াং নীলং বৃহদ্‌যোনিং তথা প্রিয়ে॥

বলা বাহুল্য, বর্ণোদ্ধৃতি ও বর্ণোদ্ধার একই অর্থের বাচক। এইরূপ বিষ্ণুক্রান্তাদেশীয় ৬৪ তন্ত্রের মধ্যে লিপির স্বরূপজ্ঞাপক কামধেনুতন্ত্রের নাম দেখিতে পাওয়া যায়, যথা মহাসিদ্ধসারে—

সিদ্ধীশ্বরং মহাতন্ত্রং কালীতন্ত্রং কুলার্ণবম্।
... ...
কামধেনু কুমারী চ ভূততামরসংজ্ঞকম্।
... ...
সফলানীহ বারাহে বিষ্ণুক্রান্তাসু ভূমিষু॥

অশ্বক্রান্তাদেশীয় ৬৪ তন্ত্রের মধ্যে ভূতলিপি তন্ত্রেরও নাম আছে। নামার্থের দ্বারা মনে হয়, ইহাও লিপি-পরিচায়ক হইবে। এতদ্দ্বারা বর্ণোদ্ধারতন্ত্রের তান্ত্রিক প্রমাণ প্রতিষ্ঠিত হইল। এখন দেখা যাক্ বঙ্গলিপির উৎপত্তির পরে এই তন্ত্র রচিত হইয়াছে কি না। বর্ণোদ্ধার-তন্ত্রে ল-কারের লক্ষণ নিম্নলিখিত ভাবে লিখিত হইয়াছে—

কুণ্ডলীত্রয়সংযুক্তা বামাদ্দক্ষগতা ত্বধঃ।
পুনরূর্দ্ধগতা তাসু নারায়ণঃ স্মৃতঃ॥

অর্থাৎ—বামদিক্ হইতে দক্ষিণ দিকে নিম্নাভিমুখী তিন কুণ্ডলী করিয়া রেখাকে উর্দ্ধদিকে প্রসারিত করিতে হইবে। যথা—ল।

কিন্তু তন্ত্রোক্ত ল-কারের এই রূপ বা আকৃতি বঙ্গাদি লিপিতে কোনও কালে ব্যবহৃত হইতে দেখা যায় নাই। "কুণ্ডলীত্রয়"-এর স্থানে লেখকদিগের প্রমাদবশতঃ "কুণ্ডলীদ্বয়" পাঠ ধরিবারও উপায় নাই, তাহা হইলে মূর্দ্ধণ্য ণ-কারের সহিত অভিন্ন হইয়া যাইবে; কারণ, ণ-কারের লক্ষণ বর্ণোদ্ধারতন্ত্রে এইরূপ বর্ণিত আছে—

কুণ্ডলীত্বগতা রেখা মধ্যতস্তত উর্দ্ধতঃ।
বামাদধোগতা সৈব পুনরূর্দ্ধং গতা প্রিয়ে॥

অর্থাৎ—বামদিক্ হইতে কুণ্ডলী করিয়া মধ্যভাগে রেখাকে উর্দ্ধগামী করিয়া তার পর অধোগামী করিয়া পুনরায় তাহাকে উর্দ্ধগামী করিবে। যথা—ল। কিছুদিন পূর্ব্ব পর্য্যন্তও বাংলা অক্ষরে মূর্দ্ধণ্য ণ-কারকে "ল" এইরূপে লেখা হইত। র-কারের লক্ষণ উক্ততন্ত্রে নিম্নলিখিত রূপ বলা হইয়াছে—

দক্ষতঃ কুণ্ডলীরেখা বামাদ্দক্ষগতাপ্যধঃ।
পুনর্দ্দক্ষগতা দ্বেধা ততোঽধোগত্য চোর্দ্ধতঃ॥
ভবানীশঙ্করবহ্নিস্তাসু তিষ্ঠান্তি নিত্যশঃ।
অর্দ্ধমাত্রা ব্রহ্মরূপা মহাশক্তিঃ প্রকীর্ত্তিতা॥

অর্থাৎ—দক্ষিণাভিমুখী কুণ্ডলী রেখাকে অধোদিকে বাম দিক্ হইতে দক্ষিণ দিকে প্রসারিত করিতে হইবে। পুনর্ব্বার সেই রেখাকে দক্ষিণ দিকে দুই ভাগে উর্দ্ধগামী করিতে হইবে। একভাগ পূর্ব্ব রেখা হইতে কিঞ্চিৎ অধোগামী হইয়া উর্দ্ধগামী হইবে। যথা—ঋ।

অবশ্য এই বচনগুলির অন্যপ্রকার ব্যাখ্যাও হইতে পারে, কিন্তু যে প্রকার ব্যাখ্যাই করা যাক্ না কেন, আজ পর্য্যন্ত আবিষ্কৃত প্রাচীন ও আধুনিক তাম্রাদিলিপি ও পাণ্ডুলিপি হইতে যত প্রকার রকারের সহিত আমাদের পরিচয় হইয়াছে তাহার কোনও প্রকারের সহিতই তাহার সঙ্গতি হইবে না। এইরূপ আরও কয়েকটি বর্ণসম্বন্ধে বিতর্কের বিষয় আছে।

যদি বঙ্গলিপি উদ্ভাবনের পরে বর্ণোদ্ধারতন্ত্রখানা রচিত হইত, তবে 'ল' প্রভৃতি বর্ণের লক্ষণও বঙ্গলিপির সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়াই করা হইত।

বর্ণোদ্ধারতন্ত্রোক্ত এই বঙ্গলিপি বাংলা ও আসাম প্রদেশেই বিশেষভাবে প্রচলিত ছিল। ইহার একমাত্র কারণ, এই স্থানগুলি পূর্ব্বোক্ত রথক্রান্তাদেশের অন্তর্ভুক্ত ছিল। রথক্রান্তা দেশেই রথক্রান্তা দেশীয় তন্ত্রোক্তলিপি প্রচলিত হওয়া স্বাভাবিক। মহাসিদ্ধসারতন্ত্রে নিম্নোদ্ধৃত রূপ রথক্রান্তাদেশের বর্ণনা আছে—

বিন্ধ্যপর্ব্বতমারভ্য মহাচীনাদিদেশকম্।
রথক্রান্তেতি বিখ্যাতং দেবানামাপি দুর্লভম্॥

অর্থাৎ—বিন্ধ্যপর্ব্বত হইতে আরম্ভ করিয়া মহাচীন প্রভৃতি দেশ পর্য্যন্ত স্থান রথক্রান্তা দেশ নামে বিখ্যাত। এই স্থান দেবগণের পক্ষেও দুর্লভ।

এখন দেখিতে হইবে, বঙ্গলিপি খ্রীষ্টপূর্ব্বের হইলে দশম শতাব্দীর পূর্ব্বে কোন শিলালিপি কিংবা তাম্রশাসনাদিতে তাহার সন্ধান পাওয়া যায় না কেন? পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, ব্রাহ্মীলিপির অধিকাংশ বর্ণই কয়েকটি সরল রেখা দ্বারা লিখিত হইত। সে কালে কাগজ ছিল না বলিয়া শিলাতাম্রাদি ফলকই লেখার আধার রূপে ব্যবহৃত হইত। তাহাতে অক্ষর ক্ষোদিত করিতে হইত বলিয়া ব্রাহ্মীলিপিই সেই কার্য্যের অনুকূল ছিল, এবং সম্ভবতঃ তখন রাষ্ট্রীয় বা জাতীয় লিপি হিসাবে ইহাই প্রচলিত ছিল। ক্রমশঃ লেখার প্রয়োজনীয়তা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ভূর্জ্জপত্র, তালপত্র প্রভৃতির ব্যবহার আরম্ভ হয়। তাহাতে ব্রাহ্মীলিপি লেখার অসুবিধা বোধ হওয়ায় খ্রীষ্টীয় তৃতীয় কিংবা চতুর্থ শতাব্দী হইতে অপেক্ষাকৃত সহজলেখ্য নাগরী প্রভৃতি প্রাদেশিক লিপির উদ্ভব হয়। উত্তর-পশ্চিম ভারতে এই লিপির সমধিক প্রচলন হওয়ায় আর্য্যদের যাবতীয় কৃষ্টির বিষয় সংস্কৃত ভাষায় এই লিপিতে লিখিত হইয়া ইহার প্রচার ব্যাপক করিয়াছে এবং এই জন্য ক্রমশঃ স্থানে স্থানে ইহা রাষ্ট্রীয় মর্য্যাদা লাভ করিয়াছে। এই জন্য পঞ্চম শতাব্দীর নন্দীসূত্রে নাগরীলিপির প্রথম পরিচয় পাওয়া যায়। বিশ্বকোষের 'দেবনাগরী' শব্দে পাওয়া যায়, গুর্জ্জররাজ দদ্দ-প্রশান্ত-রাগের ৪১৫ শকাব্দীয় (৪৮৭।৮ খ্রীষ্টাব্দ) তাম্রশাসনের সর্ব্বাংশই প্রাদেশিক গুজরাটী অক্ষরে অঙ্কিত হইলেও রাজার স্বাক্ষরস্থানে নাগরী অক্ষরে:

"স্বহস্তোঽয়ং মম শ্রীবিতরাগস্থনোঃ

শ্রীপ্রশান্তরাগস্য"—এই লেখা থাকায় মনে হয়, এই সময়েই নাগরী অক্ষর রাষ্ট্রীয় মর্য্যাদা লাভ করিতে আরম্ভ করিয়াছে। নতুবা দস্তখতের অক্ষরগুলি এইরূপ ভিন্ন রূপে লিখিবার অন্য কোন ব্যাখ্যা দেওয়া যায় না। ইহার পর হইতে প্রায় দশম শতাব্দী পর্য্যন্ত বঙ্গ, উড়িষ্যা, মিথিলা ও আসাম প্রভৃতি স্থানে এই নাগরীলিপিই রাষ্ট্রীয় আসনে সুপ্রতিষ্ঠিত থাকায় রাজকীয় তাম্রশাসনাদিতে বঙ্গলিপির সন্ধান পাওয়া যায় না। পুস্তকাদিও এত প্রাচীন থাকিতে পারে না বলিয়া সেই যুগের বঙ্গলিপি আমাদের নিকট অদৃষ্ট হইয়াই আছে। অপর, বঙ্গলিপি তান্ত্রিকদের একক সম্পত্তি বলিয়া সম্ভবতঃ সর্ব্বসাধারণের মধ্যে ইহা বিশেষ প্রচলিতও ছিল না। কারণ, তান্ত্রিকগণ তাঁহাদের প্রায় সমস্ত বিষয় ও ব্যাপার "গোপয়েৎ মাতৃজারবৎ" নিয়মানুসারে গোপন রাখিতেন। আজ পর্য্যন্তও তান্ত্রিকসাধকদের এমন অনেক অমূল্যবিদ্যা গুপ্ত অবস্থায় আছে, যাহা প্রকাশিত হইলে জগতে বিস্ময় উৎপাদন করিতে পারে।

দশম শতাব্দীর পর, সম্ভবতঃ সেনরাজাদের রাজত্বকালে, বঙ্গলিপি সর্ব্বপ্রথম রাষ্ট্রীয় মর্য্যাদা প্রাপ্ত হইয়া জনসাধারণের সমাদর লাভ করে। অতএব ইহার পূর্ব্বকালের বঙ্গলিপির অদর্শন অসঙ্গতও নয়, আশ্চর্য্যজনকও নয়।

সমবায়সূত্র, প্রজ্ঞাপনাসূত্র, ললিতবিস্তর, নন্দীসূত্র প্রভৃতি পুস্তকে কথিত বহুবিধ লিপিই বঙ্গলিপির ন্যায় দশম শতাব্দীর পূর্ব্বেই, এমন কি অনেকগুলি আজ পর্য্যন্তও অদৃষ্ট হইয়াই আছে। এই জন্য তাহাদের সকলেরই অস্তিত্ব বিষয়ে কি সন্দেহ করিতে হইবে? উক্ত গ্রন্থাদিতে একটি কাল্পনিক লিপির উল্লেখেরই বা কি সার্থকতা থাকিতে পারে? অথবা যে-সকল লিপির ব্যবহারের প্রমাণ কোনও নির্দ্দিষ্ট কালের মধ্যে পাওয়া যায় না তাহারা সকলেই একেবারে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে বলিয়া সিদ্ধান্ত করিতে হইবে? তাহা হইলে যাহাদের রাজত্বকালীন দানপত্রাদির কোনও প্রামাণ্য দলিল পাওয়া যায় না সেই-সকল রাজাদিগকেও কবির কল্পনা বলা যাইতে পারে। ইহাতে ইতিহাসের মূলেই কুঠারাঘাত করা হয়। অতএব সেই লিপিগুলিকেও যদি কিঞ্চিৎ রূপান্তরিত ও নামান্তরিত অবস্থায় বর্ত্তমান কালে স্বীকার করিতে বাধা না থাকে তবে অনামান্তরিত ও অরূপান্তরিত সেই প্রাচীন বঙ্গলিপিকে কেবল অদৃষ্টত্বদোষে বর্ত্তমান বঙ্গলিপি বলিয়া স্বীকার করিতে আপত্তি হইবে কেন?

রঙ্গমল্লী

শ্রীসীতা দেবী

১৩

সকাল হইতেই মাকে ঔষধ-পথ্য খাওয়াইয়া, কাপড়-চোপড় বদলাইয়া পূর্ণিমা প্রস্তুত করিয়া রাখিল। ছোট ভাইবোন দু'জন বাড়ীতেই থাকিবে, সঙ্গে যাইবে না। পিসীমাও ন'টার মধ্যে আসিয়া পড়িবেন বলিয়া গিয়াছেন।

তাঁহার ট্যাক্সি এবং হিরণ্ময়ের গাড়ী প্রায় একই সঙ্গে আসিয়া দাঁড়াইল। হিরণ্ময় নামিয়া পড়িয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "সব তৈরি আছে ত ?"

সবই তৈরি ছিল। সুরবালা ছেলেমেয়ে, ননদ সকলের কাছে বিদায় লইয়া আস্তে আস্তে গিয়া গাড়ীতে বসিলেন, তাহার পাশে বসিল পূর্ণিমা। হিরণ্ময় বলিলেন, "আমি বাইরে বসি না হয়। আমি আবার জায়গা নিই অনেকটা, ছোট-খাট মানুষ ত নই ? ঠাসাঠাসি ক'রে বসলে ওঁর হয়ত কষ্ট হবে।"

সুরবালা ব্যস্ত হইয়া বলিলেন, "না, না, কোন কষ্ট হবে না, বসুন আপনি।"

হিরণ্ময় ভিতরে আসিয়া বসিলেন। পূর্ণিমা যথাসাধ্য জড়সড় হইয়া তাঁহার জায়গা করিয়া দিল। উঠিয়া বসিয়া একটুখানি আদেশের সুরে হিরণ্ময় বলিলেন, "আপনি ঠিক হয়ে বসুন ত। আমি সত্যিই ত ভীমসেন নই, যে সমস্ত গাড়ীটা জুড়ে বসব ?"

পূর্ণিমা বাধ্য হইয়া স্বাভাবিক ভাবে বসিল। হিরণ্ময়ের ডান বাহু ও হাত তাহার বাহু স্পর্শ করিয়া রহিল। সারা শরীরের ভিতর দিয়া তাহার একটা শিহরণ বহিয়া গেল। হিরণ্ময় তাহা অনুভব করিলেন কি না বোঝা গেল না।

হাসপাতালে বিস্তর লোক হিরণ্ময়ের চেনাশোনা। তাঁহাদের যথাস্থানে পৌঁছিতে কোন অসুবিধা হইল না। ঘর সুরবালার ও পূর্ণিমার পছন্দই হইল। তবে তাঁহাকে অধিকাংশ সময় একলা থাকিতে হইবে শুনিয়া সুরবালা একটু ম্রিয়মান হইয়া গেলেন। হিরণ্ময় বলিলেন, "Attendant একটা রেখে দেওয়া যাক। সত্যিই এত একলা কি ক'রে থাকবেন ?"

পূর্ণিমা আর তাঁহার উপর কি কথা বলিবে ? সে ত সব ভার তাঁহার উপর ছাড়িয়া দিয়াছে।

যতক্ষণ সম্ভব মায়ের কাছে বসিয়া পূর্ণিমা বাড়ী যাইবার জন্য উঠিল। হিরণ্ময়কে আর বেশীক্ষণ বসাইয়া রাখা উচিত নয়। গাড়ীতে উঠিয়া তিনি বলিলেন, "মায়ের ঘর একেবারে thoroughly disinfect ক'রে তবে আপনারা সে ঘরে যাবেন। কোন risk নেওয়া চলবে না। আমি ডাক্তারকে দিয়ে instruction লিখিয়ে দিচ্ছি এবং ভালভাবে সেগুলি পালন করতে পারে এমন লোক পাঠিয়ে দিচ্ছি।"

সারাটা রবিবার তাহাদের বাড়ী পরিষ্কার করিতেই কাটিয়া গেল। হিরণ্ময় একবার আসিয়া দেখিয়াও গেলেন যে কাজ ঠিক মত হইয়াছে কি না। রাত্রে সরমা পূর্ণিমা নিজেদের ঘরে ফিরিয়া গেল আবার। পিসীমা আসিয়া জোটাতে ঘরকন্নার অসুবিধা কিছু হইল না, তবে মা থাকিতে যে স্নেহসিক্ত সুর বাজিত তাহা আর শোনা গেল না। পুরাণো ঝি থাকায় পূর্ণিমাকে আর বাড়ীর কাজে হাত লাগাইতে হইল না।

অফিসে হিরণ্ময়ের সঙ্গে দেখা হইতেই তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "বাড়ীতে খুব অসুবিধা বোধ করছেন নাকি ?"

পূর্ণিমা বলিল, "না, পিসীমা চালিয়ে নিচ্ছেন এক রকম ক'রে। বুড়ী ঝিটা আছে, সে অনেক দিনের পুরাণো। আর যাই হোক, মা যে ভাল চিকিৎসা পাচ্ছেন, প্রয়োজনীয় ওষুধ-পথ্য পাচ্ছেন, এতেই আমি বেঁচেছি। বাড়ীতে যখন ছিলেন, তখন ভয়ে আমার সারারাত ঘুম হ'ত না, পাছে তাঁর কিছু হয়।"

হিরণ্ময় বলিলেন, "সেই জন্যেই আমি এত তাড়াতাড়ি করলাম পাঠানোর জন্যে। রুগী একজন ছিলেনই, আর একজনও হয়ে পড়বেন অবিলম্বে। তখন ঘরে-বাইরে বড় বিপদে পড়তে হ'ত। ওঁকে যত ঘন ঘন দেখতে যেতে পারেন যাবেন। গাড়ীর যখনই দরকার হবে পাঠিয়ে দেব।"

সারাদিন কাজ করিয়া বিষণ্ণ মনে পূর্ণিমা বাড়ী

ফিরিয়া আসিল। কাপড় বদলাইল, চা খাইল। তাহার পর বারান্দায় আসিয়া বসিল। হঠাৎ মনে হইল, একবার লেকের ধারে গেলে হয় না? যদি খোলা হাওয়ায় মাথাটা একটু ছাড়ে? হয়ত দীপক সেখানে যায় এখনও, গেলেই বা? আর দশটা পরিচিত লোক হইতে দীপকের তফাৎটা কোথায়?

সরমা জিজ্ঞাসা করিল, "কোথায় যাচ্ছ দিদি?"

পূর্ণিমা বলিল, "লেকের ধারে।"

সরমা বলিল, "দীপকদাটার সঙ্গে দেখা হলে কথা ব'লো না ত? ভীষণ স্বার্থপর ছেলে। এত বড় বিপদ্ গেল আমাদের, একটা খোঁজ পর্য্যন্ত নিল না।"

পূর্ণিমা বলিল, "ও হয় ত আর আজ-কাল আসেই না। যেচে কথা বলতে যাব না, তবে কথা বললে জবাব দেব, ছোটবেলার আড়ি করার মত এখন ত আড়ি করা চলে না?"

সরমা বলিল, "আমি হ'লে আড়িই করতাম। তোমার যে কি ক'রে অমন অদ্ভুত মানুষকে ভাল লাগে, তা জানি না বাপু।"

পার্কে লোকের ভীড় তখন বেশ জমিয়া উঠিয়াছে। যেদিকে তাহারা সচরাচর বসিত, সেদিকে পূর্ণিমা বসিল না। দীপকের সহিত দেখা করিবার সত্যই কোন ইচ্ছা তাহার ছিল না।

কিন্তু অদৃষ্টে দেখা হওয়া সেদিন ছিল। খানিক পরেই দেখা গেল দীপক আসিয়া জুটিয়াছে। একটু ইতস্ততঃ করিয়া আসিয়া তাহারই কাছে বসিয়া পড়িল। জিজ্ঞাসা করিল, "কেমন আছ পূর্ণিমা?"

পূর্ণিমা তাহাকে দেখিয়া হাসিলও না, কোনপ্রকার স্বাগত সম্ভাষণও করিল না। তাহার প্রশ্নের উত্তরে বলিল, "আছি একরকম। খুব ভাল নয়।"

দীপক কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিল। তাহার পর বলিল, "আমাকে তুমি নিশ্চয়ই একটা পয়লা নম্বরের ছোটলোক ভেবেছ?"

পূর্ণিমা একই ভাবে বলিল, "কেন তা মনে করব?"

দীপক বলিল, "তোমাদের বাড়ীতে এত অসুখ-বিসুখ গেল, আমি কোনও খোঁজ করলাম না, কোন সাহায্য করলাম না।"

পূর্ণিমা কিছু বলিল না। দীপককে একটা সাধারণ শিষ্টপ্রশ্ন করিতেও যেন তাহার ক্লান্তি লাগিতেছিল।

দীপক একটুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, "আমি কেন যাই নি তা যদি বলি, তুমি কি তা বিশ্বাস করবে?"

পূর্ণিমা বলিল, "বিশ্বাস না করব কেন? আমাকে বানিয়ে কথা ব'লে তোমার লাভই বা কি?"

দীপক বলিল, "আমি তোমার জন্যে কিছু করতে পারতাম না, সেই লজ্জাতেই যাই নি। সাধারণ প্রতিবেশী হিসাবেও কর্ত্তব্য ছিল, বহুদিনের বন্ধু ব'লেও কর্ত্তব্য ছিল। কিন্তু আমার সকল দিকেই পুঁজি শূন্য।"

পূর্ণিমা বলিল, "ও-সব ভেবে লজ্জিত হয়ে লাভ নেই দীপক। কর্ত্তব্য করতে বেশীর ভাগ মানুষই পারে না, বিধাতা অধিকাংশকেই এমন অক্ষম ক'রে রেখেছেন। তুমি প্রতিবেশী হিসাবে কর্ত্তব্য করতে পার নি, আমি সন্তান হয়েও কর্ত্তব্য করতে পারি নি। আমি আর তোমাকে কি দোষ দেব?"

দীপক একটু বিস্মিত হইয়া বলিল, "কেন, আমি ত শুনলাম তোমার মা যাদবপুরে খুব ভাল seat-এ রয়েছেন?"

পূর্ণিমা বলিল, "তাই আছেন। তাঁর চিকিৎসার বা শুশ্রূষার কোন ত্রুটি হচ্ছে না। কিন্তু সে আমার গুণে নয়। মিঃ মজুমদার তাঁকে ভর্ত্তি ক'রে দিয়েছেন, সব রকম খরচ দিয়ে।"

অতঃপর বেশ খানিকক্ষণ দুজনেই চুপ করিয়া রহিল। তাহার পর দীপক বলিল, "হিরণ্ময় মজুমদার মানুষ খুব ভাল শুনেছি। যারা কাজ করে ওঁর কাছে, তারা প্রশংসাই করে। তোমার সম্বন্ধে ওঁর খুব একটা regard আছে, না?"

পূর্ণিমা সংক্ষেপে বলিল, "খুব kind ব্যবহার করেন।"

দীপক একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিল, "পূর্ণিমা, আমার একটা অনুরোধ রাখবে? বড় উপকার করা হয় আমার, তা হ'লে।"

পূর্ণিমা নিস্পৃহভাবে বলিল, "কি?"

"ওঁকে ব'লে যদি একটা কাজ আমার ক'রে দিতে পার, তোমার অফিসে। ওদের কাজ খুব বাড়ছে, নানা জায়গায় খুব expansion হচ্ছে শুনলাম। নূতন লোক নিতে পারে।"

পূর্ণিমার মনটা যেন তিক্ত হইয়া উঠিল। বলিল, "ওঁকে এখন এই নিয়ে বিরক্ত করতে যাওয়া আমার অত্যন্ত অন্যায় হবে। এমনিতেই অজস্রধারে favour নিয়েছি ওঁর কাছে। না নিয়ে উপায় ছিল না। তা ছাড়া নূতন লোক নিচ্ছে ব'লেও শুনি নি, কাজ খালি আছে ব'লেও শুনি নি।"

দীপক বলিল, "তুমি নিজের ঘরে ব'সে টাইপ কর, তুমি কোথা থেকে জানবে? বেকারের দল সবাই জানে,

অফিস-পাড়ারও সকলেই জানে। আর উনি বিরক্তই বা হবেন কেন? এরকম অনুরোধ-উপরোধ ওঁরা সারাক্ষণই শুনছেন। তুমি একটু যদি kindly ব'লে দেখ। নিজে ত আমি যথাসাধ্য খোঁজ করলাম, কোথাও সুবিধা হ'ল না।"

পূর্ণিমা কি যেন চিন্তা করিল খানিকক্ষণ। তাহার পর বলিল, "অফিসে যাঁদের সঙ্গে কথাবার্ত্তা বলি, তাঁদের কাছে খোঁজ করব। যদি শুনি কাজ খালি আছে, তা হ'লে ভেবে দেখব মিঃ মজুমদারকে বলা যায় কি না।"

ইহার বেশী কথা সে দিবে না, দীপক বুঝিতেই পারিল। বেশী জোর আর এখন করিবে কোন্ অধিকারে? পূর্ণিমাকে দেখিয়া এখন মনে হয় যে, দীপক সম্বন্ধে তাহার মনে কোন ভাবই নাই, আগ্রহ ত নাই-ই।

বসিয়া বসিয়া দীপক আরো খানিকক্ষন কথা বলিল, তাহার পর বিদায় লইয়া উঠিয়া চলিয়া গেল।

আবার সেই একটানা ক্লান্ত সুরে দিন চলিতে লাগিল। সকালে ওঠে, রণেনকে একটু পড়াইতে চেষ্টা করে, তাহার পর স্নানাহার করিয়া অফিসে যায়। একমনে কাজ করে, কাহারও দিকে তাকাইতে চায় না। তবু চক্ষু সব সময় তাহার বশে থাকে না, হিরণ্ময়ের মুখের উপর গিয়া পড়ে। কোনও দিন তিনি দেখিতে পান, বেশীর ভাগ দিনই পান না। তাহার পর বাড়ী ফেরে, সম্ভব হইলেই মাকে দেখিতে যায়। হিরণ্ময়ের গাড়ী করিয়াই যায়।

চেহারা তাহার আরো খারাপ হইয়া গিয়াছে। মুখের রং সব সময়ই বিবর্ণ, চোখের নীচে কালিপড়া।

হিরণ্ময় বলিলেন, "দেখুন, এসব overtime কাজকরা আপনার আর চলবে না। চোখের উপরে আপনি দেখতে দেখতে আধখানা হয়ে গেলেন। আমার ভয় হচ্ছে, ভিতরে ভিতরে কোন রোগের সূত্রপাত হচ্ছে আপনার। আমার চেনা একজন বেশ ভাল এবং অভিজ্ঞ ডাক্তার আছেন, কাল-পরশুর মধ্যে একদিন নিয়ে যাব আপনাকে তাঁর কাছে। তাঁকে ব'লেই রেখেছি।"

পূর্ণিমা অত্যন্ত লজ্জিত হইয়া বলিল, "অসুখ কিছু হয় নি আমার। দুর্ভাবনায় এটা হচ্ছে, ঘুম-টুম ভাল ক'রে হয় না ত?"

হিরণ্ময় বলিলেন, "অসুখ কিছু হয় নি, এইটাই ডাক্তারের মুখ থেকে শুনলে আমি নিশ্চিন্ত হব। রুগ্ন মায়ের সঙ্গে ছিলেন এতদিন, এই নিয়ে আমার একটা anxiety থেকে গেছে। আচ্ছা, ওঁকে দেখতে ত প্রায়ই যাচ্ছেন, কিরকম মনে হচ্ছে আপনার?"

পূর্ণিমা ম্লানমুখে বলিল, "কিছু উন্নতি হচ্ছে ব'লে ত মনে হয় না। রিপোর্টেও ভাল কিছু লেখে না।"

"অনেক দিনের পুরাণো রোগ সারতে সময় নেবে। ভাবনা অবশ্য হতেই পারে, তবে ভেবে লাভ ত নেই কিছু? যতদূর যা করা যায়, তা করা হচ্ছে, এই মনে ক'রে মনকে সান্ত্বনা দিতে চেষ্টা করুন। আর কাল ত শনিবার আছে, অফিসের পরে চলুন ডাক্তারের কাছে।"

কুণ্ঠিত হইয়া পূর্ণিমা বলিল, "সত্যিই কি যাওয়া দরকার?"

হিরণ্ময় বলিলেন, "আমাকে একটু নিশ্চিন্ত হতে দিতে আপত্তি আছে কি?"

পূর্ণিমা বলিল, "আচ্ছা যাব, যখন বলবেন তখনই যাব।"

সেদিন বাড়ী গিয়া হিরণ্ময়ের এই কথাটা লইয়া মনের মধ্যে অনেকক্ষণ নাড়াচাড়া করিল। কেন তিনি এত উদ্বিগ্ন তাহার জন্য? তাহাকে খানিকটা স্নেহ করেন বলিয়াই কি? না আর একটা রুগ্ন মানুষ তাঁহার ঘাড়ে পড়িবে বলিয়া? না, না, ছি, এমন অকৃতজ্ঞ কখনও তাহার হওয়া উচিত নয়। যে করুণা তাহার উপর বর্ষিত হইতেছে, তাহার যেন মর্য্যাদা রাখিতে পারে সে।

পরদিন অফিসে যাওয়ার আগে ভাইবোনকে সে বলিয়াই গেল যে, ফিরিতে তাহার খানিকটা দেরি হইবে, কোনও ভাবনা যেন তাহারা না করে। ডাক্তারের কথা কিছু বলিল না, পাছে তাহারা ভয় পাইয়া যায়।

অফিসে ঢুকিতেই বিকাশবাবুর সঙ্গে দেখা হইয়া গেল।

পূর্ণিমা জিজ্ঞাসা করিল, "আমাদের অফিসে নূতন লোক নেওয়া হচ্ছে নাকি?"

বিকাশবাবু বলিলেন, "কলকাতার জন্যে নয়, বাইরে পাঠাবার জন্যে নেওয়া হবে কিছু, শুনছি। কেন, আপনার কোন আত্মীয় আছে নাকি candidate?"

পূর্ণিমা বলিল, "আত্মীয় নয়, চেনা ছেলে একজন খোঁজ-খবর নিচ্ছিল।"

বিকাশবাবু বলিলেন, "মজুমদার সাহেব ঠিক খবর আপনাকে দিতে পারবেন, ওঁর হাত দিয়েই সব যাচ্ছে ত?"

পূর্ণিমার দেরি হইয়া যাইতেছিল, সে তাড়াতাড়ি

তাহাকে বাহির হইয়া আসিতেই হইল। মা বাড়ীতে থাকিলে সে কোন মতেই লুকাইতে পারিত না, নিজের কান্নাকাটির ব্যাপার। কিন্তু ছোটরা অতশত বোঝে না এবং পিসীমা কোন সময়েই তাহার দিকে তাকাইয়া দেখেন না। কাজেই সে নিরুপদ্রবে বসিয়া খানিকটা বিশ্রাম করিল।

খানিকটা ঘুরিয়া আসিলে হয় লেকের ধারে। এখন তাহার হইয়াছে এক অফিস আর বাড়ী এবং মধ্যে মধ্যে হাসপাতাল। বন্ধু-বান্ধব কাহারও মুখ দেখে না সে। দেখিতে খুব যে চায়, তাহাও নয়।

আজ পার্কে গিয়া অনেকদিন পরে তাহার এক সহ-পাঠিনী বন্ধু লীলার সহিত দেখা হইল। সে এখন এক মেয়েদের কলেজে কাজ করে। বিবাহ হয় নাই এখন পর্য্যন্ত।

পূর্ণিমাকে দেখিয়া সে ছুটিয়া আসিয়া তাহার পাশে বসিয়া পড়িল। বলিল, "তোর মায়ের অসুখ করেছে শুনলাম?"

ম্লানমুখে পূর্ণিমা বলিল, "হাঁ যাদবপুরে আছেন এখন।"

লীলা জিজ্ঞাসা করিল, "কিছু improvement দেখা যাচ্ছে?"

পূর্ণিমা বলিল, "না ভাই, সারবেন কি না কিছু বুঝতে পারছি না।"

লীলা একটুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "হ্যাঁ ভাই, তোর নামে একটা কথা শুনলাম, সত্যি নাকি?"

পূর্ণিমা একটু বিস্মিত হইয়া বলিল, "আমার নামে কথা? কি কথা?"

লীলা বলিল, "তোমার boss নাকি তোমায় বিয়ে করছেন?"

পূর্ণিমার দেহের সমস্ত রক্ত যেন প্রথমে তাহার মাথায় [উ]ঠিয়া গেল, মুখখানা টকটকে লাল হইয়া উঠিল, তাহার [প]র কোথায় সবটাই চলিয়া গেল। কাগজের মত শাদা [মু]খে লইয়া সে বলিল, "না ভাই, এমন চমৎকার কোন [ক]থা আমার কানে আসে নি। তবে মায়ের অসুখ [উ]পলক্ষ্যে তিনি আমাদের অনেক সাহায্য করেছেন, তাই [হ]য়ত লোকে এই রকম কথা তুলেছে।"

লীলা বলিল, "তাই হবে হয়ত। আমিও তাই [ব]ললাম যে তুমি ত তোমার এক পুরণো সহপাঠীর সঙ্গে engaged আছ, হঠাৎ মজুমদার সাহেবকে বিয়ে করতে যাবে কেন?"

পূর্ণিমার মুখের বিবর্ণতা আর ঘুচিল না। মনে মনে ভাবিল, একটার পর একটা ঘা খাওয়ারই পালা আজ। লীলা একটু পরেই চলিয়া গেল, তাই রক্ষা, না হইলে পূর্ণিমাকেই উঠিয়া পালাইতে হইত।

যখন বাড়ী যাইবার জন্য উঠিল তখন সন্ধ্যা ঘনাইয়া আসিয়াছে। কয়েক পা হাঁটিতে না হাঁটিতে দেখিল, তাহার দিকে দীপক অগ্রসর হইয়া আসিতেছে। অগত্যা তাহাকে দাঁড়াইতেই হইল।

দীপক কাছে আসিল, নিয়মমত পূর্ণিমার কুশল প্রশ্ন করিল, পূর্ণিমার মায়েরও খবর নিল। তাহার পর একটু ইতস্ততঃ করিয়া প্রশ্ন করিল, "সেই কাজের কথা কাউকে বলেছিলে নাকি?"

পূর্ণিমা বলিল, "খবর একটু-আধটু নিয়েছি। অন্য province-এর অফিসের জন্যে দু'চারজনকে নেওয়া হবে শুনলাম। মিঃ মজুমদারকে আমি কিছু বলি নি এখনও। কাল রবিবার দেখা হবে না, সোমবার কি মঙ্গলবার বলব এখন।"

দীপক বলিল, "কাজ শিখবার জন্যেও লোক নিচ্ছেন শুনলাম।"

পূর্ণিমা বলিল, "নেব এখন সব খবরই।"

কথা বলিতেই তাহার অনিচ্ছা দেখিয়া দীপক আর বেশীক্ষণ দাঁড়াইল না। সে চলিয়া যাইতেই পূর্ণিমা বাড়ী ফিরিয়া আসিল।

রবিবার সকালে হিরণ্ময়ের গাড়ী আসিয়া তাহাদের দরজার কাছে দাঁড়াইল। পূর্ণিমার হৃৎপিণ্ডটায় সজোরে কে যেন আঘাত করিল। তিনিই কি আসিয়াছেন? জানলার কাছে গিয়া তাকাইয়া দেখিল। না: গাড়ীতে কেহ নাই। ড্রাইভার তাহার হাতে কালকার নির্দ্দিষ্ট ঔষধটা দিয়া গেল।

সোমবার আফিসে গিয়া পূর্ণিমার ভাবনা হইল, কি ভাবে দীপক সম্বন্ধে কথাটা পাড়া যায়। শনিবারে যে ভাবে সে হিরণ্ময়ের বাড়ী হইতে চলিয়া আসিল, তাহার পর স্বাভাবিক ভাবে তাঁহার সঙ্গে কথা বলাও ত শক্ত। অথচ কথা ত বলিতেই হইবে। বেয়ারা তাহাকে ডাকিয়া দিয়া চলিয়া গেল। কুণ্ঠিত পদে ধীরে ধীরে সে হিরণ্ময়ের ঘরে গিয়া ঢুকিল। তিনি তখন সকালের ডাকের চিঠি-পত্র খুলিয়া পড়িতে আরম্ভ করিয়াছেন। পূর্ণিমাকে

দেখিয়া হাসিয়া বলিলেন, "আপনার এক পুরণো বন্ধু আপনার খবর নিয়েছেন।"

পূর্ণিমা বিস্মিত হইয়া বলিল, "কে?"

"বম্বের সেই অতিকায় ভদ্রলোক। জানতে চেয়েছেন, আপনি এখনও এখানে কাজ করেন কি না এবং কেমন আছেন।"

পূর্ণিমা ভীতভাবে জিজ্ঞাসা করিল, "তিনি আবার এখানে আসছেন নাকি?"

হিরণ্ময় বলিলেন, "না, এবারে আর তিনি নয়; এবারে অন্য এক ব্যক্তি। বুড়ো মানুষ, স্ত্রীজাতি সম্বন্ধে দুর্ব্বলতা নেই। কিন্তু আপনার ভয় দেখি একেবারেই কমে নি। এতদিনে চামড়া শক্ত হয়ে যাওয়া উচিত ছিল। প্রথম প্রথম মানুষের রাগ বা ভয়, যা হোক একটা কিছু হয়ই, যদি তারা নিজেরা ভদ্রলোক হয়। তার পর এখন ত আমার এক কান দিয়ে ঢোকে এবং অন্য কান দিয়ে বেরিয়ে যায়। অনেক সময় কানে ঢোকেই না একেবারে।"

পূর্ণিমা বলিল, "এখনও আপনাকে জ্বালাতন করে?"

"করবেই, যতদিন এই position-এ আছি। পুরুষ মানুষদের এসব দিকে মুখ অত্যন্ত আল্‌গা।"

একটু থামিয়া নিজেই আবার বলিলেন, "একটা বিষয়ে আপনাকে একটু সাবধান ক'রে দেওয়া দরকার মনে করছি। সাধারণ সেক্রেটারি এবং অফিসের কর্ত্তার মধ্যে যে সম্বন্ধটা থাকে, সেটা একেবারেই formal। আমাদের মধ্যে তার চেয়ে একটু বেশী ঘনিষ্ঠতা হয়েছে। আপনার বাড়ী আমি গিয়েছি এবং আপনিও এসেছেন। মাকে দেখবার জন্যে আমার গাড়ী ক'রে কয়েকবার বেরিয়েছেন। হিতৈষীরা এতবড় একটা ব্যাপারকে অগ্রাহ্য করতে পারেন নি। অনেক রকম গুজব রটেছে। রটুক, তাতে দুঃখ নেই, এ রকম ত বছর পনেরো-ষোলো সারাক্ষণই শুনছি, তবে আপনার কানে আসতে পারে। এ নিয়ে দুঃখ পাবেন না, upset হবেন না। একেই আপনার শরীর-মন অত্যন্ত খারাপ। এইটাই নিয়ম, মিস্ সান্যাল। নবাবী আমলের মনোভাব আমাদের যায় নি। স্ত্রী এবং পুরুষের একটা সম্বন্ধ ছাড়া, আর কোন সম্বন্ধ আমাদের দেশের বেশীর ভাগ লোক বুঝতে পারে না বা বুঝতে চায় না।"

পূর্ণিমার মাথাটা একেবারে নীচু হইয়া গেল।

হিরণ্ময় বলিলেন, "আপনাকে নিয়ে বিপদ্ এই যে, এই সব বাজে কথার জন্যে আপনি নিজেকে দায়ী মনে করেন। আপনার অপরাধটা কি? দেখতে সুন্দর এবং বয়স কম? এ দুটোর একটাও ত সত্যি অপরাধ নয়? তা হ'লে কুণ্ঠিত হন কেন? ভাবতে পারেন যে, আপনাকে আর আমাকে জড়িয়ে যে এত কথা ওঠে, তার জন্যে আমি আপনার উপর বিরক্ত। কিন্তু তা একেবারেই নয়। আপনি ভয় পান ব'লে দুঃখিত হই, এইমাত্র। ক্ষমতা থাকলে এসব উৎপাত থেকে আমি আপনাকে আড়াল ক'রে রাখতাম, কিন্তু পৃথিবীর সব মানুষের মুখ বন্ধ করে এমন ক্ষমতা কারো নেই।"

দুইজনেই নীরব, কিছুক্ষণের জন্য। তাহার পর পূর্ণিমা বলিল, "মেয়েদের স্কুলে কাজ করাটাই দেখছি মেয়েদের একমাত্র নিরাপদ্ কাজ। তবে তাতে মানই থাকে, প্রাণ থাকে না। চেষ্টা ক'রে ত একবার দেখলাম।"

হিরণ্ময় বলিলেন, "এক্ষেত্রেও প্রাণ বা মান, কিছুরই হানি হবে না। তবে সব সময় সজাগ থাকতে হবে।"

পূর্ণিমা বলিল, "শুধু সজাগ থাকলেই হয় না, মনে হয় সশস্ত্র থাকতে হবে। কিন্তু সে অস্ত্র নেই আমার কাছে।"

হিরণ্ময় বলিলেন, "কারো কাছেই থাকে না। তবে উপেক্ষার বর্ম্ম একটা প'রে থাকা যায় বটে।"

ইহার পর কাজ আসিয়া পড়িল। হিরণ্ময় মাঝে শুধু একবার জিজ্ঞাসা করিলেন, "ওষুধটা খাচ্ছেন ত?"

পূর্ণিমা বলিল, "খাচ্ছি।"

"এমনি খাওয়া-দাওয়ার কোন change করেছেন?"

পূর্ণিমা বলিল, "খুব বেশী কিছু নয়, তবে একটু ক'রে দুধ খাচ্ছি।"

হিরণ্ময় বলিলেন, "অল্প অল্প ক'রে বাড়ান। শরীর সারাতে না পারলে শেষে বাধ্য হয়ে ছুটি নিতে হবে, যদিও এখন নিজে রাজী হলেন না।"

পূর্ণিমা কিছু উত্তর দিল না। এ বিষয়ে কথাবার্ত্তা অফিসে বসিয়া না বলাই ভাল। কি সে বলিয়া বসিবে বা করিয়া বসিবে তাহার ঠিকানা কি? নিজেকে ত সে নিজের ইচ্ছামত চালাইতে পারে না?

কাজের ফাঁকে একসময় জিজ্ঞাসা করিল, "আমাদের অফিসে কি নূতন লোক নেওয়া হচ্ছে?"

হিরণ্ময় বলিলেন, "হচ্ছে দু-চারটে, সব সময়েই হয়। কেন, আপনি কি রণেনকে এখনই কাজে ঢোকাতে চান? একুশ বছর বয়স না হ'লে ত হবে না?"

পূর্ণিমা বলিল, "না, না, রণেন নয়। আমার পরিচিত একজন ছেলে, আমরা এক সময় সহপাঠীই ছিলাম, সেই বড় ধ'রে পড়েছে, তাকে যদি একটা chance দেওয়া হয়।"

হিরণ্ময় এবার একটু যেন গম্ভীর হইয়াই গেলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন, "সহপাঠী আপনার? কোথায় পড়েছেন একসঙ্গে?"

পূর্ণিমা বলিল, "একসঙ্গে পড়ি নি, তবে এক সময়ে পড়েছি। আশুতোষ কলেজে ছেলেদের আর মেয়েদের আলাদা আলাদা ক্লাস হ'ত।"

"বয়স কত ছেলেটির?"

পূর্ণিমা বলিল, "আমার চেয়ে বছরখানিকের বড় হবে।"

"কি করে?"

পূর্ণিমা বলিল, "সম্প্রতি ত ছেলে পড়ান ছাড়া আর কিছু করছে না। কোথাও চাকরি পায় নি।"

হিরণ্ময় অন্যমনস্ক ভাবে কি যেন চিন্তা করিতে লাগিলেন। তাহার পর বলিলেন, "কতদূর পড়াশুনো করেছে?"

পূর্ণিমা বলিল, "সাধারণ বি-এ পাস।"

হিরণ্ময় জিজ্ঞাসা করিলেন, "Business training কিছুই নেই?"

পূর্ণিমা বলিল, "না"

আবার অল্পক্ষণ চিন্তা করিয়া হিরণ্ময় বলিলেন, "দেখুন কাজ ত অনেক রকম আছে। কাকে কি suit করবে, বলা শক্ত। খুব brilliant ছেলে হ'লে ও বড় ঘরের ছেলে হলে ভাল opening ছিল। ওরা officer's training দিচ্ছে head office থেকে। Course-টা কিছু লম্বা, তবে খানিক stipend ও পায়। কিন্তু এ ছেলের সেরকম qualification ত কিছু নেই?"

পূর্ণিমা বলিল, "Brilliant কিছুই নয়, একেবারে সাধারণ graduate, বড় ঘরেরও নয়, গরীব মধ্যবিত্ত।"

"বাপ কি করেন?"

"বাপ নেই। বহুকাল হ'ল মারা গেছেন। আমারই মত অকালে সংসারের বোঝা ঘাড়ে ক'রে চলতে হচ্ছে একেও।"

হিরণ্ময় বলিলেন, "এই জন্যে আপনার সহানুভূতিটা বেশী।"

পূর্ণিমা বলিল, "হ'তে পারে তা। দারিদ্র্যের যা দুঃখ, তা দরিদ্র ছাড়া কেউ বোঝে না। এক পাড়ায় বাড়ী, দুর্গতি তাদের সারাক্ষণ দেখছি।"

হিরণ্ময় জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনাদের পাড়াতেই থাকে বুঝি?"

"হ্যাঁ, আমাদেরই পাড়ায়।"

খানিক পরে আবার তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি নাম ছেলেটির?"

"দীপক বাগচী।"

হিরণ্ময় বলিলেন, "এখানের অফিসের জন্যে এখন নূতন লোকের কোন দরকার নেই। তবে বলছেন যখন, তখন একটা কাজ আমি করতে পারি। বিদেশে যেতে যদি তার আপত্তি না থাকে, তা হ'লে এখানে ঢুকে কিছু দিন কাজ শিখে মাদ্রাজে কি বর্ম্মায় চ'লে যেতে পারে। সেখানে অপেক্ষাকৃত ভাল মাইনে পাবে।"

পূর্ণিমা বলিল, "বলব তাকে। সাংসারিক বুদ্ধি কিছু থাকলে এমন chance কখনও ছাড়বে না। তবে ছেলেটি একটু কুণো, ঘর ছেড়ে সহজে নড়তে চায় না।"

হিরণ্ময় জিজ্ঞাসা করিলেন, "married না কি?"

পূর্ণিমা একটু বিস্মিত হইল, মুখে বলিল, "না married নয়। ঐ ত অবস্থা, তার মধ্যে আর বিয়ে করবে কি ক'রে? এমনি একরকম মানুষ থাকে না? চেনা জায়গা ছেড়ে নড়তে চায় না?"

হিরণ্ময় বলিলেন, "আছে বটে। শুধুই 'বাঙালী', 'মানুষ' নয়। আমার নিজের personally ওরকম মানুষ খুব যে ভাল লাগে তা নয়। আমার এই আটত্রিশ বৎসর বয়সে কত জায়গায় যে গিয়েছি আর ঘুরেছি, তার ঠিক্-ঠিকানা নেই।"

পূর্ণিমা চুপ করিয়াই রহিল। বুঝিল, দীপক সম্বন্ধে হিরণ্ময়ের খুব ভাল ধারণা কিছু হইল না। হইবেই বা কি করিয়া? কাজ শেষ করিয়া উঠিবার সময় একটু সঙ্কুচিত ভাবেই জিজ্ঞাসা ক'রল, "কি বলব তা হ'লে দীপককে?"

হিরণ্ময় একটা চিঠি লিখিতে লিখিতে মুখ তুলিয়া বলিলেন, "বাইরে যেতে আপত্তি না থাকলে এসে দেখা করতে পারে যে কোন দিন, বারোটার মধ্যে।"

গলার স্বরটা কি তাঁহার একটু রুক্ষ শুনাইল? না সেটা পূর্ণিমার কল্পনা?

সাধারণ অবস্থায় এ সময় হিরণ্ময়কে একটা ধন্যবাদ দেওয়া উচিত। কিন্তু পূর্ণিমা যে তাহা পারে না? হিরণ্ময়ের কাছে ঋণ তাহার এমন গুরুভার যে, সাধারণ ধন্যবাদের উল্লেখ ঠাট্টার মত শোনায়। অথচ কিছুই না বলা কি যায়?

অনেক ভাবিয়া বলিল, "ছেলেটি চিরদিন কৃতজ্ঞ থাকবে আপনার কাছে যদি কাজটা পায়।"

হিরণ্ময় একটুখানি শুষ্ক হাসি হাসিয়া বলিলেন,
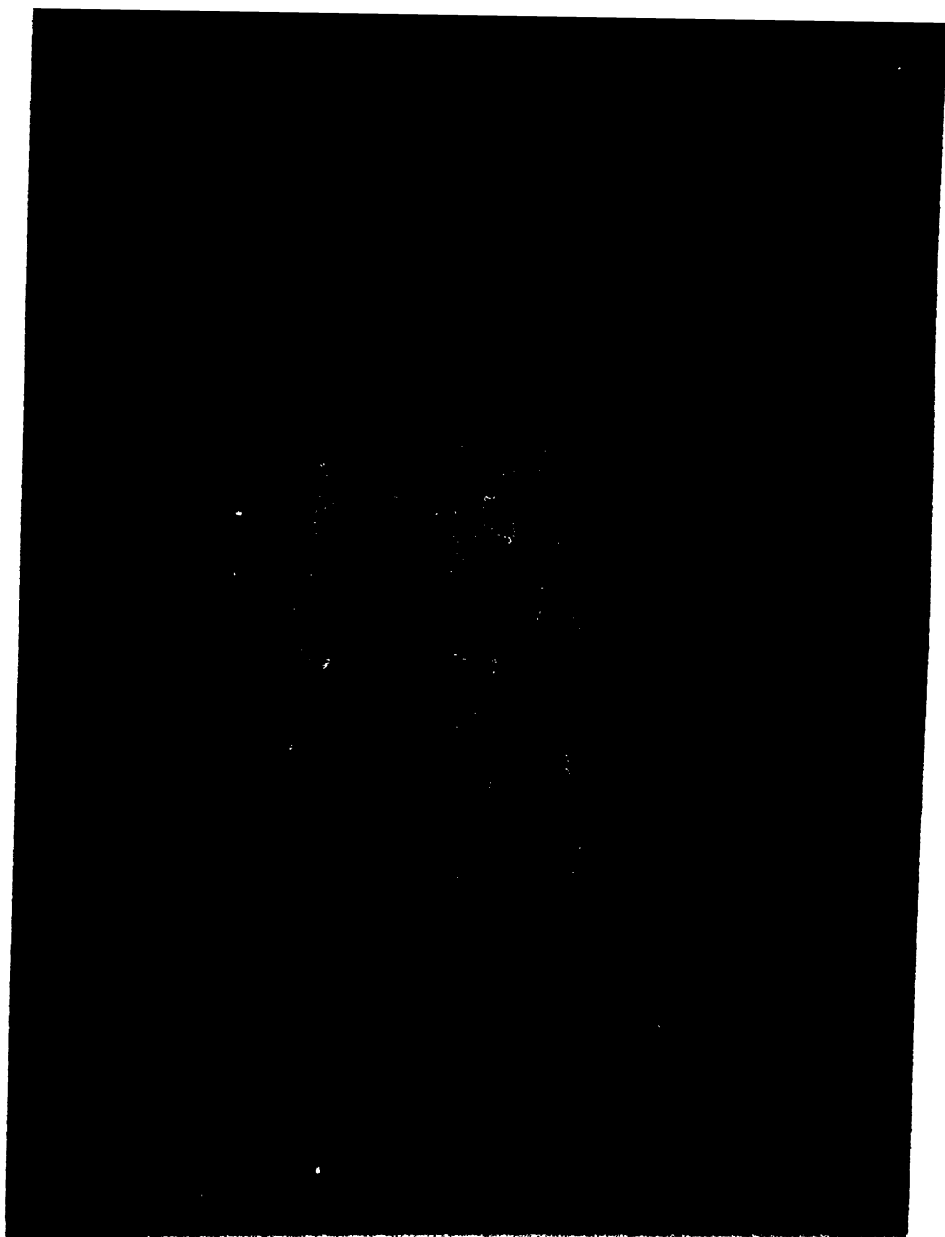
প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা

আলোকের সন্ধানে
শ্রীকানু দেশাই

"আপনার কাছে কৃতজ্ঞ থাকতে বলবেন। আপনি ওর হয়ে বললেন ব'লেই কাজ দিচ্ছি। নইলে ওরকম qualification-এর লোক সাধারণতঃ নিই না। তবে নিজের মুরোদ যদি কিছু থাকে, তা হ'লে এই begininng থেকে উন্নতি হতে পারে।"

মুখের হাসি, কথার সুর, সবের মধ্যে কেন বেসুর বাজিতেছে? সবটাই কি কল্পনা? না, হিরণ্ময় একটু বিরক্তই হইয়াছেন পূর্ণিমার উপরে। নিজে সে রাজ্যের বোঝা আনিয়া চাপাইয়াছে তাঁহার ঘাড়ে। তাহাতেও হইল না, এখন বন্ধুবান্ধব আনিয়া দরবার করিতে বসিয়াছে। হইতেই পারেন বিরক্ত। দীপকের জন্য বলা পূর্ণিমার উচিত হয় নাই। একদল লোক থাকে যাহারা পরের অপকার না করিয়া পারে না। একেবারে নররূপী শনিগ্রহ। দীপকটি সেই জাতের ছেলে। পূর্ণিমার জীবনে সে অকল্যাণ ছাড়া আর কিছুই বহন করিয়া আনিতে পারিবে না।

বাড়ী গিয়া চা খাইয়া আজ আবার লেকে বেড়াইতে চলিল। দীপক আজ অনেক আগেই আসিয়া বসিয়াছিল। পূর্ণিমা ভাবিল, ইহার আর তর সয় না। এক্ষেত্রে মানুষের সত্যই যে তর সয় না, তাহা যেন ভুলিয়াই গেল।

দীপক ব্যগ্র হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "আজ মজুমদার সাহেবকে বলেছ নাকি?"

পূর্ণিমা ঘাসের উপর বসিয়া বলিল, "বলেছি, খোঁজও নিয়েছি সব রকম।"

"কি বললেন উনি?"

পূর্ণিমা নীরস গলায় বলিল, "অন্য জায়গায় লোক পাঠাবার জন্যে কয়েকজনকে তৈরি করা হচ্ছে। দু'-চার মাস এখানে কাজ শিখবে তার পর হয় মাদ্রাজ, নয় বর্ম্মায় চ'লে যেতে হবে। এতে যদি রাজী থাক ত গিয়ে দেখা করতে পার।"

দীপক মিনিট দুই নীরব হইয়া রহিল, তাহার পর বলিল, "এ ছাড়া আর কোন রকম কাজই নেই? কলকাতা চট্ ক'রে ছেড়ে যাওয়া কি চলবে?"

পূর্ণিমার মনে বিরক্তির সঞ্চার হইতে আরম্ভ করিল, বলিল "না, আর কোন কাজ এখন খালি নেই। Officer হবার জন্যে কয়েকজনকে নাকি ওরা বোম্বাই পাঠাবেন। তবে যেরকম qualification চাইছেন, তা তোমার নেই। আর বোম্বাইটাও কলকাতার বাইরে।"

দীপক জিজ্ঞাসা করিল, "qualification-টা কি?"

পূর্ণিমা বলিল, "Brilliant academic career থাকা চাই, এবং বেশ বড় ঘরের ছেলে হওয়া চাই।"

দীপক বলিল, "ওঃ, তা হ'লে ত চুকেই গেল।"

পূর্ণিমা অল্পক্ষণ পরে জিজ্ঞাসা করিল, "তা হলে এ কাজটা তোমার নেওয়া চলবে না?"

দীপক বলিল, "রোসো, অত তাড়াহুড়ো কেন? ট্রেণ ফেল করার ভয় নেই ত? ভেবে দেখতে দাও একটু। মায়ের সঙ্গে পরামর্শ ত করতে হবে, তাঁরা একলা থাকতে পারবেন কি না? মিঃ মজুমদার কিছু হেদিয়ে যাচ্ছেন না আমার জন্যে।"

পূর্ণিমা বলিল, "না, হেদিয়ে মোটেই যাচ্ছেন না। বরং একটু বিরক্তই হয়েছেন বোধ হয় তোমার কথা বলাতে।"

দীপক বলিল, "তাই নাকি? কেন, চাকরির জন্য অনুরোধ শোনা, তাঁর পক্ষে নূতনটা কি? তাও শুনলেন তোমার মুখ থেকে, যাকে নাকি তিনি সবচেয়ে favour করেন office-এ।"

পূর্ণিমা বলিল, "দীপক, তোমার অনেক অধঃপতন হয়েছে। এ-পাড়ার বখা ছেলেদের গলার সুরটা বেশ এসে গিয়েছে তোমার গলায়। আমাকে সত্যিই অনেক দয়া তিনি করেছেন, নইলে আমি একেবারেই ডুবে যেতাম। তা নিয়ে রসিকতা ক'রে যদি কিছু আনন্দ পাও ত কর, কিন্তু আমাকে শুনিয়ে না করলেও ত পারতে।"

দীপক একেবারে মুষড়াইয়া গেল, বলিল, "কিছু মনে ক'রে বলিনি পূর্ণিমা, সত্যি বিশ্বাস কর। ক্রমাগত যত বাজে বাজে কথা শুনে হঠাৎ ফস্ ক'রে কথাটা বেরিয়ে পড়েছে মুখ থেকে। আমি রসিকতা করব এই নিয়ে তোমার সঙ্গে? অতটা গোল্লায় এখনও যাই নি। আমি চিনি না তোমাকে? তোমার স্বভাব জানি না, চরিত্র জানি না?"

পূর্ণিমা ভাবিল, তুমি ছাই জান আমাকে। মুখে বলিল, "যাক্ গে, জান বা না জান, আমাকে শুনিয়ে কিছু ব'লো না।"

বকুনি খাইয়া দীপকের আর বেশীক্ষণ বসিতে ইচ্ছা করিল না। সুরবালার একটু খবর লইয়া সে প্রস্থান করিল।

মাকে দেখিতে গেল এরপর পূর্ণিমা। প্রত্যেক বার নূতন করিয়া সঙ্কোচ অনুভব করে হিরণ্ময়ের গাড়ী

ব্যবহার করিতে। কিন্তু তাঁহাকে এ বিষয়ে কিছু বলা হয় নাই, কাজেই গাড়ী ফিরাইয়া দিতে পারিল না।

সুরবালার অবস্থার কিছু পরিবর্তন হয় নাই। মেয়েকে দেখিয়া বলিলেন, "হ্যাঁরে দিনের পর দিন ত বেশ কাটছে। টাকা ত জলের মত খরচ হচ্ছে। সবই তোদের বড় সাহেব দিচ্ছেন?"

পূর্ণিমা বলিল, "এখন পর্য্যন্ত ত তাই মা। কিন্তু তুমি এ সব ভাবনা ভাবছ কেন? ও সব আমি ভাবব।"

সুরবালা বলিলেন, "তা ত জানি। তবু তুমি ছেলে-মানুষ, জগৎসংসারের কিই বা জান? অফিসে নানা রকম ধার-ধোরের ব্যবস্থা থাকে, তোমার বাবার কাছে শুনতাম। সেরকম কিছু তোমাদের আছে কি?"

আছে কি নাই, তাহার কোন খবরই পূর্ণিমা রাখে না। আজেই ধরিয়া লইতে হইবে।

মাকে বলিল, "সব ব্যবস্থাই আছে মা, মস্তবড় অফিস। ধার আমার শোধ হয়েই যাবে। ওঁর কোন তাড়া নেই, একলা মানুষ। এমন কি, আমি না দিয়ে রণেন দিলেও উনি কিছু বলবেন না।"

সুরবালা বলিলেন, "উনি নিজে মহাদেবের মত মানুষ। ওঁকে যদি না চিনতাম, তা হ'লে এ ব্যবস্থায় রাজী হতাম না। তবে সংসারের মানুষের মন বড় নোংরা। পাছে তোমার নামে কোন কথা তুলে দেয়, এই আমার ভয়।"

পূর্ণিমা বলিল, "লোকের কথায় আমরা বাঁচবও না, মরবও না। বিপদে যখন পড়ি, তখন এই সব লোক ত বাঁচাতে আসেন না। যাঁরা আসেন, তাঁদের কথাই শোনা ভাল। তুমি আছ কেমন?"

সুরবালা নিজের রোগের বিবরণ বলিতে আরম্ভ করিলেন। খুব যে কিছু পরিবর্তন হইয়াছে, তাহা নয়। একটু পরে ম্লান মুখ আরো ম্লানতর করিয়া পূর্ণিমা চলিয়া আসিল। ক্রমশঃ

প্রাচীন চন্দ্রকেতুগড়ের মৃন্ময় শিল্প

শ্রীপরেশচন্দ্র দাশগুপ্ত

এক বিলুপ্ত মহানগরীর রহস্যময় সমাধিভূমি চন্দ্রকেতুগড়। কলকাতার উত্তর সীমানা থেকে প্রায় ২৬ মাইল দূরে টাকী রোডের দুই পাশে এই দুর্ভেদ্য জঙ্গলাবৃত স্থানটি অবস্থিত এবং এইখানে পথের দক্ষিণ-পূর্ব্ব দিকে দিগন্ত রেখায় ভীষণ অরণ্যসঙ্কুল ধ্বংসস্তূপসমূহ ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত। দেবালয় অথবা বেড়াচাঁপা নামেও পরিচিত এই জায়গাটি যে সুদূর অতীতকালে ভারতীয় সভ্যতার এক অন্যতম অতি প্রাচীন লীলাভূমি ছিল তা' প্রমাণিত হয়েছে, এইখানে আবিষ্কৃত অসংখ্য প্রত্নবস্তুর দ্বারা, যার অনেকগুলি যে কেবলমাত্র শিল্প-দৃষ্টিতে অতুলনীয় তা নয়, সেগুলির ঐতিহাসিক গুরুত্ব অসাধারণ।

প্রায় অর্দ্ধ শতাব্দীকাল পূর্ব্ব থেকে চন্দ্রকেতুগড় সম্বন্ধে বিভিন্ন পণ্ডিতজনের মনে কৌতূহল সঞ্চারিত হয়। রহস্যভেদের জন্য কোন সুপরিকল্পিত প্রচেষ্টা করা হয় নি। কেবলমাত্র এই সিদ্ধান্তেই ক্রমে আসা হয় যে, চন্দ্রকেতুরাজার কিম্বদন্তী বিজড়িত দেবালয় গ্রামটি বাঙলার এক সুপ্রাচীন জনবসতির সমাধির উপর প্রতিষ্ঠিত। প্রকৃতপক্ষে স্থানটি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করে ১৯৫৫ সালের ডিসেম্বর মাসে, যখন চন্দ্রকেতুগড়ে শুঙ্গযুগের অপরূপ শিল্পকৃতি সূর্য্যমূর্ত্তিসম্বলিত একটি খেলনা রথ দৈবক্রমে আবিষ্কৃত হয় স্থানীয় ইটখোলায় এবং পরে স্থানলাভ করে আশুতোষ চিত্রশালার প্রদর্শনী-কক্ষে। এই মূর্ত্তিটি আবিষ্কৃত হবার পর এই চিত্রশালার পক্ষ থেকে চন্দ্রকেতুগড়ে নিয়মিতভাবে অনুসন্ধান কার্য্য চালান হয় এবং এর ফলে এই স্থান থেকে অসংখ্য প্রাচীন পোড়ামাটির মূর্ত্তি, মৃৎপাত্র, মুদ্রা এবং মূল্যবান্ প্রস্তর ও রঙীন কাচের পুঁথি অথবা মাল্যদানা সংগৃহীত হয়। এই মৃৎপাত্রের নিদর্শনসমূহের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ঘুর্ণায়মান রেখাসম্বলিত এক শ্রেণীর কৃষ্ণবর্ণ মৃৎপাত্র (Rouletted Pottery), যার নির্ম্মাণ-ভঙ্গিতে প্রাচীন রোমক এবং তারও পূর্ব্বেকার গ্রীক পদ্ধতি সহজেই ধরা পড়ে। এই

দান করে যে, প্রায় দুই সহস্র বৎসর পূর্ব্বে বাঙলা তথা ভারতের অপরাপর বিভিন্ন স্থানের ন্যায় এই জায়গাটিও গ্রেকো-রোমান্ বণিকদের প্রিয় বাণিজ্যস্থল ছিল। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, ইতিপূর্ব্বে ঐতিহাসিক সতীশচন্দ্র মিত্র তাঁর "যশোহর খুলনার ইতিহাসে" অনুমান করেছেন যে, এই স্থানেই সম্ভবতঃ লুক্কায়িত আছে খ্রীষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে রচিত হেলেনীয় সমুদ্র-বিবরণী "Periplus of the Erythrean Sea"-তে বর্ণিত গঙ্গার মোহনায় অবস্থিত সুবিশাল "গাঙ্গে" বন্দরের ধ্বংসাবশেষ।

চন্দ্রকেতুগড়ে আবিষ্কৃত পুরাবস্তুসমূহের মধ্যে সর্ব্বাধিক উল্লেখযোগ্য বহুসংখ্যক পোড়ামাটির মূর্ত্তি, যাদের নির্ম্মাণকাল ভিন্ন ভিন্ন ভাবে প্রাক্-মৌর্য্যযুগ থেকে কুষাণযুগের সমাপ্তিকাল পর্য্যন্ত প্রসারিত। এই সুপ্রাচীন শিল্প এমন সুমধুর রূপ-চেতনার পরিচায়ক এবং দিব্য লোকের ইঙ্গিতপূর্ণ যে, এইগুলি ভারহুত, সাঁচী, পিতলখোরা অথবা ভাজার পাষাণক্ষোদিত মহান ভাস্কর্য্যসমূহের তুলনায় শিল্প ও মর্ম্মভাবজ্ঞাপকতায় কোনও অংশে হীন নয়। ভারহুত অথবা সাঁচীর ভাস্কর্য্যের ন্যায় চন্দ্রকেতুগড়ের মৃন্ময় মূর্ত্তি ও ফলকসমূহের পশ্চাতে আছে সেই বৌদ্ধগণের ধর্ম্মীয় কাহিনীসমষ্টি এবং প্রাক্ বৈদিক পূজাপদ্ধতি ও ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের নব দেবীর ধ্যান-ধারণা। এক কথায় এই মৃন্ময় মূর্ত্তিগুলিতে খৃষ্টপূর্ব্ব যুগের ধর্ম্ম ও শিল্পজীবনের সুস্পষ্ট চিন্তাধারার পরিচয় পাওয়া যায়। এই শিল্প-অভিব্যক্তিতে যে কেবলমাত্র প্রাকারাভ্যন্তরের নাগরিক জীবনের স্পর্শ আছে তা নয়, এইগুলিতে সামাজিক শাসন অথবা নিষেধের বন্ধনে অনাবদ্ধ এক নিসর্গ-প্রেমিক জাতির সহজ সৌন্দর্য্য-সাধনার পরিচয়ও পাওয়া যায়;—যেমন শিল্প-দৃষ্টি দেখা যায় ক্রীট, সাইপ্রাস্, মেসোপটেমিয়া ও সিন্ধু-উপত্যকার বহস্যাবৃত ধ্বংসাবশেষে।

চন্দ্রকেতুগড়ের প্রাচীনতম শিল্পকৃতি একটি ক্ষুদ্র পোড়ামাটির 'সীল'। এর আকৃতি অক্ষিকোটরের ন্যায় এবং এর মধ্যভাগে আছে তিনটি মূর্ত্তি—সহচরীসহ এক উপবিষ্ট নারীর সম্মুখে এক দণ্ডায়মান পুরুষ। চিত্রটি যে মাতৃপূজাজ্ঞাপক সে বিষয়ে সন্দেহ নেই, তবে এর পূর্ণ ব্যাখ্যা করা কঠিন। এই ধরণের মাতৃস্বরূপিনী বসুন্ধরার পূজার দৃষ্টান্ত দূরবর্ত্তী ঈজিয়ান সাগরের ক্রীট ও সাইপ্রাস্ দ্বীপদ্বয়ে এবং গ্রীসের মূল ভূখণ্ডে এই একই আকৃতির এক ধরণের সীলে কিছুটা অন্যভাবে দেখা যায়। সাধারণ দৃষ্টিতে চন্দ্রকেতুগড়ের সীলটি যোনি-প্রতীকও উত্তর ভারতের বিভিন্ন স্থানে আবিষ্কৃত প্রাক্-মৌর্য্যকালের একশ্রেণীর যোনি-প্রতীকের উপর মাতৃপূজাজ্ঞাপক বিভিন্ন রহস্যময় আলেখ্য উৎকীর্ণ আছে। ১৯৫৮ সালে খনন-কার্য্যের ফলে চন্দ্রকেতুগড়ে একটি বিচিত্র নাগিনীমূর্ত্তি আবিষ্কৃত হয়েছে যার নির্ম্মাণকাল মৌর্য্য-পূর্ব্বকালে হওয়া অসম্ভব নয়। পোড়ামাটির এই ক্ষুদ্র ভাস্কর্য্যটির দ্বি-পরিসর শিল্পরীতি, অতি বিস্তৃত নিম্নভাগ এবং সংক্ষিপ্ত ও ইঙ্গিত-জ্ঞাপক উপরের অংশ যে তাম্র-প্রস্তর যুগে অথবা তার পরে কল্পিত চিত্তহারিণী বসুন্ধরার অকল্পনীয় সৌন্দর্য্যের বার্ত্তা বহন করে, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। এই মূর্ত্তিটির একাধিক প্রতিরূপ ইতিপূর্ব্বে বিহারের লৌরিয়া-নন্দনগড়ে আবিষ্কৃত হয়েছিল। এই ধরণের দেবী অথবা মানবীমূর্ত্তি আগে অহিচ্ছত্রা, হস্তিনাপুর ইত্যাদি স্থানেও পাওয়া গেছে। বাংলায় এই শ্রেণীর পোড়ামাটির এবং হস্তীদন্তের কাজ পাওয়া গেছে বাণগড়, তাম্রলিপ্ত ও হরিনারায়ণপুরে এবং এইগুলি প্রায় সর্ব্বক্ষেত্রেই প্রাক্-মৌর্য্যযুগের বলে অনুমান করা হয়।

চন্দ্রকেতুগড়ে আবিষ্কৃত একাধিক মৃন্ময় মূর্ত্তিতে মৌর্য্যযুগের শিল্পরীতির পরিপূর্ণ প্রকাশ দেখা যায়। দু'টি পোড়ামাটির নারীমুখ বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। মূর্ত্তিদ্বয়ের ত্রিপরিসর গঠনপদ্ধতি, কমনীয় অথচ দৃপ্ত মুখভাব, ফুলাকৃতি পদ্মের ন্যায় খোঁপার অলঙ্কার এবং চতুষ্কোণ স্বর্ণ অথবা রৌপ্যগুটিকাযুক্ত ফিতাগুলি মৌর্য্য-সাম্রাজ্যের বিলাসিনী অভিজাতদের অথবা রূপবতী রাজনটীদের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। এই ধরণের মৃন্ময়-প্রতিমা ইতিপূর্ব্বে তাম্রলিপ্ত, পাটনা, বুলান্দিবাগ এবং হস্তিনাপুরে আবিষ্কৃত হয়েছে।

সম্প্রতি চন্দ্রকেতুগড় থেকে সংগৃহীত একটি মস্তকবিহীন দণ্ডায়মান নারীমূর্ত্তির ভাঁজবিশিষ্ট অপরূপ বেশ, তার ক্ষীণ অথচ কমনীয় তনুদেহকে এমন ভাবে বেষ্টন ক'রে আছে যে, তা' কোন কোন গ্রীক-ভাস্কর্য্যকে স্মরণ না করিয়ে পারে না। মৌর্য্যকালের আঙ্গিকবিশিষ্ট অপর একটি নারীমূর্ত্তিও উল্লেখযোগ্য। মাথার দু'দিকে দু'টি রমণীয় খোঁপা এবং তার সংযত অথচ চিত্তাকর্ষক দেহ-সৌন্দর্য্য এই যুগেরই এক বিশেষ শিল্প-কল্পনার নিদর্শন।

মৌর্য্য শিল্প-রীতির ধারা পরবর্ত্তী শুঙ্গকালের প্রতিক্রিয়াশীলতায় বিলুপ্ত হয় এবং তার বক্তব্য ও প্রাণশক্তি স্থান পায় লোকধর্ম্মে বিশ্বাসী রূপকারগণের মানসে।

দেখা যায় দ্বিপরিসর শিল্প-রীতি এবং কখনও কখনও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গাদির নীরস সামঞ্জস্য এবং প্রাণহীনতা। এতৎ-সত্ত্বেও শুঙ্গশিল্পের কতকগুলি নিজস্ব সৌন্দর্য্য আছে যেগুলি অন্যযুগে প্রকাশ করা সম্ভব হয় নি; যথা, এক সুপরিকল্পিত নারীদেহাকৃতি, লালিত্যপূর্ণ সুস্নিগ্ধ আনন, এবং তনুদেহে প্রাণশক্তির উত্তাপ ও লীলায়িত রেখা। চন্দ্রকেতুগড়ের শুঙ্গকালে নির্ম্মিত মৃন্ময় মূর্ত্তিগুলিতেও এই বিবর্ত্তনের ব্যতিক্রম হয় নি। আশুতোষ চিত্রশালার ক্রমান্বয় প্রচেষ্টার ফলে চন্দ্রকেতুগড় থেকে এই যুগের অসংখ্য মৃন্ময় মূর্ত্তি সংগৃহীত হয়েছে, যাদের রূপকল্পনার পশ্চাতে এক গভীর সৌন্দর্য্যানুভূতি এবং এক প্রাচীনতর সমন্বয়িত ধর্ম্মবিশ্বাসের পরিচয় পাওয়া যায়। এখানে সমন্বয়ের কথা বলা হ'ল এই জন্য যে, এই মৃন্ময় আলেখ্য-সমূহে যে কেবল ভারতীয় শৈলী ও ধ্যান-ধারণার প্রকাশ দেখা যায় তা নয়, এইগুলিতে বিস্মৃত অতীতযুগের ভূমধ্য-সাগরীয় অঞ্চলসমূহ এবং ইউফ্রেটিস্ ও টাইগ্রিস্স্নাত মেসোপটেমিয়ার চিন্তাধারার ইঙ্গিতও পাওয়া যায়, যা স্বাভাবিকভাবেই আমাদের কৌতূহলী চিত্তকে গঙ্গা উপত্যকার প্রত্নতাত্ত্বিক রহস্যের প্রতি আকৃষ্ট করে।

চন্দ্রকেতুগড়ের মৃন্ময় ভাস্কর্য্যসমূহ সাধারণতঃ দুই ভাবে নির্ম্মিত—অগ্নিদগ্ধভাবে অথবা রৌদ্রদগ্ধভাবে। এই দুই উপায়ে নির্ম্মিত মূর্ত্তিগুলি তাদের উপরের তৈলাক্ত ও মসৃণ প্রলেপের জন্য বহুদিনেও সহজে বিনষ্ট হয় না, এবং এরই ফলে এগুলি অতি সুন্দর এবং অবিকৃত অবস্থায় আবিষ্কৃত হওয়া সম্ভব হয়েছে। এই পুরাবস্তু-গুলি সাধারণতঃ কয়েকটি কারণে লোকচক্ষে পতিত হয়, ধ্বংসস্তূপসমূহে বাৎসরিক কৃষিকার্য্য, পুষ্করিণী-খনন অথবা অন্য কোন খননকার্য্য এবং বৃষ্টিপাত ও অন্যান্য কারণে ভূমিক্ষয়। এর ফলে পুষ্করিণীর ধার এবং শস্যক্ষেত্রগুলিই পুরাতাত্ত্বিকদের প্রধান লক্ষ্যস্থল হয়ে থাকে।

চন্দ্রকেতুগড়ের শুঙ্গযুগের মূর্ত্তিগুলির মধ্যে প্রধান উল্লেখযোগ্য একশ্রেণীর যক্ষ, যক্ষিণী, দেবতা, কিন্নর ও গন্ধর্ব্বের প্রতিমূর্ত্তি। ছাঁচ-নির্ম্মিত যক্ষ এবং যক্ষিণী পুত্তলিকাসমূহ স্তূপের, খাজুরাহো এবং ভুবনেশ্বরের দেউল-গাত্রের মূর্ত্তিগুলির সঙ্গে তুলনীয়। নারী-মূর্ত্তিদের কবরীর এক দিকে কিম্বা দুই দিকেই বিদ্ধ পাঁচটি আয়ুধাকৃতি রত্নময় কাঁটা (খড়্গ, ত্রিশূল, কুঠার, ভিন্দি-পাল এবং অঙ্কুশ), ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মণিসূত্র শোভিত কুণ্ডলদ্বয়, স্তনগাত্রে লুণ্ঠিত রত্নহার, বিচিত্র আকৃতির কেয়ূর, প্রাচীন সুমেরীয় ধরণের সর্পিল কঙ্কন, বিস্তৃত কটিমণ্ডলে আবদ্ধ ভারী মেখলা এবং চরণ-লগ্ন নূপুর।

শুঙ্গ-কুষাণ কথাটি এক সঙ্গে ব্যবহার করলেও দু'টি যুগের শিল্প-পদ্ধতিতে উল্লেখযোগ্য পার্থক্য দেখা যায়। শুঙ্গযুগের দ্বিপরিসর গঠন-রীতি কুষাণ যুগে অনেকাংশে পরিবর্ত্তিত হয় এবং পূর্ব্বেকার সংযত দেহ-মাধুর্য্যে বাস্তবতা ও সুস্পষ্ট প্রকাশভঙ্গি দেখা যায়, যার পরিচয় পাওয়া যায় মথুরার ভূতেশ্বর ও কঙ্কালীটিলার সহাস্য-বদনা প্রায়নগ্না অথবা অতি স্বচ্ছ মস্‌লিন বস্ত্র পরিহিতা নর্ম্ম-বিলাসিনী রূপসীদের প্রস্তর-মূর্ত্তিতে। গান্ধার থেকে জলধিশেষ পর্য্যন্ত এই বৈপ্লবিক পরিবর্ত্তনের প্রধান কারণই সম্ভবতঃ খ্রীষ্টীয় ২য় শতাব্দী পর্য্যন্ত ভারতবর্ষে প্রথমে গ্রীক এবং তার পরে শক, পহ্লব এবং ইউ চি যাযাবরগণের অনুপ্রবেশ, এবং এই যুগে সমুদ্রপথে ভারতের সঙ্গে লোহিত সাগর পথে ভূমধ্যসাগরীয় নাবিকগণের প্রত্যক্ষ যোগাযোগ। খ্রীষ্টপূর্ব্ব ২য় শতাব্দীতে গ্রীক ভৌগোলিক স্ট্রাবো গ্রীক-অধিকৃত মিশর ভূমির সুওস্ হোর্‌মোস্ বন্দর থেকে নিজচক্ষে এক বাণিজ্যার্থী নৌবহরকে ভারতের দিকে যাত্রা করতে দেখেছিলেন, যার কোন কোন নির্ভীক নাবিক সুদূর গঙ্গার মোহনা পর্য্যন্ত যেতেও দ্বিধা করে নি। এই যুগে ভারতীয় নাবিকরাও সমুদ্রপথে বিদেশে যাতায়াত করত।

চন্দ্রকেতুগড়ে আবিষ্কৃত এক ধরণের নারীমূর্ত্তির জটিল কবরীতে আয়ুধরূপী কাঁটা দেখা যায়। বলা হয়েছে এই-গুলি কার প্রতিরূপ, এই নিয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে মতভেদ আছে। গত শতাব্দীতে তাম্রলিপ্তে এই ধরণের একটি পোড়ামাটির প্রায় পূর্ণাঙ্গ মূর্ত্তি আবিষ্কৃত হয় এবং পরে তা ব্রিটেনের অক্সফোর্ড চিত্রশালায় স্থান পায়। অধ্যাপিকা ক্রামরিশের মতে মূর্ত্তিটি অপ্সরা পঞ্চচূড়ার। অপরপক্ষে পণ্ডিত জনষ্টনের ধারণায় এটি প্রাচীন রোমক-প্রভাবিত মিশরের "অক্সিরিন্‌কাস্ পেপাইরাসে" বর্ণিত গঙ্গা উপত্যকার অধিষ্ঠাত্রী দেবী "মাইয়া" অথবা "মায়া"র প্রতিরূপ। এ বিষয়ে সন্দেহ নেই যে, খোঁপার পাঁচটি অথবা দশটি কাঁটার পশ্চাতে কোন গভীর রহস্য আছে এবং এগুলি দুর্গা প্রতিমার প্রহরণ সমূহকে সহজেই স্মরণ করিয়ে দেয়। এই দেবকন্যাগণ সুন্দরী মানবীয় মূর্ত্তিতে অবতীর্ণা, কারণ তাঁরা উর্ব্বরতা তথা পৃথিবীর শস্য-সমৃদ্ধির প্রতীক। তাঁদের কবরীর রত্নশোভিত প্রহরণগুলি দেব-লোকবাসিনীর সংগ্রাম লিপ্সার পরিচায়ক।

চন্দ্রকেতুগড়ে একশ্রেণীর পোড়ামাটির নারীমূর্ত্তি দেখা যায় যাদের পরিধানে হেলেনীয় 'কিটোন" আচ্ছাদন। "কিটোন" কথাটি সম্ভবতঃ প্রাচীন আসিরীয় "কিটু" অথবা "কিটিনু" বস্ত্রের নাম থেকে গৃহীত।

অপ্সরা মূর্ত্তি
(খোঁপায় দৈব ক্ষমতা-জ্ঞাপক পঞ্চ চূড়া)

গ্রীক নারীরা সাধারণতঃ একটি সেমিজ জাতীয় পোশাকের উপর কটিদেশ অথবা জানু পর্য্যন্ত প্রসারিত একটি জামা পরিধান করত এবং এই জামাটির উপর কোন কোন সময় একটি কোমরবন্ধনী থাকত। অবশ্য এই নামে নারী-পুরুষের অন্যান্য কয়েকটি বেশবাসও বোঝায়।

চন্দ্রকেতুগড়ের "কিটোন" পরিহিতা সুন্দরীদের পদক্ষেপ অথবা বিরুদ্ধ বায়ুস্রোতের ফলে তাদের সযত্নে আবরিত তনুদেহের রেখাগুলি সূক্ষ্ম পরিধেয়কে অতিক্রম ক'রে গেছে, যেমন দেখা যায় বিভিন্ন গ্রেকো-রোমান্ ভাস্কর্য্যে।

হেলেনীয় "কিটোন" অঙ্গবাস-পরিহিতা যক্ষিণী মূর্ত্তি ভিন্ন একটি কলসধারিণী দণ্ডায়মান নারী এবং কেলিরতা একটি নায়িকা বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। কুণ্ডল শোভিতা কলসধারিণী লক্ষ্মী অথবা শ্রীদেবীর প্রতিমূর্ত্তি হওয়া অসম্ভব নয়।

চন্দ্রকেতুগড়ের একশ্রেণীর নরনারীর মূর্ত্তিতে গ্রেকো- রোমান্ শিরোবন্ধনী, বর্ম্ম ও পাদুকাদেখা যায়। শেষোক্ত-গুলি তাম্রলিপ্ত ও হরিনারায়ণপুরের কয়েকটি মৃন্ময় পুত্তলিকাতেও দেখা গেছে এবং এইগুলি উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের গান্ধার শিল্পকে সহজেই স্মরণ করিয়ে দেয়। সম্প্রতি আবিষ্কৃত দু'টি মৃৎফলকে গ্রেকো-রোমান্ বর্ম্ম-পরিহিত সৈনিকের প্রতিমূর্ত্তি সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণ করে, প্রাচীন বাংলার সঙ্গে ভূমধ্যসাগরীয় নাবিকগণের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ, যার কিছুটার উল্লেখ আছে দণ্ডীরচিত "দশকুমারচরিতের" মিত্রগুপ্তের কাহিনীতে। যোদ্ধাদ্বয়ের পরিধানে বায়ুপ্রভাবে হিল্লোলিত সূক্ষ্ম বস্ত্র এবং তার উপর আঁট-সাঁট ভাবে জানু পর্য্যন্ত প্রলম্বিত অবিকল গ্রেকো-রোমান্ "থোরাক্স" (Thorax) অথবা "কুইরাস্" (Cuirass) বর্ম্ম। সূতী বস্ত্রের উপর এইভাবে বর্ম্ম পরিধান করবার রীতি প্রাচীন গ্রীকদের মধ্যে প্রচলিত ছিল। তবে তাদের অন্তর্ব্বাস সাধারণতঃ আরও খাটো ধরণের হ'ত। এই ধরণের বিদেশী বর্ম্ম গান্ধার শিল্পে এবং সৌরাষ্ট্রের পিতলখোরা গুহাচৈত্যের ভীমকায় দ্বারপালদ্বয়ের মূর্ত্তিতেও দেখা যায়। তবে চন্দ্রকেতুগড়ের সৈনিক মূর্ত্তির যুদ্ধ-সজ্জা হেলেনীয় ও রোমক-রীতির সঙ্গে পিতলখোরার চেয়ে অনেক বেশি ঘনিষ্ঠতাসূচক। আলোচ্য ফলকটিতে দুই যোদ্ধার মধ্যে যে বাম দিকে দণ্ডায়মান, সে এক লম্বাকৃতি পেটিকা থেকে গোল ও চতুষ্কোণ মুদ্রা বিতরণ করছে, যেগুলি পাশের যোদ্ধাটি সাগ্রহে সংগ্রহ করতে ব্যস্ত। এই দৃশ্যটি স্বভাবতঃই যক্ষ সেনাপতি পাঞ্চিকের কথা

যক্ষ (পোড়ামাটি—চন্দ্রকেতুগড়)

শিরস্ত্রাণ পরিহিত যক্ষ

ছিল। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে বর্ণিত আছে যে, সৈনিকরা ডানদিকে কখনও বা একটি এবং কখনও বা দু'টি সমধার অথবা দোধারী অসি বাঁধত ("ডানভাগে বান্ধিল যুগল সমধার" —ঘন-রামের "ধর্ম্মমঙ্গল", পৃঃ ২০২)।

চন্দ্রকেতুগড়ে আবিষ্কৃত শুঙ্গকালের অসংখ্য মৃন্ময় নারী-মূর্ত্তির মধ্যে কয়েকটি বিশেষভাবে মূল্যবান্। এগুলি যুগকালীন ধারা অনুযায়ী দ্বিপরিসর আয়তনবিশিষ্ট এবং এই নারীদের খোঁপা, অলঙ্কার ও অভারণাদি ভারহুত, সাঁচী এবং অমরাবতীর নায়িকা ও বিলাসিনী-দের প্রসাধন-রীতির অনুরূপ। আনুমানিক খ্রীঃ পূঃ ১ম শতাব্দীর একটি নারীমূর্ত্তি বিচিত্র ভঙ্গিমায় এক বেদীর উপর দণ্ডায়মানা এবং তার হাতের উপুড়-করা থলি থেকে গোলাকৃতি ও চতুষ্কোণ মুদ্রা দুই দিকে বর্ষিত হচ্ছে। মুদ্রাগুলি আকৃতিগতভাবে স্পষ্টতঃই অঙ্কচিহ্নযুক্ত মুদ্রা (punch-marked coins), যেগুলি খ্রীষ্টপূর্ব্বকালে মৌর্য্য-শুঙ্গযুগে ভারতে প্রচলিত ছিল। বর্ত্তমান মূর্ত্তিটিকে লক্ষ্মী অথবা শ্রীদেবী অনুমান করলে সম্ভবতঃ ভুল হবে না। ইতিপূর্ব্বে উত্তর প্রদেশের বাসার্-এ (প্রাচীন বৈশালী) আবিষ্কৃত কয়েকটি 'সীলে' গজ-লক্ষ্মী মূর্ত্তির সঙ্গে যক্ষ পার্শ্বচরদের দেখা যায় মুদ্রা-পূর্ণ থলি থেকে মুদ্রা বিতরণ করতে। চন্দ্রকেতুগড়ের আর এক শ্রেণীর নারীমূর্ত্তির হাতে বীণাযন্ত্র দেখা যায়। এইগুলি অপ্সরাগণের ন্যায় দেখতে হলেও দেবী সরস্বতীর কথা সহজেই স্মরণ করিয়ে দেয়। শুঙ্গ-কুষাণ যুগের এক শ্রেণীর নারীমূর্ত্তিতে সমসাময়িক ধর্ম্ম-কল্পনা ও রাজকীয় অন্তঃপুরের পরিচয় পাওয়া যায়।* এবং সুদূর আফগানিস্থানের বেগ্রামে প্রাপ্ত গজদন্ত ফলকসমূহে রূপায়িত বিলাসিনীদের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। এদের পদপ্রান্তস্থিত বিড়াল ও পাখীগুলি হয়ত বিভিন্ন দেবীমূর্ত্তির বাহন হিসাবে দেখান হয়েছে। হংসী ও মার্জ্জারী যথাক্রমে সরস্বতী এবং ষষ্ঠীমূর্ত্তির জ্ঞাপক হওয়া অসম্ভব নয়।

স্মরণ করিয়ে দেয়। গান্ধারে আবিষ্কৃত কতিপয় ভাস্কর্য্যে পাঞ্চিককে মুদ্রাপূর্ণ থলি হস্তে দেখা যায়। কোন কোন সময় এই যক্ষ সেনাপতি এবং তাঁর শক্তি অথবা স্ত্রী হারিতীকে একত্র উপবিষ্ট অবস্থায় এবং তাঁদের পদপ্রান্তে এক পেটিকা থেকে মুদ্রা বিতরিত হচ্ছে দেখান হয়। গান্ধার এবং অমরাবতীর বিভিন্ন শিল্পালেখ্যতে পাঞ্চিককে 'গ্রেকো-রোমান্' অথবা শক-পহ্লব যাযাবরগণের সামরিক পরিচ্ছদে দেখা যায়। গৌতম বুদ্ধের জীবন-কাহিনীর সঙ্গে জড়িত হলেও হারিতী এবং পাঞ্চিক শিব ও অন্নপূর্ণার ভিন্ন রূপ ছাড়া আর কিছু নয়। এই বিবর্ত্তনের মূল কারণ, উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের "গ্রেকো-রোমান্" সংস্কৃতি আশ্রয়ী ও বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী যাযাবর জাতিসমূহের দৃষ্টিভঙ্গি।

চন্দ্রকেতুগড়ের দ্বিতীয় ফলকটিতে একই ধরণের বর্ম্মাবৃত এক বীরপুরুষের মূর্ত্তি। যোদ্ধার হাঁটু-ঢাকা বর্ম্মটি কারুকার্য্যখচিত এবং তার ডান দিকে একটি দোধারী তরবারি ঝোলান। এই মূর্ত্তিটির বাস্তবতা কুষাণকালের শিল্পরীতির প্রতি ইঙ্গিত করে এবং এই ভাস্কর্য্যটি সহজেই স্মরণ করিয়ে দেয় ভারহুত স্তূপ-বেষ্টনী গাত্রের তথাকথিত সূর্য্য অথবা অসুর-নৃপতি বেপচিত্তির মূর্ত্তিকে। মূর্ত্তির বর্ম্ম এবং দক্ষিণ কটিতে আবদ্ধ তরবারি প্রাচীন গ্রীক অথবা রোমক সৈনিকদের স্মরণ করিয়ে দেয়। সম্রাট্ ট্রাজানের স্তম্ভসমূহে দেখা যায় যে, যোদ্ধাদের ডান দিকে দোধারী খড়্গ ঝোলাবার রীতি

*কোন কোন সময় এই দেবকন্যাদের হাতল বিশিষ্ট গোলাকৃতি দর্পণ হাতে প্রসাধনরতা অবস্থায় দেখা যায়। এই ধরণের দর্পণ হাতে মূর্ত্তি প্রাচীন ভারত ও আফগানি-

স্থানের বিভিন্ন ভাস্কর্য্য ও আলেখ্য চিত্রে দেখা যায়। সাঁচী ও অমরাবতীর স্তূপ-দেউলের প্রস্তর-গাত্রে, অজন্তার গুহাচিত্রে ও আফগানিস্থানের বেগ্রামে এই শ্রেণীর জীবন চিত্রের পরিচয় পাওয়া যায়। সুদূর ইটালির পম্পি নগরীর ধ্বংসাবশেষেও এক অপরূপ ভারতীয় শিল্পকৃতি গজদন্ত-নির্ম্মিত এক দর্পণধারিণী কন্যার প্রতিমূর্ত্তি আবিষ্কৃত হয়েছে। গুপ্তযুগে চিত্রিত অজন্তার সপ্তদশ গুহায় দেখা যায়, এক প্রায় অনাবৃতা-দেহা রূপসী নারী দর্পণে নিজ মুখকান্তি দর্শনে বিহ্বলা। বহু পরবর্ত্তীকালে রাজপুত-মুঘল কল্পনায় রঞ্জিত বিলবালী রাগিণী চিত্রেও এক প্রসাধনরতা অপেক্ষমানা প্রণয়-বেদনাহত নায়িকাকে দেখা যায়। এক কথায় অতি প্রাচীনকাল থেকেই এই ইঙ্গিত-ধর্ম্মী দৃশ্যবস্তুর জনপ্রিয়তা। শিব-প্রিয়া উমার হস্তেও এই গোলাকার দর্পণ আছে। সম্প্রতি পারস্যের অন্তর্গত হাসানলু গ্রামের নিকটবর্ত্তী এক স্থানে খনন ক'রে পুরাতাত্ত্বিক রবার্ট ডাইসন্ এক প্রাগৈতিহাসিক সুবর্ণঘট আবিষ্কার করেছেন যার গাত্রে অসুর-দলনী ও সিংহবাহিনী মাতৃদেবীকে এই একই ধরণের গোলাকৃতি মুকুর হাতে দেখান হয়েছে। এই মুকুর সম্বন্ধে এমন ধারণাও পোষণ করা হয় যে, এইখানে দুর্গাদেবী-তুল্যা ইরাণের এই মাতৃদেবী নিজ দর্পণে ত্রিকালকে অবলোকন করছেন। সুতরাং বলা যায় দেবী এখানে ত্রিকালেশ্বরী।

উপরোক্ত আলোচনার দ্বারা আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হ'তে পারি যে, মুকুরে আত্মাবলোকনরতা রূপসীগণ একদিকে যেমন মনোহারিণী অপ্সরাতুল্যা তরুণী, অন্যদিকে হয়ত তাঁরা প্রসন্নময়ী গৌরীর জ্যোতিঃকণার অধিকারিণী।

চন্দ্রকেতুগড়ে আবিষ্কৃত এক শ্রেণীর মৃন্ময় নারীমূর্ত্তিকে দেখা যায় পদ্মপীঠে দণ্ডায়মানা এবং দুই হাতে পদ্মের সুদীর্ঘ মৃণাল। কখনও এই মূর্ত্তিকে দেখা যায় পক্ষবিশিষ্ট হিসাবে, যেন তারা পাশ্চাত্ত্য শিল্পের গগনবিহারিণী "এ্যাঞ্জেল"গণের ভারতীয় প্রতিরূপ। এই ধরণের দেবী মূর্ত্তি বহুপূর্ব্বে উত্তর প্রদেশের অন্তর্গত বাসারে অর্থাৎ প্রাচীন লিচ্ছবিগণের রাজধানী বৈশালীতে আবিষ্কৃত হয়েছে। ইতিপূর্ব্বে তাম্রলিপ্তেও এই শ্রেণীর পুরুষমূর্ত্তির পোড়ামাটির ছাঁচ পাওয়া গিয়েছে। বাসারের মৃন্ময় নারীমূর্ত্তির প্রসঙ্গে কুমারস্বামী মত প্রকাশ করেছেন,—"Votive tablets or auspicious representations of mother goddesses and bastowers of fertility and proto-types of Mayadevi and Laksmi." (History of Indian & Indonesian, Art, p. 21) অর্থাৎ এইগুলি এক শ্রেণীর উর্ব্বরতা-প্রদায়িনী পবিত্র মাতৃমূর্ত্তি এবং ফলতঃ মায়া দেবী এবং লক্ষ্মীর আদি রূপ।

বর্ত্তমান ক্ষেত্রে অন্তত একথা বলা যায় যে, পদ্মবন-বিহারিণী এই দেববালা খুব সম্ভবতঃ লক্ষ্মী দেবীরই এক সুপ্রাচীন রূপ। এখানে অবশ্য স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে, কমলার রূপকল্পনা অতি প্রাচীন কাল থেকে চলে আসছে। প্যালেষ্টাইনের অন্তর্গত তেল্ বেইত মিরসিমে খনন কার্য্যের ফলে ঠিক একই ধরণের পদ্মমৃণালধারিণী মাতৃদেবী আস্তারতের ছাঁচে ঢালা পোড়ামাটির একাধিক প্রাগৈতিহাসিক মূর্ত্তি পাওয়া গিয়েছে। এই মৃৎফলকগুলির আকৃতিও শুঙ্গ-কুষাণ যুগের ভারতীয় ফলকগুলির মত কতকটা ডিম্বাকৃতির। এমনও সম্ভব যে এই ফলকগুলির বহিরাকৃতি হয়ত কতকটা যোনি-জ্ঞাপক যার আরও স্পষ্টতর ইঙ্গিত পাওয়া যায়—চন্দ্রকেতুগড়ের যক্ষ ও যক্ষিণী মূর্ত্তিসমূহের মোড়ামুড়ি-দেওয়া ভাব দেখে, যার ফলে সম্মুখ ভাগে বৃত্তাকার উচ্চতা (convex) সৃষ্টি হয়। তেল্ বেইত মিরসিমের ইশতার অথবা আস্তারতে প্রতিমা সমূহও বাঙলা ও উত্তর প্রদেশের শ্রীদেবীর ন্যায় নানা আভরণমণ্ডিতা কিন্তু সম্পূর্ণ নগ্না। চন্দ্রকেতুগড়ে এই নগ্নতাকে পরিস্ফুট করবার প্রয়াস করা হয়েছে অঙ্গবাসের স্বচ্ছতার দ্বারা। প্যালেষ্টাইনের পদ্মবতীর প্রসঙ্গে প্রত্নতাত্ত্বিক W. F. Albright মন্তব্য প্রকাশ করেছেন "The goddess's head is adorned with two long spiral ringlets identical with the Egyptian Hathar ringlets. These plaques were borrowed from Mesopotamia, where they have a long pre-history in the early Bronze Age. Other types of naked goddess, both plaques and figurines, also occur."

দেবী ইশতারের সৌন্দর্য্য প্রসঙ্গে খ্রীষ্টপূর্ব্ব আনুমানিক ষোড়শ শতাব্দীতে রচিত একটি সুমেরীয় আক্কাদীয় প্রার্থনা-কাব্যের কিছুটা উল্লেখ করা যেতে পারে। এই কবিতাটিতে তাঁকে একদিকে ভয়ঙ্করী, দেবলোকের অধীশ্বরী, দুর্গতিনাশিনী এবং অন্যদিকে চিরসুন্দরী, লাস্যময়ী ও কামনা ও প্রেমের অধিষ্ঠাত্রী হিসাবে বর্ণনা করা হয়েছে।

চন্দ্রকেতুগড়ে সংগৃহীত কয়েকটি ভগ্ন মৃৎফলকে ভারহুত ও সাঁচীর স্তূপবেষ্টনীর ন্যায় বেদিকাবেষ্টিত পদ্মবনের অংশ অথা প্রস্ফুটিত পদ্মের কলিকার উপর কোন দেবীর পদযুগল দেখা যায়। খুব সম্ভবতঃ, এই ফলক-

পক্ষবিশিষ্ট হস্তীমূর্ত্তিযুক্ত পোড়ামাটির খেল্না—শকট

দ্বারা ঐক্যতানের বিশেষ কপিট ধরিয়ে দিচ্ছে। এখন সমস্যা, দৃশ্যটির বিষয়বস্তু নিয়ে।

সম্রাট্ প্রিয়দর্শী অশোকে শিলালিপি থেকে জানা যায় যে, তিনি জন-মানসের উন্নতিকল্পে স্বর্গীয় বিমান, হস্তী ও দেবপুরুষগণের প্রতিকৃতির শোভাযাত্রার আয়োজন করতেন। এর দ্বারা হয়ত তিনি নিখিল মানবের মনে ধর্ম্মভাবের প্রতিষ্ঠা করতে প্রয়াসী হয়েছিলেন। খুব সম্ভব এই শোভাযাত্রাসমূহে গীতবাদ্যাদিরও স্থান ছিল।

পালিভাষায় রচিত বৌদ্ধগণের "বিমানবথু" নামক গ্রন্থ থেকে জানা যায় কেমন ক'রে ইহলোকের পুণ্যের দ্বারা বিভিন্ন রমণীগণ স্বর্গলোকে নানা শ্রেণীর আশ্চর্য্য বিমান লাভ করেন। এই বিমানসমূহের মধ্যে হস্তী বিমানেরও উল্লেখ আছে।

একটি মৃন্ময় ফলকে যেন এক দেবলোকের নৃত্যগীতের দৃশ্য রূপায়িত আছে। সিংহাসনে বীণাবাদনরত এক রাজকীয় পুরুষ, সম্মুখে আসবাবের উপর খাদ্যদ্রব্য এবং দু'টি অপ্সরা মধুর আবেগভরে নৃত্যরতা। অগ্রবর্ত্তিনী নর্ত্তকীর পদদ্বয়ের বিশেষ ভঙ্গি এবং প্রসারিত মৃণালবাহু সহজেই মনে করিয়ে দেয়, উড়িষ্যায় শুঙ্গকালে ক্ষোদিত সুবিখ্যাত রাণীগুম্ফার এক রূপসী নর্ত্তকীর উদ্দাম নৃত্য-ছন্দকে। নৃত্য-গীতের মূর্ত্তি ভারহুত, সাঁচী, ভাজা, রাণীগুম্ফা এবং অমরাবতীর তক্ষণ-শিল্পে বিরল নয়। তবে চন্দ্রকেতুগড়ের এই ধরণের দৃশ্যপটের সঙ্গে শেষোক্ত তিনটি স্থানেরই বাহ্যিক সাদৃশ্য সর্ব্বাধিক। চন্দ্রকেতুগড়ের "বাদ্যকর ও নর্ত্তকীর' সঙ্গে বিশেষভাবে তুলনা করা যায় তাম্রলিপ্তে আবিষ্কৃত একই দৃশ্যমূলক একটি পোড়ামাটির ফলকের। এই দৃশ্যগুলির সঙ্গে "গুত্তিল জাতকের" কাহিনীর সংশ্রব থাকা অসম্ভব নয়। এই জাতকে বর্ণিত আছে, বুদ্ধদেব পূর্ব্বে বারাণসীতে বোধিসত্ত্ব গুত্তিল-রূপে জন্মগ্রহণ করেন এবং পরে একজন শ্রেষ্ঠ বীণাবাদক-রূপে পরিচিত হন। কথিত আছে, দেবরাজ শক্র অথবা ইন্দ্রের আমন্ত্রণে তিনি কিছুকালের জন্য মানবদেহে স্বর্গে

গুলি "সরসিজ-নিলয়া" শ্রীদেবীর পূজা উপলক্ষে নির্ম্মিত হয়েছিল। ইতিপূর্ব্বে এই ধরণের একটি মৃৎফলক তাম্র-লিপ্তে আবিষ্কৃত হয় এবং শ্রীদেবীর ন্যায় পোড়ামাটির মূর্ত্তি মান্নগড়, আটঘরা এবং হরিনারায়ণপুরেও খননকার্য্য অথবা অনুসন্ধানের ফলে আবিষ্কৃত হয়েছে।

চন্দ্রকেতুগড়ে প্রাপ্ত শুঙ্গ-কুষাণ যুগের একশ্রেণীর পোড়া-মাটির ফলকে নৃত্য ও গীতবাদ্যরতা এমন নর-নারীদের দেখা যায়, কোন কোন দিক্ দিয়ে যাদের তুলনা করা যায় ভারহুত, রাণীগুম্ফা এবং অমরাবতীর নানা আনন্দদৃশ্যের মূর্ত্তির সঙ্গে। কোথাও হস্তীপৃষ্ঠে গীত-বাদ্যরতা নারীদের, কোথাও বাদ্যকর-বাদ্যকারিণীগণের মিছিল এবং কোথাও বীণার ঝঙ্কারে তালমত্তা অপ্সরীদের নৃত্য আমাদের নয়নকে মুগ্ধ করে। হস্তীপৃষ্ঠের স্বর্গীয় ঐক্যতানটি ভারতীয় শিল্পে একক। এক প্রফুল্ল কাননে হাতীর পিঠে স্বচ্ছন্দে উপবিষ্টা সুন্দরীরা বীণা, মৃদঙ্গ, করতাল (?) ইত্যাদি বাদ্যযন্ত্র বাজাচ্ছে এবং তাঁদের অগ্রবর্ত্তিনী এক নর্ত্তকী তার সুবৃহৎ বীণাযন্ত্রটি যেন ক্ষণিকের জন্য ত্যাগ ক'রে এক আবেগময় নৃত্যভঙ্গিতে ও নিজ কণ্ঠসঙ্গীতের

গমন করেন এবং তাঁর বিশেষ অনুরোধক্রমে দেবলোক-বাসিনী অপ্সরীবৃন্দের নৃত্যানুষ্ঠানে বীণা বাজান।

সিংহাসনে উপবিষ্ট রাজকীয় বীণাবাদকের সম্মুখে নর্ত্তকীর দৃশ্যটি সুপ্রাচীন পূর্ব্ব-ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চল, এশিয়া মাইনরের শিল্পকর্ম্মেও দেখা যায়। পুরাতাত্ত্বিক হেট্টি গোল্ডম্যান্ টারসাসে খননকার্য্য ক'রে আনুমানিক খ্রীঃ পূঃ ৭ম-৮ম শতাব্দীতে নির্ম্মিত ভ্রমরের আকৃতিবিশিষ্ট একটি মাদুলী (scaraboid) আবিষ্কার করেন যার গায়ে এই একই দৃশ্যের অবতারণা করা হয়েছে। রোড্স্ দ্বীপে অবস্থিত কামেইরস্ এবং সাইপ্রাস দ্বীপের আজিয়া ইরিণি থেকেও সমসাময়িক কালের একই ধরণের চিত্র পাওয়া গিয়েছে, যদিও পোশাক এবং আঙ্গিক ভারতীয় শিল্প-শৈলী থেকে সম্পূর্ণভাবে পৃথক্। কোন কোন পণ্ডিতের ধারণায় এই নৃত্য ও গীতের উপলক্ষ্য কোন নিকুঞ্জে প্রতিষ্ঠিত মাতৃদেবতার মূর্ত্তির পূজা-উপাসনা।

ফ্ল্যাগ স্টেশনের গল্প

শ্রীঅজিত চট্টোপাধ্যায়

এখানে অল্পক্ষণের জন্য ট্রেনটা থামে। লোকজন বড় একটা ওঠা-নামা করে না। কাছাকাছি গ্রামে পালা-পার্বন থাকলে কিংবা মেলা ইত্যাদির সময় কিছু যাত্রী হয়। চারপাশে অল্প অল্প জঙ্গল। ইতস্তত বিক্ষিপ্ত দু'একটা বাতি দূরে দূরে দেখা যাবে।

লালমাটির দেশ। মাটিতে ছড়ান মোরাম বা কল্লাচের কুচি। হঠাৎ এসে শহরের মানুষের খালিপায়ে চলতে কষ্ট হবে, অবিশ্যি জুতোপায়ে কষ্ট নেই কোন। তবে কষ্ট হয় না এখানকার লোকজনের। খালিপায়ে কল্লাচমাটির উপর দিয়ে তারা দিব্যি হাঁটে।

ঠিক স্টেশন নয় এটা। রেলওয়ে পরিভাষায় হল্ট না কি যেন বলে। জেলা শহর থেকে চোদ্দ মাইল দূরে। স্টেশন ঘর নেই, লোকজন নেই। শুধু বন-জঙ্গল, লাল-মাটির প্রান্তর আর নির্জনতা।

প্রথম যখন আসি কেমন ভয় ভয় করেছিল মনটা। মানুষজন নেই, লোকবসতি নেই, নিদেনপক্ষে একটা পান-বিড়ির দোকানও থাকতে পারত। স্টেশনে নেমে সুটকেশ আর ছোট্ট বিছানাটা রেখে এদিক্-ওদিক্ চাইছি।

ছোট লাইনের গাড়ী। গতি নেই, আছে দুলুনী। জেলা শহর থেকে মাইল আটত্রিশ গিয়ে শেষ হয়েছে রেলপথ। তাই স্টেশনও সব এমনি গোছের। জঙ্গলের মধ্যে খানিকটা জায়গা বেশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। মোরাম বিছান সমতল প্ল্যাটফর্ম-গোছের একটা কিছু। এখানেই যাত্রী নামে, লোকজন ওঠে। গার্ড সাহেব নিজেই এসে টিকিট নেন চেয়ে। কখনও বা চেকার একজন দেখা যায়। রসিদ দিয়ে টিকিটের টাকা বুঝে নিচ্ছে যাত্রীদের কাছে।

প্ল্যাটফর্ম থেকে খানিকটা উপরে উঠে এলে পায়ে-চলা পথ। সুটকেশ আর বিছানাটি নিয়ে দাঁড়ালাম। একটা প্রকাণ্ড বেলগাছ। বৈশাখের প্রথম। অজস্র বেল হয়েছে গাছটায়। হয়ত কেউ পেড়েও খায় না। চারপাশের নির্জনতার মধ্যে ঐ প্রকাণ্ড গাছটা দেখে দিনের আলোতেও মনটা কেমন ছমছম করে উঠল।

খানিকটা এগিয়ে গিয়ে একটা লেভেল ক্রসিং। লালমাটির একটা রাস্তা রেল-লাইন পেরিয়ে জঙ্গলের দিকে গিয়েছে। কাছেই একটা খুপড়ির মত ঘর। ছোট্ট একটু বাগান, গাঁদাফুলের গাছ···বেলফুলের গন্ধ আসছে ভেসে। একটা দড়ির খাটের উপর একটা লোক ব'সে আছে। বেলা আটটার কাছাকাছি হবে। কিন্তু এরই মধ্যে রোদ কি প্রচণ্ড। গায়ে যেন জ্বালা ধরিয়ে দেয়।

'বাবু মশায়ের কুথকে যাওয়া হবেক?' লোকটা আমাকে জিজ্ঞেস করল।

এতক্ষণে যেন একটু ভরসা পেলাম। এই নির্বান্ধব নির্জনতা, প্রকাণ্ড বেলগাছ, বনজঙ্গল, বিরল বসতি, মনটাকে অনেকখানি অবসন্ন করেছিল।

খাটের উপর উপবিষ্ট লোকটিকে দেখে সেই ভয় ভয় ভাবটা যেন কেটে গেল।

গন্তব্যস্থান বললাম। এখান থেকে ছ' মাইল দূরের ফরেষ্ট বিট অফিসে যেতে হবে আমায়। সেখানকারই চার্জে থাকব।

ফরেষ্ট বিট অফিসটাকে লোকটি চেনে মনে হ'ল। আমাকে হেসে বলল, 'আপনি তবে লতুন আইলেন? তা সেপাই-টেপাই-গুলান কেউ আসে নাই কেনে?'

'খবর দেওয়া নেই যে। নইলে হয়ত এগিয়ে আসত ওরা'—

লোকটা হঠাৎ দাঁড়িয়ে উঠল। তার পর পথের লাল-ধুলো খানিকটা উড়িয়ে দিয়ে চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে রইল কতক্ষণ। হেসে বলল, 'যেথাকে যাবেন তার খপরটা দিচ্ছি লিয়ে যান।'

লোকটা হাতের বুড়ো আঙুল দিয়ে নাকের ডানদিক্ কিংবা বামদিক্ টিপে ঘনঘন নিঃশ্বাস ফেলতে লাগল।

বললাম, 'ওটা কি হচ্ছে?'

'লক্ষণ ভাল বাবু। আপনি নিশ্চিন্তে চ'লে যান। কোন গণ্ডগোল হব্বেক নাই পথে।'

'তোমার নাম কি?'

'হরবংশলাল বাবু। রেল কোম্পানীর চৌকিদার আমি। কিন্তু নানা বিদ্যা জানি। এখান থেকেই গণনা ক'রে ব'লে দিতে পারি ফল ভাল না মন্দ।'

ভারী অবাক্ হলাম। একটা লেভেল ক্রসিং-এর সামান্য চৌকিদার হয়ে হরবংশলাল ভূত ভবিষ্যত সবকিছু নখদর্পণে রেখেছে। হয়ত তুক্তাক্ কিছু জানে লোকটা। নইলে এই নির্জন প্রান্তরে বনজঙ্গলের মধ্যে একা একা কাটায় কি করে?

হরবংশলাল আমাকে চা ক'রে খাওয়াল। দেখলাম ওর ঝুপড়ির মধ্যে গোটানো একটা তালাই, তেল চিট-চিটে বালিশ একটা, আর গায়ে দেওয়ার কাঁথা মতন কি যেন জিনিষ। রান্না করার জিনিষপত্রও রয়েছে ঝুপড়ির এককোণে। এক পাশে পুজো-আচ্চার কোশাকুশি,... সিঁদুর-লিপ্ত একটি ঠাকুর, কম্বলের আসনও একটা। বুঝলাম, লোকটি শুধু চৌকিদারই নয়, ভগবানেও ভক্তি আছে খানিকটা।

সেদিন হরবংশলালের কাছেই জিনিষপত্র গচ্ছিত রেখে বিট অফিসের দিকে রওনা হলাম, সমস্তটাই গ্রাম ছাড়া রাঙামাটির পথ। দুপাশে জঙ্গল, কোথাও অল্পস্বল্প, কোথাও বা ঘন নিবিড় অরণ্য। মাঝে মাঝে দু'-একটা বসতি। কুসুমগাঁ, খাগ ইত্যাদি নাম। বিট অফিসে যখন পৌঁছলাম তখন বারোটার কম হবে না।

এখানে আসতেই হরবংশলালের সঙ্গে পরিচয়টা অল্প কিছুদিনের মধ্যেই বেড়ে গেল। ইতিমধ্যে স্টেশনে লোক পাঠিয়ে বাক্স-বিছানা নিয়ে গেছি কোয়ার্টার্সে। জায়গাটা মোটামুটি জানা হয়েছে। এখন ফরেষ্ট-অফিসের সাইকেলে ক'রে খুব বেড়াতে হয়। মাঝে মাঝে জেলা শহরে যাতায়াত ত প'ড়েই আছে।

ছ' মাইল রাস্তা পেরিয়ে ফ্ল্যাগ স্টেশনে আসি। লেভেল ক্রসিং-এর গেটের কাছে হরবংশলাল দড়ির খাটের উপর ব'সে সম্বোধন করে, 'কি বাবু, কুথাকে যাওয়া হবেক আজ?'

হেসে বলি, 'হরবংশলাল, আজ একবার খবরটা নাও দিকি। যেতে হবে সদর অফিসে। ফল ভাল কি না মন্দ, বল।'

খাটিয়া থেকে উঠে হরবংশলাল ধুলা ছড়ায়। আঙুল দিয়ে নাক টিপে তার সেই পরিচিত ভঙ্গিতে নিঃশ্বাস ফেলে। খানিক পরে মুখ গম্ভীর ক'রে রায় দেয়, 'বাম নাসিকাতে বায়ু। ফল সুবিধার হবেক নাই গো।'

ফ্ল্যাগ স্টেশনে ট্রেনের গতিবিধি জানার কোন উপায় নেই। হয়ত সকাল থেকে এসে ব'সে আছি। দুপুর পর্যন্ত পাত্তা নেই ট্রেনের। কোথায় কোন্ জঙ্গলে ট্রেন খারাপ হয়ে প'ড়ে আছে, কেউ হদিসও দিতে পারবে না।

এই নির্জন প্রান্তরে হরবংশলালই একমাত্র সঙ্গী। ওকে বলি, 'একা একা কেমন ক'রে কাটাও বল দিকি?'

হরবংশলাল হাসে। বলে, 'একা কই গো বাবু-মশাই? এই আপুনি আসেন, সেপাইগুলান আসে, কুসমা আর খাগ গাঁয়ের লোক আসে। রামায়ণ পড়ি, পুজা-পাঠ করি। সময়টা ঠিক কেটে যায়।'

হরবংশলালের একটা গুণ আছে। গেলেই চা করে খাওয়াবে। আমি ওর জন্যে চা আর চিনি জোগাড় করে নিয়ে যাই। কিছুতেই নিতে চায় না। অনেক কষ্টে রাজী করাই।

কথায় কথায় একদিন সে আমার হাতটা দেখতে চাইল।

বললাম, 'হাত দেখতেও জান তুমি?'

সে আমার অজ্ঞতায় করুণার হাসি হাসল। বলল, 'কই দেখি হাতখানা একবার।'

হাতখানা বাড়িয়ে দিলাম ওর দিকে। অনেকক্ষণ ধ'রে হাতটা সে পরীক্ষা করল। মাটির উপর কাঠির সাহায্যে ঘর এঁকে কি সব বিচার করতে লাগল।

'বাবুমশায়ের উন্নতি সুনিশ্চিত। বিয়া-শাদীও শীগ্‌গির হবেক।'

হরবংশলালের কথায় হেসে ফেলি। ওকে বলি, 'দেশে তোমার কে কে আছে?'

'বউ, ছেলে, জমি-জেরাত, গোরুবাছুর সব আছে গো বাবু।'

'ক'টি ছেলেমেয়ে?'

'তিন ছেলে আর দুই মেয়ে।'

বললাম, 'চিঠি-পত্তর লেখ না?'

'লিখি মাঝে মাঝে।' সে গম্ভীর হয়ে বলল।

তার পর সে গর্বের সঙ্গেই ঘোষণা করল, 'আমি ত ইখান থেকেই সব খপর পাই গো বাবু। আমার বিদ্যের কথা আপুনি ত জানেন। ফল ভাল কি মন্দ ঠিক বিচার করে বলব।'

হরবংশলালের দেশ পুরুলিয়া জেলায়। কি একটা পাহাড়ের কাছে ছোট একটা গ্রামে যেন বাড়ী। এখানে রেল-কোম্পানীর লেভেল ক্রসিং পাহারা দেয়। মাহিনা এই দুর্মূল্যের বাজারেও বিশ-ত্রিশ টাকার বেশী নয়। তবে এই নির্জন প্রান্তরে অবশ্য খরচ করার কোন উপায় নেই। কিন্তু হরবংশলালকে আমার মিতব্যয়ী ও নিরহঙ্কারী মনে হয়েছে।

এই লোকবসতি-বিরল বন-জঙ্গলের দেশে হরবংশলালের উপর কেমন একটা আস্থা হয়েছে। মাঝে মাঝে কলকাতা থেকে চিঠিপত্র আসে না। বাড়ীর কথা, মায়ের কথা, ভাইবোনেদের কথা অকারণেই মনে পড়ে।

হরবংশলালকে বলি, 'কই, একবার খবরটা নাও দিকি তুমি। অনেক দিন চিঠিপত্তর পাই নি।'

হরবংশলাল ধুলা উড়ায়, নাক টেপে, কি সব মুদ্রাভঙ্গি করে। তার পর এক সময় আমাকে বলে, 'ফল ভাল বাবু। সংবাদ শুভ হবেক।'

অনেক সময় হরবংশলালের কথা ঠিকও হয়। কোন দিন বিকেলের ট্রেনে নেমে বিট অফিসের দিকে যাব। হরবংশলাল আমাকে সাবধান করে বলে, 'আজ সংবাদ কেমন পারা লাগছে। সাবধান বাবুমশাই।'

আমি ওকে আমল দিই না। সাইকেলে চেপে রওয়ানা হই। সেদিন জঙ্গলের মধ্যেই হয়ত ঝড়-জল হয়। ভিজে গায়েই অনেক রাত্রে বিট অফিসে পৌঁছাই।

এক দিনের কথা মনে আছে। সদর অফিসে কি যেন কাজ ছিল। স্টেশনে পৌঁছে অভ্যাস মত হরবংশলালকে ডাকলাম, 'কেমন আছ হরবংশলাল?'

'ভাল বাবুমশাই', সে ঝুপড়ির মধ্য থেকে বেরিয়ে আসে।

'একবার খবরটা নাও। আজ সদরে যাচ্ছি।'

সে হেসে বলল, 'ফল মন্দ বাবুমশাই। আজ সাবধান হবেন একটুকুন।'

ওর ঝুপড়ির ভেতরে সাইকেলটা রেখে বেরিয়ে আসি। দূরে ছোট লাইনের গাড়ীর ধোঁয়া দেখা যায়। হয়ত হামিরহাটি ছেড়েছে গাড়ী।

ট্রেনে চেপে খানিকটা রওয়ানা হতেই বিপত্তিটা বুঝলাম। বেলবনী স্টেশন ছাড়িয়ে মিনিট পনর পর গাড়ী দাঁড়াল। কি যেন গণ্ডগোল হয়েছে ইঞ্জিনের। আবার যখন গাড়ী ছাড়ল তখন বেলা পড়ে এসেছে। পাক্কা দু' ঘণ্টা লেট। শহরে এসে যখন সদর অফিসের কাছে পৌঁছলাম তখন আর সময় নেই। অনেক আগেই ছুটি হয়ে গেছে।

এই বসতিবিহীন ফ্ল্যাগ স্টেশনের উপর বর্ষা, শরৎ, শীত, গ্রীষ্ম পেরিয়ে যায়। বন-জঙ্গলের মাথায় মিশকালো মেঘ জমা হয়। শ্রাবণের দিনে ধারাবর্ষণ সুরু হয় পত্রপল্লবের মধ্য দিয়ে। শীতে পাতা ঝরে, সাঁওতাল কুলিকামিনের দল ট্রেনে বোঝাই হয়ে খাটতে যায় পূব অঞ্চলে। চৈত্র-সংক্রান্তিতে গাজনের মেলা হয়। ফ্ল্যাগ স্টেশনে লোকজন বেশী নামে। হরবংশলাল ওর নীল ঝাণ্ডাটা হাতে নিয়ে লেভেল ক্রসিং-এর কাছে গিয়ে দাঁড়ায়। ট্রেন পাস করায়, আবার লেভেল ক্রসিংটা খুলে দিয়ে মানুষজন আর গরুর গাড়ী যাবার পথ করে দেয়।

সেদিন স্টেশন থেকে অনেকটা দূরে বনের একটা নীলাম হ'ল। সকাল থেকে সেখানেই থাকতে হয়েছে। নীলাম শেষ করিয়ে যখন কোয়ার্টার্স অভিমুখে ফিরছি তখন বেলা অনেক। সূর্য হেলতে সুরু করেছে সবে। ঘড়িতে দেখলাম, বেলা একটার কাছাকাছি।

ওর ঝুপড়ি থেকে বেরিয়ে হরবংশলাল বলল, 'এত দেরি করে ফেললেন বাবুমশাই।'

বললাম, 'অনেক লোক এসেছিল। ডাকাডাকিতে এমনিতেই দেরি হ'ল খানিকটা।'

'এখানেই থাকুন বাবু দুপুরটা। বেলা পড়লে যাবেন গিয়ে।'

ওর কথাটা মন্দ লাগল না। ভাদ্র মাসের রোদ বড় তেজী। বিশেষ করে পড়ন্ত রোদ যেন অসহ্য মনে হয়। ওর ঝুপড়িতে ব'সে দু'জনে গল্প সুরু করি।

বলি, 'হরবংশলাল, কতদিন চাকরি হ'ল তোমার?'

'তা বিশ বছর হবেক গিয়ে বাবু।'

'বিশ বছরই এখানে আছ?'

'হ্যাঁ বাবু। সুরু থেকে এখানেই। তখন কি ভারী জঙ্গল ছিল। দিনেমানেই বাঘ বেরুত কখনও কখনও,

তার পর বনজঙ্গল কাটা হ'ল। পাতলা হ'ল বন, আরও লোকজন এল। সব আমার চোখের সামনে দিয়ে।'

বললাম, 'রাত্রিবেলায় একলাটি তোমার ভয় করে না হরবংশলাল?'

সে অবাক্ হয়ে হাসে। বলে, 'ভয় কেনে করবে বাবু? আর আজকাল ত সব চেনাই আছে। এই যে বেলগাছ দেখছেন, রাতের বেলায় শন্ শন্ হাওয়া বইবে। কত কি শব্দ হয়। ওখানে একজন মহাপ্রভু আছেন। আমি নিজে দেখেছি।'

নাস্তিকের হাসি দিয়ে বলি, 'সে কি হরবংশলাল?'

'হ্যাঁ বাবুমশাই। ওই বেলগাছের ডালে আমি দেখেছি তাঁকে। ধপধপে কাপড় পরণে, গলায় পৈতে। দেখে আমি ঠক্‌ঠক্ করে কেঁপেছিলাম গো বাবু।'

এই বিচিত্র জগতের মানুষ হরবংশলাল। ওর কাছে এলেই এই সব কুসংস্কার, রহস্যভরা অশরীরীদের গল্প, তুক্‌তাক্, ভবিষ্যদ্বাণী সব কিছুতেই যেন একটা আস্থা হয়। শুনেছি কাছাকাছি গ্রামের লোকেরাও ওর কাছে গণনা ইত্যাদি করায়। ও যে নানা ধরণের তুকতাক জানে সে কথা এ অঞ্চলের সকলেই বিশ্বাস করে।

মাসখানেক পরের কথা। স্টেশনে এসে হরবংশলালকে একদিন বড় চিন্তিত দেখলাম। ওর পক্ষে একটু অস্বাভাবিক ব্যাপারটা।

বললাম, 'কি ব্যাপার হরবংশলাল? এত গম্ভীর কেন?'

'দিন সাতেক আগে খবর পেলাম গো বাবু যে ছেল্যাটার বড় অসুখ! আর কোন সংবাদ নাই।'

ওকে ঠাট্টা করি, 'কিসে সংবাদ পেয়েছ? তোমার ঐ বিদ্যের জোরে?'

সে তেমনি গম্ভীর হয়ে বলল, 'লোক আইছিলেক দেশ থেকে। ব'লে গেল চিঠিতে খবর পাঠাবেক।'

'তা তুমি ছুটি নিয়ে যাচ্ছ না কেন দেশে?'

'যাব ভাবছি। আজ একবার পোষ্ট অফিসটা ঘুরে আসবেন না বাবুমশাই। যদি কোন থাকে চিঠি।'

ওকে খোঁচা দেবার লোভটা সংবরণ করতে পারলাম না। বললাম, 'চিঠিতে দরকার কি তোমার? একবার খবরটা নাও না দিকি?'

ভেবেছিলাম, এর পর ধুলো উড়োবে হরবংশলাল। নাক টিপবে, নানারকম মুদ্রাভঙ্গি করবে। কিন্তু সে সব কিছুই দেখাল না সে।

বলল, 'একটুকুন তাড়াতাড়ি আসবেন গিয়ে।'

সেদিন হরবংশলালের চিঠি এসেছিল ডাকে। আমি বয়ে এনেছিলাম দুঃসংবাদ। হরবংশলালের ছেলেটি মারা গিয়েছে। সে হাউ হাউ করে কেঁদে বলেছিল, 'জোয়ান ছেলেটা গো বাবুমশাই। আমি কি করব গো অখন—'

মাসখানেক হরবংশলালকে আর দেখি নি। সে নাকি ছুটি নিয়ে দেশে গেছে। অন্য এক বিহারী লোক কাজ করছে তার জায়গায়। এর সঙ্গে তেমন আলাপ জমে নি। হরবংশলাল মানুষই ছিল আলাদা।

পাকা দু'মাস পরে হরবংশলালকে আবার দেখলাম ঝুপড়ির মধ্যে। বাগানের ভিতর শীতের মরসুমী ফুল ফুটতে সুরু হয়েছে। শালবনে পাতা ঝরবে এবার।

সাইকেল ঠেসিয়ে রেখে জিজ্ঞেস করলাম, 'কবে এলে তুমি?'

সে হাত তুলে নমস্কার করে বলল, 'ক'দিন হ'ল গো বাবুমশাই।'

'সাইকেলটা রাখো দিকি। আজ একবার সদর অফিসে যাব।'

ধোঁয়া দেখা দিয়েছে দূর বনের প্রান্তে। সকালের প্যাসেঞ্জারখানা এসে গেল প্রায়। পায়ে-চলা পথ থেকে নেমে স্টেশনের লালমাটির প্ল্যাটফর্মে এসে দাঁড়ালাম। কখন পিছু পিছু এসেছে হরবংশলাল টের পাই নি।

'তুমি আবার এলে কেন কষ্ট করে?'

'আজ কই খবরটা লিতে বললেন নাই ত? ভাল কি মন্দ জানতে হবেক নাই?'

ওর সরলতায় মুগ্ধ হ'লাম। ভাবলাম, কি দরকার ওকে কষ্ট দেওয়ার। সেদিন ছেলের দুঃসংবাদটা যে আঁচ করতে পারে নি সে আবার আমাকে কি খবর এনে দেবে? একথা ওকে মনে করিয়ে দিয়ে লাভ কি?

বললাম, 'ওসব পাগলামি ছেড়ে দাও।'

যেন আমার মনের কথাই জানতে পেরে বলল হরবংশলাল, 'বাবুমশাই, সেদিনকার কথাটা ভাবছেন ত? সংবাদ মন্দ আমি জেনেছিলম গো বাবু। তাই ত চিঠির লেগে ব্যস্ত হয়েছিলম।'

হরবংশলাল গর্বভরা দৃষ্টিতে আমার দিকে চেয়ে। এত বড় দুঃসংবাদটা তার বিদ্যের জোরে সে যে আগেই আঁচ করতে পেরেছিল, সেই গর্বই ওর চোখেমুখে ছাপিয়ে পড়ছে।

ট্রেন ছাড়ল।

বুঝলাম, এই যাত্রীবিরল নির্জন প্রান্তরে, বনজঙ্গল, বিরাট্ বেলগাছ আর বন্যজন্তু অধ্যুষিত অঞ্চলে যুক্তি দিয়ে হরবংশলালকে কিছুই বোঝান যাবে না। তুক্‌তাক্, গণনা, ফলবিচার এ সব বাদ দিয়ে বেঁচে থাকতে পারবে না সে। হঠাৎ নজর পড়ল তার দিকে। প্ল্যাটফর্মটা ছাড়িয়ে পায়ে-চলা পথটার কাছে হাসিমুখে গর্বভরা দৃষ্টিতে সে দাঁড়িয়ে।

নানা বিদ্যার অধিকারী তুক্‌তাক্-জানা রেলওয়ে ক্রসিংয়ের পাহারাদার হরবংশলাল।

শিকার

সুকুমার রায়

সাহিত্য সম্মেলন শেষ হয়েছে। আলিপুর ডুয়ার শহরটিতে সাহিত্যিকেরা এসে জুটেছে কলকাতা থেকে। অনেকে ফিরে গিয়েছে। স্বনামধন্য লেখক অমিত বন্দ্যোপাধ্যায় এসেছিল কলকাতা থেকে। সঙ্গে রয়েছে স্ত্রী মণিকা। মণিকা সাহিত্যিক নয়। সাহিত্যিকের মূল্য সম্বন্ধে যতটা সম্ভ্রমবোধ ওর মনে থাক, সাহিত্যিকের কথার ওপর নির্ভর ক'রে সাংসারিক ব্যবস্থা সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হ'তে পারে না। অনেক ক্ষেত্রে স্বামীর কথা খেলাপ হয়ে যায়। অন্ততঃ বাইরে অন্যান্যের সঙ্গে না হোক, মণিকার সম্পর্কে ত বটে। বিকেল থেকে মণিকা প্রস্তুত হয়ে ব'সে আছে। অমিতকে স্কুল-কলেজের মেয়েরা বক্তৃতা করতে নিয়ে গিয়েছে। এখন সন্ধ্যা হয়েছে, তবু ফেরবার নামটি নেই। বাংলোর লোক-গুলোকে বার বার জিজ্ঞেস করছে, ট্রেনের দেরি কত?

সন্ধ্যায় অমিত ঝড়ের বেগে বাংলোতে এসে উপস্থিত হ'ল। এসেই বলতে থাকে, এতবার বলা সত্ত্বেও তোমার গুছান হ'ল না? মেয়েদের বিরুদ্ধে চিরকাল একই অভিযোগ, ওরা সময়ের মূল্য জানে না।

মণিকা জিজ্ঞেস করে, কোন্ মেয়েদের সম্বন্ধে বলছ? তোমার স্ত্রী, না যাঁরা তোমাকে নেমন্তন্ন ক'রে নিয়ে গিয়েছিল। অথবা সমস্ত নারীজাতি সম্বন্ধে?

সবার সম্বন্ধে ত বটেই, তবে এখন তোমাকে।

তোমার সম্বন্ধে কি আমার অভিযোগ নেই?

উত্তপ্ততার অনুভূতি অমিতের মনে ছড়িয়ে গেল। মণিকার হয়ত সত্যি একলা ব'সে থাকতে খুবই অস্বস্তিকর মনে হয়েছে। কিন্তু উপায় ছিল কি? অমিত বলে, বুঝতে পারছি তোমার খারাপ লাগছে খুব। কিন্তু কাজ ত ছাড়া যায় না? আর হ্যাঁ, গাড়ী এসে গিয়েছে। দাঁড়াতে পারবে না।

কোন্ গাড়ী? মণিকা জিজ্ঞেস করে।

দুটোই, একটা মোটর আর একটা হচ্ছে ট্রেন! দুটোর যোগাযোগ হয়েছে একসঙ্গে।

মণিকা বলল, চমৎকার! মেয়ে না হয়ে আমি স্পোর্টস্‌ম্যান হলেই ভাল ছিল। আচ্ছা তুমি যাও, আমি আসছি।

অমিত বেরিয়ে এল। সঙ্গে সঙ্গেই মণিকা সমস্ত প্রসাধনের জিনিষপত্র ব্যাগের মধ্যে গুটিয়ে ঘর থেকে বের হয়ে এল। অমিত বললে, অসম্ভব! ভাবতে পারি নি তুমি এমন ভাবে তৈরি হয়ে ছিলে।

আজ্ঞে হ্যাঁ, তুমি যে আজকে ট্রেন ধরতে পারবে এ আমারও অসম্ভব মনে হয়েছিল। আমি কয়েকটি ঘণ্টাই ব'সে ব'সে অপেক্ষা করছিলাম।

অমিত আর কথা বলল না, স্ত্রীকে চটিয়ে সুফল হয় নি এ কথা বুঝতে পারল। মেয়েদের কলেজে বক্তৃতাটা

দীর্ঘ হয়ে পড়েছিল। রাস্তায় যুবক সম্প্রদায়ও এসেছিল লেখকের সঙ্গে দেখা করতে। এ অবস্থায় সবাইকে ছেড়ে আসা মুশকিল হয়েছিল, এ কথাটি মণিকাকে বোঝাতে চেষ্টা করল।

সেকেণ্ড ক্লাসে যায়গা করে নিতে হবে। দ্বিতীয় শ্রেণীর একটা কামরায় ওঠবার নির্দ্দেশ দিয়ে অমিত তরুণদের সঙ্গে কথা বলছিল। দু'একজন তরুণ সাহায্যের জন্য এগিয়ে এসেছে। দ্বিতীয় শ্রেণীর কামরায় দরজার সামনেই ব'সে ছিল এক ভদ্রলোক। গোল নিটোল লাউ-এর মত মুখমণ্ডলটি, চোখ দুটো মাংসের চাপে অর্দ্ধমুদ্রিত ক'রে নিশ্চিন্ত আরামে ব'সে ছিল :—এইখানে নয়, আর একটা কামরা দেখুন না।

অমিত ভাবছিল, কি করা যাবে? থমকে দাঁড়াল, অন্য কোথাও যে জায়গা দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না। অমিত আবার কথা বলতে যাচ্ছিল তরুণদের সঙ্গে, যারা স্টেশনে বিদায় অভিনন্দন জানাতে এসেছে।

মণিকা ভদ্রলোকের কথা অবহেলা ক'রে দরজা ঠেলে ঢুকেই পড়ল কামরায়।

ভদ্রলোকটি বলল, আপনারা তা হ'লে ঢুকেই পড়লেন।

শুধু তাই নয়, আমি এখানে ফ্লোরে বাক্স পেতে শোবার জায়গা তৈরি ক'রে নেব। আর উনি ওপরে। বলল মণিকা।

এসে পড়েছেন যখন, তখন আমার কর্ত্তব্যই হচ্ছে আপনার একটু সুবিধে ক'রে দেওয়া। লেডিজদের সুযোগ দিতেই হবে। তবে এ কম্পার্টমেণ্টে আমার সব বন্ধুরাও রয়েছে। আপনারা কোথা থেকে এলেন?

মণিকা বলল, এ স্টেশন থেকেই।

ও হ্যাঁ, কিন্তু এখানেই থাকা হয়?

না, এখানে এসেছিলাম বেড়াতে। আর ইনি এসেছিলেন সাহিত্য-সম্মিলনীতে।

গাড়ী তখন ছেড়ে দিচ্ছে। অমিতকে তরুণেরা বিদায় নমস্কার জানালে। অমিত ভেতরে মুখ ফিরিয়ে বললে, আপনিই খানিকটা জায়গা ছেড়ে দিলেন। ধন্যবাদ!

ভদ্রমহিলার জন্যে ছাড়তে হয়। আর আপনি সাহিত্যিক—আপনার মত ব্যক্তির সঙ্গে আলাপ হবার সুযোগ হ'ল। এও কম কথা নয়।

মণিকা বিছানা ছড়াতে ছড়াতে বলল, আপনি বুঝি সাহিত্যিকদের পছন্দ করেন?

হ্যাঁ, নিশ্চয়। সকলেই ত পছন্দ করেন।

মণিকা হেসে বলল, আমার কাছে সাহিত্য ভাল লাগে না।

বলেন কি?

আজ্ঞে হাঁ, ঠিকই বলছি।

কিন্তু, আপনি নিজেই সাহিত্যিকের স্ত্রী হয়ে একথা বলছেন? বুঝতে পেরেছি, ময়রার সঙ্গে মিষ্টির যে সম্পর্ক আপনারও তাই।

অমিত বললে, ময়রা যেমন ক'রে মিষ্টি তৈরি করে, তেমনি ক'রে আমার স্ত্রী আমাকে তৈরি করেছেন, এ কথা বলতে চান আপনি!

ঠিক সে কথা না হলেও, কতকটা ত বটে। আমি সাহিত্যিকদের পছন্দ করি কেন জানেন? আমার কাছে অনেক গল্পের প্লট আছে।

এবারে অমিত বিপদে পড়বে নাকি? ভদ্রলোক রাত্রিতে বিশ্রামের সময়ে গল্প নিয়ে আক্রমণ করবে? বলল, আপনিই বুঝি ক্যাপ্টেন সেন?

আজ্ঞে হাঁ, কি করে বুঝলেন?

অমিত বাক্সের ওপরে ক্যাপ্টেন জি. সেন, রিপ্রেজে-ণ্টেটিভ ইত্যাদি লেখা দেখে ওর নামটি বুঝে নিয়েছিল, কিন্তু বলল, শুনেছি বটে আপনার কথা! আপনি এদিকে যাতায়াত করেন?

লোকটি খুশী হয়ে অমিতের দিকে সিগারেটের টিন বাড়িয়ে দিয়ে বললে, ঠিকই বলেছেন। আজকাল রেড কোম্পানীর লোককে সবাই চেনে। আমি আসাম ও ওয়েষ্ট বেঙ্গলে ঘুরে বেড়াই। তাই সবাই চেনে। রেড কোম্পানী যখন রিপ্রেজেণ্টেটিভের জন্যে বিজ্ঞপ্তি দিলে তখন কত বড়লোকের ছেলে, কত এম. এ. পি-এইচ-ডি দরখাস্ত করেছিল। কিন্তু রেড কোম্পানী এই ক্যাপ্টেন গণপতি সেনকেই দিলে।

আপনি বুঝি তখন দরখাস্ত করেছিলেন?

দরখাস্ত! হ্যাঁ, দরখাস্ত ত বটে। গণপতি সেন একটু ন'ড়েচ'ড়ে ব'সে বলতে লাগল, আমি নিজে করি নি, আমাকে করতে বাধ্য করালে। শুনুন তবে, রেড কোম্পানীর বড় সাহেবের সঙ্গে আলাপ হ'ল ফ্রণ্টিয়ারে একটা স্টেশনে। আমি পেশোয়ার থেকে আসছিলাম। সঙ্গে ছিল রাইফেল, আর একটা লিওপার্ডের চামড়া। অদ্ভুত সুন্দর। সাহেবের বড় ভাল লাগল, অর্থাৎ লোভ হ'ল, খুব পরিচয়ও হ'ল। সে সাহেবই আমাকে রেড কোম্পানীতে নিয়ে আসেন। আমি এসব জায়গায় বছরে কয়েকবার ঘুরে বেড়াই।

শিকার ক'রে বেড়ান?

চক্ষু মুদ্রিত ক'রে বলল, না মশাই রেড কোম্পানীর নানাবিধ ইঞ্জিনিয়ারিং জিনিষপত্র বিক্রীর তদ্বির, তার জন্যে লোক এপয়েন্ট করা, চাকরি দেওয়া—এসব।

এই সময়ে পাশের সংলগ্ন অংশে যারা ব'সে তাস খেলছিল তাদের একজন বাথরুমের পথে যেতে যেতে বলল, ওহে ক্যাপ্টেন, রেড কোম্পানীর মেডিসিনের রিপ্রেজেণ্টেটিভ যখন সঙ্গেই রয়েছেন তখন কথাগুলো একটু সামলে ব'লো।

ক্যাপ্টেন একটু দম নিয়ে অমিতের দিকে তাকাল, তার পর মুখ ফিরিয়ে মণিকাকে বলল, আমরা অনেক দূরে এসে পড়েছি। আবার অপেক্ষাকৃত আস্তে বলল, ও মেডিসিনের কাজ দেখাশোনা করে। ওকে চাকুরি দিয়েছি আমি।

—হ্যাঁ, আপনি যে শুয়ে পড়লেন ?

মণিকা শয়ন ক'রে ট্রেনের ঝাঁকুনীতে বেশ দুলছিল, বলল, আমি আমার স্বামীর সঙ্গে থেকে থেকে দু'দিনে সাহিত্য ও কবিতার চাপে কাতর হয়ে পড়েছি।

আমাকে ত তা হ'লে নিরুৎসাহ ক'রে দিলেন। আমি বলছিলাম—আমার কাছে অনেক প্লট আছে। একটা-দুটো আমি বলব ভেবেছিলাম।

অমিত বলল, বুঝতে পারছেন ক্যাপ্টেন সেন, আমার স্ত্রীর এই ক্লান্তির কোন ওষুধ নেই। সাহিত্য বন্ধ রাখতে হবে।

ক্যাপ্টেন সেন দমলেন না। আমার ত আর সাহিত্য নয়। জীবনের অভিজ্ঞতার কথা, যাকে সাহিত্যে পরিণত করা যায়—সেই ইতিহাস। শুনলে ভাল লাগবে। ক্যাপ্টেন সেন মণিকার দিকে তাকালেন।

মণিকার রাগ তখনো পড়ে নি। সে স্বামীর জন্যে ব্যবস্থা ক'রে নিজের জন্যে একফালি জায়গা যা পেয়েছে তাতেই শুয়ে পড়েছে। অমিতের জায়গাটা ক'রে রেখেছিল বাংকের ওপর। জানালাগুলো কাচের শার্সীতে বন্ধ। বাইরে তেমন অন্ধকার নেই, কখনও জোনাকীর মালা দ্রুত চ'লে যাচ্ছে ট্রেনের গতিপথের বিরুদ্ধে। সামান্য জ্যোৎস্নায় বাইরে গাছগুলো গতিশীল অস্পষ্ট কালো স্তম্ভের মত দেখায়। তখনও কিছুটা শীত রয়েছে বাইরে। খানিকটা কুয়াশার স্তর এখানে-ওখানে ছড়িয়ে রয়েছে। ক্যাপ্টেন সেন মণিকার অনুমতি নিয়ে একটা সিগারেট ধরাল, অমিত বন্দ্যোপাধ্যায়কে দিল একটি, তার পর মণিকাকে বলল, মাপ করবেন মিসেস বন্দ্যোপাধ্যায়, আপনাকে অফার করবার মত কিছুই নেই, শুধু তাম্বুল আছে। তাম্বুল হ'ল অসমীয়া সুপুরি—বেশ নরম জিনিষ।

মণিকা হেসে বলল, আচ্ছা তাই দিন।

ক্যাপ্টেন অত্যন্ত খুশী হয়ে তাম্বুল বার করল একটা রূপোর কৌটো থেকে, আর এক খণ্ড পান ছিঁড়ে নিয়ে একটি তাম্বুল দিলে।—খেয়ে দেখুন, আসাম দেশের খুব প্রিয় বস্তু।

মণিকা বলল, ধন্যবাদ, বেশ ভাল জিনিষ।

অমিত জিজ্ঞাসা করল, তুমি না খেয়েই ভাল বললে কি ক'রে ?

আমি যখন শিলং-এ গিয়েছিলাম তখন তাম্বুল খেতাম। অবশ্য কখনও খাসিয়া তাম্বুল খাই নি। খেয়েছি অসমীয়া তাম্বুল।

ক্যাপ্টেন এবারে সুবিধে পেয়ে বলল, এই তাম্বুল কথা থেকেই আমার পূর্ব ইতিহাস মনে প'ড়ে যায়—একটা চমৎকার কাহিনী।

ক্যাপ্টেন সেনই একটু জায়গা ক'রে দিয়েছে। বিনিময়ে একটু গল্প শুনতে বলছে সে। গল্প শোনার অনিচ্ছা মণিকার নেই। স্বামী সাহিত্য করেন কাগজে-খাতায়, কিন্তু মণিকার মন সারাদিন কথার আদান-প্রদানের জন্যে ব্যগ্র হয়ে থাকে। বিশেষ আজকের দিনটা সারাদিন আলিপুর ডুয়ারের ডাকবাংলোতে বড় বৃথা অস্বস্তিতে কেটেছে। গল্প শুনলে মন্দ কি ?

অমিত পরিশ্রান্ত বোধ করছিল, শুয়ে পড়ল।

মণিকা বলল, ভাল গল্প ত ?

হ্যাঁ আমার জীবনের অভিজ্ঞতা।

আচ্ছা বলুন, আমি শুনব।

২

ক্যাপ্টেন সেনের মনে অভাবনীয় আনন্দের ফোয়ারা বয়ে গেল। বেশ ন'ড়েচ'ড়ে কৌটা থেকে পান তাম্বুল বার ক'রে গল্প শোনাতে লেগে গেল। জীবনে এমন শ্রোতা সে পায় নি। মণিকার চোখের স্নিগ্ধতায়, সুদীর্ঘ কান্তিতে, সুমিষ্ট কণ্ঠধ্বনিতে এবং মুখের কোমলতায় সে অভিভূত হয়ে কথা ব'লে যায় একটির পর একটি, কল্পনা-শক্তি হয় ক্রিয়াশীল।

আসামের মধ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছিলাম। একটা গুরুতর প্রয়োজনে নওগাঁ শহরের কাছাকাছি একটি রেলওয়ে স্টেশনে নেমে পড়েছিলাম। সঙ্গে ছিল রাইফেল ও এক-জন বন্দুকধারী পিওন। সে লোকটিও ছিল পাকা

শিকারী। কি চমৎকার আর্দ্দালীই ছিল আমার! আহ্!

রেলওয়ে স্টেশনে নেমে দেখতে পেলাম, প্ল্যাটফর্মে দুটো মেয়ে ব'সে আছে কতকগুলো মালপত্র সামনে নিয়ে—অর্থাৎ পোঁটলাপুঁটলি। ওদের সঙ্গের একজন পুরুষ আমাকে দেখে এগিয়ে এল। বন্দুক ও রাইফেল এবং আমার স্যুট দেখে হয়ত কিছু একটা ভেবেছে। মনে হ'ল ওরা বোরো-কাছাড়ী। দেহের গঠন অনিন্দিত, দুটো মেয়ের মুখই মিষ্টি। দেখে যেন কেমন মনে হ'ল, ওরা কি কথা বলতে চায় আমাকে? পিওন গিরীশ ছিল কাছেই। বললাম, দেখে এস ওরা কি বলতে চায়। কতক্ষণের মধ্যেই ওদের পুরুষটি এল। গিরীশের কথায় আশা ও ভরসা পেয়ে তাকাল আমার দিকে। আমি জিজ্ঞেস করলাম, কি ভাই, কি করতে পারি তোমাদের জন্যে?

ওরা অসমীয়া ভাষায় বললে, সাহেব, আমাদের সর্ব্বস্ব যেতে বসেছে। সামান্য তাম্বুল সঙ্গে নিয়ে বাড়ী থেকে বেরিয়ে এসেছি। তুমি ত সরকারের লোক, আমাদের বাঁচাও।

আমি সরকারের লোক নই একথা বলবার অবকাশ হল না। ওরা যেন সবাই মিলে আমাকে ধ'রে পড়ল, ওদের রক্ষা করতে হবে। কিন্তু, কোন্ বিপদ্ থেকে রক্ষা করব? তাই জানতে চাইলাম।

ওদের প্রবীণ লোকটি পরিচয় করিয়ে দিল। নওগাঁর জঙ্গলের কাছাকাছি ওদের বাড়ী। মেয়ে দু'টি হচ্ছে মা ও মেয়ে। ওদের বাড়ীতে মনসার উৎপাত হয়েছে। এমন ভীষণ উৎপাত যে, সবাইকে বাড়ীঘর-দোর ছেড়ে আসতে হয়েছে। কোথা থেকে যে এক ভীষণ সাপ এসেছে, দেশ ছারখার ক'রে ফেলল, সব লোক ভয়ে পালিয়েছে। রোজ রাত্রিতে সেই ভীষণ সাপ এসে উঁচু হয়ে ফণা ধ'রে দোরের সামনে দাঁড়ায়—মনে হয় যেন একটা মানুষ দাঁড়িয়েছে। ওরা দুয়ার বন্ধ ক'রে জেগে থাকে সারা রাত।

মণিকা বলল, বলেন কি?

হ্যাঁ। ওরা যা বললে তাই বলছি। কিন্তু আমি যা দেখেছি তা আরও ভীষণ। ওরা কথা লুকোতে চেয়েছিল, পরে কথায় কথায় সত্যিকার ব্যাপার জানতে পারা গেল। গিরীশ ওদের কাছ থেকে সত্য খবরটি বার করল। ভীষণ সাপটি নাকি অনেক কাল থেকেই সবার অলক্ষিতে এসে ওদের মেয়েটির সঙ্গে খেলা করত। তারপর ব্যাপারটা ওরা যেদিন স্বচক্ষে দেখতে পেয়েছে সেদিন পালিয়েছে। অবাক্ কাণ্ড হচ্ছে যে, মেয়েটা সাপের কাছে যেতে ভয় পায় না।

মণিকা এ গল্প শুনে উঠে বসল। এমন কি কখনও হতে পারে? মানুষের সঙ্গে বন্য সাপের হৃদ্যতা?

হ্যাঁ, এমনই হয়েছিল। সংসারে কি যে হতে পারে না জানি না। সাপের সঙ্গে মেয়ের ভালবাসা, সে কি ক'রে বোঝাব আপনাকে? রওনা হলাম আমি আর গিরীশ ওদের সঙ্গে নিয়ে। ট্রেনে দু'একটি স্টেশন এগিয়ে গিয়ে কয়েক মাইল হাঁটতে হ'ল। হেঁটে গিয়ে উপস্থিত হলাম ওদের গ্রামের সীমান্তে আর একটি গ্রামে। ঠিক হ'ল ওরা থাকবে এই গ্রামের মধ্যে। মেয়েটা ওদের গ্রামের বাড়ীতে নিয়ে যাবে।

রাত্রি এক প্রহর অতীত হতে ওদের বাড়ীতে পৌঁছে গেলাম। বাড়ীর চার সীমায় রয়েছে কয়েকটা সুপুরি গাছ এবং ঝোপ-জঙ্গল। এই সুপুরি চোলাই করেই ওরা তাম্বুল তৈরি করে। এই হচ্ছে প্রধান উপজীবিকা। বাড়ীটার পর থেকে ঘন জঙ্গলের সুরু, তার পর একফালি একটা ছোট খাল এবং তারই ওপারে কিছু দূরে আরও গহন বন। শোনা যায়, কখনও বন্য হাতীর পালও এসে উপস্থিত হয় অনেক দূর থেকে। একবার নাকি একটা গণ্ডার এসে উপস্থিত হয়েছিল।

মেয়েটা আমাদের পথ দেখিয়ে ওদের বাড়ী নিয়ে এল। অতি সন্তর্পণে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করা গেল। গিরীশ টর্চের আলোতে সমস্ত ঘরটা পরীক্ষা ক'রে নিয়ে একটা তক্তপোশ টেনে নিয়ে এল আমার জন্য। দরজার পাশেই ওর বসবার জায়গা ঠিক ক'রে নিয়ে বলল, বাবু, এটা হচ্ছে সত্যকার শিকারের জায়গা।

বাইরের উদ্ভাসিত জ্যোৎস্নায় সমস্ত ধরণী আলোকিত হয়েছে, চারদিক্‌টা বেশ দেখা যায়। মেয়েটা বেশ আড়ষ্ট হয়েই আমার পাশে বসে ছিল, ওর মুখে শুনছিলাম অনেক কথা। কি ক'রে এই গ্রামের মধ্যে ওরা একসঙ্গে বসবাস করত। মেয়েটা নাচত সবার সঙ্গে। সেবারে যখন ভূমিকম্প হল তখন এ গ্রাম থেকে অনেকে চ'লে যায়। আজ ওরা সব সাপের ভয়ে এখান থেকে চ'লে যাচ্ছে। ওর বাবা বলছে, এখানে আর থাকবে না। সুযোগ পেলে বাড়ীঘরগুলো নিয়ে যাবে।

গিরীশ বলছিল, আমরা কাজিরঙ্গা এলাকার অনেক কাছে এসে বসেছি। এখানে বসবাস্ করার অর্থই হচ্ছে বন্যজন্তুদের সঙ্গে বাস করা।

রাত্রি ধীরে ধীরে গভীর হচ্ছে, মাঝে মাঝে গিরীশ ঘরের ভেতরে গিয়ে সাবধানে একটু ক'রে ধূমপান ক'রে

আসছে। আমি নিজে সাবধানে সিগারেট খাচ্ছি, আর জঙ্গলের দিকে চেয়ে আছি। জ্যোৎস্নায় দেখতে পাচ্ছি, একটি খরগোসের দল উঠোন পার হয়ে একপাশ থেকে ছুটে চ'লে গেল। ও কি, একটা সজারু নয় কি? হাঁ, ছুটে চ'লে যায় দ্রুত। একটা প্রবল খস্‌খস্‌ শব্দের সঙ্গে বাতাসের মত একটা শোঁ শোঁ আওয়াজ হতে লাগল। পোকামাকড়গুলো চারদিকে ছুটে যাচ্ছে, উঠানের সামনে সমস্তটা পথ যেন চক্‌চক্‌ ক'রে জ্ব'লে উঠল। মেয়েটা আমার পিঠের ওপরে ওর সমস্ত শরীরটা মিশিয়ে দিয়ে বললে, ওই দেখ ডাঙ্গরিয়া বাবু, ওই দেখ।

গিরীশকে ডেকে বললাম, গিরীশ, কি করছ?

গিরীশকে দেখবার জন্মে উঠে দাঁড়ালাম, মেয়েটা ধ'রে ফেলল, বলল, যেও না ওর চোখের সামনে।

কি হবে। ভয় কি?—জিজ্ঞেস করলাম।

সামনে যাকে দেখতে পাবে, শেষ করে দেবে। বাধা না দিলে, ভয় না পেলে কিছু করবে না। ও আমাকে খুঁজতে আসে এখানে। আমার কাছে ও এসে খুশী হয়ে যায়। শরীরের একটা জায়গা আমার গায়ে লাগিয়ে দেয়। মনে হয় ওর বুঝি শরীরের ও জায়গাটাতে একটা ব্যথা আছে, বুঝি আমার গায়ে লাগলে ওর ব্যথা সেরে যায়, তার পর ধীরে ধীরে চলে যায়। আমার বাবা-মা এটা দেখেছে, দেখে ভীষণ ভয় পেয়েছে।

স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়ালাম। ভেবেছিলাম, একটা ছোট চারাগাছ বুঝি সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। অথবা একটা ছোট কালো ছড়ান ছাতার মাথায় যেন দুটো নক্ষত্র এসে জুটে বসেছে—দুটো চোখ হয়ে। 'কিং কোবরা' দেখেছি বটে, কিন্তু কোবরা জাতীয় সাপ এত বড় হতে পারে কল্পনা করতে পারি নি। বিরাট্ ফণা বিস্তার ক'রে সাপটি স্থিরচক্ষে ঘরের দিকে চেয়ে আমাদের দেখছে। গিরীশ পাথরের মত স্তব্ধ হয়ে ব'সে আছে। আমার রাইফেল ওঠালাম। মেয়েটা সহসা বললে, মেরো মেরো না—ও আমার বন্ধু। আমি শেষ দেখা ক'রে যাব ওর সঙ্গে, ও বনের ভেতরে চ'লে যাবে। কারও ক্ষতি করবে না।

মেয়েটা লাফিয়ে উঠানের ওপর প'ড়ে বিচিত্র ভঙ্গিতে নাচতে আরম্ভ করল। বোরো-কাছাড়ীরা অনেকটা ব্রহ্মদেশীয় রীতিতে নাচে, কিন্তু ওর নাচের মধ্যে বিহুর ভঙ্গিও মিশেছে। সাপটা অবাক্ হয়ে মুখ ফিরিয়ে মেয়েটার দিকে দেখতে লাগল, মুখ বাড়াতে লাগল যেন একটি মানুষ দর্শক।

মণিকা জিজ্ঞেস করে, সত্যি ঘটনা?

হ্যাঁ, সত্যি। সাপের দেহটা আঁকাবাঁকা হয়ে মিশে গেছে ঝোপটার আড়ালে। মেয়েটার নৃত্যের তালে তালে সাপটি গ্রীবা নাচাচ্ছে অত্যন্ত সামান্য। এখনও ভুলতে পারছি না জ্যোৎস্না-রাত্রির সে দৃশ্য।

আকস্মিক শব্দ হ'ল "দুম্"। গিরীশ ওর বন্দুক ছুঁড়েছে। চিৎকার করে উঠলাম, এ কি করলে গিরীশ? সঙ্গে সঙ্গে বিরাট্ বিষধর ঝাঁপিয়ে পড়ল মেয়েটার ওপর।

তখন আর গুলী করা চলে না। সাপটা বিরাট্ দেহ নিয়ে মেয়েটাকে জড়িয়ে ধরছে, আর উপায় নেই। দানবের দাপাদাপিতে উঠোনে তোলপাড় হ'ল। বাঁচা-মরার সন্ধিক্ষণে রাইফেলের গুলী করবার সুযোগ পেলাম না। উপায়ও নেই।

গিরীশ ছুটে এসে দা দিয়ে গুলীবিদ্ধ সাপের গলাটা কেটে ফেলল। মেয়েটা নিস্তেজ হয়ে প'ড়ে রইল সাপের দেহবন্ধনে বন্দী। অনেক কষ্টে ওর দেহটাকে ছাড়িয়ে নেওয়া হ'ল। কিন্তু মেয়েটাকে বাঁচানো গেল না। সারা রাত্রি মেয়েটাকে সামনে নিয়ে দু'জনা বসে রইলাম। গিরীশকে বকাবকি ক'রে আর লাভ নেই বুঝে কোন কথাই বললাম না। সেই সুন্দর কোমল দেহটা মুহূর্তে কি হয়ে গেল, তাই ভাবতে লাগলাম।

মণিকা বলল, এ যে ভীষণ কাহিনী বললেন?

হ্যাঁ, তাই ত বলছিলাম, আমার কাছে অসম্ভব সব কাহিনী আছে। সবই অভিজ্ঞতার কথা—এ নিয়ে সাহিত্য হতে পারে।

—ওগো তুমি শুনেছ? ক্যাপ্টেন সেনের ভীষণ গল্প? শুনে আমার শরীর কেঁপে উঠেছে।

অমিত বলল, ও-সব নিয়ে সাহিত্য হয় না, আত্ম-কথা হতে পারে।

এমন সময় ওপাশ থেকে বন্ধুরা চীৎকার ক'রে উঠল। সাবধান ক্যাপ্টেন, ফোর হার্টসের খেলা গেছে। এবারে ভারি রকমের মিলিটারী গল্প বল। যখন তুমি ছিলে ক্যাপ্টেন!

ট্রেন একটা স্টেশনে এসে থেমে গেল। গাড়ীতে কেউ না উঠতে পারে এজন্যে সুরু হ'ল ক্যাপ্টেনের তৎপরতা।

ট্রেন আবার চলতে সুরু করল। ক্যাপ্টেন মণিকাকে গল্প শোনাবার জন্যে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। অমিতের বোধ হয় ভীষণ ঘুম পেয়েছে। ওদিকে জোর তাস খেলা চলেছে, ওরা কতকটা আড়ালেই বসেছে। উচ্চকণ্ঠে একবার হাই তুলে গণপতি সেন বলল, হ্যাঁ, আমি তখন ক্যাপ্টেন—নেপালে পোস্টেড হয়েছি সরকারী কাজে।

ওপাশের তাস খেলার দলের মধ্য থেকে একটি চিৎকার এল, চিয়ার আপ ক্যাপ্টেন সেন! ক্লাব্‌স্! থ্রি হার্ট্‌স্!" তুমি কবে ক্যাপ্টেন ছিলে নেপালে?

সবাই হাসল একসঙ্গে। আর একটি কণ্ঠ ভেসে এল, হ্যাঁ আমি জানি ও ছিল। চালাও ক্যাপ্টেন ভাল ভাল গল্প। থ্রি নোট্রাম্প্‌স্।

ক্যাপ্টেন সেন বলে, ওদের কথায় কান দেবেন না। ওরা বন্ধু, সকলে নানা কোম্পানীর সেলার, রিপ্রেজেন্টেটিভ—আমরা সব একসঙ্গে কনফারেন্সে গিয়েছিলাম। এখন সবাই ফিরে যাচ্ছে, যে যার জায়গায়।

আর একবার অনুমতি দিন, একটা সিগারেট খাব। মণিকা মাথা নেড়ে সম্মতি জানাল। একটি ট্রেনের জানালা সামান্য উঁচু ক'রে একবার বাইরে তাকিয়ে খোলা হাওয়ায় দম নিলে, তার পর বলতে আরম্ভ করল।

কার্য্য-উপলক্ষে নেপাল গিয়েছিলাম। একজন রাজ-কুমারের সঙ্গে বেশ আলাপ জমে গেল। আমরা একটি ফরেষ্ট এরিয়ার কাছাকাছি ক্যাম্প করেছিলাম, রাজকুমার এসে বললেন, চলুন সামনের পাহাড়টাতেই যাব। একটা ভীষণ জানোয়ার ওখান থেকে বেরিয়ে প্রায়ই ভয়ানক উৎপাত করছে।

তখনি রাইফেল নিয়ে রওনা হলাম। পাহাড়ে উঠতে হবে। বেশ বেলা হয়েছে, অনেকটা পথ ঘোড়ায় চেপে যেতে হবে।

ওহো, আপনার চোখ জড়িয়ে আসছে ঘুমে?

মণিকা বলল, হ্যাঁ, আপনি বলুন।

ক্যাপ্টেন সেন দেখল, অমিত বন্দোপাধ্যায়ের মুখটা বই-এর আড়ালে। ভাল ক'রে এবার চেয়ে দেখবার সুযোগ হ'ল। মণিকার মুখের একাংশই দেখা যাচ্ছে আলোতে। পাকা আমের মত দীর্ঘাকৃতি মুখমণ্ডল, কালো ভ্রূযুগল টানা রেখার মত। মাথার কোঁকড়ানো চুলগুলো ভেঙ্গে-চুরে ছড়িয়ে পড়েছে। সমস্তটা মুখের বহিরাবরণটি যেন সাবধানে কেটে কেটে তৈরি করা হয়েছে। কিন্তু মহিলা গল্প শুনবে নাকি? ক্যাপ্টেন সেন খুব সংক্ষেপে বলতে চেষ্টা করল।

হ্যাঁ, শুনুন। নেপালের কুমারের সঙ্গে সেই গভীর বনের মধ্যে যাচ্ছি। পথ আর শেষ হয় না। সঙ্গে কয়েকটি পথপ্রদর্শক শেরপা জাতীয় লোকও রয়েছে, হিমালয়ের পাদদেশ কিনা।

আমাকে নেপালের কুমার বললে, এখানে হাতীর উৎপাত কমে গেছে, কারণ কলাগাছ সমস্ত নির্মূল ক'রে ওরা অন্যদিকে স'রে গেছে। কিন্তু অন্যান্য জানোয়ারেরা ঘুরে বেড়ায়।

হঠাৎ চীৎকার শুনতে পেলাম, "সাবধান, চুপ করে দাঁড়ান, নড়বেন না। খুব নিঃশব্দে এগিয়ে কতকটা দূরে দেখলাম এক ভীষণ দৃশ্য। একটা পাইথন, যাকে আপনারা অজগর বলেন। একটি হরিণ-শাবককে অর্দ্ধেকটা গিলে ফেলেছে। খুব ধীরে ধীরে গিলছে, এখনও অনেক সময় লাগবে পুরোটা গলাধঃকরণ করতে। কতক্ষণ দাঁড়িয়ে

দেখে ও-পথ ছেড়ে ভিন্ন পথে এগিয়ে গেলাম। এ পাহাড়ের এ পথে পাইথনের উৎপাত হতে পারে। কখন কোথা থেকে যে ঘাড়ের ওপর পড়বে ঠিক নেই।

মণিকা বলল, সাপটাকে মারা হ'ল না?

না, মারা হ'ল না। কারণ বন্দুকের একটা শব্দ হলে এ-এলাকায় যাবার সমস্ত উদ্দেশ্য বিফল হবে।

সন্ধ্যায় এসে পড়লাম পাহাড়টার ওপরে। পাহাড়টা প্রসারিত হয়েছে একটা দীর্ঘ শ্রেণীতে। এখান থেকে হিমালয়ের মহান্ দৃশ্যও কতকটা দেখা যাচ্ছে—দিনের শেষ রশ্মিতে। গাছের ওপরে একটা ছোট ঘর তৈরি করা হয়েছে। তাতেই মই বেয়ে উঠে রাত্রিবাস করতে হবে।

কুমার বলল, এ ঘর কে যে তৈরি করেছে জানা যায় না। এই দুর্গন্ধপূর্ণ ঘরেই রাত্রিবাস করতে হবে। শেষ রাত্রিতে শিকার আসবে, অদূরের একটা পাথরের ঢিবির সামনে গুহার কাছে। বেশ রাইফেলের রেঞ্জের মধ্যে।

সামান্য খাবার খাওয়ার পর রাত্রিবাসের বন্দোবস্ত ক'রে নিলাম সন্তর্পণে, অর্থাৎ নিঃশব্দে। নেপালের কুমার মদের বোতল সাজিয়ে নিলেন পাশে। আমার সঙ্গে ফ্লাস্কে চা ছিল প্রচুর—আরও অন্যান্য জিনিস। সঙ্গী লোকেরা চট্‌পট্ কয়েক সের চিনেবাদাম ছড়িয়ে রেখে এল গুহার সামনে, পাথরগুলোর ওপরে।

সে রাত্রির কথা আপনারা অনুমতি দিলে আমি আপনাকে আর একদিন ব'লে আসব। কতরকমের জন্তু-জানোয়ারের জীবন সেই জঙ্গলের মধ্যে সারারাত্রি ব'সে দেখেছিলাম, বলব আপনাকে।

বেশ ত, আসবেন একদিন, আমাদের বাড়ীতে। তার পর বলুন।

রাত্রি শেষ হয়ে এসেছে প্রায়। ভাবছিলাম শুধু, কতক্ষণে সেই মুহূর্ত্তটি আসবে? কতক্ষণে দেখতে পাব আমাদের বাঞ্ছিত জানোয়ার।

"ওই এসেছে!" ফিস ফিস ক'রে কে আমার কানে কানে বললে। অন্ধকারে শুধু দুটো টর্চের আলোকের মত দুটো চোখ দেখছিলাম। লক্ষ্য ক'রে দেখলাম, বোধ হয় চিনাবাদামগুলো শুঁকছে, গুহার দিকে একবার মুখ বাড়াচ্ছে। সম্ভবতঃ গন্ধে টের পেয়েছে, আবার আগুনের গোলার মত চোখদুটো আমাদের ওপর এসে পড়ল। নেশাতুর কুমারের দিকে তাকিয়ে রাইফেল ওঠালাম। এক মুহূর্ত্তে উদ্ভাসিত টর্চের আলোকে চোখ দুটো জলতে লাগল। বিরাট্ এক ভল্লুক রাগে গোঁ-গোঁ করছে। গুলী করলাম "দড়াম্"। ভল্লুকটি ভীষণ চিৎকার ক'রে শূন্যে লাফিয়ে উঠে ওখানেই প'ড়ে দাপাদাপি করতে লাগল। গুলীটা মাথায় লেগেছিল।

মণিকা বলল, ভল্লুক! ওগো শুনছ, এক ভীষণ ভল্লুক ইনি নিজে শিকার করেছিলেন।

অমিত উত্তর দিল, হ্যাঁ, শুনতে পাচ্ছি। ঘুমও আসছে, ভল্লুকও আসছে।

ক্যাপ্টেন মুহূর্ত্তমাত্রও সময় নষ্ট না ক'রে ব'লে চলল। তার পর দেখলাম, কতক্ষণ পরে সভয়ে, কোথা থেকে এল ভল্লুকের পরিবারবর্গ, স্ত্রী-ভল্লুকটি আর কয়েকটি শাবক। সেখানে এসে নির্ভয়ে মুখ ফিরিয়ে আমাদের দিকে ফিরে দাঁড়াল। জন্তুটা সবটা ব্যাপার বুঝতে পেরেছে।

অমিত সহসা বলল, হ্যাঁ মশায়, আপনার শিকারের শেষাংশটি আমি বলতে পারি?

বলুন ত।

সেই স্ত্রী-ভল্লুকটি ভীষণ ভাবে কান্নাকাটি আরম্ভ করলে, যেন মানুষের মত উচ্ছ্বসিত কান্না। সঙ্গে সঙ্গে শাবকগুলো অস্থির হয়ে পড়ল, গুহার ভেতরে ছুটোছুটি ক'রে যেতে লাগল।

হ্যাঁ, ঠিক বলেছেন! সে কি কান্না. আমার চোখেও জল এসেছিল, রাজকুমার অভিভূত হয়েছিল। দু-তিন ঘণ্টা আমরা সে ব্যাপার দেখেছিলাম। স্ত্রী-ভল্লুককে বুক চাপড়াতে দেখেছি। কিন্তু আপনি কি ক'রে বললেন?

অমিত হেসে ফেলল। মশায়, সাহিত্যিকেরা অন্তর্য্যামী! যখনই স্বামীকে মৃত দেখল স্ত্রী, সে নিশ্চয়ই কান্নাকাটি করবে, আর আপনারা চেয়ে সে দৃশ্য দেখবেন, নয় গল্প হবে না।

মণিকা জিজ্ঞেস করে, এ অসম্ভব কাহিনী?

অমিত উত্তর দেয়, না, এরকমের কাহিনী আমি পড়েছি।

ক্যাপ্টেন বলল, আশ্চর্য্য, আমার জীবনেও এ ঘটনা ঘটে গিয়েছিল, একদিন নেপালে যখন ছিলাম ক্যাপ্টেন।

আশ্চর্য্য দৃশ্য! ভাল লাগল আপনার গল্প। মণিকার কণ্ঠে শোনা যায়।

ক্যাপ্টেনের মন আত্মপ্রসাদে ভ'রে যায়। এবারে নিশ্চয়ই কলকাতায় পৌঁছে ক্যাপ্টেন মণিকাকে আরও গল্প শুনিয়ে আসতে পারবে।

ওদিক্ থেকে বন্ধুরা সব চেঁচিয়ে বেরিয়ে আসে। আর খেলা হবে না। ঘুমোবার বন্দোবস্ত করতে হবে।

একজন ভদ্রলোক এগিয়ে এসে বাঙ্কের ওপর বিছানা নিয়ে ব'সে যায়, কি হে ক্যাপ্টেন? তোমার জীবনের অভিজ্ঞতা সব বললে ত? এর পর ওঁর বাড়ী গিয়ে ব'লো

এস, কি ক'রে আমরা তোমাকে ক্যাপ্টেন উপাধি দিয়েছি, সেই গল্পটা।

গণপতি সেন প্রত্যুত্তর দিতে পারল না।

এই উক্তিটি মণিকার কাছে ভাল লাগে নি। সত্যি যদি গণপতি সেন ক্যাপ্টেন না হয়েও থাকে, ক্ষতি কি? এতক্ষণ গল্প ব'লে ত ভুলিয়ে রেখেছে? বলল, গল্প গল্পই, অন্য কিছু নয়। বলবার ক্ষমতা আছে, আপনার কাছে আবার শুনব।

গণপতি সেন খুশী হ'ল। সত্যি সে শিকার করতে জানে।

বড় কে?

পুষ্প দেবী

বড় মামা হঠাৎ মারা গেলেন। সুখী পরিবারের এই প্রথম বিপদ। বৃদ্ধ বাপ-মা বর্ত্তমান। শোকের আকস্মিক আঘাতে সবাই দিশাহারা।

বিপদের খবর পেয়ে বড় মামার বিধবা শাশুড়ী এলেন। সুন্দর ছোট-খাট মানুষটি। টকটকে রং, মাথার চুলগুলি কালো পরিপাটি করে আঁচড়ানো। পরনে রেলীর বাড়ীর থান। তার ভেতর থেকে গোলাপী রং একেবারে ফুটে বেরুচ্ছে। গায়ে রেশমী চাদর জড়ানো। ভদ্রমহিলা অপুত্রক এবং বিধবা। এই মেয়েটিই সম্বল। সেই একমাত্র মেয়ে আজ বিধবা। বড় মামার শ্বশুর ছিলেন নলহাটির জমিদার। মস্ত জমিদারী। ভদ্রলোকের দু'টি মাত্র মেয়ে। মেয়ে দু'টির বিয়ের আগেই ভদ্রলোক মারা যান। বিধবা গৃহিণী নিজে মেয়ে দু'টির বিয়ে দেন। এমন কপাল, বিয়ের এক বছরের মধ্যেই বড় মেয়েটি মারা যায়। এটি ছোট মেয়ে। আমার দাদামশাই তখন ডিষ্ট্রিক্ট জজ—তাঁর বড় ছেলে এটর্নীশিপ পড়ছে। খুব ঘটা ক'রেই বিয়ে হয়েছিল। সেই মেয়ে আজ বিধবা। আমরা সন্ত্রস্ত হয়ে উঠলাম।

ভদ্রমহিলা হঠাৎ যেন কি ঘটি-বাটি ভেঙেছে এমনি সুরে আহা বলে ঘরে ঢুকলেন। আমরা সবাই একসঙ্গে তাঁর মুখের দিকে চাইলাম। তিনি ব'লেই চলেছেন—আহা, ঝুনু আমার কত আদরেরই ছিল। সেই ঝুনু যেদিন যায়, বড় ঘা-ই খেয়েছিলাম—কেঁদে নারায়ণকে বলেছিলাম, নারায়ণ এমন শোক আর আমায় দিও না।

আমরা বেশ একটু অবাক্ হলাম। গিন্নি পাগল নাকি? নিজে বিধবা হয়েও কি বোঝে নি যে, বিধবা মেয়ে থাকার চেয়ে না থাকা ভাল? গিন্নি ব'লেই চলেছিলেন, হঠাৎ আমার দিকে নজর পড়ায় বললেন, ওমা রানু দিদি যে, কখন এলি ভাই? তাই বলছিলাম—তখন কত আর আমার বয়স হবে? ৩৪।৩৫ হোক। ১৫ বছরের মেয়ে আমার দপ করে চলে গেল? একা ওই রোগা মেয়ে নিয়ে পশ্চিমে গেছলাম। শুধু আমলা গোমস্তার ভরসায়। বাড়ীতে নিজের বলতে জনপ্রাণী নেই। সেদিন সকাল থেকেই দেখি, মেয়ে যেন কেমন করছে। বুঝলাম, শ্বাস উঠেছে। বেশ মনে আছে সেদিন শনিবার। ওদেশে আবার হাটবার কি না? তাড়াতাড়ি মালীকে হাটে পাঠালাম। কাদীর মা বলল, মা উনুন ধরেছে. আমি মনে মনে ভাবলাম, উনুন তো ধরেছে মা, কিন্তু ততক্ষণ মেয়ে টিকবে কি? তারপর হাতের মাপ দেখিয়ে বললেন, দিলাম দুটো ভাজা মুগের ডাল চাপিয়ে। তার মধ্যে খানকতক কাঁটাল বিচি ছেড়ে দিলাম, আর বোধহয় খানকতক মুলো আর কিসের বাপু ডাঁটা। তা মেয়েটার পুণ্যি ছিল। হাট এলো, আমি তাড়াতাড়ি কপির ডালনা টুকু রেঁধে ভাত নামিয়ে দুধটুকু নতুন গুড় দিয়ে ঘন কচ্ছি আর সাত বার ভাবছি খাওয়া হয়ে ওঠে কি না। একবার ক'রে মেয়ের মুখের দিকে চাই আর দুধে হাতা দিই। ক্ষীর যখন নামাই, নিঃশ্বাসের কষ্টে মার আমার ঠোঁট দুটো নীল হয়ে গেছে। কাদীর মাকে ঝুনুর কাছে বসিয়ে মাথায় এক আঁজলা জল দিয়ে খেতে বসলাম। আমার খাওয়াও শেষ হল, কাদীর মাও কেঁদে উঠল, ওগো বৌদি, ঝুনু-মা যে আমাদের ছেড়ে চলে গেল গো। গিয়ে দেখি

সব স্থির। সেদিনের কথা ভাবলে আজও বুকের মধ্যে কেমন করে ওঠে।

আমরা হতবুদ্ধি হয়ে গিন্নির সর্ব্বনেশে খাওয়ার গল্প শুনছিলাম। হঠাৎ কান্নার রোল উঠল, দেখি বড়-মামাকে নিয়ে যাবার জন্যে খাট ও ফুল এসেছে। বড় শাশুড়ীর গল্প এত অদ্ভুত ও অসম্ভব লেগেছিল যে, তাঁর নিজের মুখে শুনেও বিশ্বাস করতে ইচ্ছে হচ্ছিল না। তার পর ঠিক তেমনি ঘটনাই ঘটল আমাদের বাড়ীতে। আমার একমাত্র ননদ মারা গেলেন।

১৮ বছরের সুস্থ মেয়ে। সেদিন তার বাপের বাড়ী আসার কথা ছিল। রাস্তায় গাড়ী দাঁড়ালেই আমরা ছুটে গিয়ে দেখছি লতা এল কি না। এমন সময় আমার স্বামী ঘরে ঢুকলেন, সঙ্গে দিদিমা। অসময়ে ভদ্রলোক কোর্ট থেকে কেন ফিরলেন বুঝলাম না। ওঁর মুখের দিকে চেয়ে দেখি, মুখ অসম্ভব গম্ভীর ও চোখ লাল, ফুলো। সদাহাস্যময় মানুষের অমন মুখ দেখে কিছুতেই বুঝে উঠতে পারি না যে কী ব্যাপার। এমন সময় দিদিমা বলে উঠলেন, দু'কাপ চা করে আন্ ত নাত-বৌ, তোর শাশুড়ীর আর আমার?

দিদিমা ঘর থেকে চলে যেতেই উনি বললেন, লতা মারা গেছে।

আকস্মিক আঘাতে আমারই মাথা ঘুরে গেল। খাটের বাজু ধ'রে সামলে বললাম, সে কী? বায়স্কোপের ছবির মত চোখের সামনে কত ঘটনাই ভেসে উঠল—এখনও সাতদিন হয়নি লতা এসেছিল তার দেওরের বিয়েতে নেমন্তন্ন করতে। এক গা গয়না প'রে বেনারসী শাড়ী প'রে এই খাটেই এসে ব'সে বললে, তুমি নিশ্চয় যাবে না বৌদি। বাব্বাঃ, কি ভুগতেই পারে তোমার মেয়ে। একটি মেয়ে হয়েই তুমি যেন বুড়ী হয়ে গেছ। যাক্। দাদা, মা এরা ত যাবে? চলি ভাই, এখনও অনেক বাড়ী নেমন্তন্ন বাকি। কাল রাতে গেছে বৌভাত। রাত প্রায় বারটায় ফিরলেন আমার শাশুড়ী ও স্বামী। শাশুড়ীমাকে তখন জিজ্ঞেস করে-ছিলাম, আপনারা যখন ফিরলেন লতা কি করছিল মা? উত্তরে শুনেছিলাম, পরিবেশন করছিল। সেই মেয়ে হঠাৎ নেই, ভাবতেও পারা যায় না।

আবার চমক ভাঙল দিদি-শাশুড়ীর ডাকে। কি লো নাতবৌ, তোর চা কি আজ হবে না?

উঠতেই উনি বললেন, কোর্টে হিরণ এসেছিল। বললে, কলেরা হয়েছে, গিয়ে পৌঁছবার আগেই সব শেষ।

ওপরে গিয়ে দেখি দিদিমা বেশ জাঁকিয়ে বসেছেন—বলছেন, এই যে আমার সাতটা মেয়ে ন'টা ছেলে ষোলটা বিয়েন—তার মধ্যে আজ তিনটেয় দাঁড়িয়েছে, কি করব বল? যারা যায় তারা শত্তুর, তাদের নাম মুখেও আনতে নেই। জ্বালাতে এসেছিল, জ্বালিয়ে চ'লে গেল। হঠাৎ আমার দিকে নজর পড়ায় বললেন, এই যে নাতবৌ, এস ভাই এস, চা এনেছ? তোমার হাতের চা যে একবার খেয়েছে সে ভুলতে পারবে না।

সভয়ে চায়ের কাপ এগিয়ে দিই, কারণ আজকের চায়ের সম্বন্ধে ও মতামত চলায় যথেষ্ট সন্দেহ আছে।

দিদিমা বলেই চলেন, জান নাতবৌ তোমার মামা-শ্বশুর দু'জন আজ কিন্তু এখানেই খাবে। ওদের জান ত, ছোটর শুধু চিংড়ি মাছের অম্বল আর সুজির পায়েস, তা তুমি লুচিই দাও আর ভাতই দাও। বড় মামার তোমার যা একটু ল্যাটা। ওর আবার সেই একমুঠো লঙ্কা-দেওয়া ঘি-ভাত ছাড়া কিছু ত মুখে রোচে না? তা তোদের কুকার নেই? তাতেই চড়িয়ে দে না? আর মাছ যদি বেশী না থাকে, দুটো ডিম ভেজে ঘি-ভাতের মধ্যে ফেলে দিস। আর আমার ত শুধু ভাজা লুচি আর একরত্তি ক্ষীর।

দিদিমার বাক্য-স্রোতে বাধা না দিয়েই ভাবছিলাম, বাড়ীতে ত আজ মহোৎসব তা হ'লে? কি করে এমন দিনে ঠাকুর-চাকরকে ডেকে রান্নার কথা বলব বা মার কাছে ভাঁড়ারের চাবি চাইব, ভেবে পাচ্ছিলাম না। একটু আগেই পাঁড়েকে বলেছি, আজ ত আর রান্না-বান্না হবে না ঠাকুর, তোমাদের বরং পয়সা দেব, তোমরা কিছু কিনে-কেটে খেও। তাতে নিরক্ষর পাঁড়ে হাউ-মাঁউ করে কেঁদে বলেছিল, হামি কিছু খাবে না বৌদিদি, দিদিমণি কি হামারো ছিল না?

দিদিমা আবার ব'লে উঠলেন, ওকি নাতবৌ? তুই যে এখনও দাঁড়িয়ে রইলি ভাই? তোদের ত উনুন ধরাতে দোষ নেই? সে ত পরগোত্র হয়ে গেছল।

হঠাৎ বড় মামার শাশুড়ীর কথা মনে পড়ে গেল, ভাবলাম দু'জনের মধ্যে বড় কে?

টেলষ্টার

শ্রীঅশোককুমার দত্ত

টেলষ্টার ষ্টার বা তারা নয়। শুকতারা যেমন। আমরা যাকে শুকতারা বলি তা আসলে একটি গ্রহ—পৃথিবীর প্রতিবেশী শুক্রগ্রহ। তারার আলো নিয়ে তা জ্বল্‌জ্বল্‌ করে, তবে তার স্থির আলো তারার মত মিটমিট করে না। সন্ধানী লোকের কাছে এর তাৎপর্য্য সহজেই ধরা পড়ে। রাত্রির আকাশের কোণে শুকতারা যখন ফুটে ওঠে, সূর্য্যের প্রকাশ হতে আর বাকি নেই।

চিত্রে বেতার তরঙ্গ কি ভাবে আয়নোস্ফারে প্রতিফলিত হয়ে সঞ্চারিত হয় তা দেখানো হয়েছে। টেলিভিশনের তরঙ্গ খুবই ছোট হওয়ায় আয়নোস্ফারের "ছাদ" ফুটো করে হারিয়ে যায়। টেলষ্টারের সাহায্যে তা-ই আবার পৃথিবীর বুকে ফিরে আসছে।

টেলষ্টার মানুষের তৈরি এক কৃত্রিম উপগ্রহ। ১৯৫৭ সালের পর থেকে আজ পর্য্যন্ত অনেক উপগ্রহই মানুষের শক্তি ও সম্ভাবনার প্রতীক হিসাবে দেখা দিয়েছিল। এই স্পুৎনিক নিজে অদৃশ্য থাকলেও প্রতিপদে দর্শনীয়। সামান্য জীবজন্তু থেকে মানুষ পর্য্যন্ত ধারণ ক'রে তা আমাদের মনে অপরিসীম বিস্ময়ের সঞ্চার করেছে। সাধারণ বিচারে টেলষ্টার সেদিক্ থেকে মোটেই আমাদের আকর্ষণ করার মত নয়। মাত্র ৭৬·৫ কিলোগ্রাম ওজন, মাত্র ৮২·৬ সেন্টিমিটার ব্যাস—উপগ্রহটি কিন্তু আমাদের কাছে পৃথক্ এক তাৎপর্য্য বহন করছে। এই টেলষ্টারের জন্যই আজ টেলিভিশনের ছবি মহাসমুদ্রের দু'পারে ইউরোপ আমেরিকার মধ্যে সংযোগ বিকাশের পথ পরিস্ফুট করেছে।

বেতার ব্যবস্থার এই সংযোগ অবশ্য বহু আগেই গ'ড়ে উঠেছিল। ১৯০৩ সালে মার্কনি যখন আটলান্টিকের পর-পারে বেতার সঙ্কেত প্রেরণ করেন, সমস্ত বিজ্ঞানী মহলে তা ছিল খুবই অপ্রত্যাশিত এক বিস্ময়কর ঘটনা। আমরা জানি পৃথিবী প্রায় গোলাকার, আর বেতার তরঙ্গ সাধারণ আলোর মত সোজা পথ ধরে যায়। এমন অবস্থায় বেতার বার্ত্তা পৃথিবীর এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় বেশী দূরে যাওয়ার কথা নয়। কিন্তু কার্য্যত দেখা গেল তাই হচ্ছে। বিজ্ঞানীরা প্রথমে তার ব্যাখ্যা খুঁজে পেলেন না। ক্রমে জানা গেল, পৃথিবীর ঊর্দ্ধাকাশে আয়নোস্ফারের যে স্তর রয়েছে বেতার তরঙ্গ সেখান থেকে প্রতিহত হয়ে আবার পৃথিবীরই বুকে ফিরে আসে। পার্ব্বত্য অঞ্চলে প্রতিধ্বনি যেমন দিকে দিকে প্রতিহত হয়ে দশ দিকে প্রসারিত হয়, এ যেন অনেকটা তাই। আয়নোস্ফারের জন্যই পৃথিবী-ব্যাপী এই বেতার সংযোগ সফল হয়েছে।

টেলিভিশনের আশ্রয় বেতার-তরঙ্গের চেয়েও সূক্ষ্ম আলোক তরঙ্গ। এই আলোতে ষ্টুডিওর দৃশ্য দূরান্তরে সঞ্চারিত হয়। টেলিভিশনের বাংলা নাকি তাই দূরদর্শন যন্ত্র। কথাটার সার্থকতা শুধু এখানে যে, তা যন্ত্রের মূল বিষয়টিকে পরিস্ফুট করে। সে যা হোক, টেলিভিশনের ছবি বেতার সঙ্কেতের মত দূরগামী হবে এটাই ছিল প্রত্যাশিত। কিন্তু যে আয়নোস্ফার বেতার-তরঙ্গকে পৃথিবীর সীমানায় ধ'রে রাখে, টেলিভিশনের বিশেষ তরঙ্গের ক্ষেত্রে তা কার্য্যকরী হয় না। অতি ক্ষুদ্র এই তরঙ্গ শাণিত বর্শার মতই আয়নোস্ফারের "ছাদ" ফুটো ক'রে মহাকাশে ছড়িয়ে যায়। পৃথিবীতে তার আর হদিশ মেলে না। টেলিভিশনের প্রচার ব্যবস্থা তাই ফ্লাড লাইটের আলো ফেলার মত উঁচু টাওয়ার থেকে সম্পন্ন

করা চাই। স্পষ্টতঃ এই টাওয়ার যত উঁচু হবে টেলি-ভিশনের ছবিও তত দূর সঞ্চারিত হবে। কিন্তু টাওয়ার কত উঁচু-ই বা করা সম্ভব। ফলে টেলিভিশনের প্রচার বড় সীমিত। সম্প্রতি অবশ্য ইংলণ্ড সহ পশ্চিম ইউরোপের আটটি দেশের মধ্যে টেলিভিশনের সংযোগ ব্যবস্থা প্রসারিত হয়েছে। কিন্তু এজন্য ত্রিশ কি চল্লিশ মাইল অন্তর একটি ক'রে রিলে সেণ্টার (relay centre) বসানো প্রয়োজন, যাতে ক'রে একটি কেন্দ্রের ক্ষীয়মান তরঙ্গ গ্রহণ করে পার্শ্ববর্ত্তী অঞ্চলে পুনরায় সম্প্রসারণ করা যায়। ব্যবস্থা নিঃসন্দেহে ব্যয়বহুল এবং সময়সাপেক্ষ। তাছাড়া সমুদ্রের দু' পারের দেশগুলির মধ্যে টেলিভিশনের সংযোগ আনা এ ভাবে সম্ভব হয় না। তবে উপায়? মহাকাশে ধাবমান কোন কিছুকে যদি টেলিভিশনের টাওয়ারের মত ব্যবহার করা যেত! ১৯৫৭ সালের আগে যা ছিল নিছক তাত্ত্বিক কল্পনা, স্পুৎনিকের আবির্ভাবের পর তা সত্য-সত্যই সম্ভাবনার অজস্র ইঙ্গিত নিয়ে হাজির হ'ল। টাওয়ার যত উঁচু হবে, টেলিভিশনের ছবি ততদূর ছড়াবে। এ কাজে উপগ্রহের চেয়ে আদর্শস্থানীয় আর কি-ই বা হতে পারে।

মাত্র তিনটি উপগ্রহের সাহায্যে পৃথিবীব্যাপী সংযোগ সাধনের পরিকল্পনা চিত্রে দেখানো হচ্ছে। এ ভাবে যে কোন অবস্থায় পৃথিবীর যে কোন স্থান অন্তত একটি উপগ্রহের এলাকায় চ'লে আসে। তখন স্পুৎনিকের প্রদক্ষিণকাল ঠিক চব্বিশ ঘণ্টায় মাত্র একবার হওয়া চাই; সে সঙ্গে গতিবেগ ঘণ্টায় ১৮০০ মাইল—কক্ষপথে স্থায়ী হওয়ার পক্ষে তা প্রয়োজন। স্পুৎনিকের অবস্থান তাই ভূ-পৃষ্ঠের অন্তত বিশ হাজার মাইল উপরে হবে।

মানুষ ধাপে ধাপে অনেক দূর এগিয়ে এসেছে। ১৯৫৮ সালে সর্বপ্রথম উপগ্রহকে আশ্রয় ক'রে বেতার-বার্ত্তা আদান-প্রদান করা সম্ভব হ'ল। এজন্য আমাদের পরিচিত উপগ্রহ চাঁদকেই কাজে লাগানো হয়। চাঁদের পিঠে প্রতিফলিত হয়ে বেতার-তরঙ্গ ইংলণ্ড ও আমেরিকার মধ্যে কথাবার্ত্তার সফল বাহন হিসাবে প্রমাণিত হয়েছে। এর বছর দুই বাদেই কাজে হাত মিলাল মানুষের তৈরি কৃত্রিম উপগ্রহ। ১৯৬০ সালে ১০০ ফুট আয়তনের যে প্লাষ্টিক উপগ্রহটি আকাশে পাঠানো হয় তাতে প্রতিহত হয়ে বেতারবার্ত্তা আমেরিকা, ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের মধ্যে অভিনব এক যোগাযোগ ব্যবস্থা গ'ড়ে তোলে। কিন্তু বেতার সংযোগের ক্ষেত্রে এই উপগ্রহটি সাধারণ এক আলোক প্রতিফলক বা আয়নার বেশি কাজ করে নি। ঐ বৎসরই অক্টোবর মাসে যে উপগ্রহটি ছাড়া হয় তার যান্ত্রিক অংশগুলি এতই সার্থক ও সম্পূরক ছিল যে, সাধারণ ভাবে তা বেতার-সঙ্কেত প্রতিফলন না ক'রে টেপ-রেকর্ডারে সঞ্চিত রাখত, এবং পৃথিবী থেকে কোন "আদেশে"র অপেক্ষায় পুনরায় সম্প্রসারিত করত।

কিন্তু বেতারবার্ত্তা প্রেরণের পক্ষে আয়নোস্ফারই ত ছিল। ছিল এবং আছে—সত্যি কথা, কিন্তু আয়নোস্ফারই যথেষ্ট নয়। ন' কোটি ত্রিশ লক্ষ মাইল দূরে সূর্য্যের প্রভাবে পৃথিবীর ঊর্দ্ধাকাশে কত না বিক্ষোভ দেখা দেয়, মাঝে মাঝে আয়নোস্ফারের স্তরে ফাটল ধরে, সুদূরগামী বেতার-তরঙ্গ দিশাহারা হয়, সংযোগ-সূত্রটি হারিয়ে যায়। পৃথিবীজোড়া বেতার-সংযোগের ক্ষেত্রে আয়নোস্ফার মোটেই নির্ভরযোগ্য নয়। স্পুৎনিককে তার সম্ভাব্য পরিপূরক হিসাবে অনেকে চিন্তা করেছেন।
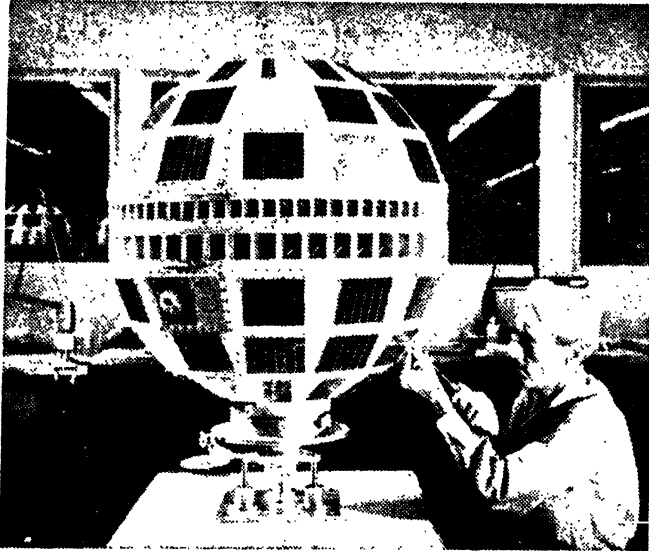
টেলষ্টার—আকাশ পথে সক্রিয় হওয়ার আগে, লেবরেটরির প্রকোষ্ঠে পরীক্ষা ক'রে দেখা হচ্ছে।
(ফটো আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের বিদেশী দপ্তরের সৌজন্যে।)

কলাকৌশলে 'গিয়ার' (Gear) যেমন এক একটি খাঁজ সরিয়ে দিয়ে আর একটি খাঁজকে জায়গা ক'রে দেয়, স্পুৎনিকের পরম্পরাও তেমনি বিশেষ তরঙ্গকে অবিচ্ছেদ্য বাঁধনে বেঁধে রাখবে।

গত ১০ই জুলাই তারিখে যে টেলষ্টার উপগ্রহটি আকাশে স্থাপিত হয়েছে তা এ দিকেই এক গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। টেলষ্টার বিখ্যাত 'বেল-টেলিফোন লেবরেটরির' উদ্যোগে নির্ম্মিত—তাই টেলষ্টার। তারার মতই তা আলোর সঙ্কেত বহন ক'রে আনছে। নির্ম্মাণ কৌশলে টেলষ্টার এলুমিনিয়াম ও মেঙ্গানিজ ধাতুর একটি ফাঁপা গোলক, গায়ে ৩৬০০টি সৌর-রশ্মিজাত বিদ্যুৎকোষ বসানো রয়েছে এই শক্তিতে ট্রান্সমিটার কাজ করে, তরঙ্গ স্রোত নূতন ভাবে প্রবাহিত হয়

তা ছাড়া টেলিভিশনের ছবি সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে দেওয়ার পক্ষে এই স্পুৎনিকই এক এবং অপ্রতিদ্বন্দ্বী। অনেক তত্ত্ব, অনেক পরিকল্পনা, অনেক বিচার-বিবেচনা হয়েছে। মোট তিনটি মত বেরিয়ে এসেছে। একটি বিষয় কিন্তু স্থির : ভূপৃষ্ঠের বক্রতার জন্য একাধিক উপগ্রহ কাজে লাগাতে হবে, যাতে প্রথম স্পুৎনিক পরিক্রমার পথে আড়ালে স'রে যাওয়ার আগেই দ্বিতীয় আর একটি সংযোগ-ধারা অক্ষুণ্ণ রাখতে পারে। একটি পরিকল্পনা মতে এজন্য আকাশের অপেক্ষাকৃত নিচু স্তরে ৫০ থেকে ১২০টি উপগ্রহ ইতস্ততঃ ছেড়ে দেওয়া প্রয়োজন, পৃথিবীর প্রতিটি অংশেই তখন কোন না কোন স্পুৎনিক বেতার তরঙ্গ ছড়াতে পারবে। পরিকল্পনা একদিন সার্থক হতে পারে, কিন্তু এজন্য যে বিরাট আয়োজন ও অর্থব্যয় স্বীকার করতে হয় তা সাধারণ হিসাবেও ধারণাতীত। দ্বিতীয় একটি মতে উপগ্রহের সংখ্যা তিনটি হলেই যথেষ্ট, তবে তাদের সংস্থাপিত করা চাই মাটি থেকে অন্ততঃ বাইশ হাজার মাইল উপরে। মোট ব্যয় পরিমাণ এখানে কিছু কম হলেও তা আনুসঙ্গিক ভাবে আরও উন্নত কারিগরি কৌশলের দাবি রাখে। তৃতীয় পরিকল্পনাটি প্রথম দু'টির মাঝামাঝি। উপগ্রহের সংখ্যা বার, পৃথিবীর আকাশে তা মালার আকারে ঘুরপাক খাবে। মোট কথা, স্পুৎনিকের সংখ্যা যাই হোক না কেন যান্ত্রিক

পৃথিবীর বক্রতার বাধা অতিক্রম ক'রে টেলিভিশনের ছবি দূরান্তরে ছড়িয়ে পড়ে। সে সঙ্গে একযোগে ৬০টি টেলিফোনের বার্ত্তাও তা বহন করতে পারে। দূর-প্রসারী সংযোগ সাধনের ক্ষেত্রে টেলষ্টার নিঃসন্দেহে নূতন পথের সূচনা করেছে। সে অনুপাতে এই অভিনব উপগ্রহটির গুরুত্ব যেন সাধারণ ভাবে তেমন স্বীকৃত হয় নি। টেলষ্টারের মাসখানেক পরে দু'টি মহাকাশযান থেকে দু'জন অভিযাত্রী নিজেদের মধ্যে সংবাদ বিনিময় করেছিলেন। বিজ্ঞানের অগ্রগমনের পথে তা নিশ্চয়ই আর এক ধাপ। কিন্তু তাঁদের এই সংযোগ ব্যবস্থার মধ্যে অসাধারণ কিছু ছিল না! ঘটনার কেন্দ্রে প'ড়ে তবু তা অনেক বড় হয়ে উঠেছে। মানুষের মনকে কত দিকেই না জাগ্রত করেছে। এটাই বোধ হয় স্বাভাবিক। মানুষের কাছে মানুষই সবচেয়ে চিত্তাকর্ষক। সে যা হোক, আমাদের দেশে যদি টেলিভিশন চালু থাকত তা হলে টেলষ্টার বাস্তব অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে আমাদের নিরাসক্ত মনে আরও বড় ক'রে ঘটনার ছাপ রেখে যেত। আপাততঃ সে সুযোগ যখন নেই তখন বলি, আলোড়ন জাগানোই সব কথা নয়। আমাদের কাছে যতই অস্পষ্ট থাক, টেলষ্টার তার পরিক্রমার পথে অশেষ তাৎপর্য্য রেখে গেছে। পৃথিবীব্যাপী এক জটিল সংযোগ ব্যবস্থার প্রথম ধাপ সম্পূর্ণ হয়েছে। টেলষ্টার মানুষের সম্ভাবনার পথে শুকতারা জ্বালিয়ে দিয়েছে।

সুন্দর গৃহ

শ্রীআরতি সেন

"বহুদিন মনে ছিল আশা"—

নিজের মনের মত ক'রে সাজানো একটু আশ্রয় কে না চায়? সারাদিনের ক্লান্ত দেহমন, পরিশ্রান্ত চোখ ঘরে এসেই শান্তি পায়। এখানে সামান্য অবহেলাও গৃহরচনার উদ্দেশ্য ব্যাহত করে। যার অট্টালিকা আছে সে হয়ত কৌচ, কার্পেট দিয়ে চোখ-ঝলসানো আয়োজন করবে, কিন্তু সৌন্দর্য ছোট্ট একটি সাজানো ঘরকে ঘিরেও বিরাজ করতে পারে। রুচিবোধের অধিকার কেবল বিত্তবানের নয়। সাধারণ, সামান্য ঘরেও রুচিকর ভাবে সাজানো হ'লে পাওয়া যায় গৃহরচয়িত্রীর ব্যক্তিত্বের ছাপ।

পাশ্চাত্য দেশগুলির ইতিহাস খুঁজলে তাদের ঘর সাজাবার পদ্ধতির ধারাবাহিক বিবরণ পাওয়া যায়। আমাদের দেশে সে ভাবে কেউ লিপিবদ্ধ ক'রে না রাখলেও যুগে যুগে যে পরিবর্তন হয়েছে তার আভাস যথেষ্ট আছে। মার্কোপোলোর বর্ণনায় দেখা যায়, ভারতবর্ষের ঐতিহ্য এবং ঐশ্বর্য পৃথিবীর সব দেশের চেয়ে বেশী ছিল। তখনকার ভারতবাসী স্বর্ণভৃঙ্গারে জল খেতেন, গজদন্তের পর্য্যঙ্কে শুতেন, মর্মর বেদীতে বসতেন, পশম বা রেশমের আস্তরণ বিছিয়ে দিয়ে অতিথিকে অভ্যর্থনা করতেন। ক্রমে তার বহু পরিবর্তন হয়েছে। অন্যান্য অনেক জিনিসের মত গৃহসজ্জাতেও পূর্ব আর পশ্চিমের হয়েছে সমন্বয় ও সংমিশ্রণ। কারণ,—মানুষের জীবনের কোন দিক্‌ই সময়ের প্রভাব ছাড়িয়ে উঠতে পারে না। মুঘল যুগে যেমন পারস্যের গালিচা এসেছিল, পানদান, আতরদানের আদর হয়েছিল, আজও তেমনি টেবিল-চেয়ার এসেছে। বর্তমান পৃথিবীতে নিজেকে কোন গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ রাখা অসম্ভব। কাজেই যে দেশের যেটুকু ভাল সেটি নিজের ক'রে নেওয়া—তার সুবিধাটুকু উপভোগ করাই শ্রেয়।

গৃহসজ্জার কথা বলতে গেলে প্রথমে গৃহের কথা আসে। মনের মত গৃহ ক'জনের ভাগ্যে জোটে? তবু যদি সেখানে বিবেচনার কোন উপায় থাকে তবে বাড়ীর প্ল্যান এমন হওয়া উচিত যাতে পারিপার্শ্বিক আবহাওয়ার উপর বাড়ীর রূপ নির্ভর করে। শহরে একটি আকাশ-ছোঁওয়া ফ্ল্যাট-বাড়ী আর শহর থেকে দূরে খোলা আব-হাওয়ায় যে বাড়ী, এ দুয়ে কত তফাৎ। কিন্তু প্রত্যেক বাড়ীতেই ভাল ভাবে আলো-বাতাস আসা দরকার। আলো-বাতাসহীন বাড়ী অস্বাস্থ্যকর ত বটেই, শত গৃহসজ্জা দিয়েও তার নিরানন্দ রূপ পরিবর্তন করা কষ্টকর। বাড়ীতে রান্নাঘরের ধোঁয়া সম্বন্ধে সতর্ক হওয়া দরকার। যেখানে কয়লা বা কাঠ ছাড়া অন্য কোন জ্বালানী ব্যবহার হয় না, সেখানে ধোঁওয়া সম্বন্ধে ভাল ব্যবস্থা না হ'লে সমস্ত আসবাব, গৃহসজ্জা নিষ্প্রভ ও মলিন হয়ে যাবে। বাড়ীর ভিতরকার ব্যবস্থা এমন হবে যাতে দাসদাসীর উপর বেশী নির্ভর না ক'রে নিজের হাতে কাজ করা চলে। বাইরের জীবনে আমরা আধুনিক সুখ-সুবিধা অনেকটা নিয়েছি—আমরা এরোপ্লেন চড়ি, টেলিফোনে কথা বলি, ইলেকট্রিক আলো-পাখা ব্যবহার করি, কিন্তু ঘরের কাজের বেলায় ঠাকুমা-দিদিমার আমলের ব্যবস্থা। দাস-দাসীর সমস্যা এখন ক্রমেই বেড়ে চলেছে, কাজেই আজকের গৃহিণীর একা হাতে অনেক কিছু করতে হয়। পাশ্চাত্য দেশে গৃহকর্মের শ্রম লাঘবের যে সব জিনিষ আবিষ্কার হচ্ছে তারও কিছু কিছু ব্যবহার করলে ঘরবাড়ী সুন্দর ও পরিচ্ছন্ন রাখবার সুযোগ হবে। দেওয়ালে সংলগ্ন আসবাব জায়গা বাঁচায়। তাতে ঝাড়া-মোছার কাজও সংক্ষেপ হয়। অনাবশ্যক অলঙ্কার দেওয়া বাড়ী প্রয়োজনের দিকে অর্থহীন আর তাতে গৃহিণীর পক্ষে ভারসাম্য রক্ষা ক'রে গৃহসজ্জা করতে বেগ পেতে হয়। বাইরে কারুকার্যবিহীন সহজ সরল রেখায় টানা অনাড়ম্বর গৃহই সহজে নিজের বৈশিষ্ট্য অর্জন করতে পারে।

গৃহসজ্জার প্রথম এবং প্রধান সহায় রং। যেখানে কিছুই নেই সেখানেও সুবিবেচনা ও সুরুচিপূর্ণ রং-এর ব্যবহার পারিপার্শ্বিককে যাদুমন্ত্রের মত পরিবর্তিত ক'রে দিতে পারে। আমাদের গ্রীষ্মপ্রধান দেশ, ঝকঝকে সোনালি রোদ্দুর। তার মধ্যে রং যে কি মাধুর্য, কি মোহ সৃষ্টি করে তা বর্ণনা করা কঠিন। বৈজ্ঞানিক মতে রং-এর আলোক বিচ্ছুরণের ক্ষমতা অসাধারণ। ক্রীম বা সাদা রং-এ ঘরের উজ্জ্বলতা বাড়ে। ফিকে হলদে ও সবুজ—ঠাণ্ডা ও আরামপ্রদ রং। অল্প ব্যয়ে শুধুমাত্র

রং-এর সাহায্যে গৃহাভ্যন্তরের আমূল পরিবর্তন করা চলে। ছোট ঘরে গাঢ় রং মানায় না, তাতে ঘরকে আরও ছোট আর সীমায়িত মনে হয়। ছাদের রং গাঢ় হ'লে মনে হয় যেন ছাদ বেশী নীচু। ছোট ঘরে হাল্কা নরম রং দিলে ঘর বড় দেখাবে, ঘরের সীমানার দিকে চট্ ক'রে দৃষ্টি আকর্ষণ করবে না। অন্ধকার বা স্বল্পালোকিত ঘরে উজ্জ্বল রং আর আলোকিত ঘরে স্নিগ্ধ রং চোখে ভাল লাগে। অবশ্য রং নির্বাচনের সময় ঘরের বাকী জিনিষের রংও যেন তার সঙ্গে মানিয়ে যায়, সে কথা ভুললে চলবে না।

ঘরে বা আসবাবে অথবা অন্য গৃহসজ্জার জিনিষে রং-এর বিচার সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত রুচির উপর নির্ভর করে। কিন্তু সে রুচিরও দায়িত্ব আছে। চিত্রকরের মত যার রং সম্বন্ধে সচেতন মন তার কথা বাদ দিলে রংকে যেমন-তেমন ভাবে ব্যবহার করায় বিপদ্ আছে। আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে বলতে পারি অতি সুন্দর জিনিষও ঘরের অন্য জিনিষের সঙ্গে রং-এ না মানালে অত্যন্ত দৃষ্টিকটু দেখায়। সবচেয়ে সহজ আর নিরঙ্কুশ পথ হচ্ছে একই রং দিয়ে সাজান। তবে তাতে ভীষণ একঘেয়েমি আসে। যদি ঝুঁকি না নিতে চান এক রং দিয়ে সাজাবেন, কিন্তু সেই এক রং-এরই বিভিন্ন 'সেড' দেবেন। উজ্জ্বল, কোমল, নরম, কড়া এমনি ফেরফের করলে এক রং-এর একঘেয়েমি অনেকটা কমবে। একাধিক রং-এর প্রয়োগে গৃহসজ্জা উজ্জ্বল ও প্রফুল্ল দেখায়। একাধিক রং ব্যবহারে যদি মনে সংশয় জাগে তবে তার সমাধানের ভারী চমৎকার একটি নিয়ম আছে।

রং-এর গোষ্ঠীতে নীল, লাল ও হলদে হ'ল মৌলিক রং। এদের সমপরিমাণ সংমিশ্রণে হয় ধূসরের উৎপত্তি। পদার্থবিজ্ঞান বলে সাদা অদৃশ্য, আর কালো হ'ল রং-এর অভাব। সাদা আর কালো বাদ দিয়ে আমরা একটি রংএর চক্র আঁকব। ঘড়ির মত ক'রে সেই চক্রকে ভাগ ভাগ করব। যেখানে বারোটার ঘর সেখানে দেখ হলদে, তার পর হলদে-সবুজ, সবুজ, নীল-সবুজ, নীল, এমনি করে ফের হলদের কাছে ফিরে যাব। এবার লক্ষ্য করে দেখে নিন এই চক্রে দু'টি মৌলিক রং মিলিয়ে তৃতীয় রং হয়েছে যেমন হলদে আর নীল মিলে সবুজ। ইংরেজীতে মৌলিক রংকে বলে primary আর দু' রংএর মিশ্রণে যে রং-এর উৎপত্তি তাকে বলে binary—এভাবে সমপরিমাণ primary ও binary মিলিয়ে হবে আর একটি রং, যাকে বলা চলে Tertiary ; সবুজ এবং হলদে মেলালে হবে হলদে সবুজ। এবার দেখবেন কেমন চট্ ক'রে আপনি রং-এর নির্বাচন করতে পারেন। সবুজ আপনার পছন্দ, অমনি আপনি দেখবেন ঐ রং-গোষ্ঠীতে আশে-পাশে কি রং সঙ্গে দিলে আপনার ভাল লাগছে। বৈসাদৃশ্য বা Contrast যদি ভাল লাগে চক্রের ঠিক উল্টো দিকে পাবেন সে রং। এই চক্র দিয়ে কতরকম পরীক্ষা করতে পারেন—অতিরিক্ত লম্বা ঘর, কোন্ রং-এ কোন্ দেওয়াল রঙ্গিয়ে দিলে বেমানান ভাব কমবে বা চৌকোণ ঘর আপনি ভালবাসেন না, দেখবেন রংচক্রেই খুঁজে পাবেন এমন দু'টি রং যা থেকে আপনার চৌকো ঘরের রূপ বদলে যাবে। একটু কষ্ট করলে নিজে হাতে রং মিশিয়ে নিতে পারবেন, অন্ততঃ যে রং করবে তাকে পথ দেখাতে পারবেন। শুধু দেওয়াল কেন গৃহসজ্জার যেখানেই রং ব্যবহার করবেন এ চক্র থেকে সাহায্য পাবেন।

ঘর সাজানয় দেওয়াল হচ্ছে পটভূমি। পটভূমির রং খুব গাঢ় বা উজ্জ্বল না হওয়াই বাঞ্ছনীয় নয় কি? ছোট জিনিষ যেমন টুকি-টাকি ঘরে সাজাবার সরঞ্জাম, কুশন, ছবি, ফুল উজ্জ্বল হ'লে ভাল দেখায়। এক কথায় বলতে গেলে যত বড় জিনিষ বা জায়গা তত কম গাঢ় হওয়া উচিত রং। তা ছাড়া রং-এর সমাবেশে সবদাই মনে রাখা প্রয়োজন যে, একটি রংকে কেন্দ্র ক'রে বাকী রং সাজানো আধুনিক পরিকল্পনার অঙ্গ। একটি রংকে কেন্দ্র করে দেখবেন ঘরের সব জিনিষ যেন একসূত্রে বাঁধা পড়েছে। কোন্ রংটিকে কেন্দ্র করা ভাল সেটা গৃহিণীর রুচিবোধের উপর নির্ভর করে। বিপরীত রং বা contrast ব্যবহার করলে কখনও সমপরিমাণ যেন না হয়। একটি ঘরের রং-এর পরিকল্পনা তার পাশের ঘরের সঙ্গে যেন সমতা রক্ষা ক'রে চলে। কি পরিকল্পনা করবেন তারও অনেকটা সাহায্য রং-এর চক্র থেকে পাবেন কিন্তু পারলে তিনটির বেশী রং-এর সমাবেশ করবেন না তাতে রং-এর ছাট হবে কিন্তু সামঞ্জস্য রাখা প্রায় অসম্ভব। মোট কথা রং দিয়ে ঘরকে জীবন্ত ক'রে তুলবেন, গৃহসময়ে আপনার ব্যক্তিত্বের সুস্পষ্ট ছাপ রাখবেন কিন্তু আতিশয্য করে মূল প্রচেষ্টাকেই ব্যর্থ করে দেবেন না।

এবার আসবাব-পত্রের কথা বলি। আমাদের আজকের গৃহাভ্যন্তরের সজ্জা প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সংমিশ্রণ সন্দেহ নেই, তবু যা আমাদের দেশে বেমানান বা উৎকট—সেটা বর্জন করাই মঙ্গল। সাজানোর মধ্যে স্বদেশী ভাব যতটুকু পারা যায় বজায় রাখাই ভাল।

গৃহসজ্জা যাই হোক, সবার আগে দেখতে হবে কোথাও ধুলো-ময়লা না থাকে। দরজায়, জানালার কাঁচে, দেওয়ালের ছবিতে, বাতির সেড বা পাখার ব্লেড্— কোথাও না। ছেঁড়া পরদা, ঘরের কোণে ঝুল, চেয়ারের ঢাকনা এলোমেলো, পেতলের ফুলদানী পালিশ-বিহীন, কাঠের আসবাব দাগে-ভরা নিষ্প্রভ—এসব গৃহিণীর অপটুতা ও অবহেলার পরিচায়ক। শত দামী তৈজস থাক আপনার ঘরে, অবহেলার আভাস থাকলে সৌন্দর্য বাধা পাবে। জাপানীদের কথা শুনেছি কত অনাড়ম্বর তাদের গৃহসজ্জা। সারাটি ঘর তারা মাদুর দিয়ে মুড়ে রাখে। তার মাঝে থাকে ছোট্ট একটি টেবিল। দেওয়ালে নিখুঁত ভাবে ঝোলানো একটি ছবি। যার কাছে অনেক ছবি আছে সে সময় বুঝে ছবি বদলে দেবে কিন্তু ভিড় হতে দেবে না ছবির। এ ছাড়া থাকে তাদের দেশের নিয়মে সাজানো সামান্য দু'চারটি ফুল। এত অনাড়ম্বর অথচ এত পরিপাটি গৃহসজ্জা কত যত্ন আর আগ্রহের পরিচায়ক। ঘরের আসবাব নির্বাচনে অনেকের স্বতঃসঞ্জাত রুচিজ্ঞান থাকে। তাঁরা পছন্দমত ঘরের জিনিস বাছাই করতে আর সাজাতেও পারেন। সেখানে ব্যক্তিগত সৌন্দর্যজ্ঞানের উপর নির্ভর করা চলে। তবে ব্যয় করার ক্ষমতা যেখানে আমাদের নেহাৎ সীমাবদ্ধ সেখানে শুধুমাত্র সৌন্দর্যজ্ঞানই সব নয়। বহু সতর্কতা ও সুবিবেচনা দিয়ে সাজাতে হবে, কেবলমাত্র নিজের মনের মত ক'রে নয়—সকলের মনের মত ক'রে। যারা সে ঘরে ঘোরা-ফেরা করবে, যারা আসবে-বসবে, সবাই যেন স্বচ্ছন্দে ঘরের সঙ্গে হৃদ্যতা পাতাতে পারে।

ঘর সাজানর ব্যাপারে সম্পূর্ণ নূতন আসবাব দিয়ে সাজাবার সুযোগ অনেকেই পায় না। যা কিছু আছে তাকে ঘসে-মেজে তার সঙ্গে খাপ খাইয়ে যেটুকু দরকার একত্র করে সাজাতে হয়। কাগজের উপর সুন্দর করে ঘরের নক্সা এঁকে তার উপর যা যা আসবাব রাখতে হবে তার অনুরূপ পেষ্টবোর্ডের কাটা টুকরা লাগান। যেভাবে যেটি রাখলে সবচেয়ে সুন্দর দেখাবে, সবচেয়ে কাজে লাগবে, আপনিই বোঝা যাবে। নূতন কিছু প্রয়োজন কিনা তাও আন্দাজ করা কঠিন নয়। এবার ঐ নক্সা অনুযায়ী ঘর সাজান। বরাবর যে একই ভাবে রাখতে হবে তা নয়। ঐ নক্সার উপর ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে দেখা চলে কোন ব্যবস্থা আবার নূতনত্ব আনবে। একই জিনিষ, একই ঘর তবু একটু অদল-বদল ক'রে যান, চোখে ভাল ঠেকবে। যে ভাবেই ঘর সাজান না কেন প্রচুর খোলা জায়গা রাখবেন। চলাফেরা করতে, কাজকর্ম করতে ঝাড়ামোছা করতে সুবিধা ত আছেই, দেখতেও ভাল লাগবে। টাও মনীষা লাও-সে বলেছিলেন, 'মাটি দিয়ে কায়দা ক'রে পাত্র তৈরী হয় কিন্তু তার শূন্য স্থানটিই হয় ব্যবহার। দরজা-জানালার বাহার দিয়ে হয় ঘর কিন্তু সে ঘরে খালি জায়গাগুলিই কাজে লাগে বেশী। আজ এই বিংশ শতাব্দীর গৃহসজ্জাতেও বলব ফাঁকা জায়গা ঘরের প্রয়োজনীয়তার পরিমাপ হিসাবেও মূল্যবান। রান্নাঘর থেকে নিয়ে অতিথি আপ্যায়নের ঘরে পর্যন্ত যত অল্প আসবাব আর তৈজস রাখবেন তত স্বচ্ছন্দতাময় হবে, সুন্দর হবে সে ঘরের জীবনযাত্রা। গৃহে যদি জায়গা কম থাকে তবে দেওয়ালে সংলগ্ন আসবাব অনেক স্থান বাঁচায়। দেওয়ালে ঢোকান গুদাম বা ভাণ্ডারও খুব কাজের জিনিস। বাড়তি জিনিসও যত্নে থাকে আর এলোমেলো অগোছাল হবার ভয় থাকে না।

ঘরের সৌন্দর্যে ফুলের স্থান খুব উঁচুতে। অতি সাধারণ ঘর একটু ফুলের স্পর্শে মধুর আর সজীব হয়ে ওঠে। অবশ্য আমি কাগজ বা প্লাষ্টিকের ফুলের কথা বলছি না। এমন কি ঝাঁটার কাঠি দিয়ে বেঁধান বোঁটা-হীন নির্দয় ভাবে বাঁধা তোড়ার কথাও ভাবছি না। টাট্‌কা, সুন্দর ফুল অল্প হলেও ভাল। যেখানে নিত্য ফুল সংগ্রহ করা সম্ভব নয় সেখানে রাখার মত অনেক সুন্দর লতা বা পাতাবাহার আছে, নানা রকমের ক্যাক্‌-টাস জাতীয় গাছও আছে। ফুলের টব কোন সুন্দর ঐ মাপের ঝুড়িতে রাখলে ঘরে রাখা চলে তাতে রোজ ফুল আনবার প্রশ্ন কমে যায়। আজকাল জাপানী ধরণের ফুল সাজানর সখ অনেকের হয়েছে কিন্তু চীনেই হোক্ আর জাপানীই হোক্ সত্যি অর্থ হিসাব ক'রে সাজাতে পারলে ভাল না হলে স্বাভাবিক সৌন্দর্য ক্ষুণ্ণ ক'রে টেরা-বাঁকা ক'রে ফুল পাতা সাজাবার কোন মানেই হয় না। ফুলকে অল্প অল্প করে একাধিক পাত্রে না সাজিয়ে এক জায়গায় বেশী করে সাজালে নয়নরঞ্জক হয়। বহুমূল্য চন্দ্রমল্লিকার দু'টি কি তিনটি খুব মূল্যবান ফুলদানে সাজিয়ে রাখার চেয়ে গুচ্ছ গুচ্ছ রজনীগন্ধা, এমন কি কাশফুলও সুন্দর দেখায়।

এবার ছবির কথায় আসা যাক্। ছবির ব্যাপারে প্রতিকৃতি বা ব্যক্তি বিশেষের ফটোগ্রাফের সঙ্গে অনেক স্মৃতি ও স্নেহ জড়ান থাকে। ছেলেমেয়ের ছবি, মা বাবার ছবি সহজে কেউ সরাতে চায় না। তবে একথা একেবারে সত্য যে, গাদা গাদা প্রতিকৃতি একটির পর একটি সাজান নেহাৎ দৃষ্টিকটু। নিজের সখের দু'একটি রাখার পর বাকী

সব "এ্যালবামে" লাগানই বাঞ্ছনীয়। চিত্রকরের আঁকা তার শিল্পের নিদর্শন আপনাতেই স্বতঃস্ফূর্ত। তার জন্য ভেবে ছবি সংগ্রহ করবার দরকার হয় না। ভাবতে হয় ফ্রেমের কথা, কি ভাবে কোথায় সাজালে ছবির পূর্ণ প্রকাশ হয় সে-কথা। এখানেও ব্যক্তিগত রুচিই বড় কথা। একটি দেওয়ালে আকার ও রূপ হিসাব ক'রে সাজিয়ে বেশ একটা ছবির "গ্যালারি"ও সৃষ্টি করা চলে, আবার একক একটি ছবি সারা ঘরকে জীবন্ত করে ফেলতে পারে। এ বিষয়ে কোনও রুচি বা সৌন্দর্য জ্ঞানের মান নেই। অভ্যাস ও অভিজ্ঞতা দিয়ে এ সম্বন্ধে সচেতনতা আসে। ফুলই বলুন আর ছবিই বলুন বা অন্য আনুষঙ্গিক ঘর সাজাবার সরঞ্জামই বলুন, কাঁচা রাঁধুনি যেমন মশলার আন্দাজ করতে পারে না তেমনি আনাড়ি হাতে এসবের সুসমঞ্জস সমতা রক্ষা করা কঠিন।

ঘরে কৃত্রিম আলো সাবধানে রাখা উচিত। আপনার চোখের সামনে ঝলসান একটি সাদা আলো অথবা যেখানে পড়াশুনা করেন সেখানে টিম্ টিম্ করছে সামান্যমাত্র ক্ষীণ বাতি দুইই সমান আপত্তিকর, বাতির সব সময় 'সেড' বা ঢাকুনি রাখবেন—তাতে চোখেরও উপকার হবে আর দেখতেও উগ্র লাগবে না। যেখানে ব'সে সবাই গল্পগুজব করবে সেখানে মৃদু ও মিঠে আলো মায়া রচনা করে, আবার যেখানে হয়ত পড়বার বই সাজান, বা সেলাইয়ের সরঞ্জাম রাখা হয় সেখানে উজ্জ্বল আলো অপরিহার্য।

গৃহসজ্জার মধ্যে কতগুলি "অকেজো" অলঙ্কার থাকে। কেউবা সমুদ্রের ঝিনুক কুড়িয়ে সাজায়, কেউবা কাঁচের বাক্সবন্ধ ক'রে পুতুল সাজায়। সৌন্দর্যের দিকে এসব ছোটখাট খুঁটিনাটিরও মূল্য আছে। এ থেকে গৃহবাসীর ব্যক্তিগত খেয়ালের পরিচয় পাওয়া যায়। এই "অকেজো" অলঙ্কার তখন কাজে লাগে। তা ব'লে—আতিশয্য ভয়াবহ। লাইন ক'রে সাজান চীনেমাটির পুতুল, পেতলের জন্তু-জানোয়ার, পাখী, এমন কি এত কাজের জিনিস ঘড়ি, তাও যদি একাধিক একই ঘরে সাজান যায়, তবে সৌন্দর্যের সহায় না হয়ে অন্তরায়ই হয়।

মোটামুটি ভাবে গৃহসজ্জার কয়েকটা দিক্ আলোচনা করলাম। আসুন এবার ছোট্ট একখানা ফ্ল্যাটকে মনের মত ক'রে সাজাই। খরচাও যতটা সম্ভব কম করবার চেষ্টা করব। দু'ঘরের ফ্ল্যাট, রান্নাঘর আর স্নানের ঘর, ছোট্ট একটু বারান্দা। আজকাল অনেকে খাবার ঘর আর বসবার ঘর একই জায়গায় করেন। তাতে অনেক অসুবিধা, জন্য আমরা রান্নাঘরের পাশে বারান্দাতেই খাবার বন্দোবস্ত করলাম।

ঘরের মেজের রং হলদে-সবুজ, দেওয়াল আমরা হলদে রং দিলাম। কট্‌কটে উগ্র হলদে নয়—নরম মোলায়েম হলদে, কারণ ঘরখানি আমাদের ছোট। এবার ঘরে আমরা একটি পাটের কার্পেট পাতলাম সস্তা উজ্জ্বল আর সুন্দর। রং আপনি নীল পছন্দ করেন ত দিন। পরদার কাপড় দিন হলদে। ছোট ঘরে ঘোর রং-এর পরদা মানাবে না। ঐ পরদায় নীল আর সবুজ ফুল ইঞ্চি ছয়েক দূরে দূরে তুলুন। এবার আসবাবে আসা যাক। বেশ বড় একটি তক্তপোষকে গদী দিয়ে ঢেকে শীতল পাটি দিয়ে মুড়ে ফেলুন। এতে দেখতেও ভাল হবে আর পরিষ্কার রাখার কাজও সহজ। একটু ভিজে কাপড় দিয়ে মুছে ফেললেই চমৎকার। আরাম ক'রে বসবার জন্য এর উপর কয়েকটা তাকিয়া দিন। তাকিয়া ঢাকাগুলি কোনটা বা হলদে, কোনটা নীল, কোনটা সবুজ। ঘরের এক কোণে একটু নিচু—ছোট টেবিলে এক গুচ্ছ ফুল রাখুন আর দেওয়ালে একটি-দু'টি ছবি। দেওয়ালে ঢোকান একটি বই-এর আলমারি থাকে ত ভাল না হ'লে সাদাসিদে একটি বইয়ের সেলফের উপরে রেডিও রাখুন। হয়ত বা একটি টেবিল-ল্যাম্প বা বাড়ীর কারও একখানা ছবি রাখলেন তার পাশে। বই যেন ঝাড়া-পোঁছা যত্ন করে রাখা হয়। এ ছাড়া ঘরে দু-একটি মোড়া বা বেতের ছোট ছোট চৌকি রাখলে এদিক্-ওদিক্ সরিয়ে ইচ্ছামত বসা যায়। হলদে দেওয়ালে উজ্জ্বল একটি ভারতীয় চিত্রকলার নিদর্শন, যেমন ধরুন যামিনী রায়ের আঁকা একটি ছবি ভারী মানাবে।

এবার শোবার ঘরে আসা যাক্। আসবাবের ঘটা করব না তাতে খরচ ও অসুবিধা দুই-ই হবে। খাট এমন ভাবে তৈরী করাবেন যাতে ঐ খাটের মধ্যে লেপ, কম্বল যত্ন করে রাখবার একটি বাক্স থাকে। খাট ছাড়া ঘরে আরাম করে বসবার জন্য দু'-তিনটি কুশনে ঢাকা মোড়া রাখুন। দেওয়ালে সংলগ্ন আলমারি থাকলে খুব ভাল ভাবে জিনিসপত্র তুলে রাখা যায়। কাপড়ের আলমারি বাদেও একটি আলমারি এমন থাকা উচিত, যাতে বিছানার চাদর, তোষকে এবং যাবতীয় বাড়তি জিনিস রাখা যায়। আয়নাখানা দেওয়ালে লাগিয়ে তার তলায় একটি তাক করে নেবেন। চিরুণী, ব্রাস এবং সাজসজ্জার সরঞ্জাম তার উপর রাখলে সুন্দর "ড্রেসিং টেবিল্" হবে।

বারান্দায় আমরা খাবার ঘর সাজাব। খাবার টেবিল না রেখে যদি নীচু লম্বা বেঞ্চ দু'খানা বা তিনখানা রাখেন তবে যে ক'জন লোক বসবে সেই ভাবে বড় ছোট করতে

পারবেন। তিনটি এমন ভাবে সাজানো যায় যাতে ইংরেজী U-র মত হয়। মাঝখান দিয়ে পরিবেশনকারিণী স্বচ্ছন্দে পরিবেশন করবেন। আবার লোক কম থাকলে একটি বেঞ্চ সরিয়ে দেবেন L-এর মত ক'রে, যাতে ঐ বেঞ্চ আর কোন কাজে লাগে। আরও কম লোক হ'লে একখানা বেঞ্চই যথেষ্ট। বসবার ব্যবস্থা মোড়ার উপর, যাতে মোড়াও ইচ্ছামত কমানো বাড়ানো চলে। খাবার ঘরে অন্য সময় ব'সে লেখাপড়ার কাজও করা চলে। বাসন রাখবার জন্য একটি আলমারি দরকার। অনেকে দেওয়ালে লাগানো আলমারি করেন আর ঐ আলমারির দরজা এমন ভাবে তৈরী যে সেখানে নামিয়ে খাবার টেবিল হিসাবে ব্যবহার করা চলে। খাবার ঘরে বেশ একটি লতা বা সামান্য কিছু ফুল থাকলে সুন্দর দেখায়।

বাকি রইল আমাদের রান্নাঘর আর স্নানের ঘর। রান্নাঘর গৃহস্থ-বাড়ীর খুব মূল্যবান অংশ। আজকের গৃহিণী সেখানে যতটা সম্ভব শৃঙ্খলা ও সৌন্দর্য আনবেন। দুঃখের বিষয়ে আমরা পশ্চিমের বহু নকল নিয়েছি, কিন্তু রান্নাঘরে শ্রম লাঘবের সরঞ্জাম বেশী কিছু নিতে পারি নি। যদি বলি আমাদের সঙ্গতির অভাব, সেটা কিন্তু সম্পূর্ণ সমর্থনযোগ্য কথা নয়, কারণ গহনার চেয়েও মূল্যবান 'সময়'। দুটো গহনা না ক'রে বরং শ্রম লাঘবের সরঞ্জাম কেনা উচিত। তাতে সহজে কাজ হবে। ঘর-বাড়ী পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকবে। ভাঁড়ারের জন্য বড় একটি আলমারি রাখবেন। বাসন ধোবার ব্যবস্থা যেন হাতের কাছে হয়, না হ'লে গৃহিণীর কাজ বাড়বে অথবা দাসদাসীর উপর নির্ভর করতে হবে। রান্নার বাসন তাকের উপর এমন ভাবে সাজানো ভাল যাতে দরকার মত হাতের কাছে সব পাওয়া যায়। মশলাপাতির বেলায়ও একই কথা। রান্নাঘরে শৃঙ্খলা থাকলে গৃহিণীর হাতে সময় বেড়ে যাবে। পারিবারিক জীবনের আনন্দ উপভোগ করার সুযোগও বেশী হবে।

স্নানের ঘরও পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ও শুকনো খটখটে রাখা উচিত। তোয়ালে বা স্নানের কাপড়-চোপড় সুবিধামত রাখার সরঞ্জাম নিতান্ত প্রয়োজনীয়। সাবান, দাঁতের মাজন, ব্রাস, তেল ইত্যাদি একটি তাকে সাজিয়ে রাখবেন। সম্ভব হ'লে একটি আয়না স্নানের ঘরের দেওয়ালে রাখলে অনেক কাজে লাগে। ঘরটিতে একটু রং আনতে চান ত সুন্দর একটি লতা বা পাতাবাহার গাছ জানলার থাকে বা ঐ রকম কোন জায়গায় সাজিয়ে দেখবেন কি চমৎকার দেখায়! ঘর-দোর পরিষ্কার করবার ঝাঁটা, ঝাড়ন বা ফিনাইলের বোতল ইত্যাদি রাখবার জন্য একটি কাঠের বাক্স রং ক'রে রাখবেন। এগুলি ইতস্ততঃ ছড়ানো থাকলে ভারী খারাপ লাগে। এ ছাড়া সারা বাড়ীর জঞ্জাল জমা করার জন্য সুবিধামত কোণায় একটি ভাল দেখতে রং-করা ঢাকনি দেওয়া পাত্র রাখবেন, যাতে সময়মত সেটা সাফ করা চলে অথচ আপনার বাড়ীর জঞ্জাল আপনার বা আপনার প্রতিবেশীর সৌন্দর্য-বোধকে আহত না করে।

গৃহকে সুন্দর করে সাজানর কথা লিখে শেষ করা যায় না। প্রতিটি গৃহ আলাদা, গৃহে যাঁরা বাস করেন তাঁদের ভিন্ন রুচি, ভিন্ন প্রয়োজন, ব্যয় করবার ক্ষমতা ভিন্ন। যাঁরা সে ঘরে আসা-যাওয়া করেন তাঁদের সৌন্দর্যের মান সকলের এক নয়। কাজেই গৃহসজ্জার মুখ্য উদ্দেশ্য সব জায়গায় সমান নয়। তবে একথা সত্য অতি সাধারণ ঘরেও সৌন্দর্য অব্যাহত রাখা চলে। শুধু রুচিকর ভাবে পরিকল্পনা করা ও প্রয়োগ করার কৌশলটি আয়ত্ত করা দরকার। সেটা কাহারও সাধ্যের বাহিরে নয়।
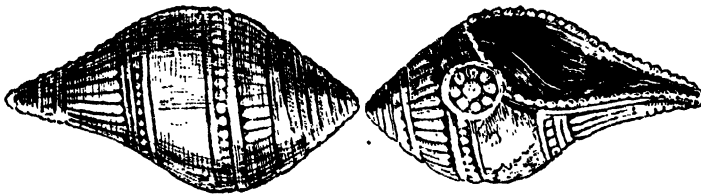
করাচীর কলিজায়

(ভ্রমণ-কাহিনী)

শ্রীমতিলাল দাশ

ভারতবর্ষ !

হৃদয়ে জাগে অপূর্ব্ব আনন্দ, কিন্তু এ পুলক অবিমিশ্র নয়। এ ভারতবর্ষ আজ আমাদের নয়। চক্রীর চক্র এনেছে বিষবাষ্প—তাই দেশের মধুর নিবিড়তার মাঝেও জাগে শঙ্কা ও ভয়—জাগে সঙ্কোচ ও দ্বিধা।

বাগদাদের বিমানে কেউ পাশে বসে নি, কারুর সঙ্গে আলাপ হয় নি—নিঃসঙ্গ নীরবতায় পারস্য উপসাগর পাড়ি দিয়ে, এলাম করাচীতে। বিমানে যে-সব বাজে বই পড়তে দেয় তার দু'চারখানি নাড়লাম সময় কাটাতে।

করাচীর ভূমিতে নেমে ভারত-জননীকে প্রণাম ক'রে বললাম, "মনের মন্দিরে তোমায় নিত্য পূজা করব—হে ভারত-জননী! তাই এদের হিংসা করব না, দ্বেষ করব না, ভালবাসা দিয়ে দেখব। তা হ'লে সত্যকার দেখা হবে।"

উপরে নীলাকাশ—তার মত উদার হৃদয় নিয়ে, পৃথিবীর মত অটল ধৈর্য্য নিয়ে এই নবজাত সমস্যাকে বিচার করব।

গ্লানি যেন মুছে গেল, ভয়বোধ দূর হয়ে গেল—অপূর্ব্ব এক প্রীতির রসে হৃদয় উচ্ছ্বসিত হ'ল।

এরা অনেকক্ষণ অকারণ দাঁড় করিয়ে রাখল। কাষ্টমস হাউসের একটি মেয়ে, আমি স্ত্রীর জন্য যে মুক্তাহার নিয়ে চলেছি, সেটা লিখতে বারণ করে দিল, বলল, তা হ'লে হয়ত আপনাকে শুল্ক দিতে হবে। লেখা কাগজ ছিঁড়ে নূতন করে লিখলাম।

তখন পেলাম সাধুবাণী—'জগতে কেউ তোমার পর নয়, সবাইকে আপনার করে নাও।' যে ভালবাসার বোধ জেগেছিল আমার অন্তরের অন্তরতম কোণে, সেই ভালবাসাই এই মেয়েটিকে করে দিয়েছিল দরদী বন্ধু। ঘাত-প্রতিঘাতের মাঝে যখন এই মানবতার কথা ভাবি, তখনই বিশ্বাস হয়—যে মানুষ সমস্তকে ছাড়িয়ে উঠবে মহত্তর লোকে, কলহ ও সংঘর্ষ তার সব নয়—মৈত্রী ও প্রীতি তার পাথেয়।

বিমানের বাসে এলাম করাচী Y. M. C. A. নামক প্রতিষ্ঠানে। House-master এখানে মেজর রাউষ্টন নামে একজন সৈনিক। প্রথমে বলল, 'স্থান হবে না'। তখন বিপন্ন হয়ে পড়লাম। সঙ্গে নর্ম্মান ফোর্ডের পত্র ছিল। প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের সঙ্গে সেটা বার করে দিলাম। রুদ্রমূর্ত্তি প্রসন্ন হ'ল—প্রত্যাখ্যানের দুঃখের মাঝ দিয়েই পেলাম আশ্রয়।

কিন্তু যে ঘরে স্থান হ'ল তার বাসিন্দা সিনেমা দেখতে গেছিল। কাজেই দ্বিতলের বারান্দায় জিনিষপত্র নিয়ে ব'সে দিগন্ত বিস্তৃত মাঠের ফাঁকে নগরীর দৃঢ়স্থির প্রাসাদগুলির আলোকমালা দেখেই কাটাতে হ'ল। কিন্তু যাকে চাই সে আসে না, প্রদোষের ছায়াতল দিয়েও সে বাঞ্ছিতের আবির্ভাব ঘটে না—প্রখর পথের আলোকে হয়ত সে পথ হারায়। Second show সিনেমা দেখে ছেলেটি ফিরল রাত বারটায়—রাত্রে আর আহার হয় নি, বিমানে যা খাওয়া হয়েছিল তাই নিয়েই তৃপ্ত থাকতে হয়েছিল। আমার সঙ্গে বিছানা নেই। ছেলেটি পাঞ্জাবী, বেশ ভাল এবং সহৃদয়, আমাকে তার উদ্বৃত্ত দিল এবং বন্ধুদের কাছ থেকেও কিছু চেয়ে এনে দিল।

ঘুম আসে না, জাগরণে পোহায় বিভাবরী।
মনে হ'ল সৃষ্টি যেন স্বপ্নে চায় কথা কহিবারে,—
বলিতে না পারে স্পষ্ট করি
অব্যক্ত ধ্বনির পুঞ্জ অন্ধকারে উঠিছে গুমরি।

ফিরে এসেছি জগৎ ভ্রমণ শেষে—অভিশপ্ত আমার এই দেশে কি বলব বাণী? পুঞ্জীভূত অন্ধকারে কি আলোক জালব? প'ড়ে আছি সবার পিছনে—আজ কি কেবল শব্দের বিদ্যুৎছটা দিয়ে দেশবাসীকে ভুলাব? রাত সাড়ে চারটায় জেগে পড়ে অলস শয়নে শুয়ে রইলাম, ছেলেটি সাড়ে পাঁচটায় উঠল। আমি ছ'টার সময় গাত্রোত্থান ক'রে প্রাতঃকৃত্যে মনোনিবেশ করলাম।

১৮ই জানুয়ারী, মঙ্গলবার। সকালে উঠে প্রাতরাশ খেলাম, আহারের ব্যবস্থা মন্দ নয়। তার পর হেঁটে হেঁটে ক্লিকটন নামক সমুদ্রতীরে চললাম—আরব সমুদ্র-তীর, বালুবেলা পরে তরঙ্গাঘাত, আকুল অধীর তরঙ্গ মনে এনে দেয় আনন্দরঙ্গ। সে তরঙ্গ ভঙ্গ আমার নিশ্চল অন্তরে ক্ষণতরে এনে দিল বেগের আবেগ।

তার পর গেলাম ভারতীয় দূতের ওখানে। তিনি

আলাপ করলেন অনাসক্ত সৌজন্যে, আন্তরিক দরদে নয়। দোষ ধরবার কিছু নেই, অথচ হৃদয় তৃপ্ত হয় না। সেখান থেকে এদের ফরেন অফিসে chief protocol নামক কর্ম্মচারীর সঙ্গে দেখা করে করাচীতে আমার বক্তৃতার ব্যবস্থা করতে বললাম। বলল, চেষ্টা দেখবে।

তার পর বাসের জন্য বহুক্ষণ অপেক্ষা করে সদরে বাসেই এলাম। একটি পুলিস-প্রহরী আমাকে সঙ্গে ক'রে ভারতীয় দূতাবাসে পৌঁছে দিল। এখানে সুর ও রাঞ্জেনবাবুর চিঠি পেলাম। খানিক আদর-আপ্যায়ন শেষে কাজের কথা হ'ল।

করাচীতে হিন্দু পঞ্চায়েৎ নামে এক সভা আছে। দূতাবাস তাদের সঙ্গে আমার যোগাযোগ করে দেবে বলল।

দুপুরে স্নানাহার শেষে প্যান আমেরিকান এয়ারওয়েজ কোম্পানীতে গেলাম। ওরা খানিক ক্ষোভের সঙ্গে বলল, "ভারতবর্ষ দিল্লীতে তাদের বিমান নামা বন্ধ করে দিয়েছে, কারণ, চুক্তি ফুরিয়ে গেছে।" তখন কে. এল. এম. অফিসে গিয়ে All India Air Corporation কোম্পানীতে আসন নিরূপিত ক'রে গেলাম করাচীর সেক্রেটারিয়েটে। এখানেই ওদের Constituent Assembly বসে। এখানে আজিজ আহম্মদের সঙ্গে দেখা করলাম।

আমি যখন পটুয়াখালিতে মুন্সেফ ছিলাম, আজিজ তখন ওখানে S. D. O. ছিল। তখন ওর মন ছিল সরল ও সুন্দর। সে আয়োজন করে আমার কাছে শুনেছে হিন্দু-ধর্মের সারতত্ত্ব। আমার বিদায় সময়ে দু' তিনশ' টাকা ব্যয় ক'রে দিয়েছিল এক চা-পার্টি—কিন্তু সেই পুরাতনকে ফিরে পাওয়া দুঃসাধ্য। আজ সে ক্ষমতার উচ্চতম আসনে। ভদ্রতা করে তবু ঘণ্টাখানেক আলাপ করল। চা খাওয়াল না—খাওয়ার নিমন্ত্রণ করল না। প্রত্যাশিত এই আপ্যায়ন না পেলেও অসৌজন্য পাই নি।

এক ঘণ্টা ধ'রে আলাপ হ'ল। আমি তাকে বললাম, "পাসপোর্ট করে বড়ই অসুবিধা ঘটছে—এটা তুলে দেওয়ার ব্যবস্থা কর—"

সে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে শুনল, তার পর বলল, "এটা না হ'লে ভাল ছিল। কিন্তু এখন হয়ত একে তুলে দেওয়া সম্ভব নয়।"

আমি বললাম, "মনে করলেই সম্ভব হয়—বন্ধুত্বের আকর্ষণ সমস্ত বন্ধনকে কাটতে পারে।" সে উত্তর দিল না—শুধু হাসল। এইটাই হয়ত রাজনীতিক চাল।

আজিজ বলল, "ভারতবর্ষের ছায়াছবি ঠিক পথে চলছে না, তাতে পাকিস্থানের প্রতি আক্রোশ থাকে, আর তা ছাড়া ওর Sex-appeal সমর্থনযোগ্য নয়—"

বললাম, "তা নয়, কিন্তু চলচ্চিত্রের ব্যবসা যারা করে, তারা জাতির অভ্যুদয় চায় না, তারা চায় অর্থ। মানুষের কাছে যৌন-আবেদন সর্ব্বাতিশায়ী, তাই অর্থ লোভে ওরা জাতির পতনের পথ এগিয়ে দেয়—"

আলাপ শেষে হোষ্টেলে ফিরে পেলাম শুধু চা, কেক ইত্যাদি। কিছু আর অবশিষ্ট ছিল না। তার পর এল দূতাবাসের চিঠি। তারা পঞ্চায়েতের শুকদেব শেঠের সঙ্গে দেখা করবার কথা লিখেছে। হন্তদন্ত হয়ে চললাম। আমার দুর্ব্বলতা রয়েছে আত্মমর্য্যাদায় সুদৃঢ় দুর্গে যারা থাকে অবিচল তাদের প্রকৃতি আমার নয়, আমি চাই আশ্রয়, আমি আত্মীয়তার প্রার্থী, বন্ধুত্বের ও সঙ্গের কামনায় ব্যাকুল। তার বাসা খুঁজতে অনেক হয়রানি হ'ল, তার গদিতে পেলাম না, গেলাম বাড়ীতে—হায় হায়, হেথা নয় হেথা নয় অন্য কোন খানে—কিন্তু শ্রান্তি এল। সেই অবসন্ন ক্লান্তি নিয়ে অনেক ঘুরে ঘুরে হোষ্টেলে ফিরলাম। রাস্তায় দু'টি পেয়ারা কিনে খেলাম। সঙ্গে কিছু রুটি ছিল, সেটা খেয়েই নৈশ-ভোজন সমাধা করলাম। কৃপণ-বুদ্ধি মানুষকে ভুল পথে চালায়, এক-বেলা না খেয়ে যে পয়সা বাঁচান সেটা ধর্ত্তব্যের মধ্যে নয় অথচ আত্মনিপীড়ন হ'ল। কিন্তু সারাজীবন এই দ্বন্দ্বের মধ্যেই চলেছে—মিতব্যয়িতা কৃপণতা নয়।

বুধবার। সকালে উঠে গেলাম ডাক-ঘরে। প্রিয়-জনকে দিতে হবে চিঠি, ঔদাস্যের আড়ালে তারা নিশ্চুপ, কিন্তু সে সঙ্কোচ ভাঙতে হবে, প্রীতির বিস্ময়-রসে তাদের হৃদয় আর্দ্র করতে হবে। তার পর গেলাম Air India Corporation-এ। সেখানে পূর্ব্বদিনের টেলি-ফোন মেসেজ সমর্থন ক'রে যাওয়ার ব্যবস্থা ঠিক করে একটা রিকসা নিয়ে করাচী বিশ্ববিদ্যালয়ের অভিমুখে রওনা হলাম। এখানে তিন জন বাঙালী অধ্যাপকের সঙ্গে দেখা হ'ল।

তিন জনেই বেশ অমায়িক, সম ভাষা-ভাষী এই বাঙালী মুসলমান বন্ধুদের সঙ্গে আলাপে বেশ আনন্দ হ'ল। বললাম, "আমি সাহিত্যের দীন পূজারী। বাংলা ভাগ হ'তে পারে রাজনীতির দাবা খেলায়, কিন্তু বাংলা সাহিত্য বাঙ্গালীর। বাঙ্গালী হিন্দু আর মুসলমানের।" ওঁরা সে কথা সমর্থন করল। এদের মন উদার, এরা রাজ-নীতির পঙ্কিলতায় ডুবে নেই। একজন অধ্যাপক, তাঁর নাম আহমান। ঢাকায় যে বিশ্বভারতীয় লেখক-সঙ্ঘের

অধিবেশন হবে তার অন্যতম সম্পাদক। আহমান বললেন, "আসুন ডক্টর দাশ ঢাকায়।"

"ইচ্ছা ত হয়, কিন্তু বিরহিনী আর হয়ত ছুটি মঞ্জুর করবেন না।"

"বলেন ত বৌঠানের কাছে আরজি পেশ করি।"

"করুন, কিন্তু ললিতা আজ নিশ্চয়ই কঠোর হয়ে উঠেছেন, আজ বলবেন, 'যেতে নাহি দিব'।"

অধ্যাপক এক কৌতুকসুন্দর হাসি হাসলেন। সান্ত্বনা দিবার জন্য বললাম, "অসম্ভব মনে হয়, তবু চেষ্টা দেখব।"

"একটা প্রবন্ধ পড়বেন নিশ্চয়ই?"

আহমানের আন্তরিকতা মুগ্ধ করে। "এলে নিশ্চয়ই পড়ব, বিশ্বসৌভ্রাতৃত্বে জয়ধ্বনি করব।"

"তা ঠিক, ভেদ ছেদ মায়া, মিলন আর মৈত্রী আসল।"

হাসতে হাসতে বললাম, "আপনি অধ্যাপক, কাব্যের কল্পলোকে আপনার বাস, তাই হয়ত চোখে রয়েছে মোহের অঞ্জন।"

ওখান থেকে গেলাম এদের University Dean ডক্টর মাহমুদ হোসেনের সঙ্গে দেখা করতে—হোসেন সাহেব ঢাকায় ছিলেন ইতিহাসের অধ্যাপক। প্রতিবেশী হিসাবে সেখানে বেশ আলাপ ছিল। আমি গিয়ে শুনি—তিনি একজন ইতালীয় অধ্যাপকের বক্তৃতাসভায় আছেন। সেই সভাতেই চললাম—। অধ্যাপক বাবর ও আল-বেরুণীর এক তুলনামূলক নিবন্ধ পড়ছিলেন—ব'সে ব'সে শুনলাম। স্বার্থবোধ মানুষকে অন্ধ করে—এই ভদ্রলোক ভারতীয় সংস্কৃতির আদৌ ধার ধারেন না—পাকিস্তানকে খুসি করবার জন্যই তিনি প্রবন্ধটি লিখেছেন—তিনি ভারতবর্ষের প্রতি অহেতুক কটাক্ষ পীড়া দিচ্ছিলেন। অধ্যাপক ভাবেন নি যে তার একজন শ্রোতা ভারতীয় আছেন, তিনি ভেদ-বুদ্ধির উপর জোর দিয়ে তাঁর রচনাকে জনপ্রিয় করতে চেয়েছিলেন।

হাসান সাহেবের মধ্যে পুরাতন পরিচয়ের আমেজ আদৌ পেলাম না। রাজনীতির ক্ষেত্রে যে অকারণ সংঘাত জেগেছিল—তাকে তিনি যেন আপন গায়ে মেখে ভারতীয়দের প্রতি এক অকারণ ঈর্ষার ভাব পোষণ করছেন। আমি বললাম, "আপনার ছেলেদের কাছে একদিন ভারতীয় কৃষ্টির কথা বলতে চাই।"

ভারতীয় কৃষ্টি—সে যেন উদ্যত সর্প—হাসান ক্ষেপে উঠলেন না, আঘাত করলেন না বটে, কিন্তু অন্তরে অন্তরে তিনি জ্বলে উঠলেন। খানিকটা সংযম অধিগত ক'রে জবাব দিলেন—"না তার সুবিধা হবে না।"

বাসায় ফিরলাম তিক্ত বেদনায়। 'মানুষের বিদ্বেষ মানুষের অনুরাগকে কি এমনি কঠোর নির্ম্মমতায় পঙ্কের তলায় ফেলে দেবে? হোষ্টেলের নির্জ্জন নিভৃত কুটীরে ব'সে মনের জ্বালায় অনেকক্ষণ জ্বললাম—তার পর বললাম, "হাসান ত সব নয়—অপরিচিত আহমান ত আছে জগতে। মৈত্রীর গভীরতায় তার হৃদয়ে যে সুর শুনলাম—তার ঝঙ্কার কি হাসানের ঈর্ষ্যার গরলকে ডোবাতে পারবে না? পারবে, পারতে হবে—বিরোধ-সংক্ষোভের মধ্যে প্রেমের অচঞ্চল জ্যোতি-শিখাকে বাঁচিয়ে রাখতে হবে। তা নইলে তুমি কিসের লিখিয়ে? কিসের কবি?"

পেলাম সংবাদ—শুকদেব বিকাল পাঁচটায় গাড়ী ধরিয়ে দেবেন। মধ্যাহ্ন-ভোজন শেষে কিছু বই রেজিষ্টার্ড বুক পোষ্টে পাঠিয়ে দিলাম। তার পর এদের 'মর্নিং নিউজ' নামক কাগজের অফিসে গিয়ে আমার বিশ্ব-ভ্রমণের এক বাণী দিলাম—সংবাদ-পরিবেশক নানা আলোচনায় আমার কথা বুঝে নেওয়ার চেষ্টা করল।

পাঁচটায় শেঠ শুকদেবের গাড়ী নিয়ে এল তার ছেলে। শুকদেব স্পষ্ট বক্তা, চমৎকার মানুষ—নানা বিষয়ে আলাপ হ'ল। তার বন্ধু দু'জন উকিলকেও ডেকে ছিলেন। সকলে মিলে খুব খাওয়া হ'ল।

কথাপ্রসঙ্গে আমি বললাম, "দ্বিধাবিভক্ত ভারতকে পুনরায় এক করা উচিত।"

শুকদেব বললেন, "না, তা সম্ভব নয়, আর কখনও হবে না। কেবল জোড়াতালি না দিয়ে জিন্নার কথা মানাই উচিত ছিল—পাকিস্থান হবে মুসলমানের, হিন্দুস্থান হিন্দুর, কিন্তু সেই অসমাপ্ত কাজ—একদিন মহৎ অমঙ্গল ডেকে আনবে—"

"কিন্তু ঐক্য?"

"না, এদের সঙ্গে ঐক্য করতে যাওয়া হবে পরম ভ্রান্তির কাজ—এরা নেবে লাভ। না, সে পথ নয় ডক্টর দাশ—মুসলিম লীগের চাতুর্য্যের কাছে বার বার আপনারা হেরেছেন এবং ভবিষ্যতে হারবেন—কাজেই অসম্ভবের কল্পনা করবেন না—"

শুকদেব বাসায় ফিরিয়ে দিয়ে গেলেন—পথে দেখালেন মহাত্মা গান্ধীর ভগ্নমূর্ত্তি—যিনি ছিলেন মুসলমানদের পরম বন্ধু—সে মহাপুরুষের মূর্ত্তি ভগ্ন ক'রে পাকিস্থান আপন নীচতাকে প্রকাশ করেছে।

শুকদেব বললেন, "এই মূর্ত্তির প্রতিষ্ঠার জন্য নানা আবেদন হয়েছে—ভারতীয় দূতাবাস থেকে করছে—পাকিস্থানের মুষ্টিমেয় হিন্দুর পক্ষ থেকেও হয়েছে—মিছি

কথা অনেক শোনা গেছে—কিন্তু আজও কিছু হয় নি, আর হবেও না—"

আমাদের রাষ্ট্রের দুর্ব্বল নীতি এমন ভাবে পদে পদে অপমানিত করছে অথচ আত্মগৌরবের জয়ঢাক আমরা খুব বাজিয়ে চলেছি। এটা কবিত্ব নয়, এটা উচ্ছ্বাস নয়—সর্ব্বত্রই দেখে এলাম নির্বীর্য্য ভারতের প্রখর অপমান আর সেই লাঞ্ছনাকে অবাস্তব মায়া ব'লে উড়িয়ে দিয়ে আমাদের পঙ্গুনেতৃত্বের বাহিনী দেশকে বিপথগামী করছেন। ব্রহ্মে ও পাকিস্থানে যা দেখলাম, তা স্পষ্টাক্ষরে বলে দিচ্ছে—আমাদের প্রতিবেশী ক্ষুদ্র ইন্দুরের দল ভারতবর্ষকে আদৌ ভয় করে না বরং যা পায় তাই কেটে কেটে ছারখার করে।

বৃহস্পতিবার, ২০শে জানুয়ারী। ভিক্টোরিয়া মিউজিয়াম দেখে এলাম। পৃথিবীর বৃহত্তম কলামন্দিরের তুলনায় নগণ্য। গবর্ণর জেনারেলের সঙ্গে দেখা করবার একটা চেষ্টা করে ব্যর্থ মনোরথ হ'লাম। কেবল Visitor's Book নামক বইতে নাম লিখে এলাম। পাকিস্থান রেডিওতে কিছু ভাষণ দেব—তার জন্য অনেকখানি কাজে অগ্রসর হয়েও ব্যর্থ মনোরথ হ'লাম।

আগের দিন সুরাবর্দ্দির সঙ্গে দেখা করবার সময় ঠিক হয়েছিল এগারোটায়। সুরাবর্দ্দি এলেন সাড়ে এগারোটায়। সুরাবর্দ্দি একদিন মহাত্মা গান্ধীর স্নেহের স্পর্শ পেয়েছিলেন—সেই অমোঘ-বীর্য্যের প্রতি হয়ত তার শ্রদ্ধা আছে মনে করে বললাম, "গান্ধী-প্রতিমূর্ত্তি ভেঙে পাকিস্থান শুধু লোকচক্ষেই হেয় নয়, সংস্কৃতির মানদণ্ডে অনেক নেমে গেছে—সেটা পুনঃস্থাপন করুন।"

রাজনীতিকের উত্তর পেলাম, "দেখি কতদূর কি হয়।"

মহত্ত্বের কোনও মহিমা দেখলাম না মানুষটিতে—তবে আমাদের সৌজন্য ও শালীনতা রয়েছে। সুরাবর্দ্দিকেও পাসপোর্ট ও ভিসা তুলে দেবার অনুরোধ জানালাম—বেদনার্ত্ত কণ্ঠে সুরাবর্দ্দি বললেন, "The Ruffians are still ruling—"

সহযোগীদের সঙ্গে সুরাবর্দ্দির মিল ছিল না খুব—তাই আমাকে বুঝাতে চাইলেন—যদি তাঁর হাত থাকত তা হ'লে তিনি অনেক কিছু করতেন। হায় মানুষের দুরাশা!

সে যে অবস্থায় কতখানি দান তা সহজে উপলব্ধি হয় না—কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে যোগদান ক'রে জ্ঞানবৃদ্ধ বলেছিলেন, "অর্থ কারও দাস নয়, মানুষ অর্থেরই দাস।" তেমনই অবস্থা মানুষকে প্রতিনিয়ত নিয়ন্ত্রিত করছে। সুরাবর্দ্দির নিকট বিদায় নিয়ে বাসায় এসে হিলারির সঙ্গে আলাপ হ'ল। হিলারি প্রশ্ন করলেন, "আপনার ভারত-সংস্কৃতির বাণী কি বর্ত্তমানে অচল নয়?"

"অচল কেন হবে? ঐতরেয় ব্রাহ্মণের চরৈবেতির মন্ত্রের আদর্শ আজও জগৎ অনুক্ষণ করতে পারে নি।"

"কিন্তু বেদান্ত মানুষের জীবনে কি সত্যকার স্থান পেত?"

"সে মানুষের সাধনার উপর নির্ভর করবে। আনন্দ-মুখর সুসমঞ্জস জ্ঞান আসতে পারে মহৎ আদর্শের অনু-করণে—সে আদর্শ বেদান্তের চেয়ে আর কোথায় মিলবে?"

হিলারি নীরব হলেন। ঠিক একটায় শুকদেবের গাড়ী এল। মধ্যাহ্ন-ভোজনের ভূরি আয়োজন—শুক-দেবের ভাই, ছেলে ও এক সহকর্ম্মী—বড় এক টেবিলের চারি পাশে ব'সে গল্পের রসে রসিয়ে খাওয়ার পর্ব্ব সমাধা করা গেল। শুকদেব ও তার সহকর্ম্মী বললেন—"ভারতীয় দূতাবাস একান্ত অকর্ম্মণ্য—কাজের কাজ ওদের দ্বারা হয় না—।"

তার পর ১৯৪৭ সনের রক্তাপ্লুত তামসী নিশীথিনীর কথা হ'ল। শুকদেব বললেন—"বীর্য্য বক্তৃতায় আসে না—ভারতের নেতারা লম্বা লম্বা কথা বলেন—কাজে কিছুই করতে পারেন না—"

নীরবে এ নিন্দা হজম করতে হ'ল। কারণ ব্যথা-পীড়িত বৃদ্ধের ভৎসর্না অন্যায় নহে।

তিনটার সময় ভিক্টোরিয়া মিউজিয়মে গেলাম—তখন সেটা বন্ধ হয়ে গেছে। ঘুরতে আর ভাল লাগছিল না।

দিবসের আলোক ম্লান হয়ে আসে—মনও অবসন্ন। তাই রয়াল সিনেমায় গেলাম। ছবিটি আমেরিকার ইতিহাসের এক বিস্মৃত দিনের আবছায়ায় গড়া—দুর্ব্বল রেড ইণ্ডিয়ান তাদের অতীতের স্বপ্ন নিয়ে পারল না আধুনিকতার সঙ্গে—তারই ছবি। আধুনিকের বেড়ার ফাঁক দিয়ে দূরাকালের এক মায়া মনে ঘনিয়ে এল। মুগ্ধা বনবালার কালো চোখের দৃষ্টি হৃদয়কে সিক্ত করে মমতায়—স্নিগ্ধ তার কণ্ঠ—করুণ তার চাহনি।

হোষ্টেলে ফিরে এলাম—চলতে আর ইচ্ছা নেই। আজ ভাল লাগছে না অলস ঔদাস্য। মধ্যাহ্ন-ভোজন গুরুতর হয়েছিল, তাই রাত্রে আর কিছু খেলাম না, মনে হ'ল যেন জ্বর জ্বর হয়েছে।

বারান্দায় ব'সে নীল আকাশের দিকে চেয়ে ঘরের কথাই ভাবতে লাগলাম—ঝঞ্ঝার মত উদ্দাম হয়ে কাজ

নেই—কাজ নেই বিশ্ব বিজয়ে। প্রাণ আজ কেবল গাইছে ডি. এল. রায়ের প্রবাসী গ্রীক সৈনিকের গান :

বহুদিন পরে হইব আবার আপন কুটীরবাসী
বিরহবিধুর অধরে দেখিব মিলন মধুর হাসি।

কিন্তু যখন ফিরব ঘরে, তখন কি সীমন্তিনী বলবেন, "ঐ এল সুন্দর, তোরা সব জয়ধ্বনি কর।"

শুক্রবার, ২১শে জানুয়ারী। আজ একটু ধীরে-সুস্থে উঠলাম। আমি ব্যস্তবাগীশ—ক্ষান্তি-গুণ জীবনে অভ্যাস করি নি, অথচ নির্ব্বিকারতা দেয় জীবনে পরমা শান্তি, সেই ক্ষান্তির অভ্যাস আজ অনিচ্ছায় করলাম। Just a put at Pakisthan ব'লে একখানি বই পাকিস্থান সরকার বার করেছেন—আমার ত তাই হ'ল, পশ্চিম পাকিস্থানের নিমেষের দেখা পেলাম।

চা খাওয়ার পর Morning News কাগজ দেখলাম। আমার যে interview হয়েছিল তার একটা বিবরণ বার হয়েছে—কিন্তু আমি যা বলেছিলাম কাগজে তা উল্টা-পাল্টা হয়ে বার হয়েছে। কবির লেখায় কবি যে অঙ্কটি দেন সেটাই সত্য হয়ে ওঠে—বাস্তব সত্যকে নিয়ে কবির কারবার নয়—একথা ব'লে হয়ত সংবাদ-পরিবেশক আমায় নিরুত্তর করতে পারেন, কিন্তু এই কারচুপিটা বরদাস্ত করা কষ্ট।

দিল্লী চলো—আজ দিল্লী যাব। কিন্তু নূতনের ভয় সর্ব্বত্র, কোথায় উঠব, কোথায় থাকব সে ভাবনা পেয়ে বসে—কয়েকজন পরিচিতের ঠিকানা চেয়েছিলাম, পাই নি—তাই দিল্লী কালী-বাড়ী উঠব এই ঠিক করলাম। ভিক্টোরিয়া মিউজিয়াম ভাল করে দেখা হয় নি—সেটা দেখা যায় কিনা, তাই বার হলাম। রিক্সা ক'রে এলাম Air India Corporation অফিসে—তার পর জিনিষ-পত্র রেখে চললাম ভারতীয় মুদ্রার সন্ধানে—কালো-বাজারে কালোরই আধিপত্য—দেড় টাকা দিয়ে যে পাকিস্থানি টাকা কিনেছি - তার বদলে এরা তের আনা মাত্র দিতে চায়, সর্ব্বনাশে সমুৎপন্নে অর্দ্ধং ত্যজতি পণ্ডিতঃ—পণ্ডিত নই—তাই এই অর্দ্ধ ত্যাগের নির্লোভতা দেখাতে পারলাম না। কালোবাজার থেকে ফিরে আমেরিকান এক্সপ্রেসের করাচী অফিসে তাই অর্থের সন্ধানে চললাম—কিন্তু করাচী শাখা একেবারে অপদার্থে ভরা। Fxchange Control আমাকে বলেছিল ঠিক ঠিক ফর্মে দরখাস্ত করলে তারা অনুমতি দেবে—প্রথম দিনেই এদের বলেছিলাম, কিন্তু যে কাণ্ডজ্ঞানহীন কেরাণীকে বলেছিলাম—সে আদৌ চেষ্টা করে নি।

করাচীর বিমান ছাড়তে অনেক দেরি হ'ল। এদের শহরের অফিসে এবং বিমান বন্দরে অনেকক্ষণ কাটাতে হ'ল। নানা ধরণের যাত্রী আসে-যায়, কিন্তু সঙ্গ ছাড়া আমার সঙ্গে কেউ আলাপ করতে বসে না। রামপ্রসাদের একটি চমৎকার গান আছে—

প্রসাদ বলে ভবার্ণবে ভাসিয়ে দিলেম ভেলা
জোয়ার এলে উজিয়ে যাব
ভাটিয়ে যাব ভাটার বেলা।

এই নির্ভরতার বোধ যদি পাই, তবেই শান্তি আসে। এই জগৎ সংসার ক'রে খেলা জানি না—সৃষ্টির নির্দ্দেশ আমি জানি না—সৃষ্টির পারেও যাওয়া সম্ভব নয়—অতএব তর্ক নয়, সংশয় নয়—সমর্পণ—পরিপূর্ণ বিশ্বাসে আত্মসমর্পণ। গীতার সেই কথা—সর্ব্ব কর্ম্ম সর্ব্ব ধর্ম্ম পরিত্যাগ ক'রে আমার কারণেও আমিই তোমায় মৃত্যু সংসার পারাপারে পার করব। দার্শনিকতা এক, আর শীলপালন অন্য, শরণাগতি যায় বুঝি, কিন্তু নিজে লালন করি না—পালন করিতেও পারি না।

বিমান চলল।

মেঘ গেল ভেদ ক'রে গরুড় পাখীর মত—এতদিন পরে আপন রাষ্ট্রে চলছি—সেই আনন্দে হৃদয় ভরপুর। স্বদেশ—সে ত কেবল মৃত্তিকা নয়—সে আমাদের জাতির অনেক যুগের ধ্যানের ধন—সাধনার সৃষ্টি।

বিশ্ব-প্রকৃতির এই উদার পরিবেষ্টনে তাই বেলা-শেষের মাধুর্য্য ব্যর্থ হ'ল না—সে নিয়ে এল ভক্তির রসাভিষিক্ত আনন্দ-সঙ্গীত—হৃদয় সুরে সুরে বেজে উঠল—। এদের খাওয়ার আয়োজন চমৎকার নয়—সর্ব্ব দেশের মানুষের জন্য সে আয়োজন নয়, তাই তার মাঝে রয়েছে ভারতীয় দৈন্য আর বণিক-বুদ্ধির কৃপণতা। যোধপুরে বিমান নামল। রাজস্থানের ইতিহাস ছায়াছবির মত মনে জাগল—দূর থেকে অম্বর প্রাসাদ দেখে নিলাম।

সমতল ভূমি থেকে ৪০০ ফুট উঁচে অবস্থিত একটি বালুময় ক্ষুদ্র পর্ব্বত-শিখরে যোধপুরের দুর্গ—বিমান-অবতরণ ক্ষেত্র থেকে প্রাসাদটি বেশ নয়ন-বিমোহন মনে হ'ল। জয়পুরে যখন বিমান নামল,তখন সন্ধ্যা হয়ে এসেছে —জয়পুরের কিছুই দেখা গেল না—স্থাপত্য সৌন্দর্য্যে জয়পুর প্রাচ্যের সুবিন্যস্ত নগরগুলির মধ্যমণি—কিন্তু তার কোনও পরিচয় জুটল না আমাদের ভাগ্যে।

বর্ণ বৈচিত্র্যময় রাজপুত ও রাজপুতানিও চোখে পড়ল না—যারা ছিল বিমান বন্দরে—তারা আধুনিক হয়ত—তারা আদৌ রাজপুত নয়। রাজপুতানা অতিক্রম করে এলাম—যোধপুর ও জয়পুরে নেমে এলাম—কিন্তু রাজ-

স্থানকে দেখতে গেলাম না। শৌর্য্য বীর্য্য ও উপকথার লীলাভূমি রাজস্থানের উদ্দেশে তাই প্রণতি জানিয়ে এলাম—আসব তোমার কাছে—ভাবীকালে।

একজন সুইডিস সাংবাদিকের সঙ্গে আলাপ হ'ল। তাকে ভারতবর্ষের অনেক কথা বললাম। বিমান নামল দিল্লীর মৃত্তিকায়—ভারত-জননীর ধূলি মস্তকে তুলে নিলাম। পথশ্রান্ত পথিককে তুমি দাও নিবিড় আরাম—দাও তার হৃদয়ে প্রেমের প্রদীপ জ্বেলে। জননী সে কথা শুনলেন কিনা জানি না—কিন্তু প্রসন্নতায় সমস্ত মন-প্রাণ পুলকিত হয়ে উঠল।

—•—

মানবপ্রেমিক মির্জা গালিব

শ্রীতন্ময় বাগচী

ইংরেজ কবি শেলী যখন লেখেন—

"Most wretched men are cradled into
poetry by wrong,
They learn in suffering, what they
teach in song."

তখন মির্জা গালিব কবি হিসাবে বিখ্যাত হবেন, না রণ-নিপুণ সেনাপতি হিসাবে ইতিহাসে স্বাক্ষর রেখে যাবেন—সেকথা তাঁর অভিভাবকেরা নিশ্চয় চিন্তা করেন নি। ধনী ওমরাহ পিতার সন্তান মির্জা গালিব যে জীবনের শেষ মুহূর্তে জন্মভূমি রামপুরের কথা স্মরণ করতে করতে দিল্লীতে অজ্ঞাত নিঃস্ব অবস্থায় শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করবেন—সেকথাও ১৭৯৭ সালের ২৭শে ডিসেম্বর নবজাত শিশুর কল্যাণে উৎসবরত ওমরাহ-পুরীর কেউই স্বপ্নেও কল্পনা করতে পারে নি। কিন্তু ভাগ্যের এমনি নির্মম পরিহাস যে ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দের ৪ঠা ফেব্রুয়ারী তিন বছর ধ'রে রোগের অসহ্য যন্ত্রণায় ভুগে মির্জা গালিব বা মির্জা আসাহুল্লা খান্ গালিবের মৃত্যু হয়। গালিবের বাবা আবদুল্লা বেগ খান্ ধনী এবং সরকারী কর্মচারী ছিলেন। কিন্তু গালিবের জন্ম থেকেই যে ভাগ্যবিড়ম্বনা সুরু হয়, ১৮০২ সালে তাঁর পিতার মৃত্যু দিয়ে, তাঁর মৃত্যুর পর সে বিড়ম্বনা স্ত্রীকেও রেহাই দেয় নি। মৃত্যুর মাস দুই আগে গালিব তাঁর বন্ধু হুসেন মির্জাকে পত্র-যোগে এই অনুরোধ জানিয়েছিলেন—'তাঁর শেষ ইচ্ছা রামপুরের মাটিতেই তাঁকে কবর দেওয়া হয়।' কিন্তু সে ইচ্ছা পূর্ণ হয়-নি—দিল্লী আজও তাঁর দেহাবশেষ ধারণের গর্বে গর্বিত।

শুধু অন্তিম বাসনাই নয়, মির্জার অনেক ইচ্ছাই পূর্ণ হয় নি। ১৮০২ সালে রায়গড়ের যুদ্ধে বাবা মারা যান এবং পিতৃব্য নসরুল্লা খাঁ শিশু মির্জার দেখাশোনার ভার গ্রহণ করেন। ১৮০৬ সালে তিনিও মারা যান—ফলে সরকার তাঁর বৃহৎ জমিদারী দখল করে। প্রথম প্রথম তিনি একটা সরকারী ঋণ পেতেন—কিন্তু সবচেয়ে প্রয়োজনের সময় অর্থাৎ ১৮৫৭ সালে সে বৃত্তিও বন্ধ হয়ে যায়।

আত্মীয় বলতে গালিবের এক ছোট ভাইয়ের কথা জানা যায়। ১৮৫৭ সালে সেও মারা যায়। তাঁর কোন বড় বোন ছিল কি না জানা যায় নি—অন্ততঃ তাঁর কোন রচনাতে এ বিষয়ে কোন উল্লেখ নেই। ১৪ বছর বয়সে গালিবের বিবাহ হয় লাহোরুর নবাব ইল্লা বক্সের কন্যা ওমর বিবির সঙ্গে। বিবাহের পর মির্জা রামপুর ত্যাগ করে দিল্লীতে বাস করতে থাকেন। যদিও এই বিবাহের ফলে তিনি প্রভাব ও প্রতিপত্তিশালী নবাব-পরিবারের সঙ্গে জড়িত হলেন, তবু এ যোগাযোগে ভাগ্য মোটেই প্রসন্ন হ'ল না। মির্জার ৭টি সন্তান হয়—কিন্তু সব ক'টি সন্তানই শৈশবে মারা যায়। স্ত্রীর ভ্রাতুষ্পুত্র আরিখকে দত্তক পুত্ররূপে গ্রহণ করেন—তবু তাঁর গুণমুগ্ধ ও নিকট বন্ধুবান্ধব তাঁকে তেমন সহানুভূতির চোখে দেখে নি।

সুদীর্ঘ ৭৩ বছরের জীবনে একদিকে আর্থিক অসচ্ছলতা, অন্যদিকে ব্যয়াধিক্যের চাপে গালিবের জীবন বেদনা ও অবমাননার করুণ ইতিহাসে পরিণত হয়েছিল। তিনি ঋণ গ্রহণ পছন্দ করতেন না—তাই মনে হয়, তাঁর বদান্যতা ও ব্যয়বহুল জীবনযাত্রাই তাঁর জীবনের বেদনা-দায়ক পরিণতির প্রধান কারণ। তিনি যখন মৃত্যুশয্যায়

তখন তাঁর নামে ৮০০৲ টাকার ঋণ বাজারে ছিল। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর স্ত্রী তখন দিল্লীর তৎকালীন ডেপুটি কমিশনারের কাছে আবেদন জানালেন, বৃত্তি পুনর্বহালের জন্য। কিন্তু সে আবেদনে তেমন কোন সাড়া এল না। তবে দয়ালু কমিশনার ওমর বিবিকে জানালেন যে, তিনি যদি স্বয়ং কোর্টে আসেন তা হ'লে মাসিক ১০৲ টাকা বৃত্তি মঞ্জুর হতে পারে। ওমর বিবি এই অসম্মানজনক প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলেন। উপায়ান্তর না দেখে ওমর বিবি নিজের দুর্দশার কথা জানিয়ে রামপুরের শাসনকর্তার কাছে এক চিঠিতে লিখলেন—'আমি বৃদ্ধা। এই ৭২ বছর বয়সে চলাফেরা করতে অক্ষম। তার ওপর স্বামীর মৃত্যু এবং ঋণের বোঝা আমাকে আরও শক্তিহীন করে ফেলেছে। সেই কারণে নিজে গিয়ে দেখা করতে পারলাম না।…বর্তমান অবস্থায় আপনার সাহায্য প্রার্থনা করছি। আমার একান্ত ইচ্ছা অশৌচের দিন শেষ হলে আপনার রাজত্বেই জীবনের বাকি ক'টা দিন কাটাতেই। এখন এখানে আমি অর্ধাশনে দিন কাটাচ্ছি। অনুগ্রহ করে আমার প্রতি করুণা প্রকাশ করবেন।'

এই চিঠির কোন উত্তর পান নি ওমর বিবি। কিছু দিন পরে আবার তিনি তাঁর আর্থিক দুরবস্থার কথা রামপুরের শাসনকর্তাকে জানালেন। সেই সঙ্গে জানালেন, কোন জায়গা থেকেও ঋণ পান না। দারুণতম দারিদ্র্যের এ এক করুণতম কাহিনী। তৃতীয়বার যে আবেদন জানান তাতে সাড়া পেলেন ওমর বিবি। গালিবের ৮০০৲ টাকা ঋণ নবাব শোধ করে দিলেন। এর পর ওমর বিবি আর বেশী দিন বাঁচেন নি। গালিবের মৃত্যুর প্রথম বার্ষিক দিনেই তিনিও পৃথিবী থেকে বিদায় নেন।

তরুণ বয়সেই গালিব স্থির করেছিলেন, শুধু বেঁচে থাকার জন্যে নয়, জীবনকে আনন্দে ভরিয়ে তোলবার জন্যে পিতৃপিতামহের অনুসৃত সেনানী-জীবন ত্যাগ ক'রে কাব্যচর্চা করবেন। তিনি সবিশেষ শিক্ষা লাভ করেছিলেন এবং নিজ প্রতিভার সংমিশ্রণে তাঁর জ্ঞানের পরিধি বেশ পরিসর হয়েছিল। বেশ গভীর জ্ঞান ছিল আরবী, উর্দু ও পার্শী ভাষায়। প্রথম প্রথম গালিব পার্শী ভাষাতেই কবিতা লেখা আরম্ভ করেন। এই সময় মির্জা বেদাল ও উর্ফী ছিলেন তাঁর পথ-প্রদর্শক। পার্শী তখন সরকারী ভাষা, কিন্তু উর্দু ধীরে ধীরে উন্নতি করতে সুরু করে দিয়েছে এবং এই ভাষাই জনসাধারণের পক্ষে সহজ ও বহুলগ্রাহ্য হয়ে উঠছিল। উর্দু ভাষার জনপ্রিয়তা অনুভব করেই জনৈক ইংরেজ (গিলক্রাইস্ট) গালিবের জন্মের সমসাময়িক কালে কলকাতায় একটি উর্দু বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রদের মধ্যে মীর আলি আফশোষ ও মীর আম্মান দেলভীর নাম উর্দু সাহিত্যে বিশেষ ভাবে পরিচিত। তাঁদের আগে কবি মীর তকিমীর ও সাউদার কবিতা জনসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। গালিবের আবির্ভাবের আগে লক্ষ্ণৌর নাসাক উর্দু সাহিত্যের গতি অনেকখানি বাড়িয়ে দেন। ঠিক এই মুহূর্তে গালিব স্থির অথচ দৃঢ় পদক্ষেপে উর্দু সাহিত্যের আসরে প্রবেশ করলেন।

গালিবের জীবনে অভিজ্ঞতা ছিল প্রচুর। বিচিত্র, বেদনাময়, গভীর। তিনি যোদ্ধার সন্তান এবং অভিজাত সম্মান ও প্রতিপত্তির অধিকারী। বংশমর্যাদায় সমাজে তাঁর স্থান অনেক উঁচুতে। কিন্তু প্রকৃতি-বৈচিত্র্যের ফলে তাঁর জীবনে বিপুল ও কঠিন পরিবর্তন আসে। গালিব ছিলেন প্রতিভার বরপুত্র—তবু পার্থিব জীবনোপযোগী ভাগ্যের প্রসন্নতা লাভ করতে পারেন নি। যদি বাস্তবের কঠোরতার কাছে তিনি নতি স্বীকার করতেন তা হ'লে হয়ত তাঁর প্রকাশ তীব্র অথচ নিরুত্তাপ হ'ত। হয়ত তিনি ইংরেজ সাহিত্যিক জোনাথন সুইফ্‌টের মত জীবন-দ্বেষী অথবা কীট্‌সের মত নিরাশাবাদী হতে পারতেন কিন্তু তিনি যে মহান জীবনাদর্শে অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন সেখানে ঈশ্বরের প্রতি অগাধ বিশ্বাস ও বেদনাত আনন্দের স্বাদ নিজেই শুধু পান নি—সবার জন্যেই ত প্রকাশ করেছিলেন। তাঁর আত্মিক প্রসারতা ঈশ্বরের প্রতি অপ্রকাশ্য গভীরতায় পরিপূর্ণ, মানুষের প্রতি সং বেদনশীলতায় জ্যোতিষ্মান। এদিকে তিনি মিল্‌টনের সমদর্শী।

মানুষ হিসাবে গালিব ছিলেন উদারহৃদয়, সহানুভূতিশীল ও বন্ধুপ্রিয়। তাঁর সহনশীলতার অনেক নিদর্শ রয়েছে বহু বন্ধুবান্ধব, সঙ্গী, শুভানুধ্যায়ীদের লেখ পত্রাবলীর অক্ষরে অক্ষরে। তাঁর সমসাময়িক খ্যাত নামা ও সুপ্রতিষ্ঠ লেখক, কবি ও শিল্পী সম্প্রদায়ের সং তাঁর বিশেষ যোগ ছিল। হিন্দু ও মুসলমান মিলে প্রা ১০০ জন তাঁর কাছে আসত শিক্ষানবিশী করতে। স্বার্থ কেন্দ্রিক কোন মানুষ এত লোকের শ্রদ্ধা, সহানুভূতি ব বন্ধুত্ব লাভ করতে পারে না। নিজের ব্যক্তিগত দুঃখদৈন্য বেদনা-দহনের অনুভূতি মানবদ্বেষী না ক'রে বিপরীত পথে অন্যের দুঃখদুর্দশা অনুভব করার মত মনোবৃত্তি তাঁর মধে

গ'ড়ে তুলেছিল। শিশুদের প্রতি তাঁর গভীর ভালবাসার অনেক নিদর্শন আছে। হরগোপাল তাপ্তেকে লেখা এক চিঠি থেকে জানা যায় যে, জয়নুল আবেদীনের দু'টি শিশু-পুত্রকে তিনি নিজের পুত্রের মত দেখতেন। তারা দিন-রাত তাঁকে নানাভাবে বিরক্ত করত, কিন্তু গালিব সে-সব অত্যাচার নির্বিকার হয়ে মেনে নিতেন। ঐ চিঠির এক জায়গায় লিখেছিলেন—"আমার 'ঐহিক' সন্তানদের দৌরাত্ম্যই যখন আমাকে বিরক্ত করতে পারে না, তখন 'আত্মিক' সন্তানদের দৌরাত্ম্যকে সহ্য করব না কেন?" তাপ্তে নিজের কবিতা পাঠিয়ে সংশোধন করে দেবার জন্য মাঝে মাঝে অনুরোধ করতেন গালিবকে।

দুঃসময়ের আঘাত ও দুর্ভাগ্যের নিষ্করুণতা তাঁর অন্তরদৃষ্টিকে দিগন্তপ্রসারিত করেছিল। অভিজ্ঞতা এনেছিল সাগরের গভীরতা। জীবন সম্বন্ধে সম্পূর্ণ সচেতন ছিলেন গালিব, বাস্তব উত্থান-পতন এড়িয়ে যেতেন না। মানুষের দুঃখকে অনুভব করতেন, তার গভীরতা উপলব্ধি করতেন নিজের বাস্তব-জীবনের পরি-প্রেক্ষিতে। তাই তিনি এত বড় সচেতন ও সংবেদনশীল কাব্য-জিজ্ঞাসার সার্থক শিল্পী হতে পেরেছেন। তাঁর কাব্যের অনুভূতির সুর আমাদের শরৎচন্দ্রের কথা স্মরণ করায়।

গালিবের কাব্যানুভূতি প্রকাশ পেয়েছিল গজলের রূপে। কুশলী শিল্পীর লেখনী স্পর্শে গজল এক নতুন রূপ নিল। ছন্দ ও রূপকের বৈচিত্র্যহীন ধারক হিসাবে গজল একটা গতিহীন অবস্থায় গুমরে মরছিল। স্বতঃস্ফূর্ত আবেগ প্রকাশের মাধ্যম না হয়ে গজল এই সময় গতিহীন পাণ্ডিত্যপ্রকাশের গতানুগতিকতায় আহত, কণ্টকিত হয়ে উঠেছিল। গালিবের বলিষ্ঠ সংবেদনী লেখনীস্পর্শে গজল আবার স্বাভাবিক ও আন্তরিকতামণ্ডিত ভাব-প্রকাশের সচ্ছলতায় গতিশীল হয়ে উঠল। তথাকথিত হতাশ প্রেমের আর্তনাদ প্রকাশের যান্ত্রিকতা থেকে গালিব গজলকে মুক্ত করলেন। এর পরিধি ও বিস্তৃতি আবার মাধুর্য অনুভূতির অন্তরের প্রতি কন্দরে প্রসারিত হ'ল। গালিবের মানব-সহানুভূতিপূর্ণ আনন্দ-বেদনার বাণী বহন ক'রে গজল জীবনের সঙ্গে সংযোজিত, পুনঃ-প্রতিষ্ঠ হ'ল। ঈশ্বরের উদ্দেশে গালিব জানালেন:

আতশ্‌ চায় দাগ-এ হসরৎ ই দিল কা সুমার ইয়াদ।
মুঝসে মিরে গুনাহ্‌ কা হিসাব আয় খুদা না মাঙ্গ।।

* * * *

ম্যস্‌ সে গরজ নিসাৎ হ্যয় কিস্‌ রুশাইয়াহ্‌ কো
ইক গুনা বেখুদি মুঝে দিনরাত চাহিয়ে।২

* * * *

পাকড়ে যাতে হ্যয় ফারিস্তন কে লেখে পার্ না হাক্‌
আদমী কো হামরা দাম-ই-তাহ্‌রের বে থা।।৩

ছন্দে গালিবের নিজস্ব আঙ্গিক ও রচনাশৈলীর বৈশিষ্ট্য আছে। মাঝে মাঝে ছন্দ অপূর্ব মাধুর্যমণ্ডিত, তার প্রধান কারণ—এই ধরণের ছন্দ-সুষমা ছাড়া গভীর আবেগ প্রকাশের অন্য কোন রূপ গালিব পছন্দ করতেন না। রচনাশৈলীর দ্বারা কবি-মানুষকে দেখতে পাওয়া যায়। Walter Pater বলেছেন—"Style is the man." ছন্দশৈলীই মানুষটির পরিচয়। গালিব উচ্চ-শিক্ষিত ছিলেন, আবার অন্যদিকে অত্যন্ত কোমল-মানস-প্রবণ। তিনি বলতেন, যা অনবদ্য তাই নতুন; আর সে-কথা তিনি বলেছেন সম্পূর্ণ নতুন আঙ্গিকে। কারণ, একমাত্র কাব্যিক প্রকাশে তিনি সুপ্রসন্ন ভাগ্য পেয়ে-ছিলেন। তাই সময়ের গতির সঙ্গে গালিবের কাব্য দেশ ও কালোত্তর বিশ্বজনীন আবেদন শোনাচ্ছে। এই-খানে তাঁর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের তুলনা করা যায়। প্রেমের একটা বিশ্বজনীন আবেদন আছে মানব-প্রেমের সঙ্গে ঈশ্বরের প্রেমের সংমিশ্রণে গালিবের কবিতাও অপরূপ অনবদ্য হয়ে উঠেছে। কিন্তু সুফি কবিদের সঙ্গে গালিবের অনেক পার্থক্য আছে। নিজের প্রিয়জন সম্বন্ধে যে-কথা বলতে পারতেন—অনায়াসে সে-কথা তিনি ঈশ্বরের উদ্দেশেও বলতেন। তাঁর কুশলী লেখনীস্পর্শে সে বাণী একদিকে যেমন প্রাঞ্জল ও মধুর, অন্যদিকে তেমনি সুষমা-মণ্ডিত। তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি যখনই পার্থিব প্রেমের অনুভূতির ঊর্ধ্বে উঠেছে, তখনই তাঁর বাণী প্রচলিত ধর্মোপদেশ বা ধর্মীয় ব্যাখ্যার চেয়ে অনেকগুণ ফলপ্রসূ হয়েছে। গালিবের ধর্মের মূলতত্ত্ব হ'ল মানসিকতা ও ভগবৎ প্রেমের অবিমিশ্র মেলন—অনেকটা রবীন্দ্রনাথের 'দেবতারে প্রিয় করি, প্রিয়েরে দেবতা'র সুর প্রতিধ্বনিত হয়েছে, যেমন:

হাওয়াস কো হ্যায় নিসাৎ-ই-কর্ ক্যয়া ক্যয়া
না হো মরণা তো জিনা কা মজা ক্যেযা।
দিল-এ-হর্ কতরা হ্যায়, সাজ-এ উন্নুল বাহার্
হাম উসকে হ্যায়, হামারা পছানা ক্যেযা।।

যুগপৎ অর্থের গভীরতা, প্রকাশের প্রাঞ্জলতা, শব্দ-চয়নের ধ্বনিমূল্য ও বাক্য-সৌষম্যে সমগ্র উর্দু সাহিত্যে গালিবের সমকক্ষ কবি বিরল। মিলটনের বিখ্যাত বাণী—"More is meant than meets the ear" গালিবের

কবিতার অন্যতম ও প্রধান সম্পদ্‌। শব্দের স্বল্পতায় তিনি যে অনির্বচনীয় অভিব্যক্তির আভাস দিয়েছেন তা একদিকে যেমন অর্থের সুপ্রাচুর্যে সম্পদশালী, অন্যদিকে ভাবের স্রোতে গতিশীল। ক্ষণিকের অনুভূতিকে তিনি চিরকালের আবেগে উজ্জীবিত করে রেখেছেন :

নজর লাগে ন কঁহি আঁখে দাস্ত ও বাজু কো
ইয়েহ লোক কেঁও মিরে জখমী-ই-জিগর্
কো দেখতে হ্যায় ॥৪

তাঁর কাব্যের অনুবাদ সম্ভব নয়। পরিপূর্ণ প্রকাশের ভঙ্গি অবলম্বন না ক'রে আভাস-ইঙ্গিতের সাহায্যে তাঁর কাব্যানুভূতি-প্রকাশভঙ্গির পিছনে একটা বিশেষ লক্ষ্য আছে। কোন সাধারণ অনুভূতি বা ঘটনাকে গালিব যে বেদনাজড়িত স্বরে প্রকাশ করেছেন তার কারণ এই নয় যে, তিনি পাঠকের আবেশের পরিণতি অনুভব করে আনন্দ পেতেন। বরং উচ্চগ্রামে বাঁধা আবেগ ও ভাবানুবেগকে সার্থক প্রকাশ করতে ইঙ্গিতমূলক প্রকাশ-ব্যঞ্জনাই সবচেয়ে উপযুক্ত মাধ্যম। যখন মুল ভাবটি সাদাসিধে অথচ বিশ্বজনীন, তখন তার প্রকাশভঙ্গিও চলতি বাচনভঙ্গির সমগোত্রীয় হয়েছে। এবং বাক্যাতীত অর্থের প্রকাশ হয়েছে।

বাসকে দুস্‌যার হ্যায় হর্ কাম্‌কে আসান হোনা
আদমী কো ভি মুইয়াম্‌সার নেহি ইনসান হোনা ॥৫

একথা আজকের পৃথিবীতে অনস্বীকার্য যে, মানুষ অনেক গুণের অধিকারী হলেও, মানুষী-শক্তি প্রকাশের ও বৃদ্ধির কাজ তার কাছে সহজ। মানুষ অনেক সাধনায় 'মানুষ'। আজকের আন্তর্জাতিক পরিপ্রেক্ষিতে প্রতিফলিত করলে গালিবের এই কথার বিশ্বজনীনতার উপলব্ধি সহজ হবে। হাইড্রোজেন ও এ্যাটম বোমার আশঙ্কাচঞ্চল বিশ্ব আজ 'মানুষ' খুঁজছে।

গালিবের কবিতার আর একটি প্রধান সম্পদ্‌ হ'ল 'আবেগময়তা'। আবেগের প্রবল প্রবাহে তিনি সমালোচকের ভঙ্গি হারান নি। জীবন ও তার ভিন্ন ভিন্ন বৈশিষ্ট্যের প্রতি গালিবের সমালোচকের সূক্ষ্ম দৃষ্টিভঙ্গি এই আবেগের সঙ্গে ওতপ্রোত ভাবে সংপৃক্ত। জীবনের নানা ঘাত-প্রতিঘাতে প্রত্যক্ষ আঘাত তাঁর ওপর পড়লেও তিনি হতাশভরা শ্রান্তির সঙ্গে নিজে যেমন জীবনকে স্বীকার করেন নি তেমনি বন্ধু-বান্ধব, সঙ্গী-সাথীকেও নির্লিপ্তভাবে জীবনের প্রতিকূলতার কাছে আত্মসমর্পণ করতে দেন নি। এমন কি ধর্মের নিছক দৈবত্বও তাঁর জিজ্ঞাসু মনকে তৃপ্তি বা শান্তি দিতে পারে নি। তাঁর সমস্ত রচনা পড়লে মনে হয়, তিনি যে জীবন আশা করেছিলেন তার মূল সুর নিরবচ্ছিন্ন সংগ্রামের প্রতি নিষ্ঠা। তিনি শ্রান্তিহীন, হতাশাবিরোধী। তিনি যেন জীবনের পরিপূর্ণতার প্রতীক। জীবনই তাঁর মূলধন, পৃথিবীই তাঁর সর্বস্ব। রবীন্দ্রনাথের মত তিনিও পার্থিব জীবনকে স্বর্গের চেয়ে বড় আসন দিয়েছেন :

দেতে হ্যায় জনত্‌ হিয়াৎ-ই-দেরকে বদ্‌লে।
নাস্‌সা বে আন্দাজা-ই-খুমার নেঁহি হে ॥৬

তিনি আরো বলেছেন :

যব্ তক্ দাহান-ই-জখম না পেদা করে কৈ
মুসকিল কা তুজসে রাহ্‌-এ সুখন করে কৈ ॥৭

তাই জীবন-জিজ্ঞাসা তাঁর কাব্যধারার প্রতি স্তরে প্রবাহিত। যেমন :

অব্‌নি মরিয়ম হুয়া করে কৈ
মেরে দরদ কে দাওয়া করে কৈ
রোক লো গর খলৎ চলে কৈ
বক্স দো পর্ খটা করে কৈ
কোন্ হ্যায় যো নেহি হ্যায় হজৎ-মন্দ্‌
কিস কি হজৎ রোয়া করে কৈ
কেয়া কিয়া খিজির নে সিকান্দার সৈ
অব্ কিসে রাহ্‌নুমা করে কৈ
যব তওয়াকে হি উঠ্‌ গ্যায়ে গালিব
কিঁউ কিসি কা গিলা করে কোই ॥৮

মানুষের স্খলন-পতন ত্রুটির প্রতি গালিবের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ছিল। মানুষ যখন কোন বিষয়ের প্রতি আবেগপূর্ণ ভাবে সংপৃক্ত হয়, পরিণাম নিষ্ফল জেনেও যখন ভাবের আবেগে অন্ধ হয়, তখনই সেই পতনের আশঙ্কা আরও প্রকট হয়ে ওঠে। ঈর্ষা, দ্বেষ, ও বিরক্তি থেকেই এই সকল মনে সঞ্চারিত হয়। অতি প্রাঞ্জল ভাষায় ও গভীর ভাব নিয়ে গালিব মানুষের এই দিকটি তাঁর ছন্দে প্রকাশ করেছেন। মাধুর্য ও গভীরতায় তাঁর ভাষা ও ভাবের মিলন হয়েছে এখানে। এর তুলনা বিশ্ব-সাহিত্যে বিরল। তাঁর ভাবগম্ভীর ছন্দ-মধুর কাব্যকে সেক্সপীয়ারের সঙ্গে তুলনা করা যায়। এমন মমত্ববোধ, মানুষের দুঃখ-দৈন্য, অভাব-অভিযোগের প্রতি সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ-দৃষ্টি ও তার মনস্তত্ত্বের সহানুভূতিশীল প্রকাশ গালিবকে 'মানবীয়' সাহিত্যে চিরস্মরণীয় করে রাখবে।

দীর্ঘ জীবন ধ'রে গালিব পরিপূর্ণ মানুষের সামগ্রিক অভিজ্ঞতার প্রকাশ রেখে গেছেন তাঁর সাহিত্যে। এইখানেই তাঁর মহত্ত্ব। তিনি জীবন-সচেতন, জীবন-শিল্পী ও তার অভিজ্ঞ ভাষ্যকার। ভাব ও ভাষার এই অপূর্ব

সংমিশ্রণে গালিব গজল-কবি হিসাবে সর্বশ্রেষ্ঠ। গজলের মধ্যে তিনি নতুন প্রাণ এনেছিলেন; সমগ্র উর্দু সাহিত্যে তাঁর সমকক্ষ বিরল। গীতি-কবি হিসাবেই তাই গালিব বিশ্বকবির সঙ্গে অতুলনীয়। গালিব নিজের যুগকে পথ দেখিয়েছিলেন, পরবর্তী যুগের তিনি পথিকৃৎ।

উপরের উদ্ধৃতিগুলির অনুবাদ :

১। অপরিতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষার বেদনায় হৃদয় আমার ক্ষত-বিক্ষত। তাই, হে ঈশ্বর, আমার কাছ থেকে পাপের হিসাব চেও না।

২। যে মানুষ মদ থেকে আনন্দ পায় সে করুণার পাত্র, কিন্তু আমার একমাত্র কামনা হচ্ছে দিনরাত আত্মবিস্মৃত থাকা।

৩। দেবদূতের দৌত্যে আমরা ধরা পড়ি। হে ঈশ্বর, আমাদের কাজের খবর যখন তোমার কাছে পৌঁছায় তখন কেউ কি তোমার কাছে থাকে?

৪। আমার প্রিয়ার বাহুতে অমঙ্গলের চিহ্ন দিতে পারে, কিন্তু মানুষ কেন আমার অন্তরের ক্ষত দেখবে?

৫। সব কাজই সহজ নয়। যেমন মানুষের পক্ষেও প্রকৃত মানুষ হওয়া সহজ নয়।

৬। আমাদের জীবনের পরিবর্তে স্বর্গের লোভ দেখান হয়—কিন্তু স্বর্গের নেশার চেয়ে পৃথিবীর আকর্ষণ অনেক বেশী।

৭। যদি নিজের অধর রক্তাক্ত না হয়, তবে প্রিয় মিলন সহজ হবে কেমন করে?

৮। মেরীর পুত্র (খ্রীষ্ট) থাকুক আর নাই থাকুক আমার বেদনা নিরাময় করার জন্যে কেউ একজন থাকুক। বিপদ্গামীকে থামানো কর্তব্য—যদি সে কোন অপরাধ করে তবে তাকে ক্ষমা করা প্রয়োজন। কোন খারাপ কথা শোনা বা কারও কোন ত্রুটিকে প্রকাশ করা অকর্তব্য। এমন কেউ নেই যে অভাবী নয়, সবাইকে কেমন করে অতৃপ্ত করা যায়? খিজির আলেকজান্দারকে কি করেছিল জান? যখন সকলের কাছে আমরা আশা হারিয়েছি তখন এ অবস্থায় কেমন করে একজনকে আমাদের পথপ্রদর্শক বলে মেনে নিই? কেমন করেই বা অন্যের বিরুদ্ধে অভিযোগ জানাই?

রেফযুক্ত ব্যঞ্জনবর্ণে দ্বিত্ব সমস্যা

শ্রীদুর্গামোহন ভট্টাচার্য

'প্রবাসী' পত্রিকায় বিভিন্ন লেখক বিভিন্ন সময়ে (শ্রাবণ, ১৩৪২, ৫৮৩ পৃঃ; ফাল্গুন, ১৩৬২, ৬৩৮ পৃঃ; ফাল্গুন, ১৩৬৭, ৫৬৬ পৃঃ) বার্তিক, কার্তিক প্রভৃতি পদের দ্বিত্ব রহিত বানানের শুদ্ধতায় সংশয় প্রকাশ করিয়াছেন। সংশয় যে অমূলক তাহা রাজশেখর বসু মহাশয় 'প্রবাসী'র মারফতেই (চৈত্র, ১৩৬২, ৭৭৫ পৃঃ) জানাইয়াছিলেন। আমিও এ সম্পর্কে অন্যত্র আলোচনা করিয়াছিলাম। কিন্তু আজও সংশয়ের নিরসন হয় নাই। সুতরাং আর একবার একটু বিশদ আলোচনা আবশ্যক।

ছাব্বিশ বৎসর পূর্বে ১৩৪২ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'বানান সমিতি' বাংলা বানানে রেফযুক্ত ব্যঞ্জনবর্ণে দ্বিত্ব বর্জনের নির্দেশ দিয়াছিলেন। ইহা লইয়া অল্প বিস্তর বাদানুবাদ চলিয়াছিল, কিছু ব্যঙ্গবিদ্রূপেরও সৃষ্টি হইয়াছিল। তখন রবীন্দ্রনাথ অকুণ্ঠচিত্তে এই নির্দেশের অনুমোদন করিয়াছিলেন এবং স্বয়ং তাহার অনুসরণ করিয়া পথ-প্রদর্শক হইয়াছিলেন। তখন হইতেই 'প্রবাসী' পত্রিকা এই বানান চালু করিবার পক্ষে সহায়তা করিয়া আসিতেছেন। এখন অনেক বাঙালী লেখকই রেফাক্রান্ত ব্যঞ্জনবর্ণের দ্বিত্বহীন বানান মানিয়া লইয়াছেন। ইহার ফলে বাংলা লেখা ও ছাপার কাজ কিছু সরল ও সহজ হইয়াছে। এই সম্পর্কে বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্দেশটি সুবিধামূলক 'ফতোয়া' মাত্র নয়, সম্পূর্ণ ব্যাকরণসম্মত।

ব্যাকরণের বিধান অনুসারে স্বরবর্ণের পরস্থিত হকার ও রেফের পরবর্তী হ-ভিন্ন ব্যঞ্জনবর্ণের বিকল্পে দ্বিত্ব হয়—অচো রহাভ্যাং দ্বে (পাণিনি ৮,৪,৪৬)। বিধানটি বৈকল্পিক: সুতরাং প্রয়োগ-কর্তার ইচ্ছানুসারে দ্বিত্ব-সহিত বা দ্বিত্বরহিত উভয় প্রকার প্রয়োগই চলিতে

তাহলে সেগুলিকে রক্ষা করার দিকেই বেশী ক'রে মনোযোগী হওয়া আমাদের কর্ত্তব্য। স্বর্গ্‌গ, গর্ব্‌ভ গেছে, যাক। হয়ত যাওয়া উচিত ছিল না।

২। বানান যথাসম্ভব উচ্চারণের অনুগামী হয় এইটাই বাঞ্ছনীয়, যদি অবশ্য সে বানান ব্যাকরণের অনুমোদিত হয়। তাই যেহেতু ব্যাকরণের অনুমোদন রয়েছে, আমরা নিশ্চয়ই কার্তিক লিখব না, লিখব কার্ত্তিক; কেননা আমরা কার্তিক বলি না, বলি কার্ত্তিক। যাঁরা সংক্ষিপ্ত বা সহজ উচ্চারণের জন্যে কিছু একটা ছাড়তে চান তাঁরা দ্বিত্ব ছাড়েন না, রেফটাকেই ছাড়েন, ছেড়ে বলেন কাত্তিক। দ্বিত্বের প্রতি আমাদের এই স্বাভাবিক অনুরক্তির পরিচয় বহন করে কথ্য ভাষার রেফ-বিবর্জ্জিত আত্তি, কত্তা, কীত্তি, তক্ক, দুগ্‌গা, নিগ্‌ঘিন্যে, মদ্দা, মদ্দার,ইত্যাদি কথাগুলো। এতে এও বোঝা যায় যে বাঙ্গালী জনসাধারণের স্বাভাবিক প্রবণতা, ধ্বনির দিক্ দিয়ে ভাষাকে দুর্ব্বল করার দিকে নয়। উচ্চারণের কথায় ফিরে আসা যাক্। এটা সকলেই স্বীকার করবেন, যে, সরবতের মত ক'রে পর্বত আমরা বলি না, যদি বলি ত পর্ব্বতের অপমান করা হয়। তেমনি সূর্য্যকে সুয বললেও তার অত্যন্ত অবমাননা হয় ব'লে আমার ধারণা।

৩। বলতে পারেন, পর্বত লিখে পর্ব্বত উচ্চারণ করতে বাধা নেই। কিন্তু ওটা বেশীদিন চলে না। বানান যেমন উচ্চারণের অনুগামী হবার চেষ্টা করে, উচ্চারণেরও তেমনি একটা চেষ্টা থাকে বানান অনুসারী হবার। আর সেইটে হওয়াই বাঞ্ছনীয়। সুতরাং যে বানান আমরা গ্রহণ করব, কথাগুলোর উচ্চারণও সেই বানান-অনুযায়ী হবে, এইটে আমাদের কাম্য কি না তা দেখা কর্ত্তব্য। রেফের জায়গায় দ্বিত্ব যেখানে যেখানে বিকল্পে হলেও বিধেয়, সেখানে সেখানে আমি স্বয়ং দ্বিত্ব উচ্চারণ ক'রে থাকি এবং আমার পরিচিত সকলকেই তা করতে শুনেছি। যাঁরা করেন না, সম্ভবতঃ তাঁদের সংখ্যা খুব বেশী নয়, তাঁরাও করবেন এইটেই কামনা করি। কিন্তু আমরা যদি পরামর্শের প্ররোচনায় ভুলে পর্বত, সুর্য, দুর্দান্ত, মার্তণ্ড, আশ্চর্য বানানগুলোকে ভাষায় চলতে দিই ত আমাদের পুত্রকন্যারা না হোক, তাদের পুত্রকন্যারা স্খলিত জিহ্বায় কথাগুলোকে পরবত, সুরয, দুরদান্ত, মারতণ্ড, আশ্চরয উচ্চারণ যদি করে ত তাতে আশ্চর্য্যান্বিত হবার কিছু থাকবে না। বাংলা কথ্য ভাষার পক্ষে সে এক মহা দুর্দ্দিন হবে ব'লে আমার বিশ্বাস। সরলীকরণ সর্ব্ব ক্ষেত্রেই যে বাঞ্ছনীয় তাও নয়। রবীন্দ্রনাথের চেয়ে রবিবাবু বলা এবং লেখা দুই-ই সহজ, কিন্তু আজকাল তা আর কেউ বলেন না বা লেখেন না।

৪। দ্বিত্ব বর্জ্জন কেউ কেউ কোথাও কোথাও করছেন ব'লে ছাপার কাজ বিন্দুমাত্রও সহজ হয়েছে ব'লে আমার মনে হয় না। রেফযুক্ত দ্বিত্ব উঠে যায়নি ব'লে সেই বানানের একাক্ষর রেফ যুক্ত টাইপ প্রত্যেক ছাপাখানায় রাখতে হয়। দ্বিত্ব বর্জ্জিত বানানের রেফযুক্ত একাক্ষর টাইপ রাখতে গেলে খরচ বাড়ে, এবং প্রায় কোথাও তা রাখা হয় না। ফলে একাক্ষর ব্যঞ্জন ও একটি রেফ পরপর সাজিয়ে কম্পোজ করতে হয় ব'লে কম্পোজিটরের কাজ বাড়ে আর স্বতন্ত্র রেফটি দু-তিন শ' মুদ্রণের পর প্রায়শঃই ভেঙে উড়ে যায়। লেখার কাজে সরল ও সহজ হয়েছে স্বীকার না ক'রে উপায় নাই, কিন্তু তাতে পরিশ্রম যেটুকু বেঁচেছে তার পরিমাপ অতিসূক্ষ্ম ইলেকট্রনিক যন্ত্রের সাহায্য না নিয়ে করা সম্ভব নয়। বিদ্রূপের অভিপ্রায় কথাটা লিখছি না।

৫। বাংলা বানানের সত্যিকারের যেগুলি সমস্যা সেগুলি সংখ্যায় এতই বেশী যে গুণে শেষ করা যায় না। ব্যাকরণানুমোদিত দ্বিত্ব বর্জ্জন করব, কি করব না, এ একটা সমস্যা ব'লে গণ্য হবার যোগ্যই নয়। তবু এ নিয়ে বিতর্কের অবকাশ আছে ব'লে যাঁরা মনে করেন, তাঁরা সংক্ষেপে তাঁদের বক্তব্য লিখে পাঠালে প্রবাসীতে সানন্দে আমরা ছাপব।

শ্রীসুধীরকুমার চৌধুরী।

বাঙ্গলা ও বাঙ্গালীর কথা
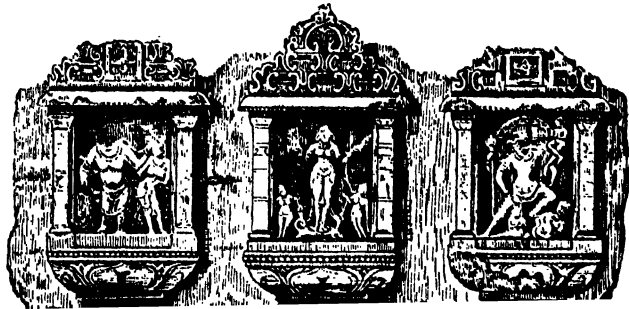
শ্রীহেমন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়

বিগত ৪ঠা সেপ্টেম্বরের কলঙ্কজনক হাঙ্গামা

বিগত ৪ঠা সেপ্টেম্বর শিয়ালদহ অঞ্চলে যে বিষম দাঙ্গা-হাঙ্গামা ঘটে, তাহার পূর্ণ বিবরণ সকল সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইয়াছে, কাজেই হাঙ্গামার ঘটনাবলীর বিশদ বর্ণনা অনাবশ্যক। এ বিষয়ে সংবাদপত্রের মন্তব্য কিছু কি উদ্ধৃত করিলেই যথেষ্ট হইবে। আনন্দবাজার পত্রিকা (৭-৯-৬২) মন্তব্য করিতেছেন :

"রেল-আইন লঙ্ঘনের অভিযোগে কে গ্রেপ্তার হইল, তাহার পদবী ও পরিচয় কি তাহা অনুসন্ধানের দায়িত্ব সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের। এই অত্যন্ত সাধারণ নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপারের ছুতা ধরিয়া রেল-কর্মচারী এবং কর্তব্যরত পুলিসের সঙ্গে দলবদ্ধভাবে বিরোধ বাধাইয়া একটা কুরুক্ষেত্র কাণ্ড যাহারা ঘটাইয়াছে তাহারা কোন্ মুখে জনসাধারণের সহানুভূতি ও সমর্থন পাইবার আশা করে? তার পর পুলিসের সহিত বিরোধের উৎসস্থল যখন শিয়ালদহ স্টেশন এবং বিরোধের সূত্র একজনমাত্র রেলযাত্রীকর্তৃক নিয়মলঙ্ঘনের অভিযোগ, তখন শিয়ালদহ স্টেশন ছাড়াইয়া মির্জ্জাপুর স্ট্রীট হইতে সার্কুলার রোড সংলগ্ন হ্যারিসন রোড পর্য্যন্ত খণ্ডযুদ্ধ, অগ্নিকাণ্ড এবং ধ্বংসলীলা বিস্তৃত হইল কেন? হাঙ্গামার কারণ নগণ্য, কিন্তু হাঙ্গামার সৃষ্টির ধরন ও তীব্রতা দেখিয়া কিছুমাত্র সন্দেহ থাকে না যাহারা দীর্ঘকাল এইসব কাজে হাত পাকাইয়াছে তাহারাই মঙ্গলবার শিয়ালদহ অঞ্চলকে লড়াইয়ের ময়দানে পরিণত করিয়াছে।

"কিন্তু মঙ্গলবারের জঘন্য কাণ্ডকারখানা সম্পর্কে পশ্চিমবঙ্গের তথাকথিত বামপন্থী নেতৃবৃন্দ যে ভূমিকা লইয়াছেন তাহা কলিকাতার বহুবিড়ম্বিত নাগরিকগণ কিছুতেই বরদাস্ত করিতে পারিবেন না। বামপন্থী নেতৃবৃন্দ তাঁহাদের বিবৃতিতে মহাবিজ্ঞ সবজান্তা সাজিয়াছেন; তাঁহারা বলিয়াছেন, দোষ পুলিসের, তৃতীয় শ্রেণীর মান্থলি টিকিটধারী জনৈক 'ছাত্রকে' পুলিস গ্রেপ্তার এবং মারপিট করে এবং পুলিসের "প্ররোচনামূলক" আচরণের ফলেই বিক্ষোভ দেখা দেয়। "বিক্ষোভ" শব্দটা বামপন্থী বিচারে একেবারে গঙ্গাজলে ধোয়া তুলসীপাতার মত সর্ব্বদোষমুক্ত। এতএব এই "পবিত্র" বিক্ষোভের ঠেলায় তেরোখানি ট্রাম যে পুড়িল, রাজপথ লড়াইয়ের ময়দানে পরিণত হইল, হাজার হাজার নরনারীর দুর্ভোগের সীমা থাকিল না, তাহার জন্য বামপন্থী নেতারা নিন্দা দূরের কথা, সামান্য দুঃখ পর্য্যন্ত প্রকাশ করেন নাই। তাঁহারা সংশ্লিষ্ট অফিসারগণের যথাসাধ্য শাস্তি দাবি করিয়াছেন, কারণ সবজান্তা বামপন্থী নেতাদের সূক্ষ্ম, অতিসূক্ষ্ম বিচারে অফিসারগণই উস্কানিদাতা। কিন্তু সত্য-সত্যই উস্কানি দিতেছেন কাহারা?

"শিয়ালদহ স্টেশনের ঘটনায় জড়িত তৃতীয় শ্রেণীর মান্থলি টিকিটধারী ব্যক্তি, যাহাকে লইয়া হাঙ্গামার সূত্রপাত সে সত্য সত্যই 'ছাত্র' কিনা বামপন্থী নেতাগণ তাহা নিশ্চিতভাবে জানিলেন কি উপায়ে? অভিযুক্ত ব্যক্তিকে 'ছাত্র' বলিয়া চালাইয়া দিলেই কি ট্রাম-বাস পোড়ান ইত্যাদি গুণ্ডামি ন্যায়সঙ্গত বলিয়া মানিতে হইবে? বামপন্থী নেতাদের বিবৃতির ভঙ্গি ও বক্তব্য প্রায় ঐ রকম। অর্থাৎ পুলিসের ঘাড়ে সব দোষ চাপাইয়া, হাঙ্গামার নিন্দাসূচক একটি কথাও না বলিয়া এবং প্রকৃত ঘটনা বিকৃত করিয়া বামপন্থী নেতারাই আরও হাঙ্গামা এবং ছাত্রবিশৃঙ্খলার উস্কানি দিতেছেন। মঙ্গলবারের অবাঞ্ছিত হাঙ্গামার জন্য কলিকাতার নাগরিকগণ স্বভাবতই উত্ত্যক্ত ও ক্রুদ্ধ হইয়াছেন; এবং ... বামপন্থী নেতৃবৃন্দের দায়িত্বহীন, ছলনাপূর্ণ আচরণও তাঁহারা নিশ্চয়ই কিছুতেই ক্ষমা করিবেন না।"

এ-বিষয়ে যুগান্তরের (৬-৯-৬২) অভিমত :

"ঐ ব্যক্তির আসল পরিচয় না জানিয়া এভাবে উত্তেজনা সৃষ্টি যেমন অভাবনীয়, তেমনি গত মঙ্গলবারের এই ঘটনায় পুলিসের অকর্মণ্যতাও ছিল অভিনব। গোড়ায় যাহা 'ছাত্র বিক্ষোভ'রূপে প্রতিভাত হয়েছিল, শেষ পর্য্যন্ত গিয়া পৌঁছিল নিছক গুণ্ডামিতে এবং আমাদের বিশ্বাস গুণ্ডামির এই অগ্নিকাণ্ডে ছাত্রদের কোন হাত ছিল না। তাদের বিক্ষোভ ও উত্তেজনার সুযোগ লইয়া শিয়ালদহ অঞ্চলের গুণ্ডাশ্রেণী (ইহারা কোন্ সম্প্রদায়ভুক্ত, পুলিস তাহা জানাইবেন কি?) একেবারে পাইয়া বসিল; দিব্যি মনের আনন্দে তারা ১৩ খানা ট্রাম গাড়ী (কোচ) জ্বালাইয়া পোড়াইয়া দিল, আর উপস্থিত দণ্ডায়মান পুলিস প্রশান্ত চিত্তে দেখিতে (কিম্বা উপভোগ করিতে?) লাগিল!

"ঘটনার উৎপত্তি একটা তুচ্ছ, এমন কি ভুয়া ব্যাপার হইতে। তৃতীয় শ্রেণীর টিকেটসহ প্রথম শ্রেণীতে ভ্রমণকারী ব্যক্তিকে 'ছাত্র' না বলিয়া যাত্রী বলা উচিত ছিল। কারণ, তাকে ছাত্র হিসাবে গ্রেপ্তার করা হয়

ঘটনাটি কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়ের নহে), হইয়াছে 'বিনা টিকেটের প্রথম শ্রেণীর যাত্রী' হিসাবে, যাহা সম্পূর্ণ আইনসঙ্গত। (বিনা টিকেটের যাত্রীকে গ্রেপ্তার না করিলে কিম্বা তার কাছ হইতে উপযুক্ত মাশুল আদায়ের চেষ্টা না করিলে এম-এল-এ'গণই রেলকর্ম্মচারীদিগকে পুনরায় দুর্নীতিগ্রস্ত বলিয়া গালাগালি করিতেন !) দ্বিতীয়তঃ দেখা যাইতেছে যে, কোন বিরোধ বা বিক্ষোভ সংঘটিত হইলেই শেষ পর্য্যন্ত সেই বিক্ষোভকে নিয়মতান্ত্রিক সীমানার মধ্যে রাখা যায় না, কি রহস্যজনক ভাবে উহা সমাজবিরোধী উচ্ছৃঙ্খল গুণ্ডার হাতে গিয়া পড়ে। মোট কথা মঙ্গলবারের সমগ্র ঘটনাটাই দস্তুরমত একটা কেলেঙ্কারি এবং এই কেলেঙ্কারির সঙ্গে জড়িত পুলিস, গুণ্ডা ও ছাত্রের দল। দুর্ভাগ্যক্রমে রাজনৈতিক নেতারাও এই কেলেঙ্কারির সমগ্র রূপ উপলব্ধি করিতে পারেন নাই, যার ফলে তাঁদের বিবৃতি ছাত্রদের বিক্ষোভে ইন্ধন জোগাইয়াছে মাত্র। আমাদের সমাজ-জীবন কোথায় গিয়া পৌঁছিয়াছে এবং ভিতরে ভিতরে কিরূপ ভয়ঙ্কর দাহ্য পদার্থ সঞ্চিত হইয়াছে, শিয়ালদহের লঙ্কাকাণ্ড তারই অন্যতম প্রমাণ। কিন্তু পুলিস, গভর্ণমেণ্ট, নেতৃবৃন্দ ও যুবক সাধারণ এই সমস্ত দুর্ঘটনা হইতে সাবধান হইবেন কি ?"

এইবার দেখুন নিপীড়িত জনগণের রক্ষক বা ট্রাষ্টি "স্বাধীনতার" (৫।৯।৬২) চিরাচরিত অনৃতভাষণ :—

"...আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস ঘটনার এই উদ্বেগজনক পরিণতি অবশ্যই রোধ করা যাইত। শিয়ালদহ স্টেশনে লাঠি চার্জ্জের পরেই বিরোধী দলের নেতা শ্রীজ্যোতি বসু মুখ্যমন্ত্রীকে টেলিফোনযোগে অনুরোধ (আদেশ ?) করেন— অবিলম্বে সরকারের একজন দায়িত্বশীল ব্যক্তিকে ঘটনাস্থলে প্রেরণ করিয়া পরিস্থিতির অবসান ঘটাইবার ব্যবস্থা করুন। তাহা করা হয় নাই। সুতরাং পরিষ্কার দেখা যাইতেছে পরবর্ত্তী ঘটনাগুলি ঘটিতে দেওয়া হইয়াছে (অপূর্ব্ব যুক্তি !)। উত্তেজনা প্রশমনের ব্যবস্থা না করিয়া পুলিস বারে বারে টিয়ার গ্যাসের আক্রমণ চালায়। পুলিশের আক্রমণে বহু ছাত্র ও পথচারী আহত হন। পুলিস শুধু এই একটি পথই জানে, অবস্থাকে শান্ত করিবার পথ তাহারা গ্রহণ করিতে জানে না। মুখ্যমন্ত্রী নিয়মিত জন-সংযোগের অভিনব পন্থা গ্রহণ করিয়াছেন, কিন্তু গতকাল যদি ছাত্রদের ও জনগণের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া তাঁহাদের অভিযোগের তদন্তের আশ্বাস দিতেন তাহা হইলে অবিলম্বে ঘটনাটি মিটিয়া যাইত। ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। ইহাকেই বলে প্রকৃত জন-সংযোগের পন্থা।

"...ছাত্রদের প্রহার করার অধিকার পুলিসকে কে দিয়াছে ? যে সকল পুলিস ছাত্রদের প্রহারের জন্য দায়ী তাহাদের অবিলম্বে শাস্তিদান করিতে হইবে। ধৃত ব্যক্তিদের কালবিলম্ব না করিয়া মুক্তি দিতে হইবে। ইহা দেশবাসীর (?) অত্যন্ত ন্যায়সঙ্গত ও প্রাথমিক দাবি। মুখ্যমন্ত্রী ছাত্রদের অভিযোগের তদন্তের আশ্বাস দিয়াছেন। তিনি অবিলম্বে ইহা কাজে পরিণত করুন।" (না করিলে ?)

"স্বাধীনতা" হাঙ্গামার দীর্ঘ ফিরিস্তি প্রকাশ করেন, কিন্তু হাঙ্গামার দিন এবং তাহার পরের দিন ছাত্রদের দ্বারা সাংবাদিক নিগ্রহের ঘটনাগুলি বেমালুম চাপিয়া গিয়াছেন—কেন ? কিসের কারণ ? জনগণমন অধিনায়ক শ্রীজ্যোতি বসুও এবিষয় নীরব কেন ? মহান নেতা জ্যোতি বসু মুখ্যমন্ত্রীকে ফোন করিতে পারিলেন, তিনি নিজে কেন অকুস্থলে একবার পদার্পণ করিয়া মারমুখী ছাত্রদের এবং জনতাকে শান্ত করিবার চেষ্টা করিলেন না ? কে তাঁহাকে নিষেধ করিয়াছিল ? কর্ত্তব্য কি একলা মুখ্যমন্ত্রীর ? 'বিশিষ্ট' নাগরিক, বিধান সভার বিরুদ্ধদলের নেতা হিসাবে জ্যোতি বসুর কি এ বিষয় কোন কর্ত্তব্য ছিল না ?

হাঙ্গামার সমস্ত দায়িত্ব এবং দোষ পুলিসের উপর অযথা চাপাইয়া দিয়া তিনি দলবিশেষের বাহবা পাইতে পারেন, কিন্তু চিন্তাশীল ভদ্রজনের কাছে তাঁহার সম্মান বৃদ্ধি পাইবে না। অবশ্য ভদ্রজনের কাছে তাঁহার সম্মান যদি কিছু থাকে।

দেশে আজ পর্য্যন্ত যত প্রকার দাঙ্গা হাঙ্গামা এবং হৈ-হল্লা হইয়াছে, কোন ক্ষেত্রেই শ্রীজ্যোতি বসু এবং তাঁহার দলের প্রচার-বাহন 'স্বাধীনতা'—হাঙ্গামাকারীদের কোন ক্ষেত্রেই কোন দোষ দেখিতে পান নাই। তাঁহার এবং তাঁহার দলীয় দৈনিক পত্রিকার দ্বারা চোখে পড়ে কেবল "মালিকের নির্ম্মম নির্দ্দয়" ও "পুলিসের নারকীয়" অত্যাচার !

এইবার যথাযোগ্য এবং যথা বিহিত ব্যবস্থা অবলম্বিত না হইলে, একদিকে বামপন্থীদের উস্কানিতে শ্রমিকদের নানা বিক্ষোভের ফলে পশ্চিমবঙ্গের কলকারখানা, ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান এমন কি কলেজ, স্কুল, হাসপাতাল প্রভৃতি ক্রমে সবই বন্ধ হইবে ! সাধারণ জনগণের জীবনও সর্ব্বপ্রকারে অতিষ্ঠ ও বিপদসঙ্কুল হইয়া উঠিবে।

ছাত্র সমাজের প্রতি আমাদের আবেদন, তাঁহারা স্থির ভাবে চিন্তা করিয়া দেখুন—দেশ কোন্ পথে যাইতেছে।

নিজেদের কল্যাণের পথ তাঁহারা ইচ্ছা করিলেই খুঁজিয়া পাইবেন। অদৃশ্য বা দৃশ্য হস্তের উস্কানিতে ছাত্রদের নৃত্য করা তাঁহাদের পক্ষে সম্মানজনক নহে।

গবাদি পশুর যত্ন

কিছুকাল পূর্ব্বে বেলগাছিয়ায় নূতন দুগ্ধ-উৎপাদন প্রতিষ্ঠান উদ্বোধনকালে পশ্চিমবঙ্গের প্রিয় মুখ্যমন্ত্রী বলেন যে —দেশে দুগ্ধ উৎপাদন বৃদ্ধি করিতে হইলে গবাদির যথাযথ যত্ন লওয়া একান্ত আবশ্যক। ইহা পরম যুক্তিযুক্ত কথা এবং সকল সম্প্রদায়ের সকল শ্রেণীর মানুষ ইহা সমর্থন করিবে, করা কর্ত্তব্য। এই প্রসঙ্গে কলিকাতা এবং বৃহত্তর কলিকাতা অঞ্চলে গবাদি পশুর কি প্রকার যত্ন লওয়া হইয়া থাকে, সে বিষয় গুটিকয়েক কথা মুখ্যমন্ত্রী মহাশয়ের নিকট নিবেদন করিতে চাই।

(১) কলিকাতায় যে সকল খাটাল এখনও রহিয়াছে, সেখানে "ফুকা" দ্বারা অতিরিক্ত দুগ্ধ নিষ্কাশন এখনও পূর্ণমাত্রায় চলিতেছে। "ফুকা"—গরুর পক্ষে কি যন্ত্রণাদায়ক তাহা হয়ত অনেকেরই জানা নাই। ইহার দ্বারা গরুকে সাধ্যের অতিরিক্ত দুগ্ধ দিতে বাধ্য করা হয় এবং ইহার ফলে গরু দু-তিন বছর, কিংবা তাহারও কম সময়ে "শুষ্ক" হইয়া যায় এবং "শুষ্ক গরু"কে পোষণ করা লাভজনক নহে বলিয়া ভালো ভালো গরু গো-পূজকরা কসাইয়ের নিকট বিক্রয় করিয়া দেয়। বলা বাহুল্য—শতকরা ৯৯টি খাটালের মালিক বিহারী এবং উত্তর প্রদেশের হিন্দু গোয়ালা। ইহারা গরুকে গো-মাতা বলিয়া পূজা করে। মাতার প্রতি সন্তানের এমন ভক্তি পৃথিবীর অন্য দেশে বিরল।

কলিকাতায় সি-এস-পি-সি-এ (কলিকাতা পশুক্লেশ নিবারণী সমিতি) নামক একটি প্রতিষ্ঠান আছে। ব্রিটিশ আমলে এই সমিতির সম্পাদিকা ছিলেন একজন ইংরেজ মহিলা—বোধহয় মিসেস্ ষ্ট্যান্‌লী। এই দুঃসাহসী মহিলা ভোর প্রায় আড়াইটা তিনটার সময় সঙ্গে কয়েকজন প্রতিষ্ঠানের কর্ম্মীকে লইয়া প্রায়ই মাণিকতলা, বেলেঘাটা প্রভৃতি অঞ্চলের খাটালে হানা দিতেন গোয়ালাদের "ফুকা" ধরিবার জন্য। অসংখ্য "ফুকা" কেস তিনি ধরেন এবং ফুকাদানকারী গোয়ালাদের আদালতে হাজির করিয়া তাহাদের যথাযোগ্য দণ্ডেরও ব্যবস্থা করেন। সাক্ষাৎ ভাবে আমি এইরূপ হানা দেওয়ার বহু ঘটনার কথা জানি।

সেই সময়কার অবাঙ্গালী গোয়ালারা স্বার্থ রক্ষার জন্য খুন জখম করিতে সিদ্ধহস্ত ছিল, কিন্তু মিসেস ষ্ট্যান্‌লী (?) নিজের জীবন বিপন্ন করিয়াও কর্ত্তব্যে অটুট ছিলেন। একজন অবলা নারীর পক্ষে যাহা ছিল সহজসাধ্য, বর্ত্তমান সি-এস-পি-সি-এর বলবান পুরুষ কর্ত্তাদের পক্ষে তাহা বোধহয় চিন্তা করাও অসম্ভব। সাহসের অভাবই ইহার একমাত্র কারণ।

(২) কলিকাতার মধ্যস্থিত এবং শিয়ালদহ (দক্ষিণ) রেললাইনের পাশে অনেকগুলি খাটাল আছে। এই খাটালগুলির অবস্থা কি তাহা চোখে না দেখিলে সম্যক্ বুঝা কাহারও পক্ষে সম্ভব নহে। এই সব খাটালে—প্রথম প্রবেশের দিন হইতে গরু-মহিষগুলিকে যে খোঁটায় প্রথম বাঁধা হয়, কসাইয়ের হাতে যাওয়ার কিংবা মৃত্যুর পূর্ব্বে সে বাঁধন আর খোলা হয় না। শীত গ্রীষ্ম বর্ষা—সকল ঋতুতেই খোলা আকাশের নীচে গরু-বাছুর এবং মহিষগুলি পড়িয়া থাকে। গ্রীষ্মে প্রচণ্ড রৌদ্রতাপ তাহাদের মুখ বুজিয়া সহ্য করিতে হয়। বর্ষাকালে এক/দেড় হাত কাদায় তাহাদের সর্ব্বক্ষণ দাঁড়াইয়া কাটাইতে হয়—এ দৃশ্য একবার যিনি দেখিয়াছেন, জীবনে কোনদিন তাহা ভুলিবেন না। শীতকালেও রাত্রের হিম, ঠাণ্ডা বাতাস এই সব অবলা জন্তুদের উপর দিয়া যায়। এই সময় কত বাছুর যে মারা যায় তাহার ইয়ত্তা নাই।

(৩) গোয়ালারা বাছুর এবং মহিষশাবকগুলিকে জন্মের পর তিন-চার মাসের বেশী জীবন্ত থাকিতে দেয় না, কারণ ইহাতে তাহাদের ভীষণ লোকসান।

(৪) খাটালগুলির ভিতরের এবং পারিপার্শ্বিক অবস্থা এক কথায় নারকীয়, তবে খাস নরকও (দেখি নাই) বোধ হয় খাটালগুলির মত 'নারকীয়' নয়। এই নারকীয় স্থান হইতে দুগ্ধ সংগৃহীত হয় এবং শহরবাসীরা 'খাঁটি' গো-দুগ্ধ পান করেন। গরুগুলি অবশ্যই খাঁটি। গোয়ালারা নোংরা বালতিতে ৩।৪ সের দুগ্ধ ভরিয়া তাহাতে এঁদো পুকুর এবং রাস্তার খোলা হাইড্রাণ্ট হইতে ইচ্ছামত জল মিশ্রিত করে এবং ইহার ফলে যে গোয়ালা ৪ সের দুধ লইয়া বাহির হয়, ঘণ্টা কয়েকের মধ্যেই সে কমপক্ষে ৮ সের খাঁটি দুধ বিক্রয় করিয়া প্রত্যাবর্ত্তন করে, প্রতি সের চৌদ্দ আনা হইতে এক টাকা সের দরে! যে সব গোয়ালা দুধের দাম কম অর্থাৎ দশ এগারো আনা সের বিক্রয় করে, তাহারা

সের প্রতি অন্তত দেড় সের ময়লা জল দুধে ঢালে! এ খবর কতজন খাঁটি দুগ্ধপায়ী জানেন বলিতে পারি না। আরও বহু কিছু বলিবার আছে—কিন্তু বর্ত্তমানে স্থানাভাব।

মুখ্যমন্ত্রীর নিকট কাতর নিবেদন এই যে, তিনি তাঁহার বিশ্বস্ত লোক দিয়া খাটালগুলির অবস্থার সন্ধান লউন এবং অসহায়, অবলা গবাদি পশুগুলির জন্য সামান্য কিছু অন্তত করুন।

শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেনের মানবতায় বিশ্বাস করি এবং এই মানবতার কারণেই তিনি অসহায় পশুগুলির জন্য অবশ্যই কিছু করিবেন, এই বিশ্বাস রাখি।

বাঙ্গালীর খাদ্য ও খাদ্যের অভ্যাস

কিছুদিন পূর্ব্বে পশ্চিমবঙ্গের '৪০ বৎসরের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন' নূতন স্বাস্থ্য মন্ত্রী নব-বারাকপুরে এক ভাষণ প্রসঙ্গে বলেন যে:

বাঙ্গালীরা যাহা খায় তাহার অধিকাংশই স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকারক! বলা বাহুল্য ৪০ বৎসরের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ডাঃ জে, আর, ধর বাঙ্গালীর বর্ত্তমানের খাদ্যদ্রব্য সম্পর্কে এ-কথা বলেন নাই—বাঙ্গালী বরাবর যে-সকল খাদ্যদ্রব্য গ্রহণ করিয়া থাকে, তাহাই লক্ষ্য করিয়া এ-উক্তি।

গত ৪০ বৎসরের মধ্যে ডাঃ ধর পূর্ব্বে এ-কথা আর কখনও বলেন নাই। বাঙ্গালীর সাধারণ খাদ্যগ্রহণ করিয়াই এ-দেশে—রামমোহন, রামকৃষ্ণ, বঙ্কিমচন্দ্র, বিদ্যাসাগর, বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ, রামানন্দ, শ্রীঅরবিন্দ, সুরেন্দ্রনাথ, সুভাষচন্দ্র, বিধানচন্দ্র (এমন কি '৪০ বৎসরের অভিজ্ঞতাওয়ালা' ডাঃ জে, আর, ধরও) জীবনধারণ করেন এবং বাঙ্গালীর গৌরব বর্দ্ধন করিয়া যান। হায়! এইসব কীর্ত্তিমান পুরুষ একবারও ভাবিতে পারেন নাই যে, তাঁহারা অখাদ্য গ্রহণ করিয়া বাঁচিয়া আছেন! সত্যকার খাদ্য পাইলে তাঁহারা অবশ্যই আরও বড়, আরও কীর্ত্তিমান হইতে পারিতেন।

'৪০ বৎসরের অভিজ্ঞতা' যে ডাক্তারের আছে—তাঁহার কথা কখনই বাজে বা মিথ্যা হইতে পারে না। কিন্তু ডাঃ জে, আর, ধর বাঙ্গালীকে ক্ষতিকর "বাঙ্গালী-খাদ্য" খাইতে নিষেধ না করিয়া যদি বাঙ্গালীকে—খাইবার বদ অভ্যাস একেবারে পরিত্যাগ করিবার বাণী দিতেন—তাহা হইলে বাঙলার খাদ্য-সমস্যা মিটিত এবং কিছু কাজের কাজ হয়ত হইত। মন্ত্রিত্ব পাইলেই বাণী বিতরণের অধিকার লাভ হয়।

খাদ্যের অভ্যাস পরিবর্ত্তন

এ-বিষয় আমাদের নূতন মুখ্যমন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন তাঁহার এক ভাষণে বলেন যে—"আমাদের সকলকেই খাদ্যের অভ্যাস বদল করিতে সচেষ্ট হইতে হইবে। কেবল ভাতের উপর জোর দিলে চলিবে না, অন্যান্য খাদ্যে অভ্যস্ত হইতে হইবে"—মুখ্যমন্ত্রীর একথা সর্ব্বতোভাবে গ্রাহ্য, কারণ বর্ত্তমান অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে অত্যন্ত যুক্তিযুক্ত পরামর্শ তিনি দিয়াছেন। এ বিষয়ে যুগান্তরের (১৯-৮-৬২) সম্পাদকীয় উল্লেখযোগ্য।

"...চাষী, কারিগর ও নিম্নবিত্ত সমস্ত বাঙ্গালীরই প্রধান এবং অনেক ক্ষেত্রে একমাত্র খাদ্য ভাত, আর তাহার সঙ্গে অল্প কিছু ডাল-তরকারি। মাংস-ডিম গরীবের কাছে লোভনীয় বস্তু, কালেভদ্রে জোটে। মাছটা আগে আহার্য্যের মধ্যে ছিল, এখন তা-ও মাংস-ডিমের সঙ্গ ধরিয়াছে। দুধ-ঘির কথা ওঠে না, তা সম্পন্ন লোকেরই পাতে পড়ে না। গরীবে আর খাইবে কি? কাজেই ভাতের বিকল্পে আমরা কি খাওয়ার অভ্যাস করিব? কোন্ খাদ্য খাওয়া আমাদের বেশীর ভাগ সাধারণ মানুষের ক্রয় সামর্থ্যে কুলাইবে এবং খাইলে আমাদের স্বাস্থ্য ও কর্ম্মশক্তি অটুট থাকিবে? কিন্তু ভাবিয়া দেখিলে বোঝা যাইবে, শ্রীসেন যুক্তিসম্মত কথাই বলিয়াছেন। ভাতের প্রতি আমাদের আত্যন্তিক অনুরাগ নিছক একটা গতানুগতিক অভ্যাসের দাসত্ব ছাড়া আর কিছু নয়। পর্য্যাপ্ত পরিমাণ চাউলের যেখানে অভাব আছে, আর ভূমির উৎপাদিকা শক্তি আশাতীত ভাবে বাড়ানো বা বাহির হইতে প্রয়োজনানুরূপ চাউল আনানো যেখানে রাতারাতি সম্ভব নয়, সেখানে ভাতের অভ্যাস সঙ্কুচিত করিয়া অন্য জাতীয় পরিপূরক খাদ্য গ্রহণে অভ্যস্ত হওয়া ছাড়া উপায় কি? এখন প্রশ্ন উঠিবে, কি সেই পরিপূরক খাদ্য এবং আনুপাতিক মূল্যে তা ভাতের সঙ্গে সমতা রক্ষা করিবে কি না? বলা বাহুল্য রুটি, ছাতু, চিড়া, সাধারণ পর্য্যায়ের ফলমূল, সব্জী, অকুলীন শ্রেণীর মাছ যে ভাতের সঙ্গে পরিপূরকরূপে অনায়াসেই ব্যবহার করা যাইতে পারে এবং দামের দিক হইতেও যে ইহারা অধিক আক্রা হইবে না, একথা নিশ্চয় ব্যাখ্যার প্রয়োজন

নাই। আসলে আমাদের রসনার বিশেষ বিশেষ শ্রেণীর খাদ্যের প্রতি পক্ষপাতই অন্যান্য খাদ্য গ্রহণের পথে সব চেয়ে বড় বাধা এবং এই বাধা সচেষ্ট হইলে আমরা সহজেই দূর করিতে পারি। আজ সময় আসিয়াছে, যখন এই প্রয়োজন সম্বন্ধে আমাদের সর্ব্বপ্রযত্নে অবহিত হইতে হইবে। অনেকে যুক্তি হিসাবে বলেন, আমাদের পাকযন্ত্র ভাত-ডাল ও তরিতরকারি গ্রহণে এমনি অভ্যস্ত যে, অন্য শ্রেণীর খাদ্য আমাদের শরীরে সহিবে না। একথাও খাঁটি নয়।……'

আশা করি আজ বাঙ্গালী-মাত্রেই মুখ্যমন্ত্রী শ্রীসেনের পরামর্শ গ্রহণ করিবেন এবং সাধ্যমত খাদ্যের অভ্যাস বদল করিয়া খাদ্য সমস্যার সমাধান চেষ্টা করিবেন।

শ্রীসেনকে ধন্যবাদ দিব এই কারণে যে, তিনি বাঙ্গালীর খাদ্যকে স্বাস্থ্যের ক্ষতিকারক বলিয়া বর্ণনা করেন নাই। অবস্থা বুঝিয়া ব্যবস্থার পরামর্শ মাত্র দিয়াছেন।

'বনেদী মন্ত্রী' এবং "কখনও কখনও" মন্ত্রার মধ্যে তফাৎ এইখানেই। একজন কথা বলেন বুঝিয়া আর অন্যজন বাণী দেন, না—।

সরকারী ছাপাখানার হাল

আনন্দবাজার পত্রিকায় (১১-৮-৬২) প্রকাশ :

"পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সাময়িকপত্র, সংখ্যাতত্ত্বের রিপোর্ট ইত্যাদি দিনের পর দিন ছাপাখানায় পড়িয়া আছে বলিয়া প্রকাশ, গত চৈত্র মাসের পর সরকারী মাসিকপত্র সমাজ শিক্ষার একটি কপিও বাহির হয় নাই। অথচ জানা গিয়াছে, শ্রাবণ পর্য্যন্ত ম্যাটার প্রেসে দেওয়া আছে।

"সরকারী সাপ্তাহিকপত্র 'কথাবার্ত্তা' এখনও একমাস করিয়া পিছনে পড়িয়া আছে। সংখ্যাতত্ত্বের রিপোর্টগুলিরও এই অবস্থা। দুই বৎসরের রিপোর্ট জমিয়া আছে অথচ নাকি প্রকাশ হয় নাই।

"বিশ্বস্তসূত্রে জানা গিয়াছে যে, সরকারী ছাপাখানায় প্রয়োজনীয় কর্ম্মচারী নাই অথচ প্রচুর কাজ আছে। ইহার ফলে একমাত্র বাজেটগুলি ছাড়া আর কিছু নিয়মিত ছাপা হইয়া ওঠে না।

"অথচ সরকারী নিয়ম নাকি এমনি যে, সরকারী প্রেস জবাব না দিলে অন্য প্রেসে কাজ দেওয়া যায় না।"

কেবল ছাপাখানারই দোষ, না অন্য কাহারও আছে?

পশ্চিমবঙ্গ সরকার কয়েকটি পত্রিকা প্রকাশ করেন—এবং এই সব পত্রিকার নিয়মিত প্রকাশের দায়িত্ব ন্যস্ত আছে "শ্রীপ্রকাশস্বরূপ মাথুর" নামক এক মহাশয় ব্যক্তির উপর। অবাঙ্গালী হইয়াও তিনি রাজ্য সরকারের বাঙ্গলা সাপ্তাহিক পত্রিকার সম্পাদক বলিয়া কথিত। সে-কথা যাউক—সরকারী ছাপাখানায় গরীব করদাতাদের অর্থের এই অপব্যয় কেন হইবে? কলিকাতায় বড় বড় ছাপাখানার অভাব নাই, তাহা সত্ত্বেও লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করিয়া স্বতন্ত্র একটা অকেজো শ্বেত হস্তী পুষিবার কোন যুক্তি নাই।

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের নিজস্ব (চলে করদাতাদের অর্থে) ছাপাখানা কোন্ বিশেষ মন্ত্রী মহাশয়ের আওতায় পড়ে জানি না। তবে এ-দিকে তাঁর দৃষ্টি দিবার সময় না থাকিলে দায়িত্ব ত্যাগ করেন না কেন?

এই সরকারই আবার বে-সরকারী কল-কারখানা ব্যবসার প্রতিষ্ঠান যথাযথ ভাবে ভালো করিয়া পরিচালনার বিষয়ে বহু উপদেশ-বাণী বিনামূল্যে বিতরণ করিয়া থাকেন!

বে-সরকারী ব্যবসা সংস্থায় শ্রমিক প্রতিনিধি

যুগান্তরে (৭-৮-৬২) প্রকাশ যে :

"বে-সরকারী ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের পরিচালনায় শ্রমিকদের প্রতিনিধিদের অংশ গ্রহণের ব্যবস্থা করিবার জন্য রাজ্য সরকার এই বৎসর আরও কুড়িটি সংস্থাকে নির্দ্দেশ দিয়াছেন। গত বৎসর ছয়টি ব্যবসায়ী সংস্থায় এই নিয়ম কার্য্যকরী করা হয়।

আজ রাজ্য সরকারের শ্রম দপ্তরের জনৈক মুখ্যপাত্র বলেন যে, ব্যবসায়ী সংস্থাগুলি ইচ্ছা করিলে পরিচালনার ব্যাপারে শ্রমিক প্রতিনিধি গ্রহণ করিতে পারেন বলিয়া প্রথমে সরকার অনুরোধ জানাইয়াছিলেন। কিন্তু এখন সরকারের পক্ষ হইতে নির্দ্দেশ জারী করা হইয়াছে।

প্রকাশ যে, সম্প্রতি দিল্লীতে অনুষ্ঠিত বিভিন্ন রাজ্যের শ্রমমন্ত্রীদের বৈঠকে স্থির হয় যে, প্রত্যেক স্তরের মধ্যে দিয়া শ্রম বিরোধের বিষয়টি আলোচিত না হইলে শ্রমমন্ত্রী হস্তক্ষেপ করিবেন না। শ্রম বিরোধের অবসানের কার্য্যাদি কেন বিলম্বিত হইতেছে, সে সম্পর্কে পশ্চিমবঙ্গ সরকার শীঘ্রই তথ্য অনুসন্ধান করিবেন বলিয়া জানা গিয়াছে।"

জানা গিয়াছে যে, ধর্ম্মঘট প্রভৃতি কারণে ১৯৬১ সালের জানুয়ারী হইতে জুন মাস পর্য্যন্ত পশ্চিমবঙ্গে ৯ লক্ষ ৩১ হাজার 'ম্যান-ডে'জ-এর ক্ষতি হইয়াছিল। কিন্তু এই বৎসর তাহা হ্রাস পাইয়া ৭ লক্ষ 'ম্যান-ডে'জ-এ দাঁড়াইয়াছে। উক্ত সরকারী মুখপাত্র মন্তব্য করেন যে, এই বৎসরে চট কলগুলির কাজ স্বাভাবিকভাবে চলায় 'ম্যান-ডে'জ-এর ক্ষতি কম হইয়াছে।

সরকারী ব্যবসায় সংস্থাসমূহ শ্রম সম্মেলনের সিদ্ধান্ত স্বীকার করিয়া লইয়াছেন বলিয়া জানা গিয়াছে।

দুর্গাপুর ইস্পাত কারখানা পরিচালনায় শ্রমিক প্রতিনিধি গ্রহণ করার নির্দ্দেশ দেওয়া হইবে কিনা, রাজ্য সরকার তাহা বিবেচনা করিবেন।—

খুবই যুক্তিযুক্ত নির্দ্দেশ, কিন্তু এ-নির্দ্দেশ হইতে সরকারী ব্যবসায় সংস্থাগুলি বাদ পড়িল কেন? এ-সব প্রতিষ্ঠানের গলদ বে-সরকারী প্রতিষ্ঠান হইতে অধিক বলিয়াই কি?

ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানে, পরিচালনা ব্যাপারে শ্রমিক প্রতিনিধি থাকা হয়ত ভাল, কিন্তু এই সব শ্রমিক প্রতিনিধি কি 'প্রকৃত' শ্রমিক প্রতিনিধি হইবেন, না বিশেষ এক পার্টির নির্ব্বাচিত লোকেরা? আমাদের এ-আশঙ্কা যদি সত্য হয়, তাহা হইলে কল্যাণ অপেক্ষা অকল্যাণই বেশী হইবে। কারণ পার্টি বিশেষের কর্ম্মীরা যে-সব প্রতিষ্ঠানে কোন গোলমাল নাই, মালিক-শ্রমিকে কোন বিরোধ নাই, সেই সব প্রতিষ্ঠানেও গোলমাল বাধাইতে এবং কথা নাই বার্ত্তা নাই হঠাৎ "দাবী মানতে হবে" ধ্বনি তুলিতে সদা তৎপর। ইঁহারা শ্রমিক-মালিক বিরোধ সৃষ্টি করাকেই শ্রমিক কল্যাণ বলিয়া মনে করেন। ট্রেড ইউনিয়নগুলিকে রাজনৈতিক দলের প্রভাব এবং নিয়ন্ত্রণ মুক্ত করিতে না পারিলে—প্রকৃত ট্রেড ইউনিয়ন তথা শ্রমিক কল্যাণ কখনও হইবে না। রাজনৈতিক দল বলিতে আমরা সকল দলকেই মনে করিতেছি, কাহাকেও বাদ দিতেছি না।

ট্রেড ইউনিয়ন হইতে সর্ব্বপ্রথম পেশাদার ইউনিয়ন নেতাদের ঝাঁটাইয়া তাড়াইতে হইবে। ইহারা প্রকাশ্যে শ্রমিক কল্যাণকামী, গোপনে রাতের অন্ধকারে মালিকের ঘনিষ্ঠ বন্ধু। দু-দিক হইতেই প্রচুর অর্থ উপার্জ্জন করে। কথাগুলি ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা হইতে বলা হইল।

চোলাই মদ

সম্প্রতি প্রকাশিত একটি সংবাদে জানা যাইতেছে যে, চোলাই মদ বিক্রয় বন্ধ করিবার জন্য বর্ত্তমান আইনের অবিলম্বে সংশোধন করা হইবে বলিয়া নির্ভরযোগ্য সূত্রে জানা গিয়াছে।

চোলাই মদ বিক্রয়ের পরিমাণ ভয়াবহভাবে বৃদ্ধি পাইবার কারণ অনুসন্ধানের জন্য রাজ্য সরকার ইতিমধ্যেই এক কমিটি নিয়োগ করিয়াছেন। সরকারের জনৈক মুখপাত্র বলেন যে, আইনে অপরাধীদের শাস্তি দিবার যে ব্যবস্থা আছে, তাহা সামান্য। সরকার শাস্তির পরিমাণ বৃদ্ধির কথা চিন্তা করিতেছেন।

কিন্তু চিন্তা মুক্ত হইয়া সরকার বাহাদুর কবে ব্যবস্থা অবলম্বন করিবেন, প্রকাশ নাই।

আর একটি কথা, সরকার কি কেবল চোলাই মদ 'বিক্রয়' বন্ধ করিবার বিরুদ্ধে আইন করিবেন—অর্থাৎ—চোলাই মদ 'প্রস্তুতের' বিরুদ্ধে কিছু করা হইবে না, এই অর্থ আমরা করিতে পারি কি?

কোন দেশে কেবল আইন করিয়া মদ্যাদি প্রস্তুত এবং বিক্রয় বন্ধ করা আজ পর্য্যন্ত সম্ভব হয় নাই। এমন কি প্রবল শক্তিধর মার্কিন রাষ্ট্রও এ বিষয়ে বিফলতাই অর্জ্জন করেন।

সুরা এবং অন্যান্য মাদক দ্রব্যের বিরুদ্ধে সত্যকার জনমত যদি গঠন করা না যায়, এসব মাদক দ্রব্যের দ্বারা মানুষ এবং সমাজের কি এবং কতখানি ক্ষতি হইতেছে, তাহা শিক্ষা এবং প্রচার দ্বারা যদি সাধারণকে না বুঝান যায়, তাহা হইলে শত প্রকার আইনেও এ পাপ নিবারণ করা যাইবে না। সরকার ইহা ভাল করিয়া জানেন, কিন্তু উপরে অবস্থিত কর্ত্তাদের মেজাজ বুঝিয়া কাজ করিতে হইবেই—তাহা যতই অসার হউক না কেন।

কলিকাতা পৌরসভার উন্নতিকল্পে কমিশনারের সুপারিশ

কলিকাতা পৌরসভার বর্ত্তমান কমিশনার রাজ্য সরকারের নিকট একটি ১২ দফা কার্য্যসূচী প্রেরণ করিয়াছেন। এগুলি কার্য্যকরী হইলে কর্পোরেশনের প্রশাসনিক ক্ষেত্রে বিরাট পরিবর্ত্তন হইবে। প্রস্তাবগুলি মোটামুটি হইল:

কমিশনার ষ্ট্যাণ্ডিং কমিটির সংস্থা হ্রাস করিবার জন্য অবিলম্বে ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে বলিয়াছেন। বর্ত্তমান কর্পোরেশনে দশটি ষ্ট্যাণ্ডিং কমিটি কাজ করিতেছে। প্রকাশ যে, কমিশনার মনে করেন, এতগুলি ষ্ট্যাণ্ডিং কমিটি থাকায় অনেক কাজ ত্বরান্বিত করার পথে বিঘ্ন সৃষ্টি হইতেছে।

রাজ্য সরকার বর্ত্তমানে কমিশনারের সুপারিশসমূহ বিশেষভাবে বিবেচনা করিয়া দেখিতেছেন। সরকারের জনৈক মুখপাত্র বলেন যে, আইনে ষ্ট্যাণ্ডিং কমিটির সংখ্যা সম্পর্কে কোন উল্লেখ নাই।

কমিশনারের সুপারিশসমূহ অর্থ বিষয়ক ষ্ট্যাণ্ডিং কমিটির নিকট বিবেচনার জন্যও প্রেরণ করা হইয়াছে বলিয়া জানা গিয়াছে।

কর্ম্মচারী নিয়োগ

আইনে উল্লিখিত বড় বড় অফিসারদের নিয়োগ, উন্নতি, সাময়িকভাবে বরখাস্ত করিবার পূর্ব্বে সরকারের অনুমোদনের প্রয়োজন আছে। আর কমিশনার ছয় শত টাকা পর্য্যন্ত বেতনের অফিসার এবং কর্ম্মচারী নিয়োগের ক্ষমতা নিজেদের হাতে লইতে চাহিয়াছেন। বর্ত্তমানে কমিশনার ২৫০ টাকার কম বেতনের কর্ম্মচারী নিয়োগ করিতে পারেন। তাঁহার হাতে যদি ছয় শত টাকা পর্য্যন্ত বেতনের কর্ম্মচারী নিয়োগের ক্ষমতা দেওয়া হয়, তবে বাস্তবক্ষেত্রে কর্পোরেশনের শতকরা ৯০ জন কর্ম্মচারী নিয়োগের ক্ষমতাই কমিশনারের হাতে চলিয়া যাইবে বলিয়া পর্য্যবেক্ষক মহল মনে করিতেছেন।

কমিশনার আরও প্রস্তাব করিয়াছেন, প্রয়োজন হইলে প্রধান প্রধান পদের জন্য রাজ্য সরকারের অফিসারদের আনিয়া নিয়োগ করা যাইতে পারে। দৈনন্দিন সকল কাজ দেখাশুনা করিবার জন্য কমিশনারের রুটিন কাজের বাহিরে রাখিতে বলা হইয়াছে। রুটিন কাজ দেখাশুনা করিবার উদ্দেশ্যে কমিশনারকে প্রদত্ত ক্ষমতা অন্যান্য ডেপুটি কমিশনারের মধ্যে বন্টন করিতে বলা হইয়াছে।

মোটর ইঞ্জিনীয়ারিং জানা কোন কর্ম্মচারীকে মোটর ভিইকলস্ বিভাগের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট পদে নিয়োগ অথবা ডাইরেকটার পদ সৃষ্টি করিবারও সুপারিশ করা হইয়াছে। তাহা ছাড়া চীফ্ ইঞ্জিনীয়ার এবং ইণ্টালী ওয়ার্কশপের ম্যানেজার পদটি স্থায়ীভাবে পূরণ করিবার জন্য অবিলম্বে ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে বলিয়া কমিশনার মনে করেন।

দশ হাজার টাকা পর্য্যন্ত নগদ এবং পঁচিশ হাজার টাকা পর্য্যন্ত পরিকল্পনা মঞ্জুর করিবার ক্ষমতা কমিশনার নিজের হাতে রাখিতে চাহেন।

আরও প্রস্তাব করা হইয়াছে যে, কমিশনার ইচ্ছা করিলে যে কোন বিষয় ষ্ট্যাণ্ডিং কমিটি বা কর্পোরেশনের বৈঠকের কর্ম্মসূচীর অন্তর্ভুক্ত করিতে পারিবেন। ষ্ট্যাণ্ডিং কমিটিতে গৃহীত প্রস্তাবসমূহ একপক্ষকালের মধ্যে কর্পোরেশনের বৈঠকে উত্থাপনের কথাও বলা হইয়াছে। আর ১৭ (জি) নং ধারাটি আইন হইতে বাদ দিবার জন্য কমিশনার সুপারিশ করিয়াছেন।

কর্পোরেশনের নূতন কমিশনার মহাশয় যে সব সুপারিশ করিয়াছেন তাহা কার্য্যকরী করা হয়ত বর্ত্তমান অবস্থায় একান্ত প্রয়োজন, এবং এ প্রয়োজন বর্ত্তমান (নির্ব্বাচিত) কাউন্সিলারদের কৃত (বা অকৃত) পাপের প্রায়শ্চিত্ত। এই সব কাউনসিলার শহরের অবশ্যপ্রয়োজনীয় কার্য্যাদি ব্যতিরেকে আর সব কাজেই বিষম তৎপরতা দেখাইয়াছেন। আর ইহাই স্বাভাবিক, কারণ কর্পোরেশনের অতি প্রয়োজনীয় একটি ষ্ট্যাণ্ডিং কমিটির সভাপতিপদে এমন একজন ব্যক্তি আছেন, যে মহাপ্রভু নিজেদের পৈতৃক ব্যবসায়টিকে লাটে তুলিয়া দিতে সক্ষম হইয়াছেন এই ব্যক্তি এবং অন্যান্য আরও অনেক সমশ্রেণীর মহাশয় ব্যক্তি কর্পোরেশনকেও তাঁহাদের পৈতৃক জমিদারী মনে করিয়া এই প্রতিষ্ঠানকেও প্রায় লাটে তুলিবার অবস্থায় আনিয়াছেন!

স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানে, আমরা বাধ্য হইয়া কমিশনার মহাশয়ের প্রস্তাব সমর্থন করিতেছি—কর্পোরেশনের 'পীড়িত' অবস্থা দেখিয়া।

প্রস্তাবিত তালিকায় আমরা কিছু যোগ করিতে চাই—কলিকাতা কর্পোরেশনের বর্ত্তমান কাউনসিলারদের অবিলম্বে 'লাল বাড়ী' হইতে আইন করিয়া বাহির করিয়া দিয়া ধাপা অঞ্চলে কোন ব্যারাক বাড়ীতে চালান করা হউক। ইহারা নোংরামীর যে দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছেন, তাহাতে ইঁহাদের যোগ্য বাসস্থান একমাত্র ধাপা অঞ্চল,

প্রস্তাবিত আইনে ইহাও থাকিবে যে, এই সকল কাউনসিলারকে আগামী ২০০ বছরের জন্য নির্ব্বাচনে দাঁড়াইবার এবং নির্ব্বাচিত হইবার যোগ্যতা হইতে বঞ্চিত করা হইল। কর্পোরেশনের তথা করদাতাদের কল্যাণ কামনা করি।

কলিকাতা কর্পোরেশনে ভুয়া মজুর ??

আনন্দবাজার পত্রিকায় (৯-৮-৪২) প্রকাশ করা হইয়াছে যে :—

"কলিকাতা কর্পোরেশনে আবর্জ্জনা ও পলি অপসারণের কাজে নিযুক্ত শ্রমিকের প্রকৃত সংখ্যা কত? 'ভুয়া মজুরের' সংখ্যাই বা কত? রাজ্যের স্বায়ত্তশাসন দপ্তর কর্পোরেশনকে সুপারিশ করিয়াছেন, এই "রহস্য" সম্পর্কে তদন্তের ভার এনফোর্সমেণ্ট পুলিসের উপর দেওয়া হউক।

"স্বায়ত্তশাসন বিভাগের ধারণা কর্পোরেশনের উপরোক্ত কাজে নিযুক্ত প্রকৃত শ্রমিকের সংখ্যা নয় হাজারের মত দাবি করা হইলেও আসলে উহা অনেক কম। ব্লক সরকার প্রভৃতির সংখ্যাও তালিকা অপেক্ষা কম বলিয়া সরকারী বিভাগ মনে করেন।

"জাতীয় স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর এক হাজার লোক কলিকাতার শতকরা চল্লিশভাগ এলাকার জঞ্জাল অপসারণে যেভাবে সফল হইয়াছেন তাহার সহিত তুলনা করিলে নয় হাজার শ্রমিক দিয়া শহরের 'ভোল ফিরাইয়া দেওয়া সম্ভব' বলিয়া সরকার মনে করেন। স্বায়ত্তশাসন মন্ত্রী শ্রীশৈলকুমার মুখোপাধ্যায় ঐ তদন্তের বিষয়টি বিবেচনার জন্য কর্পোরেশন কমিশনারকে অনুরোধ জানাইয়াছেন বলিয়া জানা যায়। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে ওই শ্রমিকদের মহার্ঘ ভাতা সরকারী তহবিল হইতে মিটাইতে হয়।

"এখানে উল্লেখযোগ্য যে, কলিকাতা কর্পোরেশনে 'ভুয়া' মজুরের অভিযোগ দীর্ঘদিনের। আনন্দবাজার পত্রিকায়ও ইতিপূর্ব্বে এ ব্যাপারে সংবাদ ছাপা হইয়াছে। অভিযোগ এই যে, কর্পোরেশনে আবর্জ্জনা সাফ ও কনজারভেন্সী বিভাগে মাষ্টার রোলে যে শ্রমিক সংখ্যা দেখান হয় প্রকৃতপক্ষে তত শ্রমিক কাজ করে না। ঐ রোলে মাসের পর মাস এমন সব শ্রমিকের নাম থাকে যাহাদের নাকি অস্তিত্বই নাই, কিন্তু তাহাদের নামে যথারীতি মজুরির বিল হয়, সেই বিলের টাকাও তুলিয়া লওয়া হয়। কর্পোরেশনের কাউন্সিলার বা কর্ত্তৃপক্ষ মহলের নাকি অনেকে এই অভিযোগের কথা জানেন। কিন্তু ওই পর্য্যন্তই। ভীমরুলের চাকে ঘা মারিতে কোন মহলই সাহসী হন নাই।"

কর্পোরেশনের "মালিক" বলিতে গেলে এক দল 'কানে তুলা দেওয়া এবং পিঠে কুলো বাঁধা কাউন্সিলার' তাঁহারা এ সংবাদের কোন প্রতিবাদ করিবেন কি?

কর্পোরেশনের এক একটি ওয়ার্ডে দু-তিন জন (?) করিয়া সুপারভাইজার থাকেন। ইঁহারাই শ্রমিকদের হিসাব রাখেন এবং তাহাদের বেতন বাবদ বিল পেশ করেন। পাকা এবং ঠিকা—দুই প্রকার শ্রমিকদেরই কর্ত্তা এই সকল সুপারভাইজার। খোঁজ করিলে দেখা যাইবে যে এই সকল সুপারভাইজার (এবং তৎসহ ব্লক-সরকারদেরও) সাপ্তাহিক বা মাসিক আয় কত এবং কি রাজকীয় চালে তাঁহারা বাস করেন। এক-একজন সুপারভাইজার চাকরিতে নিযুক্ত হইবার পর পাঁচ দশ বছরে কি পরিমাণ এবং কত টাকার স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তির অধিকারী হইয়াছেন, তাহারও একটা সত্য রিপোর্ট প্রকাশ হওয়া প্রয়োজন। ইহা হইলে বিস্ময়কর নানা তথ্য গরীব করদাতারা জানিতে পারিবেন।

রাজ্য সরকার যখন ভীমরুলের চাকে হাত দিতে ভরসা করিয়াছেন, তখন বোলতার চাকগুলির প্রতিও একটু দৃষ্টি দিতে দোষ কি? ভীমরুল অপেক্ষা বোলতার কামড়ে বিষ কম, ইহা তেমন মারাত্মকও নহে।

গিরিশ পার্কে দ্বিতল পাকা বাড়ী!

যুগান্তরে (১০-৮-৬১) প্রকাশিত সংবাদে প্রকাশ যে, একটি পাকা বাড়ী "উত্তর কলিকাতার গিরিশ পার্কের অভ্যন্তরে নির্ম্মাণ করা হইতেছে। কলিকাতা কর্পোরেশনের নিজের নিয়মকানুন কলিকাতা কর্পোরেশনের নিজের পার্কের ভিতরেই কি করিয়া প্রকাশ্যে লঙ্ঘিত হইতেছে? ঔদাসীন্য ও নিষ্ক্রিয়তার কোন নিষ্ঠুর হাত কলিকাতা শহরের আর এক টুকরা সবুজ গলা টিপিয়া হত্যা করিতেছে এবং কাহাদের বিক্রীত বিবেক সেই হত্যাকাণ্ড বিনা প্রতিবাদে প্রত্যক্ষ করিতেছে?

"যেখানে এই বাড়ীটি নির্ম্মিত হইতেছে সেখানে দীর্ঘকাল যাবৎ একটি ক্লাব আছে। পার্কের এক ধারে

কর্পোরেশন এই ক্লাবকে কিছু জমি নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়াছিলেন। টিনের চালের ঘরে ক্লাবের একটি লাইব্রেরীও সেখানে ছিল। স্বর্গত কাউন্সিলার এই ক্লাবের সদস্য ছিলেন এবং প্রায় কুড়ি বৎসর আগে এক সন্ধ্যায় এইখানে ব্যাডমিণ্টন খেলিতে খেলিতে অকস্মাৎ তিনি মারা যান। এখন সেই ক্লাব তাহাদের জন্য নির্দ্দিষ্ট জমি ছাড়াও পার্কের আর কিছু জমি গ্রাস করিয়া একটি হল ও লাইব্রেরী নির্ম্মাণ করিতেছে। অথচ সেজন্য কোন অনুমতি লওয়া হয় নাই। অনুমতি চাওয়া হইলেও কলিকাতা কর্পোরেশনের পক্ষে নিজের সিদ্ধান্ত লঙ্ঘন করিয়া সেই অনুমতি দেওয়া সম্ভব ছিল না।

"গিরিশ পার্কের একদিকে একটি বিরাট মন্দির মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়াছে। উত্তরদিকের ফুটপাথে নূতন একটি শিব মন্দির পার্কের পরিসর আরও সঙ্কুচিত করিয়াছে। তাহার উপর আসিয়াছে এই আক্রমণ।"

কেবল গিরিশ পার্কেই নহে, কালীঘাট পার্কেও এইরূপ বেআইনী বাড়ী তৈয়ারী করা হইতেছে বলিয়া প্রকাশ।

কলিকাতা কর্পোরেশনের কর্ম্মনিষ্ঠার আর একটি নিদর্শন। গিরিশ পার্ক যেখানে অবস্থিত তাহা খুব সম্ভবতঃ 'রাজস্থান'-এর এলাকা। এখানে বাঙ্গালী পৌর প্রতিষ্ঠানের নিয়মকানুন, বাধা-নিষেধ অচল!

শ্রমিক ছাঁটাই রোধ?

রাজ্যের শ্রমমন্ত্রী শ্রীবিজয়সিং নাহার বিধান সভায় জানান যে, মালিক যাহাতে সরাসরি কোন কর্ম্মচারী ছাঁটাই করিতে না পারেন এবং কোন রকম শ্রমিক ছাঁটাই করার পূর্ব্বে মালিক যাহাতে সরকারের শ্রম বিভাগের সহিত ঐ বিষয়ে কন্‌সিলিয়েশন করিতে বাধ্য হন, তজ্জন্য কোন আইন করা যায় কিনা, তাহা রাজ্যের শ্রম বিভাগ বিবেচনা করিতেছেন এবং কেন্দ্রীয় শ্রমমন্ত্রীর সহিত তাঁহারা শীঘ্রই এই সম্পর্কে আলোচনা করিবেন।

নীতি হিসাবে ইহা হয়ত যুক্তিযুক্ত। কিন্তু মালিকপক্ষেরও যে কিছু বলিবার থাকিতে পারে, তাহাও মনে রাখিতে হইবে। সরকারী নীতির কল্যাণে ব্যবসায়ীদের অবস্থা আজ সঙ্গীন। বিধি-নিষেধের অযথা বেড়াজালে এখন কোন ব্যবসায়ী শান্তিতে কাজ করিতে পারেন না। গাঁটের কড়ি ঢালিয়া যাঁহারা ব্যবসা করিতে আসিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই এখন ভালয় ভালয় এবং সময় থাকিতে কারবার গুটাইবার কথা চিন্তা করিতেছেন। সরকারী শ্রমনীতি একদিকে যেমন অন্যায়কারী শ্রমিকদের পিঠ চাপড়াইতেছেন অন্যদিকে তেমনি বিরূপ ব্যবহার করিতেছেন সৎ, ভদ্র এবং বিবেচক ব্যবসায়ীদের প্রতি।

আমরা এমন বহু ব্যবসায়ী এবং মালিককে জানি, যাঁহারা সরকারের বৈষম্যমূলক শ্রমনীতির ঝামেলা অসহ্য বোধ করিতেছেন। ইহার উপর আছে এক শ্রেণীর পেশাদার শ্রমিক নেতা। ইঁহারা চোরকে বলেন চুরি করিতে গৃহস্থকে বলেন সাবধান হইতে এবং উভয়পক্ষের নিকট হইতেই যথাসম্ভব পার্ব্বণী আদায় করিতেছেন।

এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা বারান্তরে করা প্রয়োজন হইবে। বর্ত্তমানে এইমাত্র মন্তব্য—যে "অব্যবসায়ীর হাতে ব্যবসা নিয়ন্ত্রণ"—দেশের সর্ব্বনাশ করিতেছে।

দুধ চুরির সংবাদ

"স্বাধীনতা"র সংবাদ:—

"২৪ পরগণা জেলা রেডক্রসের কয়েক লক্ষ টাকা মূল্যের দুধ চুরি এবং উহা বিতরণে দুর্নীতির এক গুরুতর অভিযোগ বর্ত্তমানে পুলিসের তদন্তাধীন আছে বলিয়া জানা গেল।

"এই দুর্নীতি ও চুরির সহিত ২৪ পরগণা জেলা কংগ্রেসের কয়েকজন উচ্চতম নেতা জড়িত থাকায় প্রভাবশালী মহল হইতে ইহা চাপা দেওয়ার জন্য নানাপ্রকারে চেষ্টা চলিতেছে।"

"কংগ্রেসের কয়েকজন উচ্চতম নেতা" না বলিয়া তাঁহাদের নাম প্রকাশে আপত্তি কি ছিল? সব খবরই যখন "স্বাধীনতা" জানেন, তখন নামগুলি গোপন করিয়া লোকের মনে ধোঁকার সৃষ্টি করা অন্যায়। খুব সম্ভবতঃ নাম প্রকাশ করিয়া পরে নাকে খৎ দিবার ভয়েই ইহা করা হয় নাই (কিছুদিন পূর্ব্বে এই দৈনিক পত্রিকা মিথ্যা-সংবাদ ছাপিয়া নাকে খৎ দিয়াছেন)। বলিতে আপত্তি নাই 'কংগ্রেসের উচ্চতম নেতা" বলিতে যাঁহাদের বুঝায়, তাঁহারা সামান্য গুঁড়া দুধ মাত্র চুরি করিয়া বদনাম কিনিবেন না। স্বাধীনতার উচিত এই ব্যাপারে জড়িত নেতাদের নাম-ধাম অবিলম্বে প্রকাশ করা। কিন্তু বড় বড় চুরির সংবাদ ছাড়িয়া দিয়া দুধ চুরির প্রতি 'স্বাধীনতার' এ সতর্ক দৃষ্টি কেন?

খেসারত

(ত্রি-অঙ্ক নাটক)

শ্রীসুধীরকুমার চৌধুরী

এই নাটকে দু'তিনটি পরিচিত ঘটনার অনুরূপ ঘটনার সমাবেশ দেখা যাবে। কিন্তু নাটকে বর্ণিত এই ঘটনাগুলির উৎপত্তি ও পরিণতি দুই-ই সর্বতোভাবে কল্পনার সৃষ্টি। নাটকে উপস্থাপিত প্রত্যেকটি চরিত্রও সম্পূর্ণ কাল্পনিক।

পাত্র-পাত্রী

সুনীল নাগ—'ক্যালকাটা সিন্ডিকেট্‌স্'-এর ম্যানেজার। বছর বত্রিশ বয়স।
শোভন সেন—'চুচিন ফ্যান্‌স্'-এর মালিক। সুনীলের প্রায় সমবয়সী।
কিসেণলাল বাগ্রি—তরুণ সিনেমা-প্রোডিউসার।
চুনীলাল বসু—কাউন্সেল। প্রৌঢ়বয়স্ক।
বীরেন সমাদ্দার—সরকার পক্ষে কাউন্সেল।
তারাদাস মুখার্জি—হাইকোর্টের জজ।
বৈকুণ্ঠ নস্কর—শোভন সেনের বাবুর্চি।
মাখন মণ্ডল—শোভন সেনের ড্রাইভার।
মায়া—সুনীল নাগের স্ত্রী, বছর পঁচিশ বয়স।
সুসীমা—সুনীল নাগের বালিকা কন্যা।
সুসীমার আয়া—প্রৌঢ়বয়স্কা।

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

[সুনীলের শোবার ঘর। সময় সকাল দশটা। যথোপযুক্ত আসবাবের মধ্যে একটি ওয়ার্ডরোব আলমারি। একেবারে দেয়ালের গা ঘেঁষে বসানো নয়।

সুনীল খোলা সুটকেস্ থেকে তার কাপড়-জামা বের ক'রে ক'রে দিচ্ছে, মায়া সেগুলোকে হয় পাট ক'রে, নয় হ্যাঙ্গারে ঝুলিয়ে আলমারিতে তুলে তুলে রাখছে। কয়েকটা প্যাকেট বেরোল।]

মায়া। এগুলোতে কি আছে?

সুনীল। সিল্ক।

মায়া। এত সিল্ক কি হবে?

সুনীল। সিল্ক দিয়ে যা হয়, সুসীর ফ্রক্, তোমার ব্লাউজ।

মায়া। (প্যাকেটগুলো একটা একটা ক'রে খুলল।) সুন্দর। (তিনটে শাড়ী বেরোল। মায়া সেগুলোকে তখনই নিল না হাতে ক'রে। গালে হাত দিয়ে বলল) আচ্ছা, তুমি কি পাগল?

সুনীল। (একটা মোড়ায় ব'সে সুটকেস্ হাটকাচ্ছিল। মুখ তুলে) কেন, কি করেছি? যা তা জিনিস এনেছি বুঝি?

মায়া। (শাড়ীগুলি নিয়ে খাটের ওপর আলাদা ক'রে পেতে) না, না, যা তা কেন হতে যাবে? খুব ভাল জিনিসই এনেছ। কিন্তু একটা আনলেই ত যথেষ্ট হ'ত। তিনটে কেন?

সুনীল। (সুটকেসের ডালা বন্ধ ক'রে) ঐ তিনটেই আমার পছন্দ হ'ল, তার মধ্যে কোন্‌টা তোমার পছন্দ হবে বুঝতে পারলাম না, তাই তিনটেই নিয়ে এলাম।

মায়া। আহা, কি বুদ্ধি, ম'রে যাই। দশটা শাড়ী পছন্দ হ'লে দশটাই আনতে ত?

সুনীল। (হেসে) তা হলে সত্যি কথাটা বলি। গোটা দশেক শাড়ীই আমার পছন্দ হয়েছিল, কিন্তু এত টাকা পাব কোথায়?

মায়া। সিল্কও এতগুলো আনবার কোনও দরকার ছিল না, দরজিরা পয়সা না নিয়ে কাজ করে না সেটা মনে ছিল না বোধ হয়।

সুনীল। (উঠে একটা চেয়ারে ব'সে) দেনা ত অনেক আছে, না হয় দরজির কাছেও দেনা কিছু হবে। সে যাক, সিল্কগুলো দেখলে দরজির খরচের ভাবনা কিছুমাত্র না ভেবেই যে খুশী হ'ত, সে গেল কোথায়? ষোল দিন দেখি নি মেয়েটাকে।

মায়া। আসবে এখুনি নাচতে নাচতে। ঘুম থেকে উঠে অবধি ত নাচছিল, বাবা আসবে, বাবা আসবে ব'লে।··· আচ্ছা, নিজের জন্যে কিছু আন নি?

সুনীল। নিজের জন্যে কি আবার আনব?

মায়া। বা রে! গরমে পরবার মত ড্রেসিং-গাউন তোমার নেই, ওই ট্রপিক্যালেরটা দিয়েই সারা বছর চালাচ্ছ। কি হ'ত কয়েক গজ সিল্ক নিজের জন্যে নিয়ে

এলে? আমি নিজের হাতে এমব্রয়ডার ক'রে ড্রেসিং-গাউন একটা ক'রে দিতে পারতাম।

সুনীল। হবে এখন। দেনাটা আগে শোধ হোক।

মায়া। (বিছানায় পাতা শাড়ীগুলোকে তুলে সুনীলের কোলের ওপর ছুঁড়ে দিয়ে) তা হ'লে রইল তোমার শাড়ী। দেনাটা আগে শোধ হোক।

সুনীল। ব্যস্! অমনি রাগ হয়ে গেল!

মায়া। কেন হবে না রাগ? উঠতে-বসতে ঐ দেনার কথাটা শুনিয়ে তুমি আমাকে খোঁটা দেবে। কেন দেবে? খোঁটা শুনতে ভাল লাগে মানুষের?

সুনীল। (শাড়ীগুলোকে মোড়ার ওপর রেখে মায়ার কাছে গিয়ে দাঁড়িয়ে) আচ্ছা মায়া, দেনার কথাটা তুললেই তুমি এত বেশী রেগে যাও কেন? ওটার জন্যে ভুগতে ত হচ্ছে আমাকে, রাগটা হয় তোমার! এত বড় ঝুঁকি যে সামলাচ্ছে, সে যদি তা নিয়ে কথা একটু-আধটু বলেই। (মায়ার মাথায় একটু হাত বুলিয়ে) এত রাগ করতে নেই। (ফিরে এসে চেয়ারে ব'সে) কই, সুমী ত এখনও এল না?

মায়া। বলতে ইচ্ছে করছে, সুমীকে দিয়ে কি হবে, দেনাটা আগে শোধ হোক। এতই যদি দেনার ভাবনা ত সেটাকে ঘাড় পেতে নিতে গিয়েছিলে কেন? (উঠে বাঁ-দিকের নেপথ্যের কাছে গিয়ে) সুমী!.. সুমী!.. সুমী! ভাল রে ভাল, গেল কোথায় মেয়েটা! সুমী! এই সুমী!.. আয়া!

(আয়া, নেপথ্য থেকে। যাই মায়া-মা!)

মায়া। সুমী আছে ওখানে? ওকে পাঠিয়ে দাও।

(আয়া, নেপথ্য থেকে। সুমী ত এখানে নেই মায়া-মা!)

মায়া। বা রে! গেল কোথায় তা হ'লে? কি মেয়ে বাবা। ছাতে গেছে? দেখি ত। (বেরিয়ে গেল বাঁ-দিক্ দিয়ে। সুনীল সুটকেসের চাবি বন্ধ ক'রে সেটাকে খাটের তলায় ঠেলে দিয়ে জুতো-মোজা ছাড়ছে, জামা ছাড়ছে। মায়া ফিরে এল, মুখে-চোখে ভয়ের ভাব।) ছাতে ত নেই! কোথায় গেল?

সুনীল। রাস্তায় বেরিয়ে গেল না ত?

মায়া। কখনও ত যায় না, তবু একটু দেখবে?

(যে শার্টটা ছেড়েছিল সেটাকে আবার প'রে সুনীল বেরুতে যাবে ডানদিক্ দিয়ে এমন সময় ওয়ার্ডরোব আলমারিটার পেছন থেকে সুমীটা বেরিয়ে এল নাচতে নাচতে।)

সুমী। (হাততালি দিয়ে হাসতে হাসতে) ঠ'কে গেলে, ঠ'কে গেলে। কি মজা, কি মজা! ঠ'কে গেলে।

সুনীল। (হেসে সুমীকে কাছে টেনে এনে) ঠকেছ তুমি। কত ভাল ভাল খাবার এনেছিলাম বাঙ্গালোর থেকে, সব তোমার মায়েতে আর আমাতে মিলে সাবাড় করলাম। তুমি এলে না ত, তাই খেতেও পেলে না।

সুমী। আহা, আমি যেন আর জানি না। কিছু খাও নি তোমরা। শাড়ী আর সিল্ক এনেছ, তাই বা ক'রে ক'রে রাখছিলে। আমি লুকিয়ে সব দেখেছি।

মায়া। বড় কাজই করেছ! আর এদিকে আমরা ভেবে মরছি মেয়ের কি হ'ল। তুমি মানুষকে মিথ্যেমিথ্যি কেন এত ভয় পাওয়াও বল ত?

সুনীল। (সুমীকে কোলে বসিয়ে) আমি কিন্তু ভয় পাই নি, কিন্তু তোমার মা সত্যিই একটু ভয় পেয়েছিলেন। ভয় পাওয়া বা পাওয়ানো, কোনটাই ভাল নয়।

সুমী। আমাকে তা হ'লে কেন এরা ভয় পাওয়ায়? জানো বাবা, আয়া শুধু শুধু আমাকে ভয় পাওয়ায়। কাল রাত্তিরে কি বলছিল জানো বাবা? বলছিল, ও আয়া নয়, আসলে রাক্ষুসী, আয়া সেজে এসেছে।

সুনীল। তাই বুঝি? এ ত ভারি অন্যায়। আয়াকে তুমি বেশ ক'রে ব'কে দিও ত মায়া। কেন ছেলেমানুষকে ও রকম ক'রে ভয় পাওয়ায়? আচ্ছা সুমী, কেন ভয় পাওয়াচ্ছিল আয়া, বল ত? দুষ্টুমি করছিলে বুঝি? কি?

সুমী। না বাবা! আমি ওকে বলেছিলাম, আমার বিছানার পাশে ব'সে পিঠ চাপড়ে আমাকে ঘুম পাড়াতে। ও বললে, ও রাক্ষুসী, আয়া সেজে এসেছে।

সুনীল। ব্যস্, ওর ছুটি হয়ে গেল। গেল কি? তোমার পিঠ চাপড়াতে আর হ'ল না। ওর চালাকিটা ধরতে পারলে না সুমী, ঠ'কে গেলে। সত্যি বলছি মায়া, আয়াকে আচ্ছা ক'রে ব'কে দিও তুমি।

সুমী। আর শোভন কাকাকে তুমি ব'কে দিও বাবা। শোভন কাকাও আমাকে ভয় পাওয়ায়।

মায়া। আচ্ছা সুমী, এত সুন্দর সুন্দর সিল্ক এনেছেন বাবা তোমার জন্যে, তুমি তাকিয়ে দেখলেও না একবার।

সুমী। দেখেছি ত। উঁকি মেরে সব দেখে নিয়েছি। ঐ ত ওখানে রয়েছে।

মায়া। সুন্দর নয় সিল্কগুলো?

সুমী। সুন্দর ত!

সুনীল। শোভন কাকা আবার কি ব'লে ভয় পাওয়ায় তোমাকে ?

মায়া। ওসব ওর বাজে কথা।

সুমী। না, বাজে কথা না। তুমি শোভন কাকাকে জিজ্ঞেস ক'রো। একদিন না ? শোভনকাকা লুকিয়েছিল ঐখানটায় (একটা খাট আর তার পাশের গদিমোড়া চেয়ারটির মাঝখানটা দেখাল)। আমি ঘরে ঢুকে দেখি, অন্ধকারে কি একটা যেন ব'সে আছে। মুখ ত আর দেখতে পাচ্ছিলাম না ? (চোখ বড় বড় ক'রে) তাই ভাবলাম, বুঝি বাঘ! আর ভয় পেয়ে চেঁচিয়ে উঠলাম।

(মায়া আতঙ্কিত মুখে একবার সুমীর দিকে তাকিয়ে একদৃষ্টে তার স্বামীকে দেখছে। সুনীল একবার মায়ার দিকে তাকিয়ে সুমীকে দেখছে।)

সুনীল। তার পর ?

সুমী। তার পর মা আলো জেলে দিলে দেখলাম, বাঘ নয়, শোভন কাকা। মা বলল, শোভন কাকা চোর চোর খেলছিল আমার সঙ্গে।

সুনীল। তুমি ভয় পেলে কেন তা হ'লে ?

সুমী। বা রে, আমি ত জানতাম না শোভন কাকা চোর চোর খেলছে আমার সঙ্গে ? তাই ত ভাবলাম, বুঝি বাঘ ! আর একদিন না ?

সুনীল। আচ্ছা সুমী, এবার তুমি যাও, খেলা কর গিয়ে। আমরা একটু কাজের কথা বলি।

(সুমী চ'লে গেল বাঁ-দিক্ দিয়ে মায়া একটু আগে থেকেই ওয়ার্ডরোব আলমারির কাপড়গুলোকে আরও ভাল ক'রে গুছিয়ে রাখছিল। তার পিছনে গিয়ে দাঁড়িয়ে)

এবার আমি যখন ছিলাম না এখানে, শোভন বেশ জমিয়ে নিয়েছিল মনে হচ্ছে ? কি ?

মায়া। (মুখ না ফিরিয়ে) একটা বিশেষ কাজে এসেছিল কয়েক দিন।

সুনীল। বিশেষ কাজটা কি ? সুমীর সঙ্গে চোর চোর খেলা ?

মায়া। না, সত্যিকারের কাজ ! কাজটা হচ্ছে—

সুনীল। কাজটা যাই হোক, আমার শোবার ঘরে কেন ?

মায়া। (ঘুরে দাঁড়িয়ে) ওরকম ক'রে ব'লো না কথাটা।

সুনীল। কি রকম ক'রে বলতে হবে ? আহা, শোভন সেন আমার শোবার ঘরে ঢুকেছিলেন, আমার স্ত্রীর খাটের পাশে অন্ধকারে ব'সে ছিলেন গুড়ি মেরে, এ ত খুব আনন্দের কথা, আমার ভাগ্যের কথা, এই রকম ক'রে ? কি ? বল ! কথার উত্তর দাও।

মায়া। তাই যেন আমি বলছি।

সুনীল। কি তা হ'লে বলছ সেইটে শুনি। (মায়ার দুই বাহুমূল দু' হাতে চেপে ধ'রে) শোভনকে কেন ঢুকতে দিয়েছিলে আমার শোবার ঘরে ?

মায়া। (সুনীলের হাত থেকে হাত ছাড়িয়ে নিয়ে খোলা আলমারির দিকে মুখ ক'রে দাঁড়িয়ে) শুনলে ত, সুমীর সঙ্গে চোর চোর—

সুনীল। মিথ্যে কথা ! ঐ বাচ্চা মেয়েটাও জানে, ওটা মিথ্যে কথা (ফিরে গিয়ে চেয়ারে গা এলিয়ে ব'সে) ছি, ছি !

(মায়া বেরিয়ে যাচ্ছিল, সুনীল উঠে গিয়ে তার পথ রোধ করল।)

যেও না, দাঁড়াও ! (মায়ার একটা হাতের কনুয়ের কাছটা চেপে ধ'রে) আমার এই কথাটার উত্তর দাও। আমি যা সন্দেহ করছি, তা কি ঠিক ? কি ?

(মায়া ভয়ার্ত চোখে একবার সুনীলের দিকে তাকিয়ে মুখ নীচু ক'রে দাঁড়িয়ে রইল, বলল না কিছু।)

উত্তর দাও ! (মায়ার হাতটা ধ'রে ঝাঁকুনি দিতে দিতে) উত্তর দাও ! উত্তর দিতে হবে তোমাকে। উত্তর দাও ! (মায়াকে তবুও নিরুত্তর দেখে তার হাত ছেড়ে দিয়ে ফিরে গিয়ে আবার চেয়ারে গা এলিয়ে বসল। হাত দিয়ে দু'চোখ ঢেকে) আমার সন্দেহটা ঠিক নয়, মিথ্যে ক'রেও তা বলতে পারলে না ? না-হয় মিথ্যে কথাই একটা বলতে ! ওঃ !

(ওয়ার্ডরোবটাকে দুই প্রসারিত হাতে জড়িয়ে ধ'রে তার গায়ে মাথা গুঁজে দাঁড়িয়ে আছে মায়া। তার হাবভাবে বেশ বোঝা যাচ্ছে, সে খুব অসুস্থ বোধ করছে। সুনীল বাঁ-দিকের নেপথ্যের কাছে গিয়ে ডাকল) সুমী ! সুমী !

মায়া। (মুখ ফিরিয়ে) এই কচি মেয়েটাকে এসবের মধ্যে টেনো না তুমি।

সুনীল। তোমরা কতটা টেনেছ সেইটে জানতে চাইছি।...সুমী !

(বাঁ-দিক্ থেকে সুমীর প্রবেশ।)

সুমী। কি বাবা ?

সুনীল। (সুমীকে নিজের চেয়ারের হাতার ওপর

বসিয়ে) আর একদিনের কথা কি বলতে যাচ্ছিলে,—কি হয়েছিল বল ত ?

মায়া। (ঘুরে দাঁড়িয়ে) বানাও এবারে গল্প।

সুনীল। বেশ ত, না-হয় একটা গল্পই শোনা গেল। তুমি কি করবে ? শুনবে গল্পটা, না যাবে ? কি ?

মায়া। যাব, আর ঐ হতচ্ছাড়ী মেয়ের একটা কথাও যদি তুমি বিশ্বাস কর ত একেবারেই যাব।

(বেরিয়ে গেল বাঁ-দিক্ দিয়ে।)

সুনীল। এবার বল ত কি বলছিলে।

সুমী। জানো বাবা, শোভন কাকা না ?

সুনীল। আস্তে, আস্তে ! আমার কানে কানে বল।

(সুনীলের কানের কাছে মুখ নিয়ে সুমী কিছু-একটা বলল।)

থাক্, থাক্, আর বলতে হবে না। শোন, আর কাউকে ব'লো না একথা। বলবে না ত ?

সুমী। বলব না! মায়াও জানে বাবা। সে তোমাকে বলতে বারণ ক'রে দিয়েছিল।

সুনীল। (উঠে দাঁড়িয়ে সুমীকে নামিয়ে দিল চেয়ারের হাতা থেকে।) আচ্ছা, তুমি যাও এবারে, তোমার নাইবার সময় হ'ল। মায়া কোথায় আছে দেখ।

(সুমী বাঁ-দিক্ দিয়ে বেরিয়ে গেলে সুনীল চেয়ারের হাতায় কণুইয়ের ভর রেখে হাতের তেলোয় মাথা দিয়ে ব'সে রইল কিছুক্ষণ, তার পর উঠে বাঁ দিকের নেপথ্যের কাছে গিয়ে)

মায়া ! মায়া রয়েছ ওখানে ? মায়া !

(সাড়া না দিয়ে মায়ার প্রবেশ।)

সুনীল। (মায়ার হাত ধ'রে টেনে নিয়ে গিয়ে একটা চেয়ারে বসিয়ে) শোন, সুমী সত্যিই গল্প একটা বানিয়েছে, তবে তার গোড়ায় আর শেষে আমি কিছু কিছু জুড়ে দিতে চাই, তাতে গল্প হিসেবে সেটা উৎরোবে ভাল।

(মায়া নিজের পাহুটির দিকে তাকিয়ে মুখ নীচু ক'রে ব'সে আছে।)

গোড়ার দিক্‌টায় কি জুড়তে চাই শোন। (পায়চারি করতে করতে থেমে থেমে) শুনতে পাই, শোভনের আজ অনেক টাকা। একদিন ছিল, আমার পকেটে চার ছ' আনা পয়সা যা থাকত তাই দিয়ে তাকে আলুর চপ আর চা খাইয়ে ধর্মতলা থেকে কাঁটাপুকুরের মেসে হেঁটে ফিরতাম।···কলেজে পড়ি তখন, একই মেসে থাকি।··· কোথা থেকে ব্যাধি জুটিয়ে নিয়ে এল, লুকিয়ে রাখা আর যায় না, এমন অবস্থা। বি-এ পরীক্ষা সামনে। পরীক্ষার ফি'র টাকায় তার চিকিৎসা করিয়ে তাকে সারালাম। পরীক্ষা দেওয়াই হ'ল না আমার সেবারে। একটা বৎসর মাটি হ'ল। এ সেই শোভন !

মায়া। (উঠে দাঁড়িয়ে) আমি যাই।

সুনীল। (মায়ার হাতটা আবার চেপে ধ'রে) সে কি ? শুনতে ভাল লাগছে না ? শোভনের কথা হচ্ছে, তাও ভাল লাগছে না ! আচ্ছা, শোভনের কথা না-হয় থাক্। (হাত ধ'রে টেনে তাকে আবার বসিয়ে দিয়ে) সুমীর গল্পের গোড়ার দিকে তোমার কথাও একটু জুড়তে হবে। কি জুড়ব, সেটা তোমার শোনা দরকার। (মায়ার পাশের চেয়ারটার হাতার উপর ব'সে) তুমি যেদিন প্রথম এলে আমার জীবনে, সেদিন তোমার রূপ দেখেই কেবল আমি ভুলি নি। বিস্তর ধার জমেছে তখন তোমার কিষেণলাল বাগ্রির কাছে। বাজে লোকের পরামর্শে ফিল্ম করতে নেমে সর্বস্বান্ত হয়েও রেহাই পাও নি, গোটা-দুয়েক তমসুক আর তিন সেট জড়োয়া গহনা নিয়ে দু'বেলা কিষেণলাল আসছে, ভয় দেখাচ্ছে, লোভ দেখাচ্ছে, সাধছে। স্থির থাকতে পারলাম না। অসহায়তার দুঃখে মলিন তোমার সুন্দর মুখখানির দিকে চেয়ে যে দেনার ভার নিজের কাঁধে সেদিন তুলে নিয়েছিলাম, তা শোধ করতে জীবনের আরও কয়েকটা বৎসর কেটে যাবে আমার। ততদিন ভুলতে চাইলেও তোমাকে ভুলতে পারব না, এই হবে আমার সমস্যা।

মায়া। দেনা শোধের ব্যবস্থা আমি করেছি।

সুনীল ওই রকমই কিছু একটা তুমি বলবে, আমি আঁচ করেছিলাম। কোথা থেকে আসছে এত টাকা ? শোভন দিচ্ছে ? কি ?

মায়া। না, আমি রোজগার করব।

সুনীল। হ্যাঁ, রোজগারই করবে, কিন্তু কে দিচ্ছে টাকাটা ? বল !

মায়া। তুমি বিদ্রূপ করতে পার। বিদ্রূপ তুমি করবেই, কারণ তুমি চাও, তোমার কাছে ঋণী হয়ে চিরটা কাল আমি থাকি। তা আমি থাকব না। থাকতে পারব না। এ দেনা শোধ আমাকে করতেই হবে। তাই আমি ফিল্মের কাজেই আবার নামব।

সুনীল। পরামর্শটা কে দিয়েছে, শোভন ?

মায়া। যেই দিক্। তবে এবারে ফিল্ম করা নয়, পার্ট নিয়ে নামব।

সুনীল। নামো। নামো যত খুশি। তোমার নামা এবারে আটকায় কে ?···ছি, ছি !

(নেপথ্য থেকেই বাবা, ও বাবা, বলতে বলতে সুসীর প্রবেশ।)

সুসী। বাবা! বাবা! মা আজ আমায় সিনেমায় নিয়ে যাচ্ছে, তুমিও যাবে ত বাবা?

সুনীল। তোমার চান হয়ে গেল এরই মধ্যে?

সুসী। না বাবা! আয়া বললে, একটু পরে চান করাবে। ও ত দাঁড়িয়ে ছিল দরজার বাইরে।

সুনীল। আয়াটি ত বেশ তৈরি দেখছি। তা হবে না? তোমাকে যে মানুষ করেছে—

মায়া। মেয়েটা রয়েছে এখানে।

সুনীল। শুনে ও যদি কিছু বোঝে, আমি খুশীই হব।

সুসী। যাবে ত বাবা?

সুনীল। আমার যে একটু কাজ রয়েছে মা?

সুসী। না বাবা, তুমিও চল। মা যে ভীষণ রেগে আছে, মা আমাকে খুব বকবে।

সুনীল। সিনেমায় ব'সে ত বকতে পারবেন না? আমি তোমাদের পৌঁছে দিয়ে আসব, আবার নিয়েও আসব।

(নেপথ্যে আয়া—সুসী! নাইবে এস।)

তুমি যাও মা, আয়া ডাকছে।

(সুসী চ'লে গেল বিষণ্ণ মুখে।)

বেচারী সুসী!

মায়া। আমি যাই।

সুনীল। (গর্জ্জন ক'রে) না। একটা বোঝাপড়া না ক'রে তুমি যেতে পাবে না। তুমি কি ভেবেছ, এমন একটা সুন্দর সুখের সংসারকে ভেঙেচুরে শেষ ক'রে দিয়ে তার পর যাই বললেই চ'লে যাওয়া যায়? যায় না। যেখানে ব'সে আছ, সেখানটা ছেড়ে উঠো না তুমি, যতক্ষণ না আমি তোমাকে চ'লে যেতে বলছি।

মায়া। বেশ।

সুনীল। বেশ? আবার তেজ দেখাচ্ছ? লজ্জাও নেই! ছিঃ!

মায়া। তুমি যা করতে চাও কর, যে শাস্তি আমাকে দিতে চাও দাও, তার পর আমায় ছুটি ক'রে দাও, আর আমি পারছি না। (মাথা নীচু ক'রে দুই হাতে মুখ ঢাকল।)

সুনীল। ছুটি আমার কাছ থেকে সহজেই তোমার হয়ে যাবে, ভাবনা নেই। কারণ, শাস্তি তোমার যেটা পাওনা সেটা আমাকে কষ্ট ক'রে দিতে হবে না। একা শোভনই তার পক্ষে যথেষ্ট হবে।

মায়া। না, আমাকে শাস্তি দাও তুমি, আমি চাইছি। দিয়ে ছেড়ে দাও।

সুনীল। (হেসে) যদি বলি, শাস্তিও দেব না, ছাড়বও না। তোমার ঐ উচ্ছিষ্ট দেহটাতে আমার প্রয়োজন আছে ব'লে সেটাকে আমি ধ'রে রাখব? তাহলে?

মায়া। সেটা কি অত্যন্ত কঠিন শাস্তি হবে না আমার পক্ষে?

সুনীল। হ্যাঁ, তোমার ও আমার এখনকার মনের যা অবস্থা তাতে সেটা তাই হবে বটে। তা শাস্তিই ত চাইছ আমার কাছে? (হাসল)...কি?...কথার উত্তর দাও।

মায়া। ও শাস্তিটা আমায় দিও না। এত নিষ্ঠুর তুমি হবে না।

সুনীল। (পায়চারি করতে করতে) জানি না কি করব। বুঝতে পারছি না। কোন শাস্তিই তোমাকে হয়ত আমি দেব না। আমার দয়ার শরীর ব'লে নয়। এটা তুমি দাবী করতে পার। দেশের আইন যে বলছে, বিবাহিতা স্ত্রীলোক পরপুরুষের সঙ্গে চোর চোর খেললে, তার পর সুসীর গল্পের মত গল্পের খোরাক জোগালে আইনতঃ কোন অপরাধ তার হয় না। এই ধরণের ব্যাপারে আইনের চোখে স্ত্রীলোকের সত্তাটা ধর্ত্তব্যের মধ্যে নয়। কেন? স্ত্রীলোক দেহসর্ব্বস্ব ভোগের বস্তু ব'লে। তা ছাড়া আর কি কারণ হতে পারে? (মায়ার সামনে দাঁড়িয়ে) আজ আমারও মনে হচ্ছে, হয়ত এইটেই ঠিক। তুমি স্ত্রীলোক, তোমার আত্মা ব'লে কিছু নেই, তোমার মনও সম্ভবতঃ নেই, তুমি শুধু একটি দেহ মাত্র, যে দেহ কোন-কোন দিকে পুরুষের দেহের থেকে আলাদা ব'লে পুরুষদের কাছে তার দাম।

(মায়া এবার চোখে আঁচল চাপা দিয়ে কাঁদছে।)

এই দামটার কথা, আর আইনতঃ শাস্তি যার পাওনা তার শাস্তির কথাটা আগে হোক। তোমার কথা নিয়ে না-হয় পরে ভাবা যাবে। কান্না থামাও। এখন কাজের কথা হচ্ছে।

মায়া। (চোখ মুছে সোজা হয়ে ব'সে) আচ্ছা, কাঁদব না। তুমি আমাকে টাকা দিয়ে কিনেছ, তুমি যা বলবে আমাকে তা শুনতেই হবে।

সুনীল। হ্যাঁ, টাকা দিয়েই কিনেছি। ঠিক কথা। তা চোর চোর খেলার সময় সে-কথাটা মনে ছিল না? কেন মনে ছিল না? কিছুই মনে থাকে না সে-সময়, সব কেমন ঘুলিয়ে যায়। না? সব মানে, সমস্ত অতীত

আর সমস্ত ভবিষ্যৎ। কেবল বর্তমানের কয়েকটা মুহূর্ত, ক'টাই বা মুহূর্ত, সবকিছুকে আচ্ছন্ন ক'রে থাকে। না? কি? কথা বলছ না কেন?…আচ্ছা, টাকা দিয়ে কেনার কথাই যখন হচ্ছে, আর আমিও ঠিক সেই কথাটাই বলতে যাচ্ছিলাম, তখন (মায়ার সামনের চেয়ারটায় ব'সে) আমার এই কথাটার উত্তর দাও। তোমাকে বেশ চড়া দামে আমায় কিনতে হয়েছিল। হয়েছিল ত? না কি? কি? বল।

মায়া। হ্যাঁ।

সুনীল। (উঠে দাঁড়িয়ে) সেই তোমাকে একটা পয়সা না খরচ ক'রে শোভন পেয়ে যাবে, তা হতে আমি দেব না। তোমাকে পাবার জন্যে যে দাম আমি দিয়েছিলাম, সেটা অন্ততঃ তাকে দিতেই হবে। তার চেয়ে এক পয়সা কম আমি নেব না। (মায়ার চিবুক ধ'রে মুখটাকে একটু তুলে দেখে) আরো বেশীই নেওয়া উচিত, (মায়া এক ঝটকায় সরিয়ে নিল মুখটা) কারণ তখনকার চেয়ে অনেক বেশী সুন্দর হয়েছ তুমি এখন। তা হোক। সেজন্যে বেশী আমি চাইব না শোভনের কাছে। বন্ধু মানুষ! কেবল তোমার বত্রিশ হাজার দেনার টাকাটা সুদ সুদ্ধ তার কাছে আমি খেসারত ব'লে দাবী করব।

মায়া। বলেছি ত, দেনাটা আমিই শোধ করব।

সুনীল। তুমিই ত শোধ করছ। বলতে গেলে এ ত তোমারই টাকা, কেবল নিজের ইচ্ছে মত তুমি খরচ করতে পারবে না, এই যা। এ টাকাতে তোমার দেনাটা শোধ যাবে। এই দেনাটা নিয়েই খুব বেশী ভাবনা ছিল ত তোমার? কি?

(মায়া উঠে দাঁড়াল, যাবে ব'লে। সুনীল এবার আর তার পথরোধ করল না।)

এতবড় একটা দেনার দায় থেকে এত সহজে নিষ্কৃতি পাব তা স্বপ্নেও ভাবি নি।…স্বপ্নেও ভাবিনি! স্বপ্নেও… আচ্ছা, তুমি যেতে পার। এবারে চোর চোর খেলবার সময় ওকে ব'লো, টাকাটা আপোসে যদি দিয়ে দেয় ত ভাল। যদি না দেয়, আমি নালিশ করব। (নিজেই বেরিয়ে যাচ্ছিল ডানদিক্ দিয়ে, ফিরে এসে) থাক্, তোমাকে কিছু বলতে হবে না। ওকে যা বলবার আমিই বলব। বোঝাপড়াটা আসলে ত আমারই সঙ্গে।

(বেরিয়ে গেল ডানদিক্ দিয়ে।)

দৃশ্যান্তর

প্রথম অঙ্ক
দ্বিতীয় দৃশ্য

[শোভন সেনের ফ্যাক্টরীসংলগ্ন বিশ্রামকক্ষ। যথোপযুক্ত আসবাব। শোভনের পাশে পেগ টেবিলে হুইস্কির বোতল, সোডা, গেলাস্। দেয়ালঘড়িতে সময় দেখা যাচ্ছে পৌনে বারোটা। পাশের একটা চেয়ারে দামী লাউঞ্জ স্যুট পরিহিত কিষেণলাল বাগ্রি। কথার মধ্যে মধ্যে শোভন একটু একটু পান করছে।]

শোভন। চড়া হারে সুদ ত অনেক দিন নিয়েছেন, এবারে একটু কমান।

কিষেণ। এ আপনি অন্যায় কোথা বোলছেন শোভনবাবু। আপনি ফ্যান তৈয়ার কোরেন, যা খরচা হোয় তার উপর সুদ কত লেন বেচবার সময়, বোলুন? আমার চেয়ে বেশী লেন, না কোম?

শোভন। ওটা হ'ল প্রফিট।

কিষেণ। আমার সুদটাও ত প্রোফিট। কেনো নয়?

শোভন। যাক, এ নিয়ে আপনার সঙ্গে তর্ক করব না। আমার কথাটা হচ্ছে, আপনার সুদের সঙ্গে আমার প্রফিট আর পাল্লা দিতে পারছে না।

কিষেণ। দাম বাড়িয়ে দিন।

শোভন। আর দাম বাড়ালে কেউ কিনবে না। কম্পিটিশন ব'লে একটা জিনিষ আছে ত!

কিষেণ। তা হ'লে কোম সুদে কারও কাছ থেকে টাকা লিয়ে আমার টাকা আপস ক'রে দিন।

শোভন। টাকার বাজার যে আলাদা। সেখানে কম্পিটিশন নেই। সাপ্লাইয়ের চেয়ে ডিম্যাণ্ড সবসময় বেশী। চাইলেই টাকা কি পাওয়া যায়?

কিষেণ। সুদ কিন্তু আমি কোমাতে পারব না শোভনবাবু। আপনি যদি বোলেন ত আসল-সে আমি কিছু বাদ ক'রে দিব।

শোভন। থাক, আপনাকে কিছু করতে হবে না। শোভন সেন এসব কথা আপনাকে বলত না, বলেনি এর আগে কোনদিন। (হুইস্কি ঢেলে সোডা মেশাতে মেশাতে) সময়টা খারাপ যাচ্ছে, তাই। যে ফোরম্যানটাকে ঠেঙিয়েছিলাম, সে অবিশ্যি তিন মাসের আগে ছাড়া পায় নি হাসপাতাল থেকে, কিন্তু ওদের ঐ strikeটা আমাকে পথে বসিয়ে দিয়ে গিয়েছে। ম্যাক্‌ফার্সন কোম্পানীর এত বড় অর্ডারটা ফস্‌কে গেল। সাপ্লাইটি দিতে পারলে ওরা বাঁধা খদ্দের হয়ে থাকত।

তা ছাড়া এমনি লোকসান গেছে যে কত হাজার টাকা তার হিসেব নেই। কি ক'রে যে সামলাচ্ছি তা আমিই জানি।

কিষেণ। কারবারী লোকের ওরকম ত হোয়। ভয় কেনো পাচ্ছেন ? টাকা লাগে, আমি আরো দিব।

শোভন। তার মানে, আপনার সুদের টাকাটা আপনারই কাছে ধার নিয়ে আপনাকে দিতে বলছেন। ওভাবে চললে কিছুদিনের মধ্যেই কারখানা লাটে উঠবে।

কিষেণ। যা বলছি তা ত শুনবেন না। এক মায়া নাগ এরকম দুটো কারখানার সামিল। ওকে লিয়ে আসুন, টাকার গদির উপর দু'জনে পা ফয়লিয়ে ব'সে থাকবেন। মাঝখান থেকে আমি ভি কিছু ক'রে লিব।

শোভন। নিয়ে আসা কি সহজ ?

কিষেণ। সহজ ক'রে লিতে হবে। সুনীলবাবু আস্তে আস্তে টাকাটা দিয়ে দিচ্ছেন, কিন্তু আমি যদি বলি, বাকী টাকাটা একসঙ্গে এখন আমার চাই। ভোয় দেখাতে ত পারি ? তখন হয়ত মায়া নাগ সহজেই রাজী হয়ে যাবেন। সুনীলবাবু ভি বাধা দিবেন না।

শোভন। দেখা যেতে পারে চেষ্টা ক'রে। আচ্ছা, বিনা মর্টগেজে এত টাকা সুনীলের কাছে ফেলেই বা রেখেছেন কেন আপনারা ?

কিষেণ। টাকাটা ত যাচ্ছিলই, স্ত্রীর ধার নিজের ব'লে মেনে নিলেন সুনীলবাবু, তাই ফিরে পাবার রাস্তা একটা হ'ল। ভাল চাকরি কোরেন, আস্তে আস্তে দিয়ে ভি দিচ্ছেন।

শোভন। তা হ'লেও মানুষের জীবন কখন আছে, কখন নেই। ওর যদি হঠাৎ ভালমন্দ কিছু হয়, টাকাটা তখন কে শোধ করবে ?

কিষেণ। সেই জন্যে ত লাইফ পোলিসি এসাইন করিয়ে লিয়েছি।

শোভন। পুরো টাকাটার ইন্‌সিওরেন্স ?

কিষেণ। তার চেয়ে ভি অনেক বেশী। ধরুন, যদি সুদ অনেক জমে যায়। ওঁর ডেথ হয়ে গেলে আমাদের পাওনা আমরা কেটে লিব, বাকী টাকা মায়া নাগ পাবেন।

শোভন। আপনারা খুব আট-ঘাট বেঁধে কাজ করেন।

কিষেণ। করতে হোয়। (হাসল।) মায়া নাগ আমার দুটো ছবিতে নামলে তমশুক আমি ছিঁড়ে ফেলে দিব, পোলিসি ভি ফিরিয়ে দিব।

শোভন। মায়া যদি বলে, তমশুকের টাকা যেমন আস্তে আস্তে শোধ হচ্ছে হোক, ফিল্মে নামবার জন্যে টাকাটা তার নগদ চাই ?

কিষেণ। বেশ। নগদই আমি দিব।

(বেয়ারার প্রবেশ ডানদিক্ থেকে।)

বেয়ারা। হুজুর, নাগ মেমসাব্!

শোভন। মায়া এই অসময়ে ? সুনীল ফিরেছে আজ, হয়ত গোলমাল কিছু একটা বেধেছে। কিষেণলালবাবু কি করবেন, বসবেন, না যাবেন ?

কিষেণ। যেমন হুকুম কোরবেন। তবে রয়েছি যে-সোময়, একটু দর্শন মিলে যায় ত ভাল।

শোভন। আচ্ছা, আপনি তাহলে বসুন। (বেয়ারার পেছন পেছন শোভন বেরিয়ে গেল ডানদিক্ দিয়ে, এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই মায়াকে নিয়ে ফিরে এল। কিষেণলাল উঠে দাঁড়িয়ে নমস্কার করল মায়াকে।)

মায়া। (সোফায় ব'সে) এই যে কিষেণলালবাবু। ভাল আছেন? আমাদের খুব জরুরি কথা আছে একটু, যদি কিছু মনে না করেন।

কিষেণ। না, না, মনে কি করব ? আমি যাচ্ছি। আপনি ত ঈদের চাঁদ ব'নে গিয়েছেন আজকাল, তাই ভাবলাম, এতদিন পরে দর্শন পাবার মওকা যখন একটা মিলেছে, একটু দেখেই যাই। দেখা হয়ে গেল, এইবারে কোথা বোলুন আপনারা।

(বেরিয়ে গেল নমস্কার ক'রে ডানদিক্ দিয়ে।)

শোভন। ব্যাপার কি ? আজ ভরদুপুরে ? খেয়ে-দেয়ে এসেছ ?

মায়া। না, ফিরে গিয়ে খাব। টেলিফোনে কথা বলার অসুবিধে, তাই সিনেমার টিকিট কিনবার ছুতো ক'রে চ'লে এসেছি। সুনীল ফিরে এসেছে।

শোভন। তা ত জানি।

মায়া। কি ক'রে জানলে ?

শোভন। সুনীল টেলিফোন করেছিল একটু আগে।

মায়া। কি বলল ?

শোভন। সাড়ে তিনটেয় আমি বাড়ীতে থাকব, না ফ্যাক্টরীতে, জানতে চাইল। দেখা করতে আসবে।

মায়া। তুমি কি বললে ?

শোভন। বললাম, জানি না। ঘুরুক না একটু হতভাগা। এমন ভাবে কথা বলছিল, যেন শোভন সেন তার বাড়ীর চাকর বা খানসামা। জেনে গিয়েছে বুঝি ?

মায়া। হুঁ!

শোভন। কি ক'রে জানল?

মায়া। সে শুনে আর হবে কি? বেশ ভাল ক'রেই জানতে পেরেছে, আমি নিজেও মুখ ফুটে পারি নি অস্বীকার করতে।

শোভন। অস্বীকার ক'রেই বা লাভ কি? জানাজানি ত হ'তই, না হয় দু'দিন আগে হয়েছে। আমার ত মনে হয়, একটা বোঝাপড়া এখন হয়ে যাওয়া ভাল।

মায়া। তাই হয়ত হতে যাচ্ছে, কিন্তু ঠিক এই সময় এভাবে সেটা না হ'লে ছিল ভাল।

শোভন। কেন তোমার তা মনে হচ্ছে?

মায়া। এ রকম একটা অবস্থার জন্যে আমি ত তৈরি নেই? তৈরি থাকা উচিত ছিল যদিও। এখন কোথায় যাব, কি করব, খাবই বা কি, মেয়েটার কি গতি হবে, কে আমাকে ব'লে দেবে?

শোভন। সেটা ভাবা যা'ক্ এস। কি করবে, এখনই তার প্ল্যান একটা ঠিক ক'রে নাও।

মায়া। আমার ভীষণ ভয় করছে। কিছু ভাবতে বা বলতে এখন ভাল লাগছে না।

শোভন। ভয় কেন করছে? খুব কি চেঁচামেচি করেছে?

মায়া। বিশেষ না, কিন্তু ওর হাবভাব, কথা বলার ধরণ একটুও ভাল লাগে নি আমার। তাই তোমাকে সাবধান ক'রে দিতে এসেছি।

শোভন। (গ্লাসের বাকী হুইস্কিটুকু খেয়ে) কেন, কি হবে? ও আমাকে মারবে? (বাঁ-হাতের আস্তিন গুটিয়ে পেশী আর মুঠি দেখিয়ে) সুনীল চেনে শোভন সেনকে। তাই বেশ ভাল ক'রেই জানে, এদিক্ দিয়ে সুবিধে কিছু হবে না। কিন্তু কেন আসছে জানো কিছু? একটা কিছু মতলব না নিয়ে আসছে না নিশ্চয়।

মায়া। বোধ হয় তোমার কাছে খেসারত চাইতে আসছে।

শোভন। খেসারত!

মায়া। তুমি ত সাবধান হও নি? ব্যাপারটা জানে অনেকেই। সাক্ষী প্রমাণের অভাব হবে না।

শোভন। শোভন সেনের কাছ থেকে সুনীল খেসারত আদায় করবে?

মায়া। বলছে ত তাই। আর বলছে, যদি আপোষে না দাও ত নালিশ করবে! বত্রিশ হাজার টাকা খেসারত দাবী ক'রে।

শোভন। (হুইস্কি ঢেলে সোডার বোতল খুলে সোডা মেশাচ্ছে।) ও একটি আস্ত পাগল, বদ্ধ পাগল। শোভন সেনকে ও ত বেশ ভাল রকম চেনে, কি ক'রে ভাবছে, বত্রিশ হাজার টাকা খেসারত তার কাছ থেকে সে আদায় করবে! (এক চুমুকে অনেকটা খেল।) বদ্ধ পাগল।

মায়া। কি ক'রে ভাবছে জানি না, কিন্তু ভাবছে। আর, একটা কিছু না ক'রে সে ছাড়বে না। এখন তুমি কি করবে ভেবে দেখ।

শোভন। ভেবে দেখা দরকার, নয়? খেসারত এক পয়সাও সে শোভন সেনের কাছ থেকে আদায় করতে পারবে না, কিন্তু পাগলকে ত বিশ্বাস নেই? এমন কিছু হঠাৎ ক'রে বসতে পারে যাতে খুব একটা কেলেঙ্কারি হয়। তাকে সেটা করতে দিতেও আমি চাই না।

(বাকী হুইস্কিটা আর এক চুমুকে শেষ ক'রে)

বত্রিশ হাজার! (হাসল)…বত্রিশ হাজার টাকা চারটিখানি কথা, চাইলেই অমনি পাওয়া যায়।…উন্মাদ পাগল।… (বেয়ারাকে ডাকল ঘণ্টার বোতাম টিপে। বেয়ারা এলে বলল, সোডা দোঠো। বেয়ারা খালি বোতলগুলি নিয়ে বেরিয়ে গিয়ে ফিরে এসে দুটো সোডার বোতল রেখে গেল পেগ টেবিলে।)

মায়া। ও এলে, কি তাহলে বলবে?

শোভন। (আবার বেশ বেশী ক'রে হুইস্কি ঢেলে সোডা মিশিয়ে এক চুমুকে অনেকটা খেয়ে) কি বলব? বলতে পারি, জাহান্নমে যাও। কিন্তু তা কি সে শুনবে? শুনবে না। (আবার একটু খেয়ে) বত্রিশ হাজার! (উঠে পায়চারি করছে।) বত্রিশ হাজার টাকা আমাকে এখন বেচলেও হবে না। ও পাগল। বদ্ধ পাগল! (পায়চারি করতে করতে মাঝে মাঝে থেমে যেন ভাবছে। হাতের ভঙ্গিতে মনে হচ্ছে, একটা কোন সমস্যার সমাধান হতে হতে হচ্ছে না। হঠাৎ তাড়াতাড়ি ফিরে এসে একচুমুকে গেলাসটা খালি ক'রে [illegible] হয়েছে। পেয়ে গেছি রাস্তা। একটা plan এসেছে মাথায়। beautiful, mervellous! (মায়ার কাঁধে হাত রেখে তার চেয়ারের হাতার ওপর বসল। তার একটা হাত আর এক হাতে নিয়ে) তুমি একটু help না করলে কিন্তু হবে না। সেটুকু তোমাকে করতেই হবে। বল, করবে?

মায়া। (নিজের হাতের ওপর শোভনের হাতটায় অন্য হাতটা রেখে) যদি আমার সাধ্যে থাকে, আর যদি তাতে ওর না ক্ষতি হয়, ত কেন করব না? নিশ্চয় করব।

শোভন। (ফিরে গিয়ে নিজের চেয়ারে ব'সে) ঐ ত! ওর না ক্ষতি হয়। তা খেসারত এক পয়সাও পাবে না সে, সেইটেই ত তার একটা মস্ত ক্ষতি।

মায়া। তা হোক। ওটা ত আমারই দেনা শোধ করবার জন্যে চাইছে, আর সে দেনা ত আমি নিজেই এখন শোধ করতে পারব তুমি বলেছ। কি আমাকে করতে হবে বল।

শোভন। (উঠে দাঁড়িয়ে আবার হুইস্কি ঢালছে। হাত কেঁপে প'ড়ে গেল খানিকটা। বসতে গিয়ে পা ট'লে গেল একটু।) কিছু না, তুমি কেবল এই…ওকে আসবার সময় (মায়ার কানে কানে কথাটা শেষ করল)।

মায়া। (শোভনের মুখটাকে জোরে ঠেলে দিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে) কি পাগলের মত কথা বলছ? এর মানে হয় কিছু? আমি চললাম।

শোভন। আস্তে! আস্তে! (উঠে দাঁড়িয়ে) এই সামান্য কাজটুকু আমার জন্যে তুমি করতে পারবে না মায়া?

মায়া। কি বাজে বকছ? বড্ড বেশী নেশা হয়েছে তোমার।

শোভন। (হুইস্কি খেয়ে) নেশা শোভন সেনের হয় না। একটু খেয়ে আছি ব'লে বুদ্ধিটা খুলেছে বরং। যা বলছি কর, ভাল হবে। না হয় দয়া ক'রে বোস আর একটু। বুঝিয়ে বলছি।

(মায়া বসলে তার পাশে সোফায় ব'সে)

কথাটা বলছি এইজন্যে যে ঐটে হ'লে সব সমস্যার সমাধান খুব সহজে হয়ে যাবে।

মায়া। (উঠে) কি বলছ এ সব তুমি? সর্ব্বনেশে কথা? আমি চললাম।

শোভন। (হেসে ওর গতিরোধ ক'রে) আ রে, ভয় পেও না। তুমি যা ভাবছ তা মোটেই নয়। শোন বলি। সুনীল আমার কাছে খেসারত চাইতে আসছে ত? আসুক। আমি চাই, ও আসুক। ওর যা বলবার বলুক। আমি ওকে বোঝাব। বেশ ভাল ক'রে বোঝাব, যেমন ক'রে ছেলেবেলায় জিওমেট্রির প্রব্লেম ওকে বোঝাতাম। যদি না বোঝে ত তখন প্যাঁচটা কষব। আর প্যাঁচটা হচ্ছে—(আবার বেশ কিছুক্ষণ ধ'রে কথা বলল মায়ার কানে কানে।) অবস্থাটা তখন কি দাঁড়াবে বুঝতে পারছ? আমি তখন যা বলব, বাছাধনকে তাইতেই রাজী হতে হবে।

মায়া। কি তুমি বলবে?

শোভন। কি বলব? বলব, খেসারত চাইতে এসেছিলে, সেটা পেয়েছ ব'লে লিখে দিয়ে বাড়ী চ'লে যাও। তোমাকে পুলিশে দিলাম না, চুপ ক'রে গেলাম, এই চুপ থাকার দাম বত্রিশ হাজার, আর খেসারতের বত্রিশ হাজার কাটাকাটি হয়ে গেল। খুব ভাল নয় প্ল্যানটা? কি বল মায়া?

মায়া। (একটু ভেবে) সে যদি রাজী না হয়?

শোভন। রাজী তাকে করতে হবে। শোন মায়া। তুমি হয়ত ভাবছ, তোমার কথা সে শুনবে না। কিন্তু আমি বলছি, যে-স্বামীরা স্ত্রীদের সত্যিই ভালবাসে, তাদের স্ত্রীরা একবার ভুল ক'রে একটু বিপথে গেলেই তাদের ভালবাসা উবে যায় না। সুনীলেরও যায় নি, তুমি দেখো। তবে হ্যাঁ, তোমাকে হয়ত একটু কান্নাকাটি করতে হবে, দেখাতে হবে, খুব অনুতপ্ত হয়েছ। তার পর খুব দরদ দেখিয়ে আসল কথাটা বলবে। তা ছাড়া তাকে বলবে,—(আবার কানে কানে কিছু একটা বলল।) দেখো, ও তোমার কথা শুনবে। আ রে, নিজেরই গরজে শুনবে। প্রাণের মায়া আর নেই কার বল?

মায়া। (উঠে দাঁড়িয়ে হাতঘড়িটার দিকে দেখে) বড্ড দেরি হয়ে গেছে, আমি চলি এখন। কথাটা আমার একটুও কিন্তু ভাল লাগছে না।

শোভন। (উঠে দাঁড়িয়ে) আ রে, তোমার কিছু ভয় নেই। একটা বেশ রগড় হবে দেখো সুনীলকে নিয়ে। (হাসছে।)

মায়া। আচ্ছা, ভেবে দেখব। চলি।

শোভন। এস।

(মায়ার হাত ধ'রে নিয়ে গিয়ে দরজা খুলে দিলে মায়া বেরিয়ে গেল। হাসি মুখে ফিরে এসে বোতলের বাকী হুইস্কিটা গেলাসে নিঃশেষে ঢালছে।)

দৃশ্যান্তর

প্রথম অঙ্ক

তৃতীয় দৃশ্য

[শোভন সেনের বাড়ীর সামনেকার গাড়ী-বারান্দা। খোলা দরজায় হলের মাঝখানটার, ও তার একপাশে দুতলায় উঠবার সিঁড়ির খানিকটা দেখা যাচ্ছে। দরজার থেকে কয়েক ধাপ সিঁড়ি নেমেছে গাড়ী-বারান্দার নীচেকার পথে। সময় বিকেল

সাড়ে তিনটে। দুই হাঁটুর উপর দিয়ে হাত ঝুলিয়ে সিঁড়ির ধাপে ব'সে আছে শোভনের ড্রাইভার মাখন মণ্ডল। শোভনের বাবুর্চ্চি বৈকুণ্ঠ বেরিয়ে এল ভিতর থেকে।]

বৈকুণ্ঠ। তুমি সেই কখন থ্যেকে বসে আছ মাখন। সাহেবকে ব'লে গাড়ী উইঠে দাও। সাহেব আজ আর বেরোবে না।

মাখন। বলতে গেলে সাহেব যদি রাগ করে?

বৈকুণ্ঠ। আরে, গিলে ত খাবে না। না হয় ত্যেড়ে আসবে একটু। তবে সাহেব আজ বেরোবে না, তুমি ছেখে নিও। বেরোবার হাল কি নিজের র‍্যেখেছে? আপিস থ্যেকেই খুব ট্যেনে এয়েছিল, বাড়ী এ্যসেও খালি ঢালছে আর খাচ্ছে। দুপুরের খাবার ছোঁয় নি এখন পর্য্যন্ত। আধসেরটাক পাকোড়া ভেজে দিয়ে এয়েছি, এখন কিছু-ক্ষণের জন্যে নিশ্চিন্দি। তুমিও যাও, গিয়ে একটু গইড়ে নাও। ডাকলে উ্যঠে আসবে।

মাখন। না রে ভাই, ব'সেই থাকি। আজ মনটা কি এক রকম যেন করতে লেগেছে। কি যেন অমঙ্গল একটা হবে। সাহেবের এ রকম হাল ত দেখিনি কখনও এর আগে? সেই নাগ মেম সাহেবটা আপিসে এয়েছিল দুপুরে, তার পর থ্যেকেই—

বৈকুণ্ঠ। আরে, ঐ মেয়েমানুষটাই ত সব নষ্টের গোড়া। সাহেবের পিছনে ল্যেগেছে, সাহেবকে শ্যাষ ক'রে তবে ছাড়বে।

মাখন। সাহেব যদি ইচ্ছে ক'রে শ্যাষ করতে দেয়।

বৈকুণ্ঠ। ইচ্ছে ক'রে কি দিচ্ছে? সাহেবের ইচ্ছেটা যে কি তা ত তুমিও জানো, আমিও জানি। না কি জানো না? বল। সেই ইচ্ছের পূরণ হচ্ছে না ব'লেই না তোমার আর আমার এই গন্তুযন্ত্রণা।

মাখন। পূরণ হচ্ছে না তুমি জানলে ক্যামন ক'রে?

বৈকুণ্ঠ। আমি যা বুঝেছি তাই বললাম।

(মাখনের পাশে বসল।)

ও মাগী সাহেবকে খেলাচ্ছে, ধরা-ছোঁয়া দিচ্ছে না, আর সাহেব ক্ষ্যাপা কুকুরের মত—

মাখন। দিচ্ছে না আবার। খু-ব দিচ্ছে। গাড়ীতে আমার সুমুখে আয়নাটা আছে কি করতে বৈকুণ্ঠ? ওটাকে একটু বাঁদিকে ঘুইরে রাখলেই কে কি দিচ্ছে না-দিচ্ছে সবই বোঝা যায়।

বৈকুণ্ঠ। সে-সব চোখে দেখাও ত এক গন্তুযন্ত্রণা! কি ছেখেছ ভাই, বল না একটু।

মাখন। আ রে, সে অনেক রকম।

বৈকুণ্ঠ। একটু বল না ভাই। ব্যেছে ব্যেছে দু-একখানা কি ছেখেছ বল, শুনি। বৌটাকে যে কতদিন দেখি নি। সেই গেল পুজোয়, তাও বারো দিনের ছুটি, মাসে এক দিন হিসেবে। কি ছেখেছ, বল না ভাই।

মাখন। সে রকম কিছু কি আর ছেখেছি? আলো কম, লোকজনের যাওয়া-আসা কম, এমন জায়গা ছেখে গাড়ী দাঁড় করাতে ব'লে সাহেব বলবে, যাও ত মাখন, ওই মোড়ের মাথার দোকানটার থ্যেকে মোগলাই পরোটা দুটো নিয়ে এ্যস। ভেজে রাখা জিনিষ আনবে না, তুমি দেঁইড়ে থাকবে, তোমার সামনে ভেজে দেবে। বুঝতেই ত পারছ ভাই। যা তুমি শুনতে চাও তাই।—কিন্তু নিজে যা ছেখি নি, তা বলব ক্যামন ক'রে যে ছেখেছি।

বৈকুণ্ঠ। একটু নয় বেইনেই বল মাখন, বড় শুনতে ইচ্ছে যাচ্ছে।

(ব্রাউন কাগজে মোড়া একটা প্যাকেট হাতে সুনীলের প্রবেশ। দুজনে উঠে দাঁড়িয়ে তাকে সেলাম করল।)

সুনীল। সেন সাহেব আছেন বাড়ীতে?

মাখন। আজ্ঞা হ্যাঁ সার্, আছেন। খবর দেব সার্?

সুনীল। খবর দেওয়া আছে।

(হলে ঢুকে সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠে গেল।)

বৈকুণ্ঠ। জানে না রে ভাই, জানে না। জানে না। জানলে আসত না। লোকটা বুদ্ধু, না ভাই?

মাখন। বুদ্ধু বই কি? নিজের মাগকে সামলাতে পারে না।

বৈকুণ্ঠ। এখনও দোস্তি হচ্ছে। যখন জানবে—

মাখন। আরে, বড়লোকদের কথা ছাড়। কি তুমি জান তাদের? তারা জেনেও বলবে না কিছু। কে কাকে বলবে, কোন্ মুখে বলবে? সবাই ত এক খেলাই খ্যেলছে। আমি জানি। আমি এগারো বছর ড্রাইভারি করছি। এদের খেলা, বুঝেছ কি বলছি, গাড়ীতেই জমে ভাল। আর সামনের আয়নাটার জন্যে ড্রাইভারদের চোখে ধুলো দিতে পারে না। কিন্তু বৈকুণ্ঠ ভাই, আমার পরাণটা ক্যামন জানি আবার ছটফট করতে লেগেছে।

(উপরে ফট্ ফট্ ক'রে দুবার শব্দ।)

মাখন। ও কিসের শব্দ হ'ল?

বৈকুণ্ঠ। দু'বোতল সোডা খোলা হ'ল। দোস্তি হচ্ছে ত?

(একটু পরে আবার একবার ঐ রকম শব্দ। সঙ্গে সঙ্গে ঝন্ ঝন্ শব্দে কাঁচ ভেঙে পড়ল।)

মাখন। এ সব কি হচ্ছে বৈকুণ্ঠ ?

বৈকুণ্ঠ। গেল আর একটা গেলাস। সাহেবের হাতটা আজ ত্যাখন থ্যেকেই কাঁপছিল। আজ গেলাস দু-একটা যাবে ত্যা'নই বুঝেছিলাম।

(উপর থেকে একটা আর্ত্ত চীৎকার কানে এল। বৈকুণ্ঠ হলে ঢুকে সিঁড়ি দিয়ে ছুটে চ'লে গেল উপরে। হলের দিকে ফিরে দাঁড়িয়ে আছে মাখন। একটু পরেই সুনীল নেমে বেরিয়ে এল। তার হাতে রিভলভার। বাইরে এসে সে একবার পিছন ফিরে দেখ্‌ল, তার পর বেরিয়ে গেল দ্রুতপদে। মাখন গেল তার পিছনে ছুটে। উপর থেকে বৈকুণ্ঠের গলা শোনা গেল, দিদিমণি, দিদিমণি, শীগ্‌গিরি আসুন! শীগ্‌গিরি !)

দৃশ্যান্তর

প্রথম অঙ্ক

চতুর্থ দৃশ্য

[সুনীলের বাড়ীর বসবার ঘর। যথোপযুক্ত আসবাব। পেছনে রাস্তার দিক্‌কার একটা পেলমেট দেওয়া তিন ভাগ করা চওড়া জানালায় তিনজোড়া হাল্কা পর্দ্দা ঝুলছে। ডানদিকে বাইরে যাবার দরজার উপর পেলমেট, সেখানেও ভারি একটা জোড়া পর্দ্দা ঝুলছে। সময় সন্ধ্যা সাড়ে ছ'টা।

সুসীর আয়া জানালার একটা পর্দ্দা সরিয়ে ঝুঁকে প'ড়ে বাইরেটা দেখছে। একটু পরে পর্দ্দাটা টেনে দিয়ে স'রে এল জানালার কাছ থেকে। বাইরে একটা গাড়ী শব্দ ক'রে এসে থামল, গাড়ীর দরজা খোলার ও বন্ধ হওয়ার শব্দ হ'ল। আয়া গিয়ে ডানদিকের দরজাটার হুড়কো খুলে দিল। তার পর জোড়া পর্দ্দার একটাকে এক হাতে একটু গুটিয়ে নিয়ে অপেক্ষা করতে লাগল দরজার পাশে দাঁড়িয়ে। 'মা, ছবিটা আর একদিন দেখব···হ্যাঁ মা আরেক দিন দেখব···আচ্ছা, তুমি না নিয়ে যাও, বাবা ত ছবিটা দেখে নি, বাবা নিয়ে যাবে,' কলকল ক'রে এই রকম সব কথা বলতে বলতে মায়ের হাত ধ'রে সুসীর প্রবেশ।]

মায়া। (সুসীর হাত থেকে হাত ছাড়িয়ে নিয়ে তাকে আয়ার দিকে ঠেলে দিয়ে) উনি বাড়ী আসেন নি?

(আয়া সুসীকে এক হাতে জড়িয়ে নিয়ে ঘাড় নেড়ে জানাল, না।)

কি অন্যায় দেখ ত আয়া। বার বার ক'রে ব'লে গেলেন, আমাদের তুলে নিয়ে আসবেন। পথের নিদারুণ ভিড়ের মধ্যে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পায়ে ব্যথা ধ'রে গেল, এলেন না। ততক্ষণ ট্যাক্সিগুলোও উধাও হয়ে গিয়েছে সব। কি কষ্ট ক'রে যে বাড়ী এসেছি, তা কেবল আমিই জানি।

আয়া। তুমি ব'সে একটু জিরিয়ে নাও মায়া-মা, আমি সুসীকে কিছু খেতে দিয়ে এখুনি আসছি।

(সুসীর হাত ধ'রে আয়া বেরিয়ে গেল বাঁ-দিক্ দিয়ে। মায়া টেলিফোনের কাছে গিয়ে একটা নম্বর ডায়াল করল। বোধ হয় বুঝল এন্‌গেজ্‌ড্, রিসিভারটা রেখে দিয়ে টেলিফোনের সামনে ছোট চেয়ারটায় বসল। একটু পরে উঠে দাঁড়িয়ে আবার ডায়াল করল, আবার আগেরই মতন রিসিভার রেখে দিয়ে বসল। ইতিমধ্যে আয়া ফিরে এল গম্ভীর মুখে।)

মায়া। অমন মুখ ক'রে রয়েছ কেন আয়া? কি হয়েছে ?

আয়া। মায়া মা, শোভন খুন হয়েছে।

মায়া। (চীৎকার ক'রে) সে কি? না!

আয়া। হ্যাঁ মায়া-মা···শোভন খুন হয়েছে।

মায়া। (আয়ার হাত চেপে ধ'রে) কখনো না, এ হ'তে পারে না! না! কি বলছ তুমি?

আয়া। এক জন কে উকীল একটু আগে খবর দিয়েছেন টেলিফোন ক'রে।

মায়া। তুমি কি ক'রে জানলে, উকীল কেউ টেলিফোন করছিলেন? নিশ্চয় কেউ দুষ্টুমি ক'রে—

আয়া। না মায়া-মা! আমিই কি সে সন্দেহ করি নি? কিন্তু আমি শোভনের বাড়ীতে টেলিফোন ক'রে জেনে নিয়েছি, খবরটা সত্যি। শোভন খুন হয়েছে।

মায়া। (একটা সোফায় ধপ্ ক'রে ব'সে প'ড়ে) কি সর্ব্বনাশ! কি সর্ব্বনাশ! না, না, না, এ হতে পারে না। কে, কে খুন করেছে? কে?

আয়া। সুনীল না কি পুলিশকে বলেছে, সে-ই খুন করেছে।

মায়া। না, না, এরকম ত কথা ছিল না। এ হতে পারে না। নিশ্চয় কোথাও কিছু একটা ভুল হয়েছে।

আয়া। ভুল হলেই ভাল। (মেজের ওপর বসল গালে হাত দিয়ে।)

মায়া। এ কি হ'ল? আয়া, কেন এরকম হ'ল?

ও মা, মা গো! (কেঁদে লুটিয়ে পড়ল সোফার উপরে। বেশ খানিকক্ষণ কেঁদে আঁচলে চোখ-মুখ মুছে উঠে বসল।) আয়া, এ অসম্ভব। আমি বলছি তোমাকে, এ অসম্ভব। নিশ্চয় কোথাও কিছু ভুল হচ্ছে। কিছু হয়নি শোভনের। আর সব-কথা ছেড়ে দিলেও, ওঁকে আমি ত চিনি? খুন করতে উনি পারেন না।

আয়া। যা শুনেছি তাই তোমায় বললাম মায়া-মা। ভুল হলেই ভাল। তবে এইটে বলব, অবস্থার ফেরে পড়লে কে যে কি করতে পারে না পারে তা বলা খুবই শক্ত। আর, শোভন সত্যিই খুন হয়েছে।

মায়া। তুমি···তুমি বলতে চাইছ, উনি খুন ক'রে থাকতে পারেন?

আয়া। বিশ্বাস করতে ইচ্ছে হচ্ছে না মায়া-মা; কিন্তু পুরুষ মানুষ এরকম অবস্থায় পড়লে খুন ত করে।

মায়া। খুন করে? করতে পারে? না? আমি একবারও কিন্তু ভাবি নি কথাটা। তুমি বলছ, উনি পুলিশকে বলেছেন, উনিই খুন করেছেন!···কি সর্বনাশ! আচ্ছা আয়া, তাহলে উনি ত এখন এসে আমাকেও খুন করতে পারেন? নিশ্চয় তাই করবেন। কি হবে? শোভন আর আমি, এ দুজনের মধ্যে আমার অপরাধটাই ত বেশী। শোভনের ত ঝাড়াহাতপা ছিল, বিশ্বাসভঙ্গের অপরাধ করে নি কারও কাছে, যেটা আমি করেছি।

আয়া। এ তুমি ঠিক বলছ না মায়া-মা। তোমাকে দিয়ে যা করিয়েছে, সেটা যদি পাপ হয়, ত সে পাপের ভাগ তারও ত পাওনা।

মায়া। ধর আমরা দু'জনেই সমান পাপ করেছি। যে পাপের জন্যে শোভন খুন হয়েছে, সেই পাপে আমাকেও খুন করতে চাইতে পারেন ত উনি?

(আয়া গালে হাত দিয়ে নীরবে মাথা নীচু ক'রে ব'সে রইল।)

আয়া!

আয়া। বল মায়া-মা!

মায়া। কথা বলছ না কেন? কি হবে? মেয়েটাকে নিয়ে কোথাও পালিয়ে যাব কি? কিন্তু কোথায় বা যাব? যেখানেই যাই, উনি আমাকে ঠিক খুঁজে বের করবেন। কেউ কিছু জানবে না, কেউ কিছু জিজ্ঞেস করবে না, এরকম ভাবে পালিয়ে থাকা মেয়েমানুষের পক্ষে ত সম্ভব নয়? আর, পালিয়ে কোথাও যদি যাই ত সেখানে গিয়ে খাবই বা কি? আয়া!

আয়া। বল মায়া-মা।

মায়া। কি হবে? কি হবে, বল না আয়া!

আয়া। ভয় পেয়ো না মায়া-মা।

মায়া। কিন্তু আমার যে ভীষণ ভয় করছে আয়া! এক গেলাস জল দেবে?

(আয়া এক গেলাস জল নিয়ে এল।
মায়া কাঁদছিল, জল খেয়ে)

কি হবে আয়া! বল না কি হবে?

আয়া। এখুনি এত ভয় পাবার কিছু হয়েছে ব'লে আমি মনে করিনে মায়া-মা। সুনীল নিজে থেকে পুলিশে ধরা দিয়েছে। নিজের মুখে দোষ স্বীকার করেছে। পুলিশ এরপর তাকে ত এখন ছাড়বে না? বিচারে যদি ছাড়া পায় ত পেল, নয়ত একেবারে নিয়ে গিয়ে ঝুলিয়ে দেবে। আর, ছাড়া যদি পায় ত তখন ভাবা যাবে। তার এখনো অনেক দেরি মায়া-মা।

(সুশী্র প্রবেশ।)

সুশী। বাবা কোথায় মা? বাবা কখন আসবে?

আয়া। বাবার আসতে আজ দেরি হবে। চল, তোমায় ঘুম পাড়িয়ে দিই গে।

সুশী। না, তুমি আমায় ঘুম পাড়াবে না। তুমি ত নিজেই বলেছ, তুমি রাক্ষুসী। বাবা কেন এখনো এল না? কেন বাবার আজ দেরি হবে? বাবা যে বলেছিল, আজ নীলপরীর গল্প ব'লে আমাকে ঘুম পাড়াবে? বাবা, বাবা গো। (মেজেয় পা ছড়িয়ে ব'সে কাঁদতে আরম্ভ করল। বোধ হয় মায়াকেও কাঁদতে দেখে তার কান্নার জোর বাড়তে লাগল ক্রমশঃ।)

পটক্ষেপ।

ক্রমশঃ

সেকেলে নাটকের একেলে রূপ

শ্রীমিহির সিংহ

জনৈক বন্ধু বলছিলেন 'ব্যাপিকা-বিদায়' ব'লে যে নাটকটি সম্প্রতিকালে অভিনীত হচ্ছে তার মধ্যে সারবস্তু কিছুই নেই। বন্ধুটি নিজে অভিনয় করেন, নাটক লেখেন এবং দর্শক হিসেবে সুরুচির দাবীও করতে পারেন। কাজেই তাঁর এই মতটুকু চট্ ক'রে ফেলে দেওয়া যায় না। অথচ সম্প্রতিকালে কলকাতা শহরে 'ব্যাপিকা-বিদায়' নিয়ে দর্শকমহলে রীতিমত সাড়া পড়েছে। চৌরঙ্গী-পাড়ায় রেস্তোরাঁতে চা খেতে গিয়েছি—শুনেছি 'ব্যাপিকা-বিদায়' নিয়ে আলোচনা। বাসে যেতে যেতে একাধিকবার শুনেছি 'ব্যাপিকা-বিদায়' সম্বন্ধে বিস্তারিত মন্তব্যের বিনিময়। শুধু তাই নয়, আমি নিজে কয়েকবার 'ব্যাপিকা-বিদায়' দেখেছি এবং লক্ষ্য করেছি যে, এমন সব দর্শকের সমাবেশ ঘটেছে প্রেক্ষাগৃহে যাঁদের সচরাচর কোনও মঞ্চাভিনয়, বিশেষ করে এ ধরণের হাস্যরসাত্মক লঘুরসের অভিনয়ে দর্শক হিসেবে দেখা যায় না। এঁদের মধ্যে সওদাগরী প্রতিষ্ঠানের অতি উচ্চপদস্থ কর্মীরাও যেমন আছেন, সেরা সাহিত্যিক, বিশ্ববিশ্রুত সঙ্গীতশিল্পী, প্রথিত-যশা চলচ্চিত্র-পরিচালকও তেমনি আছেন। 'ব্যাপিকা-বিদায়'-এর অভিনয় দেখে এঁদের উচ্ছ্বসিত হ'তে বহুবার দেখেছি। সম্পূর্ণ অন্য জাতের দর্শক হলেন তাঁরা,যাঁরা কলকাতার রঙ্গমঞ্চগুলির নিয়মিত পৃষ্ঠপোষক। এঁদের মধ্যে কেউ হয়ত পছন্দ করেন যাত্রা, আবার কেউ পছন্দ করেন 'বহুরূপী' বা 'মুখোশ' বা 'শৌভনিক' ইত্যাদির নিবেদিত গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক উদ্দেশ্য-সম্বলিত নাটকের অভিনয়। এঁরাও সাধারণভাবে আজকে বলছেন যে,'ব্যাপিকা-বিদায়' দেখে তাঁদের মুখ বদলেছে। অথচ আমার সেদিনকার সেই বন্ধুটির উক্তি যে মোটেই মিথ্যা নয় তা বোঝা যাবে 'ব্যাপিকা-বিদায়' বইটির পাতা ওল্টালেই—বইটি আপাতদৃষ্টিতে সত্যিই অন্তঃসারশূন্য। স্বভাবতঃই প্রশ্ন জাগে, তবে কেন এই জনপ্রিয়তা 'রূপকার' প্রস্তুত এই প্রহসনটির?

'ব্যাপিকা-বিদায়'-এর লেখক হলেন তিনি, যাঁর পরিচিতি ছিল 'রসরাজ' নামে—অমৃতলাল বসু। বইটি যে রচিত হয়েছিল খুব লঘু মেজাজে তাতে কোনও সন্দেহ নেই, title page-এ এই লেখা আছে 'প্রমোদ প্রহসন—Farcical comedy', এবং মহারাজা প্রদ্যোত-কুমার ঠাকুরকে উৎসর্গ করার সময়ে নাট্যকার বইটির উল্লেখ করেছেন 'দৃশ্যলীলা' রূপে। শুধু আমাদের দেশে নয়, সব দেশেই নাটকাভিনয়ের ক্ষেত্রে farce খুব জন-প্রিয়। রবীন্দ্রনাথের নাটকগুলির মধ্যেও 'চিরকুমার সভা' কিংবা 'গোড়ায় গলদ' যে রকম জমাটভাবে উপস্থাপিত করা যায় মঞ্চের উপরে, তার তুলনায় নৃত্য-গীতপ্রধান বা গুরুত্বপূর্ণ ভাব-সম্বলিত নাটক (বা গল্পের নাট্যরূপ) তত সহজে জমানো যায় না। Farce-এর তিনটি মূল উপাদান—wit বা বাক্‌চাতুর্য, নাটকের সংগঠনের মধ্যে দ্রুত একটা জট পাকিয়ে তোলা এবং তার সমাধান করা, এবং তৃতীয়তঃ সামাজিক কোনও দুর্বলতার প্রতি কটাক্ষপাত। বলা বাহুল্য, এই উপাদান কয়টি সাধারণভাবে সব নাটকের মধ্যেই অল্প-বিস্তর পাওয়া যাবে এবং বিশেষ করে তৃতীয় উপাদানটি বিশ্ব-সাহিত্যে যুগান্তকারী নাটকগুলির মধ্যে সর্বপ্রধান স্থান অধিকার করে থাকে। ইবসেন বা বার্ণাড শ'র নাটকে সমাজবদ্ধ মানুষের দুর্বলতা ও ব্যর্থতার সমালোচনা এত তীব্রভাবে আত্মপ্রকাশ করে যে, নাট্যকার দর্শকের মনোরঞ্জন ছেড়ে নূতন দর্শনের দীক্ষাগুরু হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হন।

'ব্যাপিকা-বিদায়' কিন্তু নেহাৎই মনোরঞ্জনকারী নাটক, তার বেশী কিছু নয়। সমাজের ইঙ্গবঙ্গ সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত হলেন এর মূল চরিত্রটি, স্বয়ং 'ব্যাপিকা'। নাটকটির রচনা হ'ল তাঁর কীর্তি-কলাপকে ঘিরে—তাঁর আগমনের সঙ্গেই সুরু নাটকীয়তা, তাঁর বিভিন্ন কার্য-কলাপের জন্যেই অব্যাহত থাকে নাটকের গতি, এবং তাঁর বিদায় নেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই শেষ হয়ে যায় 'ব্যাপিকা-বিদায়' নাটক। কিন্তু নাটকটির পরিপ্রেক্ষিতে তাঁর প্রকৃত পরিচয় সেই চিরপরিচিত শাশুড়ী জামাই সম্পর্কের মধ্যে দিয়ে, ইঙ্গবঙ্গ প্রবণতার মধ্যে দিয়ে নয়। গল্পটি অত্যন্ত গতানুগতিক গোছেরই। পুষ্পবরণ রায় বিলাত-ফেরৎ ইঞ্জিনিয়ার, তাঁর স্ত্রী মিনি রায় লরেটোতে পড়া মেয়ে, তবে মনের দিক্ থেকে তরুণী বাঙালী বধূর চাইতে বিশেষ অন্য রকম নয়। নাটকের সূত্রপাতে

দেখি, পুষ্পবরণ ছুটির দিনে বাড়ী থেকে বেরোচ্ছেন বড় একটা contract-এর অর্ডার পাবার আশায়। বিলেত-ফেরৎ স্বামী, বাড়ী থেকে বেরোবার মুখে 'আসি' বলবেন না 'যাই' বলবেন, হাঁচিকে বাধা ব'লে স্বীকার করবেন কি না ইত্যাদি মনোরম বিতর্কের মধ্যে দিয়ে দর্শকদের বুঝিয়ে দেন তাঁদের দাম্পত্য সম্পর্কের নিবিড়তাটুকু। সচ্ছল উচ্চমধ্যবিত্ত আবহাওয়া; স্পষ্টতঃই নববিবাহিত, মঞ্চের উপরে কিংবা নেপথ্যে কোনও শিশুর পদক্ষেপের আভাস নেই—নির্ঝঞ্ঝাট জীবনে সামান্য যে নাটকটুকু দেখা যায়, তা হ'ল স্বামীর ছুটির দিনে বেরোনোর প্রয়োজনে এবং তাঁর বেরোনোর পরে স্ত্রীর ঠাকুর-বাবুর্চি নিয়ে সারাদিনের আহার-তালিকার আয়োজনে। এটা প্রায় রূপকথার শেষে রাজার রাণী পাওয়া এবং তার পরে দু'জনের সুখে-স্বচ্ছন্দে ঘরকন্না করার মতন। এর স্পষ্টতঃ কোনও কাজকর্ম তার নেই। ঘনশ্যাম সিকদার কিন্তু বেশ ব্যস্ত লোক বলেই মনে হয়, লেকচার দেয়, যদিও তার সব লেকচার পত্রিকা ছাপে না ('শুরে কিনা, নদেকে রীতিমত হিংসে করে')! মোটের পরেই সে একজন 'পেট্রিয়ট', যদিও 'পশ্চিম' অর্থাৎ পুরী থেকে ঘুরে এসে মাথায় হ্যাট্, গায়ে কোট, পরনে ঝলঝলে প্যান্ট—এই বেশে তার দেখা পাওয়া যায়। বাস্তবিক, ঘনশ্যামের প্রথম আবির্ভাবে চমৎকার ত প্রায় মূর্ছাই গিয়েছিল, তবে কথোপকথনের মধ্যে দিয়ে এটা বেশ স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, ভুল ইংরেজী, উচ্চারণের জড়তা ও পোশাকের হাস্যকরতা সত্ত্বেও ঘনশ্যাম মানুষটি ভাল। শুধু তাই নয়, সে যে মানুষের মন কাড়তেও জানে তা বুঝতে পারি চমৎকারের কথায় 'মানুষের ভেতর প্রা মানুষ থাকে না জানতাম, কিন্তু বাঁদরের ভেতর মানুষ!'

মিনিয়েচার ছবি দেখানো: সবিতাব্রত, স্মিতা ও অসিত

মধ্যে ভাবী রোমান্সের সম্ভাবনা নিয়ে আসে মিসেস রায়ের পরিচারিকা তথা সঙ্গিনী অবিবাহিতা 'চম্‌চম্' এবং মিষ্টার রায়ের 'মেটারন্যাল নেফু ঘনশ্যাম সিকদার।'

চম্‌চম্ চপলতা-মিষ্টতা মেশানো বেশ চমৎকার একটি চরিত্র। আসলে 'চমৎকার'ই তার নাম, তবে নাটকটির গতিপথেই সেটা প্রায় রূপান্তরিত হয় চম্‌চমে। চম্‌চম্ গান গায়, মিসেস রায়ের সঙ্গে মিষ্টিগোছের পরচর্চা করে, দু'জনের মধ্যে সম্পর্কটা বেশ চমৎকার হয়ে উঠবে তা বুঝতে অসুবিধা হয় না। কিন্তু আসল নাটক সুরু হয় এই আনন্দ-তরল পরিস্থিতিতে অশান্তির ঢেউ তুলে প্রবেশ করেন মিসেস রায়ের মা মিসেস পাকড়াশী। ইনিই হলেন 'ব্যাপিকা'। এঁর আবির্ভাবও খুব সশব্দ: দরোয়ানের 'ঠাকুর যাইয়ে বড়া মেমসাব' ও তাঁর নিজের 'হ-অট্ যাও, হ-অট্ যাও' ইত্যাদির সঙ্গে! সংসদ বাংলা অভিধানে ব্যাপিকার মানে দেওয়া হয়েছে

'প্রগল্‌ভা ও চঞ্চলা স্ত্রীলোক; খিঙ্গী স্ত্রীলোক।' এ বর্ণনা সার্থক ক'রে মিসেস পাকড়াশী প্রথম থেকেই সুরু করেন মেয়ে-জামাই-এর মধ্যে প্রীতির সম্পর্কে খাদ মেশাতে। ঘনশ্যামের ভাষায় 'কন্যার প্রতি মাতার উপদেশ নয়, উপদেবতার আদেশ'। চমৎকারের সঙ্গে দর্শকও ভাবতে সুরু করে 'জমাট কালো মেঘ···ঝড় না তুললেই হয়।'

এই রকম যখন আবহাওয়া তখন প্রবেশ করেন চৌধুরী মহাশয়, পুষ্পবরণ রায় তাঁকে জ্যাঠামশাই ব'লে ডাকলেও আত্মীয়তার সূত্রে আপনার কেউ নয়। তাতে অবশ্য দু'জনের মধ্যে আন্তরিক সম্পর্ক স্থাপিত হ'তে কোনও বাধা হয়েছে ব'লে মনে হয় না। অতীতকালে তিনি পুষ্পবরণের হিতৈষী হিসেবে তাঁর বিলেত যাওয়ার ব্যবস্থা করেছিলেন, বর্তমানে পুষ্পবরণ যখন স্বচ্ছলতার মধ্যে গৃহস্থালী পেতেছেন তখন তার মধ্যে এই প্রৌঢ়টির জায়গার অভাব হয় নি। চৌধুরী মহাশয় পল্টনে হবার মত চরিত্র। পুষ্পবরণের দুর্বল গতানুগতিকতা ও ঘনশ্যামের হাস্যকর ছেলেমানুষির বিপরীতে চৌধুরী মহাশয়ের প্রাণপ্রাচুর্য নাট্যকারের সমস্ত দুর্বলতা ও রুচিহীনতা সত্ত্বেও বেশ সুন্দর ভাবে ফুটে উঠেছে। আমরা আগেই দেখেছি, সে প্রাণোচ্ছলতা আর একটি চরিত্রের মধ্যেও প্রকাশ পেয়েছে, সেটি হ'ল চমৎকার নামে চরিত্রটি। কাজেই এই দু'জনের মধ্যে যে বিশেষ ভাবে মধুর একটি সম্পর্ক গ'ড়ে উঠবে তা দর্শকের মন প্রথম থেকেই মেনে নেয়। প্রকৃতপক্ষে বাকী সব চরিত্রগুলিই যেখানে কোন না কোন complex নিয়ে ভুগছে সেখানে এই দু'জনের সুস্থ স্বাভাবিক ব্যবহার নাটকের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ।

অনেক তরল মধুরতার মধ্যে চৌধুরী মহাশয় যখন দুঃখ করতে থাকেন 'আহা চমৎকারিণী! প্রেয়সীর ঝঙ্কার আর পুত্রের প্রহার আহার করেই ত আজ
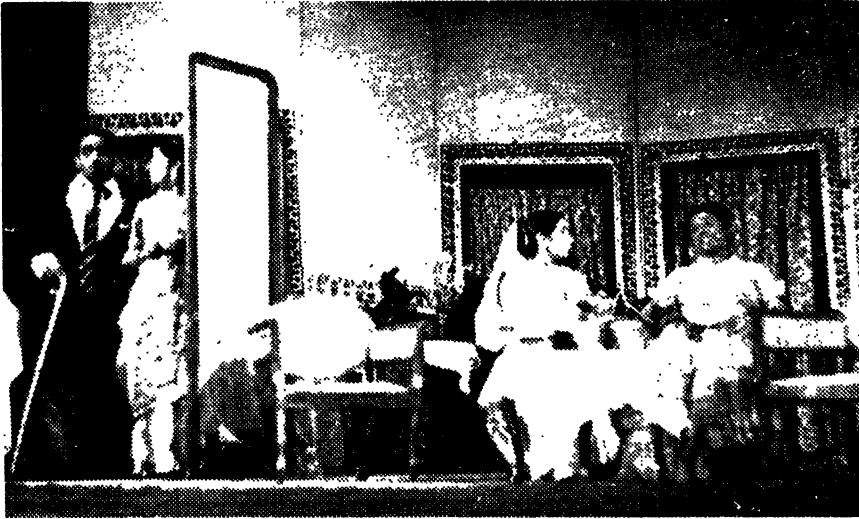
কন্যার প্রতি মাতার উপদেশ : বঙ্কিম, গীতা, মুক্তি ও কালিন্দী

কাজ করতেন, বোধ হয় General Roberts-এর Commisariate department-এ। বাংলা ভাষা তাঁর বরদাস্ত হয় না—'যে ভাষায় চোপরাও, হারামজাদ, বেয়াদব, বদমায়েস নেই, ড্যাম, রাস্কেল, গো-টু-হেল্ নেই, সে ভাষা আবার ভাষা? বড় জোর অধঃপাতে যাও।' কথায় কথায় গজলের চমক্ তাঁর জীবনদর্শনকেই সার্থক করে তোলে—'পরকে আপন করে নিয়েই ত সংসার চলছে।' মোটের পরে এক নজর দেখেই মুগ্ধ বাঙালী বীর ব'লে জগতে পরিচিত। এই ষাট বছর শেঠের বাছাই হয়ে আছি, ছান্‌লাতলায় দাঁড়ান আর বরাতে হ'ল না, একবার একটি পাঞ্জাবিনীর সঙ্গে পাঞ্জা কষবার জোগাড় হয়েছিল, কিন্তু ভৈসা ঘৃত লুচিকে যতই সুগন্ধি করুক প্রেয়সীর বেণীতে ফেনিয়ে উঠলে— ছিউ মিছ্‌লাতা।

'চমৎকার। ভাল কথা, আপনার আইবুড়ো নাম খণ্ডন হবার উপায় হয়েছে।

'চৌধুরী। চাই তোমার মেহেরবাণী, আউর কই জোয়ানী পর্সন্দ নেহি, ইওওয়াস্তে—

'চমৎকার। জোয়ানী নয়, জোয়ানী নয়, একেবারে টাটকা জোয়ান, মুখে দে চিবুলেই নাকে চোখে জল আর খিদে নিদ্রে হজম। আপনার বেয়ান এসেছেন—কনের মত কনে!'

নিজের জীবিকানির্বাহের উপায় হিসেবে গ্রহণ করেছেন। তিনি মিসেস রায়েরও বাল্যবন্ধু বটে এবং তাঁর ও জটিলেশ্বর ভাদুড়ীর পুনর্মিলনের একটা সম্ভাবনা প্রথম থেকেই দর্শকের মনে উঁকি মারতে থাকে, ভাদুড়ী সাহেবের সব বক্রোক্তি সত্ত্বেও। কিন্তু মূল নাটকের যে জটিলতা তার উৎপত্তি কিন্তু মিসেস লাহিড়ী ও তাঁর
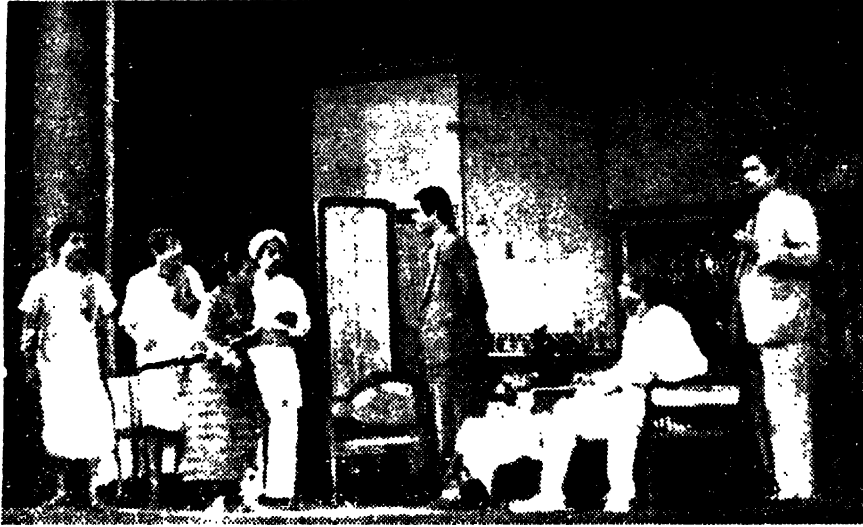
মিষ্টার রায়ের সংসার : শক্তি, প্রদ্যোত, কমলা, মধুসূদন, অসিত, সবিতাব্রত ও ভবরূপ

এ রকম অবস্থায় সম্পূর্ণ বিপরীত চরিত্রের অথচ সমবয়সী দু'টি মানুষের মুখোমুখি আসার সম্ভাবনায় দর্শকরা কৌতূহলী না হয়ে পারেন না। নাটকের উপলক্ষ্য মিষ্টার ও মিসেস রায়ের সম্পর্ককে কেন্দ্র করে হলেও প্রকৃত নাটকীয়তা এইখানে যে, অশুভ শক্তির প্রতীক 'ব্যাপিকা'কে পরাজয় স্বীকার করতে হয় শুভ শক্তির প্রতীক চৌধুরী মহাশয়ের কাছে।

নাটকটির মধ্যে তৃতীয় রোমান্স হ'ল মিসেস লাহিড়ীকে নিয়ে। মিসেস লাহিড়ী ওরফে লীলা ছেলেবেলায় ভালবাসতেন জটিলেশ্বর ভাদুড়ীকে। ভাদুড়ী সাহেব পুষ্পবরণের বন্ধুস্থানীয়, বি. এ. পড়তে পড়তে স্বদেশী হাঙ্গামায় কলেজ ছেড়ে দিয়েছিলেন ব'লে লীলার বাবা রেগে গিয়ে লীলার বিবাহ দেন ব্যারিষ্টার হেমেন লাহিড়ীর সঙ্গে। তাঁদের বিবাহিত জীবন চলল না বেশীদিন, হেমেন লাহিড়ী দু'বছরও বেঁচে ছিলেন না। মিসেস লাহিড়ীর আর্থিক দুরবস্থা সহজেই অনুমান করা যায়, কিন্তু তিনি তাঁর মামা চৌধুরীমশায়ের ওপরে পর্যন্ত নির্ভর না ক'রে মিনিয়েচার ছবি আঁকাকে

ছবি নিয়েই। পুষ্পবরণ রায় তাঁর জন্মদিনটি স্ত্রীর কাছ থেকে গোপন রেখেছিলেন, তাঁর অভিপ্রায় ছিল ঐদিনে মিসেস রায়ের একটি প্রতিকৃতি মিসেস লাহিড়ীকে দিয়ে আঁকিয়ে মিসেস রায়ের হাতে দিয়ে তাঁকে অবাক্ ক'রে দেবেন। তাঁর এই মধুর ষড়যন্ত্রের মধ্যে ছিলেন তিনি, মিসেস লাহিড়ী, চৌধুরী মহাশয় ও জটিলেশ্বর ভাদুড়ী। মুশকিল হ'ল, তাঁদের জল্পনা-কল্পনাকে মিসেস পাকড়াশী দেখে ফেললেন এবং তার মানে করলেন নিজের রুচি ও প্রবৃত্তি অনুসারে। তিনি ভাবলেন যে, মিসেস লাহিড়ীর সঙ্গে পুষ্পবরণের সম্পর্কটা বিশেষ সুবিধের নয় এবং তার জন্যে তিনি চৌধুরী মহাশয়কে দায়ী করলেন। ফলে একদিক থেকে বাড়ীর ঠাকুর, বেয়ারা, বাবুর্চি ও দাসী যেমন বিদ্রোহ ঘোষণা করল 'ব্যাপিকা'র শাসনের বিরুদ্ধে, তেমনি অন্যদিক্ থেকে তীব্র ভুল বোঝাবুঝির সূত্রপাত হ'ল মিষ্টার ও মিসেস রায়ের মধ্যে। শুধু তাই নয়, চৌধুরী মহাশয়েরও বাস করা অসম্ভব হয়ে উঠল এই পরিবারের মধ্যে। পুষ্পবরণ রায়ের সুখের সংসার প্রায় ভেঙ্গে পড়ল। কিন্তু কর্মের

শেষ ত সেভাবে হ'তে পারে না, তাই শেষ মুহূর্তেও শেষ-রক্ষা হয় ভুল-বোঝাবুঝির অবসানের মধ্যে দিয়ে, মিষ্টার রায় ফিরে পান মিসেস রায়ের ভালবাসা। এবং সেই আনন্দের মুহূর্তে জটিলেশ্বর ভাদুড়ী লাভ করেন লীলা ভাদুড়ীকে ও ঘনশ্যাম-চমৎকারের পরস্পরের প্রতি ভালবাসাও স্পষ্টভাবে প্রকাশ পায় দর্শকের সামনে। এর পরে মিসেস পাকড়াশীর আর থাকার মানে হয় না, তাঁর বিদায়ের সঙ্গেই নাটকের সমাপ্তি।

নাটকটির বর্ণনা থেকেই বোঝা যায় যে, এর মধ্যে বৈশিষ্ট্য কিছু নেই। মূল কাহিনী খুবই কষ্টকল্পিত এবং চরিত্রগুলিও আজকে ১৩৬৯ সালে ত বটেই, প্রথম অভিনয় রজনী ২৫শে আষাঢ় শনিবার, ১৩৩৩ সালেও যে খুব বাস্তবানুগ ছিল তা ব'লে মনে হয় না। কথাবার্তার মধ্যে কোন কোন জায়গায় wit-এর পরিচয় মিললেও তা অনেকাংশেই রুচিহীনতার উপরে নির্ভরশীল। 'রূপকার' নাট্য প্রতিষ্ঠানের কৃতিত্ব ত্রিবিধ—প্রথমতঃ নাটকটিকে আজকালকার রুচির সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেওয়া, দ্বিতীয়তঃ অভিনয়ের মধ্যে দিয়ে একটা পরিচ্ছন্ন (clean) আবহাওয়া সৃষ্টি করা, এবং তৃতীয়তঃ গানগুলি খুব চিত্তাকর্ষক ভাবে উপস্থাপিত করা। কিছুদিন আগে থিয়েটার সেণ্টারে তরুণ মিত্র পরিচালিত 'অলীকবাবুর' অভিনয় দেখতে গিয়ে ঠিক এই কথাগুলি মনে হয়েছিল। সেটাও farce, তার মধ্যেও একটা মস্ত বড় প্রশ্ন ছিল, সেকেলে দর্শকের যেটা ভাল লাগত সেটাকে একেলে দর্শকের হৃদয়গ্রাহী ক'রে উপস্থিত করা। 'অলীকবাবু'তেও গানের একটি স্থান ছিল, এবং মোটের ওপরেই এই সেকেলে নাটকটিকে একেলে দর্শকেরা খুব সাদর সম্বর্দ্ধনা জানিয়েছিলেন। কেন? তার উত্তর মিলবে আমাদের সাম্প্রতিক রঙ্গমঞ্চের ইতিহাসটিকে একটু ভাবলেই। এবং তার জন্যে একটা উপযুক্ত দৃষ্টিকোণ লাভ করতে গেলে আমাদের একটু পেছিয়ে যেতে হয়।

ব্যাপিকার বিরুদ্ধে ভৃত্যদের বিদ্রোহ: শক্তি, কমলা, মধুসূদন ও প্রদ্যোত

অনেকদিন আগে যখন ভারতবর্ষে 'মৃচ্ছকটিক' বা অনুরূপ সব আশ্চর্য রকমের আধুনিক নাটকের রচনা ও অভিনয় হচ্ছিল তখন অন্ততঃ সংস্কৃতির ক্ষেত্রে বাংলা দেশের কোন অস্তিত্বই ছিল বলে মনে হয় না। কিন্তু তার পরে যত দিন গেল, বাংলা দেশের একটা নিজস্ব সংস্কৃতি গ'ড়ে উঠল এবং লোক-সংস্কৃতির অপরিহার্য অঙ্গ হিসাবে নৃত্য-গীত ও অভিনয় নানান রূপে আত্মপ্রকাশ করতে থাকল। সেদিনকার ইতিহাস আমাদের দেশের ইতিহাসের অন্যান্য অনেক পরিচ্ছেদের মতনই হারিয়ে গেছে। তবে ভারতীয় সংস্কৃতির স্বর্ণযুগ যেদিন অন্ধকার মধ্যযুগের কৃষ্ণ-যবনিকায় ঢাকা প'ড়ে গেল এবং সেই যবনিকা উন্মোচনে যেদিন দেখা গেল, মুসলমান

আধিপত্যের চেহারা, সেদিন অভিনয়, নৃত্য ও গীত পর্যবসিত হয়েছে নবাবী মহলের বিলাসব্যসনে। সেদিনও কিন্তু কবির লড়াই, যাত্রা, পুতুল নাচ, পাঁচালী গান ইত্যাদির মধ্যে দিয়ে বাংলা দেশের লোক-সংস্কৃতির মধ্যে ক্ষীণ হলেও বয়ে চলেছিল অভিনয়-চর্চার ধারা। উনবিংশ শতাব্দীতে এসে বাংলার নবজাগরণের সময় অভিনয়-শিল্প হঠাৎ যেন নবযৌবন ফিরে পেল। বহু প্রতিভাশালী কবি ও সাহিত্যিক সেদিন নাট্যকার হিসেবে প্রকাশ লাভ করলেন, সংস্কৃতির নেতৃত্ব যাঁদের হাতে ছিল তাঁরা অভিনেতা ও নাট্যকারের পৃষ্ঠপোষক হিসেবে আত্মপ্রতিষ্ঠা লাভ করলেন। তখন অভিনয়ের মধ্যে লোকরঞ্জনের ধারাটিও যেমন স্পষ্টভাবে বইত, সমাজ সমালোচনার দৃষ্টিভঙ্গিও তেমনি অব্যাহত ছিল। ক্রমে যা হবার তাই হ'ল, সেই সব শক্তিশালী মানুষেরা যেদিন অবসর গ্রহণ করলেন সেদিন কম শক্তিশালী আদর্শহীন নেতৃত্বের হাতে লোকরঞ্জনই মুখ্য উদ্দেশ্য হয়ে দাঁড়াল এবং ক্রমে তা পর্যবসিত হ'ল রুচিহীন কদর্যতায়। দর্শকদের মধ্যে যাঁরা সংস্কৃতিবান্ রঙ্গমঞ্চ ও প্রেক্ষাগৃহ থেকে তাঁরা দূরেই স'রে রইলেন।

মধ্যে মধ্যে এর বিরুদ্ধে কিছু কিছু প্রতিবাদ ধ্বনিত হয়ে থাকলেও এবং ঠাকুরবাড়ী বা অন্যান্য সংস্কৃতিকেন্দ্রের কেউ কেউ সংস্কারকের মন নিয়ে মঞ্চে অবতীর্ণ হলেও সমাজ-নায়কেরা রঙ্গমঞ্চকে পতিত মানুষের জায়গা হিসেবেই ভেবে নিয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাব না ঘটলে বোধহয় আজও আমাদের সাধারণ মনোভাব তাই-ই থেকে যেত। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ আসবেন আমাদের জীবনে, জাতির ভাগ্যে তা লেখা ছিল, তার বিরুদ্ধে কি করা যাবে? তিনি এলেন এবং তাঁর প্রচণ্ড ব্যক্তিত্বের প্রভাবে সমস্ত রঙ্গমঞ্চটিকে উঠিয়ে নিয়ে এলেন ঘৃণার আস্তাকুড় থেকে সশ্রদ্ধ প্রশংসার আসরে। নাটক লিখলেন, গীতিনাট্য লিখলেন, নিজে অভিনয় করলেন—সকলকে দিয়ে করালেন—দর্শকের চোখ ঝলসে গেল তাঁর অভিনয়ে ও রুচির উচ্চতায়। বলতে গেলে আধুনিক বাংলা রঙ্গমঞ্চের সূচনা হ'ল তাঁর থেকেই। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের এই প্রয়াসগুলির মধ্যে শিল্প-সৃষ্টিই (artistic creation) ছিল মুখ্য উদ্দেশ্য—তত্ত্বকথা থাকলেও তা এমন সার্বজনীন রূপ নিত যে, কোনও প্রচার ধর্ম তার মধ্যে প্রকাশ পেত না। অবশ্য রবীন্দ্রনাথের নাটক ও নৃত্য-গীতানুষ্ঠানগুলির উপস্থাপনা সাধারণ মানুষের বুঝতে পারার একেবারে বাইরে না হ'লেও তার জন্যে প্রয়োজন ছিল কিছুটা প্রস্তুতি যা অনেক সময়েই দুর্লভ।

তাঁর অনুসরণে না হোক্, তাঁর সময়ে বহু নাট্যকার ও বহু পরিচালক এই সময়ে কুশলতার পরিচয় দিয়েছিলেন রঙ্গমঞ্চের পুনরুজ্জীবনে। কিন্তু সব সত্ত্বেও এটা সত্যি-কথা যে, গিরীশচন্দ্র ঘোষ ও শিশিরকুমার ভাদুড়ীর মতন প্রতিভাশালী ও আদর্শবান্ মানুষের নেতৃত্বও গতানুগতিকতা ও সামাজিক মর্যাদাহীনতার চাপের বিরুদ্ধে লড়াই করে টিঁকতে পারল না। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়ে এসে তাই দেখি, অনেকগুলি স্থায়ী রঙ্গমঞ্চের অস্তিত্ব থাকলেও বাংলা দেশে অভিনয়ের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়।

এই সময়ে প্রথমে 'ভারতীয় গণ-নাট্য সঙ্ঘ' ও পরে 'বহুরূপীর' নেতৃত্বে এল প্রচারমূলক অভিনয়ের যুগ। অনেক নতুন নাটক লেখা হ'ল, নতুন অভিনেতা ও অভিনেত্রীর দেখা পাওয়া গেল, অনেক পরিচালক অভিজ্ঞতা ও সাহস পেলেন—এই যুগে। সত্যিই বাংলা দেশের রঙ্গমঞ্চের ক্ষেত্রে এটা একটা নতুন যুগের সূচনা করল। আজকেও আমরা প্রধানতঃ কলকাতা শহরকে কেন্দ্র করে যে নাট্যধারা লক্ষ্য করি তা হ'ল এই সময়েরই উত্তরাধিকারী। এঁদের মুখ্য উপজীব্য হ'ল সামাজিক ও রাজনৈতিক চেতনার জাগরণ। এই দৃষ্টিভঙ্গিতে এঁরা যেমন 'বিশে জুনের' মতন নতুন নাটকও তৈরী করছেন, তেমনি 'রক্তকরবী' বা 'মুক্তধারার' মতন পুরানো নাটকেরও নতুন রকমের অভিনয় করছেন। কিন্তু দর্শকেরা যে আজ প্রচারমূলক অভিনয়ে ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন তার অকাট্য প্রমাণ পাওয়া যায় 'অলীকবাবু' বা 'ব্যাপিকা-বিদায়ে'র জনপ্রিয়তার মধ্যে। এই নাটকগুলির মধ্যে যে বলিষ্ঠতা পাওয়া যায়, প্রায় রাবেলার মতন হাসির খোরাক পাওয়া যায় তাকে দর্শক-সমাজ বিরাট্ আগ্রহে গ্রহণ করেছেন এটা বোধহয় আশারই কথা। আজকে যেখানে দুর্গাপুরের ইস্পাত কারখানা আর নতুন নতুন রাস্তা আর বড় বড় প্ল্যান ও স্কীমের প্রাদুর্ভাব, সেখানে দেশের চেহারা যে দ্রুত পাল্টাচ্ছে তাতে সন্দেহ কি? সেখানে মানুষ যদি প্রাণ খুলে হাসতে না পারে ত বাঁচবে কি ক'রে? শুনেছি 'ব্যাপিকা-বিদায়' দেখে একজন ভদ্রমহিলা বলেছেন তাঁর বহু পুরাতন blood pressure অবিশ্বাস্যভাবে কমে গেছে। আমার মনে হয় এই ধরণের blood pressure কমাবার দরকার আমাদের অনেকেরই আছে। যখন কোনও মানুষ নিজের জীবনটাকে প্রচণ্ড প্রয়াসের মধ্যে দিয়ে সফলতার মধ্যে উত্তীর্ণ করতে চায়, তখন সাধারণতঃ তার একটা খুব প্রয়োজন থাকে কোনও কোনও সময়ে সম্পূর্ণভাবে নিজেকে ছেড়ে দিতে আনন্দ উপভোগের

মধ্যে। Work এবং play-র এই দ্বৈত ভূমিকা সাধারণভাবে একটি জাতির জীবনে সত্য। আমার মনে হয় আমাদের রঙ্গমঞ্চে নির্জলা তত্ত্ববিহীন play-র অভ্যুদয় বোধহয় একটু প্রমাণ দেয় যে, আমরা এতদিনে work জিনিষটা সুরু করেছি।

এই ধরণের revivalism অবশ্য বহু দেশে বহুবার দেখা গিয়েছে। বিশেষ করে আমাদের পরিচিত ইংরাজী সংস্কৃতির ইতিহাসে ক্রমওয়েলের পতনের পরে দ্বিতীয় চার্লসের সময়ে এবং প্রথম মহাযুদ্ধের ধাক্কায় ভিক্টোরিয়ান অধ্যায়ের চূড়ান্ত সমাপ্তির পরে। তবে সেইসব দৃষ্টান্তে আমাদের একটা ভয় আছে যে, এই ঢেউ একবার সুরু হ'লে তাকে শেষ পর্যন্ত রুচিহীন অতিশয়তার থেকে রক্ষা করা যায় না। এই ভয়টা আরও দানা বেঁধেছে এই জন্য যে, 'রূপকার' নিবেদিত এই নাটকটিকে যথেষ্ট ছাঁট-কাট করা হয়ে থাকলেও এক-এক জায়গায় দু'টি-একটি কথায় মনে হয়, রুচির মাপকাঠিতে উত্তীর্ণ হতে পারলাম না। সে সব জায়গা বাদ দেওয়া হয়ে থাকলে দর্শকেরা কিছু কম উপভোগ করতেন ব'লে মনে হয় না।

'ব্যাপিকা-বিদায়ের' বর্তমান রূপে হৃদয়গ্রাহী অভিনয় যে কয়টি হয়েছে তা বলতে গেলে প্রায় সব চরিত্রেরই নাম উল্লেখ করতে হয়। চৌধুরী মহাশয়ের চরিত্রে পরিচালক সবিতাব্রত দত্ত স্বয়ং ত একটা অপূর্ব কাণ্ড করেছেন। তাঁর যেমন অভিনয়, তেমন গান—বহুবার দেখেও তাঁর খুঁৎ সত্যিই ধরতে পারি নি। আমাদের দেশের রঙ্গমঞ্চে মনোরঞ্জনের প্রয়াসে ইনি একেবারে যুগান্তর ঘটিয়েছেন বলা যায়। ঘনশ্যাম শিকদারের চরিত্রে বঙ্কিম ঘোষের মতন হাসাতে হয়ত আরও কেউ কেউ পারতেন কিন্তু হাসাতে হাসাতে দর্শকের চোখে, লুকানো বেদনার অভিব্যক্তিতে, এভাবে জল এনে দিতে আর কাউকে দেখি নি এখনও। আশা করি এঁর গুণের উপযুক্ত ভূমিকা আরও পাওয়া যাবে—এঁর অন্যান্য অভিনয় আরও দেখতে পাব। চৌধুরী মহাশয় ও ঘনশ্যাম শিকদারের ভূমিকা দু'টিকে আপাতদৃষ্টিতে ফোটানো ছাড়াও সবিতাব্রত ও বঙ্কিম আর একটি বিষয়ে সফল হ'তে পেরেছেন, সেটি হ'ল চরিত্র দু'টির মূল 'ভালত্ব'টিকে প্রমাণ করা। এরা দু'জনেই সব চপলতা সত্ত্বেও মানুষ হিসাবে ভাল তাতে কোনও সন্দেহই থাকে না। অভিনেতা হিসাবে এঁদের রুচি অসাধারণ রকমের তীক্ষ্ণ, কুশলতার কথা ত বাদই দিলাম।

মহিলা চরিত্রে মুক্তি গোস্বামীর 'মিনি রায়' এবং কালিন্দী সেনের 'ব্যাপিকার' অভিনয় খুব সুন্দর। তবে আমার মনে হয়েছে, ব্যাপিকা আর একটুখানি সংযত হলেও হ'তে পারতেন। স্মিতা সিংহের 'লীলা লাহিড়ী' একমাত্র রোমাণ্টিক ভূমিকা হিসাবে বেশ ভাল হয়েছে—তবে এক-এক জায়গায় তাঁর অভিনয়ে গতির অভাব দেখেছি, জানি না সেটাই পরিচালকের অভিপ্রায় কি না। গীতা দত্তর 'চমৎকার' চমৎকারই হয়েছে। চপল অথচ পরিচ্ছন্ন এ রকম মহিলা-শিল্পীর অভাব আমাদের বোধ হয় খুবই আছে। শুনেছি 'তিল তর্পণ' নাটকেও তিনি এই ধরণের পটুতা প্রয়োগ করে থাকেন—আশা করি সেটা অদূর ভবিষ্যতেই আমরা দেখতে পাব। তবে গানগুলি তিনি নিজে না গাইলেই ভাল করতেন—কারণ গানের গলা তাঁর নীচু।

এই অভিনেতৃ-দলটির একটা বড় বৈশিষ্ট্য যে, ছোট ছোট চরিত্রগুলির প্রতিও তাঁরা সমান নজর দিয়ে থাকেন। শ্রীধর ঠাকুরের ভূমিকায় প্রদ্যোৎ চ্যাটার্জি ও ব্রজ বাবুর্চির ভূমিকায় মধুসূদন দত্ত অনবদ্য অভিনয়ে দর্শকের মন ভুলিয়ে নেন। বেয়ারার ভূমিকায় শক্তি দত্তও খুব সহজ সুন্দর অভিনয় করেছেন। কিন্তু এই ভৃত্যদলটির মধ্যে সবচাইতে বেশী মনে থেকে যায় দাসার ভূমিকায় কমলা ব্যানার্জির কথা। কিন্তু এ'দের তুলনায় ভবরূপ ভট্টাচার্য্যের 'ভাদুড়ী সাহেব' ও অসিত মুখোপাধ্যায়ের 'মিষ্টার রায়' অনেক ম্লান। যেখানেই এ'রা দু'জনে পর পর কথোপকথনের মধ্যে ধ'রে রাখতে চেয়েছেন দর্শকের মনোযোগ, সেখানেই এঁরা বিফল হয়েছেন; বলতে গেলে নাটকটির মধ্যে প্রাণের অভাব শুধু এই অংশগুলিতেই ঘটেছে। তার জন্যে অবশ্য শুধু এঁদেরই দোষ দিই না, বোধহয় নাটকটিকে এইসব জায়গায় আরও একটু কাটছাঁট করতে পারলে ভালো হ'ত।

মঞ্চ পরিকল্পনা খুব ভালো। বিশেষ ক'রে দুইপাশে রাখা দু'টি screenকে ব্যবহার করা হয়েছে খুব দক্ষ ভাবে। কিন্তু পরিকল্পনা ভালো হলেও setটিকে অত্যন্ত বিবর্ণ বলে মনে হয়েছে। এই প্রসঙ্গে অবশ্য আর একটি কথা না বলে পারছি না—মঞ্চের পরিকল্পনা করতে গিয়ে আমরা ceiling-এর দিকটা সব সময়েই উপেক্ষা করি কেন? ইঞ্জিনিয়ারের বাড়ী—উপর থেকে একটা পুরনো পাখার অস্তিত্ব দৃশ্যমান হ'লে কি উপরের ফাঁকা ফাঁকা ভাবটা কাটত না? হাতীর দাঁতের ছবি বা ফুলদানীতে রাখা ফুল ইত্যাদিও আরও অনেক বাস্তবানুগ হলে তবে চিত্তাকর্ষক হয়। নইলে ওগুলি নেহাৎই ছেলেভুলোনো

ব'লে মনে হয়। আলোর ব্যবহার ও সঙ্গীতের ব্যবহার ভালো—আবহাওয়া জমানোর দিক্‌ থেকেও বটে আবার নাটকটির গতিকে সাহায্য করার ব্যাপারেও বটে। তবে তাতে যে আতিশয্য নেই এটা আমাদের খুশীই করেছে। পোশাকের পরিকল্পনা কিন্তু অত্যন্ত গতানুগতিক ও unimaginative বলে মনে হয়েছে। ব্যাপিকার পোশাক ত তাঁর প্রাণবন্ত অভিনয়কে সাহায্য করবার পরিবর্ত্তে ব্যাহতই করেছে বলতে হয়।

ভৃত্যদের বা চৌধুরী মহাশয়কে যেমন সহজ পোশাক দেওয়া হয়েছে, মহিলাদের যদি সেই রকম সহজ পোশাক দেওয়া হ'ত তবে কি নাটকের রসগ্রহণে কোনও ব্যাঘাত ঘটত? পুষ্পবরণ রায় ও জটিলেশ্বর ভাদুড়ীর তুলনায় ঘনশ্যামকে অতটা স্পষ্টভাবে clownish পোশাক পরানর দরকার কি? তাঁকে দেখে আমরা হাসি তাঁর অভিনয়ের জন্য, তাঁর পোশাকের জন্য নয়। এটা যদি আমরা বুঝতে পেরে থাকি ত পরিচালক কেন বুঝলেন না? তবে যাই হোক, তিনি অন্য যা যা বুঝেছেন তা নিয়েই আমরা খুশী! আমাদের মতে 'ব্যাপিকা-বিদায়ের' সফলতা মানে নাট্যকারের সফলতা নয়—পরিচালকের সফলতা।

রাজনারায়ণ বসুকে লিখিত পত্রাবলী

রাজনারায়ণ বসু মাইকেল মধুসূদনের সহিত হিন্দুকলেজে ২য় শ্রেণীতে একত্র পড়িয়াছিলেন। মধুকে তিনি বড় ভালবাসিতেন। তিনি লিখিয়াছিলেন, "আমি এই সময়ে মধুর এমনি গোঁড়া হইয়া পড়িয়াছিলাম যে তাঁহাকে দেখিবার জন্য ব্যগ্র হইয়া লিখিয়াছিলাম, 'কবে আমি দেখিব মধুসূদনবদনসরোজং।' আমি জয়দেব হইতে ঐ বাক্য উদ্ধৃত করিয়াছিলাম।"

ঋষি রাজনারায়ণ বসু ও মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ উভয়েই হাফেজের গভীর অনুরাগী ছিলেন। দেবেন্দ্রনাথের অনুরোধে বাংলায় হাফেজের অনুবাদ ১৭৮৮ শকে মাঘোৎসবে কিছু প্রকাশিত হয়। এই বইটি শ্রীকণ্ঠ সিংহের পৌত্র সচ্চিদানন্দ সিংহের নিকটে আছে। পরে আরও অনেক গজল বাংলায় অনূদিত হয়। মহর্ষি পারসী অক্ষর সুন্দর লিখিতে পারিতেন। "তাঁহার পারসী হস্তাক্ষর মুদ্রাঙ্কিত অক্ষরের ন্যায় পরিষ্কার।" এই পত্রাবলীতে আমরা তাহার পরিচয় পাইয়াছি।

মহর্ষিদেবের চিঠিতে ভয়সী (বয়সী) সাহেবের কথা আছে। এই ভয়সী সাহেব বিষয়ে পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী লেখেন, "ইংলণ্ডে যে যে স্মরণীয় মানুষ দেখিয়াছিলাম তাহার মধ্যে···চতুর্থ স্মরণীয় মানুষ থাষ্টিক চার্চের আচার্য্য রেভারেণ্ড-চার্লস ভয়সী।···তিনি যে সময়ে অসময়ে খ্রীষ্টীয় ধর্মের ও যীশুর দোষ কীর্ত্তন করিতেন, তাহা আমার ভাল লাগিত না; কিন্তু যে ভাবে উদার আধ্যাত্মিক সার্ব্বভৌমিক ধর্মের সত্য সকল ব্যক্ত করিতেন, তাহাতে আমার মন মুগ্ধ হইত।···ভয়সী সাহেবের একটি মেয়ে সিন্ধুদেশের একটি ব্রাহ্ম যুবককে বিবাহ করিয়া এ দেশে আসিয়াছে।···আমি ভয়সী সাহেবের অনুরোধে তাঁহার উপাসনা-মন্দিরে (একদিন) উপদেশ দিলাম।··যতদূর স্মরণ হয়, সেই বিবরণ উপস্থিত ব্যক্তিদিগের অনেকের ভাল লাগিয়াছিল।··আমি দেশে ফিরিলে ভয়সী সাহেব সর্ব্বদা চিঠিপত্র লিখিতেন এবং মধ্যে মধ্যে আমার কাজের জন্য অর্থসাহায্য করিতেন। মৃত্যুর দিন পর্য্যন্ত এই আত্মীয়তা রক্ষা করিয়াছিলেন।"

ভয়সী ব্রাহ্ম ধর্মে অনুরক্ত হন।

সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর ভারতের প্রথম I. C. S. তিনি পুনা, বোম্বাই প্রভৃতিতে বহুদিন ছিলেন। ইনি মাইকেল মধুসূদনের সঙ্গে এক জাহাজে বিলাত যান। "বোম্বাই চিত্র" তাঁহার রচিত। দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর সেলাই বা আঠার সাহায্য না লইয়া জ্যামিতিক মাপজোখ অনুসারে নানা রকম কাগজের বাক্স ও বই তৈয়ারী করিতেন। তাঁহার এই খেলা বৃদ্ধ বয়সেও করা অভ্যাস ছিল আমরা দেখিয়াছি। 'রেখাক্ষর বর্ণমালা' অর্থাৎ বাংলায় শর্টহাণ্ড লেখা তৈয়ারী তাঁহার আর একটি খেলা বা কাজ ছিল। পুরাতন 'প্রবাসী'তে রেখাক্ষর বর্ণমালা বিষয়ে প্রবন্ধ আছে।

রাজনারায়ণের আত্মচরিতে আছে, (১৮৬০-র কথা) "এই সময়ে কেশববাবুকে তিনি সকল অপেক্ষা ভালবাসিতে আরম্ভ করেন।·· কেশববাবুর এই সময়ে ধর্ম বিষয়ে নবোৎসাহ; ··তিনি ব্রাহ্ম-ধর্ম প্রচারের নানা উপায় বিষয়ে দেবেন্দ্রবাবুর সঙ্গে পরামর্শ করিতেন, আমি যোগ দিতাম।" রাজনারায়ণ "What is Brahmoism" নামক পুস্তক লেখেন এবং Rev. Voysey-কে

ওঁ

২৭ এপ্রেল ১৮৯২

প্রীতিপূর্ব্বক নমস্কার

আমার কাছে কবিবর মাইকেল মধুসূদনের কোন পত্রাদি নাই—তিনি যে আমাকে ইতালীয় ভাষায় কোন পত্র লিখিয়াছিলেন এমন ত মনে হয় না। কেবল তাঁর সম্বন্ধে এই একটা কথা মনে পড়ছে—আমি তাঁকে একটি ব্রহ্মসঙ্গীত লিখিবার জন্য অনুরোধ করাতে তিনি

'আশার ছলনে ভুলি কি ফল লভিনু হায়'

মত একটী লিখিয়া পাঠাইলেন। তাহা আমার ব্রহ্মসঙ্গীতে দেখিতে পাইবেন। আমার নূতন কিছু লেখা হইতেছে না—মেঘদূতের অনুবাদ অবশ্য দেখিয়া থাকিবেন—আশ্বিন কার্ত্তিকের ভারতীর সঙ্গে ক্রোড়পত্ররূপে বাহির হয়। যদি না পড়িয়া থাকেন আনাইয়া দেখিবেন। আর তাহার উপরে আপনার মতামত শুনিতে পাইলে সন্তুষ্ট হই।

'বোম্বাই-চিত্র' আপনাকে শীঘ্রই একখানি পাঠাইয়া দিব। আমি সম্প্রতি এক মাসের ছুটি লইয়া কলিকাতায় গিয়াছিলাম—দেখিতে দেখিতে দিনগুলি উড়িয়া গেল—আর কোথাও যাওয়া ঘটে নাই। আপনার সঙ্গে অনেক দিন দেখা সাক্ষাৎ হয় নাই—কবে যে এমন শুভ সংঘটন হইবে বলা যায় না। আগামী শীতকালে দীর্ঘকালের জন্য ফর্লো নেবার ইচ্ছা আছে—দেখি যদি কোন সুযোগে একবার আপনার ওদিকে যাইতে পারি। আমার কন্যা ইন্দিরা এবার B. A. পরীক্ষা দিয়াছেন—ইংরাজি ফরাসিস আর Moral Philosophy এই তিন বিষয় ইহার মধ্যে প্রথম দুয়ে Honours দেওয়া হয়—শুনছি পাস হইয়াছেন—শীঘ্রই গ্যাজেটে দেখা যাইবে।

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর

ওঁ

শ্রদ্ধাস্পদেষু

আমি এত কাজে ব্যস্ত যে আপনাকে পত্র লিখিব—তাহা আর হইয়া উঠিল না। আজ খানিকটে অবসর পেয়েছি—তাই পেন্‌সিল্ হস্তে করিয়া চটুপটু বসিয়া গেলাম। But what that কাজ is—is a mystery. আপনাকে বলি—কাগজের বাক্স বিরচনার একটি শাস্ত্র প্রণয়ন করিতেছি—ভারতীতে বাহির হইবে। আপনি তাহা দেখিবেন—ও অবশ্য অবশ্য তাহার একটা criticism করিয়া পাঠাইবেন। সকালে আমি এখন ছাতের উপরে দুকোশ হাঁটি—মাপা জোখা দুই কোশ। হাঁটিবারও একটা শাস্ত্র আছে - সেটা এর পরে আপনাকে বলিব। তাহার নমুনা—অথবা গোড়ার মুখপত্র; "দংকুজি—বংকুজি। দস্ দস্ দস্ দস্—বস্ বস্ বস্ বস্—দম্ দম্ দম্—বম্ বম্ বম্॥" ইহার দৃষ্টে যাহা বোঝেন—বুঝুন।

শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর

আমার দার্শনিক উচ্ছ্বাসের প্রতি আপনার কৃপাবলোকন হইয়াছে ইহা আমার আশাতীত সৌভাগ্য।

—০—

বিজ্ঞপ্তি

এই সংখ্যায় শিকার গল্পটির ছবি এঁকেছেন, প্রখ্যাত চিত্রশিল্পী শ্রীশৈল চক্রবর্ত্তী।

অথ সারমেয় কথা গল্পটির ছবি এঁকেছেন শ্রীমতী শক্তি বসু।

আশ্বিন সংখ্যায় কাঁকড়াবিছে গল্পটির ছবি এঁকেছিলেন শ্রীমতী শক্তি বসু। বাকী সমস্ত গল্প, এবং শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র দাশগুপ্তের ভৌতিক স্মৃতিকথা বিচিত্রিত করেছিলেন শ্রীশৈল চক্রবর্ত্তী।

মেঘ করা

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

মনজোড়া ও গগনজোড়া দেখবি মেঘ করা,
মেঘবালাদের মনোহারী মণির পসরা।
সবার সেরা নেত্রোৎসব এটা—
'নিশাত বাগে' একেবারে সব গাছে ফুলফোটা,
ময়দানবের ইন্দ্রপ্রস্থ ইন্দ্রনীল গড়া।

এ যেন রে অপ্সরাদের আনন্দাশ্রু মেঘ—
বরবেশী কোন গঙ্গাধরকে করবে অভিষেক।
লক্ষ যক্ষ বালার কটাক্ষ—
থলো থলো দ্রাক্ষা ফলে ধরেছে পাক গো,
সুধারসে ভাসিয়ে দেবে এ বসুন্ধরা।

আছে কত রামধনু ওর বক্ষে লুকায়ে,
কল্পতরুর ক্ষীরধারা, যা যায় নি শুকায়ে।
মন্দাকিনীর শুনছি কুলুকুল—
দিক্‌গজেরা সারি দিয়ে দাঁড়ানো বিলকুল,
সোনার সম্ভাবনা, কালোর মঞ্জুষাভরা।

দর্শনীয়ের দর্শনীয় দাঁড়িয়ে যে হেথা—
দূত হয়ে সে অসীমে যায় নিয়ে বারতা।
অনাগতের উল্লাস উচ্ছ্বাস—
বরুণ রাজের রাজসূয়ে, আয় দেখতে যদি চাস্,
কক্ষে নিতে ভুলিস্ না গো সুবর্ণ-ঘড়া।

স্রোত

শ্রীকামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

পাহাড়ের ঢল-নামা স্রোত
পাথরে আঘাত হেনে বিড়ম্বিত অথচ উচ্ছ্বাসে
অবাধ। আঘাতেও আঘাত পায় না
কখনো স্ফটিক-স্বচ্ছ আবার ঘোলাটেও হয়
মুহূর্তে-মুহূর্তে তার অপূর্ব প্রত্যয়।
এই ভাবে নানা-রঙা স্বাদ
চিড় খায়, জোড় লাগে।
মনের পাগলকে নিয়ে ভাবে কোনো দিন
পূর্ণ যৌবন-ভারে নিবিড় নদীর ক্ষীণ
কটিখানি।
তীরে তার তরুণীরা জল ভরে
শিশু করে জল-ছোড়া খেলা
নিশ্চিন্ত আত্মায় তার আরো বড় পট
তরুণী নদীর পর আছে এক সমুদ্রের নট
তাকে সে করবে গ্রাস, অন্তহীন ক্ষুধা :
একাকার চাঁদ-সূর্য তারার জোনাকি আর শ্যামলী বসুধা॥

আগাছা

শ্রীকালিদাস রায়

আগাছা তুমি যে ধরা জননীর স্বেচ্ছার অবদান,
মানুষের যত অযতন তোমা করেছে আয়ুষ্মান্।
পোষ্যপুত্র নহ
হেসে উপেক্ষা সহ
ধূলায় কাদায় গড়ে ওঠা যেন কাঙালের সন্তান।

ভ্রাতা উত্তম, বিমাতা ধ্রুবেরে পাঠাল নির্ব্বাসনে।
পিতৃঅঙ্কে আসন না পেয়ে ধ্রুব চলে গেল বনে।
তুমি কি ধ্রুবের মতো
আছ তপস্যা-রত
একদিন তুমি অধ্রুবে জিনি বসিবে কি রাজাসনে?

ভালবাসি তোমা মোরি মত একই প্রকৃতির সন্তান,
ঠাঁই নয় তব প্রজাদের ক্ষেত, রাজাদের উদ্যান।
তুমিও আমারি মতো
অকেজো অধম স্বতঃ
মোর ভবনের চারিপাশে রয়ে কর আনন্দ দান।

অকেজো? শুনি যে অকেজো কিছুই নয় এই দুনিয়ার,
শেষ হয়েছে কি বিজ্ঞানীদের সকল আবিষ্কার?
একদা তাদের কাছে
তোমাতে কি ধন আছে
পড়িবেই ধরা, তখন শুধুই চাষ হবে আগাছার।

সারা ধরণীই ছিল একদিন তোমাদের নিকেতন,
কোণ-ঠাসা করে রেখেছে আজিকে মানুষের প্রয়োজন।
চাও যদি আপনার
ফিরে পেতে অধিকার
বিদ্রোহী হও কণ্টকায়ুধ করিয়া আস্ফালন।

তোমরা যেন বা বন্য মানুষ কাফরি আফ্রিকার।
ইউরোপ করে ক্ষেত কারখানা বাগানের বিস্তার।
তোমাদের একে একে
সরিয়ে বসেছে জেঁকে
দাবি করো এবে সাম্য মৈত্রী জাতীয় স্বাধীনতার।

আমেরিকার গাভী

এটা হয়ত অনেকেরই জানা নেই যে, আমেরিকা যখন প্রথম আবিষ্কৃত হয় তখন উত্তর ও দক্ষিণ দুই মহাদেশ মিলিয়ে সেখানে গরুর অস্তিত্ব ছিল না। ভার্জিনিয়াতে যে ইউরোপীয়রা প্রথম উপনিবেশ স্থাপন করেন, তাঁরা প্রথম গরুর আমদানী করেন সেখানে। মেফ্লাওয়ার জাহাজে যে 'পিলগ্রিম' ঔপনিবেশিকরা ম্যাসাচুসেট্স্-এ এসে প্রথম অবতীর্ণ হন, তাঁরা গাইগরু সঙ্গে আনতে ভুলেছিলেন, এবং এই দূরদর্শিতার অভাবের দরুণ প্রথমটা তাঁদের খাবার ভাঁড়ারে অত্যন্ত বেশী কষ্ট পেতে হয়েছিল। এখন একমাত্র ইউনাইটেড্ ষ্টেট্স্-এই গাভীর সংখ্যা দুই কোটি দশ লক্ষ।

দাবাখেলার উদ্ভাবনা

কখন হয়েছিল, নিশ্চয় ক'রে বলা শক্ত। মনে হয় খেলাটি মানব-সভ্যতার প্রায় সমবয়সী। মিশরে চার হাজার বৎসরের পুরণো সমাধির মধ্যে দাবার ছক আবিষ্কৃত হয়েছে। হোমার লিখে গিয়েছেন, পেনিলোপের প্রণয়প্রার্থীদের কাজ ও অকাজের মধ্যে দাবা খেলার স্থান ছিল।

দেহ বনাম মন

আপনি যখন কোমরের ব্যথায় অত্যন্ত কষ্ট পাচ্ছেন, তখন যদি কেউ এসে আপনাকে বলে, ব্যথাটা আপনি কোমরে অনুভব করছেন বটে, কিন্তু ওটা আসলে আপনার বিরক্তি-বেদনা, তা শুনতে আপনার হয়ত ভাল লাগবে না। কিন্তু প্রতীচ্যের ডাক্তাররা অনেকেই আজকাল ঐ ধরণের সব কথা বলতে সুরু করেছেন। তাঁদের অনেকের মতে মানসিক কারণগুলিকে ভাল ক'রে অনুধাবন না ক'রে কতকগুলি শারীরিক অসুস্থতার প্রতিকার তাড়াতাড়ি করতে যাওয়া ভুল। রোগীদের চিন্তান্বিত হবার মত কিছু আর থাকে না ব'লেই ত্বরিত প্রতিকার তাঁদের অনেকের পক্ষে ক্ষতির কারণ হ'তে পারে। তা ছাড়া অনেক শারীরিক অসুস্থতার মধ্যে দিয়ে মানসিক ব্যাধির উপাদানগুলি আসিত হয়, আর সেই কারণে শারীরিক অসুস্থতার উপশম হ'লে অন্তর্নিহিত মানসিক ব্যাধি আত্মপ্রকাশ করে। কোথাও কোথাও তা উন্মাদ-রোগের রূপ নেয়, এও নাকি দেখা গেছে।

Duodenal ulcer-এ যাঁরা ভোগেন, তাঁদের মধ্যে অনেকে জীবনের নানারকম সংশয়-সমস্যা নিয়ে বড় বেশী ব্যতিব্যস্ত হয়ে থাকেন। তাঁদের ulcer হয়ত সেরে যায়, কিন্তু ulcer নিয়ে ভাবনা ক'মে যাওয়ার ফলে তাঁদের সংশয়-সমস্যাগুলি তাঁদের আরও অনেক বেশী ক'রে ব্যতিব্যস্ত করে, আর তাতে তাঁদের লাভের চেয়ে ক্ষতিই হয় বেশী।

মনের দিক্ দিয়ে যাঁরা সম্পূর্ণ সুস্থ নন, তাঁদের শরীরের ওজন কমাবার চেষ্টা একটি দস্তুর মত অপচেষ্টা, এ বিষয়ে আজকাল চিকিৎসকদের মধ্যে কোন মতবিরোধই আর প্রায় নেই। এই চেষ্টার থেকে পুরোদস্তুর উন্মাদ-রোগের সূত্রপাত হ'তে অনেক ক্ষেত্রেই দেখা গেছে। এই সব রোগীদের খাদ্য ও পানীয়ের ব্যবস্থা অত্যন্ত বেশী সতর্ক হয়ে করতে হয়, যাতে মনের দিক্ দিয়ে খাদ্যবস্তুগুলিকে নিয়ে মল্লযুদ্ধ করবার প্রয়োজন তাঁদের না ঘটে।

মন থেকে কত রকমের শারীরিক অসুস্থতার উদ্ভব যে হ'তে পারে নীচের তালিকা-দৃষ্টে তার কতকটা ধারণা পাঠক করতে পারবেন:

শারীরিক অসুস্থতা	মানসিক কারণ
১। হাতের ব্যথা-বেদনা	১। কাউকে ঘুষি লাগিয়ে দেবার ইচ্ছার সম্বরণ।
২। পেটের অসুখ (diarrhoea)	২। কারুর কোনো অনুরোধ রক্ষা না করার ইচ্ছার প্রতিরোধ।
৩। হাঁপানি	৩। রাগ, নিজের অপরাধ সম্বন্ধে সচেতনতা, নিরাপত্তার অভাব বোধ, এই মনোভাবগুলিকে চাপা দেবার চেষ্টা।
৪। পিঠের নীচের দিকে ব্যথা	৪। কোন মানুষের বা মানুষ-মাত্রেরই কাছ থেকে থাকবার ইচ্ছাকে মনে রাখতে বাধ্য হওয়া।
৫। দীর্ঘকালস্থায়ী হজমের গোলযোগ	৫। নিজের সহকর্মী, বড় কর্তা, বা নিজের কাজ সম্বন্ধে বিরূপতাকে ভুলে থাকার চেষ্টা।
৬। বুকে ব্যথা	৬। যৌন জীবন সংক্রান্ত ঘাত-প্রতিঘাত।
৭। চর্ম্মরোগ।	৭। কোন বিষয় বা মানুষ সম্পর্কে গভীর বিরাগকে প্রকাশ করার অক্ষমতা।
৮। চোখ অন্ধকার করা শিরোবেদনা	৮। গালাগাল দিয়ে বিদায় করতে ইচ্ছে করছে, এমন কাউকে তা করতে না পারা।
৯। পেটে বায়ু	৯। চিত্তবৃত্তি ও মতামতের প্রাবল্যকে দাবিয়ে রাখার প্রয়াস।
১০। থেকে থেকে দুশ্চিন্তার প্রকোপ	১০। সহজাত সৃষ্টি-প্রতিভার স্ফুরণ ব্যাহত হওয়া।

গোয়া ও পোর্তুগীজ সাম্রাজ্য

গোয়া হাতছাড়া হওয়ার দরুণ পোর্তুগীজ সাম্রাজ্যের যা ক্ষতি হয়েছে তা প্রায় ধর্তব্যের মধ্যেই নয়। পোর্তুগালের যা আয়তন, এখনও পোর্তুগীজ সাম্রাজ্যের আয়তন তা'র ২৩ গুণ বেশী।

এ্যালার্জি জিনিষটা কার আবিষ্কার ?

এ্যালার্জি (Allergy) ব'লে যে শারীর ধর্ম্ম, তার আবিষ্কারকের নাম স্যার হেনরী ডেল। ১৯১০ সালে মানুষের এই শরীর ধর্ম্ম তিনি আবিষ্কার করেন। তাঁর পরীক্ষায় ধরা পড়ে যে, মানুষের শরীরে হিষ্টামিন নামক যে রাসায়নিক পদার্থটি আছে, সেইটিই মানুষের allergy-জনিত নানারকম দুর্ভোগের জন্য দায়ী। কোন কোন জিনিষের সংস্পর্শে এলে কোন কোন মানুষের দেহে অত্যন্ত বেশী পরিমাণে এই রাসায়নিক পদার্থটি উপজাত হয়; অতিরিক্ত এই হিষ্টামিন তখন মানুষের শরীরে নানা রকমের বিপ্লব ঘটায়, মানুষ হাঁচে, কাশে, হাঁস-ফাঁস করে। স্যার হেনরী ডেলকে এই আবিষ্কারের জন্যে নোবেল পুরস্কার দেওয়া হয়।

মহাকাশ ও রেডিও-তরঙ্গ

১৯৩১ সালে কার্ল জি জ্যান্‌স্কি নামক একজন বিজ্ঞানী প্রথম আবিষ্কার করেন যে, মহাকাশ থেকে রেডিও-তরঙ্গ এসে পৃথিবীকে স্পর্শ করছে। প্রথমে বিজ্ঞানীদের মনে হয়েছিল যে, আমাদের যেটা নিজেদের নক্ষত্র-জগৎ, আমরা যেটাকে ছায়াপথ বলি, তার থেকে সমবেত ভাবে সম্ভূত এই রেডিও-তরঙ্গ বুঝি পৃথিবীতে এসে পৌছচ্ছে। কিন্তু বেশ কিছুকাল অতীত হবার পর বোঝা যেতে লাগল, যে এইসব রেডিও-তরঙ্গের অনেকগুলির উদ্ভব বিভিন্ন পৃথক্ শক্তি-উৎস থেকে, তার কোন কোনটির অবস্থান আমাদের নক্ষত্রজগতে, কোন-কোনটির তার বাইরে। অবশেষে ১৯৫১ সালে ওয়াল্টার বাআদ আবিষ্কার করলেন, এই রেডিও-শক্তির এমন একটি উদ্ভবস্থান, যাকে দূরবীক্ষণে ধরা যায়, এবং যার অবস্থান আমাদের নক্ষত্রজগতের বাইরে বহু বহু দূরে, অন্য এক নক্ষত্রজগতে। তখন থেকে এই নিয়ে অনেক গবেষণা হয়েছে, এবং মহাকাশের বিভিন্ন নক্ষত্রজগৎ যে রেডিও-তরঙ্গ পাঠাচ্ছে পৃথিবীতে প্রতিনিয়ত, তার একটা স্বাভাবিক মানও তৈরি হয়েছে। এই মানের বিচারে কয়েকটি নক্ষত্রজগতের ব্যবহারকে মনে হয় অস্বাভাবিক। কারণ, অনেক ক্ষেত্রেই দেখা গেছে, এদের দূরত্ব বা আয়তনের উপর এদের রেডিও-শক্তির পরিমাণ নির্ভর করে না। এই রকম ১০০টি নক্ষত্রজগৎ, যাদের রেডিও-শক্তির পরিমাপ হয়েছে এখন পর্যন্ত, তাদের প্রত্যেকটিকেই বলা যায় 'ইউনিক' অর্থাৎ অন্যদের থেকে ভিন্নধর্ম্মী। এই ধর্ম্মটা যে কি তা নিয়েও অনেক গবেষণা চলছে। এই গবেষণার রীতি ও পদ্ধতি ইত্যাদি বিষয়ে আমরা নিজেরা কিছু বুঝি না ব'লেই পাঠকদেরও বোঝাতে চেষ্টা করব না। এই বিশেষ জাতীয় নক্ষত্রজগৎ-গুলির কয়েকটির ছবি এইসঙ্গে আমরা ছাপছি।
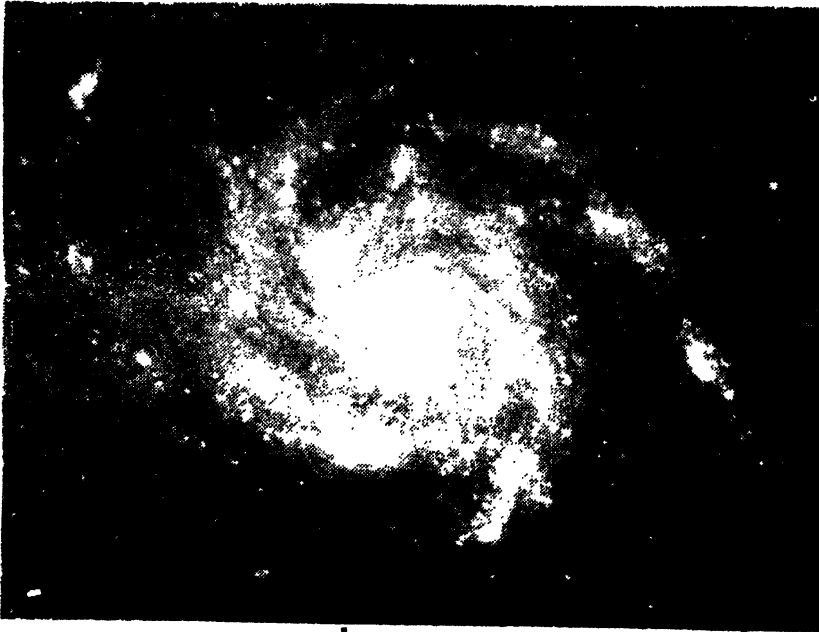
এই ঘূর্ণি (spiral) নক্ষত্রজগৎটির দূরত্ব পৃথিবী থেকে ন্যূনাধিক ৮০ লক্ষ আলোক-বৎসর। এর রেডিও-শক্তিকে বলা যেতে পারে স্বাভাবিক।

এটি একটি সংযুক্ত নক্ষত্রজগৎ। পৃথিবী থেকে এর দূরত্ব ৬ কোটি ৫০ লক্ষ আলোক-বৎসর
স্বাভাবিক রেডিওশক্তির তুলনায় এর রেডিওশক্তি ১০০ গুণ বেশী।
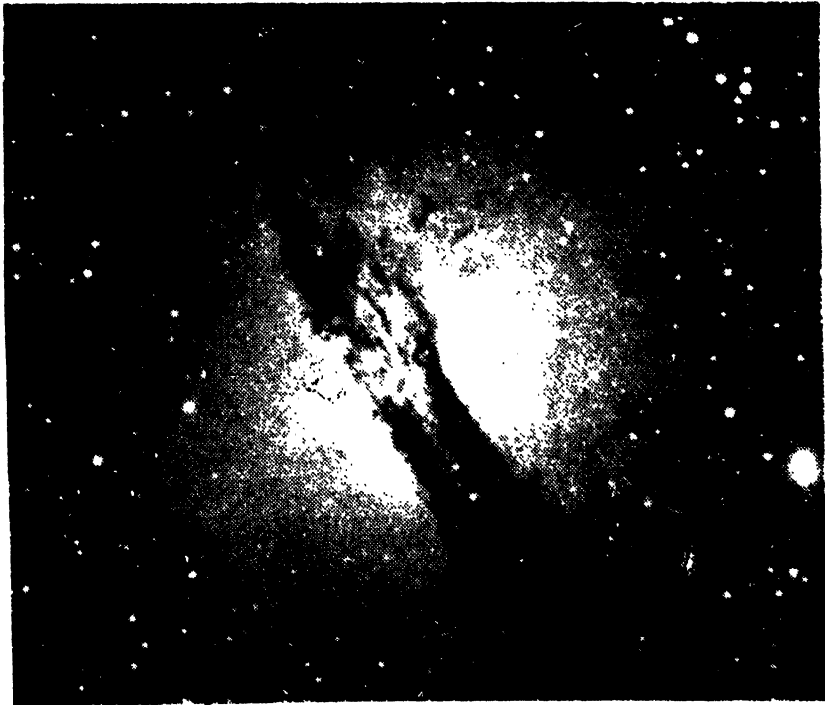
এই নক্ষত্রজগৎটির দূরত্ব পৃথিবী থেকে ১ কোটি ৫০ লক্ষ আলোক-বৎসর। কালো একটা তর্জনীর মত যা দেখা যাচ্ছে, এই নক্ষত্রজগৎটির আলোকমণ্ডলের মধ্যে তা হয়ত মহাকাশের একটি ধূলিময় মহাজগৎ। এটিও রেডিওশক্তিতে অস্বাভাবিক রকম শক্তিশালী।

কাগজের নৌকো

ইংলণ্ডের কেম্ব্রিজবাসী জন্ হুক্‌ম্যান এই নৌকোটি তৈরি করতে প একটু সময় নিয়েছেন, কিন্তু তাঁর সময় বেশী লাগবার কারণ, ৌকোটি তিনি তৈরি করেছেন আগাগোড়া কাগজ দিয়ে। এর মধ্যে রণো খবরের কাগজের পরিমাণই বেশী। নৌকোর খোলটা তৈরি

কাগজের নৌকো

তে বিশেষ রকমের (synthetic resin) আঠা দিয়ে জোড়া বারো ত খবরের কাগজ তিনি ব্যবহার করেছেন। নৌকোটির কাঠামো, গা, পাটাতন, এমন কি মাস্তলটি পর্যন্ত আঠা এবং কাগজে তৈরি। কোটির ওজন ৪ মণের চেয়েও কম। কাঠের নৌকোয় জল কে, জল সেঁচতে হয়। কাগজের তৈরি এই নৌকোটি চায়ের ানার মত নিশ্ছিদ্র, এতে কিছুতেই এক ফোঁটাও জল ঢুকবে না ব'লে া করেন জন্ হুক্‌ম্যান।

অমাতৃক ভ্রূণ

দানিয়েল পেত্রুচি নামক একজন ইতালীয় বৈজ্ঞানিক ৪২ বারের ন্ত প্রচেষ্টা ব্যর্থ হবার পর, মাতৃগর্ভের বাহিরে গবেষণাগারে, নিষিক্ত একটি ডিম্বাণু থেকে মনুষ্যভ্রূণের উৎপত্তি ও বৃদ্ধি সম্পাদন তে সমর্থ হয়েছেন। ৫৮ দিন পর্যন্ত এই ভ্রূণটি ক্রমবর্দ্ধমান অবস্থায় বিত ছিল, এবং আশা করা যাচ্ছিল, এই বৃদ্ধি অব্যাহত থাকবে। দিনের দিন ভ্রূণটির দৈর্ঘ্য ছিল ১'২০ ইঞ্চি, এবং এর হৃৎস্পন্দন রুচলাচল সুরু হয়েছিল। ভ্রূণটির মস্তিষ্ক এবং মেরুদণ্ডের সূচনা ায় সপ্তাহ থেকেই স্পষ্ট বুঝতে পারা যাচ্ছিল। কিন্তু ডক্টর পেত্রুচি এই পরীক্ষাকে আর অগ্রসর হতে দেন নি, কারণ, এই ভ্রূণটিকে বিত রাখবার জন্যে তাঁকে প্রতিদিন এক গ্যালনেরও চেয়ে বেশী sma বা রক্তরস জোগাতে হচ্ছিল। প্রয়োজনীয় রক্তরসের পরিমাণ ড়ই চলেছিল দিন থেকে দিনে। একে আরও বেশীদিন বাঁচিয়ে তে হ'লে যে রক্তরসের প্রয়োজন হ'ত তা সংগ্রহ করা কঠিন হ'ত তা ছাড়া ভ্রূণটির নিশ্বাস-প্রশ্বাস এবং পুষ্টি-সংক্রান্ত নানারকমের ব্যবস্থার নিয়ন্ত্রণ হ'ত অত্যন্ত বেশী ব্যয়সাপেক্ষ।

তবে ডক্টর পেত্রুচি মনে করেন, ভ্রূণটিকে যে অবস্থায় তিনি এনেছেন, তার থেকেই চিকিৎসাজগতে যুগান্তর সুরু হওয়া সম্ভব।

ফুস্‌ফুস্, মূত্রাশয়, এমনকি হৃৎযন্ত্র-সংক্রান্ত এমন অনেক রোগ আছে, যে-সমস্ত রোগে দেহযন্ত্রগুলির রোগাক্রান্ত অংশগুলিকে কেটে ফেলে দিয়ে তাদের জায়গায় পরিপূরক হিসাবে সুস্থ পেশী, মাংস ইত্যাদি বসিয়ে দিতে পারলে হাজার হাজার রোগী রোগমুক্ত হতে পারেন। অন্য মানুষের শরীর থেকে সেইসব পেশী ইত্যাদি নিতে যাবার অনেক বিড়ম্বনা। মনুষ্যদেহ অন্য মানুষের দেহাংশ বরদাস্ত করতে পারে না, একমাত্র নিজের যমজ বা অত্যন্ত নিকটাত্মীয়ের দেহাংশ ছাড়া। কিন্তু ভ্রূণের দেহাংশ নিয়ে মনুষ্যদেহের এই জাতীয় বাছবিচার নেই। সে-জন্যে হয়ত মা নিজের গর্ভস্থ যে ভ্রূণ, যার মধ্যে সম্পূর্ণ ভিন্নগোত্রীয় তাঁর স্বামীর দেহের সারাংশ রয়েছে, তাকে প্রাথমিক বমন ইত্যাদি সত্ত্বেও সহ্য করতে পারেন। তা ছাড়া ভ্রূণের দেহাংশ যতই অপরিণত হোক, 'কলমের কাজ' সেগুলিকে ব্যবহার ক'রে ডক্টর পেত্রুচি আশাতীত ফললাভ করেছেন। তাই ভ্রূণদেহ সহজলভ্য নয় ব'লে ল্যাবরেটরীতে ভ্রূণ উৎপাদনের কাজে তিনি ব্রতী হয়েছিলেন।

ডক্টর পেত্রুচি খোদার উপর খোদকারি করতে চাইছেন, তিনি একজন ফ্রাঙ্কেস্টাইন, এজাতীয় অনেক কঠোর সমালোচনাও তাঁকে শুনতে হয়েছে। কিন্তু মানবের হিতার্থে ল্যাবরেটরী-জাত ভ্রূণ নিয়ে গবেষণা এজন্যে তিনি পরিত্যাগ করবেন ব'লে মনে হয় না।

শক্তি ও সম্ভাব্যতার সীমার মধ্যে এই গবেষণা চালাবার চেষ্টা পেত্রুচি করবেন ব'লেই বলছেন সকলকে।

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য কি মিলবে ?

একটা জায়গায় মিলবে ব'লে মনে হয় না। নিমন্ত্রণবাড়ীতে গিয়ে পাত খালি ক'রে খেলে, অর্থাৎ পাতে বেশ কিছু ভাল আহার্য না প'ড়ে থাকলে আমাদেশে গৃহকর্তার অপমান বোধ হয়। কিন্তু ইয়োরোপ আমেরিকায় নিমন্ত্রিতের পাতে কিছু প'ড়ে থাকাটাই হচ্ছে bad manners অর্থাৎ নিমন্ত্রিতের আদবকায়দা-জ্ঞানের অভাব। নিমন্ত্রিতকে তাঁরা মনে করবেন, আদেখলা। বলবেন, এই ব্যক্তিটির পেটের ক্ষিদের চেয়ে চোখের ক্ষিদে বেশী। এসব খাবার বোধহয় দেখেনি এর আগে।

ছেলেবেলায় নিমন্ত্রণবাড়ীতে গিয়ে ভরপেট আম-ক্ষীর খেয়ে আঙ্গুল-গুলোকে পরিষ্কার করবার উদ্দেশ্যেই বোধহয় আঙ্গুল চাটছিলাম। বাড়ীর গৃহিণী আবার আম-ক্ষীর খেতে বাধ্য করলেন আমাকে। খেতে অত্যন্ত অন্যমনস্ক হয়ে আবার আঙ্গুল চাটছিলাম। আবার আম ক্ষীর পাতে পড়ল, কিন্তু খেতে পারলাম না আর। আমি জানি, মহিলাটি আমাকে আদেখলা ভাবেন নি। কিন্তু তৃতীয়বার অতিথিকে আম-ক্ষীর খাওয়াবার চেষ্টাটা এই দরিদ্র দেশে নিঃসন্দেহ অপরাধ।

পেশীবহুল দেহ

বাহান্ন ইঞ্চি ছাতি, আর সাড়ে আঠারো ইঞ্চি বাহুর পরিধির
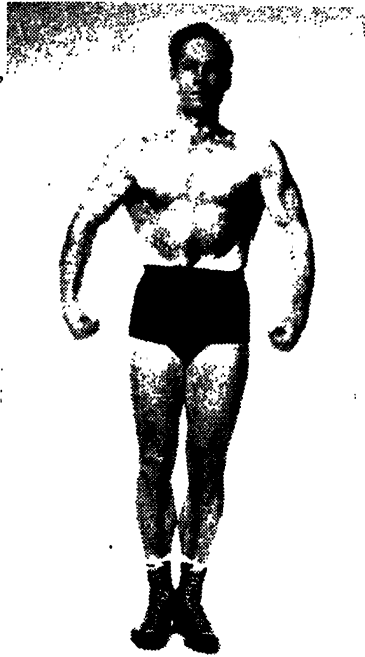
মধ্যে খুব বেশী মাহাত্ম্য কিছু নেই। ইস্কুল-কলেজের মেয়েরা দেখে এবং শুনে খুব অভিভূত হয় ঠিকই, কিন্তু ডাক্তাররা আজকাল এবিষয়ে যা বলেন তার সুর একেবারে উল্টো।

তাঁরা বলেন, মাংসপেশীর এই জাতীয় স্ফীতি কেবল যে অস্বাভাবিক তাই নয়, এ একেবারে নিষ্প্রয়োজন। যাঁরা বক্সিং লড়েন, যাঁরা ডক, খনিতে বা কামারশালায় কাজ করেন, যাঁদের দৈনন্দিন কাজে শারীরশক্তি ব্যবহারের প্রয়োজন খুব বেশী, তাঁরা মাংসপেশীর অস্বাভাবিক এই বিবৃদ্ধি নিজেদের শ্রমসাধ্য কাজগুলিকে সুষ্ঠুভাবে নিষ্পন্ন করতে একটুও বেশী সাহায্য করে ব'লে মনে করেন না।

ডাক্তাররা আজকাল বলছেন, এই ভ্রান্ত ধারণা অনেক যুবকদের মনে আছে যে, মাস্‌ল্‌গুলো দিয়েই স্বাস্থ্যের বিচার, কিন্তু বাস্তবিক তা নয়। বেশী বয়সে, যখন এরা আর মাস্‌ল্‌-চর্চা করবে না বা করতে পারবে না, তখন এদের অনেকেরই শরীরে মেদবৃদ্ধি সংক্রান্ত নানা দুরারোগ্য রোগ দেখা দেবে।

একজন ডাক্তার বলছেন, বাপু হে, এত মাসকেল নিয়ে তোমার হবে কি? বাস্‌-এ যাচ্ছ, টিকিটের দাম ছ'পয়সা, ছ'টা পয়সা নিয়েই যাও না, ছ'শ' টাকা সঙ্গে নিয়ে বেরোবার কি দরকার?

তবে হ্যাঁ, ওরকম মানুষের মাস্‌লের খেলা দেখতে ভাল লাগে, এই যা।

চাঁদের দূরত্ব

বহুকাল এইটেই জানা ছিল যে পৃথিবী-পৃষ্ঠ থেকে চাঁদের দূরত্ব ২,৩৮,৮৫৭ মাইল। এখন জানা গেছে এ দূরত্ব আরও ৯ মাইল বেশী। চাঁদ যে ৯ মাইল দূরে স'রে গেছে তা নয়, দূরত্ব মাপবার পদ্ধতি পূর্ব্বের তুলনায় উন্নততর হয়েছে

স.-চ.
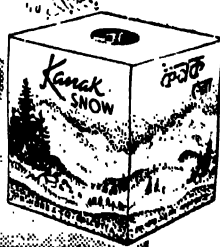
সত্যই ভগবান—মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী রচিত Truth is God রচনাবলীর সার্থক অনুবাদ। অনুবাদক : বিশিষ্ট গান্ধীবাদী লেখক শ্রীবীরেন্দ্রনাথ গুহ। গান্ধী স্মারক নিধি, ৭১ সদর বাজার রোড, বারাকপুর হইতে প্রকাশিত এবং ডি এম লাইব্রেরী কর্তৃক পরিবেশিত। তিন টাকা পঞ্চাশ নয়া পয়সা।

বর্ত্তমান যুগকে ধর্ম্মের নৈরেক্ত যুগ বলা যায়। ভগবানে বিশ্বাস এবং বিশ্বাসী আজ বহুজনের কাছে উপহাসের পাত্র কিংবা উন্মাদ বলিয়া বিবেচিত হয়। সাধারণজন যে-ভাবে ভগবানকে দেখে বা কল্পনা করে, গান্ধীজীর ভগবান্ তাহা হইতে বিভিন্ন। তাঁহারই কথায় বলি : অন্নই দরিদ্রের কাছে পরমার্থ। ক্ষুৎপীড়িত অগণিত জনতার কাছে অন্য কোন কথার মূল্য নাই। তাহাতে সে কান দিবে না। কেহ অন্নের সংস্থান করিয়া দিলে, তাহাকেই সে ভগবান্ মনে করিবে। অন্য কোন চিন্তা তাহাদের নাই। মহাত্মাজী তাঁহার এক প্রার্থনা সভায় বলেন, "আমি অগণিত জনতার একজন। আমি এই দাবি রাখি যে আমি তাহাদের জানি। চব্বিশ ঘণ্টা আমি তাহাদের সঙ্গেই থাকি। তাহারাই আমার দিবস রজনীর একমাত্র ভাবনা কারণ মূক জনতার হৃদয়-নিবাসী ভগবান্ ব্যতীত অন্য ভগবান্ আমি জানি না। ভগবানের নৈকট্য তাহারা অনুভব করে না, আমি করি। আর এই অগণিত জনতার সেবার দ্বারাই আমি ভগবানরূপী সত্যের কিংবা সত্যরূপী ভগবানের আরাধনা করি।"—বৈষ্ণব-কবির মত গান্ধীজীও "সবার উপরে মানুষ সত্য, তাহার উপর নাই"—এই মন্ত্রই ধারণ ও পোষণ করিতেন।

গান্ধীজী ভগবানে অবিশ্বাসীর অবিশ্বাস দূর করিবার কোন চেষ্টা করেন, যদি কেহ এই বিশ্বাসকে আত্ম-প্রবঞ্চনা বা ভ্রান্তি বলে, তাহাতেও তাঁহার আপত্তি নাই, তিনি স্বীকার করিয়াছেন যে অবিশ্বাস দূর করিবার মত প্রমাণ তাঁহার নাই। তবে সেই সঙ্গে অকপট বিধাহীন চিত্তে ইহাও বলিয়াছেন যে, "যাহা শুনিয়াছি তাহা যে সত্যই ভগবানের বাণী, আমার এই বিশ্বাস সমগ্র জগত সমস্বরে উল্টাটি বলিলেও টলিবে না।" তাঁহার কাছে ভগবানের বাণী, বিবেকের বাণী, সত্যের বাণী অথবা অন্তর-ধ্বনি—সবই ছিল এক। আকার তিনি দেখেন নাই, সে চেষ্টাও করেন নাই—কারণ—"আমার চিরকালের বিশ্বাস ভগবান নিরাকার।"

গান্ধীজী কি ছিলেন, তাহা জানিতে যাঁহারা চাহেন, এই পুস্তক তাঁহাদের অবশ্যপাঠ্য। মানবের শ্রদ্ধার পাত্র এই মহাপুরুষের জীবন-ধর্ম্ম, মানসিক গঠন এবং মনন কি ছিল এই পুস্তকে তাহা প্রতিবিম্বিত হইয়াছে। পুস্তকখানি সাধারণ পাঠকের পড়িতে ভাল লাগিবে, অন্য কারণ ছাড়াও, বিশেষ এই কারণে যে, পুস্তক পাঠের ফলে মনে এক বিচিত্র এবং অপূর্ব্ব শান্তির প্রলেপ অনুভব করা যায়। সহজ স্বচ্ছ ভাষা। পরিপাটি মুদ্রণ, বাঁধাই ও সুচারু প্রচ্ছদপট।

শ্রীহেমন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়

অগ্নিযুগের পথচারী—শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র মৌলিক প্রণীত, প্রাপ্তিস্থান এ, মুখার্জ্জী অ্যাণ্ড কোম্পানী, কলিকাতা-১২, মূল্য ৫.০০ টাকা, পৃষ্ঠা ২২৩।

লেখক স্বদেশীযুগের একজন দেশসেবক ও কর্ম্মী এবং যাঁহারা ভারতের স্বাধীনতা অহিংস উপায়ে আসিবে না এই মতে ও পথে বিশ্বাসী তাঁহাদেরই একজন। এজন্য ইঁহাকে অনেক লাঞ্ছনা ও অত্যাচার সহিতে হইয়াছে। শাসক গোষ্ঠীর অত্যাচার কখনও কখনও এতই নিষ্ঠুর ও অমানুষিক হইত যে, সন্দিগ্ধ ব্যক্তি মৃতপ্রায় হইলে তবে রেহাই পাইত। অজ্ঞান অবস্থায় তাহাকে হাসপাতালে পাঠাইয়া দেওয়া হইত। লেখকের "কচুয়া ধোলাই-"এর বর্ণনা সংক্ষিপ্ত অথচ সুন্দর হইয়াছে। বিদেশীর নির্ম্মম শাসন-কালেও সহানুভূতিশীল এবং দরদী ইঙ্গ-ভারতীয় নার্স, কর্ত্তব্যপরায়ণ ও সৎসাহসী ডাক্তার, এমনকি স্বদেশেও এই সকল বেপরোয়া মৃত্যুযাত্রী দেশকর্ম্মীর প্রতি দরদী উচ্চনীচ পুলিসকর্ম্মচারী যে ছিল না, তাহা নহে। ইহা লেখকের নিজের অভিজ্ঞতা হইতে জানা যায়। পুলিস মফিজুদ্দিন সাহেব, বক্সা ক্যাম্পের সুপণ্ডিত কালীশঙ্কর ব্রহ্মচারী, কংগ্রেস-পন্থী জমিদার, পরিতোষ বন্দ্যোপাধ্যায় (?) ও পারুলের (?) কাহিনী, পুরীর সন্ন্যাসীজীবন ও আধুনিক শিক্ষিতা অনীতার ছবি, 'পথে কুড়িয়ে পাওয়া বোনের' ভালবাসা হৃষিকেশে সুখজীবন, সদানন্দ অবধূত প্রভৃতির কাহিনী পাঠকের নিকট ভালই লাগিবে।

পুস্তকের স্থানে স্থানে গান্ধীপন্থা ও কংগ্রেস নীতি সম্বন্ধে যে সকল মতামত প্রকাশ করা হইয়াছে তাহা সর্ব্বসম্মত হইবে এরূপ আশা করা যায় না। পুস্তকের পরিসমাপ্তিতে বর্ত্তমান ভারত—স্বাধীন ভারতের জন্য গভীর হতাশা প্রকাশ করা হইয়াছে। "সমুদ্রমন্থনে উঠেছে গরল, অমৃতের সন্ধান এখনও মেলেনি।"

নিজ অভিজ্ঞতার বাস্তব বর্ণনায় লেখক অগ্নিযুগের যে ছবি আঁকিয়াছেন এবং এই সম্পর্কে যে সকল সমস্যার আলোচনা করিয়াছেন তাহা পাঠককে আনন্দ দানের সঙ্গে সঙ্গে নানা বিষয়ে ভাবিত করিয়া তুলিবে। পুস্তকের ভাষা প্রাঞ্জল, ছাপা ও বাঁধাই ভাল এবং এরূপ গ্রন্থের বহুল প্রচার হওয়া বাঞ্ছনীয়। আমরা দ্বিতীয় খণ্ড "ফেরারী পথচারীর" আশায় রহিলাম।

শ্রীঅনাথবন্ধু দত্ত

করাবের পালিত বংশ কথা—শ্রীদিগেন্দ্রনাথ পালিত। প্রকাশক গ্রন্থকার স্বয়ং, কাটিগড়া, কাছাড়।

গ্রন্থকারের কথায় প্রকাশ—"বহুদিন যাবৎ আমাদের বংশকথা ও বংশাবলী লিখিবার জন্য একান্ত আগ্রহ ছিল। সুবিধা পাইয়াই বর্ত্তমানে বইখানি ছাপাইতে সক্ষম হইয়াছি।" পূর্ব্ববঙ্গের যে সকল বুনিয়াদী বংশ ছিন্নমূল হইয়া দেশত্যাগ করিয়াছে, করাবের পালিত বংশ তাহাদেরই দলভুক্ত। সুতরাং বংশপরিচয় ছাপাইয়া লেখক স্বীয় বংশের গৌরব মনে রাখিবার যে প্রচেষ্টা করিয়াছেন তাহা ব্যক্তিগত ব্যাপার হইলেও প্রশংসার যোগ্য।

শ্রীকৃষ্ণধন দে

সম্পাদক—শ্রীকেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়
মুদ্রাকর ও প্রকাশক—শ্রীনিবারণচন্দ্র দাস, প্রবাসী প্রেস প্রাইভেট লিঃ, ১২০।২ আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলিকাতা-৯

প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা

রাগিণী মধুমাধবী

রাজপুত চিত্র

চিত্রাধিকারী শ্রীরামগোপাল বিজয়বর্গীয়

:: রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠিত ::

"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্"

"নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"

৬২শ ভাগ
২য় খণ্ড

অগ্রহায়ণ, ১৩৬৯

[illegible] সংখ্যা

বিবিধ প্রসঙ্গ

প্রতিরক্ষায় অবহেলা

ভারতভূমি এখন প্রবল শত্রুর দ্বারা আক্রান্ত। এ সময়ে সারা দেশ ও সমস্ত দেশবাসীর উচিত আমাদের নেতৃবর্গের পূর্ণ সমর্থনে সজাগ ও সক্রিয়ভাবে দাঁড়ান। দেশের লোক যেভাবে এই সময়ে পণ্ডিত নেহরুর আহ্বানে সাড়া দিয়াছে তাহাতে মনে হয় স্বাধীনতার পনের বৎসর বৃথা যায় নাই। শ্রীনেহরু নিজেই বলিয়াছেন যে, চীনা আক্রমণ (এইবারের) যেমন বজ্রপাতের মত ঘটিয়াছে, তেমনি দেশবাসীর স্বতঃস্ফূর্ত প্রতিক্রিয়াও বজ্রনির্ঘোষের মতই প্রচণ্ড হইয়াছে। অবশ্য চীনা আক্রমণকে বজ্রপাতের সঙ্গে তুলনা করিতে পারেন শুধু পণ্ডিত নেহরু এবং তাঁহার স্বপ্নবিলাসী সহকর্মী সহযোগী ও চাটুকারবর্গ। সেই মণ্ডলীর বাহিরে কোন বুদ্ধি-বিবেচনা-সম্পন্ন ও বহির্জগত সম্পর্কে লেশমাত্র জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তি চীনের আক্রমণকে আকস্মিক বজ্রপাতের সহিত তুলনা করিতে চাহিবেন না। কেননা সারা জগৎ জানিত যে, চীন ভারত সীমান্ত আক্রমণের প্রস্তুতিতে ব্যস্ত। জানিয়াও জানিতে চাহেন নাই পণ্ডিত নেহরু এবং তাঁহার এই বিভ্রান্তি মোচন করার মত লোক কেহই স্থান পায় নাই পণ্ডিত নেহরুর সম্মুখে। চাটুকারপ্রীতি এমনই সর্বনাশা প্রবৃত্তি।

ছল, চাতুরি, মৈত্রী ও বন্ধুপ্রীতির সুযোগ লইয়া অতর্কিত আক্রমণে মিত্রস্থানীয় জাতিকে বিধ্বস্ত করার চেষ্টা, সখ্যের ছলে বন্ধুজাতির দেশে বিশ্বাসঘাতক গুপ্তচরের ঘাঁটি স্থাপন, এ সবই ত সাম্রাজ্যবাদের ইতিহাসে পুরাণো কথা। পরস্বলোলুপ দস্যু ও সাম্রাজ্যলোলুপ শক্তি ত একই প্রকৃতির এ কথা ত সকলেই জানে এবং জগতের ইতিহাসে এরূপ অসংখ্য নিদর্শন আছে যেখানে শক্তিমদোন্মত্ত হিংস্র জাতি ঠিক এইভাবেই অসতর্ক মিত্রস্থানীয় জাতির উপর ঝাঁপাইয়া পড়িয়াছে, যেভাবে পড়িয়াছে চীন আজ ভারতের উপর।

কিন্তু জগতের ইতিহাসে এরূপ দৃষ্টান্ত বিরল যেখানে একপক্ষ ক্রমাগত তাহার অসৎ প্রকৃতির পরিচয় দিতেছে এবং সেই সঙ্গে তাহার সর্ব্বগ্রাসী সাম্রাজ্যলোলুপতার পরিচয় প্রতিনিয়ত 'চোখে আঙ্গুল' দিয়া জানাইয়া যাইতেছে, উপরন্তু যাহা ছলে বা বিশ্বাসঘাতকতার চালে পাওয়া যাইবে না তাহা সশস্ত্র আক্রমণে অধিকার করার জন্য ব্যাপক আয়োজন চালাইতেছে এবং অন্যদিকে তাহার আক্রমণের লক্ষ্য যে দেশ তাহার অধিকারিবর্গ মোহাবিষ্ট নির্ব্বোধের মত বৎসরের পর বৎসর দেশ প্রতিরক্ষা বিষয়ে সক্রিয় ব্যবস্থা না করিয়া সময় কাটাইয়াছে বাচালতায়। আমাদের ক্ষেত্রে ঘটিয়াছে তাহাই।

প্রতিরক্ষার বিষয়টি যেভাবে অবহেলিত হইয়াছে আমাদের দেশে, তাহারও তুলনা নাই জগতে। এমন নয় যে অস্ত্রশস্ত্র প্রস্তুত করার উপকরণ নাই আমাদের দেশে, এমন নয় যে অস্ত্র নির্ম্মাণের উপযোগী যন্ত্রপাতি-সরঞ্জাম পাইলে সুদক্ষ কারিগরের অভাব হইত এদেশে; এমন নয় যে এই দীর্ঘ আট বৎসরের অবকাশে—চীনের লাডাখ অঞ্চলে জবর দখলের আরম্ভকাল (১৯৫৪) হইতে—কৌশলি ইঞ্জিনীয়ার বা যন্ত্রচালককে শিক্ষিত ও দক্ষ করা

যাইত না। এমন নয় যে এই আট বৎসরে যে শত শত কোটি বিদেশী মুদ্রার অকারণে ও অযথা অপব্যয় হইয়াছে তাহা আংশিকভাবে এই কাজে ব্যয় করিলে দেশে আধুনিক অস্ত্রশস্ত্র নির্মাণের ব্যবস্থা হইতে পারিত না এদেশে। সব কিছুই হইতে পারিত; হয় নাই বুদ্ধি-বিবেচনা ও কাণ্ডজ্ঞানের অভাবে এবং যাঁহাদের উপর এই দায়িত্বপূর্ণ প্রতিরক্ষার ভার ন্যস্ত ছিল তাঁহাদের ত্রুটি-বিচ্যুতি ও নিদারুণ কর্তব্যে অবহেলার কারণে। হিমালয় অঞ্চলে এই ঋতুতে প্রেরিত সৈনিকদিগের শীতবস্ত্রেরও কিছু অভাব হইয়াছে, ইহার চাইতে অবহেলার নিদর্শন আর কি হইতে পারে?

তবুও বলিব যে, দলাদলি বা হিসাব-নিকাশ চাওয়ার সময় এখন নয় এবং এ বিষয়ে পণ্ডিত নেহরু যাহা বিগত ৯ই নভেম্বর রাজ্যসভায় বিতর্ককালে বলিয়াছেন তাহাতে দেশবাসীরও সম্মত হওয়া উচিত।

প্রধানমন্ত্রী ঘোষণা করেন যে, চীনা আক্রমণ প্রতিরোধ করার 'অপ্রস্তুতি' সম্বন্ধে একটি 'উপযুক্ত সময়ে' তদন্ত করা হইবে। "কি কি ভুল করা হইয়াছে এবং তাহার জন্য দায়ী কে বা কাহারা' তাহা বাহির করিতে এই তদন্ত সাহায্য করিবে। কিন্তু বর্তমানে এই তদন্ত চলিতে পারে না।"

তিনি বলেন যে, কোন কোন সদস্য ভারতের 'অপ্রস্তুতি' সম্বন্ধে অভিযোগ করিয়াছেন। ইহা কিছুটা সত্য হইতে পারে। তবে এখন নয়—পরে, অধিকতর উপযুক্ত একটি সময়ে এই ব্যাপারটি সম্বন্ধে তদন্ত করা হইবে কারণ ইহা লইয়া বেশ ভুল-বুঝাবুঝি ও ভ্রান্ত ধারণার সৃষ্টি হইয়াছে। "২০শে অক্টোবরের পর হইতে পরবর্তীকালে যে-সব ঘটনা ঘটিয়াছে—বিশেষ করিয়া প্রথম কয়েকদিনের ঘটনাবলীতে জনসাধারণ খুবই দুঃখিত এবং আমরাও সকলে ইহার জন্য দুঃখিত হইয়াছি। সুতরাং কি ভুল করা হইয়াছে এবং ইহার জন্য দায়ী কাহারা, ইহা জানিবার জন্য একটি তদন্ত হওয়া আবশ্যক।"

তিনি বলেন যে, বর্তমানে রাজ্যসভায় তিনি এইসব ব্যাপার সম্বন্ধে কিছু বলিতে চাহেন না; তবে এইটুকু বলিলেই যথেষ্ট যে, এমন বহু ধারণা করা হয় বা এমন অনেক অভিযোগও আছে—আসলে যাহার ভিত্তি নাই। আসল এবং মূল ব্যাপার হইল, আমরা জাতি হিসাবে শান্তিবাদী এবং শান্তি আমাদের কাম্য। কিন্তু অবস্থাগতিকে চীনের মত একটি দেশ বিগত কয়েক বৎসর যাবতই যুদ্ধের অছিলা অনুসন্ধান করিতে করিতে বর্তমানে আমাদের শান্তির পথে বিঘ্ন সৃষ্টি করিয়াছে।

প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণায় শেষের দিকের কথাগুলি অদ্ভুত মাত্র এবং সেকথার কিছু আলোচনা প্রয়োজন।

শান্তিবাদ ও প্রতিরক্ষা দুটি সম্পূর্ণ বিভিন্ন পর্যায়ের বস্তু। যে শান্তিবাদে বিশ্বাস করে সে অন্যের উপর হিংসা করে না এবং অস্ত্রবলে বা হিংসার পথে অন্যের অধিকার খর্ব বা তাহার ন্যায়ধর্মসঙ্গত সম্পত্তি কাড়িয়া লয় না। যেখানে বিরোধ বিসম্বাদ হয় সেখানে শান্তির পথে, ন্যায়-অন্যায়ের যথার্থ বিচারে, মীমাংসা করার চেষ্টাও শান্তিকামী ও শান্তিবাদীর কর্তব্য, অন্ততঃপক্ষে যতদিন না বিবাদীদের কেহ অস্ত্রবলে সেই মীমাংসার পথে প্রবল বাধা দেয়—যেমন হইয়াছে কঙ্গোতে। আবার যে সকল ক্ষেত্রে ঐ শান্তিবাদীর আত্মীয়-স্বজনের বা বন্ধু-বান্ধবের ন্যায়গত অধিকার বা সম্পত্তি অন্য কেহ ছলে-বলে-কৌশলে হস্তগত করে এবং সকল মানবত্বের দাবী উপেক্ষা করিয়া অস্ত্রবলে ও কৌশলে নিজের অন্যায় অধিকার বজায় রাখিতে চাহে—যেমন পোর্তুগাল চাহিয়াছিল গোয়ায় এবং এখনও চাহিতেছে আফ্রিকার নানা দেশে—সেখানেও ঐ শান্তিবাদের সীমা আছে। যদি দেখা যায় যে দীর্ঘদিনের চেষ্টাও ব্যর্থ হইয়াছে এবং দোষী উত্তরোত্তর আরও কঠোর ও হিংস্ররূপে শক্তি প্রয়োগ চালাইতেছে, তবে বুঝিতে হইবে যে সেখানে বৃথাই শান্তির পথে মীমাংসার প্রয়াস।

অন্যদিকে প্রতিরক্ষা হইল শত্রুর আক্রমণ হইতে নিজ সম্পত্তি বা অধিকার রক্ষার ব্যবস্থা। এই ব্যবস্থার মধ্যে শান্তিবাদ বা তথাকথিত অহিংসনীতির লেশমাত্র সম্পর্ক নাই। শত্রু যেক্ষেত্রে ও যে সময়ে বিচার-বিতর্কের ন্যায়সঙ্গত পথ ছাড়িয়া বলপ্রয়োগে নিজের সাম্রাজ্যলালসা চরিতার্থ করার জন্য সশস্ত্র আক্রমণ চালায় তখন সেই আক্রমণ প্রতিহত করার এবং ঐরূপ অন্যায়ভাবে অধিকৃত নিজ সম্পত্তির অস্ত্রবলে পুনরুদ্ধারের ব্যবস্থাই প্রতিরক্ষা, এবং ইহার আয়োজন ও প্রস্তুতির অর্থ সামরিক আয়োজন ও যুদ্ধকালীন অবস্থায় প্রয়োজন যাহা কিছু তাহার সম্যক্ ও সর্বাঙ্গক প্রস্তুতি।

সুতরাং আমরা শান্তিকামী বলিয়া আমাদের প্রতিরক্ষার প্রস্তুতি অতি অকেজো হইয়াছিল এ কথার কোনও অর্থ হয় না। চীন সম্পর্কে পণ্ডিত নেহরু যে ছিলেন ভ্রান্ত ঐ কথার তিনি এখনও প্রমাণ দিতেছেন, কিন্তু কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভায় কি কেহ ছিল না তাঁহাকে এ বিষয়ে সতর্ক করিতে বা সুবুদ্ধি দিতে পারে? আজও যে পণ্ডিত নেহরু কারণে

সভা দিল্লীতে আরম্ভ হয়। ঐদিন প্রধান মন্ত্রী শ্রীনেহেরু লোকসভার অনুমোদনের জন্য দুইটি প্রস্তাব উত্থাপিত করেন। প্রথমটি ছিল রাষ্ট্রপতি কর্তৃক দেশে জরুরী অবস্থা ঘোষণা সংক্রান্ত সাধারণ প্রথা অনুযায়ী অনুমোদন প্রস্তাব। দ্বিতীয় প্রস্তাবে ছিল চীনা আক্রমণ প্রতিহত করার ও তাহাদের কবল হইতে ভারতীয় ভূখণ্ডগুলিকে পুনরুদ্ধারের জন্য জাতির সংকল্প ও আমাদের সশস্ত্র-বাহিনীর বীরত্বপূর্ণ যুদ্ধদানের প্রশংসাবাদের ঘোষণা। দ্বিতীয় প্রস্তাবটি এইরূপ: এই সভা গভীর দুঃখের সহিত লক্ষ্য করিতেছে যে, পরস্পরের স্বাধীনতা স্বীকার, অনাক্রম, অপরের ব্যাপারে হস্তক্ষেপ না করা এবং শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান প্রভৃতি বিষয়ে চীন সম্পর্কে ভারতের মৈত্রী ও শুভেচ্ছাপূর্ণ মনোভাব থাকা সত্ত্বেও চীন ভারতের মৈত্রী ও শুভেচ্ছা এবং পঞ্চশীলের আদর্শকে (উভয় দেশই যে আদর্শ মানিয়া চলিতে একমত হইয়াছিল) পদদলিত করিয়া সশস্ত্র সৈন্য বাহিনী লইয়া ভারতকে আক্রমণ করিয়াছে।

ভারতীয় সেনাবাহিনীর যে সকল অফিসার ও সৈন্য বীরত্বের সহিত দেশরক্ষা কাজে রত আছেন সংসদ তাঁহাদের বীরত্বের প্রশংসা করিতেছে এবং দেশের সংহতি ও মর্যাদা রক্ষার জন্য সংগ্রামে যাঁহারা প্রাণ দিয়াছেন সংসদ তাঁহাদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানাইতেছে।

চীনের ভারত আক্রমণের ফলে উদ্ভূত সঙ্কট অবস্থায় দেশবাসী যেরূপ স্বতঃস্ফূর্তভাবে সাড়া দিয়াছেন সংসদ তাহাতে অত্যন্ত আনন্দিত হইয়াছে। জাতির সংকট মোচনের জন্য সমস্ত সম্পদ নিয়োগের নিমিত্ত দেশবাসীর মধ্যে যে আলোড়ন দেখা দিয়াছে সংসদ কৃতজ্ঞচিত্তে তাহা লক্ষ্য করিয়াছে। স্বাধীনতা রক্ষা ও ত্যাগের হোমাগ্নি শিখা আবার জ্বলিয়া উঠিয়াছে এবং দেশবাসী মাতৃভূমির স্বাধীনতা ও সংস্কৃতি রক্ষার জন্য বজ্রকঠোর সঙ্কল্প গ্রহণ করিয়াছে।

বৈদেশিক আক্রমণের বিরুদ্ধে যে সব মিত্ররাষ্ট্র সমর্থন জানাইয়াছে এবং সরঞ্জামাদি দিয়া সাহায্য করিয়াছে ভারত কৃতজ্ঞতা সহকারে সেই সব সাহায্যের কথা স্বীকার করিতেছে।

সংগ্রাম যতই দীর্ঘস্থায়ী ও কঠোর হউক না কেন পবিত্র ভারতভূমি হইতে আক্রমণকারিদের বিতাড়িত করার জন্য দেশবাসী যে সঙ্কল্প করিয়াছেন সংসদ তাহা সমর্থন করিতেছে।

বলাবাহুল্য এই দুইটি প্রস্তাব এবং তৎসম্পর্কিত প্রধান মন্ত্রীর ঘোষণা তুমুল হর্ষধ্বনির সহিত লোকসভায় অভিনন্দিত হয় এবং ইহাও বলা বাহুল্য যে যাহার মধ্যে স্বাধীনতা স্বাতন্ত্র্য ও দেশাত্মবোধের লেশমাত্র আছে, অর্থাৎ যাহার মনপ্রাণ কলুষমুক্ত ও মস্তিষ্ক অবিকৃত, এরূপ ভারতসন্তান মাত্রেই ঐ দুইটি প্রস্তাব ও প্রধান মন্ত্রীর ঘোষণার মূলবস্তুকে হৃদয় মনের সহিত সমর্থন করে।

চীনা আক্রমণ সম্পর্কিত প্রস্তাবটি উত্থাপন করিয়া প্রধান মন্ত্রী ৯০ মিনিট ব্যাপি বক্তৃতা করেন। সেই বক্তৃতার সারাংশ এইরূপ:

প্রধানমন্ত্রী চীনের এই বর্বরোচিত অভিযানকে অষ্টাদশ ও ঊনবিংশ শতাব্দীর সাম্রাজ্যবাদের সহিত তুলনা করিয়া বলেন, অত্যন্ত আশ্চর্যের বিষয় যে, "সাম্রাজ্যবাদ বিরোধীদের অন্যতম পুরোধা" প্রজাতন্ত্রী চীনই এখন নগ্ন আক্রমণ ও সাম্রাজ্য বিস্তারের পথ অনুসরণ করিতেছে। কম্যুনিজমের নামগন্ধ ইহাতে নাই—এ এক নূতন ধরনের সাম্রাজ্যবাদ। ইহার জন্য শুধু ভারত নয় সারা এশিয়াই আজ বিপন্ন হইয়া পড়িতেছে।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, চীন এক দায়িত্বহীন নৃশংস ও জঙ্গী রাষ্ট্র। ক্ষমতার মদোন্মত্ত চীন, শান্তিকে উপেক্ষা করিয়া প্রতিবেশীর বিরুদ্ধে অভিযান চালাইয়া ক্ষমতার পরিচয় দিতেছে। নেফার যে অঞ্চল চীনারা আজ দাবি করিতেছে কস্মিনকালেও—গত দশ হাজার বৎসরের কোনদিনও—সে অঞ্চল তাহাদের নিয়ন্ত্রণে ছিল না। আমার বিশ্বাস, আমরা কেবল ভারত তথা এশিয়ার ঐতিহাসিক সন্ধিক্ষণেই দাঁড়াইয়া নাই, সম্ভবত সমগ্র বিশ্বের যুগসন্ধিক্ষণে উপস্থিত হইয়াছি। কারণ এই সংঘর্ষে আমাদের অনেক ক্ষতির সম্মুখীন হইতে হইবে। ইহাতে অত্যন্ত সুদূরপ্রসারী পরিণতি দেখা দিতে পারে এবং এই দিক হইতেই সমস্ত বিষয়টি বিবেচনা করিতে হইবে।

তিনি বলেন যে, ভারত এমনই এক সংঘর্ষের সম্মুখীন হইয়াছে যাহা শতাধিক বৎসরের মধ্যেও এই দেশে ঘটে নাই।

শ্রীনেহরু বলেন যে, ভারত ও চীনের সীমান্ত হিসাবে চীনারা পরোক্ষভাবে ম্যাকমেহন লাইন স্বীকার করিয়া লইয়াছে। চীনারা ব্রহ্মে ম্যাকমেহন লাইন স্বীকার করিয়াছে। ইতিপূর্বে লংজু ব্যতীত অন্য কোথায়ও কোন চীনা যে ম্যাকমেহন লাইনের দক্ষিণে যায় নাই তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। যদি তর্কের খাতিরেও ধরা যায় যে, চীনারা ম্যাকমেহন লাইন স্বীকার করে না, কিন্তু আমাদের মানচিত্রে তো ঐ লাইন আছে, আমাদের

সংবিধানেও ঐ লাইনের উল্লেখ আছে, আমাদের কাজ-কর্মে আমাদের প্রশাসন-ব্যবস্থায় সর্বত্রই ঐ লাইনের অস্তিত্ব রহিয়াছে। অর্থাৎ সর্বতোভাবে আমরা গত প্রায় পঞ্চাশ বৎসর ধরিয়া ম্যাকমেহন লাইন অনুযায়ী চলিয়া আসিতেছি। চীন স্বীকার করে না বলিয়াই কি সশস্ত্র অভিযানে ঐ লাইন বাতিল করিয়া দেওয়ার অধিকার তাহার আছে?

শ্রীনেহরু বলেন, চীনা প্রধানমন্ত্রী শ্রী চৌ এন লাই যখন ভারত সফরে আসেন তখন তিনি তাঁহাকে (শ্রীনেহরুকে) বুঝাইয়াছিলেন যে চীন সরকার ম্যাকমেহন লাইনকে নানা কারণে অবৈধ মনে করেন বটে, কিন্তু তাঁহারা ভারতের বন্ধু থাকিতে চান ও ব্রহ্ম-চীন সীমান্তের ক্ষেত্রে এই লাইনকে স্বীকার করিয়া লইয়াছেন এবং চীন-ভারতের ক্ষেত্রেও স্বীকার করিবেন। পরে কিন্তু চীন অন্যমূর্তি ধরে। ভারত ও তিব্বতের মধ্যে সীমানা সংক্রান্ত কিছু প্রশ্ন অমীমাংসিত ছিল সত্য, চীনারা তাহা লইয়া উত্তেজিত হইয়া উঠিলেও তিব্বতের কোন সরকার কিন্তু সে প্রশ্ন কোনদিন তোলেন নাই। লাদাখ ক্ষেত্রে চীনের দাবী মানিয়া লওয়ার অর্থ লাদাখের দুই-তৃতীয়াংশ তাহাকে দান করা।

নেফার যে অঞ্চলে চীনারা এখন ব্যাপক অভিযান চালাইয়াছে দীর্ঘকাল তাহা ভারতেরই মধ্যে। ভারতেরই শাসন সেখানে বলবৎ। চীনের যদি সেখানে কোন দাবি থাকিয়া থাকে, তাহা লইয়া তাহারা আলোচনা চালাইতে পারিত—সশস্ত্র অভিযান নয়।

এই ব্যাপারে কম্যুনিজমের বড় রকম কোন ভূমিকা আছে বলিয়া শ্রীনেহরু মনে করেন না। তাঁহার মতে প্রধান কথা হইল, "একটি সম্প্রসারণবাদী, জঙ্গী মনোভাবাপন্ন রাষ্ট্র সজ্ঞানে ভারত আক্রমণ করিয়াছে।" "কম্যুনিজম কিছুটা শক্তি সঞ্চার বা দুর্বল করিয়া ফেলিতে পারে, কিন্তু আসল ব্যাপার হইল অষ্টাদশ ও উনিশ শতকের মত আজ পুনরায় আমরা এক নয়া আক্রমণের মুখোমুখি হইয়াছি।"

"সুতরাং", শ্রীনেহরু বলেন, "আমাদের সীমান্তে এই জঙ্গীবাদের শক্তিপরীক্ষা আমাদের করিতেই হইবে। এশিয়াকেও আজ এই জঙ্গীবাদের বুঝাপড়া করিতে হইবে। জগত এই জঙ্গীবাদের জন্য আজ উৎকণ্ঠিত। বন্ধুভাবাপন্ন বিদেশী রাষ্ট্রগুলি আমাদের সাহায্য করিতেছে, সেজন্য তাহাদের নিকট আমরা কৃতজ্ঞ, কিন্তু এই যুদ্ধের বোঝা দেশকেই বহিতে হইবে।"

প্রধানমন্ত্রী বলেন যে, ভারত এখনও আলোচনায় রাজী। তবে শর্ত হইল—৮ই সেপ্টেম্বরের পূর্বে দুই পক্ষ যেখানে ছিল সেখানে তাহাদের ফিরিয়া যাইতে হইবে। "এই প্রস্তাব অত্যন্ত যুক্তিসঙ্গত।"

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, বৃটেন ইত্যাদি যে সকল দেশ ভারতের আবেদনে সঙ্গে সঙ্গে সাড়া দিয়া ভারতকে সমর্থন জানাইয়াছে, ভারতের জন্য সাহায্য পাঠাইয়াছে, সদস্যদের বিপুল হর্ষধ্বনির মধ্যে প্রধানমন্ত্রী তাঁহাদের ধন্যবাদ জানান। তিনি বলেন যে, এই সাহায্য দেওয়া হইয়াছে বিনাশর্তে, ইহার পিছনে কোন বাধ্যবাধকতা নাই। এবং "জোট-নিরপেক্ষতার যে নীতিকে আমরা মহামূল্য মনে করি প্রত্যক্ষভাবে তাহার ক্ষতিও ইহা করে না।"

দেশের যে বীর সন্তানরা হাজারো অসুবিধার মধ্যে মাতৃভূমিকে রক্ষার জন্য সীমান্তে সংগ্রাম করিয়া যাইতেছেন প্রধান মন্ত্রী তাঁহাদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন।

সকল সদস্যের প্রবল হর্ষধ্বনির মধ্যে তিনি ঘোষণা করেন, "আপনাদের সকলের পক্ষ হইতে তাঁহাদের আমি অভিবাদন জানাইতেছি, আমাদের পূর্ণ সহযোগিতার প্রতিশ্রুতি দিতেছি।"

"মাতৃভূমির জন্য যাঁহারা প্রাণ দিয়াছেন তাঁহাদের আমরা ভুলিব না। ভাবীকালও ভুলিবে না।"

শ্রীনেহরু বলেন, "যাহারা পঞ্চবার্ষিকী যোজনায় ছাঁটাইয়ের কথা বলিতেছেন, তাঁহারা জানেন না আমাদের শক্তির উৎস কোথায়। পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা আমাদের সম্পূর্ণ করিতেই হইবে এবং অনেক ক্ষেত্রে উহা অপেক্ষাও অধিক দূর অগ্রসর হইতে হইবে। আমি আশা করি, আজ যে বিপদ ও শক্তিপরীক্ষার আহ্বান আমাদের সম্মুখে রহিয়াছে উহা শ্রীবৃদ্ধির সুযোগে পরিণত হইবে। সীমান্তের এই কালমেঘ কাটিয়া যে ভাস্বর সূর্য্য দেখা দিবে উহা শুধু স্বাধীনতার সূর্য্যই নয়, কল্যাণের সূর্য্যও।"

শ্রীনেহরু উপসংহারে ঘোষণা করেন "ইহাতে আমার কোন সংশয় নাই যে পরিষদের সকল পক্ষ সমবেত ভাবে এই বিরাট অভিযানকে সমর্থন করিবেন এবং সমগ্র বিশ্বকে দেখাইবেন যে, শান্তি ও বন্ধুত্বকামী ভারত আক্রমণ বরদাস্ত করে না। অতীতে আমরা শান্তির জন্য চেষ্টা করিয়াছি এবং ভবিষ্যতেও করিতে থাকিব। কিন্তু আমরা দেখাইব যে আক্রান্ত হইবা যুদ্ধের জন্যও আমরা তেমনই ভালভাবে কাজ করিতে পারি।"

জাতীয় আপৎকালীন অবস্থা ঘোষণা এবং চীনা আক্রমণ সম্পর্কে দুইটি প্রস্তাব ছয় দিন বিতর্কের পর

বিগত ১৪ই নভেম্বর লোকসভায় এবং রাজ্যসভায় গৃহীত হয়। বিতর্কের শেষে পণ্ডিত নেহরু তাঁহার উত্তর দিতে যাহা বলেন তাহার মধ্যে শত্রু বিতাড়নে সমগ্র দেশবাসীর দুর্জয় সংকল্প এবং আত্ম নিবেদনের ও সজ্ঘবদ্ধভাবে চীনা আক্রমণের সম্মুখীন হওয়ার উন্মাদনার বিশেষ উল্লেখ ছিল। তিনি পুনর্ব্বার বলেন যে, চীনারা ৮ই সেপ্টেম্বরের পূর্ব্বে যেখানে ছিল সেখানে ফিরিয়া গেলে পরে তাহাদের সঙ্গে আলোচনা হইবে। এ বিষয়ে ভারত সরকারের মত স্থির আছে।

বিতর্কের উত্তরদান প্রসঙ্গে পণ্ডিত নেহরুর ৭৫ মিনিট ব্যাপী বক্তৃতায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, বিটেন ও অন্য দেশ এই সঙ্কটকালে যে অস্ত্র সাহায্য পাঠাইয়াছে তাহার জন্যও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

পণ্ডিত নেহরুর আরম্ভকালীন ও উত্তরদানকালে প্রদত্ত ঘোষণাদ্বয়ের মধ্যে যাহা বলিয়াছেন তাহার প্রত্যেকটি শব্দের সমর্থন তিনি দেশবাসীর নিকট পাইয়াছেন ও পাইবেন। তবে প্রতিরোধ ব্যবস্থায় প্রস্তুতির অভাব বিষয়ে তিনি যে আংশিক "সাফাই" দিয়াছেন, তাহা তাঁহার বিতর্কের উত্তর দানের ভাষণে না থাকাই উচিত ছিল। তিনি নিজেই বলিয়াছিলেন যে, পরে এক সময়ে সে বিষয়ে তদন্ত হইবে এবং আমাদের আশা ছিল যে ঐ তদন্ত নিরপেক্ষ হইবে। তাঁহার ১৪ই নভেম্বরে প্রদত্ত বক্তৃতায় ঐ সম্পর্কে যাহা তিনি বলিয়াছেন তাহার মধ্যে কিছু অসার যুক্তি ছিল এবং তথ্য হিসাবেও যাহা তিনি উপস্থিত করিয়াছিলেন তাহার অনেক কিছুই প্রমাণ সাপেক্ষ বলিয়া আমরা মনে করি।

ছয় দিন ব্যাপী বিতর্কের মধ্যে লোকসভায় ১৬৫ জন বক্তৃতা করেন। তাঁহাদের বক্তৃতার যে সকল রিপোর্ট সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইয়াছে তাহার মধ্যে উল্লেখযোগ্য কিছুই আমরা পাই নাই। বরঞ্চ তাহা দেখিয়া আমাদের মনে হইয়াছে যে, এই জাতীয় বিষয়ে জ্ঞানবুদ্ধিযুক্ত লোকের এখন একান্ত অভাব—কি লোকসভায় কি রাজ্যসভায়। এবং উহার কারণও অজানা নয়। যাহারা প্রতিরক্ষা বিষয়ে পণ্ডিত নেহরুর আপ্ত বাক্যের বিরুদ্ধে যাইত সেরূপ কংগ্রেসী সদস্যগণকে গত নির্ব্বাচনে পণ্ডিত নেহরু ছাঁটাই করাইয়াছেন। এবং বিপক্ষের মধ্যে যে দুইজন বিশেষ বুদ্ধি-বিবেচনার সহিত কংগ্রেস সরকারের কার্য্যপন্থার সমালোচনা করিতেন—অর্থাৎ আচার্য্য কৃপালনী ও শ্রীঅশোক মেহটা—তাঁহাদেরও হারাইবার জন্য পণ্ডিত নেহরু ও তাঁহার চাটুকারবর্গ বদ্ধপরিকর হইয়া কার্য্যসিদ্ধ করেন। সুতরাং লোকসভা ও রাজ্যসভা এখন প্রায় নিষ্কণ্টক—অন্ততঃ পক্ষে পণ্ডিত নেহরুর পক্ষে। এবং আমরা সেইখানেই ভয়ের কারণ আছে মনে করি। কেননা পণ্ডিত নেহরুর মনের উচ্ছ্বাস—ও তাহার প্রতিক্রিয়ার অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনাশূন্য কার্য্যক্রম—রোধ করিবার প্রয়োজন পূর্ব্বেও ছিল এবং এখন তাহা অত্যাবশ্যক।

মূল্যবৃদ্ধি ও দেশরক্ষা

ভারতের উত্তর-পশ্চিম ও উত্তর-পূর্ব্ব সীমান্তে গত কয়েক বৎসর ধরিয়া যে চীনা দস্যুতা চলিতেছিল এবং যাহার ফলে গত কয়েক বৎসরে কয়েক সহস্রাধিক বর্গমাইল পরিমাণ ভারতভূমি চীনা দখলে চলিয়া গিয়াছে তাহা যে পরিণতিতে ভারতের উপর চীনা জঙ্গী আক্রমণেরই সূচনা করিতেছিল সে বিষয়ে আজ আর সন্দেহের কোন অবকাশ নাই। বস্তুতঃ আজ স্পষ্টই প্রতীয়মান হইয়াছে যে, এ সকলই ছিল নূতন চীনা সাম্রাজ্য-বিস্তারের পূর্ব্বাভাস, সীমান্ত লইয়া সামান্য মতান্তর মাত্র নহে। সুখের বিষয় আজ সারা দেশে চীনা আক্রমণের আঘাতে শিক্ষিত নিরক্ষর নির্ব্বিশেষে সকল দেশবাসীর মধ্যেই একটা নূতন ও বলিষ্ঠ দেশাত্মবোধ জাগ্রত হইয়াছে এবং চীনা হামলার প্রতিরোধের দ্বারা আমাদের নবলব্ধ রাষ্ট্রস্বাধীনতা ও জাতীয় আত্মসম্মান-বোধ রক্ষা করিবার সর্ব্বাত্মক প্রয়াস গড়িয়া উঠিতে সুরু করিয়াছে।

ভারতের জঙ্গী আয়োজন তুলনায় অকিঞ্চিৎকর, চীনাদের মত প্রবল জঙ্গী শক্তির আক্রমণ সফলভাবে প্রতিরোধ করিবার পক্ষে যথেষ্ট নয়। আজ তাই দেশের সকল শক্তি ও সামর্থ্যকে এই নূতন বিপদ প্রতিরোধকল্পে কেন্দ্রীভূত করিতে হইতেছে। বিপদ দেশের স্কন্ধের উপরে চাপিয়া বসিয়াছে। আজ একমাত্র প্রয়োজন কায়মনোবাক্যে ও সর্ব্বতোভাবে চীনা আক্রমণের সার্থক প্রতিরোধকল্পে সর্ব্বাত্মক ও সার্ব্বভৌম প্রস্তুতির আয়োজনে আমাদের সকল শক্তি নিয়োজিত করা। সুখের বিষয় এই গুরুতর প্রয়োজন সম্বন্ধে দেশের ও দেশবাসীর সঙ্কল্প অনমনীয় হইয়া উঠিয়াছে।

একটা কথা এই প্রসঙ্গে স্পষ্টভাবে হৃদয়ঙ্গম করা একান্ত প্রয়োজন। বর্ত্তমান দুনিয়ার জঙ্গী লড়াইয়ের এমনই ধারা যে কেবলমাত্র উপযুক্ত সামরিক আয়োজন বা লড়াইয়ের আধুনিক কৌশলে সুশিক্ষিত জঙ্গী সেনাবাহিনী ও পারদর্শী সেনানায়কের নেতৃত্বেই মাত্র ইহার আয়োজন সার্থকভাবে সম্পূর্ণ হয় না। দেশের আভ্যন্তরীণ

শান্তি, সামাজিক শৃঙ্খলা ইত্যাদি অসামরিক ব্যবস্থাও দেশরক্ষার অতি আবশ্যকীয় উপাদান। এই শান্তি ও শৃঙ্খলা সুষ্ঠু ও অপ্রতিহত ধারায় রক্ষা ও দৃঢ় করিতে হইলে দেশের বিরাট অসামরিক জনসমষ্টির দৈনন্দিন সাধারণ জীবনযাত্রার পথে যাহাতে ন্যূনতম বিঘ্ন বা বিশৃঙ্খলাও ঘটিতে না পারে সেই বিষয়ে সচেতন ভাবে অবহিত হওয়া ও তৎসম্পর্কে সকল প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বন করা প্রয়োজন।

এই সম্পর্কে যে বিরাট ও শক্তিক্ষয়কারী বিঘ্নের আশঙ্কা আমাদের মনে আসে, তাহা জীবনযাত্রার অতি প্রয়োজনীয় উপাদানগুলির সহসা মূল্য বৃদ্ধি। ইহাতে কেবল যে সামাজিক শৃঙ্খলা বিঘ্নিত হইবার আশঙ্কা আছে শুধু তাহাই নহে, ইহার দ্বারা সার্থক দেশরক্ষার আয়োজনে সরকারী শক্তি ও সামর্থ্যের প্রতিও দেশের লোকের আস্থা নষ্ট হইবার আশঙ্কা রহিয়াছে। দেশরক্ষার প্রয়োজনের নানাবিধ বিচিত্র উপাদানসমূহের মধ্যে মূল্যবৃদ্ধির আশঙ্কা প্রতিরোধের কার্য্যকরী ও সার্থক আয়োজনও তাই একটি একান্ত আবশ্যক উপাদান।

দুঃখের বিষয় ইতিমধ্যেই জনসাধারণের একান্ত প্রয়োজনীয় জীবনধারণের উপাদানগুলির মূল্যবৃদ্ধি সুরু হইয়া গিয়াছে। গত দুই-তিন সপ্তাহের মধ্যে চাউল ও অন্যান্য খাদ্যশস্যের মূল্য বেশ কিছু পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছে। কেবল চাউল বা অন্যান্য খাদ্যশস্যের মূল্যই যে কেবল বৃদ্ধি পাইয়াছে শুধু তাহাই নহে, খাদ্যের অন্যান্য উপাদানগুলির মূল্যও স্থানে স্থানে অসম্ভব বৃদ্ধি পাইতেছে। আমরা সংবাদ পাইতেছি যে, জলপাইগুড়ি ও আসাম চা বাগান অঞ্চল হইতেও অনেক নিত্য-প্রয়োজনীয় ভোগ্যপণ্যই সহসা সম্পূর্ণ উধাও হইয়া গিয়াছে, খাদ্য-বস্ত্রাদির ন্যায় জীবন ধারণের একান্ত প্রয়োজনীয় পণ্যগুলিও দুর্মূল্য হইয়াছে।

দেশদ্রোহী মুনাফাখোর

পণ্যের সরবরাহ চাহিদার অনুপাতে অপ্রতুল হইলে স্বাভাবিকভাবেই মূল্যবৃদ্ধি ঘটিয়া থাকে। খাদ্যপণ্যের হঠাৎ ঘাটতি হয় নাই। দেশের সাধারণ চাহিদা মিটাইবার পক্ষে উপযুক্ত খাদ্যশস্য সরকারী গুদামগুলিতে জমা আছে, ইহা জানা কথা। তবু দেশের জরুরী অবস্থা সৃষ্টি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই বেশী করিয়া মূল্যবৃদ্ধি সুরু হইয়াছে। ইহা যে পণ্য সরবরাহের অপ্রতুলতার জন্যই ঘটে নাই তাহা সহজেই অনুমেয়। বস্তুতঃ দেশে কতিপয় বিবেকহীন ও সমাজবিরোধী মুনাফাখোর গোষ্ঠী দেশের দুর্দিনের সুযোগ লইয়া অতিরিক্ত মুনাফার লোভেই এই সমস্যাটির সৃষ্টি করিয়া থাকে। দ্বিতীয় বিশ্ব-মহাযুদ্ধের মধ্যভাগে বাংলা দেশে ৪৩ সনের মন্বন্তর এভাবেই যে ঘটিয়াছিল তাহার প্রমাণের কোন অভাব নাই। এই মন্বন্তরের কারণ অনুসন্ধান করিবার জন্য যে কমিটি গঠিত হইয়াছিল তাঁহারা তাঁহাদের রিপোর্টে একথাটাই স্পষ্ট করিয়াই বলিয়াছিলেন। সেই বিবেকহীন মুনাফাখোরের গোষ্ঠী যে দেশ হইতে লোপ পায় নাই, বরং স্বাধীনতা লাভের পর এই কয়েক বৎসর ধরিয়া আমাদের স্বদেশীয় রাজ সরকারের স্নেহ ও অনুগ্রহপুষ্ট হইয়া সর্বে ও শক্তিতে পূর্ব হইতে আরও অনেক বেশী স্ফীত হইয়া উঠিয়াছে, তাহাতে সন্দেহের অবকাশমাত্র নাই। আশঙ্কা হয় ইহাদের মধ্যে কেহ কেহ সম্ভবতঃ কংগ্রেস সরকারের উচ্চতম দরবার সম্মানের ও খাতিরের আসনও পাইয়া থাকে। বস্তুতঃ স্বাধীনতার পর এই ধরণের সমাজবিরোধী ও বিবেকহীন ব্যক্তিবর্গও যে সামাজিক প্রতিষ্ঠার অধিকারী হইয়া উঠিতেছে তাহাতেও সন্দেহের কারণ নাই। এই গোষ্ঠী যে দেশের বর্তমান দুর্দিনের পূর্ণ সুযোগ লইয়া নানাপ্রকার বিবেকহীন উপায়ে এবং দেশের শান্তি ও শৃঙ্খলাকে বিঘ্নিত করিয়া নিজেদের মুনাফার অঙ্ক এই অবসরে আরও প্রভূত পরিমাণে স্ফীত করিয়া লইতে উদ্যত হইয়াছে, তাহার স্পষ্ট সূচনা এখনই দেখা দিয়াছে। ইহাদের কঠিন হস্তে দমন করিতে না পারিলে এবার কেবলমাত্র কয়েক লক্ষ দেশবাসীর অনাহারজীর্ণ জীবনাবসানেই শেষ হইবে না। তাহাদের জঘন্য কার্য্যকলাপ এভাবে বিনা প্রতিবন্ধকে চালাইয়া যাইবার সুযোগ পাইলে আমাদের নবোদ্বুদ্ধ জাতীয় জীবনের অস্তিত্ব পর্য্যন্ত বিপন্ন করিয়া তুলিবে এ আশঙ্কা অমূলক নহে।

যাহারা জাতির জীবনে বর্ত্তমানের ন্যায় ঘোরতর সঙ্কটের পূর্ণ সুযোগ লইয়া কেবলমাত্র নিজেদের মুনাফা বৃদ্ধির কথাই ভাবে এবং তাহারই আয়োজনে ব্যাপৃত হয়, তাহারা আমাদের স্বদেশবাসী হইলেও জঘন্যতম দেশদ্রোহের অপরাধে অপরাধী, এ বিষয়ে সন্দেহের কোন কারণ নাই। ইহাদের দমন করিবার কাজটি দেশরক্ষারই অঙ্গ। বিপদের সময় দেশের সাধারণ অসামরিক জনসমষ্টির জীবন ধারণের উপায়ে বিঘ্ন সৃষ্টি করিয়া ইহারাও বহিঃশত্রুর সহায়তা ও সহযোগিতা করিতেছে। বস্তুতঃ সকল অবস্থাতেই এ সকল বিবেকহীন ব্যক্তিবর্গ দেশদ্রোহী বলিয়া গণ্য হইবার যোগ্য।• বর্ত্তমান

আশঙ্কাজনক পরিস্থিতিতে দেশদ্রোহীর প্রাপ্য কঠিনতম দণ্ড ইহাদের উপর প্রয়োগ করিতে দ্বিধা করিবার কোনই নৈতিক কারণ নাই।

এ বিষয়ে আমাদের জাতীয় সরকার এখন পর্য্যন্ত সম্পূর্ণ সচেতন হইয়া উঠিয়াছেন এবং অবহিত হইয়াছেন এমন সূচনা আমরা খাজিও দেখিতে পাইতেছি না। জরুরী দেশরক্ষা আইনের বলে সরকার যে অতিরিক্ত ক্ষমতা গ্রহণ করিয়াছেন তাহার দ্বারা ইহাদের দমন করিবার ক্ষমতাও সরকারের অবিলম্বে গ্রহণ করা ও মুনাফাখোরদের বিরুদ্ধে প্রয়োগ করা উচিৎ। শত্রুর সঙ্গে ষড়যন্ত্রের বা আদান-প্রদানের অপরাধকে দেশরক্ষা আইনে প্রাণদণ্ডযোগ্য অপরাধ বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছে। দেশের আত্মরক্ষার সমস্যা ও প্রয়োগকে কণ্টকিত করিয়া তুলিয়া সেই সুযোগে যাহারা ব্যক্তিগত মুনাফার সন্ধানে ঘোরে তাহারাও যে অনুরূপ প্রাণদণ্ড যোগ্য অপরাধী ইহা অবিলম্বে ঘোষিত হওয়া প্রয়োজন। ইহা না হইলে তাহাদের দুর্বৃত্তশক্তি ব্যর্থ করিবার আর কোন উপায় নাই। ইহাই প্রাথমিক প্রয়োজন। দেশরক্ষার প্রয়োজনে ইহা সামরিক আয়োজনের ন্যায়ই গুরুতর প্রয়োজন। আমরা সরকারকে এই বিষয়ে অবিলম্বে অবহিত হইতে এবং বিনা বিলম্বে উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে অনুরোধ করিতেছি।

ক: ন:

মূল্যসমতা নির্দ্ধারণে সরকারী আয়োজন

সরকারের পক্ষ হইতে নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্যাদির মূল্যবৃদ্ধি নিরোধ-কল্পে যে সকল প্রাথমিক আয়োজনের ব্যবস্থা করা হইতেছে বলিয়া সম্প্রতি লোকসভায় পরিকল্পনা মন্ত্রী শ্রীগুলজারিলাল নন্দ বলিয়াছেন, তাহা হইতে দেখা যাইতেছে যে, এ সকল পণ্যের মূল্য নিয়ন্ত্রণ সাপেক্ষে চিরাচরিত প্রথাগুলিরই খানিকটা অদলবদল করিয়া এই উদ্দেশ্য সাধনের আশা করা যাইতেছে। খাদ্যবস্ত্রাদির মূল্যসমতা রক্ষা করিবার দিকেই যে প্রথম নজর দিবার ব্যবস্থা করা হইতেছে তাহা স্বাভাবিক এবং জরুরীও বটে। আবশ্যিক ভাবেই চাউলের বদলে অধিকতর গমের ব্যবহারে যাহাতে জনসাধারণ অভ্যস্ত হয় সেদিকে প্রয়াস করা হইবে। চাউলের কলগুলি ও পাইকারী কারবারীদের উপরে নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে খানিকটা মতান্তরের আভাসও দেখা যাইতেছে। কিন্তু এই ধরণের নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা নতুন কিছু নহে, কেননা দ্বিতীয় পরিকল্পনার কালেই লাইসেন্স ও অতিরিক্ত ক্ষমতাবলে চাউলকলগুলির উপরে প্রয়োজনমত নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা পূর্ব্ব হইতেই করা ছিল। এখন যে সকল ব্যবস্থাগুলি প্রয়োগের দ্বারা চাউলের মূল্যসমতা রক্ষা করা সুবিবেচনারই পরিচায়ক হইবে বলিয়া প্রস্তাব হয়। প্রয়োগের তুলনায় পরিবহন আয়োজনের সামান্যতার ফলে বিভিন্ন এলাকার মধ্যে খাদ্যপণ্যের সহজ চলাচল ব্যাহত হইবার আশঙ্কাও অমূলক নহে। সেই কারণে সরকারের পক্ষ হইতে খাদ্যপণ্য ক্রয় ও মজুত করিবার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে সন্দেহের কোন কারণ নাই। এ বিষয়ে সম্প্রতি নির্দ্ধারিত সরকারী আয়োজন যাহাতে অবিলম্বে কার্য্যকরী হইতে সুরু করে সেই দিকে সময়ক্ষেপ না করিয়া দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন। খাদ্যবন্টন নিয়ন্ত্রণ (rationing) না করিয়াও যদি এ ভাবে খাদ্যপণ্যের চাহিদা ও সরবরাহের পারস্পরিক সমতা রক্ষা করিয়া মূল্যবৃদ্ধি নিরোধ করা সম্ভব হয়, তবে মঙ্গল।

স্বাধীনতার পর হইতেই যখনই জনসাধারণের জীবন ধারণের জন্য অবশ্য প্রয়োজনীয় পণ্যাদির অতিরিক্ত মূল্যবৃদ্ধি ঘটিয়াছে, তখনই সরকার পক্ষ হইতে তাহা প্রতিহত করিবার উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করিবার পরিবর্ত্তে কি কি অবশ্যম্ভাবী বা স্বাভাবিক কারণে এমন অবস্থার উদ্ভব হইয়াছে তাহারই অজুহাত দেওয়া হইয়াছে। বস্তুতঃ অল্পদিন পূর্ব্বেও যখন মূল্যবৃদ্ধির কারণে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার রূপায়ণে বাধা-সৃষ্টি হইতেছে এই প্রশ্ন উঠিয়াছিল তখন এই সম্পর্কে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী মূল্যবৃদ্ধি দেশের আর্থিক উন্নতির অবশ্যম্ভাবী পরিচায়ক বলিয়া ব্যাপারটা উড়াইয়া দিতে এবং এই বিষয়ে সরকারী দায়িত্ব এড়াইয়া যাইবার প্রয়াস করিয়াছিলেন। যাহা হউক মূল্যসমতা রক্ষা করিবার দায়িত্ব যে কমিটির উপরে অর্পণ করিবার ব্যবস্থা হইতেছে তাহার উপরে এমন প্রভূত ক্ষমতা ন্যস্ত করা হইবে বলিয়া আশ্বাস দেওয়া হইয়াছে এবং দেশের বর্ত্তমান পরিস্থিতির প্রয়োজনে কেন্দ্রীভূত সরকারী ক্ষমতা বলে এই কমিটির সুপারিশ অবিলম্বে এবং সার্থক ভাবে প্রয়োগ করিবার ব্যবস্থাও আশা করা যায় করা হইবে। তবে এই মূল্যসমতারক্ষক কমিটির সভ্যদেরও যত্ন ও সাবধানতার সঙ্গে বাছিয়া লওয়া প্রয়োজন।

শ্রীনন্দ দ্বারা বিবৃত যে ব্যবহারকারী সমবায় (consumer co-operatives) সকল গঠন করিয়া অবশ্য প্রয়োজনীয় প্রাথমিক পণ্যাদির বন্টন ব্যবস্থাও যে ভাবে মূল্যসমতা রক্ষা করিবার আয়োজন করা হইতেছে, ইহার আমরা সমর্থন করি। শ্রীনন্দ বলিয়াছেন যে, রাজ্যসরকারগুলির সহযোগিতায় অন্যূন ২০০ শত

এই রকম পাইকারী বা কেন্দ্রীয় এবং অবিলম্বে ৪,০০০ হাজার শাখা বা খুচরা দোকান খুলিবার আয়োজন করা হইতেছে। বলা বাহুল্য যে, এই আয়োজন একমাত্র সক্রিয় সরকারী নেতৃত্বে (initiative) ও সহায়তায়ই সার্থক ভাবে রূপায়িত হইতে পারে। রেলওয়ে, ডাক-তার বিভাগ ও অন্যান্য সরকারী সংস্থাগুলির পক্ষ হইতে এই কাজে প্রভূত সাহায্য হইতে পারে। গত বিশ্ব-মহাযুদ্ধের সময়ে এই সকল বিভাগে এই বিষয়ে যথেষ্ট অভিজ্ঞতা সঞ্চিত হইয়াছে। কিন্তু এ সকল সংস্থার দ্বারা আয়োজিত পণ্যবণ্টন ব্যবস্থা যাহাতে অবিভাগীয় স্থানীয় জনসাধারণের মধ্যেও চালু করা হয়, ইহাও একান্ত প্রয়োজন। ইহা ছাড়াও যাহাতে এই সকল বিভাগীয় সমবায়গুলি ব্যক্তিবিশেষের মুনাফার ও যথেচ্ছ ক্ষমতা প্রয়োগের ক্ষেত্র না হইয়া উঠে—গত বিশ্বমহাযুদ্ধের কালে এ বিষয়েও যথেষ্ট তিক্ত অভিজ্ঞতা সঞ্চিত হইয়াছিল,—সেই দিকেও কড়া নজর রাখিবার প্রয়োজন আছে। এ ভাবে দেশের বৃহৎ শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলিকে কেন্দ্র করিয়াও উচিত মূল্যে পণ্যসংগ্রহ ও বণ্টনের সার্থক সমবায় আয়োজন করা সম্ভব ও প্রয়োজন। এই ব্যাপারে শিল্পপতি ও কর্মী-ইউনিয়নগুলির সমবেত সহযোগিতার দ্বারা সার্থক আয়োজন হইতে পারে।

এ সকল আয়োজনই অবিলম্বে কার্য্যকরী করিয়া তোলা নিতান্ত প্রয়োজন। কিন্তু শ্রীনন্দ যেমন বলিয়াছেন, খাদ্য, বস্ত্র ও অন্যান্য কয়েকটি নিত্য-প্রয়োজনীয় পণ্যাদির উৎপাদন বৃদ্ধিরও অবিলম্বে ব্যবস্থা হওয়া প্রয়োজন। বস্ত্র উৎপাদন বৃদ্ধির কাজটা অপেক্ষাকৃত সহজ, বিশেষ করিয়া মোটা তাঁতবস্ত্রের। কিন্তু তৈল, দুগ্ধ, মৎস্য, সব্জী ইত্যাদি নানাবিধ অবশ্য প্রয়োজনীয় খাদ্যপণ্যের উৎপাদন সহসা বৃদ্ধি করা সহজ নহে। এ বিষয়ে কেন্দ্রীয় সরকার তথা পরিকল্পনা মন্ত্রীর যে বিশেষ কোন আশু ফলপ্রসূ আয়োজনের ধারণা আছে তাহাও মনে হয় না। যতদূর দেখিতে পাইতেছি, কেন্দ্রীয় দপ্তরসমূহে এ বিষয়ে বড় বড় উৎপাদন পরিকল্পনা প্রস্তুত করিয়া সেগুলি বিভিন্ন রাজ্যসরকারগুলির নিকট প্রেরণ করিয়াই ইঁহারা তাঁহাদের দায়িত্ব শেষ করিবার আয়োজন করিয়াছেন।

দেশের বিবেকহীন ও দেশদ্রোহী মুনাফাখোর-দিগকে নিরোধ করিতে না পারিলে মূল্যনিয়ন্ত্রণ সম্বন্ধীয় সরকারী সকল ব্যবস্থা সত্ত্বেও যে মূল্য-সমতা কোনমতেই রক্ষা করা যাইবে না, সেই বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। মূল্যসমতা রক্ষা করিবার অবশ্য প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে সরকার অবহিত হইয়াছেন, ইহা সুখের ও আশার কথা। এই সম্পর্কে যে সকল সরকারী আয়োজনের পরিকল্পনা করা হইয়াছে, তাহাও সমর্থন-যোগ্য, ইহাতে সন্দেহ নাই। এই সকল পরিকল্পনার কার্য্যকারিতা দেশের সকল অবস্থাতেই প্রভূত ফলপ্রসূ হইতে পারে। কিন্তু কঠিন হস্তে মুনাফাখোরদিগকে নিরস্ত ও প্রতিহত করিতে না পারিলে যে এ সকলই নিরর্থক হইয়া পড়িবে এ বিষয়েও সন্দেহের কোনই অবকাশ নাই। ইহাদিগকে দমন করিবার একমাত্র উপায় ইহাদের উপরে দেশদ্রোহীর প্রাপ্য আইনের কঠিন-তম দণ্ড প্রয়োগ করা। অর্থদণ্ডে ইহাদিগকে নিরস্ত করা যাইবে না, এমন কি মোটা অঙ্কের জরিমানাও ইহারা গ্রাহ্য করিবে না। একমাত্র কঠিনতম দৈহিক দণ্ডের আশঙ্কাই সম্ভবতঃ ইহাদিগকে দমন করিতে সমর্থ হইবে। মূল্যসমতা বিধান করিবার অবশ্য প্রয়োজনীয় দায়িত্ব পালনে এই বিষয়ে উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বনের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধেও কেন্দ্রীয় সরকার অবিলম্বে অবহিত হইবেন কি? ক: না:

দেশরক্ষার জন্য স্বর্ণ সংগ্রহ

জরুরী দেশরক্ষার সমস্যাসমূহের সার্থক সমাধান-কল্পে যে সকল দেশব্যাপী সর্বাত্মক আয়োজন গড়িয়া তোলা হইতেছে, তাহারই অন্যতম অঙ্গ হিসাবে সরকারের পক্ষ হইতে স্বর্ণবণ্ডের বিনিময়ে দেশের বৈদেশিক মুদ্রার প্রয়োজন মিটাইবার প্রয়াসে স্বর্ণ সংগ্রহ করা হইতেছে। এ পর্য্যন্ত যে পরিমাণ স্বর্ণ এ ভাবে সংগৃহীত হইয়াছে, তাহা সংবাদপত্রের স্তম্ভে ও অন্যান্য ভাবে যত ফলাও করিয়াই প্রচার করা হউক না কেন, দেশের আসন্ন প্রয়োজনের তুলনায় তাহা যে নিতান্তই অকিঞ্চিৎ-কর সেই বিষয়ে মতান্তরের কোনই অবকাশ নাই। বস্তুতঃ যাঁহারা তাঁহাদের সামান্য স্বর্ণ সঞ্চয় লইয়া স্বতঃ-প্রবৃত্ত হইয়া সরকারী স্বর্ণবণ্ড ক্রয় করিতে অগ্রসর হইয়া আসিতেছেন বা বিনা প্রতিদানেই তাঁহাদের সঞ্চিত স্বর্ণালঙ্কার ইত্যাদি দেশরক্ষার প্রয়োজনে অকাতরে দান করিতেছেন তাহার নৈতিক মূল্য যতই বিপুল হউক না কেন, পরিমাণে ও দেশের প্রয়োজনের তুলনায় তাহা নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর। ইঁহাদের ত্যাগের মহিমা খর্ব্ব করিবার কোন চেষ্টা আমরা করিতেছি না। বস্তুতঃ দেশপ্রেমের নিদর্শন হিসাবে এবং আত্মস্বার্থত্যাগের উদাহরণ হিসাবে এই সকল দান সত্যই অতুলনীয়। বিশেষ করিয়া যখন স্মরণ করা যায় যে, যেই নিম্ন মধ্যবিত্ত শ্রেণী হইতে এ সকল দান পাওয়া যাইতেছে, তাঁহাদের

নিকট সঞ্চিত সামান্য স্বর্ণালঙ্কারাদির মূল্য বাজার দরের মাপকাঠি দিয়া বিচার করা সম্ভব নহে, সমীচীনও নহে। এই সকল পরিবারের অধিকাংশের নিকটেই স্বর্ণালঙ্কার সজ্জা ও আভরণের উপাদান মাত্র নহে, ইহা দুর্দ্দিনের প্রায় একমাত্র সম্বল। কিন্তু যাঁহারা দেশের অধিকাংশ স্বর্ণসম্পদ আপনাপন কুক্ষিগত করিয়া রাখিয়াছেন, তাঁহাদের নিকট হইতে বিশেষ সাড়া পাওয়া যায় নাই, যাইবেও না। ব্রহ্ম সরকার কিছুকাল আগে সকল সঞ্চিত স্বর্ণ বাজেয়াপ্ত করিয়া লইয়াছিলেন। সেই উদাহরণই এখানে অনুসরণ করা উচিৎ ছিল। তাহা যে ভারত সরকার করিবেন না, আবার ধীরে ধীরে বর্দ্ধমান সোনার বাজারদর হইতেই তাহা বুঝা যাইতেছে।

কঃ নঃ

মাতৃভূমি রক্ষা

মানুষ যদি নিজের শরীর সুগঠিত, স্বাস্থ্যবান ও সবল রাখিতে পারে, যদি নিজের জীবনযাত্রা সুনির্ব্বাহিত করিবার জন্য উপযুক্ত কর্ম্ম ও সেই কর্ম্মের দ্বারা অর্থ উপার্জ্জন করিবার ব্যবস্থা করিতে পারে, যদি নিজের সম্মান ও মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারে এবং সর্ব্বশেষে নিজ জাতি ও নিজ দেশের অর্থ, সম্মান ও সুরক্ষণের অঙ্গ হিসাবে নিজ দেহ, মন ও কর্ম্মশক্তি নিযুক্ত করিতে পারে, তাহা হইলেই মানুষের মনুষ্যত্ব পূর্ণরূপে বিকশিত হইতে পারে। যে মানুষ নিজ শরীর, মন, সুনীতিজ্ঞান ও কর্ম্ম-কৌশল যথাযথ রূপে গঠিত, বর্দ্ধিত ও সংসারক্ষেত্রে ব্যবহৃত হইতে দেয় না, কিংবা ইচ্ছা থাকিলেও অক্ষমতাপ্রযুক্ত ব্যবহার করিতে পারে না, সে মানুষের নিজ পরিবারে, সমাজে অথবা দেশের বৃহত্তর ক্ষেত্রে কোনও মূল্য থাকে না। সে শরীরের অক্ষমতাহেতু পরিবারের গলায় পাথরের নালের মতই ঝুলিতে থাকে। যে অর্থ ব্যয় করিলে পরিবারের সকল লোকেরই উৎকৃষ্টতর খাদ্য জুটিত, শিক্ষা ও শ্রমশক্তি বৃদ্ধি লাভ করিত, সে অর্থ চিকিৎসাতে ব্যয় হইয়া পরিবারের অবস্থা উত্তরোত্তর অবনতির পথেই যাইতে থাকে। সন্তানাদির লেখাপড়াও বাধা পাইয়া অনেক ক্ষেত্রে বন্ধ হইয়া যায়। সুতরাং স্বাস্থ্যবান ব্যক্তি নিজের পরিবারের ও দেশের সম্পদের মতই। অস্বাস্থ্যবান ব্যক্তিরা দেশের সমাজের ও নিজ পরিবারের অকারণলব্ধ দায়িত্বের মতই সর্ব্বমানবের প্রগতির পথে বাধার সৃষ্টি করিয়া থাকে। অজ্ঞ ও নিরক্ষর লোকেরাও তেমনি সমাজের সহায়তা-কার্য্যে শিক্ষিতদিগের তুলনায় অক্ষম। উপরন্তু যদি তাহারা কর্ম্মে অপারগ ও দক্ষতাহীন হয় তাহা হইলে তাহাদিগের ভার সমাজ ও দেশ আরও অধিক করিয়া অনুভব করিতে থাকে।

শরীরের স্বাস্থ্য ও সামর্থ, মনের তীক্ষ্ণধার ভাব যাহা দুরূহ বিষয় সকলকে অবাধে আয়ত্তাধীন করিয়া লইতে পারে, আদর্শবোধ ও নীতিজ্ঞান যাহা দ্বারা প্রগতির সত্যপথ ধরিয়া মানুষ চলিতে শিখে এবং শৌর্য্যবীর্য্য-সম্ভূত কঠিন কর্ত্তব্যবোধ ও নির্ভয় আত্মবলিদান ক্ষমতা ; এই সব দিয়াই মানুষ পরিবারের, জাতির ও দেশের সমষ্টিগত শক্তি ও ক্ষমতা বাড়াইয়া তুলিতে পারে। এই সকল গুণ না থাকিলে মানুষ শুধু যে সংসারক্ষেত্রে জনবল বাড়াইতে পারে না তাহা নহে ; তাহার উপস্থিতিতে কেবলমাত্র জনতাবৃদ্ধি পায়। ভারতের জনসাধারণের গুণাগুণ বিচার করিলে দেখা যায় যে, ভারতীয় মানবের অধিকাংশই স্বাস্থ্যহীন, কর্ম্মে অপারগ ও অজ্ঞতার অন্ধকারে নিমজ্জিত। সংখ্যায় আমরা চল্লিশ কোটির অধিক হইলেও সে সংখ্যার বিশেষ কোন সক্ষম, সজীব, কৃতবিদ্য ও কর্ম্মকুশল রূপ নাই। শতকরা আশীজন নিরক্ষর ও অক্ষম। বাকি কুড়িজনের মধ্যে স্ত্রীলোক, বৃদ্ধ ও অল্পবয়স্কদিগকে বাদ দিলে পাঁচজন আন্দাজ পাওয়া যায় যাহারা শক্তিমান, বুদ্ধিমান ও কর্ত্তব্যকর্ম্মে দ্বিধাহীন। এই শতকরা পাঁচজন একত্র হইলে প্রায় দুই কোটি পনের লক্ষ লোক হয়। যুদ্ধক্ষেত্রে নামিয়া লড়াই করিবার জন্য এই সংখ্যা অল্প নহে। দেশরক্ষার জন্য, যে কোন শত্রুর বিরুদ্ধে দাঁড়াইতে হইলে এক কোটি সৈন্যই যথেষ্ট। কিন্তু যুদ্ধে একজন সৈন্যকে পাঠাইয়া তাহাকে খাদ্যে, বস্ত্রে, অস্ত্রে, ঔষধে, যান-বাহনে পূর্ণরূপে সজ্জিত ও যোগান পুষ্টি করিয়া রাখিতে হইলে আরও দশজন কর্ম্মীর প্রয়োজন হয়। অর্থাৎ এক কোটি সৈনিক যুদ্ধে নামিলে দশ কোটি লোকের প্রয়োজন হয় সেই বিরাট সেনাবাহিনীকে সকল প্রয়োজনীয় দ্রব্যসম্ভার সরবরাহ করিয়া যুদ্ধকার্য্য সুসিদ্ধ ও সফল করাইতে। ভারতের বর্ত্তমান সামরিক পরিস্থিতিতে মনে হয় ভারতকে নিজের নৌ, আকাশ ও স্থলবাহিনীতে ক্রমশঃ যোদ্ধার সংখ্যা বাড়াইয়া চলিতে হইবে ও হয়ত চীনের সহিত সংগ্রাম ছড়াইয়া পড়িয়া ভারতের সৈন্যসংখ্যা অচিরে এক কোটির কাছাকাছি পৌঁছাইয়া যাইবে। এবং সেই সকল সৈন্যদিগকে যুদ্ধের সরঞ্জাম ও অপরাপর প্রয়োজনীয় দ্রব্যসম্ভার প্রস্তুত করিয়া সরবরাহ করিতে আরও দশ কোটি কর্ম্মীর প্রয়োজন হইবে। এই জনশক্তি আমা-

দিগের উপস্থিত নাই। কিন্তু ভারতের সাধারণের মধ্যে যে জাগরণ আজ লক্ষিত হইতেছে তাহাতে মনে হয় যে, দশ-পনের কোটি নরনারী শীঘ্রই পূর্ণ উদ্যমে ও সবলভাবে সাক্ষাতে ও পরোক্ষে শত্রুনিপাত কার্য্যে আত্মনিয়োগ করিবে।

আমাদিগের এখন জাতীয়ভাবে প্রয়োজন যে, সকল নরনারী নিজ নিজ স্বাস্থ্য, শক্তি, কর্মকুশলতা, শিক্ষা ও সামরিক ক্ষমতা যথাসাধ্য বাড়াইয়া তুলিবার চেষ্টা করিবেন। যাঁহারা স্বাস্থ্য ও শক্তিলাভের উপায় জানেন তাঁহারা মিলিতভাবে চেষ্টা করিবেন যাহাতে সকলের স্বাস্থ্য অক্ষুণ্ণ থাকে এবং শারীরিক শক্তি ক্রমশঃ বৃদ্ধি পায়। সকলে নিজ নিজ কার্য্য পূর্ব্বাপেক্ষা কিছু অধিক-মাত্রায় করিবেন এবং নূতন নূতন কর্মকৌশল আহরণ করিবার চেষ্টা করিবেন। যেখানে যে প্রকারের যন্ত্র পাওয়া যাইবে সেই সকল যন্ত্র চালাইয়া কিছু না কিছু প্রয়োজনীয় বস্তু তৈয়ার করিতে হইবে। বিভিন্ন যন্ত্র চালাইতে শিখিতে হইবে, যাহারই সুবিধা হইবে তাহাকেই। ষোল হইতে চল্লিশ বৎসর বয়সের সকল নরনারীকেই কিছু না কিছু নূতন কার্য্য-পদ্ধতি শিখিতে হইবে। এই সকল কার্য্যের মধ্যে নিচের কয়েকটি কার্য্য শিখিয়া লওয়া সহজ ও শিখিবার সুবিধাও সর্ব্বত্র আছে।

১। বাইসাইকেল চড়া, ২। মোটরগাড়ী চালান, ৩। মোটর-সাইকেল চালান, ৪। বন্দুক চালনা, ৫। অশ্বারোহণ, ৬। সন্তরণ, ৭। দাঁড় টানা ও নৌকা চালান, ৮। মাটি কাটা, ৯। ভার বহন, ১০। কর্ম্মকারের কার্য্য, ১১। বাইসাইকেল, মোটর-সাইকেল ও মোটরকার মেরামত, ১২। টায়ার মেরামত, ১৩। রন্ধন, ১৪। বৃক্ষ রোপণ ও সব্জীর চাষ, ১৫। মুরগী ও হাঁস পালন, ১৬। মেষ ও ছাগ পালন, ১৭। সূত্রধরের কার্য্য, ১৮। বয়ন কার্য্য, ১৯। গো পালন, ২০। অধ্যয়ন, ২১। বিজ্ঞান শিক্ষা, ২২। বেতার যন্ত্র নির্ম্মাণ ও মেরামত, ২৩। টেলিফোন যন্ত্র নির্ম্মাণ ও মেরামত, ২৪। বিজলী মিস্ত্রীর কার্য্য, ২৫। নানান প্রকার যন্ত্র চালনা, ২৬। গৃহ, সেতু, রাস্তা প্রভৃতি নির্ম্মাণ। আরও অনেক কিছু বিষয় শিক্ষা করা যাইতে পারে, যাহাতে সামরিকভাবে প্রস্তুতি প্রবল ও ফলপ্রসূ হইতে পারে। যুদ্ধের সহিত সাক্ষাৎভাবে জড়িত আহতের প্রাথমিক চিকিৎসা ও আহত ব্যক্তিদিগকে উঠাইয়া হাসপাতালে লইয়া যাওয়া। বিমান আক্রমণ ঘটিলে হতাহতের সংখ্যা অনেক হইতে পারে এবং গৃহে আগুন লাগিতে পারে। এই আগুন নিভান ও জলন্ত স্থান হইতে বাসিন্দাগণকে বাঁচাইয়া আনা শিক্ষার বিষয়। "ফায়ার ফাইটিং" অর্থাৎ আগুনের সহিত লড়াই করা বিশেষজ্ঞের কার্য্য। ইহা শিখিতে হয় ও শিক্ষা অত্যাবশ্যক। বিমান আক্রমণ ঘটিলে জনসাধারণের কর্ত্তব্য বিমান-নিক্ষিপ্ত বোমা ফাটিয়া যাহাতে চোট না লাগে সেইরূপ ব্যবস্থা করা। গৃহের উপর তলাগুলি হইতে নামিয়া একতলায় চলিয়া আসা এবং আশ্রয়কেন্দ্রগুলিতে চলিয়া যাওয়াও উত্তম পন্থা। একতলার গৃহের দরজা-জানলাগুলির বাহিরে দেওয়াল তুলিয়া অথবা বালির বস্তার স্তূপ সাজাইয়া বোমা বিস্ফোরণের "ব্লাষ্ট" অর্থাৎ বিস্ফোরণজাত আলোড়নের ধাক্কা হইতে গৃহের ভিতরের মানুষ ও জিনিষপত্র সকল বাঁচানর ব্যবস্থা পূর্ব্ব হইতেই করিয়া রাখা কর্ত্তব্য। প্রত্যেক বাড়ীর মালিকের উচিত নিজে অথবা গৃহবাসী অপরাপর লোকের সহিত মিলিত ভাবে হাওয়াই আক্রমণ হইতে বাঁচিবার ব্যবস্থা করিয়া রাখা। বাড়ীর ছাদে একটা ৩০ ফুট মই রাখিয়া দিলে প্রয়োজন হইলে সেটি বিভিন্ন কার্য্যে লাগিবে। এক-তলায় একটি অতিরিক্ত জলের চৌবাচ্চা অথবা ট্যাঙ্ক বসাইয়া তাহাতে সর্ব্বদা জল রাখার ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। কয়েকটি ছোট ছোট বালতি [৫-১০] কিছু ১" মোটা দড়ি [৫০-১০০'] ও একটি বাক্সে টিংচার আয়োডিন, রেঃ স্পিরিট, পরিষ্কার তুলা, ব্যাণ্ডেজ প্রভৃতি রাখা উচিত। পাড়ার সকল ব্যক্তিরই প্রয়োজন নিয়মিত সকাল সন্ধ্যায় পাড়ার নিকটের যে কোন খোলা জমিতে মিলিত হইয়া কিছু কসরত করা এবং মই দিয়া ওঠা-নামা, জলের বালতি হাতে হাতে চালান এবং দড়ি ধরিয়া উপরে উঠিয়া যাওয়া বা উপর হইতে নামিয়া আসা অভ্যাস করা। মেয়েদের সকলের প্রাথমিক চিকিৎসা শিক্ষা করা। এই সকল বিষয়ের পূর্ণ জ্ঞানলাভের উপায় হইল সরকারী অথবা স্বেচ্ছা-গঠিত প্রতিষ্ঠানগুলির সহিত যোগদান করা। ব্যক্তিগত ভাবে সকল নরনারীকেই এই সময় নিজ নিজ স্বাস্থ্য উত্তমরূপে রক্ষা করিয়া চলিতে হইবে। স্বাস্থ্যহানির সকল কারণ বুঝিয়া জীবনযাত্রার সকল অভ্যাস তেমনি করিয়া পরিবর্ত্তন করিয়া চলিতে হইবে যাহাতে স্বাস্থ্য অটুট থাকে। ধূমপান, মদ্যপান, গুরুভোজন, রাত্রিজাগরণ প্রভৃতি পরিহার অথবা সংযত করিয়া এবং ব্যায়াম ও চিকিৎসার ব্যবস্থা করিয়া স্বাস্থ্যরক্ষা করিতে হইবে। কঠিন জীবন-সংগ্রাম সম্মুখে, এই কথা স্থির নিশ্চয় জানিয়া শিক্ষা ও সাধনার পথ অবলম্বন করিয়া এই যুদ্ধে জয়লাভ করিতে হইবে। যুদ্ধকার্য্য রাষ্ট্রনৈতিক আস্ফালন ও

নিকট সঞ্চিত সামান্য স্বর্ণালঙ্কারাদির মূল্য বাজার দরের মাপকাটি দিয়া বিচার করা সম্ভব নহে, সমীচীনও নহে। এই সকল পরিবারের অধিকাংশের নিকটেই স্বর্ণালঙ্কার সজ্জা ও আভরণের উপাদান মাত্র নহে, ইহা দুর্দিনের প্রায় একমাত্র সম্বল। কিন্তু যাঁহারা দেশের অধিকাংশ স্বর্ণসম্বল আপনাপন কুক্ষিগত করিয়া রাখিয়াছেন, তাঁহাদের নিকট হইতে বিশেষ সাড়া পাওয়া যায় নাই, যাইবেও না। ব্রহ্ম সরকার কিছুকাল আগে সকল সঞ্চিত স্বর্ণ বাজেয়াপ্ত করিয়া লইয়াছিলেন। সেই উদাহরণই এখানে অনুসরণ করা উচিৎ ছিল। তাহা যে ভারত সরকার করিবেন না, আবার ধীরে ধীরে বর্ত্তমান সোনার বাজারদর হইতেই তাহা বুঝা যাইতেছে।

ক: ন:

মাতৃভূমি রক্ষা

মানুষ যদি নিজের শরীর সুগঠিত, স্বাস্থ্যবান ও সবল রাখিতে পারে, যদি নিজের জীবনযাত্রা সুনির্ব্বাহিত করিবার জন্য উপযুক্ত কর্ম্ম ও সেই কর্ম্মের দ্বারা অর্থ উপার্জ্জন করিবার ব্যবস্থা করিতে পারে, যদি নিজের সম্মান ও মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারে এবং সর্ব্বশেষে নিজ জাতি ও নিজ দেশের অর্থ, সম্মান ও সুরক্ষণের অঙ্গ হিসাবে নিজ দেহ, মন ও কর্ম্মশক্তি নিযুক্ত করিতে পারে, তাহা হইলেই মানুষের মনুষ্যত্ব পূর্ণরূপে বিকশিত হইতে পারে। যে মানুষ নিজ শরীর, মন, সুনীতিজ্ঞান ও কর্ম্ম-কৌশল যথার্থ রূপে গঠিত, বর্দ্ধিত ও সংসারক্ষেত্রে ব্যবহৃত হইতে দেয় না, কিংবা ইচ্ছা থাকিলেও অক্ষমতাপ্রযুক্ত ব্যবহার করিতে পারে না, সে মানুষের নিজ পরিবারে, সমাজে অথবা দেশের বৃহত্তর ক্ষেত্রে কোনও মূল্য থাকে না। সে শরীরের অক্ষমতাহেতু পরিবারের গলায় পাথরের নালের মতই ঝুলিতে থাকে। যে অর্থ ব্যয় করিলে পরিবারের সকল লোকেরই উৎকৃষ্টতর খাদ্য জুটিত, শিক্ষা ও শ্রমশক্তি বৃদ্ধি লাভ করিত, সে অর্থ চিকিৎসাতে ব্যয় হইয়া পরিবারের অবস্থা উত্তরোত্তর অবনতির পথেই যাইতে থাকে। সন্তানাদির লেখাপড়াও বাধা পাইয়া অনেক ক্ষেত্রে বন্ধ হইয়া যায়। সুতরাং স্বাস্থ্যবান ব্যক্তি নিজের পরিবারের ও দেশের সম্পদের মতই। অস্বাস্থ্যবান ব্যক্তিরা দেশের সমাজের ও নিজ পরিবারের অকারণলব্ধ দায়িত্বের মতই সর্ব্বমানবের প্রগতির পথে বাধার সৃষ্টি করিয়া থাকে। অজ্ঞ ও নিরক্ষর লোকেরাও তেমনি সমাজের সহায়তা-কার্য্যে শিক্ষিতদিগের তুলনায় অক্ষম। উপরন্তু যদি তাহারা কর্ম্মে অপারগ ও দক্ষতাহীন হয় তাহা হইলে তাহাদিগের ভার সমাজ ও দেশ আরও অধিক করিয়া অনুভব করিতে থাকে।

শরীরের স্বাস্থ্য ও সামর্থ, মনের তীক্ষ্ণধার ভাব যাহা দুরূহ বিষয় সকলকে অবাধে আয়ত্তাধীন করিয়া লইতে পারে, আদর্শবোধ ও নীতিজ্ঞান যাহা দ্বারা প্রগতির সত্যপথ ধরিয়া মানুষ চলিতে শিখে এবং শৌর্য্যবীর্য্য-সঞ্জাত কঠিন কর্ত্তব্যবোধ ও নির্ভয় আত্মবলিদান ক্ষমতা; এই সব দিয়াই মানুষ পরিবারের, জাতির ও দেশের সমষ্টিগত শক্তি ও ক্ষমতা বাড়াইয়া তুলিতে পারে। এই সকল গুণ না থাকিলে মানুষ শুধু যে সংসারক্ষেত্রে জনবল বাড়াইতে পারে না তাহা নহে; তাহার উপস্থিতিতে কেবলমাত্র জনতাবৃদ্ধি পায়। ভারতের জনসাধারণের গুণাগুণ বিচার করিলে দেখা যায় যে, ভারতীয় মানবের অধিকাংশই স্বাস্থ্যহীন, কর্ম্মে অপারগ ও অজ্ঞতার অন্ধকারে নিমজ্জিত। সংখ্যায় আমরা চল্লিশ কোটির অধিক হইলেও সে সংখ্যার বিশেষ কোন সক্ষম, সজীব, কৃতবিদ্য ও কর্ম্মকুশল রূপ নাই। শতকরা আশীজন নিরক্ষর ও অক্ষম। বাকি কুড়িজনের মধ্যে স্ত্রীলোক, বৃদ্ধ ও অল্পবয়স্কদিগকে বাদ দিলে পাঁচজন মাত্র পাওয়া যায় যাহারা শক্তিমান, বুদ্ধিমান ও কর্ত্তব্যকর্ম্মে দ্বিধাহীন। এই শতকরা পাঁচজন একত্র হইলে প্রায় দুই কোটি পনের লক্ষ লোক হয়। যুদ্ধক্ষেত্রে নামিয়া লড়াই করিবার জন্য এই সংখ্যা অল্প নহে। দেশরক্ষার জন্য, যে কোন শত্রুর বিরুদ্ধে দাঁড়াইতে হইলে এক কোটি সৈন্যই যথেষ্ট। কিন্তু যুদ্ধে একজন সৈন্যকে পাঠাইয়া তাহাকে খাদ্যে, বস্ত্রে, অস্ত্রে, ঔষধে, যান-বাহনে পূর্ণরূপে সজ্জিত ও যোগান পূর্ত্তি করিয়া রাখিতে হইলে আরও দশজন কর্ম্মীর প্রয়োজন হয়। অর্থাৎ এক কোটি সৈনিক যুদ্ধে নামিলে দশ কোটি লোকের প্রয়োজন হয় সেই বিরাট সেনাবাহিনীকে সকল প্রয়োজনীয় দ্রব্যসম্ভার সরবরাহ করিয়া যুদ্ধকার্য্য সুসিদ্ধ ও সফল করাইতে। ভারতের বর্ত্তমান সামরিক পরিস্থিতিতে মনে হয় ভারতকে নিজের নৌ, আকাশ ও স্থলবাহিনীতে ক্রমশ: যোদ্ধার সংখ্যা বাড়াইয়া চলিতে হইবে ও হয়ত চীনের সহিত সংগ্রাম ছড়াইয়া পড়িয়া ভারতের সৈন্যসংখ্যা অচিরে এক কোটির কাছাকাছি পৌঁছাইয়া যাইবে। এবং সেই সকল সৈন্যদিগকে যুদ্ধের সরঞ্জাম ও অপরাপর প্রয়োজনীয় দ্রব্যসম্ভার প্রস্তুত করিয়া সরবরাহ করিতে আরও দশ কোটি কর্ম্মীর প্রয়োজন হইবে। এই জনশক্তি আমা-

দিগের উপস্থিত নাই। কিন্তু ভারতের সাধারণের মধ্যে যে জাগরণ আজ লক্ষিত হইতেছে তাহাতে মনে হয় যে, দশ-পনের কোটি নরনারী শীঘ্রই পূর্ণ উদ্যমে ও সবলভাবে সাক্ষাতে ও পরোক্ষে শত্রুনিপাত কার্য্যে আত্মনিয়োগ করিবে।

আমাদিগের এখন জাতীয়ভাবে প্রয়োজন যে, সকল নরনারী নিজ নিজ স্বাস্থ্য, শক্তি, কর্ম্মকুশলতা, শিক্ষা ও সামরিক ক্ষমতা যথাসাধ্য বাড়াইয়া তুলিবার চেষ্টা করিবেন। যাঁহারা স্বাস্থ্য ও শক্তিলাভের উপায় জানেন তাঁহারা মিলিতভাবে চেষ্টা করিবেন যাহাতে সকলের স্বাস্থ্য অক্ষুণ্ণ থাকে এবং শারীরিক শক্তি ক্রমশ: বৃদ্ধি পায়। সকলে নিজ নিজ কার্য্য পূর্ব্বাপেক্ষা কিছু অধিকমাত্রায় করিবেন এবং নূতন নূতন কর্ম্মকৌশল আহরণ করিবার চেষ্টা করিবেন। যেখানে যে প্রকারের যন্ত্র পাওয়া যাইবে সেই সকল যন্ত্র চালাইয়া কিছু না কিছু প্রয়োজনীয় বস্তু তৈয়ার করিতে হইবে। বিভিন্ন যন্ত্র চালাইতে শিখিতে হইবে, যাহারই সুবিধা হইবে তাহাকেই। ষোল হইতে চল্লিশ বৎসর বয়সের সকল নরনারীকেই কিছু না কিছু নূতন কার্য্য-পদ্ধতি শিখিতে হইবে। এই সকল কার্য্যের মধ্যে নিচের কয়েকটি কার্য্য শিখিয়া লওয়া সহজ ও শিখিবার সুবিধাও সর্ব্বত্র আছে।

১। বাইসাইকেল চড়া, ২। মোটরগাড়ী চালান, ৩। মোটর-সাইকেল চালান, ৪। বন্দুক চালনা, ৫। অশ্বারোহণ, ৬। সন্তরণ, ৭। দাঁড় টানা ও নৌকা চালান, ৮। মাটি কাটা, ৯। ভার বহন, ১০। কর্ম্মকারের কার্য্য, ১১। বাইসাইকেল, মোটর-সাইকেল ও মোটরকার মেরামত, ১২। টায়ার মেরামত, ১৩। রন্ধন, ১৪। বৃক্ষ রোপণ ও সব্জীর চাষ, ১৫। মুরগী ও হাঁস পালন, ১৬। মেষ ও ছাগ পালন, ১৭। সূত্রধরের কার্য্য, ১৮। বয়ন কার্য্য, ১৯। গো পালন, ২০। অধ্যয়ন, ২১। বিজ্ঞান শিক্ষা, ২২। বেতার যন্ত্র নির্ম্মাণ ও মেরামত, ২৩। টেলিফোন যন্ত্র নির্ম্মাণ ও মেরামত, ২৪। বিজলী মিস্ত্রীর কার্য্য, ২৫। নানান প্রকার যন্ত্র চালনা, ২৬। গৃহ, সেতু, রাস্তা প্রভৃতি নিম্মাণ। আরও অনেক কিছু বিষয় শিক্ষা করা যাইতে পারে, যাহাতে সামরিকভাবে প্রস্তুতি প্রবল ও ফলপ্রসূ হইতে পারে। যুদ্ধের সহিত সাক্ষাৎভাবে জড়িত আহতের প্রাথমিক চিকিৎসা ও আহত ব্যক্তিদিগকে উঠাইয়া হাসপাতালে লইয়া যাওয়া। বিমান আক্রমণ ঘটিলে হতাহতের সংখ্যা অনেক হইতে পারে এবং গৃহে আগুন লাগিতে পারে। এই আগুন নিভান ও জলন্ত স্থান হইতে বাসিন্দাগণকে বাঁচাইয়া আনা শিক্ষার বিষয়। "ফায়ার ফাইটিং" অর্থাৎ আগুনের সহিত লড়াই করা বিশেষজ্ঞের কার্য্য। ইহা শিখিতে হয় ও শিক্ষা অত্যাবশ্যক। বিমান আক্রমণ ঘটিলে জনসাধারণের কর্ত্তব্য বিমান-নিক্ষিপ্ত বোমা ফাটিয়া যাহাতে চোট না লাগে সেইরূপ ব্যবস্থা করা। গৃহের উপর তলাগুলি হইতে নামিয়া একতলায় চলিয়া আসা এবং আশ্রয়কেন্দ্রগুলিতে চলিয়া যাওয়াও উত্তম পন্থা। একতলার গৃহের দরজা-জানলাগুলির বাহিরে দেওয়াল তুলিয়া অথবা বালির বস্তার স্তূপ সাজাইয়া বোমা বিস্ফোরণের "ব্লাষ্ট" অর্থাৎ বিস্ফোরণজাত আলোড়নের ধাক্কা হইতে গৃহের ভিতরের মানুষ ও জিনিষপত্র সকল বাঁচানর ব্যবস্থা পূর্ব্ব হইতেই করিয়া রাখা কর্ত্তব্য। প্রত্যেক বাড়ীর মালিকের উচিত নিজে অথবা গৃহবাসী অপরাপর লোকের সহিত মিলিত ভাবে হাওয়াই আক্রমণ হইতে বাঁচিবার ব্যবস্থা করিয়া রাখা। বাড়ীর ছাদে একটা ৩০ ফুট মই রাখিয়া দিলে প্রয়োজন হইলে সেটি বিভিন্ন কার্য্যে লাগিবে। একতলায় একটি অতিরিক্ত জলের চৌবাচ্চা অথবা ট্যাঙ্ক বসাইয়া তাহাতে সর্ব্বদা জল রাখার ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। কয়েকটি ছোট ছোট বালতি [৫-১০] কিছু ১" মোটা দড়ি [৫০-১০০'] ও একটি বাক্সে টিংচার আয়োডিন, রেঃ স্পিরিট, পরিষ্কার তুলা, ব্যাণ্ডেজ প্রভৃতি রাখা উচিত। পাড়ার সকল ব্যক্তিরই প্রয়োজন নিয়মিত সকাল সন্ধ্যায় পাড়ার নিকটের যে কোন খোলা জমিতে মিলিত হইয়া কিছু কসরত করা এবং মই দিয়া ওঠা-নামা, জলের বালতি হাতে হাতে চালান এবং দড়ি ধরিয়া উপরে উঠিয়া যাওয়া বা উপর হইতে নামিয়া আসা অভ্যাস করা। মেয়েদের সকলের প্রাথমিক চিকিৎসা শিক্ষা করা। এই সকল বিষয়ের পূর্ণ জ্ঞানলাভের উপায় হইল সরকারী অথবা স্বেচ্ছা-গঠিত প্রতিষ্ঠানগুলির সহিত যোগদান করা। ব্যক্তিগত ভাবে সকল নরনারীকেই এই সময় নিজ নিজ স্বাস্থ্য উত্তমরূপে রক্ষা করিয়া চলিতে হইবে। স্বাস্থ্যহানির সকল কারণ বুঝিয়া জীবনযাত্রার সকল অভ্যাস তেমনি করিয়া পরিবর্ত্তন করিয়া চলিতে হইবে যাহাতে স্বাস্থ্য অটুট থাকে। ধূমপান, মদ্যপান, গুরুভোজন, রাত্রিজাগরণ প্রভৃতি পরিহার অথবা সংযত করিয়া এবং ব্যায়াম ও চিকিৎসার ব্যবস্থা করিয়া স্বাস্থ্যরক্ষা করিতে হইবে। কঠিন জীবন-সংগ্রাম সম্মুখে, এই কথা স্থির নিশ্চয় জানিয়া শিক্ষা ও সাধনার পথ অবলম্বন করিয়া এই যুদ্ধে জয়লাভ করিতে. হইবে। যুদ্ধকার্য্য রাষ্ট্রনৈতিক আস্ফালন ও

আত্মরক্ষাৰ্থিৰ কার্য্যের মত সহজ নহে। এই কার্য্যে সফলতা লাভ করা ঠিক দুর্ভিক্ষ ও জলপ্লাবনে আর্ত্তসেবা করার মতও নহে। বিষয়টি আরও অনেক কঠোর, কঠিন, নির্মমপন্থী ও আত্মবলিদান সাপেক্ষ। সহজে ও অবসর সময়ে সমাজসেবার মত নহে। এই কার্য্যে নামিলে সকল নরনারীকে প্রাণে ভয়ের পূর্ব্বে উঠিয়া একত্র মিলিত হইয়া বিভিন্ন কর্ত্তব্য বুঝিয়া এবং অভ্যাস করিয়া কর্মক্ষেত্রের কঠিনতর অবস্থার জন্য প্রস্তুত হইতে হইবে। সন্ধ্যাকালেও অভ্যাস ও শিক্ষা চালাইতে হইবে সর্ব্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় কার্য্য হইল সকলে মিলিত হইয়া প্রস্তুত হওয়া। জনবল না থাকিলে এই কার্য্য হইতে পারে না। সুতরাং সকল বিভেদ ও পার্থক্য ভুলিয়া ভারতবাসীমাত্রকেই দেশরক্ষার কার্য্যে আত্মনিয়োগ করিতে হইবে। সরকারী ব্যবস্থার মধ্যে হয়ত দুই-তিন কোটির অধিক নরনারীর স্থান হইবে না: কারণ সে ব্যবস্থা সাক্ষাৎ যুদ্ধক্ষেত্রের ও সেনাবাহিনীর সাজসরঞ্জামের ব্যবস্থা। কিন্তু আধুনিক যুদ্ধ ব্যাপক ভাবে সমস্ত দেশ ও জাতিকে যুদ্ধে জড়িত ও লিপ্ত করিয়া ফেলে। শত্রু সকল নরনারীকে আক্রমণ ও আহত করিতে চেষ্টা করে। এবং সকলের সমবেত চেষ্টা ও কর্ম্ম ক্রমশ: এক ধারায় মিলিত হইয়া প্রবল বন্যায় শত্রুদলকে শেষ অবধি নির্ম্মূল ভাবে বিনাশ করে। আমাদের জাতীয় প্রচেষ্টা এই ভাবে ক্রমশ: সমগ্র জাতির গুরুশাসনের রূপ ধারণ করিবে। এই রাষ্ট্রীয় দল অথবা ঐ সরকারী দপ্তর দেখাইয়া এই বিপুল প্রচেষ্টা সম্পূর্ণ হইতে পারে না। জাতি কখনও গোষ্ঠী, গণ্ডি, সরকারী ডিপার্টমেন্ট অথবা রাষ্ট্রীয় দলের দ্বারা সীমাবদ্ধ হইতে পারে না। কারণ কোন গোষ্ঠী, গণ্ডি, ডিপার্টমেন্ট বা দলেই এক কোটির অধিক লোকের স্থান হইতে পারে না; এবং এই মহাজাতির জনসংখ্যা প্রায় চুয়াল্লিশ কোটি। জাতীয় ইতিহাসের এই সন্ধিক্ষণে জাতির জনবলের শুধু শতকরা দুইজন মাত্র সংগ্রাম-কার্য্যে অবতীর্ণ হইবে ও আটানব্বই জন অর্দ্ধ-জাগ্রতভাবে ঘরে বসিয়া নেতাদিগের স্তোকবাক্য শ্রবণ করিয়া নিজ নিজ কর্ত্তব্য পূর্ণ করিবে; এইরূপ ব্যবস্থার কোনও বাস্তব ঔচিত্য থাকিতে পারে না। যাঁহারা এইরূপ ব্যবস্থা করিবার চেষ্টা করিবেন তাঁহারা হয় মূর্খ নয়ত জ্ঞানপাপী। জানিয়া-শুনিয়া অভিনয়ের খাতিরে বিশ্বপ্রেমের গান গাহিয়া আমরা আজ এই সাংঘাতিক বিপদে পড়িয়াছি। সহস্র সহস্র ভারত সন্তান শত্রুর বিশ্বাসঘাতকতায় হতাহত হইয়াছে। আরও বহু সহস্র ভারতবাসী শত্রুর কবলে পড়িয়া কি অবস্থায় রহিয়াছে তাহা আমরা জানি না। এই অবস্থায় আমাদের সকলের কর্ত্তব্য প্রস্তুত হওয়া। যে অবস্থাই হোক না কেন; সরকারী পন্থা যে-দিক দিয়াই যাক না কেন; সর্ব্ব-সাধারণের প্রস্তুতি সকল সময়েই যুদ্ধে জয়লাভ করিতে সাহায্য করে। সাধারণ লোকে যদি নিজ ব্যবস্থায় হাওয়াই আক্রমণ হইতে কতকটা আত্মরক্ষা করিতে পারে তাহা হইলে সরকারী বিমান আক্রমণ বিরোধ কার্য্য সহজ হইয়া আসে। সমগ্র জাতিকে সংহত, সংযত, সুগঠিত ও সকল অবস্থার জন্য প্রস্তুত করা একমাত্র জাতি নিজেই পারে। সরকারী ব্যবস্থায় তাহা কখনও পূর্ণভাবে হইতে পারে না। এই জন্য বর্ত্তমানে প্রয়োজন দেশের সকল নর-নারীর সেই ভাবে কার্য্যে যোগদান করা যাহাতে মনে হয় সারা ভারতই যুদ্ধক্ষেত্র এবং সকল ভারতবাসীই যোদ্ধা। ইহাতে সরকারী দায়িত্ব লঘু হইবে ও যুদ্ধজয় সহজ হইবে।

অ

—০—

আচার্য রামমোহনের সঙ্গীত-প্রসঙ্গ

শ্রীদিলীপকুমার মুখোপাধ্যায়

ভূমিকা

যুগপুরুষ রামমোহন রায়ের কীর্তিকাহিনী স্মরণ করতে গেলে প্রথমেই মনে আসে ধর্মীয় ও সামাজিক ক্ষেত্রে তাঁর যুগান্তকারী অবদানের কথা। ধর্ম ও সমাজ সংস্কারের ক্ষেত্রে কি বিরাট ভূমিকা তিনি সগৌরবে পালন করেছিলেন। জাতীয় জীবনের সেই তমসাচ্ছন্ন দিনে তিনি ছিলেন আধুনিক কালের ধ্যান-ধারণার ভাব-বিগ্রহ। পাশ্চাত্যের নব্য চিন্তাধারার সঙ্গে প্রাচীন প্রাচ্য মনীষার সমন্বয় সাধন—এই অভিনব তত্ত্বের প্রথম উপলব্ধি তাঁর এবং সে আদর্শকে সার্থক করবার জন্যে তিনি আমৃত্যু সংগ্রাম করেন। ইউরোপের নতুন শিক্ষা-দীক্ষা ও সভ্যতার ধারাকে তিনি আপনার বিশিষ্ট প্রতিভায় বরণ ক'রে ভারতীয় নবজাগৃতির পথ সুগম ক'রে দেন।

ধর্ম ও সমাজ-জীবনে ক্রান্তিকারী আন্দোলন, ইংরেজী শিক্ষা প্রচলন ও ব্রাহ্মসমাজ স্থাপন, বিভিন্ন ভাষায় সংবাদপত্র প্রবর্তন ও পরিচালনা, আপন মত প্রচার ও বিরুদ্ধ মত খণ্ডনের জন্যে গ্রন্থের পর গ্রন্থ রচনা ও প্রকাশ, দেশীয় রাষ্ট্রনীতিতে অংশ গ্রহণ এবং বিশ্বের রাজনীতি বিষয়ে গভীর ঔৎসুক্য, দেশীয় প্রাচীনপন্থীদের বিপক্ষে আদর্শগত সংঘর্ষ—রামমোহনকে চিন্তা করতে গেলে প্রধানত এই সব প্রসঙ্গই মনে আসে। এবং তাই স্বাভাবিক। কারণ সেই সব অবদানের জন্যেই তিনি আমাদের জাতীয় জীবনে অমরত্ব লাভ করেছেন এবং স্মরণীয় হয়ে আছেন। সেজন্যে তাঁর জীবনী-লেখকদেরও সর্বাগ্রে ওই সব বিষয়ের বিবরণ দানে উদ্বুদ্ধ করেছে।

দেখা যায়, তাঁর প্রচলিত জীবনী গ্রন্থাদিতে, সঠিক-ভাবে বলতে গেলে, ১৮১৪ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর কলকাতায় স্থায়ীভাবে বাস আরম্ভ থেকে ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দে বিলাতযাত্রা পর্যন্ত জীবনকথায়, উক্ত প্রসঙ্গগুলিই স্থান পেয়েছে।

কিন্তু রামমোহনের সেই পরিচয়ই সম্পূর্ণ নয়। তাঁর বিপুল কর্মকাণ্ডের অন্তরালে তাঁর জীবনের আর একটি দিক্ অপেক্ষাকৃত উপেক্ষিত হয়ে আছে। নানা কারণে তাঁর জীবনীরচয়িতাদের দৃষ্টি সেদিকে আকৃষ্ট হয় নি। বলা যায়, মহা প্রতিভাধর রামমোহনের প্রধান কীর্তি-গুলি তাঁর সাংস্কৃতিক জীবনকে অনেকাংশে আচ্ছন্ন ক'রে রেখেছে।

তাঁর সাংস্কৃতিক জীবনের পরিচয় দান বা মূল্যায়ন করা যে আদৌ হয় নি, তা নয়। বিশেষ বাংলা সাহিত্যে তাঁর অবদানের কথা আলোচিত হয়েছে। যথা, বাংলা সাহিত্যে তিনি বেদান্তের প্রথম ভাষ্যকার, প্রথম গৌড়ীয় ব্যাকরণ রচয়িতা। বাংলায় প্রথম ভূগোল, জ্যামিতি ইত্যাদি পুস্তক রচনার কৃতিত্বও তাঁর। বাংলা ভাষায় গভীর পাণ্ডিত্যপূর্ণ প্রবন্ধ সাহিত্যের তিনি জন্মদাতা। বাংলা গদ্য সাহিত্যের তিনি অন্যতম আদি লেখক এবং বাংলা গদ্যকে সংস্কৃতের প্রভাবমুক্ত করবার প্রচেষ্টা সাহিত্য ক্ষেত্রে তাঁর আর এক বিশিষ্ট অবদান।

সাহিত্য বিষয়ে তাঁর দান সম্পর্কে সচেতন হলেও, অন্য একটি সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে তাঁর অবদানের বিষয়ে আমরা যথোচিত অবহিত নই। তা হ'ল তাঁর সঙ্গীত-প্রসঙ্গ।

রামমোহনের সঙ্গীত প্রসঙ্গে অবশ্য একথা সুপরিচিত যে, তিনি অনেকগুলি উৎকৃষ্ট ব্রহ্মসঙ্গীত রচনা করেছিলেন এবং বাংলা ভাষায় তিনিই প্রথম ব্রহ্মসঙ্গীত রচয়িতা। কিন্তু শুধু ব্রহ্মসঙ্গীতের আদি রচনাকার রূপেই নয়, তাঁর সঙ্গীতজীবনের আরও ব্যাপক তাৎপর্য আছে। এবং সেই দিক থেকে তাঁর সঙ্গীতজীবন বিস্তৃতভাবে আলোচনার যোগ্য। ব্রহ্মসঙ্গীত রচনা ভিন্ন সঙ্গীতক্ষেত্রে তাঁর আরও কিছু অবদান আছে, যার যথোপযুক্ত মূল্যায়ন হয় নি।

রামমোহনের সঙ্গীতজীবনকে একান্ত বা বিচ্ছিন্নভাবে বিচার না ক'রে ঊনিশ শতকের জাতীয় নবজাগরণ বা রেনেসাঁসের পটভূমিকায় যুক্ত ক'রে দেখলে যথোচিত হয়। কারণ সমগ্রভাবে তাঁর জীবনের সঙ্গে ভারতীয় রেনেসাঁসের অচ্ছেদ্য সম্পর্ক ছিল। ব্যাপক অর্থে তিনি ছিলেন সেই নব জাগৃতির এক প্রধান পুরস্কর্তা।

রামমোহনের বৃহত্তর জীবন, ধর্ম সমাজ শিক্ষা ইত্যাদি ক্ষেত্রে তাঁর কর্মধারা নবযুগের তোরণ উন্মুক্ত করতে যেমন সহায়তা করে—তাঁর সঙ্গীতজীবন সম্পর্কে তা অতখানি

গোচার-ভাবে বলা যায় না বটে। কিন্তু তাকে রেনেশাঁসের পূর্বসূত্র থেকে ছিন্ন করাও চলে না।

আধুনিক ভারতের সেই ঊষাকালে তাঁর সঙ্গীত-জীবনকে বৃহত্তর জাতীয় জীবনের পৃষ্ঠপটে বিচার ক'রে দেখলে সেই কথাই মনে হয়।

নব্য বাংলায় রাগ সঙ্গীতচর্চার সেই প্রথম যুগে তাঁর চিত্ত যে বিপুল ঐতিহ্যসম্পদ ও রসসমৃদ্ধ রাগ-সঙ্গীতে আকৃষ্ট হ'ল, কৃতবিদ্য কলাবতের শিক্ষাধীনে তিনি যে তার মর্ম গ্রহণে উদ্যোগী হলেন, রাগবিদ্যার পরিচয় লাভ ক'রে রাগের ভিত্তিতে বাংলা গান রচনা করতে লাগলেন, প্রথমে আত্মীয়সভায় এবং শেষে ব্রাহ্মসমাজ গৃহে গুণী সঙ্গীতজ্ঞদের নিয়মিত সঙ্গীতানুষ্ঠানের আয়োজন করলেন এবং এই সবের সুফল পরবর্তীকালে যে সুদূর-প্রসারী রূপে দেখা গেল সমষ্টিগত ভাবে বিচার করলে রামমোহনের এই সাঙ্গীতিক কার্যাবলীর একটি ঐতিহাসিক তাৎপর্য লক্ষ্য করা যায়। তা হ'ল, সঙ্গীত-ক্ষেত্রে রেনেশাঁসের সঙ্গে রামমোহনের সঙ্গীতকৃতির একটি সংযোগের ধারা।

ঊনিশ শতকের বাংলা তথা ভারতের নবজাগৃতি, জাতীয় জীবনের সর্বক্ষেত্রের মতন, সঙ্গীত জগতেও আপন স্বাক্ষর রেখেছিল এবং রামমোহনের সঙ্গীতজীবনের সঙ্গে তা নিঃসম্পর্কিত ছিল না।

এই পরিপ্রেক্ষিতে তাঁর সঙ্গীতপর্বের যথাসম্ভব পর্যালোচনা করবার জন্যেই বর্তমান নিবন্ধের অবতারণা। এ বিষয়ে একটি অসুবিধার কথা পূর্বাহ্নে জানিয়ে রাখা প্রয়োজন। রামমোহনের জীবনকথার মতন তাঁর সঙ্গীত-প্রসঙ্গেরও যথোপযুক্ত উপাদান ও তথ্যের অভাব। বরং তাঁর জীবনীর অন্যান্য বিষয়ের চেয়ে সঙ্গীত-সম্পর্কিত উপকরণের অভাব আরও বেশী।

প্রামাণিক উপাদানের অভাবে রামমোহনের জীবন কথায় অনেকগুলি ছিন্নসূত্র আছে, বিশেষ তাঁর প্রথম জীবনে। সমগ্র নিরবচ্ছিন্ন ধারাবাহিকতায় তাঁর জীবনী আজও গ্রথিত করা সম্ভব হয় নি। তাঁর কলকাতায় স্থায়ীভাবে বসবাসের পূর্ব পর্যন্ত, বিশেষ তাঁর কৈশোর ও সমগ্র যৌবনকালের অবিসংবাদিত ধারাবিবরণী পাওয়া যায় না। বহু ছিন্ন-সূত্র সেখানে যোজন করার অপেক্ষায় আছে, যেজন্যে গভীর গবেষণার প্রয়োজন। যেখানে তাঁর জীবনের অপেক্ষাকৃত প্রধান ও পরিচিত বিষয়গুলির তথ্যাদিরই এত অভাব, সেক্ষেত্রে তাঁর সঙ্গীত-প্রসঙ্গের মতন স্বল্প পরিচিত বিষয়ের উপকরণ আরও কম সংগ্রহ করা হয়েছে, একথা সহজেই বোঝা যায়। কারণ তাঁর সঙ্গীত-পর্ব অপ্রয়োজনীয় বিবেচনায় তাঁর জীবন সম্পর্কে আগ্রহী লেখক বা গবেষকদের মনোযোগ আকৃষ্ট করতে পারে নি।

এই সব কারণে রামমোহনের সঙ্গীতজীবন বিষয়ে বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া অতিশয় কঠিন এবং বর্তমান লেখক সে বিষয়ে সচেতন। রামমোহনের সঙ্গীত-প্রসঙ্গ নিয়ে সুসম্পূর্ণ গবেষণার দাবীও লেখকের নেই এবং এ বিষয়ে তিনি সুযোগ্য অধিকারীও নন। রামমোহনের সঙ্গীতজীবনের মূল ধারা ক'টির সম্পর্কে যে ইঙ্গিতগুলি দেওয়া হবে কিংবা ঈষৎ চন্দ্রিকাপাত করা হবে, তা হয়ত কোন যোগ্য গবেষকের কাছে দিক্‌দর্শনী স্বরূপ গণ্য হতে পারে, লেখকের এই একমাত্র আশা। কিংবা কোন উপযুক্ত অধিকারীর দৃষ্টি আকৃষ্ট ক'রে সঙ্গীতক্ষেত্রে রামমোহনের অবদানের বিস্তৃততর পরিচয় দানে উদ্বুদ্ধ করতে পারে। বর্তমান নিবন্ধ রচনার তাও অন্যতম উদ্দেশ্য।

রামমোহন যে যে বিষয়ে হস্তক্ষেপ করেছিলেন, তার প্রত্যেকটিতে তাঁর বিশিষ্ট প্রতিভার স্বাক্ষর আছে। তাঁর সঙ্গীত-প্রসঙ্গেও তাঁর অসামান্য মনীষা ও পরিশীলিত মনের পরিচয় বর্তমান। স্বরচিত ব্রহ্মসঙ্গীতগুলি রাম-মোহনের সঙ্গীতকৃতির একমাত্র পরিচায়ক নয়। তাঁর একটি ব্যাপক এবং বিভিন্নমুখী সঙ্গীতজীবন ছিল, যার যথোচিত পরিচয় লাভ না করলে তাঁর অন্তর্জীবন ও সাংস্কৃতিক জীবনেরও অনেকাংশ অপ্রকাশিত থেকে যাবে।

রামমোহনের সঙ্গীতজীবনকে প্রধান তিনটি ভাগে বিভক্ত করা যায়: (১) সঙ্গীত'শিক্ষা' বা সঙ্গীতচর্চা। (২) সঙ্গীতের পৃষ্ঠপোষকতা তথা সঙ্গীত প্রচলনে সহায়তা। (৩) রাগভিত্তিক বা রাগপ্রধান (ব্রহ্ম) সঙ্গীত রচনা।

এই তিনটি বিষয়ে যথাযথ পর্যালোচনা করলে রাম-মোহনের সাঙ্গীতিক অবদানের মূল্যায়ন অনেকাংশে হ'তে পারে।

বলা বাহুল্য হলেও একথা মনে রাখা প্রয়োজন যে, রামমোহনের সঙ্গীতের প্রকৃতি ছিল রাগসঙ্গীত—দেশী-সঙ্গীত নয়। সাধারণত যে সঙ্গীতকে অস্পষ্টভাবে বলা হয় মার্গসঙ্গীত, classical music ইত্যাদি। মার্গসঙ্গীত কথাটি, বাংলাসাহিত্যে একাধিক নেতৃস্থানীয় সঙ্গীতজ্ঞ-সাহিত্যিক ব্যবহার করলেও, যথার্থ প্রয়োগ নয়। কারণ সত্যকার মার্গসঙ্গীত খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ-সপ্তম শতকেই লুপ্ত হয়ে যায়। সঠিকভাবে বলতে গেলে রাগসঙ্গীত কথাটিই যথোচিত হয়, অর্থাৎ যা সাধারণত হিন্দুস্থানী সঙ্গীত

বা ভারতীয় সঙ্গীত, কলাবন্ত বা কালোয়াতী সঙ্গীত বা ওস্তাদি গান ইত্যাদি নামে সুপরিচিত। যার গীতরূপ তৎকালে ছিল ধ্রুপদ, খেয়াল, টপ্পা ইত্যাদি। কীর্তন, বাউল ইত্যাদি দেশী সঙ্গীতের চর্চা রামমোহন করেন নি। দেশায় সঙ্গীতের প্রতি কোনরূপ কটাক্ষ না ক'রেও মন্তব্য করা যায় যে, তিনি বিচিত্র ঐশ্বর্যময় ও ঐতিহ্যময় রাগ-সঙ্গীতকে অবলম্বন করেছিলেন। তাঁর বিদগ্ধ মন ভারতীয় সঙ্গীতের বিপুল ব্যাপ্তি ও অকূল গভীরতায় অবগাহন করেছিল। ব্রহ্মোপাসনার অঙ্গস্বরূপ তিনি সঙ্গীতের প্রয়োজন স্বীকার করতেন এবং নিয়মিত সঙ্গীতানুষ্ঠানের প্রবর্তন করেন উপাসনা মন্দিরে। কিন্তু শুধু উপাসনা সঙ্গীতেই নয়। সঙ্গীত তার নিজস্ব আবেদনের জন্যেও তাঁর কাছে আকর্ষণের বস্তু ছিল, তিনি মুগ্ধ ছিলেন তার আপন সৌন্দর্য ও রসসৃষ্টির মহিমায়। তাঁর সেই স্বভাবজ সঙ্গীতপ্রীতি তাঁকে সঙ্গীতের গভীরে প্রবেশ করতে উদ্বুদ্ধ করে।

রামমোহনের সঙ্গীতজীবনের তিনটি বিভাগের বিস্তৃত আলোচনা পৃথক অধ্যায়ে করা হবে। তার আগে তৎকালীন দেশের বৃহত্তর সঙ্গীত ক্ষেত্রের একটি সংক্ষিপ্ত পরিচায়িকা দেওয়া প্রয়োজন। তাহলে সঙ্গীত রেনেসাঁসের পটভূমিকায় রামমোহনের সঙ্গীত-প্রসঙ্গের অনুধাবন করা সহজ হবে। তাঁর সঙ্গীত জীবনের সঙ্গে যে সেই নবজাগৃতির সঙ্গীতাংশের কিছু সম্পর্ক ছিল, সে কথা পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে।

রামমোহনের যৌবনকালে, অর্থাৎ আঠারো শতকের একেবারে শেষ এবং উনিশ শতকের প্রথম ভাগে, কলকাতা তথা বাংলার সাঙ্গীতিক (অর্থাৎ রাগসঙ্গীতের) পরিবেশ কেমন ছিল?

রামমোহনের সঙ্গীতশিক্ষা ও সঙ্গীতচর্চা কলকাতায় হওয়ায়, প্রথমে কলকাতার সঙ্গীতক্ষেত্র আলোচনা করা যায়। তা ছাড়া, উনিশ শতকের জাতীয় নবজাগৃতির প্রাণকেন্দ্র থাকার কারণেও কলকাতার কথা পর্যালোচনার যোগ্য। কারণ সেই রেনেসাঁসের মধ্যে সঙ্গীতেরও একটি অংশ ছিল এবং উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে সঙ্গীতক্ষেত্রে যে বিপুল ও সৃজনশীল কর্মতৎপরতা ও ভারতীয় সঙ্গীতের নব্য মূল্যায়নের প্রয়াস দেখা দেয়—কলকাতা ছিল তার প্রধান কর্মক্ষেত্র। সেই সঙ্গীত-রেনেসাঁসের যাঁরা মুখপাত্র, তাঁদের মধ্যে প্রধান তিনজন হলেন—ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী, শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর ও কৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায়।

কিন্তু কোন বৃহৎ অনুষ্ঠানই বিনা প্রস্তুতিতে সম্ভব হয় না। সঙ্গীতক্ষেত্রের এই পুনরভ্যুদয়েরও একটি প্রস্তুতি-পর্ব ছিল, যাকে তার সূচনাকালও বলা যায়। আঠারো শতকের শেষ পাদ এবং উনিশ শতকের প্রায় সমগ্র প্রথমার্ধব্যাপী সেই পর্ব। রামমোহনের জীবনকাল তথা সঙ্গীত-জীবন আদ্যোপান্ত রেনেসাঁসের সেই সূচনা কালের অন্তর্গত এবং তাঁর সঙ্গীতাচার্যের অধীনে সঙ্গীতচর্চা, রাগের ভিত্তিতে ব্রহ্মসঙ্গীত রচনা, সমাজগৃহে উপাসনার অঙ্গস্বরূপ নিয়মিত সঙ্গীতের অনুষ্ঠান ও সঙ্গীতের পৃষ্ঠপোষকতা ইত্যাদি সবই সেই প্রস্তুতির সহায়তা করেছিল। সঙ্গীতক্ষেত্রে রেনেসাঁসের সঙ্গে রামমোহনের সঙ্গীত-জীবনের এই ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক।

রামমোহনের সঙ্গীত জীবনের পূর্ব থেকেই সে সূচনা-কালের আরম্ভ হয়। সেজন্য রামমোহনের সঙ্গীত-প্রসঙ্গের ভূমিকা স্বরূপ সেই পূর্ব বৃত্তান্ত কিছু বর্ণনা করা হবে।

আধুনিক কালে সে যুগ হ'ল বাঙ্গালীর রাগসঙ্গীত শিক্ষার প্রথম যুগ। আর সে সঙ্গীত যেহেতু হিন্দুস্থানের, সেজন্য বাঙ্গালীকে তা শিক্ষা করতে হ'ত সশরীরে পশ্চিমে অবস্থান ক'রে কিংবা বাংলার কোন দরবারী সঙ্গীত-পৃষ্ঠপোষক রাজসভার আনুকূল্যে।

তখন কলকাতার রামনিধি গুপ্ত ১৮ বছর বিহারের ছাপরায় চাকুরিসূত্রে বাস করবার সময় পশ্চিমা কলাবন্তের অধীনে রীতিমত সঙ্গীত শিক্ষা ক'রে ১৭৯৪ খ্রীষ্টাব্দে কলকাতায় ফিরে এসেছেন। ওস্তাদের কাছে তিনি টপ্পা রীতির সঙ্গীত শিক্ষা করেছিলেন এবং বাংলায় উৎকৃষ্ট কাব্যসঙ্গীত রচনা ক'রে টপ্পা অঙ্গে গেয়ে কলকাতার সঙ্গীতাসরে অভূতপূর্ব সাড়া জাগিয়েছেন। কলকাতায় প্রত্যাবর্তনের সময় তাঁর পরিণত বয়স—৫৩ বছর (জন্ম: ১৭৪১ খ্রীঃ) এবং সেই আদিযুগের রাগসঙ্গীতশিল্পীদের মধ্যে তিনি বয়োজ্যেষ্ঠ। তাঁর বাংলা টপ্পা হিন্দুস্থানী গানের আদর্শে রচিত হলেও এই স্বাতন্ত্র্য রইল যে, তাঁর গানের মধ্যে ব্যঞ্জনবর্ণের আধিক্যসম্পন্ন হিন্দুস্থানী টপ্পার তুল্য দ্রুত তান বেশী নেই। তাঁর গভীর হৃদয়াবেগ-পূর্ণ ও রসসমৃদ্ধ প্রণয়-সঙ্গীতের মাধ্যমে কলকাতা তথা বাংলায় টপ্পা রীতি বিশেষ জনপ্রিয় হয়েছিল। সঙ্গীতকে পেশারূপে অবলম্বন ক'রে তিনি কোন ধনীর সঙ্গীত-সভায় নিযুক্ত হন নি এবং তাঁর গানের আসরে যে কোন সঙ্গীত-রসিক ব্যক্তির প্রবেশাধিকার ছিল। তৎকাল প্রচলিত আখড়াই গানকে সংশোধিত ও পরিমার্জিত করে এবং বিশুদ্ধ রাগ তালে সুগঠিত ক'রে নবরূপে রূপায়িত করাও (১৮০৪ খ্রীঃ) তাঁর আর এক সাঙ্গীতিক কীর্তি।

নিধুবাবুর ঈষৎ বয়ঃকনিষ্ঠ সমসাময়িক তিনজন বাঙালী সঙ্গীতজ্ঞের কথা উল্লেখযোগ্য, যাঁরা পশ্চিমা কলাবন্তের অধীনে বিশেষভাবে সঙ্গীত শিক্ষা ক'রে বাংলা দেশে স্বতন্ত্র এক এক গীতি রীতির প্রচলন-কর্তা এবং বাংলাভাষায় সেই সেই বিশিষ্ট রীতির আদি গান-রচয়িতাও। তাঁরা হলেন— গুপ্তিপাড়ার কালী মীর্জা (জন্ম : আনুমানিক ১৭৫০ খ্রীঃ), বর্ধমানের দেওয়ান রঘুনাথ রায় (জন্ম : ১৭৫০ খ্রীঃ) এবং বিষ্ণুপুরের রামশঙ্কর ভট্টাচার্য (জন্ম : আনুমানিক ১৭৬১ খ্রীঃ)।

তাঁদের মধ্যে কালী মীর্জা সর্বাগ্রে পশ্চিমাঞ্চলের সঙ্গীত শিক্ষা লাভ করেন। রামমোহনের জন্মের পূর্বে— (১৭৭০।৭১ খ্রীঃ) কালী মীর্জা, প্রথমে বারাণসী এবং পরে দিল্লী ও লক্ষ্ণৌ যান এবং কৃতবিদ্য সঙ্গীতজ্ঞ হয়ে ফিরে আসেন ১৭৮১।৮২ খ্রীষ্টাব্দে। তাঁর কথা পরে বিস্তৃতভাবে বলা হবে, কারণ রামমোহনের সঙ্গীত-জীবনের সঙ্গে তিনি বিশেষভাবে সম্পর্কিত।

বিষ্ণুপুরের রামশঙ্কর ভট্টাচার্য এবং বর্ধমানের রঘুনাথ রায় পশ্চিমে অবস্থান না ক'রে বাংলাদেশেই সঙ্গীতশিক্ষার সুযোগ পান। রামশঙ্কর সঙ্গীতশিক্ষা করেন ঘটনাচক্রে আগ্রা অঞ্চলের জনৈক হিন্দু সঙ্গীতাচার্যের অধীনে এবং বিষ্ণুপুরে। উক্ত সঙ্গীতাচার্য পুরীতীর্থ যাত্রার পথে বিষ্ণুপুরে সমাগত হন ১৭৮১।৮২ খ্রীষ্টাব্দে এবং প্রত্যাবর্তনের পথে রামশঙ্করের সুকণ্ঠের পরিচয়ে প্রীত হয়ে বৎসরাধিক কাল বিষ্ণুপুরে অবস্থান ক'রে রামশঙ্করকে সঙ্গীত শিক্ষা দেন। (তার কৌতূহলোদ্দীপক ও বিস্তৃত বিবরণ লেখক প্রণীত "বিষ্ণুপুর ঘরাণা" পুস্তকে লিপিবদ্ধ আছে)। রামশঙ্কর এইভাবে শিক্ষাপ্রাপ্ত হয়ে বিষ্ণুপুরের আদি সঙ্গীতাচার্য রূপে বিখ্যাত বিষ্ণুপুর ঘরাণার প্রবর্তন করেন এবং কৃতী শিষ্যসম্প্রদায় (ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী, রামকেশব ভট্টাচার্য, কেশবলাল চক্রবর্তী, দীনবন্ধু গোস্বামী, অনন্তলাল বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি) গঠন ক'রে বিষ্ণুপুর ঘরাণার ধ্রুপদ সঙ্গীত বাংলাদেশে প্রচলন করেন। রামশঙ্কর, যতদূর জানা যায়, প্রথম বাঙালী ধ্রুপদগায়ক, ধ্রুপদাচার্য ও বাংলাভাষায় প্রথম ধ্রুপদ গান রচয়িতা এবং তাঁর প্রবর্তিত বিষ্ণুপুর ঘরাণার বা বিষ্ণুপুরী চালের ধ্রুপদ কলকাতার সঙ্গীতাসরে প্রচলিত হয় রামমোহনের বিলাত যাত্রার (১৮৩০ খ্রীঃ) পরে। রামশঙ্কর ভট্টাচার্যের (তিনি নিজে কখনও কলকাতায় আসেননি) কৃতী শিষ্যবৃন্দ কলকাতার সঙ্গীত-সমাজে বিষ্ণুপুর ঘরাণার ধ্রুপদের প্রথম প্রচলন কর্তা। যথা,—লাটুবাবু, ছাটুবাবুর (রামদুলাল সরকারের পুত্রদ্বয় আশুতোষ ও প্রমথনাথ দেব) সঙ্গীত-সভায় নিযুক্ত রামকেশব ভট্টাচার্য (রামশঙ্করের তৃতীয় পুত্র), যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের (ও শৌরীন্দ্রমোহনের) সঙ্গীত-সভায় নিযুক্ত ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী, তারকনাথ প্রামাণিকের সঙ্গীত-সভায় নিযুক্ত কেশবলাল চক্রবর্তী, প্রভৃতি। কলকাতার সঙ্গীত-সমাজে অবশ্য এই বিষ্ণুপুর ঘরাণার ধ্রুপদই একমাত্র ধারা নয়—ধ্রুপদ গানের বাঙালী পরিচালিত অন্য ধারাও ছিল। যেমন, বারাণসী থেকে শিক্ষাপ্রাপ্ত কলকাতার প্রথম খাওয়ার বাণী ধ্রুপদ গায়ক গঙ্গানারায়ণ চট্টোপাধ্যায় (জন্ম : আনুমানিক ১৮০৩ খ্রীঃ) যাঁর দুই প্রধান শিষ্য ছিলেন—পাথুরিয়াঘাটার হরপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় (জন্ম : ১৮৩০ খ্রীঃ) ও বিষ্ণুপুরে যদু ভট্ট (জন্ম : ১৮৪০ খ্রীঃ)। গঙ্গানারায়ণ পশ্চিমাঞ্চল থেকে সঙ্গীত শিক্ষা ক'রে কলকাতায় প্রত্যাবর্তন করেন রামমোহনের বিলাত গমনের প্রায় সমসময়ে।

(সুতরাং দেখা যায়, রামমোহন কলকাতায় তাঁর সমগ্র সঙ্গীত জীবনে এবং বিশেষ 'শিক্ষা' পর্বে ত বটেই, বিষ্ণুপুর ঘরাণার কোন ধ্রুপদী কিংবা কলকাতার প্রথম ধ্রুপদী গঙ্গানারায়ণের সাহচর্য লাভ করেন নি। এই ঘটনার তাৎপর্য রামমোহনের সঙ্গীত জীবনে সবিশেষ গুরুত্বপূর্ণ, সেজন্যে এখানে উল্লেখ করা হ'ল এবং পরে তাঁর সঙ্গীত জীবন আলোচনায় এ প্রসঙ্গ পুনরায় উত্থাপন করা হবে।)

চুপী গ্রাম নিবাসী এবং বর্ধমান রাজের দেওয়ান রঘুনাথ রায়ও রামশঙ্করের মতন স্বদেশেই পশ্চিমা কলাবন্তের অধীনে শিক্ষালাভ করেন। বর্ধমান রাজ তেজচাঁদের আনুকূল্যে সেখানকার দরবারে সমাগত গুণীদের কাছে রঘুনাথ সঙ্গীত শিক্ষা করেন রামশঙ্করের সঙ্গীত শিক্ষার কয়েক বছর পরে, কিন্তু আঠারো শতকের শেষ পাদেই। রঘুনাথের প্রধান সাঙ্গীতিক কীর্তি হ'ল—তিনি বাংলা ভাষায় প্রথম চারতুকের ও খেয়ালাঙ্গের গান-রচয়িতা এবং আদি খেয়াল গায়কও। রামমোহনের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ ঘটেছিল কি না সঠিক ভাবে জানা যায় না। কিন্তু রামমোহন ১৯।২০ বছর বয়সে নিজের বৈষয়িক প্রয়োজনে এবং পিতা রামকান্তের সকাশে বর্ধমানে যাতায়াত করতেন ব'লে রঘুনাথের সঙ্গে তাঁর পরিচয় বা সাহচর্য অসম্ভব নাও হতে পারে।

তার পর কৃষ্ণনগর রাজদরবারের পৃষ্ঠপোষকতায় সঙ্গীত শিক্ষা করেন কৃষ্ণপ্রসাদ ও তাঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতা বিষ্ণুচন্দ্র চক্রবর্তী—দুজনেই কালী মীর্জা, রঘুনাথ ও রামশঙ্করের চেয়ে ৪০।৫০ বছরের বয়ঃকনিষ্ঠ, কিন্তু তাঁদের দুজনের সঙ্গেই ব্রাহ্মসমাজে রামমোহনের সহযোগিতার

কথা জানা যায়। তাঁরা নদীয়া রাজার সঙ্গীতসভায় সমাগত কলাবন্ত হসসু খাঁ, কাওয়াল গায়ক মিয়া মীরণ, (দিল্লীর চৌরীর গায়ক) দেলওয়ার খাঁ প্রভৃতি গুণীর অধীনে চক্রবর্তী ভ্রাতৃদ্বয়ের শিক্ষালাভ ঘটে। কৃষ্ণপ্রসাদের জন্ম আঠারো শতকের একেবারে শেষে এবং বিষ্ণুচন্দ্র জন্মগ্রহণ করেন উনিশ শতকের চতুর্থ বছরে (১৮০৪ খ্রীঃ)। তাঁরা দুজনেই রামমোহন প্রতিষ্ঠিত ব্রাহ্মসমাজের (১৮২৮ খ্রীঃ) রামমোহন নিযুক্ত প্রথম দুই গায়ক এবং বিষ্ণুচন্দ্র অর্ধ শতাব্দের ও অধিককাল একাদিক্রমে সমাজের গায়ক ছিলেন এবং ব্রাহ্মসমাজের সেবায় জীবন উৎসর্গ করেন বলা যায়। বিষ্ণুচন্দ্র প্রাচীনত কলাবন্তের গায়ক হলেও অন্যান্য রীতির গানও করতেন। রামমোহন রচিত কোন কোন ব্রহ্মসঙ্গীতের তিনি সুর সংযোজক এবং রবীন্দ্রনাথের প্রথম সঙ্গীত-গুরু।

এমনি ভাবে (আধুনিক) বাংলার আদিযুগের গায়করা রাগ সঙ্গীত চর্চা আরম্ভ করেছিলেন, পশ্চিমাঞ্চলে গমন ক'রে কিংবা বাংলায় পশ্চিমা গুণীদের সাময়িক অবস্থানের ফলে। পশ্চিমাঞ্চলের দরবারী সঙ্গীত বাংলা দেশেও আঞ্চলিক রাজসভাগুলির আশ্রয়ে ও প্রশ্রয়ে প্রথমে লালিত হয়। সাধারণের পক্ষে এই সঙ্গীত শিক্ষা করা দূরের কথা, সঙ্গীতাসরে শ্রোতারূপে যোগ দেওয়াও অসম্ভব ছিল। এর ব্যতিক্রম ছিল শুধু বিষ্ণুপুরে রামশঙ্কর ভট্টাচার্যের (যিনি আপন গৃহে প্রাচীনকালের গুরুগৃহের আদর্শে শিক্ষার্থীদের বিনামূল্যে সঙ্গীত শিক্ষা দিতেন এবং ক্ষেত্রমোহন গোস্বামীর মতন বহিরাগত শিষ্যদের বছরের পর বছর আশ্রয়দানও করতেন) এবং কলকাতায় নিধুবাবুর সঙ্গীতাসর, যেখানে কারও প্রবেশ নিষিদ্ধ ছিল না।

আলোচ্য যুগে, আঠারো শতকের একেবারে শেষ ও উনিশ শতকের সর্ব প্রথম ভাগে, বাংলার সঙ্গীতামোদী রাজসভার—যেখানে পশ্চিমী কলাবন্তদের পর্যাপ্ত দাক্ষিণ্য দানে আশ্রয় দেওয়া হ'ত—সংখ্যাও খুব বেশী ছিল না। যথা, বর্ধমান ও নদীয়ারাজ, মুর্শিদাবাদ ও ঢাকার নবাব, ত্রিপুরা ও কুচবিহার রাজ প্রভৃতির সঙ্গীতসভা। এইকালে বিষ্ণুপুর রাজ্যের লুপ্ত বৈভব। অবশ্য, সেজন্যে সেখানে নগদ দক্ষিণায় পশ্চিমের গুণীদের আশ্রয়দান সম্ভব হ'ত না। আঞ্চলিক রাজসভা ভিন্ন, অভিজাত ও নবোত্থিত কয়েকটি ধনীগৃহে সঙ্গীতের আসর বসত, তাদের সংখ্যাও মুষ্টিমেয়। রাজধানী কলকাতায় নির্দিষ্ট সংখ্যক এমনি কয়েকটি গৃহে সঙ্গীতাসর ছিল—শোভাবাজার রাজবাড়ী, পাথুরিয়াঘাটার গোপীমোহন ঠাকুরের বাড়ী, পাইকপাড়ার সিংহবাড়ী, জোড়াসাঁকো ও পোস্তার রাজবাড়ী ইত্যাদি। রামমোহনের মৃত্যুর (১৮৩৩ খ্রীঃ) পরবর্তীকালে এই ধরণের ধনী গৃহাশ্রয়ী সঙ্গীতসভার সংখ্যা অবশ্য বৃদ্ধি পেয়েছিল, কিন্তু সে পর্ব আমাদের বর্তমানে আলোচ্য নয়।

রামমোহনের প্রথম যৌবনের সময় বাংলাদেশে রাগসঙ্গীতচর্চা এমনি গণ্ডীবদ্ধ ছিল। তখনকার প্রচলিত সঙ্গীতরীতির বিষয়ে জানা গেল যে, বিষ্ণুপুরে রামশঙ্করের কল্যাণে ধ্রুপদের চর্চা আরম্ভ হয়েছে। বর্ধমানে রঘুনাথ রায় খেয়ালাঙ্গের গান শিক্ষা করেছেন এবং বাংলায় চার তুকের গান রচনা করছেন। কলকাতার টপ্পার আসরে নিধুবাবুর আবির্ভাব ঘটেছে। বাংলার আর এক আদি টপ্পা গায়ক কালী মীর্জা ১৭৮১-৮২ খ্রীষ্টাব্দে বাংলাদেশে ফিরে এসেছেন পশ্চিম থেকে সঙ্গীতশিক্ষা লাভ ক'রে—কিন্তু তার পর থেকে ২০-২৫ বছর পর্যন্ত সঙ্গীতজ্ঞরূপে তাঁর কর্মক্ষেত্রের কথা জানা যায় না।

এই প্রসঙ্গে কালী মীর্জা এবং নিধুবাবুর সঙ্গীতশিক্ষার পরবর্তী পর্ব বিশেষ ভাবে পর্যালোচনার প্রয়োজন আছে। কারণ তাঁরা ছিলেন প্রথম যুগের টপ্পা গায়ক ও বাংলা টপ্পা গান রচয়িতা।

নিধুবাবু বাংলাদেশে টপ্পা গানের প্রথম প্রচলনকর্তা, আদি টপ্পাগায়ক ও বাংলা টপ্পাগান রচয়িতা রূপে স্মরণীয় হয়ে আছেন। কিন্তু তিনি অপূর্ব প্রতিভাধর শিল্পী হলেও বাংলা দেশে টপ্পাগান বিষয়ে আদি পথিকৃৎ কিংবা বাংলা ভাষায় প্রথম টপ্পাগান রচয়িতা কি না তা সন তারিখের নিরিখে আজও সুপ্রমাণিত হয় নি।

নিধুবাবুর সমসাময়িক কালে তাঁর থেকে স্বতন্ত্র এক বা একাধিক টপ্পা গানের ধারা বাংলাদেশে বর্তমান ছিল। সে পর্বের সঙ্গীতচর্চার কালানুক্রমিক ইতিহাস না থাকায় সময় সম্বন্ধে সঠিক ভাবে জানা যায় না বটে, কিন্তু কিছু কিছু কাল চিহ্ন লক্ষ্য করা যায়। সেই সূত্র অনুসরণ ক'রে নিধুবাবু, কালী মীর্জা প্রভৃতির বাংলা দেশে টপ্পা চর্চার কালগত আলোচনা কিছু হতে পারে। বর্তমান নিবন্ধে তার প্রয়োজন আছে। কারণ, তাঁদের দুজনের সঙ্গেই প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে রামমোহনের সঙ্গীত জীবন বিজড়িত। তা ছাড়া রামমোহনের অব্যবহিত পূর্ববর্তী যুগের সাঙ্গীতিক বৃত্তান্তরূপেও এই প্রসঙ্গ প্রয়োজনীয়।

আগেই বলা হয়েছে, নিধুবাবু ১৭৯৪ খ্রীষ্টাব্দে কলকাতায় প্রত্যাবর্তন করবার পর থেকে বাংলাদেশে থেকে তাঁর সঙ্গীত জীবন গর্তব্য। কলকাতায় তাঁর টপ্পা গান প্রচলন, বাংলা টপ্পা গান রচনা সবই এই সময়

থেকে। তিনি ১৭৭৬ খ্রীষ্টাব্দে ছাপরা যাত্রা করবার আগে রীতিমত সঙ্গীতশিক্ষা করেন নি—"বাঙ্গালীর গান" সম্পাদক দুর্গাদাস লাহিড়ীর এই বিবৃতি আমরা সঠিক বিবেচনা করি। কারণ ১৭৭৬ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বে টপ্পা কিংবা অন্য কোন প্রকার রাগসঙ্গীত কলকাতায় পদ্ধতিগতভাবে শিক্ষা দেবার যোগ্য পশ্চিমা কোন কলাবতের অবস্থানের কথা জানা যায় না।

অটুট স্বাস্থ্যের অধিকারী নিধুবাবু ৯৭ বছর পর্যন্ত (জন্ম: ১৭৪১, মৃত্যু ১৮৩৮ খৃঃ) জীবিত ছিলেন। ৯৬ বছর বয়সে স্বরচিত গানের সংকলন-গ্রন্থ "গীতরত্ন" স্বয়ং ভূমিকা দিয়ে প্রকাশ করেছিলেন তাঁর গানের বিকৃতি, অনুকরণ ও অপহরণ রোধ করবার মানসে। তাঁর সঙ্গীত জীবন ৫৭ বছর বয়সে (১৭৯৮) কলকাতায় আরম্ভ হলেও দীর্ঘকাল যাবৎ সগৌরবে বর্তমান ছিল। সেই বয়সের পর তিনি অন্ততঃ ৩০ বছর গায়ক রূপে বিদ্যমান থেকে কলকাতার সঙ্গীতক্ষেত্রে বিপুল প্রভাব বিস্তার করে-ছিলেন। এমন কি আরও পরেও আসরে গান করা তাঁর পক্ষে অসম্ভব নয়। অন্তত তাঁর গান রচনা আরও পরবর্তীকাল পর্যন্ত চলেছিল, তার প্রমাণ আছে। রাম-মোহন প্রথম ব্রাহ্মসমাজ স্থাপন করবার সময় নিধুবাবুর বয়স ৮৮ বছর। তারপর নিধুবাবু ব্রাহ্মসমাজের অধিবেশনে মাঝে মাঝে যেতেন—গায়করূপে কিনা সঠিক জানা যায় না। সেই সময় একদিন সমাজগৃহে সমাজের উপাচার্য উৎসবানন্দ বিদ্যাবাগীশের অনুরোধে একটি ব্রহ্ম-সঙ্গীত ("পরমব্রহ্ম পরাৎপর পরমেশ্বর" ...) মুখে মুখে রচনা ক'রে দেন। তখন তাঁর বয়স ৮৮ বছরের আরও বেশীও হতে পারে, কারণ তা ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠার কত পরে, তা জানা যায় নি। সুতরাং বোঝা যায়, অধিক বয়সে কলকাতায় সঙ্গীতজীবন আরম্ভ করলেও অনেক বেশী বয়স পর্যন্ত বর্তমান থেকে সঙ্গীতক্ষেত্রে নিধুবাবু প্রভাব প্রতিপত্তি লাভে সমর্থ থাকেন এবং টপ্পা গানের আদি বাঙ্গালী সঙ্গীতাচার্য রূপে কীর্তিত হন।

এবার কালী মীর্জা মহাশয়ের সঙ্গীত জীবনের রূপরেখা অনুধাবন করা যাক। তিনি নিধুবাবুর চেয়ে ৮।৯ বছরের বয়ঃকনিষ্ঠ এবং তৎকালীন বাংলাদেশের এক বিশিষ্ট বিদ্যা ও শাস্ত্রচর্চার কেন্দ্র গুপ্তিপাড়ায় "পলাশী যুদ্ধের সাত আট বৎসর পূর্বে" (অর্থাৎ আনুমানিক ১৭৪৯।৫০ খ্রীষ্টাব্দে) তাঁর জন্ম হয়। তাঁর প্রকৃত নাম কালীদাস চট্টোপাধ্যায় (মতান্তরে মুখোপাধ্যায়)। তিনি বাল্যকাল থেকে বিশেষ মেধাবী ও সঙ্গীতপ্রিয় ছিলেন। এবং অল্প বয়সে সংস্কৃত সাহিত্যে ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। তিনি ছিলেন মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সভা-পণ্ডিত বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কারের শিষ্য। ১৭৭০।৭১ খ্রীষ্টাব্দে কালিদাস বারাণসী যাত্রা করেন সঙ্গীত ও বেদান্ত বিশেষ ভাবে শিক্ষা করবার জন্যে। তার পর সেখান থেকে দিল্লী ও লক্ষ্ণৌতে অবস্থান করে সঙ্গীত ও পারসী ভাষা উত্তমরূপে শিক্ষা করেন। পশ্চিমাঞ্চলে বছর দশেক এই ভাবে বাস ক'রে সঙ্গীত, বেদান্ত ও পারসীতে ব্যুৎপন্ন হয়ে তিনি ১৭৮০-৮১ খ্রীষ্টাব্দে গুপ্তিপাড়ায় ফিরে আসেন ও বিবাহ করেন।

তাঁর জীবনীতে আছে যে, তিনি গায়করূপে প্রথমে নিযুক্ত হন বর্ধমানের রাজকুমার প্রতাপচাঁদের (তেজচাঁদ-পুত্র) সভায় এবং সেখানে বেতন আশানুরূপ না হওয়ায় কলকাতায় গোপীমোহন ঠাকুরের সঙ্গীতসভায় যোগদান করেন। তারপর গোপীমোহনের মৃত্যুর (১৮১৮ খৃঃ) কিছু পূর্বে তাঁরই সাহায্যে কাশীবাস আরম্ভ করেন এবং আনুমানিক ১৮২০ খ্রীষ্টাব্দে কাশীপ্রাপ্ত হন।

তিনি কলকাতায় গোপীমোহনের আশ্রয়ে বাস করবার সময়ে কলকাতার সম্ভ্রান্ত সমাজে শুধু সঙ্গীতাচার্য-রূপে নয়, সুপণ্ডিত, শিষ্টাচারসম্পন্ন ব্যক্তি এবং উৎকৃষ্ট গান-রচনাকার রূপে সুপরিচিত এবং শ্রদ্ধা ও সম্মানের পাত্র ছিলেন। তাঁর গৌরবর্ণ ও দীর্ঘকায় দেহসৌষ্ঠব, পরিচ্ছন্ন শোভন বেশভূষা ও মার্জিতরুচি আচার-ব্যবহার, গুণগ্রাহী ও সুরসিক স্বভাব এবং সঙ্গীত-প্রতিভা ও মধুর ব্যক্তিত্ব তাঁকে কলকাতার অভিজাত ও সংস্কৃতিবান্ সমাজে বিশেষ প্রীতির আসনে প্রতিষ্ঠিত করেছিল। তাঁর এমন মনোজ্ঞ চরিত্র ছিল যে, প্রতাপচাঁদের কর্ম ত্যাগ ক'রে গোপীমোহনের দরবারে যোগ দেবার পরেও প্রতাপচাঁদ কালী মীর্জাকে নিয়মিত মাসিক বৃত্তি পাঠাতেন নিজের নিরুদ্দেশ বা 'মৃত্যু'র পূর্ব পর্যন্ত এবং তাঁদের মধ্যে সদ্ভাবও বরাবর বজায় ছিল। তাঁর পারসী ভাষায় প্রগাঢ় জ্ঞান এবং পশ্চিমী পোশাক-পরিচ্ছদ ও আদব-কায়দার জন্যে তিনি 'মীর্জা' ব'লে পরিচিত হন (পারসীতে সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিকে মীর্জা বলা হয়)। তিনি স্বগ্রামে নিষ্ঠাবান্ ব্রাহ্মণের করণীয় পূজা-পার্বণের অনুষ্ঠান সেখানে গিয়ে বিধিপূর্বক করতেন এবং মৃত্যুর জন্যে প্রস্তুত হয়ে কাশীবাসও করেছিলেন শেষ বয়সে। সঙ্গীতজ্ঞরূপে তাঁর প্রধান পরিচয় হ'ল টপ্পাগায়ক ও বাংলায় উৎকৃষ্ট টপ্পাগান রচয়িতারূপে। তাঁর রচিত টপ্পা নিধুবাবুর তুল্য উৎকর্ষতা লাভ না করলেও সেকালের হিসাবে যে বিশেষ প্রশংসার যোগ্য তা কালী মীর্জা রচিত "চাহিয়ে চাঁদের পানে তোরে হয় মনে" (মোহিনী, আড়াঠেকা), "এমন

নয়নবাণ কে তোমায় করেছে দান" (সিন্ধু ভৈরবী, আড়া), "মিলন হইয়ে না হলো মিলন" (কালাংড়া মধ্যমান) ইত্যাদি গানগুলি থেকে ধারণা করা যায়। কৃষ্ণানন্দ ব্যাসদেব সংকলিত বিখ্যাত "সঙ্গীত রাগ কল্পদ্রুম" গ্রন্থে কালী মীর্জার ২৩৭টি গান সংগৃহীত হয়েছে। কালী মীর্জার রচিত মালসী গান নিধুবাবুর চেয়ে উৎকৃষ্টতর, এমন প্রসিদ্ধি আছে।

এখন পূর্বোক্ত সমস্যাটির কথা সংক্ষেপে আলোচনা করা যাক। নিধুবাবু বাংলার প্রথম টপ্পাগায়ক বা টপ্পার গানের প্রচলনকর্তা ও বাংলায় আদি টপ্পাগানের রচয়িতা কি না এবং এ বিষয়ে কালী মীর্জার অগ্রাধিকার থাকা সম্ভব কি না।

কালী মীর্জার জীবনকথা নিধুবাবুর তুলনায় বিশেষভাবে অসম্পূর্ণ নহে, এ বিষয়ে চূড়ান্ত নিষ্পত্তি সহজেই হয়ে গেল। কালী মীর্জার জীবনী থেকে জানা যায়, তিনি ১৭৭০-১৭৮০ খ্রীষ্টাব্দে পশ্চিম থেকে সঙ্গীত শিক্ষা ক'রে ফেরেন এবং প্রথমে বর্ধমানের কুমার প্রতাপচাঁদের সঙ্গীতসভায় ও পরে গোপীমোহন ঠাকুরের সভাগায়ক নিযুক্ত হন। (উক্ত প্রতাপচাঁদই "জাল প্রতাপচাঁদ" কিনা এই নিয়ে প্রসিদ্ধ মামলা সেকালে প্রচণ্ড আলোচন তুলেছিল।)

কিন্তু ১৭৮২ খ্রীষ্টাব্দ এবং কুমার প্রতাপচাঁদের সভাগায়ক নিযুক্ত হওয়ার মধ্যে প্রায় সুদীর্ঘ ১৪ বৎসরের ব্যবধান। কারণ প্রতাপচাঁদের জন্ম হয় ১৭৯০ খ্রীষ্টাব্দে এবং তাঁর সঙ্গীতসভা আরম্ভ হয় তাঁর ১৪।১৬ বৎসর বয়সের আগে তো নয়, অর্থাৎ অন্ততঃ ১৮০৫ খ্রীষ্টাব্দে। সুতরাং এই ১৭৮১-১৭৮২ খ্রীঃ থেকে ১৮০৪ খ্রীঃ পর্যন্ত ছিদ্রপথটি কি ক'রে যোজনা করা হবে? কালী মীর্জা ৩০।৩২ বৎসর বয়সকালে সঙ্গীত শিক্ষান্তে ফিরে এসে ৪৪ বৎসর বয়স পর্যন্ত গান না ক'রে কিংবা গান রচনা না ক'রে কিংবা কোন সঙ্গীতাসরে গায়ক নিযুক্ত না থেকে কালাতিপাত করেছেন? তা সম্ভব নয়। কারণ, গায়কের পক্ষে এই সময়টি শ্রেষ্ঠ। এই দীর্ঘকাল সঙ্গীতচর্চার ছেদ পড়লে তিনি পরিণত বয়সে প্রতাপচাঁদের দরবারে কিংবা প্রায় বৃদ্ধ বয়সে গোপীমোহনের আসরে বেতনভুক্ত গায়করূপে অবস্থান করবার যোগ্য থাকতেন না। কালী মীর্জা সঙ্গীত ব্যবসায়ী ছিলেন এবং সঙ্গীতকেই জীবনের বৃত্তি-স্বরূপ অবলম্বন করেছিলেন। এ বিষয়ে নিরপেক্ষ ভাবে চিন্তা ক'রে দেখলে মনে হয়—তিনি ১৭৮২ খ্রীষ্টাব্দের অব্যবহিত পরবর্তী কাল থেকেই কণ্ঠসঙ্গীত শিল্পীরূপে কোন না কোন সঙ্গীতসভায় নিযুক্ত হয়েছিলেন। কিন্তু তার কোন বিবরণ আমরা জানি না এবং যেহেতু তিনি টপ্পা গানের গায়করূপে প্রসিদ্ধ, তাই এই সময়ে, অর্থাৎ নিধুবাবুর কলকাতা প্রত্যাবর্তনের (১৭৯৪ খ্রীঃ) অনেক আগে থেকেই বাংলায় টপ্পাগায়করূপে কালী মীর্জার অবস্থান খুবই সম্ভব মনে হয়—যদিও তার কোন লিখিত প্রমাণ নেই। নিধুবাবু যখন কলকাতায় ফিরে আসেন, তখন কালী মীর্জার বয়স ৪৪ বৎসর। এত বয়স পর্যন্ত তিনি বাংলা টপ্পা রচনা করেন নি, এ কথাও বিশ্বাসযোগ্য নয়। তাঁর ২৩৭টি গান যখন তাঁর মৃত্যুর ১০ বৎসর পরে সংগৃহীত হয়, তখন তিনি নিশ্চয় আরও অধিক সংখ্যক গান রচনা করেছিলেন। এত গান তিনি রচনা করেন এবং ৩০।৩২ বৎসর বয়স থেকে বাংলাদেশে তাঁর সঙ্গীতজ্ঞের বৃত্তি আরম্ভ, তিনি ৪৪ বৎসর বয়স পর্যন্ত কোন গান রচনা করেন নি তা'ও কি হতে পারে?

সুতরাং নিধুবাবুর আদি টপ্পাগায়ক ও টপ্পাগান রচয়িতারূপে কীর্তিত হওয়া সম্পূর্ণ সঠিক কি না সেকথা নতুন ক'রে বিবেচনা করা প্রয়োজন।

নিধুবাবুর সমকালে বাংলাদেশে অন্যত্র অন্য ধারার টপ্পাগান প্রচলিত ছিল ব'লে বর্তমান নিবন্ধে যে মন্তব্য করা হয়েছে, সে বিষয়ে অন্য তথ্যও বিবেচ্য। বর্ধমান-রাজ তেজচাঁদের সভাপণ্ডিত ও মন্ত্রগুরু, স্বনামধন্য কালীসাধক কমলাকান্ত ভট্টাচার্য (জন্ম ১৭৭০ অথবা ১৭৭২ খ্রীঃ) অতি উচ্চশ্রেণীর শ্যামাসঙ্গীত রচয়িতারূপে স্মরণীয় হয়ে আছেন। তাঁর রচিত ও সুর সংযোজিত শ্যামাসঙ্গীত তিনি স্বয়ং টপ্পা রীতিতে গান করতেন (এবং সেই ঐতিহ্য আজও লুপ্ত হয় নি)। জানা যায়, তিনি প্রথম জীবনে তাঁর আত্মীয় জনৈক সর্বদাস মুখোপাধ্যায়ের কাছে সঙ্গীতচর্চা করতেন। সুতরাং কমলাকান্ত টপ্পা-রীতি সর্বদাস মুখোপাধ্যায়ের কাছে লাভ করেছিলেন, এমন অনুমান করলে অসঙ্গত হবে না। সর্বদাস টপ্পা-গানের রীতি কোথায় পেলেন? নিশ্চয় সুদূর কলকাতায় নিধুবাবুর কাছে নয়! সময়ের দিক থেকেও সর্বদাস-কমলাকান্তের এই টপ্পার ধারাটি নিধুবাবুর (অর্থাৎ ১৭৯৪ খ্রীষ্টাব্দের) পূর্ববর্তী হবার বিশেষ সম্ভাবনা। এখন প্রশ্ন: বর্ধমান জেলার এই দূর গ্রামাঞ্চলে সর্বদাস-কমলাকান্তের এই টপ্পা-রীতির ধারক কে? কালী মীর্জা কিংবা ওই অঞ্চলের বর্ধমান দরবার বা অন্য কোন সঙ্গীতাচার্য হতে পারেন। সে বিষয়ে নিশ্চিতভাবে জানা না গেলেও নিধুবাবুর সম্পূর্ণ প্রভাবমুক্ত এবং স্বতন্ত্র একটি টপ্পার ধারা বর্ধমান অঞ্চলে ছিল, এমন সিদ্ধান্ত করা যায়।

রামমোহনের সঙ্গীত-জীবনের পূর্ববর্তী বাংলার সঙ্গীত ক্ষেত্রের এই হ'ল সংক্ষিপ্ত পরিচয়।

এখন রামমোহনের সঙ্গীতপ্রসঙ্গ।

(১) রামমোহনের সঙ্গীতশিক্ষা বা সঙ্গীতচর্চা:

রামমোহন যে কতবিদ্য কলাবতের অধীনে সঙ্গীত-শিক্ষা করেছিলেন—এ এক অভিনব তথ্য এবং অনেকের কাছে অবাস্তব মনে হতে পারে। কিন্তু একথার বিশ্বাস-যোগ্য নজির আছে যে, উল্লিখিত সঙ্গীতাচার্য কালী মীর্জা ছিলেন তাঁর সঙ্গীতগুরু।

অবশ্য এই সঙ্গীতশিক্ষা তিনি রীতিমত কণ্ঠসাধনা ক'রে গায়ক হবার জন্যে করেন নি। ক্রিয়াসিদ্ধ সঙ্গীতজ্ঞ হওয়া তাঁর লক্ষ্য ছিল না, মনে হয়। তাঁর সঙ্গীতশিক্ষার অর্থ—রাগবিদ্যার সবিশেষ পরিচয় সাধন, বিভিন্ন রাগের সুরবিন্যাস ও রাগের রূপবন্ধের বিষয়ে ধারণা লাভ। অবশ্য সঙ্গীতরসিক হওয়ায়, সঙ্গীতের শুধু তত্ত্বগত ও ভাবের দিক্ নয়, তার প্রয়োগ বিষয়েও তাঁর জ্ঞান ছিল—তাঁর তুল্য প্রতিভাধর ও সঙ্গীতপ্রেমী ব্যক্তির পক্ষে যতদূর সম্ভব। তাঁর গান রচনার মূলেও সঙ্গীতের এই জ্ঞান ও প্রেরণা কাজ করেছিল। রাগবিদ্যায় অভিজ্ঞতা ও সুরজ্ঞান না থাকলে তিনি বিভিন্ন রাগ তালে গঠিত গান সে যুগে রচনা করতে পারতেন না। তখনকার কালে গান রচনাকার ও সুরকার অনেক সময়েই হতেন অভিন্ন। রামমোহনের ক্ষেত্রেও তাই ঘটেছিল ব'লে আমাদের ধারণা এবং তাঁর এই রাগবিদ্যার অধ্যাপক ছিলেন সঙ্গীতাচার্য কালী মীর্জা।

মীর্জা মহাশয়ের একমাত্র জীবনী-পুস্তিকা "গীতি-লহরী"র লেখক বলেছেন, "মহাত্মা রামমোহন রায় কলিকাতায় অবস্থিতি কালে মধ্যে মধ্যে মীর্জা মহাশয়ের নিকট সঙ্গীত শিক্ষা করিতে যাইতেন।" কালী মীর্জার কাছে রামমোহনের সঙ্গীত শিক্ষা সম্পর্কে আর কোন বিস্তারিত বিবরণ এ পুস্তকে বা অন্য কোথাও পাওয়া যায় না। কিন্তু উদ্ধৃত বিবৃতিটি সংক্ষিপ্ত হলেও সবিশেষ মূল্যবান্।

সাধারণ গায়কের মতন সঙ্গীতশিক্ষা রামমোহন গ্রহণ করেন নি, একথা মনে করেই বর্তমান অধ্যায়ের নামকরণে 'সঙ্গীতচর্চা' কথাটি রাখা হয়েছে। বিপুল ও জটিল অথচ গভীর ও সূক্ষ্ম আবেদনে পূর্ণ রাগসঙ্গীতের প্রকৃতি, বিভিন্ন রাগের গঠন ও রূপ, সুরের বিচিত্র লীলারহস্য ইত্যাদি সম্পর্কে রামমোহন সম্ভবত মীর্জা মহাশয়ের উপদেশ নিতেন। মীর্জার কণ্ঠে গানও অবশ্যই শুনতেন। রামমোহনের মতন শিক্ষিত, সংস্কৃতিবান ও শিল্পকলানুরাগী ব্যক্তি সঙ্গীতের অন্তর্নিহিত সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে সে বিষয়ে সবিশেষ জ্ঞান লাভের জন্যে উৎসুক হন ও সেকালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সঙ্গীতাচার্যের শিষ্য ছিলেন, তাঁর শিক্ষা বা চর্চার এই তাৎপর্য মনে হয়।

রামমোহন কালী মীর্জার কাছে সঙ্গীত-শিক্ষার্থী ছিলেন কোন্ সময়ে? উদ্ধৃতিতে দেখা যায়, "কলিকাতায় অবস্থিতি কালে।" রামমোহনের ১৮১৪ খ্রীষ্টাব্দের শেষ ভাগ থেকে স্থায়ীভাবে কলকাতায় অবস্থানের কথা জানা যায়। সেই বৎসর চৌরঙ্গী ও মাণিকতলায় দুটি বাড়ী ক্রয় ক'রে শেষেরটিতে (১১৩, আপার সার্কুলার রোড) বাস আরম্ভ করেন এবং অর্থোপার্জন থেকে অবসর গ্রহণ ক'রে তাঁর সমস্ত অর্থ, সামর্থ্য, বিদ্যাবুদ্ধি ও প্রভাব প্রতিপত্তি নিয়োজিত করেন তাঁর জীবনের মহান্ ব্রত উদ্‌যাপনে—সামাজিক ও ধর্মসংক্রান্ত আন্দোলনে, ইংরেজী-শিক্ষা বিস্তার ও পৌত্তলিকতা-বিরোধী কার্যা-বলীতে। সেই সনে রামমোহনের বয়স ৪০ বৎসর।

তার এক বছর পরে তিনি মাণিকতলার বাড়ীতে "আত্মীয় সভা"র প্রতিষ্ঠা করেন এবং সেই সভার অধিবেশনে সঙ্গীত অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা হয়। সেখানে গান করতেন গোবিন্দ মালা নামে একজন গায়ক।

এত বেশী বয়সে তিনি কি অকস্মাৎ সঙ্গীতের প্রতি অনুরক্ত হন? তার পূর্বে কোন সঙ্গীতাচার্যের কাছে তাঁর সঙ্গীতচর্চার কোন সংবাদ অবশ্য পাওয়া যায় না। কিন্তু তবু তেমন একটি সম্ভাবনা আছে মনে হয়। কারণ, কালী মীর্জা ও তাঁর সম্পর্কে এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য কালী মীর্জার জীবনীতে আছে, যা সত্য হলে, রামমোহন মীর্জা মহাশয়ের সঙ্গে ১৮১৪ খ্রীষ্টাব্দের অনেক আগে (অন্তত ১২।১৪ বছর) থেকে পরিচিত ছিলেন বুঝতে হবে এবং সেক্ষেত্রে রামমোহন কালী মীর্জার কাছে সেই সময় থেকেই সঙ্গীত বিষয়ে জ্ঞানলাভ করেন।

উক্ত জীবনীর সেই বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য সংবাদটি হ'ল: "মীর্জা মহাশয়ের সমীপে সঙ্গীতশিক্ষা সময় মহাত্মা রামমোহন রায়ের হৃদয়ে অদ্বৈতবাদের বীজ প্রথম রোপিত হয়। কালক্রমে তাঁহার উর্বর ক্ষেত্রে এই বীজ অঙ্কুরিত হইয়া বহু শাখা-প্রশাখা প্রসারণ পূর্বক বিশাল পাদপে পরিণত হইয়াছিল।"

কালী মীর্জা রামমোহনের মনে প্রথম অদ্বৈতবাদের প্রেরণা দেন—এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সন্দেহ নেই, এবং যথার্থ হলে রামমোহনের অন্তর্জীবনের একটি অনাবিষ্কৃত সত্য উদ্‌ঘাটিত হয়। রামমোহন জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হ'ল তাঁর ধর্মমতের পরিবর্তন বা

বিবর্তন। প্রচলিত হিন্দুধর্মের বিরুদ্ধে আন্দোলনে অবতীর্ণ হওয়া তাঁর জীবনের সবপ্রধান ঘটনা, তাঁর সমস্ত কার্যধারা এই ঘটনাকেই কেন্দ্র ক'রে অনুষ্ঠিত হয়েছে। তাঁর সেই পৌত্তলিকতা-বিরোধী মনোভাব, প্রচলিত হিন্দুধর্মের বিরুদ্ধে আদর্শগত সংগ্রামের মূল যে অদ্বৈতবাদের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল—তাঁর ধর্মজীবনের সেই অন্তর্বিপ্লব কেমন ক'রে ঘটে এবং কারও ব্যক্তিগত প্রভাবে ঘটেছিল কি না, অর্থাৎ ধর্মমতের বিকাশের যথার্থ ইতিহাস কিংবা বিবরণ আজও অপ্রকাশিত। উদ্ধৃত অংশটিতে এ বিষয়ে নির্দিষ্টভাবে কালী মীর্জার সাক্ষাৎ প্রভাবের কথা বলা হয়েছে। উক্ত গ্রন্থকার অমৃতলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, কোন প্রসিদ্ধ ব্যক্তি না হলেও তাঁর বিবরণীর বিবৃতি সরাসরি অগ্রাহ্য না ক'রে সুধী পাঠকবৃন্দের বিচার-বিবেচনার জন্যে উপস্থাপিত করা হ'ল। সুযোগ্য গবেষকবৃন্দ এ বিষয়ে অনুসন্ধান ও চিন্তা করবেন, এ আশাও করা যায়।

কালী মীর্জার বেদান্ত বিষয়ে প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য, উচ্চভাব ও কবিত্বপূর্ণ গীতরচনা (টপ্পা ভিন্ন নানা প্রকার সঙ্গীতে আধ্যাত্মিক বিষয়ের গান রচনাকার রূপেও তিনি প্রসিদ্ধ), কলকাতার বিদগ্ধ সমাজে তাঁর ব্যক্তিত্বের প্রভাব, রামমোহনের তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা পোষণ (রামমোহন অপেক্ষা তিনি ২২ বছরের বয়োজ্যেষ্ঠ) ও তাঁর শিক্ষাধীনে সঙ্গীতের উপদেশ গ্রহণ—ইত্যাদি এ প্রসঙ্গে বিবেচনার যোগ্য।

এই সংবাদ সত্য হলে, রামমোহনের একেশ্বরবাদ বিষয়ে আরবী ফার্সীতে লিখিত পুস্তক 'তুহ্ফাৎ-উল্-মুয়াহ্হিদীন' প্রকাশের (১৮০৩-৪ খ্রীঃ) পূর্বেই তিনি কালী মীর্জার সংস্পর্শে আসেন। রামমোহনের কলকাতাবাস বলতে সাধারণত ১৮১৪ থেকে ১৮৩০ খ্রীঃ পর্যন্ত বোঝায়। কিন্তু ১৮০১-২ খ্রীষ্টাব্দেও তিনি অনেক সময় কলকাতায় অবস্থান করেন, যখন ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ, জন ডিগবীর সঙ্গে আলাপ-পরিচয় ইত্যাদি কলকাতায় ঘটে। সে সময় কালী মীর্জার অবস্থান কলকাতায় হলে তাঁদের পরস্পর সাক্ষাৎ সম্পর্ক সেখানে হ'তে পারে।

যাই হোক, সঙ্গীত বিষয়ে শিক্ষার্থী হয়ে রামমোহন কালী মীর্জার সান্নিধ্য কতকাল লাভ করেন, কিংবা কি ধরণের সঙ্গীত (ধ্রুপদ বা টপ্পা) চর্চা মীর্জার আসরে হ'ত সে সম্বন্ধে মীর্জার উক্ত জীবনী থেকে কিছু জানা যায় না।

কালী মীর্জা ভিন্ন অন্য এক কলাবতের কাছেও রামমোহন সঙ্গীত বিষয়ে উপকৃত হয়েছিলেন, "তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা"র একটি নিবন্ধে এমন কথা প্রকাশিত হয়েছিল। রহিম খাঁ নামে এক খ্যাতনামা গায়ককে রামমোহন নিযুক্ত করেছিলেন তাঁকে গান শোনাবার জন্যে। তবে রহিম খাঁর সঙ্গ রামমোহন বেশীদিন লাভ করেন নি। তাঁর গৃহে নিযুক্ত হবার ৩।৪ মাস পরে রহিম খাঁর মৃত্যু হয়। রহিম খাঁকে রামমোহন পেয়েছিলেন পরিণত বয়সে এবং কলকাতায়। আদি ব্রাহ্মসমাজের প্রথম গায়ক ও সমাজ প্রতিষ্ঠায় রামমোহনের অন্যতম সহযোগী বিষ্ণুচন্দ্র চক্রবর্তীকেও রহিম খাঁ কিছুকাল সঙ্গীতশিক্ষা দিয়েছিলেন।

এই পর্যন্ত রামমোহনের সঙ্গীতশিক্ষার প্রসঙ্গ। অতঃপর কলকাতায় তথা বাংলা দেশে রাগসঙ্গীত প্রচলনে রামমোহনের অবদানের বিষয় আলোচনা করা হবে।

গ্রন্থপঞ্জী:

১। গীতিলহরী অর্থাৎ কালিদাস মুখোপাধ্যায় (মীর্জা) মহাশয়ের গীতাবলী—অমৃতলাল বন্দ্যোপাধ্যায়।
২। গীতরত্ন—রামনিধি গুপ্ত।
৩। Friend of India. April 11, 1839 A.D.
৪। বঙ্গভাষার লেখক—হরিমোহন মুখোপাধ্যায়।
৫। বাঙ্গালীর গান—দুর্গাদাস লাহিড়ী সম্পাদিত।
৬। রামনিধি গুপ্ত—সুশীলকুমার দে।
৭। সাধক কমলাকান্ত—অতুলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।
৮। ঈশ্বর গুপ্ত রচিত কবিজীবনী—ভবতোষ দত্ত।
৯। সঙ্গীতরাগকল্পদ্রুম, ৩য় খণ্ড—কৃষ্ণানন্দ ব্যাস, রাগসাগর।
১০। মহাত্মা রামমোহন রায়ের জীবনচরিত—নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়।
১১। Indian Chiefs, Rajas & Zaminders, Part II.—Lokenath Ghosh.
১২। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা।

রঙ্গমল্লী

শ্রীশান্তা দেবী

১৫

অফিসে যাইতে তাহার পরের দিন পূর্ণিমার ভয়ই করিতে লাগিল। হিরণ্ময় সত্যই যদি বিরক্ত হইয়া থাকেন, তাহা হইলে কি করিবে সে? তিনি স্বভাবতঃ রাশভারী গম্ভীর মানুষ, কিন্তু পূর্ণিমার সঙ্গে কথা বলিবার সময় সর্বদা হাসিমুখে কথা বলেন। চোখের দৃষ্টিও খুব প্রসন্ন থাকে। এইগুলিই সম্বল করিয়া পূর্ণিমার দিন কাটে, তাহার অন্তরের ক্ষুধা কিছুই মেটে না, কিন্তু একেবারে অনশনে মৃত্যু হয় না।

সেই হাসি যদি আর না থাকে, চাহনির সে প্রসন্নতাও যদি চলিয়া যায়? পূর্ণিমা কি করিবে তখন? কোন অশুভক্ষণে সে দীপকের কথা হিরণ্ময়ের কাছে বলিতে গিয়াছিল? তিনি হয়ত ধরিয়া লইয়াছেন যে, অতঃপর সময়ে-অসময়ে এই সব বন্ধুবান্ধবের কথা বলিয়া সে তাঁহাকে বিরক্ত করিবে। না, না, এ জীবনে আর পূর্ণিমা কাহারও জন্য হিরণ্ময়কে কোন অনুরোধ করিবে না। কিন্তু তাহা জানান যায় তাঁহাকে কি ভাবে?

অফিসে গিয়া প্রথমেই কিছু পরিবর্তন সে বুঝিতে পারিল না। কাজ বেশী ছিল অন্য দিনের চেয়ে, তাহাতেই ডুবিয়া থাকিতে হইল তাহাকে, ব্যক্তিগত কোনো কথা সেদিন হইলই না হিরণ্ময়ের সঙ্গে। পাঁচটা বাজিবার কিছু আগেই তিনি বাহির হইয়া গেলেন কোনো একটা কাজে, এবং পূর্ণিমা অফিস ত্যাগ করিবার সময় পর্য্যন্ত ফিরিলেনই না।

পূর্ণিমা একদিক্ দিয়া বাঁচিয়া গেল, মুখের কথায় বা দৃষ্টিতে কোনো তিরস্কার তাহাকে সহ্য করিতে হইল না, কিন্তু দিন কাটাইবার পাথেয়ও ত কিছু সে সংগ্রহ করিতে পারিল না?

বাড়ী ফিরিয়া গিয়া অনেকক্ষণ অন্যমনে সে বাড়ীতেই বসিয়া রহিল, আজ মাকে দেখিতে যাইবার দিন তাহার নয়। সুতরাং লেকের ধারে গিয়া খানিকটা বেড়াইয়া আসা যায়। দীপক আসিয়া জুটিবে, ইহা প্রায় নিশ্চিত করিয়াই বলা যায়। তা জুটুক, সময়টা ত তবু কিছুটা কাটিয়া যাইবে?

লেকে পৌঁছিবার অল্পক্ষণ পরেই দীপক দেখা দিল। চেহারাটা অন্য দিনের মত ততটা ম্লান নয়, মুখে-চোখে সামান্য একটু আশার দীপ্তি দেখা দিয়াছে। বসিয়াই বলিল, "কাল অর্দ্ধেক রাত ত কেটে গেল মায়ের সঙ্গে ঝগড়া আর তকরার ক'রে।"

পূর্ণিমা বলিল, "ঝগড়া আবার কি নিয়ে?"

"এই তোমার সেই চাকরি, আর বিদেশ যাওয়া। মা ত প্রথমে শুনতেই চান না এ প্রস্তাব। এত বড় যুবতী মেয়ে নিয়ে তিনি কি ক'রে একলা থাকবেন? অসুখ-বিসুখ হ'লে কে দেখবে? হঠাৎ কোন প্রয়োজন হ'লে, কে সাহায্য করবে? সকলের অদৃষ্টে ত Fairy God-mother বা God father জোটে না? এই সব আর কি?"

পূর্ণিমা একটুখানি বাঁকাল সুরেই বলিল, "এই একটা ব্যাপারে তোমার আমার ওপরে খুব হিংসে আছে দেখছি।"

"তোমার উপর হিংসে কিছু নয়, তুমি যা পেয়েছ deserveই কর, তবে নিজের মন্দ ভাগ্যের উপর অভিমানও নেই, তা বলব না।"

পূর্ণিমা বলিল, "তা ঝগড়াঝাঁটি ক'রে কি সিদ্ধান্ত হ'ল শেষ পর্য্যন্ত? যাবে, না যাবে না?"

দীপক বলিল, "যাব না ত, না খেয়ে মরব নাকি? টুইশানি সব সময় পাওয়া যায় না ত? আর ইউনি-ভার্সিটির ত নিত্য নূতন বাহানা। এখন স্কুলের যে সব ছাত্র-ছাত্রীরা Higher Secondary-র course পড়বেন, তাঁদের সব বিষয়ে পড়াতে হ'লে একসঙ্গে এম-এ, ও এম-এস-সি হওয়া দরকার। আমরা অত subject পড়িই নি ত পড়াব কি? একটা ছেলের জন্যে ত সাধারণ লোকে পঞ্চাশ গণ্ডা মাষ্টার রাখতে চায় না? একজনকে দিয়েই সারতে চায়। আমার সবচেয়ে শাঁসাল কাজ যেটা ছিল, সেটা ত এই কারণেই এই মাস থেকে চ'লে গেল।"

পূর্ণিমা বলিল, "তবে যাচ্ছই?"

"হ্যাঁ। কাল যাব অফিসে, মজুমদার সাহেবের সঙ্গে দেখা করতে।"

আমার বিবাহ হইতেছে হঠাৎ শুনিলাম, অবৈধ সম্পর্ক হইবে বা হইয়াছে, এ ইঙ্গিতও কানে আসিল। হিরণ্ময়ও বোধ হয় এইসব কথাই সারাক্ষণ শুনিতেছেন। পিসীমা সেকেলে মানুষ। প্রাপ্তবয়স্ক ভদ্রলোক, সংসারে সুপ্রতিষ্ঠিত, অথচ বিবাহ করেন নাই, ইহা ভাবিতে পারেন নাই, তাই এই ব্যবস্থা করিতেছিলেন। কিন্তু হিরণ্ময় তাহাকে ভালবাসেন, এ কথা পিসীমা কাহার কাছে শুনিলেন?

বর্ষাকাল আগতপ্রায়, প্রায়ই বৃষ্টি নামিবে অফিস যাইবার সময়, অফিস হইতে ফিরিবার সময়। একটা waterproof কেনা যায় কি না পূর্ণিমা তাহা মনে মনে হিসাব করিতে লাগিল। ক্লান্ত ছিল, না খাইয়াই ঘুমাইয়া পড়িল। হঠাৎ মুখে একটা কোমল স্পর্শ অনুভব করিয়া জাগিয়া উঠিল। সরমা তাহার মুখে হাত বুলাইতেছে, জিজ্ঞাসা করিল, "দিদি, তোমার অসুখ করেনি ত কিছু? না খেয়ে ঘুমিয়ে গিয়েছ কেন?"

মা হাসপাতাল যাইবার পর হইতেই সরমার বড় ভয়, কাহারও অসুখ-বিসুখকে। ছেলেমানুষ, কাহাকেও অবলম্বন করিয়া থাকিতে চায়, এখন মায়ের জায়গায় পূর্ণিমাই হইয়াছে তাহার আশ্রয়স্থল। বোনকে সান্ত্বনা দিয়া বলিল, "না রে না, অসুখ কিছুই হয় নি, tired ছিলাম, ঘুমিয়ে পড়েছি।"

এই সব স্নেহ ভালবাসার কোন মূল্য মানুষ দেয় না কেন? যাহা অজানা অচেনার কাছ হইতে আসে, তাহারই জন্য হৃদয় কেন কাঁদিয়া মরে?

দীপক আজ দেখা করিতে যাইবে অফিসে। তাহার বিবরণ শুনিয়া হিরণ্ময়ের বিশেষ পছন্দ হয় নাই, চেহারা দেখিয়া ও কথাবার্তা শুনিয়া আবার তাঁহার কি ধারণা হইবে কে জানে? বিশেষ রকম অপছন্দ হইলে পূর্ণিমার সম্বন্ধেও তাঁহার ধারণা খারাপ হইয়া যাইবে। এমন মানুষকে এ অফিসে ঢুকাইবার প্রস্তাব সে করিল কেন?

সকালের দিকে কাজ খানিকটা হইতে না হইতেই বিকাশবাবু আসিয়া খবর দিলেন যে, interview-এর জন্য দুজন লোক আসিয়াছে। হিরণ্ময় বলিলেন, "পাঁচ মিনিট পরে একজনকে পাঠিয়ে দেবেন।"

পূর্ণিমা চিঠির dictation লইয়া যথাসম্ভব তাড়াতাড়ি নিজের ঘরে পলায়ন করিল। দীপক ও হিরণ্ময়কে এক সঙ্গে দেখার আগ্রহ তাহার বিন্দুমাত্রও ছিল না। তবে নিজের ঘরে ঢুকিতে না ঢুকিতেই দেখিল দীপক হিরণ্ময়ের ঘরের সামনে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। আজ আবার দেশী পরিচ্ছদ ত্যাগ করিয়া সে সার্ট, কোট ও ট্রাউজার্স পরিয়া আসিয়াছে।

হিরণ্ময় ও পূর্ণিমার ঘরের মধ্যে একটা পাতলা দেওয়াল আছে বটে, তবে বেশ জোরে কথা বলিলে এক ঘরের কথা অন্য ঘর হইতে শোনা যায়। পূর্ণিমা টাইপ করিতে বসিল, যাহাতে টাইপ-রাইটারের শব্দে পাশের ঘরের কোন কথা তাহার কানে না আসে। হিরণ্ময় দীপককে কি বলেন, তাহা সে শুনিতে চায় না। খানিক পরে চেয়ার ঠেলিয়া উঠিয়া দাঁড়ানোর শব্দে বুঝিল যে, দীপক চলিয়া যাইতেছে। হিরণ্ময় তাহাকে বাহাল করিলেন, না বিদায় করিয়া দিলেন তাহা সে শুনিতেই পাইবে, ব্যস্ত হইবার প্রয়োজন নাই। আগ্রহ ত কিছুই নাই।

একটু পরে তাহার ডাক পড়িল হিরণ্ময়ের ঘরে। চেয়ারে বসিতে না বসিতে তিনি বলিলেন, "আপনার বন্ধুটি এসেছিল। দিলাম ত ঢুকিয়ে, তার পর যা থাকে তার অদৃষ্টে।"

পূর্ণিমা বলিল, "একটা chance দেওয়া ছাড়া আর কিই বা করা যেত? তার পর নিজের খাটুনির উপরেই নির্ভর করিতে হয়।"

হিরণ্ময় একটু বিরসভাবে বলিলেন, "করা এর চেয়ে বেশীও যায়। তবে সকলের ভাগ্যে এ ধরণের সাহায্য জোটে না।"

পূর্ণিমা তাকাইয়া দেখিল মুখখানা হিরণ্ময়ের গম্ভীরই হইয়া আছে। দীপকের সম্বন্ধে তাঁহার ধারণাটা ভাল হয় নাই, তাহা হইলে? যাক্, যাহা হইয়া গিয়াছে তাহা হইয়াই গিয়াছে। আর তাহার প্রতিকার কি?

দীপক সেদিন রোদ পড়িতে না পড়িতে লেকের ধারে গিয়া হাজির। পূর্ণিমা অবশ্য গেল অনেক পরে। তাহাকে দেখিয়া দীপক প্রায় লাফাইয়া উঠিল। বলিল, "তোমাকে কি ব'লে যে ধন্যবাদ দেব জানি না পূর্ণিমা। এই চার বছরের ভিতর আমি একটা চাকরি জোগাড় করতে পারি নি। আর তোমার একটা কথায় এত বড় অফিসে আমার কাজ হয়ে গেল। ভগবান্ই তোমায় পুরস্কার দেবেন, যদি আমি নাও পারি।"

মনে মনে পূর্ণিমা ভাবিল, পুরস্কার ত ইহারই মধ্যে আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। মুখে বলিল, "পুরস্কার পাবার মত কিই বা করেছি? আচ্ছা ওঁর সব কথার ঠিক ঠিক জবাব দিতে পেরেছ ত?"

দীপক বলিল, "পেরেছি অনেকগুলো, আবার পারিও-নি অনেকগুলো। ভদ্রলোক বিশ্ব-সংসারের কত কথাই যে জানতে চাইলেন। অত কি খবর রাখি? পাড়ার

অন্য কোন বাড়ী থেকে ধার ক'রে, আনা Statesman ছাড়া general knowledge বাড়াবার উপায়ও ত নেই আমার।"

পূর্ণিমা বলিল, "কবে থেকে join করছ?"

দীপক বলিল, "মিঃ মজুমদার ত কাল থেকেই যেতে ব'লে দিলেন। আর এক ফ্যাসাদ কি জান? ধুতি প'রে গেলে চলবে না, সাহেব সাজতে হবে। নেইও ত ওসব বড়াচুড়া। এই সব interview-এ যাবার জন্যে একটা কোনমতে জোগাড় করেছিলাম। ঐটেই কেচে-কুচে চালাতে হবে, যতদিন না মাইনে পাচ্ছি।"

অফিসের বিষয়েই অনেকক্ষণ বসিয়া গল্প করিল। কত কিই যে তাহার জিজ্ঞাস্য। পূর্ণিমা শেষে বলিল, "অত আমি জানিও না বাপু, অফিসের অন্য কেরাণীদের কাছে জেনে নিও। আমি সোজা গিয়ে ঢুকি নিজের ঘরে, সোজা বেরিয়ে ট্রামে চড়ি।"

দীপক বলিল, "মজুমদার সাহেবের ঘরটা পাশে হয়ে তোমার খুব সুবিধে হয়েছে। সেখানে যেতেও তোমাকে হাঁটতে হয় না।"

পূর্ণিমা বলিল, "তা হয় না বটে।"

দীপক জিজ্ঞাসা করিল, "তোমার মা কেমন আছেন?"

পূর্ণিমা বলিল, "ভাল আর কই? ভাল ত কিছুই দেখছি না।"

দীপক একটু পরে জিজ্ঞাসা করিল, "ওঁর সব খরচাই ধার ক'রে চালাতে হচ্ছে ত?"

পূর্ণিমা উদাস দৃষ্টিতে কোন এক দিকে তাকাইয়া ছিল, মুখ না ফিরাইয়া বলিল, "তা ছাড়া আর কি হ'তে পারে বল? জমান কিছু ত আমাদের ছিল না?"

দীপক জিজ্ঞাসা করিল, "ধার কোথা থেকে পেলে? অফিস থেকে নিয়েছ?

পূর্ণিমা বলিল, "না, অফিস থেকে আমাকে অত টাকা ধার দেবে কেন? বলেইছি ত যে, মজুমদার সাহেব দিয়েছেন।"

একটু যেন অপ্রতিভ হইয়া দীপক বলিল, "ভেবো না যে শুধু curiosity-র খাতিরে জানতে চাইলাম। টাকা-কড়ির জন্যে ত আমার সারাক্ষণ ঠেকা। মা আবার ছুটকীর বিয়ের জন্যে প্যান্ প্যান্ আরম্ভ করেছেন। যদি অফিস থেকে কিছু পাওয়া যেত ত বেঁচে যেতাম।"

পূর্ণিমা তাহার কথা বিশ্বাস করিল না, তবে বলিল, "অফিসে এসবের ব্যবস্থা কিছু কিছু আছে শুনেছি। সময় মত খোঁজ ক'রো। তবে এখনই যেন কিছু বলতে যেয়ো না। এখন ত কিছুদিন on probation থাকবে।"

আজেবাজে কতগুলো কথা বসিয়া বসিয়া বলিয়া দীপক অবশেষে প্রস্থান করিল। পিসীমার বক্তৃতা এড়াইবার জন্য কিছুক্ষণ বসিয়া থাকিয়া পূর্ণিমাও শেষে বাড়ীর পথ ধরিল।

পরদিন বাস ধরিবার জন্য বড় রাস্তায় আসিয়া দাঁড়াইতেই পূর্ণিমা দেখিল দীপক সাজিয়া-গুজিয়া দাঁড়াইয়া আছে। কথা বলিবার ইচ্ছা ছিল না, তবে দীপক কথা বলাতে তাহাকেও বলিতে হইল। সারাপথ এমন বিরস বিষণ্ণ বদনে বসিয়া রহিল যে, বাসের মধ্যে দীপকও আর কথা বলিতে সাহস করিল না।

অফিসের প্রবেশ পথেই পূর্ণিমা হিরণ্ময়ের সামনে আসিয়া পড়িল। পূর্ণিমা বুঝিতে পারিল, তাহার মুখ লাল হইয়া উঠিতেছে। নিজেকে শত ধিক্কার দিল, কেন সে এমন?

দীপকও পূর্ণিমার নমস্কারের উত্তরে প্রতিনমস্কার করিয়া হিরণ্ময় সোজা lift-এ চড়িয়া উপরে চলিয়া গেলেন, মুখে হাসির কোন চিহ্ন দেখা গেল না। পূর্ণিমার এমন মাথা ঘুরিয়া উঠিল যে, তাহার ভয় করিতে লাগিল পাছে সে পড়িয়া যায়। দীপককে সে বলিল, "আমি হেঁটেই উপরে চ'লে যাচ্ছি দীপক, তুমি lift নেমে এলে যেও। এই ভীড়ে আর রোদের ঝাঁঝে দাঁড়িয়ে থাকলে আমার heat stroke হয়ে যাবে।"

তিনতলায় যখন উঠিয়া আসিল, দেখিল, হিরণ্ময়ের ঘরে দু'তিনজন অপরিচিত লোক বসিয়া কথা বলিতেছেন। তাড়াতাড়ি নিজের ঘরে ঢুকিয়া চেয়ারে বসিয়া পড়িল, মাথা তখনও ঘুরিতেছে, সামলাইয়া উঠিতে পারে নাই। এখনই জল খাইলে বা মাথায় জল দিলে পাছে সর্দ্দিগর্ম্মির পাল্লায় পড়ে এই ভয়ে তাহাও করিতে পারিল না। টেবিলে মাথা রাখিয়া নিজেকে কোনমতে সুস্থ করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল।

হঠাৎ হিরণ্ময়ের কণ্ঠস্বর তাহার কানে আসিল, "কি হয়েছে মিস্ সান্যাল?"

ভয়ানক চমকাইয়া পূর্ণিমা মাথা তুলিল, হিরণ্ময় দরজার সামনে দাঁড়াইয়া আছেন। বলিলেন, "বেয়ারাটাকে অন্য কাজে পাঠিয়েছি, তাই আমিই আপনাকে ডাকতে এসেছিলাম। কিন্তু কি হয়েছে? অমন ক'রে প'ড়ে আছেন কেন?"

পূর্ণিমা বলিল, "ভীষণ গরমের জন্যে হয়েছে বোধ হয়। বাসে আজ অত্যন্ত বেশী ভীড় ছিল।"

"আমার ঘরে এসে বসুন। দেখুন, উঠতে পারবেন ত? না নিমেষ্‌ দত্তকে ডেকে পাঠাব?"

পূর্ণিমা বলিল, "না, না, আমি নিজেই যাচ্ছি। আস্তে আস্তে যাচ্ছি।"

এক পা এক পা করিয়া হাঁটিয়া হাঁটিয়া সে পাশের ঘরে আসিয়া ঢুকিল। Air conditioned ঘর, চমৎকার ঠাণ্ডা। বড় একটা আরাম-চেয়ার টানিয়া হিরণ্ময় বলিলেন, "এইখানে বসুন। গরম ত এখন অনেক দিন চলবে, আপনি এই দুর্বল শরীরে যাওয়া-আসা করবেন কি ক'রে?"

পূর্ণিমা ক্ষীণকণ্ঠে বলিল, "আর একটু আগে বেরোতে চেষ্টা করব।"

"তাই করবেন। নিন্‌, এখন একটু জল খান দেখি, মিনিট পাঁচ-দশ ত হয়ে গেছে।" নিজেই তিনি তাহাকে জল গড়াইয়া আনিয়া দিলেন। পূর্ণিমা কোনমতে জলটা গিলিল, তাহার যেন কণ্ঠরোধ হইয়া আসিতেছিল। দেহ তাহার জুড়াইল, বুকের ভিতরেও সান্ত্বনার প্রলেপ পড়িল। যাক্‌, খুব বিরক্ত হয়ত হন নাই হিরণ্ময়, তাহা হইলে এত যত্ন করিতেন না।

কয়েক মিনিট পরে বলিল, "এখন কাজ করতে পারব।"

হিরণ্ময় বলিলেন, "তাড়া নেই কিছু, আরো দশ-পনেরো মিনিট বিশ্রাম করুন। দেখুন, নিজের যত্ন আপনি নিজে না করলে উপায় নেই। আপনার মা পীড়িত, ভাই-বোন ছোট ছোট। এমন কেউ কি আছেন আপনার ধারে-কাছে, যিনি আপনার জন্যে কিছু করলে চারদিকের সবাই অস্থির হয়ে উঠবে না? আমার অবস্থা আপনি খানিকটা বুঝতে ত পারেন? আপনি ভয় পাচ্ছেন, upset হচ্ছেন সবই বুঝতে পারছি। এরকম বাজে কথা শুনলে ছেলেমানুষের ভয় পাওয়া বিচিত্র নয়। আমি আরো বেশী care আপনার নানা দিকে নিতে পারি, কিন্তু তা হ'লে আরো বেশী নোংরা কথা ছড়াবে। আমি সেটা সয়ে যাব, কিন্তু আপনি পারবেন না। অথচ এই ত আপনার শরীরের অবস্থা। এখন কি করা উচিত? এই ভাবে চলতে চলতে আপনি একেবারে শয্যাগত হয়ে পড়ুন, এটা আমি হ'তে দিতে পারব না।"

পূর্ণিমা বলিল, "আমি ভেবে কিছুই ঠিক করতে পারব না। আপনি আমায় যা করতে বলবেন, তাই আমি করব।"

হিরণ্ময়ের মুখে একটুখানি হাসির রেখা দেখা দিল, বলিলেন, "ঘুরে ফিরে সেই একই জায়গায় এসে পড়লেন? কিন্তু করবেনই বা কি? আপনার সত্যিকার বন্ধু, কর্মক্ষম বন্ধু, ধারে কাছে কেউ নেই তা বুঝতেই পারছি। থাকলে এতদিনে তাঁদের দেখা পেতাম। বরং দেখছি, আপনারই উপরে নির্ভর করে এমন বন্ধুর অভ্যুদয়ের সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে।"

পূর্ণিমা নীরবে মাথা নীচু করিয়া বসিয়া রহিল। এ কথার উত্তরে সে যদি কথা বলে তাহা হইলে ব্যাপারটা আরো বিশ্রী হইয়া দাঁড়াইবে।

হিরণ্ময় বলিয়া চলিলেন, "আপনাকে যে ডাঃ দাস দেখেছিলেন, তাঁর সঙ্গে মাঝে মাঝে ফোনে কথা হয়। আরো দুটো ওষুধের নাম করেছেন তিনি। কাল কিনে পাঠিয়ে দেব, নিশ্চয় নিয়ম মত খাবেন। আপনার যাওয়া-আসার কি ব্যবস্থা করতে পারি, তাও ভেবে দেখছি। গাড়ী স্বচ্ছন্দেই পাঠাতে পারতাম, কিন্তু তা ত পাঠান চলবে না। অন্য ব্যবস্থা করা যায়, তাই হয়ত করতে হবে। কিন্তু ব্যবস্থা যদি করি, আপনাকে মেনে নিতে হবে।"

পূর্ণিমা বলিল, "মেনেই নেব। এর আগে দু'তিন বার বৃথা আস্পর্ধা দেখিয়েছি আপনার কাছে যে, ঋণের ভার আর বাড়াতে চাই না, কিন্তু এখন দেখছি কথাটা অত্যন্ত নির্বোধের মত বলেছিলাম। কোন্‌ জন্মের সুকৃতির ফলে জানি না, আমার মত অসহায় মেয়ে, আপনার মত বন্ধু পেয়েছিল। এ ভগবানের দান, আমার কোন গুণে পাই নি। একে মাথায় করে নেব না, এত অহঙ্কার আমার নেই। যা বলবেন, তাই মেনে চলব এখন থেকে। লোকে কথা বলে বলুক। প্রাণ আমার আপনিই রক্ষা করেছেন, তারা করে নি। আমার আজকের কথার বিরুদ্ধাচরণ কথায় বা কাজে হয়ে যেতে পারে কখনও, কিন্তু তখনও জানবেন যে আমার আজকার কথাটাই সত্যি, আপাতদৃষ্টিতে যা দেখা গেল বা দৈবাৎ যা শোনা গেল সেটা মিথ্যে।"

১৬

সেদিন কাজ বেশী করিতে হইল না পূর্ণিমাকে। সে হিরণ্ময়ের ঘরেই বসিয়া কাটাইল প্রায় সারাটা দিন, মাঝে মাঝে অল্প-স্বল্প কিছু কাজ করিল। Dictation খানিক লইল, তাহাও টাইপ করা হইল না, কারণ air conditioned ঘর ছাড়িয়া হিরণ্ময় তাহাকে বাহির

না ত আমি? অন্ততঃ আপনার সঙ্গে একদিনও করি নি।"

পূর্ণিমা বলিল, "ভয় সত্যিই পাই, কখনও রাগ করেন না ব'লেই আরো বেশী ভয় পাই। যারা সারাক্ষণই রাগ দেখায়, তাদের রাগ লোকের সয়ে যায়, ক্রমে ভয়ের বদলে উপেক্ষা এসে যায়।"

হিরণ্ময় বলিলেন, "তা হ'লে ত দেখছি রাগের মর্য্যাদা বজায় রাখার জন্যেই আমায় শান্ত হয়ে থাকতে হবে। তবে আপনার উপর রাগ করা দরকার হবে না বোধ হয়, এখন পর্য্যন্ত ত হয় নি।"

পূর্ণিমা ম্লানমুখে একটু হাসিল। বলিল, "চেষ্টার ক্রটি ত আমি রাখব না। তার পরেও যদি হয়, ত ভাগ্য দোষ।"

কাজ আরম্ভ করিতে করিতে পূর্ণিমা একবার বলিল, "মা একটু দেখা করতে চাইছিলেন, আপনার সঙ্গে।"

হিরণ্ময় বলিলেন, "এর পর যেদিন আপনি যাবেন, আমি সঙ্গেই যাব।"

ছুটি হইবার পরও সে নড়ে না দেখিয়া হিরণ্ময় জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি? ব'সেই রইলেন যে? বাড়ী যেতে হবে না?"

পূর্ণিমা বলিল, "First rush-টা পার হয়ে যাক, তার পর যাব। ভীড় আজকাল আর বেশী সহ্য করতে পারি না।"

হিরণ্ময় কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিলেন, "আপনার যাওয়া-আসার কথা ভাবছিলাম। আচ্ছা, মিসেস দস্তরের সঙ্গে কি আসতে পারবেন? তিনি আর দু'টি মহিলা-কর্ম্মীর সঙ্গে আসেন রোজ ট্যাক্সি ক'রে। তাঁর মত ফ্যাশনেবল্ মহিলার rush hour-এ ট্রামে চড়া পোষায় না। ট্যাক্সিতে একটা seat খালি থাকে, আপনি সেটা নিতে পারেন।"

মিসেস্ দস্তরকে পূর্ণিমা দু'চক্ষে দেখিতে পারে না। ভদ্রমহিলা তাহার সঙ্গে যে কিছু খারাপ ব্যবহার করেন তাহা নয়, উচ্ছ্বাসই প্রকাশ করেন অনেক সময়। কিন্তু অফিসের কর্ত্তার প্রতি তাঁহার মনোভাবটা যে কি তাহা পূর্ণিমা ভাবিয়া পায় না। হিরণ্ময়ের গায়ের উপর আসিয়া গলিয়া পড়িবার কোন উপলক্ষ্যই তিনি ছাড়েন না। হিরণ্ময় অবশ্য সম্পূর্ণ অবিচলিতই থাকেন, কিন্তু পূর্ণিমার গা জ্বলিয়া যায়। নিজেকে মাঝে মাঝে ধিক্কার দেয় সে। তাহার এত ঈর্ষ্যা কেন? হিরণ্ময় ত তাহার সম্পত্তি নন!

মুখে বলিল, "আসতে পারি, যদি আপনি বলেন। তবে উনি ত আমার বাড়ী থেকে অনেক দূরে থাকেন।"

হিরণ্ময় বলিলেন, "ওঁর সঙ্গে যাঁরা আসেন, তাঁদের মধ্যে একজন থাকেন আপনার বাড়ীর খুবই কাছে। দু'মিনিট হাঁটলেই আপনি তাঁর বাড়ীর থেকে গাড়ী ধরতে পারবেন। যে সময়ে বেরোন, তাই বেরোলেই হবে। দেখুন, রাজী আছেন? তা হ'লে ওঁকে বলি।"

পূর্ণিমা বলিল, "তাই-ই আসব। আপনি বলুন ওঁকে, তার পর কথা ব'লে নেব আমি ওঁর সঙ্গে। কিন্তু এতেও কি আর কথা উঠবে না? আমি নিজের জোরে যে রোজ ট্যাক্সি চ'ড়ে আসছি না, তা কি আর বোঝা যাবে না?"

হিরণ্ময় বলিল, "তা যদি আপনার পিছনে কেউ ডিটেকটিভ লাগিয়ে ব'সে থাকে, তা হ'লে বুঝবে। না হ'লে অত চোখে পড়বে না। এঁরা অনেক জনই এরকম ক'রে আসেন। আমার গাড়ী চেনা বড় সহজ, চট্ ক'রে লোকের চোখে পড়ে। এটা তত পড়বে না। তবে মিসেস্ দস্তর নিজে যদি gossip ক'রে বেড়ান, সেই একটু ভয় আছে।"

পূর্ণিমা বলিল, "তা করবেন ব'লে মনে হয় না। আপনি যাতে বিরক্ত হতে পারেন, এরকম কিছু তিনি করবেন না।"

হিরণ্ময় একটু হাসিয়া বলিলেন, "তা হয়ত হ'তে পারে। দেখি ব'লে ওঁকে। ওঁরা ট্যাক্সিওয়ালাকে মাসান্তেই টাকা দেন বলে শুনেছি, সুতরাং অসুবিধা হবে না আপনার। আমি তার আগেই টাকা আপনাকে দিয়ে দেব। আবার মুখ ভার করছেন কেন? কথা ছিল না আপনার সঙ্গে যে, আমি এর পর যা ব্যবস্থা করব আপনার জন্যে, তাই আপনি মেনে নেবেন?"

উদ্গত দীর্ঘনিঃশ্বাস চাপিয়া পূর্ণিমা বলিল, "মেনেই নিলাম।"

হিরণ্ময় বলিলেন, "মুখে মানলেন বটে, তবে মনে বোধহয় মানতে পারলেন না। তার আর কি করা যাবে? মানুষের বাইরের জীবন আর ভিতরের জীবন ত এক তালে পা ফেলে চলে না? আমাদের সকলেরই এই অবস্থা। আচ্ছা, এইবার বেরিয়ে পড়ুন, ভীড় এখন একটু কম হবে।"

পূর্ণিমা চলিয়া গেল।

নূতন ব্যবস্থা তখনও চালু হয় নাই, সুতরাং পূর্ণিমা তাহার পর দিন ট্রামেই গেল এবং দীপকও যথারীতি জুটিল তাহার সঙ্গে। বলা বাহুল্য আজও তাহারা চোখে পড়িল সকলেরই। দীপক আনন্দে এতই আত্মহারা হইয়া রহিল যে, তাহার কাণ্ডজ্ঞান লোপ পাইয়া

গেল যেন। একই অফিস, চেষ্টা করিলে একটা মানুষ যে আর একটা মানুষকে এড়াইয়া না চলিতে পারে তাহা নয়, তবে চেষ্টা না করিলে সর্ব্বদাই চোখা-চোখি হইয়া যায়। পূর্ণিমার দিকে তাকাইয়া হাসিবার সুযোগ পাইলেই কথা বলিবার কোন উপলক্ষ্যই দীপক হেলায় হারাইতে দিল না। তাহার জিজ্ঞাস্যও অসংখ্য। Canteen কোথায়, কি খাইতে কত লাগে, সব সময় খোলা থাকে কি না, lunch-এর ছুটি কতক্ষণ, প্রভৃতি অগণিত প্রশ্নে সে পূর্ণিমাকে জর্জ্জরিত করিয়া তুলিল। তাহার সহকর্মীরা যে ইহা লইয়া হাসাহাসি করিতেছে, সেদিকে সে ভ্রূক্ষেপও করিল না, কিন্তু বিরক্তিতে পূর্ণিমার কণ্ঠরোধ হইয়া আসিল। হিরণ্ময় কিছু বুঝিতে পারিলেন কি না তাহা ঠিক ধরা পড়িল না।

বিকালে পূর্ণিমা বলিল, "আজ বিকেলে ত যাব মায়ের কাছে ভাবছি।"

হিরণ্ময় বলিলেন, "বেশ। আমিও যাব। আপনি বাড়ী যান, সেইখান থেকেই আপনাকে pick up করব। আর ভাল কথা, মিসেস্ দত্তকে বলেছিলাম। তিনি ত খুবই রাজী, আপনি তাঁর সঙ্গে কথা-বার্ত্তা ব'লে সময়টা ঠিক ক'রে নেবেন। এক বেলা ত নিষ্কৃতি পাবেন, তারপর অন্য বেলার ব্যবস্থা আবার ভেবে-চিন্তে করতে হবে কিছু।"

বাড়ী আসিয়া চা খাইয়া পূর্ণিমা মাকে দেখিতে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিল। সুষমা মধ্যে মধ্যে যায় দিদির সঙ্গে, বেশীর ভাগ দিনই যাইতে চায় না। রমেন একদিনও যায় না, তাহার ভয় করে।

আজ সুষমার যাইতে ইচ্ছা করিল না। পূর্ণিমা প্রস্তুত হইয়া অপেক্ষা করিতে লাগিল হিরণ্ময়ের জন্য। তিনি সচরাচর অত্যন্ত সময়জ্ঞানসম্পন্ন, আজ কেন জানি না, পাঁচ মিনিট দেরি হইয়া গেল।

হিরণ্ময় পূর্ণিমাকে দেখিয়াই বলিলেন, "দেরি হয়ে গেল, না? Unexpectedly কয়েকটা কাজ এসে পড়ল।"

পূর্ণিমা বলিল, "পাঁচ মিনিট দেরিতে আর কি এসে যাবে?"

সুরবালা অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন হিরণ্ময়কে দেখিয়া। বলিলেন, "আমার আত্মীয় স্বজন আছেন ঢের, তবে দেখতে-টেখতে বিশেষ কেউ আসেন না। কিন্তু আপনাকে দেখে যত খুসী হলাম, এতখানি আর কাউকে দেখলে হতাম না।"

হিরণ্ময় বলিলেন, "বিকেলে প্রায়ই free থাকি আমি, আরো বেশী আসতে চেষ্টা করব।"

দু'চারটা অন্য কথা-বার্ত্তার পর সুরবালা বলিলেন, "দেখুন, ভগবানের রাজ্যে কারো জায়গা চিরকাল খালি থাকে না। উনি চ'লে গেছেন কবে সবাইকে অনাথ ক'রে ফেলে, তবু তাঁর জায়গা নিয়েছিল ঐ এতটুকু মেয়ে। একলা সে পারত না, পারবার কথা নয়, তাই বিধাতাই তাকে সহায় জুটিয়ে দিয়েছেন। আপনিই আমাদের সকলকে রক্ষা করেছেন, না হ'লে পূর্ণিমা পারত না।"

হিরণ্ময় বলিলেন, "কি আর এমন করতে পেরেছি? আরো ঢের করবার ছিল।"

সুরবালা বলিলেন, "আপনি ত স্বীকার করবেনই না। যারা শুধু নাম কিনবার জন্যে পরের উপকার করে তারাই সকলের কাছে ব'লে বেড়ায়। আমি হয়ত টিকব না আর বেশী দিন, তবু এই সান্ত্বনা রইল যে, ছেলেমেয়েরা একেবারে ভেসে যাবে না।"

সেদিন সময় খুব বেশী ছিল না, পূর্ণিমারা অতঃপর চলিয়া আসিল। হিরণ্ময় সারাপথ গম্ভীর হইয়া রহিলেন। একবার শুধু বলিলেন, "সামনের week-এও একবার আমি যাব ওঁকে দেখতে।"

মিসেস দত্তের সঙ্গে যাওয়া সুরু হইল তাহার পর দিন হইতে। সহযাত্রিণী তিনজনই পূর্ণিমা অপেক্ষা বয়সে অনেক বড়। দু'জন অবিবাহিতা, তৃতীয়া মিসেস হইলেও তাঁহার স্বামীর কোন সন্ধান পূর্ণিমা পাইত না। তিনি বিধবা কি না তাহাও বুঝিত না। সাজ-পোশাক চূড়ান্ত-রকম তিনিও করিতেন, এবং বিভিন্ন যুবক-প্রেমিকদের গল্পে কুমারীদ্বয়কে বরং হারই মানাইয়া দিতেন। পূর্ণিমার এ সব গল্প অত্যন্ত [illegible] লাগিত, কিন্তু চুপ করিয়া শোনা ছাড়া উপায়ও ত কিছু ছিল না?

যাওয়ার পথে দীপকের উৎপাত ত বন্ধ হইল, কিন্তু পূর্ণিমা বেশী কিছু নিষ্কৃতি পাইল না। অফিসে তাহার হাসি-গল্প চলিতে লাগিল, এবং ফেরার পথে ট্রামে বা বাসে দীপককে প্রায় সব সময়ই উপস্থিত দেখা যাইতে লাগিল। কতদিন আগেকার কলেজে পড়ার দিনগুলির কথা পূর্ণিমার মাঝে মাঝে মনে পড়িত। কখনও দেখা করিবার জন্য সে এমনি অস্থির হইয়া বেড়াইত। কিন্তু সেই পূর্ণিমা আর এই পূর্ণিমা? তখন কি সেও এই বন্ধুর সান্নিধ্যের প্রার্থী ছিল? দীপককে দেখিলে তাহারও মুখে হাসি ফুটিত, চোখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিত। আর এখন? তাহার মনোরাজ্যের কোন কোণে দীপকের ছায়ারও কোন স্থান নাই, এখন তাহার নিকটে আসিবার চেষ্টা খালি বিরক্তির সঞ্চার করে।

ভালবাসা যে কি জিনিস তাহা কি পূর্ণিমা কোনদিন জানিয়াছিল? সাধারণ সখ্যকেই কি সে ভালবাসা ভাবিয়াছিল? এখন যাহা তাহার হৃদয়ের মধ্যে সারাক্ষণ আগুনের মত জ্বলিতেছে, তিলে তিলে তাহাকে পুড়াইয়া ছাই করিয়া ফেলিতেছে, তাহার সহিত আগেকার সেই ছেলেখেলার বন্ধুত্বের কোন তুলনা হয় কি? সেটা বাহিরের জীবনের একটা জিনিস মাত্রই কি ছিল? নিজেকে এতটা হালকা মনে করিতে ইচ্ছা হয় না পূর্ণিমার, কিন্তু সে নিজের কাছে অস্বীকার করিবে কি করিয়া যে দীপক সম্পূর্ণরূপে তাহার জীবন হইতে অপসৃত হইয়া গিয়াছে। দীপকের কাছে আসিবার চেষ্টায় সে ভয় পায়, রাগ করে, পাছে ইহা লক্ষ্য করিয়া হিরণ্ময় পূর্ণিমার প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়া ওঠেন।

দীপক যখন তাহার ঘরে আসিয়া কথা বলিতে আরম্ভ করিল, তখন পূর্ণিমার আর ধৈর্য রহিল না। হিরণ্ময়ও একবার তাকাইয়া দেখিয়া গেলেন। বিরক্তকণ্ঠে সে বলিল, "দীপক, এটা কিন্তু বেড়াবার জায়গা নয়। আমার এ ঘরে কেউই আসে না, তুমি আসছ দেখলে অন্যরাও আসকারা পেয়ে যাবে।"

দীপক বলিল, "সে কি? আমি আসছি ব'লে অন্যরাও আসবে? আমি কি অন্য পাঁচজনেরই সমান নাকি? আচ্ছা, বেশী ঘনঘন আসব না। তোমার ঘরে বেশ ঠাণ্ডা জল থাকে, তাই এসেছিলাম।"

কি করিয়া সে বুঝাইবে এই কাণ্ডজ্ঞানহীন মূর্খকে যে অন্য পাঁচজন হইতে তাহার অধিকার কিছুই বেশী নয়? প্রথম কাজে ঢুকিবার পর নিজের মনগড়া একনিষ্ঠতার যূপকাষ্ঠে নিজেকে বলি দিতে গিয়াছিল পূর্ণিমা। ভগবান্ তাহাকে রক্ষা করিলেন। মুক্তি দিয়া মুক্তি পাইয়া সে ফিরিয়া আসিয়াছিল। দীপকও তাহার জীবনকে অলক্ষ্য ডোরে বাঁধিয়া যে অতি ক্ষীণ যোগসূত্র ছিল, তাহা কি নিঃশেষে ছিঁড়িয়া যায় নাই? এই নির্বোধ এখনও কি মনে করে যে, পূর্ণিমা তাহার আশা-পথ চাহিয়া বসিয়া আছে?

হিরণ্ময় আর একদিন সুরবালাকে দেখিয়া আসিলেন পূর্ণিমার সঙ্গে। জিজ্ঞাসা করিলেন, "মিসেস দস্তরের সঙ্গে যাওয়া-আসা ত বেশ কিছুদিন করছেন। সুবিধা-অসুবিধা কি রকম বুঝছেন?"

পূর্ণিমা বলিল, "নিরুপদ্রবে অফিসে আসতে পারি, ভীড়ের ধাক্কা খেতে হয় না, রোদে পুড়তে হয় না, এগুলো ত সুবিধাই?"

হিরণ্ময় বলিলেন, "অসুবিধাটা কি?"

পূর্ণিমা বলিল, "অসুবিধা তেমন কিছু নয়। তবে উনি বড় বেশী অশ্রাব্য গল্প করেন, এইটা আমার ভাল লাগে না। মেয়েরাও যে আবার এ ধরণের গল্প করে তা আমি জানতাম না। না শুনে উপায় নেই, অথচ কানে গঙ্গাজল ঢেলে দিতে ইচ্ছে করে।"

হিরণ্ময় হাসিতে লাগিলেন। বলিলেন, "কি করা যায় বলুন? Convent এর nun-রা ত এ পাড়ায় কাজ করে না? অনেক মেয়েই আজকাল এই রকম। পুরুষদের সঙ্গে এক্ষেত্রেও সমান অধিকার দাবি করেন তাঁরা। শুনে যান, কি আর করবেন? স্কুল-কলেজে ছেলেমেয়ে বখিয়ে দেওয়ার কাজ সহপাঠীরা করে, আপনি সেখান থেকে innocent-ই বেরিয়েছিলেন, এখন সহকর্মীরা ভার নিয়েছেন আপনার।"

পূর্ণিমা আরক্ত মুখে চুপ করিয়া রহিল। তাহার পর জিজ্ঞাসা করিল, "মিসেস দস্তুর বিধবা নাকি?"

হিরণ্ময় বলিলেন, "স্বামী ত্যাগ ক'রে এসেছেন উনি।"

যাদবপুরে আসিয়া পড়াতে আর এ বিষয়ে কথা হইল না। সুরবালার জ্বর আজ বেশী ছিল বলিয়া নার্সরা খুব বেশীক্ষণ কথা বলিতে দিল না। পূর্ণিমা ভীতভাবে বলিল, "মায়ের জ্বর আবার বাড়ছে কেন?"

হিরণ্ময় বলিলেন, "ও কেন-র কি আর উত্তর আছে? পুরনো রোগ, নানারকম ওঠা-নামা করে। কতদিন এভাবে চলবে কে জানে? আপনাদের পিসীমাকে নিয়ে চলছে কেমন?"

পূর্ণিমা বলিল, "কাজকর্ম্ম ত ঠিকই চলছে। তবে পিসীমা অত্যন্ত সেকেলে মানুষ ত? যা কিছুর সঙ্গে তাঁর মতে মেলে না, তাতেই তিনি চ'টে যান। সরমা ছেলে-মানুষ, অত বুঝে চলতে জানে না, তার সঙ্গে বাধে বেশী তাঁর।"

হিরণ্ময় বলিলেন, "মেয়েদের চাকরি-বাকরি করা পছন্দ করেন না বুঝি?"

পূর্ণিমা বলিল, "পছন্দ ত অনেক কিছুই করেন না। চাকরি করা পছন্দ করেন না, কলেজে পড়া পছন্দ করেন না, অনাত্মীয় কারো সঙ্গে কথা বলা পছন্দ করেন না।"

হিরণ্ময় বলিল, "তবে ত দেখছি মহা বিপদ্। এ সব ক'টাই ত আপনাদের না ক'রে উপায় নেই।"

পূর্ণিমা বলিল, "তাঁরা সব আট ন' বছরে গৌরী-দানের গৌরী হয়ে শ্বশুরবাড়ী ঢুকেছিলেন, ঐটেই মেয়েদের একমাত্র পথ এবং শ্রেষ্ঠতম পথ ব'লে ধ'রে নিয়েছেন।"

"আপনাদেরও কি ঐ পথে চালান করবার কিছু ব্যবস্থা করছেন?"

পূর্ণিমা মুখ লাল করিয়া বলিল, "তা নিজে করছেন না, তবে অন্য আত্মীয়-স্বজনরা কেন যে এ বিষয়ে কিছু করছেন না, সেই জন্যে তাদের উপর খুব চটে উঠেছেন।"

হিরণ্ময় বলিলেন, "আপনার বাড়িতেও আপনার মায়ের একটু তাড়াতাড়ি সেরে ওঠা দরকার ছিল। ঘরে-বাইরে অশান্তি আর আপনি কত সহ্য করবেন?"

কোন্ অশান্তির কথা হিরণ্ময় বলিতেছেন, ঠিক বুঝিতে পারিল না পূর্ণিমা। অশান্তি ত আছেই জীবন জুড়িয়া? মা যে আর সারিয়া বাড়ী ফিরিয়া আসিবেন, এ আশা আর কি ধরিয়া রাখা যায়? ক্রমশঃ

ঘুম কেড়ো না

শ্রীকামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

দয়া করে ঘুম কেড়ো না।
আমি এক কেরানি
সকালে যেতে হয় বাজারে
তারপর আপিসে
[illegible]
এটা-ওটা ধার-দেনা করে
বাড়ি ফেরা।
সবাই ঘুমলে
আকাশকে দেখা।

আকাশ ঘুমোলে ভাবি
গ্রহ আর তারা স্বপ্নচারা
তার মাঝে মিলবার ক্ষণ
অব্যক্ত কথার এক রণন-রণন।
সেইখানে যেতে আমি চাই
আপিস ও হাসপাতাল নাই।
নাই ধার-দেনা
তাই বলি: দয়া কর, ঘুম কেড়ো না।

জরতী পৃথিবী

শ্রীকৃষ্ণধন দে

জরতী পৃথিবী, মনে কি পড়ে না আজো,—
বলেছে বিধাতা—"সাজো সুন্দরি, সাজো!"
কত কোটী যুগ, যায় না গণনা করা—
তপনে বেড়িয়া হয়েছ স্বয়ম্বরা,
মনে কি পড়ে না হারানো সে রূপকথা,
কিশোরী মেয়ের চঞ্চল আকুলতা?
থর থর কাঁপে অগ্নিগিরির দল,
ঘন ভূকম্পে সিন্ধু সমুচ্ছল,
ঝঞ্ঝা-কাঁপানো মহামহীরুহ-শ্রেণী,
পৃষ্ঠে দোলানো রক্ত-লাভার বেণী,
ডাইনোসরের শিশু নিয়ে তব খেলা,
ম্যামথের সাথে ছুটোছুটি সারাবেলা,
টেরোডাকটিল তোমারি যে অনুচর,
ব্রন্টোসরাসে সাজাও যে খেলাঘর,
কৃষ্ণ মেঘের সরব অশনিপাত,
হিমঝর্জর কুহেলি-মায়াবী রাত,
কত স্বপনের, কত সৃজনের গীতি
জরতী পৃথিবী, আজো ভরে আছে স্মৃতি?

জরতী পৃথিবী, অতন্দ্র জাগরণে
এল বসন্ত কবে মনে আর বনে!
নব শোভা ধরি' হাসিল দিগন্তর,
নর চিনে নারী, নারী চিনে লয় নর;
হেরিল তাহারা প্রণয়-তন্দ্রাকুল
অজানা লতায় কখন ধরেছে ফুল।
শৈল-গুহার আড়ালে বসিয়া একা,
আদিম শিল্পী এঁকেছিল লিপি রেখা,
তারপর এল কোন অশ্রুত বাণী,
সরাইয়া দিল কালো যবনিকাখানি;
ঊষসী নামিল আলো-গুণ্ঠন খুলি,
বরুণ-কন্যা বাজাল শঙ্খ তুলি;
ইন্দ্র হানিল বজ্র অগ্নিমাখা,
গরুড় মেলিল রাত্রিন্দিব পাখা,
ভূর্জ্জের বনে উঠিল যজ্ঞধূম,
সন্ধ্যার মেঘ ছড়াল যে কুঙ্কুম,
কত তপোবনে মুখর ছন্দগানে,—
তমসার তটে আলোকের অভিযানে!

জরতী পৃথিবী, সে কি আজো মনে পড়ে-
কি গান গেয়েছ কাল-রথ-ঘর্ঘরে?
পার হয় রথ কত-না সিন্ধু নদী,
কত মরুতট, পর্ব্বত নিরবধি,
কত-না নগর, কত-না শস্যভূমি,
কত প্রান্তর অরণ্য যায় চুমি,
কত সভ্যতা কত বিপ্লব বুকে
চলে তব রথ উচ্ছল কৌতুকে,
সাগর-উত্তল বক্ষে ভাসালে তরী,
মরুর বক্ষে নগর তুলিলে গড়ি',
ইতিহাস শুধু খুলে যায় তার পাতা,
কত যুগ আসি কয়ে যায় তার গাথা,
সৃষ্টি ধ্বংস বুনিছে ইন্দ্রজাল,
চেতনা পেয়েছে ফসিল ও কঙ্কাল!
তরল অনল, কালো বারুদের ধূম,
মুখর নগর করে দেয় নিঃঝুম!
আণবিক মোহে উন্মাদ হয় লোকে,
কাঁপে সভ্যতা আতঙ্ক-ভরা চোখে!

জরতী পৃথিবী, আজো শুধু চেয়ে রও,
বন-মর্ম্মরে অতীতের কথা কও!
কোন্ অনাগত যুগের সে আগমনী,
তোমারি স্থবির পঞ্জরে তোলে ধ্বনি!
কত অনাহত বীণার মূর্চ্ছনায়,
তোমারি স্বপ্ন ভরে ওঠে মহিমায়!
গ্রহ-চন্দ্রেরে মিতালি বাঁধনে ধরি
অসীমের বাণী অন্তরে লও বরি!
জানে না মানুষ কোথা পথ হবে শেষ,
চায় সে গড়িতে গগনে উপনিবেশ!
আনে বিজ্ঞান নব নব প্রসাধন,
তব জরা-দেহ সাজাইতে সচেতন;
যুগ-যুগান্ত যেখানে গণ্ডি-হারা,
মায়া-যবনিকা ঢেকেছে কালের ধারা,
সেই সুদূরের প্রান্তিকে অবগাহি'
নির্ব্বাণ রবি দেখিবে কি তুমি চাহি?
চির-তমসায় বিলীন হবে যে জানি—
তোমার শীতল নির্জ্জীব দেহখানি।

সার্কুলার রোডে ক্ষীরোদ দাসের চায়ের দোকানে ব'সে চা খাচ্ছি আর খবরের কাগজের পৃষ্ঠা ওল্টাচ্ছি। ইতিমধ্যে চোখে পড়ল—একটি সুদর্শন যুবক এসে পাশে বসল। বয় এসে তার কাছ থেকে চায়ের অর্ডার নিয়ে গেল। যুবকটি এবারে কিছুটা ইতস্ততঃ ক'রে আমার দিকে মুখ তুলে বলল, 'কর্মখালির পাতাটা যদি দেন ত একটু দেখি।'

যুবকটির মুখের দিকে তাকিয়ে ঠিক যেন বেকার ব'লে তাকে মনে হ'ল না, তবু পাতাটা এগিয়ে দিতে দিতে বললাম, 'খবরের কাগজের কর্মখালি দেখে অ্যাপ্লাই করলে আজকাল কি সত্যিই কাজ পাওয়া যায়?'

যুবকটি বলল, 'চেষ্টা করতে বাধা কি, পাওয়া যেতেও ত পারে!'

যে দিনকাল পড়েছে, তাতে মধ্যবিত্ত বাঙালীর কোন দিকে বিশেষ কিছু ক'রে খাবার উপায় নেই। তাই যুবকটির কথা ভেবে বড় দুঃখ হ'ল। বললাম, 'তা ত বটেই, চেষ্টা করতে করতেই কোথাও না কোথাও কিছু একটা জুটে যায়। তা—কি ধরণের কাজ খুঁজছেন আপনি?'

যুবকটি বলল, 'আপাততঃ দু'একটা টিউশন পেলেই আমি খুশী।'

বললাম, 'বুঝেছি, বাঁধাধরা কোন কাজের মধ্যে যেতে চান না, এই ত?'

চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে এবারে মাথা দুলিয়ে কথাটার স্বীকৃতি জানাল যুবকটি।

সঙ্গে সঙ্গে আমার একটি পুরনো বন্ধুর কথা মনে প'ড়ে গেল। দিবাকর বসু। থাকে তিলজলায়। মাঝে মাঝে তেত্রিশ নম্বর বাস ধ'রে আমার পার্শি-বাগানের বাসায় দেখা করতে আসে। টিউশনের জগতে সে সম্রাট্। এককালে ভাল চাকরি পেয়েছিল, করেছিল বছর খানেক, তার পর একদিন তার তৃতীয় নেত্র খুলে গেল। চাকরি ছেড়ে দিয়ে টিউশনি করতে সুরু করল। প্রথমে একটা, তার পর দুটো, তার পর দু'বেলা মিলিয়ে চারটে। ইদানিং টিউটোরিয়াল কলেজ খুলবে ব'লে বাড়ী খুঁজছে।

যুবকটিকে বললাম, 'টিউশনের ব্যাপারে আমি হয়ত আপনাকে কিছুটা সাহায্য করতে পারি।'

চায়ের কাপ শেষ ক'রে এবারে আমার দিকে আরও একটু ঘন হয়ে বসল যুবকটি। বলল, 'আমি তবে বেঁচে যাই; কোথায় আপনার সঙ্গে দেখা ক'রে জানতে পারব, বলুন?'

'এখানে এলেই দেখা হবে।' বললাম, 'বরং আপনার নাম-ঠিকানাটা আমাকে দিন, কিছু ক'রে উঠতে পারলে আপনাকে কার্ড দিয়ে জানাব।'

যুবকটি বলল, 'আমার জন্যে আপনি আবার কার্ড খরচা করবেন?'

বললাম, 'তিন নয়া পয়সার লোকাল পোষ্টকার্ডের বদলে আপনি বরং আমাকে একদিন এক খিলি পান খাইয়ে দেবেন, তা হ'লে ত আর ঋণী থাকবেন না!'

যুবকটি এবারে বিনয়ে গ'লে গিয়ে বলল, 'কি যে বলেন, আপনার মহানুভবতার ঋণ কোনকালেই শোধ হবার নয়।' ব'লে পকেট থেকে একটুকরো কাগজ বার ক'রে খস্‌খস্ ক'রে নিজের নাম-ঠিকানাটা লিখে আমার হাতে তুলে দিল। মিলন চৌধুরী, একাশী বাই বারোর বি, গৌরীবাড়ী লেন।

বললাম, 'ঠিক আছে, দেখা যাক্—আপনার লাক কেমন ফেবার করে!' তার পর একটুকালও আর অপেক্ষা না ক'রে চায়ের পয়সা চুকিয়ে দিয়ে সোজা নিজের কাজে বেরিয়ে গেলাম।

এরপর শুনেছি, ক্ষীরোদ দাসের দোকানে এসে দিন দু'য়েক আমার খোঁজ ক'রে গেছে মিলন। কিন্তু দেখা পায় নি। দেখলাম—ছেলেটি সত্যিই বড় বিপদে পড়েছে; তাই আর দিবাকরের আসার অপেক্ষা না ক'রে চিঠি দিলাম তাকে তিলজলায়। একমাত্র সে-ই পারে মিলন চৌধুরীকে কোথাও টিউশনিতে লাগিয়ে দিতে।

সুখের বিষয় যে, দিবাকর সঙ্গে সঙ্গেই ছুটে এল, এবং আমার কথা রাখল। মিলনকে সঙ্গে নিয়ে একদিন কাজে লাগিয়ে দিল সে, সাহাপুর অঞ্চলের এক ফ্যাক্টরীর মালিকের বাড়ীতে। শীসা আর সাবানের ফ্যাক্টরী চালিয়ে মালিক গীষ্পতি পাল নাকি টাকার উপর শুয়ে থাকেন। ছেলেকে লেখাপড়া শিখিয়ে মানুষ ক'রে তুলবার ইচ্ছে। অতএব সপ্তাহে চারদিন ক'রে পড়াবার হিসেবে মাসিক পুরো একশ' টাকা দিতে তাঁর আপত্তি রইল না। মিলন চৌধুরী যেন হাতে স্বর্গ পেয়ে গেল। প্রচুর উৎসাহ নিয়ে সপ্তাহে চার দিন ক'রে সে সাহাপুর ছুটতে সুরু করল।

বললাম, 'কেমন, এবারে খুশী ত?'

মিলন বলল, 'আপনি গত জন্মে আমার কে ছিলেন জানি না, কিন্তু এ-জন্মে যা করলেন, তার তুলনা নেই।'

বললাম, 'নেই ত নেই। তা যাক্, এবারে একটু মন দিয়ে লেগে থাকুন, দেখবেন চাকরিটা যাবে না।'

মিলন সেই থেকে রীতিমত ঘড়ি ধ'রে কাজ ক'রে যেতে লাগল। দেখতে দেখতে কোথা দিয়ে যে মাস তিনেক কেটে গেল, টের পেল না সে। ইতিমধ্যে দু-একবার এসে যে আমার সঙ্গে দেখা না ক'রে গেছে সে, এমন নয়। আমার নামের সঙ্গে একটা 'দা' যোগ ক'রে ক্রমেই আরও বেশী ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠতে চেষ্টা করেছে মিলন। সে চেষ্টা তার ব্যর্থ হয় নি। ইতিমধ্যে আমিও তাকে তুমি ক'রে বলতেই সুরু করেছি।

ইতিমধ্যে হঠাৎ একদিন বিকেলের দিকে সোজা আমার বাড়ীতে এসে উপস্থিত মিলন। জিজ্ঞেস করলাম, 'কি ব্যাপার?'

মিলন বলল, 'এতদিন সব কথা আপনাকে খুলে বলা হয় নি দীরুদা, এবারে একটা গুরুতর ঘটনা ঘটার ফলে আপনার কাছে ছুটে না এসে পারলাম না।'

জিজ্ঞেস করলাম, 'কি এমন গুরুতর ঘটনা?'

উত্তরে মিলন যা বলল, তা এই —

—গত কয়েকদিন ধ'রে গীষ্পতি পাল নাকি প্রায় রোজই মিলনকে নির্জনে নিজের ঘরে ডেকে নিয়ে গিয়ে বসাত। ছেলের পড়া হোক্ না হোক্, ছেলের বাপের ঘরে মিলনের হাজিরাটা অবশ্যম্ভাবী হয়ে দাঁড়াল।

গীষ্পতি জিজ্ঞেস করলেন, 'তুমি হাত দেখতে জান মাষ্টার?'

অবাক্ চোখে তার মুখের দিকে তাকিয়ে মিলন বলল, 'না স্যার, ও বিদ্যেটা আমার জানা নেই।'

গীষ্পতির দু'হাতের আঙুলগুলো মাঝে মাঝে কেমন বেঁকে বেঁকে প্যারালিসিসের মত হয়ে যাচ্ছিল। জোর ক'রে এক হাত দিয়ে আর এক হাতের আঙুলগুলো সজোরে চেপে ধ'রে পুনরায় জিজ্ঞেস করলেন তিনি, 'তুমি কখনও মানুষের কৃতকর্মের ফলভোগকে বিশ্বাস কর মাষ্টার?'

বিনীত কণ্ঠে মিলন বলল, 'হয়ত করি, কারণ ওটা আমাদের চোদ্দ-পুরুষের সংস্কার। কিন্তু আঙুলগুলো নিয়ে আপনি অমন করছেন কেন, কি হয়েছে আঙুলে?'

গীষ্পতি বললেন, 'এই ত আমার এখন কাল হয়েছে। দেয়াল থেকে বন্দুকটাকে নামিয়ে খুশী মত এখন আর নিজে থেকে গুলী চালাতে পারি না। কিরকম অনাসাক্তি আমি, ভাবতে পার মাষ্টার?'

মিলন তাকিয়ে দেখল, দেয়ালের একটা হুকে দু'নলা একটা বন্দুক ঝুলছে। সঙ্গে সঙ্গে তার বুকের ভিতরটা একবার কেমন ক'রে উঠল! বলল, 'এই বয়সে এখন আর সুটিং দিয়ে আপনার দরকার কি?'

'দরকার!' হঠাৎ যেন কেমন একটা ভীতিবিহ্বল আর্তস্বরে কণ্ঠ কেঁপে উঠল গীষ্পতি পালের। বললেন, 'সেই দরকারের কথাটাই ত তোমাকে বলতে চাই মাষ্টার! তুমি ছাড়া আর কাউকে আমি বিশ্বাস করি না, আর কাউকে খুলে বলতে পারি না আমি সে-কথা।'

মিলন বলল, 'বেশ ত, কি কথা বলুন।'

সঙ্গে সঙ্গে চোখদুটোকে বার কয়েক দেয়ালের চারপাশে ঘুরিয়ে নিয়ে গীষ্পতি বললেন, 'দেখতে পাচ্ছ না, চারপাশ থেকে সবাই কেমন ষড়যন্ত্র ক'রে আমাকে খুন করতে এগিয়ে আসছে! আমি ওদের খুন করব, ওদের সবাইকে আমি গুলী ক'রে মারব।' ব'লে বন্দুকটার দিকে একবার হাত বাড়ালেন তিনি, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই কেমন একটা অদ্ভুত যন্ত্রণায় বাঁ-হাত দিয়ে ডান হাতখানিকে চেপে ধরলেন।

মিলন বলল, 'আপনার শরীরটা বোধ করি ভাল নেই। আপনি সুস্থ হ'তে চেষ্টা করুন। ওদিকে রাত অনেক হ'ল, আমি উঠি। কাল এসে বরং আপনার বাকী কথা সব শুনব।'

গীষ্পতি এবারে কেমন যেন খানিকটা ঝিমিয়ে পড়লেন। আরও কিছু কথা তাঁর বলবার ছিল, কিন্তু উপস্থিত মত কিছু একটাও আর না বলতে পেরে নীরবে শুধু মিলনের মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন। মিলন আর একটু কালও অপেক্ষা না ক'রে বাড়ীর পথে বেরিয়ে পড়ল।

পরদিন পড়াতে গিয়ে ছাত্রকে সে বলল, 'তোমার বাবার শরীরটা খুব খারাপ যাচ্ছে, সেদিকে তোমাদের দৃষ্টি নেই কেন? শীগ্‌গির একজন ভাল ডাক্তার ডেকে বাবাকে দেখাও।'

ছাত্রটি সে-কথায় বিশেষ কান দিল ব'লে মনে হ'ল না; যথারীতি বই খুলে নিয়ে সে পড়তে সুরু করল।

কিন্তু বেশীক্ষণ নয়। একটু বাদেই গীষ্পতির ঘর থেকে মিলনের ডাক পড়ল। উঠে যেতে হ'ল মিলনকে।

গীষ্পতির কণ্ঠ তেমনি ভীতিবিহ্বল, তেমনি কম্পিত। বললেন, 'জান মাষ্টার, কি করেছি আমি জান? আমার ফ্যাক্টরীর বিশু দাস দল গ'ড়ে ষ্ট্রাইক ক'রে আমাকে মারবে ব'লে ষড়যন্ত্র করেছিল। আমি তাকে জলন্ত কড়াতে পুড়িয়ে মেরেছি।' ব'লেই প্যারালাইজ্‌ড আঙুলগুলো দিয়ে নিজের দু'হাত চেপে ধরতে চেষ্টা করলেন তিনি, কিন্তু পারলেন না। চোখদুটোকে

কেমন অস্বাভাবিক ক'রে পুনরায় বললেন, 'সেই থেকে ওরা সবাই আমাকে খুন করতে এগিয়ে আসছে। দেখতে পাচ্ছ না মাষ্টার, ওরা সবাই এগিয়ে আসছে আমাকে মারতে। আমি ওদের কাউকে রাখব না, সবাইকে আমি খুনী ক'রে মারব।'

শুনে মিলনের নিজেরই তখন ভয়ে সমস্ত শরীর থর থর ক'রে কাঁপছে। এককালে সে কিছু সাইকোলজি পড়েছিল, কিন্তু গীষ্পতি পালের মনের যে অবস্থা চলছে, তার সঙ্গে তার কোন একটা চ্যাপ্টারেরও মিল খুঁজে পেল না মিলন। সারা মনে ভয় নিয়েই সে বলল, 'আপনার কোন ভয় নেই স্যার; আমি ওদের যথাযোগ্য ব্যবস্থা করছি, আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন।'

গীষ্পতি পাল তেমনি ভীতিবিহ্বল কণ্ঠেই ব'লে উঠলেন, 'তোমাকেও ওরে ওরা রাখবে না মাষ্টার, একেবারে জীবন্ত মাটিতে পুঁতে ফেলবে। ওই দেখ, বিশু দাসের কঙ্কালটা আমার দিকে কেমন ক'রে এগিয়ে আসছে, কী ভীষণ আর বীভৎস ওর চেহারা!'

রুদ্ধকণ্ঠে মিলন বলল, 'আপনি বড় বেশী অপ্রকৃতিস্থ হয়ে পড়েছেন স্যার, কিছুক্ষণ চোখ বুজে চুপ ক'রে শুয়ে থাকুন দিকি! আমি একটিবার বাইরেটা একবার দেখে আসছি।' ব'লে বাইরে এসে একটু কালও আর দাঁড়াল না সে, সোজা গিয়ে নিজের ঘরে নিঃসাড় হয়ে শুয়ে পড়ল। কিন্তু সারা রাত একটুও তার ভাল ঘুম হ'ল না। ভয় হ'ল—গীষ্পতি পালের রোগটা অলক্ষ্যে তাকে এসেও অতর্কিতে আক্রমণ ক'রে না বসে! সারা রাত ঘুরে-ফিরে গীষ্পতি পালের কথাগুলি এসে তাকে কেমন যেন বড় উতলা ক'রে তুলল। একবার উঠে বসল সে, একবার পুরো এক গ্লাস জল খেয়ে আবার শুল। এমনি ক'রেই গোটা রাতটা দারুণ একটা অস্থিরতা নিয়ে কেটে গেল।

একটু বেলা হ'লে আজ সে শুনল—কাল রাত্রেই বন্দুকের গুলীতে সুইসাইড ক'রে মারা গেছেন গীষ্পতি পাল। ঘরের দরজা ভিতর থেকে বন্ধ ছিল, নইলে সহজেই এ ব্যাপারে অপরকে খুনী ব'লে সন্দেহ করা যেত। সকালে পুলিস এসে দরজা ভেঙে তবে লাস টেনে বার করেছে।

শুনে মিলন বলল, 'কী সাংঘাতিক ব্যাপার, বলুন ত ঠাকুদা! এরপর হয়ত আমাকে ডেকে ওরা এজাহার দিতে বলবে!'

কিছুটা চিন্তা ক'রে বললাম, 'বলা যায় না, ডাক পড়তেও পারে। বিশেষ ক'রে তোমার ছাত্র যখন জানে—তার বাবা রোজ তোমাকে তাঁর ঘরে ডেকে নিয়ে যেতেন, তখন তোমার ছাত্রটিই হয়ত পুলিসকে এ ঘটনা জানাতে পারে!'

ভয় পেয়ে মিলন বলল, 'ওরে বাব্বাঃ, সে যে বড় ভীষণ ব্যাপার!'

সাহস দিয়ে বললাম, 'ভীষণের কি আছে। যা জান স্পষ্ট ক'রে বলবে; তোমাকে ত আর ওরা তাতে খুনী ব'লে সাব্যস্ত করবে না?'

এবারে একটুকাল মাথা নীচু ক'রে ব'সে থেকে মিলন বলল, 'এ ঘটনা দিবাকরবাবু হয়ত কিছুই জানেন না, তাঁর জানা দরকার। তা ছাড়া ওবাড়ীতে গিয়ে আমার পক্ষে আর টিউশনি করা চলে না। আপনি বরং আমার জন্যে এবারে ভাল দেখে একটা গানের টিউশন ঠিক ক'রে দিন ঠাকুদা!'

বললাম, 'গীষ্পতি পাল মারা গেলেও তাঁর পরিবার থেকে তোমাকে ত আর জবাব দেয় নি! তা ছাড়া এরকম একশ' টাকার টিউশনই বা সচরাচর কোথায় পাবে তুমি?'

অনুনয়ের কণ্ঠে এবারে মিলন বলল, 'ও টাকায় আমার দরকার নেই, আপনি অন্য কোথাও দেখুন।'

চিন্তা ক'রে দেখলাম—মিলনকে এই নিয়ে আর জোর করা চলে না। বাধ্য হয়ে তাই আবার কিছু একটা আশ্বাস দিয়ে তবে তাকে উপস্থিত মত বিদায় করতে পারলাম।

কিন্তু গীষ্পতি পালের মৃত্যুর ঘটনা সম্পর্কে নিজেকে সে এড়িয়ে নিতে চাইলেও একেবারে ছাড়া পেল না মিলন। কোর্টে গিয়ে এজাহার দিয়ে তবে সে মুক্তি পেল।

দিবাকর বসুর কাছে ঘটনাটা শেষ পর্যন্ত আর চাপা ছিল না। আমার ঘরে ব'সে চা খেতে খেতে বলল, 'এরকম একটা অদ্ভুত কেস ঘটবে জানলে আমিই কি সেখানে মিলনকে টিউটর ক'রে পাঠাতাম! এ ত আচ্ছা কাণ্ড দেখি।'

বললাম, 'তা যাক্। মিলন যেমন নিড়ি, তেমনি ভীরু টাইপের। তুমি বরং ওকে এবারে ভাল পরিবেশে একটা গানের টিউশন ধরিয়ে দাও। কাছে এসে দাদা ব'লে দাঁড়ায়, মুখের উপর কি ক'রে বলি যে, কিছু করতে পারব না।'

চায়ের কাপ নামিয়ে রাখতে রাখতে দিবাকর বলল, 'তোমাকে নিয়ে আর পারা যাবে না। দেখা যাক, কোথায় আবার কি করা যায়।'

এর পর আর খুব একটা ঘাপ্ টির মিলনের সঙ্গে আমার দেখা হয়েছে ব'লে মনে পড়ে না।

ততদিনে গানে সে চন্দনাকে অসাধারণ উন্নতি দেখিয়েছে। সেই সঙ্গে আরও একটা উন্নতি লক্ষ্য করেছে মিলন, তা হচ্ছে বনলতার দিক্ থেকে। সেই যে এক দিন নিজের হাতে চা পরিবেশন ক'রে গিয়েছিলেন, তার পর থেকে মিলনের কাছে তাঁর লজ্জা ক্রমেই কমে এল। শেষটায় এমন হ'ল যে, চন্দনার গান শেষ হবার পরেও অনেকক্ষণ তাঁর সন্তানের ছেলেমেয়েদের কেন্দ্র ক'রেই গল্পে কথায় মিলনকে আটকে রাখতেন বনলতা। মিলন চিরকালই খানিকটা ধর্মভীরু, গান-বাজনা ছাড়া সে কিছু কিছু মহাপুরুষদের জীবনীগ্রন্থও পাঠ করেছে এবং তা থেকে যে প্রাণরস পেয়েছে, তা লোককে বলতে পারলেই তার আনন্দ। এ রকম এক-একদিন গল্পের মুহূর্তে বনলতা বলেছেন, "স্বামীজী আর সিস্টারের কথা বলুন, শুনি।" সঙ্গে সঙ্গে সেই প্রসঙ্গেই কিছুক্ষণ আলোচনা ক'রে তবে উঠতে পেরেছে মিলন। কোনদিন আজগুবি সব গল্প ব'লে এমন হাসির সৃষ্টি করেছে যে, যে, বনলতা হাসতে হাসতে বিষম খেয়েছেন, চন্দনা উঠে গিয়ে জলের গ্লাস এনে নতুন-মা'র মুখের সামনে তুলে ধরেছে, তবে সেই বিষম খাওয়া থেমেছে।

এসব মুহূর্তে সদাশিববাবু বাইরের ঘরে মক্কেলদের নিয়ে ব্যস্ত থেকেছেন। তাঁর এই ব্যস্ততাই বনলতার পক্ষে পীড়াদায়ক হয়েছে। বয়সের তারুণ্যে মনের দিক্ থেকে স্বামীর সঙ্গে তিনি নিজেকে ভালো ক'রে মেলাতে পারেন নি, যাও বা পারতেন, সদাশিববাবুর বয়সের গাম্ভীর্যে ও কর্মব্যস্ততায় তাও হয়ে ওঠে নি। এজন্যে মনের দিক্ থেকে একটা মস্ত বড় অভাব ছিল বনলতার; অথচ সেটুকু কাউকে খুলে বলবার সুযোগ ছিল না। মিলন যখন গল্প ব'লে হাসির সৃষ্টি করত, আনন্দ পেতেন বনলতা। আর সে আনন্দ শুধু তাঁর একার ছিল না, ছিল একমাত্র সদাশিববাবু ভিন্ন এবাড়ীর প্রত্যেকটি প্রাণীর। অথচ সেই আনন্দই একদিন এবাড়ীতে বজ্রাঘাত ডেকে আনল।

সেদিন, যে কারণেই হোক্, মক্কেলদের সঙ্গে নানারকম বচসায় মনটা বিক্ষুব্ধ ছিল সদাশিববাবুর। যখন তিনি কাজ সেরে ভিতর-বাড়ীর সিঁড়িতে এসে পা দিলেন, একটা উচ্ছ্বসিত হাসির রোলে সারা ঘর তখন ভ'রে গেছে। একবার গলা খাঁকারি দিয়ে নিজের উপস্থিতি ঘোষণা করলেন সদাশিববাবু। সঙ্গে সঙ্গে ঘরের খোলা জানালা দিয়ে চোখে পড়ল—ছুটছাট্ যে যার মত এদিকে-ওদিকে স'রে গেল, এমন কি বনলতা অবধি। যখন তিনি ঘরে এসে দাঁড়ালেন, দেখলেন—মিলন শুধু একা মেঝের ফরাসের উপর ব'সে আছে। জিজ্ঞেস করলেন, 'এত বড় হাসিটা হঠাৎ যে থেমে গেল, ওরা সব গেল কোথায়?'

স্বভাবজাত সহজ কণ্ঠেই মিলন বলল, 'আপনাকে দেখলাম ওদের বড় ভয়, যেই আপনি এসেছেন বুঝেছে, অমনি ছুটছাট্ পালিয়েছে।'

সদাশিববাবু এবারে হঠাৎই কেমন চীৎকার ক'রে উঠলেন, 'ছোট বউ, একবার এঘরে এস, কথা আছে।'

নম্র পায়ে বনলতা এসে দরজার পাশে দাঁড়ালেন।

মিলন ভাবল—হয়ত তাঁদের পারিবারিক কোন কথা আছে। তাই এবারে উঠতে যাচ্ছিল সে।

হঠাৎ সদাশিববাবু তেমনি চীৎকারের কণ্ঠেই বললেন, 'বিয়ে হয়ে অবধি কই আমি ত কোনদিনই তোমার মুখে হাসি দেখি নি ছোট বউ, তা মাষ্টারের সঙ্গে ত বেশ প্রাণখুলে হাসতে পার। বলি, কচিকাঁচা ছোকরাদেরই যদি পছন্দ ত যাও না, মাষ্টারকে নিয়ে গিয়েই ঘর বাঁধো। বেলেল্লাপনারও একটা সীমা আছে।'

মিলন ততক্ষণ এতটা বুঝতে পারে নি। এবারে লজ্জায় ঘৃণায় ব'লে উঠল, 'ছিঃ, ছিঃ, ছিঃ, এ আপনি কি বলছেন সদাশিববাবু, এতখানি নোংরা মন আপনার, জানতাম না!'

সদাশিববাবু বললেন, 'যদি এমনি ক'রে হঠাৎ এসে উপস্থিত না হতাম, তবে আরও জানতেন না। তাই ত বলি, ছোট বউয়ের মুখে এমন হাসি কোত্থেকে এল।'

মিলন বলল, 'জীবনে আপনার অভিজ্ঞতার শেষ নেই জানি, আর আপনিই বলেছিলেন—আপনার কোন কমপ্লেক্স নেই, কিন্তু আজ দেখছি—সে শুধু মুখে। নিজের ছেলেমেয়েদের শুনিয়ে নিজের স্ত্রীকে কোন শিক্ষিত ব্যক্তি এ ভাবে কিছু বলতে পারে, আমার ধারণা ছিল না। কথাটা যখন আমাকে নিয়েই উঠেছে, তখন বোধ করি কাল থেকে আমার আর এখানে আসা উচিত হবে না।'

দরজার পাশ থেকে এবারে কম্পিতকণ্ঠে বনলতা বললেন, 'না, না, আপনি আসবেন মিলনবাবু, আপনার মুখ থেকে তবু দুটো জ্ঞানের কথা শুনতে পাই; আপনি না এলে চন্দনার আর গান শেখা হবে না।'

সদাশিববাবু বললেন, 'চন্দনা কাল থেকে শুধু পড়বে, গান আর শিখবে না। আপনাকে আর দরকার হবে না মিঃ চৌধুরী।'

সারা মনে দারুণ একটা অপমানের বোঝা নিয়ে তাঁর ঘর থেকে সেই রাত্রে বেরিয়ে এল মিলন।

আমার সামনে এসে যখন সে দাঁড়াল, মুখে তার বিষণ্ণতার ছায়া।

জিজ্ঞেস করলাম, 'কি, শরীর ভালো নেই নাকি?'

মিলন বলল, 'না, না, শরীর ঠিকই আছে।'

বললাম, 'তবে আর কি, এস, চা খেতে খেতে বসে গল্প করি।"

আপত্তি তুলে মিলন বলল, 'এখন আর চা খেতে ইচ্ছে করছে না ঠাকুদা। আপনাকে শুধু জানাতে এলাম, সদাশিববাবুর বাড়ীর টিউশনিটাও আমার গেছে।'

বিস্ময়ের কণ্ঠে তার মুখের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে বললাম, 'বল কি?'

উত্তরে এবারে আগাগোড়া সমস্ত বিষণ্ণতা দূর ক'রে মিলন বলল, 'টিউশনিটা গেছে, তাতে ক্ষতি ছিল না, কিন্তু মনে মনে যা আশঙ্কা ছিল, এবারে তাই হয়েছে। বাড়ীতে এসে শুনলাম—ললিতার সঙ্গে তাদের স্কুলের সেক্রেটারীর ম্যারেজ রেজিষ্টারি হচ্ছে। এবারে আমি কি করব, তাই ভাবছি ঠাকুদা।'

একটা সম্ভব সান্ত্বনার কণ্ঠে বললাম, 'আবার তা হ'লে দিবাকরের শরণাপন্ন হতে হয়।'

মিলন বলল, 'আপনাকে আর দিবাকরবাবুকে অনেক জ্বালিয়েছি, আর নয়। ঠিক করেছি—টিউশনি আমি আর করব না।'

জিজ্ঞেস করলাম, 'তা হলে মাকে নিয়ে বাড়ীভাড়া দিয়ে চালাবে কি ক'রে?"

এবারে আমার মুখের উপর কেমন একটা ঔদাস্যের দৃষ্টি তুলে ধ'রে মিলন বলল, 'কোনভাবে চ'লে যাবেই।' তার পর একটু কালও আর অপেক্ষা না করে সোজা আমার ঘর থেকে সে বেরিয়ে গেল।

গলা ছেড়ে ডেকে বললাম, 'মিলন, শোন, শুনে যাও।'

কিন্তু আর তার সাড়া পাওয়া গেল না।

হিম-মণ্ডলের হিরণ্য-ভূমি

[জুলফিকার]

ভূগোলে লেখে দেশটার নাম আলাস্কা! স্থানীয় এস্কিমোরা বলে, 'al-ay-ok sa'। পৃথিবীর দুইটি বৃহত্তম মহাদেশ এশিয়া ও আমেরিকাকে পৃথক রেখেছে বেরিং প্রণালী। এধারে সাইবেরিয়া ওধারে আলাস্কা। সাইবেরিয়া অতিক্রম ক'রে রুশেরা অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে এখানে এসে দেশটাকে তাদের বিশাল সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করেছিল, কিন্তু এই উষর তুষার-ঢাকা দেশটাকে দখলে রেখে আর্থিক কোনই লাভ নেই দেখে, ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দে মাত্র চৌদ্দ লক্ষ চল্লিশ হাজার পাউণ্ডের বিনিময়ে ওটাকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের হাতে তুলে দেয়। সে আমলের রুশ কর্তৃপক্ষেরা ভেবেছিলেন তাঁরা বড় জেতা জিতলেন, কিন্তু আজ একশো বছর পর বিগত দিনের ভুলের কথা ভেবে রাশিয়ানেরা অনুশোচনায় দগ্ধ হচ্ছে।

মার্কিনেরা যখন রাশিয়ার কাছ থেকে দেশটাকে কিনে নেয়, সে সময় যুক্তরাষ্ট্রের সেক্রেটারী অব ষ্টেট্স্ ছিলেন হেনরী সিওয়ার্ড। তিনি মনে করেছিলেন, খুব সস্তায় দাঁও মারলাম এবং ভাবতেও পারেন নি যে, এই ব্যাপারটিকে কেন্দ্র করে ক্রোধ ও প্রতিবাদ সমীভূত হয়ে উঠবে।...'কতকগুলো গ্লাসিয়ার ও বরফ-ঢাকা পতিত জমির (waste) জন্য এই অর্থব্যয়ের কি সার্থকতা ছিল?' সিনেটরদের অনেকেই এই প্রশ্ন তুললেন। ঠাট্টা করে অনেকে আবার অনেক রকম উদ্ভট নামও দিয়েছিলেন দেশটার। কেউ বললেন ওটার নাম থাক, 'Seaward's folly', কেউ নাম রাখলেন 'walrusia' (walrus = সিন্ধুঘোটক), কেউ বা রাখলেন 'Polaria', কেউ নামকরণ করলেন 'বরফ-প্যাঁটরা (Ice box)।

বছর ত্রিশ বাদ সবাই বুঝল বাস্তবিক মার্কিন জাতির কী উপকারটাই না করে গেছেন সিওয়ার্ড। ক্লনডাইকের

স্বর্ণখনি আবিষ্কার হবার অল্পদিনের মধ্যেই দেখা গেল ক্রয়মূল্যের পঞ্চাশগুণ টাকা উঠে এসেছে। Ice box তখন হয়ে উঠেছে treasure chest।

বেরিং সাগরের উপকূলে নোম ও মধ্য আলাস্কায় ফেয়ারব্যাঙ্কস্ স্বর্ণ অঞ্চল, এ ছাড়া ইউকন ও তার উপনদীর অববাহিকায় অনেক স্থানে স্বর্ণের সন্ধান পাওয়া গেছে। সোনার খনিগুলোর কাজ অবশ্য সব জায়গায় এখনও পুরোপুরি চালু হয় নি।

কিছুদিন পর এখানে তাম্রখনিও আবিষ্কৃত হ'ল, আর তামা থেকে যা অর্থ হতে লাগল, তা সোনার দামকেও ছাড়িয়ে গেল।

অর্থনৈতিক দিক্‌টা বাদ দিলেও শুধু সামরিক দিক্ দিয়ে এদেশটার গুরুত্ব যথেষ্ট। প্রশান্ত মহাসাগরের অপর পারের শক্তিমান রুশ ও জাপানের বিরুদ্ধে লড়াই ও তাদের আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষার জন্য এদেশের মত এমন চমৎকার নৌ- ও বিমানঘাঁটি আর কোথায় পাওয়া যাবে?

ক্রমে জানা গেল এখানকার ভূস্তরে পর্য্যাপ্ত কয়লা ও পেট্রোলিয়াম সঞ্চিত আছে। উমিয়াতের চতুষ্পার্শ্বে পঁয়ত্রিশ হাজার বর্গমাইল পরিমিত স্থানব্যাপী সম্ভাবিত তৈলখনির জন্য জরীপের কাজ চলল আর এই জরীপের সাহায্যে জায়গাটার একটা নির্ভরযোগ্য ম্যাপও প্রস্তুত করা হ'ল। এই গোটা তৈল-ভাণ্ডার এখন ইউ. এস. নৌবাহিনীর জন্য সংরক্ষিত রয়েছে। তেল ও কয়লা ছাড়া সন্ধান পাওয়া গেছে আরও অনেক মূল্যবান্ খনিজ পদার্থের—লোহা, সীসা, টিন, জিপসাম, পারদ, এন্টিমনি, বিসমাথ, টাংষ্টেন ও প্ল্যাটিনামের। এ বাদে পাহাড়ের গহ্বরে পাওয়া গেছে মার্ব্বেল আর চুনা পাথর। হিমশীতল জলে মিলে স্যামন (salmon) ও হালিবাট মাছের ঝাঁক, ঝিনুক আর সীল, যাদের চামড়া খুবই মূল্যবান্ সামগ্রী। ফি-বছর সামুদ্রিক মাছ ও প্রাণী থেকেই গড়ে আয় হচ্ছে কমাধিক আশী লক্ষ পাউণ্ড অর্থাৎ প্রায় সাড়ে দশ কোটি টাকা।

বনে আছে অগণ্য পাইন ও সীডার গাছ। এদের গায়ে আজও বিশেষ কুঠারাঘাত পড়ে নি। বহু বছর ধ'রে এরা আমেরিকান সংবাদপত্রের কাঁচা মালের ক্রম-বর্দ্ধমান চাহিদা মিটিয়েও, পৃথিবীর অন্যান্য অনেক দেশের কাগজ কলে pulp সরবরাহ করতে পারবে।

আলাস্কায় যে পরিমাণ চাষের জমি আছে, তাতে বছরে এক কোটী লোকের অন্নসংস্থান হতে পারে। ১৯৪৯ সালে এই দেশের জনসংখ্যা ছিল মাত্র পঁচাশী হাজার, ১৯৫২ সালের আদমসুমারী অনুযায়ী দেড় লক্ষ। এর মধ্যে শতকরা ২৫ জন রেড ইণ্ডিয়ান ও এস্কিমো। এস্কিমোরা রেড ইণ্ডিয়ানদের সমগোত্রীয় নয়, এরা হচ্ছে মোঙ্গল।

সাত হাজার বর্গমাইল ব্যাপী কৃষিযোগ্য জমি এখনও অনাবাদী পড়ে এবং মোট ৩৬৬,০০০,০০০ একর জমির মধ্যে, মাত্র ২,৪০০,০০০ একর জমি আজ পর্য্যন্ত যথাযথ ভাবে জরিপ করা হয়েছে।

এখানকার জমি বেশ উর্ব্বর। গ্রীষ্মকালে আঠারো ঘণ্টার দিন। পর্য্যাপ্ত রৌদ্রালোকে বীট, গাজর, বাঁধাকপি প্রভৃতি প্রকাণ্ড আকার ধারণ করে—অবিশ্বাস্য অতিকায় আকৃতি।

আলাস্কার অধিকাংশ ভূভাগই মেরুবৃত্তের অন্তর্বর্ত্তী বা নিকট সন্নিহিত। বৎসরের বেশীর ভাগ সময় এখানকার তাপাঙ্ক শূন্য ডিগ্রীর (সেন্টিগ্রেড) নীচে থাকে। স্বল্পায়ু বসন্ত ও দীর্ঘ রৌদ্রালোকিত দিবসে এর বনস্থলী ও তৃণের প্রান্তর অজস্র পুষ্পসম্ভারে সুশোভিত হয়ে ওঠে।

আলাস্কার রাজধানী জুনো (Juneau)। ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দে যখন এদেশে স্বর্ণ-সন্ধানীদের হুড়োহুড়ি (gold rush) পড়ে যায় তখনই এ সহরটির পত্তন হয়। ১৯২০ সালে এর বাসিন্দা ছিল মাত্র সাত হাজার। প্রচণ্ড শীত ও অসহনীয় জলবায়ুর প্রকোপে অনেকেই এ স্থান পরিত্যাগ করে আসতে বাধ্য হয়। ১৯৩০ সালে এর লোকসংখ্যা ক্রমে মাত্র চার হাজারে দাঁড়ায়। ১৯৪১ সালে হ'ল ছয় হাজার, বর্ত্তমানে দশ হাজারের কাছাকাছি।

আলাস্কার হিমশৈলে আচ্ছন্ন ভূমির পরিমাণ সমগ্র সুইজারল্যাণ্ডের সমান, অর্থাৎ প্রায় ষোল হাজার বর্গ মাইল। পূর্ব্ব-পশ্চিমে প্রসারিত তিনটি সমান্তরাল গিরিশ্রেণী এণ্ডিকট (রকি), আলাস্কা রেঞ্জ ও সেণ্ট ইলিয়াস আল্পস্—গড়ে উচ্চতা তিনটিরই ১৫,০০০ ফিট। আলাস্কা রেঞ্জের মাউণ্ট ম্যাকীন্‌লে উত্তর আমেরিকার সর্ব্বোচ্চ শৃঙ্গ; এর উচ্চতা ২০,৩০০ ফিট। সেণ্ট ইলিয়াস আঠারো হাজার ফিট উঁচু। আলাস্কার অনেকগুলি আগ্নেয়গিরি আছে, তবে ভরসার কথা বহুদিন হতে তারা সুপ্ত (dormant) অবস্থায় আছে।

আশ্রয়

শ্রীনারায়ণ চক্রবর্তী

আকাশের আঙিনায় তারার বাতিগুলো জ্বলে উঠবার একটু আগে ঝপাস শব্দ ক'রে নৌকার গলুইটা বিলের ধারের নরম মাটিতে গেঁথে গেল। গলুই-এর কাছেই কাঠের তক্তার ওপর লগি হাতে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল ইয়াদালি। হঠাৎ নৌকা থামার ধাক্কাটা সামলে নিয়ে লগিটা নরম কাদায় গেঁথে রেখে লাফ দিয়ে পড়ল সমুখের নরম মাটিতে। নৌকার [illegible] জলের আন্দোলন থামে নি তখনও, অল্প অল্প কাঁপছে নৌকাটা। মাটিতে নেমেই গলুইটা দু'হাতে চেপে ধ'রে একটানে প্রায় আধ-খানা নৌকা ডাঙায় তুলে নিল ইয়াদালি, তারপর বিলের প্রবল বাতাসে কম্পিত কালো দাড়িভর্তি মুখ ফিরিয়ে বলল, "আসেন ডাক্তারবাবু, ডাইন দিকে নামেন—কাদা লাগবো না—"

নতুন নিউকাট জুতোয় যেন কাদা না লাগে, অতি সন্তর্পণে কোঁচা সামলে ডাঙায় নামে ডাক্তার অধীর বোস। পেছনে পেছনে চেক চেক লুঙ্গি পরা, খালি গা কাসেম আলি নেমে আসে কালো রং-এর ডাক্তারি ব্যাগটা হাতে নিয়ে।

মস্ত তাল গাছটার বাঁ-পাশ দিয়ে, দু'ধারের পাট গাছের অরণ্যের ভেতর দিয়ে, আলের সরু পথটা দিয়ে এগিয়ে চলল ওরা তিন জন। অধীরের মাথা ছাড়িয়ে আরও আধ হাত উঁচু পাট গাছগুলো যেন একটা দুর্ভেদ্য যবনিকার মত সমস্ত পৃথিবী ঢেকে দিল ওদের চোখের সুমুখ থেকে। পাট গাছের বড় বড় পাতায় জমা জলবিন্দু-গুলো অধীরের [illegible] পাঞ্জাবী আর ধুতি দিল ভিজিয়ে। ক্ষণ-পূর্বের এক পশলা বৃষ্টির স্মৃতি সর্বাঙ্গে বহন ক'রে অসংখ্য পাট গাছের ঊর্ধ্বভাগ আন্দোলিত ক'রে বেলাই বিলের বুক-জুড়ানো হাওয়া বয়ে যাচ্ছে আপন মনে।

এখানে যদি কাউকে মেরে পুঁতেও রাখে মাটিতে কাক-পক্ষীতেও টের পাবে না। অত্যন্ত উর্বর জমিতে আরও একটু সারের সঞ্চার হবে শুধু।

ডাইনে বাঁয়ে দু'টি পুকুর পদ্মপাতায় ঢাকা। তার পর [illegible] ফাঁকা মাঠ। নধর-পুষ্ট গরুগুলো ফিরে যাচ্ছে গোয়ালে। তারও পরে পাটকাঠির বেড়া দিয়ে ঘেরা ছোট আঙিনায় ঢুকল ওরা।

ব্যাগটি মাটিতে রেখে ভেতর থেকে একটা ভাঙা চেয়ার নিয়ে এল কাসেম।

"বসেন ডাক্তারবাবু—" ইয়াদালির পানের ছোপ-লাগা দাঁত ক'টা কালো দাড়ির জঙ্গল ভেদ করে একবার ঝিলিক দিয়েই মিলিয়ে যায়।

চুপচাপ চেয়ারে ব'সে একটা সিগারেট ধরায় অধীর। ইয়াদালি চলে গেল অন্দরে—রুগী দেখবার ব্যবস্থা করতে।

পাঁচ-সাতটা মুরগী এক পাল বাচ্চা নিয়ে ধান খুঁটে খাচ্ছে সমস্ত আঙিনাময়। কক্ কক্ শব্দ করছে ওরা। অধীরের পেছন দিকে খড়ের চালের তিন-চারটি ঘর। মাটির দেওয়াল, ছোট ছোট জানলাগুলি চ্যাটাই-এর আবরণে ঢাকা। তারই ফাঁক দিয়ে ক্ষীণ আলোকের কয়েকটা বাঁকা-চোরা রশ্মি মাটিতে এসে পড়েছে।

বাইরে বেশ ঘন হয়ে নেমেছে সন্ধ্যা-উত্তর অন্ধকার।

ধোঁয়ায় কালো লণ্ঠনটি হাতে ইয়াদালি বেরিয়ে আসে, অধীরের সুমুখে এসে দাঁড়িয়ে বলে—"আসেন ডাক্তারবাবু—"

পাট-শোলার বেড়ার ওপারে এই আঙিনারই ক্ষুদ্রতর অংশ। এখানে-ওখানে উচ্ছিষ্ট আর ভাঙা ডিমের খোলা ছড়ান। ছাই ছাই রং-এর একটা বেড়াল এটা-ওটা ছোঁক ছোঁক করে বেড়াচ্ছে।

পূব-দুয়ারী বড় ঘরটায় ঢুকল ওরা। দেয়াল-ঘেঁষা নড়বড়ে তক্তাপোশের ওপর শুয়ে আছে রোগী নয়, রোগিণী। লম্বা ঘোমটায় মুখখানা ঢাকা।

নাড়ী ধরে অধীর। দু'একটা প্রশ্ন করে। মৃদু কণ্ঠের জবাব শোনামাত্র তার হাত থেকে স্খলিত হয়ে পড়ে রোগিণীর জ্বরতপ্ত হাতখানি।

অধীরের মনের বিস্মৃতির কালো পর্দাটা ন'ড়ে উঠল যেন।

অধীরের একচেটিয়া প্র্যাকৃটিস এই সব মুসলমান-প্রধান গ্রামগুলোতে। তা ছাড়া পাকিস্থান হবার পর

ক'ঘর হিন্দুই বা আছে এ তল্লাটে! মুসলমান মেয়েদের বাক্যবিন্যাস আর উচ্চারণভঙ্গি তার অতি পরিচিত। কিন্তু এ মেয়েটির কথা ত মোটেই তাদের মত নয়!

মনে যদি বা সন্দেহ জাগল, বাইরে সেটা প্রকাশ হতে দিল না অধীর। পাশ ঘেঁসে দাঁড়িয়ে আছে ইয়াদালি শেখ, বাঘের মত দু'চোখ দিয়ে লক্ষ্য করছে অধীরের প্রত্যেকটি আচরণ।

রোগ সামান্য। অল্পক্ষণেই পরীক্ষা শেষ হয়ে গেল।

ফিরবার সময়ে—ইয়াদালি যখন ঘুরে দাঁড়িয়েছে দরজার দিকে মুখ করে, তখন শেষ বারের মত রোগিণীর মুখের দিকে একবার তাকাল অধীর। আর ঠিক সেই সময়েই পর্দানশিনীর নিরাভরণ হাত দুটি উঠে মুখের ঘোমটাটি সরিয়ে দিল কপালের ঊর্দ্ধে।

কিন্তু অধীরের হৃৎস্পন্দন স্তব্ধ করে দেবার জন্য এটুকু সময়ই যথেষ্ট।

কি ক'রে যে বাইরে এল, কি ক'রে যে ভিজিটের টাকা পকেটে নিয়ে নৌকায় এসে বসল ফের, মনে করতে পারে না অধীর। প্রেসক্রিপশনখানা লিখে দিল যেন স্বপ্নের ঘোরে।

পাশে বসে যেন একটি সুকুমার মুখের মস্ত চোখ দুটো তার সমস্ত চৈতন্য আচ্ছন্ন করে রইল।

"আদাব ডাক্তারবাবু—" কাল রং-এর ডাক্তারি ব্যাগটা নৌকার মাঝখানে সাবধানে বসিয়ে ডান-হাতের কয়েকটা আঙুল কপালে ঠেকিয়ে ইয়াদালি বলে, "ভয়ের কিছু দেখলেন না ত বিবিজানের?"

"না না, চিন্তার কোন কারণ নাই"—গ্রামোফোন রেকর্ডের মত নিষ্প্রাণ আবৃত্তি করে অধীর—"এই পুরিয়াটা দিনে চাইরবার খাওয়াইবাইন। দুই চাইর দিনের মধ্যেই সব চাইড়া যাইবো—"

লগি ঠেলে বৈঠা ধরেছে কাসেম আলি। দেলাই বিলের মাঝখান দিয়ে নৌকা চলেছে। দু'দিকে বোরো ধানের ঘন সবুজ গালিচাটি দিগন্তে গিয়ে মিশেছে। দূরে দূরে দু'একটি বাতি ঘন অন্ধকারে দীপের মত ছোট ছোট গ্রামগুলির অস্তিত্ব ঘোষণা করছে। জল-ছোঁয়া শির-শিরে হাওয়া অধীরের চুল নিয়ে খেলা করছে—কিন্তু তার মস্তিষ্কের আগুন নেভাতে পারছে না।

পাকিস্তান হবার পর সেই প্রথম দাঙ্গা। এর আগে এখানে-ওখানে ছুটকো-ছাটকা যা কিছু হয়েছে তা সব ছিল এর তুলনায় নস্যি। এ দাঙ্গার আগুন ছড়িয়ে পড়ল শহর থেকে গ্রামে, পরগণায় পরগণায়। পুবাইলও অক্ষত রইল না।

পুবাইলের মস্ত জমিদার হৃষীকেশ চৌধুরী। তাঁর পূর্বপুরুষদের দাপটে বাঘে গরুতে এক ঘাটে জল খেত বলে শোনা যায়। প্রজারা প্রায় সবাই মুসলমান, কিন্তু তবু পীরের চেয়ে কম সম্মান পেতেন না তাঁরা। এ হেন বংশের হৃষীকেশ চৌধুরী পাকিস্তান হবার পর একেবারে ঢোঁড়া সাপ।

ভোর না হতেই হাজার হাজার লোক জমায়েৎ হয় তাঁর বিরাট প্রাসাদের সিংহদরজায়। বেগতিক দেখে দেউড়ির দারোয়ানরা কোথায় যেন গা ঢাকা দিল। ফটক ভেঙে রৈ রৈ শব্দে লোক ঢুকল ভেতরে। সবার হাতেই লাঠি, টাঙ্গি বা বল্লম, কারুর হাতে জলন্ত মশাল।

আর দেরীও লাগল না, শেষ হয়ে গেল সব। আকাশ-ছোঁয়া অগ্নিশিখার দীপ্ত দাহে প্রভাত-সূর্যের মহিমাও যেন ম্লান হয়ে গেল।

বাড়ী-ঘর, লোকজন আর দাঙ্গার ভয়ে অন্য গ্রাম থেকে পালিয়ে-আসা আশ্রয়প্রার্থীরা যে কোথায় গেল কেউ জানতে পারল না।

শুধু একজনের কথা জানতে পারল অধীর ডাক্তার। দাঙ্গাবাজরা যত হাঙ্গামা করুক, ডাক্তারের গায়ে আঁচড়টি লাগতে দিল না। এ অঞ্চলে অধীর ডাক্তারের মত জমাট প্র্যাকটিস আর কোন ডাক্তারের নেই। তার এই পেশাই দুর্ভেদ্য বর্মের মত সব আঘাত থেকে রক্ষা করল তাকে।

জমিদার বাড়ী লুটের দিন ব্রাহ্মণ-পাড়া গিয়েছিল একটা জরুরী কল-এ। ফিরতে ফিরতে রাত হয়ে গেল। পুবাইল বাজারে নৌকা থেকে তাকে নামিয়ে দিয়ে ফিরে গেল রোগীর বাড়ীর লোকজন।

সেদিন হাটবার নয়। জনহীন-পরিত্যক্ত প্রকাণ্ড বাজারটি যেন একটা ভুতুড়ে বাড়ীর মতই অবাস্তব। বড় বড় চালাগুলোকে আশ্রয় ক'রে তরল নিকষ অন্ধকারে যেন জমাট বেঁধে আছে। তারই পাশ দিয়ে এগিয়ে নির্জ্জন কাঁচা রাস্তা দিয়ে স্টেশনের পথ ধরল অধীর। স্টেশনের কাছেই তার বাড়ী।

নির্জ্জন পথের দু'পাশে মস্ত মস্ত গাছের বিশাল ছায়া প'ড়ে অন্ধকার রাস্তাটিকে আরও অন্ধকার ক'রে তুলেছে। দিগন্ত রেখার অল্প ওপরে-থাকা বাঁকা চাঁদের ক্ষীণ আলোটুকুও যেন শুষে নিয়েছে ওরা। মাঝে মাঝে মটুখুইল্যার ঝোপ, বেত-বন আর বাঁশ-ঝাড়।

এমনি একটা বাঁশ-ঝাড়ের কাছাকাছি আসতেই পা দুটো আপনা থেকেই থেমে গেল অধীরের।

কান খাড়া ক'রে দাঁড়াল সে চুপ ক'রে।

ঠিক। ভুল হয় নি তার। মৃদু গোঙানির শব্দ থেকে থেকে ভেসে আসছে বাঁশ-ঝাড়ের নিবিড় অন্ধকারের ভেতর থেকে।

এক পা এক পা ক'রে এগিয়ে গেল অধীর। আন্দাজ ক'রে টর্চের আলো ফেলল।

চোখ আর ফেরাতে পারল না সে।

প্রস্ফুটিত পদ্মের জীবন-রসবাহী মৃণালটি আধাআধি কেটে ফেললে তার যে দশা হয়, এ মেয়েটিরও ঠিক সেই দশা। তবু কি আশ্চর্য রূপ তার। কাদা মাখা হীরকখণ্ডের মত বনতল আলো করে রয়েছে।

আরও কাছে এগিয়ে গেল অধীর।

চোখ দুটো বোজা, মৃতের মত বিবর্ণ মুখ, মাঝে মাঝে বিশুষ্ক ওষ্ঠাধর থেকে মৃদু গোঙানির শব্দ উঠছে। চিৎ হয়ে পড়ে আছে মেয়েটি। পরণের দামী শাড়িটা জায়গায় জায়গায় ছেঁড়া আর রক্তমাখা। অধীরের মনে হ'ল, যেন তার সিঁথির জ্বলজ্বলে সিন্দুরটুকুই পরিব্যাপ্ত হয়েছে তার সমস্ত শাড়িতে।

উবু হয়ে ব'সে নাড়ী দেখল অধীর। চোখ টেনে তার ভেতরটা দেখল। তার পর তার বিপর্যস্ত শাড়িটা ঠিক ঠাক ক'রে অতি সন্তর্পণে তাকে তুলে নিয়ে বাড়ী এল অধীর।

শোবার ঘরে বিছানায় শুইয়ে জলের ঝাপ্টা দিয়ে দিয়ে চেতনা ফিরিয়ে আনল মেয়েটির। ইন্‌জেকশন দিল দুটো, কয়েক ফোঁটা ভাইনামগোলিশিয়া ঢেলে দিল মুখে।

ক্রমে ক্রমে আচ্ছন্নতা কেটে যায়, জ্ঞান ফিরে পেয়ে চোখ মেলে অধীরকে সামনে দেখেই তাড়াতাড়ি উঠে বসতে চায় মেয়েটি।

"উইঠো না, উইঠো না"—ব্যস্ত হয়ে অধীর বলে, "এখনও খুব দুর্বল তুমি—"

কয়েক মুহূর্ত নিশ্চেষ্ট হয়ে থেকে এদিক্-ওদিক্ তাকায় মেয়েটি, ক্লান্ত স্বরে বলে, "আমি কোন্‌খানে? আপনি কে? এইখানে আইলাম কেমনে?"

"আমি অধীর বোস, রাস্তায় অজ্ঞান পাইয়া তোমারে তুইলা আনছি আমার ঘরে।"

"অধীর বোস? ডাক্তার?" ভ্রূ কুঁচকে মেয়েটি বলে। "হ, হ,—চেন না'ক আমারে?" মেয়েটির মুখের ওপর ঝুঁকে অধীর বলে, "কিন্তু তোমারে ত চিনলাম না?"

অশ্রু গড়িয়ে পড়তে থাকে দু'চোখ থেকে, অসীম মানসিক যন্ত্রণায় ছটফট করতে থাকে মেয়েটি।

অধীরের সুচিকিৎসায় আর শুশ্রূষায় দিন-তিনেকের মধ্যেই চাঙ্গা হয়ে ওঠে মেয়েটি। ফুটে ওঠে তার রূপধারার মত রূপ। আস্তে আস্তে তার দুর্ভাগ্যের ইতিহাসটুকু সংগ্রহ করে অধীর।

জমিদার হৃষীকেশ চৌধুরীর ছোট ছেলের বউ এই বেলা। অনেক খুঁজেপেতে রূপসী বউ ঘরে এনেছিলেন হৃষীকেশ। সে বিয়ের ভোজের কথা আজও মনে আছে অধীরের।

দাঙ্গা হাঙ্গামার পুরো ছবিটি ফোটাতে পারল না বেলা। তবু যেটুকু বলল তা শুনেই অধীরের শরীরের রক্ত টগ্‌বগ্ করতে থাকে। প্রত্যেকটি সক্ষম পুরুষকে মেয়েদের চোখের সুমুখে দা, টাঙ্গি দিয়ে কুপিয়ে মেরেছে গুণ্ডারা, তার পর ভাগ ক'রে নিয়ে গেছে মেয়েদের।

কিন্তু বেলার বেলায় ঘটল ব্যতিক্রম। পর পর অনেকে মিলে বেলার নারীত্বের চরম অবমাননা ঘটাবার পর কে তাকে দখল করবে এ নিয়ে ওদের নিজেদের মধ্যে লেগে গেল ঝগড়া। সে মামলা মিটবার আগেই চারদিকে রব উঠল—"পুলিস—পুলিস।"

বেলাকে একটা ঝোপের ভেতর ফেলে দিয়ে পালিয়ে গেল নরপশুর দল, আর তার একটু পরেই ভগবৎ-প্রেরিত দূতের মত আবির্ভাব হ'ল অধীরের।

দু'চোখ-ভরা কৃতজ্ঞতা নিয়ে অধীরের মুখে তাকায় বেলা। সে সময়ে অধীর তাকে উদ্ধার না করলে আরও যে কত দুর্গতি হ'ত তার তা কল্পনা ক'রে ভয়ে শিউরে ওঠে সে।

কয়েক দিনের মধ্যেই অধীর লক্ষ্য করে যে, ভিন্ গাঁয়ের কয়েকটি মুসলমান ছোকরা পুবাইলে এসে উদ্দেশ্যবিহীন ভাবে ঘোরাঘুরি করছে, শিকারী কুকুরের মত কিসের যেন সন্ধান করছে। ব্যাপার বুঝতে আর বাকী থাকে না অধীরের। বেলাকে পাবার জন্য হন্যে হয়ে উঠেছে ছোকরাগুলো। যদি একবার ঘুণাক্ষরেও জানতে পারে যে বেলা বর্তমানে তারই আশ্রয়ে আছে তা হ'লেই ত সর্বনাশ!

আতঙ্কে রাত্রে ঘুম হয় না অধীর ডাক্তারের। বহুদিন বিপত্নীক সে। সংসারে এক ভোলার মা ছাড়া আর কেউ নেই তার। তবু প্রাণ আর সম্পত্তির মায়া বড় বেশী অধীর ডাক্তারের।

আস্তে আস্তে সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে ওঠে দেলা। নতুন জীবনযাত্রার প্রণালীতেও অভ্যস্ত হয়ে ওঠে সে। কিন্তু ভাবনায় পড়ে অধীর। কোথায় কার কাছে পাঠাবে তাকে? আর এই নির্জন বাড়ীতেই বা কি ক'রে সম্পূর্ণ অনাত্মীয়া তরুণীকে রাখবে সে? মেয়ে ত নয়, এ যে আগুনের ফুলকি। কখন প্রবল হ'য়ে [illegible] কে জানে! চারদিকের খবর থেকে রোজই নতুন নতুন দাঙ্গা আর লুটের খবর আসছে, এর মধ্যে দেলাকে পথে বার করাও বিপজ্জনক।

ভয়ে নিজের ঘর থেকে বার হয় না দেলা। জানালার ধারে হাঁটু বন্ধ ক'রে ঘরের অন্ধকার কোণে ব'সে ব'সে আকাশের দিকে চেয়ে থাকে। সীমাহীন আতঙ্ক তার দুচোখ থেকে ঘুম কেড়ে নিয়েছে। [illegible] আর শান্তির নিকেতনটি আগুনে-পুড়ে ছাই হয়ে গেছে চিরদিনের মত, কিন্তু [illegible] আর মনে [illegible] ভাবনীতিহীন [illegible] কেন তাকে [illegible] খড়কুটোর মত [illegible]।

[illegible] নিজেদেরই [illegible] বুঝে নিয়েছে দেলা [illegible] সবই শুধু [illegible] ওপরেই নির্ভর করছে [illegible]। [illegible] আর [illegible] দেশ [illegible] নিয়েছে [illegible] নিশ্চিত শান্তির বাসা [illegible]। কিন্তু পৃথিবীর রূপ, আপন বুদ্ধিগুলি [illegible] সামনে [illegible] শিশিরকণার মত।

আর ঠিক এই কথাগুলিই [illegible] অধীর। তার চারদিকে ঘিরে রয়েছে হাজার হাজার মানুষ, যাদের সঙ্গে ধর্ম এবং আচারের বিপুল পার্থক্য রয়েছে তার। যে বৃহৎ মানবতাবোধ পৃথিবীর সব মানুষকেই এক ব'লে ভাবতে শেখায়, তা' এদের মনের অন্ধকার গুহায় হারিয়ে গেছে। নিছক নিজেদের প্রয়োজনের খাতিরেই অধীরকে বাঁচিয়ে রেখেছে তারা— জিয়ল মাছের মত যত্ন ক'রে বাঁচিয়ে রেখেছে। যে মুহূর্তে ওরা টের পাবে যে, তাদের মুখের গ্রাস দেলা এসে লুকিয়ে আছে তার বাড়ীতে, তখনি বন্য সব [illegible] মত মশাল জ্বেলে দল বেঁধে—আর ভাবতে পারে না অধীর। বোবা অন্ধ আতঙ্কের সাঁড়াশি হাত দুটো তার মনের টুঁটি চেপে ধরে। নিদ্রাবিহীন শয্যায় প'ড়ে ছট্‌ফট্‌ করতে থাকে অধীর।

সকাল বেলা।

গাছের লম্বা ছায়াগুলো ক্রমে ছোট হয়ে আসছে, এমন সময়ে ইন্‌স্ট্রাকশন নিতে আসে বুড়ো হাসিম শেখ। বাইরের রুগী দেখবার ঘরে অধীরের মুখোমুখি কাঠের বেঞ্চখানার সামনে বসল হাসিম, সেখান থেকে অধীরের ভেতরের উঠানের সামান্য অংশ চোখে পড়ে।

এদিক-ওদিক তাকিয়ে একটু ইতস্ততঃ করে হাসিম শেখ। মেহেদী-রাঙানো লম্বা দাড়িতে হাত বুলায় কয়েকবার। তারপর একটু কেশে সামনে ঝুঁকে ফিস্‌ফিস্‌ ক'রে বলে, "আবার বিয়া করছেন নাকি ডাক্তারবাবু?"

"কেন?" একটা প্রেস্‌ক্রিপশন লিখছিল অধীর, হাসিমের কথা শুনে হঠাৎ চমকে মুখ তুলে তাকায়। মুখের বিবর্ণতাকে চাপা দেবার জন্য তাড়াতাড়ি ব'লে ওঠে, "কেন—না তো!"

মৃদু মৃদু হেসে হাসিম বলে, "আমাগো খাওয়ান লাগবো বুইলা বুঝি চাইপ্পা যাইতাছেন? কই গো, বিয়া না করলে উঠানের ঐ শাড়ীখান আইল কইথিকা?"

হাসিমের কথা শুনে উচ্চস্বরে হেসে ওঠে তার পাশে-বসা হাসান আলি মোল্লা আর চেরাগ আলি। ঘাড় ঘুরিয়ে উঠান থেকে শাড়ীটা দেখবার চেষ্টা করে আবদুর রউফ।

চমকে পেছনে তাকিয়ে দেখে অধীর। অন্দরে যাবার ভেজানো দরজাটা কখন যেন খুলে গেছে হাওয়ায়। উঠানে লম্বালম্বি টাঙানো দড়িতে [illegible] ঝুলছে দেলার চান ক'রে ধুয়ে মেলে-দেওয়া শাড়ীখানা।

কাঁপতে কাঁপতে এগিয়ে দরজাটা দড়াম ক'রে বন্ধ ক'রে দিল অধীর। ফিরে এসে চেয়ারে ব'সে রুমাল দিয়ে ঘাড় আর কপালের ঘাম মোছে সে। শুষ্ক স্বরে হাসিম শেখকে বলে, "ও, এই শাড়ীটা? ওটা আমার আগ-পক্ষের বউ-এর শাড়ী। বাক্সের মধ্যে বেশীদিন থাকলে পোকায় কাটে, তাই মাঝে-মধ্যে বাক্স খুইলা রইদে দেই।"

ঘাড় নেড়ে তার যুক্তির সারবত্তা স্বীকার ক'রে নেয় হাসিম শেখ আর হাসান আলি মোল্লা। কিন্তু নিদারুণ সন্দেহে তীক্ষ্ণ হয়ে ওঠে চেরাগ আলি আর আবদুল

রউকের চোখ। মাথা নীচু ক'রে থাকলেও কি ক'রে যেন স্পষ্ট বুঝতে পারে অধীর।

দুপুরে খেতে ব'সে সকাল বেলার কথাটা খুলে বলে বেলাকে। শুনে মুখের সমস্তটুকু রক্ত স'রে যায় তার, মনে হয়, যেন শ্বেতপাথরে গড়া নিটোল সুন্দর একখানি মুখ, রক্তমাংসের গড়া মুখ ব'লে মনেই হয় না তখন।

"এখন উপায়? এতক্ষণে ত জাইনা গেছে যে, আমি এইখানে আছি।"

প্রশ্নটা যেন অধীরকে নয়, নিজেকেই প্রশ্ন করে বেলা।

"উপায় আর কি—আইজ রাইতেই হামলা করতে পারে।" রুক্ষ স্বরে অধীর বলে, "করলেই বা কি করুম, পলাইয়া যাওনেরও ত কোন জায়গা নাই।"

বেলার বুকের ভেতরটা তোলপাড় করতে থাকে। কিছুদিন আগের সেই আগুন-রাঙা রাত্রি তার সমস্ত বিভীষিকা নিয়ে চোখের সুমুখে ভেসে ওঠে। মনে প'ড়ে যায় সেই দুঃসহ নির্যাতন ও অত্যাচার। যা হোক্ একটা আশ্রয় ত পেয়েছে সে, নাই বা রইল তার ভবিষ্যৎ, বর্তমান ত নিশ্চিন্ত নির্ভয়। এর থেকেও কি বিচ্যুত হতে হবে আবার?

আর কোন কথা হয় না ওদের মধ্যে। নিজের নিজের ভাবনায় ডুবে থাকে ওরা। ভাত ক'টি আঙুল দিয়ে কিছুক্ষণ নাড়াচাড়া ক'রে এক সময়ে উঠে পড়ে অধীর। খাবার ইচ্ছা সম্পূর্ণ লোপ পেয়ে গেছে তার।

অনেক রাতে কোন এক দূর গ্রামে প্রচণ্ড হল্লা শুনে তন্দ্রা ছুটে যায় অধীরের। তাড়াতাড়ি বিছানা ছেড়ে বেরিয়ে আসে বাইরের বারান্দায়। দূর উত্তরের আকাশে আগুনের লোলহান শিখা যেন আকাশকে ছুঁতে চায়। দেখে হিম হয়ে আসে তার শরীর। দূরাগত ভয়ার্ত চীৎকার ও "আল্লা হো আকবর" ধ্বনিতে যেন মৃত্যুর ডম্বরু বাজে।

হঠাৎ চোখে পড়ে, কখন যেন নিজের ঘর থেকে বেরিয়ে এসেছে বেলা। মৃতের মত পাণ্ডুর মুখে উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টি। খোলা বিস্রস্ত কেশপাশ ছড়িয়ে পড়েছে সারা পিঠে।

তাকে দেখে চমকে ওঠে অধীর, কঠিন স্বরে বলে, "আবার বাইরে আইলা ক্যান? লুকাইয়া না থাকতে কইছি তোমারে?"

দ্রুতপদে অধীরের পাশে এসে দাঁড়ায় বেলা। শাড়ির আঁচল খ'সে পড়েছে মাটিতে। সমুদ্রের ঢেউ-এর মত ওঠা পড়া করছে তার উত্তুঙ্গ বুক। হিম হাতে, অধীরের হাত চেপে ধ'রে অস্ফুট শব্দে বলে, "ভয় করতাছে আমার, ঠিক এই রকম, এই রকম আগুনে জইলা গেছে আমার শ্বশুরের ভিটাবাড়ী। না জানি ওই গাঁয়ের মানুষগুলারে কি করতাছে ওরা—উঃ, কী ভীষণ, কী ভীষণ…"

বেলার সুন্দর মুখের দিকে তাকায় অধীর, চোখের ভেতরে যেন ভয়ের সমুদ্র।

ভীতা এই অনিন্দ্যসুন্দরী তরুণী আশ্রয় চেয়েছে তার কাছে, তার পৌরুষের কাছে। তার দেহে আছে দুর্বার আকর্ষণ, কিন্তু ভয়ে হিম রক্তে কামনার অগ্নিকণা জ্বলে না। দৃঢ়স্বরে অধীর বলে, "এই ভাবে একদিন আমার এই বাড়ীটাতেও আগুন লাগাইবো, কেউ বাচুম না, তুমি না, আমিও না, তোমারে না পাওয়া পর্যন্ত ঠাণ্ডা হইবো না অরা—তোমারে লইয়া কি করি আমি কও ত, কোনখানে পাঠামু তোমারে?"

"যাওনের জায়গা নাই আমার," ফিস্‌ফিস্ ক'রে বেলা বলে, "সোয়ামী নাই, শ্বশুর নাই, শ্বশুরবাড়ীর কেউ বাইচা নাই। বাপের বাড়ীতেও কি হইছে কে জানে! কই যামু আমি, কও? এইখান থেইকা বাইর হওয়া মাত্র শ্যাষ কইরা ফালাইব আমারে।"

"কিন্তু আমিই বা কেমনে রাখি তোমারে কও? অরা একবার ট্যার পাইলে কি আর ছাইড়া দিব আমারে? তখন আর ডাক্তার বইলা খাতির করব না।" বিরক্ত হয়ে অধীর বলে।

তার এ কথা শুনে এতটুকু হয়ে যায় বেলা। অধীর তার জীবনদাতা। শুশ্রূষা ক'রে, ঔষধ দিয়ে মৃত্যুর হাত থেকে ছিনিয়ে এনেছে তাকে। তার প্রতি কৃতজ্ঞতার অন্ত নেই তার।

হঠাৎ সব সমস্যা সমাধানের চোখ-ধাঁধানো বিদ্যুৎ রেখাটি চোখে পড়ে বেলার। এই ত, হাতের কাছেই ত মীমাংসা রয়েছে—ফিস্‌ফিস্ ক'রে অধীরকে বলে, "বিয়া কর আমারে।"

"বিয়া!" হঠাৎ যেন সাপ দেখে অধীর। অস্তোপ-ভুক্তা মেয়েটির বড় বড় চোখের ভেতর তাকিয়ে তার কথার সম্যক্ অর্থ আহরণের চেষ্টা করে।

স্তব্ধ হয়ে কিছুক্ষণ ভাবতে চেষ্টা করে অধীর, সুমুখে-দাঁড়ানো রূপসী মেয়েটি নিজে যেচে তার কাছে সর্বস্ব নিবেদন করতে এসেছে, কিন্তু তার বুকে উল্লাসের জোয়ার উঠছে না কেন? কেন শোনামাত্র বেলাকে বুকের ভেতর চেপে পিষে ফেলতে ইচ্ছা হচ্ছে না?

যেন কিসের জ্বালায় জ্বলতে জ্বলতে এক ছুটে নিজের ঘরে এসে দাঁড়ায় অধীর, হাঁপাতে থাকে।

না, প্রেম, ভালবাসা নয়, শুধুমাত্র বাঁচবার তাগিদে, সব কিছু বিকিয়ে নিরুদ্বিগ্ন নিশ্চিন্ত জীবনের প্রতিশ্রুতি চায় তার কাছে বেলা। এ নারী কিছুই দিতে পারবে না তাকে, এ শুধু নিতে চায়।

অধীরের পেছনে পেছনে আসে বেলা। তার দু' চোখভরা প্রত্যাশা ও বাঁচবার অবলম্বনের আশার আলো জ্বলছে।

আর্তসুরে চীৎকার করে ওঠে অধীর—"না, না—তুমি তোমার ঘরে যাও বেলা—এ অসম্ভব, এ আমি পারব না—এ আমি পারব না—"

অধীরের উত্তেজনায় বিকৃত মুখের দিকে আশ্চর্য হয়ে তাকিয়ে থাকে বেলা। কি যেন খুঁজে দেখে সে।

কিন্তু অধীরের কোনও আশ্বাস নেই সেখানে।

অপমানে কালো হয়ে যায় বেলার মুখ, খানিকক্ষণ অবনত-মুখে দাঁড়িয়ে থেকে আস্তে আস্তে চলে যায় নিজের ঘরে।

ওদিকে বক্তারপুরের ঘর-জ্বালানো আগুন নিভে গেছে। থেমে গেছে সব চীৎকার আর কোলাহল। শান্ত পৃথিবী রাত্রির কম্বল মুড়ি দিয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে নিশ্চিন্তে, নিরুপদ্রবে।

সারারাত ঘুম হল না অধীরের। প্রত্যুষের প্রথম আলোকের সঙ্গে সঙ্গে সংকল্পের দৃঢ়তা জাগে তার মনে। ভাবে, ক্ষতি কি? ব্যাধ-তাড়িত হরিণীকে আশ্রয় দিয়ে স্নেহ ও প্রেম দিয়ে কি পোষ মানানো যাবে না?

ঠিকই বলেছে বেলা। ওকে বাঁচাবার একমাত্র পথই হচ্ছে তাকে বিয়ে করা। ডাক্তার নিজে যদি রেহাই পেতে পারে তবে তার স্ত্রীও রেহাই পাবে নিশ্চয়। হাসিম শেখ বুঝি সেই ইঙ্গিতই করে গেল গতকাল। আশ্চর্য! এ বিষয়ে মনস্থির করতে এত সময় লাগল তার?

কিন্তু বেলাকে আর খুঁজে পায় না অধীর। ঘরে নেই, উঠানে নেই।

আতিপাতি করে সম্ভব অসম্ভব জায়গা খুঁজল অধীর পাগলের মত। পুকুর পাড়, বিলের ধার, কোন জায়গা বাদ দিল না।

কোথাও নেই বেলা।

নিজেকে সরিয়ে দিয়ে অধীরের ভীরু প্রাণ বাঁচিয়ে দিয়ে গেছে বেলা, সব সমস্যার সমাধান করে গেছে।

জলো-বাতাসে ধান গাছের পাতাগুলো কাঁপছে। কচুরীপানার পাশ ঘেঁষে নৌকা যাবার শব্দ হচ্ছে—সপ্ সপ্—সপ্ সপ্…

অধীরের মনে হ'ল, যেন তার জীবনের শান্তি আর সুখ চিরদিনের জন্য সরে গেছে তার কাছ থেকে।

তবু, এ কথা ভেবে তৃপ্তি পেল অধীর যে, এতদিনে নির্ভর করবার মত আশ্রয় পেয়েছে বেলা।

দলপতি সুকুমার

শ্রীবিমলাংশুপ্রকাশ রায়

'এস, আমরা একটা দল পাকাই' ব'লে সুকুমার রায় কোন দিন তাঁর দল গ'ড়ে তোলেন নি। তাঁর দল গ'ড়ে উঠেছিল অতি সহজ স্বাভাবিক ভাবে, যেমন ক'রে জলাশয়ের মধ্যকার একটা খুঁটিকে আশ্রয় ক'রে ভাসমান পানার দল গিয়ে জমাট বাঁধে। সত্যিই তিনি ছিলেন খুঁটিস্বরূপ আমাদের অনেকের আশ্রয়। তাঁর বন্ধুপ্রীতি ছিল অপূর্ব। তাঁর স্নিগ্ধ শান্ত উদার চোখ-দু'টির মধ্যে একটা সম্মোহনী শক্তি ছিল। যার দিকে তাকাতেন তাকেই বশ ক'রে ফেলতেন। তাঁর দলের আসর ছিল পথে পথে, তদানীন্তন 'প্রবাসী' কার্যালয়ের সামনে, সমাজপাড়ার সংকীর্ণ গলিতে দাঁড়িয়েই ঘণ্টার পর ঘণ্টা, বা অধুনা অবলুপ্ত 'পান্তির মাঠে' ব'সে অথবা তাঁর ২২ নং সুকিয়া ষ্ট্রীটের ভাড়াটে বাড়ীতে 'ননসেন্স ক্লাবের' সাময়িক বৈঠকে। 'প্রবাসী' তখন এলাহাবাদ থেকে সদ্য এসেছে কলকাতায়।

সুকুমারের "মঙ্গলু মামা" ছিলেন তাঁর অনুগত একটি শিষ্যস্বরূপ—অক্লান্ত কর্মী, পরহিতব্রতী, প্রফুল্লপ্রকৃতি কিন্তু একটু খেয়ালী ও অভিমানী যুবক। তার নামও ছিল প্রফুল্ল, তাই নামটাকে সে সার্থক করেছিল। তাকে প্রায়ই বলতে শুনতাম, "তাতা! এখন কি করব বল।" সুকুমার তা শুনে হেসে আমাদের দিকে তাকিয়ে বলতেন, "মঙ্গলু মামাকে যে কাজই দিই, দু'দিনেই সাবাড় ক'রে এসে বলে, এখন কি করব, তাতা।" বাস্তবিক এমন কর্মপাগল লোক বড় একটা দেখা যায় না। ঘরে ঘরে রোগীর সেবায় রয়েছে মঙ্গলু, কতজনের বিপদে-আপদে রয়েছে মঙ্গলু, আর চরম বিপদে দেখেছি মঙ্গলুই দিয়েছে কাঁধ সবাগ্রে মৃতদেহের খাটের এক প্রান্তে। কত শত শব বহন ক'রে মঙ্গলু শ্মশানে নিয়ে গিয়ে যে দাহ করেছে তার ইয়ত্তা ছিল না। এমনি ক'রে নিমতলার ডোম গোষ্ঠীর সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠ পরিচয় জমে গিয়েছিল; তার পর যেদিন অকালে অকস্মাৎ তার নিজেরই মৃত্যু হ'ল, ডোমেরা কেঁদে বসেছিল, "হায়, হায়! এ কাকে দেখি আজ খাটে?"

এই অপূর্ব যুবক মঙ্গলুর একটি অতি-প্রিয় কিশোর বন্ধু ছিল, সেও ছিল অতি অপূর্ব। দু'জনেই দু'জনকে খুব ভাল বাসত, এবং দেখেছি, সমাজপাড়ার মাঠে বা গলিতে গল্প ক'রে কাটিয়েছে দু'জনে কত দিন সকালে সন্ধ্যায়। এই সৌন্দর্যে প্রতিভাপ্রদীপ্ত মধুর স্বভাব কিশোর ছিল "মুলু"—রামানন্দ বাবুর কনিষ্ঠ পুত্র। যেদিন সে সেই কিশোর বয়সেই ইহলোক পরিত্যাগ করল, সেদিনকার সে তীব্র বেদনার দৃশ্য বর্ণনাতীত! সমাজপাড়ার মাঠে নামানো তার দেহের পাশে দাঁড়িয়ে তার শোকার্ত পিতার বিদায়কালীন মর্মস্পর্শী প্রার্থনাটি যা শুনেছিলাম তা অন্তরের অন্তস্তলে আজও তীক্ষ্ণ তীরের মত বিঁধে রয়েছে। সেদিন মনে পড়ছিল, রবীন্দ্রনাথ এমনি তাঁর কিশোর পুত্রকে হারিয়েছিলেন, আর হারিয়েছিলেন হেমচন্দ্র মৈত্র এবং ডাক্তার নীলরতন সরকার।*

কথায় কথায় অবসাদের অন্ধকারে, দূরে এসে পড়েছি, ফিরে যাই সুকুমারের কথায়। তাঁর 'ননসেন্স ক্লাবটা' ছিল উদ্ভট চিন্তার ও মুক্তকণ্ঠের কিম্ভূত কসরৎ স্থান। এখানে যে কত হাস্যোদ্দীপক কল্পনার হুল্লোড় ফোয়ারার মত ফুটে বেরুত তার হিসাব ছিল না। এই বাক্য-ল্যাবরেটরীতেই জন্ম হ'ল—'আবোল-তাবোল' ও 'হযবরল'র মত অপূর্ব পুস্তকের।

ব্রাহ্ম সমাজের অন্তর্গত যুবজনের জন্যে 'ছাত্রসমাজ' ছিল বটে, কিন্তু তা ছিল তখন ছত্রাকারে। জমাট একটা যুবগোষ্ঠীর অভাব বোধ করছিলেন সুকুমার। এমনি একটা সংঘ গ'ড়ে তুলবার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন তাঁর অনুচরদের মধ্যে। সকলেই মহা উল্লাসে উৎসাহিত হয়ে উঠল। আর অবিলম্বে গড়লেন তিনি 'ব্রাহ্ম যুবসমিতি'। আধ্যাত্মিক, সাহিত্যিক ও সামাজিক বিষয়ে আলোচনাদি চলতে লাগল। অনেকে এসে যোগ দিলেন। সমাজে নতুন একটা সাড়া প'ড়ে গেল। মাসে মাসে তিনি এই দলটিকে নিয়ে যেতেন কলকাতার বাইরে বা কলকাতার মধ্যেই নানা স্থানে। একবার নিয়ে গেলেন সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের বালিগঞ্জের ষ্টোর রোডের বিস্তৃত প্রাঙ্গনসম্বলিত ভবনে। সত্যেন্দ্রনাথ ও তাঁর পুত্র সুরেন্দ্রনাথ খুব আপ্যায়িত করেছিলেন সকলকে এবং অনেক বিষয়ে আলোচনা ও উপদেশ দিয়েছিলেন। আর একবার গিয়েছিলাম নৌকোয় ক'রে বালীতে আমাদেরই এক বন্ধু সুধাংশু গাঙ্গুলীর (মথুর গাঙ্গুলী মহাশয়ের পুত্র)

চুণী। আপনি বসুন! (মায়া বসল না দেখে একটু চুপ ক'রে থেকে) কেমন আছেন আপনি?

মায়া। (একটু ম্লান হাসি মুখে এনে) ভেবে দেখবার সুবিধে হয় নি। সুধা, যাও ত, দেখ আয়া কি করছে।

(সুধা বেরিয়ে গেল বিস্ময়মুখে ডানদিক দিয়ে।)

চুণী। ওর বাবাকে ধরে নিয়ে আসব জানতে চাইছিল।

মায়া। সারাক্ষণ বাবা বাবা করছে।

চুণী। কিছু কি বুঝতে পেরেছে?

মায়া। ওর বাবাকে নিয়ে বিপদ একটা ঘটেছে এটা বুঝতে পেরেছে, কিন্তু বিপদটা যে কি তা জানে না।

চুণী। বিপদটাকে কাটানো যায় কি না সে বিষয়ে আপনার সঙ্গে পরামর্শ করতে এলাম একটু। কিন্তু আপনি না বসলে ত আমার পক্ষে —

মায়া। (ব'সে) আমাকে কিন্তু একটু তাড়াতাড়ি উঠতে হবে।

চুণী। (ব'সে) তাড়াতাড়িই ত উঠবেন। আমি বেশী সময় নেব না আপনার।

(আয়া এসে দাঁড়ান ডানদিকের নেপথ্য ঘেঁষে, হাতে একটা নিটিং নিয়ে। চুণী ও মায়া এমনভাবে বসেছেন যে মায়া সারাক্ষণ আয়াকে দেখতে পাচ্ছে, কিন্তু পাশ না ফিরলে চুণীর পক্ষে তাকে দেখতে পাওয়া সম্ভব নয়।)

মায়া। সুধা কি করছে আয়া?

আয়া। রান্নাবাড়ী খেলছে।

(আয়ার দিকে ফিরে দেখে চুণী স্পষ্টতঃই উসখুস করতে লাগলেন।)

মায়া। ও আমার মেয়ে সুধার আয়া। ছেলেবেলায় আমাকেও ওই মানুষ করেছে। ওর সামনে সব কথাই হ'তে পারে।

চুণী। বেশ। আপনার আপত্তি না থাকলেই হ'ল।

মায়া। বলুন, কি বলতে এসেছেন।

চুণী। সুনীলের কেসটা নিয়ে একটু আলোচনা করব আপনার সঙ্গে। প্রোসিকিউশনের সাক্ষীদের জবানবন্দি শেষ হয়েছে। এবার আমাদের পালা।

মায়া। ও!

চুণী। কেসটা একেবারেই সুনীলের favour-এ যাচ্ছে না।

মায়া। Favour-এ না যায়, প্রোসিকিউশন সে চেষ্টা ত করবেই।

চুণী। কিন্তু আমরা নিজেরাও যে বিশেষ কিছু সুবিধে ক'রে উঠতে পারছি তা নয়! তার একটা কারণ, সুনীল তার জবানবন্দিতে যা বলেছে, তার কিছু লোকে বিশ্বাস করছে না, আর বাকিটাকে প্রমাণ করা শক্ত। সেইগুলো নিয়েই আপনার সঙ্গে একটু কথা বলব।

(আয়া নিটিং বন্ধ ক'রে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে মায়ার দিকে।)

মায়া। আমার সঙ্গে কথা ব'লে লাভ হবে কি কিছু?

চুণী। হ'তে পারে লাভ। সেদিন যে-কারণে যা যা করেছে ব'লে সুনীল বলেছে, আপনি হয়ত বলতে পারবেন তার কোন্‌টা কতখানি সত্যি।

(আয়া তাকিয়ে আছে মায়ার দিকে।)

মায়া। পারব না। কারণ সেদিন উনি কি করবেন না-করবেন সে বিষয়ে কোন পরামর্শই আমার সঙ্গে করেন নি।

চুণী। তা হোক্‌। আপনি তবু আমার কথাগুলো শুনুন। কি মুশকিলে যে আমি পড়েছি সেটা জানলে হয়ত আমার ওপর আপনার একটু দয়া হবে।

মায়া। (ম্লান হেসে) সে দয়াতে খুব প্রয়োজন আছে কি আপনার?

চুণী। আছে বই কি প্রয়োজন? যদি বাঁচাতে না পারি সুনীলকে, শেষ পর্য্যন্ত ফাঁসীই যদি তার হয়, খুব বেশী রাগ আমার ওপর আপনি করতে পারবেন না।

মায়া। না শুনিয়ে যখন ছাড়বেনই না, তখন বলুন; শুনছি।

আয়া। তোমার চায়ের জল কিন্তু জুড়িয়ে যাচ্ছে মায়া-মা!

মায়া। জুড়িয়ে গেলে আবার বসাতে হবে গরমে। বলুন, কি বলবেন।

চুণী। সুনীলকে বাঁচাতে হ'লে তিনটি প্রশ্নের সদুত্তর আমাদের দিতে হবে। এক, সেদিন সে শোভনের কাছে কি জন্তে গিয়েছিল। দুই, একটা গুলীভরা রিভলভার নিয়ে কেন গিয়েছিল সে তার কাছে। আর তিন, সেই রিভলভারেরই গুলীতে ঠিক সেই সময়েই শোভন যে মরল, সেটা যদি খুন নয় ত সেটা কি?

মায়া। সব-ক'টা কথারই উত্তর উনি ত দিয়েছেন।

চুণী। আমি ত আগেই বলেছি, সুনীলের কতগুলো কথা লোকে বিশ্বাস করতে পারছে না। যেমন ধরুন সে বলেছে, আপনার ফিল্মে নামার terms ইত্যাদি নিয়ে আলোচনা করবার জন্তে সে শোভনের কাছে গিয়েছিল। শোভন ও আপনার সম্বন্ধে অত্যন্ত অপ্রীতিকর একটি কথা

মায়া। বলুন, সেটা কি?

(আয়া ফিটিং বন্ধ ক'রে শুনছে।)

চুণী। নিজের অপরাধ ঢাকা দেবার জন্যে নয়, কাউকে হাঙ্গামা থেকে বাঁচাবার জন্যেও সুনীল বানিয়ে ব'লে থাকতে পারে কথাগুলো।

মায়া। তার মানে? সেরকম কেউ আছে ব'লে ত জানি না।

চুণী। কি জানি। আমাদের সবরকম সম্ভাবনার কথাই ভাবতে হয় ত? কিন্তু ভেবে কোন কিনারা করতে পারছি না। এইখানটায় আপনি আমাকে কোন সাহায্য করতে পারবেন কি না বলুন।

মায়া। আপনিই বলুন, আমি কি করতে পারি।

আয়া। কিছুই করতে পার না। এই সব খুনো-খুনির ব্যাপারে তুমি জড়াবে না নিজেকে মায়া-মা, আমি ব'লে দিচ্ছি।

মায়া। আঃ, আয়া!

চুণী। জড়িয়ে যতটা পড়েছেন, তার চেয়ে বেশী আর কি জড়াবেন? আর দেখুন, সুনীলকে তার ছেলে-বেলা থেকে আমি জানি। দয়াতে ওর মন ভরা, ক্ষমাতে ওর মন ভর্ত্তি। এক পাড়াতে থাকতাম, অনেক কাল আমার পাশের বাড়ীতে ভাড়াতে ছিল ওরা। বছর বারো বয়স হবে তখন তার। পোষা একটা নেড়ি কুত্তার বাচ্চা গাড়ী চাপা প'ড়ে মারা যাওয়াতে তিন দিন উপোস ক'রে ছিল সে। বন্ধুরা জ্যান্ত কেঁচো টুকরো টুকরো ক'রে ছিঁড়ে বঁড়শিতে গেঁথে মাছ ধরত ব'লে প্রচণ্ড ঝগড়া করত তাদের সঙ্গে, কিন্তু মারামারি বাধলে প'ড়ে প'ড়ে মার খেত। পাড়ার ছেলেরা তার নাম দিয়েছিল গোসাঁই বাবাজী। ও ছেলে খুন করতে পারে কখনো? খুন ও করে নি। অসম্ভব কথা। কিন্তু শোভনের সঙ্গে দেখা করতে যাবার সময় একটা রিভলভার হাতে ক'রে সে কেন গিয়েছিল, তার একটা বেশ সঙ্গত কারণ না দেখাতে পারলে ওকে বাঁচাতে আমরা পারব না। একটা নিরপরাধ, শিবতুল্য লোক ফাঁসীকাঠে ঝুলবে!

মায়া। আপনি ব'লে দিন আমাকে কি করতে হবে।

(আয়া তর্জ্জনী তুলে ইসারা করছে।)

তবে আমি যা জানি, যতটা জানি, সবই ত পুলিসকে বলেছি। আর যে কিছু করতে পারব ব'লে ত মনে হয় না।

চুণী। জানি না কি করতে পারবেন। তবে যদি পারেন কিছু করতে ত ভাল। কেবল সুনীলের কথাটাই যে ভাববেন তা নয়, শোভনের কথাটাও আপনাকে ভাবতে বলছি।

(উঠে একটু দূরে গিয়ে দাঁড়িয়ে পাইপটা ধরিয়ে ফিরে এলেন।) প্রোসিকিউশন বলছে, সুনীল শোভনকে খুন করেছে। ডিফেন্স এখন অবধি বলছে, তা নয়, শোভনই চেষ্টা করেছিল সুনীলকে খুন করতে, কিন্তু ধস্তাধস্তির মধ্যে নিজেরই গায়ে গুলী লেগে সে মারা গিয়েছে।

মায়া। তা ত জানি।

চুণী। কিন্তু এর মানেটা কি দাঁড়াচ্ছে একটু ভেবে দেখুন। একদল লোক যেমন সুনীলকে খুনে ভাবছে, তেমনি আর একটা দল আছে ত যারা শোভনকে খুনে ভাবছে?

মায়া। হ্যাঁ, কিছু লোক তা ত ভাবছেই।

চুণী। কিন্তু কেন ভাববে?

(পাইপটা নিবে গিয়েছিল, আবার উঠে গিয়ে সেটাকে ধরিয়ে ফিরে এলেন।)

হ'তে ত পারে যে, খুনে এদের দু'জনের একজনও নয়? না কি, হতে পারে না, বলুন।

মায়া। তা কেন হ'তে পারবে না। আর সে হ'লেই ত সবচেয়ে ভাল।

চুণী। সুনীল খুন করে নি আমি জানি, কিন্তু তা প্রমাণ করতে গিয়ে এটা আমি বলতে চাই না যে শোভনই তাকে খুন করতে চেয়েছিল। কারণ আমার ধারণা, শোভন তা কখনো চায় নি। তবে, চায় নি যে, সেটা প্রমাণ হয়ে যাওয়া দরকার ত? প্রোসিকিউশনকে দিয়ে সে-কাজ হবে না। এ কেস্ যদি তারা জেতেও, সন্দেহটা অনেকের মনে থেকেই যাবে, সে সন্দেহ থেকে শোভনকে মুক্ত করতে তারা পারবে না।

মায়া। আপনি কি পারবেন? পারা কি সম্ভব?

চুণী। সম্ভব কি না, আপনিও ভেবে দেখুন।

(পিছনে থেকে আয়া তর্জ্জনী তুলেছে।)

মায়া। কি ভাবব? কি আর আমি করতে পারি? আমি যা জানি, পুলিসকে ত সবই বলেছি।

চুণী। হয়ত পুলিস জানতে চায় নি ব'লে সব কথা বলবার সুযোগ পান নি আপনি।

আয়া। জানতে চায় নি আবার! ও'আর সুনীল এক ঘরে শোয় কি না; একখাটে শোয়, না আলাদা খাটে; ওদের বিয়ে সম্বন্ধ ক'রে হয়েছিল, না পছন্দ ক'রে; সুনীর বয়েস কত হ'ল, এতদিনেও আর ছানাপোনা হয় নি কেন তাদের, এমনি ছাঁদের যাচ্ছেতাই সব জিজ্ঞেসাবাদ। হ'ত কালো-কুচ্ছিত, দু'কথায় সেরে নিয়ে চ'লে যেত।

সকম দেখে। সুনীর জন্যে খুব ত দুঃখ করছিলে, কিন্তু ওর আসল ভালমন্দের কিছুটা একবারও ভেবেছ? ওকে দেখতে আজ তুমি রয়েছ। কিন্তু কাল সুনীল ছাড়া পেয়ে এসে যখন তোমাকে খুন করবে, ক'রে ফাঁসী যাবে, তখন মা-বাবা দুজনকেই হারিয়ে ঐ মেয়েটা কোথায় কার কাছে গিয়ে দাঁড়াবে, কে ওকে মানুষ করবে, কি খাবে ও?

মায়া। তুমি কেবল সুনীকেই ভয় পাওয়াও না আয়া, আমাকেও ভয় পাওয়াবার জন্যে উঠে-প'ড়ে লেগেছ। আমি যদি ভয় না পাই। আমি যদি বলি, উনি খুন আমাকে করবেন না। খুন করতে উনি পারেন না। পোড়ং-কেও উনি খুন করেন নি।

আয়া। হয়ত করেছে। করে থাকতে ত পারে? আর সেইটেই আমাদের আগে ভাবতে হবে। সাবধানের মার নেই।

মায়া। (দুই করতলে মুখ ঢেকে) কি করি! কি করি! কি করি রে!

আয়া। আমার কথা যদি শোন, কিছুই ক'রো না, কিছুই ব'লো না। বেশী কিছু বলতে করতে যদি যাও, ত ওরা পর পর তোমাকেও নিয়ে টানাটানি করবে। তখন তোমার ঐ মেয়েকে সামলাতে আমি পারব না, তা আগে থাকতে ব'লে রাখছি। কিসির চাকরি একটা না একটা পেয়েই যাব, তাই নিয়ে চ'লে যাব যেখানে হয়। (এসে ধপ্ ক'রে বসল মায়ার সামনে মেজের ওপর)।

মায়া। (এক হাতে কপালটা কিছুক্ষণ টিপে ধ'রে থেকে) আচ্ছা, আয়া।

আয়া। কি মায়া-মা?

মায়া। আচ্ছা, আমি যে—নাঃ, কিছু না।। (অল্প একটু বিরক্তির স্বরে) যাও, যাও তুমি। চ'লে যাও আমার কাছ থেকে।

আয়া। (উঠে দাঁড়িয়ে) একেই বলে খেতে বললে মারতে আসা।

(মায়া বাহুমূলে মুখ রেখে কাঁদছে। আয়া বেরিয়ে গেল ডানদিক্ দিয়ে। একটু পরেই সুনী এসে ডানদিকের নেপথ্যের কাছ থেকে উঁকি দিয়ে দেখে নিল ভিতরটা। তার পর হঠাৎ ছুটে এসে জড়িয়ে ধরল মায়াকে। মায়াও তাকে জড়িয়ে ধরল।)

সুনী। মা।

মায়া। কি মা?

সুনী। তোমাকেও ওরা নিয়ে যাবে না ত?

মায়া। আমাকে কে নিয়ে যাবে সুনী?

সুনী। যারা বাবাকে নিয়ে গিয়েছে, আসতে দিচ্ছে না।

মায়া। না, সুনী, না।

সুনী। তোমাকেও ওরা যদি নিয়ে যায় মা, আমি কার কাছে থাকব? আমি আয়ার কাছে থাকব না মা। ও রাক্ষুসী, আয়া সেজে এসেছে।

মায়া। (সুনীকে বুকে চেপে) না মা, তোমাকে আর কারুর কাছে থাকতে হবে না। তুমি আমারই কাছে থাকবে। তোমাকে ছেড়ে আমি কোথাও যাব না।

দৃশ্যান্তর

দ্বিতীয় অঙ্ক

দ্বিতীয় দৃশ্য

[হাইকোর্টের ক্রিমিন্যাল সেসন্স। অনারেবল্ মিস্টার জাষ্টিস তারাদাস মুখার্জ্জির এজ্‌লাস। সব-পিছনে রেলিং-ঘেরা উঁচু মঞ্চের উপর তাঁর আসন, তাতে তিনি সমাসীন। মঞ্চের ঠিক নীচেই লম্বায় মঞ্চের সমান মাপের একটা টেবিল। ওধারে ফাইল খাতাপত্র সামনে নিয়ে কোর্ট-ক্লার্ক, স্টেনো প্রভৃতি চার-পাঁচ জন কোর্ট কর্ম্মচারী। এধারে কোর্টের পোশাক-পরা কয়েকজন উকীল ব্যারিস্টার ও পুলিস-কর্ম্মচারী। তাঁদের মধ্যে সরকার পক্ষের কাউন্সেল বীরেন সমাদ্দারকে তাঁর মুখের ফ্রেঞ্চ-কাট দাড়িতে চেনা যাচ্ছে। বাঁদিকের নেপথ্য ঘেঁসে জুরীর মঞ্চ; দুই সারিতে বারো জন জুরর ব'সে আছেন ডানদিকে মুখ ক'রে, সব ক'টি মুখই গম্ভীর। জজের মঞ্চ ও জুরীর মঞ্চের মাঝখানে টেবিলটার থেকে একটু দূরে বাঁদিকে, টেবিলটার সঙ্গে প্রায় একই লাইনে সাক্ষীর উঁচু কাঠগড়া। কাঠগড়াটার সামনে সমস্ত জায়গাটাই ফাঁকা। ডানদিকে আর একটা কাঠগড়ায় সুনীল ব'সে আছে একটা বেঞ্চিতে, তার পাশে ব'সে আছে একজন কনস্টেবল্। চুণীলাল বসু ঢুকলেন গাউন উড়িয়ে খুব ব্যস্তসমস্ত ভাবে। একটা চেয়ারে ব'সে পাশে ঝুঁকে জুনিয়রের সঙ্গে মৃদুস্বরে কথা বললেন কিছুক্ষণ। কোর্ট-ক্লার্ক উঠে দাঁড়িয়ে কেস্ নম্বরটা বললে চুণীলাল উঠে দাঁড়ালেন।]

চুণী। মিসেস নাগ।

(একজন কোর্ট-কর্ম্মচারী বেরিয়ে গেল বাঁদিক্ দিয়ে ও একটু পরেই ফিরে এল। তার পিছনে

পিছন এসে জুরীর মঞ্চের সামনে দিয়ে গিয়ে মায়া সাক্ষীর কাঠগড়ায় উঠল। কর্ম্মচারীটি শপথের কার্ডটা ধরিয়ে দিল তাকে। যে হাতে ধরেছিল কার্ডটা, মনে হ'ল মায়ার সেই হাতটা একটু কাঁপছে। মায়ার পরিধানে ছাই রঙের শাড়ী, কালচে রঙের ব্লাউজ।)

জজ। আপনি বসতে পারেন, যদি চান।

(মায়া মাথাটা একবার একটু সামনে হেলিয়ে চেয়ারে বসল। চুণীলাল আস্তে এগিয়ে গিয়ে কাঠগড়া'র সামনে ফাঁকা জায়গাটায় দাঁড়ালেন। কাঠগড়ার ডানপাশে তিনি এমন ভাবে দাঁড়িয়েছেন যাতে মায়ার সঙ্গে কথা বলবার সময় তাঁর মুখের আদ্ধেকটা এবং বাকী সময় জুররদের দিকে ফিরে থাকাতে মুখের বেশীর ভাগটা চোখে পড়ছে।)

চুণী। আপনার নাম?

মায়া। মায়া নাগ।

চুণী। এই মোকদ্দমার আসামী সুনীল নাগ আপনার কে হন?

মায়া। স্বামী।

চুণী। যে শোভন সেনের মৃত্যু নিয়ে এই মোকদ্দমা, তাঁকে আপনি চিনতেন?

মায়া। হ্যাঁ।

চুণী। কতদিন থেকে চিনতেন?

মায়া। আমার বিয়ের অল্প কিছুদিন পর থেকেই।

চুণী। আপনার স্বামীর বন্ধু ছিলেন তিনি, এই সূত্রে?

মায়া। হ্যাঁ।

চুণী। গত অ'উ'শে আগস্ট সকালে আপনার স্বামী সুনীল নাগ বাঙ্গালোর থেকে কলকাতায় ফিরেছিলেন?

মায়া। হ্যাঁ।

চুণী। সময় ক'টা তখন?

মায়া। সাড়ে ন'টা আন্দাজ হবে।

চুণী। আচ্ছা, বলুন ত, সেদিন কলকাতায় ফিরবার পর কিছুক্ষণের মধ্যেই তিনি শোভন সেন ও আপনার সম্বন্ধে এমন কিছু কি শুনেছিলেন, যাতে তাঁর একটু বিচলিত হবার কথা?

(মায়া মাথাটাকে নীচু করল, উত্তর দিল না।)

বলুন, বলুন, চুপ ক'রে থাকবেন না। কথাটা এই আদালতে এই ক'দিনে অনেকবার হয়ে গিয়েছে, এ'রা সবাই শুনেছেন কথাটা, কাজেই আপনি লজ্জা না ক'রে স্বচ্ছন্দে বলতে পারেন, হ্যাঁ কি না।

মায়া। (অস্ফুট স্বরে) হ্যাঁ।

চুণী। আচ্ছা, কথাটা শোনবার পর আপনার স্বামী আপনাকে সেদিন কি মারধোর করেছিলেন?

মায়া। না।

চুণী। মারধোর করেন নি। মারতে হাত উঠিয়েছিলেন?

মায়া। না।

চুণী। তাও না। আচ্ছা, মারবেন ব'লে শাসিয়েছিলেন কি?

মায়া। না।

চুণী। মারবেন ব'লে শাসানও নি। তা হ'লে কথাটা শুনে তিনি প্রচণ্ড রকম রাগ করেছিলেন, এটা বলা চলে না।

বীরেন। (সদর্পে উঠে দাঁড়িয়ে) কাউন্সেল সাক্ষীর কাছ থেকে যা জানতে চাইছেন, সেটা সাক্ষীর একটা অভিমত মাত্র। সাক্ষ্য হিসেবে সেটা গ্রাহ্য নয়।

জজ। এ প্রশ্নটা চলবে না। (বীরেন সমাদ্দার বসলেন।)

চুণী। I am sorry my Lord! আমারই ভুল হয়েছে। আচ্ছা, মিসেস নাগ, ও প্রশ্নটার উত্তর আপনাকে দিতে হবে না। আপনি বলুন, আপনার স্বামী সেদিন আপনাকে মারেন নি, মারতে হাত ওঠান নি, মারবেন বলে শাসান নি, তা হ'লে তিনি কি করেছিলেন? খুব কি গালাগাল করেছিলেন আপনাকে?

মায়া। না, তবে—

চুণী। হ্যাঁ, বলুন, বলুন, তবে কি?

মায়া। কথা শুনিয়েছিলেন।

চুণী। কথা শুনিয়েছিলেন। অর্থাৎ এমন কতগুলি কথা বলেছিলেন, যা শুনতে আপনার ভাল লাগেনি। এই ত?

মায়া। হ্যাঁ।

চুণী। সেগুলি কি দুঃখের কথা, না রাগের কথা?

মায়া। তা ঠিক জানি না।

চুণী। Thank you! এইটেই শুনতে চেয়েছিলাম আপনার কাছে। কথাগুলো রাগের কথা কি না তা আপনি ঠিক জানেন না।···আচ্ছা, মিসেস নাগ। সেদিন সকাল থেকে আপনার স্বামী সুনীল নাগ একটানা কতক্ষণ বাড়ীতে ছিলেন?

মায়া। বিকেল আন্দাজ সওয়া তিনটে পর্য্যন্ত।

চুণী। ধরা যাক পাঁচ ঘণ্টার মত। আচ্ছা, এই পাঁচ ঘণ্টা ধ'রেই কি তিনি আপনাকে কথা শুনিয়েছিলেন?

মায়া। না।

চুণী। তবে কতক্ষণ কথা শুনিয়েছিলেন? চার ঘণ্টা?

মায়া। না।

চুণী। তিন ঘণ্টা?

মায়া। না।

চুণী। আচ্ছা, নীচের দিক থেকে সুরু করা যাক। পনেরো মিনিট? আধ ঘণ্টা?

মায়া। হয়ত আধ ঘণ্টা খানিক হবে। ঘড়ি ধ'রে দেখিনি।

চুণী। ঘড়ি ধ'রে দেখেন নি। আচ্ছা, বেশ! যে সময়টা তিনি আপনাকে কথা শোনান নি, সে সময়টায় তিনি যথারীতি স্নানাহার করেছিলেন?

মায়া। হ্যাঁ।

চুণী। একবারও কি বলেছিলেন, আজ খিদে নেই, খেতে ইচ্ছে করছে না, আজ খাব না?

মায়া। না।

চুণী। তাহলে সেদিন বাকী সময়টা তিনি এমন আর কি করেছিলেন, যা সাধারণ অবস্থায় তিনি করেন না? (মায়া নিরুত্তর।)

আমার কথাটার উত্তর দিন।

মায়া। খুব গম্ভীর মুখ ক'রে ছিলেন।

চুণী। খুব গম্ভীর মুখ ক'রে ছিলেন।...আচ্ছা, আপনার স্বামী সুনীল নাগের ওরকম গম্ভীর মুখ আর কখনো কি আপনি দেখেন নি?

মায়া। (একটু ভেবে) হয়ত দেখেছি, কিন্তু একটানা এতক্ষণ ধ'রে দেখিনি।

চুণী। একটানা এতক্ষণ ধ'রে দেখেন নি। আপনি কি বলতে চাইছেন, সেদিন আপনার স্বামী সুনীল নাগ যতক্ষণ বাড়ীতে ছিলেন, সমস্ত সময়টাই খুব গম্ভীর মুখ ক'রে ছিলেন?

মায়া। হ্যাঁ।

চুণী। সমস্ত সময়টাই কি তিনি আপনার চোখের উপরে ছিলেন?

মায়া। না।

চুণী। সমস্ত সময়টা আপনার চোখের উপর ছিলেন না। কতটা সময় ছিলেন?

মায়া। উনি আসছিলেন, যাচ্ছিলেন।

চুণী। বেশ ত, এই যাওয়া-আসার মধ্যেই কতটা সময় তিনি ছিলেন আপনার চোখের উপরে? (মায়া নিরুত্তর)।

থাক্, এ প্রশ্নেরও উত্তর আপনাকে দিতে হবে না। আমি ধ'রে নিচ্ছি, যখনই তিনি আপনার কাছে আসছিলেন, আপনি দেখছিলেন, তাঁর মুখটা খুব গম্ভীর। কিন্তু আপনার চোখের আড়ালে গিয়ে তিনি যে খুব একটা মজা হয়েছে ভেবে পেটে খিল ধরিয়ে হাসছিলেন না, তা আপনি জানেন না? তাই নয় কি?

মায়া। তা অবশ্য জানি না।

চুণী। যদি জানেন না ত কেন বললেন, সমস্ত সময়টাই তিনি গম্ভীর মুখ ক'রে ছিলেন? আপনি যেটুকু জানেন, সেটুকুই কেবল বলবেন, তার চেয়ে বেশী নয়। সাক্ষীদের তাই করতে হয়।

মায়া। তাই করব।

চুণী। মিসেস নাগ, আপনাদের একটি মেয়ে আছে, না?

মায়া। হ্যাঁ।

চুণী। সে যায় নি, এই সময়ের মধ্যে একবারও তার বাবার কাছে?

মায়া। হ্যাঁ, গিয়েছিল।

চুণী। কিরকম ব্যবহার পেয়েছিল বাবার কাছে?

(মায়া নিরুত্তর।)

বলুন।

মায়া। আপনি কি জানতে চাইছেন ঠিক বুঝতে পারছি না।

চুণী। তার বাবা কি সেদিন হেসে কথা বলেন নি তার সঙ্গে?

মায়া। হ্যাঁ, তা বলেছিলেন।

চুণী। তা হ'লে এটা বলা আপনার খুব অন্যায় হয়েছে যে, আপনার স্বামী সেদিন সমস্ত সময়টাই খুব গম্ভীর মুখ ক'রে ছিলেন। আপনি শপথ নিয়ে এই আদালতে সাক্ষ্য দিচ্ছেন, এমন-কিছু এখানে বলবেন না যা সত্য নয়।

মায়া। আমি সত্য কথাই বলেছি।

চুণী। তবু বলবেন, সত্য কথাই বলেছি! এ ত ভারি আশ্চর্য্য!

মায়া। আশ্চর্য্য হবার কিছু নেই এতে। উনি হেসে কথা বলেছিলেন মেয়ের সঙ্গে, কিন্তু ওটাকে ঠিক হাসি বলে না।

চুণী। কি ওটাকে বলে, দাঁত খিঁচনো?

মায়া। (বেশ একটু রাগের ভাব) আমি তা ত বলি নি।

চুণী। আপনি যা বলছেন তার ত ঐ মানেই হয়।

মায়া। না, ঐ মানে হয় না। আমি বলতে চেয়েছিলাম, মেয়ের সঙ্গে কথা বলবার সময় উনি জোর ক'রে হাসছিলেন।

চুণী। যেমন ক'রেই হাসুন, হাসছিলেন যখন, তখন বলা চলে না তিনি খুব গম্ভীর মুখ ক'রে ছিলেন। শুনুন, আপনি এর পর আরও সাবধান হয়ে আমার কথার উত্তর দেবেন। আপনার ভালর জন্যেই এটা বলছি।

মায়া। Thank you!

(বীরেন সমাদ্দারকে কতকটা উঁচু গলাতেই বলতে শোনা গেল, what a storm in a teacup!)

চুণী। আচ্ছা, মিসেস নাগ! আপনাকে কথা শোনাবার সময় সেদিন আপনার স্বামী সুনীল নাগ একবারও কি আপনাকে তাঁর বাড়ী ছেড়ে বেরিয়ে যেতে বলেছিলেন?

মায়া। না

চুণী। এমন-কিছু কি বলেছিলেন যাতে মনে হতে পারে তিনি ধ'রে নিয়েছিলেন, আপনি নিজে থেকেই তাঁর বাড়ী ছেড়ে চ'লে যাবেন?

মায়া। না।

চুণী। এতেও একটু অবাক্ হন নি আপনি?

(মায়ার মুখ ও হাবভাব দেখে মনে হচ্ছে, সে ঠিক ধরতে পারে নি কথাটা।)

আমি বলছি, আপনার স্বামী সুনীল নাগ সেদিন আপনাকে মারলেন না, মারতে হাত উঠালেন না, মারবেন ব'লে শাসালেন না, গালাগাল করলেন না, এমন কি বাড়ী ছেড়ে চ'লে যেতেও বললেন না, এতে একটু অবাক্ লাগে নি আপনার?

মায়া। আপনি কি জানতে চাইছেন, আমি ঠিক বুঝতে পারছি না।

চুণী। আরও স্পষ্ট ক'রে বলতে হবে? আচ্ছা বেশ। বলছি। আমি জানতে চাইছি, আপনার স্বামী সুনীল নাগ আপনার সম্বন্ধে ওরকম একটি সুন্দর সুখবর শোনবার পর সেদিন রেগে যে দিগ্‌বিদিক্ জ্ঞানশূন্য হন নি কেবল তাই নয়, একটা সাধারণ রকম রাগারাগিও কিছু করেন নি। এতে একবারও কি আপনার এরকম সন্দেহ একটু হয় নি, যে হয়ত তিনি ভিতরে ভিতরে খুব একটা আরাম বোধ করছিলেন, আর সেটা আপনাকে জানতে দিতে চান নি ব'লে মুখটাকে জোর ক'রে গম্ভীর ক'রে ছিলেন?

মায়া। না, আমার তা মনে হয় নি।

চুণী। কেন মনে হয় নি? আপনি বুদ্ধিমতী। সুনীলের সেদিনকার ব্যবহারের আর যে কোন অর্থই হ'তে পারে না, এটা আপনার মনে হওয়া উচিত ছিল।

মায়া। রাগ তাঁর হয়েছিল।

চুণী। রাগ তাঁর হয়েছিল! এই একটু আগে আপনি বলেছেন, আপনার স্বামীর কথাগুলো সেদিন রাগের কথা ছিল কি না আপনি জানেন না। আবার এখন বলছেন, রাগ তাঁর হয়েছিল! আপনার এই দুটো কথার মধ্যে কোন্ কথাটা সত্যি?

মায়া। মানুষের রাগ চাপাও ত থাকে!

চুণী। মানুষের কি হয় না-হয় তা আপনার কাছে জানতে চায় নি কেউ। আপনি আপনার স্বামী সম্বন্ধে কি বলতে চাইছেন তাই বলুন। আপনি কি এখন বলতে চাইছেন যে, আপনার উপর তাঁর রাগটা তিনি চেপে রেখেছিলেন সেদিন?

(মায়া অস্ফুট স্বরে কিছু একটা বলল।)

আপনি কি বলছেন আর একটু জোরে বলুন, যাতে এঁরা (জুররদের দিকে দেখিয়ে ও পরে জজের দিকে ফিরে) আর হিজ লর্ডশিপ শুনতে পান।

মায়া। আমি সত্যিই বুঝতে পারছি না কি বলব। আমি জানি না কিছু।

চুণী। মিসেস নাগ। আপনি উল্টোপাল্টা সব কথা বলছেন, তারপর 'জানি না, বুঝতে পারছি না' ব'লে সেগুলোকে এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করছেন। আপনি জানেন, এতে ডিফেন্সকে কোন সাহায্যই আপনি করছেন না? আপনি আজ এমন আরো কোন কোন কথা বলেছেন, যা আমাদের পক্ষে ক্ষতিকর, আর যা বলবার কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ আপনার ছিল না। তাই আমরা যদি আপনাকে বিরুদ্ধ সাক্ষী ব'লে ঘোষণা করি, আপনি ক্ষমা করবেন আমাদের। মি লর্ড! যে ট্র্যাজেডি থেকে এই মোকদ্দমার উদ্ভব তার সঙ্গে এই সাক্ষীর যোগের কথা মনে রেখে, আর যেভাবে উনি সাক্ষ্য দিচ্ছেন তা বিচার ক'রে আপনি আমাকে অনুমতি করুন আমি এঁকে জেরা করি।

(জুনিয়রের হাত থেকে এক শিট কাগজ নিয়ে তাতে সই করলে জুনিয়র সেটা কোর্ট ক্লার্কের হাতে দিলেন।)

জজ। জেরা আপনি করতে পারেন।

(বীরেন সমাদ্দার সোজা হয়ে উঠে বসলেন। তাঁকে বলতে শোনা গেল, It was all pre-arranged!)

চুণী। আচ্ছা, মিসেস নাগ! পুলিসকে আপনি

বলেছেন, ঘটনার দিন সাড়ে তিনটের আপনি সিনেমায় গিয়েছিলেন।

মায়া। হ্যাঁ, মেয়েকে নিয়ে গিয়েছিলাম।

চুণী। আমি যা জানতে চাইব, তাই আপনি বলবেন, তার চেয়ে বেশী নয়। আপনার স্বামী সুনীল নাগ আপনাকে পৌঁছে দিতে গিয়েছিলেন?

মায়া। হ্যাঁ।

চুণী। তিনি কেন যান নি আপনার সঙ্গে সিনেমা দেখতে?

মায়া। শোভনের সঙ্গে তাঁর কাজ ছিল।

চুণী। শোভনের সঙ্গে তাঁর কি কাজ ছিল তা কি আপনি জানতেন?

মায়া। না।

চুণী। কাজটা যাই হোক, ওদের দুজনের সাক্ষাৎটা যে খুব একটা আত্মীয়তার পরিবেশের মধ্যে হবে না, তা কি আপনি জানতেন?

মায়া। হ্যাঁ, তা জানতাম।

চুণী। তা জানতেন। আচ্ছা, মিসেস নাগ! কি ছবি দেখানো হচ্ছিল সেদিন সিনেমায়?

মায়া। Walt Disneyর একটা কার্টুন।

চুণী। শেষ অবধি ছিলেন?

মায়া। হ্যাঁ।

চুণী। শেষ অবধি ছিলেন। বেশ! এবারে বলুন, সিনেমায় পৌঁছবার পর থেকে সিনেমা শেষ হওয়া পর্যন্ত আপনি কি কি করেছিলেন। ফিজ লর্ডশিপ, আর এঁরা যাঁরা জুরীতে বসেছেন, তাঁরা শুনতে চান। সামান্য খুঁটিনাটিও বাদ দেবেন না।

মায়া। (একটু হেসে) দরজায় টিকিট দেখিয়ে হলে ঢুকলাম। Usher আলো দেখালে মেয়ের সিটটা নামিয়ে তাকে বসালাম, তার পর নিজে তার পাশে বসলাম। ছবি আরম্ভ হ'ল, দেখলাম।

চুণী। আর কিছু করেন নি? বেশ ভাল ক'রে ভেবে দেখুন। ভেবে জবাব দিন।

মায়া। (একটু ভেবে) ইণ্টারভ্যালের সময় চকোলেট কিনে মা-মেয়েতে খেয়েছিলাম।

চুণী। আর কিছু?

মায়া। না, মনে পড়ছে না আর কিছু।

চুণী। মনে আনতে চেষ্টা করুন।

মায়া। (একটু ভেবে) না, আর করি নি কিছু।

চুণী। মিসেস নাগ! আটাশে আগস্ট রাত্রে আপনি পুলিসের কাছে একটা বিবৃতি দিয়েছিলেন। (জুনিয়রের কাছ থেকে এক শিট কাগজ নিয়ে) তাতে আপনি বলেছেন, (কাগজে চোখ রেখে) শোভন সেনের একটা রিভলভার আছে, আর এই খবরটা আপনার স্বামীকেও সেদিন সকালে আপনি দিয়েছিলেন। (জুনিয়রের হাতে কাগজটা ফিরিয়ে দিলেন।)

মায়া। হ্যাঁ।

চুণী। খবরটা আপনার স্বামীকে আপনি কি মনে ক'রে দিয়েছিলেন?

(মায়া নিরুত্তর।)

আপনার স্বামী শোভন সেনের সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছেন শুনেই ত খবরটা তাঁকে দিয়েছিলেন?

মায়া। হ্যাঁ।

চুণী। তাহলে তাঁকে একটু সাবধান ক'রে দেওয়াই উদ্দেশ্য ছিল আপনার?

মায়া। হ্যাঁ।

চুণী। তাঁকে একটু সাবধান ক'রে দেওয়াই উদ্দেশ্য ছিল। আপনি বোধহয় ভেবেছিলেন, শোভনের কাছে একটা রিভলভার আছে জানলে আপনার স্বামী আর যাবেন না তাঁর কাছে।

মায়া। না, তা ভাবিনি।

চুণী। যেতে তাঁকে বারণ করেছিলেন কি একবারও?

মায়া। না।

চুণী। কেন?

মায়া। বারণ করলেও তিনি শুনতেন না।

চুণী। সাবধান করার অর্থ তাহলে প্রকারান্তরে এইটেই তাঁকে বলা, যে তোমার রিভলভারটাও তুমি সঙ্গে নিও?

মায়া। খবরটা তাঁকে দেওয়া উচিত মনে হয়েছিল ব'লে দিয়েছিলাম। তারপর তিনি কি করবেন না করবেন সে ত তাঁর বুঝবার কথা।

চুণী। একশ'বার। কিন্তু আপনিও কিছু ত একটা বুঝেছিলেন? আপনি কি বোঝেন নি, যে খবরটা শোনবার পর আপনার স্বামী তাঁর নিজের রিভলভারটা সঙ্গে নিয়েই শোভন সেনের কাছে যাবেন?

মায়া। তা আমি কি ক'রে বুঝব?

চুণী। আহা, নিশ্চয় ক'রে হয়ত বোঝেন নি, কিন্তু নিয়ে যাবার সম্ভাবনা যে ছিল তা ত জানতেন? তাও যদি না জানতেন ত খবরটা কষ্ট ক'রে দিতে যাবেন কেন তাঁকে আপনি?

(মায়া নিরুত্তর।)

আচ্ছা, কথাটাকে একটু অন্যভাবে বলছি। আপনি নিশ্চয় ভাবেন নি যে, শোভনের কাছে একটা রিভলভার আছে শোনবার পর নিজের রিভলভারটা সঙ্গে নিয়ে যাওয়া সুনীলের পক্ষে একেবারেই অসম্ভব ছিল?

মায়া। (একটু ভেবে) তা অবশ্য ভাবি নি।

চুণী। সম্ভাবনাটা তাহলে তাহলে ছিলই?

মায়া। হ্যাঁ, ছিল।

চুণী। সম্ভাবনাটা ছিল। গোড়াতেই এটা স্বীকার ক'রে নিতে পারতেন। আচ্ছা, মিসেস নাগ! এবারে একটু অন্য কথায় আসা যাক। আচ্ছা, ইদানীং শোভন সেনের সঙ্গে আপনার মনান্তর কিছু কি ঘটেছিল? একটু প্রণয়-কলহ বা মান-অভিমান, যে জন্য দুজনের বাক্যালাপ বন্ধ ছিল?

মায়া। না।

চুণী। বাক্যালাপ বন্ধ ছিল না। (গলার সুর একটু চড়িয়ে) তাহলে এবার আপনি বলুন, সিনেমায় নেমেই আপনি শোভনকে টেলিফোন ক'রে কেন বলেন নি যে, সুনীল সম্ভবতঃ একটা রিভলভার নিয়ে তাঁর কাছে যাচ্ছেন?

(মায়া নিরুত্তর।)

সুনীলকে সাবধান করবার জন্যে যদি শোভনের রিভলভারের খবরটা তাকে দেওয়া আপনার উচিত মনে হয়েছিল, ত সুনীল সম্ভবতঃ একটা রিভলভার সঙ্গে নিয়ে তাঁর কাছে যাচ্ছেন, এটা জানিয়ে দিয়ে শোভনকে সাবধান ক'রে দেওয়ার কথা কেন আপনার মনে হয় নি?

(মায়া তবুও নিরুত্তর। তার চোখেমুখে একটা আতঙ্কিত ভাব। জুরেরদের মধ্যে সামান্য একটু চাঞ্চল্য। অনরেবল্ মিষ্টার জাষ্টিস তালোলাম মুখার্জি মায়ার উত্তর শোনবার জন্যে একটু যেন সামনে ঝুঁকেছেন মনে হচ্ছে)

কেন টেলিফোনে শোভনকে সাবধান ক'রে দেন নি?

(মায়ার মাথাটা ক্রমশঃ নীচু হয়ে আসছে।)

ইণ্টারভ্যালের সময় মা-মেয়েতে চকোলেট কিনে খেয়েছিলেন। তখনও টেলিফোনে একটু খবর নেবার চেষ্টা করেন নি, দুই বন্ধুর সাক্ষাৎকারের ফলটা কি হয়েছে, অঘটন কিছু ঘটেছে কি না। এর থেকে আমরা যদি এই সিদ্ধান্তে পৌঁছই যে, আপনার জানাই ছিল কি ঘটেছে, সেটা খুব অন্যায় হবে কি?··· (মায়া নিরুত্তর।) বলুন কেন শোভনকে সাবধান ক'রে দেন নি? (মায়া তবুও নিরুত্তর।)···বলুন! আমার কথার উত্তর দিন!

জজ। আপনি কাউন্সেলের প্রশ্নটার যাহোক একটা উত্তর দিন।

মায়া। ফোন আমি করি নি।

চুণী। (উঁচু গলায়) তা ত আমরা জানি। সেকথা এখন হচ্ছে না। ফোন কেন করেন নি? শোভনের প্রাণটার কিছু কি দাম ছিল না আপনার কাছে? হিজ লর্ডশিপ, আর জুরীতে এঁরা যাঁরা বসেছেন তাঁরা, এর উত্তর আপনার কাছ থেকে শুনতে চান। খুনের দায়ে এখানে একটা মানুষের বিচার হচ্ছে। আমি যে প্রশ্ন আপনাকে করেছি, তার সদুত্তর না পেলে এঁরা সুবিচার করতে পারবেন না।

মায়া। (অত্যন্ত বিমর্ষমুখে) আমি সত্যিই বুঝতে পারি নি।

চুণী। (গর্জ্জন ক'রে) কি বুঝতে পারেন নি? কি? কি ঘটনার পরিবেশে দু'জনের দেখা হচ্ছে তা জানতেন, অঘটন কিছু ঘটা অসম্ভব নয় তাও আপনার জানা ছিল, নয়ত নিজের স্বামীটিকে সাবধান ক'রে দেবার কথা আপনার মনে আসত না। তাহলে কেন আপনার মনে হ'ল না যে শোভনকেও সাবধান ক'রে দেওয়া দরকার? আপনি ত কচি খুকী নন!

বীরেন। (সদর্পে উঠে দাঁড়িয়ে) মি লর্ড! একটা কথা নিয়ে সাক্ষীকে ক্রমাগত নাজেহাল করার মানে হয় না কিছু। কোর্টের সময়েরও ত একটা দাম আছে? কাউন্সেলের প্রশ্নের উত্তরে তাঁর যা বলবার সাক্ষী ত তা বলেছেন।

চুণী। মি লর্ড। আমার প্রশ্নের উত্তরে সাক্ষী যা বলেছেন সেটা কোন উত্তরই নয়। তাঁর উত্তরের উপর আমার সমস্ত ডিফেন্স নির্ভর করছে। উত্তর যদি উনি না দিতে পারেন ত তাঁর সেই অক্ষমতার যেমন খুশি অর্থ আমরা করব।

বীরেন। যেমন খুশি অর্থ কাউন্সেল করুন, প্রোসিকিউশনের তাতে কিছুই এসে যাবে না। সাক্ষী শোভন সেনকে সময়মত সাবধান ক'রে দিলে সে হয়ত মারা যেত না, এটা প্রমাণ হ'লে সুনীল নাগের অপরাধের গুরুত্ব ত একটুও ক'মে যাবে না? তবে সাক্ষীকে কাউন্সেল যদি co-accused ক'রে কোর্টে আনাতে চান, আমি বাধা দেব না।

চুণী। সাক্ষীকে co-accused ক'রে কোর্টে আনা উচিত কি না সে বিষয়ে কাউন্সেলের ওপিনিয়ন আমি সম্ভবতঃ নিতে যাব না। কারণ, সে কাজটা আমার নয়।

জজ। আমার মনে হয়, আপনাদের এই ধরণের মন্তব্যগুলি argument-এর জন্যে মুলতুবি রাখা যেতে পারে। সাক্ষীর জেরাটা শেষ হ'তে দিন।

বীরেন। I am sorry, my lord! (বসলেন।)

চুণী। Sorry, my lord! মিসেস নাগ! আপনি এবারে আমাকে বলুন, শোভনের একটা রিভলভার আছে এ কথাটা আপনি কোথায় শুনেছিলেন?

(মায়ার মুখ দেখে মনে হ'ল, সে কি বলবে বুঝতে পারছে না।)

জানতে চাইছি এইজন্যে যে, পুলিশ তদন্ত ক'রে জেনেছে, কথাটা সর্ব্বৈব মিথ্যা। শোভনের রিভলভার কস্মিন্‌কালেও ছিল না, জীবনে রিভলভারের লাইসেন্স সে নেয় নি। বিনা লাইসেন্সের রিভলভার, এমন কি একটা toy রিভলভারও পুলিস তার বাড়ী, অফিস, কারখানা তন্ন তন্ন ক'রে সার্চ্চ ক'রেও পায় নি। (গর্জ্জন ক'রে) কেন আপনি এই মিথ্যে কথাটা আপনার স্বামীকে বলেছিলেন?

মায়া। কথাটা যে মিথ্যে তা আমি জানতাম না। আমি ঐরকম শুনেছিলাম।

চুণী। ঐরকম শুনেছিলেন। কার কাছে শুনেছিলেন?

মায়া। (একটুক্ষণ ভেবে) ঠিক মনে পড়ছে না।

চুণী। তা বললে আমি শুনব না। শুনেছিলেন যখন মনে পড়ছে, তখন এতবড় একটা কথা কার কাছে শুনেছিলেন সেটাও মনে পড়তে হবে।

বীরেন। (উঠে দাঁড়িয়ে) মি লর্ড! সাক্ষী বলছেন, কথাটা কার কাছ থেকে শুনেছিলেন সেটা তাঁর মনে পড়ছে না, the matter should end there! সব কিছুই মনে থাকতে হবে এমন কোন আইন এদেশে আছে ব'লে আমার জানা নেই।

চুণী। মি লর্ড! সাক্ষীর এখন যেটা মনে পড়ছে না, আমার বিশ্বাস আমি তাঁকে একটু সাহায্য করলেই সেটা তাঁর মনে প'ড়ে যাবে। কাউন্সেল দয়া ক'রে একটু ধৈর্য্য ধ'রে থাকুন।

(বীরেন সমাদ্দার বসলেন।)

মিসেস নাগ! কথাটা যারই কাছ থেকে শুনে থাকুন, শুনে নিশ্চয় বিশ্বাস করেছিলেন, নয়ত প্রথমে আপনার স্বামীকে ও পরে পুলিসকে বলতে যেতেন না।

মায়া। হ্যাঁ, বিশ্বাস করেছিলাম।

চুণী। তা হলে হয় শোভন, নয় ত তাঁকে বেশ ভাল ক'রে জানত এমন কারো কাছ থেকেই শুনেছিলেন, নয় ত বিশ্বাস করতেন না।

মায়া। হ্যাঁ, তাই।

চুণী। শোভনকে ভাল ক'রে জানত তাঁর ফ্যাক্টরীর এমন কোনো লোকের কাছে কি শুনেছিলেন? আপনি যারই নাম করবেন, তাকেই আমরা সাক্ষী ডাকব।

মায়া। না, ফ্যাক্টরীর সেরকম কাউকে আমি চিনি না।

চুণী। তাঁর অফিসের কারও কাছে?

মায়া। অফিসের কাউকেই আমি চিনি না।

চুণী। তাঁর বন্ধুবান্ধবদের কারও কাছে?

মায়া। না।

চুণী। আপনাকে আবারও মনে করিয়ে দিচ্ছি, আপনি যারই নাম করবেন তাকেই সাক্ষী ডেকে কথাটা আমরা যাচাই ক'রে নেব। এবারে বলুন, শোভন নিজে আর তাঁর বাড়ীর লোকেরা ছাড়া আর কারও নাম কি আপনি মনে আনতে পারছেন, যাঁর কাছে কথাটা আপনি শুনেছিলেন আর শোনবামাত্র বিশ্বাস করেছিলেন?

মায়া। (একটু চুপ ক'রে থেকে) না, কারও নাম মনে আনতে পারছি না।

চুণী। চেষ্টা করুন।

মায়া। (আর একটুক্ষণ চুপ করে থেকে) না, পারছি না।

চুণী। তা হলে শোভনের বাড়ীর লোক, অর্থাৎ শোভনের মা, তাঁর বোন, তাঁর চাকর-বাকর এদের মধ্যে কার কাছে শুনেছিলেন কথাটা? আপনি নামটা বললেই আমরা তাকে সাক্ষী ডাকব।

মায়া। না, তার বাড়ীর লোকদের কারও কাছে শুনি নি।

চুণী। তা হলে বাকী থাকছেন শোভন। শোভনই তা হলে বলেছিলেন আপনাকে কথাটা। শোভন আর আপনি যুক্তি ক'রে এই মিথ্যে কথাটা সুনীলের কানে তুলে ছিলেন।

মায়া। না।

চুণী। না? না মানে কি? আমি আপনাকে আরো একটা chance দিচ্ছি। বেশ ক'রে ভেবে বলুন, শোভন বলেছিলেন কি না আপনাকে কথাটা।

মায়া। না, না, শোভন কেন বলবে?

চুণী। এই জন্যে ব'লে থাকতে পারেন, যে শুনলে সুনীল তাঁর রিভলভারটা নিয়ে হয়ত আসবেন, আর তখন যার শিল যার নোড়া তারই ভাঙি দাঁতের গোড়া জাতীয় একটা কাণ্ড শোভন করবেন। শোভনের গায়ে জোর ছিল অসাধারণ।

মায়া। না, না, শোভন আমাকে কিছু বলে নি।

চুণী। তা হলে আমাকে খুব দুঃখের সঙ্গে বলতে

জেনে, কথাটা আপনাকে কেউ বলে নি। (মায়ার দিকে তর্জনী নির্দেশ ক'রে, উচু গলায়) সুনীলকে ওটা বানিয়ে বলেছিলেন আপনি নিজেই।

মায়া। না, না, আমি কেন বলব, আমি কেন বানাব?

চুণী। আপনি ত চেয়েই ছিলেন, সুনীল তাঁর রিভলভারটা নিয়ে শোভনের কাছে যান।

মায়া। কি জন্যে চেয়েছিলাম তা ত বলেছি।

চুণী। মিথ্যে কথা বলেছেন। আপনার আশা ছিল, আপনার স্বামী শেষ পর্য্যন্ত রিভলভারটাকে কাজে লাগাতে বাধ্য হবেন। শোভন সেনের একটা কিছু অবাঞ্ছিত প্রভাব হয়ত ছিল আপনার উপর, যার থেকে এই উপায়ে আপনি মুক্ত হতে চেয়েছিলেন।

মায়া। না, না, কক্ষণো না। (উঠে দাঁড়াল।)

চুণী। আর তা চেয়েছিলেন ব'লেই শোভন সেনকে টেলিফোনে সাবধান ক'রে দেননি আপনি।

মায়া। (রেলিং চেপে ধ'রে একটু সামনে ঝুঁকে আর্তস্বরে) না, না, না, সেরকম কোন উদ্দেশ্য আমার মনে ছিল না, থাকতে পারে না। আপনারা বিশ্বাস করুন।

চুণী। আপনি না না ব'লে চেঁচালে আমি শুনব না, এঁরাও কেউ শুনবেন না। এ ত এখন জলের মত পরিষ্কার। শোভন সেনের মৃত্যু ইচ্ছে ক'রে, প্ল্যান ক'রে আপনি ঘটিয়েছেন। পুলিশ কেন এতদিন ছেড়ে রেখেছে আপনাকে জানি না।

বীরেন। (উঠে দাঁড়িয়ে) মি লর্ড! কাউন্সেলের কেস্ কি তাহলে এই যে, এই সাক্ষী আসামী সুনীল নাগকে দিয়ে শোভন সেনকে হত্যা করিয়েছেন? It would suit me very well, indeed! (বসলেন।)

চুণী। মি লর্ড! মনে হতে পারে এই সাক্ষীকে expose করতে গিয়ে আসামী সুনীল নাগকে আমি ডাগিয়ে দিচ্ছি, কিন্তু তা দিচ্ছি না। সাক্ষীর জেরা শেষ হয়ে গেলে বেশ ধীরে সুস্থে আমি প্রমাণ করব যে, আমার client আসামী সুনীল নাগ সম্পূর্ণ নির্দোষ। শোভন সেনের অপমৃত্যুর জন্যে দায়ী, সম্পূর্ণ ও একমাত্র দায়ী এই সাক্ষী, মায়া নাগ।

মায়া। (দুই হাতে কাঠগড়ার রেলিং চেপে ধ'রে) না, না, না কক্ষণো না। এ অসম্ভব কথা।

চুণী। মিসেস্ নাগ! এটা আদালত। প্রমাণ-প্রয়োগ দিয়ে এখানে কথা বলতে হয়। কেবল চেঁচিয়ে হ্যাঁ বা না বললে এখানে কোন কাজই হয় না।

মায়া। হোক আদালত, তাই ব'লে আপনার যা খুশি আপনি বলবেন আর তাই চুপ ক'রে আমাকে শুনতে হবে? আপনি অত্যন্ত অন্যায় ক'রে এই সব কথা আমার নামে বলছেন। মিথ্যে ক'রে বলছেন, কিন্তু কি ক'রে আমি তা প্রমাণ করব? (দুহাতে মুখ ঢেকে চেয়ারটাতে বসল।)

চুণী। পারবেন না, কাজেই সে চেষ্টা ক'রে লাভ নেই। শোভনের কাছে একটা রিভলভার আছে, এই মিথ্যে খবরটা সুনীলকে দিয়ে তাকে ভয় পাওয়ানো, যাতে সে নিজের রিভলভারটা নিয়ে শোভনের কাছে যায়; আর তারপর সম্ভবতঃ সে তাই যাচ্ছে জেনেও শোভনকে টেলিফোনে সাবধান ক'রে না দেওয়া, এই দুটোকে একসঙ্গে ক'রে ধরলেও যদি criminal intent না প্রমাণ হয় ত বৃথাই পঁচিশ বৎসর ক্রিমিন্যাল কোর্টে আমি প্র্যাকটিস করছি। আপনাকে জেরা করা আমার শেষ হয়েছে। আপনি যেতে পারেন। (নিজের বসবার জায়গায় যাবার জন্যে ফিরলেন।)

মায়া। (উঠে দাঁড়িয়ে) না, না, না, যাবেন না! যাবেন না! আমার বলবার কথা কিছু আছে।

চুণী। (ফিরে দাঁড়িয়ে) আবার কি বলবার কথা?

মায়া। আছে কিছু কথা। পারি কি বলতে?

চুণী। অবিশ্যি পারেন। শোনবার জন্যে আমরা ত উদ্‌গ্রীব হয়েই রয়েছি। তবে এখন recess-এর সময়, এঁরা সবাই কিছুক্ষণের জন্যে উঠবেন। Recess-এর পর আবার যখন কোর্ট বসবে, আপনি হাজির থাকবেন। আপনার সব কথা আমরা শুনব।

(জজ উঠে দাঁড়ালে কোর্টে উপস্থিত অন্যরাও উঠে দাঁড়ালেন। জজ বেরিয়ে গেলেন পিছনের পর্দাঢাকা দরজা দিয়ে। অন্যেরা ধীরে ধীরে নিষ্ক্রান্ত হয়ে যাচ্ছেন। মায়া কাঠগড়া থেকে নামতে গিয়ে একটু হোঁচট খেল, চুণীলাল ছুটে গিয়ে তার একটা হাত ধরলেন।)

পটক্ষেপ

ক্রমশঃ

সাধু কৃষ্ণপ্রেমজী

শ্রীআভা পাকড়াশী

রাণীক্ষেত থেকে ভোরের বাসে বেরিয়ে আলমোড়া দেখতে এসেছি। ভারী সুন্দর সাজান শহরটি। বাসষ্ট্যাণ্ডের ওপরেই অ্যাম্বাসেডার হোটেল। ঐ হোটেলেই মধ্যাহ্ন ভোজন সমাধা করা হ'ল। দারুণ ঝাল রান্না। এই হোটেলে খেতে খেতে হঠাৎ দেখা হয়ে গেল অগ্নিযুগের একজন খ্যাত উল্লাসকর দত্তের ভাইয়ের সঙ্গে। তাঁর কাছেই শুনলাম, এই আলমোড়া থেকে আঠার মাইল দূরে মির্ত্তোলা ব'লে একটি জায়গায় সাধু শ্রীকৃষ্ণপ্রেম-এর আশ্রম রয়েছে। এই কৃষ্ণপ্রেমজী কিন্তু আসলে একজন খাঁটি ইংরেজ-সন্তান। বড় কৌতূহল হ'ল এঁকে দেখার। এ কেমন ইংরেজ যে আবার আমাদের মূর্ত্তিপূজো করে? ক্রাইষ্টকে না ভজনা ক'রে, করে কৃষ্ণের ভজন?

আমার স্বামী বললেন, আমি শুনেছি উনি নাকি চমৎকার পদাবলী কীর্ত্তনও গাইতে পারেন।

আমি বলি, যাওয়া যায় না এখন?

আমাদের মতলব শুনে দত্তমশাই বললেন, কিন্তু এমনি হুট ক'রে যদি আপনারা গিয়ে পড়েন, তা হ'লে হয়ত উনি নাও পছন্দ করতে পারেন। তিনি শান্তিপ্রিয় মানুষ, তাই ঐ নির্জ্জনে আশ্রম স্থাপন করেছেন। লোকসমাগম বিশেষ পছন্দ করেন না।

আমি বলি, তা হোক, সাধুসন্ত মানুষ যখন, তখন অতিথিকে কি আর বিমুখ করবেন? আর করলেই বা শুনছে কে? বলব 'মানো ঔর না মানো, ময় তুমহারা মেহমান।' জীবনে এমন সুযোগ আর নাও আসতে পারে। না হয় তাঁকে দর্শন ক'রেই ফিরে আসা যাবে।

বাসষ্ট্যাণ্ডে গিয়ে খোঁজ করা হ'ল, মির্ত্তোলা যাবার কোন বাস আছে কি না? তারা বলল, আছে, তবে এখন নয়, বিকেল পাঁচটায় ছাড়বে। আর ফেরত বাস? না, রাত্রে আর ফিরবে না, পরদিন ভোরে ঐ বাসটিই আবার ফেরত আসবে।

বেশ ঠাণ্ডা। সঙ্গে আমাদের কিছুই নেই। জানতাম, আজই আবার রাণীক্ষেতের হিমালয় হোটেলে ফিরে যাব। তবু কেমন যেন একটা আকর্ষণ অনুভব করতে লাগলাম ঐ সাধু শ্রীকৃষ্ণপ্রেমজীকে দর্শন করার, তাই সাত-পাঁচ না ভেবেই বাসে চ'ড়ে ব'সে রইলাম।

কাঁচামাটির পাহাড়িয়া পথের ওপর দিয়ে ছোট্ট একটি বাস ছুটে চলেছে। ঝাঁকুনির চোটে অবস্থা কাহিল। তবে পথের শোভা অবর্ণনীয়। সেই নানা রঙের ফসল-বোনা সিঁড়ি সিঁড়ি ক্ষেত। দু'ধারে পাহাড়ী গ্রাম। শেষ পর্য্যন্ত প্রায় সন্ধ্যের মুখে বাসটি আমাদের সাড়ে বত্রিশ ভাঙ্গা ক'রে পানবেনৌলায় নামিয়ে দিল। ও কি, মির্ত্তোলা কোথায়? ঐ যে সামনের পাহাড়ে তিন মাইল চড়াই ভাঙো তবে ত মির্ত্তোলা পৌঁছবে? সর্ব্বনাশ, পথ-ঘাট কিছুই যে জানা নেই, এখন উপায়?

একজন লোক ও কিছু কুলি মাল নিয়ে যাচ্ছিল ঐ মির্ত্তোলা ছাড়িয়ে পিথোরাগড়ে। আমাদের ব্যাপার বুঝে সেই লোকটি বলল, যদি পাকদণ্ডি দিয়ে যেতে রাজি থাকেন ত আপনাদের কিছুটা পথের নিশানা আমি দিতে পারি। নিরুপায় হয়ে তখন তাকেই পারের কাণ্ডারী ক'রে শেষ পর্য্যন্ত রওনা দেওয়া হ'ল।

কেদারবদ্রীর পথ হাঁটার দরুণ পাকদণ্ডিতে হাঁটার একটা তিক্ত অভিজ্ঞতা ছিলই। কিন্তু সেই সন্ধ্যের ঘোরে জঙ্গলের মধ্যে ঘুরে অচেনা পথ খুঁজে বার করার চেয়ে, চেনা পাকদণ্ডিই শ্রেয় মনে হ'ল। উঃ, কি দারুণ প্রাণান্তকর চড়াই। তায় আবার পায় হাই হিল জুতো। যাই হোক্‌, ঘণ্টাখানেক ধ'রে পথের সঙ্গে যুদ্ধ ক'রে কোনরকমে একেবারে পাহাড়ের চূড়ায় উঠলাম। সেইখান থেকে কুলিরা আর লোকটি চ'লে গেল পিথোড়াগড়ের দিকে। নীচে, অনেক নীচে পাহাড়ের কন্দর থেকে ভেসে আসছে শঙ্খঘণ্টার ধ্বনি, ওরা বলল, ঐ হচ্ছে সাধুজীকা আশ্রম, আপনারা এবার নেমে যান এই পথ দিয়ে।

পথ আর কোথায়, একেবারে বিপথ। প্রতি মুহূর্ত্তে ভয় হচ্ছিল, পাহাড়ের অন্য দিকে না নেমে যাই। আবার কুয়াসায় ছেয়ে গেল চতুর্দ্দিক্। সঙ্গে সঙ্গে নামল টিপ টিপ বৃষ্টি। সঙ্গে না আছে ছাতা, না ওয়াটারপ্রুফ। ওদিকে আরতির ঘণ্টার শব্দও আর পাওয়া যাচ্ছে না। যা লক্ষ্য ক'রে নামছিলাম তাও ঢাকা প'ড়ে গেল কুয়াসায়। এখন আমাদের অবস্থা একেবারে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়। এদিকে দুপুরে ঝালের চোটে জিলিপির টাকনা দিয়ে

যেটুকু পেতে দেওয়া হয়েছিল তা একটা বাঘের ঝাঁকুনি আরণ্য কদতির চড়াই ভাঙার পর কোথায় ঢ'লিয়ে গেছে। সঙ্গেও কিছু নেই।

হঠাৎ কুয়াশা স'রে গিয়ে দিনমণির অতর্কিত আবির্ভাবে সারা বনস্থলী আলোকিত হয়ে উঠল আর অপ্রত্যাশিত ভাবেই নীচে দেখতে পেলাম, একটি মন্দিরের চূড়া। আর কি, পায় তখন পাখনা গজিয়েছে, হুড়মুড় ক'রে কাঁটা-ঝোপ মাড়িয়ে, খানা-খন্দ ডিঙিয়ে, নালী বেয়েই নেমে পড়লাম, পরকাল হাতে নিয়ে।

বামে শ্রীকৃষ্ণপ্রেম দক্ষিণে মাধবাশীষ

পৌঁছলাম গিয়ে আশ্রমের পেছন দিকে। এখনও বেলা যায় নি। কিন্তু সেই রোদ্দুরের মধ্যেই এল ঝম্‌ঝমিয়ে বৃষ্টি। আমরা ছুটে গিয়ে বারান্দায় উঠতেই একটি কালো রংয়ের ভুটিয়া কুকুর আমাদের দেখে ভীষণ বিরক্ত হয়ে বিকট চেঁচামেচি জুড়ে দিল। সেই চীৎকারে আকর্ষিত হয়ে বেরিয়ে এলেন এক ছ' ফুট লম্বা দিব্যকান্তি পুরুষ। মাথায় সুস্পষ্ট শিখা, বক্ষে উপবীত, গায়ে উত্তরীয়।

আমরা বিনম্র কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলাম, আপনিই কি শ্রীকৃষ্ণ-প্রেমজী?

উনি শশব্যস্তে বলেন, না, না, তিনি আমার গুরুদেব, আমি তাঁর শিষ্য মাধবাশীষ।

একেবারে অ্যামেরিকান-টানে বাংলা ভাষণ শুনে আমরা একটু থতিয়ে গেলাম প্রথমটা। হঠাৎ মনে হ'ল, যেন হলিউডের গ্রেগরী পেক্‌ স্যুটবুট ছেড়ে গেরুয়া ধারণ ক'রে সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। যাই হোক, আমরা তাঁকে বললাম শ্রীকৃষ্ণ-প্রেমজীর দর্শন চাই।

তখন উত্তর দিলেন, তিনি ত এখন জপে বসেছেন, তা ছাড়া আপনারা এ ভাবে না এসে পানুবনৌলার ডাকবাংলোয় উঠলে পারতেন। আমাদের এখানে ত থাকার কোন্ ব্যবস্থা নেই।

আমরা বললাম, দেখুন, তাঁকে দর্শন করার আগ্রহ আমাদের এতদূর টেনে এনেছে। আমরা আপনাদের কোনমতেই বিরক্ত করব না। তাঁকে একবার দর্শন ক'রে আমরা না-হয় আবার এই ভর সন্ধ্যেবেলাই ঐ অথক পথ দিয়েই ফিরে চ'লে যাব।

কিছু না ব'লে ওপরে চ'লে গেলেন।

এবার নেমে এসে হাসিমুখে আমাদের নিয়ে দোতলায় চললেন, সেখানে একটি কাঁচঘেরা ঘরের পরিষ্কার মেঝেতে আমাদের জন্য কয়েকটি আসন পেতে দিলেন। একটু পরেই সেই ঘরের পাশের একটি দরজা খুলে যিনি বেরিয়ে এলেন তাঁকে দর্শন ক'রে আমাদের মন, যুগপৎ শ্রদ্ধা ও ভক্তিতে আপ্লুত হয়ে উঠল। মনে হ'ল যেন স্বয়ং গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু আবার স্বশরীরে মর্ত্যে অবতরণ করছেন। এমনি মহিমাময় মূর্তি তাঁর। আমরা সকলেই তাঁকে প্রণাম করলাম। তিনি আমাদের সামনে আসন গ্রহণ করলেন। ঐ দারুণ পথের কষ্ট, খিদে-তেষ্টা সব নিমেষে অন্তর্হিত হ'ল ঐ মহাপুরুষকে দর্শন ক'রে।

আমার পরিশ্রান্তভাব প্রথমেই তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করল। তাই সর্বপ্রথম আমাকেই পরিষ্কার বাংলায় প্রশ্ন করলেন, তুমি অখন্ড পথ কেন এলেছ মা? আমার আশ্রমে আসার ত বেশ ভাল পথ আছে।

তখন তাঁকে আনুপূর্বিক সব বৃত্তান্ত বললাম।

শুনে একটু অবাক্ হয়ে সপ্রশংসভাবে বললেন, ঐ পাকদণ্ডির কঠিন চড়াই ভেঙে এসেছ তুমি বাঙালীর মেয়ে হয়ে? আশ্চর্য্য ত!

এবার ওঁর প্রশ্নে সচকিত হয়ে উঠেন। নিমেষে মুখের ভাব পরিবর্তিত হ'ল। ও সাধুসন্ত দেখলেই তাঁদের উল্টোপাল্টা প্রশ্ন করতে থাকে। উদ্দেশ্য, যদি ওঁরা বিরক্ত হয়েও কিছু গূঢ়তত্ত্ব প্রকাশ ক'রে ফেলেন, এই আশা।

এখানেও তার ব্যতিক্রম হ'ল না—উনি কিন্তু ধীর ভাবে উত্তর দিলেন, দেখুন, আপনি যে রকম উচ্চমার্গের জ্ঞান-গর্ভ আলোচনা শুনতে চান আমার তা জানা নেই। আমি লেকচারবাজি করা পছন্দও করি না তাই লোকালয় ছেড়ে পাহাড়ের এক প্রান্তে এই কুটীর বেঁধেছি। আমার যোগযাগ কিছুই জানা নেই, আছে শুধু ভক্তি। আর আমার গুরুমা যশোদামায়ী যেমন ভাবে ব'লে গেছেন ঠিক তেমনি ভাবে তাঁর পন্থা অনুসরণ ক'রে শ্রীরাধাকৃষ্ণের পুজো ক'রে যাচ্ছি। এ ছাড়া আর ত কিছু জানি না।

এমন নিরহঙ্কার, নিরভিমান উক্তি অতিরিক্ত অনুসন্ধিৎসুকেও স্তব্ধ ক'রে দেয়। একটু পরে আর সেই বিরক্ত ভাব রইল না।

মানুষ যতই লোকালয় পরিত্যাগ করতে চাক, আর যত বড় মহাপুরুষই হোক, মানুষ দেখলে সে খুশী হবে না এ হতেই পারে না। তা ছাড়া এই খুশী হওয়ার আর একটা কারণ বোধ হয়, ঁর ঐ গুরুমা যশোদামাইয়ের আপন ভাই আমাদের সঙ্গে সবিশেষ পরিচিত ছিলেন। তা ছাড়া বহুদিন পর বোধ হয় উনি বাংলায় কথা বলতে পারলেন আমাদের সঙ্গে, এটাও একটা কারণ। যতই নিস্পৃহ ভাব দেখাতে চেষ্টা করুন, মুখে চোখে ফুটে উঠছিল আনন্দের আভাস। গুরুমার ভাইয়ের বাড়ীর কুশল জিজ্ঞেস করলেন। কে কোথায় আছে তার খবর নিলেন। তখন সাহস পেয়ে আমার ছেলে তাঁর একটি ছবি তুলতে চাইল। কিন্তু তখনও বৃষ্টি পড়ছে। আলো না হ'লে ছবি উঠবেই না, ঐ ছোট্ট বেবি ব্রাউনি ক্যামেরাতে।

তবু কথা বলতে বলতে নীচে নামলেন। বললেন, দেখুন ত, আপনারা আমার অতিথি, কি ভাবে আপনাদের যত্ন করি? দুপুরে আমি নিজে হাতে রান্না ক'রে রাধারাণী ও কিষণজীর ভোগ দিই ও আমরা গুরু-শিষ্য তাই আহার করি। সন্ধ্যায় ভোগ হয় শুধু দুধ আর লাড্ডু। আপনারাও তাই খান তবে।

আমি বলি, না, তারও দরকার হবে না। এখানকার এই সুন্দর পরিবেশে এসে আর আপনাকে দর্শন ক'রে আমার ক্ষুধা তৃষ্ণা আর কিছুই অনুভব হচ্ছে না।

উনি বলেন, তোমার ঐ ছোট ছোট ছেলেরা এ সবের কি বুঝবে বল না।

এদিকে আলো কমে আসছে। আমার ছেলে বলে, আপনি এই বারান্দারই এক পাশে না হয় দাঁড়ান আমি একটা ছবি তুলে নি।

মাধবাশীষের পাশে সিঁড়ির ধারে গিয়ে দাঁড়াতেই হঠাৎ ফ্ল্যাশ-লাইটের মত এক ঝলক রোদ পাহাড়ের ফাটলের মধ্যে দিয়ে এসে ওঁদের মুখের ওপর পড়ল। চমৎকার ছবি উঠল। সেই সূর্য্য কিরণে উদ্ভাসিত জ্যোতির্ম্ময় মূর্ত্তির আলেখ্যখানিও এই সঙ্গে দিলাম। এটি আমাদের কাছে একটি অদ্ভুত ঘটনা ব'লেই প্রতিভাত হ'ল। অকস্মাৎ এই আলোর প্রকাশ কবির লেখা "নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গের" দু'টি লাইন মনে পড়িয়ে দিল—

আজি এ প্রভাতে রবির কর
কেমনে পশিল প্রাণের 'পর,
কেমনে পশিল গুহার আঁধারে প্রভাত পাখীর গান।
না জানি কেন রে এতদিন পরে জাগিয়া উঠিল প্রাণ।

এবার আমাদের সঙ্গে ক'রে উঠোন পেরিয়ে নিয়ে গেলেন লাইব্রেরী ঘরে। কাঁচের শার্সিদেরা কাঠের দু'খানি ঘর। অনেক ভাল ভাল বই রয়েছে সেখানে। মেঝেতে গালচে পাতা। বললেন, রাত্রে তবে এই-খানেই থাকুন। আমাদের সঙ্গে কিছুই ছিল না। এ দিকে সন্ধ্যা নামার সঙ্গে সঙ্গে হাড়ের মধ্যে কাঁপুনি উঠছে। কি সাংঘাতিক ঠাণ্ডা তবু ওরই মধ্যে চারজন ক্লান্ত শরীরে জড়সড় হয়ে ব'সে রইলাম। একটু পরেই মাধবাশীষ প্রায় চার-পাঁচটি ভুটিয়া কম্বল ও দু'তিনটি মলিদা নিয়ে হাসিমুখে এসে উপস্থিত।

আমি বললাম, এতগুলি কম্বল কি হবে? তা ছাড়া আপনাদের নিজেদের জন্য রেখে এনেছেন ত?

স্মিত হেসে বলেন, হ্যাঁ, এবার আপনারা আরতি দেখবেন চলুন।

মেঝে এত ঠাণ্ডা, পা রাখে কার সাধ্য, কিন্তু ওঁরা গুরুশিষ্য সমানে খালি পায়ে যাতায়াত করছেন, আমরাও খালি পায়ে মন্দিরে চললাম। মনে ভারী আনন্দ হচ্ছে এবার শ্রীকৃষ্ণপ্রেমজীর সেই অপূর্ব্ব সঙ্গীত শুনতে পাব। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন সুন্দর মন্দিরটি। বেশ বড় একটি সিংহাসনের ওপর রাধাকৃষ্ণের মধুর যুগলমূর্ত্তি ও তাঁদের সামনে গণেশ ও শিবের মূর্ত্তি রাখা রয়েছে। শ্রীকৃষ্ণপ্রেম কাঁসর বাজালেন আর মাধবাশীষ আরতি করলেন—প্রথমে পঞ্চপ্রদীপ তার পর কর্পূর-প্রদীপ, তার পর চামর ও বস্ত্র দিয়ে সুন্দর আরতি করলেন—আরতি শেষে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম। এবার প্রদীপ হাতে চললেন বাইরে মা যশোদামাই-এর সমাধিমন্দিরের দিকে। আমরাও গেলাম সেখানে—ছোট্ট একটি সমাধি মন্দির। এবার গানের জোগাড়, খোল আর হারমনিয়ম নিয়ে এলেন মাধবাশীষ। হারমনিয়ম নিয়ে বসলেন

আলমোড়ার পথে খাসেভর হোটেল

শ্রীকৃষ্ণপ্রেম আর মাধবাশীষের কোলে শ্রীখোল। তখন আমাদের মনে অন্ত কোন ভাব নেই। একবারও মনে হচ্ছে না এরা দুজন বিজাতীয়, পৌত্তলিকতায় অবিশ্বাসী ইংরেজ-সন্তান বসেছে আমাদের আরাধ্য দেবতাকে পূজো করতে, গান গেয়ে তুষ্ট করতে।

সে যে কি অমৃতময় অপার সঙ্গীত, কানে না শুনলে তার আস্বাদ বোঝান ভাষায় সম্ভব নয়। চতুর্দ্দিক্ নিথর নিস্তব্ধ, আকাশে মেঘ স'রে গিয়ে চাঁদ হাসছে। নীচের জঙ্গলে শন শন ক'রে বাতাস বইছে আর সেই বাতাসে পাতায় জমা বৃষ্টির জল ঝিম ঝিম ক'রে ঝ'রে পড়ছে। তারই মধ্যে এই মন্দির আর সেই মন্দিরে ধ্বনি উঠছে—ব্রজকুল আকুল—দুকূল কলরব—সঙ্গে দোহার হয়েছেন মাধবাশিস। সমস্ত পাহাড় পর্ব্বতের কন্দরে কন্দরে যেন বৃন্দাবনবাসীর সেই বিরহব্যথা, মর্ম্মবেদনা ক্রন্দনের সুরে আকুল হয়ে উঠেছে। এমন প্রাণঢালা সঙ্গীত শুনে প্রেমময় শ্রীকৃষ্ণ কি আর শ্রীকৃষ্ণপ্রেমকে দর্শন না দিয়ে থাকতে পারেন? মন ভাবে ভোর হয়ে উঠল। আমাদের অনুরোধে শ্রীকৃষ্ণপ্রেম পর পর আরও ক'খানি গোবিন্দ দাসের পদাবলি গেয়ে শুনিয়েছিলেন। আজ এত দিন পর আর তার কথাগুলি ঠিক মত মনে পড়ছে না। আগে ছিল শুধুই এঁকে দেখার কৌতূহল, এখন সেই কৌতূহল রূপ নিল শ্রদ্ধায়। এবার প্রণামান্তে উঠলাম।

লাইব্রেরী ঘরে এসে বসেছি। একটু পরেই মাধবাশীষ এলেন, হাতে একটি ডেকচিতে প্রায় সের-খানেক ফুটন্ত দুধ আর পেছনে চাকরের হাতে চারটি গেলাস, চারটি থালা ও সেই থালায় গরম পরোটা, আমের আচার এবং বড় বড় চারটি আটার লাড্ডু। ভারী সঙ্কোচ লাগে, ছিঃ কত কষ্ট করছেন এরা আমাদের জন্ত। হয়ত গুরুশিষ্য এতক্ষণ এই দুধটুকু খেয়ে রাত্রের মত বিশ্রাম নিতেন, কিন্তু এখন হয়ত বা ক্ষুধার্ত্ত অতিথিকে নিজের মুখের খাবারটিই ধ'রে দিলেন।

আমরা অনুযোগ করায় নিজে এলেন শ্রীকৃষ্ণপ্রেম—বললেন, না, না, আপনারা কুণ্ঠিত হচ্ছেন কেন? দুধের অভাব কি? আমার গোয়ালে গরু আছে।

আমি বলি, তা না না হয় হ'ল ঐ দুধটুকুই ত যথেষ্ট ছিল। আবার পরোটা কেন?

বলেন, মাধবাশীষকেও দিয়েছি ত, বোধ হয় তাঁরও খেতে ইচ্ছে হয়েছিল। এবার একটি লণ্ঠন রেখে, আমাদের রাতে দরজা খুলে বাইরে যেতে মানা ক'রে তাঁরা শুতে গেলেন। বাইরে নাকি নেকড়ে বাঘ আসে। ঐ কুকুরটির ছোড়াটা নিয়ে গেছে। এঁদের নিজেদের ক্ষেত আছে, তাতে গম আর আলু হয়। ঐ গরুর দুধ, ক্ষেতের গমের রুটি আর আলুর তরকারি, এই এঁদের সারা বছরের প্রধান খাদ্য। কোথায় বা লাঞ্চ, কোথায় বা ডিনার? আমাদের মতই মেঝেতে আসন পেতে ব'সে আহার করেন এঁরা? আশ্চর্য্য, আবাল্যের অভ্যাস কি ভাবে ত্যাগ করছেন এঁরা!

লাইব্রেরী ঘরের কাঁচের সার্শির মধ্যে দিয়ে বাইরের প্রকৃতির অপরূপ রূপ দেখছি। চতুর্দ্দিক্ নিঃঝুম হয়ে রয়েছে। রাত্রি নিশীথিনী যেন কিসের অপেক্ষায়, কার প্রতীক্ষায় মৌন হয়ে স্থির হয়ে রয়েছে। শুধু মাঝে মাঝে ফেউয়ের ডাক ঐ নিঃশব্দতার মধ্যে ক্ষণিক আলোড়ন তুলছে। ঘন পাইনের জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে আসছে আবছা চাঁদের আলো। মন্দিরে একটি প্রদীপ জ্বলছে টিম টিম ক'রে, মনে হচ্ছে এক্ষুণি এই মুহূর্ত্তে ঐ মৌন বনগুলি যেন শ্রীকৃষ্ণের মধুর বংশীধ্বনিতে-মুখর হয়ে উঠবে। সেই বংশীরব শোনার অপেক্ষাতেই যেন প্রকৃতি

দেবী রাধারাণীমাকে উন্মুখ হয়ে অধীর হৃদয়ে নীরবে কান পেতে অপেক্ষা করছেন।

রাত ভোর হ'ল। প্রভাত-পাখীর গানে ঘুম ভাঙল। দরজা খুলে বেরুতেই দেখি, বাইরে এক বালতি জল রাখা রয়েছে। মুখহাত ধুয়ে ঘরের ভেতর এলাম, বাইরে চেয়ে দেখি মুণ্ডিত-মস্তক গেরুয়া বসন-পরিহিত কৃষ্ণপ্রেমজী স্নান সমাপনান্তে সাজি ভ'রে ফুল তুলছেন। কি অপরূপ যে লাগছিল। ঐ ভোরের আলোয় ওঁর অপূর্ব্ব মূর্ত্তিখানি দেখে মনে হচ্ছিল, সার্থক হয়েছে আমাদের এঁকে দর্শন করতে আসা। তবু মনে প্রশ্ন জাগে এই যীশুভক্ত ইংরেজ অধ্যাপক ও ঐ ইঞ্জিনীয়র, ওঁরা কি পেয়েছেন আমাদের কৃষ্ণে? কেন এঁদের এই কৃচ্ছ্রসাধন? তবে কি এঁদের কাছে পবিত্র কাঠের ক্রুশের চেয়ে কৃষ্ণের বাঁশের বাঁশীই বেশী মূল্যবান্ ও পবিত্র হয়ে রূপ নিয়েছে? এই পূজো, অর্চ্চনা, আরতি, ভোগ-রান্না, এই ঠাকুর সেবার মধ্যে দিয়ে নিশ্চয়ই এঁরা এমন কিছু পেয়েছেন যা এঁদের সেই আশৈশব অভ্যস্ত জীবনের মর্ম্মমূলে নাড়া দিয়েছে।

যাবার বেলা হ'ল। প্রেমের ঠাকুর শ্রীকৃষ্ণ ও রাধারাণী এবং শ্রীকৃষ্ণপ্রেম ও মাধবাশীষকে প্রণাম জানিয়ে আমরা আশ্রম ত্যাগ করলাম। শ্রীকৃষ্ণপ্রেম আমাদের পথ দেখিয়ে অনেক দূর পর্য্যন্ত এগিয়ে দিলেন।

বললেন, দেখ মা, কেমন পথ, কাল না জেনে কত কষ্ট পেয়েছ।

আমি বললাম, আমরা পথ না জেনেই ত বিপথে ঘুরে মরি, আপনারাই ত আমাদের এমনি ক'রে পথ চিনিয়ে মঙ্গল পথে এগিয়ে দেবেন এইটুকু আশা করি।

কথাটা বুঝে হাসলেন, বললেন, না মা, আমার জ্ঞানমার্গ, ভক্তিমার্গ কিছুই জানা নেই। তবে হ্যাঁ, এটুকু বলতে পারি, শান্তি পেয়েছি। আর আমার পন্থা যদি জিজ্ঞেস কর তবে সন্ত কবীরের ভাষায় বলব,

'হাঁজি হাঁজি করতে রহো
অপনে পথ পর বলতে রহো।'

এবার হাত বাড়িয়ে নীচে পানবনোলার ডাকবাংলো দেখিয়ে দিয়ে ফিরে চললেন। আমরা কিছুক্ষণ ওখানেই থমকে দাঁড়িয়ে অপলক নেত্রে তাঁর সেই অপস্রিয়মান প্রভাত-রৌদ্রস্নাত জ্যোতির্ম্ময় দেহটির পানে চেয়ে রইলাম। একবার পেছন ফিরে চেয়ে মৃদু হাসলেন, ওঁর ঐ উজ্জ্বল রূপ কেমন যেন মনে পড়িয়ে দিল—

'অসতো মা সদ্গময়
তমসো মা জ্যোতির্গময়
মৃত্যোর্মামৃতং গময়।'

যারা মনে করে ঝড়-তুফানকে এড়িয়ে যাওয়াই মুক্তি, তারা পারে যাবে কি ক'রে? কষ্ট না করলে কি কৃষ্ণ মেলে? 'গময়' এই কথাটির মানে হ'ল এই যে, পথ পেরিয়ে যেতে হবে, পথ এড়িয়ে যাবার জো নেই। সেই পথেই চলেছেন শ্রীকৃষ্ণপ্রেমজী।

ঘরোয়া

শ্রীমাধবী বন্দ্যোপাধ্যায়

টুথব্রাশ হাতে ঘর থেকে বারান্দায় পা দিতেই বৌদির সঙ্গে চোখাচোখি হ'ল গৌতমের। বিরক্ত হয়ে বলল, "কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।" বিড়্ বিড়্ ক'রে বলল কিন্তু বৌদিকে শুনিয়েই। "দিনটা আজ কেমন যায় কে জানে।"

"বড় যে ভূতের মুখে রাম নাম?" বৌদি হেসে বলে।

কোনি জবাব না দিয়ে বাথরুমে গেল মুখ-হাত ধুতে। ফিরে এসে তোয়ালে দিয়ে মুখ মুছতে মুছতে রান্নাঘরের সামনে ছোট্ট বারান্দা, যেখানে মা তরকারি কুটছিলেন, সেখানে বসল।

"কি তরকারি হবে আজ মা?"

"তা দিয়ে তোর দরকার কি? বাজারে যাবি কখন? আটটা বাজিয়ে তবে ত উঠিস্। এখন আবার এক ঘণ্টা আড্ডা মারা হবে। তবে বাবু বাজারে যাবেন।" সুনয়নীর হাত-মুখ একসঙ্গেই চলতে থাকে।

"বেকার বাজারে গিয়ে কি করব? আজ বাজারে কিছুই পাওয়া যাবে না।" গৌতম বলে।

"কেন, আজ কি?" প্রশ্নের চোখে মা তাকান।

"সে শুনে তুমি কি করবে? তবে জেনে রাখ, আজ যদি বাজারে কিছু মেলেও, আলুগুলো বেরোবে পচা, বেগুনে হবে পোকা, কুমড়ো হবে—"

"যা, যা, বেশি ফাজলামি করতে হবে না।" মাঝ পথেই ধমকে ওঠেন সুনয়নী।

"বেশ, খারাপ জিনিস হ'লে আমাকে দোষ দিতে পারবে না কিন্তু। আমার কি! বাজারে যাচ্ছি। চা-টা কি দয়া ক'রে আমাকে দেবে কেউ?"

বলতে না বলতেই বৌদি হেনা চা এনে দিল। কাপটি ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখতে লাগল গৌতম। হেনা বুঝল, এবার গৌতম কিছু বলবে। চা খেতে খেতে কাপের আড়াল থেকে সকৌতুকে দেবরকে লক্ষ্য করতে থাকে।

"আচ্ছা মা, ছোট কাপ বুঝি একটাই আছে বাড়ীতে?"

"ঐটা বুঝি ছোট কাপ হ'ল? তবে বড় কাপ কোন্টা?"

"তোমারটা, বৌদিরটা। জান মা, বৌদি না, আমাকে একেবারে ছেলেমানুষ ভাবে। তাই যাতে চা খেয়ে লিভার খারাপ না হয় সেজন্য ছোট কাপে ক'রে চা দেয়। হুঃ—তবু যদি না তিন বছরের ছোট হ'ত!"

"বেশ করে।" সুনয়নী ঝংকার দিলেন। "কাল থেকে আধসেরী গ্লাস নিয়ে বসিস্ একটা। ছোট ত কি? বৌদিরা বয়সে ছোটই হয়। মান্যে বড়। মায়ের মত। বলতেই বলে, মাতৃসমা বৌঠাকুরাণী। বৌদি ত আজকাল চল হয়েছে। আর তুই! বুড়ো হলি, বিয়ে করেছিস! বৌয়ের সামনে দিনরাত বৌদির সঙ্গে খুনসুটি করতে লজ্জা করে না?"

"লজ্জা স্ত্রীলোকের ভূষণ।" কাপ নিয়ে রান্নাঘরে ঢুকল গৌতম। "ও-সব চালাকি চলবে না। শীগ্‌গির আর এক কাপ চা দাও বৌদি।"

"সুমি, কেটলীটা চাপাও ভাই," হেনা বলে। সুমি ওরফে নতুন-বৌ ডালের হাঁড়ি নামিয়ে কেটলী চাপায়। সেদিকে তাকিয়ে গৌতম বলে, "ঐ ভারী হাঁড়িটা ঐটুকু মেয়েকে দিয়ে কেন ওঠা-নামা করাচ্ছ বৌদি! হাত ফস্কে প'ড়ে গেলে তখন আবার আর এক বিপদ্ হবে।"

"ইস্, গ'লে না যায় মাখনের মত।"

"যেতেও পারে। তোমার মত ত নয় 'খাই-খজ্জি'।"

এদের কথা শুনে সুমিতা মুখে আঁচল চাপা দিয়ে হাসে। সবে মাসখানেক বিয়ে হয়েছে।

কেটলীর জল ফুটে উঠতেই সুমিতা নামিয়ে চা-পাতা দিল। ফের ডালের হাঁড়ি চাপাবার উপক্রম করতেই গৌতম ব্যস্ত-সমাকুল কণ্ঠে ব'লে ওঠে, "বৌদি ভাই! যাও না, পায়ে-টায়ে ফেলবে। ছেলেমানুষ!"

হেনা, সুমিতা দু'জনে দু'জনের দিকে তাকিয়ে খিল্‌খিল্ ক'রে হেসে উঠল। হেনা বলল, "ইস্, কত! প্রেম যে একেবারে উথলে উঠল। বৌকে দেখানো হচ্ছে বুঝি কত ভালবাস? এর অর্ধেক দরদও যদি বৌদির জন্যে থাকত!"

"বাঃ, তা কি ক'রে হবে? ও হ'ল নিজের বৌ। তুমি হ'লে দাদার বৌ। অর্ধেক তোমাকে দিতে গিয়ে বুড়ো বয়সে দাদার হাতে মার খেতে পারব না। তায় আবার বৌয়ের সামনে।" গৌতম চায়ের কাপ মুখে তুলল। "দাদার সবটা পেয়েও মন ভরে নি বৌদি? আবার আমারটারও অর্ধেক চাই?"

হেনা অপ্রস্তুত হ'ল। হাসি চাপতে গিয়ে বিষম খেয়ে বলল, "যাও ভাই। বাইরে মা ব'সে আছেন হুঁস নেই?"

"কে অসভ্য? তুমি না আমি? শুনলে না একটু আগে মা কি বললেন? তুমি আমার মায়ের মত। তা বৌয়ের মত হ'তে যাচ্ছ কেন?" গৌতম দমে না।

হেনা কপট কোপে বলল, "বাড়াবাড়ি ভাল হচ্ছে না কিন্তু! দিন দিন তোমার স্পর্ধা বেড়েই যাচ্ছে। যতই আমি কিছু বলছি না ততই, না? এতদিন বৌ ছিল না, তাই সহ্য করেছি। এখন আর করব না। সুমি, তোমার বরকে সামলাও ভাই।"

"সুমির দিদিই কত পারল ত সুমি।" উঠে গৌতম মায়ের ঘরে গেল।

বধূদের রান্নার যোগাড় দিয়ে সুনয়নী পূজায় বসার উদ্যোগ করছিলেন।

"কই, টাকা দেবে না বাজারের? খালি বলবে, বাজারে যা, বাজারে গেলি না? ঘুম থেকে উঠেই ত সুরু হয় মাঙ্গলিকী। এত দেরি হলে বাজারে-ফাজারে যাব না। আগেই ব'লে রাখলাম।"

"আমি ত বের ক'রে রেখেছি কখন। তোর সময় হবে তবে ত! এখন বাজারে গিয়ে কখন তুই ফিরবি?"

"থাক্, তবে আর আজ না গেলাম।" গৌতম খুশীই হয় মায়ের কথায়। বাজারে যাবার চেয়ে একটু গল্প করতে পেলে কেই বা আপত্তি করে!

"জান মা, কালকে কি হয়েছে! রাত সাড়ে এগারটা

কি বারটা হবে। মাত্র ঘুমটা লেগে এসেছে, এমনি সময় পাশের বাড়ীর কর্তা ত মদে চুর হয়ে এলেন। তোমরা ত এদিকে থাক, অত টের পাও না। আমার ত একেবারে জানালার মুখোমুখি ওদের দরজা? সব কথাই কানে আসে। এসে মেয়েকে ডাকল—এ সুরমতিয়া, কেওয়াবী খোল্। কয়েক বার ডাকার পরে মেয়ে ঘুম-চোখে উত্তর দিল—কা? তার পরে উঠে দরজা খুলে দিল, কিন্তু বাবা আর ভিতরে ঢুকল না। রাস্তায় পায়চারি করতে লাগল আর চেঁচাতে লাগল—হাম কহৈলি, সুরমতিয়া কেওয়ারী খোল্। তু কহৈলি, কা? হাম কহৈলি, কেওয়ারী খোল্। তু কহৈলি, কা? কা? কা? তু কোয়া হায় কা? কা, কা, করতে রহৈলি কৌয়াকে মাফিক। হাম কহৈলি—। রাতভর চলল বুড়োর চেঁচামেচি। কা কা করতে করতে ক্লান্ত হয়ে সকালবেলায় ঘুমিয়েছে।"

রান্নাঘরে হেনা বলল সুমিতাকে, "ঠাকুরপোর মতলব সুবিধের নয়। মা'র কাছে ব'সে গল্প ভাঁজছে। গল্প-টল্প ক'রে ঠিক বলবে, বেলা হয়ে গেছে, আজ বাজারে যাব না।"

সুমি সম্মতিসূচক হাসল। "হ্যাঁ, দিদি, গল্পটা কিন্তু সত্যিই। যতবার মনে পড়ছে হাসি পাচ্ছে।"

হেনা—"আর বলছে কেমন ক'রে দেখ না, ঠিক ওর নকল ক'রে। মাতালদের ত মাথায় একবার যা ঢোকে, তাই বার বার বলে।"

খানিক পরেই গৌতমের গলা শোনা গেল, "ওমা, ন'টা বেজে গেছে। আজ আর চাকরি থাকবে না।" হেনা সুমিতার দিকে অর্থপূর্ণ ভাবে তাকাল।

"নাঃ, আমার তোয়ালেটা যে কোথায় যায়! একদিনও হাতের সামনে পাই না। যাক্ গে, এটা কার? এটাই নিলাম।" ব্যস্তভাবে মাথায় দু'ঘটি জল ঢেলে স্নান সেরে নেয় গৌতম। খেতে ব'সে দু'গ্রাস মুখে দিয়েই ব'লে ওঠে, "দেখ মা, যা বলেছিলাম, তা সত্যি কি না!"

"কি?" সুনয়নী অবাক্ হন।

"বলেছি না, আজ অদৃষ্টে কিছু ভাল জুটবে না। এই ত বাঁধাকপির তরকারি জিনিষটা ত ভালই। কিন্তু খেয়ে দেখ, কি বিশ্রী হয়েছে খেতে।"

"কেন, কি হয়েছে?" একটু বিস্মিত, একটু বা বিব্রত হয়ে হেনা বলে। সেই পরিবেশন করছিল।

"খেয়ে দেখ। সকালে উঠে যখন তোমার মুখ দেখেছি, তখনই জানি কপালে আজ দুর্ভোগ আছে। যেদিন তোমার মুখ দেখে উঠি, সেদিনই ছাই-ভস্ম খাই।"

এবার হেনা বুঝল যে সবটাই গৌতমের দুষ্টুমি। বৌদিকে রাগাবার জন্যে নিত্য-নূতন ফন্দি বের করে। বলল—"আচ্ছা, আর বৌয়ের মুখ দেখে উঠলে?"

"পোলাও কালিয়া।"

"বেশ ত, তবে রোজই বৌয়ের মুখ দেখে উঠো। ভাল ভাল জিনিষ খাবে।"

"আমার অত সুখ তোমার সহ্য হ'লে ত! হিংসুক কোথাকার। রোজই ত দেখি, ভোর না হতেই বৌটাকে এনে উনুনের গোড়ায় বসিয়ে দাও।"

সুনয়নী এবার ধমকে ওঠেন। "তোর না দেরি হয়ে গেছে বললি? ওঠ্ তাড়াতাড়ি। লঘু-গুরু জ্ঞান নেই। সব সময় ফাজলামি।"

"আর দুটো ভাত দাও। আলুনি ডাল, নুনে পোড়া তরকারি দিয়েই না-হয় আর ক'টা ভাত খাই। কি করব, যেমন বৌ জুটেছে কপালে! থুড়ি। বৌদি।"

"কি মশাই? রান্না নাকি খারাপ হয়েছে? ভাত ত একটাও প'ড়ে রইল না।"

"হ্যাঁ। তাই ত তোমার ইচ্ছে। সেইজন্যেই যা-তা রান্না কর, যাতে কম খেয়ে উঠি।"

"আমি করি নি মশাই। তোমার বৌই করেছে।"

গৌতম সে কথা না শোনার ভান ক'রে বলতে থাকে, "রান্না করতে ব'সে মন থাকবে কবিতার খাতায়। বার বার তোমাকে বললাম, মা, আলোকপ্রাপ্তা বৌ ঘরে এনো না। আমাদের আলোকে দরকার নেই। অন্ধকারই ভাল। তখন শুনলে না, এখন ঠ্যালা বোঝ! সেদিন আমাকে বলে কি জান?

নবমধুলোভী, ওগো মধুকর
চূতমঞ্জরী চুমি।
কমল-নিবাসে যে প্রীতি পেয়েছ
কেমনে ভুলিলে তুমি?

কমল মানে পদ্ম হলেন উনি। আর চূতমঞ্জরী অর্থাৎ আমের মুকুল হ'ল সুমিতা।"

"না মা, ওর কথা বিশ্বাস করবেন না। হয়ত কোথাও পড়েছে, নিজের ভাল লেগেছে, দিল আমার নামে চালিয়ে।"

"ওকে আমি চিনি না? কাজের বেলায় ওর দেরি হয়ে যায় অফিসে। আড্ডা, ইয়ারকিতে হয় না।" রাগ ক'রে তিনি চ'লে যান।

"দাদা আজ এখনও ঘুম থেকে উঠল না বৌদি।"

"ট্যুরে গেছেন কাল রাত তিনটেয় উঠে, টের পাও নি?"

"তাই তোমার মুখটা অত শুকনো শুকনো লাগছে! তা অত চিন্তার কি আছে? আমি ত আছি। দেবরের 'দে' আর বৌদির 'দি' বাদ দিলেই ত হ'ল। সেটা কি খুবই অসম্ভব?" এদিক্ ওদিক্ তাকিয়ে দেখল। "ধারে-কাছে কেউ নেই, দাদাও না, সুমিও না। বল না, লক্ষ্মী?" অনুনয়ে ভেঙে পড়ে গৌতম।

"আচ্ছা ঠাকুরপো, তুমি কি?" সরোষে হেনা ব'লে ওঠে। "আমার কথা না-হয় নাই ভাবলে, সুমি কি ভাববে সেটা ত দেখবে! ও নতুন এসেছে, কি ক'রে বুঝবে, তোমার কোন্ কথাটা সত্যি, আর কোন্ কথাটা মিথ্যে?"

"সুমি কিছু ভাবে না। ও খুব ভাল মেয়ে।" গৌতম উঠে পড়ে।

হেনা নিজের কাজে মন দেয়। সুমিতাও এসে যোগ দেয় ওর সঙ্গে।

একটু পরেই গৌতমের আহ্বান শোনা গেল। "এক গ্লাস জল দাও শাগ্‌গির, বৌদি পান।"

হেনার মুখে দুষ্টু হাসি ফুটে উঠল, "সুমি, তোমাকে ডাকছে ঠাকুরপো।"

সুমিতাও হেসে বলল—"আমাকে ত ডাকে নি, জল চেয়েছে তাও তোমার কাছেই।"

"মোটেই নয়, তবে তুমি কচু বুঝেছ। জল দাও, বৌদি পান, তার মানেই বৌদি জল এনো না! পান সাজতে যাও।"

"আমি পান সাজছি। তুমি জল নিয়ে যাও।" সুমিতা লজ্জিত ভাবে বলে।

"বেশ, যাচ্ছি। দেখো, ঐ জলে ওর হবে না। আবার চাইবে।"

"দেখিই না।"

হেনা জল নিয়ে ঘরে ঢুকল। গৌতম নীচু হয়ে জুতো পরছিল, ওর দিকে তাকিয়ে বলল, "টেবিলে রাখ। উঃ, আজ নির্ঘাৎ লেট।"

হেনা ফিরে এল রান্নাঘরে।

"আর এক গ্লাস জল বৌদি। এটাতে মাছি পড়ল।" গৌতমের আহ্বান আবারও শোনা যায়। হেনা সুমির দিকে হাসিমুখে তাকাল। সুমিতা লজ্জায় লাল। যতই দেরি হোক, বৌয়ের সঙ্গে 'নিভৃতে' দেখা না ক'রে যাবে না। সুমিতা জল নিয়ে ঘরে ঢুকে গৌতমকে বলে, "তুমি যেন কি! সত্যি, এত লজ্জা লাগে আমার তোমার জন্য! দিদিটা দুষ্টু দুষ্টু হাসে। কি ভাবে কে জানে?"

"ভাববে আবার কি? পানটা কে সেজেছে, তুমি? উঁহু, বৌদির মত পার না। বৌদির কাছে ভাল ক'রে শিখে নিও। যতদিন না পার, ততদিন 'জলদান' কর, চলি।" গৌতম ঘরের বাইরে এল, "বৌদি, পান দিলে না?"

"কেন, তোমার সুমি দিল ত!"

"সুমি কি আর তোমার মত পারে? তোমার তুলনা মেলা ভার। তুমি হলে—"

হেনা আগেই পান সেজেছিল। ওর হাতের পান না খেলে গৌতমের তৃপ্তি হয় না জানে। গৌতমের হাতে দিয়ে সকৌতুকে বলে, "কি?"

"কি উপমা দেওয়া যায় ভাবছি।" গৌতমকে চিন্তিত মনে হয়। "যা-তা উপমা ত দিতে পারি না? হাজার হোক্, আলোকপ্রাপ্তা তুমি। শেষে আমাকেই মুখ্যু ভাববে। হ্যাঁ, একটাই মনে হ'ল—নিকষিত হেম, খাঁটি সোনা। কবিতাও লিখতে পার। রান্নাও করতে পার। সোজা কথা নয়।"

ও বাবা, নিকষিত হেম, নিজের এখন 'প্রেম বিকশিত' কিনা, তাই। বৌদিকেও নিকষিত হেম মনে হচ্ছে। হেনার কণ্ঠে কৌতুক ঝ'রে পড়ে। "যা বল। এদিকে ত দিনরাত সুমি, সুমি। পানের বেলায় বুঝি আমি?"

অলক্ষ্যে হেনার কণ্ঠে কবিতার ছোঁয়া লাগে।

"আহা, বোঝ না কেন।" গৌতমও হেনার নকল করে। "মুখেই শুধু সুমি, সুমি। মনের মাঝে তুমিই, তুমি।"

ভাগ্যিস্ মনটাকে কেউ দেখতে পায় না। সুমিতাও যোগ দেয় হাসিতে। সাইকেলে চড়ে গৌতম। সুমিতা, হেনা দু'জনেই এসে দোর-গোড়ায় দাঁড়াল। যতদূর গৌতমকে দেখা গেল, দু'জনেই তাকিয়ে রইল। হেনা ভাবল, ভাই যেমন আমুদে, দাদাটিও যদি তেমনি হ'ত!

সুমিতার মনে হ'ল, দিদি কেমন মজা করে ওঁর সঙ্গে আমার যদি একটি ওর মত দেওর থাকত!

কৃষকের লক্ষ্মী

শ্রীসুখময় সরকার

কৃষিকর্মই সভ্যতার আদি ভিত্তিভূমি। পৃথিবীর ইতিহাস অনুধাবন করিলে দেখা যায়, যে জাতি যত পূর্বে কৃষিকর্ম আরম্ভ করিয়াছে সে জাতি তত অধিক সভ্য হইয়াছে। ভারতে আর্যগণ যখন প্রথম আগমন করেন তখন তাঁহারা ছিলেন অর্ধসভ্য যাযাবর; কিন্তু তাঁহারা যখন ভারতে স্থায়ীভাবে বসবাস করিয়া কৃষিকর্ম আরম্ভ করিলেন তখনই প্রকৃতপক্ষে ভারতীয় আর্য-সভ্যতার অরুণোদয় হইল। কৃষ্টি শব্দের যতপ্রকার ব্যাখ্যাই আমরা করি না কেন, কৃষির সহিত ইহার সম্বন্ধ যে অতি নিবিড় তাহা কেহ অস্বীকার করিতে পারিবেন না। কৃষি আর কৃষ্টি—উভয়েরই ব্যুৎপত্তিগত অর্থ কর্ষণ। একটি ভূমিকর্ষণ আর একটি মনোভূমি-কর্ষণ। কিন্তু যে মানবগোষ্ঠী কৃষিকর্ম-ব্যপদেশে একটি নির্দিষ্ট স্থানে স্থির হইয়া বসবাস করিতে পারে নাই, মনোভূমি কর্ষণের সুযোগও তাহাদের হয় নাই—এ কথা বলাই বাহুল্য।

মহর্ষি চরক মানুষের তিন এষণার কথা বলিয়াছেন—প্রাণৈষণা, ধনৈষণা, পরলোকৈষণা। সকল এষণার আদি প্রাণৈষণা। প্রাণরক্ষা না হইলে সবই মিথ্যা। প্রাণের জন্যই ধন। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় "মঙ্গল করিবার শক্তিই ধন, বিলাস ধন নহে।" এই ধনের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা হইলেন লক্ষ্মী। কৃষকের উপাস্যা দেবী লক্ষ্মী। লক্ষ্মীই কৃষকের সাধনা। কে এই লক্ষ্মী? ধাতুগত অর্থে লক্ষ্মী হইলেন শ্রী, সৌন্দর্যরূপা। পৃথিবীর মত এত শ্রী, এত সৌন্দর্য আর কোথায় আছে? সকল সৌন্দর্যের আধার এই ধরিত্রী। ইঁহারই বক্ষে নদ-নদী-গিরি-কান্তার অপরূপ শোভা বিস্তার করিয়া যুগ যুগ ধরিয়া জীবের নয়ন সার্থক করিতেছে; ইঁহারই বক্ষে শ্যামল প্রান্তরে সোনালী শস্য ফলিতেছে; রমণীয় উদ্যানে বিচিত্রবর্ণের ফুল ফুটিতেছে। আকাশ হইতে রবিরশ্মি এবং জ্যোৎস্না-ধারা নামিয়া আসিয়া ইঁহারই বক্ষে সোনালী সকাল এবং রূপালী সন্ধ্যা রচনা করিতেছে। মেঘরূপী দিগ্‌হস্তীরা এই ধরিত্রীরূপা লক্ষ্মীকেই শুণ্ডে ঘট ধরিয়া স্নান করায়। বসন্তের কবোষ্ণ নিঃশ্বাসে প্রস্ফুটিত কোটি নন্দন-পারিজাতের হার তাঁহারই কণ্ঠে শোভা পাইতেছে। শুধু কি তাই? বিপুল ধনের অধিষ্ঠাত্রী তিনি। তাঁহার সাগরে রত্ন, তাঁহার আকরে স্বর্ণ। তাই ত তিনি 'বসুমতী'। বসুমতী ব্যতীত আর কে লক্ষ্মী হইতে পারেন? তবে যে শুনি, লক্ষ্মী বিষ্ণুপ্রিয়া? কে সেই বিষ্ণু, ভূমিরূপা লক্ষ্মী যাঁহার পত্নী? বৈদিক সাহিত্যে সূর্যই বিষ্ণু। বিষ্ণু চরিষ্ণু সূর্য। যে সূর্য বর্ষচক্র আবর্তিত করিয়া ঋতু নির্মাণ করিতেছেন, তিনিই বিষ্ণু। আর এই সূর্যসনাথা ধরিত্রী, যিনি ঋতুতে ঋতুতে বিচিত্র রূপের পসরা লইয়া সূর্যরূপ বিষ্ণুকে প্রদক্ষিণ করিতেছেন, তিনিই বিষ্ণু-দয়িতা লক্ষ্মী।

যজুর্বেদে লক্ষ্মী আছেন। ঋগ্‌বেদে 'লক্ষ্মী' নাম নাই, কিন্তু 'ইলা' আছেন। ঋগ্‌বেদের ইলা এবং যজুর্বেদের লক্ষ্মীতে মূলতঃ কোন পার্থক্য নাই। পুরাণে নারায়ণ ও তৎপত্নী লক্ষ্মীর কত লীলাই বর্ণিত হইয়াছে! কিন্তু এ সব গেল শাস্ত্রের কথা। আমরা ত কৃষকের লক্ষ্মীর কথা আলোচনা করিতে যাইতেছি। এখানেই বিষয়টা পরিষ্কার হওয়া আবশ্যক। পূর্বে শাস্ত্র রচিত হইয়াছে, পরে সাধারণ মানুষ দেবদেবীর সম্বন্ধে ধারণা করিয়াছে—এমন মনে করার মত মূঢ়তা আর নাই। ব্যাপারটা বরং তাহার বিপরীত। সাধারণ মানুষের মনে যে চিন্তা ঘনীভূত হইয়াছে তাহাই ক্রমশঃ দানা বাঁধিতে বাঁধিতে একটা বিশেষ রূপ লাভ করিয়াছে একটি জাতির মনে; তাহাই আবার কাব্য-কথায় পল্লবিত হইয়াছে কবির লেখনীতে। যাঁহারা বেদ-পুরাণ রচনা করিয়াছিলেন, তাঁহারা সকলেই কবি ছিলেন। রীতিমত কবি। এমন কবি এ যুগে বড় অল্পই দেখা যায়। উপমা-উৎপ্রেক্ষা-রূপকাদি অলঙ্কারের সমাবেশে তাঁহারা এমন মায়াজাল সৃষ্টি করিতেন যে কাহারও সাধ্য নাই সে মায়াজাল ছেদন করিয়া বাস্তব সত্যে প্রবেশ করে; এমন কি সেটা যে মায়া, এ বোধটাই লুপ্ত হইয়া যায়। কিন্তু কবিগণের মায়া সৃজন করিবার স্থূল উপকরণ যোগাইয়াছে সাধারণ মানুষ। সাধারণ মানুষের মধ্যেও কবি আছে—তবে তাহারা নীরব কবি; যাহা অনুভব করে তাহা রসসিক্ত অলঙ্কৃত ভাষায় প্রকাশ করিতে পারে না। কিন্তু প্রতিদিনের আচরণে তাহারা তাহাদের কবিসুলভ অনুভূতির পরিচয় দিয়া থাকে। একটি অতি সাধারণ মানুষও যখন

বলে, ভারতের প্রান্তে প্রান্তে সতী-দেহের খণ্ডিতাংশ পতিত হইয়া একান্ন পীঠস্থান গড়িয়া উঠিয়াছে, তখন কি সেই কবিত্বের অন্তরালে এই সত্যই আত্মগোপন করিয়া থাকে না যে, দেশমাতৃকার পবিত্র দেহই জগন্মাতার অঙ্গ? দেশমাতা ও জগন্মাতা কি তখন একাকার হইয়া যান না? দেশভক্তির ইহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত আর কি হইতে পারে? এই ভক্তির রসসঞ্চারে জড়মৃত্তিকাতেও যে প্রাণের প্রবাহ বহিয়া যায়। জড় আর তখন জড় থাকে না, জড়ে ও চেতনে কোন প্রভেদ থাকে না। শুধু চেতন নয়, অপরূপ-লীলাবিলাসময়, মানবীয়-সুখ-দুঃখ-আনন্দ-বেদনাময়, বেগ ও আবেগময় স্ফূর্তি-প্রাণোচ্ছল এক চৈতন্যময় জগৎ তখন মানুষের ভাবদৃষ্টিতে উদ্ভাসিত হইয়া উঠে, আর সে রচনা করিতে থাকে লোকরঞ্জন পুরাণ-কথা (myths)। এই পুরাণকথা আমাদের দেশে কেবল কথামাত্রে পর্যবসিত হইয়া থাকে নাই, জীবনের অঙ্গীভূত হইয়া গিয়াছে। অন্য দেশের সঙ্গে এইখানেই ভারতের প্রভেদ। এমনি করিয়াই ভারতের কৃষক সম্প্রদায় অনাদিকাল হইতে তাহার আরাধ্যা দেবী লক্ষ্মীর রূপ, গুণ ও লীলা কল্পনা করিয়া বর্ষে বর্ষে নানা অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়া তাঁহাকে স্মরণ করিতেছে; সঙ্গে সঙ্গে নিজেদের জীবন আনন্দ-রসে অভিষিক্ত করিয়া তুলিতেছে। কৃষকের ভূমিরূপা লক্ষ্মী, শস্যরূপা লক্ষ্মী কেমন করিয়া তাহার মনে একটি ভাবের জগৎ সৃজন করিয়া রাখিয়াছেন, এখানে আমরা তাহাই আলোচনা করিব।

আষাঢ় মাস। আকাশের নীলিমা পুঞ্জ পুঞ্জ জলদ-মেঘে সমাচ্ছন্ন। ক্ষণে ক্ষণে অন্তরীক্ষ হইতে নামিয়া আসে সুশীতল বারিধারা। জলের ধারায় দিগ্‌দেশ ধূসর হইয়া উঠে—অম্বুবাচী হয়। লক্ষ্মীরূপা ধরিত্রী রজস্বলা হন। কৃষক বলে, মা রজস্বলা হইয়াছেন, এখন তিনদিন হলকর্ষণ করিতে নাই। বিধবারা বলেন, মা অশুচি হইয়াছেন, অশুচি বসুমতীর স্পর্শে খাদ্য অশুচি হইয়া যাইবে, তাই তিনি তিন দিন মৃত্তিকালগ্ন আহার্য গ্রহণ করেন না। তিন দিন গত হইলে কৃষক হলচালনা আরম্ভ করে; তারপর বপন করে শস্যবীজ। এখন লক্ষ্মীরূপা ধরিত্রী গর্ভধারণ করিলেন।

সূর্যরূপ বিষ্ণু বর্ষচক্র আবর্তন করার ফলে দক্ষিণায়ন দিন আসিয়াছে। বিষ্ণুসখা ইন্দ্র পর্যাপ্ত বর্ষণ দ্বারা ধরিত্রীরূপা লক্ষ্মীকে অভিষিক্ত করিলেন; লক্ষ্মীর ঋতুস্নান হইল। ঋগ্বেদে ইন্দ্র বিষ্ণুর সখা। ইন্দ্র বিষ্ণুকে বলিতেছেন, "সখে, শীঘ্র শীঘ্র পদক্ষেপ কর।" অর্থাৎ ইন্দ্র বিষ্ণুকে দক্ষিণায়ন-স্থানে আসিতে বলিতেছেন। সূর্যরূপ বিষ্ণু দক্ষিণায়ন-স্থানে আসিলেই বর্ষা নামিয়া আসিবে; লক্ষ্মীরূপা ধরিত্রী ঋতুস্নানান্তে গর্ভধারণের শক্তি লাভ করিবেন।

প্রাকৃত নারী গর্ভধারণ করিলে যেমন পঞ্চম, সপ্তম ও নবম মাসে গর্ভস্থ সন্তানের কল্যাণ ও গর্ভিণীর স্বাস্থ্য-কামনায় পঞ্চামৃত সাধভক্ষণাদি শুভকৃত্যের বিধান আছে, সেইরূপ ধরিত্রীরূপা লক্ষ্মী অম্বুবাচীতে গর্ভধারণ করিলে পর তদবধি প্রায় প্রত্যেক মাসে এক-একটি ধর্মকৃত্যের মাধ্যমে লক্ষ্মীর গর্ভস্থ সন্তান অর্থাৎ শস্যের মঙ্গল কামনা করা হয়। কৃষকের দেবতা লক্ষ্মী যেন তাহার আদরিণী কন্যা; যেন শ্বশুরালয় হইতে পিতৃগৃহে আগমন করিয়াছে। তাই কৃষক-গৃহিণীর মাতৃহৃদয় কন্যার প্রতি অপরিমেয় স্নেহে ভরিয়া উঠে; কন্যাকে রুচিকর আহার্য দান করিয়া তাহার পরিতৃপ্তি সাধনের জন্য তিনি ব্যগ্র হইয়া পড়েন। বাঙালী কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত বলিয়াছেন, "দেবতারে মোরা আত্মীয় জানি।" কথাটা যে কতদূর সত্য, এই সকল অনুষ্ঠান হইতে তাহা সহজে হৃদয়ঙ্গম করা যায়।

আষাঢ়-শ্রাবণ কৃষিকর্মে কাটিল। ভাদ্র আসিল। ভাদ্র মাসের কোন এক বৃহস্পতিবারে কৃষক সমারোহের সহিত লক্ষ্মীদেবীর অর্চনা করে। ধান্যস্তূপের উপর ঝাঁপিতে কড়ি ও রৌপ্যমুদ্রা এবং 'লক্ষ্মীর সাজ' (ধাতুময় পেচক, পারাবত, ময়ূর, মৎস্যাদি) দিয়া দেবীর পূজা অনুষ্ঠিত হয়। আশ্বিন পূর্ণিমায় (কোজাগরী পূর্ণিমা) প্রতিমায় দেবীর অর্চনা হয়। কোজাগরী লক্ষ্মীপূজার সমারোহ হয় সর্বাধিক। শাস্ত্রে সেদিন রাত্রি-জাগরণ, দ্যূতক্রীড়া, নারিকেল-চিপিটক-ভক্ষণ বিহিত হইয়াছে। এই সকল অনুষ্ঠানের তাৎপর্য 'প্রবাসী'তে প্রবন্ধান্তরে ('কোজাগরী পূর্ণিমা') সবিস্তার বর্ণিত হইয়াছে। এগুলি শাস্ত্র-বিহিত অনুষ্ঠান; কিন্তু কৃষকের লক্ষ্মী এক বিচিত্র উপায়ে অর্চিতা হন আশ্বিন-সংক্রান্তিতে। এখানে সে অনুষ্ঠান বর্ণনা করিতেছি।

কৃষিকর্ম সমাপ্ত হইয়াছে। মাঠে মাঠে সবুজের সমারোহ। ধানের ক্ষেতে কানায় কানায় ভরা স্বচ্ছ জলে নীলোৎপলের নয়ন-বিমোহিনী শোভা। আলিবন্ধনের উপর কাশ-কুসুমের শুভ্র শীর্ষে শরৎ বিদায়-লিপি লিখিয়া রাখিয়াছে। বালার্কের রক্তচ্ছবি কুজ্ঝটিকার জালে আচ্ছন্ন করিয়া গগন-অন্তরালে কমলার সখী হৈমন্তী উঁকি মারিতেছে। পূর্ণগর্ভা সখীর আসন্ন প্রসবের সম্ভাবনায় তাহার অধরে সকৌতুক হাস্যরেখা উদ্ভিন্ন হইয়া

উঠিতেছে। সত্যই লক্ষ্মী যে এখন আসন্নপ্রসবা, পূর্ণগর্ভা। অম্বুবাচীর পরে তিনি যে গর্ভধারণ করিয়াছিলেন, এখন তাহা পরিপুষ্টি লাভ করিয়াছে। ধানের ক্ষেতে গিয়া দেখ, প্রত্যেকটি ধানগাছে 'থোড়' বাঁধিয়াছে। থোড়গুলির আকৃতি স্ফীতোদর শল্যের মত; ইহাদের মধ্যে ধান্ত-শীর্ষ নিহিত আছে। পূর্ণগর্ভা-নারীর মত প্রত্যেকটি ধানের গাছ অপরূপ শ্যামশ্রী বিস্তার করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। প্রাকৃত নারীকে সন্তান-প্রসবের প্রায় একমাস পূর্বে সাধভক্ষণ করাইতে হয়। কৃষকের লক্ষ্মীও অবশ্যই সাধভক্ষণ করিবেন। আশ্বিন-সংক্রান্তিতে কৃষকের গৃহে তাহারই আনন্দোৎসব। এই দিনে লক্ষ্মীর সাধভক্ষণ উৎসবটি বিভিন্ন স্থানে বিভিন্নরূপে অনুষ্ঠিত হয়। এখানে বাঁকুড়ার পশ্চিমাংশ লক্ষ্য করিয়া উৎসব বর্ণিত হইতেছে।

এ অঞ্চলে আশ্বিন-সংক্রান্তিকে বলে "নল-সংক্রান্তি।" এই দিনে একটা নল-খাগড়া অথবা শরগাছে লক্ষ্মীর সাধভক্ষণ উপলক্ষ্যে দেয় সামগ্রী মান-পাতায় বাঁধিয়া ধানের ক্ষেতে পুঁতিয়া দেওয়া হয়; এই হেতু "নল-সংক্রান্তি" নাম হইয়াছে। প্রাতঃকালে গ্রামের প্রত্যেক গৃহস্থ কয়েকটি করিয়া শর-গাছ এবং লক্ষ্মীর সাধভক্ষণের দ্রব্যাদি সংগ্রহ করিয়া চণ্ডীমণ্ডপের সম্মুখে সমবেত হয়। সাধভক্ষণের উপকরণ—আউশ ধান্যের আতপ চাউল, মাষকলাই, ওল, মানকচু, আদা, রাই সরিষা, হরিদ্রা, তালের অঙ্কুর, ডাঙ্গা-ডোঙ্গার ফল এবং অশোক ফুল। এগুলি একটি মান পাতায় পোঁটলা বাঁধিয়া পরে ঐ পোঁটলাটি শরগাছের সহিত বাঁধিয়া দেওয়া হয়। বৈকালে মাঠে গিয়া লক্ষ্মীকে সাধভক্ষণ করাইতে হইবে। সাধভক্ষণের উপকরণগুলি তাৎপর্যপূর্ণ। মাষকলাইয়ের ডাল এবং মান কচুর ঝোল দিয়া গর্ভিণী লক্ষ্মী আউশ ধান্যের আতপ চাউলের অন্ন ভোজন করিবেন। আদা শ্লেষ্মা-নাশক এবং রেচক। গর্ভিণীর দেহ শ্লেষ্মা ও কোষ্ঠবদ্ধতা হইতে মুক্ত থাকা আবশ্যক। তালের অঙ্কুর এবং ডাঙ্গা-ডোঙ্গার ফল গর্ভিণীর কোন উপকার করে কি না জানি না; তবে অশোক ফুল যে গর্ভিণীর ভ্রূণের স্বাস্থ্যরক্ষার বিশেষ উপযোগী, একথা সকলেই জানেন। এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়, অশোক ষষ্ঠীতে (চৈত্র শুক্লা ষষ্ঠী) নারীরা অশোক ফুল ভক্ষণ করিয়া একটা ধর্মকৃত্যের মধ্য দিয়া কুক্ষি ও ভ্রূণের স্বাস্থ্য রক্ষা করেন। সাধভক্ষণ-উপলক্ষ্যে রাই সরিষা ও হরিদ্রা দিবারও তাৎপর্য আছে। গর্ভিণী রাই সরিষার তৈল এবং হরিদ্রা চূর্ণ অঙ্গে মর্দন করিয়া স্নান করিবেন। সুতরাং এগুলি গর্ভবতী লক্ষ্মীর অঙ্গরাগ।

বৈকালে নল বা শর মাথায় লইয়া কোমরে কাস্তে বাঁধিয়া মৌন অবলম্বনপূর্বক প্রত্যেক গৃহ হইতে এক-একজন নিজ নিজ ক্ষেত্রের দিকে যাত্রা করে। যে জমিতে সর্বাপেক্ষা অধিক ফলন হয়, সে ব্যক্তি সেই জমিতে গিয়া উপস্থিত হয়। অতঃপর জমিতে নামিয়া শরটি পুঁতিয়া দিয়া একটি ছড়া বলে:

> ওল কুট কুট মানের পাত।
> খাও লক্ষ্মী সাধ ভাত॥
> লোকের বাড়ী আল থাল।
> আমার বাড়ী শুধুই চাল॥
> ধান ফুল ফুল···ধান ফুল ফুল···
> ধান ফুল ফুল॥

ভাবখানা এই, যেন ছড়া বলার সঙ্গে সঙ্গে থোড় ফাটিয়া ধানে ফুল ফুটিবে। বস্তুতঃ দুই-চারি দিনের মধ্যেই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ধানের ফুল ফুটিয়া মাঠে মাঠে স্নিগ্ধ গন্ধ ছড়াইতে থাকে। লক্ষ্মীর উদ্দেশে প্রণাম করিয়া কৃষক একটি ধান-গাছ সন্তর্পণে তুলিয়া লয় এবং উহা মাথায় লইয়া পুনরায় নিঃশব্দে গৃহাভিমুখে যাত্রা করে। এই ধান গাছটি লক্ষ্মীর প্রতীক। গৃহিণী লক্ষ্মীর আগমন-প্রতীক্ষায় পূর্ব হইতে গাড়ুতে জল এবং হস্তে শঙ্খ লইয়া প্রস্তুত থাকেন। 'লক্ষ্মী' গৃহের সমীপবর্তিনী হইলে জলের ধারা দিয়া এবং শঙ্খধ্বনি করিয়া তিনি তাঁহাকে ঘরে তোলেন। যে ব্যক্তি লক্ষ্মীকে মাথায় লইয়া আসে গৃহিণী তাহাকে জিজ্ঞাসা করে, "মা লক্ষ্মী সাধ খেলেন?"

উত্তর। খেলেন।
প্রশ্ন। মা লক্ষ্মী কী বললেন?
উত্তর। তুলসীতলায় পিদিম দিতে।
প্রশ্ন। আর কী বললেন?
উত্তর। মরাইতলায় মাড়ুলি দিতে।
প্রশ্ন। আর কী বললেন?
উত্তর। মরাইয়ের তরে পাটা কাটতে॥

তুলসী-তলায় পিদিম (প্রদীপ) আর মরাই-তলায় মাড়ুলি (গোময়-মণ্ডলী)—এগুলিই ত কৃষকের লক্ষ্মীশ্রী। শীঘ্রই শস্য গৃহাগত হইবে; মরাইয়ে সে শস্য তুলিয়া রাখিতে হইবে; পূর্বাহ্নেই মরাইয়ের পাটা প্রস্তুত করা আবশ্যক। কৃষকের অন্তরের এই আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ পাইতেছে কথোপকথনের মধ্যে।

তুলসীতলায় ধান গাছটি রাখিয়া পুরোহিত ডাকিয়া সেদিন সন্ধ্যায় লক্ষ্মীর উদ্দেশে পূজান্তে ভোগ নিবেদন করা হয়। সাধারণতঃ মিষ্টান্ন ও ফলমূলাদির ভোগ।

বাটীস্থ এবং সমবেত সকলে পূজান্তে দেবীর প্রসাদ গ্রহণ করে।

গ্রামে ব্রাহ্মণেরাও অনেকে কৃষিকর্ম করেন। তাঁহারা মাঠে আলিবন্ধনের উপর অন্ন-ব্যঞ্জনাদি রন্ধন করিয়া লক্ষ্মীকে ভোগ নিবেদন করিয়া থাকেন। বর্ধমানের পশ্চিমাংশে আশ্বিন-সংক্রান্তিতে মাঠে গিয়া চিঁড়া-গুড়-দই ও ফলমূলাদি সহযোগে লক্ষ্মী দেবীকে 'ফলার' করানো হয়। রাঢ়ের প্রায় সর্বত্র আশ্বিন-সংক্রান্তিতে লক্ষ্মীর সাধভক্ষণ উৎসব কোন-না-কোন প্রকারে অনুষ্ঠিত হয়।

এত এত দিন থাকিতে আশ্বিন-সংক্রান্তিতে লক্ষ্মীর সাধ ভক্ষণের দিন স্থির করা হইল কেন, এ প্রশ্ন মনে উদিত হওয়া স্বাভাবিক। ৭ই হইতে ১০ই আষাঢ় দেবী রজস্বলা হন—এ ধারণার জ্যোতিষিক কারণ এই যে, ঐ সময় রবির দক্ষিণায়ন হয়, অম্বুবাচী হয়। কিন্তু আশ্বিন-সংক্রান্তিতে সেরূপ কোন জ্যোতিষিক যোগ আছে কি? পঞ্জিকায় আশ্বিন-সংক্রান্তিতে জলবিষুব দিন ধরা হইয়াছে। এটি প্রাচীন কালের স্মৃতি। ৩৩০ খ্রীষ্টাব্দে গুপ্তাব্দমুখে আশ্বিন-সংক্রান্তিতে জল-বিষুব দিন হইত; দিবা ও রাত্রি সমান হইত। এখন আর তাহা হয় না। অয়ন-চলন হেতু বিষুব দিন ২১৬০ বৎসরে ১ মাস পশ্চাদ্গত হয়। সুতরাং বিষুব দিন এই প্রায় ১৬৫০ বৎসরে ২৩ দিন পশ্চাদ্গত হইয়াছে। এখন ৭ই আশ্বিন জলবিষুব দিন হইতেছে। তথাপি আমরা এখনও বরাহ-মিহিরের কালের (গুপ্তযুগের) স্মৃতিটি ধরিয়া আশ্বিন-সংক্রান্তিতে লক্ষ্মীরূপা ধরিত্রীকে সাধ দান করিতেছি। ইহা হইতে মনে হয়, খ্রীষ্টীয় চতুর্থ শতকে লক্ষ্মীকে সাধভক্ষণ করাইবার প্রথাটি প্রবর্তিত হয় এবং অদ্যাপি প্রায় ১৬০০ বৎসর ধরিয়া এই প্রথা চলিয়া আসিতেছে।

এক মাস অতীত হইয়াছে। লক্ষ্মী সন্তান প্রসব করিয়াছেন। ক্ষেত্রে ক্ষেত্রে স্বর্ণকান্তি শস্য-সম্ভারই লক্ষ্মীর সন্তান। ক্ষেত্র হইতে শস্য আহরণের পূর্বে কৃষকের একটি ধর্মকৃত্য আছে—তাহার নাম "মুষ্টিগ্রহণ"। গ্রাম্যজনে বলে "মুঠ আনা।" অগ্রহায়ণ মাসের প্রথম সপ্তাহে কোন এক বৃহস্পতিবারে গৃহস্বামী অথবা তাহার প্রতিনিধি শুদ্ধাচারে মাঠে গিয়া একমুষ্টি ধান্য কর্তন করিয়া গৃহে লইয়া আসে; গৃহিণী শঙ্খধ্বনি ও হুলুধ্বনি সহকারে জলের ধারা দিয়া 'লক্ষ্মী'কে ঘরে তোলেন। শীর্ষসমন্বিত ধানের মুষ্টি আলিম্পন-চিত্রিত পীঠিকায় স্থাপন করিয়া সেদিন ভক্তিভরে লক্ষ্মী দেবীর অর্চনা করা হয়।

অগ্রহায়ণ মাসের শেষ দিকে শস্য গৃহাগত হইলে মহা-সমারোহে 'নবান্ন' উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। এটি লক্ষ্মীর সন্তান-প্রসব-জনিত আনন্দোৎসবের দ্যোতক। সেদিন কৃষকদের গৃহে গৃহে "দীয়তাং ভুজ্যতাম্।" ব্রাহ্মণ কৃষক সেদিন দেবীকে নানা উপচারে অন্ন ব্যঞ্জন পরমান্নের ভোগ নিবেদন করেন; ব্রাহ্মণেতর বর্ণের গৃহে দেবী আমান্ন ভোগ গ্রহণ করেন। সুগন্ধি আতপতণ্ডুলের সহিত দুগ্ধ, মিষ্টান্ন, ইক্ষুখণ্ড ও ফলমূলাদি সহযোগে যে আমান্ন প্রস্তুত হয়, তাহা অতি উপাদেয় বস্তু। সেদিন অনেকে পূর্বপুরুষগণের শ্রাদ্ধ করিয়া তাঁহাদের উদ্দেশে আমান্ন নিবেদন করে। কৃষক সেদিন সাধ্যমত দীন-দুঃখীকে অন্নদান করে। এইরূপে ধরিত্রীরূপা লক্ষ্মীর শস্যরূপ সন্তানের গৃহাগমন উপলক্ষ্যে অনুষ্ঠিত নবান্ন উৎসব মহানন্দে উদ্যাপিত হয়।

আমরা দেখিলাম, আষাঢ় মাসে অম্বুবাচীতে লক্ষ্মীর গর্ভধারণ হইতে আরম্ভ করিয়া অগ্রহায়ণ মাসে নবান্ন-উৎসবে লক্ষ্মীর সন্তানের জন্মোৎসব পর্যন্ত সমস্ত ব্যাপারটা একটি রূপকের সূত্রে গ্রথিত হইয়া আছে। কৃষক একথা ভাবে না, ভাবিতে চাহে না। তাহার নিকট সব বাস্তব সত্য। কাব্য-কথা তাহার পুথিতে নাই, আছে তাহার জীবনে। কৃষক রমণী অলঙ্কার কেবল অঙ্গেই ধারণ করে না; অলঙ্কার তাহার আচারে, আচরণে, অনুষ্ঠানে। কিন্তু কৃষক-জীবনের এই আনন্দ-রসধারা দিনে দিনে শুষ্ক হইয়া পড়িতেছে। শিল্পায়নের একদেশদর্শী প্রমত্ততা আমাদিগকে নিরন্তর বিভ্রান্তির পথে লইয়া যাইতেছে। শিল্পকে অস্বীকার না করিয়াও আমরা কৃষিকে বাঁচাইয়া রাখিতে পারি। কৃষি না বাঁচিলে শত শিল্পোন্নয়নেও ভারতলক্ষ্মীর অধরে জীবনের হাস্য স্ফুরিত হইবে না। কৃষি না বাঁচিলে ভারতের কৃষ্টিও বাঁচিবে না।
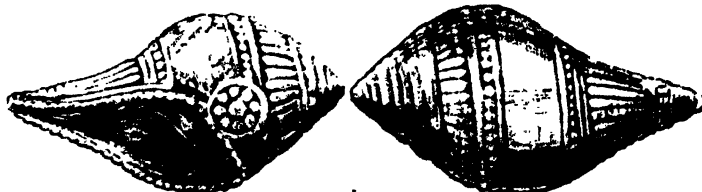
শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের ছন্দ

শ্রীআনন্দমোহন বসু

বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাসে বাংলা-চর্যাপদ ও শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের যে বিশিষ্ট স্থান, ছন্দালোচনার ক্ষেত্রেও এদের সেই স্থান অনস্বীকার্য। বাংলা-চর্যাপদের ছন্দালোচনায় দেখা গেছে যে, এই সময় থেকেই বাংলা ছন্দ তার নিজস্ব পথটি খুঁজে পেয়েছে ; সংস্কৃত-প্রাকৃত-অপভ্রংশ ছন্দের ধারা থেকে ভিন্ন খাতে প্রবাহিত হয়েছে। তবু একটি ক্ষেত্রে বাংলা-চর্যাপদের ছন্দ সংস্কৃত-প্রাকৃত-অপভ্রংশ ছন্দের কিছুটা অনুবর্তন করেছে, সে হচ্ছে প্রয়োজনে দীর্ঘস্বরকে দ্বিমাত্রিকরূপে ব্যবহার। এইজন্য চর্যাপদের যুগে কেবলমাত্র মাত্রাবৃত্ত (সরল কলামাত্রিক) ছন্দই দেখতে পাই, স্বরবৃত্ত (দলমাত্রিক) অথবা অক্ষরবৃত্ত (জটিল কলামাত্রিক) ছন্দ তখনও বাংলায় জন্মলাভ করে নি।

শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্য আবিষ্কৃত হবার পর ভাষাতাত্ত্বিক ও প্রত্নতাত্ত্বিক পণ্ডিতগণ সিদ্ধান্ত করেন যে, বাংলা-চর্যাপদ ও শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্য শতাব্দীর ব্যবধানে[১] রচিত হ'লেও বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসের ধারায় অন্য কোন কাব্য আবিষ্কৃত না হওয়া পর্যন্ত এখনও চর্যাপদের পরবর্তী সূত্র শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্য। তাই চর্যাপদের ছন্দালোচনার পর শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের ছন্দকে একটি বিশিষ্ট মর্যাদা দিতে হচ্ছে।

বাংলা-চর্যাপদের ছন্দালোচনা করতে গিয়ে যেমন দেখেছি সেখানে একমাত্র মাত্রাবৃত্ত ছন্দই ব্যবহৃত হয়েছে, তেমনি শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে দেখি কেবলমাত্র অক্ষরবৃত্ত ছন্দই ব্যবহৃত হচ্ছে। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের যুগ পর্যন্ত মাত্রাবৃত্ত এবং অক্ষরবৃত্ত ছন্দরীতিই আবিষ্কৃত হয়েছে ; স্বরবৃত্ত ছন্দ এখনও অজ্ঞাত। তবে এক্ষেত্রে একটা বড় প্রশ্ন মনে জাগে যে, মাত্রাবৃত্ত ছন্দ শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের কয়েক শতাব্দী পূর্বে আবিষ্কৃত ও ব্যবহৃত হ'লেও এই কাব্যে একটি ক্ষেত্রেও কেন ব্যবহৃত হ'ল না।

চর্যাপদের ছন্দ যেমন বাংলা ভাষার আদি যুগের ছন্দ, তেমনি শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের ছন্দ আদি-মধ্য যুগের ছন্দ। বাংলা ছন্দ যখন সবেমাত্র তার নিজস্ব পথটি গ্রহণ করছে তার পরিচয় ও স্বরূপ আছে চর্যাপদের ছন্দে ; কি শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের যুগে এসে বাংলা ছন্দ উন্নত হয়েছে। চর্যার যুগের মাত্রাবৃত্ত (সরল কলামাত্রিক) রীতিতে এখন আর ছন্দ রচিত হয় না, শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের সব ছন্দই রচিত হয়েছে অক্ষরবৃত্ত (জটিল বা বিশিষ্ট কলামাত্রিক) রীতিতে। এক্ষেত্রে একথা বলা অপ্রাসঙ্গিক হবে না যে, শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের বহুকাল পরে বাংলা ছন্দের লৌকিক রীতি (দলমাত্রিক রীতি) ব্যবহৃত হ'ল লোচনদাসের[২] রচনায়।

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে আমরা বাংলা অক্ষরবৃত্ত (জটিল কলামাত্রিক) ছন্দের কতকগুলি লোকায়ত প্রয়োগ দেখতে পাই, যা মধ্যযুগের কাব্য রচনায় প্রায় সর্বক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়েছে ; যেমন, পয়ার, লঘু ও দীর্ঘ ত্রিপদী, লঘু ও দীর্ঘ একাবলী, ত্রয়োদশাক্ষরা বৃত্তি 'মৃগনয়না' প্রভৃতি গঠন-রীতি। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের যথার্থ চৌপদী রীতিতে ছন্দোপংক্তি রচিত হয় নি, তবে চৌপদী যে এই যুগ থেকেই ধীরে ধীরে গ'ড়ে উঠছে তার লক্ষণ কিছু কিছু দেখা যাচ্ছে।

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের ছন্দালোচনায় প্রথমেই পয়ার রীতির কথা বলতে হয়। পয়ারের আট-ছয় ভাগের পর্বগঠনের যে অস্ফুট প্রকাশ আমরা দেখেছি চর্যাপদে, তারই প্রস্ফুট পরিচয় পেলাম শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে। আধুনিক কালে পয়ারের প্রধান দু'টি রূপ দেখি,—আট-ছয় ভাগের চৌদ্দ মাত্রার লঘু পয়ার, আর আট-চার-ছয় ভাগের আঠার মাত্রার দীর্ঘ পয়ার। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে পয়ার সব সময় লঘু রীতিতেই রচিত হয়েছে। শ্রীকৃষ্ণকীর্তন থেকে আরম্ভ ক'রে মধ্যযুগের কাব্যরচনার ক্ষেত্রে পয়ার রীতি ব্যাপকভাবে অনুসৃত হ'লেও সর্বত্র আট-ছয় ভাগ এবং চৌদ্দ মাত্রার বন্ধন রক্ষা সম্ভব হয় নি। শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যেও দেখি ছন্দের বন্ধন কিছুটা আলগা। তবু ত্রুটিহীন রচনা যেমন বিরল নয়, তেমনি আলগা বাঁধনও কিছুটা দেখা যাবে। সুষ্ঠু পয়ারবন্ধের নিদর্শন,—

---

১ চর্যাপদ—দশম থেকে দ্বাদশ শতাব্দী।
শ্রীকৃষ্ণকীর্তন—চতুর্দশ শতাব্দী।

২ লোচনদাস—জন্ম আনুমানিক ১৫২৩ খ্রীষ্টাব্দ। খ্রীষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দী।

সব সখিজন মেলি বড়ায়ির ঠাঁখি।
বিনয় করিআঁ বোলে চন্দ্রাবলী রাহী॥
সেমনে লইআঁ যাহা যমুনার পার।
যেহ লাগ না পাএ কাহ্নাঞি আহ্মার॥
সাশুড়ীর বোল শুনি ডরায়িলী রাহী।
পসার সাজাআঁ লৈল ঘৃত ঘোল দহী॥
[পুঁথি-পৃষ্ঠা ৮।১২]*

চৌদ্দ মাত্রার পয়ার থেকে এক মাত্রা কমিয়ে আট-পাঁচ ভাগের তের মাত্রার ছন্দোপংক্তি গঠিত হ'লে তাকে বলা হ'ত ত্রয়োদশাক্ষরাবৃত্ত, 'মৃগনয়না'। এই 'মৃগনয়না'র ছন্দোপংক্তিও শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে স্থানে স্থানে ব্যবহৃত হয়েছে। তবে সর্বত্র যে আট-পাঁচ মাত্রার পর্ববিভাগ মানা হয়েছে তা নয়: আট-পাঁচ ও সাত-ছয় মাত্রার পর্ববিভাগ সমানভাবে প্রযুক্ত। যেমন,—

বাসিত ফুলে বান্ধা বাহ্নসি কেশ।
আহ্মাত না পাত রাধা নাগরীবেশ॥
[পৃষ্ঠা ৩৮।২]

অন্তত্র,—

সোনার চুপড়ী বান্ধা রুপার দড়ী।
নেতের আঞ্চল তাত দিআঁ ওহাড়ী॥
[পৃষ্ঠা ৭৪।১]

শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে ত্রিপদীবন্ধও বহুস্থলে ব্যবহৃত হয়েছে। লঘু ত্রিপদী ৬।৬।৮ মাত্রার এবং দীর্ঘ ত্রিপদী ৮।৮।১০ বা ৮।৮।১২ মাত্রার ছন্দোপংক্তিতে গঠিত। ত্রিপদীর প্রথম ও দ্বিতীয় পর্বে (পদে) অন্ত্যানুপ্রাস বিশেষ কোথাও দেখা যায় না। যেমন,—

ঘৃত দধি দুধে পসার সাজিআঁ
মথুরাক যাসি বিকে।
সহজে রুপসী নব যুবতী
লাস বেশ তোর দিকে॥
হেন রূপ দেখি চখু আড় করে
পড়ুআ তোর গোআলা।
আছ নর লোক দেব লোক তোসে
মুনি মন হএ ভোলা॥ [৬।৬।৮ মাত্রা]
[পৃষ্ঠা ৩০।২]

অথবা অন্যত্র,—

হাসিতেঁ খেলিতেঁ গোপ নারীগণ
লাগিলা যমুনা তীরে।
কাহ্নাঞির মুখ কমল দেখিআঁ
কেহো না ভরিল নীরে॥ [৬।৬।৮ মাত্রা]
[পৃষ্ঠা ১৩২।২]

দীর্ঘ ত্রিপদীগুলির মধ্যে অনেকগুলিতে যেমন প্রথম ও দ্বিতীয় পর্বে অন্ত্যানুপ্রাস দেখতে পাইনে তেমনি আবার কয়েকটিতে পর্বে পর্বে পূর্ণ মিল পাই। যেমন, পুঁথির ১৯২।২ পাতায় একটি দীর্ঘ ত্রিপদী,—

নিবারিআঁ থাক নিজ মনে।
আপণা রাখিআঁ কাহ্ন এবে গেলা নিজ থান
তাক পাইব কেমনে॥
তোর চরিত্র ভাবিআঁ আকুল দগধ হআঁ
ভাল মন্দ কিছু না মানিআঁ।
প্রতিজ্ঞা করিআঁ কাহ্নে গেল মাথ বৃন্দাবনে
তোর নেহে তিলাঞ্জলী দিআঁ॥
[৮।৮।১০ মাত্রার চরণ]

আবার পুঁথির ২৪।১ পাতায় একটি সর্বমিল ত্রিপদী পাই,—

শুন বৃন্দাবন কথা যে ফল পাইলে তথাঁ
সে ফল খোয়াহেঁা দিবোঁ তোরে।
ফুটিল কমল ফুল চিন্তিআঁ মন আকুল
খাট পাড় যমুনার তীরে॥ ইত্যাদি।
[৮।৮।১০ মাত্রার চরণ]

ত্রিপদী প্রসঙ্গে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে ব্যবহৃত একটি নূতন বন্ধের বিষয় উল্লেখযোগ্য। এই নূতন বন্ধে প্রথম দুই চরণ (বা পর্ব) আট বা দশ মাত্রার এবং তৃতীয় চরণ অধিকাংশ ক্ষেত্রে চৌদ্দ মাত্রার। তবে কখনো কখনো এই চরণটি ক্ষুদ্রাকারও দেখা যায়। তিন চরণের শেষে একই প্রকার মিল দেওয়া হয়েছে। এই বিশিষ্ট ধরণের ত্রিপদীবন্ধ শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের পূর্বে বা পরে কোন পদাবলী সাহিত্যে লক্ষ্য করা যায় না। পুঁথির ১৩১,২ পাতায় উক্তরূপ একটি গীত,—

রাম কাজে হনুমন্তা।
তেহেন আহ্মার দূতা।
ভাঁগিল লেহা পুনী যোড়াইতেঁ শকতা॥
যে থানে সূচী না জাএ।
তথাঁ বাটিআ বহাএ।
সেহি দূতী মোর কোণ কাজেঁ চড় খাএ॥
দূতী পাঠাইবোঁ মোএঁ কীসে।
হাথে তুলী মোঁ খাইবোঁ বীসে।
মোর দূতী চড় খাইলে হেন বএসে॥
যথাঁ দূতী মোর জাএ।

* এই রচনায় শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের উদ্ধৃতি দিতে যে পৃষ্ঠা-সংখ্যা উল্লেখ করা হয়েছে তা সর্বত্র পুঁথি-পৃষ্ঠা।

তথা পরসাদ পাএ।

অসংঘট কাজ পুন সংঘট করাএ ॥

অনুরূপ বিশিষ্ট ত্রিপদীবন্ধ পুঁথির ১১।১, ১২০।১, ১৪১।১, ২০৫।২ পৃষ্ঠায় লক্ষণীয়।

পয়ার ত্রিপদীর পরই শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে উল্লেখযোগ্য 'একাবলীবন্ধ'। একাবলীতে সাধারণত ছয়-পাঁচের ও ছয়-ছয়ের ভাগে এগারো ও বারো মাত্রার চরণ থাকে। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনেই বাংলা সাহিত্যে সর্বপ্রথম একাবলী পেলাম। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে এগারো ও বারো মাত্রার একাবলী ছাড়াও আট ও দশ মাত্রার 'অষ্টাক্ষরা' ও 'দশাক্ষরা বৃত্তি' দেখতে পাওয়া যায়। এ ছাড়াও আছে সম্বোধনের ক্ষেত্রে চার ও ছয় মাত্রার অতিরিক্ত পর্ব। এখানে উল্লেখযোগ্য এই যে, পয়ার-ত্রিপদীর মত একাবলীতেও সর্বক্ষেত্রে পর্বের মাত্রাসমকত্ব মেনে চলা হয় নি।

১২ মাত্রার একাবলী

পুরুব কালত | ঋসিএ বুইল। |
বসুলে নিঅাঁ | নান্দোঘরে থুইল ॥ |
[পৃষ্ঠা ২।১২]

১১ মাত্রার একাবলী

কাহার বহু তোঁ | কাহার রাণী। |
কেহ্নে যমুনাত | তোলসি পানী ॥ |
বড়ার বহু মো | বড়ার ঝী। |
আহ্মে পাণি তুলী | তোহ্মাত কী ॥ |
কাখের কলশ | নাম্বাঅ তোহ্মে। |
কথা চারি পাঁচ | কহিব আহ্মে ॥ |
যার কাহ্ন বসে | দোষর মাথা। |
সেসি আহ্মা সমে | কহিবে কথা ॥ |
[পৃষ্ঠা ১৩৩।১]

১০ মাত্রার দশাক্ষরা বৃত্তি

উঠিলা সত্বরে নারায়ণ।
বাহু ফাল করিআঁ তখন ॥
যেন তৃন যাএ চণ্ড বাতে।
নাগবন্ধ গেলা তেহ্নমতেঁ ॥ [পৃষ্ঠা ১৩০।২]

৮ মাত্রার অষ্টাক্ষরা বৃত্তি

বৃন্দাবন মোর থানে।
বংশ বাজাওঁ গানে ॥
না কর তোঁ মন আনে।
আহ্মে অসুর দল কাহ্নে ॥
সুমেরু আহ্মার গঢ়ে।
তার শৃঙ্গে মোর মেঢ়ে ॥ [পৃষ্ঠা ২৫।১]

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনকার বড়ু চণ্ডীদাস যে শুধু সাধারণ ভাবে এই সব ছন্দ সৃষ্টি করেছেন তাই নয়, বহুস্থানে বৈচিত্র্য সৃষ্টির প্রয়াসী হয়ে মিশ্র পদও রচনা করেছেন।

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে সুষ্ঠু চৌপদীবন্ধ দেখা যায় না, তবে চৌপদীর লক্ষণ পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে এমন গীত বিরল নয়। ১২৩।২-১২৪।১ পৃষ্ঠায় অনুরূপ লক্ষণযুক্ত গীতটি লক্ষণীয়।

তোঁ এ না গুণসি মনে।
আল করিবোঁ যতনে।
নিজ ধন দিআঁ সুন্দরী রাধা
নির্মায়িলোঁ এ বৃন্দাবনে ॥
অনেক ফুল তুলিলোঁ।
আল বহুত ফল থাখিলোঁ।
আর আহুচিত কৈলেঁ রাধা
ডাল ভাঙ্গিআঁ পেলায়িলোঁ ॥

অনুরূপ আর একটি চৌপদী লক্ষণযুক্ত পদ ২১৫।১-২ পাতায়। এটি লঘু চৌপদী ঢঙে রচিত।

কুসুমশর হুতাশে।
তপত দীর্ঘ নিশাসে।
সঘন ছাড়এ রাধা
বসি এক পাশে ॥
ক্ষেপে সজল নয়নে।
দশ দিশে খনে খনে।
নালহীন কৈল যেন
নীল নলিনে ॥

প্রাকৃত-অপভ্রংশ যুগের একটি প্রধান ছন্দ "দোহা"। চর্যার ছন্দালোচনায় দেখেছি কয়েকটি পদে এই দোহা ছন্দের লক্ষণ পরিস্ফুট। শ্রীকৃষ্ণকীর্তন ও চর্যাপদের মধ্যে শতাব্দীর ব্যবধান; কোন কোন চর্যার ক্ষেত্রে দুই শতাব্দীরও বেশি। এই বিরাট্ ফাঁক পূরণের জন্য আজ পর্যন্ত বাংলা সাহিত্যে কোন গ্রন্থ আবিষ্কৃত হয় নি। তাই আদি যুগের ছন্দের ধারাবাহিক ইতিহাস রচনা দুঃসাধ্য। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনকার একজন শ্রেষ্ঠ ছান্দসিক কবি, তাঁকে বাংলা ছন্দের আদিগুরু বলতে পারি। আদিযুগ থেকে আরম্ভ করে মধ্যযুগ পর্যন্ত এতবড় ছান্দসিক কবি বিরল। একখানি কাব্যে এত বহুবিচিত্র ছন্দের সৃষ্টি ও প্রয়োগ ভারতচন্দ্রের পূর্বে কোন কবি করেন নি, এ-কথা জোর করে বলা চলে। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনকার বড়ু চণ্ডীদাস বাংলা ছন্দের বহু-বিচিত্র রূপ দিলেন। তাঁর কাব্যে 'দোহা' ছন্দও ব্যবহৃত হ'ল একটা নূতন রূপ নিয়ে। দোহা ছন্দে তের ও এগার মাত্রা অর্থাৎ

অযুগ্ম মাত্রার পাদ ব্যবহৃত হ'ত। প্রাকৃতপৈঙ্গলম্‌-এ দোহা গঠনের নিয়ম পাই :

তেরহ মত্তা পঢ়ম পঅ
পুণু এআরহ দেহ।
পুণু তেরহ এআরহই
দোহা লক্খণ এহ ॥৪

কিন্তু শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে দোহা রীতির যে ছন্দ রচিত হয়েছে তাতে আছে যুগ্মমাত্রার পাদ বা চরণ। এগুলির কোনটির প্রতি দুই চরণে অন্ত্যানুপ্রাস, আবার কোনটির দ্বিতীয়-চতুর্থে, কোন কোন ক্ষেত্রে প্রথম-তৃতীয়-দ্বিতীয়-চতুর্থে পর্যায়সম অন্ত্যানুপ্রাস; অর্থাৎ কয়েকটি দ্বিপদী এবং কয়েকটি চতুষ্পদী।

প্রতি দুই চরণে মিল [পৃষ্ঠা ১৪৪।১]

গোচরিল রাধা মোর মাএর চরণে।
তেকারণে পাইল আপমানে ॥
আজি হৈতেঁ রাধিকা তোঁ বিদারিলোঁ মণে।
সকপে কহিলোঁ তোর থানে ॥
আহ্মার কারণ রাধা দণ্ড দিল আঁখার।
আবশ্যে করিবোঁ প্রতিকার ॥

এখানে ১৪।১১ ও ১৩।১০ মাত্রার চরণ ব্যবহৃত হয়েছে।

দ্বিতীয়-চতুর্থ চরণে মিল [পৃষ্ঠা ১৬৫।২]

কাছের কলসী রাধা পাশি তোলসি ল
পাএর বাজে তোর নূপুর।
রতনে জড়িত তোর দুই বাহু শঙ্খ ল
শিশে তোর শোভএ সিন্দুর ॥

প্রথম-তৃতীয়-দ্বিতীয়-চতুর্থ চরণে মিল, পর্যায়সম। [পৃষ্ঠা ২০৯।১] এরূপ উদাহরণ বিরল।

চল চল তোহ্মে সুন্দরি রাধা
মো পরিহরিলোঁ তোরে।
বাপ নন্দ ঘোষ মাএ যশোদা
তেঁ তুহ্মী মামী আহ্মারে ॥

এখানে ১১।৮, ১১।৮ মাত্রা ব্যবহৃত হয়েছে।

বড়ু চণ্ডীদাস তাঁর কাব্যে যে ছন্দবৈচিত্র্য দেখিয়েছেন তার আলোচনা করতে গিয়ে দেখতে পাই অসমমাত্রিক চরণ রচনা করে ছন্দের মধ্যে একটা প্রবহমানতা আনয়ন করার দিকেও তাঁর ঝোঁক আছে। বড়ু চণ্ডীদাসের পাঁচশ' বছর পরে গৈরিশ ছন্দ এবং রবীন্দ্রনাথের বলাকার ছন্দে যে প্রবহমানতা দেখতে পাই তার পূর্বাভাস পাই শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের নিম্নোদ্ধৃত গীতে। [পৃষ্ঠা ২০৯।২]

সরস বসন্ত কালে।
কোকিলের কোলাহলে।
এ নব যৌবন কাহ্নাঞি প্রাণ রে ॥
এবে তোহ্মার বিরহে।
মোর আকুল দেহে।
আহ্মাকে তেজিতে তোর উচিত নহে ॥
নহোঁ গ নহোঁ গ কাহ্নাঞি তোহ্মার মাউলানী।
তোর মোর নেহ সব দেব লোকে জানে জানী ॥

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের ছন্দালোচনা মোটামুটি করা হয়েছে। বড়ু চণ্ডীদাসের ছন্দ রচনার আর একটি বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ ক'রে এই আলোচনার সমাপ্তি করব। আমরা জানি, সনেট বা চতুর্দশপদী কবিতা মধুসূদন য়ুরোপ থেকে বাংলায় আমদানী করেছিলেন। কথাটা ঠিক; যে-ধরণের চতুর্দশপদী মধুসূদন রচনা করেছিলেন ঠিক তেমনটি বাংলা ভাষায় পূর্বে ছিল না, কিন্তু বাংলা ভাষার সেই আদি যুগেও সনেটের মত ক্ষুদ্রাকার চতুর্দশপদী ও অষ্টাদশপদী বিশিষ্ট-বন্ধের গীত রচনা পদ্ধতি যে অপ্রচলিত ছিল না তার উদাহরণ আমরা চর্যাপদে এবং শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের অনেকগুলি গীতে পাই। এই সমস্ত গীতে মধুসূদনের চতুর্দশপদীর মত চোদ্দ মাত্রার চরণ ব্যবহৃত হয়েছে এবং চোদ্দ চরণে ও আঠার চরণে গীতগুলি রচিত হয়েছে। কোন কোন গীতে পয়ারের চোদ্দ মাত্রার চরণ ব্যবহার না করে সম্পূর্ণ গীতটি একাবলী রীতিতে রচিত। এই ধরণের রচনার বাহুল্যদৃষ্টে মনে হয়, এটি বড়ু চণ্ডীদাসের একটি বিশিষ্ট রীতি, যেমন য়ুরোপীয় সনেটেরও একটা বিশিষ্ট রীতি আছে।

পয়ারবন্ধে চতুর্দশপদী [পৃষ্ঠা ২০৮।২-২০৯।১]

রামগিরীরাগঃ ॥ আঠতালা ॥

কোণ অপরাধে মোকে তেজহ কাহ্নাঞি।
আপণে বিচারি তোহ্মে চাহ ত গোসাঞি ॥
সকল সংপূর্ণ মোর যৌবন সাজে।
তাহাক তেজিতেঁ না জুআএ দেবরাজে ॥১॥
বিধি দোষে কেহো নাহিঁ তেজে রমণী।
সিতা রামে দুখ পাইল সুণ চক্রপাণি ॥ধ্রু॥
সপনে গেআনে মনে চিন্তো আহোনিশী।
রাতী দিনে একলী কদমতলে বসী ॥
তোহ্মাত লাগিআঁ যবেঁ প্রাণ মোর জাএ।
তবে তিরীবধ লাগে কাহ্নাঞি তোহ্মাএ ॥২॥

৪। 'তের মাত্রা প্রথম পাদে, পুনরায় এগার মাত্রা: পুনরায়

অকোপ হৈআঁ মোর আবথা দেথ ॥
একবার তোর মোর জইউ বৃন্দাবন।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণ ॥৩॥

পয়ারবন্ধে অষ্টাদশপদী [পৃষ্ঠা ২০৮,১-২]

শ্রীরাগঃ ॥ রূপকং ॥
দুতর যমুনাত রাধা তোহ্মা কৈলোঁ পার।
লাজে পিঠ দিআঁ মো বহিলোঁ দধিভার ॥
দুসহ মদনবাণে বড় দুখ পাইল।
রাজ ভরিআঁ মোর কলঙ্ক থাকিল ॥১॥
বিরহ সন্তাপ রাধা এবেঁসি জাণিলে।
যৌবন গরবেঁ রাধা আহ্মা না চিহ্নিলেঁ ॥ধ্রু॥
তোহ্মাতে লাগিআঁ রাধা বড় পাইলোঁ দুখ।
হেন মন কৈলোঁ না দেখিবোঁ তোর মুখ ॥
তোহ্মাত লাগিআঁ রাধা তেআগিল ঘর।
তভোঁ মোর বচনে না দিলেঁ উত্তর ॥২॥
তোহ্মাত লাগিআঁ মো হইলোঁ মাহাদাণী।
তবেঁ বোলাইলেঁ সতী আইহনের রাণী ॥
এবে কেহ্ন গোআলিনী হেন তোর মতী।
তোহ্মে রতীঞঁ কুমতী আহ্মে ধর্ম্মমতী ॥ ৩ ॥
নিয়ড় সম্বন্ধ রাধা না কর দুর।
শুণি সুখি পাএ রাধা রাজা কংশাসুর ॥
আর এবে রাধা তোতে নাহিঁ মোর মন।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণ ॥ ৪ ॥

একাবলীবন্ধে চতুর্দশপদী (পৃষ্ঠা ২১১২-২২।১)

পাহাড়ীআরাগঃ ॥ রূপকঃ ॥
পুরুব কালত ঋষিএঁ বুইল।
বসুলে নিআঁ নান্দোঘরে থুইল ॥
জাণাইবোঁ কারে এসব কাজে।
সত্যে লইব কাহ্নঞিঁ মথুরার রাজে ॥ ১ ॥
বুলিআঁ পাঠাইবোঁ দুখ সমাদে।
কাহ্ন মহাদানী লাগিল বাদে ॥ ধ্রু ॥
বারেঁ বারেঁ মোএঁ বুইলোঁ ভজিআঁ।
কংসে গুণী আসিব সাজিআঁ ॥
গুণীএ যবেঁ সে আইহন বীর।
করতেঁ তোহ্মা করিব চীর ॥ ২ ॥
এভোঁ কাহ্ন তোঁ মোর বোল শুন।
আপণে আপণ হৃদয়ে গুন ॥
ছাড় তোঁ আহ্মার দানের আশে।
বাসলী বন্দী গাইল চণ্ডীদাসে ॥ ৩ ॥

৩।১-২)

বরাড়ীরাগঃ ॥ ক্রীড়া ॥
আমিলা দেবের সুমতি গুণী।
কংসের আগত নারদ মুনী ॥
পাকিল দাঢ়ী মাথার কেশ।
বামন শরীর মাকড় বেশ ॥ ১ ॥
নাচএ নারদ ভেকের গতী।
বিকৃত বদন উমত মতী ॥ ধ্রু ॥
খণে খণে হাসে বিশি কারণে।
খণে হএ খোড় খোণেকেঁ কানে ॥
নানা পরকার করে অঙ্গভঙ্গ।
তাক দেখি সব লোকের রঙ্গ ॥ ২ ॥
লাম্ফ দিআঁ খণে আকাশ ধরে।
খণেকেঁ ভূমিত রহে চিতরে ॥
উঠিআঁ সব বোলে আনচান।
মিছাই মাথাএ পাড়এ সান ॥ ৩ ॥
মিলে ধন ধন জীহের আগ।
রাঅ কারে যেন বোকা ছাগ ॥
দেখিআঁ কংসেত উপজিল হাস।
বাসলী বন্দী গাইল চণ্ডীদাস ॥ ৪ ॥

সমগ্র শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্য একাবলীবন্ধে চতুর্দশপদী ২টি এবং পয়ারবন্ধে ৮টি ও পরিশিষ্টে ১টি পাওয়া যায়। অষ্টাদশপদীর সংখ্যা সর্বাধিক। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে চতুর্দশপদী ও অষ্টাদশপদীর এরূপ বহুল ব্যবহার দৃষ্টে মনে হয়, বড়ু চণ্ডীদাসের এগুলি খুব প্রিয় ছন্দবন্ধ ছিল।

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের ছন্দালোচনা করতে গিয়ে আর একটি বিষয় উল্লেখ করা প্রয়োজন। বড়ু চণ্ডীদাস অনেক ক্ষেত্রেই গীতের প্রথমে একটি সংস্কৃত শ্লোকে বিষয়বস্তু সংক্ষেপে বিবৃত করেছেন। এই শ্লোকগুলিতে প্রধানত দুই প্রকার ছন্দ-পাদ ব্যবহৃত হয়েছে,—ছোট চব্বিশ মাত্রার, আর বড় বত্রিশ মাত্রার।

পূর্বেই উল্লেখ করেছি, বড়ু চণ্ডীদাস প্রাচীন যুগের বাংলা সাহিত্যের সর্বশ্রেষ্ঠ ছান্দসিক কবি, ছন্দোগুরু। চর্যাপদ এবং শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের মধ্যবর্তী কালের কোন প্রাচীন গ্রন্থের প্রাচীন পুঁথি এ পর্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নি, তাই বাংলা ছন্দ চর্যাপদ থেকে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের যুগে কি ভাবে ক্রমোন্নতি লাভ করেছে তা' দেখান সম্ভব নয়। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের পূর্বেকার 'শূন্যপুরাণ', 'মাণিকচন্দ্র রাজার গান' প্রভৃতি কাব্যের প্রাচীন পুঁথি পাওয়া যায় না; বহুল প্রচার এবং বহু লিপিকারের হাতে শোধনের ফলে ভাষার সঙ্গে সঙ্গে, বলা বাহুল্য, ছন্দও শোধিত রূপ ধারণ করেছে। তাই তুলনা অসার্থক।
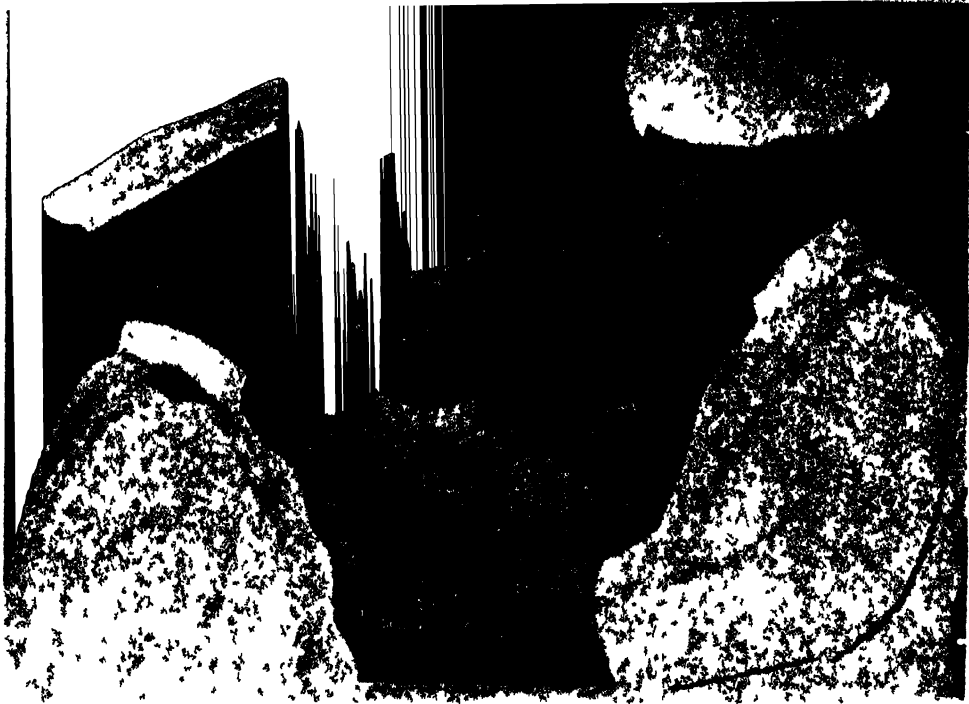
রাষ্ট্রপতি-ভবনে রাষ্ট্রপতি কমাণ্ডার প্যাট্রিক নাইজেল টুইসকে নৌ-সেনা মেডেল উপহার দিতেছেন

রাষ্ট্রপতি-ভবনে রাষ্ট্রপতি এয়ার-ভাইস-মার্শাল হরজিন্দর সিংকে প্রথমশ্রেণীর
বিশিষ্ট সেবা মেডেলে ভূষিত করিতেছেন

বাঙ্গলা ও বাঙ্গালীর কথা

শ্রীহেমন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়

বিপথগামী বালক-বালিকা ও শিশু

অর্থনৈতিক অবস্থার অবনতি, বাসগৃহ সমস্যা, ছিঁচকে সিনেমা ছবির প্রভাব এবং পিতামাতা প্রভৃতি অভিভাবকদের অবহেলা ও ঔদাসীন্যের কারণে কলিকাতা এবং আশে-পাশের এলাকায় বিপথগামী বালক-বালিকা, কিশোর-কিশোরীর সংখ্যা ভয়াবহরূপে বৃদ্ধি পাইতেছে। সংবাদে প্রকাশ, বাঙ্গলার মুখ্যমন্ত্রীর নিকট বহুসংখ্যক অভিভাবক তাঁহাদের বিপথগামী সন্তানদের সংশোধন ব্যবস্থার জন্য কাতর আবেদন জানাইয়াছেন। নিম্নে এই সমস্যার বিষয়ে 'আনন্দবাজার পত্রিকা'র রিপোর্ট কিছু দেওয়া হইল :

দক্ষিণ কলিকাতার কোন একটি স্কুলের ছাত্র সামান্য কারণে তাহার সহপাঠীকে ছুরিকাঘাত করে। আঘাতের ফলে বালকটির চোখ নষ্ট হইয়া যায়।

এই বৎসর পুলিস পাঁচ জন কমবয়েসী ছেলেকে চোলাই মদের কারবারীদের সাহায্য করার অভিযোগে গ্রেপ্তার করে। ইহারা নাকি পারিশ্রমিকের বিনিময়ে চোলাই মদ বিক্রেতাদের সাহায্য করিত।

প্রবেশন-হোস্টেল

এই বৎসর কলিকাতা পুলিসের জুভেনাইল এইড ব্যুরো চালিত সংশোধনী স্কুলে ২৬টি বালক ও বিপথগামী শিশুকে ভর্তি করা হয়। এই শিশুদের বিরুদ্ধে অভিভাবকদের অভিযোগ : তাঁহারা ইহাদের শাসন করিতে পারিতেছেন না। অনেক বিশেষজ্ঞের মতে কলিকাতা শহরে অনুসন্ধান করিলে এই রকম অসংখ্য ঘটনা পাওয়া যাইবে, কিন্তু কলিকাতায় বিপথগামী শিশুদের সংশোধনের জন্য কোন স্কুল নাই। কলিকাতা পুলিসের জুভেনাইল-এইড ব্যুরো প্রতি বৎসর কিছুসংখ্যক শিশুকে শিক্ষা দিয়া থাকেন। কিন্তু তাঁরা দেখিয়াছেন যে, এই প্রতিষ্ঠানের আর্থিক অবস্থা সীমাবদ্ধ বলিয়া তাঁহাদের বহু কেস ফিরাইয়া দিতে হয়।

অভিভাবকদের নির্দয় ব্যবহার

বিপথগামী শিশুদের সম্পর্কে অনুসন্ধান করিয়া জানা গিয়াছে যে, তাহাদের শতকরা ৯০ জন নিম্নবিত্ত পরিবার হইতে আসিয়াছে। শতকরা একশত জন শিশুই হিন্দি ছবি দেখিতে অভ্যস্ত। বড়বাজার অঞ্চলের কোন একটি চিত্রগৃহে নাকি বেলা একটা হইতে তিনটা পর্যন্ত একটি শো হয়। স্কুলে না গিয়া বহু শিশু এই হলে সস্তা যৌন-আবেদনমূলক হিন্দি ছবি দেখিতে ভিড় করে। অবশেষে ইহা নেশা হইয়া দাঁড়ায়। অর্থের জন্য বিপথগামী শিশুরা চুরি করিতে শেখে। এই চুরির ধরণ বিচিত্র। একটি শিশু বেলেঘাটার খাল হইতে চুরি করিয়া মাছ ধরিত। তাহা বিক্রয় করিয়া সিনেমা দেখিত। আর একটি শিশু তরি-তরকারির বাজারে গিয়া আনাজপত্র সরাইত ও সেগুলি বিক্রয় করিত।

সন্তানের প্রতি অবহেলা

বাপ-মায়ের অবহেলা অনেক সময় শিশুদের বিপথে ঠেলিয়া দেয়। শতকরা ৭৫ জন শিশু এমনভাবে বিপথে গিয়াছে। ১৯৬১ সালে একটি ঘটনা পাওয়া যায় যেখানে মায়ের অবহেলার ফলে একটি শিশু এক গণিকার সংস্পর্শে আসে। ঐ গণিকার মারফৎ সে নাকি মাতৃস্নেহ ফিরিয়া পায়। আর একটি দশ বছরের বালকের ঘটনা পাওয়া যায়। তাহার বাবা জুয়া ও মদে আসক্ত ছিল। শিশুটি বড় হইয়া সঙ্গী হিসাবে আসক্ত হয়। বালক বিপথে চলিয়া যায়। সে চুরি করিতে শেখে ও জুয়া খেলিতে শুরু করে। ঘোড়-দৌড়ের বই বিক্রয় করিয়া সে অর্থ সংগ্রহ করিত। আর একটি ছেলের বাবা-মা উভয়েই চাকুরি করে। ছোটবেলা হইতেই শিশুকে দেখিবার কেহ থাকে না। শিশুটি বিপথে চলিয়া যায়।

বিপথগামী শিশুদের পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে যে, তাহাদের শতকরা ৯০ জনের বুদ্ধি সাধারণ লোকের উপরে। শতকরা ৫০ জন হাতের কাজ ও ছবি-আঁকা ইত্যাদির দিকে প্রবণতা আছে।

বাসগৃহ-সমস্যা

শিশুদের এই অপরাধপ্রবণতার মূল সমাজের গভীরে নিহিত আছে বলিয়া সমাজতত্ত্ববিদের অভিমত। এ সম্পর্কে একজন বিশেষজ্ঞ বলেন : বাসগৃহ-সমস্যা তাহার অন্যতম। একই ঘরে যখন গোটা পরিবার বাস করে তখন তাহার কুফল পরিবারের শিশুদের যৌন-চিন্তার দিকে ঠেলিয়া দেয়। শহরে শিশুদের খেলাধুলার জায়গা নাই। অবসর কাটাইবার ব্যবস্থাও নাই। শিশুমন উপযুক্ত খাদ্য চাহিয়া পায় না। সন্তান পালন সম্পর্কে পিতা-মাতার বৈজ্ঞানিক ধারণা নাই। ইহা শুধু আর্থিক অসচ্ছলতা হইতে আসে।

এই সমস্যার সহিত সমগ্র জাতির ভবিষ্যৎ জড়িত থাকিলেও তথাকথিত কর্তাস্থানীয় ব্যক্তিদের এ-সব সামান্য বিষয় —ছোটখাট সমস্যা সমাধান করিবার জন্য কোনপ্রকার মাথা-ব্যথা নাই বলিয়া মনে হয়। বিপথগামী বালক-বালিকাদের সংশোধন ব্যবস্থার প্রধান দায়িত্ব সমাজের—কিন্তু বাঙ্গলা দেশের সমাজ-ব্যবস্থাও বোধ হয় বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে কিংবা বিলুপ্তির পথে। মানুষের অর্থনৈতিক অবস্থার উপর মানুষের বহুকিছু মঙ্গলামঙ্গল একান্তভাবে নির্ভর করে।

দেশে আকাশপ্রমাণ বিবিধ পরিকল্পনার কথা ছোটবড় সকল কর্তার শ্রীমুখ হইতে অহরহ শোনা যাইতেছে, কিন্তু দেশের, জাতির, সমাজের এবং পরিবারের সব কিছু যে-সামান্য বস্তুটির উপর নির্ভর করে, যে-জিনিষটিকে

সব কিছুর ভিত্তি বলিয়া মনে করা যাইতে পারে, সেই 'মানুষ' গড়িবার কোন প্রচেষ্টা বা পরিকল্পনা কোথাও দেখিতে পাই না। এই 'মানুষ' ব্যতিরেকে আর সব কিছুই বিপুল ঢক্কানিনাদে এবং কোটি কোটি টাকার শ্রাদ্ধ করিয়া নির্মিত হইতেছে বা নির্মাণ করিবার ভান করা হইতেছে। যাঁহারা সমাজের, দেশের এবং জাতির সত্য কল্যাণ চিন্তা করেন, তাঁহারা অবহিত হইলে হয়ত বা কিছু ফলের আশা করা যাইতে পারে।

এই প্রসঙ্গে 'বয়স্ক' বিপথগামীদের সম্পর্কেও চিন্তার অবকাশ আছে। কারণ? এই 'বয়স্ক' সমাজদ্রোহীদের কুদৃষ্টান্ত বহু পরিমাণে শিশু এবং বালক-বালিকাদের বিবিধ প্রকার কুকর্মে প্রেরোচিত করিতেছে। চরিত্র সংশোধন এবং সংগঠন করিতে হইলে সর্বপ্রথম দৃষ্টি দিতে হইবে পারিবারিক আবহাওয়ার প্রতি।

ভারতীয় খ্রীষ্টানদের দাবী

একটি সংবাদে প্রকাশ যে :

ভারতীয় খ্রীষ্টানেরা গত ... কলিকাতায় অনুষ্ঠিত এক সম্মেলনে তাঁহাদের আর্থিক দুর্গতির প্রতি সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। একটি প্রস্তাবে তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর সরকারী কর্মচারী নিয়োগের ক্ষেত্রে ভারতীয় খ্রীষ্টানদের জন্য তফসিল বা তফসিল উপজাতিদের অনুরূপ সুযোগ দাবি করা হয়।

কিন্তু এ দাবী কেন? তফসিল বা তফসিল উপজাতির খ্রীষ্টানগণ ত তফসিলি হিসাবে সব সুযোগ ও সুবিধা পাইতেছেন। এ দাবীর দ্বারা তাঁহারা গাছেরও খাইতে চান, তলারও কুড়াইতে চাহেন কি? একই সুবিধা দু'দিক দিয়া দু'বার আদায় করার অপচেষ্টা অন্যায়। এই সম্মেলনে আর একটি এমন প্রস্তাব গ্রহণ করা হইয়াছে, যাহার দ্বারা খ্রীষ্টানদের অন্যান্য ভারতীয়দের হইতে পৃথক্ করিবার চেষ্টা প্রকট। প্রস্তাবটি নিম্নে দেওয়া হইল :

শিক্ষা এবং মিশনারী প্রতিষ্ঠানগুলিকে গ্রামাঞ্চলে খ্রীষ্টান চাষীদের সমবায় সামরিক ... উদ্বুদ্ধ হইতে অনুরোধ করা হইয়াছে। তাহা হইলে খ্রীষ্টান চাষীরা আধুনিক ও বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে জমি চাষ করিতে পারিবে। ঐ সব প্রতিষ্ঠানকে দরিদ্র ও মেধাবী ভারতীয় খ্রীষ্টান ছাত্রদের কারিগরি শিক্ষার জন্য বৃত্তি দিতেও অনুরোধ জানান হয়।

আগামী পাঁচ বৎসরের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গ খ্রীষ্টান সম্মেলনের উদ্যোগে ৫০,০০০ টাকা তোলার প্রস্তাব করা হইয়াছে। এই টাকায় একটি কারিগরি বিদ্যালয় বা কারখানা খোলা হইবে।

ভারতীয় খ্রীষ্টান চাষীদের জন্য এ বিষয় পৃথক্ ব্যবস্থা করিবার সার্থকতা কি? সরকার হইতে সাধারণভাবে ভারতীয় চাষীদের কল্যাণের জন্য বহুপ্রকার ব্যবস্থা গৃহীত হইতেছে। খ্রীষ্টান মেধাবী দরিদ্র ছাত্রগণ কারিগরি শিক্ষার সর্বপ্রকার সুযোগ পাইতেছেন, সাধারণ ভাবে সর্বপ্রকার বৃত্তিরও তাঁহারা অধিকারী। বাংলার খ্রীষ্টানদের এই প্রকার 'মুসলীম লীগ' মনোবৃত্তিতে কেহই সুখী হইবেন না। সব বিষয়েই যদি তাঁহারা পৃথক্ হইতে চাহেন, তাহা হইলে শেষ পর্য্যন্ত হয়ত পৃথক্ একটি খ্রীষ্টান বাসভূমির দাবীও তাঁহারা একদিন করিয়া বসিবেন।

একশ্রেণীর উদ্বাস্তুদের বিচিত্র ব্যবসা

যুগান্তরে প্রকাশ :

কলিকাতা, ১০ই অক্টোবর — জানা গিয়াছে যে, কিছুসংখ্যক উদ্বাস্তু সরকারের নিকট হইতে জমি এবং গৃহ নির্মাণের ঋণ পাইবার পর আবার উহা বিক্রয় করিয়া অন্যত্র চলিয়া যাইতেছেন। বর্তমানে উহা বন্ধ করিবার মত আইন সরকারের হাতে নাই।

বারাকপুর মহকুমা ... অফিসে সংবাদ লইয়া জানা গিয়াছে যে, ঐরূপ বেশ কিছু বাড়ী নজরে এবং সরকারের গোচরে আনিয়া ... হইয়াছে। প্রকাশ যে, ঐ সকল উদ্বাস্তুর আর্থিক অবস্থা অসচ্ছল নয়। তাঁহারা নিজেদের উদ্বাস্তু প্রমাণ করিয়া জমি এবং গৃহ নির্মাণের ঋণ গ্রহণ করিয়াছেন। অতঃপর সেগুলি বাড়ীর বেশী দাম লইয়া অন্যত্র চলিয়া যান। অবশ্য সরকারের পাওনা টাকা তাঁহারা ... করিয়া পরেই ঐ কাজটি করিতেছেন। বিশ্বস্তসূত্রে জানা গিয়াছে যে, চব্বিশ পরগণায় বেশী দাম পাওয়া বাড়ী এবং জমি বিক্রয় করিয়া অন্যত্র আবার বাড়ী তৈয়ার করিয়া লইতেছেন।

ওয়াকিবহাল মহলের মতে প্রকাশ যে, বরানগর এবং দমদম অঞ্চল বৃহত্তর কলিকাতার অন্তর্ভুক্ত হইবার ফলে জমি এবং গৃহের মূল্য বৃদ্ধি পাইয়াছে। ফলে, উদ্বাস্তুরা উহাতে আকৃষ্ট হইয়াছেন।

সরকারী ঋণ লইয়া যে সকল উদ্বাস্তু জমি কিনিয়া গৃহ-নির্মাণ করিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই অসাধু নহেন, কিন্তু তাঁহাদের এক বিরাট্ অংশ সাধুও নহেন এবং সরকারের নিকট হইতে গৃহীত ঋণ শোধ না করিয়াই ঘরবাড়ী বিক্রয় করিয়া অদৃশ্য হইয়াছেন। এমন ঘটনার কথাও শুনা যায় যে, একই উদ্বাস্তু বিভিন্ন পরিচয়ে দুই বা ততোধিক বার জমি ক্রয় ও গৃহ-নির্মাণ বাবদ সরকারী ঋণ গ্রহণ করিয়াছেন।

প্রচুর বিত্তশালী তথাকথিত বহু 'উদ্বাস্তু' ঘরবাড়ী নির্মাণ এবং ব্যবসায় করিবার জন্য যে-টাকা সরকারী ঋণ হিসাবে পাইয়াছেন, তাহার পরিমাণ হাজার হাজার। এই প্রকার বহু ঋণ-গ্রহীতা সরকারী প্রাপ্য মিটাইতে নানা টালবাহানা করিতেছেন। অনেকে ডুবও দিয়াছেন।

দেশ বিভাগ হইবার পনের-বিশ বৎসর পূর্ব্ব হইতেই যাঁহারা পশ্চিমবঙ্গে চাকরি অথবা ব্যবসা-বাণিজ্যে নিযুক্ত থাকিয়া পাকাপাকি ভাবে বসবাস করিতেছেন, এমন কি পূর্ব্ববঙ্গের সহিত যাঁহাদের কোনপ্রকার সম্পর্কই ছিল না এবং নাই—এমন-প্রকার বহু 'উদ্বাস্তু' আজ সরকারী

তাঁহার সাহায্যে নিজেদের অবস্থার আরও 'উন্নতি' করিয়াছেন। একদা পূর্ব্ববঙ্গবাসী এই সকল ব্যক্তি হঠাৎ কেন এবং কি কারণে রাতারাতি 'উদ্বাস্তু' হইয়া গেলেন তাহা বুঝা কঠিন!

সরকারের যে বিভাগ হইতে উদ্বাস্তুদের ঋণ বণ্টন হইয়া থাকে, সেই বিভাগের কর্ম্মীদের সহিত যোগসাজসে বহুপ্রকার অন্যায় এবং বে-আইনী অর্থ হাত চালাচালির ব্যাপার ঘটিয়াছে এবং এখনও ঘটিতেছে—এমন কথা প্রায়ই শুনা যায়।

একদিকে একশ্রেণীর তথাকথিত উদ্বাস্তু সরকারী (অর্থাৎ করদাতাদের) টাকায় মজা লুটিতেছে, অন্যদিকে যাহারা প্রকৃত উদ্বাস্তু, তাহাদের অনেকে ক্যাম্পে কিংবা পথে-ঘাটে সপরিবারে অনশন বা অর্দ্ধাশনে দিন কাটাইতেছে। ইহার কারণ ইহাদের দেখিবার 'লোক' নাই।

শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন মহাশয় এ-বিষয় নিজেই জানেন—গলদ কোথায় এবং কেন। আমাদের মনে হয়, তিনি চেষ্টা করিলে বহু গলদ দূর করিতে পারেন এবং তথাকথিত 'উদ্বাস্তুদের' অন্যায় অনাচারও প্রতিরোধ করিতে পারেন।

প্রতি ১৫ ঘণ্টায় একটি !!

পশ্চিমবঙ্গে প্রতি ১৪ ঘণ্টায় একটি করিয়া সশস্ত্র ডাকাতি হইতেছে—অবিশ্বাস্য মনে হইলেও ইহা সত্য!

খুন, ডাকাতি, রাহাজানি, রাহাজানি ইত্যাদি যে কত বাড়িয়াছে, তাহার সঠিক বিবরণ সম্পর্কে জনসাধারণের সম্যক ধারণা না থাকিলেও, শহরে বা গ্রামে, জেলায় অথবা মহকুমায় বিভিন্ন প্রকারের অনাচার, অত্যাচার, ইত্যাদি, উপদ্রব যেভাবে অসহনীয় হইয়া উঠিয়াছে, তা সকলেই উপলব্ধি করেন। ১৯৫২ সালের ৩০শে অক্টোবর পর্য্যন্ত কলিকাতা বাদে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় ৫০০টি সশস্ত্র ডাকাতি হইয়াছে। গত বৎসর এই সংখ্যা ছিল ৩৩০। সুতরাং গত বৎসরের তুলনায় এ বৎসরে প্রায় দেড়গুণ সশস্ত্র ডাকাতি বৃদ্ধি পাইয়াছে। নিঃসন্দেহে ইহা উদ্বেগজনক। পূর্ব্বে ডাকাতিতে ছোরা, লাঠি, বর্শা ইত্যাদি ব্যবহৃত হইত, এখন সেখানে বোমা, রিভলভার ইত্যাদি ব্যবহৃত হইতেছে। অর্থাৎ ডাকাত দমন করিতে যাঁহারা অগ্রসর হইবেন, তাঁহাদের বিপদের ঝুঁকি আরও বাড়িয়াছে। ডাকাতের দল ক্রমশঃ অধিকতর দুর্দ্ধর্ষ হইতেছে। শুনিতে পাই পুলিশ বিভাগে উচ্চশিক্ষিত, কর্ম্মক্ষম লোক নিযুক্ত হইতেছে। বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে তাহার কিছু পরিচয়ও পাওয়া যাইতেছে।

কিন্তু ইহাসত্ত্বেও দেশে যদি ডাকাতির হার ক্রমশঃ এই ভাবে বৃদ্ধি পাইতে থাকে, তাহা হইলে শেষ পর্য্যন্ত ইহা কোথায় দাঁড়াইবে? দেশের শান্তি এবং মানুষের নিরাপত্তা রক্ষার ভার যাঁহাদের উপর, বর্ত্তমান অবস্থায় তাঁহাদের নূতন করিয়া চিন্তা করা দরকার—অবস্থার প্রতিকার কোন্ পথে এবং কি ভাবে হইতে পারে।

কলিকাতা কর্পোরেশনে বকেয়া কর আদায়

কমিশনার শ্রী এস. বি. রায় জানাইতেছেন যে, এখন হইতে কর্পোরেশনের বেলিফগণ করদাতাগণের নিকট কাঁচা রসিদ দিয়া কোন টাকা সংগ্রহ করিতে পারিবেন না। তিনি বলেন, উল্লিখিত বৈঠকে এই সিদ্ধান্তের কথা জানাইয়া দেওয়া হইবে। বেলিফগণ কর্ত্তৃক কাঁচা রসিদ দেওয়ার দরুন বহুক্ষেত্রে টাকা জমার ব্যাপার লইয়া সংশ্লিষ্ট করদাতা এবং বেলিফের মধ্যে ভুল বোঝাবুঝি হইয়াছে। ইহার ফলে অনেক ক্ষেত্রে কর্পোরেশনের আর্থিক ক্ষতি হইয়াছে। কর্পোরেশনের এক বৈঠকে বকেয়া কর আদায় সম্পর্কে বিশেষ ভাবে আলোচনা হয়।

সাধারণ করদাতাদের কর আদায় করিবার নানা পন্থা আছে এবং সাধারণ করদাতাদের কর বিশেষ বা বেশীদিন বাকি পড়িয়া থাকে না। কিন্তু পৌর প্রতিষ্ঠানের মাথা-মুণ্ডু বহু কাউন্সিলারের বাকী করের পরিমাণ নাকি হাজার হাজার টাকা। বহুদিন পূর্ব্বে একজন স্বর্গত ধনী পৌরপিতার বাকী করের পরিমাণ ছিল প্রায় ৬০ হাজার টাকা! এ-টাকা এখনও আদায় হইয়াছে কি না জানা নাই।

কমিশনার মহাশয় যদি বর্ত্তমান কাউন্সিলারদের দেয় করের হিসাব একবার নিজে ভাল করিয়া পরীক্ষা করেন, নানা বিচিত্র তথ্যের সন্ধান তিনি পাইবেন।

সাধারণ লোকের ঘরবাড়ীর কর যে হিসাবে ধার্য্য হয়—পৌরপিতাদের সম্পর্কে সেই প্রকার কড়াকড়ি হয় কি না, দেখা কর্ত্তব্য। এ বিষয়ে বৈষম্যের বহু অভিযোগ সাধারণ করদাতারা করিয়া থাকেন। বিশেষ ভাবে 'বাড়ীওয়ালা' পৌরপিতাদের গৃহাদির কর ধার্য্য সম্পর্কে বহু অনাচার, অবিচার কর্পোরেশন আপিস হইতেই নাকি হইয়া থাকে।

কলিকাতা কর্পোরেশন

পৌরসভার কিছুসংখ্যক কাউন্সিলার কমিশনার শ্রীরায়ের সঙ্গে কোন্দল করিবার জন্য আদাজল খাইয়া লাগিয়াছেন বলিয়া মনে হয়। কমিশনার মহাশয় সকল প্রকার বে-আইনী অনুমোদন বন্ধ করিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছেন—অন্য দিকে কিছুসংখ্যক কাউন্সিলার কলিকাতা মিউনিসিপ্যাল এলাকাকে তাঁহাদের পৈতৃক জমিদারী মনে করিয়া কমিশনার মহাশয়ের সকল প্রকার শুভ প্রচেষ্টাকে প্রতিহত করিতে বদ্ধপরিকর হইয়াছেন।

প্রকাশ, শিয়ালদহের নিকট কয়েকজন কাঠের আসবাবপত্রের ব্যবসায়ী রাস্তার দুইপাশের অতিরিক্ত জমি দখল করিয়া বে-আইনীভাবে

ব্যবসা করিতেছিলেন। পৌরসভার কমিশনার এরূপ বেআইনীভাবে ব্যবসা করার জন্য কয়েকজন ব্যবসায়ীর নিকট হইতে জরিমানা বাবদ ২৫০ টাকা আদায় করেন।

কমিশনার জরিমানা আদায় করিলে ব্যবসায়ী মহলে আতঙ্কের সৃষ্টি হয়। হাওড়া ট্রাফিক প্ল্যানিং কমিটির চেয়ারম্যানের নিকট তাঁহারা আবেদন করেন। প্রকাশ, চেয়ারম্যান ফুটপাথে অতিরিক্ত জমি দখল করিয়া এক মাসের পর্যন্ত ব্যবসা করিবার অনুমোদন দিয়াছেন।

আরও উল্লেখযোগ্য যে, পৌরসভা পূজার পূর্বে হকারদের ফুটপাথে ব্যবসা করিবার অনুমোদন দিবার ক্ষমতা হাওড়া ট্রাফিক প্ল্যানিং কমিটির চেয়ারম্যানের উপর অর্পণ করিয়া এক প্রস্তাব গ্রহণ করেন। প্রস্তাবে এই অনুমোদন কালী পূজা পর্যন্ত দিবার অধিকার দেওয়া হইয়াছিল। কিন্তু হাওড়া ট্রাফিক প্ল্যানিং কমিটির চেয়ারম্যান অনেক হকারকে ফুটপাথে ব্যবসা করিবার মেয়াদ ১৩ই নবেম্বর পর্যন্ত বৃদ্ধি করিয়া এক অনুমোদন দিয়াছেন।

এক সাক্ষাৎকারে কমিশনার শ্রী এস. সি. রায় বলেন যে, হাওড়া ট্রাফিক প্ল্যানিং কমিটির চেয়ারম্যানের পৌরসভার গৃহীত কোন প্রস্তাবের এক্তিয়ারের বাহিরে যাইবার কোন ক্ষমতা নাই।

কমিশনার এক নির্দেশ দিয়াছে ইন্সপেক্টরদের বলিয়াছেন, কোন হকারকে যেন ৩রা নবেম্বরের পর ফুটপাথে বসিয়া ব্যবসা করিবার অনুমোদন না দেওয়া হয়।

কিন্তু এখন পর্য্যন্ত শত শত হকার রাস্তার উপর বসিয়া তাহাদের ব্যবসা চালাইতেছে। কলিকাতা পুলিসের ক্ষমতা থাকিলেও, মাঝে মাঝে 'হল্লা' গাড়ির কথা ছাড়া পুলিস এ-বিষয় আর কিছুই করে না। পথে-ঘাটে যে-সকল পুলিস ডিউটি দেয়—হকারদের সহিত তাহাদের গভীর মিতালী সকলেরই চোখে পড়ে। ইহার কারণ না বলিলেও চলিবে—সকলেই জানেন।

শিয়ালদহের নিকট আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় রোডের পূর্ব দিকের তথাকথিত ফুটপাথটি বলিতে গেলে কাঠের আসবাবপত্রের ব্যবসায়ীদের আড়তে পরিণত হইয়াছে। প্রত্যেক ব্যবসায়ী তাঁহার দোকানের সামনের ১৫-২০ ফুট রাস্তা দখল করিয়া কাঠের আসবাবপত্র জমা করিয়া রাখেন। বহুকাল পূর্বে পুলিস একবার উহা বন্ধ করিয়াছিল এখন অবস্থা আবার পূর্ববৎ! এই বেআইনী দখলদারদের জন্য কয়েকজন কাউন্সিলারের এমন অস্বাভাবিক মমতা কেন—কে বলিবে!

মৌলালী হইতে প্রায় ওয়েলিংটনের মোড় পর্য্যন্ত ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীটের দুইটি ফুটপাথ মোটর মেরামত এবং ওয়েল্ডিং কারখানাওয়ালাদের দখলে। রাত্রির অন্ধকারে এখানে পথিককে প্রাণ হাতে করিয়া চলিতে হয়। ফুটপাথ দুইটিতে মোটর মেরামতের দ্রব্যসম্ভার, অক্সিজেন সিলিণ্ডার, বড় বড় লোহার টুকরা, ডাণ্ডা প্রভৃতি ইতস্তত ছড়ানো থাকে। পৌরপিতারা এদিকে দৃষ্টি দিবার সময় পান না—নিজেদের স্বার্থ ও দলীয় দ্বন্দ্ব লইয়াই সদা ব্যস্ত।

সরকার জমিদারী প্রথার লোপ করিয়াছেন সত্য, কিন্তু কবে কলিকাতা কর্পোরেশনের কাউন্সিলাররূপী কয়েকটি খুদে জমিদারকে বিতাড়িত করিবেন?

শিয়ালদহ স্টেশন এলাকা

সংবাদে প্রকাশ, শিয়ালদহ স্টেশন এলাকায় বিশেষ একশ্রেণীর সমাজবিরোধী ব্যক্তি উদ্বাস্তুদের মধ্যে আড্ডা গাড়িয়া বসিয়াছে। ইহাদের যোগসাজসে ঐ এলাকা হইতে নারীহরণ এবং অন্যান্য বহুবিধ সমাজবিরোধী কার্য্যকলাপ সংঘটিত হইতেছে। 'যুগান্তরে' প্রকাশিত রিপোর্ট হইতে অবস্থার কিছু পরিচয় পাওয়া যাইবে:

শিয়ালদহ ষ্টেশন এলাকা হইতে বিগত কয়েক দিনে ৮টি উদ্বাস্তু তরুণী উধাও হইয়াছেন বলিয়া জানা গিয়াছে।

পুলিস শিয়ালদহ ষ্টেশন এলাকা হইতে নারীঘটিত দুষ্কার্য্যের সহিত যুক্ত থাকার অভিযোগে এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করিয়াছে। গতকাল রাত্রে ষ্টেশনের এবং গেট হইতে আরও এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করিয়াছে। প্রকাশ, ঐ ব্যক্তি নাম ও পরিচয় গোপন করিয়া সেখানে আস্তানা গাড়িয়া বসিয়াছিল।

প্রকাশ যে, বর্ত্তমানে শিয়ালদহের নর্থ ষ্টেশনের এবং প্ল্যাটফরমের পাশে এবং এবং গেটের নিকট একদল সমাজবিরোধী নিজেদের উদ্বাস্তু-দরদী পরিচয় দিয়া ঐ সব কুকর্ম চালাইয়া যাইতেছে। উদ্বাস্তুদের আর্থিক অসচ্ছলতার সুযোগ লইয়া প্রথমে তাঁহাদের সহিত ঐ সকল লোকেরা ভাব জমায় এবং তাঁহাদের আপদে-বিপদে অর্থ দিয়া সাহায্যও করিয়া থাকে। পরে ঘনিষ্ঠতা হইলে ঐ সুযোগে তরুণী এবং বিবাহিতা যুবতীদের লইয়া উধাও হইয়া যায়। পুলিস ইতিমধ্যে তিনটি তরুণীকে উদ্ধার করিয়াছে।

শিয়ালদহ নর্থ ষ্টেশনের পুবে ডি এস বিল্ডিং এবং রেলওয়ে ওভার ব্রীজের নীচে একদল সমাজবিরোধী পাকাপাকি ভাবে একটি আস্তানা গাড়িয়াছে। উহারা সেখানে প্রকাশ্যে মত্ত অবস্থায় দৌরাত্ম্য চালাইয়া থাকে। উহারা একটি উদ্বাস্তু কুটিরে প্রবেশ করিয়া জনৈক উদ্বাস্তু মহিলার উপরে হামলা করিয়াছে বলিয়া এক অভিযোগে জানা গিয়াছে। ছুরি খেলা উহাদের প্রাত্যহিক ঘটনা, কেহ কিছু বলিলে উহাদের পার পাইবার উপায় নাই। পুলিস এ সকল ঘটনা জানে না উহা ঠিক নহে। তাহারা জানিয়া শুনিয়াই নিষ্ক্রিয় থাকে বলিয়া অভিযোগ পাওয়া গিয়াছে। ঐ স্থানটি রেল পুলিস এবং কলিকাতা পুলিসের বেলেঘাটা থানা এলাকার সীমান্তে অবস্থিত। কাজেই দুষ্কৃতকারীদের দৌরাত্ম্য দমনের ব্যাপারে উভয় পুলিসই উভয় পুলিসের উপর দোষ চাপাইয়া থাকে। উহার মাঝে পড়িয়া নিরীহ উদ্বাস্তুরাই শুধু হয়রান হইতেছেন।

কলিকাতা শহরের আরও কতকগুলি এলাকা সমাজ-বিরোধীদের কার্য্যকলাপে বিব্রত হইয়াছে। যথা টালিগঞ্জ, যাদবপুরের অঞ্চল বিশেষ, ইত্যাদি। এই সকল অঞ্চলে দিনের বেলাতেও মহিলাদের পক্ষে একা যাতায়াত বিপজ্জনক—বিশেষ করিয়া বালিকা এবং স্কুল-

কলেজের ছাত্রদের পক্ষে। সমাজবিরোধীদের কল্যাণে বহু অভিভাবক তাঁহাদের কন্যা প্রভৃতিকে বিদ্যালয় হইতে ছাড়াইয়া লইতে বাধ্য হইয়াছেন। সবচেয়ে আশ্চর্য্যের কথা, পুলিস কর্তৃপক্ষ উপদ্রুত অঞ্চলে উপদ্রবকারীদের সকল পরিচয় জানা সত্ত্বেও অবস্থার কোন প্রতিকার হয় না। পুলিস অবশ্য একথাই বলে যে, ধরপাকড় করিলে, উপর মহল হইতে সমাজবিরোধীদের জন্য তদ্বীর হয়, যাহার ফলে পুলিস আর অগ্রসর হইতে পারে না। কথাটা একেবারে মিথ্যা নয়—একথা অনেকেরই জানা আছে। দেখা গিয়াছে—বামপন্থী এম. এল. এ., এম. এল. সি. এবং কর্পোরেশন কৌন্সিলারদের সমাজবিরোধী বালকদের উপর একটা অহেতুক (?) মমতা আছে।

সরকারী সাহায্যের আশা না করিয়া ভদ্র শিক্ষিত ব্যক্তিরা যদি দলবদ্ধভাবে বিরুদ্ধ ব্যবস্থা গ্রহণ করেন, অবস্থার পরিবর্ত্তন একদিনেই হইতে পারে। প্রয়োজন মাত্র সামান্য সাহসের।

সারেং খালাসীদের ধর্ম্মঘট

পাকিস্তানী সারেং এবং খালাসীদের হঠাৎ ধর্ম্মঘটের ফলে কলিকাতা আসাম ডেস্প্যাচ সার্ভিসের ষ্টীমারগুলি অচল হইয়াছে—ইহা লিখিবার সময় পর্য্যন্ত অবস্থার কোন উন্নতি হয় নাই। ফলে বহু কোটি টাকার মাল পাকিস্তানের নদীবক্ষে আটক হইয়া আছে। দুই-একটি ষ্টীমার লুট হইয়াছে বলিয়াও সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। ইহা অবশ্যম্বীকার্য্য যে, ভারতের ষ্টীমার সার্ভিসে পাকিস্তানী লস্কর সারেং-এর স্থলে যে ভারতীয় লস্কর ও সারেং অধিক সংখ্যায় সংগ্রহ বা রিক্রুট করা অবশ্য প্রয়োজন।

ইহা স্পষ্টভাবে দেখা গেল যে, পাকিস্তানে গঠিত কোন ইউনিয়ন ভারতীয় সার্ভিসের ষ্টীমার অচল করিয়া দিতে পারে। শুধু তাহাই নহে, পাকিস্তানের সারেং ও লস্কর ভারতে ষ্টীমার চালাইবার কাজে নিযুক্ত থাকিলেও এবং এখান হইতেই তাহাদের বেতন পাইলেও এই দেশের ব্যবস্থার প্রতি তাহাদের আনুগত্য নাই। ভারতের কোম্পানীতে চাকরি করিব, ভারতের টাকা বেতন পাইব, অথচ ভারতের কোন আইন মানিব না এবং যাহা খুশি তাহাই করিব—এ অবস্থার অবিলম্বে প্রতিকার প্রয়োজন। কোম্পানীর স্বার্থে এবং ভারতের স্বার্থেই যতশীঘ্র সম্ভব এই অবস্থার অবসান হওয়া একান্ত কর্তব্য। ভারতের নৌ-চলাচলের পক্ষে ইহা বিপজ্জনক। ষ্টীমার সার্ভিসে পাকিস্তানী সারেং লস্করদের প্রাধান্য থাকার ফলেই যে ভারতীয় সারেং লস্কর অধিক সংখ্যায় নিয়োগে বাধা সৃষ্টি হইতেছে এ অভিযোগ বহু পুরাতন, সুতরাং ইহাও বিশেষভাবেই আপত্তিকর।

জাহাজ কোম্পানীর ৬,৫০০ লস্করের মধ্যে ৬,০০০ পাকিস্তানী! দেশ বিভাগের পনের বৎসর পরেও ভারতের জাহাজ কোম্পানীতে এ বিচিত্র অবস্থা বিস্ময়কর। এই শোচনীয় অবস্থার কারণ হিসাবে কোম্পানীর তরফ হইতে বলা হইয়াছে যে:

কোম্পানীর মতে ছয় হাজার লস্করের মধ্যে ছয় হাজার পাকিস্তানী। দেশ বিভাগের পনের বৎসর পরেও অবস্থা কেন এরূপ শোচনীয় [illegible] করিয়া বলা হয় যে, [illegible] বিশ্বাবিদ্যালয়ের জন্য কোম্পানীর যে [illegible] আছে, তাহাতে বৎসরে মাত্র একজন করিয়া [illegible] শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে। কিন্তু [illegible] খুব বেশী থাকায় এ কোম্পানীর [illegible] বৎসর [illegible] ভারতীয় লস্করের সংখ্যা [illegible] বেশী হয় নাই।

কোম্পানীর এ-যুক্তি যুক্তিহীন।

"যেখানে চাহিদা আছে, অধিক সংখ্যায় শিক্ষাদানের সুযোগও আছে, সেখানে কোম্পানীর পরিচালনে বৎসরে মাত্র একজন যুবকের শিক্ষাদানের ব্যবস্থা হইবে কেন? কেন আরও বেশী সংখ্যায় শিক্ষা দেওয়া হয় নাই? কোম্পানীর সাড়ে ছয় হাজার লস্করের মধ্যে ১৫ বৎসরে মাত্র [illegible] ভারতীয় লস্কর উহাদের কোম্পানীতে আছে কেন, ইহার সন্তোষজনক কৈফিয়ৎ যে উহাদের নিকট হইতে, উহারা কি তাহা কোনরূপ [illegible] নাই? ভারত ও পাকিস্তানের অগ্রীতি আজ সর্বত্র উহাদের এই নীতিহীনতা ও অন্যায়ের কোন [illegible] উপলব্ধি করা সম্ভব হইতেছে না? সাড়ে ছয় হাজার ভারতীয় লস্কর পাইবার আশায়ও উহারা নিজেদের ব্যবহারে [illegible] কোন পন্থা কি গ্রহণ করেন নাই? জাহাজ কোম্পানী যদি বিদেশী কোম্পানী না হইয়া দেশী কোম্পানী হইতেন, তাহা হইলে কি উহারা এই শোচনীয় বিপজ্জনক অবস্থা সহ্য করিতে পারিতেন?"

কতকগুলি বিদেশী কোম্পানীর পাকিস্তান-প্রীতি আমাদের জানা আছে। এই সব কোম্পানীর মালিকশ্রেণী ভারতে কারবার করেন, কোটি কোটি টাকা আয় করেন, কিন্তু ইঁহাদের ভারতের প্রতি কোনপ্রকার দরদ নাই। ভারতে বসিয়া ইঁহারা ভারতেরই দাঁত ভাঙিতেছেন ভারতেরই শিল-নোড়া দিয়া।

বর্ত্তমান ভারত-পাক সম্বন্ধ যেমন দেখা যাইতেছে, তাহাতে অবিলম্বে অবহিত না হইলে, অদূর ভবিষ্যতে বিষম বিপদের সম্মুখীন হইতে হইবে।

পাকিস্তানী 'অতিথি'দের গতিবিধি

ভারতের উত্তরাংশে যখন ভারতীয় সৈন্যরা চীনাদের সহিত সংগ্রামে লিপ্ত এবং দেশরক্ষার জন্য জীবন-মরণ

পণ করিয়া যুদ্ধ চালাইতেছে, সেই সময় সমগ্র আসাম এবং ত্রিপুরা রাজ্যে লক্ষ লক্ষ পাকিস্তানী অনুপ্রবেশকারী-দের উপস্থিতি ভাবনা এক ভয়ের কারণ হইয়া উঠিয়াছে। সংবাদে প্রকাশ :

"পাকিস্তানী ও অন্যান্য বিদেশীদের বহিষ্কার করার দায়িত্ব যাদের [illegible] জন্য [illegible] সামরিক কর্তৃপক্ষ [illegible] উপর চাপ দিয়েছেন। উহাদের মতে, [illegible] সম্প্রদায়ের জন্য উহাদের নিয়োগ করা হয়েছে, [illegible] উপস্থিতির ফলে তাহা [illegible] হইতে পারে। [illegible] এক বিশেষ শ্রেণীর উপর [illegible] এই সকল লোক [illegible] ঘুরিয়া বেড়াইতেছে এবং স্থানীয় কর্তৃপক্ষের [illegible] অপেক্ষা অধিকতর বিপজ্জনক হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

সম্প্রতি, আসামের উপজাতীয় সামরিক কর্তৃপক্ষ বিপুল সংখ্যক পাকিস্তানীকে [illegible] করিতে আসামের কর্তৃপক্ষের [illegible] [illegible] [illegible] পাকিস্তানী [illegible] অপরের হাতে তুলিয়া দিতে অসমর্থ হন, [illegible] অসামরিক কর্মচারী ও সামরিক কর্মচারীদের একযোগে কাজ করার পথে [illegible] হইয়াছে।

আসাম, ত্রিপুরা এবং পশ্চিমবঙ্গের এই বিপদের উদ্ভব হঠাৎ হয় নাই। ইহা গত প্রায় ১৩ বৎসর ধরিয়া ক্রমাগত চলিতেছে। সর্বসাধারণ এবং সংবাদপত্রসমূহ প্রাদেশিক এবং কেন্দ্রীয় সরকারকে এ বিপদ্ সম্পর্কে বহুবার অবহিত করিতে চেষ্টা করিয়াছেন, কিন্তু কোন ফল হয় নাই। কর্তৃপক্ষের পাকিস্তানী প্রেমের বন্যায় সকল সাবধান বাণী, সকল আবেদন-নিবেদন ভাসিয়া গিয়াছে। বলিতে দুঃখ হয়, এ বিষয় প্রধানমন্ত্রীও অপরাধী। তাঁহারই হুকুমে পাকিস্তানীদের প্রতি ভারত এমন বিকট প্রেম দেখাইতে বাধ্য হইয়াছে। এ বিষয় আসাম সরকারও কম দোষী নহেন। বাঙ্গালী খেদাইবার বিষম উৎসাহে তাঁহারা নিজেদের নাক কর্তন করিতেও দ্বিধাবোধ করেন নাই। আসামের অর্থমন্ত্রী—যিনি দেশ বিভাগের পূর্ব্বে ছিলেন দারুণ পরাক্রমশালী মুসলীম লীগ পন্থী, আজ তিনি হইয়াছেন বিষম কংগ্রেসী! এই মহাশয় ব্যক্তির আন্তরিক প্রেম এবং মমতা যে পাকিস্তানের প্রতি, তাহাতে সন্দেহ করিবার কোন হেতু আছে কি?

পাকিস্তানের হাবভাব এবং মতলব ক্রমশঃ প্রকট হইতেছে—পাক-সীমান্তে সৈন্য সমাবেশ করা হইতেছে। ভারত চীনের যুদ্ধের সুযোগ লইয়া, ভারতের অঙ্গচ্ছেদ করিয়া যাহার জন্ম সেই পাকিস্তান যে-কোন মুহূর্ত্তে ভারতের দেহে খেঁকি কুকুরের মত কামড় দিবার চেষ্টা করিবেই। এই চরম সঙ্কটকালে কেন্দ্রীয় কর্ত্তারা আশা করি অযথা পাকিস্তানী প্রেম আর বিলাইবেন না।

কম্যু প্রচারপত্রের কীর্ত্তি

ভারত সরকার বহু প্রকার চীনা পুস্তক, ম্যাপ এবং পত্র-পত্রিকাদি বাজেয়াপ্ত করিতেছেন—ঠিক সেই সময় কলিকাতার জ্যোতি বসুর প্রচার বাহন দৈনিক পত্রিকাটি ঘটা করিয়া দৈনিক পিকিং রিভিউ এবং অন্যান্য পুস্তকাদির বড় বড় বিজ্ঞাপন প্রকাশ করিতেছেন। বিজ্ঞাপনে ঘটা করিয়া লিখিত হইয়াছে—"Read & Subscribe—Chinese Periodicals—Subscription Campaign Period 18th Sep '62 to Jan 31, '63." সরকারী উদারতার (দুর্ব্বলতা?) যথাযথ ব্যবহার ইহাকেই বলে। কম্যুদের এই বাঙ্গলা প্রচার-বাহনটি আজ পর্য্যন্ত চীন-ভারত যুদ্ধ সম্পর্কে কোন প্রকার সম্পাদকীয় মন্তব্য প্রকাশ করেন নাই—অথচ কিউবার জন্য উহার ক্রন্দন এবং আস্ফালন লক্ষ্য করিবার বিষয়।

অবস্থার চাপে পড়িয়া বাধ্য হইয়া শেষ পর্য্যন্ত "ভারতীয় কম্যুনিষ্ট পার্টির জাতীয় (!) পরিষদ" অনেক টালবাহানার পর অবশেষে সাব্যস্ত করিয়াছেন যে, হাঁ, চীনারা সত্যই ভারতের উপর আক্রমণ চালাইয়াছে এবং চীনের মত একটি 'সমাজতান্ত্রিক দেশ' যে ভারতের সহিত বিরোধ অস্ত্রবলে মীমাংসা করিতে চাহিবে, ভারতীয় কম্যুনিষ্ট নেতারা কখনও তাহা ভাবিতেই পারেন নাই। কম্যুনিষ্ট পার্টির জাতীয় পরিষদের এই সিদ্ধান্ত চুলচেরা বিশ্লেষণ করিয়া লাভ নাই। কারণ, সিদ্ধান্তটি কতদিন ধোপে টিকিবে তাহা বলা কঠিন। সিদ্ধান্ত আন্তরিক কি না সে বিষয়েও সন্দেহ আছে। পার্টির জাতীয় পরিষদের সব সদস্যই চৈনিক আক্রমণ এবং ভারতের জাতীয় সঙ্কট সম্পর্কে একমত হইতে পারেন নাই। পর্দার অন্তরালে কম্যুনিষ্ট পার্টির জাতীয় পরিষদের অধিবেশনে কি ঘটিয়াছে, চীন-পন্থী, মধ্যপন্থী সদস্যরা কে কি বলিয়াছেন, তাহা জানা শক্ত। এই পর্য্যন্ত জানা যাইতেছে যে, পার্টির চেয়ারম্যান শ্রীডাঙ্গের প্রস্তাব ভোটের জোরে পাস হইয়াছে, কিন্তু চীনপন্থী ও মধ্যপন্থীরা 'সমাজতান্ত্রিক দেশ' চীনের মান বাঁচাইবার জন্য চেষ্টার ত্রুটি করেন নাই। পার্টির জাতীয় পরিষদে শ্রীডাঙ্গের প্রস্তাব ভোটাধিক্যে গৃহীত হইলেও কম্যুনিষ্ট পার্টির বিভিন্ন রাজ্য-শাখার কর্ম্মকর্তারা কোন্ সুরে তাঁহাদের তার বাঁধিবেন, কি সুর বাজাইবেন, দলের সাধারণ সদস্যগণকেই বা

তলায় তলায় কি নির্দেশ দিবেন, তাহার উপর বর্ত্তমান জরুরী অবস্থায় সতর্ক দৃষ্টি রাখা দরকার।

প্রস্তাব পাশ করা হইয়াছে বলিয়াই কেহ যেন মনে করিবেন না—এই চৈনিক-প্রেমিকদের অন্তরের কোন পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। পার্টির উপর মিঃ ডাঙ্গের খুব বেশী প্রভাব আছে কি না সন্দেহের বিষয়। কম্যুনিষ্ট পার্টির সেক্রেটারী মিঃ নাম্বুদ্রিপাদের বোলচাল এবং কথাবার্ত্তায় মনে হয় তিনি চীনপন্থীদের দিকে ঝুঁকিয়াছেন। আমাদের কথা বাঙলাকে লইয়া। বাঙলার পরম বিক্রমশালী কম্যুনিষ্ট নেতা জ্যোতি বসু মহাশয়ের বিবৃতি এবং বক্তৃতাবলীতে চীনের প্রতি তাঁহার ভক্তিশ্রদ্ধার কথা নূতন করিয়া না বলিলেও চলে। কম্যুনিষ্ট পার্টির এই নেতা শেষ পর্য্যন্ত কি খেলা দেখাইবেন তিনিই জানেন। আমাদের বলিবার কথা এই যে—প্রস্তাবে চীনের আক্রমণের নিন্দা করিয়া নেহরু এবং ভারত সরকারের সমর্থন করিলেও এই মরক্ষ্যালানো পর-ভুলানো দল এবং দলের লোকদের বিশ্বাস করিবার মত কোন কারণ নাই। মুখে বা প্রস্তাবে যাহাই বলা হউক—চীনের প্রতি সস্নেহ দৃষ্টি এবং আন্তরিক আনুগত্য এই পার্টির পূর্ব্ব বজায় আছে। ইহাদের সম্পর্কে দেশকে এবং জাতিকে অবহিত থাকিতে হইবে।

কম্যু সমাজ-বিরোধীদের সম্পর্কে মুখ্যমন্ত্রী

সমাজ এবং দেশবিরোধী কোন দল চীনাদের সঙ্গে গোপন ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হইয়া যাহাতে দেশের বর্ত্তমান অবস্থায় কোন প্রকার নাশকতামূলক কার্য্য না করিতে পারে, শ্রীযুক্ত প্রফুল্ল সেন দেশের সকলকে সেই সম্পর্কে সদা সতর্ক থাকিতে বলেন। কংগ্রেস ভবনে এক সভায় শ্রীঅতুল্য ঘোষ কম্যুনিষ্ট নেতা শ্রীজ্যোতি বসুর ৩০শে অক্টোবরের ও ১লা নভেম্বরের বিবৃতির উল্লেখ করেন। তিনি শ্রীবসুর ৩০শে অক্টোবরের বিবৃতির তীব্র সমালোচনা করিয়া বলেন যে, ঐ বিবৃতি দেখিয়া কাহারও মনে হইবে না যে, শ্রীজ্যোতি বসু ভারতের লোক। ভারতের আড়াই হাজার তিন হাজার জওয়ানের রক্তে লেফা যে লাল হইয়া গিয়াছে, তাহা শ্রীবসুর মনে কোন রেখাপাত করে নাই বলিয়া শ্রীঘোষ মনে করেন। শ্রীবসুর ১লা নভেম্বরের বিবৃতির উল্লেখ করিয়া শ্রীঘোষ বলেন যে, পার্টির জাতীয় পরিষদের প্রস্তাবের পরও শ্রীবসুর মনে সংশয় ও দ্বিধা আছে বলিয়া মনে হইতেছে।

যুদ্ধের সময় কেন্দ্রীয় সরকারের দেশদ্রোহীদের সম্পর্কে আরও বেশী কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। ভারতে কনসেনট্রেশন ক্যাম্প করিবার স্থানের কোন অভাব আছে কি? জেলখানাতেও স্থানাভাব এখনও ঘটে নাই।

এই প্রসঙ্গে 'যুগান্তরে' প্রকাশিত একটি তথ্যের প্রতি পাঠকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিঃ

ভারতের উত্তর সীমান্ত যে সময় চীনা কম্যুনিষ্টদের হানায় বিপন্ন, ঠিক সেই সময় আমাদের [illegible] একটি প্রধান ঘাঁটি কলিকাতা বন্দরে কম্যুনিষ্ট-পাকিস্তানী [illegible] হবার সংবাদ বিশ্বস্ত সূত্রে [illegible]

কলিকাতা পোর্ট কমিশনার [illegible] গুরুত্বপূর্ণ কাজে এখনও পর্য্যন্ত পাকিস্তানী [illegible] কম্যুনিষ্ট [illegible]

[illegible] পোর্ট কমিশনার্সের [illegible] কর্মীর সংখ্যা এখনও [illegible] ভারতের [illegible] কারণ হইয়াছে [illegible] পাকিস্তানীদের কাছে [illegible] পাকিস্তানী [illegible] ১৯৪৮।

[illegible] উল্লেখ করা হয়েছে:

[illegible] কর্মীর [illegible] পাকিস্তানী, দ্বিতীয় শ্রেণীর [illegible] কর্মীর [illegible] পাকিস্তানী [illegible] গুরুত্বপূর্ণ [illegible] এখনও [illegible] হয় নাই। আমরা কোথায় আছি!

আমরা খাঁটি পাকিস্তানী এবং দেশদ্রোহী, ভারতীয় হইয়াও যাহারা অভারতীয়, সেই সব মহাত্মাদের দয়ার উপর। ভারতের নিরাপত্তার পক্ষে পরম বিপজ্জনক অবস্থাগুলির যথাযথ প্রতিবিধান যদি কেন্দ্রীয় সরকার এখনও না করেন, তাহা হইলে—তাঁহারা দেশের এবং জাতির চরম সর্ব্বনাশ করিবেন। ইহা আত্মহত্যার সামিল হইবে। দেশবাসী তাঁহাদের এ-অপরাধ কখনও ক্ষমা করিবে না।

মুক্তি ফৌজ

একটি সংবাদে প্রকাশ: সুন্দরবন ও উত্তরবঙ্গের কোন কোন অঞ্চলে কম্যুনিষ্টরা চীনা সৈন্যদের মুক্তি ফৌজ আখ্যা দিয়া জনসাধারণের মধ্যে অপপ্রচার চালাইতেছে বলিয়া পশ্চিমবঙ্গ সরকার নির্ভরযোগ্য সূত্রে সংবাদ পাইয়াছেন। এই ধরণের দেশদ্রোহিতামূলক কাজ বন্ধ করিবার জন্য রাজ্য সরকার কঠোর হইতে কঠোরতর ব্যবস্থা গ্রহণে কৃতসঙ্কল্প।

বিভিন্ন স্থানে সরকারের উর্দ্ধতন অফিসার প্রেরণ করা হইয়াছে এবং এই ব্যাপারে যাহাতে যথাযথ ব্যবস্থা অবিলম্বে গ্রহণ করা হয়, সেদিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখা হইতেছে।

কেবল বিদেশে দৃষ্টি না রাখিয়া অবিলম্বে কাজ কিছু করা দরকার। অন্যদেশে যুদ্ধকালীন অবস্থায় যাহা করা হয়—আমাদেরও তাহাই করিতে হইবে অর্থাৎ যে কোন প্রকার [illegible] দেশদ্রোহিতার অপরাধে যাহারা অপরাধী বলিয়া বিবেচিত হইবে—তাহাদের প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করিতে হইবে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ [illegible] অপরাধীর এই প্রকার দণ্ড [illegible] হইলে দেশদ্রোহীদের [illegible] চৈতন্য হইবে।

এই প্রসঙ্গে 'যুগান্তর' পত্রিকার একটি সম্পাদকীয় প্রবন্ধের অংশ উদ্ধৃত করা অবান্তর হইবে না:

[illegible]

বিদেশে দু-একটি রাজনৈতিক দল ছাড়া দেশের সর্বসাধারণের দাবীও ইহাই। সরকার যখন দেশের সর্ববিধ সহযোগিতা অকুণ্ঠভাবে লাভ করিতেছেন, তখন দেশের লোকের দাবী গ্রাহ্য করিলে কোন অন্যায় হইবে না। যুদ্ধকালে মামুলী বিচার-পদ্ধতি মানিয়া চলিবার সময় নয়, এখন সোজাসুজি কোর্ট মার্শাল ব্যবস্থা করিতেই হইবে। 'যেমন কুকুর, তেমনি মুগুর' প্রবাদ-বাক্য মিথ্যা নহে। বলা বাহুল্য মানুষরূপী কুকুর অপেক্ষা প্রকৃত কুকুর সকল বিষয়ে মহত্তর এবং 'দেশভক্ত'।

ভারতীয় কম্যুনিষ্ট পার্টির জাতীয় পরিষদ চীনের ভারত আক্রমণ সম্পর্কে সর্বশেষ যে প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছে, তাহার ফলে পার্টির তিনজন সদস্য—পার্টির সম্পাদক মণ্ডলীতে কাজ করিবার অক্ষমতা জ্ঞাপন করিয়াছেন বলিয়া প্রকাশ। এই তিনজনের মধ্যে একজন হইতেছেন পশ্চিমবঙ্গের জনগণ-মন অধিনায়ক পিকিংগত-প্রাণ বাঙ্গালীগত-জান জ্যোতি বসু মহাশয়।

এই তিনজন পার্টির বামগোষ্ঠীর সদস্য। ইঁহারা ভারত আক্রমণের অপরাধে চীনকে সরাসরি নিন্দা করিবার বিরোধী—কারণ ইঁহাদের মতে কোন সমাজতান্ত্রিক দেশ অন্য কোন দেশকে আক্রমণ করিতে পারে না! আক্রমণ করিলেও—তাহা মুক্তি-ফৌজের আগমন বলিয়া মানিতে হইবে।

রজনী পাম দত্ত

বাঙ্গালী হইয়াও দেশের সহিত ইঁহার কোনপ্রকার যোগসূত্র নাই। ইনি বৃটিশ কম্যুনিষ্ট পার্টির সহ-সভাপতি। ভারত-চীন যুদ্ধের ব্যাপারে তিনি হঠাৎ একটি বাণী প্রদান করিয়া আমাদের কৃতার্থ করিয়াছেন। পাম দত্ত বলিয়াছেন যে, "চীনের সহিত ভারতের বর্তমান সীমান্ত বিরোধে বিটেন এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিকট হইতে ভারতের পক্ষে অস্ত্রশস্ত্র গ্রহণ করা শান্তির পক্ষে সহায়ক নহে। বিটেন এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ভারতকে অস্ত্রশস্ত্র দান ভারতকে রক্ষার জন্য নহে।" অবশ্য চীনের পক্ষে সোভিয়েট হইতে অস্ত্রশস্ত্র দান গ্রহণ শান্তির পক্ষে পরম সহায়ক—কারণ ইহা চীনকে রক্ষার জন্য এবং তাহার সাম্রাজ্য বিস্তারের সাহায্যকল্পেই করা হইতেছে! রজনী পাম দত্ত মহাশয় ভারতের জন্য তাঁহার পরম মূল্যবান্ মাথা ঘামাইয়া অমূল্য উপদেশ বিতরণ না করিলেই ভাল হইত। তাঁহার কথায় মনে হয়, ভারত পুরাপুরি চীনের কব্জায় গেলেই এশিয়াতে পরম ও চরম শান্তি প্রতিষ্ঠিত হইবে।

শ্রীঅতুল্য ঘোষের ভাষণ

৬।১১।৬২ তারিখের 'স্বাধীনতা'র সংবাদে প্রকাশ:

উত্তর কলিকাতায় রবীন্দ্র-কাননে (বিডন স্কোয়ার) এক সভায় শ্রীঅতুল্য ঘোষ ভাষণ প্রসঙ্গে বলেন: "কমিউনিষ্ট পার্টির খুব অল্পসংখ্যক ব্যক্তিই চীন যে ভারত আক্রমণ করিয়াছে, ইহাতে সন্দেহ প্রকাশ করেন (অর্থাৎ পার্টির অধিকাংশ সদস্যই চীনকে ভারত আক্রমণকারী বলিয়া বিশ্বাস করেন)। কমিউনিষ্ট পার্টির এই 'সন্দেহকারী' অল্পসংখ্যক ব্যক্তি দেশের কোন ক্ষতি করিতে পারিবেন না। ইঁহারা ক্ষতি করিবেন নিজেদেরই

নিমন্ত্রণ

ধর্মদাস মুখোপাধ্যায়

বীরেন অবনীশের আশৈশব হৃদয়ের বন্ধু। একসঙ্গে স্কুলে পড়ত। তার বিয়ে, সেখানে না গিয়ে পারে না সে।

তাই বেশী বলতে হয় নি বীরেনের দাদা সমরেশকে। স্টেশনে দেখা হতেই সেই খবরটা জানাল সমরেশ, ঠেলতে পারল না অবনীশ তার কথা। এইসব পড়ে কলকাতার জরুরী প্রয়োজন, অবনীশ সমরেশের সঙ্গেই রওনা হ'ল [illegible]।

সমরেশ বীরেনের দাদা হলেও বয়সে অবনীশদের চেয়ে দু'এক বছরের মাত্র বড়। তাই সেও বন্ধু পর্যায়ের। ট্রেনের মধ্যে সমস্ত পথ হাসি-তামাশা আর হৈ-হল্লোড় করতে করতে চলল ওরা। সঙ্গে আরও একজন ছিল—সে মানস। ওদের খেলার বন্ধু। একসঙ্গে ফুটবল খেলত। ভাল খেলোয়াড় ছিল মানস।

ট্রেনের মধ্যে গল্প-গুজবে ভুলেই গেল অবনীশ, নিয়ম-মাফিক নিমন্ত্রিত নয় সে। ভুলে গেল, বীরেন আর মানস যাচ্ছে গায়ে হলুদের তত্ত্ব নিয়ে। ভুলে গেল, বিয়ে হবে রাত্রে আর দুপুরেই চলল তিনজন বরযাত্রী শুধু নামমাত্র আনুষ্ঠানিক একটু ছেলের গায়ে ছোঁয়ান হলুদ নিয়ে।

একবারও মনে হয় নি হঠাৎ পথের এই নিমন্ত্রণে অন্ত কাজ ফেলে এই অসময়ে তিন জন লোক গায়ে হলুদ নিয়ে যাওয়া ঠিক নয়। সব কেমন যেন ভুলে গেল অবনীশ, যেই সমরেশ বলল—কি, যাবে না তুমি বীরেনের বিয়েতে!

গম্ভীর মুখে বলল অবনীশ, তোমরা ত আমায় নেমন্তন্ন কর নি?

– তুমি ছিলে না ব'লে আমরা বলতে পারি নি! আমাদের সে ত্রুটি তুমি মাপ কর অবনীশ। তোমার হাতে ধরে বলছি, তুমি চল। তোমার দেখা যখন পেলাম তখন না গেলে আমি ত ক্ষুণ্ণ হবই, বীরেন শুনলে ভারী দুঃখ পাবে মনে। চল ভাই, আমাদের সঙ্গে চল!

—কিন্তু...

—আর কিন্তু নয়! না গেলে বুঝব তুমি আমাদের

তুমি বিয়ে করবে না ত আমি করব

হেসে বলল, মাইরি! আমার যে বউ আছে! আবার বিয়ে!

মানস এবারে স্থান-কাল ভুলে চেঁচিয়ে উঠল, তুমি বিয়ে করবে না ত আমি করব!

—সত্যি, কি হবে!

হঠাৎ মানসের চীৎকারে কারা যেন থেমে গেল রাস্তার ওপরে। তার পরেই পড়ল চোখের ওপর কড়া তিন ব্যাটারীর টর্চ।

—চোর!

—ডাকাত!

কথার সঙ্গে সঙ্গেই ঝাঁপিয়ে পড়ে ছেলের দল ওদের ওপর। কিল, চড়, ঘুঁসি! কান্না, চীৎকার, গোঙানি সব মিলিয়ে এক সাংঘাতিক কাণ্ড!

—শালা ডাকাতের দল! মার শালাদের!

মারতে মারতে বড় রাস্তার ওপরে এনে ফেলেছে ওদের। ধুঁকছে তিনজনেই প্রচণ্ড মার খেয়ে। সমরেশের বাঁ-দিকের ভ্রূর ওপরে লেগেছে প্রচণ্ড ঘুঁষি। ভ্রূটা ফুলে বাঁ চোখটাকে ঢেকে ফেলেছে একেবারে। এক চোখ দিয়েই পিট পিট করে চাইছে সমরেশ।

—ভোঁ-ভোঁ। প্যাঁক্-প্যাঁক্! সার সার রিক্শ আসছে স্টেশন থেকে।

বিয়ে বাড়ীতে কান্নার বদলে শোনা যায় শাঁখ উলুধ্বনির শব্দ। আনন্দ উৎসবের মধুর কলরোল।

সামনের রিক্শটাই এসে থেমে গেল ভিড়ের সম্মুখে। ভিড়ের মুখেই সমরেশ! বোবা যন্ত্রণায় নিথর নিশ্চল।

হঠাৎ রিক্শ থেকে ছুটে নেমে এল বরবেশে বীরেন! দু'হাত দিয়ে সবেগে সমরেশকে জড়িয়ে ধরে বলল—মেজদা!

রবীন্দ্রনাথ ও বিশ্বদর্শন

(প্রথম পর্য্যায়—ভ্যাঙ্কুভার)

শ্রীসুধীর ব্রহ্ম

আন্তর্জাতীয় শিক্ষা মহাসম্মেলন ১৯২৯ সালে কানাডায় অনুষ্ঠিত হয়েছিল। ভারতের প্রতিনিধিরূপে রবীন্দ্রনাথ ৬ই এপ্রিল কানাডার ভিক্টোরিয়া নগরে উপস্থিত হলেন। সঙ্গে ছিলেন কবির সচিব শ্রীঅপূর্ব্বকুমার চন্দ। ঐ দিন প্রায় সকল সংবাদপত্রে রবীন্দ্রনাথের আগমন বার্ত্তা ঘোষিত হ'ল; যেমন, "উজ্জ্বল বিশুদ্ধ স্বাধীন চেতনার প্রতীক প্রাচী হইতে এই ভূখণ্ডে আগমন করিয়াছেন।" ঐ মহামণ্ডলীতে কানাডার গভর্ণর-জেনারেল লর্ড উইলিংডন ছিলেন সভাপতি, আর তাঁর পাশেই নির্দ্দিষ্ট হয়েছিল ভারতের প্রতিনিধি মহাকবির স্থান। পাশ্চাত্ত্য জগতের সম্মুখে তিনি সেদিন যে বাণী দিয়েছিলেন সে যেন শাশ্বত ভারতবর্ষেরই মন্ত্রবাণী: 'সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্' এরই একটি যুগোপযোগী মহাভাষ্য। পাশ্চাত্ত্য জ্ঞানী-গুণী ও বিদ্বজ্জনমণ্ডলীর কাছে পাশ্চাত্ত্য জীবন-আদর্শের কোথায় যে ত্রুটি এবং অপূর্ণতা সে কথাও উচ্চারণ করতে পরাঙ্মুখ হন নাই। ৭ই এপ্রিলের অপরাহ্নে কবি ভ্যাঙ্কুভারে দ্বিতীয় বক্তৃতা দিয়েছিলেন। বক্তৃতার নাম ছিল—সাহিত্যের মূল আদর্শ (দি প্রিন্সি-পল্‌স্ অব লিটারেচার); এপ্রিলের ১২ তারিখের 'ভ্যাঙ্কুভার ষ্টার' পত্রিকায় মিঃ নেয়েল রবিন্সন লিখেছেন :

ভারতবর্ষের দার্শনিক কবি ডক্টর রবীন্দ্রনাথ কদাচিৎ সংবাদপত্রের প্রতিনিধিদের সঙ্গে সাক্ষাৎ ও আলাপ-আলোচনা করে থাকেন। সুতরাং ভ্যাঙ্কুভারের এই সম্মানিত অতিথির সঙ্গে কিছুকাল কথাবার্ত্তার সুযোগ যখন পেলাম তখন সেটাকে অপ্রত্যাশিত সৌভাগ্য বলে মনে করলাম। বৃহস্পতিবার অপরাহ্নে ভ্যাঙ্কুভার হোটেলে তাঁর সঙ্গে দেখা হ'ল। এর আগে সোমবার অপরাহ্নে তাঁকে প্রকাশ্যভাবে বক্তৃতা দিতে দেখেছিলাম। সেই সময় তাঁর প্রত্যেক অঙ্গভঙ্গি ও কণ্ঠস্বরের সুমধুর গাম্ভীর্য্য বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয় হয়ে উঠেছিল। কিন্তু কাছে এসে লোকটির মধ্যে যে মহিমা ও সৌন্দর্য্যের সন্ধান মিলল, দূর হ'তে ঠিক তেমনটি বোঝা যায় নি। সেই দীর্ঘ উন্নত দেহ, শ্বেত শ্মশ্রু ও কেশপাশ, আয়ত নেত্র—কেবল ছবি দেখে যে তাদের পূর্ণ মাধুর্য্য উপলব্ধি করা যায়, এমন মনে হ'ল না।

আমি যখন কক্ষে প্রবেশ করি, কবি তখন একটি প্রশস্ত কেদারায় ব'সে ছিলেন; অঙ্গে আজানুলম্বিত ক্ষৌমবাস, হাত দুটি কোলের উপর ন্যস্ত। এই ভাবে তিনি বাতায়ন-পথে 'পয়েন্ট গ্রে'র উদ্দেশে তাকিয়ে ছিলেন। কবির পাশের আসনটিতে ব'সে পড়লাম; মিসেস মেরী রাইটার হ্যামিল্টন নানা বর্ণের খড়ি দিয়ে কবির প্রতিকৃতি আঁকছিলেন। ভাবলাম, ছবি দেখে মানুষটির কতটুকু পরিচয় পাওয়া যায়। এই ত সেদিন তাঁকে উচ্চ গম্ভীর কণ্ঠে জনমণ্ডলীর সমক্ষে অভিভাষণ পাঠ করতে শুনেছিলাম, কিন্তু সাধারণ কথাবার্ত্তার সময় কবি-কণ্ঠের যে মাধুর্য্য পরিচয় পাওয়া যায়, বক্তৃতার মধ্যে সেদিন ত সেটা পাই নি। কবি স্বচ্ছন্দ ভাবে ব'সে আছেন। কোথাও ত 'পোজ' দেবার চেষ্টা বা কৃত্রিমতা নেই! তিনি চমৎকার ইংরেজী বলতে পারেন। তাঁকে আমি কয়েকটি প্রশ্ন করায় তিনি যে উত্তরগুলি দিয়ে-ছিলেন, এখানে সেগুলি প্রকাশ করলাম।

প্রথমে হাস্য-পরিহাসের মধ্যে কথা সুরু হ'ল। ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দে কবি যখন যুক্তরাজ্যে বক্তৃতা দিয়ে ফিরছিলেন, সেই সময়ের কথা উঠল। রবীন্দ্রনাথ স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে বললেন, "সেবার এক ব্যক্তির হাতে এমনভাবে পড়ে-ছিলাম যে, আমার মধ্যে যা কিছু ছিল, সবই সে আদায় করে ছাড়ে। পরে সে বলেছিল, আমার ভ্রমণ সর্ব্বাংশে সফল হয়েছে, কিন্তু তার সে প্রশংসায় আমি যোগ দিতে পারি নি। যাহোক, ঐ ভাবে বক্তৃতা দেওয়ার ফলে একটা উপকার হয়েছিল। আমার বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য টাকার দরকার, বক্তৃতা করে সে অভাব অনেকটা মিটেছিল। তখন প্রায়ই আমি 'জাতীয়তা' সম্বন্ধে বক্তৃতা দিতাম এবং ঐ বিষয়টা সকলের মনঃপূত হ'ত না। আমার মনে হয়, তারা বাড়ী হ'তে সঙ্কল্প করে আসত যে আমার বক্তৃতা শুনে খুশী হবে না, কিন্তু শোনবার ত্রুটিও করত না। আমি পরে 'ব্যক্তিত্ব জগৎ' সম্বন্ধে বললাম—এই অভিভাষণগুলি পরে পুস্তকাকারে

বুদ্ধি-শক্তির সাহায্যে প্রকাশের একটা সাধ্য হওয়া প্রয়োজন। আর আশা করি, এই দু'য়ের মধ্যে একদিন সংযোগ স্থাপিত হবে।" সমস্যা এইখানেই। আমরা অনেকদিন হতেই বলে আসছি, "আমাদের বায়ুলোক জয় করতে হবে এবং আমরা তা করেছি। এখন ঠিক সেই ভাবেই যাতে নীতি-ধর্ম্ম জয় করতে পারি, সেই চেষ্টা করতে হবে।

আমার মনে হয়, দল বেঁধে বা প্রতিষ্ঠান গ'ড়ে মনুষ্যত্বকে এই অবস্থা হতে অব্যাহতি দেওয়া সম্ভব হবে না। চিরকাল ব্যক্তিই মনুষ্যত্বের উপকার করে আসছে। এই যে সভ্যতা হতে বিশেষ বিশেষ ব্যক্তির সৃষ্টি, কোন বড় প্রতিষ্ঠান একে সৃষ্টি করে নি। হয়ত এই সংস্কারের কাজ ইতিমধ্যেই সুরু হয়ে গেছে। ব্যক্তিগত ভাবে অনেকে প্রতিকারের চেষ্টা করছেন এবং সে সম্বন্ধে আমাদের কোন ধারণাই নেই। আমরা কিছু জানবার পূর্ব্বেই একদিন এই পরিবর্ত্তন সম্ভব হবে। একদিন পশ্চিম ডাকিনী-বিদ্যাকে অত্যন্ত বিশ্বাস করত; কিন্তু সে বিশ্বাস দূর করবার জন্য কোন প্রতিষ্ঠান বা দল গড়বার প্রয়োজন হয় নি। শিক্ষাবিস্তারের সঙ্গে এই বিশ্বাস একদিন শিথিল হয়ে এল এবং ক্রমশঃ একেবারেই বিলুপ্ত হয়ে গেল। ডার্বিনের চেষ্টার ফলে হঠাৎ এক রাত্রেই এক একটা বড় পরিবর্ত্তন ঘটতে দেখা গিয়েছে।"

এই সমস্ত কথা শুনতে শুনতে লীগ অব নেশানের কথা মনে পড়ল। সে সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের অভিমত জানতে চাইলাম। কবি বললেন, "যখন একটা বিশেষ উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য কোন যন্ত্র স্থাপনা করা যায়, তখন লোকে তার সাহায্যে নিজের স্বার্থসিদ্ধির চেষ্টাই করে বেশী। সেই ভাবেই, এই সঙ্ঘও যদি কোন দিন শক্তি লাভ করে, তবে সভাসদ্বর্গ সেটাকে এমন ভাবে ব্যবহার করবেন যদ্দারা তাঁদের ব্যক্তিগত লাভই হবে বেশী। এখন হতেই সে চেষ্টা অনেক শক্তিমান্ জাতি করছেন বলে মনে হয়। এই অসুবিধা দূর করতে হ'লে, সকলের মত নিয়ে একটি বিশেষ শক্তিমান্ সঙ্ঘ গ'ড়ে তোলা আবশ্যক।"

আমি ইতিহাসে বিশেষ অভিজ্ঞ নই; কিন্তু এইটুকু জানি যে, মানুষের অন্তরের মধ্যে একটা পরিবর্ত্তন এসেছে। মনে করে দেখুন, ঐ খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে টিউটন, স্ক্যাণ্ডিনেভিয়ানদের মত ধর্ম্মহীনদের প্রভাব কেমন করে এক মুহূর্ত্তেই নষ্ট হয়ে গেল। মানুষের একটা প্রধান স্বভাবই এই যে, "সর্ব্বদা সে অধিকতর সুখপ্রদ একটা কিছুর সন্ধান করতে থাকে এবং পেলেই তৎক্ষণাৎ তাহা পরিত্যাগ করতে দ্বিধা বোধ করে না।"

ভারতবর্ষের কথা জিজ্ঞাসা করলে রবীন্দ্রনাথ বললেন, "ভারতের অবস্থা বিশেষ সঙ্কটাপন্ন, এরূপ অবস্থা বোধ করি আর কোন দেশের নয়। বিশ্বের সমস্ত সমস্যাই যেন সংক্ষেপে সেখানে আত্মপ্রকাশ করেছে। এর একটা কারণ এই যে, আর কোন সভ্যদেশে এরূপ বিভিন্ন জাতি ও ধর্ম্মের প্রভাব নেই। সেখানে জাতীয় একতা সফল হ'তে এখনো অনেক দিন বিলম্ব হবে বলে মনে হয়। তবুও এই একতাসাধনই আমাদের কর্ত্তব্য। ইউরোপে মতভেদ থাকলে হয় সেটাকে জোর করে তুলে দেওয়া হয়, নতুবা একটি মত স্বীকার করতে বাধ্য করানো হয়। কিন্তু ভারতবর্ষে এই ভাবে সমস্যার সমাধান করা সম্ভব হয় না, হয় কেবল সমস্যার প্রকাশ করা। ভারতে তা চলে না। পৃথিবীর অন্যান্য জাতি যেদিন শান্তির উপায় খুঁজে পাবে, ভারতে সেদিন জাতীয় একতা সুপ্রতিষ্ঠিত হবে।"

বাঙ্গালী যখন যাযাবরের মত 'উদ্বাস্তু', বাঙ্গালী সমাজ, বাংলার সংস্কৃতি যখন বিপন্ন ও উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে পড়েছে, আজকের এই মুহূর্ত্তে রবীন্দ্রনাথের দেশ ভ্রমণের প্রতিটি পর্য্যায় আলোচনা করার বিশেষ সার্থকতা আছে। বিচিত্র তথ্য উদ্ঘাটন করে শত ঘটনার যোগে তাঁর বৃহৎ মানবিক রূপকে দেখানো এই যুগের যথার্থ ইতিহাস রচনা। অতীতের সেই ইতিহাস থেকে আজ আমাদের আলোক সঞ্চয় করতে হবে, কারণ কবি বিশ্বের যে সব মনীষীদের কাছ থেকে শ্রদ্ধার অর্ঘ্য পেয়েছিলেন, ভূ-পরিক্রমার নানা স্তরে তাঁদের সঙ্গে মিলিত হয়ে যে সব আলাপ-আলোচনা করেছিলেন, তার বর্ণনা কবি দেন নি, লিখতে কুণ্ঠিত হবেন বলে। তাই বোধ হয় কবির ব্যক্তিগত জীবনের বিশ্ববিস্তৃত রূপ তাঁর সাহিত্য সৃষ্টিতে পরিস্ফুট হয়ে উঠতে পারে নি। তাঁর লেখায় ভ্রমণকালীন ঘটনা বা ব্যক্তি-বিশেষের প্রসঙ্গ পাই না; আজ ভারত জুড়ে তাঁকে নিয়ে যে উৎসব আয়োজন চলছে, আমার এই আলোচনা সেই সময়ে হয়ত নেহাৎ অপ্রাসঙ্গিক হবে না।

হরতন

শ্রীবিমল মিত্র

মন্ত্রী কিন্তু সঙ্গে লোকজন বেশি আনেন নি। নিতাই বসাক এসে হৈ-চৈ বাধিয়ে দিয়েছিল। কোথাও কিছু নেই, আয়োজন-অনুষ্ঠানও কিছু তৈরি ছিল না। কোথায় মীটিং হবে, কোথায় থাকবেন মন্ত্রী তারও কিছু ব্যবস্থা ছিল না আগে থেকে। কেষ্টগঞ্জের লোকজন কেউই কিছু জানত না। রাতারাতি এমন একজন মান্যগণ্য লোক আসবেন তা কেউই ভাবতে পারে নি। খবরটা শুনে দুলাল সা' মশাইয়ের বাড়ীতে এসে হাজির সবাই।

এমন ঘটনা সচরাচর কখনও ঘটে না। আগেকার দিনে এস-ডি-ও সাহেব এলে পাইক-পেয়াদায় গ্রাম ছেয়ে যেত। পুলিস-সেপাই এসে ঘিরে ফেলত সব জায়গা। এমন ক'রে সভায় দাঁড়িয়ে বক্তৃতা করবার রেওয়াজও ছিল না। যখন কেষ্টগঞ্জে আগে আগে কংগ্রেসের মীটিং হয়েছে তখন পুলিসের ভয়ে কেউ সেদিকে যায় নি। যারা গেছে তারা পুলিসের লাঠি খেয়েছে। কিন্তু সে সব দিন বদলে গিয়েছে। এখন সব খদ্দরপরা লোক মন্ত্রী হয়েছে, লাট সাহেব হয়েছে, এখন আর কারও ভয় নেই। কেষ্টগঞ্জ ঝেঁটিয়ে লোক গিয়ে হাজির হয়েছে দুলাল সা'র বাড়ীর সামনের মাঠে। রেল স্টেশনেই ভিড় জমে গিয়েছিল মন্ত্রীমশাইকে দেখতে। সবাই ভেবেছিল, মন্ত্রীমশাই ট্রেনে চ'ড়ে আসবেন। কিন্তু না, ট্রেন এসে চ'লে গেল। ভোঁ ভাঁ, কেউ নামল না। একটা পুলিস-পেয়াদাও নামল না ট্রেন থেকে। নিতাই বসাকেরও টিকি দেখা গেল না।

হঠাৎ খবর শোনা গেল মন্ত্রীমশাই এসে গেছেন সা' মশাইয়ের বাড়ীতে।

কি ক'রে এলেন ?

কেউ জানে না কি ক'রে এলেন মন্ত্রীমশাই। নিতাই বসাক পাকা লোক। সোজা গাড়ি ক'রে একেবারে টেনে এনেছে কেষ্টগঞ্জে। কলকাতা থেকে নতুন পাকা রাস্তা হয়েছে। পিচ-ঢালা রাস্তা। আগে রাস্তাই ছিল না। নদী ছিল, নালা ছিল, ধানক্ষেত ছিল। তার ওপর দিয়েই গ্রাণ্ড্যাল হাই-ওয়ে তৈরি হয়েছে। আগে গরুর গাড়ি চলত, এখন পাঞ্জাবীদের বাস্ চলছে। হু হু ক'রে বাস চলে, একেবারে কেষ্টগঞ্জের দিকে চ'লে যায়। যারা গরুর গাড়ি চালাত তারা কাজকর্ম পায় না, পেলে পরের ক্ষেতে দিনমজুরি করে কিম্বা ব'সে থাকে।

কিন্তু দুলাল সা'র কেরামতি আছে বলতে হবে।

সেই অল্প সময়ের মধ্যেই বাড়ীর সামনে সামিয়ানা খাটিয়ে দিয়েছে। বাঁশ দিয়ে ঘিরে দিয়েছে জায়গাটা। খবরাখবর দিয়ে দিয়েছে চারদিকে। কারও গোলমাল করা চলবে না। কারও হৈ চৈ করা চলবে না। মন্ত্রী মশাইয়ের অনেক দয়া। হাজার কাজকর্ম ফেলে তিনি আসছেন কেষ্টগঞ্জে। কেষ্টগঞ্জের গ্রামবাসীদের দুঃখকষ্ট নিজের চোখে দেখবার জন্যে আসছেন। প্রায় দু'শ জন লোকের খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা ক'রে ফেলেছিলেন। ইংরিজী খাওয়ার ব্যবস্থাও ছিল, দিশী খাওয়ার ব্যবস্থাও ছিল। প্লেট ডিশ ছুরি-কাঁটা, কুশাসন কলাপাতা, চেয়ার টেবিল সব হাজির। একদিন, দু'দিন, যে ক'দিন থাকবেন তাঁরা সে-ক'দিনের যোগাড়যন্ত্র তৈরি।

কিন্তু দেখা গেল, পুলিশ মন্ত্রী হলে কি হবে, একেবারে একলাই এসে হাজির। খদ্দর-পরা চেহারা, নিতান্ত সাদাসিধে মানুষ। সঙ্গে একজন মাত্র সেক্রেটারি আর একজন আর্দালী। পুলিস পাহারাও সঙ্গে আনেন নি কাউকে। তা ছাড়া নিতাই বসাক একাই একশ। চরকী বাজির মত একাই দশদিকে পাক্ খেয়ে বেড়াতে লাগল। কালীপদ মুখুজ্জে মশাইকে আর কিছু ভাবতেই হ'ল না। মেঘ না-চাইতেই জল এসে হাজির হয়। পান চা তামাকের ছড়াছড়ি চারিদিকে। ধমক দিয়ে পুলিস সবাইকে তাড়িয়ে দেয়। বলে, এদিকে কেউ এস না ভাই, মন্ত্রীমশাই-এর শরীর খারাপ—

হলধর বললে, আজ্ঞে, একবার শুধু চরণ-দর্শন করব হুজুরের—

সারাদিন কেউ আর দর্শন পেলে না। সদরের এস-ডি-ও সাহেব, পুলিস-সুপার, সবাই একে একে গাড়ি ক'রে এলেন আর গাড়ি থেকে নেমে ভেতরে দেখা করতে গেলেন মন্ত্রীর সঙ্গে। দুলাল সা'র বাড়ীর সদরে পুলিস-পাহারা ব'সে গেল রীতিমত। কেষ্টগঞ্জের লোকজন

তটস্থ হয়ে দেখতে লাগল দরজার সামনে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে। এই ক'দিন আগেই পৈপুলবেড়ের বাগানে খুন-জখম হয়ে গেছে, তাই নিয়েও জল্পনা-কল্পনা চলতে লাগল। আসলে দোষটা যে নিবারণের তা সাব্যস্ত হতে আর দেরি হ'ল না।

মুকুন্দ বললে, সেই সব পরামর্শই হচ্ছে বোধ হয় ভেতরে—

বাইরের মাঠের ওপর দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে জটলা হচ্ছিল। বিকেলবেলাই মীটিং হবে। বাঁশ দিয়ে ম্যারাপ বাঁধান হয়েছে। ভেতরে খাওয়া-দাওয়ারও আয়োজন হচ্ছে। গন্ধ আসছিল সকলের নাকে।

হঠাৎ বি-ডি-ও সুকান্ত সস্ত্রীক এসে দাঁড়াল জীপ গাড়িতে চ'ড়ে। গাড়ি থেকে নেমে দু'জনে ভেতরে ঢুকতে যাচ্ছেন, পুলিস বাধা দিলে। বললে, নেহি হুজুর—

সুকান্ত বললে, আমি নিতাই বসাকবাবুর সঙ্গে দেখা করতে এসেছি—

—ও আমরা জানি না হুজুর—

সুকান্ত যেন কেমন মুষড়ে পড়ল। যেন নিজের মনেই বললে, এ ত মহা জ্বালা হ'ল দেখছি! ওহে বাপু, আমি এখানকার ব্লক-ডেভেলপমেন্ট-অফিসার।

তবু কিছুতেই তারা যেতে দিতে রাজি নয়।

হলধর কাছে ছিল, বললে, এখনও দেখছি ইংরেজ রাজত্ব চলছে বাবা—স্বদেশী যুগেও কড়াকড়ি—

সবাই ভেবেছিল বাঙালী মন্ত্রী, বাঙালীদের রাজ, সকলেরই অবাধ গতি হবে। ইংরেজ রাজত্বেও যা ছিল, এখনও তাই। কোনও ফারাক হয় নি এখনও। এখনও মন্ত্রীর সঙ্গে পুলিস ঘোরে। অথচ একদিন এই কংগ্রেসেরই খদ্দর-পরা কত লোক এসে গ্রামে-গ্রামে ঘুরেছে, জেলে-চাষা-মালোদের বাড়ির দাওয়ায় বসে কাঁসিতে ক'রে মুড়ি খেয়েছে, সুখ-দুঃখের কথা বলেছে। পায়ে হেঁটে-হেঁটে বাদা-বন চষে বেড়িয়েছে। তখন দুলাল সা' ছিল না। তখন দুলাল সা'র এমন অবস্থা ছিল না। এই এমন বাড়ীও হয় নি। সেই তারাই এখন মটর-গাড়ি না হ'লে চলতে-ফিরতে পারে না। তাদের সঙ্গে দেখা করতে গেলেই এখন পুলিসের কাছে গলা-ধাক্কা খেতে হয়।

কিন্তু সুকান্তকে আর ফিরে যেতে হ'ল না। নিতাই বসাক হন্ত-দন্ত হয়ে বাইরের দিকে আসছিল। বড় ব্যস্ত মানুষ আজ নিতাই বসাক। একা তার ঘাড়েই আজ মন্ত্রী-অভ্যর্থনার সব ভার। সুকান্তকে সস্ত্রীক বাইরে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে এগিয়ে এল।

বললে, আরে, আরে, আপনারা বাইরে দাঁড়িয়ে আছেন কেন, ভেতরে আসুন—

সুকান্ত যেন অকূলে কূল পেলে। পুলিসের সামনে দিয়েই ভেতরে ঢুকল। জিজ্ঞেস করলে, কালীপদবাবু এসে গেছেন নাকি?

—হ্যাঁ হ্যাঁ অনেকক্ষণ! সব বলে-কয়ে রেখেছি, কোনও ভাবনা নেই আপনার—

—এখন কে-কে আছে সঙ্গে?

নিতাই বসাক বললে, কেউ থাকলেই বা, আপনার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেব। দেখবেন, লোক খুব চমৎকার, ভারি অমায়িক লোক। আপনার কিছু ভাবনা নেই—

সুকান্ত বললে, আপনার বাহাদুরি আছে নিতাই-বাবু। সত্যি, আপনি একেবারে মিনিষ্টারকে সশরীরে এনে হাজির করলেন!

—শুধু পুলিস-মিনিষ্টার কেন? চীফ-মিনিষ্টারকে পর্য্যন্ত ধ'রে আনতে পারি, কংগ্রেসের ফাণ্ডে কত টাকা চাঁদা দিয়েছি তা জানেন?

সুকান্ত রায় আর সুকান্ত রায়ের স্ত্রীকে নিয়ে নিতাই বসাক একেবারে হন্ হন্ ক'রে ঘরের ভেতরে ঢুকে পড়ল।

জুট-মিলের ভেতরে তখন কাজ-কর্ম বন্ধ। ছুটির দিন। কিন্তু গেট খোলা। হাওড়া অঞ্চলের এদিকটা কেবল পাশাপাশি সার সার কলের চিম্‌নি। ওপাশে গঙ্গা। হঠাৎ বলা-নেই কওয়া-নেই এক-একবার জাহাজের ভোঁ বেজে ওঠে আর এ-পাড়া ও-পাড়ায় তার প্রতিধ্বনি ভেসে বেড়ায়। গেটের সামনে তেলেভাজার দোকান কয়েকটা ব'সে গেছে। সন্ধ্যে হয়ে গেছে। দলে দলে লোক ঢুকছে বেরোচ্ছে। জুট-মিলের কুলি-কামিনরা সেজে-গুজে যাত্রা শুনতে এসেছে ভেতরে। দু'দিন ধ'রে যাত্রা হচ্ছে। বিশ্বকর্ম্মা পুজোর সময় যাত্রাওয়ালাদের পাওয়া যায় নি সময় মত। পরের শনিবার আর রবিবার দুটো পালা ক'রে তবে ছুটি পাবে 'শ্রীমানী অপেরা'র দল।

আগের দিন হয়ে গেছে 'পতিতের ভগবান্', আজ রবিবার, আজ হচ্ছে 'অকূলের কাণ্ডারী'।

'অকূলের কাণ্ডারী'র একটা অঙ্ক হয়ে গেছে তখন। প্রথম অঙ্কের পর সাজঘর থেকে ঢং ক'রে ঘণ্টা প'ড়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে কন্‌সার্ট-পার্টি গৎ ধরেছে। সুর বেহাগ। সন্ধ্যের দিকে বেহাগটা জমে ভাল। ঘুরে-ফিরে দু'বার

শব্‌ বাজানো হয়ে গেছে। সাজঘর থেকে যখন আবার ঘণ্টার শব্দ শোনা যাবে তখন কন্‌সার্ট থামবে। চণ্ডী-বাবুর দলে এই-ই নিয়ম।

এর পরে দ্বিতীয় অঙ্কের প্রথম দৃশ্যেই সখীর দল এসে গান ধরবে মিশ্র-খাম্বাজে। সে-সুরও সাধা আছে। গান ধরবে—

পবনের পাক্সী চ'ড়ে স্বর্গে যাব
হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ—

আর তার পরই গান শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গেই আসরে আসবে রাণী রূপকুমারী। একলা আসবে। এসেই লম্বা প্যাকটিং।

রাণী রূপকুমারীর পার্টটাই 'অকূলের কাণ্ডারী'র প্রধান আকর্ষণ। এ-পার্টটা বরাবর করত অঞ্জনা। অঞ্জনা এই রাণী রূপকুমারীর পার্ট ক'রেই বাঁকুড়ায় সোনার মেডেল পেয়েছিল। আমাদের চা-বাগানের দিকে চণ্ডীবাবুর দলের একচেটিয়া কল্‌। সেই আশ্বিন মাস থেকে সেই যে চণ্ডীবাবু 'শ্রীমানী অপেরা'র দল নিয়ে ঘুরতে বেরোন, কোড়ভাই, ডুয়ার্স, তেজপুর, গৌহাটি হ'য়ে চ'লে যান কুচবিহারের দিকে। কলকাতায় ফেরেন গাজনের চড়ক শেষ ক'রে। ফিরতে ফিরতে বোশেখ কাটি হয়ে যায়। তারপর হাওড়ায় শিবপুর-সালকের দিকে কল্‌ পড়ে বিশ্বকর্মা পুজোর সময়। তারপর থেকে দু'মাস আবার আপার চিৎপুরের দোতলার অফিসে ব'সে ব'সে দলের লোকদের মাইনে গোনা ভাদ্র মাসের শেষ পর্যন্ত। না একটা পয়সার আমদানী, না একটা কিছু।

আসলে 'শ্রীমানী অপেরা'র নাম-ডাক যা-কিছু ওই অঞ্জনার জন্যেই। ওই অঞ্জনার জন্যেই হুমড়ি খেয়ে ব'সে থাকে চা-বাগানের ছেলে-ছোকরারা। কোলিয়ারীর বুড়ো-বুড়ো সাহেবরা পর্যন্ত অঞ্জনাকে দেখে অজ্ঞান। চণ্ডীবাবু নিজে বুড়োমানুষ হলে কী হবে, রসজ্ঞান আছে। অঞ্জনা আসরে নামবার আগে চণ্ডীবাবুকে প্রণাম ক'রে তবে যায়। চণ্ডীবাবু দেখেন চেয়ে। আপাদমস্তক চেয়ে দেখেন খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে। কখনও পেছন ফিরতে বলেন, কখনও পাশ ফিরতে বলেন। ভাল ক'রে দেখে-শুনে নিয়ে তবে আসরে ছেড়ে দেন।

কখনও বলেন, এ কি? এটা কী হ'ল?

তারপর ডাকেন—নিকুঞ্জ, এটা কী করেছ?

নিকুঞ্জ মেক-আপ্‌ দেখা-শোনা করে, আসলে নিকুঞ্জ মেক্‌ আপ্‌ম্যানদের হেড্‌।

চণ্ডীবাবু বলেন, এটা কী করেছ? আমি যদি না দেখতে পেতাম? এই ঝুমকো দুলটা পরিয়ে দিয়েছ অঞ্জনার কানে? ঝুমকো দুল এখন চলে? কেন, সেই কানপাশা জোড়া কী হ'ল?

নিকুঞ্জ মাথা চুলকিয়ে বলে, আজ্ঞে ভারি ব'লে অঞ্জনা পরতে চাইছে না—

—ভারি? কানপাশা ভারি?

অঞ্জনা বলে, না বাবা, আমার কানে লাগে বড্ড—

—কানপাশা লাগে? লাগে কেন?

—কান কেটে হ্যাঁকা হয়ে গেছে।

চণ্ডীবাবু রেগে যান—এই ত তোমার দোষ মা, লাগে তা আগে বলতে হয়, ডাক্তার-ওষুধের ব্যবস্থা করতাম আমি, এখন এই ঝুমকো প'রে নামবে, যদি সাহেবদের ভাল না লাগে, তখন?

অঞ্জনা বলে, কেন, আমাকে ত বেশ দেখাচ্ছে!

—আর এই ঢিলে ব্লাউজটা পরলে কেন শুনি? বডি ফিট্ করে নি ত! এ ত মহা মুশ্‌কিলে ফেললে দেখছি। আমি যে-দিকে দেখব না সেদিকেই চিত্তির! পয়সা যে দেবে আমাকে তা কী দেখে দেবে শুনি? পয়সা কি চা-বাগানে অত সস্তা? পয়সা কি খোলামকুচি?

তারপর নিকুঞ্জর দিকে ফিরে বলেন, না, এ চলবে না, আমি যদ্দিন আছি এ-সব চলবে না। সাজাও, ভাল ক'রে সাজিয়ে দাও, যাও—তোমাদের এইরকম কাজ হলেই 'শ্রীমানী অপেরা' কোন্‌দিন পটল তুলবে। যাও, দাঁড়িয়ে দেখছ কী, তাড়াতাড়ি কর—

তা কথাটা মিথ্যে নয়। মেয়েটার রূপ আছে, গুণ আছে, ভাবন্ আছে, সব আছে, কিসে লোকের মন ভোলে সেইটেই শেখে নি এখনও। আরে বাপু, পয়সা কি অমনি-অমনি দেয় আমাকে? রস পায় ব'লেই পয়সা দেয়! রস আবার পাওয়াতেও জানা চাই। চোখটা কেমন ক'রে ঘোরালে লোকের মাথা ঘুরে যায়, কোমরটা কেমন ক'রে বেঁকালে লোকের চোখ কপালে ওঠে তারও বিদ্যে আছে। এ-লাইনে সেই বিদ্যেটা না জানলে ঢুঁ-ঢুঁ। তা ছাড়া এই শাড়ীর কথাই ধর না কেন! শাড়ীটা পরার মধ্যেও বিদ্যে আছে। ও বিদ্যেটুকু না জানলে হাজার টাকার শাড়ী পরলেও কেউ ফিরে দেখবে না। ওই পাঁচ টাকা দামের কন্ট্রোলের শাড়ীও তোমাকে এমন ক'রে পরিয়ে দেব যে, লোকে তোমার পায়ে মাথা রেখে গড়াগড়ি দেবে। ওরই নাম হ'ল আর্ট। ওই ক'রেই ত থিয়েটারওয়ালারা আমাদের ব্যবসা মেরেছে।

—এইবার?

অঞ্জনা আবার এসে দাঁড়াল কাছে।

চণ্ডীবাবু এবার ভাল ক'রে দেখলেন। বললেন, বাঃ, এই ত, এই ত ঠিক হয়েছে—

ওদিকে তখন আসরের মধ্যে সখীর দলের গান শেষ হয়ে আসে আসে। পবনের পাক্ষী চ'ড়ে আকাশে উড়ে যাবার সময় হয়ে এসেছে। দূরের সাজঘর থেকে রাণী রূপকুমারী পার্ট বলতে বলতে ঢুকছে—

কোথা যাব, কোথা যাব অবলা রমণী,

কে আছে আমার!

কার কাছে মাগিব আশ্রয়, বল অন্তর্যামী...

সাজঘরের মধ্যে ব'সে চণ্ডীবাবু বলেন পয়সা বললেই ত আর পয়সা আসে না রে, মুখ দেখে কেউ দেয়? পয়সা আমায় করতে হয়—

এই অঞ্চলকে কোনদিন চণ্ডীবাবু নিজের হাতে শিখিয়েছেন, নিজের হাতে তালিম দিয়েছেন। এখন সেই তালিমের ফল ফলছে। সাহেব-সুবোরা যখন ছিল তখন আরও পাকা দিয়েছে তারা। তোরা ফুর্তি করতে জানিস, ফুর্তির জন্যে পয়সা খরচ করবার দিল ছিল তাদের। তারপর পাকিস্তান হ'ল আর 'সিরাজী অপেরা' নামে চালাতে শুরু করল। এখনও 'সিরাজী অপেরা' চলছে। কিন্তু সে টিম্ টিম্ ক'রে চলা। তেমন জলুস নেই দলে।

চণ্ডীবাবু বলেন, আরে দূর দূর, তোরা আর সে-সব দিন দেখলি কোথায়? ফরিদপুরের চৌধুরীদের বাড়ী জগদ্ধাত্রী পুজোর সময় গেলাম, আমার জন্য মা জননীর গহনের উদ্ধারী ছিল বাঁধা!

তারপর তামা হুঁকোর ধোঁয়া টানতে টানতে বলেন, এই ফকরে, তোর সেই কই মাছের কথা মনে আছে?

ফকির ব'সে ছিল মাটিতে। চণ্ডীবাবুর খাস চাকর। বললে, খুব মনে আছে কর্তা, কই মাছ খেয়ে আমার কলেরা হয়ে গেল...

—তুই বেটা পেটুকের সর্দার। খেলি ত খেলি একেবারে ডেড়া'শটা কই মাছ খেয়ে ফেলতে হয়? একটু বুঝে-শুনে খাবি ত!

হঠাৎ বাইরে যেন কার গলা শোনা গেল।

—কে? কে এল রে ওখানে?

চারদিকে হৈ-চৈ। লম্বা এক ফালি সাজঘর। বাইরে থেকে কে একজন ভেতরে এসে ঢুকল। চণ্ডীবাবু ঠাহর ক'রে দেখলেন। বললেন, কে তুমি? কী চাও গো?

লোকটা বললে, আজ্ঞে, একজন বাবু এসেছেন—

যাত্রাদলের সাজঘরে এ-রকম বাবু মাঝে-মাঝে এসে থাকে। চণ্ডীবাবু জানেন সে-কথা। জোড়হাটে একবার অঞ্জনার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল। বলা-নেই কওয়া-নেই পঞ্চাশটা টাকা গুঁজে দিয়েছিল চণ্ডীবাবুর হাতে। বলেছিল, রাণী রূপকুমারীকে পান খেতে দেবেন এটা—

চণ্ডীবাবু বললেন, তা বাবু এসেছে ত এখানে কী? এটা কি বাড়ী না ধর্মশালা? দেখা করতে গেলে আমার আপিসে দেখা করুক গে, আমার চিৎপুরে আপিস আছে আমার সেখানে—

—আজ্ঞে না, কাউকে খুঁজে পাচ্ছেন না সেখেনে, সবাই যাত্রা শুনতে গেছে দরজায় তালা-চাবি দিয়ে—

—তা যাত্রা শুনবে না? 'সিরাজী অপেরা'র যাত্রা হচ্ছে আর লোক নাকে সরষের তেল দিয়ে ঘুমোবে বলতে চাও?

কথা শেষ হতে-না-হতে একজন বুড়ো অথর্ব মানুষ ঘরে ঢুকল। মাথায় গলায় চাদর মুড়ি দেওয়া দেখে মনে হয়, যেন অনেক দূর থেকে আসার পরিশ্রমে কাতর হয়ে পড়েছে।

—এই, ইনিই এসেছেন।

চণ্ডীবাবুর মুখখানা কুঁচ্‌কে মুহূর্তের মধ্যে বদলে গেল।

—মশাই-এর কোত্থেকে আসা হচ্ছে?

বুড়ো ভদ্রলোক বললে, আজ্ঞে, আমি আসছি কেষ্ট-গঞ্জ থেকে—

কোন কেষ্টগঞ্জ? কেষ্টগঞ্জ ত তিনটে আছে: ফরিদ-পুরের কেষ্টগঞ্জ, না নদীয়ার কেষ্টগঞ্জ, না পাবনা জেলার কেষ্টগঞ্জ? কোনটা?

—আজ্ঞে আমার বাড়ী নদীয়া জেলায়। আমাদের বিখ্যাত ভট্টাচার্য্য বংশ, আমি ঈশ্বর কেদারেশ্বর ভট্টাচার্য্যের সন্তান, আমার নাম কাশীশ্বর ভট্টাচার্য্য—

চণ্ডীবাবু বেঞ্চির ওপর জায়গা ক'রে দিয়ে স'রে বসলেন। বললেন, বসতে আজ্ঞে হোক। ফকরে, তামাক দে ভট্টাচার্য্যি মশাইকে—তা ক'দিন পালা হবে?

ভদ্রলোক বুঝতে পারলেন না। বললেন, আজ্ঞে পালা-টালা কিছুই নয়, আমি কলকাতায় এসেছি একটা বিশেষ কাজে,—

—মামলা-মোকদ্দমা?

—আজ্ঞে না!

—তবে?

আমি আমার গ্রামবাসী এক প্রজার খোঁজে এসেছিলাম, তার ছেলে এখানে এই জুট-মিলে কাজ করে। তা এসে দেখলাম, যাত্রা চলছে, বাড়ীতে তার খুঁজে পাচ্ছি নে, তাই এখেনে আলো জ্বলছে দেখে ঢুকে পড়লাম—

চণ্ডীবাবু বললেন, আজ্ঞে, আপনিও যেমন আমিও তাই, নতুন মানুষ, পালা-গান করে বেড়াই দল-বল নিয়ে, আজ আছি কলকাতায়, কালই হয়ত চ'লে যা'ব জোড়-হাটে, আবার পরশু হয়ত চ'লে যাব বাঁকুড়ায়। আমরা হলুম উড়ো-পাখী, যখন যেখানে থাকি সেইটেই আমার দেশ—

ফকুরে তামাক দিয়েছিল।

কর্তামশাই বাধা দিলেন। বললেন, থাক, এখন তামাক খাবার বাসনা নেই—খাওয়া-দাওয়া হয় নি সারাদিন, কখনও ত আসি নি হাওড়ার দিকে, জায়গাটা খুঁজতে খুঁজতে বেলা পুইয়ে এল —

—তা আসরে খবর পাঠাব?

—তা দয়া ক'রে যদি পাঠান ত কৃতার্থ হই—

—নামটা কী বলুন?

—কেষ্টগঞ্জের বসন্ত মালোর ছেলে সত্য মালো, সেই সত্য মালোকেই আমার চাই, তার ছেলে এই দলে কাজ করে—

চণ্ডীবাবু বললেন, আপনি বসুন এখানে আয়েস ক'রে, তামাক না খান চা খান—

—আজ্ঞে চা-ও আমি খাই নে।

—তা হ'লে আর আপনাকে আপ্যায়ন করি কী ক'রে বলুন। আপনি বসুন, এই অঙ্কটা শেষ হলেই আসরে গিয়ে খোঁজ করতে বলছি। আপনি বৃদ্ধ মানুষ, অত দূর থেকে এসে শুধু শুধু ফিরে যাবেন?

ব'লে চণ্ডীবাবু হাতের হুঁকোটা নামিয়ে ফকুরের হাতে দিলেন।

বললেন, আপনার কিছু ভাবনা নেই, যাবে কোথায় আপনার লোক, 'শ্রীমানী অপেরা'র যাত্রা ফেলে কেউ কি আর অন্য কোথাও যেতে পারে? আর যদি বলেন ত আসরে গিয়েও বসতে পারেন, যাবেন? যাত্রা শুনবেন?

কর্তামশাই বললেন—না থাক, যাত্রা শোনবার মত মানসিক অবস্থা আমার নয় এখন— ক্রমশ:

—•—

ঐতিহ্য ও আধুনিকতার সন্ধিস্থলে বুদ্ধিজীবী : ভারতীয় পরিস্থিতি

শ্রীসুধীর রায় চৌধুরী

আমরা খুঁজেছি বিলেতি বইতে আপন দেশ,
বার বার তাই দেশের মানুষ ডাইনে বাঁয়ে
ঘুরিয়েছি আর হয়রান হয়ে খুঁজেছি শেষ।
আমরা খুঁজেছি হরেক বইতে আপন দেশ,
থেকে থেকে বই হারিয়েছে, মোড়ে নিরুদ্দেশ,
ভাবছি এবার ফিরবো মোড়ল সে কোন্ গাঁয়ে?
(বিষ্ণু দে)

সব দেশের বুদ্ধিজীবীরাই ঐতিহ্য ও আধুনিকতার মাঝখানে অল্প-বিস্তর সংশয়গ্রস্ত। তার ওপর ঐতিহাসিক কারণে ভারতীয় পরিস্থিতি একটু স্বতন্ত্র। একদিকে ইয়ং বেঙ্গল উগ্রতা এবং অন্যদিকে সনাতন হিন্দুয়ানির প্রতি আন্তরিক নিষ্ঠা—এর দোটানায় গত শতকের অনেকেই দ্বিধান্বিত। এখনও অনেক ইংরেজ যেমন আক্ষেপ করেন যে, ইংরেজি শিক্ষার প্রসারই ভারতবর্ষে ব্রিটিশ শাসনের কাল হ'ল; তেমনি আবার কিছু কিছু শিক্ষিত ভারতীয় অভিযোগ করে থাকেন যে, দেশ স্বাধীন হবার পর থেকে আমাদের পাশ্চাত্য সংস্কৃতি-প্রীতি ক্রমবর্দ্ধমান। মোটের ওপর সব মিলিয়ে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাসের পটভূমিতে ভারতীয় বুদ্ধিজীবীদের আলোচনা বিশেষ কৌতূহলোদ্দীপক। আমাদের অত্যন্ত শ্লাঘার বিষয় যে, শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বনামধন্য সমাজতাত্ত্বিক এডোয়ার্ড শীল্‌স্ ভারতীয় বুদ্ধিজীবীদের নিয়ে গবেষণার জন্য এদেশে আগমন করেন। এ সম্পর্কে তাঁর বৃহৎ আলোচনা গ্রন্থ "The Indian Intellectual" শীগগিরই প্রকাশিত হবে—তবে ইতিমধ্যে "The Intellectual Between Tradition and Modernity : the Indian Situation" নামে একটি সংক্ষিপ্ত প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছে। আমরা প্রধানত উক্ত পুস্তিকাকে কেন্দ্র করেই আলোচনা করব।

ভারতীয় শিক্ষিত সমাজ বিষয়ে আমেরিকান সমাজতাত্ত্বিকদের আগ্রহ নতুন নয়। কয়েক বছর আগে জে. এবং আর. ইউসীম যুগ্মভাবে প্রকাশ করেছিলেন, "The Western Educated Man in India" গ্রন্থটি। নানা কারণে বইটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য হলেও তাঁদের এই বীক্ষণ বা সার্ভে সমগ্র দেশের পটভূমিতে হয় নি—তাঁরা আলোচনার উপকরণ এবং উপাদানের জন্য

অবিভক্ত বোম্বাই রাজ্যেই সীমাবদ্ধ ছিলেন। শীল্স্ অবশ্য অনেক বেশি উচ্চাভিলাষী। সমগ্র ভারতবর্ষের প্রেক্ষিতে তিনি ভারতীয় বুদ্ধিজীবীদের প্রসঙ্গে লিখেছেন। তাঁর মূল আলোচনাটি ছয়টি অধ্যায়ে বিভক্ত এবং "ভারতীয় বুদ্ধিজীবীর ভবিষ্যৎ" (The Prospects of the Indian Intellectual) নামে একটি পরিশিষ্ট সংযোজিত হয়েছে। তাঁর বিভিন্ন অধ্যায়ের শিরোনামার মধ্যে আলোচনা পদ্ধতির একটি নির্দেশ পাওয়া যাবে : বুদ্ধিজীবী শ্রেণীর পরিধি ; ভারতীয় বুদ্ধিজীবীর জীবিকা ; ভারতীয় বুদ্ধিজীবীর আর্থনীতিক পরিস্থিতি ; ভারতীয় বুদ্ধিজীবী ও প্রতিষ্ঠানিক রূপ ; ভারতীয় বুদ্ধিজীবীর সংস্কৃতি ; ভারতীয় বুদ্ধিজীবীর নাগরিক জীবন।* এ ছাড়া পরিশিষ্টও আছেই।

শীল্স আধুনিক ভারতীয় বুদ্ধিজীবীদের নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে তাঁদের উৎস-সন্ধান করেছেন। তাঁরা যে একেবারে অমূল তরু নন, পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রসারের পূর্বেও ভারতবর্ষে যে বুদ্ধির চর্চা ছিল, সেকথা শীল্স্ বিশেষ ভাবে উল্লেখ করেছেন। ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির অপ্রতিহত প্রভাবের কথা তাঁর সবিশেষ আলোচ্য। তাঁর মতে শুধু প্রাচীন যুগে নয়, নবীন যুগেও শিক্ষা সংস্কৃতির ব্যাপারে ব্রাহ্মণেরাই অগ্রণী। এদেশে ইংরেজি শিক্ষার পথিকৃৎ রামমোহন প্রমুখ জাতিতে ব্রাহ্মণ ছিলেন। শুধু রামমোহন কেন, শীল্সের মতে, উনিশ শতকের নব জাগরণের অধিকাংশ প্রধান ব্যক্তিই জাতিতে ব্রাহ্মণ। মাদ্রাজী, মারাঠি, বাঙ্গালী ব্রাহ্মণেরা শিক্ষা, সমাজসংস্কার, সাহিত্য ইত্যাদি সব ব্যাপারেই প্রগতির পথিকৃৎ। শীল্সের মতে,

"The Indian intellectual is the heir of the Brahmins, he is the successor of the Sastris and the Pandits."

অন্যত্র তিনি বিস্ময়ের সঙ্গে লক্ষ্য করেছেন যে,—

"No other country can quite match this picture of a continuing intellectual tradition carried so long by a single section of the population."

উক্ত মন্তব্যগুলি থেকে মনে হওয়া স্বাভাবিক যে, শীল্স্ ভারতীয় ঐতিহ্যের সঙ্গে অন্তরঙ্গভাবে পরিচিত এবং ভারতীয়দের জীবনযাত্রার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ। কিন্তু পুরো গ্রন্থটি পড়বার পর হতাশ হতে হয়। আসলে তাঁর উন্নাসিকতাকে তিনি গোপন রাখতে চেয়েছেন পিঠ চাপড়ানো ভঙ্গিতে, কিন্তু সেটা প্রায়ই চাপা থাকে নি। সেজন্য এ জাতীয় উক্তি প্রায়ই উক্ত প্রতিবেদনে ঘুরে-ফিরে লক্ষ্য করা যায় যে, "The sad fact is that India is not an intellectually independent country (পৃ: ৭৮)." ভারতীয় বুদ্ধিজীবীরা নাকি এমন হীনমন্যতায় ভোগেন যে, তাঁরা বিলাতি ছাপ দেওয়া যে কোন পত্র বা পত্রিকা দেখলে গোগ্রাসে গেলবার চেষ্টা করেন। অন্য পরে বা কথা। যে ব্রাহ্মণ শ্রেণীর প্রতি তিনি প্রশংসায় পঞ্চমুখ, তাঁদের সম্পর্কেও তাঁর আসল মনোভাব প্রকাশিত হতে দেরি হয় না। ব্রাহ্মণদের মধ্যে অনেকে মার্কসবাদের অনুরাগী। এর কারণ কি? শীল্স্ গম্ভীর হয়ে বলেছেন,

"Marxism appeals to Brahmin intellectuals because it derogates the trading classes and denies their usefulness. It permits intellectuals who feel derogated to envisage a society in which their own ideas as to the good life will prevail."

তাই শীল্স্ আরও লক্ষ্য করেছেন যে, ভারতীয় বুদ্ধিজীবীরা সোভিয়েট ইউনিয়নকে ভারতবর্ষের আদর্শ মনে করলেও প্রথমোক্ত দেশ সম্পর্কে কেউই কোন বইয়ের মাধ্যমে খোঁজ-খবর রাখে না, এ সম্পর্কে রীতিমত গবেষণা ত দূরের কথা। মার্কসবাদ অথবা সোভিয়েট ইউনিয়ন সম্পর্কেও ব্রিটিশ চিন্তাবিদ্‌দের রচনা তাঁদের কাছে বেদমন্ত্রস্বরূপ।

আধুনিক বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে বর্ণাশ্রমের স্বভাবজ প্রভাব তিনি লক্ষ্য করেছেন। সেজন্য এই বিশ শতকের শেষার্ধেও নাকি এক বর্ণের বন্ধু আরেক বর্ণের বন্ধুকে বাড়ীতে আহারে নিমন্ত্রণ করতে ভরসা পান না। শীল্সের মতে ভারতীয় বুদ্ধিজীবীরা বাড়ীতে পরিবার-পরিজনের সঙ্গে শুধু যে মাতৃভাষা ছাড়া অন্য ভাষাতেই কথা বলেন না তা নয়—

"It is unusual for him to bring friends of

---

*The Dimensions of an Intellectual class : the Vocation of the Indian Intellectual ; the Economic situation of the Indian Intellectual ; the Institutional system of Indian Intellectual life ; the Culture of the Indian Intellectual ; the Civil life of the Indian Intellectual ; Epilogue : The Prospects of the Indian Intellectual.

another caste home for a meal. Many who have few or no conscious desires to maintain caste barriers and who are proud of the intercaste nature of some of their friendships, would not think of inviting a person from another caste to take food with them at home 'because it would cause distress to my women folk'."

এ জাতীয় সামান্যীকরণ হামেশাই চোখে পড়ে। রাজনৈতিক আন্দোলন এবং ভারতীয় বুদ্ধিজীবী প্রসঙ্গে জোড়াতাড়া শীল্‌সের মতামতও সবিশেষ উপভোগ্য। তাঁর গৃহীত সাক্ষাৎকারের মধ্যে বিপ্লবীদের আন্দোলনের কয়েকজন কর্মী ছিলেন। তাঁদের সঙ্গে কথাবার্তা করে শীল্‌স নিঃসন্দেহ হয়েছেন, তাঁদের ছাত্রজীবনের ঐ বিদ্রোহ আন্দোলন আসলে কিছুই নয়, "It was an adolescent revolt against the world of adults." (পৃঃ ৯৮।) অর্থাৎ ইস্কুলে থাকলে পড়াশোনা করতে হয়, নিয়ম-শৃঙ্খলা মানতে হয়, শিক্ষকদের বাধ্য থাকতে হয় সুতরাং এসব বিধি-নিষেধের বিরুদ্ধে চাপা বিদ্রোহ প্রকাশ করবার ওটা একটা ছল। এর পরেই শীল্‌স পাদটীকায় জনৈক "বুদ্ধিমান মনীষীর" মত উল্লেখ করেছেন, যাঁর মতে "Communism is an alternative to juvenile delinquency." (পৃঃ ৯৮।) এ থেকে শীল্‌স অন্য এক অনুসিদ্ধান্তে এসেছেন,—

"About India it could be said that anglophilia, truancy, the Independence Movement and the life of the sannyasin are interchangeable, in the sense that they are all efforts to transcend the demands of routine tasks and obligations of ordinary Indian domestic life."

আশা করি মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন। যদিও "The Indian students are rebels without a cause" প'ড়ে ধৈর্য এবং হাস্য সংবরণ করা দুরূহ।

শীল্‌সের এ জাতীয় কতকগুলি হঠকারী মন্তব্যে আমরা শুধু বিস্মিত নই, আসলে ভারতীয় পরিবেশ সম্পর্কেই তাঁর ধারণা ভাসা ভাসা। তিনি অতি রক্ষণশীল এবং উগ্র প্রগতিবাদী বুদ্ধিজীবীর উল্লেখ করেছেন, কিন্তু যে সমস্ত পরিবারে প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্ত্য সংস্কৃতির সুচারু সমন্বয় ঘটেছে তাদের সম্পর্কে তিনি একেবারে নীরব। একশ' কুড়ি পৃষ্ঠার এই গ্রন্থে দু'এক জায়গায় রবীন্দ্রনাথের নাম উল্লিখিত হলেও সমগ্রভাবে ঠাকুর পরিবারের কথা কোথাও বলা হয় নি। এ বিষয়ে তিনি যে খুব অবহিত, তাও মনে হয় না। সে জন্য প্রথম ভারতীয় আই. সি. এস.-এর কথা বলতে গিয়ে রমেশচন্দ্র দত্ত এবং সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথা উল্লেখ করেন, কিন্তু তিনি জানেন না যে, প্রথম ভারতীয় আই. সি. এস. উক্ত মনীষীদ্বয় নন, সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর। এ তথ্য না জানার কারণও রয়েছে। তিনি যে সব গ্রন্থ থেকে তথ্য সংগ্রহ করেছেন (বিশেষ ভাবে "The Men Who Ruled India") তাঁরা সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর সম্পর্কে বিস্ময়করভাবে নীরব। ফিলিপ উড্রফের "The Men Who Ruled ndia" গ্রন্থে ভারতীয় আই. সি. এস.-দের প্রসঙ্গে বলা হয়েছে —

"He (Surendranath), with Dutt and Gupta, went to England in 1868 and next year the three were successful in the I. C. S. exam. There were four Indians that year, these three from Bengal and another man from Bombay. *Once before and once only in 1863, an Indian had overcome the immense obstacles he had to encounter and been successful.*"

১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দে উত্তীর্ণ এই ভারতীয় যুবকটি আর কেউ নন, সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর। তিনি যে প্রবল বাধা-বিপত্তি অতিক্রম ক'রে পরীক্ষায় সফল হয়েছিলেন এ কথা লেখক স্বীকার করলেও তাঁর নামটি প্রকাশ করা প্রয়োজন মনে করেন নি। সত্যেন্দ্রনাথ তাঁর কর্মজীবনে যে ইংরেজ কর্তৃপক্ষের খুব স্নেহভাজন ছিলেন না তা সহজেই অনুমান করা যায়। প্রথম ভারতীয় আই. সি. এস. কোন নাইটহুড বা সি.আই.ই.-তে ভূষিত হওয়া ত দূরের কথা রায় বাহাদুর পর্যন্ত হন নি।

কিন্তু শীল্‌স তথ্য সংগ্রহের চেয়ে তত্ত্ব প্রচারে বেশী আগ্রহী। তিনি আগাগোড়া পরিতৃপ্ত চোখেমুখে বলেছেন, ভারতীয়রা পাশ্চাত্ত্য দেশ সম্পর্কে নানা হীনমন্যতায় ভোগে, অধিকাংশদেরই নিজেদের জীবিকা সম্বন্ধে আগ্রহ নেই, সৃষ্টির চেয়ে অনুকরণেই তাদের আগ্রহ। মেকলে একবার হাসতে হাসতে বলেছিলেন, সমগ্র প্রাচ্য দেশের সাহিত্যের চেয়ে কোন একটি শেলফে সাজান গুটিকয়েক পাশ্চাত্ত্য সাহিত্য-বিজ্ঞানের বই ঢের বেশি মূল্যবান্‌। শীল্‌স লক্ষ্য করেছেন, আমাদের গত যুগের বুদ্ধিজীবীরা মেকলের এই পরিহাসকে যেন সত্যি সত্যি

দেখে থাকবেন। "Books that have Influenced Me" এই গ্রন্থ বিষয়ে আলোচনা প্রসঙ্গে উক্ত মন্তব্য করেন। উপরি-উক্ত গ্রন্থে যাঁরা অন্তর্ভুক্ত হয়েছেন তাঁরা হলেন রাজাগোপালাচারী; কে. সি. চাগলা; রাজকুমারী অমৃত কাউর; স্যর সি. ভি. রামন প্রমুখ মনীষিবৃন্দ। যে সব গ্রন্থ দ্বারা তাঁরা প্রভাবিত তার [illegible] ক্লাসিক্যাল অথবা ভারতীয়, [illegible] সব ইংরেজ আমেরিকান লেখকের। এ যুগের [illegible] মধ্যেও শীল্স ইংরেজ মার্কিন লেখকের [illegible] প্রভাব [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] —

"Encounter and the New Statesman bring a continuous flow of new names, which many know about and some read."

আমি ঠিক [illegible] না যে, শীল্সের সব মন্তব্যই অদ্ভুত ঠেকল। আমাদের দুর্ভাগ্য যে, তাঁর নমুনা নির্বাচনের ত্রুটির জন্য ভারতীয় পরিস্থিতি সম্পর্কে তাঁর বহু সিদ্ধান্তই [illegible] [illegible] বহু কথা—

"A few of the people I met in India have a genuine love of intellectual activity, a living curiosity and a delight in discovery, but the vast majority, thoroughly decent and honest men, carry on in a listless way, as if by rote" (p. 25).

অথবা

"the emphasis in Indian intellectual life is not on creation and discovery but on reproduction" (p. 17-18).

অথবা

"India does not form an intellectual community" (pp. 17-18).

এই জাতীয় সব সিদ্ধান্তের পরেও শেষ অধ্যায়ে ভারতীয় বুদ্ধিজীবী সম্পর্কে তাঁর এত আশা কেন? এ কি অনুন্নত দেশের প্রতি অনুকম্পা?

আসল ত্রুটি অবশ্য আরও গভীরে। জাপানী বুদ্ধিজীবী বিষয়ে গবেষণা করতে গেলে জাপানী ভাষা না জেনে সে কাজ করা অকল্পনীয়। কিন্তু ভারতবর্ষে সে জিনিস অনায়াসেই সম্ভব হয়। বিদেশী বিদগ্ধ-সমাজ এ তথ্যটি সব সময় মনে রাখেন না যে, যাঁরা ভালো ইংরেজি বলেন বা লেখেন তাঁরা সব সময় ভারতীয় সংস্কৃতি সম্পর্কে ওয়াকিবহাল নন। এবং চোস্ত ইংরেজি জানাটা বুদ্ধিজীবীর প্রধানতম লক্ষণ নয়। প্রাথমিক তথ্য বা উৎসের জন্য কয়েকটি প্রধান আঞ্চলিক ভাষার জ্ঞান অপরিহার্য।

ভারতীয় ভাষা-সমূহের সঙ্গে কিঞ্চিৎ পরিচয় থাকলে তিনি শুধু কয়েকজন আই.সি.এস.-এর ইংরেজিতে লেখা কয়েকটি গ্রন্থের ভিত্তিতে বলতে পারতেন না—

"It is true that the Indian Civil Service has not yet produced scholarly and literary works like those of Mathew Arnold, E. K. Chambers, Humbert Wolfe, Edward Marsh, F. J.E. Raby, and others, but the publicistic and scholarly achievements of Romesh Ch. Dutt, V. P. Menon, A. D. Gorwala, Tarlok Singh and many others are evidence of the cultivation and the studious turn of mind of the high-ranking Indian Civil Servant."

আই.সি.এস. নয়, প্রাদেশিক প্রশাসনিক বিভাগের কর্মচারীদের মধ্যেই বঙ্কিমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র, দ্বিজেন্দ্রলাল, নবীনচন্দ্র প্রমুখের নাম পাওয়া যায় যাঁদের অনেকের কৃতিত্ব ম্যাথু আর্নল্ড প্রভৃতির চেয়ে কোনো অংশে কম নয়।

শীল্স ভারতীয় বুদ্ধিজীবীদের পরিবেশের সঙ্গে ঊনিশ শতকের রুশ বুদ্ধিজীবীদের মিল খুঁজে পেয়েছেন। এ বিষয়ে তাঁর তুলনামূলক আলোচনাটি সবিশেষ কৌতূহলপ্রদ। তাঁর মতে—

"The cultural pull of the west in India has been at least as strong as it was in Russia in the 19th century and even stronger than the pull of anglophilia in America during the same period."

কিন্তু এই মন্তব্যের যাথার্থ্য মোটামুটি অনস্বীকার্য। কিন্তু এর পর যখন তিনি এই সামান্যীকরণে উপস্থিত হন যে, সাধারণ ভাবে ভারতীয়রা তো বটেই, প্রাক্তন সন্ত্রাসবাদীরাও বলে থাকেন যে, "The British are better than the Indians" অথবা "Englishmen have better characters than we have" ইত্যাদি, তখন সন্দেহ হয়, তাঁর নমুনা সংগ্রহে কোনো গুরুতর ত্রুটি রয়েছে। শীল্সকে জনৈক প্রাক্তন সন্ত্রাসবাদী, বর্তমানে একটি খ্যাতনামা মারাঠা দৈনিক পত্রিকার সম্পাদক

যা কিছু অমঙ্গল, অশুভ, সবের মূলে তরুণ-তরুণীর মাখা হাঁচা মেলামেশা। পথে ঘাটে এই সব দুর্গাপ্রবৃত্তি দেখে দেখে তাঁর মাথার রোগ হবার উপক্রম হয়েছে। এর একমাত্র ওষুধ চাবুক। দশ আর চারকাও।

একদিন ওষুধ চাবুক হাঁকড়াতে গিয়ে পাশে বসা বিনোদবাবুর মাছের ঝোলের বাটিটাই উল্টে দিয়েছিলেন।

একবার উঁকি দিয়ে পরিমলের নিস্পন্দ দেহটা দেখেই তিনি ফিরে যাবেন নিজের কোটরে। মহেশবাবুর দিকে ফিরে ভ্রূকুঞ্চিত ক'রে বলবেন, এ আর দেখতে হবে না মহেশ ভায়া। লভ, লভ, এ ছাড়া আর কিছুই নয়। কেবল চাবুক, শুধু চাবুক নয়, একবারে খাঁটি জলবিছুটি লাগিয়ে।

তারপরই হয়ত মনে পড়ে যাবে একটা শবের ওপর চাবুক খুব কার্যকরী হবে না।

মহেশবাবু নির্বিরোধ মানুষ। কারো সাতে-পাঁচে থাকেন না। কোন এক মার্চেন্ট অফিসের লেজার-কীপার। ঢুকেছিলেন তিরিশ বছর আগে, সেই থেকে লেজার আঁকড়ে আছেন, আর ছাড়েন নি। বহু সাহেবের আনাগোনা হ'ল। নিচের লোক ওপরে উঠল প্রমোশনের মইয়ে ভর করে ছোকরারা অফিসর হ'ল। মহেশবাবু নির্বিকার। লেজার সর্বস্ব জীবনে একটু ঢেউ উঠল না। সামান্য আশার স্ফুলিঙ্গ নয়।

মহেশবাবু আপত্তি করবেন, তা কই, পরিমলের এসব রোগ ছিল, তা ত জানি নি।

পিঠে বুকে খাঁটি সরিষার তেল চাপড়াতে চাপড়াতে আত্তাপু রাখবেন।

এ রোগ কি আর কলবসন্তের মতন দেহে ফুটে ওঠে ভায়া, খুব নজর রাখলে তবে টের পাওয়া যায়। চলাফেরায়, চোখের চাউনিতে, এলোমেলো কথাবার্তায়।

মহেশবাবু কথা বাড়াবেন না। হেঁট হয়ে সামনে খোলা গীতার পাতায় মনোনিবেশ করবেন।

এদিক ওদিক আরও কথা উঠবে। নানা মন্তব্য, ইসারা, চোখ ঠারাঠারি। সম্ভব-অসম্ভব নানা জল্পনা।

সদাশিববাবু ঘোরতর বাস্তববাদী। দালালী করেন। কিসের তা আজ পর্যন্ত কেউ জানে না।

তিনি এগিয়ে এসে মেসের ম্যানেজারকে ধমক দেবেন, হাঁ করে দাঁড়িয়ে না থেকে, খোঁজ করুন ছোকরা কোন চিঠিপত্র লিখে গেছে কি না। না হ'লে পুলিস ত আবার সকলকে জড়াবে। জেরার ঠেলায় বাপের নাম ভুলিয়ে দেবে।

তখন খোঁজাখুঁজি শুরু হবে। ট্রাঙ্ক, স্যুটকেশ হাটকে, বিছানা উল্টে এদিক ওদিক অনুসন্ধান, কোন একটা চিঠি যদি পাওয়া যায়। ছোকরা কেন গেল সে জন্য মানুষের বিশেষ ঔৎসুক্য নেই, শুধু একটা স্বীকারোক্তি। পরিমলের নিজের হাতে লেখা, তার মৃত্যুর জন্য সে ছাড়া আর কেউ দায়ী নয়।

চিঠি বা কাগজের টুকরোটা না পাওয়া পর্যন্ত মেসের লোকেরা শুধু আতঙ্কিত নয়, সন্ত্রস্তও হয়ে উঠবে। মেসের ম্যানেজার সব চেয়ে বেশী, কারণ তাঁর দায়িত্বই সর্বাধিক।

আশ্চর্য, টেবিলের ওপর বিষের শিশি চাপা দেওয়া কাগজের টুকরোটা উন্মোচিত অবস্থায় কারো চোখে পড়বে না। কোন অসুবিধা না হয়, তাই পরিমল কাগজটা এমন জায়গায় রেখেছে, যাতে সবাই দেখতে পায়।

না, আত্মহত্যার কোন কারণ নেই। শুধু এই বাঁধা গৎ। আমার মৃত্যুর জন্য কেউ দায়ী নয়। ইতি পরিমল সান্যাল। তার তলায় তারিখটাও দিয়ে দেবে। অবশ্য পরিমলের মৃত্যু এমন এক ঐতিহাসিক ঘটনা নয়, যার সাল তারিখের খুব প্রয়োজন, ভবিষ্যৎ-গবেষণাকারীদের কাজে লাগবে। তবু তারিখটা থাকা দরকার। পরিমলের পৃথিবীতে থাকার শেষ দিন।

পরিমলের জন্ম তারিখটা ওর বাবার [illegible] খাতার এক পাতায় লেখা আছে, মৃত্যুর তারিখটা পরিমলের নিজের হাতে লেখা থাক কাগজের টুকরো-টার ওপর।

কাগজের টুকরোটা আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে বিষের শিশিটাও নজরে পড়বে। মেসের ম্যানেজার শিশিটা ছুঁতে যাবার আগেই সদাশিববাবু ধমকে দাঁড়িয়ে পড়লেন।

আঃ, ওসব নিয়ে নাড়ানাড়ি করছেন কেন? পুলিস এসে যা করবার হয় করবে।

সবাই এসে জড়ো হবে, কেবল সাত নম্বরের দীপ্তেন-বাবু ছাড়া। সম্ভবতঃ দীপ্তেনবাবু উঁকি দিয়ে একবার ব্যাপারটা দেখেই শার্টটা গায়ে চড়িয়ে বেরিয়ে পড়বেন। কলেজের অধ্যাপক। কলেজ এখন ছুটি, বেরোবার কোন প্রয়োজন নেই, তবু বেরোতে তাঁকে হবেই। বৃহত্তর বিপদ এড়াবার জন্য।

দিন দুয়েক আগেই দীপ্তেনবাবুর সঙ্গে পরিমলের একটা বচসা হয়ে গেছে। দোষ অবশ্য পরিমলেরই। মাস দুয়েক আগে তিন দিনের মধ্যে শোধ দেবার কড়ারে পরিমল দীপ্তেনবাবুর কাছ থেকে পঁচিশটা টাকা ধার

ছোট সংসার। বাপ, মা আর ছোট একটা ভাই। সীমিত আয়, আশা আকাঙ্ক্ষাও পরিমিত। বাপ ঘড়ি মেরামতির কাজ করে। মাঝ দুপুর বেলা বেরিয়ে পড়ে বোম্বাই বাড়িতে বাড়িতে স্নো, পাউডার, তেল, সাবান ফেরি করে। বাড়িতে থাকে অসীমা আর তার ভাই।

অন্তরঙ্গ হবার পর দিন-চারেক পরিমল অসীমাকে সিনেমায় নিয়ে গেছে। একদিন গঙ্গার ধারে। দু'জনে সিনেমা দেখে নি, নদীর বাতাস সেবন করার দিকে একটুও নজর ছিল না, কেবল বসে বসে এলোমেলো কথার ফুল দিয়ে ভবিষ্যতের মালা গেঁথেছে। কবে, কতদিন পরে দু'জনে দু'জনের সান্নিধ্যে আসবে, এক গৃহ এক মন হবে, তারই জল্পনা-কল্পনা।

কিন্তু পরিমলের মোহময় জীবনের স্বপ্ন এভাবে বাস্তবের কঠিন পাথরে লেগে খান খান হয়ে যাবে, তা সে কোনদিনই ভাবতে পারে নি।

যোগাযোগটাও নিতান্ত দৈব।

পরিমলের ধারণা ছিল দীনবন্ধুবাবুর তিনকুলে কেউ নেই। অন্তত দীনবন্ধুবাবুর মুখে আত্মীয়স্বজনের কোন কথা কোনদিন শোনে নি। কিন্তু হঠাৎ বুঝি দেশ থেকে খবর এল দীনবন্ধুবাবুর স্ত্রীর অবস্থা সঙ্গীন। এইবেলা যদি দীনবন্ধুবাবু যান ত একবার শেষ দেখাটা হতে পারে।

ক্যাশবাক্স ছোটবাবুর জিম্মায় রেখে দীনবন্ধু ছুটল দেশের দিকে। ছোটবাবু ক্যাশবাক্স পরিমলের হাতে তুলে দিয়ে বললেন, ওহে, যে ক'টা দিন দীনবন্ধু না ফেরে ক্যাশ আর মেশিন তোমাকেই সামলাতে হবে। একটু সাবধানে থেকো। বাক্স খোলা রেখে এদিক ওদিক যেও না। পাল পাল মিঞা ঘুরছে, কার মনে কি আছে ভগবান জানেন।

ক্যাশ আগলাবার দিন পাঁচেকের মধ্যে ব্যাপারটা ঘটল।

অসীমাদের বাড়ীতে পা দিয়েই পরিমল থতমত খেয়ে গিয়েছিল। বাইরের ঘরে কেউ নেই। এখন অবশ্য পরিমলের অবারিত দ্বার। সে প্রায় ঘরের ছেলে। তাই ভিতরঘরের চৌকাঠে গিয়ে দাঁড়াল।

এক কোণে অসীমার বাবা গালে হাত দিয়ে বসে। তার পাশেই অসীমার মা কি যেন বোঝাবার চেষ্টা করছিলেন। এধারে অসীমা চুপচাপ দাঁড়িয়ে। চোখ দু'টি লাল। মনে হ'ল, সারারাত ধরে বুঝি সে কেঁদেছে।

পরিমলকে দেখে অসীমা বাইরের ঘরে চলে এসেছিল।

কি ব্যাপার?

আমাদের সর্বনাশ হয়েছে।

কি হ'ল?

ঘড়ির দোকানটা খোলার সময় বাবা কিছু দেনা করেছিল এক মাড়োয়ারীর কাছে। সেই দেনা আর শোধ করতে পারছিল না। বুঝতেই ত পারছ টানাটানির সংসার। এ গর্ত খুঁড়ে আর এক গর্ত বুজোবার চেষ্টা। সেই মাড়োয়ারী নালিশ করেছিল। বাবা জানতেও পারে নি। টাকা দিয়ে সমন চেপে দিয়েছিল। এক তরফা ডিক্রি নিয়েছিল। কাল কোর্ট থেকে দোকান সীল করে গেছে। ওই দোকানে বাবার বড় বড় মক্কেলের ঘড়ি রয়েছে। তারা বাবাকে বেইজ্জত করবে। কি সর্বনাশ বল ত?

—আজ আব্রাহাম সাহেব থাকলে আমার ভয় ছিল না। ঠিক একটা ব্যবস্থা হয়ে যেত।

পরিমল চমকে ঘাড় ফিরিয়েছিল। অসীমার বাপ এক সময়ে দাঁড়িয়েছেন দেয়ালে ঠেস দিয়ে।

পরিমলের জিজ্ঞাসু দৃষ্টির উত্তরেই আবার বলতে শুরু করেছিলেন অসীমার বাপ। আব্রাহাম সাহেবের কাছেই আমি প্রথম কাজ শিখি। এখন তিনি কোটিপতি লোক। আমাকে ছেলের মতন ভালবাসেন। আব্রাহাম সাহেব বিলেতে। ফিরতে আর দিন সাতেক। কিন্তু এই সাতদিনই বা করি কি।

পরিমল খুব আস্তে জিজ্ঞাসা করেছিল, কত টাকার ব্যাপার?

তা প্রায় আড়াই হাজার। শ' পাঁচেকের মতন জোগাড় করেছি। সাত দিনের জন্য হাজার দুয়েক টাকা যদি কেউ ধার দেয়, তাহলে তার কেনা হয়ে থাকব। আব্রাহাম সাহেব এলেই টাকাটার কিনারা হয়ে যাবে।

পরিমল চোখ তুলেই বিব্রত হয়েছিল। অসীমা, অসীমার মা, অসীমার বাবা তিন জনেই একদৃষ্টিতে চেয়ে রয়েছেন তার দিকে। সে দৃষ্টিতে শুধু প্রত্যাশাই নয়, করুণ ভিক্ষার আবেদন।

পরিমলের মাথাটা খুব জোরে ঘুরে উঠেছিল। ম্লান দৃষ্টির সামনে ফুটে উঠেছিল অফিসের ক্যাশবাক্সটা। মাত্র সাতদিন। কোনরকমে সাতদিনের জন্যে কিছু একটা করতে পারলে একটা মানুষের সম্মান বাঁচে। ভাঙনের বিপর্যয় থেকে অসীমারা রক্ষা পায়। মাত্র সাতটা দিন। একটা মধ্যবিত্ত পরিবার নিশ্চিহ্ন হওয়া থেকে অব্যাহতি পায়।

দেখ না বাবা, বন্ধুবান্ধবদের কাছ থেকে যদি কিছু সুবিধা করতে পার।

জানি না বাবা। আমাকে চরম বেইজ্জতির হাত থেকে বাঁচালে।

অসীমার মা ছুটে এসে পরিমলের সর্বাঙ্গে হাত বুলিয়ে বলেছিলেন, বেঁচে থাক বাবা, রাজরাজেশ্বর হও। অসীমার মহাভাগ্য তোমার মতন স্বামী পাবে।

সে রাতে বাসরে লোকের ভিড়েও অসীমা লজ্জা পর্যন্ত ভুলেছিল। আধ-অন্ধকারে পরিমলের বুকে মুখ লুকিয়ে বলেছিল, আমি তোমার। আমি তোমার।

বিশী শুমট। পরিমলের মনে হ'ল বুঝি দম আটকে আসবে। বিয়ের শিশিটা টেবিলের ওপর নামিয়ে, এদিকের জানালাটা খুলে দিল।

নির্জন, নিস্তব্ধ গলি। রাস্তায় একটা ডাকো কুকুর পর্যন্ত নেই। কোন বাড়ীতে আলো জ্বলছে না। এক পরিমল ছাড়া বিশ্বচরাচরে কেউ বুঝি জেগে নেই।

এক সময়ে পৃথিবী খুব সুন্দর লেগেছিল পরিমলের। পৃথিবীর মানুষকে ভাল লেগেছিল। ফুল, চাঁদ, তারা, বর্ণে, গন্ধে, আলোময় আকর্ষণে দুর্বার। কিন্তু সেদিন থেকে পরিমল বদলেছে। জীবন অর্থহীন, মানুষের দয়া, মায়া কোমলবৃত্তিগুলো কেবল শিকার ধরবার ফাঁদ। আর কিছু নয়।

তিনদিন বাদ দিয়ে পরিমল আবার অসীমাদের দরজায় গিয়ে দাঁড়িয়েছিল। উদ্দেশ্য আব্রাহাম সাহেব ঠিক করে আসবেন তার খোঁজ করা। ক্যাশবাক্স সামনে নিয়ে প্রত্যেকটি মুহূর্ত এমনি দ্বিধা, শঙ্কা আর উদ্বেগে আর সে কাটাতে পারছে না। হঠাৎ যদি দীনবন্ধুবাবু ফিরে আসে তা হলেই সর্বনাশ! কিংবা কাঠের আড়তদার যদি টাকাটার কথা উল্লেখ করেন মালিকদের কাছে, তা হলেও সঙ্কট কম নয়।

খুব আশা করছে পরিমল, এ সব ঘটবার আগেই টাকাটা ক্যাশবাক্সে ফিরে আসবে।

দরজায় বিরাট তালা। অন্ধকারে পরিমল ঠিক বুঝতে পারে নি। অনেকবার ধাক্কা দেবার পর পাশের ঘর থেকে একটি বিরাট আকৃতির লোক বেরিয়ে এসেছিল।

কি ব্যাপার মশাই? বন্ধ দরজায় ওরকম ধাক্কা মারছেন কেন? দেখছেন না তালা দেওয়া?

এঁরা নেই বাড়ীতে? কোথায় গেছেন?

কোথায় গেছেন জানলে ত কাজই হ'ত মশাই। রাতারাতি সবাই সটকেছে আমরা টেরও পাই নি। সকালে বাড়ীওয়ালার লোক এসে তালা লাগিয়ে দিয়েছে।

সব, সবাই চলে গেছে, মানে অসীমা। বুকের ভেতরটা পরিমল কম্বর আর তার আয়ত্তের মধ্যে নেই। সমস্ত শরীরের সঙ্গে দেহটাও কাঁপছে।

অসীমা কে? খুকি? দেখুন মশাই, অন্য কোন ডালে বাসা বেঁধেছে। আর কোন বাবু পাকড়েছে।

লোকটার সব কথা পরিমলের কানে যায় নি। রাস্তার ওপরই মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়েছিল।

তারপর চারদিক থেকে মেঘ ঘনিয়ে এসেছিল। বিপদের ওপর বিপদ। কোথা থেকে কি খবর পেয়েছিলেন ঈশ্বর জানেন, ছোটবাবু এসে ক্যাশবাক্সের সামনে দাঁড়িয়েছিলেন।

টাকা মেলাব। ক্যাশ বই বের করুন।

তারপর, তারপর সব কিছু কেমন ওলোট-পালোট হয়ে গিয়েছিল। ছোটবাবু পুলিস ডাকতে চেয়েছিলেন, কিন্তু বড়বাবু বাধা দিয়েছিলেন। কাছে এসে পরিমলের পিঠে হাত রেখে মিঠে গলায় বলেছিলেন, এমন ব্যবহার তোমার কাছ থেকে আশা করি নি বাবা। সাত দিন সময় দিলাম, তার মধ্যে টাকাটা যোগাড় করে এনে দাও। এই ক'দিনে এত টাকা তুমি খরচ করতে পার না। যেখানে সরিয়েছ, সেখান থেকে এনে দাও ভালয় ভালয়। আর তা না হলে, আমার আর কিছু করবার নেই বাবা। যা করবার পুলিসের লোক এসে করবে।

এবারেও সাত দিন। এই সাত দিন পরিমল অসীমাদের খোঁজে পাগলের মতন পথে পথে ঘুরিয়েছিল। ভাল পাড়া, খারাপ পাড়া সব। একলা নয়, বড়বাবু একজন লোক দিয়েছিলেন সঙ্গে। নজরবন্দী অবস্থা। পালিয়ে না যেতে পারে।

টেলিফোনের বই খুলে আব্রাহাম সাহেবের ঠিকানা খুঁজেছে। গোটা চারেক আব্রাহাম। চার জায়গাতেই পরিমল হানা দিয়েছিল, কিন্তু গালাগাল খেয়ে সরে এসেছে।

গতকাল সাত দিনের মেয়াদ শেষ হয়ে গেছে।

সঙ্গের লোকটি মেস অবধি ধাওয়া করেছে। পরিমলের পাশের ঘরেই আস্তানা গেড়েছে। পরিমল চোখে ধুলো দিতে না পারে। চোখের সামনে দিয়ে বেরিয়ে না যায়।

কাল চোখের সামনে দিয়েই পরিমল বেরিয়ে যাবে। লোকটি কিছু করতে পারবে না। কিছু করার সাধ্য তার থাকবে না।

পরিমল সস্নেহে বিষের শিশিটা হাতে তুলে নিল। সব অপমান, গ্লানি আর লাঞ্ছনার অবসানের লগ্ন বয়ে

না, সে সব কিছু নয়। শোবার সঙ্গে সঙ্গেই ঘুমে দু'চোখ আচ্ছন্ন হয়ে এল।

গোলমালে যখন পরিমলের ঘুম ভেঙে গেল, তখন বেলা অনেক। প্রথমে তার মনে হ'ল, সমীরবাবু বুঝি ফিরে বন্ধ দরজায় ধাক্কা দিচ্ছেন। কিন্তু না, শব্দটা বাইরে থেকে আসছে।

পরিমল দরজা খুলে বাইরে গিয়ে দাঁড়াল। সিঁড়ির কাছে জটলা। সবাই চেঁচামেচি করছে।

কি ব্যাপার? পরিমলও সিঁড়ির চাতালে গিয়ে দাঁড়াল।

সকলেই একসঙ্গে উত্তর দেবার চেষ্টা করল। তার মধ্য থেকে পরিমল এইটুকু বুঝল, ওপর তলায় একটি মেয়ে বুঝি গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করেছে। পুলিস এসেছে। ডাক্তার এসেছে। তার কান্নাকাটি হচ্ছে।

পরিমল আর দাঁড়াল না। দ্রুতপায়ে নিজের কামরায় চলে এল। ড্রয়ার থেকে নীল কাগজের টুকরোগুলো মেলে ধরল চোখের সামনে। এই আশ্বাস, এই সতর্কবাণী ত ওপরতলা থেকেই ভেসে এসেছিল কাল রাত্রে। সম্ভবত মেয়েটির কাছ থেকেই। কারণ আর কোথা থেকে আসা সম্ভব নয়।

কিন্তু এ কি হ'ল! এতক্ষণ পর পরিমলের সমস্ত শরীর কেঁপে উঠল। আবার ঘাম জমল কপালে। মনে হ'ল, পায়ের তলা থেকে শেষ নির্ভরটুকুও স'রে যাচ্ছে।

পরিমল ছুটে জানলায় গিয়ে দাঁড়াল। রাস্তা পরিষ্কার। কাচের টুকরোর চিহ্নও কোথাও নেই।

কালকের রাত্রের ভয় আর অবসাদ আবার ঘিরে ধরল পরিমলকে। নীল কাগজের টুকরোগুলো মুঠোর মধ্যে ধ'রে রাখা সত্ত্বেও সমস্ত শরীর থরথরিয়ে কেঁপে উঠল। নিজেকে সম্পূর্ণ রিক্ত, অসহায় মনে হ'ল। নিজেকে বাঁচাবার আর নিজেকে মুছে ফেলার শক্তি, দুই-ই পরিমল একসঙ্গে হারাল।

অক্ষিগোলক

একটা ধারণা আছে সেটা ভুল। পৃথিবীর উষ্ণ অঞ্চলগুলিতে এদের বৈচিত্র্য অনেক বেশী, কিন্তু কেবল সংখ্যা দিয়ে বিচার করলে নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলগুলিই প্রথম স্থান অধিকার করে। মেরু অঞ্চলেও এদের দেখা পাওয়া যায়।

মাছিরা কেবল যে কলেরা ও টাইফয়েড জাতীয় রোগের বীজাণু ছড়ায় তা নয়, টিউবারকুলোসিসের বীজাণুও এদের দ্বারা এক দেহ থেকে অন্য দেহে সঞ্চারিত হয়। এই কারণে মাছিরা কীটপতঙ্গের মধ্যে মানুষের পরমতম শত্রু। মাছিকে বিশ্বাস নেই।

সব পোকামাকড়রাই যে মানুষের ক্ষতি করে তা মোটেই নয়। পৃথিবীতে ৭,০০,০০০ বিভিন্ন জাতের পোকা-মাকড়ের অস্তিত্ব আছে ব'লে মানুষ এখন অবধি জেনেছে। এদের মধ্যে কয়েক শ' জাতের দ্বারা মানুষের ক্ষতি হয়। অধিকাংশ কীটপতঙ্গরা মানুষের হিতকারী। মানুষের প্রয়োজনীয় বহু উদ্ভিদ এদের সাহায্যে পুষ্পিত হয়। রেশম, মধু, নানাপ্রকারের রঞ্জকদ্রব্য, গন্ধদ্রব্য ইত্যাদি এদেরই কল্যাণে আমরা পেয়ে থাকি। এদের মধ্যে অনেকে আমাদের শত্রু জাতীয় কীটপতঙ্গদের বিনাশ করে, অনেক রকমের আগাছার বিষক্রিয়াকে দমিত রাখে, মাটির বাঁধন আলগা ক'রে ফসলের উপযোগী ক'রে দেয়, এছাড়া এরা অন্য অনেক প্রাণীর এমন কি সভ্যতার নিম্নস্তরের অনেক মানুষেরও ভক্ষ্য।

বর্ণ-অন্ধ

বিজ্ঞানীরা অনুমান করেন যে পৃথিবীর বেশ কয়েক কোটি মানুষ অল্প-বিস্তর colour-blind বা বর্ণ-অন্ধ। এঁদের দৃষ্টিশক্তি হয়ত অন্য সকল দিক সম্পূর্ণ স্বাভাবিক, কিন্তু এঁরা আকাশে রামধনু উঠলে তার সব কটা রঙ দেখতে পান না। এঁদের কারও কারও কাছে সবুজ ও লালের কোনো প্রভেদ নেই, বেগুনী ও হলদে দুইই এঁদের কাছে ছাই রঙের মত দেখায়। একই রঙের নানা বিভিন্ন shade-এর তারতম্য এঁরা বুঝতে পারেন না। এমন অনেকে আছেন যাঁদের চোখে সব-কিছুই grey বা ছাই রঙের ব'লে মনে হয়, আবার অনেকে লাল ও সবুজ ছাড়া আর কিছু দেখতে পান না। এই বর্ণান্ধতা পুরুষানুক্রমিক এবং স্ত্রীলোকদের অপেক্ষা পুরুষদের মধ্যে এর প্রাবল্য অনেক বেশী।

চোখ সম্বন্ধে ভ্রান্ত ধারণা

বিগত কয়েক বৎসরের মধ্যে চোখ সম্বন্ধে অনেক নূতন তথ্য আবিষ্কৃত হয়েছে, তৎসত্ত্বেও পঞ্চেন্দ্রিয়ের মধ্যে শ্রেষ্ঠ এই ইন্দ্রিয়টি সম্বন্ধে মানুষের গতানুগতিক কতকগুলি ভ্রান্ত ধারণা দূরীভূত হয় নি।

অনেকের এখনও ধারণা, চোখ একটি অত্যন্ত কোমল স্বভাবের দেহযন্ত্র সামান্য কারণেই যা পীড়াগ্রস্ত হয়ে পড়তে পারে এবং পীড়াগ্রস্ত হবার সম্ভাবনাও তার প্রচুর। আসলে কিন্তু ঠিক এর উল্টো। আমাদের ইন্দ্রিয়গুলির মধ্যে, চোখ দুটিরই ব্যাধি প্রতিরোধের ক্ষমতা সকলের চেয়ে বেশী, আর সবদিক দিয়ে এরাই সবচেয়ে বেশী মজবুত। কোনো কারণে রোগগ্রস্ত হয়ে পড়লে চোখ যত তাড়াতাড়ি সেই রোগকে ঝেড়ে ফেলতে পারে, আমাদের অন্য কোনো দেহযন্ত্র তা পারে না। তা সত্ত্বেও একে সামান্যতম আঘাত থেকে রক্ষা করবার জন্যে প্রকৃতি দেবী পর্যাপ্ত ব্যবস্থা ক'রে রেখেছেন, আর সেই

আমরা বাঙালীরা সাঁতারে পৃথিবীব্যাপী সুনাম অর্জন করেছি, কিন্তু ডুব সাঁতারে দক্ষতা দেখাবার কোনো চেষ্টা আমাদের আছে ব'লে মনে হয় না। ওদিকে মনোযোগ আমরা এতদিন কেন দিই নি জানি না। আমাদের বিশ্বাস, ডুব সাঁতারে বাঙালীদের কৃতিত্ব কম হবার কিছুমাত্র কারণ নেই।

জ্যাক্ মোরাট নামের একজন ডুব-সাঁতারু ফোটোগ্রাফার জলের নীচে ছবি তুলছেন, সেই ছবিটি তুলেছেন, অন্য একজন ডুব-সাঁতারু ফোটোগ্রাফার। যাঁর ছবি তোলা হচ্ছে তিনিও যে একজন আশ্চর্য রকমের দক্ষ ডুব-সাঁতারু তাতে সন্দেহ করবার কোনো কারণই নেই।

জলের তলায় ছবি তোলাই জ্যাক্ মোরাটের কাজ, আর এ কাজ থেকে তাঁর আয় হয় বছরে [illegible],০০০ আমেরিকান ডলার।

স্তন্যপায়ী কোন জীব কি ডিম পাড়ে?

পৃথিবীতে ৪০০০ রকমের স্তন্যপায়ী জীবের বাস। এদের মধ্যে মাত্র দু'রকমের জীব, হাঁসের ঠোঁটের মত ঠোঁটওয়ালা প্লাটিপাস ও এচিড্‌না, এদের বাদ দিলে বাকী আর সব জীবেরই ডিম মাতৃগর্ভেই পরিণতি লাভ করে ও পরে বাচ্চা হয়ে ভূমিষ্ঠ হয়। প্লাটিপাস ও এচিড্‌নারা ডিম পাড়ে, ও পরে যথাসময়ে ডিম ফুটে বাচ্চা বের হলে তাদের দুধ পান করায়, সুতরাং তাদের স্তন্যপায়ী জীব ব'লে আখ্যাত না ক'রে উপায় নেই।

এই দু'টি জীবেরই বাস অষ্ট্রেলিয়াতে। অষ্ট্রেলিয়াতে এমন আরও কয়েকটি অদ্ভুত জীবের বাস যাদের পৃথিবীর অন্য কোথাও দেখতে পাওয়া যায় না।

পৃথিবীর সবচেয়ে লম্বা খাল

পূর্ব-চীনের টিয়েন্‌ৎসিন ও হ্যাংচাওয়ের যে খাল দ্বারা পরস্পরের সঙ্গে যোগাযোগ, সেটিই পৃথিবীর সবচেয়ে লম্বা খাল। এটি প্রায় এক হাজার মাইল লম্বা। এই খালটির প্রাচীনতম অংশটি খনন করা হয় ৪৮৬ খৃষ্টাব্দে, তারপর বিভিন্ন সময়ের চীন সম্রাটেরা এর দৈর্ঘ্য ক্রমাগত বাড়িয়ে যেতে থাকেন। বিখ্যাত চীন সম্রাট কুবলাই খানের রাজত্বকালে, ১২৮৯ খৃষ্টাব্দে এর খননের কাজ শেষ হয়। এই খালের অনেকটাই এখন পলি পড়ে অকেজো হয়ে গিয়েছে, কিন্তু অনেকটাই আবার এখনও সম্পূর্ণ ব্যবহারযোগ্য রয়েছে।

রাজনারায়ণ বসুকে লিখিত পত্রাবলী

ইংরাজী ১৮৫১ খ্রীষ্টাব্দে রাজনারায়ণ বসু মেদিনীপুর জিলা স্কুলের প্রধান শিক্ষকপদে নিযুক্ত হন। ১৮৫৫ সালে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বিধবা বিবাহের আন্দোলন সুরু হয়। এই সময় বিদ্যাসাগর সংস্কৃত কলেজের প্রিন্সিপাল ছিলেন। বাংলা দেশে তৃতীয় ও চতুর্থ বিধবা বিবাহ হয় রাজনারায়ণের জাঠতুতো ভাই দুর্গানারায়ণ বসু ও সহোদর ভাই মদনমোহন বসুর। বিদ্যাসাগরের দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়াই রাজনারায়ণ এই দুই ভাইয়ের সহিত দুটি বিধবার বিবাহ দিতে উদ্যোগী হন এবং কায়স্থ সমাজের দ্বারা নিগৃহীত হন। তাঁহার ঘর পোড়াইয়া দিবারও ভয় দেখানো হইয়াছিল।

দ্বিজেন্দ্রনাথ একটি চিঠিতে নিজের নাম Faust বলিয়া সহি করিয়াছেন। দ্বিজেন্দ্রনাথ কবি ও দার্শনিক ছিলেন এবং "স্বপ্নপ্রয়াণ" রচনা করিয়াছিলেন। সেই কারণে রাজনারায়ণ তাঁহাকে Faust নাম দিয়া থাকিতে পারেন। আর একটি চিঠিতে দ্বিজেন্দ্রনাথ নিজের নামের বদলে একটি পাখীর ছবি আঁকিয়াছেন, কারণ পাখীর একটি নাম দ্বিজ।

ইংরাজী চিঠিটি দ্বিপেন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখিত। ইনি দ্বিজেন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠ পুত্র।

দ্বিজেন্দ্রনাথ "ভক্ষহরণ কাব্য" নামে একটি কাব্য লেখেন। সেইজন্য চিঠিতে ভক্ষ হরণের ছবি আঁকিয়াছেন, নামটি লেখেন নাই।

"সত্তু" সম্ভবত সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ডাক নাম।

শ্রীশান্তা দেবী

শ্রীশ্রীহরিঃ

শরণম্

সাদর সম্ভাষণাবেদনমিদম্

যৎকালে আপনার পত্র পাই আমি অত্যন্ত পীড়িত হইয়া শয্যাগত ছিলাম ৪।৫ দিন মাত্র শয্যা পরিত্যাগ করিয়াছি কিন্তু অদ্যাপি অতিশয় দুর্ব্বল আছি। এই কারণে এতদিন আপনার পত্রের উত্তর লিখিতে পারি নাই। আপনকার বিষয়ে অবিচার হইয়াছে সন্দেহ নাই কিন্তু ডিরেক্টর সাহেব কলিকাতায় নাই নতুবা আমি তাঁহার নিকট গিয়া আপনকার বিষয়ে কিছু বলিতাম। আপনকার এবিষয়ে আপত্তি করা উচিত কি না স্থির বুঝিতে পারিতেছি না। বোধ হয় ইহাতে কোন ফল হইবে না। বিশেষতঃ আপনি আর কষ্ট করিতে পারিবেন আমার এরূপ বোধ হয় না যদি তাহা না হয় তবে আর বিরোধ করার ইচ্ছা হইবে কি। অসুস্থতা নিবন্ধন আমি কাহার সহিত পরামর্শ করিতে পারি নাই। অদ্য ৫।৬ দিনের জন্য বর্দ্ধমান যাইতেছি তথা হইতে আসিয়া আত্মীয়গণের সহিত পরামর্শ করিয়া যেরূপ কর্ত্তব্য হয়…লিখিব।

ইতি ১০ ভাদ্র

শুভধ্যায়িনঃ

শ্রীঈশ্বরচন্দ্র শর্ম্মণঃ

6, Dwarkanath Tagore's Lane
Jorasanko
The 24th Feb. 1890

My Dear Rajnarain Baboo,

By the desire of my grandfather I send you by this post the **Statesman of the 23rd** instant and trust the article in it instituting a parallel between my venerable grandfather and the late Keshub Chandra Sen, will find it interesting.

Perhaps you will send it to the Rev. C. Voysey in case you think it will interest him.

Trusting this will find you all right.

I remain,
affectionately yours
Dwipendranath Tagore

Baboo
Rajnarain Bose
Deoghur.

শ্রীতিপূর্ব্বক··· নিবেদনমিদং

ভ্রমণ হইবেক আবার তোমার সহিত সাক্ষাৎ হইবে, আবার তোমার সহিত একত্র ভ্রমণ হইবেক ইহা হইতে আর সুখের বিষয় কি আছে। পূজার সময়ে সময়ে যদি মেদিনীপুরে যাইবার পথে ওল থাকে তবে আমাকে জানাইবে। শ্রীযুক্ত ভট্টাচার্য্য মহাশয়কে কলিকাতায় থাকিয়া দর্শন পাইবার সম্ভাবনা হইয়াছে ইহাতে মন অত্যন্ত প্রফুল্ল হইল। তাঁহাকে আমার প্রীতিপূর্ব্বক নমস্কার জানাইবে। তাঁহার এখানে কতদিনের মধ্যে আসিবার সম্ভাবনা আছে? তাঁহাকে বলিবেন যে যদি তিনি আমাকে আসিয়া কলিকাতায় দেখা না পান তবে পলতার পরে গৌরহাটীর বাগানে আমাকে কৃপা করিয়া দেখা দিবেন। তোমার উপহার পাইয়া নির্ম্মল আনন্দ উপভোগ করিলাম এবং তাহা আমার চিরজীবনের সম্বল হইল। আমার অতি সৌভাগ্য যে তোমার সমান আমি **একজন** বন্ধু লাভ করিয়াছি; যত দিন যাইতেছে ততই তোমার মনের মনোহর সৌন্দর্য্য আমার মনকে আকৃষ্ট করিতেছে, আর অধিক কি লিখিব? সকলই তুমি জানিতেছ।

ইতি

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ শর্ম্মণঃ

২ আশ্বিন

১৭৭৭

৬

[একটি ঘণ্টার ছবি] ঘণ্টাবাদন বা অভিবাদন আমাদের এক সময়ের ডান হাত বাঁ হাত poor···Babu is taken away from us. তাঁহার স্মরণার্থে meeting করিবার জন্ত তাঁহার জামাতারা ব্যস্ত। আমাকে preside করবার জন্ত ধরা পাকড়া কচ্চেন; এ কাজ আমাকর্ত্তৃক হওয়া দুর্ঘট—কেননা I am a perfect novice in the trade। আপনি যদি একবার এখানে চকিতের ন্যায় আবির্ভূত হ'য়ে কাজটা সমাধা ক'রে যান তবে ভাল হয়। ·সতু এসেছেন, ১১ই মাঘে বক্তৃতা করেছিলেন। আমার শরীর ভাল না থাকাতে আমি এবার ১১ মাঘের উৎসবে যোগ দিতে পারি নাই। বেয়াই [নিরঞ্জন বাবু] এখানে এখন উপস্থিত। তিনি বলিলেন আপনার সঙ্গে তাঁর অনেক দিন সাক্ষাৎ নাই আপনাকে তাঁহার compliment দিতে। পরমপূজনীয় কর্ত্তামহাশয় এখন going on well—অর্থাৎ smoothly. আমি convalescent. আপনি এখন কেমন আছেন? রাজেন্দ্রলাল মিত্রের বাড়িটা কি খালি আছে—কত ভাড়া? কার জিম্মায় আছে? আমাকে লিখিবেন। আজ এই পর্য্যন্ত।

আপনার Faust

সহিত যে অবস্থায় দেখাইয়াছেন, তাহাতে লেখকের এই হোটেলটিকে 'ম্যাজিক বোর্ড' বলিলে কোন দোষ হইবে না।

শঙ্করের লেখা "চৌরঙ্গী"র পর হোটেল সম্পর্কে কিংবা হোটেলের পটভূমিকায় উপন্যাস লেখার অপচেষ্টা লেখক না করিলেই বুদ্ধিমানের কাজ হইত। আরো কিছু বলিবার ছিল, কিন্তু বাজে উপন্যাস সম্পর্কে বৃথা আলোচনা করিয়া লাভ কি?

এই প্রসঙ্গে একটা কথা বলতে চাই। দেশে ফিল্ম সেন্সার করিবার যেমন ব্যবস্থা আছে—ছাঁইফোঁড় উপন্যাস রচয়িতাদের সম্পর্কেও সেই প্রকার কোন ব্যবস্থা করা একান্ত প্রয়োজন।

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের এম. এ, পি. আর এস. ডি ফিল, অধ্যাপক এই উপন্যাসটির এবং সঙ্গে সঙ্গে লেখকেরও প্রশংসাপত্র দিলেন কি দেখিয়া বুঝিতে পারিলাম না।

দুঃখের সহিত বলিতে হইতেছে—লেখক নিঃসন্দেহে কলিকাতার বড় বড় হোটেল দেখিয়াছেন বোধ হয় বাহির হইতেই, ভিতরে প্রবেশ করিবার চেষ্টা (খুব সম্ভবত) সাহসের অভাবে করেন নাই।

শ্রীহেমন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়

হিমকান্তা কাঠমাণ্ডু—শ্রীপ্রবোধ দে। প্রকাশক ইন্দ্রজিৎ চন্দ্র, অর্চনা পাবলিশার্স, ৮বি, রমানাথ সাধু লেন, কলিকাতা-৭, মূল্য—পাঁচ টাকা।

একটি শ্রেষ্ঠ রূপরসিকের মন লইয়া লেখক উপস্থিত হইয়াছেন প্রকৃতি দেবীর লীলাভূমি হিমালয়ের পাদদেশিক নেপালে। প্রকৃতির রূপে তিনি মুগ্ধ হইয়াছেন আর তাঁর সেই বিমুগ্ধ মনের পরিচয়টিকে অক্লেশে সাবলীল ভাষায় পরিবেশন করিয়াছেন। নেপালের সংস্কৃতি ইতিহাস, শিল্প, তার উপত্যকায় ছড়িয়ে থাকা উপলখণ্ডের মতই অজস্র উপকথা এবং লোক-গাথা সবকিছু এই গ্রন্থে অল্প বিস্তর সন্নিবিষ্ট হইয়াছে।

ভ্রমণকাহিনী নামে পরিচিত যে সমস্ত গ্রন্থ বাংলা সাহিত্যে প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছে, তাহার অধিকাংশের মধ্যে উপন্যাস-রস সৃষ্টি করার একটা উৎকট প্রচেষ্টা আছে। বর্তমান লেখকও সেই প্রলোভন হইতে মুক্ত নন। নীরস উপাখ্যান না বলিলেই ভাল হইত; বিশেষতঃ অঙ্কুমারমতি কিশোরের নিকট নীরস জীবনের অভিজ্ঞতা। লেখক কুশলী আলোকচিত্রশিল্পী বটে, নেপালের প্রকৃতি ও মানুষের কীর্তির বহু আলোকচিত্র এই গ্রন্থখানির অন্যতম আকর্ষণ। মনে হয় গ্রন্থখানি পাঠকসমাজে আদৃত হইবে।

শ্রীযোগেশচন্দ্র বসু

দ্বারকানাথ ঠাকুর—কিশোরীচাঁদ মিত্র। অনুবাদক—শ্রীদ্বিজেন্দ্রলাল নাথ। সম্পাদক—শ্রীকল্যাণ কুমার দাশগুপ্ত। সম্বোধি পাবলিকেশন্স প্রাইভেট লিমিটেড (২২, ষ্ট্রাণ্ড রোড কলিকাতা-১) কর্তৃক প্রকাশিত। পৃঃ ৩৩২। মূল্য—দশ টাকা।

উনবিংশ শতক বাঙলার মানস-পরিমণ্ডল সৃষ্টির যুগ। এ যুগে যে কয়েকজন মনীষীর অক্লান্ত কর্মতৎপরতায় বাঙলার রাজনৈতিক, সামাজিক ও সর্বোপরি অর্থনৈতিক কাঠামো প্রস্তুত হয়েছিল দ্বারকানাথ ঠাকুর তাঁদের অন্যতম। এই কর্মবীর মহান্ পুরুষের অনলস প্রচেষ্টা ও বহু দূরদৃষ্টির ফলেই সে যুগে বাঙলার অর্থনৈতিক পটভূমিকার পরিবর্তন সাধিত হয়েছিল। "কার টেগোর এণ্ড কোম্পানী" স্থাপনের মাধ্যমে দ্বারকানাথ যুরোপীয় ও বাঙালী-ব্যবসায়ীর মিলনের প্রথম দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিলেন। প্রতীচ্যের সাহিত্য ও সংস্কৃতির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে আসার ফলেই দ্বারকানাথ প্রমুখ মনীষীগণের চিন্তায় ও কর্মে এক নূতন ও ব্যাপক ধর্মনিরপেক্ষ সংস্কারমুক্ত দৃষ্টির প্রসার ঘটেছিল। দ্বারকানাথ অদম্য কর্মশক্তি ও কর্তব্যনিষ্ঠার ফলস্বরূপ বাণিজ্যলক্ষ্মীর অজিত আশীর্বাদ লাভ করেছিলেন, কিন্তু সে অর্থ তিনি একা ভোগ করেন নি। অকৃপণ হস্তে তা দেশের ও দশের সেবায় ব্যয় করেছেন। কিন্তু এই তাঁর একমাত্র পরিচয় নয়।

লোকের বিচারে দ্বারকানাথ আজও বাঙলার জনমানসে 'প্রিন্স' হয়েই বেঁচে রয়েছেন। বাঙালীর আত্মনির্ভর জীবনবোধের সৃষ্টির পশ্চাতে তাঁর অসামান্য দানের কথা আমরা ভুলেছি। দেশের ও দশের হিতকামনায় দ্বারকানাথের কর্মতৎপরতার কোন খোঁজ আমরা রাখি না। তিনি ছিলেন রামমোহন রায়ের যুগপ্রবর্তন প্রচেষ্টার অন্যতম কর্ণধার। জন এ্যাডাম ১৮২৩ খ্রীষ্টাব্দে ভারতশাসক পদে অধিষ্ঠিত হয়ে যখন মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা হরণে উদ্যোগী হন তখন রামমোহন এই আইনের বিরুদ্ধে প্রবল আন্দোলন জাগিয়ে তুলেছিলেন। এই সময়ে রামমোহনের পাশে এসে দাঁড়িয়েছিলেন দ্বারকানাথ। হিন্দু কলেজের পুনর্গঠনে তিনি হেয়ার সাহেবকে সাহায্য করেছিলেন। মেডিক্যাল কলেজ প্রতিষ্ঠার প্রথম পর্বে সংস্কারমুক্ত মন নিয়ে প্রথম শবব্যবচ্ছেদের সময় উপস্থিত থেকে দেশে পাশ্চাত্য জ্ঞান বিজ্ঞানের প্রসারে উৎসাহ দিয়েছিলেন। সেকালের "কলিকাতার ভদ্র ও শিক্ষিত হিন্দুসমাজের সর্বাগ্রগণ্য ব্যক্তি" দ্বারকানাথ সহমরণ প্রথা নিবারণে ও ব্রাহ্মধর্মের প্রবর্তনে রামমোহনকে সাহায্য করেছিলেন। দেশবাসীর মনে রাজনৈতিক চেতনা সঞ্চারের জন্য তিনি বিলাত থেকে বাগ্মীপ্রবর ভারত হিতৈষী জর্জ টমসনকে ভারতে আনেন। এককথায় অর্থনৈতিক, সামাজিক বা শিক্ষা-সম্বন্ধীয় সকল বিষয়ে মুক্তহস্তে সাহায্যের জন্য দ্বারকানাথ এগিয়ে এসেছিলেন ও সে যুগের সর্বশ্রেণীর লোকের প্রীতি ও শ্রদ্ধা অর্জন করেছিলেন।

জাতীয় চেতনার এই মহান্ স্রষ্টার বিচিত্র কর্মমুখর জীবনকথার সঙ্গে বাঙালীর পরিচয় করিয়ে দেওয়ার ব্রত বহুদিন কেউ গ্রহণ করেন নি। সুবিখ্যাত প্যারীচাঁদ মিত্রের (টেকচাঁদ ঠাকুর) ভ্রাতা কিশোরী চাঁদ মিত্র ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দে Memoir of Dwarakanath Tagore প্রকাশ করেন। আলোচ্য গ্রন্থটি তারই বঙ্গানুবাদ। স্বচ্ছ ও সাবলীল ভাষায় অনুবাদ করেছেন অধ্যাপক দ্বিজেন্দ্রলাল নাথ। অনুবাদে মূল গ্রন্থের ভাব যথাযথ রক্ষিত হয়েছে। "সম্বোধি দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থমালার" সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক কল্যাণকুমার দাশগুপ্ত গ্রন্থটির সম্পাদনা করেছেন। শ্রীদাশগুপ্ত এরূপ অমূল্য গ্রন্থের সম্পাদনায় যে অটুট নিষ্ঠা ও ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় দিয়েছেন তার জন্য বাংলার সহৃদয় সমাজের অকুণ্ঠ সাধুবাদ তাঁর উপর বর্ষিত হবে সন্দেহ নেই। গ্রন্থের শেষে অর্ধশত পৃষ্ঠাব্যাপী তাঁর ঐতিহাসিক তথ্যে পূর্ণ সম্পাদকীয় "প্রসঙ্গকথায়" জিজ্ঞাসু পাঠকের মন পরিতৃপ্ত হবে। রম্য রচনার এই ব্যাপক বিস্তৃতির যুগে এরূপ সর্বাঙ্গসুন্দর গবেষণামূলক সম্পাদনা বোধ করি বিরল হয়ে উঠেছে। প্রকাশক এরূপ সংগ্রহের প্রকাশনাকে "আনন্দময় কর্তব্য" বলে গ্রহণ করেছেন—তা সৎসাহস ও অকুণ্ঠ সাহিত্যপ্রীতির পরিচয় বটে। বাঙলার মননসাহিত্যে গ্রন্থটি মূল্যবান সংযোজনরূপে গৃহীত হবে। বিগত শতকের বাঙলাদেশের সাংস্কৃতিক ইতিহাসের যাঁরা অনুসন্ধিৎসু পাঠক তাঁদের পক্ষে বইটি অপরিহার্য। গ্রন্থটির বহুল সমাদর কামনা করি।

শ্রীগোপিকামোহন ভট্টাচার্য্য

সম্পাদক—শ্রীকেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়
মুদ্রাকর ও প্রকাশক—শ্রীনিবারণচন্দ্র দাস, প্রবাসী প্রেস প্রাইভেট লিঃ, ১২০।২ আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলিকাতা-৯

ভারতভ্রমণে ফেডারেল জার্ম্মানীর প্রেসিডেণ্ট মিঃ লুবকে ও তদীয় পত্নী

করিতে বলেন। ঐ অধিবেশনে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সভাপতিত্ব করেন। কমিটি নয় প্রকার কাজের কর্মসূচি গ্রহণ করিয়াছেন। নিম্নে সেই নয় দফা বিবৃত হইল :

(১) জাতীয় স্বেচ্ছাসেবক সমিতি গঠন, (২) কলেজ ছাত্রদের জাতীয় সমর শিক্ষার্থীবাহিনীর অন্তর্ভুক্ত করার জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ, (৩) অগ্নিনির্বাপণ, উদ্ধারকার্য ও প্রাথমিক চিকিৎসার জন্য অসামরিক প্রতিরক্ষা সংস্থা গঠন। এই উদ্দেশ্যে প্রত্যেক শহরের শতকরা দশ জন লোককে সংগৃহীত করা হইবে, (৪) হোমগার্ড বাহিনী গঠন, (৫) স্বেচ্ছাশ্রমিক বাহিনী গঠন, (৬) ভূমিসেনা গঠন, (৭) যুবক মহিলা স্বেচ্ছাসৈন্য বাহিনী গঠন, (৮) চিকিৎসক, ইঞ্জিনিয়ার, কারিগরি বিশেষজ্ঞদের লইয়া স্বেচ্ছা সার্ভিস বাহিনী গঠন, (৯) স্বেচ্ছা পরিবহণ বাহিনী গঠন।

কেন্দ্রীয় নাগরিক পরিষদ জেলা ও গ্রাম কমিটি এবং ব্লক উন্নয়ন অফিসারদের মাধ্যমে এ পরিকল্পনা রূপায়িত করিবেন।

কমিটি বলেন যে, জাতীয় প্রতিরক্ষা সম্পর্কে কোন অননুমোদিত পোষ্টার প্রদর্শন করা উচিত নহে। জাতীয় প্রতিরক্ষা তহবিলে অননুমোদিত অর্থ সংগ্রহ বন্ধ করা উচিত।

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, কয়েকটি সংবাদপত্র এরূপ রিপোর্ট প্রকাশ করিতেছেন, যাহা আমাদের যুদ্ধপ্রচেষ্টা ব্যাহত করিতে পারে।

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ঐ সময় বলেন যে, ঐ সকল সংবাদপত্রের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা অবলম্বিত হইবে। সেই সংবাদপত্রগুলি কি ভাবে যুদ্ধপ্রচেষ্টা ব্যাহত করিতেছে এবং তাহাদের বিরুদ্ধে কি ব্যবস্থা সরকার করিবেন বলিয়া মনস্থ করিতেছেন সে বিষয়ে কোনও সংবাদ প্রকাশিত হয় নাই। বিমান-আক্রমণ হইতে রক্ষা ব্যবস্থা (এ আর পি) বিষয়ে একটি কর্মসূচী প্রণয়নের জন্য তিনি ১৩ই ডিসেম্বর একটি কর্মচারী সম্মেলন আহ্বান করিয়াছেন এ সংবাদও তিনি ঐখানেই দিয়াছিলেন।

এই সকল বৈঠক ও সম্মেলনে যে কথাবার্তা হয় তাহা কতটা ফলপ্রসূ হইতে পারে সে বিষয়ে আমাদের ধারণা খুবই অস্পষ্ট। তাহার একটা কারণ এই যে, ঐ সকল বিষয়ে প্রচার কিছুই বিশেষ হয় না। একে ত নয়াদিল্লীর সঙ্গে ভারতের সাধারণ জনের বিশেষ কোনও যোগ নাই। যে সকল রথী-মহারথিগণ সেখানে অধিকারীরূপে প্রতিষ্ঠিত, সাধারণ জনে ক্বচিৎ-কদাচিৎ মাঠে-ময়দানে তাঁহাদের দর্শন ও তাঁহাদের ভাষণ শ্রবণ করে—তাহাও দূর হইতে। এবং যাঁহাদের ঐ সকল মহাজনের সান্নিধ্যে যাইবার ও প্রত্যক্ষভাবে তাঁহাদের দর্শন ও তাঁহাদের সঙ্গে কথাবার্তা চালাইবার অধিকার আছে তাঁহাদের মধ্যে অধিকাংশ শতকরা ৯৯ জন স্বার্থ পূরণের জন্য সেখানে যাইয়া থাকেন এবং সেই কারণে তাঁহাদের মারফৎ জনসাধারণের সহিত কর্তৃপক্ষের কোনও যোগ ত ঘটেই না, বরঞ্চ ঐ স্বার্থান্বেষী ও তোষামোদকারীর দলই উচ্চ অধিকারীদিগের সহিত জনসাধারণের প্রত্যক্ষ যোগসূত্র যৎসামান্য যাহা আছে তাহাও ছিন্ন করিতে চেষ্টিত থাকে। ফলে এমন উচ্চ অধিকারিবর্গের সহিত সাধারণের যোগ শুধুমাত্র সংবাদপত্র ও বেতারের মাধ্যমে ঘটে এবং সেখানেও সাময়িক ও সংবাদপত্রের দায়িত্ব-অজ্ঞতা এবং বেতারবার্তা লেখকের কর্তব্যজ্ঞান ও লেখনী কৌশলের অভাবে সংবাদ প্রচারে বিষম তারতম্য ঘটে এবং অপপ্রচারের সুযোগও বৃদ্ধি পায়।

অন্যদিকে উচ্চ অধিকারিবর্গ সাধারণ জনের মনে কি চলিতেছে, তাহারা কি শুনিতেছে ও কি বলিতেছে এবং সেই বিষয়ে পরিস্থিতিতে তাহাদের মানসিক প্রতিক্রিয়া কি ঘটিতেছে, এ বিষয়ে সম্পূর্ণ নির্ভর করেন সংবাদপত্র ও লোকসভা ইত্যাদির সভ্যগণের কথাবার্তার উপর। বলা বাহুল্য, ঐ দুইটির কোনটিই ঐ কাজ ঠিকমত করিতে পারে না। সংবাদপত্র গুজব পরিবেশন করিতে পারে না—অন্ততঃ পক্ষে যদি সেই সংবাদপত্রের কর্ণধারগণের কাণ্ডজ্ঞান ও সত্যাসত্য জ্ঞান থাকে—কেননা, তাহাতে অপপ্রচারের পথ খুলিয়া যায়। আর লোকসভা, রাজ্যসভা, বিধানসভার সভ্যবৃন্দের মধ্যে কয়জনের এ সকল বিষয়ে কর্তব্যজ্ঞান আছে? অধিকাংশই ত দলপতির নির্দ্দেশে ওঠেন-বসেন এবং মুখ খোলেন ও বন্ধ করেন এবং দলপতির নির্দ্দেশ ত প্রায় সকল ক্ষেত্রেই দলগত স্বার্থ ও মতামতের ধারা অনুযায়ী হয়।

আপৎকালে এই কারণে, অর্থাৎ যোগসূত্রের অভাবে বিষম ভ্রম-প্রমাদের সৃষ্টি হয় এবং সেই ভ্রম-প্রমাদ গুজব ও অপপ্রচারে পরিণত হইতে সময় লাগে না যাহার ফলে জনসাধারণ বিভ্রান্ত ও বিপথে চালিত হইতে দেরী হয় না। অনেক ক্ষেত্রে সংবাদপত্র বিবেচনা না করিয়া অথবা কোন বিষয়কে ভয়াবহ ভাবে প্রদর্শিত করিয়া আতঙ্কের সৃষ্টি করে এবং অপপ্রচারের পথ না বুঝিয়া পরিষ্কার করিয়া দেয়। সেখানেও সরকারী প্রেস বিভাগের সজাগ দৃষ্টি না থাকিলে এইরূপ অনিচ্ছাকৃত আতঙ্ক সৃষ্টিও অবাধে চলিতে পারে, যাহার ফল

বাদের রূপটির সঙ্গে আমাদের যে ঘনিষ্ঠ পরিচয় ইতিমধ্যেই ঘটিয়াছে, তাহাতে তাহাদের একতরফা যুদ্ধবিরতির পরবর্ত্তী ধাপে কি পরিস্থিতির সম্মুখীন হইতে হইবে ইহা খুব সুস্পষ্ট এখন পর্য্যন্ত না হইলেও, আমাদের তরফ হইতে জঙ্গী প্রস্তুতির অতি প্রয়োজনীয়তা যে কিছুমাত্র লাঘব হয় নাই, সে বিষয়ে কোন সন্দেহেরই কারণ নাই।

বর্ত্তমান আলোচনায় আমরা এই প্রস্তুতির প্রয়োজনে যে আর্থিক আয়োজনের প্রয়োজন হইবে সেই প্রসঙ্গেরই উল্লেখ করিব। সম্প্রতি লোকসভায় অর্থমন্ত্রী প্রতিরক্ষার প্রয়োজনে যে অতিরিক্ত প্রায় ১০০ কোটি টাকা ব্যয়বরাদ্দের বিল পাস করাইয়া লইয়াছেন, দেখা যাইতেছে ইহা পূরণ করিবার জন্য কোন অতিরিক্ত কর বসানোর ব্যবস্থা করা হয় নাই। স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, বর্ত্তমান বৎসরের প্রথম দিকে যে বার্ষিক বাজেট লোকসভা পাস করিয়াছেন তাহাতে প্রায় ৮৮ কোটি টাকার ঘাটতি ছিল। বর্ত্তমান অতিরিক্ত ব্যয়বরাদ্দের ফলে এই ঘাটতি এখন মোট ১৮৮ কোটি টাকায় উঠিয়াছে এবং এই মোটা অঙ্কের ঘাটতি পূরণ করিবার কোন ব্যবস্থা বাজেটে করা হয় নাই। ইহার খানিকটা কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন অধিকরণিকের ব্যয়সঙ্কোচ করিয়া পূরণ করা হইবে বলিয়া প্রতিশ্রুতি অবশ্য দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু ইহার পরিমাণ খুব বেশী হইলেও মোট ঘাটতির শতকরা ৫ হইতে ৭ টাকার বেশী হইবে এমন আশা কোনমতেই করা যায় না, অন্ততঃ এখনই তাহা সম্ভব হইবে এমন আশা অসম্ভাব্য। দেশের ব্যবসায়ী গোষ্ঠীর তরফ হইতে ফেডারেশন অব ইণ্ডিয়ান চেম্বার্স অব কমার্স এণ্ড ইণ্ডাষ্ট্রীস্ (Federation of Indian Chambers of Commerce & Industry) সরকারকে প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন যে, এই ঘাটতি যদি অতিরিক্ত ট্যাক্স বরাদ্দের দ্বারা পূরণ করিবার ব্যবস্থা না করা হয়, তাহা হইলে তাহারা তাহাদের ব্যবসায়ের আয়ের একটা নির্দ্দিষ্ট অংশ সরকারী তহবিলে দান করিয়া এই ঘাটতি পূরণ করিবার পথে সরকারের সহায়তা করিবেন। কিন্তু এইদিক হইতে মোট আন্দাজ ১৫ কোটি টাকা মাত্র আসিবার সম্ভাবনা আছে। অতএব অতিরিক্ত ট্যাক্স ব্যতীত অন্য কোনও উপায়েই যে এই ঘাটতি পূরণ করা সম্ভব নয়, এ কথাটা স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে। সম্প্রতি কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রীও স্বীকার করিয়াছেন যে, অতিরিক্ত ট্যাক্স ধার্য্য করা অবশ্যই প্রয়োজন হইবে।

কিন্তু এ বিষয়ে অবিলম্বে ব্যবস্থা অবলম্বন করিবার একান্ত প্রয়োজনের কোন তাগিদ ইঁহাদের মধ্যে দেখা যাইতেছে না। প্রতিরক্ষা খাতে কতটা অতিরিক্ত ব্যয়বরাদ্দের শেষ পর্য্যন্ত প্রয়োজন হইবে সে বিষয়ে একটা স্থির সিদ্ধান্তে উপস্থিত হইতে না পারা পর্য্যন্ত যে ইঁহারা এই বিষয়ে কোন ব্যবস্থা অবলম্বন করিবেন না, ইহাই মনে হইতেছে। অথচ এই অনিশ্চয়তা যে কি আর্থিক সঙ্কটের সূচনা করিতে পারে সে সম্বন্ধে কেন্দ্রীয় সরকার বা তাহার অর্থমন্ত্রণাদপ্তর আদৌ সচেতন এমন আভাস পাওয়া যাইতেছে না।

প্রতিরক্ষা সম্পর্কে বর্ত্তমান অতিরিক্ত ১০০ কোটি টাকার বরাদ্দ সত্ত্বেও যে অদূর ভবিষ্যতে আরও প্রভূত পরিমাণ অর্থ বরাদ্দ করা অবশ্য প্রয়োজন হইবে এ বিষয়ে সন্দেহের কোন কারণ নাই। প্রধানমন্ত্রী ইতিমধ্যে একবার বলিয়াছিলেন যে, দেশের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা উপযুক্ত ভাবে সুদৃঢ় করিতে হইলে দেশের সশস্ত্র প্রতিরক্ষাবাহিনীগুলিকে ন্যূনপক্ষে দ্বিগুণ শক্তিমান করিয়া তুলিতে হইবে। ইহা করিতে হইলে প্রতিরক্ষা খাতে ব্যয়বরাদ্দও যে অনুরূপ অনুপাতে বাড়াইবার প্রয়োজন হইবে ইহা সহজেই অনুমেয়। অবশ্য এই বর্দ্ধিত ব্যয়-বরাদ্দের কতটা বৈদেশিক মুদ্রায় হইবে এবং তাহার মধ্যে কতটা পরিমাণ তৃতীয় প্লানে বরাদ্দ বৈদেশিক মুদ্রা প্রতিরক্ষা শিল্পসমূহে নিয়োগ করা সম্ভব হইবে, এ সকল হিসাব নির্ভুল ভাবে করিতে হইলে সময়ের প্রয়োজন। কিন্তু ইহাও সত্য যে, ইহা ছাড়াও দেশীয় মুদ্রায় প্রতিরক্ষা ব্যয়বরাদ্দ প্রভূত পরিমাণে বাড়ান অবশ্য প্রয়োজন হইবে। সশস্ত্রবাহিনীর সংখ্যা দ্বিগুণ করিতে হইলে বর্দ্ধিত সংখ্যার সশস্ত্রবাহিনীর একমাত্র বেতন-ভাতা ইত্যাদিতেই মোটামুটি ১৫০ হইতে ২০০ কোটি টাকা অতিরিক্ত ব্যয়ের ব্যবস্থা করিতে হইবে।

এই প্রায় অবশ্যম্ভাবী অদূর-ভবিষ্যৎ পরিস্থিতির জন্য এখন হইতেই যে উপযুক্ত আর্থিক প্রস্তুতির প্রয়োজন এই কথাটা যেন সরকারী মহলে আজিও স্পষ্ট হইয়া উঠে নাই বলিয়া মনে হইতেছে। কেননা এখন হইতেই উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে না পারিলে যে পরে আশু প্রয়োজনের সময় নূতন ট্যাক্স ধার্য্য করা বা কার্য্যকরী ভাবে সেগুলি আদায় করা প্রভূতভাবে বিঘ্নিত হইবার আশঙ্কা আছে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। প্রথমতঃ, তৃতীয় প্লানের তৃতীয় বার্ষিক বরাদ্দের প্রয়োজনেই ট্যাক্স

বাড়াইবার প্রয়োজন আগামী বৎসরে অনিবার্য্য হইয়া উঠিবে। অতএব সম্প্রসারিত প্রতিরক্ষা বরাদ্দ ও তৃতীয় প্ল্যানের জন্য অতিরিক্ত বরাদ্দ মিলিয়া নূতন ট্যাক্সের চাপ একত্রে খুব বেশী করিয়া অনুভূত হইবে। দ্বিতীয়তঃ, দেশের যে আর্থিক অবস্থায় এই সকল নূতন প্রয়োজন আমাদের সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছে তাহাতে একটা অতিরিক্ত চাহিদার অবস্থা ইতিমধ্যেই সৃষ্টি হইয়া উঠিয়াছে। নূতন ট্যাক্সের দ্বারা এই অতিরিক্ত চাহিদার অবস্থা দমন করিতে না পারিলে, বিশেষ করিয়া বর্তমান বাজেট-ঘাটতির অবস্থায় সকল যত্ন সত্ত্বেও অচিরে মূল্যবৃদ্ধির চড়তি অবস্থা ঠেকান সম্ভব হইবে বলিয়া মনে হয় না, এবং একবার এই অবস্থার সুরু হইলে নূতন বৎসরের সাধারণ বাজেট মারফৎ ট্যাক্স বৃদ্ধির প্রস্তাব কার্য্যকরী করিয়া তোলাও প্রায় অসম্ভব হইয়া উঠিবে।

অতএব অচিরেই যে এ বিষয়ে ব্যবস্থা অবলম্বন করা একান্ত প্রয়োজন সেই বিষয়ে দ্বিধা হইবার কোন সমীচীন কারণ দেখিতে পাওয়া যায় না। এই প্রসঙ্গে ইহা হৃদয়ঙ্গম করা প্রয়োজন যে, দেশের সাধারণ অবস্থাতেই মূল্যমান সমতার (Price Stability) অনিবার্য্য প্রয়োজন সম্বন্ধে কোনই সন্দেহের কারণ নাই, কিন্তু বর্তমান জাতীয় সঙ্কটের পরিস্থিতিতে ইহার প্রয়োজনীয়তা যে আরও কত বেশী গুরুতর সে বিষয়ে কেন যথেষ্ট সচেতনতার আভাস দেখিতে পাওয়া যায় না। অবশ্য এ কথাও ঠিক নহে যে, এখনি অতিরিক্ত বাজেটের মাধ্যমে অতিরিক্ত ট্যাক্স ধার্য্য করিতে পারিলেই মূল্যবৃদ্ধির আশঙ্কা সমূলে উৎপাটিত হইবে। বস্তুতঃ সঙ্গে সঙ্গে দেশের লোকের ভোগসঙ্কোচ করিতে না পারিলে ইহা সম্পূর্ণ সার্থকভাবে সিদ্ধ করা সম্ভব নহে। কিন্তু কি ভাবে এবং কোন্ কোন্ ভোগ্যপণ্যের বিষয়ে এই প্রয়োজনীয় ভোগসঙ্কোচ সম্ভব হইতে পারে সে বিষয়েও বিচারের প্রয়োজন। নিরপেক্ষ বিচারে দেখা যাইবে যে, গত পরিকল্পনার দশ-বারো বৎসরের মধ্যে যতবার দৃশ্যতঃ মূল্যবৃদ্ধি ঘটিয়াছে, তাহার প্রায় প্রত্যেকটিই সুরুতে খাদ্যশস্য ও অনুরূপ অবশ্য প্রয়োজনীয় ভোগ্যপণ্যের সরবরাহের ঘাটতি হইতেই প্রেরণা লাভ করিয়াছিল। অতএব কেবলমাত্র ভোগ সঙ্কোচের উপদেশ বর্ষণ করিয়াই ক্ষান্ত হইলে চলিবে না। মনে রাখিতে হইবে যে, দেশে খাদ্যশস্য বা অনুরূপ অবশ্যভোগ্য পণ্যাদির দেশে মাথাপিছু ভোগের পরিমাণ এতই কম যে, এইদিক দিয়া ভোগ-সঙ্কোচের কোন সম্ভাবনার সুবিধা নাই এবং যাহাতে এ সকলের সরবরাহে ঘাটতি না ঘটিতে পারে সেদিকে একান্ত সতর্কতার প্রয়োজন রহিয়াছে।

তবে এই প্রসঙ্গে এ কথাও স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, নূতন ট্যাক্স যেমন অবশ্য এবং এখনি প্রয়োজন, ইহার আয়োজনও এমনি হওয়া প্রয়োজন যাহার দ্বারা একদিকে অনাবশ্যক ভোগ্যের ভোগসঙ্কোচ ঘটাইতে পারা যায়, অন্যদিকে অবশ্য-ভোগ্য পণ্যগুলির উপরে যেন তাহাদের কোন চাপ না পড়ে। আমাদের বর্তমান কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রীর অতীত কীর্ত্তিকলাপ এ বিষয়ে নিতান্তই আশঙ্কাজনক উদাহরণ সৃষ্টি করিয়া রাখিয়াছে। তিনি প্রায়শঃই ট্যাক্স আদায়ের সুবিধা হইবে বলিয়া অবশ্যভোগ্য পণ্যাদির উপরে আবগারী শুল্ক বসাইয়া উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিয়া থাকেন। ইহার ফলে ট্যাক্স আদায় হয় বটে কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে মূল্যবৃদ্ধিও ঘটিয়া থাকে। বস্তুতঃ একটা নিরপেক্ষ হিসাব করিলে দেখা যাইবে যে, এভাবে সরকারের তহবিলে প্রতি ১০০্ টাকা জমা করিতে গিয়া ভোক্তাকে প্রায় ১,৫০০্ টাকা অতিরিক্ত ব্যয় করিতে হয়। সরিষার তৈলের উপর আবগারী শুল্কের উদাহরণটি হইতেই ইহা স্পষ্ট বুঝা যাইবে। সরকার প্রতি মণে ৫০ নয়া পয়সা শুল্ক লইতেছেন কিন্তু চিরকালের জন্য ভোক্তাকে এখন হইতে সেরকরা ২৫ নঃ পঃ (অর্থাৎ মণপ্রতি ১০=০০ টাকা) বেশী দাম দিতে হইতেছে। বস্তুতঃ এই ভাবেই অর্থমন্ত্রীর বদান্যতায় দরিদ্রের প্রাণ সংশয় করিয়া জাতীয় সম্পদ ও আয়ের যথাক্রমে শতকরা ৭০ ভাগ ও ৫০ ভাগ দেশের লোকসংখ্যার মাত্র শতকরা ১ জনের নিকট কেন্দ্রীভূত হইয়া পড়িয়াছে। কঃ নঃ

ধনীসম্প্রদায়, স্বর্ণবণ্ড ও দেশাত্মবোধ

দেশের বিরাট জনসংখ্যার ত্যাগের উপরে প্রতিষ্ঠিত সরকারী পরিকল্পনাপ্রসূত সম্পদ বৃদ্ধির প্রায় সমগ্র অংশ যেই শ্রেণী আত্মসাৎ করিতেছেন, তাঁহাদের মধ্যে আজিও দেশপ্রেমের অনুরূপ সাড়া জাগিয়াছে বলিয়া দেখিতে পাওয়া যাইতেছে না। স্বেচ্ছায় যে ইহারা দেশরক্ষার জন্য কোন প্রকার আত্মস্বার্থ বিসর্জ্জন দিতে প্রস্তুত হইবেন এমন আশাও করা যায় না। বরং এমন আশঙ্কা অমূলক বা অবাস্তব নহে যে ইহারা ভোগ্য পণ্যের ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় পণ্যসম্ভারের কালোবাজার করিয়া কি করিয়া আপনাদের সঞ্চিত সম্পদ আরও প্রভূত পরিমাণে বৃদ্ধি করিতে পারেন সেই সুযোগেরই সন্ধান করিতেছেন। দেশে মজুদ স্বর্ণ তহবিলের অধিকাংশ অংশই যে এই সম্প্রদায়ের কবলে রহিয়াছে সেই বিষয়ে কি কোন সন্দেহের অবকাশ আছে? অথচ ইহাদের নিকট হইতে নামমাত্র পরিমাণ স্বর্ণ আজি পর্য্যন্ত সংগ্রহ করা সম্ভব হইয়াছে। কিছুকাল পূর্ব্বে প্রচারিত কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রীর অনুমান অনুযায়ী কয়েক সহস্র কোটি টাকার স্বর্ণ দেশে গোপনে গুদামজাত হইয়া রহিয়াছে। এই পরিমাণের স্বর্ণ আজ দেশের জাতীয় সরকারের অধিকারে থাকিলে দেশের বর্ত্তমান সঙ্কটে

দেশরক্ষার কতটা যে সহায়ক হইতে পারিত তাহা নিতান্ত নিরক্ষর ব্যক্তিরও বুঝিতে আয়াস হইবার কথা নহে।

অথচ এই বিরাট মজুদ স্বর্ণের কিছুমাত্রও যে সরকারী তহবিলের দিকে প্রবাহিত হইতে সুরু করিয়াছে এমন সূচনা এখনও পর্য্যন্ত প্রত্যক্ষ হইতে সুরু করে নাই। স্বেচ্ছায় কখনও করিবে আদৌ সুরু করিবে এমনও আশা করিবার কোন কারণ ঘটে নাই। সরকারের পক্ষ হইতে ইহাদের এমন লোভ পর্য্যন্ত দেখান হইয়াছে, দেশরক্ষার প্রয়োজনে যাহারা তাহাদের নিকট মজুদ লুক্কায়িত স্বর্ণভাণ্ডার স্বর্ণ-বণ্ডের বিনিময়ে অর্পণ করিতে প্রস্তুত হইবে, তাহাদের ইহার উপরে সরকারের ন্যায্য পাওনা সম্পদকর অথবা আয়কর পর্য্যন্ত দিতে হইবে না। এমন কি, কি কি উপায়ে এই স্বর্ণসঞ্চয় তাঁহাদের তহবিলে উঠিয়াছে, এ বিষয়েও কখনই কোন প্রশ্ন করা হইবে না। কিন্তু ইহাতেও কোন বিশেষ কাজ হইতেছে বলিয়া দেখা যাইতেছে না। বরং নানাভাবে যে ইহারা ইহাদের লুক্কায়িত স্বর্ণসঞ্চয় সরকারের হস্তক্ষেপ হইতে সংরক্ষিত করিয়া রাখিবার আয়োজনে ব্যস্ত হইয়াছে তাহার সুস্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে।

ইহারা যে স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া দেশরক্ষার জন্য তাহাদের সম্পদভাণ্ডার সরকারের হাতে তুলিয়া দিতে রাজী হইবে না, এমন অনুমান করা কঠিন নহে। যাহারা দেশের লোকের অন্নবস্ত্রের বিনিময়ে, রাষ্ট্রের নিরাপত্তার কথা চিন্তা না করিয়া, বরং সেই প্রয়োজনের সুযোগে আপনাদের কালোবাজারী মুনাফা বৃদ্ধি করিতে সদাই তৎপর, তাহারা যে হঠাৎ রাতারাতি দেশপ্রেমিক হইয়া উঠিয়া তাহাদের দুর্নীতিলব্ধ সম্পদ দেশের প্রয়োজনে বিনিয়োগ করিতে তৎপর হইয়া উঠিবে ইহা অসম্ভব। এই স্বতঃসিদ্ধ সত্যটি কেন যে আমাদের দেশের সরকারের প্রধান নেতৃবৃন্দ আজিও হৃদয়ঙ্গম করিয়া উঠিতে পারিতেছেন না, তাহা বুঝা সহজ নহে। হয়ত ইঁহাদের স্নেহ ও প্রশ্রয়পুষ্ট এই সাম্প্রতিক ধনী সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে কোনও কঠিন নীতি ও ব্যবস্থা অবলম্বন করিবার প্রয়োজনকে ইঁহারা বেদনাদায়ক মনে করিয়া থাকেন। না হইলে দেশের নিরাপত্তা সাপক্ষে প্রণীত দেশরক্ষা আইনের বলে সরকারের হাতে যে জরুরী ক্ষমতা অর্পণ করা হইয়াছে, তাহা যথোপযুক্ত ভাবে প্রয়োগ করিলে যে ইহাদিগকে দমন করা কিছুই অসম্ভব নহে এই প্রত্যয় কি সরকারের জন্মে নাই? এই সকল আত্মস্বার্থসর্ব্বস্ব, সম্পূর্ণ দেশাত্মবোধশূন্য, দেশের জনসমষ্টির অসহায়তা ও সরকারী ঔদাসীন্যপুষ্ট, ধনী সম্প্রদায় যে কখনই আপনাদের সঞ্চিত স্বর্ণভাণ্ডার দেশের কাজে প্রবাহিত করিতে স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া সম্মত হইবে না, ইহা অনুমান করা কঠিন ছিল না। এই অতি সুস্পষ্ট সত্যটি কিছুকাল পূর্ব্বেই ব্রহ্মদেশের রাজ সরকার সম্পূর্ণ হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন এবং আইনের দ্বারা সেফ্ ডিপোজিট ভল্টগুলিকে সরকারী অধিকারভুক্ত করিয়া (freeze) দিয়া দেশের সঞ্চিত সম্পদ দেশের কাজে প্রয়োগ করিবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। আমাদের দেশেও অনুরূপ ব্যবস্থা অব-লম্বনে কোন নৈতিক বা আইনগত বাধা ছিল না। কেন যে সরকার ইহা করেন নাই তাহা অনুমান করা অসম্ভব না হইলেও সহজ নহে। কখনও যে এইরূপ জরুরী ব্যবস্থা অবলম্বন করিবার অভিপ্রায় সরকারের আদৌ আছে, এমন আভাসও পাওয়া যায় না। বরং বাজারের দিকে চাহিলে দেখা যায় যে, হঠাৎ পড়িয়া-যাওয়া সোনার দর আবার ধীরে ধীরে উপরের দিকে চলিতে সুরু করিয়াছে। কয়েক সপ্তাহ পূর্ব্বে অর্থমন্ত্রী শ্রী দেশাই বলেন উপরোক্ত সুবিধাগুলি কেবলমাত্র যাঁহারা দেশে সোনার বাজার দর আন্তর্জ্জাতিক মানে নামিয়া যাইবার পূর্ব্বে স্বর্ণবণ্ড কিনিবেন শুধু তাঁহাদেরই দেওয়া হইবে। যাঁহারা পরে আসিবেন তাঁহারা পাইবেন না। ইহার ফলে সোনার বাজার দর সাময়িক ভাবে খুব কমিয়া গিয়াছিল, কিন্তু সেটা সাময়িক মাত্র। দর ধীরে ধীরে বাড়িতে বাড়িতে গত সপ্তাহে ১১৮৷৷০ ভরিতে উঠে, তার পরও আরও বাড়িতেছে এবং লিখিবার সময় ১২৩৷৷০ টাকা হইয়াছে। ইহা হইতে প্রতীতি হয় যে, তাহাদের মজুদ স্বর্ণভাণ্ডারে সরকার কখনই যে হস্তক্ষেপ করিতে সমর্থ হইবেন না, এই বিষয়ে মজুদস্বর্ণের মালিক আমাদের ধনী সম্প্রদায়ের দল সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত।

দেশরক্ষার একান্ত ও আশু প্রয়োজনে সরকারী তহবিলে প্রভূত পরিমাণ স্বর্ণসংগ্রহের ব্যবস্থা বিদেশী জঙ্গী আক্রমণ সার্থকভাবে প্রতিহত করিবার যে একটি প্রধান আয়োজন, সেই বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নাই। কোন ব্যক্তিগত স্বার্থ বা শ্রেণীপ্রাধান্যই এই রাষ্ট্রীয় প্রয়োজনের ঊর্দ্ধে স্থান পাইতে পারে না। যাহার নিকট যথেষ্ট পরিমাণ স্বর্ণ সঞ্চিত রহিয়াছে দেশের ও রাষ্ট্রের সঙ্কটের সময় প্রয়োজন হইলে তাহা স্বেচ্ছায় সরকারী তহবিলে জমা দিবার দায়িত্ব হইতে সে কোন কারণেই অব্যাহতি পাইতে পারে না। স্বেচ্ছায় না দিলে তাহার নিকট হইতে জোর করিয়া এ সঞ্চয় বাহির করিয়া লইবার অধিকার সরকারের আছে এবং থাকা প্রয়োজন। ইহাদের প্রতি সরকারের এই স্নেহপ্রবণ পক্ষপাতিত্বের কারণ কি?

কঃ নঃ

আচার্য রামমোহনের সঙ্গীত-প্রসঙ্গ

শ্রীদিলীপকুমার মুখোপাধ্যায়

সঙ্গীতের পৃষ্ঠপোষকতা

রামমোহন ১৮১৪ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যভাগ থেকে কলকাতায় স্থায়ীভাবে বসবাস করতে আরম্ভ করলেন। রংপুরের কলেক্টর জন ডিগবীর অধীনে কাজ ও ব্যবসায় থেকে অবসর নিয়ে তিনি কলকাতায় চলে এলেন।

শুধু রংপুরের কাজ নয়, অর্থকরী কর্মজীবন থেকেই অবসর গ্রহণ করে রামমোহন কলকাতায় বাস করতে এলেন এবং তার পর থেকে আরম্ভ হ'ল তাঁর প্রকৃত কর্মজীবন। ধর্মীয়, সামাজিক, রাষ্ট্রীয় ও বাংলা সাহিত্য-ক্ষেত্রে তাঁর কর্মধারা পূর্ণ গতিতে উৎসারিত হ'ল। নিজেকে তিনি সম্পূর্ণভাবে নিয়োজিত করলেন আদর্শের সাধনায়। বিদ্যা বুদ্ধি সম্পত্তি ও প্রতিপত্তি সমস্তই দেশবাসীর কল্যাণকর কাজে তিনি উৎসর্গ করলেন। সভা ও বিদ্যালয় স্থাপন ক'রে, গ্রন্থ ও পত্রিকাদি প্রকাশ ও প্রচার ক'রে যুগাচার্য রামমোহন তাঁর বিশিষ্ট চিন্তা-ধারাগুলিকে রূপ দিতে লাগলেন। যুগ-মানস ও যুগ-জীবন প্রতিফলিত হ'ল তাঁর ব্যক্তিজীবনে।

তাঁর সেই বিভিন্নমুখী কার্যাবলী ভারতীয় রেনেসাঁসের ভূমিকাপর্ব। তার পরিচয় দান বর্তমান নিবন্ধে প্রাসঙ্গিক নয়। সঙ্গীতক্ষেত্রে রামমোহনের অবদানই আমাদের আলোচ্য বিষয়।

তাঁর সঙ্গীত-প্রসঙ্গেরও সূত্রপাত হয় কলকাতায় স্থায়ী-ভাবে বাস করবার সময়ে।

কালী মীর্জার শিক্ষাধীনে রামমোহনের সঙ্গীত-'শিক্ষা'র কথা ইতোপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। তাতে দেখা গেছে যে, কালী মীর্জার কাছে তাঁর সঙ্গীতশিক্ষার কাল সঠিকভাবে জানা যায় না। তিনি কালী মীর্জার সংস্পর্শে ১৮০১ খ্রীষ্টাব্দে কিংবা তার দু'এক বছরের মধ্যে আসতে পারেন। কারণ তিনি সে সময় কলকাতায় অবস্থান করেছিলেন এবং কালী মীর্জারও তখন কলকাতা-বাস অসম্ভব নয়। ১৮০১ খ্রীষ্টাব্দের তিন-চার বছর আগেও তাঁদের দুজনের যোগাযোগ ঘটতে পারে—বর্দ্ধমানে। সেখানে রামমোহন বিষয়-সংক্রান্ত ব্যাপারে এবং পিতার সঙ্গে সাক্ষাতের জন্যে যাতায়াত করতেন (তাঁর পিতা রামকান্ত রায় ছিলেন মহারাজা তেজচাঁদের জননী মহারাণী বিষ্ণুকুমারীর জমিদারীর তত্ত্বাবধায়ক; বর্দ্ধমানে রামকান্তের বিষয়-সম্পত্তিও ছিল)। এবং কালী মীর্জা ছিলেন গুপ্তিপাড়ার অধিবাসী; পরন্তু, বর্দ্ধমান রাজ-দরবারের সঙ্গেও মীর্জা মহাশয়ের সম্পর্ক ছিল এবং তার কয়েক বছর পরে কুমার প্রতাপচাঁদের দরবারে তিনি সভা-গায়কও নিযুক্ত হয়েছিলেন।

রামমোহন যদি কলকাতায় স্থায়ীভাবে বাস আরম্ভ করবার পর, অর্থাৎ ১৮১৪ খ্রীষ্টাব্দের দ্বিতীয়ার্দ্ধে, কালী মীর্জার সঙ্গে প্রথম পরিচিত হন এবং সঙ্গীতচর্চা আরম্ভ করেন, তা হ'লে "মীর্জা মহাশয়ের সান্নিধ্যে সঙ্গীতশিক্ষার সময়ে মহাত্মা রামমোহনের হৃদয়ে অদ্বৈতবাদের বীজ প্রথম রোপিত হয়," এ কথার সার্থকতা থাকে না। কারণ তার অন্তত ১১ বছর আগে, ১৮০৩ খ্রীষ্টাব্দে রামমোহনের অদ্বৈতবাদী মনোভাবের প্রকাশ দেখা যায় তাঁর লিখিত "তুহ্‌ফাৎ-উল্-মুয়াহ্‌হিদিন" গ্রন্থে।

মীর্জা মহাশয়ের সঙ্গে রামমোহনের প্রথম যোগা-যোগের কাল সঠিকভাবে জানা না গেলেও, রামমোহনের গীত-রচনার ক্ষেত্রে প্রথম অবদানের কথা জানা যায়। তা হ'ল ১৮১৬ খ্রীষ্টাব্দের কথা। সে বছর রামমোহন সিন্ধু ভৈরবী সুরে (এবং হুরো তালে) এই গানখানি রচনা করেন—

> কে ভুলালো হায়,
> কল্পনাকে সত্য ক'রি জান, এ কি দায়;
> আপনি গড়হ যাকে,
> যে তোমার বশে থাকে
> কেমনে ঈশ্বর তাকে কহ অভিপ্রায়?
> কখনো ভূষণ দেও, কখনো আহার;
> ক্ষণেকে স্থাপহ, ক্ষণেক করহ সংহার।
> প্রভু বোলে মান যারে,
> সম্মুখে নাচাও তারে—
> হেন ভুল এ সংসারে দেখেছ কোথায়?

রামমোহন র'চত এই গানখানি, এই ব্রহ্মসঙ্গীতটি, তাঁর প্রতিষ্ঠিত "আত্মীয় সভা"র এক অধিবেশনে (১৮১৬ খ্রীঃ) গীত হয়। "আত্মীয় সভা" তিনি স্থাপন

করেছিলেন ১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দে, তাঁর ১১৩, সারকুলার রোডস্থ বাড়ীতে। ব্রহ্ম বিষয়ে আলোচনা ও উপাসনাদির জন্যে রামমোহন "আত্মীয় সভা" সংস্থাপিত করেন এবং এইটিই তাঁর কলকাতায় প্রথম সংস্থা।

"আত্মীয় সভা" সম্পর্কে একটি বিশেষ লক্ষ্যণীয় তথ্য এই যে, এখানকার প্রতি সাপ্তাহিক অধিবেশনে সঙ্গীতের অনুষ্ঠান হ'ত। এই সভার প্রত্যেক অধিবেশনে গোবিন্দ মালা নামক জনৈক গায়ক ব্রহ্মসঙ্গীত গাইতেন এবং বেদপাঠ করতেন শিবপ্রসাদ মিশ্র।

সঙ্গীত যে রামমোহনের অত্যন্ত প্রিয় ছিল, সঙ্গীত দ্বারা উপাসনার যে তিনি বিশেষ পক্ষপাতী ছিলেন, "আত্মীয় সভা" তার প্রথম দৃষ্টান্ত। উত্তরকালে ব্রাহ্ম সমাজে রামমোহন সঙ্গীতের দ্বারা যে উপাসনার প্রথা প্রবর্তন করেন, এবং তারও পরে আদি ব্রাহ্মসমাজ সঙ্গীত বিষয়ে তাঁর যে ধারা অনুসরণ করে—"আত্মীয় সভা"র সঙ্গীত অনুষ্ঠান তারই পূর্বরূপ। এখানকার প্রতি অধিবেশনে নিয়মিত ভাবে সঙ্গীতের অনুষ্ঠান রামমোহনের বিশিষ্ট সঙ্গীতপ্রীতির এবং সঙ্গীত-পৃষ্ঠপোষকতার প্রকাশক। ব্রহ্মসম্বন্ধীয় আলোচনার জন্যে স্থাপিত সভায় তিনি যে নিয়মিত সঙ্গীতানুষ্ঠানের ব্যবস্থা করলেন—যার পূর্ণতর রূপ দেখা যাবে তাঁর ১৮২৮ খ্রীষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত ব্রাহ্ম সমাজে—তার বিশেষ তাৎপর্য আছে বলে আমাদের ধারণা। সঙ্গীতকে, মার্গসঙ্গীতকে এই যে বিশেষ মর্যাদার আসন তিনি দিলেন, সঙ্গীতক্ষেত্রে এইটি রামমোহনের এক স্মরণীয় অবদানরূপে গণনীয়। তাঁর পৃষ্ঠপোষকতার জন্যে সঙ্গীত শিক্ষিত ও আধুনিক মনোভাবাপন্ন সমাজে স্থান লাভ করবার অনেকাংশে সুযোগ পেল। তার ফল সুদূরপ্রসারী।

এ কথার তাৎপর্য গ্রহণ করবার জন্যে সে যুগের সাঙ্গীতিক পরিবেশ সংক্ষেপে পর্যালোচনা করা প্রয়োজন।

রামমোহনের "কে ভুলালো হায়" গানখানি তাঁর গান রচনার আদি যুগের সৃষ্টি। এমন কি তাঁর রচিত প্রথম গান হওয়াও অসম্ভব নয়। অন্ততঃ রামমোহনের রচনা ব'লে যে সমস্ত গান প্রচলিত আছে এবং যেগুলি রাজনারায়ণ বসু ও আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ কর্তৃক সংগৃহীত ও প্রকাশিত "রামমোহন গ্রন্থাবলী"তে স্থান পেয়েছে, তার মধ্যে এই গানখানি প্রথম রচনা। একথা উক্ত সংগ্রহকর্তাদ্বয়ের মন্তব্য থেকে মনে হয়। সেজন্যে এই গানটি রচনা থেকে রামমোহনের সঙ্গীত রচনা পর্বের সূত্রপাত ধরা যেতে পারে।

১৮১৬ খ্রীষ্টাব্দে, যখন তাঁর এই গানখানি রচিত হয় এবং "আত্মীয় সভা"র নিযুক্ত গায়ক গোবিন্দমালা তা সভার এক অধিবেশনে পরিবেশন করেন, তখনকার কলকাতায় এই রকম 'সভা' একটি অভিনব বস্তু। আর সেখানকার প্রতি সপ্তাহের অনুষ্ঠানের অঙ্গরূপে সঙ্গীতের প্রবর্তনও কম অসাধারণ নয়।

সঙ্গীতের ঠিক এইভাবে প্রচলন সে যুগে ছিল না। একদিকে তখন সাধারণের মধ্যে কবিগানের বিপুল জনপ্রিয়তা। কবিগানের তখনও বিশেষ গৌরবের যুগ। ১৭৬০ খ্রীষ্টাব্দ থেকে আরম্ভ করে তার সেই চরম উন্নতির কাল ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত চলে। (১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত কবিগানের যুগ-রেখা ধরা হয়, যদিও ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দের পর থেকে আর সে সমৃদ্ধ অবস্থা ছিল না।) সঙ্গীতক্ষেত্রের আর একদিকে তখন আখড়াই গানের প্রাদুর্ভাব। নদীয়া শান্তিপুর অঞ্চলে প্রচলিত এবং গ্রাম্যতা-দুষ্ট আখড়াই গান চুঁচুড়া হয়ে কলকাতার আসরে উপস্থিত হয়। এখানে শোভাবাজারের রাজা নবকৃষ্ণের সভার অন্যতম গায়ক কলুইচন্দ্র সেন সেই আখড়াই গানের প্রথমে সংশোধন করেন। তার পর প্রতিভাবান্ নিধুবাবুর হাতে তা সবিশেষ পরিমার্জিত, পরিশীলিত ও সুর-সমৃদ্ধ হয়ে অধিকার করে কলকাতার শ্রোতাদের মন। ১৮০৪ খ্রীষ্টাব্দে প্রবর্তিত নিধুবাবুর এই সংশোধিত আখড়াই-সঙ্গীত রামমোহনের "আত্মীয়-সভা"র উক্ত সময়েও সগৌরবে প্রচলিত ছিল।

কবিগান এবং আখড়াই গান ভিন্ন তখন সঙ্গীতের আর একটি ক্ষেত্র ছিল ধনীদের নিজস্ব সঙ্গীতসভা। সেখানে সাধারণের প্রবেশ সম্ভব ছিল না। তৎকালীন বাংলা দেশে যে সঙ্গীতসভা ছিল প্রধানতঃ কয়েকটি জেলার আঞ্চলিক জমিদারের। কলকাতায় তেমন ধনীগৃহ তখন মুষ্টিমেয়। যথা, শোভাবাজার রাজবাড়ী, পাথুরিয়াঘাটার গোপীমোহন ঠাকুরের বাড়ী প্রভৃতি। রামমোহনের সঙ্গীতগুরু, প্রবীণ কালী মীর্জা তখনও গোপীমোহন ঠাকুরের সঙ্গীতসভা, তথা কলকাতার সঙ্গীত-সমাজে সসম্মানে বিদ্যমান। প্রবীণতর নিধুবাবু তখনও সঙ্গীত-জগৎ থেকে অবসর নেন নি এবং তাঁর রচিত ও গীত টপ্পা অঙ্গের প্রণয়-সঙ্গীত বাঙালীদের মধ্যে সাদরে এবং সর্বাধিক প্রচারিত। গায়ক নিধুবাবুর বিষয়ে একটি উল্লেখযোগ্য তথ্য এই যে, তিনি কোন ধনীর সঙ্গীতসভায় যুক্ত কিংবা নিযুক্ত হন নি। বরাবর তিনি তাঁর নিজস্ব সঙ্গীতাসরে, বটতলার আটচালায় এবং শোভাবাজার বাগবাজার অঞ্চলে গান করতেন এবং তাঁর তাবৎশ্রোতাদেরসেখানে উপস্থিত হ'তে হ'ত।

কালী মীর্জা এবং নিধুবাবু ভিন্ন কলকাতার সঙ্গীতাসরে বিশেষ কোন বাঙালী সঙ্গীতাচার্যের অস্তিত্বের কথা তখন (১৮১৬ খ্রীষ্টাব্দ) জানা যায় না। বিষ্ণুপুর ঘরাণার আদি সঙ্গীতগুরু রামশঙ্কর ভট্টাচার্য তাঁদের সমসাময়িক ব্যক্তি। কিন্তু তিনি কখনও কলকাতায় পদার্পণ করেন নি এবং তাঁর কোন সুপরিচিত শিষ্যের পক্ষেও তখন কলকাতায় আসা অসম্ভব। কারণ রামশঙ্করের ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী প্রমুখ শিষ্যদের তখনও জন্ম হয় নি এবং রামকেশব ভট্টাচার্য্য, রমাপতি বন্দ্যোপাধ্যায়, কেশবলাল চক্রবর্তী প্রভৃতি শিষ্যবর্গের জন্ম হলেও নিতান্ত শৈশব অবস্থা। তাই সঙ্গীত শিক্ষা লাভ তাঁদের আরম্ভ হয় নি, কলকাতায় আগমন দূরের কথা।

বাংলা দেশে এবং কলকাতার সঙ্গীতচর্চার এই পরিবেশের মধ্যে রামমোহন "আত্মীয় সভা"র অধিবেশনে গান করবার জন্যে গায়ক নিযুক্ত করলেন। এবং রাগের ভিত্তিতে সঙ্গীত রচনা আরম্ভ করলেন। (কালী মীর্জার শিক্ষাদানে রাগবিদ্যার পরিচয় লাভ ঘটেছে তারও আগে।)

আধুনিক কালের বাংলা দেশে, রাগসঙ্গীত চর্চার সেই আদি যুগে রামমোহনের তুল্য প্রতিভাধর ব্যক্তির সঙ্গীতচর্চার বিশেষ মূল্য আছে। প্রথমে কৃতবিদ্য সঙ্গীতগুরুর উপদেশে সঙ্গীত শিক্ষা, তার পর যুগপৎ সঙ্গীত-রচনা এবং সাধারণের জন্যে উন্মুক্ত সভায় নিয়মিত সঙ্গীতানুষ্ঠানের ব্যবস্থা তথা সঙ্গীতের পৃষ্ঠপোষকতা ইত্যাদি রামমোহনের বিশিষ্ট সঙ্গীতকৃতির পরিচায়ক।

সঙ্গীতক্ষেত্রে তাঁর এই ত্রিবিধ কার্যধারা সঙ্গীতবিষয়ে তাঁর অবদানরূপে গণ্য হবার যোগ্য। রামমোহনের অব্যবহিত পরবর্তী যুগে ভারতীয় সঙ্গীতের রেনেসাঁসের যে উদ্বোধন হয়, তাঁর সঙ্গীত-জীবন তার সূচনার অন্তর্গত। সঙ্গীত রেনেসাঁসের পূর্ববর্তী প্রায় অর্ধ শতকের যে প্রস্তুতিপর্ব, তাঁর সঙ্গীতচর্চা তার একটি বিশিষ্ট অংশ। ঐতিহাসিকভাবে দেখলে, রামমোহনের সাঙ্গীতিক অবদানের এই তাৎপর্য পরিস্ফুট হয়। প্রস্তুতি-পর্বের অন্যান্য কর্মধারা থেকে তাঁর কর্মপ্রচেষ্টাকে বিচ্ছিন্ন করা যায় না; বরং সে সবের পরিপূরকরূপে গণ্য করলেই যথোচিত হয়।

আঠারো শতকের শেষ পাদ থেকে সেই প্রস্তুতির প্রক্রিয়া আরম্ভ। তার পর উনিশ শতকের প্রথম ভাগ ব্যাপী তার অগ্রগতি পরিণতি লাভ করেছে সঙ্গীত রেনেসাঁসে, যার পূর্ণ প্রকাশ উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে। রামমোহনের "আত্মীয় সভা"য় নিয়মিত সঙ্গীতের ব্যবস্থা, তাঁর গান রচনা, উপাসনার অঙ্গস্বরূপ রাগসঙ্গীতের প্রবর্তন—যার সার্থক প্রয়োগ ঘটে তাঁর জীবনের অন্যতম প্রধান কীর্তি ব্রাহ্মসমাজ—এই সমস্ত কার্যধারা সঙ্গীত-রেনেসাঁসের প্রস্তুতিপর্বের একটি বিশিষ্ট অধ্যায়। তাঁর সঙ্গীত রচনা এবং বিশেষ করে সঙ্গীতের পৃষ্ঠপোষকতার ফলে রাগসঙ্গীত শিক্ষিত সম্প্রদায়ের একটি উল্লেখযোগ্য অংশে সমাদৃত হয়।

রামমোহনের সঙ্গীতপ্রসঙ্গ তাঁর পূর্বাপর যুগের সঙ্গীত-চর্চার ধারার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সূত্রে আবদ্ধ। তাঁর গীত রচনা আরম্ভ এবং "আত্মীয় সভা"য় সঙ্গীত অনুষ্ঠান প্রবর্তন করবার পূর্বকালে সঙ্গীত জগতের কয়েকটি মূল ঘটনা এখানে আর একবার স্মরণ করে নিলে সেই ধারাটির তথা সঙ্গীত রেনেসাঁসের ভূমিকা পর্বের একটি পরিচয় লাভ করা যায়। রামমোহনের সঙ্গীত-চর্চার অব্যবহিত পূর্বে কালী মীর্জা, নিধুবাবু প্রভৃতি পশ্চিম অঞ্চল থেকে রীতিমত সঙ্গীত শিক্ষা করে এসেছেন। বর্ধমান রাজ-দরবারে সমাগত পশ্চিমা গুণীর অধীনে শিক্ষাপ্রাপ্ত দেওয়ান রঘুনাথ রায় বাংলা ভাষায় প্রথম চারতুকের স্থায়ী, অন্তরা, সঞ্চারী ও আভোগ গান রচনা করেছেন। বিষ্ণুপুরে ধ্রুপদ সঙ্গীত শিক্ষা দিয়ে গেছেন আগ্রা অঞ্চল থেকে আগত জনৈক হিন্দু সঙ্গীতাচার্য। বিষ্ণুপুরের প্রথম সঙ্গীতগুরু রামশঙ্কর ভট্টাচার্য সেই সঙ্গীতাচার্যের অধীনে শিক্ষালাভ করে বিষ্ণুপুরে তথা বাংলা দেশে প্রথম ধ্রুপদ গানের চর্চা আরম্ভ করেছেন। কলকাতার সঙ্গীতাসরে টপ্পার প্রচলন-কর্তা নিধুবাবু এবং কালী মীর্জা তখন আচার্য-স্থানীয়রূপে সগৌরবে বিদ্যমান।

এমনি সময়ে রামমোহন তাঁর প্রতিষ্ঠিত ধর্মীয় আলোচনা-সভা, অর্থাৎ "আত্মীয়-সভা"তে উপস্থিত ব্যক্তিদের জন্যে নিয়মিত সঙ্গীতের ব্যবস্থা করলেন। সেজন্যে বেতনভোগী গায়ক নিযুক্ত হলেন। এই সময় থেকে রামমোহনের গান রচনাও আরম্ভ হল, যার প্রথম নিদর্শন স্বরূপ পাওয়া যায় উক্ত "কে ভুলালো হায়" গানখানি। রামমোহনের রচিত গীতাবলীর প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য ইত্যাদি বিষয়ে পরে সবিস্তারে আলোচনা করা হবে। বর্তমানের আলোচ্য প্রসঙ্গ হল, রাগসঙ্গীতের প্রচারে তাঁর ভূমিকা।

রামমোহনের সংস্কৃতিবান্ ও পরিশীলিত মন রাগ-সঙ্গীতের সৌন্দর্যে আকৃষ্ট হয়ে কালী মীর্জার সাহায্যে যেমন তার তত্ত্বগ্রহণে তৎপর হয়েছিল, তেমনি আবার

সেই সম্পদ্‌কে সমাজের উপভোগের সামগ্রী করবার জন্যে চেষ্টিত ছিলেন তিনি। "আত্মীয় সভা"র সঙ্গীতানুষ্ঠান সে বিষয়ে প্রথম প্রয়াস এবং ব্রাহ্ম সমাজ তার সার্থক পরিণতি।

"আত্মীয় সভা"র মতন কোন সাধারণের জন্যে সংস্থায় নিয়মিত সঙ্গীতের প্রবর্তন সঙ্গীতের পুনরভ্যুদয় (রেণেসাঁস) ক্ষেত্রে একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। রামমোহনের পূর্ববর্তী যুগে সঙ্গীত-সম্পর্কিত কার্যাবলীর যে সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া হয়েছে, রামমোহনের এই সঙ্গীত-পৃষ্ঠপোষকতা সে সবের সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত। এ সমস্ত বিষয়ই রেণেসাঁসের প্রস্তুতি পর্বের অন্তর্গত। ভারতের নব জাগৃতির প্রাক্‌কালে জাতি-মানসের বিভিন্ন ঐশ্বর্যের দিকে তখন মনীষা প্রবর রামমোহনের চিত্ত আকৃষ্ট হচ্ছে। সঙ্গীতও তার নিজস্ব আবেদন নিয়ে তাঁর মনের দ্বারে সমুপস্থিত। সে জন্যে সঙ্গীতের নবজাগরণের আগমনীতে ও তার কর্মারম্ভে তাঁর অবদান ও স্বাক্ষর রাখছে অন্যান্যের সঙ্গে। আত্মসচেতনতার পথে অগ্রসর হয়ে তখন জাতীয় সঙ্গীত সম্পদের অনুসন্ধান কার্য আরম্ভ হয়েছে। তাই "আত্মীয় সভা"র (অস্তিত্ব ১৮১৫-১৮১৯ খ্রীষ্টাব্দ) সমকালে এ সম্পর্কে আর একটি মূল্যবান্ সংযোজন দেখা যায়। এটি অবশ্য রামমোহনের দান নয়। কিন্তু সেই একই প্রক্রিয়ায়—সাঙ্গীতিক পুনরুজ্জীবনের প্রস্তুতির—সূত্রে গাঁথা। তা হ'ল, ১৮১৮ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত "সঙ্গীত তরঙ্গ" গ্রন্থ।

ভারতীয় সঙ্গীতের তত্ত্ব বিষয়ে "সঙ্গীত তরঙ্গ" বাংলা ভাষায় মুদ্রিত প্রথম পুস্তক। রাগ সঙ্গীতের ঔপপত্তিক বিষয়ে আলোচনার এই গ্রন্থটি আদ্যোপান্ত পদ্যে লিখিত। "সঙ্গীত তরঙ্গ" রচনা করেন রাধামোহন সেন নামে কাঁসারীপাড়া নিবাসী এক রুতবিদ্য সঙ্গীতজ্ঞ, পরবর্তী কয়েক বছরে তিনি একজন উৎকৃষ্ট বাংলা টপ্পা গান রচয়িতা রূপেও খ্যাতিমান্ হয়েছিলেন। এই গ্রন্থ রচনার কাজে রাধামোহন সেনের সহায়তা করেছিলেন রামনারায়ণ মিত্র, "আলালের ঘরের দুলাল" রচয়িতা বিখ্যাত লেখক প্যারীচাঁদ মিত্রের (টেকচাঁদ ঠাকুর) পিতা। উক্ত রামনারায়ণ মিত্র রামমোহনের একজন অন্তরঙ্গ বন্ধু এবং ধর্মসঙ্গীতের বিশেষ অনুরাগী ছিলেন। "সঙ্গীত তরঙ্গ" পুস্তকটির বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনার এখানে প্রয়োজন নেই। রামমোহনের সমসাময়িক কালের সঙ্গীতক্ষেত্রে একটি মূল্যবান্ প্রচেষ্টা হিসাবে তার নাম উল্লেখ করা রইল।

"আত্মীয় সভা" দীর্ঘকাল স্থায়ী হ'ল না। ১৮১৬ খ্রীষ্টাব্দের পর থেকে রামমোহনের জীবনে মামলা মোকদ্দমার জন্যে বিষম দুর্বিপাক দেখা দেয়। তিনি নির্বিঘ্নে সভা পরিচালনার কাজে আত্মনিয়োগ করবার সুযোগ পেলেন না। অনেক সময়ে সভায় উপস্থিত থাকাও সম্ভব হ'ত না তাঁর পক্ষে। তাঁর পরলোকগত ভ্রাতা জগমোহনের পুত্র গোবিন্দপ্রসাদ রামমোহনের বিষয় সম্পত্তিতে অংশ দাবী করে সুপ্রীম কোর্টে মোকদ্দমা আরম্ভ করেন, ১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দে। বিশেষ করে সেই মামলার জন্যে রামমোহন ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়েন। সে সময় তিনি সভায় যোগ দিতে সমর্থ হতেন না বলে, সভার অধিবেশন অনেক সময়ে তাঁর বন্ধুদের বাড়ীতে হ'ত। যথা, খিদিরপুরে ভূকৈলাসে রাজা কালীশঙ্কর ঘোষালের বাড়ী, কৃষ্ণমোহন ও ব্রজমোহন মজুমদার ভ্রাতাদের বাড়ী, বৃন্দাবন মিত্রের বাড়ী ইত্যাদি।

শেষ পর্যন্ত (১৮১৯ খ্রীঃ) "আত্মীয় সভা"র অধিবেশন বন্ধ হয়ে যায়। সভা লুপ্ত হওয়ায় সেখানকার সাপ্তাহিক সঙ্গীত অনুষ্ঠানেও ছেদ পড়ে এবং সম্ভবত রামমোহনের গীত রচনাও সাময়িক ভাবে স্থগিত থাকে। কারণ, "আত্মীয় সভা"র নিয়মিত অধিবেশনের জন্যে তিনি খুব সম্ভব গান রচনা আরম্ভ করেছিলেন। সঙ্গীতের সেই পরিবেশ না থাকায় তিনি হয়ত কিছুকালের জন্যে আর গান রচনার প্রেরণা অনুভব করেন নি।

"আত্মীয় সভা" বন্ধ হওয়ার জন্যে রামমোহনের গীত রচনা ও সঙ্গীতের পৃষ্ঠপোষকতা সাময়িকভাবে স্থগিত থাকে বটে; কিন্তু দুই কাজই আবার সগৌরবে আত্মপ্রকাশ করে ন' বছর পরে, ১৮২৮ খ্রীষ্টাব্দে ব্রাহ্ম সমাজ প্রতিষ্ঠার সঙ্গে। কিন্তু এই মধ্যবর্তী কালেও রামমোহনের সঙ্গীতচিন্তা যে বর্তমান ছিল, তার একটি নিদর্শন পাওয়া যায়। এই ন'বছরের মধ্যে তাঁর গীত রচনার কথা সঠিক ভাবে জানা না গেলেও, তিনি যে সঙ্গীতচিন্তা থেকে বিরত হন নি, তার স্বাক্ষর তাঁর একটি রচনায় আছে।

রামমোহনের এই রচনাটির নাম—"প্রার্থনা পত্র।" এই ক্ষুদ্র পুস্তকটি ১৮২৩ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসে প্রকাশিত হয়।

সঙ্গীত সম্পর্কে তিনি কতখানি শ্রদ্ধার ভাব পোষণ করতেন এবং সঙ্গীতকে উপাসনার অঙ্গস্বরূপ কেন প্রয়োগ করেছিলেন, তা তাঁর "প্রার্থনা পত্র"তে লিখিত এই অংশটি থেকে বোঝা যায়:

"দশনামা সন্ন্যাসীদিগের মধ্যে অনেকে, এবং গুরু নানকের সম্প্রদায়, ও দাদূপন্থী, ও কবীরপন্থী, এবং সন্ত মতাবলম্বী প্রভৃতি…ভাষা বাক্যই কেবল উঁহাদের

অনেকের উপদেশের দ্বারা এবং ভাষা গানাদি উপাসনার উপায় হইয়াছে অতএব তাহাদের পরমার্থ সাধনে সন্দেহ আছে এমত আশঙ্কা করা উচিত নহে; যেহেতু যাজ্ঞবল্ক্য বেদগানে সমর্থকদের প্রতি কহিয়াছেন যে 'ঋক্ গাথা পাণিকা দক্ষবিহিতা ব্রাহ্মগীতিকা। গেয়মেতৎ তদভ্যাসাৎ পরং ব্রহ্মাধিগচ্ছতি। বীণাবাদনতত্ত্বজ্ঞঃ শ্রুতিজাতিবিশারদঃ। তালজ্ঞশ্চাপ্রয়াসেন মোক্ষমার্গং নিযচ্ছতি।" অর্থাৎ 'ঋক্ সাঙ্খক গান ও গাথা সংজ্ঞক গান ও পাণিকা এবং দক্ষবিহিত গান ব্রহ্মবিষয়ক এই চারি প্রকার গান অবশ্যগেয় হয়, মোক্ষ সাধন যে এই সকল গান ইহার অভ্যাস করিলে মোক্ষপ্রাপ্তি হয়। বীণাবাদনে নিপুণ ও সপ্তস্বরের বাইশ প্রকার শ্রুতি ও আঠার প্রকার জাতি ইহাতে প্রবীণ এবং তালজ্ঞ ইঁহারা অনায়াসে মুক্তিপ্রাপ্ত হয়েন।"

এই উদ্ধৃতিটি থেকে রামমোহনের স্বভাব ও চিন্তাধারার একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য উপলব্ধি করা যায়। ধর্ম ও সমাজ সংস্কার আন্দোলনে তিনি যেমন সমর্থনের নজির সন্ধান করেছিলেন প্রাচীন শাস্ত্রাদি থেকে, সঙ্গীতক্ষেত্রেও তেমনি। তিনি সঙ্গীত বিষয়েও জাতীয় ঐতিহ্যের মূল প্রবেশ করেছিলেন। আন্তরিক সঙ্গীত-প্রীতির প্রেরণায় তিনি ছিলেন সঙ্গীত-জিজ্ঞাসু; তাঁর দীপ্ত মনস্বিতা তাঁকে সঙ্গীতের গভীরে অবগাহন করতে উদ্বুদ্ধ করে। তাই একদিকে তিনি যেমন তার সৌন্দর্যে মুগ্ধ ছিলেন, অন্যদিকে তেমনি তাকে সাধনাস্বরূপ বিবেচনা ক'রে উপাসনার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গী যুক্ত করেছিলেন। যার সূত্র তিনি পেয়েছিলেন যাজ্ঞবল্ক্যের উক্ত ঋষিবাক্য থেকে এবং যার দৃষ্টান্ত দেখেছিলেন—দশনামী সন্ন্যাসী ও গুরু নানকের সম্প্রদায় এবং দাদূ-পন্থী, কবীর-পন্থী ও সন্ত মতানুসারী উপাসকদের মধ্যে।

"প্রার্থনাপত্রে" লিখিত রামমোহনের এই পঙ্‌ক্তি ক'টি তাঁর সঙ্গীতচিন্তার নিদর্শনরূপে বিশেষ মূল্যবান্। এখানে তাঁর সঙ্গীত জীবনের একটি মূল সূত্রের সন্ধান পাওয়া যায়।

১৮২৩ খ্রীষ্টাব্দের রচনা এই 'প্রার্থনাপত্রে'র পর তাঁর সঙ্গীতবিষয়ক কর্মের কথা জানা যায় পাঁচ বছর পরে, ১৮২৮ খ্রীষ্টাব্দে। এই মধ্যবর্তী সময়ে তিনি কোন গান রচনা করেছিলেন কি না তা নিশ্চিতভাবে জানবার উপায় নেই। কারণ তাঁর প্রত্যেকটি গান রচনার তারিখ জানা যায় না।

১৮২৮ খ্রীষ্টাব্দটি সঙ্গীতবিষয়ে রামমোহনের শ্রেষ্ঠ অবদানের বছর। সঙ্গীতের পৃষ্ঠপোষকরূপে তাঁর সবচেয়ে স্মরণীয় কাজ—ব্রাহ্মসমাজে সঙ্গীতের নিয়মিত অনুষ্ঠানের প্রবর্তন। আর সঙ্গীতজ্ঞরূপে তাঁর মনীষার সবচেয়ে বড় দান তাঁর রচিত গীতাবলী—তাঁর "ব্রহ্মসঙ্গীত" গ্রন্থ। এই দুটি কর্মই তিনি ১৮২৮ খ্রীষ্টাব্দে সম্পন্ন করেন। তাঁর ব্রহ্মসঙ্গীত তথা গান রচনার বিষয়ে পরে সবিস্তারে আলোচনা করা হবে। বর্তমানের আলোচ্য প্রসঙ্গ হ'ল—ব্রাহ্মসমাজে সঙ্গীত প্রচলনের ব্যবস্থা এবং তার ফলাফল।

ব্রহ্মোপাসনার জন্যে ১৮২৮ খ্রীষ্টাব্দের ২০শে, আগষ্ট তারিখে রামমোহন "ব্রাহ্মসমাজ" স্থাপন করেন। ৪৮ সংখ্যক আপার চিৎপুর রোডে বাড়ী ভাড়া নিয়ে ঐ তারিখে সমাজের প্রথম অধিবেশন হয়। বাড়ীর মালিক ছিলেন রামকমল বসু, যাঁকে রামমোহনের কোন কোন জীবনী-লেখক কমললোচন বসু বলে উল্লেখ করেছেন। ব্রাহ্মসমাজের প্রথম সম্পাদক ছিলেন তারাচাঁদ চক্রবর্তী, রামমোহনের অন্যতম অন্তরঙ্গ সুহৃদ্।

সেখানে প্রতি শনিবার সন্ধ্যা সাতটা থেকে রাত্রি নটা পর্যন্ত সমাজে সাপ্তাহিক সভার অনুষ্ঠান হ'ত। অধিবেশনের প্রারম্ভে হিন্দুস্থানী ব্রাহ্মণের বেদপাঠ ও পরে উৎসবানন্দ বিদ্যাবাগীশের উপনিষদ পাঠ হ'ত। তারপর রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ বৈদিক শ্লোকের ব্যাখ্যা করতেন। সভার শেষে হ'ত সঙ্গীত। কৃষ্ণপ্রসাদ ও বিষ্ণুচন্দ্র চক্রবর্তী ব্রাহ্মসঙ্গীত গাইতেন এবং তাঁদের গানের সঙ্গে সঙ্গত করতেন পাখোয়াজ বাদক গোলাম আব্বাস। উক্ত গায়কবাদকদের সম্বন্ধে কিছু আলোচনার প্রয়োজন আছে, তা হ'লে ব্রাহ্মসমাজে অনুষ্ঠিত সঙ্গীতের প্রকৃতি ও পরিবেশ বিষয়ে ধারণা করা যাবে।

"আত্মীয় সভা"র গায়ক গোবিন্দ মালার সঙ্গীত-জীবন সম্পর্কে যেমন কিছু জানা যায় না, ব্রাহ্মসমাজের প্রথম দুই নিযুক্ত গায়ক কৃষ্ণপ্রসাদ ও বিষ্ণুচন্দ্রের বিষয়ে কিন্তু সেকথা বলা চলে না। তাঁরা দুই ভ্রাতাই কৃষ্ণনগর রাজসভায় নিযুক্ত পশ্চিমা ওস্তাদদের অধীনে সঙ্গীত শিক্ষালাভ করেছিলেন। তাঁরা কৃষ্ণনগরের সন্তান এবং তাঁদের পিতা কালীপ্রসাদ চক্রবর্তীর নদীয়া রাজসভায় যাতায়াত ছিল, সেই সঙ্গে তার পুত্রদেরও। সেই সূত্রে প্রসিদ্ধ কলাবত হসুদু খাঁ ও তাঁর ভ্রাতা দিলওয়ার খাঁ, বিখ্যাত কাওয়াল গায়ক মিঞা মীরণ প্রভৃতির কাছে কৃষ্ণপ্রসাদ ও বিষ্ণুচন্দ্র রীতিমত শিক্ষার সুযোগ পান। হসুদু খাঁর কাছে তাঁরা শিখেছিলেন ধ্রুপদ এবং মিঞা মীরণের কাছে খেয়াল। বিষ্ণুচন্দ্র উপরন্তু তখনকার প্রসিদ্ধ গায়ক রহিম খাঁর কাছেও তালিম নিয়েছিলেন।

রহিম খাঁ-কে রামমোহনও নিজের বাড়ীতে নিযুক্ত করেছিলেন নিয়মিত গান শোনাবার জন্যে, একথা পূর্ব অধ্যায়ে বলা হয়েছে।

রামমোহনের অন্যতম অনুগত সুহৃদ্ কৃষ্ণমোহন মজুমদার (ব্রজমোহন মজুমদারের অনুজ এবং কয়েকটি ব্রহ্মসঙ্গীত রচয়িতা) কৃষ্ণপ্রসাদ ও বিষ্ণুচন্দ্র চক্রবর্তীকে রামমোহনের সঙ্গে পরিচিত করেন। রামমোহন চক্রবর্তী ভ্রাতাদের সঙ্গীত নৈপুণ্যে সন্তুষ্ট হয়ে তাঁদের ব্রাহ্মসমাজের গায়করূপে নিযুক্ত করেন ১৮২৮ খ্রীষ্টাব্দে। তার আনুমানিক পনের বছর পরে কৃষ্ণপ্রসাদের মৃত্যু হয়। কিন্তু বিষ্ণুচন্দ্র একাদিক্রমে ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত ব্রাহ্মসমাজে গায়করূপে অবস্থান করে সেই বছর অবসর গ্রহণ করেন এবং তাঁর জীবনাবসান ঘটে ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দের ৪ঠা মে।

বিষ্ণুচন্দ্রকে ব্রাহ্মসমাজের গায়কমাত্র বললে তাঁর প্রতি অবিচার করা হয়। তিনি ব্রাহ্মসমাজের সেবায় নিজের জীবন উৎসর্গ করেছিলেন, তাঁকে ব্রাহ্মসমাজের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা বলা যায়, কারণ, সমাজ-স্থাপনে তিনি ছিলেন রামমোহনের অন্যতম সহযোগী এবং তাঁর মধুর কণ্ঠে গীত গান সমাজকে অনেকের কাছে আকর্ষক করে তুলেছিল, তিনি সমাজে সামান্য বেতনে গায়ক নিযুক্ত থেকে নিজের বহু আর্থিক ক্ষতি স্বীকার ও স্বার্থত্যাগ করেছিলেন—ইত্যাদি বিবরণ "তত্ত্ববোধিনী" পত্রিকায় প্রকাশ করেছেন ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর, পরবর্তী কালের আদি ব্রাহ্মসমাজ সম্পাদক।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ বিষ্ণুচন্দ্রের সঙ্গে সমাজের সুদীর্ঘকালের যোগ ও একাত্মতার কথা "আত্মজীবনী"র কয়েক স্থানে উল্লেখ করেছেন। রামমোহন রচিত "বিগত বিশেষং ভনিতাশেষং সচ্চিৎসুখং পরিপূর্ণাং" (কেদারা, আড়াঠেকা) গানখানি বিষ্ণুচন্দ্র মর্মস্পর্শীভাবে গাইতেন এবং বিষ্ণুচন্দ্রের কণ্ঠে রামমোহন এই গান শুনতে বিশেষ ভালবাসতেন, একথাও মহর্ষির বিবৃতি থেকে জানা যায়।

সমাজ গৃহের সঙ্গীত অনুষ্ঠানে সঙ্গত করবার জন্যে রামমোহন কর্তৃক নিযুক্ত হন গোলাম আব্বাস। ইনি পাখোয়াজে তৎকালীন ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ওস্তাদ এবং কলকাতায় বহু বছর অবস্থান করেছিলেন। পরে শোভাবাজার রাজবাড়ীর একটি আসরে প্রসিদ্ধা গায়িকা হীরা বুলবুলের গানের সঙ্গে পাখোয়াজ বাজাবার সময় আসরেই গোলাম আব্বাসের মৃত্যু ঘটে।

গোলাম আব্বাসের তুল্য সঙ্গতকার এবং কৃষ্ণপ্রসাদ ও বিষ্ণুচন্দ্রের তুল্য গায়কদের নিয়মিত সঙ্গীতানুষ্ঠানের ব্যবস্থা করে রামমোহন সমাজে সঙ্গীতের একটি উচ্চ মান প্রতিষ্ঠিত করেন। তিনি যথার্থ সঙ্গীতবোদ্ধা ছিলেন বলেই তা সম্ভব হয়েছিল। তাঁর নিযুক্ত দুই গায়ক কৃষ্ণ ও বিষ্ণু দুজনেই ধ্রুপদ ও খেয়াল দুই অঙ্গেই পারদর্শী ছিলেন। বিষ্ণু অন্যান্য রীতির সঙ্গে আগমনী বাংলা গানও গাইতেন বলে প্রকাশ।

রামমোহন যখন সমাজের অধিবেশনের সময় এমন উচ্চ মানের সঙ্গীতচর্চার প্রবর্তন করলেন, তখনকার কলকাতার সঙ্গীতচর্চার অবস্থার বিবরণ আগেই দেওয়া হয়েছে। সে যুগের সেই স্বল্পবিস্তর রাগসঙ্গীতচর্চার ক্ষেত্রে রামমোহনের সমাজ গৃহে এমন সঙ্গীতের পরিবেশ সৃষ্টি বিশেষ লক্ষ্যণীয় কাজ। ব্রাহ্মসমাজে সঙ্গীতানুষ্ঠানের জন্যে বহু শিক্ষিত ব্যক্তি যে সঙ্গীতের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন এবং সঙ্গীত-চর্চা প্রসারিত লাভ করেছিল, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। কলকাতার রাগসঙ্গীতের আসর যখন মুষ্টিমেয় কয়েকজন ধনীর গৃহে সীমাবদ্ধ, রামমোহন তখন সমাজ-গৃহে সাধারণের জন্যে এই সঙ্গীতের দ্বার উন্মুক্ত করে দিলেন। ফলে শিক্ষিত সমাজের একাংশে সঙ্গীতের প্রতি যে আগ্রহ ও মমতার সৃষ্টি হল, উত্তরোত্তর তার শ্রীবৃদ্ধিই হতে লাগল। সঙ্গীত-প্রচলনে রামমোহনের এই প্রচেষ্টা রেনেসাঁসের প্রস্তুতিপর্বে যথার্থই তাঁর অবদানরূপে গণ্য করা যায়। কলকাতার নিধুবাবু, গুপ্তিপাড়ার কালী মীর্জা, বর্দ্ধমানের রঘুনাথ রায়, বিষ্ণুপুরের রামশঙ্করের সঙ্গে রামমোহনের নামকলাপ এই দিক থেকে একসূত্রে গ্রথিত। সঙ্গীতের পুনরভ্যুদয়ের ভূমিকা রচনাকালে রামমোহনের নাম তাঁদের সঙ্গে স্মরণীয়। তাঁরা প্রত্যেকেই এক একভাবে ক্ষেত্র প্রস্তুত করেছেন এবং তাঁদের সমগ্র দানের সম্মিলনে সঙ্গীত-রেনেসাঁসের সংঘটন ত্বরান্বিত হয়েছে। যে সূত্র ধরে এই প্রক্রিয়ার অগ্রগতি, তাতে রামমোহনের অব্যবহিত পরে উল্লেখযোগ্য—রাগসাগর কৃষ্ণানন্দ ব্যাস সঙ্কলিত সুবৃহৎ তিন খণ্ডে "সঙ্গীতরাগকল্পদ্রুম" কোষ-গ্রন্থের প্রকাশ। কৃষ্ণানন্দ রাজস্থানের উদয়পুরের সন্তান এবং সেখান থেকে সারা ভারত পরিক্রমা করে ৩৬ বৎসর ধরে এই বিপুল-কলেবর কোষগ্রন্থের উপাদান সংগ্রহ করেন। তার পর সে যুগের অতি অসুবিধাজনক যাতায়াত ব্যবস্থাতেও সুদূর কলকাতায় এসে এখানকার কয়েকজন ধনীর সহায়তায় তিন খণ্ডে সেই বিরাট সঙ্গীত-সংকলন স্বপ্রকাশ করেন। ১৮৪২ খ্রীঃ থেকে ১৮৪৯ খ্রীঃ পর্যন্ত আট বৎসর ধরে তাঁর "সঙ্গীতরাগকল্পদ্রুম"-এর খণ্ডগুলি প্রকাশিত হয়েছিল। শেষ খণ্ডে আছে বাংলা গানের সংগ্রহ, তার মধ্যে "নির্গুণ গান"

রঙ্গমল্লী

শ্রীসীতা দেবী

১৭

প্রত্যেক দিন সকাল মানুষের চোখে একই রকম লাগে। কিন্তু এমন দিন আসে যখন বিশ্বজগৎ একেবারে চোখের সামনে ধ্বংস হইয়া যাইতে বসে, আবার বিপুল আনন্দের প্লাবনে জীবনকে ভাসাইয়া লইয়া যায়। এমন দিনও আসে। ভোরবেলা ইহার আভাস পাওয়া যায় না।

সেদিনও সকালে রোজকার মত পূর্ণিমা প্রস্তুত হইয়া অফিসে চলিল। মাঝপথে আসিয়া গাড়ীর এন্‌জিন গেল বিকল হইয়া। মেমসাহেবরা বিরক্তিতে অস্থির হইয়া উঠিলেন, তবে তাহাতে লাভ হইল না কিছু। অনেক টানা-হেঁচড়ার পর গাড়ী আবার চলিতে আরম্ভ করিল। এবং শেষ পর্য্যন্ত প্রায় আধঘণ্টা দেরি করিয়া পূর্ণিমা গিয়া অফিসে পৌঁছিল। অন্যদিন অনেক সময়ই সে lift-এ না চড়িয়া হাঁটিয়া ওঠে, আজ তাড়াতাড়ি যাইবার জন্য lift-এই চড়িল।

তিনতলায় আসিয়া দেখিল, বিপুলকায় বিকাশবাবু হিরণ্ময়ের ঘরের দরজা জুড়িয়া দাঁড়াইয়া আছেন। হিরণ্ময়কে দেখা যাইতেছে না, তবে তাঁহার উত্তেজিত কণ্ঠস্বর শোনা যাইতেছে। পূর্ণিমা অতি লঘু দ্রুতপদে ছুটিয়া নিজের ঘরে ঢুকিয়া গেল, দুইজনেরই চোখের অগোচরে। তাহার ঘর হইতে পাশের ঘরের কথা শোনা যায়, জোরে বলিলে বেশ পরিষ্কার শোনা যায়।

বিকাশবাবু একটু কুণ্ঠিত স্বরে বলিতেছেন, "আজ্ঞে, তা জানি। এটা একটু special case ব'লেই এলাম, না হ'লে শুধুশুধু আপনাকে বিরক্ত করব কেন?"

হিরণ্ময় বলিলেন, "special কি sense-এ?"

"এই মিস্ সান্যালের নামটা এর মধ্যে জড়িত রয়েছে কিনা? তিনি অতি ভদ্র ও ভাল মেয়ে। তাঁকে নিয়ে এই ছোঁড়ারা হাসাহাসি করবে এটা ভাল নয়। হঠাৎ আপনার কানে এলে আপনি অত্যন্ত বিরক্ত হতেন। সেই জন্যে গোড়াতেই যদি আপনি ধমক দিয়ে দেন, ত ভাল হয়।"

হিরণ্ময় অত্যন্ত কঠিন স্বরে বলিলেন, "এগুলি আমার কাজ নয়। বেত নিয়ে শাসন ক'রে বেড়াবার আমার অবসর নেই। আপনিই ওদের সাবধান ক'রে দেবেন, বিশেষ ক'রে যে প্রধান দোষী তাকে। এটা club নয়, এটা অফিস, মানুষের কাজ করবার জায়গা। এখানের discipline নষ্ট করা কারো জন্যে চলবে না।"

"যে আজ্ঞে, তাই ব'লে দেব," বলিয়া বিকাশবাবু অতি দ্রুত পদক্ষেপে প্রস্থান করিলেন।

পূর্ণিমা দুই হাতে নিজের মাথাটা চাপিয়া ধরিয়া চেয়ারে বসিয়া পড়িল। এ কি হইল? হিরণ্ময়ের কঠোর কণ্ঠস্বরটা যেন বজ্রনিনাদের মত তাহার কানে বাজিতে লাগিল। কে প্রধান দোষী? কি করিয়াছে সে? পূর্ণিমার নাম লইয়া কে হাসাহাসি করিয়াছে? কাহাকে লক্ষ্য করিয়া তিনি এই শব্দভেদী অস্ত্র ত্যাগ করিলেন?

বাথরুমে ঢুকিয়া সে চোখেমুখে, মাথায় জল দিতে আরম্ভ করিল। চোখ ফাটিয়া কি অশ্রু ঝরিতেছে, না রক্ত ঝরিতেছে? যতবার মুখ ধুইয়া ফেলে, ততবার আবার চোখের জলে মুখ ভাসিয়া যায়। কোনমতে তাহাকে যে থামিতে হইবে? এখনই হয়ত তাহার ডাক পড়িতে পারে।

কোনমতে মুখচোখ মুছিয়া, চুলের জল মুছিয়া সে ঠিকঠাক হইয়া লইল। সঙ্গে সঙ্গেই পাশের ঘরে ঘণ্টা বাজিল এবং বেয়ারা আসিয়া দাঁড়াইল, তাহাকে ডাকিবার জন্য। পূর্ণিমা কম্পিত পদে তাহার পিছন পিছন গিয়া হিরণ্ময়ের সামনে দাঁড়াইল।

কি একটা লিখিতেছিলেন তিনি। কাগজ হইতে মুখ না তুলিয়া বলিলেন, "বসুন।" গলার স্বরে রসের লেশমাত্র নাই।

পূর্ণিমা বসিল। মিনিটখানিক পরে মুখ তুলিয়া হিরণ্ময় জিজ্ঞাসা করিলেন, "এত দেরি হ'ল যে আজ?" চোখের উগ্র দৃষ্টিটা পূর্ণিমা দেখিতে পাইল।

মৃদুকণ্ঠে বলিল, "রাস্তায় ট্যাক্সিটা খারাপ হয়ে যাওয়ায় প্রায় আধঘণ্টা দেরি হয়ে গেল।"

তাহার মুখের দিকে তাকাইয়া হিরণ্ময় বলিলেন,

"মাথায় এত জল ঢেলেছেন কেন? আজ আবার অসুখ করেছে?"

পূর্ণিমা বলিল, "না, অসুখ নয়। আমি কাজ করতে পারব।"

"আচ্ছা," বলিয়া হিরণ্ময় চিঠি dictate করিতে আরম্ভ করিলেন। পূর্ণিমার কি হইয়াছে তাহা জানিবার কোন উৎসাহ দেখাইলেন না। মুখের ভাব অন্যদিন অপেক্ষা ঢের বেশী কঠোর হইয়াই রহিল। পূর্ণিমা মাথা নীচু করিয়া লিখিতেছিল, সৌভাগ্যবশতঃ সে দেখিতে পাইল না যে, হিরণ্ময়ের তীব্রদৃষ্টি বার দুই-তিন তাহার মাথার উপর দিয়া ঘুরিয়া গেল।

কাজকর্ম অন্যদিনের মতই চলিতে লাগিল। দীপক আজ আর তাহার ঘরের ধারে-কাছেও আসিল না। চা খাইবার সময় কোন কিছুই যেন গলা দিয়া গলিতে চাহিল না, পূর্ণিমার। শুধু এক পেয়ালা চা খাইয়া নিজের ঘরে বসিয়া আকাশ-পাতাল ভাবিতে লাগিল।

বুক ভাঙিয়া যাইবার উপক্রম করিতেছে। ধূসর মরুভূমির মত জীবনপথ তাহার। সুশীতল জলের উৎস তাহার একটি মাত্র ছিল, আজ তাহাও শুকাইয়া গেল? অথচ কোন অপরাধ সে করে নাই। অন্যের অপরাধে এতবড় শাস্তি তাহাকে গ্রহণ করিতে হইল?

ভগবান্ আর কতদিন তাহাকে এই তুষানলে দগ্ধ করিবেন? সে কি পলাইয়া বাঁচিতে পারে, যদি আর কাহারও ভাবনা সে নাই-ই ভাবে? কিন্তু বিস্মৃতি কি ভগবান্ দিবেন তাহাকে? যে আগুনে সে পুড়িতেছে, তাহা ত তাহাকে ছাড়িবে না।

আবার কাজের ডাক পড়িল। সকালের রাগ ও বিরক্তি তখন হিরণ্ময়ের মন হইতে অনেকখানি দূর হইয়া গিয়াছে। পূর্ণিমার মুখের নিদারুণ বিবর্ণতাটা এবার তাঁহার চোখে পড়িল। বলিলেন, "অসুখই ত করেছে দেখছি, তা লুকিয়ে কি লাভ হবে? রাস্তায় অতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকায় গরমটা খুব লেগেছে?"

পূর্ণিমা বলিল, "হবে হয়ত। বেশী অসুস্থ হই নি।"

হিরণ্ময় বলিলেন, "ঠাণ্ডায় বসে নিন একটু, তারপর কাজ করবেন।"

পূর্ণিমা উদাসচিত্তে বসিয়াই রহিল। আজ আর তাহার মনে কোন সান্ত্বনা আসিল না। যা হইবার তাহা একেবারে হইয়া যাক না? তাহার জীবনে সুখ বা আনন্দ কোন দিনই আসিবে না। স্বর্গপুরীর দ্বারে ভিখারিণীর মত শূন্য ভিক্ষাপাত্র হাতে দাঁড়াইয়া থাকিয়া কি পূর্ণতা আসিবে তাহার জীবনে?

হঠাৎ হিরণ্ময়ের গলাটা তীরের মত তাহার চেতনার মধ্যে বিঁধিয়া গেল। একটু যেন বিদ্রূপের সুরেই জিজ্ঞাসা করিতেছেন, "কি এত ভাবছেন যে মানুষের কথাটা কানেই গেল না আপনার?"

পূর্ণিমা অত্যন্ত অনুতপ্ত কণ্ঠে বলিল, "বড় অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিলাম।"

"তা ত দেখতেই পাচ্ছি, কিন্তু কেন?"

পূর্ণিমার তখন চোখ ফাটিয়া জল বাহির হইয়া আসিবার উপক্রম করিতেছে। বলিল, "মায়ের কথাটা আমি কিছুতেই ভুলতে পারছি না। তাঁর অবস্থা ত ক্রমেই খারাপ হয়ে যাচ্ছে।"

হিরণ্ময় এবার অনেকটা কোমলকণ্ঠে বলিলেন, "ভেবে লাভ নেই ত কিছু। যা করবার আছে, তা শুধু ক'রে যাওয়া যায়।"

আবার খানিকক্ষণ কাজ করিল। দু'বার ভুল করিল। হিরণ্ময় বলিলেন, "থাক তবে, আজ আপনি এর চেয়ে ভাল পারবেন না। একটা ট্যাক্সি ডেকে দিক, সকাল সকাল বাড়ী চ'লে যান।"

বাড়ীই গেল। সহকর্মীদের পাশ দিয়া যাইবার সময় ইচ্ছা করিয়া কোন দিকে তাকাইল না। বাড়ীতে আসিয়া আশ্রয় নিল স্নানের ঘরে। কাঁদিয়া-কাটিয়া পরিশ্রান্ত হইয়া যাইবার আগে আর বাহির হইল না।

হঠাৎ মনের মধ্যে কোথা হইতে একটা দৃঢ়তার ভাব আসিয়া দেখা দিল। তাহার পৃথিবীর বন্ধন ভগবান্ এক এক করিয়া ঘুচাইয়াই দিবেন বোধ হয়। মা ত পরলোকের যাত্রী, একথা পূর্ণিমা নিজের কাছে আর লুকাইতে পারে না। তাহার একমাত্র সহায়, জীবনের সবচেয়ে ভক্তি ও ভালবাসার পাত্র যিনি ছিলেন, সেই বন্ধুও তাহাকে ত্যাগ করিতে বসিয়াছেন। বাকি থাকে দু'টি ছোট ভাই-বোন। কিন্তু একেবারে অনাথ ছেলে-মেয়ে কি জগতে কখনও বাঁচিয়া থাকে না? দুঃখ কষ্ট সহ্য করিয়া মানুষ হইয়া ওঠে না? আত্মীয়স্বজন আছেও ত কিছু, তাহারা কি একেবারে কিছু করিবে না? তবে পূর্ণিমা এবারকার মত ছুটি লইলে কি হয়? সে কি অপরাধী হইবে ভগবানের চরণে?

আর এই যে মূর্তিমান শনিগ্রহ তাহার জীবনকে এমন করিয়া ছিন্ন-ভিন্ন করিয়া দিল, ইহাকে শাস্তি দিবার কেহ কি নাই? মূর্খ, নির্বোধ, না তাহার চেয়েও বেশী কিছু?

কাপড়-চোপড় বদলাইয়া সে চলিল বেড়াইতে। তাহার মুখের দিকে তাকাইবার যখন আর কেহই রহিল না, তখন সে আর পরের উপকার করিতে যায় কেন?

দূর হইতে দেখিতে পাইল দীপক হন্ হন্ করিয়া আসিতেছে। পূর্ণিমা একটু নিরালা একটা জায়গা দেখিয়া বসিয়া পড়িল। ঝগড়া আজ একটা বাধিবেই, সুতরাং লোকের চোখ এবং কান এড়াইবার মত স্থানই বাছিয়া লইতে হইবে।

দীপক কাছে আসিয়া বসিয়া পড়িল। মুখ উত্তেজিত ও রুষ্ট। বলিল, "তোমাদের হোঁৎকা বিকাশবাবু খুব হেডমাষ্টারি করলেন আজ। বেতটা মারতেই বাকি রেখেছেন।"

পূর্ণিমা বলিল, "ওরকম ক'রে কথা বলছ কেন? ওঁকে সকলেই শ্রদ্ধা ক'রে চলে, কারও মন্দ ত উনি করেন না।"

"যাঁদের মন্দ করেন না, তাঁরা শ্রদ্ধা করুক গিয়ে। আমাকে মত বকবার কি হয়েছে? আমি বেশী হাসি, বেশী কথা বলি, যেখানে না যাবার সেখানে যাই আরও কত কি? হয়ত বড়-কর্ত্তাই তোমাদের হুকুম দিয়েছেন। তোমার সঙ্গে আমার আলাপ ত অফিসে গিয়ে হয় নি, ত অন্যদের মত আমি চলব কেন?"

পূর্ণিমা বিরক্ত ভাবে বলিল, "অন্যদের মতই চলতে হবে, যদি কাজ করবার ইচ্ছে থাকে।"

দীপক বলিল, "'যে যায় লঙ্কায়, সেই হয় রাবণ।' তুমিও ওদের দলে ভিড়েছ? বেশ, কথা আমি বলব না আর। এইটুকু বাঁচোয়া যে বেশীদিন আমাকে আর এ অফিসে থাকতে হবে না, বাইরে চ'লে যাব। সেখানে মানুষের মত থাকতে পারব, স্বাধীন ভাবে থাকতে পারব।"

পূর্ণিমা বলিল, "যেখানেই যাও, অফিসে Discipline মেনে চলতে হবে।"

দীপক বলিল, "তা ত হবেই, তবে সেখানে ত তুমি বড় সাহেবের সেক্রেটারী হয়ে বসে থাকবে না, গোলমাল বাধাবার জন্যে? যদি থাক ত থাকবে আমার ঘরে, যেখানে অফিসের শাসন-দণ্ড পৌঁছায় না।"

পূর্ণিমার হাড় জ্বলিয়া গেল। তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বলিল, "বড় সাহেবের সেক্রেটারি হ'য়ে থাকব না, সেটা নিশ্চিত, তার চেয়ে নিশ্চিত যে তোমার ঘরে কোনও দিন, কোনও অবস্থাতেই আমি যাব না।"

দীপক একেবারে বিস্ময়ে যেন হতবুদ্ধি হইয়া গেল। বলিল, "বলছ কি তুমি পূর্ণিমা? আমাদের কি কথা ছিল না যে আমি উপযুক্ত হলেই আমরা বিয়ে করতে পারব? বাংলা দেশের বাইরে যাবার প্রস্তাবে তাই ত আমি আরও আনন্দ ক'রে রাজী হলাম? সেখানে ত কোনও সমস্যাই থাকবে না? তোমার মত তুমি থাকতে পারবে। রোজগারও ইচ্ছা করলেই করতে পারবে।"

পূর্ণিমা বলিল, "দীপক, চিরদিনই তুমি অতি স্বার্থপর, তোমার উপযুক্ত কথাই তুমি বলেছ। আমার মা মরছেন, অসহায় ছোট ভাইবোন ঘরে প'ড়ে রয়েছে। এমন সময় তোমায় বিয়ে ক'রে বিদেশ যাত্রা না করলে আমার চলবে কেন? তোমার স্ত্রী হওয়াই যদি আমার জীবনের সার্থকতার একমাত্র পথ হ'ত, তা হ'লেও এমন অমানুষের কাজ আমি করতে পারতাম না। তবে ভগবান এইটুকু কৃপা আমাকে করেছেন যে, তোমাকে সম্পূর্ণরূপে আমার মন থেকে মুছে দিয়েছেন। শেষ যেদিন এ বিষয়ে কথা হয়, সেদিন কি পরিষ্কার ক'রে আমি তোমায় ব'লে দিই নি যে, আমাদের আর কোনও সম্পর্ক রইল না? তোমার জন্যে ব'সে আমি থাকব না, তাও ব'লে দিয়েছি। তবে আজ আবার কেন একথা নিয়ে আমাকে বিরক্ত করতে এলে?"

দীপক বলিল, "সে কথাটাকে আমি অভিমানের কথা ভেবেছিলাম পূর্ণিমা। তুমি সত্যি mean করছ তা ভাবি নি। এমনি ক'রে তা হ'লে সব শেষ হ'ল আমাদের মধ্যে? এতদিনের ভালবাসা? আমার আর কোনও স্থানই নেই তোমার জীবনে?"

পূর্ণিমা বলিল, "দেখ দীপক, তোমার বয়স যথেষ্ট হয়েছে সোজা ভাষার সোজা মানে বুঝবার। জোর ক'রে অন্য মানে যদি কর ত সে দোষ আমার নয়। আমি তোমার মনগড়া কথায় কেন bound হতে যাব? আমাদের মধ্যে কি কবে ছিল তা আমি ভুলে গেছি। এমন ক'রে সম্পূর্ণরূপে যে ভুলতে পেরেছি, তাতে মনে হয় বেশী কিছু ছিলই না। ছেলেবেলার ব্যাপার একটা; আর তুমি যাকে চেয়েছিলে সে আমি নয়, সে তোমার মনগড়া মেয়ে একটা। তার জন্যে দুঃখ কি? আর একটা গ'ড়ে নিও।"

দীপক রুদ্ধকণ্ঠে বলিল, "যেমন তুমি নিয়েছ? ভেব না যে কিছুই আমার কানে আসে না। কিন্তু সে সব ত হ'ল, ভদ্রলোকের বড়কথা। তার জন্যে কেউ কাউকে বকতে আসবে না। আজ আর দরিদ্র কেরাণীর ভালবাসায় কি তৃপ্তি আসবে তোমার? কিন্তু পূর্ণিমা, এমন দিন আসবে যখন কেরাণীর স্ত্রী হওয়াটাও তোমার বাঞ্ছনীয় মনে হবে।"

পূর্ণিমা খাড়া হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। বলিল, "আমি চললাম দীপক। এখানে ব'সে ব'সে তোমার অভদ্র ইঙ্গিত শুনবার কোন প্রয়োজন আমি অনুভব করছি না।

তোমার অনিষ্ট আমি খানিকটা করতে পারতাম, মিঃ মজুমদারকে বললেই। কিন্তু তা করব না। তুমি নির্বোধ ব'লে এ কথাগুলো আমায় শোনালে। যা হোক, এইটুকু জেনে রাখ যে, বিধাতা আমার অদৃষ্টে যে লাঞ্ছনাই লিখে থাকুন তাই আমি মাথা পেতে নেব, কিন্তু তোমার স্ত্রী হওয়াকে তার চেয়ে বাঞ্ছনীয় ভাবব না।"

সে আর পিছন দিকে না তাকাইয়া দ্রুতপদে চলিয়া গেল। অভিভূতের মত খানিকক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিয়া দীপকও নিজের ঘরের পথ ধরিল।

বাড়ী আসিয়া পূর্ণিমার মনে হইতে লাগিল একটা steam roller যেন তাহার দেহ-মনের উপর দিয়া চলিয়া গিয়াছে। দু'টিই বিধ্বস্ত। মানুষের সহ্যের সীমা কোথায় কে জানে? এততেও পূর্ণিমা মরিল না? পাগলও হইয়া গেল না?

হিরণ্ময় ও তাহাকে লইয়া এই যে ইঙ্গিত, ইহা সকলেই বিশ্বাস করে কি? করেই বোধ হয়। পূর্ণিমা সুন্দরী তরুণী। আসিয়া পড়িয়াছে যাঁহার সান্নিধ্যে, তিনি অবিবাহিত পুরুষ, যৌবন তাঁহার এখনও চলিয়া যায় নাই। তাহাকে যে হিরণ্ময় সর্ব্ব বিষয়ে সাহায্য করেন, তাহার সুখ-সুবিধার দিকে তাঁহার যে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি তাহা সকলেই লক্ষ্য করে। কেনই বা তিনি এত করিতে যাইবেন, যদি প্রতিদানে তাঁহার পাওনা কিছু না থাকে? এই প্রশ্নের উত্তর, তাহারা নিজ নিজ স্বভাবের উপযুক্ত ভাবে খুঁজিয়া পাইয়াছে। সকলেরই প্রায় এক মত। পূর্ণিমাকে হিরণ্ময় গ্রাস করিয়া বসিয়া আছেন।

অসহ্য দুঃখেও তাহার হাসি আসিল। অনাহারে মৃতপ্রায় মানুষ যদি খাদ্য চুরি করে, আইনের চোখে সে চোরই হয়, ভগবানের চোখে হয়ত হয় না। কিন্তু দেহের ক্ষুধা কি চুরি করিয়া মিটান যায় না? না হইলে পূর্ণিমা চুরিই করিত। দেহের ক্ষুধা হয়ত মেটে, কিন্তু এ জিনিষের সহিত পূর্ণিমার কোন পরিচয় নাই। তাই এই সব ইঙ্গিত যেন দারুণ দুঃস্বপ্নের মত তাহার কণ্ঠরোধ করিয়া বসে। হিরণ্ময় এগুলিকে কি ভাবে গ্রহণ করেন কে জানে? উপেক্ষাই করেন হয়ত।

খাইতে বসিয়া সে কিছুই খাইতে পারিল না। পসীমা বলিলেন, "রান্না ভাল হয় নি বুঝি?"

পূর্ণিমা বলিল, "ভালই হয়েছে। আমারই শরীরটা ভাল নেই।"

সরমা বলিল, "দিদি, তুমি শোও গিয়ে দেখি তাড়াতাড়ি। অসুখের নাম শুনলে, আমার এমন ভয় করে।"

সকালে উঠিয়া ভাবিতে লাগিল, একদিন যদি না যায়, তাহা হইলে কেমন হয়? হয়ত আজও রাগ করিয়া আছেন। নাই দেখিলাম সেই উগ্র দৃষ্টি? দীপকের ব্যবহারে যে ত্রুটি ঘটিয়াছিল তাহাতে আমারও প্রশ্রয় আছে, ইহাই তিনি ধরিয়া লইয়াছেন। কি করিয়া সে ভুল ভাঙাইব আমি? কোনও কথা বলিবার আমার সাধ্য হইবে কি?

কিন্তু সময় যত অগ্রসর হইতে লাগিল, অফিসের গাড়ীটা যেন দুর্নিবার আকর্ষণে তাহাকে টানিতে লাগিল। না গিয়া তাহার রক্ষা নাই, যাইতে তাহাকে হইবেই। অবশেষে তারই তাহাকে মানিতে হইল। স্নান করিয়া খাইয়া প্রস্তুত হইয়া সে বাহির হইয়া পড়িল। সহযাত্রিণীর বাড়ীর কাছে আসিতেই তিনি চুলে curl paper লাগাইয়া ও housecoat পরিয়া বাহির হইয়া আসিলেন, বোধ হয় পূর্ণিমার জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন। তাঁহার আজ যাওয়া সম্ভব হইল না, গত রাত্রে এক cocktail party হইতে ফিরিতে বেশী রাত হইয়া গিয়াছিল, আজ শরীর বড় খারাপ। মিঃ দস্তুরকে পূর্ণিমা যেন বলিয়া দেয়।

গাড়ী করিয়া যাইতে যাইতে পূর্ণিমা ভাবিল, একদিক দিয়া ইহারা সুখে আছে। দুঃখকে ইহারা বুকে পুষিয়া বসিয়া থাকে না। দিন-রাত ইহাদের দ্রুত তালে নাচিয়া চলিয়া যায়। তবে জীবনের গভীরতর অন্তরতর সত্তার মধ্যে ইহারা পায় কি কিছু? কে জানে?

Lift-এই আজ হিরণ্ময়ের সহিত দেখা হইয়া গেল হাসিয়া সুপ্রভাত জানাইলেন, অন্য কোন কথা বলিলেন না। পূর্ণিমা নিজের ঘরে গিয়া পাঁচ মিনিট বসিল চুলটা ঠিক করিল, ভিজা তোয়ালে দিয়া হাত-মুখ মুছিয়া তবে হিরণ্ময়ের ঘরে গিয়া উপস্থিত হইল।

হিরণ্ময় জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেমন আছেন আজ?"

পূর্ণিমা বলিল, "ভালই ত আছি।"

"দেখাচ্ছে না ভাল বিশেষ কিছু। তবে এইটাই আপনার normal অবস্থা এখন ধ'রে নিতে হবে আপনাকে যতখানি খাটতে হয়, ততটা সামর্থ্য আপনার নেই। তার আর উপায় কি? ভগবান্ বোঝা যতটা দেন, বইবার শক্তি সেই অনুপাতে অনেক ক্ষেত্রে দেন না। তবু মানুষকে বইতেই হয়।"

একখানা চিঠির dictation শেষ করিয়া বলিলেন,

"সামনের ক'টা দিন একটু বিশ্রাম পাবেন আপনি। পুরোপুরি নয় যদিও।"

পূর্ণিমা জিজ্ঞাসা করিল, "কি ক'রে?"

"কাল রাত্রের ট্রেনে আমি বম্বে যাচ্ছি কয়েক দিনের জন্যে। যে ক'দিন থাকব না, আপনি অফিসে আসবেন অবশ্য। তবে বেশী কাজ কিছু করতে হবে না। বিকাশবাবু অল্পস্বল্প কাজ দেবেন। পাঁচটা অবধি ব'সে থাকবার দরকার নেই, আগেই চ'লে যেতে পারবেন ইচ্ছা করলেই।"

পূর্ণিমা নিজে নিজের মুখ দেখিতে পাইল না, কিন্তু হিরণ্ময় দেখিলেন, তাহার মুখ হইতে রক্তের আভাস একেবারে নিশ্চিহ্ন হইয়া মিলাইয়া গেল, চোখের দৃষ্টি দারুণ অবসাদে যেন ধূসর হইয়া আসিল। হিরণ্ময়ের মুখের উপর দিয়া একটা প্রচ্ছন্ন তৃপ্তিরই ছায়া যেন ক্ষণিক দেখা দিয়া মিলাইয়া গেল। পূর্ণিমা তাহা দেখিল না।

অনেক কষ্টে গলাটা স্বাভাবিক করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "আপনি ফিরবেন কবে?"

হিরণ্ময় বলিলেন, "একেবারে ঠিক ক'রে বলতে পারছি না। হয়ত এক হপ্তার মধ্যেই ফিরব। তবে নূতন একটা scheme নিয়ে আলোচনা করার কথাও আছে, সে ক্ষেত্রে এক মাস হয়ে যাওয়াও অসম্ভব নয়।"

"একটু জল খেয়ে আসছি," বলিয়া পূর্ণিমা হঠাৎ উঠিয়া দ্রুতপদে নিজের ঘরে চলিয়া গেল। হিরণ্ময় বিষণ্ণ মুখে চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন।

মিনিট দুইয়ের মধ্যে পূর্ণিমা ফিরিয়া আসিল। আবার নীরবে কাজ করিতে বসিল। আর একখানা চিঠি শেষ করিয়া হিরণ্ময় বলিলেন, "অন্য কথা একটু ছিল। ব'লে নি সেটা, নয়ত কালকের গোলমালে ভুলে যাব। একটু সামান্য personal হবে, কিছু মনে করবেন না।"

পূর্ণিমা জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাঁহার মুখের দিকে তাকাইয়া রহিল। হৃৎপিণ্ডটা তাহার একবার সজোরে আছাড় খাইয়া পড়িল। হিরণ্ময় জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমি চ'লে যাচ্ছি শুনে কি আপনি ভয় পেয়েছেন?"

পূর্ণিমা চোখ তুলিয়া চাহিল। না, চোখের দৃষ্টিতে এখন কোন রাগ বা বিরক্তি নাই। আবার চোখ নীচু করিয়া বলিল, "আমার যে আর সহায় কেউ নেই, তাই ভয় হয়।"

হিরণ্ময় বলিলেন, "হতেই পারে। আচ্ছা কিছু-দিনের জন্যে যদি কাউকে ব'লে যাওয়া যায় একটু দেখা-শোনা করতে, একটু খোঁজ-খবর রাখতে তা হ'লে কেমন হয়? অবশ্য উপযুক্ত মানুষকে বলতে হবে। আপনি কারও নাম suggest করতে পারেন?"

পূর্ণিমা বলিল, "না, আমার জানা কেউ নেই। আত্মীয় এবং বন্ধুরা ত আমাকে এড়িয়েই চলেন, পাছে কিছু করতে হয় আমার জন্যে।"

হিরণ্ময় বলিলেন, "তা ত করবেনই, এটাই সংসারের নিয়ম। আচ্ছা, আমি বিকাশবাবুকে ব'লে যাব। উনিই এ অফিসের মধ্যে সবচেয়ে reliable মানুষ। এবং প্রায় বুড়োমানুষ, সেটাও একটা লাভ।"

পূর্ণিমা বলিল, "তাই বলবেন। মা যদি ভাল থাকতেন তা হ'লে কাউকে কিছু বলার দরকার হ'ত না। কিন্তু তাঁর অবস্থা ক্রমে খারাপ হয়ে পড়ছে। কি যে আমাদের অদৃষ্টে আছে জানি না।"

হিরণ্ময় বলিলেন, "কি আর করবেন বলুন? যথাসাধ্য ত করা হ'ল। কিন্তু টাকাতে আর-সব কেনা যায়, পরমায়ু কেনা যায় না।"

পূর্ণিমা মনে মনে বলিল, "ভালবাসাও কেনা যায় না বোধ হয়।"

সেদিনকার কাজ শেষ হইল। হিরণ্ময় বাড়ী যাইবার আগে বিকাশবাবুকে ডাকিয়া অনেকক্ষণ কথা বলিলেন, শেষে বলিলেন, "আর দেখুন, এই যে ছোকরা দুজনকে নিয়েছেন কাজ শেখাবার জন্যে, ও দুজনকে অন্যখানে চালান ক'রে দিন। ঢের কাজ শিখেছে, এবার অন্যদের দিকে মন দিচ্ছে। আমি ফিরে এসে আর ওদের এখানে দেখতে চাই না।"

বিকাশবাবু বলিলেন, "আজ্ঞে হ্যাঁ স্যার, তাই হবে। আমি সেই রকমই ব্যবস্থা করে দিচ্ছি।"

পূর্ণিমা দূর হইতে দেখিল, কি কথা হইল, তাহা অবশ্য শুনিল না কিছু।

১৮

আজ রাত্রের ট্রেনে হিরণ্ময়ের চলিয়া যাওয়ার কথা। সুতরাং আজ কাজে যাইতে হইবে কিনা তাহা ভাবিয়া দেখিবার কোন প্রয়োজন ছিল না। পূর্ণিমা সকাল হইতেই ঠিক সময়ে বাহির হইবার জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিল।

এক মাসও দেরি হইতে পারে, ফিরিয়া আসিতে। এক মাসের মধ্যে কি না হইতে পারে? পৃথিবী ধ্বংস হইতে পারে, সংসার ভাঙিয়া যাইতে পারে, মানুষ মরিয়া যাইতে পারে। আজ যে বিচ্ছেদ হইবে দু'টি মানুষের

মধ্যো তাহা যে চিরবিচ্ছেদ নয় তাহা কে বলিবে পূর্ণিমাকে ?

অফিসে আজ কাজের চাপ বেশী। কাগজপত্র অনেক যাইবে হিরণ্ময়ের সঙ্গে। সব প্রস্তুত করিয়া দিতে হইতেছে। পূর্ণিমার পক্ষে ভাল, বসিয়া ভাবিবার সময় তাহার নাই। কলের পুতুলের মত কাজ করিয়া যাইতেছে। হিরণ্ময়ের মুখের দিকে তাকাইতে সাহস হয় না, তবু মাঝে মাঝে চোখ পড়ে। সে মুখে ক্রোধের চিহ্ন যেমন নাই, প্রশান্তিও তেমন নাই।

কাজের ফাঁকে একবার বলিলেন, "সব ব'লে গেলাম বিকাশবাবুকে। যখন যা দরকার হবে, ওঁকে বলবেন।"

পূর্ণিমা বলিল, "আচ্ছা।" মনকে কঠিন করিবার জন্য তখন প্রাণপণে চেষ্টা করিতেছে। এই শেষ দয়াটুকু আর না করিলেও চলিত, ভাসাইয়াই দিয়া গেলে যখন।

বেলা গড়াইয়াই আসিতে লাগিল। চারটা বাজিতে হিরণ্ময় উঠিয়া দাঁড়াইলেন, বলিলেন, "এখন তবে চলি। কাজ আছে বাড়ীতে।" নমস্কার করিলেন না। হয়ত মনে ছিল না।

পূর্ণিমা দরজা ধরিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। জীবনের একটা অঙ্ক তাহার শেষ হইতে চলিল কি ? এখানে একবার যে সূত্র ছিঁড়িল, আর সেখানে আসিয়া জোড়া লাগিবে কি ?

কাজে ঢুকিবার পর, সে বিশেষ কখনও হিরণ্ময়কে অনুপস্থিত দেখে নাই। দুই দিনের জন্য মাত্র তিনি একবার আসানসোল গিয়াছিলেন। কাল হইতে এ বিশাল বাড়ীটা কেমন দেখাইবে ?

হিরণ্ময় হঠাৎ পিছন ফিরিয়া তাকাইলেন। কাহাকে দেখিবার আশায় ফিরিয়াছিলেন বলা যায় না। পূর্ণিমাকেই শুধু দেখিলেন। সে যেন পাথরের মূর্ত্তিতে পরিণত হইয়াছে। চেহারায় প্রাণের স্পন্দন কোথাও নাই। চোখ দু'টাও যেন দৃষ্টিহীন হইয়া গিয়াছে।

দ্রুতপদে ফিরিয়া আসিয়া পূর্ণিমার কাছে দাঁড়াইলেন বলিলেন, "একটা কাজের কথা বলতে ভুলে গেলাম। আমার ঘরে টেবিলের উপর পাথরের Paperweight দিয়ে চাপা কয়েকটা কাগজ আছে। ওগুলো টাইপ ক'রে বাড়ী যাবার সময় আমাকে দিয়ে যাবেন। Overtime খাটা আপনার বন্ধ ক'রে দিয়েছি, কিন্তু আজ আধ ঘণ্টা খানিক কাজ করতে হবে আপনাকে।"

হিরণ্ময়ের দৃষ্টির মধ্যে কি ছিল কে জানে ? পূর্ণিমার মুখে একটু যেন রক্তের আভা দেখা দিল, বলিল, "আমার কোন অসুবিধে নেই। অনেক দিন আমি ইচ্ছে ক'রেই দেরি করি। বড় বেশী গরম থাকে। আমি এখনই ক'রে দিচ্ছি।"

হিরণ্ময় চলিয়া গেলেন।

কাজ শেষ করিতে পূর্ণিমার বেশীক্ষণ লাগিল না। ঘর ঠিক করিয়া রাখিয়া, নিজের হ্যাণ্ডব্যাগে কাগজগুলি লইয়া সে বাহির হইয়া পড়িল। হিরণ্ময়ের বাড়ী পৌঁছিতে কিছুক্ষণ সময় লাগে। যখন গিয়া তাহার বসিবার ঘরে প্রবেশ করিল, তখন দিনের আলো ম্লান হইয়া আসিতেছে।

হিরণ্ময় বসিবার ঘরে বসিয়াই জিনিষপত্র গুছাইতেছিলেন। পূর্ণিমাকে দেখিয়া বলিলেন, "এই যে আসুন। এই প্যাকিং ব্যাপারটা মোটে ভাল লাগে না আমার। অথচ চাকরকে দিয়ে হয়ও না ঠিকমত। কাগজগুলো রাখুন এখানে।"

পূর্ণিমা যথাস্থানে সব রাখিয়া দিয়া বলিল, "আমি আপনাকে একটু সাহায্য করব ?"

হিরণ্ময় বলিলেন, "না, না, আমার হয়ে এসেছে প্রায়। আবার আপনাকে খাটাব কেন ? আচ্ছা, দেখুন, কয়েকটা কথা আছে যা অফিসে বলা গেল না। আপনার টাকাকড়ির হঠাৎ দরকার হতে পারে ত ? মায়ের এতটা অসুখ যখন ?"

পূর্ণিমা বলিল, "কি যে করব আমি ভেবেই পাচ্ছি না। বাবা যখন চ'লে গেলেন তখন এত ছোট ছিলাম যে কিছু ভাল ক'রে বুঝি নি। সব ধাক্কা মা সামলিয়ে ছিলেন। আজ বড় অসহায় আর অক্ষম লাগছে নিজেকে। অন্যের ভার বইব কি, নিজের ভারই যেন বইতে পারছি না।"

"বয়ে ত এলেন এতদিন। আর 'পারছি না' বললে ভগবান ত নিষ্কৃতি দেন না ? টাকার ব্যবস্থাটা ক'রে যাচ্ছি।" বলিয়া পকেট হইতে wallet বাহির করিয়া পূর্ণিমার হাতে একতাড়া নোট গুঁজিয়া দিলেন, "সব কিছুর জন্যে প্রস্তুত থাকা ভাল। টাকাটা বিকাশবাবুর হাতে দিলাম না, আর কেউ জানে, এটা ইচ্ছা করি না। বিকাশবাবু মানুষ ভাল, তবে বেশী কথা বলেন একটু। এ রকম লোকে পেটে কথা রাখতে পারে না।"

টাকা লইয়া পূর্ণিমা হাতব্যাগে ঢুকাইয়া রাখিল। বলিল, "যদি আমার আশঙ্কা সত্য হয়ে দাঁড়ায়, মা যদি চ'লেই যান, তা হ'লে আমি কি করব ব'লে যান। আমার মাথার ভিতরটা কেমন যেন জড়পিণ্ডের মত হয়ে আসছে, ভাবতে পারছি না।"

হিরণ্ময় একবার তাহার মুখের দিকে তাকাইয়া

দেখিলেন। তাহার পর বলিলেন, "এ সময়ে আমি না চ'লে গেলেই ভাল হ'ত। কিন্তু এ যাওয়াটা আগের থেকেই ঠিক ছিল। তবে এক সপ্তাহের বেশী আমি থাকব না, অন্য যা কাজ ছিল, তা পরে গিয়ে আলোচনা করলেও চলবে। আচ্ছা, এই ঠিকানা রেখে যাচ্ছি, টেলিফোনের নম্বরও রেখে যাচ্ছি। যদি তেমন emergency-ই দেখেন তা হ'লে খবর দেবেন। টেলিফোন আর aeroplane-এর সাহায্য নিলে এক দিনে খবর পাওয়া, ফিরে আসা হয়ে যায়। ভয় পাবেন না, সেরকম কিছু ঘটলে ফিরেই আসব আমি।"

পূর্ণিমা কথাই বলিতে পারিল না। কৃতজ্ঞতা যখন সকল সীমা ছাড়াইয়া যায়, তখন তাহা প্রকাশ করিবার কোন উপায় থাকে না।

একটু পরে উঠিয়া বলিল, "আমি তবে যাই এখন, আপনারও কাজ বাকি রয়েছে।"

অবনত হইয়া হিরণ্ময়কে প্রণাম করিতে গেল। এবার আর তিনি বাধা দিলেন না, উপহাসও করিলেন না। পূর্ণিমার মাথার উপর হাত রাখিয়া বলিলেন, "থাক্, থাক্। ফিরেই ত আসছি ক'দিনের মধ্যে?"

পূর্ণিমা নামিয়া চলিয়া গেল। মন জুড়িয়া এই শেষ আশ্বাসের বাণীটুকু বাজিতে লাগিল 'ফিরেই ত আসছি ক'দিনের মধ্যে।' দারুণ দুঃখের দিন ঘনাইয়া আসিতেছে পূর্ণিমার জীবনে। কিন্তু বন্ধু তাহাকে ত্যাগ করেন নাই।

হিরণ্ময়ের বাড়ী হইতে পূর্ণিমার বাড়ী খুব বেশী দূর নয়। ইচ্ছা থাকিলে হাঁটিয়া যাওয়া যায়। রোদ পড়িয়া গিয়াছে, আস্তে আস্তে হাঁটিয়া যাইতে মন্দ লাগিবে না। ঠেলাঠেলি করিয়া ট্রামে-বাসে ওঠা এখন তাহার কাছে বড়ই অরুচিকর লাগে।

পথে হাঁটিয়াই চলিল। হঠাৎ দীপকের কথা মনে পড়িল। দারুণ অকৃতজ্ঞ স্বার্থপর মানুষ। প্রথম যৌবনে স্বভাবটা তাহার এতটা নষ্ট হইয়া যায় নাই। তখন তাহাকে বন্ধু বলিয়া গ্রহণ করিতে কোথাও বাধিত না। আর এখন অন্য পাঁচটা নিন্দুকের মত সেও পূর্ণিমার কুৎসা রটাইতে ব্যস্ত। অভিশাপও একটা দিয়া গেল। যে দু'জন মানুষ টানিয়া তুলিল তাহাকে নিরাশার অতল গহ্বর হইতে, তাহাদের জন্য মনে তাহার কোন কল্যাণেচ্ছা নাই।

ভালই হইয়াছে, দীপককে এখানে রাখা হইবে না। এ ক'দিন সে ধারে কাছে আসে নাই, অফিসে আছে কি নাই, তাহা লক্ষ্যই করে নাই পূর্ণিমা। তবে একদিন না একদিন দীপককে সরিয়াই যাইতে হইবে। জীবনের পথে তাহাকে আর দেখা যাইবে না। দেখিবার ইচ্ছাও নাই পূর্ণিমার।

রাত্রির অন্ধকার যখন ঘন হইয়া আসিল তখন, পূর্ণিমা বিছানা ছাড়িয়া উঠিয়া ছোট বারান্দায় বেড়াইতে লাগিল। হিরণ্ময় এতক্ষণে কলিকাতা ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছেন। প্রতি মুহূর্ত্তেই তিনি দূর হইতে দূরে চলিয়া যাইতেছেন। পূর্ণিমার মন শুধু এখন তাঁহার সঙ্গে যাইতে পারে। চোখ কতদিন তাঁহাকে দেখিবে না, কান তাঁহার কণ্ঠস্বর শুনিবে না। তাঁহার হাতের স্পর্শও পাইবে না। সে এই প্রিয় বিরহিত দিনগুলি কেমন করিয় সে কাটাইবে?

অফিসে যাইবার সময়টা ঠিকই রহিল, তবে চারটা বাজিবার আগেই সে ছুটি পাইয়া গেল। দারুণ রোদ, তবে ভিড় কিছু নাই, এই একটা সুবিধা।

বাড়ীতেই বসিয়া রহিল, বিকাল বেলাটা। পার্কে বেড়াইতে অবশ্য যাওয়া যায়, কিন্তু অবাঞ্ছিত পরিচিত-সংসর্গ পীড়া ঘটাইতে পারে। দীপক যেরকম কাণ্ডজ্ঞানহীন সেও আসিয়া উপস্থিত হইতে পারে। দরকার নাই, ঘরেই বসিয়া থাকা যাক। সরমা আর রণেনের সঙ্গে কথা বলিবারই আজকাল সময় হয় না পূর্ণিমার।

মাকে দেখিতে গেল পরের দিন। ডাক্তার, নার্স সকলেই গম্ভীরমুখে কথা বলিল। রোগিণীর অবস্থা উত্তরোত্তর খারাপ হইতেছে। পূর্ণিমার আশঙ্কাকাতর দৃষ্টিতে মনে হইতে লাগিল, যেন ইহারই মধ্যে কালো একটা ছায়া আসিয়া মায়ের মুখে পড়িয়াছে। কাছে আসিয়া বসিতেই সুরবালা জিজ্ঞাসা করিলেন, "আজ হিরণ্ময় এলেন না?"

পূর্ণিমা বলিল, "না মা, তিনি কয়েকদিনের জন্যে বম্বে গিয়েছেন কাজে।"

সুরবালা হতাশ কণ্ঠে বলিলেন, "চলে গেছেন? কবে ফিরবেন?"

"ফিরবার ঠিক কিছু নেই। এক হপ্তার মধ্যে ফিরতে পারেন, আবার দেরিও আর কিছুদিন হতে পারে।"

সুরবালা বলিলেন, "তবে আমার সঙ্গে আর দেখা হ'ল না।"

পূর্ণিমা কাতরভাবে বলিল, "কেন তা ভাবছ মা? নিশ্চয় দেখা হবে। তিনি ত ব'লে গিয়েছেন, খুব কোন প্রয়োজন হলে ডেকে পাঠাতে তাঁকে। ঠিকানা দিয়ে গেছেন। তুমি যদি বল আমি তাঁকে চিঠি লিখতে পারি।"

সুরবালা বলিলেন, "এখনি না, ভেবে দেখি।" কিছুক্ষণ কি যেন চিন্তা করিয়া বলিলেন, "খুকী, উনি তোকে খুব স্নেহ করেন, না?"

পূর্ণিমা মাথা হেঁট করিয়া বলিল, "খুব দয়া করেন।"

সুরবালা বলিলেন, "স্নেহ না থাকলে এত দয়া করতেন না। ওঁর আশ্রয় কোনদিন ছাড়িস না মা। ওরকম সত্যিকারের ভদ্রলোক কম হয় জগতে।"

পূর্ণিমা কি উত্তর দিবে ভাবিয়া পাইল না। মা কি তাহার অন্তরের কথা জানিতে পারিয়াছেন? একটু পরে নীচু গলায় বলিল, "নিজের থেকে কোনদিনই ছাড়ব না মা; তবে ভাগ্যদোষে ছাড়তে হতে পারে।"

সুরবালা অনেকক্ষণ নীরবে কি ভাবিতে লাগিলেন। তাহার পর বলিলেন, "খোকা আর সরমা কেন আর আমায় দেখতে আসে না?"

পূর্ণিমা বলিল, "কি জানি মা, বড় ভয় ওদের হাসপাতালকে।" আরো কিছুক্ষণ বসিয়া কথা বলিল, সময় হইয়া গেল, তাহার পর বাড়ী ফিরিয়া চলিল।

হিরণ্ময়কে কি খবর দেওয়া উচিত? মা সারিবেন না, ইহা প্রায় নিশ্চিত। কিন্তু কতদিন আর তাঁর পরমায়ু আছে তাহা কে জানে? যদি কয়েকদিন থাকেন, তাহা হইলে হিরণ্ময় আপনা হইতেই ফিরিয়া আসিতে পারেন। প্রয়োজন হইলে তিনি ফিরিয়া আসিবেন বলিয়া গিয়াছেন, কিন্তু কতখানি প্রয়োজনে তাঁকে ডাকা চলে?

স্থির করিল, একদিন আরো দেখিবে সে। হিরণ্ময় ঠিকমত পৌঁছিয়াছেন কি না, একথা সে বিকাশবাবুকে জিজ্ঞাসা করে নাই. চিঠি আসিয়াছে কি না তাহাও জানিতে চাহে নাই। বিকাশবাবু অবশ্য হিরণ্ময়ের অনুরোধ মত প্রতিদিনই তাহার খবর লইতেছেন। আর খবর লইতেছেন মিসেস্ দস্তর। পূর্ণিমা যে কোন খবরই পায় নাই হিরণ্ময়ের, ইহা তিনি বিশ্বাসই করেন না। "How strange!" ধ্বনিটি তাঁহার কণ্ঠে লাগিয়াই আছে। পূর্ণিমা মনে মনে জলিয়া যায়, মুখে কিছু বলে না। স্ত্রীলোকটির স্বভাব অতি ঈর্ষ্যাকাতর। নিজে অনেক চেষ্টা করিয়াও হিরণ্ময়ের মনোযোগ আকর্ষণ করিতে সমর্থ হন নাই. সেই রাগটা বোধহয় পূর্ণিমার উপর ঝাড়িতেছেন।

বিকাশবাবুকে পরের দিনই পূর্ণিমা জিজ্ঞাসা করিল, "মিঃ মজুমদার কি ফিরে আসার বিষয়ে কোন খবর দিয়েছেন?"

"কাল হয়ত এসে পড়তে পারেন, একটা trunk call এসেছে সকালে।"

পূর্ণিমার মনের বোঝা খানিকটা যেন হালকা হইয়া গেল। পায়ের নীচের মাটি তাহার সরিয়া যাইতে আরম্ভ করিয়াছিল। আসন্ন মাতৃবিয়োগের আশঙ্কা তাহার গলা টিপিয়া ধরিয়াছিল। এই দারুণ ব্যাপার সত্যই যখন ঘটিবে তখন হিরণ্ময় যদি উপস্থিত না থাকেন? শেষ অবধি ভাবিতেই পারিত না পূর্ণিমা।

আবার জিজ্ঞাসা করিল, "তিনি কোন্ ট্রেনে আসবেন?"

বিকাশবাবু বলিলেন, "ট্রেনে আসছেনই না, planeএ আসছেন। কাল এগারোটা বারোটার মধ্যে এসে পৌঁছবেন বোধ হয়।"

দিনটা যেন আর কাটিতে চাহে না। কাজও বেশী কিছু নাই। বসিয়া বসিয়া খালি আকাশ-পাতাল ভাবা, নয়ত magazine পড়া। কতক্ষণ বা এইভাবে সময় কাটান যায়?

অবশেষে কোনমতে বিকাল হইল এবং পূর্ণিমা বাড়ী ফিরিয়া গেল। হাসপাতালে যাইবার জন্য যখনই গাড়ীর প্রয়োজন হইবে, তখনই গাড়ী ব্যবহার করার অনুমতি হিরণ্ময় তাহাকে দিয়া গিয়াছিলেন। তাঁহার ড্রাইভার রোজ গিয়া পূর্ণিমার বাড়ী খবর লইয়া আসিত। আজ মাকে দেখিতে যাইবে সে, এখন ত রোজই যায়, সরমা এবং রণেনকে লইয়াই যাইবে। সকলে মিলিয়া চলিল নির্দ্দিষ্ট সময়ে। সরমা এবং রণেন খানিকটা ভীত মুখেই বসিয়া রহিল।

মা সকলকে দেখিয়া খুশী হইলেন। বেশী কথা বলিলেন ছোট মেয়ে ও ছেলের সঙ্গে। পূর্ণিমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "হিরণ্ময় কবে আসবেন মা।"

পূর্ণিমা বলিল, "কাল দুপুরেই এসে পৌঁছবেন তিনি। পরশু তোমায় দেখতে আসবেন হয়ত।"

সুরবালা বলিলেন, "হ্যাঁ, আসতে বলিস।"

রাত্রিটা যেন আর কাটিতে চায় না। ঘড়ি দেখিতে দেখিতে ত পূর্ণিমার চোখে ব্যথা ধরিয়া গেল। বই পড়িতে ভাল লাগে না, পাঁচ লাইন পড়িতে না পড়িতে মনটা কোথায় উধাও হইয়া যায়। শেলাই ফোঁড়াই করা যায় না, আলো জ্বালিলে অন্য লোকের ঘুমের ব্যাঘাত হয়। একতলা বাড়ী, গভীর রাত্রে দরজা খুলিয়া বাহিরে বেড়াইতেও ভয় করে।

যাহা হউক, কোনমতে রাতটা ত কাটিয়া গেল। কাজকর্ম্ম সারিয়া অফিসের জন্য প্রস্তুত হইল পূর্ণিমা। আনন্দ হৃদয় ভরিয়া জাগিয়া ওঠে, আবার মায়ের কথা মনে করিয়া লজ্জা আসিয়াও মন জুড়িয়া বসে।

ট্যাক্সিতে বসিয়া মিসেস দস্তুরের বক্‌বকানি আরও যেন আজ অসহ্য লাগিতেছে। তবে পূর্ণিমা যতই না-শোনার ভান করুক, কথাগুলা তাহার কানে ঠিকই যাইতেছে।

অফিসে আজ কি করিয়া তাহারা যেন একটু আগে পৌঁছিল। হয়ত রাস্তা-ঘাট খালি ছিল। Lift-এ খুব ভিড় ছিল না, সুতরাং সঙ্গিনীদের সঙ্গে lift-এই চড়িল সে। অফিসের লোকরা অনেকে এখনও আসিয়া পৌঁছায় নাই। পূর্ণিমা একবার তাকাইয়া দেখিল। দীপককে দেখিল না। তাহার সহিত ঝগড়া হইবার পর হইতে এ মানুষটির কোন খোঁজ-খবর আর পূর্ণিমা লয় নাই। লইতে চাহেও নাই। চোখের অগোচরেই সে থাকুক ইহাই পূর্ণিমা চায়, মনের অগোচর ত সে হইয়াই গিয়াছে।

হিরণ্ময়ের ঘর বেয়ারারা ভাল করিয়াই পরিষ্কার করিয়া রাখে, তবু আজ ঘুরিয়া ঘুরিয়া পূর্ণিমা ঘর গুছাইল, পরিষ্কার করিল। কুঁজার জল বদলান হইয়াছে কি না, গেলাস পরিষ্কার আছে কি না সবই তদারক করিল।

Plane আসিবার সময় ত হইয়া গেল। ঠিক সময়ে আসিয়াছে কি না কে জানে? তাঁহার ড্রাইভার তাহাকে আনিতে গিয়াছে নিশ্চয়ই। আর কেহ গিয়াছে কি না কে জানে? সাধারণতঃ কাহারও ত যাইবার কথা নয়। মনটা তাহার ভয়ানক ছট্‌ফট্‌ করিতে লাগিল। পূর্ণিমার বাথরুমের জানলা দিয়া রাস্তার একটা অংশ দেখা যায়, সেইখানে গিয়া খানিকক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিল। না, হিরণ্ময়ের গাড়ী দেখা যায় না। আবার ঘরে ফিরিয়া আসিল।

হঠাৎ পায়ের শব্দে ফিরিয়া তাকাইল। বিকাশবাবু আসিতেছেন। পূর্ণিমাকে দেখিয়া বলিলেন, "মজুমদার সাহেব এসে গেছেন। আজ বোধ হয় আর অফিসে আসবেন না। আমায় ডেকে পাঠিয়েছেন।"

পূর্ণিমার বুকের ভিতরটা কেমন যেন করিয়া উঠিল। আসিবেন না? দেখা হইবে না?

হাসিবার চেষ্টা করিয়া বলিল, "ও, তাই নাকি?"

বিকাশবাবু চলিয়া গেলেন। চোখের জল ত আর বাধা মানিল না। চোখে মুখে বার বার করিয়া জল দিয়া, চোখের তলায় পাউডার ঘষিয়া পূর্ণিমা অশ্রু-চিহ্ন লুপ্ত করিতে চেষ্টা করিল। আজ তাহার মুখের দিকে দৃষ্টি পড়িবে অনেকেরই। মুখখানা মুখোসের মত করিয়া রাখিতে পারিলে ভাল হইত, কিন্তু সে ক্ষমতা পূর্ণিমার নাই। অন্ততঃ মিসেস দস্তুরের শ্যেনদৃষ্টিটা যদি কোন মতে এড়াইয়া যাইতে পারিত। নিজের ঘরের এক কোণে চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। বুক বার বার দুলিয়া দুলিয়া উঠিতে লাগিল, তবে চোখের জল আর মুখের উপর দিয়া গড়াইল না।

আধঘণ্টা খানিকের মধ্যেই বিকাশবাবু ফিরিয়া আসিলেন। পূর্ণিমার কাছে আসিয়া বলিলেন, "স্যার আপনাকে একবার যেতে বললেন। ওঁর টেবিলের ডান-দিকের দেরাজে একটা মোটা বাঁধান ডায়েরী আছে, সেইটা নিয়ে যেতে বললেন। গাড়ী পাঠিয়ে দিয়েছেন।"

পাছে ধরা পড়িয়া যায়, তাই পূর্ণিমা নিজের আরক্ত মুখটা তাড়াতাড়ি অন্য দিকে ফিরাইয়া লইল। হিরণ্ময়ের দেরাজ খুলিয়া ডায়েরীটা বাহির করিল, তাহার পর নামিয়া গেল নীচে।

ভদ্রলোক এখন কি করিতেছেন কে জানে? তবে ডাকিয়া পাঠাইয়াছেন যখন, তখন তাহার আগমনের জন্য প্রস্তুতই থাকিবেন। স্নানাহার হইয়াছে কি না কে জানে?

উপরে উঠিতেই হিরণ্ময় বসিবার ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিলেন। নিজের মুখের কি অবস্থা হইতেছে তাহা পূর্ণিমা জানে না। সে ত ঘোমটা টানিয়া দিতে পারে না মুখের উপর? কাছে গিয়া নীচু হইয়া প্রণাম করিল, মিনিট খানিক ত মুখটা লুকান যাইবে?

হিরণ্ময় তাহার পিঠে মৃদু করাঘাত করিয়া বলিলেন, "হয়েছে, হয়েছে। উঠতে-বসতে প্রণাম সুরু করলেন যে? আমি কি গুরুঠাকুর?"

পূর্ণিমা মনে মনে বলিল, "আমার কাছে গুরুও বটে, ঠাকুরও বটে।" মুখে একটু হাসি টানিয়া আনিয়া বলিল, "বড়দের প্রণাম করলে কি দোষ হয় কিছু?"

হিরণ্ময়ও হাসিয়া বলিলেন, "না, তা হয় না। তবে formal সম্পর্কটাই আগে শুধু ধরা হ'ত ত? আপনার আগে আরও অন্য যারা এই কাজ করেছে আমার কাছে, প্রণাম করার কথা তারা স্বপ্নেও ভাবে নি।"

ঘরের ভিতর আসিয়া বসিয়া পূর্ণিমা বলিল, "আপনার নাওয়া-খাওয়া হয়ে গেছে ত? বড় ক্লান্ত দেখাচ্ছে আপনাকে।"

হিরণ্ময় বলিলেন, "দেখাতে পারে, মোটে বিশ্রাম পাই নি। নাওয়া-খাওয়া এসেই করেছি। এই রোদে আসতে কষ্ট হয় নি ত?"

পূর্ণিমা বলিল, "গাড়ী চ'ড়ে এলাম, তা আর কষ্ট কি

হবে? আচ্ছা, এই ডায়েরীটাই কি আপনি চেয়েছিলেন?"

"রাখুন ঐ টেবিলের উপর। যেটা হোক একটা হলেই হবে। একটা ছুতো ত করতে হবে, তাই ওটাই নিয়ে আসতে বললাম।"

বিস্ময়ে হতবাক্ হইয়া পূর্ণিমা তাঁহার দিকে তাকাইয়া আছে দেখিয়া হিরণ্ময় আবার হাসিয়া বলিলেন, "ভয়ানক অবাক্ হয়ে গেছেন না? বড় সাহেবরা ঠিক এ রকম কথা বলে না। তবে এটা ত অফিস নয়, একটু নিয়ম ভঙ্গ এখানে চলতে পারে। ভাল কথা, আপনার মা কেমন আছেন?"

পূর্ণিমার মুখ যেন মেঘে ঢাকিয়া গেল, চোখ আর্দ্র হইয়া উঠিল। বলিল, "একেবারে ভাল নেই। ডাক্তাররা আর কোন আশাই দিচ্ছেন না।"

"অত্যন্ত দুঃখের বিষয়। হয়ত অনেক আগে ধরা পড়লে সারতে পারতেন। কিন্তু আমাদের দেশের মেয়েদের অসুখ ত প্রায় শেষ অবস্থা ছাড়া ধরা পড়ে না? কাল যাব তাঁকে দেখতে।"

নীচে Calling bell বাজিল এবং বেয়ারা একখানা কার্ড উপরে লইয়া আসিল। হিরণ্ময় বলিলেন, "আপনি বসুন পাঁচ মিনিট, আমি এই ব্যক্তিকে বিদায় ক'রে আসি।"

পূর্ণিমা বলিল, "আমি না হয় পাশের ঘরে বসছি।"

"পাশের ঘরে ও-ই বসবে এখন," বলিয়া হিরণ্ময় বাহির হইয়া গেলেন। ক্রমশঃ

নভেম্বর, ১৯৬২

শ্রীমিহির সিংহ

১৯৬২ সালের নভেম্বর মাস ভারতবর্ষের ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। চীনের সঙ্গে তার সম্পর্ক বহু শত বৎসর ধরেই বন্ধুত্বপূর্ণ। জাপানের সঙ্গে দীর্ঘ তিক্ত সংগ্রামের সময়ে ভারতবর্ষের জনসাধারণ চীনের জনগণের সঙ্গে যে আত্মীয়তা অনুভব করেছিল তার মধ্যে মার্শাল চিয়াং কাইশেকের ব্যক্তিগত স্থান ঐতিহাসিক নিমিত্ত মাত্র, তার বেশী কিছু নয়। তার প্রমাণ মেলে যখন কমিউনিষ্ট নেতা মাও সে তুং এবং মার্শাল চৌ এন লাই নতুন সরকার গঠন করলেন তখন তার প্রতিও ভারতীয়দের অকুণ্ঠ শুভ ইচ্ছা জ্ঞাপনে। তখন থেকেই সুরু হ'ল রাষ্ট্রসঙ্ঘে চীনকে সদস্য হিসেবে গ্রহণ করানর জন্যে সংগ্রামের—সে সংগ্রামেও ভারতবর্ষই অগ্রণী। তিব্বতে চীনা অভিযানের সময়ে প্রথম সংশয় এল ভারতীয়দের মনে—চীনা অভিপ্রায়ের সততা সম্বন্ধে। অনেকে বলেছেন যে, চীনাদের ব্যবহার অভিসন্ধিপূর্ণ—প্রথমতঃ তারা সাম্রাজ্যবিস্তারে অভিলাষী এবং দ্বিতীয়তঃ কমিউনিষ্ট জগতের দ্বিতীয় বৃহত্তম শক্তি হিসাবে তাদের সঙ্গে গণতন্ত্রী ভারতের সৌহার্দ্য চিরস্থায়ী হতে পারে না। এর বিপরীতে বয়ে এসেছে নেহরুজীর পররাষ্ট্রনীতির ধারা। প্রথমতঃ তিনি বরাবর অব্যাহত রেখে এসেছেন চীনকে রাষ্ট্রসঙ্ঘের সদস্যহিসাবে গ্রহণ করানর প্রচেষ্টা। আজও সে নীতির পরিবর্তন হয়েছে বলে জানি না। এবং দ্বিতীয়তঃ তিনি কখনই স্বীকার করেন নি যে, সীমান্তে অবস্থিত অধিত্যকাগুলি দখল করলেও ভারতবর্ষের মূল ভূখণ্ডের দিকে হাত বাড়ানোর মত হঠকারিতা চীন করতে পারে। ঘটনাপ্রবাহে আজ আমরা বুঝতে পারছি যে, সব ব্যাপারটাকে অত সহজে গ্রহণ করা আমাদের উচিত হয় নি। এখনও দুই দেশের মধ্যে কূটনৈতিক সম্পর্ক বজায় আছে, অথচ চীনা সমরায়োজন বিরাটাকারে আবির্ভূত হয়েছে আমাদের সীমান্তে। কয়েক সহস্র ভারতীয় সৈন্য হতাহত হওয়ার পরে অস্বস্তিপূর্ণ যুদ্ধবিরতির মধ্যে সমস্ত দেশ কেন—সমস্ত বিশ্বই ভাবছে এর পরে কি? সঠিক উত্তর পাওয়া যাবে ইতিহাসের পাতাতে। তবে উত্তরটা অনেকাংশে নির্ভর করবে আমাদের উপরে—ভারতবর্ষের আবালবৃদ্ধবনিতা জনগণের উপরে।

যুদ্ধ যে কোনও জাতির জীবনেই খুব গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। ব্যক্তিগত কোনও মানুষের জীবনে যেমন কোনও বাধা-

বিপত্তি এলে তার প্রকৃতি অনুসারে উন্নতি বা অবনতি দুই-ই সম্ভব, জাতির জীবনেও এ ধরনের একটি সংঘটনার ফলে অভাবিত শৃঙ্খলাপূর্ণ অগ্রগতিরও সূচনা হতে পারে, আবার প্রচণ্ড বিশৃঙ্খলার মধ্যে জাতির চরম অবনতিও ঘটতে পারে। মিথ্যা হুজুগ বা আতঙ্কের বশবর্তী না হয়ে আমাদের প্রতিটি নাগরিককে অভ্যাস করতে হবে শৃঙ্খলার সঙ্গে চিন্তা করতে ও কাজ করতে। আধুনিক একটা যুদ্ধ—যদি তা আণবিক যুদ্ধের আকার নাও ধারণ করে—বড় সহজ ব্যাপার নয়। জয়লাভ করতে হ'লে দরকার অনেক ত্যাগ, অনেক প্রয়াস এবং অনেক বুদ্ধিমত্তার। বিবেকানন্দের সর্ব্বজন-পরিচিত ভাষায়—"চালাকীর দ্বারা মহৎ কার্য্য হয় না।" গত যুদ্ধের সময়ে ইংলণ্ডের উপরে হিটলারী বাহিনীর ব্লিট্জ আক্রমণ কি মনে আছে? আমাদের ধরে নিতে হবে যে, আমাদের দেশের উপরেও ঐ ধরনের অত্যাচার নেমে আসতে পারে, এবং সঙ্কল্প করতে হবে যে ইংলণ্ডের জনসাধারণের মতনই দৃঢ়তা ও সাহসের পরিচয় দিতে হবে। তবে বলতে পারি যে, জয় আমাদের ভাগ্যে লেখা আছে।

এ যুগের যুদ্ধগুলির কারণ বড় জটিল। আগেকালে যুদ্ধ হতে পারত রাণী পছন্দের ব্যাপার নিয়ে। প্রথম মহাযুদ্ধের সময়ও নিছক রাজ্যবিস্তারের মোহ অনেকটা অংশগ্রহণ করেছিল। কিন্তু আজকাল যুদ্ধ সুরু হয় মানুষের চিন্তার জগতে। গুলী গোলা চলতে সুরু করে তার অনেক পরে। অথচ আমরা স্বভাবতঃই বেশী নজর দিই কামান-বন্দুকের দিকে। ফলে লড়াই যদি বা থামে, তার কারণটা রয়ে যায়, এবং আবার কয়েক দিন বা কয়েক বছর বাদে উন্নততর অস্ত্রের সাহায্যে নতুন করে সুরু হয় যুদ্ধ। সাধারণ মানুষ ব্যথিত চিত্তে ভাবে, তার স্ত্রী-পুত্র ও কষ্টার্জ্জিত সম্পত্তির স্থান কোথায়? চীনের সঙ্গে আজকে আমাদের যে শত্রুতার অধ্যায় চলেছে তারও কোন সস্তা বা সাময়িক অবসান খুঁজতে গেলে অনুরূপ ভুলই করা হবে। বরং আমাদের যুদ্ধ এবং তজ্জনিত দুঃখ-কষ্ট অপেক্ষাকৃত দীর্ঘস্থায়ী হোক, তবু তার প্রকৃত কারণটা যেন আমরা নির্ণয় করতে পারি এবং তার নিরসন করতে পারি। তা না হ'লে আমাদের পরবর্ত্তী যুগের মানুষেরা আমাদের সেই রকমই দোষারোপ করবে, যেমন করে থাকি আমরা আমাদের অগ্রজদের সম্বন্ধে।

চীন কেন এমন হঠকারিতার আশ্রয় নিল এর কারণ দর্শান বড় সহজ নয়। অন্য দেশের লোকেরা হয়ত খানিকটা পরিমাণ বিভ্রান্ত হ'তে পারেন চীনাদের প্রচারকার্য্যে। তাঁরা হয়ত ভাবতে পারেন যে, আমাদেরই রাজ্য-লোলুপতার দরুণ এ সংঘর্ষের সূত্রপাত। কিন্তু আমাদের দেশের মানুষের কাছে নিশ্চয়ই সেটা পাগলের প্রলাপের মতন শোনাবে। তিব্বত যখন চীন দখল করেছিল, রুশিয়ার ফিনল্যাণ্ড দখলের মতন কিংবা ইটালীর আবিসিনিয়া দখলের মতন সমস্ত পৃথিবীর সভ্য মানুষেরাই তাকে ধিক্কার দিয়েছিলেন। ভারতবর্ষের বন্ধুভাবাপন্ন তিরস্কারও যে চীনা সরকারের মনে বিঁধেছিল তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু তার পরে বহু বৎসর অতিক্রান্ত হয়েছে, ভারতবর্ষের দিক্ থেকে বিন্দুমাত্র চেষ্টা দেখা যায় নি তিব্বতের পক্ষে কোনও সক্রিয় অংশ গ্রহণের কিংবা চীনের বিরুদ্ধে কোনও সামরিক আয়োজনের। বরং চীনের নেতৃবৃন্দ ভারতবর্ষে এসেছেন এবং বিপুলভাবে সম্বর্ধিত হয়েছেন ভারতীয় নেতৃবৃন্দ ও জনসাধারণের কাছে। তবু কেন এই শত্রুতা? তিনটি কারণ অনুমান করা যায়: প্রথমতঃ তার আভ্যন্তরীণ গণ্ডগোলগুলির থেকে তার নিজের দেশের মানুষের মনোযোগ ফিরিয়ে এনে এই ধরণের একটি সংঘর্ষের উপরে নিবদ্ধ করা। দ্বিতীয়তঃ নিছক সামরিক প্রয়োজনে সীমান্তটিকে নতুন করে সাজিয়ে নেওয়া। তৃতীয়তঃ আন্তর্জ্জাতিক পরিস্থিতিতে এই ধরণের সংঘর্ষকে একটা চাল হিসেবে ব্যবহার করা।

নিজের দেশে চীনের অবস্থা যে খুব ভাল নয় তার প্রমাণ সম্প্রতিকালে অনেক পাওয়া গিয়েছে। আর্থনীতিক পরিকল্পনার ক্ষেত্রে target-গুলির উপর্য্যুপরি পরিবর্ত্তন হয়েছে। সরকারীভাবে স্বীকার করা হয়েছে যে, নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে বিভিন্ন জিনিসের যা উৎপাদন করা হবে বলে ঠিক হয়েছিল, প্রকৃতপক্ষে উৎপাদন হয়েছে তার চাইতে কম। অন্য সূত্র থেকে দুর্ভিক্ষ ও অন্যান্য বিশৃঙ্খলার খবরও পাওয়া যাচ্ছে বেশ কিছুদিন ধ'রে। এ রকম অবস্থায় একনায়কশাসিত দেশগুলির চিরাচরিত পদ্ধতি অনুসারে প্রতিবেশী কোনও দেশের সঙ্গে যুদ্ধের জিগির তোলাই স্বাভাবিক। ক্রমবর্দ্ধমান জনসংখ্যা, তার সঙ্গে বেড়ে-চলা অসন্তোষের চাপ—এর থেকে আশু পরিত্রাণের উপায় একমাত্র এই ধরণের কোনও সামরিক সংঘর্ষকে জিইয়ে রাখা। যে দেশে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত আছে সে দেশে নেতৃত্বের এই ধরণের বিফলতা দেখা গেলে নেতাদের পদত্যাগ দাবী করা হয়ে থাকে। তাঁরা সহজে যদি না ছাড়তে চাইলে পরবর্ত্তী নির্ব্বাচনের সময়ে জনগণের বিচার স্পষ্ট হয়ে দেখা দেয়। তার উপরে আর আপীল চলে না। কিন্তু যে দেশে জনগণের

নামে মুষ্টিমেয় কয়েকটি মানুষ বা একটি সংকীর্ণ গোষ্ঠী সমস্ত ক্ষমতা নিজেদের হাতে নিয়ে রেখে দিয়েছেন সেখানে রক্তাক্ত বিপ্লব ছাড়া তাঁদের হঠানো সম্ভব নয়—অথচ দেশের মানুষের কাছে সাফাই ত গাইতেই হবে, তাদের রাগের পাত্রও কাউকে স্থির করতে হবে। অতএব পাশের কোনও দেশের সঙ্গে লড়াইয়ের জিগির তোলো—সে হুঙ্কারে নিজের দেশের বঞ্চিত মানুষের কান্না চাপা পড়ে যাবে। চীনের বর্ত্তমান আচরণের এটি একটি কারণ হতে পারে।

সম্প্রতিকালে চীনাদের সমরনীতি যাঁরা লক্ষ্য করেছেন তাঁরা এটাও দেখে থাকবেন যে, চীনা সৈন্যদের জীবনযাত্রা ও যুদ্ধরীতি একটা ভয়ঙ্কর কঠোর ব্যাপার। এদের যেন অন্যতম উদ্দেশ্যই হ'ল লোকক্ষয় করা। খাওয়া-দাওয়া, চিকিৎসা, পোশাক-পরিচ্ছদ ইত্যাদি কোনও বিষয়েই বাহুল্য ত নেইই—শহরে গ্রামে বাস করবার সময়ে সেই মানুষগুলির যেটা নিম্নতম দাবীও হ'তে পারত সেটাও এখানে প্রশ্রয় পায় না। তার উপর এখানকার শৃঙ্খলা রক্ষার ব্যবস্থাও ভয়াবহ রকমের রুক্ষ। বিন্দুমাত্র প্রতিবাদ বা শৈথিল্য সহ্য হয় না সামরিক কর্তৃপক্ষের কাছে। তাছাড়া এটাও আমাদের মনে রাখতে হবে যে, আমাদের কাছে সংবাদপত্রের কৃপণ সূত্র মারফৎ যতটুকু আর্থনীতিক দুর্দ্দশার কথা এসে পৌঁছয় তাও চীনাদের মাতৃভূমি সম্বন্ধে। সেখানকার অবস্থাই যদি অত খারাপ হয়—ত তিব্বত বা অধীনস্থ অন্য দেশগুলির অবস্থা সহজেই অনুমেয়। কাজেই সামরিক প্রস্তুতির অজুহাত ছাড়া সেখানকার স্বতঃস্ফূর্ত্ত বিক্ষোভ সংযত রাখা কি সম্ভব?

দ্বিতীয় কারণ যেটি আমরা অনুমান করেছি সেটি হ'ল নিছক সামরিক ব্যাপার। 'সামরিক প্রয়োজনে' পররাজ্য গ্রাস মানুষের ইতিহাসে নতুন কিছু নয়। এই ত সেদিনও দেখেছি রুশিয়ার হাতে ফিন্‌ল্যাণ্ডের লাঞ্ছনা—সেও ত নাকি সামরিক প্রয়োজনেই! ধুরন্ধর সমর-তত্ত্ববিদ্‌গণও এ বিষয়ে মতদ্বৈধ দেখিয়ে থাকেন, কাজেই আমাদের মতামত কিছু প্রকাশ করার মানে হয় না। তবে এইটুকু আমরা সকলেই বুঝি যে, যুদ্ধ মানে যুদ্ধই। তপ্ত ইস্পাতের টুকরা যখন সৈনিকের দেহে প্রবেশ করে তখন আক্রমণকারী দেশের অভিপ্রায় অনুসারে স্থির হয় না যে তাতে যন্ত্রণা হবে কি না-হবে। ভবিষ্যতে কোনও যুদ্ধ হতে পারে এই আশঙ্কায় খুব বেশী প্রস্তুত হতে গিয়ে আমার দেশের সীমান্তে অবস্থিত অন্য দেশের জায়গা দখল করে গুছিয়ে বসতে গিয়ে কি আমি যুদ্ধের সম্ভাবনাকেই প্রবলতর করে তুলি না? যে কাপুরুষ তার হাতে অস্ত্র থাকাটাই বিপজ্জনক, কারণ, অনাগত আঘাতের আশঙ্কায় আগে থাকতেই সে আঘাত করে বসে। সাহসী যে সেই শেষ পর্য্যন্ত অপেক্ষা করে—দেখে যে আঘাত হানবার দরকার সত্যিই আছে কি না।

একনায়ক শাসিত দেশগুলিতে অবশ্য আর একটি ধরণের সামরিক প্রয়োজন দেখা দিতে পারে। সেটি হ'ল, প্রচণ্ড শক্তিশালী সামরিক বাহিনীটিকে সামলে চলা। নিজের গদি রক্ষা করতে গিয়ে নেতাকে সামরিক শক্তির উপর বড় বেশী নির্ভর করতে হয়। ফলে দেশের সমরনায়কেরা প্রভূত ক্ষমতার অধিকারী হয়ে ওঠেন। কিন্তু শান্তির সময়ে তাঁদের কর্ম্মকুশলতা দেখানর ক্ষেত্র নেই—অস্ত্রে হাত দেবার জন্যে তাঁরা অধীর হয়ে ওঠেন। ফলে যুদ্ধের মতন আবহাওয়া মধ্যে মধ্যে না আনলে চলে না, তা না হ'লে অসহিষ্ণু সমর-নায়কেরা দেশের আভ্যন্তরীণ রাজনীতিতেও নাক ঢোকাতে সুরু করবেন—এ ভয়ও ত আছে। খুব অসম্ভব নয় যে, চীনের মধ্যে এ ধরণের একটা আভ্যন্তরীণ চাপও জমা হয়েছিল যা আজকে প্রকাশ পাচ্ছে ভারত-সীমান্তে তার এই দস্যুবৃত্তিতে। আগেকার দিনেও রাজারা তাঁদের পোষা সৈন্যবাহিনীগুলিকে কিংবা তাদের অসহিষ্ণু সেনাপতিদের সামলাতে না পেরে মধ্যে মধ্যে এই রকম ছেড়ে দিতেন পার্শ্ববর্ত্তী দেশের উপরে। তাতে খানিকটা শক্তিক্ষয় এবং লুটতরাজের পরে সৈন্যদের যুদ্ধলিপ্সা সামরিক ভাবে প্রশমিত হ'ত—তারা আবার কিছুদিন শান্তশিষ্ট হয়ে বসবাস করত। এই সুযোগে যদি খানিকটা রাজ্য-বিস্তার হয়ে যেত তা হ'লে সেটা উপরি বলেই ধরে নিতেন রাজারা। আজকের দিনে অবশ্য ব্যাপারটা অত সহজ নয়, বিশেষতঃ কমিউনিষ্ট চীনের পক্ষে। সাম্য-নীতিকেও রক্ষা করতে হবে আবার এই সব জটিল এবং নীচ উদ্দেশ্যও সাধন করতে হবে। অন্তরের অনেক দাবী, অনেক গালভরা তত্ত্বকথার ধূম্রআবরণ তৈরী করতে হয় আন্তর্জ্জাতিক পরিস্থিতির দিকে তাকিয়ে।

আন্তর্জ্জাতিক পরিস্থিতির মধ্যেই বোধ হয় এই সংগ্রামের আসল কারণটি লুকিয়ে আছে। পৃথিবী আজকে ত্রিধা-বিভক্ত। ব্রিটেন, আমেরিকা, যুক্তরাষ্ট্র ইত্যাদি দেশগুলি কোন না কোনও রকমের গণতন্ত্রে বিশ্বাসী, তাদের প্রত্যেকে না হলেও অনেকেই আর্থ-নীতিক ক্ষেত্রে খুবই অগ্রসর। শিল্প-বিপ্লবের প্রথম পুরস্কার এরাই পেয়েছিল, এককালে তার পরিণতি হিসাবে ঔপনিবেশিক প্রতিপত্তি এরা লাভ করেছিল।

১৯৩০ সালের Great Depression ও ১৯৩৯-৪৫ সালের মহাযুদ্ধের ফলে এদের আর্থনীতিক চিন্তার জগতেও যেমন পরিবর্ত্তন এসেছে তেমনি এদের একদা বিস্তৃত সাম্রাজ্যগুলিও স্বায়ত্ত শাসনের পথে বহু দূর এগিয়ে গিয়েছে। আগেকার উপনিবেশগুলির সঙ্গে বাণিজ্যিক সম্পর্ক অব্যাহত থাকলেও শাসন-তান্ত্রিক সম্পর্ক আমূল পরিবর্ত্তিত হয়ে গিয়েছে। পুরাণো এই শিল্পপ্রধান দেশগুলির প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছে কমিউনিষ্ট দেশগুলি—যাদের মধ্যে চেকোশ্লোভাকিয়া ও পূর্ব্ব-জার্ম্মানী ছাড়া অন্যেরা সবাই ছিল অর্থনৈতিক অগ্রগতির ক্ষেত্রে পশ্চাদ্‌পদ। আজকে কিন্তু কমিউনিষ্ট ভাবধারার নেতৃত্বে তাদের উন্নতি ত্বরান্বিত হয়েছে—(যার থেকে অবশ্য এটা মোটেই প্রমাণিত হয় না যে, কমিউনিজমই মানুষের পরিত্রাণের পথ; পরে এ প্রসঙ্গে আলোচনা করা যাবে)। তৃতীয় দলের রাষ্ট্রগুলি প্রধানতঃ সেই পুরাণো উপনিবেশগুলি। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই এরা স্বাধীনতা পেয়েছে সম্প্রতিকালে এবং বর্ত্তমানে ব্যস্ত রয়েছে কৃষিপ্রধান অর্থনীতিগুলিকে শিল্পায়িত করতে। গণতন্ত্রের দীক্ষা এদের বেশীদিন হয় নি, ফলে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই শিল্পায়িতকরণের প্রবল সামাজিক ধাক্কা সামলাতে না পেরে সামরিক নেতাদের নেতৃত্বই মেনে নিতে বাধ্য হয়েছে।

ভারতবর্ষ যে এই তৃতীয়োক্ত মণ্ডলীর মধ্যে সর্ব্বপ্রধান রাষ্ট্র এতে সন্দেহ নেই। শুধু যে আয়তনে, জনসংখ্যায় এবং প্রাকৃতিক সম্পদেই সব চাইতে এগিয়ে আছে তা নয়, বড় দেশগুলির মধ্যে একমাত্র এখানেই সামরিক অভ্যুত্থান হয় নি, গণতন্ত্রের ধারা এখনও অব্যাহত আছে। তা ছাড়াও ভারতবর্ষের থেকেই এসেছে সেই ভাবাদর্শ যার মূলমন্ত্র হ'ল শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থান। এই আদর্শের মধ্যে মহত্ত্ব আছে আবার ভুল-ভ্রান্তিও আছে, সুতরাং কোনও একটা সময়ে আমাদের খতিয়ে দেখতে হবে, এই আদর্শ মোটের পরে ঠিক না ভুল। তবে সে ত হ'ল পরের কথা—আপাততঃ এটা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, কোনও সামরিক জোটের মধ্যে না ভিড়েও যে দেশের স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখা যায় কিংবা আর্থনীতিক উন্নতির পথে এগোনো যায় তার সব চাইতে উল্লেখযোগ্য উদাহরণ ভারতবর্ষ। বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য এই কারণে যে, সম্প্রতিকালে পৃথিবীর সব চাইতে বড় বিবাদমান দেশ দু'টি—আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র এবং রুশিয়া—এরাও যেন বুঝতে সুরু করেছে যে, আণবিক অস্ত্রের যুগে যুদ্ধে লিপ্ত হওয়ার চাইতে বোঝাপড়ার মধ্যে দিয়ে, আপোস মীমাংসার মধ্যে দিয়ে এগোনোই ভাল। সহ-অবস্থানের নীতির শেষ পর্য্যন্ত কি পরিণতি হতে পারে সে কথা আমরা পরে আলোচনা করব। তবে এটা ত ঠিক যে ভারতবর্ষের জমিতে দাঁড়িয়ে ইংলণ্ড, রুশিয়া, জার্ম্মানী—পরস্পরের প্রতি আগ্নেয়াস্ত্র তাক্ না করে—দুর্গাপুর, ভিলাই, রুরকেলার ইস্পাত কারখানা তৈয়ারী করার প্রতিদ্বন্দ্বিতায় লিপ্ত হয়েছে?

সহ-অবস্থানের পরীক্ষায় এই যে সফলতা, এরই বোধ হয় একটা ফল চীনের সঙ্গে সাম্প্রতিক বিরোধ। আশ্চর্য্যজনক শোনাতে পারে, কিন্তু কথাটা বোধ হয় ঠিক। আসলে পৃথিবীতে প্রত্যক্ষ ভাবে বিপদ্ দেখা দিয়েছে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে রুশিয়ার বিরোধিতায় নয়—চীনের সঙ্গে রুশিয়ার বিরোধে। দু'টি দেশই কমিউনিষ্ট মতবাদে বিশ্বাসী, কমিউনিষ্টদের ধারণা অনুযায়ী এদের মধ্যে বিরোধ অসম্ভব। দুই-তিন দিন আগেও আমার বিশেষ শ্রদ্ধাভাজন একজন ভদ্রলোকের সঙ্গে কথা হচ্ছিল। তিনি অল্পদিন আগে ইউরোপ থেকে ফিরেছেন। সেদেশ চেনেন খুব ভাল করে। তিনি বেশ জোরের সঙ্গে বললেন যে, রুশিয়ার সঙ্গে চীনের গভীর কোনও বিরোধ একটা অসম্ভব ব্যাপার, তিনি এ ব্যাপারটিকে আমাদের পত্রিকাগুলির প্রচার বলেই উড়িয়ে দিতে চান। কিন্তু একটু ভেবে দেখলেই বোঝা যায় যে, পঁচিশ বছর আগে রুশিয়ার আর্থনীতিক তথা রাজনৈতিক চিন্তার যে ধরণ ছিল, চীনের অবস্থা আজকে তার সঙ্গেই তুলনীয়। সহ-অবস্থানের কথা তার কাছে অবাস্তব এবং অর্থহীন। তার নিজের দেশে যে ধরণের কঠোর শৃঙ্খলা ও কষ্টসহিষ্ণুতার মধ্য দিয়ে চলতে হচ্ছে, তার যৌক্তিকতা, কমিউনিষ্ট ভাবাদর্শ অনুসারে, বিরোধী মতাবলম্বী দেশগুলির সঙ্গে আপোসহীন সংগ্রামের মধ্যেই পাওয়া যাবে।

কমিউনিষ্ট দেশগুলির মধ্যে অপেক্ষাকৃত অনগ্রসর দেশগুলি সকলেই বোধ হয় চীনের সঙ্গে এ বিষয়ে একমত হবে। কিন্তু মুশকিল হচ্ছে যে, রুশিয়ার আর্থনীতিক নেতৃত্বটাও অস্বীকার করা যায় না। হাজার হলেও এক রুশিয়াই পারে আর্থনীতিক উন্নতির পথে তাদের সাহায্য করতে। এই আপোস করার পক্ষে ও বিপক্ষে তাই রুশিয়া ও চীন নিজের নিজের দল বাড়ানোর চেষ্টা সব সময়েই করছে। বলা বাহুল্য যে রুশিয়ার (ও হয়ত চীনেরও) নিজের মধ্যেও বিরোধী দলের অস্তিত্ব আছে। এবং তার প্রমাণ স্তালিন-বিরোধী প্রচার সুরু হওয়ার পর থেকেই পাওয়া যাচ্ছে। এটা অনুমান করা বোধ হয় একেবারে অযৌক্তিক হবে না যে, রুশিয়া ও আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে (তথা সমগ্র পৃথিবীতে)

রাষ্ট্রনৈতিক চিন্তাধারার বিভিন্নতা থাকলেও আপোষ ও পারস্পরিক বোঝাপড়ার মধ্যে দিয়ে সহ-অবস্থানের বিরুদ্ধে মরণ-কামড় দেওয়ার অভিপ্রায়েই চীনের এই অবিমৃষ্যকারিতা। নিছক পররাজ্যলোলুপতা ত নয়ই (সেটা করতে গেলে অনেক কম গুরুত্বপূর্ণ দেশ বা অঞ্চল ছিল যা গ্রাস করলে সোরগোল কম হ'ত) শুধু আভ্যন্তরীণ গণ্ডগোল বা সামরিক প্রয়োজনও নয়—রুশিয়ার সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের ক্রমশঃ গড়ে ওঠা বোঝাপড়ার মধ্যে একটা ভাঙ্গন ধরানোর জন্যেই চীনের এই আক্রমণ।

তৈলখনি অঞ্চল চিরদিনই বিশেষ ভাবে গুরুত্বপূর্ণ। আসামে চীন যদি আরও এগোয় তা হলে যুক্তরাষ্ট্র এবং রুশিয়া শংকিত না হয়ে পারবে না। এবং এমন একটা অবস্থার উদয় হওয়া অসম্ভব নয় যে, যুক্তরাষ্ট্রকে বাধ্য হতে হ'ল আরও সক্রিয় অংশ গ্রহণে। তেমন অবস্থায় রুশিয়ার ভিতর থেকে এবং তার বন্ধুদের কাছ থেকে যে প্রবল চাপ আসবে যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে দাঁড়ানোর এতে সন্দেহ কি? তাছাড়া সম্প্রতিকালে কোন কোন ভারতীয় রাজনৈতিকের কার্য্যকলাপে ও আসাম ও উত্তর বাংলায় শ্রমিকদের মধ্যে নিদর্শনপত্র বিতরণের সংবাদ ইত্যাদিতে মনে হয় যে, চীনেরও কিছু বন্ধু ভারতবর্ষে এখনও আছে। এ অবস্থায় চীনের নেতারা যদি ভেবে থাকেন যে তাঁরা ভারতবর্ষের দিকে পা বাড়ালে একটা গণঅভ্যুত্থান কিংবা গৃহবিবাদের সূত্রপাত হতে পারে তবে বোধহয় খুব অন্যায় করেন নি। এখন ভারতীয় জনসাধারণের মধ্যে যে ধরণের সাড়া পড়েছে চীনা আক্রমণের বিরুদ্ধে, তাতে অবশ্য তাঁদের সে আশা ব্যর্থ হয়েছে। তবে যদি তাঁদের সে আশা কিছু পরিমাণেও পূর্ণ হ'ত ত রুশিয়ার বর্ত্তমান নেতৃবৃন্দের বিরুদ্ধে প্রবলতর জনমত তৈরী হ'ত তাঁদের নিজেদের দেশেই, এ ত নিঃসন্দেহে বলা যায়।

বস্তুত পক্ষে কমিউনিষ্ট চিন্তাধারার প্রতি সুবিচার করতে গেলে এ-কথা বলতেই হয় যে, ভারতীয় কমিউনিষ্টদের মধ্যে যাঁরা প্রকৃত নিষ্ঠাবান্ কর্ম্মী তাঁরা কখনই ভারতবর্ষকে ভারতীয় হিসাবে সমর্থন করেন না। তাঁদের মধ্যে একটি অংশ যে আজকে চীনকে সমালোচনা করছেন তার কারণ রুশিয়ার বর্ত্তমান নেতারা চীনকে সমর্থন করছেন না। যদি রুশিয়া ও চীনের মধ্যে কোনও বিরোধ না থাকত আজকে, তবে ভারতীয় কমিউনিষ্টরাও বিনা দ্বিধায় চীনকে সমর্থন করতেন—প্রকাশ্যে না হোক মনে মনে। আর যাঁদের কাছে মাতৃভূমি বড় তাঁরা এই ধাক্কায় পার্টি ছেড়ে বেরিয়ে আসতেন। এ ছাড়া আর কিছু হবার সম্ভাবনা ছিল বলে মনে হয় না। এতে কোনও সন্দেহ নেই যে, আমাদের দেশের কমিউনিষ্টরা, সমস্ত পৃথিবীর কমিউনিষ্টদের মতন একদৃষ্টে তাকিয়ে বসে আছেন রুশিয়া ও চীনের মধ্যে এই গজকচ্ছপ লড়াইয়ের নিষ্পত্তি কি হয় তাই দেখবার জন্যে। এবং তার উপরেই নির্ভর করবে ভারতীয় কমিউনিষ্ট পার্টি ও অন্যান্য দেশের কমিউনিষ্ট পার্টির সদস্যদের চিন্তা ও আচরণ। ভাবাদর্শের এই লড়াইতে যদি চীনের বর্ত্তমান নেতারা হেরে যান তবে অল্প দিনের মধ্যে ক্ষমতার সিংহাসন তাঁদের ছাড়তেই হবে—যেমন হয়েছে পূর্ব্ব ইউরোপের বিভিন্ন দেশে। আর যদি রুশিয়ার বর্ত্তমান নেতৃবৃন্দকে পরাজিত হ'তে হয় তা হ'লে পৃথিবীকে প্রস্তুত হতে হবে অনেক অনর্থের জন্যে। তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের মধ্যে দিয়ে হয়ত নিরূপিত হবে পৃথিবীর ভাগ্য।

সম্প্রতিকালে সংঘটিত কিউবার ঘটনাটিতে অবশ্য একটু যেন আশার আলো দেখা গিয়েছে। আমাদের পরিচিতদের মধ্যে এ সম্বন্ধে স্পষ্ট দু'টি মত দেখা যায়। যাঁরা রুশিয়ার সমর্থক তাঁরা বলেন যে কেনেডির হঠকারিতার সামনে ক্রুশ্চফের সরে আসা একটা মহামানবোচিত কাজ। আবার যুক্তরাষ্ট্রের যাঁরা সমর্থক তাঁরা বলেন যে, স্পষ্ট গায়ের জোরের সামনে যে পৃথিবীর সব চাইতে শক্তিশালী দস্যুও পিছু হটে এটা তারই প্রমাণ। আমাদের কিন্তু মনে হয়, যুক্তির দিক্ থেকে দেখতে গেলে ঘটনাটির একটি তৃতীয় ব্যাখ্যা সম্ভব। কিন্তু সেটা বলবার আগে মনে করিয়ে দেওয়া দরকার যে, সামরিক হস্তক্ষেপের ঘোষণা কেনেডি ইংলণ্ড, কানাডা, কিম্বা অন্য মিত্ররাষ্ট্রগুলিকে না জানিয়েই করেছিলেন বলে শোনা গিয়েছিল। এবং পশ্চাদপসরণের আগে ক্রুশ্চফ কিউবাকে পর্য্যন্ত জিজ্ঞাসা করেন নি, একথাও শোনা গিয়েছে। তাই যদি হয়, তবে কি একথা মনে করতে দোষ আছে যে, কেনেডি ও ক্রুশ্চফের মধ্যে এ ব্যাপারে ব্যক্তিগত বোঝাপড়া ছিল? শক্তিপ্রয়োগের ক্ষেত্রে পিছু হটবারও যে দরকার আছে বৃহত্তর স্বার্থের খাতিরে, অথচ নিজের নিজের দলের মধ্যে বিশৃঙ্খলা না ঘটিয়ে—এ হয়ত কেনেডি এবং ক্রুশ্চফ দুজনেই বুঝেছেন এবং পরস্পরের মুখ রক্ষা করে কিউবাতে কূটনীতির এক মস্ত চাল চেলেছেন। আমাদের মনে হয় যে, এই অনুমান সত্য হলে চীনাদের হঠকারিতার বিরুদ্ধে আন্তর্জ্জাতিক পরিস্থিতিই রুখে দাঁড়াবে, ভারতবর্ষের পক্ষে মঙ্গলময় সমাধান সম্ভব হবে।

এই আন্তর্জ্জাতিক পরিপ্রেক্ষিতে দু'টি প্রশ্ন স্বভাবতই জাগে: ভারতীয়দের কর্ত্তব্য কি এবং ভাবাদর্শের ক্ষেত্রে

কমিউনিষ্ট ও অ-কমিউনিষ্টদের যে বৃহত্তর লড়াই চলেছে তার নিষ্পত্তি কি ভাবে হবে? দ্বিতীয় প্রশ্নটির উত্তর পরে প্রবন্ধান্তরে দেওয়ার চেষ্টা করা যাবে, তবে প্রথম প্রশ্নটিই আমাদের মনে এখন অহরহ জাগছে। বড় কোনও ঘটনা ঘটলে সর্ব্বদাই একটা আলোড়ন হয় এবং ভাল মন্দ সব জাতের জিনিষই জাতির জীবনে ঘুলিয়ে ওঠে। আমাদের দেশেও তার ব্যতিক্রম হবে না। যারা সুবিধা-বাদী তারা এই সুযোগে চেষ্টা করবে অর্থ কিম্বা অন্য স্বার্থের দিক্‌ গুছিয়ে নিতে, যারা আদর্শবাদী তাদের বিশেষ করে সাবধান হয়ে চলতে হবে। প্রথমেই বলেছি আজকের যুদ্ধ ভাবাদর্শের যুদ্ধ, কাজেই এই আদর্শের ক্ষেত্রেই নির্ণীত হবে প্রকৃত জয় পরাজয়। নেহরু সরকারের আমলে আমরা বহুবার ব্যক্ত হতে শুনেছি আমাদের আদর্শগুলি—যার সবচাইতে সুন্দর ও সম্পূর্ণ প্রকাশ ঘটেছে 'পঞ্চশীলে'র মধ্যে। আদর্শপরায়ণ মানুষ যখন আদর্শহীন নীতিভ্রষ্টের হাতে মার খায় তখন দুর্ব্বল-চিত্তেরা চিরকালই হাসে। কিন্তু তাতে কিছু যায় আসে না, শেষ পর্য্যন্ত আদর্শেরই জয় অবশ্যম্ভাবী, অবশ্য আদর্শ যদি পৌরুষকে আশ্রয় করে। চীন আমাদের আক্রম করেছে ব'লে একটুও লজ্জিত হবার কারণ নেই, মনে করবার কারণ নেই যে নেহরুর পররাষ্ট্রনীতি বিফল হয়েছে। বরং মনে হয় যে, হাঙ্গেরীর ঘটনাবলী সত্ত্বেও রুশিয়া এখনও ভারতবর্ষের প্রতি বন্ধুত্ব দেখান প্রয়োজন মনে করছে, সুয়েজের ঘটনাবলী সত্ত্বেও ইংলণ্ড সমরোপকরণ পাঠাচ্ছে। যাদের বিচারে আমাদের শ্রদ্ধা আছে তারা আমাদের সমর্থন করবেই চীনের সঙ্গে এই বিরোধে।

কিন্তু আমাদের মারাত্মক ভুল হয়েছে চীনের প্রকৃতি ঠিক মতন না বুঝতে পারায় এবং সে সম্বন্ধে প্রস্তুত না হওয়ায়। চীন সম্বন্ধে সতর্কবাণী অনেকদিন আগে থাকতেই আমরা পেয়েছি—কিন্তু যুদ্ধের জন্যে তৈরি আমরা ছিলাম না। কে এর জন্যে দায়ী সেটা নিশ্চয়ই বিচার করতে হবে, তবে তার প্রয়োজন এই জন্যে যে এ রকম ব্যাপারের পুনরাবৃত্তি আমরা চাই না। পর-রাজ্যলোভ যে আমাদের নেই তা পাকিস্তান কিংবা চীনের প্রচারেই অপ্রমাণিত হবে না। তবে নিজের রাজ্যটা যে নিজেরা রক্ষা করতে পারি (আণবিক অস্ত্র ছাড়া) সেটা প্রমাণ করবার দরকার পড়েছে। রেডিও কিংবা রাস্তায় গান গাওয়া হয়ত ভাল, তবে ভয় হয় যে হুজুগের মধ্যেই না আমাদের উদ্দীপনা শেষ হয়! নেতাজীকে নিয়ে, গান্ধীজীকে নিয়ে, নেহরুজীকে নিয়ে এমন কি বুলগানিন-ক্রুশ্চফ-টিটো-চৌ-এন-লাই-রাণী এলিজাবেথ সকলকে নিয়েই আমরা মেতে গেছি। গত বছর রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে যে উন্মত্ততা প্রকাশ করেছি তার তুলনা পৃথিবীর ইতিহাসে বিরল। অথচ নেতাজী কিংবা রবীন্দ্রনাথের জীবনাদর্শকে নিজেদের ব'লে গ্রহণ করেছি বলে মনে হয় না।

বিপদের সময়ে সবচাইতে খারাপটুকু ধরে নিয়েই তৈরি হতে হয়। আমাদের তৈরি হতে হবে এই ভেবে যে, হয়ত বহুদিন ধরে বহু কষ্ট করে এই যুদ্ধ চালাতে হবে। যদি কেউ গান গেয়েই স্বাধীনতা সংগ্রামে তাঁর দামটুকু দিতে চান ত তাঁর সঙ্গে ঝগড়া করব না। কিন্তু যদি পারি ত তার চাইতে বেশীও কিছু যেন দিই। বাধ্যতামূলক ভাবে না হোক ব্যাপকভাবে সামরিক শিক্ষা চালু করা দরকার। ভেজাল আর চোরা কারবার থেকে শুধু অস্ত্র বা সমরোপকরণই নয়, সমস্ত কিছু পণ্যের উৎপাদনকেই বাঁচান দরকার। আমাদের বুঝতে পারা দরকার যে, চীনাদের নাকের উচ্চতা নিয়ে কবিতা লিখলেই তারা ভয় পেয়ে দেশ ছেড়ে পালিয়ে যাবে না। আমাদের বুঝতে হবে যে, শৃঙ্খলাবদ্ধ জাত হিসাবে যদি পৃথিবীতে স্থান গ্রহণ করতে না পারি ত আজকে চীনারা না হোক, কালকে অন্য কোনও দেশ এসে অনায়াসে আমাদের পিছনে লাগবে, আমরা নিজের শক্তিতে তার প্রতিকার করতে পারব না। যে দেশের ছেলেরা শৃঙ্খলাবদ্ধ ভাবে বাসে চড়তে পারে না, রাস্তায় চলতে পারে না, সে দেশে এক সহস্র নেতাজী কিংবা রবীন্দ্রনাথ জন্মিয়েও কিছু করতে পারবেন কি?

একজন মন্ত্রীর অকর্ম্মণ্যতার জন্যে তাঁকে অপসারিত করা হয়েছে, বেশ ভালই হয়েছে। কিন্তু অকর্ম্মণ্যতা যে আমাদের জাতিগত ভাবে ছড়িয়ে গিয়েছে সেটা কি অস্বীকার করতে পারি? পরে কোনও সময়ে কমিউনিজম কেন আমাদের পরিত্রাণের মন্ত্র নয়, সে সম্বন্ধে আলোচনার ইচ্ছা রইল। কিন্তু আপাততঃ মনে হচ্ছে যে, প্রত্যেকটি জাতির ভিতরেই নিহিত থাকে তার উন্নতি বা অবনতির বীজ। যেমন আমাদের ব্যক্তিগত দোষগুণের উপরই প্রধানতঃ নির্ভর করে আমাদের ব্যক্তিগত সুখ দুঃখ, তেমনই আমাদের সমষ্টিগত সততা, সাহস, দৃঢ়তা ও নিষ্ঠার উপরেই গ'ড়ে উঠবে চীনাদের বিরুদ্ধে আমাদের জয়ের তোরণ। কোনও বিদেশী বন্ধুর সাহায্যকে আমরা নিশ্চয়ই এ বিপদের দিনে অগ্রাহ্য করব না। কিন্তু তারও সদ্ব্যবহার করতে পারব আমাদের নিজেদের গুণেই। আর তা যদি করতে পারি ত আজকে যা মনে হচ্ছে অভিশাপ, কাল তাই ভগবানের আশীর্ব্বাদ হয়ে দেখা দেবে।

খেসারত

(ত্রিঅঙ্ক নাটক)

এই নাটকে বর্ণিত ঘটনাগুলির উৎপত্তি ও পরিণতি দুইই সর্ব্বতোভাবে কল্পনার সৃষ্টি। নাটকে উপস্থাপিত প্রত্যেকটি চরিত্রও সম্পূর্ণ কাল্পনিক।

শ্রীসুধীরকুমার চৌধুরী

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

[হাইকোর্টের ক্রিমিন্যাল সেসন্স। অনরবল্ মিস্টার জাস্টিস তারাদাস মুখার্জ্জির এজলাস। জুরর, উকীল ব্যারিস্টার এবং অন্যরা আগের দৃশ্যে যে যেখানে যেমন ভাবে বসেছিলেন তাই আছেন। জুররা ভিন্ন অন্যদের অনেকে পার্শ্ববর্ত্তীদের সঙ্গে চাপা গলায় কথা বলছেন।

পিছনের দরজার পর্দা সরিয়ে জাস্টিস্ তারাদাস মুখার্জ্জি ঢুকলেন। সকলে উঠে দাঁড়ালেন। জজ আসন গ্রহণ করলে তাঁরা বসলেন।

মায়াকে জেরা করার সময় চুণীলাল যেখানে দাঁড়িয়ে ছিলেন, উঠে গিয়ে সেইখানে দাঁড়ালেন।]

চুণী। মিসেস্ নাগ।

(একজন কর্ম্মচারী বেরিয়ে গেল বাঁদিক্ দিয়ে এবং একটু পরেই ফিরে এল। তাকে অনুসরণ ক'রে এসে মায়া সাক্ষীর কাঠগড়ায় উঠল। এবার সে আর চেয়ারে বসল না, কাঠগড়ার রেলিং চেপে ধ'রে দাঁড়িয়ে রইল, কাতর মুখে চুণীলাল বসুর মুখের দিকে চেয়ে।)

মিসেস্ নাগ! Recessএর সময় আপনি বলেছিলেন, আপনার বলবার কথা আরও কিছু আছে। আপনি যা বলতে চান, স্বচ্ছন্দে বলতে পারেন। শোনা কথা, অনুমানের কথা কিছু বলবেন না। নিজের চোখে যা দেখেছেন, সাক্ষাৎভাবে যা জানেন তাই কেবল বলবেন। (ফিরে গিয়ে বসলেন।)

মায়া। আমার স্বামী সেদিন যে তাঁর রিভলভারটা নিয়ে শোভনের কাছে গিয়েছিলেন, সে খবর টেলিফোন ক'রে শোভনকে আমি এইজন্যে দিই নি যে, তিনি যে সম্ভবতঃ তাই করবেন শোভন সেটা আগে থেকেই জানত।··· এইজন্যে জানত, যে সেটা শোভনেরই ইচ্ছাতে ঘটেছিল। ঘটনার দিন দুপুরে আমি শোভনের অফিসে গিয়েছিলাম। বলতে গিয়েছিলাম, আমার স্বামী তার কাছে খেসারত দাবী করতে আসছেন। অনেক হাজার টাকার খেসারত। আমার একটা দেনার দায় আমার স্বামী নিজের ঘাড়ে নিয়েছিলেন, সেই দেনার টাকার সমান টাকা, বত্রিশ হাজার।···আমি জানতাম, শোভনের যথাসর্ব্বস্ব দেনার দায়ে বাঁধা, এত টাকা তাকে বেচলেও হবে না।···আমি সিনেমায় পার্ট নিয়ে নামব, এই রকম একটা কথা তখন চলছিল। একজন প্রোডিউসার আমাকে খুব আগ্রহ ক'রে চাইছিলেন। ভেবেছিলাম, হয়ত তাঁকে বললে, তাঁর কয়েকটা ছবিতে আমি নামব এই প্রতিশ্রুতি নিয়ে তিনি ঐ টাকাটা আমাকে আগাম দিতে রাজী হতেও পারেন। কিন্তু শোভনকে সেটা বলবার আগেই সে তার নিজের একটা প্ল্যানের কথা আমাকে বলল।··· প্ল্যানটা হ'ল এই, যে শোভন মাতাল মানুষ, বেপরোয়া মানুষ, একটা গুণ্ডা বললেই হয়, আর তার হাতের নাগালে একটা রিভলভার সারাক্ষণ থাকে, এই সব ব'লে ভয় দেখিয়ে, তার সঙ্গে দেখা করতে যাবার সময় আমার স্বামীকে তাঁর রিভলভারটা আমি সঙ্গে নিতে বলব।

(কোর্টে উপস্থিত প্রত্যেকটি লোক অবহিত হয়ে শুনছেন। জজ একটু সামনের দিকে ঝুঁকেছেন। কেউ কেউ হাতের তেলো ঝিনুকের মত ক'রে কানের পিছনে ঠেকিয়ে ভাল ক'রে শোনবার চেষ্টা করছেন। একটু থেমে মায়া আবার বলতে আরম্ভ করল।)

শুনে প্রথমটা আমার ভাল লাগে নি। কিন্তু সে যখন তার উদ্দেশ্যটা আমাকে ভাল ক'রে বুঝিয়ে বলল, তখন ভেবে দেখব ব'লে চ'লে এসেছিলাম। আর পরে ভেবে ঠিক করেছিলাম, তার কথা আমি রাখব।···সে বলেছিল, রিভলভার সঙ্গে নিয়ে আমার স্বামী এসে খেসারত চাইলে, সে তার নিজের অবস্থাটা তাঁকে বোঝাতে চেষ্টা করবে। বেশ ভাল ক'রে বোঝাতে

চেষ্টা করবে। ফিল্ম থেকে আমি বেশ মোটা টাকা যাতে পাই তারও ব্যবস্থা সে যে করছে তা বলবে। তার পরও যদি আমার স্বামী না বোঝেন ত তখন তাঁর হাত চেপে ধ'রে বলবে, তোমার পকেটে ওটা কি? রিভলভার? পকেটে রিভলভার কেন? নিশ্চয় তুমি আমাকে খুন করতে এসেছিলে। দাঁড়াও, দেখাচ্ছি মজা। ব'লে তাঁকে টানতে টানতে টেলিফোনের কাছে নিয়ে গিয়ে পুলিস ডাকবে ব'লে ভয় দেখাবে। আমাদের সম্বন্ধে সেদিন সকালে তিনি যা শুনেছিলেন, তার পর শোভনকে তিনি খুন করতে এসেছিলেন শুনলে অবিশ্বাস ত কেউ করত না? বিশেষতঃ একটা রিভলভার সঙ্গে এনেছিলেন জানলে? কাজেই আমার স্বামী খুবই ভয় পাবেন, আর তখন শোভন তাঁকে যা করতে বলবে তাতেই তিনি রাজী হবেন, এই ছিল শোভনের ধারণা। সে বলেছিল, তার আগে হয়ত প্যাঁচ ক'ষে দু-তিনটে বুলেট সে ফায়ার করিয়েও দেবে। সেটা সে সহজেই পারত। অসাধারণ জোর ছিল তার গায়ে।···ঐ রকম ক'রে প্যাঁচে ফেলে আমার স্বামীকে শোভন বলত, তোমাকে যে পুলিসে দিলাম না, আমার এই চুপ ক'রে থাকার দাম বত্রিশ হাজার আর তোমার খেসারতের দাবী বত্রিশ হাজার, এই দুটোতে কাটাকাটি হয়ে যাক। এস, খেসারতের টাকা পেয়েছ লিখে দিয়ে ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে যাও।···শোভন বলেছিল, এ একটা বেশ রগড় হবে আমার স্বামীকে নিয়ে। আমি শোভনের কথা বিশ্বাস করেছিলাম। ভেবেছিলাম, আমার যে-দেনাটা শোধ করবার জন্মে আমার স্বামী খেসারত চাইতে যাচ্ছেন সেটা ত আমিই শোধ করব, রগড়টা হ'তে দিলে ক্ষতি কি? তাছাড়া আমি চাইছিলাম, দেনাটা আমিই শোধ করব, আমার স্বামীকে সেটা করতে দেব না। তাই শোভনের কথামত সে যা যা আমার স্বামীকে বলতে বলেছিল, আমি তাই বলেছিলাম।

জজ। আপনি ক্লান্ত হয়েছেন। ব'সে একটু বিশ্রাম ক'রে নিন, তার পর আবার বলবেন। আমরা অপেক্ষা করব।

(মায়া বাহুমূলে মুখ গুঁজে চেয়ারে বসল।)

চুণী। (উঠে দাঁড়িয়ে) মি লর্ড! যদি অনুমতি করেন ত সাক্ষীর বাকী যা বলবার আছে, আমি প্রশ্ন ক'রে ক'রে তাঁর কাছে জেনে নিই, এতে হয়ত তাঁর ক্লান্তি কম হবে।

বীরেন। (সদর্পে উঠে দাঁড়িয়ে) মি লর্ড! তাতে আমাদের ক্লান্তি বাড়বে। সাক্ষী যথেষ্ট শিক্ষিতা ও বুদ্ধিমতী। তাঁর যা বলবার, তিনি তা বেশ গুছিয়েই এই অবধি বলেছেন। আশা করি বাকীটুকুও গুছিয়ে বলতে পারবেন। কাউন্সেলের সাহায্যের দরকার হয়ত তাঁর হবে না। যদি অবশ্য বলবার মত নিজস্ব কিছু তাঁর না থাকে ত সে আলাদা কথা!

চুণী। মি লর্ড, সাক্ষী যে বিবৃতি দিলেন সেটাকেই ভাল ক'রে বুঝবার জন্মে দু-একটা প্রশ্ন যদি আমি করি, ত আশা করি কাউন্সেলের তাতে আপত্তি হবে না।

জজ। তা অবশ্য আপনি করতে পারেন।

চুণী। Thank you, মি লর্ড!

(বীরেন সমাদ্দার বসলেন।)

মিসেস নাগ! শোভন সেনের শেখানো কথাগুলো আপনার স্বামীকে যখন আপনি বললেন, তিনি শুনে কি তৎক্ষণাৎ রিভলভারটা সঙ্গে নিতে রাজী হয়েছিলেন?

মায়া। না। তিনি কিছুতেই রাজী হচ্ছিলেন না। আমি একটু কান্নাকাটি করাতে বললেন, তোমার এই কান্নার মানে আমি কিছুই বুঝতে পারছি না, কিন্তু কথা বাড়াতে চাই না ব'লে কথা দিচ্ছি, রিভলভার নিয়েই আমি যাব। তবে পকেটে ক'রে নিয়ে যাব না, কারণ, শোভন যদি টের পায় যে আমি একটা রিভলভার লুকিয়ে সঙ্গে এনেছি ত বড় বিশ্রী দেখতে হবে। তার চেয়ে ওটাকে কাগজে জড়িয়ে হাতে ক'রে নিয়ে যাব। জিজ্ঞেস করলে, মেরামত করতে দিতে যাচ্ছি বা ঐরকম কিছু একটা বলব।

চুণী। মিসেস্ নাগ! আপনি যে এই সমস্ত কথা খোলাখুলি আমাদের বলেছেন, এতে আমরা খুব খুশী। আর কিছু আপনি বলতে চান?

মায়া। না, আমি শেষ করেছি। (অবসন্ন ভাবে ব'সে পড়ল।)

চুণী। আমারও আর কিছু জানবার নেই আপনার কাছে। আপনি যেতে পারেন, যদি না আমার learned friend (বীরেন সমাদ্দারের দিকে ফিরে) আর কিছু জিজ্ঞেস করতে চান আপনাকে। (ফিরে গিয়ে নিজের আসনে বসলেন।)

বীরেন। (উঠে টাইটা ঠিক করলেন, গাউনটা পিঠের দিকে একটু নেমে গিয়েছিল, সেটাকে টেনে পরলেন, তারপর চেয়ারের ওপর একটা পা তুলে এমন ভঙ্গিতে দাঁড়ালেন, যেন অনেক ক্ষণ ধ'রে সাক্ষীকে তিনি জেরা করবেন।)

মিসেস্ নাগ! আপনি এই এতক্ষণ ধ'রে যা-কিছু বলেছেন, আমি বলছি তার প্রত্যেকটি কথাই মিথ্যে।

মায়া। আমি যা বলেছি তার প্রত্যেকটি কথা সত্যি।

বীরেন। আপনি প্রথমে আমার এই প্রশ্নটার উত্তর দিন দেখি। এসব কথা আগে তা হ'লে আপনি বলেন নি কেন? শিখিয়ে দিতে কেউ ছিল না ব'লে?

মায়া। (উঠে দাঁড়িয়ে) না। আমাকে উল্টো শেখানো হয়েছিল ব'লে।

(কোর্টে আবার অল্প একটু চাঞ্চল্য। চুণীলাল সামনের দিকে মাথা দোলাচ্ছেন।)

বীরেন। তার মানে কি হ'ল?

মায়া। কথাগুলো আমি বলতেই চেয়েছিলাম, কিন্তু বলতে আমাকে বারণ করা হয়েছিল।

বীরেন। (সগর্জ্জনে) কে? কে বারণ করেছিল আপনাকে?

মায়া। অনেকে। তাদের মধ্যে দু'জন পুলিসের লোক ও আপনার জুনিয়রও একজন ছিলেন। আমাকে তখন প্রোসিকিউশন থেকে সাক্ষী ডাকা হবে ঠিক হয়েছিল।

বীরেন। (সগর্জ্জনে) মিথ্যে কথা। আমি বিশ্বাস করি না আপনার কথা।

মায়া। আমি তাঁদের নাম বলতে পারি। মিথ্যে কি না, তাঁদের সাক্ষী ডাকলেই জানা যাবে।

(বীরেন সমাদ্দার ব'সে পড়লেন।)

জজ। আপনাকে যাঁরা কথাগুলো বলতে বারণ করেছিলেন, তাঁরা কেন বারণ করছেন তা কি কিছু বলেছিলেন?

মায়া। হ্যাঁ, বলেছিলেন। তাঁরা বলেছিলেন, যে-ঘটনাগুলোর কথা আমি ছাড়া আর কেউ জানে না, সে-গুলো যে সত্যিই ঘটেছিল তা যখন আমি প্রমাণ করতে পারব না, তখন সেগুলো ব'লে কি লাভ? মাঝখান থেকে কেস্‌টা আরো বেশী ঘোরালো হবে শুধু।

জজ। I see! (বীরেনের দিকে তাকিয়ে) কাউন্সেলের সাক্ষীকে বোধ হয় আর কিছু জিজ্ঞাসা করবার নেই?

বীরেন। (উঠে দাঁড়িয়ে) না, মি লর্ড! (বসলেন।)

জজ। (মায়ার দিকে তাকিয়ে) আপনি যেতে পারেন।

(মায়া কাঠগড়া থেকে নেমে জুররদের সামনে দিয়ে এসে বাঁদিক্ দিয়ে বেরিয়ে গেল। অনেক জোড়া চোখ মায়াকে অনুসরণ করছে। চুণীলাল বসু উঠে দাঁড়ালেন।)

চুণী। মি লর্ড! রিভলভারটা যখন accidentally ফায়ার হয়ে যায়, তখন প্রচণ্ড রকম scuffle-এর মত কিছু যে হচ্ছিল, তার প্রমাণ, শোভনের দু'পাটি চপ্পলের এক পাটি প'ড়ে ছিল বাথরুমের দূরের এক কোণে, আর এক পাটি পাওয়া গিয়েছিল শোবার ঘরে খাটের তলায়। কিন্তু নিতান্ত জুতো ব'লেই বোধহয় এদের সাক্ষ্য প্রোসিকিউশনের কাছে গ্রাহ্য নয়। Scuffle হচ্ছিল না প্রমাণ করবার জন্যে শোভনের কোমরে জড়ানো একটা তোয়ালেকে খুব ফলাও ক'রে ওঁরা কোর্টের সামনে হাজির করেছেন। তাঁরা বলতে চান, ভারী মোটা টার্কিশ তোয়ালে, একটু জোরে নাড়া পেলেই ত খ'সে প'ড়ে যাবার কথা। সেটা যে শোভনের কোমরে বেশ পরিপাটি ক'রে জড়ানো ছিল, তাইতেই বোঝা যায় যে, সামান্য ধ্বস্তাধ্বস্তির মতও কিছু সেদিন হয় নি। প্রোসিকিউশনের সপক্ষে এ বিষয়ে অনেক সাক্ষীর জবানবন্দি নেওয়া হয়েছে। তাঁরা মান্যগণ্য লোক। আমি বিশ্বাস করেছি তাঁদের কথা, তাই তাঁদের জেরা করাও প্রয়োজন মনে করি নি। কিন্তু একেবারেই মান্যগণ্য নয় এমন একজন লোক, দুর্ঘটনার জায়গায় সকলের আগে যে সেদিন গিয়েছিল, তাকে প্রোসিকিউশন সাক্ষী ডাকেন নি। ডিফেন্সের শেষ সাক্ষী হিসেবে তাকে এখন আমি ডাকব।...বৈকুণ্ঠ নস্কর!

(একজন কর্ম্মচারী পা টিপে বেরিয়ে গেল বাঁদিক্ দিয়ে ও একটু পরেই বৈকুণ্ঠকে নিয়ে ফিরে এল। বৈকুণ্ঠ কাঠগড়ায় উঠে হাত জোড় ক'রে দাঁড়িয়ে মন্ত্র পড়ার মত ক'রে শপথ গ্রহণ করল।)

চুণী। তোমার নাম?

বৈকুণ্ঠ। আজ্ঞা, আমার নাম শ্রীবৈকুণ্ঠচরণ নস্কর।

চুণী। কি করা হয়?

বৈকুণ্ঠ। আমি সেন-সায়েবের বাড়ীতে বাবর্চ্চির কাজ করি হুজুর।

চুণী। সেন সাহেব মানে, শোভন সেন সাহেব? যাঁর খুনের মামলা হচ্ছে এই আদালতে?

বৈকুণ্ঠ। আজ্ঞা হাঁ হুজুর।

চুণী। যে দুর্ঘটনায় শোভন সেন মারা যান, সেটা যখন ঘটে তখন তুমি কোথায় ছিলে?

বৈকুণ্ঠ। আমি ত ত্যাখন তেনাদের বাড়ীতেই ছিলাম হুজুর।

চুণী। কি করছিলে?

বৈকুণ্ঠ। গাড়ীবারান্দার নীচেয় ব'সে ড্রাইভারের সঙ্গে, এই একটু সুখদুঃখের কথা কইতে ছিলাম আর কি আজ্ঞা।

চুণী। তোমার সাহেবের যে কিছু হয়েছে সেটা তুমি প্রথম কার কাছে শুনলে?

বৈকুণ্ঠ। শুনতে কেন হবে হুজুর? আমিই ত প্রথম তেনাকে দ্যাখলাম।

চুণী। কি রকম? একটু বল ত আমরা শুনি।

বৈকুণ্ঠ। কি বলব আজ্ঞা! ও কি একটা বলবার মত কথা?

চুণী। তবু বল।

বৈকুণ্ঠ। একটা চীৎকার শুনে ছ্যুটে উপরে চ'লে গেলাম হুজুর। দ্যাখলাম, সায়েবের ঘর থ্যেকে নাগ সায়েব একটা পিস্তল হাতে বেইরে আসছেন।

চুণী। তখন তুমি কি করলে?

বৈকুণ্ঠ। ত্যাখন একটু স'রে দেঁইড়ে তেনারে পথ ক'রে দিলাম আজ্ঞা।

চুণী। তার পর কি করলে?

বৈকুণ্ঠ। সায়েবের ঘরের দরজা খোলাই ছিল, দ্যাখলাম, তিনি মেজেতে ম'রে প'ড়ে আছেন।

চুণী। তখন তুমি কি করলে?

বৈকুণ্ঠ। ত্যাখন ছ্যুটে সিঁড়ির মুখে গিয়ে চেঁইচে দিদিমণিকে ডাকলাম।

চুণী। তিনি তখন কোথায় ছিলেন, কি করছিলেন?

বৈকুণ্ঠ। তিনি মায়ের সঙ্গে ব'সে নীচে খানার কামরায় চা খাচ্ছিলেন হুজুর।

চুণী। আচ্ছা বৈকুণ্ঠ, তোমার সাহেব মেজেতে কি রকম ক'রে প'ড়ে আছেন দেখলে? চিৎ হয়ে, না কাৎ হয়ে, না উপুড় হয়ে?

বৈকুণ্ঠ। চিৎ হয়ে হুজুর, (দু'হাত উপরের দিকে ছড়িয়ে) হাত পা ছইড়ে।

চুণী। আচ্ছা বৈকুণ্ঠ, তোমার সাহেব ম'রে প'ড়ে আছেন দেখলে বলচ কেন? মানুষ মরেছে না বেঁচে আছে জানতে হ'লে তার নিশ্বাস পড়ছে কি না দেখতে হয়, নাড়ী পাওয়া যাচ্ছে কি না দেখতে হয়। তুমি নিশ্চয়ই ত সে সব কিছু দেখ নি?

বৈকুণ্ঠ। না হুজুর। আর দ্যেখলেই কি বুঝতে পারতাম হুজুর? নিজের নাড়ী দ্যেখেই ব্যুঝতে পারি না চলছে কি না। চ'লে ফিরে বেড়াচ্ছি দেখে বুঝতে পারি বেঁচে আছি।

চুণী। তা হ'লে কি ক'রে তুমি বুঝতে পেরেছিলে, তোমার সাহেব ম'রে প'ড়ে আছেন, সেটা বল।

(বৈকুণ্ঠ নিরুত্তর। কপালে আঙুল ঠুকছে।)

তুমি হয়ত বলতে চাইছ, তাঁকে দেখে তোমার মনে হয়েছিল, তাঁর জ্ঞান নেই।

বৈকুণ্ঠ। (হাসিতে মুখ ভ'রে) আজ্ঞা হ্যাঁ হুজুর। আপনি ঠিকই ধরেছেন। তেনার গ্যেন ছিল না ত্যাখন।

চুণী। আচ্ছা, বৈকুণ্ঠ নস্কর! তুমি ত বেশ বুদ্ধিমান্, বিচক্ষণ লোক। তোমার সাহেব মেজেতে প'ড়ে আছেন দেখেই ত আর তুমি ধ'রে নাও নি যে তাঁর জ্ঞান নেই? তাঁর প'ড়ে থাকার ধরণের মধ্যে এমন কিছু তুমি নিশ্চয় দেখেছিলে, যাতে বুঝতে পেরেছিলে যে তার জ্ঞান নেই।

বৈকুণ্ঠ। আজ্ঞা হ্যাঁ হুজুর। হুঁশ থাকলে কি মানুষ ঐ রকম ক'রে প'ড়ে থাকতে পারে? তেনারে আপনারা ত ত্যাখন দেখেন নি, দেখলে বুঝতে পারতেন।

চুণী। কি রকম ক'রে প'ড়ে ছিলেন?

বৈকুণ্ঠ। সে আমি বলতে পারব না আজ্ঞা, এনাদের সকলের সামনে।...সে বড় লজ্জার কথা হুজুর। আপনি এ্যাকলা থাকতেন ত বলতাম।

চুণী। তোমার সাহেবের পরণে কিছু ছিল না—এই ত?

বৈকুণ্ঠ। (এক হাতে সলজ্জ হাসিমুখটাকে একটু আড়াল ক'রে) আজ্ঞা হ্যাঁ হুজুর। ঠিক তাই। আপনি ঠিকই ধ'রে ফ্যেলেছেন।

(কোর্টে আবার একটু চাঞ্চল্য। বীরেন সমাদ্দার তাঁর জুনিয়রের দিকে ঝুঁকে কানে কানে কি যেন বলছেন।)

চুণী। (গলার সুর বদ্‌লে) আচ্ছা বৈকুণ্ঠ নস্কর! তুমি কি রকমের মানুষ বল ত?

বৈকুণ্ঠ। কেন হুজুর?

চুণী। তোমার সাহেব বেহুঁশ অবস্থায় হাত পা ছড়িয়ে চিৎ হয়ে প'ড়ে আছেন। তাঁর পরণে কিছু নেই। আর তুমি তাঁর মা-বোনকে ডেকে আনতে গেলে তাঁকে দেখতে?...তোমার সাহেবের এই যে অবস্থাটার কথা আমাদের বলতে তোমার এত লজ্জা হচ্ছিল, সেই অবস্থায় তাঁর কাছে তাঁর মা-বোনকে তুমি নিয়ে গেলে? লজ্জা করল না তোমার? ছি, ছি!

বৈকুণ্ঠ। কথাটা শ্যাষ করতে দেবেন ত আজ্ঞা? না কি? আগেই ছি ছি করতে ল্যেগেছেন।

চুণী। আচ্ছা বেশ! কথাটা শেষ কর তুমি।

বৈকুণ্ঠ। লজ্জা করবে না কেন আজ্ঞা? খুবই লজ্জা করছিল। তাই ত মা আর দিদিমণি সিঁড়ি দ্যে উপরে উঠছেন দেখেই ছ্যুটে ফিরে এলাম সায়েবের ঘরে। চানের ঘর থ্যেকে তিনি বোধ করি একখানি গামছা প'রে বেইরে এয়েছিলেন, সেটি প'ড়ে ছিল তেনার মাথার কাছে। সেই গামছাটি নিয়ে তেনার কোমরে জ্বইড়ে বেঁধে দিলাম ভাল ক'রে, তার পরে ত দিদিমণিরা এলেন। আমার কথা বিশ্বেস না হয়, দিদিমণিকে, মাকে জিজ্ঞেস করুন। আর সায়েবকে, তার পর আরও অনেকেই ত এসে দেখেছেন? তেনাদের জিজ্ঞেস করুন।

চুণী। না, বৈকুণ্ঠ। আমরা আর কাউকে কিছু জিজ্ঞেস করব না, তোমার কথা মেনেই নিচ্ছি। (বীরেন সমাদ্দারের দিকে ফিরে) জেরা করুন। (ফিরে এসে নিজের জায়গায় বসলেন।)

বীরেন। (যেন খুব একটা মজা হচ্ছিল এতক্ষণ, এই রকম মুখের ভাব ক'রে দাঁড়িয়ে) আচ্ছা, বৈকুণ্ঠ নস্কর! তুমি ত খুব ভাল খানা বানাতে পার, না?

বৈকুণ্ঠ। হুজুর, সেন-সায়েবের বাড়ীতে জিজ্ঞেস করলেই তা আপনি জানতে পারবেন। না পারলে কি আর তেনারা এই চোদ্দ বচ্ছর বাবর্চির কাজে আমাকে র‍্যেখেছেন?

বীরেন। বেশ, বেশ! তবে আমি বলছি যে, তার চেয়েও ভাল গল্প বানাতে পার তুমি।

বৈকুণ্ঠ। কি গল্প বেইনেছি আজ্ঞা?

বীরেন। (খুব গম্ভীর মুখ ক'রে) এই ধর, তোমার সায়েবের কোমরে তোয়ালে—মানে আর কি, গামছাটা জড়িয়ে দেবার গল্প।

বৈকুণ্ঠ। ওটা গল্প কেন হবে আজ্ঞা? যাঁরা সায়েবকে তার পর এসে দেখেছেন, তেনাদের জিজ্ঞেস করলেই—

বীরেন। আমি বলছি, তুমি একটা চীৎকার শুনে তোমার সায়েবের ঘরে যখন গেলে, তখন তাঁর পরণে কিছু ছিল না এটা মিথ্যে কথা।

বৈকুণ্ঠ। না হুজুর। সে ত আপনি ইচ্ছে করলেই—

বীরেন। এ একটা গল্প, তুমি বানিয়েছ।

বৈকুণ্ঠ। আমি বেইনেছি? এত বড় একটা লজ্জার কথা কেউ বানাতে পারে হুজুর? আপনি ভদ্রলোকের ছেলে হয়ে এটা কি বলছেন আজ্ঞা? আমি ত বলতে চাইও নি আজ্ঞা, সে ত আপনি জানেন। আমাকে দিয়ে জোর ক'রে বইলে ন্যে এ্যাখন আপনারা বলছেন আমি বেইনেছি।

বীরেন। তুমি নিজে যদি নাও বানিয়ে থাকো, অন্য কেউ বানিয়ে তোমায় শিখিয়ে দিয়েছে।

বৈকুণ্ঠ। সে কি কথা হুজুর? শিইখে দিয়েছে কি? আপনারা শোনবার জন্যে পেড়াপীড়ি করতে লাগলেন ব'লেই না? নয়ত এ কি বলবার মত কথা আপনাদের সাক্ষাতে, না কি শিখে আসবার মত কথা?

বীরেন। আচ্ছা, যেতে পার তুমি।

(পটক্ষেপ এবং একটু পরে আবার পটোত্তলন।)

চুণী। মি লর্ড, Gentlemen of the Jury! আমি এতক্ষণ প্রোসিকিউশনের সাক্ষীদের সাক্ষ্য নিয়ে আলোচনা করেছি, এবার নিজের সাক্ষীদের কথা একটু বলব। আমার একটি বড় সাক্ষী হচ্ছে সুনীলের ঐ রিভলভারটা, যেটাকে প্রোসিকিউশন সারাক্ষণ উঁচিয়ে ধ'রে আছেন আমার দিকে। সুনীল যে খুন করে নি, আমি যদি বলি যে, এই রিভলভারটাই তার একটা খুব বড় প্রমাণ, আপনারা অবাক্ হবেন। কিন্তু আমি তাই বলতে চাইছি। সুনীল কেন রিভলভারটা সঙ্গে নিয়েছিল তা আপনারা শুনেছেন। যে জন্যেই নিয়ে থাক, খুন করবার উদ্দেশ্যে যে নেয় নি তা ঐ রিভলভারটাই আপনাদের বলবে। সে উদ্দেশ্য সত্যিই যদি তার থাকত ত রিভলভারটাকে ব্রাউন কাগজে ভাল ক'রে মুড়ে সুতো দিয়ে বেঁধে সবাইকে দেখিয়ে হাতে ক'রে নিয়ে যাবে কেন? তা কি কখনও কেউ করে? পৃথিবীর ক্রিমিনলজির ইতিহাসে এ রকম কাণ্ড কখনও কেউ করেছে? খুনের উদ্দেশ্য সুনীলের যদি থাকত, খোলা রিভলভার পকেটে ক'রে সে লুকিয়ে নিয়ে যেত। কাগজের মোড়ক থেকে রিভলভারটা খুলে বের করতে যতটা সময় লাগবার কথা, তার মধ্যে না হতে পারে কি? যে লোকটাকে আমি খুন করতে চাই, সে চেঁচিয়ে লোক জড় করতে পারে, রিভলভারটার উপর ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে, লেঙ্গি মেরে আমাকে ফেলে দিতে পারে, আর কিছু না করতে পারুক, ছুটে পালিয়েও ত যেতে পারে? খুন করা যার উদ্দেশ্য সে এই সব সুবিধা সে-লোকটাকে দেবে কেন? তা কি কেউ কখনও দেয়? প্রোসিকিউশন যদি আমার এই প্রশ্নের সদুত্তর দিতে পারেন, ত আমি না হয় হার মানব। তা তাঁরা পারবেন

না। সুনীল সেদিন কেন গিয়েছিল শোভনের কাছে, আর কি ভেবে রিভলভারটাকে কাগজে মুড়ে হাতে ক'রে গিয়েছিল, মায়া নাগের মুখে তাও আপনারা শুনেছেন। মায়া নাগ আজ recess-এর পর এসে যে বিবৃতি দিয়ে গিয়েছেন, তার মধ্যে কোথাও এতটুকু অসঙ্গতি আপনারা পান নি। তা ছাড়া তাঁর এই বিবৃতির সত্য-মিথ্যা যাচাই করবার জন্যে যে তিনজন মানুষকে সাক্ষী ডাকা চলত, প্রোসিকিউশন তাঁদের ডাকবেন না বলেছেন, কাজেই মায়া নাগের এই বিবৃতিকে প্রামাণ্য ব'লে আমাদের ধরতে হবে। বৈকুণ্ঠ নস্কর গণ্যমান্য লোক নয়, কিন্তু তার সাক্ষ্যে সে যা বলেছে তা আমাদের মান্য করতেই হবে এই জন্যে যে, দুর্ঘটনার জায়গায় সে-ই প্রথম গিয়েছিল আর ঠিক তাকেই প্রোসিকিউশন সাক্ষী ডাকেন নি। তার সাক্ষ্য দেবার অত্যন্ত সহজ স্বাভাবিক ধরণ থেকেও আপনারা নিশ্চয় বুঝতে পেরেছেন যে, এমন একটাও কথা সে বলে নি যা মিথ্যে। ধ্বস্তাধ্বস্তি যে একটা হয়েছিল, শোভনের দু'পাটি চপ্পল আর বৈকুণ্ঠ নস্কর, এদের সাক্ষ্যই তা প্রমাণ করবার পক্ষে যথেষ্ট। তোয়ালেটারও একটা সাক্ষ্য আছে, যা প্রোসিকিউশনের favour-এ যায় না। সেটা হচ্ছে এই যে, ধ্বস্তাধ্বস্তি যদি নাও হ'ত, গুলী খেয়ে শোভন যে প'ড়ে গিয়েছিল তাইতেই তোয়ালের বাঁধনটা আলগা হয়ে যেত। তা যে যায় নি, তার থেকে প্রমাণ হয় বাঁধনটা পরেকার। মি লর্ড, Gentlemen of the Jury, খুন করবার উদ্দেশ্য সুনীলের যেমন ছিল না, তেমনি শোভনেরও ছিল না। শোভনের প্ল্যান কি ছিল, মায়া নাগের কাছে আপনারা শুনেছেন। খুন করতে এসেছিল ব'লে সুনীলকে ভয় পাইয়ে খেসারতের দাবীটা ছেড়ে দিতে বাধ্য করতে পারবে, শোভন ভেবেছিল। সেই জন্যে দরকার হ'লে দু-একটা বুলেট সে ফায়ারও করিয়ে দেবে, মায়াকে বলেছিল। তাই করতে গিয়ে সুনীলের রিভলভারটা যখন সে কেড়ে নিতে যায়, সুনীল তার উদ্দেশ্য বুঝতে না পেরে ভয় পেয়ে বাধা দেয়, আর একটা ধ্বস্তাধ্বস্তি বাধে। তার মধ্যে accidentally···

(আবার পটক্ষেপ ও অল্প একটু পরে পটোত্তলন। জুররদের আসন শূন্য। জজ ভিন্ন অন্যরা পার্শ্ববর্তী-দের সঙ্গে চাপাগলায় কথা বলছেন। মিনিট-কয়েক পরেই জুররা একে একে ফিরে এসে নিজ নিজ আসনে বসলেন।)

কোর্ট ক্লার্ক। (জুরীর মঞ্চের কাছে এসে) ফোর-ম্যান অব দি জুরী!

(জুররদের মধ্যে থেকে একজন উঠে দাঁড়ালেন।)

আপনাদের কি সিদ্ধান্ত তা বলুন। ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩০২ ধারায় অভিযুক্ত এই আসামী সুনীল নাগ দোষী না নির্দ্দোষ।

ফোরম্যান। নির্দ্দোষ।

কোর্ট ক্লার্ক। এটা কি আপনাদের অধিকাংশের সিদ্ধান্ত, না সর্ব্বসম্মত সিদ্ধান্ত?

ফোরম্যান। সর্ব্বসম্মত।

কোর্ট ক্লার্ক। আচ্ছা বসুন।

(ফোরম্যান বসলে কোর্ট ক্লার্কও নিজের জায়গায় ফিরে গিয়ে বসলেন।)

জজ। জুরীর সিদ্ধান্ত আমি মেনে নিচ্ছি। আসামী সুনীল নাগ নির্দ্দোষ সাব্যস্ত হয়ে খালাস হলেন।

(জজ উঠে দাঁড়ালে কোর্টে উপস্থিত সকলে উঠে দাঁড়ালেন। জজ বেরিয়ে গেলেন পিছনের দরজা দিয়ে। বীরেন সমাদ্দার ও চুণীলাল বসুকে করমর্দ্দন করতে দেখা গেল। দু'জনেরই মুখে হাসি। জুররা এতক্ষণ পরে প্রচণ্ড গাম্ভীর্য্য পরিহার ক'রে হাসিমুখে নামছেন মঞ্চ থেকে। চুণীলাল বসু ভিড় ঠেলে এগিয়ে যাচ্ছেন আসামীর কাঠগড়ার দিকে।)

দৃশ্যান্তর

তৃতীয় অঙ্ক

দ্বিতীয় দৃশ্য

[সুনীলের বাড়ীতে বসবার ঘর। সন্ধ্যা পিছনের দিকে পর্দ্দা ঢাকা দুটো জানালার উপরকার ফাঁকা জায়গাটা দিয়ে রাস্তার আলো দেখা যাচ্ছে একবার ক্ষীণ একটু বিদ্যুৎবিকাশ দেখা গেল ঘরের বাঁদিকে টিপয়ের উপর একটা ট্রে দুধের গেলাস ও চিনির বাসন। আয়া দাঁড়িয়ে দুধে চিনি মেশাচ্ছে। একটা জানালার পর্দ্দা একটু খানি সরিয়ে সুসী ঝুঁকে প'ড়ে রাস্তা দেখছে।]

আয়া। সুসী! এস, দুধ খাবে।

(সুসী উত্তর দিল না, মুখও ফেরাল না।)

কই সুসী, এস শীগগির। দুধটা জুড়িয়ে যাচ্ছে খেয়ে নাও।

সুসী। (মুখ না ফিরিয়ে) তুমি খেয়ে নাও।

আয়া। এই দুষ্টুমি সুরু হ'ল। ঠাণ্ডা হয়ে গে

খেতে ভাল লাগবে না, তার আগে খেয়ে নাও।

সুসী। (মুখটা একটু ফিরিয়ে) আমি দুধ খাব না এখন। মা আগে ফিরে আসুক।

আয়া। মা আগে ফিরে আসুক! মা ফিরে এসে দুধ খাবার সময় যদি না দেয় তোমাকে, যদি হিড় হিড় ক'রে টেনে নিয়ে যায়?

সুসী। কেন হিড় হিড় ক'রে টেনে নিয়ে যাবে?

আয়া। কেন নিয়ে যাবে তা বলি নি তোমাকে? ভুলে গেছ? (ক্ষীণ বিদ্যুদ্দীপ্তি।)

সুসী। (ঘুরে দাঁড়িয়ে) তুমি মিথ্যে কথা বলেছ, মিথ্যে কথা।

আয়া। মিথ্যে না সত্যি, দেখতেই পাবে।

সুসী। মিথ্যে কথা, মিথ্যে কথা, (ছুটে এসে আয়ার গায়ে ছোট হাতটি দিয়ে চড় মারতে মারতে) মিথ্যে কথা বলেছ তুমি আমার বাবার নামে। আমি ব'লে দেব বাবাকে।

আয়া। ব'লে দেব বাবাকে! সেও বলতে, দেখিয়ে দেবে মজা। যেমন মা তার তেমনি মেয়ে। একটু যদি ভয়ডর আছে।

(নীচে দরজার ঘণ্টা বাজল।)

সুসী। (লাফিয়ে নেচে) মা এসেছে! মা এসেছে। (ছুটে ডান দিকের নেপথ্যের কাছে গিয়ে) দরজা খুলে দাও! আয়া, এস, দরজাটা খুলে দাও! খুলে দাও শীগগির।

(আয়া গিয়ে ডান-দিকের মোটা জোড়াপর্দা-ঢাকা দরজার ছিটকিনি খুলে দিয়ে এল। সুসী বেরিয়ে গিয়ে একটু পরেই মায়ার হাত ধ'রে ফিরে এল। কোর্টে যে পোশাকে মায়াকে দেখা গিয়েছিল, সেই পোশাকই তার পরণে। তার মুখে চোখে, চলার ধরণে ক্লান্তির ভাব স্পষ্ট।)

মায়া। (সুসীর হাত ছাড়িয়ে) ছাড় দেখি এখন, একটু বসি। (হাত ব্যাগটা ছুঁড়ে ডিভানের ওপর ফেলে ঘোমটার কাঁটা খুলছে।)

সুসী। মা, বাবা কি আজ আসবে?

মায়া। হ্যাঁ সুসী, আমি ত ভেবেছিলাম আমার আগেই এসে পড়বেন। (একটা চেয়ারে গা এলিয়ে পা মেলে বসলে সুসী তার কোল ঘেঁসে দাঁড়াল।)

সুসী। মা, জান? আয়া না—

আয়া। এই সুরু হ'ল। কত গল্পই যে এখন বানাবে! (বাঁদিক্‌ দিয়ে বেরিয়ে গেল।)

মায়া। (একটা হাই তুলে) আয়া আবার কি করেছে? (হঠাৎ উঠে ব'সে) ও কি? তুমি দুধ খাও নি এখনো?

সুসী। (যে টিপয়টার উপর দুধ রাখা ছিল সে-দিকে এগিয়ে গিয়ে) দুধ খাব ত মা?

মায়া। দুধ খাবে না কেন? কি হয়েছে? (দুধ খেয়ে সুসী এসে মায়ের পাশে একটা চেয়ারে পা ঝুলিয়ে বসল।)

সুসী। (একটু ভয়ের ভাব মুখে) আমরা কি এখন চ'লে যাব মা?

মায়া। তুমি কোথায় চ'লে যাবে সুসী?

(সুসী নীরবে পা দোলাতে লাগল। তার চেয়ারের খুব কাছে নিজের চেয়ারটাকে টেনে নিয়ে ব'সে তার চেয়ারের পিঠের ওপর হাত রেখে)

আচ্ছা, সুসী! তোমার বাবা ত তোমাকে ছেড়ে মাঝে মাঝে বেশ কিছু দিনের জন্যে বাইরে চ'লে যান? আমি যদি সেই রকম চ'লে যাই, তুমি পারবে না থাকতে?

সুসী। আমি থাকবই না।

মায়া। কি যে বলে! তোমার বাবার কাছে থাকবে, কেন পারবে না? তাছাড়া আয়াও থাকবে।

সুসী। ও ত রাক্ষুসী। আমি থাকবই না ওর কাছে। জান মা? আয়া না—

(নীচে ঘণ্টা বাজল। সেই সঙ্গে অল্প একটু বিদ্যুৎ ঝলক ও মৃদু মেঘগর্জ্জন।)

মায়া। ঐ বোধ হয় তোমার বাবা এলেন।

(বাঁদিক্‌ দিয়ে আয়া ঢুকল ত্রস্তপদে। পিছনের জানলা-দুটোর কাঁচের পাল্লা টেনে বন্ধ ক'রে দুধের গেলাস ও চিনির পাত্র সমেত ট্রেটা উঠিয়ে নিয়ে গেল। মায়া উঠে গিয়ে দরজা খুলে দিলে বাইরের হাওয়ায় দরজার পর্দাটা উড়তে লাগল ঘরের ভিতর। সুনীল ঢুকল। ঢুকেই তাড়াতাড়ি বন্ধ ক'রে দিল দরজাটা। সুসী মায়ার একটা হাত চেপে ধ'রে তার গা ঘেঁসে দাঁড়িয়ে ছিল। সুনীল ছুটে গিয়ে তাকে বুকে তুলে নিল।)

সুনীল। (সুসীর হাতে, কপালে, মাথায় চুমো খেতে খেতে) সুসী, সুসী, সুসুনীকলমি!

সুসী। (সুনীলের মাথার পিছনে হাত রেখে তার মুখের দিকে তাকিয়ে) বাবা!

সুনীল। মা!

সুসী। (হঠাৎ সুনীলের বাহুবন্ধন থেকে নিজেকে

মুক্ত করবার চেষ্টা করতে করতে) আমাকে নামিয়ে দাও, নামিয়ে দাও, নামিয়ে দাও।

সুনীল। (সুসীর মাথায় একটা চুমো খেয়ে তাকে নামিয়ে দিতে দিতে) কেন? কি হ'ল?

(মায়া গিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল, পিছনের একটা জানলার কাছে। সুসী ছুটে গিয়ে জড়িয়ে ধরল তাকে।)

কি হ'ল সুসী? (মায়ার দিকে তাকিয়ে) কি, হ'ল কি ওর? (একটা চেয়ারে বসল।)

মায়া। (সুসীকে ঠেলে দিয়ে) সুসী! বোকামি করে না। যাও, গিয়ে বাবাকে আদর ক'রে দাও।

(সুসী এক পা দু'পা ক'রে এগোচ্ছিল সুনীলের দিকে।)

সুনীল। থাক, থাক, তোমার আসতে হবে না। যাও, তোমার মা'র কাছে যাও।

(বাইরে বিদ্যুৎস্ফুরণ ও একটু পরে দূরাগত মেঘগর্জন। সুসী মাঝপথে থেমে গিয়ে অত্যন্ত বিপন্ন মুখে ইতস্তত: করতে লাগল, তার পর হঠাৎ দুই হাতের পিঠ দিয়ে দুই চোখ ঢেকে বাবা, বাবা, ব'লে কাঁদতে আরম্ভ করল। সুনীল লাফ দিয়ে উঠে ছুটে গিয়ে আবার বুকে তুলে নিল তাকে। আবার তার গালে, কপালে, মাথায় চুমো খেতে খেতে বলতে লাগল)

সুসী, সুসী, কাঁদছ কেন সুসী, সুসনীকলমি? কেঁদো না লক্ষীটি।

সুসী। (শান্ত হয়ে সুনীলের গালে চুমো খেল একটা। তার পর সুনীলের কপাল থেকে তার চুলগুলো সরিয়ে দিতে দিতে) জান বাবা? আয়া না—

সুনীল। চল ভিতরে। ধড়াচূড়োগুলো ছাড়ব, আর ততক্ষণ তোমার আয়ার গল্প শুনব।

(সুসীকে কোলে নিয়ে বেরিয়ে গেল বাঁদিক্ দিয়ে। সুসী যেতে যেতে চেঁচিয়ে বলছে, মা এস, মা তুমিও এস। নেপথ্যের ওদিক্ থেকেও তার গলা শোনা যেতে লাগল, মা এস, মা, ওমা, মা! আয়া ঢুকল বাঁদিক্ দিয়ে। মায়া এসে একটা চেয়ারে ব'সে ছিল, তার কাছে গিয়ে)

আয়া। ওর চোখ দুটো দেখলে?

মায়া। চোখ? হ্যাঁ, কেন? কিছু লক্ষ্য করি নি ত? লক্ষ্য করবার মত কিছু কি ছিল ওর চোখে?

আয়া। তোমার দিকে কি এক রকম ক'রে তাকাল দেখলে না?

মায়া। না, কই, বুঝি নি ত কিছু!

আয়া। তা তুমি যদি এখন না বোঝ। আমার কিন্তু একটুও ভাল লাগছে না।

মায়া। আজকাল একটা কাজ তুমি খুব পরিপাটি ক'রে করছ, সেটা হচ্ছে মানুষকে ভয় পাওয়ান।

আয়া। ভয় একটু পেলে যে বাঁচি। আমার কথা যদি শোন—

মায়া। তোমার কথা পরে শুনব। এখন তুমি যাও দেখি আমার সামনে থেকে। আমার ভীষণ মাথা ধরেছে, কিছু বলতে বা শুনতে ভাল লাগছে না।

আয়া। মাথা ধরেছে ত টিপে দিচ্ছি।

মায়া। না, থাক, যাও তুমি।

আয়া। বাবা, বাবা, যাচ্ছি! তোমার ভালর জন্যে কিছু বলতে বা করতে যাওয়াই ঝকমারি। মরবে নিজেই, আমার কি?

(বেরিয়ে গেল বাঁদিক্ দিয়ে। বিদ্যুৎ চমকের একটু পরেই বেশ একটু শব্দ ক'রে বাজ পড়ল। বিদ্যুৎ চমকাবার সঙ্গে সঙ্গেই মায়া হাত দিয়ে চোখ ঢেকেছিল, সুনীল নিঃশব্দে ধরে এসে ঢুকল একটু পরে, মায়া তাই জানতে পারল না সেটা। মায়ার থেকে একটু দূরে আর একটা চেয়ারে বসল সুনীল, পরণে পাজামা-পাঞ্জাবি। তার পাইপ ধরাবার দেশলাইয়ের শব্দে চমকে সোজা হয়ে উঠে বসল মায়া।)

সুনীল। (কণ্ঠস্বরে কোমলতার লেশমাত্র নেই) সুসীর কি হয়েছে? এ রকম করছে কেন ও?

মায়া। কি করছে?

সুনীল। জান বাবা, ব'লে কিছু একটা বলতে সুরু করেছিল এখানে, কিন্তু ভেতরে গিয়েই কেমন যেন পাথর হয়ে গেল, কিছুতেই বলল না কথাটা।

মায়া। বলবার মত কথা হয়ত কিছু নয়।

সুনীল। আমার তা মনে হয় না।...ওকে তোমরা কিছু বলেছ?

মায়া। আমি? না।

সুনীল। আয়া কিছু বলেছে?

মায়া। জানি না।

সুনীল। জানা উচিত ছিল। কিছু একটা কেউ ওকে নিশ্চয় বলেছে, নয়ত ও এ রকম করছে কেন?

(একটুক্ষণ চুপ ক'রে কাটল।)

সে যাক, তোমাকে বলতে এলাম, I am sorry for Shobhan. যতটা দুঃখিত মানুষ হতে পারে।

(মায়া বাহুমূলে মুখ গুঁজল। বোঝা গেল সে কাঁদছে। সুনীল চোখ মুছল একবার রুমালে, মায়া সেটা দেখতে পেল না।)

এই রকম সাঙ্ঘাতিক একটা বোকামি কেন যে করতে গিয়েছিলে?

(মায়া কাঁদছে।)

ব্যাপার যা দাঁড়িয়েছিল তাতে ম'রে যেতে আমিও পারতাম। কেন মরি নি তাই আশ্চর্য্য।

(মায়া কেঁদেই চলেছে।)

আরও আশ্চর্য্য যে সে সম্ভাবনার কথাটা একবারও তোমার মনে আসে নি, যখন রিভলভারটা নিয়ে যাবার জন্যে আমাকে ধরাধরি করছিলে। এমনও ত হতে পারত, যে, শোভন আমাকে খুন করবার জন্যেই ঐ প্ল্যানটা করেছিল? তার বাড়ীতে, তার শোবার ঘরে আমার নিজেরই রিভলভারের গুলীতে আমি মরলে পৃথিবীর লোক স্বভাবতঃই ভাবত, শোভনকে খুন করতেই আমি গিয়েছিলাম. ধস্তাধস্তির মুখে ব্যাপারটা দাঁড়িয়ে গেছে অন্য রকম। চুণীলাল বসু না থাকলে কোর্ট স্বচ্ছন্দে এই view নিতে পারত, যে, আমাকে খুন করবার ষড়যন্ত্রই ছিল এদের। আর এ রকম viewও তারা খুব স্বচ্ছন্দেই নিতে পারত যে, সেই ষড়যন্ত্রের মধ্যে তুমিও লিপ্ত ছিলে।

(মায়া কান্না থামিয়ে সুনীলের শেষ কথাগুলো উৎকর্ণ হয়ে শুনছে।)

কি জানি, কি যে হ'ল, কেন যে হ'ল, কিছুই বুঝতে পারছি না। কিছু বুঝতে পারছি না আরও এইজন্যে যে, আজ যে কথাগুলো তুমি কোর্টে ব'লে এলে, তা স্বচ্ছন্দে গোড়াতেই বলতে পারতে, আর তা হ'লে আমার ভোগান্তি ঠিক এতটা হ'ত না। তোমাকে বারণ করা হয়েছিল, মানে কি? শুনলে কেন তুমি তাদের কথা?

মায়া। (চোখমুখ মুছে সোজা হয়ে উঠে বসেছিল, এবার উঠে দাঁড়িয়ে আবার ঘোমটায় কাঁটা পরছে।) সুমী কোথায়?

সুনীল। আমার কাছে রয়েছে। কেন?

(বাইরে বজ্রবিদ্যুৎ।)

মায়া। (হাতব্যাগ থেকে একটা চাবির তোড়া বের ক'রে সুনীলের পাশে টিপয়টার ওপর রাখল।) এই নাও চাবি। আমি চললাম। ঐ মেয়েটার জন্যে ছিলাম এতদিন, নয়ত এ বাড়ীতে থাকবার কোন অধিকার আমার ছিল না! তোমার বিনা অনুমতিতে আর কোথাও ওকে নিয়ে যাওয়াও ঠিক হ'ত না। এবার মেয়ে বুঝে পেলে, আমি যাই। (এগিয়ে যাচ্ছে ডানদিকের দরজাটার দিকে।)

সুনীল। (শান্ত অথচ দৃঢ় স্বরে) শোন! এস। বস ঐখানে।

(মায়া একটু সন্ত্রস্ত ভাবে দরজার সবচেয়ে কাছের চেয়ারটাতে বসল জড়সড় হয়ে।)

যাই বললেই কি যাওয়া যায়? (অল্প হেসে) কি নিয়ে যাচ্ছ, কি দিয়ে যাচ্ছ, তার একটা হিসেব আগে হোক। কি?

মায়া। এর মধ্যে কিছু সরিয়েছি কি না, safeটা খুলে দেখে নিতে পার।

সুনীল। থাক্, থাক্, ঢের হয়েছে।

(বাইরে ঝড়-বৃষ্টি ও মাঝে মাঝে বাজ পড়ার শব্দ।)

বেশ ভাল ক'রেই জান যে, যা নিয়ে যাচ্ছ, আমার সমস্ত জীবনের সুখ-শান্তি, আমার আত্মমর্য্যাদা, সেগুলি আমার ঐ safe-টাতে রাখা থাকে না। safe-এ টাকাকড়ি আমার আছেই বা কি, আর থাকলেও তুমি নিতে না আমি জানি। যদিও তোমাকে জিজ্ঞেস করতে বাধা নেই, খেসারতের টাকাটা যাতে আমি না পাই, তার জন্যে শোভনের সঙ্গে জুটে অমন আদাজল খেয়ে লেগেছিলে কেন?

(মায়া নিরুত্তর।)

এতগুলো টাকা আমি পেয়ে যাই এটা প্রাণে সইছিল না? কি? বল।

(মায়া তবুও নিরুত্তর।)

কারণটা বলই না, শুনি।

মায়া। কোর্টে আজ অনেকক্ষণ ধ'রে তোমরা আমাকে জেরা করেছ। আর কেন? এবার দয়া ক'রে ছুটি দাও।

সুনীল। আর কিছু নিয়ে জেরা করব না, কেবল এই একটা কথার তুমি জবাব দাও। কোর্টে তুমি বলেছ, ওটাতে তোমারই দেনা শোধ যেত, আর সে-দেনা তুমি নিজেই অন্য উপায়ে শোধ করতে পারবে আশা করছিলে ব'লে শোভনের প্রস্তাবে তুমি আপত্তি কর নি,। কিন্তু সেটাই সব নয়। না? কি?

মায়া। আমি সত্যিই চাই নি যে, ঐ উপায়ে দেনাটা শোধ হোক।

সুনীল। কেন?

মায়া। আমি জানতাম, টাকাটা কিছুতেই আর আমার কাছ থেকে তুমি ফিরে নিতে না। চিরটা জীবন তোমার কাছে ঋণী হয়েই আমাকে থাকতে হ'ত।

সুনীল। বুঝলাম। কিন্তু পুরুষরা স্ত্রীদের জন্যে করে, তাদের ধার দেয় না, এই নিয়মটাই চ'লে আসছে পৃথিবীতে চিরকাল।

মায়া। (একটু ভেবে) আমি তখন ঠিক তোমার স্ত্রীর position-এ ছিলাম না।

সুনীল। যখন ছিলে, তখনও তোমার যে দেনাটা আমি নিজের ব'লে নিয়েছিলাম সেইটার কথাই ভাবতে। আমার ভাবনা যতটা ভাবতে, তার চেয়েও বেশী। আর হয়ত সে জন্যেই আমাদের সংসারটা ভেঙ্গে গেল। আগে বুঝতে পারলে হয়ত তোমার রোজগারের ব্যবস্থা নিজেই আমি ক'রে দিতাম।

মায়া। (উঠে) এবারে আমি যাই। মেয়েটা হঠাৎ আবার কখন এসে পড়বে, তখন মুশকিলে পড়তে হবে।

সুনীল। একটু না হয় ব'সে যাও, বৃষ্টিটা ধরুক।

মায়া। বৃষ্টিতে কোনও অসুবিধেই আমার হবে না।

সুনীল। কোথায় যাবে? জানতে চাওয়া ঠিক হচ্ছে কি না জানি না অবশ্য।

মায়া। আজ রাত্রে ছুটকীদিদের বাড়ী, টেলিফোনে তাদের খবর দেওয়া আছে। তারপর কোথায় যাওয়া যায়, দেখতে হবে।

(একজন ভৃত্য একটা ট্রেতে ক'রে দু'জনের চায়ের সরঞ্জাম রেখে গেল। সুনীল উঠে গিয়ে চা ঢালতে যাচ্ছিল, বোঝা গেল এ কাজটা সে ভাল পারে না, মায়া এসে তার হাত থেকে টি-পটটা নিয়ে নিজে চা ঢালছে।)

সুনীল। (ফিরে গিয়ে নিজের চেয়ারটাতে ব'সে) যাবে যাও, তবে সুমীকেও নিয়ে যাও। ও তোমারই সঙ্গে থাকবে।

মায়া। (চা ঢালা বন্ধ ক'রে টি-পট হাতে নিয়েই) আমার অপরাধে মেয়েটাকে কেন শাস্তি দিতে চাইছ?

সুনীল। বাচ্চা একটা মেয়ে নিজের মায়ের কাছে থাকবে, এটা তার শাস্তি?

মায়া। (চা ঢেলে দুধ চিনি মিশিয়ে একটা পেয়ালা সুনীলের হাতে দিয়ে ফিরে গিয়ে বসল।) তোমার কথা শুনে মনে হয়, তুমি ঠাট্টা করছ আমাকে। আমার যা সুনাম বেরিয়েছে, তার পর মেয়েকে আর আমার কাছে রাখা চলে? আমি আর যা-ই হই, আমি ওর মা ত বটে? ওর ভবিষ্যৎটার কথা আমাকে ভাবতে হবে।

সুনীল। তুমি চা খাবে না?

মায়া। ইচ্ছে করছে না।

সুনীল। (দুতিন বার নীরবে চায়ে চুমুক দিয়ে) মেয়েকে ছেড়ে থাকতে পারবে?

মায়া। থাকতে হবে।

সুনীল। (আরও দুতিন বার চায়ে চুমুক দিয়ে) মেয়েটা পারবে তোমাকে ছেড়ে থাকতে? থাকে নি ত কখনও। (চা খাওয়া শেষ ক'রে পেয়ালাটা টিপয়ের উপর রেখে) শোন মায়া! তুমি ওর ভবিষ্যৎটার কথা ভাবছ। ষোল-সতেরো বছর পরে যখন ওর বিয়ের বয়স বা ইচ্ছে হবে তখনকার কথা। কিন্তু ভবিষ্যৎটাই ত মানুষের সব নয়? ভবিষ্যতে ও সুখী হবে এটা যেমন আমরা চাই, ওর এখনকার জীবনটাও সুখের হোক তাও ত আমাদের দেখা উচিত? আমি ভাবছি, আজ ঘুমোতে যাবার সময় ও যখন দেখবে ওর মা বাড়ীতে নেই আর বুকফাটা কান্না জুড়বে, তখন কি ব'লে ওকে বোঝাব? মায়ের সুনাম-দুর্নাম নিয়ে ত মায়ের দাম নয় এখন ওর কাছে?

মায়া। ধ'রে নাও না, আমি ম'রে গিয়েছি। ওর মা নেই। কত ছেলেমেয়েরই ত থাকে না।

সুনীল। ওটা ব'লে ওকে বোঝানো যাবে না, কারণ ম'রে তুমি যাও নি।

মায়া। (দুই হাঁটুর ওপর দুই কনুয়ের ভর রেখে দু'হাতে মুখ ঢেকে) কেন ম'রে যাই নি, কেন বেঁচে আছি, কি লাভ আর আমার বেঁচে থেকে?

সুনীল। (উঠে দাঁড়িয়ে রোরুদ্যমানা মায়াকে দেখল কিছুক্ষণ, তারপর তার কাছাকাছি জায়গায় পায়চারি করতে করতে) আমি যা বলছি শোন। ষোল-সতেরো বৎসর পরে কি হবে সে ভাবনা ভাববার দরকার এখন নেই। ততদিনে মানুষ অনেক কিছু ভুলে যাবে, যদি ভুলে যেতে তাদের দেওয়া যায়। আমি বলছি, তোমার কাছে সুমী অনেক বেশী ভাল থাকবে। ওকে নিয়ে যাও তুমি।

মায়া। (আঁচলে চোখ মুছে মুখ তুলে) তোমার কথাতেই তোমাকে জিজ্ঞেস করছি, তুমি পারবে ওকে ছেড়ে থাকতে?

সুনীল। আমার ভাবনা ত তুমি অনেক ভেবেছ, আজ আর না হয় নাই ভাবলে?

মায়া। আচ্ছা বেশ, নিজের ভাবনাই ভাবছি। এই

দু'মাস সারাক্ষণ বাবা বাবা ক'রে যা ভীষণ জ্বালিয়েছে আমাকে, সে রকম জ্বালাতন আর আমি হ'তে পারব না। আমার সাধ্য হবে না।

সুনীল। (পায়চারি করতে করতে থেমে) খুব বুঝি গোলমাল করেছে?

মায়া। খুব।

সুনীল। (মায়ার পাশে একটা চেয়ারে ব'সে একটু ভেবে) আচ্ছা, শোন। সুমী কখন আবার এসে পড়বে, তাড়াতাড়ি কথাটা শেষ করতে চাই ব'লে কোনও ভূমিকা না ক'রে সোজাসুজিই বলছি। তুমি যদি ইচ্ছে কর, সুমীকে নিয়ে আমার সঙ্গে এ বাড়ীতেই থাকতে পার। আমার কোনও অসুবিধে তাতে হবে না। কেবল, পৃথিবীর লোকের কাছে আমরা স্বামী-স্ত্রীই থাকব, কিন্তু পরস্পরের কাছে হব সম্পূর্ণ নিঃসম্পর্কিত। পারবে ওটা করতে, ঐ মেয়েটার sake-এ? কি?

(মায়া হাতের ওপর কপাল রেখে ভাবছে। বৃষ্টিটা ধ'রে এসেছিল, এই সময় আবার চেপে এল। রাস্তার আলো প'ড়ে জলের ধারা চকচক ক'রে জলছে দেখা যাচ্ছে জানালার সার্শির ভিতর দিয়ে।)

এতে আর-একটা লাভ এই হবে, পৃথিবীর লোকের যদি ধারণা হয় যে, আমি তোমাকে ক্ষমা করেছি, তা হলে তারাও তোমাকে সহজেই ক্ষমা করবে।

(বিদ্যুৎ ঝিলিক ও মৃদু মেঘগর্জ্জনের শব্দ।)

মায়া। আচ্ছা, তুমি আগে বল, তুমি যে তিনদিন খুনের দায়ে আসামীর কাঠগড়ায় ব'সে ছিলে, ভাল লেগেছিল তোমার?

সুনীল। না। কিন্তু ওকথা কেন?

মায়া। মনে কর, ঐ তিনদিনে তোমার বিচার শেষ হ'ল না। তিন মাসেও না, তিন বৎসরেও না। শাস্তিও হ'ল না, খালাসও পেলে না। ঐ কাঠগড়াতেই ব'সে রইলে দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বৎসরের পর বৎসর। কি রকম লাগত তোমার?

সুনীল। বোধ হয় খুবই খারাপ লাগত। কারণ, কিছুদিনের মধ্যেই পাগল হয়ে যেতাম।

মায়া। তাহলে তুমি কি চাও, আমি পাগল হয়ে যাই? সারাজীবন তোমার ঘর করব এই চিন্তা নিয়ে যে আমার বিচার হচ্ছে, জানি না কি শাস্তি আমার কপালে লেখা আছে, আর কোনওকালে এ বিচার শেষ হবে কি না?

সুনীল। (উঠে আবার পায়চারি করছে। বিদ্যুদ্দীপ্তি এখন ক্ষীণতর, দূরাগত মেঘগর্জ্জন মৃদুতর। জানালার কাছে গিয়ে কাঁচের ভিতর দিয়ে বাইরেটাকে একবার দেখল। তারপর ফিরে এসে মায়ার সামনে দাঁড়িয়ে চাপাগলায় কথা বলার ভঙ্গিতে) আর, আমিও যদি তোমাকে বলি, আমারও দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বৎসরের পর বৎসর কাটবে এই চিন্তা নিয়ে যে, হাইকোর্টে আমার বিচার শেষ হয়েছে, কিন্তু মানুষের সব কোর্টের অনেক, অনেক উপরে আর একটা যে কোর্ট আছে, সেখানে আমার বিচার হয়ত কোনওকালে শেষ হবে না, তা হলে?

মায়া। (উঠে সুনীলের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে) কেন, কেন এরকম ক'রে বলছ তুমি?

সুনীল। (চেয়ারে ব'সে) বলছি, কারণ, বুঝতে পারছি না, মানুষের বিচারে ত আমি বেকসুর খালাস পেয়েছি, ভগবানের বিচারেও কি তা পাব?

মায়া। (ঝুঁকে প'ড়ে সুনীলের একটা হাত চেপে ধ'রে) এ সব কি বলছ তুমি? (ব'সে পড়ল তার সামনে মেঝের উপর।)

সুনীল। পুলিসকে সেদিন যা বলেছিলাম, আজ তোমাকেও তাই আবার বলছি আমার মনে হয় শোভনকে আমি খুন করেছি।

মায়া। (সুনীলের দুটো হাত চেপে ধ'রে) তোমার মনে হয় খুন করেছ! কোনও মানে হয় না কথাটার।

সুনীল। মানে আছে মায়া।

মায়া। না, না, না। আমি বিশ্বাস করি না কথাটার কোনও মানে আছে, বা থাকতে পারে।

সুনীল। তা হলে সবটা তোমাকে বলতে হয়। চাও শুনতে?

মায়া। For Heaven's sake, বল। আমাকে শুনতেই হবে।

সুনীল। (উঠে চেয়ারটার হাতার ওপর ব'সে) আমি যদি জানতাম শোভনের আসল উদ্দেশ্যটা কি, আমি যদি না ভাবতাম সে আমাকে খুন করতে চাইছে, আর এত ভয় না পেতাম, শোভন মরত না। এই ভয় পাওয়াটা আমার প্রথম অপরাধ।

মায়া। আমি মানছি না ওটা তোমার অপরাধ। যা হোক, তুমি বল।

সুনীল। আমার সত্যিই মনে হয়েছিল, শোভন আমাকে খুন করতেই চাইছে। আর শোভনও এক সময় নিশ্চয় ভেবেছিল, আমি তাকে খুন করতে চাইছি, যদিও আসলে আমরা কেউই কাউকে খুন করতে চাইছিলাম না।

মায়া। হায় ভগবান্!

সুনীল। রিভলভারটা নিয়ে কাড়াকাড়ি সুরু হতেই বুঝতে পারলাম, বেশীক্ষণ সেটা চলবে না। জোরে শোভনের সঙ্গে আমি কিছুতেই পারব না। আমার ডান হাত দিয়ে ওর ডান হাতটা আমি চেপে ধরেছি, যে হাতে ওর রিভলভার; আর আমার বাঁ হাতটাকে তার বাঁ হাত দিয়ে সে এমন ভীষণ মোচড়াচ্ছে যে, আমার সমস্ত শরীর অবশ হয়ে আসছে। বুঝতে পারছি, যে কোন সময় তার ডান হাতটা ছাড়িয়ে নিয়ে সে আমাকে গুলী করবে, এমন সময়—তখন ভেবেছিলাম আমার কপালগুণে, এখন ভাবছি কপালদোষে—একটা অভাবিত ব্যাপার ঘটল।

মায়া। কি?

সুনীল। শোভন বাথরুম থেকে একটা তোয়ালে কোমরে জড়িয়ে বেরিয়ে এসেছিল, সেইটে হঠাৎ আলগা হয়ে গেল। সভ্য মানুষের instinct, আমার বাঁ হাতটা ছেড়ে দিয়ে নিজের বাঁ হাতে তোয়ালেটাকে সে সামলে নিতে গেল। বোধহয় সে জন্যে দু' সেকেণ্ড মাত্র সময় পেলাম আমি। আর তারই মধ্যে দু'হাত দিয়ে কেড়ে নিলাম রিভলভারটা তার হাত থেকে।

মায়া। তারপর?

সুনীল। তোয়ালে সামলাবার চেষ্টাটা সে ত চিন্তা ক'রে করে নি? সে চেষ্টাটা ছিল যেন instinctive। তাই দুই সেকেণ্ডের বেশী সেটা স্থায়ী হ'ল না। তোয়ালেটাকে তক্ষুণি খ'সে প'ড়ে যেতে দিয়ে আবার সে রিভলভারটা কেড়ে নিতে গেল। সেই কাড়াকাড়ির সময়েই দু'-তিনবার ফায়ার হয়ে যায় রিভলভারটা। টিগারে আঙুল ছিল আমার, যদিও তার উপর প্রচণ্ড চাপ ছিল শোভনের হাতের।

মায়া। হায় কপাল!

(সুনীল পায়চারি করছে। বাইরে বৃষ্টিপাতের শব্দ। মায়া আঁচলে চোখ মুছল।)

কি কুক্ষণে যে শোভনের কথা শুনে রিভলভারটা তোমাকে সঙ্গে নিতে বলেছিলাম। ভেবে দেখতে গেলে অপরাধটা আমারই।

সুনীল। ভেবে দেখতে গেলে বলতে হয়, সবটাই নিয়তি। তোমার কি অপরাধ? তুমি ত আর জানতে না?

মায়া। তুমিও ত জানতে না। ইচ্ছে ক'রে যা কর নি, সেটাকে তুমিই বা তা হলে তোমার অপরাধ ব'লে ভাবছ কেন?

সুনীল। (ফিরে এসে মায়ার পাশে চেয়ারটায় ব'সে) কেন ভাবছি? কেন ভাবছি শুনবে? (কপালে হাত রেখে) রিভলভারটাকে হাতে পেয়েই খোলা জানালায় আমি সেটাকে বাইরে ছুঁড়ে দিতে পারতাম। হয়ত পারতাম। দিই নি। যদি দিতাম, শোভন মরত না।

মায়া। আহা হা! কেন তাই কর নি?

সুনীল। (চেয়ারের হাতায় কিল মেরে মেরে) কেন করি নি, কেন করি নি, কেন করি নি, এই কথাটাই এখন কেবল নিজেকে জিজ্ঞেস করছি, আর যতদিন বেঁচে থাকব জিজ্ঞেস করব। এর উত্তরও পাব না, আমার বিচারও চলতে থাকবে।

মায়া। উত্তর কেন পাবে না? দারুণ বিপদের মুখে ভয়ে আর উত্তেজনায় মাথাটার ঠিক ছিল না তোমার। কারুরই থাকে না। সে অবস্থায় যা করেছ বা করনি, সেটা এমন কিছু অপরাধ নয়, এই ত উত্তর।

সুনীল। তাই কি? কি জানি! (মায়ার দিকে একটু ঝুঁকে, চাপা গলায় কথা বলার ভঙ্গিতে) আমার কি মনে হয় জানো মায়া? আমার মনে হয়, আমার অবচেতন মনে এই ইচ্ছেটা ছিল, যে, শোভন ম'রে যাক।

মায়া। (একটু ম্লান হেসে) এ তোমার বাড়াবাড়ি। জোর ক'রেই ভাবতে চাও যে, অপরাধ তুমি একটা করেছ। অবচেতন মন মানুষের আয়ত্তের বাইরে, তার ওপর মানুষের জোর খাটে না, আর সেই জন্যেই তোমার অবচেতনের যেটা অপরাধ সেটা তোমার অপরাধ হতে পারে না। এত কঠোর হয়ে নিজের বিচার ক'রো না তুমি।...বৃষ্টিটা ধরেছে, (উঠে দাঁড়িয়ে) চলি আমি। (হাতব্যাগটা তুলে নিল ডিভানের ওপর থেকে।)

সুনীল। (উঠে দাঁড়িয়ে) যাবে? আচ্ছা যাও। (দরজার দিকে এগিয়ে যেতে যেতে মায়া একবার ফিরে তাকাল। সুনীল দ্রুতপদে এগিয়ে এল তার কাছে।) মায়া! মায়া!

মায়া। (ফিরে দাঁড়িয়ে) কি বলছ?

সুনীল। পিছু ডাকলাম। কিছু মনে ক'রো না! কিন্তু মায়া, তোমার শেষ কথাটা শুনে হঠাৎ আমার একটা কথা মনে হ'ল। সেটা বোধহয় তোমার শোনা দরকার।

মায়া। কি কথা, বল।

সুনীল। মায়া, তুমিও খুব কঠোর হয়ে নিজের বিচার ক'রো না। তুমি বললে, অবচেতনের ওপর মানুষের কোনো হাত নেই, মানুষের কোনো জোর সেখানে খাটে না। তাই সেই মনটার অপরাধে মানুষের

অপরাধ হয় না। হতে ত পারে, যে-মন নিয়ে তুমি অপরাধ করেছিলে, সেই মনটার উপরেও মানুষের খুব বেশী হাত নেই, সেখানেও তার জোর বিশেষ খাটে না, তাই সেই মনটার অপরাধেও মানুষের এমন কিছু অপরাধ হয় না ?

(মায়া নীরবে মাথা নীচু ক'রে দাঁড়িয়ে আছে।)

মায়া !

মায়া। বল।

সুনীল। মায়া, তোমাকে না ক্ষমা করতে পারলে আমি নিজেকে ক্ষমা করব কি ক'রে ?

(নেপথ্য থেকে আয়ার গলা শোনা গেল। —সুসী, সুসী ! সুসী, তুমি কোথায় ? আয়ার গলা ক্রমশঃ কাছে আসছে।—সুসী ! সুসী !)

মায়া। আমি যাই। সুসী হয়ত এই দিকেই আসছে।

(ব্যস্তসমস্ত ভাবে আয়া ঢুকল বাঁদিক্ দিয়ে।)

আয়া। সুসী নেই এখানে ? কোথায় গেল তা হলে ?

(দরজার কাছে ফিরে দাঁড়াল মায়া।)

সুনীল। ওকে ত তোমার কাছেই রেখে এলাম আমি। কোথায় গেল তারপর, সেটা কি আমাদের জানবার কথা ?

আয়া। আমারই কাছে ত ছিল এতক্ষণ। একটু আগে বাথরুম যাচ্ছি ব'লে চ'লে গেল, কিন্তু বাথরুমে ত নেই ! শোবার ঘর, খাবার ঘর, কোথাও দেখলাম না তাকে।

(মায়া হাতব্যাগটা পাশের একটা চেয়ারের ওপর রাখল।)

সুনীল। কোথাও লুকিয়েছে দুষ্টুমি ক'রে। এ রকমের দুষ্টুমি ত ওর লেগেই আছে। খুঁজে দেখ ভাল ক'রে। (মায়ার দিকে ফিরে) তুমি কি করবে এখন ? যেতে চাও ত যেতে পার।

মায়া। একটু দেখেই যাই। (আয়ার পিছন পিছন বেরিয়ে গেল বাঁদিক্ দিয়ে।)

সুনীল। (বাঁদিকের নেপথ্যের কাছ অবধি গিয়ে) খাটের তলাটলাগুলো দেখো।

(ফিরে এসে পায়চারি করছে। পিছনের জানলার কাছে গিয়ে দাঁড়াল একটু। আবার একবার বিদ্যুৎ চমকাল, একটু পরেই মৃদু মেঘগর্জ্জন। বৃষ্টি নেমেছে আবার। কাঁচের সার্শির ভিতর দিয়ে দেখা যাচ্ছে, রাস্তার আলো প'ড়ে বৃষ্টির জলের ধারা চক চক ক'রে জলছে। ফিরে এসে বসল। এক সঙ্গে মায়া ও আয়া এসে ঢুকল আবার।)

মায়া। কি আশ্চর্য্য ! কোথায় গেল মেয়েটা ?

সুনীল। কোথায় আবার যাবে ? ভাল ক'রে দেখেছ সব জায়গা ?

মায়া। কোনো জায়গা বাকী রাখিনি।

আয়া। লোহার সিঁড়ির দিকে ও ত কখনো যায় না ? ভীষণ ভয় পায়। এক যদি ঐ সিঁড়ি দিয়ে নীচে নেমে গিয়ে থাকে।

সুনীল। এই ঝড় বৃষ্টিতে ?

মায়া। দেখ না একটু।

সুনীল। আমার কিন্তু তা মনে হয় না।

মায়া। তবু দেখ। ওগো !

সুনীল। (উঠে দাঁড়িয়ে, একটু হেসে) আচ্ছা, যাচ্ছি। কিন্তু তুমি কেন এত ব্যস্ত হচ্ছ বল ত ? এ ব্যাপারটা আজ না ঘ'টে দুদিন পরেও ত ঘটতে পারত ? তুমি ত তখন দেখতে আসতে না ? সুসীর ভার আমাদের ওপর দিয়ে, যেখানে যাচ্ছিলে যাও না !

মায়া। বেশ ! (এক ঝটকায় হাতব্যাগটা তুলে নিয়ে) তাই যাচ্ছি।

(হ্যাঁচকা টানে ডানদিকের দরজাটা খুলতেই সুসী চিৎ হয়ে প'ড়ে গেল মায়ার সামনে। দরজার পর্দাটা জোরালো হাওয়ার ঝাপটায় উড়ছে ঘরের মধ্যে। সুসী কাঁদছে। মায়া হাতব্যাগটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে মেজেতে ব'সে তাকে কোলে তুলে নিল। সুনীল ছুটে গিয়ে বন্ধ ক'রে দিল দরজাটা।)

সুসী। (নিজের মাথার পিছনটাতে হাত বুলোতে বুলোতে) মা ! মা ! লেগেছে। মা, মাগো ! লেগে গিয়েছে !

মায়া। (সুসীর মাথায়, পিঠে হাত বুলিয়ে) বড্ড লেগেছে কি মামণি ? আমি তোমায় লাগিয়ে দিলাম মানিক ! আমি ! ইস্, জামাটা যে চুপচুপে হয়ে ভিজে গিয়েছে !

সুনীল। যাও ত আয়া, ওর শুকনো জামাকাপড় কিছু নিয়ে এস চট ক'রে।

(আয়া বেরিয়ে গেল বাঁদিক্ দিয়ে। মায়া সুসীর জামাটা ছাড়িয়ে দিল। নীচের বডি পেটি-কোটটায় হাত বুলিয়ে পরীক্ষা ক'রে দেখল, সেটা ভেজেনি।)

সুসী। (মায়াকে জড়িয়ে ধ'রে তার মুখের কাছে মুখ নিয়ে) তুমি যাবে না। না, তুমি যাবে না। কেন

তুমি মাথায় কাপড় দিয়ে রয়েছ? কেন তুমি বাইরের কাপড় ছাড় নি? তুমি যাবে না। বল, তুমি যাবে না? বল, বল।

সুনীল। তোমার মা চ'লে যাবে, কে তোমাকে বলেছে?

সুমী। আয়া যে বললে? ও যে বললে, মা চ'লে যাচ্ছে আমাকে ফেলে?

সুনীল। তাই বুঝি বাইরে দরজায় ঠেস দিয়ে মার যাবার পথ আটকে বসেছিলে?

(আয়া এসে কিছু কাপড়-জামা রেখে গেল, একটা ফ্রক নিয়ে সুমীকে পরিয়ে দিল মায়া।)

এস তুমি এখন আমার কাছে! (ব'লে সুনীল সুমীকে কোলে তুলে নিল।)

সুমী। (হঠাৎ) নামিয়ে দাও! নামিয়ে দাও আমাকে! নামিয়ে দাও! (প্রাণপণে সুনীলের কোল থেকে নামবার চেষ্টা করতে লাগল।)

সুনীল। কি হ'ল? (নামিয়ে দিল সুমীকে, সুমী ছুটে গিয়ে আবার মায়াকে জড়িয়ে ধরল।) কি হয়েছে সুমী? (এগিয়ে গিয়ে) কেন আমার কোলে থাকতে চাইছ না? রাগ করেছ? কি করেছি আমি?

সুমী। আয়া যে বলেছে, তুমি শোভন কাকাকে মেরে ফেলেছ গুলী ক'রে, আর তাই জন্যে মা তোমার সঙ্গে আড়ি করেছে, আর তাই জন্যে তুমি মাকেও মেরে ফেলবে গুলী ক'রে। বলেছে, আমি দুষ্টুমি করলে আমাকেও তুমি মেরে ফেলবে গুলী ক'রে।

সুনীল। (আর্তস্বরে) মায়া!

মায়া। বল।

সুনীল। মায়া! এ চলবে না। না, এ কিছুতেই চলবে না। (সুমীর সামনে উবু হয়ে ব'সে) সুমী, সুমনী, সুমনী-কলমি! মা আমার! তোমাকে গুলী ক'রে মেরে ফেলব আমি! (দুই হাতে মুখ ঢাকল। একটু পরে মুখ তুলে) না! এ হ'তে দিতে আমি পারব না। কিছুতেই না। এরকম একটা বিশ্রী অবস্থার মধ্যে আমাকে রেখে চ'লে যেতে দেব না তোমাকে আমি।

মায়া। আমার কি দোষ বল। (উঠে দাঁড়াল।)

সুনীল। (উঠে দাঁড়িয়ে) পৃথিবীর আর সকলে বিচার ক'রে যাই বলুক, ভগবানের বিচারে যা-ই আমি হই, এই মেয়েটার কাছে একটা ভয়ের জিনিস হয়ে, একটা রাক্ষস, পিশাচ হয়ে বেঁচে থাকতে পারব না আমি। ও ভাববে, শোভনকে আমি গুলী ক'রে মেরেছি, তোমাকে গুলী ক'রে মারব, ওকেও গুলী ক'রে মারতে পারি আমি, এ আমি কিছুতে সহ্য করব না, কিছুতে না। না, না, না! এ আমি পারব না সহ্য করতে। (একটা চেয়ারে ব'সে বাহুমূলে মাথা গুঁজে কান্নায় ভেঙে পড়ল।) তুমি দয়া কর আমাকে, দয়া ক'রে ওর মন থেকে এই ধারণাগুলো দূর ক'রে দেবার সুযোগ আমায় দাও।

মায়া। (সুমীকে কোলে তুলে নিয়ে সুনীলের পাশে গিয়ে দাঁড়াল, তার পর তার কাঁধে একটা হাত রেখে) দয়া? দয়া তুমি আমাকে করছ। যে পাপ আমি করেছি তার প্রায়শ্চিত্ত করবার সুযোগ আমাকে দিচ্ছ। চল ভিতরে।

যবনিকা

সমাপ্ত

কমলা, পুষি ও কুমকুম

শ্রীঅর্ণব সেন

দেওয়ালের দিকে পাশ ফিরে শুয়েছিল কমলা। একটু ঘুম এসেছিল খানিক আগে, তন্দ্রার মত। কিন্তু ঘুম হ'ল না, দুপুরে ঘুম হয় না, দুপুরে ঘুমোনো কমলার অভ্যেস নেই। তবে রোজ দুপুরে ও কিছুক্ষণ শুয়ে থাকে। শ্যামল বলে, দুপুরে ঘুমোনো ভালো। শরীর ভালো হয়। দুপুরে ঘুমোলে বিকেলে ওকে ভালো দেখায়।

শুধু শুধু শুয়ে থাকতে ভালো লাগে না, একটা বই পড়ছিল প্রথমে, কিছু পরে বইটা রেখে দিয়েছে তন্দ্রা আসার সঙ্গে সঙ্গেই। কিন্তু তারপর ঘুমটুকু পালাল, তন্দ্রাটুকু কেটে গেল, এখন আর ঘুম হবে না।

দুপুর বেলা একটু একা লাগে, তবে বেশিক্ষণ নয়। শ্যামল অফিস বেরিয়ে যাওয়ার পর খারাপ লাগে, একা মনে হয়। একা থাকতে খুব বিরক্তিকর মনে হয় না রোজ, তবে এক-একদিন খুব বিশ্রী মনে হয়।

পুষি ডাকলো, 'মিউ'।

কমলা এ পাশে ফিরল, দুষ্টুটা ফিরেছে, এতক্ষণ কোথায় ছিল কে জানে? কমলা খেয়াল করে দেখল, হাঁা, নিচের রান্নাঘরে ও কোন কিছুই বাইরে রেখে আসে না, সব তুলে রেখেছে ডালের আলমারীর ভেতর। উঃ, পুষিটা কি দুষ্টু, আর কি চালাক। বেড়ালটার ভীষণ বুদ্ধি, তবে পুষিটা ওর কাছে দুষ্টুমি করে না।

কমলা ডাকল, 'আয়, পুষি।'

বিড়ালটা এগিয়ে এল, কমলা তুলে নিল বিড়ালটাকে। কমলা খাটের ওপর বসল, পা ঝুলিয়ে দিল নিচে, বিড়ালটার লোমের ওপর হাত বুলিয়ে দিতে লাগল কমলা, বেশ মোটা হয়েছে ক'মাসে। ইস্; এই সেদিন ত কতটুকু ছিল। বাথরুমের পাশে প্রথম পেয়েছিল পুষিকে, ছোট্ট রোগা চেহারা, মিউ মিউ করে ডাকছিল। কি দুর্বল ছিল তখন, আর এর মধ্যেই কত বড় হয়ে উঠল, আর হবে না? রোজ দুধ খাওয়া চাই, মাছ চাই, না হ'লে চলবে না। না, কিছুতেই চলবে না। শ্যামলকে কমলা বলেই দিয়েছে, বাজার করবার সময় পুষির হিসেবের মাছটাও কমলা মনে করিয়ে দেয়।

কমলা বিড়ালটাকে চেপে বসাল ওর কোলের ওপর।

'দেখিস বাবা, শাড়ি ছিঁড়িস্ না, তোর যা নোখ।'

বিড়ালটার গলার কাছটায় চাপ দিল কমলা। কি নরম! না, পুষিকে একটু সাবধানে রাখতে হবে, যেখানে-সেখানে ওর যাওয়াটা বন্ধ করতে হবে, যার-তার বাড়ী, বিশেষ করে পাশের ফ্ল্যাটে যখন তখন যাওয়া বন্ধ করতে হবে। এসব ঠিক নয়, কার কি রোগ আছে কে জানে, ? ও বাবা, কিচ্ছু বোঝার জো নেই।

'এই পুষি শোন্, তুই যখন-তখন পাশের ফ্ল্যাটে যাবি না, আমার কথা বুঝলি ত? গেলে এমন মারব তোকে।' পুষির গায়ের লোমগুলো আঙুল দিয়ে মুঠো করে ধ'রে ঝাঁকুনি দিল কমলা। পুষি সাড়া দিল, 'ম্যাও'।

'কেমন, বুঝলি ত?'

'মিউ।'

'বেশ, ভালো।'

পুষির গায়ে হাত বুলিয়ে দিতে লাগল কমলা। না, এত জোরে ওর লোম ধ'রে টানাটা ঠিক হয় নি। আহা, বেচারীর খুব লেগেছে বোধ হয়। দু'একটা লোম উঠে এসেছে, কি ঘন লোম, মুঠো করে ধরতে ইচ্ছে করে

কমলা নিচু হ'ল, পুষির পিঠে নিজের গাল ছোঁয়াল;

'আহা, তোর লেগেছে পুষি? এই পুষি।'

বিড়ালটা চোখ বন্ধ করে ঝিমিয়ে পড়েছিল যেন। একবার চোখ খুলল, একটু কটা চোখ, ঝকঝকে চোখ। কমলা ওর গাল ঘসল পুষির গায়ে, তখুনি ওর মনে পড়ল শ্যামল বলে, বিড়াল নাকি ডিপথিরিয়ার জীবাণু ছড়ায়।

কমলা সোজা হ'ল, পুষিকে কোল থেকে তুলে নিয়ে খাটের নিচে নামাল, রাখল ওর পায়ের কাছে। দূর, ওসব বাজে কথা, বিড়াল রোগের জীবাণু ছড়ায় সত্যি, কিন্তু সে নোংরা বিড়ালে, পুষি খুব ভালো। কোন নোংরা জায়গায় যায় না, ওর কোন রোগও নেই।

কিন্তু বিকেল হয়ে আসছে, এবার শ্যামল ফিরবে। কমলা উঠে দাঁড়াল, শাড়ির আঁচলটা ঠিক করে জড়াল শরীরে, আর্শির সামনে গিয়ে দাঁড়াল একবার, একবার দেখল।

ঘর থেকে বেরিয়ে এল কমলা, ঘড়িটা দেখা দরকার, বিড়ালটা ওর পায়ে পায়ে বেরিয়ে এল ঘর থেকে।

'আয় পুষি, নিচে চল্, আমার এখন অনেক কাজ।'

কমলা সিঁড়ি নামল, লাফিয়ে নামল, তারপর মাঝখানে সিঁড়ির বাঁকে হঠাৎ থমকে দাঁড়াল।

'এই পুষি! আয়, আমি একলা যাব?'

বিড়ালটা সিঁড়ির মুখে দোতলায় দাঁড়িয়ে রইল। উজ্জ্বল দৃষ্টিতে চেয়ে রইল কমলার দিকে।

'আয় বলছি লক্ষ্মীটি।'

কমলা কোমরে হাত রেখে নিরুপায় ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে ঠোঁট বাঁকাল।

'আসবি না ত? যা, তোর সঙ্গে আড়ি।'

কমলা মুখ ফিরিয়ে নিয়ে দ্রুত সিঁড়ি বেয়ে নেমে গেল।

সিঁড়ির নিচের ছোট ঘরটায় রাজু থাকে। বাচ্চা চাকর, বাচ্চা চাকরই কমলার খুব ভালো লাগে। দু'জনের সংসারে কাজও বেশি নয়, পরিশ্রমও কম।

দরজার মুখে দাঁড়িয়ে কমলা ডাকল, 'এই রাজু, রাজু ওঠ্, কত ঘুমোবি?'

রাজু ধড়মড় ক'রে উঠে বসল বিছানার ওপর। রাজুটা ভীষণ নোংরা, বিছানাটা যা নোংরা করে রাখে! কমলা কতদিন ধমকেছে, কিন্তু কিছুতেই শুনবে না। নোংরা থাকা স্বভাব।

রাজু চোখ রগড়াচ্ছিল দু'হাত দিয়ে।

কমলা ঝাঁঝাল গলায় বলল, 'কত ঘুমোবি আর? বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যে হ'তে চলল। বাবুর ফেরার সময় হয়ে গেছে। শীগ্‌গির উঠে চা কর্।'

অফিস থেকে ফিরে শ্যামল চা খাচ্ছিল। কমলা পাশের চেয়ারে বসেছিল।

শ্যামল চা খেতে খেতে একবার মুখ ফিরিয়ে কমলার দিকে চাইল। কমলা হাসল।

কমলা বলল, 'তোমার চেহারা একটু শুকনো লাগছে।'

শ্যামল বলল, 'ও কিছু না। বেশি পরিশ্রম হয়েছে অফিসে।'

'আর একটু চা দোব?'

'চা? দাও।'

কমলা কেটলি থেকে আর একটু চা ঢালল শ্যামলের কাপে। ওর নিজের কাপেও একটু ঢালল।

শ্যামল বলল, 'এই, তুমি বেশি চা খেও না।'

'কেন?'

'বেশি চা খাওয়া ভাল নয়। শরীর খারাপ হয়ে যাবে।'

কমলা মৃদু হাসল।

'আর তুমি খেলে বুঝি তোমার শরীর ভাল হবে?'

'না, সে কথা হচ্ছে না। তোমার পক্ষে এখন চা-টা বেশি খাওয়া ঠিক নয়। দুধ ত বাড়িয়ে দিয়েছি। দুধ খাচ্ছ না কেন?'

'ঈস্, খুব ভাবনা দেখছি আমাকে নিয়ে। যদি হঠাৎ ম'রে যাই। কতজনের ত এমন হয়। তখন দেখব এখন। দু'দিনে ভুলে যাবে আমাকে।'

'হয়েছে, থাম। খুব পাকা মেয়ে তুমি। তোমার ভালর জন্যেই বলছি। প্রথমবার, একটু যত্ন নেওয় উচিত। তুমি এখন খুব সাবধানে থাকবে।'

'এখনও যথেষ্ট দেরি।' কমলা মুখ ভার করল।

'তা হোক্।' শ্যামল গম্ভীর হয়ে বলল।

কমলা শাড়ির আঁচলটা আঙুলে জড়াচ্ছিল কতকটা অন্যমনস্কভাবে। ভয়, একটু ভয়-ভয় করল হঠাৎ। একটু শিউরে উঠল শরীরটা। প্রথমবার। কষ্ট। খুব কষ্ট হয়? যন্ত্রণা হয়? ম'রে যায় যদি? না, মিথ্যে ভয়ের কি আছে! কিন্তু...।

'মিউ।' একটা ডাক শুনতে পেল কমলা। একটু চমকে উঠল। খুব অন্যমনস্ক হয়ে গিয়েছিল ত!

'আয়।' কমলা হাতছানি দিয়ে আহ্বান জানাল বেড়ালটাকে।

বেড়ালটা এগিয়ে এসে কমলার পা ঘেঁষে দাঁড়াল। কমলা পা দিয়ে বেড়ালটাকে একটু ঠেলল।

'কি? এখন এলি যে! তখন অত ক'রে ডাকলা এলি না। দুষ্টু কোথাকার! যা, তোর সঙ্গে আমার আর ভাব নেই।'

শ্যামল বলল, 'কি হয়েছিল ব্যাপারটা?'

কমলা বলল, 'তোমার দরকার কি? আচ্ছা পুষি, তুই আর কখনও অমন করবি? বল্, আমার কথা শুনবি ত?'

বেড়ালটা ডাকল, 'মিউ, মিউ।'

কমলা শ্যামলের দিকে চোখ ফেরাল।

'দেখেছ, বলছে শুনব, শুনব। আমি ওর সব কথা বুঝতে পারি।'

শ্যামল হেসে বলল, 'তাই নাকি?'

কমলা বলল, 'এই পুষি, তুই বল্ না পারি কি না!'

পুষি সাড়া দিল, 'ম্যাঁও।'

কমলা বলল, 'ম্যাও।'
শ্যামল, 'হুঁ, তাই ত।'

কমলা আজকাল খুব সাবধানেই থাকে। ছুটোছুটি, জোরে হাঁটা, বাইরে বেরনো, সব বন্ধ। ডাক্তারের বারণ। হ্যাঁ, বাইরে বেড়াতে বেরোনো পর্যন্ত বন্ধ। পার্কে যাওয়া বন্ধ। শ্যামলের সঙ্গে কোথাও বেরোনোও বন্ধ। শুধু বাড়ীর মধ্যে আটকে থাকা। খাওয়া, শুয়ে থাকা, ঘুমোনো। কাল জয়ন্তী এসেছিল দেখা করতে। অনেকক্ষণ ছিল, ভাল লাগল। কমলা অনেক গল্প করেছে কাল। কিন্তু জয়ন্তীর মত রোজ রোজ গল্প করতে আসবে কে?

মাঝে মাঝে বিরক্তিকর মনে হয়। অসহ্য লাগে এমন বাঁধাধরা জীবনযাপন করতে। কিন্তু উপায় নেই। শ্যামলই দায়ী এর জন্যে। রাগ হয় ওর ওপর। ওর সঙ্গে সেদিন ঝগড়াও হয়ে গেছে একটু। শ্যামল রাত ক'রে ফিরেছিল। কমলা রাগ করবে না? বাড়ীতে অসুস্থ স্ত্রী। আর উনি বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা দিচ্ছেন রাত দশটা পর্যন্ত। খুব বকেছে কমলা। তার পর নিজে কেঁদেছে। শ্যামল নিরুপায় হয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ওর বকুনি শুনেছে। আসলে কিন্তু ও খুব ভাল মানুষ। ও নিজের ভুল বুঝতে পেরে চুপ ক'রে ছিল। তবে কমলার কান্না শ্যামল সহ্য করতে পারে নি। এগিয়ে এসেছে, ওকে আদর করেছে, ক্ষমা চেয়েছে ওর কাছে। কমলা হেসেছে।

শ্যামল বলে, হাসপাতালে যেতে হবে। কমলার বড় ভয় করে। হাসপাতালে ও জীবনে থাকে নি কখনও। তবে কয়েকবার দেখা করতে গেছে এর-ওর সঙ্গে। খালি ওষুধ আর ওষুধ। কি গন্ধ! সেখানেই ওকে থাকতে হবে। না থেকে উপায় নেই। শ্যামলের মতে হাসপাতালে যাওয়াই ভাল। কোন বিপদ্ বা অসুবিধে হ'লে সহজে ব্যবস্থা হ'তে পারে। কত সুবিধে ওখানে। তা ছাড়া এখানে ওকে দেখবেই বা কে? শীলাকে চিঠি লিখে আনানো যায়। কিন্তু তাতেও অসুবিধে। শীলার কলেজের পড়াশুনা আছে। তা ছাড়া এসব ব্যাপারে শীলাকে এনে খুব সুবিধেও হবে না। শীলার বয়েসই বা কি? হাসপাতালেই যেতে হবে শেষ পর্যন্ত। কমলা অনেকদিক্ ভেবে শেষ পর্যন্ত হাসপাতালে যাওয়াই ঠিক করেছে।

হাসপাতাল থেকে কমলা ফিরে এল। একটু ফ্যাকাশে হয়েছে চেহারাটা, একটু দুর্বল। শ্যামলকে আগেই বলে রেখেছিল, শীলাকে চিঠি লিখতে। শীলা সবে সেদিন সকালে এল। আর বিকেলে কমলা ফিরল হাসপাতাল থেকে। শীলাকে না আনিয়ে উপায় ছিল না। এবার শীলা কিছুদিন থাকবে ওর কাছে। অসুবিধে হবে না। এখন ওর ছুটি। কলেজ বন্ধ। মা আসতে পারতেন, কিন্তু উপায় নেই। ওখানে সংসার সামলাবে কে? অগত্যা শীলাকেই আসতে হ'ল। কমলার তাতে অসুবিধে নেই, বরং সুবিধেই। বোনের সঙ্গে অনেকদিন পর গল্প করতে পারবে শুয়ে শুয়ে। এখন কিছুদিন ত আর বেরোনো চলবে না।

কমলা শীলাকে জিজ্ঞেস করেছিল, 'এই শীলা, আমি কি খুব রোগা হয়ে গেছি?'

শীলা হেসে বলেছে, 'মোটেই না। তবে একটু যেমন হয়।' আবার হেসেছে শীলা। তারপর বলেছে, 'বাচ্চাটা কিন্তু ভারি সুন্দর দেখতে হয়েছে দিদি। তবে তোর মত দেখতে মোটেই হয় নি। অনেকটা জামাই-বাবুর মত।'

কমলা বলেছে, 'দূর! তুই কিচ্ছু বুঝিস্ না। লক্ষ্য করে দেখ্ না। চোখ, মুখ সব আমার মত।'

শীলা বলেছে, 'না, মোটেই না। বললেই হ'ল। জামাইবাবুর সঙ্গে বেশি মিল।'

খাটে কমলা শুয়ে ছিল। শীলা ওর পাশে ব'সে গল্প করছিল। ঠিক সেই সময় এল বেড়ালটা। কমলা, কিংবা শীলা কেউই প্রথমটা খেয়াল করে নি।

হঠাৎ শীলা বলল, 'এই দিদি, এ বেড়ালটা এল কোত্থেকে রে?'

কমলা হাসল। 'ও, পুষি ওর নাম। আমাদের এখানেই থাকে। ভারি সুন্দর বেড়াল।'

শীলার পায়ের কাছে ততক্ষণে বেড়ালটা এসে দাঁড়িয়েছে। নিজের গাটা একবার ঘষল শীলার পায়ে। শীলা পা দিয়ে ঠেলে দিল বেড়ালটাকে।

'যাঃ! এখান থেকে যা।'

কিন্তু পুষি নড়ল না। চুপচাপ কিছুক্ষণ ব'সে রইল শীলার পায়ের কাছে। তার পর হঠাৎ লাফ দিয়ে খাটে উঠতে চাইল। শীলা হাত দিয়ে ধাক্কা মেরে ফেলে দিল পুষিকে।

'ও মা! কি ভয়ানক বেড়াল!' শীলা চোখ বড় করল। 'এই দিদি, তুই এসব বেড়াল বাড়ীতে রাখিস্ কেন?'

কমলা অবাক্ হ'ল।

'কেন বল্ ত?'

'কেন! ভীষণ জিনিষ এই বেড়াল। যত রোগের ডিপো। তা ছাড়া যদি কুমকুমকে কামড়ে দেয় তা হ'লে কি হবে বল্ ত? এইটুকু বাচ্চা বাড়ীতে! আর তুই এরকম একটা শয়তান বেড়াল বাড়ীতে রেখেছিস্?'

'কুমকুমকে শুধুশুধু কামড়াতে যাবে কেন?' কমলা জানতে চাইল।

শীলা গম্ভীর হয়ে বলল, 'সে তুমি বুঝবে না। বাচ্চা ছেলেমেয়ে থাকলে এসব বেড়াল রেখ না। এদের কিচ্ছু বিশ্বাস নেই।'

কমলা চুপ করে রইল। সত্যি, শীলার কথাটাও ভেবে দেখা দরকার। কুমকুমকে পুষি কামড়ে দেবে? কেন দেবে শুধুশুধু? কে জানে। হতেও পারে।

বেড়ালটা ধীর পায়ে ঘর থেকে বেরিয়ে যাচ্ছিল। শীলা বলল, 'দেখছ হাঁটার ভঙ্গিটা। একেবারে বাঘের মত। তোর ভয় করে না দিদি? ও বেড়ালটাকে তাড়িয়ে দে বাড়ী থেকে। ভারি শয়তান বেড়াল, হাবভাব দেখলেই বোঝা যায়।'

কমলা হাসল শীলার কথার ভঙ্গি শুনে। তবু নিজেও চেয়ে দেখল একবার বেড়ালটার দিকে। মাঝে কিছুদিন দেখে নি। মনে হ'ল আরও একটু নধর হয়েছে। আরও একটু ভারি হয়েছে। লোম আরও ঘন হয়েছে।

না, সত্যিই কুমকুমকে একটু সাবধানে রাখতে হবে। যা দুরন্ত বেড়াল। কিচ্ছু বলা যায় না। একটু ভয় পেল কমলা।

পরের দিন কুমকুমকে এ ঘরের খাটে শুইয়ে রেখে কমলা একবার পাশের ঘরে গিয়েছিল। শীলা নীচের রান্নাঘরে ছিল।

পাশের ঘরে গিয়ে ফিরতে একটু দেরি হয়েছিল। চুল-বাঁধার চিরুণীটা খুঁজে পাওয়া যাচ্ছিল না। শীলাটার বড় এলোমেলো স্বভাব। কোথায় কোন্ জিনিষ ফেলে তার ঠিক নেই। কমলা ভাবল, বুঝবে শীলা, বিয়ে হ'লে, নিজের সংসার হ'লে এর ফল বুঝবে। শীলার ওপর একটু রাগও হ'ল কমলার। খুব কি কম বয়েস! এখন আর ছেলেমানুষী করার বয়েস নেই ওর। শীলাটা যেন কি! শেষে চিরুণী খুঁজে পেল কমলা। টেবিলের ওপর একটা বইয়ের ফাঁকে চাপা ছিল।

চিরুণী নিয়ে কমলা ঘর থেকে বেরিয়ে এ ঘরে ঢুকেই থমকে দাঁড়াল।

বেড়ালটা লাফিয়ে উঠেছে কখন খাটের ওপর। একেবারে কুমকুমের পাশে চুপটি ক'রে ব'সে আছে। কমলা ছুটে এগিয়ে গেল।

বেড়ালটা লাফিয়ে পড়ল নিঃশব্দে খাটের নীচে। কমলা চিরুণীটা ছুঁড়ে মারল। বেড়ালটা বেরিয়ে এল। কমলা ঝুঁকে পড়ল কুমকুমের ওপর। কোথাও কামড়ায় নি ত! কমলা ভাল করে দেখল। কী নরম চামড়া। একবার নোখ ছোঁয়ালেই কেটে যাবে। শয়তান, পুষিটা একটা শয়তান।

কমলার কান ঝাঁ ঝাঁ করতে লাগল রাগে। শীলা ঠিকই বলেছে, সর্বনাশা বেড়াল। কুমকুমকে কামড়াতে এসেছিল।

কমলা বলল, 'দাঁড়া, তোকে মজা দেখাচ্ছি।' দাঁতে দাঁত ঘষল কমলা। ওর চোখ জ্বলে উঠল। বালিশটা ছুঁড়ে মারলে কমলা বেড়ালটাকে লক্ষ্য করে। বালিশের ধাক্কা খেয়ে উল্টে পড়ল বেড়ালটা মেঝের ওপর। কিন্তু তখুনি উঠে দাঁড়াল। রুখে দাঁড়াল উদ্ধত ভঙ্গিতে। একটা বিকৃত কর্কশ আওয়াজ বেরোল বেড়ালটার গলা দিয়ে। কমলা ভয় পেল।

'যা, বেরো এখান থেকে।' কমলা বলল কাঁপা গলায়।

কমলা একটু এগোল বেড়ালটার দিকে। একটা গোঁ গোঁ আওয়াজ বেরোল বেড়ালটার গলা দিয়ে। কমলা বেড়ালটার চোখের দিকে চাইল। উজ্জ্বল ঝক্‌ঝকে দু'টি শানিত চোখ। জ্বল্‌জ্বল্ করছে! যেন সম্মোহিত ক'রে ফেলতে চাইছে কমলাকে। কমলা আর এগোতে পারল না। চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল বেড়ালটার চোখের দিকে চেয়ে। তারপর চীৎকার ক'রে উঠল, 'শীলা! শীলা!'

শীলা ছুটে এল নিচে থেকে। রাজু ছুটে এল।

'কি, কি হয়েছে?' শীলা বলল।

কমলা বলল, 'ওই বেড়ালটা—।'

আস্তে আস্তে ধীর গম্ভীর পদক্ষেপে বেড়ালটা এগিয়ে গেল জানলার দিকে। লাফিয়ে উঠল ওপরে। আবার লাফিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল। কমলা চেয়ে রইল।

'তুই অতো ভয় পেলি কেন দিদি?'

কমলা বলল, 'পুষিটা আজ কুমকুমকে কামড়াতে এসেছিল। আর একটু দেরি হ'লে—।' চুপ করল কমলা।

শীলা বলল, 'সে ত হবেই। আমি ত আগেই বলেছি ছোট ছেলের বাড়ীতে বেড়াল ভাল নয়। তুই ও বেড়ালটাকে আর এদিকে আসতেই দিবি না। এই রাজু শোন্, এবার থেকে ওটাকে দেখলেই মারবি।'

রাজু বলল, 'আচ্ছা।'

শীলা বলল, 'হুঁ, আর এক কাজ করতে পারিস্। ওটাকে থলির ভেতর পুরে ফেলে দিয়ে আসবি অনেক দূরে। যেন আর পথ চিনে এখানে ফিরতে না পারে। কিন্তু ধরবি কি করে, যা বেড়াল। বাঘের মত চেহারা।'

বেড়ালটা ধরা পড়ল পরের দিন। রাজু অনেক কায়দা করেই ধরল। মাছ খেতে দিয়ে আদর ক'রে ডেকে আনল বেড়ালটাকে। তার পর হঠাৎ ঝুড়ি চাপা দিয়ে অনেক কৌশলে একটা থলির ভেতরে পুরল বেড়ালটাকে।

বেড়ালটা ধরা পড়ায় শীলা খুশী হ'ল, কমলাও খুশী হ'ল। রাজুকে ও বলেওছিল, বেড়ালটাকে ধরতে পারলে একটা টাকা দেবে ওকে।

শীলা বলল, 'শোন্ রাজু, বেড়ালটাকে অনেক দূরে ছেড়ে দিয়ে আসবি। আর যেন এখানে ফিরে আসতে না পারে।'

কমলা বলল, 'হ্যাঁ, কিছুতেই যেন না ফিরতে পারে।'

কমলা একটুক্ষণ চুপ করে রইল।

কমলার চোখ দু'টি ঝকমক ক'রে উঠল।

কমলার দু'টি ঠোঁট কঠিন হ'ল।

কমলার চোখের পাতা কাঁপল।

কমলার চোয়াল নড়ল।

তার পর কমলা বলল, 'রাজু, এক কাজ কর্। থলিটার মুখ বেঁধে গঙ্গায় ফেলে দিয়ে আয়।'

রাজু ভয়ে ভয়ে বলল, 'কিন্তু।'

কমলা কঠিন স্বরে বলল, 'যা বলছি তাই কর্।'

বাঙ্গলা ও বাঙ্গালীর কথা

শ্রীহেমন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়

ভারত সফরে পশ্চিম জার্ম্মান রাষ্ট্রপতি

পশ্চিম জার্ম্মানীর রাষ্ট্রপতি ডঃ হাইনরিখ্ লুবকে কিছুদিন পূর্ব্বে কলিকাতায় আগমন করেন। তাঁহাকে কলিকাতায় পৌর সম্বর্দ্ধনা জানানো হয়। এই সম্বর্দ্ধনার ভাষণ প্রসঙ্গে ডঃ লুবকে দৃঢ়তার সহিত বলেন যে,

কম্যুনিষ্ট চীন কর্ত্তৃক ভারত আক্রমণ প্রতিরোধ করিবার জন্য পশ্চিম জার্ম্মানী তাঁহাদের বন্ধু ভারতীয় জনগণের সঙ্গেই থাকিবে।

ডঃ লুবকে ভারতের উপর কম্যুনিষ্ট চীনের আক্রমণের তীব্র নিন্দা করেন। তিনি বলেন, ভারতের উত্তর সীমান্তে কম্যুনিষ্ট চীনের এবম্বিধ আক্রমণে যে অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছে, তাহা ভারতের পক্ষে তো বটেই, সমগ্র পৃথিবীর পক্ষে বিপজ্জনক। ভারতের অখণ্ডতা রক্ষার সংগ্রামে পশ্চিম জার্ম্মানীর জনসাধারণ সব সময়েই পূর্ণ সহানুভূতি ও সমর্থন জানাইবে।

নাগরিক সম্বর্দ্ধনা সভায় লুবকের ঐ ঘোষণা ঘন ঘন করতালিতে অভিনন্দিত হয়। রাজ্যপাল কর্ত্তৃক প্রদত্ত ভোজসভায় নগরীর বিশিষ্ট ব্যক্তি ও মহিলাগণও পশ্চিম জার্ম্মানীর প্রেসিডেন্টের ঐ ঘোষণাকে স্বাগত জানান।

প্রেসিডেন্ট ডঃ লুবকে মিসেস লুবকে সহ সদলবলে এইদিনই (৩০।১১।৬২) বিমান যোগে কলিকাতায় আগমন করেন।

এইদিন সন্ধ্যায় কেন্দ্রীয় পৌরসভা ভবন প্রাঙ্গনে আয়োজিত ঐ সম্বর্দ্ধনা অনুষ্ঠানে কলিকাতার মেয়র শ্রীরাজেন্দ্রনাথ মজুমদার পশ্চিম জার্ম্মানীর প্রেসিডেন্টকে স্বর্ণখচিত একটি রৌপ্যাধারে এক মানপত্র প্রদান করেন। অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী শ্রী প্রফুল্ল সেন, কলিকাতাস্থ বিভিন্ন দূতাবাসের কূটনীতিবিদ্ এবং বিশিষ্ট অতিথিগণ উপস্থিত ছিলেন।

মেয়র শ্রীমজুমদার প্রেসিডেন্ট লুবকেকে পৌর সম্বর্দ্ধনা জ্ঞাপন করিয়া বলেন, 'পররাজ্যলোলুপ এক দুর্দান্ত শক্তির আক্রমণে আমাদের এই দেশ যখন আমাদের আবহমান স্বাধীনতা রক্ষার কঠিন শপথে দৃঢ়সঙ্কল্প, সেই মুহূর্ত্তে এই সংগ্রামী মহানগরীর পক্ষ হইতে শান্তিকামীদের মূর্ত্ত প্রতীক, নবজাগ্রত জার্ম্মান যুক্তরাষ্ট্রের মহান্ রাষ্ট্রনায়ককে স্বাগত জানাইয়া নিজেকে ধন্য মনে করিতেছি।' তিনি বলেন, 'কোটি কোটি ভারতবাসীর সঙ্গে কণ্ঠ মিলাইয়া কলিকাতাবাসী কামনা করি, ভারত-জার্ম্মানীর ঐক্য দীর্ঘজীবী হউক।'

প্রেসিডেন্ট ডঃ লুবকে দৃঢ়তার সহিত ঘোষণা করেন যে, কম্যুনিষ্ট চীনের আক্রমণের বিরুদ্ধে ভারত তাহার স্বাধীনতা রক্ষার জন্য যে ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছে তাহা জার্ম্মানীর জনসাধারণ মর্ম্মে মর্ম্মে উপলব্ধি করিতেছে। কারণ কম্যুনিষ্ট শাসনযন্ত্রের যাঁতাকলে জার্ম্মানীর এক অংশের প্রায় ১ কোটি ৭০ লক্ষ অধিবাসীকে পিষ্ট হইতে হইতেছে।

কলিকাতাকে কেন্দ্র করিয়া জার্ম্মানীর সহিত ভারতের যে বহুমুখী সম্পর্ক গড়িয়া উঠিয়াছে তাহার উল্লেখ করিয়া প্রেসিডেন্ট ডঃ লুবকে এইরূপ আশা প্রকাশ করেন যে, অদূর ভবিষ্যতে এই মহানগরীর মাধ্যমে ভারতের সহিত জার্ম্মানীর বাণিজ্যিক ও সাংস্কৃতিক সম্পর্ক আরও সুদৃঢ় হইবে।

সবশেষে তিনি বলেন যে, জার্ম্মানী সব সময়ই শান্তিকামী ভারতকে বিভিন্ন ব্যাপারে সাহায্য করিয়া যাইবে।

তিনি জানান, ভারত-জার্ম্মান সহযোগিতা গভীরতর করিবার জন্যই তিনি এদেশে আসিয়াছেন। ভারতীয় নারীদের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করিয়া ডাঃ লুবকে বলেন, যেখানেই তিনি গিয়াছেন সেখানেই দেখিয়াছেন জাতি গঠনে ভারতীয় মহিলারা তাঁহাদের যোগ্য অংশ গ্রহণ করিতেছেন।

জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ীতে কবিগুরুর স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানাইয়া ডঃ লুবকে বলেন, ভারত ও জার্ম্মানীর সৌহার্দ্যকে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর যে প্রেরণা দিয়াছিলেন তাহা অবিস্মরণীয়। রবীন্দ্রনাথের ভাবধারা ও রচনা এই পুণ্যগৃহের সীমানা ছাড়াইয়া বিশ্বমাঝে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। আজও সেই বাণী মানুষকে দুঃখ-সুখের দিনে সান্ত্বনা দেয়, বাঁচাইয়া রাখে।

জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ীর যে ঘরে রবীন্দ্রনাথ শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়াছিলেন সেখানে ডঃ লুবকে ও তাঁহার পত্নী চন্দ্রমল্লিকার এক বলয় স্থাপন করেন। 'রবীন্দ্র-ভারতী'র উপাচার্য্য শ্রীহিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁহাদের চারিদিক্ ঘুরাইয়া দেখান। ডঃ লুবকে জার্ম্মান ভাষায় রবীন্দ্র রচনাবলী এবং জার্ম্মানীতে গৃহীত রবীন্দ্রনাথের নানা আলোকচিত্র আগ্রহের সঙ্গে দেখেন। রবীন্দ্রনাথের একটি কবিতার ইংরেজী অনুবাদ হইতে তিনি কয়েক ছত্র আবৃত্তি করেন।

রবীন্দ্র ভারতীর ছাত্রছাত্রীরা 'শ্যামা' নৃত্যনাট্যের একাংশ অভিনয় করে।

ডঃ লুবকের কলিকাতায় আগমন এবং ভাষণ বাঙ্গলা ও বাঙ্গালী চিরকাল কৃতজ্ঞতার সহিত স্মরণ করিবে। বিপদ্‌কালের বন্ধুই প্রকৃত বন্ধু দরদী।

জার্ম্মান ফেডারেল সাধারণতন্ত্রের অননুকরণীয় অ্যালবাম

এই জার্ম্মান সাধারণতন্ত্রের কনসুলেট জেনারেলের (কলিকাতাস্থ) দপ্তর হইতে আমরা বিবিধ তথ্যপূর্ণ ২টি পুস্তিকা, কতকগুলি সুখপাঠ্য প্রচার পত্রাদি এবং কতকগুলি মনোহর ফটোগ্রাফ সহ একটি অতি চমৎকার অ্যালবাম পাইয়াছি।

পুস্তিকা দুইটি (১টি বাঙ্গলা এবং ১টি ইংরেজীতে) পাঠে জার্ম্মানীর ঐতিহাসিক পটভূমিকা, প্রাকৃতিক সীমারেখা, আয়তন ও লোকসংখ্যা, রাষ্ট্র প্রতীক, পশ্চিম জার্ম্মানীর বর্ত্তমান সরকার, আইন প্রণয়ণ ব্যবস্থা, পররাষ্ট্রনীতি, জনমত, রাজনৈতিক দল ও নির্ব্বাচন, অর্থনীতি, খাদ্য ও কৃষি ব্যবস্থা, বৈদেশিক বাণিজ্য, সামাজিক জীবন, সংস্কৃতি, ক্রীড়া, কলা বিজ্ঞান ও গবেষণা এবং আরও বহু জ্ঞাতব্য তথ্যের সহিত একটা মোটামুটি পরিচয় ঘটিবে।

আমরা বহু রাষ্ট্রের নানা প্রকার প্রচার পুস্তিকা ও পত্রাদি পাইয়া থাকি—কিন্তু আলোচ্য প্রচার অ্যালবামখানির মত এমন সুচারু, সুখপাঠ্য এবং চিত্রসম্বলিত প্রচার পত্র কদাচিৎ পাইয়াছি।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের কালে জার্ম্মানী ধ্বংস হইয়া গিয়াছিল, কিন্তু মাত্র ১৫।১৬ বৎসরে জার্ম্মানীর সেই ধ্বংসস্তূপের উপর আর এক নব জার্ম্মানীর উদ্ভব হইয়াছে। জার্ম্মানী বলিতে আমরা পূর্ব্ব জার্ম্মানীর (রাশিয়ার করতলগত) কথা বলিতেছি না। নূতন এই জার্ম্মানী আবার প্রমাণ করিল, মহান্ জার্ম্মান জাতির প্রাণশক্তি অফুরন্ত। বিষম বিপর্য্যয়ের মধ্যেও এই জাতি আশাহত হয় না। পর্ব্বতপ্রমাণ বাধা এবং সকল প্রকার দুঃখকষ্ট নিঃশব্দে বহন করিয়া, নব উদ্যম, নূতন আশা এবং নূতন জীবনের প্রাণপ্রাচুর্য্যে দেশ এবং জাতিকে নূতন করিয়া গঠন করিতে আত্মনিয়োগ করিতে পারে এবং যথাকালে এই জীবনব্রতে সার্থকতা অর্জ্জন করে।

ভারতবর্ষের বিশেষ করিয়া বর্ত্তমান বাঙ্গলা ও বাঙ্গালীর পক্ষে পশ্চিম জার্ম্মানী আদর্শ নূতন অনুপ্রেরণা দান করিবে—এই আমাদের বিশ্বাস। জার্ম্মানীর নবজাগরণের ইতিহাস এবং আদর্শকে যথাযথভাবে বাস্তব রূপদান পদ্ধতি যদি আজ বাঙ্গালী নিজের জীবনে প্রতিফলিত করিতে পারে—বাঙ্গালীর বর্ত্তমান দুঃখকষ্ট হীনতা এবং অর্থনৈতিক দুরবস্থা বহুল পরিমাণে বিদূরিত হইবেই। জার্ম্মান জাতির মত আমরাও যদি নিজেদের যোগ্যতা প্রমাণ করিতে পারি—কেহ আমাদের দাবাইয়া রাখিতে পারিবে না। এ বিষয়ে আলোচ্য অ্যালবাম এবং পুস্তিকাগুলি অবশ্যই কিছু সাহায্য করিতে পারে।

সময়োচিত আবেদন

সমগ্র ভারত যখন যুদ্ধ-সাহায্য ভাণ্ডারের জন্য অর্থদান, রক্তদান, স্বর্ণদান—এক কথায় আত্মদানের জন্য প্রস্তুত হইয়াছে, চীনা বর্ব্বরদের ভারতভূমি হইতে বিতাড়িত করিবার জন্য সর্ব্বাত্মক প্রস্তুতি দেশের সর্ব্বত্র প্রবলবেগে চলিতেছে, ঠিক সেই সময় কম্যু-পার্টির বাঙ্গলা দৈনিকে (২-১২-৬২) দেখিতেছি বিচিত্র এক আবেদন :

কমিউনিষ্ট পার্টি সংগঠন ও 'স্বাধীনতা'র জন্য কমিউনিষ্ট পার্টির সভ্য ও সমর্থক এবং সমস্ত দরদী দেশবাসীর প্রতি আবেদন

আপনারা জানেন দেশরক্ষার জন্য জাতীয় ঐক্য গঠন ও জনগণের ঐক্যবদ্ধ উদ্যম সৃষ্টির কাজে এবং গণতন্ত্র ও জনসাধারণের বিভিন্ন স্বার্থ-

রক্ষার কাজে কমিউনিষ্ট পার্টির ও 'স্বাধীনতা' পত্রিকার ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ।

একথাও আপনারা জানেন পশ্চিম বাঙ্গালায় পার্টি বর্ত্তমানে গুরুতর সমস্যাবলীর সম্মুখীন হইয়াছে।..........

কম্যুনিষ্ট পার্টির বর্ত্তমান "গুরুতর সমস্যাবলীর" সর্ব্ব কথা এখন সকলেই জানেন। এই চীন-দরদীদের চিনিতে আজ আর কাহারও বাকী নাই।

"স্বাধীনতা"র কাতর আবেদনে শেষ কথা :

তাহা ছাড়া অনেকদিন হইতেই 'স্বাধীনতা' পত্রিকার অর্থাভাবের কথা আপনারা জানেন এবং বারে বারে জনগণের অকৃপণ সাহায্যেই 'স্বাধীনতা' রক্ষা পাইয়াছে। 'স্বাধীনতা'র সঠিক আর্থিক অবস্থা সম্বন্ধে জনসাধারণকে জানান পার্টির কর্ত্তব্য এবং কিছুদিনের মধ্যেই তাহা আমরা পারিব বলিয়া আশা করিতেছি। ইতিমধ্যে অর্থাভাবে 'স্বাধীনতা' যাহাতে বন্ধ হইয়া না যায় তাহার জন্য জনসাধারণের নিকট আমাদের উপস্থিত হইতে হইতেছে। তাঁহাদের কাছে জরুরী আবেদন জানাইতেছি যে, তাঁহারা সাধ্যমত অর্থ সাহায্য করিয়া 'স্বাধীনতা'কে (দেশের নহে) রক্ষা করিতে অগ্রসর হোন এবং 'স্বাধীনতা'র প্রচার বাড়াইতেও সাহায্য করুন।

অর্থাৎ কি না—আপনারা দয়া করিয়া এই সঙ্কটকালে আমাদের অর্থ দিয়া রক্ষা করুন, নূতন শিল-নোড়ার সংস্থান করিয়া দিন, তাহার পর যথাসময়ে, কালবিলম্ব না করিয়া আমরা আবার আপনাদেরই শিল-নোড়া দিয়া আপনাদেরই দাঁত ভাঙ্গিবার মহৎকর্ম্মে আত্মনিয়োগ করিব!

হায়! এই কি সেই পরম বিক্রমশালী স্বাধীনতা? আজ "দাবী মানতে হবে—গদি ছাড়তে হবে—" প্রভৃতি বোল এবং বুলি কোথায় গেল? ভয় পাইবেন না—কম্যুর দল পঞ্চত্বপ্রাপ্ত হয় নাই—হইয়াছে বর্ত্তমানে "পঞ্চম-বাহিনী"—এবং এই

পঞ্চম-বাহিনীর তৎপরতা

কাঁথি, ১লা ডিসেম্বর- কাঁথি মহকুমার বিভিন্ন অঞ্চল হইতে সংবাদ পাওয়া যাইতেছে যে, এক শ্রেণীর লোক পঞ্চমবাহিনীর কার্য্যে লিপ্ত রহিয়াছে এবং সরকারের বিরুদ্ধে নানাপ্রকার অপপ্রচার করিয়া নিরক্ষর গ্রামবাসীদিগকে বিভ্রান্ত করিবার চেষ্টা করিতেছে। কম্যুনিষ্ট পার্টির কর্ম্মিগণ গোপনে ও প্রকাশ্যে এইরূপ প্রচার করিতেছে।

পল্লী অঞ্চলে প্রচার করা হইয়া থাকে যে চীনারা যুদ্ধ করে নাই; ভারতে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি পাওয়ায়, উহা চাপা দিবার জন্য সরকার যুদ্ধের কথা প্রচার করিতেছেন।

একস্থানে জনসাধারণকে অবিলম্বে পোষ্ট অফিস হইতে টাকা তুলিয়া লইতে উপদেশ দিয়া বলা হইতেছে যে, টাকা না তুলিলে ঐ টাকা সরকার বাজেয়াপ্ত করিয়া লইবেন। ইহার ফলে পোষ্ট অফিস হইতে টাকা উঠাইবার জন্য বেশ ভীড় হয়।

ব্যাঙ্কে যাহারা সোনা বন্ধক রাখিয়া ঋণ গ্রহণ করিয়াছেন; তাঁহাদের মধ্যে প্রচার করা হইয়াছে যে, ব্যাঙ্কে বন্ধকী গহনা সরকার বাজেয়াপ্ত করিবেন।

এক স্থানে প্রচার করা হইয়াছে যে, নেতাজী সুভাষচন্দ্র জীবিত আছেন। তিনি চীনা সৈন্য লইয়া ভারতের দরিদ্র ও নিরন্ন চাষী ও মধ্যবিত্তগণকে উদ্ধার করিতে আসিতেছেন। চীনা সৈন্যগণ শত্রু নহে মুক্তি ফৌজ। সেইজন্য জনসাধারণকে চীনা সৈন্যগণকে স্বাগত করিবার জন্য প্রস্তুত থাকিতে এবং সরকারকে কোন প্রকার সাহায্য না দিতে উপদেশ দেওয়া হইতেছে।

ডালং ও বমডিলা পতনের পর স্থানীয় এক রাজনৈতিক দলের কর্ম্মিগণ বিজয় উৎসব পালন করে বলিয়া সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। এই উৎসবে মিষ্টান্ন বিতরণ করা হয় এবং গভীর রাত্রি পর্য্যন্ত মাইক বাজান হয় বলিয়া স্থানীয় বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি জানাইয়াছেন।

স্থানীয় কয়েকজন শিক্ষক, অধ্যাপক, কিছুসংখ্যক সরকারী কর্ম্মচারী গোপনে সরকার-বিরোধী ও চীনের পক্ষে প্রচার কার্য চালাইয়া যাইতেছেন বলিয়া বিভিন্ন সূত্রে সংবাদ পাওয়া যাইতেছে। একজন অধ্যাপককে এ বিষয়ে অগ্রণী দেখা যাইতেছে।

স্থানীয় একজন বিশিষ্ট সরকারী কর্ম্মচারী প্রকাশ্যে প্রচার করিতেছেন যে বর্ত্তমান সরকার হইতে চীনা সরকার ভাল, চীন আসিলে বেতন বাড়িবে, সাধারণ লোকের খাওয়া জুটিবে।

পশ্চিমবঙ্গের উত্তরখণ্ডের [illegible] বিশেষ করিয়া জলপাইগুড়ি ও দার্জিলিং জেলায় বিভিন্ন অঞ্চলে [illegible] ও [illegible] প্রভৃতি অন্যান্য পাহাড়িয়া জাতির লোকদের সন্দেহজনক আনাগোনা ইদানিং বাড়িয়া গিয়াছে। ইহাদের মধ্যে পঞ্চমবাহিনীর তৎপরতাও বৃদ্ধি পাইয়াছে বলিয়া সরকারী মহলে সন্দেহ করা হইতেছে।

শুক্রবার শিলিগুড়িতে ৬০ জনের বেশী [illegible] আদিবাসী আসিয়া সরকারের আশ্রয় ও সাহায্য প্রার্থনা করে। প্রকাশ, তাহারা দাবী করে যে, বমডিলা হইতে তাহারা পলাইয়া আসিয়াছে। উহাদের কয়েকজনের চেহারার মধ্যে বেশ একটা চটপটে ভাব বর্ত্তমান। উহারা বলে, বমডিলা অঞ্চলে তাহারা ভেড়া চরাইত এবং ইহাই ছিল তাহাদের ব্যবসায়। বমডিলা পতনের পূর্ব্বেই তাহারা নাকি তেজপুর হইয়া এদিকে চলিয়া আসে। কি অবস্থায় তাহারা আসিয়াছে এবং বমডিলায় আসলে তাহারা ছিল কিনা সে বিষয়ে তাহারা নানারূপ প্রশ্নের সম্মুখীন হয়। অবশেষে বমডিলার পলিটিক্যাল অফিসারের স্বাক্ষরযুক্ত একটি কাগজ বাহির করিয়া নাকি সরকারের জনৈক মুখপাত্রকে দেখায়।

শনিবার রাজ্য সরকারের জনৈক মুখপাত্র উত্তরবঙ্গের সীমান্ত জেলাগুলিতে পঞ্চমবাহিনীর কার্যকলাপ সম্বন্ধে সতর্কতা অবলম্বনের প্রয়োজনীয়তা বিবৃত করেন। তাঁহার আশঙ্কা, পঞ্চমবাহিনী দেশে রহিয়াছে এবং নানাভাবে তাহারা তথ্যাদি সংগ্রহ করিতেছে। উক্ত মুখপাত্র উত্তরবঙ্গের তিনটি জেলা কোচবিহার, জলপাইগুড়ি ও দার্জিলিং ব্যাপকভাবে সফর করেন। সফরকালে তাঁহার যে ধারণা হয়, তাহারই ভিত্তিতে তিনি উপরোক্ত মন্তব্য করেন।

জলপাইগুড়ি, ২৯শে নভেম্বর- দেশদ্রোহী কম্যুনিষ্টরা এখনও এই জেলায় চীনা আক্রমণকারীদের মহিমা কীর্ত্তন করিয়া বেড়াইতেছে, অবশ্য গোপনে।

নির্ভরযোগ্য সূত্রে জানা গিয়াছে যে, কম্যুনিষ্টরা চীনা-আক্রমণকারদেরই "মুক্তি-ফৌজ" বলিয়া বর্ণনা করিতেছে এবং পল্লী অঞ্চলে ভাগচাষীদের

ফসল জমির মালিকদের না দিয়া নিজেদের কাছে মজুত করিয়া রাখার জন্য অনুরোধ জানাইতেছে। কৃষককুলের নিকট কম্যুনিষ্টদের আর্জি—ফসলের একটি দানাও যেন খরচ করা না হয়, কারণ, উহা চীনা মুক্তি ফৌজের প্রয়োজনে লাগিবে। অন্যথায় মুক্তি ফৌজের অসুবিধা হইতে পারে।

এদিকে পুলিশ চা-বাগান অঞ্চলে আরও ছজন কম্যুনিষ্টকে গ্রেপ্তার করিয়াছে। ইহা লইয়া গ্রেপ্তারের সংখ্যা দাঁড়াইল ১৫।

কোচবিহারে কম্যুনিষ্ট তৎপরতা

কোচবিহার, ২৯শে নবেম্বর—নিরাপত্তা আইন অনুযায়ী কোচবিহার জেলায় এ যাবৎ ৫ জন কম্যুনিষ্টকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। কিন্তু চীনাদের সমর্থনে কম্যুনিষ্ট প্রচারকার্য্যের তৎপরতা এখনও কমে নাই।

কোচবিহার উকিল সভার সম্পাদক ডাকে একখানি চিঠি পাইয়াছেন। এই চিঠিতে নেহেরু সরকারের নিন্দা করিয়া বলা হইয়াছে যে, জনগণের মুক্তির জন্য চীনা মুক্তি ফৌজ আসিতেছে। সুতরাং মাভৈঃ।

এই চিঠিতে জনসাধারণকে চীনাদের সহিত সহযোগিতা করার জন্য আহ্বান জানান হইয়াছে। এই চিঠিখানি অবশ্য কোচবিহারের কমিশনারের নিকট দাখিল করা হইয়াছে।

কলিকাতা, ২৮শে নভেম্বর—গতকাল বেলঘরিয়ার চার নম্বর রেল-গেটের সম্মুখে বোমাবর্ষণের ঘটনাকে কেন্দ্র করিয়া উক্ত অঞ্চলে রীতিমত উত্তেজনার সৃষ্টি হইয়াছে। পুলিশ এ সম্পর্কে আজ শ্রী এস পি আজাদ ও শ্রীজয়নাথ যাদব নামক দুই ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করিয়াছে। টেক্সম্যাকো শ্রমিকদের যে ইউনিয়নটির সহিত উঁহারা সংশ্লিষ্ট, তাহা নাকি কম্যুনিষ্ট প্রভাবিত।

বোমাবর্ষিত হওয়ায় শ্রীগোবিন্দ রাউত নামক এক ব্যক্তি গুরুতররূপে আহত হন। তাঁহার একটি হাত পুড়িয়া গিয়াছে। আশংকাজনক অবস্থায় তিনি সাগর দত্ত হাসপাতালে দিন কাটাইতেছেন।

আজ টেক্সম্যাকো ময়দানে টেক্সম্যাকো শ্রমিকদের এক জনসভায় বিভিন্ন বক্তা বোমাবর্ষণের পিছনে কম্যুনিষ্ট ইউনিয়নের হাত আছে বলিয়া অভিযোগ করেন। উঁহারা বলেন যে অকম্যুনিষ্ট ইউনিয়নের দুইজন নেতৃস্থানীয় কর্মীকে লক্ষ্য করিয়া বোমা নিক্ষেপ করা হইয়াছিল কিন্তু লক্ষ ভ্রষ্ট হওয়ায় উহা গোবিন্দ রাউতের গায়ে লাগে।

টেক্সম্যাকো শ্রমিকেরা প্রতিরক্ষা তহবিলে প্রতিমাসে অর্দ্ধ দিবসের বেতন দিতে চাহিয়াছিলেন কিন্তু কম্যুনিষ্ট ইউনিয়নের বাধাদানের ফলে তাহা সম্ভব হয় নাই। আজ সভায় চীনারা বিতাড়িত না হওয়া অবধি প্রতিমাসে একদিনের বেতন দিবার সিদ্ধান্ত করা হয় এবং টেক্সম্যাকো কর্তৃপক্ষকে অবিলম্বে এই সিদ্ধান্তকে কার্যকরী করিতে অনুরোধ জানান হয়।

কম্যুনিষ্ট ছাত্রদের বিতাড়ন দাবী

বর্দ্ধমান, ২৮শে নভেম্বর—মহারাজ বিজয়চাঁদ ইনষ্টিটুট অব ইঞ্জিনিয়ারিং এ্যাণ্ড টেকনোলজির প্রিন্সিপ্যাল সম্পর্কে অদ্য পাঁচ শতাধিক ছাত্র কম্যুনিষ্টপন্থী ছাত্রদের বিতাড়নের দাবী তুলিয়া সহর পরিভ্রমণ করে এবং অপরাহ্নে জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের কামরার সম্মুখে সমবেত হয়। জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট প্রিন্সিপ্যাল ও ছাত্রদের বক্তব্য শোনেন এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা-বলম্বনের আশ্বাস দেন। প্রকাশ, ইনষ্টিটুটের গভর্ণিং বডি আগামী তরা ডিসেম্বর কম্যুনিষ্ট-বিরোধী ছাত্রদের দাবী বিবেচনা করিবেন।

কলিকাতার কলেজগুলিতেও কম্যুনিষ্ট ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা কম নহে এবং ইহাদের বহুপ্রকার দেশ-বিরোধী কার্য্যকলাপের কথাও প্রায়ই শুনা যাইতেছে। সহ-পাঠীরা আশা করি দেশদ্রোহী এবং জাতিবিরোধী ছাত্র-ছাত্রীদের পরিচয় জানেন, কিন্তু আশ্চর্য্যের কথা—কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ইহাদের বিতাড়িত কিংবা শায়েস্তা করিবার কোনপ্রকার আন্দোলন বা ব্যবস্থা কলিকাতার ছাত্রমহল হইতে এখনও করা হয় নাই।

একথা সত্য যে কলিকাতার শতকরা ৯০ জন ছাত্র-ছাত্রী আজ দেশের জন্য সর্ব্বস্ব পণ করিয়াছেন। কিন্তু দুই-একটি পচা ফল যেমন ঝুড়ির সমস্ত ফলে পচন ধরাইয়া দেয়—তেমনই এই সামান্য সংখ্যক দেশদ্রোহী ছাত্র-ছাত্রী অনর্থ ঘটাইতে পারে। পচা ফলের মতই ইহাদের বাহির করিয়া নর্দ্দমায় নিক্ষেপ করা দরকার। বাঙ্গলার ছাত্রসমাজের নিকট এই বিষয় সক্রিয় কিছু আশা করা অন্যায় নহে।

ঘরের শত্রু

বাইরের শত্রুর পরিচয় স্পষ্ট, কিন্তু ঘরের শত্রু যাহারা তাহাদের সব সময় চিনিয়া উঠা দায়। ইহারা নানারূপ ভেক ধরিয়া সমাজের সকল স্থানেই ঘুরিয়া বেড়ায়। দৃষ্টি তীক্ষ্ণ ও কান খাড়া না রাখিলে চট করিয়া ইহাদের স্বরূপ বুঝা কঠিন হয়। কারণ ভিতরে ইহাদের দেশদ্রোহের কালকূট ভরা থাকিলেও বাহিরে ইহারা দেখিতে দেশের আর দশজনেরই মত। ইহারা সুকৌশলে অনবরত মানুষের মনের গায়ে এই কালকূট ঢালিয়া দিতে চেষ্টা করে। যাহারা সতর্ক, তাহারা বাঁচিয়া যায়, কিন্তু যাহারা বিষকে বিষ বলিয়া চিনিতে না পারিয়া মনে এই বিষ প্রবেশের সুযোগ দেয় তাহারা মরে। অর্থাৎ তাহারা আর মনুষ্যত্থাকে না, মনুষ্যত্বের সম্পূর্ণ বিলুপ্তি ঘটিয়া দেশদ্রোহী কালসাপে পরিণত হয়। ঘরের এই ঘৃণ্য শত্রুরা শিকারের জন্য ট্রেন, ট্রাম, বাস, রেস্তোরাঁ, চা-য়ের দোকান ইত্যাদি নানা ঘাটিতে ঘুপটি মারিয়া বসিয়া থাকে। পরিবেশ অনুকূল বুঝিলে তাহাদের বিষাক্ত মুখগুলিকে বিষাক্ত করিয়া তোলে। শুধু অন্যের চায়ের দোকান বা রেস্তোরাঁতে বসিয়াই যে ইহারা শিকার সন্ধান করে তাহা নহে, সতর্কভাবে খোঁজ করিলে দেখা যাইবে, এইসব চায়ের দোকান ও রেস্তোরাঁর কোন-কোনটা হয়তো এই ঘরের শত্রুদেরই শিকার পাকড়ানোর ঘাটি।

এই সকল ঘরের শত্রুদের সম্পর্কে অবিলম্বে সতর্ক হওয়া অবশ্য প্রয়োজন এবং এ বিষয় কোন অবহেলার অবকাশ নাই। অবহেলা করিলে দেশের এই পরম সঙ্কটকালে ইহারা অনর্থের কারণ হইবেই। পুলিশ একটু সতক এবং সজাগ হইলে এই চীনা-দালালদের অনায়াসেই খুঁজিয়া বাহির করিতে পারে। এ বিষয় সর্ব্বসাধারণেরও কর্ত্তব্য প্রচুর। আমরা অনেকেই এই দালালদের জানি, কিন্তু আত্মীয় বা বন্ধুস্থানীয় বলিয়া ঘরের শত্রুদের পরিচয় প্রকাশ করিতে সঙ্কোচ বোধ করি, দ্বিধাও হয়। কিন্তু

আত্মীয়-বন্ধু-স্বজন অপেক্ষা দেশ বড়, দেশের হিতসাধন সর্ব্বাগ্রে। আজ দেশ, জাতি এবং নিজেদের রক্ষা করিতে হইলে ঘরের শত্রুদের, চীনা-দালালদের যেমন করিয়াই হউক, কেবল দমন নহে, একেবারে লুপ্ত করিতে হইবে।

কম্যুনিষ্ট বয়কট

একটি সংবাদে প্রকাশ যে, গত ১-১২-৬২ সন্ধ্যায়:

ইণ্টালী এলাকায় ডঃ সুরেশ সরকার রোডস্থ মথুরানাথ জগদীশ বিদ্যালয়ের পরিচালক পরিষদের একটি বৈঠক মুলতুবী রাখিতে হয়। কারণ উহার সদস্যগণ পরিষদের দুইজন কম্যুনিষ্ট সদস্যের সহিত একসঙ্গে বসিতে রাজী হন না।

একটি স্থানীয় জনতা ঐস্থানে সমবেত হয় এবং কম্যুনিষ্ট সদস্যদ্বয়ের পদত্যাগ দাবী করে। বিদ্যালয়ের প্রধানশিক্ষক এই বলিয়া বৈঠক মুলতুবী রাখেন যে, অনিবার্য কারণে পরিষদের সভাপতি সভায় উপস্থিত হইতে পারিবেন না।

শুভ সংবাদ। কিন্তু এইখানেই সমাপ্তি দিলে চলিবে না। সকলপ্রকার সামাজিক, পারিবারিক এবং অন্যান্য সর্ব্ববিধ অনুষ্ঠান ও কর্ম্ম হইতে এই কম্যুদের নির্ব্বিচারে বাদ দিতে হইবে। এমন কি ধোপা নাপিত বন্ধ করিতে পারিলে আরও ভাল হয়। এই দেশদ্রোহী এবং জাতি-বিরোধীদের আজ এমন শিক্ষা দিতে হইবে যাহা ইহারা জীবনে না ভুলিতে পারে। তেমন যদি প্রয়োজন হয়, তাহা হইলে ইহাদের খাঁচায় বন্ধ করিয়া উত্তর কোরিয়া এবং চীন দেশেও চালান দেওয়া হইতে পারে। খাঁচার মূল্য দেওয়ার লোক অনেক মিলিবে।

হায়!

রাষ্ট্রবিরোধী কার্যকলাপের অভিযোগে কলিকাতা ও পার্শ্ববর্তী জেলাগুলি হইতে যে সব কম্যুনিষ্ট নেতা ও কর্ম্মীকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে জেলের মধ্যেও তাহাদিগকে প্রথম দিকে বেশ বিপাকে পড়িতে হইয়াছে বলিয়া সংবাদ পাওয়া গিয়াছে।

প্রকাশ, কোন এক বড় জেলে কিছু কিছু কর্ম্মী ও কর্ম্মচারী ঐ সব বন্দীর কোন কাজকর্ম্ম করিতে অস্বীকার করেন। তাঁহারা নাকি এরূপ অভিমত প্রকাশ করেন, ভারতবিরোধী কাযকলাপের অভিযোগে ভারতরক্ষা আইনে যাঁহাদিগকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে তাঁহারা কোন ভারতীয়ের সেবা পাইবার দাবী করিতে পারেন না। কিছু কয়েদীও নাকি অনুরূপ যুক্তিতে ঐ বন্দীদের কোন কাজ করিতে অস্বীকার করে। ফলে ঐ বন্দীদের অন্যান্য কাজকর্ম্ম তো বটেই, এমনকি আহার্য পরিবেশনেও প্রথমদিকে বেশ বিভ্রাটের সৃষ্টি হয়। জেল-কর্তৃপক্ষ এই অবস্থায় বিব্রত বোধ করেন। শেষে অনেক বুঝাইয়া কর্ম্মী ও সংশ্লিষ্ট কয়েদীগণকে উক্ত কম্যুনিষ্ট বন্দীদের কাজ করিতে রাজী করান হয়।

আমরা যাহাদের চোর-ছ্যাঁচড়-পকেটমার বলিয়া ঘৃণা করি, সেই তাহারাও, সমাজের সেই পরম ঘৃণার পাত্রেরাও প্রমাণ করিল যে, তাহারা আর যাহাই হইক দেশদ্রোহী বা জাতিবিরোধী নহে! এবং যাহারা দেশদ্রোহী, জাতিবিরোধী, তাহারা চোর-ছ্যাঁচড়-পকেটমারদেরও পরম ঘৃণার পাত্র।

জেলখানার নিশ্চিন্ত আরামে জনগণমনঅধিনায়ক জ্যোতি বসু আজ বোধ হয় আত্ম-চিন্তায় নিমগ্ন আছেন। সরকারকে ধন্যবাদ—তাঁহারা জ্যোতি বসু এবং অন্যান্য কম্যু নেতাদের কয়েদ করিয়া বাঁচাইয়া দিলেন! আজকের দিনে তাঁহারা 'খোলা' থাকিলে তাঁহাদের কপালে কি ঘটিত তাহা স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে।

এবার ছাড়া পাইয়া এই সব আপাত বন্দীরা ভবিষ্যতে কোন্ পথে চলিবেন, তাহারই প্যাঁচ ভাবিতেছেন কি?

কিন্তু এই সকল ঘৃণ্য চানা-দালালদের প্রথম শ্রেণীর বন্দী কোন হিসাবে করা হইল?

এ বিষয় আনন্দবাজারের (২৬-১১-৬২) মন্তব্যের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করি:

কারাগারের বাহিরে এই সেদিন পর্যন্তও যাঁহারা জাগ্রত জনতার ঘৃণা ও ধিক্কারে জর্জ্জরিত হইয়াছেন, কারাগারে গিয়াও নাকি তাঁহাদের বিপদ কাটে নাই। সংবাদে প্রকাশ, রাষ্ট্রবিরোধী কার্যকলাপের অভিযোগে কলিকাতা ও পার্শ্ববর্তী জেলাগুলি হইতে যে সব কম্যুনিষ্ট নেতা ও কর্ম্মীকে সম্প্রতি গ্রেপ্তার করা হইয়াছে, কোন একটি বড় কারাগারের কর্ম্মীরা নাকি সেইসব বন্দীর কাজকর্ম্ম করিতে অসম্মত হন। কর্ম্মীদের যুক্তি এই যে, ভারতবিরোধী কার্যকলাপের অভিযোগে ভারতরক্ষা আইনে যাঁহারা ধৃত, তাঁহারা কোন ভারতীয়ের সেবা পাইবার অধিকারী নহেন। সাধারণ কয়েদীরাও ওই একই যুক্তিতে কাজ করিতে অসম্মত হন। পরাধীন আমলের অবস্থার সঙ্গে এই অবস্থাটাকে একবার মিলাইয়া লওয়া যাক। রাজনৈতিক বন্দী হিসাবে তখন যাঁহারা কারাগারে প্রেরিত হইতেন, তাঁহাদের সেবা করিবার জন্য কারাগারের কর্ম্মী ও কয়েদীদের মধ্যে আগ্রহের অন্ত থাকিত না। সকলেই বিশ্বাস করিত যে, দেশের জন্য সংগ্রাম করিয়া যাহারা কারাগারে গিয়াছেন, দেশমাতৃকার তাঁহারা সুসন্তান, সুতরাং তাঁহাদের সেবা করিলেও খানিকটা পুণ্য অর্জ্জন করা যাইবে। কিন্তু আজ যাঁহাদের পাঠানো হইয়াছে, তাঁহাদের সম্পর্কে তো সে-কথা খাটে না; দেশ সেবার জন্য নয়, দেশের স্বার্থকে ক্ষুণ্ণ করিবার অভিযোগে তাঁহারা ধৃত হইয়াছেন। সুতরাং তাঁহাদের সেবা করিতে তো কাহারও আগ্রহ হইবার কথা নয়। সংবাদটা শিক্ষাপ্রদ। সে-শিক্ষা এই যে, দেশের স্বার্থকে যাহারা তুচ্ছ করে, কেহই তাহাদের ক্ষমা করে না, এমন কি চোর-ডাকাতরাও তাহাদের ঘৃণা করিয়া থাকে। শেষ-পর্যন্ত অনেক বুঝাইয়া সুঝাইয়া নাকি কম্যুনিষ্ট বন্দীদের জন্য কাজ করিতে সকলকে রাজী করানো গিয়াছে। কিন্তু বলাই বাহুল্য, অনেক বুঝাইবার পরেও যদি তাহারা রাজী না হইত, তবে তাহাতেও বিস্ময়ের কিছু থাকিত না।

কিন্তু কয়েদীদের এ-বিষয় রাজী না করাইয়া যদি কম্যু-নেতাদের কিছু সংখ্যক চরকে তাহাদের সেবার কাজে জেলে পাঠানো হইত, তাহা হইলেই ভাল হইত। এখনও ইহা করা চলে। জ্যোতি বসু এবং অন্যান্য কম্যু

নেতারা নাম ঠিকানা দিলেই চরদের পরম সমাদরে প্রভুদের সেবার কাজে জেলে প্রেরণ করা হইবে। চররাও রাত্রির অন্ধকারে পরের দেওয়ালে নোংরা পোষ্টার লাগানোর কাজ হইতে অব্যাহতি পাইবে। আহারের চিন্তাও থাকিবে না। বিশেষ করিয়া যখন পার্টি হইতে মাসহারা বন্ধ হইয়া গেল।

কেন নিরুত্তর ?

"বিধানসভার গত অধিবেশনে রণাঙ্গনে বীরযোদ্ধা শ্রীসিদ্ধার্থশঙ্কর রায়। একের পর এক ভারতীয় ঘাঁটি. শত্রুকবলিত হওয়ার দুঃসংবাদে বিমর্ষ অধিবেশন উৎকর্ণ হয়ে তাঁর বক্তৃতা শুনেছে, উদ্দীপ্ত হয়েছে গৃহশত্রু আর বহিঃশত্রুর বিরুদ্ধে তাঁর ঘৃণা ও ক্রোধ লক্ষ্য করে।

"গত নির্ব্বাচনে যে কম্যুনিষ্ট পার্টি ছিল এই নির্দ্দলায় সদস্যের সমর্থক, সেই পার্টির বিরুদ্ধেই তিনি তাঁর তূণীর থেকে বাছা বাছা সব তীর নিক্ষেপ করেছেন, নাম করে করে চীনদরদীদের বলেছেন—এরা 'দালাল, বিশ্বাসঘাতক, শত্রু।' গত দুদিনের একতরফা আক্রমণে নিরুত্তর নতমুখ কম্যুনিষ্ট আসন তাঁর ক্ষুব্ধ কণ্ঠের চীৎকারে, চোখা চোখা বাক্যবাণে এইদিন আরও নত, আরও নিরুত্তর হয়ে পড়েছিল।

"দেশের এই দুর্দ্দিনে একদল কম্যুনিষ্টের আচরণে বিস্মিত শ্রীরায় কম্যুনিষ্ট আসনের দিকে আঙুল উঁচিয়ে জানিয়ে দিয়েছেন, তাঁর আসন থেকে ওদের দূরত্ব আর মাত্র ছ' ফুটের নয়, দিল্লী থেকে পিকিং যতখানি, সেই হাজার হাজার মাইলের।

"উত্তেজনায় মুখর শ্রীরায় জ্যোতিবাবুকে আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়ে সোজাসুজি আরও জানিয়েছেন, বিরোধী দলের লীডারী করা আর তাঁর সাজে না, কিছু সংখ্যক কম্যুনিষ্ট সদস্য ছাড়া বিরোধী দলের কেউই আর শ্রীবসুর পেছনে নেই।

"শ্রীরায় জ্যোতিবাবুর কাছে অনেকগুলি প্রশ্নের জবাব চেয়েছেন। বলেছেন, এ কি সত্য নয়, পশ্চিমবঙ্গ শাখা কম্যুনিষ্ট পার্টির সম্পাদক শ্রীপ্রমোদ দাশগুপ্ত তাঁদের জাতীয় পরিষদের বিরুদ্ধে ভোট দিয়েছেন? এটা কী সত্য নয়, আর একজন নেতা শ্রীহরেকৃষ্ণ কোঙারও ঠিক তাই করেছেন? এটা কি সত্য নয়, জাতীয় পরিষদে চীনা-প্রস্তাব পাশ হওয়ার পর শ্রীপ্রমোদ দাশগুপ্ত দিল্লীতে বলেছেন, তাঁদের বাংলা মুখপত্রে এই প্রস্তাবের প্রচার বন্ধ রাখবেন? এটা কি সত্য নয়, জ্যোতিবাবু ও ডাঃ রণেন সেন সভায় যোগ দেন নি?—'বলুন, জ্যোতিবাবু মুখ ফুটে বলুন, আমার প্রশ্নের জবাব দিন, আমি কি অসত্য বলেছি, বলুন, বলুন—'

জ্যোতিবাবু নিরুত্তর। প্রত্যেকটি কমুনিষ্ট আসন নিরুত্তর। গোটা অধিবেশন-কক্ষে সূচী-পতন-নৈশব্দ্য। শ্রীরায় তখনও বলে চলেছেন, "আমি জানি, জ্যোতিবাবু তার উত্তর দেবেন না, দিতে পারবেন না।"

শ্রীরায় বিশ্বাস করেন না, কম্যুনিষ্টদের জাতীয় পরিষদের প্রস্তাবে জ্যোতিবাবুদের সমর্থন আন্তরিক। যদি তা থাকত, তাহলে তাঁরা শ্রীদাশগুপ্ত আর শ্রীকোঙারকে প্রস্তাবের বিরুদ্ধে ভোট দেওয়ার জন্যে বহিষ্কার করে দিতেন। তাঁরা তা করেন নি। এবং করেন নি বলেই 'চীন-দরদী কম্যুনিষ্টদের সম্পর্কে সাবধান।'

"শ্রীরায় সবাইকে হুঁসিয়ার করে দেন দেশদ্রোহীদের সম্পর্কে। কংগ্রেস সদস্যদের করতালি ধ্বনির মধ্যে বলেন, 'আমাদের দেখতে হবে এদের কেউ যেন কোথাও একটি সভা করতে না পারে, একটি কথা না বলতে পারে।'

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের দৌহিত্রকে আজ আবার আমরা নিজেদের মধ্যে ফিরিয়া পাইলাম। সাময়িক ভুলের কারণে তিনি যে কম্যুদের কবলে জড়াইয়াছিলেন আজ সেই কালো মেঘ কাটিয়া গিয়াছে। আশা করা যায় ভবিষ্যতে তিনি আর কখনও কম্যুদের সহিত কোনপ্রকার আঁতাতবদ্ধ হইবেন না! কম্যুকুষ্ঠরোগীদের এবার সকল বিষয়েই স্বতন্ত্র ব্যবস্থা দরকার হইবে।

বালী পৌরসভায় কম্যু বিতাড়ন দাবী

কলিকাতা, ২৯শে নভেম্বর—আজ অপরাহ্নে বালী মিউনিসিপ্যালিটি ভবনের সম্মুখে এক বিপুল জনতা জমায়েত হইয়া পৌরসভার বর্ত্তমান ক্ষমতাসীন দল সংযুক্ত নাগরিক সমিতির (কম্যুনিষ্ট প্রভাবিত) বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন। সভায় উল্লিখিত পার্টির সদস্যদের পদত্যাগ দাবী করা হয়।

প্রকাশ, উল্লিখিত বিক্ষোভ সভার পর বালী মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান শ্রীবিমল মান্না, ভাইস চেয়ারম্যান ও পৌরসভার অন্যান্য দুইজন সদস্য লিখিতভাবে বিক্ষোভকারীদের জানান যে, তাঁহারা পদত্যাগ করিতে রাজী আছেন।

উপরিউক্ত সংবাদে আনন্দ বোধ করিতেছি! এই দাবী দেশের সর্ব্বত্র সকল প্রতিষ্ঠানে অনুষ্ঠানে ধ্বনিত হউক।

প্রতিরক্ষা ফ্রণ্টে কম্যুদের ছাঁটাই

কলিকাতা, ২৭শে নভেম্বর পশ্চিমবঙ্গ প্রজা-সোস্যালিষ্ট পার্টির সক্রিয় সদস্যগণ মিলিত হইয়া সরকারের

নিকট কম্যুনিষ্ট এবং তাঁহাদের সহযাত্রীদের বাদ দিয়া সকল দেশপ্রেমিক দল ও মানুষকে লইয়া জাতীয় প্রতিরক্ষা ফ্রণ্ট গঠনের দাবী জানান।

সমপ্রকার আরও বহু বহু সংবাদের অপেক্ষায় রহিলাম। ছারপোকার যেমন শেষ রাখিতে নাই—কম্যুদের বেলাতেও তেমনি করিতে হইবে।

কম্যুদের ভূমিকা

কলিকাতা, ২৭শে নভেম্বর—পশ্চিমবঙ্গ প্রজা সোস্যালিষ্ট পার্টির চেয়ারম্যান শ্রীসুনীল দাস আজ এক সাক্ষাৎকারে বলেন যে, দেশের বৃহত্তর স্বার্থে ও জাতীয় নিরাপত্তার জন্য গত নির্বাচনে বিপর্যয়ের ঝুঁকি লইয়া পি, এস, পি, একক নির্বাচনী সংগ্রামে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। কারণ, দেশের শাসন ব্যবস্থা চীনা আক্রমণকারীর বন্ধু ভারতীয় কম্যুনিষ্ট পার্টির হাতে তুলিয়া দেওয়া যাইতে পারে না বলিয়া তাঁহারা মনে করেন।

তিনি আরও বলেন, "গত সাধারণ নির্বাচনে পশ্চিমবঙ্গে কম্যুনিষ্ট সহ ছয়টি বামপন্থী পার্টির নির্বাচনী ঐক্যের ফলে যদি রাজ্যে বিকল্প সরকার প্রতিষ্ঠিত হইত, তাহা হইলে আজ চীনা আক্রমণের পরিপ্রেক্ষিতে যে ভয়ানক বিপজ্জনক অবস্থার সৃষ্টি হইত, সেইজন্যে খোলাখুলিভাবে সংবাদপত্র মারফৎ ভুল স্বীকার করার জন্য আমরা ফরওয়ার্ড ব্লক ও আর-এস-পি'র নেতৃবৃন্দকে অভিনন্দন জানাইতেছি।

"আমরা গত সাধারণ নির্বাচনে কম্যুনিষ্টদের সঙ্গে নির্বাচনী মৈত্রী স্থাপন করিতে অস্বীকার করি। কারণ কম্যুনিষ্ট চীন কর্তৃক বলপূর্বক তিব্বত দখল, ভারত সীমান্তে বারবার আক্রমণ, রাস্তা নির্মাণ, বিমানঘাঁটি তৈয়ার এবং ভারত-তিব্বত সীমানায় প্রচুর সৈন্য ও যুদ্ধাস্ত্র প্রেরণের পরিপ্রেক্ষিতে যদি আমরা কম্যুনিষ্ট পার্টিকে ক্ষমতা দখলে সাহায্য করিতাম তাহা হইলে আমাদের এই কার্য্যের ফলে ভারতের নিরাপত্তা ও শান্তি বিঘ্নিত হইত।"

কম্যুদের কল্পনার বিকল্প সরকার গঠনের আশা চিরতরে নিভিয়া গেল। আশা করি আজ সে-সকল বাম এবং অন্য পন্থী দল কম্যুদের স্বরূপ চিনিয়া তাহাদের ধিক্কার দিতেছেন—ভবিষ্যতে আর কখনও তাঁহারা নির্বাচন বা অন্যবিধ সাময়িক সুবিধালাভের কারণে কম্যুদের সহিত হাত মিলাইবেন না। ইঁহাদের শুভবুদ্ধি চিরস্থায়ী হউক।

কম্যুনিষ্ট কার্য্যকলাপ সম্পর্কে মুখ্যমন্ত্রী

কলিকাতা, ২৭শে নভেম্বর—প্রতিরক্ষা তহবিলে অর্থ সাহায্য করিতে নিষেধ করিয়া এবং চীনা সৈন্যকে মুক্তি ফৌজ বলিয়া অভিনন্দিত করিয়া উগ্র চীনপন্থী কম্যুনিষ্টরা দেশবাসীকে বিভ্রান্ত করিবার চেষ্টা করিয়াছে। মুখ্যমন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন আজ ভারতীয় কম্যুনিষ্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য শ্রীগোবিন্দন নায়ারের সহিত আলোচনাকালে উপরোক্ত অভিযোগ করিয়াছেন বলিয়া নির্ভরযোগ্য সূত্রে জানা গিয়াছে।

পশ্চিমবঙ্গের কম্যুনিষ্ট সদস্যদের এক বিরাট্ অংশকে সরকারের গ্রেপ্তার করিবার কারণ সম্পর্কে শ্রীনায়ার মুখ্যমন্ত্রীকে নাকি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন।

ন্যাকামীরও একটা সীমা আছে—কিন্তু কম্যু-নেতাদের তাহাও নাই! কম্যুদের গ্রেপ্তার করিবার কারণ কি ভগবান্ শ্রীগোবিন্দের জানা নাই? গ্রেপ্তারের কারণ কি, তাহা ত তিনি নিজেকে জিজ্ঞাসা করিলেই যথাযথ জবাব পাইবেন।

সরকারের সহিত সংশ্লিষ্ট মহলের সংবাদে প্রকাশ যে, বর্দ্ধমান, মেদিনীপুর ও ২৪ পরগণার কোন কোন অঞ্চলে কম্যুনিষ্টরা দেশদ্রোহীর ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিল বলিয়াও মুখ্যমন্ত্রী শ্রীনায়ারকে জানান।

শ্রীনায়ার নাকি ধৃত ব্যক্তিদেরও মুক্তি দিতে সরকারকে অনুরোধ করেন। ইহার উপযুক্ত জবাবে: আজও রাজ্য সরকার আরও কয়েক জন কম্যুনিষ্টকে ভারত রক্ষা আইনে গ্রেপ্তার করিবার নির্দ্দেশ দিয়াছেন বলিয়া প্রকাশ।

কলিকাতা, ২৭শে নভেম্বর—দক্ষিণ দমদম পৌরসভায় কম্যুনিষ্ট পার্টি প্রভাবিত নাগরিক পরিষদ জোটের কমিশনার শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় দেশের বর্তমান পরিস্থিতি বিবেচনা করিয়া নাগরিক পরিষদের সহিত সকল সম্পর্ক ছিন্ন করিয়াছেন।

জনমতের চাপে কম্যুনিষ্ট নিয়ন্ত্রিত চন্দননগর মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের মেয়র ডাঃ রামচন্দ্র কুমার ও ডেপুটি মেয়র শ্রীবিন. এসু অবশেষে পদত্যাগ করিয়াছেন।

এ প্রসঙ্গে ইহা উল্লেখযোগ্য যে, গত রবিবার রাত্রে স্থানীয় কয়েক শত লোক এক বিক্ষোভ মিছিল করিয়া কম্যুনিষ্ট কাউন্সিলারদের পদত্যাগ এবং রাজ্যসরকার কর্তৃক পৌর-প্রতিষ্ঠানের পরিচালনভার গ্রহণের জন্য দাবী জানান। তাঁহারা পৌরসভা ভবনের সম্মুখে যাইয়াও বিক্ষোভ দেখান।

শিলিগুড়ি, ২৫শে নভেম্বর—শিলিগুড়ি কম্যুনিষ্ট পার্টির লোক্যাল কমিটির সদস্য শ্রীগিরিন্দ্রনাথ দে এক বিবৃতিতে জানাইয়াছেন যে, ভারত ভূমির উপর কম্যুনিষ্ট চীনের নগ্ন ও বর্ব্বরোচিত আক্রমণের পরিপেক্ষিতে ভারতের কম্যুনিষ্ট পার্টি, বিশেষ করিয়া পশ্চিমবঙ্গ কম্যুনিষ্ট পার্টির যে ভূমিকা তাহাতে তাঁহার পক্ষে উক্ত পার্টির সদস্য থাকা সম্ভব না হওয়ায় তিনি উক্ত পার্টি হইতে পদত্যাগ করিয়াছেন।

খেলা ভাঙ্গার পালা

এই সব পদত্যাগ সাময়িক প্রয়োজনে, না চিরকালের জন্য? কম্যুদের ভেক, মত ও পথ বদলানো—সুযোগ ও সুবিধা মতই হইয়া থাকে।

চীন-পন্থী কম্যুনিষ্টদের গোপন কারসাজী

আপিস আদালত কল-কারখানায় চীন-বিরোধী আন্দোলন এবং প্রতিরক্ষা ফাণ্ডে অর্থ-সংগ্রহের প্রচেষ্টায় বিবিধ প্রকারে বাধা সৃষ্টি করিবার চেষ্টা কম্যুনিষ্টরা এখনও করিয়া চলিতেছে। এই মানুষরূপী ঘৃণ্য জীবদের দেশদ্রোহিতার প্রচেষ্টা প্রকাশ্যে নহে, গোপনে। যুদ্ধ-

প্রচেষ্টা সাবোটাজ করার বিষম চেষ্টা নানা স্থানে স্থুরু হইয়া উঠিয়াছে। নিম্নে কিছু সংবাদ উদ্ধৃত করা হইল :

সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গের ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত কয়েক-জন বিশিষ্ট ব্যক্তির মুখে চীনপন্থীদের গোপন কারসাজির কিছু কিছু বিবরণ শুনিলাম : চাপে পড়িলে ইঁহারা চীনবিরোধী সভাসমিতির আয়োজন করেন, কিন্তু সে সব সভায় যাহাতে বেশী লোক না জমে সে-দিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখেন; বাধ্য হইলে জাতীয় প্রতিরক্ষা তহবিলের জন্য চাঁদা তোলার অভিনয় করেন, কিন্তু শ্রমিক বা কর্ম্মীরা যাহাতে "বেশী না দিয়া ফেলে" সে দিকে কড়া নজর রাখেন; প্রকাশ্য সভাসমিতিতে উৎপাদন বৃদ্ধি এবং সহযোগিতার আহ্বান জানান, কিন্তু পরক্ষণেই ভারতরক্ষা আইনের কঠোরতা এবং ফলে "মালিকপক্ষের স্থবিধার" কথা শ্রমিকদের স্মরণ করাইয়া দেন।

একজন বিশিষ্ট অকম্যুনিষ্ট শ্রমিকনেতার অভিমত, কম্যুনিষ্ট পার্টির রাজ্যপরিষদ বা বঙ্গীয় প্রাদেশিক ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের (বি-পি-টি-ইউ-সি) সাম্প্রতিক সিদ্ধান্ত সম্পর্কে চীনপন্থী ট্রেড ইউনিয়ন নেতা বা সংগঠকেরা মোটেই বিচলিত নহেন। তাঁহারা মূল চীনপ্রেমী মতবাদে এখনও অনড়। মুখে যে মতের উল্টা কথা বলিতেছেন, সেটা নেহাতই ধরপাকড় এবং জনমতের ভয়ে। পুলিশ ইতিমধ্যেই ইঁহাদের জনাপঁচিশেক "কমরেড"কে গ্রেপ্তার করিয়াছে।

বি-পি-টি-ইউ-সি

বি-পি-টি-ইউ-সি-তেও চীনপন্থীরাই সংখ্যাগরিষ্ঠ। কিন্তু কেন্দ্রীয় সংগঠন এ-আই-টি-ইউ-সি-তে ডাঙ্গেপন্থীরা প্রবল। কেন্দ্রীয় সংগঠনের চাপে বি-পি-টি-ইউ-সি-কেও চীনবিরোধী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে হইয়াছে। পশ্চিমবঙ্গের কয়েকজন স্থযোগসন্ধানী চীনপন্থী শ্রমিক নেতা বেগতিক দেখিয়া ভোল পাল্টাইয়াছেন।

বি-পি-টি-ইউ-সি'র সাধারণ সম্পাদক এবং দুইজন সহ-সভাপতি এখন জেলে। কিন্তু, তবু চীনপন্থী শ্রমিক নেতা ও সংগঠকরা ভাঙ্গিয়া পড়েন নাই। একদিকে যেমন তাঁহাদের সারাক্ষণের কর্ম্মীরা (হোল টাইমাররা) আত্মগোপন করিয়াছেন, অন্যদিকে তেমনি আর একদল প্রকাশ্যে চতুর সাবোটাজ পরিচালনা করিতেছেন।

কোথাও কোথাও অবশ্য উগ্র চীনপন্থীরা প্রকাশ্যে চীনপ্রেম ঘোষণা করিতেছেন। দমদম অঞ্চলের একটি বড় ইঞ্জিনিয়ারিং কারখানার প্রায় দেড়শত শ্রমিক ইঁহাদের উস্কানিতে প্রতিরক্ষা তহবিলে চাঁদা দিতে অস্বীকার করিয়াছে। যাদবপুর অঞ্চলের আর একটি বড় ইঞ্জিনিয়ারিং কারখানার কম্যুনিষ্টকবলিত প্রবলপ্রতাপান্বিত ইউনিয়ন প্রতিরক্ষা তহবিলের ব্যাপারে কোন রকমের আগ্রহ না দেখাইবার ফলে শেষপর্য্যন্ত কোম্পানীর ম্যানেজারকে চাঁদা সংগ্রহে উদ্যোগী হইতে হয়।

যেখানে কর্ম্মী এবং শ্রমিকরা উদ্যোগী হইয়া জাতীয় প্রতিরক্ষা তহবিলের জন্য ইউনিয়নের উপর চাপ দিতেছে, চীনপন্থীরা সেখানে চাঁদা সংগ্রহের অভিনয় চালাইয়া যাইতেছেন। কয়েকটি তৈল কোম্পানীর কর্ম্মীরা প্রতিরক্ষা তহবিলে একদিনের বেতন ও মাগ্গীভাতা দিতে চাহিয়াছিলেন। চীনপন্থীরা বিনয়ের অবতার সাজিয়া বলিলেন, আবার মাগ্গীভাতার হিসাবের কচকচিতে গিয়া লাভ কি—একদিনের বেসিক দিলেই হইবে। রিষড়া, বাউড়িয়া, বজবজ, চেঙ্গাইল প্রভৃতি অঞ্চলের কয়েকটি চটকলে চীনাপন্থীরা প্রচার করিয়াছেন : সবাই দশ বা বিশ নয়া পয়সা করিয়া দিলেই অনেক টাকা হইয়া যাইবে।

ডালহৌসী পাড়ার হাল

ডালহৌসী পাড়ায় কিছুটা ধোয়াক্কো করিলেও সরকারী অফিস এবং ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের কর্ম্মীদের মধ্যে চীনপন্থীদের প্রভাব বুঝা যায়। একজন অফিসকর্ম্মচারী নেতাকে গ্রেপ্তার করিলে ডালহৌসীতে যত পোষ্টার পড়ে, চীন আমাদের মাতৃভূমি আক্রমণ করায় তত পোষ্টার পড়ে নাই! কাগজ কলমে কাজ দেখাইবার উদ্দেশ্যে অফিসপাড়ার ইউনিয়নগুলি কিছু কিছু সভার আয়োজন করিলেও তাহার প্রচারও হয় নাই, লোকজনও জমে নাই।

কম্যুনিষ্ট-প্রভাবিত পশ্চিমবঙ্গ কেন্দ্রীয় সরকারী শ্রমিক কর্ম্মচারীদের ইউনিয়ন ও অ্যাসোসিয়েশনসমূহের কো-অর্ডিনেশন কমিটির ক্রিয়াকলাপের কিছুটা বিবরণ দিলেই পরিস্থিতি পরিষ্কার বুঝা যাইবে। সংগঠনটি বিরাট, সদস্য সংখ্যা বহু। অতীতে এই প্রতিষ্ঠানের আহ্বানে কলিকাতার বুকে হাজার হাজার লোকের সভা শোভাযাত্রা হইয়া গিয়াছে। কিন্তু চীনা আক্রমণের ব্যাপারে ইঁহাদের ভূমিকা কি?

এই প্রকার আরও বহু সংবাদ পাওয়া যাইতেছে। কোন কোন কারখনায় অতি গোপনে এবং সতর্কতার সহিত শ্রমিক বিক্ষোভ জাগাইবার চেষ্টাও চলিতেছে। কোন কোন মহিলা কম্যু-কর্ম্মী মাতৃবেশে এই দেশকল্যাণ কাজে নামিয়াছে।

সদাশয় সরকার একবার এদিকেও নজর দিন। কয়েকজনকে জেলে পুরিলে সমস্যা মিটিবে না। ঝাড়কে ঝাড় খতম করিতে হইবে।

'ডি ভি সি' দপ্তর স্থানান্তর

আগামী ১লা জানুয়ারী হইতে ডি-ভি-সি-র বৈদ্যুতিক বিভাগের প্রধান একটি শাখা কলিকাতা হইতে মাইথনে স্থানান্তরের সিদ্ধান্তে কর্ম্মচারী মহলে নিদারুণ অসন্তোষের সৃষ্টি হইয়াছে।

আজ বুধবার এণ্ডারসন হাউসে ডি-ভি-সি-র বোর্ডের যে বৈঠক হইবে তাহার প্রাক্কালে ডি-ভি-সি ষ্টাফ এসোসিয়েশন কেন্দ্রীয় সরকার এবং বিহার ও পশ্চিমবঙ্গ সরকারের নিকট আবেদন জানাইয়াছেন : দেশের জরুরী অবস্থার সময় যেন তাঁহারা ঐ স্থানান্তরের সিদ্ধান্ত রদ করার জন্য ডি-ভি-সি'কে বাধ্য করেন।

এদিকে ডি-ভি-সি'র বৈদ্যুতিক বিভাগের অনেক ইঞ্জিনীয়ারও জেনারেল ম্যানেজারের নিকট প্রদত্ত এক স্মারকলিপিতে এইরূপ অভিমত ব্যক্ত করিয়াছেন যে, এই বিভাগটি মাইথনে স্থানান্তরিত হইলে কাজের অনেক ব্যাঘাত ঘটিবে এবং এতদ্দ্বারা বিদ্যুৎ সরবরাহ ব্যবস্থা অব্যাহত রাখার পক্ষেও অস্থবিধা হইবে। তাঁহারা বলেন, জাতির সঙ্কটকালে যখন প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা শক্তিশালী করিয়া তোলা দরকার এবং যথাসম্ভব ব্যয়-বাহুল্য হ্রাস করিয়া সমরোপকরণ বৃদ্ধির দিকে নজর দেওয়া দরকার, তখন এই স্থানান্তরের সিদ্ধান্ত কার্য্যকরী করার জন্য অযথা অর্থ ব্যয়ের কোন যৌক্তিকতা নাই। ইহা ছাড়া যখন সর্ব্বতোভাবে অর্থের সাশ্রয় প্রয়োজন, তখন দুইটি স্থানে দপ্তর রাখা জাতীয় স্বার্থের পরিপন্থী বলিয়াই তাঁহারা মনে করেন।

এ বিষয়ে আনন্দবাজার পত্রিকার (৩০-১১-৬২) মন্তব্যই যথেষ্ট :

দুর্ম্মতির যেমন ছলের অভাব হয় না ডি-ভি-সি-কর্তৃপক্ষেরও তেমনি অজুহাত জুটিয়া যায়। দেশের এই জরুরী অবস্থাতেও ডি-ভি-সি'র চেষ্টা

ম্যানের পক্ষে প্রাদেশিক সঙ্কীর্ণতা বিসর্জন দেওয়া সম্ভব হয় নাই। কলিকাতা হইতে ডি-ভি-সি'র সদর দপ্তর বিহারের কোন স্থানে সরাইবার জন্য আগে অন্য যুক্তি দেওয়া হইত। এখন প্রতিরক্ষার প্রয়োজনের অজুহাত দেওয়া হইতেছে। ডি-ভি-সি-কর্তৃপক্ষ নিজেদের দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন হইলে দপ্তরটি মাইথনে সরাইবার কথা ভাবিতে পারিতেন না। ডি-ভি-সি'র এই বিভাগটি নীতি-নির্দ্ধারণ, লোকজন নিয়োগ ও বদলি এবং প্রয়োজনবোধে মাইথনের ডেপুটি চীফ ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনীয়ারের অফিসে মাঝে মাঝে নির্দেশ দিয়া থাকে। তাপবিদ্যুৎ-কেন্দ্রগুলিতে কয়লা সরবরাহের দায়িত্ব এই দপ্তরের উপর এবং খনি ও রেল-দপ্তরের সহিত যোগাযোগও রাখিতে হয়। তাপবিদ্যুৎ-কেন্দ্রগুলির তদারক ও মেরামতির যন্ত্রপাতি কেনার কাজও এই দপ্তরই করিয়া থাকে। কলিকাতা হইতেই এই সব কাজ করা সহজ। কলিকাতায় অফিস থাকার জন্য মাইথন ও বোকারোর তাপবিদ্যুৎ-কেন্দ্র দুটিতে গোলমাল হইয়াছিল, এমন অজুহাত দেওয়াও সম্ভব নয়। কারণ ডি-ভি-সি'র সামগ্রিক পরিকল্পনা ও আমদানিকৃত যন্ত্রপাতির ত্রুটিই ঐ গোলমালের কারণ। দেশের জরুরী অবস্থার প্রয়োজনে উপরের স্তরে ঘন ঘন পরামর্শ ও আলাপ-আলোচনার ব্যবস্থা থাকা দরকার। বিদ্যুৎ-সরবরাহের ব্যাপারে কলিকাতা ও পশ্চিম বঙ্গের শিল্প-এলাকাগুলি ডি-ভি-সি'র উপর কম নির্ভরশীল নয়। উপরন্তু, দপ্তরটি মাইথনে স্থানান্তর করিলে ডি-ভি-সি'র কর্মদক্ষতা হ্রাস পাইবে এবং অফিস ও কর্মচারীদের বাড়ীর জন্য অর্থব্যয়েরও দরকার হইবে। একান্তভাবে প্রতিরক্ষার প্রয়োজনে এই স্থানান্তরীকরণে কাহারও আপত্তি থাকিবার কথা নয়; কিন্তু নিজেদের গোঁ বজায় রাখিবার জন্য মিথ্যার বেসাতি সর্ব্বদা নিন্দনীয়।

দেশের এবং জাতির এই পরম সঙ্কটকালেও এক শ্রেণীর অফিসারদের কার্য্যকলাপ সত্যই আপত্তিকর। কিন্তু এই অফিসারদের ওপরে এমন কেহই কি নাই যিনি আপতকালে অনাবশ্যক অর্থনষ্ট এবং কর্মীদের অযথা কষ্ট ও দুর্ভোগ রোধ করিতে পারেন? বাঙলার মুখ্যমন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন এখনও যদি এ বিষয়ে দিল্লীর কর্তৃপক্ষ মহলে দরবার করেন, তাহা হইলে হয়ত এই অপকর্ম্মের অপচেষ্টা বন্ধ হইতে পারে।

সর্ব্বাধিনায়ক জয়ন্তনাথ চৌধুরী

জয়ন্তনাথ চৌধুরী যখন আমাদের সেনাদের নেতা তখন বিজয় আমাদের করতলগত—স্থলবাহিনীর অধিনায়ক পদে লেঃ জেনারেল জে. এন. চৌধুরীর নিয়োগে ভারতবাসীর মনে এই বিশ্বাস দৃঢ় হয়ে উঠেছে। অকারণে নয়।

জয় কথাটা শুধু তাঁর নামের সঙ্গেই জড়িয়ে নেই, তাঁর কর্মজীবনের সঙ্গেও এর অঙ্গাঙ্গী সম্পর্ক। হায়দরাবাদে সাফল্যমণ্ডিত পুলিশী অভিযানের তিনি ছিলেন নেতা, গতবছরে ঐতিহাসিক গোয়া-মুক্তির অভিযানে ভারতীয় সৈন্যবাহিনীর সর্বময় কর্তৃত্বভার ন্যস্ত ছিল তাঁর উপর। দু'টি অভিযানের কাহিনীই তাঁর নেতৃত্বের ঔজ্জ্বল্যে ভাস্বর হয়ে আছে।

আজ ভারতভূমি থেকে চীনা দস্যুদের বিতাড়নের দায়িত্বভার তাঁর ওপর ন্যস্ত হল। এই দায়িত্ব আগের দু'টি দায়িত্বের তুলনায় পৃথক। কিন্তু জয়ন্তনাথের মতো বীর সেনানায়কের পক্ষে কঠিন কিছু নয়। তাঁর ব্যাপক অভিজ্ঞতা, অনমনীয় সাহস এবং নেতৃত্বদানের দুর্লভ ক্ষমতার দ্বারা তিনি যে অভিযানেও বরমাল্য নিয়ে ফিরবেন তাতে সন্দেহ নেই।

জয়ন্তনাথের জীবন নানা কীর্তিতে উজ্জ্বল। অভিজাত পরিবারে জন্ম—পাবনার সেই বিখ্যাত চৌধুরী পরিবার (যাঁদের মধ্যে আছেন আশুতোষ চৌধুরী, প্রমথ চৌধুরী প্রমুখ) বাংলাদেশে সুপরিচিত।

কলকাতা ও লণ্ডনের হাইগেট্ স্কুলে শিক্ষা সমাপনের পর তিনি স্যাণ্ডহার্ষ্টের রয়্যাল মিলিটারী কলেজে যোগদান করেন। অতঃপর ১৯২৮ সালে মাত্র কুড়ি বছর বয়সে (জন্ম ১০ জুন, ১৯০৮) কমিশন লাভ এবং সপ্তম লাইট ক্যাভেলরীতে যোগদান।

জয়ন্তনাথ কোয়েটার ষ্টাফ কলেজেও শিক্ষালাভ করেন এবং অব্যবহিত পরেই বিখ্যাত পঞ্চম ভারতীয় ডিভিশনের সঙ্গে বিদেশে যান। ঐ ডিভিশনের সঙ্গেই তিনি সুদান, ত্রিত্রিয়া ও আবিসিনিয়ার প্রত্যক্ষ যুদ্ধের অভিজ্ঞতা অর্জন করেন। পশ্চিম এশিয়ায় তাঁর শেষ দায়িত্বভার ছিল তাঁর ডিভিসনের সহকারী অ্যাডজুট্যাণ্ট জেনারেল ও কোয়ার্টার মাষ্টার জেনারেলের। তাঁকে তাঁর কৃতিত্বের জন্য 'অর্ডার অফ দি ব্রিটিশ এম্পায়ার' উপাধি দেওয়া হয়।

ভারতে ফিরে এসে জয়ন্তনাথ কোয়েটার ষ্টাফ কলেজে সিনিয়ার ইনষ্ট্রাক্টর নিযুক্ত হন। ১৯৪৪ সালে তাঁর ওপর প্রথম গুরুদায়িত্ব অর্পিত হয়। ঐ সময় তিনি ষষ্ঠদশ ক্যাভেলরির অধিনায়কতা গ্রহণ করেন।

তিন হাজার মাইল পেরিয়ে

তাঁরই নেতৃত্বে এই ক্যাভেলরি ব্রহ্মে যুদ্ধ করার জন্য তিনি হাজার মাইল পথ অতিক্রম করে কোয়েটা থেকে মেইকতিলা যান। মধ্য ব্রহ্মে ঐ ক্যাভেলরির কীর্তি আজও স্মরণীয় হয়ে আছে।

ব্রহ্ম অভিযানের পর ফরাসী ইন্দোচীন ও জাভায়ও তিনি যুদ্ধের অভিজ্ঞতা লাভ করেন।

১৯৪৬ সালে তিনি মালয় কম্যাণ্ডের অ্যাডমিনিষ্ট্রেশনের ব্রিগেডিয়ার ইন চার্জ্জ নিযুক্ত হন। তাঁর আগে ভারতীয় বাহিনীতে মাত্র দু'জন ভারতীয় ব্রিগেডিয়ার পদে উন্নীত হয়েছিলেন। ঐ বছরে লণ্ডনে যে বিজয়ী ভারতীয় বাহিনী যায় জয়ন্তনাথই ছিলেন তাঁর অধিনায়ক। আবার পরের বছরই তাঁকে লণ্ডন যেতে হয় ইম্পিরিয়াল ডিফেন্স কলেজে একটি বিশেষ শিক্ষাক্রমে যোগদানের জন্যে—যে দু'জন ভারতীয় প্রথম এই শিক্ষাক্রমে যোগদান করেন তিনি তাঁদের অন্যতম।

ভারতে ফিরে এসে ১৯৪৭ সালের নভেম্বর মাসে তিনি ব্রিগেডিয়ার (প্ল্যান্স) এবং পরে স্থল বাহিনীর সদর দপ্তরে ডিরেক্টার অফ আর্টিলারী অপারেশনস্ এণ্ড ইণ্টেলিজেন্সের অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন। ফেব্রুয়ারী মাসে তিনি মেজর জেনারেল পদে উন্নীত হন এবং অস্থায়ীভাবে চীফ অফ জেনারেল ষ্টাফের কার্যভার গ্রহণ করেন।

১৯৪৮ সালে জয়ন্তনাথের ওপর প্রথম সাঁজোয়া ডিভিসনের অধিনায়কতার ভার অর্পিত হয়। হায়দরাবাদে পুলিশী অভিযানে অধিনায়কতার পুরস্কার স্বরূপ তিনি ঐ রাজ্যের সামরিক গভর্ণর নিযুক্ত হন। ১৯৪৮ সালের সেপ্টেম্বর থেকে পর বৎসর ডিসেম্বর পর্যন্ত ঐ পদে আসীন ছিলেন।

অতঃপর জয়ন্তনাথ নানা গুরুত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত থেকেছেন। তার-মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল স্থলবাহিনীর সদর কার্যালয়ে অ্যাডজুট্যাণ্ট জেনারেল (১৯৫২), চীফ অফ জেনারেল ষ্টাফ (১৯৫৩), সাদার্ণ কম্যাণ্ডের অধিনায়ক (১৯৫৯)। স্থলবাহিনীর সর্ব্বাধিনায়ক পদে নিযুক্ত হওয়ার পূর্ব্ব পর্যন্ত তিনি শেষোক্ত পদে আসীন ছিলেন। ঐ পদে থাকা কালেই তিনি ঐতিহাসিক গোয়া অভিযান পরিচালনা করেন। (যুগান্তর)

জয়ন্তনাথের এই গুরুদায়িত্ব এবং ভারতীয় সেনাবাহিনীর সর্ব্বাধিনায়ক পদলাভে আমরা বাঙ্গালী হিসাবে গৌরব বোধ করিতেছি, ভারতীয় হিসাবে যুদ্ধে জয় সম্পর্কে নূতন আশা লাভ করিতেছি।

জয়ন্তনাথ পাবনার হরিপুরের বিখ্যাত চৌধুরী পরিবারের সন্তান। সেই চৌধুরী পরিবার, যাঁদের বংশে জন্মিয়াছিলেন—আশুতোষ চৌধুরী, প্রমথ চৌধুরী, কুমুদ চৌধুরী, কালী চৌধুরী, প্রভৃতি স্বনামধন্য বাঙ্গালী সন্তানেরা। শেষোক্ত নামটি আজ বিশেষ করিয়া স্মরণীয়,—এই কালী চৌধুরীই আর. এ. এফ-এর সেই দুঃসাহসী বৈমানিক—দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে নাৎসীদের সঙ্গে লড়িতে গিয়া যিনি বীরের মত মৃত্যুবরণ করিয়াছিলেন জার্ম্মানীর মাটিতে।

চর সম্পর্কে সাবধানতা চাই

দেশের সরকার চীনাপন্থী কম্যুদের অনেককে গ্রেপ্তার করিয়া কয়েদে পুরিয়াছেন, যাহাতে এই সঙ্কটকালে দেশে কোন প্রকার বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি না ঘটে, সেই কারণে। নিরাপত্তার পক্ষে অনিবার্য্য বলিয়া সরকার ইহা করিতে বাধ্য হইয়াছেন। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আর একটি বিষম বিপদের প্রতি সরকারের দৃষ্টি দান এবং সতর্কতার প্রয়োজন অত্যধিক। বিপদটি হইল—দেশের অভ্যন্তরে পাকিস্থানী অনুচরদের অনুপ্রবেশ এবং অবাধ বিচরণ। কর্ত্তৃপক্ষ হয়ত এই বিপদ্‌ সম্পর্কে জ্ঞাত আছেন। কিন্তু যথেষ্ট অবহিত হইয়াছেন বলিয়া মনে হয় না। কয়েক লক্ষ পাকিস্থানী এ-দেশে অনায়াসে অনুপ্রবেশ করিয়া, প্রকাশ্যে-অপ্রকাশ্যে বসবাস করিতেছে। ভারতের বহু কলকারখানায়, বন্দরে-জাহাজে, ডকে এবং অন্যান্য নানা গুরুত্বপূর্ণ স্থানে এবং ঘাঁটিতে এই পাকিস্থানী অনুচর-অনুপ্রবেশকারীরা ছড়াইয়া পড়িয়াছে। ইহা খুবই সম্ভব যে ইহাদের একটা বৃহৎ অংশ দেশের ভিতরে শত্রুর চর-হিসাবে কাজ করিতেছে। পাকিস্থানের সহিত ভারতের সম্পর্ক মধুর এমন কথা কেহ বলিবেন না। তাহার উপর পাকিস্থানের চীনা-প্রেম দানা বাঁধিতেছে। (নেহরু-আয়ুব পত্রবিনিময় এবং চুক্তির কথাবার্ত্তা সত্ত্বেও)।

এমন ভাবাটা অন্যায় হইবে না যে, পাকিস্তানী চর অনুচরেরা ভারতের পরম ক্ষতি করিবার সুযোগ এবং সুবিধা পাওয়া মাত্র তাহা কাজে লাগাইবে।

তারা গোপন খবর পাচার করিয়া দিতে পারে, রেলপথ নষ্ট করিয়া বা পুল, কালভার্ট প্রভৃতি ধ্বংস করিয়া সৈন্যবাহিনীর চলাচলে ব্যাঘাত সৃষ্টি করিতে পারে অথবা উৎপাদনে বিঘ্ন সৃষ্টি করিয়া আমাদের দেশরক্ষা ব্যবস্থাকে বিপন্ন করিতে পারে। আমাদের পার্শ্ববর্ত্তী রাজ্য আসামের ঘরের দুয়ারে আজ শত্রুসৈন্য আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। এই রাজ্যে গত কয়েক বৎসরে বেশ কয়েক লক্ষ (১০।১২) পাকিস্থানীর অনুপ্রবেশ ঘটিয়াছে একথা সকলেই জানেন। আসামের দায়িত্বশীল নেতারাও এই সমস্যাটাকে যৎপরোনাস্তি লঘু করিয়া দেখাইবার জন্যই আগাগোড়া চেষ্টা করিয়া আসিয়াছেন। কিন্তু সে যাই হোক, আজ বহিঃশত্রু যখন আঘাত করিতেছে তখন এইসব অন্তঃশত্রুর উপর নজর রাখার প্রয়োজন শত গুণে বাড়িয়া গিয়াছে। আশঙ্কা হইতেছে, এখনও উদাসীন থাকিলে আমাদের এই ভুলের চরম মূল্য দিতে হইবে।

ধর্ম্মঘটের অছিলায় এই সময়ে আসামের সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের জলপথের যাগাযোগ ব্যবস্থাকে সম্পূর্ণ বিপর্য্যস্ত করা হইয়াছে। ইহার গূঢ় উদ্দেশ্য বুঝিতে কাহারও বাকী থাকে না। এ বে-আদব কর্ম্মচারীদের পিছনে পাকিস্থান সরকারেরও উস্কানি রহিয়াছে। শুধু ষ্টীমারগুলিই নয়, কিছু ভারতীয় কর্ম্মচারীও পাকিস্থানে আটক পড়িয়া গিয়াছেন এবং খাদ্যাভাবে, অর্থাভাবে নিতান্ত দুরবস্থায় আছেন। তাঁরা সাহায্যের জন্য আমাদের নিকট আকুল আবেদন জানাইয়াছেন।

ভারতের এই চরম বিপদ্‌কালে জয়েণ্ট ষ্টীমার কোম্পানীর পাকিস্তানী লস্করদের বে-আইনী ধর্ম্মঘট উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। নিমকহারাম লস্কররা পাকিস্তানী দরিয়ায় ৪০,৫০টি মাল বোঝাই জাহাজ আটকাইয়া রাখিয়া কেবল কোম্পানীকেই নয়, ভারতকেও জব্দ করিবার সোজা পথ ধরিয়াছে।

সুযোগ বুঝিয়া আজ প্রেসিডেণ্ট আয়ুব হুমকী দিতেছেন, 'কাশ্মীরের সমস্যার শান্তিপূর্ণ সমাধান না হইলে পরিণামে পাকিস্তান ও ভারতবর্ষের মধ্যে সশস্ত্র সংঘর্ষ হইবে এবং সেই সংঘর্ষ একটা নির্দ্দিষ্ট স্থানের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকিবে না।' পাকিস্তান দস্তুরমত ভীতি প্রদর্শন করিতেছে। এমত অবস্থায় দেশের সরকারের পক্ষে এই বিষয়টি গভীর ভাবে লক্ষ্য করা প্রয়োজন। কারণ, ভারতের বিশেষভাবে আসামের অভ্যন্তরস্থিত পাকিস্তানী অনুচরদের প্রতি আমাদের সরকারের নীতি কি হইবে তার সহিত এই বিষয়টি অঙ্গাঙ্গিভাবে যুক্ত। আর কালক্ষেপ না করিয়া ভারতবর্ষস্থিত প্রত্যেকটি বৈধ ও অবৈধ পাকিস্তানীর গতিবিধির উপর নজর রাখা হউক, প্রয়োজন হইলে বহিষ্কার আদেশ জারী করিয়া বা অন্তরীণ করিয়া অন্তর্ঘাতী কার্য্যকলাপের সম্ভাবনা যথাসম্ভব প্রতিরোধ করা হউক।

আমরা একান্তভাবে আশা করি ভারত এবং প্রাদেশিক সরকার বিপজ্জনক অবহেলায় এখন কালক্ষেপ করিয়া অদূরভবিষ্যতের জন্য পরম আক্ষেপের বিষবীজ বপন করিবেন না।

সরকার পাকিস্তানের সহিত সমঝোতা করুন, কিন্তু অদূরভবিষ্যতে পাকিস্তানের মতিগতির পরিবর্ত্তন যে কিছু হইবে, সে আশা না রাখিয়া। সব কিছুর জন্য পূর্ণ প্রস্তুতির প্রয়োজন আজ সর্ব্বাধিক।

হরতন

শ্রীবিমল মিত্র

১

কেষ্টগঞ্জের দুলাল সা'র বাড়ীর সামনের খোলা মাঠে তখন পুরোদমে মিটিং চলছে। নিতাই বসাকের স্থির হয়ে বসবার সময় নেই। সে-ই আসল হোতা। খদ্দরের একটা পাট-করা চাদর কাঁধে ফেলে দিয়েছে। একবার দুলাল সা'র পেছনে গিয়ে কানে কানে কি কথা বলে আর একবার মুখে আঙুল দিয়ে সকলকে চুপ করতে বলে। বলে, আস্তে আস্তে—

যারা বক্তৃতা শুনতে এসেছে তারা নিরীহ গো-বেচারা মানুষ। গোলমাল করবার সাহস তাদের নেই। ব্লক-ডেভেলপ্‌মেন্ট অফিসের সমস্ত স্টাফ আজ ছুটি পেয়েছে। তারা এসে সামনের সারিতে বসেছে, তার পর আছে পাটের ব্যাপারীরা। তার পর আছে মালোপাড়ার তাবৎ নিরক্ষর চাষীরা, আর আছে চাষী-ক্ষেতমজুরের দল। ভয়ে-ভক্তিতে সবাই গদগদ। আর গদগদ না হয়েও উপায় নেই। থানা থেকে পুলিসের দল এসে আশে-পাশে সব ঘিরে রয়েছে। আর মাঝখানে তক্তপোশ পাতা হয়েছে, তার উপর খান-কতক টেবিল-চেয়ার। সেখানে ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট, পুলিসের দারোগা, আর দুলাল সা ব'সে আছে। আর ফুলের মালা গলায় দিয়ে কালীপদ মুখার্জ্জি বক্তৃতা দিচ্ছেন।

দুলাল সা প্রথম উপরে উঠে বসতে চায় নি।

বলেছিল, আমাকে আবার কেন? আমি কে? আমি এক কোণে ব'সে ব'সেই ওঁর বক্তৃতা শুনব—

নিতাই বসাক বলেছিল, তাই কখনও হয়? এই ত তোমার দোষ। মন্ত্রী ত আর রোজ রোজ আসছেন না, আর এই সময়েই যদি আড়ালে থাক ত আমি একলা কি ক'রে সামলাব?

শেষে অনেক বলার পর রাজী হয়েছিল দুলাল সা। হাতে হরিনামের জপের মালা। সেই মালা জপতে জপতেই বক্তৃতা শুনছিল।

মন্ত্রীমশাইয়ের গলা ভাল। তিনি তখন বলছিলেন, দেশের এই দুর্দ্দিনে শুধু সরকারের হাতে দেশ-সেবার ভার ছেড়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত থাকলে আপনাদের চলবে না। আপনারাও এগিয়ে আসুন। আপনাদেরও আমাদের সঙ্গে দেশ-সেবায় হাত মিলাতে হবে। এ আপনাদেরই নিজেদের দেশ। বহু কষ্ট ক'রে, বহু জীবন বলি দিয়ে আপনারা এই স্বাধীনতা পেয়েছেন। এ স্বাধীনতা অর্জ্জন করবার দায়িত্ব যেমন আপনারা একদিন মাথায় তুলে নিয়েছিলেন, এই স্বাধীনতা ভোগ করার গুরু দায়িত্বও আপনাদের নিতে হবে। আপনারাই দেশের মালিক, আপনারা যারা অগণিত জনসাধারণ, তারাই দেশের কর্ণধার, আমরা মন্ত্রী হলেও আমরা কিছু না। আপনাদের হয়ে আমরা দেশের উন্নতির জন্যে পরিশ্রম করছি। গান্ধীজী কি চেয়েছিলেন? বলুন, আপনারা ত গান্ধীজীর জীবন জানেন, আপনারাই বলুন, গান্ধীজী কি চেয়েছিলেন? বলুন?

হলধর সামনে বসেছিল। কথাটা তার দিকে চেয়েই বলছিলেন মন্ত্রীমশাই। সে আরও ঘাবড়ে গেল।

কান্ত বসেছিল পাশে। তার সাহসের বাহাদুরি আছে বলতে হবে। সে টপ্‌ করে ব'লে ফেললে—আজ্ঞে তিনি চেয়েছিলেন আমাদের ভাল হোক—

মন্ত্রীমশাই লুফে নিলেন কথাটা। বললেন, ঠিক কথা। তিনি চেয়েছিলেন রামরাজ্য প্রতিষ্ঠা করতে। রামরাজ্য মানে কি? আপনারা রামায়ণ পড়েছেন, রামরাজ্যের কথা আপনাদের বেশী বলতে হবে না। মানে, রামরাজ্য মানে এমন এক রাজ্য যেখানে··· যেখানে

দুলাল সা নিতাই বসাকের দিকে চেয়ে ইঙ্গিতে কাছে ডাকলে। নিতাই কাছে এসে নিচু হতেই দুলাল সা ফিস্‌ ফিস্‌ ক'রে বললে, কর্ত্তামশাই মিটিং-এ এসেছে নাকি?

নিতাই বললে, না—

—খুব সাহস ত—তুমি খবর দিয়েছিলে?

নিতাই বললে, শুনলাম কলকাতায় গেছে বুড়ো—

—কলকাতায়! কলকাতায় গেছে কি করতে? জানাশোনা কেউ আছে নাকি? খবর নিয়েছ?

নিতাই বললে, যাক্‌ না, আমি আছি কি করতে?

—না, না, একটু সাবধানে থাকতে বলছি, সদানন্দকে হাসপাতালে চুপচাপ থাকতে বল, আর ডাক্তারকে সেই

যে ছ'শো টাকা দিতে বলেছিলাম, সে দেওয়া হয়েছে ত? ডাক্তারের হাতেই ত এখন সব কি না।

—সে তুমি কিছু ভেব না, সে ঠিক লিখে দেবে মাথায় লাঠি মারার ফলে স্কাল্ ফেটে গেছে।

—স্কাল্ মানে?

নিতাই বললে, ওসব কথা এখন থাক্। বুড়োকে আমি জব্দ করছি দেখ না—

—আর নিবারণ? সেটা কেমন আছে? বেঁচে আছে ত?

মন্ত্রীমশাই তখন ব'লে চলেছেন, আমরা চাই ভারতবর্ষের সাড়ে সাত লক্ষ গ্রামের মানুষ যেন নিজেরাই তাদের সমস্যা মেটাতে পারে। আমরা পিচ-ঢালা রাস্তা ক'রে দেব, আপনারা সবাই মিলে দু'পাশে ফলের গাছ পুঁতে দেবেন, দেশের খাদ্য সমস্যা মিটাবার ভার আপনাদের হাতে। বাংলা দেশ সুজলা-সুফলা-শস্যশ্যামলা দেশ, আপনারা চেষ্টা করলে এখানে সোনা ফলাতে পারেন। পুকুরে মাছ ছাড়ুন, ক্ষেতে ধান বুনুন, অন্ন-বস্ত্রের সমস্যাটা আপনারা একটু চেষ্টা করলেই মিটাতে পারেন। তুচ্ছ কারণে সরকারকে বিরক্ত করবেন না, সরকার আরও বড় বড় কাজ নিয়ে ব্যস্ত, সরকার যদি আপনাদের এই সব সামান্য ছোটখাট সমস্যা নিয়ে মাথা ঘামায়, তখন বড় বড় যে-সব সমস্যা রয়েছে তা কখন ভাববে? এই ক' বছরে সরকার কত কাজ করেছে তা জানেন আপনারা নিশ্চয়ই, ডি. ভি. সি. বাঁধ হয়েছে, ময়ূরাক্ষী বাঁধ হয়েছে, এবারে ফারাক্কা বাঁধ হবে। আরও অনেক কাজ বাকি আছে করতে, এখন কে কার জমি দখল ক'রে বসল বে-আইনী ক'রে, কার ছাগল কার ধান খেয়ে গেল, এ সব কাজ যদি সরকারকে দেখতে হয় তা হ'লে ত কোনও কাজই করতে পারবে না সরকার। আপনারাও এগিয়ে আসুন, আপনারাও আমাদের সঙ্গে হাত মিলান, তবেই ত দেশ আবার জাগ্রত হবে, তবেই ত আমরা পৃথিবীর আর পাঁচটা শক্তির মত মাথা উঁচু ক'রে দাঁড়াতে পারব। সরকারের শক্তিতে যা কুলায় তা সরকার করছে। এই সেদিন রাশিয়া থেকে ক্রুশ্চেভ সাহেব এসে আমাদের কাজের প্রশংসা ক'রে গেছেন, এই সেদিন চায়না থেকে চৌ-এন্-লাই সাহেব এসে পণ্ডিত নেহরুর জন্মদিনে অনেক জিনিষ উপহার দিয়ে গেছেন। আমাদের প্রতিবেশী-শক্তির সঙ্গে আমরা বন্ধুত্ব পাতিয়েছি। সে ছবি আপনারা খবরের কাগজে দেখেছেন। দেশ হু হু ক'রে এগিয়ে চলেছে, এ সময়ে আপনারা পেছিয়ে থাকবেন না। সমস্ত পৃথিবী আমাদের বন্ধু, জার্মানী আমাদের ইস্পাতের কারখানা ক'রে দিয়েছে, রাশিয়া আমাদের···

দুলাল সা আবার ইঙ্গিত করলে নিতাই বসাককে।

নিতাই কাছে আসতেই দুলাল সা ফিস্ ফিস্ ক'রে বললে, কালীপদবাবুকে একবার হাসপাতালে নিয়ে যেতে হবে, মনে থাকে যেন, বলবে এখানকার হাসপাতালের কেমন সুব্যবস্থা, এই সব আর কি···মানে আমি কত টাকা চাঁদা দিয়েছি, এই কথাটা কায়দা ক'রে···

নিতাই বললে, তুমি কিছু ভেব না—

—আর আমার সঙ্গে মন্ত্রী কথা বলছেন, এই রকম একটা ফোটো তুলিয়ে নিতে হবে, বুঝলে, বড় ক'রে বাঁধিয়ে রাখতে হবে, আর নতুন-বৌকে খাবার-দাবারের সব বন্দোবস্ত করতে···

নিতাই বললে, তুমি অত নার্ভাস হচ্ছ কেন? আমি ত আছি—

—না, মানে, আবার কবে মন্ত্রী আসবেন বলা যায় না ত। আর সেই কথাটা মনে আছে ত?

নিতাই বসাক বুঝতে পারলে না। বললে, কোন্ কথাটা?

—কোন্ কাজটা ফাঁক প'ড়ে যায় বলা যায় না ত। আমি নতুন-বৌকে ব'লে রেখেছিলাম পাঁচশো রূপোর টাকা যেন নতুন-বৌ কালীপদবাবুর হাতে দেয় প্রণামী ব'লে, উদ্বাস্তু-ফাণ্ডে দেবার জন্যে···মানে···

নিতাই বসাক যেন কি বলতে যাচ্ছিল, হঠাৎ চটাপট্ চটাপট্ ক'রে হাততালির শব্দ উঠতেই সজাগ হয়ে উঠল। দুলাল সা'ও সোজা হয়ে বসল। কালীপদবাবুর বক্তৃতা শেষ হয়ে গেছে। নিতাই বসাক পেছনে গিয়ে মুখ নীচু করে বললে, ওয়াণ্ডারফুল বলেছেন স্যার, অপূর্ব্ব, এমন সহজ ক'রে সব বুঝিয়ে দিলেন আপনি, জলের মত সোজা হয়ে গেল।

মিটিং ভাঙ্গার অনেকক্ষণ পর পর্য্যন্ত সবাই এসে বলতে লাগল অপূর্ব্ব, অপূর্ব্ব—

সুকান্ত রায় সোজা এসে একেবারে পায়ের ধুলো নিলে। নিয়ে মাথায় ঠেকালে। স্ত্রী পাশেই ছিল। সে-ও পায়ের ধুলো নিয়ে মাথায় ঠেকাল। সুকান্ত বললে, চমৎকার, কিরণশঙ্কর রায়ের বক্তৃতা শুনেছিলাম, তার চেয়েও ভাল।

দুলাল সা কিছুই বলে নি। সে যেন নিমিত্ত মাত্র। সে যেন কেউ-ই না। সমস্ত কাজ-কর্ম্ম-বর্ত্তমান-ভবিষ্যৎ

সে যেন হরির পায়ে ছেড়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে আছে। তার যেন কোন উদ্বেগ নেই। দুশ্চিন্তা নেই।

সুকান্ত জিজ্ঞেস করলে, আপনি কেমন শুনলেন সা' মশাই।

দুলাল সা বললে, সবই হরির ইচ্ছে হে, তাঁর ইচ্ছে থাকলে সবই সুরাহা হয়ে যায়, তাই ত বলি হরিই ভবার্ণবে একমাত্র ভরসা।

ততক্ষণে পুলিসের দল সজাগ হয়ে উঠেছে। কেউ না সামনে এগিয়ে আসে, কেউ না ভিড় ঠেলে মন্ত্রী-মশাইয়ের গায়ের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। বিশিষ্ট ক'জনকে রেখে বাকি সকলকে বিচ্ছিন্ন ক'রে দিয়েছে। সব হট্ যাও, সব স'রে যাও।

সুকান্ত রায় নিতাই বসাককেই খুঁজছিল। সাধারণ আলাপ-পরিচয় হয়েছে শুধু একবার। পরিচয় করিয়ে দিয়েছিল নিতাই বসাকই।

নিতাই বসাকই বলেছিল, এই ইনি এখানকার ব্লক-ডেভেলপমেণ্ট অফিসার, কিরণশঙ্কর রায়ের একজন প্রধান শিষ্য।

সুকান্ত বলেছিল, আপনি বোধ হয় আমার ছবি দেখেছেন স্যার, আনন্দবাজারে বেরিয়েছিল।

—কি ছবি ?

আজ্ঞে, কিরণশঙ্কর রায়ের ডেড-বডি আমি বয়ে নিয়ে গিয়েছিলাম কেওড়াতলা শ্মশান পর্যন্ত, লম্বা সাত মাইল পথ, কিন্তু জঙ্গলের মধ্যে প'ড়ে আছি স্যার, আমার ছেলেমেয়ের এডুকেশনের জন্যে যদি কলকাতার কাছাকাছি কোনও ব্লকে বদলি ক'রে···

এত ভিড়! নিরিবিলি যে একটু কথা বলবে, নিজের দুঃখের কথাটা একটু সবিস্তারে বুঝিয়ে বলবে তারও সুযোগ হয় নি তখন। পুলিসের দারোগা, ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট, সকলেই যেন ঠিক তখনই হুড়মুড় ক'রে এসে পড়ল। মিনিষ্টার দেখলেই যেন যত স্বার্থ-সিদ্ধি করবার চেষ্টা। সুকান্তর কথাটা ভাল ক'রে শেষ করবার আগেই আরও দশজন এসে পড়ল। নিরিবিলিতে কথা বলবার সুযোগটাও দিলে না কেউ।

নিতাই বসাক বলেছিল, তা হোক, এখন ত পরিচয় হয়ে রইল আপনার, তার পর মিনিষ্টারও রইলেন আমিও রইলাম, আপনার ভাবনা কি ?

সুকান্ত বলেছিল, কিন্তু দেখলেন ত, ঠিক এই সময় সবার কাজ পড়ল ? ভাবলাম কিরণশঙ্কর রায়ের কথাটা ব'লে তার পর ট্র্যান্সফারের কথাটা বলব।

—কিন্তু ছেলেমেয়ের এডুকেশনের কথা বললেন যে, ছেলেমেয়ে আপনার কোথায় ?

—ছেলেমেয়ের এডুকেশন না ব'লে আর কি কারণ দেখাই বলুন ? আর ত কোনও সুটেবল্ কারণ খুঁজে পেলাম না।

—তা বেশ করেছেন, পরে আবার চান্স জুটিয়ে দেব আমি, চীফ-মিনিষ্টারকে পর্য্যন্ত আমি এই কেষ্টগঞ্জে আনতে পারি, তা জানেন ? আপনি আছেন কোথায় ? একবার সুগারমিলটা আমায় ক'রে ফেলতে দিন।

তা এত কথার পরও সুকান্ত আশা ছাড়ে নি, মিটিংয়ের পরই তাই আবার তাড়াতাড়ি সকলের আগে গিয়ে মিনিষ্টারের পায়ের ধুলো নিয়েছিল। ভেবেছিল আর একটা সুযোগ পেলেই কথাটা খোলসা ক'রে ব'লে ফেলবে। কিন্তু পুলিসের দল এসে তখনি ছাড়াছাড়ি করিয়ে দিয়েছিল।

কি করবে বুঝতে না পেরে সুকান্ত আর সুকান্তর স্ত্রী দাঁড়িয়েই ছিল সেখানে। যদি নিতাইবাবুর সঙ্গে দেখা হয়, যদি নিতাইবাবুকে ব'লে মিনিষ্টারের সঙ্গে শেষ-বারের মত দেখাটা করা যায়। তারপর কেষ্টগঞ্জ ছেড়ে একবার চ'লে গেলে আর কি দেখা করার সুযোগ মিলবে! হঠাৎ নিতাই বসাককে দূর থেকে দেখা গেল।

—নিতাইবাবু, নিতাইবাবু!

কিন্তু নিতাই বসাক আজ যেন ঈদের চাঁদ হয়ে গেছে। দূরে ভিড়ের মধ্যে একবার খানিকক্ষণের জন্যে দেখা যায়, আবার তখনি কোথায় অদৃশ্য হয়ে যায়। পুলিস-পাহারার আড়ালে তখন মিনিষ্টার দুলাল সা'র বাড়ীর সদর-বারান্দার ভেতরে ঢুকে গেছেন। সঙ্গে আছে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট, দুলাল সা, আরও গণ্যমান্য অনেকে।

বাড়ীর ভেতরে টেবিল সাজিয়ে খাওয়ার বন্দোবস্ত হয়েছে। কাঁটা-চামচে প্লেট টেবিল চেয়ারের ছড়াছড়ি। সেখানে গিয়ে হাজির হতেই যেন চমকে উঠল। ওখানে কে ? কে ওখানে ?

নতুন-বৌও সেখানে দাঁড়িয়ে ছিল। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কথা বলছিল। শ্বশুরকে দেখেই এদিকে এগিয়ে এসেছে।

—ও কে নতুন-বৌ ?

নতুন-বৌ সামনে গলা নিচু ক'রে বললে, ও-বাড়ীর বড়গিন্নী এসেছেন, জ্যাঠাইমা—

দুলাল সা তবু বুঝতে পারলে না। নিতাই বসাক কাছে এসে জিজ্ঞেস করলে, তা কর্ত্তামশাই ত সলা-

পরামর্শ আঁটতে কলকাতায় গেছেন শুনলাম, বড়গিন্নী এসেছেন কি করতে?

নতুন-বৌ বললে, বড় বিপদে প'ড়ে এসেছেন উনি, বাড়ীতে কেউ নেই, সরকার মশাই-এর বড় খারাপ অবস্থা, এখন যায়, তখন যায়, উনি কি করবেন বুঝতে পারছেন না, তাই ঝি'কে সঙ্গে নিয়ে চ'লে এসেছেন—

নিতাই বসাক রেগে গেল, তা সরকার মশাই-এর অসুখ, আমরা কি করব? আমরা তার কি জানি—

দুলাল সা বিচক্ষণ মানুষ। বললে, সে কি কথা নিতাই, বিপদের সময় শত্রু-মিত্র দেখতে নেই, আমি যাচ্ছি—

নিতাই বসাক বললে, তুমি এই সময় ওমনি গেলেই হ'ল? তা হ'লে এদিক্‌ সামলাবে কে?

—তা এদিক্‌টাই বড় হ'ল? এদিক্‌ দেখবার জন্যে ত অনেক লোক আছে, মানুষের জীবন বড়, না মিনিষ্টারের আপ্যায়ন বড়, হরি হরি, তা হ'লে মিছেই হরির নাম করছি—

তখন একপাশে ঘোমটা দিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল বড়গিন্নী। জীবনে কখনও এমন বিপদে পড়েনি। হাতের কাছে কাউকে না পেয়ে ঝি-এর মেয়েটাকে নিয়েই চ'লে এসেছিল। বাড়ীর বৈঠকখানায় তখন সরকার মশাই যেন খাবি খাচ্ছিল দেখে এসেছে। কোথাও কারো কাছে সাহায্য পাবার আশা নেই। কর্তামশাই হন্ত-দন্ত হয়ে নিজেই চ'লে গেছেন কলকাতায়। তার জন্যেও একটা ভাবনা আছে। আশে-পাশে যে কাউকে ডেকে একবার খবর দেবে তারও উপায় ছিল না। বাড়ীতে কাজ করতে এসেছিল দুর্গা, তাকে নিয়েই চ'লে এসেছে এখানে। এখানে যে আজ এত ভিড় তাও জানা ছিল না। এখানেও পুলিস পাহারা দেখে অবাক্‌ই হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু মেয়েমানুষ দেখে বাধা দেয় নি কেউ। একেবারে খিড়কি দিয়ে সোজা ভেতরে ঢুকে পড়েছিল।

দুলাল সা সামনে এগিয়ে গিয়ে বললে, আপনার কোনও ভাবনা নেই মাঠাকরুণ, আমি ব্যবস্থা করছি সব—

বলেই কাকে যেন ডাকলে—এই কাস্তু, ইদিকে আয়—

তারপরেই সব বন্দোবস্ত ঠিক হয়ে গেল। নিজের গাড়ি দিয়ে দুলাল সা বড়গিন্নীকে বাড়ী পাঠিয়ে দিলে। ডাক্তারকেও ডাকতে পাঠিয়ে দিলে। নিতাই বসাককে বললে, মাথাটা একটু ঠাণ্ডা ক'রে কাজ করতে হয়, বুঝলে না?

নিতাই বললে, কিন্তু কোথাকার কে ম'লো না বাঁচল তা নিয়ে আমাদের কি মাথাব্যথা!

—তোমার মাথা!

দুলাল সা জোরে জোরে মালা জপতে লাগল।

—এখন যদি নিবারণের একটা কিছু হয় তখন কি হবেটা ভেবেছ? মাথাটা ঠাণ্ডা ক'রে কাজ করবে—হরি হরি, হরিকে কি সাধ ক'রে ডাকি? যাও, এখন ফোটো তোলার ব্যবস্থা ক'রে ফেল, ছবিটা তুলে এখন একবার আমাকেই নিবারণকে দেখতে যেতে হবে—

ওদিকে মন্ত্রীমশাইকে নিয়ে সবাই ব্যস্ত। পাশের চেয়ারটা খালি রাখাই হয়েছিল দুলাল সা'র জন্যে। দুলাল সা সেখানেই গিয়ে বসল। ক্যামেরাম্যানকে বলা ছিল। সেও তৈরি। দুলাল সা বসতেই ক্যামেরাটা বাগিয়ে ধরলে।

ওদিকে খিড়কির দরজার সামনে দুলাল সা'র গাড়ির ভেতরে উঠে বসল বড়গিন্নী।

নতুন-বৌ দরজাটা আস্তে বন্ধ ক'রে দিয়ে বললে, আপনি কিছু ভাববেন না জ্যাঠাইমা, জ্যাঠামশাই না-ই বা থাকলেন, আমরা ত আছি, সময় পেলেই বাবাকে নিয়ে আমি যাব'খন, আপনি ভাববেন না—

দুলাল সা'র গাড়ি স্টার্ট দিয়ে সদর রাস্তায় গিয়ে পড়ল।

হাওড়ার জুটমিলের যাত্রা সেদিন যেন তেমন জমছিল না। 'রাণী রূপকুমারী' আরাকান রাজের মেয়ে। আরাকান-রাজ রাজ্য হারিয়ে বনে বনে, পথে পথে ঘুরে বেড়াচ্ছে। রাজ্যের ভেতরে বিদ্রোহ চলছে। সঙ্গে রাণী রূপকুমারী, আর মেয়ে বহ্নিবালা। কুমারী মেয়ে। পথ হারিয়ে তারা তিন জনে তিন দিকে চ'লে গেছে। খুব জমাটি নাটক। একবার শুনতে আরম্ভ করলে শেষ দেখে উঠতে হবে। দর্শকদের নট-নড়ন-চড়ন অবস্থা। অঞ্জনা যতদিন রাণী রূপকুমারীর পার্ট করেছে ততদিন এমনি চলেছে। দু'হাতে টাকা কামিয়েছে চণ্ডীবাবু। মোটা মোটা মাইনে দিয়েছে দলের লোকদের। সবাই অন্য দল ছেড়ে চণ্ডীবাবুর দলে এসে জুটত। খাওয়াটা ভাল দিত চণ্ডীবাবু। সাবান আর সরষের তেলটা এ-দলের লোকদের গাঁটের পয়সা খরচ ক'রে কিনতে হয় না।

চণ্ডীবাবু বলতেন, তাতে তোরা যদি খুশী থাকিস তা হ'লেই আমি খুশী বাবা, আমার আর কে আছে বল না, তোরাই ত আমার সব রে—

সামান্য সাবান আর সরষের তেল। কি-ই বা দাম! আগে ও নিয়ে চণ্ডীবাবু মাথা ঘামাতেন না। সস্তা রঙিন সাবান ডজন দরে চিৎপুরের পাইকিরী দোকান থেকে কিনতেন। আর সরষের তেল যখন যে-দেশে যেমন পাওয়া যায়। তা ওটা অনেক সময় পার্টিরাই যোগান দিত। নাম হ'ত চণ্ডীবাবুর।

বিড়ি-সিগ্রেটটাও অনেকে যোগান চেয়েছিল। কিন্তু তাতে রাজি হন নি চণ্ডীবাবু।

চণ্ডীবাবু বলেছিলেন, না রে বাবা, ওতে আমি ফতুর হয়ে যাব, তেল-সাবান দিচ্ছি, দিচ্ছি, ধোঁয়া আর যোগান দিতে পারব না—অত ধোঁয়া লাগলে আমার তবিল ফেল্ প'ড়ে যাবে—

তা তাই-ই সই। তা নিয়ে আর কেউ উচ্চ-বাচ্য করে নি।

চণ্ডীবাবু বলতেন, তা ছাড়া ধোঁয়া দিতে কি আর পারি না? পারি। কিন্তু পরের পয়সায় ফোকটে ধোঁয়া টেনে টেনে গলাটা কি আর রাখবি বাবা তোরা? গলার দফা রফা হয়ে যাবে—

কিন্তু সেই তেল-সাবানের দাম হু-হু ক'রে বাড়তে লাগল। আগে একটা সাবান পড়ত ছ'পয়সা কি বড় জোর আনা দু'য়েক। তারই দাম এখন পাঁচ আনা হাঁকে। আর তেল? চণ্ডীবাবুর দলের যেমন ভাঙন ধরতে লাগল, সরষের তেলের দামও তেমনি লাফিয়ে লাফিয়ে চড়তে লাগল। পাকিস্থানের বাজারটা গেল, আসামের বাজারটাও যাবে-যাবে, তার ওপর অঞ্জনার শরীরটা ভেঙে পড়ল। দলবল নিয়ে গেছেন বাঁকুড়াতে, প্রথম অঙ্কটা সেরে সাজঘরে এসেছে, হঠাৎ বলে, মাথাটা কেমন টিপ্ টিপ্ করছে যেন বাবা—

প্রথম প্রথম ওষুধের বড়ি ছিল। অ্যাস্পিরিনের বড়ি। যত জায়গায় যেতেন, সব জায়গা যশিশি-ভর্তি বড়ি নিয়ে যেতেন চণ্ডীবাবু। বলতেন, কিচ্ছু ভয় নেই, বড়ি খেয়ে এক ঘটি জল খেয়ে নে---

শেষকালে আর সে-বড়িতেও কাজ হ'ত না। তখন মিকশ্চার। ডাক্তারের মিকশ্চার খেয়ে খেয়ে কিছুদিন চলল। কিন্তু শেষকালে তাতেও কিছু হ'ল না। যে-কে-সেই। মাথা ধরা ছাড়ে ত জ্বর ছাড়ে না, আর জ্বর ছাড়ে ত মাথা ধরা ছাড়ে না। ডাক্তার বলেন, এ রাজরোগ!

ব্যস্! সেই যে অঞ্জনার রাজরোগ হ'ল, সেই থেকে "শ্রীমানী অপেরা"ও কানা হয়ে গেল। আগেকার নাম যেটুকু আছে তাই ভাঙিয়েই খাওয়া। একটা মেয়ে নেই যুৎসই যে দলটাকে টেনে তোলে। তবু এককালে 'অকূলের কাণ্ডারী'র নাম-ডাক ছিল তাই 'শ্রীমানী অপেরা' এখন কল্ পায়। কিন্তু খানিকক্ষণ গাওনা দেখেই লোকে বুঝতে পারে। বলে, আরে এ যে মদ্দা রাণী—

গোঁফ-টোফ চেঁছে কামিয়ে, ভাল সাটিনের ব্লাউজ, জর্জেট সিল্কের শাড়ি পরিয়ে দিলেও ধরা পড়ে। তার পর বিড়ি খেয়ে-খেয়ে ঠোঁটটাকে এমন কালিমাড়া ক'রে রেখেছে মক্কুটা যে রসিক মানুষের চোখ এড়ায় না। বঙ্কুকে অনেক দিন থেকে বদল করবার চেষ্টা করছিলেন চণ্ডীবাবু কিন্তু তেমন লোক মেলে কোথায়। কলকাতার থিয়েটার ফেলে কে আর মফঃস্বলে-মফঃস্বলে মাঠে-ঘাটে ঘুরে বেড়াতে চায়। বঙ্কু যখন মিহি গলায় আসরে গিয়ে হাত নেড়ে-নেড়ে বলে—

কোথা যাব, কোথা যাব অবলা রমণী,
কে আছে আমার?
কার কাছে মাগিব আশ্রয়, বল অন্তর্য্যামী ··

তখন আসর থেকে সিটি বাজায় লোকেরা। অমন একটা চমৎকার এ্যাক্টিং জমে না। নাটক ঝুলে পড়ে।

হাওড়া জুট-মিলেও সেদিন তাই হচ্ছিল। চণ্ডীবাবু সাজঘরে ব'সে ব'সে ডাবা হুঁকো খেলে হবে কি, মন আর কান প'ড়ে ছিল আসরে। জুট-মিলের বাবুরা মোটা টাকা আগাম দিয়ে বায়না করেছিল। এখন যদি একটা হৈ-চৈ বাধে ত গাল চাপা দিয়ে দেবে সবাইকে। শ্রীমানী অপেরা'র বারোটা বেজে যাবে।

চণ্ডীবাবু তামাক খেতে খেতে বললেন, ফকরে, গোলমালটা একটু থেমেছে নাকি রে?

ফকির বললে, এখন ত দুর্গাভরামের এ্যাক্টো হচ্ছে, এখন ত চেঁচাবে না কেউ—চেঁচাবে এর পরে—

কর্তামশাই চেয়ারের ওপর চুপ ক'রে বসেছিলেন। এমন জায়গায় জীবনে কখনও আসেন নি আগে। ছোট-বেলায় তিনিই কতবার যাত্রা দেখেছেন। তাঁরই বাড়ীতে কতবার 'নল-দময়ন্তী'র পালা হয়েছে। 'হরিশ্চন্দ্র' পালা হয়েছে। 'বিজয়-বসন্ত' পালা হয়েছে। কেষ্টগঞ্জের লোক ভিড় ক'রে এসেছে তাঁর বাড়ীর সামনের মাঠে। এখন এসব কথা বলার জায়গাও এটা নয়।

চণ্ডীবাবু বললেন, ফরিদপুরের কেষ্টগঞ্জে সেবার খুব নলেন্ গুড় খাইয়েছিল আমাদের, বুঝলেন মশাই। ওঃ, গুড় খেয়ে-খেয়ে দলের লোকদের ত একেবারে পেট ছেড়ে দিলে! আহা কি গুড়, আমরা কলকাতার লোক সে-রকম গুড় চোখেও দেখতে পাই নে—আপনাদের ওখানে গুড় কেমন?

ফকির বললে, না কত্তা, পেট ত গুড় খেয়ে ছাড়ে নি, পেট ছাড়ল ছোলার ডাল খেয়ে···

—তুই থাম ত ফকুরে, তুই বেটা পেটুকের সর্দ্দার, হ্যাঙলার মত যা পাবি কেবল তাই খাবি। কলকেয় ঠিকুরে দিয়েছিস?

—দিয়েছি কত্তা, ঠিকুরে না দিলে তামাক সাজা হয়?

—তা'লে ধোঁয়া বেরোচ্ছে না কেন? টেনে-টেনে আমার গাল তেবড়ে গেল যে?

কর্ত্তামশাই আর থাকতে পারলেন না।

বললেন, দেখুন আমি অনেকক্ষণ ব'সে আছি, সত্য মালো বোধ হয় নেই আসরে—

—সে কি কথা!

চণ্ডীবাবুর যেন আঁতে ঘা লাগল। জিজ্ঞেস করলেন, আপনি ঠিক শুনেছেন আপনার লোক এই কলে কাজ করে?

কর্ত্তামশাই বললেন, আজ্ঞে আমি ত সেই রকমই জানি, সমস্ত মালোকেই আমি চিনতাম, আমারই প্রজা ছিল সে, তার ছেলে সত্য মালো, সেই সত্য মালোর ছেলে এখানে কাজ করে শুনেছি—জরুরী কাজ না থাকলে আমি এই বুড়ো বয়েসে মরতে মরতে এখানে আসি—আমার কাজ নয়, দায়। প্রাণের দায়ে এসে পড়েছি এই বিদেশ-বিভুঁই-এ—

বলতে বলতে কর্ত্তামশাই যেন একটু দম নিলেন।

একটু থেমে আবার বলতে লাগলেন, সেই সকাল বেলার ট্রেনে চেপেছি, বিকেল বেলা নেমেছি শেয়ালদা' স্টেশনে, এমন জায়গায় জীবনে কখনও আসি নি, আসবার প্রয়োজন হয় নি আমার কখনও। আপনারা এই যাত্রার কথা বলছেন, আমি শুনছি বসে বসে. এই যাত্রা আমি আমার বাড়ীর উঠোনে একদিন দিয়েছি, জানেন! হাজার-হাজার লোক এসে একদিন আমার দেউড়ির উঠোনে ব'সে যাত্রা শুনে গেছে—যাক্‌-গে সে-সব দুঃখের কথা, আমি উঠি এখন, রাত্তিরের ট্রেনে আবার ফিরে যেতে হবে আমাকে—

চণ্ডীবাবু বললেন, তা এত রাত্তিরে ফিরবেন কি ক'রে?

—তা ফিরতে পারি আর না-পারি ইষ্টিশানেই পড়ে থাকব—থাকবার জায়গা ত আর নেই!

—তারপর?

—তারপর মাথার ওপর ভগবান্‌ আছেন।

চণ্ডীবাবু যেন এতক্ষণে একটু সচেতন হলেন। বৃদ্ধ লোক। চেহারা দেখে বুঝলেন বড় বংশের লোক। বললেন, তা সঙ্গে কাউকে নিয়ে আসতে হয়। এ কলকাতা শহর! আপনি বৃদ্ধ মানুষ। আমার দেখুন না, এই বাহান্ন বছর বয়েস হ'ল, আর তেমন তেজ নেই, এই আমিই একদিন···

তারপর কথার মধ্যেই হঠাৎ যেন কি মনে প'ড়ে গেল।

—এই নিকুঞ্জ হারামজাদা, ঘুমোচ্ছিস যে, ঘণ্টা দিলি নে? এক অঙ্ক হয়ে গেল হুঁশ নেই? মেরে তোর তবলা খিঁচে দেব না!

নিকুঞ্জ একটু একটু নেশা করে তা জানা ছিল চণ্ডীবাবুর। গালাগালি খেয়ে তাড়াতাড়ি তড়াক ক'রে লাফিয়ে উঠে পেটা-ঘড়িটা ঢং ক'রে বাজিয়ে দিয়েছে নিকুঞ্জ। ওই ঘণ্টা শুনেই আসরে বাজনদাররা কনসার্ট সুরু করবে। বাজনা বাজাবার সঙ্গে সঙ্গে দুর্লভরাম আর বঙ্কু এসে হাজির। নেমে নেয়ে উঠেছে দু'জনেই। বঙ্কু শাড়িটা পা থেকে তুলে খ্যাশ খ্যাশ ক'রে চুলকোতে লাগল।

—বাপ রে বাপ, এইসা মশা হয়েছে, পা একেবারে ফুলিয়ে দিয়েছে মাইরি।

কর্ত্তামশাই তখন হাতের পোঁটলাটা নিয়ে দাঁড়িয়ে উঠেছেন। ঘরে তখন আর দাঁড়াবার জায়গাও নেই। সখীর দলের ছোকরারা, রাজা, রাণী, পাত্র-মিত্র সবাই ঢুকে পড়েছে ঘরটিতে। চণ্ডীবাবু তাদের নিয়েই ব্যস্ত।

তবু তারই মধ্যে কর্ত্তামশাই ভদ্রতা ক'রে বললেন, আচ্ছা আমি আসি তা হলে—

ব'লে চলেই যাচ্ছিলেন দরজার বাইরে। হঠাৎ [illegible] যেন এসেই বললে, এই যে ইনি—ইনিই ডাকাচ্ছিলেন—

কর্ত্তামশাই চেয়ে দেখলেন লোকটার দিকে। চিনতে পারার কথা নয়, চিনতে পারলেনও না। শুধু বললেন, তোমার নাম···তুমি সত্য মালোর ছেলে?

ছেলেটা কিছু বুঝতে পারলে না। পরণে লং কালো প্যাণ্ট, গায়ে কামিজ, ওল্টানো চুল।

ছেলেটা বললে—আপনি কে?

—আমি কাত্তীশ্বর ভট্টাচার্য্য, কেষ্টগঞ্জের কর্ত্তা মশাই—

এক নিমেষে যেন ম্যাজিক হয়ে গেল। ছেলেটা নীচু হয়ে পায়ে হাত দিয়ে মাথায় ঠেকালে। বললে আমার বাবা আসরে ব'সে আছে, আমি ডেকে আনছি গিয়ে—

তারপর সেই অচেনা জায়গা, সেই ভিড়, [illegible] পরিশ্রম, সেই সারাদিনের অনাহার সব মিলে [illegible] কর্ত্তামশাই-এর মনে হ'ল তিনি সেখানেই প'ড়ে যাবেন

সমতল মাটির ওপর পা দু'টো রেখে দাঁড়াবার ক্ষমতাটুকুও যেন তাঁর লোপ পেয়েছে। তিনি থর থর করে কাঁপতে লাগলেন। তার পর আর তাঁর কিছুই খেয়াল নেই। তাঁর চোখের ওপরই সমস্ত একাকার হয়ে গেল। শুধু মনে আছে তাঁর যেন খুব জল তেষ্টা পেয়েছিল। জল, একফোঁটা জল···

মিনিষ্টার কবে চ'লে গেছে। মিনিষ্টার আসার খবরটাও পুরনো হয়ে গেছে কেষ্টগঞ্জের মানুষের কাছে। কেষ্টগঞ্জের ইছামতীর ঘাটে তারপর পাটের ব্যাপারীরা এক খেপ মাল নামিয়ে আবার খালি নৌকো নিয়ে এসে হাজির হয়েছে। পেঁপুলবেড়ের বাঁওড়ে আবার মজুরদের কাজ আরম্ভ হয়ে গিয়েছে। সেদিকে গেলে আর চেনা যায় না। সদানন্দ না থাক, কাজ বন্ধ হয়ে থাকে নি তা ব'লে, ইঁটের পাঁজা থেকে সার সার মজুরের দল মাথায় ক'রে ইঁট বয়ে এনে গাঁথুনি সুরু ক'রে দিয়েছে। সুগারমিল্ হবে এ-খবরটা রটে গেছে। আর ক'দিন সবুর কর তখন এখানেই আবার গম্ গম্ ক'রে কল চলবে। গাঁয়ের লোকজন চাকরি পাবে।

মুকুন্দ বলে—ধর্মের কল বাতাসে নড়ে সা'মশাই, আপনিই বলেছিলেন—

দেখা হ'লে আগে অনেক কথা বলত দুলাল সা একটা কথার সূত্র পেলে সেই কথা থেকেই হরির কথা আসত। কিন্তু সেই মানুষও যেন কেমন হয়ে গেছে।

বলে—না রে মুকুন্দ, কারোর মন্দ দেখে হাসতে নেই রে, ওটা পাপ—

মুকুন্দ বলে—পাপ-পুণ্যের কথা ত জানিনে সা'মশাই : যা দু'চোখ্যে দেখছি তাই বলছি—

—তা হোক, তবু দেখলেও বলতে নেই, ওতে পাপ হয়—এই দেখ না, সদানন্দ মিছিমিছি ক'টা দিন হাসপাতালে প'ড়ে প'ড়ে ভুগল, তার জন্যেও আমার ভোগান্তি আর নিবারণটা দোষ ক'রে ভুগল তার জন্যেও আমার ভোগান্তি! আমার দু'নো খরচ—

মুকুন্দ বলে, তা আপনি কেন সরকারমশাই-এর জন্যে গাঁটের কড়ি খরচ করতে গেলেন সা'মশাই।

এ কথার উত্তর দুলাল সা দেয় না। শুধু বলে—হরির কাছে ও সদানন্দও যা আর ওই বদমাইশ্ নিবারণটাও তাই—আমার কাছে দু'জনেই সমান, দু'জনেই হরির জীব—

ব'লে দুলাল সা ভিজে কাপড়ে বাড়ীর দিকে চ'লে যায়। এমনিতে দুলাল মুখে যা বলে, সে যে কাজেও তাই করে তারই প্রমাণ পাওয়া গেল। কর্তামশাই বাড়ীতে নেই ব'লে কি দুলাল সা'ও ম'রে গেছে? যারা সুদ দিতে আসে তাদের বলে—শীগ্গির কর গো মোড়ল, তোমার টাকার জন্যে আমার ব'সে থাকবার সময় নেই, আমাকে আবার নিবারণকে দেখতে যেতে হবে—

নিতাই বসাক যেমন সুগারমিলের তদারকি নিয়ে ব্যস্ত,—ইঞ্জিনীয়ার, স্পেশ্যালিষ্ট, এক্সপার্ট, পারমিট এই সব নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছে, দুলাল সা নিবারণকে নিয়ে তেমনি ব্যস্ত।

দুলাল সা বলে—আমার সুগারমিল হোক্ আর ন-হোক্, নিবারণ ভাল হলেই বাঁচি—আহা—

সকাল বেলা জপ্ তপ্ আহ্নিক সেরে উঠেই দুলাল সা তৈরি হয়ে নেয়।

নতুন-বৌও তৈরি থাকে। তারপর গাড়ীতে উঠে একেবারে সোজা ভট্টাচায্যি বাড়ীতে। কীর্তীশ্বর ভট্টাচায্যির সদরের দেউড়িতে নেমে নতুন-বৌকে নিয়ে দুলাল সা ভেতরে গিয়ে একেবারে নিবারণের তক্তপোশের ওপরে গিয়ে ব'সে পড়ে। জিজ্ঞেস করে—কেমন আছ আজ নিবারণ?

এমনি রোজ। এবেলা-ওবেলা।

বাড়ীর ভেতরে গিয়ে নতুন-বৌ ডাকে, জ্যাঠাইমা—

বড়গিন্নী বড় মুষড়ে পড়েছে। কর্তামশাই সেই যে একদিন ভোরবেলা কলকাতায় যাব ব'লে বাড়ী থেকে বেরিয়ে গেছেন তারপর থেকে তাঁর আর কোনও সংবাদ নেই। নতুন-বৌই দু'বেলা এসে খাইয়ে যায়। সান্ত্বনা দেয়। অভয় দেয়। বলে—আপনি না খেলে কিন্তু আমিও খাব না আজকে, আমিও উঠছি না এখান থেকে, এই ব'লে রাখলাম—

নেহাৎ ছোঁয়াছুঁয়ির ব্যাপার নইলে নতুন-বৌ নিজের হাতে রান্না করেও দিয়ে যেত।

নতুন-বৌ বলে, আমারও ত মা নেই জ্যাঠাইমা, আমাকে না-হয় আপনার মেয়ে বলেই মনে করুন—

কখনও ওষধ আনে হাতে করে। কখনও ক্ষেতের তরিতরকারি, বাগানের ফল-ফুলুরি। দুলাল সা'ই ব'লে দিয়েছে। বড় মানী বংশ। যখন কিছু ছিল না আমার, যখন খেতে পেতাম না, তখন এই কর্তামশাই-এর কৃপাতেই আমি বেঁচে ছিলাম নতুন-বৌ। সেই সব পুরনো কাহিনী স্মরণ ক'রে নতুন-বৌ যেন এ বাড়ীর একজন হয়ে ওঠে।

•ওদিকে নিবারণের কাছে ব'সে দুলাল সা বলে, ওই পেঁপুলবেড়ের বাঁওড়, ওই একটা তুচ্ছ বাঁওড়

নিয়ে তুমি জীবন খোয়াতে গিয়েছিলে নিবারণ, তোমাকেও ধিক্! বলি সম্পত্তি আগে না জীবন আগে? জীবন গেলে সম্পত্তি কে খাবে শুনি? তুমি না তোমার কর্ত্তামশাই? না তোমার কর্ত্তামশাই-এর ছেলে? তা সে ফটিকও ত নিরুদ্দেশ! কার জন্যে এত তেনস্থা শুনি?

প্রশ্নগুলো একাই করে দুলাল সা আবার একাই উত্তর দেয়।

বলে—কেউ না, বুঝলে নিবারণ, কেউ না। তা যদি হ'ত ত আমিও কর্ত্তামশাই-এর মত দিনরাত সম্পত্তি সম্পত্তি করেই কাটিয়ে দিতাম! আরে দুত্তোর, সম্পত্তির নিকুচি করেছে। সম্পত্তির মাথায় মারি ঝাঁটা। সম্পত্তি হলেই যদি স্বর্গলাভ হ'ত ত আমি দিনরাত হরিনাম করব এমন বেকুব নই—

প্রথম-প্রথম দুলাল সা বলত—কিন্তু একটা মতলবে গেছেন বই কি! নইলে শুধু শুধু কি আর তিনি এতদিন কলকাতায় প'ড়ে আছেন—

নিবারণ বলত. কিন্তু একটা চিঠিও ত দিলেন না পৌঁছান সংবাদ দিয়ে—

দুলাল সা বলল -কাজে-কম্মে ব্যস্ত আছেন আর কি—

নিবারণ বলত—এমন কি কাজ তাও ত জানি না—

এমনি করেই চলছিল। কিন্তু হঠাৎ একদিন অঘটন ঘটে গেল। আর ঘটনাটা ঘটল দুলাল সা আর নতুন-বৌ-এর চোখের সামনেই।

সেদিন পোষ্টাপিসের পিওন এসে সরকারী একটা চিঠি দিয়ে গেল। গাঁয়ের পিওন। দুলাল সা'কে দেখে প্রণাম করলে।

—কি গোপাল, ভাল আছিস বাবা? বাড়ীর সব ভাল?

—আজ্ঞে সরকারমশাই-এর একখান চিঠি আছে—

সরকারমশাই শুয়ে ছিল। অবাক্ হয়ে উঠে বসল। তাকে আবার কে চিঠি লিখবে! দুলাল সা'ও অবাক্ হ'ল। নতুন-বৌও বুঝতে পারলে না কে চিঠি লিখলে। দরজার আড়ালে বড়গিন্নীও দাঁড়িয়ে ছিল।

নিবারণ চিঠিটা হাতে নিয়েই বললে—কর্ত্তামশাই লিখেছেন, কলকাতা থেকে—

নিবারণ শুনিয়ে শুনিয়েই পড়তে লাগল। কর্ত্তামশাই লিখেছেন—

সদা সুখাভিলাষ প্রসাদ প্রণত ভবতব আশীর্ব্বাদকে শ্রীশ্রীঈশ্বর দেবশর্ম্মণঃ পরম শুভাশীষাং রাশয়সন্তু পরম তোমার সুখ স্বচ্ছন্দে সানন্দ বিশেষঃ। অত্র পত্রে বিশেষ সুসংবাদ জ্ঞাত করাইতেছি। শ্রীশ্রীভগবানের পরম অনুগ্রহে কল্যাণীয়া হরতনকে প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে।···

আর পড়তে পারলে না নিবারণ। গলাটা যেন বুজে এল তার। হরতনকে পাওয়া গেছে! চোখ দু'টো হঠাৎ যেন ঝাপ্সা হয়ে এল। যেন বিশ্বাস হ'ল না। নিজের মনেই আবার বার দুই লাইনটা পড়লে নিবারণ।

দুলাল সা ব'লে উঠল—হরি হরি, হরিই ভরসা, হরিই ভরসা—

নতুন-বৌ-এর মুখেও কথা বন্ধ হয়ে গেছে।

নিবারণ হঠাৎ ব'লে উঠল—কর্ত্তামা, কর্ত্তামশাই হরতনকে সঙ্গে নিয়ে পরশুদিন আসছেন।

যেন এক মুহূর্ত্তেই নিবারণের সব অসুখ ভাল হয়ে গিয়েছে। যেন কি করবে বুঝতে পারছে না সে। তক্তপোশের ওপর ব'সে ব'সেই ডাকলে—কর্ত্তামা, কর্ত্তামা—

বড়গিন্নী দরজার আড়ালেই দাঁড়িয়ে ছিল। নিবাক্ নিথর নিস্পন্দের মত। মনে হ'ল তার পায়ের তলাকার যেন মাটি স'রে যাচ্ছে। বড়গিন্নীর মুখে কোনও দিন কথা ফোটে না। আজ যেন তা সম্পূর্ণ মূক হয়ে গেল। অন্তর্য্যামীর উদ্দেশে দু'হাত জোড় ক'রে প্রণাম করবার ক্ষমতাটুকুও যেন তার লোপ পেয়ে গেছে।

ক্রমশঃ

নারদ
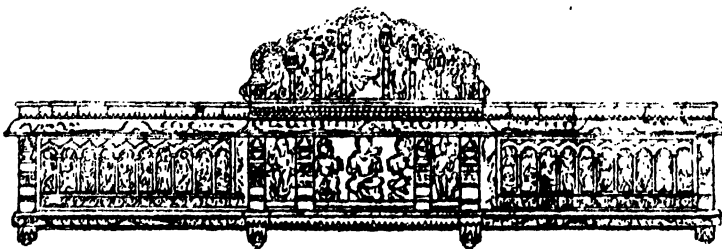
শ্রীকালিদাস রায়

কাহারেও তুমি কর নাকো ভয়,
কাহারেও কভু দ্বেষ কি ঘৃণা।
স্বর্গমর্ত্ত্যে সেতু রচিয়াছে তোমার বীণা।
ত্রিলোক তোমার হস্তামলক,
বিস্মিত নহে ত্রিকাল তব।
তুমি মহাযোগী, তব যোগাযোগে
সম্ভব হয় অসম্ভব-ও।
যক্ষ, রক্ষঃ, কিন্নর, নর,
দেবাসুর তব আপন জন।
বিশ্ব-যজ্ঞে এড়াবে কে তব নিমন্ত্রণ?
তুমি প্রজাপতি, তুমিই ঘটক
জুটাও সবারে স্বয়ংবরে।
হে চির পান্থ, হরিগুণ গাও,
তাহাই পথের ক্লান্তি হরে।
সংসারী নও, সংসার গড়া তোমার ব্রত।
ভব সংসারে বিরাগ ঘটাতে
কে পারে আবার তোমার মতো।
দেবতারা সব ভাব-বিগ্রহ
মায়াকল্পিত, তাদের মাঝে—
রক্তমাংসে তুমি জীবন্ত,
ধরার বিহার তোমারি সাজে।
শুকদেব নও নেহাৎ তাই তো
ভালবাসি তোমা হে রসরাজ,
মনে পড়ে রাজা অম্বরীষেরে?
থাক, সে কথায় নেইক কাজ।
চির যৌবন করিতে গোপন
হে রসিক, ধরো ঋষির বেশ;
তোমার জটার ফাঁকে দেয় উঁকি
কালো কুচকুচে চাঁচর কেশ।
তোমার বীণায় পাই যে গীতের সঙ্গে গীতা।
আধেক ঠাকুর, আধা দাদা তুমি
দুইয়ে মিলে দাদাঠাকুর মিতা।
তোমার জটার রশ্মিজালে
নব জ্যোতিষ্ক যেন শোভা পায় গগনভালে।
দেব নর পায় আশ্বাস তায়,
ছায়াপথে তব 'হিমাংচয়ে।'
অসুরেরা তারে ধূমকেতু ভাবি লুকায় ভয়ে!

সবার বার্তা করিছ বহন
তবু তুমি কারো ভৃত্য নহ,
চির জঙ্গম দশম গ্রহ, গতিবিধি তব অনুগ্রহ।
তোমারে হেরিয়া কুণ্ঠিতা অব-
গুণ্ঠিতা কভু হয় না নারী,
শুদ্ধান্তের চির কঞ্চুকী
পথ ছাড়ি দেয় সকল দ্বারী।
জীবন তোমার সরল কাব্য
গতিই তাহাতে ছন্দোধারা।
রসের যোগান দেয় তার রবি-চন্দ্র-তারা।

তব আতিথ্য যেখানে সেখানে
শুভাশিস-বাহী তোমার পাণি,
সংকটদা যহলে আসন্ন
শুনাও সতর্কতার বাণী।
আতিথ্যে তুমি ধর' না ত্রুটি,
পাদ্যের তরে বাড়ায়ে দাও না চরণ দু'টি!

স্থাণু হয়ে সুধা পিয়ে দেবতারা
আলস বিলাসে কাটায় দিন।
তুমি গতি সেই অগতিগণের
কাজে ও অকাজে বিরামহীন।
তুমি জানো কেবা বিরাট যজ্ঞ
করিছে ইন্দ্র-পদের লাগি,
তপ করে বনে কোথা কে গোপনে,
জপ করে কেবা রজনী জাগি—
সেই বার্তাটি বহন করিয়া
অপ্সরীভুজবন্ধাপীন
বাসবের মোহ স্বপ্ন ভাঙিয়া
করো সত্যের সম্মুখীন।

লোকে বলে তুমি দ্বন্দ্ব বাধাও,
তাও নিতান্ত মিথ্যা নয়,
বিনা দ্বন্দ্বে কি চৈতন্যের হয় উদয় ?
দ্বন্দ্ব না হ'লে সুপ্ত শক্তি জাগিবে কিসে ?
ধর্ম্মাধর্ম্ম একাকার হয়ে যাবে যে মিশে।
বিনা দ্বন্দ্বে যে বিশ্বনাট্যে
হয় নাকো কভু রসোৎসার,
তোমার মতন কে বা জানে ? তুমি
বিশ্বনাটের সূত্রধার।
দেবের দৌত্য করিয়া বেড়াও
অরসিক লোকে তাহাই বোঝে।
তুমি যে গোসাঁই অকাজের চাঁই
ঘোরো ত্রিভুবনে রসেরই খোঁজে।

জানে কয়জন তব অকারণ
যত অঘটন ঘটন ব্রত
গন্ধ, স্বাদুতা, ছন্দ জাগাতে
সুখেরে করিয়া দ্বন্দ্বাহত।
শুধু তো দ্বন্দ্বে জমে নাকো রস,
জমে তা দ্বন্দ্ব-সমন্বয়ে।
জিনিল তমসা পুলিনের কবি
দ্বিধা দ্বন্দ্বেরে অসংশয়ে—
রস প্রেরণায়, শিখাইলে তায়
'ঘটে যা তা সব সত্য নহে,'
কবি যাহা রচে তাহাই সত্য,
তাই মহাকাল শীর্ষে বহে।

—০—

যীশু

শ্রীসুধীরকুমার চৌধুরী

অন্ধকারে বারান্দাটার রেলিঙে ভর দিয়ে
দাঁড়িয়ে ছিলেন যিনি,
একটুখানি সামনে ঝুঁকে লম্বা মানুষটি,
দেখেই কেমন মনে হ'ল,
যীশু।

গুডফ্রাইডে সেদিন, সেটা মনে পড়ল যখন,
বারান্দাটার রেলিং ধ'রে দাঁড়িয়ে ছিলেন যিনি
লম্বা মানুষটি,
হঠাৎ কেমন মিলিয়ে গেলেন হাওয়ায়।

হাওয়ায় রইল, আর কিছু নয়, আশ্চর্য্য এক গন্ধ।
গন্ধ সে কি ? না কি মনের ছোঁওয়া ?
কি সেটা সে, জানে, যারা মানুষ ভালবাসে।

আমি মানুষ ভালবাসি, হয়ত বা তাই জানি,
কার ছোঁওয়া যে ছিল সেদিন হাওয়ায়।

হয়ত হবে মনেরই ভুল, মনেরই ভুল হবে,
তবু দু'টি জলভরা চোখ
তারাভরা দূর আকাশে তুলে
কতবার যে ডেকে বলেছিলাম,
সব-মানুষের চেয়ে মানুষ যীশু,
যীশু, তুমি দেবতা হ'য়ো না।

গুডফ্রাইডের দিনে
তোমার যারা ভক্ত তাদের হাতে
ক্রুশে বেঁধা তোমার মানুষ-হাতের রক্ত ঝরে।
সেদিন যখন চোখ মুছেছি রাতে,
অন্ধকারে ভিজে হাতের রঙ দেখেছি, লাল।
হয়ত হবে মনেরই ভুল, মনেরই ভুল হবে;
তবু চোখের জলে ভিজে বলেছিলাম ডেকে,
তোমার মানুষ-দেহের রক্ত আমার রক্তে মিশে
রক্ত-অশ্রু হয়ে ঝরুক না ?
তুমি মানুষ, তোমার দুঃখে কেঁদে
কাঁদতে কাঁদতে ভালবাসতে দাও।
যীশু, তুমি দেবতা হ'য়ো না।

তোমায় নিয়ে গিয়ে যারা কালভারী প্রান্তরে
হাতে পায়ে পেরেক ঠুকে চড়িয়েছিল ক্রুশে,
তোমার কোমল হাতে পায়ে পেরেক ঠুকে, যীশু,
মানুষ তারা ত ?
জানতে তাদের দুর্ব্বলতা নিজে মানুষ ব'লে।
মানল না মন নিজে ক্ষমা ক'রে,
দেবতা যে করেন না ক্ষমা,
তাঁর শাস্তি অমোঘ যে,
জানতে ব'লে বলতে হ'ল ডেকে,
পিতা ! ক্ষমা কর !
চেয়েছিল মানুষী মার্জ্জনা,
নিজে মানুষ ব'লে।

সব মানুষের চেয়ে মানুষ, যীশু,
জানতে মানুষের
মৃত্যুশোকের চেয়ে বড়
নেই যে বেদনা।
ডাক দিলে কি শক্তি নিয়ে আত্মপ্রত্যয়ের,
পৌঁছল ডাক নিষ্প্রাণেরও কানে,
মৃত্যু হতে উঠল লাজারাস,
আঁধার কবর হতে যেন ঘুম ভেঙে উঠল !

আবার কি কেউ উঠবে তেমন ক'রে ?
উঠবে যে, তা বলতে তুমি নিজেই উঠেছিলে
মৃত্যু হতে, লম্বা মানুষটি,
ক্রুশের দুঃখ সয়ে,
মানুষ হয়ে ম'রে।
মানুষকে কি বলতে এলে, মানুষ কি বুঝল !

যে-হাওয়াতে মিলিয়ে গেলে, আছ ত সেই হাওয়ায় ?
জিজ্ঞাসা তাই করি,
এ না হলে চলতে পারে তার ?
মৃত্যু হতে উঠতে যদি না পারে সে,
কিছুই হ'ল কি ?
কি হবে তার গ্রহযাত্রা ক'রে ?
নিজের প্রাণের বিনিময়ে প্রাণের নিধিটির—
মৃত্যুশিথিল দেহে
প্রাণ ফিরিয়ে আনতে যে পারল না,
মনেতে হ'ল আত্মার সে চরম অপমান,
পরম পরাভব
লজ্জানত শিরে,—
মহাকাশের পারে
অন্য কোনো ছায়াপথের সীমায়,
দৃষ্টিপারের দূর তারকার কোনো একটি গ্রহে
যায় যদি সে হতভাগা বিজ্ঞানীদের কৃপায়,
মৃত্যুকে সে যা দিয়েছে একটু কিছু তার
সেইখানে কি ফিরে পাবে ?

তুমি হাসছ। না কি কাঁদছ ?
তুমি কাঁদছ, যীশু !
যীশু, তুমি দেবতা হ'য়ো না।

—•—

যদি বারণ কর

শ্রীকামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

যদি বারণ কর তবে ফিরতেই হবে
আসা-যাওয়া বারবার। মুহূর্ত উৎসবে
মনের ফানুসটিকে আকাশে ওড়াই
চকিত পলকে ভাবি : তোমাকেই।

অদৃশ্য ভাবনার বোঝা। আছে কোনো মানে ?
শীতের আমেজ জমে প্রদোষ অঘ্রাণে।
একলা চলার পথ আদিগন্তে মেশা
তোমাকে পাবার ভাবনা—দুরন্ত সে নেশা।

সূর্য ওঠার সময় আকাশের আলো
যাবার সময় সূর্য বাতাসকে ভালোবাসলো ?
মনের মিনারে নানা কারুকাজ
প্রদোষ অঘ্রাণ সভায় ভয়ে-ভয়ে আজ
দাঁড়াই তোমার কাছে।
বসন্ত ফেরার। দেখি বিন্দু বিন্দু শিশির ঝরছে।

রোমন্থন

আভা পাকড়াশী

হ্যাঁ, ও মরে গেছে। সত্যিই মরে গেছে। চোখ দুটো খোলা, চেয়ে আছে আমারই দিকে, তবে ভাবলেশহীন। সেখানে কোন ব্যঞ্জনা ফোটে নি, মুখটা অল্প একটু হাঁ হয়ে রয়েছে, গঙ্গাজলটা গলা পর্য্যন্ত পৌঁছায় নি, মাটিতে গড়াচ্ছে। লেজটা কেমন সোজা কাঠ হয়ে গেছে। পিঁপড়েগুলো সার বেঁধে আসতে সুরু করেছে, আর ঘরভরা এত দুর্গন্ধ, ওটা কাটাতেই ত ধূপ জ্বেলে দিলাম।

আমার কি কষ্ট হচ্ছে না ওকে এই অবস্থায় দেখে? না। এখন আমার মনের অবস্থাটা অদ্ভুত। না আছে মুক্তি পাওয়ার আনন্দ, না আছে বিচ্ছেদের বেদনা। শুধু এইটুকু বোধ আছে যে, একটা অসন্তোষের ঢেউয়ে পূর্ণচ্ছেদ পড়েছে। শুধু একটা যতি, অবশ্য এইটা স্থায়ী নাও হতে পারে। উনি ইচ্ছে করলে কালকেই পাঁচ বছর আগের সেই লাকির মত একটা ছোট্ট কালো বল নিয়ে আসতে পারেন, আর বলতে পারেন, নাও এটা, তোমার জন্য আনলাম। কিন্তু সেটা যে কত বড় মিথ্যে তা আর আমার চেয়ে বেশী করে কে জেনেছে? কে বুঝেছে?

ঘড়িটা টিক টিক করে বেজেই চলেছে। কতক্ষণে আসবেন উনি? ওটা যে মরতে বসেছে সে ত দেখেই বেরিয়েছেন। তবে? আর খোকনটাও কেমন অসাড়ে ঘুমোচ্ছে। তিনতলার ফ্ল্যাট, একেই নিঃশব্দ। এখন নীচের দোকানগুলোও এক এক করে বন্ধ হচ্ছে, রাত দশটা প্রায় বাজে।

আচ্ছা, যখন দরজা খুলেই ওঁকে এই খবরটা প্রথমে দেব তখন? তখন ওঁর মুখের চেহারাটা কি রকম হবে? কিন্তু আমার? আমার মুখের চেহারাটা এখন কেমন হয়েছে? নাঃ, দুঃখু দুঃখু ভাব ফোটাতেই হবে মুখে। ফোটাতে হ'ল না, আপনিই চোখে জল আসছে, ঐ দেহটা ছোট্ট ক'রে ভাবলে, তখন যে ও কিছু জানত না। চামচে করে দুধ খাইয়েছি গলায় তোয়ালে জড়িয়ে। খালি খলবল করত। তখন ছোট ছেলের মত কোলের ওপর চেপে ধ'রে দুধ ঢুকিয়ে দিয়েছি মুখের মধ্যে, কম্বলের টুকরো জড়িয়ে প্যাকিং বাক্সটার মধ্যে রেখেছি। কুঁই কুঁই করলেই রাত্রে উঠে উঠে দেখেছি, ভিজে কাপড় বদলে দিয়েছি, কত সময় লেপের মধ্যে নিয়ে শুয়েছি। ভাল কি আমিই ওকে কম বাসতাম? কিন্তু ভালবাসতে দিল না যে? মাঝখানে এসে দাঁড়ালেন যে উনি অবিশ্বাসের ধোঁয়া নিয়ে।

আশ্চর্য্য, কুকুরটার কিন্তু বুদ্ধি ছিল মানুষের বাড়া। যেদিন থেকে বুঝল, যে, কে ওকে বেশী প্রশ্রয় দেয়, সেদিন থেকে ওর আচরণ সম্পূর্ণ বদলে গেল। অথচ আগে, সেই যেদিন গরু দেখে ভয় পেয়ে ছুটে রাস্তার ওপারে যেতে গিয়ে সাইকেল চাপা পড়েছিল, পায়ে খুব লেগেছিল—ভেঙ্গে গিয়েছিল সামনের বাঁ-পাটা, সেদিন বাড়ী এসে আমার কোলে মুখ ঢুকিয়ে কুঁই কুঁই করে কি কান্না! আর খালি খালি সেই ব্যথা পা-টা আমার কোলে তুলে দিচ্ছে—যেন বলছে, বড্ড ব্যথা করছে, সারিয়ে দাও। হাত থেকে চেন ছাড়িয়ে নিয়ে ছুট দিয়েছিল লাকি। বড় খোকার বিশেষ কোনই দোষ ছিল না, কিন্তু উনি তা বুঝলেন না, খুব মারলেন ওকে। তার পর আরও অনেক অজুহাত তুলে ওকে বোর্ডিংয়ে দিয়ে দিলেন; আমার মানা শুনলেন না। রইলাম শুধু আমি, উনি, খোকন আর লাকি।

কিন্তু সেদিন, ঠিক সেইদিন থেকে লাকি বুঝে গেল যে কে ওর বেশী আপন। ছোটরা যেমন একজনের নামে মিথ্যে করে লাগিয়ে তাকে বকুনি খাওয়াতে ভালবাসে, ওকেও সেই রোগে পেয়ে বসল। এমনিতে লাকি খোকনকে ভালবাসে, বেশ খেলা করে ওর সঙ্গে। খোকন ওকে কত লাগিয়ে দেয়, লেজ ধরে টানে, কিছুই বলে না ও। কিন্তু ওঁকে দেখলেই যেন অন্য কুকুর হয়ে যায় লাকি। তখন খোকনকে কাছে ঘেঁসতে দেয় না, খোকন যদি ওকে একটু ছোঁয় অমনি যেন কত লেগেছে এমনি করে কুঁই কুঁই করে ওঠে আর খোকনটা অযথা বকুনি খেয়ে মরে। শেষ পর্য্যন্ত ত আমি ওর বাবার সামনে লাকির গায়ে হাত দিতে বারণই করতাম। ও বেচারী কোনই কারণ খুঁজে পেত না। কেননা, হয়ত তার পাঁচ মিনিট আগেই লাকি ওর সঙ্গে হুড়োহুড়ি করে খেলছিল, অবশ্য উনি তখন বাড়ীতে ছিলেন না।

ঐ পা ভাঙ্গাই কাল হ'ল। সেই থেকেই সুরু হ'ল এই পরিবর্তন। খোলা হাওয়ায় বেড়াতে নিয়ে যেতে বলেছে ডাক্তার। কোলে ক'রে পার্কে নিয়ে যান, ঐ অত বড় এক বছরের কুকুরকে। অ্যালসেশিয়ান ও

এক বছরেই বেশ বেড়ে উঠেছে। অথচ ছেলে কোলে ক'রে কোন দিন বেড়াতে গেছেন বলে মনে পড়ে না। তার পর থেকেই সুরু হ'ল দামী দামী টনিক এনে খাওয়ান। বেশী করে দুধ খাওয়ান। অথচ খোকনটা এত ভুগছে, টনসিল নিয়ে, তার জন্য কিন্তু সেই তিন আনা শিশির হোমিওপ্যাথিক ওষুধ বরাদ্দ।

তবু তখন পর্য্যন্ত কিন্তু আমার মনে এতটা সংশয় জাগে নি। আমিও তখন সমানে ওর সঙ্গে যত্ন করি কুকুরটাকে। আসলে ভারী রুগ্ন ছিল লাকি। কিছুতেই কোন ওষুধ যেন ওর লাগত না। এক ত ওষুধ খেলেই যেখানে-সেখানে বমি করত। সেই বমিও সাফ করতে হ'ত কত সময়। তাছাড়া ওর একটা রোগ ছিল, আদর করলেই পেচ্ছাপ করে ফেলত। তাইতে উনি একদিন মেরেছিলেন। সেই থেকে ওর ধারণা হ'ল পেচ্ছাপ করাটাই অন্যায়। তার পর যখন একেবারেই চাপতে পারত না তখন যেখানে-সেখানে ভাসিয়ে দিত। তখন ধোও সব। উঃ, সে কি খোয়ার! তার পর এই আমিই ত ছাতে টেনে নিয়ে গিয়ে গিয়ে শেখালাম। তিনতলা কোঠাবাড়ী, যাবেই বা কোথায়?

লাকি কিছুতেই মোটা হয় না। ওর বয়সী অন্য অ্যালসেশিয়ান ওর থেকে অনেক বেশী মোটা আর 'হেলদি' হয়। তখন ওঁর ধারণা হ'ল, তা হ'লে বোধ হয় আমি ওকে ঠিকমত খেতে দিই না। সেই থেকে গোয়ালার সামনে দাঁড়িয়ে নিজে মেপে এক সের দুধ লাকির জন্য আলাদা করে নিতেন! তার পর সেই দুধ আমার সামনে দাঁড়িয়ে জ্বাল দেওয়াতেন। কারণ, পাছে আমি জল মিশিয়ে দিই। কিন্তু তবুও লাকি মোটা হয় না। তখন ওঁর ধারণা হ'ল, হয়ত ঐ দুধ থেকেই আমি খোকনকে দিই। খোকনের জন্য ত মাত্র আধসের দুধ বরাদ্দ, অবশ্য তার থেকেই দু'বেলা চা-ও হয়। কেউ এলে-গেলে তাদের চায়ের দুধও ওর থেকেই নেওয়া হয়। লাকির দুধে যেন হাত না পড়ে। এখন ঐ সন্দেহ মনে ঢুকল যে একসের দুধ থেকে নিশ্চয়ই কিছু স'রে যায়। সেদিন থেকে দুধটা ঠাণ্ডা হলেই লাকিকে দিয়ে এঁটো করিয়ে আলাদা ঢাকা দেওয়া থাকত।

এরপর থেকে আমারও মন স'রে যেতে লাগল লাকির ওপর থেকে। শুধু কি তাই? এমন চালাক আর বদমাস কুকুর আর দ্বিতীয় হবে না। উনি যখন থাকতেন না তখন লাকি আমার পায়ে পায়ে ঘুরত, সেই ছোট্টবেলাকার মতন। আর উনি এলেই এমন ভাব দেখাত যেন আমাকে চেনেই না। তখন ওঁর সঙ্গে সঙ্গে ঘুরবে, ওঁর আরাম-চেয়ারের তলাটিতে ব'সে থাকবে। শেষ পর্য্যন্ত ত এমন হয়েছিল যে, খোকন যদি ওঁর খুব কাছে গেছে কি আমিই যদি হাসতে হাসতে ওর গায় একটু হাত দিয়েছি ত অমনি গোঁ গোঁ করে অসন্তোষ প্রকাশ করেছে। উনিও সঙ্গে সঙ্গে ওকে আদর করতে সুরু করেছেন। আমাদের বলেছেন, স'রে যেতে। এই সব কারণে আমার যেন কেমন একটা আক্রোশ জাগত কুকুরটার ওপর। উনি চলে গেলে এক একদিন অকারণেও ওকে খুব মারতাম। কেমন যেন একটা প্রতিহিংসার আনন্দ অনুভব করতাম মনে। কিন্তু অত মার খেয়েও তখন আমার পিছু পিছু ঘুরত, আবার মায়া হ'ত আদরও করতাম। খোকনও আর ওর সঙ্গে খেলত না। অথচ উনি চলে গেলেই ও খোকনের প্যাণ্ট ধ'রে টানাটানি লাগাত খেলার জন্য। কিন্তু উনি এলেই আবার সেই একলষেঁড়েপনা সুরু করত। যেন আমাকে চেনেই না। আসলে এগুলো one man's dog, কিন্তু তা বলে এত অকৃতজ্ঞ? আর উনি ত আহ্লাদে ডগমগ। কারণ, লাকি ওঁকেই সব থেকে বেশী ভালবাসে।

মুখেও তাই বলতেন, তোমার ত খোকন আছে আর আমার লাকি আছে। ধীরে ধীরে আমাদের মধ্যে ঐ লাকিকে নিয়ে একটা ব্যবধান গ'ড়ে উঠল। আমাদের স্বামী-স্ত্রীর সুন্দর সম্পর্কে চৌড় ধরাল ঐ কুকুরটা। আমি ওকে বলতাম 'আনলাকি' শনি।

ওঃ, সে যে কি অসহ্য কষ্ট! কেন তাই বলি। মাঝে মা'র অসুখ করায় আমি বাপের বাড়ী গিয়েছিলাম, এক মাসের জন্য। ফিরে এসে দেখি লাকি মাংস খায়। রোজ আধ সের করে। আমি আসাতে উনি ত সোজাসুজিই বললেন, দেখ, লাকির মাংস যেন আমাদের মধ্যে মিশিও না। ওরটা আলাদা আনব, আলাদাই রান্না হবে। সঙ্গে গাজর, বীট আর চাল দিয়ে ফোটান হবে। ডাক্তার তাই বলেছে। এবার আমি স্পষ্ট করেই বললাম, 'আমি লাকির রান্না করব না, তুমি আমাকে যে রোজ সন্দেহ করবে সে আমি সইতে পারব না, ওর খাবার কেটে কি আমি খাই? বা ছেলেকেই যদি খাওয়াই বলে তোমার মনে হয়, ছেলে কি আমার একার? তোমার নয়?' সঙ্গে সঙ্গে জবাব পেলাম, 'দেখ, এই এক মাস আমি আর লাকি বেশ ছিলাম। এই তুমি এলে আর ঝঞ্ঝাটের সৃষ্টি হ'ল।' তখন আমারও সহ্যের সীমা ছাড়িয়ে গেছে—উত্তর দিলাম, 'তা বিয়ে না ক'রে, গোটা কয়েক কুকুর পুষে তাদের নিয়ে থাকলেই পারতে?'

জবাব দিলেন, 'তা পারেই ত লোকে। এই ত কত লোক কুকুর নিয়েই বেশ সুন্দর জীবন কাটিয়ে দেয়। মানুষের থেকে কুকুর অনেক বেশী ভাল।'

আমার আর সহ্য হ'ল না। খুব কাঁদলাম সারারাত ধরে। ভোরের দিকে আমাকে কাছে টেনে নিয়ে যেই আদর করতে গেছেন উনি, অমনি খাটের ওধারে লাকির কালো মাথাটা জেগে উঠেছে। রাগে গোঁ গোঁ করছে সে। আমারও তখন প্রচণ্ড রাগ হ'ল, উঠে গিয়ে পাগলের মত মারতে লাগলাম ওকে। উনি তখন এক ধাক্কায় আমাকে সরিয়ে দিয়ে বললেন, ছিঃ অনু, তোমার লজ্জা করে না একটা অবলা জানোয়ারকে হিংসে করতে?

আমিও চেঁচিয়ে বললাম, না, করে না; কেন তুমি ওকে কুকুরের মত দেখ না? কুকুর কুকুরের মত থাকবে, তুমি মানুষের বাড়া ক'রে তাকে ভালবাসবে কেন? নিজের স্ত্রীপুত্রের চেয়ে তাকে ওপরে স্থান দেবে কেন? ও মরুক, মরুক। ও মরলে আমার হাড় জুড়োবে। ও আমার জীবনে একটা শনি এসে জুটেছে।

এরপর থেকেই যেন উনি আমার কাছ থেকে আরও বেশী দূরে সরে গেলেন। আর কুকুরটাও যেন সারাক্ষণ আঠার মত চেপ্টে থাকত ওঁকে। ফলে হ'ল কি, বাড়ীর মধ্যেই যেন দুটো দল হ'ল। একদিকে আমি আর খোকন, আর একদিকে উনি আর লাকি। অদ্ভুত পরিবর্তন হয়ে গেল মানুষটারও। সত্যিই যেন আমরা ওঁর কেউ নই। ঐ কুকুরটিই যেন ওঁর সব। বেড়াতে গেলেও কুকুর যাবে সঙ্গে। লাকিই ওঁকে টেনে নিয়ে যেত আগে আগে, আর আমি আর খোকন পেছন পেছন হাঁটতাম। আমাদের সঙ্গে উনি আর আগের মত প্রাণখুলে মিশতেনও না। যেটুকু কথা বলতেন তার বেশীর ভাগই ঐ লাকির সম্বন্ধে। উনিই অফিস থেকে ফিরে লাকির জন্যে স্টোভে মাংসভাত ফুটিয়ে দিতেন। আর সাতদিন অন্তর কুকুর নিয়ে হাসপাতালে যেতেন। আমার অসুখ করলে ত বাপের বাড়ী আছে, আর খোকনের জন্য ত আমিই আছি। সত্যি, এক এক সময় রাগও হ'ত, আবার এক এক সময় এই মানুষটার জন্য করুণাও হ'ত। ওঁর এই ব্যবহারগুলো অনেক সময় ছেলেমানুষি মনে ক'রে ক্ষমাও করে ফেলতাম। ওঁর এই নিঃসঙ্গ অবস্থা, বিকৃত মন, আমার মনে সমবেদনা জাগাত। তখন আমি অভিনয় করতাম, যেন আমিও কুকুরটাকে ভালবাসি। উনি সেই অভিনয়ে বিশ্বাস করে অন্ততঃ কিছুক্ষণের জন্য আমাদের সঙ্গে মন খুলে মিশতেন। বাড়ীর থমথমে গুমোট ভাবটা তখন একটু কাটত, একটু যেন খোলা বাতাসের স্পর্শ লাগত। কিন্তু এই ক্ষণিকের উজ্জ্বল আবহাওয়াতে মেঘ ঘনিয়ে আসতেও দেরি হ'ত না। উপলক্ষ্য থাকত ঐ লাকি। ওঁর ঐ—

উঠিতে কুকুর বসিতে কুকুর
কুকুর করেছি সার—

এ আর আমি সব সময় সইতে পারতাম না। তখন আমি মনেপ্রাণে চাইতাম, ও মরুক, মরে যাক ও। তা হ'লে আমার হাড় জুড়োয়। এত কুকুর গাড়ী চাপা প'ড়ে মরে ও কেন মরে না?

সেই লাকি আজ মরে গেছে। আমি ওকে মারি নি, অসুখে ভুগে মরেছে। গা-ভর্তি পোকা হয়েছিল ওর। হ্যাঁ, আমি ওকে হিংসে করতাম; কিন্তু তবু সমানে ওর গায় কর্পূর তেল লাগিয়েছি পোকা মারবার জন্য। ওঁকে খোসামুদি করে ডগ-হাসপাতালে পাঠিয়েছি, ওর জন্য ওষুধ আনতে। এর মধ্যে সত্যি কোন ফাঁকি ছিল না, ওঁকে দেখিয়ে এই সেবা করি নি, নিজের প্রাণের তগিদেই করেছি। অথচ যা আমি মনেপ্রাণে চাইতাম, যে উনি লাকিকে অবহেলা করুন, উপেক্ষা করুন, তা যখন ওর এই রুগ্ন অবস্থায় সত্যিই উনি করতে শুরু করলেন—ওকে আদর করা দূরস্থান, ফিরেও তাকাতেন না ওর দিকে—কেন যে আমি তা সইতে পারলাম না জানি না। এতদিনকার মনবাসনা পূর্ণ হওয়ায় কেন যে আমার আনন্দ হ'ল না? উপরন্তু নিজেকে লাকির অবস্থায় ফেলে সেই দুর্দিনের কথা ভেবে কেমন যেন শঙ্কিত হয়ে উঠতাম। মনে হাজারটা প্রশ্ন উঠত ঐ মানুষটা সম্বন্ধে। মনে হ'ত এই অদ্ভুত ভালবাসার মূল্য কি? তবে কি কোন দিনই উনি লাকিকে সত্যি করে ভালবাসেন নি

ঐযে দরজায় ধাক্কা দিচ্ছেন। এসেছেন উনি।

—•—

ব্যাকরণ মানি না

শ্রীসুবীর রায়চৌধুরী

প্রবন্ধের শিরোনামা দেখে কেউ মনে করবেন না এটা কোন ইস্কুল-পালানো ছেলের ইস্তাহার। এমন কি তথাকথিত আজকালকার ছেলেদের ব্যাকরণ সম্পর্কে শোচনীয় অজ্ঞতা বিষয়ে এটি কোন অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষকের ডায়েরিও নয়। অথবা সুকুমার রায়ের বহুশ্রুত "হাঁস ছিল সজারু (ব্যাকরণ মানি না)" কবিতাটি সম্পর্কে কোন গবেষণাপূর্ণ প্রবন্ধ লেখার অভিলাসও আমার নেই। আসলে সার্থকনামা ব্যক্তি যেমন জগতে দুর্লভ, তেমনি বিরল সার্থক-শিরোনামার প্রবন্ধ। ধান ভানতে শিবের গীত আমরা কে না গাই? কিন্তু শিবের গীতের জন্য ধান ভানা খারাপ হয়েছে এমন অভিযোগ কস্মিন্‌কালেও শুনি নি। সুতরাং হে ক্ষীর-আস্বাদী পাঠক, বাজে কথার নীর থেকে ক্ষীর গ্রহণের দায় আপনার!

আলোচ্য প্রবন্ধের প্রতিপাদ্য হ'ল, ভাষার ক্ষেত্রে যুক্তি নয়, সংস্কারই প্রধান। আরো খোলাখুলি ভাবে বলা যেতে পারে, ব্যাকরণকে আমরা অস্ত্র হিসেবে নয় ঢালরূপে ব্যবহার করি। যাঁর সঙ্গে তর্কে এঁটে উঠতে পারি না, অগত্যা তাঁকে বানান জিজ্ঞেস ক'রে ঘায়েল করার চেষ্টা আরম্ভ হয়। অথচ আমরা জানি শিক্ষিত-শ্রেণীর মধ্যে কোন সময়ে বানান ভুল হয় না এমন ব্যক্তির সংখ্যা কোটিকে গোটিক। অথচ কারও বানান ভুল ধ'রে আমরা অপার্থিব আনন্দ লাভ করি। এহ বাহ্য। আমার বক্তব্য, ভাষা বিষয়ে আমাদের বিচিত্র সংস্কার কাজ করে। ধরুন ইংরেজি-জানা ভদ্রলোকেরা যে সব প্রত্যঙ্গ বা অসুখের নাম বাংলায় উচ্চারণ করতে লজ্জায় অধোবদন হবেন, ইংরেজিতে সেগুলি বলতে একটুও কুণ্ঠিত বোধ করবেন না। বাংলায় যে সমস্ত শব্দ অশ্লীল ব'লে অশ্রাব্য, ইংরেজিতে তা অক্লেশে বলা যায়। অর্দ্ধ-শিক্ষিতদের কথা ছেড়ে দিন, তারা বৌ বলতে লজ্জা পান, কিন্তু সদর্পে বলেন ওয়াইফ। যাই হোক, এখনও আমাদের গালাগালি দিতে হলে হিন্দী অথবা ইংরেজি আশ্রয়। ফলে বাংলা শব্দভাণ্ডারের একটা দিক্‌ এখনও অপরিণত—এ ভাষায় slang-এর বড় দৈন্য। যাও আছে তাও অব্যবহারে বিস্মৃতপ্রায়। আমি কারণে অকারণে slang ব্যবহারের পক্ষপাতী নই, কিন্তু একথা নিশ্চয়ই মানি যে, উক্ত শব্দাবলীও ভাষার অন্যতম শক্তি।

হিন্দী বিষয়ে আমাদের উন্নাসিকতার কারণও বোধ হয় এইখানে—কথ্য হিন্দীতে slang-এর বড় কদর। অবশ্য এ সম্পর্কে আমাদের সংস্কারও বিচিত্র। অনেকে বলেন, হিন্দী আবার একটা ভাষা! এখানে গোঁফ স্ত্রীলিঙ্গ। হায়, এ সব হিন্দী-বিদ্বেষীরা জানেন না যে, সংস্কৃতে স্তন-কুচ ইত্যাদি পুংলিঙ্গ। অবশ্য এ থেকে মনে করবেন না যে, আমি হিন্দী ভাষার প্রচণ্ড সমর্থক। উদ্ভট নিয়ম-কানুন সব ভাষাতেই অল্প-বিস্তর লক্ষ্য করা যায়—বাংলা বানান ও উচ্চারণের উৎকেন্দ্রিকতাও কি কম? 'একতা' শব্দটির উচ্চারণেই আমি কোন ঐক্য দেখি না। কেউ বলেন একতা, আবার কারও মতে অ্যাকতা। সেদিক্‌ দিয়ে ইংরেজি উচ্চারণের অনেকটা সম্মিতি রয়েছে। এই প্রসঙ্গে মনে পড়ল, রাজনারায়ণ বসুর আত্মচরিতে আছে যে, কাপ্তেন রিচার্ডসনের ক্লাসে কেউ যদি অ্যামিসকে এমিস উচ্চারণ করতেন, তা হলে তিনি সঙ্গে সঙ্গে বলতেন, "you are a miss." যাই হোক, বাংলা বানান-উচ্চারণে উৎকেন্দ্রিকতা সত্ত্বেও আমরা মনে করি না যে, আমাদের মাতৃভাষা অন্য ভাষার চেয়ে হীন। কিন্তু অন্য ভাষা বিষয়ে আমাদের অভিযোগ কিরকম ভাসা-ভাসা। অনেকটা যাকে দেখতে পারি না তার চলনবিষয়ে বিরূপতার মত।

ভাষা থেকে শব্দপ্রসঙ্গে আসা যাক। মেকলের ভঙ্গিতে বলা যায় যে, বয়েস বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে শব্দের ব্যঞ্জনা বদলায়। কথাটা আপাতভাবে খুব চমকপ্রদ মনে হলেও ঠিক। কী দ্রুততালে শব্দের অনুষঙ্গ পরিবর্তিত হয় তা ভাবলে অবাক্‌ হই। ছেলেবেলায় ইস্কুলে পড়বার সময় যেদিন প্রথম outstanding শব্দটি লাগসইভাবে ব্যবহার করলাম, সেদিন নিজের ব্যক্তিত্বকেই out-standing মনে হয়েছিল। হায়! বড় হয়ে যখন সরকারি আপিসে কেরাণী হয়ে ঢুকলাম, তখন কোথায় গেল সেই outstanding ব্যক্তিত্ব! সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট যেদিন বললেন, "মশাই, আপনার তিরিশখানা চিঠি আর বিল outstanding"। আমি হতবাক হয়ে গিয়েছিলাম।

পরে বুঝলাম যে, সমস্ত চিঠির এখনও উত্তর দেওয়া হয় নি বা বিল পাশ হয় নি, আপিসের পরিভাষায় সেগুলিই outstanding। আর কেরাণীদের জীবনে উক্ত শব্দের এই অভিধাই প্রধান। ইস্কুলের ছেলেরা পরীক্ষার আগে revision-এ অভ্যস্ত, কিন্তু পেশাদার রাজনীতিবিদ্, বিশেষত সাম্যবাদীদের কাছে ওর মানেই আলাদা। Revisionism বা revisionist কথাটার চেয়ে গ্লানিকর তাদের জীবনে আর কি হ'তে পারে? তেমনি ছাত্রাবস্থায় শেখা concentration এবং concentration camp-এ বিস্তর ফারাক। আমার জনৈক খেলোয়াড় বন্ধু বলেছেন যে, খেলার মাঠে enclosure শুনে শুনে তিনি চিঠির enclosure শুনে প্রথমটায় হকচকিয়ে গিয়েছিলেন।

রঙের ব্যাপারেও আমরা দৃষ্টিহীন। লাল-নাল-হলদে-সবুজ-কালো এই সব রঙের প্রত্যেকের আলাদা মানে রয়েছে, শৈশবে তা কি জানতাম? লাল বাতি বলতে কি শুধু আক্ষরিকভাবে লাল রঙের বাতিকেই বোঝায়? তেমনি Red flag, Red tapism, Red skin, Red light, Red Admiral ইত্যাদি শব্দে লালের কি বৈচিত্র্য! নীলেও তাই। নীল রঙের আভিজাত্যের কথা ছেড়েই দিচ্ছি, blue-coat boy বলতে যেরকম নিষ্ঠাবান্ পোড়োর স্মৃতি ভেসে ওঠে, তেমনি blue-print আবার গৃহপ্রবেশের ইঙ্গিত বয়ে আনে। Blue laws-এর গোঁড়ামিতে যারা পীড়িত, তারাও blue movie, blue picture-এ অধোবদন হবেন। হলদে রংটি যতই কোমল হোক yellow fever, yellow press, yellow passport এবং সর্বোপরি yellow peril কোনটাই খুব বাঞ্ছিত নয়। সত্যেন্দ্রনাথ একদা আশ্বাস দিয়েছিলেন যে, "কালো আর ধলো বাহিরে কেবল, ভিতরে সবাই সমান রাঙা।" কিন্তু এত বড় সাম্যের বাণী শোনার পরও আমরা ব্ল্যাক-মার্কেট, ব্ল্যাকমেল, ব্ল্যাকমনি ইত্যাদি বিষয়ে আশ্বস্ত বোধ করি না।

শুধু রঙের বেলায় কেন, জীবজন্তুর বেলাতেও ধরুন বাংলার বাঘ বা পুরুষসিংহ বিরাট্ খেতাব, কিন্তু বাংলার শিয়াল বললে মানহানির মামলার বিষয় হয়। হস্তিমূর্খ ব'লে আমরা অপমানিত বোধ করি, কিন্তু অত বড় একটা বিরাট্ জন্তুর থপথপ ক'রে পা ফেলার সঙ্গে রূপসী তন্বীর হাঁটার তুলনা অনায়াসে করতে পারি। মানুষ ত কুকুর-বেড়াল-ঘোড়া-গাধা-গরু-উট-হাতি ইত্যাদি অনেক জন্তুকেই পোষ মানিয়েছে, তবু আমরা বিশেষ ভাবে গাধা এবং গরুকে অপদার্থ মনে করি। মানুষের চরিত্রে যেমন খামখেয়ালিপনার অন্ত নেই, তেমনি তার ভাষাতেও সেই প্রভাব সুস্পষ্ট। অনেক সময় দেখা যায়, ভাষাবিশেষে জন্তুর অনুজ্ঞাও বদলায়। "Dove of peace" ইংরেজিতে ভাল, কিন্তু বাংলায় আক্ষরিকভাবে "শান্তির ঘুঘু" অনুবাদ করলে বেমানান লাগবে। কেননা, আমাদের ভাষায় ঘুঘুর সঙ্গে ফাঁদের একটা নিবিড় আত্মীয়তা রয়েছে।

উপযুক্ত আলোচনা থেকে আমরা আরেকটা অনুকল্পে আসতে পারি। কোন ভাষার শক্তি বা সম্ভাবনা সম্বন্ধে আমাদের ধারণাও এ জাতীয় কতকগুলি সংস্কারের ওপর নির্ভর করে। "বাংলায় বিজ্ঞানের বই লেখা চলে না" এরকম কথা তাঁরাই বেশি ক'রে ব'লে থাকেন যাঁরা বাংলা এবং বিজ্ঞানচর্চা উভয় বিষয়ে সমান উদাসীন। মধুসূদনের আগে অনেকেই মনে করতেন অমিত্রাক্ষর ছন্দ বাংলায় আনা সম্ভব নয়। পরে যখন সেটাও সম্ভব হ'ল, তখন আশঙ্কা ছিল বোধ হয় সনেট লেখা যাবে না। ক্রমে ক্রমে দেখা গেল, লেখবার লোক থাকলে যে কোন জীবিত ভাষাতে যে কোন জিনিস লেখা চলে। বাংলায় আজ মৌলিক দর্শন বা ইতিহাসের গ্রন্থ লেখা হচ্ছে, বিজ্ঞান-রচনায় অনেক সুধীব্যক্তি উদ্যোগী হয়েছেন এবং আশা করা যায় এই শাখাও অচিরে আমাদের শ্লাঘার বিষয় হবে। কিন্তু এই সব প্রশংসনীয় প্রচেষ্টা সত্ত্বেও আমাদের বহু গণ্যমান্য বুদ্ধিজীবী এক ধরনের হীনমন্যতায় ভোগেন, "ওদের দেশের মত কি আর হবে!"

আমি অনেক ভেবে-চিন্তে দেখেছি, এরকম হীনমন্যতার কারণ একমাত্র আমাদের ব্যাকরণ। বাংলা ব্যাকরণ পড়লে আপনা থেকেই বাংলা ভাষা সম্পর্কে কিরকম দীনতাবোধ জাগে। মনে হয়, হাজার বছর অতিক্রম করেও বাংলা ভাষার নাবালকত্ব আজও ঘুচল না। বাংলা ব্যাকরণের বই খুললে নিতান্ত সাক্ষর ব্যক্তিরও বুঝতে বাকি থাকে না যে, এ ভাষা এখনও পর্যন্ত পুরোপুরি সংস্কৃত পণ্ডিতদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। বাংলা উচ্চারণে মূর্ধন্য ণ এবং ষ-এর কোন স্থান না থাকা সত্ত্বেও ছাত্রদের অতি মনোযোগের সঙ্গে পড়তে হয় ণত্ব-ষত্ব বিধান। কিন্তু কেন? 'বনে' দন্ত্য ন অথচ 'আম্রবণে' মূর্ধন্য ণ হবে, শূর্পণখা ব্যক্তির নাম বোঝালে 'ণ', অন্যথায় 'ন', এরকম বানানরীতি ছেলে-ঠকানোয় বিশেষ উপযোগী, কিন্তু বাংলা ভাষার প্রকৃতি বোঝাতে কতটুকু সহায়তা করবে? আমরা যারা ন এবং ণ, শ এবং ষ-এর পার্থক্য সম্বন্ধে অনবহিত, তাদের ওপর ণত্ববিধান ষত্ববিধানের বোঝা আরোপ করা অত্যাচার। মার্কিন মুলুক যে বানান বিষয়ে নির্বিচার,

সে দেশের ভাষা বা সাহিত্য কি উচ্ছন্নে গেছে? আমাদের বৈয়াকরণেরা অজুহাত দেখান যে, বাংলা শব্দভাণ্ডারের অধিকাংশ শব্দই সংস্কৃত থেকে গৃহীত, সংস্কৃত বাংলার মাতৃসমা, সুতরাং তৎসম বানানরীতি শুদ্ধ রাখার জন্য ণত্ব-ষত্বের জ্ঞান অপরিহার্য। এর বিরুদ্ধে আমার প্রবল যুক্তি রয়েছে। প্রথমতঃ, পৃথিবীতে এমন কোন ভাষা নেই যেখানে অন্য ভাষা থেকে শব্দাবলী গৃহীত হয় নি। কিন্তু তাই বলে বিদেশী ভাষার ব্যাকরণের নিয়মকে অবাঞ্ছিতভাবে অনুপ্রবেশ করানোর দ্বিতীয় কোন দৃষ্টান্ত আমার জানা নেই। তাছাড়া "শব্দভাণ্ডার" ত ভাষা-তত্ত্বের বিষয়, ব্যাকরণে স্থান পায় কেন? সংস্কৃত শব্দের উচ্চারণ যখন বিকৃত হয়, বানানও যে পরিবর্তিত হবে তাতে অবাক্ হবার কি আছে?

আমাদের সংস্কৃত-নির্ভরতার আরেকটি প্রমাণ, বাংলা ব্যাকরণে সংস্কৃত কৃৎ ও তদ্ধিত প্রত্যয়ের গুরুত্বপূর্ণ স্থান। পণ্ডিতেরা বলেন, প্রত্যয়ের জ্ঞান না থাকলে নতুন শব্দ তৈরি করা সম্ভব নয়। কেননা, সংস্কৃতের নতুন শব্দ তৈরি করার ক্ষমতা আছে, প্রাকৃত বাংলার নেই। কিন্তু এক্ষেত্রেও মধুসূদনের অনুকরণে আক্ষেপ করতে ইচ্ছে করে, 'চীন-নারী সম পদ কেন লৌহ ফাঁসে?" কেন প্রাকৃত বাংলার শব্দ তৈরি করার ক্ষমতা নেই? সংস্কারই আমাদের একমাত্র বাধা। সবাই উদ্যোগী হলে অনায়াসে পারা যায়। প্রার্থনা থেকে প্রার্থিত, প্রার্থনীয়, প্রার্থী নিষ্পন্ন হতে পারে। সেই সাদৃশ্যে চাওয়া থেকে চায়িত, চাওনীয়, চায়ী চালু করলে কি মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যাবে? মধুসূদন যখন নামধাতুর প্রয়োগ সুরু করেন, তখন তাঁকে অনেক বিদ্রূপবাণ সহ্য করতে হয়েছিল। আজকাল ত সবাই মেনে নিয়েছেন। সেরকম প্রথম প্রথম বেসুরো শোনালেও পরে আমরা অভ্যস্ত হয়ে যাব। একটা কথা অবশ্যই মেনে নেওয়া দরকার যে, আমাদের সংস্কৃত চর্চা এবং জ্ঞানের পরিমাণ সাধারণ-ভাবে অনেক কমে আসছে, আরো কমে যাবেও। বঙ্কিমচন্দ্রের মত বলতে হয় টোলের যুগ আর ফিরে আসবে না, ফিরে আসার জো নেই, ফিরে এসে কাজও নেই। সুতরাং বাংলা ভাষার নিজস্ব শব্দ তৈরির সম্ভাবনাও বিস্তৃত হওয়া প্রয়োজন। তার জন্যে সংস্কৃতের অধীনতা থেকে মুক্ত হওয়া প্রয়োজন। সংস্কৃত শব্দ গ্রহণে আমার কোন আপত্তি নেই, কিন্তু শব্দ গঠন করার ক্ষমতা বাংলার থাকা উচিত।

এতদিন পর্যন্ত ভাল বাংলা শিখতে হ'লে সংস্কৃত জ্ঞান আবশ্যিক ছিল। কিন্তু বাংলা বানান যদি উচ্চারণ অনুযায়ী নির্দিষ্ট হয় এবং প্রাকৃত বাংলার শব্দ তৈরির ক্ষমতা স্বীকৃত হয়, তা হ'লে এই সংস্কৃত-নির্ভরতা অনেকটা দূর হবে। কথ্য ও লেখ্যভাষার মধ্যে একদা যে বিরাট্ ব্যবধান সৃষ্টি হয়েছিল চলিত ভাষার প্রভাব বিস্তৃত হবার ফলে অনেক কমে এসেছে। মোটের ওপর চিৎকারে হ্রস্ব ই-কার না দীর্ঘ ঈ-কার বিধেয় এটা কোন সমস্যা নয়। মূল সমস্যা হ'ল বাংলা ব্যাকরণকে ঢেলে সাজতে হবে।

বিদ্যাসাগর বাংলা বর্ণমালার সংস্কার করেছিলেন। আর আজকে প্রয়োজন হয়েছে বাংলা ব্যাকরণ পুনর্লিখনের। তার সূচনা পরোক্ষভাবে দেখা দিয়েছে। আগে প্রেসে 'স্ট' যুক্তাক্ষর পাওয়া যেত না। কেননা, পণ্ডিত মশাইদের বিধান ছিল ট এর সঙ্গে ষ-ই বিধেয়। কিন্তু বিদেশী শব্দের উচ্চারণ অনুযায়ী বানান প্রবর্তিত হওয়ায় ষত্ব বিধানের নিষেধ উপেক্ষা করেই আজকাল ছাপা হয় স্ট। কিন্তু আর নয়; পাঠক হয়ত হাসছেন। আমি নিরুপায় হয়ে রবীন্দ্রনাথকে স্মরণ করছি:

গম্ভীর হয়ে করি প্রফেটের ভান
শুনে যে ঘুমিয়ে পড়ে সেই বুদ্ধিমান্।

প্রাচীন চন্দ্রকেতুগড়ের মৃন্ময় শিল্প

শ্রীপরেশচন্দ্র দাশগুপ্ত

শুঙ্গ-কুষাণযুগে নির্দ্দিষ্ট চন্দ্রকেতুগড়ের তথাকথিত যক্ষ-মূর্ত্তিসমূহ, ভারহুত, সাঁচী, মথুরা এবং অমরাবতীর যক্ষ-মূর্ত্তিসমূহ ও বিভিন্ন পুরুষমূর্ত্তির ন্যায় এক সংযত আবেগ ও অতিমানবীয় ভাবকে প্রতিফলিত করে। এখানেও সাধারণতঃ দেহের দৃঢ়বদ্ধতা এবং কমনীয় ভঙ্গির সঙ্গে অমরাবতীর শিল্প-বৈশিষ্ট্যেরই অধিকতর সাদৃশ্য আছে, যদিও স্থানবিশেষে অন্যান্য বৌদ্ধ স্তূপ-দেউলের ভাস্কর্য্যের সঙ্গেও এদের তুলনা করা যায়। এই প্রসঙ্গে বলা যায় যে, কোন কোন ফলকে পশ্চাৎ-দূরত্ব অথবা 'Perspective' এর ধারণা দেওয়া হয়েছে সাঁচী ও আদি-অমরাবতীর পদ্ধতিতে। ভারহুতের বিভিন্ন ফলকের ন্যায় এখানে দৃশ্যটিকে এলোমেলোভাবে দেখান হয় নি, বরং সাঁচীর ১নং স্তূপের ভাস্কর্য্য রূপায়ন পদ্ধতির ন্যায় মূর্ত্তিগুলিকে শ্রেণীবদ্ধ ভাবে সাজান হয়েছে এবং পেছনের মূর্ত্তিগুলিকে দেখান হয়েছে ক্ষুদ্রাকার। এছাড়া মূর্ত্তিগুলিকেও অধিকতর উচ্চতা দেওয়া হয়েছে দৃশ্যের গভীরতা রচনা করবার জন্য।

চন্দ্রকেতুগড়ের যক্ষমূর্ত্তিগুলি যথানিয়মে সমপাদ-স্থানকভাবে দণ্ডায়মান অবস্থায় দেখান হয়েছে। সাধারণতঃ দেখা যায়, দৈবশক্তিসম্পন্ন এই অতিমানবগণ বায়ুস্রোতধারার ন্যায় হিল্লোলিত উত্তরীয়গাত্রে নানা অলঙ্কার দ্বারা ভূষিত হয়ে এবং দুই পায়ে সমানভাবে ভর দিয়ে ঋজুভাবে দাঁড়িয়ে আছে, তাদের মুখভাব বুদ্ধিদীপ্ত ও মর্য্যাদাপূর্ণ। এইখানে অপ্সরাদের ন্যায় এই দৈব-পুরুষদের আভরণ-বাহুল্য কিছুটা আশ্চর্য্যজনক লাগে এবং মনে হয়, এর মধ্যে হয়ত প্রাচীনকালের বিভিন্ন উপজাতীয় স্ত্রী-পুরুষদের বিলাস ও বসন-ভূষণের কিছু পরিচয় আছে।

পুরুষমূর্ত্তিসমূহের মধ্যে এক ধরণের পক্ষবিশিষ্ট যক্ষ-মূর্ত্তি বিদেশী শিল্পের 'এ্যাঞ্জেল' ও 'চেরাব'দের স্মরণ করিয়ে দেয়। এই শ্রেণীর মূর্ত্তি ভারহুত স্তূপের বিভিন্ন পাষাণ আলেখ্যের মধ্যে দেখা যায় এবং ইতিপূর্ব্বে অবিকল একই কল্পনার পরিচয় পাওয়া গিয়েছে তাম্র-লিপ্তের কয়েকটি সমকালীন ভাস্কর্য্যে। এই দেবদূত-গণের কুণ্ডলায়িত শিরোভূষণ ও অন্যান্য অলঙ্কার এবং স্কন্ধের উপর প্রসারিত হাল্কা ও ঈষৎ বক্র পক্ষদ্বয় যেন এক

চন্দ্রকেতুগড়ের অপর একটি নৃত্য-গীত দৃশ্য বিশেষ বৈচিত্র্য-পূর্ণ। একটি ভগ্ন ফলকে রূপায়িত দুই সারি মূর্ত্তি। নীচের সারিতে দু'জন কিন্নর, (একজন কুম্ভীরমুখ-বিশিষ্ট) বীণা এবং ঢক্কাবাদ্যরত, সম্মুখে একটি নৃত্যরত মূর্ত্তি। উপরের সারিতে মৃগ-বাহনে উপবিষ্ট দিক্‌পাল বায়ু এবং তাঁর অগ্রে দিক্-কুমারী বারুণী শূকরের পৃষ্ঠে আসীনা। বাহনদ্বয় দুরন্ত বেগে ধাবমান এবং দিক্‌পাল দিক্-কুমারী সঙ্গীতে আত্মহারা। দুর্ভাগ্যক্রমে এই ফলকটির প্রায় অর্দ্ধেক ভগ্ন। মনে হয়, কোন বিশেষ ঘটনা, যথা বুদ্ধ-জন্ম অথবা শিব-বিবাহ সম্ভবতঃ এই অপার্থিব আনন্দ ও উল্লাসের মূল কারণ। এই দৃশ্যটি হয়ত এই ফলকটির মধ্যস্থলে দেখান হয়েছিল। পরবর্ত্তী যুগের 'শিববিবাহ' অথবা 'কল্যাণসুন্দরম্'-এর দৃশ্যে দেব, গণ, কিন্নর ইত্যাদির সমাবেশ দেখা যায়।[১]

মানব ও পশুর সম্মিলিত মূর্ত্তির প্রথম পরিচয় পাওয়া যায় সিন্ধু উপত্যকার প্রাগৈতিহাসিক সীল-মোহর ও পশ্চিম এশিয়ার পূর্ব্ব-ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চল এবং মিশরের বিভিন্ন পুরাকীর্ত্তিতে।

কল্পিত মানব এবং জীবমূর্ত্তি চন্দ্রকেতুগড়, তাম্রলিপ্ত, বাহিরী এবং মহাস্থানগড় থেকে আরও আবিষ্কৃত হয়েছে এবং সেইগুলি আশুতোষ চিত্রশালায় সংরক্ষিত আছে। ইতিপূর্ব্বে তাম্রলিপ্তে আবিষ্কৃত কুষাণযুগের বৃষমুণ্ডবিশিষ্ট খাদ্যলোভাতুর মানবমূর্ত্তি হেলেনীয় উপকথার 'লেবিরীন্থ'-বাসী ভয়ঙ্কর মিনোটর রাক্ষসের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। এ ছাড়া, চন্দ্রকেতুগড় ও তাম্রলিপ্তের ডানাওয়ালা সিংহ ও সিন্ধু-অশ্ব অতীত পাশ্চাত্য জগতের শিল্পে রূপায়িত 'Griffin' এবং 'Sea-horse'-কে মানসলোকে উদিত করে। এই দু'টি জীব এবং অনেক রহস্যময় চিহ্ন ও মূর্ত্তি মৌর্য্য, শুঙ্গ ও কুষাণযুগের ভারতের প্রস্তর-ভাস্কর্য্যসমূহেও দৃষ্টিগোচর হয়। সর্ব্বাধিক আশ্চর্য্যের বিষয়, গঙ্গার মোহনা-অঞ্চলের শিল্পের সঙ্গে ইউরোপ ও মধ্যপ্রাচ্যের শিল্পের ঘনিষ্ঠতা। এর পশ্চাতে নিহিত অজানা ইতিহাসটি ক্রমেই আমাদের চিত্তকে কৌতুহলী ক'রে তোলে।

---

১ অনুরূপ একটি দৃশ্য আশুতোষ চিত্রশালায় একটি রাজস্থানী চিত্রে দেখা যায়।

মহান্ মুহূর্ত্তে তাঁদের মর্ত্ত্যে অবতীর্ণ হবার দৃশ্যটিকে রূপায়িত করে। এই প্রসঙ্গে বলা যায় যে, ভারহুতে এক শিলালিপিতে একজন 'দেবপুত্রের' কথা পাওয়া গিয়েছে ভগবান্ বুদ্ধের আগমন-প্রসঙ্গে।

বিভিন্ন নারীমূর্ত্তির ন্যায় পুরুষ মূর্ত্তিগুলির কেশ-বিন্যাসেও নানা বৈচিত্র্য দেখা যায়। কোন কোন-ক্ষেত্রে ললাট ও জুল্‌ফের দিকে কিছু বিন্যস্ত কেশ ভারতের ভারহুত ও পশ্চিম এশিয়ার নানা ভাস্কর্য্যের অনুরূপ রূপায়নের সঙ্গে বিশেষ ভাবে তুলনীয়। এই ধরণের কেশবিন্যাসই পরবর্ত্তীযুগের 'কাক-পক্ষ'-রীতির সৃষ্টি করেছে কি না তা আমাদের বিশেষ ভাবে বিবেচ্য। 'কাক-পক্ষ' রীতিতে কিছু কেশ বিক্ষিপ্তভাবে মুখের উপর ছড়ান থাকে। রাজপুত-মুঘল চিত্রকলায় এই রীতির বিশেষ জনপ্রিয়তা দেখা যায়।

বীণাবাদনরত রাজপুত্র উদয়ন, পোড়ামাটি, চন্দ্রকেতুগড়ে, আনুমানিক খ্রীষ্টীয় ১ম শতাব্দী

চন্দ্রকেতুগড়ের আবিষ্কৃত বিভিন্ন মৃন্ময় ভাস্কর্য্য-চিত্রে ব্রাহ্মণ্যধর্ম্ম ও বৌদ্ধধর্ম্মের নানা কথা ও কাহিনীর রূপ দেখা যায়, সেগুলি কম-বেশী দু'হাজার বছর আগেকার বাংলার আধ্যাত্মিক মনোভাব এবং ধর্ম্ম-চিন্তার সুস্পষ্ট ইঙ্গিত বহন করে। অগণন সংখ্যায় পোড়ামাটির ফলকে এই ভাবে চিত্র-রূপায়নের পদ্ধতি এই দেশের শিল্পধারার এক বৈশিষ্ট্য; কারণ, এখানে কোমল গাঙ্গেয় মৃত্তিকাই চিরদিন কঠিন ও ভারী প্রস্তরের সহজ অনুকল্প। ইতিহাস-পূর্ব্ব কাল থেকে এই মৃন্ময় আলেখ্যসমূহের রূপায়ণ সুরু এবং খ্রীষ্টীয় ১৮শ শতক পর্য্যন্ত বাংলার দেউল-প্রাচীরে এদের গৌরবময় শোভাযাত্রা।

চন্দ্রকেতুগড়ের ফলকগুলিতে বৌদ্ধ জাতকমালার চিত্রেরই বেশি আধিক্য নজরে পড়ে। এতদ্ভিন্ন গৌতম বুদ্ধের সমসাময়িক কালের বিভিন্ন ঐতিহাসিক ঘটনারও চিত্রণ আছে। এই ফলকসমূহের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা এবং সম্ভাব্য কাহিনীসমূহের উল্লেখ নিচে দেওয়া হ'ল।

১। এক ভগ্ন মৃৎফলকে অরণ্যচারী এক বিপুলায়তন হস্তীকে দেখা যায়। চিত্রটি সম্ভবতঃ ছদন্ত-জাতকের কাহিনীমূলক। এই জাতকে বর্ণিত আছে বোধিসত্ত্ব একদা ছদন্ত হাতীরূপে হিমালয়ের গভীর অরণ্যে বাস করতেন এবং চরম ক্ষমা ও তিতিক্ষার আদর্শ স্থাপন করেন। ইতিপূর্বে তাম্রলিপ্তের শুঙ্গযুগের এই ধরণের মৃন্ময় ফলক আবিষ্কৃত হয়েছে। শিল্পশৈলীর বিচারে মনে হয় বর্ত্তমান ফলকটি সম্ভবতঃ খ্রীষ্টীয় ১ম শতাব্দীতে নির্ম্মিত হয়েছিল।

২। বীণাবাদনের দৃশ্যমূলক এই মৃন্ময় আলেখ্যটি (খ্রীষ্টপূর্ব ১ম শতাব্দী) পূর্বে বর্ণিত হয়েছে। মনে হয় গুত্তিল-জাতকের কাহিনী অবলম্বনে এই দৃশ্যটি রচিত হয়েছে। কথিত আছে, গুত্তিল বারাণসীর বিখ্যাত বীণাবাদক ছিলেন এবং ইন্দ্রের আমন্ত্রণে কিছুকালের জন্য স্বর্গে বাস করেন এবং দেববালাগণের একান্ত অনুরোধক্রমে তাঁদের নৃত্যকালে বীণায় স্বর-সংযোজনা করেন। বর্ত্তমান ফলকে প্রদর্শিত সিংহাসনে উপবিষ্ট রাজকীয় বীণাবাদক সম্ভবতঃ গুত্তিল এবং নর্ত্তকীদ্বয় স্বর্গলোকের দেবকন্যা। এই ধরণের একটি মৃন্ময় আলেখ্য ইতিপূর্বে তাম্রলিপ্তের ধ্বংসাবশেষে আবিষ্কৃত হয়েছে।

৩। এই দৃশ্যের একজন বীণাবাদক ও তার পোষা হাতীকে দেখান হয়েছে। শিরস্ত্রাণ-পরিহিত সঙ্গীতজ্ঞ পুরুষটির এক হাতে সুদীর্ঘ বীণা এবং অন্য হাতে হস্তীর শুণ্ড বেষ্টন করে আছে। আলেখ্যটি স্বভাবতঃই বৌদ্ধ সাহিত্যে বর্ণিত বৎসরাজ উদয়নের কাহিনীকে স্মরণ করিয়ে দেয়। "দিব্যাবদানে" বর্ণিত আছে এই করুণ

নৃপতির সঙ্গীত-মূর্চ্ছনায় অরণ্যের বন্য হাতীরা সহজেই বশীভূত হ'ত। মহাকবি কালিদাসের বর্ণনায় তাঁর জীবন-কালেও উদয়নের কাহিনী উজ্জয়িনী নগরে সকলের মধ্যে প্রচারিত ছিল। ফলকটির নির্মাণ-কাল আনুমানিক খ্রীষ্টীয় ১ম শতাব্দী।

৪। সন্তরণরত কুমীরের পৃষ্ঠে আরূঢ় বানরমূর্ত্তি। পোড়ামাটির একাধিক ফলকে প্রদর্শিত এই ভাস্কর্য্য-চিত্রটি খ্রীষ্টীয় ১ম ও ২য় শতাব্দীর শিল্প-বৈশিষ্ট্যের সাক্ষ্য বহন করে। আখ্যানবস্তুটি স্বভাবতঃই "শুংশুমার জাতক" অথবা "মর্কট জাতক" থেকে গৃহীত ব'লে মনে করা যেতে পারে। এই কাহিনীতে বর্ণিত আছে, একবার বোধিসত্ত্ব মর্কটরূপে জন্মগ্রহণ করেন, এবং সেই সময় এক শুংশুমার অথবা কুমীর তাঁকে নদী পার করবার ছলে হৃদ্‌পিণ্ড নিতে উদ্যত হয়। এই চরম প্রাণ-সংশয় থেকে বোধিসত্ত্ব নিজ বুদ্ধিবলে উদ্ধার পান। তিনি কুমীরকে বললেন, তাঁর হৃদ্‌পিণ্ড নদীর অপর তটে বৃক্ষশাখায় ঝোলান আছে। ফলে লোভী কুমীর বুদ্ধির খেলায় সমুচিত ভাবে পরাজিত হয়। "পঞ্চতন্ত্রে"ও এই বিখ্যাত উপাখ্যানটি পাওয়া যায়। জাপান এবং রুশদেশের সাহিত্যে এই গল্পটি প্রকারান্তরিত ভাবে সন্নিবেশিত আছে *

৫। শুঙ্গযুগের দু'টি ফলকে শাবকসহ এক সুন্দর ও বৃহৎ কুক্কুট দেখা যায়। সম্ভবতঃ এখানে "কুক্কুট জাতকে"র কাহিনীর একটি দৃশ্য রূপায়িত হয়েছে। বোধিসত্ত্ব একবার এক বন্য মোরগরূপে জন্মগ্রহণ করেন এবং এক লোভী মার্জ্জারের আপাতমধুর আচরণে বিন্দুমাত্র প্রলুব্ধ না হয়ে তাঁর শাবকদের রক্ষা করেন। কুক্কুট জাতকের চিত্র ভারহুত স্তূপ-বেষ্টনীর এক স্থানে ক্ষোদিত আছে।

৬। আনুমানিক খ্রীষ্টপূর্ব্ব ১ম শতাব্দীর এক ভগ্ন মৃন্ময় ফলকে রূপায়িত এক মৃগয়ার দৃশ্য বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। হস্তীপৃষ্ঠে আরূঢ় এক রাজকীয় শিকারী এবং সম্মুখে সঙ্কীর্ণ স্থানে আবদ্ধ এবং পলায়নে অক্ষম এক মৃগ। এই চিত্রটি "নরাদীয় জাতক"কে স্মরণ করিয়ে দেয়। এখানে বর্ণিত আছে, এক নির্ব্বোধ অবাধ্য হরিণ কেমন ক'রে ফাঁদে আবদ্ধ হয়ে শিকারী কর্ত্তৃক নিহত হয়। বর্ত্তমান দৃশ্যটির অপরূপ গতিশীলতা এবং মৃগের মৃত্যু-যন্ত্রণা যেন পরোক্ষ ভাবে প্রাচীন আসিরীয় মৃগয়া দৃশ্যসমূহকে মনে করিয়ে দেয়। ফলকটির বাস্তব চিত্রণ যেন মৃগয়ার হৃদয়-হীনতার প্রতি ইঙ্গিত করে।

৭। কুমীর কর্ত্তৃক আক্রান্ত হস্তীর দৃশ্য (আনুমানিক খ্রীষ্টীয় ২য় শতাব্দী)। এই ধরণের ফলকে একটি কুমীরকে দন্তদ্বারা একটি হাতীর শুঁড়কে আকর্ষণ করতে দেখা যায়। এই দৃশ্যটি স্পষ্টতঃই পুরাণে বর্ণিত "গজেন্দ্র-মোক্ষ" কাহিনী থেকে গৃহীত।

দেওগড়ে গুপ্তযুগে নির্ম্মিত মন্দিরের প্রাচীর-গাত্রে এই কাহিনীর চিত্র ক্ষোদিত আছে। এ ছাড়া উড়িষ্যার ধারাবাহিক পট-চিত্রেও জগন্নাথদেবের মন্দির-প্রসঙ্গে এর বর্ণাঢ্য রূপায়ন দেখা যায়। চন্দ্রকেতুগড়ে এই ধরণের একাধিক পোড়ামাটির ফলক আবিষ্কৃত হয়েছে এবং এগুলিকে সাধারণতঃ কুষাণযুগের ব'লে নির্দ্দেশ করা যেতে পারে।

৮। বর্ম্মাবৃত যোদ্ধাকর্ত্তৃক মুদ্রাবিতরণ। আনুমানিক খ্রীষ্টীয় ১ম শতাব্দীর একটি ভগ্ন ও লোহিতবর্ণের মৃন্ময় ফলকে এই দান-কার্য্য রূপায়িত হয়েছে। কোমর থেকে হাঁটু পর্য্যন্ত ধাতুনির্ম্মিত দোদুল্যমান পাত-সমন্বিত রোমান্ বর্ম্ম-পরিহিত এই সৈন্যাধ্যক্ষকে এক দীর্ঘ পেটিকা থেকে গোলাকৃতি ও চতুষ্কোণ মুদ্রা বিতরণ করতে এবং অনুরূপ বর্ম্ম-পরিহিত অপর একজন সৈনিক পুরুষকে সেগুলি সাগ্রহে সংগ্রহ করতে দেখা যায়।* দৃশ্যটি সম্ভবতঃ বুদ্ধানুরাগী যক্ষ-সেনাপতি পাঞ্চিকের অবদান প্রসঙ্গে নির্ম্মিত। পাঞ্চিক ও তাঁর স্ত্রী হারিতীকে গান্ধার ভাস্কর্য্যে প্রায়শঃই গ্রেকো-রোমান্ বর্ম্ম ও পোশাকে আবৃত্ত অবস্থায় অন্ন ও শস্যদাতারূপে দেখান হয়েছে। অমরাবতীর চিত্রাঙ্ক (Relief) আলেখ্যতেও এক স্থানে পাঞ্চিককে শক-যোদ্ধার আকৃতিতে এবং হারিতীকে হেলেনীয় তরুণীর পোশাক ও ভঙ্গিতে দেখা যায়।†

৯। হস্তীপৃষ্ঠে নারীপরিবৃত রাজমূর্ত্তি (খ্রীঃ পূঃ শতাব্দী)। এই আলেখ্যটি ভারহুতের স্তূপ-বেষ্টনীর

*The Jataka: Edited by E. B. Cowell, London. 1957. pp. 110 ff.

* এই মুদ্রাগুলি ভারতের স্থাপত্যে ক্ষোদিত অনাহত ... কয়েন দলের পাঞ্চিক মুদ্রাগুলির অনুরূপ। সুতরাং মুদ্রাগুলি অঙ্কচিহ্নিত (Punch-marked) ব'লে ধ'রে নেওয়া যেতে পারে।

† রোম-শাসিত ব্রিটেনে হারিতীর অনুরূপ 'অন্নপূর্ণা' দেবীর পূজা প্রচলিত ছিল। এই পূজার উৎপত্তি এশিয়ায়, এবং ইংল্যাণ্ডে প্রচার হয় রোমক সৈনিকদের দ্বারা। এই কারণে পণ্ডিতেরা এই জাতীয় দেবদেবীদের 'Transmarine' আখ্যা দিয়েছেন: Winbolt—Britain under the Romans (a Pelican Book) p. 107, Fig. 13.

ক্ষোদিত অজাতশত্রুর বুদ্ধ দর্শন মানসে হস্তী-পৃষ্ঠে নারী-রক্ষী পরিবেষ্টিত অবস্থায় যাত্রাকে স্মরণ করিয়ে দেয়। আঙ্গিকগত বিচারেও বর্ত্তমান ফলকটি ভারহুত-শিল্পের নিকটতর।

পোড়ামাটির মুখমূর্তি, কুষাণযুগ, চন্দ্রকেতুগড়

১০। উচ্চ সোপানশ্রেণী। নিচে বৃক্ষ-চৈত্য এবং সোপানের দুই পার্শ্বে হস্তী এবং মকর অথবা সিন্ধু-অশ্ব। দৃশ্যটি অবলোকন করলে মনে হয় এখানে হয়ত গৌতম বুদ্ধ কর্তৃক সংকাশ্যে প্রদর্শিত অলৌকিক লীলার কাহিনীটি সাঁচীর দৃশ্য-ভঙ্গিমায় অতি সংক্ষিপ্তভাবে বর্ণিত হয়েছে। মইয়ের আকারের সিঁড়িটি যেন স্বর্গলোক পর্যন্ত প্রসারিত। পাশ্চাত্য ভঙ্গিতে প্রদর্শিত বৃক্ষটি সম্ভবতঃ বোধিবৃক্ষ এবং বুদ্ধের স্বর্গলোক যাত্রার ইঙ্গিত-পূর্ণ। কাল্পনিক ভঙ্গিতে প্রদর্শিত জীবদ্বয় দেবলোক ও নরলোকের বন্দনাজ্ঞাপক। সাঁচীর উত্তর-তোরণের দক্ষিণ-স্তম্ভের সম্মুখভাগে "সংকাশ্যের অলৌকিক লীলা" (Miracle of Sankasya) প্রদর্শিত হয়েছে। সেখানেও বোধিদ্রুম ও সোপানশ্রেণী কতকটা এই ভাবেই ক্ষোদিত হয়েছে। কথিত আছে, বুদ্ধ তাঁর নিজ মাতাকে অভি-ধর্ম শোনাবার জন্য ত্রয়োত্রিংশ স্বর্গে গমন করেন এবং সেখানে তিন মাস অবস্থান করবার পর শক্র ও ব্রহ্মার সমভিব্যাহারে সংকাশ্যে সোপানশ্রেণীর দ্বারা অবতরণ করেন। শিল্পগত বিচারে ফলকটিকে খ্রীষ্টীয় ১ম শতাব্দীর বলে মনে হয়। মই আকারে সোপানশ্রেণীর রূপায়ন-পদ্ধতি এবং জীবদ্বয়ের দ্বিপরিসর শিল্প-রীতি ও গতিশীলতা খ্রীষ্টীয় ১ম শতাব্দীর প্রারম্ভের দিকে ইঙ্গিত করে।*

১১। রাজকীয় দম্পতি। আনুমানিক খ্রীষ্টীয় ১ম শতাব্দীতে রূপায়িত এই মৃৎফলকে এক রাজবেশধারী সৌখিন যুবা ও তাঁর বাম পার্শ্বে এক সুবেশা তরুণীকে দণ্ডায়মান অবস্থায় দেখা যায়। তরুণীটির মৃণাল বাহু তাঁর প্রিয়তমের কণ্ঠ বেষ্টন ক'রে আছে। ইতিপূর্ব্বে একই ধরনের কুষাণকালের কয়েকটি মৃন্ময় ফলক প্রাচীন দক্ষিণ পাঞ্চালের রাজধানী অহিচ্ছত্রায় আবিষ্কৃত হয়েছে। তবে এই ক্ষেত্রে নায়কের কটিবিলম্বিত অথবা কটিতে স্থাপন-করা দক্ষিণ হস্তে একটি বেহালা আকারের তারযন্ত্র দেখা যায়। চন্দ্রকেতুগড়ের ফলকটির ঠিক এই অংশটি ভাঙা। সেই জন্য মনে হয়, এইখানেও অহিচ্ছত্রার প্রেম অথবা দাম্পত্য-দৃশ্যের সম্পূর্ণ পুনরাবৃত্তি ঘটেছিল। এইখানে উল্লেখযোগ্য যে, বাংলা এবং উত্তর প্রদেশের দৃশ্যে নায়কের মাথায় অবিকল এক ধরণের শিরস্ত্রক অথবা পাগড়ি ও গায়ে ফাঁক ফাঁক-ক'রে বোনা বিলাতি 'জার্সি'র ন্যায় আঁটা অঙ্গবাস এবং তার উপর কাঁধের দু'পাশ দিয়ে প্রবাহিত চিকন সূত্রের উত্তরীয়। প্রখ্যাত প্রত্নশিল্প-বিশেষজ্ঞ আগ্রাওয়ালের মতে, অহিচ্ছত্রার ফলকগুলিতে পুরাণে বর্ণিত পবিত্র উত্তর-কুরুদেশের চির-সুখী দাম্পত্য-জীবনের চিত্র প্রতিফলিত।

পুরাণ ও মহাভারতে উত্তর-কুরুর দাম্পত্য-জীবনের যেরকম বর্ণনাই থাকুক না কেন, এমনও হতে পারে যে, বর্ত্তমান ক্ষেত্রে সঙ্গীতপ্রিয় রাজপুত্র উদয়ন এবং বাসব-দত্তার প্রেমালেখ্য মূর্ত্ত হয়েছে। কথিত আছে, অর্জ্জুনের বংশধর কৌশাম্বীর রাজপুত্র উদয়নকে অবন্তীরাজ চণ্ড প্রদ্যোত মহাসেন প্রতারণাপূর্ব্বক বন্দী করেন এবং এমনভাবে তাকে নিজ-কন্যা বাসবদত্তার সঙ্গীত-শিক্ষক নিযুক্ত করেন যাতে তারা পরস্পর পরস্পরকে চিনতে না

* এই ধরণের সিঁড়ির কল্পনা প্রাচীন মেসোপটেমিয়ার জিগুরাতে (Ziggurat) দেখা যায়।

ভগ্ন মৃৎফলক, সম্ভবতঃ সূর্য্যরথের ধাবমান অশ্বসমূহ রূপায়িত হয়েছে, চন্দ্রকেতুগড়, আনুমানিক খ্রীঃ ১ম শতাব্দী

চক্র লাগান থাকে। এছাড়া কোনারকের সূর্য্যমন্দির এবং মামল্ল-পুরমের মন্দিরসমূহেও অতিকায় স্বর্গীয় রথের কল্পনা প্রতিভাত হয়।

চন্দ্রকেতুগড়ের মৃন্ময় শকটগুলির নির্ম্মাণকাল শুঙ্গযুগ থেকে কুষাণযুগের সমাপ্তি পর্য্যন্ত বিস্তৃত। এই ধরণের শকট ইতিপূর্ব্বে বাঙলার বাণগড়, তাম্রলিপ্ত, আটঘরা ও হরিনারায়ণপুর এবং উত্তর প্রদেশের কৌশাম্বী, অহিচ্ছত্রা ইত্যাদি স্থানে আবিষ্কৃত হয়েছে।

চন্দ্রকেতুগড়ের মূর্ত্তি-সমন্বিত মৃৎ শকটসমূহকে বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়, যথা:

১। হস্তীমূর্ত্তিযুক্ত মৃৎশকট। এ স্বর্গীয় মাতঙ্গগুলি কোন কোন পক্ষবিশিষ্ট। এবং প্রায় সর্ব্বক্ষেত্রে নানা অলঙ্কার ভূষিত এবং উৎপল-কাননে ক্রীড়ারত। কোন কোন পণ্ডিতের মতে এই পোড়ামাটির দেবরাজ শক্র অথবা ইন্দ্রের বাহন ঐরাবতের প্রতিমূর্ত্তি এ ছাড়া, ভগবান্ বুদ্ধও অনেক ক্ষেত্রে এক দিব্য হস্তী মূর্ত্তিতে ("গজোত্তম") কল্পিত হতেন, যার নিদর্শন পাওয়া যায় ভারহুত এবং সাঁচীর পাষাণ-আলেখ্যতে।

পারে। কিন্তু এত সাবধানতা সত্ত্বেও উদয়ন এবং বাসবদত্তা পরস্পর প্রেমে আকৃষ্ট হয় এবং অবন্তীর রাজধানী উজ্জয়িনী থেকে পলায়ন করতে সক্ষম হয়।

১২। দারু-নির্ম্মিত সূক্ষ্ম কারুকার্য্যখচিত বিহারের প্রবেশদ্বারে দণ্ডায়মান পুরুষ। এই ফলকটি সম্ভবতঃ খ্রীষ্টীয় ১ম শতাব্দীতে নির্ম্মিত হয়েছিল, এবং ইতিপূর্ব্বে একই দৃশ্য-সম্বলিত কুষাণ যুগের একটি পোড়ামাটির ক্ষুদ্র ভাস্কর্য্য তাম্রলিপ্তে আবিষ্কৃত হয়েছিল। দৃশ্যটি স্বভাবতঃই বৌদ্ধ সাহিত্য "দিব্যাবদানে" বর্ণিত পূর্ণ-অবদানের কাহিনীকে স্মরণ করিয়ে দেয়। কথিত আছে, পূর্ণের চন্দন-কাষ্ঠ-নির্ম্মিত বিহারে একদা বুদ্ধ পদার্পণ করেছিলেন। অজন্তার দ্বিতীয় গুহায় পূর্ণ-অবদানের কাহিনী গুপ্ত-বাকাটক যুগের রীতিতে চিত্রিত আছে।

চন্দ্রকেতুগড়ে এক শ্রেণীর সুন্দর পোড়ামাটির ক্ষুদ্রাকার শকট অথবা রথ আবিষ্কৃত হয়েছে। এইগুলি খুব সম্ভবতঃ একদিকে যেমন খেলনা হিসাবে ব্যবহৃত হ'ত, অন্যদিকে তেমনই বিভিন্ন দেব দেবীর প্রতীক হিসাবেও সাধারণের ভক্তি-অর্ঘ্য লাভ করত। এক কথায় এই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রথগুলি যেন স্বর্গলোকের বিমানসমূহের প্রতিকৃতি। আজও বাঙলার ঢোকরা কামারগণ কর্ত্তৃক নির্ম্মিত ব্রোঞ্জের হস্তী, অশ্ব ইত্যাদি পূজায় ব্যবহৃত একশ্রেণীর মূর্ত্তির নীচে

চন্দ্রকেতুগড়ের হস্তীমূর্ত্তিগুলির বলিষ্ঠতা ও আবেগ এবং মর্য্যাদাপূর্ণ সুডৌল দেহ যেন সহজেই দিগ্‌নাগগণকে স্মরণ করিয়ে দেয়, যদিও কোন কোন স্ফীত দেহে উদ্বেলিত বিপুল শক্তির আভাস অন্তর্গত ধৌলিতে মৌর্য্যযুগে ক্ষোদিত "বাকা অথবা অর্দ্ধ-প্রকাশিত হস্তীটিকে মানসপটে উদিত ক

২। অশ্বমূর্ত্তিসমন্বিত মৃৎশকট। অশ্বসমূহের সাজ ও উন্নত গ্রীবা দেখে মনে হয়, এইগুলি সাধারণ লৌকিক নয়, এইগুলি দেবগণের বাহন রাজকীয় তুরঙ্গসমূহ হয়ত প্রকৃতপক্ষে সূর্য্য অথবা বাহনের প্রতিকৃতি। কোন কোন সময় তাম্রলিপ্তের অশ্ব-শকটের ন্যায় এই মূর্ত্তিগুলিকে শুঙ্গ-কুষাণ ছাপ-চিহ্নযুক্ত অবস্থায় দেখা যায়।

৩। সজ্জিত মেষমূর্ত্তিযুক্ত মৃৎশকট। কখনও গুলির সাজসজ্জা বিশেষভাবে প্রদর্শিত হয়েছে। রত্নময় ফিতা ছাড়া অন্ততঃ একটি ক্ষেত্রে ভেড়ার

একটি সুন্দর ঘণ্টার মালা দেখা যায়। ইতিপূর্ব্বে পোড়ামাটির মেষশকট বাঙলা এবং উত্তর ভারতের বিভিন্ন স্থানে আবিষ্কৃত হয়েছে।

কোন কোন পণ্ডিতের মতে এই মেষগুলি অগ্নির বাহনরূপে নির্ম্মিত।

৪। সজ্জিত গো-শকট। এই ধরণের শকট ইতিপূর্ব্বে তাম্রলিপ্তে আবিষ্কৃত হয়েছে। চন্দ্রকেতুগড়ের মূর্ত্তিটির লাল রঙের প্রলেপ, বলিষ্ঠ আকৃতি এবং ছাপসমূহ কুষাণ যুগের শিল্প-রীতিকে স্মরণ করিয়ে দেয় এবং এদের পশ্চাতে কামধেনুর কল্পনা থাকা অসম্ভব নয়।

৫। ব্যাঘ্রমূর্ত্তিযুক্ত শকট। এই মূর্ত্তিটির লম্বা ও গোলাকার গ্রীবা এবং সমতল মুখমণ্ডলের বৃত্তাকার হস্তিনাপুরের প্রাক্ মৌর্য্য ও মৌর্য্যোত্তর থেকে আবিষ্কৃত মৃন্ময় শাবলকে মানসপটে উদিত করে। বর্ত্তমান মূর্ত্তিটি সম্ভবতঃ প্রাচীন বাংলার ব্যাঘ্র রেখা পূজার স্মৃতি বহনকরে। আজও নিম্ন বঙ্গে ব্যাঘ্র-দেবতা দক্ষিণ রায়, সোনা রায় ইত্যাদি নামে পরিচিত এবং হিন্দু-মুসলমান নির্ব্বিশেষে পূজিত। ২৪-পরগণার ধপধাপিতে ব্যাঘ্র-দেবতা দক্ষিণ রায়ের একটি মন্দির আছে। সম্প্রতি চন্দ্রকেতুগড়ে কুষাণ যুগের আঙ্গিক-বিশিষ্ট ব্যাঘ্র-বাহনে উপবিষ্ট দু'টি মূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছে। একটি ক্ষেত্রে এক অপরূপ দ্বিতল দেউলের হর্ম্ম্যতলে শক্তিসহ এই দেবতাকে হস্ত ও প্রেমিক রূপে দেখা যায়। এই মূর্ত্তিটি আনুমানিক খৃষ্টীয় ১৭শ শতাব্দীতে কবি কৃষ্ণরাম • রচিত "রায়মঙ্গল" সাহিত্যে বর্ণিত দক্ষিণ রায়কে স্মরণ করিয়ে দেয়। এই দেবতা নাকি স্বপ্নে কবি কৃষ্ণরামকে দর্শন দিয়েছিলেন।

ইন্দ্র, পোড়ামাটি, চন্দ্রকেতুগড়, খৃঃ পূঃ ১ম শতাব্দী

কবির নিজ বর্ণনা এইরূপ :

"শুনহ সকল লোক অপূর্ব্ব কথন।
যে মতে হইল এই কবিতা রচন॥
খাসপুর পরগণা নাম মনোহর।
বড়িস্যা তথায় এক তথা বিশ্বাম্বর॥
তথায় গেলাম ভাদ্রমাস সোমবারে।
নিশিতে শুইলাম গোয়ালের গোলাঘরে
রজনীর শেষে এই দেখিলাম স্বপন।
বাঘপীঠে আরোহণ এক মহাজন॥

করে ধনুঃশর চারু সেই মহাকায়।
পরিচয় দিল মোরে দক্ষিণের রায়॥"*

এখন রায়মঙ্গলের বর্ণনা এবং চন্দ্রকেতুগড়ের মৃন্ময় মূর্ত্তিসমূহ দেখে সঙ্গতভাবেই এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে, বাংলা দেশে ব্যাঘ্র-দেবতার পূজা চ'লে আসছে বহু প্রাচীনকাল থেকে। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, হরপ্পায় খনন-কার্য্যের ফলে আবিষ্কৃত একটি পোড়ামাটির সীলে মাতৃমূর্ত্তির সঙ্গে যুগল শার্দ্দুল দেখা যায়, এবং এ থেকে ম্যাকে অনুধাবন করেন যে, এই জীবদ্বয় দেবীপূজার সঙ্গে বিশেষভাবে জড়িত।** মোহেঞ্জোদাড়োতে আবিষ্কৃত তথাকথিত ব্যাঘ্র শিকারের দৃশ্যটি প্রকৃতপক্ষে ব্যাঘ্র-দেবতার চিত্র হওয়াই স্বাভাবিক। এখানে বৃক্ষোপরি এক দিব্যপুরুষ নির্ব্বিকার ভাবে উপবিষ্ট এবং নিম্নে যেন নিজ দেবতাকে অবলোকনরত এক ব্যাঘ্র। খ্রীষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীতে উৎকীর্ণ সম্রাট্ সমুদ্রগুপ্তের এলাহাবাদ অনুশাসনে এই দিগ্বিজয়ীর নিকট পরাজিত নৃপতিগণের তালিকায় মহাকান্তারের অধিপতি ব্যাঘরাজের উল্লেখ আছে। ঐতিহাসিকগণ এই মহাকান্তারকে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে নির্দ্দেশ ক'রে থাকেন। সাধারণতঃ মনে করা হয়, এই রাজ্যটি মধ্য ভারত অথবা বঙ্গ সীমান্তের বর্ত্তমান ঝাড়খণ্ডে অবস্থিত ছিল * এই ব্যাঘ্ররাজ নামটির পশ্চাতেও ব্যাঘ্র-দেবতার কল্পনা থাকা বিচিত্র নয়।

৬। পোড়ামাটির সূর্য্যরথসমন্বিত-শকট। দেবতার দুই পাশে তাঁর দুই স্ত্রী ঊষা ও প্রত্যুষা, তাঁর রথ চতুরশ্ববাহিত এবং রথচক্রতলে রাত্রির গাঢ় অন্ধকারের অকল্যাণরূপী দানব পিষ্ট। প্রশান্ত ও নির্ব্বিকার আননে সূর্য্যদেব অনন্তকাল আকাশ-পরিক্রমায় রত, এবং তাঁর দুই চিরসঙ্গিনী সশ্রদ্ধ আবেগে পতি অংশুমালীর মুখাবলোকনে রতা, যেন বিশ্বলোকের ত্রিকালকে অবগত হবার জন্য। ঠিক সে কারণে সম্ভবতঃ পারস্যের হাসানলুর সিংহবাহিনীর স্থির দৃষ্টি দর্পণের প্রতি একাগ্রভাবে নিবদ্ধ।

বর্ত্তমান মূর্ত্তিটির দ্বিপরিসর শিল্পরীতি এবং সামগ্রিক দৃষ্টি-ভঙ্গি খ্রীষ্টীয় ২য় শতাব্দীর নন্দনাদর্শকে প্রতিফলিত করে। এই ক্ষুদ্র ভাস্কর্য্যটি বিশেষ ভাবে তুলনীয় পশ্চিম ভারতীয় উপকূলের ভাজাগুহার দ্বার-পার্শ্বে ক্ষোদিত সূর্য্যমূর্ত্তির চিত্রার্দ্ধ (Relief) আলেখ্যের সঙ্গে।

৭। মেষ-পৃষ্ঠে আরূঢ় দেবতা। আশুতোষ চিত্রশালার অধ্যক্ষ শ্রীদেবপ্রসাদ ঘোষের মতে এই মেষবাহন দেবতা বৈদিক দেবতা অগ্নির প্রতিমূর্ত্তি। এই মৃন্ময় মূর্ত্তিটির স্বচ্ছন্দ ও বাস্তবধর্ম্মী গঠন-পদ্ধতি এবং অঙ্গলিপ্ত অস্বচ্ছন্দ কটিবাসের সুস্পষ্ট ভাঁজসমূহ কুষাণকালের সমাপ্তির দিকে অর্থাৎ খ্রীষ্টীয় ৩য় শতাব্দীর প্রতি ইঙ্গিত করে।

৮। দ্বিতল দেউলের নীচে ব্যাঘ-পৃষ্ঠে আরূঢ় খড়্গ ও খেটক হস্তে দেবতা এবং তাঁর শক্তি। ইতিপূর্ব্বে এই পুরাবস্তুটি আলোচিত হয়েছে। মূর্ত্তিদ্বয় সম্ভবতঃ প্রাচীন ব্যাঘ-দেবতা দক্ষিণ রায় এবং তাঁর শক্তি। দেব-দম্পতির বলিষ্ঠ গঠন-পদ্ধতি এখনও দ্বিপরিসরতা অতিক্রম করে নি এবং তাঁদের বিভিন্ন আবরণাদি খ্রীষ্টীয় ২য় শতাব্দীর ভারতীয় ভাস্কর্য্যের রচনার শৈলী প্রকৃতিকে স্মরণ করিয়ে দেয়। কোষমুক্ত সমধার তরবারি ও ঢাল হস্তে এই দেবতার বীরত্বব্যঞ্জক আকৃতি যেন সুপ্রাচীন "গঙ্গারিডি"দের ক্ষত্রিয় ভাবকে প্রতিফলিত করে।

৯। বিশালকায় পক্ষীর নখরে আবদ্ধ হস্তী মূর্ত্তিটি স্বভাবতঃই "গজেন্দ্র-মোক্ষ" কাহিনীর একটি দৃশ্যের রূপায়ন। এই রথটি আঙ্গিকগত বিচারে আনুমানিক খ্রীষ্টীয় ১ম শতাব্দীতে নির্ম্মিত হয়েছিল ব'লে মনে হয়।

১০। গণমূর্ত্তির মুখযুক্ত রথ। এই মুখটি ভয়ঙ্কর ভাবপূর্ণ, হিংস্র হাস্যে দন্তপংক্তি প্রকটিত এবং কেশ ও শ্মশ্রু ভীষণতাব্যঞ্জক। একদিকে যেমন গণমূর্ত্তিটির সঙ্গে আফ্রিকাবাসী গরিলাদের বাহ্যিক সাদৃশ্য আছে, অন্যদিকে তেমন এর উপর বিভিন্ন পত্রাকৃতি ছাপ প্রাক্-গুপ্তযুগের প্রতি ইঙ্গিত করে। এই রথটি সম্ভবতঃ খ্রীষ্টীয় ৩য় শতাব্দীতে নির্ম্মিত হয়েছিল।

১১। হস্তী-পৃষ্ঠে আরূঢ় যুগলমূর্ত্তি। খুব সম্ভব অগ্রবর্ত্তী আরোহীটি ইন্দ্রের প্রতিমূর্ত্তি। এই শক-মূর্ত্তিটি শুঙ্গকুষাণ শিল্পের প্রস্তর এবং মৃন্ময় মূর্ত্তিসমূহকে স্মরণ করিয়ে দেয়। আরোহীদ্বয়ের দ্বিপরিসর মুখ-মণ্ডল, শিরোভূষণ এবং উত্তরীয় বস্ত্র আনুমানিক খ্রীষ্টপূর্ব্ব ২ শতকের শেষভাগের প্রতি ইঙ্গিত করে।

১২। হস্তীপৃষ্ঠে আরোহী অঙ্কুশ-হস্তে একক মূর্ত্তি এই মূর্ত্তিটিও সম্ভবতঃ ইন্দ্রদেব। ভারহুতের স্তূপবেষ্টনী একটি স্তম্ভগাত্রে হস্তী-স্কন্ধে উপবিষ্ট অঙ্কুশ-হস্তে

---

* তমোনাশচন্দ্র দাশগুপ্ত: প্রাচীন বাঙ্গলা সাহিত্যের ইতিহাস। কলিকাতা, ১৯৫১। পৃঃ ২১৬-১৭।

**J. N. Banerjee: *The Development of Hindu Iconography*, Calcutta. 1941. p. 184, also foot-note.

*H. C. Roy Choudhuri: *The Political History of Ancient India.*

ধরণের এক রাজকীয় মূর্ত্তিকে দেখা যায়। তবে এখানে মূর্ত্তির বাঁ-হাতে পবিত্র দেহাবশেষ (সম্ভবতঃ বুদ্ধের) দেখা যায়। চন্দ্রকেতুগড়ের এই রথটি আনুমানিক খ্রীষ্টপূর্ব্ব ১ম শতাব্দীতে নির্ম্মিত হয়েছিল।

১৩। হস্তীর শুণ্ড-লগ্না নানা আভরণ-বিভূষিতা নগ্না নারী। কুষাণ যুগে নির্ম্মিত পোড়ামাটির শকটটিতে রূপায়িত এই নারী হাতীটিকে বেলগাছীর ফল দিচ্ছে। এই মূর্ত্তিটি "উচ্ছিষ্ট গণেশের" প্রতিরূপ হওয়া অসম্ভব নয়।* এই প্রসঙ্গে বলা যায় যে, এই শকট অথবা রথটিতে সাধারণ অন্যান্য মৃন্ময় শকটের ন্যায় কেবল হাতীর সম্মুখ ভাগটিই দেখান হয়েছে। উচ্ছিষ্ট গণেশ অথবা শক্তি গণেশ মূর্ত্তিতে সাধারণতঃ এই দেবতাকে শুণ্ডদ্বারা তাঁর স্ত্রীকে সোহাগ করতে দেখা যায়। যদি চন্দ্রকেতুগড়ের এই মৃন্ময় ভাস্কর্যটি প্রকৃতই শক্তি গণেশ অথবা উচ্ছিষ্ট গণেশের হয় তবে সম্ভবতঃ এইটিই ভারতের এই ধরণের প্রাচীনতম মূর্ত্তি।

* উচ্ছিষ্ট গণেশ অথবা শক্তি গণেশের বিস্তৃত বিবরণের জন্য T. Gopinath Rao : Elements of Hindu Iconography দ্রষ্টব্য

—০—

অর্থিক

শ্রীচিত্তপ্রিয় মুখোপাধ্যায়

"ইউরোপীয় কমন মার্কেট" ও ভারতবর্ষ

ইংলণ্ড 'কমন মার্কেট'-এ যোগদান করবে কি না তাই নিয়ে একদিকে 'কমনওয়েল্‌থ' দেশগুলিতে, অপরদিকে ইউরোপের দেশগুলিতে আলোচনার আর অন্ত নেই।

এক দলের অভিমত, ইউরোপের শক্তিশালী দেশগুলি পরস্পরের কেনা-বেচার মধ্যে যদি শুল্ক আদায় না করে এবং অন্যান্য দেশ থেকে মালপত্র কেনবার সময় সবাই মিলে একটা দর বেঁধে দেয়, তা হ'লে এশিয়া, আফ্রিকার যেসব 'অনুন্নত' দেশ এতকাল কাঁচামালের যোগানদার হয়ে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে, অসুবিধাজনক সর্ত্তেই, লেন-দেন করেছে, তারা আরও অসুবিধায় পড়বে।

বিজ্ঞান এখনও প্রায় সম্পূর্ণভাবেই ইউরোপ আমেরিকার দখলে : স্বল্পতর বা নিকৃষ্টতর কাঁচামালের সাহায্যে বেশী পরিমাণ ও বেশী মূল্যের পণ্যদ্রব্য তৈরীর জ্ঞান ক্রমেই এগিয়ে চলেছে : ফলে যেসব জাতি এতকাল শিল্প-বাণিজ্যে অগ্রণী হয়ে ছিল, তারা যেমন ইচ্ছা দর হাঁকবে ; কাঁচামাল-যোগানদারা দেশগুলি আরোই অসুবিধায় পড়বে। মালয়, বলিভিয়া, ব্রেজিল-এর টিন বা রবারের দাম কিভাবে নিয়ন্ত্রিত হয়েছিল, বা আমাদের দেশের 'ম্যাঙ্গানিজ,' লোহা, কয়লা কিভাবে বিক্রী করতে হয়েছিল, সে ইতিহাস কারোর অজানা নয়। আজ যদি এই সব দেশগুলিকেই ফ্রান্স, জার্মানী, ইংলণ্ডের সঙ্গে স্বতন্ত্রভাবে দর ঠিক না ক'রে তাদের 'জোট'-এর কাছে মাল বিক্রী করতে হয়, তার ফল এই দাঁড়াবে যে, এই সব দেশগুলিকে আর একবার এক নতুন 'সাম্রাজ্যবাদী' গোষ্ঠীর হাতের মুঠোর মধ্যে চ'লে যেতে হবে। সাম্প্রতিক বৈদেশিক ব্যবসায়ে আমাদের রপ্তানী দ্রব্যের মূল্যের হার আমদানীকৃত মূল্যের তুলনায় আপেক্ষিক ভাবে বিপরীত দিকেই যে যাচ্ছে, তাও এই সূত্রেই লক্ষণীয়।

অপর পক্ষ বলছেন : যে অর্থনৈতিক মিতব্যয়িতা ও আন্তর্জাতিক সহযোগিতা এতকাল ইউরোপ অনুসরণ করে নি বা রাজনৈতিক কারণে করতে পারে নি, আজ দু'টি যুদ্ধে আঘাত পাবার পর সেই শুভবুদ্ধি যদি তাদের হয়ে থাকে, ত পৃথিবীর পক্ষে সেটা মঙ্গলের কথা বলতে হবে : এবং অন্যান্য দেশও 'জাতীয় স্বয়ংসম্পূর্ণতা'র মত সঙ্কীর্ণ, ব্যয়সাধ্য মতবাদ ত্যাগ ক'রে যদি ভৌগোলিক ও অর্থনৈতিক সামঞ্জস্য অনুযায়ী আঞ্চলিক ভিত্তিতে 'জোট' বাঁধেন তা হ'লে সে কাজ সকলের সমর্থন পাবে।...আর কোন কারণে না হোক, নিছক ভৌগোলিক সান্নিধ্যের জন্যই ইংলণ্ডের পক্ষে পশ্চিম ইউরোপীয় বাণিজ্য-সংস্থাতে যোগদান বাঞ্ছনীয় এবং অপরিহার্য। তার 'সাম্রাজ্য' গেছে : পরিবর্তিত অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে তাকে শুধু 'কমনওয়েল্‌থ' আঁকড়ে থাকতে বলার আরেক অর্থ হচ্ছে অতীতের 'ইম্পিরিয়াল প্রেফারেন্স'এর পুনরাবৃত্তি ঘটান। শিল্প-বিপ্লবে অগ্রণী হয়েও, ইউরোপ আজ উগ্র

জাতীয়তাবাদকে প্রাধান্য দেবার ফলে আমেরিকার তুলনায় হীনবল হয়ে যেতে বাধ্য হয়েছে।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর থেকে আমাদের দেশ এবং সেই সঙ্গে এশিয়া, আফ্রিকা, দক্ষিণ আমেরিকার সমস্ত 'অনুন্নত' দেশই স্বাবলম্বী হবার চেষ্টা করছে। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের পুরাতন ধারা বদলাচ্ছে; আরও বদলাবে যখন সিংহল ও পূর্ব আফ্রিকার দেশগুলি আমাদের চা-এর রপ্তানী বাজার দখল করবে, কাপড়ের কারখানা মধ্য ও সুদূর প্রাচ্যের সব দেশগুলিতে গ'ড়ে উঠবে এবং পাটের বিকল্প সামগ্রী অন্যান্য অনেক দেশে পূর্ণোদ্যমে তৈরি হ'তে সুরু করবে।

একথা আজ অনেকাংশে ঠিক যে, কাঁচামাল-জোগানদার দেশ হিসাবে আমাদের অন্ততঃ কিছুদিনের মত সম্মিলিত ইউরোপের সঙ্গে বাণিজ্য করতে অসুবিধা হতে পারে। কিন্তু আমরা যখন স্বয়ংসম্পূর্ণতা এবং সেই সঙ্গে রপ্তানী-বাণিজ্যে অন্য দেশের সঙ্গে প্রতিযোগিতার কথা ভাবছি তখন আজ অতীতের এক ভগ্নপ্রায় ব্যবস্থাকে আঁকড়ে ধ'রে ভবিষ্যতের প্রতি উদাসীন হয়ে থাকি কি ক'রে? অচিরে আমাদের বহির্বাণিজ্যের পণ্যদ্রব্য এবং ক্রেতাগোষ্ঠীর আমূল বদল হবেই; আমাদেরও পরিবর্তিত রাজনৈতিক ব্যবসার সঙ্গে নিজেদের খাপ খাইয়ে নিতে হবে। ইউরোপের ক্ষুদ্র দেশগুলি 'যুদ্ধকালীন স্বয়ংসম্পূর্ণতা'-কে সামনে রেখে যে অদূরদর্শিতার পরিচয় দিয়েছে, অর্থ, উদ্যম, এবং কাঁচামালের ব্যবহারে যে অপচয় ঘটিয়েছে, আজ যদি সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে সেই পথ ত্যাগ করে এবং ইংলণ্ড তাতে যোগদান করে, তা হ'লে আমরা অসহায় বোধ করব কেন?

এককালে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে "Law of Comparative Cost" কথাটি অন্ততঃ কেতাবে খুব প্রাধান্য পেয়েছিল; যে দেশের যাতে 'আপেক্ষিক' সুবিধা আছে, সেই দেশ সেই পণ্য উৎপাদন করবে ও অপরের সঙ্গে বিনিময় করবে। দুই অসম জাতির মধ্যে এই theory অচল; কিন্তু আজ যখন সেই অসাম্য দূর করার জন্যই চারিদিকে তোড়জোড় চলছে, তখন একটির বদলে কয়টি দেশ মিলে যদি মিতব্যয়িতা করে, সে ত সেই Comparative Cost theory-রই নূতন ও বৃহত্তর পরিপ্রেক্ষিতে প্রয়োগ।

অপরের কপাল আমাদের মঙ্গল হবে, একথা ভাবলে, আশু ফল আর নাই হোক্ না কেন আখেরে আমরা উপকৃত হব না। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে আমরা যদি আত্মনির্ভরশীল হতে চাই তা হ'লে আমাদের উৎপাদনের পরিমাণ, উৎপাদিত দ্রব্যের উৎকর্ষ এবং মূল্য এই তিন দিকেই সজাগ হতে হবে। 'অবাধ বাণিজ্য' বা "Free Trade"-এর দিনও যেমন আর আসবে না তেমনই সে যুগের "Most Favoured Nation Theory-র" নামান্তর ঘটিয়েও আমরা প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হতে পারব না। আমরা যদি কালক্রমে চা, পাট ও কাপড়ের রপ্তানী বাণিজ্য থেকে হটে যেতে বাধ্য হই, তা হ'লে আমাদের খতিয়ে দেখতে হবে তার কতখানি আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির পরিবর্তনের দরুন আর কতখানি আমাদের গাফিলতি, অদূরদর্শিতা বা ঔদাসীন্যের দরুন ঘটল।

বহির্বাণিজ্যের ধারায় যে অবশ্যম্ভাবী পরিবর্তন আসছে তার সঙ্গে খাপ খাওয়াবার জন্য আমাদের উদ্যোগী হ'তে হবে, আর তারই সঙ্গে আমাদের বিভিন্ন প্রদেশের মধ্যে পারস্পরিক ব্যবসায় সম্পর্ক যদি আরও সুষ্ঠু ও ব্যাপক ভাবে পরিচালিত করতে পারি, তা হ'লে কালক্রমে বহির্বাণিজ্যের মোড় বেশ ভাল ভাবেই ঘুরিয়ে দেওয়া যেতে পারে। বলা বাহুল্য সেই পরিস্থিতি আনতে অনেক সময় লাগবে।

মোট কথা ভৌগোলিক সান্নিধ্য ও অর্থনৈতিক প্রয়োজনের থেকে উদ্ভূত যে ইউরোপীয় বাণিজ্য-সংঘ আজ গ'ড়ে উঠছে, তাকে আমরা অগ্রাহ্য করতে পারি না; তার বিরোধিতাও করা সঙ্গত নয়—অন্ততঃ আমাদের মত দেশের পক্ষে, যার এক-একটি 'প্রদেশ' আয়তনে ইউরোপের এক একটি রাষ্ট্রের' সমান বা বৃহত্তর।

প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা ও আমাদের অর্থসঙ্গতি

গত পনের বছর ধ'রে নিরপেক্ষতা ও শান্তির বাণী পৃথিবীর সর্বত্র বহন ক'রে নিয়ে যাবার পর শেষে আমাদেরই যুদ্ধে নামতে হচ্ছে, অদৃষ্টের পরিহাস একে আর কি-ই বা বলা যায়।

লড়াই-এর ক্ষেত্র যতই সীমাবদ্ধ হোক্ না কেন, ঢেউ অনিবার্য ভাবে এসে লাগছে আমাদের এই বিশাল দেশের প্রতিটি গ্রামে, শহরে। যুদ্ধ আমরা চাই নি, আমাদের ওপর যখন জোর ক'রেই যুদ্ধ চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে তখন আমাদের লড়তেই হবে, এবং দক্ষিণাও পুরোপুরিই দিতে হবে। সেই দক্ষিণার অপরিসীম; শুধু রক্ত নয়, শুধু কঠোর পরিশ্রম নয় থামবার পরেও তার প্রতিবিধান বহু বছর ধ'রে ত

প্রতিটি ক্ষেত্রে আমরা শুনতে পাব। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ যদিও আমাদের দেশের মাটিকে স্পর্শ করে নি, তবু আজ সতের বছর বাদেই সেই যুদ্ধের খেসারত আমাদের নানা ভাবেই দিতে হচ্ছে।

আজ অনেকেই আমাদের সমর-প্রস্তুতির অভাব দেখে সরকারকে সমালোচনা করছেন; অনেকে আবার নিরপেক্ষতা নীতি বর্জন ক'রে কোন 'সামরিক-জোট'-এ যোগদান করতে এবং বিদেশ থেকে সৈন্য এনে শত্রুর আক্রমণ ঠেকাবার কথাও বলছেন। অনেক খবরের কাগজ অকস্মাৎ অত্যন্ত গরম গরম খবর পরিবেশনের সুযোগ পেয়ে যেন কিছু দিশেহারা হয়ে 'যুদ্ধ মনোভাব' দেশের লোকের মনে গেঁথে দিতে ব্যস্ত হয়ে উঠেছেন।

এ কথা আমাদের ভুললে চলবে না যে, আমাদের দেশরক্ষার জন্য যে লড়াই হচ্ছে বা হবে তা যারই দেওয়া অস্ত্রে, বা যে দেশের সৈন্যের দ্বারাই হোক্ না কেন, তার ষোল আনা মূল্য দিতে হবে আমাদেরই, অথবা আমাদের বংশধরদের। ঋণ যদি কেউ আগিয়ে এসে আমাদের দেন, সে ঋণ আজ হোক, কাল হোক্, শোধ দিতেই হবে; যদি কেউ এক হাতে দান করেন, অন্য হাতে তা ফিরিয়ে নেবেন।

একথা অনস্বীকার্য যে, আমাদের সৈন্যবাহিনীকে আধুনিকতম রণসম্ভারে সজ্জিত করতেই হবে; সেই সঙ্গে একথাও আজকের এই দেশজোড়া উত্তেজনার মধ্যে মেনে নিতে হবে যে, গঠনমূলক যে-সব কাজ এ যাবৎ চলছিল সে-সব অব্যাহত রাখতে গেলে আমাদের কর্মতৎপরতা ও ত্যাগ স্বীকারের ইচ্ছা আরো বহুগুণ বাড়াতে হবে।

সেনাবাহিনীর জন্য আমাদের বাৎসরিক ব্যয় বরাদ্দ ছিল ৩৮৫ কোটি টাকা; অর্থাৎ দৈনিক গড় হচ্ছে এক কোটি টাকারও বেশি, আর যদি পঁয়তাল্লিশ কোটি লোকের মাথাপিছু হিসাব দেখি তা হ'লেও নিতান্ত কম নয়। সম্প্রতি লোকসভা আরো একশ' কোটি টাকা মঞ্জুর করেছেন। অচিরে প্রতিরক্ষা-খাতে মূল বরাদ্দর দ্বিগুণ অঙ্ক মঞ্জুর করবার কথা ভাবতে হবে; এবং অনেক বিশেষজ্ঞের মতে ঐ অঙ্কও পর্যাপ্ত মনে না হতেও পারে।

এ যুগের লড়াই-এর পক্ষে এই অঙ্ক নিতান্ত সামান্য মনে হলেও আমাদের জাতীয় আয় এবং পাঁচসালা পরিকল্পনার বরাদ্দ অঙ্কের পরিপ্রেক্ষিতে নিতান্ত কম নয়। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার মেয়াদ-কালে বিভিন্ন খাতে আমরা ৭,৫০০ কোটি টাকা নিয়োগ ক'রে মোট জাতীয় আয় ১৪,৫০০ কোটি থেকে ১৯,০০০ কোটি টাকায় এবং মাথাপিছু বার্ষিক আয় ৩৩০ থেকে ৩৮৫ টাকায় তোলবার সঙ্কল্প করেছি। এই বিরাট্ কাজে বিদেশের সাহায্য অনিবার্য ভাবে নিতে হচ্ছে; আমাদের নিজস্ব আয় ও ব্যয়ের যে পার্থক্য, তা পূরণ করার জন্য একদিকে যেমন ৫৫০ কোটি টাকার নোট ছাপিয়ে (deficit financing) নিতে হবে, অপরদিকে বিদেশী সাহায্য নিতে হবে ২,২০০ কোটি টাকার।

আমাদের 'বাজেট'-এর এইরকম ছক সম্পূর্ণ বানচাল হয়ে যাচ্ছে যুদ্ধের বরাদ্দ বাড়াতে গিয়ে। উপরন্তু অস্ত্রশস্ত্র তৈরির কাজে আমাদের প্রস্তুতি না থাকায় যত টাকা অতিরিক্ত খরচ করতে হবে, তার প্রায় সবটাই যাবে বিদেশে। নোট ছাপিয়ে বিদেশী দেনা মেটানো সম্ভব নয়; আর ইতিমধ্যে আমরা বিদেশ থেকে যত অর্থ কর্জ নিয়েছি তার পরিমাণ এত বেশী যে, অনেক ক্ষেত্রেই সোনা পাঠিয়ে নতুন অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহ করা ছাড়া উপায় নেই। আমাদের রাজকোষে সোনা আছে মাত্র ১,৮৮ লক্ষ তোলার মত; ১৯৫৬ সালে এই মজুত সোনার মূল্য আন্তর্জাতিক মান অনুযায়ী পরিবর্তন ক'রে ৪০ কোটি টাকার স্থলে ১১৮ কোটি টাকায় বেঁধে দিয়েছি; অপর দিকে মোট যত টাকা ছাপা আছে তার মূল্য ১,৭৭০ কোটি টাকা, জনসাধারণের হাতে 'ব্যাঙ্ক ব্যালেন্স'-সহ মোট ক্রয় ক্ষমতা হচ্ছে ২,৬৫০ কোটি টাকার মত।

অর্থাৎ যুদ্ধ-প্রস্তুতির দরুণ যে বাড়তি খরচ হচ্ছে এবং যে টাকা ধনোৎপাদনের বাবদ খরচ না ক'রে লড়াই-এর খাতে পরিচালিত হবে, তার প্রভাবে অচিরে মুদ্রাস্ফীতি এবং মূল্যবৃদ্ধির আশঙ্কা বর্তমান।

বিদেশে আমাদের রাষ্ট্রের দেনা-পাওনার হিসাবটিও খুব ভরসাজনক নয়। ১৯৫৬ সালে মোট বিদেশী দেনা ছিল ২২৫ কোটি টাকার মত; ১৯৬১ সালে সেটি দাঁড়িয়েছে ১,৪০০ কোটি টাকায়; এর মধ্যে ইংলণ্ডের কাছে দেনার যা পরিমাণ তা ৩৪ কোটি টাকা থেকে ১৬৩ কোটি টাকায় উঠেছে; যুক্তরাষ্ট্রের কাছে ১১৫ কোটি থেকে ৭২২ কোটি টাকায় দাঁড়িয়েছে; সোভিয়েটের কাছে দেনা আছে ৬৭ কোটি টাকা। বাকি টাকার দেনা পশ্চিম জার্মানী, পাকিস্তান ও আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানগুলির কাছে।

পাওনার মধ্যে ইংলণ্ডের কাছে ১৯৫৬ সালে ছিল ৫৯৯ কোটি টাকা; ১৯৬১ সালে সেটি দাঁড়িয়েছে ১২১ কোটি টাকায়; পাকিস্তানের কাছে পাওনা আছে ৩০০ কোটি টাকা। মোট বিদেশী পাওনার পরিমাণ ৯৫৬ কোটি টাকা থেকে নেমে এসেছে ৫৬৫ কোটি টাকায়।

পাঁচ বছরে বিদেশী দেনা ও পাওনার অঙ্ক যেভাবে বদলেছে তার থেকে নানা প্রশ্নই আসে ; তবে এই পর্যন্ত বলা যায় যে, লড়াই চালাবার জন্য যে পরিমাণ মজুত বিদেশী অর্থ দরকার তা আমাদের নেই বলতে গেলে।

অর্থসঙ্গতি যখন আমাদের স্বল্প, তখন আমাদের এমন এক ব্যয়ভার ঘাড়ে নিতে হ'ল যার কোন সীমা খুঁজে পাওনা কঠিন কাজ। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, মুদ্রাস্ফীতির কুফল রোধ করতে হলে অতিরিক্ত ট্যাক্স অবিলম্বে আরোপ করা প্রয়োজন ; কোন কোন প্রদেশ ইতিমধ্যেই মাদকদ্রব্য রোধ করার (prohibition) যে আইন ছিল তা রদ ক'রে আয় বাড়াবার কথা ভাবছেন। জাতীয় আয়-বণ্টন অনুসন্ধান কমিটির প্রাথমিক রিপোর্ট থেকে আমরা জানতে পাই যে, মুষ্টিমেয় কয়েকটি পরিবার দেশের মোট আয়-এর শতকরা ৭৫ ভাগ অংশ ভোগ করছেন ; সে ক্ষেত্রে ট্যাক্স আদায়ের পন্থাটি কিরূপ হওয়া বাঞ্ছনীয় ? প্রত্যক্ষ ট্যাক্স না পরোক্ষ ট্যাক্স ? দুই বিকল্প প্রস্তাবের মধ্যে পরোক্ষ ট্যাক্স দরিদ্র দেশবাসীর কাছে অবাঞ্ছনীয় বোধ হতে বাধ্য ; কিন্তু প্রত্যক্ষ ট্যাক্স ক'জনের কাছ থেকে কতখানি আদায় করা যাবে সে সমস্যা থেকে যাচ্ছে।

অপর দিকে সৈন্যবাহিনীকে সুসজ্জিত করার সূত্রে আরো কিছু কথা এসে পড়ে। আমরা চীন দেশের মতই সংখ্যায় বিপুল, এবং মোটামুটি ভাবে সজ্জিত সৈন্যবাহিনী তৈরির কথা ভাবব,—না আধুনিকতম আগ্নেয়াস্ত্রে সুসজ্জিত অথচ সংখ্যায় কম সৈন্যবাহিনী গড়তে চাইব ? তেমনি অস্ত্রশস্ত্র যা লাগছে, তা বিদেশ থেকেই বরাবর সংগ্রহ করব,—না এদেশের কারখানায় তৈরি করব ? এই দুইটি সিদ্ধান্তের উপর আমাদের অর্থনৈতিক কাঠামো অনেকাংশে নির্ভর করছে (যে "মিগ" বিমান নিয়ে এত তোলপাড়, সেই বিমান এদেশে তৈরি হলেই তার সার্থকতা ; কিন্তু তার জন্য অর্থসঙ্গতিও সেইভাবে করতে হয়)।

* * *

আজ যখন দেশরক্ষার প্রথম আবেগে শহরে শহরে নিষ্প্রদীপের মহড়া, রাইফেল চালানো শিক্ষা বা ট্রেঞ্চ খনন সুরু হয়েছে এবং তারই সঙ্গে চলেছে টাকা, সোনা, রক্ত দেওয়া ; সৈন্যবাহিনী, হোমগার্ডে নাম লেখানো আর বেতারে অবিরাম গানের ও দেশমাতৃকার আহ্বানের উদাত্ত স্বর, তখন এই কথাই আমাদের মনে হয় যে, আমাদের পুঞ্জীভূত শক্তির অপচয় যাতে না হয় সে বিষয়ে সরকারের উদ্যোগী হওয়া প্রয়োজন। সেই সঙ্গে স্পষ্ট ভাষায় কর্তৃপক্ষ বিভিন্ন স্থানের বিভিন্ন শ্রেণীর নাগরিকের দীর্ঘমেয়াদী কর্তব্য কি তাও যদি বুঝিয়ে দেন তা হ'লে ভাল হয়। আমাদের আর্থিক সঙ্গতির যে অবস্থা তাতে এক বড়রকমের লড়াই-এর প্রস্তুতি করতে হ'লে মুদ্রাস্ফীতি না ঘটিয়ে এবং এযাবৎ অবহেলিত সমস্যাগুলিকে জটিলতর না ক'রে কি ভাবে আমাদের সকলকে পরিচালনা করা যেতে পারে সে বিষয়ে সরকার এখনও কোন সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা উপস্থিত করেছেন ব'লে মনে হচ্ছে না। "ত্যাগ"-স্বীকারের জন্য সরকার সবাইকেই প্রস্তুত হতে বলছেন ; কিন্তু সেই আপীল কি এতকাল যারা ত্যাগস্বীকার করা ছাড়া আর কিছুই করতে শেখে নি তাদের কাছে পৌঁছাচ্ছে ? আর যে মুষ্টিমেয় ভাগ্যবান্ গত ১৫ বৎসরে অনেক অর্থ রোজগার করেছেন তাঁরা কি এই কথায় কর্ণপাত করছেন ? উচ্ছ্বাস ও উত্তেজনার আবেগে আমরা হঠাৎ অনেক কিছু ক'রে ফেলতে পারি সে কথা ঠিকই, কিন্তু তার দ্বারা আমরা বেশি দূর এগোতে পারব না।

* * *

জনসাধারণের তরফের কর্তব্য, প্রত্যেকের আপন কাজ সুষ্ঠুভাবে, নিষ্ঠার সঙ্গে, দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়ে ক'রে যাওয়া ; আর সরকারের তরফে যা করণীয় তা হচ্ছে অধিক উৎপাদন, দেশের সর্বত্র প্রতি মুহূর্তে যে অপচয় হচ্ছে তা বন্ধ করা, এবং নতুন আশা নিয়ে ভবিষ্যতের দিকে তাকানো, এরই জন্য যে অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করা দরকার তার জন্য যত্নবান্ হওয়া। দেশরক্ষার নামে যদি গরীবের গয়না গিয়ে সব আমেরিকায় জমা হয়, ট্রেঞ্চ খননের বরাদ্দ টাকার সবটাই যদি কনট্রাক্টরের পকেটে চ'লে যায়, মিতব্যয়িতার নামে যদি ট্রেনের যাত্রীর দুর্গতি বাড়ে আর মোটরবাসীর বিলাসিতা অব্যাহত থাকে, "ত্যাগ"-স্বীকারের দায়িত্ব যদি দরিদ্র দেশবাসীরই কর্তব্য ব'লে পরিগণিত হয় তা হ'লে মোট ফল নৈরাশ্যজনক হবে।

লড়াই ও আমরা

চীনের সঙ্গে লড়াই বাধবার সংবাদ পেয়ে প্রথমে আমরা বিস্ময়ে এবং তারই সঙ্গে সঙ্গে প্রবল উত্তেজনার স্রোতে অভিভূত হয়েছি ; আমাদের দেশের প্রতিটি নাগরিক আজ যে ভাবে সাড়া দিয়েছে তা সত্যই অভূতপূর্ব। পণ্ডিত নেহরু এত বিপদের মধ্যেও বারবারই বলছেন, চীনা আক্রমণ আমাদের যতই ক্ষতি ক'রে থাকুক, একটি ভাল কাজ যা করেছে, তা হচ্ছে প্রত্যেক

ভারতবাসীকে দেশ সম্বন্ধে, দেশের একতা সম্বন্ধে সচেতন ক'রে তোলা। রাষ্ট্রপতিও বলেছেন, এই পনের বছর আমরা অর্থ রোজগার এবং ক্ষমতা ও সম্মান সংগ্রহের চেষ্টাতেই দিন কাটিয়েছি ; বহিঃশত্রুর আক্রমণের বড় আঘাতে আজ যদি আমরা জীবনযাত্রার মোড় ঘোরাতে পারি তা হ'লেই মঙ্গলের কথা।

* * *

চীনাদের সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ এই কয় বছর আগেও কত কথা লিখে গেছেন, কত সহানুভূতি দেখিয়েছেন, সে কথা ভাবলে চীনাদের বর্তমান ব্যবহার খুবই বেদনাদায়ক মনে হওয়া স্বাভাবিক।

চীনদেশকে য়ুরোপ অস্ত্রবলে পরাস্ত করিয়া তাহাকে বিষ খাওয়াইয়াছে সেটা বড়ো কথা নয়। কিন্তু বড়ো কথা এই যে, ভারত একদিন বিনা অস্ত্রবলে চীনকে অমৃত পান করাইয়াছিল" (স্বাধিকারপ্রমত্ত, মাঘ, ১৩২৪)

বুদ্ধদেব মৈত্রী বুদ্ধিতে সকল মানুষকে এক দেখেছিলেন, তাঁর সেই ঐক্যতত্ত্ব চীনকে অমৃত দান করেছিল। আর, যে বণিক লোভের প্রেরণায় চীনে এল, এই ঐক্যতত্ত্বকে সে মানল না ; সে অস্ত্র উঁচিয়ে চীনকে মৃত্যুদান করেছে, কামান দিয়ে ঠেসে ঠেসে তাকে আফিম গিলিয়েছে। মানুষ কিসে প্রকাশ পেয়েছে আর কিসে প্রচ্ছন্ন হয়েছে এর চেয়ে স্পষ্ট করে ইতিহাসে আর কখনো দেখা যায় নি।

(শিক্ষার মিলন, আশ্বিন, ১৩২৮।)

আরেক স্থানে কবি লিখেছেন :

......কিছুকাল থেকে পাশ্চাত্য দেশে Yellow Peril বা পীতসঙ্কট নাম নিয়ে একটা আতঙ্ক দেখা দিয়েছে। এই আতঙ্কের মূল কথাটা এই যে, প্রবলের লোভ সন্দেহ করছে পাছে আর কোথাও থেকে সেই লোভ কোন একদিন প্রবল বাধা পায়।

(বাতায়নিকের পত্র : আষাঢ়, ১৩২৬।)

আরো কিছুকাল বাদে লিখেছেন :

পূর্ব মহাদেশের পূর্বতম প্রান্তে জাপান জেগেছে, চীনও তার দেওয়ালের চারদিকে সিঁধ কাটার শব্দে জাগবার উপক্রম করছে। হয়তো একদিন এই বিরাটকায় জাতি তার বন্ধন ছিন্ন করে উঠে দৌড়াতে চেষ্টা করবে, হয়তো একদিন সেই আফিম-আবিষ্ট দেহ বহু কালের বিষ ঝেড়ে ফেলে আপনার শক্তি উপলব্ধি করতে পারবে। চীনের থলিগুলি যারা ফুটো করতে লেগেছিল তারা চীনের এই চৈতন্যলাভকে য়ুরোপের বিরুদ্ধে অপরাধ বলেই গণ্য করবে......

(শূদ্রধর্ম : অগ্রহায়ণ, ১৩৩২।)

এইভাবে আজীবনকাল কবি কত জায়গায় লিখেছেন, তার তালিকা চীনারা নিশ্চয়ই জানে ; তারা ত রবীন্দ্র শতবার্ষিকী উদ্‌যাপনও করল। তারাই শেষ পর্যন্ত তার প্রাচীনতম মিত্র দেশকে এইভাবে আঘাত করল দেখে সারা পৃথিবী আজ স্তম্ভিত।

আজ যখন ভাবের জোয়ারে আমরা ভেসে যাচ্ছি তখন ভাটার দিনে কিভাবে এই জোয়ারের জল সঞ্চয় ক'রে রাখব : যে-গলদের জন্য বহিঃশত্রুর আক্রমণ আসার আগে পর্যন্ত নিজেদের "ভারতবাসী" ব'লে ভাবতে পারছিলাম না ; সেই গলদ দূর করবার জন্য কি ভাবে অগ্রসর হব সে কথাও এখনি ভাবা বাঞ্ছনীয়।

আমরা ভাবপ্রবণ জাত ; রাগে দুঃখে আনন্দে বিস্ময়ে সমান ভাবেই আমরা অভিভূত হই। ১৯০৫-এর বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সময় থেকে দেশমাতৃকার আহ্বানে আমরা বারবারই সাড়া দিয়েছি ; ভাবের জোয়ারে মাত্র তখনকার মতই কিছু উদ্দেশ্য সিদ্ধও হয়েছে। প্রায় চল্লিশ বছর আগে অসহযোগ আন্দোলনের সময় রবীন্দ্রনাথ 'সত্যের আহ্বান' প্রবন্ধে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের কথা উল্লেখ করে লিখেছেন :

শুধু ইচ্ছাবেগ আপনার মধ্যে খানিকটা বাষ্পকে খরচ করে, ছাই করে ফেলে, সে তো সৃষ্টি করে না। মানুষের অন্তঃকরণ ধৈর্যের সঙ্গে, নৈপুণ্যের সঙ্গে, দূরদৃষ্টির সঙ্গে এই আগুনে কঠিন উপাদানকে গলিয়ে আপনার প্রয়োজনের সামগ্রীকে গড়ে তুলতে থাকে। দেশের এই অন্তঃকরণকে সেদিন জাগানো হল না, সেই জন্যেই এতবড়ো একটা হৃদয়াবেগ থেকে কোনো একটা স্থায়ী বস্তু গড়ে উঠতে পারল না।

আমরা আজ ভাবাবেগে সোনা দিচ্ছি, রক্ত দিচ্ছি, সবই করছি, কিন্তু যে অবসাদ উদাসীনতা পূর্বেও বহুবার আমাদের কিছুকাল বাদেই নিস্তেজ ক'রে দিয়েছিল, আজ আমরা আমাদের পূর্বপুরুষদের সেই দোষ কি স্খালন করতে প্রস্তুত হয়েছি? সে যুগের পরিস্থিতির মধ্যে রবীন্দ্রনাথ যে সব কথা লিখেছিলেন, তা আজকের এই আক্রমণের পরিপ্রেক্ষিতে প্রযোজ্য নয় নিশ্চয়ই, কিন্তু রবীন্দ্রনাথের গান যা স্বদেশী যুগে লেখা— আজ যদি আমরা গাইতে পারি, তাঁর তখনকার লেখা পড়তেই বা আপত্তি কি? —

আমার দেশ আছে, এই আস্তিকতার একটি সাধনা আছে। দেশে জন্মগ্রহণ করেছি বলেই দেশ আমার, এ হচ্ছে সেই-সব প্রাণীর কথা যারা বিশ্বের বাহ্য ব্যাপার সম্বন্ধে পরাসক্ত।......দেশকে জয় করে নিতে হবে পরের হাত থেকে নয় নিজের নৈষ্কর্ম্য থেকে—। ইতিহাসে সকল জাতি দুর্গম পথ দিয়ে দুর্লভ জিনিষ পেয়েছে, আমরা তার চেয়ে সস্তায় পাবো— হাত-জোড় করা ভিক্ষের দ্বারা নয়, চোখ-রাঙানো ভিক্ষের দ্বারা পাব, এই ফন্দির আনন্দে সেদিন দেশ মেতেছিল।

(সত্যের আহ্বান : কার্তিক, ১৩২৮।)

এই প্রবন্ধেরই আরেক স্থানে লিখেছেন :

যে জিনিষটা ঘরে বাইরে সাত টুকরো হয়ে আছে, যার মধ্যে সমগ্রতা কেবল যে নেই তাই নয় যা বিরুদ্ধতায় ভরা, তাকে উপস্থিত মত ক্রোধ হোক বা লোভ হোক, কোনো একটা প্রবৃত্তির বাহ্য বন্ধনে বেঁধে হেঁই হেঁই শব্দে টান দিলে কিছুক্ষণের জন্য তাকে নড়ানো যায়, কিন্তু একে কি দেশ-দেবতার রথযাত্রা বলে?

—মাত্র কয়মাস আগে গান্ধীজীর জন্ম তারিখে

আমরা emotional integration-এর শপথপত্রে স্বাক্ষর করেছি। এই বিপদ্ কেটে গেলেই কি আবার আমরা পূর্বরূপ ধারণ করব?

আজ বহিঃশত্রুর আক্রমণে আমরা যে মিলন দেখছি তাকে চিরস্থায়ী করতে হ'লে আমাদের উত্তেজনার রাস্তা ছেড়ে নিজেদের অন্তরকে জিজ্ঞাসা করতে হবে, কেন আমরা এতদিন নিজেদের "ভারতবাসী" ব'লে ভাবতে পারি নি, আর আমাদের স্বভাবে, ব্যবহারে, কাজে, চিন্তায় এমন কি আছে যার জন্য উত্তেজনার মুহূর্ত ছাড়া সজ্ঞবদ্ধ হয়ে সংগঠনের কথা ভাবতে পারি না? বর্তমান সরকারের দিক্ থেকে যে অনেক গলদ, ত্রুটি-বিচ্যুতি ঘটেছে সে কথা অনস্বীকার্য; বিলাসিতা উদাসীনতা দুর্নীতিকে প্রশ্রয় দেওয়া এতদিন রাষ্ট্রের কর্ণধাররা যেভাবে দেখিয়ে এসেছেন তার দৃষ্টান্ত অন্যদেশে বিরল না হলেও, আমাদের দেশের লোকের মনোবল ক্ষুণ্ণ করার পক্ষে যথেষ্ট। কিন্তু সরকারের মুখাপেক্ষী হয়ে না থেকেও আমরা যা করতে পারতাম তা কি করেছি?

এইখানে রবীন্দ্রনাথের কয়েকটি উক্তি মাত্র পাঠকের সামনে উপস্থিত করছি:

"আমরা বিশেষ শিক্ষাদীক্ষারও ব্যবস্থার দ্বারা সমাজের অধিকাংশ লোককেই খাটো করে রেখেছি। এমনি হয়েছে যে যাকে ছোটো করেছি, সে নিজে হাত জোড় করে বলেছে আমি ছোটো।

এমনি করে অপমানকে স্বীকার করে নেবার শিক্ষা ও অভ্যাস সমাজের স্তরে স্তরে নানা আকারে বিধিবদ্ধ হয়ে আছে। যারা নীচে পড়ে আছে সংখ্যায় তারাই বেশি; তাদের জীবনযাত্রার আদর্শ সকল বিষয়েই হীন হলেও উপরের লোককে সেটা বাজে না।"

(বাতায়নিকের পত্র: আষাঢ়, ১৩২৬।)

"আমরাও যখন বলি 'স্বাধীনতা চাই' তখন ভাবতে হবে কোন্ ভেদটা আমাদের দুঃখ অকল্যাণের কারণ; নইলে স্বাধীনতা শব্দটা কেবল ইতিহাসের বুলি-রূপে ব্যবহার করে কোন ফল হবে না। যারা ভেদকে নিজেদের মধ্যে ইচ্ছা করে পোষণ করে, তারা স্বাধীনতা চায় একথার কোন অর্থই নেই।"

(সমস্যা: অগ্রহায়ণ, ১৩৩০।)

"কোলাহলের উচ্ছৃঙ্খল নেশায় সংযমের কোন বালাই নেই। অন্তরে প্রেম বলে সত্যটি যদি থাকে তবে তার সাধনায় ভোগকে হতে হয় সংযত, সেবাকে হতে হয় খাঁটি। এই সাধনার সতীত্ব থাকা চাই।"

(শিক্ষার মিলন: আশ্বিন, ১৩২৮।)

"যে কাজ নিজে করতে পারি সে কাজ সমস্তই বাকী ফেলে, অন্যের উপর অভিযোগ নিয়েই অহরহ কর্মহীন উত্তেজনার মাত্রা চড়িয়ে দিন কাটানোকে আমি রাষ্ট্রীয় কর্তব্য বলে মনে করিনে।"

(রবীন্দ্রনাথের রাষ্ট্রনৈতিক মত: অগ্রহায়ণ, ১৩৩৬।)

"অত্যাবশ্যক বোধ করলে বাহিরের কোনো পালোয়ান জাতির সঙ্গে দেনা করবার কারবার ফেঁদে বন্ধুত্ব পাতানো যেতে পারে। সেটা দেউলে হবার রাস্তা। সে রকম মহাজনরা আজও এই গরীব জাতের আনাচে কানাচে ঘুরে বেড়ায়।" (কন্‌গ্রেস: ১৩৩৯)

"আমাদের দেশের মানুষ দেশে জন্মাচ্ছে মাত্র, দেশকে সৃষ্টি করে তুলছে না; এইজন্য তাদের পরস্পর মিলনের কোন গভীর উপলক্ষ নেই, দেশের অনিষ্টে তাদের প্রত্যেকের অনিষ্টবোধ জাগে না। সম্মিলিত আত্ম-কর্তৃত্বের চর্চা তার পরিচয়, তার সম্বন্ধে গৌরববোধ জন-সাধারণের মধ্যে ব্যাপ্ত হলে তবেই সেই পাকা ভিতের উপর স্বরাজ সত্য হয়ে উঠতে পারে।"

(স্বরাজ সাধন: আশ্বিন, ১৩৩৮।)

"অশিক্ষিত লোক নিয়ে ভিড় জমানো অনেক দেখা গেল, তাদের নিয়ে দক্ষযজ্ঞ ভাঙা চলে, এমন সিদ্ধিলাভ চলে না যা মূল্যবান্। এমন কি পাশবিক শক্তিও রীতিমত ধাক্কা খেলে তারা আপনাকে সামলাতে পারে না, ছিন্নবিচ্ছিন্ন হয়ে যায়।"

(কন্‌গ্রেস: ১৩৩৯।)

"মানুষকে কৃত্রিম পুণ্যের দোহাই দিয়ে দূরে রেখেছি, তারই অভিশাপে আজ সমস্ত জাতি অভিশপ্ত। দেশ-জোড়া এত বড়ো মোহকে যদি আমরা ধর্মের সিংহাসনে স্থির প্রতিষ্ঠ করে বসিয়ে রাখি, তবে শত্রুকে বাইরে খোঁজবার বিড়ম্বনা কেন।" (নবযুগ: ৭ পৌষ, ১৩৩৯।)

রবীন্দ্রনাথের উক্তির উদ্ধৃতি ক'রে কোন বিশেষ বক্তব্য বলবার চেষ্টা করা স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ পছন্দ করেন নি। সেকথা ঠিকই। কিন্তু আজকের এই জাতীয় সংকটের দিনে তাঁর সারা জীবনের বিভিন্ন উক্তির কিছু চয়ন ক'রে দেশবাসীর কাছে উপস্থিত করছি এই ভেবে যে, তাঁর বিস্মৃত লেখাগুলি থেকে তাঁরা কিছু চিন্তার খোরাক পাবেন।

পুনর্ভ্রাম্যমাণ

(স্মৃতিচারণী—প্রথম স্তবক)

শ্রীদিলীপকুমার রায়

শ্রীনারায়ণ চৌধুরী, কল্যাণীয়েষু !

তোমার এগারই নভেম্বরের সুন্দর চিঠিটি পেলাম উনিশে—ভুপাল, দিল্লী, মুসৌরি, হরিদ্বার, জয়পুর ও উদয়পুর ঘুরে পুণায় ফিরে। তাই প্রেরণা পেলাম আমাদের সফরের খবর দিয়ে একটি খোলা চিঠি লিখতে। অতএব অবহিত হও।

আমার আগেকার প্রায় সব বন্ধুদেরই চিঠি লেখা ছেড়ে দেওয়ার পরেও তোমাকে এখনও মাঝে মাঝে বড় চিঠি লিখি, এর কারণ কি বলব ? কারণ এই যে, তাঁরা আমার পত্র পেলে আজকাল বিব্রতই বোধ করেন, সেখানে তুমি এখনও আনন্দিতই হও। তাঁরা হন না, কারণ আমি চিঠি লিখলেই ধর্মের কথা পাড়ি, আর তাঁরা শুনতে চান হয় বিজ্ঞানের আকাশে গতিবৃদ্ধির কথা, না হয় গণতন্ত্রের মহিমার কথা, না হয় পঞ্চবার্ষিকী প্ল্যানের অব্যর্থ মুক্তিবাণীর কথা—এদিকে আমি ধর্মকে জাতে-ঠেলা ক'রে চাই না এসব বুলিকে পূজার বেদীতে বসাতে। কেন জান ? কারণ, আমার মনে হয় আজও যে, ধর্মকে বাদ দিয়ে সমাজহিতৈষণার প্রচেষ্টা শুধু যে নিষ্ফল তাই নয়, তার পরিণামে "মহতী বিনষ্টি"। উদাহরণ প'ড়েই আছে। দেখ না, লাওৎসে-কনফুসিয়াস বুদ্ধকে বরখাস্ত ক'রে মাওৎসেটুং-চাউএনলাইয়ের কাছে কম্যুনিসমের দীক্ষা নিয়ে শান্তিপ্রিয় সভ্য চীন গড়িয়ে চলেছে কোন্ বর্বরতার "অসুর্য" রসাতলে। চীনকে দেখে আমাদের শিক্ষা হওয়া উচিত নয় কি ?

কিন্তু আমার আগেকার বন্ধুদের সঙ্গে যে আজ আমার অমিলের ব্যবধান দুস্তর হয়ে উঠেছে তার আরো একটি কারণ আছে: তাঁরা আজ ক্লান্ত, এবং আমি এখনো—মোটের উপর অক্লান্ত।* এ দুয়ের মধ্যে সৌহার্দের আদান-প্রদান সম্ভব কি ? দাদুর একটি দোঁহার কথা মনে পড়ে—অনুবাদ এই :

প্রিয়তম জেগে, প্রিয়তমা ঘুমে অচেতন—বলো তবে
মিলনবাসরে কেমনে দুহুঁর প্রেমের আলাপ হবে ?

তবে ভরসা এই যে, তোমার ক্লান্ত হবার এখনও দেরি আছে এবং ধর্মকে তুমি এখনও শ্রদ্ধা কর মনে মনে। তাই আজও তুমি আমার পত্রালাপে সাড়া দাও। আমার স্মৃতিচারণ দ্বিতীয় ভাগ তোমাকে উৎসর্গ করেছি এই লাভেরই অঙ্গীকারে—কিম্বা বলি তোমার এই সাড়াতেই সাড়া দিতে। কেমন ? খুশি ?

অবশ্য ধর্মের কথা তুমিও যে বেশীক্ষণ শুনতে চাইবে এমন দুরাশা আমি পোষণ করি না। তবে প্রসঙ্গান্তরের মাঝে মাঝে ধর্মের কথা এসে গেলে তোমার কানে শ্রুতিকটু না ঠেকতেও পারে এটুকু অন্তত: ভরসা পেতে চাই, কারণ, এখানে নির্ভরসা হ'লে অন্য বন্ধুদেরকে চিঠি লেখা যেভাবে ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়েছি তোমাকে লেখাও সেই ভাবেই ছেড়ে দিতে বাধ্য হব। কাজেই সাবধান !

বোলো না কাতরে : "নয় ধ- কথা আর। ভয়
পাই দাদা, অত্যধিক dose-এ।
কাব্য ও সমালোচনা সুমিষ্ট, অনুশোচনা
নাই সেথা গুরুপাক ভোজে।"

রোস, তোমার একটি মন্তব্যের সম্বন্ধে কিছু ব'লে নিই আগে। তুমি লিখেছ : "সম্প্রতি দ্বিজেন্দ্রলালের সম্বন্ধে লিখতে গিয়ে তাঁর কবিতা ও নাটকগুলি নতুন ক'রে পড়তে হয়েছে। যতই তাঁর লেখা পড়ছি ততই আশ্চর্য হ'য়ে যাচ্ছি তাঁর অসাধারণ কাব্যপ্রতিভা ও গভীর সংবেদনশীলতার পরিচয় পেয়ে। ওঁর নাটকে এমন সব সংলাপাংশ আছে যা প'ড়ে রীতিমত চমকে উঠতে হয় নাট্যকারের অনুভূতির সূক্ষ্মতায় ও হৃদয়ের বিশালতায় ! হায়, এমন একজন প্রথমশ্রেণীর কবিকেও কিনা আমাদের দেশ তাঁর যথোচিত প্রাপ্য সম্মান দিতে দ্বিধা করেছে !"

তোমার এ-খেদে আমি পুরোপুরি সায় দেই। কারণ আজও দ্বিজেন্দ্রলাল মূলত: নাট্যকার বা হাসির গানের রচয়িতা ব'লেই তর্পিত হন—কবি ব'লে নন। এমন কি জনৈক শ্রদ্ধাবান্ গবেষকও তাঁর বৃহৎ দ্বিজেন্দ্রলাল গবেষণায় কোথাও সাহস ক'রে বলতে পারেন নি যে, তিনি সবার আগে ছিলেন কবি—স্বভাব কবি—যিনি বারো বৎসর বয়সেও লিখেছিলেন, "গগন-ভূষণ তুমি জনগণমনোহারী, কোথা যাও নিশানাথ হে নীল নভো-বিহারী !" এবং মৃত্যুর আগের দিনেও রচনা করেছিলেন :

"ভারত আমার ভারত আমার যেখানে মানব মেলিল নেত্র।" হয়েছে কি জানো? তিনি হাসির গানে এক নব-পথের পথিকৃৎ হয়ে ও পরে দেশভক্তির নাটক লিখে যশস্বী হয়ে পড়ার দরুণ লোকে তাঁর নানা গানের ও কবিতার দীপ্তির দিকে তাকাবারও যেন সময় পায় নি। এই কারণেই আমি "দ্বিজেন্দ্রকাব্য সঞ্চয়ন" প্রকাশ করেছি তাঁর জন্মশতবার্ষিকী উৎসবসভার উপচার হিসেবে। কিন্তু এ-বইটি গত বৈশাখে প্রকাশ হওয়া সত্ত্বেও কোনো মাসিক পত্রিকায় এ-পর্যন্ত তার নাম পর্যন্ত কেউ উল্লেখ করেন নি।

অবশ্য মাসিক পত্রিকাদির স্বাকৃতির সাহিত্যিক মূল্য বেশি নয়, মানি। কিন্তু তবু কিছু সাড়া ত জাগা উচিত ছিল কবিশেখর কালিদাস রায় ও তোমার-লেখা গভীরদর্শী সমালোচনার পরে। কি বলো তুমি?

যা হোক্ এ-বিষয়ে আমার কি মনে হয় একটু খুলে বলি—যদিও সংক্ষেপেই বলতে হবে নানা কারণে।

আমার মনে হয়, দ্বিজেন্দ্রলালের অত্যুজ্জ্বল কবি-প্রতিভার অপ্রতিরোধ্য কীর্তি যে আজও আমাদের তেমন দৃষ্টি আকর্ষণ করে নি তার একটি কারণ—হাল-আমলের বিলিতি বাস্তববাদের মোহে প'ড়ে আমাদের খানিকটা দিগ্‌ভ্রান্ত হয়েছে। তাই দ্বিজেন্দ্রলালের প্রেমের, ভক্তির, দেশাত্মবোধের আদর্শবাদে আমরা এ যুগে ঠিক মনেপ্রাণে সাড়া দিতে পারি না। অত্যধিক বস্তুবিচারী হওয়ার দরুণ আমরা এই মতিভ্রমে পড়েছি যে, পাখীর গগন-বিহারের চেয়ে পঙ্কবটের পঙ্কবিলাস বেশি জাজ্বল্যমান সত্য—যেহেতু বেশি বাস্তব। মহাজনের মহত্ত্ব এখনও হয়ত আমাদের চোখে পড়ে সময়ে সময়ে, কিন্তু মহত্ত্ব নীচতার চেয়ে কম প্রত্যক্ষ ও ব্যাপক ব'লে আমরা অপ-সিদ্ধান্ত ক'রে থাকি—গাণিতিক যুক্তির নিরিখে যে, যেহেতু এ জগতে নীচতা হীনতা ক্ষুদ্রতারই দেখা বেশি মেলে, সেহেতু ঔদার্য মহত্ত্ব দাক্ষিণ্য নামঞ্জুর। অর্থাৎ পরিসংখ্যানের (statistics) বিচারই হ'ল সত্য নির্ণয়ের অভ্রান্ত দিশারি।

কিন্তু আমাদের জীবনে যে-সব নিরানন্দ অতিবাস্তব সত্যের দেখা সবচেয়ে বেশি মেলে (সবচেয়ে বেশি দর্শকের সাক্ষ্যে), তাদের সত্যতা বেশি মঞ্জুর, আর যে-সব আনন্দময় সত্য চেতনার বিকাশের অপেক্ষা রাখে ব'লে কম দ্রষ্টার কাছে প্রত্যক্ষ হয়, সে সব সত্য নামঞ্জুর—এ যুক্তি যদি গ্রাহ্য হয় তা হ'লে আমাদের জীবন কি ভাবে দেউলে হয়ে দাঁড়ায় বল ত? শেলি দুঃখ করেছিলেন: "আনন্দ! তোমার দেখা কত কম মেলে!" ("How rarely, rarely comest thou O spirit of delight!") বাস্তবিক, আমাদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রায় কোন্ অনুভব আমাদের গোচর হয় দিনের পর দিন? তীব্র বেদনাও নয়, গভীর আনন্দও নয়। সচরাচর আমরা দিনগত পাপক্ষয় ক'রে চলি একটা ধূসর স্বাদহীন ফ্যাকাশে অস্তিত্বের অনুভূতি চাখতে চাখতে। কিন্তু এক-এক সময় আসে যখন হঠাৎ প্রেম এসে উদয় হয়। সে বলে: "অয়মহং ভোঃ!" অমনি দুনিয়ার চেহারা যায় বদলে, আর আমরা প্রাত্যহিক ঔদাসীন্যের ধূসরতা কাটিয়ে উঠি এক নব-উপলব্ধির রঙিন পুলকলোকে। অমনি আমাদের মন গান গেয়ে ওঠে, বলে দ্বিজেন্দ্রলালের সুরে সুর মিলিয়ে (দ্বিজেন্দ্রকাব্যসঞ্চয়ন—প্রথম চুম্বন—২০৯ পৃষ্ঠা):

জীবনের সার প্রথম মধুর যৌবনে;
যৌবনসার—প্রথম মধুর প্রণয়ে;
প্রণয়ের সার প্রথম মধুর চুম্বনে:
মানবের অতি সুখময়তম ক্ষণ সে!
মানবের সুখে, দুঃখে, বিপদে, সম্পদে,
একবার আসে সে-সুখ জীবনে মরণে।
একবার দেখি মানবহৃদয় মন্দিরে
প্রেমের প্রতিমা—মৃত্যু দলিত চরণে।

দ্বিজেন্দ্রলাল ছিলেন এই মায়াবী ক্ষণমুহূর্তবাদী। তাই তিনি অঙ্গীকার করতে পেরেছিলেন।

(ঐ—২৬০পৃষ্ঠা):

যদি পেয়েছি তোমায় কুটিরে আমার আশার অতীত পণি,
আমি আঁধারে পথের ধূলার মাঝারে কুড়ায়ে পেয়েছি মণি।

প্রেমের অঞ্জন তিনি পরেছিলেন ব'লেই দেখতে পেয়েছিলেন যা প্রেমাঞ্জন বিনা দেখা যায় না।

(ঐ—২৬৬ পৃষ্ঠা):

আকাশে ভুবনে ব্যাপ্ত শুধুই তাহার রূপের আলো,
তারি পদযুগ হৃদে ধরে ব'লে ধরারে বেসেছি ভালো।
জীবনের যত দুঃখ ও ত্রুটি, নিয়তির যত ছলনা ভ্রূকুটি
ও-দু'টি আঁখির কিরণের তরে সকলই ভুলিতে পারি।

আমার "দ্বিজেন্দ্রকাব্যসঞ্চয়নে" আমি তাঁর এই-জাতীয় মণিময় মুহূর্তের উজ্জ্বল এজাহারই সংকলিত করেছি—বিশেষ ক'রে তাঁর প্রেমের কবিতায়, দেশভক্তির গানে এবং ভক্তির কীর্তনে। কিন্তু প্রেমের এ-ধরণের সোনালি অনুভূতি কখনও কদাচিৎ রঙিয়ে ওঠে গড়পড়তা মানুষের ধূসর চেতনায়। তাই তারা অবাস্তব ব'লে ফেলে দিতে চায় সেই স্থায়ী প্রেমের বিদ্যুদ্দামকে যে প্রাণবন্ত মানুষ ছাড়া আর কারুর অনুভবের পরিধির

মধ্যে আসে না। কাজেই তারা বলবেই ত: "এ হ'ল আদর্শবাদ, মাটিছাড়া—এ হয় না, হ'তে পারে না, আর হ'লেও এত অল্প লোকের জীবনে হয় এবং এত কম সময় থাকে যে এ কাজে আসে না, ধোপে টেঁকে না।"

এই মিথ্যে যুক্তির ফেরে প'ড়ে পথ হারানো সহজ ব'লেই আমরা যখন শুনি দ্বিজেন্দ্রলালের দেশভক্তির প্রদীপ্ত অনুভব সঞ্চার:

সেথা গিয়াছেন তিনি সে-মহা আহবে জুড়াইতে সব জ্বালা,
হেথা হয়ত ফিরিবে জিনিয়া সমর,

হয়ত মরিয়া হইবে অমর,
সে মহিমা ক্রোড়ে ধরিয়া হাসিয়া তুমিও মরিবে বালা!
সধবা অথবা বিধবা তোমার রহিবে উচ্চ শির।
উঠ বীরজায়া! বাঁধো কুন্তল, মুছ এ-অশ্রুনীর।

তখন বলি: "ও:। পেট্রিয়টিসম্! এ-যুগে অচল। এ-যুগে চাই ইনটারন্যাশনালিসম্, কস্মোপলিটানিসম্, ধূমকেতুঃস্পুটনিকিসম্, নীচমানুষকে মহাজনের সমান ব'লে ঘোষণা করার রিয়ালিসম্ —এই সব।"

অন্য ভাষায়, যার যেখানে দরদ নেই, যার কোন গভীর অনুভবলোকে যাতায়াত নেই, সে সেখানে শুধু যে সে-স্পন্দনের সাড়া দিতে পারে না তাই নয়, কেউ সাড়া দিলেও হাসে। ভেবে দেখে না যে, জীবনের সমস্ত বড় অনুভূতিকে নাকচ করলে যা উদ্বৃত্ত থাকে তাতে ক'রে হয়ত মানুষের দৈনন্দিন ক্ষুন্নিবৃত্তি হ'তে পারে, কিন্তু মনের প্রাণের আনন্দমন্দিরের সব দীপগুলিই যায় নিভে।

চীনের আক্রমণের পরে একথা যেন আমি নতুন ক'রে অনুভব করি দ্বিজেন্দ্রলালের নানা স্বদেশী গান গাইতে গাইতে। সঙ্গে সঙ্গে বুকে জেগে ওঠে আনন্দের গৌরবের জোয়ার, বলি—দেশভক্তির গুণগান করতে লজ্জা পাওয়ার কোন কারণ নেই। যে-দেশে জন্মেছি, যার আলোহাওয়া, ঐতিহ্য, সঙ্গীত, শিল্প, ভাষা—সর্বোপরি সাধুসন্তের চিরন্তন অমৃতবাণী আমাদের নানা জিজ্ঞাসায় দিশা দিয়েছে, প্রাণের ক্ষুধার খোরাক জুগিয়েছে, অন্তরের তৃষার জলের সন্ধান দিয়েছে—সে-দেশমাতৃকাকে ভালবাসব, এই-ই ত চাই। তাই এবার উদয়পুরে গিয়েছিলাম যেন নব হৃৎস্পন্দনের তালে, আর ওরা সবাই বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মতনই সচকিত হয়েছিল শুনে:

মেবার পাহাড়, মেবার পাহাড়, রঞ্জিত করি' কাগার-তীর,
দেশের জন্য ঢালিল রক্ত অযুত যাহার ভক্তবীর।

এ দেশভক্তি সত্যেরই নির্দেশ দেয়, মরীচিকার নয়। তবে একথা সত্য যে, যাদের দেশভক্তি বলে: "আমার দেশের লোকই রাজা হবার জন্যে জন্মেছে, আর সব দেশের লোক থাকবে আমাদের তাঁবেদার হয়ে, তাই আমার মতে, কি রুচিতে, যারা সায় দেবে না তাদের 'লিকুইডেট' করতেই হবে ট্যাঙ্ক, হ্যাণ্ডগ্রেনেড ও বিমান-বাহিনীর দাপটে—তারা দেশভক্ত নয়, মানুষের শত্রু। যেমন হিটলার, ষ্ট্যালিন, মাওৎসেটুং।"

কিন্তু কোন আদর্শ বদহজম হয়ে দুর্গন্ধে পর্যবসিত হয় ব'লে সে আদর্শের যথাবিধি পরিপাকও পুষ্টিকর নয়, এ কথা ত সত্য নয়। দ্বিজেন্দ্রনাথের চক্ষুষ্মান্ দেশভক্তি মনের প্রাণের স্বাস্থ্যের অন্তরায় নয়। তিনি বলেন নি কোন দিনই যে, আমরাই ভগবানের একমাত্র মানসপুত্র, আর সবই নারকী। বলেছেন—বিশেষ ক'রে তাঁর মেবার পতনে—যে, মানুষ ধাপে ধাপে ওঠে মুক্তির শিখরে—আত্মপ্রীতি থেকে স্বজনপ্রীতিতে, স্বজন-প্রীতি থেকে দেশভক্তিতে, দেশভক্তি থেকে বিশ্বপ্রেমে—শেষে ধর্মে। গেয়েছেন:

ঘুচাতে চাস যদি রে এই হতাশাময় বর্তমান,
বিশ্বময় জাগারে তোল্ ভায়ের প্রতি ভায়ের টান।
ধর্ম যেথা সেদিকে থাক্ ঈশ্বরের মাথায় রাখ্,
স্বজন দেশ ডুবিয়া যাক্, আগে তোরা মানুষ হ।

এ চরণগুলি গাইতে আজও আমার চোখে জল আসে, বুকে আনন্দ ছায়, রোমে শিহরণ জাগে। মনে হয় মহাপ্রাণদের মধ্যেই বা ক'জন কবি পেরেছেন এহেন মহান্ আদর্শকে এমন উদ্দীপক ভাব ভাষা ও ছন্দের গাঢ় বন্ধে এমন চিরস্মরণীয় স্পন্দনে পরিবেশন করতে? এ-শ্রেণীর অপূর্ব কাব্যে ঘুমন্ত দেশকে তিনি কতখানি জাগিয়েছিলেন স্বদেশী যুগে—ভাব ত!

আজ আমাদের দেশে একদিক্ থেকে নাস্তিক পরস্বাপহারীরা হানা দিয়েছে, অন্যদিকে দেশকে রক্ষা করতে ছুটেছে একদল আদর্শবাদী যুবক। সেদিন ইন্দিরার বড় ছেলে অনিল মালহোত্র কলকাতা থেকে লিখেছে সে সৈন্যদলে ভর্তি হবার জন্যে নাম লিখিয়েছে। খুব ভাল চাকরি পেয়েছে সে গ্রিণ্ডলে ব্যাঙ্কে। তার বিবাহ স্থির, এক পরমা সুন্দরীর সঙ্গে। এহেন যুবক মোটা মাইনে ও সুলভ্য ভোগের লোভ ছেড়ে, যখন দেশের জন্য প্রাণ দিতে ছোটে তখন—বল ত আমাকে—তার প্রাণের মূলে প্রেরণা যোগায় কোন্ ভাব—মহৎ দেশভক্তি ছাড়া? আর দেশভক্তির আদর্শ না থাকলে দেশের স্বাধীনতার রক্ষকই বা থাকবে কে? দ্বিজেন্দ্রলাল চেয়েছিলেন দেশের এই বরেণ্য স্বাধীনতা, কিন্তু সে কি দেশের ছোট-আমিকে বড় করতে, না বড়-আমিকে জাগিয়ে তুলতে? ভারতকে পুণ্যভূমি জন্মভূমি ব'লে

বরণ করেছিলেন ব'লেই না তিনি গাইতে পেরেছিলেন মহাপ্রয়াণের ঠিক আগেই—২রা জ্যৈষ্ঠ, ১৯১৩ সালে :

ভারত আমার ভারত আমার !
সকল মহিমা হউক খর্ব।
দুঃখ কী যদি পাই মা তোমার
পুত্র বলিয়া করিতে গর্ব !···
চোখের সামনে ধরিয়া রাখিয়া
অতীতের সেই মহা আদর্শ
জাগিব নূতন ভাবের রাজ্যে
রচিব প্রেমের ভারতবর্ষ।

এই বিশ্বপ্রেমের আদর্শ যাদের কাছে প্রাণস্পন্দনে স্পন্দমান কেবল তারাই পারে বড়র জন্য ছোটকে ছাড়তে—তারাই পারে দেশকে বড় করতে। তাই ইন্দিরা অনিলের পত্র পেয়ে বলছিল সেদিন : "যদি দেশের জন্যে সে সত্যিই সুদূর হিমালয়ে লাডকে প্রাণ দেয় আমি দুঃখ করব না, বলব এর দরকার ছিল।" আমি সেদিন মন্দিরে সাধক-সাধিকাদের বলছিলাম : "অনিলের আদর্শবাদে আমরা গর্ববোধ করেছি আরও এই জন্য যে, সামনে যার পরম ভোগের রাস্তা খোলা, সে যখন ভোগ ছেড়ে কোন বড় ডাকে সাড়া দিয়ে ছোটে আত্মোৎসর্গ করতে, তখন তাকে বলতেই হবে ধন্য !"

দ্বিজেন্দ্রলাল তাঁর নানা গানে ও নাটকে এই দেশ-ভক্তির ধন্য আদর্শ প্রাণোন্মাদী ভাষায় পেশ করেছেন ব'লেই এ সূত্রে আমি অনিলের ব্যক্তিগত দৃষ্টান্ত দিলাম। উদয়পুর ও জয়পুরে এবার দ্বিজেন্দ্রলালের আদর্শবাদের মহিমা যেন নতুন ক'রে উপলব্ধি করেছি, একথা বললে অত্যুক্তি হবে না।

কিন্তু আর না। তাঁর কাব্য ও বহুমুখী প্রতিভার অঙ্গীকার আর পাঁচজনের মুখে ঝঙ্কৃত হওয়াই ভাল। আমি বেশি বললে ক্রিটিকরা বলবেন (যেমন একজন সম্প্রতি বলেছেন) : "ক্ষমণীয়।" তাই তোমরাই বল—সেই ভাল। কারণ, একথা ত অস্বীকার করতে পারি না যে, আমি স্বভাবতঃ পিতৃদেবের রচনার পক্ষপাতী। কেবল এই সূত্রে গ্যেটের একটি সাফাই মনে পড়ে : Aufrichtig zu sein kann ich versprechen, unparteiisch zu sein aber nicht—অর্থাৎ, আমি কথা দিতে পারি যে আমি সত্যনিষ্ঠ হব, কিন্তু নিরপেক্ষ হবই হব—এমন অঙ্গীকার করি কোন্ মুখে ?

একথার মর্ম যেন নতুন ক'রে উপলব্ধি করেছিলাম ভুপালে আলাউদ্দীন খাঁকে দেখে। বহুদিন থেকেই আমি এই মানুষটির নানা গুণের পক্ষপাতী ব'লে তাঁর সঙ্গীতপ্রতিভা আমার আরও বেশী ভাল লাগে। ত্রিশ বৎসর আগে আমার ভ্রাম্যমাণের দিন-পঞ্জিকায় আমি এঁকে আমাদের দেশের সর্বশ্রেষ্ঠ যন্ত্রসঙ্গীতস্রষ্টা (composer of instrumental music) নাম দিয়েছিলাম। তুমি নিশ্চয়ই জান যে, ইনিই সব প্রথম আমাদের দেশে "প্রথম শ্রেণীর" অর্কেষ্ট্রা গ'ড়ে তোলেন, যাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ করেন পরে তিমিরবরণ, শিরালি মেনকার যান্ত্রিকেরা—আরও অনেকে। বস্তুতঃ অর্কেষ্ট্রা জগতে ইনি তেমনিই পথিকৃৎ যেমন মধুসূদন অমিত্রাক্ষর কাব্যজগতে। ইউরোপীয় প্রাণশক্তি ও ভারতীয় রাগ-মহিমা—এ দু'য়ের গঙ্গাযমুনা সঙ্গম হয়েছে এঁর অর্কেষ্ট্রায়।

তাই ভুপাল থেকে যখন সরকারী নিমন্ত্রণ পেলাম আলাউদ্দীন খাঁর শতবার্ষিকী সংবর্দ্ধনায় যোগ দিয়ে তাঁকে সাধুবাদ দিতে হবে—তখন এক কথায়ই রাজি হয়েছিলাম।

অথ বেচারি পুনর্ভ্রাম্যমাণ ভুপাল রওনা হ'ল ৪ঠা অক্টোবর। আর ভ্রমণ করব না—এবার তুপ্‌তপে মন দেব বেশি ক'রে—বললে হবে কি ? ভবিতব্যের কি কাটান্ আছে ভাই ? ভাগবতকার লিখেছেন—ব্রহ্মা নারদকে শাপ দিয়েছিলেন, তুমি ভবঘুরে হবে। আমি নারদের মতন অতবড় গায়ক নিশ্চয়ই নই, কিন্তু অম্বরে না হোক্ এ-ভবার্ণবে আমাকে তাঁর চেয়েও বেশি ঘুরে বেড়াতে হয়েছে আকৈশোর। তবে এক সময়ে ঘুরে বেড়াতাম এ ও তা কত কি টানে—শ্রীঅরবিন্দের ভাষায় "All sides he (man) sees and turns to every call," আর আজকাল কেউ না ডাকলে যাই না—এই তফাৎ। যাক্‌গে। ভ্রমণের আদিপর্ব সুরু করি।

ভুপালে বহুদিন পূর্বে গিয়েছিলাম ওস্তাদী গান শুনতে—(সে খবর লিখেছি বিশদ ক'রেই আমার ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থে, বইটির দ্বিতীয় সংস্করণ বোধহয় শীঘই বেরুলে প'ড়ো)—এবার পাকে-চক্রে যেতে হ'ল—ওস্তাদ গুণ-কীর্তনার্থে। History repeats itself—বলে না ?

বলেছি, আলাউদ্দীন খাঁর সঙ্গে আমার আলাপ বহু-দিনের। তাঁর বাজনা শেষ শুনেছিলাম আঠারো বছর আগে কলকাতায়। তিনি ও তাঁর জামাতা রবিশঙ্কর যুগলে বাজিয়েছিলেন—কী অপূর্ব যে !

তার পর রবিশঙ্কর একবার ডাকেন দিল্লীতে তাঁর বাসায় ও সেতার বাজিয়ে আমাদের পুলকিত করেন। এ-যুগে সেতারে তাঁর চেয়ে বড় গুণী আমি শুনি নি। তবে সে-যুগে আমার আরও বেশি ভালো লেগেছিল

বুড়ুর মন্দ লাগছিল না। আগের দিন রাত্রে বাবা বললেন, বুড়ু সোনা, সকাল সকাল ঘুমোও, কাল আমরা ভোরবেলা উঠে রওনা হব, কলকাতা যাব। বুড়ুর খুব ভাল লেগেছিল, সে হাততালি দিয়ে খিলখিল ক'রে হেসে উঠল। মামণি ক'দিন থেকে মুখভার ক'রে ছিলেন, তার সঙ্গেও বেশী কথা বলছিলেন না। তিনিও ওর হাসি দেখে যেন একটু খুশী হলেন, বাবাকে বললেন, যাও, ওকে আর নাচিও না। বাবাও বোধ হয় বুঝলেন যে, মামণির মেজাজটা একটু ভাল হয়েছে, বললেন, তবে বল কাকে নাচাব? বুড়ু ব'লে উঠল, মা নাচবে, মা নাচবে। মামণি আর পারলেন না, হেসে ফেলে বললেন, যেমন বাবা তার তেমনি ত মেয়ে হবে!

কখন বুড়ুর ঘুম এসে গিয়েছে তা সে টের পায় নি। অনেক রাত্রে ঘুম ভেঙে গিয়ে তাকিয়ে দেখল, মামণি তার দিকে পিঠ ক'রে ঘুমোচ্ছেন। কিরকম ভয় ভয় করল, সে হামাগুড়ি দিয়ে মা'র পিঠ বেয়ে উঠে বাবা আর মামণির মাঝখানে গিয়ে দু'জনের কোলের মধ্যে শুয়ে পড়ল। তার পরে আবার যখন ঘুম ভাঙল তখন দেখল, মামণি ষ্টোভ জেলে দুধ গরম করছেন আর বাবা সব বিছানাপত্র নিয়ে গিয়ে তাদের সেই ভাঙা মতন সুন্দর গাড়ীটার পিছনের সীটের উপরে চাপাচ্ছেন। গাড়ীটা বের করা রয়েছে, জানলা দিয়ে দেখতে পেয়েই বুড়ু হঠাৎ ভ্যাঁ ক'রে কেঁদে ফেলল, তার ভয় হ'ল তাকে ফেলেই বোধ হয় বাবা চ'লে যাবেন।

মামণি দুধের ডেকচি নামিয়ে রেখে আসতে আসতে বাবা ধপাস্ ক'রে বিছানাপত্রগুলো গাড়ীর মধ্যে ফেলে দিয়ে দৌড়ে এসে বুড়ুকে কোলে তুলে নিলেন। বুড়ু খুব জোরে বাবাকে জড়িয়ে ধ'রে বলল, না না না না, অর্থাৎ আমাকে না নিয়ে যাবে না। বাবা কিন্তু বুঝতে পারলেন না। বললেন, না না কি রে পাগলী? বুড়ুর কিন্তু এর মধ্যেই হাসি পেয়ে গিয়েছিল। সে নাকী-গলায় বাবাকে নকল ক'রে বলল, পাঁগলী! মামণি তাড়াতাড়ি ক'রে গরম দুধ এনে বললেন, এটা খাইয়ে দাও, আমি ততক্ষণ একটু দেখে নিই কিছু ফেলে যাচ্ছি কি না। বুড়ু গেলাসটা দেখে একটা ঝাঁপ দেবার চেষ্টা ক'রে বলল, দাও, খাব। বুড়ুর খুব ফুর্ত্তি হচ্ছিল, ভাবছিল, দুধ খাওয়া হয়ে গেলেই রওনা হওয়া যাবে। গাড়ী চড়তে তার খুব ভাল লাগে।

বাবা যখন ষ্টার্ট দিলেন তখন একটু একটু আলো ফুটছে। আকাশে তখনও তারা আছে অনেক। হাওয়াটা বেশ শিরশিরে ঠাণ্ডা। মিষ্টি মিষ্টি গন্ধ আসছে বোধ হয় শিউলী গাছটার দিক থেকে। মামণিকে খুব সুন্দর দেখাচ্ছে—মাথায় একটা লাল রঙের রুমাল বেঁধেছেন। বারান্দার আলোতে মনে হ'ল, তাঁর চোখ দুটো কেমন

চক্‌চক্‌ করছে। বাবা আবার ডাকলেন, কৃষ্ণা, চ'লে এস, উঠে পড়, আর দেরী করব না। মামণি কোনও কথা না ব'লে আলোটা নিবিয়ে দিলেন, দরজার তালাটা একবার টেনে দেখলেন, তার পর নেমে এসে গাড়ীতে উঠে বসলেন। গাড়ীটা খুব ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে রাস্তায় গিয়ে পড়ল। বুড়ু বলল, টা টা, টা টা। মামণি হঠাৎ মনে হ'ল কেঁদে ফেললেন।

বুড়ু ব'সে ছিল পিছনের সিটে। সামনের সিট আর পিছনের সিটের মধ্যে যে জায়গাটা সেখানে বাবা সব জিনিসপত্র দিয়ে ভর্ত্তি ক'রে তার উপরে বিছানাগুলো বিছিয়ে দিয়েছিলেন। তারই উপরে বুড়ু আর রোঁয়া-অলা পুতুল 'ভৌ ভৌ' গড়াগড়ি খাচ্ছিল। বুড়ুর কিন্তু এখন আর ভাল লাগছিল না। আজকাল ওর গাড়ী চড়া খুব কমে গিয়েছিল। বাবা বলতেন, পয়সা নেই, এখন আর পেট্রোল পোড়াব না। আর কিছু বলতেন না, চুপ ক'রে থাকতেন। বুড়ুর কিন্তু কেমন যেন মনটা খুব চটে যেত। গাড়ী ক'রে বেরুলে কত আলো দেখা যায়, কত রকমের মানুষ দেখা যায়। আজ তাই ওর খুব ফুর্তি হয়েছিল যখন বাবা বললেন, গাড়ী ক'রে কলকাতা যাব। কিন্তু এ কি? রাস্তাগুলো কেমন অন্ধকার অন্ধকার, অনেক লোক এখানে-সেখানে শুয়ে রয়েছে কাপড় মুড়ি দিয়ে। দেখতে দেখতে বুড়ুর হাই উঠতে লাগল, আবার ঘুমিয়ে পড়ল ভৌ ভৌকে জড়িয়ে। ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে গাড়ীর ঝাঁকুনিতে দুলতে দুলতে বুড়ু স্বপ্ন দেখছিল। দেখছিল, যেন সেই আগেকার মতন অনেক লোকজন এসেছে ওদের বাড়ীতে। মামণি খুব হাসছেন আর কথা বলছেন সকলের সঙ্গে, অনেক আলো জ্বলছে। হঠাৎ দুড়ুম ক'রে দরজা খুলে বাবা ঢুকলেন, চুলটুল অগোছালো। এসেই ধপ্ ক'রে ব'সে পড়লেন একটা সোফায় হাত দিয়ে মুখটা ঢেকে। মামণি দৌড়ে গিয়ে বাবার সামনে ব'সে প'ড়ে তাঁর হাতটা সরানোর চেষ্টা করতে করতে বললেন: কি হয়েছে? বাবা কি সব বললেন তা বুঝতে পারল না বুড়ু, শুধু মনে হ'ল বাবা বললেন, ব্যাঙ্ক নাকি ফেল পড়েছে। বুড়ুর খুব ভয় করতে লাগল, মনে হ'ল যেন সব আলো কম হয়ে আসছে আর বাবার গলার আওয়াজটা ক্রমেই জোর হয়ে উঠছে। দৌড়ে মামণির কাছে যেতে গিয়ে কিসে একটা হোঁচট খেয়ে প'ড়ে গিয়েই বুড়ুর ঘুম ভেঙে গেল। ঘুম ভেঙে দেখে, গাড়ীটা থেমে গিয়েছে আর বাবা দরজা খুলে নামছেন। বুড়ু জিজ্ঞাসা করল, কি মামণি, কি হয়েছে?

বাবা ততক্ষণে ইঞ্জিনের ঢাকনাটা খুলে কি যেন দেখছেন। এ ব্যাপারটা বুড়ু খুব জানে। ও বেশ জানে যে, ইঞ্জিনের ঢাকনা খোলা মানেই অনেকক্ষণ দেরি হবে, বাবা কালিঝুলি মেখে তার পরে রাগ ক'রে খুব বকুনি দেবেন—বোধ হয় গাড়ীটাকেই। আর মামণি গাড়ীতে ব'সে ব'সে বাবাকে খুব ঠাট্টা করবেন। ওর খুব তাই মজা লাগে যখনই ইঞ্জিনের ঢাকনা খোলা হয়। কিন্তু কিছুদিন থেকেই বাবা আর মামণি দু'জনেই কেমন অন্য-রকম হয়ে আছেন। তাকেই কি গরীব হয়ে যাওয়া বলে? আজও বুড়ু দেখল, মামণি অন্য অন্য দিনের মতন বাবাকে মোটেই ঠাট্টা করলেন না, বরং নেমে গিয়ে বাবার পাশে চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে রইলেন। বুড়ু খুব চেঁচাতে লাগল, আমি নামব, আমি নামব। কিন্তু মামণি রাজি হলেন না, বললেন, না মাণিক, তুমি এখন মোটেই নামবে না। এই দেখ না, আমরা এক্ষুণি আবার রওনা হব।

বুড়ু খুব লজ্জা পেয়ে, সে চুপ ক'রে জানলার ধারে হাঁটুগেড়ে ব'সে ব'সে দেখতে লাগল, বাবা কি সব করছেন ইঞ্জিনের মধ্যে হাত দিয়ে। তখন সকাল হয়ে গেছে, দু'টো-একটা ক'রে গাড়ী যাচ্ছে। একটা মস্তবড় লরী আস্তে আস্তে চ'লে গেল অনেক মাল বোঝাই হয়ে। একটু পরেই খুব সুন্দর দেখতে একটা গাড়ী হুস্ ক'রে চ'লে গেল। বুড়ু মামণিকে জিজ্ঞাসা করল, আমাদের গাড়ীর কি হয়েছে? মামণি বললেন, আমাদের গাড়ীটা ত বুড়ো হয়ে গিয়েছে? তাই ওর মধ্যে মধ্যে একটু অসুখ করে। বুড়ু জিজ্ঞাসা করল, তা তুমি অন্য গাড়ী কেনো না কেন? মা বললেন, আমরা কলকাতায় পৌঁছে যাই, তার পর বাবা একটা কাজ পান, তখন দেখো, কেমন নতুন ঝকঝকে একটা গাড়ী কিনি। বুড়ু ঘাড় নেড়ে বলল, আচ্ছা।

গাড়ী ঠিক হয়ে গেল। বাবা যেমন করেন তেমনি ক'রে ইঞ্জিনের মধ্যে হাত দিয়ে খুব জোরে ভরর ভরর ক'রে আওয়াজ-টাওয়াজ ক'রে তার পর দুম্ ক'রে ঢাকনিটা বন্ধ করলেন। আবার গাড়ী চলল। মামণি বুড়ুর গায়ে-মাথায় হাত বুলিয়ে বললেন, কি সোনা, ক্ষিদে পেয়েছে? বুড়ু মাথা নেড়ে বলল, না। ও সামনের সিটে মাথাটা হেলান দিয়ে ব'সে বাইরেটা দেখতে লাগল—এরকম রাস্তা ওর খুব ভাল লাগে। অনেক গাড়ী যাচ্ছে। রাস্তার ধারে ধারে অনেক জল আর আকাশটা খুব নীল হয়ে-হয়ে সেই সব জলের মধ্যে এসে পড়েছে। সাদা সাদা কাশফুলের মতন দেখতে বক আর সাদা সাদা বকের

মতন কাশফুল দেখতে দেখতে কখন বুড়ুর চোখ আবার বুজে এসেছে জানে না। ঘুম ভেঙে দেখে, ঘাড়ে খুব ব্যথা, একেবারে সোজাই করতে পারছে না। আর মামণি ডাকছেন, কই মামণি ওঠ, দুধ খাবে।

বুড়ুর খুব কান্না পাচ্ছিল ঘাড়ে ব্যথার জন্যে। ও খুব কষ্ট ক'রে বড়দের মতন কান্না থামিয়ে রাখল। শুধু ঠোঁটটা ফুলে উঠল আর চোখে একটু একটু জল এল। মামণি তাকে সিটের পিছন দিয়ে উঠিয়ে নিয়ে কোলের মধ্যে চেপে ধ'রে খুব আদর ক'রে বললেন, কান্না কেন, কান্না কেন মাণিক? ক্ষিদে পেয়েছে? সত্যি, বড়রা এক-এক সময়ে কোনও কথাই বুঝতে পারে না। বুড়ু কিছু না ব'লে চুপ ক'রে রইল। মামণি ভাবলেন, ওর বোধ হয় কান্না পাচ্ছে ক্ষিদেরই জন্যে। ওকে আরও আদর ক'রে ফ্লাস্কের থেকে দুধ ঢেলে ওকে খেতে দিলেন। প্লাষ্টিকের গেলাস বুড়ুর খুব ভাল লাগে। ও দারুণ খুশী হয়ে চোঁ চোঁ ক'রে দুধটা খেয়ে নিয়ে বলল, আরও খাব। মামণির মুখটা যেন কেমন হয়ে গেল, বললেন, হ্যাঁ মাণিক, খাবে, চল, এই ত কলকাতায় পৌঁছেই দুধ খাবে। বুড়ু বললে, হ্যাঁ, কলকাতায় দুধ খাব, দুধ দাও, খাব।

বুড়ু প্রায় চেঁচাতেই সুরু করছিল, দুধ খাব, দুধ খাব ক'রে। হঠাৎ তার নজর পড়ল যে, কে, বাবা ত নেই, গাড়ী ত চলছে না। বলল, বাবা কৈ? এর মধ্যে বাবা কখন নেমে গিয়েছেন টের পায় নি। বাবা জানলার পাশ থেকে ব'লে উঠলেন, এই ত বাবা। এমন হঠাৎ বললেন যে মামণি-সুদ্ধ চমকে উঠলেন। বুড়ু ত হেসেই অস্থির: এই ত আমার বাবা! বাবা দরজা খুলে ব'সে প'ড়ে বললেন, হ্যাঁ বাবা, আমার বাবা, কিন্তু কি করি বল ত বাবা, ব্রেকটা ধরছে না। ব্রেক অয়েল পাই কোথায়?

মামণি মুখটা শুকনো ক'রে ব'সে ছিলেন। বললেন, তখনই তোমাকে বললাম, সাফুকে আমার আংটিটা, ষ্টেপ্‌নি নাও সঙ্গে, ব্রেক অয়েল-টয়েল যা লাগে গুছিয়ে নাও। এতদূর রাস্তা, তাতে একদম পয়সা নেই। এখন কি করবে? বুড়ু বাবার কাছে অনেকক্ষণ আসতে পায় নি। বাবার গলা জড়িয়ে একদিন না-কামানো দাড়িতে গাল ঘ'ষে বললে, তুমি লক্ষ্মী হয়ে থাকো, লক্ষ্মী পয়সা আনবে।

এই কথাটা বলা মাত্র কোথা থেকে কি হ'ল, একটা ভয়ানক ধাক্কার চোটে গাড়ীটা একেবারে এক পাশে গিয়ে হেলে পড়ল—বুড়ুর মনে হ'ল কালীপুজোর বাজীর চাইতেও জোরে আওয়াজ ক'রে কে তাকে ছুঁড়ে ফেলে দিল। ও ভ্যাঁ ক'রে কেঁদে ফেলল। বাবা বেচারী ওর কথা শুনে হেসে ফেলেছিলেন।—বুড়ুর মনে হ'ল, বাবার সেই হাসি-হাসি মুখটা যেন বোঁ বোঁ ক'রে ঘুরে গেল। তার পরে দেখল, ওর বাবা বেয়ে উঠে দরজাটা কোন মতে খুলে মামণিকে টেনে বার করছেন আর মামণি খুব কাঁদছেন আর চীৎকার ক'রে বলছেন: বুড়ুকে ধরো, বুড়ুকে ধরো।

বুড়ুকে ওর বাবাই বার করলেন। বুড়ু মাটিতে [illegible] দেখে, গাড়ীটা কাৎ হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে আর উপর দিকের চাকা দুটো একটু একটু ঘুরছে। গাড়ীর তলায় কি কাদা আর ময়লা, দেখে বুড়ুর একেবারে বমি [illegible] গেল। বাবাকে জিজ্ঞাসা করতে যাবে, অত ময়লা [illegible] গাড়ীর তলায়, এর মধ্যে দেখে, বাবা খুব রেগে কি [illegible] বলতে বলতে এগিয়ে যাচ্ছেন, আর রাস্তার [illegible] একটা লাল-রঙের গাড়ী দাঁড়িয়ে রয়েছে, আর তার [illegible] খুলে খুব লম্বা আর খুব মোটা এক ভদ্রলোক বেরোচ্ছেন। বাবা রাগে কাঁপতে কাঁপতে তাকে বললেন, চোখে দেখতে পান না? দাঁড় করানো গাড়ীকে এইরকম ধাক্কা মারলেন!

ভদ্রলোক কি রকম দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে [illegible] তিনি বললেন, গাড়ী? গাড়ী কোথায়? ও ত [illegible] ক্যানেস্তারা [illegible] নিন [illegible] টাকা—আর [illegible] কিনে নেবেন। ব'লে পকেট থেকে দুটো না [illegible] বার ক'রে বাবার দিকে এক রকম ছুঁড়ে দিয়ে গাড়ীতে উঠে ভোঁ ক'রে বেরিয়ে গেলেন।

বাবা যেন একেবারে হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে [illegible] মা ঠিক আগেকার মতন রেগে উঠলেন, বললেন: তুমি কিছু বলতে পারলে না? বাবা একটা ঢোক [illegible] বললেন: কি করব? তোমরা রয়েছ সঙ্গে, [illegible] গুণ্ডার সঙ্গে একা মানুষ আমি আর কি করব? মামণি, বললেন না, চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে রইলেন। বাবাও [illegible] চুপ করে রইলেন, তার পর নিজের মনে বললেন: কি করি এখন? পকেটে ত মোটে দশটা টাকা সম্বল, কি ক'রে এখন কলকাতা পর্যন্ত পৌঁছোই—গাড়ীটারই [illegible] কি করি?

বুড়ু বুঝেছিল, কিছু একটা খুব মুশকিল হয়েছে। [illegible] ও এটাও দেখেছিল যে, ঐ লাল গাড়ীওয়ালা ভদ্রলোকের দিয়ে-যাওয়া নোটগুলো দলাপাকানো অবস্থায় [illegible] উপর দিয়ে হাওয়ায় একটু একটু ক'রে সরছিল। [illegible] ক'রে নোটগুলো তুলে নিয়ে বাবার হাতে দিয়ে বলল, এই নাও পয়সা, কেঁদো না। বাবা অন্যমনস্ক ভাবে নোট-গুলো পকেটে তুলে রাখতে গিয়ে আবার বার ক'রে

দেখেই প্রকাণ্ড এক চীৎকার ক'রে লাফ দিয়ে উঠে বললেন: এ কি কাণ্ড, এ যে দেখ একশ' টাকার নোট—ছ'শ টাকা! মা মণি নোট দুটো ছিনিয়ে নিয়ে আলোর ধ'রে বললেন: তাই ত, ও লোকটি নিশ্চয়ই বুঝতে পারে নি।

এর মধ্যে একটা মালবাহী লরী এসে দাঁড়িয়েছিল। এক-জন বাঙালী ভদ্রলোক চালাচ্ছিলেন। তিনি নেমে এসে বললেন: কি ক'রে হ'ল?

বাবা বললেন: একটা বড় ড্রেনের ধারে দাঁড়িয়ে আমার ব্রেকটা কাজ করছিল না ব'লে থেমে ছিলাম, এর মধ্যে আচমকা এক ধাক্কা লাগাল এসে!
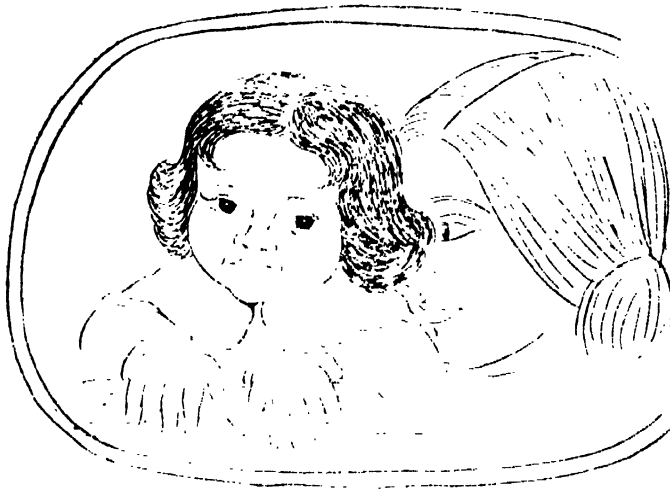
লরীর ড্রাইভার ভদ্রলোক বললেন: লাল-রঙের একটা গাড়ী কি?

বাবা বললেন: হ্যাঁ।

ভদ্রলোক বললেন: ওটা আসছে সমস্ত রাস্তা ঐ রকম জ্বালাতন করতে করতে। কিন্তু কি কাণ্ড দেখুন দেখি, বাচ্চাকাচ্চা নিয়ে—আপনারা যে প্রাণে মরেন নি এই ত আশ্চর্য্য!

বাবা মামণির হাত থেকে নোট দুটো নিয়ে ভদ্র-লোককে দেখিয়ে বললেন: আর দেখুন এ কি ব্যাপার, কুড়ি টাকা ব'লে ছ'শ টাকা দিয়েছে আমায়!

লরী-ড্রাইভার হো হো ক'রে হেসে বললেন, আরে, কি কাণ্ড! যাক্, বেশ হয়েছে—শত্রুস্য ধনক্ষয়ঃ। আপনি ওগুলো পকেটে ফেলুন, আমি দেখি, কুলীরা আপনার গাড়ীটা সোজা করতে পারে কি না।

লরীর কুলীরা, ঐ ভদ্রলোক, বাবা—সবাই মিলে গাড়ীটা সোজা ক'রে নিয়ে লরীর পিছনে দড়ি দিয়ে বেঁধে নিয়ে চললেন। বাবার ইঞ্জিন চলছে না, তবু ষ্টিয়ারিং ধ'রে ব'সে রইলেন। আর মা বুড়ুকে কোলে নিয়ে ক্লান্ত হয়ে কোন সময়ে ঘুমিয়ে পড়লেন—ভৌ ভৌ বেচারী একলা জেগে রইল পিছনের সিটে। বুড়ুর খিদে পেয়ে গেলেও বেশ মজা লাগতে লাগল।
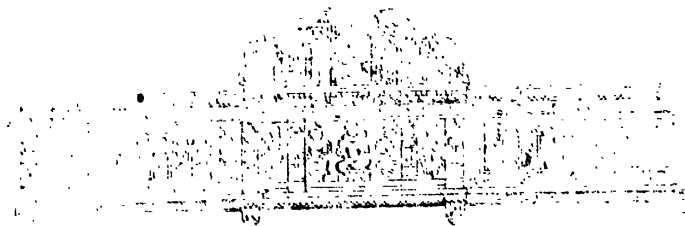
পুশকিন : রক্তের মতো লাল গোলাপ ও শাদা তুষার

শ্রীকল্যাণ চৌধুরী

১৭৯৯ খ্রীষ্টাব্দের ২৬শে মে মস্কো নগরীতে আলেকজাণ্ডার সারজিয়েভিচ পুশকিন জন্মগ্রহণ করলেন, আর ১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দে, অর্থাৎ তাঁর জন্মের একশত বৎসর পরে, রুশ-দেশের কমিউনিষ্টগণ একটি ক্ষুদ্র পুস্তিকাতে পুশকিন সম্বন্ধে মন্তব্য করে লিখলেন :

.....he was never a friend of the people, but a friend of the Tsar, the gentry, the bourgeoise.

অবশ্য ইতিপূর্বেই পুশকিন-জীবন পাঠকসাধারণের কাছে আলোচনার বিষয় হয়ে উঠেছিল। তাঁরা পুশকিনকে ঘিরে নানা সত্য-মিথ্যা কাহিনী ও প্রবাদ রচনা করতে স্বরু করে দিয়েছিলেন। তাঁদের চোখে কখনও তিনি বিদ্রোহী, কখনও পলায়নপর দুর্বলমানুষ, কখনও পঙ্গু, কখনও অদম্য শক্তিমান, কখনও স্বার্থপর মহাদুর্জন, কখনও বা পরম আত্মত্যাগী, নির্লোভ মহাপুরুষ।

সে যাই হোক্, আমরা যারা পুশকিনকে দেখেছি অন্যের চোখে, দূর থেকে, অনেকেই তাঁকে বা তাঁর রচনার মূল চিন্তাকে সঠিক বুঝে উঠতে পারি নি। তাঁর রচনা পড়তে গিয়ে তাঁর ব্যক্তিগত জীবনকে বিস্মৃত হয়েছি, কিংবা শুধুমাত্র তাঁর প্রমত্ত জীবনকেই স্বীকার করে নিয়েছি, অসম্মান প্রদর্শন করেছি তাঁর লেখার প্রতি। আসলে পুশকিনের রচনার সঙ্গে পুশকিনের ব্যক্তি-জীবন প্রায় ছায়ার মত মিশে আছে। তাঁর রচনা তাঁর জীবনের সঙ্গে নিবিড়তর সম্পর্ক স্থাপন করতে পেরেছিল বলেই হয়ত তা স্বপ্রতিষ্ঠ ও স্বতোদ্ভাসিত। সমস্ত জীবন ধ'রে তিনি ভ্রমণ করেছেন, ক্লান্ত হয়েছেন। সমস্ত জীবন-রণে তিনি বিক্ষিপ্ত হয়েছেন। তাঁর সব আশা প্রায় ফলহীন ধূসরতার মধ্যে নিক্ষিপ্ত হয়েছে। কিন্তু সেই সঙ্গে প্রখর রৌদ্রালোকে তাঁর দৃষ্টি ঘুরে ঘুরে খুঁজেছে একটি দরজা, এক টুকরো আলোকিত ইশারা। এবং সবশেষে বিদ্র ও এষণার এ-লড়াই তাঁর অন্তরকে ছিঁড়ে ছিঁড়ে কবিতার মধ্যে দিয়ে রক্তময় ফুল হয়ে ফুটে উঠেছে।

দুই

পুশকিন, তাঁর মায়ের দিক্ থেকে ছিলেন 'পিটার দি গ্রেট'-এর অধস্তন। শোনা যায়, সম্রাট্ পিটার ছিলেন আফ্রিকার ক্ষুদ্র রাজ্য ইথিওপিয়ার এক রাজকুমারীর পুত্র, বিবাহ করেছিলেন এক জর্মান মহিলাকে। তাঁর সাত সন্তানের মধ্যে একজন হলেন পুশকিনের দাদামশায় —কবি নিজের বংশপরিচয় জেনে সুখী ছিলেন, তার প্রমাণ, তিনি প্রায়ই বলতেন, 'my brother negroes', আফ্রিকাবাসীগণের প্রসঙ্গে। অনেকে মনে করে থাকেন, এই 'exotic strain'-এর ফলেই তাঁর স্পর্শকাতরতা ও ছন্দজ্ঞান স্বভাবজ হয়েছিল। তৎকালীন রুশদেশের অন্যান্য ভদ্র পরিবারের মত পুশকিন-পরিবারেও ফরাসী সভ্যতার ধারা অব্যাহত ছিল। এমন কি, গৃহে কথোপকথনের ভাষাও ছিল ফরাসী। পুশকিন পরিবারের গ্রন্থাগার, তার অধিকাংশই ছিল ফরাসী পুস্তকে সমৃদ্ধ শৈশবেই আলেকজাণ্ডার পুশকিনের মনে যে কাব্যপ্রীতি জন্ম নেয় তার পরিবর্ধন হয় গৃহের সাহিত্যিক আবহাওয়ায়। তাঁর পিতা এবং কাকা ছিলেন ফরাসী ভাষায় কবিতা রচনায় সিদ্ধহস্ত এবং পরিবারের হিতাকাঙ্ক্ষীরাও ছিলেন সাহিত্যমোদী। কিন্তু আশ্চর্য কথা, পুশকিন দিনের অধিকাংশ সময় যাঁদের সঙ্গে কাটাতেন তাঁরা শিশুর পিতামাতা নন, গৃহের দাস-দাসী ও ভৃত্য শ্রেণীর লোকজন। এদের মধ্যে অনেকেরই ছিল দেশীয় সাহিত্যের প্রতি, দেশীয় সংস্কৃতির প্রতি প্রগাঢ় মমতা। শোনা যায় তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ নিজের ভাষায় কবিতাও রচনা করতে পারতেন। আলেকজাণ্ডারকে শোনাতেন দেশীয় লোক-গাথা। সে যুগের রুশদেশের সামাজিক ইতিহাস যাঁরা জানেন, তাঁদের কাছে ভৃত্যদের মধ্যে এ ধরণের কাব্যপ্রীতি, কবিতা রচনার প্রচলন অসম্ভব বলে মনে হবে না। তা ছাড়া, আমরা জানি, অভিজাত ঘরের শিশু-সন্তানদের পরিচর্যার জন্য সে-সময় যাদের নিয়োগ করা হ'ত তারা রুচিবান্। টলষ্টয়ের জীবনী-গ্রন্থেও এর নিদর্শন আছে।

এতদিক্ থেকে পরিপূর্ণ হয়ে উঠলেও, একদিকে পুশকিনের যে অভাব তা হ'ল শিশুকালে বাবা ও মায়ের প্রত্যক্ষ স্নেহ। তিনি ছিলেন পিতামাতার চারজন সন্তানের একজন। আত্মসুখী, আনন্দপ্রিয় পিতামাতা কখনই প্রায় শিশুদের খবরাখবর নিতেন না। সে কারণে

শৈশবেও নয়, যৌবনেও নয়, প্রায় কোনকালেই পিতা-মাতার প্রতি বিশেষ অনুরক্ত হ'তে পারেন নি পুশকিন। ফলে, শৈশবেই তাঁর মনে এক স্বাধীন সত্তার জন্ম হয়েছিল এবং পরবর্তী জীবনেও তিনি সেই স্বাধীন সত্তার নির্দেশে মনস্থির করতেন। পিতামাতার দিক থেকে যেমন কোন টান নেই তেমনি কোন বাধা নেই। তবে তাঁর কার্যে প্রচণ্ড বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল যা, তা তাঁর রুগ্ন স্বাস্থ্য। পুশকিন-সাহিত্যে পিতামাতার অনুপস্থিতি কিন্তু কোনক্রমেই আমাদের চোখ এড়িয়ে যায় না। রবীন্দ্রনাথের জীবনে যা অভিশাপ হয়ে দেখা দিয়েছিল, পুশকিনের জীবনেও তাই হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ এ বিষয়ে সচেতন ছিলেন, কিন্তু পুশকিনের সচেতনতার কোন নিদর্শন আমরা পাই না।

আলেকজাণ্ডার যখন দ্বাদশ বৎসরে পদার্পণ করেন তখন তাঁকে Tsarskoe Selo—বর্তমানের Detskoe Selo-র বিদ্যালয়ে ভর্তি করে দেওয়া হয়। বিদ্যালয়টি ছিল বিশেষ ধরণের বিশাল প্রাসাদে সম্রাটের বিশেষ তত্ত্বাবধানে ছাত্রদের বিদ্যাচর্চার পালা চলত। শুধু বিদ্যা-শিক্ষাই নয়, এদের প্রত্যেককে বিশেষ 'ভদ্রলোক' তৈরী করার দিকেই কর্তৃপক্ষের নজর। ক্রমে ক্রমে এখানকার ছাত্ররাই ভবিষ্যতের চাঁই ব্যুরোক্রাট্ স্ হয়ে উঠতেন। শিক্ষকেরা প্রায় প্রত্যেকই বিখ্যাত ব্যক্তি এবং ফরাসী সভ্যতার ধারায় পুষ্ট। পুশকিন এখানে ছয় বৎসর ছিলেন এবং এখানকার সমাজের সঙ্গে অচ্ছেদ্য সখ্যে আবদ্ধ হয়ে গিয়েছিলেন। এক রাশিয়ান সমালোচক লিখেছেন—

In fact, his (Pushkin's) schoolmates stood him in lieu of family and home.

এখানে ছাত্রাবস্থাতেই তিনি প্রথম শেকস্পীয়র এবং ফরাসী কাব্য পঠনপাঠন সুরু করেন। লাতিন ক্লাসিকসের প্রতি অনুরক্ত হন। নিজ কাব্যচর্চাও সুরু হয় এখানে। তাঁর রচনা সর্বপ্রথম প্রকাশিত হতে থাকে ছাত্রদের হাতে লেখা পত্রিকায়। ছাত্রাবস্থাতেই তিনি কবিতা লিখে তৎকালীন রাশিয়ার বিশিষ্ট সাহিত্যরসিকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দের ৮ই জানুয়ারী বৃদ্ধ, প্রখ্যাত কবি Derzhavin, Tsarskoe Selo পরিদর্শন করতে এসেছেন। বালককবি পুশকিন তাঁকে তাঁর অভ্যর্থনা সভায় স্বরচিত কবিতা পাঠ করে মুগ্ধ করেন। পুশকিনের আত্ম-জীবনীতে সেদিনের কথা স্পষ্ট উল্লিখিত আছে।

I do not remember how I finished my recital. Nor do I remember how I ran away. Derzhavin was enchanted. He wanted to see me, embrace me.

বাস্তবিক পুশকিনের মত অপর কোন ব্যক্তি ইতিপূর্বে রাশিয়ার সাহিত্যজগতে এত সহজে প্রতিষ্ঠিত হ'তে পারেন নি।

ইত্যবসরে, ১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দের জুন মাসে তিনি ঐ বিদ্যালয় থেকে গ্র্যাজুয়েট হয়ে বেরোলে, তাঁকে রাজ্যের পররাষ্ট্রদপ্তরে নিয়োগ করা হয়। পুশকিন ধরাবাঁধা জীবনের অবসান হ'ল ভেবে উন্মত্ত হয়ে উঠলেন। মদ্যপান, ডুয়েল লড়া এবং নৃত্যসুখ যথেচ্ছা সুরু করলেন। একমাত্র বাসনা, জীবনে প্রভূত অভিজ্ঞতা অর্জন। ফলে, সে বয়সেই নারীপ্রেমে দক্ষ হয়ে উঠলেন তিনি। এ বয়সের পুশকিনকে বলা হয়েছে—A martyr to sensual love. শুনেছি, মহৎ কাব্যের জন্ম নাকি চাপল্য এবং চাঞ্চল্যের মধ্যে হয় না। কিন্তু পুশকিন তাঁর উচ্ছৃঙ্খলার চরম মুহূর্তেও কাব্য রচনা করেছেন। রাশিয়াকে নতুন দিনের বার্তা জানিয়েছেন। অটোক্রাসির বিরুদ্ধে শাণিত খড়্গ তুলে ধরেছেন। To Chaadayev নামক ক্ষুদ্র কবিতাটিতে রয়েছে সে বাণী।

> Not long have we by love's sweet thrills,
> By hope and fame been led astray.
> Like smoke, like mist on morning hills,
> Young pleasures fade away.
>
> * * * * * * *
>
> Believe me, Comrade, we shall see
> The dawning of a Joyful morn,
> And Russia, from her slumbers torn,
> The ruins of autocracy
> will with our names adorn.

Avrahm Yarmolinsky লিখেছেন :

He was beginning to write from experience, and his style was taking shape. In those days, however, he was best known for his saucy epigrams aimed at high dignitaries of Church and State, including the Tsar, and as the author of a few civic poems deploring the evils of Serfdom, extolling liberty and fulminating against tyranny.

পুশকিনের বয়স তখন আঠারো।

১৮২৫-এর ডিসেম্বর আন্দোলনের সূত্রপাত হচ্ছিল এ-সময়ে। শিক্ষিত জনসাধারণের একটি বিশিষ্ট অংশ যে গোপন সঙ্ঘ গঠিত করলেন, তাঁরা একান্তভাবে পুশকিনের ভক্ত হয়ে উঠলেন। এরই মধ্যে অন্য একটি ঘটনা পুশকিনকে সোজাসুজি নব্য সাথীদের পুরোভাগে

পৌঁছে দিল। পুশকিন Ruslan and Ludmila নামক কাব্যনাটিকা প্রকাশ করলেন ১৮২০ সনে। তখন, রাশিয়াতে সাহিত্যক্ষেত্রে দু'টি দল সৃষ্টি হয়েছে। প্রথমোক্তগণের নেতৃত্ব নিয়েছেন রাশিয়ার শিক্ষামন্ত্রী। দ্বিতীয় দলের পুরোধা পুশকিন। ঐ নাটিকা অভিনীত হ'লে তাঁর কথা ছড়িয়ে পড়ল সমস্ত রাশিয়ায়। পুশকিনকে তখন লোকে the singer of Ruslan and Ludmila নামে আখ্যায়িত করছে। অচলায়তন ভেঙ্গে রুশীয় কাব্যলক্ষ্মীকে মুক্তি দিলেন পুশকিন।

কিন্তু কবি নিজে মুক্তি পেলেন না। তাঁর উপর জার মহোদয়ের দৃষ্টি পড়েছিল পূর্বেই; এখন তা সন্দেহে রূপান্তরিত হ'ল। তিনি পিটার্সবুর্গ ছেড়ে আরও দক্ষিণে রওনা হলেন নতুন কাজ নিয়ে। পররাষ্ট্রদপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী কবির পরিচয়পত্রে লিখলেন :

Deprived of filial attachment, he could have only one sentiment : a passionate desire for independence. There is no excess in which this young man has not indulged, as there is no perfection which he cannot attain by the high excellence of his talents.

সেখানে কিছুদিন তিনি একদল জিপসীর সঙ্গে ঘুরে ঘুরে সমস্ত কসাক্ অঞ্চলটি দেখলেন। ক্রিমিয়ায় গেলেন এবং পেনিনসুলার দক্ষিণ তীরে পুশকিন-পরিবারের যে জমিদারি রয়েছে সেখানেও কিছুদিন কাটালেন। কিয়েভ-এ তিনি এক বন্ধুর গৃহে অতিথি হলেন। সেখানে কয়েকজন বিপ্লবীনেতার সঙ্গে তাঁর অন্তরঙ্গতা ঘটে। মদে, নাচে এবং গল্পে তাঁর দিন কাটছিল সুখে। কিন্তু অকস্মাৎ তিনি অসুস্থ হয়ে পড়লেন। নিতান্ত অনিচ্ছায় অবশেষে তিনি তাঁর ঊর্দ্ধতন কর্মচারী জেনারেল রায়েভস্কি'র পরিবারভুক্ত হয়ে ককেসাস অঞ্চলের গুরজুফে গিয়ে দিন কাটাতে থাকলেন। ইতিমধ্যে জেনারেলের ছোট মেয়ে মারিয়ার প্রেমে পড়েছেন পুশকিন। মারিয়ার রোমান্টিক প্রেম কবির মনে গভীর ভাবে দাগ কেটেছিল। পরবর্তীকালে বিভিন্ন সময় তিনি তার কথা উল্লেখ করেছেন। খুব সম্ভব পুশকিন এ সময়েই তাঁর বিখ্যাত উপন্যাস 'Captain's Daughter'-এর রমণীয় উপাদান সংগ্রহ করছিলেন। কিন্তু আশ্চর্য এই, মারিয়ার প্রেম তাঁকে বেশীদিন ভুলিয়ে রাখতে পারে নি। ককেসাস নয়, সভ্যজগতের জন্য তাঁর মন তৃষিত হয়ে উঠছিল। লিখলেন :

I've lived to bury my desires,
And see my dreams Corrode with rust ;
Now all that's left are fruitless fires
That burn my empty heart to dust.

Struck by the storms of cruel Fate,
My crown of summer bloom is sere ;
Alone and sad I watch and wait,
And wonder if the end is near.

* * * * * *

তাঁর এই অস্থিরতাই আবার তাঁকে নতুন কাজের সন্ধান দিল। তিনি ওডেসিয়ায় স্থান বদল করলেন। সমুদ্র, অফুরন্ত সূর্যকিরণ এবং ইতালীয়ান অপেরার আনন্দমত্ততা তাঁকে বিমোহিত করল। পরিচিত হলেন এ্যামেলিয়া ও কাউন্টেস্ ভরণ্টসভ্-এর সঙ্গে। কিন্তু বেশীদিন তিনি এখানে থাকতে পারলেন না। এক-ব্যবসায়ীর সুন্দরী পত্নী ইতালীয় রমণী এ্যামেলিয়া ও গবর্ণর-জেনারেল পত্নী ভরণ্টসভের সঙ্গে কবির অবৈধ-প্রণয় যখন চরমে উঠেছে তখন বিভাগীয় উচ্চমহল বিরক্ত হয়ে তাঁকে ওডেসিয়া থেকে স্থানান্তরিত করলেন মিখাইলোভস্কিতে। এ্যামেলিয়া যে কত হৃদয়ের খুব কাছে আসতে পেরেছিলেন তার নিদর্শন আমরা স্পষ্টত প্রত্যক্ষ করতে পারি। এ্যামেলিয়াকে উৎসর্গ ক'রে তিনি বহু কবিতা রচনা করেছিলেন।

১৮২৪-এর আগস্ট মাসে পুশকিন গেলেন মিখাইলোভস্কি। অঞ্চলটি ছিল তাঁর মায়ের জমিদারিভুক্ত। এখানে তিনি কিছুদিন নিজের পরিবারের সঙ্গে কাটালেন। কিন্তু ক্রমেই তা অসম্ভব হ'য়ে উঠল নানা কারণে। পিতা ক্রুদ্ধ, পুশকিন অবশেষে এর সমাধান করলেন নিজে এবং পরিবারের অন্যান্য সকলকে নিয়ে ভিন্ন স্থানে আবাস নির্মাণ ক'রে। পুশকিন একা রইলেন পিতৃস্থানে। অস্বাভাবিক পুত্রটি অনেককাল থেকেই পিতার দুঃখের কারণ হ'য়ে দাঁড়িয়েছিলেন। গৃহটি সজ্জিত ছিল, পিতামহ হানিবলের কালের পুরাতন আসবাবে। তাঁর সময় কাটত কিছুটা ভৃত্যদের সঙ্গে, বেশীরভাগ তাঁর শিশু বয়সের ধাত্রীর সাহচর্যে। দীর্ঘ শীতের সন্ধ্যায় সেই মহিলার মুখ থেকে তিনি শুনতেন নানা রূপকথা। তিনি যেন সে গৃহের অতিথি। জমিদারির কোন খোঁজখবর তিনি রাখতেন না। সময় কাটাতেন ঘোড়ায় চ'ড়ে। ঘুরে বেড়াতেন এখানে ওখানে। দেশের কোন ভদ্রলোকের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ ছিল না। শুধুমাত্র পাশের এক বাড়ীতে তাঁর যাতায়াত ছিল। সে-গৃহের অধিবাসীরা ছিলেন

সকলেই মহিলা। ঘনিষ্ঠতা যখন নিবিড় হয়ে উঠল, তখন আগুন নিয়ে খেলার ফল তাঁকে পেতে হ'ল, কারণ, ক্রমে মাতা ও জ্যেষ্ঠা কন্যা উভয়েই একযোগে কবির প্রেমে পড়লেন। যদিও প্রচণ্ড নিন্দা ও কুৎসার মধ্য দিয়ে এ ঘটনার সমাপ্তি ঘটেছিল। যতটুকু জানা যায়, কবি কিন্তু নিজে আজীবন একজন বিবাহিতা মহিলার প্রতি অনুরক্ত ছিলেন (খুব সম্ভব এ্যানিলিয়া)। যাঁর কথাপ্রসঙ্গে তিনি লিখেছেন, the genius of pure beauty. অথবা বন্ধুবর্গের কাছে যখন নিজের বিভিন্ন বয়সের বিভিন্ন মহিলার সঙ্গে নিজ প্রেম-সম্পর্কের কাহিনী বলতেন তখন ঐ মহিলার সম্বন্ধে বলেছিলেন, a Babylonian harlot.

এরই মধ্যে অখণ্ড ধৈর্য নিয়ে তিনি সাহিত্য-সাধনায় মগ্ন হয়েছিলেন। মিখাইলোভস্কিতে অবস্থানকালে তিনি শেষ করলেন তাঁর শ্রেষ্ঠ কাব্যোপন্যাস, Evgeny Onegin, লিখলেন : 'The prophet', 'The miser knight', কাব্যগ্রন্থ। Evgeny Onegin, পুশকিনের অনন্যসাধারণ রচনা। সমালোচক Gofman এ-প্রসঙ্গে বলেছেন :

Evgeny Onegin gave rise to new poems in which the hints made in the 'novel' were fully worked out. . . . . It was not by mere chance that the years of his energetic and successful work upon this novel were also the years of his greatest lyrics.

এর কিছুকাল পরই (সম্ভবতঃ ১৮২৮ সালের জুন-জুলাই) পুশকিন মিখাইলোভস্কি ছেড়ে চলে এলেন মস্কো। লেখা প্রায় বন্ধ হতে চলল। মদ্যপান, নৃত্যসুখ আবার চরমে উঠল। পরিচিত হলেন নাটালিয়া নাম্নী এক ষোড়শবর্ষীয়া তরুণীর সঙ্গে। নাটালিয়ার অনুপম দেহ-সৌন্দর্য মুগ্ধ করেছিল পুশকিনকে। নাটালিয়াকে বিবাহ করতে চাইলেন তিনি। কিন্তু তাঁর এ প্রস্তাব ঐ সময়ে গ্রাহ্য না হওয়ায় ব্যর্থমনোরথ পুশকিন পুনরায় ফিরে গেলেন ককেসাস্ অঞ্চলে। সেখান থেকে কিছুকাল পর তুরস্কে। ঐ সময়ে মাঝে-মাঝেই তিনি পূর্ব-প্রণয়ী মারিয়ার কথা স্মরণ ক'রে দিন কাটাতেন। মারিয়াকে উদ্দেশ ক'রে কবিতা লিখতেন।

The hills of Georgia are veiled in misty night :
Below, Aragva's waves are streaming.
I'm sad and yet serene : my very grief is bright,
My grief that, born of thee, is dreaming
Of thee, of thee alone . . . . . There's naught can make to pause
My sorrow's pangs, disturb their quite moving . . . . .
My heart takes fire again, and loves once more—because
No way it knows to cease from loving.

কিন্তু বেশীদিন তিনি সেখানে অবস্থান করতে পারেন নি। ডিসেমব্রিস্ট্স্ মুভমেন্টের পুরোধা পুশকিনকে ডেকে পাঠালেন ক্রুদ্ধ জার, নিকোলাস। ইতিপূর্বেই তিনি তাঁর আচরণে ক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছিলেন। যদিও বহু বাক্‌বিতণ্ডার পর তিনি মুক্তি পেয়েছিলেন জারের হাত থেকে, তবু বহু নিকট-বন্ধুবর্গকে হারিয়েছিলেন ঐ ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে। তখন ৮৩০ সাল। কবির বয়স একত্রিশ। মস্কোতেই অবস্থান করছেন : ভগ্নস্বাস্থ্য, মানসিক অশান্তিতে দিন কাটছে তাঁর। এমন সময় এক সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত ঘটনা ঘটে গেল তাঁর জীবনে। বিচিত্র ঘটনা পরম্পরায় নাটালিয়ার কাছ থেকে এল বিবাহের প্রস্তাব। আনন্দে অধীর হয়ে তিনি তাকে বিবাহ করলেন ; যদিও তিনি ভালভাবেই জানতেন যে, তখনও তার প্রতি অণুমাত্র ভালবাসা নাটালিয়ার হৃদয়ে সঞ্চিত নেই।

বাস্তবিক নাটালিয়াকে বিবাহ ক'রে কিছুমাত্র শান্তি পান নি তিনি। বাকী জীবনে পুশকিনের মন নিদারুণ ভাবে ক্ষত-বিক্ষত ক'রে দিয়েছিল নাটালিয়ার লক্ষ্যহীন উন্মত্ত আচরণ। উচ্ছৃঙ্খল কবি যখন শান্তভাবে জীবন কাটাতে চেয়েছেন তখন নাটালিয়ার চরম-বিলাসী জীবন-যাত্রা তাঁকে মমাহত করেছে। এরই মধ্যে দেখা দিয়েছে আর্থিক কষ্ট। জীবনে বীতস্পৃহ হয়ে উঠলেন তিনি :

Thou useless gift, that chance did proffer,
Life, why worst thou granted me ?
Granted! why condemned to suffer
Through thy secret destiny ?

এদিকে আত্মমুখী বিলাসিনী নাটালিয়া ঘর ছেড়ে রাতের পর রাত কাটিয়ে দিচ্ছেন নাচঘরে, পর-পুরুষের সঙ্গে। কখনও বিদেশী অর্থবান্ ব্যবসায়ীর নিভৃত কক্ষে, কখনও বা স্বয়ং জারের প্রমোদ ভবনে। অসম্ভব বিশ্বাস ছিল কবির নাটালিয়ার প্রতি, প্রাণের চেয়েও তিনি ভালবাসতেন তাঁকে। বহুবার তিনি তাঁকে বোঝাবার চেষ্টা করেছেন। অবশেষে অন্য উপায় না দেখে মস্কো ছেড়ে চলে এলেন তিনি পিটার্সবুর্গ শহরে। এতেও নাটালিয়ার মন পেলেন না তিনি। কবিতা লিখলেন নাটালিয়াকে উদ্দেশ করে। তখন ১৮৩৩ সাল।

'Tis time, my friend, 'tis time . . . . The weary heart craves peace ;
The swift days scurry past, and with each day decrease
Life's scanty particles, while, heedless, you and I
Think but to live . . . . And see, all turns to dust :
we die.

মস্কো থেকে তাঁকে চিঠি লিখলেন তিনি—

About you, my dear heart, there circulate some rumours which are only partly reaching me, because husbands are always the last in the town to learn about their wives' doings ; still, it seems that your flirtation and cruelty have driven someone to such despair that, as a solace, he has now made for himself a regular harem out of the theatrical pupils. That's not the thing, my angel.

সবশেষে তাঁর কানে এল নাটালিয়ার গোপন প্রণয় কাহিনী। ফরাসী ধনাঢ্য যুবক দ' অ্যান্থেস ও নাটালিয়ার অবৈধ সম্পর্কের বার্তা তখন সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছে। এ ঘটনা তাঁর মনে চরম আঘাত হানলেও আত্মাভিমানী পুশকিন কিছুতেই মেনে নিতে পারলেন না ঘটনাটিকে। সরাসরি দ' অ্যান্থেসকে ডুয়েলে আহ্বান জানালেন তিনি। তখন ১৮৩৭ সাল। ডুয়েল লড়তে গিয়ে গুরুতর রূপে চোট পেলেন পুশকিন। প্রচুর রক্তক্ষরণে দুর্বল হয়ে পড়লেন তিনি। ঠিক এর দু'দিন পর ২৭শে জানুয়ারী নাটালিয়ার প্রতি অনিঃশেষ ভালবাসা নিয়ে ইহজগৎ থেকে বিদায় নিলেন পুশকিন। যে নাটালিয়াকে তিনি প্রাণের চেয়েও বেশী ভালবাসতেন সেই নাটালিয়া তাঁর মৃত্যুর কারণ হয়ে দাঁড়ালেন। স্বল্পায়ু জীবনের শেষ কয়েক বৎসর তাঁর অসীম দুঃখের মধ্যে কেটেছে। কিন্তু আশ্চর্য এই, এরই মধ্যে তিনি কবিতা রচনা করে গেছেন।

Let me not laugh a madman's laugh !
Better a beggar's scrip and staff ;
Hunger, and toil, and care.—
Not that my mind I value so
Or would not freely let it go :
That loss I'd gladly bear.

তিন

জীবনের অধিকাংশকাল পুশকিন দক্ষিণাঞ্চলে অতিবাহিত করেছিলেন। এর অভিজ্ঞতা তাঁকে বহু কবিতা রচনায় সহায়তা করেছিল। কারণ, পুশকিনের মতানুসারে, কবিতার জন্মের প্রয়োজনে অভিজ্ঞতার এক বিশাল ভূমিকা রয়েছে। জার্মান কবি রিল্কে পরবর্তীকালে ঐ মতকে দৃঢ় করেছিলেন শুনেছি। The note-books of Malte Laurids Brigge-এর John Limton-এর অনুবাদ থেকে তুলে দিচ্ছি :

Verses are not, as people imagine, simply feelings ; they are experiences. In order to write a single verse, one must see many cities, and men and things ; . . . . . . One must be able to return in thought to roads in unknown regions, to unexpected encounters, ad to partings that had been long foreseen ; ইত্যাদি।

ফলে সে সব স্মৃতি ক্রমে ক্রমে কবির মনে একটি আকার গ্রহণ করে, পরে কবিতার জন্ম হয়। বাস্তবিক পুশকিনের ক্ষেত্রে তা সত্য হয়েছে। সমসাময়িক কবিতাবলীর মধ্যে একটি বিশেষ ঘটনাও লক্ষণীয়, তা হচ্ছে, বায়রণের প্রভাব। এ সময় সর্বদাই তিনি বায়রণের কবিতা পড়তেন। দক্ষিণাঞ্চলে থাকাকালীন তাঁর লেখা 'The Caucasian Prisoner' কবিতাটিতে তাঁর প্রভাব আছে। কবিতাটির বিষয় হচ্ছে : একজন ককেশিয়ান যুবতী এক রুশীয় বন্দীর প্রেমে পড়েছিল। মেয়েটি বন্দীর মুক্তিদানের পর নিজে আত্মদান করেছিল জলে ডুবে। তৎকালে লেখা অন্য বিখ্যাত কবিতার নাম, The Gypsies। কাহিনীটি এক সভ্যতা-পলাতক যুবক এক জিপসীদলে মিশে দেশময় ভ্রমণ করতে থাকে। ক্রমে এক জিপসী কুমারীর প্রেমে পড়ে। কিন্তু মেয়েটির পূর্ব-প্রণয়ীর সঙ্গে তার সংঘাত হয়, ফলে পূর্ব প্রণয়ী এবং মেয়েটিকে সে হত্যা করে। তা-ছাড়া আরও কয়েকটি অসমাপ্ত রচনায়, যেমন The Brother Robbers'-এ একই ভাবধারা বর্তমান। পুশকিনের এই কবিতাবলীর চরিত্র প্রসঙ্গে Avrahm Yarmolinsky লিখেছেন,

These poems contain remote echoes of Rousseauism and exhibit that sensitiveness to nature in its more exotic aspects, that mood of aristocratic misanthropy and world-weary 'tristesse', that are associated with Byronism.

কিন্তু চরিত্রগত ভাবে পুশকিন রোমান্টিক ছিলেন না। অথবা রোমান্টিসিজম্ তাঁর হৃদয়ের গভীরে আসন নিতে পারে নি। তিনি বিদ্রোহী ছিলেন, নিজের চরিত্রগত তাড়নায় নয়, পারিপার্শ্বিক অবস্থার চাপে। তবুও যেমন সমসাময়িক কালে, তেমন আজকের কালেও তাঁকে রোমান্টিক গোষ্ঠীভুক্ত করা হয়ে থাকে। এমন কি সেকালে তিনি 'রুশীয়ার বায়রণ' এমন নামেও অভিহিত হয়েছেন।

যেমন গ্যেটের জীবনাবসানের সঙ্গে-সঙ্গে জার্মান

সাহিত্যের প্রখ্যাত 'Aesthetic Age'-এর অবসান হয়, সুরু হয় নতুন যুগ, তেমনি রুশসাহিত্যেও পুশকিনের অবলুপ্তির সঙ্গে সঙ্গে শেষ হয় এক কাব্যের যুগ।

টমাস মান এ-মত সমর্থন করতেন।

Pushkin inhabits a sphere by himself. a sensuously radiant, naive and blithely poetic one.

এরপর সুরু হ'ল গোগলের যুগ। সমালোচক Merezhokovsky-এর ভাষায়:

the transtion from unconscious to creative consciousness.

ওঁর মত অনুসারে, এ-হচ্ছে পুশকিনের কাব্যযুগ থেকে অন্যযুগের সূচনা। সুতরাং পুশকিনের ক্ষেত্রে যদি আমরা এ-মত মেনে নি, তবে দেখব, তাঁর সাহিত্যের বিশেষ 'চার্ম', যাকে সমর্থন করেছেন টমাস মান নিজে, তা অব্যাহত আছে। এরই ফলে পুশকিনের সাহিত্য পাঠে আমরা মুগ্ধ হই, পুশকিনের Simplicity towards critical responsibility and morality আমাদের চমৎকৃত করে। এরই ফলে যেমন কোন দুরূহতম বিষয়কে তিনি সহজে ধরতে পারতেন, তেমন তার সহজতম রূপদানেও সমর্থ হতেন।*

* উদ্ধৃতিগুলি রুশ-ভাষার থেকে ইংরেজী অনুবাদ।

প্রতিবাদের উত্তর

শ্রীভূপেন্দ্রকুমার দত্ত ও শ্রীকমলা দাশগুপ্তের নামে আশ্বিনের প্রবাসীতে লিখিত "বিপ্লবের অভিব্যক্তি" নামে যে প্রবন্ধ বাহির হয়, শ্রীকৃষ্ণধন দে লিখিত তার একটা প্রতিবাদ অগ্রহায়ণ সংখ্যা প্রবাসীতে দেখলাম।

Sedition Committee Report (1918) বা Rowlatt Report-এর part 1, chapter 1, para 8, Sub para 2-তে এই কথাগুলি লেখা আছে:

"Among those who united to excuse the murder and to praise the bomb as a weapon of offence against unpopular officials, was Tilak. For two articles in the "Kesari" published in May and June, 1908, in connection with the Muzaffarpur murders, he was convicted and sentenced to six years, imprisonment."

প্রতিবাদে আর যা লেখা হয়েছে সে সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য এই যে, সে যুগে বিপ্লবীদলের সঙ্গে যাঁদের যোগ ছিল তাঁদের পক্ষে সে কথা স্বীকার করা সম্ভবও ছিল না, কেউ করতেনও না। লোকমান্য তিলকের বিপ্লবী দলের সঙ্গে যোগাযোগের প্রমাণ আজ জনসাধারণের অনেকেরই জানা। দুইজন লেখক ও লেখিকা, যাঁরা তখনকার দিনের বিপ্লবীদলের সংস্পর্শে ছিলেন এবং লোকমান্যের কার্যকলাপের কিছু কিছু অবগত ছিলেন, তাঁদের লেখা দুইখানি বই—চারুচন্দ্র দত্ত আই. সি. এস. লিখিত "পুরাণো কথা—উপসংহার" পৃষ্ঠা ১৭ এবং সরলা দেবী চৌধুরাণী লিখিত "জীবনের ঝরাপাতা" পৃষ্ঠা ১৭৮—১৮১ পাঠকদের একবার দেখতে অনুরোধ করি। এতে অন্ততঃ স্পষ্ট হবে, বিপ্লবী দলের কোন কোন কাজে লোকমান্যের সম্মতি না থাকলেও তাঁদের সঙ্গে তাঁর গভীর যোগাযোগ ছিল। বিপ্লবীদের সকলের সঙ্গে সকলে প্রত্যেকটি কর্মসূচী নিয়ে যে একমত হবেন তারও কোন হেতু নেই।

ভূপেন্দ্রকুমার দত্ত
কমলা দাশগুপ্ত

—০—

তার পর কিছুদিন আর কিছু ভাববার মত অবস্থাই ছিল না।

ক'টা পাঁজরা কেটে বাদ দেবার ব্যবস্থা হয়েছিল ডাঃ মল্লিকেরই শেষ চেষ্টায়। ডাক্তারদের কাটা-ছেঁড়ায় কোন ত্রুটি বোধহয় হয় নি, কিন্তু সে-ধাক্কা সামলে ওঠার মত জীবনীশক্তিই তার যেন ফুরিয়ে গিয়েছিল।

অনেক, অনেকদিন বাদে অনুপমকে দেখেছিল বিছানার পাশে ব'সে থাকতে।

সে কতদিন আগের কথা? না, আড়াই বছর নয়।

কিছু কি বুঝতে পেরেছিল তার মুখের দিকে চেয়ে? না, কিছুই না। অনুপমকে কেমন যেন উদ্‌ভ্রান্ত লেগেছিল। সে যেন শোভনাকে চিনতে পারছে না, বিশ্বাস করতে পারছে না শোভনাই তার সামনে শয্যার সঙ্গে মিলিয়ে শুয়ে আছে।

না, স্মৃতিকে ঠিক বিশ্বাস করা যায় না এই জায়গাটায়। এখন যা জেনেছে, তাই যেন তখনকার স্মৃতির ওপর ছায়া ফেলেছে।

অনুপমকে একটু অন্য রকম কিন্তু সত্যিই লেগেছিল মনে আছে।

জিজ্ঞাসা করেছিল শোভনা—বড্ড ভয় পেয়েছিলে, না?

অনুপম কোন জবাব দেয় নি। কেমন কাতর অসহায় ভাবে চেয়ে ছিল শুধু।

শোভনাই আবার বলেছিল, আর ভয় নেই। এবার সেরে উঠব।

সেরে উঠতে তবু আরও অনেকদিন লেগেছিল। অনুপমের দেখতে আসার মধ্যে তখনই বড় বড় ফাঁক পড়ছে।

মুখে একটু-আধটু অভিমান জানালেও মনে মনে শোভনার কোন সত্যিকারের ক্ষোভ বোধ হয় ছিল না। অনুপমের হয়ে সে নিজেই কৈফিয়ৎ দিয়েছে নিজেকে। রোজগারের ধান্দায় ঘোরবার পর অবসর যদি বা মেলে, রোজ রোজ এই রেলভাড়া ক'রে আসা কি অনুপমের পক্ষে সম্ভব?

কিন্তু অনুপম ত তখন থেকেই আসা বন্ধ করতে পারত? তখন চপলার সঙ্গে সে ত যেখানে হোক্ ঘর বেঁধেছে।

যত দেরী ক'রেই হোক্, কেন তবু আসত অনুপম? তার বিবেকে বাধত ব'লে? বিয়ে করবার সময় এ বিবেক কি অসাড় হয়েছিল? না চপলার ওপর এমন দুর্বার তার ভালবাসা যে, কোন বাধা মানে নি মন!

কিন্তু দুর্বার কোন আবেগের স্রোতে ভাসবার মানুষ হিসেবে অনুপমকে সে যে কিছুতেই ভাবতে পারে না।

চপলা আর অনুপমের দেখা হওয়া থেকে বিয়ে পর্যন্ত সমস্ত অধ্যায়টার ওপর কল্পনায় কত ভাবেই না মনটাকে ঘুরিয়ে আনা যায়। অসহায় উদ্বাস্তু নিরাশ্রয় একটি মেয়ে চপলা। হয়ত অনুপমের নিজেদের গাঁয়ের কিংবা দেশের হ'তে পারে। প্রাণ ইজ্জত ধর্ম বাঁচাতে নিরুপায় হয়ে সব কিছু ছেড়ে এসে সরকারী সাহায্য-শিবিরে আশ্রয় নেবার পরই হয়ত অনুপমের সঙ্গে দেখা হয়েছিল। তার পর মায়া মমতা থেকে ঘনিষ্ঠতা আর ভালবাসা কি? না অসতর্ক মুহূর্তের কোন দুর্বলতার দাম দিতে এ বিয়ে অনুপমকে করতে হয়েছে?

কিন্তু শিক্ষা-দীক্ষা না থাক্, সরল ও গ্রাম্য হোক্, চপলার মধ্যে কিছু এমন আছে ব'লে মনে হয় যা এই ধরণের অনুমানের সঙ্গে খাপ খায় না। মেয়েটির মধ্যে একটি স্নিগ্ধ অকৃত্রিম পবিত্রতা যেন আপনা থেকে ফুটে বার হয়।

তা হ'লে আর সকলের মত অনুপমও কি শোভনা আর বাঁচবে না ব'লে ধ'রে নিয়েছিল? তাই যদি নিয়ে থাকে তা হ'লে মৃত্যুর জন্যে ক'টা দিন অপেক্ষা করার ধৈর্যও তার হয় নি?

কিন্তু সকলের আশা-আশঙ্কাকে মিথ্যে প্রমাণ ক'রে বেঁচে ওঠার পরও অনুপম কেন যে আবার দেখা করতে না এসে পারে নি, কেন যে একটা মিথ্যা নির্মম অভিনয় আরও দীর্ঘকাল অকারণে টেনে নিয়ে গিয়ে হঠাৎ তাতে যবনিকা টেনেছে, এ প্রশ্নের মীমাংসা বুঝি আর কোনদিন হবে না।

শোভনার ভাবনায় ছেদ পড়ে।

কণ্ডাক্টার টিকিটের জন্যে কাছে এসে দাঁড়িয়েছে। শোভনা ব্যাগ খুলে একটা টাকা তার হাতে দিলে সে জিজ্ঞাসা করে নিয়ম মাফিক—কোথায় যাবেন?

শোভনা তার গন্তব্য জায়গা জানাবার পর কণ্ডাক্টার টাকাটা ফেরৎ দিয়ে বলে, পরের স্টপে নেমে যান। এ ট্রাম হাওড়া যাচ্ছে।

হাওড়া? শোভনা সত্যিই অপ্রস্তুত হয়। বিচলিত অবস্থায় সত্যিই কিছু না দেখে সে ট্রামটায় উঠে পড়েছে। কিন্তু পরের স্টপে নেমে অন্য ট্রাম ধরতে তার ইচ্ছে করে না। টাকাটা আবার কণ্ডাক্টারকে ফিরিয়ে দিয়ে হাওড়ারই একটা টিকিট সে চায়।

হাওড়ার টার্মিনাসে নেমে স্টেশনের ভিতরকার ভিড়ের মধ্যে নিজেকে মিশিয়ে দিয়ে উদ্দেশ্যবিহীন ভাবে

এদিক্-ওদিক একটু ঘুরতে ঘুরতে হঠাৎ হাওড়া আসবার খেয়াল কেন যে তার হ'ল, শোভনা ভাববার চেষ্টা করে। হয়ত মনের এই অবস্থায় একটু দূরের পাল্লাই তাকে আকৃষ্ট করেছে কিংবা তার মন এমনি ভিড়ের মধ্যেই হারিয়ে যেতে চেয়েছে কিছুক্ষণ।

মাঠ পাহাড়ে নয়, নিজেকে হারিয়ে ফেলতে হ'লে জনতার মত এমন সুবিধে আর কোথাও নেই, বিশেষ করে সে জনতা যদি এ যুগের বড় স্টেশনের মত অসংলগ্ন বিচ্ছিন্ন অসংখ্য সত্তার একটা অস্থির অস্থায়ী সমষ্টি হয়। স্টেশনে সবাই বিচ্ছিন্ন অসংলগ্ন বটে কিন্তু উদ্দেশ্যহীন নয়। প্রত্যেকের এক-একটি ভিন্ন উদ্দেশ্যের সুতো যেন কিছুক্ষণের জন্যে এখানে জট বেঁধে আবার খুলে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাচ্ছে।

বেলা এখন দুপুর, তবু ট্রেনের যাত্রীর ভিড়ের কামাই নেই। স্টেশনের বড় হলের ঢালাও মেঝের ওপর—এখানে-ওখানে নানা ছোটখাট দল কিছুক্ষণের সংসার পেতে ব'সে গেছে। তৃতীয় শ্রেণীর টিকিট-ঘরগুলোতে এখনও সার দিয়ে লোক দাঁড়িয়ে। এদের প্রত্যেকে কোথাও থেকে এসে কোথাও যাবার জন্যে উৎসুক। যার যার জীবনের একটি একটি কক্ষ আছে—আছে একটা কেন্দ্র, যা তাদের সমস্ত চলাফেরা, ভাবনা-চিন্তা, আশা-আকাঙ্ক্ষাকে একটি নির্দিষ্ট লক্ষ্যের সীমানায় ধ'রে রেখেছে!

আর তার?

হ্যাঁ, আছে, আশুবাবুর স্নেহের আশ্রয়ে ফিরে গিয়ে তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতার ঋণ শোধ করার চেষ্টা কিংবা এ নিরাপদ্ বৃত্ত কেটে বেরিয়ে নিখিল বক্সীর প্রস্তাবমত স্বাধীন চাকরির জন্যে উমেদারি করা।

সে চাকরিই, ধরা যাক্, সে পেল। তার পর?

তার পর আর একটু ভালো পোশাক, প্রসাধন, ছোট-খাট সখ মেটাবার মত সচ্ছলতা, আশুবাবুর এ আশ্রয় ছেড়ে নিজের একটা ছোট-খাট বাসা কিংবা মেয়েদের কোন নামকরা হোটেলে অন্ততঃ একটা সীট, নতুন কিছু বন্ধু, ব্যস্।

সে জীবনেরও সত্যকার কোন কেন্দ্র থাকবে কি? তাই যদি না থাকে তা হ'লে একবার কেন্দ্রহীন হয়ে ছিটকে বেরিয়ে গেলেই বা ক্ষতি কি?

মেয়ের বদলে ছেলে হ'লে, টিকিট ঘরে গিয়ে একটা দূর কোন স্টেশনের টিকিট কিনে ট্রেনে চ'ড়ে বসতে পারত না কি, অনিশ্চিত ভবিষ্যতের অন্ধকারে ঝাঁপ দেবার জন্যে? অজানা কোন শহরে গিয়ে নামত। যখন যেখানে যা জোটে তাই খেয়ে, যেখানে সুবিধে একটু হয় সেখানেই রাতের বিশ্রামটুকু সেরে, ভাগ্যের সঙ্গে যুঝে দেখতে পারত। দেখতে পারত নিজস্ব একটি জীবনের বৃত্ত রচনা করতে পারে কি না।

কিন্তু মেয়ে ব'লে সে উপায় তার নেই। যে কোন অজানা জায়গায় সে গিয়ে নামতে পারবে না, পারবে না বেপরোয়া স্টেশনের প্ল্যাটফর্মের বেঞ্চের ওপর শুয়ে রাত কাটাতে, নিজের উপর যতখানি বিশ্বাস আর যতখানি সাহসই তার থাক না কেন!

ইতিমধ্যে তার বয়সের একটি মেয়েকে একলা দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে স্টেশনের ব্যস্ত জনতার মধ্যে কিছু কিছু যে কৌতূহলের পরিচয় পাওয়া গেছে তা সবই সুস্থ বোধহয় নয়।

একজন আধা-বয়সী ভদ্রলোক গায়ে প'ড়ে এসেই বলেছেন, আপনি কোথায় যাবেন?

শোভনা ঈষৎ ভ্রূকুটির সঙ্গে মুখ তুলে তাকাতে ভদ্রলোক তেমন কিছু অপ্রস্তুত না হয়েই বলেছেন, বলছিলাম, লোক্যালে যদি যেতে চান তা হ'লে টিকেট-ঘর ওদিকে। মেয়েদের আলাদা কাউণ্টারও আছে।

ভদ্রলোক এইটুকু জানিয়েই চ'লে গেছেন। হয়ত সাহায্য করবার সদিচ্ছাই তাঁর ছিল। অন্য ধরণের কৌতূহল থাকলেও খুব দোষ দেওয়া যায় না। একা একটি যুবতী মেয়েকে উদ্দেশ্যবিহীন স্টেশনে ঘুরতে দেখেও একেবারে উদাসীন নির্বিকার থাকবে, সংসারের সবাই এমন ঋষ্যশৃঙ্গ এখনও নিশ্চয় হয়ে যায় নি।

ভদ্রলোকের উপদেশ শুনে নয়, এক জায়গায় বেশীক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকার বিপদ্ বুঝেই শোভনা লোক্যাল ট্রেনের টিকিট-ঘরগুলোর দিকেই এগিয়ে যায়।

একটা লোক্যাল সবে এসে দাঁড়িয়েছে। জনতার স্রোত প্ল্যাটফর্মের ওপর দিয়ে সবেগে বয়ে যাচ্ছে বাইরের গেটের দিকে।

হঠাৎ শোভনাকে থম্‌কে দাঁড়িয়ে পড়তে হয়। বুকের স্পন্দন যেন তার এক মুহূর্তের জন্যে থেমে গিয়ে আবার উন্মত্ত হয়ে ওঠে।

লোক্যাল ট্রেনের আগন্তুক যে যাত্রীর দল স্টেশনের পুব দিকের তোরণ দিয়ে বাইরে যাচ্ছে তাদের দিকে চেয়ে সে যেন নিজের চোখকেই বিশ্বাস করতে পারে না।

নিয়তি কি এই জন্যেই আজ তার মনে এই হাওড়া স্টেশনে চলে আসার হঠাৎ খেয়াল তুলেছে!

চিৎকার ক'রে নাম ধ'রে ডাকা যায় না। যথাসাধ্য

তাড়াতাড়ি শোভনাও গেটের দিকে যাবার চেষ্টা করে। কিন্তু মেয়ে হয়ে এই বেণীর ভাগ পুরুষের ভিড়ে ঠেলা-ঠেলি ক'রে ত যাওয়া যায় না? শোভনাকে একটু সংযত ভাবেই অগ্রসর হ'তে হয়। যার কাছে পৌঁছবার জন্যে এই ব্যাকুলতা, তাকে মানুষের ভিড়ে সামনে আর দেখাই যাচ্ছে না। তবে গেট থেকে সময়মত বেরুতে পারলে ধরা যাবে নিশ্চয়।

তার আগেই পাশ থেকে বাধা পড়ে।

এ কি, আপনি? এখানে কোথায় এসেছিলেন?

শোভনা ফিরে তাকিয়ে দেখে নিখিল বক্সীই তার পিছু পিছু ভিড়ের ভেতর দিয়ে আসছে।

বাইরের গেটের প্রায় কাছাকাছি তখন তারা পৌঁছে গেছে। ভিড়কে পথ ছেড়ে দেবার জন্যে গেটের পাশের ফুটপাথে তাদের স'রে দাঁড়াতে হয়।

নিখিল একটু কুণ্ঠিত ভাবেই কৈফিয়ৎ স্বরূপ বলে, মাপ করবেন। আচমকা এখানে আপনাকে দেখে প্রতিজ্ঞাটা ভুলে গেছি।

শোভনা উত্তর দেয় না। সে তখন তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চারিদিকের জনতার ওপর চোখ বুলিয়ে যাচ্ছে। এদিকে ওদিকে বেশ কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে সে মুখ ফিরিয়ে একটু ম্লানভাবে হাসে। তার পর বিষণ্ণ কৌতুকের সঙ্গে বলে, আপনি নিয়তি মানেন?

প্রশ্নটা এই পরিবেশে, এই অবস্থায় নিখিল বক্সীর কাছে সত্যিই একেবারে অপ্রত্যাশিত ও অদ্ভুত।

তার বিমূঢ়তাটুকু অগ্রাহ্য ক'রেই শোভনা আবার ব'লে যায়, নিয়তিই আজ আপনাকে প্রতিজ্ঞা ভুলিয়েছে। কেন জানেন? আমার নিরুদ্দেশ স্বামীকে একেবারে চোখের সামনে এনে লুকিয়ে ফেলার কৌতুক করবার জন্যে। আপনি পিছু না ডাকলে আমি হয়ত আজ তাঁকে একা ধরতে পাবার সুযোগ পেতাম।

আপনার স্বামীর কথা বলছেন! নিখিলের গলায় উত্তেজনা ও বিস্ময় মেশানো, তিনি কোথায়? বলুন, আমি···

বাধা দিয়ে শোভনা বলে, আর আপনার কিছু করবার নেই। চিরকালের মতই তাঁকে হারিয়ে যেতে দিলাম। ক্রমশঃ

কলকাতারনাট্য-আন্দোলনে থিয়েটার সেণ্টারের অবদান

শ্রীদিগু নাগ আচার্য্য

গত দুই বছরে কলকাতা শহরে থিয়েটার সেণ্টার নাট্যামোদী মানুষের মনে নিজের আসন সুদৃঢ় করে নিয়েছে। সাধারণ দর্শক যাঁরা তাঁরা মুগ্ধ হয়েছেন এখানকার ছোট্ট প্রেক্ষাগৃহটিতে (আসন সংখ্যা ১০৪) নিখুঁত উপকরণের সাহায্যে মনোরম আবহাওয়ায় ক্রমান্বয়ে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য নাটকের সুন্দর প্রযোজনায়। সপ্তাহে কয়েকটি পেশাদার প্রদর্শন এখানে নিয়মিত ভাবে হয়ে থাকে—১৯৬০ সনের ১৫ই ডিসেম্বর থেকে সুরু করে আজ পর্য্যন্ত 'ধৃতরাষ্ট্র', 'রূপোলী চাঁদ', 'আর হবে না দেরী', 'রজনীগন্ধা', 'অলীক বাবু', 'অঘটন আজও ঘটে' ও বর্ত্তমানে প্রদর্শিত 'ওরা থাকে ওধারে'— এতগুলি নাটক বিপুল সফলতার মধ্যে অভিনীত হয়েছে এই ভাবে। যাঁরা সমজদার তাঁরা নিছক এই নাটকগুলির উৎকর্ষে মুগ্ধ হওয়া ছাড়াও বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করে এসেছেন যে, বিভিন্ন রকমের আখ্যান গ্রহণ করা হয়েছে এখানে, মঞ্চসজ্জা ও প্রযোজনার পদ্ধতিও বিভিন্ন। পরীক্ষামূলক ভাবে এই ছোট্ট প্রেক্ষাগৃহটিকে পরিপূর্ণ ভাবে ব্যবহার করে আসছেন এই প্রতিষ্ঠানটির পরিচালকবৃন্দ।

কিন্তু যাঁরা উঠতি বা শিক্ষানবীশ অভিনেতা তাঁদের কাছে থিয়েটার সেণ্টারের আরও একটি বিশেষ পরিচয় আছে: ভারতবর্ষে এ ধরণের মঞ্চ-শিল্প-শিক্ষণ কেন্দ্র বোধ হয় আর দ্বিতীয়টি নেই। ত্রৈ-মাসিক যে শিক্ষাক্রম অনুসরণে এখানে শিক্ষাদান হয়ে থাকে তার মধ্যে অভিনয় ব্যতীত রূপসজ্জা, আলোক সম্পাত, মঞ্চ পরিকল্পনা ইত্যাদি আনুষঙ্গিক সব কয়টি শিল্পকলাকেই স্থান দেওয়া হয়েছে। এই শিক্ষানবীশেরা নিজেরাও বিভিন্ন নাটক মঞ্চস্থ করেন তাঁদের শিক্ষাক্রমের অঙ্গ হিসাবে

নাট্য-বিদ্যালয়ের একটি দৃশ্য : নাটক—'ধৃতরাষ্ট্র', শিক্ষক—তরুণ রায়।

আবার এই প্রতিষ্ঠানটির ব্যবস্থাপনার বাৎসরিক অভিনয়োৎসব ও অভিনয় প্রতিযোগিতাও হয়ে আসছে বহুদিন ধ'রে। বলা বাহুল্য যে, বিভিন্ন দিকে এত সফল প্রচেষ্টার ইতিহাস সাম্প্রতিক কলকাতায় ত বটেই, ভারতীয় নাট্যজগতেই এক অভিনব ব্যাপার। এই প্রতিষ্ঠানটির মূলে যাঁর ব্যক্তিত্ব ও অধ্যবসায় তাঁর প্রতিভাও এই রকমই বিভিন্ন দিকে প্রকাশ পেয়েছে—বস্তুতঃ তাঁর পরিচয় আমাদের কাছে দু'টি নামে : তরুণ রায় ও 'ধনঞ্জয় বৈরাগী'।

তরুণ রায় সম্পন্ন অবস্থার মানুষ। প্রেসিডেন্সী ও সেণ্ট জেভিয়ার্স কলেজের ছাত্র হিসেবে সাধারণ ভাল ছেলেদের মতনই অতিবাহিত হয়েছে তাঁর জীবন। অভিনয়ের দিকে তাঁর ঝোঁক অবশ্য তখন থেকেই ছিল, তবে ১৯৪৭ সালের ডিসেম্বর মাসে একটি আন্তকলেজ অভিনয় প্রতিযোগিতা সংগঠন ছাড়া তাঁর আর বেশী কিছু কর্মতৎপরতা দেখা যায় নি এই বিষয়ে। বরং তাঁর সমসাময়িক (কলেজে এক ক্লাস নীচের পড়ুয়া) উৎপল দত্ত সেই সময় থেকেই অনেক বেশী সচেষ্ট ছিলেন অভিনয়ের বিষয়ে। তবে তরুণ রায় ক্রমশঃ আরও আকৃষ্ট হয়ে পড়েন মঞ্চের প্রতি এবং জাতীয় নাট্য পরিষদ কর্তৃক প্রযোজিত 'ক্ষুধিত পাষাণে'র মঞ্চরূপ এই উদীয়মান শিল্পীর জীবনে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ১৯৫১ সালে বিলাত যাত্রা ও সেখানে ব্রিটিশ ড্রামা লীগের শিক্ষানবীশীর মধ্যেই তাঁর শিল্পীপ্রতিভার প্রকৃত উন্মোচন হ'ল বলা যায়। এবং এই অধ্যায়ে তাঁর বিশেষ কীর্ত্তি রবীন্দ্রনাথের Sacrifice এবং Post Office-এর প্রযোজনা। ১৯৫২ সালে আরভিং থিয়েটারে এই নাটক দু'টি অভিনীত হয় পেশাদারী ভিত্তিতে, ভূমিকায় সবই ওদেশীয় অভিনেতা-অভিনেত্রী।

১৯৫৪ সালে তরুণ রায় দেশে ফিরে আসেন এবং থিয়েটার সেণ্টারের গোড়াপত্তন করেন। তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম যে, কেন তিনি এ-ধরণের একটি প্রচেষ্টায় হাত দিলেন। তাঁর উত্তরটি বিশেষ তাৎপর্য্যপূর্ণ। তিনি বললেন, যে, অভিনয় ও মঞ্চের দিকে আকৃষ্ট হয়ে যখন আমাদের দেশের বিশিষ্ট অভিনেতা ও পরিচালকের কাছে গেলাম তখন দেখলাম তাঁরা কেউই মঞ্চশিল্পের বিভিন্ন দিক্ সম্পর্কে ভাল ক'রে ওয়াকিবহাল নন, তখনই ভাবলাম যে, এমন একটা প্রতিষ্ঠান গড়বার দরকার আছে যেখানে আলোক পরিকল্পনা থেকে সুরু ক'রে অভিনয় পরিচালনা পর্য্যন্ত আনুষঙ্গিক সব বিষয়ে একটা সুসম্পূর্ণ ও সুসঙ্গত শিক্ষাদান করা যাবে। ১৯৫৮ সালে তরুণ রায় দ্বিতীয়বার বিদেশ যাত্রা করেন, প্রধানতঃ ইউরোপীয় নাট্য-আন্দোলন সম্বন্ধে অবহিত হবার জন্য। সেই এক বছর এবং পরে ১৯৫৯-১৯৬০ এই এক বছর

‘ওরা থাকে ওপারে’র একটি দৃশ্য :
বিমল মিত্র, মঞ্জু ব্রহ্মচারী, পিকুলু নিয়োগী, অজিত ব্যানার্জ্জী ও তপতী মণ্ডল।

সেদিনের সেই নাট্য উৎসবের ক্ষেত্রে আজ পেশাদারা রঙ্গমঞ্চের প্রতিদ্বন্দ্বীতা এসে পড়েছে। এখন থিয়েটার সেণ্টারের সদস্য সংখ্যা ন্যূনাধিক চারশ। তবে তার জন্যে এই প্রতিষ্ঠানের অগ্রগতিতে বাধা পড়েছে বলে মনে হয় না। আশা করি যে মঞ্চশিল্পের কারিগরদের তাঁদের নিষ্ঠা ও নেতৃত্ব এখনও অনেক দিন অব্যাহত থাকবে।

মোটর দুর্ঘটনায় নিরাপত্তা

ট্রেনে ষ্টীমারে কাঁচের বা অন্য রকমের ভঙ্গুর কোন জিনিস বাক্স-বন্দি ক'রে পাঠাবার সময় সেগুলিকে বিশেষ একটা ধরণে প্যাক করা হয়, যাতে সেগুলি ভেঙে না যায়। মোটর দুর্ঘটনায় মৃত্যু বা গুরুতর আঘাত থেকে বাঁচাবার জন্যে আরোহীদেরও কেন বিশেষ ধরণে প্যাক করা যাবে না?

এ বিষয়ে গত কয়েক বৎসর ধ'রে যে সব পরীক্ষা চলছিল তার ফলে কতগুলি এমন উপায় উদ্ভাবিত হয়েছে যা অবলম্বন করলে মোটরগাড়ীর আরোহীরা প্রায় কোন প্রকার দুর্ঘটনাতেই সাংঘাতিক রকম জখম হবেন না।

উপায়গুলি হচ্ছে এই:—

১। তলায়, পিছনে ও দুইধারে কুশন দেওয়া সিট এবং সিটবেল্ট (এরোপ্লেন আরোহণের সময় যে রকম বেল্ট কোমরে জড়িয়ে আরোহীদের

মোটর দুর্ঘটনায় মৃত্যু বা গুরুতর আঘাতের হাত থেকে বাঁচবার উপায়

সিটের সঙ্গে নিজেদের বাঁধতে হয়)। তাছাড়া দুই কাঁধ জড়িয়ে একটি বন্ধনী।

মোটর দুর্ঘটনায় মাথা বাঁচাবার জন্য আশ্রয়ের ব্যবস্থা

২। পর পর কয়েক পরত কাঁচের একটি বিশেষ ধরণের উইণ্ডশিল্ড।

৩। চাপ পড়লে বা ধাক্কা লাগলে নেমে যায় এমন একটি ষ্টীয়ারিং কলাম বা চালন-দণ্ড। এতে গাড়ীতে খুব জোরে ধাক্কা লাগলেও চালকের বুকে আঘাত লাগবার সম্ভাবনা থাকবে না। ষ্টীয়ারিং হুইল বা চালন-চক্রের পরিবর্তে ক্ষুদ্র একটি চতুষ্কোণ চালন-হাতল, যাতে চালকের হাঁটুতে চোট লাগবার সম্ভাবনাও প্রায় একেবারেই থাকবে না।

৪। মাথাটার জন্যে এমন একটা আশ্রয়ের ব্যবস্থা, যাতে পিছন থেকে খুব জোর ধাক্কায় সেটা চাবুকের ফলার মত ছিটকে গিয়ে ঘাড় ও শিরদাঁড়ায় নিদারুণ আঘাত না লাগে।

এ ছাড়া আছে, হাইড্রলিক ব্রেকের একটি লাইন কাজ না করলেও গাড়ী ব্রেক করতে যাতে অসুবিধা না হয় তার ব্যবস্থা। আর চালকের যাতে তন্দ্রা না আসে তার এমন একটি চমৎকার ব্যবস্থা, যাতে কিছুক্ষণ পর পর তার সামনে একটি লাল আলো জ্বলবে। চালক আলোটাকে না নেবালে হর্ণ বাজতে থাকবে। হর্ণ না বন্ধ করলে নিজে থেকে ইগ্নিশন বন্ধ হয়ে গাড়ী থেমে যাবে।

পুনরুজ্জীবন

হৃৎযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হ'য়ে যাবার পর তার স্পন্দন ফিরিয়ে আনবার একটি নূতন প্রক্রিয়া অনেক রোগীকে নিশ্চিত মৃত্যুর কবল থেকে ফিরিয়ে আনতে সক্ষম হচ্ছে। বুকের পাঁজর কেটে ভিতরে হাত ঢুকিয়ে নিস্পন্দ হৃৎযন্ত্রটিকে মাসাজ ক'রে এতকাল তাকে পুনঃস্পন্দিত করবার চেষ্টা হ'ত। এ চেষ্টা অনেক ক্ষেত্রেই সফল হ'ত না। এই প্রক্রিয়ার প্রয়োগও দুরূহ, তাছাড়া অনেক চিকিৎসকই এই পদ্ধতির চিকিৎসার সঙ্গে পরি-

বর্শার সাহায্যে মাছ ধরা

তীক্ষ্ণ, কিন্তু তারা চোখে প্রায় দেখতে পায় না ব'লে কার দিকে তেড়ে যাচ্ছে সে বোধ তাদের থাকে না। মানুষ বা অন্য ছোটবড় যে কোন জীবকেই যে সে কারণে-অকারণে তাড়া ক'রে যায় তা নয়, হয়ত হঠাৎ ভীষণ রেগে একটা গাছকেই তাড়া ক'রে গিয়ে ঢুঁ মারল, এমনও দেখা গেছে।

তীরধনু ও বর্শা

যুদ্ধবিগ্রহে তীরধনু ও বর্শার ব্যবহার লোপ পেয়ে চলেছে। এটা পারমাণবিক বোমা ও গাইডেড মিসাইল বা যন্ত্র-নিয়ন্ত্রিত ক্ষেপণাস্ত্রের যুগ। কিন্তু পারমাণবিক বোমা বা গাইডেড মিসাইল মৎস্য-শীকারে কাজে লাগে না। আমাদের দেশের কুচ ও কোঁচ সম্বল বর্শার সাহায্যে মাছ শীকার ক'রে আফ্রিকার আদিম অধিবাসীরা। তীরধনুর সাহায্যে মাছ শীকার করে আন্দামান ও দক্ষিণ আমেরিকার আদিম অধিবাসীরা।

স্নান

অনেকে মনে করেন, ইংরেজরা ভারত জয় ক'রে ভারতবাসীদের সংস্পর্শে এসে প্রত্যহ-স্নানের অভ্যাস অর্জন করেছেন। কথাটা একেবারে মিথ্যা না-ও হ'তে পারে মনে হয় এই কারণে যে, ইংরেজদের প্রতিবেশী ফরাসীদের মধ্যে এই অভ্যাস বহুবিস্তৃত নয়। ফরাসী দেশে শতকরা মাত্র দশটি বাড়ীতে বাথটাব বা শাওয়ার আছে। শতকরা চল্লিশটি বাড়ীতে জল সরবরাহের কোন ব্যবস্থা নেই। ইংরেজদের সগোত্র আমেরিকানরা মাথাপিছু যে-পরিমাণ স্নানের সাবান ব্যবহার করে, ফরাসীরা ব্যবহার করে তার চার ভাগের এক ভাগ।

অভিনব এ্যালার্ম ঘড়ি

খুব ভোরে উঠবার জন্যে ঘড়িতে এ্যালার্মের ব্যবস্থা ক'রে শুলে যথা-সময়ে আপনার ঘুম ভাঙে তা ঠিক, কিন্তু সেই সঙ্গে পাশের খাটে শোওয়া শিশুটিরও ঘুম ভাঙে, আর সে চেঁচিয়ে কান্না জোড়ে। পাশের ফ্ল্যাটের লোকদেরও ঘুম ভেঙে যায় আর তা প্রকাশে না হোক গোপনে

তীরধনুর সাহায্যে মাছ ধরা

আপনাকে গালাগাল দেয়। এ সমস্ত অসুবিধার থেকে উদ্ধারের উপায় বের করেছেন একজন উদ্ভাবক। এঁর উদ্ভাবিত ঘড়ির এ্যালার্মটি বাজে না, একে পাশে রেখে শুলে, যেখানে এ্যালার্মের কাঁটা থাকবে, ঘড়ির কাঁটা সেখানে পৌঁছলে এ আপনাকে ঠেলে জাগিয়ে দেবে।

কোথায় প্রথম ফলেছিল

একেবারে নিশ্চয় ক'রে কি আর বলা যায়? তবে যতটা জানা যায় তাতে মনে হয়, আপেল এসেছে কৃষ্ণসাগর ও কাস্পিয়ান সাগরের মধ্যবর্তী একটি ভূখণ্ড থেকে, যা এখন রাশিয়ার অন্তর্ভুক্ত। পীচ ও কমলালেবুর জন্মস্থান চীন দেশে, চার হাজার বৎসর আগেও যে সে দেশে এদের ফলন হ'ত তার প্রমাণ রয়েছে। আর এসেছে দক্ষিণ আমেরিকা থেকে।

জুজিৎসু

অনেকেরই ধারণা, জুজিৎসুর কসরতগুলির উদ্ভব জাপানে। আসলে কিন্তু তা নয়। যদিও জাতি হিসাবে অত্যন্ত অভদ্রোচিত ব্যবহার আমাদের সঙ্গে করেছে ও করছে, তবু স্বীকার করতে হবে যে, সভ্য মানুষের ব্যবহারে লাগছে এমন আরও অনেক কিছুর মত জুজিৎসুরও উদ্ভাবনা হয়েছিল চীন দেশে।

ব্লেডের ধার বজায় রাখবার উপায়

এখন দেশের এই বিপদের দিনে সবদিক্ দিয়ে খরচ বাঁচাতে যখন বলা হচ্ছে, তখন সেফ্‌টি রেজারের ব্লেডের খরচ বাঁচাবার চেষ্টা করা নিশ্চয় সুপরামর্শ। ব্লেডটা একটু ভোঁতা হ'তেই আগে যেমন সেটাকে ফেলে দিতেন, এখন আর তা দেবেন না। একটু ভাল ধরণের একটা কাঁচের গ্লাসে জল ভ'রে নিয়ে তার ভিতরে ব্লেডটাকে ঢুকিয়ে আঙুলে চেপে তার গায়ে কিছুক্ষণ উল্টেপাল্টে ঘসে নিন। তারপর ব্লেডটাকে ব্যবহার করুন, দেখবেন আবার সেটা প্রায় নূতনের মত হয়ে গিয়েছে।

এখনই যদি এটা না করতে চান, করবেন না। তবে অন্ততঃ এইটুকু করবেন, ব্যবহার করা ব্লেডগুলো ফেলে দেবেন না। বাজারে ব্লেড যখন আর কিনতে পাওয়া যাবে না, তখন এই পুরাণো ব্লেডগুলিকে গ্লাসের গায়ে ঘসে কাজে লাগাতে পারবেন।

কর্ণাভরণ

কান না বিঁধিয়েও কানের গহনা পরা চলে, এবং পৃথিবীর অনেক দেশেই আবহমান কাল ধ'রে তা চ'লে আসছে। কিন্তু কান বিঁধিয়ে গহনা পরার রেওয়াজ তার চেয়েও বহুবিস্তৃত।

আমাদের দেশের অনেক প্রাচীন মূর্ত্তি ও চিত্রে দেখা যায়, কুণ্ডল-ভারাক্রান্ত কানের নীচের অংশটা কাঁধ অবধি নেমে এসেছে। এটা বহু শতাব্দী আগের কথা। এখনও অন্য অনেক দেশের মত এদেশের মেয়েরাও কান বিঁধিয়ে গহনা পরেন, কিন্তু কানটা কানেরই মত দেখাতে থাকে। আফ্রিকার বান্টু রা মেয়ে-পুরুষে অনেকে এখনও কানে এমন ভারি ভারি সব গহনা পরে যে, কানের নীচের অংশটা কাঁধ অবধি নেমে আসে।

কিন্তু এ-সমস্ত প্রাচীন প্রথা এদের মধ্যেও দ্রুতগতিতে লোপ পেয়ে আসছে। অন্ধকার মহাদেশ বলতে যতটা অন্ধকার আমরা কল্পনা করি, আফ্রিকা ঠিক ততটাই অন্ধকারে এখন আর নেই। পৃথিবীর অ[illegible]

কর্ণাভরণ

সুসভ্য দেশগুলির সঙ্গে সমপংক্তিতে আসন ক'রে নেবার [illegible] আশ্চর্য্য ক্ষিপ্রতার সঙ্গে আফ্রিকার দেশগুলি অর্জন ক'রে নিচ্ছে।

হৃৎযন্ত্রের ব্যথা ও হৃদ্‌রোগ

হৃৎযন্ত্রে ব্যথা হলেই সেটা হৃদ্‌রোগ সূচিত করে, এ রকম [illegible] করবার কোন কারণ নেই। হৃৎপিণ্ডের মধ্যে কেউ যেন ছুরী [illegible] কিংবা সেটাতে কেউ যেন আগুন ধরিয়ে দিয়েছে ব'লে যাঁদের [illegible], অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখা যায় তাঁদের হৃদয়ের যান্ত্রিক গোলযোগ [illegible] নেই, গোলযোগটা তাঁদের পেটের। হৃৎযন্ত্রে অল্প-স্বল্প বেদনা [illegible] হৃদ্‌রোগ ছাড়া আরও অনেক কারণে হ'তে পারে। যেমন [illegible] ক'রে শ্বাস নিতে হয়, ছাড়তে হয়, সেই জ্ঞানের অভাব; কাজের [illegible] অস্বস্তিকর অবস্থায় বসবার অভ্যাস; পাঁজরার উপর আঁটসাঁট [illegible] চাপ; নিজের ব্যবস্থা মত খাওয়া কমিয়ে 'ডায়েট' করা; [illegible] ক্লান্তি এবং অনিদ্রা; অতিরিক্ত শারীরিক শ্রম; ইত্যাদি [illegible] বিজ্ঞাপন প'ড়ে, শরীরের পুষ্টিসাধন ক'রে, যৌবন ফিরে এনে দেয়, [illegible]

সব বড়ি, ট্যাবলেট ইত্যাদি সেবন করার ফলেও হৃৎযন্ত্রে ব্যথা হতে পারে। আপনার যদি কখনও মনে হয়, আপনি হৃদ্‌রোগে ভুগছেন ত এই ধরণের কি কি চূর্ণ, বড়ি, ট্যাবলেট, টনিক, অরিষ্ট, মোদক, সালসা ইত্যাদি আপনি সেবন করেছেন, সেই খবরটা সর্বাগ্রে আপনার ডাক্তারকে দিতে ভুলবেন না।

পানাহার সম্বন্ধে কতগুলি ভুল ধারণা

নিম্নলিখিত ধারণাগুলির কোনও একটি যদি আপনার থাকে ত অবিলম্বে এবং বিনা দ্বিধায় মন থেকে সেটাকে দূর ক'রে দেবেন।

১। বেশী জল খেলে মানুষ মোটা হয়।

২। খাওয়ার সময় জল খেলে হজমের ব্যাঘাত হয়।

৩। অম্বল বা চাটুনি খাবার পর দুধ খেতে নেই। তাতে বদ্‌হজম হতে পারে।

৪। এমন সুখাদ্য কতগুলি আছে যা আপনার খাওয়া উচিত নয়, কারণ সেগুলি কোষ্ঠবদ্ধতার হেতু হ'তে পারে।

৫। বেশী নুন খেলে কিড্‌নী বা মূত্রাশয়ের ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা।

৬। কোন খাদ্য খাওয়ার ফলে আপনি যদি অসুখ বোধ করেন ত তাতে প্রমাণ হয়, ঐ খাদ্য সম্পর্কে আপনার এ্যালার্জি আছে।

৭। শরীরের স্বাস্থ্য ভাল রাখবার জন্যে প্রচুর মাংস খাওয়া উচিত বা প্রচুর শাক-তরকারি খাওয়া উচিত, বা প্রচুর ফল খাওয়া উচিত, বা পুষ্টিতে সাহায্য করে না, উদরটাকে কেবল ভারাক্রান্ত করে এমন খাদ্য খুব বেশী পরিমাণে খাওয়া উচিত, বা 'স্বাস্থ্যকর' পেটেন্ট খাবার সাধ্যমত খাওয়া উচিত।

ভুল ধারণার বশবর্তী হয়ে অনেকে, তাঁদের পক্ষে সবচেয়ে প্রয়োজনীয় ও হিতকর মনে ক'রে, একই ধরণের খাদ্য মাছ-মাংস বা তরিতরকারি বা দুধ-দই-ছানা-মাখন, বা অন্য ধরণের আর কিছু প্রায় তাঁদের একমাত্র আহার্য হিসাবে খেয়ে থাকেন। আহার্য সম্বন্ধে একদেশদর্শিতা ক্ষতিকর। নানারকম সুখাদ্যের সুসমঞ্জস ব্যবহারই আমাদের লক্ষ্য হওয়া উচিত।

এমনই আর একটি ভুল ধারণা নিয়ে জল কম খাওয়ার মত বোকামি অনেকে ক'রে থাকেন। অগস্ত্য মুনি সমুদ্র পান করেছিলেন, কিন্তু তার ফলে তাঁর দেহের স্থূলতা একটুও বৃদ্ধি পেয়েছিল ব'লে শাস্ত্রে লেখে না। আপনিও যদি পারেন সমুদ্র পান করতে, আপনার দেহের ওজন, সমুদ্রের ওজন বাদ দিয়ে, আগে যা ছিল পরেও তাই থাকবে। আহারের সময় পরিমিত জলপান পরিপাকের পরিপন্থী ত নয়ই, বরং তাতে পরিপাকের সহায়তা হয়। ভয়ে ভয়ে জল কম খাওয়ার ফলেই অনেকে কোষ্ঠবদ্ধতায় ভোগেন। হৃৎযন্ত্রে ব্যথা হবারও এটা একটা কারণ হয়ে উঠতে পারে।

স্বাস্থ্যকর সুখাদ্য, তেতো নোন্তা ঝাল টক মিষ্টি যাই হোক, তাদের মিলিয়ে খেতে স্বাস্থ্যের দিক থেকে কোন বাধা নেই। অর্থাৎ সবরকমের সুখাদ্য সবরকম ভিন্ন স্বাদের সুখাদ্যের সঙ্গে যায়।

আহার্যে বৈচিত্র্য জিনিষটা এতই বেশী উপকারী যে, প্রাপ্তবয়স্ক সুস্থ মানুষের পক্ষে এমনও খাদ্য প্রত্যহ অল্প পরিমাণে খাওয়া উচিত যা সহজে হজম হয় না। অন্ত্রাশয়ের নীচের দিকটা তাতে একটু ভারি হয় ব'লে কোষ্ঠশুদ্ধি সহজ হয়। আর বাস্তবিক, খাদ্যবস্তু যতই দুষ্প্রাচ্য হোক, সাধারণ স্বাস্থ্যবান্ প্রাপ্তবয়স্ক মানুষের পাকস্থলী এমন ভাবেই তৈরি যে, সে খাদ্য যদি অসাধারণ রকমের কিছু না হয়, এবং পরিমাণে অত্যন্ত বেশী না হয় ত তা হজম হয়ে যাবেই।

পনীর, দুধ, চকোলেট ইত্যাদি মানুষের সাধারণ আহার্য এমন কিছু নেই যার পরিমিত ব্যবহার কোষ্ঠবদ্ধতার কারণ হতে পারে। কোষ্ঠশুদ্ধি নিয়ে বেশী চিন্তা করা, জলীয় খাদ্য বা জল কম খাওয়া, যথেষ্ট উদ্ভিজ্জ পুষ্টিকর ভারী খাদ্য না খাওয়া এইগুলিই অধিকাংশ ক্ষেত্রে কোষ্ঠবদ্ধতার কারণ হয়ে থাকে।

রক্তসংবহন বা মূত্রাশয় বা হৃৎযন্ত্রঘটিত কতগুলি রোগে চিকিৎসকরা লবণের সীমিত ব্যবহারের ব্যবস্থা ক'রে থাকেন। কিন্তু সুস্থ শরীরের পক্ষে লবণ একটি অপরিহার্য বস্তু, বিশেষতঃ গ্রীষ্মকালে বা গ্রীষ্মপ্রধান অঞ্চলে।

লবণের পরিমিত ব্যবহারে কখনও কারও স্বাস্থ্যভঙ্গ হয়েছে ব'লে জানা যায় না।

কোন খাদ্য সম্পর্কে আপনার যদি এ্যালার্জি থাকে ত সেটা বদ্‌হজমের রূপ নিয়ে প্রকাশ পাবে না। এ্যালার্জি জানান দেবে চুলকনা হ'য়ে। একটা কোন বিশেষ খাদ্য আপনার সহ্য হয় না মানে, অধিকাংশ ক্ষেত্রে, আপনি সেটাকে সহ্য করেন না। কবে, কখন, কোন্ পাড়াতে কাদের বাড়ীতে ঐ খাদ্যটি খেয়ে আপনার অসুখ করেছিল, সেই থেকে তার সম্বন্ধে আপনার একটা ভীতি জন্মে গেছে। অধিকাংশ বদ্‌হজমের মূলে থাকে এই জাতীয় কোন-না-কোন ভীতি। নির্ভয়ে ও ধীরে-সুস্থে ঐ খাবারটা আর দু-একবার খেয়ে দেখুন। স. চ.

স্বাধীনতার সাধনা : শ্রীবীরেন্দ্রনাথ পাল চৌধুরী বি, এ প্রণীত। ৩৩বি, মিত্র লেনস্থিত (কলিকাতা-৬) বঙ্গ ভারতী হইতে প্রকাশিত (২৩শে জুন, ১৯৬২)। মূল্য দুই টাকা মাত্র।

পুস্তকখানি ছোট ছেলেমেয়েদের জন্য লিখিত—কিন্তু ইহা পাঠে তাহাদের কতকগুলি নাম জানা ছাড়া আর কি লাভ হইবে জানি না। স্বাধীনতার সাধকদের তালিকায় পাই—একদিকে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বিপিনচন্দ্র পাল, বালগঙ্গাধর তিলক, গান্ধী, চিত্তরঞ্জন, জবাহরলাল, মৌলানা আজাদ, সরোজিনী নাইডু এবং মাতঙ্গিনী হাজরা। অন্যদিকে পাইলাম : অরবিন্দ ঘোষ, বারীন্দ্রকুমার ঘোষ, ক্ষুদিরাম বসু, সত্যেন্দ্রনাথ বসু, কানাইলাল দত্ত, সাভারকর, বাঘাযতীন, ভগৎ সিং, সূর্য সেন, শান্তি দাস, প্রীতিলতা ওয়াদ্দার, নেতাজী।

মাত্র ১২১ পাতায় এই ২১ জনের জীবনী শেষ করা হইয়াছে। সুরেন্দ্রনাথ, বিপিনচন্দ্র প্রভৃতির ভাগ্যে ৩।৩।০ পাতার বেশী জোটে নাই। পুস্তকটি পড়িতে পড়িতে মনে হইল—বাল্যকালে সেই ষ্টিরিওস্কোপে দেখা ছবির কথা—"নক্কা দেখো, দেখো বোম্বাই, আউর দেখো দিল্লী-দরবার, তাজমহল—" ইত্যাদি ইত্যাদি। প্রতি মিনিটে, এই ষ্টিরিওস্কোপ বাক্সে দুই চোখ দুইটী চোঙাতে রাখিয়া, প্রায় ১৫ খানি বিভিন্ন রঙ্গীন চিত্র—দু এক পয়সা দিয়া দেখার সেই ভাগ্য হইত।

আলোচ্য পুস্তকখানিও প্রায় সেই ষ্টিরিওস্কোপ চিত্রের মতই হইয়াছে। ইহার বেশী আর কিছুই নহে।

"স্বাধীনতার সাধনা"য় নাম পাইলাম না—রামমোহন, রবীন্দ্রনাথ, বিবেকানন্দ, অশ্বিনীকুমার দত্ত, কৃষ্ণকুমার মিত্র, আনন্দমোহন বসু, রাজনারায়ণ বসু, রাজা সুবোধ মল্লিক, রামানন্দ, নিবেদিতা, অ্যানি বেসান্ট, ব্রহ্মবান্ধব, এবং আরো অনেকের—যাঁহারা স্বাধীনতার প্রকৃত সাধক ছিলেন এবং দেশ ও জাতিকে স্বাধীনতার পথ প্রদর্শন করেন বিবিধভাবে। ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের কাছে এতসব মহাজীবনের আলেখ্য তুলিয়া ধরিতে পারিলে, তাঁহাদের প্রকৃত কল্যাণ করিয়া দেশ-প্রেমও জাগ্রত করা যায়। আদর্শ জীবনের বিষয় মাত্র দু'চার কথা বলার কোন অর্থ হয় না। ইহাতে জীবনী হয় খর্ব, জীবন-আদর্শও অপুষ্ট করিয়া দেখানো হয়।

আর একটি কথা, জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ডের সম্পর্কে লেখক বলেন, এখানে প্রায় ১০,০০০ লোক জমায়েত হয়, আর গুলি খাইয়া মরে—প্রায় ৪০০, আহতও হয় প্রায় হাজার খানেক। ইহা ঠিক নহে। জালিয়ান-ওয়ালাবাগে লোকের ভীড় হয় ২০,০০০ হাজারেরও বেশী। নিহত হয় অন্ততঃপক্ষে ১,০০০; আহত হয় ইহার প্রায় ৪।৫ গুণ—আবালবৃদ্ধ-বনিতা।

লালনিক—শ্রীঅনিলকুমার চট্টোপাধ্যায় লিখিত উপন্যাস। শ্রীভারতী পাবলিশার্স প্রকাশিত। ৫, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২ মূল্য—৩৲ টাকা। প্রথম মুদ্রণ : ১৫-৮-৬২।

উপন্যাসটি পড়িয়া ভাল লাগিল। ইহাতে মনোরম একটি বি[illegible] ভাবরসপূর্ণ কাহিনী আছে—এবং যে কাহিনীতে পাওয়া যায় নানা বি[illegible] চরিত্র এবং সংঘাত। একটি যাত্রাদলকে কেন্দ্র করিয়া, তাহারই পরি[illegible] উপন্যাসখানি রচিত। যাত্রাদলের চরিত্রগুলিও বেশ পরিষ্কার এবং জীবন্তভাবে বর্ণিত হইয়াছে—এবং সঙ্গে সঙ্গে গল্পের গতিও বাধাহীন ভা[illegible] চলিয়াছে। উপন্যাসের সমাপ্তিও যথাযোগ্য ভাবে করা হইয়াছে, যাহা হওয়া স্বাভাবিক এবং উচিত ছিল, লেখক তাহাই করিয়াছেন।

যাত্রাদলের বা পার্টির নাম যাঁহারা শুনিয়াছেন, অথচ ইহা ঠিক [illegible] তাহা জানেন না, এই উপন্যাস পাঠে তাঁহাদের সেই যাত্রাদলের সম্প[illegible] মোটামুটি একটা স্পষ্ট ধারণা হইবে; যাহাদের লইয়া যাত্রাদলের সংসার, তাহাদের সম্পর্কে লেখক একটি অতীব চিত্তহারী চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন। যাত্রাদল বাঙ্গলা এবং বাঙ্গালীর একটি বিশিষ্ট সম্পদ এবং [illegible] গ্রাম্য বাঙ্গলাকে বহু আনন্দ, বহু শিক্ষা, বহু ধর্মকাহিনী এবং বহু [illegible]হাসিক ঘটনাবলীর সহিত পরিচিত করিয়াছে, এখনও করিতেছে। [illegible] যাত্রাপার্টির পটভূমিকায় উপন্যাস রচনা করিয়া—বাঙ্গলা উপন্যাস সা[illegible] কিছু নবীনত্ব দান করিলেন। "লালনিক" পাঠ করিবা [illegible] আনন্দ ও তৃপ্তিলাভ করিবেন বলিয়া বিশ্বাস করি।

এই প্রসঙ্গে এই উপন্যাস লেখক শ্রীঅনিলকুমার [illegible] কথা বলিব। যাত্রাদলের অধিকারীর মুখে বীরভূম-বাঁকুড়ার [illegible] যথাযথ হয় নাই। এই দুই জেলার সাধারণ লোকের ভাষা ঠিক [illegible] জানিয়া না লেখাই ভাল। কিছু দৃষ্টান্ত দিতে পারিতাম, বাহুল্য [illegible] তাহা করিলাম না। লেখকের নিকট হইতে ভবিষ্যতে [illegible] উপন্যাস, গল্প আশা করি বলিয়াই—এই কথার উল্লেখ করিলাম।

পুস্তকখানির ছাপা, বাঁধাই সুন্দর।

আড়ৎদার : শ্রীরবীন্দ্রনাথ চৌধুরী। গ্রন্থকার কর্তৃক [illegible], [illegible] স্ট্রীট, কলিকাতা-৯ হইতে প্রকাশিত। মূল্য [illegible]

১০৮ পাতার এক বিষম নাটক প্রায় ৪০ জন পাত্রপাত্রী [illegible] একটা উদ্ভট পরিকল্পনার নাটক। এককথায় 'অখাদ্য'। নাটক[illegible] বিদ্যাবুদ্ধি এবং নাটক-জ্ঞানের পরম পরিচয় ছত্রে ছত্রে [illegible] মাথামুণ্ডহীন আজগুবি ব্যাপার। বাংলা ভাষা এবং বানান[illegible] যথেষ্ট নিপুণতার সহিত লেখক করিয়াছেন; যথা :

"চোলে" (চলে), "পোড়ে" (পড়ে), "দোষা" (দেওয়া), "[illegible]" (মরে), 'নিয়েস্যুম' (নিয়ে এলুম) 'বাহরের' (বাইরের), 'ডোবিয়ে' [illegible] 'পোড়ে' (পড়ে), 'জোমে জোমে' (জমে) 'বোলে' (বলে), '[illegible]' (গড়ে), 'মোলেও' (ম'লেও)—আর বেশী দৃষ্টান্ত দিবার প্রয়োজন নাই।

নাটকখানি অভিনীত হইবার উদ্দেশ্যে রচিত হয় নাই, হইয়াছে কিছু অর্থ এবং মূল্যবান কাগজের শ্রাদ্ধ করিবার কারণেই।

শ্রীহেমন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়

আধুনিক বাংলা কাব্যের সূচনা : শ্রীসুনীলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, এডুকেশনাল এন্টারপ্রাইজার্স, ১৬-এ, কান রোড, কলিকাতা-১৯। মূল্য ২'৫০ নঃ পঃ।

আধুনিক বাংলা কাব্যের সূচনা কোথা হইতে শুরু হইয়াছে ইহা লইয়া অনেক মতভেদ আছে। গ্রন্থকার এই গ্রন্থে কবি ভারতচন্দ্র হইতে ইহার ক্রম দেখাইয়াছেন। তবে প্রথম যুগে গীতিকাব্যের ধারা অনুসৃত হইয়াছে, ইহা লক্ষ্য করিবার বিষয়। গ্রন্থকার নিজেই বলিয়াছেন, "...ভারতচন্দ্রের প্রভাব ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্য্যন্ত বাংলাকাব্যকে এমনভাবে প্রভাবিত ক'রে ফেলেছিল যে, ভারতচন্দ্রকে বাদ দিয়ে আধুনিক কাব্যের পূর্ব্বাপর আলোচনা হয়ে পড়ে অসম্পূর্ণ।"

এই গ্রন্থে তিনি যে সব কবিদের নাম করিয়াছেন, ক্রম হিসাবে তাঁহাদের বিচার অনস্বীকার্য্য। তিনি মাইকেল সম্বন্ধে ভূমিকায় একস্থানে লিখিয়াছেন, "...মাইকেলের গীতিকাব্য রচনার ক্ষমতা অনস্বীকার্য্য কিন্তু মাইকেল আবির্ভূত হয়েছিলেন classical মহাকবির ক্ষমতা নিয়ে, বাংলা কাব্য-জগতে সামগ্রিকভাবে পরিবর্ত্তনের বা যুগপরিবর্ত্তনের মহান্ দায়িত্ব নিয়ে।"

যে যুগে ভারতচন্দ্র, ঈশ্বর গুপ্ত জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, কালধর্ম্মে সে ধারার পরিবর্ত্তন স্বাভাবিক হইলেও, মাইকেলের পরিবর্ত্তন মনে হয় সৃজন-ধর্ম্মী। তাঁহার অমিত্রাক্ষর ছন্দ একটা যুগকে পরিবর্ত্তন করিয়া দিয়াছে। ইহার পরেই আর একটা পরিবর্ত্তন দেখিতে পাই, কবি বিহারীলালের কাব্যে। এই পরিবর্ত্তিত পথ ধরিয়াই রবীন্দ্রনাথ আসিয়াছেন। সুতরাং রবীন্দ্র-পূর্ব্বযুগের একটি ছেদ হিসাবে বিহারীলালকে ধরিয়া লইতে পারি। গ্রন্থকারও বলিয়াছেন, "ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে মহাকবি মাইকেল আধুনিক বাংলাকাব্যে যে-ধারার সৃষ্টি করেন, কবি হেমচন্দ্র যে-ধারা একটি বিশেষ রূপ পরিগ্রহ করে সে-ধারার পরিবর্ত্তন ঘটে বিহারীলাল চক্রবর্ত্তীর কাব্যে।"

কবি-ধর্ম্মের এই আলোচনা প্রসঙ্গে সুনীলবাবু যে অন্তর্দৃষ্টির পরিচয় দিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার কবি-মনেরই পরিচয় পাই। তথ্য হিসাবেও ইহার মূল্য কম নয়। সুধীজনের নিকট এই গ্রন্থ সমাদৃত হইবে বলিয়াই বিশ্বাস।

ঈশ্বর সান্নিধ্য বোধের সাধনা—(সাধু লরেন্সের সংক্ষিপ্ত জীবনী এবং তাঁহার কতিপয় আধ্যাত্মিক প্রসঙ্গ ও পত্রের বঙ্গানুবাদ) শ্রীহরিশচন্দ্র সিংহ প্রণীত। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ মন্দির প্রকাশক মণ্ডলী, ৫নং ঠাকুর রামকৃষ্ণ পাক রো, কলিকাতা-২৫। মূল্য ৮০ নয়া পয়সা। পৃষ্ঠা—৮৮।

বইখানি আদ্যোপান্ত পড়িয়া আমরা প্রীতিলাভ করিয়াছি। সংসারে কর্ম্ময় জীবন কাজকর্ম্মে নিরন্তর ব্যস্ত থাকিয়া ঈশ্বরে মন সতত নিযুক্ত রাখা একেবারেই অসম্ভব—এরূপ মনোবৃত্তি লইয়া যাঁহারা বলেন যে সংসারত্যাগী সন্ন্যাসী না হইলে ঈশ্বরে মন সতত নিযুক্ত রাখা চলে না, তাঁহারাও ৪০০ বৎসর আগেকার এই খ্রীষ্টীয় সাধুটির প্রসঙ্গ ও পত্রাবলী পাঠে তাঁহাদের ধারণা পরিবর্তন করিবেন, সে বিষয়ে আর সন্দেহ নাই। গ্রন্থকার সত্যই বলিয়াছেন যে "কর্ম্মবিরল সন্ন্যাস জীবন-যাপন...অনেকের পক্ষেই সম্ভব নয়। এরূপ পরিস্থিতিতে সাধু লরেন্সের কথা আমাদের মনে আশার সঞ্চার করে।"

এই সাধুটির বর্ণিত মূলতত্ত্ব ও সাধনার ইঙ্গিত আমাদের দেশে অনেক মহাপুরুষের বাণীতে অনেক প্রাচীন কাল হইতেই দেখা যায়। কিন্তু ভিন্ন দেশে ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বীর উপলব্ধিও যে অনুরূপ, ইহাই ইহাতে প্রমাণিত হয়। সাধু লরেন্স খঞ্জ ছিলেন এবং কাজে তাঁর পটুতা ছিল না, এ কথা নিজেই তিনি বলিয়াছেন। রান্নার কাজ তাঁহার ভাল লাগত না, তথাপি ঐ কাযেই তাঁহাকে দীর্ঘকাল নিযুক্ত থাকিতে হইয়াছিল। এই সব অসুবিধার মধ্যে থাকিয়াও তিনি ঈশ্বর-সান্নিধ্য এমন নিয়ত ও সুস্পষ্টভাবে অনুভবে সক্ষম হইয়াছিলেন যে তিনি, মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়াছেন যে, "...নির্জন উপাসনার সময়ে ঈশ্বরের সঙ্গে আমার সংযোগ যত নিবিড় হয় তার চেয়ে বেশী নিবিড় সংযোগ হয় যখন আমি সাংসারিক কাজে ব্যাপৃত থাকি।" কিরূপে ইহা সম্ভবপর হইয়াছিল তাহা জানিতে পারিলে সকলের পক্ষেই, বিশেষতঃ আমাদের দেশের মহিলাদের (যাঁহাদের রন্ধনাদি গৃহকর্ম্মে সর্বদা নিযুক্ত থাকিতে হয়) বিশেষ কল্যাণজনক হইবে, তাহাতে আর সন্দেহ কি? মূল গ্রন্থখানি ফরাসী ভাষায় লিখিত হইলেও নানা দেশে নানা ভাষায় ইহা অনূদিত হইয়াছে কিন্তু বাংলা ভাষায় ইহার অনুবাদ হয় নাই দেখিয়া বাংলা ভাষা ভিন্ন অন্য ভাষায় অনভিজ্ঞদের সুবিধার জন্য সরল ও সহজ ভাষায় বঙ্গানুবাদের এই প্রচেষ্টা। গ্রন্থখানি যাহাতে সহজলভ্য হয় তজ্জন্য স্বল্পমূল্যে সর্বসাধারণের মধ্যে প্রচারেরও চেষ্টা করা হইতেছে। এই সাধু প্রচেষ্টা সফল হইবে ইহাতে আমাদের বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। প্রবন্ধ ও পত্রাবলীর অন্তর্নিহিত তত্ত্ব, ভাষার সরলতা, অনুভূতি প্রকাশের উপলব্ধি-প্রসূত নিপুণতা এবং সর্বোপরি অসাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গি গ্রন্থখানিকে বিশেষ মর্য্যাদা দান করিয়াছে।

শ্রীগৌতম সেন

যুগ পরিক্রমা : ডাঃ নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত, সেনগুপ্ত ট্রাষ্টকর্ত্তৃক ২২।২৩, মনোহরপুকুর রোড, কলিকাতা-২৯ হইতে প্রকাশিত। প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড, প্রত্যেক খণ্ডের মূল্য ৮ টাকা, পৃষ্ঠা ২৭২ এবং ২৯৬।

ডাঃ নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত বাঙ্গালী পাঠকের নিকট সুপরিচিত। ইনি বঙ্গাব্দ ১২৮৮ সালে ১৮ই বৈশাখ জন্মগ্রহণ করেন। নরেশচন্দ্রের অশীতিতম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষ্যে তাঁহার পুত্র বর্ত্তমানে দুষ্প্রাপ্য প্রবন্ধগুলি সংগ্রহ করিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। নরেশচন্দ্রের বহুমুখী প্রতিভার বিকাশ ও স্বাধীন স্বচ্ছ চিন্তাধারার পরিচয় এই প্রবন্ধ-সংগ্রহ হইতে পাওয়া যায়। বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্র, দার্শনিক, ব্যবহার শাস্ত্রে সুপণ্ডিত, ঔপন্যাসিক, সাহিত্য, ধর্ম্ম, দর্শন, সমাজনীতি ও রাষ্ট্রনীতির প্রবন্ধকার নরেশচন্দ্র অর্দ্ধশতাব্দীকাল বাঙ্গালীর কর্ম্মময় জাতীয় জীবনের সহিত ওতঃপ্রোতভাবে সংযুক্ত ছিলেন। নিজের সাহিত্য সাধনা সম্বন্ধে তিনি বলিয়াছেন, "অনেকদিন পরে ১৯১৯ সালে আমি আমার প্রথম বই ছাপাই। তার পর প্রায় ষাট খানা বই লিখেছি। সাহিত্যাকাশের তারকা আমি হই নি। কিন্তু হাউই হ'য়ে ছিলাম।...একদিন আমার লেখা নিয়ে একদিকে রব উঠেছিল আমি যুগপ্রবর্ত্তক। আর একদিকে আমি একটা সমাজ-ধ্বংসী দৈত্য বলে রাশি রাশি গালাগালি বর্ষিত হয়েছিল। আজ সবাই নীরব, আমার হাউইয়ের আগুন নিভে গেছে।"

প্রথম খণ্ডে আত্মকথা ব্যতীত ছাত্র সমাজের প্রতি তিনটি, সাহিত্য বিষয়ে আটটি এবং স্মরণীতে রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এবং আশুতোষ সম্বন্ধে প্রবন্ধ আছে। দ্বিতীয় খণ্ডে ধর্ম্ম ও দর্শন বিষয়ে চারিটি, সমাজনীতি সম্পর্কে ছয়টি এবং রাষ্ট্রনীতি সম্বন্ধে ছয়টি লেখা স্থান পাইয়াছে। প্রবন্ধগুলি সাধারণতঃ সমসাময়িক পরিস্থিতিকে লক্ষ্য রাখিয়া রচিত হইলেও শুধু ঐতিহাসিকতার দিক দিয়া নহে, চিন্তাশীলতা ও স্বচ্ছ দূরদৃষ্টির জন্য ইহাদের মূল্য কিছুমাত্র কম নহে। নরেশচন্দ্র এরূপ সকল সমস্যার আলোচনা করিয়াছেন এবং সমাধানের ইঙ্গিত দিয়াছেন যাহা স্বাধীনতালাভের পরেও সমাজে ও রাষ্ট্রে উহা সমস্যাই রহিয়া গিয়াছে, সমাধান হয় নাই। প্রবন্ধগুলি পাঠকের চিন্তার খোরাক জোগাইবে।

আমরা শ্রীনির্ম্মল সেনগুপ্তকে তাঁহার পিতৃদেবের প্রবন্ধাবলী প্রকাশের জন্য অভিনন্দন করিতেছি এবং আশা করি ভবিষ্যতে বাকী প্রবন্ধগুলিও প্রকাশিত হইবে। চিন্তাশীল পাঠক সমাজে এরূপ গ্রন্থের বিপুল প্রচার বাঞ্ছনীয়।

শ্রীঅনাথবন্ধু দত্ত
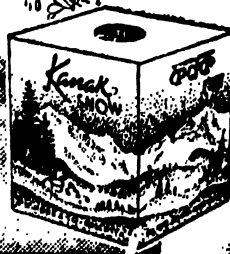
অন্ধকার বারান্দা : নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী। কৃত্তিবাসপ্রকাশনী। মূল্য আড়াই টাকা।

নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থটিতে প্রথমেই চোখে পড়ল একটি কবিতার কয়েক পংক্তি :

জীবনের কাছে মার খেয়ে প্রকৃতির কাছে সে তার দুঃখ জানাতে এসেছিল। প্রকৃতির নিজেরই যে এত দুঃখ, সে তা জানত না।

এই নতুন বক্তব্য নীরেন্দ্রবাবুর কাব্যের সাম্প্রতিক স্বরান্তরের ইঙ্গিত দিচ্ছে। বাংলাকাব্যের পলায়নবাদী প্রকৃতি সন্ধান, উদ্বেল নিসর্গস্তব শেষ হ'ল।

'অন্ধকার বারান্দা' তাঁর পূর্বপ্রকাশিত কাব্য 'নীলনির্জন' থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। কারণ পূর্ব কাব্যটি ছিল সৌন্দর্যমুগ্ধ গীতল, প্রস্তুত কাব্যটি হালের খণ্ডিত মানুষের আর্তনাদ। একেবারে যেন এই দশকের সকল মানুষের আত্মকথন। চারপাশে সীমার বলয়। নৈরাশার তামসী, ক্ষীণালো বারান্দার একই হাতছানি, শুশ্রূষা-অপারগ প্রকৃতি, টবের সীমাবদ্ধ কৌশলে ফুটন্ত ফুল, ঈশ্বর-শয়তানে যুগপৎ অবিশ্বাসী মানুষ মিছিল। তার মধ্যে নিরুপায় আর্তি :

চেনা আলোর বিন্দুগুলি
হারিয়ে গেল হঠাৎ—
এখন আমি অন্ধকারে, একা।

আর পিতামহ, আমি এক নিষ্ঠুর সময়ে বেঁচে আছি। তা হ'লে এখনকার জগৎ কেমন? কি নিয়ে বেঁচে আছি? কিসের আশ্বাসে? টুকরো টুকরো ক'রে উত্তর ছড়ানো আছে সমস্ত কাব্যে। কখনও 'বৃদ্ধের স্বভাবে' স্মৃতিচর্বণ ক'রে, 'সকাল থেকে সন্ধ্যা থেকে রাত্রি'র নগরলীলায়, কখনো সহর থেকে পালিয়ে 'কলকাতায় রবিবার' যাপনে, অথবা এরোপ্লেনে বসে ভাবা :

শূন্যে মোহার দেখার ভ্রান্তি
নিত্য দিনের চোখে।
বিশ্ববিহীনতার শান্তি অসীম ঊর্ধ্বলোকে।

কিন্তু নীরেন্দ্রবাবুর কবিস্বভাব কি বিশ্ববিহীনতার শান্তি চায়? মনে হয় আমাদের পক্ষ থেকে নঞর্থক উত্তর উঠবে। তিনি কিছুই ভোলেন নি। তাই মনে পড়ে অমলকান্তির সামান্য ইচ্ছার অপমানশেষ, সিতাংশুর সংসারে শান্তি নেই। আর তাই তিনি প্রাজ্ঞ উচ্চারণ করেন :

নিতান্তই ভ্রান্ত লোকটা। হায়
অল্প একটু সুখের কাঙাল।

অল্প একটু সুখ এখন, এই দশকে, পরশপাথর। আর আমরা সবাই উদ্বাহু বামন। 'হাউমাউ অনটনের মধ্যে পা টিপে-টিপে যেখানে পথ চলতে হয়'। প্রকৃতির দিকে চাইলে মন ব্যথিয়ে ওঠে :

এ কি করুণ সন্ধ্যা! এ কোন্ হাওয়া লেগে
অন্ধকারে অদৃশ্য ওই নদীর দুঃখ হঠাৎ উঠল জেগে।

এই কাব্যে অনেকগুলি শব্দ পৌনঃপুনিক ও প্রতীকী মনে হয়। অন্ধকার বিষণ্ণ, একা, ভয়, ইচ্ছা, টবের ফুল ব্যাখ্যা নিষ্প্রয়োজন। এ সব শব্দ এদশকের সবাই একটু বেশি ব্যবহার করেন। কবি তাই আমাদের কথা দিয়ে আমাদের প্রত্যুপহার পাঠিয়েছেন।

আধুনিক বাংলা কবিতার যে বিশেষ চারিত্র আছে, তা সৌভাগ্যত আর ইংরাজ সমালোচকদের মন্তব্য উদ্ধার ক'রে প্রমাণ করতে হয় না। বাংলার কবিরা'ও এখন স্বয়ংবশ কবিতা লিখছেন। তবে কেউ কেউ স্বাধিকারপ্রমত্ত। নীরেন্দ্রবাবু কবিতায় প্রাণপ্রতিষ্ঠা করতে জানেন। প্রাত্যহিকতা তাঁর বৈশিষ্ট্য। রোগা ঢ্যাঙা, আগুনখাকী এসব শব্দ তিনি সুন্দর ব্যবহার করেন। তাঁর কবিতা আমাদের নিত্যদিনের দ্বিধার সন্তান। সঙ্কল্প আর হতাশা, মানুষী ইচ্ছা ও তার অপনয়ন, অন্ধকার বারান্দার টবে পুষ্পসংকেত এইসবের বিরুদ্ধ অথচ প্রয়াসী যুগলমিলনে প্রসন্ন রাত্রি নামছে। কবি সেই তমসাপ্রসন্ন রাত্রির দর্শক।

বাংলা কবিতায় জীবনানন্দের শব্দ, চিত্রকল্প ও নিসর্গপ্রীতি রুচির প্রভাব পড়েছে। নীরেন্দ্রবাবুর মধ্যে জীবনানন্দের উল্লিখিত লক্ষণও খুঁজে পাই নি। কিন্তু একটি জীবনানন্দীয় প্রতীক তাঁর কাব্যস্বভাবকে অন্ধকারচেতনায় আকর্ষণ করেছে। জীবনানন্দই বাংলা কবিতায় প্রথম গাঢ় অন্ধকারের পরাক্রম এঁকেছিলেন। তাঁর ভাষায় এ অন্ধকার—'প্রধান আঁধার'। এ আঁধারে আত্মহননের ইচ্ছে জাগে, পেঁচা আর সুদর্শনের ডাক শোনা যায়।

নীরেন্দ্রবাবুর একটি কবিতার নাম 'প্রধান আঁধারে' কিন্তু তাঁর অন্ধকারচেতনা জীবনানন্দের অন্ধকারচেতনার থেকে স্বতন্ত্র। কেননা 'ভিতরে বাহিরে···স্বদেশে বিদেশে···শুধু অন্ধকার, শুধু অন্ধকার' হলেও কবি মানেন 'অন্ধকার ভাল নয়'।

যেহেতু সে একমাত্র নিজের
শরীর দেখায়। সে যেহেতু
অন্য আর কারও মুখ দেখতে দেয় না। সব দৃশ্যের মুখশ্রী মুছে অন্ধকার নিজেই
যেহেতু একমাত্রদৃশ্য হয়ে ওঠে।

এ অন্ধকার তাই সহোদর হলেও কবির প্রতিস্পর্ধী। এই আমাদের এই দশকের সংগ্রামের চেহারা। এ অন্ধকার হয়ত মূল্যবোধের বিনষ্টির ছায়া, মানুষের ক্ষয়গামী আশার রোদন, একে আমরা চাই না তবু এ ঈশ্বরপ্রতিম সম্রাট্ (লক্ষণীয়, কবি অন্ধকারের বিশেষণ দিয়েছেন একজায়গায় 'অ[illegible]য়', যা এতদিন ঈশ্বরের বিশেষণ ছিল।)

নীরেন্দ্রবাবু অন্তিমে তাই উচ্চারণ করেছেন:

অন্ধকার ভাল নয়। আমি অন্ধকারে এতকাল শুধুই আলোর ইচ্ছা লালন
করেছি।

কবি সুতরাং তিমির বিনাশী হ'তে চান না, তিনি আলোর ঝর্ণাধারার প্রত্যাশী। লেখা বাহুল্য, এ আলো 'অন্ধকারের উৎস হ'তে উৎসারিত' নয়।

'অন্ধকার বারান্দা' কাব্য তমসার মধ্যে জ্যোতিরুৎসবের ইঙ্গিত এবং সেই অর্থে আবহমান এর উপমা।

শ্রীসুধীর চক্রবর্ত্তী।

আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়: শ্রীমনোরঞ্জন গুপ্ত প্রণীত। রঞ্জন পাবলিসিং হাউস, কলিকাতা-৩৭ হইতে প্রকাশিত, মূল্য ২-৫০ নঃ পঃ, পৃষ্ঠা ১০৪।

১৮৬১ সনের ২রা আগষ্ট প্রফুল্লচন্দ্র খুলনা জেলার রাড়ুলি কাঠিপাড়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। অবশ্য প্রফুল্লচন্দ্রের জন্মের সময় খুলনা জেলার সৃষ্টি হয় নাই, ইহা যশোহর জেলার অন্তর্ভুক্ত ছিল।

ইংরেজী ১৮৬১ সন বাংলা তথা ভারতের পক্ষে অতি শুভ বৎসর। এই বৎসর বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ প্রমুখ বহু মনীষী জন্মগ্রহণ করিয়া দেশের, জাতির এমন কি পৃথিবীর মুখোজ্জ্বল করিয়াছেন। প্রফুল্লচন্দ্র ইঁহাদের অন্যতম।

প্রফুল্লচন্দ্র দেশের শিক্ষা সমাপন করিয়া ১৮৮২ সনে উচ্চ শিক্ষার জন্য বিলাত যান এবং ১৮৮৮ সনে দেশে ফিরিয়া আসেন। তখন এদেশে বিজ্ঞান শিক্ষা অতি নিম্নস্তরে। রসায়ন শিক্ষার প্রায় কোন ব্যবস্থাই ছিল না। তাঁহার জন্য কেবল মাত্র মাসিক ২০০৲ টাকার একটি অধ্যাপক পদের সৃষ্টি করিয়া ১৮৮৯ সনে জুলাই মাসে তাঁহাকে ঐ পদে নিযুক্ত করা হয়। ১৮৯৬ সনে তিনি মারকিউরাস নাইট্রাইট আবিষ্কার করিয়া পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিক সমাজে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। ১৯০০ সনের বেঙ্গল কেমিক্যালের প্রতিষ্ঠা ১৯০১ হইতে কোম্পানীতে রূপান্তরিত। ১৯০৯ হইতে এক প্রতিভাজন বিজ্ঞানী ছাত্রের দল ডাঃ রায়ের স্নেহচ্ছায়ায় মিলিত হন, মেঘনাদ সাহা, নীলরতন ধর, সত্যেন্দ্রনাথ বসু, জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ, রসিকলাল দত্ত প্রভৃতি। ১৯১৬ সনে সরকারী কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া বিশ্ববিদ্যালয় বিজ্ঞান মন্দিরে যোগদান করেন। ঐ পদ হইতে ১৯৩৬ সনে ৭৫ বৎসর বয়সে অবসর গ্রহণ করেন। ১৯৪৪ সনের ১৬ই জুন এই চিরকুমার জ্ঞান-তপস্বী, অক্লান্ত-কর্ম্মী দেশহিতব্রতী, আত্মত্যাগী আত্মভোলা কর্ম্মযোগী ৮৩ বৎসর বয়সে নশ্বর দেহ ত্যাগ করেন।

বাঙালীজাতি তথা বাঙালীতরুণেরা মানুষ হউক, খাটিয়া অন্ন সংস্থান করুক ইহাই ছিল আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্রের কামনা এবং ইহার সফলতার জন্য সমস্ত জীবন তিনি কাজ করিয়া গিয়াছেন। জীবনের শেষপাদে ইনি মহাত্মা গান্ধীর সহকর্ম্মীরূপে খাদি প্রচার করিতেন। যেখানে দুর্ভিক্ষ, যেখানে বন্যা, এককথায় যেখানে মানুষের এবং দেশের সঙ্কট সেখানেই আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র। আবার সাহিত্য ক্ষেত্রেও আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সভাপতি রূপে।

এই জীবনালেখ্যে একটি সুন্দর ভূমিকা লিখিয়া দিয়াছেন সদ্য পরলোকগত সাহিত্যিক সজনীকান্ত দাস। এই গ্রন্থের বিপুল প্রচার বাঞ্ছনীয়

কুটজ, কাব্যগ্রন্থ—এ. কে. এম. আমিনুল হক কর্তৃক কাজী গাশরাক্ মাহমুদের হিন্দী কবিতাবলীর অনুবাদ। প্রকাশক—কে. এ. মাহমুদ, ১৪৩, সেগুন বাগিচা, ঢাকা।

প্রেমিকের দুরন্ত হৃদয়ব্যথা কয়েকটি ছোট কবিতায় প্রকাশ পাইয়াছে। কবিতাগুলি যাদের উদ্দেশ্যে লেখা হয়েছে, তারা হচ্ছে কালো, প্রিয়বালা, সুভদ্রা, রাণী, সুকুমারী, মধুবালা, মধুরা, মধুরাণী। মিলনের কোন আশা নাই জানিয়া বিরহী কবি বলিতেছেন—

"বলিতে হায় ফাটে ছাতি –
কেঁদে কেঁদে দিন কাটে মোর,
কেঁদে কেঁদেই কাটে রাতি !"

কিন্তু তবুও তিনি আশা ছাড়েন নাই, বাঞ্ছিতার উদ্দেশে বলিতেছেন—

"যদি তোমায় একটিবারও
পারতাম দিতে বাণী,
পাষাণ-পরাণ জল্লাদের-ও
ঝরিতো চোখে পানি !"

শেষে তিনি জগদীশ্বরকে উদ্দেশ করিয়া বলিতেছেন –

"সত্য করে বলো প্রভু,
কতো আর বাকী রাত,
এই বিরহীর প্রেম-গগনে
কভু কি হবে না প্রাত ?"

'পূর্ব পাকিস্থানের এই কবি'র কবিতাগুলি সত্যই পরম উপভোগ্য।

শ্রীকৃষ্ণধন দে

সনেট পঞ্চাশৎ ও অন্যান্য কবিতা—প্রমথ চৌধুরী। ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোম্পানি প্রাইভেট লিঃ। পাঁচ টাকা।

'সনেট পঞ্চাশৎ' প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯১৩-তে। আর 'পদচারণ' বার হয় ১৯১৯-এ। পরে উভয় গ্রন্থ প্রমথ চৌধুরীর গ্রন্থাবলীতে স্থান পায় ১৯৩০-এ। দীর্ঘকাল পূর্বে ঐ গ্রন্থাবলী নিঃশেষ হয়ে যায়। সে জন্য এখনকার পাঠকসমাজ প্রমথ চৌধুরীর কাব্য-প্রচেষ্টার সঙ্গে বিশেষ পরিচিত ছিলেন না। পরম আনন্দের কথা সম্প্রতি বাংলা দেশের লব্ধকীর্তি গ্রন্থ-সম্পাদনা-কুশলী শ্রীযুক্ত পুলিনবিহারী সেন মহাশয় প্রমথ চৌধুরীর সনেট পঞ্চাশৎ', 'পদচারণ' ছাড়াও অন্যান্য কয়েকটি কবিতা একসঙ্গে সংকলন করে অতি সুন্দর একখানি গ্রন্থ আমাদের উপহার দিয়েছেন। গ্রন্থের পরিশিষ্ট অংশরূপে সম্পাদক "পূর্বকথা", প্রমথ চৌধুরীর নিজের লিখিত সনেট সম্পর্কিত পত্র, সাময়িক পত্রে কবিতা প্রকাশের সূচী ও প্রসঙ্গ কথা জুড়ে দিয়ে গ্রন্থখানির মূল্য বহুগুণ বর্ধিত করেছেন। এই শোভন সম্পাদনার জন্য তিনি আমাদের ধন্যবাদার্হ।

প্রমথ চৌধুরী তাঁর রচিত সনেট সম্পর্কে একদা মন্তব্য করেছিলেন, "আমার সনেটের অন্তরে হয়ত art-এর চাইতে artificiality বেশী।" এ মন্তব্য অংশতঃ অসত্য নয়। কিন্তু তিনি সম্পূর্ণ সচেতন ভাবে, কিছুটা বিদ্রূপে, কিছুটা কৌতুকে বক্তব্যে ও অবয়বে সম্পূর্ণ নতুন ধরণের সনেট রচনায় প্রয়াসী হয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথ সেজন্যই 'সনেট পঞ্চাশৎ' প'ড়ে বলেছিলেন, প্রমথ চৌধুরী বীণাপাণিকে খড়্গপাণি সাজাবার আয়োজন করেছেন। এবং সনেটগুলি যেন 'ইস্পাতের ছুরি' তীক্ষ্ণধার হাস্যে ঝকঝক করছে। কাব্যালুতার বা 'ঘুমের রাজ্যে'র বিরুদ্ধেই তাঁর ছিল কটাক্ষ। তাঁর নিজের মধ্যে সুন্দরের কল্পনা ছিল, হৃদয়ের অনুভূতিও ছিল, তা না হ'লে কি করে তিনি লিখলেন—"পাষাণী", "পরিচয়", "ভুল", প্রভৃতি অনবদ্য সনেট। প্রমথ চৌধুরীর এসব সনেট রবীন্দ্রনাথের সনেট বা চতুর্দশপদীর পাশে চাপে ম্লান হয়ে গেছে। কিন্তু আমরা প্রমথ চৌধুরীর সনেটের যে-সব উজ্জ্বল পংক্তি মাঝে মাঝে স্মরণ করি, উচ্চারণ করি সে তাঁর বিদ্রূপ-ঝলসিত, কৌতুকবিদ্ধ উক্তিগুলি, wit ও paradon-এ অলংকৃত। সেগুলিতেই তিনি স্বতন্ত্র, তিনি বিশিষ্ট। অদ্ভুত মিলের বৈচিত্র্যে ও বক্তব্যের অনন্যতায় তিনি আমাদের স্মরণীয় হয়ে আছেন। তাঁর গদ্য রচনার বৈশিষ্ট্য তাঁর কবিতায়ও প্রতিফলিত, সেই 'উইট্'-গর্ভ prosaic গড়ন আমাকে কখনও কখনও 'মরু-পর্বে'র সেই কাটা-ছাঁটা ছুটো কথা'-র কবি যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের কথা মনে করিয়ে দিয়েছে।

'পদচারণ' কাব্যখানি সত্যেন্দ্রনাথ দত্তকে উৎসর্গ করে প্রমথ চৌধুরী লিখেছিলেন, 'এগুলির ভিতর আর কিছু না থাক, আছে rhyme এবং সেই সঙ্গে কিঞ্চিৎ reason'। তাঁর অভিমত সম্পূর্ণ গ্রহণীয় তবু তাঁর ত্রিপদীগুলি এখনও আমাদের তৃপ্ত করে, সেই 'পূর্ণিমার খেয়াল' অথবা Terza Rima-য় লেখা 'খেয়ালের জন্ম' কিংবা Triolet বা 'তেপাটি' পর্যায়ের ছোট ছোট কবিতা।

'অন্যান্য কবিতা' পর্যায়ে কয়েকটি নতুন রচনার ('সুপরিচিত নয়' অর্থে) সন্ধান পাঠকেরা পাবেন। অনেকদিন পরে প্রমথ চৌধুরীর কবিতা পড়লাম, নতুনতর স্বাদ পেলাম। মনে পড়ল, একদা তিনি যে লিখেছিলেন :

পয়সা করি নি আমি, পাই নি খেতাব।
পাঠকের মুখ চেয়ে লিখি নি কেতাব॥

সেজন্যই সংখ্যালঘু সহৃদয় পাঠকেরা চিরদিনই তাঁর কবিতাকে খুশী মনে অভ্যর্থনা জানাবে।

শ্রীদেবীপদ ভট্টাচার্য

সম্পাদক—শ্রীকেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়
মুদ্রাকর ও প্রকাশক—শ্রীনিবারণচন্দ্র দাস, প্রবাসী প্রেস প্রাইভেট লিঃ, ১২০।২ আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলিকাতা।-৯

নেতৃবর্গের মুখ চাহিয়া থাকে সকল কার্য্যক্রমের নির্দ্দেশের জন্য। সেই নির্দ্দেশ যদি সুস্পষ্ট হয় এবং সেই সঙ্গে সেই নির্দ্দেশ পালনের পদ্ধতিও যদি পূর্ণরূপে বিবৃত হয় তবে তাহা যতই কঠোর ও কষ্টসাধ্যই হউক জনসাধারণের উদ্দীপনা জাগ্রত থাকিলে সে নির্দ্দেশমত কাজ সম্পূর্ণ হইবেই। তবে জনসাধারণের কাছে যে সহকারিতা, ত্যাগ ও কৃচ্ছ্রসাধনজনিত সাহায্য চাওয়া হয়, সে দাবী সকলক্ষেত্রে সমতা ও সামর্থ্য অনুযায়ী হওয়া একান্তই প্রয়োজন, নহিলে তাহাতে বিপরীত প্রতিক্রিয়া হওয়াই সম্ভব। উপরন্তু কর্ত্তৃপক্ষ যে-সকল কাজ করিতেছেন তাহার মধ্যেও সৌষ্ঠবত্ব ও সার্থকতা থাকা প্রয়োজন, নহিলে তাহাতে ত্রুটি বা কারণকারণ বিষয় প্রমাদ প্রকাশ পাইলে বা ঘোষিত হইলে জনসাধারণ উদ্‌ভ্রান্তই হয়, উৎসাহিত নয়। এইজন্য সরকারী কাজে গলদ বা অপ্রয়োজনীয়তা থাকিলে তাহা শোধরাইবার বা বন্ধ করিবার নির্দ্দেশ সরকারীভাবে গোপনে দেওয়া উচিত। শুধু সেই কাজেরই ঘোষণা বা বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হওয়া উচিত, যাহার সার্থকতা ও সাফল্য জনসাধারণের মনে উৎসাহ আনে।

জনসাধারণের কাছে প্রতিরক্ষা তহবিলে নগদ টাকা ও স্বর্ণ চাহিয়াছেন আমাদের কর্ত্তৃপক্ষ। সাধারণ জন তাহাতে সাড়া দিয়াছে সারা ভারতে—বিশেষে দরিদ্র ও মধ্যবিত্ত গৃহস্থ সাধারণ। স্বর্ণদান যাহা আসিয়াছে তাহার পরিমাণ যদি সামর্থ্যের অনুপাতে ধরা হয় তবে বলিতে হয় যে, তাহার প্রায় সবটাই দিয়াছে তাহারা, যাহাদের স্বর্ণসঞ্চয় অতি অল্প এবং অল্পকিছু দিয়াছে তাহারা, যাহাদের স্বর্ণালঙ্কার ও স্বর্ণময় তৈজসপত্র অনেক—এবং সর্ব্বাপেক্ষা অকিঞ্চিৎকর, অতিসামান্য স্বর্ণদান করিয়াছে তাহারা, যাহারা চোরাকারবার ও অসৎপথে লুণ্ঠিত অর্থের পুঁজি সরকারী ট্যাক্স এড়াইবার জন্য স্বর্ণসঞ্চয় করিয়া রাখিয়াছে প্রচুর। তাহাদের সঞ্চিত স্বর্ণের সহস্রাংশের একাংশও এই প্রতিরক্ষা তহবিলে অর্পিত হয় নাই, যেখানে গরীব গৃহস্থ দিয়াছে অনেক ক্ষেত্রে তাহার সঞ্চয়ের একদশমাংশ বা ততোধিক। স্বর্ণবণ্ডের লোভনীয় ব্যবস্থাও এই নীচমনাদের নিকট হইতে স্বর্ণ উদ্ধার করিতে পারে নাই তাই আজ দেশে স্বর্ণ-নিয়ন্ত্রণ আইন চালু করা হইয়াছে।

সাধারণ জনের মনে প্রশ্নের উদয় হইয়াছে যে, এই স্বর্ণনিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা জরুরী অবস্থা ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গেই করা হয় নাই কেন? এ কথাও এখন প্রকাশ্যে শোনা যায় যে, এই দুই মাসের অধিক দেরি করা হইয়াছে যাহাতে ঐ অসৎ-কারবারীর দল অসৎপথে সঞ্চিত স্বর্ণের পুঁজি ঠিকমত লুকাইতে পারে। এত দেরি করার অন্য কোনও যুক্তিযুক্ত কারণ আমরাও জানি না, সুতরাং জনসাধারণের বিভ্রান্তি-মোচনের কোনও উপায় আমাদের হাতে নাই। যুদ্ধ প্রস্তুতির অত্যাবশ্যকীয় উপকরণ হিসাবে বিপুল পরিমাণে স্বর্ণের প্রয়োজন, একথা, সকল মন্ত্রী ও রাষ্ট্রনায়কের মুখে শোনা যাইতেছে অথচ স্বর্ণ সংগ্রহের জন্য যাহা কর্ত্তব্য কাজ তাহাতে এত দেরি, এতই গাফিলি! উচিত ছিল জরুরী অবস্থা ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত ব্যাঙ্ক ও সেফ ডিপজিট প্রতিষ্ঠান হইতে সোনা উঠাইয়া লওয়া বন্ধ করার সরকারী আদেশ অর্ডিনান্স হিসাবে প্রদান করিয়া তাহার অব্যবহিত পরেই কাহার কাছে স্বর্ণালঙ্কার ছাড়া কতটা সোনা আছে তাহার হিসাব দাখিল করার আদেশ জারি করা।

আবার সরকারী নির্দ্দেশ অনুসারে অসামরিক প্রতিরক্ষার কাজ হিসাবে, বাংলা দেশে কিছু "স্লিট ট্রেঞ্চ" জাতীয় খাত কাটা হইতেছিল। বিমান আক্রমণে ফেলা বোমা হইতে আত্মরক্ষার জন্য এই জাতীয় খাত গত মহাযুদ্ধে ব্যবহৃত হইয়াছিল এবং বর্ত্তমানেও এই আকস্মিক আক্রমণের মুখে অসামরিক জনসাধারণের নিরাপত্তার জন্য ইহারই ব্যবস্থা করিতে নির্দ্দেশ দেওয়া হয়, কেননা, অন্যরূপ আশ্রয় নির্ম্মাণে বিপুল অর্থব্যয় হয় এবং উহা বিশেষ সময়সাপেক্ষ।

ঐ কাজ আরম্ভ হওয়ার অল্পদিন পরেই আমাদের প্রধানমন্ত্রী কোথায়ও কিছু নাই এরূপ পরিবেশে প্রকাশ্য এক বক্তৃতায় বলিয়া বসিলেন যে, উহা অনর্থক কাটা হইতেছে এবং উহাতে জনসাধারণ অকারণে শঙ্কিত হইতে পারে, ইত্যাদি, ইত্যাদি। তিনি এটুকুও বিবেচনা করিলেন না যে, তাঁহার মহামূল্য মতামত এইভাবে হাটে-বাজারে না ছড়াইয়া সরকারী কথাবার্ত্তার নির্দ্দিষ্ট নিভৃত স্থানে দিলে কাজও হইত এবং অযথা সরকারী নির্দ্দেশের বিরুদ্ধে এইভাবে বেচাল মতামত চালাইয়া জনসাধারণকে উদ্‌ভ্রান্তও করা হইত না।

এইরূপে অযথা প্রকাশ্যে বাংলা রাজ্য সরকারের কাজের সমালোচনা করায় লোকের মনে এই ধারণা ক্রমেই ঘনীভূত হইতেছে যে, চতুর্দ্দিকে শুধু "সাজ সাজ, প্রস্তুত হও" এই চীৎকারই হইতেছে এবং যেহেতু প্রস্তুতির ব্যাপারে কাজের

বদলে অকাজও হইতেছে একথা ত স্বয়ং প্রধানমন্ত্রীও বলিয়াছেন, সুতরাং হয়ত জরুরী অবস্থা এখন আর ততটা নাই! প্রকাশ্যে এইরূপ মন্তব্য করা সমীচীন হইবে কিনা সে বিচার না করায় প্রধানমন্ত্রী এই বিপরীত ব্যাপার ঘটাইয়াছেন।

বাস্তবিক পক্ষে প্রধানমন্ত্রীর এইরূপ উচ্চৈঃস্বরে চিন্তা করিবার ফলে জনসাধারণের উৎসাহ ও উদ্দীপনায় বাধা আসিতেছে। অকারণে ও অসঙ্গতভাবে, যেখানে-সেখানে, "আমরা শান্তির পথ ছাড়িব না", "আমরা কোন শক্তিজোটে যোগদান করিব না" বলিয়া তিনি যে কি অনর্থের সৃষ্টি করিতেছেন, সেটা এখন তাঁহাকে সুস্পষ্টভাবে জানান প্রয়োজন। নহিলে একদিকে চলিবে দেশে যুদ্ধযাত্রার উৎসাহ-উদ্দীপনা জাগ্রত করিবার নির্দেশ এবং অন্যদিকে চলিবে সে উদ্দীপনার উপর ঘোলা জল ঢালার মত কথাবার্ত্তা, ইহা নিতান্তই বিসদৃশ ব্যাপার। মহাত্মা গান্ধীর নিয়ম ছিল, সপ্তাহে একদিন মৌনব্রত লওয়া। কারণ, তিনি বাক্-সংযমের প্রয়োজনীয়তা ও উপকার সম্পর্কে সম্পূর্ণরূপে অভিজ্ঞ ছিলেন। তাঁহার প্রিয়-শিষ্যের এখন বিশেষ প্রয়োজন ঐ বিষয়ে জ্ঞানলাভ করিবার এবং উহা অভ্যাস করিবার।

নূতন প্রতিরক্ষামন্ত্রী শ্রী চভন এখন পর্য্যন্ত বিশেষ মুখ খোলেন নাই এবং তাঁহার অধিকাংশ সময় প্রত্যক্ষ দর্শন ও অন্য জরুরী কাজে নিয়োজিত হইতেছে। ইহা অতি শুভ লক্ষণ।

বলিতে কি, চতুর্দ্দিকে যে সকল বক্তৃতা চলিতেছে তাহা প্রায় চর্ব্বিতচর্ব্বণের ন্যায় অসার ও অবান্তর। আমরা এতাবৎ শুধু রাষ্ট্রপতির ভাষণে সুচিন্তিত মন্তব্য ও বাস্তবজ্ঞানের নির্দেশ পাইয়াছি। তিনি যেখানে যাহা বলিয়াছেন তাহার মধ্যে পরস্পরবিরোধী কোনও প্রসঙ্গ ছিল না এবং তাঁহার পথনির্দ্দেশ অতি সরল ও সহজবোধ্য। আমরা বুঝিতে পারি যে, তিনি দেশকে পুনরায় নিদ্রিত হইতে দিতে চাহেন না এবং তিনি চাহেন যে দেশের লোকে আমাদের অবস্থার বিপর্য্যয় সম্পর্কে পূর্ণ জ্ঞান পাইয়া যেন জাগ্রত ও সতর্ক থাকে। তাঁহার ভাষণে ইহাও সুস্পষ্টভাবে বুঝা যায় যে, দেশের নেতৃসমাজ দেশের জাগৃতি সম্পর্কে সতর্ক ও অবহিত নহে। এবং সেই কারণে তাঁহার সতর্কবাণী রাষ্ট্রনায়কদিগকে লক্ষ্য করিয়া দেওয়া হয়। বিগত ২রা জানুয়ারী ভুবনেশ্বরে উৎকল বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্ত্তন অভিভাষণে তিনি বলিয়াছিলেন, "আমরা সংহতি লাভ করিয়াছি, সারা ভারতে অভূতপূর্ব্বরূপে আমরা এক জাতি এক প্রাণ—এই একতার ভাব জাগ্রত হইয়াছে। চীনের এই শক্তি-পরীক্ষার আহ্বানকে যতদিন না আমরা বীরের ন্যায় সমুচিত প্রত্যুত্তর দিতে পারি ততদিন পর্য্যন্ত এই সম্মিলিত শক্তিকে দেশনেতারা যেন বিলীন হইয়া যাইতে না দেন।"

যুদ্ধ পরিস্থিতি এখন অনিশ্চিতের অবস্থায় রহিয়াছে। সমরাঙ্গণগুলিতে এখন নিঃশব্দ নিঃস্পন্দ থমথমে ভাব রহিয়াছে। এ সময় যদি আমরা অসতর্ক হইয়া নিদ্রালস-নয়নে প্রস্তুতির কাজে ক্ষান্তি দিই তবে সর্ব্বনাশের সম্ভাবনা আছে। কেননা, শত্রু সদাজাগ্রত এবং যুদ্ধপ্রস্তুতিতে ব্যস্ত হইয়া বিপুল সৈন্য ও যুদ্ধোপকরণের সমাবেশ করিতেছে এবং যে-কোন মুহূর্ত্তে সুযোগ বুঝিলেই সে ঝাঁপাইয়া পড়িতে পারে। কোনও শান্তির প্রস্তাব বা চুক্তি বা সর্ত্ত এই বিশ্বাসঘাতক ও ক্রুর শত্রু মানিবে না, যদি সে বুঝে যে, তাহার যুদ্ধযাত্রায় সাফল্যের সম্ভাবনা আছে। আগ্নেয়াস্ত্র সম্বরণ, যুদ্ধবিরতি ও পশ্চাদপসরণ—এ সবই তাহার ছল-চাতুরীর অঙ্গ, একথা এখন সুস্পষ্ট ভাষায় ঘোষিত হওয়া প্রয়োজন। নতুবা, যেহেতু আমাদের দেশের প্রায় অধিকাংশ প্রান্তেরই জনসাধারণ যুদ্ধবিগ্রহ সম্পর্কে অনভিজ্ঞ, এই "শান্তি শান্তি" রব উঠিলেই সকল উদ্যম নিষ্প্রভ হইয়া যাইবেই।

যুদ্ধের প্রস্তুতি কিভাবে হওয়া উচিত তাহা সারা ভারতকে জানাইয়াছে পঞ্চনদের সন্তান ও তাহাদের মন্ত্রীমণ্ডল উজ্জ্বল ও সক্রিয় দৃষ্টান্তের দ্বারা। অযথা আবোল-তাবোল গলাবাজিতে সময় নষ্ট না করিয়া পাঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রী তাঁহার মন্ত্রীমণ্ডলের সংখ্যা ৩১ হইতে নয়জনে দাঁড় করাইয়াছেন। এবং সারা ভারত অবাক হইয়া শুনিয়াছে যে, সকল মন্ত্রীই স্বেচ্ছায় পদত্যাগ করিয়া এই ব্যয়সংকোচ ও সময়-সংকোচের ব্যবস্থায় সহায়তা করিয়াছেন।

পাঞ্জাব অন্যদিকেও যুদ্ধ-প্রস্তুতি কাহাকে বলে তাহার দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছে সক্রিয়ভাবে যুদ্ধ-প্রস্তুতির প্রতিটি অঙ্গ চালিত করিয়া। প্রতিরক্ষা তহবিলে স্বর্ণ দান পাঞ্জাব আরম্ভ করে তাহার মুখ্যমন্ত্রীর হাতে ৩ মণ ২৪ সের সোনা দিয়া। অর্থদানে অল্প কিছুদিন পূর্ব্বেও (সম্ভবতঃ এখনও) পাঞ্জাব ছিল ভারতের সকল প্রদেশের অগ্রণী। বোধহয় ইহার কারণ, পাঞ্জাবের লোকে যুদ্ধ-বিগ্রহ কি বস্তু তাহা ভারতের অন্য প্রদেশীয়দিগের অপেক্ষা বেশী বুঝিতে সক্ষম এবং

ভারতের অন্য সমৃদ্ধ অঞ্চলের যে পেটমোটা কলুষিত-মন ঘৃণ্য চোরাকারবারীর দল দেশের ও দশের রক্তশোষণ করিয়া স্বর্ণ ও অর্থের অধিকাংশ লুণ্ঠন করিয়া বিরাট্ পুঁজি কুক্ষিগত করিয়াছে, পাঞ্জাবে তাহাদের এত প্রতাপ ও প্রাদুর্ভাব নাই। এবং সে কারণে, সং গৃহস্থের এখনও সম্বিৎ আছে। তার পর যুদ্ধের প্রধান উপকরণ যাহা, অর্থাৎ সাহসী ও যুযুৎসু জোয়ানের দল, সেদিকে প্রথম মুখেই পাঞ্জাব পাঠাইয়াছে প্রায় দুই লক্ষ যুবককে সৈন্যদলে ভর্তি হইবার জন্য এবং পাঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রী প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন যে মোটমাট ২০ লক্ষ জওয়ান পাঞ্জাব হইতে যাইবে সেনাদলে দেশের মুখোজ্জ্বল করিতে।

সাবাস পাঞ্জাব! ধন্য মুখ্যমন্ত্রী সর্দার প্রতাপ সিং কাইরণ! সবশেষে বলা প্রয়োজন আমাদের এই মুনাফাবাজ ও চোরাকারবারী-অধিকৃত প্রান্তের কথা। যে দেশে ও যে অঞ্চলে স্বাধীনতা ও দেশাত্মবোধের উদ্দীপনা প্রথম জাগে, সেই দেশ দীর্ঘ দিনের বৈদেশিক কু-শাসনে এবং স্বাধীনতার পর পক্ষপাতিত্ব-দুষ্ট, অশক্ত এবং অনভিজ্ঞ লোকের শাসন-তন্ত্র পরিচালনার ফলে এরূপ নির্য্যাতিত ও শোষিত হইয়াছে যে, সে দেশে দেশাত্মবোধের হোমাগ্নি নির্ব্বাপিতপ্রায় এবং এ দেশের সন্তান বিদেশীর ক্রীতদাস গুপ্তচরগণের দেশ-দ্রোহিতার মন্ত্রণায় বিভ্রান্ত ও পথভ্রষ্ট। উপরন্তু সোনার বাংলায় সোনার শতকরা ৯৯ ভাগ এখন ভারতের ও সমাজের জঘন্য-তম অংশের হস্তগত। এখন এ দেশের মুখরক্ষা করিতেছে সেই দরিদ্র ও মধ্যবিত্ত গৃহস্থ-কুলের নরনারী—যদিও তাহাদের নাম বা চিত্র সংবাদপত্রে দেখা যায় না—কষ্টার্জ্জিত অর্থ ও স্বর্ণ দান করিয়া।

এ দেশকে জাগাইবার চেষ্টা চলিতেছে বটে—কিন্তু যে পথে যে প্রয়াস চলিতেছে, সেখানে সাফল্যের সম্ভাবনা কম। যুদ্ধযাত্রার প্রথমে যে আবাহন গীত হয় তাহা রৌদ্ররসের; বীর-সন্তানের বরণ হয় অন্য উপচারে, বীররসের উদ্রেক, যুদ্ধযাত্রার উত্তেজনা-উদ্দীপনা হয় ভিন্ন পরিবেশে—বর্ত্তমান যুগের 'আধুনিক' গীতকার ও 'অত্যাধুনিক' সাহিত্যিকের সে অভিজ্ঞতা কোথায়, সে অগ্নিমন্ত্রের দীক্ষা কোথায়? যাহাই হউক চেষ্টা চলিতেছে এবং সে চেষ্টার পিছনে যদি আন্তরিকতা থাকে তবে সাফল্য সম্ভব।

শান্তিপূর্ণ মীমাংসার পথানুসন্ধান

নয়া দিল্লীতে কলম্বো সম্মেলনের প্রস্তাবগুলি লইয়া আলোচনা চলিতেছে। সেই প্রস্তাবগুলি লইয়া কলম্বো সম্মেলনের প্রতিনিধিদলের পক্ষে যাঁহারা আসিয়াছেন তাঁহাদের প্রধান সিংহলের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী সিরিমা বন্দর-নায়েকে এবং সহকারীদ্বয়, ঘানার বিচারমন্ত্রী শ্রীওফরি আট্টা ও সংযুক্ত আরব প্রজাতন্ত্রের শাসন পরিষদের প্রেসিডেণ্ট মিঃ আলি সাব্রি আমাদের প্রধানমন্ত্রী এবং তাঁহার সহকারি গণের সহিত আলোচনা চালাইতেছেন। এ প্রসঙ্গ লিখিবার সময় পর্য্যন্ত এই আলোচনার কোন ফলাফল ঘোষিত হয় নাই। তবে শ্রীমতী বন্দরনায়েকে আশা করেন যে, দুই দিনের মধ্যে তিনি "নির্দ্দিষ্ট ফল"—অর্থাৎ অভীষ্ট ফল—লইয়া ভারত ত্যাগ করিবেন। আমাদের সরকারী পক্ষ যেটুকু জানাইয়াছেন, তাহার উপর আলোচনা বা মন্তব্য, কিছুই চলে না।

এখানে বলা প্রয়োজন যে, এই আলোচনার ফলে ভারত-চীন সীমান্ত বিরোধের কোনও চূড়ান্ত মীমাংসা সম্ভব নহে। এই আলোচনার উদ্দেশ্য চীন ও ভারতের মধ্যে শান্তিপূর্ণ পথে মীমাংসার জন্য দুই বিরোধীপক্ষের মধ্যে সাক্ষাৎ কথাবার্ত্তা যাহাতে চলে তাহারই উদ্যোগ-আয়োজনের সম্ভাবনা। ঐ কলম্বো সম্মেলনের প্রস্তাবগুলির বিষয়বস্তু এবং উহার অধিক কোনও কিছু ইহাতে নাই।

সদ্ব্যয়, সঞ্চয় ও অপচয়

অর্জ্জিত অর্থ যথাযথভাবে ব্যয় করিলে তাহাতে মানুষের দৈহিক, মানসিক ও পারিবারিক উন্নতি হয় এবং সকল অর্থ উপার্জ্জনের উদ্দেশ্যই হইল এইরূপ সদ্ব্যয় করিয়া মানবমঙ্গল সাধিত করা। কখন কখন মানুষ বর্ত্তমানে ব্যয় না করিয়া তাহা ভবিষ্যতের জন্য সঞ্চয় করিয়া রাখে যাহাতে উপার্জ্জনের অভাব ঘটিলে কোন কষ্ট না হয়। অনেক সময় অর্থ এরূপ ভাবে ব্যয়ও করা হয় যাহা অপেক্ষাকৃত চিরস্থায়ীভাবে মানুষকে সেই ব্যয়ের সুখ উপভোগ করিতে সাহায্য করে, যথা কূপ বা পুষ্করিণী খনন, গৃহ-নির্ম্মাণ, আসবাব তৈয়ার করান, চাষের জমি ক্রয় ও তাহার সংস্কার ইত্যাদি। এইরূপভাবে অর্থ ব্যয় করিলে তাহা সঞ্চয়ের মতই, কেননা, সেই ব্যয়ের ফল মানুষ সাক্ষাৎভাবে বা তদ্দ্বারা অর্থ লাভ করিয়া বৎসরের পর

বৎসর সেই ব্যয়ের ফল উপভোগ করিতে সক্ষম হয়। ইহাকেই বলে উপার্জ্জিত অর্থ মূলধনে পরিণত করা। যে সকল ক্ষেত্রে মানুষ অর্থ ব্যয় করিয়া কোনও সুফল লাভ বা উপভোগ করিতে সক্ষম হয় না, এমন কি ব্যয়ের ফলে মানুষের অপকারই হয় এবং অপরাপর অর্থহানি আরম্ভ হয়, সেই জাতীয় ব্যয়কে অপব্যয় বলা হয় ও সেই অর্থের অপচয় করা হইয়াছে বলিয়া অর্থনীতিজ্ঞেরা ধার্য্য করেন।

ব্যক্তিগত জীবনে যেরূপে সদ্ব্যয়, সঞ্চয় ও অপচয়ের পার্থক্য লক্ষিত হয়, সমষ্টিগতভাবে বা জাতীয় জীবনেও সেইরূপভাবেই উপার্জ্জিত অর্থের ব্যবহার বর্ণনা করা হয়। অর্থাৎ জাতীয় ভাবেও অর্থের সদ্ব্যয়, সঞ্চয় ও অপচয় ঘটিয়া থাকে। জাতীয়ভাবে সেই ব্যয়কেই সদ্ব্যয় বলা হইবে, যে ব্যয় হইতে সাক্ষাৎভাবে অথবা অদূরভবিষ্যতে জাতীয় জনসাধারণের উপভোগের অথবা উপার্জ্জনের সাহায্য হইবে। যেমন জন-বহুল দেশের মধ্য দিয়া রাজপথ নির্ম্মাণ, রেল-রাস্তা, সেতু প্রভৃতি গঠন, চাহিদা আছে এরূপ দ্রব্য উৎপাদনের কারখানা, হাস-পাতাল, শিক্ষাকেন্দ্র প্রভৃতি। বিদেশী মুদ্রা স্বর্ণ, রৌপ্য বা অপরাপর অপর দেশে দ্রব্যক্রয়ের জন্য ব্যবহার্য্য শেয়ার, ডিবেঞ্চার, রাজকীয় কোম্পানী প্রভৃতি আহরণ করিয়া রাখাকে সঞ্চয় বলা চলে। দেশের খনিজাত অর্থকরী বস্তু তুলিয়া লইবার ব্যবস্থা করাও লুকান ধন খুঁজিয়া বাহির করার মত লাভজনক এবং উৎপাদন ও সঞ্চয় উভয়ের মতই জাতির মঙ্গলকর। কিন্তু রাজনৈতিক দলের জনবল বৃদ্ধির জন্য ধনোৎপাদন বর্জ্জিত ভাবে লোক নিযুক্ত করিবার ব্যবস্থাকে অপব্যয়ই বলা উচিত হইবে। এই জাতীয় বেতনভোগী রাজ-নৈতিক দলের কার্য্যের কর্ম্মী নিয়োগ বিভিন্ন সরকারী বিভাগ ও দপ্তরে অধিক সংখ্যায় ও সত্য কারণ না থাকা সত্ত্বেও সচরাচর হইয়া থাকে। হইয়াছে কিনা তাহা অনুসন্ধান করিলেই জানা যায়। কিন্তু যেখানে অপব্যয় যাহারা করে তাহারাই অনুসন্ধানের দায়িত্বপ্রাপ্ত হন, সে ক্ষেত্রে সত্য কি, তাহা কখনও জানা যায় না। সদ্ব্যয় যাহা হয় এবং সঞ্চয় তাহাও যে অধিক খরচ করিয়া করা হইয়াছে কিনা সে কথার উত্তরও সচরাচর পাওয়া যায় না ঐ একই কারণে। এবং বহু ক্ষেত্রে শিক্ষা, চিকিৎসা ও গ্রাম উন্নয়ন কার্য্যের সহিত গুপ্ত-ভাবে (যদিও সর্ব্বজনের নিকট কথাটা অবিদিত থাকে না) রাষ্ট্রনৈতিক দল গঠন কার্য্য জড়াইয়া যায়। এমন কি দেশে যে ক্ষেত্রে মহা সমস্যা ও বিপদের আবির্ভাব ঘটে সেই সময়েও দেশরক্ষার নামে অর্থ সংগ্রহ করিয়া সে অর্থ রাষ্ট্রনৈতিক দলের বল বৃদ্ধির কার্য্যে লাগান চলিতে পারে। কোথায় লাগান হইল তাহা জানা কঠিন হয়, কারণ, অনুসন্ধান-কার্য্য করার ভারও পড়ে সচরাচর রাষ্ট্রীয় দলের অনুবর্ত্তী লোকেদের উপরেই। অনেক ক্ষেত্রে সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের বিরুদ্ধ দলের লোকেরাও গোপনে নিজেদের লোকজনের বেতনের ব্যবস্থা, সরকারী ভাবে করাইয়া লইয়া থাকেন। যথা, বর্ত্তমান ভারতের পুলিস, রেলওয়ে প্রভৃতি বিভাগে বহু কম্যুনিষ্ট-কর্ম্মী চাকুরি লাভ করিয়া বেতন ও ঘুষের পয়সায় পরিবার ও পার্টির লোক প্রতিপালন করিতেছে। এই বিষয়ে অনুসন্ধান করা প্রয়োজন। কিন্তু হইতে পারে না, কারণ, উচ্চ উচ্চ পদস্থ অনেক রাজ-কর্ম্মচারী কম্যুনিষ্ট পার্টির সমর্থক ও সাহায্যকারী রহিয়াছেন।

অ.

দেশভক্তি

ইয়োরোপ আমেরিকার দেশগুলিতে যে-সকল লোক দেশের জন্য কঠিন কৃচ্ছ্রসাধন ও ত্যাগ স্বীকার করেন তাঁহা-দিগকেই দেশভক্ত বলিয়া গণ্য করা হয়। যাঁহারা দেশের জনসাধারণকে নিজেদের কর্ম্মক্ষমতা ও রাষ্ট্রীয় বিষয়ের জ্ঞান সম্বন্ধে বুঝাইয়া লইয়া দেশ-শাসন কার্য্যের জন্য নির্ব্বাচিত হইয়া রাষ্ট্রের উচ্চ উচ্চ পদগুলিতে নিযুক্ত হইয়া কায়েমি হইয়া বসেন; তাঁহাদিগের খ্যাতি ঐ সকল দেশে কর্ম্মশক্তি অথবা রাষ্ট্রীয় বিস্তার জন্য হইলেও তাঁহাদিগকে কেহ কখনও দেশ-ভক্তির জন্য সম্মান করে না। কারণ তাহারা নিজেদের পদ-মর্য্যাদা ও সমাজে ক্ষমতার অধিকারী হইবার জন্যই রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে অপরাপর লোকের সহিত প্রতিযোগিতা করিয়া নিজের নিজের প্রতিষ্ঠা বৃদ্ধির চেষ্টা করিয়া থাকেন। ব্যবসা, ওকালতি প্রভৃতিতে খ্যাতি লাভ করা যেমন একটা পেশাদারী ব্যাপার, রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে ক্ষমতার অধিকারী হওয়াও তেমনি একটা অর্থ ও প্রতিপত্তি আহরণের পথ মাত্র। এই কারণে বাস্তব-সত্যের পূজারী পাশ্চাত্যের মানুষ কোন মন্ত্রী কিংবা বিধান সভার সভ্যকে অতিবড় দেশভক্ত বলিয়া মনে করে না। দেশভক্ত সেই সব অজানা ও অচেনা সেনারাই, যাহারা শুধু দেশের গৌরবের জন্য প্রাণদান করিতে দ্বিধা করে না। পাশ্চাত্যের

প্রায় সকল দেশেই সৈন্যদলে যোগদান করিতে যাঁহারা যান তাঁহাদিগের মধ্যে বহু অর্থশালী ব্যক্তিকে দেখা যায়। দেশের জন্য যুদ্ধে প্রাণ যাঁহারা দিয়া থাকেন তাঁহাদের মধ্যেও অনেক বিত্তশালী ব্যক্তিকে দেখা যায়। আমাদিগের দেশে যুদ্ধ করিয়া প্রাণদান করে গরীবেই প্রধানতঃ। কখন কখন দুই-চারজন পয়সাওয়ালা ব্যক্তিও আসিয়া পড়েন পরিবারের যুদ্ধের ঐতিহ্যের খাতিরে; কিন্তু যাঁহারা দেশের মোড়ল ও দেশের সকল বিলি-ব্যবস্থার কাণ্ডারী, তাঁহারা প্রায় কখনই যুদ্ধের দিকে যান না। মন্ত্রী, উপমন্ত্রী, বিধানসভার সভ্য ও উচ্চপদস্থ রাজকর্ম্মচারীদিগের যুদ্ধ করিবার ইচ্ছা প্রায় কখনও হয় না। ইচ্ছা হইলেও ক্ষমতার অভাবে যুদ্ধটা আর করা হয় না। বাধ্যতামূলকভাবে এই সকল লোককে যুদ্ধে নামান প্রয়োজন।

অ.

পণ্ডিতের পাণ্ডিত্য

পণ্ডিতজনের পাণ্ডিত্যের কথা জনশ্রুতিতে চিরপ্রচলিত। বাংলা দেশের পণ্ডিত অপরাপর দেশের পণ্ডিতদিগের তুলনায় সম্ভবতঃ অধিক বিদ্যার অধিকারী, কিন্তু অন্য দেশের পণ্ডিতগণও সাধারণ বুদ্ধির নাগালের বাহিরে বিচরণ করেন বলিয়া শুনা যায়। তৈলাধার পাত্র অথবা পাত্রাধার তৈল এই সমস্যার সমাধান তৈল উল্টাইয়া বাংলার পণ্ডিত করিয়াছিলেন। ছেলেকে সাপে কামড়াইয়াছে শুনিয়া আর এক পণ্ডিত জিজ্ঞাসা করেন, "কাদের সাপ?" কেননা, ঐ প্রশ্নের উত্তর পাওয়াটা ছেলের চিকিৎসা অপেক্ষা অধিক প্রয়োজনীয় বলিয়া পণ্ডিত স্থির করিয়াছিলেন। ঘরে আগুন লাগিয়াছে বলাতে অপর এক পণ্ডিত প্রশ্ন করেন, "ইহা কেমনে সম্ভব? ঘরের চাবি যে আমার কাছে।" বর্ত্তমান জগতের পণ্ডিতদিগের পাণ্ডিত্যের সীমা বহুদূর প্রসারিত এবং তাঁহারা যে-সকল বৃহৎ বৃহৎ বিষয়ের বিচারে মনোনিবেশ করেন সে সকল কথা পূর্ব্বকালে পণ্ডিত-জনের বিদ্যার বাহিরে ছিল। অর্থাৎ, টাকা না থাকিলেও বুঝিতে হইবে টাকা আছে। গৃহ-নির্ম্মাণ করিতে হইলে সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজন কড়ি ও বরগার জন্য বৃক্ষরোপণ করা। মল্লযুদ্ধের আয়োজন করিতে হইলে অথবা ফুটবল খেলায় জয়লাভ করিতে হইলে আগে দেখিতে হইবে মাঠে মাঠে তৃণ-দূর্ব্বা ও ছোলার চাষ হইতেছে কিনা। কারণ, ঘাস ও ছাতুর ব্যবস্থা হইলে গরু তাহা খাইয়া দুগ্ধদান করিবে এবং দুগ্ধপান করিয়া শিশুগণ ক্রমশঃ সবল হইয়া কুস্তি লড়িবার জন্য প্রস্তুত হইতে পারিবে। ফুটবল খেলায় জয়লাভ করাও ঐ একই সবলতা সাপেক্ষ। অর্থাৎ, ঘাস হইল সকল সংঘাতে জয়লাভ করিবার প্রথম ও প্রধান উপকরণ। আরও যে সকল পাণ্ডিত্যপূর্ণ কথা আমরা বর্ত্তমানে শুনিতে পাই তাহার মধ্যে সত্য জ্ঞানের সার বস্তু সকল নিহিত আছে। যেমন, "কর্জ্জ করিলে ঐশ্বর্য্য বৃদ্ধি হয়"। ইহা মহাঋষি চার্ব্বাকের নীতির সহিত ঘনিষ্ঠ ভাবে জড়িত। স্বাধীনতা ও বাস্তব সম্পদ হৃত হইলে এবং ফিরাইয়া পাওয়া যাইল বলিয়া মানিতে হইবে। ইহা অতি গভীরভাবে তথ্যপূর্ণ। শৃঙ্খল যত শক্ত হয় ততই ঢিলা হয় যায়। যথা, নাগপাশ আবদ্ধ ব্যক্তির উপর ব্রহ্মাস্ত্র নিক্ষেপে উভয়াস্ত্রই নাকচ হইয়া যায়। অর্থাৎ "আমাদের বাঁধন যতই শক্ত হবে", বাঁধন ততই ঢিলা হইয়া খসিয়া পড়িবে। এই কারণে আধুনিক যুগের আধুনিক সমাজতন্ত্রবাদী পণ্ডিতদিগের মতে মুক্তির আগমন অতি নিশ্চয়ভাবে স্থির করিবার জন্য শৃঙ্খলের দৈর্ঘ্য বৃদ্ধির প্রয়োজন হইয়াছে। আমরা, মূর্খেরা, অনেক সময় বুঝিতে পারি না যে, ট্যাক্স বাড়িলে কেন আমাদিগের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য তাহার দ্বারা ক্রমবিকশিত হইয়া পূর্ণতা লাভ করে। সকল অধিকার; যেমন জমিজমা ক্রয়, গৃহ-নির্ম্মাণ, পত্নীকে অলঙ্কার দান, অর্থ সঞ্চয় প্রভৃতি উপভোগ না করাই এখন অর্থনৈতিক উন্নতির উচ্চতম প্রকাশ, কেবলও মূর্খের বোধগম্য নহে। পূর্ব্বে "নাসিকা বেষ্টন" বলিয়া একটা কথা পণ্ডিতমহলে প্রচলিত ও ব্যবহার্য্য ছিল। বর্ত্তমানে "জটিল মতে" সকল সত্যই পৃথিবী বেষ্টন করিয়া পরে উপলব্ধ হয়। সোজাসুজি সাদাসিধাভাবে কোনও সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া পাণ্ডিত্য বিরুদ্ধ ও অজ্ঞানতার পরিচায়ক। ঘুম সম্বন্ধে সুকুমার রায়ের "ভাবুক সভাতে" বলা হইয়াছিল (নায়ক ঘুমাইয়াছিলেন কিনা জিজ্ঞাসা করাতে):

> "ঘুম কি হে? সেকি কথা? অবাক করলে খুব
> ঘুমোও নি তো, ভাবের স্রোতে মেরেছিলে ডুব।
> ঘুমোয় যত ইতর লোক তেলি, মুদি, চাষা,
> তুমি আমি ভাবুক লোক ভাবের রাজ্যে বাসা।"

অর্থাৎ, উচ্চস্তরের লোক যাঁহারা তাঁহারা কোন কার্য্যই ইতর সাধারণের মত করেন না। চিন্তার ক্ষেত্রেও কাযাক্ষেত্রের ন্যায়ই তাঁহারা ঊর্দ্ধলোকে বিচরণ করেন ও তেলি, মুদি, চাষা-সুলভ গতিতে সহজ পথে কোনও সিদ্ধান্তে পৌছান মহাপাতক বলিয়া মনে করেন। যুদ্ধজয় যদি সাধারণ বুদ্ধিতে দেহ, মন, অস্ত্র

ও অর্থবলের দ্বারা সম্ভবপর মনে হয়, তাহা হইলে পণ্ডিতজনের পক্ষে সেই সহজ বুদ্ধির পথ ছাড়িয়া অবিলম্বে ভাবা প্রয়োজন যে, কেমন করিয়া দেহ, মন, অস্ত্র ও অর্থবলের সাহায্য ব্যতীত অপর পথে যুদ্ধজয় সম্ভব হইতে পারে। সুরে, বেসুরে, গদ্যে, পদ্যে, চিত্রে, বাক্যে যুদ্ধ-প্রচেষ্টা চালাইলে জয় অতি নিশ্চয়। তৎপরে যে সকল মূল সত্তার উপরে অর্থ, অস্ত্র ও শৌর্য্যবীর্য্যের বুনিয়াদ, যথা, ঘাস, মাটি, জল, কৃষি, বৃক্ষরোপণ ও খনিজ আহরণ সেই সকল বস্তুর সহিত মানব-প্রকৃতির সম্বন্ধ নির্ণয় ও ঘনিষ্ঠতর মিলনই, পাণ্ডিত্যের পথে যুদ্ধজয়ের শ্রেষ্ঠ উপায়।

অ.

সোনা কোথায়

শ্রীমোরারজি দেশাই-এর মতে ভারতের সকল লোকের পক্ষে পাকা সোনার পরিবর্তে শতকরা ৫৷৷ টাকা সুদে তোলায় ৬২৷৷৬ টাকা মূল্যের সরকারী কর্জ্জাপত্র ক্রয় লাভজনক হইবে। এই হিসাব যদি অর্থনীতির নিয়ম বিচার করা হয় তাহা হইলে দেখা যাইবে যে, কথাটা খুবই একতরফা এবং চোর ও সাধুর মধ্যে কোনও পার্থক্য রক্ষা না করিয়া কথা হইয়াছে। কারণ যে সোনা দেশের লোকের শতকরা ৯৫ জন ১২০-১৪৫ টাকা তোলা হিসাবে ক্রয় করিতেছে সেই সোনা ৬২৷৷০ টাকা তোলা হিসাবে সরকারের হাতে তুলিয়া দেওয়া দেশভক্তি হইতে পারে, কিন্তু অর্থনীতি নহে। শ্রীমোরারজির মতে সোনা যাহারা বেআইনীভাবে লুকাইয়া আমদানী করিয়াছে তাহাদের মাত্র ৬২৷৷ টাকা তোলা পড়তা হইয়াছে এবং সে টাকাও কালো বাজারে, ঘুষে অথবা রপ্তানী-দ্রব্যের চালান কম করিয়া লিখিয়া গোপনে কিছু কিছু মূল্যাংশ বিদেশে সরাইবার ব্যবস্থা করিয়া অর্জ্জিত হইয়াছে, সুতরাং সেই অর্থের অধিকাংশই ন্যায়ত অর্জ্জিত নহে এবং তৎকারণে তাহার সাহায্যে ক্রয়-করা সোনা ৬২৷৷০ টাকা তোলা হারে সরকারকে ধার দেওয়া অর্থনীতি সঙ্গত। কথাটা অর্থনীতিসঙ্গত না হইলেও নীতিসঙ্গত — একথা মানিতে হইত, যদি কথাটা পুরাপুরি সত্য হইত। কিন্তু ভারতের ঘরে ঘরে যে সোনা আছে অলঙ্কারে ও অন্যরূপে, সে-সকল সোনা ক্রয় করিবার সময় সকল বা অধিকাংশ ক্রেতা কালো-বাজারে, ঘুষে বা আইনভঙ্গ করিয়া ক্রয়মূল্যের টাকা অর্জ্জন করিয়াছিলেন, একথা অতি অল্পাংশেই সত্য। অধিকাংশ স্বর্ণ ক্রয়ই ব্যবহারের অথবা সঞ্চয়ের জন্য হইয়াছে বা হইতেছে। জুয়াচোরদের হাতে যে সোনা আছে তাহা মোট সোনার পরিমাণের সম্ভবতঃ শতকরা ১০ ভাগও নহে। তাহা হইলে যদি ভারতে ,৪০০০ কোটি প্রমাণ সোনা আছে ধরা হয়; সেই সোনার মধ্যে মাত্র ৭০০ কোটি প্রমাণ সোনা ৬২৷৷০ টাকা দরে বেচিলে নীতি রক্ষা হয়। বাকী যে সোনা আছে তাহার মধ্যে কিছু কিছু অংশ বহু পূর্ব্বে ক্রয় করা হইয়াছে বলিয়া ধরা যাইতে পারে। সোনা ক্রয় ভারতে জনসংখ্যা ও ঐশ্বর্য্য বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বাড়িয়া চলিয়াছে। ৩,৩০০ কোটি প্রমাণ সোনা গত ১০০ বৎসরের মধ্যে ক্রয় করা হইয়াছে বলিয়া ধরা যাইতে পারে, কারণ, তৎপূর্ব্বের সোনা যে দামেই ক্রয় করা হইয়া থাকুক না কেন তাহার উপর ক্রয়মূল্যের সুদ ধরিলে প্রতি ১০ টাকা (শতকরা ৪ টাকা হারে) ৫০ টাকার অধিক হইয়া দাঁড়াইয়াছে। অর্থাৎ, যদি কেহ ১৮৫০ সনে ১০ টাকার সোনা কিনিয়া ঘরে রাখিয়া থাকে; সুদে-আসলে সে ১০ টাকা আজ ৫০।৬০ টাকায় দাঁড়াইয়াছে। এই হিসাবে ১৫ টাকা, ২০ টাকা, ৩০ টাকা, ৪০ টাকা অথবা ৫০ টাকা তোলা দরের সোনা ৫০, ৪০, ৩০ অথবা ২০ বৎসর বিনা-সুদে মজুত থাকায় তাহার সুদে-আসলে মূল্য আজ ৫, ৪, ৩ অথবা ২ গুণ ধরিতে হইবে। অর্থাৎ, সুদ না পাওয়াটা মূল্যবৃদ্ধিতে ওয়াশীল হইবে। তাহা হইলে জমানো পুরনো সোনার দর ৭৫৲, ৮০৲, ৯০৲ এবং ১০০৲ ধরিতে হইবে অর্থাৎ, সকল দরে কেনা সোনার প্রমাণ সমান ধরিলে গড়পড়তা দর ৮২৷৷০ টাকা দাঁড়াইবে। চোরাই সোনার হিসাব আমরা করিতে পারিব না। বহু সৎ লোকে ন্যায়ত অর্জ্জিত ও ট্যাক্স দেওয়া টাকায় ১৩০।১৪০ টাকা তোলা হিসাবে সোনা কিনিয়াছেন আমরা জানি। তাঁহাদিগের সোনা যদি মোরারজি ৬২৷৷০ টাকা দরে কাড়িয়া লওয়ার ব্যবস্থা করেন তাহা হইলে তাঁহার ও ভারত সরকারের নীতিজ্ঞান সম্বন্ধে জনসাধারণের মত বিপরীত হইবে বলিয়া মনে হয়। সোনা যদি ভারত সরকারের প্রয়োজন হয় তাহা হইলে উচিত হইবে সোনা কর্জ্জ করিয়া পরে সোনা ফেরত দিয়া অল্প সুদে কর্জ্জ শোধের ব্যবস্থা করা। ভারতের টাকার ক্রয়ক্ষমতা ক্রমশঃ কমিয়া চলিয়াছে এবং আজিকার টাকা দশ-পনের বৎসর পরে শোধ হইলে তাহার ক্রয়ক্ষমতা শতকরা ৫০৲ হারে কমিয়া যাইতে পারে। এ অবস্থায় ৬২৷৷০ টাকা মূল্যে সোনা দিয়া ১৫ বৎসর পরে ঐ টাকা পাইলে তাহার যথার্থ মূল্য হইবে হয়ত ৩০৷৷০ টাকা মাত্র।

অ.

প্রেম ও যুদ্ধ

ইংরেজী ভাষায় একটি কিম্বদন্তি আছে, যাহার অর্থ এই যে, প্রেমের ও যুদ্ধের আবর্ত্তে পড়িলে মানুষ যাহাই করুক না কেন, তাহাই উচিত ও ন্যায় বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। অর্থাৎ, প্রেমের ও যুদ্ধের উভয় অভিযানের পথই সত্যগতি সেই দিক দিয়া। ভুল পথ কিম্বা ঠিক পথ, ন্যায়ের পথ অথবা অধর্ম্মের পথ, এই জাতীয় বিচার প্রেম ও যুদ্ধের ক্ষেত্রে চলে না। সক্ষমতাই একমাত্র নীতি এবং উদ্দেশ্যসিদ্ধিই একমাত্র লক্ষ্য। বর্ত্তমান ভারতে যে প্রেম ও যুদ্ধের খেলা সম্প্রতি আমরা দেখিলাম, সেই খেলার আরম্ভ প্রায় এক যুগ পূর্ব্বে হইয়াছে। তখন চীন সাম্রাজ্য বিস্তারের প্রলোভনে পড়িয়া ন্যায় অন্যায়-বোধ রহিত ভাবে অকারণে তিব্বত দখলে প্রবৃত্ত হইল। চীনের যুদ্ধস্পৃহা জাগ্রত হইল সেই লোভের তাড়নায়। তিব্বত কোন সময়েই চীনের অংশ বলিয়া পরিগণিত হয় নাই। অতীতে কোন কোন সময় হয়ত চীনের সম্রাটগণেরা কেহ কেহ তিব্বত আক্রমণ করিয়া সেই দেশের উপর অল্পকালস্থায়ী প্রভুত্ব স্থাপনে সক্ষম হইয়াছিলেন। আবার কোন সময় তিব্বতের সম্রাটই হয়ত চীনের কোন কোন অংশ দখল করিয়া সে দেশে তিব্বতেরই সাম্রাজ্য বিস্তার করিয়াছিলেন। ভাষায়, কৃষ্টিতে, নৃতত্ত্বের বিচারে, খাদ্যে, বস্ত্রে, রীতি নীতিতে তিব্বতবাসী কখনও চীন দেশবাসীর সহিত এক হয় নাই। চীনের তিব্বত দখল নিছক সাম্রাজ্যবাদ ব্যতীত আর কিছু নহে। তিব্বতের ও ভারতের সীমান্ত পরস্পর সংযুক্ত। কিন্তু চীন কখনও সেই সীমান্ত কোথায় তাহা লইয়া বিবাদ সুরু করিতে পারে না। কারণ চীনের তিব্বত দখলই যে ক্ষেত্রে শুধু গায়ের জোরের উপর নির্ভরশীল, সেই ক্ষেত্রে তিব্বত সংক্রান্ত কোন তর্ক বা বিচার করিতে চীন ন্যায়ত অধিকারী নহে। কিন্তু যুদ্ধের নীতিতে সকল কিছুই ন্যায় এই কারণে চীনের যুদ্ধ করিয়া প্রমাণ করিতে হইল যে তাহার দাবীও ন্যায্য। ভারত ও চীনের মধ্যে যে সম্বন্ধ তাহা এখন যুদ্ধের হইলেও ১৯৫০ খ্রীষ্টাব্দে সে সম্বন্ধ অতি গভীর "প্রেমেরই" ছিল। সে প্রেম সত্য প্রেম ছিল কিনা তাহা আমরা বলিতে পারি না। কারণ অহেতুকি ও অকারণ মনোভাবও সত্যের প্রেরণায় হইতে পারে। ইহা ব্যতীত দেখা যায় যে, ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইতিহাস, বিজ্ঞান, ভাষাতত্ত্ব ভূগোল প্রভৃতি সকল কিছুই অগ্রাহ্য করিয়া সেই "প্রেম" জাগ্রত রাখিয়াছিলেন। তিব্বতকে তিনি চীনের অংশ বলিয়া নির্দ্ধারিত করিতে কোনও লজ্জা বা সঙ্কোচ অনুভব করেন নাই। অতএব তাঁহার চীনের প্রতি ভালবাসা সকল নীতি ও সত্যকে অতিক্রম করিয়াই প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ইহার দ্বারাই প্রমাণ হয় যে, সে প্রেমে কূটরাজনীতি-প্রণোদিত কোন মিথ্যা অভিনয়ের চেষ্টা ছিল না। আজ চীন-প্রীতি বেআইনী হইয়াছে ও চীন বন্ধু ভারত শত্রুদিগকে দেশ-ভক্তগণ বিশ্বাসঘাতক বলিয়া প্রমাণ করিয়াছেন। একদিন সেই চীন-প্রীতিই প্রবল বন্যায় দিল্লীর দরবারকে ভাসাইয়া লইয়া গিয়াছিল এবং "হিন্দী চীনি ভাই ভাই" ধ্বনিতে দিল্লীর রাজপথ মুখরিত হইয়া উঠিয়াছিল। "প্রেমের" নীতিতে তখন তিব্বত দখলকারী চীনকে ভারত প্রীতির চক্ষেই দেখিয়াছিল। তিব্বতের উপর এই অতি বড় অন্যায় ভারত স্বীকার করে নাই বরং মানিয়া লইয়াছিল। কারণ "প্রেম" সকল অন্যায়কে ন্যায় করিয়া তোলে ও সকল মিথ্যাকে সত্য বলিয়া গ্রহণ করিয়া লয়। এই খেলা শেষ হইল যখন চীন যুদ্ধের সাহায্যে নিজ দুর্নীতিকে আরও প্রবল ভাবে সুনীতির আসনে বসাইবার চেষ্টা করিল। বাকী যাহা মিথ্যা ও অন্যায় ছিল যুদ্ধের আগুনে পুড়িয়া তাহাও শুদ্ধ ও সত্য হইল। এবং সত্য মিথ্যা, ন্যায় অন্যায়, ধর্ম্ম অধর্ম্ম, ইত্যাদি সকল কিছুই নিজ নিজ পরস্পর বিরুদ্ধতা প্রেম ও হিংসার যুদ্ধ বিগ্রহে জ্বলিয়া পুড়িয়া হারাইয়া ফেলিল। চীন ও ভারতের রাষ্ট্র-নীতিতে প্রেমের অভিনয় করিয়া যে বর্ব্বরতার সমর্থন করা আরম্ভ হইল আজ যুদ্ধের আড়ম্বরের ভিতর দিয়া তাহা কদর্য্যতার চূড়ান্ত হইবে বলিয়া মনে হয়। আমরা জানি না চীনাদিগের রাষ্ট্রীয় মন্ত্র কি হইতে পারে চীনা ভাষায় "জয় জয় সত্যের জয়" অথবা ঐ জাতীয় কিছু।

অ.

৮ই সেপ্টেম্বর ১৯৬২

৮ই সেপ্টেম্বর ১৯৬২ তারিখটিকে আমাদিগের প্রধানমন্ত্রী মহাশয় বিশেষ করিয়া ক্রমাগত উল্লেখ করিয়া থাকেন চীনের ভারত আক্রমণ সূত্রে। ঐ তারিখে চীন প্রবল বিক্রমে ভারত আক্রমণ আরম্ভ করে ও তাহার যুদ্ধ প্রচেষ্টা যে সীমান্ত কোথায় তাহা নির্দ্ধারণ করার চেষ্টা মাত্র, এই মিথ্যার আশ্রয়ে সাম্রাজ্য বিস্তার করা চীনের পক্ষে আর সম্ভব রহিল না। যদিও চীন অদ্যাবধি তিন-চার লক্ষ আধুনিক অস্ত্রে সুসজ্জিত ও বিশেষ ভাবে শিক্ষিত সৈন্যদলকে সীমান্তরক্ষক বলিয়া প্রচার করিয়া চলিয়াছে এই আশায় যে, মিথ্যাকে ক্রমাগত আওড়াইয়া চলিলে তাহা শেষ পর্য্যন্ত সত্য হইয়া দাঁড়ায়। এই হিটলারী নীতি অবলম্বনে নিজের সমগ্র সমর-ব্যবস্থাকে সীমান্তরক্ষা বলিয়া

প্রচার করিয়া এবং অপর দেশের সকল সীমান্তকে অগ্রাহ্য করিয়া সারা পৃথিবীকে চীনদেশ বলিয়া মানচিত্রে দেখাইয়া চীন বিশ্বমানবের অবমাননায় পূর্ণরূপে আত্মনিয়োগ করিয়া চলিতেছে। একথা আমরা সকলেই জানি, কিন্তু বিভিন্ন কারণে আমাদিগের অনেকে চীনের এই বিশ্বগ্রাসী ন্যায়ধর্ম-বিরুদ্ধতার পূর্ণ প্রতিবাদ করিতে অনিচ্ছুক। চীন ভারতের সীমানা অতিক্রম করিয়া ভারতের ভিন্ন ভিন্ন এলাকা দখল করিতে আরম্ভ করিয়াছে ১৯৫৫ খ্রীষ্টাব্দ হইতে। ৮ই সেপ্টেম্বর ১৯৬২ তারিখের পূর্ব্বেই চীন ভারতের কয়েক সহস্র বর্গমাইল দখল করিয়া লইয়াছে। একথা সর্ব্বজনবিদিত হইলেও আমাদের প্রধানমন্ত্রী কেন যে ৮ই সেপ্টেম্বর ১৯৬২ তারিখে চীনারা যেখানে ছিল তাহাদিগকে মাত্র সেইখানে ফিরিয়া যাইতে বলিতেছেন, তাহা আমাদিগের বোধগম্য নহে। চীনাদিগকে বলা প্রয়োজন ভারত বলিতে বিশ্বের অধিকাংশ লোক যাহা বুঝে সেই সকল স্থান হইতে চীনাদিগকে সরিয়া যাইতে হইবে। আরও বলা প্রয়োজন যে, চীন দেশ বলিতে পৃথিবী-বাসী যাহা বুঝেন চীনাদিগকে সেই দেশের সীমানার ভিতরে বাস করিতে হইবে। নিজ দেশের সীমানার বাহিরে গিয়া শত শত বৎসরের পুরানো নজির দেখাইয়া অপর দেশ দখল করা চলিবে না। হান, টাং, মিং সুং প্রভৃতি বংশের সম্রাটদিগের পররাষ্ট্র দখলের ইতিহাস আওড়াইলে আধুনিক যুগের চীনাদিগের সেই সকল পূর্ব্বকালের সাম্রাজ্যবাদী চীনাদিগের জয় করা রাজত্বের উপর কোন অধিকার প্রমাণ হয় না। রাষ্ট্রীয় শৃঙ্খল হইতে জগৎবাসীকে মুক্তি দান করাই শুনা যায় কম্যুনিজম-এর একটা বড় উদ্দেশ্য। একথা যদি সত্য হয় তাহা হইলে চীনের অথবা রুশিয়ার কদাপি উচিত নহে অপরের দেশে নিজেদের প্রভুত্ব স্থাপন চেষ্টা করা। চীনের লোকসংখ্যা অতিশয় অধিক। তাহার সেইজন্য বিশেষ চেষ্টা পররাষ্ট্রের উপর নিজের অধিকার স্থাপন করার। কিন্তু সুবিধাবাদ ও কোনও একটা নীতি অবলম্বন করিয়া চলা—এক কথা নহে। এই কারণে চীনকে বাছিয়া লইতে হইবে যে, চীনারা কম্যুনিষ্ট না পরদেশ-লুণ্ঠনকারী মহাদস্যুদলরূপে বিশ্বে বিচরণ করিবে। সত্যকার কম্যুনিষ্ট হইতে হইলে লুণ্ঠনকার্য্য ছাড়িতে হইবে। এবং আমাদের প্রধানমন্ত্রী মহাশয়কেও বলা প্রয়োজন যে, তিনি যেন অযথা ৮ই সেপ্টেম্বর ১৯৬২ তারিখটি আওড়াইয়া চীনাদিগের সুবিধা করিয়া না দেন। চীনাদিগকে লুঠ করা সবকিছু ছাড়িয়া দিতে হইবে। তিব্বতের সীমানা বাড়াইবার জন্য যুদ্ধ করা ত বন্ধ করিতেই হইবে—তিব্বতদেশ ছাড়িয়া চীন দেশে ফিরিয়া যাইতে হইবে। অ

যুদ্ধ প্রস্তুতি

ভারত চীনের সহিত বৃহত্তর ভাবে যুদ্ধ করিতে ভবিষ্যতে বাধ্য হইতে পারে। এই ধারণা সর্ব্বজনসম্মত, এমন কি স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী নেহরুও এই কথা স্বীকার করেন। কিন্তু ভারতের যুদ্ধ প্রস্তুতি কি প্রকার চলিতেছে সে সম্বন্ধে বিশেষ কোন খবর জনসাধারণকে দেওয়া কেহ প্রয়োজন অথবা সমীচীন মনে করেন না। সম্ভবত শত্রুপক্ষ খবর জানিয়া ফেলিবে এই ভয়ে। ভারতের সর্ব্বত্র চীনের গুপ্তচর রহিয়াছে। পুলিস, গবর্ণমেন্ট এমন কি সমর-বিভাগেও চীনের গোয়েন্দা কাজ করিতেছে, বলিয়া জনসাধারণের বিশ্বাস। সুতরাং সকল যুদ্ধ ব্যবস্থার খবরই চীনারা পাইতেছে বলিয়া মনে হয়। এ অবস্থায় সাধারণকে যুদ্ধের ব্যবস্থার খবর আরও উত্তমরূপে জানাইলে তাহা অসঙ্গত হইবে বলিয়া মনে করার কোন কারণ নাই। বরঞ্চ তাহাতে লোকের মনে উৎসাহ বৃদ্ধি পাইবে। শুধু কত টাকা ও সোনা পাওয়া গিয়াছে দান হিসাবে এই কথা জানাইলেই যুদ্ধের ব্যবস্থার খবর সম্পূর্ণ হয় না। কারণ ঐ অর্থ ও স্বর্ণ কোনও দিক দিয়া দেখিলেই যথেষ্ট হইতেছে না। ঐ অর্থ ও স্বর্ণ দিয়া যুদ্ধ চালান সম্ভব নহে। অথচ ভারতের মন্ত্রীবর্গ ক্রমাগত সাধারণকে শুনাইতেছেন যে, তাঁহারা অর্থনৈতিক পরিকল্পনাগুলি মোতায়েন রাখিবেন, কেননা, যুদ্ধের জন্য তাহা চালাইয়া চলা প্রয়োজন ও যুদ্ধ জয়ে সেইগুলির দ্বারা সাহায্য হইবে। পরোক্ষভাবে কথাটা সত্য হইলেও সাক্ষাৎভাবে যুদ্ধ-প্রস্তুতি ও অর্থনৈতিক পরিকল্পনাগুলি এক জিনিস নহে। সুতরাং যদি ভারত সরকার পরিকল্পনাগুলি ভাল করিয়া চালান ও যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হওয়া একই কথা মনে করেন তাহা হইলে তাঁহাদিগের সহিত আমরা একমত হইতে পারি না। সাক্ষাৎভাবে যুদ্ধ প্রস্তুতির অর্থ হইল সৈন্য, অস্ত্র ও অপরাপর মালমশলা যথেষ্ট সংগ্রহ করা ও তাহা ব্যবহারের স্থান, রীতি ও ক্ষমতা শীঘ্র শীঘ্র গঠিত ও নিয়ন্ত্রিত করিয়া লওয়া। এই কার্য্য হইতেছে কি না ও কতটা হইয়াছে তাহা জানিবার অধিকার সাধারণের আছে। কারণ এই দেশটি সাধারণতন্ত্রের দেশ ইহা কোন বাদশাহী অথবা "ডিক্টেটরি" রাজ নহে। দেশের শাসন-কর্ত্তাগণ ভাবিতে পারেন যে, তাঁহারা দেশের একছত্র অধিপতি ও দেশবাসী তাহাদিগের অধীন প্রজা মাত্র। কিন্তু সে ধারণা ভুল। কারণ এদেশের লোক ততদিনই শাসন-পদ্ধতিকে উচিত মনে করিবে, যতদিন সে-পদ্ধতি মানব-স্বাধীনতা ও ব্যক্তিত্বকে মানিয়া চলিবে। সরকারী সকল বিভাগ হইতে কম্যুনিষ্ট বহিস্করণ, সরকারের প্রথম ও প্রধান কর্ত্তব্য। দ্বিতীয় কর্ত্তব্য, জনসাধারণের সহিত পরামর্শে সকল কার্য্য পরিচালনা। তাঁহাদিগের একচ্ছত্র শাসন-পদ্ধতির ফল আমরা পূর্ব্ব সীমান্তে চীনের আক্রমণের ভিতর দিয়া পাইয়াছি। সেই অপমান ও নিগ্রহের পুনরাবৃত্তি আমরা চাই না। সরকার ভাবিতে পারেন যে, ডিফেন্স অফ ইণ্ডিয়ার নামে সকল অক্ষমতার সাফাই হইবে ও অক্ষমতা কায়েম থাকিবে; কিন্তু সে বিশ্বাসের উপর তাঁহাদিগের নির্ভর করা বুদ্ধির কার্য্য হইবে না। তাহা হইতে শ্রেষ্ঠতর পন্থা সকল অক্ষমতা, অন্যায় ও দুর্ব্বলতাজাতক ব্যক্তি ও ব্যবস্থা সরকারী এলাকা হইতে সমূলে উৎপাটিত করিয়া এই মহাদেশকে সবল ও অজেয় করিয়া তোলা। অ.

৺রজনীকান্ত দাস

রজনীকান্ত দাস ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দে ঢাকার অন্তর্গত ডেমরাতে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি পরে কলিকাতায় পাঠের জন্য আগমন করেন ও ১৯০১-৫ সেইখানেই কলা ও বিজ্ঞান চর্চ্চা করিয়া আমেরিকা গমন করেন। আমেরিকায় তিনি দশ বৎসরকাল কৃষি-বিজ্ঞান, জীববিদ্যা, অর্থনীতি ও সমাজতত্ত্ব শিক্ষা করেন। ওহায়ও, মিসুরী, চিকাগো ও উইসকনসিন বিশ্ববিদ্যালয়ে এই শিক্ষাকার্য্য পূর্ণ হয়। তিনি কৃষি-বিজ্ঞানে বি. এস. (ওহায়ও), এম. এস. (মিসুরী), জীববিদ্যাতে এম, এ, (উইসনলসিন) ও পি, এইচ, ডি, অর্থনীতিতে (উইসকনলিন) পদবী লাভ করেন। পরে তিনি একটি কারখানাতে রাসায়নিকের কাজ করেন ও ১৯১৯-২০ খ্রীষ্টাব্দে অর্থনীতির অধ্যাপক নিযুক্ত হন নর্দ্ধার্ণ বিশ্ববিদ্যালয় (চিকাগো) ও নিউইয়র্ক বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৯২১-২২ খ্রীষ্টাব্দে তিনি ইউ, এস, সরকারের শ্রমবিভাগে কাজ করেন ও ১৯২৪-২৫ খ্রীষ্টাব্দে শান্তিনিকেতনে কর্ম্মে নিযুক্ত হন। ১৯২৫-১৯৪০ খ্রীষ্টাব্দে তিনি জিনিভাতে আন্তর্জ্জাতিক শ্রম প্রতিষ্ঠানের প্রধান অর্থনীতিবিদের কার্য্যে নিযুক্ত থাকেন ও পরে ইউ, এস, সরকারের কার্য্যে আমেরিকা ও সাউথ কোরিয়াতে কার্য্য করেন। (১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দ অবধি)। রজনীকান্ত দাস বহু মূল্যবান ও জ্ঞানগর্ভ পুস্তক রচনা করিয়াছিলেন। ইহা ব্যতীত তাঁহার লিখিত রিপোর্ট প্রভৃতিও অনেক আছে৷ যাহার উপরে বিভিন্ন গবর্ণমেন্টের কার্য্য-পদ্ধতি চালিত হইয়াছে। তিনি এসিয়াটিক রিভিউ, ইণ্টারন্যাশনাল লেবর রিভিউ, মান্থলি লেবর রিভিউ, মডার্ণ রিভিউ প্রভৃতি পত্রিকাতে নিয়মিত লিখিতেন। শ্রমিকদিগের বিষয়ে তাঁহার লিখিত পুস্তকাবলী বিশেষভাবে শ্রমনিয়ন্ত্রণে বিশ্বের সকল জাতিকেই সাহায্য করিয়াছে।

ডাঃ রজনীকান্ত দাস নিজের পাণ্ডিত্য বিশেষ করিয়া প্রচার করিতেন না কখনও। এই কারণে তাঁহার অসাধারণ পাণ্ডিত্য জনসাধারণের নিকট ততটা বিজ্ঞপ্ত হয় নাই। তিনি ভারতের এক বিশেষ কৃতী সন্তান ছিলেন এবং তাঁহার স্মৃতিরক্ষা করা ভারতবাসীর অবশ্যকর্ত্তব্য। বিগত ১৭ই আগষ্ট, ১৯৬২, ওয়াশিংটন জেনারেল হাসপাতালে তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে এবং এদেশে সেই খবর তাঁহার আত্মীয় শ্রীসুদর্শনচন্দ্র সাহা, এজেণ্ট, সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়া, খিদিরপুর ব্রাঞ্চ, কলিকাতা প্রাপ্ত হইয়া তাঁহার বন্ধু-বান্ধবদিগকে খবর জানান। রজনীকান্ত দাসের পত্নী শ্রীমতী সোনিয়া রুথ দাস বর্ত্তমানে আমেরিকাতেই রহিয়াছেন। তিনি নিজেও সুপণ্ডিতা তাঁহাকে আমরা আমাদিগের সমবেদনা জানাইতেছি। অ.

মধ্যশিক্ষা পর্ষদ্‌ বিল

১৯৫০ সনে যখন প্রথম মধ্যশিক্ষা পর্ষদ্‌ গঠিত হয় তখন সকলেই আশা করিয়াছিলেন যে, অভিজ্ঞ শিক্ষাব্রতীদের তত্ত্বাবধানে ও সহযোগিতায় এই রাজ্যে মাধ্যমিক শিক্ষা ব্যবস্থার দ্রুত উন্নতি হইবে। কিন্তু এই কয় বছরে দেখা গেল, ইহার ঠিক উল্টোটি হইয়াছে। অবস্থা এমনই দাঁড়াইল যে, চার বৎসর পার না হইতেই মধ্যশিক্ষা পর্ষদের গণতান্ত্রিক পরিচালনা-ব্যবস্থা পশ্চিমবঙ্গ সরকার বাতিল করিতে বাধ্য হন। ১৯৫৪ সনে মধ্যশিক্ষা পর্ষদ্‌ বাতিল হইবার পর হইতে এখন পর্য্যন্ত এই রাজ্যের মাধ্যমিক শিক্ষাব্যবস্থা পরিচালনা করিতেছেন গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক নিযুক্ত একজন 'অ্যাডমিনিষ্ট্রেটর'।

একটা কথা এখানে বলা প্রয়োজন, রাজ্যের লক্ষাধিক মাধ্যমিক ছাত্রছাত্রীর শিক্ষা ও পরীক্ষার ব্যবস্থা-পরিচালনার বহুবিধ জটিল ও গুরুতর দায়িত্ব একজন ব্যক্তির উপর স্থায়ীভাবে ছাড়িয়া দেওয়া যায় না—তিনি যত দক্ষ বা অভিজ্ঞ হউন না কেন। মধ্যশিক্ষা ব্যবস্থা পরিচালনার জন্য নূতন আইন প্রণয়ন ও পর্ষদ্‌ গঠনের প্রস্তাব তাই গত কয়েক বছর ধরিয়া ঝুলিয়া রহিয়াছে। ইতিমধ্যে মাধ্যমিক শিক্ষার নীতি ও লক্ষ্য এবং আদর্শ ও পদ্ধতি সম্পর্কে কেন্দ্রীয় সরকার এবং রাজ্য সরকার গঠিত বহু কমিটি ও কমিশন নানাবিধ আলোচনা ও সুপারিশ করিয়াছেন। ঐসব আলোচনা ও সুপারিশের ভিত্তিতে ১৯৫৭ সনে রাজ্যবিধান পরিষদে মধ্যশিক্ষা পর্ষদ্‌ সম্পর্কে একটি বিল গৃহীত হইয়াছিল। কিন্তু বিলটি বিধানসভায় উত্থাপন করা সম্ভব হয় নাই বলিয়া এখন নূতন বিল পেশ করা হইয়াছে।

এই নূতন বিলে বর্ণিত মধ্যশিক্ষা পর্ষদের গঠন-পদ্ধতি ও কার্য্যকরী ক্ষমতা সম্পর্কে বিরোধীপক্ষ হইতে কিছু কিছু আপত্তি উঠিয়াছে। শিক্ষাব্যাপারে প্রয়োজনমত পরামর্শদানের সুযোগ শিক্ষাব্রতীদের দেওয়া উচিত সন্দেহ নাই, কিন্তু পরিচালনা ব্যবস্থায় গণতান্ত্রিক ভিত্তিতে ভোটাভুটি ও নির্ব্বাচনের কলাকৌশল ঢুকিতে দিলে আবারও সেই পুরাতন রাজনৈতিক চক্রে গোলমাল বাধিয়া উঠিবে। প্রকৃত শিক্ষাব্রতী এবং শিক্ষা-বিশেষজ্ঞগণকে লইয়াই মধ্যশিক্ষা পর্ষদ্‌ গঠন করিতে হইবে তবেই ইহার সুরাহা হইতে পারে।

গোল বাধিয়াছে এই নূতন বিল পেশ লইয়া। বিরোধী দল বলিতেছেন, নূতন বিল অগণতান্ত্রিক ও বিকলাঙ্গ, আর কংগ্রেস পক্ষ বলিতেছেন, পর্ষদকে সম্পূর্ণ ক্ষমতা দেওয়া যায় না। বিলটিতে প্রস্তাবিত মধ্যশিক্ষা পর্ষদ্‌ এবং উহার সভাপতির ক্ষমতা ও কার্য্যপ্রণালী সম্বন্ধে এক জায়গায় বলা হইয়াছে, মধ্যশিক্ষার ব্যাপারে রাজ্যসরকার যে সমস্ত বিষয়ের উল্লেখ করিবেন সেইগুলি সম্পর্কে রাজ্যসরকারকে পরামর্শ প্রদান পর্ষদের কর্ত্তব্য।

গণতান্ত্রিক পদ্ধতি অনুসরণের অর্থ কখনই ইহা নয় যে, প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে উচ্চ-নীচ প্রতিটি স্তরেই ভোটাভুটির মারফত নির্ব্বাচনের ব্যবস্থা রাখিতেই হইবে। বিরোধী পক্ষেও কেহ কেহ ঢোক গিলিয়া স্বীকার করিয়াছেন যে, ব্রিটেনের শিক্ষা-ব্যবস্থা পুরোপুরি গভর্ণমেণ্টের কর্ত্তৃত্বাধীন। কাজেই মধ্যশিক্ষা পর্ষদের অধিকাংশ সদস্য গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক মনোনীত হইলেই উহা আমলাতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানে পরিণত হইল, এ অভিযোগ সম্পূর্ণ অবাস্তব।

সাময়িক প্রসঙ্গ

স্বর্ণ নিয়ন্ত্রণ আদেশ

কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী শ্রীমোরারজি দেশাই দেশের বর্ত্তমান জরুরী অবস্থা উদ্ভবের পূর্ব্ব হইতেই দেশের চোরাকারবারী ও বেআইনীভাবে স্বর্ণ-আমদানীকারক গোষ্ঠীদের হাতে সঞ্চিত বিপুল স্বর্ণভাণ্ডার দেশের আর্থিক উন্নয়নকল্পে লাগাইবার একান্ত প্রয়োজনীয়তার কথা বলিতেছিলেন। চীনা-আক্রমণজনিত দেশে জরুরী অবস্থা প্রবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে এই লুক্কাইত বিপুল স্বর্ণভাণ্ডার দেশরক্ষার জন্য কতটা জরুরী তাহা তিনি এবং তাঁহার সহযোগী অন্যান্য কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রনায়কের দল আরো বারেবারেই বলিয়াছেন এবং এই উপলক্ষ্যে প্রতিরক্ষা তহবিলে স্বর্ণ এবং অর্থদান যাচ্ঞা করিয়াছেন। দেশের জনসাধারণ এই আবেদনে সাড়াও দিয়াছেন প্রভূত উৎসাহের সঙ্গে। এ সাড়া আসিয়াছে প্রধানতঃ নিম্নবিত্ত ও নিম্ন-মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের নিকট হইতে। ইঁহারা স্বর্ণে ও অর্থে তাঁদের যথাসাধ্য দেশ-রক্ষার জন্য উজাড় করিয়া দিয়াছেন এবং দিতেছেন। উচ্চবিত্ত সম্প্রদায়ের নিকট হইতে স্বর্ণদান যে বিশেষ কিছু পাওয়া যায় নাই তাহার প্রমাণের অভাব নাই।

এই সম্প্রদায়ের নিকট হইতে দেশরক্ষার প্রয়োজনে স্বর্ণ বাহির করিয়া আনিবার জন্য কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী অন্য একটি উপায় অবলম্বন করেন। তিনি স্বর্ণের বিনিময়ে বার্ষিক শতকরা ৬।॰ টাকা সুদবাহী স্বর্ণবণ্ড বিক্রয়ের ব্যবস্থা করেন। এই অসাধারণ রকম উচ্চহারে সুদের প্রতিশ্রুতি সরকার পক্ষ হইতে তিনি দেন এই কারণে যে দেশের সোনার চলতি বাজার দর সেই সময়ে ছিল মোটামুটি সোনার দরের বিশ্বমানের তুলনায় প্রায় ডবল। স্বর্ণবণ্ডের বিনিময়ে সরকার যে সোনা গ্রহণ করিবেন তাহার দর নির্দ্ধারণ করা হয় এই বিশ্বমানের কিছুটা বেশী হারে, কিন্তু ভারতের বাজার দরের তুলনায় বেশ কিছুটা কম হারে। তাঁহাদের এই ক্ষতিপূরণ হিসাবেই স্বর্ণবণ্ড ক্রেতাদের এত উচ্চহারে সুদ দিবার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয় ইহা ছাড়াও মজুদ স্বর্ণের মালিকদের অন্য প্রলোভনও দেখান হয়। প্রথমতঃ প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয় যে যাঁহারা স্বর্ণবণ্ডের বিনিময়ে তাঁহাদের সঞ্চিত স্বর্ণ বাহির করিয়া দিতে প্রস্তুত হইবেন, তাঁহারা কি উপায়ে এই স্বর্ণ সঞ্চয় করিয়াছিলেন, চোরাকারবার দ্বারা বা বেআইনীভাবে বিদেশ হইতে স্বর্ণ আমদানী করিয়া বা অন্য কোন উপায়ে, সে প্রশ্ন সরকার কখনই করিবেন না। ইহা ছাড়াও স্বর্ণবণ্ডের বিনিময়ে যে সোনা সংগৃহীত হইবে তাহার উপরে সরকার তাঁহাদের ন্যায্য পাওনা আয়কর বা সম্পদকরও কখনও দাবী করিবেন না এই প্রতিশ্রুতিও দেওয়া হইয়াছিল। কিন্তু তৎসত্ত্বেও স্বর্ণবণ্ড খরিদের জন্য স্বর্ণসঞ্চয়ী ধনী সম্প্রদায়ের মধ্যে কোনই ব্যগ্রতা লক্ষিত হয় নাই। বস্তুতঃ এ পর্য্যন্ত স্বর্ণবণ্ডের দ্বারা সরকারী তহবিলে প্রায় কোন পরিমাণ সোনাই জমা হয় নাই।

ইহা যে হইবে না সে আশঙ্কা আমরা পূর্ব্বেই স্পষ্ট করিয়া ব্যক্ত করিয়াছি। যাহারা দেশের জনসাধারণের অসহায়তার সুযোগ লইয়া তাহাদের দেহধারণের সম্বল-গুলিকে পর্য্যন্ত বিম্বিত করিয়া নিজেদের মুনাফার অঙ্ক ফাঁপাইয়া তুলিতে দ্বিধা করে না, তাহারা যে দেশের বিপদের দিনে নিজেদের নীচ স্বার্থ ভুলিয়া গিয়া সহসা দেশপ্রেমিক হইয়া উঠিবে না, ইহা অনুমান করা কঠিন ছিল না। তাহা ছাড়া এই সকল সমাজবিরোধী মুনাফাখোর গোষ্ঠীর অনেকেই যে উচ্চরাজদরবারে, এমনকি কেহ কেহ রাষ্ট্র-নায়কদের অন্তরঙ্গমহলেও খাতিরের আসন পাইয়া থাকেন, তাহাতেও কোন সন্দেহের কারণ নাই। ইতিহাসে দেখা যায়, মানুষের সমাজে সমাজবিরোধী চোরাকারবারীর অস্তিত্ব সকল কালেই কিছু-না-কিছু পরিমাণে সকল দেশেই ছিল। কিন্তু স্বাধীনতার পর হইতে ভারতে এই সকল স্বার্থসর্ব্বস্ব সমাজদ্রোহী গোষ্ঠী রাষ্ট্রনায়কদের কৃপায় যে সামাজিক প্রতিষ্ঠার অধিকারী হইয়া উঠিয়াছে, তাহার তুলনা মনুষ্য-সমাজের পূর্ব্ব ইতিহাসে পাওয়া যায় না। বস্তুতঃ জরুরী অবস্থা প্রবর্ত্তনের পর প্রথম কয়েকটা দিন ইহারা হয়ত আশঙ্কা করিয়াছিল যে, এবার ইহাদের অন্যায়লব্ধ স্বর্ণ-ভাণ্ডারের উপরে সরকারী হস্তক্ষেপ অনিবার্য্য হইয়া পড়িবে। সেই সময়ের সংবাদপত্রে দেখা যায় যে দেশের সকল শহরেই সেফ্-ডিপোজিট ভল্টগুলিতে তখন সঞ্চয় উঠাইবার একটা

বিরাট্‌ ভীড় লাগিয়াছিল। এই আশঙ্কার কারণও ছিল। রাষ্ট্রের প্রয়োজনে ব্যক্তিগত স্বর্ণসঞ্চয়ের উপরে হস্তক্ষেপ করিবার উদাহরণ ইহার পূর্ব্বেই ব্রহ্মদেশে জেনারেল নে উইন স্থাপন করিয়াছিলেন। কিন্তু দুই-চারিদিনের মধ্যেই দেশের স্বর্ণ-ভাণ্ডারীরা নিশ্চিন্ত হয়ে যান যে ভারতের বর্ত্তমান রাষ্ট্র-নেতাদের অনুরূপ কার্য্যকরী ব্যবস্থা অবলম্বনের কোনপ্রকার সুঅভিসন্ধি একেবারেই নাই। থাকিলে দেশে জরুরী অবস্থা প্রবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গেই অর্থমন্ত্রী দেশের সকল সেফ ডিপোজিট আটক ও তাহাতে সঞ্চিত স্বর্ণভাণ্ডার (অলঙ্কারাদি ব্যতীত) সরকারী তহবিলে জমা দিতে বাধ্য করিতে পারিতেন। তাহা হইলে দেশরক্ষার জরুরী অবস্থায় প্রয়োজনীয় স্বর্ণ সঞ্চয় সম্ভব ও সহজ হইত।

এক্ষণে নানাপ্রকার নিরর্থক প্রচেষ্টার পর কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী দেশরক্ষা আইনের বলে স্বর্ণনিয়ন্ত্রণ আদেশ জারী করিয়াছেন। এই আদেশের বলে একমাত্র অলঙ্কারাদি ব্যতীত, অন্য সকল প্রকারে সঞ্চিত স্বর্ণের হিসাব দেশের সকলে সরকারের নিকট দাখিল করিতে বাধ্য হইবেন। এই হিসাবের বাহিরে কেহ কোন স্বর্ণ রাখিলে তাহা বেআইনী ও দণ্ডনীয় হইবে। গত ৯ই জানুয়ারী তারিখে এই আদেশ জারী হইয়াছে এবং একমাসের মধ্যে ইহার বাধ্যতামূলক সর্ত্তগুলি সকলকে পূরণ করিতে হইবে। স্বর্ণের সকল কারবারীরাও এই আদেশের আওতায় পড়িবে এবং ভবিষ্যতে সোনার গহনা প্রস্তুত করিতেও ১৪ ক্যারেটের অধিক স্বর্ণমূল্যের গহনা প্রস্তুত করা বেআইনী করিয়া দেওয়া হইয়াছে। বেতার মারফৎ অর্থমন্ত্রী এই নূতন স্বর্ণনিয়ন্ত্রণ আদেশের তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করেন। তিনি যাহা বলেন তাহার মর্ম্মার্থ এই যে, (১) স্বর্ণ আমদানী বহু বৎসরযাবৎ বেআইনী হওয়া সত্ত্বেও দেশের আভ্যন্তরীণ স্বর্ণ লেনদেন বিষয়ে কোন নিয়ন্ত্রণবিধি অবলম্বিত হয় নাই। ইহার ফলে বেআইনীভাবে বিদেশ হইতে প্রভূত পরিমাণ স্বর্ণ এদেশে প্রবেশ করিতে থাকে। এই অবস্থাটিকে আর উপেক্ষা করা সম্ভব নয় এবং বর্ত্তমান আদেশের বলে যাহার কাছেই যতটুকু সোনা থাকিবে তাহার হিসাব সরকারে দাখিল করিতে হইবে, এই আদেশ সকল প্রকার স্বর্ণ-কারবারীদের উপরেও বলবৎ থাকিবে। (২) একবার এই হিসাব দাখিল করা হইলে নূতন স্বর্ণসঞ্চয় কে কিভাবে করিতেছেন তাহার হিসাবও স্পষ্ট করিয়া প্রত্যেককে দাখিল করিতে হইবে এবং তাহার ফলে বেআইনী স্বর্ণ আমদানী বন্ধ করা সম্ভব হইবে। (৩) এই সাপক্ষে তিনটি ব্যবস্থা অবলম্বনের কথা তিনি বলেন, যথা—(ক) এই আদেশ দ্বারা একমাত্র লাইসেন্সপ্রাপ্ত কারবারী ছাড়া কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের পক্ষেই এক গহনা প্রস্তুতকরণের দ্বারা বা উত্তরাধীকারসূত্রে ব্যতীত নূতন স্বর্ণসঞ্চয় করা বেআইনী বলিয়া ধার্য্য হইবে, (খ) এই আদেশ জারী হইবার পর সঞ্চিত গহনা ভাঙ্গাইয়া প্রস্তুত বা নূতন সোনার গহনা ১৪ ক্যারেট স্বর্ণমূল্যের অধিক হইবে না, এবং (গ) ভবিষ্যতে গহনা ব্যতীত অন্য কোন সোনার জিনিষ প্রস্তুত করা বেআইনী বলিয়া ধার্য্য হইবে। (৪) কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী আরও বলেন যে, স্বর্ণের অপ্রতিহত চাহিদার ফলে দেশের পুঁজি সংস্থানের উপরে যে অপঘাত সৃষ্টি হইয়াছে ইহাকে আর উপেক্ষা করা সম্ভব নহে। এই আদেশের দ্বারা এই অন্যায় চাহিদাকে প্রশমিত করা যাইবে।

এই আদেশ উপযুক্তভাবে কার্য্যকরী করিবার ভার একটি নবনিযুক্ত স্বর্ণনিয়ন্ত্রণ বোর্ডের উপরে অর্পণ করা হইয়াছে। এই বোর্ড প্রতিমুহূর্ত্তে দেশের স্বর্ণভাণ্ডারের অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করিবেন এবং প্রয়োজনবোধে অতিরিক্ত বিধান প্রবর্ত্তন করিবার ক্ষমতা ইহার থাকিবে।

আমরা অর্থমন্ত্রীর এই নূতন আদেশের সকল সর্ত্ত ও মন্ত্রীমহাশয়ের ব্যাখ্যা সতর্কতার সহিত অনুধাবন করিয়াছি। কিন্তু ইহার দ্বারা যে আশান্বিত সুফল ফলিবে এমন ভরসা আমাদের হয় না। যে সময়ে যে ব্যবস্থা অবলম্বন করিলে এই সুফল পাওয়া যাইবার আশা ছিল বলিয়া আমরা মনে করি, সে ব্যবস্থা অর্থমন্ত্রী জানিয়া-শুনিয়াই গ্রহণ করেন নাই বলিয়া আমাদের বিশ্বাস। গত দুই-তিন মাসে দেশের স্বর্ণভাণ্ডারীর দল তাঁহাদের অন্যায়ভাবে সঞ্চিত স্বর্ণ সকল প্রকার সরকারী হস্তক্ষেপের আশঙ্কা হইতে সুরক্ষিত করিয়া রাখিবার ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে সমর্থ হইয়াছেন বলিয়াই আমাদের ধারণা। যাহারা তাহাদের সঞ্চিত সম্পূর্ণ স্বর্ণ-ভাণ্ডারের হিসাব সরকারে দাখিল করিবে না, বর্ত্তমান আদেশের দ্বারা তাহাদের কিভাবে ইহা করিতে বাধ্য করা হইবে তাহা আমাদের বুদ্ধি ও কল্পনার অতীত। কেবলমাত্র যাহা হইবে তাহা এই যে দেশের যে সম্প্রদায়ের নিকট সামান্য পরিমাণ সঞ্চিত স্বর্ণালঙ্কার তাহাদের পরিবারের একমাত্র জীবনবীমা, তাহারাই পদে পদে ক্ষতিগ্রস্ত ও সরকারী জুলুমের পাত্র হইবে। দেশদ্রোহী স্বর্ণভাণ্ডারীরা যথাপূর্ব্ব সরকারী হস্তক্ষেপ হইতে তাহাদের লুক্কাইত সঞ্চয় অনায়াসেই রক্ষা করিয়া যাইবে।

দেশরক্ষার জন্য স্বর্ণের প্রয়োজন জরুরী। কিন্তু আমাদের সরকারী নায়কেরা সকল ব্যাপারেই যেমন করিয়া থাকেন, এ ব্যাপারেও তাঁহাদের গাফিলতির দ্বারা ইহার সম্ভাব্য পরিণতিকে কণ্টকিত ও বিঘ্নিত করিয়া তুলিয়া অবশেষে এমন একটা ব্যবস্থার প্রবর্ত্তন করিলেন তাঁহার দ্বারা কোন সুফল ফলিবার সম্ভাবনা সুদূরপরাহত।

করুণাকুমার নন্দী

পুনর্ভ্রাম্যমাণ

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

শ্রীদিলীপকুমার রায়

সেবার আমি কাশ্মীর গিয়েছিলাম—১৯৩৮ সালে—অক্টোবর মাসে। কাশ্মীরে আমার গানের ছাত্রী প্রতিভাময়ী ৺উমা বসুকে গণ্ডোলায় গান শেখাতাম দিনের পর দিন। ফিরে এলাম কাশ্মীর থেকে একাই। একটি ছোট শহরে জিরুতে নামলাম বাংলার উপান্তে। মন খারাপ ছিল আমার কন্যোপমা কিন্নরকণ্ঠী স্নেহ-পাত্রীকে ছেড়ে এসে। এমন অপরূপ ভঙ্গিতে আমার গান অতীতে কেউ কখনও গায় নি—মনে প্রশ্ন উঠছিল কেবলই ভবিষ্যতে আর কেউ কখনও গাইবে কি না? আমার এক সঙ্গীতজ্ঞ বন্ধু বলেছিলেন একবার, যে যেহেতু উমার মত কণ্ঠ ও প্রতিভা বিনা দৈলিপী গানের প্রচার সম্ভব নয় সেহেতু দৈলিপী গানের ভবিষ্যৎ অন্ধকার। একথা ভাবি আর মন খারাপ হয়ে যায়। এত সুন্দর সুন্দর গান বাঁধলাম, সুর বসালাম—কেউ কখনও গাইবে না? স্বীকৃতির লোভ যে মরিয়া না মরে রাম, জান ত হাড়ে হাড়ে! গীতার নিষ্কাম কর্মের আদর্শ—ফলাকাঙ্ক্ষাকে বরখাস্ত ক'রে কর্ম ক'রে যাওয়া—মুখে বলা সহজ, কাজে করতেই যা প্রাণান্ত পরিচ্ছেদ। তাই বিষণ্ণ মনে গ্রামটির ক্ষীণস্রোতা নদীতীরে এক গাছের তলায় ব'সে পুরবী সুরে গান বাঁধছি এমন সময়ে দেখা এক মুসলমান কৃষাণের সঙ্গে। কাহিনীটি লিখেছিলাম সেদিনই একটি কবিতায়—

গাছের তলায় গান বাঁধছি উদাস মনে—
এমন সময় কাছে
বসল এসে মুসলমান এক কৃষাণ।
বিরাগ জাগে মনের মাঝে।
চেয়ে দেখি—সাদা দাড়ি, মাথারও চুল
সবই পাকা তার,
অর্ধনগ্ন দেহখানি শীর্ণ, মুখে ভাঙা দাঁতের সার।
ছোট্ট বুকের হাড়গুলি যায় গোনা,
ঠোঁটে কোমল হাসির রেশ,
দৃষ্টি নরম। অনুতাপে শুধাই—"মিঞা!
এই কি তোমার দেশ?"

—"হ্যাঁ, স্বামীজী। কাশিম আলি—ডাকে সবাই।"
—"কি চাও?"—"কি চাই? মানে?"
এম্‌নি এসে কাছে-বসার ভাষ্য—
কিছু চাওয়া, সে কি জানে?
কয় না কথা…অবাক্ হয়ে চেয়ে থাকে,
পরে বলে—"আজ
মুখ দেখে কার উঠেছিলাম।
পেলাম দেখা সাধুর, মহারাজ।"
কথায় কথায় উঠল আলাপ জমে,
মাথার উপর ডালে ডালে
পাতায় পাতায় কী অপরূপ সঙ্গৎ ওঠে বেজে
তালে তালে।
"কৃষাণ আমি, গরিব। ভিটে তিন পুরুষের।
সাতটি ছেলে ছিল—
একটি শুধু রইল, বাকি দিয়ে আল্লা
আবার কেড়ে নিল।"
সামলে চোখের জল, বলে সে—
"শক্ত মাটি, দিই না চাটাই পেতে?"
—"দরকার নেই ভাই, বল না কি বলছিলে?"
—"চান কি তামাক খেতে?"
—"ওসব নেশা সে করে কি মশগুল যে
গানের নেশায়?"—"গান।
একটি শোনান, লক্ষ্মীটি। গাই আমিও, ঠাকুর।
একটি গান শোনান।"
গাইলাম আমি রামপ্রসাদী।
ফুটল মুখে তার কি মিষ্টি হাসি।
গাইল সেও বাউল আমার অনুরোধে—
সাঁই পীর উচ্ছ্বাসী।

চিকিয়ে ওঠে জল চোখে তার,
বলল কাশিম আলি! "কেমন ক'রে
করব আমি হায় রে খাতির? গরিব আমি—
কিছুই যে নেই ঘরে।

আপনি অতিথ দেবতা।" আমি বলি—
"যদি চাও খাওয়াতে—তবে
দাও এক গেলাস জল।" সে অবাক্ হয়ে তাকায়
হিন্দু সাধু কবে
মুসলমানের জল খেতে চায় ?
এক দৌড়ে কুঁড়ের গেল চ'লে।
মনটা আমার ওঠে ভরে···
মেঘলা ব্যথা গেছে কখন গ'লে।
"যার নেই ঘর তার নেই পর—"
গুনগুনিয়ে গাইছি, হঠাৎ দেখি
হাসিমুখে সাম্‌নে কৃষাণ। হাতে লোটা।
বললাম আমি—"এ কি ?
দুধ এ যে ভাই ?"—"কোথায় ? জোলো মিছরি
পানা, এক ফোঁটা দুধ, খান
এক চুমুকে, রুটি ও গুড় দিতে নারি—
আমরা মুসলমান,
তাই বাসি ভয়। কেবল মনে হয়—
দেখুন এ অন্ন ত নয়, খেয়ে
নিন স্বামীজী। ভুখা আছেন নিশ্চয়ই।"
সে স্নিগ্ধ হাসে চেয়ে।

মনে হ'ল সুধার পাত্র! এমন সরল দরদভরা প্রাণ!
কত দিনের চেনা যেন! জাত, শিক্ষা, কেতাব,
খেতাব, মান—
সব ভেসে যায়—মুখোমুখি দাঁড়িয়ে শুধু
স্বামীজী আর চাষা!
শুভদৃষ্টি কে ঘটালো ? না, নয় মুখের,
এ যে বুকের ভাষা।
"আজ উঠি ভাই ?"—"যাবেন কতদূর স্বামীজী ?
ধূপ যে বেজায় কড়া,
তালপাতার এই ছাতাটি নিন।"—"না, না,
আমার মাথায় টুপী পরা।
দুধ এ তোমার নয় ত—এ যে চাঙ্গী-করা
সর্বৎ সুধার।
শান্তি যেন পাও ভাই! না দেখা যদি হয়
আমাদের আর—
তোমার জন্যে করব আমি প্রার্থনা।"
সে ধরা গলায় বলল—"ঠাকুর, করি
প্রণাম—না না প্রণাম বৈকি।
যে সাধু সেই পীর, আল্লা, হরি।
কেবল ঠাকুর, একটি আর্জি—
একটি ছবি চাই আপনার আমি।"
—"পাঠিয়ে দেব আজই—না, না,
আমারও ত চাই দেওয়া সেলামি।"

সোনার আলোর হরিণ ছোটে
মেঘের ধূসর বনে রঙিন রাগে···
ছোট্ট নদী বাজিয়ে নূপুর চলে উধাও···
পথের প্রতি বাঁকে
লতা নাচে, পাতা দোলে, ফুল হাসে ঐ···
এ কি ? কোথায় ব্যথা ?
কার সে ছোঁয়ায় ছায়ার মতই মিলিয়ে গেছে।···
নিটোল কৃতজ্ঞতা
বেজে ওঠে বুকের বীণায়।···একলা কে নয় ?
তবু পথের ধারে
এম্‌নি দরদ ভরা প্রাণের প্রদীপ জ্বালে
কে সে অন্ধকারে ?

ঘটনাটি আমার কাছে অঘটনের মত ঠেকেছিল ব'লেই আমি সেদিন এ কবিতাটি লিখে রেখেছিলাম বাড়ী ফিরেই। কোথায় কে এক নাম-না-জানা অশিক্ষিত মুসলমান কৃষাণ—আর কোথায় আমি যোগদীক্ষিত, সংস্কৃতি-পঠিত, তত্ত্বজিজ্ঞাসু, কবি, গায়ক, সুরকার···অথচ মুহূর্তে কি ঘ'টে গেল, এক মুহূর্তে—বল ত! সে বলল আমাকে তার জীবনের কত সুখদুঃখের কথা—তার পরে প্রণাম করা, আদর যত্ন করা, এ মনোবৃত্তি আমাদের শিক্ষিতদের মধ্যে কমলেও অশিক্ষিতদের মধ্যে কমে নি আজও—কি হিন্দু, কি মুসলমান। তাই ত আলাউদ্দীন খাঁ যে আমাকে ও ইন্দিরাকে গড় হয়ে প্রণাম করলেন, সে প্রণাম তো আমাদের উদ্দিষ্ট নয়, সে প্রণাম প্রতীকেরই প্রাপ্য—যার নাম সাধু। বললাম: "খাঁ সাহেব! আমাকে মনে আছে, না ভুলে গেছেন ?" পরিষ্কার বাঙাল বাংলায় বললেন তিনি হেসে: "ভুলব কেন ? আমি কি পশু ?" আমি বললাম: "আপনার কাছে শিখেছিলাম আপনারই একটি নবরচিত রাগ—'হেমন্ত'—মনে পড়ে ?" খাঁ সাহেব হেসে বললেন: "না। ভুলে গেছি। এত বয়সে কি আর মনে থাকে সব কথা ?" আমি বললাম: "আমার কাছে কতবার শ্যামাসঙ্গীত গেয়েছেন মনে আছে, না তাও ভুলে গেছেন ?" খাঁ সাহেব স্নিগ্ধ হেসে বললেন: "মা-র নাম কি ভোলা যায় ?"—ব'লেই গুন গুন ক'রে ধরলেন রামপ্রসাদী:

"মা আমায় ঘুরাবি কত? চোখবাঁধা বলদের মত?"

আমি বললাম: "আপনার আশীর্ব্বাদ চাইতে এসেছি। কারণ আপনার কাছে শুধু যে হেমন্ত রাগ শিখেছি তাই নয়—আরও কত কি শিখেছি ছন্দ তাল মীড় গমক সুরের প্রাণের কথা। কত আনন্দই যে পেয়েছি আপনার গানে! লক্ষ্ণৌয়ে একদিন পণ্ডিত বিষ্ণুনারায়ণ ভাতখণ্ডে, অতুলপ্রসাদ ও আমি তিনজনে কি মাথাই না নেড়েছিলাম স্বরোদে আপনার একটি পুরিয়া আলাপ শুনে। একথা আজও মনে আছে আরও এইজন্যে যে, আপনার পুরিয়া আলাপ শুনবার আগে আমি বলতাম—পুরিয়া রাগ পুরবীর মতন মধুর নয়। আপনি আমার মত বদলিয়ে দিয়েছিলেন ঝাড়া এক ঘণ্টা ধ'রে পুরিয়া রাগের সুধাবৃষ্টি ক'রে।"

খাঁ সাহেব বললেন: "আপনি গুণী, তাই আমাদের সামান্য বাজনারও এত কদর করেন। কারণ আমাদের গানবাজনা এমন কি বলুন? আমরা গাই মানুষের জন্যে—আপনার ভজন দেবতার জন্যে..." ইত্যাদি।

ওখানে তাঁর নাতি আশীষ খাঁর স্বরোদ শুনেও মুগ্ধ হ'লাম। খাঁ সাহেব তার ঘাড় ধ'রে বললেন: "প্রণাম কর্ রে সাধুজীকে—তোর বাজনা এঁর ভালো লেগেছে।" ব'লেই আমাকে: "আপনি একে আশীর্বাদ করুন।"

এমনি শ্রদ্ধাভক্তির মাখন দিয়ে গড়া মনটি খাঁ সাহেবের। যেমন উদার তেমনি স্নেহশীল। মনে হ'ল—শুধু এই একটি মানুষের দেখা পেতেই ভূপাল আসা সার্থক।

ভূপালে শরণরাণী মাথুর নামে খাঁ সাহেবের এক শিষ্যার স্বরোদ শুনে আরও চমকে গেলাম। ভালো সেতার ও বীণা বাজানো মেয়েদের পক্ষে কঠিন নয়। কিন্তু স্বরোদে প্রচুর দেহশক্তি চাই। তাই শরণরাণী যখন সুরু করলেন, তখন ভাবলাম: কীই বা এমন বাজাবে স্বরোদ! মেয়েছেলে তো! কিন্তু ভদ্রমহিলা শুধু যে একটানা দেড় ঘণ্টা বাজালেন তাই নয়—কি অপরূপ রাগালাপ ও ঝংকারের ঝর্ণাই যে বইয়ে দিলেন কি বলব! মনে হ'ল সঙ্গীত জগতে একটি নব তারকার অভ্যুদয় হয়েছে—বটে। কেবল দুঃখ হ'ল ভাবতে—হয়ত এঁকে সিনেমায় বহাল করবে ডিরেক্টররা মোটা মাইনে দিয়ে। ফলে টাকা হবে অবশ্য, কিন্তু সঙ্গীতের হবেই হবে ভরাডুবি। প্রার্থনা করি—যেন শরণরাণী টাকার চেয়ে সঙ্গীতকেই বেশী বড় মনে করতে পারেন—তাঁর সঙ্গীতপ্রীতিই যেন হয় তাঁর রক্ষাকবচ।

ভূপালে রবীন্দ্রসদনে প্রথম দিন আমার গান করবার কথা ছিল রবীন্দ্রভবন উদ্বোধন উপলক্ষ্যে। লোকে টিকিট ক'রে এসেছিল সেই জন্যেই হয়ত—বলতে পারি না। যেটা বলতে পারি সেট এই যে, প্রথম দিনের আসরে রবীন্দ্রভবনের উদ্বোধন হোক বা না হোক, হয়েছিল কেবল আমারই গান—আর কারুর নয়।

গাইলাম প্রথমে আমরা দুজনে মিলে "ন তাতো ন মাতা"—শঙ্করাচার্যের ভবানী স্তোত্র। তার পর ইন্দিরাতে আমাতে গাইলাম একটি মীরাভজন। সবশেষে আরও একটি মীরাভজন। প্রায় দেড়ঘণ্টা গান হ'ল। পরদিন মধ্যপ্রদেশ ক্রণিকল্ লিখল: "Sri Dilip Kumar sang devotional songs for about ninety minutes. Though 66 years of age, his voice still has the quality of enthralling the audience..." ইত্যাদি।

কিন্তু এ প্রশংসায় মন খুশী হলেও তেমন ভ'রে ওঠে নি যেমন উঠেছিল পরদিন খাঁ সাহেবের সামনে রবীন্দ্রভবনে গান গেয়ে। তাঁকে ধরাধরি ক'রে প্রেক্ষাগৃহে এনে মঞ্চে বসানো হ'ল। হুমায়ুন কবীর, রাজ্যপাল, শিক্ষামন্ত্রী প্রভৃতি সবাই তাঁর গুণগান করার পর আমি বললাম প্রায় বিশ-পঁচিশ মিনিট ধ'রে খাঁ সাহেবের সঙ্গীত-প্রতিভার কথা। শেষে বললাম: "খাঁ সাহেবের কাছে বহু বৎসর আগে তাঁরই রচিত একটি নতুন রাগ শিখেছিলাম, নাম—'হেমন্ত'। সেই থেকে জয়দেবের বিখ্যাত 'চন্দন-চর্চিত-নীল-কলেবর' পদাবলীটি এই রাগেই গেয়ে আসছি সর্বত্র। বিখ্যাত কথকালি নট গোপীনাথ আমার এই গানের সঙ্গে শুধু নিজে নাচা নয়, ইন্দিরাকে নাচতে শিখিয়েছিলেন।"...ইত্যাদি।

ব'লে গাইলাম এ গানটি এবং পিতৃদেবের "আমার জন্মভূমি"—বাংলায়, হিন্দিতে, ইংরাজী ও সংস্কৃতে। আলাউদ্দীন খাঁ শুনতে শুনতে এত চোখের জল ফেলেছিলেন যে পরদিন ভূপালের একাধিক সংবাদপত্র লিখেছিল যে, দিলীপকুমারের গান শুনে খাঁ সাহেবের গাল বেয়ে অবিশ্রান্ত চোখের জল ঝরেছিল।' আমার গানের এর চেয়ে বড় পুরস্কার আর কী হ'তে পারে?

কিন্তু ভূপালে সবচেয়ে ভাল লাগল কাকে শুনবে?—এক ভক্তমণ্ডলীকে। এরা বিশ-পঁচিশ জন নরনারী এসে আমাকে বলল যে, রবীন্দ্রভবনে টিকিট ক'রে আমার গান শুনতে যাবার সঙ্গতি তাদের নেই। অথচ ইন্দিরা দেবীর ভজনাবলী প'ড়ে তারা মুগ্ধ। রবীন্দ্রভবনে পর পর দু'দিন তারস্বরে গেয়ে দেহ ক্লান্ত থাকা সত্ত্বেও এদের ভক্তি দেখে মন ব'লে উঠল: "কুছ পরোয়া

নেই, আমি চাঙ্গা আছি।" ফের ধরলাম মীরাভজন। গান শুনে তাদের সকলেরই চোখে জল—আমারও। একজনের প্রায় দশা হবার উপক্রম। তার পর তাদের কুটিরে গেলাম। দরিদ্রের কুটির—কিন্তু পাড়ার সবাই এল সে যে কি আগ্রহ নিয়ে!—আমার ও ইন্দিরার কপালে দিল তিলক, বাজাল শাঁখ, গাইল নামকীর্তন, ছড়ালো গঙ্গাজল—কী না করল তারা? আনন্দ যেন ধ'রে রাখতে পারে না দরিদ্র আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা। মনে মনে ঠাকুরকে প্রণাম করলাম: "ঠাকুর! কাল দেখালে শিক্ষিত সমাজের সভ্য, সংযত অভিনন্দন, আজ পেলাম ভক্তদের বরণমালা। এ স্বতঃস্ফূর্ত আত্মহারা অভিনন্দনের কাছে কালকের সম্মান দাঁড়ায় কি?"

পরদিন ৮ই সন্ধ্যায় রওনা হলাম দিল্লী। ৯ই সন্ধ্যায় গাইলাম দিল্লীর রামকৃষ্ণ মিশনের বিরাট লাইব্রেরি হ'লে। প্রায় সাত-আটশো শ্রোতা এসেছিল টিকিট করে ৫৲, ৩৲ ও ২৲। স্বামী স্বাহানন্দ লিখেছিলেন: ভিড় সামলানোর জন্যেই টিকিট করতে হবে—এবং টিকিটের টাকাটা স্বামীজীর জন্ম শত-স্মৃতি-বার্ষিকী উৎসব তহবিলেই জমা হবে।

হল্ পুরোপুরি ভরেনি ব'লে স্বামীজী সকুণ্ঠে বললেন: "আজ বিজয়া দশমী ব'লে বাঙালীদের অনেকেই আসতে পারেন নি।"

যাই হোক রামকৃষ্ণ মিশনে প্রথমে গাইলাম আমার রচিত শ্রীরামকৃষ্ণ বন্দনা:

তোমাকে প্রণাম চির অভিরাম শ্রীরামকৃষ্ণ যুগাবতার,
শয়নে স্বপনে জীবনে মরণে মা বিনা যে কিছু জানে নি আর।

তারপরে এর অনুবাদ গাইলাম সবাই মিলে কোরাসে—আমাদের মার্কিন শিষ্যযুগল যোগ দেওয়ার ফলে কোরাস জমেছিল বৈকি:

O pinnacle spirit of our age, O Mother Kali's deputy
And darling son, who hailedst her as thy All-in-all, we bow to the.

তারপরে গাইলাম ঐভাবে স্বামীজীর বন্দনা:
অন্নের পথ বিদায়ে বাজায়ে ত্যাগের শঙ্খ, বিবেকানন্দ!
দিলে তাহাদের দিব্য নয়ন ছিল যারা মোহ বাসনা-অন্ধ।

ইংরাজীতে:

Thou sangst, Vivekananda; "Mother India calls, how can you sleep?
A truce to crawling in coward fear!
Awake, arise love's troth to keep."

এতে একটা সুফল ফলল এই যে, বেশির ভাগ শ্রোতাই বুঝতে পারল গানদু'টির ভাবার্থ—কারণ বাঙালীর চেয়ে অবাঙালীই এসেছিল সেদিন বেশি—হয়ত অবাঙালীরা বিজয়া দশমীর জন্যে ব্যস্ত হয় না ব'লে—জানি না। জানি শুধু এইটুকু যে, রামকৃষ্ণ মিশনের পুণ্য আবহে শ্রীরামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দের তর্পণ করতে না করতে মন ভরে উঠল। তারপরে গাইলাম একটি মীরা-ভজন, পিতৃদেবের পতিতোদ্ধারিণী গঙ্গে ও সবশেষে কমলাকান্তের বিখ্যাত কালীকীর্তন "মজল আমার মন-ভ্রমরা কালীপদ নীলকমলে"—শ্রীরামকৃষ্ণদেবের প্রিয় গান। কাগজে লিখল: "শ্রোতারা শুনল পিন-পড়া নৈঃশব্দ্যে গভীর ভক্তিভাবের আবেশে..." ইত্যাদি।

এর পরের দিন গান গেয়েছিলাম রাষ্ট্রপতি ভবনে আমাদের্য বরেণ্য লোকপাল শ্রীল সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণনের সামনে। এ প্রখ্যাত মনীষীর কথা অনেক দিন থেকেই কিছু লিখব ভাবছি কিন্তু হয়ে ওঠে নি প্রধানতঃ এই জন্যই যে, তাঁর সঙ্গে আমার প্রীতি-পরিচয় বহু বৎসরের হলেও হৃদ্যতার সম্বন্ধ গ'ড়ে উঠেছে সম্প্রতিই বটে, কি ভাবে—বলি। সংক্ষেপেই বলব।

তুমি জানো আমার "তীর্থংকর" বইটির অনুবাদ আমি প্রকাশ করেছি Among the Great নাম দিয়ে এবং এও জানো যে, এ বইটি প্রকাশ হবার পরে বাংলা দেশে বিশেষ কেউ আনন্দ প্রকাশ করে নি তোমার মতন কয়েকটি দরদী গ্রহীতা ছাড়া। এরও সেই একই কারণ, মহাজনের মহত্ত্বের কাহিনীতে বংলা দেশের পাঠক-পাঠিকার মন তেমন সাড়া দেয় না: মহাজনেরা ভালো লোক হবেন এত জানা কথাই—তাঁদের কথা আবার শুনব কি? যাই হোক, তীর্থংকরের ইংরাজী রূপায়ণ Among the Great বইটি লেখা যখন সমাপ্ত হ'ল তখন ভেবেচিন্তে পাঠিয়ে দিলাম শ্রীরাধাকৃষ্ণনকে। তখন তিনি কাশীতে। ভেবেছিলাম, তিনিও আমার বাঙালী বন্ধুদের মতন বইটির অনাদর করবেন, হয়ত পড়বেনই না, কে জানে? তাই উল্লসিত হ'লাম যখন বইটির একটি চমৎকার ভূমিকা লিখে দিলেন।

তীর্থংকরের বঙ্গীয় অনাদরের ক্ষতিপূরণ মিলল Among the Great-এর সার্বভৌম সমাদরে। প্রথমে ভারতের সবদেশের মনীষীই সাড়া দিলেন। দেখতে দেখতে তিনটি সংস্করণ বেরুল। তারপরে জাইকো নিউইয়র্কে পপুলার এডিশন পঞ্চাশ হাজার কপি ছাপার

সঙ্গে সঙ্গে নানা দেশেই আমার এ বইটি আদৃত হ'ল—এমন কি, অলডাস হাকস্‌লি ও সমর্সেট মম ও প'ড়ে মুক্তকণ্ঠে প্রশংসা ক'রে আমাকে চিঠি লিখলেন। ফলে এক কথায় যে-আমি বাংলা দেশে বহুদিন ধ'রে কলম পিষেও, এমনকি চলনসই সাহিত্যিক ব'লেও গণ্য হতে পারি নি, সে-আমি একটিমাত্র ইংরেজী বই লিখেই বিশ্বের পাঠকসভায় সমাদৃত হ'লাম। ঠাকুরের লীলা কে বুঝবে! আজও আমার দশ-বারোটি ইংরাজী বইয়ের মধ্যে এই বইটিরই বিক্রয় সবচেয়ে বেশি বম্বে, পুনায়, মাদ্রাজে ও দিল্লীতে। তবে কলকাতায় নয়। কারণ বলেছি—আমার বাঙালী-বন্ধুরা প্রায় সবাই এই একটি বিষয়ে একমত যে, আমি বড়জোর একজন সুগায়ক—এমনকি সুরকারও নই, সাহিত্যিক ত নইই। একজন খ্যাতনামা সাহিত্যিক আমাকে বিজ্ঞ হেসে বলেছিলেন: "কেন মিথ্যে বই লিখছেন দিলীপবাবু? আপনি গান করুন, যা পারেন।" মনকে সান্ত্বনা দিলাম এই ব'লে যে—আজ যিনি জগতের শ্রেষ্ঠ কথাসাহিত্যিকদের অন্যতম ব'লে স্থান পেয়েছেন সেই সমর্সেট মম লিখেছেন যে, তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ উপন্যাস Of Human Bondage বহু বৎসর প'ড়ে ছিল, কোন প্রকাশকেরই নেকনজরে পড়েনি—প্রকাশ হল প্রায় দৈবাৎ—এক বান্ধবীর প্রসাদেই বলা চলে। কেবল মজা এই যে, যে উপন্যাসটির পাণ্ডুলিপি প্রকাশকের পর প্রকাশক পড়তে না পড়তে 'অচল' ব'লে বরখাস্ত করেছিলেন, সেই উপন্যাসটির প্রকাশ হবার সঙ্গে সঙ্গে মম বিশ্ববিশ্রুত কথাসাহিত্যিকদের অন্যতম ব'লে অভিনন্দিত হলেন—শুধু য়ুরোপে নয়, আমেরিকায়ও তাঁর এই পাণ্ডুলিপিটি সাদরে সাহিত্যকীর্তি-আগারে রক্ষিত হ'ল। তাই ভাবলাম, আমার সাহিত্যপ্রচেষ্টা সম্বন্ধে আমার উন্নাসিক সাহিত্যিক বন্ধুর রায় মহাকালের সুপ্রীম কোর্টের বিচারে উল্টে যেতেও পারে হয়ত। যাক্।

যাই হোক, "তীর্থংকর" অনাদৃত হওয়ার পর ভয় কাটল প্রথম শ্রীরাধাকৃষ্ণনের প্রশস্তিপূর্ণ ভূমিকা পেয়ে। তাঁকে লিখলাম কৃতজ্ঞতা জানিয়ে: "যখন আমাকে প্রায় কেউই লেখক ব'লে চিনত না আপনি তখন অকুতোভয়ে এগিয়ে এসেছিলেন আমাকে বরণ করতে " ইত্যাদি।

তারপর আমার ষাট বৎসর বয়সে কলকাতায় যখন বন্ধুরা ১৯৫৭ সালে আমাকে স্বর্ণগ্রন্থ উপহার দেন তখন তার জন্যে তিনি এই বাণী পাঠালেন প্রেসিডেণ্ট পদবী পাবার পরে:

"I am glad to know that you are according a suitable reception to Sri Dilip Kumar Roy whom I have known for a number of years ··and have had a great affection and admiartion for him. The test of human life is its capacity to radiate joy and sunshine among those who meet us. His powerful and musical voice has delighted thousands··· he has been a notable exponent of our Music and has made very valuable contributions to our literature···May he be spared for a number of years to spread the message of love and joy."

চমকে গিয়েছিলাম বৈকি। কারণ আমি বহুদিন থেকেই ভারতের এ সর্বশ্রদ্ধেয় মনীষীর পাণ্ডিত্য, চরিত্র, ঔদার্য ও দার্শনিক ভাবুকতার অনুরাগী ছিলাম বটে—বিশেষ ক'রে ভালোবাসতাম তাঁর স্বচ্ছ অনবদ্য ইংরাজী-ভাষাশৈলী—কিন্তু আমার সত্যিই একবারও মনে হয় নি যে, আমার লেখার বা গানের তিনি অনুরাগী। তাই তাঁকে ফের ধন্যবাদ দিয়ে চিঠি লিখলাম এবং সেই থেকে তিনি আমাকে নিয়মিত পত্র লিখতেন—বা আমি লিখলে তৎক্ষণাৎ পত্রোত্তর দিতেন বলাই ভালো।

শ্রীরাধাকৃষ্ণনের সম্বন্ধে অনেক কথাই লিখবার আছে। আমি কিছু লিখেছিও একটি ইংরাজী প্রবন্ধে—Minstrel Of Harmony নাম দিয়ে। এ প্রবন্ধটি তাঁর গত জন্মদিনের স্বর্ণগ্রন্থে তাঁকে উপহার দেবার কথা ছিল, দেওয়া হয়েছে কি না জানি না, কারণ, বইটি প্রকাশকেরা আমাকে পাঠান নি। কিন্তু সে যাই হোক, প্রবন্ধটিতে আমি লিখেছিলাম একটি কথা খুব জোর দিয়েই যে, ভারতের এ বরেণ্য বাণীবাহের জীবন তথা রচনার হ'ল একটি প্রধান বাণী দর্শন ও আত্মিক উপলব্ধির আলোয় ধর্ম ও রাষ্ট্রের সমন্বয়। এ প্রতিপাদ্যটিকে ফলিয়ে তুলতে হ'লে অন্তত: বিশ-পঁচিশ পাতা লিখতে হবে। তার সময় নেই—তা ছাড়া এ পত্রকে দার্শনিক প্রবন্ধে দাঁড় করালে তোমার ও পাঠকদের 'পরে অত্যাচার করা হবে। তাই শুধু এইটুকু ব'লেই ক্ষান্ত হই যে, ভারতের এ মনীষীর কাছে দার্শনিক তথা অধ্যাত্মপন্থীদেরও ঋণ যে অদূর ভবিষ্যতে স্বীকৃত হবেই হবে, একথা মনে করার বহু সঙ্গত কারণ আছে। এ পর্যন্ত ভারতের অন্তরাত্মার বাণী বিদেশে প্রচার করেছেন প্রধানত: ছয়টি মহাজন—সর্বপ্রথম স্বামী বিবেকানন্দ, তার পরে যথাক্রমে স্বামী রামতীর্থ, শ্রীঅরবিন্দ, আনন্দ কুমারস্বামী, রবীন্দ্রনাথ ও শ্রীরাধাকৃষ্ণন। এযুগে মানুষ মানুষের

কাছে এসেছে শুধু বিজ্ঞানের মাধ্যমে নয়—দার্শনিক, নাট্যকার, ঔপন্যাসিকও কবিদের মাধ্যমেও বটে। এঁদের মধ্যে কোন্ মনীষীর দান কোন্ ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি সক্রিয় হয়েছে সে গবেষণা এ খোলাচিঠিতে অবান্তর হবে। তাই এ সূত্রে শুধু এইটুকু ব'লেই থামব যে, শ্রীরাধাকৃষ্ণন তাঁর আশ্চর্য প্রাঞ্জল ও প্রসন্ন ইংরাজীতে ভারতের অধ্যাত্মতত্ত্বের প্রাণের কথাটি যে গভীর পাণ্ডিত্যে ও অন্তর্দৃষ্টির আলোয় ফুটিয়ে তুলেছেন তার জন্যে ভারত-সংস্কৃতির অনুরাগীরা তাঁর কাছে চিরদিন কৃতজ্ঞ থাকবেন। আমার নিজের তাঁকে সবচেয়ে ভালো লেগেছে এই জন্যে যে, তিনি রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হয়েও এযুগের "সেকুলার" বুলি উদ্‌গার করেন নি, বলেছেন সংযত অথচ দৃঢ় প্রত্যয়ের দীপ্ত ভাষায় যে—

"True life grows from inside···the unrest of the people is due to the thwarted desire for religion...We do not realise that religion, if real, implies a complete revolution, a total overcoming of our unregenerate nature." *

কয়েক বৎসর আগে আমি তাঁকে লিখি যে, তাঁর Principal Upanishads-এর দেড়শো পাতা ভূমিকা ও উপনিষদগুলির অপরূপ প্রাঞ্জল ইংরাজী অনুবাদ প'ড়ে আমি শুধু মুগ্ধই না, বিশেষ লাভবান্ হয়েছি। এ ছাড়া তাঁর গীতার অনুবাদও আমার খুব ভালো লেগেছে—মনে হয়েছে গীতার এত চমৎকার ইংরাজী অনুবাদ কেউ করে নি আজ পর্যন্ত। (এক শ্রীঅরবিন্দ করতে পারতেন, কিন্তু গীতা-জিজ্ঞাসুদের দুর্ভাগ্য যে, তিনি তাঁর গীতা-ভাষ্যে প্রসঙ্গতঃ কতিপয় শ্লোকের উল্লেখ করেই নিরস্ত হয়েছেন।)

শ্রীরাধাকৃষ্ণনের ইংরাজী শৈলী সম্বন্ধে অনেক কিছুই বলার আছে। ইংরাজী ভাষার চর্চা আমি ক'রে আসছি আজ ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ বৎসর এবং দীক্ষা পেয়েছি এযুগের সর্বশ্রেষ্ঠ সব্যসাচী শ্রীঅরবিন্দের চরণচ্ছায়ায়—ইংরাজী গদ্যে-পদ্যে যাঁর মত জুড়ি হাঁকাতে এযুগে আর কেউ পারে নি। তাঁর মহাপ্রয়াণের পরে আমেরিকায় একটি প্রবন্ধাবলী প্রকাশিত হয় ভারতের রাজনৈতিক ভাবধারা সম্বন্ধে। বইটি প্রকাশ করেছেন কালিফর্নিয়ার খ্যাতনামা অধ্যাপক ম্যাকেনজি ব্রাউন—The White Umbrella নাম দিয়ে। এতে শ্রীরাধাকৃষ্ণন শ্রীঅরবিন্দের তর্পণে লিখেছেন—"আমাদের দেশে শ্রীঅরবিন্দ ছিলেন মনীষীদের শিরোমণি এবং আত্মিক জগতের একজন দিক্‌পাল। আমাদের রাজনীতি ও দর্শনে তাঁর অবদান ভারতবাসী ভুলবে না কোনদিনও। আর দর্শন ও ধর্মের ক্ষেত্রে তাঁর অবদান জগৎ চিরদিন সকৃতজ্ঞেই স্মরণ করবে।"

("Sri Aurobindo was the greatest intellectual of our age and a major force in the life of the spirit. India will not forget his services to politics and philosophy and the world will remember with gratitude his invaluable works in the realness of philosophy and religion.")

শ্রীঅরবিন্দের মহিমা ও কীর্তি সম্বন্ধে কিছু বলতে যাওয়াও আমার পক্ষে ধৃষ্টতা হবে। আমি তবু তাঁর নাম করলাম শুধু এই জন্যে যে, শ্রীঅরবিন্দ যে-পথের পথিকৃৎ সে-পথে শ্রীরাধাকৃষ্ণনও একজন উজ্জ্বল দিশারী ব'লে স্বীকৃত হয়েছেন শুধু ভারতের আত্মার আধুনিক বাণীবাহদের একজন প্রধান পুরোধা রূপেই নয়, তাঁর অপরূপ স্নিগ্ধ সৌম্য গদ্যেরও গুণেও বটে। শ্রীঅরবিন্দ ছাড়া আর কোন ভারতীয় লেখকই উচ্চাঙ্গের ইংরাজী গদ্যে আজ পর্যন্ত শ্রীরাধাকৃষ্ণনের মতন স্নিগ্ধ আলো বিকীরণ করতে পারেন নি। এ-কৃতিত্বের জন্যে তিনি চিরদিন নমস্য থাকবেন মনে হয়, আর এই কারণে যে, তাঁর ইংরাজীর মধ্যে বৈদেশিক অপটুতা, প্রগল্‌ভতা বা ভুল-ভ্রান্তির চিহ্নলেশও মেলে না—তাঁর গদ্য তরু তরু ক'রে ব'য়ে চলেছে ভারতীয় দার্শনিক মনীষার সঙ্গে পাশ্চাত্ত্য পাণ্ডিত্য ও বিশেষজ্ঞতার এক অপরূপ সমন্বয়ে। এর বেশি আর বলব না আজ। কেবল এই সূত্রে আমাকে লেখা তাঁর দু'একটি পত্রের অংশবিশেষ উদ্ধৃত ক'রে সমাপ্তি টানব।

একটি পত্রে তিনি আমাকে লিখেছিলেন (১৯. ২. ১৯৫৭):

"As for the meaning of religion I have understood it as the deepening of one's inwar l awareness and extending the objects of one'sl ove."

(১১.১.১৯৫৯):

"You are doing good work and making people who come under your influence aware of themselves and their possiilitiesb;

* সত্য জীবনের প্রকাশ হয় অন্তর থেকে··ধর্মৈষণা ব্যাহত হবার ফলেই এ-যুগের মানুষ আজ এত অশান্ত হয়ে উঠেছে···আমরা এখনও ঠিক মত উপলব্ধি করি নি যে, যথার্থ ধর্ম জীবনকে ঢেলে সাজায়, ঘটায় আমাদের অশুদ্ধ চরিত্রের রূপান্তর।

—Brahma Sutra (1960) ভূমিকা ৯ পৃষ্ঠা

I am glad that your 'Among theGreat' has had a wide circulation. You are always welcome to send me accounts of your ctivitios and I will read them with interest."

এর পর থেকে আমি তাঁকে মাঝে মাঝে পাঠাতাম আমাদের পুণা মন্দিরের নানা অঘটনের কাহিনী—তিনি অবিশ্বাস করতেন না ব'লে আরও উৎসাহ পেয়ে। এসূত্রে একবার তিনি লিখেছিলেন আমাকে (২৯-৯-৬২) :

"I read the enclosures to your letter with great interest···I have a conviction based on experiene that a great Pilot is guiding and taking us from one stage to another.* All that He calls for in return is complete surrender. Consciousness of the pervading presence of the Divine has helped me all these days···I am taking the liberty of sending you a copy of my Brahmasutra. You have already my Gita and Upanishads. This will complete the classics."

আমি পাই মুসুরিতে—অক্টোবরে। এতে তাঁর নানা ভাষ্য ও ব্রহ্মসূত্র টীকা প'ড়ে মুগ্ধ হয়ে তাঁকে আমি লিখি যে আমি এথেকে যথেষ্ট লাভ করলেও আমি স্বভাবে ভক্তিমার্গী, বৈদান্তিক ভূমাতত্ত্বের বিশেষজ্ঞও নই, হ'তেও চাই না। উত্তরে তিনি আমাকে লেখেন (১৮-১০-৬২) :

"I am glad to know that you have started reading the book. You need not think that because I am interested in philosophical investigation, I am unmindful of the important role of bhakti. The Gita defines four types of devotees :

চতুর্বিধা ভজন্তে মাং জনাঃ সুকৃতিনোঽর্জুন।
আর্তো জিজ্ঞাসুরর্থার্থী জ্ঞানী চ ভরতর্ষভ ॥

Those who are sick and seek help, those who seek wealth ; those who seek knowledge and, lastly, the knower who surrenders himself to the Divine and allows the Divine to handle his life and use it for purposes other than his own."

তাঁর ব্রহ্মসূত্রের ভূমিকায় তিনি লিখেছেন (১৬৭ পৃঃ) যে ভক্তির ব্যাভিচার হ'তে পারে কিন্তু ভক্তির প্রয়োজন আছেই আছে এবং ভক্তি "touches the deepest springs of man's inner life," সঙ্গে সঙ্গে উদ্ধৃত করেছেন একটি বিখ্যাত শ্লোক "ভাগবত-মাহাত্ম্য" থেকে :

অলং কলৌ ব্রতৈঃ তীর্থৈঃ যোগৈঃ শাস্ত্রৈঃ অলম্ মখৈঃ।
অলং জ্ঞানকথালাপৈঃ ভক্তিরেকৈব মুক্তিদা ॥

অর্থাৎ কলিযুগে ব্রত তীর্থ শাস্ত্র যোগ যজ্ঞ—এসকলই বৃথা, জ্ঞানগম্ভীর কথালাপও বৃথা, ভক্তিগানেই মুক্তিগীতা।

এহেন মানুষের সঙ্গে আলাপ করতে ইচ্ছা হয় বৈকি—আরও এই জন্যে যে, এ-যুগে আমরা নিরন্তর অত্যাধুনিক হ'তে যেয়ে রুখে উঠেছি ভারতের শিক্ষা-দীক্ষাকে সবই বাতিল ক'রে পুরোদস্তুর বিলিতি সংস্কৃতিকে অবলম্বন ক'রে হাল-আমলের নানা বিলিতি বুলির নামাবলী জড়িয়ে আমাদের সেকেলে ভারতীয় ভোল বদ্‌লে ফেলতে। বিশেষ ক'রে এযুগের কর্মবীরেরা প্রায় সবাই চান ওদের চোখে বড় হয়ে উঠতে—ওদের চালে চ'লেই ওদেরকে টেক্কা দিয়ে। এহেন যুগের নবচারণদের মাঝে শ্রীরাধাকৃষ্ণের মতন তেজস্বী আত্মস্থ ভাবুকের দেখা পাওয়া খানিকটা অঘটনেরই কাছাকাছি বলব- যিনি দিল্লীর ধর্মবিরাগী "সেকুলার" রাজতক্তে ব'সেও শুধু যে ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্য রচনা করবার সময় পান তাই নয়, অকুতোভয়ে লিখতে পারেন :

"Though the conditions of modern life have become different and are in some ways better, we cannot say that we are superior to the ancients in spiritual depth or moral strength to grapple with difficulties."*

আমি তাঁকে লিখেছিলাম পুণা থেকে যে, ভূপাল হয়ে দিল্লীতে রামকৃষ্ণ মিশনে গান গেয়ে তাঁর সঙ্গে একটু আলাপ ক'রে তাঁর সামনে ভজন গাইতে চাই, যেহেতু শুনেছি যে, তিনি প্রায় প্রতি সন্ধ্যায়ই ঘণ্টাখানেক ভজন শোনেন। তিনি আমাকে তৎক্ষণাৎ নিমন্ত্রণ করেন ১০ই অক্টোবর সন্ধ্যা ৬॥০ টায়। আশা করি নারায়ণ, তুমি ঘা খেয়ে বলবে না, তিনি ভজন শোনেন ভক্তি-নিরপেক্ষ হয়ে ? (ক্রমশঃ প্রকাশ্য)

* মনে পড়ে হ্যামলেটে সেক্সপীয়রের বিখ্যাত সমধর্মী উক্তি :
"There's a divinity that shapes our ends
Rough-hew them how we will".

* এ-যুগে আমাদের জীবনের ছন্দ ও পরিবেশের বদল এবং কোনো কোনো বিষয়ে উন্নতি হ'লেও বলা চলে না যে আর্য দ্রষ্টাদের যে আধ্যাত্ম-গভীরতা বা বাধাকে জয় করবার নৈতিক শক্তি ছিল তাদেরকে আমরা ছাপিয়ে উঠেছি।

রঙ্গমল্লী

শ্রীসীতা দেবী

১৭

পূর্ণিমা ঘুরিয়া ঘুরিয়া বসিবার ঘরের বইয়ের আলমারিগুলি দেখিতে লাগিল। হিরণ্ময় বোধহয় পড়াশুনা খুব ভালবাসেন, অবসর সময় না-হইলে কাটাইবেন কি করিয়া? বাড়ীতেও কেহ নাই, এবং বন্ধুবান্ধবের বাড়ী গিয়া হল্লা করা বা ক্লাবে গিয়া তাস খেলা, এ সবও তাঁহার বিশেষ পছন্দ নয়।

আজ হিরণ্ময়কে কেমন যেন ঠিক স্বাভাবিক দেখাইতেছিল না। একটু ক্লিষ্ট, একটু ক্লান্ত মুখের ভাব। হয়ত বিশ্রামের অভাবই ঘটিয়াছিল। কথাবার্ত্তা প্রফুল্ল ভাবেই বলিতেছেন, কিন্তু আগের সেই প্রশান্তিটা নাই। কিছু এমন কি ঘটিয়াছে, যাহাতে তিনি বিচলিত হইয়াছেন?

সত্যই পাঁচ মিনিট পরে হিরণ্ময় ফিরিয়া আসিলেন। পূর্ণিমার দিকে তাকাইয়া বলিলেন, "বই বুঝি খুব ভালবাসেন আপনি?"

পূর্ণিমা বলিল, "ভাল ত বাসি খুবই, কিন্তু আজকাল ত আর সময় পাই না পড়বার। মায়ের কাছে রোজ যাচ্ছি ত?"

"বসুন আপনি," বলিয়া নিজে বসিয়া বলিলেন "আর কিছু যদি করতে চান ওঁর জন্যে, তা হ'লে, তার ব্যবস্থা করা যেতে পারে।"

পূর্ণিমা বলিল, "আমার নিজের ত এ বিষয়ে কোনও জ্ঞানই নেই, কি করা যায়, কি না করা যায়।"

হিরণ্ময় বলিলেন, "ডাক্তারের সঙ্গে পরামর্শ ক'রে দেখলে হয়। আজ রাত্রে ফোন করব।"

অল্পক্ষণ পরে বলিলেন, "আমি ভেবেছিলাম, আমি যে ক'দিন থাকব না, তাতে আপনার স্বাস্থ্যের খানিকটা উন্নতি হবে, বিশ্রাম পেয়ে। তা হয়েছে ত দেখছি উল্টো, আরও শুকিয়ে গেছেন। বিকাশবাবু বেশী কাজ দিতেন নাকি?"

পূর্ণিমা বলিল, "না কাজ কিছুই বেশী ছিল না। এত দারুণ ভয় আর দুর্ভাবনা নিয়ে শরীর আর কি ভাল থাকবে? ঘুমোতে পারি না, খেতে পারি না।"

হিরণ্ময় বলিলেন, "আমি ত ফিরে এলাম, ভয়টা এখন একটু কমবে ত?"

পূর্ণিমা বলিল, "তা ত কমবেই।"

হঠাৎ কথার মোড় একেবারে ঘুরিয়া গেল। হিরণ্ময় জিজ্ঞাসা করিলেন, "ক'মাস কাজ হ'ল আপনার অফিসে?"

পূর্ণিমা বলিল, "ছ'মাস ত হয়ে গেছে।"

হিরণ্ময় বলিলেন, "তাহলে পুরনো বন্ধু হয়ে উঠেছি প্রায় আমরা। এখন অফিসের বাইরে একটু informal হওয়া যায় বোধহয়? কি বলেন?"

পূর্ণিমার আজ কেবলই অবাক্ হবার দিন, সে বলিল, "আপনি ইচ্ছে করলেই ত informal হতে পারেন, তাতে আমার আর আপত্তি কি?"

"তা হ'লে এখন থেকে তোমাকে পূর্ণিমা ব'লেই ডাকব। অবশ্য অফিসে নয়।"

পূর্ণিমার মুখটায় রক্তোচ্ছ্বাস ঘনাইয়া আসিল। হইয়াছে কি? সে ত কিছুই বুঝিতে পারিতেছে না! কাজের জন্য আজ হিরণ্ময় তাহাকে ডাকেন নাই, কিছু একটা বলিতে চাহেন, কিন্তু কি? মুখে বলিল, "স্বচ্ছন্দে ডাকতে পারেন। এর আগেই ডাকেন নি কেন?"

"মাথায় আসে নি প্রথমতঃ, দ্বিতীয়তঃ, ভাবলাম যে, যদি তুমি কিছু মনে কর। বয়স এবং position-এর advantage নিচ্ছি ভাবতে পারতে।"

পূর্ণিমা বলিল, "আমি ত পাগল নয়? আপনার চেয়ে কত ছোট আমি। আমাকে নাম ধ'রে ডাকলে কিছু মনে করব? তা হ'লে পাগলের চেয়ে বেশী কিছু হ'তে হয়।"

হিরণ্ময় বলিলেন, "আচ্ছা, তা হ'লে এই রইল কথা। অফিসে অবশ্য নিয়ম মত 'আপনি,' 'আজ্ঞে' ক'রেই চলতে হবে।"

হঠাৎ তাহার মুখের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "দীপক গেল কবে?"

পূর্ণিমা চমকাইয়া গেল, বলিল, "জানি না ত? চ'লে গেছে নাকি?"

"তোমাকে ব'লে যায় নি?"

পূর্ণিমা বলিল, "না, বেশ কয়েকদিন আমার সঙ্গে ওর দেখা হয় নি। আপনি যেদিন বম্বে গেলেন, তার দিন-দুই আগে দেখা হয়েছিল। তখনও ত যাবার কথা বলে নি।"

হিরণ্ময় এতক্ষণ পরে একটা সিগারেট ধরাইলেন। দেশলাই কাঠিটা ash trayতে রাখিয়া দিয়া বলিলেন, "তোমাদের বাড়ী ও যায় না নাকি?"

পূর্ণিমা ক্রমেই বেশী করিয়া হতবুদ্ধি হইতেছিল। কেন এত কথা জিজ্ঞাসা করিতেছেন? কিন্তু উত্তর না দিয়া ত উপায় নাই?

বলিল, "না, আমাদের বাড়ী ও কোনদিনই যায় না।"

"এক পাড়ায় বাড়ী, অতদিনের বন্ধু, যায় না কেন?"

পূর্ণিমা আরক্তমুখে বলিল, "মা ওকে একেবারে পছন্দ করেন না, সেইজন্যে যায় না।"

হিরণ্ময়ের প্রশ্ন আর শেষ হয় না। বলিলেন, "পছন্দ করেন না কেন?"

পূর্ণিমা মাথা নীচু করিয়া বলিল, "মায়ের ধারণা, আমি ওর সঙ্গে বেশী মেশামিশি করলে, আমার অনিষ্ট হ'তে পারে।"

হিরণ্ময় এইবার একটুক্ষণের জন্য থামিলেন। বলিলেন, "তবে আমিই তোমায় খবর দিই, জান না যখন, দিন-চার আগে তাকে মান্দ্রাজে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। বন্ধুত্বের advantage নিয়ে চাকরিতে ত ঢুকল, অথচ যাবার সময় ব'লেও গেল না, এ ত চমৎকার ভদ্রতা! তোমার বোধ হয় খুব অবাক্ লাগছে পূর্ণিমা, কেন আমি এত সব personal কথা জানতে চাইছি। খুব কি বিরক্ত হ'চ্ছ, খুব কি অশ্রদ্ধা হচ্ছে আমার উপরে?"

পূর্ণিমা নতমস্তকে বসিয়াছিল, এবার মুখ তুলিয়া বলিল, "নিশ্চয়ই কারণ আছে জানতে চাইবার, নইলে আপনি চাইবেন কেন জানতে? আর আপনার সম্বন্ধে অশ্রদ্ধা আমার কখনও হতে পারে, আপনি মনে করেন?"

হিরণ্ময় বলিলেন, "তা কেন হতে পারবে না পূর্ণিমা? আমি সামান্য মানুষ মাত্র, ভুল ত হ'তে পারে? অনেকগুলি ব্যাপার ঘটেছে, তা তোমায় বলব কি না বুঝতে পারছি না। শুনে খুব দুঃখিত হবে হয়ত। একেই ভগবান্ তোমার ঘাড়ে বোঝা চাপিয়েছেন প্রচুর। দীপক সম্বন্ধে সব কথা জানতে চাইবার কারণ আমার ঘটেছে। তাকে কাজ দিয়েছিলাম তোমার কথায়, এখন যদি বাধ্য হয়ে বিদায় করে দিতে হয়, সেটা তোমায় দুঃখ দিতে পারে। ওকে ছাড়িয়ে দিলে কি তুমি কষ্ট পাবে খুব বেশী?"

পূর্ণিমা জিজ্ঞাসা করিল, "খুব বেশী কি অন্যায় করেছে সে? তা হলে না রাখাই ত উচিত? আমি কষ্ট পাই বা নাই পাই, তাতে কি এসে যাচ্ছে? তবে বড় দরিদ্র, বড় অসহায় সে, সেই জন্যে কষ্ট হয়। কিন্তু মানুষের কৃতকর্মের ফল ত তাকে পেতেই হবে? আমাকে কি বলা যায় না, কি সে করেছে?"

হিরণ্ময় বলিলেন, "বলাই ভাল। সব জিনিষটা তুমি তলিয়ে বোঝ। যাবার আগে তিনি সহকর্মীদের কাছে তোমার নামে অভিযোগ ক'রে গেছেন যে, তিনি তোমার সঙ্গে engaged ছিলেন। এখন তুমি বড়লোকের অনুগৃহীতা হয়েছ ব'লে তাকে বিদায় ক'রে দিচ্ছ। সে তোমার বহুদিনের পরিচিত, তোমরা একসঙ্গে পড়েছ, কাজেই এ ধরণের কথা সাধারণতঃ মানুষ যতটা বিশ্বাস করে, তার চেয়ে বেশী একটু বিশ্বাস করছে এর বেলা। এ কি পূর্ণিমা, শরীর খারাপ লাগছে?"

পূর্ণিমার চোখে জগৎ-সংসার তখন একেবারে কালো হইয়া গিয়াছে। রাশি রাশি ধোঁওয়া উঠিয়া যেন চোখের সামনে সব ঢাকিয়া দিল। ভয় হইল, এখনই সে অজ্ঞান হইয়া পড়িবে। কিন্তু সে সান্ত্বনাও ত জুটিল না। তপ্ত লৌহ-শলাকার স্পর্শ যেন আবার তাহার অবলুপ্তপ্রায় চৈতন্য ফিরাইয়া আনিল। হিরণ্ময় তাড়াতাড়ি উঠিয়া আসিয়া তাহার মাথাটা দুই হাতে ধরিলেন, গভীর উৎকণ্ঠার সহিত জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি হ'ল পূর্ণিমা? আমার কথা শুনতে পাচ্ছ ত?"

পূর্ণিমার বক্ষ ভেদ করিয়া একটা দীর্ঘশ্বাস বাহির হইয়া আসিল। হিরণ্ময় শেষে এই কথা শুনিলেন? আর এমন ভাবে?

হিরণ্ময়ের কথার উত্তরে বলিল, "শুনতে পাচ্ছি আপনার কথা। এখনি উত্তর দিচ্ছি।"

হিরণ্ময়ের মুখের উপরে যেন একটা কালো ছায়া নামিয়া আসিল। বলিলেন, "এত কষ্ট পেলে এ কথা শুনে? কাজ নেই, থাক্ এখন। খুব বেশী তাড়া নেই। আজ এলাম, আজই না বললে পারতাম। তবে সব পরিষ্কার হয়ে চুকে গেলে সকলের পক্ষেই ভাল হ'ত। কিন্তু তোমাকে এতখানি আঘাত দিয়ে আমার নিজেকেই অপরাধী লাগছে, যদিও অপরাধ আমার আসলে নয়।"

পূর্ণিমা বলিল, "আমার সম্বন্ধে আপনার কোন অপরাধ হয় নি, হ'তে ত পারে না। আমি সবই খুলে বলছি আপনাকে। যদি দেখেন আমি অপরাধী,

শাস্তির যোগ্য, তবে শাস্তিই দিন। কি জানতে চান বলুন ?"

হিরণ্ময় বলিলেন, "দীপক যে বলেছে সে তোমার সঙ্গে engaged ছিল, তা কি ঠিক ?"

"ঠিকই, তবে সে ত অনেকদিন আগের কথা।"

হিরণ্ময় বলিলেন, "কতদিন আগের ?"

পূর্ণিমা বলিল, "আমি তখন সবে কলেজে ঢুকেছি, বছর সতেরো বয়স ছিল। ওর সঙ্গে তখন বেশ ভাব হয়। অল্প বয়সের বন্ধুত্ব, তাকেই ভালবাসা ভেবেছিলাম। ভালবাসা কি, তাই তখন জানতাম না।"

হিরণ্ময় বলিলেন, "ভবিষ্যতে বিয়ে করবে এই কথা তার সঙ্গে ছিল ?"

পূর্ণিমা এক মিনিট থামিয়া বলিল, "সবই বলছি, কিছু লুকোব না। তার পর আপনিই বিচার করবেন, কোন প্রতারণা আমি কোথাও করেছি কি না, কোন অন্যায় করেছি কি না। রোমান ক্যাথলিকরা মৃত্যুর আগে সব অপরাধ স্বীকার ক'রে যায়, ভগবানের ক্ষমা নিয়ে যায়। আমারও বর্ত্তমান জীবনের শেষ হয়ত এটা, তাই সব স্বীকার ক'রে যাচ্ছি। আপনার ক্ষমাই আমার দরকার, হয়ত আপনি আমাকে অপরাধী ভেবেছেন। ভগবানের চোখে আমি নির্দ্দোষ, কোন পাপ করি নি।"

হিরণ্ময় বলিলেন, "আমারও চোখে তুমি নিরপরাধ, নির্দ্দোষ। কিছু বলবার দরকারই হ'ত না আমাকে, নিতান্ত অফিসের ব্যাপার এর মধ্যে একটু রয়েছে ব'লে আমাকে এতে হাত দিতে হ'ল। কিন্তু সেটুকু অল্পেই চুকে যেত। এর বেশী আমার কোন অধিকার ছিল না তোমার ব্যক্তিগত জীবনের সব কথা জানবার। তোমার অত্যন্ত কষ্ট হচ্ছে কথা বলতে, এখন থাক্ না ? আমি পরে শুনব। শুনবার আগ্রহ নেই ব'লে সাধু সাজব না, অত্যন্ত ইচ্ছা আছে শুনবার। তবে তুমি বিশ্রাম ক'রে একটু সামলে নাও।"

পূর্ণিমা বলিল, "না, এখনই ব'লে নিই। আর হয়ত সাহস হবে না, হয়ত আর আসতেও পারব না, আপনার কাছে। আমার সব কথা জানবার অধিকার আপনারই আছে, আর কার থাকবে ? আর কে আমার জন্যে ভেবেছে, কে স্নেহ করেছে, কে সহায় হয়েছে ? কিন্তু সে-স্নেহ পাবার অযোগ্য আমি ছিলাম না।"

হিরণ্ময় বলিলেন, "স্নেহ পাবার যোগ্যতা তোমার সমান ক'টা মানুষের আছে পূর্ণিমা ? এবং সে যোগ্যতা চিরদিনই থাকবে। তুমি সংক্ষেপে কথাটা সেরে নাও। এ পর্ব্ব চুকে যাক। তার পর যা করবার তা আমিই করব।"

পূর্ণিমা বলিল, "ভবিষ্যতে বিয়ে হবে, এই রকম একটা understanding ছিল বটে। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই দেখলাম যে, জিনিষটাকে ও seriously নিতে পারছে না। তার কোন উদ্যম নেই, কোন চেষ্টা নেই। মানসিক একটা ভাববিলাস মাত্র এটা তার কাছে। পথে-ঘাটে দু' একটা কথা বলা, বিকেলে পার্কে ব'সে আধ ঘণ্টা কি এক ঘণ্টা গল্প করা, এই ছিল আমাদের সম্পর্ক। মা দেখতে পারতেন না ওকে, তাই আমাদের বাড়ী ও কোনদিন আসত না। আমিও ওর বাড়ী কোনদিন যাই নি, চিঠিপত্র কখনও লিখি নি।"

হিরণ্ময় বলিলেন, "ছোট ছেলে-মেয়েতে যেরকম 'বিয়ে বিয়ে' খেলে, এও সেরকম খেলা। এটাকে কোন গুরুত্ব দেওয়াই তোমাদের উচিত হয় নি।"

পূর্ণিমা বলিল, "সেটা বুঝতে ত আমার খুব দেরি হয় নি। আমি ত দেখতেই পেলাম যে, আমার মনের মধ্যে ও ছায়া হয়ে মিলিয়ে যাচ্ছে। ওর কথা অর্দ্ধেক সময় আমার মনেই থাকত না। তবু শেষ চেষ্টা করেছিলাম, এই চাকরিটা পাবার পরে। বলেছিলাম, সংসার চালাবার ভার আমিই নেব, বিয়েটা হয়ে যাক্। তখন ভগবান্ আমাকে রক্ষা করলেন, ও রাজী হ'ল না, পৌরুষ তার আর কোনখানে ছিল না, এইখানে জেগে উঠল।"

হিরণ্ময় বলিলেন, "এমন আত্মঘাতী প্রস্তাব তুমি করলে কেন ? যার প্রতি কোন ভালবাসা নেই, তাকে স্বামী ব'লে নিতে কি ক'রে পারতে তুমি ? সে স্বভাবের মেয়ে তুমি নও।"

পূর্ণিমা বলিল, "বুঝবার ভুল। ভেবেছিলাম পারব, নিজের কথার মূল্য রাখব। কিন্তু অস্বীকার যখন দীপক করল, তখন যে মুক্তির আনন্দে মন ভ'রে গেল, তাতেই বুঝলাম যে, কত বড় ভুল আমি করতে যাচ্ছিলাম।"

হিরণ্ময় জিজ্ঞাসা করিলেন, "Engagement তোমার ঐখানে শেষ হ'ল ত ?"

"আমার দিক্ থেকে সম্পূর্ণ শেষ। তাকে সে কথা ভাল ক'রে বুঝিয়ে ব'লেও এলাম। কেন বোঝে নি জানি না। তার জন্যে আর একদিনও আমি অপেক্ষা করব না, তাও বলেছিলাম। কেন ওর মাথায় ঢোকে নি জানি না।"

হিরণ্ময় বলিলেন, "ইচ্ছে ক'রেই ঢোকে নি। কারণ, তোমাকে চট্ ক'রে হাতছাড়া করবে এত বড় মূর্খ জগতে

বেশী জন্মায় নি। তার পর যাবার আগে শেষ কবে মাদের দেখা হ'ল?"

"আপনি যেদিন বম্বে চ'লে গেলেন, তার দিন-দুই গে। নূতন চাকরি হওয়ার জোরে বিয়ের প্রস্তাব ল। আমি সম্পূর্ণ অস্বীকার করাতে নানারকম দ্র ইঙ্গিত করতে লাগল। আমি রাগ ক'রে উঠে ল গেলাম। প্রায় একটা অভিশাপ দিয়ে সেও চ'লে ল। এই আমার সঙ্গে তার শেষ দেখা। তার পর ন খবর দীপকের আমি জানি না। আপনি বলুন ন, কোন অপরাধ কি আমি করেছি আপনার কাছে? ন প্রতারণা করেছি? আমার দুর্ভাগ্য যে আমাকে লক্ষ্য ক'রে এত অপবাদ আপনার নামে হ'ল। এতে পনার মন বিরক্ত হয়ে যেতে পারে। কিন্তু সত্যি ন দোষ কি আমার ছিল?"

হিরণ্ময় বলিলেন, "কোন অপরাধ কর নি, কোন ারণা কর নি। প্রথম থেকেই তোমার সম্বন্ধে এ সব আমি বিশ্বাস করি নি। তবু স্বীকার করছি, বড় াস্তিতে ছিলাম আমি এ কথা শুনবার পর। তোমাকে ম অত্যন্ত স্নেহ করি, তোমাকে যা ব'লে জেনেছি, তুমি নও, এ চিন্তা বড় কষ্ট দিয়েছে আমাকে। তুমি ব'লে নিজেও শান্তি পেলে, আমাকেও শান্তি দিলে। বাদের কথা কিছু ধরি না আমি। একজন না একজন রকে উপলক্ষ্য ক'রে কত কথাই ত এ জীবনে শুনলাম। লোকে আজকাল দোষও যেন কেউ মনে করে না। ীদিন মনেও রাখে না, নূতন একটা scandal-এর ন পেলে তখনই ভুলে যায়।"

পূর্ণিমা নীরবে মাথা নীচু করিয়া বসিয়া রহিল। ণ্ময় বলিলেন, তিনি শান্তি পাইয়াছেন, কিন্তু পূর্ণিমার শান্তি কোথায়? পুরাতন জীবনটাকে আজ সে ড়িয়া ফেলিয়া দিল হৃদয় হইতে। কিন্তু শতমুখে যে উৎসারিত হইতে লাগিল ক্ষতস্থান হইতে, তাহা ত রুদ্ধ করিতে পারিল না?

কিছুক্ষণ পরে মাথা তুলিয়া বলিল, "আমি তা হ'লে এখন? মায়ের কাছে একবার যেতে হবে। রোজই হু এখন।"

হিরণ্ময় বলিলেন, "তা ত যাবেই। আমারও আজ বার যাওয়া উচিত ছিল। কিন্তু সত্যিই আজ আমি কান্ত আছি। তা ছাড়া অনেক সমস্যা জুটেছে, ভেবে লির সমাধান করতে হবে। কাল নিশ্চয়ই যাব, ব'লো। ডাক্তারকে আজ আমি ফোন করব ত্র। কাল শনিবার আছে, অফিসের কাজ খুব বেশী থাকবে না। তোমার সঙ্গে আরও কথা বলবার আছে। তোমাদের ওখানে ত কথা বলার জায়গা নেই? এখানেই চ'লে এস বেশ সকাল সকাল।"

পূর্ণিমার মনের ভিতর একটা যেন কান্না জাগিয়া উঠিল। আর কিসের কথা?

উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, "যাই তবে এখন?"

হিরণ্ময় বলিলেন, "এস। সত্যি আমার উপর কোন অভিমান ত কর নি, এই ব্যাপারটার জন্যে? সব পরিষ্কার হয়ে গেল, ভালই হ'ল না? না হ'লে চিরদিন কাঁটার মত ফুটে থাকত ওটা আমার মনে।"

পূর্ণিমা চেষ্টা করিয়া হাসিয়া বলিল, "না, না, অভিমান কেন করব? পরিপূর্ণ বিশ্বাস থাকা উচিত বন্ধুত্বের সম্পর্কের মধ্যেও। আমার কখনও মনে হয় নি যে, এটা আপনার কাছে বলা দরকার, না হ'লে আমি নিজেই বলতাম। এতই ওটার মূল্য কমে গিয়েছিল আমার মনে।"

হিরণ্ময় বলিলে, "দরকার মনে ত না হতেই পারে। শুধু যেটা অফিসের সম্পর্ক, তার মধ্যে ব্যক্তিগত জীবনের কোন কথা কারও জানবার দরকার হয় না, বলবারও দরকার হয় না। আমাদের সম্পর্কটা অন্যরকম হয়ে দাঁড়িয়েছে ব'লেই এত কথা বলা দরকার হ'ল। আচ্ছা, তোমাকে আর দাঁড় করিয়ে রাখব না। আমি আজ আর বেরোব না, তুমি গাড়ীটাকে অন্য কাজেও লাগাতে পার।"

পূর্ণিমা ধীরে ধীরে নামিয়া চলিল। দুর্যোগের মেঘ যেমন করিয়া ঘনাইয়া আসিতেছে, কখন না-জানি তাহার মাথায় বাজ পড়ে। ভরসা একমাত্র যিনি, নিয়তি দেবী তাঁহাকে ও পূর্ণিমাকে লইয়া এ কি নিষ্ঠুর পরিহাসের খেলা সুরু করিয়াছেন? যাহা এখন নিন্দার জিনিষ, উপহাসের জিনিষ, তাহাই পূর্ণিমার জীবনে সত্য হইল না কেন? হিরণ্ময় সত্যই কি তাহাকে ভালবাসিতে পারিতেন না, গ্রহণ করিতে পারিতেন না? লালসার উগ্র পঙ্কিল স্রোতে তাহাকে ভাসাইয়া দিতে পারিলে মানুষের মনের হিংসা আজ পরিতৃপ্ত হয়, কিন্তু বিধাতা কি পারিতেন না তাহাকে প্রেম-মন্দাকিনীর জলে অবগাহন করাইতে?

যাদবপুর হস্‌পিট্যালের নার্সদের অনেকের সহিতই পূর্ণিমার জানাশোনা হইয়া গিয়াছিল। বাহিরেই এক-জনের সঙ্গে তাহার দেখা হইল। মা কেমন আছেন জিজ্ঞাসা করাতে সে বলিল, অবস্থা কিছুই ভাল নয়।

ধীরে ধীরে পূর্ণিমা গিয়া মায়ের কাছে বসিল। কেমন যেন তন্দ্রাচ্ছন্নের মত তিনি শুইয়া ছিলেন। পূর্ণিমার

কাছে আসিয়া বসার শব্দে তাকাইয়া দেখিলেন। একটু ব্যগ্র হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "হিরণ্ময় এসেছেন?"

পূর্ণিমা বলিল, "এসেছেন মা। আজ বড় ক্লান্ত ছিলেন, কাল এসে তোমার সঙ্গে দেখা করবেন।"

সুরবালা কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন। হঠাৎ বলিলেন, "তোর বাপের কাছে আমি গিয়ে কোন্ মুখ নিয়ে দাঁড়াব? কি জবাবদিহি করব?"

পূর্ণিমা কাতরকণ্ঠে বলিল, "এ কথা কেন বলছ মা? আমাদের ভাগ্য যদি এমনিই হয়, চ'লেই যদি যাও, তা হ'লে তাঁকে ব'লো যে, এতদিন তুমি একাধারে মা আর বাবা হয়ে ছিলে আমাদের। ভগবান্ নিয়ে গেলে কি আর করবে?"

সুরবালা বলিলেন, "কি ক'রে বলব মা সে কথা? তুইই ছিলি সংসারের মা হয়ে। বলতে কি পারব যে আমার গৌরীকে আমি মহাদেবের হাতে দিয়ে এসেছি? আর কারও জন্যে কোন ভয় নেই। এখন যে আমায় কাঁদতে কাঁদতে যেতে হবে। আমি যে তোদের ভাসিয়ে দিয়ে যাচ্ছি মা? ক্ষমতা ছিল না বেশী কিছু করবার, কিন্তু বুক দিয়ে আগলে রেখেছিলাম। এখন কে চাইবে তোদের মুখের দিকে?"

পূর্ণিমা মায়ের পাশে বসিয়া নীরবে কাঁদিতে লাগিল। কি সান্ত্বনা দিবে সে মৃত্যুপথযাত্রিণীকে? সে নিজেই কোথাও আর সান্ত্বনা পাইতেছে না।

মা আবার যেন তন্দ্রার ঘোরে ডুবিয়া গেলেন। কাঁদিতে কাঁদিতেই পূর্ণিমা বাহির হইয়া আসিল।

গাড়ীতে উঠিতেই ড্রাইভার জিজ্ঞাসা করিল, "কোথায় যাবেন?"

পূর্ণিমা বলিল, "মজুমদার সাহেবের বাড়ীতে চল।"

মাকে শান্তি দিতে হইবে; যেমন করিয়া হোক। নিজের জীবনের সুখ, শান্তি, সম্মান সব বিসর্জ্জন দিতে হইলেও। ভগবান্ এমনই কি নির্দ্দয় হইবেন? আত্মাহুতি দিয়াও মাকে কি সে শান্তি দিতে পারিবে না?

২০

হিরণ্ময় সত্যই সেদিন বড় ক্লান্ত হইয়া ফিরিয়াছিলেন। কলিকাতা ছাড়িয়া গিয়া পর্য্যন্ত তাঁহার বিক্ষুব্ধ মন আরও যেন শান্তিহীন হইয়া পড়িয়াছিল। যে কাজের জন্য তাঁহার যাওয়া, সে কাজও তিনি ভাল করিয়া শেষ করিয়া আসিতে পারেন নাই। মনের অস্বাভাবিক অবস্থায় নিজেই বিস্মিত হইয়া যাইতেছিলেন। শেষে একেবারে অস্থির হইয়া ফিরিয়াই চলিয়া আসিলেন।

কলিকাতা ত্যাগ করিবার আগেই দীপক-সংক্রান্ত ব্যাপারের খানিকটা তিনি শুনিয়াছিলেন। তাঁহার নিজের সম্বন্ধে পূর্ণিমার মনোভাব যে কি তাহা সঠিক না জানিলেও একেবারে যে জানিতেন না তাহাও নয়। যে একান্ত ভাবে তাঁহার প্রতি অনুরক্ত, সে অন্য কাহাকেও প্রশ্রয় দেয় কেন? পূর্ণিমার প্রতি দারুণ একটা অভিমান লইয়াই চলিয়া যাইতেছিলেন, কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত নীরবে যাইতে পারেন নাই। তাহার ভীত স্তব্ধ মূর্ত্তি তাঁহাকে টানিয়া ফিরাইয়াছিল। সান্ত্বনার কথা বলিয়া, আশ্বাস দিয়া, তবে তাহাকে রাখিয়া যাইতে পারিয়াছিলেন।

ফিরিয়া আসিয়া দীপকের কীর্ত্তির শেষ অংশ শুনিলেন। অবসাদগ্রস্ত মন আবার বিরক্তিতে ভরিয়া উঠিল। ব্যাপারটার চূড়ান্ত নিষ্পত্তি করিয়া ফেলার জন্য পূর্ণিমাকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। কিন্তু শুধু কি এই জন্যই ডাকিয়াছিলেন? তাহাকে দেখিবার ইচ্ছাটাও কি অত্যন্ত প্রবল হইয়া উঠে নাই?

পূর্ণিমাকে অনেক কথা বলিতে হইল, তাহাকে দিয়া অনেক কথা বলাইতেও হইল। কথাও গড়াইল অনেক দূর। কিন্তু পূর্ণিমার যন্ত্রণাকাতর মূর্চ্ছিতপ্রায় অবস্থা দেখিয়া হিরণ্ময় হঠাৎ অত্যন্ত ব্যথিত হইয়া উঠিলেন। এ তিনি কি করিতেছেন! তাঁহারই হাত ধ্বংস করিবে নাকি এই কুসুম-কোমল তরুণ-হৃদয়কে? ইহাকে কি করিয়া তিনি রক্ষা করিবেন, নিষ্করুণ ভাগ্যের অত্যাচার হইতে? বসিয়া বসিয়া একমনে কত কি চিন্তা করিতে লাগিলেন।

নীচে গাড়ীর শব্দ পাওয়া গেল। অল্পক্ষণের ভিতরেই কাজ হইয়া গিয়াছে। পূর্ণিমা আর কোথাও যায় নাই।

সিঁড়িতে পদশব্দ শুনিয়া হিরণ্ময় দ্বারের দিকে তাকাইলেন। কিন্তু পূর্ণিমার এমন অবস্থা কেন? অশ্রু ঝরিতেছে দুই চোখ দিয়া, চুল খুলিয়া পড়িয়াছে।

দ্রুতপদে গিয়া হিরণ্ময় তাহাকে ধরিয়া নিকটের সোফায় বসাইয়া দিলেন। উৎকণ্ঠিতভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি হয়েছে পূর্ণিমা? খুব খারাপ খবর নাকি?"

পূর্ণিমা উত্তর দিতে পারিল না। কাছে বসিয়া হিরণ্ময় আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি হয়েছে বল, কষ্ট হ'লেও বল। আমার ত জানা দরকার।"

পূর্ণিমা আর যেন পারে না। সোফার পিঠে মাথা রাখিয়া বলিল, "আমি যে কিছুই ভাবতে পারছি না ঠিক ক'রে। ভয়ানক বিপদ্ আমার সামনে। আপনি দয়া

রুন আমাকে, আর কার কাছে আমি ভিক্ষা চাইব?" শ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে আবার চুপ করিয়া গেল।

কি ব্যাপার হিরণ্ময় ঠিক বুঝিতে পারিলেন না। মন কি ঘটিয়া থাকিতে পারে? সুরবালা মারা যান াই এখনও, তাহা হইলে সে কথা পূর্ণিমা গোপন করিত া। পূর্ণিমার মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিলেন, এতদিন ধ'রে কি পরিচয় তুমি আমার পেলে? কবে চেয়েছ, যা আমি দিতে চাই নি পূর্ণিমা? কিন্তু বল ক ক'রে কি চাও? একগুণ চাইলে, দশগুণই চিরকাল তে চেয়েছি, তাও কি বোঝ নি? একটু শান্ত হও, থাই বলতে পারছ না যে?"

পূর্ণিমা নিজেকে শান্ত করিতে পারিল না, সেই াবেই বলিল, "আমার মা ত চ'লেই যাচ্ছেন।"

হিরণ্ময় বলিলেন, "মনকে তুমি এখনও এর জন্যে স্তুত করতে পার নি? তিনি যাবেন, এ ত অনেকদিন াগেই জেনেছিলে?"

পূর্ণিমা বলিল, "বড় অশান্তি, বড় দুঃখ নিয়ে নি যাচ্ছেন। একটু শান্তি তাঁকে দিতে চাই। যা াপনার কাছে চাইতে যাচ্ছি, তা চাওয়া অতিবড় পরাধ আমার পক্ষে। কিন্তু আর কোন উপায় আমি জে পেলাম না। এর জন্যে যে শাস্তিই আমায় দিন, ামি মাথা পেতে নেব।"

হিরণ্ময় বলিলেন, "মানুষের অসাধ্য কিছু তুমি ইবে না নিশ্চয়, কেননা তা চেয়ে লাভ নেই। আমি থা দিচ্ছি, তোমার অনুরোধ রাখব। কি চাও, বল রিষ্কার ক'রে।"

পূর্ণিমা বলিল, "আপনার মুখের দিকে আমি কাতে পারছি না, আর কোনদিনও পারব না বোধ া। আমি মায়ের অযোগ্য সন্তান, কোনদিনই তাঁর ন্যে কিছু করতে পারি নি। শেষ দিনে শুধু একটু শান্তি তে চাই। নিদারুণতম দুঃখের মূল্যও যদি এর জন্যে ামাকে দিতে হয়, তাই আমি দেব। আপনি শুধু নে তাঁকে একবার একটা কথা। দারুণ মিথ্যা কথাই ব সেটা, তবু তিনি শুনুন, শুনে শান্তিতে যান।"

হিরণ্ময়ের মুখটা একটু গম্ভীর হইয়া গেল। বলিলেন, কি কথাটা শুনি?"

পূর্ণিমার মাথাটা একেবারে হেঁট হইয়া গেল। লল, "আপনি একবার শুধু বলুন যে, আমাকে গ্রহণ রবেন স্ত্রী ব'লে। তিনি শান্তিতে স্বর্গে চ'লে যান। ার পর আমার যা হয় হবে। নির্ব্বাসন দিতে চান রদিনের মত, তাই দেবেন।"

হিরণ্ময়ের মুখের উপর হইতে যেন মেঘের ছায়া সরিয়া গেল। ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, "এই কথা? এর জন্যে এত দুঃখ পাবার দরকার ছিল না। বলব তাঁকে তাই, কাল গিয়ে ব'লে আসব।"

কথাটা বলিয়াই হিরণ্ময় পূর্ণিমার মুখের দিকে তাকাইলেন। সে মাথা তুলিল বটে, কিন্তু তাহার চোখের জলও শুকাইল না, মুখও তেমনি বিষাদ-ভারাক্রান্ত হইয়া রহিল। হিরণ্ময় বলিলেন, "কই, তোমাকে ত নিশ্চিন্ত বা খুশী কিছুই দেখাচ্ছে না? মিথ্যে কথা বলিয়ে নেবে শুধুশুধুই?"

পূর্ণিমা অস্ফুট স্বরে বলিল, "মিথ্যে কথা বলতে চাইছি বটে, কিন্তু তার জন্যে ভীষণ শাস্তিও নিচ্ছি ত?"

হিরণ্ময় হাসিয়া ফেলিলেন, বলিলেন, "কোন শাস্তি নিতে হবে না পূর্ণিমা। চোখটা মোছ দেখি। আমি মিথ্যে কথা বলব না, সাধারণতঃ বলি না। সত্য কথাই বলব এবং তাতে তোমার মা কিছু কম শান্তি পাবেন না। সত্য সত্যই যে স্ত্রী ব'লে গ্রহণ করতে চাই। আজ না হয় কাল তোমার কাছে প্রস্তাব করতামই। কি বল তুমি? আমার হাতে দেবে নিজেকে? এ কিন্তু তোমার ছেলেবেলার পুতুল খেলার বিয়ে নয়। তখন ভালবাসার মানেও জানতে না, বিয়ের মানেও জানতে না। এখন খুব ভাল ক'রেই জান ব'লে আমার বিশ্বাস। আমাকে তুমি অত্যন্ত ভালবাস, আশা করি এ বিশ্বাসটাও আমার মিথ্যা নয়। এখন বিয়ে করলে সর্ব্বস্বই দিতে হবে। আমার কথার উত্তর দাও। আসবে আমার কাছে?"

সোফার পিঠে মুখ লুকাইয়া এতক্ষণ পূর্ণিমা বসিয়া ছিল। এইবার সে মাথা তুলিল। বিস্ফারিত চোখে তাকাইল হিরণ্ময়ের দিকে। দেহের ভিতর দিয়া একটা যেন বিদ্যুৎতরঙ্গ খেলিয়া গেল। হঠাৎ তাঁহার কোলের উপর উপুড় হইয়া পড়িল। দুই হাতে তাঁহার একখানা হাত টানিয়া আনিল নিজের মুখের কাছে। করতলে চুম্বন করিয়া, মুখটা সেই হাতেই লুকাইয়া, সেইভাবে পড়িয়া রহিল, মাথা তুলিল না।

হিরণ্ময় তাহার মাথায় হাত রাখিয়া বলিলেন, "আমার জীবনের সবচেয়ে বড় আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হ'ল পূর্ণিমা। কিন্তু এখন এত লজ্জা করলে চলবে না। একবার তাকাও আমার দিকে। শুভদৃষ্টি হওয়া ত দরকার একবার।"

পূর্ণিমার মাথা আর ওঠেই না। শেষে হিরণ্ময় জোর করিয়া তাহার মুখখানা তুলিয়া ধরিলেন। বলিলেন

জানতাম না, কিন্তু আমার মনে হয় সেটা সম্পূর্ণ ঠিক নয়। ব্যবহারেই যে মানুষ ধরা প'ড়ে যায়। লুকোবার চেষ্টা যে বিশেষ করতাম তাও নয়, জানাতেই বেশী চাইতাম।"

পূর্ণিমা মৃদুকণ্ঠে বলিল, "লুকোবার চেষ্টা করলেও ধরা পড়তে হয়।"

হিরণ্ময় বলিলেন, "আমার স্বভাবে বিনয়টা বড় বেশী, না হ'লে অনেক আগেই ভাল ক'রে ধরা পড়তে। তোমার মত সুন্দরী তরুণী হঠাৎ আমার মত এত বয়সের একটা লোককে ভালবেসে বসবে, তা বিশ্বাস করি নি প্রথমে।"

পূর্ণিমা বলিল, "ভগবান্ ত আমার মন দেখেছিলেন, তাই তোমার পায়ে এনে ফেললেন। এমন ক'রে কার কাছে আর আশ্রয় পেতাম, অভয় পেতাম?"

হিরণ্ময় বলিলেন, "দু'জনেরই মন তিনি দেখেছিলেন পূর্ণিমা। বুকের ভিতরটা একেবারে শুকিয়ে যাচ্ছিল, একলা থেকে থেকে। বুকে ক'রে রাখবার, প্রাণ দিয়ে ভালবাসবার একজনকে বড় দরকার ছিল। তাই ঠিক মানুষটিকে যেন খুঁজে এনে আমার হাতে দিয়ে গেলেন। বাঁচলাম আমি, তুমিও বাঁচলে। কিন্তু এত উস্‌খুস্ করছ কেন? পালাতে ইচ্ছে করছে?"

পূর্ণিমা বলিল, "না, না, হঠাৎ মনে হ'ল মেয়েরা কি দারুণ অকৃতজ্ঞ। তোমাকে পাওয়ার আনন্দে মায়ের কথা একেবারে ভুলে গিয়েছিলাম।"

হিরণ্ময় বলিলেন, "এইটাই স্বাভাবিক পূর্ণিমা। এমন সময়েও যদি বিশ্ব-সংসার না ভুলবে ত কখন ভুলবে? তুমি অত্যন্ত কর্ত্তব্যপরায়ণ মেয়ে, তাই তোমার এত তাড়াতাড়ি মনে পড়েছে। কিন্তু সত্যিই কি এখনই যেতে চাইছ?"

পূর্ণিমা মাথা তুলিয়াছিল, আবার হিরণ্ময়ের বুকেই মাথাটা ফিরিয়া গেল। একটু কাতর ভাবেই বলিল, "একেবারেই চাইছি না যে, কিন্তু যেতে ত হবেই?"

হিরণ্ময় বলিলেন, "রোজই সন্ধ্যায় ছাড়াছাড়ি হয়, কিন্তু আজ চিন্তাটাই অসহ্য লাগছে। ত্রিশঙ্কুর মত স্বর্গ আর মর্ত্ত্যের মধ্যে ঝুলে আছি যেন।"

পূর্ণিমা বলিল, "কতদিন চলবে এই রকম ক'রে আমাদের?"

হিরণ্ময় বলিলেন, "খুব বেশীদিন নয়ই। দেখি কত তাড়াতাড়ি সারা যায়। তোমাকে যতটা সময় পারি আমার কাছে ধ'রে রাখব। দু'বেলাই এখানে এস চা খেতে। এটা একটু unconventional হবে, কিন্তু আমার ত উপায় নেই তোমার বাড়ী গিয়ে গল্প করবার? নিরালায় বসাই যাবে না। কাল সকালেই এস, গাড়ী যাবে। সাহেব কাজের জন্য ডাকছেন ব'লো।"

পূর্ণিমা জিজ্ঞাসা করিল, "ভাইবোনদের বলব না?"

হিরণ্ময় বলিলেন, "মায়ের কাছে বলাটা আগে হয়ে যাক্।"

দারুণ অনিচ্ছা সত্ত্বেও পূর্ণিমা এবার উঠিয়া দাঁড়াইল, বলিল "যাই তা হলে।"

হিরণ্ময় বলিলেন, "চল, তোমায় পৌঁছে দিয়ে আসি। এত রাত্রে একলা ছাড়তে নেই।"

পূর্ণিমা বলিল, "চল।"

হিরণ্ময় উঠিয়া পাখাটা বন্ধ করিলেন। পূর্ণিমা বলিল, "এখনও যেন বিশ্বাস করতে পারছি না। মনে হচ্ছে, ভারি সুন্দর একটা স্বপ্ন দেখছি।"

হিরণ্ময় বলিলেন, "কি যে বল! এত বড় একটা লম্বা-চওড়া স্থূল reality-কে স্বপ্ন মনে হচ্ছে? রাজপুত্র বর হলে না-হয় স্বপ্ন ভাবা যেত। সে বরং আমি স্বপ্ন দেখতে পারি যে, পূর্ণিমার চাঁদটা মানুষ হয়ে নেমে এসেছে আমার বুকের কাছে।"

পূর্ণিমা বলিল, "তোমাকে আমি প্রথম থেকেই গুরুজন ব'লে এতটা সমীহ ক'রে এসেছি যে, এর উপযুক্ত জবাব দিলাম না। জবাব যে নেই, তা নয়। শুধু এইটুকুই বলি, আমাদের দেশের মেয়ে যখন স্বামীর জন্যে তপস্যা করে তখন সে কন্দর্প বা কার্ত্তিকের মত বর চায় না, মহাদেবের মত বর চায়।"

হিরণ্ময় তাহাকে এক হাতে জড়াইয়া ধরিয়া কাছে টানিয়া আনিলেন। বলিলেন, "একটু রাগলেও তোমাকে ভারি সুন্দর দেখায়। এ মূর্ত্তিটি আগে দেখি নি ত।"

পূর্ণিমা বলিল, "এ রকম কথা বললে, এর চেয়েও রাগী মূর্ত্তি দেখতে হতে পারে।"

"সব কিছুর জন্যে প্রস্তুত থাকা ভাল। কথা এরপর কতরকম শুনবে, রাগও করবে," বলিয়া হিরণ্ময় পূর্ণিমাকে লইয়া নামিয়া গেলেন।

গাড়ী চলিল। অন্ধকারে হিরণ্ময়ের বাহু একবার পূর্ণিমার ক্ষীণ তনু বেষ্টন করিয়া ধরিল। পূর্ণিমা দুই হাতে তাঁহার একটা হাত ধরিয়া বসিয়া রহিল।

বাড়ীর সামনে গাড়ী থামিল। সরমা জানলায়

দাঁড়াইয়া রাস্তা দেখিতেছিল। দিদির সঙ্গে হিরণ্ময়কে দেখিয়া একটু বিস্মিত হইল বোধহয়।

হিরণ্ময় নামিয়া পূর্ণিমাকে নামিবার পথ করিয়া দিলেন। পূর্ণিমা নামিয়া পড়িতেই বলিলেন, "আসি তবে পূর্ণিমা।" ফিরিয়া গিয়া গাড়ীতে বসিলেন।

সরমা সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে দিদির দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "উনি কি তোমায় নাম ধ'রে ডাকেন দিদি?"

দিদি হাসিয়া বলিল, "এখন ত তাই ডাকছেন।"

২১

হিরণ্ময় বোধহয় সারাটা রাত বারান্দায় ঘুরিয়া কাটাইয়া দিবেন স্থির করিয়াছিলেন। রাত একটা পর্য্যন্ত তাঁহাকে ঘরের বাহিরে দেখিয়া চাকররা কিছু বিস্মিত হইল। তবে ইহাদের কাছে কোনও কথা লুকান বড় একটা যায় না। সুন্দরী তরুণীটি আজ-কাল যায়-আসে খুব বেশী এবং তাহাকে দেখিলে যে সাহেব হাতে স্বর্গ পান, তাহাও বুঝিতে তাহাদের দেরী হয় নাই। হৃদয়ঘটিত কোন ব্যাপারেই আজ গৃহস্বামীর এই অনিয়ম তাহা ভৃত্যেরা ধরিয়া লইল।

পূর্ণিমাও অনেক রাত পর্য্যন্ত ঘুমাইতে পারিল না। সকলে ঘুমাইয়া পড়ার পরেও সে জাগিয়া বসিয়া রহিল। ঘরের ভিতর ভাল লাগিল না, ছোট বারান্দায় গিয়া বসিল। ভোরের দুঃস্বপ্নের শেষে যে পূর্ণিমা আজ জাগিয়া উঠিয়াছিল, এই কি সেই? জীবনের উপর দিয়া তাহার এখন অমৃতের স্রোত বহিয়া গিয়াছে। যে-ধারা মরুভূমির ভিতর বিলীন হইতে চলিয়াছিল, তাহা হঠাৎ কলনাদিনী স্রোতস্বিনীতে পরিণত হইল কি ভাবে? করাল ঝটিকার মেঘ তাহার জীবনাকাশ ছাইয়া ফেলিয়াছিল। কাহার মুখের জ্যোতিতে এই কালিমা নিঃশেষে ঘুচিয়া গেল?

ঘুম তাহার আর কিছুতেই আসিল না। হিরণ্ময়ের মুখই তাহার সমস্ত হৃদয় পূর্ণ করিয়া জাগিয়া রহিল।

অবশেষে শ্রান্তদেহে ঘরে ঢুকিয়া শুইয়া পড়িল। তখন প্রায় শেষরাত। কিন্তু ভোরের আলো ঘরে ঢুকিতেই নিয়মমত তাহার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। তাড়াতাড়ি উঠিয়া প্রস্তুত হইতে লাগিল, এখনই হয়ত গাড়ী আসিয়া পড়িবে। সরমা উঠিয়া জিজ্ঞাসা করিল "ভোরে উঠেই কোথায় চ'লে যাচ্ছ ভাই? চা খাবে না?"

পূর্ণিমা বলিল "একবার মজুমদার সাহেবের বাড়ী যেতে হবে, সেখানেই চা খেয়ে নেব।"

সরমা জিজ্ঞাসা করিল, "অনেক কাজ জমা হয়ে গেছে বুঝি?"

পূর্ণিমা হাসিয়া বলিল, "অনেক।" বলিতে বলিতেই গাড়ী আসিয়া গেল।

হিরণ্ময়ের বাড়ী পৌছিয়া উপরে উঠিয়াই কাহাকেও দেখিতে পাইল না। তবে তাহার পদধ্বনি বোধ হয় তাহার আগমনের সংবাদ যথাস্থানে পৌছাইয়া দিল। হিরণ্ময় নিজের শয়নকক্ষ হইতে ডাকিয়া বলিলেন, "বোস, বোস, এক মিনিটেই আসছি।"

পূর্ণিমা ঘরে না ঢুকিয়া বারান্দায় ঘুরিতে লাগিল। বাড়ীটা দেখিতে বেশ, তরও বোধ হয় গোটা চার-পাঁচ। একজন মানুষের এতখানি জায়গায় কিই বা হয়? অবশ্য পদস্থ ব্যক্তি, নিজের পদমর্য্যাদার খাতিরেই বড় বাড়ীতে থাকিতে হয়।

হিরণ্ময় বাহির হইয়া আসিলেন, একেবারে স্নান সারিয়া আসিয়াছেন। পূর্ণিমার কাছে আসিয়া তাহার গাল টিপিয়া ধরিয়া বলিলেন, "গুড মর্ণিং। তুমি লক্ষ্মী মেয়ে ত, গাড়ী যাবা মাত্র এসেছ ঘুমোও নি রাত্রে, জেগেই ছিলে?"

পূর্ণিমা বলিল, "প্রায় তাই। ঘুম আসেই নি, অনেক রাতে শুয়েছি। তুমি ঘুমিয়েছিলে?"

হিরণ্ময় বলিলেন, "একেবারেই না। নিতান্ত চাকরদের সামনে মান রক্ষার খাতিরে রাত দুটোয় গিয়ে ঘরে ঢুকলাম। চল, চা দিয়েছে।"

খাইবার ঘরে ঢুকিয়া পূর্ণিমাকে বসাইয়া নিজে একটা চেয়ার টানিয়া নিয়া বলিলেন, "নাও, চাটা ঢাল দেখি। কাজকর্ম্ম কিছু জান কি না, তা ত কাল খোঁজ করাও হ'ল না, বৌয়ের চাঁদমুখ দেখেই ভুলে গেলাম।"

পূর্ণিমা চা ঢালিতে ঢালিতে বলিল, "চাঁদমুখটা ত নূতন নয়? এ ত অনেক দিনের দেখা।"

হিরণ্ময় বলিলেন, "সে দেখা আর এই দেখা? তফাৎ নেই দুটোতে? তোমার দৃষ্টি দেখেও কাল মনে হয়েছিল, আমাকে তুমি আগে কখনও দেখ নি, এই প্রথম দেখছ।"

পূর্ণিমা আরক্ত মুখে বলিল, "সত্যিই তাই। আগের দেখার সঙ্গে এ দেখা মেলে না।"

পূর্ণিমা চা ঢালিল, খাবারের প্লেট সাজাইল। হিরণ্ময়ের দিকে সব অগ্রসর করিয়া দিল, তাঁহার অনুরোধে নিজের জন্যও লইল। কিন্তু তাহার সামনে বসিয়া খাইতে তাহার লজ্জা করিতে লাগিল। যিনি আকাশের সূর্য্যের মত দুরধিগম্য ছিলেন, তিনি আজ সব-

চেয়ে নিকটতম মানুষ হইয়া কাছে আসিয়া পড়িয়াছেন, তবু পূর্ণিমার সঙ্কোচ যায় না।

হিরণ্ময় বলিলেন, "আমাকে এত লজ্জা করলে চলবে কি ক'রে? খাচ্ছ না কেন?"

পূর্ণিমা চেষ্টা, খানিক করিল, তবে খুব সফল হইল না। বলিল, "ক্রমে ক্রমে সব অভ্যাস হয়ে যাবে।"

হিরণ্ময় বলিলেন, "শিশু-বিবাহটা একদিক্ দিয়ে ভাল। এক সঙ্গেই দুজনে মানুষ হয়, লজ্জা-সঙ্কোচ কিছু করতে হয় না।"

পূর্ণিমা বলিল, "আমি জন্মালামই যে বড় দেরি ক'রে, নইলে প্রথম থেকে যদি তোমার হাতে পড়তাম তা হ'লে ত বেঁচে যেতাম, কোন দুঃখ আমায় পেতে হ'ত না। কত ভুল করলাম, কত যন্ত্রণা পেলাম। অথচ তুমি ত ছিলে কত কাছে।"

হিরণ্ময় বলিলেন, "এগুলো যে নিতান্তই মানুষের হাতে থাকে না। নইলে সমস্ত যৌবনটা আমার এমন মরুভূমিতে কাটবে কেন? যাক্, ভগবান্‌কে ধন্যবাদ যে শেষরক্ষা তিনি করলেন। নিজে জানতাম না কিন্তু তোমারই জন্যে অপেক্ষা করেছিলাম, আর কোন বিয়ের কথায় কখনও কানই দিই নি। চল, বসবার ঘরে যাই, এরা টেবিল পরিষ্কার করুক।"

পাশের ঘরে আসিয়া পূর্ণিমা তাঁহার কোল ঘেঁষিয়া বসিয়া পড়িল। হিরণ্ময় বলিলেন, "এবারে কিন্তু আর প্রেমালাপ নয়, এখন কাজের কথা। কিন্তু তার জন্যে তোমায় গম্ভীর হতেও হবে না, দশ হাত দূরেও স'রে যেতে হবে না।"

পূর্ণিমা সরিয়াই একটু গিয়াছিল, হিরণ্ময় তাহাকে টানিয়া আবার খুব কাছে আনিয়া ফেলিলেন, বলিলেন, "কাল থেকে মাথাটা একেবারে গোলমাল হয়ে আছে। প্রায় বাইশ বছরের ছেলের অবস্থা। তাই নিজেকে একটু শাসন করতে হচ্ছে। বেশী উচ্ছ্বাস দেখালে তুমি ভয় পেয়ে যাবে। আমার গুরুগম্ভীর মূর্তিটাই তোমার বেশী পছন্দ, না? তাকেই তুমি ভালবেসেছিলে।"

পূর্ণিমা হিরণ্ময়ের বাহুতে মুখ লুকাইয়া বলিল, "ঐ গুরুগম্ভীর মুখোসের আড়ালে যে পরম স্নেহময় মানুষটি ছিলেন তাঁকে কি আমি দেখি নি?"

হিরণ্ময় বলিলেন, "দেখেছিলে ত? তবে বল কেন যে আমার ভালবাসা তুমি বোঝ নি?" ইহার পর কাজের কথা খানিকক্ষণ ধামা চাপা পড়িয়া গেল।

তাহার পর হিরণ্ময় বলিলেন, "আমার ভারিক্কি হয়ে থাকার চেষ্টাটা খুব সফল হবে না দেখছি। তারুণ্যেরও একটা ছোঁয়াচ আছে। কিন্তু তোমার ভবিষ্যতের plan-গুলো ভাল ক'রে ভেবে তৈরি ক'রে নেওয়া দরকার যে? অবশ্য অবিলম্বে আমার গৃহলক্ষ্মী হবার যে plan সে ত ঠিকই আছে। কিন্তু তোমার আর একটি সংসার আছে ত? সেটার কথা ভাবতে হয়। মায়ের আশা ত ছেড়ে দিতেই হচ্ছে। পিসীমাও কিছু চিরকাল ভাইপো ভাইঝি আগলে ব'সে থাকবেন না।"

পূর্ণিমা বলিল, "তা ত থাকবেনই না। এরই মধ্যে যাবার জন্য চট্‌ফট্ করছেন। ভাইবোন দুটোকে কোথায় যে রাখা যায়।"

হিরণ্ময় বলিলেন, "আমদেরই সঙ্গে থাক্ না? তোমারও ভাল লাগবে, ওদেরও ভাল লাগবে।"

পূর্ণিমা একটু সঙ্কুচিত হইয়া বলিল, "সবসুদ্ধ এসে উঠব? তোমার জ্বালাতন লাগবে না?"

হিরণ্ময় বলিলেন, "একটুও না। একলা একলা ত বহুকাল কাটালাম, সেটা খুব কিছু enjoy করি নি। অল্পবয়সী কয়েকজন মানুষের সঙ্গ ভালই লাগবে। তোমাকেও দুটো সংসারে ছুটোছুটি করতে হবে না।"

পূর্ণিমা বলিল, "তুমি যদি খুশী মনে আন ওদের, তার চেয়ে ভাল ব্যবস্থা আর কি হতে পারে? আর তুমি যদি আমায় কাজ করতে আর না দাও, ত আলাদা সংসার চলবেই বা কি ক'রে?"

হিরণ্ময় বলিলেন, "কাজ আর করে না, থাক্। কোথায় বা কাজ করবে? আমার অফিসে চলবে না। তোমাকে আগলাবার জন্যে আমাকেও সঙ্গে সঙ্গে সেখানে কাজ নিতে হবে, যদি অন্য কোথাও যাও। দরকারও কিছু নেই কাজ করবার। চাকরির জগতে তুমি বড় misfit, সব সহকর্মীদেরই তপস্যাভঙ্গ করবে। নিজের দশা দেখেই বুঝছি। আর বাড়ীতে তোমার কম কাজ জুটবে ভাবছ? আমিই ত হব একটি whole time job; চব্বিশ ঘণ্টাই আমার ফরমাশ খাটতে হবে, আর আবদার রাখতে হবে। এত দেরি করলে আসতে, তার ক্ষতিপূরণ দিতে হবে না? শরীরটা সারাও, আর ফুলের ঘায়ে মূর্চ্ছা গেলে চলবে না।"

পূর্ণিমা বলিল, "ফুলের ঘাই বটে। পুরুষ মানুষদের মনে এটা কিরকম লাগে জানি না। আমি যে দুঃখ পেয়েছি তার সঙ্গে খালি তুষানলে পোড়ার তুলনা হতে পারে।"

হিরণ্ময় বলিলেন, "পুরুষ মানুষ ত নানারকম আছে। আমাকে দেখলে লোহার তৈরি মনে হয় বটে, কিন্তু ভিতরে রক্ত-মাংসের হৃদয়ই আছে। সেখানে ব্যথাও

লাগে, মেয়েদের যেমন লাগে। কিন্তু সেটা প্রকাশ করার ক্ষমতা কম।"

পূর্ণিমার চোখে জল আসিয়া পড়িল। অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে বলিল, "বড় অকৃতজ্ঞ আমি। কেন এ ছাই কথা আবার মনে এল? কেন আমি কিছুতেই ভুলতে পারছি না?"

হিরণ্ময় তাহার মাথায় আর পিঠে হাত বুলাইয়া বলিলেন, "চুপ কর লক্ষ্মীটি, এ নিয়ে আর কেঁদো না। এলই বা মনে? সময়ে সব মুছে যাবে। এ সব চিন্তা জোর ক'রে মন থেকে তাড়ানো যায় না। দু'দিন আগে যা সমস্ত অস্তিত্ব জুড়ে ছিল, তা কি হঠাৎ নিঃশেষে মুছে যেতে পারে? তোমার শরীর-মনের এই ত অবস্থা, তার উপর ভাগ্য তোমার সামনে আর এক পরীক্ষা খুলিয়ে রেখেছে। সেটা যাতে ভাল ভাবে পার হ'তে পার, সে জন্য নিজেকে তৈরি কর। তোমার চোখের জল আমায় বড় দুঃখ দেয় পূর্ণিমা।"

পূর্ণিমা চোখ মুছিয়া উঠিয়া বসিল। কিছুক্ষণ তাহার মুখ দিয়া কোন কথাই বাহির হইল না। হিরণ্ময় জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি এত ভাবছ?"

পূর্ণিমা বলিল, "নিজেরই কথা।"

"নিজের কি কথা?"

পূর্ণিমার চোখ দু'টি আবার ছলছল করিয়া উঠিল, বলিল, "এই শেষ একবার অতীত জীবনের কথা তুলব, আর কোনদিন বলব না। কিন্তু শান্তি পাচ্ছি না যে, তোমাকে না ব'লে। এই যে ব্যাপারটা আমার জীবনে ঘ'টে গেল দীপককে নিয়ে, এতে তুমি কিছু মনে কর নি ত? তুমি কাল বলছিলে যে, মানুষ যখন প্রাণ দিয়ে ভালবাসে তখন সে ষোল আনাই চায় একলা—"

পূর্ণিমার কথাটা শেষ হইতেই পাইল না। তাহার মুখ দুই হাতে ধরিয়া হিরণ্ময় বলিলেন, "এ নিয়েও অশান্তি? তুমি বড় ছেলেমানুষ। এখন কি আমায় ষোল আনা দিচ্ছ না, কেউ ভাগীদার আছে?"

পূর্ণিমা বলিল, "না, না, কেউ নেই, কিছু নেই।"

"তা হলেই হল। কোন্ কালে কার একটা ছায়া তোমার মনকে ছুঁয়ে গেছে, তা নিয়ে আমি মাথা ঘামাতে যাব কেন? যে-পূর্ণিমাকে পেলাম, সে ত একান্তই আমার। আমিই কি একেবারে নির্দোষ এদিকে? কোন ছায়া কি আমার মনকে স্পর্শ করেনি কোনদিন? তাই ব'লে কি ভাববে যে আমি তোমার স্বামী হবার অযোগ্য?"

পূর্ণিমা রুদ্ধকণ্ঠে বলিল, "না, না, এমন কথা ভাবব এত বড় মূর্খ আমি নই। তবু এই দুঃখ, কেন চিরদিনের সঞ্চিত ভালবাসা একমাত্র তোমাকেই দেওয়ার জন্যে রাখি নি। একনিষ্ঠ ভালবাসার আদর্শই যে আমাদের দেশের মেয়েদের আদর্শ।"

হিরণ্ময় বলিলেন, "হ'তে পারে আদর্শ, তবে তাকে জীবনে অনুসরণ করা যায় না। তুমি এটা ভুলে যাও, মনেই কোনদিন এন না। আমিও ভুলেই যাব। সব চেয়ে বড় কথা যে, দীপককে ভাল তুমি কোনদিন বাস নি, একটা সখের মত জিনিষকে ভালবাসা ভেবেছিলে কিছু দিন।"

পূর্ণিমা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "তাই হবে।" কিন্তু তাহার মুখের উপর হইতে ছায়া সরিল না।

হিরণ্ময় তাহার দুই বাহুমূল ধরিয়া মৃদুভাবে ঝাঁকাইয়া দিলেন। বলিলেন, "তবু মুখ ভার ক'রে ব'সে থাকতে হবে? আমি দেখছি বাল্যবিবাহই করছি এক দিক্ দিয়ে। তুমি এখনও সাবালিকা হও নি। আমি তোমার ভাবী স্বামী, আমি শপথ ক'রে বলছি, তোমাকে পেয়ে আমি সম্পূর্ণ পরিতৃপ্ত আর সুখী, আমার কোন আকাঙ্ক্ষা অপূর্ণ নেই, এতেও তোমার দুঃখ যাবে না? একটু হাস দেখি একবার। এ নি ত বাড়ী চ'লে যাবে, আমার মনটা শান্ত ক'রে দিয়ে যাও, চোখে জল নিয়ে যেও না। অফিস থেকে একসঙ্গেই ফিরব, তারপর তোমার মায়ের কাছে যাব, কেমন?"

"আচ্ছা," বলিয়া পূর্ণিমা উঠিয়া দাঁড়াইল। বলিল, "অফিসে আজ মুখ দেখাতে বড় লজ্জা করবে, যদিও কেউ এখনও কিছু জানে না।"

হিরণ্ময় বলিলেন, "ঐ লজ্জাতেই ধরা প'ড়ে যাবে।"

পূর্ণিমা হাসিয়া নামিয়া গেল। বাড়ী গিয়াই স্নান করিতে চলিল, কারণ, সময় আর বেশী ছিল না।

খাওয়া-দাওয়া সারিয়া অনেকক্ষণ ধরিয়া বাছিয়া বাছিয়া শাড়ী-জামা বাহির করিয়া পরিল। হিরণ্ময়ের চোখকে আরও যেন তৃপ্তি দিতে চায়। আর কোন ঐশ্বর্য্য ত সে প্রিয়তমের কাছে বহন করিয়া লইয়া যাইতে পারিবে না, বিধিদত্ত সৌন্দর্য্য আর তরুণ-হৃদয়ের সীমাহীন ভালবাসাই তাহার সম্বল।

সরমা জিজ্ঞাসা করিল, "দিদি, আজ এত সাজছ কেন?"

পূর্ণিমা লজ্জিতভাবে বলিল, "কই আর সাজছি ভাই? আমার সাজবার আছেই বা কি?"

সাজিবার কিছু থাকুক বা নাই থাকুক, ভগবান্ই তাহাকে আশা আর আনন্দের রঙে রাঙাইয়া দিলেন। পূর্ণিমাকে যে কি আশ্চর্য্য sweet দেখাইতেছে, এবং

তাহার জন্যে দায়ী যে ব্যক্তিবিশেষের ফিরিয়া আসা, এই বিষয়ে সহযাত্রিণীরা সারাপথ গবেষণা করিতে করিতে চলিলেন। আশ্চর্য্যের বিষয় পূর্ণিমার রাগ হইল না।

অফিসে পৌঁছিয়া সে নিজের ঘরে চলিল। কেবলই মনে হইতে লাগিল, সবাই যেন তাহার দিকে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তাকাইয়া আছে। মুখখানা ক্রমান্বয়ে সাদা আর লাল হইতে লাগিল।

হিরণ্ময়ের ঘরে অনেক লোক, প্রায় কুড়ি মিনিট পরে তাহার ডাক আসিল। কাগজ-কলম গুছাইয়া লইয়া পূর্ণিমা উঠিয়া দাঁড়াইল। পা দুইটা একটু কাঁপিয়া গেল। অবাক্ হইয়া ভাবিল, এ তাহার হইল কি?

হিরণ্ময়ের ঘরে ঢুকিয়া, সলজ্জভাবে হাসিয়া তাঁহার দিকে তাকাইল। এই নূতন জীবনের সবই অচেনা, কোথায় কেমন ভাবে চলিবে সে?

তাহার হাসির প্রত্যুত্তরে হাসিয়া হিরণ্ময় বলিলেন, "কাজ করতে পারবে মনে হয়? জমা হয়েছে বেশ কিছু কিন্তু।"

পূর্ণিমা বলিল, "চেষ্টা ত করি।"

হিরণ্ময় তাহার আরক্ত মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "মুখটা ত বেশ গোলাপ ফুলের মত ক'রে এনেছ। সম্পূর্ণ সুস্থ মনে হচ্ছে না কিন্তু। ভাল feel করছ ত?"

পূর্ণিমা সত্য কথা বলিয়া ফেলিল, "খুব ভাল লাগছে না।" সত্যই ভাল ছিল না সে। বুকের ভিতরটা দুরুদুরু করিয়া কাঁপিতেছিল, হাত-পা-গুলোও তাহার বশে ছিল না।

হিরণ্ময় বলিলেন, "দেখতেই পাচ্ছি তা। তোমাকে না আনলেই হ'ত। কিন্তু সারাটা দিন দেখতে পাব না, এখানে তবু চোখের সামনে থাকবে। কাজ অনেক করতে পারবে এ আশা করি নি, নিজেও কাজে খুব মন দিতে পারছি না। তবু সাড়ে তিনটা আন্দাজ কোনমতে কাটিয়ে যাব। ততক্ষণ আমি আস্তে আস্তে dictate করি, আস্তে আস্তে লেখ তুমি। দেরি হ'লে nervous হবার কিছু নেই। আজকেই বিজ্ঞাপনটা দিতে ব'লে দেব। রোজ রোজ তোমায় টেনে আনব না, অস্বস্তি ভোগ করতে! বিশ্রাম দরকার তোমার।"

পূর্ণিমা তাঁহার কথামত কাজ আরম্ভ করিল। মন খালি বিক্ষিপ্ত হইয়া যায়, চোখ চলিয়া যায় কাগজ ছাড়িয়া। এক কথা পাঁচবার জিজ্ঞাসা করিতে হয়। খানিক পরে বলিল, "আমি যে মন দিতে পারছি না কিছুতেই। আমি একেবারে তোমার স্ত্রী হবার অযোগ্য, তোমার ত কাজে একচুল এদিক্ ওদিক্ হচ্ছে না?"

হিরণ্ময় বলিলেন, "থাক্, কাজ করতে হবে না। আমি যে জন্মেছি তোমার অনেক আগে পূর্ণিমা, ঝড়-ঝাপটা, বজ্রপাত সব কিছুর মধ্যে ব'সে অবিচলিতভাবে কাজ করার training আমার বহুদিনের। তবে যতটা অবিচলিত আমাকে দেখাচ্ছে, ততটা সত্যিই আমি নই। তুমি নিজের ঘরে গিয়ে চা-টা খাও একটু আর magazine পড়। আমি অভিলাষকে ডেকে খানিক কাজ ক'রে নিই, তারপর চ'লেই যাওয়া যাবে।"

পূর্ণিমা নিজের ঘরে ফিরিয়া গেল। সমস্ত জগৎ-সংসারটাকে তাহার নূতন লাগিতেছে কেন? বুকের ভিতরটা তাহার স্পর্শমণির স্পর্শে সোনা হইয়া গিয়াছে, পৃথিবীর উপরেও কি সেই ছোঁয়া লাগিয়াছে?

পাশের ঘরে অভিলাষ আসিয়া বসিয়াছে এবং হিরণ্ময় তাহাকে চিঠি dictate করিতেছেন। মানুষের গলার স্বর কানের ভিতর দিয়া মর্ম্মের মাঝখানে এমন মধুসিঞ্চন করে কি করিয়া?

খানিক সময় কাটিল এই ভাবেই। কিছু না করিয়াই সে ক্লান্ত হইয়া পড়িল, অথচ কিছু করিবার ক্ষমতা যে আজ সে হারাইয়াছে। কেন এমন হয়? এই কয়দিন আগে, যখন তাহার বঞ্চিত হৃদয় তাহাকে প্রায় মৃত্যুর মুখে ঠেলিয়া দিয়াছিল, তখনও ত সে কাজ করিয়াছে? প্রাণপণ প্রয়াসে নিখুঁৎ করিয়া করিবার চেষ্টা করিয়াছে যাহাতে হিরণ্ময় একেবারে বিরক্ত না হন। তবে এখন তাহার স্নায়ুতন্ত্রী এমন শিথিল হইয়া পড়িতেছে কেন? সমস্ত দেহমন বিশ্রাম চায়, কিন্তু নির্জ্জনতা চায় না। সারা বিশ্ব অবলুপ্ত হইয়া যায় যাক, কিন্তু হিরণ্ময়ের সান্নিধ্যটাকে তাহার নিঃশ্বাসবায়ুর মতই প্রয়োজন।

সাড়ে তিনটা ক্রমে বাজিল। হিরণ্ময় উঠিয়া পড়িলেন, অভিলাষ পলাইয়া বাঁচিল।

পূর্ণিমার ঘরের দরজার কাছে আসিয়া হিরণ্ময় বলিলেন "চল এইবার। কোনদিকে তাকিও না, তা হ'লে আর হাঁটতে পারবে না।"

পূর্ণিমা জিজ্ঞাসা করিল, "কেন?"

"বিকাশবাবুকে বললাম সেক্রেটারির জন্যে বিজ্ঞাপন দিতে। তিনি ত চোখ কপালে তুলে বললেন, 'সে কি স্যার, মিস্ সান্যাল আর কাজ করবেন না?' কাজেই তাঁকে বলতে হ'ল যে মিস্ সান্যাল অন্য কাজ নিচ্ছেন।"

পূর্ণিমার মুখখানা একেবারে রক্তগোলাপের রূপ ধরিল, বলিল, "তিনি শুনে কি বললেন?"

হিরণ্ময় বলিলেন, "ভদ্রলোক মহা উচ্ছ্বসিত। বললেন, 'আমার বলা সাজে না স্যার, কিন্তু আমি বয়সে

অনেক বড়, আশীর্ব্বাদ করি আপনারা চিরসুখী হোন। এত ভাল মেয়ে আপনি সারা দেশ খুঁজলেও পেতেন না।' অন্য লোক হ'লে ভাবতাম যে মন-রাখা কথা বলছে, কিন্তু ওঁকে চিনি ত, এটা সত্যিই তাঁর অন্তরের কথা, সুতরাং এতক্ষণে সবাই জেনেছে এবং তোমাকে দেখবার জন্যে উদ্‌গ্রীব হয়ে ব'সে আছে। অতএব চোখকান বুজে নেমে চল।"

পূর্ণিমা তাঁহার কথা মতই নামিয়া গেল। চোখ প্রায় বুজিয়াই নামিল, যাহাতে অতি কৌতুহলী কোনো চোখের সঙ্গে চোখাচোখি না হয়। হিরণ্ময় সোজাসুজি সকলের দিকে তাকাইয়া দেখিলেন, তাঁহার মুখের ভাব অবিচলিতই থাকিয়া গেল।

এত সকাল সকাল তাঁহাকে বাড়ী ফিরিতে দেখিয়া চাকররা কিঞ্চিৎ অবাক্ হইয়া গেল। তবে দু'চার দিন ধরিয়া সকল রকম অনিয়মে তাহারা অভ্যস্ত হইয়া আসিতেছিল। চট্‌পট্ করিয়া চায়ের জোগাড় করিয়া আনিল।

চায়ের টেবিলে বসিয়া হিরণ্ময় বলিলেন, "আমাকে যত্ন ক'রে খাওয়ানর rehearsal-টা ত দু'বেলা বেশ দিচ্ছ, কিন্তু তুমি আমার সঙ্গে না খেলে আমিও খাব না।"

পূর্ণিমা লজ্জিত হইয়া বলিল, "সত্যি, বাড়ীতেও আমি এই রকমই খাই, বেশী খেতে পারি না।"

"তা তোমার মূর্ত্তি দেখেই বুঝেছি। নামে পূর্ণিমা, কিন্তু ষোলকলায় পূর্ণ একেবারে নয়, বড় জোর তৃতীয়ার চাঁদ। তেইশ-চব্বিশ বছরের মেয়ে, অথচ তোমাকে এক হাতে তুলে ফেলা যায়। লোকের কাছে নিজের বউ ব'লে পরিচয় দিতে যে লজ্জা করবে?"

অগত্যা পূর্ণিমাকে আর একটু খাইতে হইল। দ্বিতীয় বার চা ঢালিতে ঢালিতে সে বলিল, "মায়ের সাধ ছিল আমার ঘর-সংসার দেখার। তিনি যেমন চেয়েছিলেন তার চেয়ে হাজার গুণ ভাল বিয়ে হচ্ছে তাঁর মেয়ের, কিন্তু চোখে কিছুই দেখে যাবেন না, কানেই শুধু শুনবেন।" তাহার মুখ ম্লান হইয়া গেল।

হিরণ্ময় তাহার পিঠে হাত বুলাইয়া বলিলেন, "কি করবে বল? এ ত মানুষের হাত নয়? তোমার সব কর্ত্তব্যই তুমি করেছ, এই মনে ক'রে নিজেকে সান্ত্বনা দাও। আর এই যে বিচ্ছেদের দুঃখ এগিয়ে আসছে, তা তোমার একলা দাঁড়িয়ে সইতে হবে না। ভগবান্ সঙ্গী একজন দিচ্ছেন যে তোমার সব সুখ-দুঃখের ভাগ নেবে। তোমার মা নিশ্চিন্ত শান্তিতে যাবেন এটাও মস্ত বড় কথা। অন্য সন্তানদের জন্যেও তাঁকে ভাবতে হবে না।"

পূর্ণিমা বলিল, "কত জন্ম যে আমার লাগবে তোমার ঋণ শোধ করতে।"

হিরণ্ময় বলিলেন, "একেবারে শোধ ক'রে দিও না, তা হ'লে পরের জন্মে তোমার নাগাল পাব কি ক'রে? ঋণ আর কতটা বাড়ান যায় তা ভেবে দেখতে হচ্ছে।"

পূর্ণিমা চোখের জলের ভিতর দিয়া হাসিয়া বলিল, "ঋণ না থাকলেও আসব। আশা করি পরজন্ম আছে। এতবড় জিনিষ এক জন্মের জন্যে নয়, জন্মজন্মান্তরের সঙ্গে থাকবে। শুধু ভগবান্ যেন সকাল সকাল চিনিয়ে দেন তোমায়।"

"এ প্রার্থনাটা আমারও পূর্ণিমা, এ জন্মে অনেক বঞ্চিত হলাম।"

চা খাওয়া চুকিয়া গেল। হিরণ্ময় বলিলেন, "এখনও visitors' hour এর দেরি আছে। চল, ভাবী বাসস্থানটা একটু তোমায় দেখিয়ে দিই, হয়ত কিছু অদল-বদল করতে হবে। পুরুষ মানুষের চোখে সব পড়ে না। খাবার ঘর ত বেশ ভাল ক'রেই দেখেছ, বসবার ঘরেও গিয়েছ, তবে সেটা কতদূর দেখেছ জানি না। মানুষটার দিকেই চোখ থেকেছে, ঘরের দিকে নয়, আর এদিকে ও দুটো ঘর, শোবার ঘর আর ড্রেসিং রুম। দুদিকেই এক একটা ক'রে বাথরুম আছে। ভিতরে যাবে, না লজ্জা করবে? তোমারই ঘর হবে, লজ্জা করবে কেন?"

অগত্যা লজ্জা না করিয়া পূর্ণিমাকে সব ঘরে ঘুরিতে হইল। বলিল, "বেশ সুন্দর বাড়ী, কিন্তু সরমারাও এলে একটু জায়গার টানাটানি প'ড়ে যাবে না?"

"বেশী নয়। খাবার ঘরটা ওদের দুভাই-বোনের শোবার ঘর হতে পারবে, মাঝে একটা পার্টিশন্ দিয়ে। বসবার ঘরেই খাবার টেবিল-চেয়ার ধ'রে যাবে, ওখানেও পার্টিশন্ দেওয়া যায় দরকার হলে। কলকাতায় স'ব মানুষকেই একটু ঘেঁষাঘেঁষি ক'রে থাকতে হয়।"

পূর্ণিমা বলিল, "এ আর কি ঘেঁষাঘেঁষি? এ ত রাজার হালে থাকা।"

অল্পক্ষণ পরেই তাহারা হাসপাতালের পথে বাহির হইয়া পড়িল। গিয়া পৌঁছিতে সন্ধ্যা হইয়া গেল।

তন্দ্রাচ্ছন্ন মা জাগিয়া উঠিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোর সঙ্গে কে খুকী?"

পূর্ণিমা বলিল, "উনি এসেছেন মা!"

তিন-চারটা বালিশ পিঠের দিকে গুঁজিয়া দিয়া পূর্ণিমা মাকে উঁচু করিয়া বসাইল। মা জিজ্ঞাসা করিলেন "কেঁন রে?"

হিরণ্ময় পূর্ণিমার হাত নিজের হাতে তুলিয়া লইয়া

বলিলেন, "মা, আপনাকে আমরা এক সঙ্গে প্রণাম করতে এলাম। আপনি ত ওকে আমারই হাতে দিতে চেয়েছিলেন।"

সুরবালার দুই চোখ জলে ভরিয়া উঠিল। হিরণ্ময়ের মাথায় হাত দিয়া বলিলেন, "বাবা, তুমি রাজ্যেশ্বর হও। গরীবের মেয়ে নিলে, কিন্তু কখনও কোনও দুঃখ পাবে না ওর জন্য, নিজের পেটের মেয়ে, তবু বলছি।"

হিরণ্ময় বলিলেন, "আমার জন্যেও ও যেন দুঃখ না পায়, সেই আশীর্ব্বাদ করুন।"

সুরবালা বলিলেন "তুমি মানুষকে দুঃখ থেকে উদ্ধার করতেই জন্মেছিলে, তোমাকে দিয়ে কারো কোনও মনোকষ্ট হবে না।"

হিরণ্ময় বলিলেন, "সরমা আর রণেনও এরপর পূর্ণিমার কাছেই থাকবে। ওদের জন্যে কোনও দুশ্চিন্তা মনে রাখবেন না।"

সুরবালা বলিলেন, "ভগবান্ শুনলেন তোমার কথা, তিনিই তোমায় পুরস্কার দেবেন, মানুষের সাধ্য নয়।"

বেশীক্ষণ বসা চলিল না। উঠিয়া আসিবার সময় হিরণ্ময় বলিলেন, "দু'তিন দিনের মধ্যেই যাতে বিয়েটা হয়ে যায়, সেই রকম ব্যবস্থা করছি।"

বাহির হইয়া আসিতে আসিতে পূর্ণিমা বলিল, "মাকে যে কথা দিলে, অত তাড়াতাড়ি হতে পারবে?"

হিরণ্ময় বলিলেন, "হতেই হবে, কলকাতার শহরে না হয় কি?"

পূর্ণিমাদের বাড়ীর কাছে আসিয়া পড়িল গাড়ী। হিরণ্ময় বলিলেন, "এবার বলার পালা কিন্তু তোমার।"

গাড়ীর শব্দে সরমা ও রণেন এক সঙ্গে উঁকি মারিল। পূর্ণিমা নামিল, হিরণ্ময়ও নামিলেন তাহার সঙ্গে।

ছোট ঘরে হিরণ্ময়কে বসাইয়া পূর্ণিমা বলিল, "একজন পুরনো বন্ধুর নূতন পরিচয়টা দিই।"

সরমা ব্যগ্র হইয়া তাকাইল। রণেন প্রায় চিৎকার করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কি দিদি?"

পূর্ণিমা আরক্ত মুখে বলিল, "আগে বড় সাহেব ছিলেন, এখন বড় জামাইবাবু হলেন তোমাদের।"

সমাপ্ত
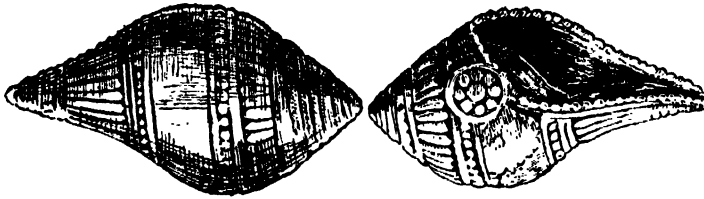
১

কাল—সন্ধ্যা, ভ্যাসিউ (বসুর ইঙ্গবঙ্গ রূপ) সাহেবের গৃহে চায়ের পার্টি। ভ্যাসিউ সাহেবের কন্যা বিনীতার পরামর্শমত নিমন্ত্রিতদের বাছাই করা হইয়াছে। বিনীতা শিল্পানুরাগী ও বিদুষী। শিল্পীদের প্রতি অনুরক্ত হওয়ায়, নৃত্য-কলাবিৎ অভিনেতা-অভিনেত্রী, চিত্রশিল্পী, সঙ্গীতজ্ঞ প্রভৃতিদের মধ্যে ছাপার অক্ষরে যাঁহাদের নাম দৈনিক পত্রিকায় বাহির হইয়াছে এবং ভবিষ্যতে যাঁহাদের সম্বন্ধে অনুরূপ বিজ্ঞপ্তির সম্ভাবনা আছে, তাঁহারা সকলেই নিমন্ত্রিতদের মধ্যে স্থান পাইয়াছেন।

ভ্যাসিউ সাহেব ঘোরতর সাহেব-ঘেঁষা মানুষ হইলে কি হইবে, অন্তরে স্বদেশী ভাগ্যদেবীকে বিশেষভাবে খাতির করিয়া চলেন। যে-কোন শুভকার্য্যের প্রারম্ভে পঞ্জিকার নির্দ্দেশ লইতে হয়। দিন, ক্ষণ, উদ্দেশ্য সবকিছু এক যোগে "মাভৈঃ"-এর সঙ্কেত না দিলে তিনি কোন কাজেই হস্তক্ষেপ করেন না। পার্টির গোপন উদ্দেশ্য, বিনীতার জন্য পাত্র-নির্ব্বাচন, তাই ভবিষ্যৎ সম্বন্ধীয় হিতোপদেশ যথাসম্ভব পঞ্জিকা হইতে সংগ্রহ করা হইয়াছিল।

এক কালে দৈন্যের সহিত বোঝা-পড়া করিতে গিয়া ভ্যাসিউ সাহেবকে নাজেহাল হইতে হয়। ভাগ্যক্রমে কোন সত্যিকারের সাহেবের নেক-নজরে পড়িয়া যাওয়ায় অবস্থার পরিবর্ত্তন ঘটে এবং অল্প সময়ের ভিতর বিলাতী কৃপা ব্যবসাকে ফাঁপাইয়া তোলে। উক্ত সাহেবের দর্শন লাভ হইয়াছিল পাঁজি দেখিয়া। তাহার পর হইতে পাঁজির ভবিষ্যৎবাণী ও সাহেবীয়ানাকে তিনি কায়মনোবাক্যে মান্য করিয়া আসিতেছেন এবং ব্যাঙ্কে মোটা অঙ্কের টাকা জমিয়া যাওয়ায় মান্যবর ব্যক্তি হইয়া

গিয়াছেন। মান্থবরের খ্যাতি অক্ষুণ্ণ রাখিতে হইলে জামাতৃপরিচয়ও তদপযুক্ত হওয়া একান্ত বাঞ্ছনীয়। এই কারণে নিমন্ত্রিত কলাবিৎদের ঘরোয়া খবর কন্যার অজ্ঞাতে সংগ্রহ করিতে হইয়াছিল।

অবশ্য বাছাইয়ের সূত্রে অনেককে যে বাতিল করা হইয়াছিল তাহা পরামর্শ ব্যতীত হয় নাই। যিনি এই দায়িত্বপূর্ণ কর্ত্তব্যে সাহায্য করিয়াছিলেন তিনি ভ্যাসিউ সাহেবের বান্ধবী। উপস্থিত নাম গোপন রাখিলাম। শ্রীমতী X বলিলেই চলিবে। বিশদ পরিচয় পরে প্রকাশ্য।

শিল্পী-জাতীয় জীবদের ভ্যাসিউ সাহেব তেমন সুনজরে দেখিতেন না। আর্থিক সচ্ছলতা সম্বন্ধে তাহারা এমনই উদাসীন যে, ধনীর সন্তান হইলেও কখন যে সবকিছু উড়াইয়া পথে বসিবে তাহার স্থিরতা নাই। তাছাড়া কন্যা অবাঞ্ছিতকে পছন্দ করিলে পিতাকে ডবল করিয়া কন্যাদায়গ্রস্ত হইতে হয়, বিবাহের আগে এবং পরে কোন সময় নিস্তার নাই। এই সম্ভাবনা বিষয়ে সাবধানতার জন্যই বাছাই-এর দিকে কড়া নজর রাখিতে হইয়াছিল।

নিমন্ত্রণের আয়োজনে, সব দিক্ দিয়া বিচার করিলে বলিতে হয়, হিসাবের কোন ক্রটি হয় নাই। কেবল একজন সঙ্গীতজ্ঞ সম্বন্ধে খাঁটি খবর পাওয়া যায় নাই। কেহ বলিয়াছে বেজায় বড় দরের স্কলার, বিশ্ববিদ্যালয়ের তকমা সংগ্রহ করা নেশা। কেহ বলিয়াছে টাকার কুমীর, কেহ বলিয়াছে এই খবরগুলি সর্ব্বৈব মিথ্যা। যে যাহাই বলুক, ভ্যাসিউ সাহেব এই সঙ্গীতজ্ঞকে লইয়া ফাঁপরে পড়িয়া গিয়াছিলেন। লোকটা ধুতি পরে। পরিচয়ের সূত্রপাতেই করমর্দ্দনের পরিবর্ত্তে জোড় হস্তে নমস্কার ঠুকিয়া দেয়। সর্ব্বোপরি ইংরেজীর সংমিশ্রণে বাংলা ভাষাকে মার্জ্জিত করিতে জানে না। সুতরাং লোকটি যে স্তরেরই গায়ক হউক, সভ্য-সমাজে অচল। অথচ বেহায়া, শ্রীবদন দেখাইবার জন্য পার্টিতে ঢুকিয়া পড়িয়াছে। বিনীতাকে এই লজ্জাকর অবস্থার জন্য দায়ী করা যায় না, কারণ শিশুকাল হইতে চরিত্রশুদ্ধির প্রকরণে খাঁটি মেম গভর্ণেসের শিক্ষা বিনীতার আত্মাকে পর্য্যন্ত শুদ্ধ করিয়া ছাড়িয়াছে। আর্টে স্বদেশীয়ানার প্রতি পক্ষপাতিত্ব যতই মাথা খাড়া করুক, ভ্যাসিউ সাহেব জানিতেন, বিনীতা কখনই তার ঐ শিক্ষালব্ধ আত্মমর্য্যাদাকে ক্ষুণ্ণ হইতে দিবে না। অতএব শত্রুপক্ষীয় কোন কূট চক্রান্তে এই রূপটি ঘটিয়াছে। সিদ্ধান্ত নির্ভরযোগ্য মনে হওয়ায় একবার ভাবিয়াছিলেন, লোকটিকে কোন উপায়ে বাড়ীর বাহির করিয়া দেন, কিন্তু কেলেঙ্কারীর সম্ভাবনা থাকায় সদিচ্ছা হইতে বিরত হন। অন্য কোন উপায় না থাকায় বান্ধবীকে অনুরোধ করিতে বাধ্য হন, গায়কের উপর নজর রাখিতে। বর্ব্বরের ব্যবহার কখন কিরূপ হইবে কিছুই বলা ত যায় না?

নিমন্ত্রিতদের মধ্যে যাঁহারা স্বাতন্ত্র্যপ্রিয় তাঁহারা একে একে বা জোড়ে দেরি করিয়া আসিতেছিলেন। ভ্যাসিউ সাহেবের পার্টিতে high tea-র উল্লেখ করিয়া নিমন্ত্রণ আসিলে ধরিয়া লইতে হয়, উগ্রতরলের ব্যবস্থা আছে এবং চায়ের উচ্চতাও ডিনারে গিয়া পৌঁছাইবে। যাঁহারা আত্মবিজ্ঞপ্তির জন্য বিশেষ ভাবে সাজিয়াছিলেন তাঁহাদের আঁট-সাঁট গলায় ফাঁস দেওয়া কালো ও সাদা পরিচ্ছদ হইতে অনুমান করা চলে, রাত্রের ভোজন এইখানেই সরিয়া যাইবেন।

আবরণের সাহায্যে কে কতটা বে-আব্রু হইতে পারেন তাহা নিমন্ত্রিত মহিলাদের প্যাঁচানো শাড়ীর ভাঁজ ও ব্লাউসের স্বল্পতায় স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। কেশ-বিন্যাসে—মেম-সাহেবী চাল অনুকরণেও কেহ কাহারও অপেক্ষা নিকৃষ্টা নয়।

ক্ষৌরকার্য্য দ্বারা কাহারও মাথার পিছনটা মুণ্ডিত-প্রায়, কাহারও ঢেউ-খেলান রুক্ষ চুল স্কন্ধ পর্য্যন্ত আসিয়া ববত্ব (bobbed) প্রাপ্ত হইয়াছে। কাহারও প্রসাধনে কেশগুচ্ছকে ঝোলান ঝাঁটা অথবা ঘোটক-লাঙ্গুলের আকৃতি দেওয়া হইয়াছে। অবশ্য সে ঝাঁটার দু'চার ঘা পিঠে পড়িলে অনেকেই চরিতার্থ হন।

ইতিমধ্যে যাঁহারা ঘরের ভিতর সমাবিষ্ট হইয়াছেন তাঁহাদের 'মার্জ্জিত' কথোপকথনে আসর গুলজার। মিলিত কণ্ঠের ভাবোচ্ছ্বাস, মৃদুগুঞ্জনের এলাকা পার হইয়া হুল্লোড়ের তল্লাটে আসিয়া পৌঁছাইয়াছে। Weather forecast হইতে আরম্ভ করিয়া সিনেমার নবাবিষ্কৃত তারকা, টাটকা divorce case বা আধুনিক আর্ট-জাতীয় কৃষ্টির আলোচনায় উল্লাস ও উত্তেজনা একই সঙ্গে প্রকাশিত হইতেছে। ফলে সবকিছু তাল-গোল পাকাইয়া মার্জ্জিত ভাষণই মেছোবাজারের আবহাওয়া সৃষ্টি করিয়াছে।

ভ্যাসিউ সাহেব, দুহিতা ও পত্নীর সহযোগে অভ্যাগতদের সম্বর্দ্ধনা করিতেছেন। সুসজ্জিত বেয়ারা চা বিতরণের সরঞ্জাম লইয়া নিমন্ত্রিতদের সামনে টহল দিতেছে। উগ্রতরলের তখনও আবির্ভাব হয় নাই। এ বিষয়ে অলিখিত সূর্য্যাস্ত আইন পাহারা থাকায় বিবেকী সমজদাররা অধীর হইয়া শুভ মুহূর্ত্তটির জন্য

অপেক্ষা করিতেছেন। যাঁহারা ইতিমধ্যে ধৈর্য্য হারাইয়াছেন তাঁহারা আর্টের আলোচনা লইয়া পড়িয়াছেন, ধূম করিয়া জীবন্ত প্রাচীনপন্থী শিল্পীদের সপিণ্ডকরণ চলিয়াছে। সজ্ঞানে অজ্ঞতার কসরৎ দেখিলে বলবান্ পালোয়ানরাও ভয় পাইয়া যায়।

এই প্রসঙ্গে আবেষ্টনীর কিঞ্চিৎ বর্ণনা প্রয়োজন।

ঘরের আসবাবপত্র সাজানোর প্রথায় সুচিন্তিত প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য রুচির অপূর্ব্ব সংমিশ্রণ পরিবেশকে এমনই বৈশিষ্ট্যম্পূর্ণ করিয়াছে যে কিপলিং বাঁচিয়া থাকিলে বিয়াকুফ বনিয়া যাইতেন। প্রাচ্য-পাশ্চাত্ত্য কোনদিন মিলিবে না, তাঁহার এই সিদ্ধান্তটি যে কত ভিত্তিহীন তাহা ভ্যাসিউ সাহেবের গৃহে প্রবেশ করিলেই প্রমাণ হইয়া যাইত।

প্রশস্ত ঘর, স্থাপত্য আধুনিক মার্কিন প্রভাবে প্রভাবান্বিত। ইরাণ, আরব ইত্যাদি দেশের ক্ষুদ্রাকার গালিচা বিক্ষিপ্ত অবস্থায় ইতস্ততঃ পড়িয়া রহিয়াছে। হঠাৎ দেখিলে মনে হয়, এগুলিকে গুছাইয়া অবহেলা করা হইয়াছে। দেয়ালে অবনীন্দ্রনাথ, নন্দলাল প্রভৃতি শিল্পীদের অঙ্কিত ছবি ঝুলিতেছে। সব কয়টিই ছাপান ছবি ;—প্রবাসী, ভারতবর্ষ ও অন্যান্য পত্রিকার পাতা ছিঁড়িয়া সংগ্রহ করা হইয়াছে। Original কিনিবার ক্ষমতা নাই এমন নয়, তবে ভ্যাসিউ সাহেব এক্ষেত্রে আসল ও নকলে কোন প্রভেদ দেখিতে পান না। অযথা আসলের পিছনে মোটা টাকা খরচ করিলে ত বেশি করিয়া দেয়ালের শ্রীবৃদ্ধি হইবে না? মূল্যবান্ কার্পেট সম্বন্ধেও আপত্তি উঠিয়াছিল, কিন্তু সাহেবদের ঘরে এই পদদলিত শোভা যখন অপরিহার্য্য, তখন কন্যার আবদার না মানিয়া করেন কি?

ঘরের কোণায় একটি প্রাচীন তক্তপোশকে খাস স্বদেশী গালিচা মুড়িয়া তাহাকে দিভানের সম্মান দেওয়া হইয়াছে। আসনটির উপর স্তূপীকৃত গোলাকার কুশন, প্রত্যেকটির খোল বাংলার কাঁথা দিয়া মোড়া। কাঁথায় বিভিন্ন নক্সা জাতীয় কারুশিল্পের নিদর্শন। দিভানটি আলো-আঁধারির মধ্যে কোণস্থ হওয়ায় কৌতূহল ও আকর্ষণের কেন্দ্র হইয়া উঠিয়াছে।

লোভনীয় স্থানটির অন্তিম কোণায়, আছোলা মোটা বংশদণ্ডের উপর ডোমপাড়া হইতে সংগৃহীত রঙীন ধামার সাহায্যে বৈদ্যুতিক আলোককে ঘোমটা দেওয়া হইয়াছে। এই কারণে উজ্জ্বল আলোক-রশ্মিতেও কেমন একটা সলজ্জ ভাব। একটু গোপনীয় কথা, একটু অতর্কিতে ছোঁয়ার সুবিধা দিবার জন্যই যেন আলো-আঁধারি অপেক্ষা করিয়া আছে। ঘরের চতুর্দ্দিকে স্যুট-মেলানো ইস্পাতের সোফা ও চেয়ার। বসিবার আগে ইষ্ট-দেবতাকে স্মরণ করিতে হয়, কারণ আসনগুলি পায়াহীন। চেয়ারগুলির এক পার্শ্বে বেতের মোড়া, তাহার উপর মাপসই পালিশ করা বারকোশ রাখিয়া পেগটেবিল করা হইয়াছে। চেয়ারগুলির অপর পার্শ্বে পিতলের পঞ্চপ্রদীপ ছাইদানী হিসাবে ব্যবহৃত হইতেছে। চেয়ার ও সোফার মধ্যস্থলে centrepiece, তাহার উপর বিরাজ করিতেছে বিদরীর কাজ-করা মোগলাই পিকদানী। নিষ্ঠীবন-পাত্রটি একলা থাকিলে curio বলিয়া ছাড়ান দেওয়া যাইত। কিন্তু ফুলের বাহার ভিতরে প্রবেশ করায় অনুমান করা চলে, সুন্দরের সংস্পর্শে সব কিছুকে জাতে তুলিবার প্রয়াস দমাইয়া রাখা যায় নাই। কড়িকাঠ হইতে ঝোলা আলোর ব্যবস্থাও চমকপ্রদ। ঝুমকাযুক্ত শিকায় হবিষ্য পাকের পোড়া মালসাকে আলপনা দ্বারা বিচিত্রিত করিয়া তাহার ভিতর ইলেকট্রিক বাল্‌ব্ রাখা হইয়াছে। Indirect lighting-এর প্রয়োজনীয়তায় মালসা হইতে যেটুকু আলো বাহির হইতেছে তাহাকেও খর-পাকড় করিয়া উপর দিকে ঠেলিয়া দেওয়ায় দৃশ্যবস্তুকে চিনিতে হইলে দিব্যদৃষ্টি ছাড়া গতি নাই, সংক্ষেপে প্রাচীন ও আধুনিক এবং প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য রুচির সমাবেশ ও সামঞ্জস্য বিচার করিলে পরিবেশকে অভিনবত্বপূর্ণ বলা চলে।

বেয়ারা রটান (রতন) সাহেবের পেয়ালায় চা ঢালিতেছে। রটান সাহেব অন্যমনস্ক। পাত্রটি পরিপূর্ণ হইবার উপক্রম দেখিয়া পার্শ্বেই আসীন মিসেস ন্যান্ডি (শ্রীমতী নন্দী) আতঙ্কিত হইয়া বলিলেন, "করেন কি? Say when! চা যে উপচে পড়বে!"

"Say when-এর উল্লেখ শুনিয়া রটান সাহেব উল্লসিত হইয়া উঠিয়াছিলেন, কিন্তু নিরীহ চায়ের দর্শনে হতাশ হইয়া বলিলেন, "অবশেষে চায়েও say when!"

ন্যান্ডি। আপনি যে রকম দিবা-স্বপ্নে ডুবেছিলেন তাতে আর একটু হলেই আমার শাড়ীটা গিয়েছিল। আসুন, আপনার চা আমি ক'রে দি।

রটান। How sweet of you.

ন্যান্ডি। দেখুন আর কতটা চিনি দেব।

রটান। আপনি দেবেন মিষ্টি, তাতেও "Say when"-এর প্রয়োজন থাকবে?

Positively vulgar , কি সব যা তা বলছেন ।

রটান। আমি যা বলছি তা নিরবচ্ছিন্ন aesthetic instinct-এর প্রতিক্রিয়া, অদমনীয় আবেগের expression এবং expression-ই আর্টের শেষকথা। আপনি উঠে যাবার কথা বলায় মর্ম্মাহত হয়েছি। রসগ্রাহীদের সুন্দরের সান্নিধ্য থেকে বঞ্চিত করলে তার বিচারকে ভুল ব'লে প্রমাণ করা হয়। আপনি কি বলতে চান, আপনার রূপের কোন গুণগ্রাহী থাকবে না এবং রসিক সুন্দরকে শ্রদ্ধার্ঘ্য দিলে দণ্ডই হবে তার পুরস্কার।

ন্যান্‌ডি। আপনার ভাষণ মঞ্চে দাঁড়িয়ে বক্তৃতার মত লাগছে। বিশেষণগুলিও মনে হয় ফরমায়ে ফেলা স্তুতি, হয়ত নম্বর দেওয়াও থাকতে পারে। প্রথম আপনি নম্বরে ভুল করেছেন, দ্বিতীয় কথা, বলার ভঙ্গিতে বদ্‌রুচি যে ভাবে বেপরোয়া হয়ে উঠছে তাতে কোন ভদ্রমহিলার আপনার সঙ্গে কথা বলা উচিত নয়। (উঠিবার চেষ্টা।)

রটান। (ন্যান্‌ডির হাত ধরিয়া মিনতির স্বরে) হঠাৎ অমন ক'রে উঠে গেলে সকলের দৃষ্টি এদিকে পড়বে। পার্টিতে একটা আন্দোলন সুরু হয়ে যাবে। আপনার indisputable reputation-এর উপরই আগে লোকের নজর পড়বে। আপনি ত জানেন, scandal কি রকম delicious topic ? তার সঙ্গে আমার খ্যাতির যোগ থাকলে ওরাই বলতে ছাড়বে না, another triumph for the irresistible man. ওদিকে আপনি হয়ত লক্ষ্য করেন নি those houndish eyes of your watchful husband হাত ধরাটা দেখে ফেলেছে। ভীড়ের আড়ালে যখন ধরেছিলাম তখনই বোঝা উচিত ছিল private affair। আড়াল টপকে উঁকি মানেই unwarranted intrusion. ঘটনাটি লঘু ক'রে দেখার উপায় নেই।

ন্যান্‌ডি। দেখে ফেলেছেন তো কি হয়েছে। হাত ধরলেই মানুষ খারাপ হয়ে যায় নাকি ? কোন enlightened person এমন কথা ভাবে না।

রটান। আপনার enlightened উদার মন, তাই

ন্যানডি। আপনি যে এত গুছিয়ে কথা বলতে পারেন তা আগে জানা ছিল না।

রটান। জানবার আর সুযোগ পেলাম কোথায় ? বিশ্বাস করুন, আপনাকে অনেক দিন থেকে ভাল লাগে, দূর থেকে admire করেছি। (ভাবাবেগ বাড়িয়া ওঠায় নিজেকে সংযত করিয়া) আপনার শাড়ীটা কি সুন্দর !

ন্যান্‌ডি। শাড়ীটা সুন্দর হওয়ার কৃতিত্ব আমার নয়, তবে আপনি যেভাবে এগুচ্ছেন তা কেউ জানতে পারলে আমার চরিত্রের তারিফ করবে না।

রটান। ওদিক্ দিয়ে আমি নিশ্চিন্ত। I have nothing to lose, nothing to worry about.

ন্যান্‌ডি। তা হ'লে আপনার কাছ থেকে স'রে যেতে হয়।

রটান। কিন্তু স'রেই বা যাবেন কোথায় ? ওদিকে মিঃ ন্যান্‌ডি যে একই রকমের পাঁয়তারা কষছেন। তাছাড়া ইতিমধ্যে মন মজান কথা শোনার জন্য যে-যার partner খুঁজে নিয়েছে। যে দিকেই যান, আপনাকে অনাহূত থাকতে হবে।

ন্যান্‌ডি। Positively vulgar, কি সব যা তা বলছেন।

ছোট-খাট ব্যাপারে নজর রাখা সম্ভব নয়। আমি দেখছি, ওদিকে বেশ গুছিয়ে আড়াল নেবার চেষ্টা চলেছে। নবাবিষ্কৃত তারকা ওখানে উপস্থিত হয়েছেন। রাতারাতি খ্যাতির বোঝা ঘাড়ে এসে পড়ায় অভিনেত্রী টাকাওয়ালা partner খুঁজছেন। পরের মাথায় কাঁঠাল ভেঙ্গে নিজেই producer হতে চান। মিঃ স্যানৃডির কাছে টাকা তো খোলামকুচি। বলা যায় না কি ভাবে মর্ত্ত্যের তারকা আপনার কর্ত্তাকে স্বর্গে তুলবেন।

স্যানৃডি। আপনি দেখছি ভবিষ্যৎ গণনাতেও পারদর্শী।

রটান। আমার গণনাকে একেবারে উড়িয়ে দিতে পারেন না। কারণ সিনেমার জগৎটাই unpredictable। আজ যে রাজা সাজে কাল তাকেই হয়ত ফকিরের part নিতে হয়। ওঠা-নামা সবই সাজার উপর নির্ভর করে। Tailor's art এবং make-up man-এর ভোজবাজি যেখানে কোলা ব্যাঙকেও beauty competition-এ নামিয়ে ছাড়ে সেখানে সুস্থ চোখেও যা দেখা যায় তা নিশ্চিন্ত মনে বিশ্বাস করা চলে না। এখন প্রশ্ন হচ্ছে মিঃ স্যানৃডির দৃষ্টিকে নিয়ে। তিনি কোন্ চোখ দিয়ে কি দেখছেন তার সঠিক খবর না পাওয়া পর্য্যন্ত অভাবনীয় ঘটনার জন্য প্রস্তুত হয়ে থাকা ভাল। দৃষ্টির পিছনে গূঢ় রহস্যও জড়িয়ে থাকতে পারে, সুতরাং নিরিবিলিতে আলোচনা হওয়া দরকার।

স্যানডি। (কাঁঠাল ভাঙ্গার প্রসঙ্গে উৎকণ্ঠিত হইয়া) আপনি কি বলতে চান, আমার স্বামী সিনেমার ব্যবসায় নামবেন! ঐ স্ত্রীলোকটির গা ঘেঁষে বসার জন্যে?

রটান। কিছুই আশ্চর্য্য নয়, অভ্যাস তো এখন থেকেই সুরু হয়েছে। ভীড়ের মধ্যে আড়াল নিতে জানলে দু'জনায় একলা হওয়ার কোন অসুবিধা নেই। সন্দেহ এড়াবার ওটা একটি recognized technique। এখন উনি নাম-করা অভিনেত্রী, দাম লাখের ঘরে উঠেছে। বুঝতেই পারছেন, আকস্মিক কিছু ঘ'টে গেলে ব্যাপারটা কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে।

স্যানৃডি। লাখ! কি সর্ব্বনাশ আমি তো ঐ অভিনেত্রীকে চিনি। কিছুদিন আগে আমাদের বাড়ীতে প্রায় হানা দিত। ঘরের গাড়ী ক'রে আসত। আমাদের দরজার সামনে হর্ণ বাজলেই দেখতাম, আশেপাশের বাড়ীর বারান্দায় ঠাকুর দেখার মত ভীড় জমে গিয়েছে। তখন কি জানতাম, কাঁঠাল ভাঙ্গার আয়োজন চলছে? আপনি আমাকে ভাবিয়ে তুললেন। চলুন, দিভানে গিয়ে ব'সি। আপনি দেখছি অনেক খবর রাখেন। দিভানের দিকে যাবার আগে জানাই, লক্ষ্মীছেলের মত বসতে হবে। আবেগের তাড়া খেয়ে আবার হাত ধরলে কর্ত্তার সন্দেহ confirmed হয়ে যাবে। উনি বেজায় jealous husband।

রটান। Jealousy জড়িয়ে থাকলে ভালবাসা বিষয়ে সন্দেহের ফাঁক থাকে না। তবে এই জাতীয় প্রেমকে savage বলতে হয়। জঙ্গলের বাসিন্দা বুনোদেরই মানায় ভাল, কারণ primitive approach-এ possessive assertion ছাড়া আর কিছু নেই। আপনার সিদ্ধান্ত মেনেই বলি, আধুনিক যুগে যে-কোন enlightened মানুষ jealousy-প্রণোদিত ব্যবহারকে encroachment into personal liberty বলবে। হাজার হোক, বিবাহে ক্রীতদাস বা দাসীর সর্ত্ত থাকে না। চলুন, দিভানের দিকে। নিরিবিলিতে বসলে এই আলোচনারও সুযোগ বেশী পাওয়া যাবে।

(স্যানৃডি ও রটানের দিভান অভিমুখে গমন।)

চেয়ার দুইটি খালি হইতেই মিস X পার্শ্বেই দণ্ডায়মান যুবককে বলিলেন, "আপনি দেখছি অনেকক্ষণ একলা দাঁড়িয়ে আছেন, চলুন, বসা যাক।" মিস X-এর পরিচয় এইখানেই সংক্ষেপে সারিয়া ফেলা ভাল। বয়সের দিক্ দিয়া তিনি অবসরপ্রাপ্তা। যৌবনের অত্যাবশ্যক সম্পদ্ অন্তর্হিত হইলেও অবশিষ্টাংশকে জোড়াতাড়া দিয়া presentable করার চেষ্টায় ক্রটি নাই। কম বয়সে মিঃ ভ্যাসিউ সম্বন্ধে দুর্ব্বলতা ছিল। ভাল লাগার আবেগ যেরূপ ঘন-ঘটা করিয়া পিছু লইয়াছিল তাহাতে through proper channel চরম কিছু ঘটিয়া যাইত। কিন্তু আইনে বাঁধা প্রেমে আপত্তি থাকায় একাধিপত্যের দাবী ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। খাস দখল বেহাত হওয়ায় মর্ম্মাহত হন নাই বরং thorough sport-এর মত দাবী ছাড়িয়াও পূর্ব্ব সম্বন্ধ বজায় রাখিয়াছেন। অপরিচিত যুবকটি পূর্ব্বোল্লিখিত সঙ্গীতজ্ঞ। নাম, বিমল রায়। গুণ অগুণ আগুন অনেক কিছুই, সেগুলি ক্রমশঃ প্রকাশ্য। পরিস্থিতিতে প্রাচীনপন্থী বলিতে হয়। ধুতি পরিয়া আসায় অভিজাত্যাভিমানী স্বাতন্ত্র্যবাদীরা অচ্যুতের সংস্পর্শ হইতে নিজেদের সরাইয়া রাখিয়াছিলেন—গত্যন্তরে ভদ্রলোককে একলাই দাঁড়াইয়া থাকিতে হইয়াছিল। Musical Conference-এ ভ্যাসিউ-দুহিতার সহিত তাঁহার পরিচয়। সেই সূত্রে আজকের পার্টিতে ছাপান নিমন্ত্রণ-পত্র পাইয়াছিলেন।

চিঠির তলায় বিনীতা স্বহস্তে লিখিয়াছিলেন, "আপনি নিশ্চয় আসবেন।"

বলিষ্ঠ গঠন, যেমন চওড়া তেমনি লম্বা, তাহার উপর অত্যুজ্জ্বল গৌরবর্ণ যেন রুখিয়া বিমলের যৌবনকে সাজাইয়াছে। এতগুলি চিত্তাকর্ষক সম্পদ্ থাকা সত্ত্বেও ভদ্রলোক অন্যায় ভাবে নম্র ও লাজুক। বেশি কথা বলার ভয়ে পরিহাসকেও প্রশংসা ভাবিতে বাধে না।

শ্রীমতী X। (বিমলের পাশে বসিয়া) বিল্ (মিঃ ভ্যাসিউর ঘরোয়া ডাক নাম) আপনার দেখাশোনার ভার আমার উপর দিয়েছে। এতক্ষণ আপনাকেই খুঁজছিলাম। আপনি ধুতি প'রে এই পার্টিতে আসবেন কল্পনা করতে পারি নি। ভেবেছিলাম, কে না কে। তাই আপনার কাছে আসায় দোমনা হয়েছিলাম। বিনীতাও আসে নি বোধ হয়? মেয়েটা ভীড়ের মধ্যে আটকে পড়েছে। জানেন তো, ও একজন ভাল conversa-tionalist। young man-রা একবার কাছে পেলে হয়, কিছুতেই ওকে ছাড়তে চায় না। ওর জন্যেই সকলে সেজে-গুজে এসেছে, একটু সময় ওদিকে না দিলেই বা চলে কেমন ক'রে? তা হ'লেও এদিকে একবার আসা উচিত ছিল। আপনি ধুতি প'রে এসেছেন তো কি হয়েছে, সকলকেই smart হ'তে হবে এমন কি কথা আছে? আপনি এখনও চা খান নি?

ধুতি পরায় যে বিশেষ অপরাধ হইয়াছে তাহা জানিতে পারায় বিমল মাথা নত করিল এবং ঐ অবস্থাতেই বলিল, "আমি চা খাই না।"

শ্রীমতী X। Strong কিছু আনতে বলব?

Strong-এর প্রস্তাবে বিমলের মাথা আরও নত হইয়া গেল।

শ্রীমতী X। আপনার ভাব দেখে মনে হচ্ছে বিনীতা না বললে চা আপনি খাবেন না। যাই, তাকে ডেকে আনি।

বিনীতাকে ডাকিবার প্রস্তাবে বিমল বিব্রত হইয়া পড়িল। বাঞ্ছিত যুবতীর সান্নিধ্যে allergic রোগীর মত বিমল super-sensitive হইয়া উঠে। স্বল্পভাষী মানুষটি যেন সম্মোহনের প্রভাবে বাচালতার ঘোরে নিজেকে হারাইয়া ফেলে। অবান্তর বা অশোভন মন্তব্য প্রকাশিত হইলেও নিজেকে সংযত করিতে পারে না। সারাটা জীবন যাহাকে বালবিধবা পিসীমার নির্দ্দেশে চারিত্রিক আদর্শ মানিতে হইয়াছে, বশ্যতার ফলে যে মানুষ প্রকাশ্যে কোন যুবতীর ছবি পর্য্যন্ত ভাল করিয়া দেখে নাই, তাহার পক্ষে বিনীতার মত পূর্ণাঙ্গীর সামনে বসিলে পরিণাম কি হইতে পারে অনুমান করিয়া বলিল, "তিনি নিশ্চয় খুব ব্যস্ত আছেন, তাঁকে আর ডাকবেন না।"

শ্রীমতী X। (স্বগত) ধুতি পরলে কি হবে, অভিমানটি পুরোপুরি আছে। (প্রকাশ্যে)—আপনি কিছু না খেলে সব দোষ যে আমার উপর এসে পড়বে। আমি নিজে যাই, ওকে ধ'রে নিয়ে আসি। কথায় বলে, যার বিয়ে তাঁর হুঁস নেই পাড়াপড়শীর ঘুম নেই। মেয়ের কি কাণ্ড বাবা, একবারও এদিকে আসে নি। (গাত্রো-থানের চেষ্টা, ইতিমধ্যে টহলদার বেয়ারা চায়ের সরঞ্জাম লইয়া উপস্থিত।)

শ্রীমতী X। (রাগতভাবে) সাবকো চা কেঁ্যা নেহি দেখলায়া?

বেয়ারা। হুজুর, দেখলাঁয়ে তো মগর সাব পিতে নেহি।

শ্রীমতী X। ঠিক হ্যায়, রোটি, কেক, স্যাণ্ডউইচ আউর টিপট ইহা রখ দেও। সাব আপসে চুন্‌কে লেঙ্গে।

(আদেশ অনুসারে যাবতীয় দ্রব্যগুলি ট্রে-সমেত centre table-এ রাখিয়া বেয়ারার প্রস্থান।)

শ্রীমতী X। চকোলেট কেকটা কেটে দি?

বিমল। কিছু যদি মনে না করেন, অসময়ে আমি কিছু খাই না।

শ্রীমতী X। আপনি চা খান না, drink করেন না, সিগারেট খান না, আহার করেন না, এমন কি কথাও বলেন না, তা হ'লে আপনি করেন কি?

বিনীতা। (পিছন হইতে) উনি অনাহারে স্বাস্থ্যোন্নতি করেন। আমাদের এখানে অন্ন স্পর্শ করলে ওঁর স্বাস্থ্যহানি হতে পারে। কি বলেন, আপনার দিক্ নিয়ে কথাটা ঠিক বলেছি কিনা? এইবার আমাদের তরফ থেকে বলি, আপনি পরিতৃপ্তি সহকারে আহার করুন, কিছু হবে না। নিমন্ত্রণ ক'রে অতিথি বধ করার প্রথা আমাদের এখানে প্রচলন নেই;

(পিছনে বিনীতার উপস্থিতি জানিতে পারিয়াই বিমল উঠিয়া দাঁড়াইয়াছিল।)

বিনীতা। আপনি বসুন, মাসীমার অনুরোধটা রাখুন। না হয় আমিই কেকটা কেটে দি।

বিমল। একান্তই যদি খেতে হয় তা হ'লে ঐটুকু কেক আর কেটে কি হবে। গোটাটাই রেখে দিন। বলেন ত ট্রেতে যা আছে সেগুলিও আত্মসাৎ ক'রে ফেলি।

ভূমিকম্প কিংবা ঐ জাতীয় আকস্মিক দুর্ঘটনার

মাঝখানে পড়িয়া গেলে অসহায় মানুষের যে অবস্থা হয় ঠিক সেই ভাবে শ্রীমতী X আতঙ্কিত হইয়া উঠিলেন একটু ধাতস্থ হইবার পর বলিলেন, "কি সর্ব্বনাশ। আমরা বধ না করলেও উনি নিজেই যে আত্মহত্যার ব্যবস্থা করছেন?"

বিমল। আমার স্বাস্থ্য যে ক্ষণভঙ্গুর নয় তাই প্রমাণ করতে চেয়েছিলাম।

শ্রীমতী X। তাই ব'লে এত লোকের সামনে ট্রে খালি ক'রে দেবেন?

বিমল। খেতে দিলে ত পেট ভ'রে খাওয়াই নিয়ম। শ্রীমতী বিনীতা যে বললেন, পরিতৃপ্তি সহকারে আহার করুন, কথাটা কি তা হ'লে কেবল স্তোকবাক্য?

বিনীতা। drink-এর পরে পেট ভ'রে খাওয়ার ব্যবস্থা ত রয়েছে।

বিমল কথায় বলে অধিকন্তু ন দোষায়। পরে যে ব্যবস্থা আছে তাকে drink-এর আগেই যথাস্থানে চালান ক'রে দিতে দিন। কারণ, drink চলবে না। পিসীমা ব্রত উদ্‌যাপন করেছেন. উদরাভ্যন্তরে পানীয়টি অদৃশ্য থাকলেও বাড়ী পর্য্যন্ত বহন ক'রে নিয়ে গেলে প্রায়শ্চিত্তের আদেশ আসতে পারে।

কি সর্ব্বনাশ! আমরা বধ না করলেও উনি নিজেই যে আত্মহত্যার ব্যবস্থা করছেন।

শ্রীমতী X। বিনীতা, কি গুণ জান তুমি? একটু আগে হাঁ, না, ছাড়া কোন কথা বার হচ্ছিল না, এখন যে বুলির বান ডাকিয়ে ছাড়লে। মনের মত মানুষ পেলে এমনটিই হয়। কাজ নেই বাপু আমার এখানে থেকে, তোমার অতিথিকে তুমিই সামলাও। যাবার আগে শুভার্থী হিসাবে কামনা করি, তোমার হাতের পাঁচই বাজি মারুক। তবে অপরের হাতেও যুৎসই তাস থাকতে পারে। যে চালই চালো, একটু সামলে চেলো। যে-সব খেলোয়াড়দের সঙ্গে যুঝতে হবে তারা পুরোন ঘাগী, সাত ঘাট ঘুরে জল খায়। আরও বলি, বিলু, যাদের বাছাই করেছে তাদের দিকেও একটু নজর দিও।

(শ্রীমতী X-এর প্রস্থান)

মনের মত মানুষ...বিলু যাদের বাছাই করেছে!... সামলে চাল চেলো...ঘাগী খেলোয়াড়, ইত্যাদি মন্তব্যে কি ইঙ্গিত ছিল বুঝিতে না পারিয়া বিমল সপ্রশ্ন দৃষ্টি বিনীতার উপর নিক্ষেপ করিল। বিনীতার অবস্থাও তদ্রূপ। বিমলের সহিত এই সব উক্তির কি যোগ থাকিতে পারে তাহা অনুমান করিতে না পারিয়া সেও বিব্রত হইয়া পড়িয়াছিল। মাসীমার অর্থপূর্ণ ইঙ্গিতে যে একটি অস্বস্তিকর পরিস্থিতি সৃষ্টি করিয়াছে তাহাতে কোন সংশয় না থাকায় ঘটনাটি লঘু করিবার নিমিত্ত বিমলের অতি নিকটে আসিয়া পরম আত্মীয়ের মত বলিল, "আপনি মাসীমার কথা শুনে কেমন জবুথবুর মত হয়ে গেছেন। উনি ঐ রকম। ওঁর সব কথা বোঝা যায় না। আপনাকে ডাকার জন্য আমিই বাবাকে বলেছিলাম। উদ্দেশ্য ছিল সকলের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেওয়া। অনেকে আপনার নাম শুনেছেন কিন্তু গান শোনার সুযোগ পান নি। আপনার সঙ্গে পরামর্শ ক'রে একদিন গানের আসর হবে ঠিক ছিল।"

বিনীতা অত নিকটে গিয়া আপ্যায়নকে যে ভাবে রসাত্মক করিয়া তুলিতেছিল তাহা যথে

কৌতূহলোদ্দীপক হওয়ায় সহজেই দৃশ্যটি আকর্ষণের কেন্দ্র হইয়া উঠিল এবং অল্পক্ষণের মধ্যেই কৌতুকপ্রিয় ব্যক্তিরা, বিনীতা ও বিমলকে ঘিরিয়া ধরিল।

মহিলাদের মধ্যে যে কয়জন বিমলের নিকটে আসিতে পারিয়াছিলেন তাহাদের মধ্যে বেলা দুর্দ্দান্ত সাহসী। পাশের চেয়ার টানিয়া একেবারে বিমলের গা ঘেঁষিয়া বসিল এবং কোন পরিচয়ের অপেক্ষা না রাখিয়া বিনীতাকে শুনাইয়া বলিল, "He is a sweet darling, isn't he? বেচারা ভাল মানুষ, তোমার dull approach-এ মনমরা হয়ে গিয়েছে। He needs expert handling. বেচারা! Sweet darling!

বিনীতা। ভদ্রলোক অসময়ে আহার করেন না। বোঝাবার চেষ্টা করছিলাম, একদিন নিয়ম ভঙ্গ করলে মারা পড়ার ভয় নেই। এর জন্যে তোমার দরদ দেখে তোমারই জন্যে ভয় হচ্ছে। তুমি যতই experienced হও, মনে রেখ he is a tough guy.

বেলা। আমিও একজন ball fighter. You will see the fun soon. কিন্তু কি বিড়ম্বনা, এগুই কেমন করে? ভদ্রলোকের নামই ত জানি না। (বিমলের হাতে হাত রাখিয়া গদ গদ ভাবে) বলুন না, আপনাকে কি ব'লে ডাকব?

বিনীতা। গোড়াপত্তন যখন darling দিয়ে সুরু হয়েছে তখন অন্য সম্বোধনে রস পাবে?

বেলা। "Darling" কথাটার ব্যবহারেও monopoly করতে চাও নাকি? তুমি বড় selfish. A thing of beauty is a source of joy for all. দেখেছ কি রকম বুকের পাটা? যেন প্রাচীন গ্রীক যোদ্ধা আমাদের সামনে উপস্থিত হয়েছেন। আচ্ছা, আপনি বুঝি খুব physical exercise করেন? Boxing করেন? foot ball খেলেন? (বিমলের সারা বাহুতে হাত বুলাইয়া) বাব্বা, গুলিগুলো কি উঁচু উঁচু। একটু শক্ত করুন ত। (নিজের অজ্ঞাতেই বিমল অনুরোধ পালন করায় টিপুনির সাহায্যে বেলার পরীক্ষা) ইস্, কি শক্ত!" টিপে দেখ বিনীতা। (বিনীতা অগ্রসর হইয়া পিছাইয়া আসিল।)

দম দেওয়া কলের পুতুল কিনিবার সময়, বাছাইয়ের প্রথায় যে ভাবে স্প্রিং টেপাটিপি চলে, সেই ভাবে জীবন্ত মানুষকে পরীক্ষার অন্তর্ভূত করায় বিমল কতকটা হতভম্বের মত হইয়া গিয়াছিল। অদ্ভুত আচরণ আপত্তিকর হইলেও প্রতিবাদ করার শক্তি ছিল না। কলের পুতুলের মতই সব কিছুতে সায় দিতেছিল।

বেলার প্রশ্ন ছিল physical exercise এর মধ্যে boxing ইত্যাদি করেন কি না। জড়ভরত অবস্থায় বিমলের মুখ দিয়া কথা বাহির হইতে চায় না, মাথা নাড়িয়া জানাইল, কোনটাতেই সে অভ্যস্ত নয়।

মাথা নাড়ানো দেখিয়া নিরস্ত হইবার পাত্রী বেলা নয়। বেলার বিচার যে নির্ভুল তা প্রমাণ করার জন্য জোর দিয়া বলিল, "নিশ্চয় করেন, তা না হ'লে muscle-গুলো অত শক্ত হয়? আমার হাত টিপে দেখুন, কত নরম।" বক্তব্য শেষ করিয়াই গোটা মাংসল বাহু বিমলের সামনে ধরিয়া দিল। নিটোল, নগ্ন ও সৌষ্ঠবপূর্ণ অঙ্গটি স্পর্শানুভূতির প্রতীক্ষায় যে ভাবে বিমলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছিল—সেইভাবে ধ্যানমগ্ন যোগীকে টলাইবার চেষ্টা করিলে তাঁহার চিত্তচাঞ্চল্য দেখা দিত, কিন্তু প্রত্যাশা-অনুযায়ী তেমন কিছু ঘটিল না।

তর্জ্জনীপ্রান্ত দ্বারা কোনপ্রকারে ছোঁয়ার কর্ত্তব্য শেষ করিয়া বিমল নিজের হাত টানিয়া লইল। একটু ছোঁয়ার অনুভূতিতে যাহা প্রকাশ হইল, তাহা ঈষৎ হাসির আভাস, অর্থাৎ বিমল বলিতে চাহিয়াছিল—নরমই বটে।

আশঙ্কাপূর্ণ বৈদ্যুতিক আলোর switch টিপিবার সময় shock লাগিবার ভয় থাকিলে ভয়াক্রান্ত ব্যক্তি যে ভাবে ছোঁয়া সম্বন্ধে সতর্কতা অবলম্বন করে সেই ভাবে বিমলের অঙ্গুলিপ্রান্ত বেলার লোভনীয় অঙ্গ স্পর্শ করায় চতুর্দ্দিকে হাসির কল্লোল উঠিল। সে হাসি থামিতে চায় না। একজনের দম ফুরাইলে relay process-এর মত আর একজন জের কাড়িয়া লইতেছে। বেগবান্ উচ্ছ্বাস শেষ পর্য্যন্ত লুটোপুটির পর্য্যায়ে আসিতে বিনীতা রুক্ষ হইয়াই বলিল, তোমরা যে কি করছ বুঝি না।

বেলা। (বিনীতার রুক্ষ ভাব দেখিয়া) সোফী, ও সোফী (স্বগতঃ কি হাসি বাবা), শুনছ? তোমাদের জ্বালায় যে বিনীতার অবস্থা কাহিল। সাবধান না হ'লে একটা catastrophe সুনিশ্চিত। শেষ পর্য্যন্ত কলজে ফাটার জন্য আমাদের দায়ী হতে হবে।

সোফী। (হাসির দাপটে দম বন্ধ হইবার উপক্রম। দুই হস্তে উদর টিপিয়া) Thank God, you came to our rescue. আর একটু দেরী হলেই casualty-র সম্ভাবনা ঘনিয়ে উঠেছিল। সাবধান হয়েই বলতে হয়, বিনীতার বাহাদুরি আছে। লোকচক্ষুর অগোচরে আমাদের না জানিয়ে এতটা এগুলে কেমন ক'রে চাঁদমণি? সব দিক্ আড়াল দিয়ে এই ভাবে romance-কে লুকিয়ে রাখা, একমাত্র বিনীতার মত মেয়ের দ্বারাই সম্ভব।

বেলা। Whatever লুকোচুরি be there, she deserves hearty congratulations.

বিনীতা। Don't be silly, ভদ্রলোককে নিমন্ত্রণ করা হয়েছিল তোমাদের গান শোনাবার জন্যে।

বেলা। Wonderful! (বিমলের প্রতি) আপনি সঙ্গীতচর্চ্চাও করেন? What a contrast with physical culture! Let us hope, not that কালোয়াতি চিৎকার accompanied by that চাঁটি-মারা বাদ্যযন্ত্র। তাছাড়া কালোয়াতি সঙ্গীত শুনিতে যাওয়াও বিড়ম্বনা। Patience exhaust করিয়ে ছাড়ে। একবার আরম্ভ হ'লে আর থামতে চায় না।

বিনীতা। You are a philistine by God's grace, আর উনি হলেন জাত ভদ্রলোক, তা না হ'লে চাঁটির অভিজ্ঞতা কিছু লাভ হয়ে যেত। তোমাকে for the sake of information বলি, উনি একজন উঁচু-দরের খেয়ালী। Musical conference-এ সম্প্রতি শ্রেষ্ঠ গাইয়ে হিসাবে সোনার মেডেল পেয়েছেন। সামনের মাসেই European tour এ বার হচ্ছেন আমাদের classical music শোনাবার জন্য।

বেলা। কি বললে, খেয়ালী! খেয়ালীরা ত পাগল হয়।

বিনীতা। জিনিয়াসও এক রকমের পাগল।

সোফী। উনি একটি genius, ওদিকে that star আর একটি genius। জিনিয়াসের ছড়াছড়ি দেখে ভয় হয় ইংরেজী বহুবচনের অর্থবিপর্য্যয়ে তোমার পার্টি একটি বিপদ-সঙ্কুল স্থান হয়ে উঠতে পারে।

বিনীতা। তোমাকে বহুবচনের মধ্যে টানলে অর্থ-বিভ্রাট খুবই স্বাভাবিক।

বেলা। Jokes apart, তুমি হয়ত জান না, সোফী একজন artist, ওর admirers-রা বলে, she is a gem among geniuses.

বিনীতা। সোফী an artist, a genius! Incredible! কেউ জিনিয়াস সাব্যস্ত হ'লে ঢাক ঢোল বেজে ওঠে। সোফীকে নিয়ে ত কোন আওয়াজ হয় নি।

বেলা। She works silently, ও তোমার মত একটাকে নিয়েই আছে।

সোফী। একটাকে নিয়ে আছে! Absurd, আমি inspired হলেই new channels explore করি।

বিনীতা। Just like you!

বেলা। সোফী, জিনিয়াসের দাবীতে ভাগ বসানোয় বিনীতার মরমে লেগেছে ব্যথা। হায়রে, আমি যদি কবিতা লিখতে পারতাম, তা হ'লে—

বিনীতা। (বাধা দিয়া) সোফী যদি ছবি আঁকতে পারে তা হ'লে তোমার পক্ষে কবি হয়ে যাওয়া অসম্ভব হবে কেন? তুমিও যদি নিজেকে জিনিয়াস ব'লে বস তা হ'লে অবাক্ হব না।

বেলা। সোফীর কথা বাদ দাও। Originality নিয়ে ওর কাজ। ওর সঙ্গে আমাদের তুলনা হয় না। সাধারণ থেকে পৃথক্ হবার জন্যই ওর জন্ম।

বিনীতা। এত বড় distinction সোফী পেল কার কাছ থেকে?

বেলা। ও distinction কেউ দিতে পারে না, নিজের কাছ থেকেই সংগ্রহ করতে হয়। ঢাকের বাদ্য যেখানে বাজে সেখানে ঢাকীকে মজুরার দাম দিতে হয়। ভাড়া-করা ঢাকীকে ডাকার অবসর সোফীর নেই। ওর admirer-রা বলে, সোফীর কাজের কদর হতে হাজার বৎসর সময় লাগবে। Convention-এর গোঁড়ামি যতদিন না যাচ্ছে academic মানদণ্ড যতদিন না বেকার হচ্ছে, ততদিন originality-কে তুলনার বাইরে রাখতে হবে, কারণ, চলতি চালে যা চলে তার সঙ্গে অসাধারণের কোন যোগ নেই।

বেলার পার্শ্বেই একজন উদীয়মান শিল্পী কিছু বলিবার জন্য অতিষ্ঠ হইয়াছিলেন। ইনিও originality-র সেবক। অতি আধুনিক প্রথায় ছবি আঁকেন। ছবিতে বলার কিছু থাকে না, তবু ভাব অন্তর্ভেদী। রূপ নাই, তথাপি রূপক। শিল্পীর ব্যক্তিত্ব ও পরিচ্ছদ দেখলেই অনুমান করা চলে, সাধারণের সহিত অমিল ঘটাইবার জন্যই যেন তাঁহার জন্ম হইয়াছে। গঠন one dimensional অর্থাৎ দৈর্ঘ্য আছে প্রস্থ নাই। যৌবনের আগমনী বার্ত্তা পাওয়া যাইতেছে কচি ও কাঁচা গোঁফের রেখায়। মুখে বিরাটকায় smoking pipe। নলে ধূম নাই, মুখের শোভাবর্দ্ধনের জন্য সব সময় কামড়াইয়া থাকিতে হয়। অভ্যাসটি সাধনালব্ধ। নতুন বাঁধানো দাঁতের সহিত গরমিল কাটাইতে হইলে যেমন শয়নের সময়ও সম্বন্ধ বিচ্ছেদ চলে না, সেই রূপ পান-পাত্রটির সহিত কামড়ের অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ স্থাপিত হইয়া গিয়াছে। ব্যক্তিত্বের বর্ণনা দীর্ঘ করিতে হইল, কারণ আধুনিক চালের শিল্পীকে সনাক্ত করিতে হইলে তাহার বসন, ভূষণ ও বদনের বৈশিষ্ট্যই প্রধান অবলম্বন।

বেলার মন্তব্য শোনার পর শিল্পীর স্কন্ধে একটি automatic ঝাঁকুনি দেখা গেল। ঘা-যুক্ত স্কন্ধে মক্ষিকা বিতাড়নকালীন মহিষ বা গরু ঐ ভাবে বিরক্তি প্রকাশ করিয়া থাকে। Automatic ধাক্কা খাইয়া পিছন হইতে সামনে আসিয়া দাঁড়াইলেন। সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য অন্তরে যুক্তি ক্ষেপিয়া উঠিয়াছিল, কোন দিকে দৃকপাত না করিয়া বলিলেন, "বেলাদি সার কথাই বলেছেন। বিচার মানেই গতানুগতিকতার অনুসরণ, ফরমায় ফেলা মানদণ্ডে তুলনামূলক হিসাব। এতে মৌলিকত্বের স্থান কোথায়?"

বিনীতা। এ সব বড় বড় কথা শিখলে কোথা থেকে? যে ভাবে এক নিঃশ্বাসে বক্তব্য শেষ করলে, তাতে মনে হয় মুখস্থ-করা বুলি। ঠিক এই ধরণের বুলি সেদিন আউড়ে ছিলে। মাঝখানে কথা আটকে যাওয়ায় খেই হারিয়ে ফেললে।

শিল্পী। (বিরক্ত হইয়া) That hackneyed question of বোঝা and শেখা। ও সব কথা fogies-দের জিজ্ঞাসা কোর। ওরা tradition আর convention নিয়ে থাকে। ওদের সম্পদের আড়ত হ'ল অতীতের গহ্বর, যার পুঁজি পুরাতন ও পচা। সোজা কথায় ওরা grave diggers. রূপ-সন্ধানে স্বাধীন চিন্তা বা নতুন পথ পায় না ব'লেই সমাধির পথে চলতে হয়।

বিনীতা। Tradition হ'ল, root, তাকে পুরাতন পচা ব'লে বাতিল করলে ত চলবে না। গাছে যখন নতুন শাখা-প্রশাখার আবির্ভাব হয়, নতুন পাতার সঙ্গে সবুজের সাড়া প'ড়ে যায়, তখন বুঝতে হবে পুরাতন তাজা শিকড় মাটি আঁকড়ে আছে, শাখা-প্রশাখাকে রসের খোরাক যোগাচ্ছে। এই সত্যের পিছনে লাগাম-ছাড়া কল্পনার দৌড় নেই, হেঁয়ালীপূর্ণ ব্যাখ্যার প্রতীক্ষাতেও চিরন্তনের নিয়ম ব'সে থাকে না। ঝরা পাতা পুরাতনের দৃষ্টান্ত হলেও, আরও পুরাতনের কোলে নতুন পাতা পালিত হয়, পুরাতন ও নতুনের যাওয়া-আসার কথা বলে। যে পাতায় সবুজের প্রত্যাশা থাকে নতুনের চাহিদা তাকে নীল ক'রে দেয় না।

শিল্পী। গোড়াতেই গলদ বাধালে। আমরা মাটি আঁকড়ে থাকি না। আমরা চলি, নতুনের সন্ধানে চলি। আমরা যে রূপকে সৃষ্টি করি তা গল্প বা ethics-এর পোঁটলা বহন করে না। আমাদের কাছে যে রূপ ধরা দেয় তা নিজেকেই নিয়ে আত্মহারা, আনন্দের উৎস থাকে উদ্দেশ্যহীনতায়, কোন প্রত্যাশার স্বার্থ নিয়ে রূপকে আমরা আড়ষ্ট ক'রে তুলি না, রূপ আপন গতিতে নিজেকে গ'ড়ে তোলে, ইতিহাসের পৃষ্ঠায় নতুন কথা যোগ ক'রে দেবার জন্যে।

বিনীতা। তার মানে যা-কিছু accidentally ঘটে তাই হ'ল তোমাদের আর্ট। ও আর্ট ত খবরের কাগজে দেখি বাঁদরেই একচেটে ক'রে ফেলেছে। আসল কথা, আমার বোঝা উচিত ছিল শিখতে গেলে ধৈর্য্য ও অধ্যবসায় দরকার হয়, গুরুর দান মানতে হ'লে মাথা নত করতে হয়। কাকেও গুরু ব'লে স্বীকার করা তোমাদের কাছে মস্ত বড় humiliation, তোমরা হ'লে escapists-এর দল। নিজেকে ফাঁকি দিতেও বাধে না। আমি ভাবি, দেশে কি এমন নির্ভীক নিরপেক্ষ সমালোচক নেই যে, তোমাদের প্রাণ খুলে বলতে পারে, "Self" traitors।

শিল্পী। দিদির স্থান যখন দখল ক'রে আছ তখন "Self" traitors বলা ছাড়া অভিশাপও দিতে পার, কিন্তু এই জাতীয় উচ্ছ্বাসের, বিস্ফোরণে যুক্তির মীমাংসা হয় না। তোমাদের চিন্তাধারা sentimenta[l] plane-এ আটকে পড়েছে, intellecutal height-এ ওঠার শক্তি নেই। Sentiment-এর কাছে নিজেকে বিলিয়ে দিলে ভক্তি ও প্রেমের রসে হাবুডুবু খাওয়া চলে কারণ, ভক্তির স্থিতি বিশ্বাসের উপর, যেখানে যুক্তি প্রশ্ন বেকার, প্রেমও কারণ খুঁজে এগোয় না, দুটো বিশ্লেষণ-বিরোধী। আমরা রূপকে প্রকাশ করা আগেই বিশ্লেষণ শেষ ক'রে নি। কাজে কাজেই বোঝা ব্যাপারে রূপের মধ্যে অরূপ তোমাদের ভাবিয়ে তোলে সত্যি কথা বললে রাগ ক'রো না, ভাবটা তোমাদের s[...] idea সইতে পারে না। Inertia তোমাদের গো[...] দিয়েছে।

বেলা। (বিমলকে ঠেলা মারিয়া) কি মশা[ই] দু'টো কথা বলুন না? দেখছেন না, the cat has be[en] let looe? আপনাকে নিয়েই ত intellectual দাঙ্গা [...] আপনি নির্লিপ্তের মত চুপচাপ ব'সে থাকলে শেষ প[র্যন্ত] আপোসে মিটমাট হয়ে যাবে, পার্টির উদ্দেশ্যই [...] হবে।

বিমল। আমি একটু-আধটু গান গাই। গুরু শেখান তাই শিখি। যেটুকু শিখেছি তাতে আ[মার] নিজের বলবার কিছু নেই। সবই গুরুর দান। ১৪[...] বৎসর হয়ে গেল, রোজই রেয়াজ করি, তবু গুরু ব[লেন] এখনও ঘরোয়ানা চাল ধরতে পারি নি। গুরু রত্না[...]

সমুদ্রতটে ছুটো বালিকণা কুড়ালে কতটুকু আর পাওয়া যায়?

শিল্পী। আপনি দেখছি ভক্তি-মার্গে উঠে গিয়েছেন। অন্ধ বিশ্বাস আর total surrender এ নিজেকে অস্বীকার করা হয় না কি? নিজেকে অস্বীকার করলে activen<se-এর আনন্দে আপনার দাবী রইলকোথায়? সবই তো আপনার গুরুর পাও না।

বিমল। আমি যে আনন্দের কাঙ্গাল, সে আনন্দে গুরু কেন, যে-কোন উদার-রসগ্রাহীর দাবী সমান। বিশ্বাস না থাকলে কোন কাজেই অগ্রসর হবার উপায় নেই। যে-কোন কার্য্যসিদ্ধির চেষ্টায় প্রয়োজন অনুসারে যদি যন্ত্রের মত জড় পদার্থকেও বিশ্বাস করতে হয়, তা হ'লে গুরুর মত পথপ্রদর্শককে অস্বীকার করেন কেমন ক'রে? দৃষ্টান্তস্বরূপ বলতে পারি, আপনি যে তুলি ব্যবহার করেন, তার উপর সম্পূর্ণ আস্থা না থাকলে, রূপ ধরার চেষ্টাতেই আপনি নাজেহাল হয়ে যাবেন, সুতরাং এগিয়ে চলার পথে একমাত্র আত্মবিশ্বাসই চরম সহায় নয়, অভিজ্ঞের কৃপাও একান্ত প্রয়োজন।

গোড়াতেই গলদ বাধালে। আমরা মাটি আঁকড়ে থাকি না। আমরা চলি নতুনের সন্ধানে।

বেলা। ভাই বিনীতা, তর্ক serious হয়ে উঠেছে, শেষ পর্য্যন্ত lecture class না হয়ে দাঁড়ায়। এইবার কথার মোড় ফেরাও।

বিনীতা। আমি বলি গানের ব্যবস্থা হ'লে কেমন হয়?

বেলা। উত্তম কথা, পিয়ানোটা বেকার প'ড়ে রয়েছে ওটাকে কাজে লাগানো যাক। যা থাকে কপালে হবে, আপনার খেয়াল গানই শুনব।

বিমল। (অবাক্ হইয়া) পিয়ানোর সঙ্গে খেয়াল গান!

বেলা। What's wrong? পিয়ানো ছুঁলে আপনার খেয়াল খাবি খেতে থাকবে নাকি?

বিমল। রাগ-রাগিণীর সঙ্গে পিয়ানো ঠোকার চলন নেই, তাই সাহস পাচ্ছি না।

বেলা। গানের মধ্যে রাগ! কাজ নেই অম আনন্দের তোয়াজ ক'রে। রাগ provoked হ'লে হয় keyboard-টাই ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যাবে। শুনে কোন বড় ওস্তাদ, trance-এর তাড়নায় তাল রাখ গিয়ে তানপুরার খোলটাই ফাটিয়ে দিয়েছিল। এক শুকনো কুমড়ো বা লাউ ফাটলে দুঃখের কিছু থাকে কিন্তু inspired mood থাকলে যে ভাবে তা তড়পানি সুরু হয়, তাতে গায়কের আশেপা শ্রোতাকে তটস্থ হয়ে থাকতে হয়, কখন তাল মা পড়বে তার ঠিক নেই। আমার মতে এই রকম ভ এবং হিংস্র রাগ ও তাদের ব্যবহার আইন দ্বারা হওয়া দরকার।

বিনীতা। Classical সুরের উপর তোমার যেরকম aggressive attitude, তাতে এই মধু ভাব

পর ওঁর গলা দিয়ে আর সুর বার হবে না। ওঁর গান তো বন্ধ করলেই, তার উপর ভদ্রলোককে খেতে পর্য্যন্ত দিচ্ছ না। এদিকে cocktail-এর সময় হয়ে এল। shelf-এ drink যে রাখা আছে, তার চাবি আমার কাছে, কিন্তু উনি কিছু মুখে না দিলে আমি উঠি কেমন ক'রে?

বিমল। তাড়া থাকলে এখুনি শেষ করে দিচ্ছি।

পরমুহূর্ত্তে দেখা গেল, একটির পর একটি ছোট কেক মুখগহ্বরে ছুঁড়িয়া দিতেছেন এবং নিমিষে ভক্ষ্যগুলি অদৃশ্য হইয়া যাইতেছে। ভোজন সুরু হইতে অভাবনীয় দৃশ্য দেখিবার জন্য আরও কয়েকজন নিমন্ত্রিত আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহাদের মধ্যে যিনি অতি শীর্ণকায় তাঁহারই কৌতূহল দেখা গেল রীতিমত তাতিয়া উঠিয়াছে। ধুতিপরা ভোজনরত এই বাবুর কাছে বিনীতাকে দেখিয়া তাঁহার ভ্রূ কুঞ্চিত হইয়া উঠিল। একরাশ ভ্রূর রেখা তখন কপালের উপর জড় হইয়াছে, মুখশ্রী দেখিলেই সন্দেহ থাকে না যে অন্তরে ঝড় উঠিয়াছে। ভদ্রাচারের বেড়া ভাঙ্গিয়া যখন তিনি বিনীতার মুখোমুখি হইয়া দাঁড়াইলেন তখন বিমল প্রবল বেগে প্রতিশ্রুতি রক্ষায় ব্যস্ত। আহারের প্রথায় ভব্যতার উপর পাশবিক অত্যাচার সহ্য করিতে না পারিয়া বলিয়া ফেলিলেন, "What a fine specimen for the circus" পরক্ষণেই বিনীতার দিকে ফিরিয়া বলিতে হইল, So you are feeding the performing animal!"

বিনীতা। তোমার shareএও প্রচুর আছে, বল ত এইখানেই ব্যবস্থা করি, তবে ওঁর সঙ্গে টক্কর দিতে গেলে ambulance car ডাকতে হবে, and mind you ভাড়াটা তোমাকেই দিতে হবে।

শীর্ণকায় ব্যক্তি। সহানুভূতি কেমন জটিল লাগছে। যাই হোক, এমন একটি জীবকে আবিষ্কার করলে কোথা থেকে? (বিমলকে লক্ষ্য করিয়া অভিনয়ের প্রথায়) মহাশয়, আপনাকে প্রণাম, অধমের আরজি, আহারান্তে ভোজন সম্বন্ধে একটি গবেষণাপূর্ণ বক্তৃতা দিতে হবে। বলাই বৃথা, আপনার বিশেষ টেকনিকের বিশদ বিবরণ থাকা দরকার। কাগজে খবর হিসাবে বার ক'রে দিতে চাই। লোকে জানুক, আজও সভ্য জগতে আপনার মত খাইয়ে পাওয়া যায়। (শীর্ণকায় ব্যক্তির কথায় কর্ণপাত না করিয়া বিমল তখন চকোলেট কেক ছাতু ছানার মত চটকাইতে সুরু করিয়াছে এবং মুঠা ভর্ত্তি দলিত কেক মুখ-গহ্বরে পুরিয়া দিতেছে। সম্পূর্ণ কেকটি নিঃশেষিত হইবার পর ঢেঁকুর উদ্গীরণ করিয়া বিমল বলিল, একটু জল, হাত ধোব।)

শীর্ণকায় ব্যক্তি। সূর্য্যাস্তের পর জল।

সোফী। He means neat জল।

শীর্ণকায় ব্যক্তি। জল নিট হলেও তো kick মারে না।

বিনীতা। জানি, nothing less would satisfy you.- Kick হজম করা ওঁর ধাতে সয় না!

বেলা। রাগ কর কেন ভাই, কথাটা তোমরা কেউ ভাল ক'রে শোন নি। উনি হাত ধোবার জন্য জল চেয়েছেন। দেখছ না, নরম চকোলেটের coating কি ভাবে হাতময় মেখে ফেলেছেন?

শীর্ণকায় ব্যক্তি। Hell! এ যে একেবারে গোবর মাখার চেয়েও বাড়া। বেয়ারা, জলদি এক বাকেট পানী লে আও।

বিমল। (পুনরায় ঢেঁকুর তুলিয়া) সত্যই খাওয়াটা বেশি হয়ে গিয়েছে, একটা ট্যাক্‌সি ডাকিয়ে দিলে ভাল হয়। এ রকম আহার তো রোজ জোটে না।

বিনীতা। ট্যাক্‌সি কেন, ঘরের গাড়ী তো রয়েছে। এত শীগ গির যাবেন?

শীর্ণকায় ব্যক্তি। অমন gracious offer প্রত্যাখ্যান করবেন না।

(ভরা বালতী জল লইয়া বেয়ারার প্রবেশ, স্থানাভাবে বিমলের সামনে রাখিল।)

বিনীতা। (বেয়ারার হাতে চাবি দিয়া) বড়া সাবকো বোলো মেরা bedroom কা সেলফ মে cock-tail কা বন্দোবস্ত হ্যায়। উস্ তরফ যানেকো মেরা কুছ দের হোগা।

(বেয়ারার প্রস্থান।)

বিনীতা। (সকলের দিকে ফিরিয়া) তোমাদের এ কি কাণ্ড? রসিকতারও একটা সীমা আছে। একজন নিরীহ ভদ্রলোককে পেয়ে যা খুশি তাই করছ। (বিমলের খুব কাছে আসিয়া) আপনি খুব অসুস্থ বোধ করছেন? বিছানায় শুয়ে একটু বিশ্রাম করবেন?

শীর্ণকায় ব্যক্তি। (ক্ষুদ্রপরিসরে পাইচারি করিতে করিতে স্বগত) যে রকম ভাব-গতিক দেখছি তাতে আজকে আর propose করার chance পাওয়া যাবে না। ভাবতে পারি না how could she take a fancy on that brute. (দীর্ঘ নিঃশ্বাস, তার পর বিনীতাকে উদ্দেশ্য করিয়া প্রকাশ্যে) তোমার সঙ্গে দরকারী কথা

ছিল, কিন্তু ভোজনদক্ষ ব্যক্তিটি যে ভাবে exclusive right establish করেছেন তাতে মনে হচ্ছে ঢেঁকুরেরই জয়জয়কার হবে।

বিনীতা। তোমার দরকারী কথার উত্তর অনেকবার দিয়েছি। অপেক্ষা কর, উনি একটু সুস্থ হয়ে উঠুন। এবার যা উত্তর দেব তা অনেক দিন মনে থাকবে।

শীর্ণকায় ব্যক্তি। তুমি যে ভাবে সেবাব্রতা হয়েছ, তাতে যে-কোন চালাক লোক বিনা রোগেই অসুস্থ হ'তে চাইবে। আমার আশঙ্কা, ব্যাপারটা শেষ পর্য্যন্ত complication-এ গিয়ে না দাঁড়ায়। রসালো রোগ, সেবায় বিঘ্ন হতে চাই না। So long ! good luck !

(শীর্ণকায় ব্যক্তির প্রস্থান।)

সোফী। (বেলার গা টিপিয়া চুপি চুপি) Exit-টা কেমন lost case-এর মত লাগছে।

বেলা। আমিও তাই ভাবছিলাম। বেচারা অনেক দিন থেকে woo করছে। He means business, তবে একেবারে tactless.

সোফী। (বেলাকে ভীড় হইতে দূরে টানিয়া) বিনীতাকে দোষ দেওয়া যায় না। লোকটির কবিতা লেখার বাতিক সম্বন্ধে আমার কিছু বলার নেই। It is alright, পচা পাতা, শুকনো ফুলের পাপড়ি আর আগুন-লাগা মেঘ নিয়ে তুমি থাক, আপন মনে পোড় বা চোখের জলে ভেজ, তোমার personal affairs-এ কেউ interfere করবে না। কিন্তু শুকনো পাপড়িকে দরদ দেখাতে গিয়ে নিজে শুকিয়ে চিমড়ে হ'লে three dimensional concrete কবিতা দেখার জন্য কে মাথা ঘামাবে? তা ছাড়া wooing একটা মস্তবড় আর্ট। Scientific process মেনে চলতে হয়। এগুবার পথে gradual steps আছে। কোন্‌টার পর কি দরকার, না মানলে মানুষ একঘেয়েমিতে তিতিবিরক্ত হয়ে ওঠে। যাক্ গিয়ে, শুকনো পাপড়ি আমাদেরও কোন কাজে আসবে না। চল ভাই বেলা, আমরাও উঠি। বিশ্রামের দোহাই পেড়ে broad hint দেওয়া হয়েছে, she needs seclusion.

(সোফী ও বেলার প্রস্থান। মজা দেখার পর্ব্ব শেষ হওয়াতে অন্য দর্শকদের দ্বারা তাঁদের অনুসরণ।)

কৌতুকপ্রিয় ব্যক্তিদের নিকট রসিকতা হইতে নিষ্কৃতি পাইবার পর বিমল ও বিনীতা উভয়ে যখন নিজেদের নির্ব্বিঘ্ন ভাবিবার সুযোগ পাইল তখন উভয়ের সহজ দৃষ্টির উপর লজ্জার পর্দ্দা পড়িয়া গিয়াছে। অবশ্যপালনীয় ভব্যতার বিরুদ্ধাচরণকালীন বিমলের পক্ষ লওয়ায় যে সত্য বিনীতার নিকট ধরা পড়িল তাহা মিলন-পিপাসু আদিম প্রবৃত্তির অভিযান। যে অভিযান জয়যাত্রার পথে দুর্দ্দমনীয় জাত্যাভিমানকে ভাঙ্গিয়া চুরমার করিয়া দেয়, কৃষ্টি-সংশ্লিষ্ট যাবতীয় ভড়ংকে নত করাইয়া ছাড়ে। বিনীতা সেই দুর্জ্জয় শক্তির নিকট পরাভব স্বীকার করিতে পারায় অনির্ব্বচনীয় পুলকে বিভোর হইয়া ছিল।

বিদুষী বিদায় লওয়ায় লজ্জাবনতা বিনীতা অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া বসিয়াছিল। নির্ব্বাক্ অবস্থায় বসিয়া থাকা অস্বস্তিকর হওয়ায় অপর দিকে মুখ রাখিয়াই জিজ্ঞাসা করিল, "সত্যি, এর আগে চকোলেট কেক খান নি?" প্রশ্নটি বিদুষীর পক্ষে যে শিষ্টাচার নয় তাহা বিচার করিবার অবকাশ বিনীতা পায় নাই। দিশাহারা নারী তখন যে কোন চিন্তাকে নিকটে পাইতেছে তাহাকেই অবলম্বন করিয়া অস্বস্তিকর পরিস্থিতিকে সহজ করিবার জন্য ব্যগ্র হইয়া উঠিয়াছে।

প্রশ্নোত্তরের ক্রমবিকাশ কোথায় যে শেষ হইবে তাহাও সে জানে না। তাহার একমাত্র চেষ্টা, কোন প্রকারে সহজ হওয়া। প্রশ্নোত্তরে বিমল বলিল, "আপনি কি তাই বিশ্বাস করেন?"

বিনীতা। বিশ্বাস করি না ব'লেই ত জিজ্ঞাসা করলুম, ঢেঁকুর তোলাও তা হ'লে কৃত্রিম?

বিমল। অস্বীকার করি না।

বিনীতা। তবে কেন সকলের সামনে নিজেকে অমন ভাবে অপদস্থ করলেন?

বিমল। ধুতি প'রে আসায় সং দেখার মজা ছিল। মজা দেখিয়ে আপনার অতিথিদের আনন্দ দিলে আপনাকে কাছে পাওয়ার আশা ছিল, তাই তাঁদের হতাশ করতে চাই নি।

বিনীতা। আমাকে কাছে পাওয়ার জন্যে?

প্রশ্নের মধ্যে আর কিছু ছিল কিন্তু বলা হইল না।

কিছুক্ষণ উভয়ে চুপ করিয়া থাকার পর বিমল বলিল, সঙ্গীত সম্মেলনে পরিচয় হবার পর আপনাকে ভাল ক'রে জানবার দরকার ছিল। যতটা জানতে পেরেছি তাতে আমার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে ভাববার কারণ ঘটেছে।

বক্তব্য শেষ হইতে বিনীতা বিমলের দিকে তাকাইল। চার চক্ষুর মিলনে বিনীতার স্বাভাবিক উজ্জ্বল দৃষ্টি নত হইয়া গেল। দৃষ্টির ভাষায় যাহা অব্যক্ত রহিল তাহা কোন ভাষার দ্বারা উপযুক্তভাবে প্রকাশ করা যায় না। তাহা নিরবচ্ছিন্ন উপলব্ধির বস্তু। দৃষ্টির আদান-প্রদান, অন্তরের কথা বাহির করিয়া আনার জন্য সচেষ্ট হইলেও লজ্জার সঙ্কোচ যে সাময়িক বাধা সৃষ্টি করিল, তাহাই উভয়ের নিকট বৃহৎ আকর্ষণ হইয়া রহিল।

লাদক

শ্রীঅনিলকুমার দাশগুপ্ত

বর্তমান পরিস্থিতি

স্বাধীনতা লাভের পর ভারতে দেশীয় রাজ্যগুলির সমস্যা দেখা দেয়। অন্যান্য রাজ্যগুলির সমস্যার সমাধান হলেও কাশ্মীর সমস্যার সমাধান আজও হয় নি। এর সমস্যা অপর রাজ্যগুলি থেকে আলাদা। ১৯৪৮ খ্রীষ্টাব্দের ২৫শে অক্টোবর পাকিস্তানী হানাদাররা হানা দিয়ে এই রাজ্যের অনেক অংশ দখল করে বসে। তখন কাশ্মীরের ইচ্ছানুযায়ী ভারত তাকে রক্ষা করার জন্য সামরিক ব্যবস্থা করে। সেই খাসেই কাশ্মীর সরকার আনুষ্ঠানিক ভাবে ভারতের সঙ্গে যুক্ত হয়। হানাদারদের সঙ্গে যুদ্ধ করে তাদের অনেকটা হটিয়ে দেবার পর ১৯৪৮ সালের ৬ই জানুয়ারী ভারত কাশ্মীর প্রসঙ্গ রাষ্ট্রপুঞ্জের নিরাপত্তা পরিষদে উত্থাপন করে। তদনুযায়ী যুদ্ধবিরতি ঘোষিত হয় এবং ১৯৪৮ সালে যে যুদ্ধবিরতি-সীমারেখা টানা হয় তা লাদক উপত্যকা পার হয়ে লাদক পর্বতকে দ্বিখণ্ডিত করেছে। তার ফলে বাল্টিস্থান পড়েছে উত্তর অংশে এবং রাজধানী লে সহ দক্ষিণ লাদক পড়েছে দক্ষিণে অর্থাৎ ভারতের নিয়ন্ত্রাধীনে।

নিরাপত্তা পরিষদে এত দীর্ঘকাল পরেও কাশ্মীর সমস্যার নিষ্পত্তি হয় নি। এখনও পাকিস্তানীরা এর একাংশ দখল করে রয়েছে। এর উপর আবার চীন লাদকের বিস্তীর্ণ অঞ্চল অধিকার করে বসল বে-আইনী ভাবে। একদিকে পাকিস্তান অন্যদিকে চীনকে নিয়ে ভারত সরকার কাশ্মীর সম্পর্কে এক ভীষণ সমস্যায় জড়িত রয়েছে।

১৯৫৯ খ্রীষ্টাব্দের আগষ্ট মাসে ম্যাকমোহন রেখা অতিক্রম করে চীন ভারত ভূমিতে প্রবেশ করে। পরে অক্টোবর মাসে দঃ পূঃ লাদকের ৪০ মাইল অভ্যন্তরে এসে ভারতীয় সীমান্ত টহলদারী পুলিশদের আক্রমণ করে চীনারা ৯ জনকে নিহত করে। এ সম্বন্ধে ভারতের প্রতিবাদের উত্তরে চীন সরকার বলেন যে, ভারতীয় টহলদার পুলিশ চীনের অংশে অনধিকার প্রবেশ করায় এই ঘটনা ঘটেছে। এখানে আশ্চর্যের কথা হচ্ছে এই, ঘটনার আগে থেকেই ভারত সরকার জানতেন যে, চীনারা সিংকিয়াং থেকে তিব্বত পর্যন্ত যে রাস্তা তৈরী করেছে তার ১০০ মাইলই ভারতের অধীনস্থ লাদকের অন্তর্গত আকশাই চীনের মধ্য দিয়ে গিয়েছে। অবশেষে ভারত সরকার স্থির করেন যে, চীন সীমান্তে বিশেষ সৈন্যবাহিনী রাখবেন।

১৯৫৯ সালের নবেম্বর মাসে চীনের প্রধান মন্ত্রী চৌ-এন-লাই প্রস্তাব করেন—চীন ও ভারত উভয়কেই পূর্বে ম্যাকম্যাহন রেখা এবং পশ্চিমে যে রেখা থেকে উভয় সরকার তাঁদের ক্ষমতা প্রয়োগ করতেন তার থেকে ২০ কিলোমিটার দূরে সরে যেতে হবে। তাতে চীনের সুবিধা হ'ত এই যে, লাদকের যে অঞ্চল নিয়ে বিবাদ সেই অঞ্চল চীনের অধিকারে থাকত। নেহেরু তখন পাল্টা প্রস্তাব করেন—যে সীমান্ত ভারত ও চীন পরস্পর দাবী করছেন তা থেকে উভয় দেশের সৈন্যগণকে দূরে সরে যেতে হবে এবং দু'দলের মাঝখানে থাকবে যে ভূমি তার উপর কারও দাবী থাকবে না। এর ফলে, ভারত বর্তমানে যেখানে আছে সেইখানেই থাকবে; কিন্তু চীনকে হটে যেতে হবে প্রায় ১২ হাজার বর্গ মাইল। সুতরাং চৌ এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন। ভবিষ্যতে যাতে আর সংঘর্ষ না হতে পারে সেইজন্য নেহেরু আরও প্রস্তাব করেছিলেন, দুই পক্ষই সীমান্তে টহল দেওয়া বন্ধ করবেন। চৌ এ প্রস্তাবে রাজী হন এবং বলেন যে, দুই মন্ত্রীর মিলিত হওয়া দরকার।

তদনুযায়ী ১৯৬০ সালের এপ্রিল মাসে চৌ দিল্লীতে আসেন। কিন্তু সমস্যার সমাধান হ'ল না, শুধু ঠিক হ'ল, ১৯৬০ সালের জুন থেকে সেপ্টেম্বর মাসের মধ্যে ভারতীয় ও চৈনিক রাজকর্মচারীরা পর্যায়ক্রমে পিকিং ও দিল্লীতে মিলিত হয়ে যাবতীয় ঐতিহাসিক ও ভৌগোলিক প্রমাণ সংগ্রহ ও পরীক্ষা করে উভয় সরকারের কাছে তাদের বিবরণ দাখিল করবেন। কিন্তু তাঁরা এরূপ বিবরণ প্রস্তুত করতে সক্ষম হন নি।

চীনাদের ট্যাঙ্ক প্রভৃতি অস্ত্র নিয়ে খোলাখুলি লাদক ও নেফা আক্রমণের ফলে আলোচনার সমস্ত পথ রুদ্ধ হয়ে গেছে।

ইতিহাস

ফ্রাঙ্কের (Francke) মতে লাদকবাসীদের মধ্যে

বিদেশ থেকে পর পর এসে বসবাসকারী চারিটি জাতির ধারা বিদ্যমান—যেমন, যাযাবর তিব্বতী, উপজাতি মোঁ (Mon), দার্দী (Dardis) ও মধ্য তিব্বতীয়। তিনি টলেমির বইয়ে যার উল্লেখ করে তিব্বতীদের অস্তিত্ব দেখাতে চেয়েছেন তা লুসিয়ানো পেটেকের মতে ঠিক নয়। পেটেক তাঁর গবেষণামূলক গ্রন্থে প্রমাণ করেছেন যে, টলেমির সময়ে লাদকে তিব্বতীদের অস্তিত্বের কোন প্রমাণ তাঁর পুস্তকে পাওয়া যায় না। তাঁর মতে ফ্রাঙ্কে লাদকীদের মধ্যে যে চারিটি ধারার উল্লেখ করেছেন তার প্রথম দুটি অপ্রামাণ্য; কিন্তু অপর দুটি জাতির অস্তিত্ব আছে। লাদকের অধিবাসীরা যে মূলে দার্দী তাতে কোন সন্দেহ নেই। তিব্বতী ছদ্মবেশে থাকলেও নদী ও পর্বতের নামগুলি এর সাক্ষ্য দেয়। নৃতাত্ত্বিক গবেষণায় স্থির হয়েছে, বর্তমান লাদকীরা প্রধানত দার্দী (ইন্দো-ইরাণীয়) ও তিব্বতী (মঙ্গোলীয়) জাতির মিশ্রণে গঠিত। দার্দী চলিত গল্পে বা পূর্ব কাহিনীতে (folklore) বলা হয় যে, সমগ্র লাদক গোড়ায় দার্দীদের অধিকারে ছিল।

তিব্বতীরা তাদের দেশ ছেড়ে কবে এখানে এসে বসবাস করতে আরম্ভ করে সেই কাল নির্ণয় করা খুব কঠিন; কিন্তু তারা যে ৭ম শতাব্দীর আগে আসে নি তা একেবারে নিশ্চিত, কারণ সে সময়ে লাদকের সঙ্গে তিব্বতের কোন সম্বন্ধ বা যোগাযোগ ত ছিলই না, পরন্তু গিউগদের (Guge) দ্বারা বিভক্ত ছিল। এরা ভাষায় ও জাতীয়তায় তিব্বতীদের অপেক্ষা ভিন্ন।

দ্বিতীয় শতাব্দীতে লাদকের ইতিহাসের সূত্র প্রথম পাওয়া যায়। সেই সময় লাদক যে বিরাট্ কুশান সাম্রাজ্যের অন্তর্গত ছিল তার প্রমাণ পাওয়া যায় খালাৎসীতে (Khalatse) অবস্থিত খরোষ্ঠি লিপি দ্বারা খোদাই করা বিবরণী থেকে। ভৌগোলিক ও অর্থ নৈতিক দিক্ থেকে বিচার করে এ কথা মনে করা যায়—পরবর্তী কালে কুশানদের মতই কাশ্মীরের শাসকরাও (রাজারা) লাদকের গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্যের রাজপথগুলির প্রধান প্রধান স্থানে সামরিক ঘাঁটি স্থাপন করতে অবহেলা করেন নি। এ রকম সামরিক কর্তৃত্ব স্থাপন খুবই স্বাভাবিক, কিন্তু তার কোন নিদর্শন পাওয়া যায় না।

লাদকে অষ্টম শতাব্দীর ঘটনাবলীর জন্য আমরা সমকালীন বাল্‌টিস্থানের ইতিহাসের উপর নির্ভর করতে পারি। তিব্বতীরা অনবরত লাদককে আক্রমণের ভয় দেখাতো, ফলে চীনের সাহায্যে তাকে তার স্বাধীনতা বজায় রাখতে হয়েছে। বাল্‌টিস্থান ৭৫১ সালের পরে তিব্বত কর্তৃক অধিকৃত হয়। লাদক দখল হয় সম্ভবত অষ্টম শতাব্দীর প্রথম ভাগে। লাদক তিব্বত রাজ্যের অবিচ্ছেদ্য অংশ রূপে ছিল না, তবে একে অধীন বা আশ্রিত রাজ্য অথবা উপনিবেশ হিসাবে বিবেচনা করা হ'ত—কারণ লাদক তিব্বতীয় বাহিনীর আঞ্চলিক সংগঠনের বাইরে ছিল। লাদকের পূর্ণ বা অর্দ্ধ ঔপনিবেশিক মর্যাদা পাওয়া স্বাভাবিক মনে হয়, কারণ লাদকের অধিবাসীরা তখনও পর্যন্ত তিব্বতীয় ছিল না, কিংবা তখন সবে মাত্র তিব্বতী হ'তে আরম্ভ করেছে। এই তিব্বতীকরণ হ'তে অনেক সময় লেগেছিল; কারণ যে গিউগ (Guge) তিব্বত থেকে লাদককে আলাদা করে রেখেছিল, আগে সেই গিউগের তিব্বতীকরণ হয়েছিল, তার পর আসে লাদকের পালা। তিব্বতী শাসন বেশীদিন স্থায়ী হয় নি। লাসার সার্বভৌমত্ব শীঘ্রই নামেমাত্র পরিণত হয়েছিল। দশম শতাব্দীতে যখন স্কিদ-আইদ-নি-মামা-গন (Skyid-Ide-Ni-mam-gon) পশ্চিম তিব্বতীয় রাজ্য স্থাপন করেন তখন তিনি লাদকে তিব্বতী শাসনের কোন চিহ্ন পান নি। কিন্তু ৯৮২-৩ সালে লিখিত হুলাদ আল আলম (Hulad-al-Alam) নামক পারসী ভূগোলে যে ভূখণ্ড বর্তমান বাল্‌টিস্থান ও লাদকরূপে পরিচিত তাকে Bolorian Tibet বলা হয়েছে। তাতে প্রমাণ হয় যে, দশম শতাব্দীতে লাদকের তিব্বতীকরণ অনেক দূর অগ্রসর হয়েছিল।

বহু প্রাচীন কাল থেকেই ভারতীয় সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় প্রভাব লাদকের উপর পড়ে। এর প্রমাণ আছে লাদকে প্রাপ্ত ভারতীয় ধর্ম সংক্রান্ত বহু খোদিত লিপিতে—এই লিপির মধ্যে সর্বাপেক্ষা প্রাচীন হচ্ছে খ্রীঃ পূঃ ২য় বা ৩য় শতকে খালাৎসীতে প্রাপ্ত ব্রাহ্মী লিপির আকারে—এ কথা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে।

১৫১৭ সালে মীর মাজিদ নামে একজন আমির লাদক আক্রমণ করেন। ১৫৩২ সালে কাসগড়ের শাসক সুলতান সৈয়দ খাঁ (চেঙ্গিস খাঁয়ের বংশধর) তিব্বতীয় অপধর্মীদের বিরুদ্ধে পবিত্র যুদ্ধযাত্রা করেন। তাঁর সৈন্যদলের এক অংশ সর্বাপেক্ষা দক্ষ সেনাপতি মির্জা হায়দার কর্তৃক পরিচালিত হয়ে লাদকে প্রবেশ করে।

সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে বাল্‌টিস্থানের মুসলমানরা লাদক আক্রমণ ক'রে এর মন্দির ও মঠসমূহ ধ্বংস করে। তারপর ১৬৮৫-৮৮ পর্যন্ত ইহা সোকুপাদের দ্বারা আক্রান্ত হয়। এই সোকুপাদের বিতাড়ন করেন ঔরংজেবের প্রতিনিধি। লাদকের রাজা তখন মুসলমান

প্রাধান্য স্বীকার করে নিয়ে 'লে'-তে মসজিদ নির্মাণের অনুমতি দেন। শিখরা কাশ্মীর জয় করার পর ১৮৩৪-৪১ খ্রীষ্টাব্দে গোলাব সিং লাদককে নিজ রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করেন।

ভৌগোলিক বিবরণ

লাদক কাশ্মীর জেলার পূর্বে পঞ্জাবের কাংড়া উপত্যকার উত্তরে অবস্থিত এবং পূর্বদিকে তিব্বত (নাগরি ও রুদক) ও উত্তর দিকে মোটামুটি কুয়েনলুন পর্বতমালা পর্যন্ত বিস্তৃত। লাদক অত্যন্ত উচ্চ পার্বত্য অঞ্চল। এর অন্তর্গত রূপসু উপত্যকা ১৫,০০০ ফুট উচ্চ। 'লে'-র নিকটস্থ উপত্যকা ১১,০০০ ফুট এবং চতুর্দিক্‌কার পর্বতমালা গড়ে ১৯,০০০ফুট উচ্চ। বাল্টিস্থানের অন্তর্গত কারাকোরাম পর্বতমালার শৃঙ্গ কে-২ এর উচ্চতা ২৮,২৫০ ফুট।

লাদক জেলার আয়তন ৪৫,৭৬২ বর্গমাইল। বাল্টিস্থান সহ এর লোক সংখ্যা ১,৯৫,৪৩১ জন (১৯৪১ খ্রীঃ)। লাদক তহসিলের জনসংখ্যা ছিল ৩৬,৩০৭ জন।

লাদককে ভূপ্রকৃতি অনুসারে দু'ভাগে বিভক্ত করা হয়—(১) উত্তর বা উচ্চ সমভূমি ও (২) গভীর উপত্যকা। দেশীয় ভাষায় যথাক্রমে এদের বলে—চাংতাং (changtang)ও রোং (rong)।

পশ্চিম হিমালয় কাশ্মীর রাজ্যে উত্তর পশ্চিম থেকে দক্ষিণপূর্ব পর্যন্ত বিস্তৃত। এই পর্বতের উচ্চতা গড়ে ১৭,০০০ ফুট এবং সর্বোচ্চ শিখর নাঙ্গা পর্বতের উচ্চতা ২৬,৬২০ ফুট। এ কাশ্মীরকে প্রায় সমান দু'ভাগে ভাগ করে এমন দুর্লঙ্ঘ্য প্রাচীর সৃষ্টি ক'রেছে যে, দুই অংশের জলবায়ুর মধ্যেই যে প্রচুর তারতম্য ঘটিয়েছে তাই নয়, অধিবাসীদের মধ্যেও তফাৎ ঘটিয়েছে।

এই পর্বতমালার দক্ষিণ অংশে আর্যদের ও উত্তরে (দার্দ জেলা ব্যতীত) মংগোলীয়দের বাস। লাদকের অধিবাসীরা বৌদ্ধধর্মাবলম্বী, সুতরাং কাশ্মীরের প্রজা হয়েও তারা ধর্মগুরু গ্র্যাণ্ডলামার মুখাপেক্ষী।

কাশ্মীরে বৃষ্টিপাত সামান্য হ'লেও নিয়মিত এবং শীতকালে তুষারপাত প্রচুর হয়। এই সঞ্চিত তুষার গ্রীষ্মকালে গলে গিয়ে দেশকে জলসিঞ্চিত করে। কিন্তু দক্ষিণের সমুদ্র থেকে আগত জলপূর্ণ মেঘ এই উচ্চ পর্বতে প্রতিহত হওয়ার ফলে অপরদিকে অর্থাৎ লাদকে বৃষ্টি প্রায় হয়ই না (বৎসরে মাত্র ২·৭ ইঞ্চি)। শীতকালে তুষারপাতও সামান্যই হয়।

লাদকের উপত্যকা ও আচ্ছাদিত স্থানগুলিতে উদ্ভিদ্ জন্মায়। খর্বাকৃতি ঝাউ প্রভৃতি কয়েক জাতীয় ছোট গাছ পর্যটকদের জ্বালানী কাঠের কাজে লাগে। এখানে পেন্সিল. দেবদারু, আপেল, তুঁত, খুবানি ও আখরোট গাছ জন্মায়। এখানকার প্রধান কৃষিজাত জিনিষ হচ্ছে গম, এক জাতীয় বার্লি (গ্রিম), জোয়ার, মটর, বীন, শালগম প্রভৃতি।

ছাগ, মেষ, চমরী গরু প্রভৃতি গৃহপালিত জন্তু এবং বন্য গর্দভ, দীর্ঘ শৃংগ বিশিষ্ট বন্যছাগ (Ibex), বন্য মেষ, হরিণ, খরগোস, পাহাড়ে ইঁদুর, ইত্যাদি লাদকে পাওয়া যায়।

লাদকের প্রধান নগর বা রাজধানী লে শ্রীনগর থেকে ১৬০ মাইল পূর্বে অবস্থিত। ভারত ও মধ্য এশিয়ার বাজার সমূহের মাঝখানে লে অবস্থিত হওয়াতে তিব্বত, সাইবেরিয়া, তুর্কীস্থান, মধ্য এশিয়া ও ভারতের অপর অংশের বণিক্‌রা তা'দের পণ্য নিয়ে এখানে আসে বিক্রয় করতে। এখানে দক্ষিণের উৎপন্ন দ্রব্যের সঙ্গে উত্তরের দ্রব্যের বিনিময় হয়। ভারতের বণিকেরা 'লে'-র উত্তরে যায় না এবং মধ্য এশিয়ার ব্যবসায়ীরা এর দক্ষিণে আসে না। লে হচ্ছে সকলের মিলন ও বাণিজ্য ক্ষেত্র।

লে থেকে তিব্বত, তুর্কীস্থান ও সিংকিয়াং পর্যন্ত কতকগুলি রাস্তা গিয়েছে। এখানে একটি মানমন্দির আছে এবং তা' এশিয়ার মধ্যে সর্বোচ্চ।

কেন্দ্রস্থলে অবস্থিতিও রাস্তাগুলির দ্বারা সন্নিহিত অঞ্চলের সঙ্গে যোগাযোগ ব্যবস্থার দরুণ লে যেমন বাণিজ্যিক তেমনি সামরিক গুরুত্বপূর্ণ স্থানে পরিণত, হয়েছে।

লাদকের অধিবাসী

লাদক ও তিব্বত এই দুই দেশেই এক দৃশ্য ও জলবায়ু, এক ভাষা, পোশাক এবং রীতি-নীতি দেখা যায়। একমাত্র লাদকেই লোহিত লামারা (রেড লামা) থাকেন। পীত বর্ণের লামারা বিশেষভাবে চীনা তিব্বতে থাকেন এবং তাঁরা লোহিত লামাদের অপেক্ষা কঠোর ধর্মাচরণকারী। লোহিত লামারা সাল পেটিকোট পরেন এবং কাঁধে রাখেন লাল শাল, আর বামবাহু খালি থাকে।. তাঁ'দের মস্তক মুণ্ডিত। যখন তাঁরা বাড়ীর বাইরে যান তখন কান ঢাকা একটি লাল টুপি মাথায় দেন। তাঁরা সর্বদা প্রার্থনা-চক্র (praying whpeel) জপমালা ও পবিত্র জলপূর্ণ বোতল হাতে করে বহন করেন।

লামাদের মঠে দু'রকম ভিক্ষু বা বৌদ্ধ সন্ন্যাসী থাকেন। এক রকম সন্ন্যাসী হচ্ছেন কর্মী, আর এক রকম—ধর্ম আচরণকারী। প্রথমোক্তরা পার্থিব কাজ করেন। তাঁরা জমি চাষ করেন, মঠের অধীনস্থ প্রজাদের কাছ থেকে কর সংগ্রহ করেন, গ্রামে গ্রামে গিয়ে সম্প্রদায়ের লোক বা সমধর্মী ভ্রাতাদের জন্য ভিক্ষা করে আনেন এবং সংশ্লিষ্ট কৃষকগণকে অর্থ ও শস্য আগাম (দাদন) দেন। শেষোক্ত ভিক্ষুদের পার্থিব বা সাংসারিক ব্যাপারের সঙ্গে কোন সম্পর্ক নেই, তাঁরা কেবল ধর্মকর্ম নিয়েই সময় কাটান। এঁদের মধ্য থেকেই মঠাধ্যক্ষ নির্বাচিত হন।

লাদকের অধিবাসীরা শান্তভাবে ও অকপটে এবং রসিকতা করে কথা বলে। লাদকীরা অমায়িক, সৎ, অতিথিপরায়ণ ও সরল এবং কারও ক্ষতি করে না। তা'দের ধর্মের গোড়ামি বা সংস্কার নেই এবং ভিন্ন ধর্মীর সঙ্গে আহারে আপত্তি নেই। মেয়েরা পর্দানসীন নয়, বিদেশীদের সঙ্গে নির্ভয়ে কথা বলে এবং তা'দের স্মিত হাস্যে সংবর্দ্ধনা জানায়। লাদকীরা যে কোন লোককে তা'দের বাড়ীতে সাদরে নিয়ে যায়, পীঠ স্থানে অবাধে প্রবেশ করতে দেয় এবং ধর্মানুষ্ঠানে বা উৎসবে উপস্থিত থাকতে দিতে কুণ্ঠিত হয় না।

লাদকে স্ত্রী, পুরুষ উভয়েই গ্রীষ্মকালেও গরম পোশাক পরে। পুরুষরা গোড়ালি পর্যন্ত লম্বিত পশমের ফ্রক (ঢিলা আস্তিন কুর্তা) বা আলখাল্লা কাপড়ের কোমর-বন্ধসহ পরে। তা'রা কান ঢাকবার ঝলঝলে ঢাকনীযুক্ত ছোট টুপি মাথায় দেয় এবং সেই কান ঢাকনা সাধারণত উপর দিকে উল্টিয়ে রাখে।

স্ত্রীলোকেরা পদগ্রন্থি পর্যন্ত বিস্তৃত ফ্রক, মেষ চর্মে নির্মিত ক্লোক বা ঢিলে পোশাক (পাত্রবরণ) ও বুট জুতো পরে। তা'দের প্রত্যেক গালে এক গুচ্ছ করে চুল ঝুলতে থাকে এবং মস্তকাভরণ পিঠের কিছুদূর পর্যন্ত নেমে আসে। এই পোশাকের নাম পেরাক এবং এ তিব্বতের স্ত্রীলোকদের বৈশিষ্ট্য। পেরাক মূল্যবান পাথরে খচিত চর্মে নির্মিত এবং দুই ফুট লম্বা ও আট ইঞ্চি চওড়া।

লাদকের সর্বত্র প্রস্তর নির্মিত প্রার্থনা প্রাচীর বা মণি দেখতে পাওয়া যায়। এ গুলি সাধারণত গ্রামের প্রবেশ পথে আবার কখন লোকালয় থেকে দূরেও থাকে। পাঁচিলের পাথরগুলি সুন্দররূপে খোদাই করা। তার কোনটাতে খোদাই থাকে বুদ্ধমূর্তি ও কোনটায় গূঢ়ার্থক মূর্ত্তি ও কোনটায় বা উৎকীর্ণ থাকে প্রার্থনা স্তোত্র। পাথরে এই খোদাইয়ের কাজ সাধারণত লাসা থেকে আগত ধার্মিক লামারা করেন।

মণির বা প্রার্থনা প্রাচীরের দুই প্রান্তে দু'টি 'কোরটেন' থাকে। বৌদ্ধদের মৃতদেহ ভস্মীভূত করার পর সেই ভস্ম কাদার সঙ্গে মিশিয়ে ছোট মূর্তি তৈরী করা হয়। এই মূর্তি বিত্তশালীর হলে-এর পাশে তৈরী 'কোরটেনে'র মাঝখানে রাখা হয় এবং দরিদ্রের হ'লে কোন পুরাণ 'কোরটেনে'র মধ্যে অন্যান্য দরিদ্রের মূর্তিগুলির সঙ্গে রাখা হয়।

হিমিস সহর 'লে' থেকে প্রায় ২০ মাইল দূরে। এখানে অবস্থিত মঠে (Himis Gompa) পৃথিবীর অন্যতম আশ্চর্য বা বিচিত্র ধর্মীয় উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। এই বাৎসরিক অনুষ্ঠান দু'দিন ধরে চলে এবং লাদকের অধিবাসী ছাড়াও তিব্বতের বৌদ্ধরা তা'তে যোগদান করতে আসে।

ধর্মীয় নৃত্য-নাট্য (Mystery Play)

গং (পেটা ঘড়ি) ও শম (Shawm) বেজে উঠে, আর সুরু হয়ে যায় ছদ্মবেশী অনুষ্ঠান। প্রথমে আসেন কয়েকজন পুরোহিত। তাঁদের মাথায় মুকট, পরণে মূল্যবান পোশাক এবং হাতে ধুনাচি। ধুপের গন্ধে সমস্ত প্রাঙ্গণ আমোদিত হয়ে উঠে। এর পরে হয় বিলম্বিত সংগীত সহযোগে নাচ। এই নাচের শেষে হয় এঁদের বিদায় গ্রহণ এবং হলুদ পোশাকে সজ্জিত ও উন্নত মস্তকাবরণযুক্ত মূর্তি সমূহের কিম্ভূতকিমাকার অঙ্গভঙ্গী করতে করতে প্রবেশ। তাদের বুকে ও পোশাকের অন্যান্য অংশে থাকে অগ্নিশিখা ও মানুষের মাথার খুলির প্রতিমূর্তি। তাদের মস্তকাবরণ খুলে পড়তেই দেখা দেয় ভীষণাকৃতি। তখন সংগীত হয়। দ্রুত ও ভয়ংকর এবং দলে দলে ভিন্ন ভিন্ন মুখোসধারী মূর্তি বেগে প্রবেশ করতে থাকে। তাদের কেউ বাজায় খঞ্জনী (Tambourine), কেউ বা ঘণ্টা আর কেউ বা ঘড় ঘড় শব্দকারী (rattle)। এই বন্য সংগীতের সাথে সাথে ভয়ংকর মুখোস পরিহিত লোকরা অদ্ভুত পদক্ষেপ ও অঙ্গভঙ্গী সহকারে নাচতে নাচতে সমস্বরে চীৎকার করতে থাকে।

একটি পবিত্র জিনিসের আবির্ভাব হতে থাকে, আর মুহূর্তে মহারোল থেমে যায় এবং সমস্ত দৈত্য ভয়ে চীৎকার করতে করতে পালিয়ে যায়। অনুচ্চ সংগীত, পবিত্র মন্ত্রোচ্চারণ ও ধুনাচি দুলিয়ে একটি

জমকাল শোভাযাত্রা মন্দিরের অলিন্দ দিয়ে এসে ধীরে ধীরে সিঁড়ি বেয়ে নামতে থাকে। একটি দীর্ঘাকৃতি মূর্তি সুন্দর সিল্কের পোশাকে সেজে এবং হিতকারিতা ও শান্তির প্রতীক একটা বিরাট মুখোস পরে পদব্রজে আসেন, আর বাহকেরা তাঁর মাথার ওপরে চন্দ্রাতপ বহন করে চলে। তিনি এগিয়ে যেতে থাকেন আর তাঁর সামনে ছেলে-বুড়ো সকলেই সাষ্টাঙ্গে প্রণাম ও স্তুতি-গান করতে থাকে। তাঁর পেছনে আরও ছ'জন মুখোস পরা মূর্তি আসেন এবং তাঁরাও সমান সম্মান পান। এই সাত জন প্রাঙ্গণের একদিকে এক সারিতে দাঁড়ালেন এবং মঠাধ্যক্ষ, পশুর মস্তক ও শয়তানের মুখোসধারীরা দলে দলে এসে তাঁদের সম্মান দেখিয়ে যায়। এই দেবত্ব আরোপিত সাতটি মুখোসধারী কারও মতে হচ্ছেন—দালাই লামার প্রতিনিধি, আর কারও মতে—ভগবান্ বুদ্ধের অবতার।

সারাদিন ধরে এই সব গাম্ভীর্য পূর্ণ পূজোর কাজ চলার ফাঁকে শয়তানের সাজে সজ্জিত হয়ে কতকগুলি মূর্তি হাস্য-পরিহাস ও ভাঁড়ামি করতে থাকে। তারা কখনও একে অপরকে আঘাত করতে থাকে, কখনও বা পরস্পর পরস্পরকে উল্টে ফেলে দেয়, আবার কখনও বা অবান্তর হাসিতে ফেটে পড়ে।

দৃশ্য পরিবর্তিত ও পবিত্র গান বন্ধ হয়ে যায়। তারপর বেগে প্রবেশ করে একদল বিবর্ণ মূর্তি। তা'দের পরণে কালো ছিন্ন বস্ত্র। তাই দিয়ে তা'রা কখন কখনও মুখ ঢাকে এবং কখন কখনও এক সঙ্গে জড় হয়ে যেন শীতে কাঁপতে থাকে। তা'রা হতাশভাবে তা'দের হাত সঞ্চালন করে এবং এলোমেলো ভাবে ছুটোছুটি ক'রে এমন ভাব করতে থাকে যেন তা'রা হারিয়ে গেছে। কখনও তা'রা ভয়ে চমকে ওঠে, আবার কখনও অন্ধের মত হাতড়ে বেড়ায় এবং সর্বক্ষণ টেনে টেনে শীস বা সিটি দেয়, মনে হয় যেন পাহাড়ের গায়ে ঝড়ো হাওয়া উঠছে ও পড়ছে। এই ভাবে একটা অবর্ণনীয় ভয়াবহ অবস্থার সৃষ্টি করে।

কিছুক্ষণ ধরে বিভিন্ন মুখোস পরা খারাপ আত্মা প্রাধান্য বিস্তার করে। তা'দের মধ্যে কেউ সাজে ষণ্ড-মস্তক ও সর্প-মস্তকাকৃতি শয়তান, কেউ কেউ হয় তিন চক্ষু দানব—তা'দের লম্বা লম্বা দাঁত, মাথায় মানুষের মাথার খুলির টায়রা; কেউ কেউ হয় কঙ্কাল, আবার কেউ সাজে ড্রাগনমুখো শয়তান—কোমরে জড়ান থাকে বাঘের ছাল। তা'রা মানুষদের ভয় দেখাতে থাকে এবং ভয়ার্ত মানুষরা তা'দের মধ্যে দিশাহারা হয়ে ছুটোছুটি করতে থাকে। এমন সময় পবিত্র মানুষরা এসে এই দানবদের বিতাড়িত করেন।

এই mystery play-র (ধর্মীয় নাটক) প্রধান উদ্দেশ্য মনে হয় যে, মানুষ তা'র চতুর্দিকে অপকারী অপদেবতা বা দৈত্য দ্বারা পরিবৃত। তা'রা জলে, স্থলে ও শূন্যে সর্বত্রই বিদ্যমান এবং চিরকাল ধরে মানুষকে ধ্বংস করার চেষ্টায় আছে। এই সব অপকারী শক্তির অমিত নির্যাতনের বিরুদ্ধে মানুষ নিজেকে রক্ষা করতে দাঁড়াতে পারে না; কিন্তু কোন সৎ লামা বা বুদ্ধের অবতার তার সাহায্যে এসে ক্ষণকালের জন্য তা'দের বিতাড়ন করেন। তাঁদের তিরোধানের পর আবার অপদেবতার আবির্ভাব হয় এবং পুনরায় সৎ লামা এসে তাদের দূরীভূত করেন। এমনি ভাবেই চলছে মানুষের জীবন।
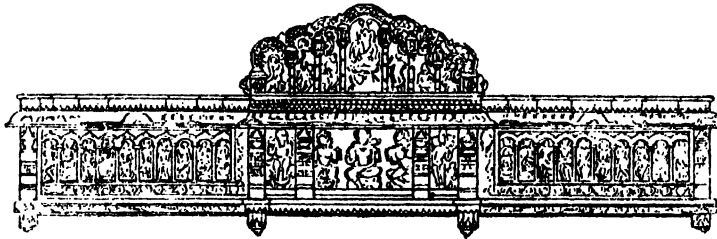
জানালার সামনে

শ্রীসলিল রায়

ছুটির দিনের ছুপুর। খেতে করতে বেলা হয়েই, পানটি চিবিয়ে, পাখাটি হাতে নিয়ে সটান চৌকিতে। চৌকিটা আবার জানলার মুখে, পুবমুখো জানলা, পুবে হাওয়া ফুর ফুর করে রমেনের চুলে এসে লাগছে। জানলার সামনে পাকা বারান্দা, তার পর দেড় মানুষ উঁচু পাঁচিল, পাঁচিলটা পুরোনো, জায়গায় জায়গায় সিমেণ্ট উঠে গিয়ে ভাঙ্গ ভাঙ্গ চেহারা, কিন্তু পাঁচিলে ত আর চোখ থাকে না, পাঁচিলের পরই ছোট্ট গলি, গলির ওপর বাড়ী। বাড়ীর দেওয়ালের ওপরটা, আর ছাদের কার্নিশ—পুরোটা নয়, খানিকটা—পরিষ্কার ঠাহর হয় চৌকিতে শুয়েই। ছাদের কার্ণিশ আর পাঁচিলের মাঝামাঝি শূন্যে খানিকটা উঁচুতে ইলেকট্রিকের তার, রোদে চক চক করছে। এখানেও দৃষ্টি থামে না, রমেনের চোখ-জোড়া ঠিক খুঁজে খুঁজে আকাশের নীচে দৃষ্টি মেলে দেয়। শুয়ে শুয়েই বেশ খানিকটা আকাশ দেখা যায়। একটা চিল উড়তে উড়তে উঁচুতে, অনেক উঁচুতে ভেসে গেল। চিলটা যেন একটুকরো ছোট্ট মেঘ হয়ে গেল, ভর্ত্তি দুপুর, থৈ থৈ রোদ্দুর, যেন একটা রোদের দীঘি, আর দীঘির পাড়ে রমেন ছায়াতে গা এলিয়ে, চিলটা রোদে ভাসছে ত ভাসছেই, আর মাঝে মাঝে যেই পাখনা দুটো কাঁপছে আনন্দে, খানিকটা আনন্দ যেন উপছে উঠে বাতাসে জল-কণার মত ভাসতে ভাসতে দেহমন ভিজিয়ে দিচ্ছে। রমেনের চোখদুটো যেন ঘুমে জড়িয়ে আসছে। কিন্তু ঘুমোবার উপায় নেই, মাছির ভন্ ভন্, পাখা দিয়ে তাড়ায় ত আবার এসে বসে। অঙ্গসঞ্চালন আর নিদ্রা ত এক-যোগে হতে পারে না। তাই চোখ খুলতেই সেই পাঁচিল, পাঁচিল পেরিয়ে গলি (যদিও গলিটা দৃশ্য নয়, কিন্তু তার অবস্থান মনে গাঁথা), গলির ওপর বাড়ী (বাড়ীটা দৃশ্য নয়), বাড়ীর দেওয়ালের ওপরটা, তারপর ছাদ—ঠিক ছাদ নয়—ছাদের কার্ণিশ, তারপর আকাশ, রোদ্দুর। এখন আর একটি চিল নয়, কয়েকটি, ভাসছে, শূন্যে ভাসছে, চিলগুলো কি আর পৃথিবীতে ফেরার কথা ভাবছে?

আর ঘুড়িগুলো? রঙীন সব ঘুড়ি, লাল, সবুজ, দু'রঙা, তিন রঙা, কোনটা আবার রঙে রঙে চৌরঙা, ঘুড়িগুলো কি চিল হয়ে গেছে? ওরা কি মহাশূন্যে সজীব হয়ে উঠেছে? ফুরফুরে হাওয়ায় জানলা দিয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে ঘুড়িগুলো দেখতে রমেনের খুবই ভাল লাগছে। কিন্তু একটিবারও যদি ওকে বলা হয় ছাদে গিয়ে দাঁড়াতে—সে পারবে না। ছেলেবেলা কবে পেরিয়ে গেছে, সময়ের ধাপে ধাপে পা দিয়ে এখন যেখানে উঠেছে সেখান থেকে ছেলেবেলার দিনগুলো পাহাড়ে চড়ে সমতল সবুজ দেখার মতই আনন্দময়, কিন্তু তাই বলে এই দুপুর রোদ্দুরে ছাদে দাঁড়িয়ে ঘুড়ি ওড়াবার স্পৃহা নেই, অথচ আশ্চর্য্য, ছেলেবেলায় রোদ্দুরে ঘুড়ি ওড়ানো নিয়ে কত না বকুনি খেয়েছে। এখন মনে হয়, ছেলেগুলোর রোদ লেগে অসুখ করবে, তার চেয়ে দুপুরে একটু নিদ্রা, না হোক একটু নিশ্চিন্ত তন্দ্রা অনেক আনন্দের। ধন্য সময়, সময় শুধু মানুষের দেহে পরিবর্ত্তন আনে না, অলক্ষ্যে মনেও।

রমেন যা ভেবেছে ঠিক তাই, পাশের বাড়ীর পলটু, ও পাশের বিশু মদন ছাদে চুপচাপ চড়েছে, আর দেখতে না দেখতে পলটুর হাতে লাটাই ঘুরতে সুরু করেছে সুতোর টানে। কোনটা লাট খাচ্ছে, কোনটা স্থির, কোনটা ইতস্তত: কাঁপতে কাঁপতে এগিয়ে যাচ্ছে। কেঁপে কেঁপে ওড়াতে কেমন যেন স্থবিরত্ব, কিন্তু লাল রঙ লাট খাওয়া ঘুড়িটা? তর তর করে বাতাসকে দোলাতে দোলাতে এগিয়ে যাচ্ছে, ও যেন ভাবছে, ফুরোবেনা পথ, পথ চলার আনন্দ ত পেলাম, চলব যতি হীন, ভাবা নেই, থামা নেই, শঙ্কা নেই। মণ্টু, পলটুর ছোট ভাইও এবার ছাদে চড়েছে, ও একদৃষ্টে এই ঘুড়িটার দিকে তাকিয়ে আছে। মণ্টু ঘুড়ি ত আর ওড়াতে পারে না, এখনও ছোট, আর ওড়ানোতে ওর যে খুব আকাঙ্ক্ষা আছে তাও মনে হয় না, তবে মাঝে মাঝে লাটাইটা হাতে নেওয়ার সুযোগ পায়। সুতোয় যখন মানজা দেয় পলটু, মণ্টুর হাতে লাটাইটা ধরিয়ে দেয়। ওর কাজ ঢিল দেওয়া, তার বেশী কিছু পারেও না। আর তাতেই ওর আনন্দ, তবে ঘুড়ি ওড়ানো দেখতে ওর আগ্রহ অসীম। যখন আশে-পাশে ঘুড়ি থাকে না, আকাশ ফাঁকা, তখন এক একদিন পলটু লাটাইটা ভায়ের হাতে ধরিয়ে দেয়, মণ্টুর

সে কি আনন্দ। কচি মুখ রোদে পুড়ে লাল হয়ে যায় কিন্তু ভ্রুক্ষেপও থাকে না মণ্টুর, আপন মনে সুতো ছাড়তে থাকে।

ঘুড়িটা তর তর করে এগিয়ে যায়। মণ্টুর মনে হয় ঘুড়িটা যেন মেঘের রাজ্যে চলে যাবে, আর মেঘের সমস্ত খবর ঐ সুতো বেয়ে ঢেউয়ের মতন তার হাত হয়ে, গলা হয়ে, মুখ হয়ে, কান হয়ে, চোখ হয়ে পৌঁছবে সমস্ত শরীরটায়, কি আনন্দ, কি আনন্দ! কিন্তু ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করে দাদাকে, সুতো আর ছাড়ব? পলটু এতক্ষণ হয়ত অন্য ঘুড়িগুলোর ওপর কারিগরী করছিল। কোনটায় কড়া বাঁধছিল, কোনটা হয়ত পেট দুমড়ে পরীক্ষা করছিল, চমকে উঠে লাটাইটা নিজের হাতে ছিনিয়ে নিয়ে বলে, আর একটু হলেই গাছে ফেলেছিলি আর কি।

মণ্টুর মুখটা ম্লান হয়ে যায়। রমেন শুয়ে শুয়ে দেখে। ছুটির দুপুরে প্রায়ই দেখে, মণ্টু যে কতবড় দুঃখ পায় সেটা রমেন বেশ বুঝতে পারে। আর একদিন আনন্দ দেখেছিল মণ্টুর মুখে চোখে, যেদিন নতুন মানজা হ'ল। লাটাইয়ের সব সুতোটাই ছেড়ে দিয়েছিল পলটু। এটা ঘুড়ি-বিজ্ঞানের ব্যাপার, মানজা শুকিয়ে নেওয়ার প্রক্রিয়ার অঙ্গ। কিন্তু মণ্টুর আনন্দ যে ঘুড়িটা বহুদূরে, প্রায় মিলিয়ে গেছে। পলটু একটিবার লাটাইটা দিয়েছিল মণ্টুর হাতে। অনেক, অনেক দূরে পাখীর মত ছোট্ট হয়ে গেছে ঘুড়িটা, কিন্তু হাতের মধ্যে তার অনুভূতি জেগে আছে। এতটা আনন্দ মণ্টু আর কোনদিন পায় নি। রমেন বেশ বুঝতে পারে যে সুযোগ পেলেই মণ্টু সব সুতোটা ছেড়ে দেবে আর অবাক্ হয়ে বড় বড় চোখ করে তাকিয়ে থাকবে দূরে ঘুড়িটার পানে। পলটু ওর হাতে লাটাই দিলেই বলে, তুই শ্রা ওড়াতে পারবি না, হাঁ করে শুধু তাকিয়ে থাকবি। বলতে বলতেই হয়ত এক গোঁত দিয়ে আর একটা ঘুড়ির বন্ধন নিমেষে ছিন্ন করে দেয়। তারপর গর্বভরে ভাইকে বলে, দেখলি কেমন এক টানে উড়িয়ে দিলাম। মণ্টুর ওতে বিশেস আনন্দ নেই। বড় হলে হয়ত হবে, কিন্তু এখন নেই।

রমেনের ঘুম আর এল না। শুয়ে শুয়ে পলটুদের কাণ্ড দেখতে লাগল। একটু পরে ঘুড়িটা নামিয়ে পলটু মদন বিশু তিন জনেই নীচে নেমে গেল, মণ্টুকে বলে গেল, ঘুড়িতে হাত দিবি না, কেমন? আমরা এখুনি আসছি। মণ্টু চুপচাপ বসে রইল, আকাশের ঘুড়িগুলো দেখতে লাগল, তারপর কি খেয়াল হ'ল লাটাইটা নিয়ে একটু নাড়াচাড়া করতে লাগল, তারপর উঠে দাঁড়াল। বাঁ হাতে লাটাই ধরে, ডান হাতে সুতো ধরে ঘুড়িটা ওড়াবার চেষ্টা করতে লাগল, কিন্তু ওড়াতে ত পারে না। ঘুড়িটা বারবার যেন মাথা ঠুকে মণ্টুর পায়ের কাছে পড়ে অনুনয় করতে লাগল, মণ্টুবাবু ছেড়ে দাও, ছেড়ে দাও। কিন্তু মণ্টুবাবুর হাতে তখন স্বর্গের চাবিকাঠি। এমন সুযোগ পায় নি কখনও, এতদিন দাদার মুখ চেয়ে থাকতে হয়েছে। সুযোগ আজ হাতে। আপ্রাণ চেষ্টা করতে থাকল মণ্টু, কিন্তু ঘুড়িতে বাতাস আর ধরে না। রমেনের তন্দ্রা এসেছিল। তন্দ্রা কেন, প্রায় ঘুমই এসেছিল। হঠাৎ আচমকা এক চীৎকারে ঘুম ছেড়ে গেল। ছাদের দিকে দৃষ্টি পড়ল, কেউ নেই। তবে? মণ্টু পিছু হটতে হটতে কার্ণিশ টপকে মাটিতে পড়েছে। গলিতে তখন কান্না। অনুশোচনায় রমেনের মনটা পুড়ে গেল, দেখেও কেন যে সে মানা করল না মণ্টুকে! আর ঠিক ছাই ঐ সময়টা তন্দ্রা এল, চোখের সামনে মৃত্যু এল তাকে অন্ধ করে দিয়ে। না, তা নয়। তার অলসই মৃত্যুকে ডেকে আনল, এ অপরাধের ক্ষমা নেই।

মণ্টু নেই, ঘুড়িও নেই, পলটু, বিশু, মদন ওরা কেউ ছাদে ওঠে না। উঠলেও ঘুড়ি ওড়ায় না। পলটু ত হাঁটু মুড়ে মুখ নীচু করে বসে বসে ভাবে। কতদিন কেটে গেছে, রমেন তবুও ঐ ছাদটার দিকে তাকাতে পারে না, তাকালেই মণ্টুর বড় বড় চোখদুটো দেখতে পায়, চোখদুটো যেন অবাক্ হয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে আছে দিশাহারা, ঠোঁটের হাসি মিশে আছে প্রতিটি প্রান্তে। তবু মন ত চিরটাকাল বেদনা বহন করে না, কালের স্রোতে ক্ষয়ে ক্ষয়ে বেদনা ক্ষীণ হয়ে আসে, তাই একদিন রমেন দেখল পলটু আবার ছাদে উঠেছে একলা, সেই লাটাই, লাটাই ভরা সুতো, সুতো ত নয়, জড়ান আনন্দ, ঘুড়িতে বাতাস লাগল। সাদা রঙ ঘুড়ি সাদা বকের মত ভাসতে ভাসতে এগিয়ে চলল। রমেনের আজ আবার মনে হল ঘুড়িটা শূন্যে সজীব হয়ে উঠেছে ও বকের মত ডানা মেলেছে আকাশের নীলে, আর বুঝি ফিরবে না পৃথিবীর বুকে।

পলটুর মুখে কিন্তু আনন্দ নেই। এখনও ম্লান রমেনের মনে কেমন একটা শঙ্কা হল, এখন কাউকে ছাড়া ছাদে ঘুড়ি ওড়াতে দেখলেই ওর ভয় করে, ভাবল পলটুকেও মানা করে, কে জানে কিছুই বলা যায় না কিন্তু মানা করতে মন চাইল না। ওড়াচ্ছে, ওড়াক পলটুর কিন্তু ওড়ানোতে মন নেই, কেমন বিমর্ষ, সুতো ছাড়ছে ত ছাড়ছেই। দেখতে দেখতে ঘুড়িটা মিলিয়ে গে

দূরে। আর ঠাহর হয় না, রমেন একটু অবাক্ হ'ল। কিন্তু ততক্ষণ সুতো শেষ, লাটাইটা একদম নিঃশেষ, তারপর এক মুহূর্ত, পলটু একটানে সুতোটা ছিঁড়ে দিলে। সুতোটা ছাদে লুটোতে লুটোতে ভেসে গেল, রমেনের মনটা বেদনায় ভারী হয়ে উঠল। মণ্টুর বেদনা এখনও ভুলতে পারে নি পলটু, ওর খুদে ভাইটার বড় সখ ছিল সমস্ত সুতোটা ছেড়ে দিয়ে আকাশে তাকিয়ে থাকার, পলটু সে কথা ভোলে নি। তাই আজ নিঃশেষ করে দিলে তার মনের বেদনা। তারপর লাটাইটা রাখল ছাদে, রমেন শুয়ে শুয়ে লাটাই দেখতে পেল না, কিন্তু পলটু কি যেন একটা করছে তা বুঝল। কি করে পলটু—এক অদম্য আগ্রহ নিয়ে রমেন মুহূর্ত গুণতে লাগল। তারপর দেখল, অবাক্ হয়ে দেখল—আগুন। লাটায়ে আগুন দিয়েছে পলটু। আগুন দিয়ে নিজে এসে বসল কার্ণিশটায়। আগুন জ্বলল দাউ দাউ করে। রমেনের মনে হল সমস্ত পৃথিবীতে যেন আগুন লেগেছে। পৃথিবীটা যেন একটা বিশাল চিতা। রোদ্দুরটা যেন তার লেলিহান শিখা, এত বড় বেদনায় সাক্ষী রইল সে। চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ল, আর তার মনে হ'ল, জানলার সামনে পাঁচিলটা নেই, গলিটা নেই, গলির ওপর বাড়ীটা নেই, বাড়ীর ওপর ছাদটা নেই, ছাদের প্রান্তে কার্ণিণ নেই, বিদ্যুতের তারগুলো নেই, কিছু নেই, কিছু নেই; শুধু আকাশ জোড়া হাহাকার—মণ্টু, মণ্টু, মণ্টু।

—•—

কবি-মানসী

মিহির সিংহ

কবির জীবনে মেয়েদের একটি বিশেষ স্থান আছে।—তা তো মোটেই অস্বাভাবিক নয়। কবি যিনি, তাঁর জীবনে অনুপ্রেরণা বহুলাংশে আসে মেয়েদের কাছ থেকে। শিশু অবস্থায় মা ও মাতৃস্থানীয়াদের সঙ্গে সঙ্গেই পরবর্ত্তীকালে ভগিনী, স্ত্রী, দুহিতা, দৌহিত্রী—সকলের সঙ্গেই প্রেম ও স্থূলতর সাংসারিক নির্ভর-শীলতার সম্পর্ক সব মানুষের মতন কবির জীবনেও ঘটে থাকে। কবির জীবনে তা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ এই জন্যে যে, এই সব সম্পর্কের মধ্যে দিয়ে কবি লাভ করেন কাব্যসৃষ্টির প্রেরণা। অতি স্বল্পকালের জন্যেও যদি কোনও মহিলা কবিকে প্রেরণা দিতে পেরে থাকেন তো তার স্বাক্ষর থেকে যায় অমর কোন রচনার মধ্যে। সেই জন্যেই, সাধারণ মানুষের জীবনে প্রিয় বান্ধবীদের স্থান একান্ত বক্তিগত ব্যাপার ব'লে বিবেচিত হ'লেও কবির জীবনীকার বা সমালোচকদের কাছে সেটা নিতান্ত তাই ই নয়। প্রেরণাদাত্রীদের (বা স্থান বিশেষে প্রেরণাদাতাদের) সঙ্গে সৃজনীশক্তির যোগা-যোগ অনুসন্ধানের মধ্যে দিয়ে অনেক সময়ে মহৎ কাব্যের মহত্তর অনুধাবন সম্ভবপর হয়। তবে সৎ সমালোচক যেখানে যথাসাধ্য সংযম, নিষ্ঠা, যুক্তি-পরায়ণতা ও যাথার্থ্যের উপরে নির্ভর ক'রে এ ধরণের আলোচনায় প্রবৃত্ত হন, সততাহীন ব্যক্তি সেখানে হয়ত নিছক কৌতূহল চরিতার্থ করার মানসে কিংবা রুচিহান পাঠকদের তৃপ্তিদানের প্রয়াসে ঐ কাজে লিপ্ত হয়ে পড়েন। বড় কবি, যে কোনও বড় মানুষের মতনই আমাদের কৌতূহলের পাত্র। তাঁর সম্বন্ধে ব্যক্তিগত কোনও তথ্য জানতে পারলেই খুশী হই—অসাধু লেখক আমাদের এই প্রবণতার সুযোগ নিয়ে সামান্য তথ্যকে পল্লবিত ক'রে তোলেন রোমাঞ্চকর কাহিনীতে। অস্বীকার ক'রে লাভ নেই যে আমাদের দেশে তথ্যানু-লম্বী সাহিত্যের লেখক ও পাঠকের সংখ্যা 'রম্য রচনা'র তুলনায় বড়ই কম। এই ধরণের অতিরঞ্জিত রচনা সহজেই আমাদের মনোরঞ্জন করে। যাঁরা তথাকথিত সংস্কৃতিবান্ পাঠক তাঁরাও অনেক সময়ে বিভ্রান্ত হন—দুটি কারণে—প্রথমতঃ পরিচিত অনেক সাহিত্যকর্ম্মের চমকপ্রদ ব্যাখ্যায় মুগ্ধ হবার অবকাশ থাকে, দ্বিতীয়তঃ কবির জীবনের অন্দর মহলে প্রবেশ ক'রে নিজেদের আশ্বস্ত করতে পারেন এই ভেবে যে, কবিও তাঁর সব মহত্ত্ব সত্ত্বেও রক্তমাংসেরই মানুষ।

প্রবীণ অধ্যাপক জগদীশ চন্দ্র ভট্টাচার্য্য প্রণীত

'কবি-মানসী' [প্রথম খণ্ড: জীবনভাষ্য, প্রকাশক ডি. এম. লাইব্রেরী, প্রথম প্রকাশ ২৫শে বৈশাখ ১৩৬৯, দাম বারো টাকা পঞ্চাশ নয়া পয়সা, পাতার সংখ্যা ৫১১] রবীন্দ্রনাথের অন্তরঙ্গ কবিজীবনী। শনিবারের চিঠিতে ক্রমশঃভাবে প্রকাশিত হবার সময়েই বইটি পাঠক সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। বইটি প'ড়ে বুঝতে পারা গেল যে তা' অকারণ নয়। মনে হয়, নানা কারণে বইটি সম্বন্ধে আলোচনার প্রয়োজন আছে। নাতিক্ষুদ্র বইটিতে ষোলটি অধ্যায় ব্যতীত আছে ভূমিকা, পরিশিষ্ট ও শব্দপঞ্জী। অধ্যাপক মহাশয়ের উদ্দেশ্য, বিশ্লেষণ ক'রে দেখানো কিভাবে রবীন্দ্রনাথের কবি-প্রতিভার বিভিন্ন অধ্যায়ে বিভিন্ন রমণীর প্রভাব পড়েছিল। 'নির্ব্বাসিত রাজপুত্র' ও 'নেপথ্যবিধান' অধ্যায় দুটিতে সংক্ষিপ্ত আলোচনা আছে মহর্ষিজায়া সারদা দেবীর। তা ছাড়া 'বিদেশী পাখি' অধ্যায়ে এসেছেন ডাক্তার আত্মারাম পাণ্ডুরঙের কন্যা আনা এবং 'কচ ও দেবযানী' অধ্যায়ে ডাক্তার স্কটের কন্যা মিস্ কে—। এঁদের দুজনের আবির্ভাবই অপেক্ষাকৃত অল্প সময়ের জন্যে,—মাদাম ভিক্টোরিয়া ও ক্যাম্পো ('বিজয়া') ও কবিজায়া মৃণালিনী দেবীর ('স্বর্ণ মৃণালিনী') প্রভাব তাঁদের চাইতে অনেক বেশী। তবে গ্রন্থকারের মতে "রবীন্দ্রনাথের প্রেরণাদাত্রী দেবী মানবীমূর্ত্তিতে মহর্ষি দেবের শুদ্ধান্তঃপুরে প্রবেশ করলেন জ্যোতিরিন্দ্রনাথের বধূরূপে।" কাদম্বরী দেবী বা 'নতুন বৌঠান'কে নিয়ে রচিত হয়েছে নয়টি পরিচ্ছেদ: 'আবির্ভাব', 'নন্দনকাননে পুনর্বসন্ত', 'মোরান সাহেবের বাগানবাড়ী', 'অভিমানিনী নির্ঝরিণী', 'আত্মবিসর্জন', 'কবির অন্তরে তুমি কবি', 'তব অন্তর্ধানপটে হেরি তব রূপ চিরন্তন', 'সৃষ্টির শেষ রহস্য—ভালবাসার অমৃত' ও 'শেষ অভিসার'। সারদা দেবী, মিস আনা, মিস কে—, মাদাম ভিক্টোরিয়া ওক্যাম্পো, মৃণালিনী দেবী ও কাদম্বরী দেবী—রবীন্দ্রনাথের জীবনী সম্বন্ধে অনুসন্ধিৎসুর কাছে কেউই অপরিচিতা নন। সাধারণ ভাবে বলতে গেলে 'বিজয়া' ও 'নতুন বৌঠান' যে তাঁর জীবনে কবিত্বশক্তির প্রেরণাদাত্রী রূপে বিশেষ অংশ গ্রহণ করেছিলেন তাও নতুন তথ্য কিছু নয়। তবে অধ্যাপক মহাশয়ের আলোচনায় নতুনত্ব নিশ্চয়ই আছে। প্রকৃতপক্ষে অধ্যায়গুলির নামের মধ্যেই বেশ স্পষ্ট ইঙ্গিত আছে তাঁর বৈশিষ্ট্যের।

প্রথমতঃ রবীন্দ্রনাথের জীবনে তাঁর প্রিয় বান্ধবীদের, বিশেষত নতুন বৌঠানের যে বিশেষ প্রভাব ছিল তার সম্বন্ধে স্পষ্ট আলোচনা এই-ই বোধহয় প্রথম। সেজন্য গ্রন্থকার আমাদের ধন্যবাদার্হ। দ্বিতীয়তঃ তিনি বিশেষ ভাবে প্রয়াস করেছেন আলোচনার ছকের মধ্যে কবির জীবনের সব কয়জন প্রেরণাদাত্রীকে আনতে, এই নিষ্ঠার জন্যেও তিনি আমাদের ধন্যবাদার্হ। তৃতীয়তঃ এটা বেশ স্পষ্ট যে রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে বিশেষ শ্রদ্ধার ভাব নিয়েই তিনি প্রবৃত্ত হয়েছেন এই কাজে; এ বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ করতে হয় এই জন্যে যে, বড়মানুষদের সম্বন্ধে কুৎসা রটানো বা অপরিচ্ছন্ন কৌতূহল প্রবৃত্তি চরিতার্থ করা আমাদের দেশে যে শুধু প্রচলিত নয় লাভজনকও বটে তা কোন কোন সাময়িক পত্রিকার ইতিহাস দেখলেই বোঝা যাবে। চতুর্থতঃ অধ্যায়ের শিরোনামাগুলিই আমাদের ব'লে দেবে যে, প্রতিপদেই গ্রন্থকার চেয়েছেন কবির সাহিত্যজীবনের সঙ্গে সামঞ্জস্য বিধান করতে, এই মূল উদ্দেশ্যটির থেকে তিনি কোন সময়েই বিচ্যুত হন নি। কিন্তু দুঃখের বিষয়—কতকগুলি দিক্ থেকে বিচার ক'রে মনে হয়েছে যে, এই চতুর্বিধ কারণে গ্রন্থটির যা সার্থকতা—ব্যর্থতা তার চাইতে বেশীই। ব্যর্থতার ইঙ্গিতগুলিও বোধহয় এই বিষয়-সন্নিবেশ ও অধ্যায়ের নামকরণের মধ্যেই অনেকটা পাওয়া যাবে। প্রথম যে ত্রুটিটি চোখে পড়ে তা হ'ল শৃঙ্খলাবদ্ধ চিন্তার অভাব। এ ধরণের আলোচনা কালানুক্রমিক হতে পারে অথবা ভাবানুক্রমিক হতে পারে, বিশেষ প্রয়োজনে কোনও কোনও ক্ষেত্রে দুরকমের পদ্ধতিই অবলম্বন করা দরকার হতে পারে; কিন্তু যদি এই ভাবে বার বার এক ব্যাপারে ফিরে আসতে হয় ত আলোচনা হয়ে পড়ে শৃঙ্খলাহীন, মূল বক্তব্য চাপা প'ড়ে যায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তথ্যের তলায়। দ্বিতীয় দোষটি এর ফলও হতে পারে, কারণও হতে পারে—প্রগল্‌ভতা। প্রবন্ধ যদি শিথিলভাবে রচিত হয়, যে জিনিসটা এক কথায় বলা যায় তা যদি দশ কথায় বলা হয় ত সম্ভাবনা থাকে 'রম্যরচনা' তৈরী হবার। রম্যরচনা মানেই যে খারাপ তা নয়। সর্ব্বকালের একজন শ্রেষ্ঠ মনীষীকে নিয়ে রম্যরচনা তৈরী করতে যাওয়া দুঃসাহসিকতার পরিচায়ক সন্দেহ নেই, তবে তাও রমণীয় হয়ে উঠতে পারে। শেলীর জীবনকাহিনী অবলম্বনে 'এরিয়েলের' মতন কাব্যধর্মী সৃষ্টিও সম্ভব। তবে তার জন্যে চাই অসাধারণ রুচি ও ভাষা-ব্যবহারে অসাধারণ দক্ষতা। নিতান্ত পরিতাপের বিষয়, এ দুটি দিক্ থেকে অধ্যাপক মহাশয় পরিপূর্ণ ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথে

জীবন, যাকে হয়ত ধ্রুপদের সঙ্গেই তুলনা করা চলে, তার অধ্যায় বিশেষের বাঙলা গজলের ঢঙে নাম দেওয়া হয়েছে 'নন্দনকাননে' 'পুনর্বসন্ত'!

বাস্তবিক পক্ষে শৃঙ্খলাহীন চিন্তা ও লেখনীর অক্ষম প্রগল্‌ভতার পরিচয় পাওয়া যাবে ভূমিকার থেকেই। সামান্য কথা: সুনয়নী দেবীর দেওয়া একটি ভাষণের অনুলিপি সংগ্রহ করার জন্য অমিতাভ চৌধুরীর কাছে কৃতজ্ঞতা স্বীকার করতে হয়েছে দুবার—একবার ১০ পাতায়, একবার ১৩ পাতায়! আর একটা জায়গা উদ্ধৃত হলে অধ্যাপক মহাশয়ের চিন্তাধারার বৈশিষ্ট্য সহজে বোঝা যাবে:

"কবি মানসী রচনাকালে প্রত্যাশিত ও অপ্রত্যাশিত বহু ক্ষেত্র থেকে উৎসাহ, সাহায্য ও প্রেরণা পেয়েছি। তন্মধ্যে সর্বাগ্রে স্মরণীয় রাজশেখর বসু মহাশয়ের উৎসাহবাণী। 'শনিবারের চিঠি'তে 'কবি মানসীর' দশম অধ্যায়ের প্রথম কিস্তি প্রকাশিত হবার পর তাঁর কাছ থেকে সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিতভাবে নিম্নোদ্ধৃত পত্রখানি আমি পাই:

৭২, বকুলবাগান রোড;
কলিকাতা-২৫
২৭।১০।৫৮

প্রীতিভাজনেষু

আপনার চিঠি পেয়ে সুখী হলাম। আমার বিজয়ার নমস্কার জানবেন।

আপনার লেখা রবীন্দ্রচরিতকথা চমৎকার লাগছে।

আপনার
রাজশেখর বসু [১১ পাতা]

রাজশেখর বসুকে তিনি একটি পত্র দিয়েছিলেন। তার উত্তরে একটি এই ধরণের চিঠি তিনি প্রত্যাশা করেন নি? সাধারণতঃ কিন্তু এরকম প্রত্যাশা খুব অস্বাভাবিক কিছু ব'লে মনে হয় না। ভূমিকার প্রায় সুরুতেই বলা হয়েছে—"গ্রন্থের প্রতিপাদ্য প্রথম অধ্যায়ে বিবৃত হয়েছে। সুতরাং এখানে তার পুনরুল্লেখ বাহুল্য মাত্র।" অথচ সেই বাহুল্য তিনি বর্জন করতে পারেন নি—সেই পৃষ্ঠাতেই সুরু করেছেন প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে মতদ্বৈধের কথা—কবিজীবনে কাদম্বরী দেবীর স্থান নির্ণয়ের বিষয়ে। তা নয় বললেন, সেটা তাঁর অধ্যাপকসুলভ প্রগল্‌ভতার লক্ষণ, কিন্তু তিনি কি বলতে চাইছেন যখন লিখছেন—"রবীন্দ্র-জীবনের নবাবিষ্কৃত তথ্যরাজির আলোকে কাদম্বরী দেবীর মৃত্যুই যে কবিজীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা এ সত্য আজ দিবালোকের মতই স্বচ্ছ হয়ে উঠেছে।" [৯ পাতা] কোন্ তথ্য আজ হঠাৎ আবিষ্কৃত হ'ল বলে দিলে তাঁর বক্তব্যটি স্পষ্ট হ'ত।

১০ পৃষ্ঠায় লেখক তাঁর অন্য একটি বই থেকে কিছুটা তুলে দিয়েছেন—"রবীন্দ্রনাথ বাঙালীজীবনে সূর্যমণ্ডলের অগ্নিবিহঙ্গ রূপেই বিরাজমান। মর্ত্যলোকে অদিতি বংশের চিরশুদ্ধ এই অগ্নিশিশুর মর্মকোষে ইসগুপ্ত সুধাহ সন্ধানে অগ্রসর হওয়ার পূর্বে সামাজিকের চেতনাকে কলুষিত কামসংস্কার থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত ও পরিশুদ্ধ করেই এ পথে অগ্রসর হতে হবে।" তিনি হয়ত ভেবেছেন এই শব্দকয়টির সাহায্যে আমাদের উপলব্ধিকে একটা গভীর-তর পর্য্যায়ে নিয়ে গেলেন। কিন্তু তাঁর উদ্দেশ্য মহৎ হলেও মনে হচ্ছে তিনি নিজেই ঠিক বুঝতে পারেন নি তিনি কি বলেছেন বা বলতে চেয়েছেন। 'কলুষিত কাম-সংস্কার'টি কি বস্তু? রবীন্দ্রনাথ একজন মানুষই ছিলেন, মানুষের সব ক্রিয়া ও প্রবৃত্তিই তাঁর নিশ্চয়ই ছিল। তাঁর ব্যক্তিগত প্রবণতাগুলির খুব বিস্তৃত আলোচনার প্রয়োজন আছে কিনা জানি না, তবে যদি কোনও নিষ্ঠাবান্ গবেষক মনে করেন যে তার প্রয়োজন আছে, তবে আশা করি তিনি প্রথমে মুক্ত হবার চেষ্টা করবেন এই রকম অস্পষ্ট চিন্তা ও অস্পষ্ট ভাব প্রকাশের অভ্যাস থেকে। তা ছাড়া রবীন্দ্রনাথের পরিচয় যদি তিনি নিতান্তই দিতে চান "অগ্নিশিশু" কিম্বা "অগ্নিবিহঙ্গ" ইত্যাদি নামকরণের মধ্যে দিয়ে, তবে তাঁর বুঝতে পারা উচিত যে, আগুনের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের আত্মীয়তার কারণই এই যে তাঁর সাহিত্যজীবনের বৈশিষ্ট্যই ছিল তেজ, বাহ্যিক অলঙ্কার অতিক্রম ক'রে মূল সত্যের প্রতি নিষ্ঠা ও সহজ প্রকাশ। অথচ জগদীশচন্দ্র ভট্টাচার্য্যের চিন্তা ও ভাষা রবীন্দ্রনাথের সেই আদর্শের সম্পূর্ণ বিপরীত দিকে চ'লে গিয়েছে। তাঁর অলঙ্কারাকীর্ণ ভাষা ইংরাজী বাঙলা কোটেশনের সিঁড়ি বেয়ে উঠতে গিয়ে মূল বক্তব্যটিকেই হারিয়ে ফেলেছে।

'যে-আমি স্বপন-মূরতি গোপনচারী' শীর্ষক প্রথম অধ্যায়টির সুরু হয়েছে কার্লাইল থেকে ষোল পংক্তিদীর্ঘ একটি উদ্ধৃতি দিয়ে। তার পরে গ্রন্থকার বলেছেন—"কার্লাইল যে সত্তাকে Hero Soul বলেছেন, আমি তাকেই বলেছি 'সূর্য্যমণ্ডলের অগ্নিবিহঙ্গ'। রবীন্দ্রনাথ বাঙালীজীবনে সেই Hero soul, সেই অগ্নিবিহঙ্গ।" [৩ পাতা]। তিনি বলুন তাই, কিংবা বলুন 'x' কিংবা 'y'—কিন্তু তাঁর প্রতিপাদ্য বিষয় কি? রবীন্দ্রপ্রতিভার আবির্ভাব কাব্যের ক্ষেত্রে এবং জাতীয় সংস্কৃতির অন্যান্য

বহু ক্ষেত্রে একটা মস্ত বড় ঘটনা এটা ত নতুন ক'রে বলবার কিছু নয়—যদি না সত্যিই 'নতুন ক রে' তা বলতে পারি! যত দূর বোঝা যায় তাঁর বক্তব্য নিহিত আছে এই কয়টি উক্তিতে: প্রথম—"আত্মকথা বলতে গিয়ে কবিমানসে কেন এই দ্বিধা—এ প্রশ্নের উত্তর রবীন্দ্রজীবন জিজ্ঞাসুকে অবশ্যই পেতে হবে।" [৪ পাতা] দ্বিতীয়—"এই 'স্বপনমুরতি গোপনচারী' সত্তাকে তাঁর বাণীপ্রকাশের মধ্যে আবিষ্কার করাই কবি-জীবনের মুখ্য কৃত্য।" [৫ পাতা]। তৃতীয়—"আমরা মনে করি, জীবনদেবতাতত্ত্ব এবং প্রেমতত্ত্ব কবিজীবনে একই তত্ত্বের দুটি নাম।" [১৮ পাতা]—কৌতূহলী পাঠক যদি বইটির প্রথম পাঁচশটি পাতা কষ্ট ক'রে প'ড়ে দেখেন ত বুঝতে পারবেন কতটা প্রয়াস করতে হয় এই বক্তব্য তিনটি উদ্ধার করতে। শুধু তাই নয়, এ ছাড়া 'ক্রবাদুর' আদর্শ, শেলীর 'ন্যাচারাল প্লেটোনিজম্', দান্তে ও পেত্রার্কার প্রেম, বৈষ্ণব প্রেম ইত্যাদি সব নিয়ে একটা গোলামঘণ্ট আলোচনা করা হয়েছে সাড়ে পাঁচ পাতা ধ'রে যার সার বস্তু সংগ্রহ করা প্রায় অসম্ভব। অথচ সহজ ভাষায় বলতে গেলে গ্রন্থকারের উদ্দেশ্য হ'ল প্রধানত: রবীন্দ্রনাথের রচনাবলীর মধ্যে থেকেই তাঁর জীবনে প্রেম ও কবিপ্রতিভার বিকাশ ও পরিণতির ইতিহাসের সন্ধান পাওয়া। এটা যদি সহজ ভাষায়, সংক্ষিপ্ত ভাবে বলা হ'ত ত কি বক্তব্যের মর্য্যাদাই আরও বাড়ত না? বাস্তবিক পক্ষে এই কিঞ্চিদধিক পাঁচশ পাতার বইটিকে মূল বক্তব্য অনুসারে সাজিয়ে বসালে বিশ পাতার একটি প্রবন্ধ হতে পারে তা হলে ক্ষতি ত হয়ই না, হয়ত লেখকের বক্তব্যটাই স্পষ্টতর হয়, আরও জোরালো হয়। কিন্তু গ্রন্থকারের হয়ত প্রকৃত উদ্দেশ্যই নয় শৃঙ্খলাবদ্ধ ভাবে সংযত আলোচনা করা। রম্য রচনার বরাতে হাততালি জোটে অনেক সহজে।

কোনও কোনও অধ্যাপক আছেন, কথা বলতে গিয়ে থামতে পারেন না, নিজের বলাকে নিজেরই এত ভালো লাগে যে ঘণ্টা প'ড়ে গেলেও ব'কে চলেন—অথচ তাতে তাঁদের ছাত্ররা যে বেশী কিছু শেখে তাও নয়। বইটিতে এই বেশী বলায় একটি মস্ত কুফল হয়েছে ভুল বলা—তথ্যের ভুল তবুও সহ্য করা যায়, কবিপ্রতিভা নিয়ে আলোচনায় প্রবৃত্ত হয়ে রসজ্ঞানহীনতার পরিচয় দেওয়া সহ্য করা শক্ত। রবীন্দ্রনাথের লেখা তাঁর নিজের বিবাহের নিমন্ত্রণ পত্রটি তুলে দেওয়া হয়েছে, তারপর অধ্যাপক মহাশয় বলছেন: "চিঠির ভাব ও ভাষাটি লক্ষ্য করবার মত। রবীন্দ্রনাথ নিজের বিবাহের নিমন্ত্রণ নিজেই করে লিখছেন, 'আমার পরমাত্মীয় শ্রীমান্ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শুভবিবাহ।' কবি যেন নিজেকে দ্বিধা বিভক্ত করে দুই—'আমি'তে রূপান্তরিত হয়েছেন।" ২২৯পাতা আমাদের কি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা উচিত গ্রন্থকারে কাছে, এই ব্যাখ্যা ক'রে দেওয়ার জন্যে—না, এই সব তথ্যের প্রতিই তিনি ইঙ্গিত করেছেন যখন বলেছেন রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে নব-আবিষ্কৃত তথ্যাবলীর কথা? আর এক জায়গায় মৃণালিনী দেবীকে লেখা রবীন্দ্রনাথের একটি চিঠির উল্লেখ ক'রে লেখক বলছেন: "রসিকতাটি উপাদেয় সন্দেহ নেই; কিন্তু সমস্ত গোয়ালার ঘর মন্থন ক'রে উৎকৃষ্ট মাখনমারা ঘের্ত পত্নীর 'দেবার জন্যে' কবি নিয়মিত পাঠাচ্ছেন- এ দৃশ্যটি যেমন হৃদ্য তেমনি উপভোগ্য।" [২৫০ পাতা] ভগবানকে ধন্যবাদ যে রবীন্দ্রনাথের কোনও ধোপার খাতা এই সব গবেষকের হাতে পড়ে নি, তাহলে হয়ত তার থেকেও কত কিছু তত্ত্ব এঁরা খুঁজে বার করতেন! প্রকৃতপক্ষে বিজয়া, 'কবির অন্তরে তুমি কবি' প্রভৃতি কয়েকটি পরিচ্ছেদে অত্যুক্তি ও আতিশয্য বাদ দিলে কবিতা, ডায়েরী ও অন্যান্য লেখার মধ্যে সামঞ্জস্য বিধানের চেষ্টার সাহায্যে লেখক তাঁর মূল প্রতিপাদ্য বিষয়টিকে খানিকদুর পর্য্যন্ত বোঝাতে পেরেছেন। কিন্তু মোটের উপরে প্রগল্‌ভতা ও রুচিহীনতায় তাঁর চিন্তা ও লেখনী এমনভাবে ভারাক্রান্ত যে বলবার নয়।

উদাহরণ পেতে গেলে হাতড়াতে হয় না। প্রায় সব পাতাতেই প্রমাণ পাওয়া যাবে লেখকের লেখনীর দুর্বলতার:

"কী বেদনা মোর সে কি তুমি জান,
ওগো মিতা মোর, অনেক দূরের মিতা।

কিন্তু 'অনেক দূরের মিতা'কে একান্ত করে কাছে পাওয়ার সাধনাতেও ত তিনি আজ সিদ্ধিলাভ করেছেন! তা ছাড়া এ উপলব্ধিও তাঁর হয়েছে যে, তাঁর জন্যে যে বেদনা, একমাত্র তাঁকে পেলেই সে বেদনার অবসান হতে পারে। নির্ঝরিণীর প্রসাদ না পেলে মরুপ্রান্তের তৃষ্ণাও যে আর কিছুতেই নিবৃত্ত হবার নয়। তাই ত তিনি 'মরুতীর হতে সুধাশ্যামলিম পারে' অন্তবিহীন পথ পেরিয়ে এসেছেন। ঝড়ের অন্ধকারে পথহারা কুলায় প্রত্যাশী পাখির মত জীবনের শেষ আশ্রয় চাইছেন তাঁরই বাতায়নে।" [৩৯২ পাতা] রবীন্দ্রনাথের মতন মানুষকে তাঁরই কবিতা ভেঙে ইট সংগ্রহ ক'রে এ রকম আক্রমণ অধ্যাপক মহাশয়ের ছাত্ররাও বোধহয় বাৎসরিক পরীক্ষার খাতায় করতে সাহস করত না। শুধু কবিতা কেন? রবীন্দ্রনাথের অন্য রচনাও গ্রন্থকারের অপূর্ব্ব বিশ্লেষণী (?) ক্ষমতার থেকে পরিত্রাণ পায় নি:

"স্বভাবতই প্রিয়াকে লেখা তাঁর তরুণ দাম্পত্য-জীবনের প্রথমার্ধের প্রেমপত্রগুলি কেমন ছিল তা জানবার কৌতূহল চিরদিনই পাঠকের চিত্তে অতৃপ্ত থাকবে। দ্বিতীয়ার্ধের যে পত্রগুচ্ছ আমাদের হাতে এসে পৌঁছেছে সেগুলি বেশীর ভাগই ভার্য্যার কাছে ভর্তার লেখা বৈষয়িক পত্র। কবিচিত্তের পরিচয় তাতে প্রায় নেই। আদরসূচক আবেগগর্ভ উক্তিগুলিও সম্পাদকের স্থূল হস্তাবলেপে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। কেবল সম্বোধনের ক্ষেত্রে 'ভাই ছোট বউ' শেষ পর্য্যন্ত 'ভাই ছুটি'তে পরিণত হয়ে কবিকণ্ঠের সম্বোধন সংগীতকে যেন দুটি অক্ষরের ধ্বনিমন্ত্রে অবিনশ্বর করে রেখে গেছে।" [২২৪ পাতা] সম্পাদকের স্থূল হস্তের বিরুদ্ধে গ্রন্থকারের সূক্ষ্ম রুচির (!) এই জোরালো প্রকাশ দেখে মনে হচ্ছে দুই অক্ষরের আরও শব্দ আমাদের ভাষায় আছে—ঠিক মত প্রকাশ করতে পারলে তাও অবিনশ্বর হয়ে থাকত গ্রন্থকারের কাছে। আর তা ছাড়া এই সব অকারণ কৌতূহলের পাল্লায় প'ড়ে গ্রন্থকারের তথ্যানুসন্ধান-ক্ষমতাও কি রকম লোপ পেয়েছে তাও দেখবার মতন: "শ্রীপ্রশান্তচন্দ্র মহলানবীশ মহাশয় দীর্ঘ দিন বিশ্বভারতীর প্রকাশ বিভাগের সম্পাদক রূপে কবির ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্য লাভ করেছিলেন।" আমরা কি গ্রন্থকারকে এজন্যেও একবার ধন্যবাদ জানাব যে, প্রশান্তচন্দ্রের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের নিকট সম্পর্কের প্রকৃত কারণটি তিনি খুঁজে বার করেছেন? কি তথ্যানুসন্ধান-ক্ষমতায়, কি ভাবপ্রকাশে জগদীশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য রবীন্দ্রনাথের অন্তরঙ্গ জীবন আলোচনা করবার যোগ্যতা প্রমাণ করতে পারেন নি।

বস্তুতঃ কবির মনের প্রক্রিয়া অন্য মানুষের চাইতে কিছুটা স্বতন্ত্র ব'লেই তিনি কবি। ফলে একদিক্ থেকে যেমন তাঁর জীবনকে দেখতে হয় অন্য মানুষের মতন পদচারীর দৃষ্টি কোণ থেকে, আবার সেই পদচারী জীবনের অভিজ্ঞতার থেকে পল্লবিত হয়ে ওঠা কবিসত্তাকে দেখতে হয় উন্নততর কোনও মার্গে বিচরণকারীর দৃষ্টিকোণ থেকে। পদচারীর দৃষ্টিভঙ্গীতে তাঁকে দেখতে সাহস লাগে—কারণ আমরা কবিকে (বিশেষতঃ মহাকবিকে) —অতিমানুষ ব'লে ভাবতে অভ্যস্ত। আবার নিছক সৃজনীশক্তিশীল 'কবি' রূপে তাঁকে দেখতে হলে নিজেকেও অনেকটা উপরে উঠতে হয় দৈনন্দিনতার থেকে। সে ক্ষেত্রে চাই তীব্র, তীক্ষ্ণ অনুভূতি। রবীন্দ্রনাথের জীবনে খুব সম্ভবতঃ স্ত্রী ব্যতীত অন্য মহিলার প্রেমের স্পর্শ লেগেছিল—তাঁর মতন দ্যুতিশীল মানুষের পক্ষে সেটা কিছু অস্বাভাবিক নয়। তাঁর নতুন বৌঠান যে তাঁর প্রেরণাদাত্রী ছিলেন তাতেও সন্দেহ নেই। তবে এটাও ঠিক হবে না যদি তাঁর সব সৃষ্টির মধ্যে এই রকম একটা মানে খুঁজতে যাই। আলোচ্য বইটা পড়ে মোটের উপরে খারাপ লেগেছে অসংযত এবং অকরুণ প্রগল্ভতার জন্যে। তবে তা বাদ দিলে বক্তব্য যেটুকু থাকে তার সম্বন্ধে লেখককে অনুরোধ করব যে, তিনি রবীন্দ্রনাথ আবার পড়ুন। সম্প্রতিকালে কোনও কোনও বিদেশী অনুগ্রহলোভী সাহিত্যসেবী রবীন্দ্রনাথের প্রেরণার উৎস খুঁজে পেয়েছেন বিদেশী লেখকদের লেখার মধ্যে। কোনও একজন ব্যবসাবুদ্ধি-সম্পন্ন লেখক সস্তায় কিস্তি-মাৎ করছেন রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে পাঁচালী গেয়ে। অতীতে রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে ঘোরতর মার্ক্সীয় পদ্ধতিতে বিশ্লেষণ হয়েছে মনে আছে। এখন কি তাহলে সুরু হ'ল রবীন্দ্রনাথের এই জন নেশান ফ্রয়েডীয় পদ্ধতিতে ব্যবচ্ছেদ?

আলোচ্য বইটিতেই দেখছি রবীন্দ্রনাথের শেষজীবনের রচনাগুলির থেকে খুঁজে বার করা হয়েছে 'উদ্দীপন' চিত্রগুলি। এও শুনছি যে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে ভগিনী নিবেদিতা ও স্বামী বিবেকানন্দের ত্রিকোণ সম্পর্ক নিয়ে গবেষণা চলছে। এ সব দিয়ে এক শ্রেণীর শ্রোতা ও পাঠককে হয়ত একটি বিশেষ ধরণের আনন্দ দেওয়া যাবে কিন্তু গ্রন্থকারের শুভবুদ্ধির কাছে আবেদন এই যে তিনি যেন এই প্রচেষ্টা থেকে বিরত থাকেন।

প্রাচীন চন্দ্রকেতুগড়ের মৃন্ময় শিল্প

শ্রীপরেশচন্দ্র দাশগুপ্ত

চন্দ্রকেতুগড়ে আবিষ্কৃত পোড়ামাটির শিল্পনিদর্শনসমূহে অন্যান্য নানা দেব-দেবীকেও দেখা যায়। ছাঁচ-নির্ম্মিত এই মৃন্ময় আলেখ্যসমূহের একটি সংক্ষিপ্ত তালিকা নিম্নে দেওয়া হ'ল।

১। এই ফলকটিতে দেখা যায়, একটি দেবমূর্ত্তি নর-বাহনের উপর উপবিষ্ট। দেবতার দুই পা নীচের মূর্ত্তির দুই কাঁধ দিয়ে দোলান এবং তাঁর অঙ্গ-দেহে কুণ্ডল, কণ্ঠহার ও কেয়ূর এবং মাথায় শিরস্ত্রক অথবা পাগড়ি। ব্রাহ্মণ্য প্রতিমা-শিল্পে দু'জন দেবতার মানব বাহন আছে, একজন কুবের, অন্যজন নিঋৃতি। এঁদের মধ্যে দ্বিতীয় জনের সঙ্গেই বর্ত্তমান মূর্ত্তির সৌসাদৃশ্য বেশী। ঋগ্বেদে নিঋৃতির উল্লেখ আছে। খুব সম্ভবতঃ বর্ত্তমান ফলকটি খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয়-তৃতীয় শতাব্দীতে নির্ম্মিত হয়েছিল।

২। এই ভগ্ন ফলকাংশটি কোমলতাব্যঞ্জক অথচ ঋজুতাপূর্ণ শিল্প-ভঙ্গির পরিচায়ক। নিম্নে শায়িত এক বিকৃতমুখ ও নর্শাফলকের ন্যায় গুচ্ছ গুচ্ছ কেশবিশিষ্ট অসুর এবং তার গলা ও চিবুকের উপর স্থাপিত এক নারীর পুষ্প-পত্রের ন্যায় লীলায়িত চরণ। এই আলেখ্যটিকে বিনা-দ্বিধায় দেবী দুর্গার মহিষাসুর বধের চিত্র হিসাবে ধরা যায়। অপরপক্ষে মূর্ত্তির বিলীয়মান দ্বিপরিসরতা, অনুপম রেখামাধুর্য্য, দেহের কমনীয় অথচ দৃঢ় ভঙ্গি এবং অসুরের লেলিহান অগ্নিশিখাবৎ (flamboyant) গুচ্ছ গুচ্ছ কেশ-সমষ্টি মনে হয় খ্রীষ্টীয় তৃতীয় শতাব্দীর শিল্প-শৈলীকে প্রতিফলিত করে।

৩। ভগ্ন ফলকে রূপায়িত ময়ূরের পালকযুক্ত শিরো-ভূষণ শোভিত দিব্য পুরুষ এবং পাশে দীর্ঘকণ্ঠ শিখী। মূর্ত্তিটি দেব-সেনাপতি কার্ত্তিকেয়র ধ্যানকে স্মরণ করিয়ে দেয়। মূর্ত্তির দ্বিপরিসরতা সত্ত্বেও সামান্য স্ফীতভাব এবং স্বচ্ছন্দ রূপায়ণ সম্ভবতঃ খ্রীষ্টীয় প্রথম শতাব্দীর নির্দ্দেশক।

৪। মৃদু হাস্যরত কিশোর কর্ত্তৃক নাড়ু-ভক্ষণ দৃশ্য (আনুমানিক খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দী)। দুর্ভাগ্যক্রমে ফলকটি সম্পূর্ণভাবে পাওয়া যায় নি। কিশোরের কান্তি-দেহ মাধুর্য্যপূর্ণ এবং তাঁর সুন্দর শিরস্ত্রকের নীচে তাঁর হাস্যরত আনন এক চাপল্যপূর্ণ ও সুমধুর চৌর্য্যবৃত্তির আভাস দেয়। খুব সম্ভবতঃ এইখানে ননী-চোর কৃষ্ণের দৃশ্যটি রূপায়িত হয়েছে। ইতিপূর্ব্বে উত্তর প্রদেশের অহিচ্ছত্রায় কৃষ্ণ-উপাখ্যানের বিভিন্ন মৃন্ময়-আলেখ্য আবিষ্কৃত হয়েছে।

৫। সিংহাসনে উপবিষ্ট রাজমূর্ত্তি ও তাঁর পদতলে বানর। আনুমানিক খ্রীষ্টীয় প্রথম শতাব্দী। ফলকটির ডানদিক্ ভাঙা ব'লে সবটা বোঝা যায় না। নৃপতির দক্ষিণ হস্তে এক ক্ষুদ্র দণ্ড দেখা যায়, যাহা কখনও রাজ-দণ্ড ব'লে মনে হয়। এই আলেখ্যটি শ্রীরামচন্দ্রের রাজ্যাভিষেকের দৃশ্যমূলক হ'তে পারে। সেই ক্ষেত্রে পদতলের বানরটি নিশ্চয়ই রামভক্ত মারুতিমূর্ত্তি। অবশ্য বর্ত্তমান চিত্রটি "গরহিত জাতক" থেকেও গৃহীত হতে পারে।[১]

এই জাতককাহিনীতে বর্ণিত আছে যে, পুরাকালে ভগবান্ বুদ্ধ তাঁর বোধিসত্ত্ব জন্ম-চক্রে একদা হিমালয় পর্ব্বতে এক মর্কটরূপে জন্ম পরিগ্রহ করেন এবং পরে ব্যাধগণ কর্ত্তৃক ধৃত হয়ে ঘটনাচক্রে কাশীর নৃপতি ব্রহ্মদত্তের এতই প্রীতিভোজন হন যে, তাঁর আদেশে মুক্তিপ্রাপ্ত হন। বোধিসত্ত্ব প্রত্যাবর্ত্তন করলে তাঁর সঙ্গে তাঁর নিজ-দলীয় অন্যান্য বানরগণের যে কথোপকথন হয় তার কিয়দংশ নিম্নে উদ্ধৃত করা হ'ল:

বানরগণ: মহাশয় আপনি এতদিন কোথায় ছিলেন?

বোধিসত্ত্ব: বারাণসীর রাজপুরীতে।

বানরগণ: তবে আপনি কিরূপে মুক্তিপ্রাপ্ত হলেন?

বোধিসত্ত্ব: রাজা আমাকে আদর করতেন এবং আমার নানারূপ ক্রীড়া দেখে সন্তুষ্ট হওয়ায় তিনি আমাকে মুক্তি দেন।

এই গল্পটিতে রাজসমীপে পোষা বানরের খেলা দেখাবার প্রসঙ্গ আছে, যা' সহজেই আমাদের স্মৃতি-পটে উদিত করে সুপ্রাচীন ব্যাবিলন্ ও অ্যাসিরিয়ার কৌতুক-লোভী নৃপতিগণের কথা।

৬। অশ্বারোহী মূর্ত্তিসমন্বিত গোলাকৃতি মৃন্ময়-

১। কাউস্কেল সম্পাদিত জাতক।

ফলক। আনুমানিক খ্রীষ্টীয়প্রথম-দ্বিতীয় শতাব্দী। অশ্বারোহীর আকৃতিতে কখনও বীরোচিত ভাব এবং কখনও এক সৌম্য ও রহস্যময় গাম্ভীর্য্যের প্রকাশ দেখা যায়। কোন সময় যেমন তাঁর উত্থিত হস্তের কশা তাঁর বেগবান অশ্বের গতিকে তীব্রতর করতে প্রচেষ্টিত, তেমনি এক ক্ষেত্রে দীর্ঘ-গ্রীবাবিশিষ্ট অশ্বটি যেন রাজকীয় মর্য্যাদায় ধীর-গতিতে ধাবমান এবং তার আরোহী ঋজুভঙ্গিতে কট্যা-বলম্বিত হস্তে উপবিষ্ট; তাঁর সমগ্র আকৃতিতে পরম আত্মবিশ্বাস এবং দিব্যভাবের অভিব্যক্তি। শেষোক্ত ঘোড়সওয়ারের মূর্ত্তিটির আবেগহীন সম্ভ্রান্ত গাম্ভীর্য্য পূর্ব্বেকার নির্ভীক রেড্‌-ইণ্ডিয়ান অশ্বারোহী সেনানায়ক-গণের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। মনে হয়, এই মূর্ত্তিগুলি সূর্য্যদেব অথবা তাঁর পুত্র বুদ্ধদেবতা দেবন্তের মূর্ত্তি।

আশ্বারূঢ় রাজ-দম্পতী, পোড়ামাটী চন্দ্রকেতুগড়।
আনুমানিক খ্রীষ্টীয় ২য় শতাব্দী

পালযুগে বাঙালী যোদ্ধাদের নিকট রেবন্ত অতি প্রিয় দেবতা ছিলেন।২

৭। রাজকীয় ছত্রের নীচে নারীমুখ-শোভিত ভগ্ন ভাস্কর্য্য চিত্র। আনুমানিক খ্রীঃ পূঃ প্রথম শতাব্দী। ছত্রটির আকৃতি জটিল ও সুন্দর এবং তার নিম্ন সীমা-রেখায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অসংখ্য ঘণ্টা ঝোলান। নারী-মূর্ত্তির বিচিত্র খোঁপায় পূর্ব্ব-পরিচিত বিভিন্ন অস্ত্রাকৃতি পাঁচটি কাঁটা শোভিত। মূর্ত্তিটি কোন সম্রাজ্ঞী অথবা কোন দেবীর প্রতিমূর্ত্তি হওয়া বিচিত্র নয়। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, মহাদেব "ছত্রেশ্বর" নামেও পরিচিত এবং পালযুগের কোন কোন পার্ব্বতীমূর্ত্তি ছত্রতলে শোভিতা।

৮। নৃত্য-ভঙ্গিমায় ভগ্ন নারীমূর্ত্তি। আনুমানিক খ্রীঃ পূঃ প্রথম শতাব্দী। মূর্ত্তির সুগঠিত পদদ্বয় প্রায় স্বচ্ছ কটিবাসকে ছাপিয়ে উঠেছে। এই কারুকার্য্যখচিত ও রত্নমণ্ডিত ক্ষুদ্র কলস মেখলার সঙ্গে আবদ্ধ এবং জানু-দ্বয়ের মধ্যস্থলে দোদুল্যমান। আশ্চর্য্যের বিষয়, এই ধরণের ক্ষুদ্র কলস গান্ধার শিল্পে মৈত্রেয় বুদ্ধের হাতে দেখা যায়। বৌদ্ধ শিল্প-বিশেষজ্ঞ পুরাতাত্ত্বিক ফুশারের মতে এই ছোট কলসটি এক ধরণের কমণ্ডলু।৩ সম্ভবতঃ এইটি পবিত্র জলাধার হিসাবে ব্যবহৃত হ'ত এবং ধর্ম্ম-কর্ম্মের সঙ্গে এর সম্পর্ক ছিল। সুবিখ্যাত প্রত্ন-তাত্ত্বিক ননীগোপাল মজুমদার দেখিয়েছেন যে, এই ধরণের কারুকার্য্যমণ্ডিত ক্ষীণ-কণ্ঠ জলাধারের সঙ্গে দুই হাজার বৎসর পূর্ব্বেকার দক্ষিণ-রুশ অঞ্চল ও সার্-

২। N. K. Bhattasali: *Iconography of Buddhist and Brahmanical Sculptures in the Dacca Museum*, Dacca, 1929; pp. 174-77 Plate LXII(a).

৩। *L' Art Greco—bouddhique du Gandhara*; tome II. Part I, pp. 218, 234.

মৃৎফলকে অশ্বমূর্ত্তি চন্দ্রকেতু গড়। খৃঃ পূঃ ১ম শতাব্দী

চন্দ্রকেতুগড়ে আবিষ্কৃত অন্যান্য বিভিন্ন পোড়ামাটির ফলকে নানা জীবজন্তুর প্রতিরূপ দেখা যায়। এইগুলির তালিকা নিম্নে দেওয়া হ'ল এবং তারা যেসব দেবতার বাহন অথবা ইঙ্গিতমূলক রূপ হ'তে পারে তাদের নামও এইখানে সংযোজিত হ'ল।

১। হস্তীমূর্ত্তি—ইন্দ্রদেব।

২। বৃষমূর্ত্তি—মহাদেব।

৩। অশ্বমূর্ত্তি—সূর্য্যদেব।

কোন কোন ক্ষেত্রে গৌতমের মহাভিনিষ্ক্রমণের অশ্ব কন্থক'ও হ'তে পারে।
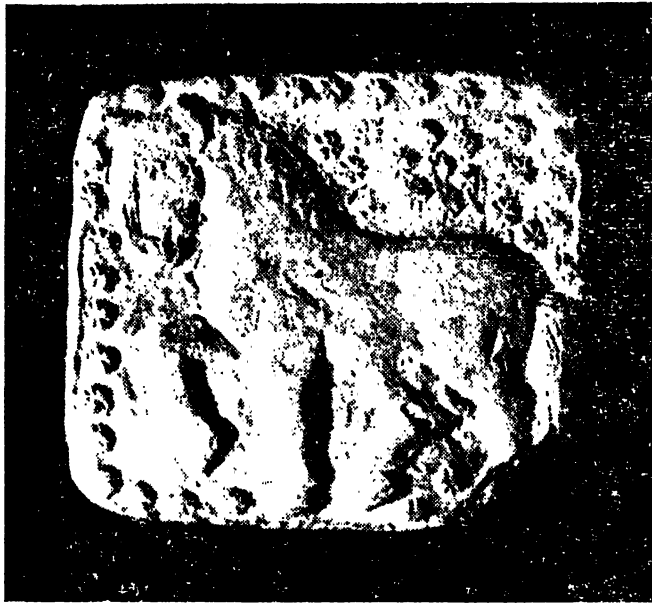
মাশিয়ার রত্নখচিত কলসের যথেষ্ট সাদৃশ্য বিদ্যমান। ননীগোপাল মজুমদারের মতে:

"The narrow-mouthed vessel of Maitreya is probably a receptacle of holy water or one used for ceremonial purposes. Similar vessels with studded gems are curiously enough known from the scythian art of South Russia and have been found in the Sarmatian graves (1st-2nd centuries A.D.)."

এখন চন্দ্রকেতুগড়ের তথাকথিত এই অপ্সরামূর্ত্তির সঙ্গে মৈত্রেয় বুদ্ধের স্মারক-চিহ্ন থাকা কিছুটা কৌতূহলপ্রদ। "আর্য্য মৈত্রেয় ব্যাকরণে" বর্ণিত আছে যে, ভবিষ্যতে বারাণসী কেতুমতী নামে প্রসিদ্ধি লাভ করবে এবং রাজা শঙ্খ চক্রবর্ত্তী হবেন ও নারীরত্ন বিশাখা চতুরষ্ট সহস্র নারীর সঙ্গে বৈরাগ্য অবলম্বন ক'রে মৈত্রেয় বুদ্ধের শরণাপন্ন হবেন।

"স্ত্রীরত্নম্ অথ শঙ্খস্য বিশাখা নাম বিশ্রুতা।
অশীতির্ভিশ্চতুরভিশ্চ সহস্রৈঃই সংপুরস্কৃতা॥"

(প্রভাসচন্দ্র মজুমদার সম্পাদিত "আর্য্য-মৈত্রেয় ব্যাকরণ", কলিকাতা, ইং ১৯৫৯, পৃঃ ২০।)

৯। বীণা হস্তে নারীমূর্ত্তি। এই মূর্ত্তিটি একদিকে যেমন সুর-সুন্দরী হ'তে পারে, অপরপক্ষে তেমনি এখানে জ্ঞান ও সঙ্গীত-সাধনার অধিষ্ঠাত্রী দেবী সরস্বতীর প্রাচীন রূপ কল্পনা থাকা সম্ভব।

৪। বানরমূর্ত্তি—হনুমান। মহাকপিজাতক অথবা গরহিত জাতকের বোধিসত্ত্ব মূর্ত্তি হওয়াও অসম্ভব নয়।

৫। গণ্ডারমূর্ত্তি—।

৬। বরাহমূর্ত্তি—এই মূর্ত্তির সঙ্গে ভগবান্ বিষ্ণুর বরাহ-অবতারের সম্পর্ক থাকা অসম্ভব নয়। অবশ্য এই ক্ষেত্রে স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে একটি জাতক-কাহিনীতে বোধিসত্ত্বকে বরাহরূপে জন্মগ্রহণ করতে দেখা যায়।

৭। কাঠবিড়ালী

৮। ময়ূর—কার্ত্তিকেয়র বাহন। অবশ্য 'মোর-জাতকে" (নং ১৫৯) বোধিসত্ত্বকে এক সুবর্ণ ময়ূর রূপে দেখা যায়। দণ্ডকারণ্যে সুবর্ণ গিরিচূড়ায় তিনি প্রত্যহ উষাকালে ও প্রদোষে সূর্য্যস্তুতি করতেন। মোহেঞ্জো-দাড়োর চিত্রিত মৃৎপাত্রেও স্বর্গীয় ময়ূরকে উড্ডীন অবস্থায় দেখা যায়।

৯। ভেকমূর্ত্তি—বৈদিক সাহিত্যে বর্ণিত বৃষ্টির দেবতা পর্য্যন্যের বাহন।

শুঙ্গ ও কুষাণ কালের বিভিন্ন মৃৎপ্রদীপ এবং ভগ্ন ফলকে অন্যান্য নানা বাস্তব ও কল্পিত জীবমূর্ত্তি দেখা যায়, যথা—

১। পক্ষবিশিষ্ট অশ্বমূর্ত্তি (Hippogryph)।

২। পক্ষবিশিষ্ট সিংহ (Griffin)।

৩। পদ্মপূর্ণ হ্রদে বিচরণশীল হংস।

৪। সাগর-অশ্ব (Sea-horse)।

ইত্যাদি।

শুঙ্গ-কুষাণ যুগের নানা পাষাণ আলেখ্যতেও এই ধরণের এবং অন্যান্য কল্পিত মূর্ত্তি দেখা যায়। এইগুলি নিশ্চিতভাবে পশ্চিম এশিয়া এবং ভূমধ্যসাগরীয় শিল্পের প্রতি ইঙ্গিত করে। বিভিন্ন মৃন্ময় ফলকের মণ্ডন-শিল্পে প্রদর্শিত চক্রাকার ও লম্বা পুঁতির সমাবেশ (Bead-and-reel) এবং সুরভি পুষ্পের (Honey-suckle) চিহ্নও এক বিস্মৃত সাংস্কৃতিক যোগাযোগের আভাস দেয় যেমন ভাবে সম্রাট অশোকের লিপি খোদিত স্তম্ভসমূহে শীর্ষস্থানে রূপায়িত এই চিহ্নগুলি এই একই বিস্ময়ের প্রতি ইঙ্গিত করে।[৪]

চন্দ্রকেতুগড়ের আবিষ্কৃত এক শ্রেণীর বহু ফলকে মিথুন-দৃশ্য দেখা যায়। বিভিন্ন ভোগবিলাসের সামগ্রী মধ্যে সৌখিন পালঙ্ক অথবা রম্য সিংহাসন কিংবা গদী আঁটা হেলান দার উচ্চাসনে অর্দ্ধশায়িতা নায়িকার সঙ্গে মিলনোদ্যত অথবা প্রেমসোহাগদানরত নায়ক স্বভাবতঃই রতিশাস্ত্রবিশারদ বাৎস্যায়নের "কামসূত্রে"র নিয়মাবলীকে প্রতিবিম্বিত করে। উল্লিখিত গ্রন্থে নির্দ্দিষ্ট বিভিন্ন মিলনপদ্ধতিকেই দেখা যায় এই মৃন্ময় ফলকসমূহের ভাস্কর্য্য চিত্রে।

স্তম্ভ ও প্রাকার শোভিত প্রসাদ কক্ষে মিথুন্যদৃশ্য। চন্দ্রকেতুগড়। আনুমানিক খৃঃ পূঃ ১ম শতাব্দী

১৯৫৫ সালে ভারতীয় প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ কর্ত্তৃক তাম্রলিপ্তে খনন-কার্য্যের ফলে বৈপরিত্য মৈথুন দৃশ্যসম্বলিত একটি শুঙ্গকালের ফলক আবিষ্কৃত হয়েছিল।[৫]

এখন এই সুপ্রাচীন মিথুনদৃশ্যগুলির প্রকৃত বক্তব্য কি, এই নিয়ে এক জটিল সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে। শুঙ্গ কালের শিল্পশৈলীযুক্ত বুদ্ধগয়া এবং সাঁচীর পাষাণ আলেখ্যসমূহে প্রেম-পরিতৃপ্ত নায়ক-নায়িকাকে দেখা যায়। অহিচ্ছত্রায় খনন কার্য্যের ফলে আবিষ্কৃত অনেক পোড়ামাটির ফলকেও এই ধরণের চিত্র রূপায়িত আছে।[৬]

তবে এই সব ক্ষেত্রে নায়ক-নায়িকার চরম মিলনের ইঙ্গিত থাকলেও তাদের আচরণ চন্দ্রকেতুগড় এবং তাম্রলিপ্তের মূর্ত্তির ন্যায় এতটা প্রকাশ্য ও আবেগধর্ম্মী নয়। অবশ্য, বুদ্ধগয়ার বেষ্টনীর একটি স্তম্ভগাত্রে এক কামাতুর রাজমূর্ত্তিকে পলায়মানা, ভীতা ও স্খলিতবসনা নারীর মেখলা আকর্ষণ করতে দেখা যায়।[৭]

কিন্তু এখানেও এই অতিশয় ব্রীড়িতা রমণীটির সঙ্গে যৌন মিলনকে দেখান হয় নি। বাঙলার এই মিথুন মূর্ত্তিসমূহের প্রকৃত সাদৃশ্য আছে বহু পরবর্ত্তীকালে ক্ষোদিত ভুবনেশ্বর এবং খাজুরাহোর শৃঙ্গাররসোদ্দীপ্ত ভাস্কর্য্যগুলির সঙ্গে। এখানেও সেই অনাবৃত সৌন্দর্য্য, মিলনক্রীড়ায় পরস্পর সম্মতি এবং উচ্ছ্বসিত মদনোৎসব।

এই যৌন-লীলা যেন প্রাচীন ভারতের বসন্তোৎসবকে স্মরণ করিয়ে দেয়। শ্রীহর্ষ রচিত "রত্নাবলী" নাটকে কৌশাম্বীর উৎসবরত ও কামলুব্ধ নর-নারীকে লক্ষ্য ক'রে বাসবদত্তার সহচরী মদনিকার গান আছে :

"কুসুমায়ুধের প্রিয়দূত বহুচূতশাখীক্ষের মুকুলের বিকাশক অভিমানিনীর মানগ্রহের শিথিলতা সম্পাদক দক্ষিণ পবন বহিতেছে।

৪। *Art of India and Pakistan;* Ed. by Leigh Ashton, p. 10 (Introduction to Sculpture by Codrington).

৫। *Indian Archaeology—A Review* : 1954-55; Plate XXXIX.

৬। V. S. Agarwala : Terracotta Figurines of Ahichchhatra of Bareilly, U.P. *Ancient India,* No. 4. pp. 109 ff; Plates XXXII & XXXIII.

৭। K. M. Munshi: *Saga of Indian Sculpture,* Bombay, 1957, Plate 9.

যুবতিসমূহে বকুল পুষ্পের আমোদ পরিত্যাগ করত, প্রিয়জনের সঙ্গমপ্রার্থী হইয়া এবং প্রতীক্ষা করিতে অসমর্থ হইয়া ভ্রমণ করিতেছে।

মধুমাস প্রথমে লোকের হৃদয় মৃদু করিয়া দেয়; পরে লব্ধপ্রবেশ বাণের দ্বারা কুসুমায়ুধ তাহাদিগকে বিদ্ধ করে।"

চন্দ্রকেতুগড়ের কয়েকটি মধুর আলিঙ্গন-দৃশ্য যেন এই বাঞ্ছিত মধুমাসের (চৈত্র) বার্ত্তা বহন করে।

সুদূর ইন্দোচীনে আবিষ্কৃত সুপ্রাচীন ওশিও নগরীর ধ্বংসাবশেষে বিভিন্ন ভারতীয় ও রোমান নিদর্শনের সঙ্গে একটি পোড়ামাটির মিথুনমূর্ত্তি পাওয়া গিয়েছে যা' অবিকল চন্দ্রকেতুগড়ের একধরণের মিথুনমূর্ত্তির মত দেখতে। প্রত্নতাত্ত্বিক ম্যালেরেটের ধারণায় ওশিওর ফলকটিতে ভূমধ্যসাগরীয় শিল্পের ছোঁয়াচ আছে। যৌনজ্ঞাপক বিভিন্ন চিহ্ন ও চিত্রের প্রচলন যে এট্রাস্কান ও রোমযুগে ইটালীয় শিল্পে প্রচলিত ছিল সে কথা বলাই বাহুল্য। চন্দ্রকেতুগড়ের মিথুন-আলেখ্যগুলির মধ্যে মহাত্মা কপিলমুনি-প্রবর্ত্তিত সাংখ্য দর্শনের কোন বাস্তব রূপক নিহিত আছে কি না কে বলতে পারে? ঈশ্বরকৃষ্ণ সম্পাদিত "সাংখ্য কারিকার" এক স্থানে উল্লিখিত আছে,

"প্রীত্যপ্রীতিবিষাদাত্মকাঃ
প্রকাশপ্রবৃত্তিনিয়মার্থাঃ।
অন্যোন্যাভিভবাশ্রয়জননমিথুনবৃত্তয়শ্চ গুণাঃ॥"

অর্থাৎ

"গুণ সকল প্রীত্যাত্মক, অপ্রীত্যাত্মক, বিষাদাত্মক, প্রকাশার্থ প্রবৃত্ত্যর্থ ও নিয়মার্থ; পরস্পর পরস্পরে অভিভূত, পরস্পর পরস্পরের আশ্রিত, পরস্পর পরস্পরের জনন হেতু, পরস্পর পরস্পরের মিথুনসংবদ্ধ ও পরস্পর পরস্পরের বর্ত্তমান। ৮

অথবা

"পুরুষার্থহেতুকমিদং নিমিত্ত নৈমিত্তিক প্রসংগেন।
প্রকৃতেবিভুত্ব যোগান্নটবদ্ধাবতিষ্ঠতে লিঙ্গং॥"

অর্থাৎ

"পুরুষার্থ হেতু নিমিত্ত নৈমিত্তিক প্রসঙ্গের দ্বারা, প্রকৃতির বিভুত্ব যোগ হইতেই লিঙ্গ শরীরের নটের ন্যায় কার্য্য-করণের ব্যবস্থা সম্পাদিত হয়।" ৯

এর ব্যাখ্যাস্বরূপ বলা হয়েছে, "সূক্ষ্ম শরীর সূক্ষ্ম পরমাণু অর্থাৎ তন্মাত্রর দ্বারা সংগৃহীত এবং ত্রয়োদশবিধ করণ বিশিষ্ট ও মনুষ্য, দেব ও পশ্বাদি যোনিতে নটবৎ অর্থাৎ নট যেরূপ পট্যাভ্যন্তরে (নেপথ্যে) প্রবিষ্ট হইয়া দেব-রূপ ধারণপূর্ব্বক রঙ্গভূমিতে আগমন করে, পুনর্ব্বার মনুষ্যরূপে পুনর্ব্বার বিদূষকরূপে বারংবার গমনাগমন করে তদ্রূপ লিঙ্গশরীর নিমিত্ত নৈমিত্তিক দ্বারা উদরাভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইয়া হস্তী, স্ত্রী, পুরুষ প্রভৃতি-প্রসঙ্গের রূপে জগতে বারম্বার জন্মগ্রহণ করে। ভাবের দ্বারা অধিবাসিত অর্থাৎ রঞ্জিত হইয়া লিঙ্গ শরীর সংসরণ করে ইত্যাদি।" ১০

চন্দ্রকেতুগড়ের মিথুন দৃশ্যগুলির পশ্চাতে সাংখ্য দর্শনের তত্ত্বজ্ঞান থাকা অসম্ভব নয়। দু'একটি ক্ষেত্রে অন্যান্য জীবের মৈথুনও দৃষ্টিগোচর হয়। অবশ্য একথাও অস্বীকার করা যায় না যে, এই দৃশ্যসমূহ প্রাক্ বৈদেশিক যুগের কোন আপাত উচ্ছৃঙ্খল ধর্ম্মক্রিয়া অথবা কোন জটিল তন্ত্রসাধনার সঙ্গে সম্পর্কিত হ'তে পারে। খ্রীষ্টীয় ১০ম ও ১১শ শতাব্দীতে ক্ষোদিত খাজুরাহোর মিথুন দৃশ্যমূলক ভাস্কর্য্যসমূহের প্রসঙ্গে অধঃপতিত কৌল ও কাপালিক সাধকগণের কথা ওঠে। শিল্পবিশেষজ্ঞ প্রমোদচন্দ্রের ভাষায়

"To the Kaula, the path is one of controlled enjoyment of the objects of the senses, for he realises that in the ultimate analysis *yoga* and *bhoga* are one and the same thing. Various stages are postulated in the upward course of the spirit, the ultimate unity being achieved only in the last stage. The ritual practices of the cult, therefore, enjoined the partaking of *Panchamritas* or panchamakarnas, the flowers, perfumes, flesh, fish and sweetmeats were commonly used in ceremonials. The participation of *Ves'yakumarikas* (virgin courtesans) is also enjoined, and the secret and symbolic nature of the rites is constantly reiterated."১১

চন্দ্রকেতুগড়ের মিথুন-চিত্রসমূহে এই বামাচারী সাধকগণের কল্পনা করা কঠিন, কারণ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এইগুলি রাজকীয় বিলাস ও বৈভবের মধ্যে দেখান হয়েছে।

৮। *The Sankhya Karipa*: By Iswara Krishna translated from the Sanskrit by Henry Thomas Colebrooke, also the Bhasya or Commentary of Gaurapada translated by H. Hayman Wilson, and translated into Bengali by Debendra Nath Goswamy; pp. 22-23.

৯। *Ibid.*., pp. 62-63.

১০। *Ibid.*, p. 63.

১১। *Lalit Kala*, Nos. 1-2, April, 1955, March, 1956, p. 102.

শ্রীসুভাষচন্দ্র বসু

কানাড়ী কবি সিদ্ধন্ন মসলি অবলম্বনে

শ্রীসুনীলকুমার নন্দী

আকাশের পট চারিদিকে বিস্তৃত—
কে হবে সাহসী পরিমাপ তার করতে গহন ও ব্যাপ্তি ;
বাঁকাচোরা পথে শত ছায়াপথ গ্রহগ্রহান্তমুখী ;
আকাশ অসীমে ব্যাপ্ত।
জন্ম জন্ম যায় লেগে যায় যে-অসীমে যেতে হয়তো,
কিন্তু সে-পথ দেখাতেও পারে একটি আলোকবর্ম্ম।

দুই

ঊর্ধ্বে নাচছে বর্ণালী রঙে সগৌরবে
চিরায়ু ছন্দে আলোকপুঞ্জ।
নেপথ্যে ওই সুতো মুড়ে মুড়ে আলো-কণিকারা খেলছে।
তৃষ্ণাকাতর শত শত চোখ অমরাবতীর দিকে উৎসুক—
তথাপি দুরূহ অর্থ মেলে না, মননের মুঠি শূন্য।

তিন

আলো ঢেকে ফেলে শক্তিমন্ত অন্ধকার
স্বারাজ্যপাট বিস্তারে হয় উন্মুখর।
যে-পরুষ হাতে আলো ঢাকে ওই অন্ধকার
তারি নিপীড়নে পৃথিবী-বক্ষ প্রকম্পিত ;
অন্ধকারের লোলুপতা আনে যদিচ যুদ্ধ চিরন্তন,
পরিণামে তবু অন্ধকারের পরাজয় আসে সুনিশ্চিত।

চার

আলো ও অন্ধকারের যুদ্ধে দেখা দেয় নৈরাজ্য
বারবার, এই পৃথিবীতে ওঠে আর্ত-করুণ কণ্ঠ—
বৃষ্টির মতো নির্মল ক'রে সকল ধূলিমালিন্য
স্বর্গের থেকে নেমে আসে এক কল্যাণময়ী শক্তি।
দানবের সাথে যুদ্ধে চণ্ডী এলেন, খড়্গ হস্তে।
স্বর্গ পাঠায় শুভাশীস বাণী, আঁধারের নৈরাজ্যে,
মদোন্মত্ত কোলাহল জাগে, বেপথু পৃথিবী নিয়ে।

পাঁচ

নব রাত্রির বেদীপ্রাঙ্গণ আলোয় আলোয় ঝল্‌মল্‌—
মনের কালিমা শান্ত ধ্যানের দীপ্তিতে হলো উজ্জ্বল।
আলোকের স্রোত পান করে এই পিপাসু পৃথিবী-বক্ষ।
হৃদয়পদ্ম বিকশিত হয়, রূপময় হাসি ওঠে।
জাগে জীবনের স্পন্দন রোল বসুধার প্রতি অঙ্গে।
সবুজ ঘাস ও শস্য ফুটলো, ফলভারে নত বৃক্ষ ;
সবুজে সবুজে বেজে ওঠে ধ্বনি মঙ্গলময় উৎসব।
হঠাৎ আলোর ঝলকানি লেগে মানুষের প্রতি অঙ্গ
শিহরণ তোলে, এই তো এসেছে আলোর মধুর লগ্ন।

ছয়

ঊর্ধ্বে বিশাল আকাশের বিস্তারে
স্বর্ণ আলোর মুকুট কিরণ দীপ্তি
নয়নে পড়িছে, সারাদেহময় কম্পিত এ-আনন্দে।
দেখো, দেখো মন হয়েছে আলোকস্তম্ভ।
অজ্ঞাতবাস নিয়েছে আঁধার দৈত্য।
হাত দাও রথে, চলো যাই চলো লক্ষ্যে—
ঢেউয়ে ঢেউয়ে ভাসে দূরাগত জয়ীকণ্ঠ।

সাত

অকাশের পট চারিদিকে বিস্তৃত—
কে হবে সাহসী পরিমাপ তার করতে গহন ও ব্যাপ্তি
বাঁকাচোরা পথে শত ছায়াপথ গ্রহগ্রহান্তমুখী ;
আকাশ অসীমে ব্যাপ্ত।
জন্ম জন্ম যায় লেগে যায় যে-অসীমে যেতে হয়তো,
কিন্তু সে-পথ দেখাতেও পারে একটি আলোকবর্ম্ম।

দাঁড়ের পাখী, টবের গাছ

শ্রীকামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

একটি পাখী আছে, জানো?
সে কেবল পাখা ঝাপটায়।
যখন দাঁড়ে বাঁধা থাকে
ভাবতে চেষ্টা করে, উধাও হচ্ছে বুঝি
আকাশের শেষহীন নীলে।
যখন ছাড়া পায়, পারে না উড়তে।
তখন পাখীর চোখে সে কাঁদে।
হায়, সে-চোখে জল পড়ে না।

একটি টবের গাছ আছে, জানো?
সে কেবল ভাবে, আমিই পৃথিবীর একমাত্র সবুজ,
আমিই রহস্যঘন অরণ্য!
আমারি বুকে জ্বলে রাত্রির জোনাকি,
সন্ধ্যায় আমারি কাছে ফিরে আসে
হাজার-হাজার পাখী।
হায়, যখন তাকে অরণ্যে রোপণ করা হোলো
দেখলো, অজস্র অজস্র সবুজে সে নগণ্য।

ওগো প্রেম!
তুমি কি দাঁড়ে-বাঁধা পাখী?
না কি টবের গাছ?

চন্দ্র-গ্রহণ

শ্রীকৃষ্ণধন দে

ছায়া-হাতে পরশ-উন্মুখ
পৃথিবী কি দিতে চায় স্নেহ এতটুক
কোলহারা শিশুটিরে?
কোটী যোজনের পথে ফিরে
নিয়ে তার বাৎসল্য-পশরা?
একটি লগন লাগি মিলন-কাতরা
ছুঁতে চায় শুধু ছায়া দিয়ে,
তার সাথে জননীর হৃদয় মিশিয়ে?

চন্দ্র তারে বলে: আরো চাই,
পরিপূর্ণ স্নেহ তব যেন বুকে পাই!
তোমার কানন মরু নদী ও সাগর,
তোমার পর্ব্বত হ্রদ পল্লী ও নগর,
আজ যেন ভুলে গেছি সব!
তবু সেই স্মৃতির বৈভব
ছায়ার মাধুরী-মাঝে ভাবি মনে, ফিরে এল না-কি?
একটি মধুর ক্ষণ, তারি লাগি পথ চেয়ে থাকি।

অচিরাবতী

শ্রীসুধীরকুমার চৌধুরী

তোমার সে রূপ কোথা গেল ?
সেদিনের সেই রূপ ?
কোথা গেল সে রূপ তোমার ?
দেখ, দেখ, খুঁজে দেখ,
গেছে যাক ব'লে এড়িও না।

বলব না ছিলে অতুলনা।
অতুলনা সকল নারীরা।
বিধাতার ধ্যানে
এক রূপ দুবার আসে না;
অতুলনা এখনো রয়েছ।

শুধু সেইদিন
তুমি ছিলে আরো বেশী তুমি।
সেদিনের রূপ ছিল তোমার রূপক।
অমর-সভার দ্বারে যে রূপচিহ্নিত পত্রে
রয়েছে তোমার পরিচয়,
সে রূপ তোমার কোথা গেল ?

সময়ের অপরিমেয়তা
করে তারে মমতা-বিহীন,
করে তারে অপচয়ী।
তাই ফেলাছড়া।
তাই তার রূপ ছেড়ে রূপে সঞ্চরণ
নিমেষে নিমেষে।
আমার যে সমুখে মরণ!
আমি যা হারাই তা যে হারায় নিঃশেষে।
আমার হারানো বেশী, কম আহরণ।
তাই বলি, খোঁজ, খোঁজ,
খুঁজে দেখ কোথা গেল
জ্যোতিরুৎসবের মত,
সুমেরুদ্যুতির মত
সেদিনের সে রূপ তোমার।

চুলের কাঁটাটি গেলে আঁতি-পাঁতি ক'রে খুঁজে মর,
একে খুঁজবে না ?

কোথা গেল ?
কোথা যায় সব ?
আলো থাকে, হাসি থাকে, রূপ থাকে,
সবকিছু থাকে,
তবু কেন কিছুই থাকে না ?
মনের বাঁধন দিয়ে আমি যেটুকুকে বাঁধি
সেটুকুই যেন চ'লে যায়!
কেন যায় ? কোথা যায় ?

জেনে যেতে চাই কোথা যায়।
জানবই।

এ জীবনে না পাই সন্ধান,
খুঁজে খুঁজে চ'লে যাব এই জীবনের পরপারে
সেই প'থ ধরে,
যে-পথে গিয়েছে চ'লে সেদিনের সে রূপ তোমার।

কানে কানে কে যে বলে,
—আমারই অলস মন সে কি ?—
বলে, কিছু যায়নি ত!
সবই আছে বুক ভ'রে অবচেতনের,
ভ'রে আছে মধুচক্র আমার মনের
সেদিনের স্মৃতির মাধুরী।
তোমার সে রূপের স্মৃতির।

ভাবি আর ভয় পাই প্রিয়া!
যদি পরপার ব'লে কিছু না-ই থাকে ?
মৃত্যুতে যদিই শেষ হয়ে যাই ?
আমার মরণে শেষ হয়ে যাবে সে রূপ তোমার,
জ্যোতিরুৎসবের মত,
সুমেরুদ্যুতির মত রূপ,
যেই রূপে তুমি ছিলে সবচেয়ে বেশী তুমি,
তুমি!

অর্থিক

শ্রীচিত্তপ্রিয় মুখোপাধ্যায়

নদী-নিয়ন্ত্রণ পরিকল্পনা

দেশের জরুরী অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে সম্প্রতি কেন্দ্রীয় সরকার নদী-নিয়ন্ত্রণের ও জলসেচের যে-সব বৃহৎ ও ব্যয়-সাপেক্ষ, দীর্ঘ-মেয়াদী পরিকল্পনার কাজ এখনো সুরু হয় নি সেগুলি কিছুকালের মত মুলতুবী রাখার কথা বিবেচনা করছেন। অপর দিকে শিল্পোন্নয়নের কাজে একান্ত-প্রয়োজন বিদ্যুৎশক্তি উৎপাদনের দিকে ঝোঁক দেওয়া হবে।[1]

অর্থাভাবে সম্ভবতঃ জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের কাজও কিছুটা মন্থর হয়ে যাবে; বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য অগত্যা উত্তাপ শক্তিই আরও বেশি পরিমাণে কাজে লাগাতে হবে।

ভৌগোলিক ও অন্যান্য কারণ-ভেদে জলসেচ, বিদ্যুৎ উৎপাদন ও অন্যান্য ব্যবহারের পার্থক্যের হার যাই হোক্ না কেন, নদী-নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে অবাধ-বাণিজ্য ও ব্যক্তি-স্বাধীনতার সমর্থকদের মধ্যে, আশু ফললাভের সম্ভাবনা না থাকাতে, কিছুকাল পূর্বেও বিরুদ্ধ মত ছিল; কিন্তু আজ আর কারোর মনেই কোন দ্বিধা নেই। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের প্রধান ধারক ও বাহক আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রেও আজ নদী-নিয়ন্ত্রণে রাষ্ট্রের কর্তৃত্ব স্বীকৃত হয়েছে।

আজ যখন অনিবার্য কারণে বৃহৎ পরিকল্পনাগুলির কাজ কিছুটা ব্যাহত হবার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে, এই সময়ে একটি অপেক্ষাকৃত অবহেলিত অথচ বহু-আলোচিত বিষয়ের সামান্য আলোচনা উত্থাপন করছি।

'পুষ্করিণী-সংস্কার অথবা নদী নিয়ন্ত্রণ', এই দৃষ্টিভঙ্গি থেকে আমাদের দেশের সমস্যাটি বিচার করা চলে না; নদী-নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজনীয়তা ও সার্থকতা অনেক ব্যাপক, তাই নদীকে অবহেলা করে শুধু পুষ্করিণী সংস্কার করলেই সমস্যা সমাধান হবে, এই প্রস্তাব গ্রাহ্য নয়।

নদীর নাব্যতা পুনরুদ্ধার এবং নদীর জল থেকে চাষের জমি সেচ—এই দুই কাজের সমন্বয় হতে পারে কি না এই কথা নিয়ে বহু আলোচনা আমাদের দেশে হয়ে গেছে।[2] আমাদের দেশে যেখানে সারাবছরের বৃষ্টি মাত্র তিন-চার মাসের মধ্যেই হয়ে যাচ্ছে, দু'টি সমস্যা খুবই প্রবল ভাবে দেখা দেয়; একটি হচ্ছে, মোট বাৎসরিক বৃষ্টির কতটা পরিমাণ অংশ শুষ্ক দিনের জন্য

---

1. The Union Government intends to ask the States to slow down many of the major long-term irrigation schemes and to step up power generation in view of the emergency : *Statesman*, 19-12-62.

২। দুর্গাপুর থেকে কলকাতার উত্তরে পঁচিশ মাইল দীর্ঘ যে খালটি এসেছে, সেটি প্রধানতঃ কম ব্যয়সাপেক্ষ নৌচলাচলের কাজে ব্যবহৃত হবে। অতিরিক্ত পলি পড়েছে বলে এখনো নৌচলাচল সুরু হ'তে পারছে না বলে জানা যায়। বাংলা দেশের "রূঢ়" (Ruhr of West Bengal) থেকে জলপথে সমুদ্রপথ যুক্ত হবে এই প্রস্তাব খুবই সঙ্গত সন্দেহ নেই। কিন্তু স্থলপথে দ্রুততর ও সস্তা যানবাহনের যুগে এই জলপথ খোলবার সময় নদীটিকেই পুনরুদ্ধারের কথা ভাবা হয় নি কেন জানি না।

3. "The weight of an inch of rainfall on an acre of land is no less than 2800 maunds. On an average of good, bad and indifferent years and taking into account all parts of the country. We get rather more than 42 inches of rain falling on every acre of land every year. That is to say, we get well over one lakh of maunds of water on every acre of land ; and we have 81 crores of acres" : *Census Report,* 1951 : Vol. 1.—"The irrigation works of the sub-continent use about 7 billion cubic feet of water, nearly 20 per cent of annual surface flow, and the great Punjab rivers are virtually drained dry by their canals. . . . . Inundation canals merely fill with the rising rivers and ifit does not rise enough, they remain empty. They are thus liable to fail precisely when most needed. Their off-takes silt readily. Perennial canals also have disadvantages of which the most important is that their headworks may trap much of the silt so valuable to the ill-manured fields. . . . ." O.H.K. Spate : India and Pakistan.

ধ'রে রাখা সম্ভব, যার ফলে সেচ কার্য ও নাব্যতা দুইই মেটানো যায়।৩ অপরটি হচ্ছে, প্রচণ্ড রোদের পর প্রবল বৃষ্টিপাতের ফলে কি পরিমাণ মাটি ধুয়ে যাচ্ছে।৪

যে যুগে লোকে পুষ্করিণীর ওপর চাষের জন্য একান্ত নির্ভরশীল ছিল, দেশের সর্বত্রই সুবিধা-মতন স্থানে পুষ্করিণী খনন করা হয়েছিল।৫ কিন্তু পুষ্করিণীর অনেক অসুবিধা: জল-ধারণের অনুপাতে স্থান নেয় বেশি; অনেক পরিমাণ জল উবে এবং মাটির নীচে চলে যায়, অনেক পুকুরেই সারাবছর জল থাকে না; পলিমাটি জ'মে বুজে যায়; আর জমি সেচের ব্যবস্থা অত্যন্ত বেশিরকম বিকেন্দ্রীকৃত (decentralised) হয়ে যায়।৬ তাই দেখা যায় যে, গত পনের বছরেও যেখানে কোটি কোটি টাকা ব্যয় করে নদী, নিয়ন্ত্রণের কাজ হয়েছে, ৭ এবং খালের পঙ্কোদ্ধার৮ ও অন্যান্য মেরামতির জন্য মোটা টাকা খরচ হচ্ছে সেখানে পুষ্করিণী পুনরুদ্ধারের দিকে নজর কমই দেওয়া হয়েছে৯।

পুষ্করিণীর অপর একটি কাজ ছিল মৎস্য চাষ, যার প্রতি ইদানীং কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি পড়েছে। সাম্প্রতিক এক হিসাবে দেখা গেছে যে, বাংলা দেশে মোট ১৯'৯২ লক্ষ একর জমি জলময়, তার মধ্যে নদীর মোহনা ইত্যাদি বাদ দিলে আভ্যন্তরীণ জলময় স্থানের পরিমাণ ১০'১২ লক্ষ একর। ১৯৫৩-৫৪ সালে এর মধ্যে মাত্র ৫'৩৬ লক্ষ একর স্থানে অল্প-বিস্তর হারে মাছের চাষ হ'ত; মোট মাছ উৎপাদনের পরিমাণ ছিল ৩২'৮১ হাজার টন; আর শুধু কলকাতা সহরেরই সারাবছরের মাছ আমদানীর পরিমাণ হচ্ছে প্রায় ৪০,০০০ টন।

প্রতি একর জলে দেখা গেছে বছরে দশ মণ মাছ উৎপাদন করা যায়; বিশেষ যত্ন নিলে কুড়ি মণ পর্যন্ত হ'তে পারে; সেই হিসাবে শুধু কলকাতার প্রয়োজন মেটাবার জন্যই আড়াই লক্ষ একর জল দরকার।১০

বর্তমানে অর্থাভাবে যদি নদী-নিয়ন্ত্রণের বৃহৎ পরিকল্পনার কাজ স্থগিত থাকে বা মন্থর হয়ে আসে এই অবসরে প্রাচীন পুষ্করিণীগুলির সংস্কারের কাজে জোর দেওয়া যায় কি না সে কথা আশা করি সরকার বিশেষ ভাবে বিবেচনা করছেন।

প্রগতি ও কর্মসংস্থান

এবারকার আদমসুমারী রিপোর্টে দেখা গেছে যে, জনসংখ্যার অত্যধিক বৃদ্ধির সঙ্গে সমান না হ'লেও গত দশ বছরে কর্মরত লোকের সংখ্যা মোটামুটি ভাবে অনেক বেড়েছে।

অতীতকাল থেকে যে অর্থ বৈষম্য ও স্বাতন্ত্র্যবোধ আমাদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক কাঠামোর প্রতি রন্ধ্রে স্থান পেয়ে এসেছে, দেশ স্বাধীন হবার পর মাত্র এই কয় বছরে তার সমস্ত চিহ্ন মুছে যাবে এবং উৎপাদন

৪। প্রতি বছর গঙ্গানদী ১৭'৭০ কোটি কিউবিক মিটার মাটি সমুদ্রে নিয়ে জমাচ্ছে; তার মধ্যে বর্ষাকালের ১২২ দিনেই যাচ্ছে ১৭ কোটি; গ্রীষ্মের তিন মাসে ১০ লক্ষ; এবং বাকি পাঁচ মাসে ৭০ লক্ষ কিউবিক মিটার মাটি যাচ্ছে।

5. "Their (tanks) siting speaks to a wonderful flair for detecting the minutest variations in the terrain. A reliable tank needs a considerable catchment, which is usually waste; rice is the usual tank-fed crop, on gently falling terraces designed to secure an even flow of water over the fields. . . . The high water-table below the tanks supplies good wells, used either for security in bad years or a second crop in good ones". O.H.K. Spate; India and Pakistan.

৬। পশ্চিম বাংলার মোট পুষ্করিণীর সংখ্যা ৬৬১,০০০। ১৯৪৭-৪৮-এ পুষ্করিণীর সাহায্যে মোট ৯৪২,০০০ একর জমি সেচ হয়েছিল; ১৯৫৪-৫৫ সালে ৭২৯,৫০০ একর। সরকারী খালের সাহায্যে ঐ দুই বছরে সেচ হয়েছে যথাক্রমে ২৭৭,০০০ একর ও ৪২৫,০০০ একর।

৭। ময়ূরাক্ষী নদীর নিয়ন্ত্রণের খাতে মোট ব্যয় হয়েছে ২০.১৬ কোটি টাকা এবং জলসেচ হচ্ছে বা হবে ৫'৩০ লক্ষ একর জমি, অর্থাৎ প্রতি একর জমি সেচের ব্যবস্থার জন্য প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে মোট ৩৮০৲ টাকা মূলধন লাগানো হয়েছে। কংসবতী বাঁধের কাজে টাকা ব্যয়ের অঙ্ক ২৫'২৬ কোটি টাকা এবং জলসেচ হবে ৮ লক্ষ একর জমিতে অর্থাৎ প্রতি একর জমির জন্য ব্যয় ৩১৬৲ টাকা পশ্চিমবঙ্গ তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার পুস্তকে দেখা যাচ্ছে ২৮০০ পুরাতন পুকুর সংস্কার ও খননের জন্য ১২৯ লক্ষ টাকা খরচ হবে এবং সেই ব্যবস্থাতে মোট ১,৪০,০০০ একর জমি সেচ হবে, একর-পিছু জমি সেচের জন্য প্রাথমিক ব্যয় হবে ৯২৲ টাকা।

৮। নদীর পলিমাটি খালগুলিতে সঞ্চিত হবার ফলে চাষের জমি এই উর্বর পলিমাটির ব্যবহার থেকে বঞ্চিত হচ্ছে কি না, এ বিষয়ে অনুসন্ধানের জন্য মিশরের গত একশো বছরের অভিজ্ঞতা আমাদের কাছে বিশেষ মূল্যবান মনে হয়।

৯। বাংলা দেশের পুষ্করিণীর সংখ্যা ৬৬১,০০০; সরকারী রিপোর্টে দেখা যায় সম্প্রতি প্রায় ৫,০০০ পুষ্করিণীর সংস্কার করা হয়েছে। মোট পুষ্করিণীর তুলনায় সংখ্যাটি খুবই কম মনে হয়।

১০। বাংলা দেশের সব লোকে যদি স্বাস্থ্যের ন্যূনতম চাহিদা অনুযায়ী দৈনিক তিন আউন্স ক'রে মাছ-মাংস খায়, তা হ'লে বছরে ৬'৩৫ লক্ষ টন জোগান থাকা দরকার। এই হিসাব হয়েছিল ১৯৫৫ সালের। ১৯৬১-আদমসুমারী হিসাবে দেখা যায় যে, দশ, বছরে বাংলা দেশের জনসংখ্যা বেড়েছে ৩২'৮%, অথচ খাদ্যশস্যের উৎপাদন বেড়েছে মাত্র ৪'৩% ভাগ।

বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গেই সকলের বাঞ্ছিত পথে কর্মসংস্থানের ঘাটতি দূর হবে এবং অর্থবৈষম্যও ঘুচে যাবে, একথা বিশেষজ্ঞরাও আশা করেন না।

গত দশ বছরে বিভিন্ন দীর্ঘ-মেয়াদী কাজগুলিতে প্রভূত অর্থব্যয় করার ফলে এতদিনে উৎপাদন বৃদ্ধির বাধাগুলি দূর হচ্ছে মাত্র। অন্যান্য ধনী দেশ সম্পূর্ণ ভিন্ন ও অপেক্ষাকৃত অনুকূল পরিবেশে বহু বছর চেষ্টা করে যে ফল লাভ করেছে, আমাদের সেই গন্তব্যস্থলে পৌঁছাতে হবে আরও অনেক অল্প সময়ে এবং প্রচুরতর বাধা লঙ্ঘন করে। এই বন্ধুর পথে অগ্রসর হ'তে গিয়ে সুরুতেই আমাদের সেই সনাতন পদ্ধতিতে উৎপাদিত স্বল্পমাত্র বিত্ত সমানভাবে বণ্টন করার চেয়ে প্রথম কিছুকাল মুখ্যতঃ উৎপাদন বৃদ্ধির পথ প্রশস্ত করারই চেষ্টা বাঞ্ছনীয়; এখন কিছুকাল যদি বণ্টন ব্যবস্থার আমুল পরিবর্তনের কাজ স্থগিত রাখা হয় বা কম গুরুত্ব দেওয়া হয় ত তার জন্য-ই চিন্তিত হওয়া নিষ্প্রয়োজন। সব দেশের সব যুগের ইতিহাসেই দেখা গেছে উৎপাদন-পদ্ধতি বদলের সঙ্গে কিছু কিছু লোক সাময়িকভাবে কর্মচ্যুত হয়েছে; অচিরে আবার কর্মসংস্থানের পরিধি ছড়িয়ে পড়েছে বিভিন্ন আকারে, নতুন নতুন পথে, বহুতর লোকের মধ্যে।

আজ আমরা যে পরিবর্তনের মধ্যে দিয়ে চলেছি, সে শুধু দশ বছরের ব্যবধানে ক'জনের কর্মসংস্থান হ'ল তার দ্বারাই মেপে দেখলে চলবে না; ভবিষ্যতের উৎপাদন-ব্যবস্থা কত সুগম হ'ল সেটাই বিশেষভাবে দেখতে হবে। সেই পরিপ্রেক্ষিতে দেখতে গেলে আমরা বর্তমান নিবন্ধে আলোচিত তথ্যসমাবেশ থেকে সম্পূর্ণ ছবিটি পাব না অবশ্যই, তবে আমাদের এই প্রগতির পথে কোথাও কোন বদল দরকার কি না, বা কোন বিশেষ পন্থা নতুন ক'রে ভেবে দেখা দরকার কি না তার কিছু ইঙ্গিত পেতে পারি।

১৯০১, ১৯৫১ ও ১৯৬১ সালের আদমসুমারী থেকে সারা দেশের জনসংখ্যা ও কর্মরত লোকের সংখ্যা বিষয়ে কতকগুলি তথ্য এই সূত্রে উল্লেখ করছি:

	১৯০১		১৯৫১		১৯৬১	
	পুরুষ	স্ত্রীলোক	পুরুষ	স্ত্রীলোক	পুরুষ	স্ত্রীলোক
১। জনসংখ্যা (০০০)	১২,১১,৮৬	১১,৭৭,৯২	১৮,৩৩,৩০	১৭,৩৫,৪৮	২২,৫৮,৪৩	২১,২৪,৬৬
২। কর্মরত লোকের সংখ্যা (০০০)	৭,৪০৫১	৩,৭৩,৪১	৯৯০৮২	৪০৪৩৮	১২,৯০,১৫	৫,৯৪,০১
৩। শতকরা কর্মরত লোকের সংখ্যা	৬১·১১%	৩১·৭০%	৫৪·০৫%	২৩·৩০%	৫৭·১২%	২৭·৯৬%

উপরোক্ত তালিকা থেকে দেখা যাচ্ছে যে, ১৯৫১ সালের তুলনায় কর্মসংস্থান বেশ কিছু বেড়েছে, কিন্তু জনসংখ্যার শতকরা হার হিসাবে দেখতে গেলে ১৯০১ এর তুলনায় এখনও কমই আছে। আদমসুমারীর বিশদ বিবরণীতে দেখা যায় যে কৃষিজ ও আনুসঙ্গিক কাজে (Primary Sector) কর্মরত লোকের মোট শতকরা সংখ্যা বিভিন্ন আদমসুমারী কালে যথাক্রমে ছিল ৩৩·৪৪%, ২৮·২০% ও ৩১·০৬%; অর্থাৎ জমির ওপর নির্ভরশীলতা হ্রাস পায় নি; গত দশ বছরে কিছু বেড়েছে।

১৯০১-এর তুলনায় শতকরা বৃদ্ধির হার যদি লক্ষ্য করা যায় তা হ'লে ১৯৫১ ও ১৯৬১ সালে নিম্নলিখিত পরিবর্তন উল্লেখযোগ্য মনে হয়:

		১৯০১	১৯৫১	১৯৬১
জনসংখ্যা	পুরুষ	১০০	১৫২·৭	১৮৬·৪
	স্ত্রীলোক	১০০	১৪৮·৬	১৮০·৪
মোট কর্মরত লোক	পুরুষ	১০০	১৩৫·২	১৭৪·২
	স্ত্রীলোক	১০০	১০৯·৩	১৫৯·১
কৃষক (cultivator)	পুরুষ	১০০	১৩২·৩	১৬৮·৫
	স্ত্রীলোক	১০০	১০৯·৯	১৯৪·৭

সর্জন শিল্পে লিপ্ত কর্মসংখ্যা পুরুষ	১০০	১১৬·৬	১৭২·৬
(in manufacturing) স্ত্রীলোক	১০০	৬১·৪	১১৭·২
ব্যবসা বাণিজ্যে লিপ্ত পুরুষ	১০০	১৩৬·৩	১৫০৩২
(Trade nad commurce) স্ত্রীলোক	১০০	৫২·৪	৩৭·০

দেখা যাচ্ছে লোকসংখ্যা বৃদ্ধির তুলনায় কর্মসংস্থান কমই আছে; কৃষির ক্ষেত্রে এবং সর্জন, শিল্প ও ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে বৃদ্ধির বিভিন্ন হার লক্ষ্যণীয়। স্ত্রীলোকের কর্মসংস্থানের হিসাব থেকে কোন কোন ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ বিপরীত ধারাও লক্ষ্য করা যাচ্ছে।

সারা দেশের কর্মসংস্থানের পরিপ্রেক্ষিতে বাংলা দেশের কয়েকটি তথ্য এই সূত্রে দেখা যেতে পারে :

	১৯৫১		১৯৬১	
	পুরুষ	স্ত্রীলোক	পুরুষ	স্ত্রীলোক
১। জনসংখ্যা (০০০)	১,৪১,০৬	১,২১,৯৫	১৮৫৯৯	১,৬৩,২৭
২। কর্মরত লোকসংখ্যা (০০০)	৭৬,৫০	১৪,১৭	১০০৪০	১৫,৪০
৩। শতকরা কর্মরত লোকের সংখ্যা	৫৪·২৩%	১১·৬৩%	৫৩·৯৮%	৯·৪৩০
৪। মোট জন সংখ্যার তুলনায়				
ক) কৃষক কর্মীর (cultivator) শতকরা সংখ্যা	১৯·৭০%	৩·৬০%	২০·৯২%	৩·৪৭%
খ) সর্জন শিল্পে লিপ্ত কর্মী সংখ্যা	৮·০৩%	১·৭৭%	৬·৬৯%	০·৪৬%
গ) ব্যবসা-বাণিজ্যে লিপ্ত	৫·৫২%	০·৬৩%	৪·৫০%	০·২২%

সারা ভারতবর্ষের মোট গড়-এর সঙ্গে তুলনা করে দেখা যায় যে, দশ বছরে কর্মরত লোকের শতকরা হার যেখানে পুরুষের ক্ষেত্রে ৫৪·০৫% থেকে ৫৭·১২%-তে এবং স্ত্রীলোকের ক্ষেত্রে ২৩·৩০% থেকে ২৭·৯৬% তে উঠেছে, বাংলা দেশে তার থেকে বিপরীত ধারা লক্ষ্য করা যাচ্ছে।

১৯৫১ সালের পশ্চিমবঙ্গ আদমসুমারী রিপোর্ট থেকে দেখা যায় যে, যেসব কাজে আগে স্ত্রীলোকেরা স্বাবলম্বী হয়ে রোজগার করত সেই সব কাজে মোট স্ত্রীলোক কর্মীর সংখ্যা পঞ্চাশ বছরে ৬৫৬,০০০ থেকে ১৯৪০০০-তে দাঁড়িয়েছিল এবং অপর দিকে বৃহৎ-শিল্পে স্ত্রীলোক-কর্মীর সংখ্যা ১৯০১-তে যেখানে ছিল ৬১,০০০, ৯৫১-তে সেই সংখ্যা দাঁড়ায় মাত্র ৮৫০০০-এ। দেখা যাচ্ছে গত দশ বছরে প্রভূত উন্নয়নমূলক কাজ হওয়া সত্ত্বেও এই ধারা অব্যাহত রয়েছে।

অপর দিকে দেখছি যে,১৯৬১ সালে বাংলা দেশের স্ত্রীলোকদের আয়ের পথ যত সঙ্কীর্ণ (৯·৪৩%), অন্য প্রদেশে তত কম নয়। অন্ধ্র প্রদেশ ৪১·৩২%, আসামে ৩৯·৯১%, মধ্য প্রদেশে ৪৪%, বিহারে ২৭·১৫%, উত্তর প্রদেশে ১৮·১৪%, পাঞ্জাবে ১৪ ১০% ভাগ।

আমাদের এই শিল্পপ্রধান প্রদেশে স্ত্রীলোকের সঙ্কীর্ণ কর্মসংস্থান কিসের সূচনা করছে? পুরুষেরাই যথেষ্ট রোজগার করছে বলে স্ত্রীলোকেরা বিনা উপার্জনে ঘরে বসে থাকতে পারছে? অথবা উন্নততর উৎপাদন-পদ্ধতির ক্রম-বিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে স্ত্রীলোকেরা—অন্ততঃ-পক্ষে গ্রামাঞ্চলের জমিবিহীন কৃষাণদের সংসারের স্ত্রীলোকেরা—বেকার হয়ে যাচ্ছে? অথবা অযাচিত ভাবে বিদেশের সাহায্য-পুষ্ট হবার দরুণ আমাদের জীবনযাত্রা সহজতর ধারায় বয়ে চলেছে, আর তারই ফলে একদিকে যেমন মৃত্যু-হার কমছে তেমনি জন্ম-সংখ্যাও পূর্ব্বের সমস্ত হিসাব ভুল প্রমাণিত ক'রে অত্যধিক বৃদ্ধি পাচ্ছে?

উৎপাদন-পদ্ধতি বদলের সঙ্গে স্ত্রীলোকের কর্মসংস্থান সঙ্কোচনের প্রত্যক্ষ নমুনা পাই, ঢেঁকির বদলে 'হাস্কিং মেশিন'-এর প্রচলন থেকে। যুদ্ধের আগে পর্যন্ত ছিল ধান ভানা কল, তার মধ্যেও ঢেঁকির সাহায্যে ধান কোটার ব্যবস্থা লুপ্ত হয় নি। গত দশ পনের বছরে ছোট ছোট হাস্কিং মেশিন সর্বত্র হয়েছে; ইলেক্‌ট্রিসিটি যেখানে গেছে সেখানে আরও বেশি হয়েছে। অপর দিকে যেসব স্ত্রীলোক ধান ভানত তারা কর্মহীন হয়েছে। যুগের সঙ্গে এই পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী এবং জমির মালিকরা হাস্কিং মেশিনে কাজ তাড়াতাড়ি ও সস্তায় হয় ব'লে এই পরিবর্তনে খুব খুশী। কিন্তু এর মোট ফলটা

কি দাঁড়াল ? চাল কোটা কি বাড়ল, অথবা দশ জনের কাজ হাত বদল করে একজনের হাতে কেন্দ্রীভূত হ'ল ?

এই সূত্রেই রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সাম্প্রতিক এক অনুসন্ধান থেকে বিভিন্ন শ্রেণীর লোকের বাৎসরিক আয়ের যে হিসাব পাওয়া যাচ্ছে তার সংক্ষিপ্ত বিবরণ উল্লেখ করছি :

বাৎসরিক আয় অনুযায়ী শ্রেণী বিভাগ	১৯৫৩-৫৪ ‖ ১৯৫৪-৫৫ (ক) গৃহসংখ্যার (Household) শতকরা ভাগ	(খ) মোট আয়এর শতকরা ভাগ	(গ) গৃহপিছু বাৎসরিক আয় টাকা	১৯৫৫-৫৬ ‖ ১৯৫৬-৫৭ (ক) গৃহসংখ্যার (Household) শতকরা ভাগ	(খ) মোট আয়এর শতকরা ভাগ	(গ) গৃহপিছু বাৎসরিক আয় টাকা
০-৩০০০ টাকা	৯৫·৩	৮১·১	১০৭৪	৯৫·৩	৭৯·৭	১০৭৮
৩০০১-২৫০০০	৪·৫	১৪·২	৩৯৪৪	৪·৫	১৫·৩	৪৩২০
২৫০০১ ও তদূর্ধ্বে	০·২	৪·৭	২৯৫০০	০·২	৫·০	৩১২৮৭

এই বিশ্লেষণের সঙ্গে আরও যে তথ্যাদি রয়েছে তাতে আমরা আয় অনুযায়ী গ্রাম ও শহরাঞ্চলের, কৃষক, ব্যবসায়ী ও চাকুরেদের এবং কৃষকগোষ্ঠীর মধ্যেও জমির মালিক ও জমিবিহীন শ্রমিকের রোজগারের তারতম্য দেখতে পাই। ঐ বিশদ আলোচনার মধ্যে অথবা সম্প্রতি "জাতীয় আয়-বণ্টন অনুসন্ধান কমিটি"র প্রাথমিক রিপোর্টে যা পাচ্ছি, তার মধ্যে প্রবেশ না করেও মোটামুটি ভাবে যে ধারা লক্ষ্য করা যায় তার থেকে এই প্রশ্নই আসে যে এই ধারা রোধ বা খর্ব করবার প্রয়োজনীয়তা আছে কি না এবং সেই প্রয়োজন থাকলে তার জন্য কি করণীয়।
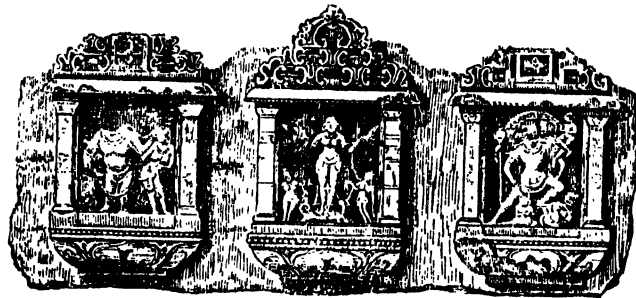
গল্প হচ্ছিল ওদের। প্রেমের গল্প।

যাত্রাদলের ভোর হয় অবিশ্যি সাধারণতঃ বেলা এগারটা-বারটায়। নিত্যি রাত জেগে পালা গেয়ে আহারাদি সেরে মানুষগুলোর শয্যা নিতেই ভোরালী বাতাস বইতে সুরু করে। তামাম দুনিয়ার যখন ঘুম ভাঙে, ওরা তখন ঘুমোতে শোয়। আবার যখন সাধারণ মানুষ আহারান্তে দ্বিপ্রাহরিক নিদ্রার প্রয়াস পায়, সেই ঠিক দুপুরে এরা ঘুম ভেঙে ওঠে। তামাম দুনিয়ার জন্যে রাত আসে বিশ্রামের আহ্বান আর আকাশে চাঁদ নিয়ে। এদের সেটা রাত নয়, কর্মময় দিনের সামিল। দুনিয়ার কাছে যেটা সূর্যকরোজ্জ্বল দিন, সেটা কর্মলগ্ন, এদের সেটা বিশ্রামের অবকাশ, রাত।

যাত্রাদলের পঞ্জিকায় চন্দ্র-সূর্যির উদয়াস্ত ভিন্নার্থক।

"দি নিউ রয়েল অন্নপূর্ণা অপেরা পার্টি"-র মানুষগুলোও সেই একই নিয়মে যদিও রোজই ঠিক-দুপুরে রাত-কাবার করেই ওঠে চিরকাল, তবু সেদিন সবাই উঠে পড়েছিল সকাল আটটা-নটার মধ্যেই। আগের রাতে পালা সুরু হয়েছিল সন্ধ্যেবেলাতেই। ফলে আহারাদি সেরে ওরা রাত একটা নাগাদ শুয়ে পড়তে পেরেছিল। আর তাই সেদিন সকালে ওদের এ হেন অকাল জাগরণে নিয়মভঙ্গ।

পৌষের শীতে মিঠে সোনালী রোদে পিঠ দিয়ে চা-এর সঙ্গে বিড়ি-সিগ্রেটের সামেজ সদ্ব্যবহার করতে করতে দলের চাঁইগোছের কয়েকজন মিলে গল্প করছিল,—প্রেমের গল্প।

পালা করে সবাই মহোৎসাহে শুনিয়ে যাচ্ছিল তাদের জীবনের ভালবাসার অভিজ্ঞতা থেকে নানান সরস-রঙীন কাহিনী। সে-ভালবাসা নেহাৎই তথাকথিত ভালবাসা। ক্লেদাক্ত। পঙ্কিল। পথে-প্রবাসে সফরকালে ওদের যত নারী-শিকারের অকথ্য ইতিহাস। কারও বা কোনও কুলবালাকে বিপথে টানার ফিরিস্তি।

গল্প করছিল ওরা বিলক্ষণ গলাবাজি ক'রে। যেন কতবড় বাহাদুরীর কীর্তি সেগুলো।

মধুমঙ্গল একপাশে বসে চুপ করে শুনে যাচ্ছিল ওদের যত পঙ্ককাহিনী। ওর শিক্ষিত ভদ্রমন কিন্তু কিছুতেই তার কোনটাকেও প্রেম বা ভালবাসার কাহিনী ব'লে মেনে নিতে পারছিল না। অস্বাস্থ্যবোধ করছিল।

আরও একজন মুখ খোলে নি। দলের ম্যানেজার-অভিনেতা সদাশিব পাল। মুখ খোলে নি, কিন্তু চোখ দুটো তার জ্বলছিল। হয়ত কৌতূহলে। হয়ত উত্তেজনায়। কিংবা হয়ত বিকৃত কামনায়।

এক-একটা কাহিনী শেষ হয় আর হাসির তুফান ওঠে। তার সঙ্গে সরস যত টীকা-টিপ্পনী আর আদি-রসজরিত ব্যাখ্যার ধুম।

সহসা "সেনাপতি" মুকুন্দ ঘোড়ুই ধ'রে বসেঃ মাষ্টার, তুমি কেনে চুপটি করে রইছ বটে? শুনাও না কেনে তুমার কাহিনী একটি।

আমি?

হাঁ, হাঁ, তুমি।

না, না, আমার ত ওরকম কিছু কখনও—

দলসুদ্ধ সবাই হৈ হৈ করে ছেঁকে ধরে বিব্রত মধুময়কে। কোনও কথা শুনবে না তারা। বিশ্বাসই করবে না যে, ওর এতগুলো বছরের জীবনে প্রেম-ঘটিত কোনও অধ্যায় নেই।

তাই কি কখনও সম্ভব?

নিজেদের দিয়েই যাচাই করে ওরা মধুময়কে।

না মাষ্টার, শুনিব নাই তুমার কুনও কথাটি। কও না কেনে একটি কাহিনী।

আহা, লাজ পাইছ কেনে? বন্ধুজনার পাশে লাজ করিতে নাই হে।

নাছোড়বান্দা। বিপর্যস্ত মধুময় উপায়ান্তর খুঁজে পায় না।

বলে: সত্যি বলছি তোমাদের, আমার জীবনে অমন কোনও ঘটনা ঘটে নি। তবে ভালবাসার গল্প একটা আমি শোনাতে পারি তোমাদের। আর আমার ত মনে হয় যে, এর চেয়ে ভাল ভালবাসার গল্প সারা দুনিয়ায় আজ পর্যন্ত খুব বেশি লেখা হয় নি।

আঁ, ইমন বটে কাণ্ডটি! তালে সিটাই কেনে শুনাও না হে মাষ্টার।

সোৎসুক কৌতূহলে ওরা ঘিরে বসে মধুময়কে।

ভূমিকা-স্বরূপ মধুময় আবার বলে: ভালবাসা অনেকরকম। বহু-বিভিন্ন তার রূপ। আমার গল্পে একই সঙ্গে পাশাপাশি দুটো ভালবাসার নমুনা পাবে। কোন্‌টা কেমন, তা তোমরাই বিচার কর।

সুরু করে মধুময় তার গল্প।

...একটি ছেলে ভালবেসেছিল একটি অসামান্য রূপবতী কুহকিনীকে।

কুহকিনীর কালো ডাগর দু'টি চোখে অতল সায়রের অনির্দেশ কালো রহস্য। কটাক্ষে তার চকিত বিদ্যুৎ। গ্রীবাভঙ্গে মরালীর সার্থক স্বাক্ষর। একঢাল কোঁকড়া কালো চুলে শাওন আকাশের মেঘাড়ম্বর। ভ্রূযুগে মুক্তবলাকার উধাও ইঙ্গিত। ঠোঁটে-গালে বস্‌রাই গোলাপের রক্তাভা। তুঙ্গ বক্ষে উদ্ধত যুগ্ম মৈনাক-স্পর্ধা মক্ষীকটি। ক্রমসূক্ষ্মাগ্র কদলীকাণ্ড-মসৃণ ললিত দু'চরণে বন-ময়ূরীর ত্রস্ত নৃত্যছন্দ।...

বাহবা, বাহবা মাষ্টার!

আহা, আহা! বাহারে!

সোচ্ছ্বাসে কলরব করে ওঠে শ্রোতারা। কেউ বা জারক-আহার্যলুব্ধের মত মুখে চুক্‌চুক্‌ ধ্বনি তোলে।

তারপর মাষ্টার, তারপর?

...ছেলেটির কিন্তু ভালবাসা ছাড়া আর কোনও সম্পদই ছিল না। নিঃস্ব। রিক্ত। বিধবা মায়ের একমাত্র সন্তান।...

উস্‌খুস্‌ ক'রে ওঠে সদাশিব পাল। ন'ড়ে-চ'ড়ে বসে। কেমন যেন একটা চাপা অস্বাচ্ছন্দ্যের আভাস পায় মধুময় তার আচরণে।

জিজ্ঞাসা করে: কী হ'ল?

ত্রস্তে জবাব দেয় সদাশিব: কিছু না ত, কিছু না।

"বিবেক" কালী ধাড়া ফুটন্ত ঔৎসুক্যে ধড়ফড় ক'রে বলে ওঠে: আরে উটার কথা ছাড়ান দাও না কেনে মাষ্টার। তুমি কও দিকি।

মধুময় আবার সুরু করে।

...কুহকিনীকে ভালবেসেছিল ছেলেটি। আত্মভোলা ভালবাসা। কুহকিনী কিন্তু যেন মরীচিকা। দূর থেকে কাছে ডাকে। কাছে এলে আর নেই। ধরা দেয় না।

একদিন ধৈর্য হারাল ছেলেটি। জানাল তার দাবী, তার কামনা, তার প্রার্থনা।

বলল: তোমার জন্যে আমি সব পারি প্রিয়া।

সব পার?

কালো দুচোখে অবশকরা মায়াকটাক্ষ হেনে জিজ্ঞাসা ক'ল কুহকিনী।

দৃঢ় আশ্বাস দিল ছেলেটি: সব।

যা চাইব, দেবে এনে?

বল, কী চাও?

এনে দিতে পার তোমার মায়ের হৃৎপিণ্ডটাকে?

এখুনি।

ছুটল ছেলেটি। নিজের হাতে হত্যা করল নিজের মাকে। উপড়ে নিল তার হৃৎপিণ্ডটা। আবার ফিরে ছুটল সে তার মানসী-প্রিয়ার কাছে আকাঙ্ক্ষিত ভেট নিয়ে।

ছুটতে ছুটতে হোঁচট খেয়ে ছেলেটি লুটিয়ে পড়ল কঠিন পথের ওপর। হাত থেকে তার ছিটকে পড়ল মায়ের রক্তাক্ত হৃৎপিণ্ডটা।

আকুল যাতনায় আর্তনাদ করে উঠল ছেলেটি: উঃ, মাগো!

সঙ্গে সঙ্গে স্নেহঝরা একটি নারীকণ্ঠ শোনা গেল: আহা, বাছারে!

চম্‌কে উঠল ছেলেটি। অবাক হ'ল অপার।

কে কথা কইল? কে বলল ওকথা? কই, কেউ ত নেই কাছে!

অবার কানে এল তার: বড্ড লেগেছে বাবা?

এবার টের পেল, কথা বলছে তার মায়ের উপড়ে আনা হৃৎপিণ্ডটা পথের ধুলোয় প'ড়ে প'ড়ে।...

গল্প শেষ হ'ল।

মধুময় জিজ্ঞাসা করল: কেমন শুনলে?

একটা মুখেও কথা ফুটল না। নিতি রাতে কথার মায়ায় ইন্দ্রজাল সৃষ্টি ক'রে লোক ভুলিয়ে আসর মাৎ করা যাদের পেশা, তাদের অতগুলো লোক হঠাৎ যেন বোবা হয়ে গেল।

কথা বলল শুধু সদাশিব।

হঠাৎ ছটকে দাঁড়িয়ে প'ড়ে পাগলের মতন চিৎকার করে উঠল: মিথ্যা—মিথ্যা মাষ্টার—ডাহা মিথ্যা তুমার কাহিনীটি! গাঁজা! তুমি যদি মাষ্টার না হ'তে ত একটি চড়ে এ্যাত্তুক্ষণ তুমার বদনটি বিগ্ড়ায়্যে দিতাম - হঁা!

অতগুলো মানুষের হতচকিত চোখের ওপর দিয়ে ঝড়ের মতন ছুটে চলে যায় সদাশিব।

তা অবাক্ হবার কথাই বটে। বিশেষতঃ সদাশিবের ওহেন আচরণে।

নামে সদাশিব, কাজেও তাই।

লম্বা-চওড়া মানুষটা। কালো, বছর চল্লিশ বয়েস। সদাহাস্যময় দিলখোলা মানুষ। হাসে গলা ফাটিয়ে হা হা ক'রে। কলজে খালি ক'রে। ছোটবড়র বাছবিচার নেই। সবার সঙ্গে সমান ভাব। দলের চল্লিশটা লোকের আপদ্-বিপদে বুক দিয়ে হামলে পড়ে। অসুখে রাত জেগে অক্লান্ত সেবা করবে। অভাবে পাওনার আশা ছেড়ে দিয়ে নিজের রোজগারের টাকা বিলিয়ে দেবে।

আগে নাকি নামকরা যাত্রাভিনেতা ছিল। শুনেছে মধুময় সেকথা অধিকারী বটুক দাস আর দলের প্রধান অভিনেতাদের কাছে। তখন ছিল যত নামডাক, তত "অনার", তত রোজগার। গুণী লোক।

এখন নিজের দলের ম্যানেজার ক'রে রেখেছে অধিকারী বটুক দাস। এতবড় দলটাকে স্বচ্ছন্দে চালিয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছিল সদাশিব। সদাশিব ছাড়া "দি নিউ রয়েল অন্নপূর্ণা অপেরা পার্টি"-র অস্তিত্ব কেউ আর এখন কল্পনা করতে পারে না। অভিনয় করা আজকাল প্রায় ছেড়েই দিয়েছে। দলের আটখানা চালু পালার মাত্র খানতিনেকে একটা করে কুচো পার্ট সাজে। আর সাজে কেউ কোনদিন অনিবার্যকারণে ব'সে যেতে বাধ্য হ'লে তার বদলে।

মধুময়ের ওপর সেই প্রথম দিন থেকেই সদাশিবের অগাধ শ্রদ্ধা। সে-শ্রদ্ধার পরিচয় পেয়ে এসেছে মধুময় তার প্রতি আচরণে, ব্যবহারে আর কথায়।

বারবার বলেছে সদাশিব: তুমারে পেয়ে দলটি মোদের ধন্য হইছে মাষ্টার, তুমার ইজ্জতে ই পোড়া দলের ইজ্জৎটি দশগুণ বাড়িছে।

সেই সদাশিবের এহেন আচরণে মধুময়ের অবাক্ হবার কথাই ত বটে।

অবিশ্যি সেইদিনই আবার একফাঁকে মধুময়কে একা পেয়ে সদাশিব সকাতরে ক্ষমা চেয়েছে ওর কাছে। স্পষ্ট দেখেছে মধুময়, চোখে-মুখে তার ফুটে উঠেছিল অকৃত্রিম লজ্জা, অনুতাপ আর অনুশোচনার সকরুণ স্বাক্ষর।

বলেছিল: ক্ষ্যামা করে্যা হে মাষ্টার। তুমার পায়ে ধরি, রাগটি যেন করো্যা নাই। পোড়া মেজাজটি তখন ভাল ছিল নাই। তুমার সাধুসঙ্গটি ইতদিন ধরে পেল্যে হইছে কী? এঁটো পাত, সগ্গে ঠাঁই পাব্যে কেনে?

ধাঁধা তাতে ঘোচে নি মধুময়ের। আরও বেড়েছে। দুর্বোধ্য হয়ে উঠেছে ওর কাছে সদাশিব একটা সুকঠিন হেঁয়ালীর মতন।

সবাই জানে, ম্যানেজার সদাশিব পাল সদাশিবের মতনই নিরাগ মানুষ। রাগতে তাকে কেউ দেখে নি কোনদিন। মধুময়ও না।

না না, ভুল হ'ল। আর একবার মধুময় রাগতে দেখেছিল সদাশিবকে। এমনি আকস্মিক আর আশ্চর্য বিজাতীয় রাগ। এমনি করেই হঠাৎ যেন ক্ষেপে উঠেছিল সামান্য একটা তুচ্ছ কারণে।

মনে পড়ে যায় মধুময়ের আবার সেদিনের ঘটনা।...

বছরখানেক আগেকার কথা।

দল তখন মরশুমের গোড়ায় বার হয়ে ঘুরতে ঘুরতে হাজির হয়েছে পিয়ালবনীর বারোয়ারী মেলার গানে।

রাঢ়দেশের বর্ধিষ্ণু সমৃদ্ধ জনপদ পিয়ালবনী। চৈত্রমাসে গাজন উপলক্ষ্যে গাঁয়ের ধর্মরাজ-তলায় মহাসমারোহে সপ্তাহব্যাপী পুজো হয়, উৎসব হয়, মেলা বসে। আর সেখানেই ফীবছর বায়না করে আনা হয় সহর কলকাতার নাম করা য'ত পেশাদার যাত্রাদল।

সেবার গিয়েছিল "দি নিউ রয়েল অন্নপূর্ণা অপেরা পার্টি।"

মধুময় তখন সবে দলে ঢুকেছে। আনকোরা। যাত্রাদলের সবকিছুই তখন ওর কাছে নব নব বিস্ময়।

প্রথম রাতের অভিনয়ের পর দ্বিতীয় সকালে ওরা

ঘুম ভেঙে উঠে নিত্য-অভ্যাসমত গল্প-আলোচনায় তখন মশগুল। আলোচনা হচ্ছিল পূর্বরাতের অভিনয়ে দলের অন্যতম "নম্বরী এাক্টর" বা পাণ্ডা অভিনেতা কুঞ্জ কপালীর একটা মারাত্মক ত্রুটি নিয়ে। রসিয়ে রসিয়ে অঙ্গভঙ্গী সহকারে ব্যাখ্যা করছিল সদাশিব। আর সবাই হেসে হেসে গড়াগড়ি যাচ্ছিল। কুঞ্জ কপালী নিজেও।

এমন সময়ে ওদের কাছে এসে দাঁড়াল একটা ভিখিরী ছেলে।

বছর-চোদ্দ বয়েস। কিন্তু অনাহার-জীর্ণ পাঁজর পাঁকাটি দেহটার জন্যে মনে হয় বছর-দশেক। জলজ্বলে সকরুণ চাহনি। ভয়চকিত ত্রস্ত আচরণ। দেখলেই মায়া হয়।

নীরবে হাত পেতে ভিক্ষে চাইল ছেলেটি।

কী যেন মায়া ছিল ছেলেটির সেই নীরব আবেদনে। দিল ওরা যার যেমন মর্জি। সদাশিব ত দরাজ হাতে দিয়ে ফেলল গোটা একটা দুয়ানি। সব মিলে প্রায় আনা পাঁচেক জমা হ'ল ছেলেটির হাতে। বড় কম রোজগার নয়।

অবাক্ কাণ্ড; তবু ছেলেটা নড়ে না। কী যেন বলতে চায়। অথচ সাহস নেই।

অভয় দিয়ে জিজ্ঞাসা করল সদাশিব: কও বাপ, কও না কেনে। ভয় কী? কও।

আমতা-আমতা করে অত্যন্ত কুণ্ঠার সঙ্গে ছেলেটি কোনমতে জানাল যে, সেদিন একটা গোটা টাকা তাকে রোজগার করে নিয়ে যেতেই হবে।

কেনে? গোটা একটি ট্যাকা কী করিবে বাপ?

ছেলেটি বলল, তার বিধবা মায়ের মরণাপন্ন অসুখ। বিনা চিকিৎসায় বুঝি মারা যায়! গতকাল ডাক্তারবাবুর পা দুটো জড়িয়ে ধরে কেঁদে পড়েছিল ছেলেটি। ডাক্তার নাকি বলেছেন যে, অন্ততঃ একটা টাকা পেলে তিনি ওর মাকে দেখে ওষুধ দিতে পারেন। তাই···

অপার সহানুভূতিতে গ'লে গিয়েছিল সবার মন। টাকাটা পুরো ক'রে দেবার জন্য সবাই আবার পকেটে-ট্যাঁকে হাত দিয়েছিল। সে-হাত কিন্তু আর খুলতে হয় নি কাউকে। খুলতে দেয় নি সদাশিব নিজেই।

ছেলেটির মুখে দুঃখের আবেদনটুকু শেষ হতেই অকস্মাৎ অবিশ্বাস্যভাবে বিক্ষুব্ধ এক অগ্নিগিরির মতন ফেটে পড়েছিল সদাশিব।

হারামজাদা বিচ্ছু কাঁহাকা! ভাঁওতা দিবার আর ঠাঁই পাইছ নাই? নিকালো উল্লুক!

খয়রাতি পয়সাগুলো ছেলেটার হাত থেকে মুচড়ে কেড়ে নিয়ে প্রচণ্ড একটা ধাক্কায় তাকে ছটকে ফেলে দিয়েছিল সদাশিব।

অসহ রাগে ঠক্‌ঠক্ করে কাঁপতে কাঁপতে গলার শির ফুলিয়ে বজ্রহুঙ্কার ছেড়েছিল: নিকালো জোচ্চোর কাঁহাকা! ইঃ, হারামজাদা মোর মাতৃভক্ত মহাপুরুষ আইছেন গো! মেরেই ফেলিব আজ তুর তলপ্যাটে চৌচাপটে দু'টি লাথি বসায়ে। যাও, আভি নিকালো!

অত কথা বলার দরকার ছিল না। প্রথম চোটটার পরেই হতচকিত ছেলেটা গড়াতে গড়াতে উঠে প'ড়ে ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটে পালিয়ে গিয়েছিল। কান্নারও অবকাশ পায় নি। কিংবা হয়ত অপার বিস্ময়াঘাতে কান্নাটুকু তার উবে গিয়েছিল।

অপার বিস্মিত হয়েছিল ওরাও সবাই। মধুময়ের ত কথাই নেই।

বাধা দেবার কেউ অবকাশ পায় নি। কিছু জিজ্ঞাসা করারও নয়।

সদাশিব নিজে থেকেই যেন কৈফিয়ৎ দিয়ে গর্জে উঠেছিল। 'না হে, না। চিন নাই তুমরা ই বজ্জাত ব্যাটাগুলারে, বিচ্ছু এক-একটি, একটি কথাও উটার সত্য না, সব মিথ্যা, সব গুল।'

বলতে বলতে সে নিজেও দ্রুতপায়ে স্থানত্যাগ করেছিল।

মধুময়ের বিস্ময় কমা দূরে থাক্, চরমে উঠেছিল সেদিন বিকেলে।

মেলাতলায় বেড়াতে গিয়ে আবার ওর দেখা হয়ে গিয়েছিল ছেলেটার সঙ্গে। ক'আনা পয়সাও ছেলেটার হাতে তুলেও দিয়েছিল। আর তখনই তার মুখে শুনেছিল যে, সকালে তার সঙ্গে অমন ব্যবহার করেছিল যে সদাশিব, সে-ই আবার দুপুরবেলায় খুঁজে খুঁজে নিজে তার আস্তানায় হানা দিয়ে ডাক্তার ডেকে তার রুগ্না মার চিকিৎসা আর ওষুধ-পথ্যের সব ব্যবস্থা করে দিয়ে এসেছিল একমুঠো টাকা খরচ ক'রে।

মেলা আর ভাল লাগে নি মধুময়ের, ফিরে এসেছিল।

সেই থেকে সদাশিব পাল তার বাহ্যিক সদাশিবত্ব সত্ত্বেও মধুময়ের কাছে হয়ে উঠেছিল একটা জীবন্ত ধাঁধা।

সেই ধাঁধা আরও জটিল হয়ে উঠল এদিনের আচরণে।

আর তার পরেই···

ব্যাপারটা ঘটল জনার্দনপুরে।

দল এসেছিল রাজবাড়ীতে তিন রাতের রাসের বায়নায়। প্রথম দিনই দল পৌঁছবার পর গোমস্তার নির্দেশমত অতিথশালায় তাদের আস্তানার ব্যবস্থা সেরে সদাশিব গেল রাজবাড়ীতে অনুষ্ঠানসূচী নির্ধারণ করতে।

গেল মানুষটা হাসতে হাসতে, ফিরে এল গম্ভীর থম্‌থমে মুখে, হাসি উবে গেছে।

শঙ্কিত বটুকদাস জিজ্ঞাসা করল: 'কি হইছে ম্যানেজার? বাধিছে নাকি কুনও ফ্যাসাদ?

—নাঃ, কিছু না। ফ্যাসাদ হব্যে কেন গো অধিকারী?

মধুময় স্পষ্ট লক্ষ্য করল, স্বাভাবিক ভাবে এই ছোট্ট জবাবটুকু দিতেও যেন সদাশিবকে বিব্রত বলে বোধ হ'ল।

—তবে? মুখখানি অমন আঁধার করিছ কেনে?

ঝাঁকিয়ে জবাব দিল সদাশিব।—মনের আনন্দে হে অধিকারী, মনের আনন্দে! জ্বালায়্যো না ইখনে মোরে, যাও না কেনে তুমার আপন কর্মে, আমার এ্যাখুন সাতশো ঝামেলার মওড়া নিতে হব্যে, সিটা জান নাই?

এর পরে আর ঘাঁটায় নি বটুকদাস, মধুময়ও কিছু জানতে চায় নি। দু'জনের কারোরই সাহস হয় নি।

প্রথম রাতটা ভোর হ'তে না হ'তেই একখানা টেলিগ্রাম হাতে নিয়ে ধড়ফড় করতে করতে ছুটে এল দলের অন্যতম নম্বরী এ্যাক্টর কুঞ্জ কপালী।

খবর এসেছে—মা তার মরণাপন্ন, যেতে হবে, ছুটি চাই।

অমন একজন নম্বরী এ্যাক্টরকে মরশুমের পেপে বার হয়ে ক'টা দিনের জন্যেও ছুটি দেওয়া মানে লোকসান, অথচ কারণটাও এমন, যে ছুটি না দেওয়াও চলে না।

ভেবে-চিন্তে হিসেব ক'রে কপালীকে সাতটা দিনের ছুটি দিতে রাজি হ'ল বটুকদাস।

বেঁকে দাঁড়াল কিন্তু অকস্মাৎ সদাশিব।

কিছুতেই যেতে দেবে না কপালীকে। অবাক্ হ'ল সবাই, এ আবার কেমন সৃষ্টিছাড়া কথা? চিরকেলে পরহিতব্রতী সদাশিবেরই বা এ কেমনধারা বিপরীত আচরণ?

কপালী ত প্রায় কেঁদে ফেলার উপক্রম।

—কও কি ভাই ম্যানেজার? গর্ভধারিণী মা'টি মরিতে চলিছে, ইমনকালে একটিবার শেষ দেখাটিও ঘটিতে দিবে নাই, পোড়াকপালী মা-টির আমি যে একটিই ব্যাটা গো!

বারুদস্তূপের মতন দপ্‌ ক'রে জ্বলে উঠল সদাশিব।

'আহা, বড় গুণের ব্যাটাটি হয়েছ তুমি বটে মায়ের! গানের দলে নাম লিখায়্যে মুখটি উজ্জ্বল করিছ তার। ইতদিন সিই বুড়ীটির কাছে থেক্যে সিটার দুঃখু ঘুচাবার কথাটি মনে পড়ে নাই? সিটা তুমার কর্তব্য না হে? আজ তার মরণকালে দরদ দেখি তুমার বাঁধ মানিছে নাই! ইস্, শেষ দেখাটি করিল্যে হব্যে কি? সগ্‌গের সিঁড়িগুলা তার পাকা হব্যে? তুমার হাতে জল-আগুন ইতকাল না পেয়্যে যখন তার চলিছে, আজিও চলিবে।

কিছুতে ছুটি দেবে না কপালীকে, এক গোঁ।

শেষ অবধি কপালীর কান্না আর বটুকদাসের অনুরোধে যেন অতিষ্ঠ হয়ে হার মেনে বলে ওঠে সদাশিব,—'বেশ, ইতই যাখন বাসনা তুমাদের, তাখন যাক্, শুধু কপালী কেনে, যিটার যিথানে খুশি যাক চল্যে। শেষে আপদ্-ব্যাঠাটি কিছু বাধিল্যে আমারে ধর্যো নাই অধিকারী। এই সাফ কথা কয়্যে দিছি তুমারে, আমি আর তুমার দলটির মুশকিলআসান হত্যে পারিব নাই। না, পারিব নাই—পারিব নাই—পারিব নাই, যাঃ!

দুপ্‌দাপিয়ে ঘর ছেড়ে বার হয়ে যায় সদাশিব।

এক ঘর লোক অবাক্ বিস্ময়ে যেন বোবা হয়ে যায়।

ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই কপালী ছোটে দুকোশ দূরে ইষ্টিশনের দিকে।

এগারটা নাগাদ রাজবাড়ী থেকে গজ্‌গজ্ করতে করতে ফিরে আসে সদাশিব।

খবর দেয়—রাজাবাবুর হুকুম হয়েছে সে-রাতে নির্ধারিত "উর্বশী-উদ্ধারে"র বদলে পালা গাইতে হবে "জামদগ্ন্য" বা "পরশুরামের মাতৃহত্যা।"

খবরটা বটুকদাসকে শুনিয়ে দিয়েই ব'লে ওঠে সদাশিব—নাও হে অধিকারী, সাম্‌লাও কেনে ইবার ফ্যাসাদটি।

মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ে বটুকদাসের।

কে সাজবে পরশুরাম? যার পার্ট, সেই কুঞ্জ কপালী ত ছুটি নিয়ে বাড়ী চলে গেল।...

ভেবেচিন্তে বলে—তা রাজার হুকুমটি না মানিলে চলিবে নাই, দিও কেনে তুমিই আজ রাতে উই পার্টটি চালায়্যে।

—আমি!

চরম বিদ্রোহী হয়ে ওঠে চির-অনুগত সদাশিব।

—কেনে হে? আমি কেনে ঠেলিব বটে নিত্যি তুমার যত গাদার মড়া? আমি ম্যানেজার বটি দলটির, ম্যানেজারী করিব, ব্যস্! দাও-দাও না কেনে আরও দলসুদ্ধ সবারে এন্তার ছুটি কল্পতরু হয়ে, আমি পারিব নাই সঙ সাজিতে, না, কখ্খনো পারিব নাই।

"না" ত না। একেবারে ধনুকভাঙা পণ।

সারাদিনে বটুকদাসের সাতশো অনুরোধ বৃথা গেল, হার মেনে মধুময়কে পাঠিয়েছিল শেষ অবধি, যদি ওর খাতিরেও কথা রাখে।

রাখেনি, অনড়, অটুট সঙ্কল্প।

মুখে সেই এক বুলি -পারিব নাই।

মধুময়কে বলেছিল—তুমারে মান্য করি মাষ্টার, তুমি আমারে ইমন আদেশটি করো্য না নাই, রাখিতে পারিব নাই তুমার আদেশ, করিব নাই আমি উ-পার্ট;...

শুধু একা বটুকদাসই নয়, দলসুদ্ধ সবাই দিশেহারা হয়ে পড়ে।

—মাত্র একটা লোকের জন্যে চল্লিশটা লোক বসে থাকবে? নাকচ হয়ে যাবে এমন লোভনীয় বায়না?...

তুখোড় অধিকারী বটুকদাস উপায়ান্তর না দেখে শেষ অবধি হানল ব্রহ্মাস্ত্র।

বলল—ইত না-না করো্য কামটি কি হে ম্যানেজার? কও না কেনে সত্যকথাটি যে উই পরশুরামের পার্টটি তুমি চালিতে পারিবে নাই, ডর পাইছ!

ব্যস্, ঘৃতাহুতি পেয়ে ধূমায়িত আগুন দপ্ ক'রে শত শিখায় লক্ লক্ করে ওঠে।

—"কি? কি কইছ হে অধিকারী? ইমন কথাটি তুমি কইছ আমারে? তুমি? তুমি আমারে জান নাই? দেখিছ নাই কুনদিন আমার অভিনয়? জেনে-শুনে তুমি আমারে ইতবড় অপবাদটিই দিছ বটে? বেশ, তালে তুমরাও শুন্যে নাও কেনে। করিব—আজই রাতে আমি উই পার্টটি করিব রাতের আসরে। দেখায়্যে দিব, তুমার ঐ নম্বরী এ্যাক্টর কুঞ্জ কপালীই সদাপালের গোদা-চরণের একটি কড়ে আঙুলের যুগ্যিও না। তবে হঁ্যা, ইটাও শুন্যে রাখ কেনে, ইটাই হব্যে বটে ই-দলে মোর শেষ অভিনয়টি—হঁ্যা!

রাগে-অভিমানে আর উত্তেজনায় থর্ থর্ করে কাঁপতে থাকে মাটির মানুষ সদাশিব পাল।

কথা রাখে সদাশিব।

অভিনয় করে বটে সদাশিব সে-রাতে। মনে হয়, যেন পুরাণের পাতা থেকে নেমে এসেছে সেই সত্যিকারের পিতৃভক্ত আর মাতৃঘাতী মূর্তিমান জামদগ্ন্য। অতবড় আসর নিস্তব্ধ হয়ে রইল সারাক্ষণ। হাততালি দিতেও ভুলে গেল সবাই। অভিনয় নয়, যেন সামনে একটানা চার ঘণ্টা ধ'রে একটা অবিশ্বাস্য ইন্দ্রজাল প্রত্যক্ষ করছে।

মুগ্ধ হ'ল মধুময়। এ কোন্ ছদ্মবেশী মায়াবী মহা-প্রতিভা?

আসরের একদিকে সুরক্ষিত রাজাসনে বসেছিলেন খোদ রাজাবাহাদুর। পাশে তাঁর আসর আলো ক'রে বসেছিল রাজাবাহাদুরের অতি পেয়ারের বাঁধা পণ্যা-প্রেয়সী সুপ্রিয়া। স্তম্ভিত রূপসাগর সুপ্রিয়া।

জনার্দনপুরে রাণীমায়ের হুকুমের ওপরে চলে সুপ্রিয়ার হুকুম। রাজার হুকুম নাকচ হয়ে যায় সুপ্রিয়ার সামান্যতম নির্দেশে। সুপ্রিয়ার ভ্রূভঙ্গে নির্ভর করে রাজাবাহাদুরের ওঠা-বসা।

এ হেন সুপ্রিয়া আর রাজাবাহাদুরও মন্ত্রমুগ্ধের মতন বসে থাকেন সদাশিবের অভিনয়ে।

—মাতৃহত্যা ক'রে মাতার ছিন্নমুণ্ড জমদগ্নিকে ভেট দিতে এলো পিতৃভক্ত সন্তান মূর্তিমান কৃতান্তস্বরূপ জামদগ্ন্য। দিল উপহার। আশীর্বাদ করলেন তুষ্ট জমদগ্নি। সহসা—

থরথর করে কেঁপে উঠল জামদগ্ন্য। কঠিন পাষাণ ফেটে অকস্মাৎ যেন বার হয়ে এ'ল মুক্তধারা।

আর্ত্ত হাহাকারে বলে উঠল—"ফিরিয়ে নাও, ফিরিয়ে নাও পিতা তোমার আশীর্বাদ! তুমি পিতা, তুমি স্বর্গ, তুমি ধর্ম, তুমি পরমন্তপঃ। তোমার আদেশ আমি অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছি। কিন্তু এ তুমি আমাকে দিয়ে কি করালে পিতা? সৃষ্টির কোনও সন্তান যে অসাধ্যের কল্পনাও কোনদিন করে নি, তাই তুমি আমাকে দিয়ে সাধন করিয়েছ। আমি স্বহস্তে হত্যা করেছি আমার জন্মদাত্রী অপার স্নেহময়ী স্বর্গাদপি গরীয়সী মাকে। জানো পিতা, মৃত্যুর পূর্বমুহূর্তে মা আমার কি করে গেছেন? অভিশাপ দেন নি। ঘৃণা করেন নি। নিন্দা করেন নি। মা আমার পরম স্নেহভরে ললাটের ওপর এঁকে দিয়ে গেছেন তাঁর শেষ আশীর্বাদ আর ভালবাসা—একটি চুমায় পিতা, একটি শেষ চুমায়! ওঃ, কি করেছি আমি—কি করেছি!

কালাপাহাড় মহাকাল জামদগ্ন্য এই প্রথম ভেঙে পড়ে অনুশোচনায়, অনুতাপে আর আকুল কান্নায়।

এক আসর লোককে চম্‌কে দিয়ে ঠাস করে জামদগ্ন্যের
প্রচণ্ড একটা চড় গিয়ে পড়ে সুপ্রিয়ার নরম গালে।

দুচোখে নামে তার অঝোর গঙ্গোত্রী।…

পালা শেষ হয় উত্তাল প্রশংসা আর করতালি রবে।

আসন ছেড়ে আসরে এসে জামদগ্ন্যের সামনে দাঁড়ান রাজাবাহাদুর আর রাজপ্রিয়া সুপ্রিয়া।

অভিনয় শেষ হয়ে গেছে। জামদগ্ন্য কিন্তু তখনও একই ভাবে একই জায়গায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ফুলে ফুলে কাঁদছে। অভিনয় ভুলে মানুষটা যেন সত্যি সত্যিই হয়ে উঠেছে মাতৃঘাতী আত্মগ্লানিকাতর জামদগ্ন্য।

আলতো ভাবে ওর কাঁধে একটা হাত ছুঁইয়ে অকুণ্ঠ প্রশংসায় রাজাবাহাদুর বলে ওঠেন—সাবাস্, সাবাস্!

মধুর মনোহারী হেসে সুপ্রিয়া বলে ওঠে—আমিও বলি, সাবাস্! ধরো তোমার বকৃশিস।

নিজের একটা চাঁপাকলি আঙুল থেকে ধক্‌ধকে হীরে-বসানো একটা আংটি খুলে সুপ্রিয়া তুলে দেয় জামদগ্ন্যের হাতে।

সঙ্গে সঙ্গে…

এক আসর লোককে চম্‌কে দিয়ে ঠাস্ ক'রে জামদগ্ন্যের প্রচণ্ড একটা চড় গিয়ে পড়ে সুপ্রিয়ার নরম গালে।

অতর্কিতে আঘাতের যাতনায় ককিকে ওঠে সুপ্রিয়া।

আঁতকে ওঠে এক আসর লোক। আঁতকে ওঠে বটুকদাস আর গোটাদলের লোকগুলো।

কি সর্বনাশ! রাজপ্রিয়া সুপ্রিয়ার বরাঙ্গে আঘাত! পাগল নাকি?…

আকস্মিকতার চমকটা মুহূর্তপরেই কাটিয়ে উঠে বজ্র-হুঙ্কার ছাড়েন রাজাবাহাদুর—রামানহাল সিং!

—হুজৌর।

স-বাহিনী ছুটে আসে যমদূতসদৃশ পাইকসর্দার রাম-নেহাল সিং। শিউরে ওঠে সবাই।

পরবর্তী হুকুমটা রাজাবাহাদুর উচ্চারণ করার আগেই ত্রস্তে বাধা দিয়ে সুপ্রিয়া বলে ওঠে—"থাক, চলে এস।" বিস্ময়াহত রাজাবাহাদুরের হাত ধরে টেনে নিয়ে চলে যায় সুপ্রিয়া। পিছু নেয় স-বাহিনী রামনেহাল সিং।

ধরে রাখা গেল না, কিছুতেই না।

দলসুদ্ধ সব্বার শত অনুরোধ ব্যর্থ হ'ল। হাতে ধরে আকুতি জানাল বটুকদাস, কাঁদল। তবুও না।

এক জবাব সদাশিবের: না হে না, তুমাদের হাতে ধরি, আমারে আর থাকিতে বল্যো নাই। পারিব নাই।

বলতে বলতে নিজেও কেঁদে আকুল হ'ল সদাশিব। তবু থাকল না।

সবার বাঁধন ছিন্ন করে ভোর না হতেই নিজের নগণ্য বাক্স-বিছানা নিয়ে ইষ্টিশনের পথে পাড়ি দিল সদাশিব। পৌঁছে দিতে মধুময় সঙ্গে গেল।

ইষ্টিশনে পৌঁছে অবাকের ওপর আরও অবাক্ হ'ল মধুময়।

ছোট্ট জনবিরল ইষ্টিশান। ট্রেন আসতে তখনও কিছু দেরি আছে। সদাশিব ছাড়া আর কোনও যাত্রীও নেই।

ইষ্টিশনের একমাত্র পিঠ-হাতল-বিহীন নড়বড়ে বেঞ্চিটায় ওরা বসে পড়ল ট্রেনের অপেক্ষায়।

সারাটা পথ গরুর গাড়িতে একটাও কথা বলে নি সদাশিব। গুম্ হয়ে বসে ছিল। ইষ্টিশনে এসেও তার সেই একই হাল। যেন মানুষটার দেহটা সামনে থাকলেও মনটা পাড়ি দিয়েছে কোন সুদূর দুর্নিরীক্ষে। নিদারুণ অস্বস্তি বোধ করছিল মধুময়।

সহসা ওর দিকে ঘাড় ফিরিয়ে তাকিয়ে ঈষৎ হাসল সদাশিব। গত দুদিনের মধ্যে এই তার প্রথম হাসি। প্রাণহীন পাংশু।

বলল: অবাক লাগিছে, না মাষ্টার?

খেই পেয়ে মধুময় জবাব দিল: তা একটু লাগছে বৈকি। কী হয়েছে তোমার?

শুনিবে?

মধুময়ের নীরব দ্বিধাগ্রস্ত চোখমুখে সুস্পষ্ট কৌতূহল লক্ষ্য করে সদাশিব আবার বলে: শুন তবে। শুনাই তুমারে। শুনায়্যে বুকটা একটু হালকা কর্‌য়ে নিই না কেনে। ইকথা আর কেউ জানে নাই মাষ্টার, বলি নাই কোনও জনারে। বলিব কী হে? ইটা যে বলিবার কথা না হে, শুনবার না।

উদ্গত একটা দীর্ঘশ্বাস চেপে একটানা সুরে সদাশিব বলে যায় তার গোপন-কাহিনী।

...জ্ঞান হবার পর থেকে সদাশিব তার বাবাকে দেখেনি। বিধবা মার একটিমাত্র আদুরে সন্তান। ত্রিভুবনে আর কোনও আত্মজন ছিল না ওদের। ভিক্ষে করে, ঝি-বৃত্তি করে ওকে বুকে নিয়ে সংসার চালাত ওর মা। ওর গায়ে কিন্তু ওর মা কোনদিন দুঃখের আঁচড়টিও লাগতে দেয় নি।

এমনিভাবে কিন্তু বেশিদিন চলল না।

মানুষ-হায়েনার উৎপাতে ঝি-বৃত্তি করা দুঃসাধ্য হয়ে উঠল ওর যৌবনবতী সুন্দরী বিধবা মার পক্ষে।

হঠাৎ কোথা দিয়ে কী যেন হয়ে গেল। একদিন ওকে বস্তিরই আর একটি বর্ষীয়সী নিঃসন্তান বিধবার হেফাজতে সঁপে দিয়ে কোথায় চলে গেল ওর মা। সদাশিব তাকে ঠানদি বলত। মাঝে মাঝে দু'চার মাস অন্তর মা যখন আবার ওকে দেখতে আসত, ও যেন চিনেও চিনতে পারত না তাকে। কোথায় গেল ওর বিধবা মার সেই ছেঁড়া থান? যে আসত সে এক সালঙ্কারা সুবেশা।

মা আসত নানান উপহার নিয়ে। ওকে বুকে জড়িয়ে আদর করত, চুমায় চুমায় ওর দম বন্ধ করে দিত, আর অঝোরে কাঁদত। থাকত মাত্র ঘণ্টা দুই। তারপরেই বিদায় নেবার আগে ঠানদির হাতে ওর মা দিয়ে যেত গোছা গোছা নোট।

তখন কিছু বুঝত না সদাশিব।

বুঝল আরও বড় হয়ে। টের পেল, সন্তানের জন্য মা বেছে নিয়েছে ঘৃণ্য পণ্যার জীবিকা। আর সেই পয়সাতেই চলে ওর রাজার হালে খাওয়া-পরা-নবাবী।

ছেলে বড় হবার পর থেকে মার আসা-যাওয়া বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। হয়ত মা লজ্জা পেত।

ছেলেরও তখন ওসব নিয়ে মাথা ঘামাবার সময় নেই! লায়েক হয়ে উঠেছে। উড়তে শিখেছে। গান-বাজনা-যাত্রা নিয়েই মত্ত। মা না আসুক, তার টাকা আসত নিয়মিত ঠিকই। আর তাতেই ছিল ও খুশি।

বস্তিরই একটি মেয়ের জন্যে ও তখন পাগল হয়েছে। ভালবেসেছে তাকে। মার রোজগারের টাকা ও উজাড় করে দেয় মনোহারিণীর আবদারে—জামা, কাপড়, গয়না—নানান ফরমাসে।

বিয়ে করবে ও সেই মনোহারিণীকে। মনোহারিণীও রাজি। অপেক্ষা করতে হবে আরও কিছুদিন।

কেন?...

তা কিন্তু ভেঙে বলে না মনোহারিণী।

অপেক্ষায় অপেক্ষায় অধৈর্য হয়ে ওঠে সদাশিব।

এমন সময়ে খবর আসে, ওর মার কঠিন অসুখ। একটিবার দেখতে চায় ওকে।

কিন্তু মার কাছে যাওয়ার ওর তখন অবকাশ কই? মনোহারিণীর দিক্ থেকে মুহূর্তের জন্যেও তখন ওর চোখ ফেরানো চলে না। সেদিকে নজর পড়েছে ওদেরই বস্তি-মালিক জমিদার-নন্দনের।

দিনের পর দিন খবর আসে। আসে মা'র সকরুণ আকুতি। সময় হয় না ছেলের।

শেষ অবধি সবাই একদিন ওকে জোর করে টেনে নিয়ে যায় মা'র কাছে।

মনোহারিণী মধুর হেসে আশ্বাস দেয়: যাও না। অত ভয় কিসের? আমি তোমারই গো, তোমারই থাকব।

গেল সদাশিব। অনেক দেরীতে গেল। মা'র সঙ্গে দেখা হ'ল না। শুনল, অভাগিনী মরার আগে পর্যন্ত আকুল অপেক্ষা করেছে সন্তানের মুখটি একটিবার দেখবে বলে। আশা পূর্ণ হয় নি।

ফিরে এল সদাশিব। ছুটে গেল মনোহারিণীর কাছে। সেখানেও দেখা হ'ল না। ওকে আশ্বাস দিয়ে

পাঠিয়ে দিয়ে ছলনাময়ী মনোহারিণী উধাও হয়ে গেছে জমিদার-নন্দনের সঙ্গে।...

গল্প শেষ করে হঠাৎ হাউহাউ করে কেঁদে ওঠে অতবড় মানুষটা।

কাঁদে আর বলে: আমি মানুষ না মাষ্টার, পিশাচ! পাথর হে, পাথর! যে মা নিজেরে বিকায়্যে আমার দেহে কুনদিন কাঁটার আচড়টি পড়িতে দিছে নাই, একটি সর্বনাশী কলঙ্কিনীর খপ্পরে পড়্যে সিই মা-টিরে দেখা না দিয়্যে আমি তারে খুন কর্‌্যেছি হে মাষ্টার! জামদগ্ন্যের পার্ট আমারে নূতন কর‍্যে কী করিতে হব্যে কও দিকি? আমি নিজেই যে নূতন এক মাতৃঘাতী জামদগ্ন্য হে, আমি যে সত্যিই এক নূতন পরশুরাম!

মধুময়ের ধাঁধার উত্তর এতদিনে মিলে যায়।

বুঝতে পারে—কেন মা আর সন্তানের প্রসঙ্গ উঠলেই অমন করে ক্ষেপে উঠত সদাহাস্যময় সদাশিব। কেনই বা তার, জামদগ্ন্যের পার্ট-এ ছিল এত আপত্তি, আর কেনই বা সেই পার্ট করার পরেই অত সাধের দলটাও সে চিরতরে ছেড়ে দিল, তাও বুঝতে মধুময়ের আর কষ্ট হয় না।

জিজ্ঞাসা করে: কিন্তু কাল রাতে তুমি সুপ্রিয়াকে অমন করে চড় মারলে কেন?

মারিব নাই? উটাই ত হইছে সব অনর্থের মূলটি হে।

ঝাঁ করে জ্বলে ওঠে সদাশিব।

আবার অবাক্ হয় মধুময়।

মানে?

সদাশিব জবাব দেয়: উটার খপ্পরে পড়্যেই না আমি নূতন জামদগ্ন্য হইছি বটে। আবার আমারে জামদগ্ন্য সাজায়্যে বকশিষ দিতে আসিছে কালামুখী?

সে কী!

হাঁ হে মাষ্টার, হাঁ। ত্যাখন নাম ছিল সাবি। এ্যাখন বস্তি ছেড়্যে রাজপ্রাসাদে উঠিছে যে। বস্তির নাম এ্যাখন চলিবে কেনে? তাই নামটি ভাঁড়ায়্যে হয়েছে বটে সুপ্রিয়া। ইঃ, সুপ্রিয়া! প্রিয়া না মাষ্টার, সুপ্রিয়া না, উটা হইছে আসলে একটি বিশ্বপ্রিয়া! উটা সিদিন—

আরও কী যেন বলতে যাচ্ছিল সদাশিব। সময় পায় না।

সগর্জনে ট্রেন এসে থামে ইস্টিশনে।

বেডিং-বাক্স দুহাতে ঝুলিয়ে নিয়ে ছোটে সে কামরার দিকে।

বহুরূপে সম্মুখে তোমার
ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর।
জীবে প্রেম করে যেইজন
সেইজন সেবিছে ঈশ্বর।

স্বামী বিবেকানন্দ

কলিকাতা মহানগরী পুনর্গঠন

শ্রীচিত্তপ্রিয় মুখোপাধ্যায়

দীর্ঘকালের অবহেলা ও অদূরদর্শিতার ফলে কলিকাতা পুনর্গঠন পরিকল্পনা সংস্থাকে (C.M.P.O.) আজ পূর্ব-ভারতের এই স্নায়ুকেন্দ্রটির সর্বপ্রকার সমস্যাই একসঙ্গে সমাধানের কথা ভাবতে হচ্ছে। আর তারই সঙ্গে ভাবতে হচ্ছে, কি ভাবে অগ্রসর হ'লে আজকের এই পুঞ্জীভূত জটিল সমস্যা আপাততঃ মিটে গিয়ে ভবিষ্যতে জটিলতর ও বৃহত্তর আকারে দেখা না দেয়। একাধারে অতীতের ভ্রম ও ত্রুটি সংশোধন এবং ভবিষ্যতের সমস্যার পুনরাবির্ভাবরোধের কথা ভাবতে হচ্ছে।

সমস্যা সবগুলিই জটিল সন্দেহ নেই। সঙ্কীর্ণ স্থানের মধ্যে অত্যধিক লোকের বাস,১ বসতি, জলসরবরাহ,২ জঞ্জাল অপসারণ, যানবাহন, বন্দর সব সমস্যা-গুলিই পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত; কোনটিকেই বাদ দিয়ে অগ্রসর হওয়া চলবে না।

ইউরোপ-আমেরিকাতে নগর পুনর্গঠন নিয়ে ইতি-মধ্যেই অনেক কাজ হয়েছে। যদিও সে দেশের সমস্যা মূলতঃ আমাদের সমস্যার থেকে ভিন্ন প্রকৃতির, তবু সেখানকার বহুবিধ প্রচেষ্টার সঞ্চিত অভিজ্ঞতা যে আমরা কাজে লাগাতে পারছি তার জন্যই আশা করা যায় যে আজ যে ব্যাপক গবেষণা ও অনুসন্ধান চলছে তার সুফল আমরা অচিরে পাব।

কলিকাতা শহর সম্বন্ধে এক বিশেষজ্ঞ কিছুদিন আগে লিখেছিলেন:

"The mass of the city presents the standa[rd] features of Indian urbanism . . . . villas hidd[en] in great gardens in the better suburbs; and, de[s]pite decades of piece-meal improvements, va[st] areas of 'bustees', the hovels of the submerg[ed] proletariat . . . as the most revolting expr[es]sions of our industrialism. . . . ."

"Of all the cities, Calcutta cared most f[or] money and least for men. . . . ." (O.H.K. Spat[e], India and Pakistan.)

শহরের কেন্দ্রস্থল থেকে বসতি অপসারণের চেষ্টা আজকে নতুন নয়,৩ কিন্তু এতকালে

১। ১৯৫১ সালের আদমশুমারী অনুযায়ী কলকাতা কর্পোরেশনের অন্তর্ভুক্ত ২৮·৩৪ বর্গমাইলের মধ্যে লোকসংখ্যা ছিল ২৫,২১,০০০ অর্থাৎ বর্গমাইল-পিছু ঘনত্ব ৮৮,৯৫৩। কলকাতা শহর, হাওড়া, টালিগঞ্জ, ভাটপাড়া, গার্ডেনরীচ ও "সাউথ সাবার্ব"-এই ৭০ বর্গমাইলের লোকসংখ্যা ৩৪,৮০,০০০ : বর্গমাইল-পিছু ঘনত্ব ৪৯,৬৮২; আর যদি কলকাতার এলাকা ও লোকের সংখ্যা বাদ দিয়ে হিসাব করি, তা হ'লে বাকি বহিরঞ্চলের ঘনত্ব বর্গমাইল-পিছু ২৪,৬৯০। এই অঞ্চলসহ পার্শ্ববর্তী ৩৫টি মুন্সি-প্যালিটির মোট এলাকা ১৬৪ বর্গমাইল, লোকসংখ্যা ৪৬,২৮,০০০ ; ঘনত্ব ২৮,২০০ এবং বহিরঞ্চলের ঘনত্ব ১২,৫৪০। ১৯৬১ সালে কলকাতা শহরের লোক সংখ্যা বেড়েছে মাত্র শতকরা ৮ ভাগ, পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে লোকসংখ্যা ৪৬ লক্ষর স্থলে দাঁড়িয়েছে ৫৫,৫০,০০-এ। নদীর পশ্চিমাঞ্চলের ১৩টি শহরের ৪২ বর্গমাইলে লোকসংখ্যা এখন ৮,৮০ হাজারের স্থলে ১১,৪৭ হাজার, পূর্বাঞ্চলের ৮৩ বর্গমাইলে লোকসংখ্যা ১০,৫০ হাজারের স্থলে ১৪,৭৬ হাজার। এই স্বল্পএলাকার ঠিক বাইরের হিসাব অনুরূপ। হাওড়া, হুগলী, ২৪ পরগণা জেলা এবং পশ্চিমে খড়্গপুর ; উত্তর-পশ্চিমে বর্ধমান ও উত্তরপূর্বে রাণাঘাট, কৃষ্ণনগর, এই এলাকার মধ্যে মেদিনীপুর, বর্ধমান ও নদীয়া জেলার অংশ, এই সব অঞ্চলের মোট এলাকা ১৩,৭৮৫ বর্গমাইল, কলকাতা ও শিল্পাঞ্চল বাদ দিলে ১৩,৩৫৩ বর্গমাইল। এই সমস্ত অঞ্চলের বর্গমাইল পিছু ঘনত্ব হচ্ছে মাত্র ৭৬৫ জন (৯৫১)।

লণ্ডন শহরের হিসাব হচ্ছে : London County Councilএর ১১৭ বর্গমাইলের ১৯৫৪ সালের লোকসংখ্যা ৩৩,৪৮ হাজার, বর্গমাইল পিছু ঘনত্ব মাত্র ২৮,৬১৫ (কলকাতার সঙ্গে তুলনীয়)। "Greater London"এর এলাকা হচ্ছে ৭২১ বর্গমাইল, লোকসংখ্যা ৮২ হাজার, বর্গমাইলে ঘনত্ব ১১৩৭০ এবং London County Councilএর এলাকা ও জনসংখ্যা বাদ দিয়ে হিসাব করলে বহিরঞ্চলের ঘনত্ব ৮০৪১ জন আর লণ্ডনের চারপাশের চল্লিশ মাইলের বেশি ব্যাসের মধ্যে যে লো[ক] বসতি তার এলাকা হচ্ছে প্রায় ৫০০০ বর্গমাইল, লোকসংখ্যা ১ কোটি লক্ষ, বর্গ-মাইল পিছু ঘনত্ব ২৫00 মাত্র এবং বহিরঞ্চলের ঘনত্ব ম[াত্র] ৮৮১ জন। London Passenger Transport Area বলতে যে এলা[কা] বোঝায় তার মোট স্থান হচ্ছে মাত্র ২000 বর্গমাইল। কলকাতা এ[বং] লণ্ডনের বহিরঞ্চলের ঘনত্বের পার্থক্য বিশেষ ভাবে লক্ষণীয়।

২। ১৯৩১-৩২এ কলকাতার পরিস্রুত জলের সরবরাহ ছিল দৈনি[ক] ৫৯·৬ মিলিয়ন গ্যালন, ১৯৫0-৫১তে ৬১·৫ মিলিয়ন গ্যালন, কিন্তু মা[থা] পিছু দৈনিক সরবরাহের অঙ্ক প্রথমোক্ত বছরে ৫৫·৩ গ্যালন, শেষে[র] বছরে ২৬·৫ গ্যালন।

৩। কলকাতা শহরে ১৯২১ সালে পাকা বাড়ী ছিল ৪৪,৭২১টি, ও বস্তি বাড়ী ছিল ৫,২০৩টি ১৯৫১ সালে পাকা বাড়ীর সংখ্যা দাঁ[ড়ায়] ৭৮,৬৯৭টিতে, আর বস্তি বাড়ীর সংখ্যা নেমে আসে ৩,৯৯০টিতে।

—"While new 'bustees' are discouraged a[nd] perhaps prevented,—except those that grow on [the] sly,—by the Trust in the city, new bustees a[nd] slums are raising their ugly leads just outs[ide] its jurisdiction in Tollygunj".—*Census*; 195[1]

চেষ্টার পরেও হালের এক হিসাবে দেখা যাচ্ছে যে, শহরের প্রায় একচতুর্থাংশ ভাগে অর্থাৎ ৪৮০০ বিঘা জমি জুড়ে ১,৯০,০০০টি পরিবারের প্রায় ৭ লক্ষ লোক বস্তিতে বাস করছে। প্রতি একর জমিতে ১২০টি পরিবার থাকবে, এই হিসাবে দেখা গেছে, এদের সকলের জন্য উপযোগী বাস করতে গেলে প্রতি বাসা-পিছু ৬০০০৲ খরচ করতে হবে৪ এবং তার জন্য মোট ১১৩·৪০ কোটি টাকা লাগবে। তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় সহরের বস্তি সংস্কারের খাতে টাকা বরাদ্দ আছে মাত্র ৫·৪৮ কোটি টাকা। তবু, যতই দুঃসাধ্য ও সময় সাপেক্ষ কাজ হোক না কেন,—সুরু ত একসময়ে করতেই হবে।

কিন্তু আরেকটি সমস্যা এই সঙ্গেই থেকে যাচ্ছে; এতকাল যে ভাবে দূর-দূরান্ত থেকে নিছক নিরুপায় হয়েই লোকে কর্মসংস্থানের আশায়৫ এখানে এসে জমা হয়েছে, সেই হারেই যদি লোক আসতে থাকে, প্রস্তাবিত বাসা তৈরীর কাজ সেই হারে যদি অগ্রসর হতে না পারে, তা হলে কি করণীয়? শহরে যদি তাদের স্থান না হয়, তারা গিয়ে জমা হবে শহরতলী অঞ্চলে, ১৯৬১ সালের আদমসুমারী হিসেব থেকে তার ইঙ্গিত পাওয়া গেছে।

অন্যান্য সমস্যাগুলির মধ্যে যে সমস্যাটি বিশেষভাবে প্রতিদিনই আমাদের স্মরণ করতে হচ্ছে, সেটি যানবাহন সমস্যা।৬ অফিস যাতায়াতের পথে রোজ যে অসাধ্য-সাধন আমাদের করতে হচ্ছে, সময়ের যে অপচয় হচ্ছে, তার যথাযথ সংখ্যাতাত্ত্বিক হিসাব নিরুপণ করা সম্ভব নয়। বৃহত্তর ব্যাসের 'সার্বাবণ' যাত্রী-যাতায়াতের ব্যবস্থা যত উন্নত হবে কলকাতার আভ্যন্তরীণ চলাচল, ব্যবস্থাও সেই অনুপাতে বাড়াতে হবে।...ইতিমধ্যেই সরকার নানান ব্যবস্থার কথা ভাবছেন; 'বাস'এর সংখ্যা বাড়ানো হচ্ছে, ট্রলিবাস-এর কথা হচ্ছে, ট্রাম কোম্পানি কোন কোন লাইনে ট্রামের জন্য স্বতন্ত্র পথের ব্যবস্থা করে দুটির বদলে তিনটি 'কোচ' চালাবার প্রস্তাব করেছেন; ময়দানের কাছে দ্বিতীয় ব্রীজ করার প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে; ডালহৌসি স্কোয়ারে লোক পারাপারের জন্য সুড়ঙ্গ পথ এবং মাটির নিচে 'কার পার্ক'এর (Car Park) কথাও বিবেচনা করা হচ্ছে। 'সার্কুলার রেলপথ'-এর দুটি বিকল্প প্রস্তাব কয় বছর আগে বিবেচিত হয়েছিল; পরে এই প্রস্তাবও হয়েছে যে, কলকাতার জমি লেনিনগ্রাডের জমির মত হওয়াতে সেখানকার ধাঁচে আমরা সুড়ঙ্গ রেলপথের কথাও বিবেচনা করব।

কলকাতার বিচিত্র সমস্যা সমাধানের এই যে বহুমুখী প্রচেষ্টা চলেছে তার অন্যতম লক্ষ্য হচ্ছে, এই স্বল্প-পরিসর স্থানের লোক-বসতি হাল্কা করা, ৭ যারা শহরে

৪। Village Housing Scheme-এ দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা কালে গ্রামাঞ্চলের বাড়ী তৈরী, মেরামতির জন্য যে খরচ করা হয়েছিল, তাতে দেখা যাচ্ছে প্রতি বাড়ীর জন্য খরচ হয়েছিল আনুমানিক ৬৬৩৲ টাকা। শহরে পাকাবাড়ীর যে খরচের হিসাব বিভিন্ন সূত্র থেকে পাওয়া যাচ্ছে, তাতে দেখা যায় কম করে ৩০০০৲ ব্যয় হচ্ছে।

5. "We know that for a certain section of the migrants, the trek to the city has not meant much improvement in even economic conditions. They have simply exchanged an irregular ill-paid occupation in the rural areas for an almost similar job in the city" : *The City of Calcutta : A Socio-economic Survey.*

৬। হাওড়া, হুগলী, ২৪ পরগণা এবং ২নং পাদটীকায় উল্লিখিত পার্শ্ববর্তী জেলাগুলির এলাকাসহ মোট ১৩,৫০০ বর্গমাইলের মধ্যে রেলপথ হচ্ছে প্রায় সাড়ে ছশো মাইল। কয়লার বদলে ইলেকট্রিসিটির সাহায্য এর মধ্যে মোট ৯০০ মাইল পথে অদূর ভবিষ্যতে রেলগাড়ি চলবে। বর্ধমান ও তারকেশ্বর লাইনে ইলেকট্রিসিটি-চালিত গাড়ি চলার ফলে দৈনিক ট্রেন ৬১টির স্থলে চলছে ১২৬টি, লোক যাতায়াত করছে দৈনিক ৭২০০০এর স্থলে দুই লক্ষ জন। ইষ্টার্ণ রেলওয়ের হিসাবে বর্তমানে হাওড়া, শেয়ালদাতে দৈনিক ৪০৯টি 'সাবার্বন ট্রেন' ও ২৯০টি 'প্যাসেঞ্জার' ট্রেন চলাচল করছে; ইষ্টার্ণ রেলপথই ১৯৬০-৬১তে ১৮ কোটি ২৬ লক্ষ যাত্রী বহন করেছে, তন্মধ্যে শেয়ালদা ষ্টেশন মারফতেই ১১ কোটি ৭১ লক্ষ যাত্রী যাতায়াত করেছে।

—কলকাতা শহরে মোট রাস্তার দৈর্ঘ্য হচ্ছে ৪৭০ মাইল; এর মধ্যে সব রাস্তা ট্রাম-বাস চলাচলের উপযোগী নয়। কলকাতার মধ্যে ট্রাম পথ হচ্ছে ৩৭·৩৪ মাইল, হাওড়ায় ৪·৭৫ মাইল; ট্রামের সংখ্যা ৪৫৮টি; ২৭টি 'রুট'-এ দোয়া চারশো ট্রাম দৈনিক ৪২০০০ মাইল পথ চলাচল করে প্রায় ১০ লক্ষ যাত্রী দৈনিক বহন করে।

সাম্প্রতিক হিসাবে জানা যাচ্ছে ৭৫০টি সরকারী বাস এর মধ্যে ৫৭৫টি বাস দৈনিক চলাচল করে ৭৩,৮০০ মাইল পথে এবং মোট ১১,৬৮-০০০ যাত্রী বহন করে। অর্থাৎ প্রতিটি 'বাস' আনুমানিক ২০০০ যাত্রী দৈনিক বহন করে।

London Passenger Transport Area বলতে সহরের ২৫ মাইল ব্যাস ধরা হয়; এর মধ্যে প্রায় এক কোটি লোকের বসবাস; রেলপথ ২৬০ মাইলের মধ্যে সুড়ঙ্গ পথের রেল ৯০ মাইল; মোট ষ্টেশনের সংখ্যা ২৮০। যাত্রী-বহনের জন্য মোট ৪০২০টি রেল-কোচ, ৭২৭০টি বাস এবং ১০৭০টি ট্রলিবাস ব্যবহৃত হয়।

7. In spite of a large coast line all round, excellent perennial posts, a most efficient, searching and far-reaching network of railways, a most superb road system. Capable of taking the heaviest of traffic, an almost completely electrified country, an all-embracing sewerage system, in spite of a high powered, determined Royal Commission,

থাকবে তাদের সকলের জীবনযাত্রা আরও সহনীয় করা এবং যারা শহরের বাইরে বসবাস করছে ও করবে আর কর্মোপলক্ষ্যে রোজ শহরে যাতায়াত করবে, তাদের আসাযাওয়ার সহজ ব্যবস্থা করা।

পরিকল্পনা ও তার রূপদানে জনসাধারণের পক্ষে সক্রিয়ভাবে যোগদান করা সম্ভব নয়, তবে সমস্যাগুলি বোঝবার এবং আলোচনায় যোগদান করার প্রয়োজনীয়তা সব দেশেই আছে, আমাদের সরকারও এই প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করেন। অতএব গ্রামীণ জীবন পুনরুজ্জীবনের ও দেশের উৎপাদন-ব্যবস্থা বিকেন্দ্রীকরণের যে বৃহত্তর প্রচেষ্টা চলছে, সেই ব্যবস্থার সুদূর-প্রসারী ফল কলকাতার ক্ষেত্রে কি হবে সে আলোচনায় প্রবৃত্ত না হয়েই, প্রাসঙ্গিক দু'টি বিষয়ের অবতারণা করছি; একটি হচ্ছে, কলকাতা ও পার্শ্ববর্তী শহরগুলির এবং খড়্গপুর, বর্ধমান, রাণাঘাট, কৃষ্ণনগর, বসিরহাট, ক্যানিং ও ডায়মণ্ডহারবার, এই এলাকার অন্তর্ভুক্ত স্থানে যে সব রেলপথ ও রাস্তা আছে বা তৈরী হবে সেই সমগ্র অঞ্চলের জমির মূল্য, ব্যবহার ও হস্তান্তর নিয়ন্ত্রণ করা; অপরটি হচ্ছে, কলকাতার আভ্যন্তরীণ যানবাহন ব্যবস্থা।

কয় মাস আগে কলকাতার টিরেটা বাজারে ৫০০০৲ টাকায় এক কাঠা জমি বিক্রী হয়েছে। কলকাতার সর্বত্র এবং বৃহত্তর কলকাতার যেখানেই উন্নয়নমূলক কাজ হবার কথা হচ্ছে, সেই সব স্থানেই জমির দাম বেড়ে চলেছে। দূরদর্শী ধনশালী ব্যক্তিরা বুঝতে পারছেন, এই অঞ্চলে জমি কেনবার কাজে তাদের টাকা খাটানো এক হিসাবে সোনা কিনে টাকা মজুত করার চেয়েও লাভজনক। এই ঊর্ধ্বমুখী মূল্যের বহুদূর-বিস্তৃত প্রতিক্রিয়া সমাজের সর্বস্তরে কিভাবে পৌঁছাচ্ছে, সে কথা বিশদভাবে আলোচনা না করেও এইটুকু বোঝা যায় যে নগর পুনর্গঠন পরিকল্পনার সঙ্গে জমির মূল্যবৃদ্ধির অব্যাহত গতি এবং জমি যদৃচ্ছ ব্যবহারের অবাধ স্বাধীনতা পরস্পরবিরোধী।৮

এ কথা ঠিক যে, জমির মূল্য, হস্তান্তর ও ব্যবহার নিয়ন্ত্রণের অস্ত্র সরকারের হাতে আছে, সেই অস্ত্র প্রয়োগও করা হয়, কিন্তু এর ব্যবহারের পরিধি সামান্যই, প্রয়োগ-পদ্ধতিও সময়সাপেক্ষ; এবং সময়মত কোন সুনির্দিষ্ট পন্থা অনুসরণ না করার ফলে অর্থব্যয়ও বেশি হয়।

'কল্যাণী', 'পাতিপুকুর', 'সল্ট লেক' ইত্যাদি এলাকাতে সরকার যেভাবে জমি ব্যবহার ও মূল্য-নিয়ন্ত্রণ করছেন, এই পদ্ধতি বৃহত্তর কলকাতার সর্বত্র প্রয়োগ করতে হলে বর্তমান জমি-মালিকানার নিয়মের যে আমূল পরিবর্তন দরকার সেটি সরকার করবেন কি না বা সে চেষ্টা সফল হবে কি না সেই প্রশ্নই অনিবার্য ভাবে আসে। যে দেশের সংবিধানে ব্যক্তিগত সম্পত্তি ভোগের অধিকার স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে, সে দেশে জমির মত সম্পত্তি হস্তান্তর ভোগ ও বিক্রয়ের অধিকার একটি বিশেষ এলাকার লোকের হাত থেকে কেড়ে নেওয়া চলে না। আর একথাও মানতে হবে, শুধুমাত্র জমির মূল্য ও ব্যবহার সম্পূর্ণরূপে রাষ্ট্রায়ত্ত হলেই সব সমস্যার সহজ সমাধান হবে না।

---

and in the face of extreme vulnerability to sea and air attack, it has not been possible to deflate London and displease its industries more evenly. . . . . Where such 'dispersal . . . would have added little, by comparison with a similar problem of ' Calcutta, to poduction costs". *Census* : 1951.

"The precise definition of Greater London is a matter of opinion. . . . . During the 1950's, the population of the inner areas has continued to fall and this has been accompanied by significant increases throughout a wide area beyond the official conurbation." . . . . *Britain* : *An Official Handbook* 1961.

৪. "The price of land may now, by specific legislation, be divorced from the operation of the 'free market' and fixed on other rational principles such as the pegging of the pice to that of pre-inflation period or bringing it into some sort of relation with the purchase price of the owner so that the unearned increment is denied to him. . . . ." (*C. I. T. Report*, 1960-61).

খুব সম্প্রতি কেন্দ্রীয় সরকার গৃহনির্মাণ সমস্যার সূত্রে এই ধরণের সিদ্ধান্ত গ্রহণের বা অনুমোদনের কথা ভাবছেন, জানা যায়, সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গ সরকারও ভাবছেন দেখলাম। এই সূত্রে রবীন্দ্রনাথের উক্তি উল্লেখযোগ্য: "জমি যদি খোলা বাজারে বিক্রি হয়ই, তাহলে যে ব্যক্তি স্বয়ং চাষ করে তার কেনবার সম্ভাবনা অল্পই।...অন্য কোন কারণে বাংলার উৎপন্ন ফসলের প্রতি যদি মাড়োয়াড়ি দখল-স্থাপনের উদ্দেশে ক্রমশ প্রজার জমি ছিনিয়ে নিতে ইচ্ছা করে, তাহলে অতি সহজেই সমস্ত বাংলা তার ঘানির পাকে ঘুরিয়ে তার সমস্ত তেল নিংড়ে নিতে পারে।...আমাদের দেশের মূঢ় রায়তদের জমি অবাধে হস্তান্তর করবার অধিকার দেওয়া আত্মহত্যার অধিকার দেওয়া--।" (রায়তের কথা: ১৩৩৩।). কলকাতা ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের পুনর্গঠনের সূত্রে এই উক্তি বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য।

এই প্রসঙ্গ নিয়ে সুদীর্ঘ আলোচনার মধ্যে প্রবেশ না করেও এই কথা বলা চলে যে, রাষ্ট্রের কল্যাণে ইতিমধ্যেই যখন নানান ক্ষেত্রে ব্যক্তি-স্বাধীনতা খর্ব করা হচ্ছে, তখন কলকাতার মত সমস্যাজর্জরিত শহরের ভবিষ্যৎ রূপ যাই আমাদের কল্পনাতে থাকুক না কেন, এর পুনর্গঠনের ক্ষেত্রে, জমির মত মহার্ঘ্য জিনিসের ব্যবহার, মূল্য ও হস্তান্তরের উপর কঠোর নিয়ন্ত্রণ প্রয়োগ না করলে কুড়ি বা তিরিশ বছর বাদে বৃহত্তর পরিধির মধ্যে আমাদের আরও জটিলতর সমস্যা সমাধানের জন্য চেষ্টা করতে হবে।

বাংলা দেশের লোকসংখ্যার তুলনায় জমির পরিমাণ স্বল্পতর হয়ে চলেছে; চাষের জমির উৎপাদন-ক্ষমতা অসাধারণ ভাবে না বাড়লে আমেরিকার মত আমরা চাষের উপযোগী জমি অন্য কাজে ব্যবহার করতে দিতে পারি না, অথচ এলোমেলো ভাবে শহর গড়ে ওঠার ফলে একদিকে যেমন চাষের জমি অন্য ব্যবহারে চলে যাচ্ছে, অপর দিকে শহর পুনর্গঠনের কাজও ব্যয়সাধ্য হয়ে উঠছে।

ইংলণ্ডের মত শহরপ্রধান দেশে জমির ব্যবহার-নিয়ন্ত্রণ কিছু দেরিতেই সুরু হয়েছে। আমরা সবে শহর পুনর্গঠনের কথা ভাবতে সুরু করেছি, জমি রাষ্ট্র-নিয়ন্ত্রণাধীন করবার কথাও ভাবা হচ্ছে; কিন্তু আশঙ্কার কথা এই যে, যাঁরা মুনাফা এবং আশু সুবিধা ছাড়া কিছু বোঝেন না, তাঁরা সরকারের থেকেও দ্রুতগতিতে দেশের ভবিষ্যৎ উন্নতির রাস্তা বন্ধ করছেন।

প্রস্তাবিত এলাকার মধ্যে জমির মূল্য, ব্যবহার ও হস্তান্তর, রাষ্ট্রের সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণাধীন করার নীতি গৃহীত হবে এই সিদ্ধান্ত যদি হয়, তা হলে তারই আনুষঙ্গিক ও পরবর্তী কাজ যা করণীয় তা স্থির করা কঠিন কাজ নয়। অনেকে জমি রাষ্ট্রায়ত্ত করার ফলে কি কি অসুবিধা হবে, তা সবিস্তারে ব্যাখ্যা করবেন, সরকারী অযোগ্যতার দরুণ কি কুফল হতে পারে তাও বলবেন, কিন্তু এর বিকল্প প্রস্তাবটি কি হতে পারে সেটিও তা হলে সেই সঙ্গে বলতে হয়। —ভবিষ্যতে কলকাতা বিকেন্দ্রীকরণের প্রস্তাব যাই হোক না কেন, জমির মালিকানা ও মূল্যের উপর কঠোর নিয়ন্ত্রণ আনা হচ্ছে পুনর্গঠনের প্রথম ধাপ।

কলকাতার আভ্যন্তরীণ যানবাহন সমস্যা মেটাতে হ'লে আমাদের অনেকগুলি বিকল্প প্রস্তাব ভাববার অবকাশ আছে: পিপ্‌ল্‌স্ কার (Peoples Car) অথবা আরও বেশি ট্রাম-বাসের ব্যবস্থা। ট্রাম-বাসের বদলে বা তারই সঙ্গে ট্রেন চলাচল ব্যবস্থা সম্ভব কি না? সুড়ঙ্গ পথে রেলগাড়ী চাই, না বম্বের মত ট্রেন হলেই চলবে? পরবর্তী সংখ্যায় এ বিষয়ে আলোচনার ইচ্ছা রইল।
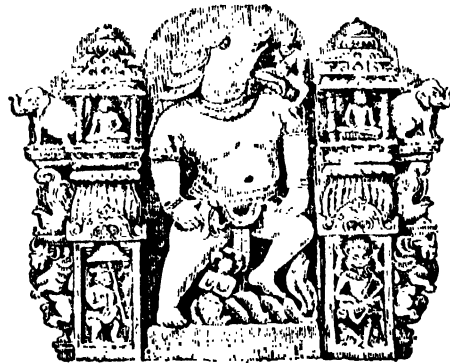
রাজনারায়ণ বসুকে লিখিত পত্রাবলী

ওঁ

বিনীত নমস্কার নিবেদনঞ্চ

অনেকদিন আপনাকে পত্রাদি লিখি নাই এবং অনেক দিন হইতে আপনার মঙ্গল সংবাদ প্রাপ্ত হই নাই। আপনার শরীর কেমন আছে এবং আপনার পারিবারিক সংবাদ কিরূপ অনুগ্রহপূর্ব্বক লিখিলে সুখী হইব। আমার শরীর বড় ভাল নাই। আমার স্ত্রীর শরীরে বাত প্রবেশ করিয়াছে। মধ্যে তিন মাস পর্য্যন্ত ইলাদেবী আমরক্ত পীড়ায় অত্যন্ত কষ্ট পাইয়া এক্ষণে ভাল হইয়াছে। পৃথ্বীনাথ, সংজ্ঞা দেবী ও দিবানাথ ভাল আছে। পূজ্যপাদ মহর্ষিদেবের শরীর আজকাল আরো একটু দুর্ব্বল হইয়াছে। পূজনীয় দ্বিজেন্দ্রনাথ বাবু বাতে কষ্ট পাইতেছেন। আমার পৃথক্ সমাজ মিট্ মিট্ করিয়া চলিতেছে। আদি সমাজের একটি পিপীলিক দ্বারাও একটু সাহায্য পাই না। কত সাধ্য সাধনা করিলাম কিন্তু কাহারও দ্বারা একদিন একটু গান গাওয়াইতে পারিলাম না। কিন্তু সে জন্য দুঃখ নাই, যত দিন শরীর থাকিবে, সাধু সঙ্কল্প রক্ষা করিবার চেষ্টা করিব।

ব্রাহ্মধর্ম্মেরবীজটা ইংরাজীতে অনুবাদ করিয়া পাঠাইবেন। আপনাকে এই অনুরোধ করিবার জন্য পূজ্যপাদ আমায় আপনাকে লিখিতে আদেশ করিলেন।

ইতি ৮ই কার্ত্তিক ৬৪

স্নেহাকাঙ্ক্ষী

শ্রীপ্রিয়নাথ শাস্ত্রী

48, Mirzapur Street.

ওঁ

চুঁচুড়া, ২রা বৈশাখ ১৩০৩

ভক্তিভাজন মহাশয়,

বহু দিবস আপনার প্রকাশ্য আশীর্ব্বাদ প্রাপ্ত হই নাই, আশা করি অত্র পত্রোত্তরে আশীর্ব্বাদ প্রাপ্ত হইব।

আজ আপনার সম্বন্ধে একটী গুরুতর বিষয় জানিবার জন্য এই চিঠিখানি লিখিতেছি। যদি বে আদবি হয় তাহা হইলে বালক ও শিষ্য বোধে ক্ষমা করিবেন। আমি কাহারও নিকট শুনিয়াছি যে পাহাড়ি বাবা আপনার ষোল আনা গুরু। এ কথা কি সত্য? যদি সত্য হয় তবে তাহা কি-ভাবে? প্রাচীন প্রথা যেমন মন্ত্র গ্রহণ বা নবীন প্রথা যেমন শক্তি সঞ্চার—এই দুইয়ের কোন এক ভাবে অথবা অন্য কোন প্রকারের তিনি আপনার গুরু।

এই কথা বিশেষ করিয়া আমার জানিবার অভিপ্রায় এই যে—কয়েক বৎসর হইতে ব্রাহ্ম সমাজে গুরু লইয়া বিশেষ ভাবে আন্দোলন চলিতেছে। ইহাতে একদল গুরু আনুগত্য স্বীকার করিয়াছেন, একদল তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত; আর ইহার মধ্যে কয়েকটি লোক মধ্যবর্ত্তী পথ অবলম্বন করিয়া আছেন এবং শেষোক্তদের মধ্যে কেহ এ বিষয়ের তথ্য নিরূপণ করিবার জন্য উৎসুক আছেন। আপনি আমাদের একজন প্রধান উপদেষ্টা, বাল্যকাল হইতে ধর্ম্মালোচনা করিয়া বৃদ্ধ হইয়াছেন, সুতরাং গুরু সম্বন্ধে আপনার অভিজ্ঞতা ও তাহার আবশ্যকতা বিষয়ক মত আমার নিকট খুব বেশী মূল্যবান্ হইবে বলিয়া মনে করি, অতএব কৃপাপূর্ব্বক উহা জানিতে দিলে চিরকৃতজ্ঞ হইব।

আমি এখন এই চুঁচুড়াতে অবস্থিতি করিতেছি, আমার গৃহিণী হুগলীর ডফারিন হাঁসপাতালের লেডি ডাক্তার। আমার দুটি পুত্র হইয়াছে। আমি নিজে এখানে একটি সভা করিয়াছি, তাহাতে রবিবার ব্যতীত প্রতিদিন ব্রহ্মজ্ঞান সম্বন্ধে আলোচনা হয়—নাম অমিয় সভা। আর এখানে একখানি "পূর্ণিমা" নামক মাসিক পত্রিকা আছে তাহাতে প্রায় প্রতি মাসে ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় একটি প্রবন্ধ লিখিয়া থাকি। অত্র স্থানীয় একটি নববিধান সমাজ আছে, তাহাতে মধ্যে মধ্যে উপাসনা করিয়া থাকি। আপনি বোধহয় জানিয়া থাকিবেন যে আমি মহর্ষির নিকট প্রচারক ব্রত গ্রহণ করিয়াছি কিন্তু আমি কোন সমাজের বিশেষ ভাবে প্রচারক নাহি। আশীর্ব্বাদ করুন, আমি যেন আপনার অনুগত হইয়া ও আপনাদের আশীর্ব্বাদ লাভ করিয়া চিরজীবন ভগবানের সেবায় জীবন অতিবাহিত করিতে পারি। আমি সপরিবারে ভাল আছি। আশা করি আপনার শরীর সুস্থ আছে, আপনার পারিবারিক কুশল সংবাদ জানিতে পারিলে আনন্দিত হইব। নিবেদন ইতি—

আশীর্ব্বাদাকাঙ্ক্ষী

শ্রীকুঞ্জবিহারী সেন

১০ই ডিসেম্বর

শ্রীচরণকমলেষু

কংগ্রেসের সময় ভারতবর্ষের নানা স্থান হইতে আগত ব্রাহ্মদের সম্মিলন সভা হইবে। এখানকার সমস্ত ব্রাহ্মের একান্ত ইচ্ছা এই যে মহাশয় সেই সময় উপস্থিত থাকিয়া সভাপতির কার্য্য করেন। বিদেশীয় ব্রাহ্মদের অভ্যর্থনার যে এক কমিটি হইয়াছে, সেই কমিটিতে মহাশয়ের নাম থাকে, সকলেরই সেই বাসনা। মহাশয়ের অভিপ্রায় জানাইয়া অনুগৃহীত করিবেন। ইতি

শ্রীকৃষ্ণকুমার মিত্র

হিন্দু সমাজ, বিবাহ ও নারী

শ্রীমিনু রায়

আদিকাল থেকে আজ পর্য্যন্ত ভারতের সমাজ-ব্যবস্থার বিশ্লেষণ করলে যে বৈশিষ্ট্য সর্ব্বাধিক প্রকট হয় তা সংরক্ষণশীলতা। যুগে যুগে সে ব্যবস্থার পরিবর্ত্তন হয়েছে সত্য, কিন্তু তার কতটা সময়োচিত? বিতর্কের অতীত না হলেও এ কথা অবশ্যস্বীকার্য্য যে, ব্যবস্থার গতিশীলতা ক্রমান্বয়ে ক্ষুণ্ণ হয়ে এসেছিল। সমাজের আদিস্রষ্টারা যে উদার দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে ব্যবস্থাবিধি প্রণয়ন করেছিলেন, সে উদারতা, সে প্রসারতা কালক্রমে সমাজের একটা ক্ষুদ্র অংশের স্বার্থ-ব্যাঘাতের আশঙ্কায় বিসর্জ্জিত হ'ল; তার স্থান নিল সংকোচনের নীতি—অস্বীকৃত হ'ল আদি অর্থ। এই সংকোচনের নীতি কতটা সামগ্রিক সমাজ-কল্যাণে অনুপ্রাণিত, তা ইতিহাসে সুস্পষ্ট।

সমাজের বৃহত্তর অংশকে ক্রমে ক্রমে মানুষের প্রাথমিক অধিকারসমূহ থেকে বঞ্চিত করার মূলে স্বার্থসাধনের উদ্দেশ্য অপ্রকট নয়। শিক্ষার অধিকার লুপ্ত ক'রে অন্ধসংস্কারে জনসাধারণকে নেশাগ্রস্ত করার প্রয়াস আধিপত্য বিস্তারের সুগম সোপান হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছিল। অশিক্ষা, কুশিক্ষা, কুসংস্কারে ও আচারের অত্যাচারে জনসাধারণ জর্জ্জরিত হ'ল; মনন-শক্তি, বিচার-শক্তির স্থান নিল অন্ধসংস্কার ও অর্থহীন আচার। বাধা-নিষেধের প্রাচীরে ধর্ম্মকে সঙ্কুচিত ক'রে, বৃহত্তর কল্যাণের নীতি উপেক্ষা ক'রে শুধু ক্ষুদ্র অংশের স্বার্থ অক্ষুণ্ণ রাখার নীতি শোষণেরই নামান্তর। সমাজ-রক্ষার নামে শোষণ-ব্যবস্থা মর্ম্মে মর্ম্মে উপলব্ধি করেও তা প্রতিহত করার সাহস তখন জনসাধারণের ছিল না। অপ্রিয় হলেও, কল্যাণবিরুদ্ধ হলেও প্রতিবাদ বা প্রত্যাখ্যান শাস্ত্রীয়বিধান বহির্ভূত!

বিক্ষোভের আলোড়ন প্রথম দৃষ্ট হয় খ্রীষ্টপূর্ব্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে—সংস্কারের দাবী নিয়ে জৈন ও বৌদ্ধ মতের আবির্ভাবে। বৈদেশিক আক্রমণের সঙ্গে সঙ্গে রাজ-নৈতিক পরিবর্ত্তন প্রভাবিত করল সমাজজীবন। স্থাণু সমাজ যখন বারংবার আক্রমণে পর্য্যুদস্ত তখন সামাজিক কর্ণধারগণের আক্রমণাত্মক নীতিগ্রহণের সামর্থ্য লুপ্ত। আভ্যন্তরীণ সংঘাতের ভয়ে যে-নীতি প্রয়োগ করা হয়েছিল, সেই নীতিই প্রযুক্ত হ'ল বৈদেশিক আক্রমণ প্রতিরোধে। সে প্রতিরোধ আত্মরক্ষারই সামিল। স্বীয় পরিধিকে ক্ষুদ্র হ'তে ক্ষুদ্রতর ক'রে আত্মরক্ষার চেষ্টা ব্যর্থ ক'রে দিল সামাজিক বিধানের আদিস্রষ্টাদের মূল উদ্দেশ্য। বিভিন্ন জীবনধারা যখন এসে মিলেছে ভারতের বুকে, তখন সমন্বয়-সাধনের পরিবর্ত্তে অস্বীকৃতির দ্বন্দ্ব পশ্চাদপসরণের পথই চিহ্নিত ক'রে গেছে।

এই সঙ্কোচননীতির পর্য্যালোচনায় প্রতীয়মান হবে সমাজ-নেতাদের সমাজ-চেতনাবোধের অভাব, নীতিজ্ঞান অপেক্ষা দলীয় স্বার্থবুদ্ধির প্রখরতা আর অদূরদর্শিতা। ধীরে ধীরে সমাজদেহে স্থাণুত্ব এনে দেওয়ার বিরুদ্ধে যুগে যুগে প্রতিবাদ হয়েছে সংস্কারকদের প্রচেষ্টায়। কিন্তু সংস্কারের প্রয়াস ও উদ্যম সামগ্রিক কল্যাণ উদ্দেশ্যে নিয়োজিত হওয়া সত্ত্বেও আশানুরূপ সাফল্যলাভ করে নি। প্রধান অন্তরায় শিক্ষার দীনতা, যার ফলে কুসংস্কারের মায়ামন্ত্রে তখন বৃহত্তর অংশ চেতনাহীন।

স্বার্থসাধনের সাময়িক উদ্দেশ্যসিদ্ধির মূলে বর্ণ-বিভাগে উত্তরাধিকার নীতির প্রয়োগ, যার কঠোর অনুসরণে সবচেয়ে বেশী বিপন্ন হ'ল নারী। "বর্ণ" কথার অর্থ "বৃত্ত" অর্থাৎ "কর্ম্ম" এবং কর্ম্মক্ষেত্রের ভিত্তিতে বর্ণবিভাগ জীবিকা-সংস্থানের প্রয়োজনে সৃষ্ট হ'লেও সাধনার ধনকে সহজলভ্য করার জন্য উত্তরাধিকার সূত্রের আরোপে অধিকার হ'ল জন্মগত। সমর্থনে সংযোজিত হ'ল ঋগ্বেদের পুরুষসূক্ত:

"ব্রাহ্মণোঽস্য মুখমাসীদ্ বাহূ রাজন্যঃ কৃতঃ।
ঊরূ তদস্য যদ্বৈশ্যঃ পদ্ভ্যাং শূদ্রো অজায়ত॥"

(ঋগ্বেদ: ১০, ৯০, ১২)

অর্থাৎ, "সেই প্রজাপতির মুখ হইল ব্রাহ্মণ, বাহু হইল রাজন্য অর্থাৎ ক্ষত্রিয়, ইহার ঊরু হইল বৈশ্য এবং পদদ্বয় হইতে জন্মিল শূদ্র।"

(ক্ষিতিমোহন সেন, জাতিভেদ: পৃ: ৭)

কিন্তু জন্মসূত্রে বর্ণবিভাগের স্বার্থ-পরিচিন্তা আশঙ্কা নারীর স্বাতন্ত্র্যে অমূলক নয়। শিক্ষায় স্বাধীন সত্তার বিকাশে নীতির পরিমাপ হয় যুক্তিসঙ্গতে। তাই নারীকে হীন প্রতিপন্ন ক'রে তার সত্তাবিলোপের প্রয়াস।

মনু বলিলেন, নারীদের বিন্দুমাত্র সংযম নাই, কামে মোহিত করিয়া পুরুষকে ভ্রষ্ট করাই তাহাদের কাজ।

(মনু—২, ২১৩-১৪)

মনু বলেন, শ্রুতিতে ও স্মৃতিতে নারীর ব্যভিচার-শীলতা সুপ্রসিদ্ধ (৯, ১৯)। তাই শ্রুতি অনুসারে পুত্রকেও কোন কোন স্থলে বলিতে হয়, আমার মাতা যে পরপুরুষলুব্ধা ব্যভিচারিণী হইয়া বিচরণ করিতেছিলেন, তাহার দৈহিক অশুচিত্ব আমার পিতা শুদ্ধ করুন।

যন্মে মাতা প্রলুলুভে বিচরন্ত্য পতিব্রতা।
তন্মে রেতঃ পিতা বৃঙ্ক্তাম্ ইত্যস্যৈতন্নিদর্শনম্॥
(মনু: ৯,২০)

(ক্ষিতিমোহন সেন, জাতিভেদ: পৃঃ ১৫৪)

সুতরাং নারী নীতিহীনা, সংযমহীনা, ব্যভিচারিণী, দুর্নীতির মূল; তার উত্তরণ সতীত্বের কষ্টিপাথরে পরীক্ষাসাপেক্ষ।

বৈদিক সমাজে দেখি নারীকে ব্রহ্মচারিণীরূপে—বেদ-ব্যাখ্যায় পুরুষের চেয়ে কম পারদর্শিনী নয়—নারী বক্তা, কলাবিদ্যায় অগ্রণী। গুরুগৃহে সহশিক্ষা ব্যবস্থায় থেকে জ্ঞানবিজ্ঞানে পারদর্শিতালাভে নারীকে সহায়তা করেছে সে সমাজ। স্মৃতির আমল থেকে ক্রমঃ অধঃপতনের ফলে নারীর বেদমন্ত্রে অধিকার লুপ্ত হ'ল; এমন কি তার উপনয়নেরও প্রয়োজন নেই। বিবাহ স্থান নিল উপনয়নের, গুরুগৃহবাস স্বামী-সেবায়। সুতরাং শিক্ষায় অনধিকার নারীকে শূদ্রের পর্য্যায়ে নিয়ে এল। পুরুষের সম-অধিকারে অধিষ্ঠিতা নারী পর্য্যবসিত হ'ল পরাশ্রিতা লতায়—

পিতা রক্ষতি কৌমারে ভর্ত্তা রক্ষতি যৌবনে।
রক্ষন্তি স্থবিরে পুত্রা ন স্ত্রী স্বাতন্ত্র্যমর্হতি॥
(মনু: ৯, ১৩)

"এই জন্য কোন কালেই নারীরা স্বাধীনতা লাভ করিবার যোগ্য নহে। সর্ব্বদাই তাহাদের থাকা উচিত পিতা, পতি বা পুত্রের অধীন হইয়া। (মনু: ৯-১৩)" —(ক্ষিতিমোহন সেন, জাতিভেদ, পৃঃ ১৫৪)

পূর্ব্বে অসবর্ণ বিবাহ যদিও নিন্দনীয় ছিল, বিরল ছিল না। বর্ণসঙ্করের উদ্ভবে বর্ণ-বিশুদ্ধির নীতি প্রয়োগ ব্যর্থ হওয়ার সম্ভাবনা অনস্বীকার্য্য। তাই নারীর ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য বর্ণবিশুদ্ধির অন্যতম অন্তরায় ব'লে অশিক্ষার যূপ-কাষ্ঠে নারীকে বলি দেওয়া সঙ্কোচন নীতির আর এক ধাপ—যার ফলে সমাজ প্রায় গতিশীলতারহিত হয়ে পড়ল।

নারীর উত্তরণ হ'ল বিবাহে। শিক্ষায় অনধিকার ও ও বর্ণরক্ষার কঠোর অনুশাসনের ফলে বাল্যবিবাহের প্রবর্ত্তন, সঙ্গে সঙ্গে নারী সমাজের দায়রূপে পরিণত হ'ল। অনিবার্য্য ফলস্বরূপ পুরুষের যথেচ্ছাচার রূপ পেল বহুবিবাহে, পণপ্রথা প্রবর্ত্তনে এবং নারীর একাধিক বিবাহ শাস্ত্রবিরুদ্ধ ঘোষণায়। এমন কি পুত্রহীন বিধবা পুত্রলাভের জন্যও যদি বিবাহ করে—যে পুত্র দ্বারা ধর্ম্মানুসারে পিতৃঋণ শোধ হয়—তার অনন্তনরক বাস।

"অপত্যলোভাদ্যা তু স্ত্রী ভর্ত্তারমতিবর্ত্ততে।
সেহ নিন্দামবাপ্নোতি পতিলোকাচ্চ হীয়তে॥
নান্যোৎপন্না প্রজাঽস্তীহ নচাপ্যন্য পরিগ্রহে।
ন দ্বিতীয়শ্চ সাধ্বীনাং কচিদ্ভর্ত্তোপদিশ্যতে॥
(মনুস্মৃতি, ১৬১-১৬২)

The woman who by desire for progeny transgresses the husband, is open to censure in this world and will fail to reach the world of her husband.

The offspring produced by another is not deemed lawful here nor that begotten in another man's wife. To righteous women no second husband is ever allowed."

(Pandit A. Mahadeva Sastri: *The Vedic Law of Marriage*: p. 61.)

বৈদিক আমলে উদারনৈতিক ব্যবস্থার ফলে নারী সর্ব্বক্ষেত্রে উৎকর্ষসাধন ক'রে পুরুষের প্রকৃত সহায়রূপে স্বীকৃতিলাভ করেছিল, প্রতিটি সমাজ-বিধির পেছনে পুরুষের সমমর্য্যাদার আভাস সুগভীর; নারীর সেখানে মানুষ হিসাবে পরিচয়। বিভেদনীতির শরণে লাভ সাময়িক এবং সামগ্রিকভাবে বিচারে ক্ষতি পরিণামে বিশেষভাবে অনুভূত হয়। কারণ এক অংশের অস্বীকারে স্বার্থভোগী অংশের অবচেতন মনে শৈথিল্যের সূচনা কাল-ক্রমে সারা দেহমনে ব্যাপ্তি অবশ্যম্ভাবী। পুরুষের বহু-বিবাহ শাস্ত্রসম্মত; পদস্খলনেও নারীর সেবা প্রাপ্য; পুরুষ যখন সম্ভোগের পূর্ণ স্বাধীনতার অধিকারী, তার উচ্ছৃঙ্খলা সমাজবিধিবিরুদ্ধ নয়, নারী তখন রিক্তা, শাস্ত্রীয় অনুশাসনে মৃতপ্রায়—যে নারী পূর্ব্বে কুমারী-মাতা হয়েও সমাজচ্যুতা হয় নি, বিধবা হয়েও পুন-র্বিবাহে শাস্ত্রের সম্মতিলাভে বঞ্চিত হয় নি, যে নারীর বহুবিবাহ ছিল শাস্ত্রীয়বিধানসম্মত।

পুরুষ-নারীর সম্পর্ক—যাকে ভিত্তি ক'রে সমাজের পত্তন—এই অসমব্যবস্থায় তা কতটা হিতকর বিচার্য্য। বিবাহ প্রথায় এই সম্পর্কের নিশ্চিত প্রয়োজন স্বীকৃতি লাভ করেছে; কিন্তু এই স্বীকৃতির মূলে সমগ্র সমাজের যে কল্যাণ প্রয়াস, পরবর্ত্তী যুগে তা কতটা ফলপ্রসূ হয়েছে?

পৃথিবীর মানব সমাজের পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করলে

বিবাহের আদি এবং মুখ্য উদ্দেশ্য দাঁড়ায়—মানুষের জৈবিক প্রয়োজনকে সুনিয়ন্ত্রিত করা, সমাজকে সংযত, সুশৃঙ্খল রাখা ও উত্তরোত্তর উন্নত সমাজ গ'ড়ে তোলা। হিন্দুধর্ম্মে বিবাহ ধর্ম্মানুষ্ঠান ; ধর্ম্ম, অর্থ, কাম—এই ত্রিবর্গ লাভের সোপান। সমাজের হিতসাধন গার্হস্থ্যাশ্রমের মাধ্যমে এবং গার্হস্থ্যাশ্রম পালনের উপর পরবর্ত্তী উন্নততর আশ্রমপ্রবেশের যোগ্যতানির্ভরশীল ব'লে বিবাহে বিশেষ গুরুত্ব আরোপিত। এই বিবাহ মনুর মতে পূর্ণতালাভ করে সপ্তপদী অনুষ্ঠানে—

"পাণিগ্রহনিকা মন্ত্রা নিয়তং দারলক্ষণম্।
তেষাং নিষ্ঠা তু বিজ্ঞেয়া বিদ্বদ্ভিঃ সপ্তমে পদে॥"

অর্থাৎ পাণিগ্রহণমন্ত্র স্ত্রীত্বের সুনিশ্চিত লক্ষণ। বিদ্বান্‌গণ জ্ঞাত হোক্ যে, এই মন্ত্রসকল পূর্ণতা লাভ করে সপ্তম পদক্ষেপণে।

সপ্তপদী মন্ত্রে পাই—

"সখসাপ্তপদা ভব, সখায়ো সপ্তপদা বভুব, সখ্যং তে গমেয়, সখ্যাত্তে মা যোষং, সখ্যান্মে মা যোষ্ঠা।
সময়াব সঙ্কল্পাবহৈ সং প্রিয় রোচিষ্ণু সুমনস্যমানৌ।
ইষমূর্জ্জমভি সংবসানৌ সং নৌ মনাংসি সং ব্রতা
সমুচিত্তান্যাকরম্॥

"A friend shalt thou be, having paced these seven steeps with me. Nay, having paced together the seven steps, we have become friends. May I retain thy friendship, and never part from thy friendship. Let us unite together : let us propose together. Loving each other and ever radiant in each other's company, meaning well towards each other, sharing together all enjoyments and pleasures, let us join together our aspirations, our vows and our thoughts." (Tai, Eka. 1, iii, 14). (Pandit A. Mahadeva Sastri : *The Vedic Law of Marriage* ; p. 10.)

যেখানে বর বধূকে তার সমস্ত কাজে, চিন্তায় সখারূপে আহ্বান জানাচ্ছে, নারী সেখানে পুরুষের সমপর্য্যায়ে, নারী সহকর্ম্মিণী, সহধর্ম্মিণী। সুতরাং পুরুষের সঙ্গে সমতা অর্জ্জনের জন্য সুযোগ লুপ্ত হয়ে গিয়ে শুধু মন্ত্রোচ্চারণের মাধ্যমে বিবাহের পূর্ণতালাভ হয়ত সংস্কারে দাঁড়িয়ে যেতে পারে, কিন্তু প্রকৃত উদ্দেশ্য সেখানে ব্যাহত এবং ব্যর্থ।

পুরুষ-নারী সম্পর্কের এই পরিণতির মূলে শিক্ষা-সংকোচন এবং সমাজের ওপর এর প্রতিফলন অতি সুস্পষ্ট। বাল্যবিবাহের কঠোরতায় পণপ্রথা সমাজের প্রতিটি পরিবারকে আর্থিক সমস্যার সম্মুখীন করায় নারী সমাজের দায়স্বরূপ হ'ল। প্রাচীর-বেষ্টিত যে জীবন—সে নারীর আর্থিক সহায় হওয়া কল্পনাতীত।

দ্বিতীয়তঃ, কলা, বিজ্ঞান, সাহিত্য প্রভৃতি সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে একটা বিরাট্ অংশের দান থেকে সমাজ হ'ল বঞ্চিত। সতীদাহে যে শক্তির শুধু অপচয় নয়, অস্বীকার ; বাল্যবিবাহে যে শক্তির বিকাশের পথ রুদ্ধ, সে শক্তি উপযুক্ত প্রণালীতে চালিত হ'লে সমাজের প্রগতির সহায়ক হ'ত সন্দেহ নেই।

তৃতীয়তঃ, একদিকে নারীবিরুদ্ধ প্রচারণা, অন্যদিকে নারীর পরনির্ভরশীলতা—এই দুইয়ের সুযোগ পুরো-মাত্রায় পুরুষ গ্রহণ করেছিল, যার ফলে পুরুষের উচ্ছৃঙ্খলতা, ব্যভিচারশীলতা সমাজে সংক্রমিত হ'ল। অতি অল্পবয়সে বিবাহব্যবস্থায় এবং বিধবাবিবাহ-নিরোধে সমাজে নৈতিক মান আরও বিপর্য্যস্ত হ'ল। জৈবিক বিজ্ঞানকে ভিত্তি ক'রে যে বিধিব্যবস্থা গ'ড়ে ওঠে নি, বাস্তবজীবনে তার প্রয়োগে এ বিপর্য্যয় অতি স্বাভাবিক।

চতুর্থতঃ, অশিক্ষা ও বাল্যবিবাহ প্রথা—এই দুইয়ের সমন্বয়ে বলিষ্ঠ জীবন বা বলিষ্ঠ উত্তরাধিকার প্রত্যাশা বাতুলতা মাত্র। অশিক্ষাপ্রসূত ব্যক্তিত্বহীনতা উত্তরাধিকারসূত্রে দীনতাই দিয়ে যায় ; বৃহত্তর অংশের এই দৈন্যে সমাজ হ'ল মেরুদণ্ডহীন।

পঞ্চমতঃ, অসমভিত্তিতে বিবাহের ফলে অসুখী বিবাহিত জীবন সমাজব্যবস্থার সুস্থতার নির্দ্দেশ দেয় না। এক অংশের স্বাতন্ত্র্যহীনতার ফলে জীবনযাত্রায় স্বাভাবিকতার অভাব যদিও বাহ্যিকভাবে ব্যাপক অনুভূত নয়, নির্য্যাতনপ্রসূত মানসিক দ্বন্দ্বে এক পক্ষের আত্মাহুতির দৃষ্টান্ত একেবারে দুর্ল্লভ নয়।

তদুপরি আছে সমাজের ওপর বিভেদনীতির বিষময় প্রতিক্রিয়া। মানুষের কর্ম্মক্ষেত্র জন্মসূত্রে নির্দ্ধারিত হওয়ায় সমাজের প্রতি তার অবদান হল সীমাবদ্ধ। কিন্তু প্রতিভার স্ফুরণ, বুদ্ধিমত্তার উন্মেষ কিংবা নৈপুণ্যের বিকাশ—কখনই এই শ্রেণীবিভাগ স্বীকার করে না। সুতরাং প্রচলিত ব্যবস্থায় জাতীয় মান জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে নিম্নাভিমুখী হওয়া অনিবার্য্য। একদিকে বৃহত্তর শক্তির অপচয়, অন্যদিকে প্রতিদ্বন্দ্বিতার অভাবে কর্ত্তব্য-নিষ্ঠায় শৈথিল্য—ফলে উন্নতির পরিবর্ত্তে পতন ত্বরান্বিত হ'ল।

সমাজের এই অবস্থার প্রতিকার প্রয়োজন এবং প্রতিকার সম্ভব হবে নারীকে পুরুষের সম-অধিকার প্রদানে। কিন্তু বিরুদ্ধবাদীরা শুধু শাস্ত্রীয় বিধান নয়, বিজ্ঞানের যুক্তিও হয়ত উত্থাপিত করবেন। নারীকে

হীন প্রতিপন্ন করার মূলে কতটা স্বার্থপ্রণোদিত উদ্দেশ্য নিহিত তা আগেই দেখেছি শাস্ত্রকে শস্ত্ররূপে ব্যবহারে। তার পর, বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ের ডাঃ কে. এম. কাপাডিয়া (*Reader in Sociology*) তাঁর "*Marriage and Family in India*" বইয়ে বলেছেন :

"Modern scientific thought has clearly shown that there is nothing inherents in the fact of sex deny any privilege to women. Inferiority of women is socially imposed, and cannot be explained on rational or psychological grounds. The consequence is woman's demand for equality and her insistence on recognition of her personality." (Chapter VIII, p. 171.)

নারীর দৈহিক বা মানসিক গঠনে এমন কিছু নেই যা তার পুরুষের সম-অধিকার লাভের প্রতিবন্ধক। বিরুদ্ধে যুক্তি না থাকলেও কতজন এ ব্যবস্থা গ্রহণে অভিলাষী ?

সংরক্ষণশীলতা মানুষকে এমনই প্রভাবিত ও পরাভূত করে যে, তার ন্যায়-অন্যায়-বোধ, বিচারশক্তি লোপ পেয়ে যায়। তার ওপর সংস্কারের বিরুদ্ধে ন্যায়ের আচরণে একটা শঙ্কা, একটা ভয় আমাদের মনকে অধিকার ক'রে আছে। এ ভয় অমূলক এবং এই বিভ্রান্তি দূরীকরণ অবশ্য এবং আশু কর্ত্তব্য। মন যেখানে অন্ধ, সংস্কার-মুক্তি সেখানে দুরাশা মাত্র। শত সহস্র বৎসরের মোহ-মুক্তি মিলিত প্রচেষ্টা এবং সময়সাপেক্ষ। অবস্থার চাপে, অর্থনৈতিক বিপর্য্যয়ে এবং রাজনৈতিক প্রভাবে নিদ্রাভঙ্গ হয়েছে, তন্দ্রাভঙ্গ হয় নি। বিধবাবিবাহ আইন-সঙ্গত হয়েও সমাজে পুরোপুরি গ্রহণযোগ্য হয় নি; বাল্যবিবাহ আইনতঃ নিরোধ হয়েও বন্ধ হয় নি; বিবাহবিচ্ছেদ আইন-অনুমোদিত ঘোষণাতেও সমাজের সম্মতি কতটা পেয়েছে ?

তাই প্রথমে মানসিক প্রস্তুতি প্রয়োজন এবং এ প্রয়োজন উভয় পক্ষের। মনকে সক্রিয় ক'রে তুলতে, তার স্বকীয় বিচারে কার্য্যক্ষম করতে শিক্ষার অংশ বিরাট্। শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে ভাবের আদানপ্রদানে জড়তার স্থান নেবে গতিশীলতা, যার সঙ্গে সময়োচিত পরিবর্ত্তনের যোগাযোগ অবিচ্ছেদ্য।

যে-সকল সংস্কারকে আমরা ধর্ম্ম ব'লে আখ্যা দিয়ে এসেছি, সে-ধর্ম্মের মূল্য কতটুকু ? বাস্তব যেখানে রূঢ় এবং দ্বন্দ্ব যেখানে অবিরত, সেখানে যে ধর্ম্ম বর্ত্তমানকে অস্বীকার করে, ভবিষ্যৎকে অদৃষ্ট বলে, সে ধর্ম্মের আশ্রয়ে বাঁচার আশ্বাস কোথায় ? প্রকৃত ধর্ম্ম নীতিজ্ঞান যার উপলব্ধি হয় শিক্ষায়।

এই নীতিজ্ঞানরহিত হয়ে উদ্দেশ্যপ্রণোদিত বাল্য-বিবাহকে আমরা স্বীকার ক'রে নিয়েছি সমাজের বিধান রূপে। শাস্ত্রের বিধান যতটা না থাক্, সংস্কারের ভয় ছিল অত্যধিক। কারণ বৈদিক মন্ত্রে পাই :

"গৃহান্ গচ্ছ গৃহপত্নী যথাঽসো বশিনী ত্বং
বিদথমাবদ স্ব,
সম্রাজ্ঞী শ্বশুরে ভব সম্রাজ্ঞী শ্বশ্র্বাং ভব।
ননান্দরি সম্রাজ্ঞী ভব, সম্রাজ্ঞী অধিদেবৃষু ॥"

এই মন্ত্রে বধূকে যে দায়িত্ব গ্রহণের আহ্বান, তার যোগ্যতা অর্জ্জন, অপরিণতবুদ্ধি সাংসারিক জ্ঞানশূন্য শিক্ষাহীন বালিকার পক্ষে সম্ভব নয়। বৈদিক মন্ত্র-সকল উল্লেখ ক'রে পণ্ডিত এ. মহাদেব শাস্ত্রী তাঁর *The Vedic Law of Marriage* বইয়ে বলেছেন :

"It is clear that the woman about to marry must be of an adult age, because she must have arleady been duly educated and trained for the due discharge of the household duties, and also learnt all about the *Vedic* law and ideals of married life. . . . . At any rate, the modern system of child marriage is directly opposed to the *Vedic* Law." (p. 142.)

এ সম্পর্কে বিজ্ঞানের সমর্থন কতটা নিম্নোক্ত উদ্ধৃতি থেকেই পরিষ্কার হবে :

"Hindu tradition requires a girl to be married at the latest by the time she has attained puberty. It has now been realized that although puberty indicates the beginning of the sex-instinct in woman, it does not suggest her maturity for sex-life. The body requires at least three years for proper development of the sex-organs in woman and her sex-life should be postponed at least for that period. Marriage should, therefore, be delayed until, at least, three years after reaching puberty. . . . . This is justified as nature's dictate. It should, however, be accepted as the minimum age, but not as the desirable age for marriage." (Dr. K. M. Kapadia : *Marriage and Family in India* : Chapter VII, pp. 151-152.)

সুতরাং বাল্যবিবাহ প্রচলনের পেছনে কোন যৌক্তিকতা নেই—কি শাস্ত্রের, কি বিজ্ঞানের। এর নিরোধে সমাজ-কল্যাণের একটা বড় দিক্—নারীর ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য স্ফুরণের সুযোগ সম্ভাবনা। বিধবা-বিবাহ আইনসম্মত হওয়ার ফলে নারীর পুরুষের সম-অধিকার লাভের যে ইঙ্গিত করে, বিবাহবিচ্ছেদ এবং পুনর্বিবাহের অনুমোদনে তা পূর্ণতা লাভ করবে।

সতীত্ব, সেবা, সহিষ্ণুতা এবং আত্মত্যাগ—এই

আদর্শের ওপর নারীর জীবনধারণ নির্ভরশীল ব'লে বিধবা-বিবাহ, বিবাহবিচ্ছেদ অথবা পুনর্বিবাহ আমাদের সমাজে অভাবনীয়। কিন্তু অন্য প্রয়োজন বাদ দিয়েও অন্ততঃ মানবিকতাবোধে এ ব্যবস্থার অনুমোদন অত্যন্ত অভীপ্সিত। বিবাহ যেখানে দুর্যোগ সৃষ্টি করে এবং মানসিক পীড়ন ও দৈহিক নির্য্যাতনের কারণ হয়ে দাঁড়ায়, সেখানে একপক্ষের আত্মবিলোপে সুস্থতার নির্দেশ নেই; প্রকৃত সমাধান শুধু বন্ধনমোচনে। তাতে দুপক্ষই সুযোগ পাবে সুস্থ জীবনযাপনের অথবা একপক্ষের অক্ষমতা অন্য-পক্ষকে পঙ্গু ক'রে দেবে না। বিবাহে যেখানে সত্তা-বিকাশের পথ রুদ্ধ, বিচ্ছেদে সেখানে রুদ্ধ পথ অবারিত হওয়ার সম্ভাবনা। হিন্দু বিবাহ এবং বিবাহবিচ্ছেদ আইন যে-সব ক্ষেত্র নির্দ্দিষ্ট করেছে এবং যে-সকল সর্ত্ত আরোপ করেছে, তাতে বিচ্ছেদের সুযোগের অপ-ব্যবহারের আশঙ্কা কম। বরং সর্ত্ত আরোপে কষ্টসাধ্য হয়েছে প্রকৃত ক্ষেত্রে বিচ্ছেদের সুযোগ গ্রহণ।

হিন্দু-সমাজে বিবাহবিচ্ছেদ অস্বাভাবিক মনে হ'লেও এর সংবিধান শাস্ত্রকারগণের মধ্যে কাউকে দিতে হয়েছে। এত সংরক্ষণশীলতার মধ্যেও মানবিকতাবোধে ন্যায়বিচার দুষ্ট হয় নি। মনু বলেছেন:

". . . . . a woman should not be compelled to live with a mad husband, a mentally defective man, a eunuch, one destitute of manly strength, or one afflicted with diseases. She should be allowed to separate from such a husband after receiving her share of property."

(Kewal Motwani: *Manu Dharma Sastra*: p. 118.)

পুনর্বিবাহের অধিকার লাভে বিবাহবিচ্ছেদ সম্পূর্ণ। শাস্ত্রে আছে:

"নষ্টে, মৃতে প্রব্রজিতে ক্লীবেচ পতিতে পতৌ।
পঞ্চ স্বাপৎসু নারীনাং পতিরন্যো বিধীয়তে॥"

অর্থাৎ স্বামী নিরুদ্দেশ হইলে, মরিলে, সংসারধর্ম্ম পরিত্যাগ করিলে, ক্লীব স্থির হইলে অথবা পতিত হইলে স্ত্রীদিগের পুনরায় বিবাহ শাস্ত্রবিহিত। শুধু তাই নয়; ডাঃ যতীন্দ্রবিমল চৌধুরী তাঁর "Women in Vedic Ritual" বই-এ বলেছেন:

"The Rg Vedic verse X. 18.8." "Rise O woman, come towards the world of the living, thou liest by the side of this one whose life is gone. Be thee full fledged wife of (this) your husband who (now grasps your hand and woees you" "refer to widow marriage." (p. 154.)

বিবাহবিচ্ছেদ, পুনর্বিবাহ ইত্যাদি অধিকার প্রয়োগের সাফল্য শিক্ষা এবং অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে পুরুষের সমতা-অর্জ্জনের ওপর নির্ভরশীল। শুধু নারীর ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের জন্য নয়, সমাজের দিক্ থেকেও বিচার করলে নারীর শিক্ষায় এবং অর্থোপার্জ্জনে অধিকার-স্বীকৃতি যুক্তিসঙ্গত। বর্ত্তমান আর্থিক সমস্যার যুগে জাতির শিক্ষা-সচেতনতা শুভলক্ষণ সন্দেহ নেই। একদিকে জাতির উত্তরাধিকারী শিশুকে গ'ড়ে তোলার কর্ত্তব্য যে-নারীর এবং যার প্রভাব শিশুর ওপর অত্যধিক পরিস্ফুট, সে-নারীর শিক্ষাহীনতা যেমন জাতির দৈন্যই সূচিত করে, তেমনি অন্যদিকে অর্থোপার্জ্জনের ক্ষেত্রে নারীর অবতরণ শুধু বাঞ্ছনীয় নয়, বর্ত্তমান পরিস্থিতিতে একান্ত প্রয়োজন। নারীর শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা একটা নিষ্ক্রিয় জড়পদার্থকে সমাজের ক্রিয়াশীল অঙ্গে রূপান্তরিত করা, যার ফলে তার অবদান প্রতিটি ক্ষেত্রে সমস্যা সমাধানে সহায়তা করবে। শিক্ষা এবং অর্থনৈতিক স্বাধীনতা কতটা মানসিক ও দৈহিক উন্নতির সহায়ক তা এই উদ্ধৃতি থেকে সহজেই বোধগম্য হবে:

(১) "উদীর্ষ্ব নার্য্যভি জীবলোকং গতাসুমেতমুপশেষ এহি।
হস্তগ্রাভস্য দিধিষোস্তবেদং পত্যুর্জনিত্বমভি সংবভূথ॥"
(ঋগ্বেদ—১০, ১৮, ৮)

"Forcibly repressed for centuries, the Hindu woman suffered from mental and physical degeneration. Mrs. Hate in her study of the Rescue Home (in Bombay) found that the average weight (99 lbs.) of the educated woman (matriculated or above) was more than the general average (97½ lbs.). The weight was still higher (99½ lbs.) where the woman was gainfully employed. The weight of the partially educated (not yet matriculated) woman was much lower (91 lbs.)."

তার পর লেখক এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন:

"But it was soon realised that education alone would not cause the regeneration—physical, moral and mental—of woman; it is only economic independence that can give them standing and the strength to fight their rights."

(Dr. K. M. Kapadia: *Marriage and Family in India*: Chapter XII, p. 241."

পুরুষ এবং নারী জীবনের দু'টি ভিন্নরূপ, কিন্তু সমাজের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। একের অপচয়ে অপরের শক্তি ক্ষুণ্ণ হয়, সমাজ হয় পঙ্গু। সুতরাং বৈষম্যমূলক নীতির প্রশ্ন অবান্তর। পুরুষের নারীর কাছে যা দাবী, তার বিনিময়ে নারীর প্রাপ্যও তাকে দিতে হবে এবং সমপর্য্যায়ে থেকে পারস্পরিক আদান-প্রদানে সুস্থ সমাজদেহ গ'ড়ে উঠবে।

শতসহস্র তমসা রজনীর পর আমাদের দেশে যে নারী আজ জাগরণোন্মুখ, সে নারী পাশ্চাত্ত্যদেশে প্রগতি রক্ষা ক'রে চলেছে, যেহেতু সমাজের প্রতি, জাতির প্রতি অবদানের যথোচিত সুযোগ দিতে এবং প্রয়োজনমত কর্ত্তব্যসম্পাদনে অংশগ্রহণের আহ্বান জানাতে সে-সমাজ এতটুকু কুণ্ঠাবোধ করে নি। আমাদের ইতিহাসের পাতায় যে নারীকে দেখেছি শৌর্য্যে, বীর্য্যে, শাসনে, জ্ঞানে, সংস্কৃতিতে কোন অংশে পুরুষের কম নয়, যে নারীকে দেখেছি পুরুষের প্রকৃত সহধর্ম্মিণীরূপে, যে নারী পুরুষের মর্য্যাদারক্ষায় মৃত্যুকে ভয় পায় নি, সে নারীকে অবগুণ্ঠনবতী ক'রে তার অমূল্য শক্তিকে এতকাল সুপ্ত করে রেখেছি। এই অর্দ্ধমৃত সমাজের পুনর্জ্জাগরণ, পুনরভ্যুত্থান নির্ভর করছে নারীকে শক্তিরূপে উপলব্ধি করার ওপর—যে শক্তি প্রভাবিত করবে শিক্ষা, সংস্কৃতি, অর্থনীতি, রাজনীতি—সমাজের সকল ক্ষেত্র।

বিভেদের প্রাচীর আজ ভগ্নপ্রায়, অর্থ নৈতিক সমস্যায় অন্নসংস্থানের দাবীতে ব্রাহ্মণ-শূদ্র, পুরুষ-নারীর শোভা-যাত্রা একশ্রেণীতে বিলীন হতে চলেছে। আজকের শিক্ষা, সংস্কৃতি ও অর্থনীতিক্ষেত্রে নারীর সক্রিয় অংশগ্রহণের সূচনায় বিরাট্ পরিবর্ত্তনের আভাস। পাশ্চাত্ত্যধারার সঙ্গে সংমিশ্রণের ফলে শিক্ষায় প্রগতি এবং সঙ্গে সঙ্গে মানুষের অধিকার সম্পর্কে আমাদের ক্রমঃসচেতনতা বাস্তবের সঙ্গে সংঘাতে প্রস্তুতির পথ। অধিকার লাভে নারী হবে পূর্ণভাবে সক্রিয়, যার ফলে সমাজের পূর্ণাঙ্গ গতিশীলতা জাতিকে এগিয়ে নিয়ে যাবে এক প্রোজ্জ্বল ভবিষ্যতের অভিমুখে।

শ্রোতা ও গায়ক রবীন্দ্রনাথ

শ্রীজয়দেব রায়

রবীন্দ্রনাথের গান আজ আমরা সারা দেশের সবাই মিলে গাইছি, তাঁর গান আমাদের নিত্য-ব্যবহার্য শিল্পসম্পদ্ হয়ে উঠেছে। তাঁর গান বাঙালীর সাংস্কৃতিক পরিচয় হয়ে আছে। এ গান শুনতে শুনতে আমরা আমাদের এই দুঃখবেদনাময় জগৎকে পর্যন্ত ভুলে যাই। তাঁর গান গাইছি আমরা উৎসবে, প্রমোদে, দুঃখবেদনে।

মাঝে মাঝে কৌতূহল হয়, কবি নিজে কেমন ধরণের গান শুনতেন, তাঁর নিজের লেখা গান তাঁর আপন গলায় কেমন লাগত শুনতে। গ্রামাফোন রেকর্ড আমাদের জন্যে তাঁর স্বকণ্ঠের কয়েকটি গানকে সযত্নে সংরক্ষিত ক'রে রেখেছে ব'লে উত্তরপুরুষ তাঁর কণ্ঠ শুনতে পাবে। কিন্তু সে যান্ত্রিক-কণ্ঠ কি প্রকৃত গীতিকণ্ঠের পরিচয় দেবে?

সুরের গুরু রবীন্দ্রনাথ সঙ্গীতের বিশেষ অনুরাগী শ্রোতা ছিলেন, নিজের গান তিনি নিজেই গাইতেন, গায়করূপেও তিনি ছিলেন বিশেষ জনপ্রিয়।

বাল্য বয়স থেকেই কবি সঙ্গীতের আদর্শ পরিবেশ লাভ করেছিলেন: জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ী ছিল সে আমলের বাংলা দেশের সঙ্গীতের পীঠস্থল। ব্রাহ্ম-সমাজের প্রধান উৎসাহদাতা দেবেন্দ্রনাথের পরিবারের সকলেই ব্রহ্মসঙ্গীতের রচয়িতা রূপে সুপরিচিত ছিলেন। ব্রাহ্ম-সমাজ-সম্পর্কীয় গুণী সুররসিকগণ সকলেই জোড়াসাঁকোর বাড়ীতে আসা-যাওয়া করতেন।

দেশ-বিদেশ থেকে কুশলী সঙ্গীতবিদ্‌দের আমন্ত্রণ হ'ত তাঁদের গৃহে; বিষ্ণুচন্দ্র চক্রবর্তী, যদুনাথ ভট্ট, রাধিকাপ্রসাদ গোস্বামী, শ্যামসুন্দর মিশ্র প্রমুখ ব্রাহ্ম-সমাজের গায়করা সকলেই তাঁদের গৃহে সমাদরে গৃহীত হয়েছিলেন।

হিন্দুস্থানী পদ্ধতির ধ্রুপদ-খেয়াল গানে তাঁদের গৃহ সর্বদাই পূর্ণ হয়ে থাকত। কবি সে কথা স্মরণ ক'রে বলেছেন—

"ছেলেবেলায় যে-সব গান সর্বদা আমার শোনা অভ্যাস ছিল সে শখের দলের গান নয়। তাই আমার মনে কালোয়াতী গানের একটা ঠাট আপনা-আপনি জমে উঠেছিল। ছেলেবেলা থেকে ভাল হিন্দুস্থানী গান শুনে আসছি বলে তার মহত্ত্ব ও মাধুর্য সমস্ত মন দিয়ে স্বীকার করি।"

হিন্দী উচ্চাঙ্গের গানের সুর অনুকরণে বাংলায় ব্রহ্ম-

সঙ্গীত রচনা করতেন দ্বিজেন্দ্রনাথ, সত্যেন্দ্রনাথ, হেমেন্দ্রনাথ, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, গণেন্দ্রনাথ, সোমেন্দ্রনাথ প্রভৃতি কবির দাদারা। রবীন্দ্রনাথও তাঁদের গান শুনে শুনে ঐ ধারায় বহু ব্রহ্মসঙ্গীত রচনা করেছিলেন।

এইভাবে অবিরাম গীত-চর্চা শুনবার সৌভাগ্য তাঁর হয়েছিল। তিনি বলছেন—"আমাদের পরিবারে শিশুকাল হইতে গান চর্চার মধ্যেই আমরা বাড়িয়া উঠিয়াছি। আমার পক্ষে তাহার এই সুবিধা হইয়াছিল, অতি সহজেই গান আমার সমস্ত প্রকৃতির মধ্যে প্রবেশ করিয়াছিল। তাহার অসুবিধাও ছিল। চেষ্টা করিয়া গান আরম্ভ করিবার উপযুক্ত অভ্যাস না হওয়াতে শিক্ষা পাকা হয় নাই।"

বিষ্ণুচন্দ্র চক্রবর্তী ছিলেন বিখ্যাত ধ্রুপদ-গায়ক। তাঁদের গৃহের প্রথম সঙ্গীতশিক্ষক ছিলেন বিষ্ণুচন্দ্র, তাঁর কাছেই কবির ভ্রাতারা সকলে সুরের দীক্ষা গ্রহণ করেন। শ্রোতা রবীন্দ্রনাথের প্রথম সাক্ষাৎ মেলে এই সূত্রে—"বাঙালীর স্বাভাবিক গীতমুগ্ধতা ও গীতিমুখরতা কোন বাধা না পেয়ে আমাদের ঘরে যেন উৎসের মত উৎসারিত হয়েছিল। বিষ্ণুচন্দ্র ছিলেন ধ্রুপদী গানের বিখ্যাত গায়ক। প্রত্যহ শুনেছি সকাল সন্ধ্যায় উৎসবে আমোদে উপাসনা-মন্দিরে তাঁর গান, ঘরে ঘরে আমার আত্মীয়েরা তম্বুরা কাঁধে নিয়ে তাঁর কাছে গানচর্চা করছেন, আমার দাদারা তানসেন প্রভৃতি গুণীর রচিত গানগুলিকে আমন্ত্রণ করছেন বাঙলা ভাষায়।"

রবীন্দ্রনাথ শৈশবে আরও একজন সুরতন্ময় বৃদ্ধের পদপ্রান্তে ব'সে হিন্দী গান শুনেছিলেন। শ্রীকণ্ঠ সিংহ ছিলেন দেবেন্দ্রনাথের অন্তরঙ্গ সহচর। তাঁর কাছেও কবির গীতিঋণ অল্প নয়।

কবি বলছেন—"আমাদের বাড়ীর বন্ধু শ্রীকণ্ঠবাবু দিনরাত গানের মধ্যে তলিয়ে থাকতেন। বারান্দায় বসে বসে চামেলীর তেল মেখে স্নান করতেন, হাতে থাকত গুড়গুড়ি, অম্বুরী তামাকের গন্ধ উঠত আকাশে, গুন্‌গুন্ গান চলত, ছেলেদের টেনে রাখতেন চারদিকে। তিনি ত গান শেখাতেন না, গান তিনি দিতেন, কখন তুলে নিতুম জানতে পারতুম না।"

যদুভট্টের একনিষ্ঠ শ্রোতা ছিলেন রবীন্দ্রনাথ। তাঁর কাছে কবি শুনেছিলেন বিষ্ণুপুর ঘরোয়ানার অজস্র হিন্দী গান। তাঁর দৌলতে প্রাপ্ত সুরেই কবি ব্রহ্মসঙ্গীতগুলি রচনা করেছিলেন। তাঁর কাছে শোনা সুর কবির মনে অক্ষয় হয়ে ছিল। তিনি বলছেন—

"তারপর যখন আমার কিছু বয়স হয়েছে তখন বাড়ীতে খুব বড় ওস্তাদ এসে বসলেন যদুভট্ট। একটা মস্ত ভুল করলেন, জেদ ধরলেন আমাকে গান শেখাবেনই, সেইজন্যে গান শেখাই হল না। কিছু কিছু সংগ্রহ করেছিলুম লুকিয়ে চুরিয়ে, ভাল লাগল কাফি সুরে রুমঝুম বরখে আজু বাদরওয়া, রয়ে গেল আজ পর্যন্ত আমার বর্ষার গানের সঙ্গে দল বেঁধে।"

গান যাকে শেখা বলে সে ভাবে তিনি কোনদিন গান শিখতে পারেন নি ব'লে কবি আক্ষেপ করেছিলেন; কিন্তু তিনি গান শুনেছিলেন নিষ্ঠাভরে, ফলে সুরের কান তাঁর তৈরি হয়ে গিয়েছিল।

"ছেলেবেলায় দেখেছি আমাদের বাড়ীতে বড় বড় গাইয়েদের আনাগোনা, শুনেছি অনেক গান, কিন্তু গান শেখার মত করে কখনও শিখি নি।"

এ আক্ষেপ তাঁর ছিল সারাজীবন। গান শুনবার অদম্য আগ্রহের সঙ্গে না-শেখার দুঃখের কথা তিনি নিঃসঙ্কোচে স্বীকার করেছেন। তিনি বলছেন—

"আমার দোষ হচ্ছে শেখবার পথে কিছুতেই আমাকে বেশীদিন চালাতে পারে নি। ইচ্ছে মত কুড়িয়ে বাড়িয়ে যা পেয়েছি ঝুলি ভরতি করেছি তাই দিয়েই। মন দিয়ে শেখা যদি আমার ধাতে থাকত, তাহলে এখনকার দিনের ওস্তাদরা আমাকে তুচ্ছ করতে পারত না। কেননা, সুযোগ ছিল বিস্তর। যে কয়দিন আমাদের শিক্ষা দেওয়ার কর্তা ছিলেন সেজদাদা, ততদিন বিষ্ণুর কাছে আনমনাভাবে ব্রহ্মসঙ্গীত আউড়েছি।"

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ আর হেমেন্দ্রনাথের কণ্ঠে গান লেগেই থাকত, সেগুলি কবি সর্বদাই তন্ময় হয়ে শুনতেন—"কখনো কখনো যখন মন আপনা হতে লেগেছে তখন গান আদায় করেছি দরজার পাশে দাঁড়িয়ে। সেজদাদা বেহাগে আওড়াচ্ছেন 'অতি গজগামিনীরে'—আমি লুকিয়ে মনের মধ্যে ছাপ তুলে নিচ্ছি।"

পল্লীসুর ও পাঁচালী তিনি শুনেছিলেন কিশোরীমোহন চট্টোপাধ্যায়ের কাছে। কবি বলছেন—"মাঝে মাঝে এসে পড়ত কিশোরী চাটুজ্যে। সমস্ত রামায়ণের পাঁচালী ছিল সুরসমেত তার মুখস্থ। কিশোর চাটুজ্যের সবচেয়ে বড় আপসোস ছিল এই যে, দাদাভাই অর্থাৎ কি-না আমি এমন গলা নিয়ে পাঁচালীর দলে ভরতি হতে পারলুম না।"

রাধিকাপ্রসাদ গোস্বামী ও শ্যামসুন্দর মিশ্রের গানও কবি অনেক শুনেছেন। তখন তিনি খ্যাতির উচ্চশিখরে সবেমাত্র উঠতে সুরু করেছেন, এই সময়কার শ্রোতা রবীন্দ্রনাথের একটি ছবি এঁকেছেন অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর—

"বাড়ীতে অনেকদিন অবধি সঙ্গীত চর্চা করেছি। রাধিকা গোসাঁই নিয়মমত আসতেন। শ্যামসুন্দর এসে যোগ দিলেন। রোজ জলসা হ'ত বাড়ীতে। রবিকাকা গান করতেন, আমি তাঁর সঙ্গে তখন বসে তাঁর গানে সুর মিলিয়ে এসরাজ বাজাতুম। ঐটাই আমার হ'ত, কারও গানের সঙ্গে যে-কোন সুর হোক্ না কেন সহজেই বাজিয়ে যেতে পারতুম।...এদিকে রবিকাকা গান লিখছেন নতুন নতুন, তাতে তখুনি সুর বসাচ্ছেন আর আমি এসরাজে সুর ধরছি।"

গায়ক রবীন্দ্রনাথের একটি সুন্দর চিত্র এতে পাওয়া যায়। কিন্তু এই রবীন্দ্রনাথ পরিণত বয়সের কবি রবীন্দ্রনাথ। বালক রবীন্দ্রনাথের গান গাওয়ার চিত্রটি কবি নিজেই অঙ্কন ক'রে গিয়েছেন। মহর্ষি তাঁর গান শুনতে বড় ভালবাসতেন, শিশু বয়স থেকেই তাঁকে গান শোনাবার জন্যে কবির আহ্বান আসত—

"যখন সন্ধ্যা হইয়া আসিত পিতা বাগানের সম্মুখে বারান্দায় আসিয়া বসিতেন। তখন তাঁহাকে ব্রহ্মসঙ্গীত শুনাইবার জন্য আমার ডাক পড়িত। চাঁদ উঠিয়াছে, গাছের ছায়ার ভিতর দিয়া জ্যোৎস্নার আলো বারান্দার উপরে আসিয়া পড়িয়াছে আমি বেহাগে গান গাহিতেছি—'তুমি বিনা কে প্রভু সংকট নিবারে, কে সহায় ভব অন্ধকারে'—তিনি নিস্তব্ধ হইয়া নতশিরে কোলের উপর হাত জোড় করিয়া শুনিতেছেন—সেই সন্ধ্যাবেলাটির ছবি আজও মনে পড়িতেছে।"

ব্রহ্মসঙ্গীত গায়ক পরিণত বয়সের রবীন্দ্রনাথের একটি ছবি এঁকেছেন শ্রীমতী সীতা দেবী। তিনি বলছেন—

"সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজে ১৩১৭ সালে একদিন রবীন্দ্রনাথকে দেখি। কবি একটি ছোট প্রবন্ধ পাঠ করেন ও সকলের অনুরোধে তাঁহার নূতন রচিত 'মেঘের পরে মেঘ জমেছে' গানটি গাহিয়া শোনান। প্রথমে দেবালয়ের ঘরটিই মানুষে পূর্ণ হইয়াছিল, কিন্তু তাঁহার অপূর্ব কণ্ঠস্বর, চারটি দেওয়ালের বাধা না মানিয়া বাহিরে পৌঁছিবা মাত্র দেবালয়ের সম্মুখের গলি ও ব্রাহ্ম সমাজের মন্দিরের প্রাঙ্গণে কি রকম লোকে ভরিয়া উঠিল তাহা মনে আছে।"

বিদেশিনী মহিলা মাদাম লেভি পরিণত বয়সের গায়ক রবীন্দ্রনাথের চিত্র অঙ্কন করেছেন—"কবিবর ও তাঁর সঙ্গীতাধ্যাপক দিনু গান করলেন, ছেলের দলও তাতে যোগ দিলে। প্রাচ্যদেশের লোকেরা যথার্থ জানে কি রকম ক'রে বসলে সভা সাজে। চাঁদের সোনালী আলোয় আকাশ অপূর্ব জ্যোতিতে পূর্ণ হয়ে উঠেছিল। তার মধ্যে কি অপূর্ব সুর আর কি মনোহর কণ্ঠ কবির, মন আমার ভরে গেল! গান গাইতে গাইতে তিনি হাঁফিয়ে উঠে থেমে যাচ্ছিলেন, তখন আমার কেমন ফাঁকা ফাঁকা মনে হচ্ছিল।"

পরিণত বয়সের শ্রোতা রবীন্দ্রনাথের আরও দুটি' ছবি আমরা পেয়েছি তাঁর অনুরাগী দু'জন সঙ্গীত-সমালোচকের কাছ থেকে। শ্রীধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় তাঁকে দেখেছিলেন শ্রীকৃষ্ণরতনজঙ্কারের খেয়াল গান শুনতে। তিনি বলেছেন—

"এক সন্ধ্যায় গানের জলসা হয়। তখন তাঁর ১০২ ডিগ্রীর ওপর জ্বর। শ্রীকৃষ্ণরতন্‌জঙ্কার ছায়ানট, জয়জয়ন্তী ও পরজের খেয়াল গেয়েছিলেন রাত্রি ১১টা পর্যন্ত। তিনি প্রায় ধ্যানস্থ হয়ে গান শুনলেন। শ্রীকৃষ্ণের গান তাঁর অত্যন্ত ভাল লেগেছিল।"

গান শুনে শ্রোতা-রবীন্দ্রনাথের মনে ভারতীয় সঙ্গীতের সমস্যা সম্পর্কে সুর রচয়িতা রবীন্দ্রনাথের যে প্রশ্ন জেগেছিল, ধূর্জটিপ্রসাদকে তিনি অসঙ্কোচে জিজ্ঞাসাও করেছিলেন। ধূর্জটিপ্রসাদ বলেছেন—

"আসর ভাঙবার পর তিনি আমাকে বলেন 'গান আমার খুবই ভাল লাগল। কিন্তু সেই ভাল লাগার সঙ্গে সঙ্গে আমার মনে গোটা কয়েক প্রশ্ন উঠেছে তোমাকে তার উত্তর দিতেই হবে। গায়কের মুখের গান থামবে কখন? প্রত্যেক রসসৃষ্টিতেই একটি থামবার ইঙ্গিত থাকে—ধ্রুপদে আছে, বাংলাগানে আছে, যদুভট্টের—গোসাঁই-এর গলায় ছিল, কিন্তু খেয়ালে থাকবে না কেন'?"

শ্রীদিলীপকুমার রায় কবিকে কাশীর বিখ্যাত বাঈ হুসনাজানের গান শুনতে দেখেছিলেন। তিনি বলেছেন—

"রবীন্দ্রনাথ তখন কাশীতে রাজা কিশোরীলাল গোস্বামীর বাড়ীতে অতিথি। সেখানে কাশীর বিখ্যাত বাঈ হুসনাজান তাঁকে গান শোনাতে এসেছিলেন। রবীন্দ্রনাথের কৃপায় সেদিন প্রাতে হুসনার অপূর্ব মনোহর টোড়ি, আশোয়ারী, ভৈরবী প্রভৃতি প্রভাতী রাগিণী শোনা গেল। সেদিন বৃদ্ধা হুসনা তাঁর দুর্বল জরাজীর্ণ কণ্ঠেও যে অপূর্ব সুরের জাল বুনছিলেন, ক্ষণে ক্ষণে ঠুংরির নানা ছোট ছোট বোলের মধ্য দিয়ে যেভাবে হৃদয়ের পরিবর্তনশীল অনুভূতিগুলিকে সুরের মুকুরে প্রতিবিম্বিত ক'রে ধরেছিলেন ও মীড়, গমক, মূর্চ্ছনার করুণ আবেদনের মধ্য দিয়ে কেন্দ্রগত সুরের ব্যঞ্জনাদি যেরূপে মূর্ত ক'রে তুলেছিলেন তা বাস্তবিকই এক শ্রেষ্ঠগুণীর পক্ষেই সম্ভব। কবীন্দ্র স্তব্ধ হয়ে গান শুনলেন।"

বাঙ্গলা ও বাঙ্গালীর কথা

শ্রীহেমন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়

গা-ঢাকা দিবেন না!

কিছুকাল পূর্ব্বে পশ্চিমবঙ্গের কম্যুনিষ্ট পার্টির রাজ্য পরিষদের সম্পাদকমণ্ডলী এক বিবৃতিতে প্রকাশ করেন যে, বর্ত্তমান পরিস্থিতিতে গ্রেপ্তার এড়াইবার জন্য দলের সদস্যদের গা-ঢাকা দেওয়ার কোন প্রশ্নই ওঠে না। তাঁহারা জানাইয়াছেন, 'কোন কমরেডের পক্ষে গ্রেপ্তার এড়াইবার জন্য গা ঢাকা দিবার কোনও প্রচেষ্টা রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলী একেবারেই অনুমোদন করেন না। যদি কোনও পার্টি সভ্য এরূপ করেন, তাহা হইলে তাহা পার্টি নির্দ্দেশ ও পার্টি শৃঙ্খলা ভাঙ্গার সমতুল্য বলিয়া গণ্য করা হইবে।'

দলের সম্পাদকমণ্ডলী এখনও কম্যুনিষ্ট পার্টির সদস্যদের গ্রেপ্তার চলিতে থাকায় বিস্ময় প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহাদের আশা, সরকার এই নীতি পরিবর্ত্তন করিয়া দেশরক্ষা ব্যবস্থায় কম্যুনিষ্টদেরও অংশ গ্রহণের পূর্ণ সুযোগ দিবেন।

এই বিবৃতি হইতে সহজেই প্রতীয়মান হয় যে, কম্যুনিষ্ট পার্টির বহু সদস্য এবং কর্ম্মী আত্মগোপন করিয়াছেন। কম্যুদের একটি বিশেষ নীতি হইল মুখে যাহা বলা হইবে কিংবা যাহা করিবার নির্দ্দেশ প্রচারিত হইবে, বাস্তবে তাহার উল্টাই অবশ্যকরণীয়! সম্পাদকমণ্ডলীর উপরি উক্ত বিবৃতি হইতে ইহাই ধরিয়া লইতে হইবে যে—তাঁহারা কমরেডদের গা-ঢাকা দিবার প্রয়োজনীয়তা বিষয়ে অবহিত হইতে বলিতেছেন।

আমাদের তরফ হইতে—আমরা রাজ্য সরকার এবং সর্ব্বসাধারণকেও কম্যুদের সম্পর্কে সবিশেষ অবহিত হইতে বিশেষভাবে অনুরোধ করিব।

দেশরক্ষা ব্যবস্থা সম্পর্কে কম্যুদের প্রার্থনামত সক্রিয় অংশ গ্রহণের সুযোগ-সুবিধা তাহাদিগকে দিবেন কি না তাহা সরকারের বিবেচ্য—কিন্তু এ বিষয় জনমতকে অগ্রাহ্য বা অবহেলা করিয়া কিছু করা অসমীচীন হইবে। সমগ্রভাবে কম্যুনিষ্ট পার্টিকে পশ্চিম বঙ্গে তথা ভারতে এখনও বে-আইনী ঘোষণা করা হয় নাই। কোন রাজনৈতিক দলকে দমন এবং নির্ব্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের আটক করা কোন গণতান্ত্রিক সরকারের পক্ষেই সুখের কথা নহে। কিন্তু দেশের আপৎকালে, বিশেষ করিয়া যুদ্ধের সময়—সরকারের পক্ষে এই ব্যবস্থা অত্যাবশ্যক হইয়া পড়ে। এমন সময় একটা বিষম বিপদের উপর আর একটা বিপদের অনাবশ্যক ঝুঁকি লওয়ার কোন অর্থ হয় না, এই প্রকার ঝুঁকি লওয়া বুদ্ধিহীনতার পরিচায়ক।

ভাবাদর্শের দিক্ দিয়া যাহাদের দেশের শত্রুপক্ষের সহিত যোগাযোগ থাকার সম্ভাবনা থাকে বা থাকিতে পারে, এবং আছে দেশের আপৎকালে তাহাদের অবাধ বিচরণের অধিকার থাকা নিরাপদ্ নহে, তাহা করিতে দেওয়াও অন্যায়।

ঘরের শত্রু

বাহিরের শত্রুকে সহজেই চেনা যায়—কিন্তু ঘরের শত্রু বিভীষণদের জানিতে-চিনিতে কিছু সময় লাগে। সুখের কথা—বিলম্বে হইলেও দেশ আজ ঘরের শত্রুদের চীন যুদ্ধের অবকাশে চিনিতে পারিয়াছে এবং দেশের সরকারকেও এ বিষয় ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হইয়াছে, যদিও এই ব্যবস্থা ব্যাপক হয় নাই এবং তাহা না হওয়ার জন্য ভবিষ্যতে বিপদের যথেষ্ট সম্ভাবনা রহিয়াছে। এ বিষয় ত্রিপুরার "সেবক" বলিতেছেন:

> চীনা ফৌজকে 'মুক্তিফৌজ' বলিয়া জনগণের প্রচারের পেছনে একটা সংঘবদ্ধ প্রচেষ্টা ছিল। তাহা না হইলে আসাম, ত্রিপুরা এমন কি পশ্চিমবঙ্গেও এই প্রচারের ঢেউ পৌছে কি করিয়া? জাতির এই সংকট-মুহূর্ত্তে চীনের হইয়া এই জাতীয় বিভ্রান্তি-মূলক ও ভারত-রাষ্ট্রবিরোধী প্রচার কাহারা করিতে পারে তাহা বুঝিতে কষ্ট হয় না। যে-সমস্ত লোক আপৎকালীন সময়ে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করিতে পারে বলিয়া গভর্ণমেণ্ট মনে করিয়াছেন তাহাদিগকে, আটক করা হইয়াছে। মনে হয়, চীন-দরদী লোক আরও দেশে রহিয়া গিয়াছে।
>
> বর্ত্তমান জরুরী ব্যবস্থা পরিচালনায় যাহারাই বাধা সৃষ্টি করিবে তাহারাই আটক থাকার যোগ্য।

কম্যুনিষ্টদের সম্পর্কে আর একটি কথা মনে রাখা প্রয়োজন। কম্যুনিজম আন্তর্জ্জাতিক আন্দোলন এবং সেই কারণেই বিভিন্ন দেশের (রাশিয়া এবং চীন ছাড়া) কম্যুনিষ্ট পার্টির কোনপ্রকার নিজস্ব জাতীয় নীতির কোন বালাই নাই। বিশেষ করিয়া ভারতীয় কম্যুনিষ্ট পার্টির নীতি-নির্দ্দেশ সবই আসে বাহির হইতে। বাহির হইতে আসে বলিলে বুঝিতে হইবে কম্যুনিষ্ট আন্দোলনের

বিশিষ্ট কর্ত্তা-স্থানীয় ব্যক্তিদের নিকট হইতেই। এই সকল কম্যু-কর্ত্তা ব্যক্তিরা কিন্তু অন্য কোন দেশের কোন বিশেষ কর্ত্তা-ব্যক্তির নিকট হইতে কোন নীতি-নির্দ্দেশ গ্রহণ করেন না। নীতিনির্দ্দেশ বাহির হইতে আসিলেও তাহা অগ্রাহ্য করা হয়। এই সব কীর্ত্তিমান্ কম্যুনিষ্ট কর্ত্তারা নিজের বা নিজেদের দেশের ও জাতির স্বার্থের অনুকূলে সর্ব্বপ্রকার নীতি স্থির করেন। এই অধিকার তাঁহাদের জন্মগত। প্রয়োজনবোধে এবং স্বার্থের অনুকূল হইলে এই শ্রেণীর নেতারা প্রচণ্ডভাবে নিন্দিত তথাকথিত 'সাম্রাজ্যবাদী ডাকাতদের' সঙ্গেও মিতালী করিতে দ্বিধাবোধ করেন না, আবার প্রয়োজনবোধে বহু-ঘোষিত মিত্র দেশের উপর চড়াও হইতেও কোনপ্রকার দ্বিধা ও লজ্জাবোধ করেন না। কিন্তু চেলাদের বেলায় নির্দ্দেশ অন্য প্রকার। একথা মনে রাখা দরকার যে, একজন কম্যুনিষ্টের কাছে দেশী মানুষের অপেক্ষা সমধর্মী বা কম্যুনিষ্ট দর্শনে বিশ্বাসী একজন পরদেশীও অনেক বেশী আপনার। অন্য মতবাদে বিশ্বাসী দেশী সরকারের অপেক্ষা অন্য দেশের কম্যুনিষ্ট সরকার অধিকতর আপন এবং অনেক বেশী নির্ভরযোগ্য।

অ-কম্যুনিষ্ট দেশের সঙ্গে কম্যুনিষ্ট দেশের যুদ্ধ লাগিলে অ-কম্যুনিষ্ট দেশগুলির কম্যুনিষ্ট পার্টির পঞ্চম বাহিনীর ভূমিকা গ্রহণের মৌল কারণ এই খানেই নিহিত। একথা অবশ্যস্বীকার্য্য যে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের সকল পর্ব্বে এবং জাতীয় সমস্যার সকল প্রশ্নে কম্যুনিষ্ট পার্টির ভূমিকা দেশ এবং জাতিদ্রোহী একই নীতির রকমফের মাত্র। কম্যুনিষ্ট পার্টি, সেই কারণেই দেখিতে পাই, সকল বিষয়েই সর্ব্বদা জাতীয় স্বার্থের বিপরীত কাজ করিয়াছে। এই পার্টি মুসলীম লীগ এবং পাকিস্তান প্রস্তাবকে পূর্ণ সমর্থন করিয়া ভারত বিভাগকে অভিনন্দিত করে এবং লক্ষ লক্ষ উদ্বাস্তর চরম ও পরম দুঃখ-দুর্দ্দশা এবং দুর্ভাগ্যের সৃষ্টি করে। এই সব পুরানো কথার নূতন করিয়া আলোচনার কোন সার্থকতা আজ আর নাই। এসব কথা সকলেরই জানা আছে। মোট কথা আজ চাপে পড়িয়া ভোল বদলাইলেও কম্যুদের বিশ্বাস করিবার মত কোন সঙ্গত কারণ ঘটে নাই এবং কম্যুদের প্রতি এখনও সরকারের কোমল বা দুর্ব্বল নীতির কোনপ্রকার যুক্তি-যুক্ত কারণ নাই। 'খুচরা' হারে কম্যু-দমন কাজের কথা নহে— এই দেশদ্রোহী বিশ্বাস-ঘাতকদের পাইকারী হারে দমন অবশ্যই করা প্রয়োজন। অবিলম্বে পাইকারী হারে কম্যুদমন ব্যবস্থা না হইলে —ভবিষ্যতে দেশ ও জাতিকে মহা বিপদের সম্মুখীন হইতে হইবে। মনে রাখা উচিত—সাবধানের মার নাই।

ভূতের মুখ রাম নাম

কিছুদিন পূর্ব্বে "স্বাধীনতা"য় ভারতের স্বাধীনতার জন্য পরম ব্যাকুল এক মন্তব্য প্রকাশিত হয়। বিপাকে এবং বিপদে পড়িয়া এই পত্রিকাকে কংগ্রেস স্তুতিও করিতে হইল!

বিপদের মাত্রা সম্পর্কে কংগ্রেস যে সজাগ আছে, তাহা আজিকার দিনে পরম আশ্বাসের বিষয়। কিন্তু লক্ষ্য করিবার বিষয়, 'এ-আই-সি-সি'র সার্কুলারের পরেও কংগ্রেস কর্তৃপক্ষকে নিজেদের সংগঠনের মধ্যে সরকার-বিরোধী ও নেহরু-বিরোধী সমালোচকদের সম্পর্কে হুঁশিয়ারি জানাইতে হইয়াছে। এমন কি উহাদের বিরুদ্ধে যে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা অবলম্বিত হইবে তাহাও সুস্পষ্টভাবে ঘোষিত হইয়াছে। এক বিষাক্ত ক্ষত যে সমাজ-দেহের অভ্যন্তরে ক্রমেই বিপদ ঘনাইয়া তুলিতেছে তাহাতে সন্দেহ নাই।

আজ তাই প্রয়োজন হইয়াছে সর্ব্ব-ব্যাপক জাতীয় ঐক্য প্রতিষ্ঠা। কম্যুনিষ্টরা এ-কথা বলিতে পারে, যতই আমাদের অফিসে আগুন লাগুক, যতই কর্মীদের উপর আক্রমণ চালানো হউক, যতই আমাদের কুৎসার সম্মুখীন হইতে হউক, আমরা জানি, নিজেদের বিপদ অপেক্ষা দেশের বিপদ অনেক বড়। তাই জাতীয় ঐক্যের আকাঙ্ক্ষা আমাদের মন হইতে বিদূরিত করা যাইবে না। মাতৃভূমির প্রতি পবিত্র দায়িত্ব পালনের অটল সংকল্পে ফাটল ধরানো যাইবে না। আমরা জানি, মাতৃভূমির সকল সুসন্তানকে ঐক্যবদ্ধ করিতে পারিলেই শুধু আজ প্রতিরক্ষা, স্বাধীনতা, শান্তি এবং জোট-বহির্ভূত নীতি রক্ষা সম্ভব।

"গরজে গয়লা পাথর বয়"—কথাটি দেখা যাইতেছে বাজে নয়। একদা, পরম বিক্রমশালী 'দাবী মানানেওয়ালা' 'গদি ছোড়ানেওয়ালা' 'স্বাধীনতা'র বর্ত্তমান অবস্থা দেখিয়া সত্যই দুঃখ বোধ করিতেছি!

তবে 'স্বাধীনতা' যাহাই বলুন—তাহার উল্টা অর্থই ধরিতে হইবে।

পঞ্চম বাহিনীর তৎপরতা

উত্তরবঙ্গের সর্ব্বত্র কম্যুনিষ্ট চীনের পঞ্চমবাহিনীর তৎপরতা দেখিয়া রাজ্যসরকার অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইয়াছেন বলিয়া জানা গিয়াছে। উত্তরবঙ্গ চীনা পঞ্চমবাহিনীর প্রধান কর্ম্মক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছে বলিয়াও তাঁহারা সন্দেহ করিতেছেন।

কম্যুনিষ্ট চীন-কবলিত তিব্বতের অতি নিকটে অবস্থিত উত্তরবঙ্গ, আসামের সহিত ভারতের অন্যান্য অংশকে সংযুক্ত রাখিয়াছে এবং এজন্য ভারতের প্রতি-রক্ষার ক্ষেত্রে উহার গুরুত্ব আজ অত্যধিক। উত্তরবঙ্গে পঞ্চমবাহিনীর কার্য্যকলাপ সফল হইলেই আসামকে

বিচ্ছিন্ন করা যাইতে পারে। এই সকল কারণেই পঞ্চম-বাহিনীর শ্যেনদৃষ্টি এখন উত্তরবঙ্গের উপর পড়িয়াছে।

উত্তরবঙ্গের ডুয়ার্স অঞ্চলের সহিত হিমালয়ের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রহিয়াছে। ছত্রিশ জাতের মানুষ এবং নানান ধরণের রাজনৈতিক দলের প্রভাব আছে এখানে। গুপ্তচর-বৃত্তির পক্ষে এই অঞ্চলটি একটি আদর্শস্থান বলিয়া আমাদের ইন্‌টেলিজেন্স কর্তৃপক্ষও মনে করেন।

গুরুত্বপূর্ণ রাস্তা, সেতু, রেল-লাইন প্রভৃতি পাহারা দেওয়া হইতেছে, কিন্তু এই কার্য্যে স্থানীয় দেশভক্ত জনসাধারণকে এখনও নিয়োগ করা সম্ভব হয় নাই—সেইরূপ চেষ্টাও হয় নাই যদিচ সামান্য প্রয়াসেই উহা সম্ভব।

অপর দিকে অত্যন্ত গোপনে জনসাধারণের মধ্যে বিভ্রান্তিমূলক প্রচার-কার্য্য, বলিতে গেলে, অবাধেই চলিতেছে। জনৈক সরকারী মুখপাত্র আজ বলেন যে, থানাঞ্চলে ডুয়ার্স অঞ্চলে—এমন কি শহরেও কিছু লোক রাষ্ট্রবিরোধী কথা-বার্ত্তা ছড়াইয়া বেড়াইতেছে। ইহারা এই বলিয়া প্রতিরক্ষা তহবিলে চাদা অথবা স্বর্ণ দিবার বিরোধিতা করিতেছে যে, "সত্য সত্য যুদ্ধ বাধিলে সরকার জোর করিয়া অলঙ্কারাদি কাড়িয়া লইত।" আবার কোথাও কোথাও ইহারা বলিতেছে, "কম্যুনিষ্ট রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে দেশের দরিদ্র জনসাধারণ যুদ্ধ করিতে চাহে না যে করিয়া হউক মিটাইয়া ফেলা উচিত।"

সীমান্ত অঞ্চল ও তিব্বত হইতে আগত কিছু উদ্বাস্তু এবং একটি সম্প্রদায়ের কিছু লোক চীনাদের পক্ষে প্রচার-কার্য্য চালাইতেছে বলিয়া প্রকাশ।

কোচবিহার হইতে একটি সংবাদে জানা যায় যে: কম্যুনিষ্টরা দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি প্রতিরোধ আন্দোলনের জন্য গ্রামে গ্রামে কমিটি গঠন করিতেছিল, এখন প্রচার করিতেছে যে, "মুক্তিফৌজ আসিতেছে, দুঃশাসনের অবসান ঘটাইয়া জনগণের সরকার কায়েম হইবে।" কৃষকদের মধ্যে কৃষক সমিতির নামে 'মুক্তিফৌজের' জন্য উহারা চাদা তুলিতেছে, বলিতেছে যে, 'সমিতির রসিদ দেখাইতে পারিলে মুক্তিফৌজ আর কাহাকেও গ্রেপ্তার করিবে না।'

কোচবিহারের কম্যুনিষ্টরা গ্রামে গ্রামে 'গণসংগঠন' গড়িতেছে, এই উদ্দেশ্যে একটি পত্রিকাও প্রকাশ করিয়াছে।

কম্যুনিষ্টরা কোন কোন স্থানে এইরূপ প্রচারও করিতেছে যে, 'সরকার দেউলিয়া হইয়া গিয়াছে। বাড়ীর সোনা ও টাকার পর ব্যাঙ্কের টাকা ও গোলার ধানও লওয়া হইবে।' কেহ যে ইহাদের কথায় বিশ্বাস করিতেছেন না তাহা নহে। ক্ষেত্র প্রস্তুত মনে হইলেই উহারা গৃহযুদ্ধের মহড়া হিসাবে চাষীদের জোর করিয়া জমির ধান কাটিতে প্ররোচিত করিতেছে—কয়েকটি ক্ষেত্রে উহাতে কাজও হইয়াছে। সরকার অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করিয়া যাইতেছেন।

কিন্তু কম্যু-পঞ্চমবাহিনীর কার্য্যকলাপ কেবল পর্য্যবেক্ষণ করিলেই কোন লাভ হইবে না। সংবাদ সত্য হইলে এই বিশ্বাসঘাতকদের অবিলম্বে কারারুদ্ধ করা প্রয়োজন। বিশেষ করিয়া আমাদের সীমান্ত অঞ্চলগুলিতে প্রতিটি প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা কঠোরতম করিতে হইবে—এবং তাহা অবিলম্বে।

কলকারখানাতে কম্যুদের কীর্ত্তিকলাপ

শ্রমমন্ত্রী শ্রীবিজয় সিং নাহার পশ্চিমবঙ্গের কল-কারখানাগুলিতে কম্যুনিষ্ট কর্ম্মীদের দেশদ্রোহিতামূলক কার্য্যকলাপের বিরুদ্ধে অভিযোগ করিয়াছেন। বিজয় বাবুর অভিযোগ হইতে জানা যায় যে, কম্যুনিষ্টরা—

প্রতিরক্ষা তহবিলে অর্থ ও স্বর্ণ সংগ্রহে বাধা দিতেছে, নানা ধরণের আপত্তিকর কথা রটাইয়া বেড়াইতেছে এবং বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করিতেও প্রয়াস পাইতেছে—কম্যুনিষ্ট-প্রভাবিত 'এ-আই-টি-ইউ-সি'র বিরুদ্ধেই এই অভিযোগ।

ভারতবর্ষের শ্রমিক-শ্রেণী আপৎকালীন অবস্থা চলা অবধি প্রতি মাসে একদিনের বেতন জাতীয় প্রতিরক্ষা তহবিলে দান করিতে কৃত-সঙ্কল্প; কিন্তু কম্যুনিষ্ট ইউনিয়নসমূহ এইরূপ কোন সিদ্ধান্ত করেন নাই, উপরন্তু যেখানেই তাহাদের প্রভাব আছে সেখানেই এইরূপ সিদ্ধান্ত গ্রহণের তাহারা বিরোধিতা করিতেছে।

কম্যুনিষ্ট ইউনিয়ন-সমূহ হইতে তাঁহাকে অনেক চিঠি দেওয়া হইয়াছে। উহার অনেক চিঠিই যথেষ্ট দীর্ঘ কিন্তু কোন ইউনিয়নের পক্ষ হইতেই প্রতি মাসে একদিনের বেতন দিবার সঙ্কল্প জানান হয় নাই।

শ্রমিকরা একদিনের বেতন দিতে চাহিলে কম্যুনিষ্ট শ্রমিক-কর্মীরা টেক্সমেকো ও বাটাতে, সিনেমা হলগুলিতে এবং আরও অনেক স্থানে বাধা দিয়াছে। তাহারা একদিনের বেতনের স্থলে 'যাহারা যাহা খুসি' দান করিবার ধ্বনি তুলিয়াছে। আপাতদৃষ্টিতে এই ধ্বনি আপত্তিকর মনে হইবার কারণ নাই, কিন্তু শ্রমিকেরা যেখানে দিতে ইচ্ছুক সেখানে এইরূপ ধ্বনি স্বতঃই সন্দেহ উদ্রেক করে। একটি কম্যুনিষ্ট ইউনিয়ন তিন মাস অন্তর একদিনের বেতন দিতে সম্মত হইয়াছে, কয়েকটি ক্ষেত্রে একদিনের বদলে প্রতি মাসে অর্দ্ধ দিনের বেতনের কথাও বলিয়াছে, কয়েকটি ক্ষেত্রে কম্যুনিষ্টদের আপত্তি বাতিল করিয়া শ্রমিকেরা একদিনের বেতন দিয়া যাইতেছেন।

শ্রীনাহার আরও বলেন যে, তাঁহার নিকট এইরূপ প্রমাণ আছে যে, কম্যুনিষ্টরা প্রতিরক্ষা তহবিলের বিরুদ্ধে 'কান-ভাঙ্গানির পালা' শুরু করিয়া দিয়াছে। অত্যন্ত গোপনে এইরূপ প্রচার করা হইতেছে যে, "যুদ্ধ-টুদ্ধ কিছু নহে, ভাঁড়ার শূন্য হইয়াছে বলিয়াই সরকার গরীবদের নিকট হইতে টাকা, সোনা—যাহা পাইতেছেন লইয়া যাইতেছেন।" কয়েকটি ক্ষেত্রে তাঁহাকে শুনাইয়া শুনাইয়াও এই সকল কথা বলা হইয়াছে।

অধিকাংশ ক্ষেত্রেই প্রতিরক্ষা তহবিলে দানের ব্যাপারে মালিক-শ্রমিক উভয় পক্ষই একযোগে কাজ করিতেছেন। শ্রমিক-নেতাদের উপস্থিতিতে সংস্থার কর্মচারীরা শ্রমিক ও কর্মচারীদের বেতন কাটিয়া রাখিতেছেন এবং পরে উভয় পক্ষের উপস্থিতিতে প্রাপ্ত অর্থ যোগ করা হইতেছে ও প্রতিরক্ষা তহবিলে প্রেরণ করা হইতেছে। কিন্তু কম্যুনিষ্ট ইউনিয়নগুলি এই পদ্ধতির ধারে-কাছে দিয়াও যাইতেছে না। আইন-বিরুদ্ধ হইলেও ইউনিয়নের নামে তাহারা অর্থ তুলিতেছে—এই-রূপ প্রমাণ নাকি শ্রমমন্ত্রীর নিকট আছে। কয়েকটি ক্ষেত্রে এইরূপ অভিযোগও উঠিয়াছে যে, যে টাকা উঠিয়াছে, তাহার সবটুকু প্রতি-রক্ষা তহবিলে যায় নাই।

কম্যুনিষ্টরা সকল ক্ষেত্রে এখন মাথা-চাড়া দিয়া উঠিতে চেষ্টা করিতেছে। এই উদ্দেশ্যে প্রতিপক্ষকে আঘাত করিতেও যে তাহারা কার্পণ্য করিবে না, বেহালা বেলঘরিয়া প্রভৃতি স্থানে তাহার কিছু প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে।

কিছুদিন পূর্ব্বে ট্যাংরায় অবস্থিত একটি গ্যাস কোম্পানীর ভিতরে একটি বোমা বর্ষিত হয়। স্থানচ্যুত না হইলে উহার দ্বারা গোটা

কারখানাটিই নষ্ট হইয়া যাইতে পারিত। এই ব্যাপারে পুলিশ কম্যুনিষ্ট ইউনিয়নের তিনজন কর্ম্মীকে গ্রেপ্তার করিয়াছে। একজন ধৃত কম্যুনিষ্ট নেতা এই ইউনিয়নটির সম্পাদক। এই কারখানাটির উৎপন্ন দ্রব্য এখন যুদ্ধের প্রয়োজনেও লাগিতেছে। বেলঘরিয়াতেও বোমা বর্ষিত হয় এবং সেই ব্যাপারেও পুলিশ কম্যুনিষ্ট কর্ম্মীদের গ্রেপ্তার করে।

শ্রীনাহার বলেন যে, এ-আই-টি-ইউ-সি যাহাই করুন না কেন, প্রতিরক্ষা তহবিলে অর্থ সংগ্রহ ব্যাপারে জাতীয় ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস এবং হিন্দ মজদুর সভা প্রশংসনীয় প্রয়াস চালাইয়া যাইতেছেন। "আর-এস-পি'র নেতৃত্বে পরিচালিত ইউ-টি-ইউ-সি সম্পর্কে বিজয়বাবু বলেন যে, তিনি যতদূর জানেন, উহারা অর্থ সংগ্রহ করিতেছে না, অর্থ সংগ্রহে বাধাও দিতেছে না।

আমরা বুঝিয়া পাই না, এত সব তথ্য জানা সত্ত্বেও যথাবিহিত প্রতিরোধ ব্যবস্থা কেন গৃহীত হইতেছে না। ভারত রক্ষা আইনে (Defence of India Act) দেশবিরোধীদের বিরুদ্ধে সর্ব্বপ্রকার ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায়। আপৎকালে এই আইনটিকে বেকার রাখার কোন অর্থ হয় না।

• কম্যুনিষ্ট অপকর্ম্মের কয়েকটি

খড়দহ অঞ্চলের বিভিন্ন কারখানায় শ্রমিক ইউনিয়নগুলির শতকরা ৯০ ভাগ কম্যুনিষ্ট নিয়ন্ত্রিত। কম্যুনিষ্ট চীন কর্তৃক ভারতভূমি আক্রান্ত হওয়া' এই সমস্ত ইউনিয়নের কর্তৃপক্ষ স্থানীয় ব্যক্তিগণ শ্রমিকদের ভিতর নানা প্রকার অপপ্রচার করিয়া তাহাদিগকে বিভ্রান্ত করিতেছে। জাতীয় প্রতিরক্ষা তহবিলে যাহাতে শ্রমিকেরা কোনরূপ দান না করে তজ্জন্যও গোপনে চেষ্টা করা হইতেছে।

নবদ্বীপে এবং আশেপাশে কম্যুনিষ্টদের গোপন তৎপরতা লক্ষ্য করা যাইতেছে। কিছুদিন পূর্বে মালঞ্চপাড়া এলাকায় কয়েকজন প্রকাশ্যে বর্তমান সঙ্কটপূর্ণ অবস্থার জন্য নেহরু সরকারই দায়ী বলায় কয়েকজন যুবক তীব্র প্রতিবাদ করে। বচসা চরমে উঠিলে বহু লোক সেখানে সমবেত হয়। ইত্যবসরে প্রচারকারিগণ প্রতিবাদকারী যুবকগণকে শাসাইয়া চলিয়া যায়।

মালদহে সম্প্রতি "চু এন লাই জিন্দাবাদ", "কম্যুনিষ্ট পার্টি জিন্দাবাদ", "চীনের পেছনে কৃষক-মজুর এক হও", "কংগ্রেস শাসন ধ্বংস হোক", "কংগ্রেসের ভাঁওতায় ভুলিও না" প্রভৃতি বাণী-সম্বলিত বহু হস্তলিখিত পোষ্টার বুলবুলচণ্ডী অঞ্চলের (মালদহ) বিভিন্ন স্থানে গাছের কাণ্ড ও গৃহপ্রাচীরের সংলগ্ন দেখা যায়।

মালদহের কম্যুনিষ্ট কর্ম্মিবৃন্দের উপরোক্ত চীন-দরদী ও ভারত-বিরোধী তৎপরতার ফলে এ জেলায় এ পর্য্যন্ত মাত্র ৪ জন কম্যুনিষ্ট ভারত-রক্ষা আইনে গ্রেপ্তার হইয়াছে।

বর্দ্ধমানের পল্লীতে

জাতীয় পতাকায় অগ্নিসংযোগ

বর্দ্ধমানের পূর্ব্বস্থলী থানার অধীন গোলাহাট গ্রামে কিছুদিন পূর্বে রাত্রি প্রায় দশটার সময়ে কয়েকজন কম্যুনিষ্ট কর্ম্মী স্থানীয় তরুণ সমিতি হইতে জাতীয় পতাকা অপসারণ করিয়া উহাতে অগ্নিসংযোগ করে। স্থানীয় দুইজন যুবক কর্ম্মস্থল হইতে ফিরিবার পথে উহা দেখিতে পাইয়া বাধা দেয় ও চীৎকার করে। উহার ফলে লোকজন ঘটনাস্থলে উপস্থিত হওয়ায় দুষ্কৃতিকারিগণ অর্দ্ধদগ্ধ পতাকা ফেলিয়া পলায়ন করে। অবিলম্বে দুষ্কৃতকারীদের নাম উল্লেখ করিয়া থানায় এজাহার দেওয়া হয়। পরদিন পুলিশ-তদন্তে ঘটনা সত্য প্রমাণিত হয়, কিন্তু এখন পর্যান্ত তাহাদের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা অবলম্বিত না হওয়ায় তাহারা সদর্পে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে এবং স্থানীয় জনসাধারণের মধ্যে অপপ্রচার করিয়া জাতীয় প্রতিরক্ষা ভাণ্ডারের জন্য অর্থ সংগ্রহে বাধা দিতেছে।

এই সমস্ত দুষ্কার্য্যে একজন প্রাথমিক শিক্ষক এবং ঐ অঞ্চলের একজন বিশিষ্ট কম্যুনিষ্ট কর্ম্মী নেতৃত্ব করিতেছে।

অথচ পুলিস এ-বিষয়ে কেন নির্ব্বিকার তাহা জানা যায় না। এই প্রকার প্রকাশ্য দেশদ্রোহিতা অন্য কোন দেশে কেহই সহ্য করিত না।

কম্যু-কীর্ত্তির ছোটখাট ঘটনাগুলিকে অবহেলার ফল ভাল হইবে না। একথা অনেকেই জানেন—পশ্চিমবঙ্গে এখনও কয়েক হাজার কম্যু-চ্যাঙড়া অবকাশের অপেক্ষায় রহিয়াছে। এই সকল চ্যাঙড়া কম্যুদের নেতারাও সুযোগের অপেক্ষায় রহিয়াছে। যাহারা হঠাৎ দেশভক্ত হইয়া গিয়াছে—সেই সব কম্যু নেতাদের কর্য্যকলাপ এবং গোপন চলাফেরার প্রতি সদা সতর্ক দৃষ্টি রাখা অবশ্য প্রয়োজন। এ-বিষয় সামান্য অবহেলাও বিষম বিপর্য্যয়ের কারণ হইতে পারে।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার একথা জানেন, কিন্তু কেন জানি না তাঁহারা এখনও নির্ব্বিকার রহিয়াছেন।

হাসপাতাল কর্ম্মীদের উস্কানি দেওয়া

সম্প্রতি একটি সংবাদে জানা গিয়াছে যে কম্যুনিষ্ট পার্টির জনৈকা কুখ্যাতা নেত্রী (উমা গুপ্তা) পশ্চিমবঙ্গের হাসপাতাল কর্মীদের মধ্যে বিশেষ সক্রিয় হইয়াছেন। দেশের বিষম আপৎকালে এই মহিলা হাসপাতাল-কর্ম্মীদের তাহাদের দাবীদাওয়া লইয়া, সরকার এবং হাসপাতাল-কর্ত্তৃপক্ষ তথা সর্ব্বসাধারণকে বিব্রত করিবার মহৎ প্রচেষ্টায় ব্যাপৃতা হইয়াছেন।

কর্ম্মীদের দাবীদাওয়া ন্যায় কি অন্যায়, সে তর্ক বর্ত্তমানে অবান্তর। বর্ত্তমান অবস্থায় যুদ্ধপ্রচেষ্টা এবং দেশ-প্রতিরক্ষার পক্ষে ক্ষতিকর সর্ব্বপ্রকার আন্দোলন বন্ধ রাখিতে হইবে—সরকারী ইস্তাহার এবং দেশ-নেতাদের ভাষণে ইহা বারবার ঘোষণা করা হইয়াছে। কিন্তু এই আবেদন অগ্রাহ্য করিয়া শ্রমিকদরদী কম্যুনিষ্ট মহিলা, কর্ম্মীদের দ্বারা একটা হট্টগোল বাধাইবার চেষ্টা কেমন করিয়া করিতে পারেন, তাহা আমাদের বুদ্ধির অগম্য। এই মহিলা পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শ্রমদপ্তরে হাসপাতাল-কর্ম্মীদের দাবীদাওয়া লইয়া প্রায়ই গোলযোগ এবং জোর দরবার করিতেছেন। শ্রম-দপ্তরের উচ্চপদস্থ অফিসারগণ এই মহিলার পরিচয় এবং তাঁহার রাজনৈতিক মতবাদ বিষয়ে সবই জানেন, তবুও কেন এই

কম্যু মহিলাকে শ্রম-দপ্তরে প্রবেশ করিতে দেওয়া হইতেছে ?

কলিকাতার বিশেষ দু-একটি হাসপাতালের কর্মীরা যাহাতে প্রতিরক্ষা ভাণ্ডারে চাঁদা না দেয়, কম্যুনিষ্ট পার্টির কোন কোন কর্মী তাহার জন্যও প্রাণপণ চেষ্টা করে। এই ব্যক্তিরা গোপনে কম্যুনিষ্ট, প্রকাশ্যে দেশ-ভক্ত হাসপাতাল-কর্মী। কাহার বা কাহাদের প্ররোচনায় এই কম্যু-কর্মীরা এই প্রকার দেশ-বিরোধী কাজ করিতেছে—তাহা সহজেই বুঝা যায়।

এ বিষয়ে সরকার কি ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়াছেন, কিংবা করিবেন, তাহা আমাদের জানা নাই। তবে যতদূর জানি, আজ পর্য্যন্ত দেশদ্রোহিতার অপরাধে সামান্য কয়েকজনকে মাত্র আইনের সাহায্যে শায়েস্তা করা হইয়াছে। এখনও সহরের পথে ঘাটে, বাড়ীর রকে, ট্রামে বাসে অফিসে কলকারখানায় রেস্তোরাঁয়—বহু বহু বিশ্বাসঘাতক দেশদ্রোহীদের ফিসফাস শুনিতে পাওয়া যাইতেছে। কোন্ গোপন বলে বলীয়ান্ হইয়া এই চীনা-প্রেমী বিশ্বাসঘাতকের দল দেশের পরম সঙ্কট লইয়া হাস্যপরিহাস করে ? চীনের এই দালালেরা, দেশরক্ষার সকল প্রয়াসকে বিকৃত এবং হালকা করিয়া দেখাইবার চেষ্টা করিতে ভরসা পায় কোন্ সাহসে ?

ভারতের অন্যান্য প্রদেশে দেশদ্রোহী বিশ্বাসঘাতকদের দমন ব্যবস্থা রাজ্যসরকারগুলি যে ভাবে এবং যে দৃঢ়তার সহিত করিয়াছেন, বলিতে লজ্জা এবং দুঃখ হয়, পশ্চিম-বঙ্গে তাহা এখনও হয় নাই। জানি না, পশ্চিমবঙ্গ সরকার এ বিষয় আইনজ্ঞের পরামর্শের অপেক্ষায় বসিয়া আছেন কি না। দেশমাতৃকার ডাকে সাড়া দেওয়া দূরে থাকুক, বড় বড় কম্যু নেতা পার্টির জাতীয় পরিষদের গৃহীত প্রস্তাব পর্য্যন্ত স্বীকার করেন নাই। পরকীয়া প্রেমে মসগুল যে সব কম্যু নেতা পার্টির ফতোয়া অগ্রাহ্য করিয়াছেন, তাঁহারা আজও কারাগারের বাহিরে বেপরোয়া ঘোরাফেরা করিতেছেন কেমন করিয়া ? কেবল ঘোরাফেরাই নহে—এই সকল চীনা-প্রেমী বিশ্বাস-ঘাতক কম্যু নেতা গোপনে প্রকাশ্যে তাঁহাদের চরিত্র-সুলভ সকল প্রতিরক্ষা-ব্যবস্থায় ব্যাঘাত সৃষ্টি এবং সাধারণ লোকের মনোবলেও চীড় ধরাইতে সকল চেষ্টাই করিতেছেন। পশ্চিমবঙ্গ সরকার আর কতকাল এ-বিষয়ে নির্ব্বিকার অবহেলা প্রদর্শন করিবেন ? জাতির এবং দেশের এই পরম সঙ্কটময় মুহূর্তে কম্যু এবং কম্যু-কর্মীদের দমনে অযথা আর বিলম্ব এবং কালহরণ করার অর্থ হইবে, দেশের অদৃষ্ট, স্বার্থ এবং স্বাধীনতা লইয়া খেলা করার সামিল।

কম্যুনিষ্ট পার্টির প্রচণ্ড প্রোপাগাণ্ডাপ্রচারের ফলে পশ্চিম বাঙ্গলার যুবসমাজের একটি বড় অংশ দেশ-প্রতি-রক্ষার বিষয়ে এখনো অনড় হইয়া আছেন। প্রকাশ্য সভায় যে সব তথাকথিত ছাত্র দেশের পক্ষে ক্ষতি এবং অমর্য্যাদাকর প্রস্তাব পেশ করিতে লজ্জাবোধ করে না, ভয় পায় না, ইহারা কোন্ শ্রেণীর, কোন মতবাদে বিশ্বাসী ?

যে বাঙ্গলার ছাত্রসমাজ একদিন দেশের জন্য, জাতীয় স্বাধীনতার কারণে দলে দলে কারাবরণ করিয়াছে, বন্দুকের সামনে বুক পাতিয়া দিতেও ভয় পায় নাই, হাসিমুখে যাহারা মৃত্যুবরণ করিতে কোন দ্বিধা বোধ করে নাই—সেই ছাত্রসমাজের এক শ্রেণীর মধ্যে এই বিকৃতি, এই দেশদ্রোহিতা কাহাদের প্ররোচনার বিষময় ফল—বুঝা কঠিন নহে।

জাতির মনোবল বজায় রাখিতে, দেশের প্রতিরক্ষা প্রচেষ্টা অব্যাহত করিতে আর অযথা কালক্ষেপ করিলে কর্তৃপক্ষকে অনতিবিলম্বে পরম আক্ষেপ করিতে হইবে। জানা-অজানা, চেনা-অচেনা সকল শ্রেণীর পঞ্চমবাহিনীর সকল প্রকার কার্য্যকলাপ বন্ধ করা ছাড়া উপায় নাই এবং ইহা করিবার ইচ্ছা থাকিলে সরকার অবিলম্বে, অদ্যই, সন্দেহজনক ব্যক্তি মাত্রকেই ভারতরক্ষা আইনের বলে কারারুদ্ধ করুন।

পশ্চিমবঙ্গের বিশিষ্ট যে দুইজন প্রখ্যাত কম্যুনিষ্ট নেতা (একজন আইনজীবী আর একজন চিকিৎসক) সহসা পার্টি হইতে পদত্যাগ করিয়াছেন, তাঁহাদের সম্পর্কেও অবহিত থাকিতে হইবে। পার্টি হইতে পদত্যাগ করিয়া-ছেন ইঁহারা 'দলগত' কারণে, পার্টি ত্যাগ করিলেও ইঁহারা তাঁহাদের মতবাদ পরিত্যাগ করেন নাই। মনে হইতেছে, পশ্চিমবঙ্গ কম্যুনিষ্ট পার্টির বর্ত্তমান সম্পাদক মণ্ডলীকে বিব্রত করিবার এবং বেকায়দায় ফেলিবার মতলবেই এই হঠাৎ 'পদত্যাগ'। ইহাতে দেশবাসীর উল্লসিত হইবার মত কোন কারণ ঘটে নাই। সোজা কথায়—ইহা ভেক বদল মাত্র।

কম্যুনিষ্টদের প্রকৃত রূপ

ভারতীয় কম্যুদের দেশের প্রতি কোন মমতা নাই, দেশের মাটির প্রতি তাহাদের কোন দরদ নাই। ইহারা, এক কথায় বলতে গেলে,—দেশদ্রোহী, নীতিহীন পরম সুবিধাবাদী। ইহাদের কর্ম্মনীতি এবং ক্রিয়া-পদ্ধতির

নির্দ্দেশ আসে বিদেশ (বর্ত্তমানে পিকিং) হইতে। বিদেশের বড় কর্ত্তাদের নির্দ্দেশে ভারতীয় কম্যুনিষ্ট পার্টি, বিশেষ করিয়া এই পার্টির পশ্চিমবঙ্গ শাখা, দেশের প্রতি চরম এবং পরম বিশ্বাসঘাতকতা করিতে বিন্দুমাত্র লজ্জা, দ্বিধা এবং সঙ্কোচ করিবে না ইহাদের বর্ত্তমান কার্য্যকলাপ এ বিষয়ে প্রকৃষ্ট প্রমাণ দিতেছে।

কম্যুনিষ্ট পার্টির বহু নেতা এবং কর্ম্মী হঠাৎ নেতাজী-ভক্ত বনিয়া গিয়াছে। এখন কথায় কথায় ইহারা নেতাজীর নাম লইয়া শপথ করে। কিন্তু এই ভারতীয় কম্যুনিষ্ট পার্টি নেতাজী সম্পর্কে ১৯৪২ সালে কি ঘোষণা করিয়াছিল? পথে-ঘাটে কম্যুচরের দল চিৎকার করিয়া বলিয়া বেড়াইত, "সুভাষ বোস ভারতে এলে তাকে ফুলের মালা দিয়ে অভ্যর্থনা করা হবে না, তাকে অভ্যর্থনা করা হবে সঙ্গীনের খোঁচা আর বন্দুকের গুলি দিয়ে।"

দেশ স্বাধীনতা লাভ করিবার পর—কম্যুনিষ্ট পার্টি ইয়ে আজাদী ঝুটা হ্যায়"-বুলি দ্বারা দেশের লোকের প্রাণ অতিষ্ঠ করিয়াছিল।

দেশ বরেণ্য বীরশ্রেষ্ঠ নেতাজী সম্পর্কে ভারতীয় কম্যুনিষ্ট পার্টির তৎকালীন মুখপত্র—কয়েকটি বিচিত্র চিত্র সদম্ভে প্রকাশ করে। 'পিপলস্ ওয়ার' পত্রিকায় প্রকাশিত কয়েকটি চিত্রের দৃষ্টান্ত এখানে দেওয়া হইল। এই চিত্রগুলি হয়ত বহুজন দেখেন নাই। অনেকে হয়ত

PEOPLE'S WAR

সুভাষচন্দ্র দুর্ভিক্ষক্লিষ্ট বাঙ্গালীদের হত্যা করিবার জন্য বোমারূপে নামিয়া আসিতেছেন !

PEOPLE'S WAR

"Subhas Bose—I am bringing freedom to India"

নেতাজীকে তোজোর কুকুররূপে চিত্রিত করা হইয়াছে

PEOPLE'S WAR

SUNDAY ORGAN OF THE COMMUNIST PARTY OF INDIA
Editor: G. ADHIKARI

"Marshal" Bose Reviews His Army.

জাপানীদের হাতের পুতুলরূপে নেতাজী

PEOPLE'S WAR

The Bose Way

সুভাষচন্দ্রকে গাধারূপে দেখানো হইতেছে

কল্পনাও করিতে পারিবেন না, যে, যে-বীর দেশের জন্য, জাতির জন্য, নিজেকে সকল পার্থিব সুখ-সম্পদ্ হইতে বঞ্চিত করিয়া—স্বাধীনতার জন্য পরম আত্মত্যাগ করিতে দ্বিধাবোধ করেন নাই, সেই সর্ব্বকালের দেশভক্ত বীরের সম্পর্কে—তাঁহারই দেশের এক শ্রেণীর লোক এমন হীন জঘন্য রুচির পরিচয় দিতে পারে! স্থানাভাবের জন্য মাত্র ৪ খানি ছবির প্রতিলিপি এখানে দেওয়া হইল।

আকাশবাণীর "যুদ্ধ-প্রচেষ্টা" (?)

'পল্লীবাসী' ঠিক সময়ে বলিয়াছেন :

সুর ও স্বর পাল্টাও

চীন যখন ম্যাকমাহন লাইন ডিঙাইয়া তাওয়াংয়ের দিকে ধাওয়া করিয়া আসিতেছে, তখনও আকাশবাণী যথারীতি লারেলাপ্পা করিতেছে দখিয়া সর্ব্বাঙ্গ জ্বলিয়া গিয়া ছিল।

সুখের বিষয়, আকাশবাণীর প্রোগ্রাম কিছু বদল হইয়াছে—দেশাত্ম-বোধক গানও হইতেছে।

কিন্তু হইলে কি হইবে কণ্ঠস্বর কোথায়? দীর্ঘদিন ঘুমপাড়ানো গান গাহিয়াই যাহারা বাহবা কুড়াইয়াছে, হঠাৎ তাহারা ঘুম-ভাঙানো গান গাহিবে কি করিয়া? ফলে সব গানই কেমন যেন ন্যাতাইয়া পড়িয়াছে। এ সময় এ ভাবে সময় নষ্ট করিতে দেওয়া যায় না। কণ্ঠস্বর পাল্টাইতেই হইবে—সুদৃঢ় উদ্দীপনাদ্যোতক উদাত্ত কণ্ঠে জাতীয় উদাসীনতাকে চূর্ণ করিতেই হইবে। ইহারা না পারে তো, শিল্পী পাল্টাইতে হইবে নূতন নূতন চারণের কণ্ঠে জাতির ঘুমন্ত বীর্য্যকে উদ্দীপ্ত করিবার ব্যবস্থা করিতে হইবে। কতকগুলি বামাকণ্ঠের এলানে সুরে দেশপ্রেমের গান একেবারে মাটি হইয়া যাইতেছে। ইহারা পারিবে না, এ কণ্ঠস্বর চলিবে না। দৃপ্তকণ্ঠে বজ্রনিনাদ তুলিতে হইবে। জাতির জীবনমরণ সংগ্রাম চলিয়াছে—এখন কি আর এ সব হাল্কা-ধরণের ন্যাকামি কাণ্ড চলে? 'আকাশবাণী'-কর্ত্তৃপক্ষ হুঁসিয়ার হউন।

একই বিষয়ে আনন্দবাজার পত্রিকা বলেন :

বর্তমানে আকাশবাণী থেকে তার ভূরি পরিবেশনের ব্যবস্থা নিশ্চয়ই হয়েছে। কিন্তু ঝাড়াই-বাছাই এবং পরিমিতি-বোধের কথাটি বোধ হয় কারো মনে আসে নি। আয়োজনের প্রাচুর্য-সত্ত্বেও পরিবেশন-দক্ষতার অভাব উদ্দেশ্যসিদ্ধির অন্তরায় হতে বসেছে। একই গান প্রতিদিন একাধিকবার শুনতে কারও ভালো লাগবে এমন আশা করা অন্যায়। একটি গান অথবা তার সুর যদি "থিম সং" হিসেবে ব্যবহার করা হয়, তা হ'লে কিছুটা ফললাভ অবশ্য হতে পারে।

সম্প্রতি আকাশবাণী কলকাতা থেকে কিছু কিছু দৃঢ়তাব্যঞ্জক নতুন গান পরিবেশিত হয়েছে সন্দেহ নেই। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই সব অধিকাংশ গানেরই কথা এবং সুর নিতান্তই দুর্বল। এ গান গেয়ে রাস্তায় খঞ্জনি বাজিয়ে বন্যার্তদের জন্য ভিক্ষা করা যায়, জাতীয় সঙ্কটে শ্রোতার মনোবল বাড়ান যায় না। নতুন সুরে বাঞ্ছিত নতুন গান যদি না-ই পাওয়া যায়, তা হলে বরং এ গান কমিয়ে রবীন্দ্রনাথ, অতুলপ্রসাদ, রজনীকান্ত অথবা নজরুলের গানই শোনান হোক। শ্রোতা যদি বিরক্ত হয়ে অনুষ্ঠানই না শোনে তা হ'লে সমস্ত প্রচেষ্টাই ব্যর্থ হবে। কর্তৃপক্ষের প্রশংসনীয় এই প্রচেষ্টা ফলপ্রসূ হবে না।

দেশর বর্ত্তমান অবস্থায় দেশাত্মবোধক সঙ্গীতের প্রয়োজনীয়তা অবশ্যস্বীকার্য্য। কিন্তু এই সব দেশাত্মবোধক গানে কতকগুলো বিশেষ ধরণের বাক্য বা কথা থাকিলেই তাহা দেশাত্মবোধক হইতে পারে না। কলিকাতা আকাবাণীতে গত কিছুকাল যাবৎ এমন এক ধরণের 'জাতীয়'-সঙ্গীত প্রচার করা হইতেছে—যাহা শ্রোতার মনকে উদ্দীপ্ত না করিয়া করে স্তিমিত ক্লান্ত। এই প্রকার গান শ্রোতার মনে একটা বিকৃত বিরক্তিকর অবস্থার সৃষ্টি করিতেছে।

দুঃখের সঙ্গে বলিতে বাধ্য হইতেছি যে, কলিকাতা আকাশবাণী হইতে আজকাল এমন ধরণের গান অহরহ প্রচারিত হইতেছে, যাহা কর্ত্তৃপক্ষের মতে দেশাত্মবোধক হইলেও, প্রচারের অযোগ্য। এই ধরণের গান প্রচার

না করিয়া সাধারণ ভাল গানের প্রচার শ্রোতাদের পক্ষে অধিকতর কাম্য।

গত মহাযুদ্ধের সময় বিবিসি হইতে যুদ্ধের পক্ষে সহায়ক বহু প্রকার বিষয়বস্তু প্রচার করা হইত, কিন্তু কলিকাতা আকাশবাণীর মত এমন অদ্ভুত গান প্রভৃতির প্রচার একদিনও হয় নাই। বার্লিন রেডিও সম্পর্কেও একই কথা বলা যায়।

কলিকাতা বেতারে "দেশাত্মবোধক" সঙ্গীতাদির প্রচার এই ভাবে আর কিছুদিন চলিতে থাকিলে শতকরা অন্তত পঞ্চাশ জন ভদ্র-বেতার শ্রোতা তাঁহাদের রেডিও লাইসেন্স ক্যানসেল করিতে বাধ্য হইবেন। স্থানীয় বেতার প্রতিষ্ঠানের পরিচালক অবহিত হউন।

জাতীয় সঙ্গীতের নমুনা

কি ধরণের দেশাত্মবোধক গান কলিকাতা বেতার হইতে প্রচারিত হইতেছে, পত্রিকায় প্রকাশিত তাহার সামান্য নমুনা দিতেছি :

১। কুসুম বিতানে ঢুকেছে ঘাতক
আগুন দিয়েছে জ্বালি,
তুমি না নেভালে কে নেভায়
বল তুমি ফুলমালি।

কি বিষম উদ্দীপনাময় গান! কিন্তু এই 'মালি' 'ফুল'টি কে?

২। বীরদল চলে সমরে,
টলমল টলমল পদভরে—
... ...

৩। আমাদের পূজার বেদাতে
পাশাপাশি দুটি মূর্তি
একটি কৃষ্ণ আর একটি হল বুদ্ধ।
... ...

৪। বন্ধুর পথ বন্ধুর নয়
যদি বন্ধু পাশে রয়।
... ...

(এই বিষম 'দেশাত্মবোধক' গানের দ্বিতীয় লাইনে 'বন্ধু'র জায়গায় 'বঁধু' বসাইলে বন্ধুর পথ পরম মধুর হইত।)

আর দৃষ্টান্ত বাড়াইয়া পাঠকদের দেশপ্রেমে উদ্দীপ্ত করিতে প্রয়াস করিব না।

তারপর কতকগুলি বিখ্যাত জাতীয় সঙ্গীত ক্রমাগত (প্রত্যহ বার সাত-আট) প্রচারিত করিয়া শ্রোতাদের কান ঝালাপালা করা হইতেছে। হাতের কাছেই গ্রামোফোন রেকর্ড—কাজেই রেডিও প্রচারকদের অসুবিধা নাই!

ইহার উপর আছে প্রাত্যহিক অনুষ্ঠান। "মজদুর মণ্ডলী" এবং "পল্লীমঙ্গল" আসর। প্রথমটি বিশ মিনিট —কাজেই অসহ্য হইলেও তাড়াতাড়ি যন্ত্রণা শেষ হয়, কিন্তু পল্লীমঙ্গল আসরটি—প্রত্যেক এক ঘণ্টা ধরিয়া চলে! এই আসরটিকে ভাঁড়ামোর আসর বলিলেও অন্যায় হইবে না। এই আসরের মোড়ল সর্ব্ববিদ্যাবিশারদ। একাধারে তিনি ধর্ম্মপ্রচারক, বক্তা, সমাজসংস্কারক, নাট্যকার, অভিনেতা, প্রযোজক, লেখক—এক কথায় "হোল্ড অল"। আসরে দুটি ভাঁড় আছে—যাঁহাদের প্রাত্যহিক রসিকতা একই ছাঁচে ঢালা। একজন মঙ্গল-বিধায়ক আছেন—ইনি শ্রোতাদের ধমক দিয়া তাঁহার উপদেশামৃত প্রচার করেন! আর একজন মহাকান্ত আছেন—ইঁহার কথাবার্ত্তায় মনে হয়, নিজেকে তিনি মহারসিক বলিয়া মনে করেন। আর মোড়লের ত "গুণের নাহিক সীমা।"

দেশের আপৎকালে—দেশাত্মবোধ জাগ্রত করিবার প্রয়াসে এই দুইটি আসরে প্রায় বিপরীত কার্য্যই হইতেছে। পল্লীমঙ্গল আসরে ভাঁড়ামোর দ্বারা কিস্তিমাতের অপপ্রয়াস বন্ধ করা প্রয়োজন। এই আসরের মোড়ল মহাশয়ের ধর্ম্মপ্রচার এবং হেডমাষ্টারী আর চলে না। ক্রমশঃ অসহ্য হইয়া উঠিতেছে।

আমরা বুঝিতে পারি না, গরীব করদাতাদের টাকায় এই ভাবে বছরের পর বছর বিশেষ কয়েকটি অযোগ্য ব্যক্তিকে বেতার প্রতিষ্ঠান কেন এবং কি কারণে প্রতিপালন করিতেছেন। দেশে নূতন এবং যোগ্যতর ব্যক্তি কি আর নাই? মোড়ল মহাশয় মনে করেন, সকল শ্রোতাই হয় শিশু আর না হয় গাধা! ইঁহার আর একটি ধারণা আছে যে, বাঙ্গলাদেশের প্রতি পল্লীতে অন্তত ১০টি করিয়া রেডিও সেট্ আছে এবং পল্লীর লোকেরা দলে দলে প্রত্যহ "পল্লীমঙ্গল" আসর 'শ্রবণ' করিবার জন্য বেলা ৫টা হইতে ভীড় করিয়া থাকে! মোড়ল মহাশয়ের কণ্ঠস্বর বিচিত্র—ন্যাকামোপূর্ণ।

প্রত্যহ একই কণ্ঠনিঃসৃত একই অমৃতবাণী মানুষ কতকাল সহ্য করিবে?

রবিবারের সঙ্গীতশিক্ষা আসরেরও নায়ক পরিবর্ত্তন এবার করা দরকার। প্রায় ৩০ বৎসর একই ওস্তাদকে শিক্ষকপদে রাখার পক্ষে কোন যুক্তি নাই। ব্যাপারটি জঘন্য একঘেয়ে হইয়া পড়িয়াছে।

বারান্তরে কলিকাতা আকাশবাণী সম্পর্কে আরও কিছু বলিবার ইচ্ছা থাকিল।

ছাত্রছাত্রী এবং ম্যাটিনী শো

জলপাইগুড়ির জনমত পত্রিকায় এক পত্রপ্রেরক বলিতেছেন :

মফঃস্বল শহরে বর্তমানে তিনটি সিনেমা গৃহ। প্রতিটি সিনেমা গৃহই ভাল চলিতেছে। অর্থাৎ জনসাধারণ সিনেমা দেখিবার জন্ম বেশ পয়সা খরচ করিতেছেন। কিন্তু বর্তমানে······সিনেমা গৃহে প্রত্যহ ম্যাটিনীর ব্যবস্থা হওয়ায় যে পরিমাণে ছাত্র-ছাত্রীদের ভীড় বাড়িতেছে তাহাতে অভিভাবকদের বিপদের সম্মুখীন হইতে হইবে। গহনা-পত্র চুরি যাইবে। বাপের পকেট মারা যাইবে। তাহার উপর সম্মুখে পরীক্ষা। এইরূপ হারে ম্যাটিনী দেখিলে পরীক্ষার ফলাফল যে কি হইবে, তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যাইতেছে, এবং উচ্ছৃঙ্খলতাও বাড়িবে। আমার মনে হয়, এই ব্যাপারে জেলা-সমাহর্তা, পুলিশ বিভাগ ও অভিভাবকদের বিশেষ নজর দেওয়া প্রয়োজন।

বিষয়টি সত্যই ভাবিয়া দেখিবার মত। এ-বিষয় কলিকাতার অবস্থা আরও সঙ্গীন, আরো উদ্বেগজনক। এই শহরে বেলা ২৷৷০।৩টায় সিনামাতে যে 'শো' হয়, তাহার দর্শক শতকরা ৯০ জনই ছাত্র-ছাত্রী, বালক-বালিকা এবং যুবক-যুবতী। কলেজ-স্কুল কামাই করিয়া কিংবা ক্লাস ফাঁকি দিয়াও হয়ত অনেকে ম্যাটিনী শো দেখিতে যায়।

দেশের এই সঙ্কটময় অবস্থার মধ্যেও ম্যাটিনী শোর টিকিট-ক্রেতাদের যে সমারোহ এবং প্রচণ্ড দীর্ঘ কিউ দেখা যায় তাহা সত্যই বিস্ময়কর। টিকিট-ক্রেতাদের মধ্যে যে প্রকার উৎসাহ, হৈ-হল্লা দেখা যায়, তাহাতে মনে হয়, দেশ যেন সাধারণ অবস্থায় রহিয়াছে এবং আমরা পরম নিশ্চিন্তে সুখসম্পদের মধ্যে কালযাপন করিতেছি। ছাত্রসমাজ এবং অভিভাবক ছাড়া এ-বিষয় অন্য কেহ কোন প্রতিকার করিতে পারিবেন না।

গত যুদ্ধের সময় রাত্রি ৮৷৷০।৯টার শো ব্লাক আউটের জন্ম ফাঁকা যাইত বলিয়া ম্যাটিনী "শো"র বিশেষ অনুমতি সিনেমাগুলিকে দেওয়া হয়। যুদ্ধ শেষ হইয়া যাইবার পরেও কিন্তু এই বিশেষ আশীর্ব্বাদটি কলিকাতা শহরের সিনেমাগুলিতে রহিয়া গিয়াছে। সরকারের ইহাতে ক্ষতি নাই, কারণ আমোদ-কর বাবদ বেশ দু পয়সা আয় হয়। কিন্তু সমাজের দিকে সামান্য কৃপাদৃষ্টি দিলে দোষ কি?

সিনেমাকে কোন দোষ দিতেছি না, কিন্তু এই সিনেমার কল্যাণে দেশের কি বিষম অকল্যাণ ছাত্র এবং যুব সমাজের হইতেছে তাহা বিচার করিয়া দেখা প্রয়োজন এবং সেই সঙ্গে অবস্থার প্রতিকারও কাম্য।

চীন আক্রমণ ও বাস্তববোধ

চীনের দ্বারা ভারত আক্রান্ত হওয়ার ফলে একটা জিনিষ যেন জলের মত পরিষ্কার হইয়া গেল। ভারতের ঐক্য সাধন এবং রক্ষার জন্ম যে সকল হিন্দীওয়ালারা সকল প্রদেশের সকল লোকের উপর হিন্দী জোর করিয়া চাপাইবার সর্ব্বপ্রকার বৈধ, অবৈধ চেষ্টা করিতেছিলেন তাঁহারা অবশ্যই আজ দেখিতে পাইতেছেন যে "হিন্দী" ভাষার সর্ব্বব্যাপী আধিপত্য না থাকা সত্ত্বেও ভারত এক ও অখণ্ড। ভারতীয় জাতিও এক এবং পরম এক অচ্ছেদ্য একতা সূত্রে আবদ্ধ।

চীনের বর্ব্বর আচারে আমরা স্বপ্নরাজ্য হইতে একেবারে কঠিন বাস্তব-জগতের মাটিতে পা দিয়াছি। প্রাদেশিক সঙ্কীর্ণতা ভুলিয়া সমগ্র ভারত আজ তাহার সমস্ত শক্তি সংহত করিয়াছে বিশ্বাসঘাতক বিদেশীকে উচিত শিক্ষা দিতে। প্রতিরক্ষার আয়োজন, প্রশাসনব্যবস্থা, আর্থিক কর্ম্মকাণ্ড সবই স্থূল বাস্তবের পরিপ্রেক্ষিতে নূতন করিয়া ঢালিয়া সাজার উদ্যোগ চলিতেছে। সঙ্কীর্ণ দৃষ্টি লইয়া কোনও সমস্যার বিচার এখন আর সম্ভব নয়। আজ নবভারতের জনতা জাগিয়াছে এবং সীমিত প্রান্তীয় স্বার্থের কথা ভুলিয়া সকল প্রশ্নই বিবেচনা করিতেছে ঐক্যবদ্ধ ভারতের কল্যাণের দিক্ হইতে। জাতীয় সংহতির বন্ধন আজ যেমন দৃঢ় হইয়াছে, গত বারো বৎসরের মধ্যে তেমন কখনও ছিল কিনা সন্দেহ।

জাতির চরম সঙ্কট দেশে যে ঐক্যবোধের সৃষ্টি করিয়াছে, তাহাতে যাঁহারা শাসনযন্ত্রের যন্ত্রী, তাঁহাদেরও চোখ খুলিয়াছে। কৃত্রিম উপায়ে এক ভাষা বিপ্লব ঘটাইয়া যে সংহতিসাধনের প্রয়াস তাঁহারা করিতে-ছিলেন, সেটার সঙ্গে বাস্তবের যে কোনও যোগ নাই, তাহা এ দুঃসময়ে তাঁহারা উপলব্ধি করিয়াছেন। জোর করিয়া সারা দেশের উপর হিন্দী চাপাইয়া দিলে যেমন ভারতীয় সংহতির সংহার হয়—তাহার বিকাশ হয় না, তেমনই আবার মাতৃভাষার পুষ্টির দোহাই দিয়া ইংরাজী বর্জ্জন করিয়া আঞ্চলিক ভাষাগুলিকে শিক্ষার বাহন করিবার জন্ম চাপ দিলেও সে সংহতির বিকার ঘটিবে। ইংরাজ কি উদ্দেশ্য লইয়া এ দেশের লোককে ইংরাজী ভাষা শিক্ষা দিয়াছিল, সে প্রশ্ন আজ অবান্তর। কিন্তু তাহারই ফলে যে আধুনিক জ্ঞানভাণ্ডারের দ্বার আমাদের নিকট খুলিয়া গিয়াছিল —এ কথা অস্বীকার করিলে সত্যের অপলাপ হইবে। ইংরাজী শিক্ষা এ দেশে জাতীয়তাবোধের বিকাশের পথে বাধা ত হয়-ই নাই, বরং তাহার ক্ষীণ ফল্গুধারাকে পরিপুষ্ট ও সঞ্জীবিত করিয়াছে। কালক্রমে তাহারই দুর্ব্বার স্রোতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের ঐরাবতও ভাসিয়া গিয়াছে। কাজেই ইংরাজী ভাষার চর্চা আমাদের বিজাতীয় আদর্শের অনুসরণ করিতে স্বদেশের সহিত আত্মিক যোগ ছিন্ন করিয়া দিয়াছে—এ অভিযোগ সত্য নয়।

যে আন্দোলনের ফলে আমরা স্বাধীনতা লাভ করিয়াছি—সেই আন্দোলনের ভাষা ছিল, ইংরেজী—ইহা অবশ্য স্বীকার্য্য। ইংরেজীই ছিল ঐক্যবন্ধনের সেতু।

আসমুদ্র হিমাচল যে জাতীয়তাবোধের বন্ধনে বাঁধা পড়িয়াছিল, তাহার উজ্জীবনে ইংরাজী ভাষার ভূমিকা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। বিভিন্ন ভাষাভাষী অঞ্চল যে তাহাদের আঞ্চলিক স্বাতন্ত্র্যের দাবি ভুলিয়া গিয়া অখণ্ড ভারতবর্ষ

গঠন করিতে পারিয়াছিল তাহার একটি কারণ, ইংরেজী ভাষা তাহাদের মধ্যে সমন্বয়সাধন করিয়াছিল। তখন যদি কোনও একটি বিশেষ আঞ্চলিক ভাষা সারা ভারতবর্ষে একক প্রাধান্যের দাবি করিত, তাহা হইলে হয়ত জাতীয়তাবোধের নবীন তলাটি অঙ্কুরেই বিনষ্ট হইত। তাহা হয় নাই বলিয়া জাতীয় সংহতির ভিত্তি ক্রমশঃ দৃঢ় হইয়াছে—ভারতে জাতীয় আন্দোলন শক্তিশালী হইয়া সার্থকতা লাভ করিয়াছে। খণ্ড ছিন্ন বিক্ষিপ্ত ভারতকে যে ভাষার পাশ একত্রাবদ্ধ করিয়াছে, সেটি ইংরাজী। বাংলা, হিন্দী, আসামী, উড়িয়া, মারাঠী, গুজরাটী, তামিল, তেলেগু—নানা ভাষাগোষ্ঠীর লোককে জাতীয়তাবাদে উদ্বুদ্ধ করিয়াছে ইংরাজী ভাষা।

ইংরেজী ভাষাকে তাড়াইয়া দিলে ভারতের উপকার না হইয়া বিপরীত ঘটিবে। হিন্দী যে মাত্র একটি আঞ্চলিক ভাষা ইহাও আমাদের মনে রাখিতে হইবে। জোর করিয়া ভাষা চাপাইতে গেলে পরম অনর্থ ঘটিবে—ঐক্যবদ্ধ ভারত টুকরা টুকরা হইয়া যাইবে।

—০—

হরতন

শ্রীবিমল মিত্র

সামান্য একটা চিঠি। কিন্তু সেই সামান্য একখানা চিঠিই যেন কেষ্টগঞ্জের সমস্ত হাওয়াটাকে একেবারে ঘুরিয়ে দিয়ে গেল। চিঠির সারাংশ কেউ খবরের কাগজে বড় বড় হেড-লাইন দিয়ে ঘোষণাও করে নি। কেউ এসে প্যাণ্ডেল খাটিয়ে সভা-সমিতিও করে নি। নিতান্তই একটা পাঁচ নয়া পয়সার পোষ্টকার্ডে চেনা কয়েকটি ছত্র। সেই চিঠিখানাই কেষ্টগঞ্জ তোলপাড় ক'রে তুলল।

দুলাল সা যখন প্রাতঃস্নানে যায়, তখন ঘাটে লোকজন না থাকারই কথা। কিন্তু যদি কেউ থাকে ত দুলাল সা'কেও তার জবাবদিহি করতে হয়।

দুলাল সা বলে—দূর আহাম্মক, ভক্তি কি আর সোজা? ভক্তি যদি একবার হ'ল ত ব্যস্, তখন আর তোকে পায় কে? তখন তুই ভবার্ণব ত'রে গেলি—তখন আর তোর কাউকে ভয় করবার দরকার নেই।

মুকুন্দর সঙ্গেই সচরাচর দেখাটা হয় দুলাল সা'র।

মুকুন্দ সংসারের মানুষ। সংসারের ভয়-ভাবনা-সন্দেহ নিয়েই বিব্রত। সে বলে—কিন্তু আমার ত বিশ্বাস হচ্ছে না সা'মশাই।

—কেন? তোর বিশ্বাস হচ্ছে না কেন?

—আজ্ঞে, এটা ত আর সত্যযুগ নয়। সত্যযুগ হ'লে না হয় বুঝতাম! এ্যাদ্দিনের হারিয়ে-যাওয়া মেয়ে কি আর পাওয়া যায়? আর জানা নেই, শোনা নেই, কলকাতায় গেলাম আর পেয়ে গেলাম। এ যুগে কি আর অঘটন ঘটে? আপনিই বলুন?

দুলাল সা মৃদু মৃদু হাসে। মুকুন্দর মত মূঢ় মানুষদের কথায় হাসি ছাড়া আর কিই-বা তার করার আছে?

—অঘটন ঘটে না? তুই বলছিস?

—আজ্ঞে, সে-সব ঘটত অবতার মহাপুরুষদের আমলে। তাঁরা ছিলেন ত্রিকালজ্ঞ।

—তা হ্যাঁ রে, আমাকে দেখেও তোর বিশ্বাস হয় না। এই যে আমি! যে-আমি তোর সামনে জলজ্যান্ত দাঁড়িয়ে আছি। আমাকে চোখের সামনে দেখেও তোর এত অবিশ্বাস?

শুধু মুকুন্দ নয়। সকলকে ওই একই কথা বলে দুলাল সা। যারা তেজারতি কারবারের সূত্রে আসে তার কাছারিতে তারা নির্বোধ, নিরক্ষর মানুষ সব। অভাবের দায়ে প'ড়ে আসে। তাদেরও বলে।

বলে এখন হরি আছে কি না বিশ্বাস হ'ল ত? আমি যখন হরি-হরি বলতাম, তখন তোরা হাসতিস, বলতিস সা'মশাই ভেক নিয়েছে—তা এখন?

তার পর আবার মালা জপতে জপতে বলে—ওই কর্তামশাই, ওই কর্তামশাইকে আমি নিজে গিয়ে বললাম হরিসভা করব, এতে আপনি প্রেসিডেণ্ট হোন্। কিছুতেই হবেন না। কর্তামশাই বলেন—আমি কেদারেশ্বর ভট্টাচার্য্যের বংশধর, আমার পূর্ব্বপুরুষ গৌড়েশ্বরের রাজপুরোহিত ছিলেন, হাতীর পিঠে চ'ড়ে রাজবাড়ীতে যেতেন, একশো-আটটা পদ্মফুলে রোজ দেব-বিগ্রহের পুজো হ'ত, তুমি আমাকে হরিভক্তি শেখাচ্ছ দুলাল?

শ্রোতারা বলে—তারপর ?

দুলাল সা বলে—আমি ত হরির তেমনি ভক্ত। হরির নাম ক'রে কর্তামশাই-এর পায়ে জড়িয়ে ধরলাম। বললাম—হরিভক্তির জন্যে আমি সব করতে পারি কর্তামশাই, আপনি প্রেসিডেণ্ট না হলে বুঝব আমার হরিভক্তিই মিথ্যে। বুঝব, হরির নাম ক'রে আমি লোক ঠকাচ্ছি। বুঝব, হরির নাম ক'রে আমি পয়সা লুটছি।

—তারপর ? কর্তামশাই রাজি হলেন ?

—আরে তবে আর বলি কি ? হরিভক্তি কি আর অত সোজা জিনিষ রে ? বাইরে হরি হরি আর ভেতরে ভেতরে পুকুর চুরি ! তেমন হরিভক্ত আমাকে পাও নি। আমি বললাম—আমি যদি তেমন হরিভক্ত হই ত আমি ছাত্রিশ জন্ম রৌরব নরকে পচব। সাত জন্মও নয় চোদ্দ জন্মও নয়—এই তোদের ব'লে রাখলাম।—এ কি রে ? দে, আর তিনটে নয়া পয়সা দে, তিনটে নয়া পয়সা আবার কম দিলি কেন নিতাই ?

নিতাই বললে—আজ্ঞে, যা এনেছিলাম তাই দিলাম, আর নেই আমার কাছে—

—ওই দ্যাখ, তুই কাকে কম দিচ্ছিস রে ? আমাকে না হরিকে ? আমার মধ্যে যেমন হরি আছে তেমনি তোর মধ্যেও ত—এস নিবারণ, এস এস—তুমি আবার এই শরীর নিয়ে—

সবাই চেয়ে দেখলে কর্তামশাই-এর সরকার এসেছে। শরীর দুর্বল। হাঁফাচ্ছে। এই মানুষটাকে নিয়ে এত দিন এত কাণ্ড হয়েছে। এই মানুষটাই দু'দিন আগে মরো-মরো হয়ে পড়েছিল। তা সবাই জানে। তাকে হঠাৎ সশরীরে আসতে দেখে কেমন যেন অবাক্ হয়ে গেল সবাই। সবাই স'রে ব'সে জায়গা ক'রে দিলে।

—আজ্ঞে, কর্তামশাই-এর আর একখানা চিঠি এসেছে।

—তা আমাকে খবর দিলেই পারতে। আমি নিজে যেতাম। ত্যাখো দিকিনি কাণ্ড ! এত ওষুধ-ডাক্তার করা হচ্ছে আর তুমি কি না তার ওপর অত্যাচার করছ ? ডাক্তারবাবুকে জিজ্ঞেস ক'রে এসেছ ?

—আজ্ঞে বড় জরুরী ব্যাপার ব'লেই এলাম। আর ত কেউ নেই।

তার পর চারদিকে একবার সকলের মুখের দিকে চেয়ে নিয়ে নিবারণ বললে—বড় দায়ে প'ড়ে আপনার কাছে এসেছি সা'মশাই, কর্তামশাই আপনার কাছেই আসতে লিখেছেন। কিছু টাকার দরকার ছিল। এই শতখানেক হলেই চলবে। বড় বিপদ্ হয়েছে তাঁর।

—আবার কি বিপদ্ ? হরি—হরি—

—আজ্ঞে হরতনের বড় অসুখ ! অসুখ অবস্থায় নিয়ে আসছেন। সঙ্গে এক ডাক্তারকেও নিয়ে আসছেন। আর রেলে অসুখ রুগীকে নিয়ে ত আর থার্ড ক্লাসে আসতে পারবেন না—অনেক খরচ আছে। হাতে যে ক'টা টাকা ছিল, এ ক'দিনে কলকাতা শহরে তাও খরচ হয়ে গেছে—তাই আপনার কাছে কিছু কর্জ্জ করতে লিখেছেন—সুদ যা লাগে তা দেব—

দুলাল সা রেগে উঠল।

—তুমি কি আমাকে চামার চশমখোর পেয়েছ ? আমি কি মিছিমিছি হরি সেবা করছি। তুমি ভেবেছ কি নিবারণ ? আমি লোকের বিপদে-আপদে টাকা ধার দিই ব'লে তেজারতি ব্যবসা করি ? আমি সুদখোর ?

নিবারণ একে অসুস্থ, তার ওপর হঠাৎ দুলাল সা'র এই ব্যবহারে থরথর ক'রে কেঁপে উঠল।

দুলাল সা ডাকলে—কান্ত—

কান্ত বললে—আজ্ঞে—

—এই নিবারণকে শ'দু'এক টাকা দাও ত। দাও—

কান্ত ক্যাশ-বাক্স থেকে নোট বার করতে লাগল।

দুলাল সা বললে—তা হ'লে তোমার অসুখে আমি যত টাকা খরচ করেছি সব হিসেব-নিকেশ ক'রে এখুনি আমার সামনে ফেলে দাও ত ! দাও। তুমি সুদের কথা কোন্ মুখে বলতে পারলে নিবারণ ? তুমি না বিচক্ষণ মানুষ, তুমি না বিবেচক মানুষ। তোমার মুখে এই কথা ! অন্য কেউ হ'লে আমি এতক্ষণে কেটে ফেলতাম না। যাও, টাকা নিয়ে সোজা এখান থেকে চ'লে যাও, সই-সাবুদ-হাতচিটে কিছু তোমায় করতে দেব না। আর কর্তামশাইকে লিখে দিও যে, দুলাল সা অর্থপিশাচ হলে আর গুরুর কাছে দীক্ষা নিত না, হরি-সভা করত না, ভোর-রাত্তিরে উঠে নিজের হাতে ঝাঁটা দিয়ে ঘাট ধুয়ে প্রাতঃস্নান করত না, লিখে দিও দুলাল সা লোকের অভাবের সময় টাকা ধার দেয় বটে কিন্তু তেজারতি কারবার করে না। যাও, দাঁড়িয়ে আছ কেন—যাও—

দুলাল সা'র মারমূর্ত্তি দেখে আর দাঁড়াবার সাহস হ'ল না নিবারণের। নিবারণ ঠিক এমন হবে ভাবে নি। দুলাল সা'র এমন দয়াও কখনও দেখে নি, এমন মার-মূর্ত্তিও কখনও দেখে নি আগে। বিনা সুদে, বিনা বন্ধকীতে কখনও টাকা দেওয়ার লোক নয় দুলাল সা। কেমন হকচকিয়ে গিয়েছিল নিবারণ। তার পর দু'শো টাকা নিয়ে সোজা উঠে পড়ল। আর তারপর গুটি গুটি

পায়ে সদর দরজা পেরিয়ে বাইরের রাস্তায় এসে পড়ল।

দুলাল তখন একমনে মালা জপছে। জপতে জপতে একবার মুখ তুলল।

বললে—দেখলি ত তোরা? আমাকে বলে কিনা সুদখোর···

তার পর নিতাইয়ের দিকে ফিরে বলে—কই রে, আর তিনটে নয়া পয়সা দে, তিনটে নয়া পয়সা ঠকিয়ে তুই কি হরির কাছে পাতক হয়ে থাকবি নাকি রে? না না, সে আমি হতে দেব না—দে, দিয়ে দে বাবা, তোর পরকালে ভাল হবে, দে—

পরকাল থাকুক আর না থাকুক, পরকালের কথা বলা ভাল, ওতে মানুষের দেব-দ্বিজে ভক্তি বাড়ে। সমস্ত কেষ্টগঞ্জের লোক যারা দুলাল সা'কে চেনে জানে, যারা দুলাল সা'র ধাপে ধাপে উন্নতি হওয়া দেখেছে, আর কর্ত্তামশাইয়ের অবনতি হওয়াও দেখেছে, তারা পরকাল বিশ্বাস করে। আর পরকাল বিশ্বাস করে ব'লেই দুলাল সা'র কাছে আসে, দুলাল সা'র মুখের কথা শোনে, দুলাল সা'র কাছে টাকা কর্জ্জ ক'রে যথারীতি সুদ দিয়ে যায়। ইহকালে তারা যা পেলে না তাদের পরকালই ভরসা। তাই দুলাল সা'কেই তারা মূর্ত্তিমান্ পরকাল ব'লে ধ'রে নিয়েছে। দুলাল সা'র এই ঐশ্বর্য্য, এই বাড়ী, এই সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য, এই পাটের ব্যবসা, এই সুগার-মিল সবই যেন পরকালের ফল। গত জন্মে দুলাল সা পুণ্য করেছিল, তারই ফল ভোগ করছে ইহকালে। ইহকালের পুণ্যের হিসেবটাও চিত্রগুপ্তের খাতায় নিখুঁত ভাবে লেখা থাকবে। তার ফল ভোগ করবে পরকালে।

একেবারে হাতে হাতে প্রমাণ!

আর কর্ত্তামশাই?

কর্ত্তামশাই-এর ইহকাল ব'লে কিছুই ছিল না। হঠাৎ নিরুদ্দেশ নাতনীর সংবাদটা কেষ্টগঞ্জময় ছড়িয়ে যাওয়াতে যেন সব হিসেব ওলট-পালট হয়ে গিয়েছিল। তা হ'লে? তা হ'লে কি সত্যি সত্যি আবার ভট্টাচার্য্যি বাড়ীতে লক্ষ্মী ফিরে আসবে? আবার ধনে-জনে-ঐশ্বর্য্যে ভ'রে উঠবে ভট্টাচার্য্যি-বাড়ী? ব্যাপারটা কেমন জটিল হয়ে উঠতে লাগল সকলের চোখে। তা হ'লে কি হবে?

দুলাল সা বলে—গুরুর কথা ত মিথ্যে হবে না—ও হতেই হবে—

সুকান্তও খবরটা শুনেছিল। তা হ'লে ত তাকেও যা বলেছে সাধু তা মিলে যাবে। জীপ গাড়ি নিয়ে ক'দিন আসা-যাওয়া করলে। কিন্তু নিতাই বসাক নেই। আসলে তার মুরুব্বি দুলাল সা নয়—নিতাই বসাক। রোজই সন্ধ্যে বেলা গাড়িটা নিয়ে বেরোয়। ঘুরতে ঘুরতে স্টোরে এসে খোঁজ নেয়। রোজই শোনে এখনও ফেরে নি। সাহেব মানুষ। সহজে সাধু-সন্নিসীর ওপর বিশ্বাস নেই, এমনিতে কিছুই বিশ্বাস করে না। জগৎটাকেই একমাত্র ধ্রুব ব'লে মনে করে। আর সব ঝুটো, আর সব ফাঁকিবাজি। সাধু তাকে বলেছিল বটে যে, জীবনে শিগ্‌গিরই তার উন্নতি হবে। আর বছর-তিনেকের মধ্যেই। কথাটা শুনে আনন্দ হয়েছিল কিন্তু পুরোপুরি বিশ্বাস হয় নি। এবার লোকের মুখে কর্ত্তামশাই-এর খবরটা শুনে কেমন টনক ন'ড়ে উঠল। লোক দেখলেই জিজ্ঞেস করে—খবরটা সত্যি নাকি?

সবাই বলে—শুনছি ত সত্যি—

যাকেই জিজ্ঞেস করেছে সে-ই ওই কথা বলেছে। সেদিন কর্ত্তামশাই-এর বাড়ীর সামনে দিয়েই জীপ গাড়িটা ঘুরিয়ে নিয়ে যেতে বললে ড্রাইভারকে। সেই ভুতুড়ে বাড়ী। এদিকটায় লোক-চলাচল করে কম। এদিকটা যেন কেমন পোড়ো-পোড়ো ভাব। সন্ধ্যের পর এদিকটায় এলে কেমন যেন গা ছমছম্ করে। তবু সেদিন এল সুকান্ত। সত্যি খবরটা একমাত্র নিবারণের কাছে ছাড়া আর কারও কাছে পাবার উপায় নেই।

গাড়িটা রেখে কাল্‌কাসুন্দি জঙ্গলের ভেতর দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে সদর-দরজার সামনে গিয়ে দাঁড়াল। ভেতরে কে আছে-না-আছে তাও জানা নেই।

দরজার সামনে গিয়ে একবার নিচু গলায় ডাকলে—সরকার মশাই—

নিবারণকে সুকান্ত দেখেছে একবার কি বড় জোর দু'বার। তার বেশি নয়। কিন্তু পেঁপুলবেড়ের বাঁওড় নিয়ে যে কাণ্ড হয়ে গিয়েছিল তাই নিয়ে নিবারণের নাম অনেকবার কানে এসেছে। কেউ বলত নিবারণ লাঠিয়াল নিয়ে দাঙ্গা করতে গিয়েছিল, আবার কেউ বলে সনাতন। সনাতন অকারণে নিবারণকে মেরেছে। কিন্তু তারও একদিন ফয়সালা হয়ে গেছে। মিনিষ্টার আসার পর থেকেই সবাই জেনে গেছে যে, নিবারণই আসল আসামী।

—সরকার মশাই আছেন?

তবু কারো সাড়া নেই।

সুকান্ত এবার দরজার কড়া নাড়তে লাগল খটাখট্ শব্দ ক'রে।

—কে?

ভেতর থেকে মেয়েমানুষের গলা পেয়ে একটু পেছিয়ে এল সুকান্ত।

আর তার পরেই দরজার হুড়কোটা খুলে গেল।

—আপনি কে?

একটা হারিকেন লণ্ঠন হাতে নিয়ে কে যেন দাঁড়িয়ে আছে। চোখে সোজাসুজি আলোটা এসে পড়তেই চোখটা ধাঁধিয়ে গিয়েছিল প্রথমে। তার পরেই চেনা গেল।

—কাকে চাই আপনার?

সুকান্ত ভাবে নি এমন হবে। ভাবলে এমন অসময়ে এ বাড়ীতে আসত না। কেমন ক'রে কল্পনা করবে নতুন-বৌ এমন সময়ে এ-বাড়ীতে আসবে?

—কাকে খুঁজছেন আপনি?

সুকান্ত বললে—আমি নিবারণবাবুকে খুঁজতে এসেছিলাম।

—কিন্তু আপনি কে?

সুকান্ত বললে—আমার নাম সুকান্ত রায়, আমি এখানকার বি-ডি-ও, ব্লক ডেভেলপমেণ্ট অফিসার, আপনাদের বাড়ীতে আমাকে দেখেছেন নিশ্চয়ই—

নতুন-বৌ বললে—সে ত হ'ল, কিন্তু এখানে আপনার কি দরকার?

সুকান্ত এই নতুন-বৌএর মুখের জেরায় যেন অস্বস্তি বোধ করতে লাগল।

বললে—আমি নিবারণবাবুর সঙ্গে একবার একটা কথা বলতে এসেছিলাম আর কিছু নয়—

—কি কথা?

এর উত্তর কী দেবে সুকান্ত? এর কোনও সদুত্তর আছে কি?

সুকান্ত বললে—এমন কিছু নয়, এমনি জানতে এসেছিলাম···

—জানতে এসেছিলেন যে-খবরটা শুনেছেন সেটা সত্যি কি না? এই ত?

সুকান্ত এ-কথার কি উত্তর দেবে তা বুঝতে পারলে না।

নতুন-বৌ সুকান্তর উত্তরের অপেক্ষা না ক'রেই বলতে লাগল—কিন্তু কেন বলুন ত? আপনাদের এত আগ্রহ কেন? আপনারা কি একটা পরিবারের দুর্দশার সুযোগ নিয়ে তামাশা করতে চান? আপনাদের কি আর কোনও কথার মত কাজ নেই? পরের দারিদ্র্যটা কি আপনাদের এতই হাসির খোরাক? আপনারা ভেবেছেন কি?

সুকান্ত চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে রইল। একটা প্রায় নিমিত্তহীন কৌতূহল দমন না-করতে পারার পরিণাম এমন হবে ভাবতে পারে নি।

—একটার পর একটা লোক কেবল আসছে আর ওই একই কথা বার বার জিজ্ঞেস ক'রে যাচ্ছে? একদিন আপনারাই গিয়ে ভিড় করেছেন আমার শ্বশুরবাড়ীতে আর আজকে আবার আপনারা এখানে ভিড় করছেন! আপনাদের কি এই-ই কাজ? যখন যেদিকে হাওয়া বইবে সেই দিকেই তালি দেবেন? ছিঃ—

নতুন-বৌ-এর ছিঃ শব্দটা যেন সমস্ত কেষ্টগঞ্জের উদ্দেশ্যেই বর্ষিত হয়েছিল। কিন্তু সুকান্তর মনে হ'ল, নতুন-বৌ যেন একলা তাকে লক্ষ্য ক'রেই ধিক্কার-ধ্বনিটা প্রয়োগ করলে।

সুকান্ত আত্মদোষ ক্ষালনের চেষ্টায় বিনীত হয়ে বলতে গেল—দেখুন···আমি ঠিক সে-জন্যে ··

কিন্তু কথা তার শেষ হবার আগেই মাঝ-পথে বাধা দিলে নতুন-বৌ।

বললে—অশিক্ষিত চাষা-ভুষোরা আসে, তাদের আসার মানে বুঝি, কিন্তু আপনারা না শিক্ষিত ব'লে বড়াই করেন? আপনারা না কোট-প্যাণ্ট প'রে গাড়ি চ'ড়ে ঘুরে বেড়ান—

সুকান্ত অন্য কিছু উপায় না-পেয়ে বললে—আমায় আপনি মাপ করবেন—

—মাপ করার প্রশ্ন নয়! অনেকবার অনেক লোকের কথার জবাব দিতে দিতে আমিও অধৈর্য্য হয়ে উঠেছি। কিন্তু আমি ভাবছি, এ ক'দিন কি গ্রামের লোকের আর কিছু করবার মত কাজ নেই? আবার দাঁড়িয়ে দেখছেন কী, যান—

সুকান্ত তখন নিজেও পালাতে পারলেই বাঁচে। কিন্তু পেছন ফিরতেই একটা গাড়ির হেড্-লাইট তার চোখের ওপর এসে পড়ল। এ-গাড়ি সুকান্তর চেনা। গাড়িটা কাল-কাসুন্দির বন মাড়িয়ে একেবারে দেউড়ির সামনে এসে ব্রেক কষল। আর গাড়ির ভেতর থেকে নামল দুলাল সা। দুলাল সা'র হাতে সেই জপের মালা। মালা জপতে জপতেই এসেছে এখানে। সিঁড়ির সামনে অন্ধকারে সুকান্তকে যেন চিনতে পারলে না। ঠাহর ক'রে দেখতে লাগল।

—কে? আমি ত ঠিক চিনতে পারছি না?

সুকান্ত নমস্কার করেছিল দুই হাত জোড় ক'রে। সেটা দেখতে পায় নি।

সুকান্ত নিজেই নিজের পরিচয় দিলে—আমি সুকান্ত, সা' মশাই—

—কে সুকান্ত?

—সুকান্ত রায়, ব্লক্ ডেভেলপমেণ্ট অফিসার।

দুলাল সা বললে—ও, সুকান্ত, তাই বল! ভালই হয়েছে তুমি এসেছ। এস, ভেতরে এস, তোমাকে বলি—

ব'লে দুলাল সা ঘরের ভেতরে ঢুকল। নতুন-বৌ পাশে স'রে দাঁড়িয়েছিল। সুকান্ত তাকে পাশ কাটিয়ে দুলাল সা'র পেছন-পেছন ঘরে গিয়ে ঢুকল।

দুলাল সা একটা চেয়ারের ওপর ব'সে বললে—নতুন-বৌ, তুমিও শোন,—

সুকান্ত যেন অস্বস্তি বোধ করছিল কেমন। একবার নতুন-বৌ-এর দিকে তাকালে। সে মুখেও যেন বিরক্তির ভাব। তবু কিছু না ব'লে সে আস্তে আস্তে বসল।

দুলাল সা বললে—আমি হাসপাতাল থেকে আসছি। সনাতন নেই—

নতুন-বৌও অবাক্ হয়ে গেল।

—সনাতন নেই মানে? কোথায় গেল সে বাবা?

সুকান্তও শুনছিল। বললে—কোন্ সনাতন?

দুলাল সা বললে—আমার সরকার আর কি। পৈঁপুলবেড়ের বাঁওড়ের মাঠের কাজ যখন হচ্ছিল, তখন সে-ই দেখা-শোনা করছিল। তাকে আমি মাইনে দিয়ে যাচ্ছিলাম বরাবর। আমার কাজ করবার জন্যেই ত সে চোট্ খেয়েছিল তখন? কি বল, কাজ করতে-করতে যখন জখম হয়েছে, তখন মাইনে ত আমার দিয়ে যাওয়াই উচিত, না কি, তুমি কি বল?

সুকান্ত বললে—আজ্ঞে, আপনি হায্য কাজই করেছেন, শুভানুধ্যায়ীর কাজই করেছেন—

দুলাল সা বললে—আমি বাবা সকলেরই শুভানুধ্যায়ী! আমার কাছে বড়-ছোট পাবে না, উচ্চ-নীচ সবাই আমার কাছে সমান, সে তোমরা যা-ই বল আর তাই-ই বল, হরির কাছে ত ছোট-বড়-উচ্চ-নীচ বিচার নেই?

নতুন-বৌ বললে—কিন্তু সে পালাল কেন বাবা?

দুলাল সা বললে—এখন সেইটেই তোমরা বিবেচনা কর। কোনও কষ্ট নেই তার, কোনও কষ্ট তার আমি রাখি নি। হাসপাতাল আমি ক'রে দিয়েছি, মানে আমিই কত টাকা চাঁদা দিয়েছি তা ত তুমি শুনেছ সুকান্ত। আমি নিজে গিয়ে রোজ দেখা ক'রে এসেছি। তবু পালাল কেন? কিসের কষ্ট হচ্ছিল তোর যে তুই পালাতে গেলি?

সুকান্ত বললে—সেই যে পুলিস-কেস হচ্ছিল, সেই জন্যে?

—তা সে-জন্যে ত আমি ছিলুম, আমি আছিও, আমি ত খরচ যুগিয়ে যাচ্ছি বরাবর। আমিই ত বরাবর ডাব নিয়ে গেছি, নেবু নিয়ে গেছি, রোজ নিয়ম ক'রে নতুন-বৌ খাবার পাঠিয়েছে হাসপাতালে, সে সব ত বাইরের লোক কিছু জানে না বাবা। বাইরের লোককে সে-সব জানাতেও চাই নি।

সুকান্ত বললে—তা পালিয়েছে তাতে আপনার কি?

নতুন-বৌও বললে—উনি ত ঠিকই বলছেন বাবা, তাতে আমাদের কি ক্ষতি?

—তোমরা ত ব'লেই খালাস! কিন্তু লোকের মুখ ত তা বললে বন্ধ থাকবে না। তারা বলবে, আমিই বুঝি টাকা দিয়ে সরিয়ে দিয়েছি! যাতে পুলিসের হ্যাপাজতে না পড়ি। তাই খবরটা শুনে কান্তকে আমি বলছিলাম, সংসারে উপকার করবার সময়ও ভেবে-চিন্তে করতে হয়। পুলিশের কী? পুলিসের সন্দেহ করাই ত পেশা!

সুকান্ত তবু বুঝতে পারলে না। বললে—কিন্তু আসামী ত সনাতন নয়, আসামী ত হ'ল নিবারণ, নিবারণ সরকার—

দুলাল বললে—সেইটে বোঝ, যে আসামী সে বেশ নিশ্চিন্তে কলকাতায় ঘুরে বেড়াচ্ছে, আর ফরিয়াদি কি না ভয়ে পালায়! এমন কথা তোমরা কেউ কখনও শুনেছ?

সুকান্ত বললে—সে যাকৃগে, আপনি তার জন্যে যথা-সাধ্য করেছেন, আপনি আর তার জন্যে ভাববেন না—

দুলাল সা বললে—দেখ, এতকাল হরি হরি ক'রে কোনও দিকেই ত নজর দিই নি, সব ছেড়ে দিয়ে হরিকেই মনে-প্রাণে ডেকেছি, এখন দেখছি মহা ভুল করেছি। সংসারের মানুষের মধ্যে যে এত গলদ তা ত জানতাম না—! এই দেখ না, খবরটা পেয়ে মনটা বড় চঞ্চল হয়ে উঠল, ভাবলাম, দূর ছাই, কার জন্যেই বা এত করি? সংসারে কে কার? চক্ষু মুদলেই ত সব অন্ধকার। তবে আর ভাবি কেন? তখনই মনে পড়ল, বড়-গিন্নীর কথাটা, বড়গিন্নীর অসুখ, বাড়ীতে কেউ নেই, নিবারণও গেছে কলকাতায় কর্তামশাই-এর কাছে, নতুন-বৌ না-হয়গেছে বড়গিন্নীকে দেখতে—কিন্তু আমারও ত একটা কর্তব্য আছে। কথাটা ভাবতেই আর থাকতে পারলাম না—তাই চ'লে এলাম। তা বড়গিন্নী কেমন আছেন নতুন-বৌ?

নতুন-বৌ বললে—ভাল, কিন্তু আপনি আবার কষ্ট ক'রে কেন আসতে গেলেন?

—আমি আসব না ত কে আসবে মা? কর্তামশাই-এর কে আছে? কর্তামশাই না হয় আমাকে দেখতে পারেন না, বুড়োবয়সে ও-রকম অভিমান ত হয়ই। কিন্তু

আমি যদি তাই মনে রেখে বিপদের দিনে না আসি ত হরির কাছে আমি কি জবাবদিহি করব বল ত মা? কর্তামশাই ত মনে করেন আমিই লোক লাগিয়ে পেঁপুল-বেড়ের বাঁওড় দখল করেছি, আমিই সনাতনকে দিয়ে নিবারণকে লাঠিবাজি করিয়েছি, তা এর জবাব আমি হরির কাছে দেব, কিন্তু কারো বিপদ্ দেখলে যে চুপ ক'রে ব'সে থাকতে পারি নে মা, এ যে আমার স্বভাব—এ-বয়সে কি আর এ-স্বভাব শুধরাবে?

এতক্ষণে সুকান্ত যেন সুযোগ পেলে।

বললে—তা হ'লে কথাটা যা রটেছে তা সত্যি, সা'মশাই?

—কোন্ কথাটা?

—ওই যে কর্তামশাই-এর হারানো নাতনীকে না কি পাওয়া গিয়েছে? পনেরো বছর পরে?

দুলাল সা বললে—পাওয়া গিয়েছে কি যায় নি সে ত আর দু'দিন বাদেই জানতে পাবে সবাই। কর্তামশাই ত নাতনীকে নিয়ে আসছেন কেষ্টগঞ্জে, নিবারণ ত সেই জন্যেই গেছে অসুখ শরীর নিয়ে—আমিই ত তাকে দু'শো টাকা দিলাম সেই বাবদে, বললাম হাতচিটে বন্ধকী কিছুই তোমার লাগবে না, আমি ত সুদখোর নই—

—তা হ'লে কলিযুগে ত এমন ঘটনাও ঘটে?

দুলাল সা বললে—কলিযুগ ত তোমরাই বল বাবা, আমি বলি অন্য কথা!

—আপনি কি বলেন?

—আমি বলি কলিযুগ সত্যযুগ ও-সব মিথ্যে কথা। যে সত্যবাদী তার কাছে সব যুগই সত্যযুগ! নইলে সত্যযুগেও চোর-ডাকাত ছিল, এখনও আছে। এই যে আমি, আমি এত সত্যি কথা বলি, জীবনে কারও অনিষ্ট চিন্তা করি নি, তা কই আমার তাতে কিছু লোকসান হয়েছে? আমার কিছু ক্ষতি হয়েছে? আমার কিছু খারাপ হয়েছে?

নতুন-বৌ বললে—আমি একটু ভেতরে যাই বাবা, জ্যাঠাইমা একলা রয়েছেন—

—না, না, তুমি যাও মা, তুমি ভেতরে যাও, আমি শুধু একবার দেখতে এলাম, আবার এখুনি চ'লে যাব—

সুকান্ত নিজের প্রসঙ্গতেই ফিরে এল, বললে—তা হ'লে আপনার গুরুদেব আমার সম্বন্ধেও যা-যা বলেছেন সব মিলে যাবে নিশ্চয়ই—

দুলাল সা বললে—ওটা ভক্তির কথা। তোমার যদি ভক্তি থাকে ত মিলবে। আমার ভক্তি ছিল তাই মিলছে, কর্তামশাই-এর ভেতরে-ভেতরে ভক্তি ছিল বৈ কি, তাই এমন ক'রে মিলল। মিলতে বাধ্য বাবা—দুইয়ে আর দুইয়ে যেমন চার, এও তেমনি।

—সেই গুরুদেবের সঙ্গে আর একবার দেখা হয় না?

দুলাল সা বললে—আমার সঙ্গে দেখা হয় বাবা, রোজই হয়—

সুকান্ত লাফিয়ে উঠল, বললে—তা হলে আমার সঙ্গে আর একবার দেখা করিয়ে দিন না সা'মশাই, এবার আমিও না হয় শিষ্য হয়ে যাব, যা থাকে কপালে, চাকরিতে উন্নতি হবে ত?

—কিন্তু তুমি কি ক'রে দেখা করবে বাবা?

সুকান্ত বললে—কেন? আপনি কি ক'রে রোজ দেখা করেন?

—আমি ত বাবা ধ্যানে দেখি···

কথাটা শেষ হবার আগেই জুতোর খটাখট আওয়াজ করতে করতে নিতাই বসাক এসে হাজির হ'ল। ঘরে ঢুকেই বললে—এই যে, দুলাল আছ এখানে।

এই নিতাই বসাকবাবুকেই এতদিন ধ'রে খোঁজাখুঁজি করছিল সুকান্ত। বললে—ওঃ, কোথায় ছিলেন এতদিন নিতাইবাবু, আমি খুঁজে খুঁজে···

নিতাই বসাক বললে—আপনার কাজেই ত গিয়েছিলাম কলকাতায়, সেখান থেকেই ত এখন আসছি—

তার পর দুলাল সা'র দিকে চেয়ে বললে—তোমার সঙ্গে একটা কথা আছে দুলাল—একবার এদিকে এস—

দুলাল সা উঠে বাইরে এল। ফিস্ ফিস্ ক'রে বললে—কদ্দুর কি হেস্ত-নেস্ত হ'ল?

নিতাই বসাকও গলা নামাল।

বললে—সব ফয়সলা ক'রে ফেলেছি।

—এখন আর কোনও গণ্ডগোল নেই ত?

—গণ্ডগোলের গোড়া উপড়ে ফেলে দিয়ে এলাম! ওইটেই আমাকে থানার ইন্‌স্পেক্টর বলেছিল যে, রোগী যদি হাসপাতাল থেকে লোপাট হয়ে যায় ত আর কারোর বাবার সাধ্যি নেই কিছু করে—পুলিসেরও বাঁচোয়া। কর্তামশাই-এর মামলা হাইকোর্টে গেলেও ফেঁসে যাবে—জজের এজ্‌লাসে আর উঠবেই না, তার আগেই খারিজ হয়ে যাবে—

—তা কি ক'রে লোপাট করলে?

—সে-সব তোমায় ভাবতে হবে না! চল, ভেতরে চল—

ব'লে আবার ঘরে ঢুকল নিতাই বসাক। দুলাল সাও মালা জপতে জপতে নিজের চেয়ারটায় ব'সে প'ড়ে একবার হাই তুললে শব্দ করে—হরি হরি···

চিৎপুরের সরু রাস্তায় দিন হোক রাত হোক, ভিড়ের কখনও কমতি নেই। সারা দিন শব্দের জ্বালায় ঝালাপালা হবার সব রকম উপকরণ মজুত আছে এখানে। বাস আছে, ট্রাম আছে, রিক্শা আছে, ঠেলাগাড়ি আছে, আরও আছে অসংখ্য মানুষ। তাই 'করুণাময়ী বোর্ডিং'-এর দোতলায় যারা সামনের দিকে থাকে তাদের ঘর পিছু ভাড়া কম। ভেতরের দিকে বেশি ভাড়া। ভেতরের ঘরগুলোতে আলো নেই, হাওয়াও নেই, কিন্তু তবু ভাড়া বেশি।

'শ্রীমানী অপেরা'র অফিস এর পাশেই। চণ্ডীবাবুই ঠিক ক'রে দিয়েছিল সমস্ত। কর্ত্তামশাইকে কিছুই করতে হয় নি। আর করবার মত ক্ষমতাও তাঁর ছিল না।

চণ্ডীবাবু বলেছিল—এ যে আপনার নাতনী তা ত জানতাম না ভট্‌চার্য্যি মশাই—আর জানবই বা কি ক'রে বলুন? লোকে শুধু জানে আমার মেয়ে—আহা বড় ভাগ্যবতী মেয়ে মশাই আমার—

কর্ত্তামশাই বলেছিলেন—আপনার এ ঋণ আমি একদিন না একদিন শোধ করবই—আপনি আমার যা উপকার করলেন তা জীবনে ভুলব না—

—কিন্তু আপনার এই নাতনীর জন্যে আমি কত টাকা উপায় করেছি জানেন? এই 'শ্রীমানী অপেরা'র দলই চলেছে বলতে গেলে একা ওই আপনার নাতনীর জন্যে—তাই ত বলছিলাম বড় ভাগ্যবতী মেয়ে আমার, যেদিন থেকে আমার ঘরে এসেছিল সেই দিনটি থেকেই আমার ভাগ্য খুলে গিয়েছিল মশাই। এবার দেখুন আপনার ভাগ্যও ফিরবে—

কর্ত্তামশাই বললেন—ওই ত আমার ভাগ্যলক্ষ্মী চণ্ডীবাবু, ও যাবার পর থেকেই আমার ভাগ্যটা প'ড়ে গিয়েছিল, আমার জমি-জমা সব চ'লে গিয়েছিল একে একে—

—সে ত আমি সব শুনেছি!

—সে আর আপনি কতটুকু শুনেছেন? দু'দিনে আর কতটুকু শোনান যায় বলুন? এও ভাগ্য! সেদিন কি যে সুমতি হয়েছিল, কুষ্টিখানা ভুল ক'রে দেখিয়ে ফেলেছিলাম সাধু মহারাজকে, আর তারই ফলে এই কাণ্ড...

চণ্ডীবাবু বলেছিল—ও সব মশাই মেলে, অক্ষরে অক্ষরে মেলে, ও আমি অনেক দেখেছি—তা সে-সব যাক্‌গে, এখন ভালোয়-ভালোয় বাড়ী নিয়ে যান, হরতন সেরে উঠুক—তার পর ঠাকুরের কাছে যা মানত করেছেন সেই রকম পুজো দেবেন—তার পর আমরা একদিন গিয়ে যাত্রা গেয়ে আসব—

—নিশ্চয় যাবেন। যাবেন বৈ কি।

তার পর একটু থেমে বললেন—কিন্তু আপনারও ত ক্ষতি হ'ল হরতনকে ছেড়ে—

চণ্ডীবাবু বলেছিল—তা আমার ক্ষতিটাই বড় হ'ল? আমি মশাই পেশাদার লোক, আর একটা দেখে-শুনে যোগাড় করে নেব'খন—ভাত ছড়ালে এ-লাইনে কাকের অভাব হয়? আর যদ্দিন না তা পাই তদ্দিন বঙ্কু আছে, বঙ্কুই গোঁফ-দাড়ি কামিয়ে নেমে যাচ্ছে...

চণ্ডীবাবুই সত্যি সব ব্যবস্থা ক'রে দিয়েছিল। না দিলেই পারত। শুধু হোটেলের ব্যবস্থাই নয়, টাকাও দিয়েছিল। কর্ত্তামশাই ত বেশি টাকা সঙ্গে নিয়ে যান নি। বড়গিন্নীর একটা গয়না নিয়েছিলেন সঙ্গে আর ট্রেন ভাড়াটা। এও যোগাযোগ ভগবানের যোগাযোগ। তুমিই সত্য মা! তুমিই সত্য! যারা অবিশ্বাসী তারা ভুল ক'রে তোমার ওপর অবিচার ক'রে। আমিও কত অবিচার করেছি। কত অবিশ্বাস করেছি একদিন।

চণ্ডীবাবু বলেছিল—খবরের কাগজে খবরটা দিয়ে দিই ভট্‌চার্য্যি মশাই, বুঝলেন?

—কোন্ খবরটা?

—এই আপনার নাতনীর খবরটা? বেশ গুছিয়ে লিখে দিলে অনেক অবিশ্বাসীর চৈতন্য হবে—

কর্ত্তামশাই বলেছিলেন—না না চণ্ডীবাবু, সেটা ভাল হবে না—আর তাতে আপনারই বা কি লাভ?

—আমার লাভ, আমার দলের পাব্‌লিসিটি।

—পাব্‌লিসিটি? মানে?

—মানে, 'শ্রীমানী অপেরা'র নামটা বিনা পয়সায় প্রচার হয়ে যাবে।

কর্ত্তামশাই হাত দুটো জড়িয়ে ধরেছিলেন শ্রীমানীবাবুর।

—না না, হরতনের বয়েস হয়েছে, দু'দিন বাদে অসুখটা সারলেই বিয়ে-থা'র ব্যবস্থা করতে হবে, আপনি আর ও-সব হট্টগোল করবেন না, তখন লোকের ভিড় হয়ে যাবে, অসুখটা বেড়ে যেতে পারে তাতে, ও হাঙ্গাম আর করবেন না দয়া ক'রে—

তা সেই ব্যবস্থাই হ'ল। কর্ত্তামশাই হরতনকে নিয়ে করুণাময়ী হোটেলে উঠলেন। অন্ধকার ময়লা ঘর। একখানা তক্তপোশ, ছারপোকায় ভর্ত্তি। সেইটেকেই পরিষ্কার ক'রে হরতনকে শুইয়ে দিলেন। আর নিজে মেঝের ওপর বিছানা ক'রে নিলেন। দু'টো দিনের ব্যাপার। তার পর কেষ্টগঞ্জ থেকে টাকা এলেই রওনা দেওয়া। টাকার জন্যে নিবারণকে লিখে দিয়েছিলেন। দুলাল সা'র কাছে গিয়েও টাকা নিতে পারে। বেটা

সুদখোর, বেটা চশমখোর। এদিকে টাকায় চার আনা পাঁচ আনা সুদ আদায় করে আর মুখে কেবল হরি হরি বলে। এবার? এবার ঐ পৈঁপুলবেড়ের জমিটা আবার মামলা ক'রে আদায় ক'রে তবে ছাড়বেন। এবার বাড়ীটা আবার সারাতে হবে। সামনের উঠোনে যে সে যখন-তখন হুট্ ক'রে ঢুকে পড়ে। এবার সমস্ত জায়গাটা পাঁচিল দিয়ে চৌহদ্দিটা ঘিরে নিতে হবে। মালো-পাড়ার জমিগুলোর একটা বন্দোবস্ত করা দরকার। অনেক জমি, অনেক বিল-বাঁওড়। দুলালের কাছে রেহানী-তমসুক নিয়ে সব কর্জ্জপত্র ক'রে দেওয়া আছে। মামলা ক'রে দুলাল সা'র ভিটে-মাটি পর্য্যন্ত আদায় ক'রে ছাড়বেন এবার। তখন এসে হাতে-পায়ে ধরলেও আর রেহাই নেই। এবার আর দয়া-মায়া নয়। দয়া-মায়া দেখিয়ে দেখিয়ে কেবল নিজের সর্ব্বনাশ করেছেন এতদিন। যথেষ্ট হয়েছে, আর নয়।

তক্তপোশের ওপর যেন কেমন একটা শব্দ হ'ল। হরতন যেন মুখের শব্দ করলে কি রকম একটা।

লাফিয়ে উঠে কর্ত্তামশাই মুখের কাছে ঝুঁকে পড়লেন —কি মা, কষ্ট হচ্ছে খুব? আচ্ছা, আচ্ছা, মশা কামড়াচ্ছে —বুঝতে পারছি—

তার পর একটা তালপাতার পাখা নিয়ে বাতাস করতে লাগলেন। বললেন—তোমার নিজের বাড়ীতে গিয়ে উঠলে তোমার অসুখ-বিসুখ সব ভাল হয়ে যাবে মা, দেখবে! আবার তুমি উঠে-হেঁটে বেড়াবে, তোমার ঠাকুমা তোমাকে কত আদর করবে তখন দেখো—আমি গরু কিনব, খাঁটি দুধ খাবে তুমি—মস্ত বড় বাগান ক'রে দেব তোমার জন্যে, তুমি সেখানে বেড়াবে, ফুলগাছ পুঁতে দেব—

হরতন চুপ ক'রে সব শোনে। আর শুনুক না শুনুক কর্ত্তামশাই সেই অন্ধকার ঘরে পাশে ব'সে নিজের মনের সব সাধগুলো এক-নাগাড়ে ব'লে যান।

চণ্ডীবাবু আসে। দেখে যায়। খুব ব্যস্ত মানুষ।

এসেই বলে মশারি পেয়েছেন ত?

—আজ্ঞে হ্যাঁ, আপনি আমার জন্যে অনেক করেছেন।

—আর বঙ্কু এসেছিল? ডাক্তার যেমন-যেমন বলে তেমনি তেমনি ওষুধ খাইয়ে যান—বঙ্কুই সব করবে, আপনাকে কিছু করতে হবে না।

তা বঙ্কু আসে ঠিক নিয়ম ক'রে। সকালে বিকেলে সন্ধ্যেয়। ছোকরামানুষ। নিজের হাতে ওষুধ খাওয়ায়। 'অকূলের কাণ্ডারী' বইতে 'রাণী রূপকুমারী'র পার্টটা সেই এতদিন চালিয়ে আসছে। অঞ্জনার অসুখের পর থেকে বঙ্কুই ওটার ভার নিয়েছে। গোঁফ-দাড়ি কামিয়ে নামে বটে, কিন্তু তেমন জমাতে পারে না।

বঙ্কু বলে বেটাছেলে কি আর মেয়েছেলের মত পার্ট করতে পারে? আপনিই বলুন—

কর্ত্তামশাই বলেন—তা ত বটেই, ও তুমি পারবে কেমন ক'রে? যার যা কাজ…

বঙ্কু বলে—তবু যদ্দিন চালাচ্ছি কষ্ট ক'রে, ওর অসুখের পর থেকেই চালিয়ে যাচ্ছি, কিন্তু মেয়ে-ছেলে না আনলে আমাদের দল আর টিঁকবে না কর্ত্তা-মশাই। দল বলতে গেলে ভেঙেই গ্যাচে…

কর্ত্তামশাই বলেন—না না, দল ভাঙবে কেন? তোমরা কেষ্টগঞ্জে আমার বাড়ী যাবে, সেখানে এই হরতনের বাড়ী দেখবে, সে কি বিরাট্ বাড়ী, এই হর-তনের পূর্ব্বপুরুষ একদিন গৌড়েশ্বরের রাজপুরোহিত ছিল কি-না, তাঁর হাতী ছিল, সেই হাতী চ'ড়ে তিনি রোজ বিগ্রহ পুজো করতে যেতেন, একশ' আটটা পদ্ম-ফুল লাগত তাঁর পুজোয়—। তোমরা গিয়ে 'অকূলের কাণ্ডারী' প্লে করবে সেখানে, লুচি-মাংস-পোলোয়া খাওয়াব তোমাদের সকলকে…

বঙ্কুকেও সেইসব গল্প বলেন কর্ত্তামশাই। সকলকেই বলেন। যে আসে হরতনকে দেখতে তার কাছেই বলেন কাহিনীগুলো। আর কেউ না থাকলে একলা হরতনকেই শোনান ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে।

নিবারণ খুঁজতে খুঁজতে একদিন এখানেই এসে পড়ল। 'করুণাময়ী হোটেল'। কর্ত্তামশাই-এর চিঠি-খানা হাতেই ছিল। সেখানার সঙ্গে একবার মিলিয়ে নিলে। টাকাগুলো খুব সাবধানে পেট-কাপড়ে বেঁধে এনেছে। এ কলকাতা শহর। এখানে জাল-জুয়াচোরের অভাব নেই। ট্রাম থেকে নেমে চারদিকের হাল-চাল দেখে অবাক্ হয়ে গিয়েছিল। তার পর হোটেলের নিচে খোঁজ নিয়ে উপরে উঠেছিল সিঁড়ি দিয়ে। তারপর এ ঘর ও ঘর ঘুরে একেবারে এই ঘরে এসে হাজির। দরজাটা ঠেলতেই কর্ত্তামশাই-এর সঙ্গে চোখাচোখি হয়ে গেছে।

—এই যে নিবারণ, তুমি এয়েছ? আমি এদিকে ভেবে ভেবে মরছি। টাকা পেলে? দুলাল সা কি বললে?

নিবারণের সে কথায় কান নেই। সে তখন তক্ত-পোশটার কাছে এগিয়ে গিয়ে হরতনকে দেখছে একদৃষ্টে। হরতন চাদর-চাপা দিয়ে চুপ ক'রে শুয়েছিল। মুখখানা শুধু খোলা। বড় বড় একজোড়া চোখ। সমস্ত মাথায়

চুলের বন্যা বইছে। হরতনও যেন একদৃষ্টে দেখছে নিবারণকে।

কর্ত্তামশাই কাছে গেলেন। তাঁর মুখে হাসি। হরতনকে জিজ্ঞেস করলেন—একে তুমি চিনতে পারছ, মা? সেই তোমাকে কোলে ক'রে গাব্-তলায় নিয়ে গিয়ে খেলা করতেন, সেই সরকার জ্যাঠা?

তারপর নিবারণের দিকে চাইলেন, বললেন—কেমন? চিনতে পারছ ত? চোখের ভুরুটা দেখেছ? এখন! এখন কি বলবে দুলাল সা! তখন যে বড় গলা ক'রে দেমাক দেখিয়েছিল, ছেলে বিলেতে ডাক্তারি পড়তে গিয়েছে, বড় বাড়ী করেছে, সুগার-মিল করেছে! তা এখন কি বলবে সে! এখন আমিও ছেড়ে কথা বলব না। ক'টা রেহানী-তমসুক ওর কাছে আছে আমি দেখব এবার কী রকম! এখন বিশ্বাস হ'ল তোমার?

নিবারণ বললে—এ হরতন কর্ত্তামশাই, আর কেউ নয়—ঠিক হরতন আমাদের। ক্রমশঃ

—০—

ডাক-টিকিট

কারেল চাপেক

মিলাডা ও মোহনলাল গঙ্গোপাধ্যায় কর্ত্তৃক মূল চেক্ হইতে অনূদিত

বৃদ্ধ কারাস্ বলে চললেন—সত্যিই তাই। কেউ যদি তার অতীতকে খুঁজে দেখে তা হ'লে চোখে পড়বে যে, অতীত জীবনের মাল-মশলাই ছিল ভিন্ন, এখনকার সঙ্গে তার কোন মিল নেই। জীবনের পথে চলতে চলতে একবার…হয়ত ভুল ক'রে কিংবা হয়ত ইচ্ছে করেই নানা পথের মধ্যে একটা পথ বেছে নিলাম। তার পর চললাম জীবনের শেষ অবধি সেই পথেই। কিন্তু যে পথগুলি ছেড়ে দিয়ে এলাম সেগুলি ত একেবারে মুছে গেল না। মাঝে মাঝে তাই সেই ফেলে-যাওয়া কোন একটি জীবনের বেদনা কাটা-পায়ের ব্যথার মত টন্‌টনিয়ে ওঠে।

আমার যখন বছর-দশেক বয়েস সেই সময় আমি ডাক-টিকিট জমাতে আরম্ভ করি। বাবার সেটা একেবারেই পছন্দ হ'ত না। তিনি ভাবতেন, এতে আমার লেখাপড়ার ক্ষতি হবে। কিন্তু আমি আর আমার একটি বন্ধু লয়জিক চাপেলকা দু'জনেই ডাক-টিকিট জমানোর এই নেশায় একেবারে মশ্‌গুল হয়ে গিয়েছিলাম। লয়জিকের বাবা ছিলেন ভিখারী। ঠেলাগাড়ির উপর অর্গান বাজিয়ে রাস্তায় রাস্তায় ভিক্ষে ক'রে বেড়াতেন। লয়জিকের ছিল এক-মাথা উস্কোখুস্কো চুল, গায়ে-মুখে মেছেতার ছাপ—দূর থেকে দেখে মনে হ'ত যেন পালক-ওঠা চড়াই পাখী। তাকে আমি প্রাণভরে ভালবাসতাম, যেমন ভালবাসা শুধু ছোট ছেলেমেয়েদের বন্ধুত্বের মধ্যেই দেখা যায়।

আজ আমি বুড়ো হয়েছি। আমার স্ত্রীও ছিল, সন্তানও ছিল। কিন্তু একথা বলব যে, মানুষের যতরকম চিত্তবৃত্তি আছে তার মধ্যে সবচেয়ে সুন্দর হচ্ছে সুগভীর বন্ধুত্ব। সেই বন্ধুত্ব সম্ভব শুধু মানুষ যতদিন ছোট থাকে ততদিন। যতদিন না সে শুকিয়ে যায়, স্বার্থপর হয়ে পড়ে। এ হচ্ছে সেই ধরণের বন্ধুত্ব-যা ফুটে বেরোয় শুধু আগ্রহ এবং শ্লাঘা থেকে, প্রাণের প্রাচুর্য্য থেকে, পর্য্যাপ্ততা থেকে, উচ্ছল পরিপ্লুত অন্তর থেকে। এত পাওয়া যায়, এত ভ'রে ওঠা যায় যে, কাউকে না দিয়ে পারা যায় না। আমার বাবা ছিলেন বিচারালয়ের 'নোটারি', স্থানীয় সমাজের মধ্যে গণ্যমান্য, সম্ভ্রান্ত এবং কড়া প্রকৃতির ভদ্রলোক। আর আমি আমার অন্তর দিয়ে গ্রহণ করেছিলাম লয়জিককে, যাঁর বাবা ছিলেন মাতাল, রাস্তার ভিখারী আর মা ছিলেন কাজের চাপে শুষ্কপ্রায় এক ধোপানী। সেই লয়জিককে আমি দেবতার মত ভক্তি করতাম। কারণ সে ছিল আমার চেয়ে অনেক বেশী দক্ষ, সে ছিল স্বাধীনচেতা, দুর্দ্দম সাহসী, তার নাকভরা ছিল মেছেতা, ঢিল ছুঁড়তে পারত সে বাঁ হাতে করে। আরও কত কি যে কারণে তাকে আমি শ্রদ্ধা করতাম্‌ তা এখন আর আমার মনে নেই। তবে জীবনে অত ভালো আর কাউকে বাসি নি।

তাই আমি যখন ডাক-টিকিট সংগ্রহ করা সুরু করি লয়জিক ছিল আমার বিশ্বাসী বন্ধু। কে যেন বলেছেন, পুরুষদের মধ্যেই সংগ্রহ-বাতিক দেখা যায়। সত্যি বটে। আমার মনে হয়, আদিম কালে সংগ্রামী মানুষ যখন তার শত্রুর মুণ্ড কেটে নিজের ঘরে সঞ্চয় করত, বিজিতের অস্ত্র-শস্ত্র, ভালুকের চামড়া, হরিণের শিং আর

যা-কিছু লুঠের মাল জমিয়ে রাখত, তখন থেকেই সেই প্রবৃত্তি বংশানুক্রমিক ভাবে আমাদের মধ্যে সঞ্চারিত হয়েছে। কিন্তু ডাক-টিকিট সংগ্রহ শুধু যে সম্পত্তি বাড়ানো তা ত নয়, এ হচ্ছে এক চিরদিনের অ্যাডভেঞ্চার। ঐ সব দূর দূরান্তরের দেশ, ভুটান, বলিভিয়া, উত্তমাশা অন্তরীপ, এদের সব যেন কল্পিত হস্তে ছুঁয়ে ফেলা যায়, যেন একটা আন্তরিক, একটা ব্যক্তিগত যোগাযোগ হয়ে যায় এদের সঙ্গে। ডাক-টিকিট সংগ্রহের মধ্যে তাই আছে একটা দেশ বেড়ানোর, সমুদ্রযাত্রার ইঙ্গিত। সব মিলিয়ে অজানা দেশে এগিয়ে চলার এক পৌরুষময় আনন্দ। ইতিহাসের ক্রুসেড-এর অধ্যায়ে যেমন ছিল।

আগেই জানিয়েছি, বাবা এটা পছন্দ করতেন না। ছেলেরা যদি তাদের বাপেদের থেকে পৃথক্ কিছু করে, বাবারা সেটা কোনদিন পছন্দ করেন না। মহাশয়রা জেনে রাখুন, আমার ছেলের প্রতি আমারও ঐ একই ভাব ছিল। পিতৃত্ব ভাব হচ্ছে নানা রকম ভাবের সংমিশ্রণ। তাতে যেমন গভীর ভালবাসাও আছে তেমনি এক ধরণের সংশয় আছে, অবিশ্বাস আছে, বৈরিতা আছে। নিজের সন্তানের প্রতি স্নেহভাব যত প্রবল হবে, সঙ্গে সঙ্গে অন্য ভাবগুলিও তত বেশী প্রকট হয়ে উঠবে। এই কারণেই আমি আমার ডাক-টিকিটের সংগ্রহটাকে আমাদের চিলেকোঠার ঘরে লুকিয়ে রাখতে বাধ্য হতাম, যাতে বাবার চোখে না পড়ে। আমাদের চিলেকোঠার ঘরে একটা পুরনো কাঠের প্রকাণ্ড খালি সিন্দুক ছিল, তাকে আমরা বলতাম ময়দার সিন্দুক। তার মধ্যে আমরা দু'টিতে ইঁদুরের মত ঢুকে পরস্পরকে ডাক-টিকিট দেখাতাম।—এই দেখ নেদারল্যাণ্ড। ঐ হ'ল ঈজিপ্ত। এই হচ্ছে সভেরিগে অর্থাৎ সুইডেন। কি করে যে আমি ডাক-টিকিটগুলি যোগাড় করতাম সে আর এক অ্যাডভেঞ্চার। চেনা অচেনা নানা বাড়ীতে গিয়ে আমি তাদের পুরনো চিঠিপত্র থেকে ডাক-টিকিট খুলে নেবার জন্যে বায়না ধরতাম। কোন কোন বাড়ীর ছাদের ঘরে ডেস্কের ভিতর দেরাজ-ভর্ত্তি কাগজপত্র থাকত। সেখানে মাটিতে ব'সে ধুলো-ভরা কাগজের স্তূপ থেকে একখানা আগে-না-পাওয়া ডাক-টিকিট খুঁজতে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটিয়ে দিতে যে কি ভাল লাগত, তা আর কি বলব। গাধা আমি—ডুপ্লিকেট সঞ্চয় করতাম না। হঠাৎ হয়ত এমন হ'ত যে, পুরনো লমবার্ডির অথবা ছোট কোন জার্মান প্রদেশের কিংবা কোন এক স্বাধীন শহরের একটা ডাক-টিকিট পেয়ে গেলাম। তখন আমার কি আনন্দ যে হ'ত—সত্যি মনে হ'ত একটা ব্যথা বাজছে। এদিকে লয়জিক আমার জন্যে বাইরে দাঁড়িয়ে। অনেকক্ষণ পরে আমি যখন বেরিয়ে আসতাম, দরজা পেরিয়ে এসেই ফিস্‌ফিস্ ক'রে বলতাম—লয়জো, একটা হানোভারের টিকিট ছিল!—পেয়েছিস্ না কি?—হাঁ পেয়েছি। তার পর আমরা আমাদের রত্ন নিয়ে ছুটতাম বাড়ীতে আমাদের সিন্দুকের কাছে।

আমাদের শহরে ছিল কাপড়ের কারখানা। সেখানে তৈরী হ'ত পাট এবং তুলো থেকে নানারকম সস্তা ধরণের কাপড়। এই সব মাল রপ্তানি হ'ত পৃথিবীর প্রায় সব অশ্বেতকায় জাতির দেশে। সেখানে তাঁদের ছেঁড়া কাগজের ঝুড়ি হাতড়ে ডাক-টিকিট খুঁজে বার করবার অনুমতি আমি পেয়েছিলাম। সেই ছিল আমার শিকারের উর্বরতম স্থান। সেখানে আমি পেয়েছিলাম শ্যামদেশ, দক্ষিণ আফ্রিকা, চীন, লিবেরিয়া, আফগানিস্তান, বোর্ণিও, ব্রেজিল, নিউজিল্যাণ্ড, ভারত এবং কংগোর ডাক-টিকিট। জানি না, এই সব দেশের নাম শুনতেই আপনাদের রহস্যময় লাগে কি না, মনের মধ্যে 'যাই-যাই' ভাব জাগে কি না। সন্ধান করা আর খুঁজে পাওয়া, এর চেয়ে বড় মানসিক উত্তেজনা, এর চেয়ে বড় সন্তুষ্টি মানুষের জীবনে আর নেই। প্রত্যেক লোকেরই কিছু-না-কিছু খোঁজা উচিত। ডাক-টিকিট না হোক অন্ততঃ সত্যকে খোঁজা উচিত। নইলে সোনার পর্ণাঙ্গ অথবা প্রাগৈতিহাসিক কালের পাথরের তীরের ফলা।

আমার জীবনের সবচেয়ে সুন্দর সময় ছিল এই। লয়জিকের সঙ্গে বন্ধুত্ব আর ডাক-টিকিট জমান। তার পর হ'ল আমার 'স্কারলেট' জ্বর। ছোঁয়াচে রোগ ব'লে লয়জিককে আমার কাছে আসতে বারণ করা হ'ল। কিন্তু সে আমাদের বাড়ীর বারান্দায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শিষ দিত, যাতে আমি শুনতে পাই। একদিন হ'ল কি, যখন আমার কাছে কেউ নেই, সেই সময় এক দৌড়ে হাজির হলাম আমাদের চিলেকোঠার ঘরে দেখতে আমার সেই সাধের ডাক-টিকিটের সংগ্রহ। শরীর আমার তখন এত দুর্ব্বল যে, সিন্দুকের ঢাকাটাই তুললাম অনেক কষ্টে। কিন্তু দেখলাম, সিন্দুক খালি! যে বাক্সের মধ্যে আমার ডাক-টিকিট থাকত সেটা অদৃশ্য হয়েছে।

কি যে কষ্ট হ'ল, কত যে ভয় পেয়ে গেলাম তা বর্ণনা করার সাধ্য আমার নেই। মনে হ'ল, যেন পাথর হয়ে গেছি। কাঁদতেও পারলাম না, মনে হ'ল কে যেন গলা চেপে ধরেছে। আমার ডাক-টিকিট, আমার সবচেয়ে

আনন্দের ধন, তা আর নেই—প্রথমত: এইটেই হচ্ছে ভয়ানক। তারপর তার চেয়েও ভয়ঙ্কর হচ্ছে এই যে, চুরি করেছে লয়জিক···যে আমার একমাত্র বন্ধু···যখন আমি অসুস্থ, সেই সময়। মস্ত বড় একটা ধাক্কা খেলাম। বড় নৈরাশ্যে, হতাশায়, বড় দুঃখে মন ভ'রে গেল।

আমার মনেই পড়ে না, কি ভাবে ছাদের ঘর থেকে ফিরে এলাম। কিন্তু তার পর জ্বর বেড়ে উঠল, আমি হয়ে পড়লাম বেহুঁস। যখনই একটু চেতনা হ'ত, আমি প্রাণপণে চিন্তা করতাম। বাবাকে বা মাসীকে এ বিষয়ে কিছু জানাই নি—আমার মা আগেই মারা গিয়েছিলেন। তাঁরা যে আমায় মোটেই বোঝেন না এটা আমি জানতাম। আমি ছিলাম তাঁদের কাছে কেমন যেন অপরিচিত। সেইদিন থেকে তাঁদের সঙ্গে আমার আর কোন অন্তরঙ্গ বা ছেলেমানুষী সম্পর্ক রইল না। লয়জিকের এই প্রবঞ্চনা আমার উপর এক গুরুতর আঘাতের মত এসে পড়ল। এই প্রথম মনুষ্যত্বের উপর আমি বিশ্বাস হারালাম। ভাবলাম, লয়জিক ভিখারী। ভিখারী ছাড়া আর কি···তাই চুরি করেছে। একটা ভিখারীর ছেলের সঙ্গে ভাব করেছিলাম বলেই এটা হ'ল। আমি কঠিন হয়ে উঠলাম। সেই থেকে আমি মানুষকে মানুষের সঙ্গে তফাৎ করে দেখতে শিখলাম। যে সরলতার দৃষ্টিতে আমি সমাজের সবাইকে সমান চোখে এতদিন দেখে এসেছি তা আর টিকল না। কিন্তু তখনও আমি বুঝি নি, আমি যে নাড়া খেয়েছি তা কত গভীর। আমি বুঝি নি যে, নাড়া খেয়ে আমার ভিতরের সবকিছু কোথায় তলিয়ে গেছে।

জ্বর থেকে যখন উঠলাম, ডাক-টিকিট হারানোর দুঃখও তখন ঘুচে গেছে। শুধু বুকের মধ্যে একটা খোঁচা লাগল, যখন দেখলাম লয়জিকের নতুন নতুন বন্ধু হয়েছে। সে যখন আমায় দেখে ছুটে এল, এসে এতদিন পরে হঠাৎ দেখা হওয়ায় কতকটা দিশেহারা হয়ে গেল। আমি তখন বড়দের মত শুকনো গলায়, গম্ভীর গলায় বললাম—যাও এখান থেকে। আমি তোমার সঙ্গে কথা কইব না। লয়জিক রাঙা হয়ে খানিক পরে বললে—আচ্ছা বেশ। সেইদিন থেকে সে আমাকে সঙ্গত ভাবে প্রচুর ঘৃণা করতে সুরু করল, যেমন গরীবরা বড়লোক-দের ক'রে থাকে।

এই ঘটনা আমার সমস্ত জীবনকে প্রভাবিত করল। অথবা শ্রীপাউলুসের ভাষায় বলতে গেলে—জীবনের যে পথ আমি বেছে নিলাম তা এরই দ্বারা প্রভাবিত হ'ল। আমি বলব, আমার জগৎ হ'ল অপবিত্র, মানুষের উপর আমি হারালাম বিশ্বাস, মানুষকে ঘৃণা করতে, অবহেলা করতে শিখলাম। আমার আর কোন বন্ধু হয় নি। তার পর যখন বড় হলাম, এই ভেবে ভারি গর্ব্ব অনুভব করতাম যে,জগতে আমি একা, কাউকে আমার দরকারও নেই, কাউকে কিছু আমি দেবও না। তার পর অনুভব করতে লাগলাম যে, আমায় কেউ ভালবাসে না। তার একটা ব্যাখ্যা ঠিক ক'রে ফেললাম। বললাম—যেহেতু আমি ভালবাসাকে ঘৃণা করি, কাজেই কোনরকম ভাব-প্রবণতার আমার কোন প্রয়োজন নেই। এইভাবে আমি হয়ে উঠলাম গর্ব্বিত, সম্মানপ্রার্থী, আত্মকেন্দ্রিক, বিদ্যা-ভিমানী এবং সব মিলিয়ে নিখুঁৎ ভদ্রলোক! আমার নীচে যাঁরা আমার সঙ্গে কাজ করতেন তাঁদের প্রতি আমার ব্যবহার হল কর্কশ। বিবাহ করলাম—ভালবাসা-হীন বিবাহ। সন্তানদের শিক্ষা দিলাম নিয়ম-নিষ্ঠা এবং আতঙ্কের ভিত্তিতে। আমার কর্ম্মপ্রবণতা এবং সুবিবেকের সাহায্যে প্রচুর কৃতিত্ব অর্জ্জন করলাম। এই ছিল আমার জীবন—আমার সমস্ত জীবন। আমার কর্ত্তব্য ছাড়া আর কোনদিকে আমি দৃকপাত করি নি। আমার মৃত্যুর পর পত্রিকায় এই সব ছাপা হবে। ছাপা হবে, কি ধরণের সুযোগ্য কাজের লোক আমি ছিলাম, কি অনুকরণ-যোগ্য চরিত্রের লোক ছিলাম। কিন্তু লোকে যদি জানত, কি নিঃসঙ্গ ছিল আমার জীবন—কত অবিশ্বাস আর কত কাঠিন্যে ভরা!

তিন বছর পূর্ব্বে আমার স্ত্রী মারা যান। নিজের কাছে বা অপর কারও কাছে যদিও এ কথা আমি স্বীকার করি নি কিন্তু এই ঘটনায় আমি হয়ে পড়েছিলাম অসহ্য একাকী। এই একাকিত্বের মধ্যে পড়ে আমি আমার পারিবারিক স্মৃতিচিহ্নে ভরা জিনিষগুলি খুঁজে বার ক'রে দেখতে সুরু করি। মা-বাবা যা-সব রেখে গিয়েছিলেন ···ফটো, চিঠি, আমার স্কুলের খাতা···এই সব। যখন দেখলাম, কত যত্নে আমার কড়া-প্রকৃতির পিতা সেগুলিকে সাজিয়ে-গুছিয়ে রাখতেন, কি যেন একটা বুকের মধ্যে থেকে ঠেলে আমার গলাকে চেপে ধরতে লাগল। একটা পুরো আলমারি ভরা এই সব জিনিষ চিলেকোঠার এক কোণে সাজান ছিল। তারই একটা দেরাজের মধ্যে সব জিনিষের নীচে ছিল একটা বাক্স, আমার বাবার শীলমোহর আঁটা। সেই বাক্সটা খুলতেই তার মধ্যে আমার সেই পঞ্চাশ বছর আগেকার ডাক-টিকিটের সংগ্রহ বেরিয়ে পড়ল।

কিছুই অস্বীকার করব না। চোখে আমার অশ্রুর

স্রোত নামল। আমি সেই বাক্সটা অমূল্য সম্পদের মত আমার ঘরে নিয়ে গেলাম। আমার সেই দুঃখের মধ্যে আস্তে আস্তে ঘটনাটা পরিষ্কার হয়ে ফুটে উঠল চোখের সামনে। ঘটনাটা তাহলে ঘটেছিল এইভাবে···যখন আমার অসুখ সেই সময় কেউ-না-কেউ আমার সংগ্রহটিকে আবিষ্কার করেছিলেন এবং আমার বাবা করেছিলেন সেটি যথারীতি বাজেয়াপ্ত। যাতে আমার পড়ার ক্ষতি না হয়। এটা তাঁর করা উচিত হয় নি। কিন্তু এর মধ্যেও ছিল তাঁর স্নেহ এবং কঠোর সতর্কতা। জানি না কেন, বাবার জন্যে আর আমার নিজের জন্যেও ভারি একটা দুঃখ হতে লাগল।

তার পর আমার মনে পড়ল লয়জিকের কথা। লয়জিক তাহলে আমার ডাক-টিকিট চুরি করে নি। হায়, তার প্রতি কত অন্যায় করেছি। আবার আমার চোখের সামনে সেই পারিপাট্যহীন মেছেতা ভরা ছেলেটির ছবি ভেসে উঠল। ভগবানই জানেন তার কি হয়েছে। তিনিই জানেন সে বেঁচে আছে কি না। এ একটি অন্যায় সন্দেহের বশে আমি আমার একমাত্র বন্ধুকে হারিয়েছিলাম। তার ফলে হারিয়েছিলাম আমার শৈশবকে। তারই ফলে আমি গরীব-মাত্রকে অবজ্ঞা করতে শিখেছিলাম। তার ফলে আমি হলাম উন্নাসিক। কোন মানুষের প্রতি আমি লগ্ন হয়ে থাকতে পারলাম না। এই কারণেই ঘৃণা বিরক্তি আর বিতৃষ্ণার দৃষ্টি ছাড়া আর কোন দৃষ্টি নিয়েই আমি ডাক-টিকিটের প্রতি তাকাতে পারি নি। এই কারণেই আমি কোনদিন আমার বাগদত্তাকে বা স্ত্রীকে চিঠি লিখি নি, এবং নিজেকে ছলনা ক'রে এসেছি এই বলে যে, এই সমস্ত সস্তা উচ্ছ্বাসপ্রবণ অভিব্যক্তির অনেক ঊর্দ্ধে আমি। এর ফলে আমার স্ত্রী দুঃখভোগ করেছেন। এর জন্যে, শুধু এরই জন্যে আমি কর্ম্ম-জীবনে অত উন্নতি করতে পেরেছি এবং এমন ভাবে আমার কর্ত্তব্য সম্পন্ন করেছি, যাতে অপরে আমার দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে ধন্য হয়।

আমার সমস্ত জীবনটা চোখের সামনে আবার দেখলাম। দেখে হঠাৎ মনে হ'ল, জীবনটা বড় নিরর্থক, বড় উচ্ছিন্ন। মনে হল' জীবনটাকে সম্পূর্ণ অন্যভাবে কাটাতে পারতাম। আর তা যদি হ'ত! কত উচ্ছলতা ছিল আমার মধ্যে। কত অ্যাড্‌ভেঞ্চার, কত স্নেহ, বীরত্ব, কল্পনা এবং বিশ্বাস। ওঃ ভগবান্! যা হয়েছি এ ছাড়া কত কি আমি হতে পারতাম! পর্য্যটক, অভিনেতা অথবা সৈনিক। মানুষকে আমি ভালবাসতে পারতাম; সরাইখানায় পাঁচজনের সঙ্গে ব'সে এক পেয়ালা ক'রে সরাবও খেতে পারতাম, মানুষকে বুঝতে, সমঝাতে পারতাম, জানি না আরও কত কি হতে পারতাম। মনে হ'ল যেন আমার ভিতরকার বরফ গলতে আরম্ভ করেছে। একটার পর একটা ডাক-টিকিট দেশে যেতে লাগলাম। সবগুলোই ছিল। কোনটা এদিক্-ওদিক্ হয় নি। লমবাডি, কিউবা, শ্যামদেশ, হানোভার, নিকারাগুয়া, ফিলিপিন, আর আর সব দেশ—যেখানে যেখানে আমি ভ্রমণে যেতে চেয়েছিলাম এবং যে সব জায়গায় কোনদিন আমি আর যাব না। প্রতি টিকিটের সঙ্গে ছিল একটি ছোট্ট ইঙ্গিত, ছোট্ট হাতছানি। যা হতে পারত এবং যা হয় নি। সারা রাত তাদের নিয়ে আমি ব'সে রইলাম আর বিচার ক'রে চললাম নিজের জীবনের। দেখলাম যে, আমার আসল জীবন কোনদিন বাস্তবতায় পরিণত হয় নি, যা হয়েছে তা এক ধরণের অনাত্মীয়, কৃত্রিম, নৈর্ব্যক্তিক জীবন।

শ্রীকারাস হাত নেড়ে বললেন···তাই ভাবি, কত কি, কত সব আমি হ'তে পারতাম। আর ভাবি লয়জিকের প্রতি কতদূর অন্যায় করেছিলাম।

পাদ্রী ভোভেস এই গল্প শুনছিলেন। তিনি ভারি মনমরা হয়ে পড়লেন। বেদনায় পূর্ণ হয়ে গেল তাঁর অন্তর। খুব সম্ভব নিজের জীবনের কোন ঘটনা তাঁর মনে পড়ছিল, দরদ-ভরা স্বরে তিনি বললেন: শ্রীকারাস, এ সব কথা আর ভাববেন না। কি আর এর মুল্য? ফেরান ত আর যাবে না একে! নতুন করে আরম্ভও করা যাবে না।

শ্রীকারাস দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে আর একটু রাঙা হয়ে বললেন: তা যাবে না বটে, কিন্তু সেই সংগ্রহটা আবার নতুন করে আরম্ভ করে দিয়েছি।

পাঠশালা

যুগান্তকারী অস্ত্রোপচার

আঙুলের ডগার খানিকটা, নাকের একটু অংশ, কানের একটা টুকরো, এই জাতীয় ছোট ছোট দেহাংশ কেটে ছিঁড়ে গেলে সেগুলিকে সেলাই ক'রে আবার যথাস্থানে জুড়ে দেবার কাজ ডাক্তাররা অল্প-বিস্তর ক'রে আসছিলেন এতদিন। কিন্তু গোটা হাত বা গোটা পা শরীরের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলে সেটাকে রিপুকর্ম্ম ক'রে শরীরের সঙ্গে লাগিয়ে দিতে পারতেন না তাঁরা।

জুড়ে দেওয়া কাটা হাত।

জন্তুজানোয়ারদের নিয়ে কিছুদিন হ'ল এইদিকে কিছু কিছু চেষ্টা-চরিত্র চলছিল, আর তার থেকে কিছু পরিমাণ সাফল্যের সূত্রপাতও দেখা যাচ্ছিল। গ্রেহাউণ্ড জাতীয় কুকুরদের সামনের পা কেটে ফেলে সেগুলিকে আবার জুড়ে দিতে লাগলেন মিয়ামি ইউনিভার্সিটির একজন ডাক্তার। বাস্তবিক পক্ষে ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দেই আর একজন আমেরিকান ডাক্তার, চার্লস্ গুথরী, একটা কুকুরের ঘাড়ে অতিরিক্ত একটা মাথা জুড়ে দিতে পেরেছিলেন, সেটা মনে রাখতে হবে।

১৯৫৯ খ্রীষ্টাব্দে রুশ বৈজ্ঞানিকরা আরও নিপুণভাবে কুকুরদের উপর এই বিশেষ অস্ত্রোপচারটি ক'রে দেখাতে লাগলেন। কিন্তু এ সবই হ'ল ল্যাবরেটরীর গবেষণা।

গত ২৩শে মে আমেরিকার বোস্টন শহরে এভেরেট নোল্‌স্ নামে বারো বৎসর বয়সের একটি ছেলের ডান হাতটা একটা দুর্ঘটনার ফলে শরীর থেকে একেবারে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। ব্যাপারটা ঘটে দুটো ত্রিশ মিনিটে, দুটো বেজে চল্লিশ মিনিটের সময় ছেলেটিকে সেখানকার জেনারেল হস্‌পিটালে নিয়ে আসা হয়। এক ঘণ্টার চেয়েও কম সময়ের মধ্যে তাকে অপারেশন টেবিলে শুইয়ে তাকে ঘিরে জমায়েত হলেন বারোজন ডাক্তার, নার্স ও পরিচারক। আর সুরু হয়ে গেল মানুষের ইতিহাসে একটি যুগান্তকারী অস্ত্রোপচার।

হাড়ের সঙ্গে হাড়, পেশীর সঙ্গে পেশী জুড়ে, শিরার সঙ্গে শিরা, উপশিরার সঙ্গে উপশিরা এবং কোন কোন স্নায়ুর সঙ্গে স্নায়ু মিলিয়ে সেলাই ক'রে হাতটিকে তার যথাস্থানে আবার বসিয়ে দিলেন তাঁরা। দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া হাতটিতে রক্ত চলাচল সুরু হ'ল আবার ক্রমশঃ।

এই অত্যন্ত জটিল ও কঠিন অস্ত্রোপচারের রোমাঞ্চকর বিবরণ নভেম্বরের পপুলার সায়েন্স ছাপা হয়েছে। কৌতূহলী পাঠক কাগজটি সংগ্রহ ক'রে পাঠ করতে পারেন।

সমস্ত অস্ত্রোপচারটিতে সময় লেগেছিল মোট আট ঘণ্টা। সাড়ে আট ঘণ্টা অজ্ঞান ক'রে রাখা হয়েছিল এভেরেট নোল্‌স্‌কে।

প্রথম অস্ত্রোপচারের পাঁচ দিন পর নোল্‌স্‌কে আবার অজ্ঞান ক'রে দ্বিতীয়বার অস্ত্রোপচার করা হয়, জোড়ের জায়গায় তারই দেহের অন্যত্র থেকে পেশী ও চামড়া নিয়ে জুড়বার জন্যে।

১৩ই জুন, অর্থাৎ হাসপাতালে আসবার ঠিক তিন সপ্তাহ পর, এভেরেট নোল্‌স্‌কে বলা হয়, তার হাসপাতালে থাকবার দরকার আর নেই।

কিন্তু তার মানে এই নয় যে, সব ঠিক হয়ে গেল। ছেলেটির হাতটিকে এখন তার শরীরের অবিচ্ছেদ্য অংশ ব'লে আবার স্বীকার করতেই হবে অবশ্য, কিন্তু হাতটাতে কোন সাড় নেই। প্রত্যহ ছেলেটিকে আসতে হবে হাসপাতালে, হাতের পেশীগুলিতে বৈদ্যুতিক 'উত্তেজনা' দেবার জন্যে, আর হাতের আঙুলগুলোকে মালিশ করাবার জন্যে।

১১ই সেপ্টেম্বর, অর্থাৎ প্রথম অস্ত্রোপচারের সাড়ে তিন মাসের মতন পর তৃতীয়বার অস্ত্রোপচার হ'ল, হাতের স্নায়ুগুলোকে শরীরস্থ

স্নায়ুগুলির সঙ্গে ভাল ক'রে জুড়ে দিতে। এটা করতে এত কাটাছেঁড়া করতে হ'ল যে এবারে ছেলেটির উরুর কাছ থেকে অনেকখানি পেশী কেটে এনে জোড়ের জায়গায় জুড়তে হ'ল।

এখন ডাক্তাররা অপেক্ষা করছেন। আরও দুমাস, অর্থাৎ মার্চ্চ মাসের মাঝামাঝি পর্যন্ত তাঁদের অপেক্ষা করতে হবে জানতে, কাটা হাতের স্নায়ুগুলোর সঙ্গে শরীরের স্নায়ুগুলো ঠিকমত মিলল কি না।

মিলবেই যে এ কথা ডাক্তাররা বলতে পারছেন না। কিন্তু তাঁরা আশা করছেন যে মিলবে। নোল্‌সের পুনরুজ্জীবিত হাতটিতে সাড় ফিরে আসবে।

হাড় ও পেশীর খানিকটা এমন ভাবে থেঁৎলে গিয়েছিল যে চেঁছে ফেলে দেওয়া ছাড়া উপায় ছিল না। তার ফলে নোল্‌সের ডান হাতটি তার বাঁ হাতের চেয়ে লম্বায় এক ইঞ্চির মতন ছোট হবে। হয়ত একেবারে স্বাভাবিক হবে না আর হাতটা। কিন্তু ডাক্তারদের দৃঢ় ধারণা, হাতটা বেশ ভাল ভাবেই সাধারণ জীবিকা-নির্বাহের কাজে লাগবে। স, চ,

নদীগর্ভের পুরস্কার

এশিয়ার বিভিন্ন দেশে খাদ্যসঙ্কট সমাধানের জন্য 'কড়া ব্যবস্থা' অবলম্বন করা হচ্ছে। ছবিতে চীন দেশে হুপেই প্রদেশের

সার-সংগ্রহ।

শা-শাউতে একদল কর্মী জলের নীচে গাছ গাছড়া সংগ্রহ করছে। ঐ কর্মীরা জানায় যে তাদের এই কাজ ,অধিক খাদ্য ফলাও' অভিযানের অংশবিশেষ। তারা জলের নীচে থেকে যে বস্তু সংগ্রহ করে আনছে তা নোংরা ও অখাদ্য গাছগাছড়া এবং এগুলি মানুষের খাদ্যের সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত। ঐ গাছ-গাছড়াগুলি ওরা সংগ্রহ করছে জমিতে দেওয়া সারের জন্য।

চীনের লোক যে তাদের খাদ্যসমস্যা সমাধানের জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করছে এটা কোন ঘটনা নয়। চীনারা পরিশ্রমী জাতি হিসাবে তাদের খাদ্য-সমস্যার সমাধানের জন্য গা লাগিয়েছে, তারা কোন কিছুকে ফেলে না দিয়ে তাকে কাজে লাগাবার চেষ্টায় আছে।

দার্জ্জিলিং-এর রেলগাড়ী

ছবিতে যে ট্রেনটিকে দেখা যাচ্ছে এর সম্বন্ধে সুন্দর এক রূপকথা আছে। আকারে এর এঞ্জিনটি মোটর গাড়ীর চেয়ে সামান্য বড় এবং পঞ্চাশ বছর আছে এটি ব্রিটেনে তৈরী হয়। পশমের টুপী পরা দুটি লোককে এঞ্জিনটির সামনের
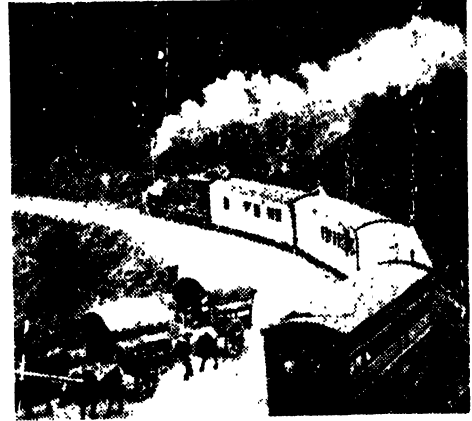
দার্জিলিং-এর রেলগাড়ী।

দুদিকে বাক্সারে বালির পাত্র হাতে বসে থাকতে দেখা যায়। খাড়াই পথে চলতে গিয়ে যখন এঞ্জিনের চাকা পিছলে যায় তখন লোক দুটি মুঠো মুঠো বালি ছিটিয়ে দেয় লাইনে এবং তারপর ট্রেন চলতে শুরু করে।

আইন ক'রে দাড়ি কামানো

পুরাকালে পেরুর প্রাচীন রাজাদের আইনে দাড়ি কামান ছিল বাধ্যতামূলক। তিন হাজার বছর আগে পেরুর লোকেরা কাঁচের টুকরোর মত মসৃণ পাথরের তৈরী অস্ত্র দিয়ে দাড়ি কামাত। চকমকি পাথরের ক্ষুর ছিল প্রস্তরযুগে এবং প্রাচীন রোমে সরল ধার বিশিষ্ট ক্ষুর দিয়ে একটি একটি করে দাড়ি কামান হত। ঐভাবে যুগের পর যুগ চলে এসেছে। সেফ্‌টি রেজার চালু হয়েছে মাত্র এই শতাব্দীতে এবং বিদ্যুৎচালিত ক্ষুর চালু হয়েছে কুড়ি বছরের বেশী নয়।

ওয়াকাম্বা সুন্দরী

এটা বেশ মজার ব্যাপার যে ওয়াকাম্বা উপজাতীয় কনেকে বিয়ের আগে পূর্বরাগ নৃত্য নাচতে হয়। কারণ সেই নাচের মধ্য দিয়ে সে কেমন চটপটে এবং সুন্দর তা দেখাতে হয় এবং বেশ কয়েক ঘণ্টা ধরে এই নাচ চালিয়ে যেতে হয়।

বিবাহার্থিনীর নৃত্য।

কারণ ওয়াকাম্বা বর শুধু সুন্দরী বৌই চায় না, চায় শক্ত সমর্থ জীবনসঙ্গিনী, যে শিকার করা, মাছ ধরা প্রভৃতি কাজ স্বামীর ওপর না চাপিয়ে নিজে করবে এবং চুপচাপ বসে থাকবে না।

এই ওয়াকাম্বা সুন্দরীদের সৌন্দর্য্যের রহস্যটা বেশ কৌতূহলজনক। ছাগলের দুধের সঙ্গে মাটি মিশিয়ে সেই কাদা ওরা মুখে হাতে সর্বাঙ্গে মাখে এবং এতেই নাকি তারা তাদের চেহারার সৌন্দর্য্য বাড়ায়। শোনা যায়, এজন্যে এদের কখনো চর্মরোগ হয় না।

বিচিত্র জগৎ

অনেকেই হয়ত জানেন না যে বিষধর সাপের ফণা চেপ্টা আর নির্বিষ সাপের ফণা গোল। বিষধর সাপ কামড়ালে সেই জায়গায় দুটো দাঁতের দাগ দেখা যায় এবং ক্ষতস্থান থেকে রক্ত পড়ে না। কিন্তু নির্বিষ সাপ কামড়ালে ক্ষতস্থান থেকে রক্ত ঝরে। বিষধর সাপ প্রসব করে সর্পশিশু, নির্বিষ সাপেরা পাড়ে ডিম।

হুভার ড্যাম

হুভার জলাধার (ড্যাম) উচ্চতায় হ'ল ৭২৬ ফুট, চওড়ায় ৬৬০ ফুট এবং আড়াআড়িভাবে তা হ'ল ১২৪৪ ফুট। জলাধারের নালা ও সুড়ঙ্গ পথ পাকা করতে যে পরিমাণ সিমেন্ট ইত্যাদি খরচ হয়েছে তা উত্তর মেরু থেকে কুমেরু পর্যন্ত পাঁচ ফুট চওড়া পাকা রাস্তা করার পক্ষে যথেষ্ট।

বিচিত্র শিরোভূষা

তুর্কানা উপজাতীয় লোকদের মস্তক আভরণ হিসাবে উট পাখীর পালক এবং জিরাফের লোম ব্যবহার করতে দেখা যায়। ধ, ম,

বিচিত্র শিরোভূষা।

রাজপরিবারের জন্য ব্রিটেনের ব্যয়

রাজ্ঞী হিসাবে দ্বিতীয় এলিজাবেথের সমস্ত ব্যয় নির্বাহের জন্য ব্রিটিশ পার্লামেন্ট বৎসরে কিঞ্চিদধিক যাট লক্ষ টাকার ব্যবস্থা ক'রে থাকেন। তাঁর স্বামী ডিউক অব এডিনবরার জন্যে পৃথক বরাদ্দ বৎসরে ছ'লক্ষ টাকা, আর প্রিন্সেস মার্গারেট ও তাঁর স্বামী লর্ড স্নোডনের জন্যে দু-লক্ষ টাকা।

ব্রিটিশ রাজপরিবারে বৈভব

রাজ্ঞী এলিজাবেথের একান্ত নিজস্ব গহনাপত্রের মধ্যে আছে হীরের আটটি মুকুট, ছোট থেকে বড় হয়ে আবার ছোট হওয়া ২২টি হীরের একটি হার, ১২০ ক্যারাট ওজনের একটি হীরের পিন। সমস্ত গহনাগুলি সংখ্যায় এত বেশী, যে রাজ্ঞীর পছন্দ ক'রে নেবার সুবিধের জন্যে সেগুলোর ক্যাটলগ ছাপানো হয়েছে। এ ছাড়া তিনি ইচ্ছা মত বিশ্ববিশ্রুত ব্রিটিশ 'ক্রাউন জুয়েলস্' বা রাজকীয় মণিমাণিক্যের গহনাগুলি ব্যবহার করতে পারেন।

বাকিংহাম প্যালেস ও ব্রিটেনের অন্যান্য রাজপ্রাসাদগুলিতে পাঁচ টনের মত ওজনের সোনার বাসন আছে।

নিজস্ব সম্পত্তির বিচারে রাজ্ঞী এলিজাবেথ পৃথিবীর নারীদের মধ্যে তৃতীয় স্থান অধিকার করেন। প্রথম স্থান পান হল্যাণ্ডের এক-কালীন রাণী উইলহেলমিনা। দ্বিতীয় স্থান বেগম আগা খানের। এলিজাবেথের এই ব্যক্তিগত সম্পত্তিরই মূল্যের পরিমাণ হবে ৭৫ কোটি থেকে ৮৫ কোটি টাকার মধ্যে।

এলিজাবেথের সংগ্রহের মধ্যে ছবি আছে ৬০০০। এদের প্রতি তিনটির মধ্যে একটি কোনো-না কোনো প্রাচীন বিশ্ববিখ্যাত চিত্রকরের আঁকা। এই ছবিগুলি বেচতে ইচ্ছে করলে এলিজাবেথ কুড়ি বাইশ কোটি টাকা স্বচ্ছন্দে পেতে পারেন। স, চ,

বাঁশীই বটে

জাহাজের বাঁশীর আকার সম্বন্ধে বলতে হলে কুইন মেরী জাহাজের কথা বলতে হয়। এর তিনটি সাইরেন আর তিনটি ফানেলের দুটি ভিতরের সম্মুখভাগে এবং তৃতীয়টি মাঝখানে। প্রত্যেকটি বাঁশীর ওজন

কুইন মেরী।

প্রায় এক টন। লম্বায় ৬ ফুট এবং ব্যাস প্রায় ২ ফুট। এদের গম্ভীর এবং তীক্ষ্ণ আওয়াজ বার মাইল দূর থেকেও শোনা যায়। ধ, ম,

এম্পায়ার স্টেট বিল্ডিং কি বাতাসে নড়ে ?

না। এই ত্রিশ বৎসর বয়সের ১০২তলা বাড়ীটির ভিত্তিমূল চ'লে গিয়েছে মাটির উপর থেকে ৫৫ ফুট নীচে, পাথরের স্তরের মধ্যে। ভীষণ ঘূর্ণিবায়ুও একে কাঁপাতে পারে না। ১৯৪৫ সালে একটা এরোপ্লেন এর ৭৮ তলায় এসে ধা খায়, যার ফলে ১৪ জন লোক মারা যায়। কিন্তু সাত তলা উপরে একটি ছেলে তখন তার বাবার অফিসে বসে মজার ছবি দেখছিল। নীচে যে কিছু একটা হ'ল তা একবারও বোধ হয় নি তার।

ইলেকট্রন অনুবীক্ষণ

এই অনুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে বিজ্ঞানীরা এমন একটি অণোরণীয়ান জগতে অনুপ্রবেশ করতে সক্ষম হচ্ছেন, যার কিছুমাত্র পরিচয় অত্যন্ত শক্তিশালী সাধারণ অনুবীক্ষণের দৃষ্টিতে ধরা পড়ত না। এটি হচ্ছে Virusএর জগৎ, যে ভিরাস থেকে একদিকে সাধারণ সর্দি আর অন্য দিকে সম্ভবতঃ ক্যানসার রোগের উৎপত্তি। এক ইঞ্চির দুই কোটি ভাগের এক ভাগ দূরে অবস্থিত দুটি অণুকে এই যন্ত্রের সাহায্যে আলাদা করে দেখা সম্ভব হচ্ছে। অণুগুলিকে দুই লক্ষ গুণ বড় করে দেখাচ্ছে এই যন্ত্র। এই অসাধ্য-সাধন সম্ভব হচ্ছে ফাঁকা বা Vacuumএর ভিতর ইলেকট্রন ছুঁড়বার একটি প্রক্রিয়ার দ্বারা। যন্ত্রটির নির্মাণে ৭০০০ সম্পূর্ণ পৃথক্ যন্ত্রাংশ ব্যবহৃত হয়, এর থেকে বোঝা যাবে এর গঠন কত জটিল।

চীনে বাদামের সঙ্গে চীনদেশের সম্পর্ক

কোনো সম্পর্ক নেই। আজকের দিনে সভ্য মানুষের অন্য অনেক আহার্যের মত চীনেবাদামেরও উৎপত্তি আমেরিকাতে। আমেরিকার আদিবাসী 'ইন্‌কা'রা এর চাষ করত, কলম্বস নূতন মহাদেশে পদার্পণ করবার বহু আগে থেকেই। এর প্রথম উদ্ভাবনা তাদের দিয়েই হয়েছিল। নামটা বদলে ইন্‌কা-বাদাম করলে কেমন হয় ?

স. চ.

সত্তর বৎসরের যুবক

সুইডেনের মালমো নিবাসী মেজর ডানিয়েল নর্লিং যে পৃথিবীর একজন সেরা সক্ষম লোক তা নিয়ে বুড়োরাও গর্ব করতে পারেন! তিনি তাঁর ৭০ তম জন্মবার্ষিকীতে হাতের ওপর ভর দিয়ে যে প্রাতঃকালীন ব্যায়াম কৌশল দেখান তাতে এ কথার প্রমাণ পাওয়া যায়। অবশ্য ইতিপূর্বে তিনি ১৯০৮ সালে লণ্ডন অলিম্পিকে এবং পুনরায় ১৯১২ সালে ষ্টকহল্‌ম্ অলিম্পিকে সোনার মেডেল পুরস্কার পান।

সত্তর যুবক।

ধ ম

চীন ও প্রপঞ্চশীল নীতি

শ্রীদিঙ্‌নাগ আচার্য্য

১৯৬২ সালের শেষ দিনটিতে ব'সে চীনের কথাই ভাবছি। না ভেবে উপায়ই বা কি? সকাল বেলা যা খবরের কাগজ পেয়েছি, সারাদিন রেডিওতে যা-কিছু অনুষ্ঠান শুনেছি, যা-কিছু কথাবার্ত্তায় যোগ দিয়েছি—সব কিছুতেই চীনের সঙ্গে আমাদের সাম্প্রতিক বিরোধের কথাই সর্ব্বপ্রধান স্থান অধিকার ক'রে রয়েছে। সুখে-দুঃখে ১৯৬২ সালটি একরকম কেটেছে—এখন শেষ হয়ে যাওয়ার মুহূর্ত্তে একটু একটু মন খারাপ না লেগে পারে না। চীনের সঙ্গে আমাদের সংঘর্ষে আমাদের মন আরও বেশী ক'রে বিষণ্ণ হয়েছে—যার উপরে আমাদের বিশ্বাস ছিল, সদিচ্ছা ছিল যার সম্বন্ধে, সে পিছন থেকে ছুরী মারলে রাগ হওয়ার সঙ্গে দুঃখও না হয়ে পারে না। তা ছাড়া যাঁদের পরিজনেরা এই সঙ্কটে প্রাণ হারিয়েছেন তাঁদের দুঃখও আজ আমাদের সকলের মনকে স্পর্শ না ক'রে পারে না। খুব সহজ, গতানুগতিক ভাবে বলতে পারা যায় যে আমাদের দিক্ থেকে কোনও অন্যায় করা হয় নি, যা কিছু অন্যায় তা চীনের দিক্ থেকেই উদ্ভূত, অতএব জয় আমাদের হবেই। আমার কিন্তু মনে হয় না যে অত সহজ ভাবে ব্যাপারটিকে নেওয়া উচিত। হাঙ্গেরীর অবস্থা কিংবা ইতিহাসের পাতায় পোল্যাণ্ডের ভাগ্য-বিপর্য্যয়ের কথা ভাবলে বোঝা যায় যে, ন্যায়পরায়ণ হলেই এ পৃথিবীতে জয়যুক্ত বা সুখী হওয়া যায় না। জাতিগত ভাবে সফল হতে হলে যেমন ন্যায়নিষ্ঠও হতে হয় তেমনই অন্য অনেক দিকে দৃঢ়তা ও সাহসের প্রয়োজন পড়ে—আন্তর্জ্জাতিক ক্ষেত্রে বুদ্ধিমত্তা ছাড়াও।

গত সংখ্যার প্রবাসীতে প্রকাশিত মিহির সিংহের প্রবন্ধটিতে বলা হয়েছে "যুদ্ধ সুরু হয় মানুষের চিন্তার জগতে" (পৃঃ ২৮৬)—কথাটি ঠিক। আজকের যুগে প্রচণ্ড এক লড়াই চলেছে মানুষের মনের অধিকার নিয়ে। বলাটা হয় ত একটু ভুল হ'ল, আসলে এ লড়াই চলে আসছে চিরকাল ধ'রে। অনেক মনস্তাত্ত্বিকের মতে যেমন মেয়ে-পুরুষের সম্পর্ক আর ক্ষমতা বিস্তারের অভিপ্রায় মানুষকে প্রতিনিয়ত পরিচালিত করে, অনেক রাজনৈতিকের মতেও তেমনি মানুষের ইতিহাস গ'ড়ে ওঠে আর্থনীতিক প্রগতি ও ক্ষমতার লড়াইয়ের উপর ভিত্তি ক'রে। মনীষী কার্ল্ মার্ক্স যে এই মতটির প্রথম প্রচারক তা ঠিক নয়, তবে তাঁর মতন সুসংবদ্ধ ভাবে আর কেউ মতটি ব্যক্ত করে নি তাঁর আগে। খুব সংক্ষেপে বলতে গেলে মার্ক্সের বক্তব্যটি হ'ল এই যে আদিমতম সমাজ-ব্যবস্থায় মানুষ তার পরিশ্রমের বিনিময়ে যা উৎপাদন করত তাই সে ভোগ করত খাওয়া-পরা ও বাসস্থানের আকারে। কিন্তু পরিশ্রমের তুলনায় উৎপাদনের পরিমাণ বাড়ানোর চেষ্টা তার মজ্জাগত, ফলে উৎপাদনের উপকরণ তৈরী করা সুরু হ'ল। কিন্তু একদিন যদি ব্যয় করতে হয় এই উপকরণ তৈরী করার কাজে ত সেদিন হয়ত মানুষটিকে উপোস করে থাকতে হবে, কারণ, উৎপাদন ত সেদিন কিছু হচ্ছে না। এর থেকে বাঁচবার উপায় হ'ল, আগের দিনের উৎপাদন থেকে কিছুটা আজকের জন্যে মূলধন হিসাবে সঞ্চিত করে রাখা। তার ফলে অবশ্য আগামী কাল উৎপাদন গত কালকের চাইতে অনেক বেশী হবে।—এই ভাবে সুরু হয় মানুষের অগ্রগতি।

পরবর্ত্তী কালে মানুষের সমাজে আরও দু'টি নতুন জিনিষের আমদানী হয়: অর্থ ও ব্যক্তিগত মালিকানার। বস্তুতঃপক্ষে এদুটি ছাড়া আমাদের জীবনধারণই প্রায় অসম্ভব। আমরা ভাবতেই পারি না যে, এদুটি জিনিস নেই অথচ সমাজ দাঁড়িয়ে আছে। কিন্তু মার্ক্স বলছেন (এবং তাই বোধ হয় ঠিক) যে, মানুষের ইতিহাসের গোড়ার দিকে এদের অস্তিত্ব ছিল না। যাই হোক, অর্থ নামক বস্তুটি থাকবার ফলে উৎপাদন এবং সঞ্চয় ও ভোগের মধ্যে রাস্তাটি দীর্ঘ হয়ে পড়ে, কেনা-বেচার ব্যাপারটি জটিলতর হতে থাকে, আমার উৎপাদিত দ্রব্যের সঙ্গে আর একজনের উৎপাদিত দ্রব্যের সাক্ষাৎ বিনিময় বিরল হয়ে আসে। আর এদিকে উৎপাদনে অংশগ্রহণকারী ত্রিবিধ উপাদান—শ্রম, প্রাকৃতিক সম্পদ্ ও উপকরণ বিভিন্ন মানুষের ব্যক্তিগত সম্পত্তি হয়ে দাঁড়ায়। উৎপাদন পদ্ধতির অগ্রগতির ফলে উদ্বৃত্ত যা হয় তাও আর সমাজের সমষ্টিগত লাভ না থেকে ব্যক্তিগত মানুষের হাতে চ'লে যায়। অর্থাৎ, অনেকের পরিশ্রমলব্ধ উদ্বৃত্তটুকু একজন বা অল্প কয়েকজনের উপভোগের জন্যে ব্যয়িত হতে থাকে।

শ্রেণীগত ভাবে দেখলে ব্যক্তিগত মালিক তিনটি দল-ভুক্ত হতে পারেন: 'শ্রমিক'রা যাঁরা শ্রমশক্তির অধিকারী, 'জমিদার'রা যাঁরা প্রাকৃতিক সম্পদের অধিকারী এবং 'পুঁজিপতি'রা যাঁরা সঞ্চিত মূলধনের অধিকারী। একেবারে আদিম অবস্থায় সব মানুষই ছিলেন শ্রমিক, তখন কোনও আর্থনীতিক বা সামাজিক বিরোধের অস্তিত্ব সে অর্থে ছিল না। তার পরে যখন মানব-সমাজে কিছুদূর পর্য্যন্ত অগ্রগতি হ'ল তখন এলো জমিদারদের প্রতিপত্তির সময়। তাঁরা প্রাকৃতিক সম্পদের মালিক হিসাবে দেশের সব উদ্বৃত্তই নিজেদের প্রাপ্য বলে মনে করতে থাকলেন। তার পরে শিল্পবিপ্লবের মধ্য দিয়ে এলো বর্ত্তমান যুগ, পুঁজিপতিরা উৎপাদনের উপকরণ তথা capital-এর মালিক হিসাবে সব উদ্বৃত্তটুকু টানতে চান নিজেদের দিকে। মার্ক্সের আলোচনায় দেখানো আছে যে, বর্ত্তমান সমাজ-ব্যবস্থার মধ্যে নিহিত আছে এর অবশ্যম্ভাবী অবসানের বীজ এবং এর ধ্বংসের উপরেই গড়ে উঠবে নূতন এক সমাজ, যেখানে ব্যক্তিগত মালিকানার উপরে নির্ভরশীল শ্রেণীগুলির আর অস্তিত্ব থাকবে না। দেশের যা উদ্বৃত্ত তা সমস্ত মানুষের মধ্যে সমান ভাবে বণ্টিত হবে, বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে স্বার্থের সংঘাত আর থাকবে না।

মার্ক্সের এই চিন্তাধারার উপরে অনেক কিছু আলোচনা হয়েছে, অনেক মানুষ এর দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়েছেন, অনেক মানুষের রক্তধারা বয়েছে এর উপলক্ষ্যে। এতে আশ্চর্য্য কিছু নেই—পৃথিবীর ইতিহাসে খ্রীষ্ট বা মহম্মদ বা অনুরূপ কোনও মানুষ যখনই এসেছেন তখনই মানুষের চিন্তার জগতে গভীর আলোড়ন সুরু হয়েছে, অনেক মঙ্গল, অনেক অমঙ্গল সংঘটিত হয়েছে বহু মানুষের জীবনে। আসলে আদর্শবাদ মানেই হ'ল মানুষের মনোরাজ্য দখলের অভিযান। মার্ক্সের এই চিন্তাধারা এত সরল, পুঁজিবাদীদের আয়ত্তাধীন সমাজ-ব্যবস্থায়—নিপীড়িত মানুষের কাছে এত সহজ একটা প্রতিশ্রুতি নিয়ে হাজির হয়েছে এই আদর্শবাদ যে অনেকের কাছেই এর আকর্ষণী শক্তি অসাধারণ। প্রথম মহাযুদ্ধের সময়ে রুশিয়াতে প্রথম মার্ক্সপন্থী সরকার গঠিত হ'ল—ইতিহাসে সব নতুন জিনিষের মতন বহু সমালোচনা আবার বহুজনের সমর্থনের ঝড় বয়ে গেল এই ব্যাপারটি নিয়ে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়ে ও তার অব্যবহিত পরে পূর্ব্ব ইউরোপ ও এশিয়াতে অনেকগুলি রাষ্ট্র মার্ক্সপন্থীদের করায়ত্ত হ'ল—অন্য অনেক রাষ্ট্র সরাসরি মার্ক্সীয় বলে গণ্য না হলেও তার সমর্থক ব'লে পরিগণিত হতে থাকলেন।

আজকে দেখা যাচ্ছে মার্ক্সবাদীদের একটি প্রধান বিশ্বাস ভেঙে পড়ছে। মার্ক্সপন্থী সরকার হলেই যে তারা সবাই মোটামুটি একতাবদ্ধ থাকবে তা নয়—তাদের মধ্যেও যথেষ্ট বিরোধ সম্ভব। প্রকৃতপক্ষে ইউগোস্লাভিয়া ও রুশিয়ার মধ্যে অতীতে যে বিরোধ হয়েছিল, কিংবা বর্ত্তমানে রুশিয়া ও চীনের মধ্যে যে বিরোধ দেখা দিয়েছে তাই হ'ল এর সব চাইতে বড় উদাহরণ। এটা খুব আশ্চর্য্য কিছু নয়। শক্তিশালী আদর্শবাদ যখন প্রথম প্রথম মানুষের মনে ধর্ম্মযুদ্ধ গোছের একটা উদ্দীপনা সৃষ্টি করে তখন তার যা প্রকৃতি থাকে, আর তার পরে যখন ক্ষমতায় আসীন মানুষের বা গোষ্ঠীর পৃষ্ঠপোষকতা-পুষ্ট "সরকারী" মতবাদ হিসাবে প্রকাশ পায় তখনকার চেহারা মোটেই এক নয়। তাছাড়া মার্ক্সীয় দর্শনের মধ্যেই লুকিয়ে আছে একটি নিদারুণ দ্বন্দ্বের বীজ। সেটা যে রুশিয়ার ক্ষমতাধিকারীরা বুঝতে পারছেন না তা মনে হয় না—তবে সে সম্বন্ধে তাঁরা স্বাভাবিক কারণেই নীরব।

মার্ক্স ব'লে গিয়েছেন যে, পুরোপুরি সাম্যরাজ্য প্রতিষ্ঠিত হলে সেখানে সব শ্রেণীবিরোধের অবসান ঘটবে, শাসনযন্ত্রের "state" নামক প্রকাশের আর অবকাশ থাকবে না, ইত্যাদি, ইত্যাদি। বস্তুতঃ পক্ষে অবশ্য রুশিয়া বা অন্য অন্য মার্ক্সপন্থী রাষ্ট্রে যা দেখেছি তাতে মনে হয় মার্ক্স-কথিত শ্রমিক শ্রেণীর নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠিত Ditatorahip বা একনায়কতন্ত্রই প্রচলিত আছে। এই সব রাষ্ট্রে শ্রমিক, পুঁজিপতি ও জমিদার শ্রেণীর হয়ত অবসান হয়েছে (অন্ততঃ এঁদের মধ্যে শ্রেণীগত বৈষম্য ও তজ্জনিত বিরোধের) কিন্তু ক্ষমতা দখল করেছে নতুন অভ্যুদিত একটি শ্রেণী। কোনও কোনও সমাজতাত্ত্বিক এর নাম দিয়েছেন "New class"। এই নতুন শ্রেণীটির হাতে আছে দেশের একমাত্র রাজনৈতিক দল মার্ক্সবাদী দলের নেতৃত্ব ও দেশের শিল্প বাণিজ্য তথা সমস্ত উৎপাদন-কেন্দ্রের নেতৃত্ব। শ্রেণীটির শীর্ষে আছেন একটি মানুষ বা একটি ক্ষুদ্র দল—তাঁরা ব্যক্তিগত ভাবেও যেমন সুযোগ সুবিধা পেয়ে থাকেন এই ক্ষমতার, তেমনি সমষ্টিগতভাবে তাঁদের হাতেই থাকে দেশের বিপুল সম্পদের পরিচালন-ক্ষমতা।

অল্প কয়েকজনের হাতে নেতৃত্ব থাকার অবিসংবাদি কয়েকটি সুবিধা আছে। হিটলারের জার্ম্মানী শুধু নয় প্রাচীন যুগের স্পার্টার ক্ষেত্রেও দেখেছি, একনায়কের অধীনে দেশের অর্থনীতিক উন্নতি ত্বরান্বিত হয়। তার মূল কারণ এই যে, একাগ্রচিত্তে কোনও অভীষ্টের প্রা

দৌড়োনো যায় এবং দেশের লক্ষ লক্ষ মানুষের কাছে ছড়িয়ে থাকা তাদের উদ্বৃত্ত উৎপাদনকে কেন্দ্রীভূত করে রাষ্ট্রের ইচ্ছামতন নিয়োজিত করা যায়। রুশিয়া তথা অন্যসব মার্ক্সবাদী রাষ্ট্রের ক্ষেত্রেও এই অর্থনীতিক উন্নতি আমরা ঘটতে দেখেছি। তবে এটাও ঠিক যে এই উন্নতির জন্য দাম দিতে হয় অত্যন্ত বেশী।

রুশিয়ার বর্তমান নেতারা ষ্ট্যালিনের আমলের অনেক সমালোচনা করেছেন আজকাল। সেই সব অন্যায় কাজকর্ম্ম আমাদের অজানা ছিল না। তাঁরাও যে আজকে এ বিষয়ে স্পষ্ট আলোচনা করছেন এটা ভালই। তবে ভুললে চলবে না যে এটা একটা সাময়িক বিচ্যুতি নয়। মার্ক্সীয় চিন্তাধারা তথা সমস্ত হিংসাত্মক ও একনায়ক-আশ্রয়ী আদর্শবাদের আমলে এ রকম একটা অধ্যায় আসতে বাধ্য। এমন কি আজকে চীন ও রুশিয়ার মধ্যে দৃষ্টিভঙ্গীর যে পার্থক্য রয়েছে তারও মূল তাদের দুই দেশের অর্থনীতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে বিভিন্নতার মধ্যে লুকিয়ে আছে। আজকে চীন যে অবস্থায় আছে, রুশিয়াও যেদিন সেই অবস্থায় ছিল সেদিন সেও এই রকম ব্যগ্র ছিল ঠাণ্ডা লড়াই জিইয়ে রাখতে।

সেই জন্যেই মনে হচ্ছে, আজকের এই লড়াইতে আমরা এখনও ঠিক ক'রে উঠতে পারিনি, কে আমাদের শত্রু। আমার মনে হয়, আমার ভুল হতে পারে, আমাদের আসল বিরোধ হওয়া উচিত এই ধরণের একনায়কত্বের বিরুদ্ধে। মার্ক্সীয় দর্শনের অনুকূলে অনেক যুক্তি আছে। বিশেষ ক'রে অনেক স্বার্থত্যাগী আদর্শপ্রাণ মানুষ এর আওতায় এসেছেন ও তাঁদের জীবন উৎসর্গ করেছেন। তাঁদের পরোক্ষ প্রভাবের ফলে পুঁজিবাদী দেশে সামাজিক ক্ষেত্রে অনেক প্রগতি সম্ভব হয়েছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও বলব যে, মার্ক্সীয় দর্শনের মধ্যে আমাদের পরিত্রাণ খুঁজতে গেলে ভুল করব। মার্ক্সীয় দর্শন যে পর্য্যন্ত দেখতে পেয়েছে—তার পরেও আজ ইতিহাস এগিয়ে এসেছে। তার হিসেব-নিকেশ না ক'রে তাকে আঁকড়ে থাকা আমাদের পক্ষে প্রগতির লক্ষণ হবে না।

চীনের সঙ্গে আমাদের বিরোধের পরিপ্রেক্ষিতে আজ ১৯৬২ সালের শেষ দিনটিতে ব'সে মনে হচ্ছে, আমরা পরাজিত হব শুধু ঠিকই করিনি—পরাজিত হয়েই ব'সে আছি। কারণ, আমাদের সামনে কোনও আদর্শ নেই যা দিয়ে আমাদের ব্যক্তিগত কিংবা সমষ্টিগত জীবনকে পরিচালিত করতে পারি। তার সব চাইতে বড় প্রমাণ হ'ল এই যে, মার্ক্সীয় রাষ্ট্রের জনসাধারণের মতন আমরাও হয়ে পড়েছি পরমত সম্বন্ধে অসহিষ্ণু, তাদের মতন আমরাও তাকিয়ে আছি সব বিষয়ে সরকারী নির্দ্দেশের অপেক্ষায়—যাকে বলে regimentation তার স্পষ্ট ছাপ পড়েছে আমাদের মনে। বরং চীনের লোকেরা তার পরিবর্ত্তে অর্থনীতিক উন্নতি আদায় ক'রে নিয়েছে—আমরা তাও হয়ত পারব না। অথচ চীনের সঙ্গে যদি কোনও বিরোধ থাকে আমাদের তা নিছক জমি নিয়ে নয়—এই আদর্শ নিয়েই।—আমরা চাই আমাদের গণতন্ত্রের আদর্শকে বজায় রাখতে।

চীনকে শুধু একটি রাষ্ট্র হিসেবে প্রতিহত করলে হবে না। আসলে আমাদের প্রত্যেককে ব্যক্তিগতভাবে বুঝতে হবে যে, এই লড়াই একটা আদর্শের লড়াই। আজকে চীনের সঙ্গে আমাদের সংঘর্ষ হ'য়ে থাকতে পারে, আবার কালকে হ'তে পারে অন্য কোনও রাষ্ট্রের সঙ্গে সংঘর্ষের সূচনা। তখন কি আবার এই রকম দিশাহারা ভাবে ভাবব, কেন এই বন্ধু-বিচ্ছেদ? এই জন্যেই আমার প্রবন্ধের এই নামকরণ—'প্রপঞ্চশীল নীতি'। পঞ্চশীল নীতি শুনতে বেশ ভালো লাগে—বাইরে আমাদের প্রচারের দেশেও খুব কার্য্যকরী হ'তে পারে। কিন্তু কোনও সাধারণ ভারতীয়ের জীবনে কখনও কোনও সময়ে কি এটা একটা সক্রিয় আদর্শবাদ হিসাবে স্থান পেয়েছে? আমার মনে হয়, আমাদের ব্যক্তিগত জীবনে এবং সমষ্টিগত ভাবে রাষ্ট্রীয় জীবনে আমরা শুধুই সুবিধাবাদীর ভূমিকা গ্রহণ ক'রে এসেছি। এবং আজ ১৯৬২ সালের শেষ দিনে দেখছি আমাদের ভুল আমাদের ধ'রে ফেলেছে। এইটাই আজকের দিনের উপলব্ধি।

যুদ্ধের সময়ে প্রচণ্ড শৃঙ্খলা ও নিয়মানুবর্ত্তিতা দরকার। তা'তে দুঃখ নেই—কারণ অসুখ করলে নিয়ম মেনে চলতেই হবে। কিন্তু অসুখটা কি? আমার মনে হয়, ভারতবর্ষে শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থান ও তার সঙ্গে অর্থনীতিক ও সামাজিক উন্নতির ক্ষেত্রে গণতান্ত্রিক পদ্ধতি অবলম্বনের যে পরীক্ষা চলেছে তার সঙ্গে চীনের মতন আদর্শ অবলম্বী রাষ্ট্রের বিরোধ কোন না কোনও সময়ে হ'তই। কিন্তু তার থেকে পরিত্রাণের উপায় সক্রিয় কোন আদর্শবাদকে ব্যক্তির ও জাতির জীবনে গ্রহণ করা। আমার মনে হয়, মার্ক্স স্বয়ং যদি আজকে বেঁচে থাকতেন ত তাঁর বিশ্লেষণকে তাঁর নিজের পথেই আরও অনেক দূর এগিয়ে নিয়ে যেতেন। তাঁর মনোভাব বোধহয় কোনসময়েই এই ছিল না যে, তিনি যা বলছেন তাই

চরম ও সঠিক। বিজ্ঞানসেবীর—ধর্ম অনুসারে তিনি তাঁর কাছে তথ্য ছিল তার ভিত্তিতেই যতদূর সম্ভব বিশ্লেষণ করেছিলেন সামাজিক পরিণতির ইতিহাস। আজকের দিনে মার্ক্সীয় রাষ্ট্রে নতুন ক্ষমতাধিকারী শ্রেণীর অভ্যুদয়ে অনেক তথ্য হাতে এসেছে—যার সাহায্যে এটা অন্তত বলা যায় যে, মার্ক্সীয় সমাজ-ব্যবস্থা মানে মানুষের সব দুর্গতির অবসান নয়।

বললে হয়ত খুব platitude-এর মতন শোনাবে কিন্তু মনে হচ্ছে, বিনোবা ভাবে বা অনুরূপ মানুষরা মানুষের মনের জগতে যে পরিবর্ত্তনের কথা বলেছেন তার মধ্যেই প্রকৃত সমস্যাটি লুকিয়ে আছে। মানুষের মধ্যে আছে ক্ষমতার প্রতি আসক্তি—তাকে যদি সংশোধন না করতে পারি ত যে কোনও সমাজ-ব্যবস্থাতেই লড়াই লাগবে ক্ষমতা নিয়ে।

বাঙলায় তোরঙ্গ শব্দ

শ্রীসুধীর রায় চৌধুরী

"শব্দে শব্দে বিয়া"র বিবিধ সাধনপদ্ধতিকেই এক হিসেবে বলা যেতে পারে ব্যাকরণ। সন্ধি-সমাস-প্রত্যয়াদি নিষ্পন্ন শব্দাবলী ত আসলে তা-ই। উচ্চারণের বিকৃতির দরুণ অথবা অন্যান্য কারণে শব্দের যে ধ্বনি-পরিবর্তন তার মূলেও একই প্রভাব কার্যকরী। কিন্তু একটু লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে, উক্ত ক্ষেত্রে শব্দগুলি তাদের স্বাতন্ত্র্যকে পুরোপুরি বিসর্জন দেয় না অর্থাৎ সন্ধি-সমাসে শব্দগুলির উচ্চারণ একটি অন্যটির প্রভাবে পরিবর্তিত হলেও কোন বর্ণ পুরোপুরি বর্জিত হয় না। অন্যদিকে তোরঙ্গ শব্দগুলি ইচ্ছামত ছেঁটেকেটে দুটো শব্দ থেকে এমন একটা নতুন শব্দ তৈরি করে যার মধ্যে মূল দুটো শব্দেরই মানে অল্প-বিস্তর পরিমাণে নিহিত থাকে। বলা বাহুল্য এ জাতীয় শব্দ নিষ্পন্ন হয় ব্যাকরণের বেড়া ডিঙিয়ে। কেউ যদি মধুর ও মিষ্টির সমন্বয়ে 'মধুষ্টি' তৈরি করেন তাহলে আমরা সেটাকে বলব তোরঙ্গ শব্দ।

"তোরঙ্গ" শব্দটি বুদ্ধদেব বসুর পরিভাষা, ডঃ সুকুমার সেনের মতে "জোড় কলম" শব্দ। বলা বাহুল্য প্রথমোক্ত শব্দটি "পোর্টম্যান্টো"র আক্ষরিক অনুবাদ। পোর্টম্যান্টো শব্দের আদি স্রষ্টা হাম্প্‌টি ডাম্প্‌টি—যার রচয়িতা লুইস ক্যারল। অ্যালিস যখন আজব শব্দ "slithy"র মানে বুঝতে না পেরে তাকে জিজ্ঞেস করল মানে কি, তখন সে হেসে বললো "slithy" মানে "lithe and slimy." তার পর আরো পরিষ্কার করে ব্যাখ্যা করল, "ব্যাপারটা বুঝলে না? "It's like a portmanteau —there are two meanings packed up in one word." তার পর থেকে এ জাতীয় শব্দকে পোর্টম্যান্টো শব্দ বলা হয়। ক্যারলের "Through the looking glass"-এ "Jabberwocky" পর্যায়ের ছড়ায় এ জাতীয় অনেক দৃষ্টান্ত ছড়ান রয়েছে। তার কিছু কিছু শব্দ আজকাল কথাবার্তাতেও চলে গেছে, যেমন "chuckle" এবং "snort" শব্দের সমন্বয়ে গঠিত "chortle". তোরঙ্গ শব্দাবলী যে শুধু হাসিঠাট্টার অর্থে প্রচলিত তা নয়। জয়েসের বিশিষ্ট প্রয়োগের কথা তো ছেড়েই দিলাম, দৈনন্দিন কথাবার্তা এবং লেখাপড়ায় ব্যবহৃত পোর্টম্যান্টো শব্দের বহু উদাহরণ রয়েছে, যেমন, Eurasia (Europe + Asia), wuncle (= wicked uncle), gruncle (= grand uncle), gracing (= grey-hound racing) ইত্যাদি।

বাঙলায় তোরঙ্গ শব্দের সুন্দর প্রয়োগ পেলাম সুকুমার রায়ের কবিতায়। বুদ্ধদেব বসুর সঙ্গে আমরা একমত যে, "হাঁসজারু" বা "বকচ্ছপ" শুনে ছোটো যত ইচ্ছে হাসুক, কিন্তু আমাদের মনে পড়ে যায় জেমস জয়েসকে আর পূর্বসূরি লুইস ক্যারলকে, যিনি "slithy" আর "mimsy" উদ্ভাবন করে জয়েসকে পথ দেখিয়ে দেন। তবে একটা প্রশ্ন থেকে যায়, তোরঙ্গ শব্দের পুরোপুরি উদ্ভাবক ক্যারল কিনা। অর্থাৎ ভাষাতে তার আগেও এর কোনো অস্তিত্ব আছে কি? ক্যারলের মাধ্যমে আজ তোরঙ্গ শব্দাবলী জনপ্রিয়, তার ও জয়েসের প্রতিভা-স্পর্শে এর ব্যঞ্জনাও বিচিত্র ক

আক্ষরিক ভাবে উদ্ভাবকের সম্মান তাঁদের প্রাপ্য কিনা বিবেচ্য। কেননা ডঃ সুকুমার সেন তাঁর "ভাষার ইতিবৃত্ত" গ্রন্থে বৈদিক সংস্কৃত থেকে শুরু করে পালি-বাঙলা ইত্যাদি সর্বস্তরেই পোর্টম্যান্টো শব্দের দু'একটি উদাহরণ দিয়েছেন। উদাহরণগুলি এই প্রসঙ্গে কৌতূহলোদ্দীপক হবে মনে করে উদ্ধৃত হ'ল :

শ্যাম + শ্বেত > শ্যেত (বৈদিক)
জহার + বভার > জভার (")
সম্যক্ + সোম্য > সম্ম (পালি) ;
আরবী মিন্নৎ + সংস্কৃত বিজ্ঞপ্তি > বাংলায় মিনতি ;
অরি + বৈরী মধ্য বা. ঐরি ;*

তা ছাড়া বিষমচ্ছেদ, মিশ্রণ, লোকনিরুক্তির অনেক দৃষ্টান্ত তোরঙ্গ শব্দের কাছে ঘেঁষে যায়। মোটের ওপর তোরঙ্গ শব্দ একেবারে অভিনব নয়।

বুদ্ধদেব বসু আরো লিখেছেন, 'গল্পসল্পে' রবীন্দ্রনাথ খেলাচ্ছলে দু-একটি নমুনা বানিয়েছিলেন, যেমন 'হিদিক্কার' বা 'বুদবুধি'। এর প্রথমটিতে 'হৃদয়', 'হক্কা', 'ধিক্কার' এই তিনটি শব্দেরই আভাস দেয়, আর দ্বিতীয়টিতে 'বুধ' আর 'বুদ্বুদ' মিশে পাণ্ডিত্যের প্রতি কটাক্ষ পড়েছে।" কিন্তু শুধু খেলাচ্ছলে নয়, রবীন্দ্রনাথের কবিতাতেও তোরঙ্গ শব্দের দু-একটি নমুনা পাওয়া যায়। "রবীন্দ্রকাব্যভাষা"র লেখিকা সুনন্দা দত্ত রবীন্দ্রনাথের যে শব্দ-সংগ্রহ করেছেন, তার মধ্যে 'মৈতালি' এবং 'লুঠেল' অবশ্যই এজাতীয় শব্দ। 'সেঁজুতি' কাব্যগ্রন্থে আছে :

কেটে গেছে বেলা শুধু চেয়ে-থাকা মধুর মৈতালিতে,
নীল আকাশের তলায় ওদের সবুজ বৈতালিতে।

মৈতালি নিষ্পন্ন হয়েছে মৈত্রী এবং মিতালির সমন্বয়ে। রবীন্দ্র-কাব্যগ্রন্থে এজাতীয় আরো উদাহরণ থাকা সম্ভব। এই প্রসঙ্গে 'নবজাতকে'র 'শেষ হিসাব' কবিতাটি থেকে অংশবিশেষ উদ্ধৃত করা যেতে পারে :

পথের মধ্যে লুঠেল দস্যু
দিয়েছিল হানা,
উজাড় করে নিয়েছিল
ছিন্ন ঝুলিখানা।

লুঠেল-এর মূলে রয়েছে লুঠ এবং লেঠেল।

অবনীন্দ্রনাথের স্বভাবের সঙ্গে তোরঙ্গ শব্দসৃষ্টির মানসিকতার মিল রয়েছে। অবশ্য তিনি সচেতন ভাবে কোনো তোরঙ্গ শব্দ তৈরি করেছিলেন কি না তার প্রমাণ নেই। তবে তাঁর 'বুদ্ধিজিভি' জাতীয় শব্দে এই প্রবণতারই পরিচয় রয়েছে। এমন কি হিরিদয়কে 'হৃদয়' থেকে বিপ্রকর্ষ বলায় আমার অমত। কেননা অবনীন্দ্রনাথের চরিত্রের নাম রিদয়, হৃদয় নয়। বরং হে রিদয়-এর সঙ্গে হিরিদয়ের অধিকতর ঘনিষ্ঠতা।

সাধারণভাবে আমাদের লেখকেরা রক্ষণশীল ব'লে বাংলা ভাষায় এ জাতীয় শব্দ খুব বেশি নেই। তবুও ইতস্তত উদাহরণ দু-একটি চোখে পড়ে। যেমন জনৈক তরুণ লেখকের রচনায় 'শুখী' প্রয়োগ দেখেছিলাম। একটা কথা অবশ্য মনে রাখা দরকার। খুব নিপুণ শব্দশিল্পী না হলে অক্ষম লেখকের কাছে এটা শুধু ব্যাকরণ বিষয়ে অজ্ঞতার চমৎকার অজুহাত তৈরি হবে।

ধ্বনিসাদৃশ্যে শব্দ তৈরি করবার দৃষ্টান্ত বাঙলায় আছে। একদা 'ইণ্টার্ন্যনে'র অনুকরণে খবরের কাগজের লেখকেরা সৃষ্টি করলেন 'অন্তরীণ'। রবীন্দ্রনাথের আপত্তি সত্ত্বেও উক্ত শব্দটি এখন অভিধানেও স্বীকৃত। অনুরূপভাবে তোরঙ্গ শব্দাবলীও ভাষার শব্দসমৃদ্ধিতে সহায়তা করতে পারে। অবশ্য এক্ষেত্রে পরিমিতিবোধই সবচেয়ে বড় কথা।

---

* ভাষার ইতিবৃত্ত (৫ম সংস্করণ), পৃঃ ৩৬

রবীন্দ্র-সাগর-সঙ্গমে—শ্রীবিশু মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত।

এম. সি. সরকার এণ্ড সন্স প্রাইভেট লিঃ —মূল্য দশ টাকা।

রবীন্দ্র-শতবর্ষ-পূর্তি উপলক্ষ্যে গত দুই বৎসর যাবৎ অসংখ্য পুস্তক নানা ভাষায় প্রকাশিত হইয়াছে। এবং এখনও দুই-একটি প্রকাশিত হইতেছে। আলোচ্য পুস্তকটি শেষের দিকে প্রকাশিত হইলেও সাহিত্য-রস-লিপ্সু সুধীজনের নিকট পূর্ণ সমাদর পাইবার যোগ্য, কারণ—ইহা "প্রধানতঃ রবীন্দ্র-সাহিত্যের উপর রচিত যুগাচার্যদিগের সমালোচনা, টীকা, টিপ্পনী ও মন্তব্যের সঙ্কলন।" এইরূপ গ্রন্থ ইতোপূর্বে আমাদের চোখে পড়ে নাই এবং ইহা রবীন্দ্র-সাহিত্য-পরিক্রমা-রূপ দুরূহ বিষয়ে বহু অপরিহার্য উপকরণ যোগাইবে।

সাহিত্য-সমালোচনা সাধারণতঃ সাহিত্যের মূল্যায়ন বলিয়াই গৃহীত হয়। কিন্তু বস্তুতঃপক্ষে কোন বিশেষ সাহিত্য সম্পর্কে যদি বিভিন্ন যুগের সমালোচনার ধারা পৃথক ভাবে বিশ্লেষণ করা হয় তবে উহাতে সেই যুগের সাহিত্যিকদিগের গোষ্ঠীগত ও ব্যক্তিগত পরিচয়ও পাওয়া যায়, যাহা দ্বারা সেযুগের সমাজ সাহিত্য ও সাহিত্যিকগণ কিরূপ ছিলেন তাহাও বুঝা যায়। এদিকে যেমন কোনও ভাষায় সাহিত্যের বিকাশ ও প্রগতির পথ যে কিরূপ বন্ধুর ও দুর্গম ছিল তাহা বুঝিবার উপায় ভিন্ন ভিন্ন যুগে সেই সাহিত্য বিশ্লেষক সমালোচকদিগের দৃষ্টিভঙ্গির সহিত পরিচিত হওয়া অন্যদিকে কোন বিশেষ সাহিত্যের ধারা সকল অনুকূল ও প্রতিকূল সমালোচনার বাধা কিভাবে অতিক্রম করিয়া স্বপ্রতিষ্ঠ হইয়াছে সে-বিষয়ে সম্যকভাবে জানিবার উপায়ও ঐ সমালোচকদিগের নিবন্ধ ও মন্তব্যে। রবীন্দ্র-সাহিত্যের দিগন্ত প্রসারিত আয়তন এবং তাহার সুদীর্ঘ কালের ব্যাসে তাহার ঐ জাতীয় পরিচিতির বিষম অন্তরায় ছিল। বিশুবাবুর এই সযত্ন সংগৃহীত সঙ্কলন সে বাধা অনেকটা দূর করিতে পারিবে মনে হয়।

পুস্তকটি শুধু সাহিত্য সমীক্ষাকারির পক্ষে অত্যাবশ্যক নহে, ইহার নিবন্ধগুলির অধিকাংশ এমনই সরস ও সুলিখিত যে সাহিত্যরসামোদী মাত্রেই আনন্দ পাইবেন। সে কারণে সঙ্কলনকারী রসিকজন মাত্রেরই ধন্যবাদার্হ।

ক. চ.

সবার উপরে: শ্রীসীতা দেবী। সিলেক্ট পাব্লিকেশন্স।

৩৫, লেক টেম্পল রোড, কলিকাতা ২৯। মূল্য: সাড়ে চার টাকা।

শ্রীসীতা দেবী সাহিত্য-সৃষ্টির ক্ষেত্রে দীর্ঘদিন ধ'রে পদচারণা ক'রে আসছেন। তাঁর এই সাহিত্য সাধনা বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রকে উর্বরা করতে সাহায্য করেছে কি না কালের কষ্টিপাথরে যাচাই হবে একদিন। কিন্তু আপাততঃ বলা যায় যে তাঁর নিরলস লেখনী থেকে এখনও অব্যাহতভাবে চলেছে সৃষ্টিকার্য, যা উৎসাহিত করবে সাহিত্যানুরাগীদের। স্কুলে পড়ার সময় পড়েছিলাম তাঁর সমস্যামূলক উপন্যাস 'বন্যা'। সমাজের অচলায়তন বাধানিষেধ আর তথাকথিত সামাজিক আচার-আচরণ কুসংস্কারের গণ্ডী অতিক্রম ক'রে প্রেমের মূল্য দিতে তাঁর উপন্যাসের নায়ক-নায়িকারা এসেছিল এগিয়ে। আলোচ্য 'সবার উপরে' উপন্যাসেও তাঁর সেই বাঁধন ভাঙ্গার আহ্বানকে তাঁর নায়ক-নায়িকারা সোচ্চারে ঘোষণা করতে কণ্ঠ মিলিয়েছে।

আজকের সাহিত্য যদিও আঙ্গিকে এবং বিষয়-বৈচিত্র্যে নতুন নতুন পরীক্ষা-নিরীক্ষার ক্ষেত্রে অবতীর্ণ এবং ঘটনা-প্রবাহকে প্রথম উপজীব্য না করে আজকের মানুষের জীবন-যন্ত্রণা ও মানসিক জটিলতার জট উন্মোচনের দিকেই অধিকতর মনোযোগী; তবু সমস্যামূলক ও বাস্তবধর্মী উপন্যাস যা সাধারণ মানুষের জীবন-দর্শন, সুখ দুঃখ হাসি কান্নার চিরন্তন সমস্যাগুলিতে ভাস্বর সেখানে তার প্রয়োজন আজও ফুরায়নি। তাই আলোচ্য উপন্যাসে প্রেমকে লেখিকা সামাজিক অনুশাসনের শিকল ছিঁড়ে নানা ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়া প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছেন। নায়িকা সুমনার পড়াশুনা করে নিজের পায়ে দাঁড়াবার ইচ্ছাকে আমল না দিয়ে বিয়ে দেওয়ার পরই স্বামীকে চেনা জানার আগে স্বামীর এ্যাকসিডেন্টে মৃত্যু হয়। তারপরই শুরু হয় বাড়ীতে মায়ের আর সমাজের কড়াকড়ি ও অনুশাসন। বিধবা সেজে থাকার যন্ত্রণার থেকে শুরু হয় সমস্ত আনন্দ-উৎসব আর মেলামেশা থেকে বঞ্চনার ইতিহাস। এই দুঃসহ ব্যথা তার নিঃসঙ্গ জীবনকে পাকে পাকে জড়িয়ে ধরে। কিন্তু এর মধ্যেই হঠাৎ আলোর ঝলকানির মত তার জীবনে আসে নায়ক বিজয় গৃহশিক্ষক রূপে। তারপর কেমন ক'রে নিজের মানসিক দ্বন্দ্ব, সংসার আর চারপাশের বেড়াজাল থেকে মৃত বলে প্রচারিত স্বামীর পুনরাবির্ভাব সত্বেও সে বেরিয়ে আসে, তারই বলিষ্ঠ কাহিনী 'সবার উপরে' পাতার পাতায় বিবৃত। নায়ক বিজয়কে সে পেয়েছে পৌরুষে উজ্জীবিত জীবন-সঙ্গী হিসাবে। তাঁকে অবলম্বন ক'রেই সে তা'র প্রেমের কষ্টি-পাথরে তথাকথিত সমাজকে যাচাই ক'রে তা'কে মেকী প্রতিপন্ন ক'রে ছুঁড়ে ফেলেছে অতীতের অন্ধকার গর্ভে।

সে যুগের লেখিকা তাঁর পরিণত বয়সেও যে উদার ও প্রগতিশীল দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় দিয়েছেন এ উপন্যাসে, তা'তে পাঠকেরা অভিনন্দিত করবে তাঁকে। জীবন-মৃত্যুর সন্ধিস্থলে দাঁড়িয়ে নায়িকা সুমনা আইনের নাগপাশকে করেছে অস্বীকার, অতীত পুতুলখেলার জীবনকে পিছনে

ফেলে নতুন প্রাণশক্তিতে নতুন জীবন-স্বপ্নকে চলেছে সার্থক করতে। নায়িকার এই সার্থকতার সঙ্গে উপন্যাসের সার্থকতার প্রশ্নও জড়িত। সহজ ও স্বচ্ছন্দ ভাষায় অবলীলাক্রমে চরিত্রগুলি পাঠকের চোখের সুমুখে জীবন্ত হয়ে উঠেছে। বিশেষ করে নায়িকার ব্যক্তিত্ব ও স্বাতন্ত্র্যবোধ, তার সংযম ও শিক্ষা তাকে বিশিষ্টা করে তুলেছে এই উপন্যাসে। নায়কের দৃঢ়তা ও সঙ্কল্পে অটলতা তাকে নায়োকচিত মঞ্চে উন্নীত করেছে। তবে নায়ককে দেখে মনে হয় এরা যেন নায়ক হ'বার জন্যই এসেছে উপন্যাসে। পার্শ্বচরিত্রের মধ্যে পূর্ব্ব-স্বামী, পুষ্প, বাবা রাসবিহারী এবং মা গৌরাঙ্গিনী কিছুটা স্বয়ংসম্পূর্ণ। অনান্য চরিত্রগুলি যেন উপন্যাসের প্রয়োজনে এসেছে বলে মনে হয়। এদের দিকে লেখিকা আর একটু দৃষ্টি দিলে এরা হয়ত নিজের পায়ে কিছুটা খাড়া হ'তে পারত। সংলাপে পরিমিতি-বোধ, বিশেষ ক'রে নায়ক নায়িকার মন দেওয়া-নেওয়ার সময় মার্জিত কথাবার্ত্তা ও রুচিবোধ চমৎকার মাধুর্য্য সৃষ্টি করে।

ধর্ম্মদাস মুখোপাধ্যায়

জাতীয় গ্রন্থপঞ্জী—বাংলা বিভাগ ১৯৫৭-৬

সম্পাদক—বি, এস, কেশবন, ষ্টেট ব্যুরো অব এডুকেশন, শিক্ষা বিভাগ পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক প্রকাশিত। মূল্য ৭·৫০ নয়াপঃ পৃষ্ঠা ৪৩৬।

জাতীয় গ্রন্থপঞ্জীর প্রথম সংখ্যা ১৯৫৮ সালের আগষ্ট মাসে প্রকাশিত হয়। ইহাতে ১৯৫৭ সালের শেষ তিন মাসে প্রাপ্ত বই তালিকা-বদ্ধ করা হইয়াছিল। বছরের শেষে অবশ্য একটি ক্রম-বার্ষিক সংখ্যা প্রকাশিত হয়। বর্তমান গ্রন্থ জাতীয় গ্রন্থপঞ্জীর দ্বিতীয় খণ্ড বলা যাইতে পারে। ব্যক্তিগত ভাবে অথবা কোন প্রকাশন সংস্থা-কর্তৃক প্রকাশিত পুস্তক ছাড়াও রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকার এবং আধা-সরকারী প্রতিষ্ঠানের প্রকাশন এই গ্রন্থপঞ্জীতে অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে। কেবল স্বরলিপি, মানচিত্র, পত্রিকা এবং সংবাদপত্র (নূতন নামে প্রকাশিত বা নূতন পত্রিকায় প্রথম সংখ্যা ব্যতীত), পাঠ্য-পুস্তক নির্দ্দেশিকা এবং অর্থ-পুস্তক—এবং অন্যান্য নিতান্ত সাময়িক প্রকাশিত পুস্তিকা ইত্যাদি এই তালিকাভুক্ত হয় নাই।

নিয়মিত প্রকাশিত সরকারী গ্রন্থপঞ্জী গ্রন্থাগারসমূহের পুস্তক নির্ব্বাচনে যে বিশেষ সহায়ক হইবে, তাহা বলাবাহুল্য। আশা করি বাংলা দেশের প্রত্যেক গ্রন্থাগার-কর্তৃপক্ষ ইহার একখানি সংগ্রহ করিবেন। কোন কোন রাজ্যে এরূপ গ্রন্থপঞ্জী সরকারী সাহায্যপ্রাপ্ত গ্রন্থাগারে বিনামূল্যে বিতরণ করিয়া থাকেন। পশ্চিমবঙ্গ সরকার ইহা বিনামূল্যে সম্ভব না হইলে অল্পমূল্যে ইহা সরকারী-সাহায্যপ্রাপ্ত গ্রন্থাগারে সরবরাহ করিবেন ইহাই বাঞ্ছনীয়।

শ্রীঅনাথবন্ধু দত্ত

সম্পাদকের বৈঠকে। সাগরময় ঘোষ। ত্রিবেণী প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেড। কলকাতা-১২। পাঁচ টাকা পঞ্চাশ ন.প.

দু'রকম সাহিত্যিক আড্ডার সঙ্গে আমরা পরিচিত। এক, কোন বিশিষ্ট সাহিত্য আন্দোলনের নেপথ্যলোকে যার জড়, আর কোন পত্রিকাকে কেন্দ্র ক'রে বা অন্য কোন উপলক্ষ্যে সমান-বয়সী সমান-ধর্মা সাহিত্যিক ও সাহিত্য-যশ-প্রার্থীর আসাযাওয়া, ওঠাবসা, কথাকাহিনীতে যে আড্ডা বিচিত্রিত হয়ে ওঠে, বহিরঙ্গ দিক্ যার প্রধান। প্রথম শ্রেণীর অন্তরঙ্গ আড্ডা বা বৈঠকের কথা আমরা ভারতী, সবুজপত্র, কল্লোল, পরিচয় (সুধীন্দ্রনাথ দত্ত সম্পাদিত) প্রভৃতির নামে শুনে এসেছি। দ্বিতীয় শ্রেণীর আড্ডার কাহিনী বক্ষমান গ্রন্থে শ্রীযুক্ত সাগরময় ঘোষ আমাদের শোনাচ্ছেন। দীর্ঘ দুই যুগ তিনি 'দেশ' পত্রিকার সম্পাদনা কর্মে সংশ্লিষ্ট। বিভিন্ন সময়ে এক-দুই ক'রে এ পত্রিকার শনিবাসরীয় বৈঠকে এসে মিলিত হয়েছেন অনেক সাহিত্যিক,- কেউ কবি, কেউ গাল্পিক, কেউ বা 'সব্যসাচী লেখক', অনেক সাহিত্যমনা অসাহিত্যিকও এসে বসেছেন তাঁর সাহিত্য-সংসর্গের ঝুলিঝোলা ঝেড়ে, তাঁদের বহির্মুখী কথোপকথনে কোন্ অজান্তেই সুরু হয়ে গেছে মৌসুমী বৃষ্টির মত অনায়োজিত আড্ডা। স্বয়ং সাগরবাবুর কথায়: "আমি লেখক নই, কস্মিন্‌কালে লেখার অভ্যাসও আমার নেই। লেখকদের লেখা খুঁজে বেড়ানোই আমার নেশা ও পেশা, নিজের লেখা কোনদিন চিন্তাই করি নি।...দীর্ঘ বাইশ বছর 'দেশ' পত্রিকা সম্পাদনা কাজের সঙ্গে আমি যুক্ত। সেই সুবাদে লেখকদের সঙ্গে আমার ব্যক্তিগত অন্তরঙ্গতা বহুকালের, প্রবীণ ও তরুণ লেখকদের স্নেহ, প্রীতি ও ভালবাসা পেয়ে আমি ধন্য। সাহিত্যিকদের জীবনের অনেক কাহিনীর সঙ্গে আমি ব্যক্তিগতভাবে জড়িত, অনেক কাহিনী আড্ডায় বন্ধুদের মুখে শোনা। সুতরাং সম্পাদকের বৈঠকের চুটকি গাল-গল্প লিখে যদি কোন অপরাধ করে থাকি..." ইত্যাদি। এ থেকে এই গ্রন্থ সম্পর্কে আমরা একসঙ্গে অবহিত হতে পারি এর দেশকালপাত্র সমেত এর সমগ্র দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কে, এর বিন্যাসশৈলী সম্পর্কেও। প্রথমতঃ, বহুলেখকের নিকট সান্নিধ্য সংঘটনে সাগরবাবু যে কৃতিত্ববান্ তার বহু উদাহরণ এখানে আছে। দ্বিতীয়তঃ, প্রবীণ নবীন নির্বিশেষে সাহিত্যিকদের যে স্নেহপ্রীতিলাভ তাঁর দীর্ঘ বাইশ বছরের সম্পাদকজীবনে সম্ভব হয়েছে তার কাহিনীযমন আয়তনে দূরব্যাপী, আবেদনেও চিত্তাকর্ষক, প্রথম থেকেই তার নজীর গ্রন্থের আদ্যন্ত ছড়ানো। তৃতীয়তঃ, ব্যক্তিগতভাবে ছাড়াও আড্ডার মাধ্যমে অন্যান্য বন্ধুদের ব্যক্তিগত কাহিনী এসে জুড়ে তাঁর কাহিনীকে সুবিচিত্র ও বহুধাবিস্তৃত করেছে। নইলে রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের মনিকর্ণিকার ঘাটে ডুবে যাওয়া ও উদ্ধার পাওয়ার অসাধারণ কাহিনী, জলধর সেনের নাটোর রাজ সাক্ষাতের দুরন্ত নাটক, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় নামের দুই লেখক—সহাবস্থানের অশান্তিপূর্ণ কৌতুক-মীমাংসা এত সহজে আমাদের গোচর করা তাঁর পক্ষে সম্ভব হ'ত না। এমনি আরো কত গল্প, কত তামাসা, কত ঘটনা, আখ্যান, চরিত, রীতি নীতি, মতাদর্শ—সম্পাদকীয় দায়দায়িত্ব-জড়িত কত অম্লমধুর অভিজ্ঞতা—একাহারে ষোড়শ ব্যঞ্জনের স্বাদ তিনি দিলেন। যে জীবনের চিরন্তন সংজ্ঞা সেই সনাতন সংজ্ঞায় লেখা আছে, ভ্যারাইটি ইজ দি স্পাইস্ অব লাইফ, আমরা তাঁর সুনিপুণ দৌত্যে সেই বিচিত্রস্বাদী মহাজীবনের খণ্ড খণ্ড চলচ্ছবিকেই পেলাম এখানে। চতুর্থতঃ, তাঁর লেখা এই বৈঠকী কাহিনী যে 'চুটকি গাল-গল্প' তাতে 'অপরাধের' কিছু নেই—বৈঠকীগানে ধ্রুপদী গমক ব্যবহার না ক'রে তিনি মাত্রাজ্ঞানেরই পরিচয় দিয়েছেন। বরং লেখায় সরসতা ও সাবলীলতা ক্ষুণ্ণ করে যে কোথাও তিনি চুটকির নেশায় অঘটিত অসংযম ঘটান নি, এতে তাঁর বাহাদুরি, এমন কি শিল্পীজনোচিত সংগতিবোধ নির্দশিত।

সদ্যোগত কয়েক যুগের শ্রুত-বিস্মৃত বহু লেখকের লঘুগুরু পদধ্বনিতে এই গ্রন্থ উচ্চকিত, কম্পিত। রামানন্দবাবুর জীবন-পণ সম্পাদকীয় সংহতি-রক্ষা, জলধর সেনের ঈর্ষাযোগ্য ভোজনবিলাস, শরৎচন্দ্রের কুট পরিহাস-রস, বনফুলের তথ্যযুক্তিসিদ্ধ জ্যোতিষানুরাগ, বিভূতি বন্দ্যোপাধ্যায়ের চমকপ্রদ কাঁকড়া-রসায়ন, প্রেমেন্দ্র মিত্রের শুষ্কবাক্ সম্পাদক-সংহার —কত দৃষ্টান্ত বলব--পড়ে পড়ে দেখে দেখে উল্লাস সম্বরণ দায় হয়ে পড়ে। আর বার বার সাধুবাদ দিতে হয় লেখকের পরিমিতি বোধের, চূড়ান্ত প্রলোভনের মুহূর্তেও তিনি আশ্চর্য নিয়ন্ত্রিত। সম্পাদকের কাঁচি চালনায় যে তিনি সিদ্ধহস্ত তার প্রমাণ তিনি তাঁর নিজের লেখাতেই দিলেন। অধিকন্তু দিলেন একটি নতুন আড্ডারস, অব্যবসায়ীর দৃষ্টিতে যে আড্ডা-চিত্র এতকাল বুদ্ধদেববাবুর একটি সুলিখিত প্রবন্ধেই আটকে ছিল, সেই রুদ্ধশ্বাস রসিককে সেখান থেকে মুক্ত ক'রে যেন সাগরবাবু রোমাঞ্চিত প্রাণীর সমস্ত আবেগে ভ'রে দিয়েছেন তাঁকে, এই গ্রন্থে, অথচ কোন ভাবালুতা করেন নি। "আড্ডা কোনো উদ্দেশ্য সাধনের উপায় নয়, তা থেকে কোনো কাজ হবে না, নিজের কিংবা অন্যের কোনো উপকার হবে না। আড্ডা বিশুদ্ধ নিষ্কাম, আপনাতে আপনি সম্পূর্ণ।" সাগরবাবু তাঁদের শনিবারের নিয়মিত আড্ডায় এই মূল সুরটি কোথাও খণ্ডিত হ'তে দেন নি, অথবা খণ্ডিত করে দেখান নি। এমন কি আজ সেই নিষ্কাম আড্ডার কাহিনী বানিয়ে তিনি যে তাঁরই কথায়, 'লেখক ও গ্রন্থকার হতে" পেরেছেন আর সবিনয়ে নির্লিপ্তভাবেই যেন বলছেন, "সেইটুকুই আমার লাভ"—এও সম্ভব হয়েছে তাঁর আড্ডা-রসিক স্বভাব গুণে। তিনিও বুদ্ধদেববাবুর মত হয়ত বলতে পারেন, গুরুজন-জল্পিত সর্বনাশের বদলে "এখন দেখছি আড্ডায় আমার সর্বলাভ হ'ল।"

"'আর আড্ডা স্থিতিশীল নয়, নদীর স্রোতের মতো বহমান'" বলেই এই সুমুদ্রিত 'সম্পাদকের বৈঠকে' গ্রন্থে বহু বিচিত্র মানুষ তার কাহিনী চরিত্রচিত্র ও অভিজ্ঞতার এত অজস্র সুবর্ণফসল অক্লেশে ফলিয়ে গিয়েছে; সাগরবাবু, এই গ্রন্থে, বস্তুত এই নদী-স্রোতেরই উৎস ও উৎসাহ।

নিখিলকুমার নন্দী

সম্পাদক—শ্রীকেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়
মুদ্রাকর ও প্রকাশক—শ্রীনিবারণচন্দ্র দাস, প্রবাসী প্রেস প্রাইভেট লিঃ, ১২০।২ আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলিকাতা-৯

:: রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠিত ::

"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্"

"নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"

৬২শ ভাগ
২য় খণ্ড

ফাল্গুন, ১৩৬৯

৫ম সংখ্যা

বিবিধ প্রসঙ্গ

ভারত প্রতিরক্ষায় সাধারণজনের কর্তব্য

সম্প্রতি মধ্য কলিকাতার সুবোধ মল্লিক স্কোয়ারে ভারত প্রতিরক্ষা কমিটির (পশ্চিমবঙ্গ) আয়োজনে আট দিনব্যাপী সম্মেলন হইয়া গিয়াছে। এই সম্মেলনের উদ্দেশ্য ছিল বর্ত্তমান সঙ্কটকালে দেশবাসী নানা স্তরের জনসাধারণের কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করা। আয়োজকগণ ভিন্ন শ্রেণীর সাধারণকে ভিন্ন দিনে আহ্বান করিয়া তাঁহাদের কার্যক্রম নির্দ্ধারণে চেষ্টিত হইয়াছিলেন। উদ্দেশ্য ছিল একদিকে প্রতিরক্ষার বিভিন্ন বিষয়ে বিভিন্ন প্রকারের লোকের নিকট হইতে কি ভাবে বিশেষ সাহায্য প্রয়োজন তাহা তাঁহাদের জানাইয়া তাঁহাদিগের সংযোগিতা পূর্ণরূপে অর্জ্জন করা।

এই ভাবে প্রথম দিনে অর্থাৎ ১লা ফেব্রুয়ারীতে ছাত্র-সম্মেলন আহ্বান করা হয়। ঐ দিন পৌরোহিত্য করেন, রবীন্দ্র-ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য্য শ্রীহিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায় এবং উদ্বোধন করেন মুখ্যমন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্ল সেন। পরের দিন, ২রা ফেব্রুয়ারী সমাজসেবীদের সম্মেলনে উদ্বোধন করেন প্রদেশ কংগ্রেসের সভাপতি অতুল্য ঘোষ এবং সভাপতি ছিলেন ডাঃ ত্রিবেদী। তৃতীয় দিনের সম্মেলনে শিক্ষকগণকে আহ্বান করা হয় যাহাতে সভাপতি ছিলেন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য্য শ্রীবিধুভূষণ মল্লিক এবং উদ্বোধন করেন মুখ্যমন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্ল সেন। চতুর্থ দিনে, ক্রীড়াবিদ্ এবং ক্রীড়ামোদী সাধারণের সম্মেলন হয়, যাহাতে সভাপতিত্ব করেন শ্রীভূপতি মজুমদার এবং ভাষণ দিয়াছিলেন উড়িষ্যার স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীনীলমণি রাউতরায়। পঞ্চম দিনে অনুষ্ঠিত শিল্পী সম্মেলনে শ্রীঅহীন্দ্র চৌধুরী সভাপতিত্ব করেন এবং উদ্বোধন করেন ভারত প্রতিরক্ষা সাহায্য সমিতির চেয়ারম্যান শ্রীঅতুল্য ঘোষ। ঐ দিন কেন্দ্রীয়মন্ত্রী শ্রীজগজীবনরামও ভাষণ দিয়াছিলেন। ষষ্ঠ দিনের অধিবেশনে মহিলা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সভাপতির আসন গ্রহণ করেন শ্রীমতী রমা চৌধুরী এবং ভাষণ দেন রাজস্থানের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীমোহনলাল সুখাড়িয়া। সপ্তম দিবসে ব্যবসায়ী সম্মেলনে উদ্বোধন করেন মুখ্যমন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্ল সেন, সভাপতি ছিলেন শ্রীবদ্রীদাস গোয়েঙ্কা এবং ভাষণ দিয়াছিলেন প্রতিরক্ষামন্ত্রী শ্রীচ্যবন। শেষদিনে, ৮ই ফেব্রুয়ারীতে অনুষ্ঠিত হয় সাহিত্যিক-দিগের সম্মেলন, যাহাতে সভাপতিত্ব করেন শ্রীতারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় ও উদ্বোধন করেন শ্রীঅতুল্য ঘোষ। এই দিন সমাপ্তি হয় এই আট দিনব্যাপী আয়োজনের।

এই আট দিনের আয়োজন অনেক দিক্ দিয়া নূতন ভাবে প্রতিরক্ষা সাহায্য বিষয়ে জনসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে চেষ্টিত হইয়াছিল। সে চেষ্টা কতদূর সফল হইয়াছে আমরা জানি না, কেননা এখনও সে কথা বুঝিবার সময় আসে নাই। তবে সম্মেলনের ভাষণ, প্রস্তাব ও কর্ম্মসূচী ইত্যাদি সম্বন্ধে প্রচার আদৌ সন্তোষজনক হয় নাই। আশা করা যায় প্রত্যেকটি অনুষ্ঠানের ভাষণ, বিবরণ ইত্যাদি যথাযথ ভাবে অনুলিখিত হইয়াছে এবং পরে তাহার বিশদ ও বিস্তারিত বিবরণ প্রচারিত হইবে। যদি তাহা না হয় তবে কলিকাতায়

অনুষ্ঠিত অন্য শত শত সম্মেলনের মত ইহাও জনসাধারণের মনে ক্ষণিকের উচ্ছ্বাস সৃষ্টি করিয়া লুপ্ত হইবে। সংবাদপত্রে এই সকল অধিবেশনের যেরূপ রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছে তাহা মোটেই সন্তোষজনক বা কার্য্যকরী নহে, কেননা এই আয়োজনের যাহা উদ্দেশ্য তাহার অনুরূপ তথ্য সমাবেশের কোন চেষ্টাই ঐ সকল রিপোর্টে আমরা দেখিতে পাই নাই।

অবশ্য উদ্দেশ্য কি, অর্থাৎ উদ্যোক্তাদিগের এই সকল সম্মেলন আহ্বানের পিছনে কি ইচ্ছার প্রভাব ছিল, তাহা আমরা জানি না। যদি সংবাদপত্রে এই আট দিনব্যাপী আয়োজনের যে উদ্দেশ্য জ্ঞাপন করা হইয়া ছিল তাহাই মূল উদ্দেশ্য হয় তবে আমরা বলিতে বাধ্য যে প্রচারের অভাবে সে উদ্দেশ্যসিদ্ধি ব্যাহত হইবে। যদি এই আয়োজন শুধুমাত্র জনজাগৃতির উদ্দেশ্যে করা হইয়া থাকে তবে আমাদের কিছু বলিবার নাই। অবশ্য যুদ্ধের আশঙ্কা যদি থাকে এবং সে বিষয়ে আমাদের শাসনতন্ত্রের উচ্চ অধিকারীমাত্রই একমত হইয়া বলেন যে, আশঙ্কা বিশেষভাবে বর্ত্তমান—তবে এখানে এইভাবে জনজাগরণের জন্য "ঢোলশহরৎ" জাতীয় আয়োজন কি প্রয়োজন? আমাদের ধারণা সে প্রয়োজন হয়ত দূর মফঃস্বলে থাকিতে পারে, কলিকাতায় নহে।

আমরা অকারণে বিরূপ মন্তব্য করিতেছি না। দেশের জনসাধারণের অতি সামান্য অংশই এই জাতীয় আয়োজনে উপস্থিত হইতে পারে। বাকি বিরাট অংশের নিকট এখানে —অর্থাৎ কলিকাতার ঐ অঞ্চলে—অনুষ্ঠিত সভায় যাহা কিছু কথিত বা প্রস্তাবিত হইয়াছে এবং ঐখানে বক্তৃতা ও আলোচনার মাধ্যমে যে কার্য্যক্রম ও কার্য্যসূচী স্থিরীকৃত ও অনুমোদিত হইয়াছে, তাহা পৌঁছাইয়া দিবার সহজ ও সাধারণ উপায় সংবাদপত্রে প্রচার। দৈনিক সংবাদপত্রে উহার প্রচার নির্ভর করে যেদিনের সম্মেলন তাহার পরের দিনের কাগজে বিজ্ঞাপন ও দেশ-দেশান্তরের বিশেষ সংবাদকে স্থান দিবার পর কতটুকু জায়গা বাকি থাকে তাহার উপর এবং সেই সঙ্গে আর এক কথাও থাকে সেটি হইল সংবাদদাতার সময়ের অবকাশ ও "মর্জ্জি"। যদি প্রতিদিনের কথাবার্ত্তার চুম্বক উদ্যোক্তাগণ নিজেরা প্রস্তুত করিয়া সংবাদ-সম্পাদকের কক্ষে পৌঁছাইবার আয়োজন করিতেন তবে প্রচারের কাজ অনেক অগ্রসর হইত। অন্যদিকে সরকারী সাপ্তাহিক কয়টিতে যদি সবিস্তার ও বিশদভাবে এই সকল সংবাদ ও তথ্যাদি প্রচার করা হয় তবে যে যে কেন্দ্রে সেগুলি যায় এবং যে যে সংবাদ-পত্রে তাহা পাঠানো হয় সে সকল স্থলে এই আয়োজনের প্রতিচ্ছায়া রক্ষিত এবং প্রচারিত হইবার আশা থাকে।

প্রচার যাহা করা হইয়াছে তাহার দৃষ্টান্ত কিছু দিলে এই প্রসঙ্গ আরও পরিষ্কার হইবে।

প্রথম দিনের অধিবেশন সম্পর্কে যাহা সংবাদপত্রে পাওয়া যায় তাহার চুম্বক আনন্দবাজার পত্রিকা এইরূপ দিয়াছেন :

কম্যুনিষ্ট চীন আক্রমণজনিত বর্ত্তমান সঙ্কট সময়ে দেশ-বাসী তথা সমাজের নানা স্তরের লোকদের কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণকল্পে শুক্রবার সুবোধ মল্লিক স্কোয়ারে ভারত প্রতিরক্ষা সাহায্য কমিটি (পশ্চিমবঙ্গ) আয়োজিত আট দিনব্যাপী সম্মেলন শুরু হয়। এইদিন ছাত্র সম্মেলনের উদ্বোধন করেন মুখ্যমন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন। রবীন্দ্র-ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য্য শ্রীহিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায় পৌরোহিত্য করেন।

শ্রী সেন ছাত্রদের দুইটি প্রধান কর্ত্তব্যের কথা স্মরণ করাইয়া দেন : ১। পরীক্ষায় সাফল্য অর্জ্জন, ২। শহরে ও পল্লীতে নিরক্ষরতা দূরীকরণ। কমিটির চেয়ারম্যান প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি শ্রীঅতুল্য ঘোষ "যুদ্ধজনিত মনোভাব" সৃষ্টির প্রয়োজনীয়তার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। সভাপতি শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, শিক্ষা, শিল্প ও কৃষির উন্নয়নের সঙ্গে সঙ্গে সামরিক শক্তি সঞ্চয় এবং প্রতিরক্ষার জন্য দেশবাসীকে সব সময় প্রস্তুত থাকিতে হইবে।

যুগান্তর মুখ্যমন্ত্রীর ভাষণের সারাংশের মধ্যে তাহাদের কর্ত্তব্য সম্পর্কে উপদেশ এই ভাবে দিয়াছেন :

মুখ্যমন্ত্রী ছাত্র-ছাত্রীদের ভালভাবে পড়াশুনা করিয়া পরীক্ষায় কৃতকার্য্য হওয়ার সঙ্কল্প লইতে পরামর্শ দিয়া বলেন যে, ছুটির সময়ে ছাত্র-ছাত্রীদের নিজ নিজ এলাকায় এবং গ্রামে গিয়া নিরক্ষরদের শিক্ষাদানের কার্য্যে আত্ম-নিয়োগ করা উচিত। গ্রামের ছোট ছোট রাস্তা নির্ম্মাণ ও অন্যান্য উন্নয়ন-কার্য্য সম্পাদনেও তাহাদের নিযুক্ত থাকা উচিত। আর প্রয়োজন সামরিক শিক্ষা গ্রহণ ও নিয়মানুবর্ত্তিতা পালন। তিনি বলেন যে, এই রাজ্যে বর্ত্তমানে ৩৪ হাজার ছাত্র-ছাত্রী জাতীয় সমর-শিক্ষার্থী বাহিনীতে রহিয়াছে। এই শিক্ষার্থীর সংখ্যা শীঘ্রই এক লক্ষ করা হইবে।

অন্যান্য বক্তাও প্রায় একই ধারায় উপদেশ দিয়াছেন ও দেশের ছাত্রদের আহ্বান করিয়াছেন এই আপৎকালে দেশরক্ষা

ও দেশসেবার কাজে আগাইয়া আসিতে। অন্য সংবাদপত্রে —উপরোক্ত দুইটি ছাড়া সংবাদ একই প্রকার দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু কোথায়ও কোন নির্দ্দেশ নাই যে যাহারা এই আহ্বানে অগ্রসর হইয়া সক্রিয়ভাবে প্রতিরক্ষা সাহায্য কাজে অগ্রসর হইতে চায় তাহারা অতঃপর কিভাবে এবং কোন্ কর্ম্মসূচী অনুসারে অগ্রসর হইবে। কলিকাতার কোনও ছাত্র বা ছাত্রী যদি আগামী গ্রীষ্ম অবকাশে মফস্বলে কৃষি-সাহায্য বা নিরক্ষরতা দমন কাজে নিজের শক্তিসামর্থ নিয়োগ করিতে চাহে তবে সে কোন্ সংস্থার কাজে কিভাবে আবেদন করিবে এবং এই কাজে তাহার নিজের থাকা-খাওয়া ইত্যাদির ব্যবস্থা কে করিবে সে বিষয়ে সবিশেষ বিবরণ কিছুই প্রকাশিত হয় নাই। এবং মফস্বলের ছাত্রের ক্ষেত্রে এই সকল সংবাদ ও তথ্যের পরিবেশন কিভাবে হইবে তাহারও কোনও নির্দ্দেশ নাই। তবে এই অধিবেশনের স্থায়ী সাফল্য অর্থাৎ উপদেশ-গুলির সক্রিয় অনুশীলনের পথ কোথায়?

দ্বিতীয় দিনের সমাজকর্ম্মী সম্মেলনের যে সংবাদ প্রচারিত হইয়াছে তাহা আশাপ্রদ, কেননা তাহাতে শুধু ছাপার অক্ষরে উপদেশ প্রচার ছাড়া প্রাথমিক শুশ্রূষা-বিষয়ে অগ্রসর হইবার বিশদ নির্দ্দেশ রহিয়াছে—অবশ্য ইণ্ডিয়ান মেডিকেল এসোসিয়েশনের সহযোগে এবং প্রতিরক্ষা সাহায্য কমিটির সমাজসেবা উপসমিতির চেষ্টার ফলে তাহা সম্ভব হইয়াছে।

তৃতীয় দিনের শিক্ষক-সমাবেশে যে সংবাদ প্রচারিত হইয়াছে তাহাতে উপদেশ, অনুরোধ ও সামান্য কিছু অনুযোগ ছিল। সুনির্দ্দিষ্ট কার্যপন্থা কিছুই বিশেষ দেখানো হয় নাই, শুধুমাত্র কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য শিক্ষকদিগকে অধিক সংখ্যায় এন. সি. সির ট্রেনিং গ্রহণ করিতে অনুরোধ জানাইয়াছিলেন। প্রস্তাব একটি গৃহীত হয় তাহাতে এক ব্যাপক কার্য্যক্রমের নির্দ্দেশ ছিল। কিন্তু আমাদের শিক্ষকগণ সম্পর্কে যে অভিজ্ঞতা এতদিনে সঞ্চিত হইয়াছে, তাহাতে ঐ প্রস্তাবের নির্দ্দেশগুলি সক্রিয়ভাবে চালিত ও পালিত করাইতে হইলে যে ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন তাহার ধারাগুলিও ঐ সঙ্গে অনুমোদিত এবং যথাস্থানে প্রেরিত না হওয়ায় ঐ প্রস্তাবকে আমরা কোনও গুরুত্ব দিতে অক্ষম। যাঁহারা ঐ প্রস্তাবের লক্ষ্য তাঁহাদের অধিকাংশই উহা চালু করিতে অক্ষম এবং কিছু অংশ উহার বিপরীত কার্য্যে অভ্যস্ত। প্রস্তাবটি "যুগান্তর" দিয়াছেন এইরূপে:

পশ্চিম বাংলার কলেজ ও স্কুলগুলির জাতীয়তাবাদী শিক্ষক-দের এই সমাবেশে ভারতের উপর চীনের আক্রমণের নিন্দা করিয়া এইরূপ প্রস্তাব গ্রহণ করেন যে, শিক্ষক ও ছাত্রদের জাতীয় চেতনায় উদ্বুদ্ধ করিয়া তুলিতে হইবে। শত্রুপক্ষ চীনের "ছদ্মবেশী দালালদের" উৎখাত করিবার জন্য ছাত্রদের ও সামগ্রিকভাবে সমাজকে গড়িয়া তুলিতে হইবে, যাহাতে তাঁহারা নিজেদের ঘর রক্ষা করিতে পারেন। জাতীয় সঙ্কটের সঙ্গে বুঝাপড়া করার জন্য শিক্ষার ক্ষেত্রে এক মানবিক পরিবেশ সৃষ্টি করিতে ও উহা অব্যাহত রাখিতে হইবে। মুখ্যমন্ত্রীর প্রতিরক্ষা তহবিলে নিয়মমাফিক অর্থদান ও ব্লাড-ব্যাঙ্কে রক্তদান করিয়া জাতীয় সরকারের প্রতিরক্ষা প্রস্তুতিকে শক্তিশালী করিয়া তুলিতে হইবে।

এতদ্ব্যতীত ঐ প্রস্তাবে আরও বলা হইয়াছে যে, পশ্চিম বাংলার বিভিন্ন স্কুলে সুসংবদ্ধভাবে ক্লাশ আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে মাতৃভূমির প্রতি আনুগত্যের শপথ লইতে হইবে এবং এই শপথ গ্রহণ সমাবেশে মাতৃভূমির গৌরব বৃদ্ধিকারী রবীন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রলাল, অতুলপ্রসাদ প্রমুখের রচিত গান গাহিতে হইবে। মাতৃভূমি, জাতীয় পতাকা ও জাতীয় নেতাদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাইবার এক সংক্ষিপ্ত প্রণালী ছাত্রদের শিখাইতে হইবে। ছাত্রদের শরীর-চর্চ্চা আবশ্যিক করিতে হইবে।

ইহা ছাড়া স্কুল ও কলেজের ছাত্রদের সম্মিলিতভাবে এন. সি. সি., এ. সি. সি., বয়স্কাউটস, গার্লস গাইডস, জুনিয়ার রেডক্রস সোসাইটিজ, সেণ্ট জন এ্যাম্বুলেন্স কোর প্রভৃতিতে নাম লিখাইতে হইবে। দেশ ও জাতীয় নেতাদের বিরুদ্ধে সর্ব্বপ্রকার প্রচার ও কুৎসা রটনা বন্ধ করিতে হইবে। যে সকল পাঠ্যপুস্তকে দেশ বা জাতির প্রতি অমর্য্যাদাকর কিছু থাকিবে সেগুলি সতর্কভাবে পরীক্ষা করিয়া দেখিতে হইবে।

চতুর্থ দিনে ক্রীড়াবিদ্ ও ক্রীড়ামোদীদিগের সম্মেলনকে ঠিক বর্ত্তমান অবস্থা অনুযায়ী অধিবেশন বলা যায়। সম্মেলনে যে আট দফা কর্ম্মসূচী গৃহীত হয় এবং কিভাবে ও কাহাদের সহযোগিতা পাইলে ঐ কর্ম্মসূচী সক্রিয়ভাবে চালিত হইবে তাহার নির্দ্দেশ দেওয়া হয়। বিশেষজ্ঞ ক্রীড়াবিদ্‌গণ—যাঁহাদের অনেকে ইতোমধ্যেই ঐ কাজে লাগিয়া গিয়াছেন—কর্ত্তব্য ও কর্ম্মপন্থা বিশ্লেষণ করিয়া সবিশেষে নির্দ্দেশ দিয়াছিলেন। কর্ম্ম-সূচী ও সেই সঙ্গের প্রস্তাব আনন্দবাজার পত্রিকা দিয়াছেন এইরূপে:

কর্ম্মসূচী এই : (১) দৈহিক দক্ষতার মান উন্নয়ন—এজন্য বিভিন্ন ধরনের শারীর কৌশল শিক্ষণের ব্যবস্থা করিতে হইবে ; (২) নির্দ্দিষ্ট সময় অন্তর দিবা শিবিরের মাধ্যমে যৌথ জীবনের দায়িত্ব সম্পর্কে চেতনা সঞ্চার ; (৩) হাইকিং ধরনের ঝুঁকিপূর্ণ ভ্রমণের মধ্য দিয়া দেশের বিভিন্ন স্থানের যোগাযোগ ব্যবস্থা এবং ভৌগোলিক পরিচয় গ্রহণের ব্যবস্থা ; (৪) নৌ-চালনা ও সাঁতার শিক্ষা ; (৫) প্রয়োজন অনুযায়ী পর্ব্বতারোহণ শিক্ষা ; (৬) প্রতিযোগিতামূলক খেলার মাধ্যমে আন্তঃ-আঞ্চলিক সৌহার্দ্য বৃদ্ধি ; (৭) সকল স্তরে জাতীয়তাবোধকে প্রাথমিক নীতিরূপে গ্রহণ ; (৮) বাধ্যতামূলক সামরিক শিক্ষার সঙ্গে এই কার্য্যবিধিকে শিক্ষাজীবনে আবশ্যিক স্থান দান।

প্রস্তাবে বলা হয়, বিভিন্ন খেলাধূলা সংগঠন, স্কুল-কলেজ, জেলা স্কুল বোর্ড এবং অন্যান্য সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানকে এই কার্য্যসূচী রূপায়ণের জন্য অগ্রণী হইতে হইবে। বৎসরের বিশেষ কয়েকটি দিনে—বাংলার নববর্ষ, ১৫ই আগষ্ট, স্বাধীনতা দিবসে এবং ২৬শে জানুয়ারী প্রজাতন্ত্র দিবসে অভি-প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করিতে হইবে। অন্ততঃ ২৫ লক্ষ ছাত্র-ছাত্রী ও যুবককে এই কার্য্যক্রমের আওতায় আনা যাইবে বলিয়া আশা প্রকাশ করা হয়।

সোমবার ক্রীড়াবিদ্ সম্মেলনে ক্রীড়াজগতের খ্যাতনামা প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন। উক্ত কমিটির চেয়ারম্যান প্রদেশ কংগ্রেসের সভাপতি শ্রীঅতুল্য ঘোষ সমাজ জীবনে ক্রীড়ানুষ্ঠানের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা বিশ্লেষণ করেন এবং বলেন, শারীরচর্চ্চা প্রভৃতির মাধ্যমে তাঁহাদের শক্তিশালী হইতে হইবে। তাঁহাদের এমন শক্তি অর্জ্জন করিতে হইবে, যাহাতে কোন বিদেশী শত্রুর ভারত আক্রমণের ধৃষ্টতা না হয়।

পঞ্চম দিনে, শিল্পী সম্মেলনে যে বক্তৃতা হয় তাহাতে স্থায়ী কিছুর নির্দ্দেশ আমরা পাই নাই—অন্ততঃপক্ষে সংবাদপত্রে সেরূপ কোনও নিদর্শন নাই। বাংলার শিল্পীদের, এই সময়ে জনসাধারণের মধ্যে দেশরক্ষার কাজে উৎসাহ সৃষ্টির জন্য যে প্রশংসাবাদ হয় তাহা ঠিকই হইয়াছিল। কিন্তু পথ যে সামনে অনেক দূর পর্য্যন্ত গিয়াছে এবং সে পথের পাথেয় কি তাহা বুঝা গেল না কিছুমাত্র সংবাদপত্রের খবরে।

ষষ্ঠ দিনে, মহিলা সম্মেলনে সেই উপদেশ ও অনুরোধের পর্ব্বই গিয়াছে। সংবাদপত্রে ইহার অধিক আর কিছুই আমরা পাই নাই।

সপ্তম দিনে, ব্যবসায়ী সম্মেলনে, ব্যবসায়ীগণের প্রতি সুস্পষ্ট কার্য্যক্রমের নির্দ্দেশ বা তাঁহাদের কর্ত্তব্য কি সে বিষয়ে বিশদ আলোচনা কোন কিছুই হয় নাই। শুধুমাত্র জিনিষ-পত্রের মূল্যবৃদ্ধি যাহাতে না হয় সে বিষয়ে মুখ্যমন্ত্রী ব্যবসায়ী সমাজকে "অগ্রণী" হইতে বলেন। শ্রমিক ও মালিক প্রসঙ্গ এখানে কিভাবে আলোচিত হইল আমরা বুঝিলাম না, কেননা শুধু একপক্ষই উপস্থিত ছিলেন। ব্যবসায়ীদের এ সময়ে কর্ত্তব্য কি সে বিষয়ে বিশদ আলোচনার প্রয়োজন ছিল, কেননা এতাবৎ তাঁহারা দেশরক্ষা অপেক্ষা স্বার্থরক্ষাতেই বেশী উৎসাহ দেখাইয়াছেন। প্রতিরক্ষামন্ত্রীর আশে-পাশে যাঁহাদের চিত্র দেখা গিয়াছিল সে দিনের সংবাদপত্রে, তাহাতে বরং আমাদের মনে আশঙ্কা জাগিয়াছে তাঁহার সম্বন্ধে। এ দিনের সম্মেলন সম্পূর্ণ ভুয়া মনে হয়—সংবাদপত্রের মাধ্যমে, বিচারে।

শেষ দিনে, সাহিত্যিক সমাবেশে, সাহিত্যিক সম্মেলনে যাহা ঘটিয়া থাকে তাহাই ঘটিয়াছিল—তাহার অধিক কিছু নয়, কমও কিছু নয়। কোনও কার্য্যক্রমের নির্দ্দেশ এক্ষেত্রে সম্ভব ছিল না এবং দেওয়াও হয় নাই। মূল বক্তা তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় ঠিকই বলিয়াছিলেন যে, সাহিত্যিকদিগের কর্ত্তব্যের নির্দ্দেশ আসিবে তাহাদের হৃদয়ের অন্তস্থল হইতে। এবং তিনি বলেন ইহা আশ্বাসের কথা ও আনন্দের কথা যে বাংলা দেশের সাহিত্যিকরা এ বিষয়ে পিছাইয়া নাই। আনন্দ-বাজার পত্রিকা তাঁহার ভাষণের সারাংশ দিয়াছেন এইভাবে :

সভার মূল বক্তা ছিলেন তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁহার দীর্ঘ ভাষণে শ্রী বন্দ্যোপাধ্যায় একদিকে সাহিত্যিকদের প্রলুব্ধ করার ব্যাপারে কম্যুনিষ্ট রাষ্ট্রগুলির চক্রান্তের বিস্তৃত ইতিহাস উল্লেখ করেন, অন্যদিকে সব বিভেদ ভুলিয়া সাহিত্যিকদের দেশমাতৃকার সেবায় উদ্বুদ্ধ হইবার আবেদন জানান।

শ্রী বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, 'বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সময় যে মন্ত্রপাঠ করিয়া আমরা হাতে রাখী বাঁধিয়াছিলাম—সেই সঙ্কল্প আজ গ্রহণ করিলে আমাদের আর অন্য কোন প্রয়োজনই হইত না। আমরা পুরাতন ভাণ্ডার হাতড়ালেই বল পাইতাম।'

শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায় দুঃখ প্রকাশ করিয়া বলেন, "দেশ-দেশান্তর হইতে সাহিত্যিকদের কাছে যে আমন্ত্রণ আসে তাহা 'অভিসন্ধি-মূলক'।" প্রসঙ্গতঃ তিনি বলেন, 'যে চীন আমাদের আক্রমণ করিয়াছে তাহার গুণগান করিয়া আমাদের দেশের অনেক লেখক বই লিখিয়াছেন। ভারতের এই বিপদ সুদীর্ঘকালের

ষড়যন্ত্র। অনেকদিন ধরিয়া বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে তাহার জাল বোনা চলিতেছে, এবং ঐ সব প্রতিষ্ঠানকে পুষ্ট করিয়া তাহার সুতা আমরাই বুনিয়া দিয়াছি।'

চীনা আক্রমণের ফলে কম্যুনিজমের প্রতি আকৃষ্ট অনেক ভারতীয় বুদ্ধিবাদীদের 'ভুল ভাঙ্গিয়াছে' জানিয়া শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায় আনন্দ প্রকাশ করেন। তিনি তাহাদের উদ্দেশে বলেন, 'ভ্রান্তিকে প্রণাম করে বলুন—'তুমি ভ্রান্তিরূপে এসেছিলে। আজ সংশয় অতিক্রান্ত। যে অনুজেরা আজ সত্যে ফিরে আসবেন তাঁরা সত্যিকারের মানুষ।'

কম্যুনিজমের 'চাকচিক্যময় মোহ' সম্পর্কে শ্রী বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, 'অনেকে এতদিন মরীচিকার পিছনে ছুটিয়াছেন। তাঁহারা আজ ফিরিয়া আসিয়া দেশকে একবার মা বলিয়া ডাকুন।'

যাহাই হউক এই আট দিনের আয়োজন যদি বাংলা দেশের সন্তানদিগকে, বয়স, কর্মক্ষেত্র ও সমাজস্তর নির্বিশেষে, একই মুখে ও একই কাজে আত্মনিবেদন করার বিষয়ে আংশিকভাবে সাফল্য লাভ করিয়া থাকে ত তাহাও অনেক লাভ। আমরা এই প্রসঙ্গ এত বিস্তারে আলোচনা করিলাম শুধু এত বড় আয়োজনে কর্মসূচী নির্দেশ ও প্রচার, এই দুইয়ের সামঞ্জস্যের প্রয়োজনীয়তা বুঝাইবার জন্য।

মূল্যবৃদ্ধি নিবারণ

ভারত সরকার সাধারণের প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি মূল্যবৃদ্ধি নিবারণের জন্য নানাপ্রকার ব্যবস্থা করিতেছেন। এই সকল ব্যবস্থার ফলে মূল্যবৃদ্ধি বন্ধ হইতেছে বলিয়া মনে হয় না। কারণ কৃত্রিম উপায়ে মূল্যবৃদ্ধি নিবারণ ততটা সহজ নহে যতটা সহজ, সস্তায় দ্রব্য ক্রয় করিয়া লইয়া পরে তাহা উচ্চ মূল্যে বিক্রয় করা। ভারত সরকারের বিশ্বাস যে, ভারতবর্ষ অর্থনীতির দিক দিয়া আধুনিক রীতিতে সুগঠিত। বস্তুতঃ ভারতবর্ষের অর্থনীতির বাজারে ব্যাঙ্ক এমন কি ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রে অর্থের ব্যবহারও পূর্ণভাবে প্রচলিত নহে। দ্রব্য অদল-বদল ও নানাপ্রকার প্রাচীন পদ্ধতিতে ঋণদান ও শোধের ব্যবস্থা এখনও ভারতে বহুলভাবে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। সুতরাং ব্যাঙ্কগুলিকে ইহাকে কর্জ্জ দিবে না অথবা উহার কর্জ্জ আদায় করিয়া লও বলিয়া দিলেই ক্রয়-বিক্রয়ের ধারা তৎক্ষণাৎ উল্টা পথে চলিতে আরম্ভ করিবে, এই বিশ্বাস ভ্রমাত্মক। ব্যাঙ্ক ধার না দিলে অপর মহাজন যথেষ্ট আছে, যাহারা ধার উচ্চ সুদে দিবে এবং তাহাতে দ্রব্যমূল্য আরও বাড়িয়া যাইবে। ভারতের ফ্যাক্টরীজাত মাল ব্যাঙ্কের সাহায্যে বাজারে আসিতে পারে; কিন্তু চা, কফি, লা, পাট প্রভৃতি বস্তু ব্যতীত অপরাপর ভূমিজ দ্রব্যনিচয় বিক্রয় ক্ষেত্রে ততটা ব্যাঙ্কের সহিত জড়িত নহে। এই কারণে আড়তদারগণ ব্যাঙ্কের সাহায্য ব্যতীতও নিজকার্য্য চালাইতে পারে। আড়তদারদিগের সংখ্যা ভারতবর্ষে কয়েক লক্ষ হইবে। তাহারা হিসাবপত্র যে প্রকার নিয়মে করিয়া থাকে তাহাতে কেহ তাহাদিগের ক্রয়-বিক্রয়ের সত্য আয়তন কখনও জানিতে পারিবে বলিয়া মনে হয় না। অন্ততঃ সরকারী কর্ম্মচারিগণ নিশ্চয়ই পারিবে না। কারণ, পারিলে লোকসান ও না পারিলেই তাহাদিগের লাভ। এই অবস্থায় সরকারী নিয়মকানুন জনসাধারণের স্বাধীনভাবে কাজ-কারবার চালাইবার পথে বিঘ্নের সৃষ্টি করিবে মাত্র; তাহাতে সাধারণের কোনই লাভ হইবে বলিয়া মনে হয় না। ভারত সরকারের ও ভারতের অপর সকল প্রতিষ্ঠানের নিয়ম-কানুন রাংতা-আবৃত কাষ্ঠ তরবারির সহিত তুলনীয়। চোখ ঝলসাইয়া দেয় ও অভিনয়ের মঞ্চে বিশেষ উপযোগ্য; কিন্তু যুদ্ধে অথবা সম্পদ রক্ষার জন্য কার্য্যকরী নহে। কারণ, ধারেও কাটে না, ভজনেও কাটে না। ইংরেজী ভাষায় "আই ওয়াশ" বলিয়া একটা কথা আছে, তাহার অর্থ লোক দেখান কার্য্যের অভিনয়। আমরা জাতীয় ভাবে মানি যে, "সত্যমেব জয়তে"। অতঃপর বলা প্রয়োজন "অসতো মা সদ্গময়ো"।

অ.

দারিদ্র্য নিবারণ

ভারত সরকারের দ্বারা নিযুক্ত অথবা অপর কোন প্রতিষ্ঠানের গবেষণাকারীদিগের অনুসন্ধানের ফলে জানা গিয়াছে যে ভারতে ৪১৫ কোটি লোক আছেন যাহাদিগের মাসিক আয় মাত্র দশ টাকা অথবা তাহা হইতেও কম। ভারতের জনসংখ্যার শতকরা ষাট জনের রোজগার মাসিক কুড়ি টাকা অথবা তাহা হইতেও কম। অর্থাৎ, ভারতে প্রায় ২৭ কোটি লোকের বাস যাহারা মাসিক অনধিক কুড়ি টাকা পাইয়া থাকে জীবন নির্ব্বাহের জন্য। একথাও অনুসন্ধানে জানা গিয়াছে যে, ভারত সরকারের আপ্রাণ চেষ্টা সত্ত্বেও ভারতের অধিকসংখ্যক লোকেরই আজ হইতে ৩৭ বৎসর পরেও দুইবেলা পূর্ণ আহার জুটিবে না। অতএব ভারত সরকার মনস্থ করিতেছেন অথবা শীঘ্রই সম্ভবতঃ করিবেন যে

এই ঐশ্বর্য্য-বিভেদ দূর করিয়া দিলে দারিদ্র্য নিবারণ হইবে। ভারতের সকল ব্যক্তির আয় একত্র করিয়া জনসংখ্যা দিয়া ভাগ করিলে গড়পড়তা মাথাপিছু আয় দাঁড়ায় মাসিক ৩০ টাকা হইতে কম। সম্ভবতঃ ২৫ টাকাও নহে। এই অবস্থায় সকলে মিলিত ভাবে সকল আয় সমানে ভোগ করিলে মাথা-পিছু ভোগের অংশের মূল্য হইবে মাসিক ১০।১৫ টাকা মাত্র। কারণ, সরকারী খরচগুলি চালাইতে হইবে এবং তাহাতে জাতির মাথা হেঁট করিয়া কার্পণ্য করিলে চলিবে না। রুশ ও চীনের অনুকরণে সরকারী খরচ চালাইলে জাতীয় আয়ের শতকরা ৫০ টাকার অধিকই সমষ্টিগত ভাবে খরচ হইবে নিশ্চয়ই। এই কথা মনে রাখিয়াই বলিতেছি যে, ব্যক্তিগত ভোগের পরিমাণ মাসিক ১০।১৫ টাকার অধিক হইবে না। অর্থাৎ, যে দিক দিয়াই দেখা যাউক না কেন ভারতবাসীর অনটন নিবারণ বর্ত্তমান রাষ্ট্রের দ্বারা সম্ভব হইবে না। কারণ, যাঁহারা এই রাষ্ট্রের নিয়ন্তা তাহারা নিজ কল্পনাশক্তির শেষসীমা অবধি চলিয়া গিয়াও ভারত সন্তানদিগকে ২০০০ খ্রীষ্টাব্দে পূর্ণ-উদর অবস্থায় দেখিতে পাইতেছেন না। অতএব যাহা-দিগের আগ্রহ দুইবেলা পূরা-পেট খাইবার, তাহারা স্বভাবতঃই অপর উপায় অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইবে। দেশবাসী সকলে বিদেহ হইলে রাষ্ট্র চলিতে পারে না। অবশ্য দেশবাসী স্বাধীন প্রচেষ্টা দ্বারা আর্থিক উন্নতিসাধন করেন, ইহাও রাষ্ট্রনৈতিক ভাবে বাঞ্ছনীয় নহে বলিয়া শুনা যায়। সুতরাং স্বাধীন প্রয়াসের দাবি করিয়া কোন লাভ নাই। রাষ্ট্রকে অবলম্বন করিয়াই এই রোগের প্রতিকার সন্ধান করিতে হইবে।

অ.

দেশরক্ষার প্রস্তুতি

দেশরক্ষার প্রস্তুতির ক্ষেত্রেও নেতাদিগের সেই মনো-ভাবের পরিচয় পাওয়া যাইতেছে, যে মনোভাবের প্রকাশ অর্থ-নীতির পরিকল্পনায় পাওয়া যায়। অর্থাৎ সকল ব্যবস্থাই অতি উৎকৃষ্ট সবল ও পাকা বুনিয়াদের উপর গড়িয়া তুলিতে হইবে, এই চেষ্টা। খাওয়ার ব্যবস্থা ভাল মত করিতে হইলে উৎকৃষ্ট রন্ধনশালা, ভোজন-কক্ষ ও বাসনপত্র জোগাড় করা প্রয়োজন। রন্ধনশালা ও ভোজন কক্ষ নির্ম্মাণের জন্য সিমেণ্ট ও ষ্টীল প্রয়োজন। অতএব সিমেণ্ট ও ষ্টীল তৈয়ার করার ব্যবস্থা অগ্রে করা হউক। প্রতি ৪।৫ জন লোকের জন্য এক একটি রন্ধনশালা নির্ম্মাণ করিতে অন্তত এক টন করিয়া সিমেণ্ট ও ষ্টীল লাগিবে। অর্থাৎ, ৪৫ কোটি ব্যক্তির জন্য এই কারণে সাড়ে দশ কোটি অথবা ১০৫ মিলিয়ন টন হিসাবে সিমেণ্ট ও ষ্টীল প্রয়োজন। আমাদিগের যে কয়টি কারখানা আছে তাহার সংখ্যা অন্ততপক্ষে পাঁচগুণ হইলে ইহা সম্ভব হইবে। সুতরাং পরিপ্রেক্ষিত পরিকল্পনার দৃষ্টিতে খাওয়ার ব্যবস্থা ২০০০ খ্রীষ্টাব্দের কিছু পরেই সম্ভব হইবে। দেশরক্ষার ব্যবস্থা অতি অবশ্যই অস্ত্রশস্ত্র সরবরাহ এবং সবল ও সুস্থদেহ সেনানীদিগের উপরে নির্ভর করিবে। সুতরাং দেশরক্ষার জন্য অর্থ নৈতিক পরিকল্পনার বাস্তব গঠন বিশেষ প্রয়োজন। এই ব্যবস্থা সুসম্পন্ন হইতে যথেষ্ট সময় লাগিতে পারে। এই কারণে দেশরক্ষার ব্যবস্থা কিছু দীর্ঘকাল ধরিয়া করিতে হইতে পারে। তাড়াহুড়া করিয়া ও যেমন করিয়া হউক ৫০।৬০ লক্ষ সৈনিক একত্র করিয়া যুদ্ধ করা সম্ভব, কিন্তু সেরূপ ভাবে যুদ্ধে অগ্রসর হওয়া উপযুক্ত ও শ্রেষ্ঠ পন্থা নহে। অর্থনীতিজ্ঞদিগের সহিত পরামর্শে ইহাই স্থির করা হইতেছে যে, যুদ্ধের সকল সরঞ্জাম স্বদেশে প্রস্তুত করিয়া লইয়া দ্বিধাহীন আবেগে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হওয়াই জয়লাভ করিবার সত্য পথ। বিভিন্ন ব্যবস্থা সম্পূর্ণ হইলে শেষ পর্য্যন্ত সেনাবাহিনী অজেয় শক্তির আধার হইয়া সমরে অগ্রসর হইতে পারিবে। পরাজয়ের কথা তখন আর উঠিতেই পারিবে না। খাট-পালঙ্ক তৈয়ার করাইতে হইলে বৃক্ষের প্রয়োজন হয় ইহা সর্ব্বজনবিদিত। বর্ত্তমান সভ্য জগতে অর্থ নৈতিক প্রতিষ্ঠানসমূহের পূর্ণতর গঠনের ফলে পালঙ্ক প্রয়োজন হইলে অবিলম্বে বৃক্ষ রোপণ করিবার আর প্রয়োজন হয় না। কিন্তু যে সকল দেশের যথা ভারতের, সেই অর্থ নৈতিক পূর্ণতাপ্রাপ্তি এখনও ঘটে নাই, সে সকল দেশে অনেক সময়ে কোনও কার্য্য করিতে হইলেই লম্বা লম্বা ফিরিস্তি করিয়া কার্য্য না করিবার অথবা বিলম্বে করিবার সাফাই গাওয়া হইয়া থাকে। সত্য সত্যই কার্য্য করা অবিলম্বে সম্ভব কি না একথার বিচার করিতে হইলে উচ্চ-পদস্থ ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারীদিগের নিজ চক্ষে দেখিতে হয় পরিস্থিতি যথার্থ কি প্রকার। যে দেশে উচ্চপদস্থ ব্যক্তিগণ সম্পূর্ণ অথবা মূলতঃ কর্ম্মে অভিজ্ঞতাবর্জ্জিত সে দেশে সকল কিছুই নাসিকা বেষ্টন করিয়া দেখাইবার সুবিধা অলস ও নিষ্কর্ম্মা রাজকর্ম্মচারিগণ সর্ব্বদাই পাইয়া থাকেন। যুদ্ধের প্রস্তুতি-ক্ষেত্রে এই অলস ও দীর্ঘসূত্রী কর্ম্মপদ্ধতি বিপদ্‌জনক।

অ.

বাংলায় অবাঙ্গালীর প্রভাব

ব্রিটিশ সাম্রাজ্য ভারতে সর্ব্বত্র প্রতিষ্ঠিত হইলেও মাদ্রাজ ও বাংলায় ব্রিটিশের সহিত আধিপত্য প্রবলতর ভাবে বিরাজ করে। ফলে ইংরেজী ধরনধারণ এই দুই অঞ্চলে অধিক প্রচলিত হয়। ইংরেজের ব্যবসায় নীল, পাট, চা, কফি, লা প্রভৃতি লইয়াই ভারতে প্রতিষ্ঠিত হয় রপ্তানীর ক্ষেত্রে এবং আমদানিতে বস্ত্র, লৌহ, ইস্পাত, যন্ত্র, কলকব্জা ও অপরাপর কারখানা-প্রস্তুত দ্রব্যাদিই দেখা যাইত। বাংলা তথা কলিকাতাতেই ইংরেজের ব্যবসায়ের প্রধান কেন্দ্র ছিল, যদিও কলিকাতার "হাউস"গুলি ভারতের সর্ব্বত্রই নিজ নিজ শাখা-প্রশাখা বিস্তার করিয়া ব্যবসা বাড়াইবার ব্যবস্থা করিত। কলিকাতা এই ভাবে ক্রমশঃ ভারতের সকল প্রদেশের ব্যবসার কেন্দ্র হইয়া দাঁড়াইল এবং অল্পে অল্পে কলিকাতার "হাউস", দোকানপাট ও বৃহত্তর কলিকাতার কারখানাগুলিতে অবাঙ্গালী কর্ম্মীর সংখ্যা বাড়িয়া চলিতে লাগিল। ইহার জন্য বাঙ্গালীর আরাম ও আমোদ প্রিয় স্বভাব অনেকাংশে দায়ী। যে সকল কার্য্যে শরীরের শক্তি-সামর্থ্য নিয়োগ করিতে হয়, অথবা যাহা কষ্টকর কার্য্য, সেই সকল কার্য্যে বাঙ্গালী সহজে যাইতে চাহে না। ইহা ব্যতীত বাঙ্গালী আয় অপেক্ষা ব্যয় অধিক করিয়া থাকে এবং এই কারণে সঞ্চয় করিয়া কারবার করা অথবা কারবার বাড়ান বাঙ্গালীর পক্ষে সহজ হয় না। অবাঙ্গালী জাতিগুলির মধ্যে ভারত ও ভারতের বাহির হইতে অনেকে জীবিকা-নির্ব্বাহের জন্য বাংলা দেশে আসিয়া থাকে, যাহারা কষ্ট করিয়া অর্থোপার্জ্জন করিয়া এবং ভোগে সংযম করিয়া নিজেদের ঐশ্বর্য্য বৃদ্ধি করিয়া থাকে। মাড়োয়ারী, ভাটিয়া, ইহুদী, আর্ম্মানী, চীনা এবং হিন্দীভাষী মিস্ত্রী ও কর্ম্মকৌশলহীন শ্রমিক কলিকাতার বাসিন্দা-মহলে এখন চিরস্থায়ী হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ইহাদিগের সহিত আসিয়া জুটিয়াছে অসংখ্য মুটিয়া, রিক্সাওয়ালা, পান-বিড়িওয়ালা, ছোট-বড় দোকানদার, ফেরিওয়ালা, ঠেলাগাড়ীওয়ালা, বিভিন্ন প্রকার শকট-চালক, ভিক্ষুক, জুয়াড়ী, জালিয়াত, চোর, ডাকাইত, পকেটমার ও অন্যান্য সমাজদ্রোহী অপরাধীবৃন্দ। এই সকল ব্যক্তির কোন উপযুক্ত বাসস্থান নাই এবং ইহারাই এই সুবিশাল মহানগরীর স্বাস্থ্য ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা নষ্ট করিয়া শহরের নিন্দার কারণ হইয়াছে। ইহাদিগের সহিত অন্তরঙ্গ ভাবে জড়িত রহিয়াছে বাংলার অবাঙ্গালী ব্যবসাদারগণ। এই সকল ব্যবসাদারদিগের অনেকের স্বভাব হইল স্বাস্থ্য, শোভা ও শুদ্ধাচার বর্জ্জিত জীবন-যাত্রা পদ্ধতির অনুসরণ। উচ্চ সুদে ঋণদান, পরের সম্পদ গ্রাস করা, ভেজাল, মেকি ও নিরেস মাল বিক্রয়, বিভিন্ন উপায়ে লোক ঠকান, শঠতা, বঞ্চনা, প্রতারণা, আইন অমান্য করা, উৎকোচদান ও রাজস্ব ফাঁকি দেওয়া। এই সকল সমাজদ্রোহী অসৎ লোকের সংখ্যাবৃদ্ধির ফলে ভারতের, বাংলার কিম্বা কলিকাতার কোনও লাভ হয় নাই। কোন ব্যক্তি, গোষ্ঠী অথবা রাষ্ট্রের যে ক্ষেত্রে এই সকল লোকের দ্বারা কোনও উপকার হয় নাই, সে ক্ষেত্রে ইহাদিগের দমন বিশেষরূপে প্রয়োজন। কিন্তু ইহারা রাষ্ট্রীয় দলের অপনেতা-দিগকে উৎকোচদানে খুশী রাখিয়া নিজেদের অধর্ম্মের কারবার বজায় রাখিয়া চলে। আজকাল এই জাতীয় সুনীতিধ্বংসী ব্যবসাদারদিগের মধ্যে ইংরেজী শিক্ষা ও ইংরেজী ঢং-এ চলাফেরা করিবার কায়দা রপ্ত করিবার আপ্রাণ চেষ্টা আরম্ভ হইয়াছে। কিন্তু ইহার কারণ বিদেশ গমন ও বিদেশীর সাহায্যে ব্যবসা করা। সাধারণ ভাবে বলিতে গেলে ইহা-দিগের উচিত ইংরেজী চালচলন শিক্ষার সহিত সর্ব্বজাতি-অনুমোদিত সুনীতিজ্ঞান অর্জ্জন চেষ্টা করা। নতুবা শিক্ষিত অধার্ম্মিকগণ অশিক্ষিত সুনীতিদ্রোহীদিগের তুলনায় সমাজের অধিক ক্ষতি করিবে বলিয়া মনে হয়। ইহাদিগের একথা মনে রাখা উচিত যে, ধর্ম্ম ও সুনীতির পথেও অশেষ ঐশ্বর্য্য আহরণ করা সম্ভব। অবশ্য কেবলমাত্র ব্যবসাদারদিগকে দোষ দিলে সামাজিক পাপের বর্ণনা সম্পূর্ণ হয় না। রাষ্ট্র-নীতির ক্ষেত্রেও অসংখ্য লোক রহিয়াছে যাহারা সমাজে দুর্নীতির প্রচারে বিশেষ ভাবে সাহায্য করিয়া থাকে। ডাক্তার, উকিল, রাজকর্ম্মচারী, শিক্ষক প্রভৃতি অপর পেশা-অবলম্বী লোকেরাও দুর্নীতির অপযশ হইতে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত নহেন। তবে ব্যবসাদার মহলে দুর্নীতি সর্ব্বগ্রাসী। এই কারণে প্রথমে প্রয়োজন এই সকল ব্যক্তিদিগকে সুনীতির পথে ফিরাইয়া আনা। আমাদের দেশনেতাদিগের বিশ্বাস ভারত-বাসীর সর্ব্বাপেক্ষা বড় অভাব বস্তুর। যথা, ইস্পাত, কলকব্জা, সিমেন্ট, কয়লা ও অপরাপর কারখানাজাত দ্রব্যসমূহের। কিন্তু বস্তুতঃ আমাদের অত্যন্ত অভাব সুনীতিবোধের। এই অভাব পূর্ণ না করিয়া যেদিকেই জাতীয় ভাবে অগ্রসর হইবার চেষ্টা করা যাইবে সেইদিকেই অশেষ বাধাপ্রাপ্ত হইতে হইবে। কারণ, সকল উন্নতির মূলে রহিয়াছে নীতিজ্ঞান—যাহা

না লাভ করিলে অপর সকল লাভই শীঘ্রই লোকসানে পরিণত হয়।

অ.

ভেজাল সোনার গহনা

সোনা স্বভাবতঃ নরম। এই কারণে সোনা যাহাতে সহজে বাঁকিয়া না যায় সেই জন্য তাহার সহিত তামা মিলাইয়া গিনি সোনা তৈয়ার করা হয়। গিনি সোনায় এগার ভাগ সোনা ও এক ভাগ তামা থাকে। উহাকে $\frac{11}{12}=\frac{22}{24}$ কিম্বা ২২ ক্যারেট সোনা বলিয়া অভিহিত করা হয়। এই সোনা দিয়া জগতের সকল দেশে স্বর্ণমুদ্রা তৈয়ার করা হইয়াছে এবং ভারতের জনসাধারণের মধ্যে এই ২২ ক্যারেট সোনার আদর সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। কারণ ইহার দ্বারা তৈয়ার করা গহনা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া সর্ব্বত্র আদৃত হয়। ১৮ বা ১৪ ক্যারেট সোনা, অর্থাৎ ৯ ভাগ সোনা ও ৩ ভাগ খাদ অথবা ৭ ভাগ সোনা ও ৫ ভাগ খাদ, দুনিয়ার বাজারে বহুল পরিমাণে চলে। প্রধানতঃ ঘড়ি, ঘড়ির শিকল অথবা বন্ধনী তৈয়ার করিবার জন্য। এই জাতীয় সোনা কঠিনতর হয় বলিয়া জড়োয়ার কার্য্যে ইহা ব্যবহার করা হয় যাহাতে বসান মণিমুক্তা সহজে খুলিয়া পড়িয়া না যায়। কিন্তু উৎকৃষ্ট নক্সার গহনা গড়াইতে হইলে ২২ ক্যারেট সোনাই শ্রেষ্ঠ। একথা শতলক্ষ বিশেষজ্ঞ দ্বারা বহুযুগের প্রমাণসিদ্ধ সত্য। শ্রীমোরারজি এই কথায় বিশ্বাস না করিলেও ইহার সত্যতা অপ্রমাণ হয় না। কারণ সহস্রাধিক বৎসর যাহার প্রচলন তাহার মূলে সত্য নাই শুধু আছে কুসংস্কার, এই জাতীয় বিচার স্বতঃসিদ্ধ বলিয়া মানিয়া লইতে পারা যায় না। বিশেষ প্রমাণ ব্যতীত শ্রীমোরারজির কথা জনসাধারণে মানিবে না। দ্বিতীয় কথা এই যে, যদি ১৪ ক্যারেট সোনা গহনা গড়িবার পক্ষে অধিক উপযুক্ত বলিয়া প্রমাণ হয় তাহা হইলে সেই সোনা সস্তা বলিয়া তাহার ব্যবহার দ্বিগুণ চতুর্গুণ বাড়িয়া গিয়া বাজারে সোনার চাহিদা আরও বাড়িয়া যাইবে। অর্থাৎ, ১৪ ক্যারেট সোনার বিদেশের ও এদেশের মূল্যের পার্থক্যের জন্য ১৪ ক্যারেট সোনাও সেই ভাবেই গুপ্ত আমদানি হইতে থাকিবে ও অতিরিক্ত লাভে গোপনে বিক্রয় হইবে, যে ভাবে পাকা সোনা ও গিনি সোনা হইয়া থাকে। এই কারণে মোরারজির সোনা (পূর্ব্বে ব্রিটিশ যুগে যাহার নাম ছিল ভাইসরয়জ গোল্ড) বাজারে চলিলে সোনার গুপ্ত আমদানি আরও বাড়িয়া যাইবে এবং সেই সোনা কালো বাজারে আরও সতেজে বিক্রয় হইবে। ৭০ টাকায় যাহা ক্রয় করা যায় তাহা যদি ১৪০ টাকায় বিক্রয় হয় তাহা হইলে যাহা হয় তাহা আমরা দেখিয়াছি ও দেখিতেছি। ইহার পরিবর্ত্তে যদি ৪৫ টাকার মাল ৯০ টাকায় বিক্রয় করিবার ব্যবস্থা হয় তাহা হইলে দ্বিতীয় বস্তুর কালো-বাজার বন্ধ হইয়া যাইবে এই সিদ্ধান্ত সম্পূর্ণরূপে অমূলক। এই কষ্টকল্পিত সিদ্ধান্ত শ্রীমোরারজির দফতরের বিতণ্ডামাত্র। গিনি সোনার সহিত তুলনায় ১৪ ক্যারেট সোনার যে মূল্য-হীনতা; ঐ অপূর্ব্ব সিদ্ধান্তও সেইভাবে নিকৃষ্ট ও মূল্যহীন। শুধু এই জাতীয় একটা কথা তুলিয়া ভারতের অর্থনীতিতে একটা অশোভন আলোড়নের সৃষ্টি করা হইল মাত্র এবং বহু লক্ষ কারিগরের রোজি নষ্ট করিবার ব্যবস্থা হইল। ভারতের জনসাধারণ মনে মনে বিশ্বাস করে যে, সোনা কিনিয়া গহনা গড়াইলে সেই সঞ্চয় শ্রেষ্ঠ সঞ্চয়। তাহাতে সুদ আসে না বটে, কিন্তু সুদের লোভে আসল নষ্টও হয় না। যে চাষী ১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দে ১০ মণ চাউল বিক্রয় করিয়া ৫০ টাকা সেভিং-ব্যাঙ্কে রাখিয়াছিল, আজ তাহার সেই টাকা সুদে-আসলে ধরা যাউক ১০০ টাকায় দাঁড়াইয়াছে। ১০০ টাকায় আজ সেই চাষী ১০ মণের পরিবর্ত্তে মাত্র সাড়ে তিন মণ চাউল ক্রয় করিতে পারিবে। সে যদি ঐ সময় ৫০ টাকার সোনার গহনা গড়াইয়া রাখিত তাহা হইলে আজ তাহার গহনার দাম হইত ১৫০ টাকা। রাজস্বসচিবকে অর্থনীতি শিখাইবার স্পর্দ্ধা আমাদের নাই; কিন্তু তাহার মনে রাখা উচিত যে, শুধু সত্যই জয়যুক্ত হয়। মিথ্যার ক্রমাগত প্রচারের ফলে মিথ্যা সত্য হইয়া দাঁড়ায় একথা হিটলার প্রচার করিয়া পরে দেখিয়াছিলেন যে, মিথ্যা কখনও সত্য হয় না এবং মিথ্যা শেষ অবধি পরাজয়েই লয় প্রাপ্ত হয়।

বর্ত্তমান ক্ষেত্রে চীনের ভারত আক্রমণের ফলে দেশব্যাপী একটা নব জাগরণ দেখা গিয়াছে। এই যে ভারতবাসীদের জাগরণ ইহা শুধু কংগ্রেসের সভ্যদিগের জাগরণ নহে। ভারত-বর্ষে প্রতি কংগ্রেস সভ্য অথবা যে কোনও প্রকার রাষ্ট্রীয় দলের সভ্য যদি একজন থাকে তাহা হইলে যাহারা কোনও দলের সহিত যুক্ত নহে তাহাদিগের সংখ্যা হইবে শতাধিক। বর্ত্তমান পরিস্থিতিতে কংগ্রেসের যে চেষ্টা দেখা যায় তাহা কতকটা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি এবং আরও অধিকভাবে, নিজেদের দলের মতামত পোষণের চেষ্টা। দারিদ্র্য দূর করা ও অর্থ-

নৈতিক পরিকল্পনাগুলি চালাইয়া চলা, যুদ্ধের জন্য শ্রেষ্ঠ প্রস্তুতি ইত্যাদি কথা বলার আর কোনও উদ্দেশ্য আছে বলিয়া মনে হয় না। এই সময়ে উচিত ছিল একান্তভাবে সামরিক প্রস্তুতি সাধন করা। তাহা করা হইতেছে কি না সাধারণের পক্ষে তাহা জানা সম্ভব নহে; কারণ সর্ব্বত্র আবোল-তাবোল বক্তৃতার বন্যায় সাধারণের জ্ঞানবুদ্ধি ও দেশেপ্রেমের প্রেরণা কোথায় ভাসিয়া যাইতেছে তাহা কে জানে? জাতিগত ভাবে আমরা এই সকল বহু শাখা-প্রশাখাশোভিত কর্ত্তব্য বিচারের ধাক্কায় বিব্রত, বিভ্রান্ত ও সংশয়াচ্ছন্ন। কথা ও কাজের মধ্যে যে একটা স্বাভাবিক বৈষম্য আছে তাহা সহজে কেহ ভুলিতে পারে না। বেশী কথা হইলেই মনে হয় কাজ হইবার সম্ভাবনা অল্পই। ইহা জানিয়াও প্রত্যহ বাণী প্রচার করিবার আগ্রহ আমাদিগের নেতামহলে চিরজাগ্রত। এই আগ্রহ অহেতুকী নহে। যাহার যত দোষত্রুটি থাকে তাহারই তত অধিক কথা বলার প্রয়োজন হয়। সাফাই গাহিবার এবং সাধারণের চিন্তা ও দৃষ্টিকে ভিন্ন পথে চালিত করিবার জন্য। অবশ্য দু'-একটা কথা কখন কখন বলা হয় যাহার কিছু মূল্য আছে। কিন্তু এই নিত্য বক্তৃতা-পদ্ধতির উদ্দেশ্য কি তাহা আমরা না জানিলেও ইহার ফলে যে বক্তৃতা সম্বন্ধে সাধারণের মনে অশ্রদ্ধার সৃষ্টি হয় তাহা সর্ব্বজনগ্রাহ্য। অতএব সোনাই হউক অথবা মাটিই হউক (ভূ) বাক্য সংযম বিশেষভাবে প্রয়োজন।

অ.

মন্ত্রীদিগের বক্তৃতা

ভারতবর্ষে যাঁহারা মন্ত্রীর পদ অলঙ্কৃত করেন তাঁহারা প্রায় সকল ক্ষেত্রেই লোক-চক্ষুর অন্তরালে থাকিয়াই নিজ নিজ প্রতিভায় পূর্ণ পরিণতি লাভ করিয়া কংগ্রেস পার্টির দ্বারা আবিষ্কৃত হইয়া উচ্চপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া থাকেন। অপর ভাবে বলিতে হইলে বলা যায় যে, কংগ্রেস বহু অজানা-অচেনা প্রতিভাশালী ব্যক্তিকে লোক-সমাজে প্রতিপত্তি দান করিয়াছেন, যে সকল ব্যক্তিকে পূর্ব্বে বিশেষ কেহ চিনিত না ও জানিত না। ইহা দ্বারা কংগ্রেস দলের কর্ম্মক্ষমতার দৈন্য প্রমাণ হয় কি না; অথবা ভারতের লোকেরাই গুণীর আদর করিতে জানেন না প্রমাণ হয় এই প্রশ্নের উত্তর কে দিতে পারে? জনসাধারণ একথা সর্ব্বত্রই বলিতে বাধ্য হন যে, অনেক মন্ত্রীদেরই নিজ নিজ কার্য্যে কোন দক্ষতা নাই। তাঁহাদিগকে কেন মন্ত্রী করা হয় তাহা প্রধানমন্ত্রী নেহরু অথবা মুখ্যমন্ত্রিগণ ব্যতীত অপর লোকের নিকট অজ্ঞাত। কংগ্রেস দলের নির্ব্বাচনের যুদ্ধে কে কতটা সাহায্য করিয়াছেন বিজয় লাভে তাহার উপর সেই সকল যোদ্ধার পুরস্কার নির্ভর করে। মন্ত্রীত্বও একটা পুরস্কার। কিন্তু এই পুরস্কার পাইয়া যাঁহারা সর্ব্বঘটে কর্ত্তৃত্ব করিতে আরম্ভ করেন তাঁহারা যদি নিজ নিজ কার্য্যে অক্ষম ও অপারগ হন, তাহা হইলে সমাজের ও সাধারণের অবস্থা উত্তরোত্তর খারাপ হইতে থাকে। চীনের সহিত সংঘর্ষে দেখা গিয়াছে যে সৈন্যদিগের অস্ত্র, বস্ত্র, রসদ, গুলীবারুদের ব্যবস্থা মন্ত্রীদিগের অবহেলা ও অক্ষমতার জন্য ঠিকমত হয় নাই। অপরাপর মন্ত্রীদিগের অলস ও শিথিল কর্ম্মপদ্ধতির জন্য রাস্তাঘাট ঠিক ভাবে নির্ম্মাণ করা হয় নাই। পরে একমাত্র প্রতিরক্ষামন্ত্রী মেননকে বিতাড়িত করিয়া দোষ ক্ষালন করা হইয়াছে কোনও প্রকারে। নিজেদের দোষের জন্য কোনও অনুতাপের লক্ষণ দেখা যায় নাই। নিজ হইতে কোন মন্ত্রী কর্ম্মে ইস্তফা দিয়া সরিয়া দাঁড়ান নাই। একটা সর্ব্বব্যাপী নির্লজ্জতা আকাশে-বাতাসে বিস্তৃত, যাহা জাতীয় ভাবে অত্যন্তই ভয়াবহ। কারণ, নিষ্কর্ম্মা, অলস ও কাণ্ডাকাণ্ড-জ্ঞানহীন লোকেরা যদি অনায়াসে সকল অপরাধ করিয়াও বেকসুর-খালাস ভাবে নিজ নিজ পদে অধিষ্ঠিত থাকিয়া যায় তাহা হইলে দেশরক্ষা বা অপর কোন বিষয়েই কাহারও উপর নির্ভর করা চলিবে না।

শুধু একটা রাষ্ট্র শাসন-পদ্ধতির অঙ্গ সবল ও সচল ভাবে পূর্ণ উদ্যমে চালিত রহিয়াছে। ইহা হইল বক্তৃতা ও বাণীর প্রচার। প্রত্যহ প্রাতে সংবাদপত্রে প্রথমেই দেখা যায় কোন্ কোন্ মন্ত্রী কোথায় কোথায় কি কি বাক্য উচ্চারণ করিয়াছেন। কর্ম্মে যাহা যাহা বাকি থাকিয়া যায় বাক্যের দ্বারা সেই সকল অক্ষমতা সংশোধন করিয়া লইবার ব্যবস্থা আধুনিক রাষ্ট্রনীতির প্রধান অস্ত্র। কিন্তু এই অস্ত্রে যুদ্ধ জয় করা যায় না, এমন কি আত্মরক্ষাও ইহা দ্বারা সম্ভব হয় না। লৌহ ও ইস্পাত অথবা অর্থ নৈতিক পরিকল্পনা সম্বন্ধে যাহা যাহা উচ্চারিত হইয়াছে তাহাতে সুব্রহ্মণ্য বা কৃষ্ণমাচারী আত্মপ্রসাদ অনুভব করিয়া থাকিতে পারেন, কিন্তু ইস্পাত বা অপর বস্তু এক ছটাকও হইবে বলিয়া মনে হয় না, অথবা হইলে স্বর্ণ অপেক্ষা অধিক

মূল্যে হইতে পারে। কেননা, এক মন্ত্রীর ইস্পাত সম্বন্ধে সাক্ষাৎ জ্ঞান নির্ভরযোগ্য কি না একথা ততটাই বিচারসাপেক্ষ যতটা অভ্রান্ত কৃষ্ণমাচারীর সর্ব্বজ্ঞভাব। কৃষ্ণমাচারী বিভিন্ন পরিকল্পনার ধারাগুলি পরস্পর সংশ্লিষ্ট করিবার জন্য নেহরুর দ্বারা নিযুক্ত। যদি প্রত্যেকটি পরিকল্পনা আড়ষ্টগতি ভুলপথের পথিক হয়, তাহা হইলে সেইগুলিকে একত্র করিলে একটা সর্ব্বনাশী ভুলের সৃষ্টি হইবে মাত্র। সুতরাং এই মন্ত্রীত্বের ফলে জাতির কোনও লাভ হইবে বলিয়া মনে হয় না। সুব্রহ্মণ্য ইস্পাত বিষয়ে যে অগাধ জ্ঞান কিছুকাল পূর্ব্বে প্রকাশ করিয়াছিলেন; যাহার গভীরতা ইণ্ডিয়ান আয়রণের গভর্ণিং ডিরেক্টরের বাৎসরিক বিবৃতিতে বর্ণিত হইয়াছে; তাহাতে উক্ত মন্ত্রীর উচিত ছিল কোন অপর ক্ষেত্রে নিজ শক্তি নিয়োগ করিবার চেষ্টা করা। কিন্তু আমরা জাতিগত ভাবে খুবই সহনশীল। বহু কথার অর্থ না বুঝিয়া কথাগুলিকে শ্রদ্ধার সহিত শ্রবণ করা আমাদিগের রীতি। অর্থ নাই অথবা খুবই গর্হিত ও ক্ষতিকর জানিলেও আমরা ভক্তিপ্লুত ভাবে সেই সকল কথা শুনিয়া আনন্দাশ্রুপাত করিতে অভ্যস্ত। এই সকল কারণে বহু ভণ্ড, অভিনয়কারী ছদ্মবেশী পাপ এই মহাদেশে সুখে দিন গুজরান করিয়া থাকে। দেশবাসী সজাগ হইলে এই সকল বিষয়ের একটা বিচার হইতে পারে ও দেশের মাথায় কাঁঠাল ভাঙ্গা অত সহজে আর না চলিতে পারে।

অ.

জাতীয় প্রস্তুতির কথা

জাতীয় প্রস্তুতি ও সামরিক ভাবে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হওয়া এক কথা নহে। জাতীয় প্রস্তুতি অর্থে বুঝিতে হইবে যে, জাতির সকল ব্যক্তি নিজ নিজ কর্ত্তব্যকর্ণীয় যথাযথ ও ভাবে করিতে প্রস্তুত হইবেন এবং সেই কর্ত্তব্য ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত ভাবে এরূপ উদ্যমের সহিত করিবেন যাহাতে জাতীয় জীবনে একটা নব জাগরণ উপস্থিত হইবে ও সমগ্র জাতি সমবেত ভাবে নিজ কর্ম্মশক্তিকে জাতীয় আদর্শ ও উদ্দেশ্য-সিদ্ধির জন্য তেমন করিয়া নিযুক্ত করিতে সমক্ষ হইবেন যাহা দ্বারা এক মহান ও সগৌরব সফলতা সর্ব্বকার্য্যে জাতিকে সমৃদ্ধিশালী করিয়া তুলিতে পারিবে। অপর ক্ষেত্রে সামরিক প্রস্তুতি অর্থে বুঝিতে হইবে সৈন্যশক্তির গঠন, শিক্ষা ও যুদ্ধক্ষমতা বৃদ্ধি। জলযুদ্ধ, আকাশযুদ্ধ ও স্থলযুদ্ধের অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহ ও ব্যবহার শিক্ষা, শত্রুর সকল আক্রমণ নিবারণ করা এবং সকল ভাবে সেইরূপ নির্ম্মাণ, গঠন, আমদানির ব্যবস্থা করা, যাহাতে সেনাগণ পূর্ণ উদ্যমে যুদ্ধকার্য্য সুসম্পন্ন করিতে পারে। সামরিক প্রস্তুতি একান্ত ভাবে রাজশক্তির সহিত মিলিত রাখা কর্ত্তব্য এবং জাতীয় প্রস্তুতির সহিত যদি সমরশক্তির সম্বন্ধ কোন কোন ক্ষেত্রে নিকটতর হওয়া প্রয়োজন হয়, তাহা হইলে সে ব্যবস্থা রাজকর্ম্মচারীদের সহিত সংযোগে হওয়া প্রয়োজন। সামরিক শক্তি সংহত, সংযত আবেগে এরূপভাবে প্রয়োগ করিবার ব্যবস্থা হওয়া উচিত যাহাতে যুদ্ধের প্রয়োজন ঘটিলে সে শক্তি দ্রুত গতিতে তীব্রভাবে ও অসীম শৌর্য্যের সহিত শত্রু সংহারে প্রবৃত্ত হইতে পারে। জাতীয় প্রস্তুতির ভিত্তির উপরেই সামরিক শক্তি গঠিত ও সুরক্ষিত হইতে পারে। কারণ আধুনিক যুদ্ধে শত্রুর সর্ব্বব্যাপী আক্রমণ-রীতির ফলে দেশের সকল অধিবাসীই যুদ্ধে লিপ্ত হইয়া পড়িতে বাধ্য হইয়া থাকেন এবং যদি দেশের সকল ব্যক্তিই যুদ্ধকালে নিজ নিজ কর্ত্তব্য পূর্ণরূপে করিতে না পারেন তাহা হইলে সামরিক শক্তি ব্যবহার করা কঠিন হইয়া দাঁড়ায়। দেশবাসী যুদ্ধে সাহায্য না করিয়া অন্তরায়ের সৃষ্টি করিতে থাকেন ও সে অবস্থার পরিবর্ত্তন না হওয়া পর্য্যন্ত সামরিক শক্তি নিজ দৃঢ় ও স্থিরবীর্য্যভাব হারাইয়া পতনশীল হইয়া পড়ে। জাতীয় প্রস্তুতি না থাকিলে সামরিক শক্তির ব্যবহার কঠিন, এমন কি অসম্ভব হইয়া দাঁড়ায়।

যে জাতির সকল নর-নারী বয়স ও অবস্থা নির্ব্বিচারে সুস্থ, সবল, সংযমী, দৃঢ় ও সচেতন ভাবে পরস্পরের সাহায্যে সজাগ নহে, সে জাতি কখনও শক্তিশালী হইতে পারে না। যেমন লক্ষ লক্ষ মুষ্টি ধূলি পরস্পর সংলগ্নভাবে সংস্থাপিত করিয়া একটি অট্টালিকা নির্ম্মাণ সম্ভব হয় না; সেই কার্য্যের জন্য সুকঠিন অঙ্গ ইষ্টক জ্বালাইয়া তৈয়ার করিয়া লইতে হয়; তেমনি জাতির সমষ্টিগত স্বরূপ কখনও বাস্তব সত্তা লাভ করে না, যদি না জাতির প্রত্যেকজন ব্যক্তি দেহে, মনে, আগ্রহে, আকাঙ্ক্ষায় বিশদভাবে আকৃতিবান হইয়া উঠিতে না পারেন। যে জাতির মানুষের দেহে বল নাই, প্রাণে আদর্শের প্রেরণা নাই, মনে বিক্ষিপ্তভাব; সে জাতি কার্য্যক্ষেত্রে সর্ব্বদাই অক্ষম থাকিয়া যাইবে। কোন জাতির নর-নারীগণ যদি কর্ত্তব্যে সর্ব্বদাই অবহেলা করেন, অলস, আরামপ্রিয় ও অকর্ম্মণ্যভাবে

সকল কার্য্যে হস্তক্ষেপ করেন এবং প্রগতি অর্থে গা ঢিলা দিয়া যত্র-তত্র গড়াইয়া পড়া বুঝেন; সে জাতির কোনপ্রকার উন্নতি হওয়া কদাপি সম্ভব নহে। জাতির সকল মানবের অবস্থা উন্নত ও শক্তিশালী না হইলে, সামরিক, অর্থনৈতিক অথবা অপর কোন প্রচেষ্টাতে জাতি সমষ্টিগত ভাবে সফলতা লাভ করিতে সক্ষম হইতে পারে না। ব্যক্তির গুণের উপরেই জাতির মর্যাদা, ক্ষমতা ও কর্ম্মশক্তি নির্ভর করে এবং সামরিক শক্তি সেই জাতীয় কর্ম্মশক্তিরই অপর অভিব্যক্তি। ব্যক্তিত্বকে খর্ব্ব করিয়া জাতি গঠন চেষ্টা যে সকল দেশে করা হয়, সে সকল দেশে ব্যক্তিদিগকে মতামত জাহির করা, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাষ্ট্রীয় দল গঠন ও রাষ্ট্রীয়শক্তির সহিত সম্বন্ধ বর্জ্জন করিয়া কর্ম্মক্ষেত্রে অগ্রসর হইতে দেওয়া হয় না। কিন্তু ব্যক্তিগত শক্তি, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও কর্ম্মের আগ্রহ পূর্ণমাত্রায় সংরক্ষিত ও পরিবর্দ্ধিত করিয়া জাতীয় কর্ম্মক্ষমতাকে ক্রমশঃ শ্রেষ্ঠত্ব দান করিবার চেষ্টা করা হইয়া থাকে। মন ও আত্মার দিক দিয়া ব্যক্তিত্বের শৃঙ্খলাবদ্ধ অবস্থা ক্ষতিকর হইলেও এই উপায়ে জাতিকে একটা বিরাট ও প্রবল কর্ম্মশক্তির আধারে পরিণত করা যায়। অপর ক্ষেত্রে ব্যক্তিস্বাধীনতার নামে ব্যক্তিত্বের উচ্ছৃঙ্খল অবস্থাও মনের ও আত্মার পূর্ণ গঠনের সহায়ক নহে; মানুষ যদি সংযত ভাবে নিজ ব্যক্তিত্বের পূর্ণ বিকাশের চেষ্টা না করে এবং নিজ পরিবার, গোষ্ঠী ও জাতির ইষ্ট ও সমষ্টিগত উন্নতিও শক্তির জন্য নিজের আবেগ ও আকাঙ্ক্ষা দমন করিয়া পরহিতের কথাও মনে রাখিয়া চলিতে চেষ্টা না করে তাহা হইলে তাহার ব্যক্তিত্বের মর্য্যাদা সুরক্ষিত হইতে পারে না, কারণ, জাতির গৌরবের সহিত ব্যক্তির আত্মসম্মান অতি ঘনিষ্ঠরূপে জড়িত।

জাতীয় সামরিক শক্তি বর্দ্ধন ও গঠন করিতে হইলে সামরিক বাহিনী সকলের পশ্চাতে সকল শক্তির ভিত্তি ও মূল হিসাবে জাতির সকল ব্যক্তির শক্তি-স্বাস্থ্য-কর্ম্মক্ষমতা সংগঠিত প্রচেষ্টা সুপ্রতিষ্ঠিত থাকা প্রয়োজন। এই কার্য্য সুসাধিত করিতে হইলে জাতির অন্তর্গত সকল ব্যক্তির—নর-নারী নির্ব্বিচারে—নিজ নিজ শরীর সুগঠিত, দৃঢ় ও বলশালী করিবার চেষ্টা করা প্রয়োজন। শিক্ষা, মনের বিস্তার, কর্ম্মক্ষমতা ও কৌশল এবং উচ্চ আদর্শে ন্যস্ত সৎসাহস বৃদ্ধি করিবার চেষ্টাও অবশ্য প্রয়োজনীয়। এই সকল কার্য্যে সফলতা আনয়ন করিতে হইলে সকল ব্যক্তির কর্ত্তব্য :

১। উপযুক্ত ব্যায়াম করা। যাহাতে শরীরের শক্তি, ক্ষিপ্রতা ও কষ্ট সহ্য করিবার ক্ষমতা বৃদ্ধি হয় সেই প্রকার ব্যায়ামই উপযুক্ত।

২। খাদ্যবস্তু এরূপ হওয়া প্রয়োজন যাহাতে পুষ্টি পূর্ণরূপে হয় এবং যাহাতে সকল প্রকার খাদ্য খাওয়া অভ্যাস হয়। মোটা খাবার সৌখিন খাদ্য অপেক্ষা অধিক স্বাস্থ্যকর ও শক্তিদায়ক। রুচির ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ি করা চলিবে না। অর্থাৎ ছোলা, ভুট্টা, বাজরা, জুঁনরি প্রভৃতি খাওয়া অভ্যাস করিতে হইবে।

৩। হণ্টন, দ্রুত ও দূর ধাবন, উল্লম্ফন, উচ্চস্থলে ক্ষিপ্রতার সহিত আরোহণ ও সেইখান হইতে অবরোহণ প্রভৃতি অভ্যাস করা স্বাস্থ্য ও শক্তি আহরণের পক্ষে প্রকৃষ্ট পন্থা। অযথা ট্রামে, বাসে অথবা রিক্‌শাতে গমন করা উচিত নহে। পদব্রজে গমনাগমন করিলে অর্থের অপব্যয় নিবারণ হয় এবং স্বাস্থ্যও ভাল থাকে। সাইকেল চড়া, সন্তরণ ও ঘোড়ায় চড়া অভ্যাস করিলে স্বাস্থ্য ও শক্তি লাভ হয়। মুষ্টিযুদ্ধ, কুস্তি, লাঠি খেলা, ছুরি ও তলোয়ার খেলা, তীরধনুক ব্যবহার, বন্দুক চালনা, ড্রিল, কসরত ড্রিল প্রভৃতি শক্তিসামর্থ্য লাভের উৎকৃষ্ট উপায়। যে সকল ব্যক্তির শরীরের গঠন সর্ব্ব-অবয়বে সমান নহে এবং কোন কোন মাংসপেশী অপরের তুলনায় স্বল্পায়তন ও দুর্ব্বল তাঁহাদিগের পক্ষে বিশেষ প্রকারের কসরত করিয়া দেহের গঠন ঠিক করিয়া লওয়া কর্ত্তব্য। সময় সময় বন-ভোজন করিতে যাওয়া ও শিকার করা স্বাস্থ্যের পক্ষে সহায়ক।

৪। শুধু শরীর ও মনের গঠন হইলেই মানুষের জীবন যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি পূর্ণভাবে সম্পন্ন হয় না। কর্ম্মক্ষমতা বৃদ্ধি এই প্রস্তুতির বিশেষ অঙ্গ। সামরিক কার্য্যে সহায়তার জন্য প্রাথমিক চিকিৎসা, অগ্নি-নির্ব্বাপন, শত্রুর আক্রমণ হইতে জনসাধারণের আত্মরক্ষা প্রভৃতি শিক্ষা করা উচিত। অর্থোপার্জ্জনের জন্য অপরভাবে কার্য্যশক্তি ও কর্ম্মকৌশল বৃদ্ধির ব্যবস্থা করা উচিত।

৫। এই সকল শিক্ষার আরম্ভ হয় সাইকেল, মোটরসাইকেল, মোটর গাড়ী প্রভৃতি চালনা শিক্ষা করিলে। বিদ্যুৎ সরবরাহের তার, সুইচ ও বৈদ্যুতিক কলকব্জা চালনা ও মেরামত; টেলিফোন, টেলিগ্রাফ, রেডিও চালনা ও মেরামত,

সাধারণভাবে আধুনিক কারখানার কার্য্যে যোগদান করিবার ক্ষমতা আহরণ ইত্যাদিতে মানুষের সামরিক ও জীবনযাত্রা নির্ব্বাহের শক্তি বৃদ্ধি পায়। যাহার সে সুবিধা হইবে না তাহার পক্ষে মাটি কাটা, ইটের পাথাই, ছুতার, কামার অথবা রাজমিস্ত্রীর কার্য্য শিক্ষা বিধেয়।

৬। মানুষ যে এলাকাতে বাস করে সে এলাকার সকল খবর রাখলে তাহার নিজের ও প্রতিবেশী সকলের মঙ্গল হয়। ডাক্তার, কবিরাজ, হাসপাতাল, দাওয়াইখানা, রাস্তাঘাট প্রভৃতি চিনিয়া রাখা সকলের কর্ত্তব্য। জল, বালি, মাটি প্রভৃতি কোথায় পাওয়া যায় তাহাও জানিয়া রাখা প্রয়োজন। সর্ব্বদা সজাগ ভাবে সকল লোকের সহিত পরিচিত হইয়া থাকা প্রয়োজন। কোনও প্রকার বিপর্য্যয় উপস্থিত হইলে কেমন করিয়া তাহার প্রতিবিধান করা হইবে তাহা জানিয়া ও ভাবিয়া রাখা কর্ত্তব্য।

৭। বিপর্য্যয়কালে খাদ্য, পানীয় জল, ঔষধ প্রভৃতি কোথায় ও কেমন করিয়া পাওয়া যাইবে তাহা জানা প্রস্তুতির প্রয়োজনীয় অঙ্গ। খাদ্যবস্তু আহরণ ও পূর্ব্ব হইতে উৎপাদন করিবার ব্যবস্থা করা উচিত। সকল পুষ্করিণীতে মৎস্য ছাড়া, হাঁস, মুরগী পালন, ফলের বৃক্ষ রোপণ, আলু, পেঁয়াজ, রসুন, টোমাটো, কড়াইশুঁটি, ছোলা, ভুট্টা প্রভৃতি চাষ করা অল্প জমিতেও সম্ভব। সেই চেষ্টা করা সকল লোকের কর্ত্তব্য। জাতীয় প্রস্তুতি ব্যক্তিগত ক্ষমতা ও কর্ম্মশক্তির প্রকাশমাত্র। সকল ব্যক্তির সমবেত চেষ্টাতেই তাহা পূর্ণ হয়। সামরিক প্রস্তুতি এই কৃষ্টি, শক্তি ও সাধনারই বিশেষ অভিব্যক্তি। অ.

পঙ্গু শিশুদিগের চিকিৎসা

রোগের অথবা শরীরের পঙ্গু অবস্থার চিকিৎসায় আধুনিক জগতে যে উত্তরোত্তর উন্নতি সাধিত হইতেছে; যাহা দ্বারা ক্রমশঃ যে সকল রোগ বা অবস্থার পূর্ব্বে কোনও চিকিৎসা হইত না সেগুলির প্রতিকার সম্ভব হইয়া উঠিতেছে; তাহার জন্য বৈজ্ঞানিক গবেষণা, অনুধাবন, বিচার ও কারণ অনুসন্ধান যাঁহারা করিয়াছেন ও করিতেছেন তাঁহারাই প্রধানতঃ প্রশংসার অধিকারী। ভারতবর্ষে এই জাতীয় বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান ও আবিষ্কার চেষ্টার সুব্যবস্থার প্রয়োজন বহুদিন হইতেই রহিয়াছে, কিন্তু সে কার্য্য সাধনে রাষ্ট্র, বিশ্ববিদ্যালয় কিম্বা তদপেক্ষা ক্ষুদ্রায়তন প্রতিষ্ঠান প্রভৃতির মধ্যে বিশেষ চেষ্টা দেখা যায় নাই। চিকিৎসাক্ষেত্রে যে সকল মহামানব ব্রিটিশযুগে ভারতবর্ষে এই বিষয়ে সকলকে উদ্বুদ্ধ করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন তাঁহারা নিজেদের স্বপ্ন বাস্তবে পরিণত হইতে দেখিয়া যাইতে পারেন নাই, কিন্তু তাঁহাদিগের ব্যক্তিগত চেষ্টা ও অনুপ্রাণতার কথা আমাদিগের সর্ব্বদা মনে রাখা উচিত। শিক্ষার ক্ষেত্রে যেমন আমরা যতই উন্নতি করি না কেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের কথা আমাদিগের সর্ব্বদাই কৃতজ্ঞভাবে মনে রাখা ও তাঁহার নিকট আমাদিগের ঋণ স্বীকার করা উচিত। জাতীয় জাগরণের ক্ষেত্রে তেমনি রাজা রামমোহন রায়ের অধিকার সকলকেই মানিতে হয়। ১৯৫৬ খ্রীষ্টাব্দে চিকিৎসা ও জীববিদ্যারক্ষেত্রে গবেষণা ও অনুশীলনকার্য্য বিস্তৃত ভাবে করিবার জন্য একটি প্রতিষ্ঠানের সূচনা করা হয় যাহা ক্রমশঃ সুগঠিত হইয়া উঠিয়াছে ও যাহার চেষ্টায় কিছুদিন পূর্ব্বে পঙ্গু শিশুদিগের চিকিৎসা ও স্বাভাবিক কর্ম্মণ্যতা পুনরায়ত্ত করিবার একটি হাসপাতাল ও ব্যায়ামকেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। বন হুগলিতে (ডানলপ-ব্রিজ ব্যারাকপুর ট্রাঙ্ক রোডের নিকটে) পূর্ব্বে একটি বাস্তহারাদিগের বাসের জন্য ব্যবস্থা করা হয়। এইখানে বহু সংখ্যক বাসগৃহও নির্ম্মাণ করা হয়। ভারত গবর্ণমেণ্টের বাস্তহারা বিভাগ এইখানে গৃহগুলি ব্যতীত আরও অনেক জমি লইয়া রাখিয়াছিলেন। বর্ত্তমানে এই গৃহগুলি নূতন হাসপাতাল ও চিকিসাকেন্দ্রকে দেওয়া হইয়াছে এবং কয়েক লক্ষ টাকাও গবর্ণমেণ্টের তরফ হইতে উপরোক্ত প্রতিষ্ঠানকে (The society of Experimental Medical Sciences. চিকিৎসা-বৈজ্ঞানিক অনুশীলন-পরীক্ষা সঙ্ঘ) দেওয়া হইয়াছে। সঙ্ঘ ইহার ও সংগৃহীত অপরাপর অর্থের সাহায্যে হাসপাতাল ও অনুশীলন কেন্দ্র সকল নির্ম্মাণ করিতেছেন। হাসপাতাল উন্মোচন কার্য্য পশ্চিমবাংলার মুখ্যমন্ত্রী প্রফুল্লচন্দ্র সেন মহাশয় কয়েক সপ্তাহ পূর্ব্বে করিয়াছেন। মনে হয় এই চিকিৎসাকেন্দ্র ক্রমশঃ ভারতে এক অদ্বিতীয় স্থান গ্রহণ করিবে।

এই চিকিৎসা ও অনুশীলন—পরীক্ষণকেন্দ্রের যে সকল বিভিন্ন অঙ্গ ক্রমশঃ গড়িয়া উঠিবে তাহার মধ্যে কয়েকটির কথা এখন পর্য্যন্ত নির্দ্ধারিত হইয়া গিয়াছে। যথা জীববিদ্যা ও শারীরবিদ্যা (physiology)। শারীরবিদ্যার গবেষণা ও অনুশীলন পরীক্ষা কেন্দ্রটি স্যর নীলরতন সরকারের নামে প্রতিষ্ঠিত হইবে। নীলরতন সরকার মেমোরিয়াল ট্রাষ্ট সোসাইটি এই জন্য সোসাইটি অফ এক্সপেরিমেণ্টাল মেডিকেল সায়েন্সেকে এক লক্ষ টাকা দিবেন স্বীকার করিয়াছেন এবং ইহার মধ্যে চল্লিশ হাজার টাকা দিয়াছেন। আমরা এই নূতন ও বিরাট প্রতিষ্ঠানের উন্নতি কামনা করি। অ.

পুনর্ভ্রাম্যমাণ

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

শ্রীদিলীপকুমার রায়

আমরা গেলাম সদলবলে। রাষ্ট্রপতি প্রথমে আমাকে ও ইন্দিরাকে একান্তে ডেকে চা খাওয়ালেন। কথায় কথায় অনেক প্রসঙ্গই এসে গেল। সবচেয়ে ভাল লাগল, যখন তিনি ভারতের আত্মিক মহিমার কথা বললেন, যার মূলে আছে মৈত্রী ও অনুকম্পা। উদাহরণ দিলেন বিখ্যাত দ্রৌপদীর—ভাগবত থেকে। বললেন: "তুমি জান দুর্বৃত্ত অশ্বত্থামা কি ভাবে দ্রৌপদীর ঘুমন্ত পাঁচ পুত্রকে ঘোর রাত্রে চোরের মতন এসে হত্যা করেছিল? অর্জুন কৃষ্ণের কথায় অশ্বত্থামাকে দণ্ড দিতে তাকে বেঁধে এনে দ্রৌপদীর সামনে দাঁড় করাতেই দেবী বলে উঠলেন 'মুচ্যতাং মুচ্যতাং'*—গুরুপুত্রের বন্ধন খুলে দাও। এখনো তাঁর মা কৃপী বেঁচে—

মা রোদীৎ অস্য জননী গৌতমী পতিদেবতা।
যথাহং মৃতবৎসার্তা রোদিমি অশ্রুমুখী মুহুঃ॥"

ব'লে একটু থেমে রাষ্ট্রপতি গাঢ় কণ্ঠে বললেন: "এরই নাম ভারতের নারী—যে-দুঃখ পেয়ে শুধু যে দুঃখ দিতে চায় নি তাই নয়—দুঃখ যাকে দীক্ষা দিয়েছে সমবেদনার, প্রেমের, ক্ষমার।" একটু থেমে তিনি ব'লে চললেন: "আমাদের মধ্যে আর্যদৃষ্টির বিকাশ হয়েছিল একসময়ে। উঠেছিলাম আমরা সত্যিই আত্মিক কীর্তির শিখরে। ধর, সংসারে থেকে অচলপ্রতিষ্ঠ হয়ে নিষ্কাম কর্মের আদর্শ। কি ভাবে কর্ম করতে হবে হাজারো চঞ্চলতার মাঝে? না, 'মৌলিস্থকুম্ভপরিরক্ষাধীর্ণটীব'—মাথায় কলসী রেখে নটী নাচছে, কিন্তু কুম্ভ আছে অচঞ্চল। এ-যুগে আমরা অনেক কিছু শিখতে পারি এ-ধরণের উপমার মধ্যে দিয়ে, দেখতে শিখতে পারি ঠিক ভঙ্গিতে।"

এইভাবে আরও অনেক কথাই বললেন রাষ্ট্রপতি—আরও কয়েকটি শ্লোক উদ্ধৃত করলেন উদ্দীপ্ত হয়ে, ভারতের ধর্মবুদ্ধির সমর্থনে। বড় ভাল লাগল শুনে—আরও এই আশাপ্রদ সত্যটি লক্ষ্য ক'রে যে, তাঁর মন রাষ্ট্রনৈতিকতার চাপেও একটুও নুয়ে পড়ে নি, দৃষ্টি হয় নি আবিল। তিনি চলেছেন আজও তাঁর স্বধর্মের অনুসরণ ক'রে স্বভাবের সহজ প্রেরণায়। প্লেটো তাঁর বিখ্যাত 'রিপাব্লিক' গ্রন্থে অকুতোভয়েই লিখেছিলেন যে, রাজাদের সব আগে হ'তে হবে দার্শনিক—Philosopher King; আমি একথার উল্লেখ ক'রে রাষ্ট্রপতিকে বললাম: "ভারতের দৈন্যের সীমা নেই, আমরা আজ এ-লক্ষ্যহারা জগতে খানিকটা হয়ত উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে পড়েছি নানা ভাবে নানা আদর্শের সংঘাতে। কিন্তু তবু এ-গর্ব আমরা করতে পারি যে, আমাদের রাজা—খাঁটি দার্শনিক। য়ুরোপে দার্শনিক রাজার কেবল একটি দৃষ্টান্ত আছে প্রাক্‌-হিটলারী যুগের মাসারিক—চেকোশ্লোভিকিয়ার প্রেসিডেন্ট। ১৯২২-এ আমি প্রাগ-এ তাঁর সঙ্গে তাঁর রাজপ্রাসাদে দেখা করেছিলাম। সান্ধ্যাহারের পর তিনি আমার সঙ্গে আলোচনা করেছিলেন কার জানেন? টলষ্টয়ের, যাঁকে তিনি চিনতেন। রাজারাজড়ার মধ্যে এমন মনীষী সচরাচর ঠাঁই পান না—পেলেও শক্তিমদে তাঁদের মাথা গরম হয়ে ওঠে, যার ফলে তাঁদের দার্শনিক দৃষ্টি হয়ে ওঠে আবিল। তাই আমি এত আনন্দিত হয়েছিলাম ভাবতে যে, এই প্রথম আমরা রাজসিংহাসনে পেলাম এমন রাজাকে যিনি ভারতের রাজধর্মের খবর রাখেন... শান্তিপর্বে যে-রাজধর্মের গুণগানে ভীষ্ম যুধিষ্ঠিরকে সোচ্ছ্বাসেই বলেছিলেন: 'কৃতস্য করণাৎ রাজা'—রাজাই সত্যযুগের প্রবর্তক।"

এরপরে গান হ'ল একটি মঞ্চে। পাদপ্রদীপের মতন সাজিয়ে সুন্দর ক'রে প্রদীপ জ্বালান হয়েছিল, আর রাখা হয়েছিল শ্রীকৃষ্ণের একটি মর্মরমূর্তি। মঞ্চের উপরে ছিলাম আমরা ছয় জন, তাছাড়া ইন্দিরার মাতুলানী শ্রীপ্রাণনাথ নন্দার স্ত্রী, নীলকণ্ঠ, দেওয়ান সুরেন্দ্রলাল—আরও অনেকে। সামনে রাষ্ট্রপতির বন্ধু-বান্ধব অতিথি এবং আমার কয়েকটি বন্ধু, যাঁদের আমি ডেকে এনেছিলাম। এঁদের মধ্যে ছিলেন আমার এক প্রিয় বন্ধু শ্রীমননকুমার মৈত্র।

এ সবের ফলে হ'ল কি, রাষ্ট্রপতি ভবনের অফিসিয়াল আবহ ফিকে হয়ে যাওয়ায় গান ক্রমে ক্রমে উঠল দেখতে দেখতে। চীন তখনও ভারত আক্রমণ করে নি, তবে তোড়জোড় বাঁধছে ব'লে আমি প্রথমে গাইলাম একটি

---

* আমার ভাগবতী কথায় আমি এ-অংশের অনুবাদ করেছি এই ভাবে:

মুক্ত করো, মুক্ত করো, করিও না হত্যা এ-নির্বলে,
জননী ইঁহার কৃপী পতিব্রতা আজিও জীবিতা।
পুত্রশোকে যে-বেদনা সহি আমি আজ জীবন্মৃতা
সেব্যার্থা সহিতে যেন না হয় তাঁহাকে অশ্রুজলে।

সৈন্যদের অভিযান-সঙ্গীত—march-song; গানটি ১৯৫০ সালে ইন্দিরা রচনা করে জেনারেল কারিয়াপ্পার অনুরোধে এবং আমি সুর দিয়ে গাই বম্বেতে। এবং আমি টাকা পাই মোটমাট আঠারো হাজার—ভাবতেও বুকে বল আসে আজ।

যাই হোক, অক্টোবর থেকে চীনারা ভারত আক্রমণ করার পর মুসুরী, দিল্লী, জয়পুর ও উদয়পুরে এ গানটি আমি প্রায় প্রতি আসরেই গাইতাম—কেন, তা কি আর বলতে হবে? গানটি শুনে ১৯৫০ সালে বড় কেউ খেয়াল করেন নি তার তাৎপর্য। কিন্তু এবার গাইতে-না-গাইতেই শ্রোতারা উঠলেন সবাই উদ্দীপ্ত হয়ে, বিশেষ ক'রে এর ইংরেজী অনুবাদও আমি সঙ্গে সঙ্গে গাইতাম ব'লে। বাংলাতেও গাইতাম, তবে কেবল বাঙ্গালীদের আসরে। হিন্দি গানটি ও তার ইংরেজী অনুবাদ ইন্দিরার তৃতীয় ভজনাবলী 'সুধাঞ্জলি'-তে পাবে। বাংলাটি কেবল 'শতাঞ্জলি'-তে ছাপা হয়েছে। তাই এখানে প্রতি গানের মাত্র দু'টি লাইন উদ্ধৃত ক'রেই থামব।

হম ভারতকে হৈঁ রখবালে দেশকা বল হম প্রাণ হৈঁ হম্।
ইজ্জৎ ইস্‌কী শান হমারী মা হৈঁ য়ে সন্তান হৈঁ হম্॥

We are India's sleepless sentinels,
Strength of her sinews, her heart's delight,
Jealous of her soul's inviolate honour,
Sons we remain to our Mother of might.

আমরা যে ভারতের ধর্মধারক ভাই,
দেশের আমরা বল, তনু মন প্রাণ,
তারি গরিমার মহাগৌরবে গৌরবী,
সেবক মায়ের, অনুগত সন্তান।

এ গানটির সম্বন্ধে দু'চারটি কথা এখানে বলা অপ্রাসঙ্গিক হবে না। আমাদের দেশে স্বদেশী গানের রেওয়াজ, সুরু হয় বঙ্কিমচন্দ্রের 'বন্দেমাতরম্' থেকে। তার পরে অনেক কবিই স্বদেশী গান লিখেছেন ভারতের নানা ভাষাতেই—বাংলা ভাষায় সবচেয়ে মর্মস্পর্শী ও উদ্দীপক গান লিখেন নিশ্চয়ই দ্বিজেন্দ্রলাল। কিন্তু তিনিও সৈন্যদের রণাভিযান-সঙ্গীত লেখেন নি। ইন্দিরার এই গানটিই প্রথম রসোত্তীর্ণ গান হিন্দি মার্চ-সঙ্গীতের মধ্যে। ফরাসী ভাষায় সৈন্যদের রণাভিযান সঙ্গীত হ'ল বিখ্যাত La Marseillaise; কিন্তু সে গানে রক্তারক্তি কাণ্ড বড় বেশি প্রকট হয়ে উঠেছে। ইন্দিরার গানটির মধ্যে রক্ততাণ্ডব-বর্জিত আত্মোৎসর্গদীপ্ত রণবাণী ছত্রে ছত্রে ফুটে হয়েছে, তাই চীনাদের অত্যাচার সুরু হওয়ার পরে আমি এ গানটির বহুল প্রচার চেয়েছিলাম। আমার উদ্দেশ্য সফল হয়েছে—জয়পুরে, দিল্লীতে, মুসুরীতে ও উদয়পুরে এ গানটি শুনে হাজার হাজার লোককে উজিয়ে উঠতে দেখেছি—জয়পুরে ছাত্রছাত্রীদের এত উৎসাহ হ'ল যে তা'রা এল টেপ রেকর্ড করবে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধ্যায়কে সঙ্গে নিয়ে—পরে জয়পুর রেডিও কর্তৃপক্ষ লিখলেন, এ গানটি ব্রডকাষ্ট্ করবার অনুমতি চান, এবং দিল্লী থেকে পুনা রেডিও অফিসে বিশেষ নির্দেশ এল এ গানটি রেকর্ড করার। এ-সূত্রে বলার লোভ সামলাতে পারছি না (ত্রুটি মার্জ্জনীয়) যে, দিল্লীর কর্তারা আমাকে হার্মোনিয়মের সঙ্গেই এ গানটি গাইতে অনুমতি দিয়েছেন ব'লে গতকাল—৩রা ডিসেম্বর এখানকার পুনা রেডিওতে এ গানটি গেয়ে এলাম পরমানন্দে এবং ঐ সঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ তর্পণও গাইলাম—যে বন্দনা দু'টি রামকৃষ্ণ মিশনে গেয়েছিলাম ও তোমাকে পাঠিয়েছিলাম।

রাষ্ট্রপতি ভবনে সেদিন প্রথমেই গেয়েছিলাম জয়দেবের বিখ্যাত—

প্রলয়পয়োধিজলে ধৃতবানসি বেদং
বিহিতবহিত্রচরিত্রমখেদং
কেশবধৃত-মীনশরীর জয় জয় জগদীশ হরে!

এ গানটি আমি মালকোষ ও ভৈরবী মিশিয়ে গাই মন্দিরে আর সবাই কোরাসে যোগ দেন—জয় জগদীশ হরে।—এবার কলকাতায় গিয়ে তোমাকে শোনাবই শোনাব। হরিদ্বারে গিয়ে যখন পাঁচ দিন গঙ্গাতীরে ছিলাম—একটু পরকালের পারানি জোগাড় করতে, তখন সেখানে একদিন ব্রহ্মকুণ্ডে গঙ্গাতীরে খোলায় অজস্র ভক্ত শ্রোতার সামনে গেয়েছিলাম পিতৃদেবের গঙ্গাস্তোত্র—পতিতোদ্ধারিণি গঙ্গে, এবং পরম ভক্ত নারায়ণ দাস বাজোরিয়ার মন্দিরে গেয়েছিলাম এ গানটির জুড়ি ঐ একই সুরে:

হরিপদকমলসমুদ্ভবকোমলকায়ে!
পাতকমঙ্গজময়ি শিবজায়ে!
জাহ্নবি! হর দেবি! মমাম্ব ও দশবিধপাপহরে!

অবশ্য গঙ্গাকল্লোলিত অনিন্দ্য হরিদ্বার তীর্থভূমিতে এ ধরণের সংস্কৃত স্তোত্র যে রকম জমেছিল, রাষ্ট্রপতি ভবনে সে রকম জমে নি। কিন্তু তবু সুরটি এমন জমকালো হয়েছে যে, সবাই মুগ্ধ হয়েছিল। প্রসঙ্গতঃ বলি "দশবিধপাপহরে" গঙ্গাস্তোত্রটির রচয়িতা সর্বজন শ্রদ্ধেয় শ্রীজীব ন্যায়তীর্থ। ইনি শুধু মহাপণ্ডিতই নন,

সেই সঙ্গে সংস্কৃতে একজন মনোহর কবি। এঁর অনেক পদাবলীই আমি সুর দিয়ে গেয়ে থাকি যত্র-তত্র। কারণ, জয়দেবের পর এত সুন্দর ভক্তিস্নিগ্ধ সুললিত সংস্কৃত গান আমি আর পড়ি নি। এঁর একটি আবাহনের দুটি মাত্র চরণ উদ্ধৃত করার লোভ সম্বরণ করতে পারছি না:

এহি দয়াধন! রসঘনবিগ্রহধারণ! সুন্দরমূর্তে!
মায়াসংবৃত-কায়ালঙ্কৃত-বিশ্বচরাচরপূর্তে!

এর আমি অনুবাদ করেছি—

এস দয়াধন! এস রসঘনবিগ্রহ হে শ্রীকান্ত!
নিজ কায়াভায় রঞ্জি' ধরায় কেন কর মায়াভ্রান্ত?

যা হোক রাষ্ট্রপতি ভবন প্রসঙ্গের হারানো খেই ধরি ফের।

গান সত্যি জ'মে গেল শেষের দিকে—যখন ধরলাম ইন্দিরার জনপ্রিয় মীরাভজন—

দীপক জলগ সারী রাত।
আর্জ সুনা হৈ ইস পথ পর আয়েঙ্গে মেরে নাথ॥
প্রদীপ! জ্বল্ তুই সারারাত,
শুনেছি যে আজ এই পথ বেয়ে আসিবে সে প্রাণনাথ।

এ গানটি কলকাতায়ও গেয়েছিলাম দশ হাজার শ্রোতার সাম্‌নে বঙ্গ সংস্কৃতি সম্মেলনে—তোমার সাম্‌নেই, মনে পড়ে কি? পরে এ গানটি কলকাতায় রামকৃষ্ণ মিশনেও গেয়েছিলাম সাদার্ণ এভেনিউএ—বহু শ্রোতার অনুরোধে।

গানটিতে রাগ সঙ্গীত ও কীর্তন মিশিয়েছি ব'লে দেখতে দেখতে জ'মে যায়-রাষ্ট্রপতি ভবনেও জ'মে গেল এবং আশাতীত ভাবেই বলব—বিশেষ যখন তান ও আঁখরের প্রেরণা এসে গেল। রাষ্ট্রপতি গানের শেষে মঞ্চের কাছে এসে দাঁড়ালেন এবং আমি নেমে আসতেই আমাকে আলিঙ্গন ক'রে স্নেহস্নিগ্ধ কণ্ঠে বললেন—"তুমি আত্মহারা হয়ে গেয়ে শেষের দিকে আমাদের সবাইকেই উদ্দীপ্ত ক'রে তুলেছিলে।" ("You forgot yourself and lifted us all up.")

আনন্দ হ'ল বৈকি—আরও এই জন্যে যে, ১৯৫২ সালে যখন আমি রাষ্ট্রপতি ভবনে প্রথমবার ভজন করেছিলাম তখন সে ভজন গান গেয়েছিলাম বটে, কিন্তু ভজন হয় নি। সেখানে ছিলেন পণ্ডিতজী, আজাদ, তদানীন্তন প্রেসিডেণ্ট রাজেন্দ্রপ্রসাদ এবং আরও বহু রাজপুরুষ। কিন্তু এঁদের কাউকেই আমি তেমন ভালবাসতে পারি নি ব'লেই হোক বা পরিবেশটি অত্যধিক গুরুগম্ভীর (official) ছিল ব'লেই হোক আমার গান সেদিন জমে নি। কিন্তু শ্রীরাধাকৃষ্ণকে আমার সে সুন্দর সন্ধ্যায় সত্যিই পর মনে হয় নি—বিশেষ ক'রে সম্প্রতি তাঁর গীতা ও উপনিষদ্ ভাষ্য প'ড়ে মুগ্ধ হওয়ার জন্যেই হয়ত। তা ছাড়া তিনি প্রেক্ষাগৃহটিকে গুরুগম্ভীর ক'রে সাজান নি ত, স্নিগ্ধ দীপালোকে প্রদীপ্ত ক'রে কৃষ্ণবিগ্রহ স্থাপন ক'রে তবে ডেকেছিলেন আমাকে ভজন-কীর্তন-স্তোত্র গাইতে। নইলে গাইতে গাইতে আমার মনে এত সহজে ভক্তিভাবের ঢলও নামত না—বা শ্রোতাদের মনও তেমন গলত না। গাইছে ত গাইছে—মনে হ'ত সবার। বড়জোর বাঃ—বেশ! দুটো খুশির হাততালি—ব্যস্। এই কথাটি তোমাকে বার বার বলেছি নারায়ণ, (যদিও তোমার মন পাই নি) যে, ভক্তি বাদ দিয়ে ভজন বা মূর্তি বাদ দিয়ে কীর্তন হয় না। কিন্তু এ-চিন্তা এখন মুলতুবী থাক—তোমার উপর বেশি জুলুম করা সমীচীন হবে না—পূর্ব বন্ধুদের মধ্যে প্রায় সকলেই আমার ধর্মপ্রলাপে চম্পট দিয়েছেন, তোমাকেও হারাতে চাই না। তাই শুধরে নিই, বলি: আচ্ছা ভাই, আচ্ছা, তুমি ভক্তি বাদ দিয়ে সাধ মিটিয়ে কীর্তন ও আঁখর উপভোগ ক'রো—কেবল আমি যদি তা না পারি ত অক্ষম ব'লে কৃপা ক'রো—বেদরদী না হয়ে। কেমন?

এর পর অন্তিম অধ্যায় তাড়াতাড়ি সারি। চিঠিটা দশ-পনের পাতায় শেষ করব ভেবে ব'সে দেখ দেখি, কি কাণ্ড ক'রে ফেললাম! হয়ত সবটা পড়বেই না তুমি। যাই হোক, খোলা চিঠি ত—ছাপা হ'লে তুমি না পড়লেও দু'চারজন পাঠক অন্ততঃ পড়বেন।

মুসুরীতে ইন্দিরার পিতৃদেব কৃপারামজির আতিথ্যে প্রতি বৎসরে একবার ক'রে যাই পূজার সময়ে। কেবল গত বৎসরে যাওয়া হয় নি কলকাতা, কাশী ও অযোধ্যায় যেতে হয়েছিল ব'লে।

কৃপারামজি হঠাৎ হৃদ্‌রোগে শয্যাশায়ী হয়ে পড়েন—angina pectoris, বড় সাংঘাতিক অসুখ; জান নিশ্চয়ই। এবার বাঁচার আশা ছিল না বললেই হয়। যখন অবস্থা খুব খারাপ তখন তিনি ইন্দিরা আর আমাকে তার করেন। তার পর ইন্দিরার বোন কান্তা যায় ও পুনায় ফিরে এসে বলে: অবস্থা সঙিন। এই সময়ে প্রথম আমি তাঁর জন্যে দৈনিক প্রার্থনা সুরু করি আমাদের পুনার মন্দিরে—বিগ্রহের সামনে। সচরাচর আমি কারুর দৈহিক বা ঐহিক মঙ্গলের জন্যে প্রার্থনা করি না। কিন্তু কৃপারামজি আমাকে অত্যন্ত ভালবাসেন ব'লেও বটে এবং তিনি সত্যিই শ্রদ্ধাবান্ ধার্মিক ও মহৎ মানুষ ব'লেও বটে, আমি এ যাত্রা প্রার্থনা না ক'রে পারি নি। তার পরে কী যে হয়ে গেল চক্ষের

নিমিষে, তিনি সেরে উঠলেন, লিখলেন, (৯ই জুলাই) যে হৃদ্‌রোগ "gone with the wind"! পরে আমাকে সস্নেহ তিরস্কারও করলেন এই বলে যে, গত বৎসরে আমি যাই নি ব'লেই তিনি এত ভুগলেন। এবার আসতেই হবে—এবং কথা দিতে হবে যে, অন্ততঃ দু' সপ্তাহ থাকব।

তোমরা নিশ্চয়ই বিশ্বাস করবে না যে, এ যুগেও অঘটন ঘটে—প্রার্থনায় অসুখ সারে। নাই করলে। আমি দেখেছি সারতে, আর একবার নয়—অনেক বার। কিন্তু সে অন্য কথা। আমি একথার উল্লেখ করলাম তোমাকে প্রার্থনার শক্তি সম্বন্ধে ভাগবতী কথা শোনাতে নয়—শুধু জানাতে কেন আমাদের মুসুরী যেতে হয়েছিল সদলবলে—বারো জন: আমাদের ছ'জনের পরে যোগ দিলেন এসে (ইন্দিরার ভজনাবলী ও আমার Miracles Do Still Happen-এর প্রকাশক) শ্রী মোহন সাহানি, তাঁর স্ত্রী, দুই মেয়ে ও দুই ছেলে। পরে ইন্দিরার স্বামীও যোগ দেন।

মুসুরিতে গিয়ে প্রায় রোজই ভজন করতাম। একদিন ওখানে 'গান্ধি হলে' এবং কমুনিটি প্রোজেক্ট হলেও ভজন করলাম। উভয়ত্রই বহু লোকে সাড়া দিল ভক্তিতে। ভারত আজও ভারত, হিন্দু আজও কৃষ্ণ রাধা মুরলী-নূপুর শিব-দুর্গা-স্তোত্র দোঁহায় সাড়া দেয় মনেপ্রাণে—শুধু শিক্ষিত হিন্দুরা নয়, অশিক্ষিতরাও। তাই মুসুরীতে একাদিক্রমে প্রায় দিন পনের গাইলাম পরমানন্দে এবং প্রত্যহই ভিড় হ'ত, সাভয় হোটেলের মস্ত ঘর ভ'রে যেত।

ঠিক এই সময়ে চীন আক্রমণ করল আমাদের দেশ এবং আমি উদ্দীপ্ত হয়ে উঠে ফের তারস্বরে সুরু করলাম স্বদেশী গান গাইতে—প্রত্যহ। পরে স্থির করলাম, সৈন্যদের জন্যে কিছু টাকাও তুলতে হবে। কিন্তু হাতে সময় কম, তাছাড়া দেশে অশান্তি চাঞ্চল্য চারদিকেই—দিল্লীতে অনেক চেষ্টা ক'রেও কিছুতেই কন্সার্ট দিতে পারলাম না। এতে আমি দুঃখ পেয়েছি।

প্রাণবন্ত মানুষ কোন দেশেই কোন অনড় অচল নীতি মেনে চলতে পারে না—চললে পথভ্রষ্ট হয়। প্রায় সব সাধারণ নীতির ক্ষেত্রেই বিশেষবিশেষ পরিবেশে ব্যতিক্রমকে জানতে হয়। তুমি জান শ্রীঅরবিন্দ পণ্ডিচেরি আশ্রমে রাজনীতির চর্চা করতে আমাদের নিষেধ করতেন, কিন্তু হিটলারের বীভৎস নিষ্ঠুরতার প্রতিবাদে ইংরেজ সরকারকে শুধু যে সমর্থন করেন তাই নয়—আশ্রমের তহবিল থেকে টাকা পাঠান—যা তিনি কখনও করেন নি। এ-দৃষ্টান্ত দিলাম কেন তুমি নিশ্চয়ই বুঝবে। আমি এ সূত্রে বলতে চাই খুব জোর দিয়েই যে দেশের দারুণ বিপদে প্রতি ধার্মিকেরই কর্তব্য নিজের ধর্মকে বিপন্ন মনে ক'রে শত্রুর বিরুদ্ধে দাঁড়ান—সাধ্যমত কিছু অন্ততঃ দেশের সেবা করা। আমার দৃঢ় বিশ্বাস আজ শ্রীঅরবিন্দ জীবিত থাকলে আমাকে বলতেনই বলতেন দেশের জন্যে গান গেয়ে টাকা তুলতে। না, এ আমার শুধু বিশ্বাস নয়—প্রাণের সানন্দ সাড়া। তাই আমি আজকাল মন্দিরে প্রতিদিন স্বদেশী গান ও মার্চ-সঙ্গীত গাই ও সাধক-সাধিকাদের শেখাই। ইচ্ছা আছে পুনাতে একটি হলে গেয়ে কিছু টাকা তুলব—যদি যুদ্ধ চলে অবশ্য। প্রার্থনা করি—চীনের সুমতি হোক সে অধর্ম ছেড়ে ধর্মকে বরণ করুক। কিন্তু বৈজ্ঞানিক বস্তুতান্ত্রিকদের সুমতি হওয়া দুর্ঘট ব'লে বোধ হয় এ-আশা দুরাশা যে, এ-নাস্তিক আবহেও চীন শুনবে "ধর্মের কাহিনী"।

যাই হোক ঠাকুরের কৃপায় এর পরে আমার স্বদেশী গান গাওয়া সফল হয়েছিল—শুধু মুসুরী ও দিল্লীতেই নয় রাজস্থানেও বহু লোককে স্বদেশী গানে মাতিয়ে তুলতে পেরেছিলাম এ-৬৬ বৎসর বয়সেও। দিনের পর দিন গেয়েছি জয়পুরে ও উদয়পুরে স্বদেশী গান ভজনের সঙ্গে —যে কথা অন্য একটি চিঠিতে লিখেছি—আমার আর এক প্রিয়বন্ধু শ্রীনীলকণ্ঠ মৈত্রকে। আমি এ-দুটি চিঠিই তোমাকে পাঠাচ্ছি এক সঙ্গে এই অনুরোধ জানিয়ে যে তুমি প'ড়ে পাঠিয়ে দেবে প্রবাসীতে ছাপতে—শ্রীসুধীর কুমার চৌধুরী মহাশয়কে। আমার বিশ্বাস যে, এ-চিঠি দুটির মধ্যে কিছু কিছু ব্যক্তিগত প্রসঙ্গ থাকলেও তিনি সানন্দেই ছাপবেন, কেননা এর বাদী সুর—আত্মকথা নয়।

আমি জানি অনেকেই আপত্তি করবেন, আমি এত হাল্কা ভাষায় নানা গুরুগম্ভীর কথা পেশ করেছি ব'লে। কি করব নারায়ণ? আমাকে চলতেই হবে নিজের ছন্দে, নিজের বুদ্ধি বিচার বিবেক মেনে। আমার বুদ্ধি বলে যে, বিশেষ ক'রে খোলা চিঠির ভাষায় যত বেশি মৌখিক ইডিয়ম যাবে ততই ভাল। বার্নার্ড শ'র একটি উক্তি আমার মন নিয়েছে: ভাল শৈলী (style) বলব তাকেই যা জোরাল (effective); আমার মনে হয় আমার লৈখিক ভাষা আজকাল আত্মস্থ ও স্বাভাবিক্ হয়ে শুধু যে সত্যিকার জোরাল হয়েছে তাই নয়—ভাষায় আমি নিজেকে খুঁজে পেয়েছি। একথা সত্য হোক বা না হোক, আমি মানি গীতার কথা: "স্বধর্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্মো ভয়াবহঃ।" ইতি

তোমার নিত্যশুভার্থী দিলীপ দা।

ক্রমশঃ প্রকাশ্য

হীরা সাগরের কথা

(সেকালের কাহিনী)

গিরিবালা দেবী

গ্রামের নদীর নাম হীরা সাগর। নামটা বড় হ'লেও নদীটি কিন্তু তেমন বিশাল নয়। বর্ষার বিপুল সমারোহ ও প্লাবন ভিন্ন বাকী কয়েক মাস সে শান্ত সমাহিত হয়ে আপনার সীমার মধ্যে আবদ্ধ হয়ে থাকে। হীরা সাগর ক্ষুদ্র গ্রামবাসীদের জননী-স্বরূপা। তাই সে নিশিদিন কুলুকুলু গান গাওয়া থেকে বিরত হয় না।

গ্রামের ইতর-ভদ্র সকলকেই পদার্পণ করতে হয় সেই গীতিমুখর তটভূমিতে। সেখানে দিবসারম্ভের সঙ্গে সঙ্গে সুরু হয়ে যায় জনতা, জটলা, কোলাহল, কলরব।

তটসীমার রেখাকারে বেষ্টিত কাশশ্রেণীর ফাঁকে ফাঁকে যার যেমন ইচ্ছানুযায়ী এক-একটি ঘাট রচনা ক'রে নিয়েছে। কোনটা পুরুষের ঘাট। ঝুলে-পড়া প্রাচীন বটের ছায়ায় মেয়েদের ঘাট। কোনটা বা গো-ঘাটা, গ্রামের যত গরু-বাছুরকে জলে নামিয়ে সেই ঘাটে স্নান করান হয়। চাষারা সমবেত হয়ে নদীর পাড় কেটে গো-ঘাটা প্রায় সমতল ক'রে নিয়েছে। নইলে জীব-জন্তু নামাওঠা করতে পারে না।

ঘাটের পরে ঘাটের পত্তন না ক'রে এদের উপায়ান্তর নেই। সাধারণ মধ্যবিত্তের গ্রাম। কোথাও ধনীর আলয় অট্টালিকার চিহ্ন নেই। কোথাও স্বচ্ছ বারিপূর্ণ সারি সারি সোপানে সুসজ্জিত পুষ্করিণীর সাক্ষাৎ পাওয়া যায় না।

এটা ছিল কয়েক বছর পূর্ব্বেও এক বিস্তীর্ণ বিরাট্ পেঁচাচরা শনের ভূমি। মাঠের শেষ প্রান্তে কয়েক ঘর চাষী সম্প্রদায় আস্তানা গ'ড়ে ধানের চাষ, পাটের চাষ করত।

মাইল দুয়ের নাকালিয়ার বন্দরে শান্ত হীরা সাগর নূতন বাঁক নিয়ে হঠাৎ প্রচণ্ড বেগে ভাঙ্গন আরম্ভ ক'রে দেয়। নদীর সেই রুদ্রমূর্ত্তিতে সর্ব্বহারা হয়ে অনেকেই এই পেঁচাচরা মাঠে বসতি স্থাপন করেছিল। নদীর লীলা কেউ বুঝতে পারে না। দুই বছর ব্যাপী অনেক পুরাতন স্মৃতি-বিজড়িত অট্টালিকা, কুটির, শস্যক্ষেত্র, ফল-ফুলের বাগান গ্রাস ক'রে, গ্রামবাসীদিগকে বিতাড়িত ক'রে নদী আবার শান্ত রূপ ধারণ করেছে। এ পারের সম্পদ্ পরপারে ধূধূ চরাভূমিতে পরিণত হয়েছে। কিন্তু পুরাতন আবাসস্থলেই নূতন গ্রামের অধিবাসীদের রয়ে গেছে শ্রী-সমৃদ্ধি। বন্দরের ঘাটে দুই বেলা মাল ও যাত্রীবাহী দুইখানা ষ্টীমার এসে ভিড়ে। আশেপাশের গ্রামবাসীদের নগরে যাবার ওই একমাত্র যানবাহন। এ অঞ্চলে রেলগাড়ী নেই, ষ্টীমারে গোয়ালন্দ অবধি পরিক্রমার পরে তবে রেলগাড়ী। অবশ্য নৌকাতেও দূরে দূরে যাতায়াত চলে। হাট, বাজার, পোষ্টাফিস যা কিছু সেই বন্দরে। সারাদিন লোক ছোটে বন্দরে, কেউ হাঁটাপথে, কেউ নদী বেয়ে নৌকায়। এদের জীবনের কেন্দ্র যে সেখানেই প'ড়ে রয়েছে। সেইখানেই আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব।

যাঁরা ছড়িয়ে-ছিটকে এসে এ গ্রামে ঘর বেঁধেছেন তাঁদের অধিকাংশকে শনের নীচু জমিতে প্রচুর মাটি তুলে ভিটে বেঁধে নিতে হয়েছিল, ফলে প্রত্যেকের বাড়ীর পশ্চাৎভাগে এক একটা বিরাট জলা বা মেঠেলের সৃষ্টি হয়েছে। সেই জলা যতই আয়তনে দীর্ঘ বা গভীর হোক না কেন তবু তার নাম মেঠেল, পুকুর নয়। গ্রামের ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়দের সকলেরই গৃহে প্রতিষ্ঠিত নারায়ণ-শিলা বিরাজিত। তাঁদের পূজা ও ভোগে কূপ বা মেঠেলের জল অচল। সেই জন্যই হীরা সাগর গ্রামবাসীদের চির আদরের। বর্ষাকালে এ নিয়মের ব্যতিক্রম হয়। নদীর জলপ্লাবনে মেঠেল ডোবা যত জলাশয় পথঘাট একাকার হয়ে যায়। প্রবল স্রোতের সঙ্গে গঙ্গা, যমুনা, কাবেরী, গোদাবরী ও সমুদ্র মিশে সমস্ত জলকে পবিত্র করে। নিষেধের বেড়ী ভেঙ্গে যায় ঝন্ঝন্ ক'রে।

শ্রাবণের মাঝামাঝি। দিবানিশি চলছে অবিশ্রান্ত ধারাবর্ষণ। মেঘে মেঘে ঝাপসা আকাশ যেন শতধারে ফুটো হয়ে গিয়েছে। সেই ছিদ্রপথে বারি ঝরছে অবিরত। কালের প্রাচীর বেষ্টিত হীরা সাগরের তটভূমি জলের নীচে তলিয়ে গিয়েছে। পাড়ের অসংখ্য বুড়ো গাছগুলো কোমর-জলে দাঁড়িয়ে সভয়ে কাঁপছে থর থর ক'রে। পাখীরা নীড় পরিত্যাগ ক'রে পালিয়ে গেছে

ডাঙ্গার গাছে। শ্যামল বন-বিতান ছেড়ে শৃগালের দল পলায়ন করেছে দূরে। আর তাদের প্রহর ঘোষণা শোনা যায় না। সাপের গর্ত্ত জলের তলে, বিষধর সর্প-কুল আশ্রয় নিয়েছে গৃহস্থের কুটিরে। ভেজাকাক খাদ্যের আশায় ঘরের চালে ব'সে দিন-ভোর একটানা আর্ত্তনাদ করে কা-কা রবে।

গোয়ালের সামনে অঙ্গনে দাঁড়িয়ে জাবর কাটতে কাটতে গৃহপালিত গরু-বাছুররা দুই অসহায় বিশাল নেত্র মেলে অঝোরে ধারাস্নান করতে থাকে। কুকুর-বেড়ালদেরও শান্তি নেই, কেবলই ইতস্ততঃ খুঁজে বেড়ায় শুষ্ক স্থান। নদীর পরপারে শ্যামল আউশ ধানের ক্ষেত-গুলো গলাজলে নিমগ্ন হয়ে উর্দ্ধে মাথা তুলে বায়ু হিল্লোলে নৃত্য করে। চারপাশে অপার অনন্ত জলরাশি মুখর বাতাসের স্পর্শে নাচতে থাকে তা থৈ তা থৈ। জলের নাচনে ঢেউয়ের আঘাতে কত কুটিরের দাওয়া ধপ ক'রে তলিয়ে যায় জলের নীচে, বাঁশের খুঁটি আলগা হয়ে দরিদ্রের মাথা গোঁজার আশ্রয়টুকু ঝুঁকে পড়ে জলের উপরে। উন্মাদ প্রবল স্রোতে ভেসে যায় কত-জনার আশার ও আনন্দের সারি সারি ফুল ফলের গাছ। রাঙ্গা মোচা বুকে নিয়ে ফলন্ত কদলীবৃক্ষ। ছোট ছোট খড়ের চাল, বাঁশের খুঁটি। মরা পশুপক্ষী। সময়ে গলিত মানুষের শব। অন্নহীন বস্ত্রহীন কৃষকরা মাথায় হাত দিয়ে বর্ষাকে বিদায় জ্ঞাপন করে। এ সময় তাদের ক্ষেতের কাজ বন্ধ, মজুরীর কাজ বন্ধ। কাজের মধ্যে জোলায় নালায় কাটা পাট জাগ দিয়ে রাখা হয়েছে, তাই ছাড়ান। আর 'দোয়ার' পেতে মাছ ধরা। ঘরে চাল বাড়ন্ত তেল নেই, জলে সেদ্ধ মাছ লবণ সংযোগে খেয়ে অধিকাংশ দিন তাদের কেটে যায়। তাদের কাছে বর্ষার অভিনব রূপও নেই, মনোহারিত্বও নেই। গরীবের নিকটে বর্ষা দুরন্ত দুঃখের সময়। প্রতি পদক্ষেপে নৌকার প্রয়োজন। নৌকার অধিকারীদের কাছে অনুনয় বিনয়—"কর্ত্তা, আজকের হাটে আপনার নায়ে দুডা ধান তু'লা দেমু, আমি সাঁতার দিয়েই আসতে পারমু কিন্তক ধান যে ভিজে যাবে।"

কেউ বলে, কর্ত্তার নায়ে চাল কিনে দেবে। কারও জ্বর গায়ে জলে নামার সাহস নাই, কর্ত্তার নৌকায় একটু 'ঠাঁই' চায়। এমনি কাকুতি মিনতি প্রভাত হতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত। পল্লীগ্রামে কবির সজল শীতল বর্ষার এই অভিনব রূপ।

হীরা সাগরের অনতিদূরে ঈশান কবিরাজের বাড়ী। বাড়ী পঞ্চশালায় বিভক্ত হলেও মাটির ভিটে খড়ের চাল। বাহির মহলে বাংলো প্যাটার্ণের চারিদিকে বারান্দাযুক্ত দুই কামরা বৃহৎ গৃহ। দক্ষিণের ভিটেয় টিনের বিরাট্ চণ্ডীমণ্ডপ। পূবে কবিরাজী ঔষধালয়। পশ্চিমের ভিটেয় আগন্তুক অভ্যাগতদের থাকার স্থান। তার পরেই বাঁশের বেড়া দেওয়া আড়াল করা অন্দর-মহল। অন্দরের পরে রান্না বাড়ী। আম কাঁঠালের বাগিচা। মেঠেল। বাহির দিকে রাস্তা দিয়ে ঢুকতেই দুই পাশে দুটি ফুলের বাগান। দশ বিঘে জমি নিয়ে কাঁচা আবাস স্থল। কবিরাজ মশায় ছিলেন বন্দরের অধিবাসী। সেখানে এঁরা ধনী নামে খ্যাত না থাকলেও সৎ ও বিদ্বান্ নামে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলেন। এঁদের বিখ্যাত আয়ুর্ব্বেদ ভবন ও সংস্কৃত চতুষ্পাঠী হীরাসাগরের বক্ষে বিলীন হয়ে গেছে। চোদ্দ পুরুষের কীর্ত্তিকলাপ জোতজমির এতটুকু চিহ্নও অবশিষ্ট নেই। সাতবার বাড়ীভাঙ্গার পর ঈশান নিরুপায় অতিষ্ঠ হয়ে পেঁচাচরা মাঠে এসে আশ্রয় নিয়েছেন। সাতবার গৃহ নির্ম্মাণের ফলে সর্ব্বহারা হয়ে বর্ত্তমানে তাঁর প্রায় নিঃস্ব অবস্থা। দিন এনে দিনে খাওয়া। কিন্তু নাম ও প্রতিপত্তি সম্মানের অভাব নেই। চিকিৎসা শাস্ত্রে তাঁর যেমন অভিজ্ঞতা তেমনি সুযশ গ্রাম হ'তে গ্রামান্তরে প্রচারিত। তাই তাঁকে প্রতি সপ্তাহে পরিভ্রমণ করতে হয়, দূর হ'তে দূরান্তরে। সাধারণতঃ তিনি পাল্কীতেই রোগীগৃহে যাতায়াত করেন। বর্ষার কয়েকমাস নৌকায়।

'অজগর' মেঠেলের উত্তর চালায় পাল্কীবাহক কয়েক ঘর কাহার স্ত্রীপুত্র নিয়ে ঘর বেঁধে কর্ত্তার কৃপায় জীবিকা অর্জ্জন করছে।

কর্ত্তাদের বংশের তিন শাখা। জ্যেঠতুত খুড়োতুত তিন ভাই, প্রথম শাখা চন্দ্রনাথ বিদ্যাবাগীশ, তাঁর তিন পুত্র বিদ্যমান প্রসন্ন, হরচন্দ্র, পূর্ণচন্দ্র সকলে প্রবাসী। দ্বিতীয় শাখা অমরনাথ তর্কতীর্থ। তাঁর একমাত্র পুত্র শ্রীশচন্দ্র। তৃতীয় শাখা হলধর আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রী, তাঁর বংশধর ঈশান কবিরাজ। আশ্চর্য্যের বিষয় এঁরা এক পরিবারের তিন ভ্রাতার তিন মেয়েকে বিবাহ করেছিলেন। রাসমণি অটলমণি অনেক কাল পূর্ব্বেই স্বামীদের অনুগমন করেছেন। ঈশান-গৃহিণী দুর্গামণি রয়েছেন বার বার ভাঙ্গাঘর জোড়া দিতে।

শ্রাবণের বর্ষণ-মুখর সন্ধ্যা। বৈকাল থেকে বৃষ্টির সহচর হয়েছে পূবালী প্রখর বাতাস। বাঁশবনের সন সন শব্দের সঙ্গে নদীর খল খল হাসিতে কানে তালা লেগে যায়। বৃষ্টির ঝম ঝম তান ছাপিয়ে আকাশ

গর্জ্জন করছে কড় কড় নাদে। যেন প্রলয় কাল সমাগত, কেউ ঘরের বার হ'তে সাহস করছে না। ঈশানচন্দ্র আকাশের অবস্থা দেখে বন্দরের দিকে নৌকা ভাসাতে বিরত হয়ে ঔষধালয়ের চৌকীর বিরাট ফরাসে তাকিয়া হেলান দিয়ে বাইরের দিকে চেয়ে রয়েছেন। লম্বা বেঞ্চির উপরে ব'সে হারিকেন লণ্ঠনের সামনে পাঁচটি ছাত্র অধ্যয়ন করছে। বারান্দায় দুটি চাকর হামানদিস্তায় ঔষধের গাছ-গাছড়া চূর্ণ করছে। উৎকলবাসী পূজারী ব্রাহ্মণ চক্রধর পাণ্ডা প্রকাণ্ড কালো পাথরের খলে চূর্ণ গুঁড়ো আরও মিহি ক'রে মাড়ছে।

এ সময় ঈশান চন্দ্র কখনও গৃহে আবদ্ধ হয়ে থাকতে পারেন না। প্রভাতে বেলা আটটার পর থেকে বারটা ও সন্ধ্যার পরে রাত দশটা সাড়ে দশটা অবধি নাকালিয়া বন্দরে কাটিয়ে ফিরে আসেন। সেখানেই তাঁর রোগী ও আত্মীয় স্বজন বন্ধুবান্ধব।

বাড়ীতে তিনটি দুগ্ধবতী গাভী লালমণি, ধলোমণি ও আদরিণী। গৃহে এত দুধের প্রয়োজন হয় না। ঈশানচন্দ্র নৌকাযোগে দুই বেলা দুই কলসী দুধ স্বজনদের ভেতরে বিতরণ ক'রে আসেন।

দুর্যোগের জন্যে এ বেলা বন্দরে যাওয়া হয় নি, এক কলসী দুধ পৃথক্ করে রাখা রয়েছে। ঈশানচন্দ্র ঘন ঘন বাইরে দৃষ্টি নিক্ষেপ করছিলেন, একটু 'ধরণ' হলেই তিনি নৌকা ভাসাতে পারেন।

এমন সময় মণ্ডপের পেছন দিকে বৈঠার ঠক ঠক শব্দ হ'তে লাগল। ওদিকেও একটা ছোটখাট ডোবা আছে, সরকারী মাঠের সংলগ্ন বর্ষার জলে মাঠ-ঘাট মিলে-মিশে পাথার হয়ে গেছে। কবিরাজ-বাড়ীটা চেড়া বাঁশের বেড়া দিয়ে ঘেরা হ'লেও ওদিক্ দিয়েও একটা চওড়া রাস্তা আছে বাড়ী ঢোকার।

তখনই যেন প্রখর বাতাস সহসা ঝটিকায় রূপান্তরিত হ'ল, বিদ্যুৎ ঝলকাতে লাগল। বিকট আর্ত্তনাদে মেঘ গর্জ্জন ক'রে উঠল। টিপি টিপি বৃষ্টি ঝরছে। ঘরে ও বারান্দায় সব ক'টি প্রাণী সচকিত ভাবে বাইরে দৃষ্টি নিক্ষেপ করল। একটা জলন্ত মশাল নিয়ে পাকা বড় বড় বাঁশের লাঠি হাতে জনাদশেক প্রেতের মত নেংটি-পরা লোক "আল্লাহো আকবর" জিগীর দিতে দিতে এগিয়ে এল ঔষধালয়ের সামনে।

ভীত ত্রস্ত হয়ে ছাত্রের দল উঠে দাঁড়াল। চাকরদের হামানদিস্তার ডাণ্ডি থেমে গেল, চক্রধরের খলের চূর্ণ খলেই প'ড়ে রইল। কারোর মুখে বাক্য নেই, চোখ পলক-হারা।

কেবল স্তব্ধ হয়ে থাকতে পারলেন না ঈশানচন্দ্র, তাকিয়া ছেড়ে বারান্দায় এসে উচ্চস্বরে হাঁক দিলেন, "তোমরা কারা? কি জন্যে এসেছ?"

"আমরা আইচি ডাকাতি করতে প্যাটের দায়ে।" বলতে বলতে লোকগুলো একের পর এক উঠে আসতে লাগল বারান্দায়। বারান্দার কোণে তামাকের আগুন মাটির প্রকাণ্ড একটা হাঁড়িতে সংরক্ষিত থাকত তখনকার কালে প্রতি গৃহে গৃহে। ঘষি ও তুষের আগুন দিনরাত্রি জলত ধিকি ধিকি ক'রে। গ্রাম্য লোক এ আগুনকে বলত "আলের আগুন"। মশালধারী দলপতি অগ্রসর হয়ে মশালটা ঠেকিয়ে রাখল আলের গায়ে। নির্ভীক ঈশানচন্দ্র হো হো ক'রে কৌতুকের হাসি হাসলেন, "এখনও রাত দশটা বাজে নি, এরই ভেতরে দল বেঁধে গরীবের বাড়ীতে ডাকাতি করার সখ হয়েছে? ব্যাটারা, তোদের কি ভয়-ডর নেই? সময়ের জ্ঞান কাণ্ড নেই? আমার বাড়ীর পেছনে থাকে সাজোয়ান কাহাররা পনেরো-কুড়ি জনা, তাদের পাশে নমঃশূদ্র পাড়া। তাদের কাছে লাঠি-সড়কির অভাব নেই। তারা টের পেলে তোদের কাউকে ফিরে যেতে দেবে না। আমার ঘরেও লাঠি-সোটা, সড়কী কোঁচ বল্লমের অভাব নেই। কাছেই চৌকিদারের বাড়ী।"

মুহূর্ত্তে অতগুলো কাল কুৎসিত মুখ ভয়ে পাণ্ডুর হয়ে গেল। তারা হাতের লাঠি নামিয়ে মেঝেয় ব'সে পড়ল।

বিহারী ও তারিণী নমঃশূদ্র ভৃত্যদ্বয় হামানদিস্তা সরিয়ে এক দৌড়ে নিজেদের শোবার ঘর থেকে দু'খানা মাদুর এনে বিছিয়ে দিয়ে অভ্যর্থনা করল, "ভাই সগল, আপুনিরা ওইদিকে স'রে ব'স, গায়ে বৃষ্টির ছাট লাগছে। তামুক সাজি।"

অবিরত আগন্তুক অভ্যাগত ও রোগীদের আনা-গোনায় এ বাড়ীর ভৃত্যসম্প্রদায়ের মধ্যে একটা শিষ্টাচার-বোধ জন্মেছিল। আর তাদের গায়ের জোর ও সাহস অপরিমিত। নমঃশূদ্র তরুণেরা অমন ভাতে-মরা লিক-লিকে চেহারার মরদদের হাতের লাঠি দেখে ভীত হবার পাত্র নয়।

কলিকা সাজার আয়োজনে ঈশানচন্দ্র তাঁর পরিত্যক্ত স্থানে ফিরে এসে বসলেন। তাঁর পিছনে পিছনে ডাকাতদের দলপতি ঘ'রে ঢুকে মেজেয় উপু হয়ে ব'সে নিবেদন করতে লাগল, "করতা, আমাগরে আসা বেথা ক'রে দিবে না। মা কালীর নামে ভরা গাঙ পাড়ি দিয়ে আইচি। ট্যাকা পয়সা ধান চাল সোনা রূপা যা হয় ফ্যালায়ে দ্যাও, আমরা স'রে পড়ি, কাজ্যা কের্জনে কাম

নাই। আমরা আসলে চোর ডাকাত না, করতা, এখন ক্ষ্যাতের কাম নাই, ঘরামির কাম নাই, ঘরে দানা না প্যায়ে পোলাপানরা শুখায়ে মরবে, তাই পরাণের দায়ে গাঁথরের কয়ডা মাস আমাগরে লাঠি নিয়ে বার হইতে হয়। আপুনিরা ধনী, আল্লার দোয়ায় আরো পাবেন।"

ঈশানচন্দ্র গম্ভীর হয়ে বলেন, "কে তোদের খবর দিয়েছে আমি ধনী লোক। যার সাতবার বাড়ী-ঘর ভেঙ্গে যায়, সাত কেন এবার দিয়ে আটবার মাথা গোঁজার ভিটে বাঁধতে হয়, তার আবার থাকে কি রে? থাকুক বা না থাকুক, তোরা এমন অপকর্ম্ম করিস্ কেন? ধরা পড়লে যে কয়েদ হবে সে ভয়ও নেই? তোদের বাড়ী কোথায়?"

"আজ্ঞে, চরে। আমরা খুন-খারাপি করি না, ম্যায়ালোকের গায়ে হাত দেই না। আমাগরে ওস্তাদের মানা। লাঠি সড়কির ডর দ্যাখায়ে যা পাই তাই দিয়া পরাণ বাঁচাই করতা। আপনার বড় ছাওয়াল তিন জনা জবর রোজগার করে। কিছুবাবু নাকি আসামে ইঞ্জিয়ার সায়েব হইয়া মারপাট দিয়া ট্যাকা কামায়। ওই প্যাট কাটা ঘর তেনার নক্‌সা। সগলে কয় কিছুবাবু হাজার হাজার ট্যাকা ডাকে পাঠায়ে দেয়। আপনার তিন ভাই আরও দুই ছাওয়াল পাঠায়ে দেয়। কর্ত্তামার গায়ে সোনা ঝলক দেয় আঁধারে।"

"হাঁ, সাদা শাঁখা দুটো ঝলক দেয় বটে। কিছু আমার বড় ভাইয়ের ছেলে, ছেলে-বয়েসে বাপ-মা মারা যাওয়ায় আমরাই মানুষ করেছি। আসামে সে বড় কাজ করে, সেখানে তারও সংসার আছে। পুজোর সময় তারা সকলে বাড়ীতে আসে, ধুমধাম ক'রে পুজো ক'রে যায়। বারো মাসে তাদের সাথে আমার টাকার কারবার বিশেষ থাকে না। আমার ভাইরা কলকাতার ফতেবাবু, যেমন উপার্জ্জন তেমনি গাড়ীঘোড়ায় উড়িয়ে দেয়। আমার বড় ছেলে সেখানে কবিরাজি করে। কাকাদের কাছে থাকে, সংসার টানতে হয় সেখানে। যা পারে মাঝে মাঝে পাঠিয়ে দেয়। ছোট ছেলে স্কুলে পড়ে। তোরা ভুল খবর পেয়ে এসেছিস। আমার কিছু নেই। দিন আনি দিন খাই। তোদের মাঠা'নের সোনার ঝলক গাঙ ভাঙ্গার সময় চালাঘর থেকে তোরাই নিবিয়ে দিয়েছিস। আমার ঘরে সোনার রূপার কুটিও নেই।"

দলপতি "তোবা তোবা" ক'রে কানে আঙ্গুল দিল, "না করতা, তোমাগরে ভাঙ্গনের সময় আমরা যে ছাওয়াল মানুষ ছিলাম। আমার বাপজানের লগে রথের মেলায় যাইয়্যা তোমাগরে বাড়ীতে জলপান খাইয়্যা আইছিলাম। তখন তোমাগরে লম্বা দালান কোঠায় পাঠশালার পড়ন হইতো। দপ দপ করছে কোঠা বাড়ী, গম গম করছে লোকজন। ভাঙ্গনে সর্ব্বস্বি গেল তলায়ে।"

"হ্যাঁ, সর্ব্বস্ব, দেবোত্তর ব্রহ্মোত্তর জোতজমা চোদ্দ পুরুষের ভিটে মাটি বিসর্জ্জন দিয়ে এই খাজনা করা জমিতে বসত করছি। তোর নাম কি রে?"

"নাম যে কইতে মানা করতা, নাম জানা থাকলেই ধরা পড়ার ডর," বলতে বলতে দলপতি দুই হাতে পেট চেপে "মা রে মা রে" আর্ত্তনাদ ক'রে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল।

বারান্দা হ'তে তার দুই সহচর ছুটে গিয়ে গায়ের জোরে পেটে ডলাই মলাই সুরু করতে লাগল।

ঈশানচন্দ্র তীক্ষ্ণ নেত্রে বারেক দলপতিকে লক্ষ্য ক'রে প্রশ্ন করলেন, "ওর অম্লশূল ব্যথা কত দিন হ'ল হয়েছে? কোন ওষুধপত্র খেয়েছে কি?"

দলপতি যন্ত্রণায় কুঞ্চিত হয়ে কান্নায় ভেঙ্গে পড়ল, "মাসেক ছয় এই কাল রোগ আমার প্যাটে বাসা বাঁধিছে করতা, থাকি থাকি মরণ কামড় মারে। পীরের দরগার ধুলাপরা খাইচি তবু আরাম হলি নে।"

তখন রজনী গভীরতার দিকে পদক্ষেপ করছে। ঝড়ো বাতাস এ প্রান্তের জমাট মেঘের স্তূপ উড়িয়ে দিয়ে ছিন্ন ভিন্ন ক'রে অন্য প্রান্তে স'রে যাচ্ছে। বায়ুর প্রতাপে বৃষ্টির বেগ মন্দীভূত হয়েছে। গোটা গ্রামখানা যেন মহানিদ্রায় মগ্ন। কোথাও আলোকের চিহ্ন নেই, জাগরণের সাড়া নেই।

ঈশানচন্দ্র চক্রধরকে একটা ঔষধের নির্দ্দেশ দিয়ে এক ছাত্রকে বাড়ীর ভেতর থেকে গরম জল ক'রে আনতে বললেন।

গরম জল সংযোগে এক পুরিয়া ঔষধ সেবনের পরে দলপতির সুস্থ হয়ে উঠে বসতে বিশেষ সময় লাগল না।

ঈশানচন্দ্র ঔষধের প্রতিক্রিয়ায় প্রসন্ন হয়ে বললেন, "তোকে আমি একমাসের ওষুধ দেব। আমার কথা মত নিয়ম ক'রে খাওয়া দাওয়া করবি, ওষুধ খাবি, তাহলেই রোগ সেরে যাবে। কিন্তু ওষুধ দিতে হ'লে আমার খাতায় রোগীর নাম লিখে রাখতে হয়?"

দলপতি ঔষধের গুণে যন্ত্রণার লাঘবে আরাম বোধ করছিল, কৃতজ্ঞ হৃদয়ে অনুচ্চস্বরে বললে, "করতা, আপুনি মেহেরবাণী ক'রে আমারে জানে বাঁচালে, তোমারে নাম না কইলে কইবো কারে? নাম আমাগো রহিম সর্দ্দার।

আমারে কি কইবেন, কি খাতি দিবেন, কয়ে বুলে দিলে আমরা নায়ে যায়ে গাও ছাড়ে দিই।"

"এখনও ঝড় থামে নি, এর ভেতরে তোরা নদী পার হয়ে চরে যেতে পারবি না। রাতটা এখানে খেয়ে দেয়ে শুয়ে থাক্, ভোরের দিকে নৌকা ছাড়িস। ভয় নেই, আমার কাছে ব্যারাম দেখাতে এসেছিস, শুনলে কেউ কোন কথা বলবে না।"

"করতা, আমরা সগলে আপুনির কেনা বান্দা হইয়া রইলাম। আমরা একডা-আধডা মানুষ নয়, দশটা আইছি, এত রাতে ভাত বেন্ননের ঝামেলায় কাজ নাই। চারডা ক'রে চিড়্যা গুরমের জলপান দিবেন, তাই প্যাটে দিয়ে প'ড়ে রইমু। এখন আপুনি খাওন-দাওন কর‍্যা জিরায়ে লন গে। ওষুদ-পত্তর দ্যান, যতন ক'রে বাঁদে ছাঁদে থুই।"

ঈশানচন্দ্র চক্রধরকে ঔষধের নির্দেশ দিয়ে রহিমকে উপদেশ দিতে লাগলেন খাদ্যের বিষয়ে। কি খাদ্য গ্রহণ করতে হবে, কি দ্রব্য এক মাস যাবৎ বর্জ্জন করতে হবে তার বিশদ বিবরণ দেওয়া শেষ ক'রে বললেন, "এক মাস ওষুধ খাবার পরে তুই আবার আমার সঙ্গে দেখা ক'রে যাস্, সাবধানে থাকলে আর ব্যথা উঠবে না জানি, তবু যদি ওঠে, ফের চ'লে আসিস্। তোদের মতন অমন দশজন-বিশজন লোক আমার বাড়ীতে কত আসে, কত যায়। দশখানা গাঁয়ের লোক যারা ষ্টীমার ঘাটে আসে, তাদের আস্তানা এখানেই। ওতে আমাদের ঝামেলা নেই। তোরা যাত্রা ক'রে এসেছিলি, তোদের অমনি ফেরা উচিত হবে না। আমার কাছে যা সামান্য আছে তাই দিচ্ছি, আর এক বস্তা চাল তোদের নৌকোয় তুলে দেওয়াচ্ছি, সবাই ভাগ ক'রে নিস্। একটা কথা তোদের খোদার নামে ব'লে যা, আর কোনদিন ডাকাতি করতে বের হোস্ নে, শরীর খাটিয়ে মেহনত ক'রে খাস্, তা হলেই খোদা দুঃখ দূর করবেন।"

রহিম সর্দ্দার কর্ত্তার পায়ে মাথা নামিয়ে কৃতজ্ঞতায় বিগলিত হ'ল।

কর্ত্তা অন্তঃপুরে প্রবেশ ক'রে ডাক দিলেন, "বড়-বৌ"।

বড়-বৌ দুর্গামণি রাত্রের রন্ধন শেষ ক'রে যে এক কলসী দুধ আজ বিতরণ করা হ'ল না, ঝি ব্রজেশ্বরীকে তার ব্যবস্থা করতে উনুনের সামনে বসিয়ে দিয়েছিলেন।

কর্ত্তার সাড়া পেয়ে বাইরে বেরিয়ে এলেন।

ঈশানচন্দ্র বললেন, "তোমার এবেলার রান্না বুঝি হয়ে গেছে? অতিথি এসেছে দশজনা। তাদের কি দিয়ে খেতে দেবে? বেশি মাছ আছে ত?"

দুর্গামণি স্বামীর মুখের পানে বারেক চেয়ে ভেবে জবাব দিলেন, "বাড়ীর লোকদের কম ক'রে দিলে যা মাছ আছে তাতে দশ জনার কুলিয়ে যাবে। ছেলেমেয়ে, বউমা বাড়ীতে নেই, রাতে তোমার খাওয়া নেই, কত আর লাগবে? তবে ভাত ডাল চড়াতে হবে, আমি দু'উনুনে এক্ষুণি চড়িয়ে দিয়ে আসছি। রাত হয়ে গেছে তোমার দুধ গরম ক'রে আনি।"

"এখন নয়, পরে দিও। ডাল-ভাতের বদলে খিচুড়ি করলেও মন্দ হয় না। দুধ ত আজ দেওয়া হ'ল না, দুধ দিয়ে কি করতে চাও?"

"ক্ষীর করতে ব্রজেশ্বরীকে বসিয়ে দিয়েছি, এখন ভাবছি ক্ষীর না ক'রে চাল দিয়ে পায়েস ক'রে দিলে লোকগুলো খেয়ে পরিতৃপ্ত হবে। বাদলের দিন খিচুড়িই রেঁধে দেই। যারা এসেছে তারা কি রোগী? রোগ দেখাতে এত লোক কোথা থেকে এল?"

"না, ঠিক রোগী নয়, কাল শুনো ওদের কথা। চক্রধর কিম্বা মুরারীকে রান্নাঘরে ডেকে নাও, তুমি একা একা পেরে উঠবে না।"

"হাঁ, তোমার চক্রধর রান্নাঘরের উপযুক্ত মানুষ, এক গেলাস জল গড়িয়ে খেতে কলসী ভেঙ্গে ফেলে। আমার রান্না হয়ে গেলে মুরারীকে ডাকব, তখন সে পরিবেশন করবে। আমি ননীর পুতুল নই, ওই ক'টা লোকের জন্যে রাঁধতে গ'লে যাব না।" বলতে বলতে দুর্গামণি রন্ধনশালায় ঢুকলেন।

ষাট-সত্তর বছর পূর্ব্বে পল্লীগ্রামে খাদ্য জিনিষের দাম ছিল না। দাম ছিল টাকার। নিম্ন মধ্যবিত্তরাও লোককে একটা টাকার পরিবর্ত্তে পাঁচ সের ধান-চাল দান করতে কুণ্ঠিত হ'ত না। ঈশানচন্দ্র হীরা সাগরের প্রলয় নর্ত্তনে বিব্রত ও বিত্তহীন হলেও তাঁদের বৃহৎ একটা জোত ছিল উমারপুরে। জমিগুলি বর্গা দেওয়া ছিল চাষীদের মধ্যে। গ্রামটাও চাষী-প্রধান। ফসলের অর্দ্ধ অংশ চাষাদের, অর্দ্ধেক জমির মালিকের সর্ত্ত। তখনকার লোকদের ভেতরে ছিল ধর্ম্মভাব ও সততা। ঈশানচন্দ্রের পক্ষ থেকে কোনদিন কাউকে যেতে হয় নি, জমি পর্য্যবেক্ষণ করতে। ফসল কাটার সময় ভাগ, বখরা করতে। বর্গাদার চাষীরাই নৌকা বোঝাই ক'রে দিয়ে যেত। ধান সরিষা তিল যব ও মাষকলাই মটর খেঁশারী। গাভীদের জন্যে ধানের খড়। নিজেদের বাড়ী-ঘরের মত নিজেরা এসে, ধানের মরাইতে ধান

তুলে দিয়ে যেত। গোলা ঘরের মাচানের উপরে বাঁশের চাটাই দিয়ে বোনা ডোলে রেখে দিত শস্য-সম্ভার, গোশালার সন্নিকটে পাহাড়ের ন্যায় খড়ের পালা দিয়ে রাখত গরুর খোরাক।

উমারপুরের জমিতেই প্রায় বছর এঁদের কেটে যেত খেয়ে, খাইয়ে। তা ছাড়া গ্রামের আশেপাশেও খণ্ড খণ্ড কতকগুলি ধেনো জমি ছিল, তাতেও ধান আসত রাশি রাশি। কলুবাড়ীতে সরিষা পাঠিয়ে তেল ক'রে আনা হ'ত। তেল খেত মানুষে, খইল খেত গাভীরা।

যব খোসা ছাড়িয়ে ভেজে ছাতু কোটা হ'ত গ্রীষ্মকালে। প্রভাতে ঝি'চাকর ও কর্তার ছাত্রের দল ছাতু গুড় খেয়েই কাটিয়ে দিত গোটা গ্রীষ্মকাল। তিলের নাড়ু তৈরি ক'রে রাখা হ'ত মাটির পাকা হাঁড়িতে। তখন পাড়াগ্রামে ভদ্রতা রক্ষার একালের মত উপকরণ থাকত না। সাধারণ গৃহস্থবাড়ীতে মাননীয় অতিথিদের সামনে ধ'রে দেওয়া হ'ত তিলের নাড়ু, নারিকেলের নাড়ু, দুধের দুই-একটা গৃহজাত মিষ্টান্ন। আম জাম কাঁঠালের সময় ত কথাই ছিল না। এমন বাড়ী ছিল না যেখানে ফলবান্ বৃক্ষ বিরল। প্রতি গৃহে গরুবাছুর। তারা দিগন্তপ্রসারিত চ'রে চরে খেয়ে দুধ দিত প্রচুর। কাঁচা ঘাসের গুণে যেমন তাদের দুধের স্বাদ, তেমনি নধর-কান্তি রূপ।

ঈশানচন্দ্রের গৃহে গণ্ডা দুই ঝি-চাকর নিত্য বিরাজিত, তখন ঝিদের বেতন ছিল না। খাওয়া-পরাই যথেষ্ট। গোচালক বালক রাখালদেরও মাইনা দিতে হ'ত না। বড় চাকররা কেউ পেত এক টাকা, কেউ পাঁচ সিকে। দুই টাকার ওপরে মাইনা কল্পনার বাইরে।

বন্দরের কুণ্ডুদের মেয়ে ব্রজেশ্বরী করত এ-বাড়ীর রান্না ঘরের কাজ অর্থাৎ সে জল আচারণীয়া। নমঃশূদ্র জাতি অন্নদা বাইরের কাজকর্ম্ম ও বাসন মাজায় নিযুক্ত হয়েছিল, তার বার তের বছরের ছেলে শ্যামাচরণ গরুর রাখাল। সাত-আট বছরের মেয়ে প্রমদা মায়ের সঙ্গে টুকটাক ফরমাইজ খেটে এই বাড়ীর অন্নে উদর পূরণ করত। এদের মাহিনা ছিল না। তিন বেলা খাওয়া, পরিধানের বস্ত্র, মাথায় মাখার তেল, পান দোক্তা পেলেই এরা পরম পরিতৃপ্ত।

পুরাতন দাসী দ্রৌপদীর মার জগতে কেউ নেই, শিশু দ্রৌপদীকে নিয়ে বিধবা হয়ে সে এখানে প্রথমে আশ্রয় নিয়েছিল। প্রথম ও শেষ তার এখানেই পরিস্থিতি। 'দেরপোর মা' নামটুকু রেখে পরে দ্রৌপদী বহুকাল পূর্ব্বেই অনন্ত পথে যাত্রা করেছে। কেউ কেউ তাকে ডাকে দেরপোর মা, আর সকলে বুড়ো দিদি।

দুর্গামণি তাঁর দক্ষিণদ্বারী শয়নগৃহের পেছনে বুড়ো দিদির দোচালা খড়ো ঘর ক'রে দিয়েছেন। দুর্গামণি সামনে একটা বারান্দা রাখতেও ভুল করেন নি। বুড়ো দিদি গোবর মাটি দিয়ে লেপে পুছে ঘর বারান্দা মাটির ডোয়া ছবির মতন ক'রে রাখে। ঘরে তক্তপোশের উপরে তার স্বহস্তে রচিত নক্সাকাটা কাঁথার বিছানা পাতা। এককালে সূচিশিল্পে পারদর্শিনী বুড়ো দিদির মতন কেউ ছিল না। এখন দৃষ্টিশক্তি কমে গেছে, সূক্ষ্ম শেলাই করতে হাত কাঁপে। তাই বুড়ো দিদি নিয়েছে অন্য কাজ। তার বাতিক ফল ও তরকারি উৎপন্ন করা। বাড়ীর আলানে-পালানে শশার মাচা, বেগুন ক্ষেত, লঙ্কা গাছের ঝাড়, লাউ, কুমড়া, ঝিঙের লতার সমাবেশ। এসমস্তই বুড়ো দিদির স্বহস্তে রোপিত। যার জগতে কেউ নেই তার নিবিড় সম্পর্ক 'গ'ড়ে উঠেছে গাছপাতার' সঙ্গে। গাছগুলো তার প্রাণস্বরূপ। তার কল্যাণে এ বাড়ীতে তরকারি বিশেষ কিনতে হয় না। আর নিত্যনৈমিত্তিক সংসারযাত্রায় তেমন প্রয়োজন হয় না জ্বালানী কাঠের। দিনভোর বুড়ো দিদি একটা ঝুড়ি হাতে ঘুরে বেড়ায় এ বাগান থেকে সে বাগানে। নূতন মাটিতে বিরাট্ ফলের বাগান তৈরি হয়েছে। যে সময়ের যে ফল, নারিকেল তাল, আম, কাঁঠাল, জাম, জামরুল, খেজুর, বাতাবী, পেয়ারা, আতা, নোনা, কুল, লিচু, কলা ও আনারস। কোনটারই অভাব নেই।

গাছের মরা ডাল ভেঙ্গে পাতা ঝাড় দিয়ে বুড়ো দিদি শুখিয়ে রাখে বাঁশের মাচায় তুলে। গোবর দিয়ে ঘষি করে রাখে ডোল ভ'রে। এখন তাকে কেউ কোন কাজের কথা বলে না। ভার দেয় না। সারা জীবন খেটে সে বাড়ীর একজনাই হয়ে গেছে, কিন্তু বুড়ো দিদি কাজ না পেয়ে অকাজে জীবন কাটায়। কেউ তাকে নিবৃত্ত করতে পারে না। সারাদিন খেটেখুটে সন্ধ্যাবেলা সে গা ধুয়ে শুদ্ধ হয়ে কপালে তিলক কেটে তার ঘরের দাওয়ায় চট পেতে বসে জপের মালা নিয়ে। ব্রজেশ্বরী রাত্রে বাড়ীতেই থাকে। থাকে না অন্নদা, সন্ধ্যায় দ্বিপ্রহরের রাখা ভাত তরকারী খেয়ে ছেলেমেয়ে নিয়ে ঘরে ফিরে যায়। ঘর তার কাছেই, লাহিড়ীদের মেঠেলের চালায়।

ঈশানচন্দ্রের অন্দর মহলের এই বিধান। বাহির মহল গমগমে। চক্রধর ঠাকুর, ছাত্রের দল ও দুই চাকর।

ঝাড়ের কলার পাতা কেটে ধান চালে বস্তা পেতে ও মাটির গেলাসে জল দিয়ে বাইরের ঘরে রহিম সর্দ্দারদের খেতে বসান হ'ল। কর্ত্তার দুই ছাত্র মুরারী ও বলাই সকলকে পরিবেশন ক'রে খাওয়াল। অতিথি দেবতা, এই বিশ্বাসে দুর্গামণি সেই রাত্রে যথাসাধ্য আয়োজন করেছিলেন। বুড়ো দিদির খেতের সদ্য তোলা বেগুন ভাজা, কলাইয়ের ডালের খিচুড়ি, ঠাকুর-ভোগের নিরামিষ তরকারি ও মাছের ঝাল। কাঁচা তেঁতুল পোড়া চাটনী আর খোরা ভরা ভরা পায়েস, যে যত খেতে পারে।

সকলকে খেতে বসিয়ে গৃহিণী শয়নগৃহের মেঝেয় কর্ত্তাকে জল খেতে দিলেন। দুধ খই, একটুখানি পায়েস, কর্ত্তার রাতে ভোজন সহ্য হয় না। সেই জন্য লঘু খাদ্যের ব্যবস্থা। যেদিন থেকে কর্ত্তা রাতের আহার অল্প ক'রে নিয়েছেন, সেই দিন হতে দুর্গামণিও রাত্রে ভাত খাওয়া ছেড়ে দিয়েছেন। স্বামী যে সাক্ষাৎ দেবতা, তিনি যে দ্রব্য গ্রহণ না করেন, স্ত্রী তা গ্রহণ করতে পারেন না।

ঈশানচন্দ্র জলযোগ করতে ব'সে দুধ খই-ই খেলেন বটে কিন্তু পায়েসের বাটি থেকে দু' আঙ্গুলে ক'রে একটু পায়েস তুলে মুখে দিলেন। তিনি মুখে না তুললে দুর্গামণির খাওয়া হবে না। সেই জন্যে অনেক সময় বাধ্য হয়ে তাঁকে অনেক কিছু ঠোঁটে ছোঁয়াতে হয়।

ঈশানচন্দ্র মুখ ধুয়ে হরিতকীর টুকরো মুখে দিয়ে খড়মের ঠকাস ঠকাস শব্দ ক'রে যখন ফের বাইরে উপস্থিত হলেন, তখন রহিম সর্দ্দারদের খাওয়া হয়ে গেছে। আগুনের আলের চার পাশে তারা গোল হয়ে ব'সে তামাক খাচ্ছে। মুসলমানদের হুঁকো তিন-চারটের বেশি বাড়ীতে নেই, মাটির কল্কে আছে অসংখ্য। কেউ কেউ হুঁকো টানছিল আর বাকীরা দুই হাতে জ্বলন্ত কল্কে মুখের কাছে চেপে ধ'রে তামাকের আস্বাদ গ্রহণ করছিল।

কর্ত্তার আগমনে সকলেই শশব্যস্তে হুঁকো কল্কে নামিয়ে উঠে বললে, "করতা, সালাম, পরাণ ভর্য়া খাইছি সগলে। এহন হুকুম হইলে নায়ে যায়ে শুইয়া থাকি, গাঁথর কমতি হলেই নাও ছাড়্যা দিমু।"

"এখানেও তোমাদের শোবার জায়গা আছে, তবে নৌকা তোমাদের খালি থাকবে, গাঁয়ে এ সময় তোমাদের জুড়িদারের অভাব নেই। আমার লোকেরা তোমাদের নৌকায় দুইমনা এক বস্তা চাল রেখে এসেছে। তোমরা ঘরে ফিরে সবাই ভাগ ক'রে নিয়ো। আর এই নাও, আজ আমার বাক্সে সাত টাকা তিন আনা তিন পয়সা মাত্র সম্বল ছিল, দিলাম। তোমরা তোমাদের খোদার নামে ব'লে যাও আর ডাকাতি করতে বার হবে না ; মেহনত ক'রে খাবে।" ব'লে রহিম সর্দ্দারের সামনে মুঠো মেলে ধরলেন।

রহিমরা দু পা পিছিয়ে কানে আঙ্গুল দিল, "তোবা, তোবা, করতা, তোমাগো ট্যাকা পয়সা মোরা লিতে লারবো। চাইল দিলেক, মাথায় তুল্যা লইলাম। আপনাগো দোয়ায় পরাণ ভর্য়া প্যাটে দানা দিইচি, দাওয়াই পাইচি। দাওয়াইয়ের দাম যে আমাগোই দেওন লাগে। তোমাগো নিমক খাইচি, নিমকহারামী কইতে কইবেন না করতা। আপনি দ্যাবতা, দ্যাবতার ব্যাভার করিছেন।" বলতে বলতে রহিম হাত জোড় করল।

কর্ত্তা হাসলেন, "নে ব্যাটা, হাত পাত্। বাড়ীতে আমি রোগী দেখে ওষুধ দিয়ে পয়সা নেই না। আমার বাবার মানা। সকলেরই জানা আছে। আমি বাড়ীতে রোগী দেখে পয়সা না নিলেও রোগীর বাড়ী গেলে টাকা না নিয়ে ফিরে আসি না। তেমনি তোদেরও নিয়ম আছে। শুধু হাতে ফিরতে নেই। তুই ওষুধ খেয়ে খাবার দাবার দিকে নজর রাখিস। আবার যদি ব্যথা ধরে, আমাকে দেখিয়ে যাস, না ধরলে একমাস ওষুধ খেয়ে ফের আসিস।"

রহিম সজল নয়নে কর্ত্তাকে আভূমি নত সেলাম ক'রে হাত পেতে টাকা পয়সা গ্রহণ ক'রে বললে, "করতা, মেহেরবান, আইজ থেক্যা আপুনি আমার বাপজান হইলেন। মোগো মরা বাপকে ফির্যা পাইচি। আমরা এহনে চলি। মশালডা উঠানের মধ্যিখানে গ্যাড়ে র‍্যাখা যাই, মশাল নিবায়ে গেইলে সংসারের ভাল হয় না। জ্বালায়ে গেইলে দবদবে গবগবে হইয়া ওঠে।"

অঙ্গনের আর্দ্রমৃত্তিকায় প্রজ্বলিত মশাল পুঁতে রেখে রহিম সর্দ্দাররা বিদায় নিল। ঈশানচন্দ্র ফের খড়ম বাজিয়ে শয়নগৃহে ফিরে গেলেন।

রজনীর প্রবল ঝড়বৃষ্টি প্রভাত-সূচনায় প্রশমিত হল। ক্ষান্তবর্ষণ আকাশে দুঃখের হাসির মত ম্লান রৌদ্র তরুশিরে লুটিয়ে পড়ল। রাত্রের ঘটনাবলী দিবসারম্ভের সঙ্গে সঙ্গে পল্লীবাসীদের জানতে বাকী রইল না। কাহার ও নমঃশূদ্রেরা দল বেঁধে এল মনের খেদ মিটাতে। জেলে পাড়ারাও চুপ ক'রে থাকতে পারল না। কর্ত্তার সহৃদয়তা ও সৌজন্য তা'রা মেনে নিতে চায় না। চর থেকে নেংটি পরা ক' ব্যাটা নেড়ে এসেছিল এ গাঁয়ে ডাকাতি করবার সাহস নিয়ে। কতবড় বুকের পাটা, কতবড় আস্পর্দ্ধা। তা'রা ঘুণাক্ষরে টের পেলে

তাদের জন্মের মত ডাকাতি করবার সখ মিটিয়ে দিতে পারত। এ অসম্মান ত কর্ত্তার নয়, গাঁয়ের জোয়ান মরদদের। যে 'গাঁথরে' চাষীর ঘরে একমুঠো ধান-চাল নেই, সেই দিনে কর্ত্তা তাদের জামাই আদরে খাইয়ে ওষুধ দিয়ে ক্ষান্ত হ'লেন না, দুই মণ চাল ও টাকা পয়সা দান ক'রে বিদায় দিলেন। এ দুঃখ তা'রা রাখবে কোথায়? ব্যাটাদের নাম জানা গেলে এই দণ্ডে লাঠি-সোটা নিয়ে তারা চরে ধাওয়া ক'রে সব ব্যাটার মাথা কেটে আনবে।

কর্ত্তা বিক্ষুব্ধ জনতাকে মধুর বাক্যে শান্ত করতে লাগলেন, "এ তোরা কি বলছিস? কেউ ডাকাতি করতে আসে নি, দুঃখে প'ড়ে ভিক্ষা নিতে এসেছিল। ভিক্ষা না দিলে তোদের গ্রামের মান থাকত কি? তোদের খবর দিলে তোরা এসে দুই দলে লাঠালাঠি খুনোখুনি করতিস ত? থানা পুলিশ ভিন্ন লাভ হ'ত কার? এ সময় চোর ডাকাত সাধু এক সমান হয়ে যায়। অত বিচার করতে নাই। ক'দিন আগে কাশীপুর জমিদার-বাড়ীতে রোগী দেখতে গিয়েছিলাম। কইজুড়ির হাট দিয়ে আসবার সময় সুবিধা দরে ষোল মণ মোটা চাল এনেছিলাম। ওদেরও দুই মণ দিয়ে দিয়েছি। তোদের যার ঘরে চাল নেই, তারা তারা এক বস্তা ভাগ ক'রে নিয়ে যা। ভেতরে তোদের মাঠা'নের কাছে যা, তিনি দিয়ে দেবেন।"

বর্ষার সময় ধানচালের মূল্য বেশি, কাজেই এই অপ্রত্যাশিত প্রস্তাবে সবগুলি চোখ উৎসাহে উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

এমন সময় লাহিড়ী-বাড়ীর সার্ব্বজনীন কর্ত্তামা গোবিন্দমণি আসরে অবতীর্ণ হলেন। লাহিড়ীরা চৌদ্দ-পুরুষের প্রতিবেশী ঈশানচন্দ্রদের। দুই পরিবারের ভাগ্যসূত্র বিধাতা যেন একসঙ্গে বেঁধে দিয়েছেন। এরাও হীরাসাগরের কল্যাণে ভিটেমাটি হারিয়ে এদের সহযাত্রী হয়ে আবার পাশাপাশি হয়েছেন। এঁদের সঙ্গে সম্পর্কের বন্ধন না থাকলেও উভয় পরিবার পরস্পরের আত্মার আত্মীয় হয়ে গেছেন। লাহিড়ীদের জ্যেষ্ঠ যিনি, নাম মহেশচন্দ্র লাহিড়ী, তিনি ঈশানচন্দ্রদের কলকাতার বাড়ীতে থেকেই সরকারী অফিসে চাকরী করেন। তাঁর দুই ছেলে সেখান থেকেই কলকাতার ইস্কুলে লেখাপড়া করছে।

কর্ত্তামা বললেন, "হাঁ ইশেন, একি কথা শুনছি? রাতে বাড়ীতে ডাকাত পড়েছিল, তুমি কাউকে না জাগিয়ে তাদের ভূরিভোজন করিয়ে চাল টাকা দিয়ে নাকি বিদায় করেছ? এতে চোর ডাকাতদের আস্কারা দেওয়া হয়। কাল এখানে এসেছিল, আজ আমার ঘরে ঢুকলে তখন? দোষীকে শাস্তি না দিলে তার সাহস বেড়ে যায়।"

চিরকালের প্রতিবেশিনী সুবাদে ঈশানচন্দ্র কর্ত্তা-মাকে কাকীমা ব'লে ডাকতেন, সম্মানের সঙ্গে কথা বলতেন। তিনি নতনেত্রে উত্তর দিলেন, "না, না ওরা সামান্য চাষাভুসা মানুষ, চোর ডাকাত নয়। ঘরে চাল ছিল না বলে চাইতে এসেছিল। আপনার বাড়ীতে ডাকাত ঢুকবে কেন? ঢুকলেও আমরা ত আছি।"

"হ্যাঁ, তোমরা যা আছ তা আমার বিলক্ষণ জানা আছে। যত মুল্লুকের বদ্‌লোক তোমার কাছে কখনও শাস্তি পায় নি, পুরস্কার পেয়েছে। মজুমদার-বাড়ীর বিধবা বৌটাকে নিয়ে কি গোলমালটা না হ'ল গাঁয়ে। সকলে তাদের একঘরে ক'রে রাখল। তুমি তাকে গঙ্গা-স্নান করিয়ে ঠাকুরের চরণামৃত খাইয়ে শুদ্ধ ক'রে নিলে। সকলের আগে তাদের বাড়ীতে তুমি পাতা পেতে খেয়ে জাতে তুলে দিলে। সেই দিন থেকে সকলে তোমার নাম রেখেছে পতিত-পাবন। সংসারে থাকতে গেলে সব জায়গায় 'পতিতপাবনগিরি' করলে কি চলে বাবা?"

"চলে না যে, সে আমি জানি কাকীমা। যে ক্ষেত্রে অচল তা আমি চালাতে যাই না। কিন্তু যেখানে চল হবার সম্ভাবনা সেখানে অচল ক'রে রাখা কি পাপ নয়? মানুষ মাত্রেই ভুল ভ্রান্তি করে, তা গেরো দিয়ে রাখলে কি চলে? আপনি ত ভাগবত পুরাণ রাতদিন শুনছেন, তার মধ্যে কি দেবতাদের ত্রুটিবিচ্যুতি জানতে পান না?"

"সে যে দেবতার দেবলীলা, দেবতার সাথে মানুষের তুলনা?"

"শক্তিমান্ দেবতা যে প্রলোভন দমন করতে অক্ষম, দুর্ব্বলচিত্ত নগণ্য মানুষ কি তাতে সক্ষম হতে পারে? দেবতার দেবলীলা, মানুষের বেলাতেই যত দোষ। যেটা দূষণীয় সেটা সকলের কাছেই সমান হওয়া উচিত।"

কর্ত্তামা জবাব দিতে দিতে মুখ তুললেন বটে কিন্তু ভিন্ন গ্রামের অপরিচিত কয়েকটি রোগীর আবির্ভাবে জবাব দেওয়া হ'ল না। মাথার কাপড় আরও একটু টেনে দিয়ে তিনি ভেতরে চ'লে গেলেন।

গত রজনীর ঘটনা নিয়ে তখন অন্তঃপুরে দাসী মহলে তুমুল আলোচনা আরম্ভ হয়েছে। অন্নদা ছেলেমেয়ে সহ এসেই যোগ দিয়েছে বুড়োদিদি ও ব্রজেশ্বরীর সঙ্গে।

বাড়ীতে এত বড় কাণ্ড হ'ল অথচ, তারা কিছুই জানতে পারল না। বুড়োদিদির সর্ব্বাপেক্ষা আক্ষেপ—মুখপোড়া বিহারী মাথায় বাঁশের মাথাল চাপিয়ে লণ্ঠন ধ'রে তার বেগুন ক্ষেত উজাড় করেছে পট পট শব্দে বেগুন তুলে। ডাকাত খাওয়ানোর এত ধুম আগে টের পেলে বুড়োদিদি আঁশবঁটি দিয়ে তাদের নাক কেটে দিয়ে ক্ষান্ত হ'ত। ভদ্দরলোকের সবই বিকট, আদর ক'রে ডাকাত খাওয়ায়। "যাদের পিঠে নাই চাম, তাদের আবার রাধাকেষ্ট নাম।"

ডাকাতদের ঝাঁটা পিটতে না পেরে ব্রজেশ্বরীর দুঃখ।

অন্নদার পরিতাপ, সে তখন উপস্থিত ছিল না। থাকলে পাড়ায় খবর দিয়ে লঙ্কাকাণ্ড বাধিয়ে দিত।

ওদের জটলার ভেতরে কর্ত্তামা উপস্থিত হয়ে ডাকলেন "বড় বৌ"। এ বাড়ীর বড় বৌ মানে গৃহিণী দুর্গামণি। তিনি তখন চালের বস্তার মুখ খুলে পাড়ার নমঃশূদ্র ও কাহারদের বেতের কাঠায় ক'রে চাল মেপে দিয়ে স্বামীর আদেশ পালন করছিলেন। জেলে পাড়ারা চাল না নিয়েই প্রস্থান করছে। বর্ষাকালের রূপোর পাতের মতন ইলিশ মাছের আমদানীতে তাদের গৃহে ধানচালের অভাব নেই।

কর্ত্তামার সাড়া পেয়ে গৃহিণী এগিয়ে অভ্যর্থনা করলেন, "কাকীমা এসেছেন, আসুন, বসুন বারান্দায়।"

বারান্দায় কুশাসনে ব'সে কর্ত্তামা বললেন "কাল রাতে তোমাদের বাড়ীতে ডাকাত পড়েছিল? তোমরা ভয়ে ম'রে তাদের আচ্ছা ক'রে খাইযে টাকাকড়ি চাল ও ওষুধপত্র ঘুস দিয়েছ?"

"তারা যে ডাকাত তা আমি এখন শুনছি। কত লোকই ত এ বাড়ীতে আসে যায়, খায়, কে জানে কার স্বরূপ? আপনার ভাসুরপো তাদের কি দিয়েছেন আমি তা জানি না।"

গৃহিণীর মুখে "কত লোক আসে যায়, খায়," শুনে গোবিন্দমণি মনে মনে রুষ্ট হয়েছিলেন। বহু পুরুষ যদিও এঁরা পাশাপাশি একত্রে বাস করছেন, আপদে, বিপদে, রোগে, শোকে, উৎসবে, আনন্দে দুই বাড়ী এক হ'তেও কখনও বিলম্ব হয় না তবুও গোবিন্দমণি এদের ভাল শুনতে পারেন না। ভাল দেখলে হৃদয়ে প্রচ্ছন্ন অনল জ্বলতে থাকে ধিকিধিকি ক'রে। বাইরে তিনি নির্লিপ্ত ভাবে কর্ত্তামা সেজে আছেন বটে। বিধাতা তাঁকে কর্ত্তামার উপযুক্ত রূপও দিয়েছিলেন। ষাটের ওপর বয়েস, এখনও দোহারা সুঠাম গঠন। চুল পাকে নি, দাঁত পড়ে নি, গায়ের বর্ণ অতসীফুলের মত। একমাত্র সন্তান মহেশচন্দ্রকে নিয়ে প্রায় বাল্যে বিধবা হয়েছিলেন। ছিলেন বাড়ীর বড় বৌ, একান্নবর্ত্তী পরিবার, দেবররা ওঁকেই সংসারের কর্ত্রী ক'রে দিয়েছিলেন। তিন দেওরের একটিও জীবিত নেই, তাদের ছেলেরা অর্থোপার্জ্জনের জন্য বিদেশে থাকে, ছুটিছাটায় বাড়ী এলে সকলে আবার একত্রিত হয়।

কর্ত্তামার হৃদয়ের নিভৃতে একটি নিদারুণ জ্বালা আছে। ঈশানচন্দ্রের খুড়তোত ভাই ও জ্যেষ্ঠপুত্র দীননাথদের কলকাতার বাসাবাড়ীতে থেকে তাঁর ছেলে মহেশচন্দ্র ও দুই নাতি প্রফুল্ল পদ্মেশ পড়াশোনা করে, এদের অন্নদাস হয়ে তাদের থাকাটা ইনি পছন্দ করেন না। ছেলের সামান্য আয়ে সেখানে বাসাভাড়া ক'রে পরিবার নিয়ে গেলে এখানকার সংসার চলে না। দেবররা না থকেলেও তাদের বিধবারা মরে নি, ছেলে-মেয়ে রয়েছে। সেই এক ক্ষোভ, আর এক ব্যাপার ঈশানচন্দ্রদের বারোমাসের তের পার্ব্বণের। তাঁদেরও চণ্ডীমণ্ডপের অভাব নেই, কিন্তু গৃহবিগ্রহ শালগ্রামশিলার নিত্য পূজা ভোগ আরতি ভিন্ন সেখানে আর কোন অনুষ্ঠান হয় না। পাড়া সচকিত ক'রে ঢোল কাঁসি কাড়া বাজে না। অথচ হৃদয়ে ঈর্ষ্যার গরল লুকিয়ে এ বাড়ীর ছলছুতোয় তাঁকে উপস্থিত হতে হয়। তাই ডাকাত পড়ার খবরে তাঁকে ছুটে আসতে হয়েছে।

তিনি ডাকাতের প্রসঙ্গ এড়িয়ে অন্য প্রসঙ্গ উত্থাপিত করলেন। জিজ্ঞাসা করলেন, "তোমার নাতি নাতনী বৌমা কবে ফিরবে বড় বৌ? তাদের খবর পেলে? ভবানীপুরে মানতের পূজা দিতে যাওয়া সোজা কথা নয়। সে ভারী দুর্গম পথ। ঘাঁটিতে ঘাঁটিতে ডাকাতের থানা। তোমার পোষ্য ভাইয়ের করমজায় অত বড় জাগ্রত সিদ্ধেশ্বরী থাকতে কেউ নাকি অতদূরে মানত করে?"

দুর্গামণি মলিন মুখে বলেন, "আমি ত মানত করি নি কাকীমা, আমার বেয়াই হলেন ব্যস্তবাগীশ মানুষ, নিজের এক মেয়ে ছাড়া আর ছেলেপেলে হ'ল না। বৌমার প্রথম মেয়ে হবার পর তিনি ধরে নিলেন মেয়েরও বুঝি তাঁদের দশা হবে। তাই মানত ক'রে এলেন ভবানীপুরের পীঠস্থানে, ছেলে হলে মোষ বলি দিয়ে মায়ের পূজা দেবেন। কেদারনাথের বয়েস তিন চলছে, বেশিদিন ঠাকুর-দেবতার ধার ফেলে রাখতে নেই ব'লে নিয়ে গেছেন ওদের। তাদের খবর পাব কি ক'রে? নৌকোয় যেতে আসতেই দিন তের-চোদ্দ লাগবে। রেল ষ্টীমার নেই, বার্ষাকালে এদিকের কেউ নৌকা ভিন্ন যেতে পারে না। শুনেছিলাম বেয়াইদের সঙ্গে ওখানকার

জমিদারবাড়ীরও কারা যেন যাবে। তাদের বজরায় পাইক বরকন্দাজ বন্দুক থাকবে। এই যা ভরসা। এখন নারায়ণের দয়া।"

মানুষকে অহেতুক ভয় দেখিয়ে ভীত করতে কর্তামা খুব ভালবাসতেন। এক্ষেত্রে ভয়ের তেমন কারণ নেই জেনে তিনি ক্ষুণ্ন হলেন।

মেঘলা আকাশের পানে ক্ষণেক চেয়ে থেকে সহসা প্রশ্ন করলেন, "আচ্ছা বড় বৌ, তোমার মা এখন কোথায়? তোমার পুষ্যি ভাই বুঝি মাকে দেখাশোনা করে না? করমজায় সিদ্ধেশ্বরীর থানে কখনো ত থাকতে শুনিনি? লোকে যে কেন পুষ্যি এঁড়ে নেয়? শূন্য গোয়াল ভালো তবু দুষ্ট এঁড়ে ভালো নয়।"

"না কাকীমা, শ্যামসুন্দর, তার বৌ খুব ভালো। মাকে কাছে রাখতে অস্থির। মা থাকতে পারেন না বিষয় রক্ষের জন্যে। তবে যাওয়া আসা করেন। সিদ্ধেশ্বরীর মেলার সময় মাসখানেক ক'রে থাকেন।"

"শ্যামসুন্দরই না তোমার বাবার বিষয়সম্পত্তির মালিক, সে পারে না দেখাশোনা করতে?"

"হাঁ, বাবার দেবোত্তর সম্পত্তি বাড়ীঘর ক্ষেতখামার সমস্তই শ্যামসুন্দর পেয়েছে। কিন্তু বাবার পৈইজার পৈত্রিক বাড়ী দুই কাকার সম্পত্তির মা যে উত্তরাধিকারিণী। আমরা খুড়তুতো জ্যেঠতুতো তিন বোন ছিলাম, কারও ছেলে ছিল না।-জানেন ত, তিন বোনের বিয়ে হয়েছিল এই বাড়ীতে। দুই বোন গেছে, বাকী রয়েছি আমি। মা তাঁর নাতিদের পাওনাগণ্ডা রক্ষে করতে প'ড়ে আছেন ওখানে। আমার বোনপো দেওররা কলকাতায় থাকে, পূজোয় বাড়ী এসেও ওমুখো হয় না। দীননাথও ঐ ধরণের, কোন কিছুতে আসক্তি নেই। এ বংশের কারও বিষয়বুদ্ধি নেই। একজনা জন্মকাল এখানেই থাকেন, তাঁকেও পই পই ক'রে ব'লে কয়েও একবার পাঠাতে পারি না। বলেন, 'যাদের বিষয় তারা এসে রক্ষে করুক, আমার কি দায় পড়েছে? আমি খেটে খাই-শ্বশুর খুড় শ্বশুরের মাটি চাটির ধার ধারি নে।"

"ধার ধারবে কেন? ভাগ্যবানের বোঝা যে বাসুদেবে বয়। কি কাণ্ড বড় বৌ, তোমাদের বাড়ীতেই কি যত আঁটকুড়ে মেয়ের বাথান। তোমরা তিন বোন এসেছিলে সেকালে, কিন্তু দীনুর বৌ এল একালে, তারও ভাইবোন নেই? বাপের যা-কিছু সমস্তই মেয়ে পাবে?"

দুর্গামণি অপ্রতিভ হয়ে বলেন, "বিষয়ের লোভে উনি বৌমাকে আনেন নি, ব্রাহ্মণপণ্ডিতের মেয়ে, তাদের কি আছে না আছে তা আমরা জানি না। হরিহরপুরে রোগী দেখতে গিয়ে মেয়েটিকে দেখেই উনি এনেছিলেন। আপনাদের কথা বলছি নে, একালে এ গাঁয়ে আমার বৌমার মত রূপ কারও ঘরেই নেই। আগে যেমন আপনার সুন্দরের নাম ছিল, এখন বৌমার।"

কর্তামা প্রসন্ন হলেন।

"তা সত্যি বড় বৌ, এখনকার বৌঝিদের রূপ নেই, রং-এর বাহার নেই। ঘরে ঘরে কেলো হাঁড়ি। লোকে কথায় বলে, 'গুণের ধরি ছাতি, রূপের মারি লাথি।' তা তোমার বৌ রূপেও যেমন, গুণেও তেমনি।" বলতে বলতে কর্তামা কুশাসন হতে গা উত্তোলন করলেন।

দুর্গামণি বললেন, "উঠছেন কাকীমা? একটু দাঁড়ান, পালপাড়া থেকে ঠাকুরভোগের জন্যে তরকারি দিয়ে গেছে। দুটো নিয়ে যান, ভোগে দেবেন।" হবিষ্যি ঘর হতে একটা থলি ভরে দুর্গামণি চালকুমড়ো ঝিঙে ধুঁধুল বরবটি বেগুন সাজিয়ে এনে দিলেন।

"বর্ষাকালের খানাক্ত দিব্যি লক লক করছে।" বলে প্রাপ্তির পুলকে কর্তামা বিগলিত হয়ে প্রস্থান করলেন।

কর্মের তাড়নায় ডাকাত পর্ব্বের জের আর বেশিক্ষণ চলল না। ব্রজেশ্বরী গেল রান্নাঘর নিকোতে। অন্নদা বসল এঁটো বাসনের কাঁড়ি নিয়ে। পুরোদিদি ছুটল বাগান পরিক্রমায়।

গৃহিণীকেও ছুটতে হ'ল পুজো ও ভোগের আয়োজনে। বধূ হেমাঙ্গিনী মূর্ত্তিমতী লক্ষ্মীপ্রতিমা। সে কাছে না থাকায় দুর্গামণি কাজের সমুদ্রে হাবু ডুবু খাচ্ছেন। হরিমন্দির ঘরে নারায়ণ বিগ্রহ শ্রীধরের ভোগ রেঁধে রেখে তখনই আবার তাঁকে ছুটতে হয় মাছ ভাত রাঁধতে রন্ধনশালায়। তিনটে গোরুর দুধ বিলিয়ে দিয়েও যা থাকে, তার সেবা সোজা নয়। তেমন তেমন অবস্থা হলে ব্রজেশ্বরী বারান্দার উনুনে দুধ জ্বাল দেয়, ক্ষীর করে।

পূজারী ব্রাহ্মণ চক্রধর কর্তার প্রধান কর্ম্মসচিব। ফুল তোলা পুজো ভোগ ও সন্ধ্যার আরতি ছাড়া ভেতরের কাজ তাকে দিয়ে চলে না। দেশ-দেশান্তর হ'তে কর্তার ছাত্র আসে দলে দলে আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্র অধ্যয়ন করতে, গাছগাছড়া চিনে ঔষধ প্রস্তুতের প্রণালী শিক্ষা করতে। তারা ঘরের ছেলে হয়ে কেউ থাকে দুই বছর, কেউ থাকে চার বছর। শিক্ষা সমাপ্তে পুরাতন ছাত্ররা কবিরাজ হয়ে তাদের গ্রামে ফিরে যায়। নূতনের দল আবার আসে। শুধু চক্রধরের যাওয়া-আসা নেই। বছরে তার একবার ছুটি মেলে রথের সময়, এক মাসের।

কিন্তু সে তার আবাসভূমি পুরীতে গিয়ে এক মাসও থাকতে পারে না। এই বাড়ীর এই জনকজননী তার আপনার হ'তেও নিকটতম হয়ে গেছেন।

কর্তা রোগী দেখে ব্যবস্থাপত্র লিখে দেন, চক্রধর ঔষধ ভাগ ক'রে পুরিয়া ক'রে দেয়। পাঁচনের মোড়ক বাঁধে। কত বন-উপবন থেকে রাশি রাশি গাছগাছড়া সংগ্রহ করতে হয়। তার কতক রৌদ্রে শুখিয়ে নিয়ে চূর্ণ করতে হয়। কতক তামার বড় বড় হাঁড়িতে জ্বাল দিয়ে রস বের করা হয়। বর্ষার সময় ঔষধ তৈরি প্রায় বন্ধ। বর্ষান্তে ফের স্থরু হয় ঔষধ প্রস্তুতের বিপুল সমারোহ। এখান থেকেই ঔষধের এক ভাগ চ'লে যায় কলকাতার দীননাথ আরোগ্যশালায়।

চক্রধরকে ঔষধের ভার বইতে হয়, হাট বাজার করতে হয়, সময় সময় গ্রামের বাইরে কর্তার সঙ্গী হয়ে যেতে হয় রোগীর গৃহে, তাই দুর্গামণি সংসারের কাজে তার সাহায্য পান না। বধূর কর্মকুশলতায় ঘরের কাজ পড়ে থাকে না। তার দুইখানা ভুজই দশভুজার সমান। নাতনি তটিনীটা পর্য্যন্ত কাছে নেই, ছোট আট বছরের মেয়ে সে আর কি কাজ করবে? তবু "ঘটিটা আন্, বাটিটা রেখে দে।" সেটুকুও বন্ধ। হীরাসাগরের তটনিবাসী সংস্কৃত ভাষায় সুপণ্ডিত ঈশানচন্দ্র প্রথম নাতনির নাম রেখেছিলেন তটিনী। তাঁর আদরের তটিনী নামটুকু তাঁর কণ্ঠেই সীমাবদ্ধ হয়ে রয়েছে, ঘরে পরে বাইরে ভেতরে সকলের কাছে তটিনী হয়েছে তিমু।

দুর্গামণি মণ্ডপ ও ভোগের ঘর মার্জ্জনা ক'রে স্নান সেরে নিলেন। এখন স্নানের খুব সুবিধা, নদনদী খাল-খন্দের সঙ্গে গঙ্গা এক হয়ে গেছে। এক জায়গায় ডুব দিলেই হ'ল। তাঁর আবার নিত্য পূজোয় সময় লাগে। কর্তার ফুল চন্দন নৈবেদ্য সাজিয়ে পূজোর বালাই নেই। তিনি কর্ম্মবীর, মনে যত ভক্তিই থাকুক না কেন, বাহ্যিক পূজো-অর্চ্চনার সময় পান না। তাই ভোর হ'তে না হ'তে হাতমুখ ধুয়ে পট্টবস্ত্র প'রে শয়নগৃহের কোণে আসনে ব'সে জপ আহ্নিক সেরে রাখেন। আচারপরায়ণা ভক্তিমতী দুর্গামণির এতটুকুতে মন ভরে না।

দুর্গামণি স্নানান্তে মণ্ডপে ঢুকলেন। অন্তঃপুরের যাবতীয় কাজ বুঝে নেওয়ার ভার ব্রজেশ্বরীর ওপরে। সে হাতে পায়ে গোটা বাড়ী নৃত্য ক'রে বেড়াতে লাগল।

বাইরেও কর্ম্মের ঝটিকা বইছিল। রোগীদের দেখে শুনে ঔষধের ব্যবস্থা করে কর্তা এক কলসী দুধ নিয়ে নৌকায় ভাসলেন হীরাসাগরের বুকে। দুই বেলা বন্দরে না গেলে তাঁর চলে না। অহরহ সেই জলের তলার মাটি যেন তাঁকে আকর্ষণ ক'রে নিয়ে যায়। বাড়ীতে দুইখানা ডিঙ্গি নৌকা। বর্ষার সময় ছোটটা সংসারের কাজকর্ম্মে ব্যবহার হয়। বড়খানা কর্তার নিজস্ব সম্পত্তি। তাতে ছই দেওয়া, পাটাতনের উপরে মোটা গালিচা বিছান। কি বর্ষাকাল, কি গ্রীষ্ম, দুই বেলা হীরাসাগরের তীর ঘেঁসে নাকালিয়া না গিয়ে তিনি থাকতে পারেন না। তাঁর নৌকার মাঝি বিহারী চাকর। স্বামীর এই বন্দরপ্রীতির জন্য দুর্গামণির ক্ষোভের সীমা নেই। এতই যদি টান, তা হলে এখানে না এলেই ভাল হ'ত। কারোর আনাচে কানাচে কুঁড়ে বেঁধে ওইখানে প'ড়ে থাকলেই হ'ত।

ভোর বেলা গাভীদের দোহন হ'য়ে গেছে, নালকে বাছুরগুলো পেট পুরে দুধ খেয়ে সারা আঙ্গিনায় লাফিয়ে বেড়াচ্ছে। গরুরা জাব খেতে খেতে বিশাল নেত্র মেলে পর্য্যবেক্ষণ করছে বৎসদিগকে। আজ আকাশ মেঘের ভারে মুখভার ক'রে থাকলেও বর্ষণ নেই। প্রভাতের ম্লান রৌদ্র এক-একবার আকাশের গায়ে ঝলক দিয়ে নিবে যাচ্ছে। রাজ্যের কাক শালিক চড়াই পাখী খাদ্যের আশায় উঠানে নেমে পরস্পর ঝগড়া বাধিয়ে দিয়েছে।

গৃহিণী পূজো সেরে বাইরে বেরিয়ে দেখলেন, তাঁদের পুরান মজুর কতুসেখ দক্ষিণদ্বারী ঘরের কাঠের সিঁড়ির ওপরে বিরস মুখে ব'সে রয়েছে। এ সময় তাদের কাজ বন্ধ থাকে। পূজোর পূর্ব্ব হ'তে প্রায় বছর ভরেই কতু এ বাড়ীতে মজুর খাটে। বাগান নিড়ানো, বেড়া বদ্‌লানো, চালে নূতন শন দেওয়া, কাঠ কাটা, একটার পর একটা কাজ লেগেই থাকে। তার মধ্যে নূতন ধান উঠলে মলন মলা পালা দেওয়া কত কি; কাজের অন্ত থাকে না।

গৃহিণী সস্নেহে জিজ্ঞাসা করলেন, "কি রে কতু, তোরা সব ভাল আছিস ত? ক'দিন দেখি না? পাট ছাড়ানো হয়ে গেল?"

"হইবে মা'ঠান, আমাগো জমিন বেশি লয়, ক'ডা পাটই বা হইবে। ম্যায়াডার প্যাটের অসুখ, তাই কর্তার ঠাঁই আইছি ওষুদের লেগে। কর্তা বন্দরে গেইচে; ঠাকুর মশায় ওষুদ দিইয়ে দিলে।"

"আজ ওই ওষুধ খেতে দিগে, কাল সকাল বেলা মেয়েকে এনে কর্তাকে দেখিয়ে ফের ওষুধ নিয়ে যাস। বর্ষাকাল, যা তা খেতে দিসনে।"

"খাইতে দিমু কি মা'ঠান, ঘরে যে একডা দানাও নাই। মজুরী বন্ধ, ক্যাতের কাম বন্ধ, প্যাট চলে ক্যামনে?

পাট ক'ডা ধোওন শুকান না হইলে ত বেচতে পারমু না।" কতুর কোটরাগত চোখ দুটো ছল ছল করতে লাগল।

দুর্গামণি ক্ষণকাল সেইখানে প্রসাদী কাটা ফল ও বাতাসা হস্তে থমকিয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। ভাবতে লাগলেন, কতুকে এখন কি কাজ দিয়ে মজুরী দেওয়া যায়।

ব্রজেশ্বরী বহুকালের দাসী, সবদিকে তার সজাগ দৃষ্টি। সে এগিয়ে এসে উচ্চস্বরে ডাকল, "মা ঠান, ভোগঘরে যাও। ভোগ পাক ক'রে রাঁধার ঘরে মাছ-ভাত রাঁধতে হবে না? ওদের কাঁদুনি লেগেই আছে, যখন হাতে পয়সা থাকে তখন এককুড়ি ক'রে ইল্‌শে মাছ কিনে খায়। অসময়ের জন্যে কানাকড়িটাও রাখে না। বর্ষাকালে ওদের দুঃখ যদি না হয়, তবে হবে কার?"

দুর্গামণি সচকিত হয়ে বললেন, "কতু, এই যে পুজোর প্রসাদ নে, খেয়ে চাল নিয়ে যা। কাল একবার আসিস, দেখি কোন্ কাজে তোকে লাগিয়ে দিতে পারি। ব্রজ, কতুকে দু'কাঠা চাল মেপে দাও।" ব'লে কতুর প্রসারিত দুই হাতে কাটা শশা কলা পেয়ারা ও ও বাতাসা স্পর্শ বাঁচিয়ে নিক্ষেপ ক'রে দুর্গামণি দ্রুত পদে হবিষ্য ঘরের দিকে চ'লে গেলেন।

এ সময় দুই দণ্ড দাঁড়িয়ে কারোর সুখদুঃখের দুটো কথা শোনবার তাঁর অবকাশ নেই। কাজের উপরে কাজের বোঝা স্তূপ হয়ে প'ড়ে রয়েছে। তবু রক্ষে, কর্তা বেলা বারটা-একটার পূর্বে ভোজনে বসেন না।

ব্রজ মহা বিরক্ত। এমন লক্ষ্মীছাড়া বাড়ী সে জন্মে দেখে নাই। ধানচাল সাক্ষাৎ লক্ষ্মী, তা নিয়ে কি এত হেলা-ফেলা ভাল? ভারী ত কয় বস্তা চাল, তাই যেন কর্তা-গিন্নীর চক্ষুশূল হয়েছে। চাল গোলাজাত হবার আগেই দান খয়রাতে শেষ হয়ে এল।

ব্রজ দক্ষিণদ্বারী ঘরের কাঠের সিঁড়ি দিয়ে দুমদাম শব্দে উঠতে লাগল। আটচালা প্রকাণ্ড ঘর, মানুষ সমান উঁচু ভিটে। রেলিং দেওয়া কাঠের সিঁড়ি দিয়ে উঠতে হয়। ঘরের মাঝখানে দেওয়াল দিয়ে দুই ভাগ করা হয়েছে। মাঝখানে দরজা বসান। দক্ষিণ ও উত্তরের দিকে চওড়া বারান্দা। সামনের অংশে কর্তা শয়ন করেন। তাঁর খাট পাতা। শিয়রে বিত্তশূন্য একটি লোহার সিন্দুক। বেঞ্চির উপরে বাক্স-পেঁটরা, কাঁচের বই-এর আলমারী, সেগুন কাঠের ঔষধের বাক্স। কাঁঠাল কাঠের ঔষধের বাক্স। পাকা বাঁশের লাঠি। খুরপোষের ওপরে বসান তিন চারটে রূপো বাঁধানো হুঁকা, ইত্যাদি।

অপর অংশে দুর্গামণি বধূ ও নাতি-নাতনীকে নিয়ে শয়ন করেন। এক দিকের খাটে তাঁর ও তিনুর বিছানা, অন্যদিকে তক্তাপোষে ছেলে কেদারনাথকে নিয়ে বধূ হেমাঙ্গিনী শয়ন করে। ছেলে প্রবাসী, রূপসী তরুণী বধূকে পৃথক্ ঘরে রাখা চলে না। কর্তারও বয়েস হয়ে যাচ্ছে, শরীর ভাল নয়, কাছাকাছি লোক থাকার প্রয়োজন। সেই জন্যে বিরাট ঘরের ভেতরে দেয়াল তুলে দুর্গামণি দুই ভাগ ক'রে নিয়েছেন।

বধূ তার ছেলের মানত দিতে গিয়েছে, তার চৌকি শূন্য, সেইখানেই চালের বস্তা ক'টা নামিয়ে রাখা হয়েছিল। ঝড়বাদলের মধ্যে এখনও গোলাঘরে তোলা হয় নি।

ব্রজ মহা অসন্তুষ্ট হয়ে ধামায় ক'রে দু'কাঠা চাল এনে কতুর মলিন গামছায় ঢেলে দিল।

কতুর মলিন মুখ উজ্জ্বল হ'ল। সে লোভাতুর দৃষ্টি বারেক বস্তার প্রতি নিক্ষেপ ক'রে ধীরে ধীরে বাড়ীর পথ ধরল।

বর্ষার রাত্রি, দিনটা মেঘলা থাকলেও বৃষ্টি হয় নি। কিন্তু রাত দ্বিপ্রহর হতে টিপি টিপি বাদল ঝরছে।

এ বেলা ঈশানচন্দ্রকে যেতে হয়েছিল রোগী দেখতে পাশের গ্রামে। অনেক রাত্রে ফিরে তিনি জলযোগ সেরে ঘুমিয়ে পড়েছেন।

দুর্গামণির চোখে আজ ঘুম নেই। দুই ছেলে কলকাতায়, তাদের কথা মনে পড়ছে। তাঁর পালিত পুত্র শ্রীশচন্দ্রের সুন্দর সৌম্য মুখছবি মনের পটভূমিকায় বার বার উদয় হচ্ছে।

তাঁরা তিন বোন এদের এক হাঁড়িতে চাল দিয়ে এক জায়গায় হয়েছিলেন। সেখানে ছিলেন জ্যেঠতুতো খুড়তুতো তিন বোন, এখানে এসেও হয়েছিলেন জ্যেঠতুতো খুড়তুতো তিন জা। চন্দ্রমণি ও দুর্গামণি প্রায় সমবয়স্কা ছিলেন, দুই জনার ভেতরে ভালবাসা ছিল অপরিসীম। চন্দ্রমণির আঁতুড়ের দুইটি সন্তান নষ্ট হবার পরে শ্রীশচন্দ্রের জন্ম হয়। তখনকার পল্লীর প্রথা অনুযায়ী ছোট বোনের কাছে চন্দ্রমণি সদ্যঃজাত শিশুকে বিক্রয় ক'রে দিয়েছিলেন। সূতিকাগারের বেড়া কেটে একমুঠো চালের খুদ দিয়ে দুর্গামণি ছেলে কিনে কোলে তুলে নিয়েছিলেন। সেইজন্য ছেলের নাম হয়েছিল "কিনু"। সে নাম আজও অপরিবর্তিত হয়ে রয়েছে।

ছেলে কেনা-বেচায় কিনুর ভাগ্যবিধাতা বোধ হয় অলক্ষ্যে ব'সে হেসেছিলেন। তাই কিনুর মা ছ'মাসের বেশি বাঁচলেন না। কিন্তু নিজস্ব রূপে দুর্গামণির সন্তান হয়ে গেল। তখন দুর্গামণির কোলে কন্যা স্বর্ণলতা। এক মায়ের স্তনদুগ্ধে দুই শিশু পরিবর্দ্ধিত হ'তে লাগল। কিনুর বাবাও গেলেন তার বছর পাঁচেক বয়সের সময়। তার পিতা হলেন ঈশানচন্দ্র। দুর্গামণি তার জন্মের সময় হ'তেই ত মাতা হয়েছিলেন। সেই কিনু কৃতী হয়ে বিবাহ ক'রে বড় ইঞ্জিনীয়ার হয়েছে। তারা রয়েছে আসামের দুর্গম স্থানে। তার জন্যে দুর্গামণির মাতৃহৃদয়ে উদ্বেগের সীমা থাকে না। কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা উদ্বেগের বেশি কারণ হয়েছে নাতি নাতনী দুবর জন্যে। আজ তের-চোদ্দ দিন তাদের খবর নাই। যে পথে রেলগাড়ী স্টীমার নেই, ডাক ঘর নেই, বর্ষার অনশন, সেখানে কি কেউ মানত করে? যেমন বেয়াই, তেমনি বেয়ান। নিজে কাকজ্যো ব'লে দুই বউরেই অস্থির হয়ে উঠেছিল।

আনমনে চিন্তা করতে করতে দুর্গামণি সহসা সচকিত হলেন। বাইরে আদ্র মৃত্তিকায় মৃদু মৃদু পদধ্বনি হচ্ছে। ফিস্‌ফাস্ কথার গুঞ্জন।

তিনি ধীরে বিছানায় উঠে বসলেন। খোলা বাতায়নে বাইরে চাইলেন। অন্ধকার রাত্রি বাদল ঝরছে টিপি টিপি, মেঘ গর্জ্জন করছে গুর গুর ক'রে। জগৎ মহাসুপ্তিতে মগ্ন, কোথায়ও জাগরণের চিহ্ন নেই। সামনের আঙিনায় পদশব্দ মিলিয়ে গেছে, গৃহের পশ্চাতে ঢেঁকিশালায় ও কি? আস্তে আস্তে কে যেন ঢেঁকিতে পাড় দিচ্ছে ধুম ধুম ক'রে।

দুর্গামণি আর স্থির থাকতে পারলেন না। ক্লান্ত স্বামী নিদ্রায় অচৈতন্য, তাঁর ঘুম ভাঙ্গানো চলবে না। তিনি আজন্ম পল্লীবাসিনী, এ ঢেঁকির ব্যাপার তাঁর অজানা নেই, চোররা চুরি করতে এসে প্রথমেই সন্ধান নেয় গৃহস্থ জাগ্রত আছে কি না। ঢেঁকিই তাদের সাধারণ উপায়।

দুর্গামণি সন্তর্পণে ঘরের দুয়ার খুলে হারিকেনের শিখা বাড়িয়ে দিলেন। কর্ত্তার পায়ের দিকের দেয়ালে ঝুলান ছিল পাঁঠা কাটার খড়্গ রামদা, তলোয়ার। তিনি চোখ আঁকা চকচকে ঝকঝকে রামদাখানাই তুলে নিলেন ডান হাতের শক্ত মুঠোয়। বাঁ হাতে লণ্ঠন। বারান্দায় পা দিয়ে দরজা ভেজিয়ে দিলেন।

গত রজনীর ঘটনার পরে আজ অন্দর সুরক্ষিত ক'রে রাখা হয়েছিল। পশ্চিমের ঘরে চক্রধর ও উত্তরের ঘরে মুরারী, নীলকণ্ঠ শুয়েছিল। পূবের ঘরে ব্রজ থাকে, আজ সেও একাকী ছিল না। অন্নদার আট বছরের মেয়ে পেমোকে মেঝেয় মাদুর পেতে শুইয়ে রেখেছিল। দিবালোকে যাদের আঁশবটি দিয়ে নাক কেটে দেবার আস্ফালন করেছিল ব্রজেশ্বরী, রাতে তাদেরই পুনরাগমনের ভয়ে পেমোকে কাছে রাখতে হয়েছিল।

দুর্গামণি আলো, রামদা নিয়ে সাক্ষাৎ চণ্ডীরূপে এগিয়ে গেলেন ঢেঁকিশালার দিকে। তাঁর আকৃতি অনেকটা চণ্ডীর মতনই। একহারা লম্বা গড়ন, কালো বর্ণ। শরীরের কোথায়ও মেদ মাংস নেই, লাবণ্য শ্রী নেই। কিন্তু শান্ত মুখে মাখা একটা তেজদীপ্ত মহিমা, যেটুকুর জন্যে অসুন্দরকেও সুন্দর দেখায়। দুই বাহুমূলে দুই গাছা শুভ্র মোটা শাঁখার বালা, গলায় লাল সুতোয় বাঁধা ইষ্ট-কবচ। স্বামীর কল্যাণ-কামনায় নাসিকায় নাকফুল একরাত্ত সোনার মটর।

ঢেঁকি ঘরের সম্মুখীন হয়ে দুর্গামণি উচ্চ গম্ভীর স্বরে হাঁক দিলেন, "কে রে মরতে বাড়ী ঢুকেছিস? ঢেঁকি পাড় এসে লাগবে আয়, নইলে নেই?"

পেমোর ঘর দূরে নয়, আতঙ্ক ও উৎকণ্ঠায় আজ তার চোখে ঘুম ছিল না। গৃহিণীর সুউচ্চ কণ্ঠস্বরে সে চিৎকার ক'রে উঠল, "তোমরা কে কোথায় আছ, বাঁচাও, রক্ষে কর! ডাকাত পড়েছে, ডাকাত।" বজর অমানুষিক চিৎকারে পেমোর ঘুম ভেঙ্গে গেল। সেও মাদুরে শুয়ে শুয়ে তারস্বরে আর্ত্তনাদ করতে লাগল, "ও রে মা রে, এই কল গেলি রে! ডাকাত মোরে কুচি কুচি কইরা কাইটা ফেলিছে।"

মুহূর্ত্তে সকল গৃহের দ্বার খুলে গেল, বাহির মহল থেকে লাঠি সড়কি নিয়ে সকলে ছুটে এল। লাহিড়ী-বাড়ী হ'তে ঝি চাকররা লণ্ঠন ও লাঠি হাতে দৌড় দিল। তাদের কোলাহলে নমঃশূদ্র পাড়া সচকিত হ'ল। কাহারেরা হুঙ্কার দিয়ে রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ হ'তে লাগল।

কিন্তু চোর কোথায়? গৃহিণীর রণরঙ্গিণী মূর্ত্তি দেখা মাত্র কোমরে নেংটি গোঁজা মাথায় গামছা বাঁধা দুটো লোক ঢেঁকি ছেড়ে মণ্ডপের পেছনে মেঠেলের জলে দৌড়িয়ে ঝাঁপ দিয়ে পড়েছে। বাড়ীখানা বাঁশের বেড়া দিয়ে ঘেরা। মেঠেলের গায়ে খানিকটা জায়গা খোলা আছে নৌকা যাতায়াতের জন্যে। তার পরেই অবারিত মাঠ, মাঠের ভেতরে খালগর্ত্তের আদি অন্ত নেই। মাঠের শেষে কৃষক পল্লী, সলিলবিপুলা হীরাসাগর। অন্ধকারে মানুষ দেখা যায় না, কিন্তু জলের খলবল লক্ষ্য ক'রে এপার থেকে লাঠি, গাছের গুঁড়ি, বাঁশের চেলা

কাঠ্‌অবিরত ছোঁড়া হ'ল। কিন্তু কারো আঘাত বা আহত হবার নিশানা পাওয়া গেল না। কিছুক্ষণ জলের শব্দ হবার পর তাও থেমে গেল। কারো বুঝতে বাকী থাকল না, এটা চাষাদেরই অভিযান। তারা আসলে চোর ডাকাত নয়, কিন্তু বর্ষাকালে পেটের জ্বালায় এমনি একটু আধটু গোলমালের সৃষ্টি ক'রে থাকে। এটাকে পল্লীবাসীরা তেমন গুরুত্ব দেয় না। এ সময় প্রায় প্রতিদিন রান্নাঘরের হাঁড়ি ফেলতে হয়। পান্তা ভাতের লোভে চোরেরা হাঁড়ি খট খট করে, বেড়া ভাঙে, সিঁদ কাটে। ধরা পড়লে বেদম মার খায়। নাক কাণ ম'লে দোষ স্বীকার করে, তবু চুরির বিরতি হয় না। পেটের জ্বালা যে বিষম জ্বালা।

জনসমাগমে ব্রজর লুপ্ত সাহস ফিরে এসেছিল, সে প্রবল বিক্রমে চেঁচিয়ে পাড়া মাথায় ক'রে তুলল। "পোড়াকপালেদের আর মরণের জায়গা ছিল না। চাল ক'বস্তার লোভে লোভে একবার আসে ডাকাত হয়ে, আবার হয় চোর। দিতে দিতে থলি উজোড় করেছে তবু মরণ হয় না। 'যত ছিল নাড়াবুনে সব হইচে কীর্ত্তনে।' হরি বল্লেই যাদের কাঁড়াচাল মেলে তারা গোল্লাই খেয়ে ডাকাত সাজে কেনে?" বুড়োদিদি ফোঁড়ন দিল, "তুইডা ছিঁচকে চোরের তরাসে তুই যে দাপাদাপি লাগিয়ে দিছিস রোজ, সত্যিকার ডাকাত পড়লি করতিস কি? অগির ম্যায়াডার বা কেমন? চেঁকশালায় চোর আইছেল, খিল আটকা ঘরে শুইয়া ডুকরে মরছেল 'মা রে, মলাম রে গেলাম রে!' ম্যায়ডা আথুকি। 'আথুকিরে নিলে বাঘে, বেড়ে কাঁদে পাড়ার নোকে।' এখন মায়ে আইস্যা ম্যায়া কোলে ক'রে শোলক কয়ে ঘুম পাড়াক—'আপুছি আপুছি ঘুমায় ঘুমায় মধুপুরের বাঘ ডাকে দারুণ সময়।'

ব্রজ ঝঙ্কার দিলে, "তোর শাস্তর বস্তর এখন ধুয়ে দে বুড়োদিদি, আমি না চেল্লালে এতো নোক কোথায় পেতিস? ওরা যদি চোর না হয়ে ডাকাত হ'ত, সড়কি দিয়ে খোঁচায়ে খোঁচায়ে মেরে ফেলত, তখন করতিস কি?"

"আহা মরি, কত চোর ছ্যাঁচোড় ত্যাঁদড় বান্দর দেখেচি। খোঁচায়ে মারা সোজা কতা লয়। কাল না আইছেল দল বাঁধি লুট করতি, এক প্যাট খাইয়ে দাইয়ে ভিক্ষে শিক্ষে লিয়ে পগার পার হ'ল। গেরামে যারা থাকে তাদের অতভয় ডর করলি চলে না? দেখ না, আমাগরে মাঠা'ন ক্যামন শক্ত মাহুষ; অমনি না হলি কি ভদ্দর নোকের ম্যায়া হয়? পণাম করি ওনার খুরে খুরে।"

ব্রজ বুড়োদিদির কথায় সায় দিয়ে ঘাড় নাড়ল।

প্রভাতের আর দেরী নেই, আকাশের পূর্ব্বপ্রান্তে অন্ধকার ফিকে হয়ে গেছে। চন্দ্র,তারকা-বিহীন নভো-নীলের বিচিত্র বর্ণছটা মুছে গিয়েছে। এই ঝরঝর বারি ঝরছে, পরক্ষণেই বর্ষণক্লান্ত আকাশে গুর গুর মেঘ ডাকছে। বৃষ্টিধৌত অরণ্যে সিক্ত তরুশির কম্পন তুলে প্রতীক্ষা করছে নব দিবসের নবীন সোণার আলোকের।

ঢেঁকি ঘর থেকে একটা সিঁধকাঠি কুড়িয়ে নিয়ে-দুর্গামণি ফিরে এলেন শয়নগৃহে। যাঁর নিদ্রাভঙ্গের আশঙ্কায় তিনি কাউকে না ডেকে নিঃশব্দে বের হয়ে-ছিলেন, তিনি লোকজনের গোলমালে কখন যেন নীরবে বারান্দায় এসে বেতের মোড়ায় ব'সে রয়েছেন।

দুর্গামণি দা ও সিঁধকাঠি নামিয়ে রেখে স্বামীর পায়ের কাছে ব'সে বললেন, "তুমি উঠে পড়েছ? ঘুম হ'ল না?"

"বাড়ীতে চোর এলে এত গোলমালে কারও কি ঘুম হয়? কিন্তু তোমার আমাকে না জাগিয়ে একলা ঘরের বের হওয়া অন্যায় হয়েছে বড় বৌ। দুঃসাহসের বিপদও আছে সেটা তুমি বোঝ না কেন?" ব'লে ঈশানচন্দ্র স্ত্রীর মুখের পানে চেয়ে রইলেন। পূর্ব্বেই বলেছি, সে মুখে চাইবার মতন কিছুই ছিল না। কিন্তু যা ছিল তা অন্য কোন মুখে খুঁজে পাওয়া যায় না।

দুর্গামণি বললেন, "চোর ডাকাতের সামনে যেতে আমার ভয় কিসের? ভয়ের নেই কিছু।"

ঈশানচন্দ্র ভাবলেন, বাড়ী ভাঙার সময় দুর্গামণির যে গহনা খোয়া গিয়েছে, অদ্যাপি তিনি তার একখানাও দিতে পারেন নাই। আভরণশূন্যা নারীর এটা বোধহয় সেই প্রচ্ছন্ন চিত্তক্ষোভ। একটু কুণ্ঠার সঙ্গেই তিনি বললেন, "হাঁ, মেয়েদের গায়ের সোনার গয়নার ওপরেই চোর ডাকাতদের লোভ বেশী। আমি ত নতুন ক'রে তোমাকে ক'বছরের ভেতরে কিছু গড়িয়ে দিতে পারি নি। দীন্থ দিয়েছিল একটা গলার হার—তুমি তা দিয়ে দিলে কিমুর ছেলে সুরেনকে। সে ছেলে ওদের বাঁচল না, হারের জায়গায় হার প'ড়ে রইল। কিন্থ দিল একজোড়া বালা, তা দিয়ে গুরুপত্নীকে প্রণাম করলে—"

দুর্গামণি স্বামীর কথায় বাধা দিলেন, "সেটা ত মন্দ কাজ করি নি। গয়না পরতে আমার ভাল লাগে না। ছেলেমানুষ নই, বুড়ী হয়ে গেছি, এখন আমার গয়নার কিসের দরকার? মেয়ে মানুষের স্বামী পুত্রই শ্রেষ্ঠ অলঙ্কার।"

ঈশানচন্দ্র ক্ষণেক মৌন হয়ে রইলেন।

পাড়ার যারা চোর ধরতে এসেছিল চোরের পলায়নে ভগ্নমনোরথ সকলেই প্রস্থান করেছিল। বাড়ীর লোকজনেরাও ধীরে ধীরে যে যার ঘরে ঢুকে শয্যায় আশ্রয় নিল।

দুর্গামণি স্বামীকে অনুরোধ করলেন, "এখন তুমি শুয়ে পড়গে যাও। ঘুম হ'ল না শরীর খারাপ হবে।"

"ভোর হ'ল, এখন আর শোব কি? তা চোর ক' জনা এসেছিল? তাদের চিনতে পেরেছ?"

"দৌড়ে পালিয়ে গেল, অন্ধকারে তেমন ঠাওর করতে পারলাম না। কিনুর ইচ্ছে তোমার শোবার ঘরটা পাকা ক'রে দেয়। পাকা ঘর হলে সিঁধ কাটার ভয় থাকে না। কিন্তু তুমি তাতে মত দাও না কেন?"

"মত দেই না, আমার কুলদেবতাকে টিনের ঘরে রেখে আমি পাকা ঘরে শুতে পারব না ব'লে। পাকা ঘর আমাদের বংশে সয় না। নইলে হীরাসাগর গ্রাস করত না। কিনু ছেলেমানুষ, সে দিতে চাইলেই কি তার ওপরে বেশি চাপ দেওয়া যায় বড়বৌ? তারও সংসার আছে, পদমর্য্যাদা আছে। বিধবা বোনকে মাসে পঞ্চাশ টাকা সাহায্য ক'রে, ভাগ্নে ভাগ্নীদেরও ঐ রকম দেয়। আমাকেও পাঠায়। সে আর কত পারবে? আসামের অজানা জঙ্গলে টাকার জন্য প'ড়ে রয়েছে। প্রথম ছেলেটি হয়েছিল, তাও রইল না। ওখানে কি বাচ্চাদের শরীর থাকে, কিনুর ছেলে গেলে দীনু তটিনীকে তাদের কাছে দিয়ে এসেছিল। তাকেও ধরেছিল কালাজ্বরে। তাড়াহুড়া ক'রে মেয়েটাকে আনিয়েছিলাম ব'লে প্রাণে বাঁচল। বংশের প্রতুলতা নেই। ন ভাই নিঃসন্তান, মেজ ভাইএর একমাত্র ছেলে। ছোটরও তাই গতিবিধি দেখেই বেয়াই বেয়ান বৌমার জন্য ব্যাকুল হয়েছিলেন।"

"ব্যাকুলতার ফল ত অকূল পাথারে ভাসা। এখন ভালয় ভালয় আমার ঘাটের ভাড়া ঘাটে ভিড়লেই বাঁচি।"

দুই স্বামীস্ত্রীর সুখদুঃখের আলাপ আলোচনার মধ্যে রজনী প্রভাত হ'ল।

গৃহিণীর চিরকালের অভ্যাস আহারাদির পরে অবকাশ সময় যাপন করা মহাভারত রামায়ণ পাঠে। তিনি নিরক্ষরা ছিলেন না। প্রবাসী ছেলেদের কাছে নিয়মিত চিঠিপত্র লিখতেন। আলপনায় ছিল তাঁর অসামান্য দক্ষতা। গ্রামের ছেলেমেয়েদের বিয়ের পিঁড়ি তাঁকেই চিত্রিত ক'রে দিতে হ'ত। টেকোয় সূক্ষ্ম পৈতা কাটাতেও কেউ তাঁর জুড়ি ছিল না। তাঁকে পৈতাও কাটতে হ'ত অজস্র। বাড়ীতে বারমাসে তের পার্ব্বণে যেমন পৈতার প্রয়োজন, তা ভিন্ন কি এখানে কি কলকাতায় পরিবারভুক্ত সকল ব্রাহ্মণকেই তাঁর পৈতার যোগান দিতে হ'ত।

বধূ যাওয়ার পর দুর্গামণি কাটনার ডালায় হাত দিতে সময় পান নাই। এখন কাটনা তোলা রয়েছে। মেঝেয় শীতলপাটি পেতে তিনি শুয়ে শুয়ে রামায়ণ পড়ছিলেন, এমন সময় দাওয়ার নীচে দাঁড়িয়ে কাতরস্বরে কতু সেখ ডাকল, "মা'ঠান, সালাম।"

কপালে ঠেকিয়ে বই মুড়ে রেখে তিনি বাইরে বেরিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, "কি রে কতু এসেছিস? তোর মেয়ে আজ কেমন আছে? কাল থেকে বাড়ীর চারপাশে ঘুরে বড়োর ভাঙ্গা বাঁশগুলো তুই বদলে দিবি। নতুন বাঁশ লাগলে ঝাড় থেকে কেটে নিতে হবে। কাল থেকে তোর কাজ হ'ল এখানে।"

কতু আনন্দের পরিবর্ত্তে ডুকরে কেঁদে উঠল।

দুর্গামণি সবিস্ময়ে প্রশ্ন করলেন, "কি হল তোর? কাঁদছিস কেন? বাড়ীর ছেলেমেয়েরা ত ভাল আছে? কাল যে চাল দিয়েছিলাম, দুপুরে ভাত খেয়েছিস?"

কতু ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদে, "ভাত পামু কনে মাঠান। তুই কাঠা চাল দিইছিলে দশ সের। তুই ওক্তো খাইয়ে শ্যাস ক'রে দিইচি।"

"দশ সের চাল দুই বেলায় খেয়ে ফেললি?"

"হয় মাঠান, ছাওয়াল ম্যায়া পাঁচড়া, দুই মাগীমরদ রইচি। তাতে মরা প্যাট কি ভরতি চায়? খাবলা খাবলা ক'রে যতই দেওন যায়, ততই গোব বাড়ে। দুই ওক্তো পরাণ ভর্যা খাইয়ে চারডে পান্তা কর্যা থুইছিলাম পাতিলে। বিয়ানে ছাওয়াল পাওয়াল নাস্তা খাইচে, মোরা দুইডা খাইচি পান্তা ভাতের জল।"

"তোর বড় ছেলে না পাটের কুঠিতে কাজ করত? বৌ চিঁড়ে কুটত, ধান ভানত?"

"হয় মাঠান, পাট না উঠলে পাট কুঠির কাম বন্ধ। আইজ মাল্‌দা পাড়ার সর্দ্দারগরে কাছে বড় ছাওয়ালডাকে দিইচি জাগের পাট ছাড়াইতে। ওরা তিন ওক্তো খাতি দিইবে। ট্যাকা পয়সা দিবি না। বৌডারেও আজ ডাকি নেচে চির্‌য়া কুটনের লেগে। গাঁথর কাটি গেইলে যে বাঁচন যায় মাঠান।"

"সে ত ঠিক, সকলে কাজ পেলে তোদের আর দুঃখ কি? আজ বরং আর চারটি চাল নিয়ে যা। কাল থেকে ত তুই এখানেই খাবি?"

"আমি চাইলের লেগে আইচি না মাঠান, পড়্যা

গেইছি একডা কাঁপরে। তুমি মাজ্জান, মুনিব, তুমি আমাগরে বাঁচায়ে দাও।" বলতে বলতে কতু হাউমাই করে কান্না আরম্ভ করল।

দুর্গামণি যত জিজ্ঞাসা করেন তোদের কিসের বিপদ্‌, কতু কথা বলে না। হাত জোড় ক'রে কেবলি কাঁদে।

অনেক চেষ্টার পরে দুর্গামণি কতুর সুগোপন বার্ত্তা জানতে সক্ষম হলেন।

গত রাত্রে কতু তার ছেলেকে নিয়ে চারটি চাল চুরি করতে এসেছিল। শলুই কামারের সিঁধকাঠিটা লুকিয়ে এনেছিল তার দোকান থেকে। শলুই কামার টের পেয়ে তাকে থানায় দিতে চাচ্ছে। অস্ত্রটা মাঠান মেহেরবান কারে ফেরত দিলে সে সেটা শলুইকে পায়ে ধ'রে দিয়ে রক্ষা পেতে পারে।

দুর্গামণি ভাল ক'রে না দেখলেও এই সন্দেহই করে-ছিলেন। কিন্তু বিশ্বাস করবার প্রবৃত্তি হয় নি। কতুকে তিনি ছেলেবেলা থেকেই দেখছেন, কাজ করাচ্ছেন, তার এত বড় বিশ্বাসঘাতকতা! দুর্গামণি গর্জ্জে উঠলেন, "নেমকহারাম, ওই বেড়ার গায়ে রয়েছে সিঁধকাঠি নিয়ে দূর হয়ে যা। এ বাড়ীতে ঢুকিস নে। এত বড় বেইমান জন্মে দেখি নি।"

"মাঠান দয়া কর, মুই বেইমান নিমকহারাম লই, প্যাট আমাগো নেমকহারামি করেছে। প্যাটের জ্বালায় যা করতি আইচিলাম, আল্লার নাম লিয়ে কিরা কর‍্যা কইচি, পরাণডা বার হইলিও ওমত কাম ক'রে করমু না। কসুর করিচি মাজ্জান, দোয়া করেন।"

কতু একবার কান মলে, নাক মলে, দুর্গামণির পদতলে মাথা কোটে দুম দুম ক'রে। সে এক বিষম কাণ্ড।

"মানুষের অভাবেই স্বভাব নষ্ট।" পতিতপাবনের স্ত্রী পতিতপাবনী অবশেষে কতুকে ক্ষমা না ক'রে থাকতে পারলেন না।

এ সময় গ্রামে গ্রামে এরূপ ঘটনা নিত্য নূতন ঘটে থাকে। এর জন্যে কেউ পুলিশ ডাকে না। গ্রামের মান্যগণ্য মাতব্বররা একত্র হয়ে পঞ্চায়েত বসিয়ে দোষীকে শাসন করে, হিতোপদেশ দেয়, জন খাটিয়ে শাস্তি দেয়। সেকালের মানুষের ক্ষমার প্রবৃত্তি ছিল অপরিসীম। দয়া দাক্ষিণ্য সহানুভূতি ছিল অসামান্য। তারা যেমন মানুষকে ভালবাসতে জানত, তেমনি জানত বিশ্বাস করতে। ক্ষণিকের অপরাধকে গুরুতর অপরাধ ব'লে মনে রাখত না।

শ্রাবণ বিদায় নিল মনসার পূজা ও ভাসান গানের মধ্য দিয়ে। ভবানীপুর হতে সদ্যঃ প্রত্যাগত কর্ত্তার এক রোগী ভিন্ন গ্রাম থেকে খবর দিয়ে গেল। কেদারের মানতের মোষ বলি দিয়ে মায়ের পূজা নির্ব্বিঘ্নে শেষ হয়েছে। মা প্রসন্ন হয়ে পুজো বলি ভোগ গ্রহণ করেছেন। দেবস্থানে কয়েক দিন অবস্থান করবার বিধি, তাই তাঁরা ক'দিন পরে রওনা হচ্ছেন। সকলে ভাল আছেন।

শুভ সংবাদ পেয়ে কর্ত্তাগিন্নী নিশ্চিন্ত হলেন। বুকের পাষাণ ভার যেন অনেকটা হাল্কা হ'ল।

ভাদ্র সমাগমেই দুর্গা পূজার আয়োজন সুরু ক'রে দিতে হয়। পঞ্জিকার দিনক্ষণ নির্ণয় ক'রে দেবীপ্রতিমার কাঠামো তৈরি হয়। বাঁশখণ্ড ও নদীর এঁঠোলো মাটির প্রয়োজন। সমস্ত জিনিস সংগ্রহ হ'লে তার পরে আসে দেউড়িপালেরা। প্রথমে জড়া বেঁধে একমেটে ক'রে তারা চ'লে যায়, তার পরে দোমেটে, শেষ কালে চিত্তির।

কথায় আছে বন্যার জল, আসতে সকলে দেখে, যাবার সময় টের পাওয়া যায় না। প্রবাদটা মিছে নয়। ভাদ্র মাস পড়তে না পড়তে বর্ষাপ্লাবিত ধরণীর বারিসিক্ত রূপ যেন কার যাদুমন্ত্রে পরিবর্ত্তিত হতে লাগল। খাল বিলের জল স'রে গিয়ে হীরাসাগরের তটরেখা জাগ্রত হ'ল, তীরবর্ত্তী বনশ্রী মাথা তুলে চাইল শরতের সোনা গলানো নীলাকাশের পানে। পাখীরা ফের ফিরে এলো তাদের পুরাতন বৃক্ষের কুলায়ে। বাজপাখীরা আকাশের গা ঘেঁষে উড়ে উড়ে ডাকতে লাগল কর্কশস্বরে, উড়ন্ত বাজের দিকে ঊর্দ্ধে চক্ষু তুলে অনাহারে ক্লিষ্ট কৃষক-বধূদের মলিন অধরে আনন্দের হাসি ঝিলিক দিতে লাগল। কৃষকদের কোমরে-নেংটি-আঁটা মেয়ে বলে, "বাবা, মা তোরা ঠাকুর বাড়ী কামে যাইছিস কখন? এবার কিন্তুক পুজ্জায় আমারে পাছা পাইড়্যা কাপড় দিতি হবে।"

ছেলে বায়না করে, "মুই চাই গলা উঁচা পিরান।"

হুঁকোয় সুখটান দিয়ে বাপ জবাব দেয়, "পাবি ব্যাটা, পাইয়্য যাবি পিরান, তোরেও দিমু পাছা পাইড়্যা শাড়ী, এই ত কামে যাইচি। এই কাম চলিবে বছর ভোর।"

মা পান দোক্তা গালে দিয়ে বলে, "মুইও যাইচি ধান বানতে, ধান বানা, চিইড়া কোটন, ডোয়া বাঁধন, কামের অন্ত নাই। তোরা বাড়ীঘর ঝাড় পোঁচ দে, খড়ি কুড়ায়ে জড়ো করিস। মুই চাইল আইনে ভাত রাঁধে দিমু প্যাট ভইর‍্যা।"

নিরানন্দ গৃহে কতদিন পরে পুলকহিল্লোল বয়ে যায়, এস্ত সকলের আশার স্বপ্ন সফল হয় না। বিধাতা যাদের মেরে রেখেছেন, তারা বাঁচবে কি ক'রে?

সে দিন ভোর বেলা তখনো মেঘমুক্ত আকাশে শরতের রৌদ্রের আভা বিস্তার লাভ করে নি। পাখীরা দলে নীড়ের বার হচ্ছে। অকস্মাৎ নদীর দিক্ থেকে চীৎকার গোলমালে সকলে সচকিত হয়ে ছুটতে লাগল। বার্ত্তা বাতাসে বয়ে আনল, ছিরু মণ্ডলকে নাকি কুমীরে ধ'রে নিয়ে গেছে! ছিরুর একখানা পা ভাঙ্গা, লাঠি ধ'রে অতি কষ্টে চলা ফেরা করে। যৌবনে সে ঘরামির কাজ করত। চাল ছাইতে গিয়ে অসাবধানে মাটিতে গড়িয়ে প'ড়ে তার ঐ দশা হয়েছে। পায়ের সঙ্গে হাতেও চোট লেগেছিল, হাতেও তেমন জোর নেই। তার সংসার:—এক বিধবা মেয়ে ও বৌকে নিয়ে। তারা পাড়ায় পাড়ায় ধান ভেনে খায়; ছিরু ব'সে ব'সে খায় ব'লে বৌ মুখ-ঝামটা দেয়। সেই জন্যে ছিরু হীরা সাগরের উপকূলে বাঁশের দোয়াড় পেতে মাছ ধ'রে বিক্রি ক'রে। সন্ধ্যায় দোয়াড় পেতে রেখে আসে, ভোরবেলা মাছ বোঝাই দোয়াড় তুলে নেয়। আজ দোয়াড় তোলার সময় এই বিপত্তি।

হীরা সাগর নদীতে বর্ষা ভিন্ন আর কখনো মানুষ-খেকো ঘড়েল কুমীর থাকে না। বানের সময় আসে, বান না থাকলে জলের টানে তারাও চ'লে যায় পদ্মা যমুনা বড় নদীতে। কিন্তু যখন তারা আসে, তখন প্রত্যেক বছরেই দুই-চারজনার জীবন নাশ না ক'রে ফিরে যায় না। ছিরুর শোচনীয় মর্ম্মান্তিক খবর পেয়ে কেউ ঘরে থাকতে পারল না, সকলে সমবেত হ'ল নদী তীরে।

জেলে পাড়া উজাড় ক'রে জেলেরা এসেছে নৌকা নিয়ে লগি বাগিয়ে সড়কি উঁচিয়ে। যাদের নৌকা আছে, তারা কেউ বাদ যায় নি। হীরা সাগরের বক্ষ নৌকায় নৌকায় ছেয়ে গেছে। বৈঠা ও লগির খটখট তুমুল শব্দে জনতার কোলাহলে প্রভাতের শান্ত স্তব্ধতা সুদূরে পলায়ন করেছে।

পাটকুঠির চারজনা সাহেব এসেছে বন্দুক নিয়ে লঞ্চে, বন্দুকের গুড়ুম গুড়ুম শব্দে স্থল জল অন্তরীক্ষ প্রকম্পিত। কিন্তু কুমীরের দেখা নাই, ছিরুর চিহ্ন নাই। ষ্টীমারঘাট থেকে মোহনগঞ্জ মোহনা পর্য্যন্ত জল তোলপাড় ক'রে চলে অন্বেষণ।

ক্রমে বেলা বাড়ে, জনতা কমতে থাকে। ছিরুর বৌ ও মেয়ে বালির উপরে মাথা কুটে কুটে কাঁদে। নৌকাও থামে না, লঞ্চও থামে না। উভয় পক্ষেরই জেদ, কুমীরের কবল থেকেই হোক, অতল জলের তল থেকেই হোক, ছিরুর দেহ উদ্ধার করতেই হবে।

অপরাহ্ণে হীরাসাগরের পরপারে নলখাগড়ার বনে ছিরুর দেহ পাওয়া গেল বটে, কিন্তু ছিরুকে নয়, তার পঙ্গু পাটাই কুমীর কেটে নিয়েছে, শরীরের আর কোথাও আঘাতের চিহ্ন নেই।

জেলেরাই ছিরুর শব আবিষ্কার করেছিল, তাদের নৌকাতে মৃতদেহ এপারে আনা হ'ল দাহ করতে।

খাস সাহেবরা যে পরম বস্তু খুঁজে পায় নি, ধীবররা তাই সংগ্রহের আনন্দে গৌরবে অস্থির। 'কারো পৌষ মাস কারো সর্ব্বনাশ।'

বন্দরে ষ্টীমার ঘাটের উপরে টিনের প্রকাণ্ড পাটের কুঠিবাড়ী, লোকে বলে 'সাহেবের কুঠি'। বহুকাল হ'তে এই অখ্যাত অজ গাঁয়ে বেনের দল এসে পাটের ব্যবসা ফেঁদে বসেছে। ওদের চেষ্টায় এবং পাট চালানির ব্যবসার জন্যে দুই বেলা ষ্টীমার ভেড়ে। পাটকুঠিতে শ্রমিকরা কাজ ক'রে পেটের সংস্থান করে। সেদিক্ দিয়ে সাহেবরা গ্রাম উন্নত করেছে। অবনতি যা হয়েছে, সেটা সাধারণের বোধগম্য নয়। এদের গাড়ী ঘোড়া লঞ্চ বোট কিছুরই অভাব নেই, সাত সমুদ্র তের নদীর পার থেকে এসে দিব্যি আমিরী চালে রয়েছে। তাদের বিবিরা আসে, থাকে, ফের চ'লে যায়। গ্রামের নিম্ন শ্রেণীর লোকেরা এই সাদা মানুষগুলোকে দেবতার প্রতিনিধি ভেবে সম্মান করে। এদের আপদে বিপদে ওরা দাঁড়ায় বৈ কি। শীতকালে যখন পাহাড় থেকে গভীর নিশীথে চিতাবাঘ নেমে আসে, বাঘের অগ্রগামী শেয়াল ডাকে ফেউ ফেউ রবে, তখন গাঁয়ের লোক ধ'রে নেয় শেয়ালের ফেউ-এর ভাবার্থ "মানুষ গরু সাবধান, দেশে আইল ভগবান্।"

চিতাবাঘ বুনো শূকর ক্ষিপ্ত হ'লে সাহেবরাই ধ্বংস করে গ্রামকে নিরাপদ করে। কুমীরের ক্ষেত্রেও সাহেবরা অনেকখানি অগ্রসর হয়েছিল। ধীবরদের কৃতিত্বে ঈষৎ ম্লান হয়ে গেল।

সেদিন সাহস সঞ্চয় ক'রে কেউ আর হীরাসাগরের জলে নামতে পারল না! এখনো খাল বিল জলে পরিপূর্ণ, কোথায়ও জলের অভাব নেই। সে দুঃখের রজনী অবসান হ'ল। প্রভাত-অরুণ সোনার আলো গায়ে মেখে হাসি মুখে দেখা দিল সুউচ্চ তরুশিরে, গৃহস্থের আঙ্গিনায়।

আবার কোলাহল জাগল নদীতটে, বন্দুকের ভীষণ গর্জ্জনে চারদিক্ কাঁপতে লাগল। দলে দলে লোক

ছুটল, সাহেবরা কুমীর মেরেছে। সারারাত অভিযানের পরে তার সাক্ষাৎ পেয়েছিল, জল থেকে আধো জাগা বালির চরে।

কি বিশাল ঘড়েল কুমীর! মানুষ'খেকো বাঘের মতন বিরাট্ মাথা, মূলোর মত দাঁত, হাতপায়ের নখগুলো যেন ধারালো ছুরি। সমস্ত গায়ে পুরু হয়ে জলের শেওলা জমেছে। কুমীরের পেট চেরা হ'ল, পেট থেকে বের হ'ল ছোট বড় কয়েক টুকরো হাড়। এক গাছা রুপোর মল, একটা সোণার আংটি ও মাকৃড়ী। ছিরুর বৌ ও মেয়ে সদ্য শশ্মান হতে ফিরে বুক ফাটা আর্ত্তনাদে লুটিয়ে পড়ল পেটকাটা কুমীরের লেজের কাছে, "ওরে দুসমন শয়তান, আমাগো কি সব্বনাশ করলি। তর কি মরণের আর ঠাঁই ছেল না? কে মাছ মাইর‍্যা আমাগরে ভাত দিবে। আমরা যামু কনে? কি দিইয়া ছেরাদ করমু? কি দিইয়া প্যাট ভরামু?"

সাহেবরা পরস্পরের প্রতি একটা ইঙ্গিত ক'রে চার-জনাই পকেটে হাত দিল। তারা চার জনা চারখানা দশ টাকার নোট বের করে ছিরুর বউয়ের হাতে দিল। আর দিল কুমীরের পেটের সোনা রূপোর গহনা। শিকার নিয়ে মহাগর্ব্বে সাহেবরা লঞ্চ ভাসাল। জনতাকে হুকুম দিয়ে গেল, নদীর জ'লে কেউ যেন না নামে। এর জোড়াটা না মারা অবধি। জোড়া ভিন্ন কুমীর থাকে না, ছোট নদীতে আসে না।

এর তিন দিন পরে হাড়গিলা নদীর বাঁকে সাহেবদের বন্দুকের গুলিতে কুমীরের জোড়াটা নিহত হয়েছিল। লোকে বলে সেটার পেটে নাকি পাওয়া গিয়েছে সোনার হার। সেটা বড় সাহেব তার মেমকে উপহার দিয়েছে।

(আগামী সংখ্যায় সমাপ্য)
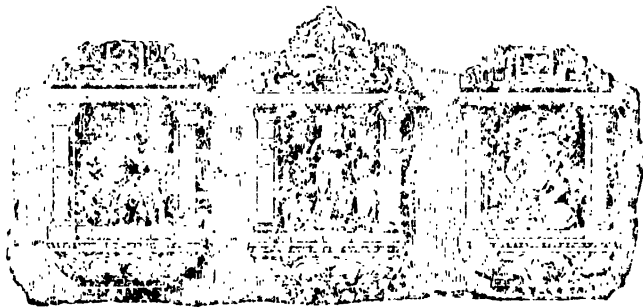
পাত্রপাত্রীর পরিচয়

স্বাল্প্‌টার ভদ্রলোক—অবাঙ্গালী
শান্তা
শান্তার স্বামী—অশোক
কুলি
রেষ্ট হাউসের কিপার
মহারাজা বিষ্ণুবর্ধন
মন্দির-রক্ষক ব্রাহ্মণ
রাজপুরোহিত
পুরোহিত-পুত্র অম্বর
প্রতিহারী
প্রহরী
রাজ-পারিষদগণ
নগরবাসিগণ
দেবদাসী সন্তরা
সন্তরার সখীবৃন্দ
সন্তরার দাসী

(সময় সন্ধ্যা। দূরে একটি মন্দিরের আকারের পুঞ্জীভূত অন্ধকার। রাস্তায় চলমান তিনটি প্রাণী : শান্তা তার স্বামী ও বাক্স-বিছানা মাথায় একটি কুলি। মূর্ত্তিগুলি অনেকটা শিলুহএটে আঁকা ছবির মত দেখাচ্ছে। ঝিঁ ঝিঁ ডাকছে। নির্জন প্রান্তর।

মাঝে মাঝে ফেউ ডাকছে। দূরে ডাকবাংলোর আলো দেখা যাচ্ছে। শান্তা সুন্দরী, বয়স বছর ২০।২২, তার স্বামীও সুদর্শন, বয়স ৩০।৩২।)

কুলি। সাব! উয়ো দেখিয়ে টেম্পল (পুঞ্জীভূত অন্ধকারটার দিকে অঙ্গুলি-নির্দেশ করে)।

অশোক। ও! এইটেই তাহলে সেই হ্যালিকিড মন্দির, বুঝেছ শান্তা? বাসে আমার পাশে যে মাদ্রাজী ভদ্রলোক বসেছিলেন, তিনি বলছিলেন, যে-বেলুর মন্দির আমরা এইমাত্র দেখে এলাম, সেটি আর এই হ্যালিকিড মন্দির, টুয়েলফ্‌থ্‌ সেঞ্চুরীতে রাজা বিষ্ণুবর্ধন তৈরী করান। তাঁরই রাণী সন্তরার নাচের ভঙ্গিমা দেখে শিল্পী ঐ সব মনোহর মূর্তি তৈরী করে।

শান্তা। সত্যি অপূর্ব। মূর্তিগুলি যেন জীবন্ত। কতরকম যে নাচের মুদ্রা আর ভঙ্গিমা সুন্দর সুষ্ঠু ভাবে ঐ মূর্তিগুলিতে জীবন্ত হয়ে উঠেছে, না দেখলে অনুমান করা যায় না।

অশোক। কি রকম ভিজে মাটির সোঁদা গন্ধ বেরুচ্ছে না? মনে হচ্ছে, কোথায় যেন এসে পড়েছি। চার-দিকে কি রকম ফেউ ডাকছে শোন। বেলুরটা কিন্তু বেশ একটা বড় গ্রাম ছিল। এখানে ত সেই বাস ষ্ট্যাণ্ডেই একটা ছোট্ট কফিখানা দেখলাম, আর ত কোথাও কিছু নেই। ভাগ্যিস ওখানেই কফি আর দোসা খেয়ে নিয়েছি আমরা, নাহলে রাত্রে হরিমটর।

কুলি। জল্‌দি চলিয়ে সাব। টাইগার হ্যায়। শের!

অশোক। হাঁ, হাঁ, চল। (শান্তাকে) লোকেরাও বলছিল বটে যে, এখানে কদিন ধ'রে বড় বাঘের উৎপাত হয়েছে। ঐ যে পরশু মাইশোর 'জু'তে বাঘের বাচ্চা-গুলো দেখলে না? সেগুলো এখান থেকেই নিয়ে গেছে শিকারীরা। আর তাদের মা সেই বাঘিনীটা তাই ক্ষেপে গিয়ে ভীষণ উৎপাত করছে।

শান্তা। এই ত এসে পড়েছি আমরা। ঐ ত ডাকবাংলো না কি রেষ্টহাউস দেখা যাচ্ছে।

(রেষ্টহাউসের ঘর। বড় বড় কাচের জানলা। সামনে চওড়া বারান্দা। পাশাপাশি দুখানি ঘরের দরজা দেখা যাচ্ছে। বারান্দার একাংশ ও একটি ঘরের ভিতরটি পুরো দৃশ্যমান। অ্যাটাচ্‌ড্‌ বাথ। বেসিনটা দেখা যাচ্ছে। ঘরে দুখানা খাট, ড্রেসিং টেবিল, চেয়ার আলনা সব সাজান। ইলেকট্রিক লাইটও আছে। রেষ্ট হাউসের কিপার বালতি ক'রে জল এনে টবে ভরছে।)

রেষ্ট হাউসের কিপার। (সেলাম ক'রে) সাব, পাম্প্‌ হ্যায়, পর কোই নেহি আতা, ইসলিয়ে বন্ধ্‌ পড়া রহ্‌তা। আউর ইসলিযে খারাপ ভি হো যাতা। পানি ত হম্‌ ভর্‌ দেতে হ্যায় সাব, পর মাফ্‌ কিজিয়ে, খানা ত আভি নেহি মিলেগা। সুবে নাস্তা তৈয়ার হো যায়গা। উধরবালা কামরেমে এক সাব হ্যায়, মহিনা ভর্‌ হো গয়া। উয়ো তো অপ্‌নে পকাকে খাতে।

অশোক। (বেসিনে মুখ ধুয়ে রুমাল দিয়ে মুখ মুছতে মুছতে) আচ্ছা, আচ্ছা, ঠিক হ্যায়। পানি ভরকে তুম্‌ যাও। (শান্তাকে) ন্যাটা বড্ড বকে, কিন্তু সেই হায়দ্রাবাদ থেকে লক্ষ্য করছি, এ দেশের লোকেরা যেমন চমৎকার উর্দু বলে, তেমনি ব্যবহার জানে। শান্তা, আমার হয়ে গেছে, তুমি এবার বাথরুমে যাও।

(অশোকের পরণে প্যান্ট আর বুশশার্ট, আর শান্তার লাল শাড়ী আর হলদে ব্লাউজ। টুলের ওপর রাখা স্যুটকেস খুলতে খুলতে হাই তোলে শান্তা। বেডিংটা খাটের ওপর রাখা।)

শান্তা। আমার ভারী ঘুম পাচ্ছে! বাবাঃ, একদিনে পঞ্চান্ন মাইল বাস্‌ জার্নি, সোজা কথা নাকি? তার পর তোমার সঙ্গে ঘুরে ঘুরে ঐ বেলুর মন্দিরের অন্ধিসন্ধি দেখা। কোথায় গর্ভগৃহ, কোথায় সেই সিঁড়ি ভেঙ্গে পাতাল প্রবেশ ক'রে সুড়ঙ্গের মধ্যে বন্দীদের কারাগৃহ, এই সব দেখে দেখে পায় আমার ব্যথা ধ'রে গেছে। আবার এই সেপ্টেম্বর মাসেই এখানে কেমন ঠাণ্ডা দেখেছ? (শাড়ী জামা বের ক'রে সাবান তোয়ালে হাতে দাঁড়ায়।)

অশোক। (ড্রেসিং টেবিলের সামনে চিরুণী দিয়ে চুল আঁচড়াতে আঁচড়াতে) যাই বল, ঘরটি কিন্তু চমৎকার। আমি কিন্তু এতটা আশা করি নি। তবে বোধ হয় বেশীর ভাগ বন্ধই প'ড়ে থাকে। দেখছ না, কি রকম চামচিকের গন্ধ!

(জোরে বাঘ ডাকল।)

শান্তা। বাবাঃ! দেখছ কি রকম বাঘ ডাকছে? তুমি আবার চুলটুল আঁচড়ে বাবু সেজে চললে কোথায়?

অশোক। (হাসতে হাসতে শান্তার কাঁধে হাত দিয়ে) কি হ'ল? ভয় পাচ্ছ নাকি? বেশ একটা রোমান্সের শিহরণ জাগছে, না? আমি ঐ পাশের

ঘরের ভদ্রলোকের সঙ্গে একটু আলাপ ক'রে আসি। এক মাস প্রায় আছে যখন, তখন সবই জানে এখানকার। সকালে ফেরার বাস কটায় পাব সেটাও জেনে আসি। যাও তুমি, ফ্রেশ হয়ে নাও। বড় টায়ার্ড দেখাচ্ছে তোমায়। দরজাটা বন্ধ ক'রে নাও।

(শান্তার বেশ-পরিবর্তন হয়ে গেছে। একটু ঠাণ্ডা বোধ হওয়ায় একটা সবুজ রংএর মাদ্রাজী শাড়ী ও লাল ব্লাউজ পরেছে। দুটি খাটে বিছানা পাতা। ড্রেসিং টেবিলের ওপর টয়লেটের জিনিস ও দাড়ি কামানার সরঞ্জাম। আলনায় তোয়ালে ও অশোকের রাত্রের পোশাক পাজামা-পাঞ্জাবী। টেবিলের ওপর ওয়াটার বট্‌ল্ ও ফ্লাস্ক। শুয়ে পড়েছিল শান্তা। বন্ধ দরজায় ধাক্কা পড়তে উঠে দরজা খুলে দাঁড়ায়। অশোকের সঙ্গে আরও একজন সুবেশ ভদ্রলোক। ঢোলিগড়ি পাজামা ও গলাবন্ধ পাঞ্জাবী পরা। নমস্কার করেন তাকে।)

অশোক। আরে শান্তা, ইনি হচ্ছেন একজন স্কাল্পটার। কি চমৎকার সব মূর্তি তৈরী করেছেন জান? বেলুরে যা দেখে এলে অবিকল তার সব প্রতিমূর্তি। সেই মৃদঙ্গ বাজাতে বাজাতে এক রূপসী নাচছে, তার সেই হাসি হাসি মুখ, পায়ের হাতের পেশীর কম্পন, সব হুবহু তুলেছেন ভদ্রলোক, তারপর সেই শিব-পার্বতীর বিয়ে। শিবের মুখটি গৌরী-লাভে আনন্দে উজ্জ্বল, আর গৌরী লজ্জায় নতমুখী। তাছাড়া এখানে উনি একটি মোহিনী মূর্তি দেখে তার মিনিয়েচার তৈরী করছেন। অপূর্ব হয়েছে মনোহারিণী মোহিনী মূর্তিটি। তার প্রতিটি অঙ্গে যেন মনোহর নাচের মুদ্রা জীবন্ত হয়ে ফুটে উঠেছে! শুধু হাতটি তার এখন জুড়তে বাকি। (উৎসাহিত ভাবে) চল না, দেখবে ত চল ওঁর ঘরে।

শান্তা। (ক্লান্ত ভঙ্গিতে) আজ থাক্, কাল সকালে ভাল ক'রে দেখব। (স্কাল্পটার ভদ্রলোককে) ম্যয় কাল আপকি কামরেমে যাকর্ সব্ কুছ্ দেখুঙ্গি। আপকি তারিফ ত খুব কর্ রহেঁ ইয়ে।

স্কাল্পটার ভদ্রলোক। (এতক্ষণ মুগ্ধদৃষ্টিতে শান্তার দিকে চেয়ে ছিলেন। এবার ওর সুগঠিত শরীরটির দিকে আরও একবার শিল্পী-সুলভ দৃষ্টি হেনে, হাত জোড় ক'রে বিনীত হেসে) বহুত মেহেরবানি আপকি। জরুর তসরিফ লাইয়েগি। আজ আপকো পরেসান্ মালুম দেতা হ্যায়, আরাম কিজিয়ে। ইয়ে লাড্ডু লিজিয়ে, রাতকো লিয়ে জরাসা আরাম মিলেগি। ম্যয় বহুত শর্মিন্দা হুঁ কি আপলোগকে লিয়ে ম্যয় আউর কুছ সেবা ন কর্ শকা (অশোককেও নমস্কার ক'রে চ'লে যায় ভদ্রলোক।)

শান্তা। (বিরক্তির সুরে) বাবাঃ, এতও বকতে পার। প্রফেসারি ক'রে ক'রে বকাটা তোমার অভ্যেসে দাঁড়িয়ে গেছে। আমার ঘুমে চোখ ভেঙ্গে আসছে বলে, আর তুমি আসছই না। (বিছানায় আড় হয়ে শুয়ে একটা লাড্ডু ভেঙ্গে খেতে খেতে) নাও, তুমিও দুটো লাড্ডু খাও, আর ওয়াটার বট্‌লে জল আছে, খেয়ে শুয়ে পড়। ক্ষিধে পেয়েছিল কিন্তু। ভদ্রলোক কিন্তু বেশ ভদ্র, তাই না? আমাদের সঙ্গে কিছু নেই দেখে লাড্ডু দিয়ে আতিথেয়তা করলেন।

অশোক। (চেয়ারে ব'সে লাড্ডু খেতে খেতে) আর তুমি তাকে দরজা থেকে বিদায় করলে! একবার বসতেও বললে না! খালি ত তোমার ঘুম আর ঘুম। আরে, ভদ্রলোক শুধু—ভদ্র আর স্কাল্পটারই নন, ইতিহাস আর দর্শনেও পণ্ডিত। ওসমানিয়াতে পড়েছে। শোন, ইনি বলছিলেন, এই হালিবিড মন্দিরও বিষ্ণুবর্দ্ধনের তৈরী, তবে প্রথম তৈরী হয় এটি, তাই অনেক পুরনো। তা ছাড়া পরে এইসব জায়গা একেবারে নিবিড় জঙ্গলে ভ'রে গিয়েছিল। বাঘের বাসা হয়েছিল ঐ মন্দিরের মধ্যে। বর্তমান মাইশোরের মহারাজার দাদু মহারাজা কৃষ্ণরাজা ওয়াডিয়ার একদিন শিকারে এসে এই মন্দির আবিষ্কার করেন আর সংস্কার করান। ঐ নিবিড় জঙ্গল নষ্ট ক'রে বসতি ও বসান। এই মন্দিরটি নাকি ঐ বেলুরের চেয়েও বড়। ভেতরে বিরাট শিবলিঙ্গ আছে। বেলুরের মত নারায়ণের মূর্তি নয়। সেই নারায়ণের কি যেন নাম বলল ওরা, শান্তা?

শান্তা। (ঘুমন্ত চোখ খুলে) চেন্না কেশব! আমাদের এবার পূজোটা বেড়িয়েই কেটে গেল। আজ সপ্তমী পূজো, বেলুরে ছিলাম। কাল ত মহাষ্টমী।

অশোক। হ্যাঁ, হ্যাঁ, আর শোন না, দুটো দোতলা সমান নন্দীমূর্তি আছে। এই মন্দিরের বৈশিষ্ট্য হ'ল এই যে, এর সারা গায়ে সমস্ত রামায়ণ মহাভারতের সপ্তকাণ্ড আর অষ্টাদশ পর্বের ঘটনা খোদাই করা আছে। নারায়ণের কপট নিদ্রা থেকে আরম্ভ ক'রে ভীষ্মের শরশয্যা পর্য্যন্ত সব আছে। কী সূক্ষ্ম সুন্দর কাজ! কি মুখের ভাব! বলতে বলতে ত ভদ্রলোকের চোখে মুখে আনন্দ ফেটে পড়ছিল—বলছিল, আমাদের দেশের লোকে যায় ওদেশের পেইন্টিং আর ভাস্কর্য্য

দেখতে, আগে নিজের দেশের জিনিস দেখে শেষ করুক। শিল্পে কি গভীর জ্ঞান, কি সূক্ষ্ম নিপুণ কারিগরি, আর পরিমাপ বোধ ছিল আমাদের প্রাচীন মূর্তিকারদের; দেখে অবাক্ হ'তে হয়। এইসব দক্ষিণের মন্দির আর অজন্তা ইলোরা হ'ল আমাদের প্রাচীন ভাস্কর্য্যের জলন্ত নিদর্শন। শান্তা, ও শান্তা! ঘুমিয়ে পড়লে নাকি তুমি? ওই তোমার এক দোষ। আমি চেয়ারে ব'সে ব'কেই চলেছি, আর তুমি বেশ মজা ক'রে ঘুমোচ্ছ। (স্বগতঃ) যাকগে এবার ভেবে আমিও শুয়ে পড়ি।

(বিশাল মন্দির। মন্দির চত্বরে আরোহণের জন্যে প্রশস্ত সোপান। চত্বরে পট্টবস্ত্র-আচ্ছাদিত একটি প্রস্তরমূর্তি। সোপানের দুই পার্শ্বে স্ফিংক্সের ন্যায় দুটি সিংহমূর্তি। শান্তার হস্তে মাঙ্গলিক। চরণে নূপুর। কেশ আলুলায়িত। বক্ষে কঞ্চুলী। তদুপরি স্বচ্ছ বক্ষাবরণ। নিতম্বে নীবিবন্ধ। স্কন্ধে বেষ্টিত একটি জরীমণ্ডিত পুষ্পমাল্য। সোপানে আরোহণরতা দেবদাসী সন্তরা রূপী শান্তা। তারই পায়ের নূপুরে নিক্কণ উঠছে ছম্ ছম্। পার্শ্বস্থিত ঘরের সেই ভাস্করও তার পাশে পাশে চলেছেন। তাঁরও হস্তে পূজার সম্ভার। পাজামা-পাঞ্জাবী স্থলে অঙ্গাবরণ হয়েছে ধুতি ও উত্তরীয়।)

শিল্পী। (মৃদু ও গম্ভীর কণ্ঠে) দেবী সন্তরা! আজ মহাষ্টমী। আমার মোহিনীমূর্তি সমাপ্ত হয়েছে, অবলোকন করুন। (মূর্তির পট্টবস্ত্রের আবরণ অতি ধীরে উন্মোচন করলেন।)

শান্তা। (স্বগতঃ, বিস্মিত ভাবে) কি সূক্ষ্ম কারুকার্য্য এই মূর্তির অলঙ্কারে। কাঁপা রুদ্রাক্ষের মালাটি নাভি-নিম্নে বিলম্বিত, মনে হয় ওটি বিচ্ছিন্ন, কিন্তু তা নয়। ঐ একটি প্রস্তরফলকেই নির্মিত।

সন্তরা। এই অপরূপ মোহিনী মূর্তি হস্তহীন কেন?

শিল্পী। আজ আপনি মধুমন্তিতে নৃত্য করবেন আর আমি সেই নৃত্যপর সুডৌল হস্ত এর অঙ্গে স্থাপন করব।

সন্তরা। (অবাক্ হয়ে হতচকিত ভাবে শিল্পীর আরও একটু সন্নিকটে এসে) আমি? আমি নৃত্য করব? সে কি? এ তুমি কি বলছ শিল্পী?

শিল্পী। হ্যাঁ দেবী সন্তরা, আপনি! স্মরণ করুন সে দিনের ঘটনা।

দৃশ্য পরিবর্তন, ফ্ল্যাশব্যাক।

(বিরাট গোপুরম্। মন্দিরের প্রবেশদ্বার হতে দেবতার মূর্তি পর্য্যন্ত পথ। পথের দুইপার্শ্বে কারুকার্য্য খচিত স্তম্ভশ্রেণী, স্তম্ভগুলিতে সুর বাঁধা। প্রথম স্তম্ভটি বজ্রস্তম্ভ, সূচনা-সূচক। অন্যান্যগুলি হতে মৃদঙ্গের ন্যায় শব্দ উত্থিত হয়। মন্দির অভ্যন্তরে বিশাল বিষ্ণুমূর্তি। দেবতার সম্মুখে গোলাকৃতি মসৃণ প্রস্তর-চত্বর। লোকে লোকারণ্য। স্তম্ভসারির পশ্চাতে উচ্চ বেদীর আকারের প্রস্তর-চট্টান। মধ্যস্থলের বৃহদায়তন চট্টানের একপার্শ্বে মহারাজ বিষ্ণুবর্ধন সমাসীন। কিঙ্করীরা ব্যজনরতা। মহামাত্য, সেনাপতি ও দৌবারিকগণ অন্যান্য চট্টানের শোভাবর্ধন করেছেন। দেবদাসী সন্তরা একপার্শ্বে দণ্ডায়মানা। তার হস্তে মুকুর। পার্শ্বে করঙ্কবাহিনী দাসী।

(সন্তরারূপী শান্তা, নিজের প্রসাধন অন্তে মুকুর হস্তে শেষবার নিরীক্ষণ ক'রে নিচ্ছে, প্রসাধন তার যথাযথ হয়েছে কি না।)

সন্তরা। (স্বগতঃ) কি আশ্চর্য্য। এ কি অভিনব সজ্জা আমার? অলক্তক-সিঞ্চিত চরণে শিঞ্জিনী, নাভির নিম্নে নীবিবন্ধনী, কটিতে মেখলা, বক্ষে কঞ্চুলী, কণ্ঠে মুক্তার সাতনরী, প্রকোষ্ঠে চূড় কঙ্কণ, কর্ণে মণিকর্ণিকা ও মস্তকে সিঁথিমৌর। হস্তের মুকুরে দেখছি, এক রূপসী দন্ত বিকশিত ক'রে হাস্য করছে। কে আমি? (পার্শ্বস্থ দাসীকে) রঞ্জাবতী! মুকুর গ্রহণ ক'রে এবার তাম্বুল অর্পণ কর। (ধীরপদক্ষেপে এবার মহারাজ সমীপে উপস্থিত হয়ে মহারাজকে) মহারাজ জয়ন্ত! (আবারও সচমকে দেখল, মহারাজ বিষ্ণুবর্ধন তারই স্বামী অশোক। কিন্তু এ কি বেশ? পরিধানে সুন্দর গরদের জোড়, কণ্ঠে স্বর্ণ-উপবীত। কর্ণে কুণ্ডল, হস্তে বাজুবন্ধ ও প্রকোষ্ঠে হীরকবলয়, শোভন মস্তকে স্বর্ণমুকুট।)

মহারাজ। (স্বস্তি করেন দেবদাসী সন্তরাকে) শুভমস্তু! দেবদাসী! নৃত্য আরম্ভ হোক।

(সেই কৃষ্ণপ্রস্তরের সুগোল চত্বরের উপর উদ্দাম নৃত্যে নেচে চলেছে দেবদাসী সন্তরা। ভারত নাট্যম্, কথকলি, ভস্মমোহিনী, স্বৈরিণী, কিঙ্করী, শচী, কত বা সে নাচের নাম, কত বা মুদ্রা। হঠাৎ সম্মুখে দৃষ্টি পড়তে সবিস্ময়ে দেখে, সেই শিল্পী নিবিষ্ট নিথর হয়ে পারিপার্শ্বিক ভুলে একাগ্র দৃষ্টিতে মুগ্ধ বিস্ময়ে অপলকে চেয়ে আছে তারই দিকে।)

মহারাজ। (রোষকষায়িত লোচনে তীব্র দৃষ্টিতে লক্ষ্য করেন শিল্পীকে ও রাগতকণ্ঠে ব'লে ওঠেন) কে এই

দুর্বিনীত যুবক? যে এত বড় স্পর্ধা ধরে? দেবতা ও রাজার প্রসাদীতে ওই ভাবে দৃষ্টিক্ষেপ করে?

সভাসদ। (সভয়ে উত্তর দেয়) মহারাজ! ও পুরোহিতপুত্র, অম্বর!

মহারাজ। (সক্রোধে) অম্বর! তুমি আমার সম্মুখে উপস্থিত হও।

(মস্তক অবনত ক'রে অম্বর অগ্রসর হয় রাজসমীপে।)

মহারাজ। কি তোমার পরিচয়?

অম্বর। আমি শিল্পী।

মহারাজ। পার তার কোন নিদর্শন সর্বসমক্ষে উপস্থিত করতে?

অম্বর। (বিনীত ভাবে) পারি মহারাজ।

মহারাজ। পার এই দেবদাসীর নৃত্যভঙ্গিমা পাষাণে প্রতিফলিত করতে?

অম্বর। (দুই হস্ত জোড় ক'রে অবনত মস্তকে) আজ্ঞা করুন।

মহারাজ। বল যুবক! কত দীর্ঘ সময়ে সেই মূর্তি নির্মাণে সক্ষম হবে তুমি?

অম্বর। (তেমনি বিনীত ভাবে তবে উজ্জ্বল দুই চক্ষু মহারাজের চক্ষে মিলিত ক'রে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ভাবে) অদ্য থেকে তৃতীয় চন্দ্র-মাসে দুর্গোৎসবের মহাষ্টমী তিথিতে আমি দেবদাসী সন্তরার মনোহর নাচের ভঙ্গিমার একটি রূপক মূর্তি আপনার সকাশে প্রকাশ করব। অবশ্য প্রত্যহ যদি এঁর এই অপূর্ব নৃত্যভঙ্গিমা অবলোকনের সৌভাগ্য হয় তাহলেই আমি আমার প্রতিজ্ঞা রক্ষা করতে সক্ষম হব মহারাজ।

মহারাজ। তথাস্তু। কিন্তু যদি অপরাগ হও তবে রাজরোষে রাজ-অবরোধে হবে তোমার স্থান।

(রাজপুরোহিতের কণ্ঠের নারায়ণী স্তোত্র স্তিমিত হয়ে আসে। হস্তস্থিত পঞ্চপ্রদীপ কেঁপে ওঠে, পুত্রের অমঙ্গল আশঙ্কায়। আরতি শেষে মহারাজার আদেশে মন্দির-অভ্যন্তরের বজ্রস্তম্ভে আঘাত করে প্রতিহারী। সমস্ত মন্দির-অভ্যন্তর ও মন্দিরের চতুষ্পার্শ্ব কেঁপে ওঠে সেই ভীষণ নির্ঘোষে।)

প্রতিহারী। মহাদেবী দেবদাসী সন্তরা অদ্য হইতে তৃতীয় মাসে মহাষ্টমী তিথিতে রাণী সন্তরাতে পরবর্তিত হবে···ন। ঐ মহাষ্টমী তিথিতে দেবী সন্তরা বিংশতি বৎসরে পদার্পণ করবেন...। সেই দিন শিল্পী অম্বর তাঁর মূর্তি সর্বসমক্ষে বিচারের জন্য প্রকাশ করবে···। প্রকৃত শিল্পী কি না তার প্রমাণ দেবে···। অন্যথায় রাজদণ্ড।

(মন্দির দেউলে ও দেহলী-প্রান্তে লোকে লোকারণ্য। বজ্রস্তম্ভের নির্ঘোষ যে ঘোষণার সূচক দেশবাসীরা তা জ্ঞাত আছে।)

(আজ সেই মহাষ্টমী তিথি। অম্বরের পরীক্ষার দিন। মন্দির সম্মুখের প্রস্তর চত্বরের উপর সেই মোহিনী মূর্তি। শিল্পীর এক হস্তে মার্জনিকা, অন্য হস্তে মূর্তির আবরণী সেই পট্টবস্ত্র। তার স্থির ও গভীর দৃষ্টি সন্তরার মুখের উপর ন্যস্ত। পুষ্পপাত্র হস্তে দণ্ডায়মানা সালঙ্কারা দেবদাসী সন্তরা। সেই পূর্ববর্ণিত পোশাক)।

অম্বর। দেবী! কিছু প্রকাশ করুন। আমি যে আপনার মুখ-নিঃসৃত সামান্য কোন বাক্য শ্রবণের নিমিত্ত বহুক্ষণ হতে এই স্থানে অপেক্ষা ক'রে আছি। সর্বসমক্ষে এই মূর্তি প্রকাশের পূর্বে আপনার কৃপা দৃষ্টি লাভ করুক আমার এই মোহিনী মূর্তি।

সন্তরা। (বিস্ময়াবিষ্ট কণ্ঠে) এ যে আমার প্রতিকৃতি! অম্বর কেমন ক'রে তুমি এব এই কঠিন প্রস্তরময় মুখে আমার মুখের কোমলতা উৎকীর্ণ করেছ? কি যন্ত্র দিয়ে করেছ এই সব অলঙ্কারের সূক্ষ্মতার সৃষ্টি? (কিছুক্ষণ অম্বরকে সন্ধানী দৃষ্টিতে দেখে) কে তুমি শিল্পী? সত্য বল, কোথায় পেয়েছ তোমার এই অদ্ভুত প্রতিভা? কে দিল তোমাকে এই প্রেরণা?

অম্বর। (বিগলিত স্বরে) তুমি! তুমিই দিয়েছ দেবদাসী। তোমায় আমি সমস্ত অন্তর দিয়ে, আমার সত্তা দিয়ে ভালবাসি সন্তরা। তোমার ঐ মোহিনী মূর্তি আমার অন্তরের অন্তস্তলে মুদ্রিত হয়ে আছে। আমি সেই রূপ, সেই দেহভঙ্গিমা, সেই মুখশ্রী অনায়াসে এই কঠিন প্রস্তরে উৎকীর্ণ করেছি।

(পক্বকেশ শ্বেতশ্মশ্রু বৃদ্ধ রাজপুরোহিত সোপানে আরোহণ-রত। এই বাক্য শ্রবণে পুত্রের অমঙ্গল আশঙ্কায় কেঁপে ওঠে তাঁর পিতৃঅন্তর। দুই হস্ত প্রসারিত ক'রে ব্যাকুল ভাবে ছুটে এসে পুত্রকে আলিঙ্গন করেন।)

রাজপুরোহিত। এ তুই কি বললি অম্বর? ভুলেও ও বাক্য আর উচ্চারণ করিস্ না। জানিস্ কি এর শাস্তি?—আজীবন অন্ধ হয়ে রাজকারাগারে বন্দী থাকতে হবে। ওরে, তুই আমার একটি মাত্র পুত্র। আমার সে ক্ষতি সহ্য হবে না রে, সহ্য হবে না।

(মন্দির-অভ্যন্তর। পূর্বের ন্যায় মন্দির-প্রাঙ্গণ ও দেউল-অভ্যন্তর পাত্রমিত্র ও সভাসদে পরিপূর্ণ।

—অম্বর, সত্বর এইস্থান পরিত্যাগ কর, নচেৎ বিপদ্ অনিবার্য্য।

মহারাজ রাজগুরুর পদবন্দনায় রত। শুভক্ষণ সমুপস্থিত। মহাষ্টমীর তিথিপূজা ও বিবাহের লগ্ন সমাগত। দেবতার মূর্তির সম্মুখে জোড় হস্তে দণ্ডায়মানা দেবদাসী। তার অনতিদূরে অম্বর দণ্ডায়মান। মুখ তার প্রতিভা-উদ্ভাসিত, কিন্তু ম্লান। আরতি-প্রদীপ সদৃশ দুই চক্ষু দিয়ে সে যেন ঐ দেবদাসী সন্তরারই আরতিতে রত।

দেবদাসী তার প্রতি দৃষ্টিপাত ক'রে সচেতন করতে চেষ্টা করে তাকে।)

সন্তরা। (অস্ফুট ভয় কম্পিত স্বরে) অম্বর, সত্বর এই স্থান পরিত্যাগ কর, নচেৎ বিপদ্ অনিবার্য্য। কেন তোমার এই অমর প্রতিভার বিনাশ সাধন করতে চাও? কি আছে আমার এই অসার দেহে? ত্যাগ কর আমার চিন্তা। নিজের সৃষ্টির মধ্যে মগ্ন হয়ে যাও তুমি। তোমার ভাস্কর্য্যই নতুন প্রেরণা দেবে তোমাকে।

অম্বর। (ধীর অথচ দৃঢ়স্বরে) তা হয় না সন্তরা। তুমি যে আমার, মন-প্রাণ নয়, অস্থি-মজ্জায় মিশে গেছ'। তোমার চিন্তা পরিহার করা আমার পক্ষে অসম্ভব। রাজরোষ আমাকে চক্ষুহীন ক'রে দিলেও অনায়াসে তোমার এই অনবদ্য রূপ পাষাণে প্রতিফলিত করতে সক্ষম হব আমি।

(শঙ্খ ও ঘণ্টা ধ্বনির মধ্যে তিথিপূজা শেষ হ'ল। রাজগুরু তাঁর আসন গ্রহণ করলেন। মহারাজ পাত্রমিত্র পরিবৃত হয়ে প্রস্তরপট্টে সমাসীন।)

প্রতিহারী। (সেই বজ্রস্তম্ভে লগুড়াঘাত করতে করতে উচ্চৈঃস্বরে ঘোষণা করে) মহারাজের আদেশ, পুরোহিত-পুত্র অম্বর এইবার তাঁর নির্মিত মূর্তির আবরণ সর্বসমক্ষে উন্মোচন করু…ন। যদি কৃতকার্য হন তবে মহারাজ তাঁর যাচ্ঞা পূর্ণ করবে…ন। আর যদি প্রমাণিত হয় তাঁর ঐ মূর্তিতে দেবদাসী সন্তরার নৃত্যের প্রতিকৃতি প্রতিফলিত হয় নি তবে তিনি আজীবন রাজকারাগারে বন্দী থাক…বেন

(ধম্-ধম্-ধম্। ঘোষণা শেষ হ'ল। পট্টবস্ত্র

আবৃত মূর্তিটি কয়েকজন বাহক মিলে বহু কষ্টে রাজ-সমীপে বহন ক'রে আনে ও একটি উচ্চ বেদীর উপরে স্থাপন করে। সকলের মিলিত গুঞ্জনধ্বনিতে দেব-দেউলের অভ্যন্তর গম্ গম্ করতে থাকে। অম্বর প্রথমে নারায়ণকে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করে, পরে পিতার দিকে ক্ষণকাল স্থিরদৃষ্টিপাতে তাঁর আশীর্বাদ ভিক্ষা করে। রাজপুরোহিত শুভকামনার সহিত একটি প্রসাদী ফুল পুত্রের হস্তে অর্পণ ক'রে তার শির-চুম্বন করেন। সন্তরাও ধীর পদক্ষেপে অগ্রসর হয়; তার হস্তে একটি দীপাধার। মহারাজার আদেশে দেবদাসী সন্তরাও একটি দীপাধার হস্তে মূর্তির পার্শ্বে মূর্তিমতী দীপশিখার মত দণ্ডায়মানা। তার প্রতিকৃতি ঐ মূর্তিতে কি পরিমাণ প্রতিফলিত হয়েছে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিচার হবে তার।)

অম্বর। (ধীরপদে অগ্রসর হয়ে অতি যত্নের সহিত সেই মোহিনী মূর্তির আবরণ উন্মোচন করে।) অব-লোকন করুন মহারাজ।

(সভাসদরা স্ব স্ব আসন পরিত্যাগ পূর্বক মূর্তির নিকটবর্তী হন। মহারাজাও সিংহাসন ত্যাগ ক'রে মূর্তির নিকটে বেদীনিম্নে দণ্ডায়মান। দেবদাসী সন্তরা দীপাধার হস্তে ঐ মোহিনী মূর্তির ন্যায় নৃত্যের ভঙ্গিতে দণ্ডায়মানা। মহারাজ জীবন্ত সন্তরা ও মূর্তি সন্তরার মধ্যে পার্থক্য পর্যবেক্ষণের নিমিত্ত কিছুক্ষণ নির্বাকভাবে নিরীক্ষণ করেন, পরে ধীরে ধীরে নিজের মতামত প্রকাশ করেন।)

মহারাজ। (আবেগপূর্ণ অথচ ধীর স্বরে উচ্চারণ করেন) ধন্য তুমি অম্বর! ধন্য তোমার শিল্প-সাধনা। তোমার এই ভাস্কর্য্য অনন্তকাল ধ'রে তোমার পরিচয় বহন করবে। এই রূপলাবণ্যময়ী সন্তরা একদিন জরাগ্রস্তা হবে। আমার এই রাজত্বও একদিন কালগ্রাসে বিলীন হয়ে যাবে! কিন্তু অম্বর! তোমার শিল্প হবে অমর, চিরস্থায়ী। এরই মাধ্যমে জীবিত থাকবে সন্তরার অপূর্ব নৃত্যকৌশল। (অম্বরের নিকটবর্তী হয়ে ভাবাপ্লুত ভাবে) বল ভাস্কর! তোমাকে কি পুরস্কার দেব? কোন্ পুরস্কার তোমার যোগ্য হবে শিল্পী?

অম্বর। (অতি বিনীত অথচ দৃঢ়স্বরে) মহারাজ, আমি এই দেব-দেউলের সমস্ত প্রাচীর-গাত্রে ঐ দেব-দাসীর প্রত্যেকটি নৃত্য-ভঙ্গিমা এমনি জীবন্ত ক'রে উৎকীর্ণ করব, আজীবন কাল পর্যন্ত। বিনিময়ে আপনি আমাকে ঐ মূর্তিমতী নৃত-শিল্পী দেবদাসী সন্তরাকে ভিক্ষা দিন মহারাজ।

মহারাজ। (রোষান্বিত কণ্ঠস্বর সারা দেউলে প্রতিধ্বনি তোলে।) জিহ্বা সম্বরণ কর যুবক। যশ, অর্থ, উপাধি যা তোমার মন চায়, যাচ্ঞা কর। শুধু ও নাম বিস্মরণেও উচ্চারণ ক'রো না।

অম্বর। (স্থির দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ভাবে) না মহারাজ! আর কোন দ্বিতীয় যাচ্ঞা আমার নেই। আপনি আমাকে ক্ষমা করুন।

মহারাজ। (অতিশয় বিরক্ত ও রাগান্বিত হয়ে সুউচ্চ কণ্ঠে ডেকে ওঠেন) প্রতিহারী! প্রহরীকে বল, এই দুর্বিনীত যুবককে কারাগারে নিক্ষেপ করুক এবং রাত্রির মধ্যযামে এর দুই চক্ষে যেন তপ্ত লৌহশলাকা বিদ্ধ ক'রে একে চক্ষুহীন করা হয়। ঐ দূষিত দৃষ্টি যেন আর কখন দেবদাসীকে কলুষিত না করে। (পুনরায় আসন গ্রহণ করেন মহারাজ।)

(সন্তরা দীপাধার হস্তে স্থাণুর মত সেই প্রস্তরময়ীর সমীপে দণ্ডায়মানা। তার হস্তস্থিত দীপালোকে প্রকাশমানা সেই পাষাণী রূপসী দেবদাসী মধুর ভঙ্গিমায় আনন্দে নৃত্যরতা। দীপা-লোক পড়েছে তার সুন্দর মুখে, মরাল কণ্ঠে, গতিশীল মধুমন্তিতে নৃত্যপরা তার দুই সুডোল হস্তে, ক্ষীণ কটিতটে, নিতম্বে, উরুতে, পদতলে। অথচ শরীরিণী দেবদাসী, গতিহীনা, নিশ্চলা, পাষাণে পরিণতা। গভীর দৃষ্টিপাতে তার কাছে শেষ বিদায় নিয়ে চ'লে যায় শৃঙ্খলিত অম্বর। দেবদাসীর দৃষ্টি নারায়ণের মুখোপরি ন্যস্ত। সে দেখে, নারায়ণ চেন্না কেশব তাঁর সাদামণিময় চক্ষু মেলে সবই প্রত্যক্ষ করলেন। তবে তাঁর পাষাণ-হৃদয় কি সত্যই দয়াহীন! তার দু নয়নে অশ্রুর ধারা বয়।

রাজপুরোহিত। (এক হস্ত শূন্যে উত্তোলন ক'রে) হা পুত্র!

(সভা নিস্তব্ধ।)

রাজগুরু। (গুরুগম্ভীর কণ্ঠে) দেবদাসী, শেষবারের মত আজ তুমি দেবসমক্ষে নৃত্য কর। তাঁর প্রসাদ ভিক্ষা কর।

দেবদাসী। (বেদী হতে ধীর পদক্ষেপে অবতরণ করতে করতে বিকৃত কণ্ঠে স্বগত:) কিন্তু হায় নারায়ণ! আমার হস্তপদ যে নিষ্ক্রিয়-প্রায়। নিজের এই সুন্দর দেহ-সৌষ্ঠবের প্রতি এসেছে অসহ্য ঘৃণা, মনে এসেছে ক্ষোভ। আমার এই অসার দেহের জন্য আজ একটি সম্ভাবনাময় তরুণের সারা জীবনে নেমে আসবে অন্ধকার! অথচ আমি নিরুপায় ক্রীড়নক! নিয়মের নিগড়ে বাঁধা।

এই রাজ্যের প্রথামত বিংশতি বর্ষ পর্যন্ত দেবতা আমার স্বামী, তারপর রাজা হবেন ভর্তা। এই বিবাহের শেষে আমি হব রাজকুলবধূ। রাজঅন্তঃপুরে অন্যান্য মহিষীদের সঙ্গে হবে আমার স্থান। হে শিলাময় কঠিন দেবতা! দয়া ক'রে কিছু উপায় ক'রে দাও।

(উদ্দাম আকুল হয়ে নেচে চলেছে দেবদাসী। আজ তার অঙ্গে নীবিবন্ধ ও কঞ্চুলীর স্থলে ঘাগরা ও ওড়না। নৃত্যের তালে তালে নূপুরের শিঞ্জিনী উঠছে ছিম ছিম। দেবারতি ও পূজারিণীর ভঙ্গি ও মুদ্রার অপ্রকাশ। নারায়ণের চরণে প্রাণভরা প্রণতি জানিয়ে শেষ করে দেবদাসী। এখন তার মুখ আনন্দোজ্জ্বল।)

সন্তরা। (নারায়ণের উদ্দেশে সহর্ষে) মনে এসেছে উপায় প্রভু! মনে এসেছে উপায়। দীনবন্ধু, তুমি অনাথের নাথ।

(সুরু হয় বিবাহের মঙ্গলানুষ্ঠান। সন্তরার সখীরা বধূবেশে সজ্জিত করে তাকে। পুরাতন স্বর্ণাভরণ এক-একটি ক'রে অপসারিত করে তার দেহ থেকে। তার স্থলে পুষ্পাভরণে সজ্জিত করে তাকে। মহারাজ স্বয়ং তার কণ্ঠে মঙ্গলসূত্র পরালে তবে নূতন স্বর্ণাভরণ অঙ্গে তুলবে সে। এই প্রথা। সখীরাও সন্তরার ন্যায় ঘাগরা ওড়না ও কঞ্চুলীতে শোভিতা।

সন্তরা। (পরমাশ্চর্যে একটি সখীকে সম্বোধন ক'রে পুলকিত স্বরে) কে তুমি? এস্থানে তোমার উপস্থিতি কি ভাবে সম্ভব?

সখী। (সহাস্যে) যাক্, কি ভাগ্যি! রাণীতে রূপান্তরিতা হয়েও ননদিনীকে বিস্মৃত হও নি দেখছি। (পরম আদরে সন্তরার মুখ স্পর্শ ক'রে অঙ্গুলি চুম্বন ক'রে গুণ গুণ ক'রে গান ধরে)—

সাজাব যতনে কুসুমে রতনে
কেউড়ে কঙ্কণে কুঙ্কুমে চন্দনে।

(সন্তরা ঘাগরা ও ওড়নার স্থলে এবার রক্তবর্ণ বারাণসী শাড়ী ও চেলি পরিহিতা। শাড়ী দক্ষিণ দেশীয় প্রথায় তার অঙ্গের শোভা বর্ধন করেছে। কণ্ঠে জরীমণ্ডিত পুষ্পমাল্য, মস্তকে পুষ্পমুকুট ও সিঁথি-মৌর, কর্ণে পুষ্পকুণ্ডল, হস্তে পুষ্পনির্মিত কঙ্কন ও বাজুবন্ধ। আগুলফ-লম্বিত বেণীবদ্ধ কেশ এবার কবরীতে পরিবর্তিত, কুসুমে সজ্জিত। সখী-বেশী সন্তরার ননদিনী এবার তার কোমল করখানি ধারণ ক'রে দেবসমীপে অগ্রসর হয়। সলজ্জ পদক্ষেপে অনুগমন করে বধূবেশী সন্তরা।

মহারাজও বর-বেশে সজ্জিত। প্রশস্ত ললাটে শ্বেত চন্দনের কুণ্ডরীক চিহ্ন। মস্তকে স্বর্ণ-কিরীট, কর্ণে কুণ্ডল, কণ্ঠে শ্বেতবর্ণ পুষ্পমাল্য ও পরিধানে বারাণসী জোড়। প্রকোষ্ঠে স্বর্ণবলয়। রাজগুরু সমভিব্যাহারে দেব-সন্নিধানে অগ্রসর হ'ন। সখাদের হুলুধ্বনি ও শঙ্খধ্বনির মধ্যে বিবাহের ক্রিয়াকর্ম সমাপ্ত হয়। এবার মহারাজ ও সন্তরা একত্রে এসে নারায়ণের সম্মুখে জোড় হস্তে দণ্ডায়মান হন। রাজপুরোহিত নারায়ণের প্রতিভূ হয়ে দেবদাসী সন্তরাকে রাজহস্তে সমর্পণ ক'রে রাজাকে প্রণাম করতে বলেন।)

রাজপুরোহিত। দেবদাসী সন্তরা! অদ্য হতে তুমি রাজরাণী সন্তরা। এখন মহারাজা তোমার স্বামী, রক্ষক, পূজ্যস্থল, দেবতাজ্ঞানে তুমি ওঁর আজ্ঞা পালন করবে, তুষ্টিসাধন করবে। আজ হতে তুমি রাজকুলের মহারাণী সন্তরা। নাও, নারায়ণকে প্রণাম কর, পরে রাজাকে প্রণাম কর। তিনি তোমার তিনটি বাঞ্ছা পূর্ণ করবেন।

(মহারাজ ও দেবদাসী একত্রে নারায়ণ চেন্ন কেশবকে প্রণাম করেন।

মহারাজ। এস রাজ্ঞী, তোমার কণ্ঠে আমি এ মঙ্গলসূত্র প্রদান করি।

পুরোহিত। (বিনীতভাবে) মহারাজ! প্রথমে আপনি সন্তরার তিনটি ইচ্ছা পূর্ণ করবেন, পরে ওর অনুমতি হলে তখনই মঙ্গলসূত্র ওর কণ্ঠে দেবার অধিকার হবে আপনার।

সন্তরা। (স্বগতঃ) বিবাহের পূর্বে পূজারিণী নৃত্যের সময় এই উপায়টিই স্মরণে এসেছিল আমার।

মহারাজ। (মঙ্গলসূত্র হস্তে সস্মিত কণ্ঠে) বল রাজ্ঞী সন্তরা, কি তোমার ইচ্ছা? কি তোমার বাসনা, প্রার্থনা কর নির্ভয়ে।

সন্তরা। (কুণ্ঠিত ভঙ্গিতে) মহারাজ! দয়া ক'রে আপনার কঠিন আদেশ প্রত্যাহার করুন। এ পুরোহিতের পুত্র অম্বরের চক্ষুদান করুন।

মহারাজ। (চিন্তিত ভাবে) তথাস্তু।

সন্তরা। (বিনম্র ভাবে) মহারাজ! আজ আপনার রাজ্যে উৎসবের সমারোহ। এইদিনে পুরাতন বন্দীরা মুক্তি পায়।

মহারাজ। (সন্দিগ্ধ স্বরে) রাজ্ঞী সন্তরা! তুমি কি বন্দী অম্বরের প্রতি অনুরক্তা?

সন্তরা। (নির্ভীক ভাবে) না মহারাজ! শুধু অনুকম্পা। ওর ভাস্কর্য্য ও প্রতিভার প্রতি শ্রদ্ধা।

মহারাজ। (প্রীত ভাবে) বেশ। উত্তম। এবার তোমার তৃতীয় ইচ্ছা প্রকাশ কর রাজ্ঞী।

সন্তরা। (অচঞ্চল ও সলজ্জ ভঙ্গিতে) মহারাজ! আমি নৃত্যশিল্পী। নৃত্যের মাধ্যমে আমি কলার সাধনা করি। একান্ত অন্তঃপুর মধ্যে এ সাধনা বিফল। সেই কারণে বিবাহ অন্তেও দেবসমক্ষে এই দেউলে নৃত্য করার অনুমতি প্রার্থনা করি। আমার আবাল্যের অভ্যাস আপনি রক্ষা করুন মহারাজ।

মহারাজ। (ঐশ্বর্য্যসুলভ হাস্যের সাথে) সন্তরা! তোমার অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য আমার অগোচর নেই। অনুকম্পা ওর প্রতি আমারও আছে। অত বড় প্রতিভা বিনষ্ট হবে না! কল্য প্রভাতে আমি স্বয়ংই অম্বরকে মুক্তি দিতাম। তবু তোমার এই কারুণ্য ও উদার অন্তঃকরণের প্রশংসা না ক'রে পারছি না সন্তরা। তুমিই প্রকৃত রাজমহিষীর লক্ষণযুক্তা। যাও রাজ্ঞী, স্বহস্তে বন্দীর বন্দিত্ব মোচন ক'রে মুক্ত ক'রে এস তাকে।

পুরোহিত। (সহর্ষে) জয় হোক মহারাণী সন্তরার! জয় মহারাজা বিষ্ণুবর্দ্ধন! (উচ্ছ্বাসের প্রাবল্যে সাষ্টাঙ্গে নারায়ণের চরণে প্রণিপাত করেন। সন্তরা শ্রদ্ধাবনত চিত্তে প্রনাম করে মহারাজকে।)

মহারাজ। (সন্তরার দুই হস্ত ধারণ ক'রে উত্তোলন করেন ও মঙ্গলসূত্র কণ্ঠে প্রদান করেন।) এস রাণী সন্তরা!

সন্তরা। আশীর্বাদ করুন মহারাজ, যেন আপনার উপযুক্ত হতে পারি।

মহারাজ। প্রহরী! রাজ্ঞীকে বন্দী-সকাশে নিয়ে যাও।

(অন্ধকার সুড়ঙ্গ পথ। চর্মচটিকার গন্ধপূর্ণ। অগ্রে দীপ হস্তে প্রহরী চলেছে, পশ্চাতে রাণী সন্তরা। শিঞ্জিনীশব্দে সুড়ঙ্গ মুখরিত।)

সন্তরা। প্রহরী! এই সুড়ঙ্গ পথে এত চর্মচটিকার দুর্গন্ধ কেন? (স্বগতঃ) এই উৎকট কটু গন্ধ যেন বিস্মৃতিকে স্মৃতিতে আনে।

(সুড়ঙ্গ পথ শেষ হয়। অকস্মাৎ শৃঙ্খলের ঝনৎকার ওঠে ঝনঝন ও সন্তরার সম্মুখে দণ্ডায়মান বন্দী অম্বর।)

অম্বর। (বিস্মিতভাবে সন্তরার দুই অনাবৃত স্কন্ধে বাহু স্থাপন ক'রে) এ কি সন্তরা! তুমি এই বন্দীশালায়? মুক্তি দিতে এসেছ আমায়, না দর্শন দিতে এসেছ?

সন্তরা। (সরোষে দুই পদ পশ্চাতে স'রে গিয়ে) ছিঃ অম্বর! পরস্ত্রীকে স্পর্শ ক'রো না। এখন আমি রাজ্ঞী সন্তরা।

(আবার সেই রেষ্টহাউসের আগেকার ঘর। সময় সকাল। কাঁচের জানালার মধ্যে দিয়ে ফিকে রোদ্দুরের আভাস আসছে। শান্তা পরনের সবুজ শাড়ীটাই আগাগোড়া মুড়ি দিয়ে অঘোরে ঘুমোচ্ছে। পাজামা-পাঞ্জাবী পরা অশোক। দাড়ি কামানোর সরঞ্জামগুলি ড্রেসিং টেবিলের ওপর রাখা রয়েছে। মুখ-হাত ধোওয়া, দাড়ি কামান সবই হয়ে গেছে তার।)

অশোক। (স্বগতঃ) বাবাঃ, আচ্ছা ঘুম! (ঘড়ি দেখে) ইস্, এদিকে বেলা আটটা প্রায় বাজে। (এবার শান্তার পাশে ব'সে তার দুই কাঁধে হাত দিয়ে ডাকে) শান্তা! এই শান্তা!

শান্তা। ছিঃ, পরস্ত্রীকে স্পর্শ ক'রো না।

অশোক। (আশ্চর্যভাবে) কি হয়েছে? এই শান্তা! কার সঙ্গে কথা বলছ? ওঠ। ন'টার বাস ছেড়ে যাবে যে। মন্দির দেখবে কখন?

(শান্তা হতভম্ব হয়ে খাটের ওপর উঠে বসে। এখনো তার দুই চোখে স্বপ্নের ঘোর। অভিভূতের মত অশোকের দিকে চেয়ে থাকে। কোথায় সেই মহারাজা বিষ্ণুবর্দ্ধন?)

শান্তা। (স্বগতঃ) কি আশ্চর্য! তা হলে কি এতক্ষণ একটানা স্বপ্নই দেখছি নাকি? কি অদ্ভুত সব জীবন্ত ব্যাপার দেখলাম। সত্যি কি এটা স্বপ্ন, না জাতিস্মরের মত পূর্বজীবনের ছায়া দেখলাম?

অশোক। কি? আবারও যে উঠে ব'সে রইলে? যাও, বাথরুমে যাও। ইস্! কি চামচিকের গন্ধ ঘরটায়! আমি জানলাটা খুলে দিই। দেখ না, রোদ উঠে গেছে বাইরে।

শান্তা। সত্যিই ত, এই দম আটকান চামচিকের গন্ধই আমাকে নিয়ে গিয়েছিল দূর অতীতে।

(ঠক ঠক শব্দ ওঠে দরজায়, চমকে ওঠে শান্তা।)

শান্তা। (জড়সড় ভাবে) কে? কে ওখানে?

অশোক। আঃ, এত ভয় পাচ্ছ কেন? দাঁড়াও, আমি দেখছি কে?

(অশোক দরজা খুলতে সাদা শার্ট ও গ্রে কলারের ফুলপ্যান্ট পরিহিত সম্ভ্রান্ত স্বাস্থ্যবান ভদ্রলোক কফি-ভরা ফ্লাস্ক হাতে ঘরে ঢোকেন। কিন্তু শান্তার জবুথবু ভাব দেখে)

স্কাল্পটার। এক্সকিউজ মি। আপলোককে লিয়ে জরাসা কফি লিজিয়ে। (তাড়াতাড়ি চ'লে যান।)

শান্তা। (বিস্মিত ভাবে) অম্বর, তুমি?

অশোক। (একটু বিরক্ত ভাবে) বলি শান্তা দেবী, আপনার ব্যাপারটা কি? গাত্রোত্থান করবেন কি না?

শান্তা। এই, চটো না বলছি, কাল রাত্রে ভারী অদ্ভুত স্বপ্ন দেখেছি, জানো?

অশোক। মানে? তাই বুঝি আমাকে বলছিলে পরস্ত্রীকে স্পর্শ ক'রো না?

শান্তা। (মৃদু হাস্যের সঙ্গে) ওমা, তাই বলেছি বুঝি? তুমি এখন ঐ ভদ্রলোকের সঙ্গে মন্দিরে চ'লে যাও। ঐ ত মন্দির দেখা যাচ্ছে। আমি স্নান ক'রে এক্ষুণি যাচ্ছি।

(চুলের বিনুনী খুলতে খুলতে ড্রেসিং টেবিলের সামনে দাঁড়ায়।)

অশোক। লাল সিল্কের শাড়ীটি যেন পরতে ভুলো না তুমি। আমাকে আবার এদের সেই মাদ্রাজী গরদের জোড় ভাড়া করতে হবে বেলুরের মত, তবে মন্দিরে ঢুকতে পাব। এদের পুজোর ধরণটি কিন্তু বড় সুন্দর, তাই না? স্বামীস্ত্রীতে একসঙ্গে মাঙ্গলিক হাতে গলায় মালা প'রে পুজো দিতে হয়। পুরুত আবার তোমার কপালে রোলি পরিয়ে দিয়ে কেমন দেবতাকে আর আমাকে প্রণাম করতে বললেন। নাও, তুমি তাড়াতাড়ি নাও, আমি ত সকালেই একবার মন্দির প্রদক্ষিণ ক'রে এসেছি। রোদবৃষ্টি থেকে বাঁচবার জন্য কোণা কেটে তৈরী করেছে এই হ্যালিকিড মন্দির। সব মিলে বোধ হয় চুরাশিটি কোণ আছে। বেলুরের মত এখানেও নর্তকীদের মূর্তি আছে। প্রত্যেকটি নাচের অভিব্যক্তি নর্তকীর মুখে পরিষ্কার ফুটে উঠেছে। মনে হ'ল যেন ট্যাবলো দেখছি। ভেতরে মহাদেবের মূর্তি আছে। তাই দ্বারপাল জয়-বিজয়। তাদের গলায় দেখলাম রুদ্রাক্ষের মালা। যেন আলাদা ক'রে কেউ পরিয়ে দিয়েছে। কিন্তু জান, ওটি একই সঙ্গে পাথর কেটে তৈরী? কি সূক্ষ্ম নিপুণ কাজ!

শান্তা। (চিরুণী দিয়ে চুল আঁচড়াতে আঁচড়াতে অভিভূতের মত) আ রে, আমিও যে দেখেছি ঐ মালা! কি সূক্ষ্ম কারুকার্য্য করা প্রত্যেকটি গহনা! চল, চল, আমি দেখব ঐ মূর্তি। আর ঐ তোমার স্কাল্পটার কি দেখে মোহিনী মূর্তি গড়েছে তাও দেখব।

অশোক। তুমি মন্দিরে না গিয়ে আবার মালা দেখলে কোথায়?

শান্তা। (পেছন ফিরে দুই হাতে ড্রেসিং টেবিলটা ধ'রে নিজের উত্তেজনা দমন করতে করতে) আমি বুঝেছি, বুঝতে পেরেছি আমি। (এবার সামনে ফিরে) বহুপূর্ব জীবনে বোধ হয় তুমি ছিলে মহারাজা বিষ্ণুবর্ধন, আর আমি ছিলাম তোমার রাণী সন্তরা। আর ঐ স্কাল্পটার ভদ্রলোক ছিলেন এই মন্দিরের মূর্তিকার, ভাস্কর। না হলে এই প্রাচীন মন্দিরের প্রতি তাঁর কিসের এত আকর্ষণ? না হলে কাল লাড্ডু দিতে এসে ভদ্রলোক অমন আশ্চর্য্য হয়ে কি দেখছিলেন আমার মধ্যে?

অশোক। কি আবোল তাবোল বকছ? এদিকে সময় চ'লে যাচ্ছে।

শান্তা। জানি, তুমি বিশ্বাস করবে না। তোমাকে বলাও বৃথা। (রাগ ক'রে মুখ ঘুরিয়ে নেয়।)

অশোক। (খোসামুদির স্বরে) তুমি সুন্দরী, তাই তোমাকে অমন আদেখলের মত দেখছিল ঐ অম্বুরীপ্রসাদ। নাও, হয়েছে?

শান্তা। অম্বুরীপ্রসাদ? ঐ ভদ্রলোকের নাম অম্বুরীপ্রসাদ? আশ্চর্য্য ত?

অশোক। (অধীর ভাবে) আমি যাচ্ছি, তুমি স্বপ্ন দেখ ব'সে ব'সে। মন্দির আর দেখো না। (বাইরে বারান্দায় বেরিয়ে) শান্তা! দরজাটা বন্ধ ক'রে নাও।

(স্কাল্পটার ভদ্রলোক ওদের অপেক্ষায় বাইরে দাঁড়িয়ে ছিলেন।)

স্কাল্পটার। আইয়ে, চলিয়ে মন্দির মে। পর আপকি wifeকি name শান্তা হ্যায়? তাজ্জব কি বাত!

অশোক। (স্বগতঃ) কেন বাপু? তোমাকেও কি আবার ঘোড়া রোগে ধরল নাকি? (প্রকাশ্যে) কেন কি হুয়েছে তাতে? বাত কেয়া হ্যায়?

স্কাল্পটার। মহারাণী সন্তরা দেবীকি face cutting কি সাথ আপকি wifeকি faceকি আদল আতি হ্যায়। আউর নাম মে ভি similarity হ্যায়। Dance করনা জানতি কেয়া আপকি মিসেস?

অশোক। উয়ো আ রহি হ্যায় মেরে মিসেস, উন্‌হি কো পুছিয়ে।

(স্কাল্পটার ভদ্রলোক, অশোক, শান্তা মন্দির-চত্বরে ওঠার জন্যে সিঁড়িতে ওঠে। মন্দিররক্ষক একজন মাদ্রাজী ব্রাহ্মণ। হাতে ক্যামেরা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন চত্বরে।)

মাদ্রাজী ব্রাহ্মণ। Please, ওখানেই দাঁড়াও তোমরা। আমি তোমাদের একটা snap নিতে চাই। এটা আমার

একটা মেশা। যারা মন্দিরে পূজা দিতে আসে তাদের বেশীর ভাগের আলেখ্য আমার কাছে আছে।

শান্তা। (সবিস্ময়ে) ইনিই ত সেই রাজপুরোহিত! আর ঐ ত সেই দুটি সিংহমূর্তি। তা ছাড়া ঐ সুড়ঙ্গ পথ, ঐ চেন্নাকেশবের মূর্তি সব বেলুরে আছে। তবে কি আমি জাতিস্মর?

(স্তম্ভিত বিস্ময়ে দাঁড়িয়ে থাকে শান্তা, ওর দিকে চেয়ে থাকে অম্বুরীপ্রসাদ। ওদিকে নটার বাসের হর্ণ বাজছে। ওরা যাবে ব্যাঙ্গালোর)।

সমাপ্ত

প্রাচীন চন্দ্রকেতুগড়ের মৃন্ময় শিল্প

শ্রীপরেশচন্দ্র দাশগুপ্ত

বর্তমান নিবন্ধের উপসংহারে চন্দ্রকেতুগড়ে আবিষ্কৃত পোড়ামাটির সীল ও মৃৎপাত্রের অলঙ্করণ সম্বন্ধে আলোচনা করা অপ্রাসঙ্গিক হবে না। প্রাগৈতিহাসিক শৈলী ও অনুভূতিযুক্ত সীলটি ইতিপূর্বে আলোচিত হয়েছে। চন্দ্রকেতুগড়ের অন্যান্য সীলগুলির বেশীর ভাগ মৌর্য্য, শুঙ্গ ও কুষাণ কালের আঙ্গিকধর্মী এবং এইগুলি বিভিন্ন দিক্ দিয়ে তুলনা করা যায় উত্তর ভারতের রাজঘাট ও ভিটার সীলসমূহের সঙ্গে। একটি গোলাকৃতি সীলে এক দণ্ডায়মানা নারীমূর্ত্তিকে দেখা যায় এক পবিত্র বৃক্ষকাণ্ড ধারণ করতে; নীচে স্বল্পপ্রাপ্ত ব্রাহ্মী লিপি মৌর্য্য-শুঙ্গযুগের নির্দেশক। নারীমূর্ত্তির বেশভূষা, কবরীর গোলাকৃতি অলঙ্কাররত্ন এবং দীর্ঘ অথচ সুডৌল মৃণাল-বাহু পাটনার অদূরে অবস্থিত বুলান্দিবাগের মৌর্য্যযুগে নির্ম্মিত নর্ত্তকীকে স্মরণ করিয়ে দেয়। অপরপক্ষে বৃক্ষকাণ্ড ধরবার ভঙ্গিটি ভারহুত, সাঁচী এবং অন্যান্য নানা স্থানের শিল্প-বর্ম্মে রূপায়িত 'বৃক্ষকা' অথবা 'শালভঞ্জিকা'র মূর্ত্তিসমূহকে মানসপটে উদিত করে। উল্লিখিত ভঙ্গিদ্বয় উর্ব্বরতা তথা শস্যশালিতার দ্যোতক। এক কথায় 'বৃক্ষকা' এবং 'শালভঞ্জিকা' বনদেবারই রূপ। তরুলতা ও পুষ্পরাজির নিবিড়তা ও শাশ্বত বিকাশের সঙ্গেই তাদের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ। মানবের কবিমানসের অন্বিষ্ট জীবন-উৎসেরই মধুর রূপক প্রতিফলিত হয়েছে তাঁদের পরিপূর্ণ নারীত্বে। এক কথায় এই আকাঙ্ক্ষিত কল্পনা একান্তই ইঙ্গিতধর্মী। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, সুপ্রাচীন কাল থেকে পশ্চিম এশিয়া ও ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে রূপসী মানবী অথবা দেবীর সঙ্গে পল্লবিত তরুলতার যোগাযোগ কল্পিত হ'য়ে এসেছে।

চন্দ্রকেতুগড়ের অন্যান্য কয়েকটি সীলে ..নের ছড়া বা শীষ দেখা যায়। এইগুলি প্রাচীন বাংলা তথা ভারতের অনেক সীলের রূপায়ণের সঙ্গে তুলনীয়। পশ্চিম দিনাজপুরের বাণগড় এবং ২৪ পরগণার আটঘরা ও হরিনারায়ণপুরে এই ধরণের চিত্রসম্বলিত শুঙ্গ-কুষাণ যুগের সীল আবিষ্কৃত হয়েছে। ধানের ছড়া স্বভাবতঃই শ্রী, ভূমি অথবা লক্ষ্মীর কল্পনার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট।

শুঙ্গ কালের এক ধরণের বিচিত্র সীল একাধিক আবিষ্কৃত হয়েছে। এইগুলির গঠন-প্রকৃতি দেখে মনে হয়, এইগুলি সম্ভবতঃ পুঁথি অথবা মূল্যবান্ দলিল-পত্রের বন্ধনীতে ব্যবহৃত হ'ত। এইগুলির পশ্চাৎ দিক্ ভাঙ্গা এবং সেখানে সুতো পরাবার চিহ্ন রয়েছে। সীলগুলির চিত্রবস্তু কিছুটা অসাধারণ। সাঁচীর তোরণের ন্যায় দুই দিক্ মোচান বর্গাযুক্ত শুঙ্গকালীন তোরণ-দ্বারের উপর লুণ্ঠিত পেখমযুক্ত ময়ূর। তোরণের পাশে কয়েকটি পবিত্র চিহ্ন। এই চিত্রটি দেখে এ কথা অনুমান করা যায় যে, প্রাচীন চন্দ্রকেতুগড়ে দেব-সেনাপতি কার্ত্তিকেয়র মন্দির ছিল এবং কে জানে শুঙ্গযুগে হয়ত এখানকার রাজকীয় চিহ্ন ছিল ময়ূর-তোরণ। এই প্রসঙ্গে আমাদের স্বভাবতঃই মনে পড়ে, জৈমিনীয় মহাভারতে বর্ণিত কৃষ্ণার্জ্জুনের সঙ্গে যুদ্ধরত তাম্রধ্বজের পিতা ময়ূরধ্বজের কথা। পণ্ডিতগণ সাধারণতঃ মনে করেন যে, এই ময়ূরধ্বজ প্রকৃতপক্ষে তাম্রলিপ্তের রাজা ছিলেন।

পোড়ামাটির ফলকে রূপায়িত একটি নাটকীয় দৃশ্য। সম্ভবতঃ বৌদ্ধ জাতক অথবা পুরাণের কোন উপাখ্যান থেকে গৃহীত। চন্দ্রকেতুগড়। আনুমানিক খ্রীষ্টীয় ২য়-৩য় শতাব্দী।

ভারহুত ও সাঁচীর তোরণের ন্যায় ক্ষুদ্রাকার তোরণ ইতিপূর্বে তাম্রলিপ্তে আবিষ্কৃত হয়েছে। হরিনারায়ণপুরে প্রাপ্ত শুঙ্গকালের একটি লিপি-বিহীন ছাপযুক্ত তাম্র মুদ্রায় অনেকটা এই ধরণের প্রবেশদ্বার অঙ্কিত আছে। নিম্নবঙ্গে আবিষ্কৃত একাধিক দৃষ্টান্ত দেখে মনে হয়, এই ধরণের তোরণ-শিল্পের উৎপত্তি প্রাচ্য ভারতে হওয়া অসম্ভব নয়। ইতিপূর্বে প্রত্নতাত্ত্বিক ফার্গুসন্ দেখিয়েছেন যে, এই শ্রেণীর স্থাপত্য-রীতি প্রাচীন ইহুদী এবং রোমানগণের নিকট পরিচিত ছিল।[১] রোমান সম্রাট্ সেপ্‌টিমাস্ সেভেরাস্ পূর্ব ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে প্রচলনের নিমিত্ত অনেকটা এই ধরণের তোরণ-অঙ্কিত এক শ্রেণীর মুদ্রার প্রচলন করেন। অবশ্য, এই ক্ষেত্রে মনে রাখতে হবে যে, অতীতকালে চীন ও জাপানেও অনেকটা এই ধরণের তোরণ নির্মিত হ'ত। চীনদেশে একে বলা হ'ত "পাই লিউ" এবং জাপানে "তোরী"।

চন্দ্রকেতুগড়ের প্রাচীন মৃৎপাত্রসমূহেও গভীর শিল্পানুভূতির পরিচয় পাওয়া যায়। এইগুলির গায়ে নানা জীবমূর্তি এবং সুপ্রাচীন লোকাচার-সম্মত কারুকার্য্য সহজেই আমাদের মুগ্ধ করে। চন্দ্রকেতুগড়ে বিভিন্ন শ্রেণীর প্রাচীন মৃৎপাত্র আবিষ্কৃত হয়েছে, যথা—

১। লাল-কালো মৃৎপাত্র (Black and Red Pottery)।

২। লাল ও ঘৃতবর্ণের মৃৎপাত্র (Black and Cream Pottery)।

৩। উজ্জ্বল কৃষ্ণবর্ণ পালিশযুক্ত মৃৎপাত্র (Northern Black Polish)।

৪। ধূসর রঙের মৃৎপাত্র (Grey ware)।

৫। আদি ঐতিহাসিক লোহিত-তাভ মৃৎপাত্র।

৬। কেন্দ্রমুখী বৃত্তাকার চিহ্নযুক্ত মৃন্ময় থালা (Rouletted dish)।

৭। বিভিন্ন ছাপ ও চিহ্নযুক্ত মৃৎপাত্র।

লাল-কালো এবং লাল-ঘিয়ে রঙের মৃৎপাত্রগুলির উৎপত্তি সম্ভবতঃ তাম্র-প্রস্তর যুগে এবং এইগুলির প্রচলন মৌর্য্যকাল পর্য্যন্তও প্রসারিত ছিল। সাধারণতঃ এইগুলি আবিষ্কৃত হয় ভারতের প্রাগৈতিহাসিক নগরীসমূহের ধ্বংশাবশেষে।

৩নং নিদর্শন উজ্জ্বল কৃষ্ণবর্ণ মৃৎপাত্রসমূহকে উত্তর ভারতের নানা স্থানে প্রত্নতাত্ত্বিক খনন-কার্য্যের বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে মোটামুটিভাবে খ্রীঃপূঃ ৭ম থেকে খ্রীঃপূঃ ২য় শতাব্দীর মধ্যে নির্দেশ করা হ'য়ে থাকে।[২] এইগুলি সাধারণতঃ মুকুরের ন্যায় উজ্জ্বল পাত্রবিশিষ্ট। কখনও এই কৃষ্ণবর্ণের অন্তরালে স্বর্ণাভা অথবা রৌপ্যাভার ছটা দেখা যায়।

৪নং ধূসর রঙের মৃৎপাত্রের বিশেষ প্রচলন ইতিহাস-

১ James Fergusson: Tree and Serpent Worship, London, 1873.

২ Y. D. Sharma Exploration of Historical Sites, Ancient India, 1953, No. 9 (Special Jubilee Number), p 119.

পূর্ব্ব কাল থেকে বহু পরবর্ত্তী শুঙ্গ-কুষাণযুগ পর্য্যন্ত। চন্দ্রকেতুগড়ের এক শ্রেণীর সূক্ষ্ম কণাযুক্ত মসৃণ ধূসর পাত্র একদিকে যেমন স্মরণ করিয়ে দেয় প্রাগৈতিহাসিক চিত্রিত ধূসর মৃৎপাত্রকে (Painted Grey Ware), অপরপক্ষে তেমনি এমন অনেক ধূসর মৃৎপাত্র আবিষ্কৃত হয়েছে যেগুলিকে মৌর্য্য-শুঙ্গ অথবা কুষাণকালে নির্দ্দেশ করা যেতে পারে।

৬ নং 'রুলেটেড' মৃৎপাত্রসমূহ রোমক নির্ম্মাণ পদ্ধতির পরিচায়ক।[৩] যদিও কেন্দ্রমুখী বৃত্তাকার চিহ্ন অথবা চক্রের অলঙ্করণ প্রাগৈতিহাসিক সিন্ধু সভ্যতার মৃৎপাত্রে দেখা যায় তবুও সম্ভবতঃ শুঙ্গ-কুষাণকালে এই চিহ্নযুক্ত একধরণের থালার প্রচলন হয় গ্রেকো-রোমান্ বাণিজ্যের দরুণ। ইতিপূর্ব্বে দক্ষিণ ভারত, উড়িষ্যা ও বাংলার আরিকামেড়ু, ব্রহ্মগিরি, শালিহুন্দম্, শিশুপালগড়, তাম্রলিপ্ত, আটঘরা এবং হরিণারায়ণপুরে অনেক সংখ্যক 'রুলেটেড' মৃৎপাত্র আবিষ্কৃত হয়েছে।

৭ নং ছাপযুক্ত ও অন্যান্য নানা চিহ্ন-খোদিত মৃৎপাত্র প্রাগৈতিহাসিক কাল থেকে ভারতে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। তবে সাধারণতঃ শুঙ্গ, কুষাণ ও গুপ্তযুগের নিদর্শনসমূহেই এদের সমধিক প্রচলন দেখা যায়।

৩ বারাণসী অঞ্চলের রাজঘাটে খনন কার্য্যের ফলে গুপ্তযুগে নির্ম্মিত এই ধরণের নল আবিষ্কৃত হয়েছে। Indian Archaeology—A Review, 57-58, p 51, plate LXIXA

চন্দ্রকেতুগড়ে আবিষ্কৃত এক শ্রেণীর ধূসর অথবা কৃষ্ণবর্ণ প্রলেপযুক্ত মৃৎপাত্রের গায়ে পদ্ম-চিহ্নের ছাপ দেখা যায়। ১৯৫৭ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়-নিয়ন্ত্রিত খননকার্য্যের ফলে এই ধরণের নিদর্শন শুঙ্গ-কুষাণ স্তর থেকে উত্তোলিত হয়। এ ছাড়া, শিল্পশৈলীর বিচারেও এই চিত্রগুলি এই যুগের মণ্ডন-ধারার সাক্ষ্য বহন করে। কুষাণ ও গুপ্তযুগের বিভিন্ন সময়ে নির্দ্দিষ্ট নানা মৃৎপাত্রে ছাপচিহ্ন দেখা যায়, যথা, পত্রচিহ্ন, জ্যোতি-বিচ্ছুরিত সূর্য্যগোলক, পুষ্পলতা, ইত্যাদি। এই ছাপচিহ্ন স্বভাবতঃই অহিচ্ছত্রার বিভিন্ন অনুরূপ অলঙ্কৃত মৃৎপাত্রকে স্মরণ করিয়ে দেয়। একধরণের মকরাকৃতি নলও দেখা যায়, যেগুলি খুব সম্ভব এক বিশেষ ধরণের পবিত্র মৃন্ময় কুম্ভের অংশ ছিল। মকরের শুঁড়ের সামান্য বক্রতা দেখে এগুলিকে কুষাণযুগে নির্দ্দেশ করা যেতে পারে।

চন্দ্রকেতুগড়ের কয়েকটি ধূসর মৃৎপাত্রের গায়ে (গড়ন দেখে অনুমান হয় এক শ্রেণীর থালার মধ্যস্থলে) বৃত্ত-রেখার মধ্যে বিভিন্ন ধরণের শৃঙ্গযুক্ত হরিণ দেখা যায়। এইগুলি অতি সুন্দর ভাবে ছাপনির্ম্মিত এবং এদের শিল্প-বক্তব্যে প্রাগৈতিহাসিক মৃৎপাত্রসমূহের চিত্রিত মৃগদলের আভাস বিদ্যমান। অপর একটি ক্ষেত্রে কেবলমাত্র রেখার দ্বারা অঙ্কিত একটি চতুষ্পদ জীব ইতিহাসপূর্ব্বকালের চিত্রণ-পদ্ধতিকে স্মরণ করিয়ে দেয়।
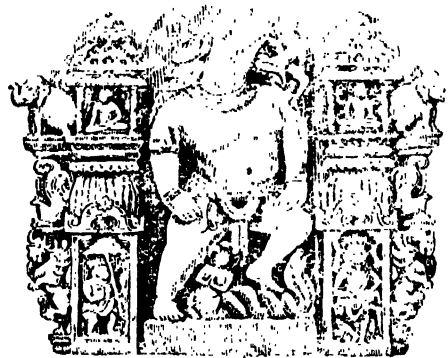
শুভ শঙ্খধ্বনি, আলো, উৎসবের কোলাহলের মধ্যেই বেশীর ভাগ গল্প শেষ হয়। তার পরের কথা প্রায় কেউ লিখতে চায় না। মনে হয়, পাঠক-পাঠিকা কেউ খুশী হবে না। এ সংসারে দুঃখ, যন্ত্রণা, সমস্যা, বিশ্বাসঘাতকতা, কিই বা নেই? নিরবচ্ছিন্ন সুখ আর শান্তি কার ভাগ্যেই বা ঘটে? অল্প একটু আনন্দের জন্যে কি বিপুল দুঃখের মূল্য যে দিতে হয়, তা না জেনেছে ক'টা ভাগ্যবান্ মানুষ?

কিন্তু তাই ব'লে গল্পেও খালি এই সব কথা থাকবে? পৃথিবীতে এমন মানুষও আছে যারা সুখে-শান্তিতে ঘর করে, যাদের ভালবাসা চিরনবীন থাকে, এটা কি ভাবতে ইচ্ছে করে না? করে বইকি। এই জন্যেই ত বেশীর ভাগ লোক গল্প পড়ে। নইলে পয়সা খরচ ক'রে, সময় নষ্ট ক'রে গল্প প'ড়ে লাভটা কি?

তবু জীবনগ্রন্থের রঙীন পাতার উল্টো দিক্‌টা অনেক সময় বড়ই বিবর্ণ হয়, এটাও মাঝে মাঝে মনে পড়া মন্দ নয়।

প্রিয়ম্বদার বিয়ের সময় সবাই ত তাকে সৌভাগ্যবতী মনে করেছিল। সে দেখতে ভাল, লেখাপড়া বেশ শিখেছে, গান গায় সুন্দর, ছবি আঁকতে পারে। কিন্তু হ'লে কি হবে, বাপের টাকা-পয়সা নেই ত? বড় মেয়ে শকুন্তলার বিয়ের সময় যে টাকা ধার করেছিলেন, তাই এখনও তিনি শোধ ক'রে উঠতে পারেন নি। ভাগ্যে পরিবারটা বড় নয়, দুই মেয়ে, এক ছেলে আর কর্তা-গিন্নী। কোন মতে চলে। তবে কষ্ট হলেও প্রিয়ম্বদার পড়াশুনো চালিয়েই আসা হয়েছে, সে ক্ষেত্রে কোন কার্পণ্য গৃহস্বামী করেন নি।

প্রিয়ম্বদা বি. এ. পাস করার পর তার মা কিন্তু আর চুপ ক'রে থাকতে রাজী হলেন না। এবার মেয়ের বিয়ের ব্যবস্থা করতে হয়। বেশী বুড়ো ক'রে বসিয়ে রাখলে ভাল বর পাওয়া যায় না। শেষে কি দোজবরে পড়বে নাকি?

কর্তা তলে তলে পাত্রের সন্ধান আরম্ভ করলেন। আসল জায়গায় যে বড় খুঁৎ, শুধু মেয়ের রূপে-গুণে কি হবে? আগে তাঁর পকেটের সন্ধান হবে, তার পর ত মেয়ের রূপ-গুণের খোঁজ পড়বে?

আত্মীয়-স্বজনকে বলা, বাংলা কাগজে বিজ্ঞাপন দেওয়া সবই হতে লাগল অল্প-বিস্তর, প্রিয়ম্বদার প্রবল আপত্তি সত্ত্বেও। মায়ের একই উত্তর, "আমরা খ্রীষ্টানও নই, ব্রাহ্মও নই, আমাদের মধ্যে ত এমনি ক'রেই বিয়ে হয়।"

মেয়ে দেখানোও হ'ল দু'চার বার। মেয়ের চেহারা দেখে বা তার গুণাবলী শুনে অপছন্দ কারও হয় না। কিন্তু দেনাপাওনার কথা উঠলেই সব আলোচনা থেমে যায়। আর কেউ এগোয় না।

সঞ্জীব এসেছিল কনে দেখতেই, তবে নিজের জন্যে নয়। বন্ধু গোপেশ তাদের তিন-চারজনকে জোগাড় ক'রে নিয়ে গিয়েছিল, একলা যেতে লজ্জা করে ব'লে। মেয়েকে দেখে সঞ্জীব নিজে মুগ্ধ হয়ে গেল। কি সুন্দর বুদ্ধিদীপ্ত মুখ, একটু অপ্রসন্নতার ছাপটাও যেন তার মুখে মানিয়েছে ভাল। গানও গায় চমৎকার। ছবিগুলিও ত বেশ।

অন্যক্ষেত্রে যা হয়, এ ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম হ'ল

না। মেয়ে দেখে সবাই খুশী, কিন্তু মেয়ের বাপ সম্বন্ধে ছেলের বাপ খুশী হতে পারলেন না, সুতরাং ব্যাপারটা আর বেশী দূর গড়াল না। শুনে সঞ্জীব যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচল।

সে কৃতী ছেলে। বাপ বেশ অবস্থাপন্ন, এবং ছেলে সে একমাত্রই। একটি বোন আছেন তবে বহু বৎসর আগেই তাঁর বিবাহাদি হয়ে গেছে। ভাড়া করা বাসা নয়, নিজেদের বাড়ীতেই তারা বাস করে। অল্প দিন হ'ল বেশ একটা শাঁসাল কাজও সঞ্জীবের জুটে গিয়েছে।

এ রকম ছেলের এখনও কেন যে বিয়ে হয় নি, সেটাই আশ্চর্য্য। সম্বন্ধ অবশ্য গণ্ডায় গণ্ডায় আসছে, কিন্তু কোনটাই মা, বাবা এবং ছেলে, তিন জনের একযোগে পছন্দ হচ্ছে না। সঞ্জীবের বাবার টাকার কোন অভাব নেই, বেয়াইয়ের গলা টিপে পয়সা না নিলেও তাঁর স্বচ্ছন্দেই চলবে। কিন্তু কেন জানি না তিনি দৃঢ়পণ নিয়েছেন যে, তাঁর নিজের মেয়ের বিয়েতে যত টাকা তাঁকে বার ক'রে দিতে হয়েছে, ততটা অন্ততঃ তিনি ছেলের বিয়েতে আদায় করবেন। না করবেন কেন? তাঁর জামাইয়ের বাজারদর যা, তাঁর ছেলের তার চেয়ে বেশী বই কম হবে না। তা অতখানি বদান্য কন্যার বাপের সন্ধান সহজে পাওয়া যাচ্ছে না। যদি বা আসে, সে ক্ষেত্রে মেয়ে পছন্দ-মত নয়। গৃহিণীর এতে প্রবল আপত্তি। তাঁর একটি মাত্র বউ হবে, কালপেঁচী হ'লে চলবে কেন? ছেলেও অবশ্য সুন্দরী বউ চান, তবে বলেন যে, যদি খুব সুশিক্ষিতা, সদ্বংশজাতা হয়, তা হ'লে অন্য দিকে একটু নিরেস হলেও তাঁর আপত্তি নেই।

এই ভাবেই দিনগুলো গড়িয়ে যাচ্ছিল, এমন সময় রঙ্গমঞ্চে প্রিয়ম্বদার প্রবেশ। সঞ্জীব স্থির করল, বিয়ে যদি করতে হয়, ত এখানেই সে করবে। একমাত্র খুঁৎ ত এই যে বাপের পয়সা নেই? তা সেটাকে খুঁৎ মনে না করলেই হয়? তার নিজেদের ত পয়সার কোনো অভাবই নেই।

একলা বাপের সঙ্গে মোকাবিলা না ক'রে মাকেও সে দলে টানবার ব্যবস্থা করল। তাঁর টাকার লোভ খুব বেশী নেই। বোনের সাহায্যে কথাটা মায়ের কানে উঠতে দেরি হ'ল না। মেয়ে সুন্দরী, সুশিক্ষিতা, গুণবতী, তা হ'লে সম্বন্ধটা মন্দ কিসে?

তবু ছেলের কাছে মা একটু যাচিয়ে নিলেন। নিভৃতে তাকে ডেকে জিজ্ঞাসা করলেন, "হ্যাঁরে, খুব সুন্দর নাকি মেয়েটি?"

ছেলে একটু আরক্ত হয়ে বলল, "এ যাবৎ যতগুলির ছবি দেখেছ তাদের চেয়ে অনেক ভাল।"

"বি. এ. পাস শুনলাম। কত বয়স মেয়ের?"

"তা কুড়ি-একুশ হবে।"

মা বললেন, "অতবড় মেয়ে আনবার আমার ইচ্ছে ছিল না। ঝানু হয়ে গেলে নিজের মনের মত ক'রে গ'ড়ে নেওয়া যায় না।"

সঞ্জীব বলল, "বেশী ছোট মেয়ে অশিক্ষিত বোকা হয় প্রায়ই। ওরকম চলবে না।"

মা সেটা না জানতেন এমন নয়। তাঁর মেয়ে বিভার বেশ অল্প বয়সেই বিয়ে হয়েছিল। শ্বশুরবাড়ী গিয়ে মানিয়ে নিতে তার সময় লেগেছে ঢের, কথাও নানারকম শুনতে হয়েছে।

আবার প্রশ্ন করলেন, "খুব সাহেবীয়ানা ঢং-এ মানুষ নাকি? তা হ'লে ত আমাদের পরিবারে খাপ খাবে না।"

সঞ্জীব বলল, "বেশী কিছু সাহেবীয়ানা আছে ব'লে ত মনে হ'ল না। সাহেবী করতে হ'লে ঢের পয়সা লাগে। তা ছাড়া সুশিক্ষিতা মেয়ে সব অবস্থায় মানিয়ে চলার ক্ষমতাও রাখবে বইকি কিছু কিছু।"

অতঃপর বাকি রইল কর্ত্তার পেছনে লাগা। সম্মুখ সমরের ভার গৃহিণীই নিলেন, ছেলেমেয়ে পিছন থেকে রসদ জোগান দিতে লাগল।

কর্ত্তা প্রথমতঃ বিশ্মিতে আপত্তি করতে লাগলেন। অত গরীব ঘরে ছেলের বিয়ে দিতে তিনি রাজী নন। কুটুম্বের সুখ কিছু হবে না। বেয়াই আসবেন বেড়াতে রিক্‌শ চ'ড়ে, বেয়ান আসবেন শাঁখা হাতে। লোকের কাছে তিনি কুটুম্ব ব'লে পরিচয় দেবেন কি ক'রে?

সঞ্জীবের মা বললেন, "তুমি ত শুধু টাকার কলসীর সঙ্গে বিয়ে দিতে চাও, মেয়ে কেমন সেদিকে খেয়াল নেই। সেই মিত্তিরদের বাড়ীর খোঁড়া মেয়েটা হলেই তোমার পছন্দ হয়। আমি কিন্তু অমন বউ বরণ ক'রে ঘরে তুলব না, আর তোমার ছেলে কান ম'লে বিদায় ক'রে দেবে। সে কোন্ গুণে চোট যে, যা-তা বউ নিয়ে ঘর করবে?"

কর্ত্তা চ'টে বললেন, "টাকা থাকলেই মেয়ে খারাপ হবে এ আবার কোন্ দেশী কথা? দত্তদের মেয়েটি কি খারাপ ছিল?"

গৃহিণী বললেন, "সে ত তেরো বছরের মেয়ে, তোমার ছেলে খুকী বিয়ে করবে না।"

কর্ত্তা বললেন, "তাঁর বাপ-ঠাকুরদাদা সবাই যা করেছে, তিনি তা করবেন না। মহা সাহেব!"

গৃহিণী বললেন, "আসল কথা এই যে, এই মেয়েটিকে তার দারুণ পছন্দ হয়ে গেছে। একে ত বিয়ে করতেই চায় না, বিলেত যাবার জন্যে নাচছে, তার উপর এক জায়গায় যদি বা রাজী হল, তা তুমি আবার কি বাজে খোট ধ'রে বসলে। এরপর একেবারে বেঁকে বসলে আর ওর বিয়েই দিতে পারবে না।"

কর্ত্তা বললেন, "বেশ, তোমাদের যা খুশি কর গিয়ে। ছেলেই যখন কর্ত্তা, তখন তার মতেই বিয়ে হোক। আমি সম্মতিও দিচ্ছি না অসম্মতিও দিচ্ছি না। তবে নিজেরা যদি কখনও ঠকো, তখন আমাকে বলতে এস না।"

এর পর কথাবার্ত্তা দ্রুতগতিতেই এগিয়ে চলল। সঞ্জীব একদিন নিয়ম-মত বন্ধুবান্ধব নিয়ে কনে দেখে এল, যদিও আর দেখার দরকার ছিল না। প্রিয়ম্বদা তেমনি সুন্দরই আছে, মুখের অপ্রসন্নতাটাও এখন নেই। হয়ত বর পছন্দ হয়েছে ব'লেই।

বিয়ে হয়ে গেল মাস খানিকের মধ্যেই। তার পর রক্তাম্বরে অলঙ্কারে সুসজ্জিতা হয়ে চন্দনচর্চ্চিত ললাটে ও দ্রুতস্পন্দিত বুকে প্রিয়ম্বদা তার নূতন ঘরে এসে উঠল। শাশুড়ী বউ দেখে মহাখুশী, শাশুড়ীর ছেলে ততোধিক। লোক ডেকে দেখাবার মত বউ বটে।

শ্বশুর একটু গম্ভীর হয়ে রইলেন, ভাল বা মন্দ কিছুই বললেন না।

এর পরের মাসটা কেটে গেল একটা সুখস্বপ্নের মত। এ পৃথিবীটাতে যে এত আনন্দ আছে, এত সুখ আছে, তা কি প্রিয়ম্বদা জানত আগে? এত ভালবাসা যে পাওয়া যায়, এমন ক'রে যে ভালবাসা যায়, তাও কি কখনও কল্পনা করেছিল?

কিন্তু এ সুস্বপ্ন চিরস্থায়ী হয়ে রইল না। ক্রমে দিনের আলোয় চোখ মেলে চাইতে হ'ল।

দোষ-গুণ দিয়ে মানুষ তৈরি। প্রিয়ম্বদার ক্ষেত্রে গুণ যেগুলি তা চোখে পড়তে দেরি হ'ত না। দোষ যেগুলি সেগুলি ধরা পড়তে লাগল এক সঙ্গে বাস করবার অল্পদিনের মধ্যেই। অসম্ভব জেদী মেয়ে, যা খোট ধরে তা ছাড়ে না, কেটে দুখানা ক'রে ফেললেও। স্বভাবে রাগ আছে, অভিমানীও খুব।

সঞ্জীব নিজেও যে খুব মৃদু-স্বভাবের তা নয়। তবে সারাক্ষণই যে রাগারাগি করছে তাও নয়। চালচলন বেশ ভদ্র। মনে কিছু আত্মাভিমান আছে তেবে সেটা সহজে ধরা পড়ে না। একটু পরমত-অসহিষ্ণুতাও আছে।

শ্বশুর গম্ভীর প্রকৃতির রাশভারী মানুষ। এমনিতেই কথাবার্ত্তা বলেন কম। পুত্রবধূর সঙ্গে একেবারেই প্রায় বলেন না, কারণ বিয়েটাতে তিনি খুশী হন নি। শাশুড়ী একে স্ত্রীলোক, তার উপর প্রিয়ম্বদা তাঁর একমাত্র বউ, তাঁরই কারবার বেশী ওর সঙ্গে। তিনিও ক্রমে যেন চঞ্চল হয়ে উঠতে লাগলেন বউয়ের ব্যবহারে।

প্রথম কয়েকদিন ভালভাবেই কাটল। যে যা বলে বউ তা শুনে চলে। সঞ্জীব একদিন গর্ব ক'রে মাকে বলল, "দেখলে ত মা, বেশী বয়সের মেয়ে হ'লেই যে ট্যাঁটা অবাধ্য হয়, তা নয়।"

শাশুড়ী বললেন, "রোস বাছা, ধোপে টেঁকে তার পর বোলো।"

ধোপে যে টিঁকবে কিনা সে বিষয়ে তাঁর সন্দেহ হ'তে আরম্ভ হয়েছিল। জোড় ভাঙতে বাপের বাড়ী গিয়ে তার পর যখন প্রিয়ম্বদা ফিরে এল, তখন দেখা গেল, তার আচরণ একটু একটু বদ্‌লাচ্ছে।

শাশুড়ী হয়ত আদর ক'রে বউয়ের চুল বেঁধে দিলেন। তিনি সাবেকী মানুষ, সেই ভাবেই বাঁধলেন। খানিক পরে বউ নিজের ঘরে উঠে গিয়ে চুল খুলে নিজের অভ্যস্ত ধাঁচে আবার বেঁধে নিল। তবে মাথায় ত ঘোমটা, খুব লম্বা না হলেও? কাজেই চট্ ক'রে সেটা কারও চোখে পড়ল না।

সঞ্জীবই সেটা আবিষ্কার করল একদিন। প্রিয়ম্বদা চুল বাঁধছে এমন সময় ঘরে ঢুকে সঞ্জীব বলল, "এ কি? মা না এখনি তোমার চুল বেঁধে দিলেন?"

প্রিয়ম্বদা বলল, "যা ভুতের মত দেখাচ্ছিল, তাই একটু ঠিক ক'রে নিচ্ছি।"

সঞ্জীব কিঞ্চিৎ আহত হয়ে বলল, "মা দেখলে কি মনে করবেন?"

প্রিয়ম্বদা বলল, "থাকি ত ঘোমটা টেনে জুজুবুড়ী হয়ে। কে দেখতে আসছে আমার চুল বাঁধা?"

সঞ্জীবের মুখটা একটু গম্ভীর হয়ে গেল, বলল, "তোমার বুঝি খুব কষ্ট হচ্ছে এখানে?"

প্রিয়ম্বদা স্বামীর মুখের দিকে চেয়ে বলল, "কষ্ট হ'তে যাবে কেন? একটু-আধটু অসুবিধা কখনও কখনও হয়।"

তবে সে তখনি উঠে প'ড়ে মিটমাট ক'রে ফেলল, স্বামীর গাম্ভীর্য্য তার সহ্য হ'ল না। সুন্দরী নববিবাহিতা

পত্নী, সঞ্জীবের অত্যন্ত ভালবাসার পাত্রী, তার উপর বেশীক্ষণ রাগ ক'রে থাকা চলল না। কিন্তু তার মনটা একটু ক্ষুব্ধ হয়েই রইল কিছুক্ষণ।

প্রিয়ম্বদার খাওয়া-দাওয়া নিয়েও গোলযোগ। সে এ মাছ খাবে না, সে তরকারি খাবে না। সঞ্জীবের মায়ের বেশ একটা গর্ব্ব ছিল যে, তাদের বাড়ীর মত খাওয়া-দাওয়া বেশী বাড়ীতে হয় না। বউ যে এটা-সেটা ঠেলে সরিয়ে রাখে তা তাঁর ভাল লাগে না। বউ ভেট্‌কি মাছের ঝোলটা ফেলে রাখল দেখে বিরক্ত হয়ে ব'লে উঠলেন, "কি কাণ্ড বাছা, টাট্‌কা মাছ ফেলে দিচ্ছ কেন? তোমরা কি বাড়ীতে দু'বেলা মাংস খাও নাকি?"

প্রিয়ম্বদা বলল, "কোথায় পাব দু'বেলা মাংস? মাসে একদিন জুটত কিনা সন্দেহ। এ মাছটায় বড় উগ্র গন্ধ, আমার ভাল লাগে না।"

"ভাল না লাগতে পারে, তাই ব'লে নতুন বউ এই রকম ক'রে বলবে না কি মুখের উপর? শাশুড়ী মুখ ভার ক'রে বললেন, "তা হ'লে তুমি খাবে কি দিয়ে? আমাদের গেরস্তের সংসারে দু'বেলা মাছই হয়, অন্য কিছু ত আমরা খাই না? আর কোন্ মাছে কত গন্ধ তাই বা যাচাই করতে বসবে কে?"

প্রিয়ম্বদা নিশ্চিন্তভাবে বলল, "তাতে কি? আমার জন্যে রোজ একটা বেগুন পোড়া কি আলুভাতে ক'রে দিলেই আমার খাওয়া হয়ে যাবে।"

গৃহিণী আর কথা বাড়ালেন না, নিজে খেয়ে উঠে চ'লে গেলেন। ছেলের সঙ্গে দেখা হলে বললেন, "কি মেমসাহেব বউই এনেছ বাপু, তিনি মাছ খেতে পারেন না, তাঁর জন্যে কি এখন মুরগী রাঁধতে হবে না কি বাড়ীতে?"

সঞ্জীব একটু অপ্রস্তুত হয়ে বলল, "সে নিশ্চয়ই তা বলে নি?"

"বলে নি বটে, তবে খাওয়া ফেলে উঠে গেছে।"

সঞ্জীব মনে মনে বিবেচনা করতে লাগল, এ নিয়ে প্রিয়ম্বদাকে কিছু বলা যায় কি না। সে আবার যা তার্কিক মেয়ে। অথচ সব বিষয়ে এত স্বাতন্ত্র্যবাদিনী হ'লে পাঁচ জনের সংসারে চলে কি ক'রে? ছোটখাট বিষয়ে একটু মানিয়ে নেবার চেষ্টা করতে হয় বইকি?

রাত্রে প্রিয়ম্বদাকে বলল, "আচ্ছা, ধর যদি তুমি বিলেত যেতে তখন খাওয়া-দাওয়া, চলা-ফেরার একটু তফাৎ করতে হ'ত না?"

প্রিয়ম্বদা তার মুখের দিকে তাকিয়ে বলল "তা হ'ত বইকি?"

সঞ্জীব বলল, "তা হ'লে এখানেও সে চেষ্টা করলে ক্ষতি কি? আমাদের বাড়ীর রান্না-বান্না এমন ত কিছু খারাপ নয়? মাছ-তরকারি ঠেলে ফেলে দিলে মা বিরক্ত হন, না হয় কষ্ট ক'রে খেয়েই নিলে?"

প্রিয়ম্বদা বলল, "বাবাঃ, পান থেকে চুন খসবার জো নেই! কি হয়েছে একখানা মাছ ফেলেছি ত? আমি ত তার বদলে চপ্‌ কাট্‌লেট্‌ তৈরি ক'রে আনতে বলি নি? আমি না খাই, আমারই পেট কাঁদবে, আর কারও ত কিছু হবে না?"

সঞ্জীব বলল, "তোমার নিজের ভাল লাগা, মন্দ লাগা ছাড়া আর কিছু কি বিবেচনা করবার নেই? অন্য লোকের খুশি অখুশিতে তোমার কিছুই এসে যায় না দেখছি।"

প্রিয়ম্বদার মুখের হাসি মিলিয়ে গেল, বলল, "বড় কোন ব্যাপার হ'ত ত এ কথা বলা চলত। একটা মাছ ফেলা নিয়ে যে এত খণ্ড প্রলয় বেধে যাবে তা কে জানত বাপু।"

সঞ্জীব বলল, "কি আর করবে বল? তোমার অদৃষ্টই খারাপ। না হ'লে এমন বাজে পরিবারে পড়?"

কথাতে যে খোঁচাটুকু ছিল তা প্রিয়ম্বদার কান এড়াল না। বলল "না হয় আমি গরীবের বাড়ী থেকে এসেছি, তাই ব'লে ঠাট্টা করার কি দরকার? গরীব যে তা ত লুকনো হয় নি?"

সঞ্জীব বলল, "তা লুকনো হয় নি বটে, তবে তুমি যে এমন ভয়ানক আত্মকেন্দ্রিক তা আমার জানা ছিল না।"

সেদিন ঝগড়াটার খুব সহজে মিটমাট হ'ল না। সময় লাগল।

খাওয়া-পরা, নিমন্ত্রণ বাড়ীতে যাওয়া, সব নিয়েই বাধে আজকাল। শাশুড়ী সনাতন প্রথায় মানুষ, বউকে দাবিয়ে রাখার চেষ্টাটা ছাড়তে চান না। হ'লই না হয় শিক্ষিতা বউ, তাই বলে মাথায় চ'ড়ে নাচবে না কি? ছেলে ত তাঁর নালিশ শুনতে শুনতে উত্যক্ত হয়ে উঠল।

একদিন একটু চড়া গলায় বলল, "দোহাই তোমার, এই উগ্র স্বাধীনতাবোধটা একটু কমাও। এত অশান্তি আমার ভাল লাগছে না। বাঙ্গালী ঘরে বউরা কিরকম ক'রে চলে তা কি তুমি কখনও দেখ নি?"

প্রিয়ম্বদা বলল, "যদি বা দেখে থাকি ত তাদের মত হবার আমার বিন্দুমাত্রও ইচ্ছে নেই। আমি যেমন আছি তাই থাকব। অন্য কারও অসুবিধা যতক্ষণ না ঘটাচ্ছি, ততক্ষণ আমার পেছনে না লাগলেই হয়।"

"তোমার নাম কেন যে প্রিয়ম্বদা রাখা হয়েছিল জানি না। নামটা মোটেই সার্থক হয় নি।" ব'লে সঞ্জীব ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

এই ভাবেই চলল, দু-তিন মাস। প্রিয়ম্বদার হাসি মুছে গেছে, সঞ্জীবেরও মেজাজ খিট্‌খিটে হয়ে উঠেছে।

ব্যাপারটা চরমে উঠল চতুর্থ মাসে। গৃহিণীর গুরুঠাকুর এসে উঠলেন তাঁদের বাড়ীতে মহা সম্মানিত অতিথিরূপে।

গৃহিণী ত আনন্দে আত্মহারা। বসবার ঘরে মহা সমারোহে গুরুঠাকুরকে এনে বসান হ'ল। গৃহিণী সকলকে ডেকে পাঠালেন। নিজে গলবস্ত্র হয়ে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করলেন। কর্তা ও সঞ্জীবও প্রণামই করলেন, অত গভীর ভক্তিভরে না হলেও। শুধু প্রিয়ম্বদা আলগোছে একটা প্রণাম সেরে বেশ খানিকটা দূরে স'রে দাঁড়াল। এই পেটমোটা, এক গোছা টিকিওয়ালা বৃদ্ধ ব্রাহ্মণকে দেখে তার মনে কোনও ভক্তির ভাব এল না।

এর পর পাদোদক পান। প্রিয়ম্বদা এক ছুটে নিজের ঘরে গিয়ে দরজা বন্ধ করল।

গৃহিণী হঠাৎ পিছন ফিরে জিজ্ঞাসা করলেন, "বউমা কোথায় গেল? চন্নামৃত নেবে না?"

সঞ্জীব গম্ভীরভাবে বলল, "আমাকে দাও, আমি দিয়ে আসছি।"

পাথরবাটি ক'রে চরণামৃত নিয়ে সে শোবার ঘরে গিয়ে হাজির হ'ল। প্রিয়ম্বদা সন্ধ্যা হওয়া সত্ত্বেও ঘরে আলো জ্বালে নি, খাটে উপুড় হয়ে শুয়ে আছে।

সঞ্জীব অনেক চেষ্টায় কণ্ঠস্বর একটু সংযত ক'রে বলল, "খাট থেকে নেমে এটা নাও, মা পাঠিয়েছেন।"

প্রিয়ম্বদা খাট থেকে না নেমে বলল, "ও সব নোংরা জিনিষ আমি খাব না।"

সঞ্জীব বলল, "তোমার উপর কোনদিন কিছু নিয়ে আমি জোর করি নি, কিন্তু আজ আমার এই কথাটা তোমায় রাখতে হবে। না যদি রাখ, বুঝব যে আমার কোন মূল্যই নেই তোমার কাছে।"

প্রিয়ম্বদা উঠে ব'সে বলল, "ও, সাধ্বীত্বের প্রমাণ দিতে হবে? আমি দেব না। তুমি কোন্ আক্কেলে এই বাজে রাবিশ আমাকে গেলাতে এসেছ? আমার মূল্যও দেখি তোমার কাছে ভয়ানক বেশী।"

সঞ্জীব হন্ হন্ ক'রে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। তার মা এই দিকেই আসছিলেন, ছেলেকে দেখে জিজ্ঞাসা করলেন, "বউমা খেয়েছে পাদোদক?"

সঞ্জীব বলল, "সে খাবে না। এই নাও তোমার বাটি। রাগ তোমার হতেই পারে, কিন্তু এই নিয়ে এখন গোলমাল ক'রো না, শুনলে তোমার গুরুঠাকুর কি ভাববেন? উনি চলে যান, তার পর এর হেস্তনেস্ত আমি করব।"

গৃহিণী বললেন, "তুমি যা করবে আমার তা জানা আছে। রূপ দেখে যে একেবারে গ'লে গেলে, না হলে এই ধাড়ী খ্রীষ্টানের বেটীকে আমি ঘরে আনি? আমার সোনার সংসার ছারখার ক'রে দিতে বসল।"

কথাটা আস্তে বলেন নি, প্রিয়ম্বদা শুনতেই পেল। সঞ্জীব আর কিছু না ব'লে সিঁড়ি দিয়ে নেমে একেবারে বাড়ীর বাইরে চ'লে গেল।

অনেক রাত ক'রে সে যখন ফিরল, তখন বাড়ীর সবাই প্রায় খেয়ে দেয়ে শুয়ে পড়েছে। তার ঘর অন্ধকার, দরজাটা ভেজান। দরজা ঠেলে ভিতরে ঢুকে সঞ্জীব আলো জ্বালল। প্রিয়ম্বদা একই ভাবে শুয়ে আছে, আর ঘরের পাথরের টেবিলে দু'জনের ভাত চাপা দেওয়া রয়েছে।

সঞ্জীব বলল, "ঢের রাত হয়েছে। উঠে এসে খেয়ে নাও, এগুলি ত নোংরা নয়?"

প্রিয়ম্বদা বলল, "আমি খাব না, আমার ভয়ানক শরীর খারাপ লাগছে।"

সঞ্জীব বলল, "কি, এরপর সত্যাগ্রহ করবে নাকি, আমাদের জব্দ করার জন্যে?"

প্রিয়ম্বদা বলল, "আমার বয়ে গেছে। আমি কাল কিছুদিনের জন্যে মায়ের কাছে যাচ্ছি, শরীর ভাল হ'লে আসব।"

সঞ্জীব বলল, "ভাল কথা, কিছু তাড়াতাড়ি করার দরকার নেই। যতদিন খুশি থেকো, আমার অসুবিধা হবে না।"

প্রিয়ম্বদা বলল, "বেশ, মনে রাখব।"

সঞ্জীব বলল, "আমি নীচের ঘরে যাচ্ছি, সেখানেই রাত্রে শোব। রাত জেগে কাজ করতে হবে, তোমায় অসুবিধা ঘটাতে চাই না।" ব'লে নীচে চ'লে গেল।

প্রিয়ম্বদার সে রাত্রে খাওয়াও হ'ল না, ঘুমও হ'ল না। সারারাত ফুলে ফুলে কেঁদেই কাটিয়ে দিল। মনে দারুণ অভিমান, দুর্জ্জয় রাগ। কোন্‌টা বেশী, নিজেও সে ঠিক করতে পারে না। এতখানি তাচ্ছিল্যের জিনিষ

সে? সর্বক্ষেত্রে তাকেই নীচু হতে হবে, তার দিকটা কেউ দেখবে না? সে শুধু বউ, মানুষ নয়?

সঞ্জীবেরও যে কাজকর্ম খুব বেশী হ'ল তা নয়। সারারাত কাগজপত্র নিয়ে সে শূন্য দৃষ্টিতে সামনের দিকে চেয়ে রইল। এ কি করল সে? সুন্দর মুখের প্রলোভনে এ কি বিপুল সমস্যাকে ডেকে আনল নিজের জীবনে? প্রিয়ম্বদার বহিরাবয়ব দেখলে মনে হয়, মাখন দিয়ে গড়া, কিন্তু ভিতরটি ত নিরেট পাষাণ। এই পাষাণে মাথা ঠুকেই কি সঞ্জীব চিরজীবন কাটাবে? তার প্রতি স্ত্রীর বিন্দুমাত্রও যে ভালবাসা আছে, তা সে ভাবতেই পারল না।

ভোরে উঠে উপরে গেল। প্রিয়ম্বদার দুই চোখ লাল, সে বাক্স বিছানা গোছাচ্ছে। সঞ্জীব বলল, "এখনি যাচ্ছ নাকি?"

প্রিয়ম্বদা বলল, "দেরি ক'রে লাভ কি? সত্যিই আমি বড় অসুস্থ বোধ করছি। গাড়ীটা যদি একটু বলে দাও।"

সঞ্জীব বলল, "মা-বাবাকে ব'লেও যাবে না?"

প্রিয়ম্বদা বলল, "কি দরকার, চ'লেই যখন যাচ্ছি? তুমিই ব'লে দিও।"

সঞ্জীবের ব্রহ্মরন্ধ্র অবধি রাগে জ্ব'লে উঠল। আহত পৌরুষ তার প্রায় তাকে পাগলের পর্য্যায়ে ঠেলে দিল। বলল, "অতি উত্তম! সম্পর্ক তা হ'লে শেষ করতেই চাইছ? কর, আপত্তি নেই, আমি এতে ঠকব না।"

রাগ দেখে প্রিয়ম্বদা আরও রেগে গেল। বলল, "আমিই কি ঠকব নাকি? এ রকম অত্যাচার সয়ে আমি থাকছি না। একমুঠো ভাতের জন্য আমাকে তোমাদের পায়ে তেল দিতে হবে না। আমি রোজগার ক'রে খেতে জানি।"

সঞ্জীব তার দিকে একটা জ্বলন্ত দৃষ্টি নিক্ষেপ ক'রে বাইরে বেরিয়ে এল। চাকরকে ডেকে বলল, "গাড়ী বার ক'রে আনতে বল ড্রাইভারকে।"

পাঁচ মিনিট পরে ঘরে ঢুকে বলল, "গাড়ী এসেছে, নীচে যাও, তোমার জিনিষ মুকুন্দ নিয়ে যাচ্ছে।"

প্রিয়ম্বদা বোধহয় বিদায় নেবার অভিপ্রায়েই সঞ্জীবের সামনে গিয়ে প্রণাম করতে গেল। সঞ্জীব তাকে সজোরে ঠেলে দিল, এত জোরে ঠেলল যে প্রিয়ম্বদা ঠিকরে গিয়ে কপাটে ধাক্কা খেল। খুব দারুণ অবশ্য লাগল না, কিন্তু স্বামীর দিকে অগ্নিবর্ষী দৃষ্টি হেনে বলল, "যাক, তোমাকে ভাল ক'রে চিনে গেলাম। টাকায় বড়লোক হলেই ছোটলোক হতে আটকায় না।" আর এক মুহূর্ত্তও সে দাঁড়াল না।

সঞ্জীব অনেকক্ষণ চুপ ক'রে ঘরের মধ্যে ব'সে রইল। তার মা তাকে চা খেতে ডাকতে এসে বললেন, "তোমাদের কি কাণ্ড-কারখানা বল ত বাপু। ভোর না হতেই তোমার গুণবতী বউ গেলেন কোথায়? আমরা কি বাড়ীতে নেই? সংসারটা আমাদের না?"

সঞ্জীব বলল, "সে যদি চ'লে যেতে চায়, দাও না যেতে। প্রয়োজন কি তার ভাবনা ভাববার?"

মা বললেন, "ও, তা হ'লে তিনি আর আসছেন না এখানে? এই তোমাদের ঠিক হ'ল নাকি? আমাদের মুখ দেখাতে হবে না লোকের কাছে?"

সঞ্জীব বলল, "আসছেন নাই ধ'রে নাও, অন্ততঃ সম্প্রতি। লোকের কাছে মুখ দেখান সত্যিই অসম্ভব হ'ত, আর বেশীদিন তাকে এখানে রাখলে।"

"তা বেশ, তুমিই এনেছিলে, তুমিই বিদায় করলে। আমি কিন্তু এর মধ্যে নেই বাপু, আমাকে দোষ দিও না। তোমার বাবাই ঠিক চিনেছিলেন ওদের, আমরা গুরুজনের কথা শুনলাম না, তাই পস্তাতে হল।" ব'লে গৃহিণী প্রস্থান করলেন।

এক সপ্তাহ প্রিয়ম্বদা কোন খবর দিল না, সঞ্জীবও কোন খবর নিল না। তার বাবা মা একেবারে স'রে দাঁড়ালেন। যে পুত্রবধু তাঁদের অস্তিত্বকে স্বীকারই করে না, তার ভাবনা তাঁরা ভাবতে যাবেন কেন?

আট দিনের দিন সঞ্জীব একখানা চিঠি লিখে পাঠাল প্রিয়ম্বদার বাবার কাছে। প্রিয়ম্বদা অনেক জিনিষপত্র রেখে গেছে, সেগুলি নিয়ে কি করা হবে এই তার জিজ্ঞাস্য।

মস্ত বড় জবাব এল। প্রিয়ম্বদা আর ফিরে আসবে না। বিবাহ-বিচ্ছেদ করাই তার ইচ্ছা, তার বাবারও ইচ্ছা। তার উপর অত্যন্ত অত্যাচার হয়েছে, মারধোরও বাদ যায় নি। এ ক্ষেত্রে সম্পর্ক বজায় রাখা নিষ্ফল। সঞ্জীবের কিছু বলবার থাকলে সে আদালতে বলতে পারে। জিনিষপত্র যা আছে, তা যেন এ বাড়ীতে পাঠিয়ে দেওয়া হয়, অবশ্য সেই সব জিনিষই, যা মেয়ে বাপের বাড়ী থেকে পেয়েছিল।

ক'দিন একলা ব'সে ভাববার সময় পাওয়াতে সঞ্জীবের মনটা অনেকটা নরম আর কাতর হয়ে এসেছিল। মানুষের জীবনের প্রথম গভীর প্রেম ভোলা সহজ নয়। কিন্তু এই আঘাতে তার সুপ্ত ক্রোধ আবার

মাথা চাড়া দিয়ে উঠল। তখনই চিঠির উত্তর দিল, পাছে রাগ প'ড়ে গেলে উত্তরটা নরম হয়ে যায়। লিখল, বিবাহ-বিচ্ছেদ করাটা খুবই সুপরামর্শের কথা। তাদের একত্রে বাস আর একেবারে সম্ভব নয়। আদালতে সে যাবেই না মোটে। তাঁরা একতরফা যা খুশি ব্যবস্থা করিয়ে নিতে পারেন। জিনিষপত্র যথাসম্ভব শীগ্‌গির পাঠিয়ে দেওয়া হবে।

কোন্ জিনিষগুলি যে প্রিয়ম্বদা সঙ্গে এনেছিল, আর কোন্‌গুলি এ বাড়ী থেকে দেওয়া তা সঞ্জীবের জানা ছিল না। অগত্যা মায়ের ডাক পড়ল। তিনি পরম গম্ভীর মুখে সব ভাগ ক'রে দিলেন। বউ তাঁদের দেওয়া কোন জিনিষই নিয়ে যায় নি। গৃহিণী গর্জ্জে উঠলেন, "দেখেছ কি পাজী শয়তান মেয়ে? হাতের লোহাগাছ শুদ্ধ খুলে রেখে গেছে। এমন মেয়ে ছেঁটে কাঁটা উপরে কাঁটা দিয়ে পুঁতে ফেলতে হয় জ্যান্ত।"

সঞ্জীব কথা বলল না। জিনিষপত্র বার ক'রে নিয়ে আলমারীতে চাবি বন্ধ ক'রে মাকে চাবিটা ফিরিয়ে দিল, বলল, "চাবি তুমিই রাখ, ভিতরে সোনা-রূপো অনেক রয়েছে, আমি কখন কোথায় ফেলব, তার ঠিক নেই।"

জিনিষপত্র ফেরৎ গেল। প্রিয়ম্বদার কোনও চিহ্ন আর এ বাড়ীতে রইল না। কিছুদিনের মধ্যে আইনসঙ্গত ভাবে তার বিবাহ-বিচ্ছেদ হয়ে গেল।

সংসার আগের মতই চলতে লাগল, অন্ততঃ বাইরে। কিন্তু অপ্রিয়বাদিনী প্রিয়ম্বদাকে একজন মানুষ ভুলতে পারল না, সে সঞ্জীব।

মা বললেন, "এ রকম সন্ন্যিসি হয়ে তুই কেন বেড়াবি বাছা? একজন গেছে আর একজন আসবে। আমি দেখে-শুনে খুব ভাল মেয়ে নিয়ে আসব এবার।"

সঞ্জীব বলল, "ওসব কথা রাখ দেখি। তোমার মেয়ে দেখতে হবে না। আমি বিয়ে আর করব না।"

মা চোখ কপালে তুলে বললেন, "কেন, শুনি? তুই পুরুষ বেটাছেলে না? সে ছুঁড়ি আবার বিয়ে করতে পারে আর তুই পারিস না?"

কথাটা ছুরীর খোঁচার মত লাগল সঞ্জীবের মনে। বলল, "কে তোমায় বলেছে যে সে বিয়ে করেছে আবার?"

মা বললেন, "কেউ কি আর আমার কানে কানে ব'লে গেছে? এই লোকের মুখে কানাঘুষো শুনি আর কি।"

সঞ্জীব মাকে কিছু বলল না, কিন্তু তার মনটা অস্থির হয়ে রইল। তলে তলে খবর নিল। প্রিয়ম্বদার বাবা মেয়ের বিয়ের জন্যে আবার চেষ্টা করছেন বটে।

কয়েক দিন পরে মাকে ডেকে বলল, "তুমি ত আমার এক ব্যবস্থা করতে যাচ্ছিলে, সেটা ত চলবে না। আমি এখন একটা করতে চাইছি, মন দিয়ে শোন, আর দোহাই তোমার, আগেভাগে আপত্তি তুলো না।"

মা গম্ভীর হয়ে বললেন, "কি ব্যবস্থা শুনি? তোমার ভালর জন্যে যদি হয় ত আপত্তি করতে যাব কেন?"

সঞ্জীব বলল, "আমি বিলেত যাওয়া ঠিক করেছি কিছুদিনের জন্যে। অফিস থেকেই পাঠাবে, আমাকে পয়সা খরচ ক'রে যেতে হবে না। এতে ভবিষ্যৎ উন্নতির সম্ভাবনা প্রচুর।"

মা বললেন, "আর এই শ্মশানপুরী আগলে আমরা দুই বুড়ো-বুড়ী ব'সে থাকব? কিছুদিন মানে কতদিন শুনি?"

সঞ্জীব বলল, "সত্যিই অল্প দিন, এক বছরের বেশী হবে না।"

গৃহিণী বললেন, "তোমার বাবার ত শরীর দেখছ। ওঁকে নিয়ে একলা থাকতে আমার খুব ভয় করবে।"

সঞ্জীব বলল, "সাবধানে থাকলে তোমাদের ভয় পাবার কিছু নেই। বাবার কি বা বয়স? আমি না হয় বিভা আর অমরেশকে ব'লে যাব, তারা এসে কয়েক মাস থেকে যাবে। অন্ততঃ মাস ছয় ত পারবেই। তারা এলে তোমার খুব ভাল লাগবে। বাকি ক'মাস না হয় তোমার সন্ন্যাসী ভাইটিকে ধ'রে এন, তিনি তোমাদের আগ্‌লাবেন।"

মা বললেন, "নিজের ঘর-সংসার ফেলে সবাই আমাকে আগ্‌লাতে আসবে কেন?"

সঞ্জীব বলল, "নিজের সংসার হলে কি আর মেয়েরা বাপের বাড়ী আসে না? ওর খুকী হ'বার সময় বিভা এসে সাত-আট মাস থাকে নি? এখন না হয় আমাদের গরজে একবার এল। আর মেজ মামার ত সংসার বলতে কিছু নেই-ই।"

গৃহিণী বললেন, "তা তোর ভালর জন্যে হয় ত আমি আপত্তি করি না। দেখ্ বলে-কয়ে ওরা যদি রাজী হয়।"

বলা-কওয়া চলতে লাগল। বিভা ত খুবই রাজী তবে তার স্বামী একটু-আধটু আপত্তি করতে লাগল। সঞ্জীব তাকে বুঝিয়ে-পড়িয়ে রাজী করল শেষ পর্য্যন্ত। তার মামা অবশ্য বিশেষ কিছু আপত্তি করলেন না, ভাইয়ের সংসারে আছেন, না হয় বোনের সংসারে

থাকবেন। তাঁর পড়াশোনা ধ্যানধারণার কোনও ব্যাঘাত না হলেই হ'ল।

যাবার আগে সঞ্জীব আর একবার প্রিয়ম্বদার খোঁজ নেবার চেষ্টা করল। খুব নির্ভরযোগ্য খবর কিছু পেল না, আগে যেমন ভাসা-ভাসা খবর শুনত, তাই আবার শুনল। তার পর যাওয়ার আয়োজনে ব্যস্ত হ'য়ে পড়ল, এবং চ'লেও গেল অল্পদিনের মধ্যে।

বিলেতে গিয়ে সে একটা সম্পূর্ণ ভিন্ন সামাজিক পরিবেশে পড়ল। ইচ্ছা এবং অর্থ থাকলে এখানে ফুর্ত্তি করবার অঢেল সুযোগ। কিন্তু সঞ্জীব অত্যন্ত সজাগ আর সচেতন হয়ে রইল। জীবনের সবচেয়ে বড় আঘাত সে পেয়েছিল মানুষকে ভালবাসতে গিয়ে। সে সম্ভাবনা থেকে নিজেকে সে সযত্নে সরিয়ে রাখল। কাজ ছিল তার অনেক, কাজের মধ্যেই ডুবে গেল সে।

একটা বছর খুব লম্বা সময় নয়, তবে অঘটন ঘটতে হ'লে তার মধ্যে ঢের ঘটতে পারে। সঞ্জীবের কাজ শেষ হবার মাস দুই আগে সে খবর পেল যে, তার বাবা হঠাৎ মারা গেছেন। মাও এই ধাক্কায় খুব অসুস্থ হয়ে পড়েছেন।

এখন চ'লে গেলে তার এতদিনের পরিশ্রম পণ্ড হয়। ভগ্নীপতিকে এবং মামাকে চিঠি লিখে পাঠাল। তাঁরা আশ্বাস দিয়ে উত্তর দিলেন। সঞ্জীব যেন নিজের কাজ শেষ ক'রেই আসে। এখানে সব কিছুর ব্যবস্থা তাঁরা করবেন। সঞ্জীবের মায়ের দেখাশোনা, চিকিৎসা, কোন কিছুতে ত্রুটি করা হবে না।

পিতৃবিয়োগের দুঃখ একটা আছেই বড় রকমের, যত বয়সেই সেটা মানুষের জীবনে আসুক। কয়েকটা দিন সঞ্জীব অভিভূত হয়ে রইল। তার সেই অশুভ শুভ-পরিণয়ে সে বাবার খানিকটা বিরাগভাজন হয়েছিল। প্রিয়ম্বদা মাঝখান থেকে স'রে গেলেও, পিতাপুত্র ঠিক আগের সম্বন্ধের মধ্যে ফিরে আসেন নি। এই কথাই বার বার ক'রে তার মনে পড়তে লাগল।

কিন্তু কাজ ফেলে রাখলে চলবে না। সব শেষ ক'রে তাকে দু'মাসের মধ্যে দেশে ফিরে যেতে হবে। মাকে চিঠিপত্র লিখে যথাসাধ্য সান্ত্বনা দিল, তার পর কাজের মধ্যে ডুবে গেল।

মাঝে মাঝে দেশ থেকে চিঠি আসে। বিভাই লেখে বেশীর ভাগ। বাবা বিষয়-সম্পত্তির ভাল ব্যবস্থা ক'রে গেছেন। সেদিকে ভাববার কিছু ছিল না। তবে মা প্রায় শয্যাশায়ী হয়ে পড়ছেন ক্রমে। কোনও চিকিৎসায় তাঁর বিশেষ কোনও উপকার হচ্ছে না। সঞ্জীবকে দেখবার জন্যে তিনি বড় বেশী ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন।

সঞ্জীব ফিরেই চলল কিছুদিন পরেই। বাড়ী এসে পৌঁছে, পুরনো শোকগুলি তাকে যেন নূতন ক'রে অধিকার ক'রে বসল। আজন্ম পরিচিত সংসার তার কোথায় যেন হারিয়ে গেছে। তার সেই দশাসই চেহারার রাশভারী বাবা, সারা বাড়ীটা যেন জুড়ে থাকতেন, একলা মানুষের উপস্থিতিতে সমস্ত বাড়ীটা যেন গম্‌গম্ করত। তিনি যে জায়গা শূন্য ক'রে দিয়ে গিয়েছেন, তা আর পূর্ণ হয় নি। মা সারাদিন বাড়ী মাথায় ক'রে রাখতেন হাসি-গল্পে, কখনও বা গঞ্জনা, তিরস্কারে, তিনি এখন নিথর নিস্পন্দ। শরীরের একটা দিক্ অবশ হয়ে গেছে। ঝিয়ে সব কাজ করে তাঁর। ছেলের হাত ধ'রে শুধু কাঁদতে লাগলেন, কথা বলবার যেন কিছু খুঁজে পেলেন না। আরও একটি মানুষ ছিল, রূপের প্রভায় যার বাড়ী আলো হয়ে উঠত। কিন্তু সে আলো ত কবে নিভে গেছে।

সঞ্জীব ফিরে আসার পরেই বিভা আর অমরেশ নিজেদের বাড়ী ফিরবার জন্যে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। বহু কাল নিজের ঘর-সংসার ছেড়ে আছে। এরা চ'লে গেলে মাকে নিয়ে বিপদ্ হবে, সেটা সঞ্জীব খুবই বুঝতে পারল, কিন্তু কতকালই বা এদের আট্‌কে রাখা যায়? কিছুদিনের মধ্যেই তারা চ'লে গেল। মামাকে ব'লে-কয়ে কিছুদিন সঞ্জীব ধ'রে রাখল, এবং সংসারের কি ব্যবস্থা করা যায়, তাই নিয়ে তাঁর সঙ্গে পরামর্শ করতে লাগল। বিভাও মাঝে মাঝে যোগ দিতে লাগল এই সব পরামর্শে।

বিভার বক্তব্য, সব দিক্ বজায় থাকে দাদা যদি আবার একটি বিয়ে করে। বেশ বড়সড় ভাল মেয়ে দেখে। সে এ বিষয়ে যথাসাধ্য সাহায্য করতে রাজী আছে। অবশ্য নার্স বা হাউস কিপার রেখেও চালান যায়, তবে মা আবার বেজায় গোঁড়া, ছোঁয়াছুঁয়ি নিয়ে গোলমাল বাধাতে পারেন। নার্সদের মধ্যে অনেকে খ্রীষ্টান, অনেকে নীচ-জাতীয়া। নানা হাঙ্গামা আছে। মামা সাংসারিক বিষয়ে জানেন খুব কম, উল্লেখযোগ্য কিছু বলতে পারেন না।

সঞ্জীব মনে মনে চিন্তা করতে লাগল। বিয়ে অবশ্য একটা না করা যায় এমন নয়। আইনতঃ বাধা কিছু নেই। কিন্তু বিয়ে করবার কোনও ইচ্ছা সে নিজের মধ্যে খুঁজে পেল না। আবার যাকে নিয়ে আসবে,

তাকে হৃদয়ে কোন স্থান দিতে পারবে কি? ঘর থেকে চ'লে গেছে যে, সে কি মন থেকেও গিয়েছে? আর স্ত্রীর পরিপূর্ণ অধিকার যাকে দিতে সে কিছুতেই পারবে না, অথচ যে সংসারের প্রতি সব কর্ত্তব্য পালন ক'রে চলবে, এমন মেয়ে কোথায় পাওয়া যাবে? শুধু ঘর-সংসারের লোভে বা স্বচ্ছল অবস্থায় আরাম ভোগ করবার জন্যে হয়ত কেউ আসতে পারে। কিন্তু তেমন কাউকে নিয়ে সঞ্জীবের চলবে কি? আর ধাক্কা খেতে সে চায় না। এবং প্রতারণাও সে করতে পারবে না। যদি কাউকে ধরে আনে, তাকে ব'লে-কয়েই আনতে হবে।

অথচ তাদের সাজান সংসারের দুর্গতি দেখে তার মনটা খারাপ হয়ে যায়। মায়ের সেবা-শুশ্রূষা ভাল ক'রে হয় না ঝি'দের হাতে। তারা যথাসাধ্য ফাঁকি দেয়। সঞ্জীব পুরুষ, রোগিণীর সব রকম পরিচর্য্যায় সে সাহায্য করতে পারে না।

অনেক ভেবে বিয়ে করাই স্থির করল। সুখ বা আনন্দ কিছুই সে পাবে না, তবু যদি নিশ্চিন্ততা পায়, তাও ঢের। বাবার জন্যে সে কিছুই করতে পারে নি, মায়ের জন্যে নিজের অসুবিধা ঘটিয়েও যদি কিছু করতে পারে, তাও ভাল।

বিভাকে বলল, "দেখ্, বিয়েই আমি করব, কিন্তু মেয়ে আমি নিজেই ঠিক করব, আর কেউ আমার প্রয়োজনটা ঠিক বুঝবে না।"

বিভা বলল, "তা কর বাপু, তবে মায়ের সঙ্গে যাতে বউয়ের বনে সেটা একটু দেখো। বড় অসহায় হয়ে পড়েছেন, তাঁকে কোনরকম মনোকষ্ট না পেতে হয়, তা হলেই হল।"

সঞ্জীব কাগজে একটা বিজ্ঞাপন দিল, অত্যন্ত সাবধানতা সহকারে। বিবাহার্থে সে পাত্রী চায়। সাবালিকা ও শিক্ষিতা হওয়া প্রয়োজন, গৃহকর্ম্মনিপুণা ও রোগীর সেবায় অভ্যস্ত হ'লে আরও ভাল। সে নিজেই দেখবে ও আলাপ করবে। দাবি-দাওয়া কোনরকম কিছু নেই। নিজের সাংসারিক অবস্থা, ও বিদ্যার পরিচয় পুরোপুরি দিল। পাত্রীর রূপের বিষয় নীরব রইল, ফোটোগ্রাফও চাইল না।

বিজ্ঞাপনের জবাব আসতে সুরু করল প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই, তবে খুব পছন্দমত প্রথমেই কাউকে পাওয়া গেল না। দু'একজন নার্স এবং লেডী ডাক্তারও আবেদনপত্র পাঠালেন। লেখাপড়া ভাল জানে এমন মেয়েও পাওয়া গেল, তবে তারা গৃহকর্ম্ম বা রোগীর শুশ্রূষার বিষয় কোন উল্লেখ করল না। নাচ, গান, ছবি আঁকা, শেলাই সব জানে, এটাই বড় ক'রে দু'চারজন জানাল।

সঞ্জীব দ্বিধায় প'ড়ে গেল। সে যা চায়, ঠিক ত পাওয়া যাচ্ছে না। শুধু বউ হিসাবে কয়েকটিই ভাল হ'তে পারে, কিন্তু তার ত শুধু সুন্দরী, সুশিক্ষিতা, accomplished মেয়েতে চলবে না? এবং সেরকম মেয়ে সঞ্জীবের কাছে আসবেই বা কেন শুধু সংসার করার লোভে? নিজেদের দিকে যাদের বড় কোনো খুঁৎ আছে, তারাই এরকম ক্ষেত্রে আসতে পারে। সত্য-মিথ্যা যাচাই করাও এ ক্ষেত্রে সুকঠিন। রূপ চোখে দেখা যায়, কিন্তু গুণ বা স্বভাব চোখে দেখা যায় না।

আরও কয়েকদিন অপেক্ষা করাই সে স্থির করল। তার পর এক এক ক'রে পরীক্ষা ক'রে দেখবে।

সে দিন অফিস থেকে ফিরে এসে ব'সে চা খাচ্ছে, এমন সময় নূতন ছোকরা চাকরটা এসে খবর দিল যে একজন মেয়েছেলে বাবুর সঙ্গে দেখা করতে এসেছে। নীচে বৈঠকখানায় বসেছে।

সঞ্জীব বিস্মিত হ'ল। আত্মীয়া বা বন্ধু কেউ নয়। তা হ'লে উপরেই উঠে আসত। বিজ্ঞাপনে ত তার বাড়ীর ঠিকানা ছিল না, বক্স নম্বরই দেওয়া ছিল। হয়ত তলে তলে খোঁজ নিয়ে কেউ বাড়ীতে এসে উপস্থিত হয়েছে।

চাকরকে বলল, "তুই আলো জ্বেলে দিয়ে আয়, আমি এখনি যাচ্ছি।"

চুলটা আঁচড়ে, একটা পাঞ্জাবী গায়ে চড়িয়ে সে নীচে নেমে গেল। বৈঠকখানা ঘরে একটি মেয়ে দাঁড়িয়ে আছে। পিছন ফিরে রাস্তা দেখছে, কোলে একটি নিদ্রিত শিশু। সঞ্জীবের পা দুটো যেন অবশ হয়ে এল, হৃৎপিণ্ডটা এমন জোরে লাফিয়ে উঠল যে তার প্রায় দম আট্‌কে গেল। এ ত প্রিয়ম্বদা!

পায়ের শব্দে প্রিয়ম্বদা পিছন ফিরে তাকাল। প্রিয়ম্বদাই বটে, কিন্তু এ কি রকম প্রিয়ম্বদা? অত্যন্ত রোগা হয়ে গিয়েছে, অমন যে আগুনের মত রং, তাও যেন ম্লান দেখাচ্ছে। শাদা জামা, ফিতে পাড় শাড়ী পরা। গহনা নেই, হাতে প্লাষ্টিকের চুড়ি। শিশুটি অতি সুন্দর দেখতে।

সঞ্জীবকে নির্ব্বাক্ দেখে প্রিয়ম্বদা হাসবার চেষ্টা ক'রে বলল, "ভয়ানক অবাক্ হয়ে গিয়েছ?"

সঞ্জীব কোনমতে গলাটা পরিষ্কার ক'রে বলল, "অবাক্ হবার কথা নয় কি?"

প্রিয়ম্বদা বলল, "অবাক্ হবারই কথা, রাগ করবারও কথা। খুব কি বিরক্ত হয়েছ?"

সঞ্জীব এতক্ষণে নিজেকে একটু সামলে নিল, বলল, "না, না, বিন্দুমাত্রও বিরক্ত হই নি। তুমি বোসো, দাঁড়িয়ে রইলে কেন? বাচ্চাটিকে সোফায় শুইয়ে দাও। তোমারই ত?"

প্রিয়ম্বদা ছেলে কোলে ক'রে সোফায় ব'সে পড়ল, বলল, "আর কারো হ'লে আমি নিয়ে আসব কেন?" ব'লে ছোট হ্যাণ্ডব্যাগ থেকে একখানা কাগজ বার ক'রে সঞ্জীবের হাতে দিল।

সঞ্জীব সেটা খুলে দেখল, শিশুর জন্মের সার্টিফিকেট। একটু ক্ষুব্ধ হয়ে বলল, "এটা দেখাচ্ছ কেন? আমি কি তোমার কথা অবিশ্বাস করছি?"

খারাপ করেছি। অল্প বয়সের নির্বুদ্ধিতা। নিজের ভালমন্দও বুঝি নি।"

সঞ্জীব বলল, "তোমার বয়স কম ছিল ঠিকই, রাগ করবার কারণও ঘটেছিল। কিন্তু তোমার মা-বাবার ত বয়স কম নয়? তাঁরা কেন আমায় জানালেন না? তোমাকে জোর ক'রে আমি রাখতে পারতাম না, কিন্তু আমার সন্তানের উপর অধিকার আমি ছাড়তাম না।"

প্রিয়ম্বদা বলল, "তাঁরা প্রথমে কিছু বুঝতে পারেন নি, আমি বলি নি তাঁদেরও। বাবা ভয়ানক বেশী চ'টে ছিলেন, চেষ্টা করছিলেন আবার আমার বিয়ে দিয়ে দেবার। সত্যিই একটা বিপদে পড়বার ভয়ে শেষে তাঁদের বলতে বাধ্য হলাম।
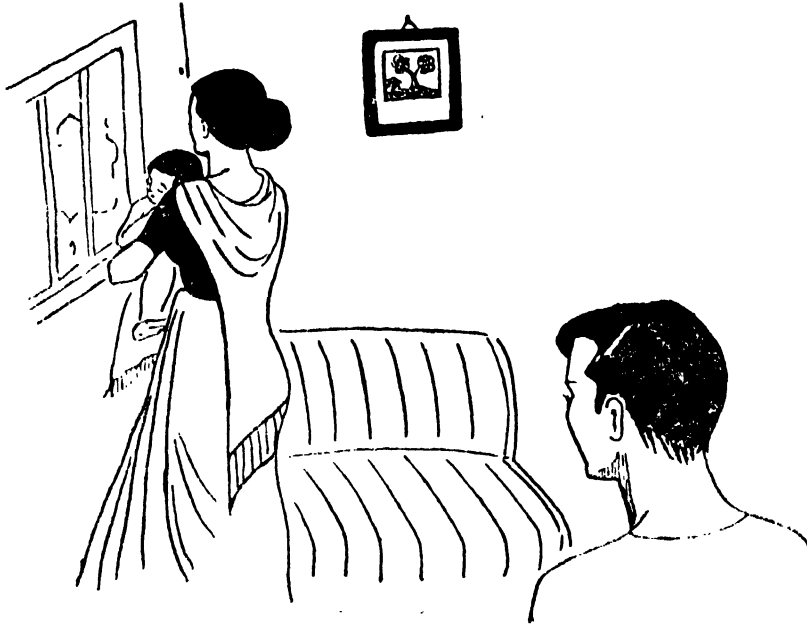
বৈঠকখানা ঘরে একটি মেয়ে দাঁড়িয়ে আছে, পিছন ফিরে রাস্তা দেখছে, কোলে একটি নিদ্রিত শিশু।

প্রিয়ম্বদা বলল, "জন্মের তারিখটা দেখ। আমি যে দিন চ'লে যাই, ঠিক তার ছ'মাস পরে হয়েছে।"

সঞ্জীব একটুক্ষণ চুপ ক'রে রইল, তার পর প্রায় রুদ্ধকণ্ঠেই বলল, "এটাও তুমি আমায় জানাও নি? এতই খারাপ ব্যবহার আমি তোমার সঙ্গে করেছিলাম?"

প্রিয়ম্বদার মুখটা আরও যেন শুকিয়ে উঠল, নীচু গলায় বলল, "তোমার চেয়ে ব্যবহার আমিই বেশী

সঞ্জীব বলল, "'বিপদ্' বলছ কেন? তুমি কি বিয়ে করতে আর চাও নি?"

প্রিয়ম্বদা খানিকক্ষণ মাথা নীচু ক'রে ব'সে রইল। তার পর বলল, "কি হবে এর জবাব শুনে?"

সঞ্জীব বলল, "তুমি উত্তর একটা দাও প্রিয়ম্বদা, আমার বড় দরকার জানবার।"

প্রিয়ম্বদা বলল, "তখন তোমার সন্তান আমার পেটে,

আর একজন পুরুষকে স্বামী ব'লে কি ক'রে গ্রহণ করব? আমার সমস্ত অস্তিত্ব যে বিদ্রোহ ক'রে উঠল।"

সঞ্জীব বলল, "ছেলে হয়ে যাবার পরে ত পারতে? আমি বিলেত যাবার সময় শুনে গিয়েছিলাম যে বিয়ে তোমার ঠিক হয়ে গিয়েছে।"

প্রিয়ম্বদা বলল, "ভুল শুনেছিলে, আমি আর বিয়ে করতে রাজী হই নি।"

সঞ্জীব বলল, "আমার জানবার আগ্রহ যতই থাকুক, এ বিষয়ে আর কিছু প্রশ্ন করবার অধিকার আমার নেই। বুঝতে পারছি, বেশী কিছু তুমি বলতে চাও না।"

প্রিয়ম্বদা এ কথার কোনো উত্তর দিল না। সঞ্জীব জিজ্ঞাসা করল, "তোমার চেহারা এত বেশী খারাপ দেখাচ্ছে কেন? কোন শক্ত অসুখে পড়েছিলে?"

প্রিয়ম্বদা বলল, "খোকন হবার সময় খুব ভুগেছিলাম, তার পর ভাল ক'রে বিশ্রাম পাই নি, খাটতে হ'ত বড় বেশী। চিকিৎসা যেভাবে হওয়া উচিত ছিল, তাও করাতে পারি নি।"

সঞ্জীবের মুখখানা আরও বিষাদক্লিষ্ট দেখাতে লাগল। বলল, "এমন অবস্থাতেও আমাকে কিছু জানাও নি? আইনই কি সব? আমি তখন দেশে ছিলাম না ঠিকই, কিন্তু খবর পেলে ওখান থেকেই আমি সাহায্য করতে পারতাম। অফিসে বা ব্যাঙ্কে খোঁজ করলেই আমার ঠিকানা পেতে। এত নীচ কেন মনে করলে আমাকে?"

প্রিয়ম্বদা বলল, "খোকনের কোন অযত্ন অনাদর হতে দিই নি। তার কোন অভাব হলে সত্যিই জানাতাম তোমাকে। গয়নাগাঁটি সব বিক্রী ক'রে আমি আঁতুড়ের খরচ সব চালিয়েছি, সংসারে সাহায্য করেছি। কিন্তু আমার নিজের জন্যে বা আমার বাবা-মায়ের জন্যে কি ক'রে তোমার কাছে সাহায্য চাইব?"

সঞ্জীব একটুক্ষণ চুপ ক'রে রইল, তার পর বলল, "একটা কোনো প্রয়োজনে তুমি এসেছ বুঝতে পারছি। সেটা কি বল।"

প্রিয়ম্বদার গলা দিয়ে কথাটা যেন আসছিল না। কোনমতে ঢোক গিলে বলল, "আমাদের অবস্থা বড় খারাপ হয়ে পড়েছে। বয়স হবার আগেই বাবাকে পেন্‌শন্ নিতে হয়েছে। বড় অসুস্থ তিনি, কাজ করতে আর পারলেন না। দাদা পরিবার নিয়ে বিদেশে চলে গেছে, সেখানে নাকি খরচ ভয়ানক বেশী, সে টাকাকড়ি কিছুই প্রায় পাঠায় না। মাও অসুস্থ। এ ক্ষেত্রে একটু বেশী মাইনের কাজ না নিলে আমার ত চলবে না, তাই—"

বাকি কথাটা সে যেন আর শেষ করতে পারছিল না।

সঞ্জীব বলল, "এই কাজ জোটানতে আমি সাহায্য করি, এই কি তুমি চাও?"

কোনও মতে নিজেকে সামলে নিয়ে সে বলল, "না, ঠিক তা নয়। কাজের খোঁজ একটা আমি পেয়েছি। মাইনে মন্দ নয়, তারা আমার সঙ্গে কথা ব'লে চাকরি দিতে রাজীও হয়েছে। কিন্তু সমস্ত দিন ঘোরাঘুরির কাজ, খোকনকে আমি রাখতে পারব না, দেখাশোনা করবার কোন সময়ই পাব না। তাই তোমার কাছে দিয়ে দিতে এসেছি। ও রাজার ছেলে হয়ে জন্মেছে, কেন দুঃখিনী মায়ের কাছে কষ্ট পাবে?"

সঞ্জীব একেবারে স্তব্ধ হয়ে গেল।

প্রিয়ম্বদা মাথা নীচু ক'রে চোখের জল সাম্‌লাবার চেষ্টা করতে লাগল।

একটু পরে সঞ্জীব বলল, "তুমি কি পাগল হয়ে গেছ, প্রিয়ম্বদা? এইটুকু দুধের শিশু, সে তোমায় ছেড়ে থাকতে পারবে? তুমি ওকে ছেড়ে থাকতে পারবে? ওকে মানুষ করবে কে? আমি ত এসব বিষয়ে একেবারে অজ্ঞ, সব পুরুষ মানুষই তাই। আর তুমি কি জান না যে আমার মা পক্ষাঘাত হয়ে প'ড়ে আছেন?"

প্রিয়ম্বদা এবার কেঁদেই ফেলল। তার ক্ষীণ দেহ থর থর ক'রে কাঁপতে লাগল। সঞ্জীব তাড়াতাড়ি উঠে শিশুটিকে তার কোল থেকে তুলে নিল। এই দারুণ সমস্যার মধ্যে দাঁড়িয়েও তার মনে হ'ল, তার সমস্ত শরীরটা যেন জুড়িয়ে গেল।

ইচ্ছা করতে লাগল প্রিয়ম্বদাকে একটু সান্ত্বনা দেয়। কিন্তু কি বলবে সে, কি করবে? এমন অদ্ভুত প্রস্তাবে ত রাজী হওয়া সম্ভব নয়?

বলল, "প্রিয়ম্বদা, লক্ষ্মীটি, এরকম ক'রে কেঁদো না। একে দেবার নামে তোমার এই অবস্থা, দিয়ে গেলে তুমি ত ক'দিনের মধ্যে ম'রেই যাবে, আমি স্পষ্টই বুঝতে পারছি। এ আমি হতে দিতে পারব না।"

প্রিয়ম্বদা কোনমতে নিজেকে সামলে নিল। চোখের জল মুছতে মুছতে বলল, "মাতৃহীন শিশুও ত মানুষ হয়? নার্স রেখে কি ভাল আয়া রেখে?"

সঞ্জীব বলল, "নিজের অভিমান রাখতে গিয়ে তুমি একে এতদিন পিতৃহীন ক'রে রেখেছিলে, সেটাই যথেষ্ট অন্যায়, এখন আবার মাতৃহীন করবার ব্যবস্থা করছ? এই তোমার কর্ত্তব্যবোধ?"

প্রিয়ম্বদার মুখটা একেবারে বিবর্ণ হয়ে গেল। মাথা নীচু করে বলল, "তবে কি করব তুমিই ব'লে দাও। আমি আর ভাবতে পারছি না।"

সঞ্জীব নিজের কোলে সুপ্ত শিশুর অনিন্দ্যসুন্দর মুখের

দিকে তাকাল, তার পর বলল, "দেখ, একে আমি ছাড়ব না, ছাড়তে পারব না। আমার প্রথম সন্তান, এবং সম্ভবতঃ আমার একমাত্র সন্তান হয়েই থাকবে। কিন্তু তাই ব'লে তোমাকে আমি এতবড় অপরাধ করতে দেব না। ও মাকেও ছাড়বে না, বাবাকেও ছাড়বে না। প্রায় সব শিশুর যা আছে, ওর কেন তা থাকবে না?"

প্রিয়ম্বদা বলল, "সেটা কি ক'রে সম্ভব হবে? চাকরি না ক'রে ত আমার উপায় নেই?"

সঞ্জীব বলল, "তুমি চাকরি করলে যা পেতে আমি তা দেব। তুমি মনে কর চাকরিই করছ, নিজের ছেলেকে মানুষ করার চাকরি।"

প্রিয়ম্বদা এতক্ষণে মুখ তুলে তাকাল। বলল, "আমি ওকে নিয়ে যে যাব, তাতে ও ত আবার তোমার কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়বে। তুমি কিছু আমাদের বাড়ীতে যেতে রাজী হবে না রোজ ওকে দেখবার জন্যে?"

সঞ্জীব বলল, "তোমাদের বাড়ী যেতে হবে কেন? তুমি আমার বাড়ীতেই থাকবে ওকে নিয়ে।"

দারুণ বিস্ময়ে প্রিয়ম্বদা যেন পাথর হয়ে গেল। একটু পরে বলল, "এ ত হতে পারে না। লোকে কি বলবে? সামাজিক রীতি নীতি বলে একটা জিনিষ আছে ত?"

সঞ্জীব বলল, "সমাজের চোখে অশোভন যাতে কিছু না হয়, তার ব্যবস্থা ক'রেই আনব। আবার রেজিষ্ট্রি ক'রে তোমাকে বিয়ে করব।"

প্রিয়ম্বদার চোখ দিয়ে আবার জল পড়তে আরম্ভ করল। কোনমতে অস্পষ্ট ভাবে বলল, "এর ফলে কি হতে পারে একবারও ভেবেছ? আমি দুঃখ পেয়েছি ঢের, শাস্তি পেয়েছি ঢের। কিন্তু সেই মানুষই ত আমি? সর্ব্বনাশা স্বভাব যাকে ধ্বংসের মধ্যে নিয়ে গেল! আর একবার এই আগুনে আমি পুড়তে পারব না। ম'রে যাব।"

সঞ্জীব বলল, "প্রিয়ম্বদা, তুমি ত আমার স্ত্রী হয়ে বাস করেছ চার মাস? আমি রাগী, অসহিষ্ণু, এমন কি ছোট লোকও হতে পারি, কিন্তু মিথ্যা কথা তোমার কাছে কোনদিন বলেছি কি?"

প্রিয়ম্বদা রুদ্ধকণ্ঠে বলল, "না।"

"তবে আমি প্রতিজ্ঞা করছি এই ছেলে বুকে নিয়ে যে, কোনো মতান্তর বা মনান্তর আমি ঘটতে দেব না। তার কোন সুযোগই আসবে না। তোমার মতামত নিয়ে তুমি থাকবে, আমি কিছুতে হস্তক্ষেপ করব না। তোমার উপর কোন দাবি করব না, কোন অধিকার ফলাতে যাব না। তুমি ছেলেকে মানুষ কর, তার শৈশব সুখের হোক আনন্দের হোক। সংসারটারও ভার নিও, রোগিণীরও তত্ত্বাবধান কোরো, এইটুকুমাত্র তোমার কাছে অনুরোধ আমার।

প্রিয়ম্বদা কাঁদতে কাঁদতে বলল, "কেন এমন ব্যবস্থা করছ? একবার যাকে নিয়ে এত কষ্ট পেলে, কেন আবার সেই শত্রুকে ঘরে ডেকে আনছ? আমি শুনেছি তুমি আবার বিয়ের ব্যবস্থা করছিলে। তাই কর, সেটাই স্বাভাবিক হবে, তুমিও সুখী হবে।"

সঞ্জীব বলল, "আমার পক্ষে যা স্বাভাবিক আমি তাই করছি। এতে আমি যতখানি সুখী হব তাতেই আমার চলবে, তার বেশী চাই না। মোট কথা আমার খোকনকে আর আমি ভেসে যেতে দেব না। তাকে আমার চাই, এবং খোকনের তোমাকে চাই, কাজেই তিনজনকে এক সঙ্গেই থাকতে হবে।"

প্রিয়ম্বদা কথা বলছে না দেখে বলল, "আশা করি আমার কথা বিশ্বাস করছ?"

প্রিয়ম্বদা বলল, "হ্যাঁ।"

"তুমি মনে কোন সংশয় নিয়ে এসো না। যে ভাবে থাকতে চাও তাই থাকবে তুমি। আমাকে স্বামী মনে না করতে চাও, শুধু বন্ধুই ভেব। নিজের ভোগসুখেচ্ছা আমি ছেড়েই দিয়েছি। আমি কতখানি আদায় করতে পারব, সে কথা আর ভাবব না। ছেলের জন্যে কতখানি স্বার্থত্যাগ করতে পারব, তাই শুধু ভাবব। তুমিও তাই ভেব। আমরা পরস্পরকে সুখী করতে পারি নি, ছেলেকে দুজনে মিলে সুখী করব, তার জীবন সার্থক করব। এই লক্ষ্য নিয়ে চল, দেখবে, চলতে একেবারে কষ্ট হচ্ছে না।"

প্রিয়ম্বদা চোখের জল মুছে ফেলল। বলল, "তাই হবে। ভগবান্ যেন আমার সহায় হন, আমি আর যেন কোন অপরাধ না করি। কবে আসব তবে?"

সঞ্জীব বলল, "দিন-পনের লাগবে ব্যবস্থা করতে, তার পরই নিয়ে আসব।"

প্রিয়ম্বদা বলল, "খোকাকে দাও তবে, আমি যাই।"

সঞ্জীব এতক্ষণ পরে ছেলেকে ফিরিয়ে দিল। বলল, "ওরকম ট্রামে ক'রে যেতে হবে না, আমি গাড়ী ব'লে দিচ্ছি। আর দেখ, এই টাকা ক'টা রাখ, আগাম মাইনে। যখনই যা দরকার হবে, আমাকে জানিও চিঠি লিখে।"

প্রিয়ম্বদা বলল, "আচ্ছা। আসি তবে।"

ছেলেকে সোফায় শুইয়ে দিয়ে সঞ্জীবের কাছে এসে প্রণাম করল। সঞ্জীব তার মাথায় হাত দিয়ে বলল, "কাল গিয়ে খোকনকে আর তোমাকে আমি দেখে আসব। তোমার বাবা মাকে জানিয়ে রেখো।"

স্বপ্নবসন্ত

শ্রীঅজিত চট্টোপাধ্যায়

ছোটখাটো একটা আস্তানা। মাথা গোঁজবার মত ঠাঁই। আজ একমাস ধ'রে সুরমার মনে এই ছাড়া আর অন্য কোন কামনা নেই। জলপাইগুড়িতে ব'সে যখন প্রথম বদ্‌লির অর্ডার পেয়েছিল তখন বনময়ূরের মতই নেচে উঠেছিল ওর মনটা। প্রায় সাত বছর ধ'রে জলপাইগুড়িতে। বদ্‌লির নামগন্ধ নেই। কত দরখাস্ত, মিনতিপত্র, বড় সাহেবের কাছে দরবার।

কিছুতেই কাজ হয় নি কোন। ভেবেছিল এরপর হয় ত কুচবিহার কিংবা শিলিগুড়ি পাঠাবে। একবার উত্তরবঙ্গে এলে আর কি রেহাই আছে? কলকাতার মুখ দেখা আর হয়ত কপালে নেই।

জলপাইগুড়িতে ব'সে কলকাতার স্বপ্ন দেখত সুরমা, আলো-ঝলমল চৌরঙ্গী, কলেজ ষ্ট্রীটের বইপাড়া, উত্তর কলকাতার সিনেমা থিয়েটার—এক-একদিন একটা চিন্তা, চোখ বুজে সুরমা ভাবত। সাত বছর আগে দেখা কলকাতাটা চিত্রবিচিত্র হয়ে ভেসে উঠত ওর মনের দর্পণে—

এখানে এসে যে এমন বিপদে পড়তে হবে আগে ভাবে নি। শুনেছিল বাসা জোগাড় করা একটু শক্ত ব্যাপার। লোকজন বেড়েছে খুব। কিন্তু তাই ব'লে দীর্ঘ একমাসের একনাগাড়ে চেষ্টাতেও যে দু'খানা ঘর পাওয়া যাবে না তা ভাবতে পারে নি।

এসে উঠেছে এক আত্মীয়ের বাড়ীতে, তাঁরা অবিশ্যি ভদ্রতা ক'রে একখানা গোটা ঘরই ছেড়ে দিয়েছেন ওকে। বারান্দায় রান্না-বান্না সেরে নিলে ঐ একখানা ঘরেই অবিশ্যি চলে। কিন্তু এটা ত আর স্থায়ী ব্যবস্থা নয়। তা ছাড়া ছেলেমেয়ের পড়াশুনার জন্যও একটা ঘরের বড় দরকার। অন্তত দু'খানা ঘরের কমে কিছুতেই চলে না। কিন্তু সমস্ত কলকাতা শহরটা চ'ষে বেড়ালেও বুঝি দু'খানা খালি ঘর পাওয়া সম্ভব হবে না।

উদ্বাস্তু পুনর্ব্বাসন বিভাগে সুরমার চাকরি, যে সমস্ত ছিন্নমূল আশ্রয়প্রার্থীর দল এসেছে, তাদের সুষ্ঠু-পুনর্ব্বাসনের দায়িত্ব ওদের দপ্তরের। 'এদিকে কলকাতা শহরে নিজেরই একটা মাথা গোঁজবার ঠাঁই জোগাড় করতে হিমশিম্ খেয়ে যাচ্ছে সুরমা। জানাশোনা লোকজন, আত্মীয়-স্বজন, অফিসের সহকর্ম্মী ইত্যাদি প্রত্যেকের কাছেই জানিয়েছে সুরমা ওর প্রয়োজনের কথা। কেউ কেউ আশ্বাস দিয়েছে। কেউ বা হেসে বলেছে—'বাড়ী? কি বলছেন আপনি? কলকাতা শহরে বাড়ী পাওয়া ত লটারী পাওয়ার সামিল। খুব ভাগ্যবান্ না হলে জোগাড় করাই মুশ্‌কিল।'

নিরাশ হয়ে আবার মফঃস্বলে ফিরে যাওয়ার কথাও ভাবছে সুরমা। মাথা গোঁজবার ঠাঁই যদি নাই মেলে তবে এত বড় শহরকে আঁকড়ে ধ'রে পড়ে থাকবার কোন মানেই হয় না। কতদিন নিজের মনকে বুঝিয়েছে সুরমা। মফঃস্বলেই ভাল। খোলা মাঠ, রোদ-জ্বলা আকাশ, অতি পরিচিত পাড়াপড়শী। কলকাতার এই স্যাঁতসেঁতে মাটি, বুকচাপা ঘরবাড়ী, অপরিচিতের ভান করা পাড়া-পড়শীর চেয়ে সে ঢের ভাল।

অফিসেই একদিন খবরটা পেল সুরমা। দু'খানা ঘর নাকি খালি হবে। এখনও কাকপক্ষীতে টের পায় নি। সুলতা নাকি অনেক কষ্টে খোঁজ পেয়েছে। ওর এক মাসীমার দেওরপো না কে যেন ইণ্টালীতে থাকত দুখানা ঘর নিয়ে, সেটাই খালি হবে, মাসীমা কাল এসেছিলেন সুলতাদের বাড়ী বেড়াতে।

—'আজই গিয়ে ধর। বাড়ীওয়ালার ঠিকানাটা আমি চেয়ে এনেছি'—সুলতা ফিস্ ফিস্ ক'রে বলল।

—'কি ক'রে পেলি ঠিকানা?'

—'মাসীমার সঙ্গে কাল গেছলাম যে। কি করি আর? তোর যা প্রযোজন সেটা ত বুঝতে পারছি।'

সুরমা ওর হাত দুটো চেপে ধরল। মুখে কৃতজ্ঞতার সলজ্জ হাসি।

—'ছাড়্, ছাড়্। হাত ছাড়্ আগে। কেউ কোথাও দেখে ফেলবে আবার। জিজ্ঞেস ক'রে বসবে। একবার যদি খোঁজ পায় ত দেখবি, লাইন সুরু হয়ে গেছে।'

—'কিন্তু অফিসের কেউ ত আর আমার মত উদ্বাস্তু নয়?' সুরমা বিস্মিত হয়ে প্রশ্ন করল।

—'অফিসের লোক কি শুধু একা? তাদের আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু বান্ধব নেই?' সুলতা আবার হাসল।

ঠিকানাটা ডালহৌসী অঞ্চলের। কি একটা অফিসের নাম। ভদ্রলোকের কি সব ব্যবসা আছে কলকাতায়। সন্ধ্যে ছ'টা পর্য্যন্ত অফিস-পাড়াতেই থাকতে হয়। সুলতা বলছিল—'চেপে ধরবি ভদ্রলোককে। দু এক মাসের ভাড়া অগ্রিম দিতেও পিছপা হস নে, বুঝলি?'

নিজের মনে মনে তারই একটা মহড়া দিচ্ছিল সুরমা। একটা বাস প্রায় ওর ধার ঘেঁষে চ'লে গেল। নিজের মনেই চমকে উঠল সুরমা। ভয়ে, আতঙ্কে। রাস্তা ছেড়ে দিয়ে ফুটপাথে উঠল। কলকাতার পথে-ঘাটে চলাফেরার এখনও অভ্যেস হয় নি তেমন। মাত্র ত একমাস এসেছে। আস্তে আস্তে হবে সব। আগে ত ঘর দুটোর অধিকার আসুক। সুরমা নিজের মনে ভাবল।

বেলা চারটের কাছাকাছি। নিজের হাতঘড়িটার দিকে একবার চাইল সুরমা। ওর শরীরের উপর দিয়ে ছত্রিশটি শীত গ্রীষ্ম পেরিয়ে গেছে। কিন্তু এখনও দেহের বাঁধুনি অটুট। এক নজরে দেখলে বছর-ত্রিশের বেশী মনেই হবে না। বিধবা হয়েছে আজ বছর-দশেক আগে। রাস্তায় পথ চলতে চলতে হঠাৎ মৃত স্বামীর মুখখানাই মনে পড়ল সুরমার। আজ সে থাকলে আর এমন ক'রে বাড়ীর জন্যে ছুটোছুটি করতে হ'ত না সুরমাকে। একটা গাড়ী-বারান্দার নীচে ছায়ার মধ্যে দাঁড়াল সুরমা। রুমাল দিয়ে মুখ মুছল। কপাল, ঘাড়ের কাছের খানিকটা অংশও বাদ গেল না।

দোতলায় অফিস। স্যুইং ডোরটা ঠেলতেই ভদ্রলোককে দেখতে পেল সুরমা। দামী স্যুট আর টাই পরণে। বাঁ-হাতে একটা সিগার। চোখে মোটা কালো ফ্রেমের চশমা। টেবিলের উপর ঝুঁকে প'ড়ে কি যেন লক্ষ্য করছেন।

ঘরে ঢুকে সুরমা নড়েচড়ে দাঁড়াল। শাড়ীর খসখস শব্দ হ'ল একটু, হাতের বলয় দুটি বেজে উঠল একবার।

—'কি চান আপনি?' ভদ্রলোক মুখ তুলে চাইলেন।

—'আপনিই মিঃ এন. এল. মিত্র?' সুরমা জানতে চাইল।

—'হ্যাঁ। বসুন না।' একটি অঙ্গুলীর নির্দ্দেশ এল ওর দিকে।

চেয়ারে ব'সে হাতব্যাগটা টেবিলের উপর রাখল সুরমা। ডান-হাতটা আলতো ক'রে ছুঁয়ে রইল কাঠের টেবিলটা। বাঁ-হাতটা কোলের উপর—

'আমি এসেছিলাম একটা বাড়ীভাড়া নেবার ব্যাপারে—' সুলতা ডান-হাতটা ব্যাগের উপর বুলোতে লাগল। অনেকটা আদর করার ভঙ্গিতে। পোষা জন্তুর গায়ে আদরের হাত বুলোনর মত।

ভদ্রলোক ওর মুখের দিকে চেয়ে। মোটা কালো ফ্রেমের চশমাটার আড়ালে চোখের তারা দুটো অস্বাভাবিক জ্বলজ্বলে। কেমন অস্বস্তি লাগল সুরমার। বাড়ীভাড়ার প্রশ্ন এড়িয়ে ভদ্রলোক যেন ওকেই লক্ষ্য ক'রে চলেছেন।

—'আপনার নাম সুরমা না?

—'হ্যাঁ। কিন্তু আপনি কি আমায়—'

—'ঝাড়গ্রামের কথা মনে আছে? সেই দাঙ্গা-হাঙ্গামার বছরে গিয়েছিলাম আমরা—'

চশমাটা টেবিলের উপর রাখলেন ভদ্রলোক। আর সেই মুহূর্ত্তেই সুরমা চিনতে পারল নিশীথ মিত্রকে।

ঝাড়গ্রাম শহরটা এতদিনে কত বড় হয়েছে কে জানে! ষ্টেশন থেকে তেমনি পীচের কালো রাস্তা বন-অঞ্চলের মধ্য দিয়ে পুরানো ঝাড়গ্রামের দিকে গিয়েছে কি? তখন ত পথের দু'পাশে ভারী জঙ্গল ছিল শুধু। সন্ধ্যের পর একা একা পথ হাঁটত না কেউ। জন্তুজানোয়ার কিংবা চোর ছিনতাই, উপদ্রব দুটোই সমান।

উনিশশো ছেচল্লিশ—

সেই দাঙ্গাহাঙ্গামার বছরটা।

কলকাতা থেকে চ'লে এসেছিল নিশীথ মিত্ররা। পুরানো ঝাড়গ্রামে আরও অনেকে এসেছিল পালিয়ে। কলকাতায় জীবন তখন জলমতি তরলম্। ঘরের মানুষ পথে বেরুলে আবার ফিরবে কি না তার ঠিকঠিকানা নেই। যুদ্ধের সময়ই অনেক বাড়ী উঠেছিল পুরানো ঝাড়গ্রামে। অন্য সময় চাবি থাকত সেগুলোয়। শীতের সময় বা পুজোর ছুটির অবসরে মালিকরা আসতেন কেউ কেউ। দাঙ্গার বছরে আগেভাগেই দরজা খুলে গেল বাড়ীগুলার। কচি কচি মুখের হাসি, মেয়েদের ঠাট্টা-তামাসা আর পুরুষদের উচ্চৈঃস্বরে ভ'রে উঠল। যেন বসন্তের হাওয়া এল ভেসে। অসময়ে বা অদিনে। পুরানো ঝড়গ্রামের পথেঘাটে সকালে-বিকালে নতুন মানুষের মুখ দেখা যেতে লাগল।

নিশীথ মিত্রের সঙ্গে আলাপ হয়েছিল একদিন পথের মধ্যেই—

বিকেলে বেড়াতে বেরিয়েছিল সুরমা। ভাইবোনদের

নিয়ে। দু'পাশের বনঝোপে অস্তসূর্য্যের রাঙ্গা আলো, কালো পীচঢালা পথটা পুরানো ঝাড়গ্রামের মধ্য দিয়ে এগিয়ে গেছে। রাজবাড়ীর গেষ্টহাউসটার পাশ দিয়ে দূরের আরো গভীর অরণ্যের মধ্যে গিয়ে মিশেছে কোথাও। একটা শঙ্খচিল আকাশে পাক দিচ্ছে··· কখনও ডাকছে তীক্ষ্ণস্বরে। ওদের দেখে নিশীথ মিত্র এগিয়ে এসেছিল আলাপ করতে। সঙ্গে চেনে বাঁধা শীতপ্রধান দেশের সারমেয় একটি। পরণে স্যুট। চোখে সোনালী ফ্রেমের চশমা।

—আমরা কিছুদিন হ'ল এসেছি এখানে। আপনারা নিশ্চয় এখানেই থাকেন?'

ঘাড় নেড়ে সায় দিল সুরমা। ওর ছোটভাই আঙ্গুল বাড়িয়ে দেখাল,—'ওই যে হলুদে রঙের বাড়ীটা দেখা যাচ্ছে—ওটাই ত আমাদের বাড়ী—

সুরমা বলল,—'আমার বাবা সরকারী চাকরি করেন এখানে। ভাড়া নিয়েছি বাড়ীটা।'

নিশীথ মিত্র হেসে বলল, 'আমরা এসেছি প্রাণের দায়ে। অনেকটা পালিয়েও বলতে পারেন। কলকাতায় এখন পথঘাট, চলাফেরা, কিছুই নিরাপদ্ নয়। তাই—'

সুরমা জানত, আরো অনেকেই এসেছে পুরানো ঝাড়গ্রামে। দাঙ্গাহাঙ্গামার কথা কাগজে দেখেছে। নতুন লোকজন যারা এসেছে তাদের কাছেও শুনেছে কিছু কিছু।

—'কোন বাড়ীটায় উঠেছেন?'—

—'এখান থেকে দেখা যাবে না ঠিক। ওটা আমাদেরই বাড়ী। বাবা তৈরী করিয়েছিলেন বছর কয়েক আগে। মাঝে-মধ্যে উনিই আসতেন। আমরা কখনও আসি নি এর আগে।'

বছর-পঁচিশ বয়সের সুদর্শন যুবক। সুরমা অপাঙ্গে চেয়ে চেয়ে দেখল। নিশ্চয় বড়লোক খুব। জামাকাপড়, চোখের চশমা, হাতের ঘড়ি, আঙ্গুলের জ্বলজ্বলে পাথরের আংটি আর চেনে-বাঁধা বিলাতী কুকুরটাও সেই কথাই বলছে।

এরপর আলাপটা বেড়েছিল সাধারণ নিয়মে। ছোট জায়গা পুরানো ঝাড়গ্রাম এমনিতেই লোক কম। শিক্ষিত মার্জ্জিত লোকের সংখ্যা আরও অল্প। পরিচয়টা তাই পথেই শেষ হয়ে যায় নি। আলাপটা পথ থেকে বাড়ীতে পুরানো ঝাড়গ্রামের বাইরেও ছড়িয়ে পড়েছিল।

নিশীথ মিত্র বলেছিল—'ভারী অদ্ভুত জায়গা এই পুরানো ঝাড়গ্রাম। এর চারপাশের জঙ্গল, ঘন বন, আদি বাসিন্দা—সবকিছুই যেন কত প্রাচীন। সময়টা স্তব্ধ হয়ে থেকেছে। কলকাতার এত কাছে, এত শান্ত নিস্তব্ধ শহর যে থাকতে পারে, আমি আগে কোনদিন ভাবি নি।'

—'কেন, আপনার বাবা কখনও বলেন নি এখানের কথা?'—

—'বলেছেন, কিছু কিছু। বাবার নিশ্চয় ভাল লেগেছিল। নইলে বাড়ীটা করবেন কেন শুধু শুধু—'

—'এখানকার জলহাওয়াও ত খুব ভাল।'—

একগাল হেসে নিশীথ মিত্র বলেছিল,—'তা সত্যি। এই ক'মাসেই দেখুন না বেশ উন্নতি হয়েছে স্বাস্থ্যের।'

শীত কেটে গিয়ে বসন্ত এসে গেল। ঋতুচক্রের আবর্ত্তনে, পুরানো ঝাড়গ্রামের অরণ্যে মঞ্জুরিত শালফুলের সুবাস ছড়াল। বাংলোবাড়ীর ফুলবাগানে বেল, চাঁপা আর গোলাপফুলের উৎসব সুরু হ'ল যেন। সুরমার মনেও ছোট্ট একটি গোলাপের কুঁড়ি ফুটছিল সকলের অজান্তে। তার সৌরভ তখনও কেউ পায় নি। বোধ হয় নিশীথ মিত্রও না।

ওরা গিয়েছিল সুবর্ণরেখা নদী দেখতে। দুই পরিবারে মিলেমিশে। ঝাড়গ্রাম থেকে বেশ কিছু দূরে। দু'পাশে অরণ্য যেন আরও ঘন, নিবিড় নির্জ্জন ছায়া পথের দু'পাশে ছড়িয়ে।

সুরমা বলল, 'জানেন নিশীথদা, সুবর্ণরেখা নাম কেন?'

—'কি ক'রে জানব? তুমিই বল।'

—'সুবর্ণরেখার বালিতে রেণু রেণু সোনা মিশে আছে। এখানকার লোকে বালি বেছে নিয়ে সোনা খোঁজে। তবে বড় পরিশ্রম। বাবার কাছে শুনেছি।'

সুবর্ণরেখার তীরের বিকেলটি শান্ত। কলরব নেই, নেই পাখপাখালীর ডাক। বেড়াতে বেড়াতে দু'জনে গিয়ে পড়েছে একপাশে।

—'আচ্ছা নিশীথদা, কলকাতায় গিয়ে এই সুন্দর বিকেলটা কোনদিন মনে হবে আপনার?'

—'কোনদিন?' নিশীথ কি ভেবে বলল,—'তা বলতে পারি না। তবে এই পুরানো ঝাড়গ্রামের দিনগুলো কি কখনও ভুলতে পারব? মনে হয় না।'

কি একটা বুনো গাছের সুন্দর ফুল ফুটেছে থোকা থোকা। নীল রঙের গুচ্ছ গুচ্ছ পুষ্প-স্তবক।

সুরমা বলল, 'কি সুন্দর ফুল। দেখেছেন নিশীথদা।'

নিশীথও চেয়ে দেখল। তার পর একটু হেসে বলল, 'তুমি নেবে কয়েকটা?'

সুরমা ঘাড় নেড়ে বলল, 'না, না, থাক্। কষ্ট হবে আপনার।'

কথা না শুনে গাছে উঠল নিশীথ মিত্র। আনাড়ি হাত। ফুল পেড়ে আনতে গিয়ে কনুয়ের কাছে খানিকটা ছাল উঠেছে চামড়ার। তবু মুখে হাসি—

—'এই ফুলগুলো কেন দিলাম বল ত সুরমা?'

—'কেন?'

—'ইংরেজরা বলে, যদি কিছু বলতে চাও, ফুল দিয়ে বল। আমি যা বলতে চাই তা এই ফুলগুলোর কাছে জেনে নিতে পারবে না?'

সুরমার কানের কাছটা লাল হ'য়ে উঠেছিল একটু।

ছোট্ট সেই গোলাপ কুঁড়িটা যেন ফুটে উঠতে চাইছে। মৃদু মৃদু হাওয়া। কেমন হাল্কা মনটা। কিসের নেশা যেন—

দীর্ঘ ষোল বছর পরে পুরানো ঝাড়গ্রামের সেই দিনগুলি হঠাৎ সজীব হয়ে উঠতে চাইছে। বুনো ফুলের উগ্র সুবাস এখনও যেন লেগে আছে মনের কোণে একটু। সুবর্ণরেখাতীরের সেই শান্ত মায়াময় বিকেলটি আজও বোধ হয় হারিয়ে যায় নি পৃথিবী থেকে।

চেয়ারে ব'সে ভাবছিল সুরমা। চায়ের কাপে চুমুক দিতে দিতে লক্ষ্য করছিল নিশীথ মিত্রকে। কনুয়ের কাছের সেই কাটা দাগটা কবে মিলিয়ে গেছে হয়ত।

নিশীথ মিত্র বলল—'তার পর, তোমার কোন খবর নেওয়াই হয় নি। বর্ষার সময়ই ত তোমার বাবা বদলি হয়ে গেলেন ওখান থেকে।'

—'হ্যাঁ, ওখান থেকে বর্দ্ধমান। তার পর কলকাতায় আসি। বি. এ. পাশ করেছিলাম, তার পর—' ম্লান হেসে সুরমা বলল—'কতদিন ত কেটে গেল। উনি মারা গেলেন সেও প্রায় বছর-দশ হবে।'

নিশীথ বলল—'কলকাতায় বদলি হয়ে এলে কতদিন?'

—'এই ত এক মাস। কোথাও জায়গা পাচ্ছি না। ছেলেমেয়ে দুটোকে নিয়ে কষ্টের একশেষ। ঘর দুটো আমাকে দেবেন ত নিশীথদা? আমি দু'মাসের ভাড়া এ্যাডভান্স নিয়ে এসেছি—'

বাধা দিয়ে নিশীথ বলল—'ঘর দুটো তুমিই পাবে। আর তার জন্যে এ্যাডভান্সও লাগবে না। তোমার বিপদে এইটুকুও সাহায্য কি করবে না নিশীথদা? না, তুমি দেখছি পুরানো ঝাড়গ্রামের কথা সব ভুলে গিয়ে ব'সে আছ।' নিশীথ মিত্র ঠোঁট টিপে একটু হাসল।

তবু সুরমা বলল—'একবার জানতে পারলে রাজ্যিশুদ্ধ লোক ধর্ণা দেবে আপনার কাছে।'

—'শোন, ভয় নেই তোমার। ঘর দুটো তুমি ঠিক পাবে।' একটু থেমে আবার ভারী গলায় বলল নিশীথ মিত্র—'সুরমা, আমাদের সেই সুবর্ণরেখা বেড়াতে যাওয়ার কথা মনে আছে তোমার?'

সুরমা চুপ ক'রে রইল।

—'শীতের সময় আবার গেছলাম পুরানো ঝাড়গ্রামে। ভেবেছিলাম তোমরা আছ।' নিশীথ মিত্র হাসল।

—'আমরা ত পুজোর আগেই চ'লে এলাম বর্দ্ধমানে।'

—'তাই শুনলাম গিয়ে। আর যাওয়া হয় নি তেমন। সে বাড়ীটাও ভাড়া দিয়েছি।'

সুরমা উঠে দাঁড়াল। একটু লজ্জা লজ্জা আনন্দ সমস্ত মুখে। ঠোঁটে ঈষৎ হাসি। বলল,—'আজ আসি নিশীথদা। আবার কবে আসব বলুন?'

—'কবে ওরা ছাড়ছে বাড়ী?'

—'সামনের সপ্তাহে।'

—'আমিই আজ খবর নিচ্ছি। তুমি তা হ'লে শনিবার দিন বেলা পাঁচটা নাগাদ চ'লে এস।'

সুরমা হাতব্যাগটা নিয়ে সিঁড়ির দিকে পা বাড়াল।

শনিবার দিন ঘুরে এল। মৌলালী ছাড়িয়ে একটা ষ্টপে নেমে পড়ল সুরমা। ঘর দুটো একবার দেখে যাবে ভাবল। পরশু নাকি খালি হয়েছে। অফিসে সুলতা বলেছিল। দোতলার এককোণে ঘর দুটো। বেশ খোলামেলা। নিশীথ মিত্রের উপর কৃতজ্ঞতায় ভ'রে উঠছে মনটা বার বার। অন্য কেউ হ'লে কি আর পেত সে এটুকু? কত আত্মীয়-স্বজন, জানাশোনা। তার হয়ে কে তদ্বির-তদারক করবে।

কিন্তু কারা যেন জিনিসপত্র তুলছে ঘর দুটোতে? পরশু খালি হয়েছে মাত্র! আজই আবার কে আসতে গেল এখানে?

খোঁজ নিতে গেঞ্জী গায়ে দেওয়া এক ভদ্রলোক বেরিয়ে এলেন।

—'ঘর দুটো পরশু খালি হয়েছে, না?' সুরমা বলল।

—'আজ্ঞে হ্যাঁ। আজই আবার ভাড়া হয়ে গেল।'

—'আপনি?' একটা স্যাঁতসেঁতে ভিজে গলায় বলল সুরমা।

—'আজ্ঞে না, আমি রাড়ীর দালাল। দু'মাসের ভাড়া দালালী পেয়েছি- তাই একটু সাহায্য করছি এঁদের।'

—'এ বাড়ীর মালিক ত নিশীথনাথ মিত্র ?'

—'ঠিক বলেছেন। তবে ভাড়া দেওয়ার তেমন ইচ্ছে ছিল না তাঁর। ওর বয়েসকালের কে এক বান্ধবীকে নাকি কথা দিয়েছিলেন। কিন্তু আমিও পরেশ দালাল। এই ক'রেই খাই। হাজার টাকা সেলামির লোভ দেখালাম, ব্যস্‌, ঘণ্টাখানেক পরেই রাজী। ওসব বান্ধবী-টান্ধবী কোথায় ভেসে গেল।'

শীতের বেলা। রোদ গুটিয়ে গেছে শহর থেকে। এখন একটা অন্ধকার শহরটার গলা জড়িয়ে ঝুলছে।

সমস্তটাই ভুল। বুঝবার ভুল সুরমার। সুবর্ণরেখা তীরের সেই বসন্ত সন্ধ্যা হারিয়ে গেছে কবে। নীলরঙের বুনো ফুল শুকনো হয়ে ঝ'রে পড়েছে। ষোল বছর আগেকার সেই অল্প অল্প হাল্কা রং ছিল নেহাৎই কাঁচা। এই শীতের বিকেলে তার চিহ্নমাত্রও নেই।

বাঙ্গলা ও বাঙ্গালীর কথা

শ্রীহেমন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়

পশ্চিমবঙ্গের শিল্পোন্নয়নের উপর নূতন আঘাত

কলিকাতা শিল্পাঞ্চলের চাহিদা মিটাইবার জন্য ব্যাণ্ডেলে যে ১৫০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনের কেন্দ্র স্থাপনের কথা এতদিন আমরা স্থির নিশ্চয় বলিয়া ভাবিয়াছিলাম, কেন্দ্রীয় সরকার ও পরিকল্পনা কমিশনের প্রতিনিধিদের মধ্যে আলোচনার ফলে পশ্চিমবঙ্গ সরকার এই বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র স্থাপনের অনুমতি লাভ করেন নাই। অজুহাত : ব্যাণ্ডেলে কয়লা সরবরাহের বিষম অসুবিধা আছে। এবং এই অজুহাতেই কেন্দ্রীয় সরকার ব্যাণ্ডেলে প্রস্তাবিত বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র দুর্গাপুরে বসাইতে পরামর্শ দান করিয়াছেন। কিন্তু রাজ্য সরকারের বিশেষজ্ঞেরা বলিতেছেন যে দুর্গাপুর হইতে কলিকাতায় সরাসরি বিদ্যুৎ প্রেরণের কোন ব্যবস্থা না থাকায় দুর্গাপুরে এই নূতন কেন্দ্র স্থাপন করিয়া লাভ কিছুই হইবে না।

কেন্দ্রীয় সরকারের এই সিদ্ধান্তের ফলে, তৃতীয় পরিকল্পনায় যে সকল শিল্প প্রসার প্রস্তাব গ্রহণ করা হইয়াছে তাহা বানচাল হইবার আশঙ্কা দেখা যাইতেছে। দুর্গাপুরে নূতন বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র স্থাপন করিতে সময় লাগিবে কম পক্ষে চার বৎসর, অথচ ব্যাণ্ডেলে ইহাতে লাগিবে মাত্র দুই বৎসর, কারণ ব্যাণ্ডেলে ৩০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র নির্মিত হইতেছে, তাহার সহিত এই নূতন পরিকল্পনার কাজও সংযুক্ত করা সম্ভব। কিন্তু যাহা সহজ সম্ভব বলিয়া সাধারণ বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তিরা মনে করেন, অসাধারণ বুদ্ধি এবং মাথাওয়ালা কেন্দ্রীয় কর্তারা তাহা গ্রাহ্য করেন না। সাধারণের সহিত অসাধারণের তফাৎ এইখানেই। কমনসেন্স এবং আনকমনসেন্স বর্তমান ভারতে দুইটি বিরুদ্ধ-শক্তি বলিয়া ধরা যাইতে পারে।

পশ্চিমবঙ্গের পরলোকগত মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ রায় এই বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রটি ব্যাণ্ডেলে স্থাপনের জন্য ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন। প্রথমতঃ এই ১৫০ মেগাওয়াটের বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রটি আজিমগঞ্জে এবং পরে ইহা কাটোয়াতে স্থাপনের সিদ্ধান্ত করা হয়। পরিশেষে ইহা ব্যাণ্ডেলে স্থাপন করা হইবে বলিয়া স্থির হয় এবং পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী প্রফুল্লচন্দ্র সেন কেন্দ্রের নিকট হইতে এই মর্মে একটি মৌখিক আশ্বাসও পান। মৌখিক আশ্বাস পাইয়া প্রফুল্লবাবুর নিশ্চিন্ত হইয়া বসিয়া থাকা ঠিক হয় নাই, কারণ কেন্দ্রীয় কর্তাব্যক্তিরা প্রতিনিয়ত লক্ষ লক্ষ কথা বলেন, সেই জন্য কখন কাহাকে কি বলেন, কি প্রতিশ্রুতি দেন, তাহা তাঁহাদের বিরাট মস্তিষ্কেও ধরিয়া রাখা সম্ভব হয় না।

পরে কেন্দ্রীয় সরকার ব্যাণ্ডেলে রেলযোগে কয়লা সরবরাহের অসুবিধার অজুহাত দেখাইলে রাজ্যসরকার দুর্গাপুর হইতে ডি-ভি-সি খাল দিয়া নৌকাযোগে ব্যাণ্ডেলে কয়লা সরবরাহের সিদ্ধান্ত করেন। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার দুর্গাপুরের উন্নত ধরণের কয়লা বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য ব্যবহার করিতে দিতে রাজী হন না। রাজ্য সরকার তখন কলিকাতা

ইলেকট্রিক সাপ্লাই কর্পোরেশনকে বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য যে কয়লা সরবরাহ করা হয় তাহা ব্যাণ্ডেলে ব্যবহার করিয়া কলিকাতায় নৌকা-যোগে কয়লা প্রেরণের বিকল্প প্রস্তাব করেন। কিন্তু তথাপি কেন্দ্রীয় সরকার এই বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র ব্যাণ্ডেলে স্থাপন করিতে দিতে রাজী হইতেছেন না। এই মতান্তরের ফলে তৃতীয় পরিকল্পনার দুই বৎসর কাটিয়া গিয়াছে এবং আগামী তিন বৎসরের মধ্যে ইহার নির্ম্মাণ সম্পূর্ণ না হইলে পশ্চিমবঙ্গের শিল্পের প্রসার বিশেষ ভাবে ব্যাহত হইবে বলিয়া আশঙ্কা করা হইতেছে।

চতুর্থ পরিকল্পনাকালে পশ্চিমবঙ্গে অতিরিক্ত ১০৫০ মেগাওয়াট বিদ্যুতের প্রয়োজন হইবে। এই অতিরিক্ত পরিমাণ বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য রাজ্য সরকার যে দুই শত কোটি টাকার প্রাথমিক পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছেন আজ কেন্দ্রীয় সরকার ও পরিকল্পনা কমিশনের সদস্যগণ তাহা নীতিগত ভাবে সমর্থন করিয়াছেন।

কিন্তু নীতিগত ভাবে সমর্থন করার অর্থ এই নয় যে—বাস্তবে তাহা পালন করা হইবে! কেন্দ্রীয় সরকার নীতি-গত ভাবে সমর্থন এবং সঙ্গে সঙ্গে ইহা বহুবার ঘোষণাও করিয়াছেন, করিতেছেন এবং ভবিষ্যতেও করিতে থাকিবেন—যে দেশের প্রত্যেকটি লোককে তাঁহারা সাধারণ ভাবে মানুষের মত সকল সুযোগ দানের সকল ব্যবস্থাই করিবেন। কিন্তু আজ পর্য্যন্ত দেশের শতকরা ৭০ জন মানুষের জন্য তাঁহারা বছরে একখানি বস্ত্র, একবেলা আধ-পেটা অন্ন এবং অসুস্থ হইলে সামান্যতম চিকিৎসার ব্যবস্থাও করিতে পারেন নাই। শিক্ষার কথা না বলাই ভাল। অথচ ব্যাণ্ডেলে বিদ্যুৎ কেন্দ্রের নূতন এই পরি-কল্পনা কেন্দ্র কর্তৃক সমর্থিত হইলে পশ্চিমবঙ্গের, অন্ততঃ কলিকাতা অঞ্চলে আরও ৪.৫ লক্ষ ব্যক্তির রুজিরোজ-গারের সামান্য কিছু সুরাহা হইতে পারিত।

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের নিজেদের তরফ হইতে কয়লা উত্তোলন পরিকল্পনাও বাতিল হইবে—এইরূপ সম্ভাবনা দেখা যাইতেছে। ডাঃ রায় ইহার প্রায় পাকা ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, বাঁচিয়া থাকিলে তিনি অবশ্যই ইহা কার্যে পরিণত করিতেন। কিন্তু বাঙ্গলা ও বাঙ্গালীর দুর্ভাগ্য—ডাঃ রায়ের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই তাঁহার অতি-প্রিয় এবং বাঙ্গলার পক্ষে অতি-প্রয়োজনীয় পরিকল্পনাগুলিরও অকাল মৃত্যুর সকল ব্যবস্থাই হইতেছে। সত্য-মিথ্যা বলা শক্ত, ব্যাণ্ডেল পরিকল্পনা ভণ্ডুল করিবার ব্যাপারে ডি, ভি, সি'র অবাঙ্গালী কর্ত্তাদের গোপন হস্ত নাকি বিশেষ ভাবে কাজ করিয়াছে। ডি, ভি, সি'র পক্ষে পশ্চিমবঙ্গের নূতন বৈদ্যুতিক উৎপাদন কেন্দ্র ব্যাণ্ডেলে স্থাপিত হইলে, তাহার কর্তৃত্ব থাকিবে প্রাদেশিক সরকারের হাতে—ইহা ডি, ভি, সি'র কাম্য নহে। পরের ধনে পোদ্দারীর পূর্ণ অধিকার থাকা চাই ডি, ভি, সি'র হাতে এবং যাহার ফলে অন্য একটি রাজ্য সকল সুবিধা ভোগ করিবে—পশ্চিমবঙ্গের অবশ্য-প্রয়োজনীয় বৈদ্যুতিক চাহিদার সবিশেষ সঙ্কোচ সাধন করিয়া। অথচ ডি, ভি, সি'র, খরচ বাবদ পশ্চিমবঙ্গকে দিতে হইবে শতকরা প্রায় ৬৫৲ টাকা! নিজের টাকা খরচ করিয়া কেহ বা কোন প্রদেশ যদি স্বাবলম্বী হইবার প্রয়াস পায়, তাহাতে বাধা আসে কি কারণে, তাহার একটি মাত্র অর্থই আমরা করিতে পারি এবং এই কারণ আর কিছুই নহে—সর্ব্বপ্রকারে দুর্গত, ভাগ্যহত পশ্চিম বাঙ্গলা এবং বাঙ্গালীর প্রতি কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষের বিষম প্রেম!

আন্দামানে বাঙ্গালীদের সেই একই অবস্থা

একটি সংবাদে জানা গেল যে আন্দামানে বাঙ্গালী অধিবাসীদের শিক্ষার ব্যাপারে কর্তৃপক্ষের বিমাতাসুলভ ব্যবহার ব্যবস্থার সম্মুখীন হইতে হইয়াছে। এই দ্বীপে সকল শ্রেণীর অধিবাসীদের সকল ক্ষেত্রে এবং স্তরে শিক্ষাদান ব্যবস্থা বিনামূল্যে হইয়া থাকে।

বাঙ্গালী ছাত্রছাত্রীদের নিম্ন প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিতে পঞ্চম শ্রেণী পর্য্যন্ত মাতৃভাষায় শিক্ষাদানের ব্যবস্থা আছে। কিন্তু তাহার পর, ৬ষ্ঠ শ্রেণী হইতে দশম শ্রেণী পর্য্যন্ত সকলকেই হিন্দীতে পড়াশুনা করিতে হইবে।

আন্দামানের রাজধানী পোর্ট ব্লেয়ারে অন্ততপক্ষে ছয়টি নিম্ন প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষার মাধ্যম একমাত্র হিন্দী। 'প্রাদেশিক' অপরাধে অপরাধী বলিয়া অভিহিত হইবার ভয়ে আন্দামানের বাঙ্গালী অধিবাসীরা নিজেদের দাবী লইয়া কর্তৃপক্ষের নিকট আবেদন-নিবেদন করিতে সঙ্কোচ বোধ করিতেছেন।

পাহাড়প্রমাণ বাধার সম্মুখীন হইয়াও পোর্ট ব্লেয়ারের বাঙ্গালী অধিবাসীরা বহুকষ্ট করিয়া রবীন্দ্রনাথের নামে একটি বাঙ্গলা বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছেন। কিন্তু দুঃখের কথা এই বিদ্যালয়টিকে পাকাপাকি ভাবে স্থাপন করিবার জন্য কোন জমি কর্তৃপক্ষ এখনও দেন নাই, বাঙ্গালীদের বহু আবেদন-নিবেদন সত্ত্বেও। অথচ অন্যদিকে হিন্দী কলাপরিষদ এবং তামিল-সঙ্ঘ তাঁহাদের বিদ্যালয়ের জন্য যথাক্রমে চার এবং দুই বিঘা জমি কর্তৃপক্ষের নিকট হইতে অতি সহজেই পুরস্কার পাইয়াছেন।

বাঙ্গালী অধিবাসীরা বহুকষ্টে এবং প্রচুর শ্রমের ফলে যে রবীন্দ্র বিদ্যালয়টি স্থাপন করিয়াছেন, আন্দামান সরকার যদি তাহার জন্য একখণ্ড জমি দান করিতেও

কার্পণ্য করেন এবং অচিরে দান না করেন, তাহা হইলে এই বাঙ্গলা বিদ্যালয়টি অঙ্কুরেই পঞ্চত্বপ্রাপ্ত হইবে। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা প্রয়োজন—আন্দামানে সাধারণ বাঙ্গালী ছাড়াও প্রায় ৬,০০০ বাঙ্গালী উদ্বাস্তু পরিবার আছেন। এই সকল পরিবারের মোট ছেলেমেয়ের সংখ্যা বেশ কিছু হইবে।

আন্দামানেও দেখা যাইতেছে—এক শ্রেণীর কেন্দ্রীয় অবাঙ্গালী অফিসারের পূর্ণ রাজত্ব! ইহাদের প্রকাশ্য প্রয়াস জোর করিয়া হিন্দীর প্রচলন সকল শ্রেণীর মানুষের উপর গোপন চাপের দ্বারা! কেন্দ্রীয় সরকারের তরফ হইতে ঘোষণা করা হইয়াছে বহুবার যে, জোর করিয়া কাহারও উপর হিন্দী চাপানো হইবে না। অথচ আন্দামানে এই ঘোষণার ব্যতিক্রম কেন—কাহার হুকুমে? সর্ব্বহারা চরম-দুর্গত বাঙ্গালী উদ্বাস্তু বালক-বালিকাদের মাতৃভাষার স্নেহাঞ্চল হইতেও উদ্বাস্তু করার এমন নির্ম্মম এবং অমানুষিক পরিকল্পনা অযথা পরম এক অকল্যাণের সৃষ্টি করিতে বাধ্য।

বিনোবা ভাবের ভাবনা

একটি সংবাদে প্রকাশ যে, মালারপুর গ্রামে আচার্য্য বিনোবা ভাবের সঙ্গে আলোচনা শেষ করিয়া পশ্চিমবঙ্গ কম্যুনিষ্ট পার্টির সাধারণ সম্পাদক শ্রীভবানী সেন এবং বিধানসভা দলের নেতা শ্রীসোমনাথ লাহিড়ী (কিছুদিন পূর্ব্বে) কলিকাতায় ফিরিয়াছেন। কম্যুনিষ্ট পার্টি মহলের সংবাদ "আচার্য্য ভাবের বক্তব্য দলের নেতাদের কাছে সন্তোষজনক মনে হইয়াছে।"

এই সম্পর্কে সর্ব্বোদয় প্রেস সার্ভিস জানাইতেছে: আচার্য্য ভাবের সঙ্গে সাক্ষাতের পর শ্রীভবানী সেন বলেন, "গ্রামদান এবং কমিউন আন্দোলনের মধ্যে একটা সাদৃশ্য আছে। তিনি আরও জানান, গ্রামদান প্রতিরক্ষা ব্যবস্থারই অঙ্গ।"

কলিকাতায় জানা গেল, গ্রামদান আন্দোলনে আচার্য্যজীর সঙ্গে সক্রিয় সহযোগিতার কথাও কম্যুনিষ্ট পার্টি চিন্তা করিতেছে।

দেশের অবস্থা যখন ছিল স্বাভাবিক—চীনারা যখন ভারত আক্রমণ করে নাই, তখন বিনোবাজীর আবোল-তাবোল বুকনিতে দেশবাসী কান দিক্ বা না দিক্—কেহই ইহা লইয়া মাথা ঘামায় নাই। কিন্তু দেশের এই আপৎকালে বিনোবা ভাবে যে ভাবে ভাবিতেছেন তাহাতে দেশবাসীকেও বেশ ভাবাইয়া তুলিয়াছেন। এই ২ নং মহাত্মা বোধ হয় মনে করিয়াছেন তিনি যাহা খুশি বকিয়া যাইবেন এবং দেশবাসী 'অগো' বলিয়া তাহা আচার্য্যবাণী বলিয়া নতমস্তকে শ্রবণ এবং স্বীকার করিয়া লইবে। সর্ব্বোদয়—সোল এজেন্ট বিনোবা সাধু (সাধু এখানে বনিক অর্থে ব্যবহৃত হইল) তাঁহার পসরাতে কি পণ্য ফিরি করিতেছেন, তাহা ক্রমে ক্রমে স্পষ্ট এবং প্রকট হইতেছে। সমগ্র ভারত যখন কম্যুদের, সমাজ এবং দেশের সর্ব্বক্ষেত্র হইতে তাড়াইতে বদ্ধপরিকর, ঠিক সেই সময়টিতে সাধুমহারাজ কম্যুদের কেবল সহযাত্রী না, কোল দিবার জন্য পরম ব্যগ্র হইয়া উঠিলেন!

মধ্যপ্রদেশের নরঘাতক, নারীধর্ষক দস্যুদের 'অন্তর' পরিবর্ত্তন করিয়া—ঘৃণ্য ডাকাতদের সাধু করিবার ব্রতে পরম সার্থকতা অর্জ্জন করিয়া এবার তিনি দেশদ্রোহী কম্যুনিষ্টদের পরম দেশভক্ত বানাইয়া দিবার ব্রত গ্রহণ করিয়াছেন!

বিনোবাজীর প্রদত্ত নব-আলোকে আলোকিত হইয়া বাঙ্গলার দেশদ্রোহী চীনপ্রেমী কম্যুদের দিব্যদৃষ্টি লাভ হইয়াছে। কম্যুরা এখন বলিতেছে, কম্যুনিজম্ এবং সাধুমহারাজের গ্রামদানে 'কমন গ্রাউণ্ড' বা প্ল্যাটফর্ম পাওয়া গিয়াছে! এ বিষয় আমরা এখন ভীষণ ভাবে ভাবেজীর ব্যাখ্যার অপেক্ষায় রহিয়াছি।

চীন-ভারত যুদ্ধ সম্পর্কে আমরা সাধুমহারাজের বিচিত্র অভিনব ব্যাখ্যার কথা শুনিয়াছি। এই ব্যাখ্যায় আমরা চমৎকৃত, অভিভূত হইয়াছি। উঁহাই বুঝিয়াছি যে, চীনের সঙ্গে অযথা কলহ করিবার কোন কারণ নাই। ব্যাপারটার মীমাংসা সহজেই হইতে পারে।—অবশ্যই পারে, যদি বিনোবা ভাবে মহারাজকে সীমান্ত অঞ্চলে 'ভূ এবং গ্রামদান' প্রচারে ব্লাঙ্ক-চেক্ দিয়া প্রেরণ করা হয়।

কম্যুদের সহিত ভাবেজীর হঠাৎ প্রেম দেখিয়া মনে হইতেছে চম্বলের দস্যুদের সদাশয় করিতে গিয়া তাঁহার যে-বিষম শিক্ষালাভ হয়, তাহা তিনি ভুলিয়া গিয়াছেন। যে রোজা ঢোঁড়া সাপ ধরিতে ব্যর্থকাম হন, সেই রোজাই আজ কম্যু-কেউটে ধরিয়া পোষ মানাইবার প্রয়াস পাইতেছেন!

চীনাদের সম্পর্কে বিনোবাজীর সাম্প্রতিক একটি উক্তি এখানে উল্লেখ করা যায়। সাধু-মহারাজ বলেন—ভো ভো ভারতবাসী! "চিন্তা করিয়া দেখ, বিজয়ী চীনাবাহিনী অস্ত্রত্যাগ করিয়া পিছনে সরিয়া গিয়াছে—এমন ব্যাপার ইতিহাসে কেহ কখন দেখিয়াছে কি?" ভাবেজীর ভাবনাতে ভাবিয়া দেখিলে আমাদের মনে হইবে যে দস্যু চীনারা যদি ইচ্ছা করিত, তাহা

হইলে তাহারা অক্লেশে কেবল তেজপুর নহে, গোটা আসাম প্রদেশটাই দখল করিতে পারিত। কিন্তু চীনারা তাহা করে নাই এবং ইহা না-করার মধ্যেই তাহাদের জাতীয় মহত্ত্ব, এবং দেবত্ব প্রকট হইয়াছে! ভাবেজী এমন কথাও বাঙ্গলা দেশের বুকের উপর বসিয়া বলিতে সাহস করিয়াছেন—"ভারত চীনের কাছে অহিংসা ও প্রেম ও ভ্রাতৃত্বের পাঠ গ্রহণ করিতে পারে!"

দেশের কথা ভাবিতে ভাবিতে ভাবেজীর ভাবনা ভাবাবেগ আজ পথ ভুল করিয়া অতলে তলাইয়া গিয়াছে, তাহা না হইলে দেশের পরম আপৎকালে এমন অভাবনীয় ভাবে বাণী নির্গত হইত না। বিনোবাজী যত ইচ্ছা ভাবুন, যাহা ইচ্ছা বলুন—কিন্তু বাঙ্গলা দেশের বুকের উপর বসিয়া এই সব বুজরুকি কেন? কম্যুদের সঙ্গে এই সঙ্কটকালে মিতালী করার একমাত্র অর্থ এই হইবে যে, যাহারা আজ হালে পানি না পাইয়া হাবুডুবু খাইতেছে—সেই বিশ্বাসঘাতক দেশদ্রোহী কম্যুদের—সমাজ-জীবনের সর্বাত্মক ক্ষতিসাধন করিয়া—আবার পুনর্ব্বসতি দান করা! আর এই পুনর্ব্বাসনের ফল হইবে—দেশ যখন চীনাদের সহিত যুদ্ধ করিয়া বিপদ্‌মুক্ত হইতে প্রাণপণ করিতেছে ঠিক সেই সন্ধিক্ষণে দেশের সর্ব্বাত্মক প্রতিরক্ষা প্রচেষ্টায় ফাটল ধরানো। ভাবেজীর ভাবে বিভোর হইয়া কম্যুর দল তাঁহার সঙ্গে গ্রামাঞ্চলে ভ্রমণ করিবার স্বর্ণ সুযোগ ষোল আনা কাজে লাগাইবে। ভাবেজীর চীনাপ্রেমের উক্তি তাহারা আবার প্রকট-প্রকাশ্যভাবে সরল গ্রামবাসীদের মনে চীনা-প্রেমের বিষাক্ত বীজ বপন করিতে উদ্যোগী হইবে।

সাধু বিনোবা মহারাজ বাঙ্গলা দেশে বসিয়া দেশবাসীর রাজকীয় সম্মান এবং আরাম বিলাস লাভ করিয়া আজকাল যাহা করিতেছেন, যে সব কথা বলিতেছেন, তাহা কোন সাধারণ লোক করিলে এবং বলিলে তাহাকে দেশদ্রোহীতার অপরাধে অভিযুক্ত হইতে হইত। রাজ্য সরকার অবহিত হউন। হয় ভাবেজীকে এই রাজ্য হইতে অপসৃত করুন আর না হয় তাঁহাকে প্রথম শ্রেণীর আরামপ্রদ নির্জ্জন কারাকক্ষে অবরুদ্ধ করিয়া পরকালের ভাবনা ভাবিবার অবকাশ দান করুন! বর্ত্তমানের ভাবনা দেশবাসীর উপরেই দয়া করিয়া ছাড়িয়া দিন।

আবার কলিকাতা পৌরসভা

দেশবন্ধু দাশ এবং নেতাজীর আমলে প্রবর্ত্তিত কলিকাতায় দরিদ্র শিশু ও বালকবালিকাদের অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষাদানের ভার কলিকাতা পৌরসভা কর্ত্তৃক গৃহীত হয়। হঠাৎ জানা গেল, কলিকাতা কর্পোরেশন এই দায়িত্ব হইতে মুক্তি পাইবার জন্য রাজ্য সরকারকে নোটিশ দিয়াছে। পৌরসভার বর্ত্তমান মালিকগোষ্ঠী বলিতেছেন, তাঁহাদের পক্ষে কলিকাতার দরিদ্র করদাতাদের শিশু এবং বালকবালিকাদের অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষাদান করদাতাদের অর্থে আর সম্ভব নয়। কারণ নাকি বিষম অর্থাভাব। মনে হয় টাকাটা যেন তাঁহাদের পৈতৃক জমিদারী হইতে আসে, এবং টাকার অভাবটা যে কি ভয়ানক, তাহা প্রমাণ করিবার জন্য পৌরপিতারা নিজেদের সাঙ্ঘাতিক কর্ম্মকুশলতার একটা লিষ্টও দিতে লজ্জাবোধ করেন নাই। কর্পোরেশনের বিরুদ্ধে করদাতাদের নিত্যনব হাজার হাজার অভিযোগই প্রমাণ করিতেছে, কর্ত্তব্যপালনে পৌরপিতারা কি-প্রমাণ সাফল্য অর্জ্জন করিয়াছেন—সঙ্গে সঙ্গে সুনামও!

কর্ত্তব্যনিষ্ঠ কলিকাতা কর্পোরেশন শহরের পথ-ঘাট হইতে জঞ্জাল সাফ করিতে পারিবেন না। করদাতাদের প্রয়োজনীয় পানীয় জল দিতে পারিবেন না। শহরে কলেরা বসন্ত প্রভৃতি মহামারী এবং অন্যান্য সংক্রামক রোগের দমন ব্যবস্থাও করিতে অপারগ। রাস্তাঘাট মেরামত করিবার দিকে দৃষ্টি দিবার তাঁহাদের সময় নাই। বেপরোয়া এবং অননুমোদিত বিরাট বিরাট প্রাসাদ নির্ম্মাণ বন্ধ করিতে তাঁহারা ব্যর্থকাম হইয়াছেন। অবশ্য মধ্যবিত্ত এবং দরিদ্রজনের বেলায় কর্পোরেশনের নির্ম্মাণ বিভাগ অতি তৎপর। কর্ম্মচারীদের নিয়মানুগ করিয়া কর্পোরেশনের কোন কাজের কোন সুরাহা করিতে পৌরপিতারা অপারগ! সাধারণ পার্কে জবরদখল বন্ধ করিয়া যাহারা এই সব পার্কে নিজেদের খেয়াল-খুশিমত পাকা বাড়ী, মন্দির প্রভৃতি নির্ম্মাণ করিতেছে, আইনগত ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও গোপন কারণ বশতঃ এই সব অনাচারের কোন প্রতিকার করিতে পারেন না।

গত কিছু কাল হইতে কলিকাতা পৌরসভার কাউন্সিলারদের একমাত্র অতি-প্রয়োজনীয় কর্ত্তব্য হইয়াছে—কেমন করিয়া কি ভাবে বর্ত্তমান কমিশনারকে জব্দ করা এবং তাঁহাকে কর্পোরেশন হইতে তাড়ানো যায়। কমিশনারের বিষম অপরাধ, তিনি অকর্ম্মণ্য এবং অনাচারী পৌরপিতাদের তোয়াক্কা না করিয়া কলিকাতা কর্পোরেশনকে কলঙ্কমুক্ত করিতে চাহিতেছেন। কয়েক দিন পূর্ব্বে পৌরপিতারা কমিশনারের বিরুদ্ধে বিষোদ্গার

করিয়াছেন। মনে হয়, কমিশনারকে অপসারণ করিবার উদ্দেশ্যে ইহাই প্রথম উদ্যোগ।

কংগ্রেসী রাজ্য সরকার কমিশনার নিয়োগ করিয়াছেন, অথচ একজন কংগ্রেসী কাউন্সিলার (কর্পোরেশনে কংগ্রেসীদলের সেক্রেটারী) রাজ্য সরকারের নিকট এক প্রস্তাব পেশ করিয়াছেন কমিশনারকে সরাইয়া লইবার জন্য। সুখের কথা, কমিশনার মিঃ এস, বি, রায় ইহাতেও সঙ্কল্পচ্যুত হন নাই—এবং কাউন্সিলারদের অভদ্রজনোচিত ইতর কুৎসা গালাগালির কোন জবাব দেওয়াও প্রয়োজন মনে করেন নাই। মিঃ রায়ের এই সংযত ভদ্র ব্যবহার অনাচারী অভদ্র কাউন্সিলারদের আরও ক্ষিপ্ত করিয়া তুলিয়াছে।

কমিশনার মহাশয় কাউন্সিলারদের (সবাই নহে) বে-আইনী আব্দার এবং অনুরোধ রক্ষা না করিয়া আইন-সঙ্গত ভাবে সব কাজ করিতে চেষ্টা পাইতেছেন—একদল কাউন্সিলার, স্বার্থে ঘা লাগাতে, এখন কমিশনারকে কামড়াইবার জন্য তাঁহাদের বিষ দাঁতে শান্ দিতেছেন। ইহা সত্ত্বেও কমিশনার মহাশয় জলাতঙ্ক রোগের ঝুঁকি লইতে প্রস্তুত হইয়াছেন।

বর্ত্তমান কাউন্সিলারদের অনাচারের ফলে কলিকাতা শহর আজ কেবল ভারতে নহে, পৃথিবীর সর্ব্বত্র সর্ব্বাপেক্ষা কুৎসিত ও অপরিচ্ছন্ন শহর বলিয়া খ্যাতিলাভ করিয়াছে! একদিন যে শহর ছিল প্রাচ্যের গৌরব, বর্ত্তমান অনাচারী কাউন্সিলাররা সেই একদা সুখ্যাত নগরকে মৃত, পোড়ো এবং জঘন্যতম নোংরা নগরে পরিণত করিয়াছেন।

কলিকাতা কর্পোরেশনের কাউন্সিলারদের শাসন-গুণে সর্ব্বস্তরে ঘুষের রাজত্ব কায়েম হইয়াছে—গোপন ব্যবস্থা এবং তদ্বিরের কল্যাণে কাউন্সিলারদের ঘৃণ্যতম অনাচার আজ পরম শুদ্ধাচার বলিয়া ঘোষিত হইতেছে। দুর্নীতি এবং পাপের 'সহাবস্থান' কর্পোরেশনে চরম সার্থকতা লাভ করিয়াছে।

কর্পোরেশন সম্পর্কে রাজ্য সরকারের অপূর্ব্ব নিষ্ক্রিয়তা তথা নির্বিকার ভাব দেখিয়া আমরা আতঙ্কিত বোধ করিতেছি। রাজ্য সরকার কংগ্রেসীদের করতলগত, কলিকাতা কর্পোরেশনও তাহাই—একমাত্র এই কারণেই কি বর্ত্তমান কর্পোরেশনকে বাতিল করিয়া কাউন্সিলার-দের বিরুদ্ধে চার্জ্জ শীট ইস্যু করিতে রাজ্য সরকার এত দ্বিধা বোধ করিতেছেন? বঙ্গীয় কংগ্রেসের 'সর্ব্বাধি-নায়ক' শ্রীল শ্রীযুক্ত অতুল্য ঘোষ মহাশয় আজ দেশের লোককে নানা প্রকার অমূল্য উপদেশামৃত বিনামূল্যে বিতরণ করিতেছেন। গুরুভক্তা দেশে ঘোষ মহাশয় আজ গুরুমহারাজ হইয়াছেন। কিন্তু অতুল্যবাবু তাঁহার তাঁবে কর্পোরেশনের অনাচার এবং পাপের রাজত্ব অবসানের জন্য তাঁহার কনিষ্ঠ অঙ্গুলীটিও সঞ্চালন করিতেছেন না কেন? কংগ্রেসের কলঙ্ক গোপন রাখিবার জন্যই কি এই নীরবতা? কিন্তু কলিকাতা কর্পোরেশনের কলঙ্ক আজ বিশ্ববিদিত।

আসন্ন সর্ব্বনাশ!

কলিকাতার ভূগর্ভস্থিত নালা-নর্দ্দমাগুলির সঙ্গীন অবস্থা যাহা বুঝা যাইতেছে—তাহাতে যে-কোন সময় সমগ্র সহরের পয়ঃপ্রণালী ব্যবস্থা অচল (choked) হইবার সম্ভাবনা বিদ্যমান। কয়েকদিন পূর্ব্বে কলিকাতার এক-স্থানে পয়ঃপ্রণালীর অভ্যন্তরে গ্যাস জমিবার ফলে এবং ঐ গ্যাসের প্রবল চাপে একটি ম্যানহোলের কয়েক মণ ভারী লোহার ঢাকনা প্রায় ৬।৭ ফুট উপরে নিক্ষিপ্ত হয়। সৌভাগ্যের বিষয় কেহ হতাহত হয় নাই। কিন্তু এই ঘটনা ভাবী বিপদের পূর্ব্ব সঙ্কেত।

ভূগর্ভস্থিত পয়ঃপ্রণালীগুলিতে বছরের পর বছর জঞ্জাল সঞ্চিত হইয়া উহা প্রায় বন্ধ হইবার মত বিপজ্জনক অবস্থায় আসিয়াছে। একদিন হঠাৎ দেখা যাইবে—পয়ঃপ্রণালীর সঞ্চিত ও বিষাক্ত গ্যাসের বিষম চাপে কর্পোরেশনের সারা বাড়ীটি সমেত শহরের আরও বহু কিছু আকাশে উঠিয়া যাইবে! জীবনহানি যে কত হইতে পারে, তাহার সংখ্যা সহজে অনুমেয়! কিন্তু এই বিষম বিপদের মুখে বসিয়াও, গৌরাসেনের পিতার অর্থশ্রাদ্ধকারী কাউন্সিলারবৃন্দ পরমানন্দে নিজ নিজ এবং দলগত স্বার্থ রক্ষার কারণে ইতর কোঁদলে কালক্ষেপ করিতেছেন। যে করদাতাদের করুণা ভোটের কল্যাণে ইঁহারা কাউন্সিলার হইয়াছেন, সেই করদাতাদের সামান্যতম স্বার্থও আজ পৌরসভায় রক্ষিত হইতেছে না। করদাতারা আর কতকাল এই ক্লীব কাউন্সিলারদের কদাচার করুণ অসহায় ভাবে অবহেলা করিবেন—জানি না! কিন্তু আমাদের মতে শহরের সকল জঞ্জাল এবং পয়ঃপ্রণালীর ময়লা সাফ করিবার পূর্ব্বে সর্ব্বপ্রথম এই কাউন্সিলাররূপী জঘন্যতম এবং পরম বিষাক্ত জঞ্জালগুলিকে সরান দরকার। এই আসল জঞ্জাল বিদূরিত হইলেই অন্যবিধ সর্ব্বপ্রকার আবর্জ্জনা অচিরে অন্তর্হিত হইবে। শহরের পয়ঃপ্রণালীর জঞ্জাল বাহির হইবার পথ-মুখ (outlet) এই লজ্জাহীন পৌর পিতারাই অবরোধ করিয়া বসিয়া আছেন! কলিকাতা তথা কলিকাতাবাসীদের রক্ষা করিতে হইলে রাজ্য সরকারের আজ প্রধান কর্ত্তব্য, বিশেষতঃ বর্ত্তমান

লইয়া যাইবার অপচেষ্টা পরিত্যাগ করিলে ভাল হয়—বিশেষতঃ এ-কাজটা যখন গরীব করদাতাদের পয়সায় হইতেছে।

তারপর—পল্লীমঙ্গল আসর

গতবারে বলিয়াছি—ইহা ভাঁড়ামোর মজলিস। আসর সুরু হয় ঢোল গোবিন্দ, ঘাসীনাথ, ভ্যাবাকান্ত, মঙ্গলচণ্ডী এবং 'গাঁয়ে মানে না আপনি' মোড়লের এক-ঘেয়ে ভাঁড়ামোর দ্বারা। আসরের সূচনা প্রত্যহ একইভাবে, একই ভাঁড়ামো এবং তথাকথিত রসালাপের দ্বারা! বিজ্ঞপ্রবর মোড়লের বিরক্তিকর মোড়লী এবং কথায় কথায় "কি গো" "না গো" "হ্যাঁ গো" প্রভৃতি স্ত্রীসুলভ সম্বোধন কর্ণপটাহে পেরেক ঠোকার মত লাগে!

এই আসরে কি নাই? কলিকাতা বেতারকেন্দ্রের প্রায় সব কয়টি অনুষ্ঠানের সব কিছুই এই আসরে পাওয়া যাইবে—আবহাওয়ার খবর, নাটক, গল্প-কবিতা পাঠ, 'কথিকা', মহিলাদের আসর। এমন কি বালক-বালিকাদের আসর পর্য্যন্ত এখানে আছে। আমাদের মনে হয়, কলিকাতা বেতারে এই সব অনুষ্ঠান আর আলাদা ভাবে না করিয়া এই পল্লীমঙ্গল আসরটি সকাল হইতে রাত্রি পর্য্যন্ত বিস্তারিত করিয়া দিলেই কাজ চলিবে। তাহা ছাড়া এই এক এবং অদ্বিতীয় পরম বিজ্ঞ মোড়লই বেতারের সর্ব্বাত্মক পরিচালনার ভার গ্রহণ করিয়া মনের আনন্দে তাঁহার মোসাহেবদের লইয়া দিনাতিপাত করিতে পারিবেন।

মজদুর মণ্ডলীর আসরে উপকার হয়ত অনেকেরই হয়, কেবলমাত্র মজদুরদের ছাড়া, কারণ দেশের মজদুরদের শতকরা ৯৯ জন মজদুর ইহা শ্রবণ করে না। যদি কেহ করে, সে কিছু বুঝিতে পারে কি না সন্দেহ, কারণ, মজদুরদের বিদ্যাবুদ্ধি আসর-পরিচালকের মত এত পরিপক্কতা এখনও লাভ করে নাই। বেতার শ্রবণ করিবার সময়ও তাহাদের নাই বলিলেও চলে। পল্লী-মঙ্গল আসর সম্পর্কে একই কথা প্রযোজ্য। ভাঁড়ামো এবং ন্যাকামো দিনের পর দিন কাহারও ভাল লাগে না। চাষীদের যে-সব বিষয়ে পরামর্শ-উপদেশাদি বিতরণ করা হয়—তাহা কোন চাষী শ্রবণ করে না, করিলেও বুঝিবে না।

মজদুর মণ্ডলীর এবং পল্লীমঙ্গল আসরের যথাক্রমে পরিচালক এবং মোড়ল সপ্তাহে একদিন শ্রোতাদের চিঠিপত্রের জবাব দিয়া থাকেন। শতকরা প্রায় ৯৯টি চিঠির বক্তব্য হুবহু একই—যথা: "আসরের আলাপ-আলোচনা শুনিয়া আমরা কত যে আনন্দ পাই, কত যে মহা উপদেশ লাভ করি এবং সে-উপদেশে আমাদের কি বিষম উপকার হয় তাহা বলা যায় না। প্রত্যহ আসর শুনিবার জন্য দলে দলে শ্রোতা আমাদের বাড়ীতে বহু আগে থেকেই জমায়েত হন। আপনাদের আমরা ধন্যবাদ, কৃতজ্ঞতা জানাই।"—প্রতিটি চিঠিতে নাকি প্রায় এই অমৃত বার্ত্তাই থাকে—এবং পত্রগুলি পাঠ করিয়া পরিচালক এবং মোড়ল হেঁ হেঁ করিয়া বলেন, "আপনার চিঠি পড়ে যথেষ্ট উৎসাহ আর আনন্দ পেলাম। আপনাদের ধন্যবাদ জানাই" ইত্যাদি, ইত্যাদি পরম বিনয় বাক্য!

পল্লীমঙ্গল আসরের পরমপণ্ডিত এবং সর্ববিদ্যা-বিশারদ মোড়ল মহাশয়ের "কথিকা" এবং তাঁহারই রচিত বিচিত্র বীভৎস রসপূর্ণ নাটকও প্রায়ই অভিনীত হয়, স্বয়ং নাট্যকার স্বরচিত নাটকের প্রযোজক এবং প্রধান চরিত্রেও অবতরণ করেন। এদিক্ দিয়া তাঁহাকে অদ্বিতীয় জিনিয়াস্ বা প্রতিভাধর বলা যাইতে পারে। শ্রোতাদের দুর্ভাগ্য একাধারে এই নাট্যকার প্রযোজক অভিনেতাকে প্রকাশ্য ষ্টেজে দেখা যায় না। দেখা গেলে তাঁহার অভিনন্দন কি হইত, কি ভাবে এবং কি দিয়া হইত—তাহা সহজে অনুমেয়!

এবারের মত ইহাই যথেষ্ট। বারান্তরে আরো বিশদভাবে আলোচিত দুইটি আসর এবং অন্যান্য কয়েকটি বিষয় লইয়া কিছু বলিবার ইচ্ছা রহিল।

পয়সা খরচ করিয়া লোকে কলিকাতা বেতারকেন্দ্রের এ-অত্যাচার কতদিন ভদ্রভাবে সহ্য করিবে জানি না। এই ভাবে চলিতে থাকিলে অহিংস শ্রোতারা হয়ত হঠাৎ একদিন হিংস্র হইয়া উঠিবে!

কবি

কারেল চাপেক

মিলাডা ও মোহনলাল গঙ্গোপাধ্যায় কর্তৃক
মূল চেক হইতে অনুদিত

পুলিশ-সংক্রান্ত এক নিত্য ঘটনা।

ভোর চারটের একটু পরে জিতনা ষ্ট্রীটে একখানা মোটর গাড়ী এক মাতাল বুড়ীকে চাপা দিয়ে সবেগে পালিয়ে যায়। আর পুলিশের তরুণ কর্মচারী ডাক্তার মেজ্‌লিকের উপর ভার পড়ে গাড়িখানাকে খুঁজে বার করার। মেজ্‌লিক কাজটা বেশ ভাল ক'রে করবেন ব'লে সম্পূর্ণ দায়িত্ব নিজের উপর নিলেন।

১৪১ নং পাহারাওয়ালার সঙ্গে তাঁর কথাবার্তা চলছিল এই রকম। ডাক্তার মেজ্‌লিক বললেন—বেশ, তুমি তা হ'লে যেখানে দাঁড়িয়ে ছিলে তার তিন-শো গজ দূরে এক ছুটন্ত গাড়ি আর এক ভূলুণ্ঠিত দেহ দেখতে পেয়েছিলে—এই ত? প্রথমে তুমি কি করলে?

পাহারাওয়ালা উত্তর করল—আমি তখনই দৌড়লাম চাপা-পড়া মহিলাকে প্রাথমিক চিকিৎসা দেওয়ার ব্যবস্থা করতে!

মেজ্‌লিক বিরক্ত হয়ে বললেন—গাড়ির নম্বরটা আগে লিখে নিয়ে তার পর সেই বুড়ীর যত্ন করলেই ত হ'ত।

তার পর একটু থেমে পেন্সিল দিয়ে নিজের মাথা আঁচড়াতে আঁচড়াতে বললেন—আমি হ'লে বোধহয় তাই করতাম। যাই হোক্, তুমি তা হ'লে গাড়ির নম্বরটা দেখ নি। বেশ, গাড়িটা কি রং-এর?

১৪১ নং পাহারাওয়ালা থতমত খেয়ে বললে—আমার মনে হয় কোন গাঢ় রং-এর। দাঁড়ান, নীল বা লাল হ'তে পারে। গাড়ির ধোঁয়ায় ভাল ক'রে দেখাই গেল না।

মেজ্‌লিক মাথায় হাত দিয়ে পড়লেন। কাঁদ কাঁদ হয়ে বললেন—হায় ভগবান্! গাড়িটা খুঁজে পাই কি ক'রে এখন? দেশের যত ড্রাইভার তাঁদের প্রত্যেককে থামিয়ে জিজ্ঞেস করতে হবে নাকি—ও মশায়, আপনি কোনও বুড়ীকে চাপা দিয়েছেন? বলুন না, দয়া ক'রে! হায়! হায়! কি করি এখন!

পুলিশ কর্মচারীর এই অসহায় অবস্থা নিরীক্ষণ ক'রে পাহারাওয়ালা খানিকক্ষণ মাথা নাড়ল, তার পর বললে—সাক্ষ্য দেবার জন্য একটি লোক এসেছেন, কিন্তু তিনিও কিছু জানেন না। তিনি হুজুর পাশের ঘরে আছেন।

মেজ্‌লিক বিরক্ত মুখে বললেন—বেশ, তাকে নিয়ে এস। ব'লে একটা পাতলা নথী ঘেঁটে কি যেন খুঁজে বার করবার বৃথা চেষ্টা করতে লাগলেন। তার পর তিনি অভ্যাস মত সুরু করলেন—বলুন, আপনার নাম আর ধাম। সাক্ষীর দিকে একবার ফিরেও তাকালেন না।

সাক্ষী দৃঢ়কণ্ঠে উত্তর দিলেন—ইয়ান ক্রালিক। টেকনিক্যাল স্কুলের ছাত্র।

—আজ ভোর চারটের পর একখানা অজানা গাড়ি বোজেনা মাখাচকোভাকে কেমন ক'রে চাপা দিল আপনি দেখেছেন?

—দেখেছি। ড্রাইভারই যে দায়ী তাতে সন্দেহ নেই। রাস্তা একেবারে ফাঁকা ছিল কমিশনার সাহেব। গাড়ির বেগ একটু কমিয়ে দিলেই—

বাধা দিয়ে মেজ্‌লিক বললেন—কত দূরে দাঁড়িয়ে ছিলেন আপনি?

—বড়জোর দশ পা। আমার এক বন্ধুকে নিয়ে এক কফিখানা থেকে বেরিয়ে হাঁটছিলাম। জিতনা ষ্ট্রীটে পৌঁছলে পর—

মেজ্‌লিক আবার বাধা দিয়ে বললেন—আপনার বন্ধুটি কে? তাঁর সম্বন্ধে এই ফাইলে কিছু দেখছিনে ত?

সাক্ষী একটু গর্বের সঙ্গে জবাব দিলেন—ইয়ারোস্লাভ নেরাদ—কবি। কিন্তু তিনি বোধহয় কিছু বলতে পারবেন না।

—কেন?

—কারণ তিনি—তিনি এমনই কাব্যিক যে, সেই দুর্ঘটনার পর ছোট ছেলের মত কাঁদতে কাঁদতে বাড়ীর দিকে ছুটেছিলেন। যাই হোক্, আমরা জিতনা ষ্ট্রীটে পৌঁছতেই পিছন থেকে উন্মত্ত বেগে একখানা গাড়ি এসে—

—গাড়িটার নম্বর কত?

—তা জানেনে সাহেব। লক্ষ্য করি নি। তবে তার পাগল-পারা বেগ দেখে আমার মনে পড়ল—

—কি গাড়ি ?

—চার সিলিণ্ডার মোটার। গাড়িগুলোর 'মেক' অবশ্য আমি চিনি না।

—রঙটা? ভিতরেই বা কে বসে ছিল? খোলা গাড়ি, না বন্ধ ?

সাক্ষী ঘাবড়ে গিয়ে বললেন—তা ত জানিনে। তবে মনে হয় কোন যেন কালো মত গাড়ি. কিন্তু ভাল ক'রে দেখতে পাই নি। কারণ, দুর্ঘটনাটা ঘটতেই নেরাদের দিকে চেয়ে আমি ব'লে উঠলাম দেখ, দেখ. হারামজাদটা মানুষ চাপা দেবে আবার গাড়িও রুখবে না !

মেজ্‌লিক ভারি অসন্তুষ্ট হ'য়ে বললেন—হুঁ! আপনার মনের নৈতিক প্রতিক্রিয়াটি প্রশংসনীয় বটে কিন্তু তার বদলে গাড়ির নম্বরটা মনে রাখতে পারলে আরও ভাল হ'ত। মানুষ কি ক'রে যে দেখতে ভুলে যায় সেইটেই আশ্চর্য! ড্রাইভার দাযী তা জানেন, লোকটা হারামজাদা, তা-ও বললেন অথচ নম্বরের বেলায় আর দেখতে পেলেন না। নৈতিক বিচার ত সবাই করতে পারে। কিন্তু ভাল ক'রে দেখাটাই হচ্ছে আসল। আচ্ছা, ধন্যবাদ শ্রী ক্রালিক। আপনার আর সময় নষ্ট করব না।

এর ঘণ্টা-খানেক পরে ১৪১ নং পাহারাওয়ালা কবি ইয়ারোস্লাভ নেরাদ যে বাড়ীতে থাকতেন সেই বাড়ী-ওয়ালীর দরজার কড়া ধ'রে নাড়া দিল।

—আজ্ঞে কবিমশায় বাড়ীতে আছেন বটে কিন্তু তিনি এখন ঘুমচ্ছেন।

কবি চোখ কচলাতে কচলাতে দরজায় এসে দাঁড়ালেন। তার পর অত্যন্ত বিস্মিত হ'য়ে খুদে খুদে চোখ মেলে দেখতে থাকলেন পাহারাওয়ালাকে। কি যে অপরাধ তিনি করেছেন, কই, তাঁর ত কিছুই মনে পড়ছে না। অবশেষে অনেক কষ্টে বুঝলেন, থানায় কেন তাঁকে যেতে হবে।

কবি অবিশ্বাসের সুরে জিজ্ঞেস করলেন যাওয়া কি সত্যিই দরকার? আমার ত কিছুই মনে পড়ছে না। রাত্রে আমি একটু -

পাহারাওয়ালা সমঝে নিয়ে বললে—মত্ত হয়েছিলেন। অনেক কবি দেখেছি আমি—জানি। আচ্ছা বেশ, কুর্তা প'রে নিন, আমি অপেক্ষা করছি।

তার পর ভুঁড়িখানা, জীবন, মহাশূন্যের নীহারিকা ইত্যাদি নানা বিষয়ের আলোচনা কবি ও পাহারা-ওয়ালার মধ্যে চলতে থাকল; এক রাজনীতি ছাড়া—কারণ এ বিষয়ে দু'জনেই ছিলেন অজ্ঞ। এমনি সৌহার্দ্য-পূর্ণ ও জ্ঞানগর্ভ বাক্যালাপ করতে করতে কবি থানায় গিয়ে পৌঁছলেন।

মেজ্‌লিক শুধোলেন—আপনি কবি ইয়ারোস্লাভ নেরাদ? দেখুন সাক্ষী মশায়, একখানা অজানা গাড়ি যখন বোজেনা মাখাচকোভাকে চাপা দিয়ে পালালো, আপনি কি সেখানে উপস্থিত ছিলেন?

দীর্ঘশ্বাস ফেলে কবি বললেন—ছিলাম।

গাড়িটা কি রঙের একটু বলতে পারেন? খোলা না বন্ধ? কি রঙের? ভিতরে কারা ছিলেন? নম্বরই বা কত?

বেশ খানিকটা ভেবে উত্তর দিলেন কবি—জানি না। লক্ষ্যই করি নি।

—কোন খুঁটিনাটি আপনার মনে নেই?

কবি সরলভাবে বললেন—না, খুঁটিনাটি আমি কোন দিন মনে রাখতে পারি না।

মেজ্‌লিক একটু বিদ্রূপের সুরে বললেন—তা হ'লে দয়া ক'রে বলুন কি দেখেছিলেন।

—দেখেছিলাম সমস্ত পরিবেশটা। নির্জন সুদীর্ঘ পথ। প্রভাত আর সেই স্খলিত নারীদেহ। তার পর হঠাৎ লাফিয়ে উঠে বললেন—বাড়ী এসে তার উপর কিছু লিখে ফেলেছি।

এ পকেট খোঁজেন, ও পকেট খোঁজেন। একরাশ কাগজের টুকরো, খাম, হিসাবপত্র সব বার ক'রে ফেললেন।

—এটা ত নয়, এটাও না। তা হ'লে বোধ হয় এইটা। শেষে এক খামের পিছনে লেখা একখানা কি বার ক'রে বিড় বিড় করে পড়তে লাগলেন।

মেজ্‌লিক গম্ভীরভাবে বললেন—দেখি।

—নাঃ, এতে কিছু নেই। তবে চান ত প'ড়ে শোনাতে পারি। ব'লে উৎসাহে কবির দু'চোখ বিস্ফারিত হ'য়ে উঠল। তিনি সুর ক'রে টেনে টেনে প'ড়ে চললেন—

কালো বাড়ীর কুচকাওয়াজ—
এক দুই· থামো
বীণার তারে ঘা দিয়েছে ঊষা
কেন গো মেয়ে হচ্ছ এমন রাঙা
১২০ হর্স পাওয়ারের গাড়ি
যাবোই মোরা দুনিয়ার শেষে
সিঙ্গাপুরে তাও হতে পারে
থামো থামো
উড়ে চলে গাড়ি

আমাদের ভালোবাসা ধূলায় লুটায়
মেয়েটি যেন ডাঁটা-ভাঙা ফুল,
হংসগ্রীবা, যুগল স্তন, দুমড়ানো ছিটকিনি
এত কান্না কেন ?

—এই। ব'লে ইয়ারোস্লাভ নেরাদ শেষ করলেন।

—ওরে ব্বাবা, এর মানে কি ?

কবি বিস্মিত হয়ে উত্তর দিলেন—কেন ? সেই গাড়িটা আর তার সঙ্গে জড়িত সেই দুর্ঘটনা। বোঝা যাচ্ছে না কি ?

মেজ্‌লিক সন্দিগ্ধ স্বরে জবাব দিলেন—একেবারেই না। গত পনেরই জুলাই ভোর চারটের কিছু পরে জিতনা ষ্ট্রীটে অজানা এক গাড়ি ষাট বছরের এক মাতাল ভিখারিণী বোজেনা মাখাচকোভাকে চাপা দিয়ে পালিয়ে গেল আর আহতা হাসপাতালে গিয়ে মরণোন্মুখ হয়ে প'ড়ে রইল—আপনার পদ্যে তার কোন হদিস্ পাওয়া যাচ্ছে না। আমি যা যা শুনেছি তার কোন তত্ত্বেরই আপনার কবিতায় উল্লেখ নেই।

কবি নাক আঁচড়িয়ে উত্তর দিলেন—ওগুলো হচ্ছে স্থূল বাস্তবতা—কাঁচা! কবিতা হচ্ছে ভিতরকার আসল বস্তু। কবিতা মুক্ত, শাসনহীন। কবিতা অবাস্তব। আপনাদের ঐ স্থূল বাস্তবতা কবির অবচেতনে কল্পনা ফুটিয়ে তোলে। বুঝেছেন ? সেই কল্পনাপ্রসূ যে কাব্য তা যা-কিছু দেখা, যা-কিছু-শোনা তারই আনুষঙ্গিক। পাঠক যখন পড়ে তখন নিজেকে সমর্পণ করে সেই স্বতস্ফূর্ত অনুষঙ্গের কাছে। তবে ত বোঝে সে কাব্য। এই ব'লে একটু ভর্ৎসনার সুরে তাঁর বক্তব্য শেষ করলেন।

মেজ্‌লিক বললেন—যাক্ গে! আপনার রচনাটা বরং একবার আমাকে দিন। আচ্ছা, এখানে লিখেছেন—

কালো বাড়ির কুচ কাওয়াজ—এক, দুই থামো···
এবার আমায় বুঝিয়ে দিন এর মানে কি ?

কবি শান্ত স্বরে উত্তর দিলেন—এই ত জিত্‌না ষ্ট্রীট। লম্বা দু-সার বাড়ি, জানেন ?

ডাক্তার মেজ্‌লিক ঠাট্টার সুরে বললেন—নারোড্‌নি ষ্ট্রীটই বা হবে না কেন ?

—নারোড্‌নি ষ্ট্রীট অমন সরল না কি ? ব'লে কবি সব দ্বিধার অবকাশ ঘুচিয়ে দিলেন।

—তার পর বীণার তারে ঘা দিয়েছে ঊষা। বেশ, এটার একটা মানে হতে পারে, কিন্তু এই যে—কেন গো মেয়ে হচ্ছ এমন রাঙা। মেয়েটিকে কোথা থেকে পেলেন ?

—সকালের আকাশের রাঙা আভা। ব'লে সংক্ষেপে বুঝিয়ে দিলেন কবি।

—দাঁড়ান, এই জায়গাটার মানে কি ? ১২০ হর্স পাওয়ারের গাড়ি। যাবোই মোরা দুনিয়ার শেষে।

কবি বুঝিয়ে বললেন—নিশ্চয় সেই সময় গাড়িটা এসে পড়েছিল।

—ওটা বুঝি ১২০ হর্স পাওয়ারের গাড়ি ছিল ?

—তা কি ক'রে বলব ? মানে হচ্ছে প্রচণ্ড বেগে ছুটেছিল গাড়িটা। এত বেগে যে, মনে হচ্ছিল পৃথিবীর শেষ প্রান্তে উড়ে গিয়ে পড়বে।

—ও, বুঝলাম। সিঙ্গাপুরে তাও হতে পারে। বাপ্‌রে বাপ্—সিঙ্গাপুরই বা কেন ?

কবি কাঁধ নেড়ে বললেন—তা আমার আর মনে নেই। তবে বোধ হয় সেখানে মলয়ীরা থাকে।

—মলয়ীদের সঙ্গে গাড়ির সম্পর্কটা কি ?

কবি অস্থির ভাবে খানিকটা নড়া-চড়া করলেন, তার পর ভেবে বললেন—গাড়িটা খয়েরি রঙের হতে পারে। খয়েরি রঙের কিছু সেখানে নিশ্চয় ছিল, নইলে সিঙ্গাপুর লিখব কেন ?

—দেখুন, গাড়িটা লাল, নীল, কালো তিন রকমই শুনেছি। আপনি কোন রংটা নিতে বলেন ?

—খয়েরিটাই নিন। রংটা প্রীতিকর।

মেজ্‌লিক প'ড়ে চললেন—আমাদের ভালবাসা ধূলায় লুটায় মেয়েটি যেন ডাঁটা ভাঙা ফুল। ডাঁটা-ভাঙা ফুল মানে কি সেই মাতাল ভিখারিণী ?

ক্ষুব্ধ স্বরে কবি বললেন—নারী সে নারীই। তাকে ত আর মাতাল ভিখারিণী বলতে পারি না!

—বেশ, তবে এই জায়গাটা ? হংসগ্রীবা যুগল স্তন দুমড়ানো ছিটকিনি ? এ সবই কি মুক্ত শাসনহীন অনুষঙ্গ ?

কবি একটু থমকে গিয়ে তার পর খানিকটা আশ্চর্য হয়ে কাগজটা হাতে নিলেন। পড়লেন—হংসগ্রীবা যুগল স্তন দুমড়ানো ছিটকিনি। এটা কি হতে পারে বলুন ত ?

ডাক্তার মেজ্‌লিক ক্ষুণ্ণ স্বরে বললেন—তাই ত জিজ্ঞেস করছি।

—থামুন একটু। সেখানে নিশ্চয় কিছু ছিল। দেখা যাক। আচ্ছা চেক্ ২ ত হংসগ্রীবার মত নয় কি ? কবি পেন্সিল দিয়ে সংখ্যাটি লিখলেন।

মেজ্‌লিক এইবার মনোযোগী হয়ে উঠলেন। বললেন—হাঁ, বুঝলাম। তার পর যুগল স্তন?

—ওটা ত চেক 3—ছোট ছোট দু'টি গোল খিলেন। ব'লে কবি নিজেই বেশ আশ্চর্য্য হয়ে গেলেন।

—তা হ'লে বাকি রইল দুমড়ানো ছিটকিনি।

কবি চিন্তা ক'রে বললেন—দুমড়ানো ছিটকিনি? দুমড়ানো ছিটকিনি চেক্‌ 5 হতে পারে। দেখুন দেখি। একটা দুমড়ানো ছিটকিনি আঁকলেন। হ'ল চেক্‌ 5?

ডাক্তার মেজ্‌লিক একখানা কাগজে 235 লিখলেন। লিখে বললেন—আপনি নিশ্চয় ক'রে বলতে পারেন যে গাড়ির নম্বর ছিল 235?

ইয়ারোস্লাভ শান্ত স্বরে বললেন—আমি গাড়ির কোন নম্বরই লক্ষ্য করি নি। কিন্তু ঐ ধরণের কিছু সেখানে ছিলই, না হ'লে আমার কবিতার মধ্যে ঢুকবে কি ক'রে? ব'লে তিনি একটু অবাক্‌ হয়ে তাঁর কবিতাটির দিকে আর একবার তাকালেন। বললেন—এই ছত্রটিই সারা কবিতার সেরা ছত্র।

দু'দিন পরে ডাক্তার মেজলিক কবির বাড়ীতে এলেন। এবারে তিনি নিদ্রামগ্ন ছিলেন না—তাঁর ঘরে ছিল একটি মেয়ে। কবি পুলিশের কর্মচারীকে বসতে দেবার জন্যে একখানি খালি চেয়ার খোঁজবার বৃথা চেষ্টা করলেন অনেকক্ষণ।

মেজ্‌লিক বললেন—থাক্‌, থাক্‌, আমায় আবার এখনই যেতে হবে। গাড়ির নম্বরটা যে সত্যিই ২৩৫ শুধু সেই খবরটাই আপনাকে দিতে এসেছি।

কবি বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞেস করলেন—কিসের গাড়ি?

হংসগ্রীবা, যুগল স্তন দুমড়ানো ছিটকিনি। আর সিঙ্গাপুর। কথাগুলো মেজ্‌লিক এক নিশ্বাসে বলে ফেললেন।

কবি উত্তর দিলেন—অন্তর্নিহিত বাস্তবতা মানে কি, এবার বুঝতে পারছেন ত? আরও কিছু কবিতা শোনাব না কি? এবারে অনায়াসে বুঝতে পারবেন।

মেজ্‌লিক তাড়াতাড়ি বললেন—আর একদিন। যখন আবার কোন মামলার তদন্ত আসবে।*

*[রূপা কোম্পানী কর্তৃক প্রকাশিতব্য "কারেল চাপেকের নীল চন্দ্রমল্লিকা" গ্রন্থের একটি গল্প।]

—০—

নীল্‌স্‌ বোর

শ্রীঅশোককুমার দত্ত

"পদার্থবিজ্ঞানে, পরীক্ষামূলক গবেষণার ন্যায় গণিতসিদ্ধ গবেষণাও যে অতি প্রয়োজনীয়, আইন্‌স্টাইন ও বরুকে পুরস্কৃত করিয়া নোবেল কমিটি এই সত্য স্বীকার করিয়াছেন। কথিত আছে, বৈজ্ঞানিক বুন্‌সেন্‌ বলিয়াছিলেন, 'এক আউন্স পরীক্ষালব্ধ তথ্য এক টন থিওরি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।' কিন্তু আমার মনে হয় বর্‌ অথবা আইন্‌স্টাইনের মতবাদের ন্যায় এক ছটাক থিওরি অনেক জাহাজ-বোঝাই পরীক্ষিত তথ্য সংগ্রহ অপেক্ষা ওজনে ভারী।"

—অধ্যাপক মেঘনাদ সাহা।

"রাদারফোর্ড পরমাণু সম্বন্ধে যে নূতন কথা বলতে শুরু করেছিলেন, বোর তা অনেকটা সম্পূর্ণ ক'রে তোলেন।...এর পর হাইজেনবার্গ, পাউলি, ডিরাক, ফোর্মি, আইনষ্টাইন এবং সত্যেন বসু ইত্যাদি নামের 'সাঁকো' বেয়ে পরমাণুর তত্ত্ব অনেক দূর অগ্রসর হয়েছে।"

—লেখক।

সিনেট হল তখনও ভাঙা হয় নি। ১৯৬১ সাল। তারিখটাও মনে আছে। ১৭ই জানুয়ারী। সেই বিখ্যাত বক্তৃতা-ঘরে গিয়ে যখন পৌঁছলাম, বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা অশেষ আগ্রহ ও কৌতূহল নিয়ে অপেক্ষা করছে। ঠিক সময়েই তিনি এলেন। সঙ্গে উপাচার্য নির্মল সিদ্ধান্ত এবং শ্রীমতী বোর। এই নীল্‌স্‌ বোর—পরমাণুবিজ্ঞানে যাঁর এত কর্মকাণ্ড! সাধারণ বেশ, সাধারণ ভাব, সাধারণ ধরণ-ধারণ। সব মিলিয়ে মস্ত অসাধারণ। আমাদের পাশ ঘেঁষে মঞ্চে উঠে বসলেন। কয়েক বছর আগের ঘটনা, আজও মনের পটে স্পষ্ট হয়ে আছে।

১৯৬২ সালের ১৮ই নভেম্বর। বেতার ঘোষণায় অপ্রত্যাশিত সংবাদ বয়ে নিয়ে এল, অধ্যাপক নীল্‌স্ হেনরিক ডেভিড বোর হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত হয়ে সহসা দেহত্যাগ করেছেন। সীমান্ত বিগ্রহে আমাদের মন আজ নানাভাবে বিক্ষুব্ধ। তবু সুদূর কোপেনহেগেনে এক বর্ষীয়ান্ বিজ্ঞানীর মৃত্যু সংবাদ আমাদের নাড়া না দিয়ে পারে নি। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের মহাপ্রয়াণে কবি নজরুল দেখেছিলেন, জাতীয় জীবনে এক ইন্দ্রপতন অধ্যাপক বোরের মৃত্যু বিজ্ঞানের জগতে তেমনি এক মস্ত ঘটনা। গত পঞ্চাশ বছর ধ'রে যাঁর নাম পরমাণু বিজ্ঞানের নানা সমস্যা; জটিলতা, তাত্ত্বিক মীমাংসা আজও প্রয়োগ-কৌশলকে বারবার ছুঁয়ে গেছে, তিনি অতীতের স্মৃতিবিজড়িত হয়ে ইতিহাসের কালো অক্ষরে বাঁধা রইলেন। এমনিই হয় বটে", জীবতারা যখন "খসে," কীর্তিমানের কীর্তি ধ্রুবতারা হয়ে জ্বল্‌জ্বল্ করে, মর্ত্যের মরসীমায় তার আলোটুকু ধরা পড়ে মাত্র।

নীল্‌স্ বোর ৭০ বৎসর বয়সে

১৯১১ সালে বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ শেষ ক'রে বোর যখন উচ্চতর গবেষণার জন্য ইংলণ্ডে এসে পৌঁছলেন, কেমব্রিজ ও ম্যানচেষ্টার তখন পরমাণু বিজ্ঞান-চর্চার পরম তীর্থ হয়ে দাঁড়িয়েছে। দু' হাজার বছরের অস্পষ্ট ধারণাকে দূর ক'রে রাদারফোর্ড পরমাণুর ভিতরে এক আশ্চর্য সত্যের প্রকাশ পেলেন। যে পরমাণুকে গত যুগের বিজ্ঞানীরা পদার্থের মূল উপাদান মাত্র জেনে সন্তুষ্ট ছিলেন দেখা গেল সেই সামান্য বস্তুকণা গঠন-কৌশলে বিশাল অনন্ত সৌরজগতেরই প্রতিভাস। সৌরমণ্ডলে যেমন সূর্যকে কেন্দ্র ক'রে গ্রহ এবং গ্রহাণুপুঞ্জ প্রদক্ষিণ করে, রাদারফোর্ডের পরীক্ষায় তেমনি পরমাণুর এক বস্তুকেন্দ্র বা নিউক্লিয়াসের সন্ধান পাওয়া গেল। এই নিউক্লিয়াস কি, কেমন তার গঠন, কি কি বৈশিষ্ট্য—এ সব নিয়ে জিজ্ঞাসার আজও শেষ হয় নি। তাত্ত্বিক জটিলতার কথা বাদ দিলে মোট কথায় যা দাঁড়ায়: পরমাণু প্রায় বস্তুহীন ফাঁকা, সৌরজগতের মতই শূন্যতায় পূর্ণ, কেন্দ্রস্থলে নিউক্লিয়াস আর সীমানা ঘেঁসে ইলেকট্রন কণা—যে ইলেকট্রন বিদ্যুতের নেগেটিভ অংশ, পরমাণুর পরিধি রচনা ক'রে ঘুরপাক খাচ্ছে। শিশিরবিন্দুতে সূর্যের প্রতিবিম্বের মত সৌরজগতের এক প্রতিরূপ আমরা খুঁজে পেলাম। ছোটর মধ্যে বৃহতের এই সঙ্কেত তত্ত্বলোক ও ভাবলোক দু'জায়গাতেই সমান আলোড়ন তুলেছিল।

কবিতা ও বিজ্ঞান এক জায়গায় এসে মিলিত হ'ল। রাদারফোর্ডের পরমাণুর চিত্রে খুঁত তাই সহজে ধরা পড়ে না। বোরই প্রথম বিষয়টি উত্থাপন করলেন। সৌরজগতে সূর্যের আকর্ষণে যেখানে গ্রহগুলি প্রদক্ষিণ করছে, বিদ্যুতের প্রভাব সেখানে নেই। কিন্তু পরমাণুর কেন্দ্রে পজিটিভ বিদ্যুৎ, ইলেকট্রনগুলি নেগেটিভ-ধর্মী। সৌরজগতের নিয়ম এখানে খাটবে কি ক'রে? পজিটিভ-নেগেটিভের পরস্পর আকর্ষণের কথা আমরা জানি, সে

আকর্ষণে ইলেকট্রন কক্ষচ্যুত হয়ে নিউক্লিয়াসের মধ্যে বিলীন হবে, পরমাণুর অস্তিত্ব তাই মুহূর্তের বেশি স্থায়ী হ'তে পারে না। কিন্তু বাস্তবে যখন দেখি পরমাণুগুলি বেশ "বেঁচেবর্তে"ই রয়েছে, রাদারফোর্ডের পরমাণুর তত্ত্ব সমর্থন করার কোন উপায় থাকে না। কোয়াণ্টাম তত্ত্ব থেকে বোর তার মীমাংসার ইঙ্গিত পেলেন।

ম্যাক্স প্ল্যাঙ্ক কোয়াণ্টাম তত্ত্বের মূল উদ্‌গাতা। কোয়াণ্টাম তত্ত্ব আলোর বিকীরণ তত্ত্ব। আলোর প্রকৃতি ও স্বরূপ নিয়ে বিজ্ঞান বহুদিন থেকেই চিন্তা ক'রে আসছে। আজ যে তার সব কিছু জানা গেছে, এ কথা নিশ্চয়ই বলা যায় না। বাস্তবিকই, আলোর মধ্যে যে এত কালো রয়েছে কে আগে তা ধারণা করতে পেরেছিল? আলোর প্রকৃতি নিয়ে কথা বলতে গিয়ে প্ল্যাঙ্ক এক অভিনব তত্ত্ব দাঁড় করালেন। এর আগে আমরা জানতাম, জলের ঢেউ যেমন ছড়িয়ে পড়ে, আলোও তেমনি 'ইথারে'র তরঙ্গবিস্তার। এই ইথার সর্বত্র সঞ্চারী, তবে মানুষের অনুভূতির সীমায় ধরাছোঁয়ার বাইরে। ইথারকে কাল্পনিক বস্তু ব'লে আমরা তুচ্ছ করতে পারি না, কারণ তাকে স্বীকার ক'রে নিলে আলোর অনেকগুলি ধর্ম ব্যাখ্যা করা সহজ হয়। প্ল্যাঙ্কের তত্ত্বে ইথারের এই তরঙ্গবাদ অগ্রাহ্য করা হ'ল। আলোর মধ্যে রয়েছে আলোর উপাদান আলোক-কণা, এই কণা বা কোয়াণ্টাম মেশিনগানের গুলী ছোড়ার মত ছাড়াছাড়া বেরুতে থাকে। নিরবচ্ছিন্নভাবে জলস্রোতের মত অবিশ্রাম প্রকাশ পায় না। এ কথার তাৎপর্য বহুদিকে বহুভাবে প্রসারিত হয়েছে। কোয়াণ্টাম তত্ত্ব নিয়ে অধিক আলোচনার ক্ষেত্র বা পরিসর এখানে নেই। মূল কথা এই যে, আলো কোন সময়েই সমানভাবে প্রকাশ পাচ্ছে না। বোর এই ধারণাটিই তাঁর পরমাণু-তত্ত্বে প্রয়োগ করলেন। তিনি বলতে চান, আলোর (বা আরও সতর্কভাবে বলতে গেলে প্ল্যাঙ্কের কাল্পনিক Linear Ocillator-এর) মত ইলেকট্রনগুলিও প্রদক্ষিণরত অবস্থায় সর্বদা তেজ বিকীরণ করবে না, কোনরূপ শক্তিব্যয় ছাড়াই আপনার নির্দিষ্ট পথে বিচরণ করবে। ইলেকট্রনের এই সম্ভাব্য কক্ষপথ সীমাবদ্ধ। বোর তাদের সংখ্যা এবং অবস্থান নির্দেশ ক'রে দিলেন। যদি কোন কারণে ইলেকট্রন এক কক্ষ ছেড়ে আর এক কক্ষে যায় তবেই একমাত্র অবস্থা-বিশেষে শক্তির শোষণ বা বিকীরণ হবে। এই নিয়মে পরমাণুগুলি স্থায়ী থাকে সত্য কিন্তু তত্ত্বটির পরিকল্পনায় কৃত্রিমতা লক্ষ্য না ক'রে পারা যায় না। পরমাণু বিশ্বের তাবৎ জিনিষের মূল উপাদান কিন্তু তার জগৎ যেন আলাদা এক জগৎ সাধারণ অবস্থায় আমরা যে জগতের সঙ্গে পরিচিত হই তার সঙ্গে এর কোন মিল নেই। এখানকার নিয়ম আলাদা, যুক্তি আলাদা। কিন্তু এই বিরোধ আপাত মাত্র। সূচ খুবই সূক্ষ্ম, তা ব'লে লাঙ্গলের কাজ সূচে হয় না। সাধারণ জগতে যে সব বিচার-বিবেচনা সামান্য হয়ে থাকে, পরমাণুর ছোট্ট জগতে এসে তাই বিরাট আকার ধারণ করে। অবস্থা তাই সমস্ত বিষয়টিকে অন্যভাবে নিয়ে আসছে। পরমাণুর জগৎ আর আমাদের পরিচিত জগতে তাই এত ফারাক।

যাই হোক্, বোর এভাবে পরমাণুর এক স্থায়ীরূপ "এঁকে" দিলেন। তার পর তা অনেক ভাবে পরিশীলিত ও প্রসারিত হয়েছে। অনেক বিখ্যাত বিজ্ঞানী অবশ্য সেই তত্ত্ব ভাবনাকে আজ স্বীকার ক'রে নিতে পারেন নি। কিন্তু পূর্ণ মীমাংসা যদি না হয়ে থাকে, বোর যে বিষয়টিকে এক নূতন দৃষ্টিকোণ থেকে তুলে ধরেছিলেন, এতে সন্দেহের অবকাশ নেই। পূর্ণজ্ঞান ব'লে কিছু বিজ্ঞানের বইয়ে লেখা থাকতে পারে না, আজ যা সহজ সত্য ব'লে প্রতীয়মান, নবলব্ধ জ্ঞানের আলোকে তা-ই আবার অসঙ্গত ও তাৎপর্যহীন মনে হতে পারে। সে যা হোক্, দুই কি তিন হাজার বছর ধ'রে পরমাণু সম্বন্ধে যে অস্পষ্ট ধারণা মানুষের মনে জট পাকিয়েছিল, বোর তাকে পরিপূর্ণ তাত্ত্বিক শৃঙ্খলে বাঁধবার জন্য আজীবন সাধনা ক'রে গেছেন। নীল্‌স্ বোর সমসাময়িক কালে একজন শ্রেষ্ঠ তত্ত্বজ্ঞানী পরমাণুবিদ্ ব'লে কীর্তিত আছেন।

জ্ঞানী জ্ঞান বিতরণ করেন। দীপশিখা যেমন প্রদীপের আলোতে তার জ্বালানী তেল পূর্ণাহুতি দেয়। বোর কোপেনহেগেনে এক গবেষণা-কেন্দ্র গ'ড়ে তুলেছিলেন। তাঁর নিষ্ঠায় শীঘ্রই তা বিজ্ঞান-চর্চায় পৃথিবীর এক সেরা প্রতিষ্ঠান হিসাবে পরিগণিত হ'ল। নানা দেশ থেকে দলে দলে শিক্ষার্থীরা জ্ঞানার্থী হয়ে তাঁর কাছে জমায়েত হলেন। জ্ঞান তার শিখা ছড়াল। বোরকে এক গুণী ব্যক্তি "বিজ্ঞানের এক অচঞ্চল দীপশিখা" রূপে বর্ণনা করেছিলেন। ১৯৪১ সালে এই শিখা একবার কেঁপে উঠল। কালক্রমে বছর গড়িয়ে তখন মহাযুদ্ধের দাবদাহের মধ্যে এসে পড়েছে। সারা বিশ্ব জুড়ে যুদ্ধের অভিঘাত সমস্ত কিছু টলমল ক'রে তুলছে। বোরের এত সাধের গবেষণা-মন্দিরও তাসের প্রাসাদের মত ধ্ব'সে পড়ল। কিন্তু তারই বছর কয় আগে ল্যাবরেটরীর নির্জন কোণে যে সত্য প্রকাশ পেল—দুনিয়ার অনেক রাজা ও রাজত্বের উত্থান-পতনের থেকে তা অনেক বড়-দিবের ঘটনা। বার্লিনের কাইজার ভল্‌মেহ্ ল্যাব-

রেটরীতে একযোগে ব'সে কাজ করার সময় অটো হান ষ্ট্রেশমান, ফ্রিশ এবং মাইৎনার এক অভাবনীয় তথ্যের সন্ধান পেলেন। পরমাণুর অভ্যন্তরে পরিবর্তন ঘটিয়ে এতদিন পদার্থের স্বরূপ পাল্‌টে দেওয়া যাচ্ছিল, কিন্তু এবার যেন দেখা গেল সম্পূর্ণ নতুন ধরণের ব্যাপার। ইউরেনিয়াম পরমাণুতে নিউট্রনের আঘাত ঘটিয়ে অন্য একটি নতুন পরমাণু পাওয়ার কথা ছিল, কিন্তু নাইট্রোজেন ফসফরাস বা অ্যালুমিনিয়ামের বেলায় যা দেখলাম, ইউরেনিয়ামের ক্ষেত্রে তার ব্যতিক্রম হ'ল। একটি মাত্র পরমাণুর বদলে এখানে একজোড়া পরমাণু। এরা এল কোথা থেকে? বিজ্ঞান হতবুদ্ধি হ'ল। নূতন এক সমস্যা বড় হয়ে দেখা দিয়েছে। সমাধানও তাই অনেক তাৎপর্যপূর্ণ হবে, কিন্তু সময়টা তখন ১৯৩৯ সালের শেষ বরাবর, রাজনীতির ধোঁয়াটে ভাব মহাযুদ্ধের দিকে মোড় নিয়েছে। জার্মানীর অভ্যন্তরে সুরু হয়েছে আগ্রাসী ইহুদী নির্যাতন। ফ্রিশ এবং মাইৎনার ছিলেন ইহুদী, সহকর্মীদের সাহায্যে তাঁরা পলায়নের পথ প্রস্তুত করলেন। সীমান্তের ওপারে ডেনমার্ক, রাজধানী কোপেনহেগেনে তাঁরা আশ্রয় নিলেন। ঘটনা এখানেই জমাট হয়ে উঠল। ব্যক্তিগত বিপর্যয়ের মধ্যেও মাইৎনার তাঁর বৈজ্ঞানিক সমস্যাটির কথা ভুললেন না। ইউরেনিয়াম পরমাণুর অদ্ভুত আচরণ তাঁর মন বিভোর ক'রে তুলল। মাইৎনার ভাবছিলেন, জলের ফোঁটা ভেঙে পড়ার মত ইউরেনিয়াম থেকে নূতন দু'টি পরমাণুর সৃষ্টি হয় নি ত? নিজের সিদ্ধান্তের সমর্থনে তিনি বোরের গবেষণা-কেন্দ্রে গণনায় বসলেন। সে সঙ্গে পিতৃব্য অটো ফ্রিশকে কথাটা জানাতে ভুললেন না। প্রস্তাবটা ফ্রিশের কাছেও যেন যুক্তিযুক্ত মনে হ'ল। বোরের কাছে তিনি বিষয়টি উত্থাপন করা মনস্থ করলেন। ঘটনা এখান থেকেই নাটকের থেকে নাটকীয় হয়ে উঠল। পূর্ব পরিকল্পিতভাবে বোর তখন প্রিন্সটনে আইনষ্টাইনের সঙ্গে সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে আমেরিকা পাড়ি দিচ্ছেন। ট্রেন ছাড়ে ছাড়ে···বোর ফ্রিশের মুখে বিজ্ঞানের এক আশ্চর্য কাহিনী শুনলেন। এর তাৎপর্য তাঁর কাছে নিশ্চয়ই অস্পষ্ট রইল না। কিন্তু যাওয়া বানচাল করা তখন আর তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিল না। অনেক আশা ও আশঙ্কা বুকে নিয়ে বোর আমেরিকা যাত্রা করলেন। গিয়েই পেলেন কোপেনহেগেন থেকে লেখা মাইৎনারের এক টেলিগ্রাম। হাঁ, এক নবযুগ সূচনা হ'তে চলছে। ইউরেনিয়াম পরমাণু বাইরের আঘাতে জলবিন্দুর মতই দ্বিধাবিভক্ত হচ্ছে, ফলে জন্ম হচ্ছে নূতন দুটি পরমাণু, আর সেই সঙ্গে অভাবনীয় পরমাণু শক্তি।

পরে এই শক্তিকে জাগ্রত ক'রে বোমার আকারে রূপ দেওয়ার জন্য নীল্‌স্ বোর তাঁর সর্বশক্তি নিয়োগ করেছিলেন। নিরাপত্তার খাতিরে তখন তাঁর ছদ্মনাম ছিল নিকোলাস বেকার। নীল্‌স্ বোর আর নিকোলাস বেকার একই ব্যক্তির দুই পরিচয়—চিরদিন যিনি শান্তিবাদী, যুদ্ধের বিভীষিকাই তাঁকে অগ্নিস্রাবী ক'রে তুলেছিল। বিপরীত অবস্থা এক কে এভাবে বিভিন্ন রূপে তুলে ধরে। পাল নৌকাকে ঠেলে নিয়ে যায়, কিন্তু ঝড়ের মুখে তা-ই আবার দারুণ বিপর্যয়ের কারণ হয়। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে এই ঝড় আরও ভয়ঙ্কর হয়ে দেখা দিয়েছিল।

জীবনপঞ্জী:

জন্ম—৭ই অক্টোবর, ১৮৮৫ সাল। জন্মস্থান: কোপেনহেগেন। পিতা: খ্রীশ্চিয়ান বোর, বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক।

শিক্ষা—কোপেনহেগেন বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ শেষ ক'রে উচ্চতর গবেষণার জন্য ইংলণ্ডে গমন করেন। মাত্র ২৬ বছর বয়সে ডি-এস-সি উপাধি লাভ।

কর্ম—আজীবন শিক্ষাব্রতী। ১৯৫৬ সাল পর্যন্ত নিজের প্রতিষ্ঠিত গবেষণা-মন্দিরের ডিরেক্টরের পদ অলঙ্কৃত করেন। মাঝে ১৯৪৩ সালে জার্মানীর হাতে ডেনমার্কের পতনের পর আমেরিকায় এটম বোমার পরিকল্পনায় অংশ নেন। শান্তি স্থাপনের পরই পুনরায় স্বদেশে এসে অধ্যাপনা ও গবেষণার কাজে আত্মনিয়োগ করেন।

সম্মান—১৯২২ সালে বোর নোবেল প্রাইজ পান, তা ছাড়া বিভিন্ন উপলক্ষ্যে আমেরিকার ফ্রাঙ্কলিন পুরস্কার, লণ্ডনের রয়েল ইনষ্টিটিউট এবং বার্লিনের একাডেমী ডার ভিসেনশাফ্‌টনের (বিজ্ঞান পরিষদ) সদস্যপদ ইত্যাদি অজস্র সম্মানে ভূষিত হন। ১৯৫৭ সালে 'এটম ফর পীস' পুরস্কার লাভ। ১৯৬০ সালে ভারত আগমন উপলক্ষ্যে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে সম্মানাত্মক ডি-এস-সি উপাধিদানে অর্ঘ্য নিবেদন করেন।

মৃত্যু—১৯৬২ সালের ১৮ই নভেম্বর। ৭৭ বছর বয়সে হৃদ্‌রোগে প্রাণত্যাগ করেন।

অপরিচিতা

শ্রীসুধীরকুমার চৌধুরী

জানি না কে তুমি, শুধু জানি তুমি আছ পৃথিবীতে,
মাটির এ পৃথিবীতে, হে অপরিচিতা!

সে কোন্ যুগের কথা, আজ মনে পড়ে।
ষ্টীমারের ঝপঝপ, ঝকঝকে জল,
খর-রৌদ্র গায়ে মাখে শীতার্দ্র বাতাস
ঘুমের আবেশে ভরা।
দূর গ্রামটির
মঠের চুড়াটি দেখি প্রহরেক ধ'রে।
কখনো সম্মুখে দেখি, কখনো বা বামে,
পশ্চাতে কখনো,
হঠাৎ তন্দ্রার ঘোরে কেন মনে হয়,
ঐখানে তুমি আছ, হে অপরিচিতা!
কালো দীঘিটির ঘাটে, ঢেঁকিশালে, উঠোনে, হেঁসেলে
কল্পনায় তোমাকে দেখি না।
ভাবি না কেমন মুখখানি।
ভাবি না কিছুই, শুধু অনুভব করি।
সে যে কি নিবিড় অনুভব!

নদী বাঁক ঘুরে যায়,
চোখের আড়ালে পড়ে গ্রাম,
মঠের চুড়াটি ঢাকে অন্য এক গ্রামের গাছেরা।
কত কাছে এসে দূরে যাই,
দূর থেকে যাই আরো দূরে,
ষ্টীমারের ঝপঝপ শুনি একটানা,
টনটন ক'রে ওঠে বুক
তোমাকে চলেছি ছেড়ে, এই বেদনায়।

মনে পড়ে, কবে কোন্ আসন্ন সন্ধ্যায়
অজানা পথের পাশে ছোট বাড়ীটির
স্তিমিত প্রদীপজ্বালা ঘরে
মনে হয়েছিল, তুমি আছ।
বাগানে বেড়ার গায়ে শাড়ীটি কতই যেন চেনা।
একটুকু সাড়া দিই যদি,
দু'হাতে কপাট খুলে তুমিই দাঁড়াবে,
দু'টি চোখে জন্মান্তের পরিচয়,
হেসে ক'বে, এস!

জীবনে চলার পথে
না জানি না জেনে কতবার
এসেছি তোমার কাছে, হে অপরিচিতা,
না জেনেই দূরে গেছি।
নিশান্তে সে কোন্ যাত্রীবাসে
তোমার নিঃশ্বাস-সুরভিত
বাতাসে নিঃশ্বাস নিয়ে আধ-ঘুমে
জেনেছি, এসেছ তুমি কাছে।
প্রত্যূষে বিদায়ক্ষণে
মুখটি পড়েনি চোখে আধঘুমে আধ-অন্ধকারে।
শুনেছি কি কণ্ঠস্বর অন্তরাল হ'তে?
হয়ত শুনিনি।
হয়ত বা জনতার ভিড়ে
দেখেছি অঞ্চলপ্রান্ত বহুদূর থেকে,
হয়ত দেখিনি।
পাইনি তোমার দেখা এ জীবনে, হে অপরিচিতা!

যাদেরে দেখেছি,
যাদেরে পেয়েছি আমি বুক ভ'রে এ বুকের কাছে,
তারা যা দিয়েছে,
হয়ত তোমার সাধ্যে ছিল না যে দাও ততখানি।
তবু কিছু ছিল
একান্ত যা তোমার দেবার,
হয়ত আমারই সাধ্যে ছিল তা একান্ত ক'রে পাওয়া
এ জীবনে হ'ল না তা।
শুভলগ্ন বহুদিন ছিল,
বহুদিন হয়ে গেছে গত,
আর, ফিরবে না,
মন্থর রক্তের তালে শুনি আজ বিচ্ছেদের সুর।

এই যে বিচ্ছেদ,
এর কোথা ছেদ নেই, শেষ এর নেই কোনোখানে।
কত সেতু বাঁধা হ'ল জানা-অজানায়,
আরো কত বাঁধা হবে,
পরজন্ম যদি থাকে, জন্মজন্ম ধ'রে।
নিশান্তের যাত্রীবাসে আধঘুমে আধ-অন্ধকারে
হয়নি যে মুখখানি দেখা একদিন,
সে মুখটি আর দেখব না।

যদি দেখতাম,
হয়ত হ'ত না কিছু, দুজনাতে শুধু দেখা হ'ত।

পরিচয় পেতাম তোমার,
রহস্যমধুর পরিচয়।
হয়ত নিজেরও কোন্ রহস্যমধুর পরিচয়
পেতাম তোমার কাছে, হে অপরিচিতা!

জানো কি আমার মধ্যে আমি বয়ে বেড়াই যে এক
পরিচয়হীন মানুষেরে,
হে অপরিচিতা?
পরিচয়-হীনা তুমি, তাই ত সংজ্ঞে হয়ে আছ
আমারই মতন আপনার,
হে অপরিচিতা!

সীমান্ত ওই ডাক দিয়েছে

শ্রীসুনীলকুমার নন্দী

সোনার ফসল তুলবো বলে মাঠের আলে নামছি,
খবর এলো এই অবেলায় দস্যু করে হামলা—
সীমান্ত ওই ডাক দিয়েছে, বুকের তলে রক্ত
ছলাৎ ছলাৎ বৈঠা ফেলে, এবার তবে যাই মা।

তোমার মুখে মলিন ছায়া মানায় না মা, চক্ষে
সেই পুরনো দীপ্তি টানো, বাঁধ ভাঙা জল বাঁধে
গেলাম যেদিন দুপুর রাতে চক্ষে অভয় সলতে
জালিয়ে তুমি বলেছিলে: 'জল বেঁধে বাপ ফিরবি,
তা না হলে রাক্ষুসে জল সোনার ফসল গিলবে—
সারা গাঁয়ের কান্না যেন পারিস তোরা রুখতে।'

সীমান্তে বয় কনকনে শীত, নক্সী কাঁথার কোটটা
বের করে দাও, হিমেল হাওয়ায় লড়তে গিয়ে রক্ত
ঠাণ্ডা হলে চলবে না, আজ বুক ভরা যে-শান্তি
আমার দেশের মুক্ত হাওয়ায় গাঁয়ের পথে গন্ধে
গুচ্ছ গুচ্ছ সোনার ফসল ভাসান দিতে চাইছে
দস্যু সেনা, বইয়ে দিয়ে রক্ত ঢালা গঙ্গা।
কেমন করে রইবো ঘরে, এবার তবে যাই মা—
সীমান্ত ওই ডাক দিয়েছে, জল এনো না চক্ষে।

এবারও মা সাহস রেখো, দস্যু বেঁধে ফিরবো—
তোমার দীপ্ত চক্ষু মাগো আমার সাহস-উৎস।

স্বর্ণালোক লতা

শ্রীমিহির সিংহ

বড বড় অনেক পুরোনো গাছের বাকলে
পুরো এক-একটা অরণ্য তুমি দেখতে পাবে।
যদি তোমার নজর থাকে, আর অভাব না থাকে
অবসরের, তা হলে দেখতে পাবে সেখানে
কত ছাতার ভিড়। ছোট্ট ছোট্ট কত সম্পূর্ণ গাছ
সারি সারি দাঁড়িয়ে আছে, সবুজ হলুদে লাল
সব রঙ। অগুন্তি আকৃতি—আর তাদের তলায়
ক্ষুদ্রতর কত বিচিত্র প্রাণীর ভিড়।
পাখির কলরবে আকৃষ্ট হয়ে যদি মাথা তোলো
উপরের দিকে—যেখানে সূর্য্যের আলো
গাছের পাতার ছাঁকনীর মধ্যে দিয়ে না এসে
সোজা মেশে সুদূর নীল আকাশের মাঝে—
সেখানে রোদের স্রোতে গা ভাসিয়ে দেখো
অফুরন্ত আনন্দে স্নান করছে ছুটির চিন্তার মত
অর্থহীন নিছক সুন্দর পরগাছা লতা।
আমার মনে হয়, শক্তিশালী দৃঢ় গাছের
তরুণী বধূ ওরা। ফল নয়, ফুল নয়,
ওরা নিজেরাই ওদের নিজেদের সার্থকতা।
প্রতি মুহূর্ত্তে নিবিড় ক'রে ওদের নির্ভর
জীবন যুদ্ধের বৃক্ষ-সৈনিকদের 'পরে, যাদের
রুক্ষ শিকড় থেকেই ওদের সূক্ষ্ম শিরাপথে
সঞ্চারিত হয় প্রাণ রস।
তবুও তো বাঁচি ওদেরই নিয়ে, যুদ্ধ করি আছে ব'লে,
—ওরা যে স্বর্ণলতা।

শুধুই আগুন

(সাঁওতালী লোক-সঙ্গীত)

শ্রীকৃষ্ণধন দে

পলাশ আলতাপাটি অশোকমুকুল
রক্তকরবী আর কামরাঙা ফুল
লালে লালে ভরে দেয় কোপাইয়ের কুল,
—এল কি ফাগুন ?
—সই, তোরা বুঝবি না, আমার চোখে
শুধুই আগুন, এ যে শুধুই আগুন !

অকালে নদীতে খর গ্রীষ্মের তাপ,
পিয়াসী রাতের কী যে অসহ প্রতাপ !
সারারাত দেহে যেন ছোবলায় সাপ,
—ভেবে হই খুন !
—সই, তোরা বুঝবি না, আমার চোখে
শুধুই আগুন, এ যে শুধুই আগুন !

উঠোনে যে সারি সারি ফোটে দোপাটি,
তাতে বাঁধি পরিপাটি সাঁঝ্-খোঁপাটি,
ঘাটে যেতে ঢেউ-ছোঁয়া নরম মাটি
—জ্বালায় দ্বিগুণ !
—সই, তোরা বুঝবি না, আমার চোখে
শুধুই আগুন, এ যে শুধুই আগুন !

মাঝ রাতে বাঁকা চাঁদ পথ যে হারায়,
মউবনে চুপি চুপি হাতটি বাড়ায় !
'মর্-মর্' শুনে লাজে সরে সরে যায়
—মুখ ক'রে চুণ !
—সই, তোরা বুঝবি না, আমার চোখে
শুধুই আগুন, এ যে শুধুই আগুন !

ফুল সব ঝরে গেছে, মরে গেছে বন,
আজো তার স্মৃতি নিয়ে কাঁদে যৌবন !
কে-অদেখা শিকারী যে বিঁধে গেল মন
—খালি ক'রে তূণ !
—সই, তোরা বুঝবি না, আমার চোখে
শুধুই আগুন, এ যে শুধুই আগুন !

মনের মানুষ ছাই, গেল যে কোথায় ?
বাতাসে বাঁশের বাঁশী পথ কি জানায় !
মন-ধরা মায়াজাল পেতে রেখে যায়
—মায়াবী নিপুণ !
—সই, তোরা বুঝবি না, আমার চোখে
শুধুই আগুন, এ যে শুধুই আগুন !

—০—

কাছে আছো

শ্রীকামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

কাছে আছো। তবু দূরে, অন্য কোনো গ্রহে।
ঘাস ওঠে ফুল ফোটে কোন্ সে আগ্রহে ?
শিশিরের পদশব্দ কেন শুনতে পাই ?
হৃদয়ের দশ দিকে শুধু নাই নাই।
কথা তার ভাষা তার পরম অচেনা
মাঝে মাঝে মুকুলিত রঙীন কল্পনা।

জানি এক ঘর আছে, জানি এক মাঠ,
জীবন মাপবো জানি : ছয় সাত আট।
একবার যদি ভুরু একটু বাঁকাও,
একবার ঠোঁট চেপে একটু তাকাও
মনে হয় হেমন্তের বড় ক্যানভাসে
তোমার মায়াবী ছবি ভরে আছে একটি আকাশে।

স্তব্ধ প্রহর

শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত্র

স্থির একটা সঙ্কল্পের পর মনটা কি কিছুক্ষণের জন্যে ভারহীন শিথিল হয়ে যায়?

শোভনার অন্ততঃ তাই মনে হচ্ছে। মস্ত বড় একটা বোঝা সে যেন নিজের অজান্তেই বয়ে বেড়াচ্ছিল। এই সঙ্কল্পের সঙ্গে সঙ্গে সে বোঝা নেমে গেছে একেবারে। এতদিন বাদে নিজেকে সত্যিই মুক্ত মনে হচ্ছে।

দু'জনে একটা টেবিলে এসে বসেছে।

চারিধারে আরও অজস্র টেবিল-চেয়ার ছড়ানো। একটাও খালি নেই। লোকজন এসে জায়গা না পেয়ে ফিরে যাচ্ছে। 'বয়'দের ছোটাছুটি, ব্যস্ততা। টেবিলে টেবিলে যারা ভীড় করে আছে তাদের সম্মিলিত একটা বিচিত্র কলরবই যেন তাদের ঘিরে রাখার একটা নির্জনতার আবরণ।

একটা ছোট টেবিলে দু'জনে যে জায়গা পেয়েছে এটাও ভাগ্য। দু'কাপ চা চেয়ে বহুক্ষণ থেকে অপেক্ষা ক'রছে। বিরক্ত হওয়ার বদলেও বিলম্বে শোভনা অন্ততঃ খুশি। জনতার মাঝখানে এমনি নির্জনতায় যতক্ষণ সম্ভব সে ব'সে থাকতে চায়। একলাও নয়। সামনে আর একজন কেউ থাকা দরকার যাকে উপলক্ষ্য ক'রে নিজের সঙ্গে কথা বলা যায়। নিখিল বক্সীর বদলে আর কেউ সঙ্গী হ'লে হয়ত ক্ষতি ছিল না। কিন্তু নিখিল বক্সীই ভালো। নিখিল বক্সী তার প্রতি আকৃষ্ট এ কথা প্রথম জানবার পর যে বিস্মিত অস্বস্তিমেশানো বিরাগ তার মনে জেগেছিল, তা আর এখন নেই। নিখিলের সেই মুগ্ধতায় সাড়া না দিক তাতে বিরূপতা অন্ততঃ আর জাগছে না। সত্যি কথা বলতে গেলে অনুরাগের উত্তাপটুকু ভালোই লাগছে। তার কারণ বোধ হয় এই যে, নিখিল মুগ্ধ হলেও মূঢ় ভক্ত নয়। মোহ বা আকর্ষণ যেমন তীব্রই হোক, নিজের কঠিন দূরত্ব সে রাখতে জানে। নিখিলের মত একাধারে চেনা ও অচেনা, দূর ও নিকট একজন সঙ্গীই তার এখন বুঝি সবচেয়ে দরকার ছিল।

হাওড়া স্টেশনের এই জনবহুল রেস্তোরাঁটিতে এসে বসা ঠিক আকস্মিক নয়। শোভনাই নিজে থেকে এখানে আসবার প্রথম ইঙ্গিতটুকু দিয়েছিল।

পলাতক স্বামীকে চিরকালের মত হারিয়ে যেতে দেবার কথা শোভনা তীব্র কঠিন স্বরে বলে নি, কিন্তু হতাশ কোন ম্লান হাসিও তার মুখে ছিল না। তার বদলে যে বিষণ্ণ কৌতুকের আভাস তার মুখে দেখা গিয়েছিল তাইতেই যেন তার সঙ্কল্পের তীক্ষ্ণতা আরও ফুটে উঠেছে।

নিখিল তার দিকে চেয়ে একটু বিমূঢ় ভাবেই চুপ ক'রে ছিল। চুপ ক'রে ছিল শুধু বলবার কোন কথা খুঁজে পায় নি বলে নয়, এর পর তার কি করা উচিত তা স্থির করতে না পারার দ্বিধা সংশয়েও। আকস্মিক এই নাটকীয় মুহূর্তের সাক্ষাৎ শেষ হবার পর অনায়াসে সে চলে যেতে পারে। কিন্তু সেই বিদায় নেওয়াটাকে সহজ করবার মত কোন ভঙ্গি বা কথা সে খুঁজে পায় নি।

শোভনাই তাকে এ সমস্যা থেকে মুক্তি দিয়েছিল।

জিজ্ঞাসা করেছিল স্বাভাবিক কণ্ঠে—এখন কি বাড়ী ফিরছেন?

বাড়ী? নিখিল সাধারণ আলাপের স্তরে নেমে আসতে পেরে যেন কৃতজ্ঞ হয়ে বলেছিল—না, এর মধ্যে বাড়ী যাব কি?

একটু হেসে নিজের স্বাভাবিকতা খুঁজে পেয়ে তার পর বলেছিল—আরও দু'চারটে দরজা থেকে হতাশ হয়ে না ফিরলে বিবেকেই যে বাধবে। রাত্রে ঘুম হবে না।

বিবেককে কতটা সমীহ করেন জানি না, শোভনাও কৌতুকের স্বরে বলেছিল, নইলে বলতাম কোথাও গিয়ে খানিক বসি চলুন। একটা প্রতিজ্ঞা ত ভেঙেছেন আর একটা ঘাও না হয় বিবেককে দিলেন!

শুধু কথাগুলোই নয় শোভনার এ গলার স্বর ও মুখের ভাবও নিখিলের কাছে অপ্রত্যাশিত। এ শোভনা যেন কোন এক আবরণ সরিয়ে অকস্মাৎ বেরিয়ে এসেছে।

তাই না হয় দিলাম! উত্তর দিতে নিখিলের একটু দেরী হয়েছিল—কিন্তু কাছাকাছি বসবার জায়গা···

একটু থেমে ভেবে নিয়ে নিখিল বলেছিল, স্টেশনের একটা রেস্তোরাঁয় যাওয়া যায় বটে, তবে সেখানে জায়গা পেলে হয়!

জায়গা তারা পেয়ে গেছে ভাগ্যক্রমে। এক কোণের

একটা ছোট টেবিল। সবচেয়ে সুবিধে, দু'টির বেশী চেয়ার সেখানে ধরে না।

ভীড়ের দরুন, না পোষাক-আশাকে খদ্দেরের দর কষে ফেলে, বলা যায় না, 'বয়'রা প্রথম গ্রাহ্যই করে নি। দু'চারবার তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করার চেষ্টায় বিফল হয়ে অনেক৺কষ্টে একজনকে দু কাপ চায়ের কথা বলতে পেরেছে শেষ পর্যন্ত।

আর কিছু খাবেন? জিজ্ঞেস করেছে নিখিল।

না, শুধু বসবার জন্যেই এসেছি, খাবার জন্যে নয়। তা ছাড়া..., ব'লে শোভনা একটু থেমেছে।

তা ছাড়া, কি?—নিখিল হেসে-ই উল্টো প্রশ্ন করেছে, —বেকার মানুষের পকেটের অবস্থা বুঝে তাকে লজ্জা থেকে বাঁচাতে চাচ্ছেন?

তাই যদি করি, সেটা অপমান মনে করবেন কি?

শোভনার গলায় এবার বুঝি ঠিক কৌতুকের সুর নেই।

নিখিল কিন্তু এবারেও হেসে বলেছে—না তা করব না, তবে বেকারকেও বেহিসেবী হবার সুযোগ একদিন না হয় দিলেন। তারও একটা উল্লাস আছে। ফুরোবার ভয় যাদের নেই ফতুর হবার উত্তেজনা তারা জানে না।

শোভনা উত্তর না দিয়ে নিখিলের মুখের দিকে খানিক চেয়ে থেকেছে, তার দৃষ্টিতে বিস্ময় আর কৌতুকের সঙ্গে একটা নতুন কৌতূহলও বুঝি মেশানো। নিখিল বক্সীকে এই কিছুদিনের মধ্যে সামান্য একটু জানবার সুযোগ তার হ'য়েছে। কিন্তু যা জেনেছে তাতে সত্যিকার পরিচয় কিছুই কি ধরা পড়েছে? পড়ুক বা না পড়ুক সে পরিচয় জানবার বিশেষ কোন আগ্রহ তার ছিল ব'লে মনে হয় না। আজ কিন্তু সামনের মানুষটাকে শুধু একটা সাময়িক ধারণার ছাপ দিয়ে জীবনের অনেক পরিচয়ের ভিড়ে ঠেলে রাখতে পারা যাচ্ছে না, একটা জিজ্ঞাসা মনে জাগছে যা অগ্রাহ্য করবার নয়।

শোভনার উত্তর না দিয়ে শুধু চেয়ে থাকার ধরণে একটু অবাক্ হয়ে নিখিল বলেছে আবার—কই, কিছু বললেন না?

শোভনা প্রথমে এবার হেসে উঠেছে। তার পর সহজ হয়ে বলেছে—আপনাকে ফতুর করবার মত কিছু খাবার কথা ভেবে পাচ্ছি না। সুতরাং শুধু ঐ চা-ই থাক্। কিন্তু সত্যি এখন কি মনে হচ্ছে জানেন, সে রকম সম্বল থাকলে খুব একটা বাড়াবাড়ি-গোছের কিছু করতে পারলে মন্দ হ'ত না। নিত্যকার নিয়ম ভাঙা একটা উদ্দামতাও এক একদিন বোধহয় দরকার। এই খাওয়ার ব্যাপারই ধরুন না, এই একটা সামান্য রেস্তোরাঁতেই বা ব'সে আছি কেন? একটা খুব জমকালো নামডাকওয়ালা জায়গা, পয়সার যেখানে খোলামকুচির মত ছিনিমিনি হয় সেরকম একটা জায়গায় একদিন গিয়ে বেপরোয়া হতেই বা দোষ কি! গল্পে-উপন্যাসে সত্য-মিথ্যা পড়েছি, রাস্তায় যেতে যেতে দূর থেকে দেখে কল্পনা করেছি, কিন্তু সে রকম একটা জায়গায় কোন দিন যাবার ভাগ্য হয় নি, ভাগ্য হয় নি ব'লে যে মনে মনে ক্ষোভ হয়েছে কোন দিন তাও নয়, কিন্তু আজ যেন হচ্ছে। আজ আরও অনেক কিছুর জন্যে ক্ষোভ হচ্ছে, মনে হচ্ছে অনেক কিছুতেই ঠকেছি বড় বেশী, শুধু ঠকি নি, নিজেকেও ঠকিয়েছি···

বলতে বলতে হঠাৎ থেমে গেছে শোভনা।

বুকের চাপা অন্ধকার থেকে হঠাৎ ছিটকে আসা এ স্ফুলিঙ্গের সম্মান নিখিল রেখেছে নীরব সহানুভূতি দিয়ে।

একটু বাদেই আবার কৌতুকের রেখা ফুটে উঠেছে শোভনার মুখে। হেসে বলেছে—কোন নাটক থেকে মুখস্থ বললাম ভাবছেন ত? আচ্ছা আপনি কখনও নাটক করেছেন, মানে ষ্টেজে নেমেছেন অভিনয় করতে?

প্রসঙ্গ বদলাবার এ চেষ্টায় নিখিল সাহায্যই করেছে। বলেছে—তা নেমেছি বইকি! এবং দস্তুর মত হাততালি পেয়েছি, এখন ত মনে হয় পেশা হিসাবে ওইটে বেছে নিলে আজ আপনাকে সেই সব নামজাদা হোটেলেই নিয়ে যেতে পারতাম।

তাই যদি হ'ত তা হ'লে সঙ্গে নেবার লোকও হ'ত আলাদা, আপনার রাজ্যের ত্রিসীমানায় আমি আর থাকতাম কোথায়?

নিখিলের ইচ্ছে হয়েছে শোভনার কথাটাই ঘুরিয়ে বলে। বলে—আমাকে নিয়তি মানি কিনা জিজ্ঞাসা করেছিলেন। আমিও যদি সেই কথাই আপনাকে জিজ্ঞাসা করি, যদি বলি যে রাজ্যেই থাকি দেখা আমাদের হ'তই।

কিন্তু নিখিল সে ইচ্ছা চেপেই রেখেছে। তার বদলে সুরটাকে হাল্কা রেখে শোভনার কথাতেই সায় দিয়ে বলেছে—তা ঠিকই বলেছেন। সুতরাং কি হ'লে কি হ'ত সে কল্পনা করে লাভ নেই, তবে অভিনয় আমি সত্যিই করেছি, আপনি কখনও করেছেন?

হ্যাঁ করেছি, কলেজে পড়বার সময়, তবে খুব খারাপ অভিনয়, ষ্টেজে নেমে পার্ট ভুলে গেছলাম, প্রম্পটার চেষ্টা করেও খেই ধরাতে পারে নি। হলের লোকেরা প্রম্পটারের গলাই শুনতে পেয়েছে, আমার নয়। সমস্ত

প্র আমার জন্যে মাটি হয়ে গেছল। তার পর আর কোনদিন ও ধার মাড়াই নি।

নিখিলের মুখে হাসি, শোভনার মুখে আত্মসমালোচনার কৌতুক। আবহাওয়াটা কি বেশ সহজ স্বাভাবিক হয়ে এসেছে?

হ'লেও তেমন থাকে নি শেষ পর্যন্ত। ওপরে একটা ঝাবছা কুয়াশার আবরণ পড়েছিল মাত্র। সেটা হঠাৎ যেন আপনা থেকেই সরে গেছে।

বয়দের একজন কৃপা ক'রে দু' পেয়ালা চা টেবিলের ওপর রেখে যাবার পরই হাওয়াটা গেছে বদলে।

শোভনা পেয়ালাটা তুলে চা মুখে দিতে যাচ্ছিল, নিখিল হঠাৎ ব্যস্ত হয়ে বলেছে, দাঁড়ান, খাবেন না। চায়ে কি যেন পড়েছে মনে হ'চ্ছে।

শোভনা পেয়ালাটা নামিয়েছে।

হ্যাঁ, সত্যিই কি একটা পড়েছে। প্রথমে চায়ের পাতাই মনে হয়েছিল, কিন্তু চায়ের পাতা নয় একটা পোকা। বেশীক্ষণ আগে পড়ে নি। গরম চায়ের ভেতর পড়ে এখনও একটু ছটফট করছে।

মাছি ত নয়? ওতে কিছু হবে না। ব'লে শোভনা পেয়ালাটা কাৎ ক'রে ডিসের ওপর চায়ের সঙ্গে পোকাটা ফেলে দিয়ে আবার খাবে বলেই স্থির করেছে। কিন্তু তা আর সম্ভব হয় নি।

না, না, ও কি করছেন? ব'লে পেয়ালাটা টেনে নিয়ে নিখিল বলেছে—ওই পোকা-পড়া চা কি খায় না কি? আর এক পেয়ালা আনাচ্ছি দাঁড়ান।

আর এক পেয়ালা আনাবেন? কতক্ষণে? ব'লে শোভনা হেসেছে, তার পর হঠাৎ গম্ভীর হয়ে বলেছে, আবার আনালেই যে পোকা পড়বে না কি করে জানলেন? না, চা খাওয়া আমার ভাগ্যে নেই। আপনি ব'সে খান, আমি উঠছি।

সে কি! আহত বিস্ময়ে নিখিলের মুখ থেকে আপনা থেকেই কথাটা যেন বেরিয়ে গেছে।

শোভনা সত্যিই উঠে দাঁড়িয়েছিল। কিন্তু নিখিলের মুখের দিকে চেয়ে আর চলে যেতে পারে নি। তার দিকে তাকিয়ে একটু লজ্জিত বোধ ক'রেই বলেছে—এখন চলে যাওয়াটা খুব অভদ্রতা হবে, না? আচ্ছা, আমি বসছি। আপনি চা-টা খেয়ে নিন। কিন্তু আমার জন্যে আর চা আনাবেন না।

বেশ, তা আনাব না! নিখিল নিজের চায়ের পেয়ালাটাও সরিয়ে রেখে বেশ একটু দৃঢ় স্বরে বলেছে—কিন্তু আমার ক'টা প্রশ্নের জবাব না দিয়ে আপনিও উঠতে পারবেন না।

এটা কি জুলুম না কি? শোভনার স্বরে কৌতুক যেমন নেই তেমন বিরক্তিও নয়—আপনার প্রশ্নের জবাব আমি দিতে যাব কেন? আমি এখুনি উঠে চ'লে গেলে আপনি কি বাধা দেবেন?

না, তা দেব না। অধিকার থাকলেও দিতাম না। কিন্তু আপনিও এমন ভাবে চ'লে গিয়ে শান্তি পাবেন কি?

হ্যাঁ, আমার বিবেকে একটু লাগা উচিত। আপনাকে আমিই এক রকম এখানে টেনে এনেছি বটে। কি আপনার প্রশ্ন, বলুন শুনি?

বয় এসে টেবিলের পাশে দাঁড়াতে কথায় বাধা পড়েছে। নিখিল চায়ের পেয়ালা নিয়ে যেতে ব'লে আরও নতুন দু পেয়ালার অর্ডার দিয়েছে। একটু অদ্ভুত ভাবে দু'জনের দিকে চেয়ে পেয়ালা নিয়ে বয় চলে যাবার পর বলেছে—চা চেয়েছি, আপনাকে খাওয়াবার জন্যে নয়, এখানে বসবার ভাড়া হিসেবে।

আপনার প্রশ্নের উত্তর এক কথায় তা হ'লে দেওয়া যাবে না মনে হচ্ছে।—হাল্কা ভাবে বলবার চেষ্টা সত্ত্বেও শোভনার গলায় একটু তিক্ততার যেন আভাস পাওয়া গেছে :

কিছুক্ষণ নিখিল কোন জবাব না দিয়ে মাথা নিচু করে কি যেন ভেবেছে। তার পর মুখ তুলে শোভনার চোখের দিকে স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে বলেছে—আপনার সম্বন্ধে আমার মনের ভাব কি তা আপনি জানেন। প্রতিজ্ঞা যা ক'রেছিলাম তা রাখতে পারতাম কি না জানি না, কিন্তু আজ এমন আশাতীত ভাবে দেখা না হয়ে গেলে এ সব প্রশ্ন, বিশ্বাস করুন মনের মধ্যে চেপেই রাখতাম। কিন্তু আজ ভাগ্যই যখন এমন ভাবে সুযোগ দিয়েছে তখন ক'টা কথা আমি না জিজ্ঞাসা করে পারব না। আমি আগে যা বলেছি সে কথাটা ধরবেন না। আপনাকে জোর ক'রে কোন কথা আমি বলতে চাই না। তা বলা যায়ও না। আমার যা জিজ্ঞাসা করবার আমি করব। আপনার ইচ্ছা হয় উত্তর দেবেন, নইলে দেবেন না। তবে আপনাকে দেখে আজ আমার মনে হচ্ছে, কারুর কাছে নিজের ভেতরের কথা কিছু বলতে পারলেও আপনি যেন স্বস্তি পাবেন। আমাকে সেই রকম একজন বন্ধুই মনে করুন না যাকে বিশ্বাস ক'রে ঠকবার কোন ভয় কোনদিন নেই। পুরুষ বা নারী এ রকম কোন বন্ধু আপনার আছে বলে আমার মনে হ'চ্ছে না।

নিখিল চুপ করেছে, শোভনাও নীরব।

এ নীরবতা কি এক অস্পষ্ট আবেগে যেন স্পন্দমান।

দু'জনেরই মনে হয়েছে তারা যেন হঠাৎ এই ব্যস্ত কোলাহলমুখর পরিবেশ থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে।

ধীরে ধীরে শোভনার মুখের কঠিন রেখাগুলো কখন কোমল হয়ে এসেছে। সেই সঙ্গে ভেতরটাও বোধ হয়।

নিখিল তখনও কোন প্রশ্ন করে নি। শোভনা নিজে থেকেই বলতে সুরু করেছে—কি আপনার প্রশ্ন ঠিক জানি না। তবে আমার জীবনের কথাই আপনি জানতে চান মনে হচ্ছে, কি ক'রে এমন ভরাডুবিতে এসে পৌঁছলাম তাও বোধ হয় আপনার জিজ্ঞাস্য। কিন্তু কয়েকটা ঘটনা ছাড়া আর কিছুই ত আপনাকে বলতে পারব না। তা থেকে আপনি কি-ই বা বুঝবেন! আমি নিজেও বুঝতে পারি না কোথা থেকে, কেমন ক'রে এই পরিণামে এসে পৌঁছলাম।

শোভনা একটু থেমেছে। তার পর আবার যখন বলতে সুরু করেছে তখন তার গলার স্বর যেন বুকের গভীরতা থেকে উঠে এসেছে মনে হয়েছে।

নিখিলের দিক্ থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে শোভনা বলে গেছে—যাকে ভালবেসে বিয়ে করা বলে আমি তাই ক'রেছিলাম। এমন প্রচণ্ড স্রোত সেদিন আমায় টেনেছিল যে যত বড় বাধাই হোক আমি বোধ হয় অনায়াসে অগ্রাহ্য করতে পারতাম। বাধা অবশ্য তেমন কিছুই আসে নি। অভিভাবক বলতে ছিলেন শুধু আমার মা। তিনি মনে যদি কিছু ভেবে থাকেন, মুখে তা প্রকাশ করেন নি। আর আমার স্বামী, তিনি যেন শুধু আমার হাত ধ'রে টেনে নেবার অপেক্ষাতেই ছিলেন। সেদিন এত সহজে কেন তাঁকে জয় করতে পেরেছিলাম বুঝলে আজকের সর্বনাশের ইঙ্গিত বোধ হয় আমি পেতাম। কিংবা এ ধারণাও হয়ত আমার ভুল। ভাগ্য আমার ওপর নির্মম না হ'লে ওই মনের মেরুদণ্ডহীন মানুষটাকে নিয়েই জীবন আমি স্বচ্ছন্দে না হোক্ পরম সুখে কাটিয়ে দিতে পারতাম। কিন্তু তা হয় নি। আমাকে—আমাকে রাজরোগে ধরেছিল। তিন বছর আমি হাসপাতালে কাটিয়েছি আর তারই মধ্যে আমার স্বামী আবার যে বিয়ে করেছেন, এই সেদিন তা জানতে পেরেছি। নিজের চোখে আমার জায়গা যে দখল করেছে তাকে দেখেও এসেছি আজ। আর কি শুনতে চান, বলুন।

ধীরে ধীরে নিখিলের দিকে শোভনা মুখ ফিরিয়েছে এবার। গলা যত ভারীই হোক্ চোখ তার সজল নয়। কিন্তু সেই শুষ্ক চোখের দৃষ্টিতে এমন কিছু আছে যা হতাশার চেয়ে গভীর, আবার ঘৃণার চেয়ে তীব্র।

শুনতে আরও অনেক কিছুই চাই। বেশ কিছুক্ষণ চুপ ক'রে থেকে নিজেকে যেন তৈরী ক'রে নিয়ে বলেছে নিখিল,—যদি অধিকার দেন ত পরে সে সব শুনব। কিন্তু আজ যা জানতে চাই তা এই, যে কিছুক্ষণ আগে যাঁকে চিরকালের মত হারিয়ে যেতে দেবার কথা বলেছেন, তাঁকে মন থেকে মুছে ফেলতে পেরেছেন কি?

তা কি পারা যায়!

শোভনার গলাটা যেন একটু তীক্ষ্ণই শুনিয়েছে।

না, আমারই বলবার ভুল।—কুণ্ঠিত হয়েছে নিখিল,—কথাটা আমি ঠিক সাজিয়ে বলতে পারি নি। মুছে ফেলা নিশ্চয়ই যায় না। আমি বলতে চেয়েছি এই—এই হারিয়ে যেতে দেওয়া মানে কি আপনার নিজেরও সব কিছু হারিয়ে ফেলা। মানে, যে প্রচণ্ড স্রোত একদিন আপনাকে টেনেছিল বলেছেন আজও তাই কি আপনাকে পেছন থেকে সামনে ফিরতে দিচ্ছে না?

অত ঘুরিয়ে বলবার চেষ্টা করছেন কেন?—শোভনার গলায় এবার সহানুভূতির আভাসই পাওয়া গেছে।

শোভনা আরও কিছু বলবার আগেই কিন্তু নিখিল প্রতিবাদ না ক'রে পারে নি।

ঘুরিয়ে বলবার চেষ্টা ক'রছি না কথাটাই সোজা করে বলবার নয়। আর সোজা ক'রে বলতে গেলে যা বলতে চাই তা আরও বাঁকা হয়ে দাঁড়াবে।

শোভনা একটু চুপ করে থেকে ধীরে ধীরে বলেছে,—হ্যাঁ হেঁয়ালির মত শোনালেও কথাটা সত্যি। এমন অনেক কিছুই আছে যার সরল সহজ সার কথা বলা যায় না। আপনি যা জানতে চান তা আমি একেবারে বুঝি নি এমন নয়। কিন্তু আপনার প্রশ্নটা যেমন স্পষ্ট হওয়া সম্ভব নয়, আমার উত্তরটাও তাই। যে প্রচণ্ড স্রোত একদিন আমায় ভাসিয়ে নিয়ে গেছল তার বেগ আজ মনের মধ্যে কোথাও আছে বলে সত্যিই টের পাচ্ছি না, কিন্তু পিছনের একট মিথ্যে বাঁধন ছিঁড়ে গিয়েও যেন কোথাও জড়িয়ে আছে। বাঁধন নয় হয়ত সেটা তার দাগ মাত্র। তবু সেটা ভুলতেও পারছি না, মেনে নিতেও।

তার মানে মুখে যে সঙ্কল্পই করুন,—একটু বুঝি তিক্ত স্বরেই বলেছে নিখিল, মনে মনে সেই স্মৃতির বাঁধনেই বাঁধা থাকবেন!

শোভনা সোজা নিখিলের মুখের দিকে চোখ তুলে তাকিয়েছে এবার। তারপর দৃঢ় স্বরে বলেছে, না তা থাকব না। জীবনে ঠকেছি যত তার চেয়ে নিজেকে ঠকিয়েছি অনেক বেশী, এই ক্ষোভ যে অসহ্য হয়ে উঠেছে তা ত বলেই ফেলেছি। ঠকতে হয়ত পরেও পারি, কিন্তু নিজেকে আর ঠকাব না।···

হঠাৎ যেন চমকে লজ্জিত হয়ে শোভনা চুপ করে গেছে।

পাশের টেবিলের দুটি ছেলে ও একটি মেয়ের মধ্যে একটা তুমুল তর্ক হচ্ছে। এমন সোৎসাহে ও উচ্চকণ্ঠে সে তর্ক চলছে, যে না শুনে উপায় নেই। তর্কের বিষয় অতি সাধারণ। সিনেমার দুজন নায়িকার শ্রেষ্ঠত্ব নিয়ে বিচার। তর্ক যারা ক'রছে তাদের ধরণ দেখে মনে হ'চ্ছে পৃথিবীর ভবিষ্যৎই বুঝি তাদের বিচারের ফলাফলের ওপর নির্ভর করছে।

শোভনা কিছুক্ষণ শুনে হেসে বলেছে—আমরা এখানে কিরকম বেমানান বুঝতে পারছেন। বেমানান শুধু নয় এতক্ষণ ধরে যা বললাম সব যেন নিরর্থক বেসুরো। সত্যি কথা বলছি এই চারিধারে যাদের দেখছি তাদের মত সহজ স্বাভাবিক হয়ে সিনেমার ছবি কি মাঠের খেলা নিয়ে মেতে থাকতে পারলে আমি ধন্য হয়ে যেতাম।

চারিধারে যাদের দেখছেন তারাও হয়ত যাকে সহজ স্বাভাবিক মনে করেন, সবাই তা নয়। তাদেরও মনে কত জট, জীবনে কত কি সমস্যা হয়ত আছে।

তা থাক্‌ নিখিলের মৃদু প্রতিবাদে একটু অধৈর্যের সঙ্গেই শোভনা বলেছে, কিন্তু জীবনের মানে আর হৃদয়ের সত্য বোঝবার নিষ্ফল চেষ্টায় তারা নিজেদের নাকাল করে না। যা ধরা ছোঁয়া যায় তাই নিয়েই তাদের কারবার!

হঠাৎ এ প্রতিক্রিয়ার কারণটা একটু বুঝে নিখিল একটু হেসেছে।

শোভনার পরের অপ্রত্যাশিত অসংলগ্ন জিজ্ঞাসাটা কিন্তু তাকে চমকে দিয়েছে।

সে চাকরিটা সত্যিই চেষ্টা করলে পেতে পারি মনে করেন?

তা জানি না। তবে চেষ্টা করলে আশা আছে বলেই মনে হয়েছিল।—নিখিলের উত্তর দিতে একটু দেরী হ'য়েছে—কিন্তু হঠাৎ সে চাকরীর কথা মনে হ'ল কেন?

কেন বুঝতে পারছেন না? যা ধরা ছোঁয়া যায় তাই নিয়ে থাকতে হলে ওরকম একটা চাকরী সবার আগে দরকার! এখন কিন্তু উঠুন। এখানে বসবার ভাড়া যথেষ্ট উসুল হ'য়ে গেছে।

শোভনা উঠে দাঁড়িয়েছে। 'বয়'কে ডেকে চায়ের দাম চুকিয়ে আসবার সময় নিখিলের মনে হ'য়েছে, আশুবাবুর ভাড়াটে বাড়ীতে যার সঙ্গে প্রথম পরিচয় ও আজ যাকে নিয়ে এ রেস্তোরাঁয় ঢুকেছিল তার জায়গায় সত্যিই আর একটি মেয়ে যেন তার সঙ্গে চলেছে।

শোভনা সত্যিই আরেকজন হ'তে চেয়েছিল। চেয়েছিল অতীতকে মুছে ফেলে দিয়ে নয়, তাই থেকেই নতুন সত্তায় উত্তীর্ণ হবার বেগ সংগ্রহ ক'রে।

তার এই সঙ্কল্পে সাহায্য করবার জন্যেই পর পর কয়েকটি ঘটনা যেন ঘটে গেল।

প্রথম ঘটনা তার চাকরী পাওয়া।

সত্যিই শোভনা অপ্রত্যাশিত ভাবে কাজ পেয়ে গেল একটা। নিখিল বক্সী যে কাজের সন্ধান এনেছিল সেটা নয়। তবে সে চাকরীর আশায় না গেলে এ কাজের হদিশ মিলত না, আর দেখা হ'ত না জেনী-দির সঙ্গে।

জেনী-দির সঙ্গে দেখা হওয়াটাই সব চেয়ে বড় ঘটনা।

নিখিলের সন্ধান দেওয়া চাকরীর জন্যে দরখাস্ত করার কিছুদিন পরেই ইনটারভিউ এর ডাক পেয়ে শোভনা একটু উৎসাহিতই হয়েছিল, কিন্তু ইন্টারভিউ দিতে গিয়ে অন্য প্রার্থীনীদের চেহারা, পোসাক, চাল-চলন দেখে তার মন দমে গিয়েছিল সেইখানেই। সাজ পোশাক তার কিছু লজ্জা পাবার মত ছিল না অবশ্য। আশুবাবুর বদান্যতার সুযোগ এই একটিবার সে নিতে আপত্তি করে নি। পছন্দসই শাড়ি ব্লাউজ নিজে দেখে শুনে কিনে এনে ছিল, প্রসাধনেরও ত্রুটি করে নি। কিন্তু মস্ত বড় কোম্পানীর হাল ফ্যাশানের অফিসবাড়ীর যে ঘরটিতে তাদের জনে জনে ডাক পড়বার অপেক্ষায় বসতে বলা হয়েছিল, সেখানে পা দিয়েই বুঝেছিল চেহারা চটক পোষাক যদি চাকরী পাবার কারণ হয় তাহলে কোন আশাই তার নেই। ঘরের একটি কোনে অত্যন্ত কুণ্ঠিত হ'য়ে সে গিয়ে বসেছিল। একেবারে আধুনিক কায়দায় সাজানো ঘরের যান্ত্রিক পরিচ্ছন্নতার মধ্যেই যেন একটা উন্নাসিক অবজ্ঞা প্রচ্ছন্ন ব'লে তার মনে হয়েছিল।

অন্যান্য মেয়েরা নিজেদের মধ্যে আলাপ-সালাপ করছে—বাংলার চেয়ে ইংরাজি শব্দের প্রাধান্যই তাদের আলাপে বেশী। ইন্টারভিউ দিতে আসা যেন তাদের কাছে একটা হাসি তামাসার ব্যাপার। হয় ত আসলে তারাও শোভনার মতই মনেমনে শঙ্কিত, শুধু বাইরের

বেপরোয়া তাচ্ছিল্যের ভাবটা তার আবরণ মাত্র। কিন্তু এই আবরণটুকু দেবার ক্ষমতাও তার নেই।

সবচেয়ে খারাপ লেগেছিল একজনকে, মেয়ে না বলে তাঁকে মহিলাই বলা উচিত। সাজ পোষাকে একেবারে আধুনিকা। উগ্রতা না থাকলেও স্নিগ্ধতাও কোথাও নেই। বয়সটা মাজা ঘষা দেহের আঁটসাট রোগাটে গড়নে বোঝা না গেলেও দু'কানের ওপর চুলের রূপোলি ঝিলিকে আর চোখের কোলের কুঞ্চনে ধরা পড়ে।

চাকরীর সন্ধানে যারা এসেছে তাদের কয়েকজনের তিনি পরিচিত বোঝা যায়। জেনী-দি নামটা তাদের মুখেই প্রথম শুনেছিল। নামটা শুনে একটু বিস্মিত যেমন হয়েছিল তেমনি অকারণে একটা বিদ্বেষও অনুভব করেছিল মনের মধ্যে। বিদ্বেষটা বোধহয় জেনীদির কোন কিছুই যেন, গ্রাহ্য না করা একটা হাল্কা প্রগলভতায়। সবটাই শোভনার কৃত্রিম মনে হ'য়েছিল। কথাবার্তার মধ্যে একটা বেহায়াপনার আভাসও তাকে পীড়িত করেছে। যেমন একটি মেয়ে ক্ষোভের ভাণ করে বলেছে, —আপনি এখানে এলে আমরা কোথায় যাই বলুন ত জেনীদি? কোথায় বাঘ ভালুক শিকার করবেন না, আমাদের সঙ্গে ইঁদুর বেড়াল মারতে এসেছেন? জেনীদি হতাশার ভঙ্গী করে বলেছে, হায় রে ইঁদুর বেড়ালও যে আর এই ভোঁতা তীরে বেঁধে না। নেহাৎ স্বভাব দোষে আসি।

কিছুক্ষণ অত্যন্ত অস্বস্তির সঙ্গে বসে থেকে হঠাৎ সে উঠে পড়েছিল। এখানে সাক্ষাৎকারের অপেক্ষায় বসে থেকে কোন লাভ নেই তখন সে বুঝে নিয়েছে, তার চেয়ে নিজের মান বাঁচিয়ে চলে যাওয়াই ভালো।

ঘরের দরজা দিয়ে বার হবার লম্বা করিডর। সে করিডরের দু'প্রান্তে নিচে নামবার লিফ্‌ট ও সিঁড়ি।

কোন দিকের সিঁড়িটা কাছে হয় ঠিক করে নিয়ে কয়েক পা যেতে না যেতেই পেছন থেকে কে বলে উঠেছিল—সে কি! আপনি যাচ্ছেন কোথায়?

ইন্টারভিউ দিতে এসে নিজের খুশিতে চলে যাওয়া আইনের চোখে অপরাধ নিশ্চয় নয়, তবু শোভনার মনে হয়েছিল দারুণ একটা অন্যায় করতে গিয়ে সে যেন ধরা পড়ে গেছে।

চমকে বিবর্ণ মুখে ফিরে তাকাবার পর তার কিন্তু বিস্ময়ের সীমা ছিল না।

ঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে জেনীদিই তাকে ডাকছেন। শোভনার কিছু বলবার মত অবস্থা তখন নয়।

জেনীদিই তার কাছে এগিয়ে এসে ঈষৎ হেসে বলেছিলেন—পালিয়ে যাচ্ছিলেন বুঝি?

কথাটা নয় জেনীদির মুখের হাসিটাই শোভনাকে অবাক্ ক'রে দিল বেশী, ওই পালিশ করা রং লাগানো মুখে এমন স্নেহ ও সহানুভূতির হাসি ফুটতে পারে শোভনা ভাবতে পারে নি।

শোভনা তখনও কিন্তু বলবার মত কিছু খুঁজে পায় নি।

জেনী-দি অসঙ্কোচে তার পিঠে হাত দিয়ে হেসে বলেছিলেন—প্রথম প্রথম ওই রকম পালাবার ইচ্ছেই হয়। তা ছাড়া আমাদের ধরণ-ধারণ দেখেও ভড়কে গিয়েছিলেন নিশ্চয়।

না,—বলে শোভনা একটু মৃদু প্রতিবাদ করতে গেছল। জেনী-দি তাকে থামিয়ে বলেছিলেন—লুকিয়ে লাভ কি ভাই। নিজেদের কি আমরা চিনি না। তবে এক হিসেবে পালিয়ে এসে ভালই করেছেন। আপনার কি আমার, ওখানে কোন আশাই নেই।

জেনীদির সঙ্গে নিজের কোন স্বাধীন ইচ্ছা ছাড়াই শোভনা তখন কাছের সিঁড়িটার দিকে চলতে সুরু ক'রেছে। এতক্ষণে নিজেকে সে কিন্তু অনেকটা সামলে নিতে পেরেছে। তাই স্পষ্ট করেই জিজ্ঞাসা ক'রতে পেরেছিল,—আপনার কোন আশা নেই কেন বলছেন?

জানি বলেই বলছি।—জেনী-দি সিঁড়ি দিয়ে না নেমে লিফ্‌টের সামনে দাঁড়িয়ে পড়ে বোতাম টিপছিলেন।

লিফ্‌ট উঠে আসবার পর লিফ্‌টম্যান দরজা খুলে দিতে শোভনার সঙ্গে ভেতরে ঢুকে আগের কথার জের টেনে বলেছিলেন—তবু কেন মরতে এসেছিলাম মনে ভাবছেন নিশ্চয়। ওটা অভ্যাস কিংবা নেশাও বলতে পারেন। নইলে আগে থাকতেই জানি এই বিজ্ঞাপন দিয়ে ইন্টারভিউ-এ ডাকাটা একটা চোখে ধুলো ছাড়া কিছু নয়। কে কাজ পাবে আগেই ঠিক হয়ে আছে, শুধু বাইরের ঠাট্ বজায় রাখবার জন্যে এই সব ব্যবস্থা।

লিফট নিচে নামবার পর তা থেকে বেরিয়ে অফিস বাড়ির দরজার কাছে এসে জেনীদি হেসে বিদায় নিয়ে বলেছেন—চলি ভাই। আবার হয়ত কোথাও ইন্টারভিউ-এ দেখা হ'তে পারে।

জেনীদি চলে যাবার পর তাঁকে এগিয়ে যাবার একটু সময় দেবার জন্যই শোভনা সেখানে দাঁড়িয়ে পড়েছিল। সামান্য কয়েক মিনিটের আলাপে একটা মানুষের

কতটুকুই বা জানা যায়। তবু প্রথম দর্শনের পর যে ধারণা তার হ'য়েছিল জেনী-দির ক্ষণিকের পরিচয় যে তা ভেঙে দিয়েছে এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। আশা নেই জেনেও জেনী-দির মত মানুষের এই কাজের চেষ্টায় আসা ও ইণ্টারভিউ না দিয়েই চলে যাওয়ার রহস্য সম্বন্ধে কৌতূহল অবশ্য মেটাবার নয় বলেই মনে হয়েছিল।

সে কৌতূহল মেটবার সুযোগ অমন ভাবে মিলবে শোভনা ভাবে নি।

অফিস থেকে বেরিয়ে ফুটপাথে নামতে না নামতেই দেখা গেছল জেনী-দি তার দিকেই ফিরে আসছেন।

যেতে গিয়ে ফিরে এলাম ভাই! জেনী-দি কাছে এসে হেসে বলেছিলেন—আপনি কোথায় যাবেন জিজ্ঞেস করতেই ভুলে গেছি। আসুন না আমি পৌঁছে দিই। যেতে যেতে যেতে আর একটু আলাপ করাও যাবে।

পৌঁছে দেবার কথায় একটু বিব্রত বোধ ক'রে শোভনা মৃদু প্রতিবাদ করেছিল—না না আপনি পৌঁছে দেবেন কি! আমি আমি অনেক দূরে থাকি!

আহা! দূরে মানে ত হিল্লী দিল্লী নয়। আমার সঙ্গে যেতে আপত্তি না থাকে ত চলুন।

না, না আপত্তি কিসের!—লজ্জিতভাবে বলতে হয়েছে শোভনাকে। কিন্তু আপনাকে অকারণে এত কষ্ট দিতে…

কষ্ট আমি সাধ করে যখন নিচ্ছি তখন আর কথা নয়। বলে জেনী-দি শোভনাকে আর কিছু বলতে দেন নি।

শোভনাকে বিনা প্রতিবাদেই জেনী-দির সঙ্গে যেতে হয়েছে কিন্তু কিছুদূর গিয়ে ফুটপাথের ধারে একটি গাড়ির দরজা যখন খুলে ধরেছেন তখন বিস্ময় বিহ্বল হয়েই প্রথমটা গাড়িতে চড়তে তার পা ওঠে নি।

গাড়ি অবশ্য এমন কিছু নয়। পুরোন মডেলের একটা 'টুরার'। জেনী-দি নিজেই তার চালিকা।

কিন্তু এরকম একটা গাড়িও তাঁর চালাবার সংস্থান আছে, সেরকম একজন জেনী-দির দরের মহিলা কেন যে সামান্য একটা চাকরীর সন্ধানে ধরনা দিতে আসেন, আবার ফলাফলের জন্যে অপেক্ষা না ক'রেই নিজে থেকে কেনই বা চলে যান এ রহস্যের কিছু হদিস সেদিন জেনী-দির পাশে বসে যেতে যেতেই শোভনা পেয়েছিল।

জেনী-দির সঙ্গে সেদিনের সেই দৈবাৎ পরিচয়ই তার পর কয়েকদিনের মধ্যে অত্যন্ত গাঢ় অন্তরঙ্গতায় কি ক'রে যে পৌঁচেছে তা শোভনা নিজেই বলতে পারবে না।

শিক্ষা, দীক্ষা অবস্থা ও সামাজিক পরিবেশের গভীর ব্যবধান সত্ত্বেও কোন এক গভীর আত্মীয়তার ভিত্তি যেন তাদের মধ্যে প্রচ্ছন্ন ছিল।

শোভনার নতুন মোড় ফেরা জীবনে জেনী-দির আবির্ভাবও যেন ভাগ্যের একটা গূঢ় সঙ্কেত বহন ক'রে এনেছে।

আগামী সংখ্যায় সমাপ্য
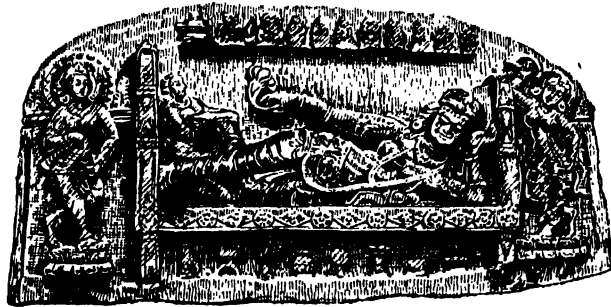
এব্রাহাম লিংকন

শ্রীকমলা দাশগুপ্ত

ভূমিকা

W. M. Thayer লিখিত এব্রাহাম লিংকন-এর জীবনী পড়েছিলাম। পেয়েছিলাম আমেরিকার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস, Abraham Lincoln Speaks, প্রভৃতি কয়েকখানা বই। এ সব পড়তে এত ভাল লেগেছিল যে, মনে হ'ত এব্রাহাম লিংকন যেন কোথাও আমাদের বিদ্যাসাগরকে ছুঁয়ে রয়েছেন। দারিদ্র্যের নিষ্পেষণে, মেধায়, প্রতিভার স্ফুরণে, হৃদয়ের প্রসারতায় এবং জাতির জন্য শক্ত ভিত্তিপ্রস্তর গঠন করতে লিংকন এবং বিদ্যাসাগর যেন এক-ধাতুতে গড়া দু'টি ভাই। দু'টি ভাই-ই যেন প্রায় একই সময়ে পৃথিবীর দুই প্রান্তে দাঁড়িয়ে মাথার ঘাম পায়ে ফেলছিলেন। আরও মনে হয়েছিল লিংকনের সঙ্গে যেন আমাদের মহাত্মা গান্ধীর মিল আছে। গান্ধীজীর প্রেম ও ক্ষমা, সত্য ও সততা বিরাজ করছে লিংকনের মধ্যে। গান্ধীজী ছিলেন ভারতের জাতির পিতা বাপুজি। আমেরিকায় তেমনি ছিলেন পিতা এব্রাহাম। পিতার ন্যায় স্নেহ ছিল তাঁদের জাতির সৈনিকদের প্রতি, উদার ক্ষমা ছিল তাঁদের অন্তর পরিপূর্ণ ক'রে। অন্যদিকে দুর্যোগের অন্ধকারে দৃঢ় হাতে জাতিকে শক্ত ক'রে ধ'রে এগিয়ে চলেছিলেন দু'জনেই—দু'জনেই জাতীয় স্বাধীনতা-সংগ্রামের সর্বাধিনায়ক দু'জনকেই গোঁড়া আততায়ী গুলী ক'রে হত্যা করে। গান্ধীজীকে হত্যা করেছিল গোঁড়া এক সাম্প্রদায়িকতাবাদী, এব্রাহাম লিংকনকে নিহত ক'রে এক গোঁড়া দাসপ্রথা-সমর্থক। গান্ধীজী মৃত্যু দিয়েও সাম্প্রদায়িকতা দূর করতে চেয়েছেন, এব্রাহাম লিংকন নিজের প্রাণের মূল্য দিয়েও দাসপ্রথা উচ্ছেদ করেছেন। এই মহামানবদের স্মরণ করতে গিয়ে ইচ্ছে করল এব্রাহাম লিংকন সম্বন্ধে একটু লিখে শ্রদ্ধা নিবেদন করি। তাই এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা।

দুর্গম পথ

এব্রাহাম লিংকনের পূর্বপুরুষদের দুঃসাহসিক জীবনের যে ছোট্ট একটু ইতিহাস আছে, সে কাহিনী উল্লেখ করার মত। এব্রাহামের পিতা ছিলেন টমাস লিংকন। আমেরিকার কেন্টাকি প্রদেশের সুজলা সুফলা ভূমির খ্যাতি শুনে টমাস লিংকনের পিতা চ'লে আসেন সেখানে বসবাস করতে ১৭৮০ খ্রীষ্টাব্দে। সেই সময়ে এবং তার প্রায় একশত বছর আগে থেকে আমেরিকার সমস্ত উত্তর-পশ্চিম অংশ জুড়ে রেড ইণ্ডিয়ানরা শ্বেতাঙ্গদের ভয়ঙ্কর শত্রু ছিল। টমাস লিংকনের পিতা আত্মরক্ষার জন্য সর্বদাই সঙ্গে রাইফেল রাখতেন। কেন্টাকিতে এসেছেন তিনি চার বছর আগেই। একদিন তিনি ক্ষেতের বেড়া বাঁধছিলেন। ছয় বছর বয়স্ক পুত্র টমাস সঙ্গেই ছিল। অন্য দুই পুত্র কাছেই অন্য ক্ষেতে কাজ করছিল। টমাসের পিতা যখন একমনে বেড়া বাঁধছিলেন, তখন একদল রেড ইণ্ডিয়ান গুপ্তস্থান থেকে অতর্কিতে তাঁকে গুলী করে। তৎক্ষণাৎ তাঁর মৃত্যু হয়। টমাসের ভাইরা ছুটে এসে একদল বসতিস্থাপনকারীর সাহায্যে রেড ইণ্ডিয়ানদের মাথা লক্ষ্য ক'রে গুলী ছুঁড়তে লাগল। রেড ইণ্ডিয়ানরা তাদের একটি মৃত এবং একটি আহত সাথীকে ফেলে রেখে পালিয়ে গেল।

এব্রাহামের পিতামহের পরিবারে সেদিন বিষণ্ণতম দিন ঘনিয়ে এসেছিল। কে তাদের রক্ষা করবে? কে খাওয়াবে? দারিদ্র্যের কশাঘাত থেকে কে এই অসহায় পরিবারটিকে বাঁচাবে? এই চাঞ্চল্যকর কাহিনী এব্রাহাম তাঁর পিতা টমাস লিংকনের কাছ থেকে শুনতেন শত শত বার। পিতামহের দুঃসাহসিক জীবনযাত্রার টুকরো টুকরো কাহিনী এব্রাহামের হৃদয়ে খোদাই ক'রে ব'সে গিয়েছিল, তাঁর জীবনকে যেন তিলে তিলে তৈরী ক'রে চলেছিল। তাঁর মনে হ'ত, তাঁর নিজের জীবনে যত দুঃখ এবং দারিদ্র্যই আসুক না কেন, তাঁর পিতামহের পরিবারের জীবনের চাইতে তা অনেক ভাল, অনেক সহনীয়।

টমাস লিংকন লেখাপড়া কিছু শেখেন নি। সুযোগ হয় নি। ঝড়ের বেগে ঘুরে বেড়াতে তিনি ভালবাসতেন। ক্ষুধার তাড়নায় বহুস্থান ঘুরতে ঘুরতে অবশেষে ২৬ বছর বয়সের সময় এলিজাবেথ টাউনে র কেজাসেফ হ্যাঙ্ক্স্ নাম

একজন কাঠের মিস্ত্রীর কাছ থেকে তিনি কাঠের কাজ করতে শেখেন।

পরে জোশেফ হ্যাঙ্ক্‌স্‌-এর ভাগ্নী নান্সি হ্যাঙ্ক্‌স্‌কে তিনি বিবাহ করেন। জীবনের প্রধান সম্পদরূপে তিনি স্ত্রীকে পেলেন। টমাসের অশান্ত, দুর্দান্ত জীবন স্ত্রীর প্রভাবে শান্ত হয়ে গিয়েছিল।

টমাস লিংকনের পুত্র এব্রাহাম লিংকন কেন্‌টাকি প্রদেশের হার্ডিন কাউন্টি নামক স্থানে ১৮০৯ খ্রীষ্টাব্দে ১২ই ফেব্রুয়ারী জন্মগ্রহণ করেন। যে জরাজীর্ণ কুটিরে তিনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন তা'তে কোন জানালা-দরজা ছিল না, মেঝেটাও ঠিকমত তৈরী ছিল না। ভাঙাচোরা ঘুপ্‌চি এই ঘরে কোনমতে টমাস তাঁর পরিবার নিয়ে বাস করতেন।

এব্রাহামের ডাক নাম ছিল এব্‌। পিতামাতা পুত্র এব এবং কন্যা সারা দু'জনকেই লেখাপড়া শেখাতে চাইলেন। স্কুল যাও বা ছিল সেখানে, শিক্ষকরা নিজেরাই কিছু জানতেন না। এব্‌ এবং সারা প্রথমে গেলেন রিণের স্কুলে। রিণে নিজে পড়তে পারতেন কিন্তু লিখতে বা অঙ্ক কষতে জানতেন না। এব্‌ ও সারা কয়েক মাসের মধ্যেই পড়তে শিখে গেল। তার পর হ্যাজেলের স্কুল থেকে তারা লিখতে শিখল। প্রতিদিন মাইল-চারেক হেঁটে শুকনো রুটি সঙ্গে নিয়ে স্কুলে যেত দু'টি ভাইবোন। আট-দশ সপ্তাহের মধ্যেই এখানে যা শেখার ছিল, তা তা'রা শিখে নিল।

লিংকনের পরিবারে তিনখানি বই ছিল। একখানি বাইবেল, একখানি প্রশ্নোত্তরমালার বই, আর একখানি বানান শেখার বই। মা বাইবেল প'ড়ে যেতেন, বালক এব্রাহাম মন দিয়ে শুনত। তখনও এব পড়তে শেখে নি। পড়তে শিখে সে নিজেই পড়ত। বাইবেলের বহু কাহিনী তার একেবারে রপ্ত হয়ে গিয়েছিল।

হয়ত এই বিশেষ গ্রন্থখানি এব্রাহামের জীবনকে সাধুতা এবং মহান্‌ আদর্শে প্রণোদিত করেছিল, ন্যায়পথের সন্ধান দিয়েছিল, ভগবানের প্রতি নির্ভরতা এনেছিল, বৃহত্তর জীবনের পাথেয় হয়ত তিনি এখান থেকেই পেয়েছিলেন।

১৮১৬ সালে টমাস লিংকন ইণ্ডিয়ানা নামক ষ্টেটে চ'লে যান। সেটা ছিল দাসপ্রথারহিত ষ্টেট। টমাস কাঠের কাজ জানতেন। নিজেই নৌকা তৈরী ক'রে ফেললেন। এব্‌ তা মন দিয়ে দেখলেন। প্রথমে টমাস একাই মাল রেখে আসতে চললেন। ওহিও নদী দিয়ে ব'য়ে যাবার সময় নৌকা উল্টে গেল টমাসকে নিয়ে। তীরে যাঁরা দাঁড়িয়ে ছিলেন তাঁরা নদীতে ঝাঁপিয়ে প'ড়ে নৌকা সোজা ক'রে দিলেন এবং নদীর ভিতর থেকে কয়েকটা কুড়াল এবং কয়েকটা হুইস্কির পিপা উদ্ধার ক'রে দিলেন।

নৌকা এসে যেখানে ভিড়ল সেখান থেকে আঠারো মাইল রাস্তা গিয়ে তবে পাবেন তিনি তাঁর গন্তব্যস্থল স্পেন্সার কাউন্টি। টমাস লিংকন এবং তাঁর সাহায্যকারী ব্যক্তিটি কুড়াল দিয়ে জঙ্গল কেটে কেটে অগ্রসর হ'তে লাগলেন। জঙ্গলের যেন শেষ নেই। যুক্তরাষ্ট্র আমেরিকা যাঁরা গ'ড়ে তুলেছিলেন, টমাস লিংকনের মত দুঃসাহসিক লোকেরা ছিলেন তাঁদের এক-একজন অগ্রদূত বা পায়োনিয়ার। স্পেন্সার কাউন্টির বসতিগুলি ছিল বহু দূরে দূরে। এক-একটি পরিবার, কেউ দুই মাইল, কেউ চার মাইল, কেউ আট দশ মাইল দূরে থাকতেন। তবু এঁরা পরস্পরকে প্রতিবেশী মনে করতেন।

আপন স্ত্রী-পুত্রকে নিয়ে যেতে টমাস আবার ফিরে এলেন কেন্‌টাকিতে একশত মাইল পায়ে হেঁটে। এব্রাহাম মন দিয়ে শুনলেন পিতার ওহিও নদীতে নৌকা উল্টে যাওয়া এবং জঙ্গল কেটে রাস্তা ক'রে নেবার কাহিনী।

দু'টি ঘোড়া এল, বাকী মালসমেত তাঁরা রওনা হলেন। রাত্রির বিশ্রাম ছিল তারায় ভরা খোলা আকাশের নীচে কম্বল বিছিয়ে। গ্রামে পৌঁছে দুই মাইল দূরের প্রতিবেশীর সাহায্যে তাঁরা ঘর বাঁধলেন ১৮১৬ সালে।

শৈশবে ৭।৮ বছর বয়সের এই কঠিন দুর্গম যাত্রা এব্রাহামকে ভবিষ্যতে কঠিনতর জীবনে অগ্রসর হবার জন্য দুর্দ্ধর্ষ, সাহসী, নিরলস, উৎসাহী, কষ্টসহিষ্ণু হ'তে শিক্ষা দিয়েছিল। এই সময় থেকে পূর্ণবয়স্ক হওয়া পর্যন্ত প্রতি-দিন তিনি কুড়ালের কাজ ক'রে চলেছিলেন। লোহার মত শক্ত শরীর গ'ড়ে উঠেছিল। দক্ষ কাঠুরিয়া ব'লে তাঁর নাম ছড়িয়ে পড়েছিল। পরবর্তী জীবনে যখন তিনি আমেরিকার প্রেসিডেণ্ট পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন এবং তিনি যখন যুদ্ধের (war of the rebellion) কর্ণধার ছিলেন, সেই সময় তিনি একটি হাসপাতাল পরিদর্শন করতে গিয়েছিলেন। হাসপাতালে তিন হাজার রুগ্ন এবং আহত সেনার চিকিৎসা হচ্ছিল। প্রেসিডেণ্ট এব্রাহাম প্রতিটি সৈনিকের সঙ্গে করমর্দন করেন। তাঁর বন্ধুরা ভাবলেন, প্রেসিডেণ্টের হাত বুঝি অবশ হয়ে যাবে।

এব্রাহাম বললেন—আমার বাল্যের কঠিন জীবনযাত্রা আমার হাতের পেশীকে শক্ত ক'রে গড়েছে। এই ব'লে বেরিয়ে এসে তিনি সামনের একটা মস্ত ভারী কুড়াল নিয়ে একটা কাঠের গুঁড়ি জোরে জোরে কাটতে লাগলেন, কাঠের কুচিগুলি তীর বেগে ছিট্‌কে ছিট্‌কে ছড়িয়ে পড়ছিল। তার পর ডান হাতখানা ভারী কুড়াল-শুদ্ধ ঘুরিয়ে সামনে ধরলেন, সোজা ক'রে, হাত একটুও কাঁপল না। পরে কাঠের কুচিগুলিকে হাসপাতালের একটি কর্মী সযত্নে তুলে রেখে দিল। পিতা এব্রাহামের হাতের কাটা কাঠের কুচি যে!

নতুন বাসস্থানে গিয়ে প্রথমে টমাস একটি তিনদিক্‌-বন্ধ তাঁবু খাটালেন। শীত প্রায় এসে গিয়েছিল। পরের বছর বসন্তকালে ঘর বাঁধবেন স্থির হয়, শীতকালটা এবার খুব কষ্টেই কাটবে—কিন্তু উপায় নেই, শীতের আশ্রয়ের এবং ক্ষুধার কষ্ট সবই তাঁরা সহ্য ক'রে নিয়েছিলেন। পরের বসন্তে ১৮১৭ সালে তাঁরা একটি কাঠের বাড়ী তৈরী ক'রে ফেললেন, কাঠের মেঝের ফাঁকগুলি কাদা দিয়ে ভ'রে দেওয়া হ'ল, ঘরের আসবাবপত্র পিতাপুত্র মিলে তৈরী করে ফেললেন, কাঠের কুঁদো কেটে কেটে খাট, টেবিল, টুল ইত্যাদি তাঁরা সন্ধ্যার আগেই সম্পূর্ণ তৈরী ক'রে নিলেন। ঐ বিছানা, টেবিল এবং টুল দিয়ে সেদিন যে-ঘর তাঁরা বেঁধেছিলেন তাতে এব্রাহাম তাঁর জীবনের বারো বছর কাটিয়ে দিয়েছিলেন।

ক্ষেতের শস্যকে ভাঙিয়ে আটা বানাতে ১৮ মাইল দূরের মিলে যেতে হ'ত, কাজেই একদিন পিতাপুত্র মিলে একটা বেশ মোটা দেখে গাছ কেটে ফেললেন। গাছের গুঁড়িটার মাথার দিকে আগুন দিয়ে পুড়িয়ে গর্ত ক'রে নিলেন, আর বাইরে জল ঢালতে লাগলেন, যেন গুঁড়ির বাইরেটা পুড়ে না যায়। আর-একটা কাঠের ডাণ্ডা বানিয়ে নেওয়া হ'ল। এব্রাহাম পিতার কাছ থেকে উদূখল বা হামানদিস্তা তৈরী করতে শিখলেন, ওহিও নদীতে অন্যান্য যন্ত্রপাতির সঙ্গে তাঁদের আটা-পেষা যাঁতাটা ডুবে গিয়ে কিছু ক্ষতি করতে পারে নি।

বড় বড় গাছ এবং জঙ্গলে ঘেরা ছিল তাঁদের বাড়ীটা, জঙ্গলে মোরগ, হরিণ এবং শূকরের অভাব ছিল না। বন্দুক দিয়ে এব্রাহাম সেগুলি মেরে আনতেন, এভাবে লক্ষ্যভেদ করতে শেখাও হ'ত, আবার খাদ্যও পেতেন।

এব্রাহাম লেখাপড়া ছাড়েন নি, রাতে বাতি ছিলও না, দরকারও হ'ত না, মস্ত বড় কাঠের কুঁদো জ্বালিয়ে রেখে বাতির কাজ, পড়ার কাজ সবই করতেন। এব্রাহাম কাঠকয়লা দিয়ে গাছের ছালের উপর, কাঠের তক্তার উপর এবং শীতকালে বরফের উপর নিজের নাম লিখতেন।

এব্রাহামের মা বলতেন মদ্যপান কখনও আরম্ভ ক'রো না, আরম্ভ করলে তবে ত মাতাল হবার ভয়। পরবর্তী জীবনে এব্রাহাম জনসাধারণের কাছে নির্ভয়ে এবং সগৌরবে ঘোষণা করেছেন যে, মায়ের উপদেশ মেনেছেন ব'লেই তিনি চিরজীবন মদত্যাগী। ছোটবেলার কঠিন জীবনযাত্রা ভবিষ্যৎ এব্রাহামের জীবন ও চরিত্র গঠন ক'রে চলেছিল, দারিদ্র্য এবং অখ্যাতজীবন গ'ড়ে তুলেছিল এক মহামানবকে।

১৮১৮ সালে এব্রাহামের মায়ের মৃত্যু হয়। টমাস লিংকন নিজের হাতে কফিন তৈরী ক'রে বাড়ীর কাছেই তাঁকে সমাধিস্থ করলেন, মায়ের মৃত্যু এব্রাহামের জীবনে গভীর দুঃখ বহন করে এনেছিল, শোক এবং নিঃসঙ্গতা তাঁকে পীড়িত ক'রে তুলেছিল. তাঁর পিতা তাঁকে একদিন "পিলগ্রিম্‌স্‌ প্রোগ্রেস" নামে বইখানি এনে দিয়ে বললেন তাঁকে প'ড়ে শোনাতে, বইয়ের গল্পে আছে একজন সাধু এবং ধর্ম-পরায়ণ ব্যক্তি কত কষ্ট ক'রে, কত দুর্লঙ্ঘ্য বাধাবিঘ্ন অতিক্রম ক'রে, অত্যন্ত ভারী বোঝা পিঠে নিয়ে এগিয়ে চলেছেন, তিনি শ্রান্ত তবু স্থির ভাবে অভীষ্ট লক্ষ্যের দিকে ধীরে ধীরে এগিয়ে চলেছেন, এবং শেষ পর্যন্ত তাঁর লক্ষ্য এবং কাম্য স্বর্গদ্বারে গিয়ে তিনি পৌঁছেছেন। এই গল্প এব্রাহামের মনে গভীর ছাপ রেখে যায়, অলক্ষ্যে তাঁর চরিত্র গঠন করে। কয়েকদিন পরে পিতা টমাস লিংকন এনে দিলেন তাঁকে ঈসপ্‌স্‌ ফেব্‌ল্‌স্‌, বইখানি। বই দু'খানি মনেরআনন্দে পড়তে পড়তে এব্রাহামমুখস্থ ক'রে ফেললেন। কাজের ফাঁকে ফাঁকে এবং রাত জেগে তিনি বই পড়তেন, রবিন্‌সন্‌ ক্রুশো এবং ওয়াশিংটনের জীবনী পড়েছেন তিনি মুগ্ধ হৃদয়ে, কিন্তু যে কোন কিষাণ চোদ্দ-পনেরো বছরের এই কিশোর বালককে সানন্দে ভাড়া খাটাতে নিয়ে যেত, কারণ এই কিশোর যত কাঠ কেটে দেবে, যত কাঠের কুঁদো বহন করবে তার অর্দ্ধেক কাজও মালিকরা নিজেরা করে উঠতে পারত না। কিন্তু পড়াশুনার মধ্যেই ফিরে যেতে চাইত এব্রাহামের মনটা।

কিষাণদের মধ্যে কাজ করবার সময় কিষাণপত্নীরা এব্রাহামকে 'ক্ষিপ্রহাত' বলতেন। আগুন জ্বালাতে, জল তুলতে, কাঠ বহন করতে, বাচ্চা রাখতে এব্রাহাম অত্যন্ত দক্ষ ও চটপটে ছিলেন। ভবিষ্যৎ জীবনের জন্য

দ্রুতগতিতে কাজ ক'রে যাবার শিক্ষা ছোটবেলাই তাঁর হয়েছিল।

১৮১৯ সালের শেষে বিধবা মিসেস জন্‌সন্‌কে টমাস লিংকন বিবাহ করেন। মিসেস জন্‌সনের তিনটি সন্তান ছিল। সকলে মিলে একত্রে কুটিরে তাঁরা বাস করতে থাকেন। নতুন গৃহকর্ত্রী বাড়ীঘর নতুন ক'রে সাজিয়ে নিলেন। কুটিরের মেঝে তৈরী করালেন। জানালা-দরজা বসিয়ে নিলেন। শুধু তাই নয় তিনি ভাল লেখাপড়া-জানা শিক্ষিতা মহিলা ছিলেন।

নতুন মা এসে এব্রাহামের মন জয় ক'রে নিলেন। লেখাপড়া শিখতে এব্‌ উৎসাহ পেতে লাগল। তার সমস্ত ইচ্ছাই নতুন মা পূরণ করেছেন। নতুন-মা এব্‌-এর মধ্যে অসাধারণ প্রতিভার সন্ধান পেয়েছিলেন। সেই প্রতিভা বিকশিত করবার জন্য তাঁর চেষ্টার ত্রুটি ছিল না।

মায়ের ঐকান্তিক ইচ্ছায় এবং পিতার আগ্রহে এব্‌ ১৮২৩ সালে এণ্ড্রু ক্রফোর্ডের স্কুলে ভর্তি হয়। ক্রফোর্ড ছাত্রকে চিনে ফেলেছিলেন। তিনি টমাস লিংকনকে বলতেন, এব্‌ সবকিছু জানতে এবং বুঝতে চায়। একদিন এব্‌ এই জঙ্গলের জীবন, কাঠুরিয়ার জীবন কাটিয়ে উঠবে। সমস্ত বাধাবিঘ্ন পার হয়ে নিজেকে সে প্রতিষ্ঠিত করবে।

দেওয়ালে গাঁথা একটা হরিণের শিং কেউ ভেঙে ফেলেছিল একদিন। ক্রফোর্ড ছেলেদের ডেকে গম্ভীর গলায় জিজ্ঞেস করলেন, কে এই কাজ করেছে? এব্‌ তৎক্ষণাৎ জবাব দিয়েছিল, 'আমি।' নিজের দোষ ঢাকবার চেষ্টা সে করে নি। এব্‌ ওয়াশিংটনের জীবনী পড়েছিলেন। ছোটবেলায় ওয়াশিংটন বাগানে তাঁর পিতার প্রিয় চেরীগাছটি নতুন পাওয়া কুড়াল দিয়ে কেটে ফেলেছিলেন। পিতা জিজ্ঞাসা করাতে অমনি ক'রেই তিনি নিজের দোষ স্বীকার করেছিলেন।

এব্‌ একটা রচনা লিখেছিল: 'জীবজন্তুর প্রতি নিষ্ঠুরতা।' ছেলেরা যখন কচ্ছপের পিঠের উপর জলন্ত কয়লা রেখে কষ্ট দিত, এব্‌ খুব কষ্ট পেত। তাদের সঙ্গে ঝগড়া ক'রে, জলন্ত কয়লাটা কচ্ছপের পিঠ থেকে ফেলে দিত।

এব্রাহাম মনে করত, জর্জ ওয়াশিংটন ছিলেন পৃথিবীর একজন শ্রেষ্ঠ মানব। একদিন সে উইম লিখিত ওয়াশিংটনের জীবনী ধার ক'রে নিয়ে এল যোশিয়া ক্রফোর্ডের (শিক্ষক ক্রফোর্ড নন) কাছ থেকে। কাজের ফাঁকে ফাঁকে এবং গভীর রাত পর্যন্ত পড়ত বইখানা। পরের বই, তাই খুব যত্ন ক'রে সাবধানে রেখে দিত। একদিন রাতে বইখানা একটা তাকে রেখে এব্‌ ঘুমিয়ে পড়েছিল। তাকের উপরের পাটাতনের তক্তাগুলিতে ফাঁক ছিল। রাতে কখন বৃষ্টি হয়ে বইখানি সম্পূর্ণ ভিজে চুপচুপে হয়ে গেছে। ভোরে উঠে বইখানির এই দশা দেখে এব্‌ বিমূঢ় হয়ে গেল। যত্ন ক'রে রাখবে ব'লে নিয়ে এসেছিল যে। সোজা চলে গেল সে বইএর মালিকের কাছে। অত্যন্ত দুঃখ ও সংকোচের সঙ্গে ঘটনাটি ব্যক্ত ক'রে এব্রাহাম বইখানির দামের পরিবর্তে কিছু কাজ ক'রে দিতে চাইল। যোশিয়া ক্রফোর্ড কঠোর প্রকৃতির ছিলেন। তিনি খুব চ'টে গিয়ে বকাবকি করতে লাগলেন। এব্‌ বারবার ব'লে চলেছে, সে বইএর দামের বদলে কাজ ক'রে দেবে। বইএর মালিক তার পর এব্রাহামকে দিয়ে তাঁর কয়েক একর জমির পাকা শস্য সমস্ত কাটিয়ে নিলেন। পাঁচদিনের কাজ এব্রাহাম কঠিন পরিশ্রম ক'রে তিনদিনে ক'রে ফেলল। এব্রাহাম এই মালিকের উৎপাড়ন কখনও ভুলতে পারে নি। অবশ্য বইখানি সে পেয়ে গেল।

পরে এই লোকটিই এব্রাহাম ও তার বোন সারাকে দিয়ে অল্প পয়সায় দিনমজুর হিসাবে খাটিয়ে নিতেন ঘরে বাইরে। বাইরের কাজে এব্রাহাম তাঁর ক্ষেতের শস্যবোনা থেকে কাটা পর্যন্ত সমস্ত কিছু ক'রে দিয়েছে। কোনদিন কিছু কম কাজ হয়ে গেলে সেই অনুপাতে পয়সা কাটা যেত। এব্রাহাম কখনও প্রতিবাদ করত না, ভুলতেও পারত না। সারা করত ঘরের কাজ।

একদিন মিসেস ক্রফোর্ড এব্রাহামকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি বড় হয়ে কি করবে? এব্রাহাম সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিল—আমি আমেরিকার প্রেসিডেণ্ট হব। তখন ওয়াশিংটনের জীবনী প'ড়ে মনটা তার ভরপুর। তার দীন পারিপার্শ্বিক, দারিদ্র্য এবং ঘরের অবস্থা সব নিয়ে হয়ত কথাটা সেদিন প্রলাপের মত শুনিয়েছিল।

এব্রাহামের বয়স তখন ষোল বছর। জেম্‌স্‌ টেলার এব্রাহামের কর্মক্ষমতা জানতেন। একদিন এব্‌-এর বাবাকে টেলার বললেন, এব্‌কে তিনি মাসে ছয় ডলার ক'রে দেবেন, খেতে-থাকতেও দেবেন। এর বদলে এব্‌ তাঁর কাজ ক'রে দেবে—ওহিও নদীতে ফেরী নৌকা চালাবে, ক্ষেতের কাজ করবে, ঘোড়াগুলি দেখাশুনা করবে, ঘর-সংসারের কাজেও সাহায্য করবে। নয় মাসের জন্য এই চাকরি। পিতা রাজী হলেন। পুত্র

কাজে যোগ দিলেন। ষোল বছরের কিশোর নৌকা চালাতে খুব আনন্দ পেতেন। বয়সের আন্দাজে অত্যধিক লম্বা এবং অত্যন্ত শক্তিমান ছেলে বলিষ্ঠ যুবকের মত অনায়াসে নৌকা চালিয়ে যেতেন।

ঐ বাড়ীর ছেলে গ্রীন টেলারের সঙ্গে তিনি উপর-তলায় শুতেন। ঐ ঘরে অন্যান্য বইএর মধ্যে ছিল যুক্তরাষ্ট্র আমেরিকার ইতিহাস। রাত জেগে এব্ বইগুলি পড়তে লাগলেন। বাতি জ্বালিয়ে রাখাতে গ্রীনের অসুবিধা হ'ত। একদিন ত গ্রীন রেগে গিয়ে ভাড়াকরা মজুর ছেলেকে মেরে বসলেন। এব্রাহাম কিন্তু নিজেকে খুব সংযত রাখলেন। বহুদিন পরে গ্রীন এই ঘটনাটি স্মরণ ক'রে বলেছেন যে, অমন মধ্যরাত্রি পর্যন্ত জেগে বই পড়া এবং সর্বপ্রথম ভোরে জেগে ওঠা ছেলে তিনি কখনও আর দেখেন নি। প্রহার করার কথা মনে ক'রে তিনি বলেন, ইচ্ছা করলেই মজবুত ছেলে এব প্রতিশোধ নিতে পারতেন কিন্তু এব্-এর সংযত বুদ্ধি তখনই জাগ্রত হয়ে উঠেছিল।

নয় মাস এখানে চাকরি করার পর এব্ বাড়ী ফিরে এলেন। বোন সারার বিবাহ হ'ল সমারোহ ক'রেই। এব্-এর লিখিত কবিতা বিবাহে ঘটা ক'রে সুর দিয়ে গাওয়া হয়। এব্ ছিলেন বুদ্ধিতে উজ্জ্বল, রসিকতায় ভরপুর। বিবাহের একবছর পরেই সারার মৃত্যু হয়। এব্রাহাম কিছুদিন পর্যন্ত শোকে অভিভূত হয়ে রইলেন।

একবার এব্রাহাম জোন্‌স্-এর অধীনে দোকানদার হয়ে রইলেন। বাক্স থেকে মাংস বার করা, বাক্স বন্ধ করা, কাটা, বিক্রি করা ইত্যাদি সবই করতেন।

জোন্‌স্-এর কিছু বই ছিল, তিনি একটি খবরের কাগজও রাখতেন। এব্রাহাম মন দিয়ে সব পড়তেন। রাজনীতি আলোচনা করতেন জোন্‌স্। দোকানে কাজ ছেড়ে দেবার পরেও এব্রাহাম এই দোকানে এসে আড্ডা দিতেন। এখানে রাজনীতি আলোচনা হ'ত, গল্প জ'মে উঠত, হাসি রসিকতা ভেঙ্গে পড়ত। এব্রাহাম ছিলেন তার কেন্দ্র। বুদ্ধির দীপ্তিতে, চমৎকার গল্প বলতে, গদ্য ও কবিতা আবৃত্তি করতে এবং লিখতে তিনি ছিলেন সকলের মধ্যমণি। সমস্ত কাজের মধ্যে তাঁর সর্বাপেক্ষা প্রিয় ছিল লেখাপড়া। পড়তে গিয়ে যেখানটা খুব ভাল লেগে যেত অমনি সেটা লিখে ফেলতেন, মুখস্থ করতেন। পড়তে পড়তে রাত্রি যে কখন প্রভাত হয়ে যেত তিনি টেরও পেতেন না।

ক্ষেতের কাজ করতে গিয়ে বন্ধু ও সাথীদের সামনে দাঁড়িয়ে উঠে তিনি বক্তৃতা সুরু করতেন, বক্তৃতায় মুগ্ধ হয়ে থাকতেন ক্ষেতের কর্মরত বন্ধুরা। তাঁর বক্তৃতায় কখনও গম্ভীর বক্তব্য থাকত, কখনও উত্তেজনায় ঘুষি পাকিয়ে উঠত, কখনও রঙ্গরসে সবাইকে ডুবিয়ে দিতেন তিনি। চমৎকার প্রস্তুতির ক্ষেত্র বপন হচ্ছিল ভবিষ্যৎ প্রেসিডেন্টের বাগ্মিতার।

মাইল-দেড়েক দূরে উইলিয়াম উডের কাছে তিনি মাঝে মাঝে কাজ করতেন। উড দু'খানা কাগজ রাখতেন। কাগজ দুখানির আকর্ষণ এব্-এর কাছে ছিল দুর্দমনীয়। টেম্পারেন্স কাগজখানাতে মদ্যপান সম্বন্ধে এব্রাহাম চমৎকার একটি প্রবন্ধ লিখে ফেললেন। উড একদিন বললেন 'রাজনীতি নিয়ে লিখতে পার এব্?' উৎসাহিত হয়ে সাতদিনের মধ্যে অতিসুন্দর একটি রচনা তিনি লিখে নিয়ে এলেন। তার শেষ বাক্য ছিল—আমেরিকার শাসনতন্ত্র রক্ষা করতে হবে, যুক্তরাষ্ট্রকে চিরস্থায়ী করতে হবে, তার আইনকে শ্রদ্ধা, সম্মান এবং কাজে পরিণত করতে হবে।

এরই তেত্রিশ বছর পরে এব্রাহাম লিংকন আমেরিকার প্রেসিডেন্ট হয়ে যখন দেখলেন, দেশের শত্রুরা আমেরিকার শাসনতন্ত্রের পতন ঘটাতে চাইছে, তখন তিনি তাঁর উদ্বোধনী বক্তৃতায় বলেছিলেন, শাসনতন্ত্র এবং আইন-অনুসারে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র অবিচ্ছেদ্য, আমার সাধ্যানুসারে আমি চেষ্টা করব যেন যুক্তরাষ্ট্রের আইন কাজে পরিণত হয় নিষ্ঠার সঙ্গে, আন্তরিকভাবে।

১৮২৮ সালের এপ্রিল মাসে জেন্ট্রি নামে একজন ব্যবসায়ীর প্রয়োজন ছিল ব্যবসা উপলক্ষ্যে নৌকাভর্তি ক'রে বেকন নিউ অর্লিএন্‌স্-এ পাঠাবার। তিনি জোয়ান ছেলে এব্রাহামকে নৌকা বেয়ে নিয়ে যেতে নিযুক্ত করতে চাইলেন। ওহিও নদী বেয়ে মিসিসিপি নদীর মধ্য দিয়ে নিউ অর্লিএন্‌স পৌঁছাতে হবে। আঠার শত মাইল বেয়ে নিয়ে যেতে হবে মিসিসিপির তীব্র স্রোত ঠেলে। দুর্গম ও দুঃসাহসিক নৌকাযাত্রার জন্য এব্রাহাম রাজী হলেন। পিতার অনুমতি ছিল, অর্থেরও প্রয়োজন ছিল।

যাত্রা সুরু হ'ল। জেন্ট্রির ছেলে এলেনও এব্রাহামের সঙ্গে ছিলেন। সারাদিনের হাড়ভাঙা পরিশ্রমের পর তাঁরা রাতে নৌকা কোন নিরাপদ্ স্থানে বেঁধে রেখে ঘুমাতেন। একদিন রাতে তাঁরা টের পেলেন, একদল ক্রীতদাস তাঁদের নৌকার মাল চুরি করতে নেমেছে। দু'জনে ছুটে গেলেন ডাকাত ধরতে। দুই দলেরই মানুষ জখম হয়, রক্ত ঝরতে থাকে। কিন্তু সেদিকে কারোই খেয়াল ছিল না। অবশেষে একজন নিগ্রোকে তাঁরা মারা

মারতে জলে নিয়ে ফেলে দিলেন, তখন নিগ্রোরা পালিয়ে গেল। সেদিন ক্রীতদাসের রক্তের সঙ্গে এব্রাহামের রক্তও একসঙ্গে বয়ে গিয়েছিল। যে এব্রাহাম নিজেকে বাঁচাবার জন্য সেদিন ক্রীতদাসেরসঙ্গে লড়াই করেছিলেন।

এব্রাহাম রাজী হলেন। এই কথামত ১৮৩১ সালের আগষ্ট মাসে এব্রাহাম নিউ সালেম গেলেন। মালপত্র না আসা পর্যন্ত তাঁর করবার কিছু ছিল না। ১৫।১৬টি পরিবার নিয়ে গ্রামটি। তিনি ঘুরে ঘুরে বেড়াতে লাগলেন। নির্বাচনের দিনে তিনি নির্বাচনের জায়গার কাছাকাছি অমনি ক'রে ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন। একজন বিচারক এসে এব্রাহামকে জিজ্ঞেস করলেন, তিনি লিখতে জানেন কি না। সেই সময় সেখানে অনেক লোকেই লেখাপড়া জানতেন না। এব্রাহাম বললেন, একটু একটু জানেন। এব্রাহামকে তিনি নির্বাচনের দিনে কেরাণীর কাজ ক'রে দিতে অনুরোধ করলেন। এব্রাহাম রাজী হলেন। দক্ষতা এবং সততার সঙ্গে পক্ষপাতহীনভাবে কাজটি তিনি করেছিলেন। এটাই ছিল তাঁর জীবনের জনসাধারণের জন্য প্রথম কাজ।

ক্রমে ওফুটের মালপত্র এসে গেল। মুদীর মাল, লোহার জিনিষ, মাটির জিনিষ, পেয়ালা, প্লেট, ছুরি, কাঁটা, জুতো, কফি, চা, চিনি, গুড়, মাখন, বারুদ, তামাক, হুইস্কি, ইত্যাদি জিনিষ। এখানকার একটা মিলের ভারও এব্রাহামকে দিলেন ওফুট। ওফুট বলতেন—যুক্তরাষ্ট্রের যে-কোন লোকের চেয়ে এব্ বেশী জ্ঞানবুদ্ধি রাখে. এব্ যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেণ্ট হবে, মনে রেখো আমার কথাটা।

একদিন সন্ধ্যাবেলায় দোকানের হিসাব মেলাতে গিয়ে এব্রাহাম দেখেন, মিসেস ডানকানের কাছ থেকে তিনি ছয় সেণ্ট বেশী পেয়েছেন। তৎক্ষণাৎ দোকান বন্ধ ক'রে ছুটলেন মিসেস ডানকানের কাছে দুই মাইল দূরে ছয় সেণ্ট ফিরিয়ে দিয়ে আসতে

আর একদিন রাতে দোকান করবার সময় একটি মহিলা আধ পাউণ্ড চা কিনতে আসেন। চা ওজন ক'রে খদ্দের বিদায় দিয়ে তিনি বাড়ী ফিরে গেলেন। পরদিন সকালে দোকান খুলে দেখেন, দাঁড়িপাল্লায় আধ পাউণ্ড ওজনের বাটখারার জায়গায় এক-চতুর্থ পাউণ্ড বাটখারাটা তখনো চাপান রয়েছে। তৎক্ষণাৎ তাঁর গত রাতের কথা মনে পড়ল। বাকী চা মেপে নিয়ে দৌড়ে গিয়ে দিয়ে এলেন সেই মহিলাটিকে। এই সব ঘটনা তাঁকে জনপ্রিয় ক'রে তুলেছিল।

স্কুল মাষ্টার গ্রাহামের সঙ্গে এব্রাহামের খুব ঘনিষ্ঠতা ছিল। একদিন এব্রাহাম তাঁকে বললেন—আমার খুব ইংরেজী ব্যাকরণ পড়তে ইচ্ছা করে।

—সময় কোথায় তোমার?

—যখন যেটুকু পাই, তাছাড়া রাত আছে।

নানা কথা থেকে গ্রাহাম আন্দাজ করেছিলেন যে, এব্রাহাম জনসাধারণের জন্য কাজ করতে ইচ্ছুক, অর্থাৎ তিনি গণজীবন গ'ড়ে তুলতে চান। গ্রাহাম তাঁকে সন্ধান দিলেন ছয় মাইল দূরে এক জায়গায় একটা ব্যাকরণ বই আছে কার্কহামের লিখিত। সংগ্রহ ক'রে আনতে একটুও দেরি হ'ল না এব্রাহামের।

তিনি দোকানে ব'সে বিক্রয়ের ফাঁকে ফাঁকে গ্রামার বইটি পড়তেন। রাতে আগুন জ্বালিয়ে সেই আলোতে পড়তেন।

গ্রীন পরিবার তাঁকে বই দিতেন, স্কুল মাষ্টার গ্রাহাম তাঁকে পড়া বুঝিয়ে দিতেন। পড়তে বসতেন তিনি কখনও রাস্তার ধারে, কখনও মাঠের মধ্যে। নিউ সালেমের প্রতিটি বিদ্বান্ অথবা সুধী পথিককে এব্রাহাম পথের মধ্যে আটকে ধ'রে বসিয়ে পড়াটা বুঝে নিতেন যেখানটা বুঝতে পারতেন না। সকলেই জানে, ছেলেটির লেখাপড়ার তীব্র আকাঙ্ক্ষা, শরীরে আছে শক্তি, মনে সাহস আর প্রাণে অজস্র রসিকতা।

কয়েক মাসের মধ্যেই এব্রাহাম শুদ্ধ ইংরেজী গ্রামারের শক্ত ভিত্তি তাঁর মনে গেঁথে ফেললেন।

ওফুটের মিল এবং দোকানের ব্যবসা নানাকারণে দীর্ঘস্থায়ী হয় নি। কিন্তু এব্রাহামের এই সময়কার কর্মজীবন নানাকারণে উল্লেখযোগ্য। তিনি ছিলেন এখানে একাধারে বিচারক, ঝগড়া মিটাবার মধ্যস্থ, রেফারী এবং সকলের বন্ধু। তিনি ছিলেন বুদ্ধিমান্, সৎস্বভাব, নম্র, হৃদয়বান্, অথচ কঠোর এবং শক্তিধর।

সেই সময় যুক্তরাষ্ট্র আমেরিকায় শ্বেতাঙ্গ এবং রেড ইণ্ডিয়ানদের মধ্যে 'ব্লাক হকওয়ার' চলেছিল। ইলিনয়ের গভর্ণর স্বেচ্ছাসেবকদের চারটি রেজিমেণ্টের জন্য আবেদন জানালেন। নিউ সালেম শহর থেকে এব্রাহাম ভলাণ্টিয়ার হলেন। নিউ সালেমের স্বেচ্ছাসেবকরা দলে ভারী ছিলেন। তাঁদের সকলের প্রিয় ছিলেন ব'লে এব্রাহামকেই তাঁরা ক্যাপ্টেন নির্বাচন করলেন।

একটি ঘটনা এখানে উল্লেখযোগ্য। একদিন একটি বৃদ্ধ রেড ইণ্ডিয়ান লিংকনদের ক্যাম্পে ঢুকে পড়েছিল। সে আর্তস্বরে কথা দিচ্ছিল, সে শ্বেতাঙ্গদের বন্ধু। সেনাদের কাছে সে দয়াভিক্ষা করছিল। সৈনিকেরা চেঁচামেচি ক'রে উঠল।

—ওদের বিরুদ্ধেই আমাদের লড়াই চলছে, ওদের উপর আবার দয়া কি ?

—গুলী কর, ওকে গুলী কর। প্রেসিডেণ্ট হয়ে সেই এব্রাহামই পঁয়ত্রিশ বছর পরে ক্রীতদাসদের দাসত্ব থেকে মুক্তি দিয়েছিলেন।

১৮৩০ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে এব্রাহাম এবং তাঁদের পরিবার প্রায় দুইশত মাইল দূরে ইলিনয়েসএ চ'লে যান। তখন তাঁর বয়স ২১। ডেণ্টন ওফুট নামে একজন বণিক ব্যবসা উপলক্ষ্যে এক নৌকা-ভর্তি মাল নিউ অর্লিএন্স-এ নিয়ে যাবার জন্য এব্রাহাম এবং আরও দু'টি লোককে ঠিক করেন। নৌকাটা এব্রাহামকেই শেষ পর্যন্ত তৈরী করতে হয়। নৌকায় মাল নিয়ে যেতে যেতে এব্রাহাম এবং ওফুট নানা আলোচনা করতেন, রাজনীতিই তারমধ্যে প্রধান স্থান অধিকার করত।

ঐ নৌকায় যেতে যেতে একদিন এব্রাহাম দেখলেন, একদল ক্রীতদাসকে একসঙ্গে বেঁধে রাখা হয়েছে এবং একজন পরিচালক তাদের মাথায় চাবুক মারছে। এব্রাহাম এ দৃশ্য দেখে ব'লে উঠলেন, 'যে জাতি এমন অমানুষিক ব্যবহার বরদাস্ত করে সে জাতিকে একদিন এর মূল্য দিতে হবে।' ওফুট বললেন, 'এতে এরা অভ্যস্ত, গরু-ভেড়ার দলের বেশী এরা এদের মনে করে না।' এবাহাম প্রতিবাদ করলেন, 'মনে না করলে কি হবে? অমানুষ না হ'লে মানুষকে গরু-ভেড়ার দল বানান যায় না। আমি ব'লে রাখছি, যে জাতি এ কাজ করে তারা অভিশাপ কুড়োবে।'

—'আমাদের সময়ে নয়' ওফুট বললেন। এব্রাহাম তৎক্ষণাৎ জবাব দিলেন, 'কারো সময়ে হবে।'

ত্রিশ বছর পর জন হ্যাঙ্ক্স্ এই সব দিনের কথা মনে ক'রে বলেন—লিংকন এই সব নিগ্রোদের শৃঙ্খলে বদ্ধ অবস্থায় যে-ভাবে অত্যাচারিত হতে দেখেছেন তাতে তাঁর হৃদয় ক্ষত-বিক্ষত হয়েছে। বেদনায় তিনি মুষড়ে পড়েছেন, অন্যমনস্ক হয়ে গেছেন। দাস প্রথা সম্বন্ধে তাঁর মতামত এই সময়েই স্থির হয়ে যায়। লিংকন নাকি নিজেই বলেছেন, ১৮৩১ সালের মে মাসের নৌকাযাত্রার সময়কার দৃশ্যগুলিই তাঁর মনকে সঙ্কল্পবদ্ধ করে। অদৃষ্ট তাঁকে এমন ভাবে পরিচালিত ক'রে নিয়ে চলেছিল, যেন তিনি ভবিষ্যতে আমেরিকার দাস-প্রথাকে পরাজিত করার শক্তি অর্জন করেন।

একদিন নদীর মধ্য দিয়ে যেতে যেতে ওফুট এব্রাহামকে জিজ্ঞেস করলেন, তাঁর দোকানের ব্যবসাটা এব্রাহাম নিউসালেমে চালাতে রাজী কি না। এব্রাহাম হবেন দোকানের এবং গুদামের ভারপ্রাপ্ত।

—স্পাই, স্পাই।

ভীত রেড ইণ্ডিয়ানটি এক টুকরো কাগজ দেখাল। এব্রাহাম প'ড়ে দেখলেন, সেনাপতি কাস তাঁকে সৎ-চরিত্রের সার্টিফিকেট দিচ্ছেন এবং সৎকর্মের জন্য তার নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতিও কাগজে দেওয়া আছে।

—জাল, ওটা জাল।

—দয়া নয়, মৃত্যুদণ্ড চাই।

সৈনিকদল তাকে মেরে ফেলতে উদ্যত হ'ল। তৎক্ষণাৎ ছিপছিপে রোগা ও বিরাট্ লম্বা দেহ নিয়ে ক্যাপ্টেন লিংকন রেড ইণ্ডিয়ানটিকে আড়াল ক'রে দাঁড়িয়ে পড়লেন এবং দৃঢ়ভাবে আদেশ দিলেন, তোমরা ওকে হত্যা করবে না, আমাকে না মেরে ওকে তোমরা কিছুই করতে পারবে না। আমাকে যারা আজ ভীরু বলছ তারা এগিয়ে এসে আমার সঙ্গে লড়াই কর।

ধীরে ধীরে সবাই শান্ত হ'ল। সেদিন ক্যাপ্টেন লিংকনের জীবন এবং খ্যাতি দুইই বিপন্ন হয়েছিল। কঠিন সঙ্কল্প নিয়ে তিনি সঙ্কট পার হয়ে গেলেন। কিন্তু বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে নালিশ করলেন না। জনপ্রিয়তা ছড়াতে থাকে।

ব্ল্যাক হক ওয়ার থেকে ফিরে আসার পর এব্রাহাম হার্নডন পরিবারের সঙ্গে থাকতে লাগলেন। কিন্তু তিনি একটা কাজ খুঁজছিলেন। একদিন তিনি বন্ধু উলিয়াম গ্রীনকে জিজ্ঞেস করলেন, কামারের কাজ শিখলে কেমন হয়? গ্রীন ত সে কল্পনা হেসেই উড়িয়ে দিলেন। এব্রাহামকে তিনি গুণের আকর মনে করতেন। বললেন, জান না তোমাকে আমরা আইন সভায় পাঠাচ্ছি?

এব্রাহাম সেকথা ব্যঙ্গ ব'লে উড়িয়ে দিলেন। পরদিন সত্যই স্থানীয় বড় বড় লোকেরা এসে তাঁকে ইলিনয় থেকে নির্বাচনে দাঁড়াতে সনির্বন্ধভাবে বার বার অনুরোধ করতে লাগলেন। অনুরোধ এড়াতে না পেরে পরাজয় সুনিশ্চিত জেনেও অবশেষে তিনি রাজী হলেন।

তিনি হেরে গিয়েছিলেন। মোট ভোটসংখ্যায় বিজয়ী ব্যক্তির পরই এব্রাহামের ভোটসংখ্যার পরিমাণ ছিল। এতে সর্বাপেক্ষা আশ্চর্য হয়েছিলেন এব্রাহাম নিজে।

বন্ধু গ্রীন এবার তাঁকে আইন পড়তে পরামর্শ দিতে লাগলেন। আইনজীবীদের সম্বন্ধে এবাহামের ধারণা খুব উচ্চ ছিল না। আইনজীবীরা নাকি সত্যকে মিথ্যা

এবং মিথ্যাকে সত্য করে। জঘন্য অপরাধীকে ততখানি সাহায্য করে যতখানি করে নিরপরাধ ব্যক্তিকে।

সিদ্ধান্ত কিছুই হ'ল না। এব্রাহাম কামার হবার সঙ্কল্প স্থগিত রেখে দোকানের ব্যবসার চেষ্টা করতে লাগলেন। বই পড়া চলতে লাগল পূর্ণ উদ্যমে। রোলিন লিখিত প্রাচীন ইতিহাস, গিবন লিখিত রোম সাম্রাজ্যের অবনতি এবং পতন, শেক্স্‌পীয়ার এবং বার্নস্‌-এর কবিতা যেখানটা ভাল লাগে অমনি মুখস্থ ক'রে ফেলেন। কোন কোন বই সংক্ষিপ্ত আকারে নিজে লিখে রাখেন মনে রাখার জন্য।

এই সময় আশাতীতভাবে লিংকন একটা কাজ পেয়ে গেলেন। জন ক্যালহাউন তখন একজন জমির জরীপকার ছিলেন। তিনি এব্রাহামকে বললেন, জমি জরীপ করতে শিখতে। শিখতে লাগবে ছয় সপ্তাহ। তার পর কাজ পাওয়া সহজ এবং লাভজনক।

সত্যই এব্রাহাম জরীপ করতে শিখে সার্ভেয়ার হলেন। লাভও ভালই হ'তে লাগল। জমি নিয়ে ঝগড়া তিনি চমৎকারভাবে মিটিয়ে দিতেন। তাঁর বিচারে দুই পক্ষই সন্তুষ্ট হ'ত।

এই সময়ে হতভাগ্য, দুঃখী ও দরিদ্রের প্রতি সহানুভূতি তাঁর আরও ঘনীভূত হয়ে উঠেছিল। এক তীব্র শীতের রাতে এব্রাহাম দেখলেন ট্রেন্ট নামে একটি লোক খালি পায়ে শীতে কাঁপছে, কিন্তু হিল নামে এক ভদ্রলোকের জন্য জ্বালানী কাঠ কাটছে।

—কত পাবে ?

—এক ডলার। আমার পা ঠাণ্ডায় জমে যাচ্ছে, জুতো নেই।

—কাঠ আমি কেটে দিচ্ছি, তুমি পা সেঁকে গরম ক'রে নাও ভিতরে গিয়ে।

এব্রাহাম এত দ্রুত কাঠ কেটে দিলেন যে সবাই অবাক্ হয়ে গেল।

এব্রাহামকে লোকে বলত সাধু এব্। ১৮৩৩ সালে প্রেসিডেন্ট জ্যাক্‌সন্ এব্রাহামকে তাঁর দক্ষতা ও সাধুতার জন্য নিউ সালেমের পোষ্টমাষ্টারের পদে নিযুক্ত করেন। এইভাবে তাঁর জীবনের জয়যাত্রা সুরু হ'ল।

(আগামী সংখ্যায় সমাপ্য)

'ওগ্ গর ভত্তা' থেকে 'মুরগি খাই না'

শ্রীসুধীর রায়চৌধুরী

লিখিবে পড়িবে মরিবে দুখে
মৎস্য মারিবে খাইবে সুখে।

যাঁদের ধারণা এই বহু-পরিচিত লাইন দু'টি কোন পাঠশালা-পালানো বাপে-তাড়ানো মায়ে-খেদানো মৎস্য-প্রিয় বালকের লেখা, তাঁরা বাঙালী-সংস্কৃতির কিছুই জানেন না। আসলে এটি আধুনিক অর্থে কোন জাতীয় কবির রচনা। আমাদের সাধারণ জীবনের আশা-আকাঙ্ক্ষার নির্ভুল চিত্রণ এতে পাওয়া যাবে। সমাজ-সেবীরা দীর্ঘ-শ্বাসের সঙ্গে ঘোষণা ক'রে থাকেন, আমাদের সতীসীমন্তিনীদের জীবনের তিনভাগই কেটে যায় রান্নাঘরে,কিন্তু তাঁরা হয়ত এ খবর রাখেন না যে, আমাদের পুরুষ প্রভুদের মূল্যবান্ সময়ের অধিকাংশই ব্যয় হয় ভোজন-চিন্তায়। বেতাল বাঙালী ছিল না ব'লেই ভোজন-বিলাসীর চেয়ে শয্যাবিলাসীকে উপরে স্থান দিয়েছিল, কিন্তু বাঙলা সংস্কৃতির অনুরাগী হ'লে ভোজনচিন্তার চমৎকারিত্বের কথা মানতেই হ'ত। সত্যেন দত্তের মত বলতে হয়, কোন্ দেশে ভাইফোঁটা জামাইষষ্ঠী উপলক্ষ্যে এত আহার্য্যের ঘনঘটা? কোথায় পাওয়া যাবে সেই ঔদরিক কুলীন জামাতাদের? বহু প্রসিদ্ধ জামাতা-বিষয়ক শ্লোকটি নিশ্চয়ই কোন বাঙালী কবির রচনা যে শ্লোকে প্রাতঃস্মরণীয় জামাতাদের কথা উল্লিখিত হয়েছে, হবির অভাবে রবি নামক জামাতার শ্বশুরগৃহ ত্যাগ, পিঠের অভাবে মাধবের, কদন্নে পুণ্ডরীকাক্ষের এবং পরিশেষে অসীম ধৈর্য্যশালী পরম ঔদরিক ধনঞ্জয়, যাকে শুধু প্রহারের দ্বারাই পরিহার করা সম্ভব হ'ল। এ-

জাতীয় প্রচুর গল্প বাঙলা রূপকথায় মেলে। গরম কড়াতে তালের বড়া ছাড়বার সঙ্গে সঙ্গে দড়িতে গিঁট বেঁধে হিসেব রাখার মত অসীম ধৈর্য্য বোধহয় এই শস্য-শ্যামলা বাঙলা দেশের পতিকুলের পক্ষেই সম্ভব। অথবা সেই জামাইয়ের কথা শোনেন নি? —যাকে তাড়াবার জন্য তার শাশুড়ীর প্রাণান্তকর প্রচেষ্টা, অবশেষে তাকে শুনিয়ে শুনিয়ে বলা:

আজ আমাদের কোটন-কাটন, কাল আমাদের রাঁধন-বাড়ন, পরশু মোদের খাওয়া।

সঙ্গে সঙ্গে জামাইয়ের সপ্রতিভ উত্তর:

আমি আজও আছি, কালও আছি, পরশু আমার যাওয়া।

এ জামাই যে মঙ্গলকাব্যের শিবের ঐতিহ্যবাহী, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। ভোজনচিন্তা এবং রান্নাঘর আমাদের শব্দভাণ্ডারকে যে কতদূর প্রভাবিত করেছে তার বিষয় যে কোন ভাষাতাত্ত্বিকের কাছে পাওয়া যাবে। আমাদের অনেক প্রবচনের মূলেও আহারের অনুষঙ্গ, যেমন, উনো ভাতে দুনো বল, ভরা ভাতে তল; যারে মারব ভাতে, কেন মারব হাতে; ভাত দেবার ভাতার নয়, কিল দেবার গোঁসাই; নুন আনতে পান্তা ফুরোল; মোটে মা রাঁধে না, ইত্যাদি। এই বিশ শতকের শেষার্দ্ধেও ইষ্টবেঙ্গল-মোহনবাগান খেলায় জয়-পরাজয়ের ওপর চিংড়ি এবং ইলিশমাছের মূল্যবৃদ্ধি নির্ভর করে। যশোর-খুলনা অঞ্চলের কোনও এক অজ্ঞাতনামার খেদোক্তি আজ প্রায় প্রবচনে দাঁড়িয়ে গেছে:

খাতি নাতি বেলা গেল শুতি পারলাম না
ফইরহাটের ফলোইমাছ কিনতি পারলাম না।

"খাতি-নাতি"ই বেলা চ'লে যায় (পাঠক! এর সঙ্গে লালাবাবুর "বেলা যায়" এর উপলব্ধি তুলনা করুন) তবুও আফশোষ "ফইরহাটের ফলোই মাছ কিনতি পারলাম না।"

প্রশ্ন উঠতে পারে মঙ্গলকাব্যে অন্নপূর্ণার কাছে যে প্রার্থনা "আমার সন্তান যেন থাকে দুধে-ভাতে"-এর মধ্যে কি জাতীয় জীবনের কোন সত্য চিত্রণ নেই? নিশ্চয়ই আছে। আমাদের আহার্য্যের উপকরণ হয়ত সামান্য, কিন্তু আয়োজন বিরাট্। দরিদ্র গার্হস্থ্য-জীবনে মূল্যবান্ আহার্য্য সংগ্রহের সঙ্গতি থাকে না, সেজন্য সেদিক্ দিয়ে প্রত্যাশা সামান্য। কিন্তু রন্ধনের পারিপাট্য আহার্য্যের স্বল্পতার জন্য আটকায় না। তাই একই উপকরণ দিয়ে কত বিচিত্র পদের সৃষ্টি হয়। এর মধ্যে প্রাচুর্য্যের চেয়েও ভোজন বিলাসের পরিচয় স্পষ্ট।

মধ্যযুগের সাহিত্যের কথা ছেড়ে দিন। বাঙলা সাহিত্যের প্রথম নাগরিক কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত থেকে দ্বিজেন্দ্রলাল, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, রজনীকান্ত, সত্যেন্দ্র-নাথ, এমন কি তারাশঙ্কর, বিভূতিভূষণ, মুজতবা আলি প্রমুখ পরবর্ত্তী লেখকদের রচনাতেও বাঙালীর ভোজন-প্রীতির পরিচয় স্পষ্ট। বঙ্কিমচন্দ্রের অবিস্মরণীয় নায়ক নবকুমার ত রন্ধনের জন্যই কাষ্ঠসংগ্রহে গিয়ে বনে নিরুদ্দেশ হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথ বিবাহের বর্ণনায় সানাইয়ের করুণ সুরের সঙ্গে সঙ্গে উচ্ছিষ্ট কলাপাতার উল্লেখ করতে ভোলেন নি। ব্যক্তিগত জীবনে জলযোগ—সেন মহাশয়ের পৃষ্ঠপোষকতা ছাড়াও তাঁর বহু ছড়া এবং কবিতায় আমাদের রন্ধন আড়ম্বরের উল্লেখ আছে। আহারের দৃশ্য ছাড়া শরৎচন্দ্রের কোন উপন্যাসের কথা ভাবাই যায় না। বিভূতিভূষণের আম আঁটির ভেঁপু বা পুঁইমাচা কি ভোলবার? বিদেশী সাহিত্যেও বহু ঔদরিক বা ভোজন-বিলাসীর চিত্রণ অল্প-বিস্তর চোখে পড়ে। কিন্তু সেগুলির অধিকাংশই আমাদের হাস্য উদ্রেক করে। সত্যি কথা বলতে কি, ঔদরিকতা আমাদের সাহিত্যে শুধু হাস্যরসের জন্য সব সময় বর্ণিত হয় নি, ভোজনবিলাস আমাদের জীবনযাত্রার অঙ্গীভূত ব'লেই এর সঙ্গে আমাদের সুখ-দুঃখ, শোক-মিলন সব কিছুর স্মৃতি জড়িত। তাই ঔদরিকতা নিয়ে "অগ্রদানী"র মত বীভৎস গল্প লেখাও সম্ভব হয়। রোগশয্যায় রচিত কান্তকবির গানগুলিতে কত সুস্থ মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষার অভিব্যক্তি রয়েছে কে জানে!—"যদি কুমড়োর মত চালে ধ'রে র'ত পান্তুয়া শত শত।"

আমাদের ভৌগোলিক জ্ঞানের উন্মেষের সঙ্গে ভোজনের কি নিবিড় সংযোগ রয়েছে। যখন আমাদের অক্ষর পরিচয় হয় নি, তখন থেকেই কি শুনি নি বর্দ্ধমান নামে একটি জেলার কথা এবং তার মিহিদানা, সীতাভোগের খ্যাতি? তেমনি সাতক্ষীরার সন্দেশ, জনাইয়ের মনহরা মহারাজপুরের দই, জয়নগরের মোয়া, প্রভৃতি আরও কত জনপদের উল্লেখ করা চলে।

ভোজন-বিষয়ে আমরা কত সচেতন তার আরেকটি বড় প্রমাণ যে আমাদের দেশে আহারের সময় স্বাদ অনুযায়ী পদ-গ্রহণের নির্দ্দিষ্ট রীতি আছে। তিক্ত দিয়ে সুরু মধুর দিয়ে সমাপ্তি। এ জাতীয় "বাছ-বিচার" অন্য কোথাও নেই। প্রমাণ স্বরূপ সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের "আমার বোম্বাই প্রবাস" থেকে কয়েক লাইন উদ্ধৃত করা যেতে পারে: "আমাদের যেমন তিক্ত হ'তে আরম্ভ ক'রে 'মধুরেণ সমাপয়েৎ' একটা নিয়ম আছে, ওদের

(মহারাষ্ট্র এবং গুজরাটে) মিষ্টি ঝাল নোন্তা যখন যাতে অভিরুচি তাই গ্রহণে কোন বাধা নেই। মিষ্টে অরুচি হ'লে টক ঝাল, ঝালে অরুচি হ'লে আবার মিষ্টি, ঝালের মুখ মিষ্টি ক'রে আবার নোন্তায় এসে পড়া যায়। কোন মারাঠী কিংবা গুজরাটী বন্ধুর বাড়ি নিমন্ত্রণে গেলে কখন কোন্‌ জিনিষ খেতে হবে—কোথা হ'তে আরম্ভ কোথায় গিয়ে শেষ, এ এক সমস্যা।" কিন্তু বাঙালীর রসনা বহু আগে থেকেই বিভিন্ন স্বাদ-গ্রহণের সময়ে পঠ-পর্য্যায়ের পক্ষপাতী। রাজা কৃষ্ণচন্দ্র ভোজনরসিক গোপাল ভাঁড়কে প্রশ্ন করেছিলেন, "কী দিয়ে সুরু করব?" এবং সেই অবিস্মরণীয় উত্তরটি প্রত্যেক পাঠকেরই জানা, "মহারাজ পোড়া দিয়ে সুরু করুন, তার পর পোড়ার মুখে যা খাবেন তা-ই ভাল লাগবে।" ভোজন-বিষয়ে আলোচনা করতে গিয়ে আমিও অনুরূপ সমস্যায় পড়েছি, কোন্‌ জায়গা থেকে সুরু করব? বাঙলা দেশ বিভিন্ন সময়ে বহু বিদেশীর পদানত হয়েছে এবং এই প্রভাব শুধু রাষ্ট্রনৈতিক বা সাংস্কৃতিক জীবনে সীমাবদ্ধ থাকে নি, আমাদের রান্নাঘরকেও প্রভাবিত করেছে। আমরা যেমন ছানার খাবার দিয়ে বিশ্বকে আপন করেছি, তেমনি বিদেশীদের কাছ থেকেও কম রান্না শিখি নি। আমাদের পরিচ্ছদও আজ যেম মিশ্র সংস্কৃতির প্রতীক, আমাদের আহারও তাই। ধুতির নীচে শার্ট গুঁজে গায়ে কোট চাপিয়ে হেড আপিসের বড়বাবুর যে-চেহারায় অভ্যস্ত, তা যে ইঙ্গ-বঙ্গ সাংস্কৃতিক সমন্বয়ের পরিচয়বাহী—এ কথা যেমন কাউকে ব'লে দিতে হয় না, তেমনি, যে কোন হিন্দু বাড়ির বিয়ের ভোজ্য তালিকা দেখলেই বোঝা যাবে মোগল-মোসাল, পর্তুগীজ-ইংরেজ সবাই মিলিত হয়েছে এই হেঁসেলের হাঁড়ি-কড়ায়। বিয়েবাড়ির লিষ্টি দেখুন—শাক-ছ্যাঁচড়া আছে, সঙ্গে আছে ভেট্‌কী-ফ্রাই কিংবা চিংড়ি-কাটলেট আর পোলাও ত থাকবেই। সুতরাং একই সঙ্গে হিন্দু-মুসলমান, ইরেজী খানার সমাহার। আমাদের দেশে রান্নার ক্রমবিবর্তন নিয়ে কোন গবেষণা হয় নি, হ'লে আমাদের সাংস্কৃতিক ভাব-বিনিময়ের অনেক বিবরণ পাওয়া যাবে। মুজতবা আলি সুদূর জার্মানীতে বাঙালী রান্না এবং হোটেলের কাহিনী শুনিয়েছেন "চাচা কাহিনীতে"। আর "ভারততীর্থের" কবি পাকশালায়ও বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যের অন্বেষণ করেছেন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সুরুতেই তিনি ঘোষণা করেছিলেন,

> "মনে রেখো দৈনিক চা খাইবে চৈনিক
> গায়ে যদি বল পাও হয়ো তবে সৈনিক
> জাপানীরা আসে যদি চিঁড়ে নিক দই নিক
> আধুনিক কবিদের যতো পারে বই নিক।"

এই প্রসঙ্গে কামাক্ষীপ্রসাদের "লণ্ডনে প্রথম দিন" গল্পটি মনে পড়ল। শিশু তো দূরস্থান, বয়স্ক ব্যক্তিদেরই টেমস নদীতীরে ব'সে গঙ্গার ইলিশের কথা মনে ক'রে চোখের জল সম্বরণ করা দুষ্কর হয়!—Nostalgia কি শুধু ঘরের মানুষের জন্য, ঘরের খাবারের জন্য নয়? কিন্তু ভোজনের এই দীর্ঘ আলোচনার ছেদ টানার সময় হয়েছে, কেননা, রসনার আস্বাদন ছাড়া ভোজনের আলোচনার নান্য পন্থা। ঘ্রাণে অর্দ্ধভোজন হয় (ঠিক! শিবরামের "গন্ধ চুরির মামলা" স্মরণ করুন!), কিন্তু আলোচনায় সিকি ভোজনের কথাও কেউ বলেন নি। বরং বিদেশী প্রবচনের অনুকরণে বলা যায়, পুডিং-এর প্রমাণ তার স্বাদ গ্রহণে। সুতরাং আহার্য্য বিনা এ আলোচনা পাঠকের কাছে কদর্য্য মনে হবে। অগত্যা বলি, আমার কথাটি ফুরোল। কিন্তু বলতে না বলতেই আবার ভোজনের প্রসঙ্গ এসে পড়ে, নটে গাছটি মুড়োল, কেন রে নটে মুড়লি, "বৌ কেন ভাত দেয় না," ইত্যাদি। তাই বলছিলাম, হে রসনাপ্রিয় রসিক জাতি, তোমাকে প্রণাম।

অন্ধ বিশ্বাস

সামুদ্রিক প্রাণী একটি সীল মাছের সঙ্গে মানুষের গভীর অন্তরঙ্গতার এই চমকপ্রদ ঘটনাটি ঘটেছিল দক্ষিণ আফ্রিকার কেপ প্রদেশের গর্ডন উপসাগরে একটি শিলাময় পাহাড়ের মত স্থানে।

একদিন উক্ত উপসাগরের একজন হারবারমাষ্টার মেজর ভ্যান রিয়েট কৌতূহলবশে ঐ পাহাড়ে নৌকা বেয়ে গিয়ে দেখতে পান, একটি ছোট সীল মাছ মাথায় ভালরকম চোট খেয়ে ধুঁকছে। পাছে মানুষ দেখে ভয় পেয়ে সীল মাছটি জলে নেমে পড়ে এবং এই অবস্থায় ডুবে মরে, তাই তিনি চ'লে যাবার আগে কয়েকটি মাছ তার দিকে ছুঁড়ে দিয়ে গেলেন। দেখা গেল, তার কাছে যে মাছগুলি পড়েছে সেগুলি সে খাচ্ছে, একটু দূরেরগুলি খাবার ক্ষমতা তার নেই।

সেইদিন আর একবার মেজর সিলটির কাছে গেলেন এবং কয়েকটি মাছ দিয়ে ডাকলেন 'জ্যাকি!'

জ্যাকি মেয়ে হওয়া সত্ত্বেও মেজর না জেনে যে নাম রাখলেন, ঐ নামই ঐ উপসাগরীয় অঞ্চলে রূপকথার মত ছড়িয়ে পড়েছিল লোকের মুখে মুখে।

মেজর প্রতিদিন তাকে দু'তিনবার ক'রে খাবার দিতেন। মাছটি হয়ত জলের নীচে ডুব দিয়েছে। মেজর যেই ডাকলেন—'ছোট্ট জ্যাকি! ছোট্ট জ্যাকি!' জ্যাকি অমনি তাড়াতাড়ি জল থেকে সাঁতার দিয়ে উঠে আসত এবং মেজর তার দিকে মাছগুলো ছুঁড়ে দিতে সে তার সমুখের পা দুটো দিয়ে সানন্দে খাবারগুলো লুফে নিত। এই রকমে একটা জন্তু ও মানুষের মধ্যে আশ্চর্যজনকভাবে গ'ড়ে ওঠে আন্তরিক বন্ধুত্ব, যার ভিত্তি হ'ল মাছটির মানুষের প্রতি অন্ধ বিশ্বাস আর মানুষটির অকৃত্রিম ভালবাসা।

ক্রমে জ্যাকির মাথার ঘা শুকিয়ে এল। কিন্তু মাথার আঘাত ছাড়াও তার ডান চোখের নীচে এবং গলার ভিতরও আঘাত ছিল, মেজর তাও দেখলেন। বুঝলেন, এ আঘাত তার স্বজাতির সঙ্গে মারামারি ক'রে হয় নি, কোন শিকারী তাকে মারার জন্য বর্শা দিয়ে আঘাত দিয়েছে। কারণ, শিকারীরা মাছ না পেলে, বছরে একদিন মাত্র সীল মাছ ধরার বে-আইন, তাকে উপেক্ষা ক'রে সীল মাছ ধ'রে সাধারণ মাছের অভাব পূরণ ক'রত এবং এইরকম এক শিকারীর বর্শার আঘাতেই কানা হয়ে গেল জ্যাকির বাঁ চোখটা। যাই হোক, জ্যাকি জলের নীচে থাকলেও তার বন্ধুর ডাক শুনতে পেলেই তাড়াতাড়ি জল থেকে উঠে আসত এবং বন্ধুর দেওয়া মাছগুলি খেয়ে আবার জলের নীচে চ'লে যেত। জ্যাকি তার স্বভাবজাত কারণে বেশীক্ষণ মানুষের সংস্রবে থাকতে ভালবাসত না। তথাপি সে এইভাবে শুধু তার বন্ধুর নয়, ছোট ছোট ছেলেমেয়েদেরও প্রিয় হয়ে উঠেছিল। সে বাচ্চাদের হাত থেকে মাছ নিয়ে খেত (যদিও তার এক কামড়ে ঐ বাচ্চাদের একটা হাত সে দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন ক'রে নিতে পারত) এবং বাচ্চারাও ভয় করত না তাকে একটুও।

জ্যাকি ও মেজরের মধ্যে ঘনিষ্ঠতা দৃঢ়তর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বাইরের লোকের সঙ্গেও তার ভাব হয় এবং তাদের হাত থেকেও সে মাছ নিয়ে খেতে ভয় পেত না। মেজর নিজে হাতে খাওয়াতেন এবং সময় সময় তাদের মধ্যে মান-অভিমানের পালাও চলত। জ্যাকি পেশাদার জেলেদের কাছ থেকে পর্যন্ত ভালবাসা আদায় করেছিল এবং এই ভালবাসা জেলেরা মাছ দিয়ে দেখাত। এমন কি কম মাছ পেলেও তারা জ্যাকিকে কিছু না দিয়ে পারত না।

সুতরাং জ্যাকির স্থানীয় লোকদের কাছ থেকে ভয় পাবার কারণ কিছু ছিল না, কিন্তু ভয় ছিল তার বাইরের লোকের কাছ থেকে। একদিন বাইরের কিছু শিকারী তাদের নৌকার কাছে জ্যাকিকে ঘুরতে দেখে একজন একটি বড় বঁড়শি দিয়ে তাকে ধরার চেষ্টা করে এবং এতে জ্যাকি প্রায় মরণাপন্ন হয়।

জ্যাকি ক'দিন অনুপস্থিত থাকার পর মেজরের ডাক শুনে সেদিন উঠে এল জল থেকে। মেজর দেখলেন, তার মুখে লম্বা নাইলনের একটা ফালি ঝুলছে এবং যন্ত্রণায় জ্যাকি কাতরাচ্ছে। জ্যাকির মুখ খুলে মেজর দেখলেন, মাছসমেত একটি বড় বঁড়শি তার গলায় আটকেছে। বঁড়শিটা ডাক্তার এসেও খুলতে পারলেন না, কিন্তু সেটাকে ডাক্তার চালান ক'রে দিলেন জ্যাকির পেটের মধ্যে এবং এইভাবে জ্যাকি সে যাত্রায় বেঁচে গেল।

জ্যাকির এখন মেজরের পোতাশ্রয়ই হচ্ছে ঘরবাড়ির মত। কিন্তু জ্যাকি সবসময় পোতাশ্রয়েই থাকত না। সময় সময় সে গভীর জলের নীচে চ'লে যেত এবং মেজরের ডাক শুনতে না পাওয়ায় সে মাঝে মাঝে অনুপস্থিতও থাকত। সেই সময় মেজর জলের ধারে গিয়ে খুব জোরে চীৎকার করে জ্যাকিকে ডাকলে, জ্যাকি তাড়াতাড়ি উঠে এসে লুটিয়ে পড়ত তার পায়ের কাছে।

সেবারে গ্রীষ্মের শেষে ফল্‌স্ উপসাগরের লাল জোয়ার এসে পোতাশ্রয়ের জলকেও বিষাক্ত ক'রে দেয়। এই জোয়ারকে বলা হয় 'মৃত্যুর লাল জোয়ার'। এই জোয়ারের জল এলে অজস্র মাছ মারা পড়ত। জ্যাকি এই জোয়ারের ভয়ে গর্ডন উপসাগর থেকে অনেক দূরে বাঁচার জন্য চ'লে যায়। মেজর জ্যাকির এই দূরে স'রে যাওয়ায় একদিকে যেমন উদ্বিগ্ন রইলেন, অন্যদিকে তিনি ভগবানের কাছে প্রার্থনা জানালেন তার জন্য।

তিনদিন পরে জোয়ার চ'লে গেলে জ্যাকি ফিরে এল। দেখা গেল জ্যাকি বেশ রোগা হয়ে গিয়েছে এবং মাছ খেতে না পেয়ে নির্জীব হ'য়ে পড়েছে। গর্ডন উপসাগরের সকলে এই অবস্থার পর জ্যাকিকে আবার

দেখতে পেয়ে খুব খুশী। কিন্তু জ্যাকি আর আগের মত যেন স্ফুর্তিবাজ নয়। স্বতঃস্ফূর্তভাবে মনের আনন্দে সাঁতার কাটে না। মাষ্টার তার নাম ধ'রে ডাকলে সে ছুটে আসে। তিনি হাত বাড়িয়ে দেন। সে তার গোঁফের শুঁয়ো দ্বারা স্পর্শকরে তার বন্ধুর হাত। মেজর দেখেন, তার জ্যাকি সম্পূর্ণ অন্ধ হ'য়ে গিয়েছে।

মেজরের চোখ বেয়ে জলের ধারা নামে। তাঁর দুঃখ হয় একে আজও বকলে আপন ক'রে নিতে পারল না? তাই কোন শিকারী জ্যাকির বাম-চোখটায় বর্শার ফলা দিয়ে আঘাত করেছে। রক্ত ঝরছে চোখ থেকে। ডাক্তার পরীক্ষা ক'রে বললেন, জ্যাকি জীবনে আর দৃষ্টিশক্তি ফিরে পাবে না।

এই সময় জ্যাকি পদার্পণ করে যৌবনে। তার খাবার লাগে বেশী এবং ৩০ থেকে ৪০ পাউণ্ড মাছ প্রতিদিন জোগাড় করতে হয় তার জন্য। তাকে এখন খাইয়ে দিতে হয়। তার দুঃখ দেখে পেশাদার জেলেরা পর্যন্ত তাকে মাছ দেয়।

কিন্তু মুশকিল হ'ল, গরম পড়ায় মাছ পেত না জেলেরা। কম মাছ পাওয়ায় জ্যাকির জন্য আলাদা ক'রে মাছ রাখা সম্ভব হ'ত না।

অন্ধ হওয়া সত্ত্বেও জ্যাকির সাহসের অভাব ছিল না। অবাধে চলাফেরা করত সে। ফলে ভয় হ'ল মেজরের যে, কোন সময় জ্যাকি চ'লে যাবে দূরের কোন গভীর জলে। তার ডাক শুনতে না পেয়ে খাবার অভাবে কিংবা হাঙ্গরের পেটে তার মৃত্যু ঘটবে।

তাই মেজর জনমঙ্গল কর্তৃপক্ষের কাছে জ্যাকির সঙ্কটের কথা বললেন। কিন্তু তাঁরা জানালেন যে এ ব্যাপারে তাঁরা নিরুপায়।

মেজর একদিন দেখলেন, জ্যাকি বেজায় খুশীমনে সাঁতার দিচ্ছে। সে যেন তার পুরানো দিনে ফিরে গিয়েছে।

মেজরের শেষ ডাকে জ্যাকি উঠে এল তাড়াতাড়ি সাঁতরে এবং কয়েক ফুট দূরে দাঁড়িয়ে বন্ধুর সান্নিধ্য অনুভব করার চেষ্টা করল। দূরে দাঁড়িয়েই মেজর কোথায় আছেন তা বোঝবার জন্য তার গোঁফের শুঁয়ো বাড়িয়ে তাঁকে স্পর্শ করতে গেল। মেজর হাত বাড়িয়ে দিলে জ্যাকি তার সুন্দর নরম শুঁয়ো দিয়ে তাঁর হাতের আঙুলে সুড়সুড়ি দিল।

—ছোট্ট জ্যাকি! আমার ছোট্ট জ্যাকি!

মেজর চোখ বুজে তাঁর বন্দুকের ঘোড়া টিপলেন। গুলী ছুটে গিয়ে জ্যাকিকে বিদ্ধ করল। জ্যাকি করুণ আর্তনাদ ক'রে লুটিয়ে পড়ল বন্ধুর পায়ে।

বন্দুকটি ছুঁড়ে ফেলে মেজর কোলে তুলে নিলেন জ্যাকিকে। পোতাশ্রয়ের কাছেই এক বাগানে মেজর সমাহিত করলেন তাঁর প্রিয় জ্যাকিকে।

যে যুদ্ধের শেষ নেই

মেজর এবং তাঁর দলবল চীনের মূল ভূখণ্ডের কাইকেং ও লোয়াং-এর মধ্যবর্তী ভূভাগে ৪ ঘণ্টা ধ'রে উড়তে লাগলেন। তাঁদের লক্ষ্যস্থানে নামতে হ'লে এখনও ৪৫ মিনিটের পথ বাকী। ও পক্ষের দু'টি মিগ ফাইটার বিমান তাঁদের অনুসরণ করছে।

মেজরের একমাত্র অনুকূলে আছে আবহাওয়া। মেঘের আড়ালে থেকে তাঁরা শত্রুপক্ষের বিমানবিধ্বংসী কামানগুলিকে বিভ্রান্ত ক'রে চলেছেন। কারণ, তাঁরা ১২০০ ফুট উপরে আছেন।

মেজরের এই সি ৪৬ বিমানের নির্মাতা ভাবেন নি কোনদিন যুদ্ধে, এই বিমানটি কাজে লাগবে। মেজরকেও ২০ বছর পরে চীনের মূল ভূখণ্ডে জীবনমৃত্যুর সন্ধিস্থলে এসে দাঁড়াতে হবে ভাবেন নি।

আজকের রাত্রিতে এই অভিযানের উদ্দেশ্য ড্রাগন উৎসবে খাদ্য সরবরাহ। ছোট মজবুত প্রতিটি থলির মুখে জাতীয়তাবাদী চীনের পতাকা। তার পিছনে লেখা "থলি খোলামাত্র এই খাদ্য গ্রহণ করবে। কারণ এ খাদ্য জমানো এবং রান্নার প্রয়োজন করে না।"

মেজর আক্রমণকারীদের বিভ্রান্ত ক'রে খাদ্যবস্তু সরবরাহ করবেন ভাবলেও তারা যে সর্বরকমে সজাগ তা তিনি জানেন। কারণ তারা গোলা ছুঁড়েছিল।

মেজর জানেন মিগ বিমানের জ্বালানি ফুরাবে। তাই ঘড়ি ধ'রে সময়ের সঙ্গে তাল রেখে তাঁদের পৌঁছাতে হবে তৃতীয় পাহাড়ে। একটি পাহাড়চূড়া অতিক্রম করার পরও তৃতীয় পাহাড়ের চূড়া এখনও ২৬০০ ফুট উঁচুতে। যদি এখন গতি বদলান্ বা পিছনে ফেরেন তবে আক্রমণকারীরা তাঁদের অনুসরণ করবে। তাঁকে লক্ষ্যে পৌঁছাতে হ'লে যা রসদ আছে তাতে অন্য কিছু করলে সফলতা আসবে না।

পাহাড়ের চূড়া ক্রমেই দেখা যেতে লাগল। তাঁরা নিকটবর্তী হলেন পাহাড়ের। বুঝলেন সময় সন্নিকট।

তিনি যুক্তি দিয়ে সিদ্ধান্তে এলেন যে কমিউনিষ্ট পাইলটরা ভুলভাবে তাঁদের পিছনে, পাশে অনুসরণ করছে। তিনি পাহাড়ের এত কাছে এসে গিয়েছেন যে, ভয় হ'ল শত্রুরা তাঁদের কামানের নাগালের মধ্যে পেয়ে যাবে।

তাই মেজর আবার উঠে এলেন উপরে। শুনতে পেলেন তাঁর সাহায্যকারীর স্পষ্ট দীর্ঘশ্বাস।

মেজর সহকারীকে জিজ্ঞাসা করলেন—কোন সঙ্কেত পাচ্ছ কি?

—না।

সুতরাং মেজর রত হলেন চতুর্থ পাহাড়ের সন্ধানে। সেখানেই খাদ্য ফেলবেন বিমান থেকে। সময় দেখে ঠিক করলেন, নতুন উপায় অবলম্বন করতে হবে। তাঁর সহকারী বললেন, এক নম্বর এঞ্জিন গরম হয়ে উঠেছে।

—আমি জানি।

হঠাৎ মেজর দেখলেন, একটা কিছু নড়ছে মনে হয়। তিনি যেন বিপদের আভাস পেলেন। যে দু'টি শত্রুপক্ষের ফাইটার বিমান অনুসরণ করছিল তাদের একটি অথবা নতুন কোন উপসর্গ। শত্রুরাও তাদের পদ্ধতি পালটেছে মনে হ'ল। তাঁর মনে হ'ল শত্রুরা তাঁদের ধ্বংস করতে এগিয়ে আসছে।

মেজর তাঁর বিমানকে নীচেয় নামিয়ে নিলেন বিমানের বেগ কমিয়ে। বিমানটিকে এমন অবস্থায় নিয়ে এলেন যাতে তাঁরা ঘুরতে পারেন একই জায়গায়।

তিনি বুঝলেন এতে আক্রমণকারীরা ক্রুদ্ধ হবে। তারাও গাছের মাথার সমান নীচে নেমে চেষ্টা করবে তাঁদের বিমানকে ধ্বংস করতে। তারা এসে পড়বে হয়ত তাঁদের পাশেই।

রাত্রির নিস্তব্ধ আকাশ। আগে থেকে জানা না থাকলে পাহাড়ের চূড়ায় নিরাপদে অবতরণ শক্ত। চূড়া মনে হবে কাছে কিন্তু আসলে তা দূরে।

মেজর দেখলেন ফাইটার বিমান তাঁদের ঘিরে ফেলেছে। চেয়ে দেখলেন মাটি কাছেই।

—পাইলট ও ক্রু সকলে টুপি পরুন।

মূল ভূ-খণ্ড থেকে কম্যুনিষ্ট চীনদের বিধ্বস্ত গোলাবর্ষণে বিধ্বস্ত ফরমোসার একটি গৃহ।

একজন উত্তেজিত হয়ে বলল—একটা জেট ইঞ্জিন ধাক্কা খেয়েছে পাহাড়ের সঙ্গে।

মেজর কমিয়ে দিলেন বিমানের গতিবেগ। সামনেই পাহাড়ের চূড়া ও তার নীচে উপত্যকা। নদীগর্ভের নীচে জলকে সাদা দাগের মত দেখাচ্ছে। পাশেই একটি চিতার আগুন।

—কোন সংকেত?

—না-না-না।

মেজর একটি এঞ্জিন নিয়ে চতুর্থ পাহাড়ে নামার ঝুঁকি নিতে রাজী নন। এতে সময় লাগবে অনেক। আনানি লাগবে।

তিনি চার ঘণ্টা ছিলেন চীনের মূল ভূখণ্ডে। এক এঞ্জিন নিয়ে চললে রাত্রি শেষ ক'রে দিনের আলো দেখা দেবে। তার অর্থ কমিউনিষ্টদের হাতে ধরা পড়ার আশঙ্কা।

মেজর বললেন, আমরা একটি এঞ্জিন হারিয়েছি। তাই ফিরে যেতে হবে। এখন সোজাসুজি ফিরব। চিহ্নিত গ্রামগুলি দেখা গেলে খাদ্য ফেলব।

ফেরার পথে চিহ্নিত গ্রামের দেখা নেই। খাদ্য বোঝাই ক'রে উড়ায় ফেরার চেয়ে যে কোন গ্রামে খাদ্যবস্তুগুলি নিক্ষেপ করলে বুভুক্ষুরা খেয়ে বাঁচবে।

মেজর ফিরলেন পিছনে। তিনি জানেন, তাঁর মত অনেকে এই উদ্দেশ্য নিয়ে মূল ভূখণ্ডে তাদের কর্তব্য সম্পাদন করার জন্য রয়ে গিয়েছে।

ধ, ম,

সাধারণের জন্য বিজ্ঞান

পঞ্চশস্যের এই নৈবেদ্যে বিজ্ঞানের যৎসামান্য উপকরণ সাজাতে গিয়ে মাঝে মাঝে মনে পড়ে বই কি, সামান্য এই খুদকুটো জড়ো করে রাম পূজার আয়োজন করছি। টুকিটাকি বিজ্ঞানের বা কথা বলি, সে তুলনায় পুরো বিষয়টির পরিধি যে কতো বড়ো, আমাদের সহজ ধারণায় তা আসে না। বিজ্ঞান ও তার প্রয়োগবিদ্যায় আজ পৃথিবীতে পঞ্চাশ হাজারেরও বেশী পত্র-পত্রিকা নিয়মিত বার হচ্ছে। তাতে প্রতি বছর অন্তত বারো লক্ষ বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধ প্রকাশ পায়। এক বিজ্ঞান বিষয়েই ছাপা বইয়ের সংখ্যা ষাট হাজারের কম হবে না। আয়োজন যে কি বিরাট এ থেকে তার কিছু অনুমান হয়। প্রতি কুড়ি বছরেই নাকি এই পরিমাণ বেড়ে দ্বিগুণ হচ্ছে। পদার্থ বিজ্ঞানের আলোচনার জন্য ইংরেজীতে 'ফিজিকাল রিভিয়ু' ব'লে একটা গবেষণাপত্র রয়েছে। ১৯৪৬ থেকে ১৯৬০ সালের মধ্যে তার আয়তন যে হারে বৃদ্ধি পেয়েছে তাতে হিসাব করে দেখা গেছে, এভাবে বেড়ে চললে পত্রিকাটির ওজন সামান্য দেড় শ' বছরের মধ্যেই খোদ পৃথিবীর ওজনকেও ছাড়িয়ে উঠবে! বাস্তবক্ষেত্রে সে সম্ভাবনা অবশ্য নেই, তবে বিজ্ঞানের গতি যেভাবে বেড়ে চলেছে তার সম্বন্ধে ধারণা আনার জন্যই একথা তোলা হ'ল।

এমন অবস্থায় বিজ্ঞান সাধারণের হাতে কতটা পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে তা হ'ল বিশেষ জিজ্ঞাসা। কথাটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। বিজ্ঞান আজ মানুষের চিন্তায়, ভাবনায়, জীবনের সর্বক্ষেত্রে যেভাবে প্রভাব নিয়ে আসছে তাতে মূল বিষয়গুলি সকলকেই বুঝে নিতে হবে। কিন্তু এ ক্ষেত্রে সমীক্ষার ফল মোটেই আশা করার মত নয়। হিসাবটা অবশ্য আমেরিকার। সে দেশের খবরের কাগজ বা অন্যান্য সাময়িক পত্রিকায় মোট পরিসরের মাত্র শতকরা সাত ভাগ জায়গায় বিজ্ঞানের আলোচনা থাকে। আমাদের দেশের হিসাবটা আরো খারাপ। অনুমান, শতকরা দুই থেকে তিন ভাগের বেশি হবে না। তবে হাঁ, রকেট বা স্পুৎনিক ছোঁড়ার পর বৈজ্ঞানিক রচনার যেন মান বেড়েছে। মানুষ আরো সচেতনভাবে বিজ্ঞানকে জানতে চাইছে। এর মধ্যে হুজুক কতটা কাজ করছে তা অবশ্য চিন্তার কথা। তবে সব মিলিয়ে বিজ্ঞানের প্রতি যে আজ আকর্ষণ বেড়েছে, তাতে সন্দেহ নেই।

যা দর্শনীয়—তাই মানুষকে আকর্ষণ করবে এ ত স্বাভাবিক।

বিজ্ঞানের মহাযজ্ঞ

৪ঠা থেকে ২০শে ফেব্রুয়ারী—রাষ্ট্রসংঘের উদ্যোগে জেনেভায় বিজ্ঞান ও তার প্রয়োগবিদ্যার এক মহাসম্মেলনের আয়োজন করা হয়েছে। সারা পৃথিবীর প্রায় দেড় হাজার বিজ্ঞানী এতে যোগ দিচ্ছেন। সম্মেলনের সভাপতি বিখ্যাত ভারতীয় বিজ্ঞানী অধ্যাপক এম. এস. থাকার আর তার

সাধারণ সম্পাদকের কাজ করবেন ব্রাজিলের বৈজ্ঞানিক কারলোস্ কাগাস্। অনগ্রসর দেশগুলি যাতে আধুনিক বিজ্ঞানের সুযোগসুবিধা-গুলি গ্রহণ করতে পারে তার উপায় নির্ধারণ করাই সম্মেলনের উদ্দেশ্য। অধ্যাপক থাকার এ সম্বন্ধে সম্প্রতি বলেছেন, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর থেকে উন্নত ও অনগ্রসর দেশগুলির মধ্যে পার্থক্য ক্রমশই বেড়ে চলছে। উন্নত দেশগুলি যে হারে এগিয়ে চলছে অনুন্নত দেশগুলি তার সঙ্গে তাল বজায় রাখতে পারছে না। বিশেষ সামাজিক ও অর্থনৈতিক সমস্যার পরিপ্রেক্ষিতে এশিয়া ও আফ্রিকার দেশগুলিকে তাই আরো তৎপর হতে হবে।

বিজ্ঞানের এই মহাসম্মেলন উপলক্ষ্যে রাষ্ট্রসংঘের তরফ থেকে এই নতুন ডাকটিকিট চালু করা হয়।

সম্মেলনে প্রায় দু'হাজার প্রসঙ্গ পাঠ করা হবে। ভারত থেকে পাঠানো হয়েছে ৬০টি। অধ্যাপক থাকার ছাড়াও আমাদের দেশ থেকে ডঃ ভাবা; ডঃ এস আর. সেন; ডঃ এস এইচ. জাহীর ইত্যাদি বিশিষ্ট বিজ্ঞানীরা সম্মেলনে যোগদান করছেন। আশা করি ভারত এই সম্মেলনের অভিজ্ঞতা থেকে কল্পনা ও দূরদৃষ্টির আলোকে দিক্‌দর্শন খুঁজে পাবে।

পরমাণুর জন্ম

পরমাণু ছিল, এবং আছে। তবু মানুষের হাতে তার একবার জন্ম হ'ল। পরমাণু বলতে আমরা যা জানি, তার যে বিপুল শক্তি, মানুষের সাধনায় তা বেরিয়ে এলো কুড়ি বছর আগে আমেরিকার শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের এক নিভৃত কামরায়। এ বছর তার বিংশবার্ষিকী। ১৯৪২ সালের ২রা ডিসেম্বর. মানুষের হাতে পরমাণুর "চুল্লী" প্রথম কাজ সুরু করল। সমস্ত মানুষের ইতিহাসে এ এক বড় ঘটনা। আইনষ্টাইনের তত্ত্ব অনুসারে য়ুরেনিয়াম পরমাণুর বস্তুসত্তা লোপ পেয়ে যে শক্তি বেরিয়ে এলো তা হ'ল এই পরমাণু শক্তি। ধীরে ধীরে সে শক্তিই আজ প্রবল হয়ে মানুষের সামনে আশা ও আশংকার দুটো চিত্রই সমানভাবে তুলে ধরেছে। ১৯৪২ সালের ঘটনাটা তাই অনেক গুরুত্ব-পূর্ণ ঘটনা।

এ প্রসঙ্গে পরমাণুর ইতিহাসের প্রধান ধাপগুলি এখানে তুলে ধরতে পারি। খুব সংক্ষেপে তা হবে পরমাণুর জন্মকাহিনীর এক পুরো ইতিহাস।

১৮৯৬ সাল—তেজস্ক্রিয়তা বা রেডিও-একটিভিটির আবিষ্কার (বেকারেল)। এই তেজস্ক্রিয় রশ্মি হ'ল অত্যন্ত তেজ বা শক্তিসম্পন্ন আলো।

১৮৯৮ সাল—রেডিয়াম আবিষ্কার (প্যারী ও ম্যাডাম কুরি)।

১৯১১ সাল—পরমাণুর কেন্দ্রবস্তু বা নিউক্লিয়াসের আবিষ্কার রাদারফোর্ড)।

১৯১৩ সাল—নীলস্ বোর কর্তৃক পরমাণুর প্রকৃতি ব্যাখ্যা।

১৯৩২ সাল—পরমাণুর উপাদান নিউট্রনের আবিষ্কার (চ্যাড়উইক)।

১৯৩৪ সাল—কৃত্রিম উপায়ে তেজস্ক্রিয় জিনিষের সৃষ্টি (আইরিন ও জোলিও কুরি)।

সাহিত্যিকের চোখে বিজ্ঞানী

বিজ্ঞানের সঙ্গে সাহিত্যের সম্পর্ক যতই জোরালো হোক্ না, দেখা যায় বৈজ্ঞানিকের সম্বন্ধে কলম ধরতে সাহিত্যিকের কালি শুকায়। এ কথা আমাদের দেশ সম্বন্ধে বিশেষ করে সত্য। সম্প্রতি তার এক ব্যতিক্রম দেখতে পেয়ে খুব আনন্দ হ'ল। বৈজ্ঞানিক-চূড়ামণি নীলস্ বোরের মৃত্যুর পর সাহিত্যিক পরিমল গোস্বামীর স্মৃতিচারণের "দ্বিতীয় স্মৃতি" আলোড়িত হয়েছিল (বইটি সদ্য-প্রকাশিত)। তা থেকে সামান্য একটু আমরা তুলে ধরলাম:

"অ্যাটম বা পরমাণুর গঠনতত্ত্ব নিয়ে অনেকদিন ধ'রে আলোচনা চলছিল। অ্যাটমের ভিতরে কি আছে, তা জানা সহজ ছিল না, প্রবেশের দরজা পাওয়া যাচ্ছিল না। কিছু কিছু আভাস মেলে, অথচ সিসেমি দরজা খোলে না। অবশেষে রাদারফোর্ড প্রথম ঝাঁপিয়ে পড়লেন, অ্যাটমের অভ্যন্তরে। ডিম যেমন শুককীটের দ্বারা নিষিক্ত হয়—ডিমের ভিতরে শুককীট মাথা গলায়, রাদারফোর্ডও তাই করলেন অ্যাটমের মধ্যে, কিন্তু ভিতরের গঠন-রহস্য সব ব্যাখ্যা করতে পারলেন না। নীলস্ বোর দিলেন পরবর্তী ব্যাখ্যা (মাঝখানে অনেক বিখ্যাত বিজ্ঞানীর নাম উল্লেখে বিরত রইলাম)। অ্যাটমতত্ত্ব অনেকখানি এগিয়ে গেল।"

নীলস্ বোর সম্বন্ধে একটি পূর্ণাঙ্গ আলোচনা এ সংখ্যার প্রবাসীতে স্থান পেয়েছে।

এটম থেকে ইলেকট্রিসিটি

শেষ পর্যন্ত ভারতবর্ষেও তা সম্ভব হতে চলছে। পরমাণুর যে বিস্ফোরণশক্তি তাকে সংযত ক'রে গ'ড়ে তোলা হয় 'রিয়েকটার' যন্ত্র, বিদেশী সাহায্যে ভারতে ইতিমধ্যে দু'টি রিয়েকটার তৈরী হয়েছে। বম্বের কাছে ট্রম্বেতে এই রিয়েকটার দু'টি মূলতঃ গবেষণাধর্মী, তাতে পরমাণু-সংক্রান্ত গবেষণার কাজই হয়ে থাকে। তৃতীয় যে রিয়েকটার

তাতে তাপশক্তি হবে প্রচণ্ড, এই উত্তাপকে কাজে লাগিয়েই ইলেকট্রিসিটি,—কয়লা না পুড়িয়ে এভাবে পরমাণুর ব্যবহার। বম্বের একশ' কিলোমিটার দূরে তারাপুরে এই রিয়েকটার তৈরীর কাজ এগিয়ে চলছে। আশা করা যায় ১৯৬৪-৬৫ সালের মধ্যেই তা সম্পূর্ণ হবে। দ্বিতীয় পরমাণু বিদ্যুৎ কেন্দ্র বসানোর স্থান হ'ল রাজস্থানের রাণাপ্রতাপ সাগর নামে এক জায়গায়।

চারবার মৃত্যু

চার চারবার যিনি মৃত্যুকে ডিঙ্গিয়ে এসেছেন তিনি মৃত্যুঞ্জয় বই কি! কিন্তু আর একটি কারণেও তিনি মৃত্যুঞ্জয় তাঁর বৈজ্ঞানিক কীর্তিই তাঁকে মানুষের কাছে অমর করে রাখবে। এই মৃত্যুবিজয়ী পুরুষটি হচ্ছেন লেভ দেভিদোভিচ্ ল্যান্ডাউ, রুশদেশের পদার্থবিজ্ঞানী, বারবার 'ক্লিনিক্যাল' মৃত্যুর পর পুনর্জীবিত হয়ে যিনি এ বছর নোবেল পুরস্কার পাওয়ার গৌরব অর্জন করেছেন। 'ক্লিনিক্যাল' মৃত্যু মানে শরীরের সমস্ত ক্রিয়াকলাপ বন্ধ হয়ে যাওয়া। হৃদ্‌পিণ্ড বন্ধ হয়, শ্বাস-প্রশ্বাস থেমে যায়—এমন সঙ্গীন অবস্থা, মৃত্যু নয় ত কি?

গত বছর জানুয়ারী মাসের এক কুয়াশা-কুটিল সকাল, অধ্যাপক ল্যান্ডাউ এক মারাত্মক মোটর দুর্ঘটনায় আহত হলেন। তাঁর মাথার খুলি ফেটে গেল, পাঁজরার ন'টা হাড় ভাঙল, তলপেটের গ্রন্থিগুলি থেকে দারুণ রক্তস্রাব, সমস্ত শরীর পক্ষাঘাতে আক্রান্ত হ'ল, সে সঙ্গে হৃদ্‌পিণ্ড আর ফুসফুসের কাজও প্রায় বন্ধ হওয়ার জোগাড়। সঙ্গে সঙ্গেই ব্যবস্থা নেওয়া হ'ল, রুশদেশের সেরা চিকিৎসকরা এসে জড়ো হলেন—

লেভ ল্যান্ডাউ, পুনর্জীবনের পরে।

এমন একজন মহাবিজ্ঞানীর জীবন এভাবে নষ্ট হ'তে দেওয়া হবে না। দিবারাত্র অক্সিজেন চলল, বৈদ্যুতিক উপায়ে শরীরের দূষিত জিনিষ টেনে আনা হ'ল, নাকের ভিতর দিয়ে তরল জাতীয় জিনিষ খাওয়ানোর ব্যবস্থা হ'ল।

এভাবে চারদিন। চতুর্থদিন শরীরের রক্তচলাচল সম্পূর্ণ বন্ধ। তার মানে মৃত্যু। কিন্তু বিজ্ঞানীরা দমলেন না। বাষ্পযন্ত্রের সাহায্যে রক্ত চালনার চেষ্টা হল। ফুসফুস্ আবার গতি ফিরে পেল।

কিন্তু কদিন আর। সাত দিনের মাথায় আবার "মৃত্যু"। এবারেও হার মানা নেই। এভাবে নবম আর একাদশ দিনে আবার, প্রতিবারই নিশ্চিত মৃত্যুর দ্বার থেকে ফিরিয়ে আনা হল। বারবার চারবার।

তাপমাত্রা ছিল ১০৭ ডিগ্রী, নিচের দিকে কখনো বা ৯০৪ ডিগ্রী (ফারেনহাইট)। শরীরের হাড় এত বেশী টুকরো হয়ে ভেঙেছে যে সাধারণ "প্লাষ্টার" দিয়ে জোড়ার উপায় ছিল না। তবু চার থেকে পাঁচ সপ্তাহের মধ্যে ভাঙ্গা হাড় জোড়া নিল।

কিন্তু পক্ষাঘাত? ডঃ ল্যান্দাউ কাউকেও চিনতে পর্যন্ত পারেন না, তার স্মৃতিশক্তি সম্পূর্ণ বিলুপ্ত। তবে কি আবার অপারেশনের প্রয়োজন? পৃথিবীর নানা দেশ থেকে আসা বিজ্ঞানীরা সে আলোচনাই করছেন।

"দাউ, তুমি যদি আমায় চিনে থাকো তোমার চোখ দু'টি বন্ধ করো।"

অধ্যাপক লিফৎসিৎ উত্তেজনায় চীৎকার করে উঠলেন। তবে ত ল্যান্দাউ স্মৃতি ফিরে পাচ্ছেন, কথা বলতে পারেন না চোখ বন্ধ ক'রে তা জানালেন—"দাউ" ল্যান্দাউয়েরই ডাকনাম। বন্ধুকে যখন চিনতে পেরেছেন, তখন আর অপারেশনের কি দরকার-চিকিৎসকরা সিদ্ধান্ত নিলেন।

আস্তে আস্তে অবস্থার উন্নতি হ'তে লাগল। স্বাভাবিকভাবে কি ক'রে শ্বাস নিতে হয় তাও তাঁকে নূতন করে শেখাতে হল—প্রথমে দিনে পাঁচ কি দশ মিনিট মাত্র। তার পর কথা বলা। ধীরে ধীরে তাও আয়ত্তে এলো। ছ' সাত মাসের মধ্যেই তিনি তাঁর প্রিয় কবিতাগুলি আবৃত্তি করতে পারলেন। বিজ্ঞানের বিষয়গুলি ক্রমে তাঁর মনে পড়তে লাগল। কবে তিনি তাঁর গবেষণার কাজে ফিরে যেতে পারবেন এখন এ তাঁর আন্তরিক জিজ্ঞাসা।

আশা করি যিনি চার চারবার "মৃত্যু"কে ফাঁকি দিয়ে আমাদের মধ্যে রয়ে গেছেন, শেষ পর্যন্ত তাঁর এই ইচ্ছাও পূর্ণ হবে।

বিস্ফোরণের বিরুদ্ধে

পারমাণবিক অস্ত্রশস্ত্র বাতিল করার উদ্দেশ্যে পৃথিবীর জ্ঞানী গুণী বিজ্ঞানীরা এ পর্যন্ত অনেক কথাই বলেছেন। এ সম্বন্ধে মালীর পররাষ্ট্র মন্ত্রী বোরিমা বেকাম যে বিশেষ তথ্যটি তুলে ধরেছেন তা থেকে আমরা বিষয়টিকে নূতন আলোকে দেখার সুযোগ পাই। রাষ্ট্রসংঘের সাধারণ অধিবেশনে তিনি বলেছেন, পরমাণু অস্ত্রের এই সর্বনাশা প্রতিযোগিতায় প্রতি বছর অন্তত ষাট হাজার কোটি টাকার প্রয়োজন হয়। পৃথিবীর সমস্ত অনগ্রসর দেশগুলির মোট জাতীয় আয়ের থেকেও বেশী এর পরিমাণ।

ভবিষ্যতের প্রস্তুতি

বিজ্ঞান যেন সময়কে ধাক্কা দিয়ে নিয়ে চলছে। আজ যা নূতন, অভাবনায়, আগামী কালেই তা বাতিল হয়ে পড়ছে। দুনিয়ার পরিবর্তনের হার

ছ'শ ফুট উঁচু স্তম্ভের উপর কাঁচের রেস্তোরাঁ।
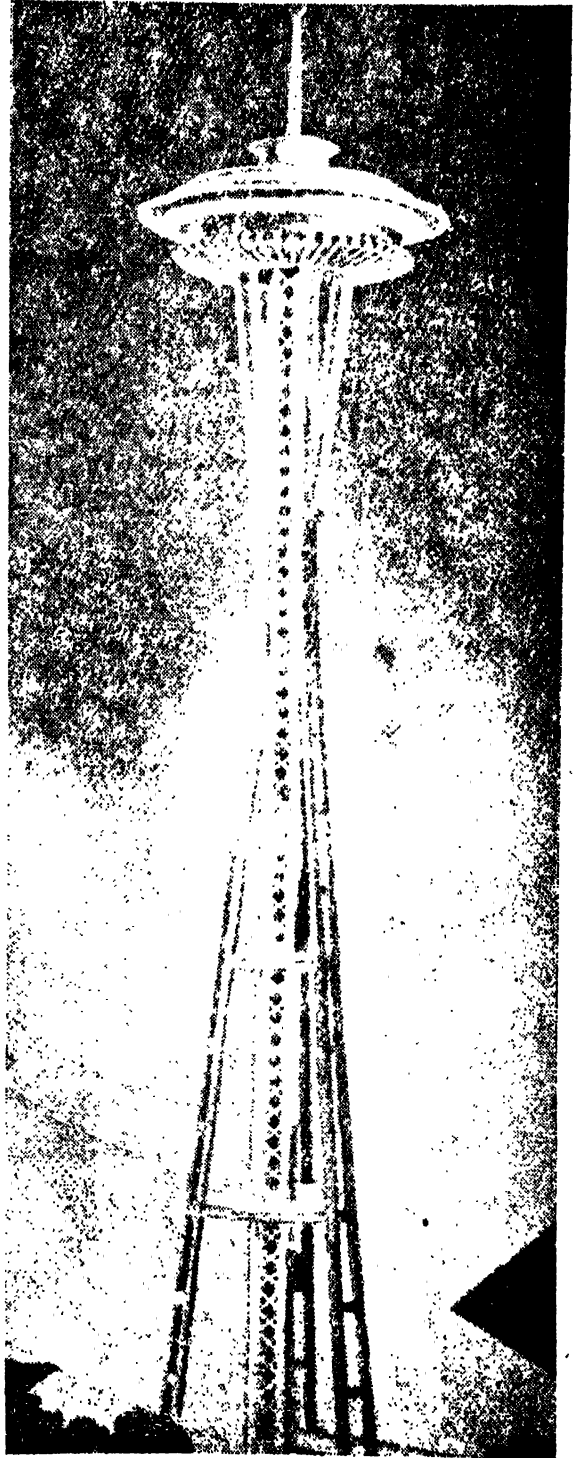
এমনি দ্রুত, এমনি আকস্মিক। এমন অবস্থায় ভবিষ্যৎ যে যথার্থ কি রূপ নিয়ে আসছে কে তা কল্পনা করতে পারে? বিশেষজ্ঞগণ তা চিন্তা করে দেখেছেন, শুধু চিন্তা নয় প্রদর্শনী সাজিয়ে তা সাধারণের সামনে তুলেও ধরেছেন। গত বছর আমেরিকার সিয়াটেল-এ যে বিশ্ব প্রদর্শনীর আয়োজন হয়, তার উদ্দেশ্যই ছিল আগামী শতাব্দীর সম্ভাব্য দিকগুলি সম্বন্ধে দেওয়া। বিজ্ঞান ও তার প্রয়োগবিদ্যার প্রভাবে আমাদের সামনে যে পরিবর্তন আসছে তা যেমনি বিচিত্র তেমনি চমকপ্রদ। ছোটখাট এমন কম্পুটার বা গণনাযন্ত্র তৈরী হবে যা রান্নাঘর ও গৃহস্থালীর টুকিটাকি অজস্র কাজকর্ম নির্ঝামেলায় সহজ করে দেবে। থাকবে এক ধরণের টেলিফোন যা তুলে শুধু কথা বললেই প্রয়োজনমত দরজা বা জানালা বন্ধ করা যাবে, বাগানে জল দেওয়া চলবে, ঘরদোর পরিষ্কার করাও অসম্ভব হবে না। সাধারণ ইলেকট্রিক বাল্বের বদলে থাকবে দেওয়াল জুড়ে আলোর ব্যবস্থা, এ আলো যেমন উজ্জ্বল তেমনি স্বাভাবিক স্নিগ্ধ, মস্ত বড়ো টেলিভিশন থাকবে যাতে ক'রে পাশের গাঁয়ের বন্ধুর সঙ্গেও ব'সে দাবা বা তাস খেলা যায়। শীতকালে ঘর গরম করার জন্য থাকবে বিচিত্র ব্যবস্থা, কম্বলের ভিতরটাও বৈদ্যুতিক উপায়ে গরম রাখা যাবে।

আগামী যুগের মানুষ অনেকেই মহাশূন্যের পথে পাড়ি জমাবে। প্রদর্শনীতে তাই রয়েছে এক 'আকাশমঞ্চ' (SPACEARIUM) যার ভিতরে ঢুকে মহাকাশযাত্রার অভিজ্ঞতালাভ করা যাবে, মনে হবে সত্যই যেন গ্রহতারা-সমাকুল আকাশের মধ্য দিয়ে পাড়ি দিচ্ছি।

এমনি অজস্র সম্ভাবনার চিত্র রয়েছে এই অভিনব বিজ্ঞান প্রদর্শনীতে। এখানে আর একটি আকর্ষণ—ছ'শ' ফুট উঁচু একটা ইস্পাতের স্তম্ভ, যার উপরে একটা কাচের ঘর ঘণ্টায় একবার করে ঘুরপাক খাচ্ছে। এই অভিনব ঘরটিতে ব'সে আশেপাশের দৃশ্য দেখতে দেখতে কার না মনে হয়, হাঁ আমিও প্রস্তুত, এই মুহূর্তেই বর্তমানের বাঁধন কেটে ভবিষ্যতের রাজ্যে প্রবেশ করতে পারি।

পরলোকে ডঃ নিখিলরঞ্জন সেন

আমাদের দেশের এক বিখ্যাত বিজ্ঞানীকে আমরা সম্প্রতি হারালাম। গত ১৩ই জানুয়ারী ডঃ নিখিলরঞ্জন সেন কলকাতায় দেহরক্ষা করেছেন। অধ্যাপক সেন আপেক্ষিকতা, জ্যোতির্পদার্থ বিদ্

অধ্যাপক নিখিলরঞ্জন সেন

এবং বলবিদ্যা-সংক্রান্ত গবেষণায় পৃথিবীর বিজ্ঞানী-সমাজে প্রতিষ্ঠা পেয়েছেন। গত ত্রিশ বছর ধ'রে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে রাসবিহারী ঘোষ অধ্যাপকরূপে তিনি একদল যে বিশেষ কৃতী গণিতজ্ঞ সৃষ্টি করেছেন, ভরসা আছে এই বিগত বৈজ্ঞানিকের সম্মান তাঁদের কাছে আরো অনেক দূর প্রসারিত হবে।

এ. কে. ডি.
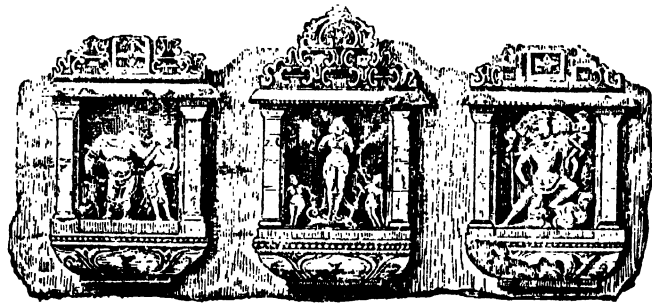
হরতন্

বিমল মিত্র

১১

সদানন্দ এ উপন্যাসে একটা সামান্য চরিত্র। কিন্তু তারও একটা বিশিষ্ট ভূমিকা আছে আমার গল্পে। সেই ঘটনাটা বলি।

সদানন্দ শুধু দুলাল সা'র ম্যানেজারই ছিল না, ম্যানেজারের চেয়েও বেশি ছিল। এককালে কান্ত যখন আসে নি, তখন কান্তর জায়গাতেই কাজ করত সদানন্দ। শুধু খাওয়া। পেট-ভাতা চাকরিতেই এসেছিল প্রথমে সদানন্দ। সদানন্দ তখন তাইতেই মহা খুশী। তখন খেতে পাওয়াটাই বড় কথা। তার বেশি কিছু সে চায় নি।

কিন্তু আস্তে আস্তে দুলাল সা'র অবস্থা ভাল হ'ল।

তারই চোখের সামনে দুলাল সা'র নতুন বাড়ী উঠল। দিনের পর দিন দুলাল সা'র অবস্থার বদল হ'তে দেখল। সদানন্দ চোখের সামনেই দেখতে পেলে কেমন ক'রে কোথা থেকে টাকা আসে দুলাল সা'র আর নিতাই বসাকের। সদানন্দই হিসেব রাখত, সাদানন্দই ক্যাশ বুঝিয়ে দিত দুলাল সা'কে। তার নিজের অবস্থা এতটুকু বদলালো না, এতটুকু উন্নতি হ'ল না নিজের।

অনেকবার আড়ালে বলেছিল সদানন্দ দুলাল সা'কে

- সা মশাই, আমি ত আর পারি নে—

—পারি নে মানে? মানেটা খুলে বল!

সদানন্দ বলছিল—আজ্ঞে, পারি নে মানে সংসার চালাতে পারি নে —

— তার মানে তুমি মাইনে বাড়াতে চাও?

—আজ্ঞে, তার বেশি আর কী চাইব বলুন? সতেরো টাকায় আর চালাতে পারি নে সংসার—

দুলাল সা কথাটা শুনে হাসতে লাগল।

বললে—সতেরো টাকায় সংসার চালাতে পার না? তুমি যে হাসালে আমাকে সদানন্দ! মানুষের খেতে কত টাকা লাগে বল দিকিনি? একটা মানুষের মাসে কত টাকা লাগে খেতে?

- আপনিই বলুন?

দুলাল সা বললে—একটা পয়সাও লাগে না। তবে বলি তোমাকে। এই আমি! আমি যখন এই কেষ্টগঞ্জে প্রথম এলাম, তখন আমার হাতে একটা পয়সাও ছিল না! বুঝলে হে, একটা পয়সাও ছিল না,—তখন আমি খাই নি? তখন আমি খেতে পাই নি? তখন কি আমি উপোস ক'রে থাকতাম? তুমিই বল না, তখন কি আমি উপোস ক'রে থাকতাম? আমার কথার জবাব দাও!

প্রথমে বিনা পয়সার চাকরি! শুধু পেট-ভাত। তার পরে তিন টাকা, পাঁচ টাকা! শেষকালে সতেরো টাকা। তাতেও সদানন্দর লোভ মেটে না। যার এত লোভ তাকে ক্যাশে রাখা ঠিক নয়। চোখের সামনে টাকার পাহাড় দেখলে লোভও বেড়ে যাবার কথা! এত টাকা দুলাল সা'র আর তার নিজের কিছুই নেই। এটা খারাপ। নিতাই বসাকও বললে এটা খারাপ। দুলাল সা'রও তাই মত।

দুলাল সা'র তখন রমারম অবস্থা চলেছে। পাট, তিসি, ধান। তার ওপর আছে লোহালক্কড়। শুধু তাই নয়, কোথা থেকে কোন্ অদৃশ্য সুড়ঙ্গ পথে ঝুড়ি-ঝুড়ি টাকা এসে হাজির হচ্ছে তার ইয়ত্তা নেই। নিতাই বসাক যত দিল্লী যায়, যত কলকাতায় যায় তত টাকা এসে যায় অদ্ভুত ভাবে। সাত শো টন পাটের অর্ডার আসে সিঙ্গাপুর থেকে। তিন শো টন তিসির অর্ডার আসে আমেরিকা থেকে। একেবারে আন্তর্জাতিক ব্যাপার। দুলাল সা'র আড়তের সামনে নৌকার গাদি লেগে যায়, লরীর ভিড় তিন দিন ধ'রে আর শেষ হয় না।

এ সমস্তই দেখত সদানন্দ।

দেখত আর মাস-কাবারি সতেরোটি টাকা নিয়ে ট্যাঁকে গুঁজত!

শুধু সদানন্দ কেন, দুলাল সা'র অধীনে যারা কাজ করত তারা ঐহিক সুখ নিয়ে মাথা ঘামাত না। তাদের সকলের একমাত্র সম্বল হরি। দুলাল সা'ই তাদের বলেছিল—টাকায় সুখ নেই!

যদি জিজ্ঞেস কর সুখ কিসে আছে ত দুলাল সা'র একটু জবাব ছিল—হরিতে। অর্থাৎ হরির নাম করলে পেটই শুধু ভরবে না, ইহকাল পরকাল এবং পরকালের পরেও যদি অনন্তকাল ব'লে কিছু থাকে ত তাও উত্তীর্ণ হওয়া যাবে। হরিনামের নাকি এমনিই গুণ!

এমনি ক'রেই চলছিল। কিন্তু সদানন্দের চাল-চলন ভাল মনে হ'ল না নিতাই বসাকের।

নিতাই বসাক বলেছিল—ওর চাকরি খতম্ ক'রে দাও দুলাল—

দুলাল সা বলেছিল—না না, কৃষ্টের জীব, আহা ওকে বরং সরিয়ে দাও—

সরিয়ে দেওয়া হয়েছিল! সংসারে এমন এক-একজন লোক থাকেই যারা যেখানেই থাকুক শান্তির ব্যাঘাত ঘটায়। বাড়ীর বউ হয়ে এলে তারা ঘর ভাঙে। বাড়ীর চাকর হ'য়ে এলে তারা সিন্দুক ভাঙে। অফিসের ক্লার্ক হ'য়ে এলে তারা শৃঙ্খলা ভাঙে। সদানন্দ সেই জাতেরই লোক। ক্যাশ থেকে তাকে সরিয়ে দুলাল সা'র পাটের গদিতে বসিয়ে দেওয়া হ'ল। পাটের গদিতে কাজ তেমন কিছু করতে হ'ত না। পয়সা-কড়ির সংস্রবও ছিল না। লরীতে মাল বোঝাই হবার সময় গুণতে হ'ত। রাম দুই তিন ক'রে গুণতি ক'রেই খালাস।

সেই সময়েই ঘটনাটা ঘটল!

বিজয়ের বিয়ের কথা উঠেছে। দুলাল সা'র কাছে লোক-জন আসা-যাওয়া সুরু করেছে পাত্রের খবর নিয়ে। সেটা জানত সদানন্দ।

সদানন্দ তেমনি একদিন গদিতে কাজ করছিল। সেই সময়েই খবরটা আসে কানে।

নৌকা ক'রেই এসেছিল ভদ্রলোক। গহনার নৌকাতে কোনও রকমে এসে পৌঁছেছিল কেষ্টগঞ্জে। এসে সামনে যাকে পেয়েছে তাকেই ধরেছে।

—কা'কে চান আপনি?

—আজ্ঞে আমি দুলাল সা' মশাই-এর সঙ্গে দেখা করতে চাই—

—আপনি কোত্থেকে আসছেন?

ভদ্রলোক বললেন -আমি আসছি অনেক দূর থেকে। বড়-চাতরা নাম শুনেছেন?

—শুনি নি, কিন্তু মশাইএর কী করা হয়?

—আমি ঘটকালী করি। পাত্র-পাত্রী সংবাদ আনা-দেওয়া করি, তাতেই আমার জীবিকা চলে। আমি শুনেছি সা' মশাই-এর একটি বিবাহ-যোগ্য পুত্র আছে, সে ডাক্তারী পড়ে, তার জন্যেই এক পাত্রীর সংবাদ এনেছি -

এ-সব সদানন্দ জানত। বললে—আসুন, আপনি এখানে বসুন আয়েস ক'রে—

খুব খাতির-টাতির করলে সদানন্দ। সদানন্দ বললে—আমি দুলালবাবুর গদির লোক,—

ভদ্রলোকও নিজের পরিচয় দিলে। নাম—দোলগোবিন্দ প্রামাণিক। পেশা ঘটকালী। বড় বড় ঘরে বিয়ে দিয়ে দেওয়াই কাজ আমার। এবার মহারাজার মেয়ের বিবাহটি দিয়ে দিলেই একটা মস্ত কাজ হয়।

মহারাজার নাম শুনেই সদানন্দ একটু কৌতূহলী হয়ে উঠেছিল।

—কোন্ মহারাজা? কোথাকার মহারাজা?

দোলগোবিন্দ বললে—আমাদের বড়-চাতরার—

—বড়-চাতরা কোথায়?

বর্দ্ধমান জেলার একটা গ্রামের নাম বড়-চাতরা। ও নামেই শুধু মহারাজা। আমরা মহারাজা ব'লেই ডাকি। এককালে মহারাজা ছিল হয়ত কেউ ওই বংশে। সে-বাড়ীও আছে। কিন্তু ভাঙা-চোরা অবস্থায়! জৌলুস নেই, জাঁক নেই। তবে বড় বংশ। বংশের মর্য্যাদা আছে। বৃদ্ধ বাপ, আর এক বিধবা পিসীমা মাত্র সংসারে। এই কন্যাটির বিবাহ দিলেই দায়মুক্ত!

—দেবেন থোবেন কেমন?

দোলগোবিন্দ প্রামাণিক এবার হাতের পোঁটলাটা একটু গুছিয়ে বসল। বলতে যেন একটু সময় নিলে। তার পর বললে—আজ্ঞে, ধনীর ঘরে কন্যাদান করবেন, কুল-মর্যাদা যা লাগে তা দেবেন বৈ কি? মহারাজা গরীব ব'লে কি সত্যি-সত্যিই গরীব, এখনও সিন্দুক ঝাড়লে হীরাটা মুক্তাটা ছিট্‌কে বেরিয়ে আসতে পারে—

সদানন্দ কথাগুলো মন দিয়ে সব শুনলে।

তার পর হঠাৎ যেন খেয়াল হ'ল। বললে---খাওয়া-দাওয়া কোথায় করবেন ঘটক মশাই আজকে?

---খাওয়া-দাওয়ার জন্যে ভাবনা নেই, মুড়ি-চিড়ে যা'হোক দুটি চিবিয়ে জল খেয়ে নেব'খন্—আমার এ অভ্যেস আছে—আগে কাজটা হোক, তখন খাওয়ার কথা ভাবব—

সদানন্দর তখন ছুটি হবার সময় এসেছে।

বললে—আসুন, আমার সঙ্গে আসুন, কথা আছে—

ব'লে সদানন্দ নিজের বাড়ীতে নিয়ে গিয়েছিল দোলগোবিন্দ প্রামাণিককে। বললে—আপনি হলেন কেষ্টগঞ্জের অতিথি মানুষ, আপনকে অভুক্ত রাখতে পারি কি আর—

বাড়ীতে নিয়ে গিয়ে সদানন্দই সমস্ত শিখিয়ে পড়িয়ে দিয়েছিল দোলগোবিন্দকে। কন্যাদায় বড় দায়! এক হাজার-এক কথার আগে মেয়ের বিয়ে হয় না, তা ত জানেন ঘটক-মশাই। আগে বলুন মেয়ে কেমন?

সে সা' মশাই নিজে গিয়েই দেখে পছন্দ করবেন! ঘটকের কথায় ত বিয়ে হবে না!

সদানন্দ বলেছিল—কিন্তু আপনাকে ব'লে রাখাই

ভাল, সম্বন্ধ অনেক আসছে, কলকাতার বড় বড় লোকের বাড়ী থেকেও সম্বন্ধ আসছে—অনেক টাকার লোভ দেখাচ্ছে তারা, আমি সবই জানি—

—তা ত জানবেনই আপনি! আপনি এতদিন সা' মাশাই-এর গদিতে চাকরি করছেন—

সদানন্দ বললে—কাজ করছি ব'লে নয়, আমি ইচ্ছে করলে সা' মশাইকে ফাঁসিয়েও দিতে পারি!

—কী রকম?

—আমি ত ক্যাশে কাজ করতাম আগে! এই ধরুন, ব্যাঙ্কের টাকা আমিই জমা দিয়ে আসতাম। কত ট্যাকা ট্যাক্স ফাঁকি দিয়েছে সা'মশাই তাও আমি বলে দিতে পারি। হরিসভার নাম ক'রে কত টাকা নিজের পেটে পুরেছে তাও আমি ব'লে দিতে পারি। আমি ইচ্ছে করলে সা'মশাইকে পুলিশেও ধরিয়ে দিতে পারি।

—তাই নাকি?

—তা আপনি যেন আবার এসব কথা কাউকে বলবেন না।

—না না, ছি ছি, সে কি কথা! আপনার বাড়ীতে পাত পেড়ে খেয়ে-দেয়ে আপনারই সব্বোনাশ করব? আমি তেমন নেমখারাম নই—

—হ্যাঁ, আপনি ভাল লোক, তাই আপনাকেই সব খুলে বললাম। নইলে এ-সব কথা কাউকে বলবার নয়। আমি বেতন পাই কত টাকা জানেন?

দোলগোবিন্দ চুপ ক'রে রইল। বললে—কত?

—পাঁচ বচ্ছর পেট-ভাতায় কাজ করেছি আমি, তা জানেন? তার পর এক টাকা দু'টাকা ক'রে বেড়ে বেড়ে এখন হয়েছে সতেরো টাকা! ভাবুন একবার কাণ্ড-কারখানা। আমার কেউ নেই বলেই তাই সতেরো টাকায় চালাচ্ছি—নইলে সতেরো টাকায় আজকাল চলে? আপনিই বলুন?

—তা ত বটেই! তা আপনি কি করতে চান, বলুন?

তা সেই দিনই প্রথম পরামর্শ হ'ল দুজনে। অনেক অত্যাচার সহ্য করেছে সদানন্দ। সদানন্দ জীবনে কারও ক্ষতি করে নি। কারও ক্ষতির চিন্তাই করে নি। আর পাঁচজন ভদ্রসন্তানের মত নিজের আর্থিক উন্নতিই চেয়েছিল। সে চেয়েছিল সে-ও একদিন অবস্থাপন্ন হবে! দুলাল সা'র মত না হোক, নিতাই বসাকের মত না হোক, আরও অন্য সাধারণ পাঁচজনের মত, কিন্তু তা হয় নি। হয় নি ব'লেই মুখ বুজে প'ড়ে আছে, আর ব'সে ব'সে এই পাটের গাঁট গুনছে।

দোলগোবিন্দ ঘটক এসেছিল ঘটকালি করতে, কিন্তু এসে এ এক অদ্ভুত লোকের পাল্লায় পড়ে গেল।

—তা আমি কি করব বলুন না, আমি কি করতে পারি তার?

সদানন্দ বললে—আপনি সবই করতে পারেন ঘটক মশাই। আপনিই আমাকে উদ্ধার করতে পারেন এই বিপদ্ থেকে—

—কি রকম ক'রে?

—সেই কথা বলব ব'লেই ত আপনাকে নিয়ে এলাম আমার বাড়ীতে। দেখছেন ত এই ধরের অবস্থা—

দুপুর বেলায় সদানন্দের গদি বন্ধ থাকে। সবাই খেতে যায় সেই সময়ে। বিকেল তিনটের পর আবার খোলা। সেই সময়টুকুর মধ্যে সদানন্দ দোলগোবিন্দকে নিজের সামনে বসিয়ে সব শুনিয়ে দিলে।

—আমি দুলাল সা'র সর্বনাশ করতে চাই মশাই। ও যেমন আমার সর্বনাশ করেছে, তেমনি আমিও ওর সর্বনাশ করতে চাই। দুলাল সা'র ক্যাশে কাজ করতাম আমি। আমি সব জানি ওর ভেতরের ব্যাপার। কোথায় কত টাকা লগ্নী আছে তাও জানি, কত টাকা সিন্দুকে আছে তাও জানি, কত টাকা ট্যাক্স ফাঁকি দিয়েছে তাও জানি। হিসেবের খাতা আমিই রাখতাম কি না?

দোলগোবিন্দ ঘটক বললে—তা এ সব খবর পুলিশের কাছে দিয়ে দ্যান্ না—

—না মশাই, আমি গরীব মানুষ, পুলিশ-টুলিশ সব বড়োলোকদের দলে। আমি যখন বিপদে পড়ব তখন আমাকে কে দেখবে? তাই ত এতদিন চুপ ক'রে আছি, কিছু করছি না—তাই ত আপনাকে এত কথা বলছি—

—তা এখন আমি কি করতে পারি আপনার বলুন?

—আপনি সব করতে পারেন আমার—

ব'লে হঠাৎ নীচু হয়ে কানে কানে কি বললে সদানন্দ শুনেই চমকে উঠল দোলগোবিন্দ ঘটক।

—বলেন কি? আমি এমন গণ্ডগোলের মধ্যে থাকতে পারব না মশাই, আমি নিরীহ গেরস্ত মানুষ, আমি কারও সাত-পাঁচে থাকি না মশাই, আমার নিজেরই বলে মেয়ে আছে তাদের বিয়ে দিতে হবে, তখন ধর্মে সইবে ভেবেছেন?

সদানন্দ হাত জড়িয়ে ধরল। বললে—আমার এ উপকারটুকু আপনাকে করতেই হবে ঘটক-মশাই—

দোলগোবিন্দ ঘটক তখন বোধহয় পালাতে পারলে বাঁচে, এমন ঝঞ্চাট হবে জানলে এত লোক থাকতে কি আর এই লোকটার কাছে আসে? তিরিশ বছর ধ'রে

ঘটকালীর ব্যবসা ক'রে আসছে দোলগোবিন্দ, কিন্তু এমন বিপদে কখনও পড়ে নি সে।

—আমার নিজের কিছু নেই অবশ্য, তবু নেই-নেই ক'রে একেবারেই যে কিছু নেই, তাও নয়। ক্যাশ টাকা আমার নিজের নেই, কিন্তু অন্য যা-কিছু আপনাকে আমি তাই-ই দিয়ে দেব—আমার এ উপকারটা আপনি করুন।

দোলগোবিন্দ ঘটক আসলে বোধহয় ধর্মভীরু লোক, ভয়ে আঁতকে উঠল। বললে—না মশাই, আমি উঠি, আমি গরীব-গুর্বো মানুষ, আমার আবার লোভ লেগে যাবে, আমি তখন সামলাতে পারব না—

ব'লে এবার সত্যিই উঠে দাঁড়াল, পৌঁটলাটাও হাতে তুলে নিলে, তখন আবার সদানন্দর গদিতে যাবার সময় হয়ে এসেছে।

সদানন্দ পেছন পেছন গেল।

বললে—ঘটক মশাই, আপনি যাচ্ছেন যান, কিন্তু আমার কথাটা একবার ভেবে দেখবেন, সারা জীবনে আপনি যা পাবেন না, তাই আপনি পেয়ে যেতেন—

কথাটা যেন হেঁয়ালির মত শোনাল!

—তার মানে?

—মানে, আমার ত টাকা নেই, আমি আপনাকে কিছু সোনা দিতাম, গিনি সোনা।

দোলগোবিন্দ যেন কেমন থমকে দাঁড়াল, মেয়ের বিয়ে দিতে হবে তারও, তিনটি বিবাহযোগ্যা মেয়ে দোলগোবিন্দের নিজেরই, এক-একটা বিয়ের ঘটকালী ক'রে কত আর পায় সে, কিছু কাপড়, কখনও বা একখানা কাশ্মীরী শাল, আর নগদ কিছু টাকা, তাও চল্লিশ-পঞ্চাশ টাকার বেশি নয়।

—সে সোনা আমার মায়ের, একেবারে সে-কালের খাঁটি সোনা, আজকালকার মত ফন্-ফনে সোনা নয়, আমি আর সে-সোনা নিয়ে কি-ই বা করব? আমার বউ নেই, মেয়েও নেই, কেউই নেই। মা ম'রে যাবার পর গয়নাগুলো সব প'ড়ে আছে, কারও ভোগেই লাগছে না—

দোলগোবিন্দ আমতা আমতা ক'রে জিজ্ঞেস করল—কতটা সোনা?

—তা ধরুন না কেন, পনের ভরির কম নয়। দাদামশায়ের দেওয়া গয়না সব, নিজে স্যাকরার সামনে ব'সে সে-সব গয়না পছন্দ মাফিক তৈরি করিয়ে নিয়েছিল। তখন কি আর দাদামশাই জানত যে মেয়ে বিধবা হবে অল্প বয়সে, শ্বশুরবাড়ীতে দেওররা তাড়িয়ে দেবে—কিছুই ভাবতে পারেনি বুড়ো, আর একটা মাত্তোর নাতি, সেও যে দুলাল সা'র পাটের আড়তে ভ্যারেণ্ডা ভাজবে, তাও জানত না।

—তা সে-সব গয়না এখন কোথায়?

—আছে মশাই আছে, বাউণ্ডুলে মানুষ হ'লে কি হবে, ভাল জায়গাতেই গচ্ছিত রেখে দিয়েছি, কতবার ভেবেছি যাকে সামনে পাই দিয়ে দিই, একবার রাগ ক'রে ইছেমতীর জলেই ফেলে দিতে গিয়েছিলাম, ভেবেছিলাম—যাক্ কুমীরের পেটেই যাক্ ও-গুলো, তা কি মনে ক'রে আবার রেখে দিয়েছিলাম, এখন যদি একটা সৎ কাজে লেগে যায় ত লাগুক্—

—সৎ কাজ? সৎ কাজটা কি?

সদানন্দ বললে—এই আপনার তিনটে মেয়ের বিয়ে হয়ে যাক তাতে—

—তাতে আপনার কি লাভ মশাই?

সদানন্দ বললে—লাভ আছে বৈকি, একেবারে লাভ না থাকলে আর করি? গতগুলো সোনা দিয়ে দিই আপনাকে? দুলাল সা'কে জব্দ করাও ত একটা লাভ আমার, ছেলে ত ওর ওই একটি, ওই বংশধরটির সর্বনাশ হলেই সা'মশাইয়েরও সর্বনাশ। আমি মশাই ও-বেটার সর্বনাশ দেখে তবে মরতে চাই, তার আগে নয়—দেখি ওর হরি ওকে ঠেকায় কী ক'রে!

—তা আপনার যখন এত গয়না রয়েছে, তখন পরের চাকরি করছেনই বা কেন? আমি হ'লে ত এমন চাকরির মাথায় লাথি মেরে চ'লে যেতাম।

সদানন্দ হাত দিয়ে নিজের কপালটা ছুঁয়ে বললে—কপাল কোথায় যাবে মশাই? সেই যে কথায় আছে না, আমি যাই বঙ্গে আমার কপাল যায় সঙ্গে—এও তাই। নইলে আমার নিজের মায়ের অত সোনা থাকতে আমিই বা চাকরি করতে আসব কেন, আর এত লোক থাকতে আমিই বা সা' মশাই-এর বিষ-নজরে পড়ব কেন? বলুন? তা সে যা হবার হয়ে গেছে, আপনার সঙ্গে দেখা না হলে ও-সোনা আমি কাউকে-না-কাউকে দিয়ে বিবাগীই হয়ে যেতাম! এখন আমার কথা আমি বললাম, আপনার কর্তব্য আপনি ঠিক করবেন—

তা একদিনে দোলগোবিন্দ প্রামাণিকের মত অভাবী ধর্মভীরু মানুষকে কাবু করা গেল না। লোকটা রয়ে গেল সেদিন কেষ্টগঞ্জে। তার পরদিনটাও রয়ে গেল। আবার তার পরদিনও!

সেই কথাই আগে বলেছি। সদানন্দ এ-উপন্যাসে একটা অতি সামান্য চরিত্র। পেঁপুলবেড়ের বাঁওড় নিয়ে

লাঠালাঠির সময় সেই সদানন্দই কুলি-মজুর খাটাবার কাজ করছিল। সতের টাকা মাইনে পেত। তার পর হাসপাতালে পাঠিয়েছিল তাকে দুলাল সা। দুলাল সা'ই তাকে দিনের পর দিন নিজে গিয়ে দেখে আসত। তার খাবার বয়ে নিয়ে যেত! আবার সেই সদানন্দই একদিন হাসপাতাল থেকে নিরুদ্দেশ হয়ে গিয়েছিল!

সামান্য চরিত্র বটে, কিন্তু এ উপন্যাসে তারও একটা বিশিষ্ট ভূমিকা ছিল। আসলে সদানন্দ না থাকলে এ-উপন্যাস লেখাই হ'ত না বলতে গেলে।

দোলগোবিন্দ প্রামাণিক যে করিৎকর্মা মানুষ তা পরেই প্রমাণ হয়ে গেল। দুলাল সা' মেয়ে দেখে এল। আশীর্বাদ ক'রে এল। পাত্রীপক্ষও এসে পাত্রকে আশীর্বাদ ক'রে গেল।

এ সব সেই অতীত কালের ঘটনা। তখন দুলাল সা'র এই নতুন বাড়ী হয় নি। কিন্তু অবস্থা ফিরেছে। বিজয় তখন কলেজে পড়ে। কলকাতায় পড়ে আর ছুটির সময় বাড়ীতে আসে। বেশ ফুটফুটে ছেলে। ছেলে দেখে সকলের চোখ জুড়িয়ে যায়। যেমন অমায়িক বাপ, তেমনি অমায়িক ছেলে। সেই ছেলেরই বিয়ে। কেষ্টগঞ্জ ঝেঁটিয়ে লোক নেমন্তন্ন হয়েছিল। মা নেই, সুতরাং পুত্রবধূ এলে বাড়ীটাতে আবার লক্ষ্মীশ্রী ফিরে আসে। দুলাল সা আসলে কিছুই দেখে নি। কিছু চায়ও নি। যৌতুকের দিকে নজর দিতে গেলে মালে ভেজাল পড়ে। শুধু দেখেছিল মেয়ে। এমন মেয়ে চেয়েছিল, যে এসে সমস্ত সংসারের ভার নিজের মাথায় তুলে নেবে। মেয়ের বাপ নেই, মা নেই। থাকবার মধ্যে ছিল তখন এক বুড়ো পিসীমা। পিসীমারও বয়েস হয়েছিল। ভাইঝির বিয়েটি দিয়ে তিনিও মুক্তি পেতে চেয়েছিলেন। তা ভাল! বাপের বাড়ীতে বিশেষ কেউ না থাকাই ভাল। এক-একটা বউ থাকে যখন-তখন বাপের বাড়ী যেতে চায়। বাপ-মা অন্ত প্রাণ! তেমন না হওয়াই ভাল। তেমন মেয়ের শ্বশুরবাড়ীতে সহজে মন বসতে চায় না। দুলাল সা' নিতাই বসাক খুব ভাল ক'রে দেখে শুনে নতুন বৌকে এনেছিল বাড়ীতে। বর যেদিন কনেকে নিয়ে কেষ্টগঞ্জে এল সেদিন গাঁয়ের লোক ভেঙে পড়েছিল সা' মশাই-এর বাড়ীতে। আহা, বেশ বউ। বেশ বউ করেছেন সা' মশাই। যেমন সা' মশাই-এর ছেলে, তেমনি বউ। দু'টিতে বেশ মানিয়েছে। একবাক্যে সবাই ওই কথাই বললে। সা' মশাই ছেলের বিয়েতে একটি পয়সাও নেয় নি, সেটাও লোকমুখে প্রচার হয়ে গিয়েছিল।

দুলাল সা বলেছিল—ছেলে কি আমার পাট না তিসি হে যে, ছেলে বেচে পয়সা নেব?

কেউ কেউ বলেছিল—আজ্ঞে কর্তামশাই কিন্তু ছেলের বিয়েতে নগদ দু'হাজার টাকা নিয়েছিলেন—

দুলাল সা বলেছিল—তোরা বড় পরের নিন্দে ক'রে বেড়াস হলধর, পরনিন্দা মহাপাপ তা জানিস?

তা সেদিন আর অত বক্তৃতা শোনবার সময় ছিল না কারও। শ'য়ে শ'য়ে লোক পাতা পেতে ব'সে গেছে খেতে। ছাদ, উঠোন, বারান্দা কোথাও ফাঁক নেই। লুচি দিতে দিতে তরকারী ফুরিয়ে যায়, তরকারী দিতে দিতে লুচি ফুরিয়ে যায়। ওদিকে ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব এসেছে, পুলিশের সুপার এসেছে। তাদের দিকটা দেখবার ভার নিয়েছে নিতাই বসাক নিজে। বাড়ীর সামনে মাথার ওপর মাচা খাটিয়ে নহবৎ বসেছে। কলাপাতা, খুরির পাহাড় জমে গেছে আঁস্তাকুড়ে। দুলাল সা'র বাড়ীতে প্রথম আর শেষ বিয়ে বলতে গেলে। কোনও ব্যাপারে কার্পণ্য নেই দুলাল সা'র। তারই মধ্যে দোলগোবিন্দ প্রামাণিক এক কোণে ব'সে পেট ভ'রে খাচ্ছিল। আসলে তারই ত উৎসব আজকে।

—তুমি খেয়েছ? পেট ভ'রে খেয়েছ ত?

দোলগোবিন্দ বললে—আজ্ঞে প্রচুর খেয়েছি—

—দেখ বাবা, মনে কোন ক্ষোভ রেখ না—পেট না ভরলে পরের ব্যাচে আবার ব'সে যাও, কিন্তু পরে যেন কিছু ব'লো না—

দুলাল সা'র সকলের কাছেই ওই এক কথা।

সকলেই দুলাল সা'র কাছে এসে হাত জোড় ক'রে ব'লে গেল—অতি উত্তম আয়োজন হয়েছে সা' মশাই—

—তা বৌমাকে দেখেছ ত?

—আজ্ঞে হ্যাঁ, লক্ষ্মীপ্রতিমা একেবারে—

ক্রমে বিয়েবাড়ীতে রাত গভীর হয়ে আসতে লাগল। যত রাত হয় দোলগোবিন্দ তত ছটফট করে। তত এর ওর মুখের দিকে চায়। কাউকে কিছু জিজ্ঞেস করতেও পারে না। রাত আরও গভীর হয়ে এল। তখন বুকটা দুরদুর করতে লাগল। বার-বাড়ী ঘুরে দেখে দোলগোবিন্দ। তখনও অন্ধকারে এখানে-ওখানে দু'চারটে লোক ঘোরাঘুরি করছে। আত্মীয় অভ্যাগত অনেকে চ'লে গেছে, অনেকে আবার এ বাড়ীতেই শোবে। দোলগোবিন্দ ঘরের ভেতরে গিয়ে সকলের মুখের দিকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখে।

—কী দেখছেন ঘটক মশাই?

দোলগোবিন্দ সে কথার উত্তর না দিয়ে ঘর থেকে

বেরিয়ে আসে। একবার এ-ঘর একবার সে-ঘর। ঘর ছেড়ে বারান্দা, উঠোন, বার-বাড়ী, ভেতর-বাড়ী। একেবারে পাগলের মত হন্যে হয়ে ছটফট করতে লাগল। নহবতে তখন দরবারী কানাড়ায় কোমল গান্ধারটাকে মীড় দিয়ে মোচড়াচ্ছে। সমস্ত বাড়ী আর একটু পরেই ঘুমিয়ে পড়বে।

—কী খুঁজছেন ঘটক মশাই, কা'কে খুঁজছেন?

তখন আর সময় নেই! দোলগোবিন্দর তখন শুধু পাগল হতে বাকি। শুধু কেঁদে ফেলতে বাকি।

হঠাৎ সামনে পাওয়া গেল সদানন্দকে। দোলগোবিন্দ একেবারে ঝাঁপিয়ে প'ড়ে ধরেছে তাকে। এবার? এবার কোথায় পালাবে তুমি?

—কী হে, আমার সোনা?

লোকটাও হতভম্ব। থতমত খেয়ে গেছে সে।

—বলি আমাকে যে সোনা দেবে বলেছিলে? পনের ভরির গিনি সোনার গয়না?

—কে সোনা দেবে বলেছিল? কখন বলেছিলাম? পাগল হয়ে গেলেন নাকি আপনি ঘটক মশাই?

চারদিকে সবাই হৈ হৈ ক'রে উঠেছে। বিয়েবাড়ীর গোলমালের মধ্যে যে-যেখানে ছিল ছুটে এল। কী হয়েছে ঘটক মশাই? কে সোনা দেবে বলেছিল? কা'কে?

—দেখুন না, আমাকে বলছেন কিনা আমি পনের ভরির গয়না দেব বলেছিলাম! আমি অত গয়না চোখে দেখেছি জীবনে? আমার অত সম্পত্তি থাকলে আমি পরের বাড়ীতে কাজ করি?

—ছাড়ুন, ছাড়ুন—

সবাই ধ'রে ক'রে ছাড়িয়ে দিলে ঘটক মশাইকে দোলগোবিন্দর তখন বিপর্যস্ত অবস্থা। কাঁধের চাদর মাটিতে লুটোপুটি খাচ্ছে।

আর ওদিকে ফুলশয্যার খাটে তখন নববধূ ঘোমটার আড়ালে মুখ ঢেকে ব'সে আছে। এই নতুন বৌ। এই নতুন বৌ-ই তখন নববধূর বেশে ঘোমটার আড়ালে ব'সে থর থর কাঁপছে।

আর বাড়ীর সদরের মাথায় মাচার ওপর তখন মুলতান ধরেছে নহবতওয়ালা। ক্রমশঃ

আর্থিক

শ্রীচিত্তপ্রিয় মুখোপাধ্যায়

শহর ও গ্রাম এবং মিশ্র অর্থনীতি

আমাদের গ্রামপ্রধান দেশে "শক্তির ক্ষেত্র" নগর ও "প্রাণের ক্ষেত্র" গ্রামগুলির পূর্ব সম্বন্ধ কি ভাবে নষ্ট হয়েছে এবং সেই সম্বন্ধ পুনরায় স্থাপন করার জন্য কি করা বাঞ্ছনীয়, তাই নিয়ে দেশের চিন্তাশীল ব্যক্তিরা স্বাধীনতার আগেও বহু আলোচনা করেছেন। দেশ স্বাধীন হবার পর সেইসব কল্পনায় রূপ দেবার চেষ্টা সুরু হয়েছে, কিছু পরিমাণে ফলও নিশ্চয় পাওয়া গেছে। কিন্তু ১৯৬১র আদমসুমারী থেকে জানা যায় যে, শহরের সংখ্যা এবং শহরে লোকের সংখ্যা বেড়ে চলেছে, বিশেষজ্ঞদের অনুমান এই যে, কৃষি-উৎপাদন বৃদ্ধি এবং শিল্প-বিকেন্দ্রীকরণের চেষ্টা ফলপ্রসূ হওয়া সাপেক্ষে শহর-বৃদ্ধির গতি আরো কিছুকাল অব্যাহত থাকবে। ইতিমধ্যে শহর ও গ্রামবাসীর মাথাপিছু আয় কতটা, তাই নিয়ে যত অনুসন্ধান হয়েছে তার থেকেও দেখা যাচ্ছে[১] যে, শহরবাসীর আয়ের হার বৃদ্ধি পাচ্ছে।

সমস্যাজর্জরিত বাংলা দেশে কর্মসংস্থান, বাসগৃহ ও আনুষঙ্গিক সমস্যা এবং সেই সঙ্গে উত্তরোত্তর জনসংখ্যা বৃদ্ধির দরুণ কৃষিযোগ্য জমি সংরক্ষণ, এইসব বিবিধ সমস্যা সমাধানের উপায় অনুসন্ধান করার জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকার সম্প্রতি যে কমিশন নিয়োগ করেছিলেন, তার প্রাথমিক 'রিপোর্ট' প্রকাশিত হয়েছে।[২] এই কমিশনের মতে শহরগুলির দ্রুত এবং পরিকল্পনা-বিহীন বৃদ্ধি রোধের অন্যতম উপায় হচ্ছে, জমির ব্যবহার ও মূল্য নির্ধারণের অবাধ স্বাধীনতা বন্ধ করা এবং কৃষির জমি, বাসস্থানের জমি, কলকারখানার জন্য জমি ইত্যাদির ব্যবহার এক সামগ্রিক পরিকল্পনার সাহায্যে নিয়ন্ত্রণ করা। এই প্রস্তাব কার্যকরী করার বিঘ্ন বহুবিধ, সন্দেহ নেই; মিউনিসিপ্যালিটি-গুলির অযোগ্যতায় জমির মালিকদের আপত্তি, সরকারের অর্থাভাব, ইত্যাদি নানান কথাই উঠবে; কিন্তু এই পথে অগ্রসর না হ'লে নগর পুনর্গঠনের যতই মনোগ্রাহী পরিকল্পনা হোক্ না কেন, সুফল পাবার আশা সুদূর-পরাহত হবে।

বাংলা দেশের, তথা পূর্বভারতের স্নায়ুকেন্দ্র কলকাতা শহরের জীবনযাত্রা সহনীয় করার জন্য যে চেষ্টা চলেছে, তার সূত্রে প্রস্তাবটি বিশেষ ভাবে প্রণিধানযোগ্য। কলকাতাবাসীর দুর্দশার অন্ত নেই এবং দৈনন্দিন সমস্যাগুলি মেটাতে হ'লে কতকগুলি ন্যূনতম চাহিদা অনুযায়ী ব্যবস্থা করতেও হবে। যে কাজগুলি এতকাল অবহেলা করা হয়েছে এবং এখন না করলে জীবনযাত্রা অচল হয়ে যাবে সেগুলি যে করতেই হবে, সে কথা বলা বাহুল্য। সংস্কার ও পুনর্গঠনের কাজে নেমে কতদূর সামঞ্জস্যপূর্ণ পরিকল্পনা আমরা করব সেইটিই মূল প্রশ্ন। কিন্তু তার মোট ফল যদি এই দাঁড়ায় যে, এইখানকার বাসিন্দাদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের ব্যবস্থাদি আরো "আধুনিক" হবার সঙ্গে সঙ্গে গ্রামের সঙ্গে জীবনযাত্রার মানের ব্যবধান আরো বেড়ে যায়, তা হ'লে অতীতে যে জন-স্রোত এই শহরের দিকে বয়ে এসেছিল সেই স্রোত রোধ করা যাবে না; অদূর ভবিষ্যতে মহানগরী পুনর্গঠন সমস্যা বৃহত্তর গণ্ডিতে জটিলতর আকার ধারণ করবে। অন্যান্য শহর বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গেও একই সমস্যা দেখা দেবে। শহরের প্রয়োজনীয়তা সর্বদেশে সর্বকালেই আছে, কিন্তু তার স্ফীতির সীমারেখা কোথায় টানা হবে সেই প্রশ্ন আজ আরো উগ্রভাবে দেখা দিচ্ছে। রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন:

> "শহরের সমারোহ আপন কৃত্রিম আলোর তাবতায় দেখতেই দিচ্ছে না, তার বাইরের ছায়া কিরূপ অন্তহীন।... যদি দেখতুম যা হারিয়েছি শহরে তা বহুগুণিত আকারে ফিরে পেতুম, তাহলেও সান্ত্বনা থাকত।"
>
> (পল্লীপ্রকৃতি, পৃঃ ৪২-৪৩।)

---

১ দ্রঃ রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়া বুলেটিন, সেপ্টেম্বর, ১৯৬২।

২। "The Master Plan . . . should allocate areas for use of agricultural, industrial, commercial and residential purposes; define sites for proposed roads and other lines of communication; indicated proposed sites parks, playgrounds. pleasure grounds and other open spaces. The Plan should also include regulations controlling location. size and height of buildings and other structures within each zone, show sites of proposed public and semi-public buildings, provide for the control of architectural features in specific areas and if thought necessary, indicate the stages by which the development should be carried out. etc.—*The Statesman*. 4 1. 63.

আজ এই সমস্যা জটিলতর আকারে দেখা দিচ্ছে। শহরের সার্থকতা সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ আরেকস্থলে লিখেছেন, "শহরে মানুষ আপন কর্মোদ্যমকে কেন্দ্রীভূত করে, তার প্রয়োজন আছে." কিন্তু অতীতে শহরের যা কাজ ছিল আজ তার দ্রুত পরিবর্তন দেখা দিচ্ছে।৩

একথা আজ আমাদের অস্বীকার করার উপায় নেই ভালোয় হোক্, মন্দয় হোক্, ইচ্ছায় হোক্, অনিচ্ছায় হোক্, আমরা কার্যত: "modern way of life",—যা পাশ্চাত্ত্য জীবনধারার নামান্তর,—তাই আমাদের চরম লক্ষ্য ব'লে গ্রহণ করেছি। কলকাতা শহর যদি বাহ্যিকভাবে নিউইয়র্ক বা লণ্ডনের মত সুখস্বাচ্ছন্দ্য ও সুবিধার ব্যবস্থা করতে পারে তা হ'লে আমরা লক্ষ্যস্থলের কাছাকাছি উপস্থিত হয়েছি ব'লে মনে করব। গ্রামগুলির যদি কিছু উন্নতি কেউ করতে পারেন ত তা হোক্, আমাদের আপত্তি নেই, কিন্তু আমরা 'টিউব রেলওয়ে', 'এয়ারকণ্ডিশন্‌ড্' ঘর, 'টেলিভিশন', 'পিপ্‌ল্‌স্ কার' এই সব পেলেই মনে করব যে, সে যুগের ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের দ্বিতীয় মহানগরী তার গৌরবস্থল পুনরুদ্ধার করতে পেরেছে। শহর-প্রধান দেশগুলিতে নাগরিক জীবনের সুখস্বাচ্ছন্দ্য উৎকর্ষের চূড়ায় ওঠা সত্ত্বেও যে সেসব দেশে সমস্যা মেটে নি, সে কথা আলোচনা বাহুল্য মাত্র।৪

* * *

কলকাতা মহানগরী ও অন্যান্য শহর সংস্কারের কাজে হাত দেবার সঙ্গেই একটি বিষয়ে আমাদের স্থির সিদ্ধান্ত করতে হয়; অগণিত গ্রাম ও কয়েকটি শহরের পারস্পরিক সম্পর্ক কি ধরণের হবে।

বৃহৎ শিল্প প্রতিষ্ঠান গ'ড়ে উঠবার সঙ্গে সঙ্গে গ্রাম ও শহরের ভারসাম্য যে নষ্ট হয়েছে, তাই নিয়ে সব দেশেই বিশদ আলোচনা হয়েছে।৫ এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সুস্পষ্ট মতামত তাঁর বহু রচনার মধ্যে প্রতিফলিত হয়েছে; বর্তমানে বিনোবাজী যে মতবাদ প্রচার করছেন,৬ তার প্রয়োগপদ্ধতি নিয়ে দ্বিমত থাকতে পারে কিন্তু বিকল্প ব্যবস্থা কি হ'তে পারে তার স্পষ্ট নির্দেশ এখনো আমরা কি পেয়েছি?

এই সূত্রে লুই মামফোর্ড-এর উক্তি উল্লেখযোগ্য:

"During the nineteenth century the tendency toward economic balance and variety within a given region was disparaged by the popular schools of economics." . . . . . "This one-sided regime . . . . treated the region as a whole, as a mine from which special materials were to be extracted and it produced a one-sided, monotonous, socially crude life in its main industrial centres and factory villages." . . . . "Many things that were done hastily in the nineteenth century,—because there was in a sense no time to think,—now have to be done over again." . . . "Population . . . . must be regrouped and nucleated in a fashion that will make possible a co-operative, civilized life."

* * *

গ্রাম-জীবন পুনরুদ্ধারের নামে মধ্যযুগীয় উৎপাদন

৩। "Within a century and a half the process of devitalizing mechanization has resulted in a new artificial environment which does not seem to blend into the natural landscape. . . . . To appreciate this rather abstract appraisal of the new environment which the machine has created, one will do well to compare a modern factory city with a medieval town" World Resources and Industries.

"...রাশিয়ায় দেখেছি গ্রামের সঙ্গে শহরের বৈপরীত্য ঘুচিয়ে দেবার চেষ্টা। এই চেষ্টা যদি ভালো করে সিদ্ধ হয় তাহলে শহরের অস্বাভাবিক অতিবৃদ্ধি নিবারণ হবে।" রাশিয়ার চিঠি, পৃ ১১৯।

৪। . . ."Cities became notorious centres of wealth, whereas the open country was neglected and backward." World Resources and Industries.

৫। "The historical forces that have been at work since the late eighteenth century have led to a concentration and a centralization of economic life in large industrial units and in large urban agglomerations; and rural life and rural society have been steadily weakened." Rural Depopulation in England and Wales, 1851-1951: John Saville.

৬। উপরতলা হোল দিল্লী তার নিচের তলা কলিকাতা......আর সকলের নিচের তলা হোল আপনাদের গ্রাম। উপর তলা যদি মজবুত হয় আর নিচের তলা যদি দুর্বল হয় তখন কি হবে? সমস্ত ঘরটাই ভেঙে পড়তে পারে।"...

"আজ গ্রামের বুদ্ধিশক্তি, শ্রমশক্তি সবই শহরের দিকে প্রবাহিত হচ্ছে। গ্রামে কেবল বৃদ্ধ এবং আকাট মূর্খেরা থেকে গেছে।"... "আজকের রচনা নগর-প্রধান, কাল গ্রামপ্রধান রচনা হবে। তাতে নগরও অবলম্বন পাবে।"—গ্রামদান, কি ও কেন। বিনোবা ভাবে।

ব্যবস্থায় প্রত্যাবর্তনের প্রস্তাব কোন মনীষী বা বিশেষজ্ঞ উত্থাপন করবেন না, করলেও সে পথে কেউ যাবে না।৭

৭। কেউ কেউ বলেন, মানুষের ব্যবহার থেকে যন্ত্রগুলোকে একেবারে নির্বাসিত করলে তবে আপদ্ মেটে। একথা একেবারে অশ্রদ্ধেয়। মানুষের কর্মশক্তির বাহন যন্ত্রকে যে জাতি আয়ত্ত করতে পারে নি সংসারে তার পরাভব অনিবার্য, যেমন অনিবার্য মানুষের কাছে পশুর পরাজয়।"—সমবায়নীতি, পৃঃ ৪৪।

এ যুগে শহরের প্রাধান্যের মূলে আছে বৃহদাকার যন্ত্রের ও শিল্পপ্রতিষ্ঠানের আবির্ভাব এবং কুটিরশিল্পের বিলোপ। আমরা অতীতের ভারসাম্য ফিরিয়ে আনতে চাই অথচ এ যুগের উন্নততর উৎপাদন প্রণালীও কাজে লাগাব৮ এই দুই ব্যবস্থার যথাযথ সমন্বয় কি ভাবে ঘটাতে পারি? শিল্পবিপ্লবের সমুদ্র মন্থনে অমৃতের ভাগই বেশি উঠেছে, গরল যদি কিছু উঠে থাকে ত সেটি এড়িয়ে চলবার বোধহয় উপায় নেই। আমরা শিল্পোন্নয়নের পথ যখন নিচ্ছি, আনুষঙ্গিক কুফলকে ত কিছুটা মেনে নিতেই হবে। শিল্পোন্নতির অন্ধকার দিক্ ছাপিয়ে কত দেশ শক্তিশালী সম্পদশালী হয়ে উঠেছে, সে দৃষ্টান্ত ত বিরল নয়। এই সব দেশে শিল্পোন্নয়নের সঙ্গে সঙ্গে যে কুফলই দেখা দিয়ে থাকুক না কেন৯ গ্রাম ও শহরের পার্থক্য নিশ্চয়ই আমাদের দেশের মত এত প্রকট নয়।১০

* * *

আমরা চেষ্টা করছি, ধনতন্ত্রবাদের ও সমাজতন্ত্রবাদের যা কিছু শ্রেষ্ঠ তাই গ্রহণ করব গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে। গ্রাম পুনরুজ্জীবিত করতে হবে সমবায়-প্রথার সর্বাঙ্গীন প্রয়োগ ক'রে; রাষ্ট্রের তরফ থেকে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সাহায্য ক'রে কুটিরশিল্প ও কৃষি-উৎপাদন বাড়াতে হবে; যে সব শিল্প রাষ্ট্রায়ত্ত করা দরকার সেগুলি সম্পূর্ণ ভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে, অপর দিকে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য কিঞ্চিৎ খর্ব ক'রে অথচ তার সম্পূর্ণ কণ্ঠরোধ না ক'রে বৃহৎ শিল্পকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে সমাজ-কল্যাণের পথে। আমাদের অর্থনৈতিক কাঠামোকে আমরা যেমন Public Sector ও Private Sector এই দু'টি ভাগে ভাগ করেছি, তেমনি অপর একটি গণ্ডি কেটেছি, যাকে বলছি সমবায় প্রথার সর্বাঙ্গীন প্রয়োগ।

সমবায় প্রথার উদ্ভব হয়েছে প্রায় দেড়শো বছর আগে; বর্তমান আকারে ধনতন্ত্রবাদ ও কারখানার সৃষ্টি এবং সমাজতন্ত্রবাদের অভ্যুত্থানও প্রায় সমসাময়িক। আমাদের দেশেও সমবায় প্রথার প্রয়োগ হয়েছে এই শতাব্দীর গোড়া থেকে; কিন্তু যদি বা ইউরোপের মত উগ্র ধনতান্ত্রিক অঞ্চলে সীমাবদ্ধ গণ্ডির মধ্যেও সমবায় প্রথার কিছুমাত্র প্রসার হয়েছে, আমাদের দেশে স্বাধীনতার পূর্বে কেন সমবায় প্রথা সার্থক হয় নি১১, তাই নিয়ে বহু আলোচনা ইদানীং কালে হয়েছে ও হচ্ছে। "জীবিকার ক্ষেত্রে পরস্পরকে মিলাইয়া" দেবার কথা রবীন্দ্রনাথ চিরকাল ব'লে গেছেন; "যাহা একজনে না

৮। "আমাদের এই কথাই বলতে হবে—যন্ত্র এবং তার মূলীভূত বিদ্যায় যে প্রভূত শক্তি উৎপন্ন হয় সেটা ব্যক্তি বা দল বিশেষে সংহত না হয়ে যেন সর্বসাধারণে ব্যাপ্ত হয়।" পল্লীপ্রকৃতি, পৃঃ ৫৩।

"Rural regions will attract industry, foster a co-operative way of life, promote bio-technic urbanism; while industry must, for the sake of life-efficiency, seek a wider rural basis. Each village will thus be the embryo of a modern city, not the discouraged, depauperate fragment of an indifferent metropolis." Lewis Mumford: *The Culture of Cities.*

৯। "What stands in the way is not a machine age, but the survival of a pecuniary age. The worker is tied helplessly to the machine and our institutions and customs are invaded and eroded by the machine, only because the machine is harnessed to the dollar." . . . ". . . . a regime of pecuniary profit and loss still commands our allegiance." (Quoted from 'World Resources and Industries,' p. 39).—"Unemployment in the United States was not brought under control until World War II stepped demand up to abnormal size." World Resources and Industries, p. 100.

ব্রিটেনে সম্প্রতি বেকার সমস্যা খুবই প্রবল হয়ে উঠেছে।

১০। "It is difficult to generalise briefly about differences in the provision of amenities between town and country in the twentieth century, although the development of television has unproved the rural position. (Rural Depopulation in England and Wales, 1851-1951).

আমাদের দেশের গ্রামাঞ্চলে ইলেক্ট্রিসিটি পৌঁছে যাচ্ছে দ্রুত গতিতেই, এবং তার ফলে কুটিরশিল্প প্রসারেরও সম্ভাবনা আছে অবশ্যই। কিন্তু নানান কারণের সমন্বয়ে এযাবৎ শিল্প-বিকেন্দ্রীকরণের কাজে বিদ্যুৎ যথেষ্ট পরিমাণে ব্যবহার হচ্ছে না।

১১। কো-অপারিটিভের যোগে অন্য দেশে যখন সমাজের নীচের তলায় একটা সৃষ্টির কাজ চলেছে, আমাদের দেশে টিপে টিপে টাকা ধার দেওয়ার বেশী কিছু এগোয় না।...বুদ্ধির সাহস এবং জনসাধারণের প্রতি দরদ বোধ এই উভয়ের অভাব ঘটাতেই দুখীর দুঃখ আমাদের দেশে ঘোচানো এত কঠিন হয়েছে। —রাশিয়ার চিঠি, পৃঃ ২০।

পারে তাহা পঞ্চাশ জনে জোট বাঁধলেই হতে পারে" এই বাণী আমরা কবির বহু লেখায় পাই, কাজেও তার পরীক্ষা তিনি ক'রে গেছেন। "শক্তি-সমবায়" হচ্ছে তাঁর সকল কথার মূলমন্ত্র ; "আজ ভারতবর্ষে জীবিকা যদি সমবায় নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত হয় তবে ভারত-সভ্যতার ধাত্রীভূমি গ্রামগুলি আবার বেঁচে উঠবে ও সমস্ত দেশকে বাঁচাবে।"

স্বাধীনতার পর বিষয়টির প্রতি কর্তৃপক্ষের বিশেষ নজর গেছে। অতীতের ভুলত্রুটি সংশোধনের আপ্রাণ চেষ্টা চলেছে, সেই সঙ্গে এই কথা উপলব্ধি করা যাচ্ছে যে, সমবায়ের প্রয়োজন শুধু যে জীবনের—বিশেষতঃ গ্রামীণ জীবনের—একটি ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য তাই নয়, কৃষি-পণ্য উৎপাদন, বণ্টন, বীজ ও সার সরবরাহ, জলসেচ, স্বল্পকালীন ও দীর্ঘমেয়াদী ঋণ, কুটিরশিল্প, সর্বক্ষেত্রেই সমবায় শক্তির প্রয়োজনীয়তা আছে। পূর্ব অভিজ্ঞতা থেকে দেখা গেছে যে, সরকারের প্রত্যক্ষ সহযোগিতা এবং অংশগ্রহণ না থাকলে এখনও সমবায় পদ্ধতিতে কাজ করার মত মানসিক প্রস্তুতি সব অঞ্চলের সব শ্রেণীর লোকের মধ্যে জাগ্রত হচ্ছে না।১২ অনেকের মতে সরকারী সাহায্য ও অংশগ্রহণ সমবায়ের বিকাশের পরিপন্থী ; কিন্তু পল্লীসমাজ যেখানে ধর্মীয় ও অর্থনৈতিক বৈষম্যে প্রবল ভাবে বিভক্ত সেখানে বিকল্প উপায়ই বা কি ?

১২। বাংলাদেশ সমবায় আন্দোলনের পুরোভাগে ছিল একসময়, কিন্তু এখন দেখা যায় অন্যান্য বহু প্রদেশ সমবায় পদ্ধতিতে কাজ করার পথে অনেক অগ্রসর হয়ে গেছে। -এর কারণ বিশ্লেষণ করতে গেলে গ্রামী জীবনের সামাজিক কাঠামোর তারতম্য নিয়ে আলোচনা প্রয়োজন। ১৩১৫ এবং ১৩৩৫ সালে,—কুড়ি বছরের ব্যবধানে, রবীন্দ্রনাথ এ বিষয়ে যা লিখেছিলেন, তা উল্লেখযোগ্য : "আমাদের প্রজাদের মধ্যে যারা মুসলমান তাদের মধ্যে বেশ কাজ অগ্রসর হচ্ছে—হিন্দুপল্লীতে বাধার অন্ত নেই। হিন্দুধর্ম, হিন্দুসমাজের মূলেই এমন একটা গভীর ব্যাঘাত রয়েছে যাতে করে সমবেত লোকহিতের চেষ্টা অন্তর থেকে বাধা পেতে থাকে।" (পল্লীপ্রকৃতি, পৃঃ ২২৭।)

"আজ ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে য়ুরোপে সমবায় নীতি অগ্রসর হয়ে চলেছে। সেখানে সুবিধা এই যে-মানুষে মানুষে একত্র হবার বুদ্ধি ও অভ্যাস আমাদের দেশের চেয়ে অনেক বেশি। আমরা অন্ততঃ হিন্দুসমাজের লোকে, এই দিকে দুর্বল। (সমবায়নীতি, পৃঃ ৪৭।)

১৯৬০-৬১র সমবায় সমিতির হিসাব থেকে দেখা যায় যে ১০০০ জন লোক পিছু সমবায় প্রাথমিক সমিতির সদস্য-সংখ্যা মাদ্রাজে সবচেয়ে বেশি (১২৪ জন); মহারাষ্ট্রে ১০৩ জন, অন্ধ্র প্রদেশে ৯৭ জন; কেরালাতে ১০১ জন; মহীশূরে ১০২ জন; পাঞ্জাবে ৯৮ জন; আর পশ্চিমবঙ্গে মাত্র ৫৩ জন। (দ্রঃ ইকনমিক উইকলী, ২২ ডিসেম্বর, ১৯৬২ : পৃঃ ১৯৭৫।)

এই সূত্রে সম্প্রতি রিজার্ভ ব্যাঙ্ক বিভিন্ন অঞ্চলে কৃষি-মানের প্রয়োজন ও সমবায় প্রথায় কাজের অগ্রগতি সম্বন্ধে অনুসন্ধান ক'রে ১৯৬২ নভেম্বরের 'বুলেটিন'এ যে বিবরণী প্রকাশ করেছেন, তার থেকে গ্রামাঞ্চলে ধনী চাষী ও শহরের ব্যবসায়ীর প্রভাবের আভাস পাওয়া যায় ; কয়েকটি ছত্র এখানে উদ্ধৃত করছি :

"The most important factor limiting the growth of marketing co-operatives was the domination of marketing co-operatives by vested interests."

"Another factor particularly in the areas growing paddy, cotton and such other crops which have to be processed, was that the marketing co-operatives, as they did not have processing units of their own, had to sell, without processing, members' produce to the local traders who in turn arranged for its processing before sale in the terminal markets." . . . "Inadequate efforts on the part of the marketing societies to establish direct contacts with terminal markets resulted in continued dependence of these societies on private trade channels." ।১৩

"In the absence of a proper loan policy and loan procedure the vested interests represented by traders, money-lenders and big cultivators had scope for infiltrating into primary societies with a view to availing of large amounts of loans at concessional rate of interest."

". . . . . the problem was not 'one of mere re-organization of existing institutions, . . . but one of something which goes deep into the socio-economic structure of rural India and is ultimately related to the mal-adjustment of the structure with the country's economy, administration and institutional development as a whole."

". . . . the shortfall in achievements can only be explained by the fact that the 'forces of transformation' were not as powerful as those which were sought to be counteracted."

* * *

শহরের অর্থবান্ ব্যক্তিদের প্রভাব গ্রামাঞ্চলে বহুদূর বিস্তৃত হচ্ছে ; জমিদারী উচ্ছেদ হয়ে গেলেও অল্প জমির মালিকরা ধনবান্ ব্যক্তিদের কাছ থেকে সারাবছরের ধান দাদন পেয়ে এবং প্রয়োজনমত নগদ

১৩। এই সূত্রে 'ইকনমিক উইকলী' ২২ ডিসেম্বর '৬২ তারিখের সংখ্যায় Consumers, Co-operatives সম্বন্ধে বিবরণী দ্রষ্টব্য। প্রাথমিক সমবায় সমিতিগুলিকে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই পাইকারী ক্রয়-এর জন্য Private trader এর কাছে উপস্থিত হতে হয়।

টাকা ধার পেয়ে এখনও ক্রীতদাসের পর্য্যায়ে থেকে যাচ্ছে। শহর থেকে গ্রামাঞ্চলে যাতায়াতের জন্য রাস্তাঘাট উন্নত এবং দ্রুততর যানবাহন হবার ফলে একদিকে যেমন গ্রামের লোকের কূপমণ্ডুকতা দূর হচ্ছে, তেমনি আরেকদিকে দেখা যাচ্ছে, গ্রামের উদ্বৃত্ত উত্তরোত্তর শহরের দিকে প্রবাহিত হচ্ছে। এর প্রতিকার অবশ্যই এই নয় যে, রাস্তাঘাটের সংস্কার-কাজ বন্ধ করা; এর উৎস হচ্ছে আমাদের অর্থ নৈতিক কাঠামো, উৎপাদন ব্যবস্থা ও আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি।[১৪]

* * *

এর থেকেই অনিবার্যভাবে প্রশ্ন আসে 'মিশ্র অর্থ-নীতি'র কাঠামোর মধ্যে সমবায় প্রথার সাফল্য আদৌ সম্ভব কি না। একদিকে উৎপাদন ব্যবস্থার মূলনীতি হচ্ছে "লাভ" বা "মুনাফা", অপরদিকে নীতি হচ্ছে "Each for all and all for each"। একই গোত্রের ভোগ্যদ্রব্য ভিন্ন উৎপাদন-নীতির দ্বারা তৈরী হ'লে তার মোট ফলাফল কি দাঁড়ায় তা আমাদের দেশের লোকে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থেকেই উপলব্ধি করে; এ যাবৎ দেখা গেছে, নীতিগতভাবে সমবায়ের সাফল্যের সমস্ত কারণ বর্তমান থাকা সত্ত্বেও ব্যক্তিগত লাভের দ্বারা প্রণোদিত কাজের সঙ্গে সমবায়ের কাজের কোন সংস্পর্শ অনিবার্যভাবে অসম প্রতিযোগিতায় দাঁড়িয়ে গেছে।

বিনোবাজী তাঁর বিকল্প প্রস্তাবে যা বলতে চেয়েছেন[১৫] তা' কোনদিন সফল হবে কি না বলা যায় না, তবে এই সূত্রেই এই প্রশ্ন আসে: আমরা যদি সমাজতান্ত্রিক দেশ গঠনই আমাদের লক্ষ্য ব'লে মেনে নিই, মিশ্র অর্থনীতির সাহায্যে কি সেখানে পৌঁছাতে পারব?

* * *

সরকার যে সব প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ পদ্ধতির দ্বারা কুটিরশিল্প পুনরুদ্ধারের চেষ্টা করছেন তার মধ্যে একটি হচ্ছে "Common Production Programme"।[১৬] ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের দ্বারা উৎপাদিত দ্রব্যের সঙ্গে বৃহৎ শিল্প প্রতিযোগিতা করতে পারবে না। প্রয়োজনীয় কাঁচামাল সরবরাহ ও তার মূল্য নির্ধারণ প্রণালী যদি Privato Sector-এর উৎপাদনকারীর হাতে কেন্দ্রীভূত না থাকে তা হ'লে হয়ত এক সীমাবদ্ধ এলাকার মধ্যে শিল্পজাত দ্রব্যের ক্ষেত্রে এই প্রণালীতে কিছু সুফল হ'তে পারে। কিন্তু এর পরিধি কতদূর বাড়াতে পারলে তবে দুই পরস্পরবিরোধী উৎপাদন-পদ্ধতির কোন অসম সংঘর্ষ হবে না সে কথা বিশেষভাবে বিচার্য। ধানকল বা 'হাস্কিং মেশিন' যদি সমবায় সমিতির হাতে থাকে অথচ ধান বিক্রীর ক্ষেত্রে ধনী আড়তদারের ক্ষমতা অক্ষুণ্ণ থাকে, অথবা তাঁতের জন্য সুতো তৈরীর ভার যদি Private Sectorএ থাকে, তা হ'লে তার সম্পূর্ণ সুফল পাওয়া কঠিন। উপরন্তু কৃষিজ পণ্য উৎপাদন ও বণ্টন সম্বন্ধে যে সমস্যা ইতিমধ্যে উল্লেখ করা হয়েছে, সে সমস্যা থেকেই যাচ্ছে।

* * *

সমবায় প্রথার সার্থকতা সম্বন্ধে আমাদের যতই উচ্চ ধারণা থাকুক না কেন, তার প্রয়োগ সম্বন্ধে আমরা উদাসীন বা সন্দিহান, তা না হ'লে গত ষাট বছরেও সমবায় প্রথা আমাদের দেশে যথেষ্ট পরিমাণে শিকড় গাড়তে পারল না কেন? যৌথ প্রতিষ্ঠানে (Joint Stock Company) আমরা অনেকেই 'শেয়ার' কিনি নিরাপদ্ লাভের আশায়; সেখানে অর্থসংস্থান ব্যবস্থা যদি বা গণতান্ত্রিক, ব্যবস্থাপনা (management) সম্পূর্ণ ভিন্ন গোষ্ঠীর লোকের হাতে কেন্দ্রীভূত। তবু আমরা এই প্রতিষ্ঠানে শেয়ার কিনে অংশীদার হ'তে দ্বিধা করি না; কিন্তু সমবায় সমিতিতে অনুরূপভাবে টাকা দিতে আমাদের চরম দ্বিধা। আমাদের কাছে সমবায়ের সার্থকতা তখনই যখন আমাদের অর্থসংগতি কম; সমবায়ের মূল বাণী গ্রহণ করতেই আমাদের

১৪। আমেরিকার মত আমাদের কোনদিন কৃষিজ পণ্যের মূল্য বেশী রাখার জন্য উৎপাদন সঙ্কোচন করার কথা ভাবতে হবে না, কিন্তু শিল্পদ্রব্যের মত কৃষির ক্ষেত্রেও উৎপাদনের সঙ্গে মূল্যের যে ঘনিষ্ঠ-যোগ বর্তমান অর্থ নৈতিক কাঠামোর মধ্যে রয়েছে এর সংস্কারের কথা একদিন আমাদের ভাবতে হবে।

"In an Exchange Economy,—also known as a market or price economy—we find a strange warping of appraisal. But we find more, namely a conflict of interest between buyer and seller. The buyer craves abundance, the seller scarcity." World Resources and Industries.

এই প্রসঙ্গটি স্বতন্ত্রভাবে আলোচনা করার ইচ্ছা রইল।

১৫। এই সূত্রে বিনোবাজীর গ্রামদানের নিয়মাবলীর এবং রবীন্দ্রনাথ-পরিকল্পিত পল্লীসমাজ-এর নিয়মাবলী (দ্রঃ পল্লীপ্রকৃতি, পৃঃ ২২২) তুলনীয়।

১৬ দ্রষ্টব্য: Co-operative movement in India. J. Banerjee, পৃঃ ২০৯।

আপত্তি। যারা অতি দরিদ্র এবং একা কাজ করতে অক্ষম তাদের জন্যই সমবায় ব্যবস্থা; ফলে যখনি আমাদের যথেষ্ট অর্থসংগতি হচ্ছে, তখনি আমাদের স্বাতন্ত্র্যবোধ উগ্র হয়ে উঠছে; বাংলা দেশে পূর্বের সমবায় সমিতির অনেকগুলিই এই ভাবেই নষ্ট হয়েছে। সমবায় হচ্ছে দুর্বলের অস্ত্র; কিন্তু তীর ধনুক-হাতে একশোজন লোক যুদ্ধে নামলেও বন্দুকধারী একজনের হাতেই তারা পরাজিত হচ্ছে ও হবে।

'মিশ্র অর্থনীতি'র মধ্যে সমবায়ের সার্থকতা সম্বন্ধে শেষ কথা বলার সময় এখনো নিশ্চয়ই হয় নি; কিন্তু একথা গভীরভাবে ভেবে দেখবার সময় হয়েছে ব'লে মনে হয়, যে একদিকে 'ব্যক্তিগত লাভ' আরেকদিকে 'স্বেচ্ছায় সম্মিলিত হয়ে সকলের জন্য নিঃস্বার্থ কাজ', এরই সমন্বয় সম্ভব কিনা।—গ্রামের সংখ্যা অধিক হ'লেও বর্তমান সমাজ-ব্যবস্থা অনুযায়ী শহরের লোকেরাই অর্থে, বিদ্যায় ও নিজেদের অভাব, অভিযোগ, অসুবিধা কর্তৃপক্ষের গোচরে আনবার বিদ্যায় শক্তিশালী; এই শহরগুলিতেই যদি Private Sector তার পণ্যের পসরা নিয়ে চোখধাঁধানো বিজ্ঞাপন দিয়ে ক্রেতা আহ্বান করে, এবং শহরে কেন্দ্রীভূত ব্যাঙ্কগুলি তাদের সমস্ত অর্থ দিয়ে এই Private Sector-এর ব্যবসায়ে নিজেদের লাভের জন্য টাকা খাটায়, তা হ'লে কি আমরা আশা করতে পারব যে, শহরের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতরভাবে যুক্ত হয়েও গ্রামগুলি,—বা সেখানকার অর্থশালী কৃষকরা—ব্যক্তিগত স্বার্থের থেকেও সমবায়ের নীতিতে অধিকতর আস্থাবান্ থাকবে?

"বর্তমানকালে সমাজে অতিপরিমাণে যে আর্থিক অসামঞ্জস্য প্রশ্রয় পেয়ে চলেছে তার মূলে আছে লোভ। ...এখন সেই লোভের আকর্ষণ প্রচণ্ড প্রবল, কেননা লাভের আয়তন প্রকাণ্ড বড়ো হয়েছে" (সমবায় নীতি, পৃঃ ৩১)। আমাদের বর্তমান সমাজে আমরা কি এই লোভের পথ বন্ধ করতে পেরেছি, অথবা যে পথে চলেছি তাতে কি এই পথ বন্ধ করতে পারব? 'রাশিয়ার চিঠি'তে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, "সেখানকার পলিটিক্স্ মুনাফা-লোলুপদের লোভের দ্বারা কলুষিত নয়"; আমরা সমবায় আন্দোলনের জন্য যত টাকাই বরাদ্দ ধরি না কেন, আমাদের দেশের "শক্তির ক্ষেত্র" শহরগুলিতে যদি মুনাফার প্রশস্ত পথ খোলা থাকে তা হ'লে কি গ্রামে সমবায় সফল হবে? সাধারণ নগরবাসীর পক্ষে সমবায় প্রথায় জীবনধারা নিয়ন্ত্রণ করার অবকাশ সামান্যই; 'ক্রেতা-সমবায়' সফল হবার সম্ভাবনা কম, কেননা, শহরে Private Sector-এর কাজের এবং প্রভাব বিস্তারের পথ অবারিত থাকবে। এক্ষেত্রে গ্রামকে সমবায় প্রথায় দীক্ষিত বা উদ্বুদ্ধ করতে হ'লে শহরের কোন্ কাজ সম্পূর্ণভাবে সমবায় প্রথার আয়ত্তাধীন করা প্রয়োজন সে কথা বিচার্য।

* * *

একদিকে শহরগুলির অবাধ স্ফীতি, আরেকদিকে Private Sector-এর দ্বারা ভোগ্যসামগ্রী উৎপাদনের ব্যবস্থা—এই দুই প্রবল আকর্ষণ-শক্তির মধ্যে দুর্বলদের জন্য সমবায়ের যে চেষ্টা হচ্ছে, তার শেষ ফল কি হবে তা কেউ বলতে পারে না। একথা ঠিকই যে, অবাধ ব্যবসায় স্বাধীনতাও যেমন চলতে পারে না তেমনি প্রতিটি ক্ষেত্র থেকে প্রতিযোগিতা অদৃশ্য হ'লেও সমাজের ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা, কিন্তু আমরা যে মানদণ্ড দেশের অপেক্ষাকৃত শক্তিশালী অংশের জন্য স্বীকার ক'রে নিয়েছি, তার পরিণতি কি হবে এবং আখেরে গ্রামজীবনের শীর্ণধারা সমবায়ের সাহায্যে নতুন খাতে বইবে কিনা, সেই প্রশ্নটি থেকে যাচ্ছে।
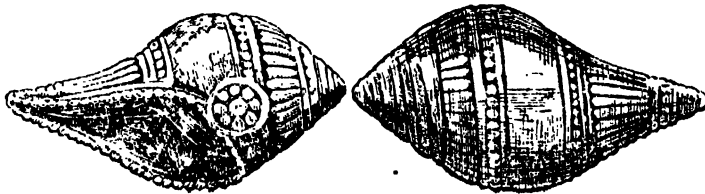
আচার্য রামমোহনের সঙ্গীত-প্রসঙ্গ

শ্রীদিলীপকুমার মুখোপাধ্যায়

রামমোহনের গীত-রচনা

রামমোহন যে বাংলা গীতাবলী রচনা করেছিলেন, সে কথা তার সঙ্গীতকৃতির মধ্যে সর্বাধিক সুপরিচিত। গান তিনি অধিক সংখ্যায় রচনা না করলেও বৈশিষ্ট্য ও উৎকর্ষতার জন্যে তা মূল্যবান্ সঙ্গীত সম্পদ হয়ে আছে।

সঙ্গীতজ্ঞ রামমোহনের সবচেয়ে সৃজনশীল অবদান এই সঙ্গীতাবলী। তাঁর জীবনের দীর্ঘকাল এবং তাঁর পরিণত বয়সের অনেকাংশ এই সমস্ত সঙ্গীত রচনার জন্যে চিহ্নিত করা যায়। তাঁর কর্মমুখর কলকাতা বাসের প্রায় সমগ্র সময়-ব্যাপী তাঁর গান রচনার পর্ব। এমন কি, কলকাতা পরিত্যাগের পরবর্তীকালে অর্থাৎ তাঁর ইংলণ্ড প্রবাসের শেষ জীবনেও তিনি বাংলা গান রচনা থেকে বিরত হন নি। তাঁর প্রথম ও শেষ গান রচনার মধ্যে অন্তত ১৬ বছরের ব্যবধান। এ পর্যন্ত যতদূর জানা গেছে, ১৮১৬ খ্রীষ্টাব্দে 'আত্মীয় সভা'য় গীত "কে ভুলালো হায়, কল্পনাকে সত্য বলি জান একি দায়" (সিন্ধু ভৈরবী ঠুংরী) তাঁর রচিত প্রথম গান। এবং সম্ভবত তাঁর রচিত শেষ গান হ'ল, "কি স্বদেশে কি বিদেশে যখন যেথায় থাকি" (বাগেশ্রী, আড়াঠেকা)। এই গানটি তিনি বিলাতে রচনা করেছিলেন, মৃত্যুর এক বছর পূর্বে। সেই-দূর বিদেশে উপযুক্ত পরিবেশের অভাব এবং শেষ জীবনে তাঁর আর্থিক অসচ্ছলতার জন্যে দুশ্চিন্তা ইত্যাদির মধ্যেও যে তিনি এমন প্রাণস্পর্শী ব্রহ্মসঙ্গীত রচনা করেন, তা যুগপৎ তাঁর সঙ্গীতপ্রীতি ও আদর্শনিষ্ঠার মহৎ নিদর্শন। ১৮৩২ খ্রীষ্টাব্দের ২২ সেপ্টেম্বর তারিখের পত্রে তিনি জ্যেষ্ঠ পুত্র রাধাপ্রসাদ রায়কে এই গানটি প্রেরণ করে লিখেছিলেন, "এই অবকাশে ব্রাহ্মসমাজে কাযের নিমিত্ত এক গীত পাঠাইতেছি, যদ্যপি তোমরা ও বিদ্যাবাগীশ উচিত জান, গাথকদিগকে দিবে।"

বিলাতে রচিত এই গানটির পরে আর কোন গান তাঁর রচনা করার কথা জানা যায় নি। উত্তর জীবনের ১৬ বছর ব্যাপী তাঁর সঙ্গীত রচনার কাল হ'লেও তিনি যে অধিক সংখ্যায় গান রচনা করবার অবসর পান নি, তার কারণ স্পষ্ট। তিনি প্রধানত সঙ্গীতজ্ঞ ও গান-রচয়িতা ছিলেন না। তাঁর বিপুল কর্মপ্রবাহের মধ্যে এবং অবকাশের অভাব সত্ত্বেও তিনি গানগুলি রচনা করেছিলেন, সঙ্গীতের প্রতি আত্যন্তিক প্রীতিবশতঃ ও আদর্শ-প্রকাশের বাহনস্বরূপ।

রামমোহন-রচিত গানের সংখ্যা কত, এ কথার সঠিক ও সন্দেহাতীত উত্তর দেওয়া কারও পক্ষে সম্ভব নয়। কারণ, কোন্ কোন্ গান রামমোহনের রচনা তা নিশ্চিতভাবে জানা যায় না। তাঁর সমসাময়িককালে কোন গানই তাঁর রচনা হিসাবে চিহ্নিত হয় নি এবং তিনিও স্বয়ং সে বিষয়ে নির্দেশ দেন নি। তাঁর এবং তাঁর অনুগামী বন্ধু বা শিষ্যদের রচিত গীতাবলী ব্রহ্ম-সঙ্গীতরূপে প্রচারিত হয়েছে, রচয়িতাদের নামাঙ্কিত না হয়ে এবং রচয়িতাদের রচনা-রূপে নির্দিষ্ট না হয়ে। সেজন্যে রামমোহনের পরবর্তীকালে যাঁরা সঙ্গীতসংকলন, গ্রন্থ সম্পাদনা ও প্রকাশ করেছেন, তাঁদের, অনেকের পক্ষে রামমোহনের গীতাবলীর সঠিক সন্ধান দেওয়া সম্ভব হয় নি। রামমোহনের গান ব'লে যা সঙ্কলিত হয়েছে প্রায় সব ক্ষেত্রেই, তার মধ্যে অন্যের রচিত গান স্থান পেয়েছে এবং রামমোহন-রচিত অনেক গানও বাদ পড়েছে। যেমন, নবকান্ত চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত "সঙ্গীত সংগ্রহ", প্রথম ভাগ (১২৮৯ সনে প্রকাশিত), আদি ব্রাহ্মসমাজ থেকে ১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত (সম্পাদকের নাম নেই) "রামমোহন গীতাবলী," ইত্যাদি। আদি ব্রাহ্মসমাজ থেকে প্রকাশিত "ব্রহ্ম-সঙ্গীত" প্রথম ভাগে যে ৬০টি গান অন্তর্ভুক্ত হয়েছে, তার মধ্যেও রামমোহনের রচনা আছে, কিন্তু সেক্ষেত্রে গানের সঙ্গে রচয়িতাদের নাম উল্লেখ করা নেই।

এমন কি, স্বয়ং রামমোহন ১৮২৮ খ্রীষ্টাব্দে "ব্রহ্মসঙ্গীত" নামে যে গীতাবলী প্রকাশ করেছিলেন, তার মধ্যে স্বরচিত গানগুলি চিহ্নিত করেন নি এবং তাঁর সুহৃদবৃন্দের রচনাও তার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করেছেন। তার সঙ্কেত থেকে কোন্ গানগুলি বন্ধুদের রচিত তা জানা যায় বটে, কিন্তু এই "ব্রহ্মসঙ্গীত" হ'ল সে সময় (১৮২৮ খ্রীষ্টাব্দ) পর্যন্ত রচিত ব্রহ্মসঙ্গীতাবলীর সঞ্চয়ন। ওই সাল পর্যন্ত রামমোহন ও তাঁর স্বমতাবলম্বী সুহৃদদের ভাবসৃষ্টি, তাঁদের ধ্যানধারণার সম্মিলিত বাণীরূপ। রামমোহন কয়েক বছর ধ'রে যে গানগুলি রচনা করেছিলেন উক্ত

গ্রন্থের পরে, তা সম্পূর্ণ তিনি আর কখনও প্রকাশ করেন নি।

রামমোহন-রচিত গানগুলির পরিচয় এইভাবে প্রায় লুপ্ত হয়েই যেত, যদি না রাজনারায়ণ বসু ও আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ (১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দ) রামমোহন গ্রন্থাবলী'র নির্ভরযোগ্য সংস্করণ প্রকাশ করতেন। এই গ্রন্থাবলীতেই প্রথম বিশেষ বিবেচনা সহকারে রামমোহন রচিত গানগুলি সংগৃহীত হয়েছে। উক্ত সম্পাদকদ্বয় বিবৃত করেছেন—"আমরা বর্তমান গ্রন্থাবলীতে কেবলমাত্র রামমোহনের রচিত ব্রহ্মসঙ্গীতগুলি সন্নিবিষ্ট করিয়াছি।"

এই সংস্করণের প্রামাণিকতার বিষয়ে এই কারণে নির্ভর করা যায় যে, গ্রন্থাবলীর অন্যতম সম্পাদক হলেন মনীষী রাজনারায়ণ বসু। তিনি আদি সমাজের অন্যতম নেতৃস্থানীয় এবং সমাজের ঐতিহ্যের একজন শ্রেষ্ঠ ধারক ও বাহক। রামমোহন-প্রবর্তিত মতাদর্শের একনিষ্ঠ উত্তর সাধক এবং রামমোহনের সৃষ্টি ও অবদান সম্পর্কে সশ্রদ্ধ অনুসন্ধিৎসু। তা ছাড়া, তাঁর পিতা নন্দকিশোর বসু মহাশয় ছিলেন রামমোহনের অন্যতম বিশিষ্ট অনুগামী সুহৃদ। সেই সূত্রে রাজনারায়ণ তাঁর পিতার সাহায্যে রামমোহনের গীতরচনার বিষয়ে বিশেষ ভাবে জানতে পারেন; রামমোহন রচিত ও প্রকাশিত "ক্ষুদ্রপত্রী"গুলি থেকে রামমোহনের গানের সনাক্তকরণেও হয়ত রাজনারায়ণ তাঁর পিতার সহায়তা লাভ করেছিলেন। এই সব কারণে রাজনারায়ণ বসু ও আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ সংগৃহীত রামমোহনের গীতাবলী প্রামাণিক হিসাবে গণ্য করা চলতে পারে। অন্তত যে সমস্ত গান তাঁরা রামমোহনের রচনা বলে উক্ত "গ্রন্থাবলী"তে স্থান দিয়েছেন, সেগুলি অপর কোন ব্যক্তির রচিত মনে করা উচিত হবে না। তবে এমন হওয়া অসম্ভব নয় যে, রামমোহনের রচিত সমস্ত গীতাবলী এই গ্রন্থাবলীতে অন্তর্ভুক্ত হয় নি। হয়ত রামমোহন আরও কয়েকটি গান রচনা করেছিলেন, যা বসু ও বেদান্তবাগীশ মহাশয়েরা সম্পূর্ণ সংগ্রহ করতে পারেন নি। তাঁদের সংগৃহীত গানের সংখ্যা হ'ল ৩২টি। আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, রামমোহনের সঙ্গীত রচনার কাল ১৬ বছর ব্যাপী ছিল। সুতরাং মনে হয়, আরও অধিক সংখ্যক গান তিনি রচনা করেছিলেন। তবে নিশ্চিতভাবে জানা যায় না ব'লে এ বিষয়ে কোন মতামত প্রকাশ করা সমীচীন নয়। এবং রামমোহনের গান রচনা সম্পর্কে আলোচনা করবার জন্যে উক্ত ৩২টি গান নিদর্শনস্বরূপ গণ্য করা ভিন্ন অন্য উপায় নেই। "বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ" সংস্করণ রামমোহন গ্রন্থাবলীতেও উক্ত "গ্রন্থাবলী" অনুসরণে তাঁর গানগুলি পুনর্মুদ্রিত হয়েছে।

রামমোহন-রচিত সঙ্গীত বিষয়ে পর্যালোচনা করতে বর্তমান নিবন্ধে ওই ৩২টি গানকেই অবলম্বন করা হবে। এ প্রসঙ্গে বিশেষভাবে আলোচনার বিষয় হ'ল—রামমোহনের গীতাবলীর বৈশিষ্ট্য কি, সাঙ্গীতিক পরিভাষায় তা কোন্ অঙ্গের গান (অর্থাৎ ধ্রুপদ, খেয়াল, টপ্পা ইত্যাদি), তাদের মূল্যায়ন, বাংলার গান রচনার ক্ষেত্রে রামমোহনের অবদান কতখানি, তাঁর সঙ্গীতাবলীর প্রভাব ও ফলশ্রুতি কি, ইত্যাদি।

একথা সুপরিজ্ঞাত যে, রামমোহন-রচিত গানই বাংলা ভাষার প্রথম ব্রহ্মসঙ্গীত। ব্রাহ্ম-সমাজের প্রতিষ্ঠাতা এবং ব্রাহ্মধর্মের প্রবর্তক স্বাভাবিক ভাবেই প্রথম ব্রহ্মসঙ্গীত রচনাকারও। ব্রাহ্মসমাজ স্থাপনের অনেক আগে, অন্তত এক যুগ আগে তাঁর ব্রহ্মসঙ্গীত রচনার ("কে ভুলালো হায়") কথা জানা যায়। তবে সমাজ প্রতিষ্ঠার সময় থেকে তাঁর গীতসৃষ্টিধারা অধিকতর বেগবতী ও ফলবতী হয়েছিল, সন্দেহ নেই। তাঁর ব্রহ্মসঙ্গীত রচনার আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে তাঁর অনুরাগী বন্ধুগণ ব্রহ্মসঙ্গীত রচনা আরম্ভ করেন—যথা কৃষ্ণমোহন মজুমদার ("কেমনে হবে পার সংসার পারাবার" রচয়িতা), নিমাইচরণ মিত্র ("বিষয় মৃতা তৃষ্ণায় ক্রমে আয়ু হয় ক্ষীণ"), ভৈরবচন্দ্র দত্ত ("অহঙ্কারে মত্ত সদা অপার বাসনা" রচয়িতা), নীলমণি ঘোষ (যাঁর রচিত "কে জানে তোমায় তারা, তুমি সাকারা কি নিরাকারা" গানখানি শুনে রামমোহন তাঁকে বিশেষ প্রশংসা ও আলিঙ্গন করেন), কালীনাথ রায় ("মায়াবশে রসোল্লাসে" রচয়িতা) প্রভৃতি।

পরে আদি ব্রাহ্মসমাজকে কেন্দ্র ক'রে রাগের ভিত্তিতে ব্রহ্মসঙ্গীত রচনায় এই ধারা অনুসৃত ও পরিপুষ্ট হ'তে থাকে। আদি সমাজে সাপ্তাহিক উপাসনাকালে ব্রহ্মসঙ্গীতের অনুষ্ঠান নিয়মিত হওয়ার ফলে বহু উচ্চাঙ্গের গান রচিত হয়, যাদের সাঙ্গীতিক মূল্য অনস্বীকার্য। যে রাগসঙ্গীত রামমোহনের বিশেষ প্রিয় ছিল, যা' রচনা ক'রে এবং সমাজের প্রতি সাপ্তাহিক অধিবেশনে গীতানুষ্ঠানের ব্যবস্থা ক'রে তিনি শিক্ষিত সমাজে তা' প্রচলনে অন্যতম পথপ্রদর্শকের কাজ করেছিলেন—আদি সমাজের উদ্যোগে তা' উত্তরোত্তর জনপ্রিয় হ'তে থাকে। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ রামমোহন পরিকল্পিত এই ধারাকে বিবর্ধিত করতে বিশেষ সহায়তা করেন। তিনি স্বয়ং কয়েকটি সঙ্গীত রচনা করেছিলেন এবং সঙ্গীতের পৃষ্ঠপোষকও ছিলেন। তাঁর প্রেরণায় তাঁর কৃতী পুত্রগণ, দ্বিজেন্দ্রনাথ

সত্যেন্দ্রনাথ, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ প্রভৃতি এবং ভ্রাতুষ্পুত্র গণেন্দ্রনাথ রাগ-অঙ্গে উৎকৃষ্ট ব্রহ্মসঙ্গীতাবলী রচনা করেন। এমনি ভাবে বিষ্ণুরাম চট্টোপাধ্যায়-রচিত কয়েকটি গান ("অচল মন গহন" প্রভৃতি) শ্রেষ্ঠ বাংলা রাগসঙ্গীতের নিদর্শন হয়ে আছে। এই ধারার শেষ ও সর্বোত্তম সুরকার গীতিকার রবীন্দ্রনাথে ব্রহ্মসঙ্গীতের মহত্তম পরিণতি।

এই বিপুল ধারার উৎসমূলে হলেন রামমোহন। তাঁর ব্রহ্মসঙ্গীত রচনা ও সমাজগৃহে তার প্রবর্তনার এই এক প্রধান তাৎপর্য।

রামমোহন-রচিত বাংলা গানের দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হল—হিন্দুস্থানী রাগসঙ্গীতের আদর্শে ও অনুকরণে গীত রচনা। গানের বিষয়বস্তুর জন্যে হিন্দী গানের অনুকরণ হয়। গানের সাঙ্গীতিক গঠন ও রূপবন্ধের অর্থাৎ রাগ, তাল ইত্যাদি বিষয়ে রামমোহন হিন্দী রাগসঙ্গীতকে আদর্শ স্বরূপ রেখে তাঁর মনোমত বিষয়বস্তু নিয়ে গান রচনা করেন। রামমোহনের এইভাবে গান রচনার ফলও হয় সুদূরপ্রসারী। হিন্দুস্থানী রাগ-সঙ্গীতের সুর ও তালের অনুকরণে—এবং সঙ্গীতাচার্য কালী মীর্জার অধীনে 'শিক্ষা'র ফলেও বোধ হয় বলা যায়—রামমোহন যে ব্রহ্মসঙ্গীত রচনা আরম্ভ করলেন, সেই ধারাও পরবর্তীকালের আদি ব্রাহ্ম-সমাজ গোষ্ঠীর সঙ্গীত-রচয়িতারা অনুসরণ ক'রে চললেন। অর্থাৎ, দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, গণেন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিষ্ণুরাজ চট্টোপাধ্যায়, সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রভৃতি এবং তরুণ রবীন্দ্রনাথও "হিন্দী গান ভাঙ্গা" অর্থাৎ হিন্দীগানের ঠাট, রাগ ও তালের অনুকরণে বাংলা গান রচনা করতে লাগলেন। তার ফলে বাংলা দেশে ভারতীয় ঐতিহ্যমণ্ডিত সঙ্গীতধারা কতখানি বিস্তার লাভ করে, বাংলার সঙ্গীত ভাণ্ডার কি পরিমাণ সমৃদ্ধিশালী হয়, তা ধারণা করা কঠিন নয়। ভারতীয় সঙ্গীতসম্পদ্ এইভাবে আহরণ ও আত্মস্থ করবার এক মহান্ পথপ্রদর্শক হলেন রামমোহন।...

এখন রামমোহন-রচিত এই ব্রহ্মসঙ্গীতগুলির গঠন বা সাঙ্গীতিক রূপ সম্পর্কে আলোচনা করবার আছে। আচার্যের ব্রহ্মসঙ্গীতাবলী কোন্ অঙ্গের গান? ধ্রুপদ অথবা খেয়াল কিংবা টপ্পা? অনেকে মনে করেন যে তা ধ্রুপদ গান।

বাস্তবিকপক্ষে এমন একটি ধারণা ও মত প্রচলিত আছে যে, রামমোহন রায়ের ব্রহ্মসঙ্গীতগুলি ধ্রুপদ এবং তিনিই বাংলা ভাষায় প্রথম ধ্রুপদ গান রচনা করেন। এ সম্পর্কে একটি স্বতন্ত্র নিবন্ধে অনুরূপ মত প্রকাশর করেছেন যোগানন্দ দাস মহাশয়। রামমোহনে তাবৎ গীতাবলীতে এমন স্পষ্টভাবে ধ্রুপদ গান বলে আর কেউ ঘোষণা করেছেন কি না বর্তমান লেখকের জানা নেই। সেজন্য যোগানন্দ দাস মহাশয়ের বক্তব্য উপলক্ষ্য করে এ প্রসঙ্গের অবতারণা করা হ'ল। তিনি বলেছেন, "রামমোহন যেমন তন্ত্র পুরাণ প্রভৃতি ছেড়ে একেবারে মূল বেদ বেদান্তে কোপ মারলেন, ক্রীশ্চান ধর্মশাস্ত্র আলোচনা করতে গিয়ে যেমন একেবারে গ্রীক্ ও হীব্রু বাইবেলে গিয়ে পৌঁছলেন, ঠিক তেমনি সঙ্গীত সংস্কৃতিতেও একেবারে গোড়া ধ'রে টান দিলেন—এদেশে সঙ্গীত শাস্ত্রের মূল ভিত্তি, ধ্রুবপদ বা ধ্রুপদ। বাংলাভাষায় শাস্ত্রীয় রাগ-রাগিণীর উপর প্রতিষ্ঠিত সর্বপ্রথম ধ্রুপদ সঙ্গীত রচনা করলেন রাজা রামমোহন রায়।...সঙ্গীত নায়ক শ্রীগোপেশ্বর বন্দ্যো-পাধ্যায় 'ধ্রুবপদ' শব্দের অর্থ বলছেন, 'ঈশ্বরবিষয়ক বর্ণন।' সুতরাং রামমোহন কর্তৃক শাস্ত্রীয় সঙ্গীত রক্ষার জন্য ধ্রুপদে 'ব্রহ্মসঙ্গীত' বা ঈশ্বরবিষয়ক বর্ণন রচনা। বাংলা দেশে এই ভাবে বাংলা ভাষার মাধ্যমে ধ্রুপদ সঙ্গীতের প্রচলন সুরু হ'ল।...রামমোহন গ্রন্থাব[illegible], বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ সংস্করণে রামমোহনের যে ৩২টি ব্রহ্মসঙ্গীত ছাপা হয়েছে...বাংলা ভাষায় এই-ই হ'ল সর্বপ্রথম (১৮২৮ খ্রীঃ) ধ্রুপদাঙ্গ সঙ্গীত।" ('বাংলা ভাষায় ধ্রুপদাঙ্গ সঙ্গীত ও রাজা রামমোহন রায়'—যোগানন্দ দাস, যুগান্তর সাময়িকী, ৮ই সেপ্টেম্বর, ১৯৫৭)।

উদ্ধৃত মতামতের মধ্যে দু'টি মূল বক্তব্য প্রকাশ পেয়েছে। (১) রাজা রামমোহন বাংলা ভাষায় প্রথম শাস্ত্রসম্মত ধ্রুপদ গান রচয়িতা এবং (২) তাঁর ব্রহ্মসঙ্গীতাবলী ধ্রুপদাঙ্গ সঙ্গীত।

প্রথম বিষয়টিতে আমাদের নিবেদন এই যে, বিষ্ণু-পুরের আদি সঙ্গীতাচার্য এবং প্রথম ধ্রুপদ গায়ক ও ধ্রুপদ গান রচয়িতা রামশঙ্কর ভট্টাচার্য রামমোহনের পূর্বে ধ্রুপদ গান রচনা করেছিলেন। বাংলা দেশে রাগসঙ্গীত-চর্চার কোন পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস এবং বিগত যুগের সঙ্গীতাচার্যদের কোন প্রমাণিক জীবনী-গ্রন্থ রচিত হয় নি, নচেৎ এ বিষয়ে অবিসংবাদিত তথ্য পাওয়া যেতে পারত। তা' না হ'লেও কিছু সন্-তারিখের আলোর সন্ধান এ প্রসঙ্গে পাওয়া যায় (গত দুই সংখ্যার 'প্রবাসী'তে তা' উল্লিখিত হয়েছে)। বিষ্ণুপুর ঘরাণার প্রবর্তক ও আদি ধ্রুপদীকর রামশঙ্কর ভট্টাচার্য রামমোহনের অপেক্ষা প্রায় ১৫ বছরের বয়োজ্যেষ্ঠ ছিলেন এবং ভট্টাচার্য মহাশয়ের

সঙ্গীতচর্চা আরম্ভও হয়েছিল রামমোহনের তুলনায় অল্প বয়সে। রামশঙ্কর ভট্টাচার্যের সঙ্গীত-জীবন ও ধ্রুপদ-শিক্ষা আরম্ভ হয় ২০।২১ বছর বয়সে অর্থাৎ ১৮৮০।৮১ খ্রীষ্টাব্দে। রামশঙ্করের সঙ্গীতজীবন সবিস্তারে বর্ণনার এখানে প্রয়োজন নেই। শুধু উল্লেখ করবার আছে যে, তাঁর রচিত ধ্রুপদ গানগুলি এককালে বাংলার সঙ্গীত-সমাজে সুপরিচিত ছিল। যথা, "অজ্ঞান তম শিকরে গাঢ়ময়ি পতিতে" (রাজবিজয়, তেওরা), "অশরণ-জন শরণদ ভবসাগর নাবিক গোবিন্দ" (ভূপালী, ব্রহ্মতাল), "প্রণমামি শঙ্কর শম্ভু শিব" (বাহার, গীতাঙ্গী), "মাত সুরেশ ত্রিপথ গামিনী" (ভৈরব, চৌতাল), "তারিনি তপন-তনয়-ত্রাসে" (শঙ্করাভরণ, চৌতাল), "দুহিতহরা পরা দশকরা" (ভূপালী, পটতাল) প্রভৃতি। রামশঙ্করের ধ্রুপদ-গীতাবলী রচনার তারিখ সঠিকভাবে জানা যায় না বটে, কিন্তু তাঁর সঙ্গীত-জীবন যখন ১৮৮০।৮১ খ্রীষ্টাব্দে আরম্ভ হয়েছিল এবং সঙ্গীতচর্চাই যেহেতু তাঁর জীবনের মূল অবলম্বন ছিল, তখন এ ধারণা পোষণ করা অসঙ্গত হবে না যে, রামমোহনের সঙ্গীত রচনাকালের পূর্বেই রামশঙ্কর ভট্টাচার্য ধ্রুপদ গান রচনা করেন।

যোগানন্দ দাস মহাশয়ের দ্বিতীয় বক্তব্য সম্পর্কে আমাদের নিবেদন আরও গুরুত্বপূর্ণ। রামমোহনের রচিত ব্রহ্মসঙ্গীতাবলী কি ধ্রুপদ গান? ধ্রুপদ গান কাকে বলে? উদ্ধৃত অংশে উক্ত লেখক ধ্রুপদের সংজ্ঞা-স্বরূপ শ্রদ্ধেয় গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের মন্তব্য (ধ্রুপদ অর্থ 'ঈশ্বরবিষয়ক বর্ণন') উল্লেখ ও সমর্থন করেছেন। কিন্তু শুধুমাত্র "ঈশ্বরবিষয়ক বর্ণন" এই কথায় ধ্রুপদের সংজ্ঞা নিরূপণ হয় না। ধ্রুপদ গান নৃপতির গুণ বর্ণনা ক'রেও রচিত হ'তে পারে, প্রকৃতি ও ঋতু বর্ণনাও হ'তে পারে। কিন্তু এহো বাহ্য। এসব হ'ল ধ্রুপদ গানের শুধু বিষয়বস্তুর কথা। কিন্তু বিষয়বস্তুই ধ্রুপদ গানের একমাত্র নিরিখ নয়, প্রধান বৈশিষ্ট্যও নয়। প্রকৃতপক্ষে ধ্রুপদ হ'ল একটি বিশিষ্ট গীতিরীতি ও পদ্ধতি। কি ভাবে গানটি গাওয়া হ'ল তারই ওপর নির্ভর করে তা' ধ্রুপদ অথবা খেয়াল, টপ্পা বা ঠুংরী।

রামমোহনের একাধিক সমসাময়িক সঙ্গীতজ্ঞ ও গীতরচয়িতা বহু ঈশ্বরবিষয়ক গান রচনা করেছিলেন যা 'ঈশ্বরবিষয়ক বর্ণন', কিন্তু ধ্রুপদ নয়। তাঁর চেয়ে ২৫ বছরের বয়োজ্যেষ্ঠ (বর্ধমানের দেওয়ান) রঘুনাথ রায় প্রচুর পরিমাণে চার তুকের ঈশ্বরবর্ণনাত্মক গান রচনা করেছিলেন, কিন্তু সে সব ধ্রুপদরূপে গণ্য হয় না। তাদের বলা হয় খেয়াল অঙ্গের, কারণ তা খেয়াল-পদ্ধতিতে গীত হ'ত। রামমোহনের ৪।৫ বছরের বয়োজ্যেষ্ঠ, সাধক কমলাকান্ত বহু ঈশ্বরবিষয়ক গান করেন যা টপ্পা অঙ্গের, ধ্রুপদ নয়। কারণ ধ্রুপদ একটি বিশেষ ধরণের গীত-শৈলী, সাঙ্গীতিক গঠন, যা' কয়েকটি চিহ্নিত তালে গীত হয়ে থাকে। কোন গানের সাঙ্গীতিক রূপ ও রূপবন্ধ স্থির করে যে তা' ধ্রুপদ অথবা অন্য কোন অঙ্গের।

ধ্রুপদের আদি-প্রকৃতি বিষয়ে সুস্পষ্টভাবে পরিচিতি দিয়েছেন স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ, সঙ্গীতশাস্ত্রে সুপণ্ডিত এবং প্রাচীন ভারতীয় সঙ্গীতের ইতিহাসকার। তিনি বলেছেন, "ধ্রুবপদ শব্দটির অর্থ শাশ্বত, পদ বা গান নয়; ধ্রুবপদ আসলে 'ধ্রুব' নামক প্রবন্ধ এবং প্রবন্ধরূপ গীতির নামই ধ্রুবপদ গান। 'পদ' অর্থে গান। 'প্রবন্ধ' শব্দে বুঝি প্রকৃষ্টরূপে বন্ধ, অর্থাৎ বিরুদ, পাট, পদ, তেনক প্রভৃতি ছ'টি অঙ্গ, ছন্দ, তাল এবং প্রাচীন উদ্‌গ্রাহক, মেলাপক প্রভৃতি অথবা আধুনিক স্থায়ী অন্তরা প্রভৃতি অংশযুক্ত নিবন্ধ গানের নামই প্রবন্ধ বা প্রবন্ধ গান। মতঙ্গ (বৃহদ্দেশী), পার্শ্বদেব (সঙ্গীত সময়সার), শার্ঙ্গদেব (সঙ্গীত রত্নাকর) গ্রন্থে অন্যান্য বিচিত্র প্রবন্ধের নামোল্লেখ করেছেন। তাঁরাও বলেছেন, ধ্রুপদ বা ধ্রুবপদ গানের প্রাণকেন্দ্র ধ্রুবপ্রবন্ধ। খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয় শতকে রচিত ভরতের 'নাট্যশাস্ত্রে' 'ধ্রুবা' নাট্যগীতির উল্লেখ আছে, কিন্তু 'ধ্রুব' প্রবন্ধের উল্লেখ নেই। তাহলেও ভরত নিবদ্ধ অনিবদ্ধ অন্যান্য শিবস্তুতিমূলক গাথা, পাণিক ও বেনক প্রভৃতি প্রবন্ধ গানের নামোল্লেখ করেছেন। খ্রীঃ ৫—৭ম শতকের গ্রন্থ বৃহদ্দেশীতে, খ্রীঃ ৯—১১শ শতকের (গ্রন্থ) সময় সঙ্গীতসারে ও বিশেষভাবে ১৩শ শতকের গোড়ার দিকে রচিত সঙ্গীত রত্নাকরে 'ধ্রুব' প্রবন্ধের উল্লেখ ও পরিচয় আছে।" (বেতার জগৎ, শারদীয় সংখ্যা, ১৩৬৯ সাল—স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ)।

আধুনিক কালে ধ্রুপদ গানের রূপ ও গঠন বিষয়ে সাধারণভাবে এই পরিচয় দেওয়া যায়: ধ্রুপদ চার তুক বা কলিতে (স্থায়ী, অন্তরা, সঞ্চারী ও আভোগ) গঠিত কয়েকটি বিশিষ্ট তালে চৌতাল, সুর ফাঁকতাল, তেওরা, ধামার আড়া চৌতাল, ঝাঁপতাল প্রভৃতি) গীত এবং সাধারণত এক মাত্রায় একটি স্বরের অধিক থাকে না। ধ্রুপদ গানের অন্তর্নিহিত গাম্ভীর্যের জন্যে মৃদঙ্গের মেঘমন্দ্রধ্বনিতেই তার সঙ্গত হয়ে থাকে, তবলার চটুল নিক্কণ ধ্রুপদ গানের (পাখোয়াজ-তুল্য) উপযোগী নয়।

ধ্রুপদ গান কাকে বলা যায়, আশা করি তার সংজ্ঞা নির্ণয়ে আর অধিক বাগ্‌বিস্তার বাহুল্য। এটি মূলত সঙ্গীতের ক্রিয়াংশের ব্যাপার। এখন একটি সাধারণ

উদাহরণ দিয়ে ধ্রুপদের প্রকৃতির প্রসঙ্গ শেষ করা হবে। রবীন্দ্রনাথের "সত্যমঙ্গল প্রেমময় তুমি" (ইমন কল্যাণ, তেওরা), "সীমার মাঝে অসীম তুমি" (কেদারা, একতালা) এবং "কে বসিলে আজি হৃদয়াসনে" (সিন্ধু, মধ্যমান) তিনখানি গানই ঈশ্বরবিষয়ক বর্ণন। কিন্তু তিনটিই ধ্রুপদ নয়। প্রথমটি ধ্রুপদ, দ্বিতীয়টি খেয়ালঙ্গ এবং শেষেরটি টপ্পা অঙ্গের গান। তার কারণ, গান তিনখানির সাঙ্গীতিক রীতি ও পদ্ধতি স্বতন্ত্র, যদিও বিষয়বস্তু ঈশ্বরবিষয়ক বর্ণন।

ধ্রুপদের এই স্বরূপ বিবেচনা করলে, রামমোহনের গানগুলিকে কোন্ অঙ্গের বলা সঠিক হয়?

রামমোহন রচিত ব্রহ্মসঙ্গীতাবলীর প্রকৃতি নির্ণয়ে অবশ্য একটি অসুবিধা আছে। তাঁর গান ঠিক কি পদ্ধতিতে গাওয়া হ'ত, তার সমসাময়িক কালের কোন নজির নেই। কারণ, রামমোহন গীতির কোন নির্ভরযোগ্য সেকালের স্বরলিপি পাওয়া যায় নি। তাঁর অব্যবহিত পরবর্তীকালেও তা' প্রস্তুত হ'বার কথা জানা যায় না। তাঁর কয়েকটি গানের যে একটিমাত্র স্বরলিপি পুস্তক পাওয়া যায়, তা' অর্বাচীন ("রামমোহন যুগগীতি" —দেবকুমার দত্ত সম্পাদিত)।*

রামমোহনের গানের স্বরলিপি আমাদের হাতে এসে পৌঁছায় নি বটে, কিন্তু তাঁর গীতিরীতির পরিচয় লাভের একটি মূল্যবান্ সূত্র পাওয়া যায়। আদি ব্রাহ্মসমাজ প্রকাশিত "ব্রহ্মসঙ্গীত" (প্রথম ভাগ) এবং রাজনারায়ণ বসু ও আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ সম্পাদিত "রামমোহন গ্রন্থাবলী"তে মুদ্রিত গানগুলিতে প্রত্যেক গানের রাগের সঙ্গে তালেরও উল্লেখ আছে। সেইসব তালের সূত্রে গানগুলির রীতি-প্রকৃতি বুঝতে পারা যায়। অন্তত কোন গান ধ্রুপদ কিনা তা' তার তালের উল্লেখ থেকে ধারণা করা যেতে পারে। চৌতাল বা তেওরা বা সুরফাঁক-তালে গঠিত গান যেমন কোন কালেই টপ্পা হতে পারে না, তেমনি আড়া-ঠেকা কিংবা কাওয়ালী কিংবা তেওট তালে ধ্রুপদ গীত হওয়া অসম্ভব।

রামমোহনের যে ৩২টি গান বসু ও বেদান্তবাগীশ সংস্করণে আছে তাদের নিম্নলিখিত তালের সংখ্যা পাওয়া যায়—

২৩টি আড়া-ঠেকা, ২টি একতালা, ১টি কাওয়ালী, ১টি তেওট, ১টি ঠুংরি, ১টি আড়া, ২টি ঝাঁপতাল ও ১টি ধামাল বা ধামার। এদের মধ্যে আড়া ঠেকা, একতালা, কাওয়ালী, তেওট ও ঠুংরি (এ ঠুংরি পরবর্তীকালের সুপরিচিত ও মনোমুগ্ধকর এবং লক্ষ্ণৌতে বিবর্তিত গীত-বিশেষ নয়, এটি ৮ মাত্রার একটি তাল যা খেয়াল, টপ্পা ও ভজনেও ব্যবহার করা হ'ত) তাল কোনদিনই ধ্রুপদে চলিত ও ব্যবহৃত হ'তে পারে না। একতালা, তেওট ও কাওয়ালী বিশেষ ক'রে খেয়ালের তাল। ১৬ মাত্রার তাল আড়া ঠেকাও খেয়ালে প্রচলিত, টপ্পাও আড়া ঠেকায় গীত হ'তে পারে এবং গীত হ'ত।

এই সূত্রে অনুসন্ধানের ফলে জানা যায় যে, রামমোহনের ৩২টি গানের মধ্যে ২৮টি হ'ল খেয়াল টপ্পা অঙ্গের গান। বাকি ৪টির মধ্যে "কোথায় গমন কর সর্বক্ষণ" গানটিকে (আলাইয়া সুরের) আড়া তাল বলা হয়েছে। কিন্তু শুধু আড়া ব'লে কোন তাল নেই। আছে আড়া-ঠেকা ও আড়া-চৌতাল, প্রথমটি খেয়ালের এবং দ্বিতীয়টি ধ্রুপদের তাল। সেজন্যে নিশ্চিতভাবে বলা যায় না গানখানি খেয়াল কিংবা ধ্রুপদাঙ্গের। তবে গানটি চার তুকের নয়, সেজন্যে ধ্রুপদ না হই'বার সম্ভাবনা বেশি। দু'টি গানে আছে (১০ মাত্রার) ঝাঁপতাল, যা' ধ্রুপদ ও খেয়াল দু অঙ্গের গানেই ব্যবহৃত হয়। সুতরাং সঠিক স্বরলিপি বিনা নিশ্চিতভাবে বলা যায় না যে, ঝাঁপতালের এই গান দুখানি ("দ্বিভার ভাব কি মন", আলাইয়া ও "পরমাত্মায় হও রে মন রত", ইমন কল্যাণ) ধ্রুপদাঙ্গের কিনা। উক্ত গান দু'খানির মধ্যে শেষেরটি ("পরমাত্মায় হও রে মন রত") চার তুকের নয়, এটি লক্ষ্যণীয়।

এইভাবে দেখা যায় যে রামমোহনের ৩২টি গানের মধ্যে একটিমাত্র নিশ্চিত ধ্রুপদাঙ্গের আছে—"ভয় করিলে যাঁরে থাকে না অন্যের ভয়" (সাহানা, ধামাল)। ১৪ মাত্রার তাল ধামাল বা ধামার ধ্রুপদাঙ্গের এবং সমস্ত ধ্রুপদী তালের মধ্যে অপেক্ষাকৃত হাল্‌কা চালের। আগেকার কালে হোলি বা হোরি বিষয়বস্তুর গান সাধারণত ধামার তালে সুপ্রচলিত ছিল, সেজন্যে হোরি ধামার কথাটি প্রায় অঙ্গাঙ্গী ব্যবহার করা হয়ে এসেছে।

চৌতাল, সুরফাঁকতাল, তেওরা প্রভৃতি যথার্থ ধ্রুপদ গানের তালে রামমোহনের একটি গানও গঠিত হয় নি। এই সমস্ত বিষয় নিরপেক্ষভাবে বিচার ক'রে দেখলে, রামমোহনকে ধ্রুপদ গান-রচয়িতা বলা যথাযথ হয় না। তাঁর গান প্রায় সবই খেয়াল ও টপ্পা অঙ্গের। তাঁর "মন একি ভ্রান্তি তোমার" (সিন্ধু ভৈরবী, আড়াঠেকা) গানটি এখনও কোন কোন গায়কের মুখে শোনা যায় এবং বর্তমান

* কাঙ্গালীচরণ প্রণীত ২য় খণ্ডে "ব্রহ্মসঙ্গীত স্বরলিপি"তে রামমোহনের ১০টি গানের স্বরলিপি আছে, কিন্তু তার কোনটিই ধ্রুপদ নয়।

লেখকের তা শোনবারও সুযোগ হয়েছে। গানখানি শুনলে স্পষ্টই বোঝা যায় যে, এটি টপ্পা অঙ্গের। রামমোহনের সঙ্গীত ঐতিহ্যের ধারক ও বাহক আদি ব্রাহ্মসমাজ সে যুগের যে সঙ্গীত-সম্পদকে উত্তরকালের ভাণ্ডারে বহন করে এনেছেন, উক্ত গানখানি তারই অন্যতম নিদর্শন। টপ্পা অঙ্গের এই গানটিতে রামমোহন-যুগের সঙ্গীত-স্মৃতির অনুরণন শোনা যায়।

রামমোহনের রচিত এবং সম্ভবত তাঁরই দ্বারা সুর ও তাল আরোপিত গানগুলি যে ধ্রুপদ নয়, খেয়াল টপ্পা অঙ্গের, তাতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। রামমোহনের সঙ্গীতচর্চা এবং গীতরচনার যুগে কলকাতার সঙ্গীতসমাজে ধ্রুপদ গানের উল্লেখযোগ্য চর্চা ছিল না এবং রামমোহনের সঙ্গীত-মানস গঠিত ও পরিপুষ্ট হয়েছিল উনিশ শতকের প্রথম পাদে। তখন কলকাতার সঙ্গীতের আসরে কোন ধ্রুপদী গুণীর বিদ্যমান থাকার কথা জানা যায় না। কলকাতার সঙ্গীতক্ষেত্রে তখন সগৌরবে বিরাজ করছেন দুই দিকপাল সঙ্গীতাচার্য—নিধুবাবু এবং কালী মীর্জা। দু'জনেই টপ্পা গায়ক শুধু নন, বাংলা ভাষায় প্রথম দুই টপ্পা গান রচয়িতাও। দু'জনের মধ্যে কালী মীর্জা মহাশয় রামমোহনের সাক্ষাৎ সঙ্গীতগুরু এবং নিধুবাবুও রামমোহনের সঙ্গে একেবারে যোগাযোগ রহিত ছিলেন না, সে কথা জানা যায় গুপ্ত মহাশয়ের ব্রাহ্মসমাজে যাতায়াত এবং সেখানে একদিন একটি ব্রাহ্মসঙ্গীত রচনার বিবরণ থেকে। সুতরাং বোঝা যায়, রামমোহন টপ্পা গানের পূর্ণ প্রভাবে বিদ্যমান ছিলেন। কলকাতার সঙ্গীতাসরে টপ্পার তুল্য প্রভাব-প্রতিপত্তি খেয়ালেরও ছিল না রামমোহনের সময়ে। কলকাতায় সে সময়ে খেয়াল-গায়কের বিশেষ সন্ধান পাওয়া যায় না, যেমন দেখা যায় বর্ধমান, কৃষ্ণনগর প্রভৃতি অঞ্চলে, যেখানে খেয়াল গানের ধারার অস্তিত্ব বিশেষভাবে ছিল রাজদরবারের উদ্‌যোগে ও পৃষ্ঠপোষকতায়।

এই আলোচনার প্রথম দুই অধ্যায়ে বলা হয়েছে, বিষ্ণুপুর তথা বাংলার প্রথম ধ্রুপদী রামশঙ্কর ভট্টাচার্য কোনদিন কলকাতায় পদার্পণ করেন নি এবং তাঁর কোন কৃতী শিষ্যের পক্ষেও রামমোহনের সময়ে কলকাতায় আসা সম্ভব নয়। কারণ তখন কোন রামশঙ্কর শিষ্যের সঙ্গীত-শিক্ষা আরম্ভ হয় নি, অনেকের জন্মও হয় নি। সুতরাং রামশঙ্কর কিম্বা তাঁর ঘরাণার কোন ধ্রুপদ-গায়কের সঙ্গে রামমোহনের যোগাযোগ ঘটে নি। এ কথা বিবৃতি করবার উদ্দেশ্যই এই যে, রামমোহন সঙ্গীত 'শিক্ষা'র সময় এবং সঙ্গীত-রচনার অধিকাংশ সময়ে কোন ধ্রুপদীয় সংস্পর্শ লাভ করেন নি।

যতদূর জানা যায়, তাঁর নিযুক্ত ব্রাহ্মসমাজের প্রথম দুই গায়ক (কৃষ্ণনগরের) কৃষ্ণপ্রসাদ ও বিষ্ণুচন্দ্র ভ্রাতৃদ্বয় অন্যান্য অঙ্গের সঙ্গে ধ্রুপদ গানও গাইতেন। কিন্তু তা' ১৮২৮ খ্রীষ্টাব্দের কথা।

তৎকালীন কলকাতার বাস্তব-সঙ্গীত পরিবেশের ফলে, টপ্পার সেই পরিপূর্ণ প্রভাবের যুগে, রামমোহনের পক্ষে স্বাভাবিকভাবেই ধ্রুপদ গান রচনা করা সম্ভব হয় নি।

এই অভিমত এবং সিদ্ধান্ত থেকে যেন কোন ভুল ধারণার সৃষ্টি না হয় যে, রামমোহনকে ধ্রুপদ গান রচয়িতারূপে স্বীকার না ক'রে এবং টপ্পা ইত্যাদি অঙ্গের সঙ্গীত রচনাকার অভিহিত ক'রে তাঁর সাঙ্গীতিক অবদানকে আমরা লঘু করতে চাই। এমন ধারণা করা সম্পূর্ণ অমূলক হবে। ধ্রুপদ না হলে যে তার সাঙ্গীতিক মর্যাদা হীনতর হবে এমন কথা সঙ্গীতক্ষেত্রে কখনই গ্রাহ্য হ'তে পারে না। বিশেষ রামমোহনের ক্ষেত্রে। তিনি তাঁর যুগের সঙ্গীত পরিবেশে যা' অসম্ভব ও অসাধ্য তার সাধন কেমন ক'রে করবেন? তাঁর পক্ষে ধ্রুপদ গান রচনা আশা করাই অবাস্তব। কারণ, সে সময় রামমোহন বা তাঁর সমবয়সী কোন কলকাতাবাসীর পক্ষে ধ্রুপদ গানের সম্যক্ পরিচয় লাভ সম্ভব ছিল না। টপ্পা অঙ্গের গানই ছিল সর্বাধিক প্রচলিত রাগসঙ্গীত। তার মূলে ছিলেন নিধুবাবু এবং কালী মীর্জা।

রামমোহন-রচিত ব্রহ্মসঙ্গীতাবলী ধ্রুপদ নয়, খেয়াল ও টপ্পা অঙ্গের গান—একথায় কেউবা মনে আঘাত পেতে পারেন এই ধারণার বশবর্তী হ'য়ে যে, টপ্পা গান ছিল অশ্লীল। কিন্তু এ ধারণাও যথাযথ নয়। কোন গান টপ্পা কিনা তা তার বিষয়বস্তুর উপর নির্ভর করে না। কারণ, টপ্পাও একটি বিশিষ্ট ও নির্দিষ্ট গীতিরীতি। ধ্রুপদে যেমন গমক, টপ্পা তেমনি মুর্কি জমজমায় স্বাতন্ত্র অর্জন করেছে। পাঞ্জাব অঞ্চলে এবং সে দেশীয় ভাষায় প্রচলিত প্রাচীনতর টপ্পার বিষয়বস্তু অবশ্য ছিল প্রেম ও প্রণয় এবং বাংলা ভাষায় নিধুবাবুর টপ্পা গানও মূলত প্রণয়-সঙ্গীত। যুগের রুচির তুলনায় যতদূর সম্ভব মার্জিত ও পরিশীলিত হওয়া সত্ত্বেও নিধুবাবুর গানের সম্পর্কে অশ্লীলতার অপবাদ রটে, তাঁর প্রতি অবিচারের ফলে। তাঁর গানের অসামান্য জনপ্রিয়তা দর্শনে অনেক ইতর ভাষা ও নিকৃষ্ট ভাবের গান-রচয়িতারা নিধুবাবুর নামে প্রচলিত করে দেয় এবং ফলে নিধুবাবুকে শুধু অপযশের

ভাগী হ'তে হয় না, টপ্পা গান আসলে অশ্লীল, এমন একটি ধারণার সৃষ্টি হয়। যাই হোক্, টপ্পা গান হ'ল প্রকৃত পক্ষে একটি গীতিরীতি এবং এর বিষয়বস্তুও শুধু মানবিক প্রণয় নয়, বিশেষ বাংলার সঙ্গীতক্ষেত্রে। নিধুবাবুর সমকালে এবং পরবর্তীকালে বহু গভীর অধ্যাত্ম এবং ভক্তি-ভাবপূর্ণ গান টপ্পা অঙ্গে রচিত ও গীত হয়েছে এবং শ্রোতাদের মন সেই সব গানের মাধ্যমে পবিত্র ভাবধারায় আপ্লুত করেছে। সাধক কমলাকান্ত-রচিত "মজিল মোর মন ভ্রমরা শ্যামাপদ নীলকমলে" প্রভৃতি টপ্পা অঙ্গের গান আজও সুপরিচিত এবং রবীন্দ্রনাথের টপ্পা অঙ্গে গানগুলিও এ প্রসঙ্গে স্মরণীয়।

রামমোহনের গান যে ধ্রুপদ না হয়ে খেয়াল ও টপ্পা অঙ্গের হয়েছে, সেজন্যে তার সাঙ্গীতিক মূল্য এবং আধ্যাত্মিক আবেদন কিছুমাত্র ক্ষুণ্ণ হয় নি। তাঁর গান হ'ল তাঁর সুগভীর অধ্যাত্মচেতনা এবং অদ্বৈতবাদী মানসিকতার সঙ্গীতময় প্রকাশ, তাঁর ধর্মচিন্তার সঙ্গীতরূপ এবং আপন গৌরবে গৌরবান্বিত।...

তাঁর গীতাবলীর বিষয়বস্তু একটি স্বতন্ত্র প্রসঙ্গরূপে বিশেষভাবে আলোচনার যোগ্য। তিনি গান রচনার প্রেরণা দু'দিক্ থেকে লাভ করেছিলেন, মনে হয়। এই দ্বিবিধ প্রেরণার একটি হ'ল, সাঙ্গীতিক এবং আর একটি আধ্যাত্মিক। প্রথমটির ফলে তিনি হিন্দুস্থানী রাগ-সঙ্গীতের আদর্শে গান 'গঠন' করলেন, অর্থাৎ, তার বহিরঙ্গ রূপটি নিলেন। দ্বিতীয়টির ফলে নির্বাচন করলেন গানের বিষয়বস্তু, তা হ'ল বেদান্তশাস্ত্রে ব্যাখ্যাপ্রাপ্ত ব্রহ্মের স্বরূপ। নানা ভাবে ব্রহ্মস্বরূপ বর্ণনা হ'ল তাঁর গানের অন্তরঙ্গ বিষয়।

ব্রহ্ম নিরাকার এবং সর্বব্যাপী, সংসার অনিত্য, অদ্বৈতভাবে আস্থা এবং দ্বৈতভাবে অনাস্থা, বৈরাগ্য সাধন এবং পরমেশ্বরে আত্মসমর্পণ প্রভৃতি ভাব রামমোহনের গানের বিষয়বস্তু। গানের বিষয়বস্তুর সন্ধানে তিনি সেজন্যে মূল বেদান্ত শাস্ত্রাদির শরণ নিয়েছেন। তাঁর গানগুলি যেন শাস্ত্রের এক-একটি সূত্রের সঙ্গীতরূপ।

এ বিষয়ে কয়েকটি দৃষ্টান্ত দেওয়া হ'ল:

(১) ছান্দোগ্য উপনিষদের ষষ্ঠ অধ্যায়ে শ্বেতকেতুর পিতা শ্বেতকেতুকে ব্রহ্মজ্ঞান দানের প্রসঙ্গে আছে—
'সদেব সৌম্য অগ্রম্ আসীৎ একমেবাদ্বিতীয়ম্।'

রামমোহনের রচনা: (ইমন কল্যাণ—তেওট)

ভাব সেই একে।
জলে স্থলে শূন্যে যে সমান ভাবে থাকে॥
যে রচিল এ সংসার, আদি অন্ত নাহি যার,
সে জানে সকল, কেহ নাহি জানে তাকে॥

(২) ঈশোপনিষদের একটি সূক্ত—
বায়ুরনিলম্ অমৃতম্ অথেদং ভস্মান্তং
শরীরম্ ওঁ ক্রতো স্মর কৃতং স্মর...।

রামমোহনের রচনা: (রামকেলী—আড়াঠেকা)

মনে কর শেষের সেদিন ভয়ঙ্কর।
অন্যে সবে কথা কবে তুমি রবে নিরুত্তর॥
যার প্রতি যত মায়া কিবা পুত্র কিবা জায়া,
তার মুখ চেয়ে তত হইবে কাতর।
গৃহে হায় হায় শব্দ সম্মুখে স্বজন স্তব্ধ
দৃষ্টিহীন নাড়ি ক্ষীণ, হিম কলেবর।
অতএব সাবধান, ত্যজ দম্ভ অভিমান,
বৈরাগ্য অভ্যাস কর সত্যেতে নির্ভর।

(৩) মুণ্ডক উপনিষদে বর্ণিত—
হিরণ্ময়ে পরে কোষে বিরজং ব্রহ্ম নিষ্কলং
তৎ শুভ্রং জ্যোতিষাম্ জ্যোতি তৎ যৎ আত্মবিদ্ বিদুঃ।

রামমোহনের রচনা: (গৌড়মল্লার—আড়াঠেকা)

মনের মন্দিরে মন, কোথা কর অন্বেষণ,
অন্তরে না দেখে তাঁরে কেন অন্তরে ভ্রমণ।
যে বিভু করে যোজন, কর্মেতে ইন্দ্রিয়গণ,
মাজিয়া মন-দর্পণ তারে কর দরশন।

একই ভাব অবলম্বনে তাঁর আর একটি গান আছে:

সে কোথায় কার কর অন্বেষণ।
তন্ত্র মন্ত্র যন্ত্র পূজা স্মরণ মনন॥...ইত্যাদি

(৪) মহানির্বাণ তন্ত্রের উক্তি—
ভয়ানাং ভয়ং ভীষণাং ভীষণানাং গতিঃ প্রাণিনাং
পাবনাং পাবনানাং। মহোচ্চৈঃ পদানাং নিয়ন্তৃ ত্বমেকং
পরেষাং পরং রক্ষণং রক্ষকানাং॥ ইত্যাদি

রামমোহনের রচনা: (সাহানা—ধামার)

ভয় করিলে যাঁরে না থাকে অন্যের ভয়।
যাঁহাতে করিলে প্রীতি, জগতের প্রিয় হয়।
জড়মাত্র ছিলে, জ্ঞান যে দিল তোমায়,
সকল ইন্দ্রিয় দিল তোমার সহায়।
কিন্তু তুমি ভুল তাঁরে এ তো ভাল নয়॥

এই ভাবে দেখা যায়, রামমোহনের গীতাবলী ব্রহ্ম-সাধনার অঙ্গরূপে রচিত। বেদান্তে জ্ঞানমার্গ এবং উপাসনা যে ভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে, রামমোহনের গানের অন্তর্নিহিত ভাবসমূহ তার সঙ্গীতময় প্রকাশ।

চীন ও প্রপঞ্চশীল নীতি

শ্রীদিঙ্‌নাগ আচার্য

২

মাঘ মাসের প্রবাসীতে 'চীন ও প্রপঞ্চশীল নীতি' প্রবন্ধটি শেষ করতে গিয়ে লিখেছিলাম যে, "মানুষের মধ্যে আছে ক্ষমতার প্রতি আসক্তি—তাকে যদি সংশোধন না করতে পারি ত যে কোন সমাজ ব্যবস্থাতেই লড়াই লাগবে ক্ষমতা নিয়ে।" [পৃঃ, ৫০৮] অর্থাৎ ধর্মীয় বা যে কোনও আদর্শবাদই হোক্ না কেন প্রথম প্রথম যেসব মানুষেরা প্রচারক বা কর্মী হিসেবে আবির্ভূত হন তাঁদের মধ্যে সততা ও স্বার্থহীনতার কোন অভাব থাকে না। পরিপূর্ণ নিষ্ঠার সঙ্গে তাঁরা ভাবেন যে, এই আদর্শবাদের প্রভাবে সমাজের প্রভূত মঙ্গল সাধিত হবে। কিন্তু সংস্কারকের মনের মধ্যে একটা গোঁড়ামির ভাব গোড়া থেকেই লুকিয়ে থাকে। যত দিন যায় এবং সামাজিক শক্তি এই আন্দোলনের আয়ত্তাধীনে আসে ততই গোঁড়ামি এবং ক্ষমতার প্রতি মোহ নেতৃবর্গকে পেয়ে বসে। তা ছাড়া অনেক অসাধু লোকও দলের মধ্যে ঢুকে পড়ে। এ সবের সম্মিলিত ফল হ'ল এই যে, সম্পূর্ণ সৎ কোন আন্দোলনেরও যত দিন যায় ততই প্রথম দিক্‌কার আদর্শ থেকে চ্যুত হওয়ার সম্ভাবনা বেড়ে ওঠে।

মার্ক্সবাদী আন্দোলনের মধ্যে এই ত্রুটিগুলি আরও বেশী ক'রে দেখা দিয়েছে তার কয়েকটি বিশেষ কারণ আছে: প্রথমতঃ, এই আন্দোলনটি একটি আদর্শগত আন্দোলন হ'লেও ইতিহাসে অন্যান্য আন্দোলনগুলির থেকে এই অর্থে স্বতন্ত্র যে কোন আধ্যাত্মিক মূল্যবোধ এর মধ্যে স্থান পায় নি। মার্ক্সবাদ মানুষের অর্থনৈতিক তথা বস্তু-জীবনটাকে বড় করে দেখেছে। ভগবান্ কি অন্যান্য কোন আধ্যাত্মিক ব্যাপার নিয়ে মার্ক্সবাদ শুধু যে মাথাই ঘামায় নি তাই নয় এই মূল্যবোধগুলিকে তাচ্ছিল্যই প্রদর্শন করেছে। ফলে মার্ক্সীয় নীতিবিচারে সাধারণ-প্রচলিত উচিত-অনুচিত বোধের স্থান নেই। মার্ক্সীয় দৃষ্টিভঙ্গিতে ঐতিহাসিক যে সম্ভাবনা দেখা পাওয়া যায় তাকে ত্বরান্বিত ও নিশ্চিত করবার জন্যে চলিত অর্থে কোন অন্যায় কাজ করাও মার্ক্সবাদীর কাছে অন্যায় নয়।

দ্বিতীয় যে কারণটিতে মার্ক্সবাদী আন্দোলন বিশিষ্টতা লাভ করেছে, তা হ'ল প্রচণ্ড একটি একনায়কত্বের অভ্যুদয়। মার্ক্স ভবিষ্যদ্‌বাণী করেছিলেন যে, শ্রমজীবীদের নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা হবে মার্ক্সীয় বিপ্লবের পরে, এবং ষ্টেট্ বা রাষ্ট্র-শাসন যন্ত্রটি আস্তে আস্তে লোপ পাবে। প্রকৃতপক্ষে কিন্তু দেখা গিয়েছে সে শ্রমজীবীদের নামে একটি মানুষ অথবা একটি ক্ষুদ্রদলের হাতে অভূত-পূর্ব ক্ষমতার সমাবেশ ঘটেছে। একনায়কত্বের স্বাভাবিক নিয়মানুসারে অত্যাচার, অবিচার এবং ক্ষমতা বজায় রাখার জন্য অন্যায় ইতিহাসের পাতাকে কলঙ্কিত করেছে। সবচেয়ে দুঃখের ব্যাপার হ'ল যে, অন্যান্য একনায়কত্বের বেলায় সমর্থক যে জোটে নি তা নয় কিন্তু অত্যাচারী একনায়কত্বের বিরুদ্ধে চিন্তাশীল মানুষেরা রুখে দাঁড়িয়েছেন। কিন্তু মার্ক্সবাদ তার 'অমোঘ ঐতিহাসিক সত্যে'র আরাধনার মধ্যে দিয়ে অনেকের কাছে ধর্মের স্থান গ্রহণ করেছে। ফলে চরম অন্যায়ের মুহূর্তেও সম্পূর্ণভাবে সৎ এবং নিষ্ঠাবান মার্ক্সবাদী অন্যায়কারী একনায়ককে সমর্থন করেছেন 'ঐতিহাসিক প্রয়োজনে'র খাতিরে।

এই দ্বিবিধ কারণে মার্ক্সীয় আন্দোলন সামাজিক স্বাস্থ্য ও মানুষের প্রকৃত মঙ্গলের বিরুদ্ধে একটি ভয়াবহ শক্তিরূপে আজকে পৃথিবীর মঞ্চে উপস্থিত। মার্ক্সীয় আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে মানুষের অর্থনীতিক্ উন্নতি

রাম্বিত করা সম্ভব। খানিকটা তার ফল হিসেবেই, মাজের বৃহত্তর অংশটিতে প্রয়োজন মতন খেতে-পরতে ওয়ার ব্যবস্থাও মার্ক্সীয় সমাজে হয়ে থাকে। কিন্তু গুলি করতে গিয়েও অসীম অমঙ্গল এই সব দেশের বনে আসে। অপেক্ষাকৃত অনগ্রসর দেশে যখন মার্ক্সীয় বস্থা সবে প্রচলিত হয়েছে তখন চীনের মতন শঠতা সাংঘাতিক স্বার্থপরতাই আশা করা যায়। চীনের গ্রাম অপেক্ষাকৃত উন্নতিশীল মার্ক্সীয় দেশগুলির সঙ্গে অ-মার্ক্সীয় দেশগুলির বোঝাপড়ার বিরুদ্ধে, এবং ভারত-বর্ষের মতন শান্তিপ্রিয় দলনিরপেক্ষতার বিরুদ্ধে। আর ভারতবর্ষের সংগ্রাম হওয়া উচিত ধর্মহীনতার বিরুদ্ধে, একনায়কত্বের বিরুদ্ধে।

আধ্যাত্মিক মূল্যবোধটি মানুষের দৈনন্দিন জীবনেও কি ছাপ ফেলে না? আমার উদ্দেশ্য যতই ভাল হোক্ না কেন, আমার পথ যদি হয় একনায়কত্বের নীতি-হীনতার মধ্যে দিয়ে ত আমি নিজে শুধু ছোট হব না আমার আশেপাশে অমঙ্গল ডেকে নিয়ে আসব। আজকে চীনকে সামরিক শক্তি দিয়ে প্রতিহত করতে হবে এইটা বোঝানোর জন্যে যে ভারতবর্ষের গায়ে অন্যায় ক'রে হাত লাগালে সে হাত পুড়বে। কিন্তু তাতেই সংগ্রাম শেষ হবে না; আমাদের দেশের সমাজ-ব্যবস্থাটাকে যদি মানুষের পক্ষে সুখশান্তি ও মঙ্গলময় ক'রে না তুলতে পারি ত বাইরের শত্রুর আক্রমণ প্রতি-হত করতে পারলেও সামাজিক অন্তর্দ্বন্দ্বের আঘাত আমরা সামলাতে পারব না। মানুষের মনের মধ্যে সততা, স্বার্থশূন্যতা, পরমতসহিষ্ণুতা ইত্যাদি সেইসব চিরপরিচিত মূল্যবোধগুলিকে জাগ্রত না করতে পারলে আমাদের মঙ্গল সম্ভব নয়। আমাদের সমাজ-ব্যবস্থার এই মূল্যবোধ থেকে আমরা বহুল পরিমাণে ভ্রষ্ট হয়েছি, মার্ক্সীয় সমাজ-ব্যবস্থারও অবস্থাটা কিছু ভাল হবে ব'লে মনে হচ্ছে না। একমাত্র পরিত্রাণের পথ—আমাদের প্রত্যেককে ব্যক্তিগত ভাবে এই মূল্যবোধগুলি নিজেদের জীবনে ফিরিয়ে আনা। এর কোন সংক্ষিপ্ততর পন্থা কখনও হয় নি, হ'তে পারে না। উপলব্ধিটি যদি আমা-দের জীবনে চীনের সঙ্গে দ্বন্দ্বের মধ্যে দিয়ে উপস্থিত হয় তবে বলব সার্থক হয়েছে আমাদের প্রয়াস।

—০—

বিজ্ঞপ্তি

প্রবাসীতে কোন লেখা প্রকাশের জন্য গৃহীত হইলে, প্রকাশের পূর্বে লেখকের পারিশ্রমিক মূল্য সম্পাদক কর্তৃক নির্দ্ধারিত হইবে। অবশ্য এই নির্দ্ধারিত মূল্যের কথা লেখককে জানানো হইবে। লেখকের স্বীকৃতি-পত্র পাইলে তবেই উহা প্রবাসীতে প্রকাশ করা যাইবে।

— কর্মাধ্যক্ষ

যে নদী মরুপথে (১ম পর্ব) : যোগীলাল হালদার ; রামলালপাবলিশিং হাউস ; মূল্য ৩.০০।

"লোক সাহিত্যের ত্রিধারা"র লেখক শ্রীযোগীলাল হালদার বাঙলা সাহিত্যে সুপরিচিত। "যে নদী মরুপথে" তাঁর দুই খণ্ডে সমাপ্য উপন্যাসের প্রথম পর্ব। আধুনিক ঔপন্যাসিকদের মত তিনি বিদ্রোহী নন, তাই তাঁর উপন্যাসে একদিকে যেমন ছায়াঘেরা পাখি ডাকা শান্তির নীড় ছোট ছোট গ্রামগুলির সুন্দর বর্ণনা রয়েছে, অন্যদিকে কলকাতার জীবনযাত্রার চিত্রণেও সেই সহজ বিশ্বাস, আশা এবং আশ্বাসের সুর ধ্বনিত হয়েছে। বস্তুত এদিক থেকে তিনি বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের উত্তর-সাধক। বস্তুত শুধু নায়কের নাম সাদৃশ্যের জন্য নয় (প্রসঙ্গত উল্লেখ্য "পথের পাঁচালী", "অপরাজিত"-র নায়কের মত "যে নদী মরুপথে"র নায়কের নামও অপু), পটভূমি-নির্বাচনের ঐক্যের জন্যও নয়, বিভূতি-ভূষণের সঙ্গে লেখকের আন্তরযোগ আরও নিবিড়। এঁদের উভয়ের জগতে ছলনা কপটতা, দুঃখ বিপদ সবই আছে, কিন্তু তা সত্ত্বেও কোন ভিলেন নেই। এই প্রসঙ্গে "যে নদী মরুপথে"র অংশ-বিশেষ উদ্ধৃত করা যেতে পারে। ছেলে কালোবাজারী করে, কিন্তু মা তার সহজ বিশ্বাসে জানেন ছেলে বড় কাজ করে।

"দাদা কোথা পিসিমা ?" জিজ্ঞাসা করিল অপূর্ব।

কোথায় কি কাজে গেছে।—উত্তর দিলেন পিসিমা।

দাদা কি কাজ করেন ?—বলিল অপূর্ব।

বিলাক্-এর কাজ করে।

বিলাক্ অর্থাৎ কালোবাজার। পিসিমা এমনভাবে অপূর্বর কথার উত্তর দিলেন যেন তাঁহার অংরনাল এমন কাজ করে, যে কাজ খুব উঁচুদরের (পৃঃ ৯৪)।"

এই কান্না-হাসির দোল-দোলান সংসারের চিত্রণ "যে নদী মরুপথে" —এর নায়ক অপূর্ব অনাথ এবং সহায় সম্পদহীন। তার একমাত্র পাথেয় স্নেহ-সম্পদ। বিশ্বেশ্বরী থেকে নালিমা, গীতা থেকে গুরুপদ এইভাবেই তার জীবনকে সমৃদ্ধ ক'রে তুলেছে। বইটি পড়ে তৃপ্তি পেয়েছি।

বইটির প্রচ্ছদ এবং মুদ্রণ পরিচ্ছন্ন।

সু, রা, চৌ

মায়া বাতায়ন : শ্রীকৃতান্তনাথ বাগচী, রঞ্জন পাবলিশিং হাউস, ৫৭, ইন্দ্র বিশ্বাস রোড, কলিকাতা-৩৭। মূল্য—দেড় টাকা।

কবি হিসাবে কৃতান্ত বাগচীর নাম সাহিত্য-ক্ষেত্রে চিহ্নিত হইয়া আছে। তিনি আধুনিক নন, অর্থাৎ আধুনিক যুগের ঝাঁজ তাঁহার কবিতার মধ্যে নাই। তিনি দরদী কবি এবং রোমাণ্টিক কবি। এই জন্যই তাঁহার ছন্দের প্রতিটি কবিতাই রসঘন হইয়া উঠিয়াছে। আলোচ্য গ্রন্থখানির অধিকাংশই প্রেমের কবিতা। কবির অন্তরের যে আবেগ তাহা বাস্তবের বহু উর্দ্ধে। সংসারের আর পাঁচজনের সহিত কবিকে বিচার করিতে গিয়া আমরা ভুল করিয়া বসি। তাঁহার নিজের কথায় বলি,

"আমরা যে গান জানি

এক নিমেষে প্রসাই ধূলির মলিন মুখোশখানি।"

বাংলা দেশ কবির দেশ। যে ছন্দ প্রকৃতিতে, সেই ছন্দ মানুষের মনেও। তাই দোলা দেয় মানুষকে সকল ক্ষেত্রে। দুঃখের বিষয়, সেই কবিতা আমরা হারাইতে বসিয়াছি। রুক্ষ মাটিতে ফুল-ফোটানর মত যে কয়জন কবি আজও বাঁচিয়া আছেন, কৃতান্তবাবু তাঁহাদের মধ্যে একজন। 'মৃত্যুর মুক্তি' কবিতায় তাঁহার সেই বেদনাই ফুটিয়া উঠিয়াছে।

"আমি কি ঘাসের ঘুমে কখন হয়েছি ইতিহাস

অপ্রত্যয় অতীতের অর্থহীন পীত ক্রীতদাস !

শিবা কোন শবে

সম্ভাষণ করে ফিরে অমাবস্যা প্রহরের রবে

নিমেষে নিষ্ফল হল রক্ত আর মাংসের বিশ্বাস

ঘুমের ঘাসের তলে পাথরে ঘুমায়ে ইতিহাস।

শূন্যতার শিল্পী-মৃত্যু বুঝি তার রিক্ত তৃপ্তি ভরে

শিশির তুলিতে নীল এঁকে দিল মৌন ওষ্ঠাধরে।"

এ কথা নিঃসন্দেহে বলিতে পারি, 'মায়া বাতায়ন' রসিকজনকে তৃপ্তি দিবে।

অগ্নিকন্যা—বোম্মানা বিশ্বনাথম্, নবজাতক প্রকাশন, ৩, এ্যাণ্টনি বাগান লেন, কলিকাতা-৯। মূল্য দু'টাকা।

অগ্নিকন্যা উপন্যাসের রচয়িতা গুড়িপাটি ভেঙ্কটচলম্। তেলেগু সাহিত্যে তাঁহার নাম সুবিদিত। গল্প সাধারণ হইলেও চরিত্র-চিত্রণে লেখকের মুন্সিয়ানা আছে। নারী লইয়া পৈশাচিক উল্লাসে যাহারা মাতে সেইরূপ একটি চরিত্র সুন্দরাম্মা। নিখুঁত হইয়াছে এই চরিত্রটি।

অনুবাদে বোম্মানা বিশ্বনাথম্ ইতিপূর্বেই নাম করিয়াছেন। সুন্দর তাঁহার হাত। মূল লেখকের স্পিরিটটুকু বজায় রাখিতে না পারিলে অনুবাদ করা বৃথা। কেবল ভাষান্তরিত করার নামই অনুবাদ সাহিত্য নয়, অনেক অনুবাদকই একথা মানিতে চাহেন না। বোম্মানা বিশ্বনাথম্ যথার্থ অনুবাদক। বিশেষ করিয়া বাঙালী না হইয়াও তিনি বাংলা ভাষায় অনুবাদ করিয়া যে কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন তাহা উল্লেখযোগ্য।

...ভিন্ন ভাষায় অনুবাদ করিয়া তিনি খ্যাতি অর্জন করিয়াছেন। অগ্নিকন্যা অনুবাদ-গ্রন্থ বুঝিবার উপায় নাই। অনুবাদকের ইহাই সবচেয়ে বড় কৃতিত্ব। বইখানি পড়িতে সকলেরই ভাল লাগিবে।

সুরের সানাই বাজুক—১, উমেশ মুখার্জি রোড, বেলঘরিয়া হইতে শ্রীঅ...র রায়চৌধুরী ইহা প্রকাশ করিয়াছেন। মূল্য দুই টাকা।

এই উপন্যাসের রচয়িতা কোডাওয়াটিগান্টি কুটুম্বরাও। ইহাও তেলেগু ... হইতে অনূদিত। এই উপন্যাসের কাহিনী মূলতঃ গড়িয়া উঠিয়াছে ... প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে একটি পতিতার বলিষ্ঠ ভূমিকার ভিত্তিতে। ...ন ইহাদের স্থান নাই। কিন্তু কেন? এই প্রশ্নই সে করিয়াছে সমাজের কাছে। গল্প সাধারণ, কিন্তু চরিত্র-বৈশিষ্ট্যে ইহা সমুজ্জ্বল। অনুবাদ গ্রন্থ যাঁহারা ভালবাসেন, এ গ্রন্থ তাঁহাদের ভাল লাগিবে।

বাসর স্বপ্ন: প্রবোধ সরকার, কিতাব মহল, ৪৯, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬। মূল্য দু' টাকা।

... উপন্যাস। কিন্তু ইহাকে বড় গল্প বলাই সঙ্গত। গল্পের মধ্যে বৈশিষ্ট্য কিছু নাই। তবে সহজ করিয়া বলার কৃতিত্বে বইখানি সমাদর লাভ করিবে। প্রবোধবাবু জনপ্রিয় লেখক। এ বইখানি তাঁহার সুনাম অক্ষুন্ন রাখিবে ইহা বলাই বাহুল্য।

শ্রীগৌতম সেন

হিমকান্তা কাঠমাণ্ডু—শ্রীপ্রবোধ দে, প্রকাশক—শ্রীইন্দ্রজিৎ চন্দ্র; অর্চনা পাবলিশার্স, ৮বি, রমানাথ সাধু লেন, কলিকাতা-৭, মূল্য ৫৲ টাকা।

প্রকৃতির সংগে মানুষের নিবিড় পরিচয় বহুভাবে উদ্ঘাটিত হয়েছে। ভ্রমণ বৃত্তান্ত ইহাদের মধ্যে অন্যতম। আলোচ্য গ্রন্থখানি তারই উজ্জ্বল নিদর্শন। এ গ্রন্থের ভাষা পার্বত্য নির্ঝরিণীর মতই ঝঙ্কারমুখরা; কোথাও কোথাও তাহা উপলখণ্ড প্রতিহত স্রোতের মতই উত্তাল; কিন্তু এ ভাষার গতি মাঝে মাঝে ব্যাহত হয়েছে, বিশেষ ক'রে যেখানে এ ভাষার নেশা লেখকের মনকে অধিকার ক'রে তাঁকে কষ্টসাধ্য চেষ্টায় প্রণোদিত করেছে।

জানি না কেন, অধুনা ভ্রমণ-বৃত্তান্তে প্রণয়ের আদিরসের অবতারণা না করলে ভ্রমণ-বৃত্তান্ত রচনা করা সম্ভবপর হচ্ছে না। ভ্রমণ-বৃত্তান্তের রচয়িতাগণ আজকার কুমারী ছেড়ে বিধবা ও সধবাদের অবলম্বন করছেন। প্রগতির অপূর্ব নিদর্শনই বটে। বাজারের চাহিদার প্রতি লক্ষ্য রেখে বৈদগ্ধের এরূপ পরিণতি গ্লানিজনক।

বইখানির বৈশিষ্ট্য নেপালের সংস্কৃতি, ইতিহাস, শিল্প, উপকথা, লোকগাথা এবং দেশময় ছড়িয়ে-থাকা বিদগ্ধ-জনোচিত মানস-প্রবণতা অতি সুন্দরভাবে সন্নিবিষ্ট হয়েছে। অবশ্য ঐতিহাসিক ভিত্তি সন্দেহাতীত

নয়; কারণ লেখক মধ্যে মধ্যে কল্পনার আশ্রয় নিয়েছেন। তাঁকে অবহিত হ'তে বলি।

গ্রন্থখানির আলোকচিত্র ও প্রচ্ছদপট অতি সুন্দর এবং রুচিমার্জিত। বাংলা পুস্তকে এরূপ দেখেছি বলে মনে হয় না। অনলস সাধনা দ্বারা গ্রন্থকার তাঁর লক্ষ্যে উপনীত হ'ন, এই কামনাই করি।

শ্রীযোগেশচন্দ্র বসু

সাহিত্য ও সমাজ মানস—শ্রীনারায়ণ চৌধুরী প্রণীত—প্রকাশক—বিদ্যোদয় লাইব্রেরী প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা-৯, মূল্য ৬'০০ টাকা, পৃষ্ঠা ২০১।

প্রবন্ধের বই। ইহাতে সাহিত্য-সম্পর্কিত ষোলটি এবং সমাজ-বিষয়ক সাতটি প্রবন্ধ স্থান পাইয়াছে। সাহিত্যিক প্রবন্ধগুলির মধ্যে মাইকেল মধুসূদন ও বিভূতিভূষণ (বন্দ্যোপাধ্যায়) প্রত্যেকের উপর একটি এবং রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে পাঁচটি প্রবন্ধ এবং বাকী নয়টি সাহিত্যের বিভিন্ন বিভাগের এবং সাহিত্যিক সম্পর্কে লিখিত। লেখক চিন্তাশীল কিন্তু আদর্শবাদী। বাংলা সাহিত্যের গতি-প্রকৃতি সম্বন্ধে তিনি যে সব আলোচনা করিয়াছেন বা মতামত প্রকাশ করিয়াছেন তাহা সর্ব্বজনগ্রাহ্য হইবে এরূপ আশা করা যায় না বরং বর্ত্তমান লেখকগণের একটি বৃহৎ অংশ উহার বিরোধিতা করিবেন ইহার সম্ভাবনা আছে। তবু স্বীকার করিতে হইবে 'জীবনচর্যা থেকে সাহিত্য চর্চা', 'সাম্প্রতিক সাহিত্যের লক্ষণ', 'সাম্প্রতিক কথা সাহিত্য' এবং 'আদর্শবাদী সাহিত্যের অপ্রতুলতা' প্রবন্ধে এরূপ সব ইঙ্গিত ও আলোচনার রেশ আছে যাহা পাঠকের চিন্তার খোরাক যোগাইবে। অবশ্য লেখক বর্ত্তমান সময়ের লেখক বনাম সাহিত্যিকগণের নিকট হইতে অনেক কিছু আশা করেন বলিয়াই মাঝে মাঝে নিরাশার কথা বলিয়াছেন। সাহিত্য কেন, কোন-কিছুতেই বেশী কিছু আশা করা যায় না, উচিতও নহে। এ জনজাগরণের ফলে স্বাধীন দেশে লিখিবার ও ছাপাইবার অবাধ অধিকার কেবল সুফল্ই প্রসব করিবে এরূপ আশা করা যায় না। বর্ত্তমান সাহিত্যের একটি বিরাট্ অংশ 'নিতান্ত সাময়িক' অনেকটা দৈনিক বাজারের ক্রয়-বিক্রয়ের জিনিষের মত, আবার চানাচুরের মতও বলা চলে। সুতরাং ইহাদের জন্ম-মৃত্যু একসঙ্গে হইতেছে, তবে এই সাময়িক খাদ্যে যদি বেশ রকমের ভেজাল থাকে বা বিষদুষ্ট হয় তবে মানুষের স্বাস্থ্য বিপন্ন হ এবং উহার জন্য ব্যবস্থা প্রয়োজন। বর্ত্তমানে সাহিত্যের ক্ষেত্রে ব্যবস্থা একেবারেই নাই বলা চলে, যাহা আছে তাহা ফৌজদারী আইনের আওতায় না পৌঁছা পর্য্যন্ত নিরঙ্কুশ। অসার সাহিত্যের প্রচার এবং প্রসার বাধাহীন, এজন্যই আলোচ্য গ্রন্থে লেখকের আপশোষ।

লেখকের 'সমাজ'-সম্পর্কিত প্রবন্ধগুলিতে অনেক সদুপদেশ আছে। আচার-ব্যবহার সম্বন্ধে এমন সব কথা আছে যাহা হয়ত অনেকেই মানিয়া লইবেন কিন্তু কার্য্যতঃ কেহই করেন না। এই লজ্জাকর ত্রুটির জন্য আমাদের জাতীয় চরিত্র দায়ী সন্দেহ নাই। এই বিষয়ে শিশুকাল হইতে আমাদের বালকবালিকাগণকে তৈরী করিতে পারিলে দীর্ঘকালের চেষ্টায় ফল পাওয়া যাইতে পারে। অবস্থা দাঁড়াইয়াছে এই যে 'কার বা গরু কে দেয় ধোঁয়া!' আজ সমস্ত দেশব্যাপী নিয়ম-শৃঙ্খলহীনতা। ছেলে-বুড়ো, ভদ্র-অভদ্র, শিক্ষিত অশিক্ষিত, চেলা ও গুরু সকলকে এ রোগে ধরিয়াছে। আমরা বাক্-সর্ব্বস্ব জাতিতে পরিণত হইয়াছি। আমাদের চলাফেরায়, কথাবার্ত্তায়, কাজে-কর্ম্মে ইংরেজীতে যাকে 'এটিকেট' তাহার পর্য্যন্ত অভাব। তাই লেখক দুঃখ করিয়া অনেক কিছু বলিয়াছেন।

এরূপ গ্রন্থের প্রচার বাঞ্ছনীয়। পুস্তকের ছাপা ও বাঁধাই উৎকৃষ্ট।

শ্রীঅনাথবন্ধু দত্ত

সম্পাদক—শ্রীকেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়
মুদ্রাকর ও প্রকাশক—শ্রীনিবারণচন্দ্র দাস, প্রবাসী প্রেস প্রাইভেট লিঃ, ১২০।২ আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলিকাতা

:: রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠিত ::

"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্"

"নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"

৬২শ ভাগ
২য় খণ্ড

চৈত্র, ১৩৬৯

৬ষ্ঠ সংখ্যা

বিবিধ প্রসঙ্গ

বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদ

বিগত ১৫ই ফাল্গুন (ইংরেজী ২৮শে ফেব্রুয়ারী) বৃহস্পতিবার রাত্রি ১০-১৫ মিনিটে ভারতীয় সাধারণতন্ত্রের প্রথম রাষ্ট্রপতি রাজেন্দ্রপ্রসাদ তাঁহার সদাকৎ আশ্রমস্থ ভবনে লোকান্তর গমন করেন। ১৯৬১ সনে কঠিন পীড়াগ্রস্ত হওয়ার পর তাঁহার স্বাস্থ্য ভগ্ন হয়, যদিও সেবার তিনি রোগ হইতে মুক্ত হইতে পারিয়াছিলেন। তাঁহার শরীর এতই ক্ষীণবল ছিল যে, ঐদিনই প্লুরো-নিউমোনিয়া রোগে আক্রান্ত হইলে পর তাঁহার প্রতিরোধ-শক্তি দ্রুত নিঃশেষিত হইয়া যায়।

১৮৮৪ সনের ৩রা ডিসেম্বর বিহার রাজ্যের সারণ জিলার অন্তর্গত জেরাদেই গ্রামের মহাদেব সহায় নামক এক সম্পন্ন গৃহস্থের পঞ্চম ও সর্ব্বকনিষ্ঠ সন্তানরূপে জন্মগ্রহণ করেন রাজেন্দ্রপ্রসাদ।

তখনকার দিনের রীতি অনুযায়ী রাজেন্দ্রপ্রসাদের বর্ণ পরিচয় ও শিক্ষারম্ভ হয় এক মৌলভির কাছে এবং অল্পদিনের মধ্যেই তিনি ফার্সি ও উর্দ্দু বর্ণমালা আয়ত্ত করিয়াছিলেন। পরে হিন্দীভাষা ও সাহিত্যের সহিত অল্পবিস্তর পরিচয় হইলে পরে তিনি নয় বৎসর বয়সে ছাপরায় ইংরেজী স্কুলে একেবারে নীচের ক্লাসে ভর্ত্তি হইয়াছিলেন। কিন্তু বাৎসরিক পরীক্ষায় তিনি এত বেশী নম্বর পাইয়াছিলেন যে, স্কুলের হেডমাষ্টার ক্ষীরোদচন্দ্র রায়চৌধুরী তাঁহাকে "ডবল প্রমোশন" দিয়াছিলেন। পরে তিনি পাটনায় টি. কে. ঘোষ স্কুলে ভর্ত্তি হন।

যখন তিনি পঞ্চম মানের ছাত্র তখন মাত্র তের বৎসর বয়সে আবার এক মোক্তারের কন্যার সহিত তাঁহার পিতা তাঁহার বিবাহ দেন। ইহার অল্প কিছুদিন পরেই রাজেন্দ্রপ্রসাদের "স্বদেশী" এই শব্দের সহিত পরিচয় হয়। তাঁহার এক দাদা ঐ শব্দ এবং উহার অর্থ কি, সে বিষয়ে এলাহাবাদ হইতে জ্ঞানলাভ করিয়া আসিয়া কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে সেই শিক্ষা দিয়াছিলেন এবং রাজেন্দ্রবাবু সেইদিন হইতে দেশী কাপড় ব্যবহার করিতে আরম্ভ করেন।

পাটনা হইতে এণ্ট্রান্স পরীক্ষা দিয়া তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমস্ত পরীক্ষার্থীর মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করেন এবং ইহার জন্য ২০৲ বৃত্তি ও ইংরেজীতে প্রথম স্থান অধিকার করায় ১০৲ বৃত্তি পাইয়াছিলেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে অবাঙ্গালী ছাত্র এই প্রথম ঐভাবে শীর্ষস্থান অধিকার করে। রাজেন্দ্রবাবু তাঁহার আত্মজীবনীতে লিখিয়াছেন "আমার এই কৃতিত্বে সবচেয়ে বেশী খুশী হন আমার বাঙালী শিক্ষক রসিকলাল রায়। তিনি আম ও মিষ্টি আনাইয়া আমাদের ভোজ দেন।"

ইহার পর তাহার ছাত্রজীবন কাটে কলিকাতায় ইডেন হিন্দু হষ্টেলে ও প্রেসিডেন্সী কলেজে। তাঁহার পরীক্ষায় কৃতিত্ব এখানেও চলে। এবং এখানের এই ছাত্রজীবনের মধ্যেই তাঁহার স্বাদেশিকতাবোধ আরম্ভ হয় বঙ্গবিভাগ আন্দোলনের মধ্য দিয়া ও সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠিত ডন সোসাইটির সংস্পর্শে আসিয়া।

১৯১০ সনে বি. এল. পরীক্ষায় পাস করিবার পর তিনি

প্রথমে মজঃফরপুরের এক স্কুলে শিক্ষকের কাজ গ্রহণ করেন। এক বৎসর পরে সে কাজ ছাড়িয়া তিনি কলিকাতা হাইকোর্টে ওকালতি আরম্ভ করেন। পরে পাটনায় হাইকোর্ট স্থাপিত হইলে তিনি সেখানে যাইয়া হাইকোর্টে বিশেষ সাফল্যের সঙ্গে আইনজীবীর কাজ চালাইতে থাকেন।

১৯১০ সনে তাঁহার গোখলের সঙ্গে পরিচয় হয় এবং গোখলে তাঁহাকে "সারভ্যান্টস অফ ইণ্ডিয়া সোসাইটি"তে যোগদান করিতে আহ্বান করেন। কিন্তু রাজেন্দ্রবাবুর সর্ব্ব জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা যাঁহাকে তিনি পিতৃতুল্য শ্রদ্ধা করিতেন—অনুমতি না দেওয়ায় তিনি হাইকোর্টে প্রাকটিশ এবং সঙ্গে সঙ্গে কিছু দেশের কাজ করিতে থাকেন। বিহার বিশ্ববিদ্যালয়কে সরকারী আমলাতন্ত্রের কবল হইতে উদ্ধার করার চেষ্টাই ছিল সে সময় তাঁহার প্রধান লক্ষ্য এবং উহাতে তিনি সফলকাম হইয়াছিলেন। ঐ সময়েই তিনি হিন্দীকে শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে গ্রহন করাইবার চেষ্টাও করেন এবং শিক্ষার খরচ কমাইয়া তাহা দরিদ্র সাধারণের ক্ষমতার মধ্যে আনিবার জন্যও চেষ্টা করেন। এইভাবে একদিকে অর্থ উপার্জ্জন ও অন্যদিকে দেশসেবা করিয়া তিনি কিছুদিন চলেন কিন্তু এইভাবে জীবন-যাপন তাঁহার মনে শান্তি বা সন্তোষ আনিতে পারে নাই।

গোখলের আহ্বান চাহিয়া তিনি তাঁহার অগ্রজের অনুমতি পাইয়া যে পত্র লেখেন তাহাতে স্পষ্ট ভাষায় লেখা ছিল যে, তাঁহার বড়লোক হইবার বা উচ্চ আসন লাভ করার কোনও কামনা নাই। এই চিঠি লেখার সময় তাঁহার বয়স ২৬ বৎসর মাত্র এবং তখন তাঁহার ছাত্রজীবনের সাফল্যপূর্ণ পরিণতি সবেমাত্র হইয়াছে। তিনি লিখিয়াছিলেন, "যাঁহাদের এ বিষয়ে কিছুমাত্র জ্ঞান আছে তাঁহারা জানেন যে, সুখশান্তি আসে মানুষের অন্তর হইতে, বাহির হইতে নয়...সুতরাং আমরা যেন দারিদ্র্যকে ঘৃণা না করি। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মনুষ্যগণ দরিদ্রতম-দিগেরই মধ্যে ছিলেন, এবং প্রথমে তাঁহারাও ছিলেন অত্যাচার প্রপীড়িত ঘৃণা ও অবজ্ঞার পাত্র।" তিনি একথা পূর্ব্বেই লিখিয়াছিলেন যে, তাঁহার জীবনযাত্রার পথ তিনি এত সহজ ও মিতাচারযুক্ত করিয়াছেন যে, তাঁহার নিজের কোনও সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের ব্যবস্থা প্রয়োজন হয় না।

গোখলের প্রতি তিনি আকৃষ্ট হইয়াছিলেন, কেননা গোখলে গরীব গৃহস্থের মত থাকিতেন। কিন্তু গান্ধীজীর মধ্যে তিনি দারিদ্র্যক্লিষ্ট ভারতীয় জনসাধারণের প্রকৃত পরিচয় পাইলেন এবং সেই কারণে গান্ধীজীর আহ্বানে তিনি স্থির থাকিতে পারিলেন না। অত বড় আয়ের ও ঐরূপ যশ ও মানের পথ ছাড়িয়া তিনি নিজেকে নিবেদন করিলেন দেশের কাজে। এই ভাবে সকল বাধা-বন্ধন হইতে নিজেকে মুক্ত করিয়া তিনি ১৯১৭ সনে গান্ধীজীর সঙ্গে মিলিত হইয়া চম্পারণ জেলায় নীলকর-দিগের এলাকায় গোলযোগ ও বিক্ষোভের তদন্ত করিতে যাইলেন।

রাজেন্দ্রবাবু ১৯২০ সনে বিহার প্রাদেশিক কংগ্রেসের প্রেসিডেন্ট নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন এবং তাহার দুই বৎসর পরে কংগ্রেস পরিচালক কমিটি (ওয়ার্কিং কমিটির) সভ্য নিযুক্ত হইয়াছিলেন। ১৯৫০ সনে ভারতের রাষ্ট্রপতি নির্ব্বাচিত হওয়া পর্য্যন্ত তিনি পরিচালক কমিটির সভ্য ছিলেন শুধু ১৯৩৯ সনে তিনি ও পরিচালক কমিটির অন্য কয়েক জন সভ্য কিছুদিনের জন্য পদত্যাগ করেন। যখন সুভাষচন্দ্র বসু দ্বিতীয় বার কংগ্রেসের সভাপতি নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন।

১৯৩০ সনে তিনি প্রথম কারারুদ্ধ হইয়াছিলেন এবং ১৯৩২ সনে পুনর্ব্বার তাঁহাকে ছয় মাসের কারাদণ্ড দেওয়া হয়। ১৯৩৩ সনে তাঁহাকে আবার গ্রেপ্তার করিয়া ১৫ মাসের জেল দেওয়া হয়। কিন্তু ১৯৩৪ সনের জানুয়ারীতে বিহারে প্রচণ্ড ভূমিকম্পের ফলে নিদারুণ দুরবস্থা হওয়ায় সরকার রাজেন্দ্রবাবুকে আর্ত্তত্রাণ ও দুর্দ্দশাগ্রস্ত জনসাধারণের সেবা ও সহায়তার কাজ পরিচালনা করিবার জন্য বিনাসর্ত্তে কারামুক্ত করিয়া দিয়াছিলেন। তিনি কারামুক্ত হইয়া ভূমিকম্পে প্রপীড়িত সর্ব্বহারাদিগের উদ্ধার, সেবা ও পুনর্বসতির কার্য ব্যাপক ভাবে গঠিত ও চালিত করেন। ঐ বৎসর তিনি কংগ্রেসের প্রেসিডেন্ট নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন। ১৯৩৯ সনে সুভাষচন্দ্র কংগ্রেস প্রেসিডেন্টের পদ ত্যাগ করায় সাময়িক ভাবে রাজেন্দ্রবাবুকেই পুনর্ব্বার প্রেসিডেন্ট করা হয়।

১৯৩৯ সনে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভ হওয়ায় কংগ্রেসের পরিচালক কমিটিতে মতানৈক্য দেখা দেয়। গান্ধীজী ও অন্য চারজন—যাহার মধ্যে রাজেন্দ্রবাবু ছিলেন—বলেন যে, ঐ যুদ্ধের কাজে কোনও ভাবে সহায়তা করা কংগ্রেসের অহিংসনীতির বিরোধী। কিন্তু পরিচালক কমিটির অধিকাংশ সভ্যই মনে করেন যে, যদি ব্রিটিশ সরকার ভারতের স্বাধীনতা লাভের বিষয়ে সম্মতি দেয় এবং যুদ্ধকালে জাতীয় সরকার প্রতিষ্ঠিত করায় রাজী হয় তবে কংগ্রেসের পক্ষে

যুদ্ধ প্রচেষ্টায় সহায়তা করা নীতি-বিরুদ্ধ হইবে না। তাঁহাদের মতে অহিংসনীতি শুধু স্বাধীনতা লাভের আন্দোলনে প্রয়োজন, শত্রুর আক্রমণ প্রতিরোধে তাহার স্থান নাই। অহিংসনীতি রাজেন্দ্রবাবুর জীবনদর্শনের অঙ্গ ছিল, সুতরাং তিনি সভ্যদিগের অধিকাংশের সহিত একমত না হইতে পারিয়া পদত্যাগ করেন কিন্তু শেষে মৌলানা আজাদের অনুরোধে পদত্যাগ পত্র প্রত্যাহার করেন। ১৯৪২ সনের আগষ্ট মাসে বোম্বাইয়ের নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির অধিবেশনে তিনি অসুস্থতা নিবন্ধন যোগদান করিতে পারেন নাই এবং "ভারত ছাড়ো" প্রস্তাব গ্রহণের সময় তিনি উপস্থিত ছিলেন না। কিন্তু অন্যদের সঙ্গে একসময়েই তাঁহাকে [illegible] পাটনায় কারারুদ্ধ করা হয়।

১৯৪৫ [illegible] সনে, ছাড়া পাইবার পর তিনি মধ্যবর্ত্তীকালীন কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায় খাদ্য ও কৃষিমন্ত্রী নিযুক্ত হইয়াছিলেন। ১৯৪৭ সনে আচার্য্য কৃপালনী কংগ্রেস প্রেসিডেন্টের পদ ত্যাগ করার পর তাহাকে ঐ সঙ্গে কংগ্রেস প্রেসিডেন্টের কাজও করিতে হয়। খাদ্যমন্ত্রী থাকিবার সময় তাহাকে কনস্টিটুয়েণ্ট এসেম্ব্লির সভাপতি নির্ব্বাচিত করা হয়। ১৯৫০ সনে ভারতের সংবিধান কার্য্যকরী হইলে পরে তাঁহাকে সাময়িক ভাবে ভারতের রাষ্ট্রপতি নির্ব্বাচিত করা হয়। ১৯৫২ সনে সাধারণ নির্ব্বাচনের পর তিনি সাধারণতান্ত্রিক ভারত রাষ্ট্রের সর্ব্বপ্রথম রাষ্ট্রপতির পদে প্রতিষ্ঠিত হন। ১৯৫৭ সালে তিনি দ্বিতীয়বার রাষ্ট্রপতি নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন। সেই আসন ত্যাগের পর তাহার নিজহস্তে গঠিত সদাকৎ আশ্রমে ফিরিয়া যান। এবং প্রত্যাবর্তনের বৎসরকাল পূর্ণ হইবার পূর্ব্বেই তাহার সেই প্রিয় কর্ম্মস্থলে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। এই আশ্রমই ছিল তাঁহার কর্ম্মপ্রিয় সাধনক্ষেত্র এবং ইহার নিভৃত শান্তিময় পরিবেশেই তাঁহার দেহান্ত ঘটিল।

গান্ধীজীর প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হইয়া তাঁহার অনুগামী যে কয়জন মহাপ্রাণ ভারতমাতার সন্তান একনিষ্ঠ ভাবে গান্ধীজীর নির্দ্দেশ অনুযায়ী দেশসেবা ও ভারতে স্বাধীনতা ও স্বারাজ্যের প্রতিষ্ঠার জন্য এবং স্বাধীনতা লাভের পর জনকল্যাণ ও জাতির প্রগতির জন্য আজীবন চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন রাজেন্দ্রবাবু ছিলেন তাঁহাদের অন্যতম। বস্তুতঃপক্ষে গান্ধীজীর আদর্শবাদকে ধারণ করিয়া এই ভাবে সম্পূর্ণ আত্মনিবেদন যে অতি অল্প কয়জন করিয়াছিলেন, রাজেন্দ্রবাবু ছিলেন তাহাদের মধ্যে শেষজন।

শিক্ষাদীক্ষা, বিদ্যাবুদ্ধি, অধ্যবসায় এই সকল গুণের কোনও অভাব ছিল না ডাঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদের। খ্যাতি, প্রতিপত্তি, ধন-মান ও অতুল ঐশ্বর্য্য অর্জ্জনের পূর্ণ সুযোগ ছিল তাঁহার সম্মুখে এবং সে পথে তিনি অতি সহজেই অগ্রসর হইয়াছিলেন অনেকদূর পর্য্যন্ত। কিন্তু কর্ম্মজীবনের আরম্ভেই যেজন নিজেকে সকল মোহ ও বন্ধন হইতে মুক্ত করিতে চেষ্টিত তাহার কাছে ধন-মান ঐশ্বর্য্য ইত্যাদি লাভের পথ সুখকর নয়। গান্ধীজীর প্রেরণায় তিনি জনহিতকর নিষ্কাম কর্ম্মের পথ ধরিয়াছিলেন এবং প্রায় অর্দ্ধ শতাব্দী কাল সেই পথেই অতিবাহিত করিয়া তাঁহার ব্রত সমাপ্ত হয়।

রাজেন্দ্রপ্রসাদের বিশেষত্ব ছিল তাঁহার আজীবন আত্মশুদ্ধির অক্লান্ত প্রয়াসে। আমাদের নেতৃস্থানীয় যাঁহারা আছেন ও ছিলেন তাঁহাদের অনেকেই লোভ-লালসা বিলাস বর্জ্জন করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন, কিন্তু গান্ধীজীর শিষ্যদের মধ্যে অহংকার ও আত্মাভিমান হইতে নিজেকে সম্পূর্ণ ভাবে মুক্ত করিতে পারিয়াছিলেন একমাত্র এই মহাপ্রাণ দেশনায়ক। এই চিত্তশুদ্ধির প্রয়াস তাঁহার মন ও স্বভাবকে উত্তরোত্তর মধুর ও স্নিগ্ধ করে।

তিনি দীর্ঘদিন ভারতের প্রথম নাগরিকের আসনে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। কিন্তু সেই অধিকারের শেষদিন পর্য্যন্ত তাঁহার মনপ্রাণ পদগর্ব্ব হইতে মুক্ত ছিল এবং সেই কারণে তিনি অন্যের কথা ও ভিন্ন মত সহজ ও সরল ভাবে গ্রহণ করিতে পারিতেন। তিনি রাষ্ট্রপতি হইবার পর যে কয়বার আমাদের সঙ্গে তাঁহার সাক্ষাৎ ভাবে আলোচনা হইয়াছিল, তাহাতে এই শুদ্ধচিত্ত নিষ্কাম কর্ম্মীর প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা দৃঢ়তর হয়।

জনকল্যাণ বনাম দলানুগত্য

বিগত ৭ই মার্চ্চ নয়াদিল্লীতে রাজ্যসভায় ১৯৬৩-৬৪ সনের বাজেট সম্পর্কে চার দিনব্যাপী বিতর্কের পর কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী শ্রীমোরারজী দেশাই উত্তর দান করেন। এই বিতর্ক ও উত্তর দান—দুইয়ের মধ্যেই যে উষ্মা প্রকাশ পায় তাহার নিদর্শন উহার রিপোর্টে পাওয়া যায়। সংবাদটিতে যে যে স্থলে ঐরূপ তর্কবিতর্কের উল্লেখ আছে তাহার কিছু নীচে "আনন্দবাজার পত্রিকা" হইতে উদ্ধৃত করা হইল :

"বাজেট লইয়া আলোচনার সময় দুইজন প্রবীণ কংগ্রেস

সদস্য রাজকুমারী অমৃতকুমারী ও শ্রীকুম্ভরাম আর্য্য কর ধার্য্যের প্রস্তাবের উপর তীব্র আক্রমণ চালান।

"উক্ত সদস্যদ্বয়ের বক্তৃতাকে 'সরকারের পৃষ্ঠদেশে ছুরিকাঘাত" বলিয়া বর্ণনা করিয়া শ্রীমোরারজী দেশাই এই মর্ম্মে বিস্ময় প্রকাশ করেন যে, কংগ্রেসের দৌলতেই তাঁহারা আজ এই মর্য্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। কিন্তু সেই প্রতিষ্ঠানের প্রতি তাঁহাদের বিন্দুমাত্র আনুগত্য আছে বলিয়া মনে হয় না।

"রাজকুমারী অমৃতকুমারী দুঃসহ করভারের নিষ্ঠুর নিষ্পেষণের কথা উল্লেখ করিয়া বহু সরকারী 'অপকর্ম্মের' চিত্র তুলিয়া ধরেন। তিনি বলেন, কেরোসিন ও অন্যান্য দ্রব্যের উপর অতিরিক্ত কর ধার্য্যের পরিবর্ত্তে সরকারের উচিত অযথা ব্যয় সঙ্কোচের ব্যবস্থা করা।

"শ্রীদেশাই দৃঢ়তার সহিত তাঁহার বাজেট প্রস্তাব সমর্থন করিয়া বলেন যে, দেশের প্রতিরক্ষা এবং উন্নয়নের বিরাট প্রচেষ্টাকে সাফল্যমণ্ডিত করিতে হইলে প্রত্যেকের আয়ই কিয়ৎ পরিমাণে হ্রাস পাইবে।

"অর্থমন্ত্রী এই কথাও স্বীকার করেন যে, কেরোসিন তৈলের উপর কর ধার্য্য করিবার ফলে দরিদ্র জনসাধারণের কষ্ট হইবে বটে, কিন্তু বৈদেশিক মুদ্রার অভাবের ফলে যে অসুবিধার সৃষ্টি হইয়াছে তজ্জন্য কেরোসিন তৈলের উপর কর ধার্য্য না করিয়া তাঁহার আর কোনও উপায় ছিল না। আমাদের যে বৈদেশিক মুদ্রা আছে তাহা ব্যয় করিয়া আমরা এই দেশে জালানী তৈল আমদানী করিতে পারি না। দেশের ভিতর যে জালানী তৈল পাওয়া যায় আমাদিগকে তাহাই ব্যবহার করিতে হইবে।

"তিনি এই কথা স্বীকার করেন যে, বাধ্যতামূলক সঞ্চয়ের পরিকল্পনা খুব সহজ প্রক্রিয়া নাও হইতে পারে। ইহার ফলে বিশেষভাবে কৃষিজীবীদিগকে কিছু ত্যাগ স্বীকার করিতেও হইতে পারে। কিন্তু তিনি এই কথাও বলেন যে, এইভাবে অর্থ সঞ্চিত হইলে ৫ বৎসর বাদে তাহা সুদ-সমেত ফেরত দেওয়া হইবে।

"শ্রীদেশাই বলেন যে, সর্ব্বপ্রকার অর্থ ব্যয়ের ব্যাপারে গবর্ণমেন্ট যথাসম্ভব অধিক পরিমাণে সতর্ক হইয়া আছেন। বাজেটের ব্যয় বরাদ্দ স্থির করিবার সময় গবর্ণমেণ্ট সমস্ত মন্ত্রণালয়কে এই নির্দ্দেশ দিয়াছেন যে, প্রতিরক্ষা কার্য্যের বহির্ভূত সমস্ত কাজকর্ম্মই কমাইয়া ফেলিতে হইবে।

"ব্যয় হ্রাসের জন্য যে সমস্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইয়াছে তাহার ফলে ১৯৬৩-৬৪ সনের বাজেটে ৩৫ হইতে ৪০ কোটি টাকা ব্যয় হ্রাস করা সম্ভবপর হইয়াছে।"

রাজকুমারী অমৃতকুমারী (অমৃত কৌর) ও শ্রীকুম্ভারাম আর্য্যের বক্তৃতার পূর্ণ রিপোর্ট কোথায়ও প্রকাশিত হয় নাই। যেটুকু হইয়াছে তাহাতে মনে হয়, হয়ত ইঁহারা মাত্রা ছাড়াইয়া গিয়াছেন। অন্যদিকে শ্রীমোরারজী দেশাই উত্তর দেওয়ার মধ্যে এমন কয়েকটি কথা বলিয়াছেন, যাহাতে মাত্রাজ্ঞানের অভাব আছে মনে হয়। বাজেট সম্পর্কে আলোচনা এই প্রসঙ্গে আমরা এখন করিতেছি না, কেননা ঐ সকল কথার আলোচনা হওয়া প্রয়োজন; নহিলে এদেশের রাষ্ট্রনীতির ধারা ক্রমশঃই বিকারগ্রস্ত হইতে বাধ্য। তবে শ্রীদেশাইয়ের এই বক্তৃতার মধ্যে অন্য কয়েকটি বিষয়ের তিনি উল্লেখ করিয়াছেন যাহাতে অনিশ্চিতকে নিশ্চিতের রূপ দেওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ পায়। তিনি বলিয়াছেন যে, অপরিশোধিত উদ্ভিজ্জ তৈলের উপর কর হ্রাস করা হইয়াছে এবং কর হ্রাস করার ফলে "যাহাতে উহার মূল্য হ্রাস পায় তজ্জন্য আমরা চেষ্টা করিতেছি।" এই চেষ্টার ফলাফল দেশের লোক অল্প কিছু-দিনেই দেখিতে পাইবে এবং সেই ফলাফলের উপর শ্রীদেশাইয়ের "চেষ্টা" কিরূপ তাহার মূল্যায়ন হইবে।

তিনি বলিয়াছেন,"সর্ব্বপ্রকার অর্থ ব্যয়ের ব্যাপারে গবর্ণমেণ্ট সতর্ক হইয়া আছেন" এবং "ব্যয় হ্রাসের জন্য যে সমস্ত ব্যব অবলম্বন করা হইয়াছে তাহার ফলে ১৯৬৩-৬৪ সনের বাজে ৩৫ হইতে ৪০ কোটি টাকা ব্যয় হ্রাস করা সম্ভবপর হইয়াছে।" ইহাও কার্য্যতঃ কি দাঁড়ায় সেটা বুঝা যাইবে ইহার পরে বাজেটে বা "অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দের সময়। যদি সত্যই ব্যয় হ্রাস হয় তবে বুঝিব আশাপূরণের দিন সুদূর হইলেও লক্ষ্যের মধ্যে আসিয়াছে।" নহিলে—?

জাতীয় আয় বৃদ্ধির কথায় শ্রীমোরারজী দেশাই বলেন যে, পরিসংখ্যান অনুসারে উহা শতকরা ২·৫ বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং আয় বৃদ্ধির যাহা পরিকল্পনা করা হইয়াছিল উহা তাহাপেক্ষা কম। সেই সঙ্গে তিনি বলিয়াছেন যে, "পরিসংখ্যান কখনও কখনও বিভ্রান্তিকর হইয়া থাকে এবং এই ক্ষেত্রে ক্ষুদ্র শিল্প ও বাণিজ্য এবং পরিবহনের ক্ষেত্রে যে আয় বৃদ্ধি হইয়াছে তাহা ধরা হয় নাই।" অর্থাৎ তিনি বলিতে চাহেন যে, আয়বৃদ্ধি হয়ত ২·৫% অপেক্ষা অধিক।

পণ্যমূল্য ও শস্যমূল্যের সহিত তুলনামূলক নির্ণয় করিলে এই "আয়বৃদ্ধি" সম্পূর্ণ কাল্পনিক দাঁড়ায় একথাও আমরা শুনিয়াছি এবং কার্য্যতঃ যাহা দেখি তাহাতে ঐরূপ নির্ণয়কে সম্পূর্ণ অবিশ্বাস্য বলিয়া উড়াইয়া দিতেও আমরা প্রস্তুত নহি।

যাহা হউক এইবার মূল প্রসঙ্গে ফিরিয়া আসা যাউক। রাজকুমারী অমৃতকুমারী বা শ্রীকুন্তারাম আর্য্যের মন্তব্য বা যুক্তির আমরা কোনও আলোচনা বা সমর্থন করিতে চাহি না। তাঁহাদের যুক্তি কিরূপ তথ্যের উপর তাঁহারা দাঁড় করাইতে চেষ্টিত হইয়াছিলেন তাহার কোনও বিবরণ আমাদের জানা নাই সুতরাং সে বিষয়ে চর্চ্চা শুধু অবান্তর নয়, ভ্রমপূর্ণও হইতে পারে।

শ্রীদেশাই এই মন্তব্যদ্বয়ের বক্তৃতাকে "সরকারের পৃষ্ঠদেশে ছুরিকাঘাত" আখ্যা দিয়াছেন। অমৃতকুমারীর বক্তৃতার বিষয়ে তিনি আরও বলিয়াছেন যে, রাজকুমারী নিজের দলের বিশেষ ক্ষতি করিয়াছেন এবং বলিয়াছেন যে, "সত্য যতই অপ্রীতিকর হউক না কেন তাহা প্রকাশ করিতে হইবে" ইহাই রাজকুমারীর মনোভাব। এই সঙ্গে আমরা পাই যে, শ্রীদেশাইয়ের মতে "সত্যের সহিত তিক্ততা মিশ্রিত হইলে তাহা আর সত্য হয় না"। বোধ হয় এখানে অতিরঞ্জনের কথা বলা হইয়াছে, অর্থাৎ অপ্রিয় সত্যের সহিত আরও তিক্ততা মিশ্রিত করিয়া অতিরঞ্জিত করিলে তাহা আর খাঁটি সত্য থাকে না। এই কথার অন্য অর্থ অর্থাৎ "সত্য তিক্ত বা অপ্রিয় হইলে তাহা আর সত্য থাকে না।" অত্যন্ত অসঙ্গত এবং বিকারগ্রস্ত-নীতির পরিচায়ক সুতরাং উহা গ্রহণ করিতে ইচ্ছা হয় না।

সবশেষে স্পষ্ট ইঙ্গিত করা হইয়াছে যে, রাজকুমারী যদি সরকারীনীতি দেশকে সর্ব্বনাশের পথে লইয়া যাইতেছে মনে করেন তবে তাঁহার উচিত যাঁহারা দোষ করিয়াছেন তাঁহাদের সংস্রব ত্যাগ করা—অর্থাৎ কংগ্রেস দল ত্যাগ করা।

এইখানেই আমাদের মনে প্রশ্ন জাগ্রত হইয়াছে যে, দলানুগত্য বড় না জনকল্যাণ ও দেশপ্রেম বড়। কংগ্রেসে ঢুকিলে দেশ ও দশের প্রগতি বা কল্যাণচিন্তা সবকিছুই দলপতি মহাশয়গণের শ্রীচরণে নিবেদন করিয়া "যো হুকুম সরকার" মূলমন্ত্র লইতে হইবে। এই কি বর্ত্তমান কংগ্রেসের নীতি? যদি তাই হয় তবে একনায়কত্ব আর কতদূরে? যদি তাহা না হয় তবে শ্রীদেশাইয়ের এই সকল মন্তব্যের পূর্ণ ব্যাখ্যা করা প্রয়োজন। সমালোচনার কারণ আছে, সে কথা শ্রীদেশাই নিজেই স্বীকার করিয়াছেন। যদি তাহা থাকে তবে স্বদলীয় লোক সেকথা বলিলে কি মহাপাপ হয়? অবশ্য মাত্রা যদি ছাড়াইয়া মন্তব্য অতিরঞ্জনে দূষিত করা হয় তবে সে অন্য কথা। সমালোচনা কি ভাবে ও কতদূর ব্যাপক করার অনুমতি স্বাধীনতা দলের সদস্যগণের আছে তাহা দেশবাসীর জানা প্রয়োজন।

ভারত রাষ্ট্র এখন রিপাবলিক। এই বিদেশী শব্দের অনুবাদ আমরা করিতাম সাধারণতন্ত্র শব্দে। দিল্লীর পরিভাষাকারগণ করিয়াছেন "গণরাজ্য"। সে যাই হউক, নামে কি আসে যায়,—বস্তুটি কি তাহাই জানা প্রয়োজন। পণ্ডিত নেহরু বলিয়াছেন যে, আমাদের লক্ষ্য একটি "সোসালিষ্ট ছাদের ডিমক্রেসী গঠন" (A Socialistic pattern of democracy)। "সোসিয়ালিজম বলিতে আমরা যে মতবাদ বুঝি তাহাতে ব্যক্তিগত বা জন্মগত প্রাধান্য বা অধিকার থাকে না এবং সাধারণ ভাবে ডিমক্রেসী ত লোকতন্ত্র। কিন্তু এই সমাজবাদ ও লোকতন্ত্রে নানাপ্রকার হেরফের হয়। হিটলারের নাৎসী মতবাদ, ষ্টালিনের একনায়কত্ব এ সবই সমাজবাদ নামে কিছুদিন চলিয়াছিল। সুতরাং শুধুমাত্র "সোসিয়ালিষ্টিক প্যাটার্ণ" বলিলেই হয় না উহার আরও বিশদ ব্যাখ্যা প্রয়োজন নহিলে শ্রীমোরারজী দেশাইয়ের ন্যায় পরমত অসহিষ্ণু উগ্র মনোভাবই কংগ্রেসের মধ্যে উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইবে। রাজকুমারী অমৃতকুমারীর মন্তব্যগুলির বিরূপ সমালোচনা করার পূর্ণ অধিকার শ্রীমোরারজী দেশাইয়ের আছে এবং উহা উচিত কাজ, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। কিন্তু যেহেতু রাজকুমারী তাঁহার নিজদলের কার্য্যকলাপ অনুমোদন করেন না এবং হয়ত সমালোচনার উষ্মায় তিনি মাত্রা ছাড়াইয়া গিয়াছেন, সেই কারণে তাহাকে কংগ্রেস দল ছাড়িতে উপদেশ দেওয়ার অধিকার শ্রীমোরারজী দেশাইয়ের নাই—অন্ততঃপক্ষে যদি কংগ্রেসের অধঃপতন অত্যধিক না হইয়া থাকে।

ডিমক্রেসীর সংজ্ঞার্থ মার্কিন মনীষী থিওডোর পার্কার এই ভাবে দিয়াছেন, "A democracy—that is a Government of all the people, by all the people, for all the peoples" এই সংজ্ঞার্থ পরে আরও প্রসিদ্ধি লাভ করে মার্কিন প্রেসিডেন্ট আব্রাহাম লিঙ্কনের মুখে উচ্চারিত হইয়া।

আমাদের জানা প্রয়োজন যে, পণ্ডিত নেহরু "সোসালিষ্টিক

প্যাটার্ণ অফ ডিমক্রেসী" বলিতে কি বুঝেন। এবং সেই সঙ্গে আমরা জানিতে চাহি যে কংগ্রেসের সদস্যবর্গের আনুগত্য কাহার উপর অর্পিত হওয়া উচিত তিনি মনে করেন, দেশের না দলের?

কেন্দ্রীয় কর্ত্তৃপক্ষের খরচের হিসাব

রাজ্যসভায় বাজেট বিতর্কের মধ্যে যাহারা সরকারী খরচ হ্রাস করিয়া বাজেটের আর্থিক সঙ্কুলানের কথা তুলিয়াছিলেন, তাঁহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া অর্থমন্ত্রী শ্রীমোরারজী দেশাই প্রশ্ন করেন যে, তাঁহারা নিজেদের সংসারে কয় নয়া পয়সা খরচ কমাইয়াছেন। প্রশ্নের উত্তরে প্রশ্ন করা সকলক্ষেত্রে যথাযথ হয় না, কিন্তু সরকারী মহল হইতেই যে সকল তথ্য প্রকাশিত হয় তাহাতে ঐরূপ প্রশ্ন সরকার বাহাদুরকেই করিতে ইচ্ছা করে।

সরকারী খরচপত্র সম্পর্কে কিছু তুলনামূলক তথ্য সম্প্রতি হিন্দুস্থান ষ্ট্যাণ্ডার্ড প্রকাশ করিয়াছেন। তাহাতে দেশের শাসনতন্ত্র ও সাধারণ পরিচালন বিভাগগুলিতে অর্থব্যয়ের একটি হিসাব দেওয়া হইয়াছে। এই তথ্যগুলির উৎস বোধ হয় পার্লামেন্টের খরচপত্র প্রাক্কলন (estimater) কমিটির রিপোর্ট, সুতরাং ইহাতে কোনও বিশেষ ভুল না থাকাই সম্ভব। ঐ হিসাবে ১৯৫২-৫৩ সনের খরচের সঙ্গে বর্ত্তমান খরচের তুলনা করা হইয়াছে। তাহাতে দেখা যায় যে, কেন্দ্রীয় বাজেটে প্রশাসন ও পরিচালনের খরচ ১৯৫২-৫৩ সনে হইয়াছিল ২৩·৩০ কোটি টাকা এবং আগামী বৎসরের প্রাক্কলনে উহার পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ৮৮·২৮ কোটি টাকা অর্থাৎ এগার বৎসরে খরচ বাড়িয়াছে প্রায় ৬৫ কোটি টাকা।

এই খরচ বৃদ্ধির হিসাবে দেখা যায় ১৯৫২-৫৩ সনে কেন্দ্রে পুলিস বাবদ খরচ ছিল ২·৯১ কোটি যেখানে ১৯৬২-৬৩ সনে ঐ খাতে খরচ হয় ২৫·৬২ কোটি এবং আগামী বৎসরের বাজেটে উহা ধরা হইয়াছে ৩৩·৫৩ কোটি টাকা। তারপর আসে পররাষ্ট্র-সম্পর্কিত দপ্তর। সেখানে ১৯৫২-৫৩ সনে খরচ হয় ৪·১৯ কোটি এবং আগামী বাজেটে ধরা হইয়াছে ১৫·১১ কোটি। বর্ত্তমান বৎসরে চাহিদা দাঁড়াইয়াছে ১২·৭১।

পার্লামেন্ট এবং রাজ্যের সংসদগুলিতেও কেন্দ্রের খরচ দশ বৎসরে ১·১২ কোটি হইতে ৩·০৯ কোটিতে দাঁড়াইয়াছে। আগামী বৎসরে এখানে সামান্য খরচ বাঁচান হইতে পারে, কেননা বরাদ্দ করা হইয়াছে ২·৮৮ কোটি।

সাধারণ পরিচালনের খরচ দশ বৎসরে ৭·৭৩ কোটি হইতে ১৮·৪৭ কোটিতে দাঁড়াইয়াছে। আগামী বৎসরে উহা আরও বাড়িয়া ১৯·৭১ কোটি হইবে।

এই তথ্যগুলি অবশ্য সাধারণ পরিচালন ও অন্য কয়টি বিভাগের। অথচ শ্রীমোরারজী দেশাইয়ের বক্তৃতায় আমরা পাই যে, ১৯৬৩-৬৪ সনের বাজেটে খরচ ৩৫ হইতে ৪০ কোটি কম হইবে। কোথায় ব্যয় সঙ্কোচ করা হইয়াছে তাহা জনসাধারণে জানে না, তবে পার্লামেন্ট প্রাক্কলন (estimater) কমিটির সপ্তদশতম বিবৃতিতে দেখা যায় যে, কেন্দ্রীয় মন্ত্রীদিগের দপ্তরগুলিতে ব্যয়সঙ্কোচের যে চেষ্টা হইয়াছে তাহা কমিটির মতে সন্তোষজনক নহে। ঐ সপ্তদশতম রিপোর্টে পুনরায় বিভাগগুলিকে জোরের সহিত বলা হইয়াছে ব্যয়সঙ্কোচের জন্য আরও অধিক চেষ্টা করা প্রয়োজন এবং সেই চেষ্টাকে আরও প্রবল ও তীব্র করাও প্রয়োজন।

পরিচালন ও শাসনতন্ত্রে অনাচার ও দুর্নীতি সম্পর্কে পার্লামেন্টের কংগ্রেস দলের পরিচালক কমিটির এক অধিবেশনে উচ্চ অধিকারিদিগের মধ্যে দুর্নীতি সম্পর্কে আলোচনা সম্প্রতি হইয়া গিয়াছে। বলা বাহুল্য আলোচনায় কোনও কিছু ব্যবস্থা বা কার্য্যক্রমের বিষয় স্থির হয় নাই। পণ্ডিত নেহরু সেই অধিবেশনে উপস্থিত ছিলেন এবং তিনি বলেন যে, দুর্নীতি আছে সন্দেহ নাই—তবে যতটা বলা হয় ততটা নয়; উপরন্তু তাঁহার মতে বর্ত্তমানে যে দুর্নীতি নিবারণের ব্যবস্থা আছে তাহাই যথেষ্ট। কয়েকজন সদস্য এই আলোচনার ধারায় সন্তুষ্ট না হওয়ায় এ বিষয়ে পুনরায় আলোচনা হইবে বলা হয়। জানি না সে আলোচনায় কোনও কাজ হইবে কি না। তবে একথা নিশ্চয় যে, দুর্নীতি ও দুষ্কৃতিতে কোনও ভাটা পড়িবে না যতদিন এই বর্ত্তমান দুর্নীতি-নিরোধ ব্যবস্থাকে যথেষ্ট মনে করা হইবে।

সবশেষে বলি ব্যক্তিগত খরচের কথা। বিগত ৭ই মার্চ্চ পূর্ত্ত, গৃহ ও পুনর্ব্বাসন মন্ত্রী শ্রীমেহেরচাঁদ খান্না তাঁহার মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট সংসদীয় উপদেষ্টা কমিটির নিকট এক হিসাব উপস্থিত করিয়া তাঁহাদের চমৎকৃত করিয়াছেন। সংসদীয় বিধানে মন্ত্রিগণ বিনা ভাড়ায় আসবাব-সজ্জিত বাড়ী ও বিনামূল্যে জল ও বিদ্যুৎ ভোগ করিতে পারেন। অবশ্য খরচটা যায় সরকারী তহবিল হইতে।

প্রত্যেকজন মন্ত্রী, রাষ্ট্রমন্ত্রী ও উপমন্ত্রীর ঐ সকল বাবদ

খরচার হিসাব এখানে দেওয়া প্রয়োজন নাই। তবে দেখা যায় যে আসবাব হিসাবে এবারের মন্ত্রীদের জন্য এতাবৎ খরচ হইয়াছে ১৩,০৪,৭১২ টাকা এবং প্রতি বৎসর তাঁহাদের জল ও বিদ্যুৎ যোগাইতে খরচ হয় ১,৬২,০০০ টাকা। ইহা "গৌরীসেনের" টাকা, সুতরাং শ্রীদেশাইয়ের ব্যয়সঙ্কোচের "নয়া পয়সা" এখান হইতে আসিবে না বলা বাহুল্য!

তের হাজার না সাড়ে সাত শত ?

পাকিস্থানের পররাষ্ট্র মন্ত্রী মিঃ ভুট্টো পিকিং হইতে প্রত্যাবর্ত্তনের সময় হংকং ও কলিকাতায় চীন-পকিস্থান চুক্তির বিষয়ে কতকগুলি কথা বলেন যাহার সম্পর্কে আমাদের পররাষ্ট্র দপ্তরের একজন মুখপাত্র আমাদের পক্ষের মন্তব্য প্রকাশ করেন।

মিঃ ভুট্টো হংকং-এ বলিয়াছেন যে, পাকিস্থান চীনকে এমন কোনও এলাকা দেন নাই যাহা বর্ত্তমানে পাকিস্থানের অধিকারে আছে। কলিকাতায় আবার আরও ফলাও করিয়া তিনি বলেন যে, ঐ চীন-পাক চুক্তির ফলে পাকিস্থান ৭৫০-৮০০ বর্গমাইল এলাকার উপর নূতন অধিকার লাভ করিয়াছে। পণ্ডিত নেহরু মন্তব্য করেন যে, পাকিস্থান চীনকে ১৩০০০ বর্গমাইল এলাকা ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হইয়াছে—কলিকাতায় সে কথা উল্লেখ করায় মিঃ ভুট্টো শ্লেষাত্মক উক্তি করেন, "হয়ত উহা ১৩০০০ অপেক্ষাও বেশী দাঁড়াইবে—বিশেষ যদি বহির্মঙ্গোলিয়া, ভিতর মঙ্গোলিয়া সমরকন্দ ও উজবেগীস্থানকেও ঐ এলাকার মধ্যে ধরা হয়!"

এই ব্যঙ্গোক্তি সম্পর্কে আমাদের পররাষ্ট্র দপ্তরের মুখপাত্র বলেন যে, হয় পাকিস্থানের সরকারী মানচিত্র মিথ্যা, নয় মিঃ ভুট্টোর কথাবার্ত্তা ভুয়া। তিনি বলেন যে, যদি মিঃ ভুট্টোর হংকং-এ প্রদত্ত উক্তি সত্য হয়—অর্থাৎ সত্য সত্যই পাকিস্থান চীনকে তাহার নিজস্ব কোনও এলাকা দেয় নাই—তবে ১৯৬১ সনে করাচীতে ভারতীয় হাই কমিশনারকে পাকিস্থান সার্ভে বিভাগের যে মানচিত্র দেওয়া হয় তাহাতে "যথার্থ সীমা-রেখা" বলিয়া যাহা দেখানো হইয়াছে তাহা মিথ্যা, নহিলে যদি সত্য হয় তবে পাকিস্থান ১৩০০০ বর্গমাইল এলাকা চীনকে দায়ে পড়িয়া ছাড়িয়া দিয়াছে। বলা বাহুল্য এই এলাকার উপর পাকিস্থানের কোনও অধিকার নাই, উহা "জবর-দখল" মাত্র। পাকিস্থান সার্ভে বিভাগ ১৯৬২ সনে ঐ অঞ্চলের যে মানচিত্র [চতুর্থ সংস্করণ] প্রকাশ করিয়াছেন তাহা পরীক্ষা করিলেই কতটা এলাকা পাকিস্থান চীনের হাতে তুলিয়া দিয়াছে তাহার সঠিক পরিমাণ বুঝা যাইবে।

অঙ্কশাস্ত্রে আমাদের সেরূপ দক্ষতা বা অধিকার নাই। সুতরাং ১৩০০০ কিম্বা ৭৫০-৮০০ এই সমস্যা পূরণ পাকিস্থানের "সমঝদার দোস্ত" দুই জনার উপর ছাড়াই ভাল। সম্ভবতঃ মার্কিনী ও ব্রিটিশ পররাষ্ট্র দপ্তর এদিকে দৃষ্টিপাত করিবেন।

রাজস্ব ও নিজস্ব

ভারতের জনসাধারণ ক্রমশঃ নিজ নিজ রোজগারের কতটা অংশ সত্য সত্যই নিজস্ব ও কতটা রাজস্ব, ইহার বিচারে হতবুদ্ধি হইয়া পড়িতেছেন। দেখিতেছেন যে, রোজগার যাহা হইত, প্রথমতঃ তাহা আর সে পরিমাণে হইতেছে না। ইহার কারণ, ভারতীয় রাষ্ট্রনেতাদিগের ব্যক্তি-স্বাধীনতা হ্রাসের পদ্ধতি। এটা বারণ, ওটা চলিবে না, সেটা আমদানী বন্ধ এবং অনেক কিছুই পাওয়া আইনতঃ সম্ভব হইলেও পাওয়া অসম্ভব—এই সর্ব্বব্যাপ্ত বাধার ব্যবস্থার ফলে মানুষের আয়-ব্যয় ও জীবনযাত্রা আর সাবলীল গতিতে চলিতে পারে না। ধাক্কা ও হোঁচট খাইয়া তাহা কোনমতে মন্দগতিতে চলে। ব্যক্তি-স্বাধীনতা যদি ক্রমশঃ লোপ পাইয়া এরূপ আকার ধারণ করে যাহাতে ব্যক্তি বিভিন্ন রাজকীয় চালানে স্বাক্ষর করিবার অধিকারমাত্র লইয়া সংসারপথে চলিতে থাকিবে—শুধু রাজকীয় আজ্ঞা পালন করিবার আগ্রহে তাহা হইলে জাতীয় স্বাধীনতা সুরক্ষিত হইতে পারে কি না, তাহা বিচার-সাপেক্ষ। ব্যক্তির সকল অধিকার রাজদপ্তরে জমা হইলেও সেই সকল অধিকারের ব্যবহার আমলাদিগের হস্তে অবাধ ভাবে ন্যস্ত হইলেও দেশের লোক মুক্তির হাওয়ায় বাস করিতে থাকে, এই বিশ্বাস কম্যুনিষ্ট রাজত্বে দেখা যায় এবং বর্ত্তমান ভারতের "সোসিয়ালিষ্ট" মহলেও ইহার আবির্ভাব লক্ষিত হইতেছে। রাজস্ব আহরণ সর্ব্বগ্রাসী আকৃতি ধারণ করিলেও দেশের জনসাধারণ স্বেচ্ছায় রাজস্ব দিতেছেন বলিয়াই গ্রাহ্য হইবে, যেহেতু জনসাধারণের প্রতিনিধিগণ বিভিন্ন ক্ষেত্রে "হাঁজি হাঁ" বলিয়া আমলাতন্ত্রের সকল অনাচারে সায় দিয়া চলিতেছেন। রাজস্ব আদায়ের জন্য ক্রমে ক্রমে আমলার সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতেছে এবং সেই সকল আমলাগণের অনেক ব্যক্তিই রাজস্ব যাহারা সহজে দিয়া থাকেন তাঁহাদিগকে বিপর্য্যস্ত করিয়া ও যাহারা রাজস্ব ফাঁকি দিয়া ঐশ্বর্য্যলাভ করে

তাহাদিগকে খুসী রাখিয়া নিজ নিজ "কর্ত্তব্য" সম্পাদন করিয়া চলেন। যথা, ইঁহাদিগের প্রশ্ন করিবার কেতা এমনই যে, কোন ভদ্রলোককে তাঁহার ৩৫ বৎসর পূর্ব্বে কি রোজগার কেমনভাবে হইয়াছিল সে কথার জবাবদিহি করিতে বাধ্য করিতে চেষ্টা ইঁহারা অনায়াসেই করিতে পারেন। অথচ যে ব্যক্তি মাসিক ছয়-সাত হাজার টাকা খরচ করে চার শত টাকা রোজগারের উপর তাহাকে কোনও জবাবদিহি করিতে হয় না। রাজস্ব আদায় নীতির গোড়ার কথা হইতেছে রাজস্ব আহরণ সহজবোধ্য নিয়ম অনুসারে হওয়া প্রয়োজন এবং তাহা আদায় করিবার জন্য আদায় অপেক্ষা ব্যয় অধিক না হওয়া। ভারতীয় রাজস্ব আহরণ নীতি এই দুইটি নিয়মের ব্যতিক্রমেই অনেক-ক্ষেত্রে চলিয়া থাকে। ইহার কারণ দেশের সাধারণের দারিদ্র্য এবং আমলাদিগের "যেমন করিয়া হউক" রাজস্ব আদায় চেষ্টা। সাধারণের প্রতিনিধিগণ অবশ্য প্রধানতঃ রাষ্ট্রীয় দল-গুলির ভৃত্য ও অবসর সময়েও কখন কখন বিবেকের তাড়নায় সাধারণের বন্ধু। এই অবস্থায় ভারতের রাজস্ব আহরণ নীতি আমলাদিগের সুবিধা অনুসরণে চলে; দেশের অর্থনৈতিক উন্নতি অথবা সাধারণের স্বাস্থ্য শক্তি, সুবিধা কিংবা স্বাধীন জীবননির্ব্বাহ পন্থার সাহায্যের জন্য গঠিত হয় না। অর্থাৎ, ভারতীয় রাজস্ব আহরণ নীতি যদি সকল ভারতবাসীকেই ব্যক্তিগত ভাবে দারিদ্র্যের ও কর্ম্মহীনতার শৃঙ্খলে আবদ্ধ করিয়া রাখে তাহা হইলে সেই নীতি সমষ্টিগত ভাবে কার্য্যকরী ও স্বাধীনতা রক্ষার সহায়ক, এ কথা বিশ্বাসযোগ্য নহে। ইহার সুনিশ্চিত প্রমাণ প্রয়োজন। স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়াছিলেন:

"There is too much talk, tall talk! We are great, we are great! Nonsense! We are imbeciles; that is what we are! We speak of many things, parrot-like but never do them; speaking and not doing has become a habit with us. This sort of weak brain is not able to do anything; we must strengthen it."

তর্জ্জমা নিষ্প্রয়োজন। পণ্ডিত নেহরু ও মোরারজী বিবেকানন্দের ঐ উক্তি পাঠ করিয়া ও তদনুসারে চলিলে আমাদের জাতীয় উন্নতি আরও সহজসাধ্য হইতে পারে। ১৮২০ সনে রাজা রামমোহন রায় বলিয়াছিলেন:

"The struggles are not between the reformers and anti-reformers! but between liberty and oppression throughout the world, between justice and injustice and between right and wrong."

তর্জ্জমা পুনরায় অনাবশ্যক। নেহরু ও মোরারজি সাহেব-দ্বয়ের বিচার করিয়া দেখা আবশ্যক যে, তাঁহাদিগের রাজস্ব আহরণ নীতি ভারতের জনসাধারণকে পেষণ করিতেছে কি না। মোরারজির স্বর্ণ ব্যবহার ইচ্ছার সংস্কার চেষ্টা যদি বহুসংখ্যক কর্ম্মীকে কর্ম্মহীন অবস্থায় ভিক্ষুকের স্তরে নামাইয়া দেয় এবং স্বর্ণ আমদানি ও গোপনে ক্রয়-বিক্রয় বন্ধ না হয়; বা হইলেও এত অধিক খরচে হয় যে, লাভ অপেক্ষা লোকসান অধিক হয়; তাহা হইলে তাঁহার ঐ সংস্কার চেষ্টা বাতিল করা উচিত। জনা দুই-তিন "হাঁজি হাঁ" মহিলা লোকসভায় তাঁহাকে সমর্থন করিলেও ভারতের প্রায় সকল স্ত্রীলোকই তাঁহার এই সংস্কার চেষ্টাকে উৎপীড়ন-মাত্র বলিয়া মনে করেন। কারণ, স্বর্ণালঙ্কার স্ত্রীলোকের একমাত্র দুর্দ্দিনের সম্বল এবং মোরারজি যাহাই বলুন এ বিষয়ে অন্য মত স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে দৃষ্ট হয় না ও হইবেও না। যাঁহারা ব্যাঙ্কে, হীরক-মুক্তাতে ও ভাড়া দিবার ঘর-বাড়ীতে ঐশ্বর্য্য সঞ্চিত করিয়া রাখিতে পারেন, তাঁহাদিগের মতকে জনমত বলিয়া অভিহিত করা সত্যকথা নহে। বিবেকানন্দের ভাষায়:

"Truth is infinitely more powerful than untruth; so is goodness. If you possess these they will make their way by sheer gravity."

অসত্যের জয় হইতে পারে না এবং সত্য ও সুন্দর যাহা তাহা নিজগুণে যথাস্থানে প্রতিষ্ঠিত হইবে। নেহরু সাহেব ও তাঁহার রাজস্বসচিব মোরারজি যদি সত্য ও সুন্দরের আশ্রয়ে চলিতে শিখেন তাহা হইলে তাঁহাদিগের ও দেশের মঙ্গল হইবে বলিয়া আমাদিগের বিশ্বাস।

মোরারজি ও তাঁহার বাংলা মুল্লুকের চেলা ব্যানার্জ্জি উভয়ের মধ্যেই একটি গুণ লক্ষ্য করা যায়। ইহা হইল তাঁহাদিগের অদম্য আত্মবিশ্বাস। তাঁহাদিগের বিশ্বাস যে, তাঁহারা আছাড় খাইলেও আছাড়ের একটা অর্থনৈতিক ব্যাখ্যা সম্ভব। মোরারজি আবার অর্থনীতি অপেক্ষা আরও গভীরে চলিয়া যান। তাঁহার প্রত্যেকটি টাকা আদায় চেষ্টার একটা আধ্যাত্মিক ও সমাজ-সংস্কারমূলক অর্থ থাকে। বিশ্বের বাজারে ভারতের "রুপিয়া" গড়াইয়া অল্পমূল্য হইয়া যাওয়ায় এবং অপর দেশের দ্রব্য ক্রয়ের জন্য বিদেশী অর্থের অভাবে মোরারজি ভারতে স্বর্ণ ব্যবহার নিবারণ চেষ্টা আরম্ভ করেন। মতলব ছিল সাধারণে তাঁহাকে অনেক স্বর্ণ হাতে তুলিয়া দিবে ও তিনি সেই স্বর্ণ জমা রাখিয়া "রুপিয়া"র অধঃপতন বন্ধ করিবেন এবং প্রয়োজনমত বিদেশী মুদ্রা কর্জ্জাও করিতে পারিবেন। কিন্তু

এক্ষেত্রে তাঁহার চেষ্টা বিফল হইয়াছে। তিনি মাত্র আঠার কোটি টাকার স্বর্ণ পাইয়াছেন বলিয়া প্রচার। ইহা বাজার দরে অথবা তাঁহার কল্পিত দরে তাহা আমরা জানি না। অর্থাৎ কল্পিত দরে হইলে ইহার বিশ্বের বাজারের দাম আঠার কোটি। নতুবা মাত্র নয় কোটি। যাহাই হউক, এইটুকু মাত্র স্বর্ণ পাওয়ার জন্য চার লক্ষ স্বর্ণকারের পেশা নষ্ট করিয়া দেওয়ার কোন সার্থকতা থাকে না। কারণ, চার লক্ষ লোক যদি বৎসরে এক হাজার টাকা হিসাবেও রোজগার করিত তাহা হইলে তাহাদিগের মোট রোজগার হইত বাৎসরিক চল্লিশ কোটি টাকা। উন্মাদের অঙ্কশাস্ত্রেই বাৎসরিক চল্লিশ কোটির মূল্য এককালীন আঠার কোটি অপেক্ষা ন্যূন বলিয়া গ্রাহ্য হয়। এই সকল স্বর্ণকারগণ যে সকল অলঙ্কার প্রভৃতি গঠন করিত সেইগুলির মধ্যে অনেক অলঙ্কার বিদেশে চালান হইত এবং বিদেশী পরিব্রাজকগণ সাক্ষাৎ ভাবে এদেশেও ক্রয় করিত। এই ক্রয়ের মোট পরিমাণ কিছু কম নহে। পাঁচ হাজার বিদেশী এদেশে ভ্রমণে আসিয়া যদি একজন দুই-পাঁচ শত টাকার অলঙ্কারও ক্রয় করিতেন তাহা হইলে সেই ক্রয়ের মূল্য হইত দশ-পঁচিশ লক্ষ টাকা। অর্থাৎ আঠার কোটির স্বর্ণ বাঁধা রাখিয়া এককালীন যাহা ধার পাওয়া যায় তাহা অপেক্ষা কুড়ি-পঁচিশ লক্ষ টাকার বিদেশী মুদ্রা বাৎসরিক অর্জ্জিত হওয়া অধিক বাঞ্ছনীয় কি না তাহা বিচার্য্য। কারণ, ধার করিলে তাহার সুদ দিতে হয় ও ধারের টাকা বদ খরচ হইয়া যাইলে তাহার কোনও মূল্য থাকে না। কিন্তু পঁচিশ লক্ষ বাড়িয়া এক কোটি হইতে পারে। এবং সেই ব্যবসার মূল্য অনেক কোটি টাকা বলিয়াই সুবুদ্ধি লোকে ধরিবে। মোরারজির ও তাঁহার পূর্ব্বের অপরাপর কংগ্রেসী মন্ত্রীদিগের পরিচালনার ফলে ভারতের অর্থনীতি আজ বিশেষ ভাবে নিস্তেজ, ও কোন-মতে জীবিত অবস্থায় টিঁকিয়া রহিয়াছে। ১৫।১৬ বৎসর ধরিয়া দেশের "উন্নতি" সাধন করিয়া আজ কংগ্রেসের রাজত্বে ভারতের শতকরা ৬০ জন লোক মাসিক ১০-২০ টাকা মাত্র "জাতীয় ঐশ্বর্য্যের অংশ"রূপে আয় করিয়া থাকেন। ইহার মধ্যে কতটা রাজস্ব হিসাবে লয়প্রাপ্ত হয় ও কতটা নিজস্ব ভোগের জন্য থাকে তাহা বলা যায় না। যাহাই ভোগে লাগুক তাহার পরিমাণ অতি অল্প, এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। যাহাকে উপযুক্ত খাদ্য, বস্ত্র ও আবাসস্থান বলে তাহা ভারতের শতকরা ৬০ জনের জোটে না, এ কথা সর্ব্বজনগ্রাহ্য। এই অবস্থায় "আমরা প্রগতিশীল, আমরা অগ্রগামী হইতে থাকিব" প্রভৃতি মিথ্যা আস্ফালনের কোনই মূল্য নাই। দেশরক্ষার জন্য "সাক্ষাৎ" ভাবে, অর্থাৎ অস্ত্রশস্ত্র ক্রয় এবং সেনাদলের ভরণ-পোষণের জন্য, যাহা প্রয়োজন সেই অর্থ দেশবাসী যেমন করিয়া পারে দিবে সন্দেহ নাই। কিন্তু মোরারজি অথবা নেহরুর দেশবাসীর মানসিক সংস্কৃতি অথবা অর্থনীতির ভিত্তিগঠন ইত্যাদি অবাস্তর প্রচেষ্টার খরচ দেশবাসী জোগাইতে অক্ষম। যদি গায়ের জোরে তাহাদিগের শেষ কপর্দ্দক পর্য্যন্ত আদায় করিয়া লইয়া রাজ্য পরিচালনা কার্য্য করা হয় তাহা হইলে তাহার ফলে দেশের অবস্থা আরও শোচনীয় হইবে বলিয়া মনে হয়। ইহার কারণ এই যে, জাতীয় অর্থনীতির মূলসূত্র হইল জাতির প্রাকৃতিক সম্পদের শ্রমশক্তির সাহায্যে সেই মত গঠন ও পরিবর্ত্তন করিয়া লওয়া, যাহাতে তদ্দ্বারা মানুষের জীবনযাত্রা-নির্ব্বাহের সাহায্য ও সুবিধা হয়। এই কার্য্য করিতে হইলে মূলধন প্রয়োজন। মূলধন অর্থে সেই সম্পদই বুঝা যায় যাহা প্রকৃতিদত্ত বস্তুর শ্রমশক্তি নিয়োগে পরিবর্ত্তিত রূপ ও যাহা দ্বারা আরও সম্পদ উৎপাদন সম্ভব। আমাদিগের কংগ্রেসী অর্থনীতির আরম্ভ-কালে মহাত্মা গান্ধী তাহাকে সৎপথে চালাইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। পরে যখন নেহরুর বহির্মুখী দৃষ্টি ও বাহিরের জগতের প্রতি আকর্ষণের টানে ভারতীয় অর্থনীতি অতি-মাত্রায় অপর দেশের আশ্রয়ে "অগ্রগমন" চেষ্টা আরম্ভ করিল ও মোরারজির ন্যায় রাজস্বমন্ত্রিগণ সেই কারণে দেশের আভ্যন্তরীণ কাজ-কারবারের সর্ব্বনাশ সাধন করিয়া ক্রমশঃ দেশের বহু কর্ম্মীকে বেকার অবস্থায় আনিয়া ফেলিলেন; তখন ভারত সেই গভীর দুর্দ্দশাতে আসিয়া পড়িল, যেখানে মানুষের জীবনযাত্রার কোন নিশ্চিত পথ রহিল না; এবং ভবিষ্যতে কি হইবে সে কথা সম্পূর্ণ অজানার খাতায় লিখিত হইল। বর্ত্তমানে ভারতের বহুলক্ষ কর্ম্মী নিজ নিজ কর্ম্মশক্তি নিয়োগের পথ খুঁজিয়া না পাইয়া হতাশ ও নিরন্ন অবস্থায় দিন কাটাইতেছে। ভারতের রাজস্বসচিব নিজ কল্পনাশক্তির মাহাত্ম্যে মুগ্ধ হইয়া, তিনি ভারতবাসীকে ক্রমশঃ কিরূপ মায়ামুক্ত করিয়া আধুনিক করিয়া তুলিতেছেন, সেই বর্ণনায় নিবিষ্ট। তিনি ও তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী মন্ত্রিগণ ভারতবাসীকে প্রথমতঃ জমির মায়া কাটাইয়া উঠিতে শিখাইয়াছিলেন। পরে ক্রমশঃ ব্যবসার ও কর্ম্মের মায়া কাটাইয়া আজ ভারতবাসী মোরারজির পাঠশালায় স্বর্ণের মায়া ত্যাগ করিতে শিখিতেছেন। স্বর্ণের পরিবর্ত্তে মোরারজির কর্জ্জাপত্র লইয়া সকলে সুখে কালাতিপাত করিবেন বলিয়া মোরারজি মনে করেন। ভারতবাসী যদি বস্ত্র, খাদ্য ও বাসস্থানের মায়াও কাটাইয়া উঠিতে পারেন তাহা হইলে তাঁহাদিগের তুরীয় অবস্থাপ্রাপ্ত হইতে সুবিধা হইবে বলিয়া মনে হয়। মোরারজির কার্য্য-কলাপ দেখিয়া মনে হয় যে, ভারতীয় মানবের যে-সকল মূল সাংবিধানিক অধিকার রাজনীতির ক্ষেত্রে চুক্তিবদ্ধ হইয়াছে,

তাহার মধ্যে ব্যক্তিগত সম্পত্তি রাখিবার অধিকারটি কল্পনা ও প্রহসন মাত্র। কারণ মোরারজি আজ যাহা বলেন কাল তাহার কোনও মূল্য থাকে না, এবং দেশবাসী তাঁহার মায়াবাদের ধাক্কায় অতিষ্ঠ। তিনি সত্যজ্ঞানী পুরুষ ও তাঁহার নিকট লাল-কালো, ছোট-বড়, আমার-তোমার ও আছে-নাই প্রভৃতি ভেদের কোনও বাস্তবতা নাই। এইরূপ জ্ঞানী পুরুষকে কৈলাস শিখরে স্থাপন করা প্রয়োজন; রাজস্ব-সচিবের কুরসি তাঁহার যোগ্য পীঠ নহে। তাঁহার দিব্যজ্ঞানের চাপে ভারতবাসীর অবস্থা মনস্তত্ত্ববিদ্‌ আড্‌লেরের ঘোড়ার অবস্থার সমতুল্য হইয়াছে। আড্‌লের ঘোড়াকে ঘাস না খাইয়া জীবিত থাকিতে শিক্ষা দিতেছিলেন ও ঘোড়ার ঘাস প্রত্যহ একটি করিয়া কম করিয়া দিতেছিলেন। একদা অশ্ব শুধুমাত্র একটি তৃণ ভোজন করিয়া দিন কাটাইতে সক্ষম হইল। আড্‌লের মহা আনন্দে বলিলেন, "হয়েছে, হয়েছে!" কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ পরদিন ঘোড়াটি মরিয়া গিয়া আড্‌লেরের আনন্দস্রোতে বাধার সৃষ্টি করিল। মোরারজি আমাদিগকে সকল বস্তুর অসারতা শিক্ষা দিয়া ক্রমশঃ মায়ামুক্ত করিয়া আনিতেছেন। এখন আমরা ঐ সঙ্গে দেহমুক্তও হইব কি না ইহা বিচার সাপেক্ষ্য।

শুনা যায় যে, আমাদিগের দেশের লোকে ২০০০ খ্রীষ্টাব্দেও পুরা পেট খাইতে পাইবে না। কারণ, আমাদিগের বৈজ্ঞানিক প্রগতিশীলতা। আমরা তাড়াহুড়া করিয়া ক্ষুধা পাইলেই খাওয়া অথবা শীত করিলেই গাত্রবস্ত্র টানিয়া লওয়ার ন্যায় অবিমৃষ্যকারীতাতে বিশ্বাস করি না। আমাদিগের সকল কার্য্য ও প্রচেষ্টা পরিপ্রেক্ষণের ছাঁচে ঢালিয়া তবে সাধারণের সম্মুখে উপস্থিত করা হয়। সকল কিছুই বিশ্লেষণ-সংশ্লেষণ প্রভৃতি বিজ্ঞান ও গণিত শুদ্ধ পদ্ধতি অবলম্বনে নিখুঁত ভাবে পরিকল্পিত হইবার পরে যথাসময়ে করা হইবে বলিয়া মোটা তোষকের উপর পাশ-বালিশ আঁকড়াইয়া বসিয়া মন্ত্রিগণ জনসাধারণকে আশ্বাস দিয়া থাকেন। দেশাত্মবোধের সহিত গদি ও পাশ-বালিশের যে নিগূঢ় ও অন্তর্নিহিত সম্বন্ধ, তাহা কেহ অস্বীকার করিতে পারে না। কারণ, উক্ত রাজসভা (প্রাঃ) ও বাণিজ্যের আসবাব মাড়বার, কচ্ছ, চেট্টিপুরম ও সকল বাজারের সকল "গদ্দি"তেই ব্যবহৃত হইতে দেখা যায়। যেখানেই অসহায় ও অসতর্ক খরিদ্দার অথবা অধমর্ণগণ উচ্চ মূল্যে নিকৃষ্ট বস্তু ক্রয় অথবা উচ্চ সুদে হাতচিটায় লিখিত পরিমাণ অপেক্ষা অল্প অর্থ ঋণ হিসাবে গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়া থাকে; সেই সকল স্থানেই গদি ও পাশ-বালিশ ব্যবহার করা হইয়া থাকে। ভারত সরকার তাঁহাদিগের ধর্ম্মনিরপেক্ষ সমাজতান্ত্রিক গণবাদের প্রতীক বলিয়া, কেন যে ধর্ম্মচক্রকে গ্রহণ করিয়াছেন এবং আধুনিক যন্ত্রবাদের খাতিরে কেন যে দন্তবহুল "পিনিয়ন" চক্রকে গ্রহণ করেন নাই ইহার উত্তর আমরা দিতে পারি না, কারণ, এ সকল কথা উচ্চস্তরের বিধান-নীতির কথা। পাশ-বালিশ জড়াইয়া গদির উপর অর্দ্ধশায়িত *অবস্থায় দেহ স্থাপন করিয়া দেশরক্ষা, দেশ-সংগঠন* প্রভৃতি আলোচনা করা উপযুক্ত পন্থা কি না তাহাই বা কি করিয়া *সাধারণ মানুষের পক্ষে বলা সম্ভব?* যদি কেহ গদির উপরে লম্বমান মানবমাত্রকেই বণিক ঠিক অথবা শোষক বলিয়া ভুল করে, তাহা হইলে সে ভুল তাহার উচ্চস্তরের জ্ঞানের অভাবপ্রসূতমাত্র বলিয়া ধরিতে হইবে। এই যে জ্ঞানের অভাব সাধারণ মানুষের মধ্যে, তাহাও ত আমাদিগের অতিমানব নেতাগণ দূর করিতে পারিতেছেন না। কারণ ভারতে বর্ত্তমানে যে-সংখ্যক নিরক্ষর মানুষ বর্ত্তমান রহিয়াছে, ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দে তাহা অপেক্ষা কম ছিল। জনসংখ্যার সহিত নিরক্ষরতা বৃদ্ধির অর্থ এই যে, বালক-বালিকাগণ শিক্ষালাভ করিতেছে না। পঞ্চদশ বৎসর দেশ শাসন করিয়া আমাদিগের গদিয়ান জননেতাগণ যদি শতকরা ৬০ জন লোককে মাসিক কুড়ি টাকা অপেক্ষা কম আয়ের উপর জীবন নির্ব্বাহ করিতে দিতেছেন, এবং যদি দেশের নিরক্ষরতার অপনোদন করিতে অক্ষম হইতেছেন, তাহা হইলে তাঁহাদিগের কর্ম্মক্ষমতা সম্বন্ধে সন্দেহ জাগ্রত হওয়া স্বাভাবিক। তাঁহাদিগের মতে তাঁহারা যে চীনা দস্যুর আক্রমণ হইতে ভারতকে সাক্ষাৎ ভাবে রক্ষা করিতে অক্ষম হইয়াছিলেন, তাহা তাঁহাদিগের দেশ-গঠন কার্য্যে অধিক ভাবে নিবিষ্ট থাকার ফলে হইয়াছিল। এই প্রগাঢ় দেশ-গঠন সাধনার ফলে যদি অর্দ্ধ শতাব্দীকালেও দেশের লোকের খাইবার সংস্থান না হয় এবং শিক্ষা, চিকিৎসা ও রাস্তা নির্ম্মাণের ব্যবস্থাও না হয়; অথবা দেশবাসীর মধ্যে অধিক লোকই বেকার বা অংশতঃ বেকার রহিয়া যায়, তাহা হইলে নেতাগণের দেশ-গঠন প্রচেষ্টা ও বিভিন্ন পরিকল্পনার কার্য্যকারিতা সম্বন্ধে সন্দেহ হওয়াও স্বাভাবিক। সুতরাং মোরারজি যেক্ষেত্রে বলিতেছেন যে, তাঁহার রাজস্ব আদায় অধিক মাত্রায় হওয়া প্রয়োজন, কারণ, তাঁহাকে দেশরক্ষা ও দেশ-গঠন এই দুই কার্য্যেই বহু খরচা করিতে হইবে; সে-ক্ষেত্রে দেশরক্ষা সম্বন্ধে কাহারও কিছু বলিবার থাকিবে না যতক্ষণ দেখা যাইবে যে দেশরক্ষার কার্য্য সত্য সত্যই বর্দ্ধিত ভাবে অগ্রসর হইতেছে। দেশ-গঠন কার্য্যে অক্ষমতা এতটা প্রকট ভাবে প্রমাণ হইয়া গিয়াছে যে, সাধারণের ঐ বিষয়ে মন্ত্রীদের দ্বারা নিযুক্ত বিশেষজ্ঞদিগের প্রতি কোন বিশ্বাস আর নাই। সুতরাং ঐ সকল "মূল" গঠন-কার্য্যের জন্য ছোট ছেলেদের দুধ অথবা বালক-বালিকাদিগের শিক্ষা বন্ধ করিয়া ও গায়ের গহনা খুলিয়া দিয়া কেহ টাকা দিতে স্বেচ্ছায় আর প্রস্তুত নহেন। কারণ, সকলেরই বিশ্বাস এই টাকা অপব্যয় ও অপহৃত হইবে। জোর করিয়া রাজস্ব আদায় করা অসম্ভব নহে এবং করা হইতেও পারে—গায়ের গহনা খুলিয়া লওয়া অবধি, কিন্তু সেইপ্রকার উপায় অবলম্বন করা উচিত হইবে না। যদিও কংগ্রেসী জনপ্রতিনিধিগণ "হাঁজি হাঁ" বলিয়া সবকিছুই "সর্ব্বসম্মতিক্রমে" হইল বলিয়া প্রমাণ করিতে পারেন নেতা-

দিগের প্রতি বিশ্বাস ও ভক্তিবশতঃ, অথবা নিজদলের রাজত্ব রক্ষার জন্য; তাহা হইলেও জনসাধারণ সেই গণতন্ত্রের অভিনয়ের সমর্থন করিবেন বলিয়া আমাদের মনে হয় না। এই জাতীয় ছদ্মবেশী স্বৈরতাবাদ দেশের পক্ষে কখনও মঙ্গলকর হইতে পারে না। সর্ব্বক্ষণ "আমি, আমি, আমি" শুনিতে কেহ রাজি নহে। মোরারজির নিকট চরিত্রশুদ্ধি করিতেও কেহ প্রস্তুত নহে। পাকা সোনার পরিবর্ত্তে আধপাকা সোনা ব্যবহার করিলে চরিত্রের উন্নতি হয়, ইহাও কেহ স্বীকার করিবে না। অপরদেশে সকল লোকে নকল মণিমুক্তা ব্যবহার করে, এ কথাও সত্য নহে। যদি সত্য হইত তাহা হইলে পৃথিবীর হীরার খনিগুলি বন্ধ হইয়া যাইত। মুক্তা, পান্না, চুনি, প্রভৃতি মণি বিক্রয় হইত না। হ্যাটন গার্ডেনের বাজার ও অ্যামষ্টার-ড্যামের হীরা কাটিবার ব্যবসায় বন্ধ হইয়া যাইত। পৃথিবীর সোনার খনিগুলিও আর চলিত না। ভারতে মোরারজির মতে আঠার শত কোটি টাকার সোনা আছে। ইহা তাঁহার আন্দাজের কথা। ব্রিটেনে সোনা আছে সরকারী খরচ অনুসারে ৯০০০ কোটির অধিক মূল্যের। ব্যক্তিগত ভাবে কি আছে তাহা জানা সম্ভব নহে। ব্রিটেনের লোকসংখ্যা ভারতের এক-অষ্টমাংশ। সুতরাং মোরারজির কথা সত্য হইলেও আমরা নিজেদের স্বর্ণ আহরণকারী উন্মাদ বলিয়া মনে করিতে রাজি নহি। আমাদের দেশের লোকে সম্পদ রক্ষার উপায় হিসাবে স্ত্রীলোকদিগকে স্বর্ণালঙ্কার দিয়া থাকেন। অপর উপায়ে সম্পদ রক্ষা করিলে সে সম্পদের মূল্যহানি হইয়া লোকসান হয়। মোরারজিকে আজ এক শত মণ চাউল বিক্রয় করিয়া সেই টাকা কর্জ্জ দিলে, তিনি যে সময় সাড়ে চার টাকা হারে সুদ সমেত সেই টাকা কাগজের রুপিয়াতে ফেরত দিবেন, তখন সেই টাকায় হয়ত মাত্র পঁচাত্তর মণ চাউল ক্রয় করা যাইবে। কাগজের টাকার ক্রয়শক্তি ক্রমশঃ হ্রাস হইতেছে। এই কারণে মানুষে স্বর্ণ ক্রয় করিতে চাহে। মোরারজি স্বর্ণ ক্রয় বন্ধ করিলে তাঁহারও কোন সুবিধা হইবে না ও সাধারণের মনে বিক্ষোভের সঞ্চার হইবে মাত্র। চৌদ্দ ক্যারেট স্বর্ণও বেআইনীভাবে আমদানী হইতে পারে ও হইবে। যদি না মোরারজি উচিত মূল্যে চৌদ্দ ক্যারেট সোনা বিক্রয় ব্যবস্থা করেন। তাহা করিবার সামর্থ্য তাঁহার নাই। এবং যদি বিদেশী মুদ্রা অর্জ্জন করিয়া তাহা চৌদ্দ ক্যারেট সোনা কিনিতে খরচ করা হয়, তাহা হইলে স্বর্ণ ক্রয়-বিক্রয় নিয়ন্ত্রণের কোনও প্রয়োজন বা সার্থকতা থাকিবে না। সুতরাং চৌদ্দ ক্যারেট স্বর্ণও কালোবাজারেই মাত্র পাওয়া যাইবে এবং মোরারজির পাকা সোনা ব্যবহার অভ্যাস-দমন চেষ্টা বৃথা হইবে। তিনি বোম্বাই শহরটিকে যেরূপ মাতালের আড্ডা করিয়া তুলিয়াছিলেন মদ্যপান নিবারণ আইন করিয়া, স্বর্ণালঙ্কার অথবা স্বর্ণ কিনিয়া জমা করা বন্ধ করিবার চেষ্টা করিয়া সারা দেশে আর একটা সর্ব্বব্যাপী আইন-অমান্য পাপের সৃষ্টি করিবেন মাত্র। রাজস্ব সংক্রান্ত কোন লাভ ইহা হইতে হইবে বলিয়া মনে হয় না।

ভারতের মানুষ আইনভঙ্গ করাকে জীবনযাত্রার অঙ্গ বানাইয়াই ধরিয়া লইয়াছে দেখা যায়। যেখানে যে আইনই করা হউক না কেন, সে আইনের শীঘ্রই কোনও ইজ্জৎ থাকে না দেখা যায়। রেলে বিনা-টিকেটে ভ্রমণ, চেন টানিয়া গাড়ী থামান, দরজা খুলিয়া ঝুলিয়া ঝুলিয়া যাওয়া ইত্যাদি একটি নিদর্শন এই আইন অমান্য করার। কলিকাতার মোটর গাড়ীর হর্ণ বাজান, নিজ নিজ গমন পথে (Lane) চলা, গতিবেগের সীমা মানিয়া চলা, গাড়ী দাঁড় করান প্রভৃতি কোনও নিয়মই মোটর-কার, বাস বা লরী চালকেরা মানে না। পথিকেরা সর্ব্বত্র গাড়ী চলিবার পথে হাঁটা-চলা করে। রিক্শ বা ঠেলা-গাড়ীর কোন যাতায়াতের নিয়ম আছে বলিয়া মনে হয় না। কণ্ট্রোল যেসকল বস্তুর আছে সেসকল বস্তুই কণ্ট্রোলের নিয়ম অমান্য করিলে তবে পাওয়া সহজ হয়। অপরাধীদিগের শাস্তি না পাইবার বিভিন্ন বেআইনী উপায় আছে। ট্যাক্স ফাঁকি দিবারও অনেক উপায় আছে। ভারতের মানুষ যে কোন প্রকার নূতন আইন প্রবর্ত্তিত হইলে সে সম্বন্ধে কিছুই প্রায় বলে না, তাহার প্রধান কারণ হইল এই বিশ্বাস যে, যাহাই আইন হউক না কেন তাহা না মানিলেই চলিবে। অর্থাৎ, আইন অমান্য করিয়া চলা ভারতীয় মানবের নিকট এতই সহজ ও স্বাভাবিক যে, তাহার আইন লইয়া মাথা ঘামাইবার প্রয়োজন হয় না। মোরারজির সর্ব্বগ্রাসী বাজেট যে কতদূর সর্ব্বগ্রাস করিতে সক্ষম হইবে তাহার নমুনা আমরা পূর্ব্বকার সকল বাজেটেই পাইয়াছি। অর্থাৎ, রাজস্ব আদায় করা হয় শুধু ভদ্র ও উচ্চ স্তরের নীতি-জ্ঞানবান লোকের নিকট হইতেই প্রধানতঃ। অসৎ ও জুয়াচোর লোকেরা শুধু ততটুকুই রাজস্ব দেয় যেটুকু না দিলে একান্তই চলে না। যাহা দেয় তাহাও আইন ভাঙ্গিয়া শীঘ্রই ওয়াসিল হইয়া যায়। ব্যবসা-বাণিজ্যের রোজগারের অনেক

অংশই পাকা খাতায় উঠে না এবং রাজস্ব যাহা দেওয়া হয় তাহা সেইটুকুর উপরেই, যেটুকু রাজস্ব হিসাবের খাতায় উঠে। সেইজন্য ট্যাক্স যাহাই হয় না কেন, লক্ষ লক্ষ ধনী তাহার বেশীর ভাগ ফাঁকি দিয়া থাকে। মোরারজি এ কথা জানেন ভাল করিয়াই এবং তাঁহার বা তাঁহার দলের লোকেদের এই অবস্থার সংশোধনের কোন চেষ্টা ও ইচ্ছা নাই। কারণ দলের বহু লোকেই ট্যাক্স ফাঁকি দিয়া থাকেন এবং যাঁহাদের রোজগার ঘুষঘাস বা জোরজুলুমের উপর নির্ভর করে তাঁহাদিগের অনেকেই অতি বিশিষ্ট ব্যক্তিসঙ্ঘের অন্তর্গত। অর্থাৎ, যাঁহারা বেশী গোলযোগের সৃষ্টি করিতে সক্ষম তাঁহারা ট্যাক্স ফাঁকি দিয়া নিজেদের লেনদেনের দাবিদাওয়া ঠিক করিয়া লইতে অভ্যস্ত। যাহাদের গোলযোগের ক্ষমতা নাই তাহারা ট্যাক্স দিতে থাকিবে। ভারতের বাৎসরিক ট্যাক্স ফাঁকির পরিমাণ ১০০০ কোটি টাকার অধিক হইবে। অর্থাৎ মোরারজি যদি ট্যাক্স আদায় করিতে সক্ষম হইতেন তাহা হইলে তাঁহাকে কোনও রাজস্ব বৃদ্ধি করিতে হইত না।

অপর কথাটি হইল জাতীয় ধনোৎপাদন ক্ষমতার ব্যবহার। ভারতের কর্ম্মীজনের মধ্যে অর্দ্ধেক সংখ্যক লোকেরও পুরাপুরি কাজ করিবার সুযোগ নাই। ভারতীয় মানব যদি পুরাপুরি কাজ করিতে পারিত তাহা হইলে ভারতের জাতীয় আমদানি হইত বৎসরে ৩০,০০০ কোটি টাকার কম নহে, ইহার মধ্যে বে-আইনী রোজগার ধরা হইতেছে না। সকল ব্যক্তির সমবেত কর্ম্মপ্রচেষ্টা সম্ভব হইলে রাজস্ব সাধারণ হারে আদায় হইলেই তাহার পরিমাণ দ্বিগুণ হইত। জোরজুলুম করিয়া কাড়িয়া লওয়ার আবহাওয়ার সৃষ্টি করার প্রয়োজনই হইত না। ভারতের সকল সম্পদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ সম্পদ তাহার জনশক্তি। সেই মানব শক্তিকে উপেক্ষা করিয়া বিদেশী যন্ত্র সংগ্রহ করিবার জন্য ধারকর্জ্জ, দ্বিগুণ মূল্য কবুল করা ও নিকৃষ্ট যন্ত্রপাতি ক্রয় করা একটা অর্থনৈতিক মহামারীর মতই ভারতকে চাপিয়া ধরিয়াছে। শুধু যেনতেন প্রকারে যে-কোন প্রকার যন্ত্র আনিয়া বসাইয়া দিলেই, অনন্ত উন্নতির পথ খুলিয়া যাইবে, এই অন্ধ বিশ্বাস ভারতের উত্তরোত্তর মহা ক্ষতি করিতেছে। এই ভুল বিশ্বাসকে ভাঙ্গিয়া দেওয়া একান্ত প্রয়োজন। অন্য প্রয়োজন হইল জনশক্তিকে শতকরা একশত ভাগ কাজে লাগান। প্রথমতঃ, কংগ্রেসের সকল সভ্যগণ প্রত্যহ আট ঘণ্টা কোন-না-কোন কাজ (দ্রব্য উৎপাদনক্ষম) করিতে আরম্ভ করিলে অপরাপর ভারতবাসিগণ তাঁহাদের দেখিয়া কাজে লাগিয়া পড়িবে। দেশব্যাপী কাজের একটা প্রেরণা জাগ্রত হইয়া পড়িলেই আমাদিগের রাজস্বহানি আর হইবে না। ইহার জন্য প্রয়োজন দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্ত্তন। যাঁহারা ভারতকে গত ১৫ বৎসর ভুল পথে চালাইয়া লইয়া চলিয়াছেন, তাঁহাদিগকে এখন ছুটি দিয়া সত্যকার কর্ম্মী লোকের সাহায্যে জনশক্তির উপযুক্ত ব্যবহারের ব্যবস্থা করিতে হইবে। ইহা করিলে সকল দিক দিয়া মঙ্গল; না করিলে যে মহা অমঙ্গলের সূচনা হইতেছে তাহা চরমে পৌঁছাইয়া দেশের সর্ব্বনাশের কারণ হইবে।

আইন প্রণয়ন করিয়া দেশবাসীর মনের গতি ও সংস্কার পরিববর্ত্তন করা যায় কি না এই সম্বন্ধে শ্রীমোরারজি বলেন যে, ইহা নিশ্চয়ই করা যায়। সতীদাহ প্রথা, বাল্য বিবাহ ও বিধবা বিবাহ আইন করিয়া রদ করা হইয়াছে। তিনি ভুলিয়া গিয়াছেন যে, ঐ সমাজ-সংস্কারমূলক আইনগুলি হইবার পূর্ব্বে রাজা রামমোহন রায়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও বহু অপরাপর সমাজসেবক মহাপুরুষ দীর্ঘকাল ব্যাপী প্রচার ও জনমত গঠন প্রচেষ্টা করিয়াছিলেন। এবং ঐ ঘৃণ্য সংস্কারগুলির সহিত স্বর্ণালঙ্কার পরিধান অভ্যাসের তুলনা কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তি করিতে পারেন না। নারী জাতির অবমাননা ও নারীদিগের উপর অমানুষিক অত্যাচার এক কথা এবং স্বর্ণ ক্রয় করিয়া নিজ সম্পদ রক্ষা করা সম্পূর্ণরূপে অপর জাতীয় বিষয়। ইহা ব্যতীত বলা যায় যে, শ্রীমোরারজি কোন দিক দিয়াই রাজা রামমোহন বা ঈশ্বরচন্দ্রের সহিত তুলনীয় চরিত্রের লোক নহেন। তাঁহার আত্মম্ভরিতা চরমে না পৌঁছাইলে তিনি এ তুলনার ইঙ্গিতও করিতে পারিতেন না। তাঁহার রাজস্ব আহরণ প্রচেষ্টা ও বিদেশী দ্রব্য ক্রয়শক্তি বৃদ্ধির ব্যবস্থা চেষ্টার সহিত ভারতীয় মানবের বিভিন্ন সামাজিক সংস্কার ও মনোভাব পরিবর্ত্তন করিয়া তাঁহার ইঙ্গিতে নৃত্য করিতে হইবে এইরূপ ধারণা কোন ন্যায়বান ও স্বাধীনতাকামী ব্যক্তি পোষণ করিতে পারেন না। এক কথায়, অন্যায় নিয়ম খাড়া করিয়া তাহার সাফাই গাহিবার জন্য আবোল-তাবোল বক্তৃতা করিয়া জনসাধারণের মধ্যে গবর্ণমেণ্টের প্রতি অবজ্ঞার ভাব সৃষ্টি করা যদি ভারতরক্ষা আইন অনুসারে অপরাধ বলিয়া গ্রাহ্য হয় তাহা হইলে কোন কোন উচ্চস্তরের ব্যক্তির বিরুদ্ধে উক্ত আইন প্রয়োগ করিলে দেশের ও জাতীয় গবর্ণমেণ্টের মঙ্গল হইবে বলিয়া মনে হয়।

মহেঞ্জদাড়ো সভ্যতা

শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়

স্যার জন মার্শেলের মতে মহেঞ্জদাড়ো সভ্যতার তারিখ খ্রীঃ পূঃ ৩২৫০ হইতে খ্রীঃ পূঃ ২৭৫০।১ ইরাকের অন্তর্গত প্রাচীন "উর" ও "কিষ" নগরের ধ্বংসাবশেষের মধ্যে দুইটি "শীল" (Seal) পাওয়া গিয়াছে সেগুলি যে মহেঞ্জদাড়োর শীল, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ হইতে পারে না। উর ও কিষের ধ্বংসাবশেষের তারিখ খ্রীঃ পূঃ ২৮০০।২ সুতরাং ঐ তারিখে মহেঞ্জদাড়ো বিদ্যমান ছিল।২ মার্শেল যখন লিখিয়াছিলেন তখন মহেঞ্জদাড়োতে একটির নীচে আর-একটি এইভাবে সাতটি নগরের ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হইয়াছিল। এক-একটি নগর ৭০ বৎসর ছিল এইরূপ অনুমান করিয়া তিনি সিদ্ধান্ত করেন যে, মহেঞ্জদাড়ো মোট ৫০০ বৎসর বিদ্যমান ছিল। মহেঞ্জদাড়োর ধ্বংসাবশেষে যে সভ্যতার নিদর্শন পাওয়া যায় তাহা একটি অর্বাচীন সভ্যতা নহে,—তাহা একটি পরিণত সভ্যতা,—এই সভ্যতার পরিণতি হইতে অন্ততঃ একসহস্র বৎসর লাগিয়াছিল, ইহা মার্শেলের মত।৩ মার্শেল আরও বলিয়াছেন যে, "ওবিদের" ধ্বংসের মধ্যে এক প্রকার ভারতীয় মৃত্তিকা-নির্মিত৪ মৃৎপাত্রের খণ্ড পাওয়া গিয়াছে। ফ্রাঙ্কনির মতে৫ ওবিদের তারিখ খ্রীঃ পূঃ ৪০০০ হইতে খ্রীঃ পূঃ ৩৫০০। ইহা হইতে অনুমান হয় যে, মহেঞ্জদাড়ো খ্রীঃ পূঃ ৩৫০০ এর পূর্ববর্তী। মার্শেল আরও কতকগুলি দ্রব্যের উল্লেখ করেন, যেরূপ দ্রব্য ইরাকে খ্রীঃ পূঃ ৪০০০ এবং খ্রীঃ পূঃ ২৫০০-এর মধ্যবর্তী যুগে পাওয়া গিয়াছে।

পরবর্তীকালে হুইলার মহেঞ্জদাড়োর তারিখ খ্রীঃ পূঃ ২৫০০ হইতে খ্রীঃ পূঃ ১৫০০ বলিয়া নির্দেশ৬ করেন। হুইলারের সময়ে মহেঞ্জদাড়োর প্রায় ত্রিশটি শীল ইরাকে পাওয়া গিয়াছিল, যাহাদের মধ্যে (তাঁহার মতে) একটি শীল খ্রীঃ পূঃ ২৩৫০-এর পূর্ববর্তী, সাতটি শীল প্রায় খ্রীঃ পূঃ ২০৫০, অন্যান্যগুলি আরও পরবর্তী। তাঁহার মত অনুসারে ধ্বংসের তারিখ খ্রীঃ পূঃ ১৫০০ বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে। কিন্তু নগর স্থাপনের তারিখ খ্রীঃ পূঃ ২৮০০-এর পরে হইতে পারে না বলিয়া মার্শেল যে সকল কারণ দিয়াছিলেন সেগুলি অগ্রাহ্য করিবার সমর্থনে হুইলার কোনও যুক্তি দেন নাই। এজন্য মহেঞ্জদাড়োর প্রাথমিক নির্মাণ খ্রীঃ পূঃ ২৮০০-এর পূর্ববর্তী ইহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে। মার্শেলের যুক্তি অনুসারে ইহা আরও ১০০০ বৎসর পূর্বের।

হুইলার বলিয়াছেন যে, বেদের রচনাকাল অনুমান খ্রীঃ পূঃ ১৫০০ এবং ঐ সময়েই আর্যগণ ভারতে প্রবেশ করে। বেদে অনার্যদের সহিত যুদ্ধ এবং তাহাদের নগর ধ্বংসের কথা আছে। হুইলারের মতে তাহা বেদের রচনাকালের সমসাময়িক অর্থাৎ ১৫০০ খ্রীঃ পূঃ। মহেঞ্জদাড়োর ধ্বংসের তারিখের সহিত তাহা যখন মিলিয়া যাইতেছে তখন তাঁহার মতে আর্যগণই মহেঞ্জদাড়ো ধ্বংস করিয়াছিল—মহেঞ্জদাড়োবাসী নিরীহ অনার্য-দিগকে আর্যগণ বর্বরভাবে আক্রমণ করিয়া হত্যা করিয়াছিল এই মত তিনি প্রচার করিয়াছিলেন। পিগট৭ এই মত সমর্থন করিয়াছেন। মহেঞ্জদাড়োতে কতকগুলি নিহত নরনারীর কঙ্কাল পাওয়া গিয়াছে। তাঁহাদের মতে ইহারা আর্য আক্রমণের প্রমাণ।

কিন্তু কতকগুলি কারণে এই মত গ্রহণ করা যায় না। প্রথম বেদের তারিখ। উইন্টারনীজ লিখিয়াছেন যে, ইহা নিঃসন্দেহ ভাবে প্রমাণিত হইয়াছে, বিশেষতঃ বুলারের দ্বারা (Dr. Buhler), যে বেদ ১৫০০ খ্রীঃ পূঃ এর বহু পূর্বে রচিত হইয়াছিল ৮ তাঁহার মতে বেদের

১। Mohenjo Daro and Indus Civilization Vol 1 p. 106

(২) Mr. Gadd এবং Prof. Langdon প্রথম এই মত প্রচার করেন। (Proceedings of British Academy, XVIII, 1932তে Gaddএর প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়)

৩। Marshall, p. 103

৪। Marshall, p. 104

৫। Ancient History of Western Asia, India and Crete p. 22

৬। Indus Civilization. p. 4

৭। Prehistoric India by Pigett.

৮। History of Indian Literature. Vol. I p. 299

রচনাকাল খ্রীঃ পূঃ ২৫০০। বেদ যদি খ্রীঃ পূঃ ২৫০০-এ রচিত হয়, এবং মহেঞ্জদাড়ো যদি খ্রীঃ পূঃ ১৫০০তে ধ্বংস হয় তাহা হইলে বেদে যে সকল অনার্য্য নগর ধ্বংসের উল্লেখ আছে তাহাদের মধ্যে মহেঞ্জদাড়ো থাকিতে পারে না। প্রকৃতপক্ষে বেদের তারিখ আরও অনেক প্রাচীন। বাল গঙ্গাধর তিলক তাঁহার 'ওরিয়ন' (Orion) নামক পুস্তকে বেদে উল্লিখিত জ্যোতিষিক-সংস্থান হইতে প্রমাণ করিয়াছেন যে বেদ রচনার সময় ৪৫০০ খ্রীঃ পূঃ এর পূর্ববর্তী। তিলকের পুস্তক যখন প্রকাশিত হয় ঠিক সেই সময়—য়ুরোপে অধ্যাপক জ্যাকবির গবেষণা-ফল প্রকাশিত হইয়াছিল, বেদে উল্লিখিত সেই সকল ঘটনা হইতেই তিনি স্বতন্ত্রভাবে গণনা করিয়া বেদের রচনাকাল খ্রীঃ পূঃ ৪০০০ বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। ইঁহাদের গণনাতে কোনও ভুল কেহ দেখাইতে পারেন নাই। পরন্তু তিলক লিখিয়াছেন৯ যে, বুলার, বার্থ, উইন্টারনীজ এবং ব্লুমফীল্ড্ তাঁহাকে লিখিয়াছেন যে তাঁহার গণনা নির্ভুল বলিয়া তাঁহারা মনে করেন।১০ অধ্যাপক পি সি সেনগুপ্ত Ancient Indian Chronology নামক গ্রন্থে বেদে উল্লিখিত অন্য জ্যোতিষিক-সংস্থান হইতে গণনা করিয়া বেদের তারিখ খ্রীঃ পূঃ ৪০০০ বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। বিলাতের রাজকীয় জ্যোতির্বিদ (Royal Astronomer) তাঁহাকে লিখিয়াছেন যে তাঁহার গণনা নির্ভুল। বেদের তারিখ যদি খ্রীঃ পূঃ ৪০০০ বৎসর হয় এবং মহেঞ্জদাড়ো যদি খ্রীঃ পূঃ ১৫০০ তারিখে ধ্বংস হয় তাহা হইলে বেদে যে নগর ধ্বংসের উল্লেখ আছে তাহার মধ্যে কখনই মহেঞ্জ-দাড়োর উল্লেখ সম্ভবপর নহে। অখিল ভারতীয় ঐতিহাসিক সম্মেলনের ষোড়শ অধিবেশনের সভাপতিরূপে ডাঃ পি ভি কানে আর একটি আপত্তি তুলিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে মহেঞ্জদাড়ো একটা প্রকাণ্ড নগর ছিল,—তাহার পরিধি ৩.৪ মাইল ছিল। তাহার লোক সংখ্যা অন্তত ১ লক্ষ ছিল। যদি আর্যগণ ঐ নগর আক্রমণ করিয়া লোক সংহার করিত তাহা হইলে নিহত নরনারীর সহস্র সহস্র কঙ্কাল পাওয়া যাইত, কিন্তু মোটে অনধিক চল্লিশটি কঙ্কাল পাওয়া গিয়াছে। অকস্মাৎ সিন্ধুনদের প্লাবন-জন্য সমস্ত নগরবাসীদের পলায়নের সময় দস্যুর আক্রমণে এরূপ অল্পসংখ্যক নরনারী হত্যা আশ্চর্য নহে।

বেদে উল্লিখিত আর্য ও অনার্যের যুদ্ধ সম্বন্ধে ইহা লক্ষ্য করিবার বিষয় যে, প্রত্যেক ক্ষেত্রে—অনার্য (বা অসুর) গণ প্রথমে আর্য্যদিগকে আক্রমণ করিয়াছিল, তাহার পর আর্যগণ অনার্যদিগকে আক্রমণ করে এবং তাহাদের নগর ধ্বংস করে। সম্বর নামক অসুর আর্য-রাজা দিবোদাসকে আক্রমণ করিয়াছিল। ইন্দ্র সম্বরকে আক্রমণ করেন এবং বিষ্ণুর সাহায্যে সম্বরের একশত নগর ধ্বংস করেন (ঋগ্বেদ সংহিতা ২।১২।১১ এবং ৭।১৮।২০)। সুশ্রব নামক আর্যরাজাকে কুড়িটি অনার্য রাজা ৬০,০৯৯ সৈন্য লইয়া আক্রমণ করে। ইন্দ্র আক্রমণ-কারীদিগকে নিধন করেন (ঋগ্বেদ ১।৫৩।৯)। অসুরগণ অত্রিকে একটি গৃহে আবদ্ধ করিয়া যন্ত্রণা দেয়। ইন্দ্র অত্রিকে রক্ষা করেন (ঋঃ ১।১১৬।৮)। অসুরগণ আর্য রাজা দভীতের রাজধানী অবরোধ করে এবং দভীতকে বন্দী করে। ইন্দ্র তাঁহাকে উদ্ধার করেন এবং অসুরদের অস্ত্র পুড়াইয়া দেন (ঋঃ ২।১৫।৪)। ঋগ্বেদের এই মন্ত্রের উপর নির্ভর করিয়া পিগট লিখিয়াছেন যে, আর্যগণ অনার্যদের "গৃহ" পুড়াইয়া দিয়াছিল (Prehistoric India, p. 262)। এইরূপ মনোভাব লইয়া পিগট আর্য্যগণের বিরুদ্ধে নগ্ন বর্বরতার অভিযোগ আনিয়াছেন (artless barbarity)। অসুর বরশিখের ১৩০টি পুত্র বর্ম পরিধান করিয়া হরিয়ুপিয়ার পূর্বদিকে ইন্দ্রকে আক্রমণ করিয়াছিল, ইন্দ্র তাহাদিগকে পরাস্ত ও নিহত করিয়াছিলেন (ঋঃ ৬।২৭।৬)। বরশিখের অপর পুত্রগণ হরিয়ুপিয়ার অপর প্রান্তে দাঁড়াইয়া ছিল, তাহারা ভয়েই মরিয়া গেল। সায়ণ লিখিয়াছেন যে, হরিয়ুপিয়া একটি নগর বা নদীর নাম, বোধহয় ইহা নদীর নাম, কারণ, নদীর অপর তীরে দাঁড়াইয়া যুদ্ধ দেখা যায়, পরন্তু নগরের এক প্রান্তে দাঁড়াইয়া অপর প্রান্তের যুদ্ধ দেখা যায় না।১১ ঋঃ ৪।৩০।৫-এ বলা হইয়াছে যে অসুরগণ দেবতাদিগকে আক্রমণ করিয়াছিল, ইন্দ্র তাহাদিগকে বধ করেন। ঋঃ ৪।১৮।৯এ বলা হইয়াছে যে, ব্যাংশ নামক অসুর ইন্দ্রকে আক্রমণ করিয়াছিল। ইন্দ্র তাহাকে বধ করেন। এই সকল ক্ষেত্রে দেখা যায় যে অসুরগণই প্রথমে আর্য্য-দিগকে আক্রমণ করিয়াছিল।

পূর্বে বলা হইয়াছে যে ইরাকে উর (Ur) এবং কিষ

৯। Vedic Chronology and Vedanga Jyotish p. 16

১০। উইন্টারনীজ পরে লিখিয়াছেন যে, বেদের রচনার সময় খ্রীঃ পূঃ ৪০০০ না ধরিয়া খ্রীঃ পূঃ ২৫০০ ধরা উচিত। তাঁহার মতের পরিবর্তনের তিনি যথেষ্ট কারণ দেন নাই।

১১। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ হরিয়ুপিয়াকে পাঞ্জাবের হরপ্পার (Harappa) সহিত এক বলিয়াছেন।

(Kish) নামক স্থানের প্রাচীন ধ্বংসাবশেষের মধ্যে মহেঞ্জদাড়োর শীলমোহর পাওয়া গিয়াছে। ঋগ্বেদের নিম্নলিখিত মন্ত্রগুলি হইতে মনে হয় যে, উর এবং কিস এই দুইটি নাম সংস্কৃত উরু এবং ক্ষিতি শব্দের অপভ্রংশ।১২

"বিচক্রমে পৃথিবীমেষ এতাং
ক্ষেত্রায় বিষ্ণুর্মনুষে দশস্যন্।
ধ্রুবাসো অস্য কীরয়ো জনাসঃ
উরুক্ষিতিং সুজনিমা চ কার॥"

ঋঃ ৭।১০০।৪

"বিষ্ণু তাঁহার ভক্তদিগকে বাস করিবার স্থান দিবার জন্য পৃথিবী ভ্রমণ করিয়াছিলেন। যাঁহারা তাঁহার পূজা করেন তাঁহারা নিরাপদ্ বাসস্থান পান। বিষ্ণু উরুক্ষিতি নির্মাণ করিলেন।"

"উরুক্ষিতৌ গৃণীহি দৈব্যং জনম্" (ঋঃ ৯।৮৪।১)

"হে সোম, তুমি উরুক্ষিতিতে দেবতাদিগকে স্তব দ্বারা আনয়ন কর।"

"প্রত্যোষ যাতুধান্যঃ উরুক্ষয়েষু দীদ্যৎ"

ঋঃ ১০।১১৮।৮

"হে অগ্নি, তুমি উরুর গৃহ সকলে প্রজ্বলিত হইয়া রাক্ষসদিগকে দগ্ধ কর।"

ঋঃ ৮।৬৮।১২র অনুবাদ—"আমাদের পুত্রদিগকে উরু দাও, পৌত্রদিগকে উরু দাও, আমাদের গৃহের জন্য উরু দাও, বাস করিবার জন্য উরু দাও।"

(ঋঃ ৮।৬৮।১৩)

পরের মন্ত্রের অনুবাদ এইরূপ:

"আমাদের ভৃত্যদিগকে উরু দাও, গাভীদিগকে উরু দাও, রথের জন্য উরু দাও, পথ দাও।"

শেষের তিনটি মন্ত্র হইতে মনে হয় যে 'উরু' একটি স্থানের নাম।

Maspero প্রণীত Struggle of Nations-এর সূচীপত্র হইতে দেখা যায় যে, প্রাচীন ইরাকে এই সকল স্থান ছিল:

উর, কিষ, উরু, উরুক, উরক্যাশডেম্। এই শব্দগুলি উরু, ক্ষিতি ও উরুক্ষিতির অপভ্রংশ। উরুক্ষিতির অর্থ বিশাল ভূমি। আর্যগণ বেলুচিস্থান এবং পারস্যের পর্বতসঙ্কুল দেশ অতিক্রম করিয়া যখন ইরাকের বিশাল প্রান্তর দেখিল তখন তাহার নাম রাখিল 'উরুক্ষিতি'। সেখানে তাহারা যজ্ঞ করিত। তাহাদের দেখিয়া বন্য লোকেরা আক্রমণ করিয়াছিল। তাহাদিগকে পরাস্ত করিয়া আর্যগণ সেখানে বসবাস করিয়াছিল। প্রাচীন নাম উরুক হইতে আধুনিক নাম ইরাক হইয়াছে। ইহা উরুক্ষিতির অপভ্রংশ। উর, কিস, উরু প্রভৃতি প্রাচীন নাম, সেই অঞ্চলে মহেঞ্জদাড়োর শীলমোহর প্রাপ্তি, এবং বেদে উরু উরুক্ষিতি প্রভৃতি উপনিবেশে গিয়া যজ্ঞ করিবার কথা, এই সকল হইতে বুঝিতে পারা যায় যে, প্রাচীন ইরাকে আর্য্যগণ উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিল।১৩

মহেঞ্জদাড়োতে শিব এবং দেবীর উপাসনার নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে। পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতগণ বলেন বেদে শিব ও দেবীর উপাসনা ছিল না, অনার্যদিগের নিকট হইতে পরবর্তী হিন্দুরা এই উপাসনাগুলি গ্রহণ করিয়াছে। কিন্তু এই মত ভ্রান্ত। শুক্লযজুর্বেদের ১৬ অধ্যায়ে দেখা যায় যে রুদ্রের নীল গ্রীবা, জটা, পশুচর্মের বস্ত্র ও পিণাক ধনু ছিল। সুতরাং রুদ্র এবং শিব যে এক দেবতা তাহাতে সন্দেহ হইতে পারে না। ঋঃ ১০।৯২।৯-এ পরমেশ্বর অর্থে "শিব" শব্দ ব্যবহার হইয়াছে। বেদে শিশ্নদেবের নিন্দা আছে সত্য, কিন্তু শিশ্নদেব শব্দের অর্থ শিবলিঙ্গের উপাসক নহে। যাস্ক ও সায়ণ ব্যাখ্যা করিয়াছেন ইহার অর্থ 'ইন্দ্রিয়পরায়ণ'। ঋঃ ১০।১২৫ দেবীসূক্ত এবং ১০।১২৭ রাত্রিসূক্তে পরব্রহ্মকে স্ত্রীলিঙ্গ বাচক শব্দে অভিহিত করা হইয়াছে। সুতরাং বেদে দেবী বা শক্তিপূজা দেখিতে পাওয়া যায়। মহাভারত ১।১।২৬৭ শ্লোকে বলা হইয়াছে—

"ইতিহাসপুরাণাভ্যাং বেদং সমুপবৃংহয়েৎ"

অর্থাৎ, রামায়ণ, মহাভারত এবং পুরাণের সাহায্যে বেদের অর্থ ভালভাবে বুঝিতে হইবে। পুরাণে যে শিব-পূজা ও শক্তিপূজার উল্লেখ আছে তাহার মূল বেদেই আছে। মহেঞ্জদাড়োতে শিব ও শক্তি পূজার নিদর্শনগুলি প্রমাণ করিতেছে যে, মহেঞ্জদাড়োর সভ্যতা বৈদিক সভ্যতা।

মহেঞ্জদাড়োতে লোহা পাওয়া যায় নাই বলিয়া সেই সময় অন্য কোথাও লোহা ছিল না তাহা বলা যায় না।

১২। 'ক্ষিতি' হইতে 'কৃষিতি' তাহা হইতে 'কিষিতি' তাহার সংক্ষেপ আকার 'কিষ'। 'উরুর' সংক্ষেপ 'উর'।

১৩। মহেঞ্জদাড়োর কতকগুলি প্রাচীন নিদর্শন ইরাকে পাওয়া গিয়াছে, কিন্তু ইরাকের প্রায় কোনও প্রাচীন নিদর্শন ভারতে পাওয়া যায় নাই। এজন্য মনে হয় উভয় দেশের মধ্যে বাণিজ্য সম্পর্ক ছিল না। ভারত হইতে ইরাকে উপনিবেশ স্থাপিত হইয়াছিল।

(Marshall Vol. II. p. 381 এবং Piggott. p. 208 দ্রষ্টব্য)

মার্শেল লিখিয়াছেন যে মহেঞ্জদাড়োতে অশ্বের নিদর্শন পাওয়া যায় নাই। কিন্তু পিগট পরে লিখিয়াছেন যে অশ্বের নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে।১৪ খ্রীঃ পূঃ ২৩০০ তারিখে লুইটি নামক ইণ্ডো-য়ুরোপীয় জাতি এশিয়া মাইনরে প্রবেশ করিয়াছিল। খ্রীঃ পূঃ ১৯০০ তে হিটাইটিরা তাহাদের নিকটে রাজত্ব করিয়াছিল।১৫ খ্রীঃ পূঃ ১৫০০—১৪০০ তারিখে মিটান্নিদের মধ্যে কতকগুলি আর্য্য নাম পাওয়া যায়। ১৩৮০ খ্রীষ্টাব্দে হিটাইটি ও মিটান্নিদের মধ্যে যে সন্ধি হইয়াছিল তাহাতে ইন্দ্র, বরুণ, মিত্র ও নাসত্য (অশ্বিনীকুমার) এই সকল বৈদিক দেবতার নাম পাওয়া যায়। হিটাইটির দেশে একটি প্রাচীন ঘোড়দৌড়ের পুস্তক পাওয়া গিয়াছে তাহাতে কতকগুলি প্রায় সংস্কৃত নাম পাওয়া যায়, যথা—ঐকাবর্ত্তন (একবার আবর্তন করা), তেরাবর্ত্তন (তিনবার), পঞ্চাবর্ত্তন (পাঁচবার), সত্তাবর্ত্তন (সাতবার)।১৬ হুজনি মনে করেন এই সকল ইণ্ডো-য়ুরোপীয় জাতি ককেসাস পর্বত লঙ্ঘন করিয়া আসিয়াছিল। কিন্তু যখন মহেঞ্জদাড়োর সীল হইতে প্রমাণ হইতেছে যে, প্রায় ঐ সময় ভারত হইতে কতকগুলি লোক ইরাকে গিয়াছিল, তখন ককেসাস পর্বত লঙ্ঘন করিয়া আরও কতকগুলি ইণ্ডো-য়ুরোপীয় জাতি এশিয়া মাইনরে আসিয়াছিল (যাহার অন্য কোনও প্রমাণ নাই) এরূপ কল্পনা করা নিষ্প্রয়োজন। পূর্বে যাহা বলা হইয়াছে তাহা হইতে সিদ্ধান্ত করা উচিত যে, বেদের তারিখ সম্বন্ধে তিলক ও জেকবির মত (খ্রীঃ পূঃ ৪০০০) যথার্থ, শিব ও শক্তিপূজা বৈদিক পূজা এবং মহেঞ্জদাড়োর সভ্যতা ও বৈদিক সভ্যতা।*

১৪। Prehistoric India, p. 157

১৫। Hrozny, Ch. p. XIII

১৬। Piggott. p. 251

*১৯৬১ সালে শ্রীনগরে অখিল ভারতীয় প্রাচ্য বিদ্যা সম্মেলনে পঠিত প্রবন্ধের সারমর্ম।
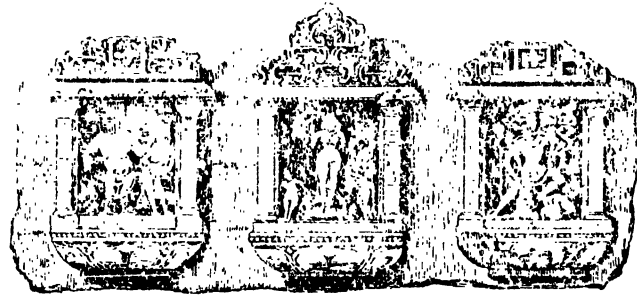
হীরাসাগরের কথা

তটিনী

(সেকালের কাহিনী)

গিরিবালা দেবী

দিবাশেষের ডুবুডুবু বেলায় আমাদের নৌকা ভিড়ল হীরাসাগরের নদীর কূলে স্নানের ঘাটে। আমরা ইছামতি, হারগিলা, ভেড়াকোলার বিরাট্ নদী পাড়ি দিয়ে অবশেষে আমাদের গন্তব্য স্থানে পৌছলাম। ভাদ্রের শেষ, এখন মেঠেলে নদী থেকে নৌকা যায় না। মাঠের সমতলভূমির জল শুকিয়ে গেছে।

এতদিন শুধু জল, আর জল। জলে ভেসে ভেসে ছোট ভাই কেদারনাথের মানস পূজা দিতে যাওয়া হয়েছিল মায়ের পীঠস্থান ভবানীপুরে।

শুধু কি জলপথ? চান্দাইকোণার নদী থেকে গো-যানের রাস্তা একবেলার। প্রাতঃস্মরণীয়া রাণী ভবানী প্রতিষ্ঠিত দেবীর মন্দির। ছায়া-ঢাকা পাখী-ডাকা স্নিগ্ধ শ্যামল মাতৃস্থান। নগরের কোলাহল নেই, আবিলতা নেই, সুকোমল সুমিষ্ট গ্রামের পরিবেশ। তমাল-তালী বনের অভ্যন্তরে লুকান মণিদীপ। স্থানে স্থানে ঘাট-বাঁধা পুকুর। বর্ষায় ভরা জলে টলমল। পাড়ে নিবিড় বৃক্ষশ্রেণী গায়ে গায়ে মাথায় মাথায় জড়াজড়ি ক'রে নীলাকাশের দিকে চেয়ে আছে। চারদিকে শিবমন্দির। ত্রিশূল-ফলক মেঘমুক্ত রৌদ্র কিরণে ঝলমল করছে। পথঘাট রাশি রাশি গুলঞ্চ ফুলে পরিবৃত। নহবৎখানার পরে নাট-মন্দির। দুই পাশে যাত্রীনিবাস, দোকান পসার। তার পরেই মা ভবানীর মন্দির। বিষ্ণুচক্রে ছেদন হয়ে এখানে মুখপদ্ম বিরাজিত। তাই সোনার মুখখানিই প্রকট, দেবীর সর্ব্বাঙ্গ বহুমূল্য শাড়ীতে আচ্ছাদিত। মস্তকে হীরক-মণ্ডিত স্বর্ণমুকুট। কর্ণে কর্ণাভরণ, নাসিকায় মুক্তার নথ। বক্ষে থাকে-থাকে কণ্ঠহার লম্বিত।

মন্দিরের বামভাগে একখানা রূপার খাটে মখমলের বিছানা-বালিশ। আরতির সময় চন্দন, তাম্বুল ও ফুলের মালা শয্যার পাশে রক্ষিত হয়। রাত্রি দশটার পরে কাহারও পুরীপ্রবেশের অধিকার নেই। তখন ভবানী-ভবের মিলনক্ষণ। পূজার সরঞ্জাম সমস্তই রৌপ্য-নির্ম্মিত।

আমাদের বাড়ীর কুলপুরোহিতের জ্যেষ্ঠপুত্র সূর্য্যকুমার চক্রবর্ত্তী মায়ের মন্দিরের চণ্ডী-পাঠক। তাঁর বাড়ীতেই আমাদের বাসা হয়েছিল। ওখানে যাত্রীদের রান্না ক'রে খেতে হয় না। প্রভাতে মায়ের বাল্যভোগ হয় দৈ-ভাজা চিঁড়ে ও ক্ষীরতক্তি দিয়ে। দ্বিপ্রহরে মাছ মাংস দই ক্ষীর পায়েস তালের বড়া ইত্যাদি দিয়ে। বোয়াল মাছ ও তালের বড়া ভিন্ন নাকি দেবীর ভোগ হয় না। যে বিরাট্ পুষ্করিণীর চাতালে ব'সে দেবী একদা শাঁখারির কাছে শাঁখা পরেছিলেন, শাঁখা পরার প্রমাণ দেখাতে গভীর জলের তল হ'তে নূতন লাল শঙ্খে শোভিত সুকু-করপল্লব দুটি ঊর্দ্ধে তুলেছিলেন সে জলাশয় প্রাচীন ঘন তালবৃক্ষে বেষ্টিত। সে গাছে আবার বারমাসই তাল ফলে। সেই তালের বড়া দিয়ে দেবী ভবানীর নিত্য-নৈমিত্তিক ভোগ হয়।

রাত্রের ভোগ লুচি মোহনভোগ ক্ষীর ক্ষীরতক্তি আর নানা প্রকার ফল।

আমরা যেদিন পৌছলাম তার পরের দিনই কেদারের মানতের পুজো। জোড়া পাঁঠা ও মোষ বলি দিয়ে সমাধা করবার দিন নির্দ্দিষ্ট হয়েছিল। ওখানে পুজোর প্রধান উপকরণ পাঁঠা ও মোষ চেষ্টা ক'রে সংগ্রহ করতে হয় না, প্রচুর পরিমাণে জোগান থাকে।

ভোর হ'তে না হ'তে মায়ের জাগরণের মাঙ্গলিক ভোরাই বাজে নহবৎ থেকে। বাজনার সঙ্গে সঙ্গে সাড়া প'ড়ে যায়। ফুলের সাজি, বেলপাতার ডাল, নানারূপ পুজোর উপকরণ নিয়ে সকলের ব্যস্ত আনাগোনার বিরাম থাকে না।

প্রভাতেই আমরা মায়ের শাঁখার ঘাটে সকলে স্নান সেরে নিয়েছিলাম। পুকুরে দলে দলে কচ্ছপ খাদ্যের আশায় ইতস্ততঃ বিচরণ করছিল। ওরা কারুকে কিছু বলে না। ওদের গায়ে গা লাগিয়ে মানুষ স্নান সেরে নেয়।

সকলের সঙ্গে আমাকেও যেতে হয়েছিল মন্দিরে। মন্দিরে পুজোর কি বিপুল আয়োজন, রাশি রাশি ফুল মালা চন্দন সিঁদুর ও পূজাসম্ভার।

পুরোহিত নিত্যপূজা সমাধা ক'রে সংকল্পের পূজোয় বসেছেন। পূজো হ'লে পাঁঠা মোষ বলি দেওয়া হবে।

সূর্য্যকুমারের জ্যাঠামশায় সুললিত স্বরে চণ্ডী পাঠ করছেন। ঢাক ঢোল কাঁসী সানাই বাজছে। সকলে ব'সে আছেন গলবস্ত্রে যুক্তকরে মুদিত নয়নে। মা'র মুদ্রিত নয়নের পল্লব বেয়ে প্রার্থনার পূত অশ্রুজল ঝরছে ঝরঝর ক'রে। দিদিমারও তাই।

আমি সকলের অলক্ষ্যে আস্তে আস্তে স'রে পড়লাম সেখান থেকে। বলি আমি দেখতে পারি না। বলির বংশে জন্ম নিয়েও বলি দেখার অভ্যাস হয় নি।

দাদামশাই ঘরে তালা দিয়ে সবাইকে নিয়ে মন্দিরে গেছেন। ঘর বন্ধ। কোথায় বা পালিয়ে থাকব?

আমি ধীরে ধীরে অগ্রসর হ'লাম শাঁখার ঘাটে। ঘাট নির্জ্জন, জনতা পূজার প্রাঙ্গণে উপস্থিত। দিনটা মেঘলা, বৃষ্টি হয়নি, রৌদ্রের প্রখরতাও নেই গভীর অরণ্যে বনভূমিতে শরতের আগমন সূচিত হচ্ছে। শাখায় শাখায় ফুল ফোটার সমারোহ, লতায় পাতায় পুলকের শিহরণ। গুলঞ্চ ফুলের গালিচায় বনতলের মৃত্তিকা দৃষ্টিপথে পড়ে না। সৌরভে বর্ষার সজল শীতল বাতাস মদির হয়ে উঠেছে। শ্যামল তালপত্রের ভেতরে লুকিয়ে পাখী ডাকছে "বৌ কথা কও" বৌ কথা কও।" অনতিদূর থেকে বায়ুহিল্লোলে ভেসে আসছে, "গৃহস্থের খোকা হোক।" কোথাও "চোখ গেল, চোখ গেল", সকরুণ আর্ত্তনাদ।

আমি চাতালের পাশের বৃহৎ এক তালগাছে হেলান দিয়ে ব'সে রইলাম। শরীর শ্রান্ত লাগছিল, মানতের পূজো শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত কারুকে কিছু খেতে হয় না। দুধ ও চরণামৃতে দোষ নেই, কেদারকে তাই খাওয়ানো হয়েছে। মা আমাকেও একবাটি গরম দুধ খেতে দিয়েছিলেন। পাতলা দুধ ঢক ঢক ক'রে গেলা আমার দু'চোখের বিষ। আমি তা খাই নি। কেদার আমার ছোট ভাই, আমি তার দিদি, তিন-চার বছরের বড়, আমার কি আত্মমর্য্যাদাবোধ নেই?

ক্ষুধায় পিপাসায় আমি তন্দ্রাচ্ছন্নের মতন ব'সে রইলাম তালতলায়। মন্দিরে তখনও ঝমর ঝমর বাজনা বাজছে। "ভবানী মার জয় জয়" নাদে চতুর্দ্দিক মুখরিত।

আমি প্রতীক্ষা করতে লাগলাম, শতবেণুবীণার স্বরে সহসা ধ্বনিত হবে "শাঁখারি আমায় শাঁখা পরিয়ে দাও।"

কচ্ছপ জলের ভেতরে থলবল করছিল, আমি আশা-পূর্ণ নেত্রে চেয়ে রইলাম অতল গভীর নীরে রাঙ্গা শাঁখায় মণ্ডিত রাঙ্গা করপদ্ম দু'টি বারেক দেখবার আশায়।

"সোনা, সোনা, তুই এখানে ব'সে ঘুমুচ্ছিস না কি? তোকে যে খুঁজে খুঁজে আমরা হয়রান। খুব ভালভাবে পূজো হয়ে গেছে। চল্ প্রসাদ খাবি?" বলতে বলতে আমার স্নেহময় দাদামশায় দুই প্রসারিত বাহুর বন্ধনে বেঁধে আমাকে বুকে তুলে নিলেন।

আমার পিতৃবংশের মত মাতৃবংশে কাব্য-কবিতা ছিল না। ঠাকুরদাদা-প্রদত্ত তটিনী নামের মাধুর্য্য এঁরা উপলব্ধি করতে পারেন নি, তাই তটিনী নটিনী পরিহার ক'রে দাদামশায় দিদিমা আমাকে সোনা ব'লে ডাকতেন। তিলু মিলুরও ধার ধারতেন না।

আমাদের প্রত্যাগমনে বাড়ীতে আনন্দের উৎস বয়ে গেল। দাস-দাসী হ'তে ঠাকুরদা ঠাকুমা আমাদের সস্নেহে বেষ্টন ক'রে ধরলেন।

আমার দিদিমার নাম গঙ্গা, তিনি যেমন সরল প্রকৃতির তেমনি কৌতুকময়ী। গঙ্গার স্বচ্ছ সলিল ধারার মত তাঁর হাস্যকৌতুক সর্ব্বদা ঝরঝর ক'রে ঝরে পড়ে।

দিদিমা আমার ও কেদারের হাত মুঠোয় চেপে ঠাকুরদাদার হস্তে তুলে দিয়ে বললেন, "এই যে বেয়াই মশায় আপনার হারাধন অক্ষত অবস্থায় ফেরত দিয়ে গেলাম। বলতে নেই, জলের হাওয়ায় যেটের একটু মোটা তাজা ক'রেই এনেছি। এই যে বেয়ান দিদি, তুমি, পেছনে কেন? দেখে-শুনে বুঝে নাও তোমার জোড়া মাণিক দু'টিকে।"

"বারে বারে 'তোমাদের' বলছিস কেন? ওরা কি তোদের নয় গঙ্গা? এবার ওরা ত প্রায় দিন-কুড়িক তোদের কাছে থেকে এল। এবার তোরাও কয়েক দিন ওদের কাছে থেকে যা।"

দিদিমা খিল খিল ক'রে হাসতে লাগলেন, "তোমার কথা শুনে বাঁচি না দিদি, আমার বাড়ীতে বুঝি দুর্গা পূজো নেই? তোমাদের কি, পূজোয় রাজ্যের লোক এসে পড়বে, আমার হ'ল 'এক শেয়ালে রাঁধে বাড়ে দুই শেয়ালে খায়, রাজার ব্যাটা মজুমদার ঘোড়ায় চ'ড়ে যায়।' ভগবান্ ছেলেও দেননি, গোটাকত মেয়েও দেন নি। সবেধন নীলমণি, তাও তোমার আঁচলেই বাঁধা। পূজোর কাজ ত করতে হ'বে সই। রাতটুকু থেকে কাল সকাল বেলা আমাদের পাড়ি জমাতে হবে।"

"না রে, কাল কিছুতেই তোদের আমি যেতে দেব

না, গঙ্গা। ভবানীপুরের পুজো দেবার গল্প শুনতেই যে আমার সাতদিন কেটে যাবে। বৌমা ভিন্ন যেমন তোদের আপনার কেউ নেই, তেমনি গাঁয়ের ছেলে-মেয়েরা তোর বার মাসের তের পার্ব্বণ তুলে দিচ্ছে নিজেদের কাজ মনে ক'রে। তুই দু'দিন থেকে গেলেও কোন ক্ষতি হবে না।"

দিদিমা একটু ভেবে জবাব দিলেন, "হাঁ, তারাই আমাদের বল ভরসা। 'নিনায়ের শতেক নাও।' যা করবার ওরাই করে, আমাদের "এদিক্ নদী ওদিক' নদী, মধ্যে বালির চর, তার ওপর বসে আছে শিবসদাগর'।"

ঠাকুমা ঠাকুরদাদা, দাদামশায় দিদিমাকে আদর আপ্যায়িত ক'রে ঘরে নিয়ে বসালেন।

বিহারী তামাক সেজে দিয়ে গেল। প্রসাদ ও ক্ষীর-তক্তি দিদিমা দুই-হাঁড়ি ভ'রে এনেছিলেন। হাঁড়ির মুখ খুলে তিনি প্রত্যেককে ডেকে প্রসাদ বিতরণ করতে লাগলেন।

দাদামশায় তামাক টানতে টানতে ঠাকুরদাদার কাছে গল্পের ঝুলি খুলে দিলেন। কেদার আহ্লাদে গোপাল হয়ে ঠাকুমার কোল জুড়ে ব'সে রইল। আর আমার মা নিরলসা বঙ্গের বধূ, যাঁর নয়নে অমৃত, হৃদয়ে মধুভরা। তিনি ঘরে ঘরে ঢুকে প্রৌঢ়া শ্বশ্রূমাতার অসমাপ্ত কাজগুলো সেরে রাখতে লাগলেন। আমি ধীরে স'রে পড়লাম সেখান থেকে। এক জায়গায় চুপ-চাপ ব'সে থাকতে পারি না আমি। জনতায় যেতে পারি না। ঝগড়া বিরোধের মধ্যে গেলে আমার দম যেন বন্ধ হয়ে আসে। আমি বোকা, মুখচোরা; আমার জগৎ যেন আলাদা। লোকের ভিড় সইতে পারি না। এই বাড়ীঘর পরিবেশ ছেড়ে কোথায়ও আমাকে থাকতে হয় নি। এক জ্যেঠামশায়ের কাছে আসাম মঙ্গলদই ছাড়া। সেখানে ঠাকুরদা ঠাকুমা বাধ্য হয়ে আমাকে জোড় ক'রেই পাঠিয়েছিলেন।

জ্যাঠামশায়ের প্রথম সন্তান সুরেশ এক বছর বয়েসে আসামেই মারা গিয়েছিল। তখন কেদার মায়ের কোলে। জ্যাঠামশায় শোকে দুঃখে অভিভূত হয়ে পড়েছিলেন। মামণি (জ্যাঠাইমা) দিনরাত কাঁদতেন। দাস-দাসী ভিন্ন তখন তাঁদের কাছে কেউ ছিল না। সেই সময় জ্যাঠামশায় আমাকে নিয়ে গিয়েছিলেন তাঁদের কাছে।

ঠাকুরদা-ঠাকুমা কিছু-অন্ত প্রাণ, কিছুর গমনপথে কাঁটার ভয়ে তাঁরা বুক পেতে দিতেও কুণ্ঠাবোধ করতেন না। নইলে আমাকে চোখের আড়ালে রাখবার লোক নন ওঁরা। এবাড়ীতে মেয়ে টেঁকে না। ঠাকুমার এক-মাত্র মেয়ে বিয়ে ঠিক হ'লে হঠাৎ মারা যায়। ও পক্ষের তিন ভাইএর ভেতরে ন'ঠাকুরদা নিঃসন্তান, মেজোর একমাত্র ছেলে নন্দদুলাল। ছোটর প্রথম মেয়ে শঙ্করী অল্প বয়সেই গেছে। এখন তাদের দুই ছেলে। সেজন্য এখানে মেয়ের খুব আদর।

আদর হোক, অনাদর হোক, আমাকে যেতে হয়েছিল আসামে। ছয় বছর বয়স তখনো আমার পূর্ণ হয় নি, একে বুদ্ধিহীনা, তায় মুখ চোরা, সাত চড়ে মুখ দিয়ে একটা রাও বেরোয় না। সবাইকে ছেড়ে যেতে খুব কষ্ট হয়েছিল বৈ কি, কিন্তু ব্যক্ত করবার শক্তি ছিল না। মুখে কথা নাই, চোখে জল নাই। এমনি জড় পদার্থ।

আজও আমার হৃদয়ের পটভূমিকায় অঙ্কিত হয়ে রয়েছে, সেই নিবিড় পাদপ-পল্লবে ভূষিত আকাশস্পর্শী অগণিত নীল গিরিমালা। কি অপরূপ নীলের সমাবেশ; কে যেন সমগ্র পর্ব্বতশ্রেণীকে নীলে নীলে রাঙিয়ে রেখেছে। এত নীলের পরিবেশের জন্য ওখানকার অধিষ্ঠাত্রী দেবীর নাম নীল পর্ব্বতবাসিনী।

প্রস্তরে মণ্ডিত বিশাল ব্রহ্মপুত্র নদের কী ভীমগর্জ্জন। ভয়াল ভীষণ মধুর রূপ। সেই তুলনাতীত রূপের সঙ্গে রং মিলিয়ে বিশ্ব-শিল্পী সৃষ্টি করেছিলেন বন্য পশুপক্ষী। তরুলতা পত্রপুষ্প। কিন্তু কে উপভোগ করবে সেই অপার অনন্ত সৌন্দর্য্য? সন্ধ্যা-সমাগমে গিরিগুহা থেকে দলে দলে বাঘ নেমে আসে সমতল ভূমিতে। বাঘের গর্জ্জনে চারিদিক্ কম্পিত হ'তে থাকে পাহাড়ে পর্ব্বতে ধ্বনি প্রতিধ্বনিত হয়। বাঘ সুরক্ষিত বাংলোর চতুর্দ্দিকে ঘুরে বেড়ায়। আকুল হয়ে খুঁজে বেড়ায় প্রবেশ-পথ। না পেয়ে ক্ষিপ্ত হয়ে ভয়ঙ্কর শব্দে গর্জ্জন করতে থাকে। সারা রাত চলে বাঘের তাণ্ডব লীলা। বীভৎসতার বিক্রম। প্রভাত সূচনায় ফের তারা ফিরে যায় পর্ব্বতগুহায়।

আজন্মের পরিচিত পরিমণ্ডল চ্যুত হয়ে আমি যেন কেমন হয়ে গিয়েছিলাম। কারোর সঙ্গে কথা বলি না, হাসি না, খেলি না। শুধু ভীত-ত্রস্ত চোখ মেলে বাতায়ন পথে চেয়ে থাকি পাহাড়ের দিকে। কখন নেমে আসবে বাঘেরা, কোনটা ভীষণকায়, কোনটা খর্ব্বাকৃতি। কারও গা যেন তুলি দিয়ে আঁকা, মসৃণ লাবণ্য ঝরে পড়ছে। কোনটা বা মোছা মোছা বিবর্ণ রঙের। প্রফুল্ল জ্যোৎস্না-লোকে ওদের প্রত্যক্ষ করতে আমার বাকী ছিল না।

দ্বিপ্রহরে জ্যাঠামশায় ঘোড়ার গাড়ীতে লোকজন ও বন্দুক নিয়ে কাজে বেরিয়ে গেলেন। মামণি চারদিক্ বন্ধ

ক'রে আমাকে নিয়ে বসতেন, শেলেট পেন্সিল ও বই হাতে।

সেকালের মেয়ে হ'লেও মামণি ছিলেন তখনকার যুগের সুশিক্ষিতা। বাড়ীতে মাষ্টার রেখে তাঁর জমিদার পিতা লেখাপড়া শিখিয়েছিলেন। জ্যাঠামশায়ের অপূর্ব্ব রূপ ও পদমর্য্যাদায় জমিদারের মেয়ে এসেছিল গৃহস্থ বাড়ীতে।

হাঁ, মামণির কাছেই আমার অক্ষর পরিচয় হয়েছিল। কিন্তু বেশিদূর অগ্রসর হ'তে পারে নি। সহসা আমাকে ধরে ফেললে আসামের কালাজ্বর। এই কালাজ্বরই একদা সুরেশের প্রাণকলিকাটুকু হরণ ক'রে নিয়েছিল। সেই ভয়ে ভীত হয়ে জ্যাঠামশায় বাবাকে চিঠি লিখলেন আমাকে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে। আমি বোকা হ'লেও বুঝেছিলাম, অত কাঁপুনি আমার জ্বরের জন্যে নয়, বাঘের ভয়ে।

চিঠি পেয়েই বাবা আমাকে সেই ভয়াবহ ব্যাঘ্রভূমি থেকে সুজলা সুফলা শস্য-শ্যামলা চিরপরিচিত হীরা-সাগরের উপকূলে শান্তির নীড়ে ফিরিয়ে এনেছিলেন।

আশ্চর্য্যের বিষয় বাড়ী ফিরেই আমি ভাল হয়ে গিয়েছিলাম।

মাঝে মাঝে বাবা ঠাকুরদাদা ঠাকুমাকে সঙ্গে ক'রে আমাদের নিয়ে কলকাতায় গেছেন বটে, গঙ্গায় যোগের স্নান তীর্থদর্শন উপলক্ষ্য ক'রে। কিন্তু বাড়ী ছেড়ে, রোগীদের ছেড়ে ঠাকুরদাদা বেশিদিন থাকতে পারেন নি। আবার সবাইকে ফিরে আসতে হয়েছে হীরাসাগরের কাছে।

আমাদের খবর পেয়ে লাহিড়ী-বাড়ীর কর্ত্তামা আর সকলে ছুটে এলেন কুশল বার্ত্তা নিতে। সকলেরই পায়ের ধূলো নিয়ে আমি গেলাম বুড়োদিদির কাছে।

সন্ধ্যার আর দেরি নেই। অরণ্যের ভিতরে আস্তে আস্তে অন্ধকার ঘনীভূত হয়ে আসছে। গাছে গাছে পাখীরা ফিরে কিচিরমিচির শব্দ করছে। আমাকে দেখে ভুলু কুকুর লেজ নাড়তে নাড়তে কাছে এল। মেনী বিড়াল গায়ে মাথা ঘসতে লাগল। কাকার পায়রার ঝাঁক তখনি খোপে ঢোকার উপক্রম করছে। কাকা কলকাতা পড়তে যাবার সময় এগুলোর ভার দিয়ে গিয়েছিলেন আমার ওপরে। এখন এদের বংশবৃদ্ধি হয়েছে বিগুণ। এরা বর্ত্তমানে আমারই সম্পত্তি। আমি মুরারি কাকাকে এদের ভার দিয়ে গিয়েছিলাম। তা গুণে-গেঁথে দেখলাম পায়রা ঠিকই আছে। বুড়োদিদি বলে, "তিন ভাল আঠার দোষ, জেনে শুনে কবুতর পোষ্।" আমি কিন্তু এদের কোন দোষ পাই না। উত্তরের বারান্দায় পুজোর মুড়ির ধান রৌদ্রে দিয়ে তুলে রাখা হয়েছিল। আমি সকলের অগোচরে একমুঠো ধান এনে পায়রার খোপের সামনে মুঠো খুললাম। পায়রারা ঝাঁপিয়ে পড়ল আমার মাথায়, পিঠে, কাঁধে। না, ওরা আমায় ভোলে নি, ভুলু মেনী ভোলে নি।

বুড়োদিদি মেঠেলে কাপড় কাচছিল। বর্ষায় লাহিড়ী-দের মেঠেল ও আমাদের মেঠেল এক হয়ে এক প্রকাণ্ড দীঘির সৃষ্টি হয়েছে। পাড় দেখা যায় না, ভরা জলে টল টল করছে।

বুড়োদিদি প্রতিদিন সন্ধ্যায় গা ধুয়ে কাপড় কেচে শুদ্ধাচারে হরিনামের মালা জপ করতে বসে। সমস্ত দিনরাতের মধ্যে এইটে হ'ল ওর ভজন-পূজনের সময়।

বুড়োদিদি বুড়ো হ'লে কি হবে, ওর সঙ্গে আমার যেন কোথায় মিল আছে। ও গাছপালার ভেতরে বনে বনে ঘোরে, আমিও তাই। প্রভেদ, আমি ভালবাসি পশু পক্ষী, হীরাসাগরকে। আমার সঙ্গী-সাথী নাই বললেই চলে। মুখচোরা কুনো-প্রকৃতি হাঁদা গঙ্গারামের সাথে কারোর খেলা জমে না। না জমুক, ওরাই আমার ভাল।

বুড়োদিদি কাপড় কাচতে কাচতে বললে, "তিনু, শুনেছিস, ছিরুমণ্ডলকে যে কুমীরে মেরে ফেলেছে। আজ দশ দিন হ'ল।"

আমার হৃদয়ে নিদারুণ আঘাত লাগল। আহা, দুঃখী ছিরু, আমাদের যাবার আগের দিন ও এসেছিল। মণ্ডপের কানাচে দাঁড়িয়ে ছিরু আমাকে ডেকে চুপে চুপে বলেছিল, "ঠাকুর্জি আমারে দু'ডা চাল দিবা? হুলো মুনিষ্যি খাটতে যাটতে পারি না, ম্যায়া বৌ খাতি দিতে চায় না, চোপা নাড়ে।"

আমি লুকিয়ে ছিরুকে এক কাঠা চাল দিয়েছিলাম। ছিরুর মলিন মুখ হাসিতে ভ'রে গিয়েছিল, সেই ছিরু আজ নেই।

আমার বিমনা মুখের পানে চেয়ে বুড়োদিদি ছিরুর মৃত্যুকাহিনী সবিস্তারে বর্ণনা করতে লাগল।

পেমো বসেছিল বাসন মাজার ঘাটে। সে খর খর ক'রে ব'লে উঠল, "ঠাকুর্জি, তোমরা চল্যা গেলে কত কাণ্ড হইছে, ছিরুরে কুমীরে খাইল, বাড়ীতে ডাকাত পড়িছেল, কতু সিঁদ কাঠি লয়ে আইছেল চাল চুরি করতি।"

"হ, ওয়ার হইছেল" 'লোভ লাগছে ছাগল খায়ে। নিত্যি আসে কানছি বায়ে।' দুপুরে দুই কাঠা চাল পায়ে লোভ হইছিল, ধরা পড়্যা সে কি কাঁদন, দাপাদাপি,

নাক ঘষা, কান মলা! চরের শেখের ব্যাটাগরেও ওই দশা, ডাকাতি না ডাকাতি গণ্ডে পিণ্ডে খায়ে চাল নয়ে ওষুদ নয়ে পগার পার।" বলতে বলতে বুড়োদিদি গা ধুয়ে কাপড় কেচে জল থেকে উঠে এল।

এদের কথাবার্ত্তা শুনতে আমার আগ্রহ হচ্ছিল না, ভালও লাগছিল না। মর্ম্মের মর্ম্মস্থলে কেবলি আঘাত করছিল, "ঠাকুর্জ্জি, আমারে দুডা চাল দিবা?"

দাদামশায় দিদিমা পরের দিন ভোরে রওনা হবার সঙ্কল্প করেছিলেন কিন্তু ঠাকুরদাদা ঠাকুমা কিছুতেই তাঁদের ছেড়ে দিলেন না! একদিন আমাদের কাছে তাঁদের থাকতে হ'ল। আমার দাদামশায় ও দিদিমাকে আমি সর্ব্বাপেক্ষা বেশি ভালবাসি! ঠাকুরদাদা ও ঠাকুমাও আমার অতিশয় ভালবাসার। কিন্তু এঁরা যেন হৃদয়ের অতি কাছে স্থান ক'রে রেখেছেন। ঠাকুরদাদা গম্ভীর প্রকৃতির কাজের মানুষ, বাইরে বাইরেই অধিকাংশ সময় ঘুরে বেড়ান। তাঁর সান্নিধ্য বেশী পাই না। ঠাকুমা স্বল্পভাষিণী চাপা স্বভাবের, তাঁর অসীম স্নেহ অন্তঃসলিলা ফল্গুর মত প্রচ্ছন্ন রূপে নিরন্তর প্রবাহিত। বাহ্যিক প্রকাশ নেই। শাসন ও নীতি-শিক্ষায় তিনি শিশু-চিত্ত গঠনের প্রয়াসী। তাঁর আচার ও নিষ্ঠা শুচিবায়ুর পর্য্যায়ে উন্নীত হবার পথে। সারাদিন ছোঁয়াছুঁয়ি, কাপড় ছাড়া, হাত পা ধোয়া আমার ভাল লাগে না। আমাদের বাড়ীটা যেন জগাখিচুড়ি। আমার মা ঠাকুমা ন' ঠাকুমা ছাড়া বাকী ঠাকুমারা ও জ্যাঠাইমা খাস কলকেতাই, এখানে তাঁদের প্রাধান্য বিশেষত বজায় রাখতে সচেষ্ট, তাঁদের স্বামীরাও নিজেদের বাঙ্গালত্ব স্ত্রীদের কাছে প্রকাশ করতে লজ্জিত। শহরের মার্জ্জিত রুচি, ভদ্রতা, সংযত বাক্যালাপ এঁদের ভিতরে সম্পূর্ণরূপে আধিপত্য বিস্তার করতে পারে নাই। আবার গ্রাম্য সরলতা, নম্রতা, অকপটতা, কর্ম্মকুশলতা নগরবাসিনীরা আয়ত্ত করতে পারেন নাই। ফলে মোটা সরু সুতোয় জট পাকিয়ে গেছে। এটা পুরাতন গ্রাম নয়, পুরাতন পরিবেশও নাই। নদীর ভাঙ্গুনিতে একদা যে যেখানে পারে ছড়িয়ে ছিটিয়ে বাসভূমি নির্ম্মাণ করেছিল, কেউ এ পাড়ায়, কেউ সে পাড়ায়, কারোর বাড়ীর সামনে বিরাট্ মাঠ, কারও জলাশয়। সমশ্রেণীর ভদ্র প্রতিবেশী আমাদের একমাত্র লাহিড়ীরা। সে বাড়ীতে আমার সমবয়স্কার অভাব। সেই কারণেই আমার স্বভাব নিতান্ত কুনো ও বুনো হয়ে গ'ড়ে উঠেছিল। আমি পছন্দ করতাম হরিহরপুর, দাদামশায়ের গ্রামকে। সেখানে আমার জন্ম হয়েছিল ব'লেই বোধহয় সে শান্ত-শীতল গ্রামের অপরূপ সুষমা আমাকে অভিভূত ক'রে রেখেছিল। সেটা পুরাতন সমৃদ্ধিশালী পল্লী, চালে চালে বসতি। সহজ-সুন্দর তাদের জীবনযাত্রা। সকলের সঙ্গে সকলের প্রীতির বন্ধন, হৃদ্যতা, নিবিড়তা।

আমার দাদামশায়ের নাম রসময়, দিদিমা গঙ্গাদেবী, দুইজনার দেহেই বিশ্বশিল্পী তাঁর রূপের ভাণ্ডার উজাড় ক'রে দিয়েছিলেন। রূপে গঠনে অতুলনীয়। অপূর্ব্ব রূপের জন্যই সে গ্রামে তাঁদের নাম হয়েছিল রাঙ্গা ঠাকুর, রাঙ্গাঠা'ন। দুই রূপের আধারে আমার স্নেহময়ী জননীর উৎপত্তি। তাঁতে হেমাঙ্গিনী নামের সার্থকতা বিকশিত হয়েছিল। পিতৃবংশ অসুন্দর, আমি পিতৃবংশের ধারা পেয়েছিলাম। কেদার কিন্তু পেয়েছিল মাতৃকুলের ধারা। তাঁদের বাহ্যিক শুধু নয়নরঞ্জন ছিল না, হৃদয়ও ছিল অপরিসীম স্নেহ-মমতায় ভরা। অত স্নেহ জগতে আমি কারোর কাছেই পাই নি। কিন্তু তাঁদের ভালবাসা বিশেষ উপভোগ করতে পারি নাই, ঠাকুমা নিজের ঘর অন্ধকার ক'রে বধূর পিত্রালয়ে প্রদীপ জ্বালবার পক্ষপাতী ছিলেন না। দুই-চার মাস পরে কালে-ভদ্রে মা তিন-চার দিনের জন্যে পিত্রালয়ে যাবার অনুমতি পেতেন মাত্র। সেই সময় মার সঙ্গে আমিও যেতাম। কিন্তু সেই অল্প সময়ে আমার মন পরিতৃপ্ত হ'তে পারত না। সেই শান্ত সুন্দর গ্রামের মনোরম চিত্র গ্রামবাসিনীদের সুমিষ্ট সরল সখ্যতা—দাদামশায় দিদিমার উচ্ছ্বসিত আদর-সোহাগ আমাকে যেন মোহাচ্ছন্ন ক'রে রাখত। যা ক্ষণস্থায়ী তারই প্রতি মানব-চিত্ত ধাবিত হয় বেশি। হরিহরপুরে না থাকলেও জলপথে দাদামশায় দিদিমার কাছে থেকে প্রচুর স্নেহ পেয়ে এখন তাঁদের ছেড়ে দিতে আমার প্রাণের মধ্যে হাহাকার করছিল। কিন্তু তবুও ছেড়ে দিতে হ'ল।

ঠাকুরদাদা ও ঠাকুমার অনুরোধ-উপরোধ এড়াতে না পেরে তাঁরা রয়ে গেলেন একদিন আমাদের কাছে। ঘাটে তাঁদের নৌকা বাঁধাই ছিল। পরের দিন প্রভাতে রওনা হ'লেন।

দাদামশায়ের চক্ষু অশ্রুসজল, দিদিমার নয়নে অবিরল ধারা। মার ঘোমটার ভেতরে অশ্রুজলের বন্যা বয়ে যাচ্ছিল।

ঠাকুমা সান্ত্বনা দিলেন, "গঙ্গা, কাঁদিস নে, পুজোর পরে ফের ওদের নিয়ে গিয়ে ক'দিন কাছে রাখিস। আর একটা কথা, আশীর্ব্বাদ কর্, এর পরে বৌমার ছেলে-

মেয়ে কিছু হ'লে তোকে দিয়ে দেব। তোর শূন্য জীবন পূর্ণ হবে।"

দিদিমা আঁচলে চোখ মুছে দুঃখের হাসি হাসলেন, "না দিদি, তোমার ধন আমি নেব না, তোমার ঘরেই এরা সুখে থাকুক। 'পরের সোনা দিলে কানে প্রাণ যায় হেঁচকা টানে।' ঈশ্বর দেনার মালিক, তিনি যাকে যা দিয়ে সন্তুষ্ট হন, তাই ভাল।"

অন্দরের সীমানা পর্য্যন্ত মা ঠাকুমা, দাদামশায় ও দিদিমাকে এগিয়ে দিয়ে গেলেন। আমি চললাম ওদের সঙ্গে সঙ্গে; ব্রজদিদির কোলে কেদার।

দুঃখ কষ্ট হ'লে আমি কাঁদতে পারি নে। এ আমার এক ভয়ানক বিশ্রী স্বভাব। বুকের মধ্যে কঠিন প্রস্তর-খণ্ড যেন জমজমাট হ'য়ে চাপতে থাকে, কিন্তু অশ্রুজলের সুশীতল ধারায় তা প্রশমিত হয় না।

নদীর ঘাট বাড়ী থেকে বেশী দূরে নয়, পায়ে পায়ে ফুরিয়ে গেল। নৌকা প্রস্তুত। দাদামশায় দিদিমা আমাদের দুই ভাইবোনকে আদর ক'রে চুমো খেয়ে চোখের জলে ভাসতে ভাসতে নৌকায় চড়লেন। ভাদ্রের ভরা নদীর খরস্রোত তাঁদের বহন ক'রে তীরবেগে ভেসে চলল। কাঠ ছইয়ের মাঝখানে দাঁড়িয়ে ওঁরা অনিমেষে চেয়ে রইলেন আমাদের প্রতি।

ঘুমভাঙ্গা হীরাসাগরের এখন যেন কেমন একটা ঝিমানো ভাব। জলের ওপরে কুয়াশার মত বাষ্পরাশি [illegible] উড়ে মিলিয়ে যাচ্ছে আকাশে। ছোট ছোট ঢেউগুলো সদ্য ঘুম ভাঙ্গার সুখে নদীর গায়ে ছলাৎ ছলাৎ ক'রে আঘাত ক'রে শ্রেণীবদ্ধ কাশের গুচ্ছকে সজাগ ক'রে তুলছে। বন্য হাঁসের ঝাঁক এপারের আর্দ্র মৃত্তিকায় বিচরণের চিহ্ন এঁকে নিশাশেষে উড়ে গেছে পরপারে। [illegible] গাছের কোলে তাদের কলকাকলি প্রভাতের মুক্ত পবন বয়ে আনছে। বুড়ো দিদি বলে, 'নদী আপনি নাচে, আপনি গায়, আপনি বলে হায় হায়।' কথাটা কিন্তু ঠিক নয়, নদীর বুকের উপরে ছায়া ফেলে পানচিলের দল উড়ে উড়ে গান গাইছে। ঝপ্‌ঝপ্‌ শব্দ ক'রে শুশুক-শুক ঝাঁপ দিচ্ছে। একটার পরে একটা নৌকা ভেসে চলেছে বৈঠার হটর হটর রবে। প্রভাতের প্রথম অরুণালোকে আকাশের পূর্ব্বপ্রান্ত লালে লাল হয়ে গেছে। সেই লালের আভা ছড়িয়ে পড়েছে জলের ওপরে।

দাদামশায় ও দিদিমাকে বহন ক'রে সেই রাঙ্গা রেখা অতিক্রম ক'রে নদীর বাঁকে নৌকাখানা অদৃশ্য হয়ে গেল। দূর থেকে ছইয়ের মাঝখানে সাদা শাড়ীর আঁচল বার কতক ঝলক দিয়ে অন্তর্হিত হ'ল।

কেদার ব্রজদির কোল হ'তে নামবার উপক্রম ক'রে ভেউ ভেউ ক'রে কেঁদে উঠল, "দাদু দিদা যাব। নিয়ে চল।"

ব্রজদি, তাকে ভোলাতে লাগল, "দাদু দিদা এক্ষুণি ফিরে আসবে। বড় গাঙ পাড়ি দিয়ে জাহাজঘাটা হয়ে তোমার জন্যে এই বড় বড় রুই মাছ চিতল মাছ নিয়ে ফিরে আসবে। ওই দেখ, মাছরাঙ্গা পাখী কত বড় একটা মাছ ধরেছে। ওই যে নারকেলে বোঝাই মহাজনী নৌকো যাচ্ছে। আমরা বিকেলে ওই নৌকোয় পদ্মানদীতে বেড়াতে যাব।"

ব্রজদির ছেলে ভুলোনোর বাক্-চাতুরিতে কেদার সহসা কান্না ভুলে চারদিকে চেয়ে চেয়ে প্রশ্নের পরে প্রশ্ন করতে লাগল।

আমার মন কিন্তু শান্ত হ'ল না। চোখে জল নেই, কিন্তু বিচ্ছেদব্যথায় হৃদয় উদ্বেলিত। আমি পা দুটো হীরাসাগরের শীতল জলে ডুবিয়ে কাঠের গুঁড়ির ওপরে বসে চেয়ে রইলাম আমার অশেষ ভালবাসার দুটো প্রাণীর বিদায়-পথের দিকে।

ব্রজদি তাড়া দিল, "তিলু, এখন বাড়ী চল, বেলা হয়ে গেল, কেদারের খাওয়া হয় নি।"

হীরাসাগর ছেড়ে আমার যেতে ইচ্ছা করে না। কি এক দুর্নিবার আকর্ষণে সে যেন তার কাছে আমাকে বেঁধে রাখতে চায়। তার ভাঙ্গা ভাঙ্গা তরঙ্গ, সলিল-সিক্ত বায়ুহিল্লোল আমাকে ভুলিয়ে দেয় বাড়ীর কথা, স্বজনের কথা। তাই সারাদিন কাটে আমার নদীর তটে। সকলের অগোচরে লুকিয়ে আনাগোনার বিরাম থাকে না। হীরাসাগর যেন আমার জীবনের জীবন, খেলার সাথী। কিন্তু তখনই ব্রজদির সঙ্গে আমাকে বাড়ীর পথে পা বাড়াতে হ'ল। আমার হাতে রইল সারাটা দিন। তখন কোথায় ব্রজদি, কোথায় কেদার।

আমাদের বাড়ীতে ঢোকার রাস্তাটা শ্যামল দূর্ব্বাদল-মণ্ডিত। দুই পাশে দুটো ফুলের বাগান। চেরা বাঁশের বেড়া দিয়ে ঘেরা। বাঁশের দরজায় দ্বিপ্রহরে ও সন্ধ্যায় তালা দিয়ে রাখা হয়। বাগানে ফুলগাছের আদিঅন্ত নেই। লতায় পাতায় ফুলে মনোরম। এ বাগান রচনা করেছেন আমার মেজ ঠাকুরদাদার একমাত্র সন্তান নন্দ-কাকা। তিনি কলকাতা ইস্কুলে পড়েন। বয়স বছর পনের। মায়ের অপূর্ব্ব রূপের অধিকারী। লেখাপড়ায় মনোযোগ নেই, যত উৎসাহ আগ্রহ বৃক্ষরোপণে।

ইস্কুলের ছুটি হবামাত্র তিনি এখানে আসেন, তাঁর সঙ্গে আসে ঝুড়ি ঝুড়ি ফুলগাছ। মাতা-পিতার একমাত্র আদরের সন্তান। বয়েসের অনুপাতে মুরুব্বিপনাটা বেশি বেশি।

এ অঞ্চলে নন্দকাকার উদ্যান তুলনাহীন। দর্শনীয় বস্তু। এর রক্ষণাবেক্ষণের ভার ঠাকুরকাকার ওপরে।

পূজার বিলম্ব নাই। নন্দকাকাদের আসবার সময় প্রায় আগত। দুইটি মজুর লাগানো হয়েছে বাগানের আগাছা পরিষ্কারের জন্য।

বাগানের সামনে পৌঁছতেই কানে গেল কলকোলাহল। স্বর্ণচাঁপার গাছের শেকড়ের আড়াল থেকে আত্মপ্রকাশ করেছে এক বিরাট্ গোখরো সাপ। সাপটা যেমন মোটা তেমনি কালো, লেজের খানিকটা নেই। মজুররা কোদালের আঘাতে তাকে শেষ ক'রে দিয়েছে। এখন জটলা হচ্ছে মরা সাপ নিয়ে। ঠাকুমা কপাল অবধি কাপড় টেনে বেড়ার গায়ে এসে দাঁড়িয়েছেন। বুড়োদিদি সরোষে বক্তৃতা দিচ্ছে, "তোরা এ-কি অকল্যাণ করলি ব্যাটারা, ওটা যে কত কালের বাস্তু সাপ। কেউ কি বাস্তুসাপ মারে? বনে বাদাড়ে ও আমার সামনে কতবার পড়েছে আমি হাত তুলে পরণাম ক'রে কয়েছি, 'শাওন মাসের পূজ্যা খাও, মুখখানা লুকিয়ে ল্যাজটা দেখিয়ে গর্ত্তে যাও।' সেই সাপ তোরা মারলি?"

মজুররা প্রতিবাদ করল, "মারবে না, দুধকলা দিয়ে পুষবে। ফোঁস ক'রে তেড়ে এসেছিল। কারে যেন দংশন করেছিল, তাই ল্যাজ খ'সে পড়েছে। মানুষকে ছোবল দিয়ে মারলে যে সাপের ল্যাজ থাকে না।"

ঠাকুমা সাপকে আগুনে পোড়াবার আদেশ দিয়ে বিষণ্ণ মুখে মণ্ডপে গেলেন। অল্পদিন পূর্ব্বেই শ্রাবণ সংক্রান্তিতে ঘটা ক'রে মনসা পূজা করা হয়েছে। নাগপঞ্চমীর সর্পঘটগুলো বিসর্জ্জন দেওয়া হয়েছে। এক কোণে মনসার বেদী রয়েছে।

ঠাকুমা গলবস্ত্রে যুক্তকরে সেই বেদীতে লুটিয়ে প্রণাম করলেন। কি প্রার্থনা করলেন জানি না।

পল্লীগ্রামে ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের প্রভাতে ফ্যানা ভাত খেতে দেওয়া হয়। খালি পেটে দুধ চিঁড়ে মুড়ি খাওয়ালে নাকি পেট গরম হয়, লিভার খারাপ হয়ে যায়। লাল বরণের চালের ফ্যানা ভাত, বেগুন ঝিঙে কুমড়ো ভাতে, ঘরের তৈরি গাওয়া ঘি, এই উপকরণ।

মা ভাত চড়িয়েছেন। দাদামশায় দিদিমার জন্যে তাঁর চোখের জল ঝ'রে পদ্মের পাপড়ির মতন চোখের পাতা ফুলে উঠেছে। গৌরগণ্ড রাঙা টুকটুকে।

দুই ভাইবোনকে গরম ভাত খেতে বসালেন একই থালায়। মা কেদারকে সাপের গল্প ব'লে ব'লে ভাতের দলা মুখে দিতে লাগলেন। ও ভাত খেতে চায় না। ভাতে দুধে ওর রুচি নেই। সব লোভ ওকে।

খাওয়া হ'লে মুখ ধুয়ে কেদার চ'লে গেল বাইরে। বাড়ির মহলে থাকতেই ও ভালবাসে। ভেতরে আমার খেলার ঘরে কখনও কখনও খেলতে বসলেও বেশিক্ষণ থাকতে ভালবাসে না। বাসবে কি ক'রে? ও যে ছেলে, ওর প্রকৃতি বাহিরমুখী। খেলার ঘরের কাদা গুলে জিলিপী ভাজা, বড়ি দেওয়া, তেলাকুচো ফলের কুটনো কোটা ওর পছন্দ নয়। ঘরামিরা যেখানে ঘর তৈরী করে, চাকররা গোয়ালের পাশে খড় কাটে, কাঠ চেরে, সেই জায়গা ওর পছন্দ।

আমাদের রান্নাঘরের পেছনে এক জোড়া নারকেল গাছে এবার প্রথম নারকেল ফলেছে। এদেশে ভাল নারকেল ফলে না। নারকেল গাছের গোড়ায় ঝুড়ি ঝুড়ি পুঁটি মাছের ক্ষার ও রাশিকৃত নুন নিক্ষেপ ক'রে ফল ফলানো হয়েছে। ফিঙে পাখীরা বাসা বেঁধেছে নারকেল গাছে। ওদিক্ দিয়ে কারুর হাঁটবার উপায় নেই, লোক দেখলেই ফিঙে তাদের মাথায় ঠোকর দিয়ে চেঁচিয়ে বাড়ী মাথায় তুলবে।

পাখীরা বিষম চিৎকার সুরু ক'রে দিয়েছিল। খেতে বসলে মা বলেছিলেন, "টুলু, খেয়ে উঠে একবার বই নিয়ে পড়তে বোস্, যেটুকু শিখেছিলি, ভুলে গেলি যে! পড়া হ'লে আমার কাছে বই আনবি, আমি তোর পড়া ধরব। খাতায় এক পাতা লেখা ক'রে আনিস্।" মা'র কথা আমার মোটেই ভাল লাগে নি। সেকাল হলেও আমার মা লেখাপড়া জানতেন, ঠাকুমাও। কিন্তু লেখাপড়া আমার ভাল লাগে না। নির্জ্জন বন-বনান্তরে শুধু ঘুরে বেড়াতে আমার ভাল লাগে। আমার গাঁ বাড়িতে ব্রজদি টিপ্পনি কাটে, 'মাছ মারবো খাব ভাত, লেখাপড়া উৎপাত।'

ব্রজদির কথা শুনে আমার রাগ হয়, বাগানে বেড়ান আর মাছ মারা যেন এক সমান? কুণ্ডুদের মেয়ের আর জ্ঞানবুদ্ধি কত হবে। হোক্ বা না হোক্, মা'র কথা আজ আমাকে শুনতেই হবে। পড়ার বই নিয়ে বসবার আগে একবার ফিঙের নাচন দেখে যাই—

কিন্তু নারকেল গাছতলা অবধি আমার যাওয়া হ'ল না। গাছতলায় প্রকাণ্ড এক গোখরো সাপ বিশাল

ফণা বিস্তার ক'রে গর্জ্জন করছে দুই-তিনটে ফিঙে পাখী তার মাথায় সন্তর্পণে ঠোকর দিয়ে উড়ে যাচ্ছে। সাপের সঙ্গে পাখীর খেলা আমি মুগ্ধ দৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করতে লাগলাম।

কতক্ষণ দাঁড়িয়ে ছিলাম জানি না, হঠাৎ ব্রজদিদির চিৎকারে আমার মোহাচ্ছন্ন ভাব কেটে গেল। বাইরে থেকে চাকররা ছুটে আসতে না আসতেই অন্নদা উঠোন থেকে একখানা বাঁশ তুলে নিয়ে সাপের পিছন দিক্ থেকে মারল মাথায় সজোরে। তখন চাকররাও এসে গেছে, মড়ার ওপরে খাঁড়ার ঘা দিতে ত্রুটি করল না।

ব্রজদি কলকলাতে লাগল, "ধন্যি, সাহস তোর অন্ন, অত বড় সাপটাকে তুই গেলি মারতে? ও যদি ঘাড় ফিরায়ে তোবে ছোবল দিতো তখন হতো কি?"

"ছোবল অ্যায়ন অতো সোজা লয়, সগলতারই কল-কারসাজি থাকে। মোরা নমোশূদ্দরের ম্যায়া ভয় ডর করলি কি আমাগরে চলে বেরজদিদি? সাপ শেয়াল শুয়োর লিয়ে বাস করতি হয়।" ব'লে অন্নদা গর্ব্বের হাসি হাসতে লাগল।

বুড়োদিদি কলা বাগানে গিয়েছিল, কলাগাছের শুকনো ডাল-পাতা বোঝা বোঝা জড় করতে। কলার বাস্না রৌদ্রে শুকিয়ে আগুনে পুড়িয়ে সে ক্ষার প্রস্তুত ক'রে বিতরণ করে কৃষকপাড়ায়। তখন পাড়াগাঁয়ে সাজিমাটির চলন ছিল, সোডা-সাবান তেমন আধিপত্য বিস্তার করতে পারে নি। আর বিনা-পয়সায় কলার ক্ষারে কাপড় পরিষ্কার হ'লে গরীবের দেশে কে ধারবে সোডা-সাবানের ধার?

ফের সর্পবিনাশের বার্ত্তা পেয়ে বুড়োদিদি ব্যস্ত সমস্ত হয়ে ছুটে এল, "আহা, এক বেলার ভেতরে দুই-দুইটা মা মনসার অনুচর প্রাণ দিল মানুষের হাতে। বর্ষার জলে বেবাক খালখন্দ ডুবে গিয়েছিল ব'লেই না ওরা আশ্রয় নিয়েছিল মানুষের কাছে ডাঙ্গায়। এখন জল নেমে গেছে, তাই ওরা নিজেদের আবাস খুঁজে নিচ্ছিল। বিনা অপরাধে কি এমনি ক'রে মারতে হয়?"

বুড়োদিদির বোষ্টমী ধর্ম্মে সকলে হিঃ হিঃ শব্দে হেসে অস্থির।

বাঁশে ঝুলিয়ে মড়া সাপ শ্যামাচরণ নিয়ে গেছে বাইরে। তার মায়ের কৃতিত্ব সকলকে দেখাতে।

আমার আর বই নিয়ে বসা হ'ল না। মন যেন কেমন উদাস লাগছিল। খেলাঘরে খেলার সাথী নেই, ভাইটা রান্না খাওয়া খেলা ভালবাসে না। পেমো আমার সমবয়স্কা, কিন্তু তার সঙ্গে খেলা চলে না। একে সে বাড়ীর দাসীর মেয়ে, তাতে জাতে নিম্নশ্রেণীর। তাকে ছোঁয়া-মাত্র ঠাকুমা স্নান না করালেও হাত-পা ধুইয়ে কাপড় ছাড়াবেন। আর দাসীকন্যার সঙ্গে নাতনীর সখিত্ব তাঁর মর্য্যাদায় বাধে। তবে এ বাড়ীতে পেমো যে পর্য্যায়ে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করছিল, আমার খেলাঘরে তার ব্যতিক্রম হয় নি। চারদিকে ইটের বেষ্টনী দেওয়া আমার খেলাঘর পেমো গোবর-মাটি দিয়ে নিকিয়ে তকতকে ক'রে রাখে। কেঁচোর ঝরঝরে মাটি খেলাঘরের ভাতের জন্য খুঁজে এনে দেয়। আর সংগ্রহ করে তিত-পোল্লা পিঠালির ফল, নলটুনির ফল, তেলাকুচা ইত্যাদি।

আমি বিমনা হয়ে কাঁঠালতলার খেলার ঘরে দাঁড়িয়ে ছিলাম। পেমো আমার কাছে এসে চুপে চুপে জিজ্ঞাসা করল, "ঠাকুর্জ্জি, মুই মনসা পূজ্যার একডা ঘট পাইচি মাঠালের জলে, তুমি পূজ্যা কর না, দুইডা সাপ ম'ল বাড়ীতে, ঘটে পূজ্যা, দেওন নাগে? ঘট আনমু, ফুল দুব্যা তুলে দিমু?"

ঝিমানো মনটা আমার উৎসাহে নেচে উঠল। বড়রা কি করবে না করবে তাতে আমার কিসের দরকার? খেলাঘরে মনসা পূজা হওয়া উচিত। তা হ'লে খেলাঘরের চতুঃসীমানায় সাপের ভয় থাকবে না। আমি সাগ্রহে বললাম, "তুই ঘট আন্, ফুল বেলপাতা, নারকোলের ঝরা ফল, ধুতরো ফল নিয়ে আয়। মনসার পুজো করি। তোর খুব বুদ্ধি পেমো, ঠিক কথা বলেছিস। কিন্তু পুজোর পুরোহিত পাব কোথায়?"

"কেনে, ক্যাদার ভাইডাকে ডাইক্যা আনি, সেই হইবে পুরুত ঠাকুর?"

পেমোর প্রস্তাবে আমি আনন্দিত হয়ে পুজোর আয়োজন করতে লাগলাম। এ সময়টা আমাদের পক্ষে খুব নিরাপদ্ সময়। ঠাকুমা মণ্ডপে পূজায় বসেছেন, মা হবিষ্যি-ঘরে দুধ জ্বাল দিচ্ছেন।

কেদার ঘটের সামনে কলাপাতার আসনে ব'সে বললে, "দিদি, মন্তর বল।

মন্ত্র বললাম, "এই বস্তের এই ফল, ঘটে দাও ফুল জল।"

পূজার পরে মাটির জিলাপী তক্তি নাড়ু প্রসাদ মুখের সামনে ধ'রে কেদার দৌড়ল বাইর মহলে। ছেলেদের সঙ্গে ঘরকন্নার খেলা জমে না। পেমো কেদারের ধাবমান মূর্ত্তির দিকে চেয়ে টিপ্পনি কাটল, "ঘোড়ায় চ'ড়ে আসে যায়, হাম্বা দেখে মূচ্ছা খায়।"

পেমোকে প্রসাদ দিয়ে নিজে খেয়ে খেলা সাঙ্গ করতে হ'ল।

ঠাকুমা আজ আমাকে স্নান করতে বারণ ক'রে দিয়েছেন। সর্দ্দি লেগেছে খুব। নইলে এতক্ষণ হীরাসাগরের জলে আমার জলখেলা স্থরু হয়ে যেত। সে ডুব-সাঁতার চিৎ-সাঁতারের আনন্দ অতুলনীয়। গেঁয়ো ছেলেমেয়েরা পাঁচ-ছ বছরেই সাঁতার শিখে যায়। আমিও সাঁতার শিখেছিলাম। আজ স্নান নেই, বাড়ীতে ভাল লাগছিল না। আমি পা বাড়ালাম লাহিড়ীবাড়ীর দিকে। পাশাপাশি বাড়ী, কামিনী ফুলের গাছের তলা দিয়ে সঙ্কীর্ণ এক ফালি রাস্তা। বুড়োদিদি বলে, কামিনী গাছে পরীরা থাকে। ভরা দুপুরে ও সন্ধ্যায় তাদের আনাগোনা চলে। আমি কিন্তু পরী দেখতে পাই না; তবু কামিনীতলা দিয়ে যাতায়াতে আমার শরীর ছমছম করে।

ওখানে আমার সমবয়স্ক কেউ নেই। তিন বৌয়ের কয়েকটা মেয়ে আছে, আমার চেয়ে বয়েসে ছোট। কটা ছেলে আছে কোদারের বয়সী। ওরা পুতুল খেলতেও জানে না; খেলার ঘরে বাঁদাবাড়া করতেও পেরে নি। কাজেই ওদের প্রতি আমার আকর্ষণ নেই। আমার আগ্রহ মঙ্গল ভাইটির ওপরে। মঙ্গল মহেশ জ্যাঠার ছোট ছেলে। বয়স এখনো এক বছর পেরোয় নি। ওর আগেরটি আঁতুড়েই মারা গেছে, সেই কর্ত্তামার ভারি আদরের নাতি। ছেলেটি সুন্দর, অতি সুন্দর। মোটা-সোটা গড়ন, মাথাভরা কোঁকড়া চুল। মুখে হাসির লহর। মঙ্গল আমাকে খুব ভালবাসে, দেখামাত্র কচি কচি দুধে দাঁত ক'টা বের ক'রে হাত বাড়িয়ে ডাকে, "জি-জি"।

মঙ্গল যে আমাকে এত ভালবাসে, কর্ত্তামা সেটা পছন্দ করেন না। সকলে বলে, কর্ত্তামা কোপন স্বভাবের মানুষ। পরের বাড়ীর মেয়ের প্রতি ছোট শিশুর ভালবাসা তিনি সইতে পারেন না। তিনি সইতে না পারলেও মঙ্গলকে বেশিক্ষণ না দেখে আমি থাকতে পারি না।

তখন বেলা প্রায় দ্বিপ্রহরের কাছে। চারদিক্ গম গম করছে কর্ম্মব্যস্ততায়। মঙ্গলের মা জ্যাঠাইমা রান্নাঘরে রান্না চড়িয়েছেন। ছোট মার ওপর ভোগ রান্নার ভার। ছোট মা লাহিড়ীবাড়ীর ছোট বৌ, বাল-বিধবা। কঠোর আচারপরায়ণা ব্রহ্মচারিণী। যৌবন এখনো নিঃশেষ হয় নি, গায়ের বর্ণ অতসী ফুলের মতন। লম্বা ছিপ ছিপে গড়ন। শান্ত সুন্দর মুখে চোখে কি যেন এক পুণ্যের প্রদীপশিখা প্রজ্বলিত হয়ে রয়েছে। বাড়ীর সবগুলো ছেলেমেয়ের তিনি ছোট মা, প্রতিবেশিনীদেরও। কর্ত্তামার পরে তিনি এখানকার গৃহিণী; পূজারিণী। এদের মণ্ডপেও শালগ্রাম শিলা বিরাজিত, তাঁর নাম দধিবাহন। ছোট মা হবিষ্যি ঘরে নারায়ণের ভোগ রান্না করেছিলেন, অন্য কাকীমারা কেউ দুধ জ্বাল দিচ্ছিলেন, কেউ বাটনা নিয়ে বসেছেন।

কর্ত্তামা মঙ্গলকে দক্ষিণ-দ্বারী ঘরে খাটের বিছানায় ঘুম পাড়িয়ে রেখে দাওয়ায় বসে তেল মাখছিলেন। মঙ্গলকে স্নান করানো হয়েছে, চোখে কাজল, কপালে টিপ।

আমি কর্ত্তামাকে লুকিয়ে পেছনো দরজা দিয়ে ঢুকলাম ঘরে, ঘুমন্ত মঙ্গলকে একটুখানি আদর করবার উদ্দেশ্যে।

কিন্তু ও কি? টিনের চালে কাঠের বাতার গায়ে, এ কি ভয়াবহ পরিবেশ। একটি নেংটি ইঁদুর প্রাণভয়ে ভীত হয়ে বাতা বেয়ে বেয়ে ছুটে পালাচ্ছে। তাকে তাড়া দিয়ে গর্জ্জন করছে প্রকাণ্ড এক গোখরো সাপ।

নিমেষের মধ্যে আমি মঙ্গলকে একটানে বুকে তুলে নিয়ে বাইরে এলাম।

ছোটমা যেন থালা-বাটি কি নিতে এসেছিলেন এ দিকে। সবিস্ময়ে আমার দিকে চোখ তুলে প্রশ্ন করলেন, "এ-কি তিলু, ঘুমের ছেলেকে তুলে কোলে নিয়েছিস কেন? ছোটদের কাঁচাঘুম ভাঙ্গাতে নেই।"

কুণ্ঠার সঙ্গে উত্তর দিলাম, "ঘরের বাতায় সাপ বেরিয়েছে, তাই।"

ছোট মা দরজায় উঁকি দিয়ে চেঁচিয়ে উঠলেন, "চালের বাতায় সাপ ইঁদুরের পিছু নিয়েছে। চাকরদের ডাক্ রে, লাঠি সড়কি নিয়ে আসুক।"

ঝি কালাব-কথা কালো উঠোনে ধান রোদ্রে দিয়ে ঘুরে ঘুরে দুই পায়ে নেড়ে দিচ্ছিল। সাপের উল্লেখে ভাইদের খবর দিতে দৌড়াল।

"মঙ্গল আমার ঘরে রয়েছে," ব'লে কর্ত্তামা তেল মাখা হাতে শিথিল গাত্রবস্ত্র সংবরণ ক'রে ঘরের দিকে যেতে গেলেন।

ছোট মা তাঁকে হিড় হিড় ক'রে টেনে আঙ্গিনায় নামিয়ে নিয়ে বললেন, "তিলু তাকে কোলে ক'রে নিয়ে গিয়েছে রান্নাঘরের বারান্দায়। ভাগ্যে মেয়েটা এসেছিল, তাই ছেলের প্রাণ রক্ষে হ'ল। তিলুর কাছে মঙ্গলকে আপনি যেতে দিতে ভালবাসেন না। আমরা যে যার কাজ নিয়ে মত্ত, আপনার নজর কম, তিলু হঠাৎ না এলে

আজ কি দশা হ'ত মঙ্গলের একবার ভেবে দেখুন ত ?"

কর্ত্তামা আর্ত্তনাদ করতে লাগলেন, আমার পোড়ার দশা, ছিল বিল শুকিয়ে গেল চালের বাতায় সাপ র'ল, দিনে-দুপুরে এমন কাণ্ড। তোমরা মনসা পুজোয় অনাচার করেছিলে ছোট বৌ; এখন তার ফল ফলছে। দুরন্ত ছেলে, অতটুকু ডিগডিগে মেয়ে থামাতে পারবে না ব'লেই মঙ্গলকে ওর কোলে দিতে আমি ভালবাসিনে। নইলে আমি কি জানি না মঙ্গলকে তিলু কত ভালবাসে।"

দেখতে দেখতে কাহার ও নমশূদ্রেরা এল সাপ মারতে। সকলের হাতে লাঠি সড়কি। নিড়ানোর কাজে দুইজনা মুসলমান মজুর বাগানের দিকে ছিল। তারাও এল পাঁচন কোদাল খন্তা নিয়ে। কিন্তু সাপ চালের মটকায়, ইঁদুরের পশ্চাতে। কারোর নীচে নামবার লক্ষণ নেই।

তার পরে মই আনা হ'ল খান-দুই, ঘরের ভেতরে যুদ্ধ বেধে গেল রুশ-জাপানের।

জ্যাঠাইমা রান্না ফেলে রেখে রন্ধনশালার বারান্দায় একখানা বড় পিঁড়া পেতে আমাকে বসিয়ে সস্নেহে চুমো খেয়ে আদর করলেন, "লক্ষ্মী মেয়ে, তুই আজ আমার মঙ্গলকে বাঁচালি'।"

মঙ্গল তখন আধ-ঘুমে আধ-জাগরণে আমাকে দুই হাতে জড়িয়ে ধ'রে ডাকল, "জিজি।"

কিন্তু জিজির কোলে মঙ্গলের আর ঘুম হ'ল না। সহসা আমার চোখে পড়ল এঁদের পূর্ব্বদ্বারী ঘরের গলা সমান উঁচু ডোয়ার ভেতর ইঁদুরের গর্ত্ত থেকে কি যেন মুখ বের করছে। মাটির ডোয়ায় ইঁদুরের গর্ত্তের অভাব নেই। বর্ষার পরে ডোয়া বেড়া এখনো লেপে-পুঁছে পরিষ্কার করা হয় নি। পুজার পূর্ব্ব থেকে এইবার আরম্ভ হবে গৃহসংস্কার।

আমি বললাম, "জ্যাঠাইমা, ওই দেখ, তোমাদের ডোয়ায় আর একটা ইঁদুর উঁকি ঝুঁকি দিচ্ছে।"

জ্যাঠাইমা ক্ষণকাল সেই দিকে চেয়ে চেয়ে বললেন, "ও তো ইঁদুর নয়, সাপ।"

এর পরে বাড়ীতে সুরু হয়ে গেল লঙ্কাকাণ্ড। ঘরে সাপ, বাইরে সাপ।

মুসলমান চাকররা কোদাল নিয়ে এগিয়ে এল বাইরে। তারাই মই বেয়ে উঠে ঘরের সাপকে সড়কি দিয়ে বিঁধিয়ে আধমরা ক'রে নামিয়ে এনেছে উঠোনে। তখনো তার গর্জ্জন ফোঁসফোঁসানি থামে নি।

ধুপ ধুপ কোদাল পড়তে লাগল ডোয়ার গায়ে। গর্ত্ত মেঝে অবধি সারিত সুড়ঙ্গের শেষ প্রান্ত খুঁড়ে মজুররা উল্লাসে জিগির দিতে লাগল। তারা সাপ পেয়েছে। শুধু সাপ নয়, সাপের ডিম ঝাঁকাখানিক।

সাপ মরল, ডিম বের হ'ল। হালচে-গাঁথা ডিম গুলো ফুটে সাপ বেরোবার উপক্রম হয়েছে। দুই-তিনটে ডিম ভাঙ্গা-মাত্র ছোট ছোট লিকলিকে সাপের বাচ্চা ফণা তুলল।

মুসলমানদের নাকি ধর্ম্ম, সাপ দেখলেই তাকে মারতে হবে, না মারলেও একটা ঢিল ছুঁড়তে হবে। মজুররা মহা বিক্রমে সর্প ধ্বংসে মনোনিবেশ করতে লাগল।

গোলমাল শুনে ঠাকুমা এলেন এবাড়ীতে। কর্ত্তামার তখনো স্নান হয় নি। তিনি তৈলার্ত্ত দেহে কেঁদে উঠলেন, "বড়-বৌ, দেখ আমার কি বিপদ, ঘরে সাপ বাইরে সাপ, তোমার তিলু আজ আমাদের রক্ষে করেছে, মঙ্গলকে বাঁচিয়েছে। ও না দেখলে আমাদের কি দশা হ'ত? পুরুষ-শূন্য বাড়ীতে চাকর-বাকর নিয়ে বাস করি, জলের পাতিলে হাত দিয়ে থাকি। আমাদের একমাত্র ভরসা তোমরা।"

ঠাকুমা সান্ত্বনা দিলেন, "সাপ ত মারা পড়েছে কাকীমা আর কাঁদবেন না। আজ আমাদের বাড়ীতেও ত দু-দুটো সাপ মারা হয়েছে। সাপের দেশে কোন্ বাড়ীতে সাপ নেই বলুন?"

"আছে সকল বাড়ীতে, জানি বড়-বৌ, কিন্তু এমন হালচে-গাঁথা ডিম, দিনে-দুপুরে চালের বাতায় সাপ বেড়ানো আর দেখি নি।"

"আমাদের চোখে পড়ে নি তাই, নইলে আশ্চর্য্যের কিছু নেই। আমাদের জোর বরাত, ডিমগুলো ফোটার আগে পুড়িয়ে ফেলা হ'ল। নইলে ঘর-দোরে সাপের রাজত্বি হয়ে যেত। বাড়ীতে মনসা-মঙ্গল গান দিন, ঘরে ঘরে হলুদ পোড়ান। ভয় নেই।"

কর্ত্তামার ত্বরা সইছিল না। তিনি ভীতত্রস্ত হয়ে তখনই লোক পাঠালেন ভাসান যাত্রাওয়ালাদের কাছে। জেলেপাড়া ও সাহাপাড়ার কয়েকটি লোক মনসামঙ্গল গান করে। মনসামঙ্গল গায়কের পয়সা নিতে নেই। ভালবেসে কেউ কাপড়-জামা দিলে নিতে পারে। গান শেষে পেট পুরে তাদের খেতে দিলেই তারা খুশী। কোন বাড়ী থেকে তাদের গান গাইবার আহ্বান এলে যেতে হয়। ওজোর আপত্তি করা বারণ।

অন্তঃপুরেই ভাসান যাত্রার আসর সাজানো হ'ল। পূজার সময় যে সব উজ্জ্বল আলোকে বাড়ী আলোকিত হয়, ঠাকুরদাদা সেই সমস্ত আলো এনে বাঁশ পুঁতে বাঁশের গায়ে আলোর ব্যবস্থা ক'রে দিলেন। চাটায়ের ওপরে

সতরঞ্চি পাতা হ'ল। যাত্রাদলের কুড়িটি লোকের খাবারের ব্যবস্থা করা হ'ল। সেকালে কুড়িটি লোকের খাবারের আয়োজনে কারুকে বেগ পেতে হয় নি। এক মাছ ও দুধের যোগাড়। আমাদের তিন গোরুর সমস্তটা দুধ ঠাকুমা পাঠিয়ে দিলেন পায়েস রাঁধতে। ইলিশ মাছের নৌকা থেকে ইলিশ মাছ আনা হ'ল পাঁচ কুড়ি। আপদে-বিপদে উৎসবে-আনন্দে আমাদের দুই বাড়ী এক হয়ে যেত।

সন্ধ্যার পরে গানের আসর বসল। ঢোল করতাল বেহালা বাজতে লাগল ঝমর ঝমর। দলে দলে লোক এসে জমায়েত হ'ল। পল্লীগ্রামে গান-বাজনা হ'লে আর রক্ষা নাই। ভালমন্দের বিচার বোধ নাই। যারা জীবনে থিয়েটার দেখে নি, ছায়াচিত্রের নামও শোনে নি, তাদের কাছে যাত্রা ভাসান রামায়ণ আশাতীত অপূর্ব্ব সম্পদ্।

গেঁয়ো ভাসান যাত্রা হ'লেও এদের সাজ-পোশাক ছিল কিছু কিছু। গ্রামের কৃতী যাঁরা তাঁদেরই দান।

প্রথমে মর্ত্ত্যে পূজা প্রচলিত হবার জন্যে মনসার আবেদন শিবের নিকটে। তার পরে চাঁদপত্নী মেনকার স্বপ্ন বৃত্তান্ত। চাঁদ সদাগরকে অনুনয়-বিনয়। চাঁদ সদাগরের ক্রোধ ও গর্জ্জন-তর্জ্জন—

"যে হাতে পূজিছি আমি শিব দুর্গা ভবানী,
সে হাতে পূজিতে নারি, ব্যাঙখেকো কানী।"

পরের অধ্যায় যেমন সকরুণ, তেমনি বিলাপপূর্ণ। মেনকার সাত পুত্রের মৃত্যু, সাত তরুণী বধূর মর্ম্মান্তিক কাকুতি। সপ্তডিঙ্গা মধুকরের নিমজ্জন। নিদারুণ দুঃখে-শোকে চাঁদ সদাগরের অটলতা।

লক্ষ্মীন্দরের ও বেহুলার জন্ম, বয়োপ্রাপ্তি। বেহুলার মায়ের সাবধানতা,—"ও পথে যেওনা বেউলে, বেউলে আমার মা, চাঁদের ব্যাটা লক্ষ্মীন্দর দেখলে ছাড়বে না।"

তার পরে বিয়ে, লোহার বাসর, কালনাগিনীর দংশন। জনতা চোখের জলে ভাসতে লাগল।

মৃত স্বামীকে নিয়ে বেহুলা অজানা অনন্তে খরস্রোতে কলার ভেলায় ভেসে গেল। বনের পশুপক্ষী লতাপাতা নদীর ঢেউ কাঁদছে তার দুঃখে।

সেই গলিত শবের হাড় ক'খানা বস্ত্রের ভেতরে লুকিয়ে বেহুলা উপনীত হ'ল নেত্য ধোপানীর ঘাটে। নেত্যর সঙ্গে সম্বন্ধ পাতান হল মাসী বোনঝি। নেত্য দেবতাদের কাপড় কাচে। বেহুলা মাসীর হাতের কাজ কেড়ে নিয়ে নিজে কাপড় কাচা সুরু করল।

"নেত্য ধোপানী কাপড় কাচে ক্ষারে আর বোলে,
বেউলে সুন্দরী কাপড় কাচে শুধা গাঙের জলে।"

রজনী গভীরের দিকে অগ্রসর হচ্ছে। কৃষ্ণপক্ষের রাত্রি, প্রথম যামে অন্ধকার, তার পরে প্রফুল্ল জ্যোৎস্না নীলাকাশ থেকে ঝ'রে পড়ছে বনে বনান্তরে। শরতের আসন্ন আগমনে জগৎ আনন্দে হাসছে, ভরানদী হাসছে কাশের চামর দুলিয়ে, চঞ্চল চপল ঢেউগুলি শিশুর মতন হাসছে তটের গায়ে ছলাৎ ছলাৎ শব্দে।

এত হাসি পুলকের মধ্যে চাঁদ সদাগরের শোকের পুরীতে হাসির আনন্দের প্রবাহ ব'য়ে গেল খরতর বেগে।

বেহুলা দেব-সভায় নৃত্য দেখিয়ে মোহিত ক'রে বর মেগে এনেছে চাঁদ সদাগরের সবক'টি সন্তানের জীবন।

শ্রোতারা এতক্ষণে চোখ মুছে উল্লাসে হরিধ্বনি দিতে লাগল। মেয়েরা সুউচ্চস্বরে 'উলু-উলু' রবে চার-দিক্ সচকিত ক'রে তুলল। গান থেমে গেল কিন্তু শরতের শীতল বাতাসে মিশে রইল পল্লীর মেঠো স্বরের মূর্চ্ছনা।

হীরাসাগরের বক্ষে সাপে-কাটা কত মড়ার শব ভেলায় ভেসে যায় বর্ষাকালে, কিন্তু এযুগের কোন বেহুলা তাদের জীবন ফিরিয়ে আনতে পারে না।

পালপাড়া থেকে দেউড়িকাকা এসেছে আমাদের প্রতিমা দোমেটে করতে। দেউড়িকাকার নাম শিবচরণ, তার সঙ্গে এসেছে তিন ছেলে দুর্গাচরণ, তারাচরণ ও কালীচরণ। আমাদের এদিকে প্রতিমা প্রস্তুতকারকে দেউড়ি বলে। এরা বহু পুরুষ হ'তে এ-বাড়ীর প্রতিমা গড়ছে, ঠাকুরদার পরে বাবা, তার পরে নাতি। বংশের ধারা চ'লে এসেছে ধারাবাহিক রূপে।

আমাদের প্রতিমা বড়, পূর্ব্ব হ'তে আরম্ভ করতে হয়, নইলে শুকায় না।

মণ্ডপের বারান্দায় কাঠামোর ওপরে বাঁশ খড় মাটি লেপে মূর্ত্তির একটা আকার ক'রে রাখা হয়েছিল। এবার দোমেটেয় তাদের হাত পা মুণ্ডের সমাবেশ হবে। তার পরে পূজার সমকালে 'চিত্রির'।

দেউড়িকাকা আমাকে ডাকে 'মাসা' ব'লে, কেদারকে 'মামা', আমরা দুই ভাই-বোন মণ্ডপের বারান্দায় উপস্থিত হ'লাম।

কেদারের বয়েস কম হ'লে কি হবে, ওর প্রকৃতিটা যেন শিল্পীসুলভ। ও গঠন দেখতে খুব ভালবাসে, তাতেই আনন্দ। আমি এক জায়গায় বেশীক্ষণ আবদ্ধ হয়ে থাকতে পারি না। আমার চঞ্চল চিত্তকে অহরহ টানতে

থাকে চির চপল রূপময় হীরাসাগর, কাননকুন্তলা বনশ্রী, পশুপক্ষী।

দেউড়িকাকা প্রত্যেক পূজায় প্রতিমা নির্ম্মাণের সময় আমাকে ছোট-খাটো একটা ক'রে দেবীমূর্ত্তি উপহার দিয়ে থাকে। আমার ঘরের তাকে জমেছে অনেকগুলো মাটির মূর্ত্তি। কেদার এতদিন ছোট ছিল তাই তার ভাগ্যে জুটেছিল হাতী ঘোড়া কুকুর বেড়াল। এখন সে বড় হচ্ছে, এবার থেকে সেও পাবে দেবদেবী।

দেউড়িকাকা কেদারকে সস্নেহে জিজ্ঞাসা করল, "মামা, এবার পূজোয় তুমি কি নেবে? মাসী, তোমার কোন দেবতা দরকার?"

আমি বললাম, "গণেশ।"

কেদার চাইল গোপাল ঠাকুর।

প্রার্থনা শেষ ক'রে আমি সেখান থেকে কেটে পড়লাম। আমার আবার একটা নূতন কাজ হয়েছে পূজার পাঁঠা পালন। এখন থেকেই বলির পাঁঠা সংগ্রহ করা হচ্ছে। আমাদের দুর্গাপূজায় বলি দেওয়া হ'ত সাতটা পাঁঠা। কালি পূজায় একটা পাঁঠা। খুঁতশূন্য সুলক্ষণ পাঁঠা বাছাই ক'রে কিনতে হয় পূর্ব্ব থেকে। প্রতিবার পূজার আগে ঠাকুরদাদার সঙ্গে ন'ঠাকুরদার বলি নিয়ে বেধে যায় ছোটখাটো একটা খণ্ডযুদ্ধ। ন'ঠাকুরদাদা কথক। তাঁর গলায় তুলসীর মালা, দিন-রাত হরিনামে তন্ময়। তিনি বলির বিরোধী। রাগ ক'রে কতবার পূজায় যোগ দেন নাই। কিন্তু ঠাকুরদাদা কিছুতেই বলি বন্ধ করেন নি। তাঁর এক বুলি, পূজার অঙ্গহানি কখনও হ'তে দেবেন না।

এখন ন'ঠাকুরদাদা পূজায় বাড়ী আসেন বটে কিন্তু বলির সময় লাহিড়ীবাড়ীর কাছারিঘরে আলবোলায় নল মুখে দিয়ে গম্ভীর হয়ে ব'সে থাকেন।

বলি আমারও দুচোখের বিষ। পাঁঠাগুলোর ওপরে মমতায় বিগলিত হয়ে আমি তাদের তত্ত্বাবধান করি। লুকিয়ে লুকিয়ে তাদের চাল খেতে দেই। ঘণ্টায় ঘণ্টায় জল খাওয়াই। চাকরদের দিয়ে কুলের ডাল কাটিয়ে তাদের কুলের পাতা মুখের কাছে ধরি। ছাগলে কুলের পাতা খেতে খুব ভালবাসে। তারা এ-পৃথিবীর আলোয় বেশীদিন থাকতে পারবে না, বলশালীরা দুর্ব্বলকে হত্যা করবে তাদের দুঃখে আমার প্রাণ কাঁদে হায় হায় ক'রে। পাঁঠাদের গায়ে মশা-মাছি বসতে দেই না, আমি তাদের গায়ে আঁচল বুলিয়ে দেই। ঠাকুমা রাগ ক'রে আমায় বলেন 'পশুমাতা'।

যত দিন যায় পাঁঠার সংখ্যা তত বেড়ে চলেছে, চরের রহিম সর্দ্দার দুটো পাঁঠা এনে দিয়েছে। পূজার সময় সে নাকি কলাপাতা, সোলাকচু, মানকচু, কচুরমুখী এনে দেবে। ঠাকুরদাদার ঔষধে রহিম এখন সেরে গেছে। আসে যায়। ও নাকি ডাকাত, ডাকাত না ছাই, সাধারণ একটা মানুষ, তবে ভারি জোয়ান। পাঁঠাগুলোকে মেঠেলের পাড়ে চরতে দিয়ে আমি বসেছিলাম আম গাছের ছায়ায়, এমন সময় অন্নদা কোথা থেকে ছুটে এসে মাটিতে লুটিয়ে চিৎকার ক'রে কাঁদতে লাগল, "ও রে ছিনাথ রে, তুই ক্যামনে চলি গেলি রে? আমার দুদের ছাওয়ালের কি দশা ক'রে গেলি?" বুড়ো দিদি ব্রজদিদি ছুটে এল কি হ'ল কি হ'ল ব'লে।

যা হবার তাই হয়েছে,—মাস দুই হল শ্রীনাথ, পেমোর চল্লিশ বছর বয়স্ক স্বামী গিয়েছিল ব্যাপারীদের নৌকায় মোকামে। দিন পঁচিশ হ'ল কলেরায় তার মৃত্যু হয়েছে। খবর এসেছে।

পেমো কচি কচি ঘাস তুলে পাঁঠাদের খাওয়াচ্ছিল। মায়ের কান্নায় সচকিত হয়ে ছুটে গেল মায়ের কাছে।

মা দুই হাতে মেয়েকে বুকে জড়িয়ে ধ'রে সে কি আর্ত্তনাদ!

নমঃশূদ্র পাড়ার বয়স্কা মেয়েরা এসে বললে, "আ-লো অন্নদা, গুধা গুধা ডুকরে আর কি করবি? এহন ম্যায়াডারে নয়ে গাঙের ঘাটে যা, শাঁখা ভেইঙ্গে সেঁদুর মুছ্যা তেউনি পরায়ে দে। বেদবার নেয়ম কম্ম করা। ছিনাথের গতি হোক।"

গোলমালে ঠাকুমা এলেন ঘাটে। সমস্ত শুনে বললেন, "ওইটুকু বাচ্চা মেয়ে, ওর আবার নিয়ম কাণ্ড কিসের? দু'বছরের ঘুমন্ত মেয়েকে কোলে নিয়ে যার মা শ্রীনাথের সাথে সাতপাক ঘুরেছিল, তার বিয়ে বিয়েই হয় নি। পেমো বড় হ'লে ওর সত্যিকার বিয়ে দেওয়া দরকার।"

অন্নদার মাসী ক্ষ্যামদা সবিস্ময়ে গালে হাত দিল, "হেই মা-ঠান কইচো কি? হেন্দুর ম্যায়ার একবারের পর আর বিয়ে হয় না। তবে চ্যাংড়া পোলা থাকতি পারবি মরদের কাছে; ঘর বসতের নেগে। নামো হাতে কিচ্ছু দিতি নারবে। চিকণ পাইড় কাপড় পরতি হোবে। আর ছাওয়াল পাওয়াল হোলে রাখতে পারবি নে। আমাগো তো ডোম ডোকলার ঘর লয় যে বিদ্বার নিকা দিব? ছিনাথের ছেরাদ করতি হবে পেমোরেই, ঠাকুরমশাই পাঁতি দিইচে ওরে নেম কর্ম্মে রাখতি।"

অন্নদা চিৎকার ক'রে কাঁদতে লাগল, "ও রে ছিনাথ, তুই কনে গেলি, আমার সর্ব্বনাশ কইর‍্যা? মুই কি দিইয়া

ছেরাদ করামু? কি দিইয়া জাতেরে খাইতে দিয়া ম্যায়াডারে শুদ্দ করমু? তুই একলা মরস নি, আমাগরে মাইর‍্যা রাখ্যা গেইচিস।"

ঠাকুমা বললেন, "কাঁদিস নে, অন্নদা, কেঁদে লাভ নেই। শ্রাদ্ধে আর জ্ঞাতিগোষ্ঠী খাওয়াতে যা দরকার আমরাই দেব। তোদের জাতের ঠাকুরমশায় যে পাঁতিই দিক না কেন, আমরা বামুন, আমাদেরও পাঁতি আছে। মাস ত কেটেই গেছে, আর অশৌচের বাকী পাঁচদিন। এ কবেক দিন পেমো আমাদের নারায়ণের ভোগ খাবে। দেখি, ঘরে নতুন কাপড় চাদর কি আছে, চান ক'রে তাই পরুক।"

শ্যামদা প্রসন্ন হ'ল, "হেই মা ঠান, যে বিধান দ্যাছে তাই করাও ম্যায়াডার, ছিনাথের কুল ছেল উঁচা, শুদ্দ ক'রে ছেরাদ করতি হোবে।"

এত দুঃখের মধ্যেও বড়দিদির মুখের আগল নেই, সে খন খন ক'রে উঠল, "কুল দেখে দিছিলি বিয়ে কুল ধুয়ে কি খাব; কুলের মুখে খড়ের নুঁড়া আগুন জেলে দেব।"

সন্ধ্যার আবছা অন্ধকারে বুড়োদিদির ঘরের পেছন থেকে চাপা স্বরে পেমো ডাকল, "ঠাকুজ্জি, আমি আইচি।"

আমি বুড়োদিদির দাওয়ায় চাটাইয়ে ব'সে ব্যাঙ্গমা ব্যাঙ্গমীর গল্প শুনছিলাম। পেমোর কণ্ঠস্বরে চমকে ছুটে গেলাম, ঠাকুমা তাঁর ভাণ্ডার হ'তে একখানা বিলাতি উড়ানী-চাদর পেমোকে পরতে দিয়েছিলেন। অতটুকু মেয়ে থানের কাপড় গায়ে শুখোতে পারবে না। তাই চাদরের ব্যবস্থা করেছিলেন।

পেমোর দিকে চেয়ে আমার চোখ জলে ভ'রে গেল। এ কি অত্যাচার, আচারের নামে অনাচার। তার নাকে ছিল পিতলের একটা ফুল ও নোলক, তা খুলে নেওয়া হয়েছে। হাতের শাঁখা ও কাঁচের চুড়ি ভেঙ্গে দেওয়া হয়েছে। সারা গায়ে সাদা চাদর জড়ানো, এ আবার কে আমার অপরিচিত মূর্ত্তি? সে শ্যামবর্ণা উজ্জ্বলনয়না হাস্যমুখী বালিকা কোথায় যেন হারিয়ে গেছে। আমি কোন কথা কইতে পারলাম না, নত চোখে চুপ ক'রে রইলাম।

সন্ধ্যা ঘন হয়ে আসছে, বাতাসে পাতা ঝরছে ঝর ঝর ক'রে। আমাদের পাশে শেফালি গাছের ডালে ডালে থোকায় থোকায় শেফালি ফুটে সৌরভে আমোদিত ক'রে তুলেছে। মালীপাড়া থেকে গ্রাম্য কীর্ত্তনের সুর বায়ুহিল্লোলে বয়ে আসছে, "ধূলোখেলা খেলব না আর, আমার হরিনামে মন মজেছে। চায় না মন অপর খেলা—জানি না তায় কি সুখ আছে।"

সেই গানের সুরে আমার চমক ভাঙ্গল, আমি জিজ্ঞাসা করলাম, "পেমো, আজ তোকে ভাত খেতে দেয় নি?"

"দিইছেল, তোমাদের ঠাকুরের ভোগ কলার পাতায় ক'রে। আত্তে নাকি কিছুটি খাইতে নেই, মরে মাসী কয় তা হ'লে ছিনাথের গতি হইবে না। খাইতে না দেয় না দিক, হাতখানা আমাগো ইঁটা দিয়ে শাঁখা চুড়ি ভাঙ্গে ভাঙ্গে কাইটে দিইচে।" বলতে বলতে চাদরের ভেতর থেকে পেমো তার রিক্ত হাতখানা বের ক'রে আমার চোখের সামনে প্রসারিত করল।

এখানে কেউ নেই, অন্ধকারে কারুর দেখবারও সম্ভাবনা নেই, তাই আমি জাতির গণ্ডী ভুলে সমবেদনায় বিগলিত হয়ে পেমোর হাতখানা হাতে তুলে নিয়ে দেখতে পেলাম তার ক্ষত বড়ই।

পেমো সভয়ে স'রে গেল আমার সঙ্গ হাত দূরে—"আমারে ছুঁইতে নাই ঠাকুজ্জি, আমাগো অশুচ, ছুঁইলে তোমাগো পাপ হইবে। ক্যাবল হাত কাটে নি। সিঁথির সিঁদুর গাঙের বালু দিয়া ঘইস্যা ঘইস্যা মুইছা দিবার কালে চাল চামড়া উইঠ্যা গ্যাচে।"

বললাম, "আমার কাছে ওষুধ আছে, তাই লাগালে রাতের ভেতর সেরে যাবে কাটা জালা।"

ঠাকুমা জপে বসেছেন, মা তুলসীতলায় প্রদীপ দিয়ে প্রণামান্তে ফিরে যাচ্ছিলেন রান্নাঘরের দিকে। আমাদের সাড়া পেয়ে এগিয়ে এলেন—"ও কে? পেমো নাকি? তোরা সন্ধ্যে বেলা এ কানাচে কেন? যা, ভেতরে দাওয়ায় গিয়ে বোস গে। মা গো, একরত্তি মেয়েটার কি বেশভূষা ক'রে দিয়েছে? এ ক'টা দিন গেলে আমি তোকে হাতভরা কাচের চুড়ি পরিয়ে দেব। এ বেলা তোকে বুঝি কিছু খেতে দেবে না? আচ্ছা, আমি তোকে খাবার দিচ্ছি। তোরা এখানে আর থাকিস নে। সন্ধ্যা বেলা নতুন বেরোবার সময়।"

রাতে সাপের নাম করতে নেই, তাই মা 'লতা' বললেন। আমি বললাম, "সেদিন ভাসান যাবার শেষে না ওস্তাদ রোজা আমাদের দুই বাড়ীতে ধূলো পড়ে ছিটিয়ে দিয়ে গেছে মা, বলে গেছে আর সাপ বেরোবে না?"

"বলুক, তবু সাবধানে থাকা দরকার। রাতে নাম

করতে নেই, আবার নাম করলি? তোরা ভেতরে যা, আমি আসছি।" মা চ'লে গেলেন।

পেমো রন্ধনশালার কোণে ঢেঁকিশালায় গিয়ে মেঝেয় ব'সে পড়ল। আমি বসলাম ঢেঁকির ওপরে।

পেমো কথা বলে না, চুপ ক'রে ব'সে থাকে, আমি তাকে সান্ত্বনা দিতে লাগ্‌লাম, "শ্রীনাথের শ্রাদ্ধ হয়ে গেলেই মা তোকে চুড়ি দেবেন। আমি তোকে শাড়ী কাপড় দেব হ'খানা। দাদামশায় আমায় অনেক শাড়ী দিয়েছেন। তার থেকে দেব। পুজোয় ঠাকুরদাদাও দেবেন। তোর ঢের শাড়ী হবে।"

পেমো সখেদে উত্তর দিল, "শাড়ীখ্যান দিবা ঠাকুর্জ্জি, শাঁখা সিঁন্দুর যে আর জনমভোর ছুঁইতে নারব। দোলের মেলায় মুই বাইছে বাইছে শাঁখার বাহারে বালা কিনিছিলাম, ভাঙ্গি দিলে সগলে মিলে। কপাল জুড়্যা আর সিঁদ্‌রের ফোঁটা দিতি নারব ঠাকুর্জ্জি।"

স্বামীর শোকে নয়, শাঁখা-সিঁদুরের দুঃখে পেমো দীর্ঘ-নিশ্বাস মোচন করল। হাঁ, মেয়েটা ছোট্ট কপাল জুড়ে বৃহৎ একটা সিঁদুরের টিপ প'রে থাকতে খুব ভালবাসত। সেই প্রভাত সূর্য্যের মতন টিপটি না পরলে পেমোর মুখ-খানা যেন মানাত না।

আমি তাকে কি বলি? অনেক ভেবে চিন্তে বললাম "তোর যেন সিঁদুর পরা মানা হ'ল, এবার থেকে কাঁচ-পোকার টিপ পরিস, আমাদের বাড়ীতে ঢের কাঁচপোকা আছে। আমি মাকে দিয়ে টিপ কাটিয়ে দেব। মা ধুপের আঠা ক'রে দেবেন, খ'সে যাবে না।"

"তা হ'লে তুমিও কাঁচপোকা কপালে দিবা, ঠাকুর্জ্জি।"

"না, আমার ভাল লাগে না টিপ পরতে, সাজ-পোশাক করতে।"

পেমো মুখ তুলে কি যেন বলতে গিয়ে থেমে গেল, মা এলেন একঘটি জল ও একখানা পিতলের থালায় দুধ চিঁড়ে কলা বাতাসা নিয়ে। পেমোর সামনে থালা ধ'রে দিয়ে বললেন, "ঘটির জলে হাত ধুয়ে তুই আগে খেয়ে নে পেমো। খেয়ে দেয়ে ঘটি থালা ধুয়ে দিয়ে বাড়ী যেয়ে শুয়ে থাকগে। এখান থেকে যে খেয়ে গেলি তা তোর ক্ষ্যামদা দিদিকে বলিস নে। ওর 'নিজের বেলায় আঁটি-সাঁটি, পরের বেলায় দাঁত কপাটি।' বড় কঠিন প্রকৃতির মেয়েমানুষ। না খেতে দিয়েই মেয়েটাকে মেরে ফেলতে চায়।"

পেমোর বোধহয় খুব ক্ষিধে পেয়েছিল, সে মার কথার জবাব না দিয়ে নীরবে দুধ চিঁড়ে গব গব ক'রে খেতে লাগল।

কয়েক দিন পরে মিটে গেল শ্রীনাথের ব্যাপার। নদীর ঘাটে কলার খোলায় চাল গুড় কলা মেখে পিণ্ড দান ক'রে পেমো শুদ্ধ হয়ে গেল। স্বামীর প্রতি স্ত্রীর কর্ত্তব্য পালন করা হ'ল। ওদের সমাজের লোক কম নয়, কে করবে রান্নাবাড়ার হাঙ্গামা। বিশেষতঃ আনন্দ উৎসব নয়। শোকের ব্যাপারে যেন তেন রূপে মাত্র নিয়ম রক্ষা করা। তাই স্বজাতি মাতব্বরদের পরামর্শে অন্নদা জামাতার পারলৌকিক কাজে দই-চিঁড়া ফলারের ব্যবস্থা করল। ঠাকুমা বহন করলেন যাবতীয় ব্যয়।

নিয়মভঙ্গের পরে ভবানীপুর থেকে আনীত দিদিমার দেওয়া কতগুলি লাল নীল কাঁচের চুড়িতে পেমোর শূন্য প্রকোষ্ঠ পরিশোভিত করা হ'ল। মেয়েটা লাল রং-এর পরম ভক্ত, সে মার কাছ থেকে চেয়ে নিল আমার ন হাতি লালপাড় শাড়ী। দাদামশায় ও দিদিমা অনেক-গুলো শাড়ী ও চুড়ি দিয়েছিলেন। তার ভাগ পেয়ে অনাথা মেয়েটা কৃতার্থ হয়ে গেল। কিন্তু এ প্রাপ্তিতেও তার যেন তেমন পুলক নেই, জন্মের মতন তার শাঁখা-সিঁদুরের অধিকার রইল না, এ দুঃখ সে মুহূর্ত্তেও ভুলতে পারছিল না। সেই মড়ার উপরে অবিরত খাঁড়ার ঘা দিচ্ছিল ক্ষ্যামদা। লাল চুড়ি বিধবার হাতে রাখতে নেই, লাল পেড়ে শাড়ী পরতে নেই, পাপ হয়; খুলে ফেল। খালি হাতে থানের ধুতি পরে থাক। তবে না মানান্ত হবে।

ঠাকুমা ক্ষ্যামদাকে ডেকে ব'কে দিলেন, তাদের জাতির পাঁতি সিকেয় তুলে রাখতে বললেন। বামুনের মেয়ের শাসনে ক্ষ্যামদা ভয়ে চুপ ক'রে গেল।

দিন যায়, পূজার দিন প্রায় সমাগত হতে থাকে। মাঠে ঘাটে বর্ষার জল কাদা শুকিয়ে গেছে। বাদল-স্নাত প্রকৃতি শরতের সোনার সাজে সেজে ঝলমল করছে। স্থলপদ্ম ফুলের গাছে পাতা দেখা যায় না, ফুলে ফুলে ছেয়ে গেছে। জবা গাছগুলো আপাদ মস্তক লালে লাল হয়ে হাসছে। অপরাজিতা লতা নীল ফুলে ভ'রে গেছে। অতসী হলুদে ছোঁপান শাড়ী পরেছে। বনতলে শিউলি ফুলের গালিচা পাতা। বিলের বুকে রাঙ্গা ও সাদা পদ্মের সমারোহ। গৃহে গৃহে পূজার আয়োজন ও উদ্দীপনা।

পূজার সবগুলি বলির পাঁঠা কেনা হয়েছে। তাদের সঙ্গে একটি মোষ। ঠাকুরদাদার কাছে জ্যাঠামশায় একটা মহিষের কথা লিখেছেন। তাঁর না কি মানত আছে, তিনি নিজে হাতে মোষ বলি দেবেন। এর

আগেও তিনি মোষ বলি দিয়েছিলেন, কিন্তু আমি তা দেখি নি। যে পাঁঠা কাটা দেখতে পারে না, সে দেখবে মোষ বলি? বলির পশু দেখলেই আমার বুকের মধ্যে যেন কেমন কেমন করে।

পাঁঠার পালকে আমি রোজ চাল খেতে দেই, সামনে জলের পাত্র ধরি। তারা আমাকে খুব ভালবাসে। দেখলেই লেজ নেড়ে কান নেড়ে এগিয়ে আসে 'ম্যা—ম্যা' ক'রে। যত দিন এগিয়ে আসে, আমি আর ওদের দিকে চাইতে পারি না। মোষটা তার ঈষৎ লাল দুই চোখ মেলে চেয়ে থাকে মুখের দিকে। বেচারা জানে না, ওর দিন ফুরিয়ে আসছে। এই বিশাল বিরাট্ পৃথিবীতে যেখানকার যা তুচ্ছতম জিনিষটুকুও পর্য্যন্ত প'ড়ে থাকবে, থাকবে না শুধু ওই ক'টি প্রাণী।

ছিরু মণ্ডলের বৌ ও মেয়ে আমাদের বাড়ীতে পূজোর ভোগের চাল তৈরি করছে। সারাদিন ঢেঁকিতে পাড় পড়ছে ধুপ ধুপ। সময় সময় ক্লান্ত হয়ে কাঁঠাল গাছের ছায়ায় জিরিয়ে নিতে ব'সে কেঁদে ওঠে, "ও রে মা দুরগ্যা, এবার আমাগো কি দশা দেখনার নেগে আনিছ? কুমীরে সর্ব্বনাশ করিছে। ওরে বাবা কুমীর, তর মনে এই ছেল?"

অন্নদা কাজের ফাঁকে ফাঁকে আর্ত্তনাদ করে, "ও রে ছিনাথ, তুই কেনে আমাগো ম্যায়াডারে এমতি নিজলা নিফলা কর্যা গেলি? অরে লখ্যা সারা জনম মুই কিমতে কাটাইমু?" মার বিলাপে মেয়ে শুধু চেয়ে থাকে মায়ের দিকে, কথা বলে না। ও যেন সাধারণ হতে সুদূর দূরান্ত হয়ে গেছে। খেলাঘরে আর ওকে মানায় না, সেই জন্যেই পেমো খেলা ভুলে গেছে।

বাড়ীতে আমি থাকতে পারি না। এই রোদন বিলাপ ও পশুগুলোর আমার প্রতি বিশ্বাস নির্ভরতা সইতে পারি না। হীরাসাগরের তটভূমিতে বিচরণ ক'রেই আমার অধিকাংশ সময় কেটে যায়।

হীরাসাগরের তটরেখা থেকে জল অনেকখানি নেমে গেছে। তীরের কাশগুচ্ছ শুভ্রবেশে চামর বীজন করছে শারদলক্ষ্মীকে। বনশ্রীর কি অপূর্ব্ব লাবণ্য! ওপারের শ্যামল ধানের ক্ষেত্রে হরিদ্রা আভা বিকিরণ করছে। পাকা ধানের ঝমঝম নূপুর ধ্বনি এপারে বয়ে আনে শরৎ সমীরণ। কোথাও সরিষা ফুলের কাঁচা সোনা রং-এর আচ্ছাদন বিস্তার ক'রে রেখেছে মাঠের পরে মাঠ।

নদীর বক্ষে নৌকার বিরাম নেই। ভাসমান নৌকার কোনখানা পাল তোলা, কোনখানার পাল গুটান। ধান চাল নারিকেল বোঝাই অতিকায় মহাজনী নৌকাগুলি ধীর মন্থর গতিতে মাল বয়ে নিয়ে যাচ্ছে বন্দর থেকে আর এক বন্দরে। বিরাট দাঁড়ের টানে বিপুল জলরাশি আলোড়িত আন্দোলিত হচ্ছে। ঢেউ ভেঙে পড়ছে খণ্ড খণ্ড হয়ে। ঢেউয়ের মাথায় ফেনপুঞ্জ, হীরকের দ্যুতি। তটের বালুকণায় হীরকচূর্ণ ঝিকমিক করে। তরঙ্গে তরঙ্গে হীরার দীপ্তি। একবার জ্বলে, আবার তলিয়ে যায়।

বুড়ো বটগাছের গুঁড়িতে ব'সে আমি চেয়ে থাকি জলের দিকে। গভীর জলে ছায়া ফেলে নীলাকাশের গা ঘেঁষে ঝাঁকে ঝাঁকে উড়ে যায় বক হংস। হীরাসাগর মুখর হয় তাদের কলগুঞ্জনে। গাং শালিকেরা জল ছুঁয়ে ছুঁয়ে 'চিক্ চিক্' রবে শিকার করে। নদীর জলে ভেসে যায় দল দাম পাতা লতা। কত লোক স্নান করতে আসে, মাটির কলসী ভরে জল নিয়ে ফিরে যায় ঘরে। কেউ কাপড় কাচে, বাসন মাজে। চাষে গান গায়, আমি ব'সে ব'সে অনিমেষে নিরীক্ষণ করি।

ঠাকুরদাদার কাছে চিঠি এসেছে জ্যাঠামশায় মামান তাঁদের মেয়ে উমাতারাকে নিয়ে কলকাতা প্রথমে আসবেন। তার পরে সকলে একত্রিত হয়ে রওনা দেবেন এখানে।

রাবণের গোষ্ঠীতে বাড়ী ভ'রে যাবে। এতবড় বাড়ীতে শোবার জায়গা কুলোবে না। কর্ত্তাদের সঙ্গে আসবে যার যার চাকর, কর্ত্রীদের সঙ্গে খাস ঝির দল। দিনরাত চলবে তাদের কোলাহল, কিচির মিচির। নন্দকাকা আনবেন ঝুড়ি ঝুড়ি ফল গাছ। বৃক্ষরোপণের চলবে মহাসমারোহ। রতীন কাকার কাছে তার পায়রার হিসাব দাখিল করতে আমার প্রাণান্ত হবে। কাটুরিয়া গ্রাম থেকে আসবেন আমাদের দিদি, জ্যাঠামশায়ের ভাগ্নী তাঁর মেয়েরা, বড় সরযূ আমার বয়সী। তীক্ষ্ণ বুদ্ধিশালিনী। আমার মত মুখচোরা হাবাগোবা 'মুনিষ্যি' নয়। আরও কতজনা আসবেন। পূজাবাড়ী গমগম করবে। করুক সে গমগম ঝনঝন, আমার হীরাসাগরই ভাল। হীরাসাগর যেন আমার সঙ্গে চুপে চুপে কথা বলে। ভরা দ্বিপ্রহরে নিস্তব্ধ নির্জ্জনতায় তার ছলাৎ ছলাৎ শব্দের অর্থ আমি হৃদয়ঙ্গম করতে পারি। হীরাসাগর বলে, 'তটিনী তটে কেন? চ'লে আয় আমার বুকের মাঝখানে। আমি তোকে মুঠো মুঠো হীরে দিয়ে লুকিয়ে রেখে দেব অগাধ নীরে। আমি যে হীরাসাগর, আমার অতল তলে হীরার খনি লুকানো রয়েছে।'

এব্রাহাম লিংকন

জীবনের জয়যাত্রা

শ্রীকমলা দাশগুপ্ত

১৮৩৪ সালের পুনরায় নির্বাচনের সময় এল। হুইগ দলের সদস্যরূপে এব্রাহাম নির্বাচনে প্রার্থী হ'লেন এবং জয়লাভ ক'রলেন। সংসদের যোগ্যতা অর্জন করবার জন্য গভীরভাবে পড়াশুনা করতে লাগলেন। তাঁর পোষাক এবং রূপ সম্বন্ধে নানারকম হাসিঠাট্টা চলত। উপযুক্ত পোষাক তিনি কিনে ফেললেন।

তাঁর বন্ধু জন ষ্টুয়ার্ট ছিলেন স্প্রিংফিল্ডের বিখ্যাত আইনজীবী। তিনি এব্রাহামের প্রতিভা স্ফুরণের সম্ভাবনা দেখে তাঁকে আইন পড়তে উপদেশ দিলেন। বললেন, তুমি নিজে নিজেই পড়তে পারবে! তোমার জরীপের কাজের ফাঁকে ফাঁকে সময় ক'রে নিয়ে পড়লেও হবে। বছর-তিনেক পড়তে হবে। যত বই লাগবে আমার কাছ থেকে নিও।

জন ষ্টুয়ার্টের কথায় কাজ হ'য়েছিল। এব্রাহাম আইন পড়বেন বলে স্থির ক'রে ফেললেন। পড়বার জন্য সময় বাঁচাতে হবে। তাঁর সান্ধ্য বৈঠকটি বড় প্রিয় জিনিষ ছিল। সেখান থেকে নিজেকে বঞ্চিত ক'রলেন। রাতের ঘুমটুকু ছাড়া বাকী সব রাতটুকুই রাখলেন পড়ার জন্য। জরীপের কাজের ফাঁকও ভরেছিলেন তিনি আইনের বই পড়া দিয়ে।

ওদিকে আইনসভায় এমন কাজ করেছিলেন যে, ১৮৩৬ সালে আবার তিনি নির্বাচিত হন। তাঁর ভবিষ্যৎ জীবনের প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী এ, ডগলাসও তখন আইনসভার প্রতিনিধি ছিলেন।

এইবারের আইনসভায় দাসত্বপ্রথা রদ করার প্রশ্ন সরাসরি এসে পড়ল। যাঁরা রদ করার পক্ষপাতী ছিলেন তাঁরা তাঁদের বক্তব্য ছেপে উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকায় প্রচার করতে লাগলেন। দাসত্ব প্রথার পাপের বিরুদ্ধে বক্তৃতা করতে লাগলেন। বিপক্ষদল এই আন্দোলন দাবিয়ে রাখার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করতে থাকেন। ইলিনয়েস্-এ তিক্ত অভিজ্ঞতা দেখা দিল।

ইলিনয়েস-এর ডেমক্রেটিক দল দাসপ্রথা রদ করবার আন্দোলনের বিরুদ্ধে আইনসভায় প্রস্তাব আনতে লাগলেন। হুইগদলের এব্রাহাম এবং তাঁর বন্ধু ড্যানষ্টোন ঘৃণ্য প্রস্তাবগুলির বিরুদ্ধে নির্ভীকচিত্তে বিরোধিতা করলেন। কিন্তু প্রস্তাব গৃহীত হয়ে গেল ১৮৩৬-৩৮ সালে আইনসভায় দাসপ্রথা বিলোপের জন্য অবিশ্রান্ত লড়াই করাতে লোকেরা তাঁকে নির্ভীক যোদ্ধা নামে অভিহিত করে।

১৮৩৭ সালে লিংকন কোর্টে যোগদান করেন স্প্রিংফিল্ডে গিয়ে তাঁর উপকারী বন্ধু জন ষ্টুয়ার্টের অংশীদার হয়ে তিনি কোর্টে আইনজীবীর কাজ করতে থাকেন।

১৮৩৮ সালে এবং ১৮৪০ সালে লিংকন তৃতীয় এবং চতুর্থবার লোকসভায় নির্বাচিত হন।

১৮৪১ সালে ষ্টুয়ার্টের সাথে লিংকনের অংশীদারের কাজ শেষ হয়। তখন তিনি জজ লোগানের সঙ্গে কাজ করতে থাকেন। লিংকন ১৮৪২ সালে মেরী টডকে বিবাহ করেন। তাঁদের চারটি পুত্রের মধ্যে একটি বেঁচেছিলেন। তিনি বড় হয়ে ওয়াশিংটনে যুদ্ধবিভাগে সেক্রেটারীর পদে নিযুক্ত হন।

আইনজীবীরূপে লিংকন ছিলেন সাধু, দয়ালু, উদার এবং ন্যায়পরায়ণ। কয়েকটি ঘটনা উল্লেখযোগ্য।

একজন আগন্তুক এসে লিংকনকে তাঁর মামলা পরিচালনা করতে বলেন। লিংকন ধৈর্যের সঙ্গে বহুক্ষণ ধ'রে তাঁর মামলার বিষয়বস্তু শোনার পর বললেন—আমি ত আপনার মামলা গ্রহণ করতে পারব না। কারণ, আপনি হচ্ছেন মামলার অন্যায়কারী পক্ষ। আপনার বিপক্ষ হচ্ছেন ন্যায়বিচার পাবার যোগ্য।

—তা দিয়ে আপনার কি? মামলা পরিচালনা করবার জন্য আপনাকে আমি অর্থ দিচ্ছি।

—তা দিয়ে আমার কি? অন্যায়কারীকে সমর্থন করা আমার ব্যবসার উদ্দেশ্য নয়। যেখানে অন্যায় পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে সে রকম মামলা আমি গ্রহণ করি না। আমি ইচ্ছা করলে হয়ত ছয়টি সন্তানসহ গরীব বিধবাকে বঞ্চিত ক'রে আপনাকে জিতিয়ে দিতে পারি। কিন্তু আমি তা করব না। বহু অর্থের বিনিময়েও নয়।

আমেরিকার কতগুলি রাজ্য ছিল দাসপ্রথামুক্ত অর্থাৎ দাসগণ সেই রাজ্যে গেলে দাস থাকবে না, তারা মুক্ত হিসাবে গণ্য হবে। অন্য কতগুলি রাজ্য ছিল দাসপ্রথা-

যুক্ত। অর্থাৎ সেখানে গেলে মুক্তদাসও ক্রীতদাসরূপে পণ্য হবে এবং পুনরায় তাকে বিক্রি করাও চলবে।

একদিন একটি নিগ্রো নারী এসে এব্রাহাম লিংকনকে তার করুণ কাহিনী বলে। কেন্‌টাকি রাজ্যে থাকতে সে ক্রীতদাসী ছিল। কিন্তু দাসমুক্ত রাজ্য ইলিনয়েস্‌এ এসে তার মনিব তাকে এবং তার সন্তানকে মুক্ত ক'রে দিয়েছেন। কিন্তু তার ছেলে একটা ষ্টীমারে নিউ অর্লিন্‌স্ রাজ্যে গেছে এবং বোকার মত সেখানে নেমে পড়েছে। সেখানকার পুলিস তাকে গ্রেপ্তার করেছে। তাকে যদি এখনি ছাড়িয়ে আনা না যায় তবে তাকে পুনরায় দাসরূপে বিক্রি ক'রে দেবে। নিউ অর্লিন্‌স্ ছিল দাসপ্রথাযুক্ত রাজ্য।

লিংকনের দরদী হৃদয় এই অমানুষিক আচরণে বিচলিত হয়ে উঠল। গভর্ণরের কাছে বন্ধু হার্নডনকে পাঠালেন কিছু ব্যবস্থা করতে। গভর্ণর বললেন, এইক্ষেত্রে কিছু করার আইনসম্মত কোন অধিকার তাঁর নেই। লিংকন তাঁর হাত দুটো আকাশের দিকে তুলে ব'লে উঠলেন, এই ছেলেটিকে যদি তিনি রক্ষা করতে না পারেন তবে ইলিনয়েস্‌এ কুড়ি বছর ধ'রে এমন আন্দোলন চালাবেন যে গভর্ণরকে এরূপ ক্ষেত্রে কিছু করবার আইনসম্মত অধিকার দিতে হবে।

ওদিকে লিংকন এবং হার্নডন তৎক্ষণাৎ নিজেরা টাকা পাঠিয়ে দিলেন নিউ অর্লিন্‌স্-এর এক বন্ধুর কাছে, যাতে নিগ্রো ছেলেটিকে উদ্ধার করা যায়। ছেলেটি রক্ষা পেয়েছিল এবং সে তার মায়ের কাছে ফিরে গিয়েছিল।

একবার লিংকন একটা দেওয়ানী মামলার কেস গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর মক্কেল তাঁকে ভুল বুঝিয়েছিল। ধাপ্পাটা তিনি কিন্তু আগে ধরতে পারেন নি। তিনি কোর্টে জোরের সঙ্গে নিজের মক্কেলকে নির্দোষ প্রমাণ করবার জন্য যুক্তির অবতারণা করলেন। কিন্তু বিপক্ষের এটর্নি যখন একেবারে হাতেনাতে প্রমাণ দাখিল করলেন তখন লিংকন কোর্ট থেকে নিঃশব্দে স'রে পড়েন। কোর্ট তাঁকে খুঁজতে লোক পাঠিয়ে দিল হোটেলে। লিংকন জজকে তখন ব'লে পাঠালেন, তিনি যেতে পারবেন না, কারণ তাঁর হাত নোংরা হয়ে গেছে, তিনি পরিষ্কার হবার জন্য চলে এসেছেন।

ছোটবেলায় নিউসালেমএ থাকতে অত্যন্ত দারিদ্র্যের সময় লিংকন এক সময় আর্মষ্ট্রং পরিবারে থাকতেন। মিসেস আর্মষ্ট্রংকে তিনি 'আণ্ট হান্না' ব'লে ডাকতেন। আণ্ট হান্না তাঁর মোজা রিপু ক'রে দিতেন, সার্ট তৈরী ক'রে দিতেন এবং খেতেও দিতেন। ওদিকে লিংকন তখন তাঁর বাচ্চাকে দোলনায় দোলা দিতেন। সেই বাচ্চা উইলিয়াম আর্মষ্ট্রং বড় হয়ে উঠল। পিতার মৃত্যুর পর উইলিয়ামের যখন বাইশ বছর বয়স তখন একটা সাংঘাতিক ঘটনা ঘটল। উইলিয়াম ও তার কয়েকজন বন্ধু মদ খেয়ে উত্তেজিত হয়ে ওঠে এবং মারামারি করতে থাকে। একটি বন্ধু তাতে মারা যায়। উইলিয়াম এবং নরিস দু'জনকে হত্যার অভিযোগে অভিযুক্ত করা হয়।

নিরুপায় বিধবা মিসেস আর্মষ্ট্রং নিজের বিপদের কথা লিংকনকে করুণভাবে জানালেন। লিংকনের দুর্দিনের বন্ধু আণ্ট হান্না, তাঁর দরিদ্রজীবনের উপকারী বন্ধু আণ্ট হান্না। তাঁর ক্রন্দন লিংকনকে স্থির থাকতে দিল না। তাঁর পুত্রকে ফাঁসী থেকে বাঁচাবার মামলা তিনি হাতে নিলেন। আণ্ট হান্না তৎক্ষণাৎ স্প্রিংফিল্ডে তাঁর কাছে চ'লে গেলেন।

জনগণ তখন এই মামলায় এত উত্তেজিত ছিল যে, লিংকন মনে করলেন এই অবস্থায় নিরপেক্ষ জুরি পাওয়া কঠিন। অতএব মামলার জন্য সময় অতিবাহিত হ'তে দেওয়া দরকার, যাতে উত্তেজনা শান্ত হয়ে যায়। উইলিয়াম দিনগুলি জেলের মধ্যে কাটিয়ে চলল। মা তাতেই গভীর আঘাত পেলেন, উপায় নেই।

ইতিমধ্যে লিংকন মামলাটা তন্ন তন্ন ক'রে বুঝতে থাকলেন। অবশেষে মামলার দিন এসে গেল। উইলিয়ামের দুশ্চরিত্রের কাহিনী তার বিরুদ্ধে গেল। একজন প্রত্যক্ষদর্শী সাক্ষী এসে তার সাক্ষ্যে বলে, সে নিজের চোখে দেখেছে উইলিয়ামের সাংঘাতিক ঘুসিতেই লোকটি মাটিতে প'ড়ে যায় এবং তার মৃত্যু ঘটে। সাক্ষী বলেছে, রাত সাড়ে দশটায় এই ঘটনা ঘটে এবং চাঁদের আলোয় সে স্পষ্ট দেখেছে উইলিয়ামই এই হত্যাকারী।

এ্যাটর্নি লিংকন পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে জেরা করতে লাগলেন। অবশেষে তিনি কোর্টকে জানালেন, পঞ্জিকাতে আছে তার ঘণ্টা খানেক বাদে সে রাতে চাঁদ উঠেছিল। প্রত্যক্ষদর্শীর সাক্ষ্য ধূলিসাৎ হয়ে গেল। উইলিয়াম বেঁচে গেল কিন্তু দ্বিতীয় বন্ধু নরিসের আটবছর কারাদণ্ড হয়।

আণ্ট হান্না ছুটে এসে কৃতজ্ঞ হাতে লিংকনের হাত চেপে ধ'রে কাঁপতে লাগলেন। পূর্বতন উপকারীর উপকার করতে পেরে বোধ করি লিংকনও সার্থকতার আনন্দে কাঁপছিলেন। সেখানে অর্থ গ্রহণ করবার প্রশ্নই ছিল না।

রাজনীতির ঘূর্ণাবর্ত

এব্রাহাম লিংকন ১৮৪৬ সালে যুক্তরাষ্ট্র কংগ্রেসে নির্বাচিত হন। ১৮৪৭ সালে তিনি জাতীয় প্রতিনিধি সভায় আসন গ্রহণ করেন। ইলিনয়েস্ থেকে তিনিই একমাত্র হুইগ প্রতিনিধি ছিলেন। যুক্তরাষ্ট্র সেনেটের ডেমোক্রেটিক প্রতিনিধি ছিলেন ষ্টিফেন এ ডগলাস। দুই প্রতিদ্বন্দ্বী মুখোমুখি এসে পড়লেন সব বিষয়ে।

সে সময়ে চলেছিল মেক্সিকো যুদ্ধ এবং টেক্সাস রাজ্যকে দাসপ্রথাসমর্থক রাজ্য ব'লে মেনে নেওয়া হযেছিল। দক্ষিণের রাজ্যগুলি দাসপ্রথাসমর্থক হিসাবে টেক্সাস রাজ্যে দাসপ্রথার বর্বরতা বিস্তৃত করতে ব্যস্ত হয়ে উঠেছিল। কংগ্রেসের সভায় লিংকন এই অন্যায় আইন প্রবর্তনের বিরুদ্ধে মর্মস্পর্শী বক্তৃতা দিতে থাকেন। এটা ছিল তাঁর আদর্শের সংগ্রাম। কংগ্রেসে তীব্র মতভেদ ও তিক্ত বাক্‌যুদ্ধ চলতে লাগল। লিংকন দাসপ্রথার বিরুদ্ধে চল্লিশবার ভোট দিলেন। তাঁর তর্কের আন্তরিকতা, যুক্তির তীক্ষ্ণতা, প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব তাঁকে সর্বজনপ্রিয় করে তুলল।

১৮৪৮ এবং ১৮৫০ সালে তিনি নির্বাচনে দাঁড়ান নাই। নানা বিষয়ে তিনি অধ্যয়ন করতে থাকেন। এভাবে কয়েক বছর কেটে গেল। রাজনীতি ক্ষেত্র থেকে তিনি নিজেকে সরিয়ে রাখলেন। কিন্তু ১৮৫৪ সালের মিজুরী আপোস রদের ঘটনাটি তাঁকে আমূল নাড়া দিয়ে গেল। ১৮২০ সালে উত্তর পশ্চিম যুক্তরাষ্ট্রে দাসপ্রথা বন্ধ রাখবার যে নিয়ম প্রবর্তন করা হয়েছিল সেটা এতে ভেঙে গেল এবং কনসাস ও নেব্রাস্কাতে দাসপ্রথা প্রবেশ করবার পথ খুলে গেল। ডগলাস ছিলেন এই বিলের প্রবর্তক। লিংকন এবার নিষ্ঠুর দাসপ্রথার বিরুদ্ধে প্রবল সংগ্রামে অবতীর্ণ হলেন। ডগলাস তাঁর বিলের পক্ষে বক্তৃতা করতে যেখানেই গেছেন সেখানেই লিংকনও তাঁর প্রত্যেকটি কথা উপযুক্ত যুক্তি দিয়ে খণ্ডন ক'রে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন।

১৮৫৮ সালের ১৭ই জুন নির্বাচনী প্রচারকার্যের প্রথম বক্তৃতায় এব্রাহাম ঘোষণা করেছিলেন:—

"অন্তর্বিরোধের ফলে সর্বনাশ অনিবার্য। আমার দৃঢ় বিশ্বাস এই যে, অর্দ্ধেক দাস এবং অর্দ্ধেক স্বাধীন নরনারী নিয়ে এই সরকার বেশীদিন টি'কে থাকতে পারে না। আমি চাই না আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র ভেঙে যাক,—আমি বিশ্বাস করি, ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবার হাত থেকে আমেরিকাক রক্ষা করা নিশ্চয়ই সম্ভব।"

লিংকনের এই বক্তৃতা সেদিন সমগ্র আমেরিকাকে চমকে দিয়েছিল। ডগলাস এবং লিংকন একসঙ্গে নির্বাচনী প্রতিদ্বন্দ্বিতার বক্তৃতা দিয়ে চলেছিলেন।

এব্রাহাম এক জায়গায় লিখেছিলেন, 'আমি নিজে যেহেতু দাস হ'তে চাই না সেহেতু আমি দাসের মালিকও হ'তে চাই না।'

১৮৫৮ সালের বক্তৃতার এক জায়গায় তিনি বলেছিলেন—"আপনারা নিগ্রোকে মানুষ ব'লে স্বীকার করলেন না। আপনারা তাকে নীচে নামিয়ে দিলেন এবং ক্ষেতের পশু ছাড়া আর কিছু হওয়া তার পক্ষে অসম্ভব ক'রে তুললেন, তার আত্মাকে নষ্ট ক'রে দিলেন এবং এমন এক অন্ধকার গহ্বরে তাকে নিয়ে ফেললেন যেখানে আশার ক্ষীণ আলোও নিভে গেছে। এর পর কি আপনারা নিশ্চিত ক'রে বলতে পারেন যে, যে-রাক্ষসকে আপনারা সেখানে জাগিয়ে দিলেন সে ফিরে এসে আপনাদেরই টুকরো টুকরো ক'রে ছিঁড়ে ফেলবে না? আমাদের স্বাধীনতার মূলমন্ত্র কী? স্বাধীনতাকে ভালবাসা আমাদের মূলমন্ত্র। স্বাধীনতা সকল মানুষের সকল দেশের সর্বত্র জন্মগত অধিকার।..."

১৮৫৮ সালে ইলিনয়েস স্টেটে সাতটি বিতর্ক সভাতে লিংকন এবং ডগলাস তাঁদের আপন আপন দৃষ্টিভঙ্গির ব্যাখ্যা ক'রে বক্তৃতা করেন। চারিদিকে ছড়ানো গমের ক্ষেতের মাঝে মাঝে রোদে ঝল্‌মল্ করা ছিল এক একটি ছোট ছোট শহর। তাঁদের বক্তৃতা শুনতে সেখানকার কৃষক পরিবারেরা কেউ পায়ে হেঁটে, কেউ বা গাড়ীতে এসে জমা হতেন। সেনেটার ডগলাস ডেমক্রেটিক দলের সদস্যদের নিয়ে ছাদখোলা মস্ত এক গাড়ীতে ক'রে সভায় এসে উপস্থিত হতেন। বলিষ্ঠ চেহারা দুর্বিনীত ও দাম্ভিক ছিলেন এই বক্তা। তিনি বাগ্মী ছিলেন। অসাধারণ আত্মপ্রত্যয় এবং তেজস্বিতা ছিল তাঁর। তাঁকে দেখলে মনে হ'ত প্রতিপক্ষের সঙ্গে সংগ্রাম করতে তিনি যেন উদ্যত হয়েই আছেন। এব্রাহাম লিংকন অধিকাংশ সময় সভায় উপস্থিত হতেন পায়ে হেঁটে। সমবেত জনতার মাথা ছাড়িয়ে তাঁর লম্বা গলা ও কুঞ্চিত রেখায় ভরা মুখ চোখে পড়ত। জনতার দিকে মুখ তুলে যখন তিনি দাঁড়াতেন তাঁর মুখে ফুটে উঠত করুণাভরা অসীম বিষণ্ণতা। অজস্র আক্রমণ তাঁকে সহ্য করতে হ'ত। এতদূর সূক্ষ্ম, বলিষ্ঠ যুক্তির সঙ্গে বোধহয় ইংরাজী ভাষায় দুইজন প্রতিদ্বন্দ্বী আর কোনদিন বিতর্কে নামেন নাই। নির্বাচনের ফলে ডগলাসেরই শেষ পর্যন্ত জয় হয়েছিল,

কিন্তু লোকে এব্রাহাম লিংকনকে জাতির একজন শক্তিমান্ নেতা ব'লে চিনে নিয়েছিল।

১৮৬০ সালে যুক্তরাষ্ট্র আমেরিকার প্রেসিডেণ্ট নির্বাচনের সময় এল। উত্তর এবং দক্ষিণ অঞ্চলের বিরোধিতা উগ্রভাবে প্রকট হয়ে উঠল। নির্বাচনের ব্যাপারে রিপাব্লিকান পার্টি জনপ্রিয় নেতা এব্রাহাম লিংকনকে প্রেসিডেণ্ট পদপ্রার্থীরূপে মনোনীত করেন। তাঁরা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিলেন, দাসপ্রথাকে কোনমতেই কোন অঞ্চলে বিস্তৃত হ'তে দেবেন না। বিরোধীদলের মধ্যে একতার অভাব ছিল। ফলে রিপাব্লিক দলই নির্বাচনে জয়লাভ করল। এব্রাহাম লিংকন হলেন আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেণ্ট। তিনি ১৮৬১ সালের ৪ঠা মার্চ প্রেসিডেণ্টের শপথ গ্রহণ করেন।

প্রেসিডেণ্ট হয়ে ওয়াশিংটন যাবার সময় থেকেই বহু লোকে আশঙ্কা করছিল, বুঝি প্রেসিডেণ্ট লিংকনকে শত্রুরা হত্যা করবে। ওয়াশিংটন যাত্রার বিদায়কালে তাঁর মা পুত্রের জন্য এই আশঙ্কায়ই অভিভূত হয়ে পড়েছিলেন। লিংকন ছিলেন নির্ভীক।

এব্রাহাম যখন প্রেসিডেণ্টের পদ গ্রহণ করেন তার আগেই দক্ষিণ দিকের স্টেটগুলি যুক্তরাষ্ট্র থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়ে পৃথক্ এবং নতুন রাষ্ট্র গঠন করে। তার নাম দেওয়া হয় 'কন্‌ফেডারেটেড্ স্টেট্‌স্ অব আমেরিকা।'

এব্রাহাম লিংকন তাঁর প্রথম উদ্বোধনী বক্তৃতায় দক্ষিণ অঞ্চলের স্টেটগুলি যে যুক্তরাষ্ট্র থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েছে সেকথা স্বীকার করলেন না। তাঁর মতে সেটা অবৈধ। বক্তৃতার উপসংহারে গভীর আবেগ নিয়ে তিনি আবেদন করলেন যাতে পুরাতন প্রীতির ভাব আবার প্রতিষ্ঠিত হয়। এই আবেদনেও দাক্ষিণের অঞ্চলে কোন ফল দেখা গেল না। ১৮৬১ সালের ১২ই এপ্রিল তারিখে দক্ষিণ ক্যারোলাইনার চার্লস্‌টন্ বন্দরের ফোর্টসাম্‌টারের উপর কামানের গোলা বর্ষণ করা হয়। ১৮৬১ সালের এপ্রিল মাসে গৃহযুদ্ধ অর্থাৎ সিভিল ওয়ার বেধে গেল উত্তর ও দক্ষিণ অঞ্চলের মধ্যে। যুদ্ধের সময় দক্ষিণ অঞ্চলের পক্ষে প্রায় আট লক্ষ সৈন্য এবং উত্তর অঞ্চলে তার দুই বা তিনগুণ বেশী সৈন্য যুদ্ধ করেছিলেন। দক্ষিণের প্রায় পঞ্চাশ হাজার শ্বেতাঙ্গ এবং এক লক্ষ নিগ্রো উত্তরের পক্ষে যোগদান করেন।

১৮৬৩ সালের ১লা জানুয়ারী প্রেসিডেণ্ট লিংকন এক যুগান্তকারী ঘোষণা করলেন। তিনি দাসত্বের বন্ধন থেকে প্রত্যেকটি নিগ্রোর মুক্তি ঘোষণা করলেন। মুক্তির পরে নিগ্রোগণ যুক্তিসংগত মজুরী নিয়ে কাজ করতে পারবে। তাদের তিনি জাতীয় সৈন্যদলে যোগদান করতে আহ্বান করলেন।

১৮৬৩ সালের জুলাই মাসে গেটিস্‌বার্গে যে ভয়ঙ্কর যুদ্ধ হয়েছিল তার ফলেই যুদ্ধের মোড় ঘুরে যায়। দক্ষিণ স্টেটগুলির সেনাপতি জেনারেল লী-র পরাক্রমশালী সেনাদল অপূরণীয় ক্ষতি সহ্য করে অবশেষে পোটোম্যাকে সরে যেতে বাধ্য হ'ল। এই ব্যর্থতার ফলেই স্পষ্ট বোঝা গেল যে, দক্ষিণ অঞ্চলের কন্‌ফেডারেটেডদের আর যুদ্ধে জয়লাভের কোন আশা নেই। তাঁদের শক্তি সামর্থ্য ক্রমেই ফুরিয়ে আসছিল। কিন্তু এই সময় থেকে উত্তর অঞ্চলের শক্তি বৃদ্ধি হতে থাকে।

গেটিস্‌বার্গের ভয়ঙ্কর যুদ্ধে অসংখ্য বীর আত্মাহুতি দিয়েছিলেন। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের কংগ্রেস তাঁদের স্মরণে জাতীয় সমাধিক্ষেত্র প্রতিষ্ঠা করতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। সমাধিক্ষেত্র উৎসর্গ করবার জন্য প্রেসিডেণ্ট এব্রাহাম লিংকন নিজে ওয়াশিংটন থেকে গেটিস্‌বার্গে চ'লে আসেন। সেদিন তাঁর হৃদয়স্পর্শী বক্তৃতার মর্ম ছিল এই—

সাতাশ বছর আগে আমাদের পূর্বজগণ এই মহাদেশে এক নতুন জাতিকে স্বাধীনতায় উদ্বুদ্ধ ক'রে গঠন করেন। তাঁরা বলেছেন সকল মানুষই সমান ব'লে সৃষ্ট হয়েছে। আমরা বহুদিন ধ'রে একটা ভয়ঙ্কর গৃহযুদ্ধে লিপ্ত আছি। সেই যুদ্ধেরই একটা মহান্ ক্ষেত্রে আজ আমরা মিলিত হয়েছি। যে সমস্ত বীর এই জাতিকে বাঁচাবার জন্য এখানে আত্মবলিদান ক'রে গেছেন আমরা তাঁদের চির-শান্তির জন্য এই যুদ্ধক্ষেত্রেরই একটা অংশ উৎসর্গ করতে উপস্থিত হয়েছি। এ কাজ আমাদের অবশ্য কর্তব্য।

কিন্তু বৃহৎ অর্থে আমরা এই ক্ষেত্রকে উৎসর্গ করতে পারি না। যে সমস্ত মৃত অথবা জীবিত বীরগণ এখানে যুদ্ধ করেছেন তাঁরাই এ স্থান পবিত্র ক'রে রেখেছেন—আমাদের ক্ষুদ্র শক্তি বিন্দুমাত্রও তা বাড়াতে অথবা কমাতে পারে না। আমরা এখানে মুখে কি-কথা ব'লে গেলাম সে কথা পৃথিবী মনে রাখবে না, কিন্তু তাঁরা কি-ক'রে গেছেন সে কথা পৃথিবী কখনো ভুলতে পারে না। যে-কাজকে তাঁরা মহান্‌ভাবে এগিয়ে দিয়ে অসম্পূর্ণ রেখে চ'লে গেলেন সেই অসম্পূর্ণ কাজকে সম্পূর্ণ করবার জন্য আমাদের জীবিতদেরই বরং এখানে জীবন উৎসর্গ করতে হবে। আমরা যেন এখানে এই প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করতে পারি যে, তাঁদের মৃত্যু বৃথা যায় নি, এই জাতি স্বাধীনতার জন্য নবজন্ম গ্রহণ করবে এবং পৃথিবী থেকে এ কথা যেন বিনষ্ট হয়ে

না যায় যে, জনসাধারণের শাসনযন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হবে জনসাধারণের দ্বারা এবং জনসাধারণেরই জন্য (Government of the people, by the people and for the people)।

১৮৬৫ সালের ৯ই এপ্রিল তারিখে দক্ষিণের সেনাপতি জেনারেল লী আত্মসমর্পণ করেন।

যুদ্ধের সময় উত্তর অঞ্চল এব্রাহাম লিংকনকে এক মহান্ দেশনেতারূপে পেয়েছিল। সমগ্র জাতি উপলব্ধি করেছিল এই পণ্ডিত, চিন্তাশীল মানুষটির অন্তর্দৃষ্টি কত গভীর, কি অসীম তাঁর ধৈর্য, কতবড় তিনি সত্যনিষ্ঠ এবং উদার। বলপ্রয়োগ নয়, প্রেম এবং মহানুভবতা দিয়ে তিনি সমগ্র জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করতে চেষ্টা ক'রে গেছেন। আভ্যন্তরীণ শাসনকার্যে, পররাষ্ট্রনীতিতে সর্বত্রই তিনি মর্যাদাবোধ, নিষ্ঠা এবং দৃঢ়তার পরিচয় দিয়েছেন। তাঁর নেতৃত্বে আমেরিকার জনসাধারণের পূর্ণ আস্থা ছিল বলেই ১৮৬৪ সালে তিনি দ্বিতীয়বার প্রেসিডেণ্ট পদে নির্বাচিত হন। তখনও যুদ্ধ শেষ হয় নাই।

সৈন্যদের প্রতি ছিল তাঁর দরদী অন্তরের গভীর স্নেহ এবং অসীম সহানুভূতি। তিনি তাদের পুত্র ব'লে সম্বোধন করতেন এবং তাদের জীবনকে সর্বাপেক্ষা মূল্যবান্ মনে ক'রতেন। তারা তাঁকে পিতা এব্রাহাম বলত।

সৈনিকদের প্রতি তাঁর অকৃত্রিম দরদ সম্বন্ধে অসংখ্য ঘটনার মধ্যে কয়েকটি উল্লেখ করছি।

একদিন অবিরাম কাজের এক ফাঁকে নিজের ঘরে চা খেতে যাবার সময় একটি শিশুর কান্না শুনে তিনি তৎক্ষণাৎ অফিসঘরে ফিরে গিয়ে খবর নিয়ে জানলেন, একটি মহিলা তিনদিন ধ'রে তাঁর সঙ্গে দেখা করবার জন্য অপেক্ষা করছে। কিন্তু অপেক্ষমান এত লোকের মধ্যে মহিলাটির পালা তখনও আসে নাই। শিশুর কান্নায় আকৃষ্ট হয়ে সেই ক্ষণেই প্রেসিডেণ্ট লিংকন মহিলাটিকে ডাকালেন। মহিলাটি আবেদন করলেন, তাঁর স্বামী একজন সৈন্য। বিনা অনুমতিতে সৈন্যবিভাগ থেকে পলাতক বলে তাঁর প্রতি গুলী করার আদেশ হ'য়েছে। তিনি স্বামীর প্রাণভিক্ষা করতে লাগলেন। মৃত্যুদণ্ড হ্রাস করার মতো কিছু যুক্তি পেয়েই প্রেসিডেণ্ট একটা কাগজে কিছু লিখে তার প্রাণরক্ষার আদেশ দিয়ে দিলেন। ঐ শিশুর কান্নাই বোধহয় সৈনিকের প্রাণ বাঁচিয়েছিল।

মাননীয় কেলী একদিন প্রেসিডেণ্টকে জানালেন, উইলি নামে একটি বালক যুদ্ধে দুইবার অসীম বীরত্বের পরিচয় দিয়েছে। তাকে নেভাল স্কুলে (নৌবিভাগের শিক্ষালয়ে) ভর্তির অনুমতি দেওয়া হোক্। প্রেসিডেণ্ট রাজী হয়ে জুলাই মাসে ভর্তির অনুমোদন করলেন। কিন্তু সে সময় উইলির ১৪ বছর বয়স হবে না। সেপ্টেম্বরে হবে। উইলি প্রেসিডেণ্টের সামনে এসে সামরিক কায়দায় অভিবাদন ক'রে দাঁড়াল। প্রেসিডেণ্ট ব'লে উঠলেন, "এই সেই ছেলে যে দুইবার যুদ্ধে বীরত্বের পরাকাষ্ঠা দেখিয়েছে? আমারই এর কাছে মাথা নত করা উচিত, এই ছেলের নয়।" প্রেসিডেণ্ট অমনি তাঁর আদেশপত্রে জুলাই কেটে সেপ্টেম্বর লিখে দিলেন।

একদিন একটি বিষণ্ণমূর্তি বৃদ্ধা মহিলা প্রেসিডেণ্টের সঙ্গে সাক্ষাতের অপেক্ষায় দাঁড়িয়েছিলেন। প্রেসিডেণ্ট দেখতে পেয়ে তখনই জিজ্ঞেস করলেন, কি হয়েছে? মহিলাটি বললেন, তাঁর স্বামী যুদ্ধে মারা গেছেন এবং তাঁর তিন পুত্রই যুদ্ধক্ষেত্রের সৈন্য। একা থাকা বা চলা তাঁর পক্ষে আর সম্ভব হচ্ছে না। বড় ছেলেটিকে তিনি ফিরে পেতে চান।

লিংকন করুণ দৃষ্টিতে তাঁর দিকে তাকিয়ে বললেন,—নিশ্চয়, আপনার সবকিছু আপনি আমাদের দিয়েছেন, অবলম্বনের একটা আশ্রয় আপনাকে দিতেই হবে। বড় পুত্রের মুক্তির আদেশ তিনি দিয়ে দিলেন। বৃদ্ধা যখন আদেশপত্র নিয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে গিয়ে পৌঁছালেন পুত্র তখন যুদ্ধে মারাত্মকভাবে আহত হয়ে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করছে। নিরাশ হয়ে মা ফিরে এসে দাঁড়ালেন আবার লিংকনের কাছে। প্রেসিডেণ্ট সব শুনলেন। অশ্রুপূর্ণ চক্ষে তিনি বৃদ্ধাকে দ্বিতীয় আদেশ লিখে দিলেন তাঁর দ্বিতীয় পুত্রকে মুক্তি দেবার জন্য। তিনি বললেন, "একটি পুত্র আপনি নিন, আর একটি পুত্র আমার থাক।" উভয়েরই চোখে জল।

সৈনিক বেঞ্জামিন ওয়েন নিজের কাজের পোষ্টে দাঁড়িয়ে ঘুমাচ্ছিল, সেই অপরাধে তার প্রতি গুলী ক'রে মারার আদেশ হয়। বেঞ্জামিন পিতাকে চিঠিতে লিখল, —বন্ধু জিমি অসুস্থ ছিল। বন্ধুর সমস্ত বোঝা এবং নিজের বোঝা নিয়ে রাত্রিবেলা 'ডাবল্ কুইক্ মার্চ' ক'রে তাদের দ্রুত যেতে হচ্ছিল, সকলেই খুব ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল। বেঞ্জামিন এত শ্রান্ত হয়েছিল যে, তার কর্তব্যস্থলে ঘুমিয়ে পড়েছিল, কিন্তু টের পায় নি। বন্ধু জিমির কোন দোষ নেই, সে দায়ী নয়, তাকে যেন দোষারোপ করা না হয়।

বেঞ্জামিনের চিঠি নিয়ে বোন ছুটে গেল প্রেসিডেণ্টের কাছে। চিঠিখানি প'ড়েই লিংকন মৃত্যুদণ্ড বাতিলের

আদেশ দিয়ে দিলেন। এবং আদেশ ত্বরান্বিত করার জন্য নিজেই দ্রুত খবর দেবার ব্যবস্থা করলেন যাতে দেরি হয়ে না যায়।

একদিন কৃতজ্ঞ দুই ভাইবোনে যখন প্রেসিডেন্টের সামনে এসে দাঁড়াল তখন প্রেসিডেন্ট হাসি-উদ্ভাসিত মুখে উঠে এসে বেঞ্জামিনকে একটি ব্যাজ পরিয়ে দিয়ে বললেন,—"যে সৈনিক অসুস্থ বন্ধুর বোঝা বহন করে এবং বন্ধুর বিরুদ্ধে নালিশ না দিয়ে মৃত্যু বরণ করতে যায় তার জন্য এই ব্যাজ।"

একটি সৈনিকের পিতা তাঁর পুত্রের মৃত্যুদণ্ড রহিত করবার প্রার্থনা নিয়ে মিঃ কেলগের কাছে যান। কেলগ প্রেসিডেন্টের সঙ্গে দেখা ক'রে ঘটনাটা সব প'ড়ে যাচ্ছিলেন। যেখানে ছিল, একটা পুলের কাছে সৈনিকটি বীরবিক্রমে সংগ্রাম করেছে সেখানটায় প্রেসিডেন্ট উৎসাহের সঙ্গে ব'লে উঠলেন—

—সে আহত হয়েছিল?

—গুরুতরভাবে।

—তবে সে দেশের জন্য রক্তপাত করেছে?

—হ্যাঁ মহৎভাবে।

—বাইবেল-এ আছে না যে, রক্তপাত পাপকে স্খালন করে? ভাল পয়েন্ট পেয়েছি—ব'লেই তিনি সৈনিকের মৃত্যুদণ্ড ক্ষমা করার আদেশ লিখে দিলেন।

বিদ্রোহীদলের বন্দী সৈনিকদের প্রতি নিষ্ঠুর ব্যবহার অথবা তাদের উপবাসী রাখতে প্রেসিডেন্ট লিংকন কিছুতেই রাজী হ'তে পারতেন না। তাঁর শাস্তি দেবার ধারা চলেছিল অন্যপথে। নিজের সৈনিকদের কঠিন এবং বিপদ্‌সংকুল জীবনযাত্রার প্রতি তাঁর যে গভীর সহানুভূতি ছিল সেই সহানুভূতি বিদ্রোহী সৈনিকদের মধ্যেও ছড়িয়ে পড়ল।

ফ্রেডারিক নামক স্থানে বিদ্রোহীদের মধ্যে আহত সৈনিকদের রাখা হয়েছিল। প্রেসিডেন্ট সেখানে যান। তাদের দেখে তিনি বলেন—"দেশের এবং জাতির প্রতি কর্তব্যবোধে আমরা যুদ্ধ করতে বাধ্য হয়েছি। তোমাদের মধ্যেও অনেকে হয়ত নিরুপায় অবস্থায় প'ড়ে শত্রুপক্ষঅবলম্বন করেছ। তোমাদের প্রতি আমার মনে কোন বিদ্বেষ নাই, সমবেদনা এবং শুভকামনার সঙ্গে আমি তোমাদের করমর্দন করতে পারি।"

আহত বিদ্রোহী সেনারা প্রথমে একটু দ্বিধা করছিল। পরক্ষণেই দ্বিধা কেটে গেল, এগিয়ে এল তারা প্রেসিডেন্টের সঙ্গে করমর্দন করতে। যারা বেশী আহত হয়েছিল তারা উঠতে পারছিল না। প্রেসিডেন্ট লিংকন তাদের প্রত্যেকের কাছে নিজে গিয়ে তাদের হাত ধ'রে করমর্দন করতে করতে বললেন, "ছেলেরা তোমরা আনন্দে থেকো, শেষে সবই ভাল হবে। তোমাদের সকলের জন্য সর্বোত্তম যত্নের ব্যবস্থা করা হবে।"

এই অভাবিত সস্নেহ ব্যবহার পেয়ে সেদিন বিদ্রোহী বন্দী সৈনিকদের চোখে জল এসেছিল। কিন্তু এটা না করতে পারলে প্রেসিডেন্ট লিংকন মনে শান্তি পেতেন না। ভালবাসা এবং ক্ষমা ছিল লিংকনের শত্রুকে শাস্তি দেবার রূপ।

মহান্ এব্রাহাম লিংকনকে জাতি নেতারূপে পেয়ে সেদিন ধন্য হয়েছিল। ১৮৬৪ সালে তারা দ্বিতীয়বার তাঁকে প্রেসিডেন্ট পদে বরণ করে। দ্বিতীয়বার প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হবার পর ১৮৬৫ সালের ৪ঠা মার্চ উদ্বোধনী বক্তৃতায় লিংকন বলেন—

কারও প্রতি বিদ্বেষ না রেখে প্রত্যেকের প্রতি সদিচ্ছা বহন ক'রে, অবিচলিত ন্যায়নিষ্ঠা নিয়ে আমাদের অভীষ্ট কার্যসিদ্ধির পথে অগ্রসর হ'তে হবে। জাতিকে যে আঘাত সহ্য করতে হয়েছে তাতে সান্ত্বনার প্রলেপ দিতে হবে। যুদ্ধের দায়িত্ব বহন করেছেন যাঁরা তাঁদের এবং তাঁদের পরিবারের মঙ্গল সাধনের ভার নিতে হবে আমাদের······এবং ন্যায়ের উপর প্রতিষ্ঠিত শান্তি যাতে স্থায়ীভাবে আমরা অন্যের সঙ্গে ভোগ করতে পারি সে-জন্য চেষ্টার ত্রুটি করলে চলবে না।

এর প্রায় তিন সপ্তাহ পরে ১৮৬৫ সালের ৯ই এপ্রিল বিদ্রোহীদের সেনাপতি জেনারেল লী আত্মসমর্পণ করেন। আত্মসমর্পণের জন্য বিজিত দক্ষিণ অঞ্চলকে যে-শর্ত প্রেসিডেন্ট লিংকন দিয়েছিলেন সে রকম উদার শর্ত কোন বিজয়ীপক্ষ কোনদিন দিয়েছেন ব'লে ইতিহাসে দেখা যায় না।

প্রেসিডেন্ট লিংকন নিজেকে যুদ্ধে বিজয়ী বীর মনে করতেন না। তাঁর মত ছিল দক্ষিণ অঞ্চলের বিদ্রোহের কথা মন থেকে মুছে ফেলতে হবে এবং যে সব স্টেট যুক্তরাষ্ট্র ত্যাগ করেছিল, পূর্ব মর্যাদা দিয়ে তাদের আবার যুক্তরাষ্ট্রে ফিরিয়ে আনতে হবে।

১৪ই এপ্রিল প্রেসিডেন্ট লিংকন ক্যাবিনেট সদস্যদের সঙ্গে তাঁর শেষ বৈঠকে যোগদান করেন। বৈঠকে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় যে, দক্ষিণ অঞ্চলের সমুদ্রতীর থেকে অবরোধ প্রথা তুলে নেওয়া হবে। প্রেসিডেন্ট তাঁর সহকর্মীদের কাছে আবেদন করলেন, রক্তপাত এবং পূর্ব অপরাধের জন্য নির্যাতন করার বদলে এবার দেশে শান্তি স্থাপনের দিকে দৃষ্টি দেওয়া হোক্।

এব্রাহাম লিংকন বিদ্রোহ দমন ক'রে সেদিন আমেরিকার স্বাধীনতা রক্ষা করেছিলেন। আমেরিকার জাতীয়-স্বাধীনতার ইতিহাস-ফলকে জর্জ ওয়াশিংটনের নামের পাশে এব্রাহাম লিংকনের নাম খোদিত হয়ে রইল। চার্লস্ সামনার বলেন,—জর্জ ওয়াশিংটন এবং এব্রাহাম লিংকন উভয়েই জাতির কঠিন ও দুর্যোগময় পরীক্ষার সময় রাষ্ট্রের কর্ণধার ছিলেন। দু'জনেরই একাগ্র চিন্তা জনসাধারণের মঙ্গলের জন্য কেন্দ্রীভূত ছিল। দু'জনেই সকল যুদ্ধের জাতীয় নেতারূপে দেখা দিয়েছিলেন। ইতিহাসে দুই যুগের দুই প্রতিনিধি তাঁরা। দুই জনকেই ইতিহাসের দুই সন্ধিক্ষণে একই ধরণের কর্তব্য সমাধা করতে হয়েছিল। যে-কাজ জর্জ ওয়াশিংটন অসমাপ্ত রেখে গিয়েছিলেন তা এব্রাহাম লিংকন অগ্রসর ক'রে নিয়ে চলেছিলেন। সেবা ও দেশপ্রেমের প্রতীক দুই নেতা তাই জাতির কাছ থেকে একই পূজা ও অর্ঘ্য পেয়েছেন মৃত্যুর পর।

মৃত্যু

প্রেসিডেন্ট হ'বার পর থেকে লিংকন চিঠি পেতে লাগলেন তাঁকে হত্যা করা হবে। চিঠি ক্রমাগত এত আসত যে তিনি এতে অভ্যস্ত হয়ে গেলেন। তাঁর জীবন-রক্ষার জন্য যখনই ব্যবস্থা গ্রহণ করা হ'ত তখনই তিনি বিরক্ত হয়ে উঠে আপত্তি করতেন। এভাবে নাকি মানুষকে রক্ষা করা যায় না।

১৮৬৫ সালের ১৪ই এপ্রিল বিজয় উৎসবের দিন ছিল। ছুটি ঘোষণা করা হয়েছিল। সে রাতে ফোর্ড থিয়েটারে যে প্রোগ্রাম ছিল তাতে প্রেসিডেন্ট লিংকন যাবেন ব'লে কাগজে দেওয়া হয়েছিল।

রাত ৯টা বাজতে কুড়ি মিনিট বাকী। প্রেসিডেন্ট লিংকন সস্ত্রীক এবং আরও কয়েকজন থিয়েটার হলে প্রবেশ করেন। হলে সমাগত সমস্ত জনগণ একত্র দাঁড়িয়ে শান্তির দূতকে স্বাগত সম্বর্দ্ধনা করেন।

ঘণ্টাখানেক পর একটা পিস্তলের আওয়াজে সকলে চম্‌কে উঠল। মিসেস লিংকন চীৎকার ক'রে উঠলেন। আততায়ী প্রেসিডেন্টের প্রাইভেট বক্স থেকে লাফিয়ে প'ড়ে স্টেজের দিকে এই বলতে বলতে ছুটল, অত্যাচারীর শেষ এইভাবেই হয়। হাতের ছোরা বার করে সে ব'লে উঠল—দক্ষিণ অঞ্চল তার প্রতিশোধ নিয়েছে। আততায়ী পলায়ন করল।

গোঁড়া দাসপ্রথা সমর্থক আততায়ী জন উইলকিস্ বুথ্ যখন তার বাড়ী থেকে পালাতে চেষ্টা করছিল তখন তাকে গুলী ক'রে মারা হয়।

প্রেসিডেন্টের অচেতন দেহকে তৎক্ষণাৎ অন্যত্র নিয়ে যাওয়া হয়। গুলী তাঁর মাথার পিছন থেকে মস্তিষ্ক ভেদ ক'রে ডানদিকের চোখের পিছনে আটকে ছিল। শ্রেষ্ঠ ডাক্তাররা অসহায়ভাবে চেষ্টা করতে লাগলেন। সব চেষ্টা ব্যর্থ ক'রে দিয়ে পরদিন ১৫ই এপ্রিল তারিখে (১৮৬৫) প্রাতে ৭-২২ মিনিটের সময় প্রেসিডেন্ট লিংকন শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। পৃথিবী সেদিন এক মানব-দরদী মহামানবকে হারিয়েছিল।

হাজার হাজার শোকার্ত হৃদয় সেদিন তাদের শেষ শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করল—'হে বীর, হে শহীদ, হে বন্ধু, বিদায়।'

ভেবেছিলাম এ কাহিনী কোনদিন লিখব না। এ যুগে এমন একটা কাহিনী কেউ বিশ্বাসও করবে না, করতে পারে না। কালটা যান্ত্রিক সভ্যতার। শুধু লেদ মেশিনের তলায় পুরনো ধর্ম, পুরনো বিশ্বাসই গুঁড়িয়ে যাচ্ছে না, ঈশ্বরকেও ক্রাশারের তলায় চেপে নিশ্চিহ্ন করে দেবার চেষ্টা চলেছে অনবরত।

এমন পরিবেশে লোকান্তরিত এক আত্মার উপকথা শোনার শ্রোতার সংখ্যা মুষ্টিমেয়।

তবু এ কাহিনী আমায় লিখতে হবে। না লিখলে মনে শান্তি পাব না। প্রাণান্তকারী এক যন্ত্রণায় রাতের পর রাত নিদ্রাশূন্য শয্যায় ছটফট করব।

মাস দুয়েক আগের কথা।

অফিসের কাজটা শেষ হয়ে যেতেই গৌরীর কথা মনে পড়ল। বিশেষ ক'রে বলেছিল, যদি কোনদিন পাটনা আসেন, একবার আমার বাড়ীতে পায়ের ধুলো দেবেন। ধীরা চকে গিয়ে ওঁর নাম করলেই হবে।

হোটেলের গেটেই একটা সাইকেল রিক্সা মিলল। উঠে প'ড়ে বললাম, ধীরা চক।

রিক্সাওয়ালা কিছুক্ষণ আমার দিকে চেয়ে সবিস্ময়ে বলল, উঁ কাঁহা?

সর্বনাশ! পাটনার লোককে পাটনার পাত্তা বলে দিতে হবে?

হঠাৎ মনে প'ড়ে গেল, গৌরীর কাছেই একবার শুনেছিলাম, ওই জায়গাটার পুরনো একটা নাম ছিল, গর্দানীবাগ। মারাত্মক নাম সন্দেহ নেই। যার গর্দানের মায়া আছে সে ও তল্লাটে সহজে পা দেবে না। ইদানীং বুঝি নামটা শুধরে নেওয়া হয়েছে। নতুন নাম ধীরা চক অনেক মোলায়েম, অনেক ভদ্র।

রিক্সাওয়ালাকে সেই কথা বললাম, গর্দানীবাগ চেনো?

রিক্সাওয়ালা ঘাড় নাড়ল। তার পরই প্যাডেল চালাতে শুরু করল।

হাতঘড়িতে দেখলাম সাড়ে পাঁচটা। শীতের সন্ধ্যা। এর মধ্যেই দিনের আলো সম্পূর্ণ মুছে গেছে। কালো আবরণ অঙ্গে জড়িয়ে রাত্রি এগিয়ে আসছে। অন্ধকারের সঙ্গে সঙ্গে পাটনার কড়া শীত বাড়ছে। মাফলারটা ভাল করে গলায় জড়িয়ে নিলাম। কোটের কলার দুটোও তুলে দিলাম।

ষ্টেশন পার হয়ে বাঁহাতি মোড় নিল রিক্সা। ডান দিকে হার্ডিঞ্জ পার্ক। আকাশে তারার সমারোহ দূরে

থাক, একটি নক্ষত্রেরও দেখা নেই। একটানা ঠুং ঠুং শব্দ। মাঝে মাঝে পাশ কাটিয়ে দ্রুতগতিতে কয়েকটা লরী চলেছে। কিছু কিছু পথচারীও দেখা যাচ্ছে কখনও সখনও।

অনেকক্ষণ চলার পর মনে হ'ল, এতক্ষণে ধীরা চক পৌঁছে যাওয়া'ত উচিত।

রিক্সাওয়ালাকে জিজ্ঞাসা করলাম। সে কিছু বলল না। কেবল গতি একটু মৃদু করল।

সামনেই একটা পানের দোকান। টিম টিম করে ল্যাম্প জ্বলছে। সেখানে রিক্সা থামাতে বললাম।

রিক্সা থামতেই পানের দোকান থেকে লোকটা নেমে দাঁড়াল।

কইয়ে হুজুর?

জিজ্ঞাসা করলাম, এটা কি ধীরা চক?

লোকটা ভ্রূ কোঁচকাল, তার পর খুব কাছে এসে আমার আপাদমস্তক দেখে বলল, ধীরা চক, হিঁয়া কাঁহা? এ ত ভিকা চক!

তবে ধীরা চকটা কোথায়? বিনীতভাবে প্রশ্ন করলাম।

উত্তরে লোকটা হাত দিয়ে যে দিক্‌টা দেখাল, আমি সম্প্রতি সেই দিক্ থেকেই আসছি।

নিরুপায়। রিক্সা ফিরল। যে পথে এসেছিলাম, সেই পথে।

বেশ কিছুক্ষণ চলার পর আমিই আবার রিক্সা থামালাম। একটা বাংলো প্যাটার্নের বাড়ীর হাতায় একটি ভদ্রমহিলা বসে বসে কি বুনছিলেন। বাগানের মধ্যে একটা বেশী পাওয়ারের আলো।

গেটের কাছে দাঁড়াতেই ভদ্রমহিলা মুখ ফেরালেন। চেহারায় বাঙালী বলেই মালুম হ'ল। কথা বললেন কিন্তু হিন্দীতে।

কিসকো মাংতে আপ?

আমি বাংলাতেই উত্তর দিলাম।

চাই. না কাউকে। ধীরা চকটা কোথায় বলতে পারেন?

ধীরা চক? ভদ্রমহিলা দাঁত দিয়ে ঠোঁটটা কামড়ালেন, আপনি ত ভুল পথে এসেছেন।

সারাটা জীবনই ত তাই চলছি। এমন একটা লোভনীয় উত্তর কষ্টে সংবরণ করলাম। শুধু বললাম, ভুল পথে?

মানে, উল্টো রাস্তায়, ভদ্রমহিলা হাসি চাপবার চেষ্টা করলেন, আপনি আনিসাবাদে এসে পড়েছেন।

দয়া করে ধীরা চকটা কোথায় রিক্সাওয়ালাকে একটু বুঝিয়ে বলবেন?

দেখুন, ধীরা চকটা কোথায় আমিই ঠিক জানি না। আমি এখানে মাস চারেক হ'ল এসেছি। আগে ছিলাম ভাগলপুর, তার আগে—

সভয়ে হাতঘড়ির দিকে দেখলাম। প্রায় সাড়ে সাতটা। অর্থাৎ প্রায় ঘণ্টা দুয়েক ধরে ধীরা চকের সন্ধানে পথে পথে ঘুরছি।

আপনি বরং ডান দিকের রাস্তাটা ধরে চলে যান। খগোল রোড। ওদিক্‌টায় হ'তে পারে। একবার যেন শুনেছিলাম ধীরা চক ওইদিকেই কোথাও।

এমন একটা পথনির্দেশের ওপর নির্ভর করে আর যাই হোক অজানা জায়গায়, তামসী রাত্রে যাত্রা শুরু করা যায় না। কিন্তু নিরুপায়। অনন্তকাল ভদ্রমহিলার গেটের সামনে অপেক্ষা করাও সম্ভব নয়।

একমাত্র পথ ফিরে যাওয়া পাটনা হোটেলে। তার পর সেখান থেকে কলকাতায় ফিরে এক সময় চিঠি লেখা গৌরী আর রমেনবাবুকে। কিন্তু তার মধ্যেও কোথায় একটা লজ্জা লুকান আছে। প্রেমে প্রত্যাখ্যাত হওয়া আর কোন ঠিকানা খুঁজে না পাওয়ার মধ্যে পার্থক্য খুব বেশী নয়। দুটোতেই নিজের পৌরুষের অবমাননার প্রশ্ন জড়ানো।

তাই শেষবারের মতন একবার ডান দিকের পথই অনুসরণ করলাম।

কিছু আগে পর্যন্ত দিনের আলো সহায় ছিল, এবার ধীরে ধীরে সেটুকুও মুছে গেল। জমাট অন্ধকার। দু ধারে বড় বড় গাছের সার লাগান অপরিসর পথ। মনে হ'ল সমস্ত জগৎ থেকে মানুষের অস্তিত্বটুকুও বুঝি মুছে গেছে। চরাচরে একমাত্র প্রাণী আরোহী আমি আর বাহক রিক্সাওয়ালা।

হঠাৎ একটা শাদা ফলক নজরে এল। টিমটিমে বৈদ্যুতিক বাতি। কি একটা পুলিশ ফাঁড়ি।

রিক্সা থামিয়ে নেমে গেলাম।

একটা পাহারাওয়ালা আহ্নিকে বসেছিল। তাকেই পাকড়াও করলাম।

এদিকে ব্যানার্জী বাবুর কুঠিটা কোথায়? এ জায়গার নাম কি?

পাহারাওয়ালা ইঙ্গিতে আমাকে থামিয়ে দিল। তখনও আহ্নিক শেষ হয় নি। অগত্যা অপেক্ষা করলাম মিনিট দশেক। পাহারাওয়ালা চোখ খুলল। আবার প্রশ্ন করলাম।

উত্তরে পাহারাওয়ালা বলল, এই এলাকাটাই ধীরা-চক। এখানে তিন ব্যানার্জী বাবু আছেন। এই ফাঁড়ির পিছনে একজন, সামনে দুজন।

মনে ঠিক করলাম পিছনটাই আগে খোঁজ করে আসি, তার পর সময় আর মেজাজ থাকলে সামনে দুজনের খোঁজ করব।

আবার রিক্সায় উঠলাম। ইতিমধ্যে শীতের প্রকোপটা বেশ মালুম দিচ্ছে। দুটো হাঁটুতে জলতরঙ্গ বাজছে। মুখে 'হি হি'র কাওয়ালি। মাফলারটা খুলে মাথা আর কান ঢেকেছি।

রিক্সাওয়ালাকে নির্দেশ দিয়ে চোখ বন্ধ করে বসলাম।

মনে হ'ল অনন্ত কাল। অনন্তকাল ধরে রিক্সা চলেছে। বিরতি নেই। শেষ নেই। চোখ বন্ধ করেই বুঝতে পারলাম, সোজা পথে নয়, রিক্সা আবর্তিত হচ্ছে একই রাস্তায়।

চোখ খুললাম। সত্যিই তাই। একটি গাছ বার তিনেক অতিক্রম করতেই খেয়াল হ'ল। কোথাও একটা গোলমাল হয়েছে।

রিক্সাওয়ালাকে ধমক দিলাম, কোথায় চলেছিস? এ ত ঘুরপাক খাচ্ছিস একই রাস্তা ধরে।

রিক্সাওয়ালা স্বীকার করল, চক্কর লাগ গিয়া হুজুর। রাস্তেমে ঠিক খেয়াল নেই হোতা।

সর্বনাশ, সারা রাত ধরে রিক্সা এমনই চক্রাকারে ঘুরবে নাকি? তা হলে শীতে জমাট হয়ে যাব। ভোর বেলা আমার আর রিক্সাওয়ালার, কারুরই পাত্তা পাওয়া যাবে না।

ঠিক হয়ে বসলাম, দুটো চোখ রগড়ে নিয়ে বাইরের নিচ্ছিদ্র অন্ধকারের দিকে নিরীক্ষণ করলাম।

সূচিভেদ্য আঁধার। দু'পাশে জলাজমি। দু-একটা ঝাঁকড়া গাছ দেখা যাচ্ছে। জলাজমি থেকে ধোঁয়ার কুণ্ডলী উঠছে আকাশের দিকে। সাদা পর্দার মতন। দৃষ্টি সীমিত। দূরের কিছু দেখার উপায় নেই।

শাল আর সিমুলে জড়াজড়ি। তলায় কাশের জঙ্গল। আবার পার হলাম সেই এলাকা। এই নিয়ে চার বার। কিছু একটা করতে হবে, নয় ত ক্রমাগত পাকের পর পাক দিয়ে রাত কাবার করে দেওয়ার কোন অর্থ হয় না।

চোখ কুঁচকে এদিক্ ওদিক্ দেখতে দেখতে নজরে এল। মিটমিটে আলোর ইসারা। কুয়াশার জন্য আরও ম্লান আর নিষ্প্রভ।

রিক্সাওয়ালাকে বললাম, ওই দিকে চল। ওই আলোর কাছে।

মনে হয়েছিল দশ মিনিটের পথ, কিন্তু আধ ঘণ্টারও বেশী সময় লাগল।

ছোট একটা মাটির ঘর। ওপরে টালির ছাউনি। দাওয়ায় একটা খাটিয়া পাতা। তার ওপর এক প্রৌঢ় দুলে দুলে সুর করে কি একটা পড়ছে। একপাশে হারিকেনের ক্ষীণ দীপ্তি।

রিক্সাওয়ালার ঠুন ঠুন শব্দে প্রৌঢ় থেমে গেল। নীচু হয়ে মুখ বাড়িয়ে দেখে বলল, কৌন্?

রিক্সা থেকে নেমে উঠানে গিয়ে দাঁড়ালাম। একটু কেশে গলাটা পরিষ্কার করে নিয়ে বললাম, ধীরা চক যাব, রমেন ব্যানার্জীর বাড়ী, পথ হারিয়ে ফেলেছি।

প্রৌঢ় অন্তর্ভেদী দৃষ্টি দিয়ে জরিপ করল আমাকে। দাড়িতে হাত বোলাতে বোলাতে বলল, পথ হারিয়ে ফেলেছেন। আমরা সবাই ত পথ হারাই। ঠিক পথে ক'জন আর চলতে পারি।

মনের এই অবস্থায় প্রৌঢ়ের দার্শনিক উক্তি খুব প্রীতি-প্রদ ঠেকল না। বিরক্ত কণ্ঠে বললাম, ব্যানার্জীবাবুর পাত্তা যদি জানা থাকে মেহেরবানী করে বলুন। অনেক সময় নষ্ট হয়েছে পথে পথে।

আবার প্রৌঢ় দৃষ্টি ফেরাল আমার দিকে। এবার দুচোখে আগুনের স্পর্শ। মনে হ'ল, সে দৃষ্টির বৈদ্যুতিক দাহ আমার সমস্ত শরীর দগ্ধ করে দিল।

আস্তে আস্তে এগিয়ে প্রৌঢ়ের সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম।

বৈঠিয়ে। অনুনয় নয়, আদেশের সুর।

সঙ্গে সঙ্গে খাটিয়ার এক পাশে বসে পড়লাম।

দশ মিনিটের বেশী সময় নেব না বাবুজী। একটা কাহিনী শুনুন।

আপত্তি করতে গিয়েও পারলাম না। প্রতিবাদের সমস্ত শক্তি নিঃশেষিত। রহস্যময়ী রাত্রির এক অবাস্তব পরিবেশ আমাকে সম্পূর্ণভাবে আচ্ছন্ন করে ফেলল। মনে হ'ল, সময় এখানে অর্থহীন। অখণ্ড, অবিচ্ছিন্ন এক মহা-কালের তরঙ্গে আমি নিশ্চিহ্ন। আমার স্বতন্ত্র কোন সত্তা নেই।

এক তবলচী ছিল বাবুজী। খুব নাম করা তবলচী। আঙুলের ছোঁয়ায় তবলায় মেঘের ডাক ফুটত। কিন্তু এখানে এ সবের কদর হ'ল না। বাঁয়া আর ডুগি বগলে নিয়ে নুরুল ইসলাম লক্ষ্ণৌ গিয়ে উঠল। সেখানে এক জলসার আসরে রোশন বাইয়ের সঙ্গে দেখা হ'ল। দেখা

থেকে আলাপ, তারপর গোপনে মহব্বতের ফুল ফুটল। রোশেনারাকে নিয়ে নুরুল ফিরে এল পাটনায়। এখানেই ঘর বাঁধল।

ঘর বাঁধল এক শর্তে। রোশনবাই আর মুজরো নিতে পারবে না। দশজনের মনোহরণ আর নয়, রোশনের রোশনাই বিচ্ছুরিত হবে শুধু একজনকে ঘিরে।

নুরুলও তবলা ছাড়ল। তবলার বোলে পেট ভরবে না। পাটনা শহরে খানদানী সুরের ভক্ত রহিস আদমী কোথায়! কেউ ব্যবসা করে, কেউ চাকরি। বড়জোর দু-একজন কাওয়ালিতে মাতে। তাই নুরুল তবলা সরিয়ে হাতুড়ি ধরল। ফুলওয়ারী শরিফে নতুন কারখানা পত্তন হয়েছে। সেখানে নাম লেখাল।

প্রথম মাস ছয়েক বেশ কাটল। দুজনের চোখে প্রথম প্রণয়ের ঘোর। বিন্দুতে অতল সিন্ধু দেখল। পলকের অদর্শনে আত্মহারা।

কারখানা থেকে ফিরে এসে নুরুল আসর বসাত। ঘরের মাঝখানে জাজিম পেতে তবলা নিয়ে বসত। সামনে হাঁটু মুড়ে রোশনবাই। সুরের ফুলকিতে রাতের আকাশ ভাস্বর হয়ে উঠত। কোন কোনদিন কখন রাত ভোর হয়ে যেত দুজনের কেউ টেরই পেত না।

দুজনকে নিয়েই দুজনে সম্পূর্ণ। কাছাকাছি প্রতিবেশী কেউ ছিল না। নুরুল আর রোশনের প্রতিবেশীর প্রয়োজনও ছিল না।

কারখানা বড় হ'ল। কাজ বাড়ল নুরুলের। মাঝে মাঝে সারারাত কারখানায় কাটাতে হ'ত। যন্ত্রের সান্নিধ্যে। ভোরের দিকে উদ্‌ভ্রান্তের মতন নুরুল ছুটে আসত। ভোর ভোর উঠে রোশন উঠানে প্রতীক্ষায় থাকত। তার আয়ত দুটি চোখ রাত্রিজাগরণে ক্লান্ত তবু প্রতীক্ষাচঞ্চল।

কিন্তু এ স্বপ্নও শেষ হ'ল।

নুরুলের আলিঙ্গনে রোশন যেন আর আগের মতন রোমাঞ্চিত হয়ে ওঠে না। নুরুল কাছে এলে আর তার দুটি গালে আবিরের ছোঁয়া লাগে না। খঞ্জনপাখীর মতন দুটি চোখ আর নৃত্যচপল হয় না।

রোশন সব সময়ই কেমন অন্যমনস্ক গালে হাত রেখে চুপচাপ বসে থাকে জানলার ধারে। জলাভূমির দিকে একদৃষ্টে চেয়ে কি যেন খোঁজে। নুরুল কাছে এসে দাঁড়ালেও সচেতন হয়ে ওঠে না।

নুরুল ভাবে, বোধহয় ফেলে আসা জীবন সহস্র আকর্ষণে রোশনকে টানছে। তবলার বোল, গজলের সুর, ঘুঙুরের নিক্বণ হাতছানি দিচ্ছে। খাঁচার বন্দী বিহঙ্গকে নীলাকাশের লোভ।

রোশনের মন লক্ষ্ণৌয়ের জীবনকেই বরণ করে নিতে চায়। তাই নুরুল একদিন সোজাসুজিই বলল, রোশন!

বার দুয়েক ডাকের পরেও রোশনের সাড়া পাওয়া গেল না। তার হুঁশ হ'ল, নুরুল কাঁধের ওপর হাতটা রাখতে।

কিছু বলছ? ক্লান্ত, বিষণ্ণ কণ্ঠস্বর রোশনের।

ক'দিন তোমাকে ভারি অন্যমনস্ক মনে হচ্ছে।

রোশন একটু বুঝি চমকাল, অন্যমনস্ক? কই না তো।

তোমার এখানে ভাল লাগছে না, তাই না? তুমি লক্ষ্ণৌ ফিরে যেতে চাও?

এবার দৃশ্যত রোশন কেঁপে উঠল। নুরুলের একটা হাত চেপে ধরে বলল, না, না, সেখানে আর আমি যেতে চাই না। সে জীবনে আমার কোন লোভ নেই। নিজেকে হাজার মানুষের মাঝখানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে বাঁচতে আমার একটুও ইচ্ছা নেই। তুমি অমন কথা আমাকে ব'লো না।

তবে তুমি এমন উদাসীন হয়ে থাক কেন? হাজার ডাকে তবে তোমার সাড়া পাই। তুমি যেন ক্রমে আমার কাছ থেকে দূরে সরে যাচ্ছ।

বড় একলা মনে হয়, রোশন ক্লান্ত নিঃশ্বাসের সঙ্গে হতাশ কণ্ঠে বলল।

একলা? কেন আমি ত রয়েছি।

তুমি? কোথায় তুমি রয়েছ? দিনের পর দিন তুমি ত দূরে সরে যাচ্ছ।

না, রোশন, আমি দূরে সরে যাচ্ছি না। আরো কাছে এগিয়ে আসছি আমি।

নুরুল এগিয়ে এসে রোশনের একটা হাত ধরতেই সে চেঁচিয়ে উঠল, উঃ, ছাড় ছাড়।

অপ্রস্তুত নুরুল তাড়াতাড়ি হাত ছেড়ে দিয়ে সরে দাঁড়াল, কি হ'ল?

উঃ, হাত দুটো তোমার কি শক্ত হয়ে গেছে। রোশন যন্ত্রণায় ককিয়ে উঠল।

একটা হাতে নিজের প্রসারিত আর একটা হাত নুরুল টিপে টিপে দেখল। সত্যই হাতুড়ি পিটে পিটে দুটো হাত বেজায় কড়া হয়ে গিয়েছে। শক্ত বাহুর আলিঙ্গনে ধরা দিতে রোশনের কষ্ট হয়। কিন্তু এ কথা কেন রোশন বোঝে না যে, নুরুলের দুটো হাত শক্ত হয়েছে বলেই স্বচ্ছল হয়েছে সংসার। হাত বাড়ালেই প্রয়োজনের জিনিস মেলে। আগের দিনের মতন অভাবের হাজার ফাটল দিয়ে অনশনের নির্মম বাতাস বয় না।

ক'দিন তোমাকে ভারি অন্যমনস্ক মনে হচ্ছে।

মাস তিনেকের মধ্যেই সব কিছু বদলে গেল। যেখানে শাল, পিপুল আর অশথের সমারোহ ছিল, তলায় কাশের বন, সেখানে দলে দলে মজুর এসে জুটল। নানারকম যন্ত্রপাতি। হরেক প্রকারের গাড়ী। এক সপ্তাহের মধ্যে বড় বড় গাছ ধরাশায়ী হ'ল। কাশের জঙ্গল উধাও। হাজার কুলির ঘামে রুক্ষ কঠিন মাটি ভিজে গেল।

হুরুল এক ছুটির দিনে এগিয়ে গেল।

তাঁবুর দরজায় ফেল্ট হ্যাট মাথায় কাঠের চেয়ারে বসে একজন কাজ তদারক করছিল, হুরুল তার কাছে গিয়ে দাঁড়াল।

সেলাম আলেকাম।

আলেকাম সেলাম। লোকটি সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিল।

আধ ঘণ্টার মধ্যে দুজনে দোস্ত বনে গেল। নাম, ধাম, পরিচয় সব জানা হ'ল।

কাশেম আলি ঠিকাদারের লোক। এখানে উড়ো-জাহাজ নামার আস্তানা হচ্ছে। আট মাসের মধ্যে গাছ-পালা জলা জঙ্গল নিশ্চিহ্ন করে জায়গাটার নতুন রূপ দিতে হবে।

হুরুল অবাক্ হয়ে শুনল। আশমানের পাখী মাটি ছোঁবে এখানে, তার বাড়ীর এত কাছে। তাজ্জবকী বাত!

কাশেম আলিকে হুরুল বাড়ীতে টেনে আনল। নাস্তা করল এক সঙ্গে। অনেক রাত অবধি গল্পগুজব। বিবির খবর দিল কিন্তু রোশনকে বাইরে বের করল না। তাদের সমাজে সে রকম রেওয়াজ নেই।

মাস তিনেক চলল এমনি ভাবে। একদিন হুরুল যায় কাশেমের তাঁবুতে, পরের দিন কাশেম আসে হুরুলের ডেরায়। সামনে আসেনি রোশন, কিন্তু হুরুলের

পীড়াপীড়িতে আড়াল থেকে গান শুনিয়েছে নুরুলের তবলার তালে তালে।

কাশিম খুশিতে ফেটে পড়েছে। বলেছে, নুরুল মিয়া, তুমি স্বর্গের হুরীকে হারেমে বন্দী করেছ।

এরই মাস দুয়েকের মধ্যে কথাটা চালু হ'ল।

প্রথম বাজারে বলল গয়াপ্রসাদ। বাজারেই আলু বেগুন নিয়ে বসে। কপালে ফোঁটা, ধর্মভীরু লোক। অন্য ব্যাপারীদের মতন দামে আঁর ওজনে দুদিকে খদ্দেরকে কাটে না। যা কিছু করে ওজনের কারসাজিতে। থাকে নুরুলের বাড়ীর কাছে।

শুনেছ নুরুল মিয়া?

কি শুনব? ঝুড়িতে আলু ঢালতে ঢালতে নুরুল উত্তর দিল।

তোমার বিবি কিছু বলে নি?

কি বলবে? এবার নুরুল ইসলাম আশ্চর্য হ'ল।

গয়াপ্রসাদ কি একটু ভাবল, তার পর বলল, তোমার ত জানবার কথা নয়। রাতভোর তুমি ত কারখানায় থাক।

নুরুল ঝুড়ি সরিয়ে দোকানে বসে পড়ল, হেঁয়ালি ছেড়ে ব্যাপারটা কি বল ত?

ঝুঁকে পড়ে গয়াপ্রসাদ ফিস ফিস করে বলল, আলেয়া।

কি?

আলেয়া, আলেয়া। আলেয়া জানো না, মাঠের মাঝখানে জ্বলে আর নেবে। পথিক আলো ভেবে অনুসরণ করে আর তাকে ভুলিয়ে বিপথে নিয়ে গিয়ে ঘাড় মটকে মেরে ফেলে।

নুরুল ইসলাম এবার সশব্দে হেসে উঠল, গাঁজার মাত্রাটা একটু কমাও গয়াপ্রসাদ, নয়ত হরেক রকমের খোয়াব দেখবে।

গয়াপ্রসাদ নুরুলের একটা হাত জাপটে ধরল, তোমার গা ছুঁয়ে বলছি নুরুল, আমি নিজের চোখে দেখেছি।

বটে। নুরুল আর হাসল না বটে, কিন্তু গম্ভীরও হতে পারল না।

কাল রাত্রে বাইরে বেরিয়েছিলাম, দেখলাম সামনের জলা জায়গায় একটা আলো জ্বলছে আর নিবছে।

জলা জায়গায় এক রকম গ্যাস জন্মায়, ওই রকম জ্বলে আর নেবে। মক্তবে পড়েছি।

আরে দূর, গয়াপ্রসাদ কণ্ঠে তাচ্ছিল্যের সুর আনল, গ্যাস কি ঘুরে ঘুরে বেড়ায় নাকি। স্পষ্ট দেখলাম এঁকে বেঁকে আলোটা সারা জলা জায়গায় ঘুরে বেড়াচ্ছে।

তারপর।

তারপর আর আমার দাঁড়িয়ে থাকতে সাহস হ'ল না ভাই। ছুটে ঘরের মধ্যে চলে গেলাম।

তা কি করা যাবে? নুরুল ইসলামের মুখে চিন্তার ম্লান ছায়া।

সেই কথাই ত তোমাকে জিজ্ঞাসা করছি। পীরের দরগায় মানত করলে কিছু উপায় হয় না? বৌ ছেলে-পুলে নিয়ে ঘর করি। বাড়ীর আনাচে কানাচে এ রকম অপদেবতার চলাফেরা হলেই ত মুশকিল।

বাড়ী ফিরে নুরুল রোশনকে কথাটা বলল। ভেবেছিল, রোশন কথাটা শুনে হেসে উড়িয়ে দেবে, কিন্তু সে হাসল না। বরং বেশ একটু গম্ভীর হয়েই গেল।

কি হ'ল?

এই আলেয়ার ব্যাপার। এটা আমিও দেখেছি। আমাদের পিছনের জলার ওপর দিয়ে ঘুরে ঘুরে বেড়ায়। মাঝ রাতে কতদিন আমি দেখেছি।

যত সব আজগুবী কথা। নুরুল কণ্ঠে উপেক্ষার সুর মেশাল। কিন্তু মনে কেমন একটা খটকা লেগে রইল। ছেলেবেলা থেকেই নুরুল অসম সাহসী, ভয় ডর বলে কিছু ছিল না। বাজি রেখে একবার সারাটা রাত কারখানায় বসে ছিল।

তবু এ রকম জলজ্যান্ত আলেয়ার খবর কেউ কখনও দেয়নি। রোশনকে আর কিছু না বলে, পরের দিন দুপুরে নুরুল কাশেম আলির কুঠিতে গিয়ে উঠল।

পরিহাস-তরল গলায় বলল, আশেপাশে যে বড্ড ভূতের উপদ্রব শুরু হয়েছে আলি সায়েব।

তোমারও চোখে পড়েছে মিয়া?

উত্তর শুনে নুরুল মিয়া ত অবাক্। সামলে নিয়ে বলল, না, মানে আমি স্বচক্ষে দেখি নি। তবে এধারে ওধারে সবাই বলছে।

ও সব চেপে যাও মিয়া। অপদেবতার কোপে পড়লে ধড়ে মুণ্ডু থাকবে না।

তুমি এ সব বিশ্বাস কর?

তা করি বই কি? আল্লা যেমন আছে, তেমনি শয়তানও আছে। বেহেস্ত যদি থাকে ত দোজখও আছে। ভূতপ্রেত আছে বই কি। শুধু থাকা নয়, তাদের অপকার করবার শক্তিও আছে।

হুঁ। নুরুল মিয়া আস্তে আস্তে উঠে পড়ল। এ ভাবে কথা কাটাকাটি করে ফয়শালা হবে না। যদি হিম্মৎ থাকে, নিজেকে লড়তে হবে।

দিন চারেক পরে মাঝরাতে শরীর খারাপের অজুহাতে নুরুল মিয়া কারখানা থেকে বেরিয়ে পড়ল। বাড়ী গেল না। বাড়ীর কাছ বরাবর এসে পাকুড় গাছের নীচে চুপচাপ দাঁড়াল।

সামনে জলা, মাঝে মাঝে কাশফুলের জঙ্গল, ফণিমনসার ঝোপ। কুয়াশার ম্লান আস্তরণ। ভালো করে কিছু দেখা যায় না।

কোথাও আলেয়ার চিহ্নমাত্রও নেই। অনেকক্ষণ বসে বসে নুরুল বিরক্ত হয়ে উঠল। আশে পাশে ঝিঁঝিঁর ডাক, জোনাকির ঝিলিক।

একটু বুঝি তন্দ্রার ভাব এসেছিল, চোখ খুলেই নুরুল অবাক। ঠিক জলার এক কোণে সঞ্চরমান এক অগ্নিশিখা। ধীরে খুব ধীরে এগিয়ে চলেছে।

দুটো হাত দিয়ে নুরুল সজোরে চোখ দুটো মুছে নিল। এ কি, খোয়াব দেখছে নাকি! সত্যিই ত চোখের সামনে দুলে দুলে আগুনের মালা এগিয়ে চলেছে, ঠিক সোজা ভাবে নয়, চক্রাকারে।

তা হলে ত কথাটা মিথ্যা নয়, প্রতিবেশীরা সত্যি কথাই বলেছে। আলেয়া নয়, আলেয়া হলে এ দীপ্তি গতিশীল হ'ত না। তবে, তবে এ কি?

নুরুল দাঁড়িয়ে উঠে নিজের বাড়ীর দিকে ছুটল, এ ভাবে উন্মুক্ত প্রান্তরে এ সময়ে দাঁড়িয়ে থাকাটা নিরাপদ্ হবে না, বাড়ী গিয়ে রোশনকে জাগাবে, তারপর দুজনে মিলে জানলা দিয়ে রহস্যময় গতিবিধি নিরীক্ষণ করবে।

দরজা ঠেলতে গিয়েই নুরুল অবাক্, হাতের টর্চের আলোয় দেখল, দরজা ভেজানো, হাত রখতেই খুলে গেল। দ্রুতপায়ে নুরুল ভিতরে ঢুকে গেল, তন্ন তন্ন করে প্রতিটি ঘর খুঁজল, রোশন কোথাও নেই।

জানলা দিয়ে নুরুল আর একবার বাইরের দিকে দেখল, অগ্নিময় শিখা একটু একটু করে এগিয়ে চলেছে জলার অন্য পাড়ের দিকে।

দু এক মিনিট দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে নুরুল কি ভাবল, তারপর ঘরের কোণ থেকে শড়কিটা তুলে নিয়ে ছুটে বেরিয়ে গেল।

এই পর্য্যন্ত বলে প্রৌঢ় চীৎকার করে হেসে উঠল। সেই পৈশাচিক হাসির শব্দে আমার শরীরের রক্তকণিকা হিম হয়ে গেল, বোধ হয় খাটিয়ায় বসে না থাকলে, পড়েই যেতাম মেঝের ওপর।

শয়তানীকে ঠিক ধরে ফেললাম বাবুসায়েব। জলা পার হবার আগেই। একেবারে পাকা ব্যবস্থা। কোমরে এক হাঁড়ি বাঁধা, তাতে কাঠকুটো দিয়ে আগুন জ্বালিয়েছে, এক হাতে ধুনোর কুচি, মাঝে মাঝে হাঁড়িতে ফেলতে আগুন লক লক করে উঠছে, মুখে তাপ না লাগে, তাই মুখ ঢাকা।

টানতে টানতে শয়তানীকে এপারে নিয়ে এলাম। হাতে শড়কি ছিলই। একেবারে এফোঁড় ওফোঁড় ক'রে ফেললাম। যে গলা দিয়ে রাতভোর গজল, খেয়াল, কাওয়ালী বের হ'ত, সে কণ্ঠ দিয়ে একটু শব্দও বের হতে দিই নি। ওই শাল আর শিমুলের তলায় বাবু সায়েব, রোশন ঘুমাচ্ছে। আমি নিজের হাতে তাকে শুইয়ে দিয়েছি।

কাশেম আলির খোঁজ করেছিলাম পরের দিন। ব্যাপারটার আঁচ পেয়ে সে পালিয়েছে। সারা পাটনা শহর তন্ন তন্ন ক'রে খুঁজেছি, তাকে পাই নি।

প্রৌঢ় একটু বুঝি দম নিল। আমার অবস্থা শোচনীয়। সর্বাঙ্গ ঠক ঠক ক'রে কাঁপছে। মনে হ'ল এখান বুঝি পড়ে যাব উঠানের ওপর।

আবার সেই পৈশাচিক হাসি। শরীরের রক্ত যেন জমাট বেঁধে গেল। ঘুরে পড়তে পড়তেই আওয়াজ কানে গেল।

মরেও শয়তানী স্বভাব ছাড়ে নি বাবুসায়েব। এখনও আপনাদের মতন নওজোয়ানদের টানছে। তারই আকর্ষণে আপনি কেবল ঘুরছেন একই পথ দিয়ে।

কি করে চেতনা ফিরে পেলাম, কি ভাবে টলতে টলতে সাইকেল রিক্সায় গিয়ে উঠেছি, তা আজও আমার বিস্ময়।

চমক ভাঙল অনেকগুলো লোকের কণ্ঠস্বরে। বাংলা ভাষা কানে যেতে।

আরে এ কি? আপনি? কবে এসেছেন পাটনায়? এত রাত্রে এখানে? রমেনবাবুর গলা। এতগুলো প্রশ্নের উত্তরে শুধু একটি কথা বলতে পারলাম, একটু জল।

কাছাকাছি বাড়ী থেকে জল এল। অনেক কষ্টে থেমে থেমে ঘটনাটা বললাম। রিক্সা'ওয়ালাও সাক্ষ্য দিল।

রমেনবাবু ক্লাব থেকে ফিরছিলেন বন্ধুদের সঙ্গে। কাহিনীটা মন দিয়ে শুনে বললেন, খুব ছেলেবেলায় এরকম একটা ঘটনা আমি শুনেছি বটে। ঠিক থানার পিছনে একটা কবরও আছে। এখানকার লোকেরা বলে বাইজীর কবর। কিন্তু তার সামনে ত কোন ডেরা নেই? ফাঁকা মাঠ।

আবার সবাই ফিরলাম, কেবল রিক্সাওয়ালা বাদ। সে আসতে রাজী হ'ল না। ভাড়া নিয়ে ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটে পালাল।

শাল-শিমূলের কাছে এসে নিজের চোখকেও যেন বিশ্বাস ক'রে উঠতে পারলাম না।

কোথাও কোন আস্তানার ক্ষীণ চিহ্নও নেই। সামনে প্রসারিত বাঁজা মাঠ। কাশের জঙ্গল। বুনো লতা। লালচে রঙের ফুলের গোছা।

কৈ, কোথায় কি দেখেছেন ?

কিছু বলতে পারলাম না। সামনে এরোড্রোম। যন্ত্রদানবের অবতরণ ক্ষেত্র। পিছনে বরফের কল থেকে ধোঁয়ার কুণ্ডলী উঠছে। বিজ্ঞানের অগ্রগতির এই পরিপ্রেক্ষিতে দাঁড়িয়ে নতুন ক'রে সে কাহিনী আজকের মানুষদের বার বার বলা যায় না।

মাথা নীচু করে চলতে গিয়েই থেমে গেলাম। শাণিত উজ্জল দুটি চক্ষু। এই ত সন্দেহাকীর্ণ প্রৌঢ়ের দৃষ্টির সন্ধান পেয়েছি।

একটু এগিয়েই থমকে দাঁড়ালাম।

না, চোখ নয়, কাশের জঙ্গলে রাংতার টুকরো আটকে রয়েছে। এ যুগের ধূমপায়ী কোন মানুষের সিগারেটের কৌটা থেকে অবহেলায় ছুঁড়ে ফেলে দেওয়া রাংতার কিছুটা।

এ পাশে কবর। বাইজীর কবর। বুনো লতায় প্রায় আবৃত। অবিশ্বাসিনী এক নারীর অপবিত্র সত্তা চিরনিদ্রায় নিথর।

কোথাও অস্বাভাবিক কিছু নেই। হিংসা, দ্বেষ, আর হত্যার প্রাচীন এক কাহিনী প্রকৃতি কবে নিশ্চিহ্ন ক'রে দিয়েছে।

আমি বুঝি স্বপ্নই দেখেছিলাম, কিংবা ক্লান্ত দৃষ্টির সামনে নিজেরই চিন্তার মিছিল।

—০—

১৩৬৯ ফাল্গুন সংখ্যা প্রবাসীর

অশুদ্ধি সংশোধন

শ্রীমতী কমলা দাশগুপ্তের এব্রাহাম লিংকন প্রবন্ধে, ৬০৫ পৃষ্ঠার প্রথম স্তম্ভ, চতুর্থ ছত্রে "ক্রীতদাসের সঙ্গে লড়াই করেছিলেন" কথা কয়টির পর, ৬০৬ পৃষ্ঠার প্রথম স্তম্ভ, তৃতীয় ছত্রের "প্রেসিডেন্ট হ'য়ে সেই" কথা কয়টির থেকে আরম্ভ ক'রে সেই স্তম্ভের অবশিষ্টাংশ ও দ্বিতীয় স্তম্ভের প্রথম দুটি ছত্র বসবে। ৬০৬ পৃষ্ঠার প্রথম স্তম্ভ, তৃতীয় ছত্রের "গুলী কর, গুলী কর" কথা কয়টির পর, দ্বিতীয় স্তম্ভের তৃতীয় ছত্রের "স্পাই, স্পাই" থেকে প্রবন্ধের অবশিষ্টাংশ বসবে।

৬০৭ পৃষ্ঠায় " 'ওগ্‌গর ভত্তা' থেকে 'মুরগি খাই না' " প্রবন্ধটির রচয়িতার নাম সুবীর রায় চৌধুরী, সুধীর রায় চৌধুরী নয়।

প্রবাসীর এই সংখ্যাটিতে আরও অনেক ছাপার ভুল থেকে গেছে, তবে পাঠকরা সেগুলিকে সহজেই ছাপার ভুল ব'লে বুঝতে পারবেন মনে ক'রে এখানে সেগুলির উল্লেখ করা হ'ল না।

ভুলগুলির জন্যে আমরা অত্যন্তই লজ্জিত এবং দুঃখিত।

বাঙ্গলা ও বাঙ্গালীর কথা

শ্রীহেমন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়

সোনার বাজার এবং স্বর্ণ-শিল্পের মরণ-সঙ্কট

কেন্দ্রীয় সরকারের অধুনা স্থাপিত স্বর্ণ-বোর্ড সোনার বাজারে এবং স্বর্ণ-অলঙ্কার শিল্পে যে প্রচণ্ড আঘাত হানিয়াছেন, তাহার ফলে দেশের স্বর্ণশিল্প এবং এই শিল্পে জড়িত লক্ষ লক্ষ শিল্পীকে উপার্জ্জনে বঞ্চিত হইয়া আজ পথে বসিতে হইয়াছে। "সোনার কলিকাতা" আজ পোড়া বাজারে পরিণত হইতে চলিয়াছে! সংবাদ-পত্রে প্রকাশ—

স্মরণাতীতকাল হইতে ভারতের যে সুনাম ছিল মুখ্যত তাহার মূলে ছিল ভারতের অপূর্ব ঐতিহ্যমণ্ডিত স্বর্ণশিল্প। স্বর্ণশিল্পই ভারতকে সোনার ভারতে রূপান্তরিত করিয়াছিল, সেই জন্যই ভারত হইয়াছিল সকল দেশের রাণী'। অভিপ্রেত হউক অথবা না হউক, এই ঐতিহাসিক সত্য কেহ অস্বীকার করিতে পারেন না।

ভারতের স্বর্ণশিল্পের শ্রেষ্ঠত্ব এই একটি তথ্য হইতেই জানা যাইবে: এখনও একজন সাধারণ স্বর্ণশিল্পী এক পাত সোনা দিয়া দশটি সোনার [illegible] তৈয়ারী করিতে পারেন! একদিনে এই শ্রেষ্ঠত্ব আসে নাই, যুগ-যুগান্তের সাধনার ফলেই ভারতীয় স্বর্ণশিল্প যুগান্তর আনিতে পারিয়াছে।

কিন্তু আজ? স্বর্ণ বোর্ড যে ভূমিকম্প সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহাতে ভারতের সুপ্রাচীন স্বর্ণশিল্পের অপমৃত্যু ঘটিয়াছে। জাড়ুপাড়া, কাঁসারি-পাড়া, গরাণহাটা, সিমলে, তালতলা, বাঁশতলা যেখানেই যান দেখিবেন সোনার দোকানগুলি খাঁ খাঁ করিতেছে। শো-কেশগুলি শূন্য। বিরসবদনে যাঁহারা দোকানগুলি পাহারা দিতেছেন, তাঁহাদের যত প্রশ্নই করুন না কেন শুধু একটি জবাবই পাইবেন। গহনা আছে? গহনা মেরামত করিতে পারিবেন? গহনাটি বড় হইয়াছে, একটু ছোট করিতে পারিবেন? গিনি সোনার গহনা না হয় নাই, কিন্তু ১৪ ক্যারেট সোনার গহনা? তাহাও নাই? দোকানীরা সকলে বাধ্য হইয়া "ভদ্রলোক" বনিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের মুখে ভদ্রলোকের এক কথা শুধু "না" ছাড়া আর কথা নাই।

সরকারী হুকুমে এখন হইতে ১৪ ক্যারেট সোনার গহনা গড়িতে হইবে—তাহার বেশী সোনার গহনা নির্ম্মাণ করা বে-আইনী এবং দণ্ডনীয় বলিয়া ঘোষিত হইয়াছে। কিন্তু ১৪ ক্যারেট সোনার গহনা প্রস্তুত করা সম্পর্কে একজন প্রখ্যাত স্বর্ণ-শিল্পী দুইখানি বালা, একটি গিনি সোনার অপরটি ১৪ ক্যারেট সোনার, দেখাইয়া বলিয়াছেন,—

গিনি সোনার বালা একবার পুড়াইয়াই তৈরী করিয়াছি, আর ১৪ ক্যারেটবালাকে তিনবার পোড়াইয়াও বাগে আনিতে পারিতেছি না—এই দেখুন, ফাটিয়া যাইতেছে।

আর একজন বলিলেন, মশাই, গিনি সোনা নরম, নমনীয়তার জন্যই তাহার উপর মণিপুরী কাজ, নক্সা, এনামেল প্রভৃতি সূক্ষ্ম কারুকার্য সম্ভব হইয়াছে। এখন এই শক্ত সোনা দিয়া আমরা কি করিব?

কিন্তু ইহাতে সরকারী কর্ত্তাদের কি আসিয়া যায়? তাঁহারা অবাস্তব লোকে তাপ-নিয়ন্ত্রিত কামরায় বসিয়া হুকুম দিবার মালিক—বাস্তবে কি সম্ভব আর কিই বা অসম্ভব, তাহা লইয়া মূল্যবান্ মাথা এবং মেদবহুল দেহকে পরিশ্রান্ত করিবার তাঁহাদের অবসর কোথায়? একজন নবযুবক স্বর্ণ-শিল্পী রোজী হইতে বঞ্চিত হইয়া আক্ষেপ করিয়া বলিতেছেন:

বুড়ো আঙ্গুল কাটিয়া দিয়া ইংরেজ বাংলার মসলিন শিল্পকে খতম করিয়াছিল, আর স্বাধীন ভারতের জাতীয় সরকার ভুল পথে চলিয়া বিনা রক্তপাতে আর একটি মহান্ শিল্পকে শেষ করিয়া দিলেন। যে সরকার খদ্দর আর তাঁতের কাপড়ের জন্য হৈচৈ করেন, তাঁহারাই স্বর্ণ-শিল্পে মসলিনের বদলে মিলের কাপড় আমদানি করিতেছেন।

স্বর্ণ-শিল্পীদের ক্ষোভ এবং আশঙ্কার মূল কারণ সরকার অলঙ্কারে সোনার ব্যবহার সীমিত করিতে গিয়া পাশ্চাত্ত্য-প্রভাবিত ১৪ ক্যারেট সোনার ব্যবহারের যে হুকুম জারী করিয়াছেন, যাহার ফলে দেশের স্বর্ণালঙ্কার-নির্ম্মাণ-জগৎ হইতে হস্ত-শিল্প বিদায় লইতে বাধ্য হইবে, তাহার স্থলে আবির্ভূত হইবে এই শিল্পে মেশিন যুগ! লক্ষ লক্ষ স্বর্ণ-শিল্পী, যাঁহাদের মাথার উপর খাঁড়া-ঝুলিতেছে, তাঁহারা পরম হতাশাভরে আজ বলিতেছেন:

ভারবাহী নাগর (অর্থাৎ রিক্সাওয়ালা) এবং পাণ্ডাদের মুক্তি দিবার পথেও সরকার অর্থনৈতিক দিকটা না দেখিয়া পারেন নাই, এক্ষেত্রে সরকার সেদিকে ফিরিয়াও তাকাইলেন না—আমরা এমন কি মহা-পাতক!

অথচ, স্বর্ণশিল্পীমহল বলিতেছেন, ১৪ ক্যারেট সোনার গহনা চলিবে বলিয়াই সরকার সরিয়া দাঁড়াইয়াছেন, কি করিয়া তাহা হইবে তাহা বাৎলাইয়া দিবার দায়িত্বটুকুও লন নাই। তাঁহাদের নয়ানীতি ভারতের অর্থনীতিকে নূতন বিপদের দিকে ঠেলিয়া দিয়াছে। এখন নূতন করিয়া যে সব নূতন ধরণের উখো, করাত, বুলি, চেন মেশিন প্রভৃতি লাগিবে তাহা এখনও মানসম্মতভাবে ভারতে তৈরী হয় না, কবে হইবে তাহাও কেহ বলিতে পারে না। তাই বৈদেশিক মুদ্রা অপব্যয় করিয়া এই সব বস্তু আমদানি করিতে হইবে—সরকার কি সেই পথই বাছিয়া লইবেন?

গোল্ড প্লেটিং করিবার জন্ম এইভাবে পরের মুখের দিকে তাকাইয়া থাকিতে সরকার রাজী কি? আর যন্ত্র আনিলেই কি সব হইয়া গেল? বৌবাজারের একটি বড় ফার্ম অনেকদিন হইল একটি জার্মান চেন মেশিন পড়িয়া আছে, লোকাভাবে উহা চালান সম্ভব হয় না। সরকার কি এখনও বাহির হইতে "এক্সপার্ট" আনাইবার অনুমতি দিবেন?

পশ্চিমবঙ্গে স্বর্ণালঙ্কার-নির্মাতা রেজিষ্টার্ড দোকানের সংখ্যা হাজারেরও বেশী, কলিকাতায় এই সংখ্যা প্রায় ৪০০ হইবে।

এই সব দোকানে গড়ে দশজন করিয়া কারিগর কাজ করেন। এমন কয়েকটি দোকান আছে যাহাদের কারিগর ও কর্মচারীর সংখ্যা ৫০ হইতে ৭০ বা ততোধিক। রেজিষ্টার্ড সোনার দোকানগুলির উপর নির্ভর করেন অন্ততপক্ষে ৪০।৪৫ হাজার মানুষ।

ইহার উপর—পশ্চিমবঙ্গের আনরেজিষ্টার্ড দোকানের সংখ্যা পাঁচ-সাত হাজারের মত হইবে। ইহার দুই-আড়াই হাজার এই মহানগরীতে অবস্থিত। এই দোকান-গুলির উপর নির্ভর করেন ত্রিশ-চল্লিশ হাজারের মত কর্মচারী। এই দুই ধরণের দোকানকেই গহনা তৈরি প্রভৃতি কাজে মজুরির বিনিময়ে সাহায্য করেন এমন কনট্রাকটার-সংস্থার সংখ্যাও পাঁচ সহস্রাধিক। উহার কর্মচারীর সংখ্যা পঞ্চাশ হাজারের মত। এই হিসাব ছাড়াও রাজ্যের সর্বত্র আরও অসংখ্য সোনার দোকান ছড়াইয়া রহিয়াছে। বেসরকারী হিসাব অনুযায়ী দুই লক্ষ শিল্পী এবং তাঁহাদের পরিবারসমূহ এই ব্যবসায়ের উপর নির্ভর করেন। এখানেই শেষ নহে। ডাইস ও যন্ত্র নির্মাতা, যন্ত্রপাতি ও অ্যাসিড বিক্রেতা, রিফাইনারি ও নেহারাওয়ালা প্রভৃতি মিলাইয়া আরও পঞ্চাশ হাজার কর্মীও এই শিল্পের উপর একান্ত নির্ভর-শীল। এত ঘটা করিয়া যে ১৪ ক্যারেট সোনার রাজত্ব কায়েম করা হইতেছে, তাহা কি এই আড়াই লক্ষাধিক কর্মচারী এবং পঁচিশ হাজারের মত মালিককে কেবলমাত্র পথে বসাইবার জন্য?

প্রবীণ স্বর্ণশিল্পীরা বারবার জানিতে চাহিয়াছেন, সোনার অধিক ব্যবহার আর চোরা-চালান বন্ধ করিবার জন্য এই সর্বনাশা পথ ছাড়া সরকার কি আর পথ পাইলেন না? তাঁহাদের প্রশ্ন: সরকারের উদ্দেশ্য সফল হইয়াছে কি? কতটুকু মজুত সোনার হিসাব তাঁহারা পাইয়াছেন? সোনার ব্যবসা লাটে উঠিলেও ১৩৮ টাকা ভরি মূল্যের কমে সোনা পাওয়া যাইতেছে কি? তাহা হইলে সোনার চোরা-চালান বন্ধ হইবে কি করিয়া?

কেন্দ্রীয় সরকার যে-ভাবে অগ্রসর হইতেছেন তাহাতে কাহার কি শুভ হইবে জানি না। কিন্তু স্বর্ণ-শিল্পীমহল যাহা আশঙ্কা করিতেছেন—তাহা সত্যই ভয়াবহ এবং শিল্পী-মহলের এই আশঙ্কা সত্বর দূর করা সরকার বাহাদুরের একান্ত কর্তব্য। কিন্তু কর্তব্য পালন না করাই সরকারের কর্তব্য।

দেশের ব্যবসা-বাণিজ্য লইয়া কেন্দ্রীয় সরকারের অনভিজ্ঞ অঙ্ক পণ্ডিতের দল যে প্রকার বিষম সর্বনাশা খেলা খেলিতেছেন—তাহাতে সর্বমহলে—বিশেষ করিয়া ব্যবসায়ী মহলে—আজ পরম এক সর্বনাশের আশঙ্কা ঘনীভূত হইতেছে।

কিন্তু সোনা পাইবে কোথা

সরকার ১৪ ক্যারেট সোনার অলঙ্কার তৈরারীর নির্দেশ জারি করিয়াই আপৎকালে তাঁহাদের কর্তব্য এবং দায়িত্ব শেষ করিয়াছেন। কিন্তু স্বর্ণ শিল্পীরা এই সোনা কোথা হইতে পাইবেন—সে বিষয় তাঁহার একেবারে নীরব। পাকা সোনা না পাওয়া গেলে তাঁহারা কি উপায়ে ১৪ ক্যারেট সোনার গহনা নির্মাণ করিবেন? সরকার হইতে পাকা সোনা না পাওয়া গেলে—পাইকারী সোনার ব্যবসা এবং স্বর্ণালঙ্কার শিল্পীরা বিপন্ন হইয়া পড়িবেন—ইতিমধ্যেই ইহা প্রকট হইয়াছে।

স্বর্ণনিয়ন্ত্রণ বিধি চালু হওয়ার পর হইতেই পাইকারী বাজারে লেন-দেন বন্ধ। আগেই সোনার চাহিদার তুলনায় সরবরাহ ছিল কম। তাঁহারা লোকের বিক্রীত অলঙ্কার হইতে প্রাপ্ত সোনায় কারবার চালাইতেন। কিন্তু এখন বিনি সোনার গহনা আর পাওয়া যাইবে না বলিয়া পুরানো গহনা কেহই বিক্রী করিতে আসিতেছেন না। ফলে সোনার সরবরাহ নাই। তাঁহাদের ঘরে যে সোনা আছে তাহাও প্রয়োজনের তুলনায় নগণ্য। সে সোনা বিক্রী হইয়া গেলে ভবিষ্যতে কোথায় সোনা পাওয়া যাইবে, সে নিশ্চয়তা নাই। সুতরাং, সরকার হইতে প্রয়োজনমত সোনা সরবরাহ না করিলে বাজার চালান অসম্ভব।

আচমকা স্বর্ণশিল্পীদের মস্তকে আণবিক বোমা না ফাটাইয়া সরকার ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতে পারিতেন। ব্যক্তি বা পরিবার পিছু সোনার ব্যবহার সীমিত করিয়া দিয়া স্বর্ণালঙ্কার নির্মাণ বরাদ্দ করা অসম্ভব ছিল না। ১৮ ক্যারেট সোনার ব্যবহার আপাতত কিছুদিন বজায় রাখিলে—দেশ হইতে সোনা উবিয়া যাইত না। কিন্তু অনভিজ্ঞের হাতে কাজের দায়িত্ব থাকিলে যাহা ঘটে, স্বর্ণের ব্যাপারে ঠিক তাহাই ঘটিয়াছে।

কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রীর খ্যাতি প্রচুর। বোম্বাই প্রদেশে মুখ্যমন্ত্রী থাকা কালে প্রদেশবাসী তাঁহাকে "আনন্দ-মার"

(Kill-joy), "Moral জী" ইত্যাদি উপাধি দিয়াছিল। নিজেকে তিনি মহাত্মা গান্ধীর একনিষ্ঠ ভক্ত বলিয়া প্রচারে গর্ব্ব বোধ করেন। কিন্তু বোম্বাই প্রদেশে তাঁহার আমলে 'সুরা বর্জ্জন' কি প্রচণ্ড সার্থকতা লাভ করে—তাহা ঐ প্রদেশের সুরাপায়ী মাত্রেরই জানা আছে। সেই মহাযোগী সর্ব্ব-সাধনা-সিদ্ধ মোরারজী এবার দেশের লোককে ২২ ক্যারেট সোনার অনিষ্টকর এবং অযথা মোহ হইতে ত্রাণ করিবার পরম পবিত্র ব্রত লইয়াছেন। তাঁহার ধারণা, স্বর্ণ-নিয়ন্ত্রণ আদেশ বলবৎ করিলেই দেশের সকল সোনা এবং সোনার গহনা তাঁহার ভাণ্ডারে প্রচণ্ড স্রোতে প্রবাহিত হইয়া অচিরে সরকারের স্বর্ণ ভাণ্ডার কানায় কানায় পূর্ণ করিবে। যাহার ফলে সরকার বাহাদুর বিদেশী মুদ্রার ঘাটতি-মুক্ত হইতে পারিবেন অক্লেশে!

মোরারজী মহারাজ ভুলিয়া যাইতেছেন যে সোনা লইয়া তাঁহার অর্থাৎ কেন্দ্রীয় সরকারের এত বিষম টানাটানিতে, সোনা সংগ্রহের এই অতি প্রচেষ্টার একমাত্র ফল হইবে, লোকের সোনার প্রতি আকর্ষণ আরও বাড়িয়া যাইবে। যাহার যতটুকু সোনা আছে, প্রাণ থাকিতে সে তাহার মায়া ছাড়িতে পারিবে না।

সরকারের এই স্বর্ণ-নীতির ফল ইতিমধ্যেই প্রকট হইয়াছে। কালো বাজারে সোনার দর চড়িয়া গিয়াছে এবং ঐ-চড়া দরেই সোনার কেনা-বেচা তেজী দেখা যাইতেছে!

স্বর্ণ-নিয়ন্ত্রণ আদেশ জারী হইবার সঙ্গে সঙ্গেই খোলা-বাজারের সোনা গা-ঢাকা দিয়া উদয় হইয়াছে কালো বাজারে। ধনীদের সঞ্চিত কোটি কোটি টাকার সোনার অবস্থাও একই প্রকার বলিয়া শুনা যাইতেছে। কালো বাজারের সোনার কারবারীরা গোপনে সোনা মজুত করিতেছে। কারণ, তাহারা সোনার প্রতি মানুষের চিরন্তন পরম দুর্ব্বলতার খবর রাখে, এবং ইহাও জানে যে অচিরে লোকে আবার কালোবাজারের অসম্ভব দরেও অবশ্যই সোনা কিনিবে।

আমাদের মনে হয় 'পীত-জাতির' ভীতি—তাহা যতই সত্য এবং ভয়াবহ হউক—সাধারণ মানুষকে 'পীত'-ধাতুর প্রতি মায়া ত্যাগ করাইতে সক্ষম হইবে না। দেশের মানুষকে সত্যকার দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করিতে পারিলেই তবে ইহা সম্ভব। কিন্তু দেশের বর্ত্তমান ৯ ক্যারেট কিংবা তদপেক্ষাও কম ক্যারেটের নেতৃত্ব এ-পবিত্র কর্ত্তব্য পালনের অযোগ্য। যে দূরদর্শিতা, চরিত্র, আত্মত্যাগ এবং দেশপ্রেম লোকে নেতৃত্বের নিকট আশা করে বর্ত্তমান কংগ্রেসী নেতৃত্বে তাহার অভাব পর্ব্বত-প্রমাণ। সর্ব্বাপেক্ষা ভয়ের কথা অদ্যকার কংগ্রেসী তথা সরকারী নেতারা তাঁহাদের মনের এবং আদর্শের দারিদ্র্য কী ভীষণ তাহা জানেন বলিয়াই এবং নিজেদের এই দুর্ব্বলতার কথা জানেন বলিয়াই অহরহ তাঁহারা বিষম বাক্য-প্রবাহে জনমনের নিকট হইতে ইহা গোপন রাখিবার এত প্রচণ্ড প্রয়াস পাইতেছেন।

সাধারণ মানুষকে ত্যাগে, বিশেষ করিয়া স্বর্ণ-ত্যাগে উদ্বোধিত করিতে হইলে নেতাদের সর্ব্বাগ্রে এই ত্যাগের দ্বারা দৃষ্টান্ত স্থাপন করিতে হইবে। কোন্ নেতার সঞ্চিত সোনার পরিমাণ কি এবং তাহার কি অংশ তিনি খুশী মনে হাসিমুখে দান করিয়াছেন তাহা প্রকাশ করিতে হইবে। দেশের জন্য আমরা সর্ব্বাত্মক ত্যাগের জন্য সদা প্রস্তুত—কিন্তু এই ত্যাগের ব্যাপারে শ্রেণীবিশেষের জন্য মানের বা দানের তারতম্য মানুষ বরদাস্ত করিবে না।

কর্পোরেশন প্রসঙ্গ

সংবাদপত্রে প্রকাশ যে:

বিধান পরিষদের বৈঠক শেষ হইবার সঙ্গে সঙ্গে রাজ্যসরকার-অর্ডিন্যান্স ও বিভিন্ন ধরণের আদেশ জারীর মাধ্যমে জেলা বোর্ড ও কয়েকটি পৌরসভাকে শায়েস্তা করিতে উদ্যত হইয়াছেন।

আর একটি অর্ডিন্যান্স জারী করিয়া রাজ্যসরকার ২৪ পরগণা জেলা বোর্ডটি আরও এক বৎসর নিজের কর্তৃত্বাধীন রাখিবার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, গত ছয় বৎসর ধরিয়া এই জেলা বোর্ডটি এ্যাডমিনিষ্ট্রেটর কর্তৃক পরিচালিত হইয়া আসিতেছিল।

রাজ্য সরকার আর এক আদেশ জারী করিয়া দমদম পৌরসভার চেয়ারম্যানকে অপসারণ করিয়াছেন। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে এই মিউনিসিপ্যালিটির কমিশনারদের মধ্যে সাতজন চেয়ারম্যানের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব উত্থাপন করায় এক অচল অবস্থার সূচনা হইয়াছিল।

পর্যবেক্ষক মহলের সংবাদে প্রকাশ যে, আগামী দু-এক সপ্তাহের মধ্যে বর্তমান বিভাগের অন্তর্গত আরো দুইটি পৌরসভার পরিচালনার দায়িত্বভার রাজ্য সরকার নিজে গ্রহণ করিতে পারেন।

রাজ্যসরকারের তৎপরতায় সকলেই কেবল খুশী নয়, চমৎকৃত হইবেন। কিন্তু দু-চারিটা মাছি মারিয়া বিশেষ কি লাভ লাভ হইবে জানি না। কাউন্সিলার বিষে জর্জ্জরিত কলিকাতা কর্পোরেশনের বিষয় রাজ্যসরকার যথাবিহিত ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে কেন এত দ্বিধাবোধ করিতেছেন? করদাতারা আজ ইহাই জানিতে চাহে। কর্পোরেশনের বিষয় সংবাদপত্রে বহু চাঞ্চল্যকর কলঙ্ক-কাহিনী সবিস্তারে প্রকাশিত হইয়াছে, এখনও হইতেছে, কিন্তু তাহা সত্ত্বেও রাজ্যসরকার এবং বঙ্গেশ্বর শ্রীঅতুল্য নির্ব্বাক্, নিশ্চল। কয়েকদিন পূর্ব্বে প্রকাশ

পায় করদাতাদের টাকা লইয়া কাউন্সিলারগণ কি বিষম ছিনিমিনি খেলিতেছেন। দেখিলে মনে হয় তাঁহারা পৈতৃক জমিদারীর টাকাই উড়াইতেছেন!

কিন্তু (অ)পৈতৃক জমিদারীর টাকা উড়াইয়া কিংবা অপচয় করিবার কাউন্সিলারদের যে প্রচণ্ড নেশা এবং ঝোঁক—প্রাপ্য ন্যায্য অর্থ আদায়ের প্রতি এই কর্ত্তব্যনিষ্ঠ পৌরপিতাদের কোন চেষ্টাই নাই! কেবল ইহাই নহে, অনুমোদিত কয়েকটি ব্যাঙ্কে পৌরপ্রতিষ্ঠানের অধিকতর সুদ পাওয়ার সকল সুযোগ থাকা সত্ত্বেও, পৌর-কর্ত্তারা অপর কয়েকটি ব্যাঙ্কে অল্পতর সুদে টাকা জমা রাখিয়া বছরের পর বছর করদাতাদের অর্থের প্রভূত লোকসান করিতেছেন। রাজ্যসরকারের নির্দ্দেশে স্পেশাল অডিট কলিকাতা কর্পোরেশনের পাঁচ বৎসরের ব্যাঙ্কের হিসাব অডিট করিয়া এই বিচিত্র তথ্য কয়েক মাস পূর্ব্বে উদ্ঘাটিত করিয়াছেন।

প্রকাশ পাইয়াছে যে:

পশ্চিমবঙ্গের একাউন্টেন্ট জেনারেল এবং একজামিনার অব লোকাল একাউন্টসকে লইয়া গঠিত উক্ত স্পেশাল অডিট ১৯৫৪ সালের ১লা এপ্রিল হইতে ১৯৫৯ সালের ৩১শে মার্চ পর্যন্ত কলিকাতা পৌরসভার হিসাব পরীক্ষা করিয়া একটি গোপন রিপোর্ট দিয়াছেন।

উক্ত রিপোর্টে এইরূপও উল্লেখ করা হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ যে, কয়েকটি ক্ষেত্রে কোন ব্যাঙ্কের চলতি সুদের হার অপেক্ষা কম সুদে সেই ব্যাঙ্কেই টাকা জমা দেওয়া হইয়াছে।

স্পেশাল অডিট রিপোর্টে প্রথমে কঠোর মন্তব্য করিয়া বলা হইয়াছে যে, স্বল্প মেয়াদে যে সকল ব্যাঙ্কে টাকা জমা রাখা হয়, সেই সকল ব্যাঙ্কের সুদের হার অডিটকে জানাইতে পৌরসভার ফিনান্স অফিসার ও চীফ একাউন্টেন্ট অনিচ্ছা প্রকাশ করেন। সেই কারণে অডিটকে সরাসরি ব্যাঙ্কের নিকট হইতে সুদের হার জানিতে হয়। রাজ্যসরকারের অডিটরদের তদন্তের শুরুতেই এইভাবে বাধার সম্মুখীন হইতে হয়।

অনুমোদিত ব্যাঙ্কের মধ্যে শতকরা ৩৲ টাকা সুদের হার বিশিষ্ট ব্যাঙ্ক থাকা সত্ত্বেও পৌর কর্তৃপক্ষ অনেক ক্ষেত্রে শতকরা ২-২৫ নয়া পয়সা, ২-৭৫ নয়া পয়সা বা ২৲ টাকা সুদের ব্যাঙ্কে লক্ষ লক্ষ টাকা জমা দিয়াছেন। কয়েকটি ক্ষেত্রে একমাস বা একমাসের বেশি সময়ও টাকা জমা রাখা হইয়াছে।

ব্যাঙ্কে টাকা জমার ব্যাপার লইয়া আরও বহু চমৎকার তথ্য প্রকাশ করিয়াছেন স্পেশাল অডিট। বর্ত্তমানে সম্পূর্ণ রিপোর্ট প্রকাশ করা সম্ভব হইল না স্থানাভাবে।

১৯৫৭-৫৮ এবং ১৯৫৮-৫৯ এই দুই বৎসরে ব্যাঙ্কে পৌর-কর্ত্তৃপক্ষ যে টাকা জমা রাখেন তাহার পরিমাণ এমন কিছু বেশী নয়, মাত্র ৬ কোটি ৫৫ লক্ষ টাকা! সুদের খাতে কর্পোরেশনের ক্ষতি কি পরিমাণ হইয়াছে, তাহা আমাদের পক্ষে ঠিক বলা শক্ত।

ইহাও জানা গিয়াছে যে পৌর-কর্ত্তাদের বিষম কর্ত্তব্য-পরায়ণতা এবং অতীব তৎপরতার কল্যাণে একমাত্র বাড়ীর ট্যাক্স বাবদ পাওনা প্রায় ২ কোটি ১৫ লক্ষ টাকা অনাদায়ী খাতে পড়িয়া আছে। অন্যান্য নানা বিল বাবদ অনাদায়ী টাকার পরিমাণ হইবে কম পক্ষে ২৬ লক্ষ টাকা। ইহা ছাড়া টালিগঞ্জ অঞ্চলের ট্যাক্স বাবদ প্রায় ৬৮ লক্ষ টাকা অনাদায়ী আছে। খাজনা আদায়ের পরিসংখ্যানে প্রকাশ যে প্রতি কোয়ার্টারে কলিকাতায় শতকরা ৬০ এবং টালিগঞ্জে শতকরা মাত্র ২০ টাকা আদায় হইয়া থাকে। কিন্তু এই অনাদায়ী কোটি কোটি টাকা আদায়ের সুব্যবস্থা বা কোন ব্যবস্থা করা বর্ত্তমানে পৌর-পিতাদের বোধ হয় কর্ত্তব্য নহে! পৌরপিতাদের একমাত্র কর্ত্তব্য, টাকা তাঁহাদের হাতে তুলিয়া দিলে সেই পরমানন্দে বেপরোয়া অপব্যয় করা।

রাজ্যসরকার এ-রাজ্যের কয়েকটি ছোট ছোট পৌর-সভাকে শায়েস্তা করিতে উদ্যত হইয়াছেন কিন্তু তাঁহাদের নাকের ডগায় কলিকাতা পৌরসভার বিষয় অবিলম্বে যথা-যোগ্য ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে আর বৃথা কালক্ষেপ করার একমাত্র অর্থ হইবে করদাতাদের আক্ষেপের পরিমাণ বৃদ্ধি করা।

কলিকাতা পৌরপিতাদের এখন একমাত্র কর্ত্তব্য দেখা যাইতেছে, কর্ত্তব্যনিষ্ঠ এবং দক্ষ কমিশনার শ্রী [illegible] বি. রায়কে কর্পোরেশন হইতে বিতাড়িত করা এবং এই পুণ্যব্রত সার্থক করিবার জন্য পৌর-পিতারা আদাজল খাইয়া লাগিয়াছেন।

কমিশনারের সহিত কর্পোরেশনের কাউন্সিলরদের মতপার্থক্য কয়েক মাস হইতে তীব্রতর হইয়াছে। সম্প্রতি কর্পোরেশনের বাজেট প্রণয়নের ব্যাপারে ইহা চূড়ান্ত পর্যায়ে উঠিয়াছে। জানা গিয়াছে যে, অর্থ বিষয়ক স্ট্যাণ্ডিং কমিটি যেভাবে কমিশনারের প্রস্তাবসমূহের প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহাতে মুখ্যমন্ত্রী ব্যক্তিগতভাবে বিশেষ ক্ষুব্ধ হইয়াছেন। তিনি ইতিমধ্যে কয়েকজন প্রবীণ কাউন্সিলারকে তাঁহাদের মত পরিবর্তনের জন্য অনুরোধ জানাইয়াছেন। প্রকাশ যে, কাউন্সিলার-গণ যদি বাজেটটি পুনরায় পরীক্ষা না করেন, তবে মুখ্যমন্ত্রী অন্য ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ দিবেন, সে বিষয়ে ইতিমধ্যে ইঙ্গিত পাওয়া গিয়াছে।

কিন্তু এই 'অন্য ব্যবস্থা' গ্রহণে বিলম্ব হইতেছে কেন, তাহা করদাতারা বুঝিতে পারিতেছে না।

প্রকাশ যে রাজ্য সরকারের সংশ্লিষ্ট মহল কংগ্রেস মিউনিসিপ্যাল পার্টির এই প্রচেষ্টার কথা শুনিয়া বিস্ময়বোধ করিতেছেন। তাঁহারা মনে করেন যে, কর্পোরেশন ও কমিশনারের মধ্যে যে মত-পার্থক্য চলিতেছে এবং যাহার ফলে নগর-জীবনের স্বাভাবিক কাজ ব্যাহত হইতে চলিয়াছে, তাহার অবসান উচ্চতম রাজনৈতিক মহলের সিদ্ধান্তের উপর নির্ভর করিতেছে। তবে সত্যসত্যই যদি কমিশনারের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব উত্থাপিত হয়, তাহা হইলে সরকারের নিকট দুইটি দরজা খোলা রহিয়াছে। সরকার হয় প্রস্তাব উত্থাপিত হইবার পূর্বেই শ্রীরায়কে কর্পোরেশন হইতে সরাইয়া আনিবেন, অথবা তাঁহারা কর্পোরেশন পরিচালনার সম্পূর্ণ দায়িত্ব নিজ হস্তে গ্রহণ করিবেন।

কলিকাতার করদাতাদের স্বার্থ কি দেশের উচ্চতম রাজনৈতিক মহলের মর্জির উপরেই নির্ভর করিবে? যাহাদের অর্থে কর্পোরেশনের স্থায়িত্ব নির্ভর করে এবং অকর্ম্মার ঢেঁকি পৌরপিতাদের নবাবীর বেপরোয়া অনাচার চলে, সেই করদাতাদের, সব কিছু দেখিয়া কেবল ফ্যাল ফ্যাল করিয়া চাহিয়া থাকা ছাড়া আর কিছুই করিবার নাই? রাজ্যসরকারও কি "উচ্চতম রাজনৈতিক মহলের" সর্ব্বোচ্চ অধিনায়কের অঙ্গুলি-সংকেতে চলিবেন? ইহা যদি সত্য হয় তাহা হইলে আমরা যদি বলি যে সমগ্র পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য ঐ উচ্চতম রাজনৈতিক মহলের খাস জমিদারী, তাহা হইলে কি অন্যায় হইবে? 'উচ্চতম রাজনৈতিক মহল' বলিতে পশ্চিমবঙ্গ কংগ্রেস পার্টিকে বুঝায় ইহা স্পষ্ট করিয়া বলিবার দরকার নাই, এই কংগ্রেস পার্টির তথা কর্পোরেশন মিউনিসিপ্যাল পার্টির এক এবং অদ্বিতীয় রাজচক্রবর্ত্তী অতুল্য ঘোষ মহাশয়। ঘোষ মহাশয় গত কিছুকাল হইতে পশ্চিমবঙ্গবাসীদের আপৎকালে তাহাদের কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য বিষয়ে বহু বহু সাধু কথা এবং অমৃত উপদেশ একেবারে বিনা মূল্যেই বিতরণ করিতেছেন। কিন্তু দেশবাসী যদি আজ তাঁহাকে সবিনয়ে প্রশ্ন করে—"মহারাজ! আমরা, আপনার বিনীত প্রজাকুল, আপনার উপদেশামৃত লাভে পরম উপকৃত এবং গর্ব্বিত বোধ করিতেছি। কিন্তু পরকে উপদেশ দিবার পূর্ব্বে আপনি স্বয়ং আপনার দায়িত্ব এবং কর্ত্তব্য কতখানি পালন করিতেছেন তাহা দয়া করিয়া প্রকাশ করিবেন কি? কেন এবং কি কারণে আপনি কলিকাতা পৌর-সভার অনাচারী স্বার্থসর্ব্বস্ব শুভবুদ্ধিহীন এবং সর্ব্ববিধ অপকর্ম্মপটু এই পৌরপিতাগুলিকে আপনার বিশাল বিপুল পক্ষছায়ায় আশ্রয় দান করিয়া বিসদৃশ পক্ষপাতিত্ব দেখাইতেছেন? আপনি পরমপ্রতাপশালী বঙ্গেশ্বর, আপনার এক কথায় পশ্চিমবঙ্গের শাসন-রঙ্গমঞ্চে বিপর্য্যয় ঘটিতে পারে, তাহা সত্ত্বেও কেন আপনি এই কলিকাতা শহরকে রাহুমুক্ত করিতেছেন না? হে আশ্রিত-বৎসল—আমরাও আপনার আশ্রিত, কৃপা করিয়া এই মানসিক কুষ্ঠ-রোগগ্রস্ত মানবরূপী অমানব পৌরপিতাকুল হইতে আমাদের রক্ষা করুন!"

মুখ্যমন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেনের উপর আমাদের পরম শ্রদ্ধা এবং বিশ্বাস আছে। আশা করি তিনি কলিকাতা কর্পোরেশনের কলঙ্ক দূরীকরণে কোন প্রকার দলগত পক্ষপাতিত্ব প্রদর্শন করিবেন না। যাহা ন্যায়, যাহা করা একান্ত কর্ত্তব্য কর্পোরেশনের ব্যাপারে তিনি তাহাই করিবেন এবং ইহাও দেখিবেন, শ্রী এস. বি. রায়ের মত কর্ত্তব্যনিষ্ঠ ব্যক্তির যেন কোন অসম্মান না হয়।

"চিত্তরঞ্জন" বিহারে?

অবাক্ হইবেন না—কারণ

কেন্দ্রীয় বিজ্ঞান গবেষণা ও সংস্কৃতি দপ্তর কর্ত্তৃক ১৯৬১ সালে প্রকাশিত এক মানচিত্রে চিত্তরঞ্জনকে বিহারের অন্তর্ভুক্ত দেখান হইয়াছে। এই ভুল সম্পর্কে রাজ্যসরকারের দৃষ্টিও পড়িয়াছে। তবে এখনও ইহার কোন প্রতিকার হয় নাই।

সার্ভেয়ার জেনারেল অব্ ইণ্ডিয়ার নির্দ্দেশক্রমে এই মানচিত্র প্রস্তুত করা হয়। বোম্বাইয়ের একটি বহুল প্রচারিত সাপ্তাহিক ব্যবহৃত মানচিত্রে এই ভুল লক্ষ্য করিয়া একজন ইঞ্জিনিয়ার উহার সম্পাদককে চিঠি লেখেন। তাঁহাকে উক্ত সূত্রের উল্লেখ করা হয়।

মানচিত্রটি পরীক্ষা করিয়া দেখা যায় যে, উহাতে শহরের বর্ণানুক্রমিক তালিকায় চিত্তরঞ্জন (৫৫নং পৃষ্ঠায়) বিহারের মধ্যে পড়িয়াছে। সংশ্লিষ্ট মানচিত্র ৪১ নং পৃষ্ঠায় দেখান হইয়াছে। ১৯৫৭ সালের জাতীয় মানচিত্রেও এই সম্পর্কে স্পষ্ট করিয়া উল্লেখ করা হয় নাই।

ইহাতে আমাদের আপত্তি করিবার কোন কারণ ঘটে নাই। এই প্রসঙ্গে চীনাদের মানচিত্র তৈয়ারীর কথা মনে পড়িতেছে। ভুলকে ভুল স্বীকার করিয়াও ভুল শুধরাইবার কোন চেষ্টা না করিয়া চুপচাপ থাকাই ভাল এবং পর পর কয়েকবার এই ভুল ম্যাপই যদি প্রকাশ করা যায়, তাহা হইলে কালক্রমে ভুলই সত্য বলিয়া স্বীকৃত হইতে বাধ্য। অর্থাৎ চিত্তরঞ্জন যে সত্যই বিহারে, পশ্চিমবঙ্গে নহে, তাহাই প্রমাণিত হইবে। এই ধারায় ক্রমাগত যদি ভুল ম্যাপ ছাপার ব্যবস্থা হয়, তাহা হইলে পশ্চিমবঙ্গের কোলাঘাট পর্য্যন্ত বিহারের অন্তর্ভুক্ত করা এমন কিছু কষ্টকর হইবে না। অন্যদিকে উড়িষ্যাও তাহার নয়া-ম্যাপ প্রকাশ কার্যক্রম স্থির করিয়া খড়্গপুর পর্য্যন্ত রাজ্য বিস্তারে কোন বাধা পাইবে না।

আপৎকালে সামান্য বিষয়ে আমরা কোন প্রতিবাদ করিব না।

পশ্চিমবঙ্গের নূতন বাজেট

এবারের বাজেট রাজ্য-বিধান সভায় পেশ করিবার সময় অর্থমন্ত্রী শ্রীশঙ্করদাস বন্দ্যোপাধ্যায় যে ভাষণ দান করেন, তাহাতে এ রাজ্যের তীব্র বেকার-সমস্যা এবং মধ্যবিত্ত শ্রেণীর জীবনযাত্রা, ব্যয়বৃদ্ধির জন্য কি বিষম দুর্ব্বিষহ হইয়াছে, তাহার এক করুণ চিত্র উদ্ঘাটিত হইয়াছে। বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের ভাষণ পশ্চিমবঙ্গের প্রধানতম সমস্যা নিদারুণ বেকার সমস্যার স্পষ্ট স্বীকৃতি। সরকারীভাবে ইহাও স্বীকার করা হইয়াছে যে নানা প্রকার চেষ্টা করিয়াও এ রাজ্যের বিষম বেকার সমস্যার

কোন কার্য্যকরী সমাধান করা সম্ভব হয় নাই। হাজার রকম নব নব কাজের সৃষ্টি করা সত্ত্বেও এ রাজ্যের বেকার সমস্যা ক্রমবর্দ্ধমান। অর্থমন্ত্রীর ভাষণে এ তথ্যও প্রকাশ পাইয়াছে যে, তৃতীয় পরিকল্পনার শেষে ভারতে বেকার সংখ্যা বৃদ্ধিপাইয়া অন্তত ১ কোটি ৩০ লক্ষ হইবে।

এক বিচিত্র ব্যাপার!—প্রথম পরিকল্পনার শেষে বেকার সংখ্যা ছিল প্রায় ৫০ লক্ষ, দ্বিতীয় পরিকল্পনার শেষে ৯০ লক্ষ—এবার তৃতীয় পরিকল্পনার শেষ এই বেকার সংখ্যা দাঁড়াইবে ১ কোটি ৩০ লক্ষ! ইহা হইতেই পরিকল্পনার ভীষণ সার্থকতার পরিচয় প্রকট হইতেছে!

এক-একটি পরিকল্পনার সঙ্গে সঙ্গে যদি বেকার সংখ্যা এই বিষম হারে ক্রমাগত বৃদ্ধি পাইতে থাকে তাহা-হইলে গরীব দেশের গরীব জনগণের কোটি কোটি টাকার শ্রাদ্ধ করিয়া এমন অদ্ভুত পরিকল্পনার কি প্রযোজন, এবং কিই বা তাহার স্বর্গীয় স্বার্থকতা তাহা আমাদের মত হীনবুদ্ধি লোকের পক্ষে বুঝা অসম্ভব! কল্পনার 'পরি' বাস্তব জগতে দেখা দিবে—এ-সান্ত্বনা কোটি কোটি মৃত্যুপথযাত্রীর মনে কি প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করিবে, তাহা বুঝাইয়া বলিবার প্রয়োজন নাই। যে-ভাবে পরম বিজ্ঞ-জন রচিত পরিকল্পনা চলিতেছে, তাহা যদি এইভাবে আরো কয়েক বৎসর চলে, তাহা হইলে সত্যই সত্যই সে-দিন কল্পনার 'পরি', পশ্চিমবঙ্গ তথা ভারতের মাটিতে নামিয়া আসিবে, সেই দিন ঐ-সুন্দরী পরিকে দেখিবার জন্য কয়জন লোক বাঁচিয়া থাকিবে, তাহা বলা কঠিন! অনাহারে মৃতপ্রায় মানুষের মুখের সামনে ভাত না দিয়া তাহাকে যদি বছরখানেক পরে কালিয়া-পোলাওএর ভোজের আশ্বাস কিংবা প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়, তাহা হইলে ঐ অনাহারে মৃতপ্রায় মানুষ ভবিষ্যতের ভোজের আনন্দে নিশ্চয়ই কীর্ত্তন গাহিতে গাহিতে নৃত্য করিবে না।

পরিকল্পনা সম্পর্কে আমাদের ভাগ্যবিধাতাদের মুখে অহরহ শুনিতেছি—পরিকল্পনায় 'এই হইবে,' 'ঐ হইবে', আরো কত কি হইবে এবং এমন দিন শীঘ্রই (বর্ত্তমান মানুষের আরো পাঁচ পুরুষ পরে) আসিতেছে যখন দেশের সব লোক পরমানন্দে, নির্ভাবনায় দিন গুজরান করিতে থাকিবে। সবই ভবিষ্যতের কথা "কি হইবে"—কিন্তু "কি হইল"—প্রভুদের মুখে তাহার কোন সামান্য ইঙ্গিতও পাওয়া যায় না কেন?

অর্থমন্ত্রী আরও বলেন, পশ্চিমবঙ্গে শ্রমিক শ্রেণীর জীবনযাত্রার মান ১৭ শতাংশ বৃদ্ধি পাইয়া ১৩১ হইতে ১৫৩ হইয়াছে (১৯৪৪—১০০) কিন্তু কমবেশী নির্দিষ্ট আয়ের বিরাট্ মধ্যবিত্ত শ্রেণীর বেলায় কি হইয়াছে? তাঁহাদের প্রকৃত আয়বৃদ্ধির ব্যবস্থার কথা ছাড়িয়া দিলেও আমরা কি তাহাদের অধিকাংশের জীবনযাত্রার ব্যয় বৃদ্ধির জন্য ক্ষতিপূরণ করিতে পারিয়াছি? কৃষিসহ অসংগঠিত বেসরকারী ক্ষেত্রে নিযুক্ত বিপুল জন-সাধারণের বেলায়ই বা কি হইয়াছে? সম্প্রতিকালে তাহাদের অধি-কাংশের প্রকৃত আয় বৃদ্ধি কি অতি সামান্য নয়? পরিকল্পনা কমিশন স্বয়ং লক্ষ্য করিয়াছেন অগ্রগতি দ্রুত হয় নাই।

তিনি বলেন, ১৯৭৫ সালের মধ্যে দেশবাসীর ক্ষুধার হাত হইতে মুক্তির ব্যবস্থা করিতে হইলে অর্থ নৈতিক অগ্রগতি বর্তমান লক্ষ্য বাৎস-রিক ৫ শতাংশ হইতে বাড়াইয়া ৭ শতাংশ করা প্রয়োজন। এই নিষ্ঠুর সত্যের সম্মুখীন হইতে হইবে। সেই জন্যই আমি একাধিকবার বলি-য়াছি যে, অবিলম্বে কৃষি-উৎপাদন উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি করিতে হইবে, যাহাতে জনসংখ্যার সকলের জীবনযাত্রার ন্যূনতম মানের ব্যবস্থা করা যায়।

অতি সত্য কথা। কিন্তু এখানেও সেই একই কথার পুনরাবৃত্তি..."বৃদ্ধি করিতে হইবে।" অর্থমন্ত্রী এ-কথা বলিতে ভরসা পাইলেন না—"মধ্যবিত্ত শ্রেণীর অবস্থার কিছুটা উন্নতি করিব।" তবুও অর্থমন্ত্রীর বাস্তব দৃষ্টি যে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মানুষের বাস্তব অবস্থার প্রতি এতখানি পড়িয়াছে, তাহার জন্য তাঁহাকে সাধুবাদ জানাই। তিনিও যে রাজ্যপালের মত বাঙ্গলার মানুষকে আর 'আরাম-বিলাস' পরিত্যাগ করিতে প্ররোচনা দেন নাই—তাহার জন্য তাঁহাকে ধন্যবাদ দিতেছি।

যথারীতি ঘাটতি বাজেট

বলা বাহুল্য এ-রাজ্যের বিধানসভায় যে নূতন বাজেট পেশ করা হইয়াছে—তাহাতে সাধারণ মানুষের আশা-আনন্দের কোন ইশারাই নাই। উপরন্তু সে-সব মানুষের, বিশেষ করিয়া দরিদ্র মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মানুষের উদ্বেগের কারণ দেখা যাইতেছে প্রকৃত পরিমাণে। প্রাথমিক হিসাবে বাজেট উদ্বৃত্ত দেখান হইলেও সর্ব্বপ্রকার লেন-দেনের হিসাব,—ঋণ পরিশোধ এবং অন্যান্য আবশ্যিক খরচার হিসাব ধরিলে দেখা যাইবে, আর যাহা হইবে পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে খরচ করিতে হইবে তাহা অপেক্ষা প্রায় ১৮ কোটি টাকা বেশী (এবারের বাজেটে ১১৭ কোটি ৬ লক্ষ টাকা আয় ধরা হইয়াছে)। কাজেই সর্ব্বপ্রকার খরচা মিটাইয়া, নূতন পরিকল্পনার ব্যয় সঙ্কুলান করিবার জন্য নূতন কর ধার্য ছাড়া অন্য পথ আর কি থাকিতে পারে? একথা বলা দরকার যে, আমরা বাজেট সমা-লোচনা করিতেছি না, বাজেট সম্পর্কে সাধারণ লোককে সামান্য দু'চারটি কথা বলিতে চেষ্টা মাত্র করিতেছি। যোগ্য ব্যক্তি অন্যত্র বাজেট সমালোচনা যথাযথ ভাবেই করিবেন।

সরকারের পক্ষে হয়ত নূতন কর ধার্য্য করা ছাড়া অন্য কোন পথ নাই। কিন্তু নূতন কর ধার্য্য করিবার পূর্ব্বে রাজ্য সরকারের একথা চিন্তা করিয়া দেখা কর্ত্তব্য—সাধারণ মানুষ আর নূতন কোন করভার বহন করিতে পারিবে কি না। সরকার হয়ত "ডিরেক্ট" কর অর্থাৎ সোজাসুজি কর না বসাইয়া 'ইনডিরেক্ট' অর্থাৎ বাঁকা পথে কর বসাইবেন। কিন্তু যে ভাবে বা যে পথেই কর বসান হউক না কেন, শেষ পর্য্যন্ত তাহা গরীবকেই বহন করিতে হইবে। কল-কারখানার ব্যবহার্য্য বিদ্যুৎ এবং অন্যান্য মাল-মসলার উপরে কর বসাইলে শেষ দফায় তাহা দিতে হইবে—সাধারণ ক্রেতা সাধারণকেই। মালিক গোষ্ঠীর ইহাতে কোন ক্ষতি বা কষ্ট হইবে না, তাঁহাদের হয়ত লাভের অঙ্ক এই নূতন ধার্য্য করের কল্যাণে কিছু পরিমাণে বৃদ্ধি পাইবে। (বছর দুই পূর্ব্বে সরকার কয়লার দর টন প্রতি ১ টাকা আন্দাজ বাড়াইলেন—ইহার ফলে কিন্তু ক্রেতাদের মণ প্রতি ছয় হইতে আট আনা বেশী বরাবর দিতে হইতেছে!*)

সাধারণ মানুষের ধারণা, যে-কোন নূতন কর ধার্য্য করা হউক, তাহার ফলে স্ফীত-উদর এক শ্রেণীর মালিক ব্যবসায়ীর উদর স্ফীততর, স্ফীততর উদর স্ফীততম হইবে! আজ যে সব ভাগ্যহত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মানুষ কোনক্রমে একমুঠা অন্ন মুখে দিতে পারিতেছে, সেই এক মুঠা অন্নও তাহার আয়ত্তের বাহিরে চলিয়া যাইবে! মধ্যবিত্ত শ্রেণীর পরিবারের ছেলেমেয়েদের অবস্থা আজ সকল দিক্ হইতেই চরমে উঠিয়াছে। নূতন করের কল্যাণে তাহাদের সম্মুখে সামান্য যে আশার আলোক এখনও রহিয়াছে—তাহাও চিরতরে নির্ব্বাপিত হইবে!

পশ্চিমবঙ্গে মধ্যবিত্ত অপেক্ষা শ্রমিক সমাজের (যাহাদের অধিকাংশই বিহার, ওড়িষ্যা এবং অন্যান্য প্রদেশ হইতে আগত) আর্থিক অবস্থা বহুগুণে শ্রেয়। ইহাতে আমাদের দুঃখ বা আপত্তি করিবার কোন হেতু নাই, কিন্তু সর্ব্বভাবে নিপীড়িত গরীব কেরাণী এবং অন্যান্য কর্মী কর্মচারীদের অবস্থার প্রতি একটু করুণা মিশ্রিত সদয় দৃষ্টিদানের আবশ্যকতা সরকার বাহাদুর এবং ধনী মালিক এবং ব্যবসায়ী গোষ্ঠী অস্বীকার করিতে পারিবেন কি? সমাজের মেরুদণ্ড মধ্যবিত্ত শ্রেণীকে নিপীড়িত এবং শেষ পর্য্যন্ত অবলুপ্ত করিয়া দেশের কল্যাণ কখনও হইতে পারে না। যাঁহারা দেশের শিক্ষা ও সংস্কৃতির বাহক এবং ধারক সেই মধ্যবিত্ত সমাজকে অবহেলা এবং পীড়িত করিয়া যাঁহারা নিজেদের বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ বিত্ত-সম্পদের সৌধ রচনা করিবার সাধনায় নিমগ্ন আছেন, তাঁহাদের বিনীত অনুরোধ জানাই ইতিহাসের পৃষ্ঠায় চোখ বুলাইতে। ইতিহাসের শিক্ষা এবং ধারা তাঁহারা যদি যথাযথ অনুধাবন করিতে পারেন, তাঁহাদের অবশ্যম্ভাবী ধ্বংসের পথ হয়ত রোধ করিতে পারিবেন। একটা সাবধান বাণী স্পষ্ট বলাই ভাল—মধ্যবিত্ত সমাজ যদি মরে, তবে সেই বিষম মরণ-স্রোতের টানে দেশের সব কিছু, সকল শ্রেণীর মানুষ অবলুপ্তির কাল-সাগরে চিরতরে নিমজ্জিত হইবে!

ব্যবসায়ী সরকার!

দেশের স্বাধীনতা লাভের পর হইতেই ব্যবসায়-বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ সরকার গ্রহণ করিয়াছেন। সরকার বিবিধ প্রকার আদেশ-নির্দ্দেশের দ্বারা ব্যবসা-বাণিজ্য যাহাতে ঠিকভাবে এবং ঠিক পথে চলে, প্রতিনিয়ত তাহার জন্য হাজার হাজার বিধিব্যবস্থা জারী করিয়া বেসরকারী ব্যবসায়ীদের জীবন অতিষ্ঠ করিয়াছেন বলিলে অত্যুক্তি হয় না। সবই হয়ত সহ্য হইত, সরকার বাহাদুর যদি নিজের কর্ত্তৃত্বাধীন ব্যবসায়গুলিকে ব্যবসা-সঙ্গতভাবে পরিচালনা করিয়া বেসরকারী ব্যবসায়গুলিকে দৃষ্টান্ত দেখাইতে পারিতেন। কিন্তু ব্যবসায় পরিচালনায় পশ্চিমবঙ্গ সরকার (এ বিষয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের কৃতিত্ব আরও চমৎকার!) কি দৃষ্টান্ত দেখাইতেছেন?

১৯৬২-৬৩ সালের সংশোধিত হিসাবে প্রকাশ, রাজ্যসরকার সরাসরি যে ১৪টি ব্যবসা পরিচালনা করেন তাহার ৭টিই লোকসানে চলিতেছে! এই ১৪টি ব্যবসায়ে সরকার ৫ কোটি ৮১ লক্ষ টাকা লগ্নী করিয়াছেন। ১৯৬২-৬৩ সালে লোকসানের পরিমাণ ৪ লক্ষ ২২ হাজার টাকা।

এবার সর্ব্বাপেক্ষা অধিক লোকসান হইয়াছে বহু-নিনাদিত কল্যাণী শিল্প এষ্টেটে—মোট ২ লক্ষ ৭৬ হাজার টাকা।

সরাসরিভাবে রাজ্যসরকার নিয়ন্ত্রিত ব্যবসাগুলির মধ্যে সব চেয়ে বড় কলিকাতায় দুধ সরবরাহ প্রকল্প। বর্ত্তমানে এই প্রকল্পে নিয়োজিত মূলধনের পরিমাণ ৪ কোটি ৯২ লক্ষ টাকা। ১৯৬২-৬৩ সনের সংশোধিত হিসাবে লাভ দেখান হইয়াছে ৩ লক্ষ ১১ হাজার টাকা। ১৯৬১-৬২ সনে এই প্রতিষ্ঠান মোট প্রায় ২ কোটি ৮ লক্ষ টাকার দুধ এবং দুগ্ধজাত অন্যান্য দ্রব্য বিক্রী করিয়াছে!

সরকার নিজে দুইটি শিল্প এষ্টেট পরিচালনা করেন। একটি বারুই-পুরে আর একটি কল্যাণীতে। বারুইপুরের ব্যবসায় ১৯৬২-৬৩ সনে ১৬ হাজার টাকা লাভ দেখায়; আর ঐ সময় কল্যাণীর এষ্টেট লোকসান দেয় ২ লক্ষ ৭৬ হাজার টাকা। বারুইপুর ও কল্যাণীতে নিয়োজিত মূলধনের পরি-

নাগ যথাক্রমে ৫ লক্ষ ২৫ হাজার টাকা এবং ৫৫ লক্ষ ২৬ হাজার টাকা। সংস্থার ১৯৬৩-৬৪ সনের বাজেটেও কল্যাণী এষ্টেটে ১ লক্ষ ৮৬ হাজার টাকা লোকসান ধরিয়াছেন।

সরকার পরিচালিত সেলস এম্পোরিয়ামগুলিতেও লোকসান। ১৯৬২-৬৩ সনের সংশোধিত হিসাবে লোকসানের পরিমাণ ২৬ হাজার টাকা। ১৯৬২-৬৩ সনে এই দোকানগুলির মাধ্যমে মোট ৫ লক্ষ ৩১ হাজার টাকার জিনিসপত্র বিক্রী হইয়াছে। নিয়োজিত মূলধনের পরিমাণ ১ লক্ষ ১৫ হাজার টাকা।

চিত্তরঞ্জন অ্যাভিনিউস্থিত সেল্‌স্ এম্পোরিয়াম তুলিয়া দিবার সিদ্ধান্ত করিয়া ঐ প্রতিষ্ঠানে প্রায় ৪১ জন কর্ম্মীকে কর্ম্মচ্যুতির নোটিশ দেওয়া হইয়াছে বলিয়া জানা যায়।

দীর্ঘকাল চাকুরী করিবার পর এতগুলি লোকের ভবিষ্যৎ আজ অন্ধকারে। এখন পর্য্যন্ত ইহাদের জন্য কোন বিকল্প ব্যবস্থা হয় নাই।

"সরকারী ব্যবসায় লাভের জন্য নয়"--এমন কথা হয়ত কেহ কেহ বলিবেন—কিন্তু লাভের জন্য যদি ইহা না হয়, তাহা হইলে গরীব করদাতাদের অর্থের শ্রাদ্ধ করিবার এ অনাবশ্যক ঘটা কেন? গৌরী সেনের টাকা বলিয়াই কি ইহাতে খেয়ালখুশির ছিনিমিনি চলিবে?

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সেল্‌স্ এম্পোরিয়াম বন্ধ!

মার্চ্চ মাস হইতে চিত্তরঞ্জন অ্যাভিনিউ এবং অন্যত্র স্থিত সরকারী সেল্‌স্ এম্পোরিয়াম বন্ধ করিয়া দিবার সিদ্ধান্ত করিয়া—বেকার সমস্যা-পীড়িত পশ্চিমবঙ্গে দুইশত হতভাগ্য মানুষকে অনাহার, অর্দ্ধাহার ও পরম অনিশ্চয়তার মধ্যে নিক্ষেপ করিবার 'পাকা পরিকল্পনা'র বাস্তব ব্যবস্থা সরকার করিয়াছেন। বরখাস্তের নোটিশ-প্রাপ্ত কর্ম্মচারীদের মধ্যে ১৮ ১৯ বৎসর। কাজ করিতেছেন এমন সরকারী কর্ম্মচারীও আছেন।

জীবনের সকল ক্ষেত্রে উৎপীড়িত, বঞ্চিত ও ব্যতিব্যস্ত মধ্যবিত্ত ও নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবারেরা যখন বাঁচিয়া থাকিবার জন্য আপ্রাণ প্রয়াস করিতেছেন, সেই সময় বিনামেঘে বজ্রপাতের ন্যায় বহু সংখ্যক সুস্থ-সবল কর্মক্ষম উপার্জনশীল ব্যক্তির উপর এই ছাঁটাই-এর কালমেঘ নামিয়া আসিয়াছে। রাজ্যসরকার আগামী ১লা মার্চ হইতে সেলস্ এম্পোরিয়াম উঠাইয়া দিয়া তথায় কেন্দ্রীয় সরকারকে "ক্রেতা সমবায় বিপণি" স্থাপন করিবার জন্য জায়গা ছাড়িয়া দিবার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। কেন্দ্রীয় সরকারের এই পরীক্ষামূলক প্রচেষ্টার প্রতি আনুকূল্য প্রদর্শনের জন্য প্রজাদরদী পশ্চিমবঙ্গ সরকার এই সেলস্ এম্পোরিয়ম কেন্দ্রটির অকাল মৃত্যু ঘটাইলেন। যে ৩২ জন কর্মচারী এখানে কাজ করিতেন তাঁহাদের মধ্যে ২৩ জনের উপর গত ৩১শে জানুয়ারী একমাসের সময় দিয়া বরখাস্ত নোটিশ জারী করা হয়।

ইহা ছাড়া বাকী ৯ জন কর্মচারীর উপর গত ১১ই ফেব্রুয়ারী বরখাস্তের নোটিশ জারী করা হইয়াছে। ইহাদিগকে আইনানুযায়ী এক মাসের সময়ও দেওয়া হয় নাই; শুধু বলা হইয়াছে যে, আগামী ১লা মার্চ হইতে তাঁহাদের আর চাকুরী থাকিবে না। এই ৩২ জনের সকলেই গত তিন হইতে দশ বৎসর সরকারী চাকুরী করিতেছেন।

বরখাস্তের ব্যাপারে নিজেদের শ্রম আইন লঙ্ঘন করিতে রাজ্য সরকার কোন সঙ্কোচ বা দ্বিধা বোধ করিলেন না। রাজ্য সরকারের শ্রম-আইনের বিষয় ঘোষণাকারী রাজ্য শ্রমমন্ত্রী শ্রীবিজয় সিং নাহার মহাশয়ও এ বিষয়ে এখনও নির্ব্বাক্! অথচ বেসরকারী ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানে শ্রমিক ও কর্ম্মচারী ছাঁটাই-বরখাস্তের সমস্যা সমাধানে বিজয়বাবুর বিজিগীষা সর্ব্ববিশ্রুত! শ্রমিক সমস্যায় বিজিগীষু বিজয়বাবু কি সহসা ক্লান্ত বোধ করিতেছেন?

সেল্‌স্ এম্পোরিয়ামের স্থানে কেন্দ্রীয় সরকার 'ক্রেতা সমবায় বিপণি' স্থাপন করিতেছেন ইহা হয়ত শুভ সংবাদ, কিন্তু এই নব-প্রতিষ্ঠানে কয়জন স্থানীয় লোক নিযুক্ত হইবে? সেল্‌স্ এম্পোরিয়ামের কর্ম্মচ্যুত ব্যক্তিদের এখানে নিয়োগ করা সম্পর্কে কোন সর্ত্ত কি রাজ্য সরকার আরোপ করিতে পারিতেন না? কেন্দ্রীয় সরকারের বাঙ্গালী প্রীতি সুবিদিত, কাজেই আমাদের এ আশঙ্কা আছে যে, কেন্দ্রীয় সরকারের ক্রেতা সমবায় বিপণিতে আমদানী করা ব্যক্তিদের বিষয় সর্ব্বাগ্রে বিবেচিত হইবে, যেমন পশ্চিমবঙ্গে অবস্থিত কেন্দ্রীয় সরকারের অন্যান্য প্রায় সকল প্রতিষ্ঠান এবং সংস্থায় হইয়া থাকে। সকল দিকের প্রবল চাপে নিপীড়িত বাঙ্গালী হাহুতাশ ছাড়া আর কি করিতে পারে?

রাজ্যসরকারের অপূর্ব্ব দক্ষতা

এ-রাজ্যে যখন প্রবল অর্থসঙ্কট চলিতেছে এবং দেশবাসীর উপর নূতন নূতন কর চাপাইবার ব্যবস্থা হইতেছে —ঠিক সেই সময়ে নিম্নলিখিত সংবাদটি বহুজনের পক্ষে চমকপ্রদ এবং রাজ্যসরকারের দক্ষতার অপূর্ব্ব নমুনা বলিয়া গৃহীত হইবে।—

সেচ দপ্তরের 'এ্যালবেট্রস' নামে মোটর লঞ্চটি তিন বৎসর যাবৎ বাগবাজার খালে অ-ব্যবহৃত অবস্থায় পড়িয়া রহিয়াছে, কিন্তু লঞ্চটির কর্মচারীরা—সারেং, খালাসীরা যথারীতি মাহিনা পাইয়া যাইতেছেন।

সেচ দপ্তর এখন কাজের প্রয়োজনে লঞ্চটির খোঁজ লইয়াছেন। কিন্তু ফুটো লঞ্চের হাল মেরামতির জন্য খরচ পড়িবে ১ লক্ষ ২৩ হাজার টাকা।

ভাল করিয়া নিরপেক্ষ ব্যক্তির দ্বারা খোঁজ খবর লইলে রাজ্যসরকারের এই প্রকার আরো হাজার হাজার অপচয়ের এবং কোটি কোটি টাকার অপচয়ের সংবাদ পাওয়া যাইতে পারে। এই অপচয় রোধ করিবার দক্ষতা যদি রাজ্যসরকারের থাকিত তাহা হইলে আজ সরকারকে ৩।৪

কোটি টাকার জন্য নূতন কোন কর বসাইতে হইত না। রাজ্য-সরকারের উপর মহলের উচ্চ বেতনভোগী অফিসারদের অপচয় বন্ধ করিবার দিকে দৃষ্টি দিবার সময় কোথায়? যাঁহাদের নামকরা হোটেলে 'লাঞ্চ' করিতেই দু-তিন ঘণ্টা কাটিয়া যায়, বাগবাজারের খালে 'লঞ্চ' দেখিবেন তাঁহারা কখন? কিন্তু আপাতত অকেজো এই লঞ্চটির ১ লক্ষ ২৩ হাজার টাকা মেরামতি খরচা কে দিবে? যাঁহাদের পরম দক্ষতা এবং কর্ত্তব্যনিষ্ঠার জন্য ইহা ঘটিল—তাঁহারা না, সেই চিরপরিচিত শ্রীগৌরী সেন মহাশয়? শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন এ বিষয়ে কি বলেন বা কি করেন—তাহার জন্য সাগ্রহ প্রতীক্ষায় রহিলাম।

আপৎকালে নূতন আপদ্-হিন্দীর জয়যাত্রা পুনরারম্ভ?

সকলেই মনে করিয়াছিল হিন্দীওয়ালাদের জয়যাত্রার অশুভ অভিযান হয় ত চিরতরে বন্ধ হইল—কিন্তু হায়! আমাদের সে আশা একান্ত দুরাশা বলিয়া এখন মনে হইতেছে।* সরকার (কেন্দ্রীয়) হইতে মাত্র 'কিছুকাল' পূর্ব্বে ঘোষণা করা হয় যে, জোর করিয়া কাহারো উপর হিন্দী চাপানো হইবে না এবং এ-প্রকার কোন অভিলাষও তাহাদের নাই। কিন্তু সাম্প্রতিক কয়েকটি ব্যাপারে বেশ বুঝা যাইতেছে যে, অহিন্দী ভাষীদের ঘাড়ে হিন্দী চাপাইবার উৎসাহ এবং ইচ্ছা কেন্দ্রীয় সরকারের হিন্দী বোলনেওয়ালা প্রভুদের অন্তরের গোপনে বেশ প্রবল রহিয়াছে এবং এবার বাঁকাপথে এই অত্যাচার চালাইবার প্রচেষ্টা বেশ সতেজ হইয়াছে। কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতাশালী কয়েকজনের এই উৎসাহ কোন কোন অহিন্দীভাষী রাজ্যের কর্ত্তাদের মধ্যে সংক্রামিত হইতেছে বলিয়া মনে হইতেছে। অহিন্দীভাষী রাজ্যের কর্ত্তৃপক্ষের এই উৎসাহ আন্তরিক কিংবা বাধ্য হইয়া, তাহা এখনই বলা শক্ত।

* কিছুকাল পূর্ব্বে শিলংএ অনুষ্ঠিত পূর্ব্ব আঞ্চলীয় বৈঠকে এই অঞ্চলের রাজ্যগুলিতে একাদশ শ্রেণী পর্য্যন্ত হিন্দী বাধ্যতামূলক স্থির হইল কেন এবং কোন্ আইনে? পূর্ব্বাঞ্চলের অন্য রাজ্যগুলির কথা আমরা বলিব না। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের বিষয় কিছু বলিবার অধিকার আমাদের অবশ্যই আছে।

পশ্চিমবঙ্গে হিন্দীকে অবশ্যপাঠ্য বিষয়ভুক্ত করিলে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে যে সব ছাত্র-ছাত্রী সাহিত্য বিষয় লইয়া পড়াশুনা করিবে তাহাদের ইংরেজী, বাংলা, সংস্কৃত ও হিন্দী এই চারিটি ভাষা শিখিতে হইবে। ইহা যে তাহাদের শক্তি-সামর্থ্যের উপর জুলুম বিশেষ তাহা বালক-বালিকাদের শিক্ষা সম্বন্ধে যাহাদের কিছুমাত্র অভিজ্ঞতা আছে তাঁহারাই তাহা উপলব্ধি করিতে পারিবেন। যাঁহারা সংস্কৃত পড়িবে তাহাদের এই ভাষা শিক্ষা করিতেই দেবনাগর অক্ষরের সহিত পরিচয় হইবে। তাহারা যদি ভবিষ্যতে হিন্দী শিক্ষা করিতে চায়, বা তাহাদের হিন্দী শিক্ষা করিবার প্রয়োজন হয়, তাহা হইলে তাহা শিক্ষা করা তাহাদের পক্ষে কঠিন হইবে না। কিন্তু নানা পাঠ্যবিষয়ের চাপে ভারাক্রান্ত ছাত্রছাত্রীদের উপর বাধ্যতামূলক পাঠ্য হিসাবে হিন্দী চাপাইয়া তাহাদের নিষ্পিষ্ট করার ফল শিক্ষার দিক্ দিয়া কল্যাণকর হইবে না।

"কল্যাণকর হইবে না" বলা অপেক্ষা ইহা বলিলে যথোচিত হইবে যে, জোর করিয়া হিন্দীকে বাধ্যতামূলক করিলে, তাহার ফল হইবে বিষময়!

অনেকে বলিতে পারেন, "যেহেতু হিন্দী একটি ভারতীয় ভাষা সেই হেতু হিন্দী ভারতের সর্ব্বরাজ্যেই সর্ব্বজনগ্রাহ্য হওয়া উচিত।" এ যুক্তি কেবল অচল নহে, সর্ব্বতোভাবে অগ্রাহ্য করার যোগ্য। ১৫ বৎসর পূর্ব্বে মাত্র একটি ভোটের আধিক্যে যখন হিন্দী ভারতীয় সরকারী ভাষা বলিয়া কনষ্টিটুয়েণ্ট অ্যাসেম্ব্লীতে গৃহীত হয়, সেই পরম অকল্যাণকর দিনটি হইতে আজ পর্য্যন্ত কঠোর বাস্তব অভিজ্ঞতায় ইহা প্রমাণিত হইয়াছে যে, ভারতের অহিন্দী ভাষী রাজ্যগুলিতে হিন্দী অচল—অন্ততপক্ষে গায়ের জোরে ইহা কখনই চলিবে না। এ কথাও অবশ্যই বলা যায় যে দেশী 'হিন্দী' ভাষা দেশের বিপুল সংখ্যক অহিন্দী ভাষার নিকট 'বিদেশী' ইংরেজী ভাষা অপেক্ষা অধিকতর 'বিদেশী'।

হিন্দীকে 'রাজকীয়' প্রাধান্য ও প্রতিষ্ঠা দানের অপচেষ্টায় অহিন্দী ভাষারা বিচলিত, ক্ষুব্ধ এবং এই প্রচেষ্টার মধ্যে সকলেই 'হিন্দী'-সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার অশুভ ছায়া দেখিতে পাইতেছে। হিন্দীকে রাজসিংহাসনে জোর করিয়া বসানোর প্রচেষ্টা জাতীয় সংহতি এবং দেশের শক্তিবৃদ্ধির পক্ষে, বিশেষত এই সঙ্কটকালে, একেবারেই অনুকূল নহে। ব্যবহারিক এবং বাস্তব যোগ্যতার দিক হইতে 'হিন্দী' ইংরেজীর ধারে কাছেও যে আসিতে পারে না একথা 'হিন্দী' উপরওয়ালারাও ভাল করিয়াই জানেন। কিন্তু মানুষ সব ছাড়িতে পারে, হাজার সুযুক্তিতেও অন্যায় নষ্টামীর জিদ ছাড়িতে পারে না!

হিন্দী একবার কেন্দ্রীয় সরকারের রাষ্ট্রীয় ভাষা রূপে যে ভাবেই হউক স্বীকৃত হইয়াছে বলিয়াই যে হিন্দীকে চিরকালের মত নতমস্তকে বহন করিতে হইবে এমন কোন কথা নাই। ছোটখাট নানা তুচ্ছ কারণে কেন্দ্রীয় সরকার প্রয়োজন বোধ করিলে সংবিধান সংশোধন, এমন কি পরিবর্ত্তনও করিতে দ্বিধাবোধ করেন না। তাহা

হইলে ভারতের সংখ্যাগুরু বহুগুণে অহিন্দীভাষী জনগণের (যাহাদের সংখ্যা খুব কম করিয়া ধরিলেও প্রায় ৩৩।৩৪ কোটি হইবে) ভাষা সম্পর্কে দাবী সংবিধান পরিবর্ত্তনের দ্বারা কেন স্বীকৃত হইবে না? ইহ জগতে চিরস্থায়ী কিছু নয়, কাজেই হিন্দীকে চিরকাল অনিচ্ছুক মানুষের ঘাড়ে চাপাইয়া রাখা অসম্ভব, আজ হউক, কাল হউক ইহার পরিবর্ত্তন হইবেই।

বিশ্ব-ভাষা ইংরেজীকে কোণঠাসা করিয়া তাহার স্থলে অর্দ্ধপক্ক হিন্দীকে চালু করার চেষ্টা জুলুম ছাড়া আর কি বলা যায়? প্রাদেশিক ভাষা, ইংরেজী এবং সংস্কৃত এই তিনটি ভাষার উপর জবরদস্তির দ্বারা চতুর্থ ভাষা হিন্দী চাপাইয়া অহিন্দীভাষী ছাত্রছাত্রীদের উপরেও ইহা অতীব ক্ষতিকর জবরদস্তি। অথচ হিন্দী ভাষী ছাত্র-ছাত্রীরা এই জুলুমের আওতায় পড়িবে না। এ প্রকার পক্ষপাতিত্বমূলক "জোর যার মুলুক তার" মনোবৃত্তি কেন্দ্রীয় সরকারের কর্ত্তৃপক্ষের পক্ষে একান্ত অশোভন। যাহার ইচ্ছা হয় হিন্দী শিখুক—কিন্তু ইহাতে কোন প্রকার বাধ্যবাধকতা থাকা অন্যায়।

সভ্য জগতের কোথাও জোর করিয়া কাহাকেও কোন ভাষা শিক্ষায় বাধ্য করা হয় না, এমন দেশও আছে যেখানে ৩।৪টি, এমন কি ততোধিক ভাষাও সরকারী ভাষা বলিয়া স্বীকৃতি পাইয়াছে। বিশ্বের বৃহত্তম গণতান্ত্রিক দেশেই ইহার বিষম ব্যতিক্রম দেখা যাইতেছে।

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের নিকট আমাদের বিনীত নিবেদন এই যে—তাঁহারা হিন্দীকে মাধ্যমিক শিক্ষার স্তরে বাধ্যতামূলক করার পূর্ব্বে এ-বিষয় যেন জনমত গ্রহণ করেন। তবে বিষয়টির অযৌক্তিকতা এমনই প্রচণ্ড যে, জনমত গ্রহণ না করিয়াও তাঁহারা এ-বিষয় আর অগ্রসর না হইলে বাঙ্গলা এবং বাঙ্গালীর অশেষ কৃতজ্ঞতা অর্জ্জন করিবেন।

রাজপথ জনপথ* ও প্রসঙ্গত

শ্রীদিলীপকুমার রায়

হরিকৃষ্ণ মন্দির
হরিকৃষ্ণ মন্দির রোড
পুনা-৫

শ্রীসুধীরকুমার চৌধুরী
প্রীতিভাজনেষু,

আপনি শ্রীচাণক্য সেনের "রাজপথ জনপথ" উপন্যাসটির সম্বন্ধে যা যা লিখেছেন সবই সত্যি। তাই আপনার সঙ্গে পুরোপুরি সায় দিতে পেরে আমি আরো বেশি তৃপ্তি পেয়েছি। কারণ, কে না জানে, মানুষে মানুষে প্রীতির সম্বন্ধ আরো গভীর হয়ে ওঠে কোন শ্রদ্ধার ক্ষেত্রে মতে মিললে। (এখানে "শ্রদ্ধা" শব্দটি আমি admiration-এর প্রতিশব্দ হিসেবেই ব্যবহার করতে বাধ্য হচ্ছি, যেহেতু এ-ইংরাজী শব্দটির কোনও প্রতিরূপই আমাদের বাংলাভাষায় নেই।) তাই এ-বইটি সম্বন্ধে আপনাকে কয়েকটি কথা লিখতে বসেছি আজ। পত্রাকারে লিখবার উদ্দেশ্য শুধু এই যে, পত্রে অবান্তর আলাপ আনা চলে। শুধু কবিই নন, লিপিকারও নিরঙ্কুশ।

এ-প্রসঙ্গে প্রথমেই একটি কথা মনে পড়ছে। অনেক আগে শ্রীঅরবিন্দকে আমি কোন কবিযশঃপ্রার্থী বন্ধুর একটি বই পাঠিয়ে জিজ্ঞাসা করি তাঁর মতামত। উত্তরে তিনি আমাকে লেখেন শুধু একটি ছত্র: "যে-বইয়ের সম্বন্ধে আমি মন খুলে সুখ্যাতি করতে পারি না তার সম্বন্ধে চুপ ক'রেই থাকতে চাই।" Eloquent silence —যাকে বলে!

শ্রীচাণক্য সেন আমাকে যখন দিল্লীতে বলেন যে তাঁর "রাজপথ জনপথ" পাঠাবেন, তখন সত্যি বলতে কি আমার মনে একটু অস্বস্তিই হয়েছিল। কারণ এখনো নানা লেখকই নানা বই পাঠান—আর আমার শক্রবৃদ্ধি

* রাজপথ জনপথ—উপন্যাস—তৃতীয় মুদ্রণ, ১৯৬২, নবভারতী ৮, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২। মূল্য ৬.৫০ নঃ পঃ

হয় তাঁদের লেখা প'ড়ে আমি চুপ ক'রে থাকতেই বাধ্য হই ব'লে। শ্রীচাণক্য সেনের খোলামেলা ব্যবহার আমার ভাল লেগেছিল (যদিও তিনি স্বধর্মে ক্রিটিক ভাবতে একটু যে ভয় পাই নি এমন কথাও বলতে পারি না), তাই চাই নি তাঁকেও পেতে-না-পেতে হারাতে। এ-ভয়ের হেতু এই যে, আমার "স্মৃতিচারণ" সমালোচনা-প্রসঙ্গে তাঁর কয়েকটি মন্তব্য প'ড়ে আমার মনে হয়েছিল, তিনিও ইদানীন্তনদের মতন বাস্তববাদী—realist—সুতরাং নিষ্করুণ স্বপ্নহীন, শ্যেনদৃষ্টি। মূল্যবান্ কথা অনেক বলেন, কিন্তু উচ্ছ্বাসকে ডরান, তাই প্রায় প্রতি প্রশংসার পিছনেই "কিন্তু" বসিয়ে আরাম পান। এদিকে আমি উচ্ছ্বাসে গা ভাসাতে না পারলে মনমরা হয়ে পড়ি। তাই ভেবেছিলাম—"রাজপথ জনপথ" পাঠাতে যদি তিনি ভুলে যান ত বেঁচে যাই। এ-ধরণের সাবধানী মনোভাবের আর একটি কারণ—কয়েকটি বহুস্তুত আধুনিক উপন্যাস প'ড়ে সম্প্রতি বড় ঘা খেয়েছি। মনে অস্বস্তিকর প্রশ্ন জাগে—তুচ্ছাতিতুচ্ছ তথা বীভৎস মনোভাবের মালা গেঁথে এঁরা কী ধরণের তৃপ্তি পান? তারপর নিজের মনকে ধমকে বলেছি: "কি জানো? এ হ'ল সেই এক পুরুষের (generation) সঙ্গে পরবর্তী পুরুষের চিরন্তন ব্যবধান— এ ওকে বুঝবে না, বুঝতে পারে না, পারে না পারে না।" ভেবে আমি হাল ছেড়ে দিয়েই বসেছিলাম।

তাছাড়া আমি ধর্মবিশ্বাসী, শ্রীচাণক্য সেন তাঁর সমালোচনায় "ধর্মীয়" বিশেষণটি একাধিকবার এমন তির্যক্ ভাবে প্রয়োগ করেছেন যে আমার পক্ষে ভয় ত পাবারই কথা।

এই সব ভেবে বিরস মনেই "রাজপথ জনপথ" পড়া সুরু করি মুসুরিতে। কিন্তু কয়েক পাতা পড়তে না পড়তে চমকে উৎফুল্ল হ'য়ে উঠি: এ কী কাণ্ড! এ যে প্রতিভা —যাকে নিয়ে উচ্ছ্বাস করতে মন শুধু যে কুণ্ঠাবোধ করে না তাই নয়, প্রায় গান গেয়ে ওঠে যেন: আর ত ভয় নেই!

অথ "রাজপথ জনপথ" প'ড়ে উল্লাসের ফলে আমার মনে মিইয়ে-যাওয়া ভরসা উঠল চাঙ্গা হয়ে। তবে ত বাংলা সাহিত্য ক্ষীয়মাণ (decadent) নয়। অন্নদাশঙ্করের "পথে প্রবাসে" ও বিভূতিভূষণের "পথের পাঁচালী"র পরে কোন ইদানীন্তনের উপন্যাস প'ড়েই আমি এত ভরসা পাই নি। কেন বলি। যথাসাধ্য সংক্ষেপেই বলব—পাছে চাণক্য সেন ফের শাসান: "এর নাম সমালোচনা নয়, উচ্ছ্বাস! ধিক্!"

রোলাঁ তাঁর বিখ্যাত উপন্যাস Clerambault-এ একবার লিখেছিলেন: আমি যখন কোন বইয়ে সাড়া দিই তখন খুঁজলে দেখতে পাই যে সাড়া দিচ্ছি বিশেষ ক'রে এই জন্যে যে, তার মধ্যে আমি আমার নিজেকে নতুন ক'রে আবিষ্কার করি। একথার ভাষ্য এই যে কোন বই আমাদের মন টানে তখনই যখন তার মধ্যে আমাদের নিজের নিজের রুচি, ভাব, চিন্তা ও রসাহরণের পদ্ধতির সঙ্গে কোন সহজ মিল খুঁজে পাই। "রাজপথ জনপথ" পড়তে পড়তে আমার ক্রমাগতই মনে হয়েছে একথা। এখানে ওখানে গ্রন্থকারের কত চিন্তা, চিত্রণ, ভাব ও দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গেই যে আমার নিজের ভাবধারার সাদৃশ্য খুঁজে পেয়েছি, আর মনে মনে পুলকিত হ'য়ে ব'লে উঠেছি: "তাহলে ত দেখছি চাণক্য সেন তা নন আমি যা ভেবেছিলাম! বাঁচা গেল!"

"বাঁচা গেল"!—ইউরেকা! এই কথাটিই বার বার মনে হয়েছে এ বইটির নানা চিন্তাশীল ও নির্ভীক মন্তব্য প'ড়ে। উপন্যাসে আমরা—অন্ততঃ এ যুগে—শুধু আখ্যান ও চরিত্র-চিত্রণই ত চাই না, চাই জীবনসম্বন্ধে ঔপন্যাসিকের স্বকীয় অভিজ্ঞতা উপলব্ধি দর্শন মননের এজাহারও বটে। রাজপথ জনপথের প্রায় পাতায় পাতায় এমন সব চমৎকার মন্তব্য আছে যার সঙ্গে আমাদের অধ্যাত্মদৃষ্টির মিল খুঁজে পাওয়া যায়। দু'একটি উদাহরণ না দিলেই নয়।

"যেখানেই যাও সেই এক ব্যাপার। খুদে খুদে মানুষ, যাদের বুদ্ধি পর্যাপ্ত, বিবেচনা গোষ্ঠীবদ্ধ এবং দৃষ্টি সীমিত, তাদের ঘাড়ে বিরাট্ দায়িত্ব, হাতে বিরাট্ শক্তি। তারা সবাই মিলে মানুষকে চরম বিনাশের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে, আর কী ক্ষুধাই না বেড়ে গেছে মানুষের! পাঁচশো বছর ধ'রে মানুষ যত্ন ক'রে নিজের পুঁজি যা কিছু জমিয়েছিল, এই বিংশ শতাব্দীতে বুঝি সব খেয়ে শেষ করবে।* চারদিকে কেবল আরো চাই! যার কুটির ছিল তৃপ্তির নিলয়, সে চাইছে কোঠাবাড়ী, যার কোঠাবাড়ী ছিল সে চাইছে অট্টালিকা। কোন ক্ষেত্রে মানুষের পরিতৃপ্তির চিহ্ন নেই, তার অনন্ত কামনা লেলিহান বহ্নিশিখায় চারিদিকে উন্মত্তের মত ছুটেছে।"

(১৩৯—৪০ পৃঃ)

উদ্ধৃতাংশটুকু সংক্ষেপ ক'রে দিতে পারলাম না কারণ, এ-সূত্রে গ্রন্থকার আমাদের বর্তমান দুর্দশার দু'টি গভীর কারণের ইঙ্গিত করেছেন চমৎকার বিশ্লেষণে—অর্থাৎ, অজ্ঞান ও দুষ্পূরণীয় ভোগতৃষ্ণা। মনু তথা ভাগবতকার

* মনে পড়ে শ্রীঅরবিন্দের সাবিত্রীতে: "An idiot hour destroys what centuries made!"

উভয়েই একটি শ্লোকে এই দ্বিতীয় ট্রাজিডিটির নির্দেশ দিয়েছেন: "ন জাতু কামঃ কামানু উপভোগ্যেন শাম্যতি" অর্থাৎ ভোগের পথে ভোগতৃষ্ণা বেড়েই চলে "হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মেব ভূয় এবাভিবর্ধতে"—আগুনে ইন্ধন দিলে যেমন শিখা আরো লেলিহান হয়ে ওঠে ঠিক তেম্নি। আর প্রথম নিদানটির ইঙ্গিতও দিয়েছেন আমাদের বহুমুনি-ঋষি: বিজ্ঞানের দীর্ঘকালব্ধ বস্তুসমৃদ্ধির পথে মানুষের শুধু যে মুক্তি নেই, তা নয় রিপুমত্ত মানুষ শক্তি পেলে মানুষের সর্বনাশ হবেই হবে। শ্রীঅরবিন্দ তাঁর Life Divine-এ বিজ্ঞানের এই মারাত্মক মতিভ্রমের কথা বলেছেন শেষ অধ্যায়ে—প'ড়ে দেখতে অনুরোধ করি। তাতে ১১৬০-৬১ পৃষ্ঠায় তিনি যা লিখেছেন তার মর্ম এই যে, মানুষ যে-সভ্যতা গ'ড়ে তুলেছে হাল আমলে তা এমনই কেঁপে উঠেছে যে তার বুদ্ধি পড়েছে ফাঁপরে—কারণ (বলছেন তিনি), বিজ্ঞানের আহৃত নানা শক্তি দিয়ে কোথায় মানুষের দারিদ্র্য ঘোচাবে, না, মানুষ অজ্ঞানবশে তারি রাজরথে চ'ড়ে হয়েছে ধ্বংসপথের যাত্রী, কেননা বৃহৎ শক্তির লাগাম ধরেছে (চাণক্য সেনের ভাষায়) "খুদে খুদে মানুষ,"—শ্রীঅরবিন্দের ভাষায়: What uses (the many potencics) of this universal Force—(যে-মহাশক্তিকে বিজ্ঞান পরিবেশন করেছে সভ্যতার পাত্রে)—is a little human individual or communal ego with nothing universal in its light of knowledge···which would create a mental unity or a spiritual oneness."

আমার Miracles Do Still Happen-এর পরিশেষে (appendix-এ) আমি লিখেছি যে, মানুষের এই ট্রাজিডির মূলে আছে তার ধর্মে অনাস্থা তথা অধর্মের দুষ্প্রবৃত্তিকে পদে সমর্থন করার মোহ। এর ফলে কী হয়েছে, শ্রীচাণক্য সেন তারও নির্দেশ দিয়েছেন বইটির নানা নিপুণ বিশ্লেষণে, যথা (শ্রীমতী সিম্বিয়ার উক্তি): "এ পৃথিবীতে আদর্শের কোন স্থান আছে? দুটো বিরাট্ শক্তির সাংঘাতিক লড়াই চলছে, একদিকে আদর্শহীন দুর্ধর্ষ সাম্যবাদ," (যথা রুশ বা চীন)। "অন্যদিকে আদর্শ-পচা ক্রমশঃ-নিস্তেজ ধনতান্ত্রিক গণতন্ত্র" (যথা আমেরিকা বা ইংলণ্ড)।···"তোমারা তোমাদের অজ্ঞাতেই য়ুরোপের অন্ধ অনুকরণ করছ"—ফলে "যা একটু আছে তোমাদের মানসে তাও যাবে···হয় সাম্যবাদ তোমাদের গ্রাস করবে, নয়ত অন্যপথে অন্য শক্তির সঙ্গে হাত মিলিয়ে সাম্যবাদ থেকে বাঁচতে চাইবে, আর মারামারি করবে নিজেদের মধ্যে যেমন করছি আমরা।"

মনে পড়ে একদা ফরাসী বিপ্লবও প্রচার করেছিল liberte, egalite, fraternite—স্বাধীনতা, সাম্য, সৌভ্রাত্র্য—কিন্তু যেই এলেন নেপোলিয়ন অম্নি সব ডুবল, দুর্ভাগা আদর্শবাদী স্বপনীর বুকে এসে চেপে বসল শক্তিমদমত্ত একনায়কত্ব (dictatorship), আর সঙ্গে সঙ্গে জাগল নেপোলিয়নের একচ্ছত্র সম্রাট্ হবার লালসা—জয়ধ্বনি রটল vive l'Empereur! তখন কোথায় রইল স্বাধীনতা ও সৌভ্রাত্র্য আর কোথায়ই বা রইল সাম্যবাদ! আদর্শবাদে মানুষের অবিশ্বাস এসেছে কি সাধে? বিজ্ঞানের মাধ্যমেও কী এল? না, বিমানযোগে প্রত্যাসন্ন আণবিক বোমার ধ্বংস সাধন-কীর্তি। বিজ্ঞানেই মানুষের মুক্তি—বটে!

আমার কিন্তু সবচেয়ে ভাল লেগেছে শ্রীচাণক্য সেনের দুটি সাহসিক উক্তি। প্রথমটি হ'ল: "গতিটাই হ'ল বড়, মতি গেল ডুবে।" (১৪৩ পৃষ্ঠা) এ সম্বন্ধে কিছু বলতে চাই।

এ যুগে একটি বুলি অনেকেই প্রায় স্বতঃসিদ্ধের মতন মেনে নিয়েছেন যে, গতির প্রগতিতেই মানুষের সভ্যতার প্রগতি। জাহাজ চলেছিল ঘণ্টায় পঞ্চাশ-ষাট মাইল। ট্রেন চলল ঘণ্টায় একশো দেড়শো। মোটর—তিন চারশো মাইল। বিমান চলল ঘণ্টায় হাজার বারশো। রকেট প্লেনের ঘোষণা: ঘণ্টায় দশ হাজার মাইল গতিসিদ্ধি এল ব'লে! কিন্তু তাতেও চলবে না, চালাও স্পুটনিক—ঘুরুক সে আকাশে মিনিটে হাজার মাইল, মানুষ বাহবা দিক।—চন্দ্রে, শুক্রে, মঙ্গল গ্রহে অভিযান শুরু হ'ল ব'লে!

আমি বলছি না এ অঘটন ঘটতেই পারে না। কিন্তু এ কথা বলতে চাই জোর দিয়েই যে, আত্মজয়ী হ'তে না পারলে ব্রহ্মাণ্ডজয়ী হ'লেও মানুষ কৃতকৃত্য হবে না—গ্রহ-গ্রহান্তরে গিয়েও তার কীর্তির জয়ধ্বজা ওড়ালেও সে আজ যেমন অসুখী ভয়ত্রস্ত, (গীতার ভাষায়) "কার্পণ্য-দোষোপহতস্বভাব" আছে তাই থাকবে। "খুদে খুদে মানুষ" গতির শিরস্ত্রাণ চড়িয়ে মাথায় বিশেষ বাড়বে না—বাড়বে শুধু দম্ভে। শঙ্করাচার্য যখন বলেছিলেন যে, মনকে যে জয় করেছে তারই নাম জগজ্জয়ী ("জিতং জগৎ কেন? মনো হি যেন") তখন তিনি উচ্চারণ করেছিলেন এমন একটি পরম প্রজ্ঞাবাণী যার মার নেই। অন্য ভাষায় মানুষের মুক্তি গতির প্রগতিতে নয়, মনের প্রাণের সুমতিতে—অর্থাৎ ধর্মনিত্য হওয়ার মধ্যে—যে কথা মহাভারতে কৃষ্ণ বলেছিলেন দ্রৌপদীকে: "ধর্ম

নিত্যান্ত যে কেচিৎ নতে সাদন্তি কর্হিচিৎ—যারা ধর্মনিত্য তারা কখনো অবসন্ন হয় না।"

কিন্তু এ-যুগে গতির কীর্তিস্তবে মুখর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মানুষ বধিরও হয়ে পড়েছে, তাই সে আত্মিক সত্যবাণী আর শুনতে পাচ্ছে না—বিজ্ঞানের এই বাহ্যকীর্তির মোহে প'ড়ে চলতে চাইছে যান্ত্রিকদের নির্দিষ্ট পথে—গতিকে বাড়াও আরো—আরো—আরো। শোনা যায়—ত্রিশ বৎসর আগে একদা এক পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিক কোনও চৈনিক দার্শনিককে বলেছিলেন জাঁক ক'রে: "নানাবিধ আবিষ্কার ক'রে আমরা কী ভাবে মানুষের সময় বাঁচিয়ে দিয়েছি ভাবো তো?" দার্শনিক হেসে জবাব দিয়েছিলেন: "মানি। কিন্তু সে উদ্বৃত্ত সময় দিয়ে তোমরা কী করেছ শুনতে পাই কি?" (এ-শ্রেণীর অকেজো দার্শনিক আজ আর চীনে মেলে কি না জানি না—এক মাওৎসেটুঙের কোনও কন্‌সেন্‌ট্রেশন ক্যাম্পে ছাড়া।)

কথাটা ভাববার বৈ কি। কারণ অবসর বৃদ্ধি সার্থক হয় তখনই যখন সে-অবসর মানুষ নিয়োগ করে জনকল্যাণে ও আত্মসৃষ্টিতে—নিষ্কাম কর্মে, জীবসেবায়, ধ্যানে, প্রেমে, আনন্দে। এ যদি সে না পারে তবে কী হবে এ-গ্রহে ও-গ্রহে ঢু মেরে, মানুষের মনে চমক জাগিয়ে? এখানে আমাকে ভুল বুঝবেন না। বিজ্ঞানের নানা সৃষ্টি খুবই মূল্যবান্ আমিও জানি। কেবল আমি বলতে চাই এই কথা যে, এ সব সৃষ্টির ফল মানুষের সত্যি কাজে আসে তখনই, যখন সে আত্মিক শক্তিতে প্রতিষ্ঠ পেয়ে জ্ঞানে উজ্জ্বল, প্রেমে সুন্দর ও কর্মে পরার্থনিষ্ঠ হয়ে ওঠে। খ্রীষ্টদেব এই সত্যেরই উল্লেখ করেছিলেন যখন তিনি বলেছিলেন: ভাগবত সাম্রাজ্যের অধিকার পেয়ে সত্যাশ্রয়ী হ'লে জীবনের সব প্রাপ্তিই অলঙ্কার হয়ে দাঁড়ায়—নইলে সবই ব্যর্থ—"Seek ye first the kingdom of God, and his righteousness; and all these things shallbe added unto you." যে মানুষ ইন্দ্রিয়দাস, নিষ্ঠুর, গৃধ্নু দাম্ভিক সে সমস্ত সৌরজগতের সাম্রাজ্য পেলেও থাকবে হিটলার স্টালিন, মাওৎসেটুঙের মতনই ব্যর্থ, অসুখী, অন্ধ।

খ্রীষ্টদেবের এ গভীর উক্তিটি উদ্ধৃত করতাম না যদি শ্রীচাণক্য সেন "রাজপথ জনপথ"-এ ভারতমানসের জয়গান না করতেন এই বলে যে, ভারত-মানসকে জানতে হলে উপনিষদ, গীতা, রামায়ণ ও মহাভারত না পড়লে চলবে না।" (১২৯ পৃঃ।) কোন ইদানীন্তনের মুখে এ-ধরণের কথা শুনলে মনে পুলক জাগে, বিশেষ যখন এই সঙ্গে শুনি হিন্দু যুবক সোম বলছে নিগ্রো অতিথি কাবাকুকে: "মহাভারত আর ইলিয়ডের তুলনা হয় না। ইলিয়ড ভাগীরথী। মহাভারত অকূল সাগর।... হোমার মহাকবি। দান্তেও তাই। কিন্তু বাল্মীকি আর ব্যাসদেব মহাকবিই নন, মহর্ষি। ভারতবর্ষ ব'লে আজ যা দেখছ হাজার হাজার বছর দুখানি মহাকাব্য তাকে বাঁচিয়ে রেখেছে। আজও গ্রামে গিয়ে দেখ। কোটি কোটি মানুষ যুগ যুগ ধরে বেঁচে থাকার রসদ পেয়েছে এই দুখানা মহাকাব্য থেকে। ভারতবর্ষের মানুষের জীবনে এমন কোনো সংঘাত, আদর্শ, স্খলন, মাহাত্ম্য, ভাবনা নেই যা এ-দুই মহাকাব্যে প্রতিফলিত হয় নি। এ-দেশের লক্ষ লক্ষ গ্রামে যারা রামায়ণ আর মহাভারত থেকে জীবনতৃষ্ণা মেটায় তারা অশিক্ষিত, কিন্তু অসভ্য নয়; তারাই সত্যিকারের ভারতবর্ষ, আমরা কয়েক লক্ষ নগরবাসী যা নই। তুমি ভারতবর্ষের কোনো ভাবধারার পুরো নাগাল পাবে না যদি না এই রসসমুদ্রে প্রবেশ করতে পারো।"

আমি স্বীকার করছি যে, কোনো ইদানীন্তন তরুণ লেখকের কাছ থেকে ভারতের মহিমময় অধ্যাত্ম তথা এপিক ঐশ্বর্য সম্বন্ধে এ-জাতীয় প্রণাম-অর্ঘ্য আমি আশা করি নি, এবং সেই জন্যেই আমার মনে আশা জেগেছে যে, রাজপথ জনপথের এই ভাবুক গ্রন্থকার অতঃপর আমাদেরকে আরো মূল্যবান্ ভাবমণি উপহার দেবেন, ভারতের চিরন্তন অধ্যাত্ম সম্পদের আনন্দ কোষাগার থেকে।

কিন্তু আর না। এবার রাজপথ জনপথের ঔপন্যাসিক সাফল্য সম্বন্ধে সংক্ষেপে কিছু বলতে চাই। "সংক্ষেপে" বলতে হবে এই জন্যেই যে, এ-বইটির প্রশংসা যদি খুঁটিয়ে করতে হয় তা হ'লে এত কথা বলতে হয় যে, একটিমাত্র পত্রে কুলোবে না—একেই পত্র যে বৃহৎকায় হয়ে দাঁড়াল—ভয় হয় পাছে আপনি না ছাপান—স্থানাভাব ব'লে।

প্রায় চল্লিশ বৎসর আগে আমি একটি উপন্যাস লিখি—"মনের পরশ"। এতদিন বাদে এর দ্বিতীয় পরিবর্তিত সংস্করণ ছাপা হচ্ছে "ভাবি এক হয় আর" নব নামে। (মাসিক বসুমতীতে এটি বেরিয়েছিল তিন বৎসর আগে।) এ-উপন্যাসটিতে আমি লিখি য়ুরোপের নানা জগতের মানুষ কী ভাবে ভারতীয় মনের কাছে এসে মিতালির রাখীবন্ধনে বাঁধা পড়েছে।

তার পরে আমার "দোলা"-য় চৈনিক ভাবুককে পরিবেশন করেছি এবং আইরিশ ও জাপানীকে পেশ করেছি "তরঙ্গ রোধিবে কে?" উপন্যাসে। কিন্তু নিগ্রোদের নিয়ে যে উপন্যাস লেখা সম্ভব এ কথা আমার

একবারও মনে হয় নি। না-হওয়ার প্রধান কারণ এই যে, আফ্রিকাকে আমি না দেখেছি অভিজ্ঞতার পরিধির মধ্যে, না কল্পনার আলোয়। শ্রীচাণক্য সেন তাঁর অসামান্য নৈপুণ্যের মাধ্যমে এক নিগ্রো যুবককেই করেছেন তাঁর উপন্যাসের নায়ক। এ সামান্য কীর্তি নয়। কারণ যতই ঔদার্যের গুণগান করি না কেন, এখনো কোন দেশেই বিশ্বমানব বর্ণবিদ্বেষকে পুরোপুরি কাটিয়ে উঠতে পারে নি। তাই নিগ্রো বা নাগা বা সাঁওতাল বা রেড ইণ্ডিয়ানদেরকে কিছুতেই আমরা "সবার উপরে মানুষ সত্য" নীতি মেনে ডাকতে পারি না প্রাণের প্রীতি-ভোজে, গৃহে ঠাঁই দিতে ডরাই প্রিয় অতিথিরূপে—সর্বোপরি, শিউরে উঠি মা-বোনের সঙ্গে মিশতে দিতে, বা স্ত্রীর সঙ্গে অকুতোভয়ে পিকনিক করতে পাঠাতে।

আমাদের এই আদিম অক্ষমতার কথা শ্রীচাণক্য সেন শুধু যে চমৎকার করে ফুটিয়েছেন তাই নয়, তাঁর প্রতিভার অঘটনঘটনপটীয়সী শক্তিবলে নিগ্রো-নায়ক পিটার কাবাকুকে তাঁর সমবেদনার রসায়নে নিষিক্ত ও সুরভিত ক'রে আমাদের মনের মানুষ ক'রে তুলে ধরেছেন। তিনি যেন বলেছেন কোনো রাগে ধুয়োর মতনই—বারবার: দেখ, রং মিশ কালো হলেও এর হৃদয়ে আছে সেই একই প্রেম, সাহস, সততা ও সুষমা যা মানুষকে তার পশুত্বের গণ্ডী থেকে মুক্তি দিয়ে উত্তীর্ণ করেছে আদরণীয় বন্ধুর পর্যায়ে। এ হেন আত্মীয়কে বরণ করা যায় সতীর্থ ব'লে, গৃহে স্থান দেওয়া যায় অতিথি ব'লে, সর্বোপরি হিন্দু কুমারীর দয়িত ব'লে অভিনন্দন করতেও পারা যায় শুধু এই জন্যে যে, বর্ণ, শিক্ষা, সংস্কার, জাতি এ সবই বাহ্য—আসল কথা হ'ল নিগ্রো মানুষের মতন মানুষ কি না, প্রীতিরসের রসায়নে রসোত্তীর্ণ কি না, প্রেমের আলোয় রমণীয় হয়ে উঠেছে কি না।

তিনি এই অসাধ্য সাধন করতে সক্ষম হয়েছেন প্রতিভার একটি কাজ অসম্ভবকে সম্ভব করা ব'লে। চলতি নৈপুণ্য পায়ে হাঁটা পথেই চলে। প্রতিভা নিজের পথ কেটে নেয় অচিন পথে—"দুর্গম গিরি প্রান্তর মরু দুস্তর পারাবার"—লঙ্ঘন ক'রে। এই প্রতিভার ছাপ তাঁর বহু চরিত্রেই পাই—রাজপুরুষ শুকদেবের কর্মনৈপুণ্যের সঙ্গে অন্ধ আত্মপ্রসাদের চিত্রণে তাঁর পত্নী সুলোচনার রূপ গুণ থাকা সত্ত্বেও—"ফুরিয়ে যাওয়ার" বেদনায়, সিস্থিয়ার বুদ্ধি তাকে কী ভাবে নিঃস্ব অন্তর্দাহের পথে ঠেলেছে তার রূপায়নে, সর্বোপরি, হিন্দু কুমারী পার্বতীর প্রেমের ক্ষেত্রে ঘা খেয়েও প্রেমের পথেই পুনঃ পদার্পণের স্নিগ্ধ রোমান্সের দীপ্ত পটে। আরো কত যে ছোট ছোট ছবি গ্রন্থকার পরিবেশন করেছেন—শুধু তৃণ লতা ফুল পল্লবের চিত্রণেই নয়—আগাছা ঝোপঝাপ কাঁটাবনের আলেখ্যেও বটে, যে পড়তে পড়তে ক্রমাগতই বিস্ময় জাগে তাঁর ভূরিভোজের ব্যবস্থায়। সবশেষে ফের বলি—বইটির মধ্যে নানা স্থলেই পরিচয় পাই তাঁর গভীর অধ্যাত্মশ্রদ্ধায়—যে শ্রদ্ধা ভারতের অন্তরের সর্বোত্তম কৌস্তুভমণি। তাই আমরা আরো আশা করব, যেন তাঁর হাতে ভারতীয় অন্তর-সম্পদের নানা দীপ্তির উদ্‌ঘাটন হয়—যার ফলে রসের মন্দিরে জ্বলবে দীপালির পরে আনন্দ-দীপালি। ইতি

প্রীতিবদ্ধ—দিলীপকুমার রায়।

ফাঁকি

শ্রীমিহির সিংহ

রামু ওরফে রাম ওরফে রামচন্দ্র নন্দীকে আলাদা ক'রে মনে ক'রে রাখবার মতন কিছু তার চেহারায় ছিল না। দোহারা শাম্‌লা চেহারা, অর্থনীতিকদের সংজ্ঞা অনুসারে 'নিম্নমধ্যবিত্ত' শ্রেণীর অন্তর্গত অন্য যে কোনও যুবকের মতন তার বেশভূষা আর ধরণ-ধারণ। পড়াশুনো বেশী করে নি, তবে বাসে অন্য কারুর হাতে ইংরাজি খবরের কাগজ দেখলে চেয়ে নিয়ে প'ড়ে থাকে। কাজ করে একটা টাইপ রাইটার এবং অফিসের অন্য সব জিনিষের দোকানে, লেখাপড়ার সঙ্গে তার কাজের যোগাযোগ কিছু নেই প্রায়, তবে বুক পকেটে একটা ডট্ পেন, একটা পুরোনো অচল এভাশর্প কলম, আর একটা প্রেসিডেন্ট ক্লমম যেটা দেখলে হঠাৎ পার্কার ডুওফোল্ড ব'লে ভুল হয়। চিঠিপত্র আদান-প্রদান করার মতন বিশেষ কেউ নেই, গত বছর-খানেকের মধ্যে বোধ হয় দুটো তিনটের বেশী চিঠি পায় নি তবে সে সব কয়টিই তার বুক-পকেটে থাকে, অত্যন্ত নিষ্ঠা সহকারে পুরোনো ছাড়া জামার থেকে নতুন ধোপভাঙ্গা জামায় স্থানান্তরিত হয়। চোখ দুটো তার আসলে বোধ হয় খারাপই, তবু সেটা ডাক্তারকে না দেখিয়ে একজোড়া কালো চশমা সে সদাসর্ব্বদা প'রে থাকে। বস্তুতঃ পক্ষে আপিসের সাহেবরা গলাটাকে টাইয়ের নিবিড় আবেষ্টনীর মধ্যে রক্ষা না করতে পারলে যেমন নিজেদের অমন অটুট আত্মবিশ্বাসও হারিয়ে ফেলেন, রামুর চোখেও যদি কালো চশমা জোড়া না থাকে ত তারও যেন পায়ে পায়ে জড়িয়ে যায়। আর একটি জিনিসও তার না থাকলে অচল হয়ে যায়—হাতের ডায়েরিটি। কি তার কর্মব্যস্ততা জানি না, কত জনের ঠিকানা তাকে হাতের কাছে রাখতে হয় তাও জানি না, তবে বাড়ীর বাইরে এক পা বাড়াতে হলেও সুন্দর রেক্সিনে বাঁধাই ডায়েরিটা হাতে না থাকলে চলে না। হ্যাঁ, ডায়েরিটার একটা স্পষ্ট প্রয়োজনীয়তা আছে—তার খাপে রামুর সম্বল টাকা কয়টি রাখা থাকে, বলতে গেলে অংশতঃ সেটা পার্সেরই কাজ করে তার। মাথার চুলটা যত্ন ক'রে ছাঁটা, সামর্থ্যের অতিরিক্তই সে ব্যয় করে সেজন্যে। খাদি গ্রামোদ্যোগের থেকে কেনা বাফ্‌তার হাওয়াই শার্ট আর হরলাল্‌কার সেল থেকে কেনা রেডিমেড ট্রাউজার্স পরে শ্যাম্‌লা ছেলেটি যখন সকাল্‌বেলা দ্রুতপদে বাড়ী থেকে বেরিয়ে বাস ষ্ট্যাণ্ডের দিকে রওনা হয় তখন আমাদের জাতীয় সভ্যতার রাজধানীর লক্ষ লক্ষ কর্মব্যস্ত মানুষের থেকে আলাদা ক'রে চিনবার মতন কিছু থাকে না তার মধ্যে, তবে আপনার অবসর থাকলে সে চোখে পড়তে বাধ্য, যদিও সে একেবারেই সাধারণ।

আপনাকে আমাকে সে বলবে না, খুব সম্ভবতঃ নিজেও সে কখনও ভেবে দেখে নি, তবে আসলে রামুর জীবনের একটা সব চাইতে উপভোগ্য সময় হ'ল এই বাসে করে যাতায়াত করাটা। বাড়ীতে তার কতকগুলো নির্দিষ্ট কর্তব্য আছে, অধিকারও আছে—যথা সকলের আগে ভাত পাওয়া, রবিবারে সকালে এক পেয়ালা বেশী চা। অফিসে তাকে সেল্‌স্‌ম্যানদের জুনিয়র হিসেবে কাজ করতে হয়—ঠিক মতন না করলে বকুনি খেতে হয়, পুজোর বকশীষের সময় ছাড়া দরোয়ান, বেয়ারারা তাকে সেলাম করে না। আত্মীয়দের বাড়ীতে বা বন্ধুবান্ধবের আড্ডায়ও কারুর চাইতে সে বয়সে ছোট, কারুর চাইতে বয়সে বড়—সব জায়গাতেই তার সামাজিক স্থানটি অত্যন্ত সুনির্দিষ্ট। ভিড়ের বাসটিতেই শুধু তাকে কেউ চেনে না, এখানেই সে স্বাধীন ভারতবর্ষের সম্পূর্ণ স্বাধীন নাগরিক—প্রাইভেট্ সিটিজেন। প্রতিদিনকার জীবন যুদ্ধে তার স্থানটি কমা সেমিকোলন পর্যন্ত দিয়ে ঠিক করা আছে, নতুন ক'রে কিছু ক'রে নেবার নেই। তাই বাসের ভীড়ে প্রতিদিন তার ছোটখাট একটা ব্যক্তিগত জীবন-সংগ্রাম চলে। ভিড় না হলে তার ভালই লাগে না। অনেক ভিড়ে ঠেলাঠেলি ক'রে শুধু পায়ের ডগাটার স্থান ক'রে নিতে পারলে তার যে তৃপ্তিটা হয় সেটা কুশলী গায়কের সমে এসে মেলার চাইতে কিছু কম নয়।

দোতলা ষ্টেট বাসের বড় পাদানীটা হচ্ছে তার সব চাইতে প্রিয় জায়গা। হিন্দু-মুসলমান, সেকালের সেই শক-হুনদলের বংশধর—সকলেরই সমানভাবে মিলবার মিশবার জায়গা সেটা। দেড় হাজার টাকা মাইনের কর্মচারীই হ'ন আর দেড় লক্ষ টাকার অধিকারী দোকানের মালিকই হ'ন, রামুর সঙ্গে কারুর কোনও

পার্থক্য এখানে নেই—ড্যালহাউসি স্কোয়ারে পৌঁছতে সকলেরই টিকিট কাটতে হবে এগারো নয়া পয়সার। যদি আপনার নতুন কেনা এ্যাম্বাসাডর জুতোর উপরে মমতা থাকে কিম্বা সদ্য পাটভাঙা ট্রাউজারসের ক্রিজটা বাঁচিয়ে চলতে চান ত রামুর কাছ থেকে সহানুভূতি আশা করবেন না। রবীন্দ্রনাথের 'সই নিয়ে নেমে এসো, নহিলে নাহি রে পরিত্রাণ' লাইন দুটি সে জানে,—সেই রকম একটা মনোভাব নিয়েই সে অসাবধান কোনও সহযাত্রীর পক্ষ নিয়ে অযাচিত ভাবে আপনাকে ব'লে দেবে ট্যাক্সি ক'রে যেতে। বলা বাহুল্য এটা বলতে সে আপনার সম্বন্ধে ব্যক্তিগত ভাবে কোনও বিরোধিতার ভাব পোষণ করবে না, এটা তার কাছে একটা নীতির ব্যাপার। সত্যি কথা বলতে গেলে, তার কোনও ঝগড়া কোনও মানুষের সঙ্গেই প্রায় নেই। বাসে যেতে, কাগজের সমসাময়িক মতামত অনুসারে চীনেদের কিংবা পুলিশের কিংবা কালোবাজারীদের বিরুদ্ধে মতামত সে তীব্র ভাবেই প্রকাশ করে, তবে তার জন্যে সত্যিকারের কোনও উত্তাপ তার মনের মধ্যে থাকে না মোটেই।

তবে কে যেন ব'লে গেছেন যে দোষ না থাকলে মানুষের ব্যক্তিত্ব সম্পূর্ণ হয় না। রামুর প্রায় নিষ্কলঙ্ক চরিত্রের একটুখানি গোপন খুঁত ছিল যেটা না বললে তার বর্ণনাটা সম্পূর্ণ হয় না। ভিড়ের বাসের সে ভাড়াটা দিত না। অফিসে বেরোনোর সময়ে তার বরাদ্দ পঁচাত্তর নয়া পয়সা। তার থেকে বাইশ নয়া পয়সা যাওয়ার কথা বাসের ভাড়ায়। কিন্তু আসলে সেটা তার খরচই হ'ত না। কি ভাবে যে ব্যাপারটা আরম্ভ হয়েছিল তা তার মনেই পড়ে না, বোধ হয় নিছক ভিড়ের জন্যেই। কিন্তু ক্রমে এটা তার বিশেষ একটা প্রাত্যহিক প্রয়াসে দাঁড়িয়ে গিয়েছে। স্পষ্ট মিছে কথা সে সাধারণতঃ বলে না, কণ্ডাক্টর ভাড়া চাইলে বলে না যে টিকিট হয়ে গিয়েছে। তবে নানান্ উপায়ে সে চেষ্টা করে কণ্ডাক্টারের সঙ্গে যাতে সোজাসুজি কথা না হয়। উপায় সত্যিই নানা রকমের আছে—দুটো হাতই যদি ব্যস্ত থাকে হ্যাণ্ডেল ধরতে ত কোনও ভদ্র কণ্ডাক্টারই ভাড়া চাইতে পারে না। একটা হাত যদি খালিও থাকে ত কণ্ডাক্টারের চোখ এড়ানোর চেষ্টা করা যায়। নেহাৎ যদি তাও না পারা যায় ত খুব ভালো একটা উপায় হচ্ছে স্বয়ং কণ্ডাক্টারের সঙ্গে কথাবার্তা সুরু করা, তার পাশে দাঁড়িয়ে। অনেক সময়েই কণ্ডাক্টার কথা বলতে গিয়ে টিকিট চাইতে ভুলে যায়। তবে যখন এসব কিছুতেই কুলোয় না তখন নামতে হয় কিম্বা নামবার ভঙ্গী করতে হয়। এমন কি, খুব বেকায়দায় পড়লে কোনও একটা অজুহাতে ঝগড়াঝাঁটি কিম্বা অন্য কোনও অশান্তিও সুরু করতে হয়। তবে সে খুব কম। কলকাতার ভিড়ে ষ্টেট বাসের পাদানীতে চলতে গেলে ভাড়া দেওয়াটাই কঠিন, ভাড়া না দেওয়ার জন্যে আলাদা ক'রে চেষ্টা করতে হয় না অনেক সময়েই।

রামুর মনে রোম্যান্স যেমন বাসেরভিড়ে কোনও কোনও দিন সুবেশা সুশ্রী তরুণীদের উপস্থিতি, তেমনি সমাজের অব্যবস্থার বিরুদ্ধে আদর্শগত প্রতিবাদও বাসের এই ভাড়া না দেওয়ারমধ্যে দিয়ে। এগারো নয়া পয়সা ক'রে ভাড়াটুকু ফাঁকি দিয়ে এ্যানার্কিষ্ট বা নিহিলিষ্টদের প্রচারপুস্তিকা প্রকাশ কিম্বা বোমা ছোঁড়ার মতই আদর্শগত তৃপ্তি পায় রামু। মনের অবচেতনে তার অনেক না-পাওয়ার বেদনা আছে। শ্রেণী-সংগ্রামের রেশ খবরের কাগজের পাতার মধ্যে দিয়ে তার মনের মধ্যে একটু যে ছাপ ফেলেছে তার একটা অভিব্যক্তি এই ভাড়া না দেওয়ার—নীরব সংগ্রামের মধ্যে পাওয়া যাবে। আর প্রতিদিনকার ছোট ছোট জয়ের চিহ্ন থেকে যায় রেক্সিনে মোড়া ডায়েরীর খাপে জমে ওঠা কয়েকটা টাকায়। এগারো নয়া পয়সা এগারো নয়া পয়সা ক'রে এক একটা টাকা সম্পূর্ণ হয় আর রামুর মনটা খুশিতে ভ'রে ওঠে। একটা গোপন উচ্ছ্বাস তার মনের কোণে উঁকি মারে—ষাট সত্তরটা টাকা যদি জ'মে ওঠে ত একটা চলনসই ঘড়ি হয়ে যায়। রামু কল্পনায় ভাবে, একটা ষ্টীলের ব্রেসলেট ওয়ালা চকচকে আস্ত ঘড়ি তার কব্জীতে থাকবে, সেই হাতটা বাড়িয়ে দিয়ে বাসের জানলার পাশটা শক্ত ক'রে ধরবে—যেন তার পৌরুষটাই সার্থক হবে তখন।

ভিড়ের বাসের মতন ঊর্দ্ধশ্বাসে দিনগুলো চলছিল। কোনও অর্থ নেই অথচ অনেক ব্যস্ততায় ঠাসা। একটা দিন থেকে আর একটা দিন, একটা বাস থেকে পরেরটার মতনই অ-বিশেষ। ক্রিকেটের আলোচনা শেষ হয়ে গিয়েছে, হকির আসরের জল্পনা সুরু হয়েছে, এই রকম একটা দিনে বিকেল বেলা বাড়ী ফেরার সময়ে রামুর বুকটা ধুক ধুক করছিল। ৪৯ টাকা ৮৯ নয়া পয়সা তার জমেছে, কড়ায় গণ্ডায় হিসেব করা আছে ডায়েরির পাতায়, খাপের মধ্যে আছে নগদ ৪৯ টাকা। আজকের সন্ধ্যেটা কাটাতে পারলে পুরা পঞ্চাশ টাকা তার জমে—কোথায় লাগে দুর্গাপুরের কারখানায় ইস্পাত উৎপাদনের টার্গেটে পৌঁছোনো। কিন্তু অফিস থেকে বেরোতে দেরী হয়েছে, নতুন টিক তুলে রাখতে সময় গেছে, ইতিমধ্যে

বাসের ভিড়টাও হাল্কা হয়ে এসেছে। রামুর মনটা দমে গেল। জানে, এপাড়া থেকে আরও যত রাত হবে ভিড় ততই ক'মে আসবে, অপেক্ষা ক'রে লাভ নেই। তবে কি হেঁটেই চ'লে যাবে? কিন্তু পাড়াতে একটা জলসা আছে। হেঁটে গেলে অনেক দেরী হয়ে যাবে পৌঁছোতে। সামাজিক অবিচারের বিরুদ্ধে রামুর চাপা অভিযোগটা ধূমায়িত হয়ে উঠল। প্রথম যে বাসটা এলো তাতেই উঠে পড়ল রামু। আট-দশ জন মাত্র দাঁড়িয়ে আছে—ফাঁকাই বলতে হবে এক রকম। তবে একটা ভালো কথা হ'ল কণ্ডাক্টার একেবারে সামনের দিকে, এ পর্য্যন্ত আসতে দেরী আছে। রামু একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে দোতলায় উঠবার সিঁড়িটাতে হেলান দিয়ে দাঁড়াল। নাঃ, কপালটা ভালো না। কণ্ডাক্টারটা সোজা চ'লে এল, রামু মরিয়া হয়ে পকেট থেকে আটটা নয়া পয়সা বার ক'রে দাঁড়াল, নেহাৎ দিতে হলে দিতেই হবে।

কিন্তু রাখে কেষ্ট মারে কে? পরের ষ্টপেজেই উঠল সাত-আট জন দেহাতী লোকের একটি ক্ষুদ্র জনতা। তাদের বাসে চড়ন্তে অনভ্যস্ত চালচলনে নিমেষের মধ্যে আবহাওয়াটা পাল্টে গেল। কতদিন এদের উদ্দেশ্যে রামু কটূক্তি করেছে। আজ কৃতজ্ঞতায় তার মন ভ'রে গেল। সালংকারা দেহাতী মহিলা-দুটির বসবার ব্যবস্থা ক'রে আর সকলের টিকিট কাটতে কণ্ডাক্টারের যতটা সময় যাবে তার মধ্যে অনেক দূর এগিয়ে যাওয়া যাবে। রামু পয়সা কটা আবার পকেটের মধ্যে ফেলে দিল। দু ষ্টপেজ বাদে উঠল তিন চারটি ছেলের আর একটি দল। এতক্ষণে রামু নিশ্চিন্ত হতে পারল। অনেক ধাক্কাধাক্কি ছোটোখাটো বিতণ্ডার ঢেউয়ের মধ্যে রামু যেন আনন্দে, সাঁতার দিতে লাগল। ধাক্কায় ডায়েরিটা একবার প'ড়ে গেল, একটি ছেলে সেটি তুলে দিতে রামু বেশ চোস্ত ভাবে তাকে ধন্যবাদ জানিয়ে এক ষ্টপেজ আগেই নেমে পড়ল।

একটু দূর থেকে ভেসে আসছে এ্যামপ্লিফায়ারের আওয়াজ। জলসা এখনও বসে নি, কর্মকর্তারা শুধু নিজেদের কর্মব্যস্ততাটাই জাহির করছেন। গুন গুন করে গান করতে করতে রামু পানের দোকানের সামনে দাঁড়াল—এইখানেই ও খুচরো পয়সাগুলো দিয়ে টাকা ক'রে নেয়। পকেট থেকে পয়সাগুলোবার করে গুনে গুনে দিয়ে ডায়েরিটা খুলল—খুলেই তার বুকটা ধড়াস করে উঠলো—খাপটা খালি।

পুনর্ভ্রাম্যমাণ

(দ্বিতীয় স্তবক)

(মীরার রাজস্থান)

শ্রীদিলীপকুমার রায়

নভেম্বর, ১৯৬২
উদয়পুর, সার্কিট হাউস

শ্রীনীলকণ্ঠ মৈত্র স্নেহাস্পদেষু,

অনেকদিন বাদে তোমাকে লিখতে বসেছি। এখানে শেষ করতে পারব ব'লে ভরসা হয় না, কারণ, আজ, কাল ও পরশু তিন দিনই গাইতে হবে—একদিন আবার কলেজে। তাই এ-চিঠি পুনায় ফিরে পাঠাব। তবু যতটা পারি লিখে রাখি—মনে নানা ভাবোদয় হচ্ছে, এ অপরূপ স্বপ্ন-দিয়ে-তৈরী-স্মৃতি-দিয়ে ঘেরা রাজ্যে।

কিসের স্বপ্ন? হ্রদ, বীথি, শৈলমালা, হ্রদের-বুক-থেকে ওঠা মর্মর প্রাসাদ। সে না দেখলে ব'লে বোঝাবার নয়। রূপের বর্ণনা সম্পূর্ণ ব্যর্থ বলি না। কিন্তু সেজন্যে চাই কাব্যকে তলব করা, অথবা কাব্যধর্মী গদ্য। কিন্তু তার আবার মুশকিল এই যে, যে দেখে নি তার মনে হবে—উচ্ছ্বাস। তাই থাক বর্ণনা। এইটুকু বলেই ক্ষান্ত হই যে, চারদিকে শ্রী ও মহিমার আগুন লেগেছে, দেখতে দেখতে সত্যিই আবেশ আসে।

কিন্তু স্মৃতির কথা বলতেই হবে কিছু।

আমি কীর্তন গেয়ে এসেছি সে কবে থেকে! পঞ্চাশ বৎসরেরও বেশি। শৈশবে পিতৃদেবের মুখে শুনতাম কত যে কীর্তন: ছিল বসি সে কুসুম কাননে, কেন মিছে আশা, মিছে ভালবাসা, চাহি অতৃপ্ত নয়নে তোর মুখপানে—আরও কত গান কত কীর্তনীর মুখে: যমুনা এই কি তুমি সেই যমুনা, শারদ চন্দ পবন মন্দ বিপিনে বহল কুসুমগন্ধ, সুন্দরি রাধে আওয়ে বনি ব্রজরমণীগণ মুকুটমণি···ইত্যাদি। অতঃপর কৈশোরে শুনি পিতৃদেবের অবিস্মরণীয় গৌরকীর্তন: ও কে গান গেয়ে চ'লে যায়। আজও মনে পড়ে, এ-গানটি গাইতে গাইতে পিতৃদেবের গৌরবর্ণ মুখ ভক্তির আবেগে রাঙা হয়ে ওঠা—বিশেষ ক'রে তাঁর অবিস্মরণীয় চরণটি গাইবার সময়ে: "ও কে দেবতা ভিখারী মানবদুয়ারে দেখে যা রে তোরা দেখে যা।" তাঁর মুখে এ-গানটি শুনতে শুনতে অভক্তকেও উদ্দীপ্ত হয়ে উঠতে দেখেছি।

তার পরেই আমার জীবনে এল হিন্দি ভজন পর্ব। এ-পর্বে তুলসীদাসের গানই প্রথম আসে; দ্বিতীয়, অপরাজেয় মীরা ভজন। বোলপুরে শ্রীক্ষিতিমোহন সেনের কাছে শিখি সহজ সুরে—চাকর রাখো জী, সুনি ময় হরি আওনকী আওয়াজ, চিতনন্দন চিলমাঈ, তুমরে কারণ সব সুখ ছোড়্যা, নয়ন ললচাওত জিয়ারা উদাসী, ইত্যাদি। পরে এ-গানগুলি নতুন ক'রে সুর দিয়ে নানা সভায় ও আসরে গাওয়া সুরু করতে না করতে বাইরণের মতন প্রখ্যাত হয়ে উঠি—হিন্দু মহাসভায়, কাশীতে—১৯১৮ সালে। বিশেষ ক'রে আমার মুখে মীরাভজন শুনে অবাঙালী বহু গণ্যমান্য ভক্ত তথা অভক্ত উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠেন: স্বামী শ্রদ্ধানন্দ, ভগবান্ দাস, শিবপ্রসাদ গুপ্ত, যুগলকিশোর বিড়লা, শ্রীপ্রকাশ··আরও কত। ফলে একদিকে আমার খুব ক্ষতি হয়—আমি নিজেকে বাহবা দিতে সুরু করি। কিন্তু লাভও আসে অন্য পথ দিয়ে—গাইতে গাইতে মীরার বিরহব্যথা, ব্যাকুলতা, ও ভক্তির অন্দরমহলে কিছুটা রস প্রাণে জেগে ওঠে ও আমি মীরাকে ভালবেসে ফেলি।

অতঃপর যৌবনে বিলেতেও গাইতাম মীরাভজন নানা মজলিশে। স্থির করি—দেশে ফিরে মীরার আরও ভজন সংগ্রহ করবই করব—এমন ভজন আর কে লিখেছে হিন্দি ভাষায়? তখন কি জানি ইন্দিরাই আমার মীরা-ভজন তৃষ্ণা মেটাবে সমাধিতে শোনা সাত-আটশো মীরা-ভজন রচনা ক'রে? কিন্তু সে পরের কথা থাক্।

দেশে ফিরে নানা স্থানে নানা মীরাভজন সংগ্রহ করি—কারণ, মীরাভজনাবলীর বইও তখন প্রকাশিত হয় নি বা হ'লেও আমার হাতে পড়ে নি। কাজেই আমাকে হাত পাততে হ'ল প্রধানতঃ উত্তর প্রদেশের নানা অখ্যাতনামা গায়কের কাছে। তাদের মধ্যে অনেকেরই বাণী অশুদ্ধ ছিল, তবু মীরার নানা চরণ মনকে আমার চম্‌কে দিত: "সন্ত দেখ দৌড় আঈ জগত দেখ রোঈ।" কী অপরূপ!—জগৎ দেখে যে মহিমময়ীর

বুকে কান্না জেগে উঠত, সে আনন্দে উচ্ছল হয়ে উঠত শুধু সাধুসন্তকে দেখে। "দাসী মীরা লাল শ্যাম হোথী সো গেঈ"—মীরা দাসী শ্যামপ্রিয়, এইই ত মীরার নিয়তি—তাই যা হবার তা হ'ল, না হয়ে উপায় ছিল না ব'লে। আমার জীবনে কৃষ্ণভক্তি প্রথম জেগে উঠেছিল কৈশোরে। যৌবনে সে-ভক্তিকে উস্কে দেয় প্রধানতঃ মীরার পথেঘাটে-গাওয়া ভজন।

জয়পুরে আসি ১৯২৪ সালে। ছিলাম সংসার সেনদের মনোজ্ঞ নিলয়ে। আমার আপ্যায়নকর্তা বীরেন সেন আমাকে নিয়ে গেলেন বিখ্যাত গায়িকা গহরবাঈয়ের ওখানে। তিনি শুধু সাদরে আমাকে গান শোনানো নয়, আমার গানও শুনলেন বাহবা দিয়ে। মনে আছে—তাঁর বিশেষ ভালো লেগেছিল অতুলপ্রসাদের একটি বাংলা গান: "ও আমার নবীন শাখী, ছিলে তুমি কোন্ বিমানে?" অতুলদা প্রায়ই আমাকে হেসে বলতেন—বাংলা ভাষার উপর অত্যাচার করেছেন তিনি। শাখী মানে ত পাখী নয়—গাছ, আর বিমান মানে ত আকাশ নয়—উড়ো জাহাজ। তবু অম্লানবদনে আমি গাইতাম শাখীকে পাখী ও বিমানকে আকাশ মনে ক'রে। Where ignorance is bliss, it is folly to be wise—ব'লে নয়।

কিন্তু এ-ও অবান্তর। জয়পুরে এসে আমার সবচেয়ে বড় লাভ হ'ল একটি চমৎকার মীরাভজন পেয়ে—গায়ক খুলজি ভট্ট-র কাছে: কৃপা ভঈ সদ্‌গুরু আপনে কী বেরে বেরে হরি নাম লিয়ো রে। এ-গানটির ভাবার্থ—সব ভক্তকেই তুমি দেখা দিলে ঠাকুর, কেবল মীরার কান্নায় সাড়া দেবার বেলায়ই কিনা ঘুমিয়ে পড়লে—"সব ভক্তন কে সহায় হো হরি, মেরে বের কহাঁ সোয় রহিয়োরে?" গানটি কত জায়গায়ই যে গাইতাম ও কত লোকের চোখেই যে জল ঝরত—সে কী বলব? এ-গানটির একটি বৈশিষ্ট্য ছিল এই যে, এর রাগটি ছিল শুদ্ধ—দেশী আসাবরী—আরোহণে জৌনপুরীর ঠাট সা রে মা পা··· ইত্যাদি। অবরোহণে ভৈরবী—কোমল রেখাবের সোপানে। কাজেই ওস্তাদরাও আমার পিঠ চাপড়াতেন। সময়ে সময়ে—"বহুৎ আচ্ছা বেটা—মহশাল্লা।"

সেই জয়পুরে ফের এলাম দিল্লীতে তোমাদের কাছে বিদায় নিয়ে। তোমাকে বলেছিলাম যে জয়পুরে যাচ্ছি দু'টি উদ্দেশ্য নিয়ে—শ্রীরাধার একটি শাদা পাথরের বিগ্রহ সংগ্রহ করতে আর সৈন্যদের জন্যে কিছু টাকা তুলতে, যদি সম্ভব হয়।

দু'টি উদ্দেশ্যেই লক্ষ্যসিদ্ধি হয়েছে। চমৎকার রাধা-বিগ্রহ পেয়েছি এবং কিছু টাকা অন্তত তুলেছি। কি ভাবে—বলি।

তুমি ষ্টেশনে এসেছিলে দিল্লীতে। দেখলে তো আমাদের বিরাট্ দল—রাউণ্ড ডজন্ যাকে বলে: আমার সঙ্গে ইন্দিরা, শ্রীকান্ত (ব্রিগেডিয়ার শিব থাডানি), একান্ত (রিচার্ড মিলার), প্রশান্ত (ডন ট্যাপ্লে), ইন্দিরার কিশোর পুত্র প্রেমল, শ্রীমোহন সাহানি সপরিবারে—স্ত্রী, দুই কন্যা ও দুই পুত্র সহ। এ-রেজিমেণ্ট নিয়ে কোন ছাপোষা মনিষ্যির স্কন্ধে ভর করা ত সম্ভব নয়। কাজেই শরণে নিতে হ'ল রাজস্থানের রাজ্যপাল সম্পূর্ণানন্দজির। ইনি শুধু পণ্ডিত নন, আমার গান ভালবাসেন। তাই সুবিধা হ'য়ে গেল, তাঁর রাজভবনেই উঠলাম সদলবলে। তাঁকে লিখেছিলাম সৈন্যদের জন্যে কিছু টাকা তুলতে চাই। তিনি খুশী হলেন: প্রথম দিন এসেই গাইলাম তাঁর বিরাট্ হলে—৮ই অক্টোবর রাত্রে। প্রধানমন্ত্রী মোহনলাল সুখদিয়াজীও এসেছিলেন। তিন-চারশ অতিথি। সবাই কিছু কিছু দিলেন সৈন্যদের বাক্সে।

পরদিন বিরাট্ রামলীলা মাঠে গান হ'ল। দ[illegible]টাকা পাঁচটাকা, তিনটাকা, দু'টাকা টিকিট। প্রায় তিনহাজার লোকের সামনে গাইতে হ'ল। দেহের গঙ্গা-যাগে পা হ'লেও কণ্ঠ এখনও মরণাপন্ন হয় নি। তাই পরপর দুদিনই তারস্বরেই গাইলাম দেড়ঘণ্টা ধ'রে। জমেছিল বিশেষ ক'রে ইন্দিরার রচিত—"হম্ ভারতকে হৈঁ রখবালে দেশকা বল হম্ প্রাণ হৈঁ হম্"—সৈন্যদের মার্চসঙ্গীত—"লা মার্সেয়েজ্"-এর মতন। গানটি সেনাপতি কারিয়াপ্পার অনুরোধেই ইন্দিরা বেঁধেছিল ১৯৫০ সালে ও আমি বম্বেতে প্রথম সুর দিয়ে গেয়েছিলাম, তারপর আর বড় গাওয়া হয় নি। কম্যুনিষ্ট জগত্তারক চৈনিকরা আমাদের দেশে অভাবনীয় "আত্মরক্ষার্থে" হু হু ক'রে ট্যাঙ্ক-আদি নিয়ে দু'হাজার বর্গমাইল অধিকার করার পরে এ-গানটি ফের গাওয়া সুরু করি মুসুরিতে—অক্টোবরের শেষে। দিল্লীতেও প্রতি আসরে গাইতাম তুমি স্বকর্ণেই শুনেছ। জয়পুরে এ-গানটি প্রথম দিন সম্পূর্ণানন্দজির রাজপ্রাসাদে গাইলাম সদলবলে হিন্দি, ইংরাজীতে। গানটি সবাইকেই চমকে দিয়েছিল জয়পুরে—বিশেষ ক'রে রামলীলা উদ্যানে স্বদেশী পাখোয়াজ ও বিলিতি ড্রামের সঙ্গতে দ্বাদশী কোরাসে। তুমি যদি শুনতে ত তুমিও নিশ্চয় বলতে: "ভূয়াসি চ পুনঃ পুনঃ।"

এ-দুটি আসরে ভজন তথা পিতৃদেবের স্বদেশী গানও

গেয়েছিলাম। এবং বলাই বেশি—তাঁর স্বদেশী গান সবাইকেই মুগ্ধ করেছিল—আরও এইজন্যে যে, তাঁর প্রতি গানই আমি বাংলায় গেয়ে ইংরাজী ও হিন্দিতেও গাইতাম একই সুরে– তুমি ত শুনেছ কতবারই। বাংলাদেশে আমার প্রিয়বন্ধুরা এসব গানের হিন্দি বা ইংরাজী অনুবাদে সাড়া দেন না। কিন্তু এ দেশের লোকে দিল সোৎসাহেই। তাই মনটা খুশী আছে—অনুবাদেও গানগুলি উদ্দীপক হয়েছিল দেখে।

জয়পুরে এবার একটি নতুন অভিজ্ঞতা হ'ল। সরকারী পাবলিক রিলেশনস্ অফিসে গিয়ে নানা প্রেসের প্রতিনিধিদের সামনে আমাকে তাঁদের রকমারি প্রশ্নের জবাব দিতে হ'ল। কেমন প্রশ্ন—শুনবে নমুনা?—আপনি সাধু হয়েও সৈন্যদের জন্যে টাকা তুলতে চাইলেন কী ভেবে? সাধুদের সমাজ-সেবায় নিযুক্ত করা সম্বন্ধে আপনার কি মত?...ইত্যাদি। উত্তরে অনেক কথাই বলতে হ'ল। শুনে ওরা খুশী হ'ল কি না বলতে পারি না, তবে বন্ধুবর্গীয় কয়েকজন প্রীত হ'লেন, যখন আমি বললাম খাঁটি সাধুরা সমাজ সম্বন্ধে উদাসীনও নন—বস্তুতঃ তাঁরা ভগবৎসাধনায় ভগবৎকৃপার আবাহন ক'রে সমাজের বহু হিতসাধনই ক'রে থাকেন—ভগীরথের তপস্যায় গঙ্গাবতরণের উপমা দেওয়া চলে। সংসারীরা সাধুদের দেখাশুনা করবে, প্রতিদানে সাধুরা সংসারীদের পরম সার্থকতার—শান্তির, জ্ঞানের ও ভক্তির—দিশা দেবেন—এই লেনদেনেই ঐহিক সংসারী ও সাধু বৈরাগীকে আনন্দের রাখীবন্ধনে বাঁধে। তবে সাধুদের তলব ক'রে সমাজসেবকের রেজিমেণ্ট গঠন করলে ধর্ম যাবে রসাতলে, একথাও বললাম সমানই জোর দিয়ে। বললাম: সংসারে একদল ধার্মিক থাকা দরকার যাঁরা চিরদিন থাকবেন মুক্তিসাধক, ধ্যানমন্ত্রী, ভক্তিপন্থী ও জীবন্মুক্ত। এঁরাই সমাজকে ধারণ করেন, কারণ আধ্যাত্মিকতাই হ'ল নৈতিকতার শেষ ভিত্তি। তাই সাধুদের স্বাধীনতা দিতেই হবে সাংসারিক দায়িত্ব থেকে। না দিলে তারা ধ্যানলোকের আলোর দিশা পেতে পারে না। ভগবৎকরুণার আবাহন হয় বহু তপস্যায় তবে।

শেষে বললাম—আমি চিরদিন নিজের জ্ঞান-বুদ্ধি-বিবেক মেনেই চ'লে এসেছি। চৈনিকরা যখন আমাদের পুণ্যভূমি আক্রমণ করে, তখন আমার মন রুখে উঠে বলে—স্বদেশী গান গাইতেই হবে নানা সভায়। তারপরে ইন্দিরা বলে—গান গেয়ে কিছু টাকা তোলা মন্দ কি? মন তৎক্ষণাৎ সায় দিল আমার। ভাবলাম—গুরুদেবের আশ্রমের জন্যে গান গেয়ে আড়াই লক্ষ টাকা তুলেছি দশ-বার বৎসরে, সৈন্যদের জন্যে কি কয়েক মাসে দশ-বিশ হাজারও তুলতে পারব না? বয়স একটু বেশী হয়েছে সত্যি, তাই হয়ত বেশি টাকা তোলার জন্যে আগেকার মতন খাটতে পারব না। কিন্তু যতটা সয় ততটা খাটতে বাধা কি? সাধু হ'লে দেশকে ভালবাসতে পারা যাবে না একথা ত কোনও শাস্ত্রেই লেখে নি। বরং আরও বেশি ভালবাসতে হবে দেশের মাটিকে, জগন্মাতাকে বরণ ক'রে। "বন্দেমাতরম্" মন্ত্র ত চিরন্তন মন্ত্রই বটে, কাজেই সাধু হ'লে দেশের জন্যে গান করতে বাধবে কেন? গীতায় কি ঠাকুর বলেন নি—সর্বকর্মাণ্যপি সদা কুর্বাণো মদ্ব্যপাশ্রয়ঃ মৎপ্রসাদাদবাপ্নোতি পদং শাশ্বতম্ অব্যয়ম্?" অর্থাৎ, যে কোন কাজ ভগবদাশ্রয়ী হয়ে করলে ভগবৎপ্রসাদে পরম পদ মিলবেই মিলবে। (অবশ্য কুকর্ম নয়—সৎকর্ম। কেননা যাকে ভালবাসা যায় তাকে কেউ কু কিছু দিতে পারে না, সু-ই দেয়—এই প্রেমের চিরন্তন ধর্ম) কিন্তু আর না, ধর্মের কথা বেশি বলা সমীচীন নয়—বিশেষ এ যুগের "সেকুলার" রাষ্ট্রে। কে জানে কর্তারা ডরিয়ে উঠে বলবেন হয়ত (ডি, এল, রায়ের ঢঙে):

ঐ যায় যায় যায়!
ফের ধর্ম ধর্ম ক'রে বুঝি কর্ম ডোবে হায়!

মনে প'ড়ে গেল এক রাজনৈতিক ধনুর্ধরের কথা। তিনি পণ্ডিচেরীতে এসে আমাকে দিয়ে শ্রীঅরবিন্দকে লিখিয়েছিলেন যে, তিনি কর্মগাণ্ডীবী—নিঃশ্বাস ফেলবার সময় পান না, কেবল বুঝতে পারছেন না টঙ্কার দিতে দিতে ঠিক পথে চলেছেন কি না। তা'তে শ্রীঅরবিন্দ আমাকে লেখেন: পথে আলোর দেখা না পেলে আলোর জন্যে অপেক্ষা করাই ভাল, দাপিয়ে চ'লে খানায় পড়ার চেয়ে। এযুগে আমরা ভাবি কর্মসিদ্ধিই একমাত্র সত্য, ব্যস্ততার মধ্যেই সুস্থতা, ইত্যাদি। কিন্তু ধ্যানপ্রেমপন্থী আত্মজ্যোতি সমাহিতির মধ্যেই যে শুভকর্মের চিরন্তন প্রেরণা নিহিত, ভগবৎমুখী জ্ঞানালোকের মধ্যেই যে পরম সার্থকতার নিত্যদিশা অন্বেষণীয়—একথা এ-যুগের সেই সব কর্মবীরদের বলা বৃথা, যাঁদের ধারণা—কর্মব্যস্ততার উপনামই কর্মযোগ। মরুক্ গে—জয়পুরের কথায় ফিরে আসি।

পাবলিক রিলেশনস্ প্রতিষ্ঠানের এক দিক্‌পাল মন্ত্রী আমার কাছে এসে বললেন—জনসাধারণকে সরকার নানাভাবে বিশ্ববুদ্ধি ও বিশ্বজ্ঞান দিয়ে বিশ্বকর্মা ক'রে তুলতে চাইছেন কি ভাবে আমার দেখা দরকার। এই মানুষটি বড় সদাশয়—মিষ্টভাষী, মিষ্টহাসি, দরদী।

কেবল জানেন না কি চাইছেন তিনি। তাই মনে করেন কার্লমার্ক্স ও শ্রীঅরবিন্দ উভয়েই মহর্ষি। তাঁর একটি প্রবন্ধে লিখেছেন (উভয়সঙ্কটে প'ড়ে) যে শ্রীঅরবিন্দ সম্বন্ধেও যেমন কার্ল মার্ক্সের কথা নেওয়া যায় না, তেমনি কার্ল মার্ক্সের সম্বন্ধেও শ্রীঅরবিন্দের কথা নেওয়া চলে না। অথচ উভয়েই মহর্ষি! কিমাশ্চর্যমতঃপরম্ !!

বন্ধুটির নাম দেওয়া যাক সদাশয় শাস্ত্রী। এঁর সঙ্গে ব'নে গেল, ইনি শুধু আমার লেখার অনুরাগী ব'লেই নয় —পিতৃদেবের লেখারও বিশেষ ভক্ত। বললেন: রাজস্থানে পিতৃদেবের "মেবারপতন" নাটকের খুব নামডাক। আমিও মনে করি, এ নাটকটি পিতৃদেবের সর্বশ্রেষ্ঠ নাটক, তথা জগতের শ্রেষ্ঠ নাটকদের অন্যতম, তাই ভাব জমে গেল। তারপর দেখি—কী আনন্দ!—শ্রীঅরবিন্দেরও নানা লেখা ইনি সত্যিই প'ড়ে ফেলেছেন, ও শুধু পড়া নয়, পড়ে কিছু কিঞ্চিৎ লাভবান্‌ও হয়েছেন বৈকি। ভাবলাম মনে মনে—বিচিত্র মানুষের চরিত্র। আমার এক কম্যুনিষ্ট নওজোয়ান বন্ধু বলতেন (ধন্য ভাবুক!) যে, শ্রীঅরবিন্দের লাইফ ডিভাইন ও কার্ল মার্ক্সের দাস কাপিতাল এযুগের দুই সেরা সহোদর জীবনবেদ! শ্রীঅরবিন্দ—যিনি ভগবৎসাধনকেই মানুষের শ্রেষ্ঠ সাধনা মনে করেন এবং রাষ্ট্রের চাপে মানুষের ব্যক্তিত্ব নিষ্পিষ্ট হচ্ছে ব'লে তাঁর নানা রচনায়ই দুঃখ করেছেন—তাঁর অন্তরঙ্গ সতীর্থ কিনি? না, উগ্রপন্থী কার্ল মার্ক্স, যিনি রাষ্ট্রের একাধিপত্যকে বরণ করেছেন মনে-প্রাণে, হিংসা-দ্বেষকেই আবাহন করেছেন শ্রেণীর সঙ্গে শ্রেণীর যুদ্ধে —যিনি (রাসেলের ভাষায়) প্রচার ক'রে এসেছেন পরমানন্দে gospel of hatred! কিন্তু সদাশয় শাস্ত্রীর চিন্তা কাঁচা তথা ঝাপসা হ'লেও প্রাণটি উদার ও দরদী—দিল-খোলা যাকে বলে। জ্বলন্ত উৎসাহ তাঁর সব তাতেই। প্রাণবান্ পুরুষ, তাই যাই ধরুন না কেন—ধরেন মোক্ষম আঁকড়ে। এর ফল ফলেছিল পরে —উদয়পুরে, কিন্তু এখানেই সে কাহিনী বলা ভাল। হ'ল কি, তিনি ও জয়পুরের এক মন্ত্রী (তাঁর নাম হো'ক কর্মবীর দোবে) আমার নামে এক চার পৃষ্ঠার পুস্তিকা ছাপিয়ে ফেললেন, আমার ও ইন্দিরার ছবি সমেত। সেই সঙ্গে ছিল একাসনে তোলা ছবি শ্রীসুখাদিয়া ও সম্পূর্ণানন্দের। সে পুস্তিকাটি পেলাম আমি উদয়পুরে এসে। চমৎকার ছাপা কাগজ ছবি—কেবল আমার সম্বন্ধে নানা উচ্ছ্বাসে ভরা—দিলীপকুমার হেন-তেন, কত কি। প্রায় মার্কিন বিজ্ঞাপন। আমি যে এত চমৎকার লোক একথা আবিষ্কার ক'রে আমি অবশ্য উৎফুল্ল হয়ে উঠেছিলাম। কিন্তু দুঃখের বিষয়—আমার শত্রুরা ও বিশেষ ক'রে আমার বাংলাদেশের বন্ধুরা কেহই বিশ্বাস করবেন না কিছুতেই, বলবেন: পাগল না ক্যাপা! কিন্তু এখানেই সদাশয় শাস্ত্রীর উচ্ছ্বাসের সমাপ্তি নয়। হ'ল কি, এখানে (উদয়পুরে) পরশু—১৩ই সন্ধ্যায় একটি বড় প্রেক্ষাগৃহে আমার গানের ব্যবস্থা করেছিলেন। আমরা সদলবলে পৌঁছালাম ১২ই। দুপুরে সদাশয় শাস্ত্রী ও কর্মবীর দোবে জয়পুর থেকে যুগলে মোটরে রওনা হ'লেন—১৩ই। আট ঘণ্টায় মোটর আসে জয়পুর থেকে উদয়পুর, কিন্তু শাস্ত্রীজি দোবেজিকে মোটরে শোনাতে লাগলেন আমার ইংরাজী নাটক Sri Chaitanya ও নানা ইংরাজী কবিতা। ফলে মোটরে পশ্চিম মুখে মোড় নিয়ে আজমীড়ে না পৌঁছে দক্ষিণে বেঁকে হু হু ক'রে চ'লে পৌঁছলেন টঙ্ক-এ। সেখানে তাঁদের চৈতন্য হ'ল যে খুশখেয়ালে চ'লে কাব্যরসিক হ'লে বেঠিক পথের পথিক হ'তে হয়! সে যাই হোক, অতঃপর তাঁরা শর্টকাটে কাজ হাঁসিল করতে যেয়ে পড়লেন এক নদীর চরে—মোটর হ'ল পঙ্কগর্ভে কর্ণের রথের মত অচল। এক জীপ এল মোটরকে উত্থিত করতে, কিন্তু ওমা, সেও পঙ্কের আলিঙ্গনে সর্ফাস করতে করতে হ'ল স্থাবর। তখন অগত্যা সনাতন গোযানকে এসে মোটরযানকে উদ্ধার করতে হ'ল—পুরোণো চাল ভাতে বাড়ে, বলে না? অবশেষে জীপে চ'ড়ে উভয়ে উদয়পুরে পৌঁছলেন রাত আড়াইটেয়। মনে রেখো আজমীরের পথে এলে দুই বন্ধু উদয়পুর পৌঁছতেন সন্ধ্যা সাড়ে ছ'টায় এবং তার পর আমাকে নিয়ে যেতেন নক্ষত্রবেগে কলাভবনে। সেখানে আহূত সুভদ্র ও সুভদ্রারা এসেওছিলেন অনেকেই, কিন্তু সদাব্যস্ত কর্মকর্তারাই গায়েব, কাজেই তাঁরা করেন কি—ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে গেলেন। এদিকে সার্কিট হাউসে আমরা (হায় রে) "সেজেগুজে রইলাম ব'সে (কেউ) নিয়ে গেল না কপালদোষে"—অবস্থা! হাসব, না কাঁদব বল ত? কেবল ভাব বন্ধু, একবার বন্ধুযুগলের দিলীপ কাব্যপ্রীতির বহরের কথাটা ভাবো—কবিতার মোহন কুজনে কি না পশ্চিম ছেড়ে দক্ষিণে নিরুদ্দেশ যাত্রা! দিগ্বিদিক্ কাণ্ডজ্ঞান হারানো—একেবারে অক্ষরে অক্ষরে! এর ও পরে কে বলবে—এ যুগে কবির আদর নেই? ধন্য সদাশয় শাস্ত্রী! ধন্য কর্মবীর দোবে!

সদাশয় শাস্ত্রীর সদাশয়তার আর একটি প্রমাণ মিলল তাঁর দিলীপবিজ্ঞপ্তি-পুস্তিকায় একটি উদ্ধৃতিতে।

উদ্ধৃতিটি তিনি আমার Eyes of Light কাব্যগ্রন্থের একটি কবিতা থেকে আহরণ করেছেন, যথা :

So Thee to adore in rhythm and rhyme
And perfect songs the heavens I move :
Flirting with art is a waste of time,
But touching Thee through art is Love.

(ছন্দে ও মিলে তোমার ভজন গাহিতেই সাধি আমি
বিপুল স্বর্গসাধনা—ফুটিতে মধুকীর্তনে গানে :
শিল্পবিলাস—মায়া সে, যখন সে তোমারে নমে স্বামী,
তখনই সে হয় ধন্য তৃপ্ত মঞ্জরি' প্রেমে প্রাণে।)

সদাশয় শাস্ত্রীর কৃপায় কিন্তু এই সূত্রে আমি একটি আত্ম-আবিষ্কার করলাম যেন নতুন ক'রে : আত্মাদর অভিমান কি ভাবে ঠাঁই পায় মায়া যুক্তির প্রশ্রয়ে। ব্যাপারটা সংক্ষেপে এই : আমেরিকায় এভাবে আত্ম-বিজ্ঞপ্তির প্রশ্রয় দিয়েছি নানা রিপোর্টারকে নিজের নানা কীর্তিকলাপের কথা ব'লে। এ-অপকর্মের ফলে আত্মগ্লানি হয়েছে বৈকি, তবু নিজেকে সাশ্রুনেত্রে বুঝিয়েছি—যস্মিন্ দেশে যদাচার। কিন্তু এদেশে—বিশেষ পুণায় মন্দির প্রতিষ্ঠার পরে আর এ-অপকর্ম করি নি এবং মনে মনে পণ নিয়েছিলাম, করব না কিছু-তেই। কিন্তু সৈন্যদের জন্যে টাকা তুলব একথা শাস্ত্রীকে বলার সঙ্গে সঙ্গে তিনি উৎফুল্ল হয়ে এইভাবে আমার বিজ্ঞাপন জাহির করেছিলেন সত্যিই আমাকে না ব'লে। বললে আমি নিশ্চয়ই বারণ করতাম। কিন্তু মজা এই যে, যখন আমাকে না ব'লে এভাবে আমার গুণপনার আমেরিকাভঙ্গিম বিজ্ঞাপন ছাপিয়ে দিলেন, তখন দেখলাম—কই, খুব দুঃখিত ত হই নি, যদিও মুখে বলেছিলাম তারস্বরেই যে, এ অশোভন। কিন্তু ভাবের ঘরে চুরি ক'রে কে কবে ভগবান্ পেয়েছে ? তাই এতে খুশী হওয়ার জন্যেও পরে আমাকে সত্যিই পরিতাপ করতে হয়েছিল। কারণ, এ-সূত্রে আত্মপ্রচার সাধুকে সাজে না। তাই বলছি—নতুন ক'রে বুঝলাম কত ছলে আত্মাদর এসে অলক্ষ্যে গহন মনে বাসা বাঁধে ও প্রশ্রয় পেলে পুষ্টকায় হ'য়ে ওঠে শনৈঃ শনৈঃ। এসূত্রে মনে পড়ে ভগবান রমণ মহর্ষির একটি কথিকা। আমাকে তিনি বলেছিলেন : "বাবা, মায়া নানা ভাবে এসে এমনই মন ভোলায় যে তাকে অনেক সময়ে মায়া ব'লে চেনাই যায় না—বিশেষ ক'রে এই আত্মা-দরের আরামবাগে। কি ভাবে, বলি শোন। এক ধনী মানী পরিবারের কুলতিলক ভগবৎসন্ধানে সর্বত্যাগী হয়ে বনে গিয়ে বহু বৎসর তপস্যা করেন একটি কুটিরে। একদা তাঁর এক অনুরাগী বন্ধু সেই বনে গিয়ে হঠাৎ তাঁর দেখা পেয়ে উচ্ছ্বসিত হয়ে বলে তাঁকে : ভগবানের জন্যে কত কৃচ্ছ্রসাধনই না করেছ তুমি, বন্ধু! ধন্য ধন্য হে সর্বত্যাগী!' ধনীপুত্র সত্যিই ত্যাগ করেছিলেন অনেক কিছু—সুখ আরাম বিলাস স্ত্রীপুত্র পরিবার। কিন্তু এই স্তবগানে তিনি খুশী হ'য়েছিলেন এতশত তপস্যার পরেও।" ব'লে আমার দিকে চেয়ে রমণ মহর্ষি বলেছিলেন : "ভগবান্ তাঁর কাছ থেকে এখনও অনেক দূরে।"

কথিকাটি আমাকে অভিভূত করেছিল। কারণ এই সূত্রে আমি যেন নতুন ক'রে বুঝতে পেরেছিলাম যে, আমাদের গহন মনে প্রশংসার প্রচ্ছন্ন তৃষ্ণা কত গভীর দুরপনেয়। তাই না পরমহংসদেব বলতেন : "আমি ম'লে ঘুচিবে জঞ্জাল! কিন্তু আমি কি যায়—অশ্বত্থ গাছ যতই কাটো দেখবে এক নতুন শিকড় বেরিয়েছে কোত্থেকে। তাই আমি যখন যাবে না—থাক্ শালা দাস আমি হয়ে।"

কথায় কথায় কোথায় এসে পড়েছি! ধান ভানতে শিবের গীত। হোক গে—যখন এ সৎকথাই বটে। তাছাড়া আত্মপ্রচারের প্রায়শ্চিত্তও ত চাই। আশা করি ভবিষ্যতে আরও সতর্ক হব—আত্মাদরকে এভাবে প্রশ্রয় দেব না আর। এবার ফিরে আসি জয়পুরের প্রসঙ্গে। অবহিত হও।

ক্রমশঃ

সুবীরের ডায়েরী

শ্রীআভা পাকড়াশী

১৯৬২, ৩রা আগস্ট কি কুক্ষণে যে কাশ্মীর এসেছিলাম। সেই বাবামশাই মারা গেলেন। আমার মনই বলছিল যে এ যাত্রা শুভযাত্রা নয়। কিন্তু বাবামশাইএর যে কি এক জিদ, আমি কাশ্মীর যাব। সেখানে গেলেই আমি সেরে যাব। অসুস্থ শরীরে এই ধকল কখনও সহ্য হয়?

এই বিরাট্ প্রাসাদে কার কি কাজ ছিল কে জানে। কেই বা এখন কাশ্মীর আসছে, এতবড় বাড়ী সহজে ভাড়াও হ'তে চায় না। তার ওপর এই ছবি। এত ছবি যে কি করব? কেই বা এর কদর বুঝবে? অথচ বাবামশাই কত কষ্টে টাকা জোগাড় ক'রে কত অসুবিধে সহ্য ক'রেও এই ছবি কিনেছেন। ছবিগুলির মধ্যে রয়েছে একটি কাশ্মীর-দুহিতার ছবি। তার নিজের পোশাকে। কিন্তু মুখখানি যে কি সুন্দর সুষমাময়, নীল চোখে যে কি গভীর দৃষ্টি, দেখলে ফেরান যায় না।

আজ প্লেন বুক্ ক'রে এলাম। কাল বাবামশাই-এর দেহ নিয়ে কলকাতা রওনা হব। কি নিদারুণ শোকের ছায়া যে নামবে বাড়ীতে ভাবতেই আমার সারা শরীর হিম হয়ে আসছে। বড় ক্লান্ত লাগছে। সন্ধ্যে বেলায় শুয়ে পড়েছিলাম। হঠাৎ একটা ফোঁপান কান্নার শব্দে ঘুম ভেঙ্গে গেল। ধড়মড়িয়ে উঠে বসলাম। কোথায় কে কাঁদছে যেন? বাবামশাই বড় সখ ক'রে বাড়ীটা সাজিয়েছিলেন। এক-একটা ঘরে এক-এক রংএর পেন্টিং। পিঙ্ক রুমে ঘরের দেওয়াল থেকে আসবাবপত্র, এমনকি টেবিল ল্যাম্পের শেডটি পর্য্যন্ত গোলাপি। তেমনি আছে ব্লু রুমে আর গ্রীন রুমে। আমার ঘরটি হচ্ছে পিঙ্ক রুম, পাশের গ্রীণ রুম থেকে আসছে কান্নার শব্দ। এ ঘরেই রয়েছে বাবামশাই-এর শব। কে কাঁদে?

উঠে গেলাম। গিয়ে, যা দেখলাম তাতে সত্যিই রীতিমত অবাক্ হয়ে গেলাম। কি অপরূপ রূপ! যেন এক টুকরো চাঁদের আলো পড়েছে বাবামশাইয়ের বুকের ওপর। আকুল হয়ে কাঁদছে মেয়েটি। আমার পায়ের শব্দে চোখ তুলে তাকাল। চোখে যেন ঝিলমের ঝিলি-মিলি। কি অপূর্ব মুখের ডোল। কিন্তু বড় চেনা। বহু কষ্টে মনে পড়ল, হ্যাঁ, এই সেই ছবির কাশ্মীর-কন্যা।

তবে কি এ ছবি কল্পনা নয়? সত্যিকার মানুষ অত সুন্দর হয়? কি নিখুঁত সুন্দরী মেয়েটি! কিন্তু বাবা-মশাই-এর মৃত্যুর সঙ্গে কি ওর সম্পর্ক? কাঁদছে কেন মেয়েটি?

কে তুমি?

উত্তর নেই।

কাঁদছ কেন?

এবার ভাঙ্গা ভাঙ্গা হিন্দিতে বলে, মেরা বাবুজী।

চমকে উঠি। সে কি? আমি ত জানতাম আমিই বাবামশাই-এর একমাত্র সন্তান। তবে কি বাবামশাই এই কারণেই কাশ্মীর আসার জন্য এত উতলা হয়েছিলেন?

ওকে জিজ্ঞেস করলাম, কই, তোমাকে ত আগে কখনও দেখি নি। কোথায় ছিলে তুমি?

কেন, এখানেই।

কে তুমি?

বলল, আমি, মালতী। ধীরে ধীরে উঠে এসে এবার আমার সামনে দাঁড়াল সেই জমাট জ্যোৎস্না। গায় তার কাশ্মীরী ঢং-এর ঢিলে কামিজ, পরনে ঘাগরা, মাথায় ওড়না। গলায় পুঁতির মালা। কানে মস্ত মস্ত মাকড়ি। একেবারে হুবহু সেই ছবিটি। নিয়ে গেলাম ওকে ছবির ঘরে।

জিজ্ঞেস করলাম, এ কে? তুমি?

বলল, না, আম্মা।

মানে? এ তোমার মা?

বলল, হ্যাঁ।

অদ্ভুত সাদৃশ্য ত?

মহা সমস্যায় পড়লাম। কি করি এই মালতীকে নিয়ে? এখানকার চাকর-দারওয়ান কেউ ওকে চিনল না। একটা বুড়ী নানি ছিল, সে বলল, উও তসবীরআলি ত মর গঈ। উসকা বাচ্চা কব হুয়া পতা নেহি। পর উও ত জিন হো গইথি। বাবুজী উসে দেখতে থে, সব কোই উসে দেখতে থে। পুঁছো মহলবালে কো।

সত্যিই তাই। ওখানকার স্থানীয় চাকর-বাকর সবাই তাই বলল।—গভীর রাত্রে মহলে মহলে তারা

ঐ তসবীর-বালিকে ঘুরে ঘুরে বেড়াতে দেখেছে। আর রাজাসাহেব মানে আমার বাবাকেও, মেরি হাসিনা, মেরি লালি, ব'লে তার পেছু পেছু ছুটতে দেখেছে। ঐ তসবীরআলির নাম ছিল 'লালিয়া'।

নানির কিন্তু দেখলাম ঐ লালিয়ার ওপর বেশ রাগ। বলল, নিজে ত যত পারত টাকা-পয়সা নিত রাজাসাহেবের কাছ থেকে, তা ছাড়া ভাই বাপ যে যেখানে আছে সকলের জন্যে টাকা আদায় করত। ম'রে গিয়ে পরছাঁয় হয়ে এসেও টাকা চাইত। বড়ি চসম।

ওর কথা সত্যি। সেই রাত্রেই একজন বেশ সম্পন্ন বৃদ্ধ কাশ্মীরী ভদ্রলোক এসে বললেন, মালতী সম্পর্কে আপনার ভগ্নী। সুতরাং আপনি ওকে সঙ্গে ক'রে কলকাতা নিয়ে যান। আজ থেকে ওর সব ভার আপনার। আমি বৃদ্ধ হয়েছি, কবে আছি কবে নেই। ঐ রকম রূপের ডালি নাতনীকে কে দেখ্‌ভাল করবে? এতদিন রেখেছিলাম রাজাসাহেবের খাতিরে। তা ছাড়া আপনাদের যা বিষয় আছে তার অর্ধেকে যখন ওর সম্পূর্ণ অধিকার তখন ও তা বুঝে শুনে নিক। আমার ছেলে, মানে ওর মামাকে আপনার সঙ্গে পাঠাব। সেই সব ঠিক ক'রে নেবে।

বললাম, কাল বলব। ভোর ছয়টায় আমার প্লেন আপনি তার আগে আসবেন। রাতটুকু আমাকে ভাববার সময় দিন।

কি যে করি মহা সমস্যায় পড়লাম বাড়ীর কথা মনে পড়তে লাগল। আমার মা। সেই কল্যাণময়ী মূর্তি! সেই চওড়া পাড় শাড়ী, হাত ভরা সোনার চুড়ি আর কপালে মস্ত বড় সিঁদুর টিপ। গিয়ে ত সে মূর্তি আর দেখতেই পাব না, তার ওপর আর এই মালতীকে নিয়ে গিয়ে তাঁকে আর একটা শেল হানি কেন? আমি নিজে যে দুঃখ পেয়েছি, বাবার ওপর আমার মনে যেটুকু অশ্রদ্ধা জেগেছে তা আমারই থাক। তিনি বাবামশাই-এর একমাত্র প্রিয়তমা পত্নী হয়েই শোক-সাগরে নিমজ্জিতা থাকুন।

৪ঠা আগস্ট। ভোরে উঠতেই বেয়ারা এসে খবর দিল সেই কাশ্মীরী ভদ্রলোক এসেছেন। সত্যিই এ যেন কাবলিওয়ালার বাড়া। বাবামশাই বোধ হয় শুধু রূপ দেখেই ভুলেছিলেন। না হ'লে ত দেখছি এদের কোন রকম শিক্ষা বা সহবতের বালাই নেই। আজ পর্যন্ত মৃতের সৎকার হ'ল না, আর এরা কি না সেই মৃতের সম্পত্তি ভাগের জন্য এখনই উঠে-প'ড়ে লেগেছে।

বাড়ীতে ঢুকতে খারাপ লাগছে। দেউড়ির গয়াদিন দারওয়ান থেকে সুরু ক'রে ঠাকুর দালানের পুরুতমশাই, ঠাকুর বাড়ীর ঝি-চাকর, অন্দর বাড়ীর আশ্রিতার দল, যে যেখানে পেরেছে দাঁড়িয়ে ব'সে উদ্‌গ্রীব হয়ে অপেক্ষা করছে, শুধু বাবামশাইকে একবার দেখবে। কেন? শুধুই কি তিনি তাদের প্রতিপালক ছিলেন ব'লে, না আরও অন্য কোন কারণে?

মানুষ একেবারে দোষশূন্য হয় না। প্রত্যেক মানুষের মধ্যেই কিছু দোষ আর কিছু গুণ থাকে। কারুর বা দোষের ভাগ বেশী আবার কারুর বা গুণের ভাগ। কিন্তু যত জানছি, যত দেখছি, তত আমার মনে হচ্ছে, বাবা-মশাই-এর স্বভাবের মত এমন দোষগুণের চুলচেরা সমান ভাগ বোধহয় খুব কম লোকের স্বভাবেই থাকতে পারে।

৫ই আগস্ট। একদিকে বিরাট্ পরিবারের প্রতিপালক। এতবড় বিস্তীর্ণ জমিদারী আমাদের, তার সবকিছু ছিল তাঁর নখদর্পণে। তাঁর নজর এড়িয়ে কোথাও কিছু হবার উপায় ছিল না। প্রত্যেকে তাকে সমীহ করত। তাঁর বিরাট্ ব্যক্তিত্বের সামনে কারুর মাথা তোলার ক্ষমতা পর্যন্ত ছিল না। কিন্তু অন্যদিকে সামান্য কারণে যে তিনি কত ক্রুর হতে পারতেন! হয়ত আমার কাছে সামান্য কারণ, কিন্তু তাঁর কাছে সেটা ছিল একটা বিরাট্ কিছু। বোধহয় কোথাও একটুখানি সম্মানহানির সম্ভাবনা ছিল তাই তিনি রাগে অগ্নিশিখা হয়ে জ্বলে উঠেছেন। আবার যেখানে নারীঘটিত ব্যাপার, যাকে ভাল লেগেছে তাকে ছলে-বলে-কৌশলে যেমন ক'রে হোক্ অধিকার রেছেন। যেটা তাঁর মনে হয়েছে চাই, সেটা তাঁর চাই-ই চাই। সামান্য একটা হাতীর দাঁতের ছোরা, তাই নিয়ে রেষারেষি হ'ল পাতিয়ালার মহারাজার সঙ্গে। বাবামশাইও কিনবেন আর তিনিও কিনবেন। গেল পাঁচ লাখ টাকা সেই সামান্য ছোরাটির পেছনে। তবু মান ত রইল। অথচ এত সম্মানও বোধ হয় কেউ পায় নি। আমাকে কে চেনে? যে চেনে সে তাঁর ছেলে ব'লে চেনে। আমার নিজস্ব গুণে চেনে না। আমার ভাল লাগে না অত গোলমাল। পার্টি, ডিনার, ড্যান্স, মহফিল মুসায়রা, গানের আসর, কোন কিছুতেই আমার মন টলে না। ওসবের মধ্যে গেলে যেন আমি নিজেকে হারিয়ে ফেলি। তার চেয়ে এই আমার ষ্টুডিও। এর মধ্যে আছে আমার কল্পনা, আর আমি। বেশ নির্বিবাদে কেটে যায় দিনগুলো। সবাই বলে, আমি হয়েছি আমার মার মত। আমার মামাও, শান্ত সমাহিত নির্বিবাদী পুরুষ, যেন 'যোগাযোগে'র কুমুর দাদা।

এদের দ্বারা জমিদারী করা হয় না। দেনার দায়ে বিকিয়ে যায়।

আজ ডায়েরী লিখতে ব'সে খালি নিজের কথাই লিখছি। এই কয়দিন পরে নিজের পরিচিত ঘরে ব'সে শুধু নিজেকেই মনে পড়ছে। আসবার সময় মালতীর দাদামশাইকে মালতীর খরচ বাবদ কিছু টাকা দিয়ে এসেছি। বলেছে, টাকা ফুরোবার আগেই যদি একটা কোন ব্যবস্থা না কর তবে মেয়ে নিয়ে কলকাতায় তোমাদের বাড়ী হাজির করব। বুঝলাম, ব্ল্যাকমেল করছে। তাই এখানে এসে দেবব্রতকে ডেকে পাঠিয়েছি। ও আসুক। অন্ততঃ বাড়ীর গুমোট কিছুটা কাটবে। হাসি কথা হৈ চৈ-তে মাতিয়ে দিতে পারে সকলকে। তা ছাড়া এই ব্যাপারে ওর সঙ্গে একটা পরামর্শও করতে পারব।

আমি ত বাড়ীতে কারুর সঙ্গে কথাই বলতে পারছি না। যার কাছে যাই, খানিকক্ষণ তার কাছে বসি আবার উঠে চ'লে আসি। কাঁচের আলমারীতে সাজান পুতুল, দেয়ালে বড় বড় রামায়ণ মহাভারতের ছবি। গঙ্গাবতরণ, অহল্যা উদ্ধার, সীতার পাতাল প্রবেশ, যামিনী রায়ের আর গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের আঁকা এই সব ছবিগুলোর দিকে তাকিয়ে থাকি। ফরাস ভরা সব আত্মীয়স্বজন, সবাই মিলে মাকে ঘিরে আছে। এই ভিড়ে আর আহা উহুতে আমার কেমন প্রাণ হাঁপিয়ে ওঠে। পালিয়ে আসি নিজের মহলে। শোক কি আমার হয় নি? হয়েছে। কিন্তু শোকের এই সাড়ম্বর প্রকাশ আমি সইতে পারি নে। এর থেকে আমার ক্যানেরী আর টারজান অনেক ভাল। টারজান পায় পায় ঘোরে, কোন সান্ত্বনা দেয় না।

৮ই আগস্ট। দেবব্রত এসেছে। আমি আর মা দু'জনেই বর্তে গেছি ওকে পেয়ে। সত্যি এ আত্মীয়া-পরিবৃতা মাকে দেখে আমার কষ্ট হ'ত কিন্তু আমি ছিলাম নিরুপায়। ও এসে তার মধ্যে থেকে মাকে বের ক'রে বাবার মহলে পুরে দিয়েছে, আর সকলকে বলেছে, উনি এখন অসুস্থ, আপনারা শুধু বিকেলে খানিকক্ষণের জন্য এসে না হয় দেখে যাবেন।

আজ বিকেলে ওকে মালতীর সব কথা ব'লে পরামর্শ চাইলাম। ও বলল, তুই একটা গাড়ল, ওকে তুই বোন ব'লে মানলি কেন? আর টাকাই বা দিলি কেন? একবার যখন টাকা পেয়েছে তখন ত পেয়ে বসবেই ওরা। যাই হোক্, আর কোন সাড়াশব্দ করিস না, দেখি না কি হয়?

আমি বলি, না, না, দেবব্রত সে হয় না। যদি এখানে নিয়ে এসে হাজির করে? মা'র মনে কতটা লাগবে ভেবে দেখ।

"খুব দেখেছি বাবা, খুব দেখেছি। এবার তুমি দেখ ত, আমি কি করি।"

জলখাবার দিয়ে গেছে। বললাম, নে, খেয়ে নে।

বলল, বাবাঃ, তোমাদের এই রাজসিক খানা আমার সইবে না। পাথরের গেলাস ভরা সরবত, রাজ্যের ফল তার ওপর আবার ঐ বিশাল-দর্শন দুটি মিষ্টি।

অন্নদাদি আমাদের খাবার দেয়। বলল, কেন গো দাদাবাবু? এই বয়েসে আর এটুকুও খেতে পারবে না? কেন, নোন্‌তা কিছু নেই ব'লে কষ্ট হচ্ছে? বল ত নিমকি ভাজা আছে এনে দিই।

না গো অন্নদাদি আর তোমার অন্নপূর্ণা হয়ে কাজ নেই। বহু কষ্টে শরীরটা ঠিক রেখেছি ভাই, তা দু'দিন এমনি রাজভোগ খেলে বেশ একখানি নেয়াপাতি ভুঁড়ি গজাবে এখন।

তা ওর শরীর দেখে সত্যিই হিংসে হয়। পাকা ছ' ফুট লম্বা, তার সঙ্গে মানান শ্যামবর্ণ শরীর, মা[illegible]-ভরা চুল, ঝকমকে চোখ আর প্রাণ-খোলা হাসি, এই হ'ল দেবব্রত।

১৩ই আগস্ট। আজ বাবামশাই-এর কাজ। ক'টা দিন আর কোন উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটেনি। তাই আমার ডায়েরীও লেখা হয় নি। আমাদের ম্যানেজার হরনাথ বাবু আর আমি ক'দিন বাবামশাই কি রকম কি রেখে গেছেন, কিসের কি ব্যবস্থা ক'রে গেছেন, দেখতে দেখতেই কাটিয়ে দিলাম। যা দেখলাম তাতে আমার বুকটা দশহাত ব'সে গেছে। ষ্টেটের এই অবস্থাতেও যে বাবামশাই কি করে পুজোর সময় অত ধুম করতেন, প্রত্যেক আত্মীয়স্বজনকে কাপড় দিতেন, অষ্টমীর দিন বাড়ীতে বড় বড় ওস্তাদ এনে বা বাঈ নিয়ে এসে নাচ-গানের মজলিশ বসাতেন ভেবে পাই না। তাছাড়া পুজোর এই কয়দিন যে যেখানে আছে সে কয়দিন আমাদের বাড়ীতে তাদের ঢালাও নেমন্তন্ন হ'ত ভোজ খাবার। সাধারণ পুজো-বাড়ীর ব্যাপার ত আর নয়! নয় রকম ভাজা, দুতিন রকম ডাল, পাঁচ-সাত রকম নিরিমিষ তরকারি, চার রকম অম্বল, এ ছাড়া মাছ, মাংস, পোলাও লুচি; দই আর মিষ্টি, পায়েস ত আছেই। আবার বিকেলে জলখাবার, সিঙ্গাড়া, খাস্তার কচুরি, দরবেশ, পান্তুয়া, রসগোল্লা, এই সব। যে যত পারত খেত, আবার টিফিন কেরিয়ার ভ'রে ভ'রে বাড়ী নিয়ে যেত।

এই ত গত বছরেও সবই ঠিক ঠিক মত হয়েছে। কিন্তু এ বছর কি ক'রে কি করব ভাবতেও আমার বুকের রক্ত হিম হয়ে আসছে। আর যা না করব তাই নিয়ে দশটা কথা হবে। আত্মীয়স্বজনরা ভাববে, ওঃ, বাপ এত রেখে গেছে, ছেলেটা কি কঞ্জুষ, বাপ যা করত ছেলে তার কিছুই বজায় রাখল না।

এ ত গেল একদিক্, তার পর বাবামশাইয়ের দানও ছিল কিছু কম নয়। মাসে শুধু মাসহারা দেওয়া হয় দু' হাজার টাকা। এই মাসহারার খাতায় আমি গুলাম নবীর নাম দেখলাম। এই গুলাম নবী হ'ল মালতীর দাদামশাইয়ের খাস বেয়ারা। আমি টাকা দিয়েছিলাম যখন তখন ওই সই দিয়ে রসিদ দিয়েছিল।

১৪ই আগস্ট। কাল কাজ আর কাঙালী বিদেয় হ'ল। মা সারাদিন কাজের পর নিজে দাঁড়িয়ে সব কাঙালীদের একটা ক'রে ধুতি আর একসরা মিষ্টি আর দুটো ক'রে টাকা দিয়েছেন। আজ জ্ঞাত ভোজন। সিঁড়িতে লালের বদলে সাদা কার্পেট পড়েছে। বাবা-মশাইয়ের বসার ঘরে সেই হলের মধ্যিখানের সিংহাসনের মত চেয়ারটায়, যেটাতে তিনি সব সময় বসতেন, তার ওপর একটা অয়েলপেন্‌টিং করিয়ে রেখেছি। ছবিটা খুব ভাল হয়েছে। মনে হচ্ছে যেন সত্যিই বাবামশাই ব'সে আছেন।

তিনি সবুজ রংটা খুব বেশী পছন্দ করতেন। তাই এই ঘরের সব সবুজ। সবুজ পোর্সিলেনের ফ্লাওয়ার ভাস— ঘড়ির ডায়াল তাও সবুজ রং-এর, আর ঘরের বেশীর ভাগ জিনিষ সবুজ রেক্সিনে মোড়া। মেঝের কার্পেটটাও সবুজ মখমলের। ঝাড়লণ্ঠনের বেলোয়ারা কাঁচগুলোও সবুজ আলো ছাড়ছে। উনি যে আলবোলা ব্যবহার করতেন তার নলটি -পর্যন্ত সবুজ জেড পাথরের। ঐ সিংহাসনের পাশেই সোনালী আর সবুজে মেশা কাঁচের টিপয়টার ওপর সবুজ মিনা-করা জয়পুরী বাক্সয় রয়েছে হাভানা চুরুট, ওটি ছিল তাঁর বড় প্রিয়। আর আতর-দানে রয়েছে নানা বর্ণের নানা গন্ধের আতর। ওর দশটি কৌটা আতরের দাম বোধহয় একশো টাকা। ঘরে ঢুকলে এই আতরের গন্ধে মন মেতে ওঠে। এর গন্ধ কাপড় ধুলেও যায় না। কিন্তু তিনি এই আতর যেদিন যেটা মর্জি পাঁচ মিনিট অন্তর হাতে মাখতেন।

ছড়ির ঘরে তাঁর পোশাকের সঙ্গে মানান করার জন্য নানা রকম ছড়ি সার সার সাজান আছে। পোশাকের ঘরের ত কথাই নেই। যখন যেমন দরকার, কখনও স্যুট, কখনও ব্রোকেডের শেরোয়ানী, সিল্কের চুড়ীদার, তার সঙ্গে পাঞ্জাবী, আবার কখনও শান্তিপুরী কোঁচান ধুতি তার সঙ্গে গিলে করা আদ্দির লক্ষ্ণৌ কাজ করা পাঞ্জাবী। প্রত্যেক কাজের জন্য তাঁর আলাদা আলাদা লোকও ছিল। বিলাসিতা তিনিই ক'রে গেছেন সত্যি। সখও ছিল। অবশ্য তাঁর এই সখ সৌখিনতা তাঁকে মানাতও। তেমনি রাজার মত সুপুরুষ চেহারাও ছিল। বাবামশাই গিয়ে পর্যন্ত তাঁর কথা ছাড়া আর অন্য কথা যেন ভাবতেই পারছি না। ডায়েরী নিয়ে বসতেই শুধু তাঁর কথা ছাড়া যেন আর কিছু লিখতেই পারছি না।

কাল একটা রেজিষ্ট্রি চিঠি এসেছে কাশ্মীর থেকে। "টাকা দাও, না হ'লে রওনা হচ্ছি।"

দেবব্রত বলছে, তার চেয়ে চল আমরাই রওনা হয়ে গিয়ে একটা ব্যবস্থা ক'রে আসি।

আমি বললাম, দাঁড়া, কাজকর্মটা ভাল ভাবে মিটুক, তার পর না হয় মাকে নিয়েই যাব।

১৫ই আগস্ট। আজ স্বাধীনতা দিবস। এই দিনে ভারত তার বহু আকাঙ্ক্ষিত স্বাধীনতা লাভ ক'রে ধন্য হয়েছিল। স্বাধীনতা সকলেরই কাম্য। আজ ত আমিও স্বাধীন। কিন্তু সে স্বাধীনতা যে শেল হয়ে বাজছে আমার। এই স্বাধীনতার বোঝা যে বড় গুরু-ভার। একে ত ঋণের বোঝা, দ্বিতীয়তঃ গুরু দায়িত্ব, তার ওপর আবার চিন্তার দাহন ত আছেই, সুতরাং এই স্বাধীনতায় আনন্দ কই? যখন ইংরেজ ছিল তখন তার ভাল-মন্দ সব-কিছুকেই নির্বিবাদে সমানে গালাগাল দিয়েছি আমরা, কিন্তু আজ? ভাল হলেও সেটাকে ভাল করার দায় আমাদের, আর মন্দ হ'লেও তার সমস্ত মালিন্য আমাদের। নিন্দা, অপবাদ, কলঙ্ক নির্বিচারে সবই আমাদের, কেউ আর তা ঘাড় পেতে নেবে না। কারুর আড়ালে স'রে থেকে ফাঁকি দেবার আর আমার উপায় নেই। সব-কিছুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে জবাবদিহি করতে হবে। এড়িয়ে যাবার বা পালিয়ে যাবার উপায় নেই। ভাল ক'রে যেন নিঃশ্বাস নিতে পারছি না আমি। বুকের ওপর যেন কেউ বিশ মণ বোঝা চাপিয়েছে। এই অন্তঃসারশূন্য সচ্ছিদ্র ষ্টেট নিয়ে কি ক'রে সংসার-তরণী বাইব? কোন্‌দিন বা সবশুদ্ধ ভরাডুবি হবে। সবাই মিলে তলিয়ে যাব চোরাবালির গর্ভে। এখন আর কোন কথা নয়। শুধু সেই ভয়ঙ্কর দিনের জন্য পলে পলে অপেক্ষা করা।

কিন্তু দেবব্রত বলে, তুই অত ভেঙ্গে পড়ছিস কেন বল্ ত? মন শক্ত কর। ঐ রকম সিংহের মত বাবা ছিল তোর, আর তুই কিনা একটা মেষ হয়েছিস্। ভয়ে মুখ

লুকোতে চাইছিস, পালাতে চাইছিস? এত পরনির্ভর কেন তুই? আর কিছু করতে হবে না তোকে, শুধু নিজের চক্ষুলজ্জাটা বাদ দে। ব্যস্, দেখবি সব ঠিক হয়ে গেছে। অন্যে কি মনে করছে, কে কি বলবে সে সব না ভেবে তুই যা করবি তাই ক'রে যা, ব্যস্। উপস্থিত চল্, কাশ্মীরের ব্যবস্থাটা ক'রে আসি।

নাচ ঘর বা জলসা ঘর বললেই বোধহয় ঠিক বলা হয়। কত যে জলসা আর মহফিল হয়েছে এই ঘরটায়। চারদিকের থামগুলিতে টাঙ্গান আমাদের পূর্বপুরুষদের সোনালী ফ্রেমে বাঁধান বড় বড় সব অয়েল-পেন্টিং। তার পর নানা আকারের সব সুন্দর সুন্দর ফ্রেস্কো। সমস্ত ঘরের সিলিং জুড়ে সোনালী রং-এর পেন্টিং, বেলজিয়ান কাটগ্লাসের ঝাড়লণ্ঠন সিলিং থেকে ঝুলছে। ঘরের চার-ধারে সাজান সব ইটালিয়ান স্কাল্পটারের সুন্দর সুন্দর মূর্তি। নানা রকম কিউরিও। বড় বড় চায়নিজ ভাস। একটা জয়পুরী মিনা-করা পেতলের বিরাটাকার থালা, তাতে আগাগোড়া রামায়ণের ঘটনাবলী খোদাই করা আছে। লাল মখমলের বনাত দেওয়া ব্রোঞ্জের চেয়ার। চেয়ারগুলোর গঠন অনেকটা সিংহাসনের আকারের। মেঝেতে বিশাল একটা মেরুণ আর সোনালী কাশ্মীরী কার্পেট। ঘরের এ কোণ থেকে ও কোণ দেখা যায় না। বহুকাল আগের থেকে এই ঘরে নাটক সিনেমা, এই সব হয়ে আসছে, কারণ তখন এই বাড়ীর মেয়েরা পাবলিক সিনেমা হলে গিয়ে সিনেমা থিয়েটার দেখতেন না। সুতরাং তখনকার যে সিনেমা বা নাটক খুব নাম করত আর মেয়েরা তা দেখার ইচ্ছে প্রকাশ করতেন সেগুলি এইখানে দেখান হ'ত তাঁদের। স্টেজের অভিনেতা-অভিনেত্রীরা এইখানে এসে নিজের অভিনয় দেখানোকে খুবই সম্মানজনক মনে করত। আর সিনেমার ফিল্মের রীল নিয়ে এসে বাড়ীর প্রজেক্টরে ফিট ক'রে দেখান হ'ত। তখন এই কার্পেট তুলে দেওয়া হ'ত। সার সার লাল বনাতের চেয়ার পড়ত। আরও অনেক বাড়ীর মেয়ে-বৌরা তাদের সাজের বহর দেখাতে রূপের লহর তুলে আসত। সিনেমা বা থিয়েটার অন্তে রাত্রের আহার এ বাড়ীতে সমাধা ক'রে কিঞ্চিৎ প্রফুল্ল কিঞ্চিৎ উত্তেজিত সমভিব্যাহারী পুরুষদের সঙ্গে একে একে বাড়ী ফিরে যেত। যাঁদের নিজস্ব গাড়ী থাকত না তাঁদের আমাদের গাড়ী পৌঁছত।

এই ঘরটির নামই হয়ে গেছে নাটক ঘর সংক্ষেপে নাটঘর। নাটঘরেই দাঁড়িয়ে আছি। তাই সব পুরণো কথা মনে পড়ছে। আজ এই ঘরেও বৈরাগ্য এসেছে। লাল মখমলের চেয়ার আর রঙদার কার্পেট চাপা পড়েছে সাদা রেশমের আস্তরণের তলায়। মঞ্চে আজ আর কেউ খুশির ফোয়ারা ছিটিয়ে নাচছে না বা কেউ অষ্টমীর গানও গাইছে না। জমকালো পোশাক পরা কোন অ্যান্টিগোনাস বা অ্যালেকজাণ্ডারও নেই। সুন্দরী ছায়াও নেই। আছে খোল করতাল হাতে একদল কীর্তনীয়া। আজ ইতিহাস বদল হয়েছে। তবে এই অধিকারীর খুব নাম আছে। যাঁদের ইচ্ছে হচ্ছে তাঁরা নীচের ফরাসে ব'সে খানিকক্ষণ ধ'রে কীর্তন শুনছেন। দানের ঘরে যোড়শের জোগাড় হয়েছে। মনে হচ্ছে খাটপালং আর বাসনের দোকান ব'সে গেছে। পুরুত মশাই আসনে ব'সে হুকুম করছেন আর দুজন ঠাকুরমশাই সব জোগাড় দিচ্ছেন। পুষ্পপাত্রে ভর্তি সাদা ফুল আর বাটি ভরা সাদা চন্দন নিয়ে মা বসেছেন। যেন একখানি সরস্বতী প্রতিমা। মাকে এই বেশে যেন ঠিক আমার মা, আমার সেই বড্ড বেশী চেনা মা-টিকে খুঁজেই পাচ্ছি না। যেন কত দূরের অচেনা কোন এক তপস্বিনী মূর্তি। আমারও বেশের পরিবর্তন হয়েছে বৈকি। মা আমাকে যেন সান্ত্বনা দেবার জন্যই একবার প্রশান্ত দৃষ্টিতে আমার দিকে চাইলেন। কাজ মিটতে সন্ধ্যে উৎরে গেল।

আজ মৎস্যমুখী। আমাদের আবার এই দিনেই বেশীর ভাগ আত্মীয়স্বজনদের নিমন্ত্রণ করা হয়। শুধু নিরামিষ খাইয়ে কি লাভ? সেইজন্য সেদিন বড় একটা কেউ আসেনও না। শুধু শ্রদ্ধা জ্ঞাপন ক'রেই ফিরে যান।

আজ লোকে লোকে বাড়ী ভ'রে গেছে। নীচের রাস্তায় আর সামনের দেউড়ীতে গাড়ী ত আর ধরছে না বলতে গেলে। শহরের বহু গণ্যমান্য লোক আজ আমার বাড়ীতে অতিথি। জানি না তাঁদের ঠিকমত সম্বর্দনা করতে পারছি কি না? পুলিশের আই জি গাড়ী সন্নিবেশ করার ভার নিয়েছেন। বহু মন্ত্রীরা এসেছেন, তাঁদের সঙ্গে আমাদের আত্মীয়তাও আছে, আবার বন্ধুত্বও আছে। বাবামশাই-এর পরিচিত আর গুণমুগ্ধ লোকেরা সংখ্যায় বহু।

একফাঁকে একটুখানির জন্য নিজের ঘরে পালিয়ে এসে নিজেকে এই ডায়েরীর পাতায় খুঁজে নিচ্ছিলাম। দেবব্রত এসে ধরল। বলল, উঃ, আমি যে আমি, আমারও প্রাণ হাঁফাচ্ছে বাবা, এই তোদের বাড়ীর নিয়মানুবর্তিতা মেনে চলতে চলতে। তোদের বাড়ী যারা আসে, তারা নিজেদের বাড়ীর বাইরে ছেড়ে আসে। একটা সভ্যতা, ভদ্রতা আর নম্রতার মুখোস প'রে ঢোকে তারা। আবার যখন যায় তখন সেই তৈরী-করা কাষ্ঠ

হাসিটা তোদের বাড়ী রেখে দিয়ে চ'লে যায়। তোরা তাই পেয়ে খুশী থাকিস্। ঐ তোদের সো-কল্ড ম্যানেজার, সরকার-কাম-সেক্রেটারী শ্রেণীর জোড়হাত আর হুজুর হুজুর-এর তলায় যে কত গুজুর গুজুর আছে তা ধরার অন্ততঃ তোর সাধ্য নেই। তাঁর ছিল। ওরাই দেখছি তোকে চরিয়ে খাবে। যাক্‌গে, কারুর সর্বনাশ আর কারুর পৌষমাস। হ্যাঁ, শোন্, বাড়ীর ভেতর একটা ব্যাপার দেখে এলাম।

আমি বললাম, কি?

ওর কাছে সব শুনে সত্যিই আমি বাড়ীর ভেতর গিয়ে মাকে জিজ্ঞেস করতে বাধ্য হলাম। কোথায় পাঠাচ্ছ এত সব জিনিস? দেখি, মা নিজে দাঁড়িয়ে সব ঠিক করাচ্ছেন। ভারে ভারে সব রান্না খাবার। যে ক'টা পদ রান্না হয়েছে তার কোনটা বাদ যায় নি। অন্নদাদি ও আরও দু'জন ঝি মিলে সব দেখে দেখে পরাতে সাজাচ্ছে। লুচি, পোলাও, মাছ, মাংস, দৈ, নিরিমিষ তরকারী এমনকি শাক ভাজা, পটল ভাজা পর্যন্ত। আবার দৈ মিষ্টি সন্দেশ ত আছেই। এসব কোথায় যাচ্ছে মা? আবার জিজ্ঞেস করি। যাদের পাঠাচ্ছ তারা এখানে এসে খেলেই পারত।

মা'র মুখখানা গম্ভীর; বললেন, পরে বলব বীরু, তুই এখন যা।

২০শে আগস্ট। মার কাছে সব শুনে আমি ত সত্যিই হতবাক্ হয়ে গিয়েছি। আমি যতটুকু মার কাছে লুকোতে চেয়েছি, তিনি দেখছি তার থেকেও অনেক বেশী জানেন। শুধু জানেন না, তাদের আবার কৃপাও করেন। আমাকে এই অনুরোধ করলেন, দেখিস্ বীরু, ওরা যেন মাসোহারাটা মাসে মাসে ঠিকমত পায়। ওদের ত উনি ছাড়া কেউ ছিল না? কে দেখবে বল্? ভেসে যাবে? তা ছাড়া ছেলেমেয়েগুলো ত কোন দোষ করে নি। অত সব ভাল জিনিষ রান্না হ'ল আর তারা খেতে পাবে না? তাই ত পাঠিয়ে দিলাম। আমি ত পুজোতেও ওদের সমানে তিন দিন ধ'রে সব পাঠাই। তবে ওদের মধ্যে একটা মেয়ের মধ্যেই কিছু মানুষের বুদ্ধি আছে। সে কাল ফেরত দিয়েছে সব। বলেছে, কার শ্রাদ্ধ করতে এনেছ এসব? আমি কি রাস্তার কুকুর যে যা পাব বাছ-বিচার না ক'রে খাব? আজ তাঁর কাজ। তাঁর শ্রাদ্ধের খাওয়া আমি খাব? এর চেয়ে না খেয়ে মরি সেও ভাল। তাকে আমি দেখেছি। কোন ভদ্র ঘরের মেয়ে হবে। অপরূপ সুন্দরী।

আর থাকতে পারি নি মা'র সামনে, উঠে এসেছিলাম।

৩০শে আগস্ট। মাকে নিয়ে কাশ্মীর যাচ্ছি। মাও কেন জানি না সাধারণ বিধবাদের মত তীর্থ যাব ব'লে জেদ না ধ'রে আমার সঙ্গেই আসতে রাজী হয়েছেন। দেবব্রতও স'ঙ্গে আছে। তবে রওনা হবার আগের দিন দেবব্রত বলল, দেখ্ বীরু, ভগবান্ বোধহয় সময় সময় এক রকম দেখতে দুটো মানুষ গড়েন। না হ'লে তোমার ঐ কাশ্মীর-সুন্দরীকে আজ আমার সিনেমার পেছনের সিটে স্বশরীরে প্রত্যক্ষ করলাম? অবশ্য শাড়ী-পরিহিতা।

শুধু বললাম, সে কি?

ও বলল, হ্যাঁরে, হ্যাঁ।

২রা সেপ্টেম্বর। এখানে পৌঁছেই বুঝলাম, মা কেন এসেছেন। ম্যানেজার কালিপদবাবুকে বললেন, তিনি নেই আর বীরুর ওপর আমি এত ভার চাপাতে চাই না। এই ক'দিনেই বাছা আমার শুকিয়ে উঠেছে। আপনি এই বাড়ী বিক্রির ব্যবস্থা করুন কালিপদবাবু।

তিনি ত আকাশ থেকে পড়লেন, বললেন, সে কি মা? কর্তাবাবুর তৈরী সেই কবেকার এই "নগিন মহল"? একে বেচে দেবেন? আর শুধু বাড়ীই ত নয়? বাড়ীর এইসব জিনিষপত্র? এইসব দামী দামী ছবি? এ সবের কি হবে? তা ছাড়া এ নগিনা বোট?

মা ঢালাও হুকুম দিলেন, সব বেচে দাও, জিনিষপত্র নিলামে তোল। ছবি সব কলকাতা পাঠাও, ধীরে ধীরে বেচে দেব।

শঙ্কিতভাবে জোড়হস্তে কালিপদবাবু বিদায় নিলেন। এই "নগিন মহল" না থাকলে তাঁরও আর অস্তিত্ব থাকে কই? বহু রকম মেরামতি আর বাড়ী রক্ষার নাম ক'রে তিনি যে এ যাবৎ বেশ মোটা একটা টাকা বার করতেন, তা ছাড়া এই বাড়ীরই এক অংশে নিজে সপরিবারে বাস করতেন আবার সুবিধে বুঝে আউট হাউসগুলো সিজনের সময় চড়া দামে ভাড়াও দিতেন। সে সবই যে যায়। শুধু কিছু মাসোহারা পাবেন ষ্টেট থেকে। যাক্, এখন এ প্রসঙ্গ থাক্।

৭ই সেপ্টেম্বর। কাল রাত্রে দেবব্রত একটা কাণ্ড করল। রাত্রে মার ঘরের পাশের ঘরে ও শুয়েছিল। এই বাড়ীটা কাঠের। পাহাড়ের বাড়ী যেমন হয়। তাই এঘরে কথা বললে কান পেতে শুনলে তার কিছু কিছু শোনা যায় ওঘর থেকে। দুটো ঘরের মাঝের দরজাও বন্ধ ছিল না, শুধু ভারী রেশমের পর্দা দেওয়া ছিল। তখন গভীর রাত। ও পড়ছিল। ওর মনে হল, যেন কেউ খুব সরু মিষ্টি গলায় ডাকছে, বহেনজী! বহেনজী!

মা'র ঘুম খুব সজাগ। মাও সাড়া দিলেন, কে? কে? কৌন্ হায়?

তখন সেই মিষ্টি গলা বলল, ম্যয় লালিয়া হুঁ।

মা তখন এক তাড়া দিলেন, কি করতে এসেছিস্ মরতে? সে তোর কাছেই এসে শেষ হ'ল রাক্ষুসি, আমি ত তাকে শেষ সময় একবার দেখতেও পেলাম না। তাকে পেয়েও শান্তি হয় নি তোর? কি, চাস্ কি তুই?

আবার ধীরে শব্দ হয়, মেরি লড়কি। তুম দেখো উসে।

ব্যস্ শব্দ থেমে গেল। দেবব্রত ছিল পর্দার আড়ালে, দেখল, একটা কালো ছায়ামূর্তি বারান্দার ওপর দিয়ে চলেছে। ও ছুটল তাকে ধরতে। ও যত ছোটে সেও তত ছোটে, শেষকালে সেই ছায়ামূর্তি কেমন ক'রে বা একটা দেয়ালের মধ্যে হঠাৎ মিলিয়ে গেল।

আমি বললাম, মিথ্যেই তুই কষ্ট করলি। বাড়ীশুদ্ধ সবাই জানে, লালিয়ার ভূত, ঘুরে বেড়ায় এখানে।

দেবব্রত বলে, দূর্। তুই এই আজ-কালকার যুগের ছেলে হয়েও মান্ধাতার আমলে বাস করছিস দেখছি। ওটা ভূত নয় মানুষ, জলজ্যান্ত মানুষ, এ আমি তোকে লিখে দিতে পারি।

আমি বললাম, তবে বলতে চাস লালিয়া মরে নি?

ও বললে, সে মরেছে মানছি আমি, তবে এ লালিয়া সেজেছে।

সারা সকাল সে সেই দেয়াল নিয়ে পড়েছে। কি ক'রে ওর মধ্যে সেই মেয়েটা ঢুকে গেল তাই দেখবে।

বাবামশাই থাকতে যখন যেখানে গেছি তিনি সেলুনের ব্যবস্থা করতেন। বাড়ীর বাবুর্চি, ঝি, চাকর, বামুন সব সঙ্গে যেত। তারই মধ্যে বাড়ীর মেয়েরা পান সাজত, কুটনো কুটত, ভাঁড়ার দিত। ঝিয়েরা বাটনা বাটত। উনুনে রান্না হ'ত। ঠাকুর রান্না করত। আবার এদিকে বাবুর্চি-খানায় সাদেক আলি বাবুর্চি মুর্গির রোষ্ট বানাত। সন্ধ্যে বেলার মৌতাতের জন্য কাবাব ভাজত। প্রত্যেকের আলাদা আলাদা কামরা। মা'র, আমার, বাবামশাইয়ের ত আলাদা থাকতই। অন্যদের জন্যও আলাদা ব্যবস্থা থাকত। ওরই মধ্যে মা নিত্য গোপালের ভোগ দিতেন, পূজো করতেন। গাড়ী যখন যে ষ্টেশনে বেশীক্ষণ থাকত, সেখান থেকে সব জিনিষপত্র কেনা হ'ত, কখন কখন কোন ষ্টেশনে দু'দিন তিনদিন আমাদের সেলুনটা সাইডিং-এ রেখে দিত। তখন এটাই যেন আমাদের বাড়ী হ'ত। আমরা ট্যাক্সিতে ক'রে শহর দেখে বা যা দ্রষ্টব্য দেখে ফিরে আসতাম সেলুনে। এই ভাবে পুরো দক্ষিণ ভারত ঘুরেছি আমরা গত বছরে। এবার মা বারণ করলেন, বললেন, অযথা গুচ্ছের কতক-গুলো টাকা খরচ করিস্ না বীরু, ফার্ষ্ট ক্লাশে আমি বেশ যেতে পারব। গুচ্ছের লোকও নিতে হবে না, যে ক'জন না নিলে নয় তাই নে। তোর বিশু আর আমার অন্নপূর্ণা, সুবাসিনী আর ঠাকুর বনমালী হ'লেই হয়ে যাবে। রান্নাঘরের কাজ ওখানকার লোকেই ক'রে দেবে এখন!

১০ই সেপ্টেম্বর। বড় ভাল লাগছে কাশ্মীরে এসে। শুধু সুন্দর পাহাড়ের শহর ব'লে নয়। এখানে এসে পক্ষী-শাবক আবার তার নীড় খুঁজে পেয়েছে ব'লে। ওখানে ঐ আত্মীয়স্বজনের ভারে মাকে যেন হারিয়ে ফেলেছিলাম, নিজেকে তাই বড় অসহায় মনে হ'ত। এখানে এসে বুঝতে পারছি, বাবামশাই না থাকলেও মা আছেন। আর তিনি বাবামশাইয়ের মত অবুঝ নন।

১৪ই সেপ্টেম্বর। ক'দিন দেবব্রত 'শোনমার্গ', 'গুল-মার্গ' খুব বেড়িয়ে বেড়াল। তার পর বলল, চল্ তোদের হাউস বোটটার সদ্ব্যবহার করা যাক্। ক'দিন 'নগিনা'কে নিয়ে নগিন লেকে থাকা যাক্। মাকেও জোর-জবরদস্তি রাজী করাল। এমন কাণ্ড সুরু করে ও যে, মা না করতে পারেন না ওর কথায়।

বলল, কেন মাসীমা এখানে রোজ রাত্রে শাঁকচুন্নির নাকী কান্না শুনছেন? তার চেয়ে চলুন, হাউস বোটে ক'দিন থেকে আসবেন। দেখি, সেখানে পর্যন্ত শাঁকচুন্নি ধাওয়া করে নাকি? যদি করে, বুঝব, সে সত্যিই কাশ্মীরী শাঁকচুন্নি। আপনি না গেলে কিন্তু আমরাও যাব না। শেষে আমার মাসীমাকে একা পেয়ে শাঁকচুন্নিতে ধরুক্ আর কি! তবে আপনি যে যাবেন, সে জানি, কেননা আপনার ছেলেরা হাউস বোটে থাকতে চাইছে, শেষবারের মত, যখন ওটা বিক্রিই হয়ে যাবে, তখন কি আর আপনি না গিয়ে পারেন? তবে সেদিনের দেয়ালের রহস্য আমি বোধ হয় ধ'রে ফেলেছি। ওটা একটা ফাঁপা কাঠের দেয়াল। ওর মধ্যে একটা ঘর আছে।

মা বললেন, হ্যাঁ, আছেই ত। তবে ওর চাবি আছে কালিপদর কাছে। ওটা চতুর্দিক্ বন্ধ একটা গুদোম। ওর মধ্যে যত পুরনো ফার্নিচার জড় ক'রে রাখা আছে।

মোটেই তা নয়, বলল দেবব্রত।

মা বললেন, সে কি রে? তুই ঢুকেছিলি না কি ওঘরে?

ও বলে হ্যাঁ, তবে কালিপদর চাবি খুলে নয়। আমি ঢুকেছি একতলার চিমনীর মধ্যে দিয়ে। ওঘরে অটো-মেটিক চুল্লি ছিল বোধ হয় পুরনো আমলে। একটা বিশাল মোটা পাইপ নীচে থেকে উঠেছে ঐ ঘরের মধ্যে। চিমনীর মধ্যে দিয়ে আবার সিঁড়ি করা আছে। বোধ হয় কয়লা দেখার জন্যে বা চিমনী পরিষ্কার করার জন্য হবে। সেইখান দিয়ে পালিয়েছে সেদিন তোমার শাঁকচুন্নি। আর আসে নি সে?

ওর কথা বলার ধরণে মাও হাসছিলেন। হাসতে হাসতেই বললেন, হ্যাঁ, প্রায় রোজই ত আসে।

ও বলে, .অ্যাঁ! তাই না কি? দাঁড়াও, আমিও নাছোড়বান্দা। ওকে ধ'রে তবে ছাড়ব, তবে আমার নাম দেবব্রত।

কিন্তু সেরাত্রে কে জানে কেন আর এল না লালিয়া। ...রার সারারাত জেগে জেগে সিগারেট খাওয়াই ...ল।

...ই সেপ্টেম্বর। আজ নগিনা হাউস বোটে এসেছি ...র। কালিপদবাবু বাড়ীটা বিক্রির জন্য বিশেষ চেষ্টাই করছেন না। মা বলছেন তারাকুমারকে আসতে লেখ। তার এখানে শ্বশুরবাড়ী। নিশ্চয়ই অনেকে চেনে জানে। এলে একটা ব্যবস্থা করতে পারবে। নাহলে তার শ্বশুরকেই বলে দিক।

তারাকুমার মার এক বোনপো। মার কথা মত সব খুলে লিখে তাকে আসতে বললাম।

১৭ই সেপ্টেম্বর। হাউস বোটটা এখনো চমৎকার রয়েছে। তিনটে শোবার ঘর। খাট, ড্রেসিং টেবিল, ওয়ার্ডরোব দিয়ে সাজান। প্রত্যেক ঘরের পাশে বাথরুম। বাথরুমে গরম জল আর ঠাণ্ডা জলের ব্যবস্থা করা রয়েছে। তার পর আছে সোফা সেট আর কার্পেটে মোড়া সুন্দর একটি ড্রয়িং রুম। ঘরটি সব এই কাশ্মীরী জিনিষ দিয়ে সাজান। কাশ্মীরী কাজ করা কাঠের ষ্ট্যাণ্ডিং লাইট। ছোট ছোট নক্সাদার টেবিল। ওদেশী কাজ করা চেয়ারের ঢাকা, টেবিল ক্লথ, গালচে। ডিভানের ওপর সুন্দর একটা কাশ্মীরী কাজের কালিন। এছাড়া আছে সুন্দর ঢাকা বারান্দা। তাছাড়া চেয়ার-টেবিল দিয়ে সাজান খাবার ঘর। টেবিলে মুখ দেখা যায় এমন হাই পালিশ। তবে রান্না করে ওরা পাশের নৌকোয়। শিকারায় বেড়াতে যাওয়া হয়। এখন সিজনের সময়। প্রচুর লোক এসেছে কাশ্মীর ভ্রমণে। বেশীর ভাগ হাউস বোটই ভরা। চুপ চাপ ব'সে ব'সে এই নানা রং-এর মেলা দেখতে বেশ ভাল লাগে। বোটের ভিড় থেকে আমাদের হাউস বোটটা একটু দূরে রাখা হয়েছে। কিন্তু আজ কালিপদবাবু বললেন, বাড়ীর ব্যাপারে কে একজন কথা কইতে আসবেন, তাই বোট ওদিকেই লাগান হয়েছে। ইনি মহারাজা শচীন্দ্রনাথ রায়। হয়ত বাড়ীটা কিনবেন, এই ভেবে তাঁর অনারে আমাদের বোট সরিয়ে আনা হ'ল।

১৮ই সেপ্টেম্বর। মা কত রকম খাবার করিয়েছিলেন মহারাজার জন্য কিন্তু তিনি খবর পাঠালেন আজ তাঁর শরীরটা ঠিক নেই, তিনি কাল আসবেন। দেবব্রত বলে, যেতে দিন মাসীমা। আমি আর বীরু থাকতে আপনার খাবার প'ড়ে থাকবে না। ফ্রিজিডেয়ারে রেখে দিন, কাল মহারাজারও ভোগে লাগবে।

রাত হ'ল। খাওয়া-দাওয়া সেরে যে যার ঘরে শুয়েছি। তিনটে শোবার ঘরে আমরা তিন জন। মা'র কাছে অন্নদি শুয়েছে। হঠাৎ একটা ঝুটোপুটি দৌড়ো-দৌড়ির শব্দে আমার ঘুমটা ভেঙ্গে গেল। উঠে দেখি, মা চুপ ক'রে বিছানায় ব'সে ঠাকুরের নাম জপ করছেন। অন্নদি ভয়ে জড়সড় হয়ে ব'সে আছে। আর দেবব্রত তার ঘরে নেই। আর কেউ বিশেষ জাগে নি। শুধু রামদীন দারওয়ান থাকে আমাদের নৌকোয়, সেও নেই। রান্নার নৌকোয় বাকি চাকর-বাকর। গেল কোথায় দেবব্রত আর রামদীন? মা বললেন, বীরু, ঐ লালিয়ার মেয়েকে কালই কিছু টাকা দিয়ে দে। মিটিয়ে ফেল্ ব্যাপারটা।

আমি বললাম, তা নয় মা। ওরা শুধু টাকাতেই সন্তুষ্ট নয়। ওরা পুরো সম্পত্তির অর্দ্ধেক অংশ চায়। কারণ, ঐ লালিয়ার মেয়ে মালতীকে আমায় বোন ব'লে স্বীকার করতে বলে। তা কি ক'রে সম্ভব হয় বল? আমি তোমাকে কিছুই বলি নি তাই জান না।

মা বলেন, কিন্তু আমি যে রাতে ঘুমোতে পাই না। রোজ রাতে এসে আমাকে জ্বালায়। আজ আমাকে ছুঁয়েছে, পা ধ'রে টেনেছে, তাই ত চেঁচিয়ে উঠেছিলাম। আর ঐ ছেলেকেও বলিহারি, ছুটল অমনি! আরে, ভূত না হ'লে কি আর নৌকোয় আসতে পারে? অত ডাকলাম, সে কানেও তুলল না। দুদিন বাদেই ত ওর ছুটি ফুরোবে, চ'লে যাবে ও, তখন কেমন ক'রে থাকব তাই ভাবি।

বুঝলাম, মা আমার ওপর নির্ভর করেন না। একটু ব্যথা পেলাম মনে। কিন্তু উপস্থিত ওরা গেল কোথায়?

ধুম্ ক'রে কি একটা ভারী জিনিষ পড়ার শব্দ হ'ল। বাইরে বেরিয়ে দেখি, দেবব্রত অন্য নৌকো থেকে লাফিয়ে নামল। কি যেন একটা ভারী জিনিষ তুলে আনছে বুকে চেপে। তাকিয়ে দেখলাম, একটা কালো কাপড়ে জড়ান শরীর। এত ঠাণ্ডাতেও ঘেমে নেয়ে গেছে দেবব্রত। কপালটা অনেকটা চিরে গিয়ে রক্ত প'ড়ছে। কালো কাপড়ে মোড়া শরীরটা ধীরে মাটিতে শুইয়ে দেয় দেবব্রত, আর বলে, এই নাও তোমার লালিয়া। দেখুন মাসীমা, ভূত নয়, মানুষ। জলজ্যান্ত মানুষ। মরে নি, অজ্ঞান হয়ে গেছে, ভয়ে।

অন্নদি বলে, কেন এই মুসলমানীকে রাত-বিরেতে ছুঁলি তুই?

তবু দেবব্রত ধীরে ধীরে তার মুখের ঢাকা খুলে দেয়। অপরূপ সুন্দরী মেয়েটা। আমি অবাক্ বিস্ময়ে চেয়েছিলাম, এবার বললাম, ও লালিয়া নয়, ও মালতী।

মুখে চোখে জলের ঝাপটা দিতে উঠে বসল মালতী। ব'সেই চারদিকে তাকিয়ে দু'হাতে মুখ ঢেকে হু হু ক'রে কেঁদে উঠল। এইবার দেবব্রত তাকে ঝাঁকুনি দিয়ে বলল, বল কে তুমি? না হ'লে পুলিশে দেব তোমাকে।

নেহি নেহি বাবুজী, তুম্‌হারা গোড় লাগি, ব'লে সত্যিই দেবব্রতর পা জড়িয়ে ধ'রে অঝোরে কাঁদতে থাকে মেয়েটা।

এইবার দেবব্রত তাকে সোজা ক'রে বসিয়ে দিবে বলে, বল্ তবে তুই কে?

এবার নাগিনীর মত ফুঁসে ওঠে মেয়েটা। বলে, আমাকে তুই বোল না তুমি বাবুজী। আমিও বড় ঘরাণার মেয়ে। তবে এখন আমরা গরীব হয়ে গেছি। সত্যিই বড় গরীব আমরা। তাই এই জঘন্য কাজ করতে রাজী হয়েছিলাম। তবে তোমরা যাই বল, আমার পিতাজীর দোষ নেই। সব দোষ ঐ তোমাদের কালিপদবাবুর আর গুলাম নবীর। ওরাই বেশীর ভাগ টাকা মেরেছে। আর আমাদের লোভ দেখিয়েছে অনেক দৌলত পাইয়ে দেবে ব'লে। শেষ পর্যন্ত বদ্‌নামিই সার হ'ল। আমি পিতাজীকে সমানে মানা ক'রেছিলাম, শোনে নি। পরে অবশ্য আমারই দোষ ছিল।

দেবব্রত বলে, সব ব্যাপার যদি তুমি খুলে বল তবে আমি পুলিশ ডাকব না আর। না হ'লে পুলিশের হাতেই তুলে দেব তোমাকে।

ধীরে ধীরে বোর্খা খুলে ফেলল মালতী। একরাশ মালতী ফুলের মতই শুভ্র সুন্দর মেয়েটা। বড় বড় চোখ তুলে শুধু দেবব্রতর দিকে ফিরে দাঁড়িয়ে বলল, এই তোমার জন্যই আমি ধরা প'ড়ে গেলাম। ফিস্ ফিস্ ক'রে বলে, শুধু তোমাকে একবার দেখব ব'লে আমি এই বোটেও লালিয়া সেজে আসতে রাজী হ'য়েছিলাম। এবার আমাদের সকলকে নমস্কার ক'রে বলে, শোন তবে যা জানতে চাও। প্রথমেই বলি, আমি মুসলমানীও নই কাশ্মীরীও নই। আমার বাড়ী তোমাদেরই মত বাংলা দেশে। তবে আমি পাঞ্জাবী মেয়ে।

এবার দেবব্রত একটু শ্লেষের সঙ্গে হেসে উঠে বলে, বাহবা পঞ্জাবন্ দা কুড়ি।

জ্ব'লে ওঠে মেয়েটা। আবার পরক্ষণেই নিবে যায়। কিন্তু বলে, বাঃ! সাহেবের তো বেশ আমাদের ভাষায় দখল আছে দেখছি।

হাসে দেবব্রত।

মালতী বলে, আমাদের স্কুল থেকে আমাদের কাশ্মীর বেড়াতে নিয়ে এসেছিল। আমার পয়সা না থাকলেও সকলেই আমাকে স্নেহ ক'রত। তারাই চাঁদা ক'রে আমাকে নিয়ে এসেছিল। এখানের সব-কিছু দ্রষ্টব্য জিনিষের মধ্যে তোমাদের ঐ 'নগিন মহল'ও পড়ে। আমরা মেয়েরা তোমাদের ঐ কালিপদবাবুর পারমিশন আদায় ক'রে দেখতেও গেলাম। ছবির ঘরে ঢুকে কিন্তু আমার সঙ্গিনীরা একটা ছবির কাছে ভীড় ক'রে চেঁচামেচি করতে লাগল, তারপর আমাকে ধ'রে ছবির সামনে দাঁড় করিয়ে মেলাতে লাগল। আমিও অবাক্ হয়ে তাকিয়ে রইলাম। সত্যিই ত, আমিই যেন ঐ কাশ্মীরী পোশাকে ছবির মধ্যে দাঁড়িয়ে আছি। এর কিছুদিন পরই আমরা ফিরে যাবার খরচ তোলার জন্য একটা ড্রামা করলাম। তাতে আমি কাশ্মীরী মেয়ে সেজেছিলাম। ঐ ছবির সঙ্গে মিলিয়ে পোশাক ক'রেছিলাম নিজের। সেই ড্রামা দেখে একজন লোক আমাদের টিচারের সঙ্গে দেখা করতে চাইল।

সে হ'ল গুলাম নবী। ও বেয়ারার কাজ করলেও লেখাপড়া জানে, শয়তানী বুদ্ধিতে ওর কাছে সবাই হার মানে।

সে কলকাতা পর্যন্ত গিয়ে আমার বাবাকে রাজী করিয়ে আমাকে নিয়ে এসে এখানকার ভাল কলেজে

ভর্তি ক'রে দিল। আমরা পাঁচ-ছয়টি ভাইবোন। বাবার রোজগার মাত্র একটা ছোট হোটেল চালিয়ে। তাতে সত্যিই আমরা দুবেলা পেট ভ'রে খেতে পেতাম না। আমি এক ভদ্রমহিলার দয়ায় স্কুলে পড়তে পেরেছিলাম। সেখানে গিয়ে যখন গুলাম নবী বেশ কিছু টাকা হাতে দাঁড়াল, আবার আরও টাকা দেবার আশ্বাস দিল, আর আমার সম্পূর্ণ ভার নিতে চাইল, তখন আর তারা আপত্তি করে কি ক'রে?

আজ থেকে তিন বছর আগের কথা বলছি আমি। কিছুদিনের মধ্যেই বুঝতে পারলাম, কি আমার কাজ। একজন বৃদ্ধলোককে পরছাঁয় সেজে আমাকে ঠকাতে হবে। তার কাছে টাকা চাইতে হবে। এই জঘন্য কাজে আমার মন সায় দিল না। আমি আমার পিতাজী-কে লিখলাম। কিন্তু তখন পিতাজী নিরুপায়। টাকা খেয়ে বসেছেন, শোধ দিতে পারবেন না। সুতরাং আমাকেও মেনে নিতে হ'ল। এরপর রাজাসাহেবকে লালিয়া সেজে ঠকিয়েছি। টাকা চেয়েছি, টাকা পেয়েছি। অভিনয় করতে গিয়ে সময় সময় আমি সত্যিই নিজেকে লালিয়া ভেবেছি। মায়া হয়েছে ওঁর প্রতি, কিন্তু আমার উপায় নেই। টাকার যোগাড় করতে না পারলে আমাকে ঐ গুলাম নবী আর কালিপদবাবু মারধোর করেছে পর্যন্ত। খেতে দেয় নি, এ ত হামেশাই হয়েছে।

কথা বলতে বলতে ওর দুচোখ জলে ভ'রে ওঠে। ওর ঐ শিশির টলমল পদ্মকলির মত চোখের দিকে দেব-ব্রত কিছুক্ষণ আনমনা হয়ে চেয়ে থাকে। ফের বলতে সুরু করে মালতী, এই আমার দাদুর বয়সী মানুষটি যখন একটিবার তার কাছে যাবার জন্য আমাকে বারবার খোসামুদ করতেন, আমাকে একটুখানি ছোঁবার জন্য পিছু পিছু ছুটে বেড়াতেন, তখন সময় সময় আমি হারিয়ে ফেলতাম নিজেকে। তখন কাছে যেতাম না, গেলে ত ধরা প'ড়ে যাব। তবে তিনি ঘুমিয়ে পড়লে কতদিন তাঁর পায়ের কাছে ব'সে কেঁদেছি। মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়েছি। আবার তিনি কলকাতা ফিরে গেলে আমার সব ফাঁকা হয়ে গেছে, শুনা শুনা লেগেছে। মেরে অন্নদাতা। এবার তিনি মারা গেলে আমি আর নিজেকে সামলাতে পারি নি। খুব কাঁদছিলাম তাঁর বুকের ওপর প'ড়ে।

দাদাজী, ব'লে আমার দিকে তাকিয়ে বলে, উনি দেখে ফেলেন আমায়। ধরা প'ড়ে গিয়ে আমি লালিয়ার মেয়ে সেজে গিয়েছিলাম। গুলাম নবী তখন সেইটেই ধ'রে আমাকে ওর বোন ব'লে চালবার চেষ্টা করল। এক বুড়া কাশ্মীরীকে আমার দাদু বানাল।

আমি ঐ চিমনীর মধ্যে দিয়ে ওপরে যেতাম, নীচে আসতাম। ঐ কালিপদবাবুই আমাকে মহলে সব চিনিয়ে দিয়েছিল। প্রথম দিন যখন তোমরা এলে তার পর দিন আমি লালিয়া সেজে মাইজীর কাছে গিয়ে-ছিলাম। তখনই আমি ওকে দেখে চমকে উঠি, ব'লে দেবব্রতর দিকে তাকায়।

গুলাম নবী ঐ লালিয়ার আপনাভাই। কি মতলবে জানি না ও আমাকে কিছুদিন আগে কলকাতা নিয়ে গিয়েছিল। আমি একদিন আমার পুরণো বন্ধুদের সঙ্গে সিনেমা গিয়েছিলাম, তখন ওকে দেখি। আবার দেখি মাইজীর পাশের ঘরে ব'সে কিতাব পড়ছে। ব্যস্, আমার ওকে দেখার নেশা লেগে গেল। সেই থেকে ওরা বারণ করলেও আমি এসেছি। বোটেও আমি স্বইচ্ছায় এসেছি।

দেবব্রত এবার ওর দিকে বেশ ভাল ক'রে তাকিয়ে যেন কি বিচার করে, তারপর বলে, তোমাকে আর লালিয়াকে একেবারে একরকম দেখতে কেন? সে বিষয় কিছু বলতে পার?

পারি, তবে ওর মত ক'রে সাজলে আমাকে ওর মত দেখায়, না হ'লে ততটা নয়। তবে হ্যাঁ, খানিকটা মিল আছে বৈকি। তামার তাউজী মানে জ্যাঠামশাই মুসলমান হয়ে যান। পরে শুনলাম কাশ্মীরে ছিলেন। ও তাঁরই মেয়ে। এক বংশের মেয়ে, খানিকটা সাদৃশ্য ত থাকবেই।

মা এতক্ষণ চুপ ক'রে সব শুনছিলেন। এবার বললেন, তুই আমার কাছে থাক্, বোটের বাইরে যাস্ না মালতী। আর আমি তুই বলায় নিশ্চয়ই তোর রাগ হচ্ছে না?

কিছুই বলে না মালতী, শুধু মা'র দুটো পা জড়িয়ে ধ'রে মা'র কোলে মাথাটা গুঁজে দিয়ে ফুলে ফুলে কাঁদতে থাকে। মা আমাদের বলেন, তোরা নিজের নিজের ঘরে যা। রাত আর বেশী নেই। কাল ঐ নিমকহারাম কালিপদর একটা ব্যবস্থা করতে হবে।

আবার দেবব্রতকে বলেন, দেবু, মেয়েটা বড় সরল, না রে?

ও অন্যমনস্কে বলে, হ্যাঁ।

১৯শে সেপ্টেম্বর। ভোরবেলায় সব আশেপাশের হাউস বোটের বাসিন্দারা এসে উপস্থিত। কাল রাত্রে

কি হয়েছিল জানতে চায় তারা। কোন রকমে তাদের কৌতূহল মিটিয়ে ফেরৎ দিলাম। কিন্তু অত সোজা থাকল না ব্যাপারটা। রীতিমত ঘোরাল হয়ে দাঁড়াল; একটু পরেই একরাশ পুলিশ নিয়ে গুলাম নবী এসে উপস্থিত। আমরা নাকি তার মালিক-কন্যাকে জোর ক'রে আটকে রেখেছি। তাকে ছেড়ে দিতে হবে। ওদের মধ্যে রামদীনকেও দেখলাম। বুঝলাম যে, তা হ'লে ঐ হ'ল কালিপদবাবুর চর এবং বার্তাবহ। ওরা একেবারে খানাতল্লাশির পরওয়ানা নিয়ে এসেছে। এ যেন একেবারে শত্রুব্যূহের মধ্যে প'ড়ে গেলাম। যাদের নিজের লোক ব'লে এতদিন বিশ্বাস করেছি, নির্ভর করেছি যাদের ওপর, তারা এত অকৃতজ্ঞ, এত নিমকহারাম ভাবতে নিজের বুকটাই যেন কি রকম মুচড়ে উঠছে। অসময়ের বন্ধু বটে দেবব্রত। সেই হেয়ার স্কুল থেকে ওর সঙ্গে পড়ছি। তখনও যেমন বন্ধুত্ব ছিল, আজও তেমনি আছে। বেশীর ভাগই ওর গুণে। ওরা আমাদের মত টাকায় ধনী নয়, অন্তরের সম্পদে ধনী। আমাদের মত উত্তরাধিকার সূত্রে ওরা টাকা পায় না। ওরা নিজের পরিশ্রমে টাকা বানায়। যাক্, এখন পুলিশের ব্যাপারটা বলি।

যাঁদের সকালে নিছক কৌতূহলী দর্শক ব'লে ফিরিয়ে দিয়েছিলাম, তাঁদের মধ্যে থেকেই একজন সৌম্যদর্শন বৃদ্ধ স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে আমাদের সাহায্যে এগিয়ে এলেন। শুনলাম বাবামশাই এঁর বিশেষ পরিচিত ছিলেন।

আর মালতী কারুর মানা না শুনে নিজে বেরিয়ে এসে পুলিশের সামনে গুলাম নবীর স্বরূপ খুলে দিল। বলল, সে স্বইচ্ছায় এই বোটে এসেছে। আশ্রয়ের আশায়। তাকে জোর ক'রে কেউ আটকে রাখে নি। ফিরে গেলে তাকে মার খেতে হ'ত। তাই ফেরে নি। পুলিশ জানতে চাইল, মালতীর সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক কি? এবার দেবব্রত এগিয়ে এসে বলল, ও আমার ভাবী স্ত্রী। ব্যস্, এবার আপনারা যান। আর কিছু জানতে চাইবেন না।

আমি চমকে তার দিকে তাকালাম। দেখলাম, সেখানে সংশয়ের লেশমাত্র নেই, বরং মুখে তার একটা দৃঢ় প্রতিজ্ঞার ছাপ ফুটে উঠেছে। এতে ক'রে সে আমাদের নাম, বাবামশাইএর সম্মান সবই বাঁচাল। আর বাঁচাল একটি কুমারী মন।

আগের দিন ভাঁওতা দিয়েছিল কালিপদ। কারুর বাড়ীর বিষয় কথা বলার ছিল না। কোন সত্য "রাজা শচীন্দ্রনাথ" নেই কাশ্মীরে। আমাদের বোট নৌকোর সারিতে না এলে আসে কি ক'রে লালিয়া? ঐ যে দেবব্রত বলেছিল, ভূত হ'লে এই বোটেও আসবে। সেখানে দাঁড়িয়েছিল সে।

২০শে সেপ্টেম্বর। কালিপদ বা তার পরিবার পরিজন কাউকেই আর পাওয়া গেল না। "নগিন মহলে"র বহু মূল্যবান্ জিনিসও তার সঙ্গে অন্তর্ধান করেছে। মা বললেন, যাক্, আপদের শান্তি হয়েছে। এখন যা জিনিষ আছে তার আর বাড়ীটার একটা গতি করতে পারলে নিশ্চিন্তে কলকাতা ফিরি। জানি না সেখানে আবার কি ভূতের কেত্তন হচ্ছে। চোখ খুলে চল্‌বি বীরু। দেখলি ত কাণ্ড? চিরকাল আর কে সাহায্য করবে বল্? একটু শক্ত হ' তুই।

আমি ত মা'র ধৈর্য, বুদ্ধি আর সহ্যশক্তি দেখে অবাক্ হয়ে যাচ্ছি। মাকে আমি যতটা নরম প্রকৃতির জানতাম তিনি ততটা নন। দরকার হ'লে শক্ত হবে রুখে দাঁড়াবার যথেষ্ট ক্ষমতা রাখেন দেখছি। বাবামশাই হয়ত এই জন্যই মাকে এতটা সমীহ ক'রে চলতেন। অত গুণ না থাকলে এতটা শ্রদ্ধা পাওয়া যায় না।

২১শে সেপ্টেম্বর। সেই ভদ্রলোকের নাম সোমেন্দ্রনাথ। তাঁর কাশ্মীরে ব্যবসা আছে। মস্তবড় শালের কারবারী তিনি। নামকরা ঘরের মানুষ, তবে পড়তি অবস্থায় ব্যবসা ধরেছেন। তিনিই ভার নিলেন বাড়ীর। তাঁর সঙ্গেই লিজের বন্দোবস্ত হ'ল। বোটটা তিনি আর একজনকে দিয়ে কিনিয়ে দিলেন। বাকী রইল জিনিষপত্র আর ছবি। তারও ব্যবস্থা হ'ল। কলকাতা যাবে সব। বহুকাল ধ'রে আমার পূর্বপুরুষেরা এক এক ক'রে কোথা থেকে সব মূল্যবান্ জিনিষ নিয়ে এসে সাজিয়ে-গুছিয়ে এই "নগিন মহল"-এর সৌন্দর্য বাড়িয়েছিলেন, আজ আমারই হাত দিয়ে তার বিনাশ সুরু হ'ল। তাঁরা বিস্তার করেছিলেন, আর আমি গুটিয়ে তুলছি।

২২শে সেপ্টেম্বর। মালতী এসে বসেছে আমার সামনে। আমি এতক্ষণ ধ'রে ওর একটা ছবি আঁকছিলাম। একেবারে ওর নিজস্ব ভঙ্গিতে। দেখব, লালিয়ার সঙ্গে ঠিক কতখানি মেলে। দেবব্রত গেছে বাজারে। নামবার আগে কিছু কেনাকাটা করতে। মালতী আমাকে ভাই ব'লেই ধ'রে নিয়েছে। ডাকছেও দাদাজী ব'লে। মাকে বলছে মাতাজী। মহাখুশীতে আছে ও। সারাদিন নেচে গেয়ে, টিয়াগুলোকে খুঁচিয়ে,

টারজানকে জালিয়ে সারাবাড়ী মাথায় ক'রে রেখেছে। তবে দেবব্রতকে বড় জালায়, ওর দাড়ি কামাবার ব্লেড লুকিয়ে রাখে, খুব তাড়াতাড়ি কোথাও বেরুবার সময় একপাটি জুতো গায়েব ক'রে দেয়। দেবব্রতও তখন মহারেগে ওর পিঠে কিলবৃষ্টি করে, কিম্বা সুপুষ্ট বেণী ধ'রে হ্যাঁচকা টান লাগায়। দু'পক্ষই মজা পায় তাতে। আবার দেবব্রত গালাগাল দেয় শাঁকচুন্নি, ভূত ব'লে। ও বলে, ও বাত আউর মৎ বোলো মেরে রাজা, উসসে আচ্ছা, তুম বোলো "পঞ্জাবন্ দা কুড়ি"। শাড়ীতে-চুড়িতে বড় সুন্দর মানিয়েছে ওকে। স্বভাবটিও বড় মিষ্টি। দেবব্রত ঠকে নি। তবে ওর বাড়ীতে সবাই কি ভাবে নেবে কে জানে।

মা আমাকেও বাঁধছেন ঐ সোমেন্দ্রনাথের কন্যার সঙ্গে। দেখেছি তাকে। সুন্দরী সেও। তবে বড় গম্ভীর। উচ্ছলতা নেই তার মধ্যে। মা যখন বলছেন, আপত্তি করা সাজে না আমার।

৩রা অক্টোবর। আজ আমরা এখানকার সব বন্দো-বস্ত পাকা ক'রে কলকাতা রওনা হচ্ছি। মালতী আমাদের সঙ্গেই আছে। ওখানে গিয়ে আমাদের বাড়ী থেকেই ওর বিয়ে হবে।

তারপর আমার গলাতেও মা ফাঁস পরাবেন। দেবব্রত বলছে, সাধ ক'রে যে জাফরাণী মালা গলায় তুলেছি, যদি বরাবর তাকে এমনি তাজা আর হাসিখুসী রাখতে পারি, তবেই বুঝব, নিজের হিম্মৎ আছে।—বলে আর হাসে মালতীর দিকে তাকিয়ে। সে কিছুই বোঝে না। শুধু লাল আনারকলি ঠোঁট দুটো ফুলিয়ে আদরের সুরে বলে, "মেরে রাজাজী।"

—*—

অশুদ্ধি সংশোধন

প্রবাসী ফাল্গুন সংখ্যায় শ্রীমতী আভা পাকড়াশীর 'সম্বরা' নাটিকাটিতে 'হ্যালিবিড মন্দির' কথাটি ভুলক্রমে 'হ্যালিকিড মন্দির' ছাপা হয়েছে।

কলিকাতা মহানগরী পুনর্গঠন

শ্রীচিত্তপ্রিয় মুখোপাধ্যায়

২

[পূর্ব প্রবন্ধে কলিকাতা মহানগরী পুনর্গঠনের প্রথম ধাপ হিসাবে শহর ও পার্শ্ববর্তী এলাকার জমির মূল্য, হস্তান্তর ও ব্যবহার নিয়ন্ত্রণের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। ইতিমধ্যে West Bengal Town and Country Planning Legislation Commissionএর বিস্তারিত যে রিপোর্ট প্রকাশিত হয়েছে তাতে এই প্রসঙ্গটি বিশদভাবে আলোচিত হয়েছে এবং সুনির্দিষ্ট কতকগুলি প্রস্তাব করা হয়েছে। সম্প্রতি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগে যে আলোচনা সভা হ'ল তাতেও অন্যান্য বহুবিধ সমস্যার সঙ্গে জমির ব্যবহার নিয়ন্ত্রণের কথা বিবেচিত হয়েছে। সুপরিকল্পিত ভাবে শহর পুনর্গঠন এবং জমির মালিকানা ও ব্যবহারে অবাধ স্বাধীনতা একত্র চলতে পারে না, একথা স্বীকৃত হচ্ছে।]

কলকাতা ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চল পুনর্গঠনের কাজটির দু'টি স্বতন্ত্র অথচ ঘনিষ্ঠ ভাবে সংশ্লিষ্ট দিক্ আছে, একটি হচ্ছে অতীতের অদূরদর্শিতা ও অবহেলার ফলে যেসব সমস্যা সঞ্চিত হয়েছে এবং দৈনন্দিন কর্মব্যবস্থায় যে শৈথিল্য ঘটেছে তার সংশোধন, অপরটি হচ্ছে যেসব অর্থনৈতিক ও সামাজিক কারণের সমন্বয়ে শহরটির বর্তমান অতিস্ফীতি হয়েছে তা নিবারণ করা। দ্বিতীয়টির কারণ অন্বেষণ এবং তার সমাধান করতে গেলে তার কর্মক্ষেত্র হবে শহরের বাইরে; প্রথমটির কর্মক্ষেত্র হচ্ছে শহরের সীমানার মধ্যে। শহর পুনর্গঠনের কাজে আমরা যদি সমস্ত অর্থ ও শক্তি ব্যয় করি এবং মূল সমস্যাটি অগ্রাহ্য করি তা হলে আজ যেমন আমরা পূর্বপুরুষদের অদূরদর্শিতাকে অভিসম্পাত করছি, তেমনি আমাদের বংশধররাও আমাদের বৃহত্তর ভুলের জন্য কয় বছর বাদে আমাদের অভিশাপ দেবে।

গত দশ বছরে দেখা গেছে, কলকাতার উপকণ্ঠে নদীর দুই পাশের শহরগুলিতে যত লোক বেড়েছে, কলকাতার সীমানার মধ্যে তত সংখ্যায় লোক বাড়ে নি; এবং এই লোকবৃদ্ধির অধিকাংশই, বলা বাহুল্য, অন্যান্য অঞ্চল থেকে লোকের আগমনের জন্য ঘটেছে। মূল অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধান করতে না পারলে একথা ভাবা অসম্ভব নয় যে, দ্রুততর যানবাহন ব্যবস্থার সঙ্গে সঙ্গে মহানগরীর প্রত্যেক প্রভাবান্বিত অঞ্চল ক্রমেই দূরবর্তীস্থানে ব্যাপ্ত হয়ে পড়বে। ইতিমধ্যেই তার দৃষ্টান্ত দেখা যাচ্ছে।

মূল সমস্যার সমাধান যে ভাবেই হোক্ না কেন, এ কথা আজ অস্বীকার করার উপায় নেই যে, কলকাতা এবং তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে এ যাবৎ যত লোক জমায়েৎ হয়েছে, সেই সংখ্যা হ্রাস পাবার কোন সম্ভাবনাই নেই। সুদূরপ্রসারী শিল্প-বিকেন্দ্রীকরণ প্রস্তাবগুলি কার্যকরী হতে সময় নেবে; ইতিমধ্যে দেশের লোকসংখ্যা উত্তরোত্তর বাড়ছে; তাই যতই চেষ্টা করা হোক্ না কেন, এই স্বল্প গণ্ডির মধ্যে সঞ্চিত বর্তমান জনসংখ্যার চাপ কমবে না; এই পর্যন্ত আশা করা যেতে পারে যে, ভবিষ্যতে আর বহিরাঞ্চল থেকে পূর্বের মত জনস্রোত অর্থান্বেষণে এখানে ছুটে আসবে না। তার পরের প্রশ্ন হচ্ছে, অন্যান্য যে কোন বড় শহরের তুলনায় যত অতিরিক্ত লোক এই স্থানে আছে, তাদের ভবিষ্যতে থাকবার ব্যবস্থা এইটুকু স্থানের মধ্যেই যতটা সম্ভব সুষ্ঠুভাবে ক'রে দেওয়া হবে, অথবা বেশ কিছু সংখ্যক লোককে শহরের বাইরে থাকবার ব্যবস্থা ক'রে দিলে বর্গমাইল পিছু ঘনত্ব অন্ততঃ লণ্ডন বা নিউইয়র্ক শহরের পর্যায়ে নামিয়ে আনবার চেষ্টা করা হবে।

ধ'রে নেওয়া যাক্, বর্তমানে যতগুলি অব্যবহৃত স্থানে নতুন বাসা তৈরী বা উপনগরী গ'ড়ে তোলা হচ্ছে সেখানে সব উদ্বৃত্ত লোক, হালের মানদণ্ড অনুযায়ী না হোক্, এখনকার অসহনীয় অবস্থার তুলনায়, অপেক্ষাকৃত স্বাচ্ছন্দ্যের সঙ্গে থাকবে। তারই সঙ্গে যদি দ্রুত যানবাহনের দ্বারা যুক্ত স্থানগুলির মধ্যে বাসযোগ্য সমস্ত জমি সরকার দখল ক'রে নেন এবং 'কল্যাণী' বা অন্যান্য সরকারী জমিতে যে ভাবে কলকাতার বাসিন্দাদের বসবাসের ব্যবস্থা করেছেন, সেই ব্যবস্থা চালু ক'রে দেন, তা হ'লে আশা করা যায় যে, কলকাতার সীমানার মধ্যে যত লোক আছে তার সংখ্যা কমবে। (এই সূত্রে যেসব সমস্যার কথা আসে সেগুলি বর্তমান প্রবন্ধে আলোচ্য নয়।)

* * * *

তারই সঙ্গে অনিবার্য ভাবে যে প্রশ্নটি আসে সেটি হচ্ছে, বাসস্থানের সঙ্গে কর্মস্থলের দূরত্ব এবং উভয়স্থানের মধ্যে যাতায়াত ব্যবস্থা। কর্মক্ষেত্র বিকেন্দ্রীকরণ যতই হোক্ না কেন, অথবা দপ্তর স্কুল কলেজ কলকাতার বাইরে যতগুলিই পাঠিয়ে দেওয়া হোক না কেন, একথা ঠিক যে আজ কলকাতা ও শহরতলীর যত লোককে কাজের খাতিরে দৈনিক কলকাতায় আসতে হচ্ছে এবং কলকাতার মধ্যেই চলাফেরা করতে হচ্ছে সেই সংখ্যার লাঘব হবে না। পূর্ব প্রবন্ধে আমরা দেখেছি, কয়লার ট্রেনের পরিবর্তে কয়েকটি লাইনে ইলেকট্রিক ট্রেন চলাচল করার দরুণ "Day time population" কি সংখ্যায় বেড়েছে ; কলকাতার চারিদিক্ থেকে শহরের নিকটবর্তী ষ্টেশন পর্যন্ত চলাচল-ব্যবস্থা উন্নততর হবার সঙ্গে সঙ্গে এই লোকসংখ্যা বৃদ্ধি অবশ্যম্ভাবী। কলকাতার সীমানার মধ্যে বাস করে এবং বাইরে থেকে যাতায়াত করে এই দুই শ্রেণীর লোকের প্রয়োজন মেটাবার জন্য আভ্যন্তরীণ যানবাহন ব্যবস্থা কি রকম হ'লে সমস্যার স্থায়ী সমাধান হয় তাই নিয়ে গত পনেরো বছর ধ'রে বহু তদন্ত গবেষণা হয়েছে, অনেক কিছু প্রস্তাবও হয়েছে, কিন্তু সমাধানের কোন সম্ভাবনা জনসাধারণ উপলব্ধি করতে পারছে না। এ যাবৎ যেসব দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনাগুলি বিবেচিত হয়েছে সেগুলি মুখ্যতঃ অর্থাভাবের জন্যই, অথবা কোন অলঙ্ঘনীয় বাধা উপস্থিত হওয়াতে, কার্যকরী হয়ে ওঠে নি।

অনেকগুলি বিকল্প প্রস্তাব এ যাবৎকাল সবিস্তারে আলোচিত হয়েছে। "সার্কুলার রেলওয়ে"র প্রস্তাব একবার মুলতুবী হ'লেও একেবারে পরিত্যক্ত হয় নি, সম্প্রতি আবার বিবেচিত হচ্ছে ; উত্তর কলকাতা থেকে দক্ষিণ কলকাতা পর্যন্ত 'লাইট রেলওয়ে'র কথা সম্প্রতি ভাবা হচ্ছে ; ইতিমধ্যে সর্বসমস্যা-নিবারক 'টিউব রেলওয়ে'র কথাও বিবেচনা করা হয়েছে।—ট্রাম কোম্পানী একদিকে যেমন 'ট্রলিবাস' চালাবার প্রস্তাব করেছেন, আরেক দিকে ট্রামের স্বতন্ত্র পথ ক'রে দু'টির বদলে তিনটি কোচ্-এর' গাড়ী চালাবার প্রস্তাবও এনেছেন। ইতিমধ্যে, শিল্পপতিদের এবং সরকারের তরফ থেকেও যেমন 'পিপ্‌ল্‌স্ কার' (Peoples Car) করবার কথা ভাবা হয়েছে তেমনি অর্থসম্পন্ন জনসাধারণের পক্ষ থেকেও এই প্রস্তাবে সাগ্রহ সম্মতি আছে। আর এরই মধ্যে চেষ্টা চলেছে, ট্যাক্সির সংখ্যা বাড়িয়ে, 'স্কুটার'-এর প্রচলন ক'রে, একতলার বদলে দোতলা বাস্ চালু ক'রে, মন্থরগতি যানবাহন বন্ধ ক'রে, সমস্যার আংশিক সমাধানের।

লোকবৃদ্ধির তুলনায় কিন্তু এ-যাবৎ যা ব্যবস্থা হয়েছে সবই নিতান্ত স্বল্প ব'লে প্রমাণ হচ্ছে। যাঁদের দৈনন্দিন ট্রামে-বাসে চ'ড়ে কর্মক্ষেত্রে যাতায়াত করতে হচ্ছে তাঁদের সময়, পরিশ্রম, উদ্বেগ ও জীবন সংশয় নিয়ত যা ঘটছে তার সংখ্যাতাত্ত্বিক হিসাব সংগ্রহ করা সম্ভব নয়। সম্প্রতি কলিকাতা পুনর্গঠন সংস্থা (C.M.P.O.) এক হিসাব নিয়ে দেখেছেন যে, কলকাতার বাসিন্দাদের মধ্যে গড়পড়তা শতকরা ত্রিশ জন লোককে কর্মোপলক্ষ্যে বাসস্থানের বাইরে যেতে হয় না। শতকরা চল্লিশ জন কর্মস্থলে হেঁটে যান, শতকরা ছাব্বিশ জন ট্রাম বা বাসে যাতায়াত করেন এবং বাকি চার জন নিজস্ব মোটরগাড়ী, ট্রেন বা অন্যান্য যানবাহন ব্যবহার করেন। এই সরল সংখ্যাতাত্ত্বিক বিবরণীর মধ্যে যে অগণিত লোকের দৈনন্দিন সমস্যা সঞ্চিত হয়ে আছে তার বিশদ বিবরণ নিষ্প্রয়োজন।[১]

অপর দিকে রাস্তার তুলনায় গাড়ীর সংখ্যা এতই

---

১ কলকাতার দক্ষিণাঞ্চল থেকে যেসব 'ডেলি প্যাসেঞ্জার' কর্মোপলক্ষ্যে কলকাতায় যাতায়াত করেন তাঁদের এ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি [illegible] সম্প্রতি [illegible] কিছু তথ্য আমাকে দিয়েছিলেন। [illegible] ডায়মণ্ড হারবার ও লক্ষ্মীকান্তপুর লাইনের প্রতিটি ষ্টেশনের প্যাসেঞ্জারদের কাছ থেকে তিনি জেনেছিলেন, তাঁরা ষ্টেশনের কত দূরে থাকেন, কিভাবে, কতক্ষণে ষ্টেশনে আসেন, ট্রেনে কতক্ষণ থাকতে হয়, শেয়ালদায় প্রথম ট্রাম বা বাস এ উঠতে পারেন কি না, ট্রামে-বাসে বসতে জায়গা পান কি না, ফেরবার সময়ে কোন্ ট্রেন ধরতে পারেন, কতক্ষণে বাড়ী পৌছান ; দৈনিক মোট কত সময় পথে ব্যয় হচ্ছে, ট্রেনের বদলে বাস-এ আসা যায় কি না, কেন বাস-এ আসেন না ; বাসে যাতায়াতে কত খরচ হয় ; বাড়ী পেলে কলকাতায় এসে থাকতে চান কি না ; তাঁরা যেখানে থাকেন সেখানে দৈনন্দিন জিনিষপত্রের দাম কলকাতার তুলনায় সুলভ কি না ; অন্যান্য ব্যবস্থাদি কি রকম ইত্যাদি। দক্ষিণাঞ্চল থেকে যত লোক রোজ আসেন তাঁদের এই সব প্রশ্ন ক'রে যা জবাব পাওয়া গেছে সবই মোটামুটিভাবে তাঁদের চরম অসুবিধার ইঙ্গিত করছে। পরবর্তী কোন সংখ্যায় এই তথ্যাদি নিয়ে আলোচনার ইচ্ছা রইল। মধ্যবর্তী ষ্টেশনগুলির কথা ছেড়ে দিয়ে আমরা দেখছি যে, লক্ষ্মীকান্তপুর ষ্টেশনে যাঁরা ট্রেনে উঠছেন তাঁদের অনেকে আসছেন ৯।১০ মাইল দূরের গ্রাম থেকে ; বাস-এ আধঘণ্টা যাচ্ছে, ট্রেনে যাচ্ছে ২ ঘণ্টা ২০ মিনিট, শেয়ালদায় অপেক্ষা করতে হচ্ছে ১৫ ২০ মিনিট, তারপর আরও আধঘণ্টা যাচ্ছে কর্মস্থলে পৌছাতে। ডায়মণ্ডহারবারে প্যাসেঞ্জার আসছেন প্রায় ১৪।১৫টি গ্রাম থেকে ; কেউ আসছেন ৬।৭ মাইল দূর থেকে পদব্রজে ; কাউকে বাস-এ কাটাতে হচ্ছে সোয়া ঘণ্টা, ট্রেনে কাটছে সোয়া দুই ঘণ্টা। আর এই চলেছে বছরের পর বছর, চিরজীবন ধ'রে।

বেড়েছে যে, আজ যদি মনে করাও হয় যে গাড়ীর সংখ্যা দ্বিগুণ করা সম্ভব হবে, রাস্তায় অত গাড়ী চলবার স্থান হবে কি না সন্দেহ; আর রাস্তার পরিধি বা রাস্তার সংখ্যা উত্তরোত্তর বাড়িয়ে চলাও সম্ভব নয়। অথচ যানবাহন চালাবার ভার যাঁদের উপর তাঁরা দেখছেন যে, অন্যান্য সব বড় শহরের মতই এখানেও সকালে-বিকালে যেমন প্রতিটি গাড়ী দ্বিগুণ লোক নিয়ে চলাচল করছে, অন্য সময়ে অপেক্ষাকৃত খালি থাকছে; আয়-ব্যয়ের সমতা রক্ষা করতে হ'লে অনির্দিষ্টভাবে গাড়ীর সংখ্যা বাড়িয়ে চলাও সম্ভব নয়।[২]

*　　*　　*　　*

কোন্ ধরণের যানবাহন ব্যবস্থা হ'লে এখন এবং ভবিষ্যতে, সবদিক্ দিয়ে সুবিধা হয় সেটি মীমাংসা করা অতি কঠিন কাজ সন্দেহ নেই। আমাদের স্থির করতে হয় (ক) জনসাধারণের ব্যবহারযোগ্য এবং ব্যক্তি-বিশেষের ব্যবহারযোগ্য যানবাহনের প্রয়োজনীয়তার সমতুল্য বিধান কি ভাবে করব এবং (খ) জনসাধারণের ব্যবহারোপযোগী যানবাহন ব্যবস্থার কোন্‌টি আমাদের পক্ষে সর্বাপেক্ষা কার্যকরী ও কম ব্যয়সাধ্য হবে।

কলকাতার যানবাহন সমস্যা আজ যেরকম দাঁড়িয়েছে, আমরা সবাই 'প্রাইভেট' গাড়ীর যাত্রীর দিকে তাকিয়ে ভাবি, আমরাও যদি ওভাবে যাতায়াত করতে পারতাম, তা হ'লে আমাদের এত দুর্গতি ভোগ করতে হ'ত না। প্রসঙ্গ উত্থাপিত হ'লেই আমরা আমেরিকার দৃষ্টান্ত উল্লেখ ক'রে বলি, সেখানে প্রতি তিন জনের মধ্যে একটি ক'রে গাড়ী আছে, আমাদের তার তুলনায় কত কম।[৩] অর্থ-সামর্থ্যে, লোহা, কয়লা, পেট্রোলের প্রাচুর্যে, আমেরিকার সঙ্গে আমাদের অবস্থা কোনভাবেই তুলনায় নয়, তবু আমরা সকলেই ঐ দেশের কাছাকাছি পৌঁছতে পারলে খুশী হই।

কিন্তু আমেরিকার বড় শহরগুলিতেও আজ অতিরিক্ত হারে ব্যক্তিগত গাড়ী চলবার ফলে কি অবস্থা দাঁড়িয়েছে তার আভাস পাই সেখানকার লোকদের উক্তি থেকে :

"The automobile has swept in on us like a wild prarie fire. Today, we have too many automobiles and too little space on city streets. . . . Americans generally are fairly considerate of their fellowmen, but very few of us seem to realise how inconsiderate we are when we drive our private cars—more frequently than not with ourselves as the only passengers—into a congested area and take up 80 square feet of street space for the transportation and movement of just one person" . . . "when you consider efficient use of street space you must consider ways and means of inducing the people . . . to make greater use of public transportation." . . . "When a city is faced with an epidemic—infantile paralysis, for example—we rally as a unit and do something about it even if it means curtailing the personal privileges of freedom of some citizens. Today the epidemic is traffic paralysis, as fatal and crippling to the city as infantile paralysis is to human beings."

কলকাতা শহরে যে হারে প্রাইভেট গাড়ীর সংখ্যা বাড়ছে, ইতিমধ্যেই আমরা আগামী দিনের সমস্যা কিছুটা আঁচ করতে পারি। আমাদের মত দরিদ্র দেশে ব্যক্তিগত যানবাহন যতই বাড়বে, সমস্যা জটিলতর হবে, জনসাধারণের সমস্যা বাড়বে। ইতিমধ্যেই আমরা ভূগর্ভে

---

২ ইংলণ্ডের যানবাহন ব্যবস্থা আমাদের থেকে বহুগুণে উন্নত, তা সত্ত্বেও সেখানে এই সমস্যা কি রকম দাঁড়াচ্ছে, তার আভাস পাওয়া যায় নিম্নলিখিত বক্তব্য থেকে :

"This crowded, urban and industrialised island . . . is already suffering from sclerosis of its traffic arteries; each year costs rise and comfort declines . . . The truth is that the problem is being tackled in a totally casual and inconsistent manner. The railways are treated in isolation. as if the only consideration was to balance their books. The production of motor vehicles progressively overtakes the provision of roads. . . . Things are not merely done haphazardly; they are also guided—both in public and private transport—by the principles of profit rather than by any overall conception of public service or economic need. . . . . If British towns are not to become a misery to all who live or travel in them, if the drift of population and prosperity of Southern England is to be halted, . . . if there is to be a sensitble policy for the use of domestic coal and imported oil, if scarce capital is to be invested in the right places with best effect, new responsibilities will fall on the Minister of Transport . . . ." (*New Statesman*, October 12, 1962. The Philosophy of Transport),

৩ ১৯১৪ সালে আমেরিকার জনসংখ্যা ছিল ৯ কোটি ৭৬ লক্ষ; গাড়ীর সংখ্যা ছিল ১৭ লক্ষ; অর্থাৎ, প্রতি ৫৭জন লোকপিছু গাড়ী ছিল একটি। ১৯৫৪ সালে জনসংখ্যা ১৬ কোটি, গাড়ীর সংখ্যা ৫ কোটি ৪০ লক্ষ; অর্থাৎ প্রতি তিনজন লোকপিছু গাড়ীর সংখ্যা একটি।

'কার পার্ক'-এর ব্যবস্থার কথা ভাবছি, ভবিষ্যতে আরও ভাবতে হবে। কিন্তু জনসাধারণের যানবাহন ব্যবস্থার স্থায়ী সমাধানের কথা ভাবতে গেলে যা করণীয় তা যথেষ্ট উদ্যমের সঙ্গে হচ্ছে ব'লে মনে হয় না।

* * * *

জনসাধারণের ব্যবহারযোগ্য যানবাহন কিরকম হ'লে, মিতব্যয়িতা ও কার্যকারিতার সমন্বয় ঘটান যায় তাই নিয়ে নানা রকম মতামত হওয়া স্বাভাবিক। ট্রাম শহরের অনেক অঞ্চলে ক্রমে অচল হয়ে আসছে; বাস-এর বহন ক্ষমতাও সীমাবদ্ধ। যে-সব দেশের সঙ্গতি আছে, তারা বহু পূর্বেই মাটির নীচে রেলপথ অথবা elevated rail ক'রে গাড়ী চালাবার ব্যবস্থা করেছে।

কিছুদিন পূর্বে টিউব রেলওয়ের কথা বিবেচিত হয়েছিল; বলা বাহুল্য যে কোন বড় শহরেই এই ব্যবস্থা হচ্ছে সবচেয়ে সন্তোষজনক। কিন্তু যে দেশের অর্থসঙ্গতি স্বল্প, এবং শিল্প-উপকরণও ঐ জটিল ব্যবস্থা চালু রাখার উপযোগী নয়, সে দেশে সম্পূর্ণভাবে বিদেশের মুখাপেক্ষী হয়ে ভূগর্ভের রেলগাড়ী চালাবার ব্যবস্থা করা উচিত হবে কি না এ প্রশ্ন অনিবার্য ভাবে লোকের মনে আসে। ইদানীং শোনা যাচ্ছে, প্রধানতঃ অর্থাভাবের কথা বিবেচনা ক'রেই প্রস্তাবটি বাতিল হয়েছে এবং পরিবর্তে 'সার্কুলার রেলপথ' সম্বন্ধে ১৯৪৭ সালেই যে তদন্ত হয়েছিল সেই অনুযায়ী ব্যবস্থা করার কথা হচ্ছে; আর সেই সঙ্গে উত্তর কলকাতা থেকে দক্ষিণ কলকাতা পর্যন্ত Light railway চালানো যায় কি না সেকথাও বিবেচনা করা হচ্ছে।

মাত্র কুড়ি বছর আগে হাওড়ার নতুন ব্রীজ তৈরী হ'ল; নদীর পশ্চিমদিক্ পর্যন্ত ট্রামপথ খোলা হ'ল, কিন্তু রেলপথ করবার কথা ভাবা হয় নি। একটা সময় ছিল যখন কলকাতায়, একদিকে ব্রিটিশ ট্রাম কোম্পানীর স্বার্থ, আরেকদিকে ধরের কাছে কয়লায় প্রাচুর্য—এই দুই কারণে শহরের সীমানার মধ্যে রেলপথ আনবার কথা ভাবা হয় নি, এবং এ কথাও অবশ্য ঠিক যে, সে যুগের পরিপ্রেক্ষিতে ট্রামই যথেষ্ট কার্যকরী ছিল।

আজ যখন বিজ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে ইলেকট্রিক ট্রেন চলাচল সহজসাধ্য হয়েছে এবং কলকাতার উপকণ্ঠ পর্যন্ত ইলেকট্রিক ট্রেন চালাবার ব্যবস্থাই হচ্ছে, তখন কলকাতার সীমানার মধ্যেও রেলপথ আনা যায় কি না এ প্রশ্ন সাধারণ লোকের মনে আসে। বোম্বাইয়ে ট্রাম প্রায় অচল, বাসে ভিড় নিয়ন্ত্রণ করার ব্যবস্থা চালু রাখা সম্ভব, তার প্রধান কারণ হচ্ছে সেখানকার ইলেকট্রিক ট্রেনের দ্রুত চলাচল এবং শহরের সীমানার মধ্যে প্রবেশের ব্যবস্থা। আজ যখন লাইট রেলওয়ের কথা ভাবা হচ্ছে এবং সার্কুলার রেলওয়ের কথাও নতুন ক'রে বিবেচনা করা হচ্ছে, তখন একথাও আমরা ভেবে দেখতে পারি, কলকাতার বিভিন্ন অঞ্চল দিয়ে আরও কতকগুলি লাইন প্রবেশ করানো সম্ভব কি না। বিভিন্ন অঞ্চল থেকে যত লোক ডালহৌসি স্কোয়ারের কাছে রোজ আসছেন, প্রধানতঃ তাঁদের যাতায়াতের জন্য নদীর পশ্চিম এবং পূর্ব পার থেকে রেলপথ যদি ইডেন গার্ডেন বা ময়দানের কোন সুবিধাজনক স্থান পর্যন্ত আসে তা হ'লে যাত্রীদের অধিকাংশই এই ব্যবস্থায় যাতায়াত করতে পারেন।[৪] আউট্রাম ঘাটের কাছে দ্বিতীয় যে ব্রীজটি হবার কথা হয়েছে, আশা করা যায় সেই ব্রীজের উপর দিয়ে রেলপথও আনা হবে এবং শালিমার ষ্টেশনের কাছ থেকে যাত্রীবাহী ইলেকট্রিক ট্রেন নদীর পুব পার পর্যন্ত আনা হবে। শেয়ালদা ষ্টেশনটিকে আরও এগিয়ে আনা হ'ল, কিন্তু এই ষ্টেশনে বজবজ, ডায়মণ্ডহারবার, লক্ষ্মীকান্তপুর, বারাসাত, রাণাঘাট অঞ্চল থেকে যত লক্ষ লক্ষ লোক দৈনিক শহরে আসছেন তাঁদের চলাচল ব্যবস্থা অনেক সহজ হয়ে যাবে যদি শেয়ালদা থেকে ডালহৌসি পর্যন্ত, অথবা একদিকে দমদম থেকে, অপর দিকে ঢাকুরিয়া বা যাদবপুর থেকে রেলপথ ডালহৌসি স্কোয়ার বা ইডেন গার্ডেন পর্যন্ত আনা যায়। এই প্রস্তাব কার্যকরী করতে গেলে বিঘ্ন অনেক সন্দেহ নেই; অনেক ভাঙ্গা-গড়া করতে হবে, পথের যাতায়াত ব্যবস্থায় অনেক অদল-বদল করতে হবে, হয়ত কোন একটি রাস্তায় অন্যান্য যানবাহন চলাচল বন্ধও করতে হবে; কিন্তু এর বিকল্প কোন ব্যবস্থায় কি সমস্যা সমাধান হবে? রেলপথ হাওড়া ও শেয়ালদা পর্যন্ত আসছে; অন্তত পক্ষে দিনের দুটি সময়ও যদি হাওড়া ও শেয়ালদাগামী ট্রেনগুলি শহরের মধ্যে প্রবেশ করে তা হ'লেই প্রধান সমস্যা বহুলাংশে মেটান যায়। ট্রাম-এর জন্য এসপ্ল্যানেড ও ডালহৌসি স্কোয়ারে যতটা স্থান নির্ধারিত করা আছে, আজকালকার ইলেকট্রিক ট্রেনের জন্য তার থেকে খুব বেশী স্থান লাগবার কথা নয়, বিপরীত দিকে ঘোরবার জন্য স্বতন্ত্র স্থান লাগে না। কোন কোন খাল বুজিয়ে দিয়ে সেখানে রাস্তা বা বাড়ী

---

৪ হিন্দুস্থান ষ্ট্যাণ্ডার্ড, ২২ জানুয়ারী, ১৯৬২ সংখ্যায় এই প্রসঙ্গটি বিশদভাবে আলোচনা করেছি।

হবে' শোনা যাচ্ছে, কিন্তু যথেষ্ট সুদূরপ্রসারী দৃষ্টি নিয়ে দেখলে মনে হয়, ঐ সব স্থানের অনেকাংশই রেলপথের জন্য কাজে লাগান যায়। সার্কুলার রোডের প্রশস্ত ফুটপাথ-এর একাংশে এক সময় রেলপথ ছিল; উপযুক্ত পরিকল্পনার সাহায্যে এই স্থানও সম্ভবত কাজে লাগান যায়। মোট কথা যদি একথাই স্থির করা হয় যে, ভবিষ্যতের চাহিদা বুঝে শুধু ট্রাম বাস্ বা ট্রলিবাস্ দিয়ে জনসাধারণের যানবাহন সমস্যা মেটাবার চেষ্টা করা হবে না, তা হ'লে এখনও উত্তরে দক্ষিণেশ্বর ষ্টেশন থেকে উল্টোডাঙ্গা ষ্টেশন পর্যন্ত এবং দক্ষিণে ঢাকুরিয়া থেকে আরম্ভ ক'রে কালীঘাট মাঝেরহাট ষ্টেশন পর্যন্ত, আর মাঝখানে কাঁকুড়গাছির কাছে এমন স্থান সম্ভবতঃ বের করা যায় যেখান থেকে শহরের মধ্যে রেলপথ আনা যায়। ভাঙা-চোরার কাজ কিছু করতেই হবে, যেমন বরাবর ইমপ্রুভমেণ্ট ট্রাস্ট করছেন; এর বিকল্প ব্যবস্থা এই হ'তে পারে না যে, যেমন চলছে তেমনি চলবে অথবা 'মোনোরেল' (monorail) বা টিউব রেলওয়ে করতে হবে। (লাইট রেলপথেরও পরীক্ষা আগে হয়ে গেছে, এর কার্যকারিতা খুবই সীমাবদ্ধ।) বোম্বাইয়ের ব্যবস্থার সঙ্গে কলকাতার ব্যবস্থা সম্পূর্ণভাবে তুলনীয় নয় একথা ঠিক, কিন্তু সেভাবে দেখতে গেলে লণ্ডন, বা নিউইয়র্ক বা লেনিনগ্রাডের সঙ্গে কলকাতার অসামঞ্জস্য আরও অনেক বেশি, অথচ আমরা যখন নতুন ব্যবস্থার কথা ভাবি তখন বিদেশের শহরের দৃষ্টান্তই টানি। লেনিনগ্রাডের জমি এবং কলকাতার জমি একই রকম এই যুক্তিতেই মাত্র দু'বছর আগে ভূগর্ভে রেলপথ করার কথা আলোচিত হচ্ছিল! বোম্বাই শহরের ভৌগোলিক পরিস্থিতি, জলবিদ্যুতের প্রাচুর্যের জন্য ৩৫ বছর আগেই রেলপথ আনবার সম্ভাবনা, ঐ শহরের লোকেদের অর্থসঙ্গতি৫, সবই কলকাতার থেকে ভিন্ন সন্দেহ নেই, কিন্তু তা সত্ত্বেও ঐ শহরের সঙ্গে সাদৃশ্য ইউরোপ বা আমেরিকার যে কোন শহরের থেকে বেশী হওয়া স্বাভাবিক। অন্যান্য অনেক কারণের সঙ্গেই, বোম্বাই শহরের সীমানার মধ্যে রেলপথ আনার ফলে যাতায়াত ব্যবস্থা কলকাতার তুলনায় এত সহজ যে, শহরতলী ও শহরের মধ্যের সীমারেখা টানা কঠিন। কলকাতার অনেকে নিরুপায় হয়ে দূরে গিয়ে থাকছেন, হাওড়া, শেয়ালদা পর্যন্ত ইলেকট্রিক ট্রেনের সাহায্যে দ্রুতগতিতেই আসছেন বা আসবেন, কিন্তু ট্রেনে কুড়ি মাইল পথ যতক্ষণে অতিক্রম করছেন শহরের মধ্যে দুই মাইল পথ অতিক্রম করতে ততখানি সময়ই দিচ্ছেন। যাঁরা এই সময়ের অপব্যয় করা সম্ভব মনে করছেন না, তাঁরা কর্মস্থলের সঙ্গে বাসস্থানের দূরত্ব আর বাড়াতে নারাজ, কলকাতার সমস্ত অসুবিধা মেনে নিয়েও এখানেই থেকে যাচ্ছেন।

*   *   *   *

কর্মস্থল হিসাবে কলকাতার যে প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব তা হ্রাস পাবে না, অথচ আমাদের ভাবতে হবে কি ভাবে এই ঘন লোকবসতি অপেক্ষাকৃত হাল্কা হয়. সে ক্ষেত্রে কলকাতার "Day time population" বাড়িয়ে বাসিন্দা জনসংখ্যা কমাতে হ'লে আভ্যন্তরীণ যানবাহন ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন প্রয়োজন। অপর দিকে, যাঁরা উন্নততর যানবাহন ব্যবস্থার সুবিধা গ্রহণের জন্য দূরে গিয়ে থাকতে ইচ্ছুক, তাঁরা যাতে অদূরভবিষ্যতে আরও বিশৃঙ্খলভাবে গ'ড়ে-ওঠা শহরে বাস না করেন তার জন্য জমির ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ অনিবার্য। আজ যখন কলকাতা পুনর্গঠনের কথা ভাবা হচ্ছে তখন অন্যান্য সমস্যাগুলির সঙ্গে এই দুইটি সমস্যার কথা সম্পূর্ণ নতুন দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে বিবেচনা করা হবে আশা করা যায়। জমির ব্যবহারে অবাধ স্বাধীনতা এবং যানবাহন ব্যবস্থা সম্বন্ধে পাশ্চাত্যের শহরগুলির এ যাবৎ অনুসৃত নীতি অনুযায়ী ব্যক্তিগত গাড়ীর প্রতি বিশেষ ঝোঁক—এই উভয় বিষয়েই বিশেষ চিন্তার প্রয়োজন আছে মনে হয়।

৫ ১৯৩৯-৪০-এ কলকাতা কর্পোরেশনের মাথাপিছু মিউনিসিপ্যাল ট্যাক্স-এর আয় ছিল টা. ১৮।১০।৭; মাদ্রাজে টা. ৮।৫ আর বোম্বাইয়ে টা. ২৪।১১।৭ ১৯৬০-৬১তে ঐ অঙ্ক যথাক্রমে টা. ১৬.৫০ ন.প., টা. ১৬.০৫ এবং টা. ৪৪.০০

—*—

সন্ধ্যামণি

শ্রীসীতা দেবী

"হ্যাগা দুর্গাদিদি, তুমি কোন্ ঘরে রয়েছ ?"

রান্নাঘর থেকে ভারি মোটা গলায় জবাব এল, "আমি এখানে, ভাত চড়াচ্ছি।"

প্রতিবেশিনী রোহিণী রান্নাঘরের দরজার কাছে এসে দাঁড়ালেন। মোটাসোটা ভারি মানুষ, চওড়া ক'রে সিঁদুর পরা। পরণে আধময়লা লাল পেড়ে শাড়ী। হাতে একটা ছোট বটুয়া। মুখভর্ত্তি পান।

দরজার কাছে দাঁড়াতেই দুর্গা বললেন, "বোস ভাই, এই পিঁড়িখানা টেনে নাও, আমি এই চাল ক'টা ধুয়ে হাঁড়িতে দিয়ে আসছি। আজ কালীঘাট গিয়েছিলাম ব'লে কাজকর্ম্মে দেরি হয়ে গেল।"

রোহিণী একখানা বড় পিঁড়ি টেনে নিয়ে চৌকাঠের ওপারেই ব'সে বললেন, "তা ভাই কাজ কর তুমি, এখন বাগড়া দিতে গেলে আরও দেরি হয়ে যাবে। তুমি সোনাকে ডাক না হয়, এই অনন্তগাছা সিন্ধুকে তুলে রাখুক, আর আমায় পঞ্চাশটা টাকা দিক্। বাড়ীওয়ালা মিন্সের দুমাসের ভাড়া বাকি, এক মাসেরটা না দিয়ে দিলে আর চলছে না। কখন আবার থানা পুলিশ ক'রে বসে কে জানে ? ওঠাবার জন্যে ত মুখিয়ে আছে, আমরা উঠে গেলেই এখন কলি ফিরিয়ে দরজা-জানলায় রং দিয়ে ১০০৲ টাকায় ভাড়া দিয়ে দেবে। নিতান্ত আমরা পনেরো-কুড়ি বছর রয়েছি, তোলা ত সহজ নয়। এই অনন্তটা আগেও একবার তোমার কাছে বাঁধা রেখে-ছিলাম, কেমন জিনিস, কত ওজন সবই তোমার জানা আছে। আমিই ডাকব নাকি সোনাকে ? তুমি ত ব্যস্ত রয়েছ।"

দুর্গামণি হাঁড়িতে চাল ঢালতে ঢালতে বললেন, "থাক্, ওকে আর ডেকে কাজ নেই, আমিই উঠছি। ও এক অদ্ভুত মেয়ে বাপু, ওর তল পাওয়া ভার, ওকে ডেকে লাভও হবে না কিছু।"

একটা ঝগড়ার আভাস পেয়ে পুলকিত হয়ে রোহিণী বললেন, "কেন বল দেখি ? সোনার ত কত সুখ্যাতি পাড়ায়, এমন মেয়ে আর হয় না, সে আবার কি করল ?"

দুর্গামণি ঠোঁটটা একটু বেঁকিয়ে বললেন, "করে নি কিছু, করবে আবার কি ? এই বাক্যি দিয়ে দগ্ধাচ্ছেন আর কি ? আমি সুদ নিয়ে টাকা ধার দিই, গহনা বন্ধক রাখি এতে তার বড় ঘেন্না। খেয়ে-প'রে আছেন কিসের কল্যাণে তা ত মাথায় ঢোকে না ? মেমসাহেবী ফলাচ্ছেন আর কি ?"

রোহিণী গালে হাত দিয়ে বললেন, "ওমা, ঘেন্না কি গো ! বলে, এতে কত বাড়-বাড়ন্ত তোমার, দুধে-ভাতে খাচ্ছে কিনা, কত ধানে কত চাল হয় বোঝে না। ঐ ত পোড়া কপাল, দশ বছর বয়েসে কড়ে রাড়ী। বাপও ত কোন্ কাল থেকে ঘরে ব'সে। বাড়ী ভাড়া দিচ্ছ বটে, কিন্তু সেও ত পুরনো ভাড়াটে, কতই বা দেয় ?"

দুর্গামণি এইবার চালের কাঁশিখানা নামিয়ে রেখে উঠে দাঁড়ালেন। বললেন, "দাও বাপু তোমার গহনা, রেখে আসি। কি সুদ্‌টুদ্ নিই, সে ত তোমার জানাই আছে। আসলটা যখন হয় দিও, তার জন্যে আমি কিছু বলি না, তবে সুদটা মাসে মাসে নিয়মমত যেন পাই, ওর উপরেই আমার নির্ভর, জান ত ?"

"তা আবার জানব না ? আমি কি নূতন মানুষ ?"

দুর্গামণি অনন্তগাছটা হাতে নিয়ে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে দেখলেন। তারপর নিজের শোবার ঘরে গিয়ে ঢুকলেন। কর্ত্তা নিশিকান্ত বিছানা ছেড়ে উঠে ব'সে তামাক খাচ্ছেন, হাঁপানী রুগী ঘর ছেড়ে বিশেষ বেরোন না, মধ্যে মধ্যে বারান্দায় গিয়ে বসেন। স্নান, খাওয়া, ঘুমোনো আর তামাক খাওয়া এই নিয়ে তাঁর দিন কাটে। একটা খবরের কাগজ আসে বাড়ীতে, মর্জ্জি হ'লে সকাল বেলা সেটা পড়েন, মর্জ্জি না হ'লে তাঁর মেয়ে প'ড়ে শোনায়।

স্ত্রীকে দেখে বললেন, "কার সঙ্গে কথা কইছিলে ?"

দুর্গামণি বললেন, "ঘোষবাড়ীর রোহিণী, টাকা ধার করতে এসেছে।" তিনি চাবির তাড়া থেকে চাবি বেছে বার ক'রে সিন্ধুকের তালা খুলে ফেললেন, ভিতর থেকে কয়েকখানা নোট গুণে বার ক'রে আবার সিন্ধুক বন্ধ করলেন। উঠে দাঁড়াতেই কর্ত্তা আবার কথা বললেন, "সোনা কোথায় ? তাকে ত অনেকক্ষণ দেখছি না ?"

গৃহিণী বললেন, "মলিনাদের বাড়ী গেছে, এখনি আসবে। কেন, তোমার কিছু দরকার আছে নাকি ?"

নিশিকান্ত বললেন, "না, দরকার তেমন কিছু নেই,

একখানা চিঠি লেখাব তাকে দিয়ে, তা যখন হয় হবে। হাতের আঙুল ক'টা বাদ্‌লা হাওয়ায় ক'দিন থেকে টন্‌টন্ করছে, কলম ধরতে গেলেই লাগে।"

দুর্গামণি উত্তর না দিয়ে বেরিয়ে গেলেন। ঠিক সেই সময় একটি মেয়ে এসে দাঁড়াল ঘরের সামনে। শেষ কথাগুলো বোধহয় শুনতে পেয়েছিল, একটু ব্যস্ত ভাবেই বলল, "আসেত একটু দেরি হয়ে গেল। কি চিঠি বাবা? দাও না লিখে দিচ্ছি?"

তার বাবা বললেন, "কাল হ'লেও হবে। তোমার সতীশ জ্যাঠামশায়ের লেখা। তার মধুপুরের বাড়ীটা বিক্রি করতে চায়, আমি কিছু সাহায্য করতে পারি কি না জানতে চেয়েছে, তা আমার ত এই অবস্থা।"

পায়ের চটি জোড়া খুলে মেয়েটি ঘরের ভিতর এসে ঢুকল। রাস্তার জুতো বা চটি প'রে ঘরে ঢোকা দুর্গামণি পছন্দ করেন না। নিজে চামড়ার জুতো বা চটি কোনদিন পরেন না। বিংশ শতাব্দীতে কলকাতায় বাস ক'রেও তিনি পল্লীগ্রামের চালচলনই বজায় রেখেছেন।

এই মেয়েই নিশিকান্ত ও দুর্গামণির একমাত্র সন্তান। দেখতে বেশ সুশ্রী, দুর্গামণির মেয়ে ব'লে মনে হয় না। দুর্গামণির গায়ের রং কালো, শরীরের গঠন রোগা আর কঠিন। মুখের ভাবেও কঠোরতার ছাপটাই সর্ব্বপ্রথম চোখে পড়ে। মেয়ে সন্ধ্যা বা সন্ধ্যামণি একেবারে অন্য রকম। উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ রং, মুখশ্রী সুন্দর, কোমলতাপূর্ণ। তবে তরুণী মেয়ের পক্ষে বড় গম্ভীর। সাজসজ্জাও তরুণী-সুলভ নয়। শাদা শাড়ী, শাদা ব্লাউস পরণে, এলোচুল হাতখোপা ক'রে জড়ান। হাতে খুব সরু দু'গাছি রুলী, আর কোন গহনা গায়ে নেই।

দুর্গামণি পাড়াগাঁয়ের মেয়ে। দৈহিক শ্রীর অভাব ছিল, তাঁর বাপের টাকা পয়সাও বেশী ছিল না, সুতরাং বিয়ে হ'তে একটু দেরি হয়েছিল। অনেক খোঁজাখুঁজির পর নিশিকান্তর সঙ্গে তাঁর বিয়ে হয়। নিশিকান্তও গরীবের ছেলে, বাল্যে পিতৃহীন। দেখতে-শুনতে বেশ ভাল ছিলেন, তাই দেখে দুর্গামণির বাবার বড় পছন্দ হয়। তাঁর এক মাসতুতো ভাই, একটা মাঝারী-গোছের অফিসের কর্ত্তাস্থানীয় ছিলেন। তাঁর সাহায্যে নিশিকান্তর একটা চাকরি হয় এবং কৃতজ্ঞতার ঋণ শোধ করবার জন্যে তিনি অপ্রিয়দর্শনা দুর্গামণিকে বিয়ে ক'রে কলকাতার বাড়ীতে নিয়ে আসেন। বাড়ী মানে একখানা ভাড়াটে ঘর, বারান্দায় চটের পরদা দিয়ে ঘেরা, রান্নার জায়গা এবং অন্য সব ভাড়াটেদের সঙ্গে একটি সাধারণ স্নানের ঘর ও আনুষঙ্গিক আর কিছু।

দুর্গামণি গরীবের ঘরে মানুষ, স্বামীর সংসারেও দেখলেন দারিদ্র্যের উৎকট ছাপ। কোনদিন স্বামীর উপার্জ্জনে তিনি স্বচ্ছলতার মুখ দেখবেন না, এটা বুঝতে তাঁর দেরি হ'ল না। উঠতে যদি হয়, নিজের চেষ্টাতেই উঠতে হবে। কিন্তু কি করা যায়?

লেখাপড়া বেশী শেখেন নি তিনি। কি ক'রেই বা শিখবেন? তাঁদের গাঁয়ে ছেলেদেরই পড়াশুনো হ'ত না, তা আবার মেয়েদের! নিতান্ত বাংলা লেখাপড়াটা শিখেছিলেন কোনমতে। তা দিয়ে কি আর রোজগার হবে?

তিনি যেখানে এসে উঠলেন সেটা দরিদ্রের পল্লী। খোলার ঘর আছে, টিনের ঘর আছে, পাকাবাড়ী দু'চার-খানা আছে, কোনটাই বিশেষ নূতন নয়। এরই একটার একখানা ঘরে তিনি এসে ঢুকেছিলেন। প্রতিবেশিনীরাও সকলেই গরীব বা নিম্নমধ্যবিত্ত। পুরুষদের একলা উপার্জ্জনে সংসার অতি কষ্টে চলে, মাঝে মাঝে একেবারে অচলও হয়ে পড়ে। তাই ঘরের মেয়েরাও প্রাণপণে চেষ্টা করে ঘরে ব'সেই কোন উপায়ে কিছু উপার্জ্জন করতে। লেখাপড়া এরাও বিশেষ কিছু জানে না। কেউ খবরের কাগজ জোগাড় ক'রে ঠোঙা বানায়, কেউ উল বোনে, কেউ জামা-ব্লাউস সেলাই করে, কেউ আচার, চাটনি, জ্যাম, জেলি তৈরী করে। নানারকম জলখাবার তৈরী ক'রে গৃহস্থ বাড়ীতে বিক্রী ক'রে আসে, এমনও দু'চারজন আছে। কিন্তু এতে ক'টাকাই বা হাতে আসে? সংসার চালিয়ে, ছেলেমেয়ে পালন ক'রে, কতক্ষণই বা এরা এসব ব্যাপারে খাটতে পারে?

দুর্গামণির তখন পর্য্যন্ত ছেলেমেয়ে হয় নি, তবু সংসার ছিল, তার পিছনে খাটতেও কিছুটা হ'ত। আর দু'পাঁচ টাকা এনে একটু সাশ্রয় করা তাঁর উদ্দেশ্যও ছিল না। তিনি বেশী উপার্জ্জনের উপায় খুঁজতে লাগলেন।

পাড়ায় এক বিধবা বৃদ্ধা মহিলা ছিলেন, সকলে তাঁকে দত্ত গিন্নী ব'লে ডাকত। এই মহিলার হাতে বেশ টাকা-পয়সা ছিল। ছেলের সংসারে থাকতেন বটে, তবে নিজের সব খরচ নিজেই চালাতেন, ছেলের কাছে কিছু নিতেনও না, তাকে কিছু দিতেনও না। ছেলের অবস্থা ভাল নয়, সংসারে টানাটানি লেগেই আছে। তা ব'লে মা কখনও উপুড়হাত করতেন না। ছেলের আবেদনে তাঁর একমাত্র উত্তর ছিল, "তোমার বাপ কত লাখ রেখে

গেছে শুনি? নিজে না খেয়ে, না প'রে, কত দুঃখধান্দা ক'রে দুটো পয়সা জমিয়েছি বাপু, তুমি এর উপর আর নজর দিও না। মরার পর যা থাকবে তোমারই থাকবে, তার আগে সবকিছু ঢেলে দিয়ে, তোমাদের হাত-তোলায় আমি থাকতে পারব না, তা পষ্ট ব'লে দিলাম।"

ভদ্রমহিলা কি ক'রে এত টাকা করলেন, দুর্গামণি তলে তলে খোঁজ নিতে লাগলেন। খোঁজ পেতে বেশী দেরি হ'ল না। ভদ্রমহিলা তেজারতির ব্যবসা করেন। টাকা ধার দেন বেশ চড়া সুদে, এবং সুদ আদায় করেন প্রতি মাসে, নিজে বাড়ী বাড়ী ঘুরে। লোকে তাঁকে প্রায় কাবুলীওয়ালার সমানই ভয় করে। টাকা ডুবে যাবার ভয়ও নেই, তিনি সোনারূপো বন্ধক ছাড়া বেশী টাকা দেন না। থালা, বাটি, ঘটি বাঁধা দিয়ে গরীব প্রতিবেশিনীরা দু'চার টাকা নেয় বটে, তবে এগুলো দত্ত গিন্নীর তেমন পছন্দ নয়। কোন্ ছেলেবেলায় এ-কাজ আরম্ভ করেছিলেন, এখন তিনি প্রচুর বিত্তের অধিকারিণী।

দুর্গামণির ব্যাপারটা বেশ পছন্দ হ'ল। এতে খাটুনি কিছুই নেই বলতে গেলে, অথচ লাভ প্রচুর। এক তাগাদায় বেরোনো, আর চড়া চড়া কথা বলা, তা সে ক্ষমতা দুর্গামণির প্রচুর আছে, না হয় ঠিকে ঝি পঞ্চার মাকে দু'চার পয়সা দিয়ে প্রথম প্রথম সঙ্গে নিলেই হবে।

টাকা জোগাড় করা যায় কি ক'রে? স্বামীর রোজগার থেকে কিছুই উদ্বৃত্ত থাকে না। নিতান্ত মা ষষ্ঠীর অনুগ্রহ হয় নি তাই কোনমতে চলে। এই বয়সেও নিশিকান্তের স্ত্রীকে একটা কিছু উপহার কিনে দেবার সাধ্যি হয় না। অবশ্য এও হতে পারে যে, সে ইচ্ছাও নেই। এই রূপহীনা স্ত্রীকে সাজিয়ে দেখবার ইচ্ছা না হ'লে, সেটাকে খুব যে কিছু অস্বাভাবিক বলা যায় তা নয়।

অনেক ভেবেচিন্তে তিনি তাঁর সম্বল যে দু'খানা সোনার গহনা ছিল, তাই বিক্রী ক'রে ফেলা স্থির করলেন। কর্তা হয় ত রাগ করবেন, কিন্তু তাঁর রাগ করবার কি অধিকার? তাঁর দেওয়া ত আর নয়?

বেচেই ফেললেন শেষ পর্য্যন্ত। প্রথম হারছড়াটা, শেষ বালাজোড়া। নিশিকান্ত জানতে চাইলেন গহনা কোথায় গেল? স্ত্রী প্রথমে বললেন, পাড়ায় চোরের উপদ্রব শুনে লুকিয়ে রেখেছেন। তার পর যখন সুদের টাকা বেশ মুঠো ভ'রে আসতে লাগল, তখন স্বীকারই ক'রে বসলেন। ভবিষ্যতে নূতন ফ্যাশানের গহনা গড়িয়ে নেবেন ব'লে স্বামীকে আশ্বস্তও করলেন। ব্যাপারটা নিশিকান্তের খুব যে একটা ভাল লাগল তা নয়, কিন্তু স্ত্রীকে বারণ ক'রে লাভ নেই, তিনি স্বামীর কোন কথাই শোনেন না।

টাকার সাধ ছিল দুর্গামণির, টাকা ত বেশ আসতে লাগল, কিন্তু আর একটি সাধ তাঁর যা ছিল, তা পূর্ণ হবার কোন লক্ষণই দেখা গেল না, কোন ছেলেমেয়ে তাঁর ঘর আলো করতে এল না। বয়স এদিকে ত্রিশের কোঠায় এসে পড়ল, বিয়েও হয়েছে কম দিন না, পনের-ষোল বছর ত হবেই।

প্রথম প্রথম মাদুলি, তাগা, তাবিজ ধারণ, এই সব ক'রেই নিশ্চিন্ত ছিলেন, কিন্তু কোন কাজই হয় না দেখে ডাক্তারি চিকিৎসারই শরণ নিলেন।

এবারে তাঁর কপাল ফিরল, কিছুদিনের ভিতরেই জানতে পারলেন যে, তাঁর ঘরে নূতন অতিথি আসছে দুর্গামণি মহাখুশী হয়ে উঠলেন, নিশিকান্তকে খুব বেশী উৎফুল্ল মনে হ'ল না। আর দায় না বাড়লেও তাঁর চলত। চুপচাপ নিরিবিলিতে ব'সে তামাক খাওয়া ছাড়া বেশী উচ্চাকাঙ্ক্ষা তাঁর ছিল না।

দুর্গামণি হঠাৎ দুম্ ক'রে ব'লে বসলেন, "এরপর নিজে-দের একটা বাড়ী না করলে আর চলছে না, এই পায়রার খোপে এর পর কুলোবে না।"

নিশিকান্ত ত আকাশ থেকে পড়লেন, হুঁকোর নল থেকে মুখ সরিয়ে বললেন, "ক্ষেপলে নাকি? বাড়ী করা সহজ কথা? কি দিয়ে বাড়ী করবে?"

দুর্গামণি সংক্ষেপে বললেন, "বাড়ী যা দিয়ে করে, টাকা দিয়ে। আমি ত আর রাজপ্রাসাদ বানাতে বলছি না, প্রথম একতলা খানতিনেক ঘর আর রান্নাঘর, চানের ঘর হ'লেই হবে, তারপর আস্তে আস্তে বাড়াব।"

নিশিকান্ত বললেন, "তাও ত দশ-বারো হাজার টাকা লাগবে, সেটা আসছে কোথা থেকে?"

বলা বাহুল্য এ সব দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আগেকার কথা, তখন কলকাতায় এবং আশেপাশে মধ্যবিত্তদের বাড়ী করা একেবারে অসম্ভব ছিল না।

দুর্গামণি স্বামীর কথার উত্তরে বললেন, "আসবে আমারই সিন্দুক থেকে। এই বারো-চোদ্দ বছর ধ'রে জমাচ্ছি না? কখনও একটা পয়সা খরচ করেছি আমি?"

নিশিকান্ত হতবাক্ হয়ে ব'সেই রইলেন। স্ত্রীর টাকা-পয়সার কোন খোঁজই তিনি রাখতেন না। জিজ্ঞাসা দু'চারবার ক'রে যখন দেখলেন যে, সঠিক কোন উত্তর

পাওয়া যায় না, তখন আর প্রশ্ন করার উৎসাহ রইল না, তাই ব'লে তলে তলে এত কাণ্ড হয়ে গেছে, তাঁর স্বপ্নেরও অগোচর ছিল।

স্বামীর উপর কোনকিছুর জন্যে নির্ভর করা দুর্গা-মণির স্বভাবে ছিল না। অতি কুঁড়ে মানুষ, ওকে দিয়ে কোন কাজ হবে না, এই ছিল তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস। তলে তলে খোঁজ-খবর নিতে লাগলেন। এ সব বিষয়ে পরামর্শ-দাত্রী ছিলেন দত্তগিন্নী। তিনি যে বাড়ীঘরও বাঁধা রাখেন, তা দুর্গামণির এতদিন জানা ছিল না, এখন শুনলেন একটি বন্ধকী বাড়ী দত্তগিন্নীর হাতে আছে। যিনি টাকা ধার নিয়েছিলেন, তিনি মারা গেছেন, পাঁচ বছরে টাকা শোধ দেবার কথা ছিল, তা এ পাঁচ বছরে এক পয়সা সুদও দেন নি, আসল ত দেনই নি। লেখাপড়া যা হয়েছিল, সে অনুসারে ভদ্রমহিলা বাড়া এখন দখল করতে পারেন, তারই ব্যবস্থা করছেন তিনি।

দুর্গামণি তাঁর সঙ্গে গিয়ে বাড়ী দেখে এলেন। মন্দ কি? তিনখানা ঘর আছে, বড় রান্নাঘর আছে, বাথ-রুমও আছে, মেরামত হয় নি বহুদিন, একটু শ্রীহীন হয়ে পড়েছে, সারিয়ে-সুরিয়ে নিলেই হবে, একটু সস্তাতেই ত পাচ্ছেন?

রীতিমত আদালতে গিয়ে টিপ সই দিয়ে দুর্গামণি বাড়ী কিনে ফেললেন, এত বৎসরের মধ্যে নিশিকান্তকে এই একবার চেয়ার ছেড়ে উঠে স্ত্রীকে নিয়ে ঘরের বাইরে বেরোতে হ'ল। দুর্গামণির এত হাসি মুখ নিশিকান্ত এর আগে কখনও দেখেন নি।

বাড়ী সারাতে, রং করাতে মাসখানিক লাগল। তার পর দিনক্ষণ দেখে দুর্গামণি নিজের বাড়ীতে এসে উঠলেন। একখানা ঘরের সংসারে আসবাবপত্র বলতে কিছু ছিল না, এবার দু'চারখানা এল। এ সব নিয়ে বাড়াবাড়ি করার কোন ইচ্ছা দুর্গামণির ছিল না, নিজের জন্যেও গোটাদুই গহনা গড়িয়ে নিলেন, এখন পাঁচজনের সঙ্গে সমাজে চলতে হবে ত?

সন্তান হবার আগে তার জন্যে কিছু কেনাকাটা করা দুর্গামণির সংস্কারে বাধে, কিন্তু মনে মনে তিনি সবই গুছিয়ে রাখতে লাগলেন, হয়ে যাক্ বাচ্চাটি, তার পর ঘর ভ'রে জিনিষ আসবে, কাকে দিয়ে কি কি জিনিষ কেনাবেন, তাও ঠিক ক'রে রাখলেন।

বেশী বয়সের সন্তান, কষ্ট কিছু পেতেই হবে, এটা দুর্গামণি ধ'রেই রেখেছিলেন, তবু হাসপাতালে যেতে রাজী হলেন না, সেখানে সব খ্রীষ্টানী কারখানা, নার্স-গুলো কি জাতের তার ঠিক নেই, তিনি তাদের হাতে জল খেতে পারবেন না, বাড়ীতেই ডাক্তার ডাকবেন, নার্স ডাকবেন, যা যা দরকার। ঠিকা ঝিকে বেশ কিছু টাকার লোভ দেখিয়ে কিছু দিনের মত দিন-রাত রাখার ব্যবস্থা ক'রে নিলেন। সে-ই রান্নাবান্না ক'রে দেবে, যত দিন দুর্গামণি শুয়ে থাকবেন। সন্তান বাড়ীতেই হ'ল। টাকা খরচ হ'ল প্রচুর, কষ্টও পেলেন অত্যধিক। কিন্তু তাতে দুর্গামণিকে বিশেষ বিচলিত বোধ হ'ল না। কোন্ ভাল জিনিষই বা দাম না দিয়ে পাওয়া যায়? ছেলের আশা খুব করেছিলেন, ছেলে হ'ল না, হ'ল মেয়ে। তাতেও মেয়ের মা বেশী কিছু দমলেন না। কেন, মেয়েই বা কম কিসে? নিজেকে কোনও পুরুষের চেয়ে নিম্নস্তরের জীব তিনি একেবারেই মনে করতেন না। এ বিষয়ে তাঁর বিনয়ের যথেষ্ট অভাব ছিল।

মেয়েটি বেশ সুন্দর দেখতে। ভাগ্যে নিশিকান্তর চেহারাটা ভাল ছিল, আর কোন গুণ থাক্ বা না থাক্। নইলে মায়ের মূর্তি ধ'রে মেয়ে যদি আসতেন, তা হ'লেই হয়েছিল আর কি? বিয়ে দিতে জিভ বেরিয়ে যেত। পোড়া পুরুষ মানুষের চোখে বাইরের রূপটাই যে সব, ভিতরের গুণের কি তারা কোন মূল্য দেয়? কি নাম হবে খুকীর? সন্ধ্যাবেলা হয়েছিল, আর ফুলের মত সুন্দর, তাই দুর্গামণি নিজেই নাম রাখলেন সন্ধ্যামণি। নামটা নিশিকান্তের খুব বেশী পছন্দ হ'ল না, কিন্তু স্ত্রীর কোন কথার উপর তিনি কোনদিনই কথা বলেন না। বাচ্চাটির উপর তাঁর যে কোন অধিকার আছে তা তাঁর কোন ব্যবহারে প্রকাশ পেল না।

দুর্গামণি মাসখানেকের মধ্যেই ঝেড়ে উঠে পড়লেন। ঘর-সংসারের ব্যবস্থার একটু অদল-বদল হ'ল। মেয়েকে কোনও দিক্ দিয়ে অযত্ন করা চলবে না। যতদিন শিশু আছে, ততদিন দুর্গামণিকে বেশী মন দিতে হবে তার কাজে, ঘরের কাজ যতটা পারেন অন্য লোকের সাহায্যে চালাবেন। রান্নাটুকু শুধু নিজের হাতে রাখলেন, অন্য কাজের জন্যে রাতদিনের ঝি মোতায়েন হ'ল। জল বাটনা আগে ঝিদের হাতের নিতেন না, এখন ভাল জাতের ঝি রেখে তারও ব্যবস্থা করতে লাগলেন।

সন্ধ্যা বড় হ'তে লাগল। ছোট থেকেই ভারি শান্ত, কান্নাকাটি বেশী করে না, রাত্রে মা-বাবাকে ঘুমোতে দেয়। অনেক বাচ্চা জন্মায় সুন্দর হয়ে, বড় হ'তে হ'তে কালো শ্রীহীন হয়ে যায়, সন্ধ্যা ক্রমেই যেন বেশী ফুটফুটে হয়ে উঠতে লাগল। ডাক নাম দাঁড়াল শেষ অবধি সোনা। সন্ধ্যামণি মস্তবড় নাম, ও নামে সারাক্ষণ ডাকা যায় না।

দুর্গামণিকে যেন মাতৃত্বের নেশায় পেয়ে বসল।

এতকাল টাকা ছাড়া আর কোন নেশা তাঁর ছিল না। স্বামীকে বিশেষ কোন মূল্য তিনি কোনও দিনই দেন নি। তাঁর সিন্ধুকে সঞ্চিত সোনা আর রূপোই তাঁর প্রাণ ছিল। বন্ধকী সোনা তিনি কম দখল করেন নি, এবিষয়ে দত্তগিন্নীর তিনি উপযুক্ত শিষ্যা ছিলেন। মেয়ের বিয়ের সময় তাঁকে এক ভরিও সোনা কিনতে হবে না। যা আছে তাতে রাজকন্যার বিয়ে হয়ে যেতে পারে। মেয়েকে লেখাপড়া শিখিয়ে মেমসাহেব বানাবেন, এ ইচ্ছা তাঁর ছিল না। আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিতা মেয়েদের তিনি দেখতে পারতেন না। যত সব ফুলবিবি, কাণা-কড়ির মুরোদ নেই, কঞ্চিখানা ভেঙে দু'খান করতে জানে না, আর লজ্জা সরম একেবারে নেই। কিন্তু মেয়েদেরও যে একটা স্বাধীন জীবনের দরকার আছে, এটাও তিনি অস্বীকার করতেন না। মেয়েকেও স্বাধীন হবার শিক্ষা দিতে হবে। তিনি ত কারো কাছে কখনও মাথা নীচু করেন নি, যদিও ইংরেজী শিক্ষা পান নি। তাঁর মেয়েও করবে না। তার জন্যে এত ধনসম্পদ্ তিনি রেখে যাবেন যে, কোন স্বামী তাকে উপেক্ষা করতে সাহস করবে না।

তবু লেখাপড়া একেবারে না শেখালে আজকাল চলে না। লোকে মুখ্যু ব'লে অবজ্ঞা করে, এমন কি বিয়ের বাজারেও একটু দর নেমে যায়। কিন্তু স্কুলে তিনি পাঠাবেন না মেয়েকে। পাঁচ রকম মেয়েদের সঙ্গে মিশে তাতে স্বভাব খারাপ হয়ে যায়। একটি মেয়ে শিক্ষয়িত্রী রাখলেন, সে বাড়ীতে এসে সন্ধ্যাকে পড়িয়ে যেতে লাগল।

পাঁচ-ছ বৎসর পর্য্যন্ত মেয়েকে নিয়ে তাঁকে কোন হাঙ্গাম পোহাতে হ'ল না। মেয়ের অসুখ-বিসুখ বিশেষ কিছু করে না, অবাধ্যও সে নয়, মোটামুটি মায়ের কথা শুনেই চলে। কখনও কখনও নূতন খেলনা বা রঙীন ফ্রকের জন্যে আবদার ধরে। তা সে আবদার মেটাতে পেরে দুর্গামণিই যেন বেশী কৃতার্থ হয়ে যান। ভাগ্যে দুটো পয়সা রোজগার করতে পেরেছিলেন, তাই না হাত তুলে মেয়েকে এটা-সেটা দিতে পারছেন? স্বামীর উপর নির্ভর করলে ত পাড়ার অন্য ছেলেমেয়েগুলোর মতই হ'ত? আধপেটা খেত, ময়লা ছেঁড়া কাপড় পরত আর সারাদিন অলিতে-গলিতে বদমাইসি ক'রে ঘুরত, লোকের গালমন্দ খেত। পয়সার মহিমার উপর তাঁর ভক্তি আরও অচলা হয়ে উঠতে লাগল।

কিন্তু মেয়ে আর একটু বড় হ'তেই তিনি বিপদের আভাস পেতে লাগলেন নানা দিক্ থেকে। মেয়ের জিনিষপত্রের উপর মায়া নেই। পাড়ার বাজে ছেলেপিলের সঙ্গে খেলবার জন্যে কাঁদে, সব সময় তাকে সামলান যায় না। নিজের খেলনা, জামা, যখন যা ইচ্ছে তাদের দিয়ে দেয়। বকলে কাঁদতে কাঁদতে বলে, "ওদের যে নেই।"

দুর্গামণি মেয়ের কান্না শুনতে পারেন না। জগতে এই একটি মাত্র ছোট্ট মানুষের কাছে তিনি পরাজিত তবু বলেন, "তোমারও কিছুই থাকবে না যদি সব যাকে তাকে দিয়ে দাও।"

সন্ধ্যার যুক্তিতর্কের অভাব নেই, বলে, "তুমি যে আবার দেবে। ওদের মা ত দেয় না?"

এ ত তবু অল্পের উপর দিয়ে যাচ্ছিল, আরও দু'এক বছর বয়স বাড়তেই মেয়ের আরও চোখ ফুটল। কত মেয়েরা সুন্দর সুন্দর জামা প'রে স্কুলে যায়, সেও যাবে তার ত অনেক সুন্দর সুন্দর জামা আছে। মা ত বই শ্লেট সব কিনে দিতে পারে? কেন সে যাবে না স্কুলে? কেন সে ওদের মত গান শিখবে না, ছবি আঁকা শিখবে না?

সন্ধ্যামণি শান্ত মেয়ে, কিন্তু জেদ ধরলে ছাড়ে না। মায়ের এই গুণটি পেয়েছে। সত্যাগ্রহ করতেও ছাড়ে না, সে দুধ খাবে না, ভাত খাবে না। তার মা এ সব সইতে পারেন না, তাঁকে হার মানতে হয়।

শেষ পর্য্যন্ত সন্ধ্যামণি স্কুলে ভর্ত্তি হয়ে তবে ছাড়ল। বই খাতা জামা জুতো কিছুর অভাব হ'ল না। যে ঝি মেয়ের পালকে নিয়ে রাস্তা দিয়ে যেত তাকেও ডেকে দুর্গামণি বখশিসের লোভ দেখিয়ে বশ করলেন। সে সর্ব্বদা যেন তাঁর মেয়ের হাত ধ'রে হাঁটে, ঝড় জল বা বেশী রোদে কখনও যেন বার না করে। আগেই বাড়ীতে এসে খবর দিলে তিনি বাড়ীর ঝিকে পয়সা দিয়ে পাঠিয়ে দেবেন, সে রিক্‌শা করে নিয়ে আসবে।

নিজের ঝিয়ের আর একটা কাজ বাড়ল, রোজ দুপুরে গিয়ে খুকীকে দুধ আর জলখাবার খাইয়ে আসতে হবে। অন্য মেয়েরা ফেরিওয়ালার কাছে এটা-সেটা কিনে খায়, তাঁর মেয়ের সেটা চলবে না।

সন্ধ্যামণির পড়াশুনো ত এগোতে লাগল। কিন্তু পাঁচ রকমের মেয়েদের সঙ্গে মিশে স্বভাবও কিছু কিছু বদলাতে লাগল। আগের মত বাধ্য নেই আর, যা খুশি তাই করার ঝোঁক বেড়েছে।

দুর্গামণি মনে মনে চিন্তিত হয়ে উঠতে লাগলেন। আর কিছুটা বড় হ'লে মেয়েকে আর হাতের মুঠোয় রাখা যাবে না। দেখতে বাপের মত, কিন্তু স্বভাবটা

একেবারেই মায়ের মত। এ মেয়ে চিরদিন নিজের মতে চলবে। কলকাতা আজব শহর, এখানের মেয়েগুলিও আজব, তাঁর সন্ধ্যাও যদি ঐ রকম স্বেচ্ছাচারিণী হয়ে ওঠে? কি সর্ব্বনাশ!

নিজের তাঁর বিয়ে হয়েছিল পনেরো ষোল বছরে, কিন্তু মেয়ের ন'বছর বয়স হ'তে না হ'তেই তিনি তার জন্যে পাত্র খুঁজতে লাগলেন। খুব খরচ ক'রে ভাল ঘরে, ভাল বরে বিয়ে দেবেন তিনি, শ্বশুরবাড়ী তখনই তখনই পাঠাবেন না, ব'লে-কয়ে দু-চার বছর নিজের কাছেই রাখবেন। একটু সেয়ানা হ'লে তবে পাঠাবেন। এ ছাড়া মেয়েকে আগলে রাখবার আর কোন উপায় তিনি ভেবে পেলেন না।

কথায় বলে, ভাত ছড়ালে কাকের অভাব হয় না। ঘটকীদের কাছে দুর্গামণি যা ফর্দ্দ দাখিল করলেন গহনা ও নগদ টাকার, তাতে তাদের চোখ ছানাবড়া হয়ে এল। সব তিনি এখনই দিচ্ছেন না, তবে তাঁর টাকাকড়ি, বাড়ী ঘর যা আছে সব মেয়েই পাবে। তাঁর আর ছেলেপিলে হবে না, ডাক্তারে বলেছে তাও জানিয়ে দিলেন। মেয়ে বড় হলেই তার জন্যে তিনি আলাদা দোতলা বাড়ী ক'রে দেবেন, জমি দেখে রেখেছেন।

এ হেন বিয়ে হ'তে দেরি হয় না। সন্ধ্যামণিরও বিয়ে হয়ে গেল দশ বছর বয়সে। ছেলের কুড়ি বছর বয়স, মেডিক্যাল কলেজে পড়ছে, ভাল নামজাদা ঘরের ছেলে, দেখতে ভাল। দুর্গামণির বেশ পছন্দ হ'ল। সন্ধ্যামণি অঢেল গহনাগাঁটি, কাপড় চোপড় দেখে, মাকে ছেড়ে যাবার দুঃখে কাঁদতেও ভুলে গেল।

কিন্তু এবার হ'ল নির্ম্মল আকাশ থেকে বজ্রপাত। বছর ঘুরতে না ঘুরতে সন্ধ্যামণির বিধবা হবার সংবাদটা শক্তিশেলের মত এসে পড়ল দুর্গামণির বুকে!

ভগবান্ থেকে আরম্ভ ক'রে সবাইকে দুর্গামণি চীৎকার ক'রে কটূক্তি করতে লাগলেন, শাপ-শাপান্ত করতে লাগলেন সব মানুষকে, যারা এ বিয়ের সঙ্গে জড়িত ছিল। এই দাগা পাবার জন্যে কি তিনি একরাশ টাকা খরচ করেছিলেন? মৃত জামাইকেও গাল দিতে ছাড়লেন না। ভারি ডাক্তার হচ্ছিলেন ছেলে, যমকে ত ঠেকাতে পারলেন না।

সন্ধ্যামণি ব্যাপারটা খুব ভাল ক'রে বুঝল না। তার খাওয়া-দাওয়া পোশাক-আশাকে মা খুব যে একটা পরিবর্ত্তন ঘটালেন তা নয়। তবে সে আর সিঁদুর পরে না, মাছ খায় না। কিন্তু তার বদলে দুধ ক্ষীর ফল পাকুড় খাওয়ার ঘটা আরও বেড়ে গেল। পুরনো স্কুল ছাড়িয়ে মা তাকে নূতন বড় স্কুলে দিয়ে দিলেন, সেখানে সে গাড়ী ক'রে যেতে লাগল। যা নিয়ে মেয়েটা ভুলে থাকে থাক, পাঁচ রকম মেয়ের সঙ্গে মেশাটার ভয়ও তিনি ত্যাগ করলেন।

টাকা রোজগারের চেষ্টায় আবার উঠে-প'ড়ে লাগলেন। চিরজীবন পায়ের ওপর পা দিয়ে ব'সে থাকতে পারে মেয়ে, এমন ব্যবস্থা তিনি ক'রে যাবেন। তাকে মাষ্টারণীগিরি করতে হবে না পেটের ভাতের জন্যে।

কিন্তু বড় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সন্ধ্যা গম্ভীর হয়ে উঠতে লাগল। নিজের অবস্থা সে বুঝতে আরম্ভ করেছে। গহনাগাঁটি গায়ে যা ছিল, বেশীর ভাগই খুলে ফেলল। রঙীন শাড়ী জামা আর পরতে চায় না, খাওয়া-দাওয়াও দিল কমিয়ে। মা বকলে চুপ ক'রে থাকে, কিন্তু জেদ ছাড়ে না। নিশিকান্ত খানিকটা অসুস্থ হয়ে প'ড়ে চাকরি-বাকরি ছেড়ে দিলেন। দুর্গামণির তাতে এসে গেল না বিশেষ কিছু। স্বামীর রোজগারের সঙ্গে তাঁর সংসার চালানোর সম্পর্ক কমই ছিল। ভদ্রলোক সামান্য কিছু টাকা পেলেন হাতে, সেটা ব্যাঙ্কে জমা রাখলেন। সামান্যই সুদ পাবেন, তাতে তাঁর তামাকের খরচ আর হোমিওপ্যাথিক ওষুধের খরচ চ'লে যাবে। এ টাকাটা আর প্রাণ ধ'রে স্ত্রীর হাতে দিতে পারলেন না।

সন্ধ্যামণি-তরুণী জীবনে প্রবেশ করল। ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করল, জেদ ক'রে কলেজে ঢুকল। মা বললেন, "অত পড়বার দরকারটা কি? তোমার খাবার-পরবার অভাব হবে?"

সন্ধ্যা বলল, "একটা কিছু নিয়ে ত থাকতে হবে?"

মা বললেন, "আমার কাজে ত একটু সাহায্যি করলে পারিস্। এই হিসেব-কিতেবগুলো।"

সন্ধ্যা বলল, "ওসব আমি পারব না। ওগুলো আমি পছন্দ করি না তা ত জানই।"

দুর্গামণি কি বলতে গিয়ে থেমে গেলেন। কাজ কি ওকে বেশী ঘাঁটিয়ে? যা মেয়ে, হঠাৎ ব'লে বসবে, "তোমার সুদের পয়সায় আমি আর ভাত খাব না।"

সুদ আদায়ের জন্যে শক্ত কথা অনেককে বলতে হয়, সন্ধ্যা কাছে থাকলে তার মুখ ব্যাজার হয়ে ওঠে, মায়ের কাছ থেকে স'রে যায়। তার বাবা রোজগার করেন না, সেও এখন অবধি কিছু করে না। মায়ের উপার্জ্জনে সকলে স্বচ্ছন্দে থাকে, ক্রমাগত তাঁর সমালোচনা করা ভাল দেখায় না।

পড়াশুনা যখন চুকে যাবে, তখন আবার মেয়ে কি বলবে—কে জানে? এখন তবু পড়া আর বাপের সেবা

নিয়ে আছে। পাড়াপড়শীর ঘরে মাঝে-সাঝে যায়, দুর্গামণি প্রাণ ধ'রে বারণ করেন না। সবাই তাঁর জানা-শোনা, সবাই তাঁর শাণিত জিভকে ভয় ক'রে চলে। তাঁর মেয়ের অনিষ্ট কেউ করতে চাইবে না। সবাই তাকে জন্মাবধি দেখছে, সকলেই ভালবাসে।

কিন্তু সবদিক্ থেকে কি আগলে রাখা যায়? পাড়া-প্রতিবেশীর ঘরে কত রকম ছেলেমেয়ে আছে। কলকাতার কত রকম কাণ্ড ত দুর্গামণি সারাক্ষণ শুনছেন। বাহির দেখে ত মানুষের ভিতর বোঝা যায় না? বিশেষ ভয় তাঁর পাড়ার ছেলেগুলোকে। সোনা অত্যন্ত পবিত্র স্বভাবের মেয়ে তা তিনি জানেন, কিন্তু ছেলেমানুষ ত?

একদিন বললেন, "অনিলের সঙ্গে অত কথা বলিস্ কেন? লোকে মন্দ বলতে পারে।"

সন্ধ্যা গভীর দৃষ্টিতে মায়ের দিকে তাকাল, বলল, "আমি মন্দ না হ'লে লোকে মন্দ বলবে কেন? অনিলদার কাছে মাঝে মাঝে পড়া ব'লে নিই, তাতে নিন্দে করার কি আছে? ওর ভাইবোন সবাই ত সেখানে থাকে।"

দুর্গামণি উত্তরে কিছু বললেন না। অনিলের বিরুদ্ধে সত্যিই কিছু জানেন না তিনি। সে সচ্চরিত্র ছেলে, পরের ভালই করে, মন্দ কখনও করে নি। কিন্তু তাঁর মেয়ের যে কপাল মন্দ।

দিন কাটতে লাগল। দুর্গামণি বাড়ীর দোতলা তুললেন, ভাড়াও দিলেন। সন্ধ্যা ক্রমেই যেন বেশী ক'রে মুষড়ে পড়ছে আর রোগা হচ্ছে। আই. এ. একবারে পাশ করতে পারল না। তার মা মাষ্টার রাখতে চাইলেন, তাতেও রাজী হ'ল না। বলল, "না মা, তোমার উপর আর ভার চাপাব না। আমি পড়ায় মন দিই নি ব'লে ফেল করেছি, এবার মন দিয়ে পড়ব।"

দুর্গামণি বললেন, "আমার টাকা কার জন্যে তবে?"

সন্ধ্যা বলল, "নিজের জন্যে একটু খরচ কর না? তোমার কি কোন সখ নেই?"

দুর্গামণি কপালে একটা চড় মেরে বললেন, "আমার আবার সখ?"

সন্ধ্যা বলল, "ঝি-চাকর রেখে একটু আরাম কর না? চিরকাল কি শুধু খাটবে? না হয় দান-ধ্যান কর, তীর্থ-ধর্ম্ম কর। আমাদের দেশে মেয়েরা বয়স বেশী হ'লে তাই ত করে।"

দুর্গামণি বললেন, "ওসব দিকে আমার মন যায় না বাপু।"

সন্ধ্যা একটু হেসে বলল, "তোমার খালি সিন্ধুকের ভিতরের সোনা আর সিন্ধুকের বাইরের সোনা।"

দুর্গামণি বললেন, "এক সোনার জন্যেই ত অন্য সোনার দরকার।"

বৎসর কয়েকটাই কেটে গেল, প্রায় একই ভাবে। দুর্গামণি আগের মতই আছেন শক্তি বা সামর্থ্য কিছুই কমে নি। জীবনযাত্রা এক ভাবেই চলেছে। সিন্ধুকের ভিতরের সোনার তাল আরও ভারি হয়েছে। সন্ধ্যামণি বি. এ. পাশ করেছে, সে আরও পড়তে চায়, কিন্তু এম. এ. পড়া মানে ট্রামে-বাসে ঘোরা আর ছেলেদের সঙ্গে এক-সঙ্গে পড়া, এতে দুর্গামণি রাজি নয়। চাকরি করতে দিতেও চান না। খাওয়া-দাওয়া ঠিকমত হবে না, রোগা মেয়ে আরো রোগা হয়ে যাবে। আসল কথা, তিনি সন্ধ্যাকে সম্পূর্ণ নিজের আয়ত্তের বাইরে চলে যেতে দিতে চান না।

নিজের পয়সা-কড়ির হিসাব-নিকাশের জন্যে দুর্গামণি মাঝে মাঝে অনিলকে ডেকে পাঠান। অঙ্কশাস্ত্রটা তাঁর খুব পরিষ্কার জানা নেই।

সেদিন বিকেলে অনিল ঘরে ঢুকে গৃহিণীকে না দেখে সন্ধ্যাকে জিজ্ঞাসা করল, "তোমার মা কোথায়?"

সন্ধ্যা বলল, "কোথায় আর? রান্নাঘরে।"

অনিল বলল, "তুমি গিয়ে রান্না কর, ওঁকে একটু পাঠিয়ে দাও। কি খাতাপত্র দেখতে হবে, তা দেখে দিয়ে যাই। আমায় তাড়াতাড়ি আর একটা কাজে যেতে হবে।"

সন্ধ্যা বলল, "কি কাজ তোমার? আবার inter-view?"

অনিল বলল, "প্রায় তাই। কি আর করি বল? তোমার মত ত বড়মানুষের এক সন্তান নয় যে কোন ভাবনাই ভাবতে হবে না?"

সন্ধ্যা বলল, "ভাগ্যে হও নি। সোনার শিকলে বাঁধা থাকা কিছু সুখের নয়।"

অনিল বলল, "শিকলটা একটু আল্‌গা করা যায় না বা একেবারে কেটে দেওয়া যায় না?"

সন্ধ্যা বলল, "কই আর পারছি। মা আমার একাধারে মা আর বাবা। তাঁকে এমন ব্যথা দিতে পারি না। কর্ত্তব্যবোধ ত একটা আছে?"

অনিল বলল, "নিজের প্রতিও ত একটা কর্ত্তব্যবোধ আছে? মানুষ হয়ে জন্মেছ, সেটা একেবারেই ব্যর্থ হয়ে যেতে দেবে?"

দুর্গামণি এসে পড়ায় সন্ধ্যাকে আর উত্তর দিতে হ'ল না। কিন্তু অনিলের কথাটা ভুলল না সে। সত্যিই নিজেকে সব দিক্ দিয়ে মাটি করছে সে।

হঠাৎ ভারতবর্ষের উপর বিনা মেঘে বজ্রাঘাত হ'ল। বিশ্বাসঘাতক শত্রু দেশ আক্রমণ করল।

দুর্গামণির প্রশান্ত তরঙ্গহীন সংসারেও ঢেউ উঠল। সন্ধ্যা ভয়ানক চঞ্চল হয়ে উঠল, দুর্গামণি সেই পরিমাণেই চুপ হয়ে গেলেন। চাঁদা চাইতে এখনই সব এল ব'লে, কি ক'রে ঠেকাবেন তিনি তাঁদের? মেয়ে ত শত্রুতাই করবে, আর স্বামী ত ভালতেও না মন্দতেও না।

সত্যিই সন্ধ্যাবেলা অনিল এসে উপস্থিত হ'ল। সামনে নিশিকান্তকে দেখে বলল, "আমাদের পাড়ার ক্লাব থেকে টাকা তুলে পাঠাচ্ছি, তাই এলাম।"

নিশিকান্ত অনেক ভেবেচিন্তে পকেট থেকে পাঁচটা টাকা বার ক'রে তার হাতে দিলেন। বললেন, "আমি গরীব মানুষ জানই ত বাপু, এর বেশী দেবার আমার ক্ষমতা নেই।"

কথাটা অজানা নয় অনিলের। সে অতঃপর রান্নাঘরের সামনে দাঁড়িয়ে বলল, "আপনি কি দিচ্ছেন মাসীমা?"

দুর্গামণি অনেক কষ্টে ঠোঁটের বজ্রআঁটুনি আলগা ক'রে বললেন, "আমি ত ভেবে কিছুই ঠিক করতে পারছি না বাবা, আমি পরে বলব।"

অনিলকে অগত্যা তখনকার মত চ'লেই যেতে হ'ল। সন্ধ্যার দিকে তাকিয়ে একটু শুকনো হাসি হাসল যাবার আগে।

সন্ধ্যা গিয়ে দাঁড়াল মায়ের কাছে। বলল, "ফিরিয়ে কেন দিলে মা? তোমার কি টাকার অভাব আছে নাকি?"

দুর্গামণি বললেন, "টাকা যেমন আছে, টাকার দরকারও তেমনি আছে।"

সন্ধ্যা বলল, "নগদ টাকা না হয় না দিলে, তোমার দরকার থাকতে পারে। কিন্তু কলসী বোঝাই সোনা যে রেখেছ সিন্ধুকে, সে তোমার কোন্ কাজে লাগছে? তার থেকে কিছু দিতে পার না?"

দুর্গামণি মুখ কালো ক'রে বললেন, "ওদিকে চোখ দিও না বাপু, ও দান করবার জন্যে নয়।"

সন্ধ্যা বলল, "দেশ তোমার কাছে কিছু নয় মা? তার ভাল-মন্দে তোমার কিছু এসে যায় না? ডাকাত এসে যদি পড়ে, তখন এ সব সোনাদানা কোথায় থাকবে?"

দুর্গামণি উত্তর দিলেন না। মেয়ে চ'লে যাচ্ছে দেখে বললেন, "রাগ করিস না বাপু, গোটা দশেক টাকা না হয় দিচ্ছি। তোর বাপও কিছু দিয়েছে।"

সন্ধ্যা বলল, "থাক্ মা, দরকার নেই। বাবা দেবেন কোথা থেকে, তাঁর ত কিছু নেই? কিন্তু তোমার কাছ থেকে আমি দশ টাকা নিয়ে তোমার অপমান করব না, দেশেরও অপমান করব না। আমাদের দেশে মাকে আর জন্মভূমিকে স্বর্গের চেয়ে গরীয়সী বলে, এদের অশ্রদ্ধার দান দিতে নেই।"

সে তখনই কোথায় চ'লে গেল। দুর্গামণি মুখ কালো ক'রে রান্না ক'রে যেতে লাগলেন। মনটা ভয়ঙ্কর ভার হয়ে উঠল, আর কিছুর জন্যে নয়, সন্ধ্যা রাগ ক'রে গেল ব'লে, তাঁকে ছোট ভাবল ব'লে।

মেয়ে ফিরে এল যখন তখন ঘরে আলো জ্বলে গেছে। নিশিকান্ত জিজ্ঞাসা করলেন, "কোথায় গিয়েছিলি মা?"

সন্ধ্যা বলল, "পাড়ায় ঘুরে এলাম। জান বাবা, অনিলদারা অনেক টাকা তুলেছে। সোনাও প্রায় পঞ্চাশ ভরি জোগাড় করেছে।"

নিশিকান্ত বললেন, "তা লোকে দেবে বৈকি, এমন দিনে না দেবে ত কবে দেবে?"

দুর্গামণি কোন মন্তব্য করলেন না। সন্ধ্যাকে বললেন, "সকাল সকাল খেয়ে নে, আমার মাথাটা একটু ধরেছে।"

সন্ধ্যা গিয়ে খেতে বসল মায়ের সঙ্গে। কয়েক গ্রাস মুখে নিয়ে বলল, "আচ্ছা মা, বিয়ের সময় আমায় ত একরাশ গহনা দিয়েছিলে, সে ত আমি পরছি না, কোন-দিন পরবও না। সেগুলো দেওয়া যায় না?"

দুর্গামণির চোখ প্রায় কপালে উঠল, বললেন, "তুই বলিস্ কি রে? অত গহনা দিয়ে দেব? মেয়েমানুষের এ হ'ল গিয়ে স্ত্রীধন। এ কেউ নষ্ট করে কখনও? এখন না হয় আমি আছি। এর পর একলা পড়বি যখন, তখন ঠেকায় পড়লে কি তোমার দেশ-মা দিতে আসবে, না প্রধান মন্ত্রী দিতে আসবে?"

সন্ধ্যা খাওয়া থামিয়ে বলল, "কেউ দিতে আসবে না, নিজের ঠেলা নিজেকেই সামলাতে হবে। এ সব সোনা-দানা আমার কোন কাজে লাগবে না, ও আমি ছোঁবও না।"

দুর্গামণির মেজাজ এবার গরম হ'তে আরম্ভ করল, বললেন, "কেন, শুনি? আমি কি চুরি ক'রে এনেছি? এত ঘেন্না কিসের?"

সন্ধ্যা বলল, "ঘেন্না করছি না, কিন্তু ঐ সোনায় তোমার অভিশাপ জড়ান আছে, কত লোকের বুকফাটা দীর্ঘনিশ্বাস মিশে আছে ওর সঙ্গে, ও ছুঁতে আমার ভয় করবে।"

দুর্গামণি স্তম্ভিত হয়ে চুপ ক'রে গেলেন। খানিক পরে বললেন, "খাচ্ছিস্ না কেন?"

সন্ধ্যা বলল, "আর খেতে পারছি না।" ব'লে অর্দ্ধেক ভাত ফেলে উঠে গেল।

দুর্গামণির সে রাত্রে ঘুমই হ'ল না। সারারাত ছট্‌ফট্ ক'রে ভোর হ'তে না হ'তেই উঠে পড়লেন।

সন্ধ্যা চা খেয়েই কোথায় বেরোচ্ছে দেখে বললেন, "কোথায় চল্‌লি আবার সাত সকালে?"

মেয়ে বলল, "মলিনার ছোট বোন দুটোকে আমি পড়াব সকালে, কথা দিয়েছি, সেখানে যাচ্ছি।"

দুর্গামণির মুখটা প্রলয় গম্ভীর হয়ে উঠল, বললেন, "কি দরকার পড়ল তোমার? নিজের জন্যে কবে কি চেয়ে পাও নি যে দৌড়োলে চাকরি করতে?"

সন্ধ্যা বলল, "শুধু নিজের দরকারই কি দরকার? আরও কত রকম দরকার আছে, সব সাবালক মানুষেরই নিজের বলতে কিছু থাকা উচিত, যার উপর একলা তারই অধিকার। নিজে ত সেটা জানই, তা না হ'লে অত অল্প বয়সে স্বামীর রোজগারে খুশী না থেকে আলাদা রোজগার করতে গিয়েছিলে কেন?"

এর কিছু উত্তর তার মা খুঁজে পেলেন না, মেয়ে পড়াতে চ'লে গেল।

গোলযোগ ক্রমে বাড়তেই লাগল, কমল না। অনেক বাড়ীতে এই দেওয়া-না-দেওয়া নিয়ে ঝগড়া-ঝাঁটিও হয়ে গেল। অনিল আবার এসে হাজির হবে, এই এক ভয় ছিল দুর্গামণির। কিন্তু সে আর এলই না, সন্ধ্যা হয়ত তাকে বারণ ক'রে দিয়েছিল।

মাসখানিক পরে সন্ধ্যা একদিন হাসিমুখে বাড়ী ঢুকল। তার মা জিজ্ঞাসা করলেন, "হাস্‌ছিস্ কেন রে?"

সন্ধ্যা বলল, "এতদিন লজ্জায় আমি অনিলদাদের বাড়ী যাই নি, আজ মাইনের টাকাটা পেলাম, তাই তাদের তহবিলে দিয়ে এলাম।"

দুর্গামণি বললেন, "সবটাই?"

সন্ধ্যা বলল, "হ্যাঁ, ক'টা বা টাকা, তার আবার কি রেখে কি দেব?"

দুর্গামণি বললেন, "কি সব ছেলে-ছোক্‌রার কাণ্ড হচ্ছে বুঝি না। এই রকম ক'রে ধনে-প্রাণে শেষ হওয়া!"

সন্ধ্যা বলল, "কি পাগলের মত কথা বল মা? একে শেষ হওয়া বলে? প্রাণ যারা দিচ্ছে, তারা অমর হবে, শেষ হবে না। জান, অনিলদা যুদ্ধে চ'লে যাচ্ছে, নাম দিয়ে এসেছে।"

দুর্গামণি গালে হাত দিয়ে বললেন, "কি সর্ব্বনাশ! বুড়ো মা-বাপের মুখের দিকে তাকাল না?"

সন্ধ্যা বলল, "বাপ-মার ত গৌরববোধ করা উচিত, এমন ছেলে ব'লে। সবচেয়ে যা প্রিয়, তা যে দান করতে পারে, তার মত বড় কে?"

দুর্গামণি ক্ষীণকণ্ঠে বললেন, "তোমাদের সব বাড়াবাড়ি। যুদ্ধে না গেলে বুঝি দেশের কাজ করা যায় না?"

সন্ধ্যা বলল, "সবাই তাই যদি ভাবে, ত যুদ্ধ করবে কে?" ব'লে সে নিজের ঘরে ঢুকে গেল। দুর্গামণি ভারাক্রান্ত মনে নিজের কাজে গেলেন।

অনিল যেদিন চ'লে গেল, সেদিন কি মনে ক'রে তার সঙ্গে একবার দেখা ক'রে এলেন, কিছু হয়ত বলতে চেয়েছিলেন, লজ্জায় বলতে পারলেন না।

দিন তিন-চার পরে সকালে উঠে দেখলেন, সন্ধ্যা তাঁরও আগে উঠে ব'সে আছে। ব্যস্ত হয়ে বললেন,'কি? শরীর খারাপ নাকি?"

সন্ধ্যা বলল, "না, শরীরে কিছু হয় নি, তোমাকে একটা কথা বলব ব'লে ব'সে আছি।"

অমঙ্গল আশঙ্কায় দুর্গামণির বুকের ভিতরটা হিম হয়ে গেল, ক্ষীণ কণ্ঠে বললেন, "কি কথা?"

সন্ধ্যা বলল, "আমি নার্সিং শিখতে যাচ্ছি, কিছুদিন হোষ্টেলে থাকতে হবে, তার পর সরকার যেখানে পাঠাবেন সেখানে যাব, তুমি আমায় বারণ ক'রো না।"

দুর্গামণি মাটিতে ব'সে পড়লেন, বললেন, "এ বুঝি অনিলের পরামর্শ? ওকে দিয়ে তোমার মন্দ হবে, এ আমার মনই বলেছিল। বারণ ক'রে কি করব, তুমি ত আমার কথা শুনবে না? কিন্তু মা-বাপ কি কেউ নয়? তাদের প্রতি কোন কর্ত্তব্যই নেই? আমার আর কে আছে?"

সন্ধ্যা বলল, "মা, তুমি শুধু মা নও, দেশও মা। তার জন্যে যে অনেক করবার। এখন তার দায় বেশী, তার কাজে যাচ্ছি। বেঁচে থাকলে নিশ্চয় ফিরে আসব তোমার কাছে। এখনই ত তোমার আমাকে দরকার নেই? তুমি সুস্থ সক্ষম আজ, কোন অভাব নেই তোমার। তুমি বাধা দিও না, শরীর দিয়ে সেবা করা ছাড়া আমার আর ত কিছু উপায় নেই?"

সন্ধ্যামণি যেদিন চ'লে গেল, সেদিন সারাদিন দুর্গামণি জলস্পর্শ করলেন না। শোবার ঘরের মেঝেতে প'ড়ে রইলেন। দু-তিনটি স্ত্রীলোক টাকা ধার করতে এল, তাদের দূর্ দূর্ ক'রে তাড়িয়ে দিলেন।

পরদিন উঠে বসলেন। ঝিকে বললেন, "আমি সকালে বেরচ্ছি, তুই রান্নাটা দেখিস্, ফিরতে দেরি হবে আমার।"

নিশিকান্ত তাকিয়ে দেখলেন। দুর্গামণির কঠিন মুখ আরও যেন কঠিন হয়ে উঠেছে। সিন্ধুকের তালা খুলে একটা ব্যাগে তিনি সোনার গহনাগুলো ভরছেন। ব্যস্ত হয়ে বললেন, "ও কি হচ্ছে? ওগুলো নিয়ে কোথায় চললে, শুনি?"

দুর্গামণি বললেন, "দান ক'রে দেব যুদ্ধের জন্যে।"

নিশিকান্ত বললেন, "খাওয়া-পরা চলবে কিসে?"

দুর্গামণি বললেন, "বাড়ীভাড়ার টাকায় দুটো বুড়ো মানুষের বেশ চ'লে যাবে। এই পাপের সোনা বিদায় না করলে আমার সত্যি সোনা ফিরে আসবে না। সে আমায় ঘেন্না ক'রে চ'লে গেছে।"

নিশিকান্ত বললেন, "তুমি একেবারে পাগল হয়ে গেছ। ঝোঁকের মাথায় কাজ ক'রো না, এর পর পস্তাবে।"

দুর্গামণি বললেন, "কিছু পস্তাব না। সাগরে ডুব দিয়ে মানুষে যা ছাড়ে, তা আর ছোঁয় না। আমিও সাগরে ডুব দিয়ে সোনা ছাড়লাম। মেয়ে গেল দেশের জন্যে জীবন দিতে, আমি মা হয়ে তার কাছে হার মানব না। এগুলো জীবনের তুল্য ছিল আমার কাছে, আমারও জীবন দেওয়া হ'ল।"
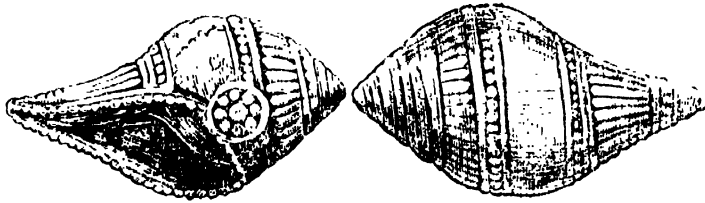
হরতন

শ্রীবিমল মিত্র

১২

এ-সব ঘটনা আজকের নয়। এই আজ যখন কর্ত্তা-মশাই কলকাতা থেকে হরতনকে খুঁজে নিয়ে কেষ্টগঞ্জের গাঁয়ে ফিরে আসছেন, তখন আর কারো সে-ঘটনা মনে থাকবার কথা নয়। মনে থাকলে থাকতে পারে এক সদানন্দর। তা সে সদানন্দও ত নিখোঁজ।

সদানন্দকে যে এত খাতির, সদানন্দকে যে রোগী সাজিয়ে হাসপাতালে বসিয়ে এমন রাজার হালে খাওয়ান-দাওয়ান, তার মুলেও ছিল এই ঘটনা।

দোলগোবিন্দ সেই বিয়ের দিনের ঘটনার পর থেকেই যেন কেমন হয়ে গিয়েছিল। সদানন্দ প্রথমে বলেছিল বিয়েটা হয়ে গেলেই তার পাওনা মিটিয়ে দেবে।

তা হ'ল না।

সাত সমুদ্র তের নদী পেরিয়ে তবে বিয়ে। বর-যাত্রীরা দল বেঁধে গিয়েছিল সবাই। দুলাল সা বর-কর্ত্তা হয়ে গিয়েছিল। নিতাই বসাকও ছিল। বরপক্ষের লোক যখন গিয়ে পৌঁছুল তখন ব্যবস্থা দেখে অবাক্ হয়ে গেল। এতগুলো লোক গেল, আপ্যায়ন করবার তেমন কেউ নেই।

নিতাই বসাক জিজ্ঞেস করলে—কই হে, ঘটক কোথায় গেল? দোলগোবিন্দ প্রামাণিক আমাদের?

দোলগোবিন্দ ব্যস্ত হয়ে এসে বলেছিল—ডাকছেন নাকি আমাকে বসাক মশাই?

নিতাই বসাক বললে—তা ডাকব না? বলি পান-তামাক কোথায়? খাতির করবার লোকজন সব কোথায় গেল?

—বড় মুশ্‌কিল হয়েছে বসাক মশাই, ব্যবস্থা সবই ঠিক আছে, একটা গোলমাল হয়ে গেছে শুধু—ব'লে কাকে যেন ওদিকে ডাকতে ডাকতে চ'লে গেল। বললে—অ নিবারণ, নিবারণ কোথায় গেল··

দোলগোবিন্দ সেই যে নিবারণকে ডাকতে গেল আর তার পাত্তা পাওয়া যায় নি। কিন্তু বিজয়ের বিয়ে তা ব'লে আটকে থাকে নি। পাত্রীর বুড়ী পিসীমা জ্বরে ধুঁকছিল বিছানায় শুয়ে। সেই পিসীমাই জ্বর নিয়ে উঠে বসতে যাচ্ছিল।

নিতাই বসাক বললে—থাক্ থাক্, আপনাকে আর উঠতে হবে না কষ্ট ক'রে—

বুড়ো মানুষ বটে, কিন্তু টাকা ছিল বুড়ীর। সেই টাকার জন্যেই গ্রামের লোকজন এসে জুটেছিল। তারাই পরিবেশন করলে। তারাই সমস্ত আয়োজন আপ্যায়ন করলে শেষ পর্য্যন্ত। একটু রাত হ'ল বটে, কিন্তু কাউকে অভুক্ত ফিরতে হ'ল না। শেষ পর্য্যন্ত সবাই লুচি, বেগুন ভাজা, কুমড়োর ছক্কা, মাছের কালিয়া, চাটনি, দই মিষ্টি খেয়ে পান চিবোতে লাগল। শোবার বন্দোবস্ত-তেও কোনও ত্রুটি হয় নি কোথাও। কোথা থেকে বালিশ, বিছানা, তোশক, মাদুর সব যোগাড় হয়ে গেল। কারো কোনও অসুবিধেই হ'ল না।

শেষ পর্য্যন্ত নিশ্চিন্ত হ'ল দুলাল সা। নিশ্চিন্ত হ'ল নিতাই বসাক।

আরো বেশি ক'রে সবাই নিশ্চিন্ত হ'ল বউ দেখে। একেবারে দুর্গা প্রতিমা।

ছোট মেয়ে দেখেই পছন্দ করেছিল দুলাল সা। একেবারে ছোট বয়েস থেকেই এসে দুলাল সা'র সংসারের ভার মাথায় তুলে নেবে। বাপ নেই। মাও কিছুদিন আগে মারা গেছে। শুধু এই ভাইঝিটির বিয়ে দেবার জন্যেই পিসীমা বুড়ো হাড় নিয়ে বেঁচে ছিল।

দোলগোবিন্দ বলেছিল—মেয়ে পাবেন আর সম্পত্তিও পাবেন। ওই পিসী মারা গেলে সমস্ত সম্পত্তি আপনার ছেলের হাতেই বর্ত্তাবে—

বিজয়ও তখন ছোট। বড় মানিয়েছিল তার সঙ্গে নতুন-বৌকে।

পরের দিন নৌকো যখন তৈরী হয়েছে তখন দোল-গোবিন্দ এসে হাজির।

নিতাই বসাক তাকে দেখে অগ্নিশর্ম্মা। এই মারে ত সেই মারে।

বললে—তুমি কোথায় ছিলে দোলগোবিন্দ? তুমি কোথায় পালালে আমাদের ফেলে?

দোলগোবিন্দ যেন আকাশ থেকে পড়ল। বললে—পালাব কেন আমি বসাক মশাই? আমার পাওনা-গণ্ডা না নিয়েই আমি পালাব? আপনি বলছেন কি?

—তা হ'লে তোমায় সারারাত টিকি দেখতে পলাম না যে?

দোলগোবিন্দ বললে—তা হ'লে ওগুলো খেলেন ক? এতগুলো লোকের খাবার ব্যবস্থা করলে কে?

—তুমিই সব করলে নাকি?

—আজ্ঞে সম্বন্ধ ক'রে দিয়েই পালাব তেমনি ঘটক পান নি আমাকে বসাক মশাই। পিসীমার ঠিক দিন ঝেই যে অসুখ হয়ে গেল, নইলে কি আমি ভাবতাম?

তা দোলগোবিন্দও বর-কনের সঙ্গে কেষ্টগঞ্জে এসেছিল। এসেও কিন্তু তার উৎকণ্ঠা কমে না। যাকে দখে তাকেই জিজ্ঞেস করে—হ্যাঁ গো, সদানন্দবাবু কোথায় গেল? সেই পাটের আরতের সদানন্দ?

কেউ বললে—আছে এখানেই কোথাও—

সদানন্দ এমন কেউ নয় এ-বাড়ীর যে সে না হ'লে লোকজন উপোস করবে। সুতরাং তার খবর রাখবার কথা নয় কারো। সবাই যে-যার কাজে ব্যস্ত। দোল-গোবিন্দর কোনও কাজই নেই। বৌভাত চুকে গেলেই তার পাওনা-গণ্ডা মিটিয়ে দেবে নিতাই বসাক। সমস্ত দিন দম্ ভ'রে তামাক খেয়ে বেড়ালেই হয়। যজ্ঞি বাড়িতে এসে আর কী করবে সে?

কিন্তু বৌভাত মিটে গেল, তখনও উৎকণ্ঠা কমে না। তখনও সদানন্দকে খুঁজে বেড়ায়। শেষে অনেক রাত্রে যখন সবাই খেয়ে-দেয়ে পান চিবুতে চিবুতে বাড়ী চ'লে গেছে, বর-কনে বাসর-ঘরে ঢুকেছে, তখনও দোল-গোবিন্দ চারদিকে পাগলের মত ঘুরে বেড়াচ্ছে।—হ্যাঁ গো, সদানন্দকে দেখেছ তোমরা কেউ? সদানন্দকে?

নিতাই বসাককে কে একজন খবর দিলে। বললে—ঘটক মশাই কেমন আবোল-তাবোল বকছে—

বাইরে তখন কেউ নেই। এঁটো কলাপাতার ডাঁই প'ড়ে আছে রাস্তার ওপর। যে-যেখানে পেরেছে সারা-দিন খাটুনির পর অঘোরে ঘুমোচ্ছে। সানাই-ওয়ালারাও মাচার ওপর ঘুমে অচেতন। নিচে ক'টা ঘেয়ো কুকুর কাড়াকাড়ি লাগিয়েছে এঁটো-কাঁটা নিয়ে। তারই মধ্যে দোলগোবিন্দ আপন মনেই বিড়বিড় ক'রেই বকছে—সদানন্দ কোথায় গো, সদানন্দ কোথায়?

অন্ধকার নির্জ্জন আবহাওয়ায় দোলগোবিন্দর সেই অস্পষ্ট কথাগুলোও যেন বড় তীক্ষ্ণ হয়ে বাতাসের বুকে গিয়ে বিঁধছে।

—আমাদের সদানন্দকে দেখেছ? সদানন্দ?

নিতাই বসাক গিয়ে ধমক দিলে—কি গো, দোল-গোবিন্দ, কি বলছ মনে মনে?

—আজ্ঞে?

—বলি কি বলছ তুমি মনে মনে?

দোলগোবিন্দর চোখে তখন নেশার ঘোর লেগেছে যেন।

নিতাই বসাকের দিকে ফিরে বললে—সদানন্দকে দেখেছ তুমি? সদানন্দকে?

নিতাই বসাকের তখনি সন্দেহ হ'ল।

জিজ্ঞেস করলে—নেশা করেছ নাকি, ও দোলগোবিন্দ, নেশা করেছ তুমি? আমাকে চিনতে পারছ না তুমি? আমি নিতাই বসাক—

দোলগোবিন্দর তখন যেন এক মুহূর্ত্তের জন্যে একটু চেতনা ফিরে এল, কিন্তু আবার তারপরই বিস্মৃতির মধ্যে তলিয়ে গেল—

নিতাই বসাক আবার জিজ্ঞেস করলে—তুমি খেয়েছ?

—সদানন্দকে দেখেছ তুমি? সদানন্দকে?

এ যেন এক অনন্ত প্রশ্ন আচ্ছন্ন ক'রে ফেলেছে দোল-গোবিন্দকে। সারা জগৎ জুড়ে তার কাছে যেন আর কিছু নেই, আর কেউ নেই। শুধু সদানন্দ আর সদানন্দ। সদানন্দই যেন বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডে এক এবং আদি সত্য। দোল-গোবিন্দর কাছে আর সমস্ত মিথ্যে, আর সমস্ত অহেতুক, আর সমস্ত নিরর্থক!

তার পর নিতাই বসাকও আর দাঁড়াল না সেখানে।

পাগলের সঙ্গে মিছিমিছি কথা ব'লে কোনও লাভ নেই। লোকটার মাথা খারাপ হয়ে গেল এক দিনেই, এই সেদিনও বেশ ছিল। কথা-বার্ত্তা বলেছে, পাওনা-গণ্ডা নিয়ে দর বাড়িয়েছে, কমিয়েছে, আর সেই বৌভাতের রাত্রি থেকেই যেন অন্য-মানুষ হয়ে গেল।

নিতাই বসাকও তখন বাড়ীর ভেতরে গিয়ে নিজের শোবার বন্দোবস্ত ক'রে নিলে।

তার পরদিন সকাল থেকেই কেষ্টগঞ্জের লোক দেখতে পেলে। লোকটা সারারাত ঘুমোয় নি। চোখ দুটো লাল। প্রথম দিন পায়ে জুতো ছিল। হাতে ছাতাটাও ছিল। গায়ে একটা জামাও ছিল। সারা দিন এখানে-ওখানে ঘুরতে লাগল। তার পর দিন ঘাটের কাছে। সেই মুখের বিড়-বিড় শব্দ। সদানন্দ আছে? সদানন্দ?...

তার পর দিন থেকে আস্তে আস্তে চেহারাটা আরও শুকিয়ে আসতে লাগল। মুখের দাড়ি খোঁচা খোঁচা হয়ে

বেরোতে লাগল। পায়ের জুতোটা আর নেই। ক্রমে জামাটাও ছিঁড়ে আসতে লাগল। সমস্ত দিনরাত সেই এক বিড় বিড় শব্দ। সদানন্দর নামটাই যেন জপমালা করে ফেললে দোলগোবিন্দ।

দোলগোবিন্দকে দেখলে লোকে আর গ্রাহ্য করত না আগের মতন। সে-ও কারো দিকে চাইত না। সে-ও রাস্তা দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে আপন মনে বিড় বিড় ক'রে চলত।

সদানন্দ যেদিন ছুটির পর গদিতে এসে আবার মাল গুণতে লাগল, সেদিন অনেকে বললে—কি হে সদানন্দ, দোলগোবিন্দ তোমায় খোঁজে কেন?

সদানন্দ অবাক্ হয়ে গেল।

বললে—দোলগোবিন্দ কে?

দোলগোবিন্দ পরামাণিক।

তবু সদানন্দ চিনতে পারে না। জিজ্ঞেস করে—কে দোলগোবিন্দ পরামাণিক? কোথায় বাড়ী? কোথায় বাড়ী তা কে জানে? ঘটক ঘটকই। ঘটকের আবার বাড়ীর খবর কে রেখেছে?

—চিনতে পারলে না তুমি?

সদানন্দ বললে—আজ্ঞে চিনব কি, ও নামই কখনও শুনি নি আমার বাপের জন্মে!

—কিন্তু এত লোক থাকতে তোমায় খোঁজে কেন হে?

—তা আমি কি জানি কর্ত্তা!

—তা তুমি একবার চল না, কথা বলবে তার সঙ্গে?

সদানন্দ রেগে গেল। বললে—আমার আর কাজ-কম্ম নেই, আমি যাব যার-তার সঙ্গে কথা বলতে? আমার পাটের গাঁট কে গুণবে?

শুধু একজন নয়। আরও অনেকেই এল সদানন্দের কাছে। সদানন্দ যে ছুটি থেকে ফিরে এসেছে তা জানবার সঙ্গে সঙ্গেই লোকে এল দেখতে। সবাই ওই একই কথা বলে। সবার মুখেই ওই এক প্রশ্ন। আর কোনও লোকের নাম করছে না, শুধু সদানন্দর নাম। দোল-গোবিন্দর চেহারা তখন আর চেনবার উপায় নেই। খালি গা, খালি পা। তেল না মেখে মেখে মাথায় জটা হয়ে গেছে। দাড়িতে উকুন বাসা করেছে। তখন আঁস্তাকুড়েই ঘর-বাড়ী বানিয়ে ফেলেছে দোলগোবিন্দ। যা-তা খায়। কোমরে কাপড়ের ঠিক থাকে না।

সদানন্দ সকলের পীড়াপীড়িতে আর থাকতে পারলে না।

বললে—চল তা হ'লে দেখেই আসি—লোকটা কে?

তারপর বললে—তোমরা ঠিক জানো আমার নাম করছে?

—হ্যাঁ গো, তোমার নামই করছে—বলছে সদানন্দ কোথায়—

—তা ভগমানের রাজ্যিতে আমি ছাড়া আর কোনও সদানন্দ থাকতে নেই?

তারপর একটু থেমে বললে—তা চলো দেখেই আসি মজাটা—

সামনে এসে দাঁড়াল সদানন্দ।

রাস্তার এক পাশে একটা গাব গাছ। তারই তলায় ধুলোবালির ওপর তখন নোংরা ছেঁড়া কাঁথা গায়ে দিয়ে আবোল-তাবোল বকছিল দোলগোবিন্দ। এতগুলো লোক সামনে আসতেও তার কোন ভ্রুক্ষেপ নেই। সে একমনে বিড়বিড় ক'রে চলেছে—সদানন্দকে দেখেছ, সদানন্দ—

সদানন্দ এবার সামনে এগিয়ে গেল।

বললে—বলি কাকে খুঁজছ গো তুমি? খুঁজছ কাকে? আমিই তো সদানন্দ, এই ত আমি এসেছি।

দোলগোবিন্দ সদানন্দর দিকে চাইলেও না। যেন জানতেও পারলে না কেউ এসে দাঁড়িয়েছে তার সামনে।

সদানন্দ সাহস ক'রে আরো ঝুঁকে দাঁড়াল। বললে—ভাল ক'রে চেয়ে দেখ আমার দিকে, আমিই সদানন্দ, আমাকে খুঁজছ কেন?

এতক্ষণে ঘোলাটে চোখ তুলে চাইল দোলগোবিন্দ।

বললে—সদানন্দকে দেখেছ, সদানন্দ?

সদানন্দ বললে—আরে কি আশ্চর্য্য, আমিই ত সদানন্দ—আমাকে চেন তুমি?

দোলগোবিন্দ তবু বিড় বিড় করছে—সদানন্দকে দেখেছ—সদানন্দ?

—আরে এ ত আচ্ছা পাগলের ডিম! এ কোত্থেকে এল কেষ্টগঞ্জে?

নিরঞ্জন পাশে দাঁড়িয়ে ছিল। সে বললে—আজ্ঞে, এই পাগলটাই ত সা'মশাই-এর ছেলের বিয়ের সম্বন্ধ করেছিল—

সদানন্দ জিভ্ দিয়ে একটা চুক্ চুক্ আওয়াজ তুলল।

—আরে এ যে একটা আস্ত পাগল! এই পাগলের কথায় ছেলের বিয়ে দিলে সা'মশাই? ভু-ভারতে আর ঘটক পেলে না?

তারপর সকলের দিকে চেয়ে বলতে লাগল—তা ভাল ক'রে দেখে-শুনে বিয়ে দিয়েছেন ত? আরে রাম

রাম, ছেলের বিয়ে ব'লে কথা! যার-তার কথায় বিয়ে দিলেই হ'ল? কুটুম কেমন?

কুটুম আর কেমন! দিয়েছে-থুয়েছে ত ভালই। তবে দুলাল সা' ত চায় নি কিছুই। দাবী-দাওয়া কিছুই ছিল না দুলাল সা'র। মেয়েটি ভাল লেগেছে চোখে। আর মেয়ে দেখতে যাবার আগেই ঠিক একটা তিসির অর্ডার এসেছিল হাজার দশেক টাকার। লক্ষণটা ভাল।

আর ছেলের বিয়ের পর থেকেই যেন কোথা থেকে আকাশ ফুঁড়ে টাকা আসতে লাগল কারবারে। পয়মন্ত বউ না হ'লে কি এমন হয়?

সদানন্দ বললে—ভাল হ'লেই ভাল রে বাবা! আবার অতি ভালর গলায় দড়িও ত পড়ে—

তা সে-সব কথায় কেউ আর সায় দেয় নি। সা' মশাই খাইয়েছে ভাল, বউ ভাল হয়েছে, আর কি চাই? এখন ভবিতব্য। ভবিতব্যর হাত ত কেউ এড়াতে পারবে না? তুমি ভাল ধরে ছেলের বিয়ে দিলে, তারপর মেয়ের বাপের বাড়ী ঝেঁটিয়ে লোক এসে জুটল তোমার ঘাড়ে! তখন?

—মেয়ের বাপ-মা?

—বাপ-মা নেই, এক পিসীমা আছে, তাও আজ আছে কাল নেই এমনি অবস্থা—

সদানন্দ যেন নিজের মনেই বলতে লাগল—কে জানে বাবা, বংশ-টংশ দেখে বিয়ে দিয়েছেন কি না সা'মশাই, আমার ত ভয় করছে হে—

—তা ছেলের বিয়ে যখন দিয়েছে, তখন কি আর দেখে দেয় নি সা'মশাই?

—কে জানে ভাই, আমার ত ভয় করছে। শেষ-চাঁড়াল-ফাঁড়াল না হয়—

ব'লে আর দাঁড়াল না সদানন্দ। সেখান থেকে চ'লে গেল নিজের কাজে। দোলগোবিন্দ তখনও সেখানে ব'সে ব'সে বিড় বিড় করছে—সদানন্দ আছে, সদানন্দ—

যতদিন দোলগোবিন্দ ছিল কেষ্টগঞ্জে ততদিন ওইটেই ছিল তার বাঁধা বুলি।

কথাটা কেমন ক'রে নিতাই বসাকের কানে গেল একদিন। সংসারে একজনের কথা আর একজনের কানে তোলবার লোকের অভাব হয় না কখনও। সদানন্দর কথাটা তখন রং চড়িয়ে চড়িয়ে সেটার অন্য চেহারা দাঁড়িয়েছে।

নিতাই বসাক একদিন ডেকেই পাঠালে সদানন্দকে। সদানন্দ আসতেই নিতাই বসাক জিজ্ঞেস করলে—বলি, সদানন্দ, তোমার কি চাকরি-বাকরি করার ইচ্ছে নেই?

সদানন্দ বললে—আজ্ঞে, চাকরি না-করলে খাব কি?

—তা সে-কথাটা সবসময় মনে থাকে না বুঝি?

—আজ্ঞে, মনে না-থাকলে চাকরি করছি কেন?

নিতাই বসাক সদানন্দর আগা-পাশ্‌তলা একবার দেখে নিলে। তারপর বললে—খুব বেয়াদপি হয়েছে তোমার, না?

—আমার বেয়াদপিটা কোথায় দেখলেন বসাক মশাই?

নিতাই বসাক ধমক দিয়ে উঠল—চোপ্‌রাও—চাবকে তোমায় লাল ক'রে দেব, তা জান?

সদানন্দর মুখ দিয়ে অনেক কথাই বেরোতে পারত, কিন্তু সময়-মত সামলে নিলে সে।

নিতাই বসাক বলতে লাগল—কি সব ব'লে বেড়াচ্ছ শুনি নতুন-বৌএর নামে? আমার কানে কিছু যায় না ভেবেছ?

সদানন্দ মুখ নিচু ক'রে বললে—আজ্ঞে, আমি ত কিছু বলি নি—

—কিছু না বললে আমার কানে এল কেন কথাটা? দেশশুদ্ধ্ লোকের সামনে তুমি যে নতুন-বৌ-এর নামে এ-সব ব'লে বেড়াচ্ছ, এখন যদি দুলালের কানে যায়? তখন তোমার চাকরি কোথায় থাকবে শুনি? চাকরি থাকবে?

এর উত্তরে সদানন্দ কিছুই বলে নি সেদিন। নিতাই বলেছিল—যাও, দুলালের পায়ে হাত দিয়ে ক্ষমা চেয়ে এস, যাও—

দুলাল সা'র পায়ে হাত দিয়ে মাথায় ঠেকাতেই দুলাল সা' বলেছিল—এই যে বাবা, মনে-মনে তোমার অনুতাপ হয়েছে তাইতেই আমি খুশী! আরে তাই ত আমি সবাইকে বলি, আমি যদি আমার নিজের ক্ষতি না করি ত সদানন্দের সাধ্যি কি আমার ক্ষতি করে সে—

তারপর সদানন্দর চিবুকে হাত দিয়ে বলেছিল—এত লোক থাকতে তুমি আমার ক্ষতি কেন করবে সদানন্দ? আমি কি তোমার কিছু ক্ষতি করেছি যে আমার পাকা ধানে তুমি মই দেবে?

তার পর কান্তির দিকে চেয়ে বললে—ওরে কান্তি, ত্যাখ্ ত্যাখ্, এই সদানন্দর দিকে চেয়ে ত্যাখ্, চোখ দু'টো কেমন ছল-ছল করছে ওর, চেয়ে ত্যাখ্—

আগে চোখ দুটো ছল ছল করছিল না সদানন্দর।

কিন্তু দুলাল সা'র কথাতেই যেন সত্যি সত্যি ছল-ছল ক'রে উঠল। কোঁচার খুঁট দিয়ে চোখ দুটো মুছে নিলে।

দুলাল সা সেটা লক্ষ্য করলে। তারপর বললে—কাঁদ্ বাবা, কাঁদ্ তুই। একটু কেঁদে নে, একটু যদি বুক ভ'রে ভাল ক'রে কাঁদতে পারিস্ ত তাতেও তোর মঙ্গল রে। তাতেও তোর ভাল হবে। কাঁদ্, আহা, তোকে কাঁদতে দেখেও ভাল লাগছে বড় রে—তোর মনের সব গ্লানি কেটে গেল, তুই বেঁচে গেলি রে—

তারপর কি বলতে এসেছিল সদানন্দ আর কি-বা বলে গেল, দুলাল সা'র সামনে গিয়ে কিছুই আর খেয়াল রইল না। দুলাল সা'কে দু' কথা শুনিয়ে দেওয়াও হ'ল না। সদানন্দ দেখে অবাক্ হয়ে গেল, নতুন-বৌ এসে দুলাল সা'র কোন ক্ষতি হ'ল না। বরং দিন-দিন উত্তরোত্তর উন্নতি হ'তে লাগল। বাড়-বাড়ন্ত হ'তে লাগল। পাটের গাঁটের রপ্তানি বাড়তে লাগল। সব দিক্ থেকে পয়সা আসতে লাগল দুলাল সা'র সিন্দুকে। দুলাল সা'র ছেলে বিজয় ডাক্তারি পাস করল। বিজয় জলপানি পেলে। দিনে দিনে ফুলে ফেঁপে উঠতে লাগল দুলাল সা আর নিতাই বসাক।

নিতাই বসাককে চুপি চুপি ব'লে দিলে দুলাল সা—সদানন্দর মাইনে দু'টাকা বাড়িয়ে দাও তুমি—

নিতাই বসাক বললে—কেন? ওই পাজি হারামজাদাকে তুমি মাইনে বাড়িয়ে দিচ্ছ?

—আরে বাড়িয়ে দাও না তুমি!

—তবে ভয় পাচ্ছ নাকি তুমি?

—ভয় পাওয়ার কথা নয়, লোকটাকে ক্ষেপিয়ে দিও না, ক্ষেপলে ঘরের বেরালও বন-বেরাল হয়ে ওঠে।

তা সেই সতেরো টাকা বেড়ে তিরিশ হ'ল। তিরিশ বেড়ে হ'ল চল্লিশ।

কিন্তু তাতেও খুশী নয় সদানন্দ। বলতে গেলে কিছুতেই খুশী হবার লোকই নয় সদানন্দ। খুশী হবেই বা কি ক'রে? দিন দিন দুলাল সা'র অবস্থার উন্নতি হ'তে থাকলে কেউ খুশী থাকতে পারে? সেই দুলাল সা'র পুত্রবধূ যেন মা-লক্ষ্মী হয়ে এসে বাড়ীতে ঢুকেছে। সে আসার পর থেকেই রমারম অবস্থা দুলাল সা'র। দুলাল সা'র ছেলে বিলেতে গেল। সেখান থেকেও ভাল খবর আসে।

কেন এমন হ'ল? এমন ত হবার কথা নয়!

সদানন্দ তখন ম্যানেজার হয়েছে নিতাই বসাকের। পেঁপুলবেড়ের বাঁওড়ে কুলি খাটাবার কাজ পেয়েছে। রাতারাতি বেড়া দিয়ে বাঁওড়টা ঘিরে দিতে হবে এই হুকুম হয়েছে তার ওপর। কিন্তু মনে শান্তি নেই এক তিল। মনের মধ্যে কেবল খচ্‌খচ্ ক'রে কি যেন বেঁধে। দোলগোবিন্দ বেটা কি তাকে সত্যি সত্যিই ভেল্‌কি দেখালে?

দোলগোবিন্দ প্রামাণিক যেন ধূমকেতু হয়ে উদয় হয়েছিল সদানন্দের জীবনে।

নইলে অমন জল-জ্যান্ত মানুষটাই বা বলা-নেই কওয়া-নেই পাগল হয়ে যাবে কেন?

আর পাগল ব'লে পাগল!

শেষের দিকে তার দিকে আর চাওয়া যেত না। বিড় বিড় ক'রে তখনও কেবল বলত—সদানন্দ আছে, সদানন্দ—

তা দুলাল সা'ই বোধহয় অনেক খোঁজ-খবর নিয়ে খবরাখবর দিয়েছিল তার দেশে। বড়-চাতরাতে। সেখান থেকে লোক এল। দূর-সম্পর্কের শালা না কে যেন।

দুলাল সা জিজ্ঞেস করলে—এই তোমার ভগ্নীপতি? ভালো ক'রে চেয়ে দেখ চিনতে পার কি না—

লোকটা দেখলে ভাল ক'রে। তারপর বললে—আজ্ঞে হ্যাঁ, এই ইনিই আমার ভগ্নীপতি—দোলগোবিন্দ প্রামাণিক—পেশা ছিল ঘটকালি—

—তা তোমাদের বংশে কারও পাগলের ব্যামো ছিল?

—আজ্ঞে না।

—তা হলে পাগল হ'ল কেন?

তা কি আর কেউ বলতে পারে।

দুলাল সা টাকাকড়ি দিলে। পাওনা-গণ্ডা যা হয়েছিল তাও মিটিয়ে দিলে শালার হাতে। তার ওপরও কিছু দিলে খুশী হয়ে। বললে—তোমার ভগ্নীপতিই আমার ছেলের বিয়ের সম্বন্ধ করেছিল, আমার নতুন-বৌমাও খুব মনের মত হয়েছে আমার—আমার যথাসাধ্য তোমাকে দিলাম, এখন চিকিৎসা ক'রে দেখ, যদি ভাল হয়—

সেই যে দোলগোবিন্দ গেল, তার পর থেকে আর তার কোনও খবর নেই, খবর রাখার কেউ দরকারই মনে করে নি।

কিন্তু মনে রেখেছিল এক সদানন্দ।

সেই সদানন্দও হাসপাতাল থেকে নিরুদ্দেশ হয়ে যাবার পর সমস্ত প্রসঙ্গটাই চিরকালের মত একেবারে চাপা প'ড়ে গেল। অন্তত সেই রকমই নিতাই বসাকের ধারণা। দুলাল সা'ও হাঁপ ছেড়ে বাঁচল যেন।

আর ওদিকে তখন কর্ত্তামশাইয়ের খবরটা এমন ক'রে ছড়িয়ে পড়েছে যে সদানন্দর কথাটা ভাববারও কারো সময় নেই। সমস্ত কেষ্টগঞ্জটাই যেন হরতনের কথা নিয়ে মেতে উঠেছে। ওদিকে বি-ডি-ও সুকান্ত রায় থেকে সুরু ক'রে হলধর পর্য্যন্ত সকলের মুখেই ওই একই কথা। সাধুর কথা ফলেছে গো। এতদিনের হারানো নাতনী আবার নাকি কেষ্টগঞ্জে ফিরে আসছে?

কেষ্টগঞ্জের রেল-ষ্টেশনে সেদিন গ্রাম ঝেঁটিয়ে সবাই গিয়ে হাজির হ'ল। সকাল দশটার ট্রেনেই আসবার কথা, ছ'টা থেকেই আর লোক ধরে না প্লাটফরমে। গিজ গিজ করছে লোক। নিবারণ সরকার আসছে, কর্ত্তামশাই আসছে, আর আসছে হরতন।

ছ'টা বাজল, সাড়ে ছ'টা বাজল, দশটা বাজল।

ট্রেন বুঝি লেট ছিল, শেষকালে সাড়ে দশটার সময় ট্রেন এসে পৌঁছল। হৈ হৈ ক'রে উঠল সবাই। এসেছে—এসেছে। জানলায় নিবারণ সরকারের মুখটা দেখা গেছে। সবাই রে-রে ক'রে দৌড়ে গেল কামরাটার দিকে। ট্রেন না থামতেই সবাই গিয়ে হামলা করছে, স'রে যাও, স'রে যাও সব, পথ ছাড়, পথ ছাড়, দেখতে দাও—

ষ্টেশন-মাষ্টার মশাই বুঝি নিজেও আর কৌতূহল দমন করতে পারে নি। লাল পাখাটা উঁচু করে ধ'রে একবার ঝুঁকে দেখলে। ড্রাইভার যেন ট্রেন ছেড়ে না দেয়। খুব হুঁশিয়ার, আগের থেকে খবর দেওয়া ছিল, হাসপাতাল থেকে ষ্ট্রেচারের ব্যবস্থাও হয়েছে। অসুস্থ নাতনীকে ট্রেন থেকেই একেবারে শুইয়ে বাড়ী নিয়ে যেতে হবে। হৈ-চৈ গোলমাল যেন না হয়। ভুগে ভুগে হার্ট দুর্ব্বল হয়ে গেছে, একবার বাড়ীতে নিয়ে গিয়ে তুলতে পারলে হয়, তখন সবাই ভালো ক'রে দেখ, এখন পথ ছাড়ো। রাস্তা দাও এখন, ট্রেন এখুনি ছেড়ে দেবে, হুঁশিয়ার।

কিন্তু কে কার কথা শোনে, ট্রেন থামবার সঙ্গে সঙ্গে সবাই হুমড়ি খেয়ে পড়ল, হরতন এসেছে, হরতন। হরতনকে দেখবার জন্যে গ্রামের আর কেউ বাকি নেই। সবাই কাজ-কর্ম্ম ফেলে ছুটে এসেছে।

ক্রমশঃ

আর্থিক
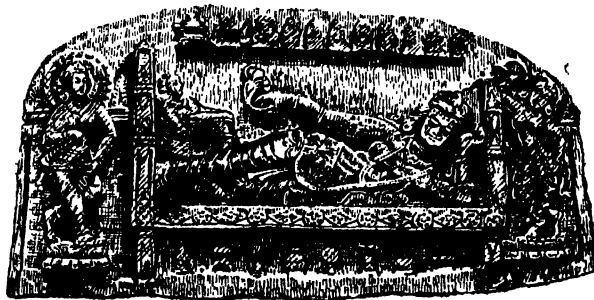
শ্রীচিত্তপ্রিয় মুখোপাধ্যায়

স্বর্ণ নিয়ন্ত্রণ

লড়াই-এর খবর জুড়িয়ে আসতে না আসতে সারা দেশে আরেকটি নতুন প্রশ্ন নিয়ে আলোড়ন সুরু হয়েছে। দেশের লোক হঠাৎ জানতে পেরেছে যে, সোনার অভাবে বিদেশ থেকে যুদ্ধের সরঞ্জাম সংগ্রহ করা যাচ্ছে না; "গয়নার বদলে বন্দুক" জোগাড় করতে হবে, তাই কর্তৃপক্ষ সবাইকে আহ্বান জানালেন প্রতিরক্ষা তহবিলে সোনা দান করবার জন্য। লড়াই আপাতত থেমেছে কিন্তু যুদ্ধপ্রস্তুতির বাবদ আমাদের উদ্যোগ আয়োজন পূর্ণমাত্রায় চালিয়ে যেতে হচ্ছে; এবারকার বাজেটে সেই প্রচেষ্টা খুবই স্পষ্টভাবে প্রতিফলিত হয়েছে। ইতিমধ্যে প্রতিরক্ষা তহবিলে সোনা দান করবার উৎসাহে যখন ভাঁটা পড়ে এল, সরকার সকলকে "স্বর্ণ বণ্ড" কেনবার জন্য অনুরোধ করলেন। সোনা ঘরে জমিয়ে রাখলে সুদে বাড়ে না, 'স্বর্ণবণ্ড'-এ মোটা সুদের ব্যবস্থা হ'ল। যাঁরা 'বণ্ড' কিনবেন তাঁরা সোনা কোথা থেকে কিভাবে সংগ্রহ করেছেন সে প্রশ্নও করা হবে না ব'লে জানান হ'ল। সরকার জানালেন যে, সোনার মূল্য স্থির করা হবে আন্তর্জাতিক হার অনুযায়ী, অর্থাৎ তোলা-প্রতি ৬২.৫০ টাকা; বাজার দরের থেকে এই দাম কম, কিন্তু পরিবর্তে ভাল সুদ দেওয়া হবে। লোকে যথেষ্ট পরিমাণে যেন এই প্রস্তাবে সাড়া দিল না।

সম্প্রতি সরকার স্বর্ণ নিয়ন্ত্রণ আইন প্রবর্তন ক'রে এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন যে, গয়না ছাড়া অন্য যে কোন আকারে সোনা মজুত আছে, তার হিসাব কর্তৃপক্ষের কাছে দাখিল করতে হবে; সোনার নিয়ন্ত্রিত দর বাঁধা হ'ল ৬২।৫০ টাকায় এবং অতঃপর গয়নাতে যে সোনা থাকবে তার সর্বোচ্চ পরিমাণ হবে ১৪ ক্যারেট।

এই সুদূরপ্রসারী সিদ্ধান্তটি নিয়ে দেশ জুড়ে নানা রকম প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে। সোনা আমদানী রপ্তানী নিষিদ্ধ থাকা সত্ত্বেও যারা বেআইনীভাবে সোনা আমদানী ক'রে মোটা টাকা লাভ করছিল তারা চিন্তান্বিত; দেশের স্বর্ণশিল্পীরা বেকার হবার আশঙ্কায় সরকারের কাছে প্রতিবাদ জানিয়েছেন; যাঁরা ব্যাঙ্কের 'সেফ ডিপোজিট ভল্ট'-এ সোনা রেখে নিশ্চিন্ত হয়েছিলেন তাঁরা ঐ সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত হবার ভয়ে ব্যাঙ্কের কাছ থেকে তুলে নিজেদের হেপাজতে নিয়ে গেছেন; আর মধ্যবিত্ত যে সব লোক দুর্দিনের সহায় হবে মনে ক'রে সোনার গয়না গড়িয়ে তাঁদের সামান্য পুঁজি ব্যয় করতেন তাঁরা দিশেহারা বোধ করছেন।

অর্থমন্ত্রী সম্প্রতি বলেছেন:

"The 'sanctity' acquired by the custom of using gold for religious and other purposes in this country has brought in many uneconomic results and losses. It is only in order to destrory this custom that this step (gold control) has been taken."

আর যে কয়েক হাজার স্বর্ণকার(১) বেকারত্ব আশঙ্কা ক'রে সরকারী সাহায্য দাবী করেছিলেন তাঁদের প্রস্তাব অগ্রাহ্য ক'রে তিনি বলেছেন:

"We have not yet reached a stage where we can give relief to all unemployed people in this country." (Statesman, 26. 2. 63.)

* * *

একদল বিশেষজ্ঞের মতে স্বর্ণমূল্য নিয়ন্ত্রণের এই ব্যবস্থা আরও পূর্বেই গ্রহণ করা উচিত ছিল; সোনা সম্বন্ধে আমাদের দেশের লোকের যে অহেতুক আগ্রহ ও সঞ্চয়শীলতা আছে তা' বর্তমান যুগে অচল; আর এই সোনা জমানোর প্রবৃত্তিকে কেন্দ্র ক'রে আভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে এত জটিলতার সৃষ্টি হয়ে আসছে যার অবসান একান্ত প্রয়োজন।

আরেক দলের মতে সোনার মত স্থায়ী মূল্যের এবং সর্বজন-ও সর্বদেশ-গ্রাহ্য এই ধাতুকে হীনমূল্য করা ঠিক হচ্ছে না। লোকে সোনা জমাতে চায় নানা কারণে; তার মধ্যে অন্যতম হচ্ছে দুর্দিনের সংস্থান। যে কারণে পৃথিবীর সব দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক, স্বর্ণমুদ্রামান ত্যাগ

১। ১৯৫১ সালের আদমসুমারী অনুযায়ী "Workers in precious stones, precious metals and makers of jowellery and ornaments" এই শ্রেণীর লোকের সংখ্যা বাংলা দেশে ছিল ৩১,০০০ জন। যারা এইসব জিনিষ বিক্রী ক'রে জীবিকা নির্বাহ করে, অর্থাৎ প্রস্তুতকারক নয়, তাদের সংখ্যার হিসাব স্বতন্ত্র।

।। সত্বেও সোনা সঞ্চিত ক'রে রাখতে আগ্রহী, সেই ক্তেই সাধারণ লোকেও সোনা জমিয়ে রাখতে চায়। তাঁরা বলেন, লোকের এই সহজাত সঞ্চয় প্রবৃত্তি াধ করার ফলে গুপ্ত পথে যে কারবার চলবে তা রোধ াতে সরকার পারবেন না, মাঝখান থেকে লোকের াব নষ্ট হবে, সরকারের তহবিলেও সোনা যথেষ্ট রিমাণে জমবে না।

গয়না ছাড়া আর সব আকারের সোনার তালিকা াইকে সরকারের কাছে দাখিল করতে হবে এই মর্মে নিয়ম চালু হয়েছে; এই প্রসঙ্গে অনেকের বক্তব্য াই যে, অতঃপর চোরা কারবারীরা সোনার থান আমানী না ক'রে যথাসম্ভব বেশী ক'রে তৈরী গয়না আমদানী রতে সচেষ্ট হবে; আরেক দিকে, যে সব স্বর্ণকার যাবৎ সহজ পথে কাজকর্ম করছিল তারা বাধ্য হয়ে প্ত পথে কাজ করতে প্রবৃত্ত হবে।—Smuggling বন্ধ রাই যদি বর্তমান আইনের অন্যতম উদ্দেশ্য হয়ে থাকে এদের মতে যেসব ছিদ্র দিয়ে সোনা এ দেশে আসে সই সব পথ বন্ধ করার জন্যই যথেষ্ট ব্যবস্থা গ্রহণ করা াঞ্ছনীয় ছিল। এ কথাও অনেকে বলছেন যে, সোনার াম যখন কমান হ'ল তখন লোকের মনে সোনা কেনার াগ্রহ বাড়বেই, কমবে না; সকলেই এই কথা ভাববে য, টাকার ক্রয়ক্ষমতা যে হারে নেমে যাচ্ছে সেই গতি ন্ধ হবে না। সোনার চাহিদা সব সময়ই থাকবে; দি বা খোলা বাজারে দাম বাঁধা থাকে, 'কালো' াজারে বেশী দামে বিক্রি করার পথ কেউ বন্ধ করতে ারবে না। ফলে কার্যতঃ দেশশুদ্ধ লোক প্রকারান্তরে 'কালো বাজারী" হয়ে উঠবে। অপরদিকে সোনার মামদানী যদি সম্পূর্ণ বন্ধই থাকে তা হ'লে সকলেই াদের সঞ্চিত সোনা যথাসম্ভব ধ'রে রাখারই চেষ্টা রবেন, ফলে বাজারে যথেষ্ট পরিমাণে সোনা বাঁধা রে বিক্রীর জন্য থাকবে না।—আর যদি সকলের সোনা াজেয়াপ্ত করার কথা ভাবা হয় ত সে স্বতন্ত্র কথা। —আইন ক'রে কোন জিনিসের ব্যবহার বন্ধ করতে গিয়ে এ যাবৎ ত সুফল পাওয়া যায় নি; মাদকদ্রব্য ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ করার ফলে দেখা গেছে দেশে মদ্যপানের হার অনেকস্থানেই বেড়েছে; জমিদারী প্রথা লোপ করার পর দেখা গেছে বেনামীতে জমির হস্তান্তর অবাধে ঘটছে, ালের ঘাটতির দিনে যখন এক জেলা থেকে আরেক জেলায় চাল নেওয়া নিষিদ্ধ ছিল তখনি দেখা গেছে প্রায় প্রকাশ্যভাবে এই নিষিদ্ধ ব্যবসা ফেঁপে উঠেছে! অনেক বিশেষজ্ঞের মতে তাই সোনার দামও ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ করতে হ'লে, আন্তর্জাতিক মূল্যে সরকারী তত্ত্বাবধানে সোনা আমদানী করার যেমন প্রয়োজনীয়তা আছে, তেমনি আরো কয়টি পন্থা অবলম্বন করা প্রয়োজন: একটি হচ্ছে সামান্য কিছু পরিমাণ সোনার হিসাব বাদ দিয়ে তার বেশী যত সোনা (গয়না সহ) আছে, তার তালিকা সরকারের কাছে দাখিল করতে বলা; অতঃপর যত গয়না তৈরী হবে তাতে, 'সরকারী নির্দেশানুযায়ী প্রস্তুত' এই মর্মে ছাপ থাকার ব্যবস্থা করা এবং এখন থেকে যত সোনা কেনা-বেচা হবে তার সম্পূর্ণ ধারাবাহিক হিসাব ক্রেতা এবং বিক্রেতার কাছে রক্ষিত কাগজে সরকারী তত্ত্বাবধানে লিপিবদ্ধ হবে তার ব্যবস্থা করা।

• • •

স্বর্ণ নিয়ন্ত্রণের প্রসঙ্গে তিনটি ভিন্ন কিন্তু পরস্পরের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত প্রশ্ন আসে:

(ক) সোনা সঞ্চয় করা সম্বন্ধে লোকের যে আগ্রহ যুগ যুগ ধ'রে চ'লে আসছে সেই আগ্রহাতিশয্য এ যুগে বাঞ্ছনীয় কিনা; আর যদি বাঞ্ছনীয় না হয়, বর্তমান যে ভাবে তাকে খর্ব করার চেষ্টা করা হচ্ছে সেটি সম্ভব কি না।

(খ) সোনাকে কেন্দ্র ক'রে চোরাকারবারের যে আন্তর্জাতিক জোট আছে সেটিকে এদেশে রোধ করাই যদি বর্তমান আইনের উদ্দেশ্য হয় ত সেই ব্যবস্থা ঘটিয়ে তোলা সম্ভব কি না।

(গ) আন্তর্জাতিক লেনদেনের উদ্দেশ্যে আমাদের প্রয়োজনীয় সোনা সংগ্রহের জন্য আভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক মূল্যের পার্থক্য ঘুচিয়ে দেবার সর্বশ্রেষ্ঠ উপায় কি?

বহু প্রাচীন কাল থেকে আমাদের দেশের লোকের কাছে সোনার চাহিদা ও কদর এত বেশি যে, বিদেশীরা এদেশকে বলেন bottomless pit; এখানে যে সোনা একবার বিদেশ থেকে আসে সেই সোনা অবিলম্বে লোকের অলঙ্কার হিসাবে ব্যবহৃত হ'তে থাকে অথবা মাটির নিচে পোঁতা থাকে অথবা মন্দিরগুলিতে গিয়ে জমা হয়।...গত কয়েক শতাব্দীর যে হিসাব পাওয়া যায় তার থেকে সোনার ব্যবহারের পরিমাণ সম্বন্ধে কিছু আন্দাজ পাওয়া যাবে।

পৃথিবীর মোট স্বর্ণ উৎপাদন (মিলিয়ন আউন্স)		ভারতে মোট সঞ্চিত স্বর্ণ (মিলিয়ন আউন্স)	
খ্রীষ্টাব্দ		খ্রীষ্টাব্দ	
১৪৯৩-১৬০০	২৩'০	১৪৯৩-১৮৩৪	১৪'০
১৬০১-১৭০০	২৮'৮		
১৭০১-১৮০০	৬১'২		
১৮০১-১৮৫০	৩৮'০	১৮৩৫-১৮৫০	৩'০
১৮৫১-১৯০০	৩৩৬'২		
১৯০১-১৯২৫	৪৭৭'৫	১৮৫১-১৯৪৭	১১৩'০
১৯২৬-১৯৪৩	৬২৮'৭		
	১৫৯৩'৪		১৩০'০

পৃথিবীর মোট জনসংখ্যার তুলনায় অথবা ভারতের মোট জাতীয় আয় বা জাতীয় সম্পত্তির (national wealth) তুলনায় আমাদের স্বর্ণ সঞ্চয়ের পরিমাণ বেশি কি কম সে কথা বিশেষজ্ঞেরা বলতে পারবেন।—১৮৮৬ থেকে ১৯৪৭ পর্যন্ত ভারতে স্বর্ণ উৎপাদন হয়েছে মাত্র ২১'৮ মিলিয়ন আউন্স; ১৯৪৮-১৯৫৬র মধ্যে এদেশে স্বর্ণ উৎপাদনের পরিমাণ প্রায় ১'৯ মিলিয়ন আউন্স। গত ১০০ বছরে বাইরে থেকে স্বর্ণ আমদানী হয়েছে ১৩০'২ মিলিয়ন আউন্স এবং রপ্তানী হয়েছে ৭৬'৬ মিলিয়ন আউন্স। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় মিত্রপক্ষ এদেশে সোনা আমদানী করেছেন ৭'৫ মিলিয়ন আউন্স। অনুমান করা যায় যে, দেশ ভাগের পর ভারতবর্ষে যে সোনা আছে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের তহবিলে রক্ষিত ৭ মিলিয়ন আউন্স বাদে, তার পরিমাণ ১০৫ মিলিয়ন আউন্স; ১৯৫৭-৫৮র বাজার দর অনুযায়ী (আউন্স প্রতি ২৮৯ টাকা) এর মূল্য হচ্ছে ৩০৩৫ কোটি টাকা, এবং আন্তর্জাতিক লেন-দেনের হারে এর মোট মূল্য হচ্ছে ১৭৫০ কোটি টাকা। প্রথম মহাযুদ্ধের কয় বছর সোনা আমদানী রপ্তানী বন্ধ ছিল; দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়েও বন্ধ ছিল; তার পর ১৯৪৬-৪৭এ কিছুকাল অবাধ বাণিজ্য প্রচলিত থাকার পর সেই ব্যবস্থা রদ করা হয়; এই সময় স্বর্ণ আমদানীর পরিমাণ মাত্র ০'৭ মিলিয়ন আউন্স; অপর দিকে ১৯৩১ থেকে ১৯৪২এর মধ্যে এ দেশ থেকে স্বর্ণ রপ্তানী হয়েছে ৪৩ মিলিয়ন আউন্স। এখন অবাধ বাণিজ্য রহিত হওয়াতে সোনা যে বেআইনী ভাবে এদেশে আমদানী হচ্ছে এ কথা সরকার এতকাল কার্যতঃ মেনে নিয়েছেন; দেশে সোনার চাহিদা উত্তরোত্তর বাড়ছে তাই সোনার আমদানীও অব্যাহত আছে। মোট কত সোনা এই ভাবে আসে তাই নিয়ে আন্দাজী হিসাব অনেক হয়েছে, সঠিক হিসাব পাওয়া সম্ভব নয়। Forward Market Commission on the Recognition of Associations-এর অনুমান হচ্ছে বছরে ৩০।৪০ কোটি টাকার সোনা আসে। ইদানীং কালের হিসাব অনুযায়ী এই অঙ্ক আরো বেশি।

যদিও স্বর্ণমান (Gold Standard) আর প্রচলিত নেই, তবু International Monetary Fund কর্তৃক গৃহীত ব্যবস্থানুযায়ী সব দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক-কেই সোনা মজুত রাখতে হয়; কাগজের টাকার ভিত্তি হিসাবে যেমন সোনা থাকা দরকার, তেমনি দরকার আন্তর্জাতিক লেনদেন মেটাবার জন্য। দ্বিতীয় মহা-যুদ্ধের আগে ১৯৩৮ সালে মোট ২৫,৫৬৬ মিলিয়ন ডলারের সোনা বিভিন্ন কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কে জমা ছিল, তার মধ্যে যুক্ত-রাষ্ট্রে ছিল ১৪,৫৯২ মিলিয়ন ডলারের সোনা। আর ১৯৪৮এ মোট অঙ্ক দাঁড়ায় ৩৬,০০০ মিলিয়ন ডলারে, তার মধ্যে যুক্তরাষ্ট্রেই ছিল ২৩,৭৪০ মিলিয়ন ডলারের সোনা। (১৯৫৬ সালের তথ্য থেকেও অনুরূপ বণ্টন লক্ষ্য করা যায়: দ্রষ্টব্য রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়া বুলেটিন, নভেম্বর ১৯৫৬)। ১৯৫২ সালে মোট ষোলটি দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কে সোনা মজুত ছিল ৮৭৬ মিলিয়ন আউন্স, তার মধ্যে যুক্তরাষ্ট্রে ছিল ৬৯১ মিলিয়ন আউন্স। ভারতবর্ষে মোট কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কে ও জনসাধারণের হাতে কত সোনা মজুত আছে সেকথা পূর্বে উল্লেখ করা হ'য়েছে।

বর্তমান যুগের ইতিহাসের ছাত্ররা জানেন যে, ১৯৩৪ সালে যুক্তরাষ্ট্র যখন সোনার দাম আউন্সপ্রতি কুড়ি ডলারের স্থলে ৩৫ ডলার স্থির করল, তখন থেকে সোনার উৎপাদন কি হারে বেড়ে চলল আর তারপর পৃথিবীর সোনা গিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কে ধীরে ধীরে জমা হ'ল। সোনার প্রয়োজনীয়তা যখন আদৌ হ্রাস পায় নি এবং পৃথিবীর সর্বত্র সোনা উৎপাদনও হচ্ছে তখন একটি বিশেষ দেশের লোককে সোনার প্রতি আসক্তি ত্যাগ করতে বললে কি সে প্রস্তাব কার্যকরী হবে?

আর ব্যক্তিগত সঞ্চয়ের স্পৃহার সূত্রে একথা বোধ হয় অবান্তর হবে না যে, এই স্পৃহা শুধু ভারতবর্ষের বা প্রাচ্যের দেশগুলির মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। ১৯৫৬ সালে মোট স্বর্ণ উৎপাদন হয়েছিল ২৮ মিলিয়ন আউন্স, তার মধ্যে ১০ মিলিয়ন আউন্স সোনা "Private Hoarding"-এ চ'লে গিয়েছিল; মাত্র তিন মিলিয়ন আউন্স ব্যবহার

হয়েছিল শিল্প বাণিজ্যের প্রয়োজন মেটাতে।২ ইউ-রোপেই মোট চার মিলিয়ন আউন্স সোনা Hoarded হয়েছিল, তার মধ্যে ফ্রান্সই হচ্ছে উল্লেখযোগ্য। অথচ প্রাচ্যের দেশগুলির তুলনায় সেখানকার সোনার দর অপেক্ষাকৃত কম। এই সূত্রে বিভিন্ন দেশের সোনার দরের হিসাব উল্লেখ করা হ'ল।

মিনিয়ামের মত কোন দিন অদৃশ্য হয়ে যাবে, বা কমে যাবে ?

আমাদের দেশের লোকের মধ্যে সোনার প্রতি যে আকর্ষণ আছে তার বহুবিধ ব্যাখ্যা থাকা স্বাভাবিক; তার অন্তত একটি হচ্ছে, এর মূল্যের স্থায়িত্ব অথবা ক্রমিক বৃদ্ধি এবং সঞ্চয় করবার সুবিধা। দরিদ্র স্বল্পবিত্ত লোকের কাছে এর এক রকম সার্থকতা; প্রচুর বিত্তশালী লোকের কাছে এর সার্থকতা আরেক রকম।

তোলা-প্রতি সোনার দাম (টাকা নয়া পয়সা

	বেলজিয়াম	ফ্রান্স	পাকিস্তান	সুইজারল্যাণ্ড	ব্রিটেন	যুক্তরাষ্ট্র
১৯৫৪-৫৫	৬৩'৩১	৬৭'৪৪	১৪২'৪৪	৬২'৬২	৬২'৭৫	৬২'৫০
১৯৫৫-৫৬	৬২'৮৭	৭২'৫০	১১৪'৫০	৬২'৫০	৬২'৩৭	৬২'৫০
১৯৫৬-৫৭	৬৩'২৫	৭৩'৪৭	১১২'২৫	৬২'৩৪	৬২'৬২	৬২'৫০
১৯৫৭-৫৮	৬৩:০০	৬৮'২৩	১০৭'৫০	৬২'৭০	৬২'৩৩	৬২'৫০

সোনার 'সরকারী' দর অথবা বাজারদর কম থাকলেই যে 'Private Hoarding আর হবে না সে কথা বোধহয় স্বতঃসিদ্ধ ব'লে ধ'রে নেওয়া যায় না।

* * *

অতীত যুগে রোম সাম্রাজ্যে সোনার থেকে রূপোর কদর ছিল অনেক বেশি; কালক্রমে উভয় ধাতুর উৎপাদনের পরিমাণ ও ব্যবহারের ধারা বদলের সঙ্গে রূপোর প্রতি লোকের পূর্বের আকর্ষণ কমে গেল; গত শতাব্দীতে এ্যালুমিনিয়াম যখন প্রথম আবিষ্কৃত হ'ল তখন আমেরিকার ধনীরা এই ধাতু থেকে গয়না প্রস্তুত ক'রে ব্যবহার করতেন; এক আউন্স এ্যালুমিনিয়ামের জন্য দাম দিতে হ'ত সাড়ে পাঁচশ' ডলারেরও বেশি। আজকের দিনে সে কথা চিন্তা করাও যায় না। সোনার থেকেও মূল্যবান্ ও সুদৃশ্য ধাতু আছে; কিন্তু তা সত্ত্বেও দেখা যাচ্ছে পৃথিবীর সব দেশেরই লোকে সোনার প্রতি অল্প বিস্তর আকৃষ্ট। সোনার কদর কি রূপো বা এ্যালু-

সোনার মূল্য নিয়ন্ত্রণ ও ব্যবহারে মিতব্যয়িতা সম্বন্ধে আমাদের সরকার যে ব্যবস্থা অবলম্বন করছেন তার সার্থকতা আছে তাতে কোনই সন্দেহ নেই। ধানের দর এবং জমির দর যেমন অন্যান্য সব জিনিষের দাম টেনে তোলবার বা নামাবার সহায়ক: সোনার দরও সেই পর্যায়ে পড়ে বলা যেতে পারে। এই তিনটি জিনিষের দর যদি সরকার কঠোর ভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন তা হ'লে অনেক অবাঞ্ছনীয় গতিরোধ অবশ্যই করা যেতে পারে।...কিন্তু এ যাবৎ যে সব ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়েছে তাতে বাঞ্ছিত ফল কি পাওয়া যাবে? আইন ক'রে সোনার দর কমানো হ'ল অথচ গহনার ক্ষেত্রে নিয়ম শিথিল রইল। এতে কি smuggling বন্ধ অথবা সোনার দাম কমানো সম্ভব হবে? আর যদি বেআইনী আমদানী বন্ধ করার জন্য যথোপযুক্ত কঠোরতা অবলম্বন করার দ্বারাই বাঞ্ছিত ফল লাভ করার কথা ভাবি তা হ'লে আইন ক'রে দাম কমানোর সঙ্গে সঙ্গে দেশের ন্যায্য চাহিদা মেটাবার জন্য সহজ পথে সোনা আমদানীর কথা ভাবতে হবে না? আর যদি 'কালোবাজারী'দের বেআইনী সঞ্চয় বন্ধ করাই উদ্দেশ্য হয় তা হ'লে সবাইকে দফে দফে ভয় বা হুমকি দেওয়াতে কি সঞ্চিত সোনা হাতে আনা সহজ হবে? ১৯৪৬-এ যখন হাজার টাকার নোট বাতিল করা হ'ল তখন বিনা নোটিশেই কাজ সুরু করা হয়েছিল। কালোবাজারের সোনা বাজেয়াপ্ত করা যদি আখেরের উদ্দেশ্য হয় তা হলে আরও আগে তৎপর হ'লেই বোধহয় সুবিধা হ'ত। এখন যা পরিস্থিতি দাঁড়াল

২ ১৯৩৫ সালের হিসাব থেকে দেখা যায়, পৃথিবীর মোট মজুত সোনার এক-চতুর্থাংশ মাত্র "non-monetary purpose"এ ব্যবহৃত হয়েছিল। তারপর ক্রমে Paper Currencyর প্রচলন বেড়ে যাওয়াতে যদিও আভ্যন্তরীণ ব্যবহারে সোনা থেকে মুদ্রা করা উঠে গেছে, সেই সঙ্গে সব কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের চাহিদাও বেড়ে যাচ্ছে। Non-monetary কাজে সোনার সবচেয়ে বেশি চাহিদা গয়নার জন্য, তারপর আসে কৃত্রিম দাঁত প্রস্তুতের কাজে। Gold leaf করতে সামান্য সোনা প্রয়োজন হয়; এক গ্রাম সোনা থেকে ১/৩০০,০০০ ইঞ্চি পাৎলা gold leaf করা হয়, অর্থাৎ প্রায় ৯ স্কোয়ারফুট এলাকা ঢেকে ফেলা যায়। এক গ্রাম সোনা থেকে ১॥ মাইল লম্বা তার প্রস্তুত করা যায়। সোনার অন্যান্য ব্যবহার হয় টেলিফোন, পোর্সিলিন, ওষুধ, রং ইত্যাদির কাজে।

তাতে আশঙ্কা হয় যে, একদিকে যেমন কয়েক হাজার স্বর্ণকার সহজ পথে রোজগার করার অধিকার থেকে কিছুটা বঞ্চিত হ'ল ; অপর দিকে সাধারণ ক্রেতারা—যারা বেশি দাম হ'লেও স্থায্য পথে খোলাবাজারের দোকান থেকে গিয়ে সোনা কিনছিল, তারাও অনেকে খিড়কি দরজা দিয়ে কেনাবেচা করতে বাধ্য হ'তে পারে। আর যারা অসৎ উপায়ে টাকা জমিয়ে সোনার আকারে রেখেছে, তারা যথারীতি গা ঢাকা দিয়ে থাকবে !!

আইন প্রণয়নের দ্বারাই যে লোকের ইচ্ছা বা রুচি বদলানো যায় না এ পরীক্ষা সব দেশেই হয়ে গেছে।··· সোনা ও রূপার ক্ষেত্রে দেখা গেছে, কোন দেশই একক ভাবে তাদের পছন্দমত ব্যবস্থা অনুসরণ করতে পারে নি। চীন দেশকে এক সময় আমেরিকার চাপে রৌপ্যমুদ্রামান ত্যাগ করতে হয়েছিল ; আমেরিকাও তেমনি Silver Purchase Act (1934) প্রবর্তন ক'রে পৃথিবীর রূপোর দাম নিয়ন্ত্রণ করতে পারে নি ; আজ আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি থাকা সত্ত্বেও দক্ষিণ আফ্রিকার ইচ্ছা-অনিচ্ছাকে আমেরিকা অগ্রাহ্য করতে পারছে না।

অন্যান্য সব দেশের মতই আমাদের তহবিলে সোনা দরকার অথচ সোনার উৎপাদন পরহস্তগত ; সরকারী তত্ত্বাবধানে নির্দিষ্ট মূল্যে সোনা আমদানীর পথ যদি বা খোলা আছে তার উপযুক্ত সঙ্গতি আমাদের নেই। দেশের মধ্যে যে পরিমাণ সোনা আছে তারও সামান্যমাত্র অংশ currency reserve বা balance of payments-এর ঘাটতি মেটাবার জন্য পাওয়া যাচ্ছে। এক্ষেত্রে আইন ক'রে সোনার দাম কমিয়ে এবং সরবরাহ আপাত' ভাবে বন্ধ ক'রে দিলে শেষ পর্যন্ত তার সামাজিক ও অর্থনৈতিক ফলাফল কি দাঁড়াবে সে প্রশ্নের উত্তর খুঁজে পাওয়া মুশকিল।

বেআইনী ভাবে সোনা আমদানীর ফলে একদিকে যেমন অনেক দুর্নীতি প্রশ্রয় পাচ্ছে, তেমনি দেশের আর্থিক লোকসানও অনেক হচ্ছে তাতে সন্দেহ নেই। বিদেশী মুদ্রা কম ব'লে আমরা সোনা আমদানী বন্ধ ক'রে রেখেছি ; কিন্তু সেই টাকাই যখন বেআইনী আমদানীর জন্য দেশ থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে তখন সম্পূর্ণ সরকারী নিয়ন্ত্রণে সোনা আমদানীর ব্যবস্থা করলে তার কি প্রতিক্রিয়া হ'তে পারে সে কথা বিবেচ্য। যারা সোনা smuggle করার কাজে লিপ্ত, তারা বিদেশে যখন সোনা কিনছে এদেশে আনবার জন্য, তখন এদেশেরই টাকা কোন না কোন উপায়ে বিদেশে নিয়ে যাচ্ছে, ফলে আপাত ভাবে আমরা যে বিদেশী মুদ্রা বাঁচাচ্ছি ব'লে মনে করছি সে উদ্দেশ্য সফল হচ্ছে না। এ দেশে সোনার দাম কমিয়ে দিলে এই ব্যবসায়ে ভাঁটা পড়বে, বিদেশে মুদ্রা রপ্তানীর ছিদ্রপথও বন্ধ হবে, সে কথা ঠিক ; কিন্তু সরকারী তত্ত্বাবধানে খোলা বাজারে কম মূল্যে সোনা আমদানীর ব্যবস্থা চালু না রাখলে পূর্বে উল্লিখিত কয়েকটি সমস্যা দেখা যেতে পারে ব'লে আশঙ্কা হয় ; দেশের মধ্যে অন্যান্য সমস্ত "controlled" জিনিষের মত 'সাদা' ও 'কালো' দু'টি দরে কারবার চলবে, বিদেশ থেকে থান সোনার বদলে তৈরী গয়না আসার কাজও বন্ধ হবে না মনে হয়। পূর্বেও দেখা গেছে রূপো আমদানী বন্ধ থাকাকালীন বোম্বাইয়ের বাজারে রূপোর দর বিদেশের দরের থেকে বেশি থেকেছে বরাবর ; বেআইনী আমদানীও বন্ধ হয় নি।[৩]

সোনার বর্তমান বাজার দর এবং সরকারী দরের সঙ্গে তার পার্থক্য নিয়ে যে সমস্যা দেখা দিয়েছে সেই বিষয়টি আরেক দিক্ দিয়ে আলোচনা করা যেতে পারে।

১৯৩৪ সালে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র সোনার দাম বাড়িয়ে আউন্স প্রতি ২০ ডলারের জায়গায় ৩৫ ডলার (অর্থাৎ পূর্বের ডলার ও টাকার বিনিময় হার অনুযায়ী প্রায় ১১৬ টাকা অথবা 'তোলা'-প্রতি আনুমানিক ৪৩ টাকা ; এবং বর্তমান বিনিময় হার অনুযায়ী আউন্সপ্রতি ১৬৭ টাকা বা তোলা-প্রতি ৬২।৫০) বেঁধে দেওয়াতে পৃথিবীতে সর্বত্র সোনার দর বাড়তে থাকে, উৎপাদনও অনেক বেড়ে যায়। সরকারী তহবিলের সোনা বেশির ভাগই আমেরিকায় সঞ্চিত আছে তাই ওখানকার দরই কালক্রমে আন্তর্জাতিক দর হিসাবে গৃহীত হয়। ······ইংলণ্ডে ১৯৩৯ সেপ্টেম্বর থেকে ১৯৪৫ জুন পর্যন্ত সোনার দর ছিল আউন্স-প্রতি ৮ পাউণ্ড ৮ শিলিং (অর্থাৎ তোলা-প্রতি প্রায় ৪২ টাকা) ; তারপর সামান্য পরিবর্তনান্তে ১৯৪৯, ১৯শে সেপ্টেম্বর থেকে মুদ্রামূল্য হ্রাসের সময়ে সোনার দর ঠিক

---

৩ দ্রষ্টব্য : রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়া বুলেটিন, ডিসেম্বর ১৯৫৩। ১৯৩৮-৩৯এ বোম্বাইএ রূপোর দর (১০০ তোলা-প্রতি) ছিল ৫১ টাকা ১১ আনা, ১৯৫১-৫২ তে ১৮৮ টাকা ৪ আনা। নিউইয়র্ক-এ একই সময়ে দাম ছিল যথাক্রমে ৫৩ টাকা ১ আনা ও ১৫৮ টাকা ১৩ আনা। ১৯৫৮-৫৯ ব্রিটেনে ১৩৫/৩৯, টাকা আমেরিকায় ১৩৩/১৭ টাকা এবং ভারতে (বোম্বাই) ১৯০/০৬ টাকা।

করা হ'ল ১২ পাউণ্ড ৮ শিলিং (অর্থাৎ আন্তর্জাতিক হারের সমতুল্য)।...আমাদের দেশে ১৯৫৬ সালের ৫ই অক্টোবর পর্যন্ত কেন্দ্রীয় তহবিলে সঞ্চিত সোনার দর ছিল তোলা-প্রতি ২১ টাকা ২৪ নয়া পয়সা (অর্থাৎ ইংলণ্ড বা অন্যান্য দেশে প্রচলিত সরকারী দরের থেকে অনেক কম); ১৯৫৬ থেকে দর বাঁধা হ'ল ৬২৷৫০ টাকায় তোলা (অর্থাৎ ১০ গ্রাম-পিছু ৫৩ টাকা ৫৮ নয়া পয়সা)। বাজারের সোনার দর ১৯৩৯এ ছিল তোলা প্রতি আনুমানিক ৩৫ টাকা; ১৯৫২ থেকে সোনার দর কিভাবে ওঠানামা করেছে, তার হিসাব নিচে দেওয়া হ'ল।

বোম্বাই-এর বাজারে সোনার দর (Spot Price Avarege):

বৎসর	তোলা-প্রতি মূল্য (গড়)	বাজারে আনুমানিক মজুত সোনা (তোলা) (Estimated Visible Stocks)	প্রতি দশগ্রাম-পিছু মূল্য (গড়)
১৯৫১-৫২	১০৯'০৭	৬৯১৭৩	৯৩'৫১
১৯৫২-৫৩	৮৮'০১	৩৮৩২৭	—
১৯৫৩-৫৪	৮৬'০৯	২৫৯৪২	—
১৯৫৪-৫৫	৮৯'১৫	২৯৬৭৩	—
১৯৫৫-৫৬	৯৫'৮৫	২২৫২৮	৮২'১৮
১৯৫৬-৫৭	১০৪'৫২	২৪৫৭৭	৮৯'৬১
১৯৫৭-৫৮	১০৮'৪৬	১৯২১২	৯২'৯৯
১৯৫৮-৫৯	১১২'০৮	২৪১৩৫	৯৬'০৯
১৯৫৯-৬০	* ১২০'৯৬ / ১২৬'২০	— / ৩১,৮৮৫	* ১০৩'৭১ / ১০৮.২০
১৯৬০-৬১	—	—	১১৪'৯১
১৯৬১-৬২	—	—	১২১'২৫

ইতিমধ্যে দেশে কাগজের টাকা বেড়ে চলেছে; জিনিষপত্রের দাম বেড়ে চলেছে; এই বৃদ্ধির সঙ্গে সোনার দাম বৃদ্ধি তুলনীয়। প্রাসঙ্গিক কয়েকটি তথ্য এই সূত্রে দেখা যেতে পারে:

	১৯৫১-৫২	১৯৫৬-৫৭	১৯৬১-৬২
১। জনসাধারণের হাতে মোট অর্থ (Money Supply (কোটি টাকা) with the public)	১৮৫০ (১০০%)	২৩৪৫ (১২৬'৭%)	৩০৪৯ (১৬৪'৮%)
২। মোট নোট-এর পরিমাণ (কোটি টাকা) (Notes in circulation)	১১২৮ (১০০%)	১৪৮৩ (১৩১'৫%)	২০২৭ (১৭৯.৭%)
৩। জনসংখ্যা (কোটি)	৩৬'১১ (১০০%)	—	৪৩'৯২ (১২১'৫০%)
৪। রূপার বাজার দর (কিলোগ্রাম প্রতি) (টাকা)	১৬১'৪১	১৫০'৫৮	২০৬'৪৯
৫। শেয়ার বাজারের মূল্যসূচক (Variable Dividend Industrial Securities) ১৯৫২-৫৩=১০০ ||	—	—	১৯২০৭
৬। পাইকারী মূল্যসূচক (Index number of Wholesale prices) ১৯৩৮-৩৯=১০০	৪৩৪'৬ (১৯৫১-৫২) / ৩৮০'৬ (১৯৫২-৫৩)	—	—
১৯৫২-৫৩=১০০	—	১০৫'১	২২'৯

* প্রতি ১ তোলা=১১'৬৬৩৮ গ্রাম। ১৯৫৮ জুন পর্যন্ত মহীশূর সোনার দাম দেওয়া আছে, অ্যাবিসিনিয়া সোনার দাম জুলাই ১৯৫৮ থেকে জুলাই ১৯৫৯ পর্যন্ত। তারপর "বুলিয়ান"-এর দাম দেওয়া আছে। এই শেষোক্ত পরিবর্তনের ফলে ১৯৫২-র সঙ্গে ১৯৬২-র মূল্য বৃদ্ধির তুলনামূলক হিসাব করতে হ'লে ১৯৫২-র মূল্যেও বদলে নিতে হয়; এই হিসাবে দেখা যায় যে ১৯৫২কে ১০০ ধরলে তখন থেকে ১৯৬২তে মূল্যের সূচকসংখ্যা ১২৪'২৮%। আর যদি ১৯৩৯-এর মূল্যের সঙ্গে ১৯৬২-র মূল্যবৃদ্ধির তুলনা করা হয় তা হ'লে দেখা যাবে ১৯২৯ যেখানে ১০০, সেখানে ১৯৬২-র দাম হচ্ছে ৩৪৬%। বর্তমানে ১৯৫৪ থেকে সূচক-সংখ্যার হিসাব করা হয়; সেই হিসাবে ১৯৬২-র সূচক-সংখ্যা প্রায় ১৬০। আর ১৯৫১-৫২কে ১০০ ধরলে ১৯৫৯-৬০-এ সূচক সংখ্যা ছিল ১১০.৯।

৭। ক্রেতার মূল্যসূচক
(Consumer price Index number
Working Class)

১৯৪৯-৫০ = ১০০ ১০৫ ১০৭ ১২৭

৮। বিদেশী মুদ্রার পরিমাণ
(Foreign Exchange
Reserves) (কোটি টাকা)

৭৮৬·৬৯ ৬৮১·১০ ২৯৭·৩১

পাইকারী মূল্যের সূচক গত কয় বছর ধ'রে ১৯৫২-৫৩ থেকে গণনা করা হয়েছে; ১৯৩৯-এর হিসাবে দেখতে গেলে মূল্যসূচক প্রায় ৪৬৭%এ দাঁড়ায়ঃ সোনার দাম যুদ্ধ-পূর্ব বছরের তুলনায় অত বাড়ে নি দেখা যাচ্ছে।

অপর দিকে দেখা যাচ্ছে, নোটের পরিমাণও বাড়ছে, শেয়ার বাজারের সূচক সংখ্যাও বেড়ে যাচ্ছে, আরেক দিকে বিদেশী মুদ্রার সঞ্চয় নিম্নগামী হয়ে চলেছে।

টাকার মূল্য যে হারে কমেছে, তাতে সোনা সঞ্চয়ের স্পৃহা লোকের মনে আসা স্বাভাবিক (যে পরিমাণ অর্থ দেশের মধ্যে circulate করছে, তাতে সোনার দাম ইতিমধ্যে আরো যে কেন বেশি হবার লক্ষণ দেখা দেয় নি সেটির কারণ অনুধাবনযোগ্য।)

সোনার দাম আরও নামাবার যে চেষ্টা সরকার করছেন তা নিঃসন্দেহে সময়োপযোগী হয়েছে। সেই সঙ্গে একথাও ভাবতে হয় লোককে সঞ্চয়ী করতে উৎসাহিত করতে হ'লে আর কি করণীয়। টাকার মূল্য যদি ক্রমে কমতে থাকে তা হ'লে লোকের নগদ টাকা সঞ্চয়ের স্পৃহা না থাকাই সম্ভব; ইন্সিওরেন্সে সারাজীবন প্রিমিয়াম দিয়ে লোকে যখন টাকা ফেরৎ পাচ্ছে, দেখছে টাকার ক্রয় ক্ষমতা কমে গেছে। টাকার মূল্য স্থির থাকবে এই আশ্বাস যদি লোকে পেত তা হ'লে সোনার প্রতি এমন যে আসক্তি দেখা যাচ্ছে তা বহুলাংশে কমতি ব'লে মনে হয়। কিন্তু সে ভরসা কি সরকার দিতে পারছেন?

এই সঙ্গে এ কথাও ভাবতে হবে যে, সোনার আন্তর্জাতিক দরের সঙ্গে আভ্যন্তরীণ দরের কিছু পার্থক্য মেনে নেওয়া প্রয়োজন কিনা। Smugglingও বন্ধ করতে হবে, hoar ingও বন্ধ করতে হবে; লোকের সোনা সম্বন্ধে আগ্রহও কমাতে হবে। কিন্তু সমস্ত বাঞ্ছনীয় ফল পেতে হ'লে, বর্তমানে যে দর বাঁধা হ'ল এবং সেটি কার্যকরী করার জন্য যে সব পন্থা গ্রহণ করা হ'ল সে সব পন্থা ফলপ্রসূ হবে কিনা সেকথা বিশেষভাবে বিবেচ্য। এক বিশেষ অর্থ নৈতিক ফল পেতে গিয়ে কতকগুলি অবাঞ্ছনীয় সামাজিক কুফলের যাতে না উদ্ভব হয় সেকথাও বিশেষভাবে ভেবে দেখা দরকার ব'লে মনে হয়। ঐ সূত্রে, সরকারী নিয়ন্ত্রণাধীনে সোনা আমদানীর ব্যবস্থা, নির্দিষ্টহারে সোনা বেচাকেনাগুলি যথাযথ লিপিবদ্ধ করার ব্যবস্থা, সোনার গয়নাতে সরকারী শিলমোহরের ব্যবস্থা ইত্যাদির কথাও সরকার যথাসময়ে বিবেচনা করবেন আশা করা যায়। আর সেই সঙ্গেই সরকারী কর এড়াবার জন্য যাঁরা প্রভূত সোনা লুকিয়ে রেখেছেন, তাঁদের কাছ থেকে সোনা আদায় করার কি ব্যবস্থা হচ্ছে সেকথা জানবার জন্য জনসাধারণ আগ্রহান্বিত থাকবে।

ল্যান্দাউ-এর তত্ত্ব

গত সংখ্যায় আমরা রুশ পদার্থবিদ্ লেভ ল্যান্দাউ-এর কথা উল্লেখ করেছিলাম। মোটর দুর্ঘটনায় চার চারবার ক্লিনিক্যাল "মৃত্যু"র হাত এড়িয়ে তিনি এখন পঞ্চম জীবন যাপন করছেন। কিন্তু প্রথম জীবন অর্থাৎ দুর্ঘটনার আগেই যে বৈজ্ঞানিক কীর্তি তিনি অর্জন করেছিলেন তাই তাঁকে মানুষের কাছে চিরজীবী করে রাখবে। ভবিষ্যতে সে সম্বন্ধে পূর্ণাঙ্গ আলোচনার ইচ্ছা রইল। বর্তমানে প্রাথমিকভাবে কিছু বলার চেষ্টা করছি মাত্র।

আমাদের প্রসঙ্গ তরল হিলিয়াম। হিলিয়াম সাধারণ অবস্থায় একটি গ্যাস, রাসায়নিক বিচারে খুবই নিষ্ক্রিয়-- সহজে অন্য জিনিষের সঙ্গে মিলিত হ'তে চায় না। কিন্তু এই "নিরীহ" গ্যাসটিই অত্যন্ত নিচু তাপমাত্রায়--তরল অবস্থায়—আশ্চর্য সক্রিয় হয়ে ওঠে। বিজ্ঞান সব কিছুরই বিধি-ব্যবহার নিয়মের বাঁধনে বাঁধে--সমস্ত জটিলতা ও বৈচিত্র্যের মধ্যে একটা সূত্র খোঁজার চেষ্টা করে। কিন্তু তরল হিলিয়াম—বরফ জমানো টেম্পারেচারের ২৭০ ডিগ্রী নিচুতে নেমে কি যেন এক আশ্চর্য জগতের সম্মুখীন হচ্ছে। ব্যাপারটা বড় বিচিত্র। যথা--

(১) হিলিয়ামের তাপ পরিবহন ক্ষমতা তখন বেড়ে যায় লক্ষ-কোটি গুণ। সহসা। কেন?

(২) হিলিয়ামের একটি অতি সূক্ষ্ম স্তর জীবন্ত অ্যামিবার মতই যেন আপনা আপনি ছুটে চলে। পাত্রে তরল হিলিয়াম ধরা আছে, কিছুক্ষণের মধ্যেই দেখা গেল তা পাত্রের গা বেয়ে নিচে নেমে পড়েছে-- নিঃসন্দেহ পাত্রের কোথাও ভাঙা বা ফুটোফাটা ছিল না।

(৩) ইঞ্জিন উত্তাপকে যান্ত্রিক শক্তিতে পরিণত করে। এখানেও সেই ইঞ্জিনের কাজ—বিচিত্রভাবে। খুব সরু করে পাত্রের মুখ গড়া হয়েছে, তাতে তরল হিলিয়াম। ক্ষীণ একটু আলো এসে পড়ল, আলোর ফলে উত্তাপও-- হিলিয়াম উত্তপ্ত হল। পরিমাণ খুবই কম, কিন্তু পরিণতি কী অভাবনীয়! সেই সামান্য উত্তাপেই তরল হিলিয়াম উঠল লাফিয়ে—ফোয়ারায় যেমনটি হয়—অন্তত দু-তিন ফুট।

এ সমস্ত বিষয় বিবেচনা করতে গিয়ে বিজ্ঞানী লণ্ডন এক অভিনব তত্ত্ব প্রকাশ করেন। তরল হিলিয়ামের মধ্যে মেলানো-মেশানো থাকে দু-ধরণের জিনিষ, একটি স্বাভাবিক বা সাধারণ, অন্যটি বিশেষ বা অতিপদার্থ। এই অতিপদার্থ টির জন্যই যত অঘটন। তাপমাত্রা যতো কমানো যায় মোট জিনিষটিতে অতিপদার্থের পরিমাণও তত বেড়ে ওঠে— হিলিয়ামের বিধিব্যবহারও সে অনুপাতে অদ্ভুত হয়ে দাঁড়ায়। লণ্ডনের এই তত্ত্বে কল্পনার প্রসার অনেকদূর, তবে তার ভিত্তিমূলে সত্যেন বসুর পরিসংখ্যানটি গ্রহণ করা আছে। পদার্থ যে সাধারণ অবস্থার অতীত বিশেষ কোন অবস্থায় বিচরণ করতে পারে আইনষ্টাইন সত্যেন বসুর ঐ সূত্রটি থেকে তা ব্যাখ্যা করে দেখিয়েছেন। লণ্ডনের তত্ত্বে সেই বিশেষ অতিপদার্থ টিই আরোপ করা হয়েছে। দেখা গেল এই অভিনব দ্বৈতবাদ তরল হিলিয়ামের গুণাগুণ ব্যাখ্যায় বেশ কাষ্যকরী। বিজ্ঞান দিশাহারা হয়ে পড়েছিল, একটা দিক্ খুঁজে পেল। পূর্ণ মীমাংসা অবশ্য আসে নি। কিন্তু তার কারণও যথার্থ রয়েছে। সত্যেন বসুর সমীকরণ আদর্শ গ্যাসের সম্বন্ধে। হিলিয়াম তরল অবস্থাতেও অনেকটা গ্যাসের মত-- কিন্তু পুরোপুরি কখনো নয়, আদর্শ গ্যাস ত নয় কোনক্রমেই। মূলেই যখন এই গোলযোগ, পুরোপুরি সমাধান সেখানে আসে না। বসুর নিয়ম থেকে নূতন কোন তাৎপর্য্য উদ্ধার করা যায় কি-না, তা ছিল সমসাময়িক বিজ্ঞানের এক বিশেষ চিন্তা।

সমস্যা যখন এভাবে গোল পাকিয়ে উঠছে, ল্যান্দাউ তাঁর নূতন তত্ত্বটি নিয়ে এলেন। প্রথমেই তিনি বলে নিচ্ছেন, তরল হিলিয়ামের ক্ষেত্রে সত্যেন বসুর নিয়মকে টেনে আনার দরকার নেই। তার বদলে চলবে এই নূতন তত্ত্ব: অত্যন্ত নিচু তাপমাত্রায় হিলিয়ামের পরমাণুগুলি দু ভাবে কাজ করে। তাপমাত্রায় যে বিশেষ কতকগুলি পরমাণুমাত্র উত্তেজিত হয়--তারা হ'ল ফোনন। তাপমাত্রা আরো বাড়লে দেখা দেয় রোনন, আসলে ফোনন-ই ক্রমে রোনন হয়ে দাঁড়ায়। রোনন আর ফোনন অত্যন্ত জটিল নিয়মে কাজ করে। তরল হিলিয়ামের পটভূমিকায় তারা গ্যাসের কণার মতই বিচরণ করে। কিন্তু তাদের মূল প্রকৃতি যে কি তা যেন বেশ অস্পষ্ট। লণ্ডনের মতে ল্যান্দাউয়ের তত্ত্বটিও এখনো পূর্ণতা পায় নি। কিন্তু ল্যাবরেটরির পরীক্ষার ফল এ দিকেই যেন সায় দিয়েছে। রোনন আর ফোনন তাই গুরুত্ব নিয়ে উঠেছে। অত্যন্ত নিচু তাপমাত্রায় তরল হিলিয়ামের মধ্যে পরমাণুর "ঢিল" ছুঁড়ে যেন এদেরই খোঁজ পাওয়া গেল। ল্যান্দাউয়ের তত্ত্বকথা সমর্থিত হয়েছে। দুর্ঘটনার ফাঁড়ার সঙ্গে ল্যাবরেটরির অগ্নিপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে লেভ ল্যান্দাউ এ বছর নোবেল পুরস্কারের শিরোপা পেলেন।

শিল্পীর চোখে পরমাণু

আমাদের দেশের একজন বিখ্যাত সাহিত্যিক তাঁর শিল্পীজীবনের সমস্যার কথা বলছিলেন। চাঁদের দিকে তাকিয়ে যে কারো চাঁদপানা মুখের কল্পনা করব তার উপায় নেই! চাঁদের সমস্ত দেহ, তার বিরস গহ্বর, খাড়াই পাহাড় কল্পনার জাল কেটে দেয়—কবিতার পরিবেশ টুটে যায়। নূতন জানার এই এক সমস্যা-- চরকা বুড়ী নেই, রূপকথা নেই; কিন্তু আমাদের ধ্যান ধারণাকে সেভাবেই গড়ে নিতে হবে। বিজ্ঞানের পরিধি যত বড়ই হোক না, জীবনের পরিধি আরো বড়। সাহিত্যিক—জীবনশিল্পী, পুরাণো ধারণার মধ্যে তাঁকে নূতনের তাৎপর্য্য খুঁজে নিতে হবে। যা ছিল, তাকে অতিক্রম করে চাই এই উত্তরণ। সামনে চড়াই, কিন্তু পথ আরো দূর ছড়িয়ে আছে।

বিজ্ঞানের সাধনায় পরমাণু আজ সমস্ত গুরুত্ব নিয়ে ফুটে উঠেছে। যন্ত্র, বিজ্ঞান ও মানুষের চিন্তায় তা মধ্যমণি। শিল্পীর ধারণায় তা কি
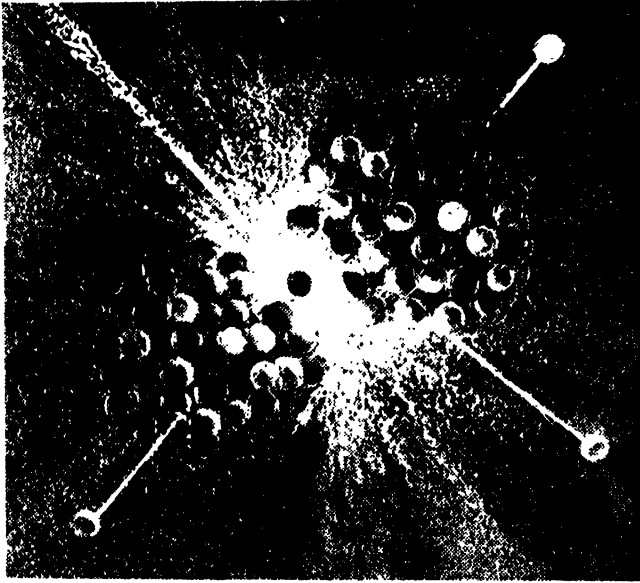
পরমাণু "ভেঙে" শক্তি বেরুচ্ছে
শিল্পীর তুলিতে তা এঁকে দেখান হয়েছে

রূপ নেবে না কৌতূহলের বিষয় বই-কি? পরমাণু ফেটে শক্তি বিস্ফোরিত হচ্ছে—রয়নকোল্স্ তা শিল্পীর তুলিতে এঁকে দেখিয়েছেন। এখানে তা তুলে ধরলাম।

মাতৃভাষায় বিজ্ঞানচর্চা

"দেশ যদি বলে চলবে, তবে এই মুহূর্তেই তা সম্ভব হতে পারে।"

অনেক দিন ধরে তিনি যা বলে এসেছিলেন বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের পঞ্চদশ প্রতিষ্ঠা দিবসের অনুষ্ঠানে তিনি সে কথারই পুনরাবৃত্তি করলেন, মাতৃভাষাই শিক্ষার মূলমন্ত্র। দেশকে যদি বৈজ্ঞানিক ধারণায়, বৈজ্ঞানিক ভাবনায় জাগ্রত করতে হয় তবে এই পথটিই বেছে নিতে হবে। অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ বসুর কথা দেশের শিক্ষাবিধাতাগণ আর একবার ভেবে দেখবেন, এই একান্ত কামনা।

বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ দীর্ঘ চোদ্দ বছর ধ'রে নানা প্রকাশনা ও বক্তৃতা ইত্যাদির মাধ্যমে বাংলায় বিজ্ঞান আলোচনার ধারাটি সজীব রেখেছেন। এমন একটা জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ কাজে তাঁরা নানা আর্থিক বাধা ও অসুবিধার মধ্য দিয়েও কাজ ক'রে যাচ্ছেন। আশা করি সরকার তাঁদের ডাকে আরো বেশী করে সাড়া দেবেন।

দেশের প্রভুত্ব নিয়ন্ত্রণ রাজনৈতিকদের হাতে। বৈজ্ঞানিক সাহিত্যিক অধ্যাপক জ্ঞানীগুণীদের প্রভাব সেখানে খুবই ক্ষীণ। আচার্য্য বসু মহাশয় তাই বলছেন, শুধু আন্তরিকতার জোরে যতটা করা যায় তা আমরা করছি। কথাটির সুর আমাদের মনকে স্পর্শ করেছে—পাঠকদের হাতে তার ছিটেফোঁটা এখানে তুলে দিলাম।

কলিঙ্গ পুরস্কার

বৈজ্ঞানিক চলচ্চিত্রে এবার কলিঙ্গ পুরস্কার পেল দক্ষিণ মেরু সম্বন্ধে একটি পোলিশ চিত্র—'শ্বেত ভাল্লুকের দেশে'। কলিঙ্গ পুরস্কার আন্তর্জাতিক পুরস্কার, বিজ্ঞানের বিষয়গুলিকে সাধারণের মত ক'রে প্রচার করার কাজে উৎসাহ দেওয়ার জন্য চলচ্চিত্র ছাড়াও উপযুক্ত গ্রন্থ রচনার জন্যও প্রতিবছর এই পুরস্কার দেওয়া হয়ে থাকে। কলিঙ্গ ফাউণ্ডেশনের পরিচালক (উড়িষ্যার মুখ্যমন্ত্রী) শ্রীবিজয়ানন্দ পট্টনায়কের ব্যক্তিগত দানে আন্তর্জাতিক শিক্ষা বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি পরিষদ (ইউনেস্কো) এই পুরস্কারটির প্রবর্তন করেন। চলচ্চিত্রের ক্ষেত্রে এই পুরস্কারটির মূল্যমান দু'হাজার পাউণ্ড বা ত্রিশ হাজার টাকা।

শুধু গ্রন্থ রচনার জন্য এ বছর কলিঙ্গ পুরস্কার পেলেন ব্রিটেনের বিখ্যাত বিজ্ঞান-লেখক ও বৈজ্ঞানিক কাহিনীর রচয়িতা আর্থার সি. ক্লার্ক। ক্লার্ক বিজ্ঞানভিত্তিক গল্প উপন্যাস লিখে সম্প্রতি প্রভূত প্রতিষ্ঠা অর্জন করেছেন। বিজ্ঞান আমাদের দেশে শিক্ষিত লোকদের কাছেও প্রায় অজ্ঞাত, বিজ্ঞানের বিষয়গুলি অবলম্বন ক'রে গল্প রচনার ধারা আমাদের দেশে এখনো তৈরী হয় নি। যোগ্য হাতে পড়লে এ জাতীয় রচনা বিজ্ঞান সম্বন্ধে একটা ধারণা সৃষ্টি করার সঙ্গে সঙ্গে নানা পরিস্থিতির টানে তা সম্বন্ধে একটা সত্যকারের আকর্ষণ সৃষ্টি করে। এটি হ'ল বড় কথা। যে কল্পনা ও ভবিষ্যৎদৃষ্টির সঙ্গে আমরা সাহিত্যের মাধ্যমে পরিচিত হই এখানে তা যুক্তি ও তথ্যের মধ্যে প'ড়ে সে সম্বন্ধে একটি পরিষ্কার চিত্র ফুটে ওঠে। বর্তমানের আলোকে ভবিষ্যতের রূপ দেখে আমরা মুগ্ধ হই। বিশেষভাবে বলতে গেলে—এ সমস্ত কল্পনা-প্রবণ বিজ্ঞান-কাহিনীকারদের ধারণার মধ্যে অনেক বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব ও পরিকল্পনার ইঙ্গিত খুঁজে পাওয়া গেছে। জুল ভার্ন ও এইচ জি ওয়েলস্ সম্বন্ধে এ কথা বারবার সত্য প্রমাণিত হয়েছে। আর্থার ক্লার্কও অনুরূপ কৃতিত্ব দেখিয়েছিলেন। একটিমাত্র উদাহরণ আমরা এখানে উল্লেখ করতে পারি। টেলিভিশনের ছবি বেতার তরঙ্গে বাহিত শব্দের মত এতদূর ছড়ায় না—তার প্রসার বড় জোর ত্রিশ কি চল্লিশ মাইল। ফ্লাড লাইটের আলোর মত টেলিভিশনের টাওয়ার যত উঁচু হবে তার ছবিও ছড়াবে ততদূর। ক্লার্ক তাই ভাবছিলেন, টাওয়ারের বদলে চাঁদের অনুকরণে কোন উপগ্রহ তৈরী সম্ভব কি না—যা পাঁচ শ' কি হাজার মাইল উপর থেকে ঐ টাওয়ারের মতই কাজ করবে। ১৭ কি ১৮ বছর আগে তিনি এসব কথা ভেবেছিলেন। আমরা জানি সম্প্রতি একটি কৃত্রিম উপগ্রহ—টেলস্টারের মাধ্যমে সে পরিকল্পনাটি কার্যকরী হয়েছে। পরীক্ষামূলকভাবে আটলান্টিকের এপার-ওপার ইউরোপ আমেরিকার মধ্যে টেলিভিশনের চিত্র বিনিময় হয়েছে। এ ভাবে পৃথিবীব্যাপী সংযোগ বিকাশের ক্ষেত্রে

একটা গুরুত্বপূর্ণ ধাপ তৈরী হয়েছে। (টেলস্টার সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা কার্তিকের প্রবাসীতে প্রকাশিত হয়েছিল।)

গ্রন্থ রচনায় কলিঙ্গ পুরস্কারের মূল্যমান এক হাজার পাউণ্ড অর্থাৎ টাকার হিসাবে পনেরো হাজার টাকা। ক্লার্কের আগে আরো ন'জন এই আন্তর্জাতিক পুরস্কার অর্জন করেছিলেন—তাঁদের মধ্যে রয়েছেন দ্য ব্রোয়ী (De Broghie) রাসেলের মত জগৎবরেণ্য প্রতিভা।

'আশ্চর্য'

আশ্চর্য বই কি! আমাদের দেশে বিজ্ঞান আলোচনার পরিসর এখনো ভাল ক'রে তৈরী হয় নি। এমন অবস্থায় কেবলমাত্র বিজ্ঞান-নির্ভর কাহিনীর উপর নির্ভর ক'রে যাঁরা পত্রিকা প্রকাশ করেছেন তাঁদের অভিনন্দন জানাতে হয়! 'আশ্চর্য!'—ভারতীয় ভাষায় এ ধরণের প্রথম পত্রিকা—খুব সম্ভবত। বৈজ্ঞানিক গল্প-উপন্যাস রচনার ঐতিহ্য আমাদের দেশে যখন নেই, পত্রিকার পাঠ্য-উপাদান তাই বেশীর ভাগ বিদেশী অনুবাদ থেকেই সংগ্রহ ক'রে নিতে হবে। বিজ্ঞানের একটি আন্তর্জাতিক পরিচয় আছে, সে হিসাবে তা নিয়ে লেখা গল্প-উপন্যাস দেশ নির্বিশেষে আমাদের কাছেও গ্রহণযোগ্য হবে। তাদের আশ্রয়ে দেশের সাধারণের মনে যদি বিজ্ঞানের প্রতি সত্যকারের আকর্ষণ জাগিয়ে তোলা যায় সেটাই হবে আসল পাওয়া।

এ. কে. ডি.

চিরস্থায়ী টায়ার

ফ্লোরিন গ্যাসের প্রদাহিকা শক্তি এতই বেশী যে তাকে কাচের পাত্রে রাখা যায় না। কিন্তু এই গ্যাসের সাহায্যে এমন একটি যৌগিক পদার্থ উদ্ভূত হবে ব'লে আশা করা যাচ্ছে, যা দিয়ে তৈরী টায়ার গাড়ীর চাকায় একবার পরিয়ে দিলে আর কখনো খুলতে হবে না। এই টায়ার কাটবে না, পাংচার হবে না, এর দাঁত ক্ষয়ে যাবে না।

আরো আশা করা যাচ্ছে যে, এই গ্যাসকে কাজে লাগিয়ে এমন কাপড় তৈরী করা যাবে যা আগুনে পুড়বে না, দরজা জানালা এমনভাবে রঙ করা যাবে যে রঙ কোনদিন চটে যাবে না, ধাতুর কাঠিন্য বাড়াবার অনেক বেশী ভাল এ্যালয় এর থেকে পাওয়া যাবে, তাছাড়া পাওয়া যাবে অনেক উজ্জ্বল রঞ্জক পদার্থ, অনেক বেশী কার্যকর এ্যানেস্থেটিক যা দিয়ে অপেক্ষাকৃত সহজে রোগীকে অচেতন বা তার দেহাংশকে অসাড় করা যাবে। নানারকমের অন্য ওষুধবিষুধও তৈরী হবে এর সাহায্যে।

এই সিন্থেটিক পদার্থটি নিয়ে খুব জোর গবেষণা চলেছে ব্রিটেনে। এটি জনসাধারণের কাজে লাগবার মত অবস্থায় এখনো আসে নি।

স. চ.

দূর থেকে কাছে

এইচ জি ওয়েলস্ বৈজ্ঞানিক বিষয়ে সফল ভবিষ্যৎবাণী ক'রে খ্যাতি কুড়িয়েছেন। ১৯০২ সালে এরোপ্লেন প্রথম আকাশে উড়ল। তার মাত্র এক বছর আগে ওয়েলস্ এ সম্বন্ধে যা মন্তব্য করেছেন তা সত্যই কৌতূহল জাগিয়ে তোলে: আকাশে উড়ে চলার জন্য আজকাল এই যে সব যন্ত্র তৈরীর চেষ্টা চলছে আমি তার উপর আস্থা রাখি না। এ থেকে সত্যই বড় দরের কিছু আসবে আমার বিশ্বাস হয় না। আসলে এরোনটিক্স্ একটা অসার বিদ্যা। আকাশে উড়ে বেড়ানো? হায়! আর যা হোক মানুষ ত আর পাখী নয়!

অদৃশ্য সঙ্কেত

আজ থেকে দেড় শ'বছর আগে ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দে স্যার উইলিয়ম হার্শেল বর্ণালীর সাতটি রঙ নিয়ে পরীক্ষা করে দেখছিলেন। তাঁর এই
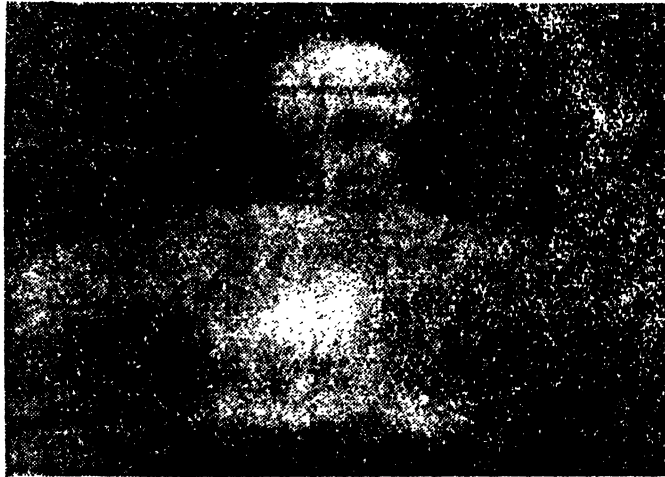
অদৃশ্য আলো এক্স্-রের মত কাজ করছে। এই আলোতে বুকের ডান দিকে এক ধরণের ক্যান্সার ধরা পড়ছে।

স্তব্ধ প্রহর

শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত্র

জেনী-দির দরুণই শোভনার নতুন চাকরি।

জেনী-দি সেদিন শোভনাকে সত্যি তার বাসায় পৌঁছে দিয়েছিলেন। কিন্তু তার আগে নিয়ে গিয়েছিলেন তাঁর নিজের ডেরায়।

ডেরা এমন কিছু নয়, তবে শোভনার কাছে তা একেবারে নতুন। আগেকার খাস ইংরেজদের পাড়া এখন পাঁচমিশেলী হয়েছে। কিন্তু শহরের সাধারণ ধনী-দরিদ্রের বাঙ্গালী অঞ্চলের সঙ্গে তার কোন মিল নেই। প্যাণ্ট-কোট এখন সর্বত্র দেখা যায়। কিন্তু এখানে শাড়ার চেয়ে স্কার্ট-ই বুঝি বেশী। কটা চুল নীল চোখও চোখে পড়ে। এই পাড়ারই একটি বিরাট্ ম্যানসনের ছোট একটি একানে ফ্ল্যাট নিয়ে থাকেন জেনী-দি। ছোট-বড় অমন পঞ্চাশটা ফ্ল্যাট নিয়ে ছ'তলা প্রমাণ বাড়ী। গেট দিয়ে ঢুকতে হয়, অপরিসর হোক্, লিফ্ট্ একটা আছে ওঠা-নামার। নিচের সিমেণ্ট বাঁধানো চত্বরে জেনী-দির মত আট-দশটা সরেস-নিরেস নতুন-পুরোণ গাড়িও আছে।

জেনী-দি গাড়িটা রেখে শোভনাকে লিফ্টে তুলে তাঁর চার তলার ফ্ল্যাটে নিয়ে গেছলেন। এ বাড়ীর হিসেবে দু'কামরার নেহাৎ সস্তা এক ফ্ল্যাট। সাজসজ্জা আসবাবপত্রও সাদাসিধে মামুলী। কিন্তু শোভনার কাছে সবই অদ্ভুত লেগেছে। এই একটা জগতের সঙ্গে কোন পরিচয় তার ছিল না কোনদিন।

কয়েক মিনিটের পরিচয়ে জেনী-দি তাকে হঠাৎ নিজের ফ্ল্যাটে এমন অপ্রত্যাশিত ভাবে এনে তুললেন কেন?

এ প্রশ্নের জবাব একদিনে পায় নি। পেয়েছে ধীরে ধীরে জেনী-দির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হবার পর। ঘনিষ্ঠতা তাদের সেই দিন থেকেই সুরু হ'লেও জেনী-দি এক নিঃশ্বাসে তাঁর কাহিনী কোনদিন ব'লে যান নি। এখানে-ওখানে আলাপ-আলোচনার টুকরো থেকে শোভনাকেই তা গেঁথে তুলতে হয়েছে নিজের মনে।

ভালবাসার মত ভাল লাগারও কোন স্পষ্ট বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা বোধ হয় দেওয়া যায় না। কেন এক মুহূর্তে কাউকে আপনার ব'লে মনে হয় তার কোন নিয়ম-কানুন নেই। শোভনাকে জেনী-দির হয়ত সেই রকম ভালই লেগেছিল, লেগেছিল হয়ত মিলের চেয়ে অনেক কিছুতে গরমিলের জন্যেই। কিন্তু হঠাৎ শোভনাকে নিজের ফ্ল্যাটে শুধু নয়, আসলে নিজের জীবনেই ডেকে আনার কারণ বোধহয় নিঃসঙ্গতা, যে নিঃসঙ্গতা একটা বয়স পার হবার পর জেনী-দির মত মেয়েকেও কাতর ক'রে তোলে।

এককালে যাকে ইঙ্গবঙ্গ সমাজ বলা হ'ত জেনীদি তার মধ্যেই মানুষ। কনভেণ্টে পড়াশুনা করেছেন, সাহেবিয়ানার পরিবেশে বড় হয়েছেন। বিয়ে নিজেদের সমাজেই হয়েছিল আলাপ পরিচয় পূর্বরাগ ইত্যাদি সব ধাপ পেরিয়ে। কিন্তু তবু সে বিয়ে সুখের হয় নি। সুখের না হ'লেও হয়ত মানিয়ে চলা যেত, কিন্তু স্বস্তিটুকুও জেনী-দি পান নি। জুলুম অত্যাচার ঠিক নয়, মন মেজাজ স্বভাব প্রবৃত্তি রুচির গরমিল। সে গরমিল দিন দিন স্পষ্ট হয়ে প্রাত্যহিক জীবন তিক্ত ক'রে তুলেছে। এ তিক্ততা পাছে আরো তীব্র কিছুতে পৌঁছয়, পরস্পরের সম্মতি ক্রমেই তাই ছাড়াছাড়ি হয়েছে। বিবাহ-বিচ্ছেদের কিছুদিন বাদে স্বামী বিদেশে চ'লে গেছেন, আর ফেরেন নি। জেনী-দি বাপ-মায়ের একমাত্র মেয়ে। দু'জনেই তাঁরা গত হয়েছেন। মেয়ের জন্যে যা রেখে গেছলেন তা আগেকার দিনের পক্ষে যথেষ্ট ছিল। দিন-কাল বদলাবার দরুণ তার মূল্য কমে গেছে। তখন যা নিশ্চিন্ত স্বাচ্ছল্য দিতে পারত, এখন তাতে একরকম চ'লে যায়। জেনী-দির আর্থিক ভাবনা খুব বেশী তাই নেই। আগে পছন্দমত ছোটখাট কাজকর্ম করেছেন। ভালো না লাগলে ছেড়ে দিয়েছেন। এখনও জীবিকার জন্যে চাকরি খোঁজবার ঠিক দরকার নেই। তবু একটু-আধটু ঘোরাফেরা না ক'রে পারেন না, যে নিঃসঙ্গতা ক্রমশঃ চারদিক্ দিয়ে ঘিরে আসছে বলে ভয় হয় তাই এড়াতে বোধহয়। কাজকর্ম এখনও একেবারে চান না তা নয়, কিন্তু বেশীর ভাগই মনের মত হয় না। নিজের সমাজের সঙ্গেও যোগাযোগ বিশেষ নেই। তা ছাড়া সময়ের সঙ্গে তাঁদের সে সমাজেও ভাঙ্গন ধরেছে। পুরনোকালের মানুষ শুধু নয় রুচি প্রকৃতি আদর্শও

সবক্ষেত্রে বাতিল না হ'লেও ম্লান হয়ে গেছে। এখনও পুরনো কালের চেনাশোনা মহলে উৎসবে পার্টিতে ডাক পড়ে কিন্তু সে সব উৎসব থেকে আরো হতাশ হয়ে ফিরতে হয়। সেখানকার কৃত্রিম উৎসাহ উত্তেজনা যেন আরো করুণ। সে সমাজ নিজের অন্তিম নিয়তি যেন বুঝেও না বুঝবার ভান করছে।

নিঃসঙ্গতার এই স্তরে পৌঁছে জেনী দি দৈবাৎ শোভনাকে পেয়ে বেঁচে গেছেন। তাঁর যে জগৎ ক্রমশঃ সঙ্কীর্ণ হয়ে এসে কঠিন কারাগার হয়ে উঠছিল শোভনাই যেন তার নতুন দরজা খুলে দিয়েছে। শোভনার জন্যে তাই তাঁর উৎসাহের সীমা নেই। পরিচয়ের কিছুদিন বাদেই তিনি শোভনার একটা কাজের ব্যবস্থা সত্যিই ক'রে ফেলেছেন। কাজটা সত্যি ভালো। শোভনার কাছে অন্ততঃ আশাতীত।

নামজাদা এক বড় কোম্পানী শহরের সৌখিন পাড়ায় একটা শো-রুম খুলেছে। বেচাকেনার দোকান ঠিক নয়, নিজেদের তৈরী জিনিষপত্র সাধারণের কাছে প্রচার করাই আসল উদ্দেশ্য। আধুনিক সৌখিন ধনী সমাজের গৃহসজ্জার উপকরণ আসবাবপত্রই সেখানে প্রধান।

জেনী-দি নিজে সেখানে কাজ সংগ্রহ ক'রে শোভনাকেও সহকারিণী হিসেবে নেওয়ার ব্যবস্থা করেছেন।

শোভনা এ কাজ নিতে একটু দ্বিধাই করছিল প্রথম। এখানে যে ধরণের লোকের আনাগোনা তাদের জগতের সঙ্গে কোন পরিচয়ই তার নেই। তাদের সঙ্গে ছুটো কথাবার্তা কইতে গেলেই সে ধরা পড়ে যাবে না কি?

কিন্তু জেনী-দি শতার সব আপত্তি হেসে উড়িয়ে দিয়েছেন। বলেছেন, ধরা পড়বে কার কাছে! সে যদি কানা হয়, অন্যেরা চোখে দেখে না। সত্যিকার রুচির বনেদ নতুন কালের ধাক্কায় ধ্বসে গেছে। এখন শুধু চোখ-কান বুজে ফ্যাশানের হুজুগে ভাসা।

শোভনার সাজসজ্জা প্রসাধন শুধু তিনি বদলে দিয়েছেন। এখন তাকে দেখে চেনা ভার। মাথার চুল থেকে পায়ের নখ পর্যন্ত ভোল পাল্টে গেছে। শোভনার অস্বস্তি হয়েছিল প্রথমে যথেষ্টই। কিন্তু জেনী-দি বুঝিয়ে দিয়েছেন যে, কাজ সে করতে যাচ্ছে তাতে বাইরের চটক আর পালিশটাই আসল।

জেনী-দির ধারণা যে ভুল নয় তার প্রমাণ শোভনা প্রথম থেকেই পেয়েছে। অপ্রস্তুত তাকে ত কোথাও হতেই হয় নি, তার বদলে অসুবিধে যা একটু-আধটু হয়েছে তা কোন কোন পুরুষ আগন্তুকের অতিরিক্ত আলাপের উৎসাহে। কিন্তু সেটাও গা-সওয়া হয়ে গেছে কিছুদিনে।

অসুবিধা সব চেয়ে যেটা বেশী হয়েছে তা হ'ল এখনকার এই উগ্র আধুনিক সাজে আশুবাবুর বাড়ীর সেই আধা-পল্লী অঞ্চল থেকে প্রতিদিন কাজের জায়গায় আসা। বড় রাস্তায় এসে পৌঁছতে পারলে আর অবশ্য কোন ভাবনা নেই। কিন্তু তার আগের দীর্ঘ পথ এই সাজ-পোশাকে প্রতিদিন হেঁটে আসা একটা বিড়ম্বনা! মুখের আলাপ না থাক্, এ রাস্তার অনেকেই তাকে সেই প্রথম এ পাড়ায় আসার পর থেকেই দেখে আসছে। তাদের সে বিস্মিত বিদ্রূপ-দৃষ্টি প্রতিদিন তাকে যেন জর্জ্জর ক'রে দেয়। চেষ্টা ক'রেও এই ব্যাপারে নিজেকে নির্বিকার ক'রে তুলতে সে পারে না।

একমাত্র সৌভাগ্যের কথা এই যে, আশুবাবুর সামনে দিয়ে এ সাজ-পোশাকে শোভনাকে বার হ'তে হয় নি। শোভনার এ চাকরি পাবার কিছুদিন আগেই আশুবাবু সত্যিই তীর্থ ভ্রমণে বেরিয়ে গেছেন। যাবার আগে শোভনাকেই তাঁর বাড়ীঘর দেখাশোনার ভার দিয়ে যেতে চেয়েছিলেন। কিন্তু শোভনা রীতিমত অনুনয় বিনয় ক'রে তাঁকে নিরস্ত করেছে কোন রকমে। শেষ পর্যন্ত আশুবাবুর সেই দাবাখেলার বন্ধু উমেশবাবুকেই এ দায়িত্ব দিয়েছেন। শোভনা শুধু তার ঘরটিতে বিনা ভাড়ায় যতদিন ইচ্ছা থাকবার অধিকারটুকু পরম অনুগ্রহ হিসেবে গ্রহণ করেছে।

কিন্তু অনুগ্রহের দানের মর্যাদাও তার পক্ষে রাখা ক্রমশঃ অসম্ভব হয়ে উঠেছে।

জেনী-দিকে এ সমস্ত কথা কিছুই শোভনা অবশ্য জানায় নি। কিন্তু নিজে থেকেই, কি বুঝে বলা যায় না, তিনি হঠাৎ একদিন শোভনাকে তাঁর ফ্ল্যাটে এসে থাকবার প্রস্তাব করেছেন।

শোভনার আশু সমস্ত সমস্যার এমন সমাধান আর কিছু বুঝি হ'তে পারে না, তবু জেনী-দির স্নেহ-প্রীতির এ নিদর্শনে অভিভূত হয়েও সে এক কথায় সায় দিতে পারে নি। সময় নিয়েছে ক'টা দিন ভেবে দেখবার।

ভেবে দেখবার সময় নেবার কারণ তার সাময়িক সুবিধা অসুবিধার সমস্যার চেয়ে আলাদা কিছু। শুধু আলাদা কিছু নয় তার চেয়ে অনেক গুরুতর কিছু, যা এতদিন বাদে সত্যই তার জীবনের একেবারে নতুন পাতা ওল্টাবার দাবী নিয়ে এসেছে।

জীবনের সমস্ত ভিত নতুন ক'রে পাতবারও সিদ্ধান্ত

সঙ্কট দেখা দিয়েছে অবশ্য মাত্র কয়েকদিন আগে। কিন্তু তার সূচনা হয়েছে তার নতুন কাজ পাওয়ার কিছুদিন পরেই। কিংবা বুঝি অনুপমের নির্মম বঞ্চনার প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাবার পর থেকেই সমস্ত ঘটনার বেগ এই জীবনের ধারা বদলানো প্রপাতের দিকেই অলক্ষ্যে বইছিল।

স্পষ্ট সূচনা অবশ্য শোভনাদের কোম্পানীর শো-রুমে অপ্রত্যাশিতভাবে সেই দুঃখী বৌ আর তার স্বামীর একদিন আসায়।

সেদিন শো-রুমে ভিড় বুঝি একটু বেশী। শোভনা অবাঙালী একটি পরিবারকে অতি আধুনিক আসবাব-পত্রের মহিমা বোঝাতে তখন হিমসিম খাচ্ছে। দুঃখী বৌ বা তার স্বামীকে সে লক্ষ্য করে নি।

দুঃখী বৌ-ই তাকে প্রথম দেখে সবিস্ময়ে কাছে এসে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞাসা করছে,—আপনি! আপনি শোভনা না?

প্রশ্নের এ সবিস্ময় সুরের কারণ বুঝতে শোভনার দেরি হয় নি। শোভনাকে এখানে দেখা যতটা অপ্রত্যাশিত তার চেহারা পোশাকের এ পরিবর্তন তার চেয়ে বেশী নিশ্চয়।

ভেতরে কুণ্ঠিত বোধ করলেও শোভনা বাইরে তা প্রকাশ করে নি। বরং সহজ ভাবেই পরিহাসের সুরে বলেছে, হ্যাঁ শোভনাই। অনেক কিছু হয়ত বদলেছে কিন্তু নামটা বদলাতে পারি নি।

দুঃখী বৌ এবার সরল ভাবে স্বীকার করেছে,—সত্যি ভাই প্রথমটা সন্দেহই হচ্ছিল তুমি কি না। তা ছাড়া তোমাকে এখানে দেখবার কথা ভাবতেই পারি নি। অনুপমবাবুর কথা শুনে ত···

দুঃখী বৌ কথাটা আর শেষ করতে পারে নি। হঠাৎ দ্বিধাভরে থেমে যে ভাবে শোভনার দিকে তাকিয়েছে তাতেই শোভনার সমস্ত মুখ একটা অস্পষ্ট সন্দেহে কঠিন হয়ে উঠেছে। তবু যথাসাধ্য নিজেকে সামলাবার চেষ্টায় ঈষৎ হেসে সে বলেছে—একটু দাঁড়াও ভাই। আমায় এই মক্কেলদের জেনী-দির হাতে সঁপে দিয়ে আসছি।

জেনী-দির খোঁজে যাবার কিন্তু দরকার হয় নি। তিনি বোধ হয় কিছু আগেই কাছে এসে দাঁড়িয়েছিলেন। দুঃখী বৌ আর তার স্বামীর সঙ্গে নমস্কার বিনিময়ের ধরণে বোঝা গেছে তাঁরা পরস্পরের অপরিচিতও নন।

জেনী-দির হাতে মক্কেলদের ছেড়ে দেবার পর শোভনা কিন্তু সোজাসুজিই প্রশ্ন করেছে—কি শুনেছ আমার সম্বন্ধে বল ত? আমি হঠাৎ মারা গেছি, না তাঁকে ছেড়ে কোথাও উধাও হয়ে গেছি?

মুখে হাসির আভাস রাখবার চেষ্টা থাকলেও শোভনার কণ্ঠের তীক্ষ্ণতা তাতে চাপা পড়ে নি।

দুঃখী বৌ বেশ একটু বিব্রত ভাবে একবার স্বামীর দিকে অসহায় ভাবে চেয়ে কথাটা ঘোরাবার চেষ্টা করেছে প্রথমে। না, মানে, সেরকম কিছু না, তবে

শোভনা দুঃখী বৌকে নিজেই এবার এ বিব্রত অবস্থা থেকে নিষ্কৃতি দিয়ে বলেছে—থাক, তিনি কি বলেছেন তা আমার না জানলেও চলবে। কিন্তু তাঁর সঙ্গে তোমাদের যোগাযোগ কোথায় হ'ল সেইটেই বুঝতে পারছি না।

বাঃ, অনুপমবাবু এখন ওঁর কাছেই কাজ করছেন যে! তুমি—মানে, তুমি জান না?

দুঃখী বৌ অস্বস্তিকর প্রসঙ্গটা এড়াবার সুযোগ পেয়েও এই শেষ প্রশ্নে আবার এমন ভাবে জড়িয়ে পড়বে বোধ হয় ভাবে নি।

শোভনার কিন্তু এ ভুলের সুযোগ নিতেও যেন এবার ঘৃণা হয়েছে। একটু তিক্ত হাসির সঙ্গে বলেছে,—না জানলেই বা ক্ষতি কি! তিনি কাজ পেয়েছেন এই ত যথেষ্ট। কোথায়, কি করছেন তা আমায় জানতেই বা হবে কেন?

এ আলোচনায় এখানেই ছেদ টানবার জন্যে শোভনা তার পর বলেছে,—এখন একটু চাকরির দায় সারতে হয়। আমাদের কোম্পানীর কেরামতি একটু ঘুরে দেখাই এস।

দুঃখী বৌ আপত্তি করে নি। কিন্তু সামান্য একটু দেখাশোনার পরই বলেছে—আজ আর থাক্ ভাই! এমনি আজ হঠাৎ খেয়ালে ঢুকে পড়েছিলাম। আরেক-দিন বরং এসে ভাল ক'রে দেখে যাব।

বেশ, তাই এস।—কোম্পানীর স্বার্থে যেটুকু প্রয়োজন সেই মাপা ভদ্রতার হাসিটুকুই শোভনার মুখে দেখা গিয়েছে।

এতক্ষণ সঙ্গে সঙ্গে ফিরলেও দুঃখী বৌ-এর স্বামী তার ছায়ার মতই নীরব ছিলেন।

বিদায় নিয়ে চ'লে যাবার পথে শো-রুমের দরজার কাছে থেমে প'ড়ে তিনি কি যেন তাঁর স্ত্রীকে বলছেন, শোভনা দেখতে পেয়েছে।

দুঃখী বৌ তার পরই আবার ফিরে এসেছে শোভনার কাছে।

অত্যন্ত কুণ্ঠিত ভাবে বলেছে—একটা কথা বলবার

জন্যে আবার ফিরে এলাম ভাই। উনিই বললেন সত্যি কথাটা তোমায় না জানিয়ে যাওয়া অন্যায় হবে।

শোভনার মনের তিক্ততাটা তখনও কাটে নি। তবু দুঃখী বৌ-এর এই কুণ্ঠা ও ব্যাকুলতায় সে লজ্জিতই বোধ করেছে, নিজের অনিচ্ছাতেও যেটুকু রূঢ়তা তার কণ্ঠে প্রকাশ পেয়েছে তার জন্যে। এই দুঃখী বৌ-এর সঙ্গে একদিন পরিচয় করতে পেরেই যে ধন্য হয়েছে, মুগ্ধ হয়েছে তার হৃদয়ের উদারতায়, একথা কয়েক মুহূর্তের জন্যে ভুলে যাওয়ার জন্যেও অপরাধী মনে হয়েছে নিজেকে।

যথাসাধ্য স্নিগ্ধ স্বরে সে বলেছে,— কি সত্যি কথা না জানিয়ে যাওয়া তুমি অন্যায় মনে করছ জানি না, কিন্তু আমার কথা যদি বিশ্বাস কর তা হ'লে আমার স্বামীর সম্বন্ধে সত্য-মিথ্যা কোন কিছু জানবার বিন্দুমাত্র প্রয়োজন আর আমার নেই।

শোভনার কণ্ঠের আন্তরিকতা কিন্তু দুঃখী বৌ-এর কাছে অভিমানের মতই শুনিয়েছে। ব্যাকুল ভাবে এক নিঃশ্বাসে সে ব'লে গেছে,—ছি, এসব কি বলছ ভাই। তোমাদের মধ্যে ভুল বোঝাবুঝির কাঁটা আমার দোষেই বিঁধে থাকলে আমার আফশোষের সীমা থাকবে না। অনুপমবাবু আমাদের কাছে মিথ্যে কথা বলেছেন ঠিকই, কিন্তু তবু তাঁকে কত দুঃখে কি অবস্থায় এ মিথ্যে বলতে হয়েছে আমাদের চেয়ে তোমারই আগে বোঝা উচিত। তুমি আবার অসুখে পড়েছ ব'লে তোমায় হাসপাতালে পাঠাতে হয়েছে এই কথাই জানিয়ে তিনি যে কোন একটা কাজ চাইতে এসেছিলেন। তখন তুমি এ কাজ পেয়েছ কি না জানি না। পেয়ে থাকলেও নিজের জন্যে ও মিথ্যেটুকু বলা খুব সাংঘাতিক অন্যায় ব'লে মনে করতে পারছি না।

কথাগুলো ব'লে এমন ভাবে দুঃখী বৌ শোভনার দিকে চেয়েছে যেন শোভনার মনের কাঁটাটুকু দূর হয়ে গেছে না জেনে গেলে তার স্বস্তি নেই।

শোভনা সেই রকম কিছু আশ্বাস দিয়েই এ অপ্রীতিকর আলোচনাটা শেষ করতে চেয়েছিল, কিন্তু হঠাৎ তার মনের মধ্যে কি যেন একটা তিক্ত বিদ্রূপ-তীব্র খেয়ালের ঢেউ উঠেছে।

কিছুক্ষণ নীরব থেকে সে একটু হেসে বলেছে,—না, অন্যায় তিনি কিছু করেন নি। বরং আসল সত্যটা গোপন ক'রে আমার মান বাঁচাবার যে চেষ্টা করেছেন তার জন্যেই আমার কৃতজ্ঞ থাকা বোধ হয় উচিত। আর কেউ না জানুক সত্য কথাটা তোমায় অন্ততঃ না জানিয়ে পারছি না। আমার অসুখের কথাটা মিথ্যে। আসল সত্য হ'ল এই যে, সমস্ত সম্পর্ক চুকিয়ে তাঁকে আমি ছেড়ে এসেছি। এই কথাটাই লজ্জায় ঘৃণায় বলতে না পেরে বোধ হয় হাসপাতালের মিথ্যেটা তাঁকে সাজাতে হয়েছে।

দুঃখী বৌ এ কথায় স্তম্ভিত হয়েছে সন্দেহ নেই। কিন্তু এ কথা বলবার পর তার প্রতিক্রিয়াটুকু দেখবার জন্যেও শোভনা আর সেখানে দাঁড়ায় নি।

তার ক'দিন বাদে অফিসের কাজের পর বিকেলে বাইরে বেরিয়ে নিখিলকে রাস্তায় অপেক্ষা করতে দেখেছিল ?

শোভনার ঠিক মনে নেই। ওই কয়েকটা দিনের ঘটনা ও ভাবনাগুলো মনের মধ্যে বিন্দুমাত্র অস্পষ্ট না হ'লেও যেন কেমন জট পাকিয়ে গেছে।

অফিসের ছুটির পর জেনী-দিই নিজের গাড়ীতে তাকে বাসায় পৌঁছে দেন নিত্য নিয়মিত ভাবে। শোভনা দু-একবার নিষ্ফল আপত্তি জানিয়ে পরে নিরস্ত হয়েছে।

জেনীদির সঙ্গে গাড়ীতে গিয়ে বসবার আগেই নিখিলকে দেখতে পায়।

সেদিন জেনীদির সঙ্গে বাসায় ফেরা আর হয় নি।

জেনীদি আগে কখনও নিখিলকে দেখেন নি। কি তিনি ভেবেছিলেন শোভনা তখন অন্ততঃ জানতে পারে নি।

নিখিলের অমন অপ্রত্যাশিত ভাবে তার জন্যে রাস্তায় অপেক্ষা করায় শোভনার পক্ষে বিস্মিত হওয়াই স্বাভাবিক ছিল। কিন্তু কেন বলা যায় না তা যেন সে হয় নি। কে জানে মনের অগোচরে এমনি একটি প্রত্যাশাই হয়ত তার ছিল।

নিখিলের সঙ্গে এ চাকরি পাবার কিছুদিন পর থেকেই দেখাশোনা তাদের হয় নি। না দেখা হওয়ার কারণ স্বেচ্ছায় পরস্পরকে এড়িয়ে চলা নয়। নিখিল কিছুদিনের জন্যে কোথায় যেন বাইরে গেছল মাকে সঙ্গে নিয়ে। যাবার আগে দেখা ক'রে গেলেও কোথায় যাচ্ছে তা জানায় নি। কৌতূহল যতটাই থাক্ শোভনারও প্রশ্ন করতে কোথাও বেধেছে। কেন যে এ দ্বিধা হয়েছে নিজেকে প্রশ্ন করতেও সে সাহস করে নি।

তার পর এই প্রথম দেখা।

তার জন্যে অপেক্ষা করতে দেখে বিস্মিত হোক্-না-হোক্, জেনী-দি গাড়ী নিয়ে চ'লে যাবার পর নিখিলের ব্যবহারে সে অবাক্ হয়েছে সত্যিই।

প্রথম দেখার পর কথাবার্তা কিছু হবার আগেই নিখিল রাস্তার ওপারের একটা চলন্ত ট্যাক্সি ডেকেছে।

ট্যাক্সি! ট্যাক্সি কেন? শোভনা সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা না ক'রে পারে নি।

ট্যাক্সিটা তখন তাদের কাছের ফুটপাথে এসে দাঁড়াবার জন্যে মুখ ঘোরাচ্ছে।

ট্যাক্সি কেন জিজ্ঞাসা করছেন? নিখিল হেসে বলেছে,—চ'ড়ে বেড়াবার জন্যে। হাওড়ার সেই রেস্তোরাঁয় যে ইচ্ছের কথা বলেছিলেন, তাও আপনার আপত্তি না থাকলে আজ মেটাতে পারি। লক্ষ্য করেছেন কি না জানি না, যে আজ আপনাকে ত নয়ই, খানদানী কোন হোটেলে রেস্তোরাঁয় ঢুকলে বয়-খানসামারা আমার পোশাক দেখেও অন্ততঃ চোখ কপালে তুলবে না।

বাড়াবাড়ি কিছু না থাক্ নিখিলের সাজ-পোশাকের পরিবর্তন আজ চোখে পড়বার মত। শোভনা তা লক্ষ্যও করেছে।

একটু হেসে বলেছে,—কিন্তু আমাকে ট্যাক্সি চড়িয়ে হোটেল রেস্তোরাঁয় খাওয়াবার জন্যেই কি এত তোড়জোড়! তাই জন্যেই কি অপেক্ষা ক'রে দাঁড়িয়েছিলেন এখানে?

তাই যদি মনে করেন প্রতিবাদ করব না। এখন দরকার শুধু আপনার সম্মতির। যদি আপত্তি থাকে ত বলুন সামান্য কিছু গুণগার দিয়ে ট্যাক্সিকে বিদায় ক'রে দিই।

ট্যাক্সিটা তখন তাঁদের কাছেই এসে দাঁড়িয়েছে।

নিখিলের দিকে একবার অদ্ভুত দৃষ্টিতে চেয়ে শোভনা নিজেই প্রথম ট্যাক্সির ভেতরে গিয়ে বসেছে। নিখিল এসে বসবার পর ড্রাইভারকে নির্দেশও দিয়েছে সে নিজেই।

নিখিল একটু অবাক্ হলেও হেসে জিজ্ঞাসা করেছে—হোটেল রেস্তোরাঁয় তা হ'লে যেতে চান না?

না। জীবনটা কাব্য নয় জানি, মাত্রা বা মিল কোন কিছুর ধার সে ধারে না। তবু একটা অধ্যায় যেখানে সুরু হয়েছিল সেখানেই তা শেষ করা যায় কি না দেখতে যাচ্ছি।

চম্‌কে একটু যেন সভয়েই নিখিল এবার শোভনার দিকে চেয়েছিল। শোভনার এ কণ্ঠস্বর সে অন্ততঃ কখনও আগে শোনে নি।

তার পর সত্যিই সেইখানেই শোভনা নিখিলকে নিয়ে গিয়ে বসিয়েছিল।

সেই এক বেঞ্চিতে, হতাশা-গভীর এক সন্ধ্যায় যেখান থেকে উঠে আসবার শক্তিটুকুও শোভনাকে জীবনের ভিত্তিমূল থেকে যেন সংগ্রহ করতে হয়েছিল।

কি কথা সেদিন তাদের মধ্যে হয়েছিল?

কিছুই বুঝি নয়।

পাশাপাশি ব'সে গভীর নীরবতার ভেতর দিয়ে পরস্পরকে যেন তারা নতুন ক'রে চিনেছিল।

অনেকক্ষণ বাদে, এপার-ওপারের অসংখ্য আলোর বিন্দুর কম্পিত রেখায় ছাড়া বিস্তীর্ণ নদীর স্রোত যখন অন্ধকারে মুছে গেছে, নিখিল তখন ধীরে ধীরে দ্বিধাভরে বলেছে, কেন আজ তোমার অপেক্ষায় এসে দাঁড়িয়েছিলাম তখন জিজ্ঞাসা করেছিলে। সে প্রশ্ন তখন এড়িয়ে গেছলাম, ভাল ক'রে সবকিছু বলবার সুযোগের আশায়। এখন মনে হচ্ছে সে সুযোগের আর দরকার নেই। ভেবে এসেছিলাম অনেক কথাই তোমায় বলব, যুক্তি দিয়ে তর্ক ক'রে নিজের বিশ্বাসের ব্যাকুলতা দিয়ে যেমন ক'রে হোক্ আমার কথা তোমায় বোঝাবই। কিন্তু এখন গভীর ভাবে বুঝতে পারছি, যে কথা হৃদয়ের অতলে থাকে তা জানাবার রাস্তা ও নয়। এখানে আজ এই আবছা অন্ধকারে শুধু এই পাশাপাশি ব'সে থাকার সান্নিধ্যে আমাদের অন্তরের সেই গভীর ঢেউ যদি পরস্পরকে না দোলা দিয়ে থাকে তা হ'লে কথার ঝড় তুলেও কোন লাভ হবে না। কিছুই না ব'লে তাই শুধু দুটো খবর তোমায় জানাই। অনেকদিন বাদে সত্যিই একটা ভাল কাজ আমি পেয়েছি। এখানে নয়, বাংলা দেশ থেকে অনেক দূরে, যেখানে এখানকার চেনা জগতের স্মৃতিও ইচ্ছে করলে মুছে ফেলা যায়।

কয়েক মুহূর্ত চুপ ক'রে থেকে নিখিল গলার স্বর একটু হাল্কা করবার চেষ্টা ক'রে আবার ব'লেছিল, —এই চাকরির পাকা খবর নিতেই আমি গেছলাম। ফিরে এসেছি এখানকার সব পাট চুকিয়ে যাবার ছুতোয় ক'দিনের ছুটি নিয়ে। যাবার পথে মাকে কাশীতে রেখে এসেছি তাঁরই নিজের ইচ্ছায়। জীবনের শেষ ক'টা দিন তিনি সেখানেই কাটাতে চান। ছেলের প্রতি তাঁর অন্ধ স্নেহ যত প্রবলই হোক্, অগঙ্গার দেশে গিয়ে পরকাল খোয়াতে তিনি রাজী নন।

নিখিল আবার চুপ ক'রে ছিল কিছুক্ষণ।

শোভনা এতক্ষণের মধ্যে নিখিলের দিকে একবার ফিরে পর্যন্ত তাকায় নি। নিখিলের কোন কথা সে

নেছে কি না তাও তার নিশ্চল স্তব্ধতার মূর্তি দেখে বোঝা যায় নি।

সে-ই কিন্তু এবার প্রায় অস্পষ্ট কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করেছিল—কবে আপনি যাচ্ছেন?

কবে যাচ্ছি?—শোভনার এই প্রশ্নটুকুই যেন নিখিলের গলার স্বর দীপ্ত উত্তেজিত ক'রে তুলেছিল—যদি বলি যাবার তারিখ শুধু নয়, এমন কি যাওয়া-না-যাওয়া তোমার ওপরই নির্ভর করছে।

আমার ওপর!—শোভনার কণ্ঠে বিস্ময়ের চেয়ে বেদনার সুরই যেন বেশী স্পষ্ট।

হ্যাঁ, তোমার ওপর! ধর্ম-নীতি, মানুষের সমাজের বিধি-নিষেধ আইন সব আমি মানি শোভনা, কিন্তু সেই সঙ্গে এ বিশ্বাসও আমার যাবার নয় যে, জীবনকে এমন সত্যের পরীক্ষা কখন কখন দিতে হয়, কোন কেতাবী আইন যার মর্ম জানে না। মানুষের আইন যে মুক্তি তোমায় দিতে পারে তার ব্যবস্থা তুমি যদি চাও ত আমি করতে প্রস্তুত। কিন্তু জীবনের পরম বিচারক যদি কেউ থাকেন তা হ'লে তাঁর কাছে মুক্তির রায় যে তুমি পেয়ে গেছ তা তুমি জান। সেই রায়কেই মাথা পেতে নিয়ে মানুষের বিচারের সুদীর্ঘ জটিলতার জন্যে অপেক্ষা করার ধৈর্য সত্যিই আমার নেই। আর সাতদিন মাত্র সময় আমরা নিজেদের দেব। যেখানে যাচ্ছি সেখানকার দু'টি রেলের টিকিট কাটা থাকবে। নিজের মনের ব্যাকুলতায় তোমায় যদি ভুল বুঝে থাকি, আমায় ক্ষমা ক'রো। ট্রেনের একটা সীট তা হ'লে খালিই যাবে। নিয়তিকেও তার জন্যে দোষ দেব না। বরং জীবনে একবার যে স্বর্গমর্ত্য-টলান দোলা লেগেছে তার জন্যেই কৃতজ্ঞ থাকব।

এত কথার উত্তরে কিছুই বলে নি শোভনা, শুধু নীরবে হাতটা বাড়িয়ে নিখিলের হাতটা খুঁজে নিয়ে ধ'রে থেকেছে।

তার পরের দিনই জেনী-দি তাঁর কাছে এসে শোভনার থাকবার কথা তুলেছিলেন। কিন্তু তার আগে চমকে দিয়েছিলেন হঠাৎ দুঃখী বৌ-এর কথা জিজ্ঞাসা ক'রে।

অফিসের ছুটির পর সেদিন জেনী-দি শোভনাকে তাঁর ফ্ল্যাটেই নিয়ে গেছলেন, রাত্রের খাওয়াটা সেখানেই সেরে যাওয়ার জন্যে।

জেনী-দির অনুরোধে হপ্তায় এমন দু'চারদিন শোভনাকে অফিসের ছুটির পর সেখানেই খেয়ে আসতে হয়।

রান্নার আয়োজন করতে করতে জেনী-দি হঠাৎ জিজ্ঞাসা করেছিলেন,—লটীর সঙ্গে তোমার কোথায় আলাপ হয়েছিল বল?

লটী!—শোভনা অবাক্ হয়ে জেনী-দির দিকে তাকিয়েছিল।

জেনী-দি সেদিনকার শো-রুমের সাক্ষাৎটা উল্লেখ করবার পর শোভনা সবিস্ময়ে বলেছিল,—ওর নাম লটী! সত্যি কথা বলতে গেলে ওর আসল নামই জানতাম না। আমরা ওকে দুঃখী বৌ ব'লেই জেনে এসেছি।

দুঃখী বৌ! এ নাম কোথা থেকে কে দিলে!

জেনী-দির গলায় বিস্ময়ের চেয়ে বেদনাই যেন ফুটে উঠেছিল।

কে কবে এ নাম দিয়েছিল তা'ও জানি না। তবে এক ছেলেমেয়ের অভাব ছাড়া কোন দুঃখ যার আছে ব'লে মনে হয় নি তার অমন উল্টো নাম কেমন ক'রে হ'ল সত্যিই ভেবে একটু অবাক্ই হয়েছি তখন।

জেনী-দি কিছুক্ষণ কেমন যেন অন্যমনস্ক হয়ে গেছেন। তারপর গাঢ় স্বরে ধীরে ধীরে বলেছেন,—উল্টো নয়, এর চেয়ে যথার্থ নাম ওর বুঝি হ'তে পারে না। তবে ওই নামের পেছনে কি করুণ ইতিহাস, আর কি অসামান্য মহিমা যে আছে তা যদি কেউ জানত।

সত্যিই বুঝতে পারলাম না আপনার কথা!—শোভনা কৌতূহলভরে না ব'লে পারে নি।

না পারবারই কথা!—জেনীদি একটু চুপ ক'রে থেকে কি যেন একটা দ্বিধা জয় ক'রে বলেছেন,—লটী বয়সে আমার চেয়ে ছোটই হবে, তবে একই কনভেন্টে আমরা পড়েছি। আসল নাম বোধহয় ওর লতিকাই ছিল, সে যুগের সাহেবিয়ানার ফ্যাসানে সে নাম হয়ে উঠেছিল 'লটী'। ওর স্বামী অরুণবাবুকে ত দেখেছ। কলেজ থেকে বেরুবার পরেই ভালবেসে ও বিয়ে করে। বিয়ের উৎসবে আমরা সবাই বোধহয় একই কথা ভেবেছিলাম। সামাজিক পরিবেশের তফাৎ থাকলেও এমন রাজযোটক আর হয় না ব'লেই আমাদের মনে হয়েছিল। কিন্তু সে রাজযোটকের এই পরিণাম কেউ কল্পনাও করতে পারে নি। বিয়ের কিছুদিন পরেই লটী জানতে পেরেছিল কোন দিন সন্তানের জননী হবার সৌভাগ্য তার হবার নয়।

জেনী-দি এইটুকু ব'লে থেমেছিলেন।

শোভনা প্রশ্ন আর কিছু করে নি, কিন্তু তার বিমূঢ় দৃষ্টিতে বোঝা গেছল, লটী বা দুঃখী-বৌ-এর এই নাতি-

বিরল দুর্ভাগ্যের মধ্যে নিদারুণ ইতিহাস বা অসামান্য মহিমার কোন পরিচয় সে পায় নি।

স্তম্ভিত হয়েছিল কিন্তু জেনী-দির পরের কথায়।

জেনীদি বলেছিলেন, সাধারণ মাপের আর কোন স্বামী কি করত জানি না কিন্তু লটীর স্বামী নিজে থেকে লটীকে বিনা বাধায় সমস্ত লজ্জা স্বীকার ক'রে বিবাহ বিচ্ছেদের সুযোগ দিতে চেয়েছিলেন। কিন্তু লটীই অটল হয়ে থেকেছে তার সঙ্কল্পে।

শোভনাকে ব্যাপারটা ভাল ক'রে বোঝবার একটু সময় দেবার জন্যেই যেন কিছুক্ষণ থেকে জেনীদি আবার বলেছিলেন—এ সব কথা আমি কি ক'রে জানলাম ভাবতে পার। সত্যিই আমার জানবার কথা নয়। কিন্তু আমার স্বামী ব্যরিষ্টার ছিলেন, বোধহয় তোমায় বলেছি! অরুণবাবু তাঁর কাছেই এসেছিলেন পরামর্শ ও সাহায্য নিতে। আমার স্বামী এমন বিচিত্র ব্যাপারটা সবিস্তারে আমায় না শুনিয়ে পারেন নি। লটীর সঙ্কল্পের অটলতায় অন্ধ সংস্কারের দুর্বলতাই তিনি দেখে-ছিলেন। আমার মন কিন্তু তাতে সায় দেয় নি।

জেনীদি সে দিন আরো অনেক কথাই বলেছিলেন। বলেছিলেন,—লটীর জীবনের এ গোপন করুণ রহস্য কেন যে তোমায় না ব'লে পারলাম না নিজেই ঠিক ভেবে পাচ্ছি না। হয়ত নিজের মনে আজ জীবনের অনেক কিছু সম্বন্ধে নতুন ক'রে সংশয়ের যন্ত্রণা জেগেছে ব'লে। লটীর কথা ভাবলে শ্রদ্ধায় বিস্ময়ে আমি অভিভূত হই আজো। কিন্তু সেই সঙ্গে মনে হয় তার জীবনের আদর্শ বুঝি শুধু কাব্যে কাহিনীতেই অমর ক'রে রাখবার। সে আদর্শকে দূর থেকে কল্পনায় প্রণাম করাই ভাল। নইলে জীবনকে বঞ্চনা করবার, তার কোন সঙ্গত দাবীকে অস্বীকার করবার শাস্তি অসহ্য।

রাত্রে খাওয়া-দাওয়ার পর শোভনাকে তার বাসায় পৌঁছে দেবার সময়েই জেনীদি শোভনাকে তাঁর ফ্ল্যাটে এসে থাকবার কথা বলেছিলেন। তাঁর মনের সুর তখন আবার বদলে গেছে।

ঠাট্টার সুরেই বলেছিলেন,—তোমার নিয়তি ত আমার ছকেই বাঁধা দেখতে পাচ্ছি। কেন আর তবে আলাদা এমন প'ড়ে থাকা। আমার কাছেই এসে থাক না কেন! মাঝে মাঝে একটু-আধটু হা-হুতাশ শোনাবার মানুষ না পেলে আমারও যে আর চলছে না।

নিখিলের সঙ্গে দেখা হয়েছে তার আগের দিনই। তার শেষ কথাগুলোই সারাক্ষণ তখন মনের মধ্যে ধ্বনিত হচ্ছে। সমস্ত সময়ের স্রোত যেন সামনের একটা তারিখের অজানা অনিশ্চিত প্রপাতের দিকে ধাবিত।

শোভনা দ্বিধাভরে সময় চেয়েছিল ক'দিন ভেবে দেখবার।

জেনীদিকে ঠিক আগের দিনই কথাটা জানিয়েছিল। অন্য কিছু নয়, শুধু এ চাকরি সে আর করবে না সেই সিদ্ধান্তের কথা।

ভাবনা ছিল, জেনীদি এ সম্বন্ধের কারণ নিশ্চয়ই জানতে চাইবেন। যত অস্বস্তিকরই হোক্ জেনীদি সে রকম কোন প্রশ্ন করলে সব কথাই না ব'লে সে পারত না। বলবার জন্যে নিজেকে সে প্রস্তুতও করেছিল। স্থির করেছিল, অন্ততঃ এই একজনের কাছে কোন কথাই সে গোপন করবে না।

কিন্তু জেনীদি কোন প্রশ্ন করেন নি। এমন কি তেমন কোন বিস্ময়ের আভাসও দেখা যায় নি তাঁর মুখে।

শুধু কেমন একটু সস্নেহ কৌতুকের দৃষ্টিতে তার দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে গাঢ় স্নিগ্ধস্বরে বলেছিলেন—ভুল করছ যদি ভাবি তবু সাবধান হবার উপদেশ দেব না। ভুল করার ভয়েই জীবনকে সবচেয়ে বড় ফাঁকি আমরা দিই।

তার পর সেই আশা আশঙ্কা উত্তেজনা স্পন্দিত রাত।

সন্ধ্যার পর একটু দেরি ক'রেই শোভনা বাসায় ফিরে-ছিল। ফিরেছিল বেশ একটু ক্লান্ত হয়ে। সারা দুপুর থেকে বিকেলটা দোকানে-বাজারে ঘুরে কয়েকটা দরকারী-অদরকারী জিনিষপত্র কিনেছে। ঘোরাঘুরি করেছে যতখানি দরকার তার চেয়ে বুঝি অনেক বেশী। এই কেনাকাটায় নিজেকে ব্যস্ত রাখাও যেন তার এক রকম প্রস্তুতি।

এ কয়দিনের মধ্যে নিখিলের সঙ্গে একটিবারের জন্যে মাত্র দেখা হয়েছে। নিখিল এ বাসা তার মাকে নিয়ে চ'লে যাবার সময়েই ছেড়ে গেছল। সাময়িক ভাবে একটা হোটেলেই এসে উঠেছে।

সেখান থেকে একটিবার শুধু সকালে একদিন এসে-ছিল শোভনার অফিসে বার হবার আগে।

এসে ঘরে পর্যন্ত ঢোকে নি, দরজাতেই দাঁড়িয়ে শুধু ক'টি কথা মাত্র ব'লে চ'লে গেছে। ব'লে গেছে—সকালেই ট্রেন, একটু আগেই ট্যাক্সি নিয়ে আমি আসব। একলাই

আমায় ফিরতে হবে কি না তা স্থির করার ভার তোমার ওপরই ছেড়ে গেলাম।

শোভনা রাত্রের খাওয়াটা সেদিন বাইরেই সেরে এসেছিল। একবার ইচ্ছে হয়েছিল জেনীদির সঙ্গে শেষ দেখা করে আসতে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তা যায় নি।

বাসায় ফিরে জিনিসপত্র গোছাতে বেশ একটু সময় লেগেছে। তার পর শারীরিক ও মানসিক ক্লান্তিতে একান্ত অবসন্ন হ'লেও বিছানায় শুয়ে ভাল ক'রে ঘুমোতে পারে নি। একটা অগভীর তন্দ্রায় মাঝে মাঝে একটু আচ্ছন্ন হয়েছে মাত্র।

এই আচ্ছন্নতা হঠাৎ চম্‌কে কেটে গেছে।

দরজায় কে যেন ধীরে ধীরে ঘা দিচ্ছে।

এত রাত্রে তার দরজায় কে ঘা দিতে পারে।

নিখিলের ছেড়ে-যাওয়া বাসায় নতুন একজন ভাড়াটে এসেছে বটে। কিন্তু তাদের সঙ্গে ত পরিচয়ই নেই। মধু এখন আশুবাবুর ঘরেই থাকে। কিন্তু সেও এত রাত্রে এমন দ্বিধাভরে দরজায় ঘা দেবে কেন?

উঠে ব'সেও শোভনা প্রথম কোন সাড়া দেয় নি। দরজায় মৃদু করাঘাত শোনা গেছে আবার।

কে?—বেশ তীক্ষ্ণস্বরেই জিজ্ঞাসা করেছে শোভনা।

দরজার ওধার থেকে অনুচ্চ কুণ্ঠিত মিনতি শোনা গেছে এবার।

দরজাটা একটু খোল সু।

শোভনার সমস্ত শরীর হিম হয়ে গেছে যেন তখনি, ভয়ে বিস্ময়ে না কাতরতায়, তা সে নিজেই জানে না।

প্রায় যন্ত্রচালিতের মত খাট থেকে নেমে দরজাটা খুলে দেবার পর শুধু একটা কথাই তার গলা দিয়ে বেরিয়েছে।

তুমি?

অস্পষ্ট রুদ্ধস্বর, তবু তা যেন তার সমস্ত দেহমন জীবন মথিত করা আর্তনাদের মত।

আমায় মাপ করো সু। তোমার কাছে না এসে আমার উপায় ছিল না।

শোভনা কিছুই বলে নি কথার উত্তরে, ধীরে ধীরে আবার ঘরের ভেতর গিয়ে বসেছে। অনুপমও এসেছে তার পিছু পিছু। কাছে গিয়ে বসে নি, দাঁড়িয়ে থেকেই বলেছে,—আমায় একটু জল দেবে সু?

অন্ধকার ঘর, শোভনা তবু আলো জ্বালেনি, অন্ধকারেই কলসি থেকে জল গড়িয়ে গেলাসটা অনুপমের হাতে দিয়েছে।

অনেকক্ষণ লেগেছে অনুপমের জলটুকু খেতে। সে জল যেন তার গলা দিয়ে নামতে চাইছে না।

জল খাওয়া শেষ হবার পরও সে নীরবে দাঁড়িয়ে থেকেছে অনেকক্ষণ। তার পরে প্রায় অস্ফুটকণ্ঠে বলেছে —আমায় কিছু টাকা দিতে হবে সু। নিরুপায় হয়ে শেষ পর্যন্ত তোমার কাছে এসেছি। তুমি, আজকাল ভাল চাকরি কর। যত সামান্যই হোক কিছু আমায় দাও। বাচ্চাটাকে নইলে বাঁচাতে পারব না।

অনেক কথাই নিশ্চয় বলতে পারত শোভনা। বলতে পারত—কেন? আমায় হাসপাতালে পাঠাবার নাম ক'রে তুমিওত ভাল চাকরিই পেয়েছ,তবু তোমার আমার কাছেই কি বাচ্চাকে বাঁচাবার টাকা চাইতে আসতে হয়?

কিন্তু কিছুই সে বলে নি, বালিশের তলাতেই তার ব্যাগটা থাকে, সেটা খুঁজে নিয়ে খুলে অন্ধকারেই অনুপমের হাতে নোটগুলো দিয়েছে।

সত্যিই বিমূঢ় হয়ে গেছে অনুপম, নোটগুলো হাতের মুঠোয় ধ'রে কেমন একটু শঙ্কিতস্বরেই বলেছে—এ যে অনেক টাকা সু?

হ্যাঁ, যা আমার কাছে আছে সবই তোমাকে দিলাম। আশা করি বাচ্চা তোমার বাঁচবে।

সু! একটা মূর্ত কান্নাই যেন মেঝের ওপর ভেঙে প'ড়ে শোভনার কোলের মধ্যে মুখ গুঁজেছে প্রচণ্ড ব্যাকুলতায়।

নিখিল বক্সী তার পর দিন খুব সকালেই এসেছিল।

এসে কয়েক মুহূর্ত শুধু দরজার কাছে দাঁড়িয়ে নীরবেই ফিরে গেছল আবার।

শোভনার ঘরের দরজা খোলাই ছিল, শোভনা নয়, নিস্তব্ধ কোন পাষাণ মূর্তিই যেন সেখানে দাঁড়িয়ে, আর তার পেছনে বিছানার ওপর তখনো নিদ্রিত যে মানুষটিকে দেখা গেছল কোন দিন তাকে না দেখলেও নিখিল চিনতে ভুল করে নি।

ফিরে যাবার আগে এক মুহূর্তের জন্যেও পরস্পরের দৃষ্টি বিনিময় কি তাদের হয় নি?

হয়ে থাকলেও তা বুঝি সমস্ত ব্যাখ্যার বাইরে।

অন্ধকার শূন্যতার সঙ্গে নেভানো দীপের সাক্ষাৎ কি ভাষা দিয়ে বোঝাবার!

সমাপ্ত

[দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখা]

শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্তবাবু
রাজনারায়ণ বসু
মহাশয় শ্রদ্ধাস্পদেষু
বৈদ্যনাথ-দেওঘর
Deoghar

ওঁ

শ্রদ্ধাস্পদেষু

আপনি আমার উপর—নিরীহ আমার উপর—যেরূপ প্রবল বেগে কারণের সহস্র কিরণ বর্ষণ করিয়াছেন—তাহাতে আমি ত একেবারে বিগতপ্রায়! শিশির বিন্দু প্রচণ্ড সূর্য্যকিরণে যেরূপ হয়—আমারও সেইরূপ দশা। প্রধান কারণ—শুধু যে আপনাকেই অতিষ্ঠ করিয়াছে তাহা নহে, অনেককেই অতিষ্ঠ করিয়াছে তাহা সত্ত্বেও আমি ত যেখানকার সেইখানেই আছি—কলিকাতা ছাড়ি নাই! আমাকে আপনি প্রধান কারণ বলেন নাই—তবু রক্ষে!, কিন্তু সহকারী কারণও কম কথা নহে—অনেক সময় সহকারী সম্পাদক সম্পাদক অপেক্ষা বেশী কাজ করিয়া থাকে। কি দোষে যে আমি সহকারী কারণ হইলাম—যতক্ষণে না আপনি আমাকে সম্মুখে (লেখনীতে নহে মুখে) খুলিয়া বলিতেছেন, ততক্ষণ আমি কিছুতেই শান্তি মানিতেছি না!

এইবার একটি কথা আমার মনে হইল—আপনি কিন্তু ঘুণাক্ষরেও আমার অপরাধ লইবেন না—আমাকে বেকসুর খালাস দিবেন—এইরূপ আমাকে অভয়-দান করুন—তবে আমি তাহা বলিব, নচেৎ আমি চুপ! আমি আপনাকে একটা কথা লিখিব—আপনি হয়ত একেবারে চটিয়া আগুন হইবেন—এ আমার লঘুপাপে গুরুদণ্ড বিধান করিবেন—একেবারে আপনার মনোরাজ্য হইতে আমাকে বহিস্কৃত করিয়া দিবেন! অতএব আগে আপনি আমাকে রীতিমত অভয় প্রদান করুন, তবে আমি সে-কথাটি বলিব। আমি যখন এত করিয়া অভয় প্রদান করিতেছি—আপনি অবশ্যই আমাকে অভয় দিয়াছেন সন্দেহ নাই।—অতএব আমি বলি। আমার দুষ্ট সরস্বতী আমার কানের কাছে চুপি চুপি বলিতেছে যে রাজর্ষি গোলদিঘির ধারে কি কাণ্ড করিবেন তা তো জানো—তখনকার সেই কারণের তেজ এত কাল চাপা ছিল। আজ তাহা নিজমূর্ত্তি ধারণ করিয়া উঠিয়াছে—তাই চিঠিতে কারণের বন্যা উপস্থিত।—বেয়াদপী মাপ করিবেন—কৌতুকের একটা বৃত্তি আছে সেটাকে সামলানো দায়—তাই আমি বেয়াদপি না করিয়া থাকিতে পারিলাম না—কিন্তু আপনি মন্তব্য দিয়াছেন—সুতরাং সাতখুন মাপ (as usual)

পুঃ আমি ভাল আছি, কর্ত্তামহাশয় পূর্ব্বাপেক্ষা ভাল আছেন—সমস্ত মঙ্গল।

ওঁ

শ্রদ্ধাস্পদেষু,
বিনীত নমস্কার নিবেদনঞ্চ,

আপনার শেষ পত্র পাইয়া ও তাহার মর্ম্ম সকলকে অবগত করিয়া আমি তদ্দিনেই শান্তিনিকেতনে বিশেষ কার্য্যানুরোধে গিয়াছিলাম। তার পরে আপনার সে পত্রের উত্তর দিতে ভুলিয়া গিয়াছি। ...আপনার স্নেহ মমতাকে ধন্যবাদ আপনি আমার পত্র না পাইয়া] আমার সংবাদ পত্রান্তরে জিজ্ঞাসা করিয়াছেন। আপনার স্নেহ ও ভালবাসা অতুলনীয়। আমরা আপনার স্নেহের যোগ্য পাত্র নই। আমার ছেলেমেয়ে এখনো ভাল নাই। তাহাদের পীড়া একটু আধটু আছেই আছে। আমাদেরও তাই।

আপনি বোধ হয় এই প্রথম বারে শুনিয়া সুখী হইবেন যে শান্তিনিকেতনে একটি মন্দির নির্ম্মাণের উদ্যোগ হইতেছে। আপনি একবার এই সময়ে শান্তিনিকেতন দেখিতে যাইবেন কি? এইবার শীতকালে একবার অবশ্য অবশ্য যাইবেন—ইহা আমার বিশেষ অনুরোধ। আপনার শরীর এখন কেমন আছে। যোগীন্দ্রনাথ বাবুকে ও অবিনাশকে আমার প্রেমালিঙ্গন দিবেন। আপনি আমার অকৃত্রিম ভক্তি গ্রহণ করুন। পূজ্যপাদ মহাশয় পূর্ব্ববৎ আছেন। ইতি ১০ শ্রাবণ ৬১

স্নেহাকাঙ্ক্ষী
শ্রীপ্রিয়নাথ শাস্ত্রী

কবি উপেক্ষিত

শ্রীকৃষ্ণধন দে

তোমারে কত-না বাসিয়াছি ভাল,
তুমি চির-আঁকা মানসপটে,
হে নদি, কত-না সন্ধ্যা-উষায়
গেয়েছি যে গান তোমারি তটে!
তুমি শুনিবে না কবিতা আমার,
চিরজীবনের সাধনাখানি?
তোমারি নূপুর ছন্দ-মধুর
মুখর তোমার কাব্যে, জানি।
মানুষ শোনে না আমার কবিতা,
তব পাশে আজ এসেছি তাই,
—শুনিবে ভাই?
শত তরঙ্গে ভ্রুকুটিভঙ্গে
নদী হেসে বলে: সময় নাই!

তোমারে কত-না বাসিয়াছি ভাল
হে সাগর, তুমি রত্নাকর,
নীল কৌস্তভ-আভা-রঞ্জিত
তব তরঙ্গ কি মনোহর!
তব উচ্ছল কম্বু-নিনাদে
দিয়েছি কাব্যে ছন্দরোল,
প্রবাল-আসনে সাগর কন্যা
চির হিন্দোলে দিতেছে দোল্।
মানুষ শোনে না আমার কবিতা,
তব পাশে আজ এসেছি তাই,
—শুনিবে ভাই?
উর্মি-ভঙ্গে হাস্য-রঙ্গে
কহিল সাগর: সময় নাই!

তোমারে কত-না বাসিয়াছি ভাল,
পর্ব্বত, তুমি তুঙ্গ-শির,
তুমি রহস্য আদিম যুগের,
তুমি বিস্ময় ধরিত্রীর!
তব গম্ভীর ধ্যানের মূর্ত্তি
প্রেরণা দিয়েছে কাব্যে মোর,
মেঘবালা দেয় ললাটে তিলক,
ঢালে নির্ঝর নয়ন লোর!
মানুষ শোনে না আমার কবিতা,
তব পাশে আজ এসেছি তাই,
—শুনিবে ভাই?
চির-তুষারের অট্টহাস্যে
কহে পর্ব্বত: সময় নাই!

তোমারে কত-না বাসিয়াছি ভাল,
কল্যাণরতা বনানি অয়ি,
কত ফলফুলে ভরেছ অঙ্গ,
নিত্য নূতন সুষমাময়ী!
আদিম যুগের ইতিহাস লয়ে
আজো স্নেহাকুল ও-হিয়াখানি,
তোমারি ছায়ায় বসিয়াছি কত,
কাব্যে লিখেছি তোমারি বাণী!
মানুষ শোনে না আমার কবিতা,
তব পাশে আজ এসেছি তাই,
—শুনিবে ভাই?
বনমর্ম্মরে কৌতুক ভরে
বলিল বনানী: সময় নাই!

ভুলে যাওয়া

শ্রীকামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

ভুলে যাওয়া ফেলে যাওয়া সহজ নাকি
হৃদয়ের সব কথা কি শুধুই ফাঁকি ?
তুমি যে চেয়ে থাকো রাত্রিদিনে
তোমার সেই চোখের আলোয় প্রতিক্ষণে
নানা রঙের ভাবনাকে কি গেঁথে রাখি
ভুলে যাওয়া ফেলে যাওয়া সহজ নাকি ?

আকাশ-ভরা অন্ধকারে চেয়ে থাকা
তারা দিয়ে কোন কথাটি রইল আঁকা।
কত গান আলোয় আলো তোমার মুখে
এ-জীবন পূর্ণ বুঝি দুঃখে-সুখে।
প্রজাপতি ডানার মতো স্বপ্ন দেখি
ভুলে যাওয়া ফেলে যাওয়া সহজ নাকি ?

এপার ওপার

শ্রীসুনীলকুমার নন্দী

নিতলে আলো অন্ধকারে ঝাঁপ দিতে চায় স্বপ্ন
স্মৃতির অতল পাতাল ছুঁতে ; বনকলমীর গন্ধ···
মজা পুকুর···ভগ্ন প্রাসাদ···সামাল সামাল গর্ত
কেউটে সাপের···পা তুলে নাও, শিউরে ওঠে কণ্ঠ,
পোড়ো বাড়ি। তুমি এখন সকাল দুপুর সন্ধ্যা
তুফান ভাঙো, হাজার ভিড়ে পথ খোঁজে পথ নৌকো।

পথ ছড়ানো চতুর্দিকে···ঢেউ ভাঙা জলবিন্দু
হাওয়ায় ধূমল, ঝাপটা মারে, পথ খোঁজা অসাধ্য—
চোখ ভরে জল গড়িয়ে আসে, সাত পুরুষের আয়না
ঝাপসা : মরাই...সাঁঝের প্রদীপ···সবুজ মাঠের শস্য···

ব্যাকুল হয়ে ঝাঁপ দিও না হায় দুরাশা স্বপ্ন—
এপার ওপার তৃষ্ণা জ্বলে, তুফান ভাঙে মধ্যে।

সমাপ্তি

শ্রীমিহির সিংহ

আজ উঠেছিলাম অনেক ভোরে। কাজকর্মের
সুরুর আগে বারান্দা থেকে দেখলাম
রাত্রের শেষ তারাটি ক্ষীণ হয়ে জ্বলছে
ফিকে নীল আকাশের স্নিগ্ধ হাওয়ার উপরে।
দিনের পরিচ্ছন্ন প্রাঙ্গণে ভাঙ্গা কাঁচের টুকরোর
মতন তার কপালেও জোটেনি সমাদর।
আমার কৌতূহলী চোখের সামনেই ধীরে
লেপে মুছে নিল গৃহস্থ সূর্য্যের সম্মার্জ্জনী।
তারকার অপমৃত্যু এ নয়। তাতে তবু থাকে
একটা জ্বলন্ত হৃদয়স্পর্শী শেষ, শেষ হলেও
স্মৃতির কালো পটভূমিকায় তার অন্তর্ধান পথ
অনেকক্ষণ উজ্জ্বল থাকে ফস্ফরাসের দাগের মতন।
তার মাঝে নাটকীয়তা থাকে, শেষ হলেও তার
কথাটা ফুরোয় না। কিন্তু আমার নিঃসঙ্গ
আত্মানুভূতির গভীর আকাশে তীক্ষ্ণ তীব্র
দ্যুতিময় উপলব্ধির মতন যারা বাঁচে—রোজকার
পরিপাটি সংকীর্ণ দিগন্ত 'পরে, তাদের
সকলেরই সমাপ্তি কি সর্ব্বদাই হবে
এমন প্রাত্যহিক অ-নাটকীয় অগৌরবে ?

সে নিজেই ফুটে উঠছে

শ্রীপূর্ণেন্দুপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য

প্রথমে মনই ছিল, শুধু এক মনের আকাশ।
সে-ই তো ঘুমের লোভে আপন ইচ্ছায়
ভূমিশয্যায় এল। আধো-ভাঙা ঘুমে
আবার সে গাছপালা ঝোপেঝাড়ে নিজেকে দোলালো
তারপর রয়ে সয়ে জাগর ডাগর চেতনায়
মানুষের চোখে সে তাকালো।

তারই ঘুম, তারই তন্দ্রা, তারই জাগরণে
মাটি ফুঁড়ে উঠেছি, ফুটেছি।
লুকোচুরি খেলায় সে নিজে
গর্ত্তে লুকিয়ে থেকে টু দিয়েছে,
তারপর বেরিয়ে এসেছে।

নিজের ঘুমের লোভ থেকে সে নিজেই
জেগে উঠছে।
আমি তারই মধ্যে আছি, তার সেই স্বয়ং-বোধে
নিজেকে মিলাতে গিয়ে বারবার তারই পিছুটানে
ঘুমের ঘূর্ণিপাকে ঘুরপাক খাই।

কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের ইতিহাস, ১ম খণ্ড, ১৮২৪-১৮৫৮—শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত।

কলেজের ১২৫ বৎসর পরিপূর্তি উপলক্ষ্যে এই জয়ন্তী গ্রন্থটি প্রকাশিত হয় ও প্রবাসী ও Modern Review পত্রিকার একনিষ্ঠ কর্মী ৺শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এই জয়ন্তী গ্রন্থখানি প্রকাশ ক'রে বাংলার শিক্ষা ও সংস্কৃতি ইতিহাসের বহু নূতন তথ্য উদ্ধার ও পরিবেশন ক'রে সাধারণের প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতা অর্জন করেছেন। তাঁর অকাল মৃত্যুতে আমরা ব্যথিত, তাই তাঁর গবেষণাপূর্ণ গ্রন্থ সমালোচনার মাধ্যমে তাঁকে স্মরণ করছি: ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোং ১৭৫৭ সাল থেকে বাংলা দখল করলেও শুধু জমিদারী সামলান ও খাজনা আদায় কাযেই বেশী সময় ও চিন্তা নিয়োগ করেন। কিন্তু ১৭৫৭ ১৮৫৭ অর্থাৎ পলাশীর যুদ্ধকাল থেকে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা অবধি এই শতকে এমন কয়েকজন মহাপুরুষ বাঙ্গালী জন্মগ্রহণ করেন যাঁরা কোম্পানীকে ভাবিয়েছিলেন যে, শিক্ষা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও ভারতের তথা যুক্তরাজ্যের (United-Kingdom) দেবার অনেক কিছু আছে। পূর্ব ও পশ্চিমের এই সহযোগ ও সহকারিতা যেমন সুস্পষ্ট হয়েছে কলিকাতা তথা মাদ্রাজ ও বম্বে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায় (১৮৫৭), তেমনি প্রাচীন সংস্কৃত ভাষা ও গ্রন্থাদি রক্ষা ও পুনঃপ্রকাশের মাধ্যমে বড় কাজ হয়েছিল তার সাক্ষী আজও বহন করে কলিকাতা সংস্কৃত কলেজ যার আদিপর্বে দেশবরেণ্য পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর কর্ণধার-অধ্যক্ষ ছিলেন। তিনি ৯ বছরের বালক শিক্ষার্থীরূপে ১৮২৯ সালে সংস্কৃত কলেজে প্রবেশ করেন ও ক্রমশঃ সাহিত্যাচার্য সেক্রেটারী ও অধ্যক্ষরূপে তাঁর মনীষা দেখিয়ে পদত্যাগ করেন এক নূতন ভাষা দেশকে উপহার দিয়ে ও চারিত্রিক আদর্শ দেখিয়ে। তাঁর জন্ম ১৮২০ সালে অর্থাৎ হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠা ও মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্মের তিন বছর পরে। কী গভীর ও স্থায়ী তাঁর প্রভাব সেটি নিজে স্বীকার করে গেছেন বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ তাঁর জীবনস্মৃতি ও 'বিদ্যাসাগর' প্রবন্ধে। সেকালের অধ্যাপক পণ্ডিতদের মূল্যবান্ তথ্য ব্রজেনবাবু এ গ্রন্থে দিয়েছেন। রামচন্দ্র বিদ্যালঙ্কার যিনি স্বনামধন্য রাধাকান্ত দেবের সভাপণ্ডিত ছিলেন ও তাঁর প্রধান ছাত্র জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন শতাধিক বৎসরাধিককাল শাস্ত্র চর্চা ক'রে কলেজের তথা হুগলী জেলার (ত্রিবেণী) মুখোজ্জ্বল ক'রে গেছেন, তাঁর ঠাকুর দালান। টোল-তীর্থ) ও গ্রন্থাদি বাবাটি গ্রামের বিদ্যালয়ের শতাব্দী উৎসবে গিয়ে তাঁকে সকৃতজ্ঞ প্রণাম জানিয়ে এসেছি ও "জজ পণ্ডিত"দের কত প্রভাব ছিল Leningrad বিশ্ববিদ্যালয় (Moscow থেকে) গিয়ে অধ্যক্ষ গৌরী শাস্ত্রী ও আমি দেখে এসেছি। পণ্ডিতদের হস্তলিখিত কাগজ বাংলা দেশ থেকে নিয়ে গিয়ে সুদূর Russian Academy সযত্নে রক্ষা করেছেন ও St. Petersberg অভিধান (Anglo-German) অভিধান সংকলনের সময় রাধাকান্ত দেবের শব্দকল্পদ্রুমও প্রকাশ সুরু হয় সেকথা লিখেছি।

তেমনি আদিব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠায় মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ও রাজা রামমোহনের দক্ষিণ হস্তস্বরূপ পণ্ডিত রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ ১০ বৎসরকাল (১৮১৭-২৭) সংস্কৃত কলেজে অধ্যাপনা ক'রে পদচ্যুত হন—এ কাহিনী ব্রজেনবাবু সযত্নে উদ্ধার ও প্রকাশ করেছেন। সেকালে ব্যাকরণ সাহিত্যাদির সঙ্গে বেদান্ত নামক দর্শনের বিশেষ শাখায় গবেষণা ও শিক্ষণ দেওয়া হ'ত। রামমোহনের জীবিতকালেই বেদান্ত শ্রেণীতে দক্ষিণ ভারতের পণ্ডিত রুদ্রমণি দিক্ষিত বাঙালী ছাত্রদের পাঠ দিতেন। প্রসিদ্ধ Bishop College-এর অধ্যক্ষ Rev. W. H. Mill তাঁর সম্বন্ধে লিখেছেন এই Mill সাহেবকেই প্রথম James Prinsep অশোক লিপির পাঠোদ্ধার করে চিঠি লিখেন। সে-চিঠি Bengal Asiatic Society তে আছে। Prinsep সাহেবের সঙ্গে স্মরণ করা উচিত পণ্ডিত কমলাকান্ত বিদ্যালঙ্কারকে, যিনি সংস্কৃত ছাড়া বৌদ্ধ পালী ভাষাও জানতেন, তাই Prinsep সাহেবের অশোক লিপি পাঠোদ্ধারে তাঁকে সাহায্য করেন। সেবিষয়ে উদ্ধৃতি দিয়ে শেষ করি "Asiatic Society of Bengal" এর সহ-সভাপতি Mr. H. Torrens স্পষ্ট লিখে গেছেন (1843 Proceedings.)

"I have with much regret to report the death of the aged and highly respected Pandit Kamalakanta Vidyalanker, the friend and fellow labourer of James Prinsep. The Society owes a debt of gratitude to Kamalakanta and of respect to him as the colleague of James Prinsep."

তিনি "অলঙ্কার" পড়াতেন ও "পুরাতত্ত্ব" শ্রেণীর অধ্যাপকও ছিলেন—অনেকে তাঁকে ভুলে গেছেন কিন্তু ৺হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মশাই সাক্ষ্য দিতেন শুনেছি। তাঁর উপযুক্ত শিষ্য ৺রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ও (আমার গুরু) এবিষয়ে বলতেন যখন Pala যুগের লিপি ASB monograph রাখালবাবু প্রকাশ করতেন। Prof. W. L Wilson Major Prince ও Lt. H, Todd, Capt. Trojer-এর সঙ্গে রাজা রাধাকান্তদেব, রসময় দত্ত ও দেওয়ান রামকমল সেন (কেশব সেনের পিতামহ) প্রভৃতিও নানাভাবে সংস্কৃত কলেজের কাজে সাহায্য করেছেন। 1846-56 এই দশ বছর পণ্ডিত বিদ্যাসাগর মহাশয় কলেজের বহু উন্নতি-সাধন করে গেছেন। তাঁর নামে এক গবেষণাগার ও Hall উদ্বোধন করেছেন শিক্ষামন্ত্রী শ্রীহরেন্দ্র রায় চৌধুরী (২৫ ফেব্রুয়ারী)। সাধারণকে যোগদান ও বিদ্যাসাগর মহাশয়কে অর্ঘ্য দিতে অনুরোধ করি। ব্রজেনবাবুর ইতিহাসখানি সবাইকে পড়তে অনুরোধ করি, তাঁর উত্তরসাধক অধ্যাপক (যাদবপুর) শ্রীগোপিকামোহন ভট্টাচার্য কলিকাতা সংস্কৃত মহাবিদ্যালয় গবেষণা গ্রন্থমালার দ্বিতীয় খণ্ড (১৮৫৮-১৮৯৫) প্রকাশ ক'রে আমাদের কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ করেছেন।

গোপিকাবাবু রামমোহন Macaualy Prinsep'যুগ ছেড়ে E B Cowell প্রসন্নকুমার সর্বাধিকারী ও মহেশ ন্যায়রত্ন যুগে আমাদের পৌঁছে দিয়েছেন দ্বিতীয় খণ্ডে। Cowell সাহেব Tagore Law Professor রূপে Hindu Law বিষয়ে ভাষণ দেন জানি কিন্তু তিনি সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের এতবড় প্রেমিক ছিলেন প্রথম জানলাম—Cambridge বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁর বহু সংগ্রহ আছে, যেমন Hodgson সংগৃহীত নেপালী পুঁথিও দেখে এসেছি। University প্রতিষ্ঠার বৎসরাধিক আগে ১৮৫৬ সালে Cowell সাহেব Presidency কলেজের ইতিহাস ও রাষ্ট্রনীতির অধ্যাপক, Gorden Young তখন DPI ছিলেন ও Higher Education Service গঠন ক'রে মাহিনা বাড়িয়ে এদেশের মানুষদের নিয়োগ সম্ভব হয়। তখন প্রেমচাঁদ তর্কবাগীশ, দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ (সোমপ্রকাশ সম্পাদক) ও রামনারায়ণ তর্করত্ন (কুলীনকুলসর্বস্ব নাটক রচয়িতা) প্রভৃতি মনীষীরা সংস্কৃত কলেজে অধ্যাপনা ক'রে গেছেন। Presdiency College ও সংস্কৃত কলেজের দলিলপত্র দেখে মনোজ্ঞ বিবরণী গোপিকাবাবু আমাদের দিয়ে ধন্য করেছেন। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রতিষ্ঠিত তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা (১৮৪৩ সালে প্রতিষ্ঠিত) প্রায় শতাব্দী কাল (১৯৩০) পর্যন্ত চলিয়াছিল। তার পরিচালক সভায় দেখি অক্ষয়কুমার দত্ত সম্পাদক ও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, রাজেন্দ্রলাল মিত্র, প্রসন্নকুমার সর্বাধিকারী, আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ, রাজনারায়ণ বসু প্রভৃতি। Cowell সাহেব Bethune Societyর আর বহু প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন ও বুদ্ধচরিত ও চণ্ডীকাব্য পাশ্চাত্ত্য দেশে প্রথম প্রকাশ করে যান। ছাপা ও কথা হিন্দুস্থানী ভাষার চর্চা ও কলিকাতার ছাপাখানা ও ewspapern মাধ্যমে প্রচার সুরু হয় বৌদ্ধজাতকাদিও প্রকাশিত হয় Cowell Hodgson Neil Bandale প্রভৃতির সাহচর্যে- এসব খবর পেয়ে আমরা সুখী হয়েছি। প্রাচ্যবাণীর প্রতিষ্ঠাতা অধ্যাপক যতীন্দ্রবিমল চৌধুরীও এ বিষয়ে নূতন তথ্য প্রকাশ করবেন এ আশা রাখি। প্রবাসী সম্পাদক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ও দরিদ্র ব্রাহ্মণ ঘরের সন্তান। কলিকাতায় এসে পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রীর সঙ্গলাভ ক'রে বাংলা, ইংরেজী, হিন্দী প্রভৃতি ভাষায় বহুকাল সুযোগ্য সম্পাদকতা করে গেছেন, তাঁরও শতবার্ষিকী আগতপ্রায়। তাই সংস্কৃত কলেজ কমিটি ও অধ্যক্ষ গৌরীনাথ শাস্ত্রীকে আমাদের সাদর অভিনন্দন ও কৃতজ্ঞতা জানাই। ইতি—

বিদ্যাসাগর কলেজের প্রাক্তন ছাত্র—

শ্রীকালিদাস নাগ

সম্পাদক—শ্রীকেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়
মুদ্রাকর ও প্রকাশক—শ্রীনিবারণচন্দ্র দাস, প্রবাসী প্রেস প্রাইভেট লিঃ, ১২০.২ আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড কলিকাতা-৯

'প্রবাসী' মাসিক সংবাদপত্রের স্বত্বাধিকার ও অন্যান্য বিশেষ বিবরণ প্রতি বৎসর ফেব্রুয়ারী মাসের শেষ তারিখের পরবর্তী সংখ্যায় প্রকাশিতব্য :—

ফরম্ নং ৪

(রুল নং ৮ দ্রষ্টব্য)

১। প্রকাশিত হওয়ার স্থান—	কলিকাতা (পশ্চিমবঙ্গ)
২। কিভাবে প্রকাশিত হয়—	প্রতি মাসে একবার
৩। মুদ্রাকরের নাম—	শ্রীনিবারণচন্দ্র দাস
জাতি	ভারতীয়
ঠিকানা	১২০।২, আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলিকাতা-৯
৪। প্রকাশকের নাম	ঐ
জাতি	ঐ
ঠিকানা	ঐ
৫। সম্পাদকের নাম	শ্রীকেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়
জাতি	ভারতীয়
ঠিকানা	১২০।২, আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলিকাতা-৯
৬। (ক) পত্রিকার স্বত্বাধিকারীর নাম	প্রবাসী প্রেস প্রাইভেট লিমিটেড
ঠিকানা	১২০।২, আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলিকাতা-৯

এবং

(খ) সর্বমোট মূলধনের শতকরা এক টাকার অধিক অংশের অধিকারীদের নাম-ঠিকানা—

১। শ্রীকেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়
১২০।২, আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলিকাতা-৯

২। শ্রীমতী অরুন্ধতী চট্টোপাধ্যায়
১২০।২, আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলিকাতা-৯

৩। শ্রীমতী রমা চট্টোপাধ্যায়
১২০।২, আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলিকাতা-৯

৪। শ্রীমতী সুনন্দা দাস
১২০।২, আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলিকাতা-৯

৫। শ্রীমতী ইশিতা দত্ত
১২০।২, আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলিকাতা-৯

৬। শ্রীমতী নন্দিতা সেন
১২০।২, আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলিকাতা-৯

৭। শ্রীঅশোক চট্টোপাধ্যায়
১২০।২, আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলিকাতা-৯

৮। শ্রীমতী কমলা চট্টোপাধ্যায়
১২০।২, আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলিকাতা-৯

৯। শ্রীমতী রত্না চট্টোপাধ্যায়
১২০।২, আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলিকাতা-৯

১০। শ্রীমতী অলকানন্দা মিত্র
১২০।২, আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলিকাতা-৯

১১। শ্রীমতী লক্ষ্মী চট্টোপাধ্যায়
১২০।২, আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড কলিকাতা-৯

আমি, প্রবাসী মাসিক সংবাদপত্রের প্রকাশক, এতদ্বারা ঘোষণা করিতেছি যে, উপরি-লিখিত সব বিবরণ আমার জ্ঞান ও বিশ্বাস মতে সত্য।

তারিখ—১৫।৩।১৯৬৩ ইং

প্রকাশকের সহি—স্বাঃ শ্রীনিবারণচন্দ্র দাস